প্রবাসী
ষষ্টি-বার্ষিকী
স্মারকগ্রন্থ

প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশক :
প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
শ্রীমতী চিত্রনিভা চৌধুরী

প্রকাশনা :
৩১শে চৈত্র, ১৩৬৭

মূল্য :
বারো টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিন্নপত্রাবলী

ছিন্নপত্র গ্রন্থে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে লেখা ১৪৫টি পত্রের সারসংকলন করা হয় ১৩১৯ সনে। বর্তমান গ্রন্থে ইন্দিরা-দেবীকে লেখা কবির আরও ১০৭টি পত্র সংকলিত। পূর্বোক্ত 'ছিন্নপত্র'-সমূহেরও পূর্ণতর পাঠ এইগ্রন্থে পাওয়া যাইবে। একাধারে কবি রবীন্দ্রনাথ ও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের এমন অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ -অঙ্কিত এক-একখানি ত্রিবর্ণ চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ -অঙ্কিত এক-একখানি প্রতিকৃতিতে ও অন্যান্য একবর্ণ চিত্রে অলংকৃত। মূল্য বাঁধাই ১০.০০ টাকা, পুরু কাগজে ছাপা ও কাপড়ে বাঁধাই ১২.৫০ টাকা।

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

১২৯৮ ও ১৩০০ বঙ্গাব্দে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। কবিকর্তৃক সম্পাদিত পরবর্তী পাঠ রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে বিচ্ছিন্নভাবে সংকলিত থাকিলেও এই দুই-খণ্ড গ্রন্থের যথাযথ পুনর্মুদ্রণ ইতিপূর্বে হয় নাই। বর্তমান সংস্করণে দুই খণ্ড একত্র গ্রথিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া 'ডায়ারি'র প্রাথমিক খসড়াটিও আদ্যন্ত সংকলিত হওয়ায় এই গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য যেমন বহুগুণ বাড়িয়াছে, তথ্যসন্ধানী বিদ্বজ্জনের নিকট ইহার আকর্ষণ বা একান্ত আবশ্যকতাও অল্প হয় নাই। একাধিক প্রতিকৃতিচিত্রে ও পাণ্ডুলিপিচিত্রে ভূষিত, প্রাসঙ্গিক সংকলন ও গ্রন্থপরিচয় সংযুক্ত। মূল্য কাগজের মলাট ৫.০০ টাকা, বোর্ড বাঁধাই ৬.৫০ টাকা।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

স্বচ্ছন্দ চলিত বাংলায় লেখা এই গ্রন্থখানিতে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম ইংলন্‌ড-গমন ও প্রবাসযাপনের (১২৭৮-৮০) বিবরণ দিয়াছেন মনোহর ভাষায় ও ভঙ্গীতে। প্রথমে ভারতীতে (১২৮৬-৮৭) ও পরে গ্রন্থাকারে (১২৮৮) প্রকাশিত। কবির জীবনকালে অচ্ছিন্ন আকারে ইতিপূর্বে আর কখনো ছাপা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ভাব এবং ভাবনার বিবর্তন ধারায় এটির একটি বিশেষ স্থান আছে। রবীন্দ্রজীবনের দূর অতীতের একটি অধ্যায় মনশ্চক্ষে ছবির মতো ফুটিয়া উঠে। মূল্য কাগজের মলাট ৪.৫০ টাকা, বোর্ড বাঁধাই ৬.০০ টাকা।

শেষ সপ্তক

শেষ সপ্তকে মুদ্রিত দশটি গদ্যকবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপ বা রূপান্তর বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে এই সংস্করণের 'সংযোজন' অংশে মুদ্রিত। সচিত্র সংস্করণ : কাগজের মলাট ৪.৫০ টাকা। বোর্ড বাঁধাই ৫.৫০ টাকা।

কালান্তর

নূতন সংস্করণে সাতটি প্রবন্ধ (রচনা ১৩৩৮-৪৬ বঙ্গাব্দ) প্রথম গ্রন্থভুক্ত হইল। মূল্য ৫.৫০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মায়া
এইগুলি দিয়ে সেবা করতে প্রস্তুত
MAYA
হ্যাণ্ড পাম্প লিফ্‌ট ফোর্স এবং ডীপওয়েল টাইপ লিপি
ক্রাউন-ফোলিও সাইজের মুদ্রণ যন্ত্র—ট্রেডল্‌ ও শক্তিচালিত।
সেণ্টিপিটাল হাউস সার্ভিস্‌ পাম্প—নলকূপ, অগভীর কূপ ও রিজার্ভারের জন্য
প্রিসিসন পিলার ড্রিলিং মেসিন—১½″ এবং ১¼″ ছিদ্র করার ক্ষমতাবিশিষ্ট।
নন-ফেরাস টিল্‌টিং ফার্নেস—ঘণ্টায় ২০০ পাঃ এবং ৪০০ পাঃ গালাইবার ক্ষমতাবিশিষ্ট।
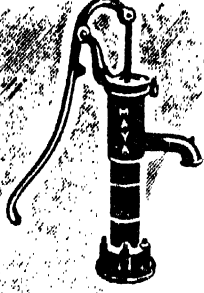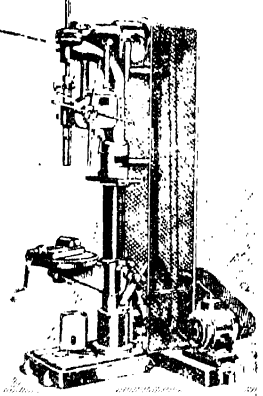
SDRJ-15
বাঙ্গলার গৌরব ~ বিশ্বের বিস্ময়
Glomax
রাঙ্গাজবা কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌, কলিকাতা।

সূচীপত্র

প্রবাসী-প্রসঙ্গ

প্রবাসীর বয়স—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১
প্রবাসীর পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে—জগদীশচন্দ্র বসু ... ২
সচিত্র প্রবাসী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩
প্রবাসীর কথা—শ্রীশান্তা দেবী ৪
প্রবাসীর স্মৃতি—শ্রীহরিহর শেঠ ১১
ষষ্টিপূর্ত্তি—ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১২
রামানন্দ ও ভারতীয় চিত্রকলা—ডক্টর নন্দলাল বসু ১৫
প্রবাসে প্রবাসী—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ১৫
পূজ্যপাদ রামানন্দ—শ্রীযামিনীকান্ত সোম ১৮
সেকালের প্রবাসী—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ২১
প্রবাসীর ষাট বৎসর—শ্রীহুমায়ুন কবির ২২
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—শ্রীসত্যব্রত মিত্র ২৪
প্রবাসী (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ২৮

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩০
তুমি কেমন ক'রে গান কর যে গুণী—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৫
নারী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীদিলীপকুমার রায় ৪১
রবীন্দ্রনাথ ও রাষ্ট্রচেতনা—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৪৮
সাময়িক পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫২
ইংরেজি গীতাঞ্জলির সূচনা—শ্রীক্ষিতীশ রায় ৫৯
রবীন্দ্রনাথ ও ভারতে শিক্ষাশিল্পের ক্রমবিকাশ—শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ ... ৬৩
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্যারিসে একদিন—শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ... ৬৯
স্মৃতিতীর্থ—শ্রীসীতা দেবী ৭২
রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিধ কৃতি ও বাঙালীর কর্ত্তব্য—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ... ৭৬
শতবার্ষিকী (কবিতা)—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭—শ্রীপরিমল গোস্বামী ৬৫৩
রবীন্দ্র-প্রতিভা—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ৭৫৮
রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী (কবিতা)—শ্রীহেমলতা ঠাকুর ৭৮৮

সূচীপত্র

রাষ্ট্র-প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রচেতনায় ষাট বৎসর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১১৬
স্বাধীনতার স্বরূপ—শ্রীচাণক্য সেন ১২১

অর্থনীতি-প্রসঙ্গ

বাঙ্গলার আর্থনীতিক ইতিহাস—শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ ১৪০

দর্শন

ভারতীয়ক্ষেত্রে বিগত ষাট বছরের দার্শনিক চিন্তাধারা—ডক্টর সরোজকুমার দাস ... ১৪৯

বিজ্ঞান

বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি—ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু ও শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৬৪
চাঁদে উঠব কেন—শ্রীপরিমল গোস্বামী ১৭৫
নাইট্রোজেন সমস্যা—ডক্টর নীলরতন ধর ৩৮৪
রসায়নের প্রগতি—ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ ... ৫৪৫

শিক্ষা

বাংলাদেশে গত ষাট বৎসরের শিক্ষা—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন ২০৬
বাংলাদেশে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষা—ডক্টর ত্রিগুণাচরণ সেন ২১৪

সূচীপত্র

সমাজ

গত ষাট বৎসরে বাঙালী হিন্দুর সামাজিক পরিবর্তন—শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত ... ২৪৫

সমাজ-সেবা

সমাজসেবায় বাংলার ষাট বৎসর—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় ২৫৮
রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজসেবা—স্বামী গম্ভীরানন্দ ২৬২
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বিকাশ—স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ ২৬৬
ব্রাহ্ম আন্দোলন ও সমাজসেবা—শ্রীযোগানন্দ দাস ২৭১

ভাষা ও সাহিত্য

ষাট বছরে বাংলা গদ্য—ডক্টর সুকুমার সেন ৩২৭
এ শতকের বাংলা কবিতা—শ্রীনিখিলকুমার নন্দী ৩২৯
বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর—শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য ৩৪৩
বাংলা লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্য—ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ৩৭১
ষাট বছরের ছোটদের সাহিত্য—শ্রীছায়া দেবী ৩৭৬
আয়না—শ্রীলীলা মজুমদার ৬৮৩

সঙ্গীত

বাংলার সঙ্গীত-সংস্কৃতি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ৩৯২
বাংলার রাগপ্রধান সঙ্গীত—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩৯৬
হিন্দী গান 'ভাঙা' রবীন্দ্রসংগীত—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস ৫২৯

সূচীপত্র

ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা

ভারতীয় চিত্র ও মূর্ত্তি-শিল্পের ষাট বৎসর—শ্রীসুধীর খাস্তগীর ৫৫৬
মূর্ত্তি ও চিত্রশিল্প—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ৫৬২
ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগৃতি—শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ... ৫৬৮
বাংলার কৃতী ভাস্কর—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র ৫৭৫
শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসুর শিবলীলার চিত্র—শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ... ৬৯২
শিল্পাচার্য্য নন্দলালের রূপসৃষ্টি—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ৬৯৫
যামিনী রায়ের ছবি—শ্রীবিষ্ণু দে ৬৯৮
শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রকরণ তত্ত্ব—ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী ... ৭০২

...তিকথা

সেকাল আর একাল—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ৬৩৯
জগদীশ-স্মৃতি—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ৬৪২
...আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাদেশিকতা—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় ৬৪৯
...হপাঠী সুভাষ—শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৬৫৮

সূচীপত্র

পিতৃস্মৃতি—শ্রীসীতা দেবী ৬৭০
আমার রামানন্দ ঠাকুরদা—শ্রীপুষ্প দেবী ৬৭৬
রামানন্দ-স্মৃতি—শ্রীঅবনীনাথ রায় ৬৭৭
স্মৃতির ঝাঁপি—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত ৬৭৮
কোর আর্ট্‌স্ ক্লাব—শ্রীসুনীতি দেবী ৬৮৫
কবি-কথা—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৬৮৭

ইতিহাস-চর্চ্চা

বাঙালীর ইতিহাস চর্চ্চা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ৭৬৭

মহিলা-বিভাগ

বাংলার নারী—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ৭০৬
দ্রৌপদী—শ্রীসুরুচি সেনগুপ্ত ৭২৫
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী—শ্রীকমলা দাশগুপ্ত ৭৩০
জীবিকার ক্ষেত্রে এই শতাব্দীর মেয়েরা—শ্রীকনক মুখোপাধ্যায় ... ৭৩৭
আলপনা চিত্র—শ্রীসুলেখা দাশগুপ্ত ৭৪১
স্ত্রীশিক্ষা—শ্রীবেলা দে ৭৪৩

সূচীপত্র

উপন্যাস

শেষ পারানির কড়ি—শ্রীসীতা দেবী (চিত্রিত করেছেন শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী) ... ৪২৪

এষণা—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু (চিত্রিত করেছেন শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার) ... ৫৯৮

নাটক

চম্পক—শ্রীমনোজ বসু ২৯৩

যা হওয়া উচিত নয়—শ্রীবাণী রায় ৫৯৪

গল্প

ঘর—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী ৭৯

দুই বোন—শ্রীশান্তা দেবী ৮৭

কাঁচের পুতুল—শ্রীমহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য ৯৬

আহীর-বধূ—শ্রীঅমিতাকুমারী বসু ১০২

প্রেসিডেণ্ট—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১২৭

জীবনে যে কথা বলিনি—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ১৩১

রঘুনাথের ভাগ্য—বনফুল ১৭৯

ইন্দুমতীর স্বয়ংবর—শ্রীপরিমল গোস্বামী ১৮৯

সরকারী—শ্রীবিমল মিত্র ১৯৫

সেই আমি—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৬

সূচীপত্র

সমাধান—জরাসন্ধ … … ২২৯
বিদ্রোহী—শ্রীচাণক্য সেন … … ২৩৭
পুরবৈয়াঁ—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী … … ২৭৯
মৃদুলা—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র … … ২৮৮
অরণ্যমাতা—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী … … ৩৫৩
পাহাড়তলির হাটে—শ্রীকালীপদ ঘটক … … ৩৬০
পরাভব—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় … … ৩৯৮
ব্যাধি—শ্রীধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় … … ৪০৮
সারস্বত—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় … … ৪১৮
অদৃশ্য সুতো—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় … … ৫৮০
অন্ধ পৃথিবী—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত … … ৫৮৭
মানুষ ভগবান্—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় … … ৭৭৯

(১, ৫, ৭, ৮, ১১, ১২, ১৪, ১৮, ২০ ও ২১ সংখ্যক গল্প চিত্রিত করেছেন শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার।
২, ৩, ৪, ৬, ৯, ১০, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯ ও ২২ সংখ্যক গল্প চিত্রিত করেছেন শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী।)

কবিতা

প্রবাসী—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক … … ২৯
শতবার্ষিকী—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় … … ৭৭
রসমালঞ্চের মালাকর—শ্রীকালিদাস রায় … … ১২৬
মাটির প্রদীপ—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় … … ২২৩
ধূপছায়া—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় … … ২২৩
মমি—শ্রীকৃষ্ণধন দে … … ২২৪
একটি বিশাল গাছ—শ্রীমণীশ ঘটক … … ২২৫
তিনপ্রহর—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ … … ২২৮
উপহার লিপিকা—শ্রীনিশিকান্ত … … ৬২৯
সিতাংশু—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী … … ৬৩৫
সন্ত অ্যালবার্ট—ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তী … … ৬৩৬
লুসিয়া, প্রকৃতি, আমরা—শ্রীবিষ্ণু দে … … ৬৩৬
স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে—শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় … … ৭৪৬
প্রেম ও প্রতিমা—শ্রীশঙ্খ ঘোষ … … ৭৪৬
অঙ্গীকার—শ্রীনিখিলকুমার নন্দী … … ৭৪৬
বৃক্ষবন্দনা—শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় … … ৭৪৭
আসঙ্গনীল—শ্রীসুধীর চক্রবর্ত্তী … … ৭৪৭
কুয়াশা—শ্রীউমা দেবী … … ৭৪৭
সুখদুঃখের ঢেউ—শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত … … ৭৪৮
অন্তিম ভাষণ—শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত … … ৭৪৮
ফিরবে না—শ্রীসুনীলকুমার নন্দী … … ৭৭৮
আমার ভালোবাসা—শ্রীসুনীলকুমার নন্দী … … ৭৭৮
পদ্মাপুরাণ—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী … … ৭৭৮

সূচীপত্র

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী—শ্রীহেমলতা ঠাকুর ৭৮৮
অকৃতজ্ঞ—শ্রীদিলীপকুমার রায় ৭৮৮
স্মরণে—ডক্টর সুশীলকুমার দে ৭৮৯
কাজরী—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর ৭৯০
পদ্মমধু—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯১
সমুদ্র—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ৭৯২
প্রথম প্রশ্ন—শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী ৭৯২
প্রবাসী : নতুন ধ্যান— শ্রীদিলীপকুমার দাশগুপ্ত ... ৭৯২
কত কী পেলাম না যে—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ৭৯২
অবন্ধন—শ্রীমায়া বসু ৭৯৩
সমুদ্র, অরণ্য, আকাশ, তুমি—শ্রীহেনা হালদার ৭৯৩
জীবনজিজ্ঞাসা—শ্রীকরুণাময় বসু ৭৯৩

বিবিধ

ষাট বৎসরের বাংলা ও বাঙালী—ডক্টর কালিদাস নাগ ১০৮
বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি ধারা—শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ ১৬০
ষাট বৎসর পূর্ব্বের ছাত্রজীবন—ডক্টর ভূপতিমোহন সেন ২১৯
রামানন্দ, দাসাশ্রম, দাসী—শ্রীজীবনময় রায় ৬৬৫
সশস্ত্র বিপ্লবে বাঙ্গলার বলি—শ্রীকালীচরণ ঘোষ ৭৪৯
রবীন্দ্রনাথের একটি গান ও তার অ-পূর্ব্বপ্রকাশিত স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার ... ৭৭৬
"মধুর তোমার শেষ যে না পাই"—শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৭৯৪

ছেলেদের পাততাড়ি

গল্প

দুই বন্ধু—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৭৯৫
বটগাছ—শ্রীসুখলতা রাও ৮০৫
স্বর্গবিভ্রাট—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত ৯০৭
আকাশ-প্রদীপ – শ্রীগিরিবালা দেবী ৮১২
কিচ্ছু না—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী ৮২০
পেয়ারার স্বর্গ—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ৮২৭
ভূতুড়ে দোলা—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ৮৩১
নায়েব কাকার কাণ্ড—শ্রীআভা পাকড়াশী ৮৩৫

কবিতা

কুমড়ো ভাতে—শ্রীজীবনময় রায় ৮১৭
ঘুঁটেরাম সংবাদ—শ্রীরবিদাস সাহা রায় ৮৪০
লাল পুতুল তুতুলের বিয়ে—শ্রীকানাই সামন্ত ৮৪১

প্রবন্ধ

পুতুলেরা নাচে—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী ৮৪৩

(২, ৪, ৫, ৮ সংখ্যক গল্প, ১, ২ সংখ্যক কবিতা ও পুতুলেরা নাচে চিত্রিত করেছেন শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী। ১, ৬ ও ৭ সংখ্যক গল্প চিত্রিত করেছেন শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার। ৩ সংখ্যক গল্পটিতে দু'জনেরই আঁকা ছবি আছে।)
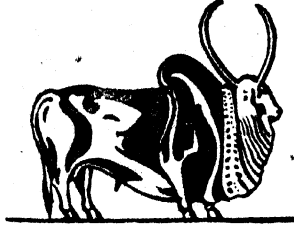
পাঁচ হাজার বছরেরও আগে যে কেশতৈল প্রবর্তিত হয়েছিল

মহেঞ্জোদারো আর হরাপ্পার প্রাত্যহিক ব্যবহারের অস্ত্রপাতি ব্যতীত তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা আর রূপার যে সব শিল্পসম্পদ পাওয়া গিয়েছে তাতে পাঁচ হাজার বছরেরও বেশী আগে ভারতবর্ষে সভ্যতা কত উন্নত ছিল তার পরিচয় মেলে। পরবর্ত্তী ইতিহাসে অবশ্য অনেক জিনিষ পাওয়া যায় না। সেই সুদূর অতীতেও দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়ায় তৈরী কেশতৈল উচ্চশ্রেণীর অভিজাত মহলে ব্যবহৃত হ'ত।

এখন আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় একটি বিশেষ ফলপ্রদ ভেষজ কেশতৈল আবার আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি হ'ল কেয়ো-কার্পিন। এতে কোন কৃত্রিম রং থাকে না।

মনোরম গন্ধযুক্ত কেয়ো-কার্পিন চুলের গোড়ায় স্বাভাবিকভাবে অফুরন্ত প্রাণশক্তি যোগায়।

ফলপ্রদ ভেষজ কেশতৈল
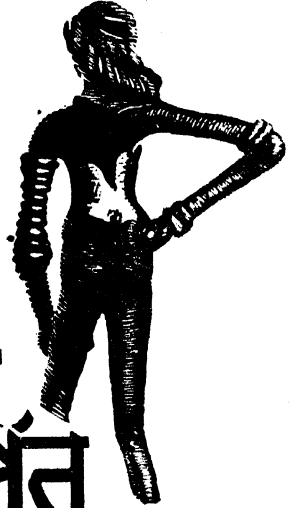
দে'জ মেডিকেল ষ্টোরস্ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বম্বে • দিল্লী • মাদ্রাজ
পাটনা • গৌহাটি • কটক

বর্ষফলাফল কথন

শ্রীনন্দলাল বসু

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

প্রবাসী

ষষ্টিবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

প্রবাসীর বয়স

"প্রবাসী" চল্লিশ বৎসরে পড়িল। ইহার নাবালকত্ব অনেক দিন হইল গিয়াছে, কিন্তু এখনও বার্দ্ধক্য আসে নাই। যদি ইহা আরও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে—আশা করি থাকিবে—তাহা হইলে বছর কুড়ি পরে ইহার বার্দ্ধক্য আসিবে। আমি ত তখন বাঁচিয়া থাকিব না। কিন্তু আমার অভিলাষ এই যে, সে-বার্দ্ধক্য যেন "বার্দ্ধক্যং জরসা বিনা" হয়।

প্রবাসীর চল্লিশে পদার্পণ উপলক্ষে

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৭।

প্রবাসীর পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে

সম্পাদকবরেষু,

তোমার সম্পাদিত প্রবাসী এবার সড়্‌বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। এই উপলক্ষ্যে আমার শুভ আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। তুমি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ, ভয়কে জয় করিয়াছ, তেজস্বী হইয়াছ, সত্যব্রত পালন করিতেছ। শিষ্যের জন্য ইহা অপেক্ষা আমার বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই নাই। তোমার গৌরবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গের বাহিরে সুদূর এলাহাবাদ হইতে প্রবাসী প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মনে করিয়াছিলাম, প্রবাস হইতে প্রকাশিত হইল বলিয়াই বোধ হয় পত্রিকাখানির নামকরণ হইল প্রবাসী। [illegible] জানিতে পারিলাম, তখন হইতেই দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলে। প্রবাসীর মলাটে লিখা থাকিত,

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পরদাস-খতে সমুদায় দিলে॥"

অনেক দিন হইতেই দেশে চারিদিকে একটা জড়ত্ব ও অবসাদ দেখা যাইতেছে। অতি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদ স্বার্থপরতা প্রতিদিন জাতীয় জীবন কলুষিত করিতেছে। দেশের যখন দুর্দ্দিন আসে, তখন দুঃখকে সে নান দিয়াই নিদারুণ করিয়া তোলে।

কেবলমাত্র অতীতের গুণকীর্ত্তন করিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি এবং দুর্ব্বলতাকে দিতেছি। কথার গ্রন্থিবন্ধনে আমরা যে-জাল বিস্তার করিয়াছি, সেই জালে আপনারাও আবদ্ধ হইয়াছি।

জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে; দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে। ভয়ের অতীত হইতে হইবে; সহস্র প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। অবিরাম চেষ্টা ও বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই আমরা দেশের ও জগতের কল্যাণসাধন করিতে পারিব। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু।

এই নিরাশার মধ্যেও যথেষ্ট আশার আলোক আছে। যখন নিশির অন্ধকার সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতম, তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। আঁধারের আবরণ ভাঙ্গিলেই আলো। কোন্ আবরণে আমাদের জাতীয় জীবন আঁধারময় ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলস্যে, স্বার্থপরতায় ও পরশ্রীকাতরতায়। এ-সব অন্ধকারের আবরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

যে-শিক্ষা দ্বারা এই জাতি ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া বৃহত্ত্বের অনুসন্ধান করিত, যাহা দ্বারা মনুষ্য ভয়ের অতীত হইত, যে-বীরধর্ম্মের অনুষ্ঠানে শক্তিহীনের দুর্ব্বহ ভার শক্তিশালী স্বেচ্ছায় বহন করিত,—সেই শিক্ষা ও দীক্ষা এখনও এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই শিক্ষা যেন তোমার লেখা দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

জগদীশচন্দ্র বসু।
প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৩।

সচিত্র প্রবাসী

ছেলেদের জন্যে বই লিখি, কিন্তু সে-বই ছবি দিয়ে সাজিয়ে দেবার ভারও নিজে নিতে হয়। শুধু এই নয়, ব্লক তৈরি করাতে ছুটতে হয় ফিরিঙ্গীর কাছে। হাফটোন এবং থ্রী-কলার ব'লে। দুটো জিনিষই তখন ছাপাখানা থেকে অনেক দূরে অজ্ঞাতবাস করছে। সেই সময়ে রামানন্দবাবুর মাথায় খেয়াল উঠল সচিত্র প্রবাসী প্রকাশ করার। আমি তখন আছি এলাহাবাদে চার্চ্চ-রোডে জজ সাহেবের বাংলায়, আর রামানন্দবাবু থাকেন ভরদ্বাজ-আশ্রমের কাছাকাছি আর-একটা বাসায়—দুজনেই প্রবাসী আমরা। ইণ্ডিয়ান প্রেসের চিন্তামণিবাবু তখন নতুন নতুন ছাপাখানাটা সুরু করেছেন। একজন হিন্দুস্থানী চিত্রকর, সে ছবি আঁকে বই সাজাতে। বাংলার চিত্রকর সবাই ভবিষ্য অবস্থায় তখন, কেবল সকাল হচ্ছে মাত্র। সেই সচিত্র মাসিকপত্রের আরম্ভের যুগে সেই সময়ে রামানন্দবাবুর দুঃসাহসে ভর ক'রে প্রবাসীর প্রথম সংখ্যার লেখা দেবার আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। সচিত্র মাসিক পত্রিকা বার করার স্বপ্ন অনেক দিন এসেছিল আমাদের অনেকের মনে, কিন্তু সে পত্রিকা নিয়মিত ভাবে প্রকাশের বিষয়ে সন্দেহ নিয়েই আসত ভাবনাটা। তাই রামানন্দবাবু যখন নিঃসংশয়ে ছবি ছাপানোর প্রস্তাবটা আমার কাছে পাড়লেন, তখন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েতে পরিপূর্ণ তাঁর সংসারটির দিকে চেয়ে আমি বলেছিলেম, কাগজটা চালাতে গিয়ে শেষ না বিপদে পড়েন। সেই প্রবাসী আর আজকের প্রবাসী সমান ভাবে চ'লে এল, নতুন নতুন আর্টিষ্ট এল ছবি দিতে 'প্রবাসী'তে। এ যে হ'ল তার জন্যে দায়ী আমি নয়, রামানন্দ-বাবু। নতুন বাংলার আর্টিষ্টদের ছবি প্রবাসীতে এবং তাঁর আল্‌বমে, তাঁর রামায়ণে ছাপিয়ে বারে বারে সমালোচকের হাতে তাঁকে তিরস্কৃত হ'তে হয়েছে; আর আমরা আর্টিষ্টরা শুধু যে তাঁর দৌলতে বিনি পয়সায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি তা নয়, নিয়মিত দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্য তাও পাচ্ছি এখনো। কে ছাপ্‌ত ঘরের কড়ি দিয়ে আমাদের ছেলে-মেয়েদের হাতের ছেলেখেলার ছবি সমস্ত, যদি না প্রবাসী [illegible]র করতেন রামানন্দবাবু। কোথায় ছিল তখন নবযুগ, কোথায় বঙ্গবাণী, কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় বা বসুম[illegible]র পুরস্কার। প্রবাসীর সঙ্গে গোড়া থেকেই আমার বিনামূল্যে দেওয়া এবং নেওয়া সম্পর্ক বহু বৎসর আগে সেই প্রবাসে স্থির হয়ে গেছে। এখনকার আর্টিষ্ট, তারা কেউ সত্যিই আমার ছাত্র—কেউ ছাত্র না হয়েও ঐ নামে চ'লে যায়। সবাইকে প্রবাসী বিনা খরচে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, সুতরাং তাদের সবার হয়ে আজ আমি প্রবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আর আমার নিজের দিক্ থেকে বলছি, শোভন কীর্ত্তি তোমার হউক।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৩।
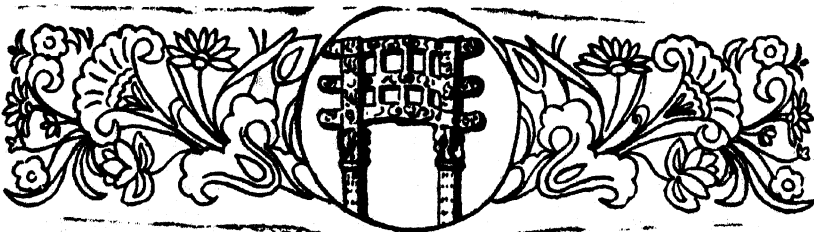
প্রবাসীর কথা

শ্রীশান্তা দেবী

এলাহাবাদ 'কায়স্থ পাঠশালা' কলেজের অধ্যক্ষরূপে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে বাসা বাঁধেন। অল্প বয়স থেকেই নানা প্রসঙ্গে লেখা এবং পত্রিকা সম্পাদনার একটা ঝোঁক তাঁর ছিল, যদিও ভবিষ্যতে এটাই যে তাঁর জীবিকা ও জীবনের ব্রত হবে তা তিনি পূর্ব্বে ভাবেন নি। চাকরির প্রতি বিতৃষ্ণা তাঁর আজীবন ছিল এবং পঁচিশ বৎসর বয়সেও তিনি বলতেন, 'যদি নিতান্ত চাকরি করতেই হয় শিক্ষকতা করব, না হলে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেবার ইচ্ছা আমার নেই।' তিনি ষোল বৎসর অধ্যাপকের কাজ করেন এবং তারই মধ্যে দেশে 'দাসী' ও 'প্রদীপ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। জনসেবার উদ্দেশ্যেই 'দাসী'র আবির্ভাব এবং জনসেবার উদ্দেশ্যেই তাঁর জীবনব্যাপী কর্ম্মযজ্ঞও চলে। তিনি বলতেন, 'বাহাদুরি নেবার জন্যে কলম ধরব না, সেবার জন্যে ধরব।'
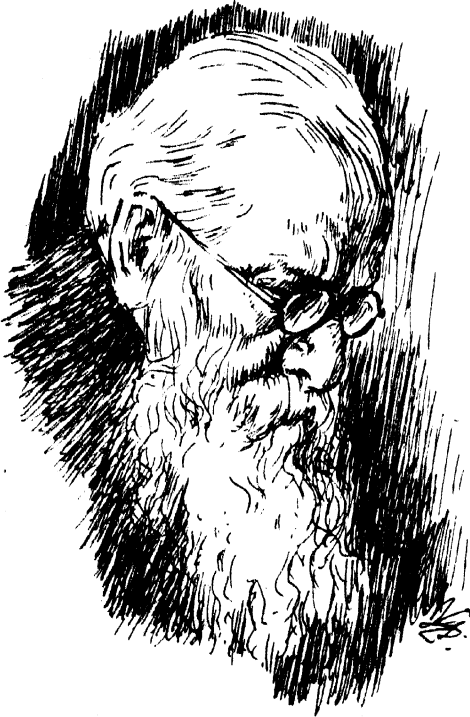
'দাসী' ও 'প্রদীপ' ছেড়ে দেবার পর বাংলা ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে এলাহাবাদের ২।১ সাউথ রোডের বাসাবাড়ী হতে রামানন্দ প্রথম 'প্রবাসী' প্রকাশ করেন।

রামানন্দ বাল্যকাল হতেই ভারতভক্ত ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য ও শিল্পকলা তাঁকে কিশোর বয়স থেকেই মুগ্ধ করেছিল, তাই এই কথা প্রচারের আগ্রহ ছিল তাঁর গভীর। 'প্রবাসী' বাহির করবার সময় প্রবাসের অর্থাৎ বাংলা বাহিরের ভারতবর্ষের এই সমস্ত ঐতিহাসিক তীর্থস্থানের গৌরবের ও স্থাপত্যের কথা প্রথমেই তাঁর মনে পড়েছিল। এগুলি এক অর্থে প্রবাস, কিন্তু অন্য অর্থে স্বদেশ ব'লে গৌরবেরও জিনিস। এই সকল কথা মনে রেখে প্রবাসীর জন্যে একটি সুচিত্রিত মলাট তৈরী হয়। তাতে 'প্রবাসী'কে ঘিরে আছে মনে হয় অমরাবতীর স্তুপ মন্দির, আগ্রার তাজমহল, বর্ম্মার প্যাগোডা, দিল্লীর কুতুবমিনার, বুদ্ধগয়ার বুদ্ধ মন্দির, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মন্দির ও সাঁচির তোরণ। বাংলা কাগজের এরকম জমকালো মলাট ইতিপূর্ব্বে কখনও তৈরী হয় নি, তাই শুধু মলাট দে'খেই অনেকেই খুশী হয়ে উঠেছিলেন।

এলাহাবাদে এ রকম প্রচ্ছদপট ছাপা তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না ব'লে প্রথম চার সংখ্যার প্রচ্ছদপট কলকাতায় ছাপা হয়। ভাদ্রমাস হতে এলাহাবাদেই ছাপা হয়।

সম্পাদকের শিল্পানুরাগ শুধু মলাটেই নয়। সম্পাদক তাঁর সৌন্দর্য্যবোধ ও শিল্পানুরাগের প্রকৃত পরিচয়

দিয়েছেন প্রথম সংখ্যায় স্বলিখিত 'অজন্টাগুহা চিত্রাবলী' প্রবন্ধে। ভারত-শিল্পের এই অপূর্ব্ব নিদর্শন সম্বন্ধে তখনকার দিনে কোন ভারতীয় ভাষার পত্রে কোন শিল্পী কিংবা শিল্প-সমালোচক কোন প্রবন্ধ লেখেন নি। ভারতীয় ভাষার প্রথম প্রবন্ধ চিত্র-সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত হয়ে প্রকাশিত হ'ল 'প্রবাসী'তে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী হতে। তাই আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছিলেন, 'সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল অজণ্টা গুহা চিত্রাবলী। এরূপ প্রবন্ধ আর কোথাও দেখিয়াছি মনে হয় না।' শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখলেন,'বাস্তবিক এলাহাবাদে বসিয়া যে অসাধ্য সাধন মহাশয় করিতেছেন তাহা আপনার ন্যায় বহুদর্শী বিচক্ষণ সম্পাদকের পক্ষে সম্ভব।' সম্পাদকের বয়স তখন মাত্র ৩৬ বৎসর।

তখনকার দিনে রাজা রবি বর্ম্মা, ম্হাত্রে, প্রভৃতি দুই একজন ভারতীয় চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর ইউরোপীয় প্রথায় দেশী চিত্র অঙ্কন ও মূর্তি গঠন ক'রে ইউরোপ আমেরিকায় প্রচুর সম্মান ও প্রশংসা পেয়েছিলেন। প্রথম বৎসরের প্রবাসীতে এঁদের চিত্র ও এঁদের জীবনকথা রামানন্দ স্বয়ং লেখেন। ম্হাত্রের সরস্বতী মূর্ত্তির ছবি ইতিপূর্ব্বে বাংলা বা ইংরেজী কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নি। দেশী প্রাচীন প্রথার পুনরুদ্ধার এর পরের কথা।

প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই সম্পাদক শিল্পী ও শিল্পের বিষয় স্বয়ং প্রবন্ধ লিখতেন। চতুর্থ সংখ্যায় 'ভারতবর্ষের শিল্প' নামে সুচিত্রিত প্রবন্ধটি এই রকম একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এটি প্রধানতঃ জীবনসাধন শিল্প (Industrial Art) বিষয়ে লিখিত। ভারতীয় বহু কারুশিল্পের ছবি এই সংখ্যায় আছে। অথচ তখন দেশে এগুলির এখনকার মত আদর ছিল না।

শিক্ষক রামানন্দের দৃষ্টি শিক্ষা সম্বন্ধে চির জাগ্রত ছিল। তিনি শুধু বিবিধ প্রসঙ্গে নয়, সুচিন্তিত এবং সুগ্রথিত প্রবন্ধেও শিক্ষার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রথম থেকেই চেষ্টিত হন। তাঁর লিখিত 'শিক্ষার উন্নতি ও তাম্রসিত্ত দান' প্রবন্ধটি এখনও পুনর্মুদ্রিত হলে পাঠকদের দৃষ্টি প্রসারিত হবে।

প্রবাসীর বহুমুখী কার্য্যধারার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেকালে ছিল, শিক্ষা, শিল্প ও প্রবাসী বাঙালীর কথা। বাঙালীরা এককালে তাঁদের শিক্ষা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কর্ম্মপটুতার জন্যে বাংলার বাহিরে বহু উচ্চ পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁরা অনেকেই দরিদ্র বাঙালীর সন্তান। এঁদের জীবনকথা ও কৃতিত্বের কথা প্রচার ক'রে বাঙালীর অধিকতর আত্মোন্নতির সঙ্কল্প বৃদ্ধির ইচ্ছা সম্পাদকের ছিল। প্রথম সংখ্যা প্রবাসীর পুরশ্চিত্র তাই ছিল জয়পুরের দেওয়ান কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছবি। সামান্য স্কুল মাষ্টার হতে তিনি রাজ্যশাসনের সুকঠিন কার্য্য পর্য্যন্ত বাংলার বাহিরে ক'রে গিয়েছেন।

রামানন্দের সেকালের বন্ধুদের মধ্যে আমরা শৈশবে প্রায় প্রত্যহ দেখতাম গৌরকান্তি যুবক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও প্রাচীন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনকে। এই জ্ঞানেন্দ্রমোহনকেই প্রবাসীর প্রথম সংখ্যায় রাণাকুম্ভের জয়স্তম্ভ 'ক্ষীরাৎকুম্ভ' বিষয়ে সম্পাদক প্রবন্ধ লিখতে বলেন। সেইদিন জ্ঞানবাবু জানলেন 'প্রবাসী' নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা রামানন্দ প্রকাশ করবেন। তৎপূর্ব্বে তিনি এবং অন্য অনেকেই কিছু জানতেন না। জ্ঞানেন্দ্র প্রবাসী বাঙালী সম্বন্ধে বহু তথ্য রামানন্দকে জানাতেন।

প্রবাসী বাঙালীদের ইতিহাস উদ্ধার করবার ইচ্ছায় প্রথম বৎসরের প্রবাসীতেই চারটি স্বর্ণপদক ঘোষণা করা হয়। এ হতেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁর 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী' নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের সূচনা করেন। এবং প্রবাসীকে কেন্দ্র ক'রেই বইটি ধীরে ধীরে গ'ড়ে ওঠে।

যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়কেও প্রবাসীর আজন্ম বন্ধু বলা যায়। প্রথম সংখ্যা থেকে তিনি প্রবাসীর লেখক।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনও প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রবাসীর লেখক। তিনি অনেক সময় একটি সংখ্যায় ২।৩টি লেখা দিতেন।

সাউথ রোডের বাসা থেকে যখন প্রথম প্রবাসী প্রকাশিত হয় তখন সম্পাদকের আরেকজন সহায় ছিলেন

তাঁর পত্নী মনোরমা দেবী। অন্য একজন ম্যানেজার ছিলেন অবশ্য, কিন্তু গোড়ার থেকেই মনোরমা দেবী সমস্ত হিসেবপত্র দেখতেন। নূতন একটা কাজের সূত্রপাত দেখে শিশুদেরও উৎসাহ লেগে যায়। শৈশবে আমরা কাগজ, আঠা, দড়ি নিয়ে এসে প্রবাসী প্যাক্ করায় সাহায্য করতাম আজও মনে আছে। অবশ্য আমাদের সাহায্যটা বাটির জলে টিকিট ডুবিয়ে কাগজের গায়ে আটকানোর বেশী অগ্রসর হ'ত না। প্রকৃত সাহায্য করতেন মা। রামানন্দ তাঁর কন্যাদের বলেন, "ঐ সময় আমার ও তোমাদের মায়ের একটি পাব্লিক কাজ আরম্ভ হয়।" কাগজের সম্পাদক যদি তাঁর স্বত্বাধিকারী না হন তা হলে তাঁকে বহু অসুবিধা ভোগ করতে হয়। 'প্রদীপে'র সময় সেই সব অসুবিধা তাঁর ছিল। তাই তিনি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব 'প্রবাসী' প্রকাশ করেন। কিন্তু অধ্যাপক ও অতিথি-বৎসল রামানন্দের অর্থ ছিল না। তিনি একরকম শূন্য হাতেই 'প্রবাসী' প্রকাশ করেন, নিজের শক্তি ও বিধাতার আশীর্ব্বাদের উপর বিশ্বাস রেখে। এই দুঃসাহসিক কাজে তাঁর সহায় হন এলাহাবাদের চিন্তামণি ঘোষ। তাঁরই ইণ্ডিয়ান প্রেসে প্রবাসীর প্রথম পাণ্ডুলিপিগুলি বিকশিত হয়েছিল। এমন সুন্দর ছাপা ও বাঁধান বাংলা দেশেও তখন হ'ত কিনা সন্দেহ। প্রবাসীর জন্যই ঐ প্রেসে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। যখন সচিত্র মাসিক পত্রিকাকে চিত্রিত করবার দেশে কোন উপকরণই ছিল না তখনই ১৩০৯ সালে বহুবর্ণ চিত্রিত ছবি ছাপা হয়। স্বদেশের সৃজনী প্রতিভাকে এবং স্বদেশের শক্তিমানদের সম্মানই স্বদেশের সম্মান মনে করতেন ব'লে, যে যুগে জীবিত লোকের জীবন-কথা লেখা চলিত ছিল না সেই যুগেও, রামানন্দ 'প্রদীপে' জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যোদ্ধা প্যারীমোহন, প্রভৃতির চরিত-কথা লিখেছিলেন এবং প্রবাসীর আদিযুগে প্রথম বৎসরে দেড় হাজার টাকা লোকসান দেবার পরও তিনি দ্বিতীয় বৎসরে অজস্র অর্থব্যয়ে অবনীন্দ্রের এবং তাঁর শিষ্যবর্গের ছবি নিয়মিত ছাপবার ব্যবস্থা করেন। ১৩০৮ সালেই তিনি অবনীন্দ্রের ছবি ছাপবার অনুমতি নিয়ে আসেন। কিন্তু সেই সময় কলকাতায় নানা রঙে ছবি ছাপবার উপায় ছিল না ব'লে ১৩০৯-এর আগে অবনীন্দ্রনাথের 'সুজাতা ও বুদ্ধ' এবং 'বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী' ছাপা সম্ভব হয়নি। এ দুটিও প্রথমে এক রঙে ছাপা হয়। তাই অবনীন্দ্র পরে বলেন,

> "রামানন্দবাবুর কল্যাণে আমাদের ছবি আজ দেশের ঘরে ঘরে। এই যে ইণ্ডিয়ান আর্টের বহুল প্রচার—এক তিনি ছাড়া আর কারুর দ্বারা সম্ভব হ'ত না। আর্ট সোসাইটি পারে নি। চেষ্টা করেছিলুম, হ'ল না। রামানন্দবাবু একনিষ্ঠভাবে একাজে লেগেছেন—টাকা ঢেলেছেন—চেষ্টা করেছেন, পাব্লিকে ছবির ডিমাণ্ড ক্রিয়েট্ করেছেন। কত বাধা তিনিও পেয়েছিলেন, আমিও পেয়েছিলুম কত বাধা, কিন্তু আর কারও দ্বারা সম্ভব হ'ল না। আমরা ছবি আঁকিয়ে ছেড়ে দিতুম, উনি ঘুরে ঘুরে কোথায় কি করতে হবে—কি ক'রে গরীবেরও ঘরে দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র ছবির প্রচার করতে হবে সব নিজেই করতেন। এ আমরা কখনই পারতুম না। তিনিই হাত বাড়িয়ে ভার তুলে নিলেন।"

তাই সুনীতিবাবু বলেন,

> "যেদিন প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় অবনীন্দ্র আর তাঁর শিষ্যদের আঁকা ছবি প্রকাশ ক'রে তাঁর সাহিত্য-সাধনা আর সমাজহিতৈষণার অন্তরালে নিভৃতে অবস্থিত রসোপভোগ-শক্তির পরিচয় দিলেন, আর আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের রূপকর্ম্মের প্রতিলিপি দিতে লাগলেন, সেদিন আধুনিক যুগে বাংলার আর ভারত-বর্ষের সুকুমার শিল্পের উজ্জীবন বিষয়ে এক পরম শুভদিন।"

ভারতীয় চিত্রশিল্পের অস্বাভাবিকতাকে বিদ্রূপ ক'রে ক'রে যখন বড় বড় শিল্পীরাও তুলি ও কলমের কোলাহলে চারিদিক মাতিয়ে তুলেছিলেন তখন দৃঢ়চিত্ত শিল্পরসিক রামানন্দই বলেছিলেন,

> "যাহারা এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন তাঁরা বোধ হয় মনে করেন চিত্র ও ভাস্কর্য্যবিদ্যার উদ্দেশ্যই নকল করা। বাস্তবিক তাহা নয়, অন্ততঃ প্রাচীন প্রাচ্যশিল্পীরা তাহা মনে করিতেন না। তাঁহারা কবিদের ন্যায় উপমার রীতি অবলম্বন করিয়া বাহ্য সৌন্দর্য্যের ভিতরের প্রাণটিকে, নিয়ামক সূত্রটিকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা

করিতেন।······কবি জানেন মানুষের চক্ষু ঠিক পদ্মপলাশবৎ হইতে পারে না। তিনি কেবল চক্ষুর দীর্ঘায়তত্ব প্রকাশ করিতে চান। আমাদের শিল্পীদের রীতিও তাই। তাঁহারা স্বাভাবিক গঠনের অবিকল নকল করেন না। কবি যে উপমাটিকে কথায় প্রকাশ করেন, তাঁহারা তাহাকেই চক্ষুর গোচর করিয়া দেন।"

সম্পাদক স্বয়ং ত লিখতেনই, তার উপর অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী ও ভগিনী নিবেদিতাকে দিয়েও প্রবন্ধ লেখাতেন।

ইংরেজ শাসনে ভারতের কি কি দুর্গতি হয়েছে এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ভারতের কত গৌরবের বিষয় ছিল এসব বলা রামানন্দের একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল। তাঁর এই চিন্তাধারার সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল ছিল তাঁর ১৩০৮ সালে পাওয়া বন্ধু মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের চিন্তাধারার। ১৩০৮ সালে একদিন সাউথ রোডের বাংলোতে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সোনালী রেড শোভিত কালো মিলিটারী পোশাক ও হেলমেট প'রে একজন ভদ্রলোক প্রবাসী-সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে আসেন, শৈশবের এই স্মৃতিটুকু আজও মনে পড়ে, কারণ তখন এই রকম পোশাক দেখা আমাদের বিশেষ অভ্যাস ছিল না। বামনদাসবাবুর সেদিনের পরিচয় ক্রমে জীবনব্যাপী সৌহার্দ্দ্যে পরিণত হয়। ১৩০৯ সাল হতেই তিনি প্রবাসীর নিয়মিত লেখক হন। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও নগর সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। প্রবাসীর সাহায্যে এই তথ্যগুলি বাংলা ভাষায় প্রচারিত হয়। এই ভাবেই চাঁদবিবির পূর্ব্বে অপ্রকাশিত একটি চিত্র প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। বাঙালীর ও ভারতীয়দের বহু গৌরবের ইতিকথা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও প্রথম যুগ হতে প্রবাসীতে লেখেন। মহিলা-লেখিকা বিনয়কুমারী ধর ও লজ্জাবতী বসু প্রথমদিকে লিখতেন।

প্রবাসীর প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' কবিতাটি প্রকাশিত হলেও ১৩০৮ সালের অন্য কোন সংখ্যায় রবীন্দ্ররচনা প্রকাশিত হয় নি। তখন রবীন্দ্রনাথ নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে ব্যস্ত। তদুপরি ১৩১২তে রবীন্দ্রনাথের 'ভাণ্ডার' প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী' ৬/৭ বৎসর প্রকাশিত হবার পর যখন বাংলার ও বাংলার বাহিরে প্রবাসীর আবির্ভাবে একটা বড় রকম সাড়া প'ড়ে গিয়েছে তখন উচ্চশিক্ষিত সমাজে বাংলা কোনও মাসিকপত্রের প্রবাসীর মত বহুলপ্রচার ছিল না। এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকতা ছেড়ে দেন। রামানন্দের ইচ্ছা ছিল, প্রবাসীকে রবীন্দ্রনাথের লেখায় অলঙ্কৃত করেন এবং প্রবাসীর সাহায্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিস্তৃততর প্রচার করেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও বন্ধুত্বের দাবীতে লেখা আদায় করতে তিনি কখনও চেষ্টা করেন নি। তিনি জানতেন, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের গুরুভার তখন রবীন্দ্রনাথের স্কন্ধে। তাই তিনি প্রকৃত বন্ধুর মত রবীন্দ্রনাথের অর্থাগমের চেষ্টাই করতেন। যদিও ঠিক এই সময় রামানন্দ প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর জন্য ঋণভারে পীড়িত এবং কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।

বঙ্গদর্শনের 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'র পর রবীন্দ্রনাথ তখন আর নতুন উপন্যাস লেখেন নি। ১৩১৪ সালে প্রবাসীতে 'মাষ্টার মহাশয়' গল্প ও 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল। রামানন্দের ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথ একটি বড় উপন্যাস লেখেন। কবি সে বিষয়ে বলেছেন,

> "এরই কিছুদিন পরে একদিন রামানন্দবাবু আমাকে কোন অনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্যের স্বরূপ পাঠালেন তিনশো টাকা। বললেন, যখন পারবেন লিখবেন, নাও যদি পারেন আমি কোন দাবী করব না। এত বড় প্রস্তাব নিষ্ক্রিয়ভাবে হজম করা চলে না। লিখতে বসলুম 'গোরা'। আড়াই বছর ধ'রে মাসে মাসে লিখেছি, কোন কারণে এতটুকু ফাঁকি দিই নি।'

অনেক পরে ১৩২৪ সালে কেউ কেউ রটান যে, 'সবুজপত্রে'র যুগে প্রবাসী সম্পাদক নাকি নানা কৌশলে রবীন্দ্রনাথের নিকট লেখা আদায় করার চেষ্টা করেন। একথা তিনি রবীন্দ্রনাথকে তৎক্ষণাৎ লেখেন। কারণ কথাটি তাঁর মনে আঘাত করে।

রবীন্দ্রনাথ জবাব দেন,

"এরকম জনশ্রুতি আমার কানে পৌঁছয় নি। কিন্তু যদি করতেন তাতে আমার দুঃখিত হবার কারণ থাকত না। আমি যদি প্রবাসীর সম্পাদক হতুম ত রবীন্দ্রনাথকে সহজে ছাড়তুম না—ভয়, মৈত্রী, প্রলোভন প্রভৃতি নানা উপায়ে লেখা বেশী না পাই ত অল্প, অল্প না পাই ত স্বল্প আদায় ক'রে নিতুম। বিশেষ রবীন্দ্রনাথের দোষ হচ্ছে এই যে, খেজুর গাছের মত উনি বিনা খোঁচায় রস দেন না। আপনি যদি ওঁকে সময়মত ঘুস না দিতেন তা হলে কোন মতেই 'গোরা' লেখা হত না।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'প্রবাসী'র সম্পর্ক এর পর প্রায় চিরস্থায়ী হয়। কেবল 'সবুজপত্রে'র যুগে কিছুদিন কবি প্রবাসীতে অতি সামান্যই লেখা দিতেন।

যাই হোক, বড় ছোট কোন লেখকের লেখাই প্রবাসীর প্রকৃত বিশেষত্ব ছিল না। প্রবাসীর বিশেষত্ব ছিল সম্পাদকের দেশ বা মানবহিতৈষণা এবং তন্নিমিত্ত সাহিত্যসাধনা। তাঁর এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার মত জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর নির্ভীকতা, প্রাঞ্জল চিন্তা ও অতুলনীয় লিখনভঙ্গি মিলিত হয়ে দেশবাসীর সম্মুখে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যে নিবন্ধের ডালি পরিবেশিত হ'ত তাই চিন্তাশীল ও চিন্তানুরাগী পাঠকসম্প্রদায়কে প্রবাসীর প্রতি আকৃষ্ট করে।

প্রবাসীর এই শ্রেষ্ঠ গুণকে ঘিরেছিল তার অন্য কয়েকটি গুণ, যা দেশে পূর্ব্বে প্রায় দেখা যেত না। প্রবাসী লেখকদের নিয়মিত দক্ষিণার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন, প্রবাসী নিয়মিত ৩১ দিন অন্তর পত্রিকা প্রকাশ অবশ্যকর্ত্তব্য ব'লে ধরেন, এবং প্রবাসী নির্ভুল হবার আদর্শ প্রচার করেন।

কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে ১৯০৬ সনে রামানন্দ কলেজের কাজ ছেড়ে দেন। তখন প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু দাঁড়ায় নি। তবু নানা কলেজ এবং ইণ্ডিয়ান প্রেসে চাকরি পেয়েও তিনি আর চাকরি করেন নি। এর পর থেকেই পুরোপুরি পত্রসম্পাদনার জীবিকা গ্রহণ করেন। তাঁর লেখনী সাংবাদিকের লেখনী অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর চিন্তামালার সৃষ্টি ক'রে গিয়েছে।

কলেজ থেকে যেদিন তাঁকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয় তার কথা আজও মনে পড়ে। কলেজের সভা শেষ হবার পর সমস্ত ছাত্ররা 'প্রিন্সিপাল' সাহেবকে বাড়ী পৌঁছে দিতে আসে। তখনকার দিনে ঘোড়ার গাড়ীরই চলন ছিল বেশী। ছেলেরা গাড়ীর ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরা গাড়ী টানতে টানতে নিয়ে এল। বিদায়ের সময় পায়ের উপর মাথা দিয়ে দুই হাঁটু ধ'রে এক-একজন ছেলে কতক্ষণ যে প'ড়ে রইল তার ঠিক নেই। ঠেলাঠেলি করতে গিয়ে দু'চার জন বারান্দা থেকে নীচের নর্দ্দমায় পড়ে গেল। অধ্যাপক ও ছাত্রদের অশ্রুজলের মধ্যে অর্দ্ধ-রাত্রে বিদায়পর্ব্ব শেষ হ'ল।

এর পর পুরা সাহিত্যসেবার জীবন সুরু হ'ল। তাঁর লেখা সামান্য শিক্ষিত মানুষও যেন বেশ বোঝেন এই জন্য তিনি অতি সহজ স্বচ্ছ ভাষায় লেখার ব্রত নেন। সাহিত্যিক নাম পাবার লোভ তিনি ত্যাগ করেন। তিনি বলতেন,

"পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সাহিত্যিক নহে। তাদের দলভুক্ত থাকা দুর্ভাগ্য মনে না করিতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।"

নেপালচন্দ্র রায় বলেন,

"সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জনই দেশসেবক ম্যাটসিনির শ্রেষ্ঠ ও মহান্ ত্যাগ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয় নাই।"

কিন্তু তিনি এর জন্য দুঃখিত ছিলেন না। তিনি দেশকে অজ্ঞান অন্ধকার থেকে এবং পরাধীনতার পাশ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষার কাজেই লেখনী নিযুক্ত রেখেছিলেন। খ্যাতি-প্রতিপত্তির দিকে মন দেন নি। মানবতা ও স্বাধীনতা ছিল তাঁর আদর্শ। তাই মহান্ প্রহরীর মত চিরজীবন তিনি জাতির

শিয়রে সদাজাগ্রত দৃষ্টি মেলে ছিলেন। প্রবাসী যতদিন প্রবাসে অর্থাৎ এলাহাবাদে ছিল ততদিন তার লেখকেরা অধিকাংশই ছিলেন প্রবাসী বাঙালী। রামানন্দ তাঁর বন্ধু বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন, "আমি কলিকাতা-বাসী লেখকদের—বঙ্গবাসী লেখকদের বলিলেও চলে,—সাহায্য অল্পই পাইতেছি, এই জন্য প্রবাসী লেখকদের উপর অধিক নির্ভর করি।" বিজয়চন্দ্র ১৩০৮-এর আশ্বিন থেকেই প্রবাসীর লেখক হন। তিনি কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক সবই লিখতেন। যদুনাথ সরকারও প্রবাসীর চির সুহৃৎ ছিলেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ও কতকটা প্রবাসেই প্রবাসীর লেখক হন। ১৩০৯ সালে কলিকাতার মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রবাসী-সম্পাদককে প্রথম দে'খে চারুবাবু বলেন, "এমন শুভ্রমূর্ত্তি আমি কখনও দেখি নাই। বস্ত্র শুভ্র, বর্ণ শুভ্র, কেশও শুভ্র-প্রায়, সর্ব্বাঙ্গে শুভ্রতার দ্যুতি।"

১৯০৭ সনে চারুবাবু এলাহাবাদে প্রবাসী-সম্পাদকের বাসায় অতিথি হন। এলাহাবাদে আসবার আগেই চারুবাবুর দুই-একটি লেখা প্রবাসীতে ছাপা হয়। পরে দীর্ঘকাল চারুবাবু 'মুদ্রারাক্ষস' নামে প্রবাসীর গ্রন্থ সমালোচনা করতেন। তখনকার দিনে সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রে নিয়মিত ভাল সমালোচনা বাহির হ'ত না। এ অভাব মোচন করতে রামানন্দ সচেষ্ট হন। গ্রন্থ-সমালোচনার জন্যও তিনি পারিশ্রমিক দিতেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রের কোন ছিদ্র পেয়ে ভারতের তদানীন্তন কর্ত্তৃপক্ষ সম্পাদককে নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যেই এলাহাবাদ ত্যাগ করতে বলেন। বাংলা ১৩০৯ সালেই ইণ্ডিয়ান প্রেসে বাংলা কম্পোজিটার না পাওয়াতে প্রবাসী কলকাতার কুন্তলীন প্রেসে ছাপা সুরু হয়। ১৩১৫ থেকে প্রবাসী-সম্পাদক সপরিবারে আবার কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। কাজেই প্রবাসী ঘরে ফিরে এল। তখন তার অফিস ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে।

এরই ২।৩ বৎসর পরে চারুচন্দ্র হন প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক। লোকে তাঁকে বলত 'প্রবাসীর চারু'। প্রবাসীকে তিনি নিজের কাগজের মতই ভালবাসতেন। এই সময় কবি সত্যেন্দ্রনাথ একজন নিয়মিত লেখক হন। তিনি ছিলেন চারুবাবুর বিশেষ বন্ধু। ক্রমে প্রবাসীর আয়তন এবং বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি পায়। যে প্রবাসী ৪০ পৃষ্ঠা নিয়ে আবির্ভূত হয়, ক্রমে সেই প্রবাসী ১৫০, ২০০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত হয়। শুধু সম্পাদকের বিবিধ প্রসঙ্গই ২০।২৫ এমনকি ৩০।৩৫ পৃষ্ঠা হতে লাগল। স্বদেশী আন্দোলনের পর দেশে নানারকম নূতন নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিত। তখন মানুষ, বিশেষতঃ সাংবাদিকেরা, বাংলা ও ইংরেজী মাসের শেষে উদ্‌গ্রীব হয়ে পথ চেয়ে থাকতেন মাসের ১লা প্রবাসী-সম্পাদক কি বলেন তাই জানবার জন্যে। বহু মানুষের মত তৈয়ারী হ'ত চিন্তানায়ক রামানন্দের মতের উপর নির্ভর ক'রে। প্রবাসী অপেক্ষা মডার্ণ রিভিয়ুর প্রভাব আরও বিস্তৃততর হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেই প্রবাসী স্বদেশে বিতাড়িত হয় ব'লে পুলিশের চোখ তখন প্রবাসী মডার্ণ রিভিয়ুর উপর সর্ব্বদা কঠোর দৃষ্টি দিয়ে থাকত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রহস্যালাপে প্রবাসী-সম্পাদক অনেক সময় বলতেন, পুলিশের খাতায় তাঁরা কি কি নম্বরে অভিহিত। অনেক পুলিশ কর্ম্মচারী সম্পাদক মশায়ের বন্ধু ছিলেন ব'লে এই নম্বর দুটি তিনি জানতে পারেন। মাঝে মাঝে তাঁরা খবর দিতেন, প্রবাসী অফিস শীঘ্র খানাতল্লাসী হবে। তখন পুলিশের অবাঞ্ছিত অনেক কাগজপত্র পোড়ান হ'ত। একবার মডার্ণ রিভিয়ুর পুরা একটি ফর্ম্মা রাতারাতি পুড়িয়ে ফেলা হয়। আর একটি মূল্যবান্ কাগজ পোড়াবার ইচ্ছা না থাকায় রামানন্দ সেটি বেয়ারিং পোষ্টে ডাকবিভাগে সঁপে দেন। কাগজটি নির্ব্বিঘ্নে এলাহাবাদে মেজর বসুর নিকট পৌঁছে যায়।

সম্পাদকের কাগজ দুটির গরম অথচ সাবধানী লেখার জন্যে পুলিশ তাঁর প্রতিবেশীদের মধ্যেও গুপ্তচরের ব্যবস্থা করেন। ডাকবিভাগে তাঁর প্রতি চিঠি খোলা হ'ত এবং কোন কোন চিঠি বাজেয়াপ্ত করা হ'ত। এইরূপ একটি চিঠির কথা মোতীলাল নেহরুর মোকদ্দমার সময় কোর্টে পুলিশ প্রকাশ করেন। তা দে'খে মোতীলাল মুখ টিপে হাসেন।

স্বদেশী আন্দোলন, আর একটি আন্দোলন বিশেষ ক'রে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু পত্রে প্রায় এই সময় সুরু হয়—সেটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলনে আশুতোষ প্রমুখ রামানন্দের বহু পুরাতন বন্ধু [illegible]পক্ষের হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু এঁরা প্রতিমাসেই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন না-জানি এবার কোন্ [illegible] দলিল উদ্‌ঘাটিত হবে। দলিল না থাকলে সম্পাদক তাঁর কাগজে কোন অভিযোগের স্থান দিতেন না। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা সকলেই করেন ও ছাপেন। কিন্তু সে যুগে রামানন্দ ছাড়া কারও একাজে অগ্রসর হবার সাহস ছিল না।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আসার পরও বছর দুই বোধ হয় প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর কোন সহকারী সম্পাদক ছিলেন না। সম্পাদক একলাই সব কাজ করতেন। ১৯১০ সনে অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর শরীর খারাপ হওয়াতে প্রথম সহকারী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজের ভার লন। ১৯১৩ হতে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু ব্রাহ্মমিশন প্রেসে ছাপা সুরু হয়।

প্রবাসীতে কষ্টিপাথর, ছেলেদের পাততাড়ি, মহিলা মজলিস, বেতালের বৈঠক, আলোচনা, দেশবিদেশের কথা, পঞ্চশস্য, কত বিভাগই নূতন নূতন খোলা হল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী নবাগত কাগজেরা তাড়াতাড়ি তার অনুকরণ সুরু ক'রে দিলেন। এই সকল বিভাগের মধ্যে সঙ্কলন বিভাগে একসময় রবীন্দ্রনাথ নানা বিদেশী কাগজ থেকে মালমশলা সংগ্রহ ক'রে স্বয়ং এবং তাঁর আশ্রমের শিক্ষকদের দ্বারা লিখিত ছোট ছোট লেখা পাঠাতেন। বিদেশী কাগজগুলি কলকাতা থেকে পাঠাতেন রামানন্দ, তার থেকে কিছু লেখা যেত রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এবং কিছু প্রবাসীতে।

এই সময়ে (১৩১৬ বা ১৭তে) রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে আছে, "রামানন্দবাবু ১০০৲ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন অতএব আমরা ঋণে আবদ্ধ। তুমি সেই যে দুই-একটা কাগজ নিয়ে গেছ তার থেকে কিছু ক'রে দেবে।" আশ্রমের অধ্যাপকদের সঙ্কলিত এই লেখাগুলি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সংশোধন ক'রে প্রবাসীতে পাঠাতেন।

শিশু প্রবাসী অনেক সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং যৌবনে অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে দেশসেবা ক'রে বাঙালীকে বিস্মিত করেছে। এর মধ্যে বেশীর ভাগ দিন প্রবাসীর কেটেছিল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সরু গলিটিতে। এই গলিতেই ভাড়ার গাড়ী চ'ড়ে কতবার রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হয়েছেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বেঙ্গল কেমিক্যাল্ থেকে উপহার এনেছেন, ভগিনী নিবেদিতা প্রবাসী-সম্পাদকের অসুস্থতার সংবাদে এসে খোঁজ করেছেন। মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয় করতে র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ডকেও দেখা গিয়েছে। নামের ফর্দ্দ দিয়ে লাভ নেই। তবে বহুলোক বিদেশ থেকে এলে কলকাতায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে না দে'খে গেলে কলকাতা দেখা সম্পূর্ণ মনে করতেন না। আমাকে একজন পারস্যদেশীয় ভদ্রলোক বলেছিলেন, তাঁর বন্ধুরা তাঁকে কলকাতায় গেলে রামানন্দকে না দে'খে ফিরতে বারণ করেন।

সম্পাদক কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ছেড়ে অন্যত্র বাসা নেবার পরও এই বাড়ীটিতে বহুদিন প্রবাসী অফিস ছিল; পুরাতন যোগসূত্র ছিন্ন হয় নি। পরে প্রবাসী সার্কুলার রোডে চ'লে আসে, পুরাতন প্রবাসীর দলও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। চারুচন্দ্র ঢাকা চ'লে যান, কবি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। কিন্তু পুরাতনের স্থানে দীর্ঘ ষাট বৎসর ধ'রে কত নূতন আবার দেখা দিয়েছেন। আশা করা যায় ভবিষ্যতেও বহু নূতন 'প্রবাসী'র নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেখা দেবেন।

প্রবাসীর স্মৃতি

শ্রীহরিহর শেঠ

নববর্ষাগমের সঙ্গে বৈশাখের 'প্রবাসী'খানি হাতে পেয়ে ষষ্টিবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে পরিচালকদিগের পরিকল্পিত একখানি উৎকৃষ্ট স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায় অবগত হই। স্মৃতিশক্তি প্রায় বিদায় নিতে চলেছে, তা হলেও যে পত্রিকার সঙ্গে তার জন্মদিন থেকে পরিচয় বা সম্বন্ধ বললেও হয়, এই শুভদিনে তার কথা স্বতঃই মনে এসে একটা আনন্দ ও গৌরবে যখন মনটা উল্লসিত, তখন স্মারকগ্রন্থের জন্য কিছু লেখা পাঠানোর আহ্বান পেলাম।

এলাহাবাদ হতে যখন প্রবাসী প্রথম প্রকাশিত হয়, আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক তখন থেকেই। যতদূর মনে পড়ে, প্রবাসীতে আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৩১০ সালের আষাঢ় সংখ্যায়। ঐ প্রবন্ধটির নাম 'কোহিনূরের কথা'।

প্রবাসীর জন্মের পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠনাথ দাসকে প্রকাশক ক'রে 'প্রদীপ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। প্রথম থেকেই কয়েক বৎসর রামানন্দবাবু এর সম্পাদক ছিলেন। সেই তরুণ বয়স হতেই গ্রাহক ও লেখক-রূপে সে-পত্রিকার সঙ্গেও আমি সম্পর্কিত ছিলাম।

সেই পুরাতন দিনের সাময়িক পত্রিকা ও তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে তাদের প্রভাব ও দান সম্বন্ধে কিছু লিখতে পারলে এই স্মারকগ্রন্থের পক্ষে হয় ত অপ্রাসঙ্গিক হ'ত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, একে ক্ষমতার অভাব, তার পর যা-কিছু জানা ছিল তা আর মনে আনতে পারি না। তার পর মরণের জন্য প্রস্তুতির অঙ্গস্বরূপে আমার বহু যত্নে রক্ষিত পত্রিকাগুলি সেদিন কলেজ লাইব্রেরিতে দিয়ে আজ একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। কিছু দেখে শুনে মনে আনব সে সুযোগও নেই।

বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, নবজীবন, নব্যভারত, সাহিত্য, জন্মভূমি, সাধনা, ভারতী, প্রভৃতি সে যুগে কত ভাল ভাল কাগজই না ছিল। একে একে সে-সব বিলুপ্ত হয়েছে। আর্য্যদর্শন, পুরাতন পর্য্যায়ের বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন, এসব প্রকাশের সময়ের কথা তেমন মনে হয় না। তবে বুঝা যায়, নানা কারণে সে যুগে তাদের প্রসিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। প্রবন্ধ-সম্ভারে ত সে-সকল পত্রিকা সমৃদ্ধ ছিলই, উপরন্তু অনেক পত্রিকার মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য ছিল। যতদূর মনে পড়ে, জন্মভূমিতে তখন ছবিও প্রকাশিত হ'ত এবং এ ধরণের সচিত্র মাসিক পত্রিকা তখন আর বড় একটা ছিল না। স্বল্প হলেও হাফ্‌টোন ব্লকের ভাল ছবি বোধ হয় সাহিত্যেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর, কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধি, প্রভৃতির ছবির ব্লকগুলি বিলাত থেকে তৈরি করিয়ে আনীত হয়েছিল, এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশের কথা মনে পড়ে।

অধুনা 'প্রবাসী' এবং তার পর প্রকাশিত সেই ছাঁচের 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', প্রভৃতি কতিপয় মাসিক পত্রিকা, কোন কোন বিষয়ে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও কতকটা একই প্রকারের। অবশ্য কোন্‌টির স্থান কোথায় তা নির্দ্ধারণের শক্তি আমার নেই। তবে পাঠকপাঠিকার মনোরঞ্জনের দিকে দৃষ্টি রেখেও শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্রীয় কল্যাণ, প্রভৃতির দিকে লক্ষ্যপথ হতে প্রবাসী কোনদিন বিচ্যুত হয়েছে ব'লে মনে হয় না। প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' সম্পূর্ণ নিজস্ব।

পরম শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গত রামানন্দবাবুর মনীষা ও পাণ্ডিত্যের কোন পরিচয়ই বাঙ্গলার সুধীসমাজের কাছে অজ্ঞাত না থাকলেও, তাঁর রচিত তেমন কোন রসসাহিত্যের কথা বড় একটা শোনা যায় না। তবে তিনি শুধু শুষ্ক পাণ্ডিত্যেরই অধিকারী ছিলেন না, ইংরেজী সাহিত্যে ছিল তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি। এমনকি অনেকে শুনলে আশ্চর্য্য

হবেন যে, যৌবনে তিনি কবিতাও লিখতেন। তাঁর কোন কোন কবিতা 'ধর্ম্মবন্ধু' এবং 'দাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রবাসীর সঙ্গে প্রথম হতে গ্রাহকরূপে, তার পর লেখক হিসাবে আমার সম্পর্ক। প্রবাসীতে আমার রচনা প্রকাশের বহুকাল পরে তাঁর সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বিংশতিতম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনকালে। সেই সময়ে আমার অধুনালুপ্ত 'জাহ্নবী নিবাস' নামক বাটী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হতে আরম্ভ ক'রে দেশের প্রায় সকল বিশিষ্ট সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে ধন্য হয়েছিল।

আজ পাঁচজনের কাছে যে একটু স্নেহ ভালবাসা পেয়ে থাকি তার মূলেও যে প্রবাসীর কিছুটা কৃতিত্ব আছে একথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি।

ষষ্টি-পূর্তি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

'প্রবাসী'র বয়স ষাট পুরা হইতে চলিল। আমার বয়স সত্তর। প্রবাসী ১৩০৮ সালে যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন আমার বয়স দশ বৎসর। এই ষাট বৎসর ধরিয়া প্রবাসীর সহিত আমার যোগসূত্র বরাবর অটুট হইয়া আছে—প্রথমটায় পাঠকরূপে, পরে কিছুকাল ধরিয়া প্রবাসীর অনুরাগী ও হিতৈষীরূপে। এই ষাট বৎসর বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের পক্ষে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মহত্ত্বপূর্ণ যুগ। প্রায় তিন পুরুষ ধরিয়া আমাদের দেশের উন্নতি, প্রগতি এবং কচিৎ অবনতি, আমাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমাদের জয়-পরাজয়, আমাদের হর্ষবিষাদ, এ সমস্তর সাক্ষী হইয়া প্রবাসী মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। এই ষাট বৎসরের সাতশো কুড়িখানি প্রবাসী পত্রিকার মধ্যে বাঙ্গালীর এ যুগের ইতিহাস ও সাহিত্য নিহিত আছে —খালি বাঙ্গালাদেশের কেন, ভারতবর্ষের ও সমগ্র বিশ্বেরও ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটা দিগ্‌দর্শন এই ষাট বৎসর ধরিয়া প্রবাসীর মধ্যে পাওয়া যাইবে। কিরূপ ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর ও ভারতবাসীর মনের গতি বদলাইয়া গেল ও যাইতেছে—কিভাবে অবস্থাগতিকে পড়িয়া মহামহিম ভারতসম্রাটের অনুরক্ত প্রজা ধীরে ধীরে তাহার চেতনা ও সংবিৎ ফিরিয়া পাইল, কিরূপে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল এবং অবশেষে অপ্রত্যাশিতভাবে সেই স্বাধীনতা অর্জন করিল—এ-সব কথার অবিনশ্বর সাক্ষ্য প্রবাসী দিয়া আসিয়াছে। প্রবাসীর ষষ্টি-পূর্তি উৎসব এই-সব কারণে বাঙ্গালীর পক্ষে, ভারতবাসীর পক্ষে একটি স্মরণীয় ব্যাপার।

এই ষাট বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীকে এবং ভারতবাসীকে প্রবাসী কি দিয়াছে, এ বিষয়ে সামান্য একটু বিচার করিবার উপযুক্ত অবসর এই ষষ্টি-পূর্তি উৎসব। প্রবাসীর প্রথম সংখ্যা হইতেই লক্ষণীয় তাহার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের দেশাত্মবোধ এবং আদর্শপ্রবণতা। যতদূর মনে হয়, ১৩০৮ সালে প্রয়াগ হইতে যখন প্রথম সংখ্যা প্রবাসী বাহির হয় তখন আমি স্কুলের ছাত্র। আমার কাছে এক নূতন জগতের খবর আনিল এই প্রথম সংখ্যার প্রবাসীর পৃষ্ঠার পথে—অজন্টার চিত্রাবলী। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার এক অনাস্বাদিত-পূর্ব রস নয়নপথের মাধ্যমে উপভোগ করিবার অবকাশ আমি পাইলাম। প্রবন্ধটি সম্ভবতঃ গ্রিফিথের বই আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছিল কিন্তু এই ভাবে এই সচিত্র প্রবন্ধের মাধ্যমে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট প্রবাসী যেন এই বাণী আনিয়া দিল—

'আত্মানং বিদ্ধি', নিজেকে জানো। প্রবাসী নামটির মধ্যে বাংলাদেশকে প্রাণ দিয়া ভালোবাসে এমন বাঙ্গালীর মনের ভিতরকার আকুতি যেন প্রকাশ পাইতেছে। মনে হয়, এই নামের পত্রিকা প্রয়াগ হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 'প্রবাসী বাঙ্গালী' এই শব্দটি বাঙ্গালীর মনের মধ্যে গাঁথিয়া গেল।

কয়েক বৎসর পরে যখন প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং স্থায়ীভাবে বাংলা দেশের হৃদয় ও মস্তিষ্ক, বাঙ্গালার সংস্কৃতির কেন্দ্র কলিকাতায় প্রবাসীকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন প্রবাসী আর 'প্রবাসী বাঙ্গালী' রহিল না, সে আবার ঘরবাসী হইল। কিন্তু ঘরবাসী হইলেও বাঙ্গালী তখনও তাহার লক্ষ্য স্বাধীনতায় পৌঁছিতে পারে নাই। সেই জন্য কলিকাতায় প্রকাশিত প্রবাসীর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রবাসী-সম্পাদক এই বচন উদ্ধৃত করিয়া দিলেন—

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে।"

অর্থাৎ তখনও বাঙ্গালী এবং ভারতবাসী নিজের দেশে থাকিয়াও প্রবাসী—এটি স্বাধীনতার জন্য প্রয়াসের ইঙ্গিত ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

প্রকাশনের পারিপাট্যে, প্রবন্ধগৌরবে, চিত্রসম্ভারে প্রবাসী প্রথম হইতেই বাঙ্গালা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকার আসন অধিকার করিতে সমর্থ হয়। প্রবাসীতে প্রবন্ধ বাহির হওয়া বহু বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে একটা সম্মান ও গৌরবের কথা বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় অতি সংক্ষেই আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে যেগুলি শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট অঙ্গ ও প্রকাশভূমি রূপে দেখা দেয়, সেগুলি দুই হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিলেন এবং বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তাহা ধরিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। এ বিষয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির যে সেবা প্রবাসী ও সঙ্গে সঙ্গে 'মডার্ণ রিভিয়ু' করিয়া আসিয়াছিল সেটি ছিল ভারতীয় শিল্পের প্রচার। তখনকার দিনে ভারতের প্রাচীন এবং ততোধিক আধুনিক শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান সাধারণের কাছে, এমনকি শিক্ষিতম্মন্য সজ্জনগণের কাছেও অজ্ঞাত ও অখ্যাত এবং অবজ্ঞাত ও অবহেলিত হইয়াছিল। কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি. হাভেল ভারতীয় শিল্পের লুপ্ত গৌরব আবিষ্কার করিয়া ইউরোপের এবং ভারতবর্ষের সুধীসমাজের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। তিনি অবনীন্দ্রনাথের সাহচর্যে তাঁহার শিল্প-শিক্ষালয়ে ভারতীয় শিল্পের আসন নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিলেন। এই কার্যে হাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের সহায়ক সহযাত্রী এবং উপদেষ্টা হইলেন কতকগুলি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মনীষী—যেমন জাপানের ওকাকুরা কাকুজো, ইংল্যাণ্ডের স্যার জন উডরফ ও নরম্যান ব্লাণ্ট, সুইডেনের হালমার পন্টেনম্যোলার এবং বিশেষ করিয়া সিংহলের আনন্দকুমারস্বামী ও ভারতমাতা যাঁহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছিলেন সেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-পাদানুধ্যাত সন্ন্যাসিনী, আইরিশ কন্যা নিবেদিতা। রবীন্দ্রনাথেরও ইহাতে সহযোগ ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাবে ভারতবর্ষের শিল্পচেতনার পুনরুজ্জীবনে আত্মনিয়োজিত হইলেন। কলিকাতায় প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু প্রতি মাসে আধুনিক ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার রঙ্গিন চিত্র প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহা অনেকের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জনশলাকার কার্য করিল কিন্তু কতকগুলি অজ্ঞান-তিমিরান্ধ লোকের মোহ ঘুচিল না। পূজনীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এই জন্য ইহাদের নিকট হইতে গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে এবং তিনি আর্থিক ক্ষতিও এই সাধু উদ্দেশ্যের জন্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি একবার প্রবাসীর অথবা মডার্ণ রিভিয়ুর এক গ্রাহক ভারতশিল্পের এই সব ছবি তাঁহার কাছে পীড়াদায়ক মনে হওয়ায় এগুলির প্রকাশের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য করিয়া লেখেন এবং ভীতিপ্রদর্শন করেন যে, এইরূপ ছবি প্রকাশ করা বন্ধ না করিলে তিনি আর উক্ত পত্র গ্রহণ করিবেন না। তখনই সম্পাদকের নির্দেশ হইল, ঐ গ্রাহককে জানাইয়া দেওয়া যে, অতঃপর তাঁহার নিকট পত্রিকা যাইবে না।

প্রবাসী পত্রিকার এই একটি প্রথম সার্থকতা ইহাই হইয়াছিল যে, বাঙালী তথা ভারতবাসীর মনে ভারতীয় শিল্প ও চিত্রকলা সম্বন্ধে জ্ঞান, মর্যাদাবোধ এবং রসানুভূতি প্রতিষ্ঠিত করা। প্রবাসীর এই আগ্রহ ও চেষ্টার ফলে

অন্ততঃ আংশিকভাবে বাঙ্গালী অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, সুরেন্দ্র গাঙ্গুলি, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, যামিনী রায় প্রমুখ শিল্পীকে নিজের হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে ইহা একটি কম কথা নয়।

প্রবাসী পত্রিকায় বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ লেখকেরা লিখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন হইতে আরম্ভ করিয়া কবিগুরুর তিরোধানের সময় পর্যন্ত (কিছুকাল ধরিয়া 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে সঙ্গে) প্রবাসী বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের রচনার মুখ্য প্রকাশভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ভাবে বাঙ্গালীর মধ্যে [illegible] নিয়মিত ভাবে রবীন্দ্রনাথের অমর রচনা পরিবেশন করিয়া দিবার কৃতিত্ব প্রবাসীরই। কেবল রবীন্দ্রনাথ নহে, অন্য লেখকদেরও অনেক শ্রেষ্ঠ লেখা প্রবাসীর পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিরূপ আগ্রহের সঙ্গে আমরা মাসের পর মাস রবীন্দ্রনাথের লেখার জন্য, তাঁহার 'গোরা' উপন্যাসের অংশের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিতাম! বহু সাধারণ পাঠাগারে বাঙ্গালা মাসের প্রথমে প্রবাসী পত্রিকা আসিলে তাহার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত।

বাঙ্গালীর সাহিত্য-চেতনার উদ্বোধনে এবং তাহাকে পুষ্ট ও রসসিক্ত করিবার কার্যে এই ভাবে অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া প্রবাসীর কৃতিত্ব অতুলনীয় হইয়া আছে।

আর একটি বিষয়। প্রবাসীর দেশ-সেবা এই পত্রিকাকে বিশেষ গৌরবান্বিত করিয়াছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বলিষ্ঠ ও নির্ভীক স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার জন্য সাধনা, প্রবাসীতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত তাঁহার 'বিবিধ প্রসঙ্গ' শীর্ষক অংশে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সব শ্রেণীর পাঠককেই বিশেষ ভাবে জাগরিত করিয়া রাখিতে সহায়তা করিয়াছিল। এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তখনকার দিনে ব্রিটিশ সরকার প্রবাসীর এই কর্মচেষ্টা বন্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযুক্তিপূর্ণ তীব্র অথচ ভদ্র ও সংযত অভিমতের কোঁনও প্রতিবাদ করা সরকারের সাধ্যের বাহিরে ছিল এবং এইজন্য সরকার প্রবাসীর বিরুদ্ধে কোনও আইনের অস্ত্র প্রয়োগের সাহস করেন নাই।

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই ভাবে প্রবাসী বাঙ্গালার জনগণের মধ্যে উচ্চ ভাব, আদর্শ শিক্ষা, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি সদ্‌গুণ বর্ধনে সার্থকতা অর্জন করিয়াছে। প্রবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত শুদ্ধ ও শুভ্র জ্যোতির্ময় দৃষ্টিভঙ্গি। ইণ্টেলেকচুয়ালিজ্‌ম্ অর্থাৎ অধিমানসিকতা ও ইউনিভার্সাল হিউম্যানিজ্‌ম্ অর্থাৎ বিশ্বমানবিকতার অন্যতম প্রচারকরূপে প্রবাসী কার্য করিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালীর চিত্তে এখন যে একটি যুক্তি ও জ্ঞানের দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়, প্রবাসী পত্রিকা তাহার অভিবর্ধনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

আমি নিজের ব্যক্তিগত সংযোগের কথা বিশেষ বলিতে চাহি না। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের স্নেহলাভ করিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি এবং আমার কতকগুলি প্রবন্ধ ও ধারাবাহিক ভ্রমণ-কথা প্রবাসীর মাধ্যমেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই হেতু প্রথম হইতেই সেগুলির মূল্য জনসমাজে কিছু পরিমাণে আধিক্য লাভ করিয়াছিল। প্রবাসীর সঙ্গে আমার জীবনের ষাট বৎসরের ঘনিষ্ঠ যোগ চলিয়া আসিয়াছে—এই হেতু প্রবাসীর ষষ্টি-পূর্তির এই শুভ অবসরে আমি আমার নিজের পক্ষ হইতে এবং দেশবাসীর পক্ষ হইতে প্রবাসী পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি—এবং প্রার্থনা করি যেন বাঙ্গালীর জীবনে বহু বৎসর ধরিয়া, এমন কি পূর্ণ শতাব্দী ও তাহার অধিককাল ধরিয়া প্রবাসী সত্য শিব সুন্দর এবং জ্ঞান ও রসানুভূতির ধারা অব্যাহত রাখিয়া যাইতে পারে।

—*—

রামানন্দ ও ভারতীয় চিত্রকলা

শ্রীনন্দলাল বসু

প্রবাসী ষষ্টিবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থের আয়োজন হচ্ছে জেনে খুশী হলাম।

শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ কবে হ'ল তা আমার ঠিক স্মরণ নেই; তবে সে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে। আমার ছাত্রাবস্থায়, আমি তখন গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে অধ্যয়ন করি, সেই সময় থেকেই তিনি আমায় বিশেষ স্নেহ করতেন।

বাংলা ১৩২৭ সালে কিছুদিনের জন্যে তাঁর কন্যা শ্রীমতী শান্তা দেবীর চিত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন; সেই বোধহয় আমি প্রথম শিক্ষকতা আরম্ভ করি। তার পর তাঁর সম্পাদিত রামায়ণের জন্যে প্রায় ২০।২২খানি ছবি আমাকে দিয়ে আঁকিয়েছিলেন, যা ক'রে আমি বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেছিলাম।

আমাদের বর্ত্তমান ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণের মূলে তাঁর উৎসাহ ও সাহায্য যে কতখানি শক্তি সঞ্চার করেছিল, তা আজকে বিশেষ ক'রে উপলব্ধি করতে পারি। মডার্ণ রিভিয়ু, প্রবাসী ও চ্যাটার্জ্জির পিক্‌চার এ্যাল্‌বাম্‌স-এর মাধ্যমে সেই যুগে আমাদের চিত্রকলার সর্ব্বাপেক্ষা প্রচার সম্ভব হয়েছিল।

আজকের এই ভারতীয় চিত্রকলার উচ্চ মান ও প্রতিষ্ঠার মূলে শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু একজন প্রধান দরদী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বিশেষ ক'রে ব্যক্তিগত ভাবে আমার চিত্রের প্রতি তাঁর একটি অকৃত্রিম আগ্রহ ও ভালবাসা ছিল যা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।

প্রবাসে 'প্রবাসী'

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণে বলেছিলেন বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন ও সাহিত্য নিয়ে আবির্ভাব যেন 'রাজোচিত' ('রাজবদুন্নতধ্বনিঃ') সমারোহময় হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের সময় আমাদের জন্ম হয় নি। সুতরাং সেই 'গোলেবকাওলী'র, আরব্য উপন্যাসের ও রূপকথার যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য পেয়ে সেকালের পাঠকদের মনে কি ভাব হয়েছিল তা আমাদের অনুভব করাও সম্ভব নয়। আমরা বাংলা সাহিত্যের পুরাতন যুগ, দারিদ্র্যের যুগ প্রায় গত হওয়ার সঙ্গেই জন্মেছিলাম। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গেই পেয়েছিলাম বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব ভাবকল্পনার ঐশ্বর্যের সমারোহময় এক নব বঙ্গসাহিত্য। তখনকার বাংলা সাহিত্যে গল্পগদ্য-সাহিত্য 'কেচ্ছা' নামে অভিহিত হত। সেই সব গল্প গোলে-বকাওলী বা লয়লা মজনুর প্রেমের কাহিনী আর আমাদের পদ্য ও পয়ার ছন্দে রচিত কাশীরামদাস, কৃত্তিবাস, কবি-কঙ্কণ, ভারতচন্দ্রের সাহিত্য-যুগ অনেকটা পিছনে প'ড়ে গেছে তখন।

নবশিক্ষিত বঙ্গসমাজের সাহিত্যরসিক পাঠকদের মনের অতলে কোনখানে যে একটি মার্জ্জিত রসের বুভুক্ষা

ও তৃষ্ণা সুষুপ্ত ছিল, সেটা যেন অকস্মাৎ জেগে উঠে এক অপূর্ব কাব্যময় গদ্যসাহিত্যে, অপূর্ব কাব্যলোকে নতুন রকমের রস আস্বাদনের একটি বিস্মৃত যুগে এসে দাঁড়িয়েছে। যেখানে সাহিত্যের নানা দিকে নানা ভাবের রচনা-সম্ভার অজস্র ধারায় মন্দাকিনীর মত প্রবাহিত হচ্ছে।

আমাদের সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র নেই। বঙ্গদর্শনও নেই। যদিও হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র আছেন। কিন্তু নবযুগের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 'উদয়-মহাযুগ' আরম্ভ হয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকে জয়মাল্যের আশীর্বাদ মহাকবি পেয়েছেন সেই আমলেই। যেন এক মহাসাহিত্যগুরু আগামী যুগের এই মহাকবির আবির্ভাব মানসচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন।

এবং যদিও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'ভারতী' বেরিয়ে আবার হস্তান্তরিত হয়েছে স্বর্ণকুমারীর হাতে, অক্ষয়কুমার সরকারের 'সাধারণী', রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা', সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের 'সাহিত্য'ও দেখা গেছে—কিন্তু 'বঙ্গদর্শনের' মত বলিষ্ঠ চিন্তায় কল্পনায় ভাবসমৃদ্ধ নেতৃত্ব করবার মত পত্রিকা একখানিও ছিল না মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'সব্যসাচী' নেতৃত্ব বলেছিলেন।

এমন সময়ে সহসা ১৩০৮ সালে প্রয়াগের বা এলাহাবাদের প্রবাস থেকে দেখা দিল প্রবাসী। শ্রদ্ধাভাজন রামানন্দবাবুর সম্পাদনায়। প্রবাসীর আগে দেখা গিয়েছিল 'প্রদীপ', সেও রামানন্দবাবুরই সম্পাদনায়; কিন্তু সে 'প্রদীপ' ভাল ক'রে জলবার আগেই নিবে গিয়েছিল। 'প্রদীপ' দেখেছিলাম বাড়ীতে। তার আগে ছিল 'দাসী', সেও তাঁরই সম্পাদিত।

এবং সেই ১৩০৮ সালেই আমরা আমাদের প্রবাসের বাড়ীতে দেখলাম 'প্রবাসী'। তখন খুবই বাল্যকাল। তখনি দেখেছি বা দু' এক বছর পরে দেখেছি। কবে পড়েছি মনে পড়ে না। কিন্তু দেখেছি প্রবাসী। পরিষ্কার ছাপা, চমৎকার কাগজ, বিখ্যাত লেখকদের রচনা, প্রখ্যাত শিল্পীদের,—সে-সময়ের রবিবর্মা, বামাপদবাবু, শশীকুমার হেশ প্রমুখ অনেকের ছবি নিয়ে 'প্রবাসী' মাসিকপত্র-জগতে নতুন আদর্শ, এককথায় বঙ্গদর্শনের মতই যেন একটি নতুন যুগ সৃষ্টি ক'রে দাঁড়াল। যেন প্রথম বছর থেকেই, প্রথম সংখ্যা থেকেই।

বঙ্গদর্শনে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে নবযুগ সৃষ্টি করেছিলেন। রামানন্দবাবু পত্রিকা সম্পাদন ও সাংবাদিক জগতে (তখন সাংবাদিক শব্দটা ছিল না) বলিষ্ঠ চিন্তা, তেজস্বী ভঙ্গি, মত ও মন্তব্যের এক নতুন আদর্শ সৃষ্টি করলেন।

বাংলাদেশের মনের কথা ঠিক জানি না সে বয়সে। কিন্তু প্রবাসে প্রবাসীদের বাংলাদেশের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই নেপথ্যে চেনা-পরিচয় হ'ত। মনে মনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলত। সেই প্রবাসী মানুষদের কাছে 'প্রবাসী'র সমাদরের অবধি রইল না। প্রবাসের শিক্ষিত প্রবাসী বাঙালীদের কাছে 'প্রবাসী' যেন গৃহপঞ্জিকার মত অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠল—অবশ্যপাঠ্য ত বটেই। তাঁদের মনে ও জীবনে সাহিত্যের একটি শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন আনন্দময় পরিবেশ 'প্রবাসী' সৃষ্টি করেছিল।

১৩০৮ সাল থেকে পরের কয়েক বছর প্রবাসী সাহিত্য ও সমাজচিন্তার আদর্শ নিয়েই যেন একমন ছিল। হেনকালে সহসা ১৩১১ সালে প্রথম বঙ্গব্যবচ্ছেদ হ'ল। এর পরে 'প্রবাসী' আর শুধু সাহিত্য-সমাজ-শিল্পকলার ভাবনা নিয়ে ব্যাপৃত রইল না। 'প্রবাসী' যেন দেশের বেদনা-ভাবনা, অপমান-লাঞ্ছনার গ্লানির কথা নিয়ে আকুল হয়ে উঠল। সাহিত্য, সমাজচিন্তা, চিত্র, শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক মহাশয় রাজনীতিকে সমান ক'রে—এক ক'রে নিলেন প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে—প্রবাসীর বিখ্যাত লেখকদের নানা রচনায় ও প্রবন্ধে। দেশকে যেন এই চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে 'প্রবাসী' চালনা করতে লাগল। প্রয়াগে প্রবাসে ব'সেও 'প্রবাসী' বাংলার-ভারতবর্ষের-বিদেশের সবদিক্ দেখতে পেত। দেশের কোনও ছোট সমস্যা 'প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারত না।

দেশের লোক দেশে ব'সে 'প্রবাসী' পড়েন, প'ড়ে কি ভাবেন, করেন, আমরা প্রবাসীরা তা ঠিক জানতাম না। কিন্তু বিদেশের প্রবাসের লোকের চিন্তারাজ্যে 'প্রবাসী' যেন সব বাঙালীর সঙ্গে সঙ্গে সব ভারতবাসীর সমস্ত আশা-নিরাশা বেদনা-ভাবনা ঘনীভূতভাবে মূর্ত ক'রে দেখাবার আদর্শের ভার নিয়েছিল। 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গ জনমতের নির্ভীক, স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, দৃঢ় অভিব্যক্তি ব'লেই সে যুগের শিক্ষিত সমাজ ধ'রে নিতেন, মেনে নিতেন, বিশ্বাস করতেন।

এক কথায় কি সাহিত্যের আদর্শের মান—কি সমাজের সংস্কার বা কল্যাণ-প্রসঙ্গ কিংবা দেশী বা বিদেশী রাজনীতির আলোচনা অথবা শিল্পকলা-প্রসঙ্গ, সমস্ত কিছুতে 'প্রবাসী'র আদর্শ, 'প্রবাসী'র অভিমত, 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় মতামত সমস্ত দেশের ও প্রবাসের শিক্ষিত মানুষের কাছে সর্বাগ্রগণ্য ছিল।

১৩১৪ সাল থেকে 'গোরা' ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে প্রকাশিত হতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দরের 'স্বদেশী যুগের ব্যাধি ও প্রতিকার' আদি নানা আলোচনাময় রচনা—যোগেশচন্দ্র রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ চিন্তাশীল লেখকদের রচনা নিয়ে, তখনকার খ্যাত অখ্যাত নানা লেখক-লেখিকাদের লেখা নিয়ে 'প্রবাসী' দেশে প্রবাসে সাহিত্যের আদর্শ-চিন্তায় বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালীর মর্মের মাঝখানে তার আসন প্রতিষ্ঠা ক'রে নিল।

প্রবাসীর উদ্বোধন-বাণী ছিল—

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"।
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

১৩১৫ সালে প্রবাসী কলকাতায় আসার পর তার প্রচ্ছদে দেখা গেল গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কতকাল পরে' প্রসিদ্ধ গানটির কয়েকটি লাইন—

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
... ...
পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে"।

দেখতে দেখতে 'প্রবাসী'র ("নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ") বলিষ্ঠ নীতির আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ দেশের বহু পত্র-পত্রিকাই গ্রহণ করেছিল যদি বলি, অত্যুক্তি হবে না। যদিও আমাদের আরো কয়েকটি উৎকৃষ্ট পত্র-পত্রিকা, কিছু বা সাহিত্য, কিছু বা সব মিশোনো, মাঝে মাঝে জন্মগ্রহণ করেছিল; আদর্শও বড়ই ছিল, যেমন 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা', 'নারায়ণ', 'বঙ্গবাণী'; কিন্তু 'প্রবাসী'র মত প্রতিষ্ঠা পাবার আগেই তারা অকালপ্রয়াণ করেছে। পাঠকমণ্ডলী তাদের সমাদর ক'রে নিলেও তারা বাঁচেনি।

'প্রবাসী'র নিয়মিত প্রকাশ, সুনির্বাচিত রচনা, মতামতের বিশেষত্ব, সব বিষয়েই 'প্রবাসী'র তুলনা 'প্রবাসী'ই আছে।

'প্রবাসী'র শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সাহিত্যকার বা সাহিত্যিক যাকে বলে তা হয়ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি কোন্ এক অদ্ভুত ক্ষমতায় 'প্রবাসী'র যেমন মার্জিতরুচি পাঠকমণ্ডলী সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি বিদগ্ধ সাহিত্যিক সজ্অও সৃষ্টি করেছিলেন। ভারতবর্ষের সম্পাদক-জগতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ একটি অবিস্মরণীয় বিষয়।

'প্রবাসী'তে লেখা বা রচনা প্রকাশ হওয়া তখনকার দিনের লেখকসমাজে বিশেষ শ্লাঘার বিষয় ছিল। আবার পাঠকসমাজও 'প্রবাসী'র নিয়মিত পাঠক হওয়ার জন্যে গর্ব অনুভব করতেন।

অবান্তর হলেও একটা কথা বলি। বিদেশে প্রবাসে বহুদিন থেকেছি, হিন্দী সাহিত্য পত্র দেখবার সুযোগ হয়েছে—'মাধুরী' 'মনোরমা', ইত্যাদি। পাঞ্জাবেও পত্র-পত্রিকা চোখে পড়েছে। অন্যান্য দেশের মাসিক পত্রের কথা

ঠিক জানি না। তবে, যে হিন্দী সংখ্যা-গরিষ্ঠ লোকের ভাষা— তাতেও 'প্রবাসী'র মত কোন পত্রিকার দেখা পাই নি। না সাহিত্য হিসেবে, না রাজনীতি, না চিত্রকলা বা সমাজ-চিন্তাতে। আজও নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ভারত-বর্ষের চোদ্দটি ভাষায় প্রকাশিত নানা সাহিত্য-পত্রের মধ্যে 'প্রবাসী'ই শ্রেষ্ঠ পত্রিকা।

আজ প্রবাসীর ষাট বছর পূর্ণ হবে। প্রবাসী আমার চেয়ে মাত্র ৬।৭ বছরের ছোট। এই দীর্ঘকাল 'প্রবাসী' দেখবার পড়বার সুযোগ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের একজন হিসেবে আমার মনে হয় প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় যে সুন্দরের, সত্যের, ন্যায়ের বলিষ্ঠ আদর্শ সাহিত্য ও রাজনীতিতে প্রথম থেকে 'প্রবাসী'র জন্য গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর দীর্ঘজীবনের অবসানের পরেও 'প্রবাসী' সেই গৌরবময় ঐতিহ্য বহন ক'রে চলেছে।

প্রবাসীর বয়স্ক পাঠক আরো অনেকে হয়ত আছেন। কিন্তু বর্ষীয়সী পাঠিকা আমার মত আর কে বেঁচে আছেন জানি না। বিশেষ ক'রে প্রায় চল্লিশ বছর কাল ধ'রে প্রবাসিনী পাঠিকাই ছিলাম। প্রবাসীদের অনেকের মত আমরাও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই বাংলা দেশের সান্নিধ্য অনুভব করেছিলাম। বাঙালীর মনের—অন্তরের আনন্দ আশার স্পর্শ পেয়েছিলাম। সাহিত্যের রস গ্রহণ করেছিলাম। যে সময়ে ১৩০৮ সাল থেকে দীর্ঘকাল উৎকৃষ্ট সাহিত্য পত্রিকা কমই ছিল বা ছিল না। সুনিয়মিত প্রকাশিত পত্রিকা তো আরোই কম। এবং দীর্ঘায়ু পত্র তারও চেয়ে কম। 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা'র মত উৎকৃষ্ট পত্রিকাও তো স্বল্পায়ুই ছিল। এবং বলি 'প্রবাসী' দেশবাসী ও প্রবাসী প্রবাসিনীর সমাদরের, গর্বের জিনিষ ছিল, এখনো আছে।

আজ তার ষাট বছরে কামনা করি সে দীর্ঘায়ু হোক। কত দীর্ঘায়ু? দুরাশা হলেও আশা করি যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, বাঙালী থাকবেন।

—•—

পূজ্যপাদ রামানন্দ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

সে ১৯০৫ সনের কথা। কলেজের ছুটির সময় হঠাৎ গিয়ে পড়লুম এলাহাবাদে।

সেখানে আপনজনের কাছেই রইলুম। আনন্দে থাকি, খুব বেড়াই। যেমন খসরু বাগ, চাঁদনির বাজার, বিশেষ ক'রে যমুনার পুল। যমুনার পুলের উপর দিয়ে রোজ সন্ধ্যার আগে পুলের ও-পারে চ'লে যাই। এ-পারে লোকজন, কত কি। ও-পারে গিয়ে দেখি, জনমানবশূন্য স্থান। কি নির্জন, কি শান্ত। যেন ভিন্ন এক দেশে এসে পড়লুম। খুব ভালো লাগে এ জায়গাটি। সেখানে বসি। ব'সে ব'সে কত কি ভাবি। ও-পারে ডান কোণে দেখা যায় ফোর্ট। ফোর্টের নীচেই ত্রিবেণী।

একদিন গেলাম ফোর্ট দেখতে। ফোর্ট দেখলুম। ত্রিবেণীর সঙ্গম-স্থান দেখলুম। কত আনন্দ যে হ'ল, কি বলি! বেশ থাকি। থাকতে থাকতে অনেক দিন যায়। সবাই বলেন—'ওহে, তোমার কলেজ খুলবে কবে?' আমি চুপ ক'রে থাকি, জবাব দিই না। আবার কথা ওঠে, 'তুমি যাবে না? এ কি রকমের তোমার কলেজ যে, দু'মাস হয়ে গেল, এখনো ছুটি?' আমি বললুম, 'কলেজ খুলে গেছে—আমি যাব না।' 'যাবে না? সে কি?' 'না, যাব না। এখানেই থাকব। এ বেশ জায়গা।' 'এখানেই থাকবে? থেকে কি করবে?' 'পড়ব, এখানে কলেজ নেই?'

যাঁর কাছে ছিলুম, তিনি বললেন, 'পড়বে? আচ্ছা, থাকো। এখানেই পড়।' স্থির হ'ল, ভর্তি হব কায়স্থ পাঠশালায়।

গেলাম কায়স্থ পাঠশালায়। ভর্তি হব। এলাহাবাদে তখন বাঙালীর কি প্রাধান্য! পদস্থ সব বাঙালীরা থাকেন। রামানন্দবাবু ছিলেন কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ। বহু বৎসর আছেন। গেলাম ভর্তি হতে। কেরাণী মশাই বললেন, 'অধ্যক্ষের কাছ থেকে এই কাগজখানা সই করিয়ে আনো। আনলেই ভর্তি হবে।' গেলুম অধ্যক্ষের ঘরে। দেখলুম, একটি বড় ঘরে শ্মশ্রুধারী এক ভদ্র ব্যক্তি একাই ব'সে রয়েছেন। ইনিই অধ্যক্ষ রামানন্দবাবু। সামনে গিয়ে নমস্কার ক'রে কাগজখানি ধরতে, মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। কিছু না ব'লে সই ক'রে দিলেন। কলেজে ভর্তি হলুম। কি আনন্দ!

এই কলেজে তখন সুরেন্দ্রনাথ দেবও একজন অধ্যাপক। ইনি ইতিহাস পড়ান। সংস্কৃত পড়ান পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্ট। রামানন্দবাবু পড়াতেন ইংরেজীর এনখ্ আর্ডেন এবং আইভ্যান্‌হো। কি চমৎকার তাঁর পড়ানো। শেষ পিরিয়ডে হ'ত ইংরেজী। আমরা ছাত্ররা তন্ময় হয়ে শুনতুম তাঁর পড়ানো। তিনি পড়িয়েই চলেছেন, ছাত্ররাও শুনছে মোহিত হয়ে। সময়ের দিকে খেয়াল নেই। কখন শেষ হয়ে গেছে পিরিয়ড। হঠাৎ একজন হয়ত ব'লে উঠল সময়ের কথা। তখন হ'ল তাঁর পড়ানো বন্ধ।

কলেজে রামানন্দবাবুকে সবাই দেবতার মত ভক্তি করত। তাঁর সৌম্যমূর্তি ভক্তিরই উপযুক্ত। তখন ছিল ১৯০৫ সন। বাংলা দেশে স্বদেশী যুগের আরম্ভ। বাংলা দেশকে দু'ভাগ ক'রে দিয়েছে ইংরেজ। সেখানে কি উত্তেজনা! তার ঢেউ গিয়ে পৌঁছাল এলাহাবাদে। এলাহাবাদে বহু বাঙালী। বহু পদস্থ বাঙালী। একদিন খবর হল, কাল সমস্ত বাঙালীদের জুতো না প'রে আসতে হবে। বাংলা দেশে কাল কাজকর্ম বন্ধ থাকবে। সবাই কাল সেখানে খালি পায়ে থাকবে। রাখাবন্ধন হবে সেখানে। আমাদের এখানেও তা পালন করতে হবে। পরের দিন কলেজের আর পাশের বাঙলা স্কুলের যত ছাত্র, অধ্যাপক, শিক্ষক সবাই এলেন খালি পায়ে। এই দৃশ্য দে'খে হিন্দুস্থানীদের কেউ শ্রদ্ধায় মোহিত হয়, কেউ বা কৌতুক ক'রে হাসে। তার পর পাড়ায় পাড়ায় সভা হয়। স্বদেশী বক্তৃতা হয়। অনেক সভায় রামানন্দবাবু দেন বক্তৃতা। বক্তৃতাও তাঁর অপরূপ। রামানন্দবাবু দেন বক্তৃতা, আর দেন নেপালবাবু। নেপালবাবু পাশের বাংলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

আমরা কজন বাঙালী ছাত্র বাংলা থেকে ইংরেজী অনুবাদ শিখতুম। এই ক্লাসটি নিতেন রামানন্দবাবু নিজে, তাঁর নিজের ঘরে ব'সে। দেখতুম, তাঁর টেবিলের এক পাশে এক গোছা 'প্রবাসী' রয়েছে। তিনি মাঝে মাঝে সেই 'প্রবাসী' খুলে কিছু অংশ দিতেন, বলতেন অনুবাদ করতে। সেই দেখলুম প্রবাসী পত্রিকা, যার প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দবাবু নিজে।

এর আগেও ছিল এক পত্রিকা নাম 'প্রদীপ'। সে কাগজ পূর্বে তিনি কলিকাতা থেকে বার করতেন। যদিও তিনি স্বয়ং তখন এলাহাবাদেই থাকতেন। এই থেকে বোঝা যায়, বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রীতি ও দরদ কতখানি ছিল। এলাহাবাদ থেকে তিনি ১৩০৮ সালে বৈশাখ মাসে 'প্রবাসী' বার করলেন।

রামানন্দবাবু সে যুগে অর্থাৎ তখনকার কালেও খাঁটি দেশভক্ত ছিলেন। তাঁর দেশভক্তি অতুলনীয়। তেমনটি খুব বেশী দেখি নি। তাঁর দুটি পোশাক দেখেছি। গরমের দিনে হাতে বোনা এড়ি বা মুগার খাকি রঙের পাতলুন ও লম্বা কোট, এবং শীতের দিনে স্বদেশী কালো মোটা পশমের এক লম্বা কোট এবং খাকি পশমের পাতলুন। এই দুই রকম ছাড়া আর কোন পোশাকই পরতে তাঁকে দেখি নি। অপূর্ব মানাত তাঁর সৌম্য মূর্তিটিকে এই খাঁটি স্বদেশী পোশাকে। তখন সবে স্বদেশীর আরম্ভ। সেই আরম্ভের অনেক পূর্ব থেকেই তিনি স্বদেশী।

সেই স্বদেশী যুগের এক বিপদ্ এসে পড়ল কলেজের উপর। স্বদেশীর জন্যই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক, স্থির হল অধ্যক্ষ রামানন্দবাবু পদত্যাগ করবেন। এ কি ভয়ানক কথা! এ কি বিপদ্! এ বিপদ্ যার পক্ষে যাই

হোক, পদত্যাগ তিনি করলেনই। কলেজে হৈ হৈ প'ড়ে গেল। আমরা ছাত্র—আমাদের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তারিখও শোনা গেল যে, অমুখ তারিখের পর তিনি আর কলেজে থাকবেন না। তাই ত! এখানে আছেন বারো বছর।

পদত্যাগ ক'রে কি করবেন? একদিন সংস্কৃতের ক্লাসে আমরা পাঁচ-সাত জন ছাত্র পণ্ডিতজীর ঘরে ব'সে আছি, এমন সময় পণ্ডিতজী এক গোছা ছাপানো কাগজ এনে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,—'দেখো, রামানন্দ তো পাগল হো গয়া। নোক্‌রি ছোড়্ কর্ ক্যা করেগা? রেশেলা নিকালেগা। রেশেলা!—আরে মেরা হিন্দী আখ্‌বার কা (প্রবাসীর অনুকরণে পণ্ডিতজীর হিন্দী পত্রিকা) সাঁইকোড়ো ভি গাহক্ নেহি হৈ। ইন্ কা রেশেলা কৌন্ পড়েগা? কহ তো? এ তো পাগল হো গয়া।'

পণ্ডিতজীর ছুঁড়ে-দেওয়া ছাপানো কাগজ হাতে নিয়ে পড়লুম। দেখলুম লেখা আছে: Modern Review and Miscellany. Edited by Ramananda Chatterjee. বেশী কথা নয়, বাহুল্য কথা নয়। শুধু কে কে লিখবেন, কি কি বিষয় থাকবে পত্রিকায়, সেই কথা। প'ড়ে বোঝা গেল, এ হবে এমন এক পত্রিকা, যাতে দেশের কথা আলোচিত হবে।

আমরা দেখলুম, পড়লুম, বুঝলুম—আনন্দ পেলুম। কিন্তু পণ্ডিতজীর গজগজানি চলতেই থাকল। কে পড়বে এ পত্রিকা? কি ক'রে চলবে? পণ্ডিতজীর রামানন্দ-প্রীতি ছিল অসাধারণ। কিন্তু পণ্ডিতজীর এই ভয় ছিল অমূলক।

তার পরে এল রামানন্দের বিদায়-অভিনন্দনের দিন। অপরাহ্ণে কলেজ-হলে বিদায়-অভিনন্দন হচ্ছে। কে আর কি বলবে? সকলে চোখের জলেই ভাসছে। সকলে কেঁদেই অস্থির। যেন একান্ত আপন জন চ'লে যাচ্ছেন। কি বেদনা, কি অস্থিরতা, কি দুঃখ! এমনতরোটি দেখিনি আর কোথাও।

তখন শীতকাল। রামানন্দের 'মডার্ণ রিভিয়ু' বেরুল। কাড়াকাড়ি, লোফালুফি কলেজের ভেতর কাগজ নিয়ে। কি অপূর্ব সম্পদ্ তাতে রয়েছে। শিক্ষিত মহলে হৈ হৈ। পর পর তিন সংখ্যা বেরুল এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে। অপূর্ব প্রচার হ'ল। অত্যন্ত সাফল্যলাভ করল, আর তার বিস্তার হ'ল আশাতীতরূপে। তার পর?

তার পর তিনি এলাহাবাদ থেকে চ'লে গেলেন কলিকাতায়। 'প্রবাসী' আগে থেকেই ছিল। এখন যোগ হ'ল 'মডার্ণ রিভিয়ু'। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' দু'টি কাগজ। দু'টি কাগজ কি রকমের? তা বলবার আর প্রয়োজন আছে কি? মনে হয়, এ দুটি কাগজ বাংলায় সাংবাদিক জগতের শিক্ষাগুরু। একথা বললে বাহুল্য কিছু বলা হয় কি? সে যুগে আর কাগজ ছিল কোথায়? ছিল ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্যপত্রিকা—'ভারতী', আর ছিল সমাজপতি মশায়ের 'সাহিত্য' আর 'নব্যভারত'। এগুলিতে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি থাকত। কিন্তু 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' ছিল অনেকাংশে রাজনৈতিক পত্রিকা। লেখার গুণপণায়, সম্পাদকীয় মূল্যবান্ আলোচনায় সুতরাং মর্যাদায়, 'প্রবাসী' ছিল বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। আর 'মডার্ণ রিভিয়ু'? এর লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন, কারা? যাঁরা সব লেখক ছিলেন, তাঁদের বাদ দিয়ে ভারত ছিল তখন অচল।

অধ্যাপনার বিষয়ে রামানন্দ ছিলেন যেমন অসাধারণ, অধ্যাপনা ছেড়ে এসে দেশের সেবাতেও হয়েছিলেন তেমনি অসাধারণ, অসামান্য। তিনি অসাধারণ দেশপ্রেমিক ও অসামান্য সাংবাদিক।

'প্রবাসী' কথা থেকেই মনে হয় 'প্রবাসী বাঙালী' কথার সৃষ্টি এবং 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন' কথারও উদ্ভব। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ছিলেন রামানন্দেরই সৃষ্টি। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন জ্ঞানেন্দ্র-মোহন। যে পুস্তকে প্রবাসী বাঙালীর কথা, প্রবাসী বাঙালীর কীর্তিকলাপের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। সে-সব কথা এখনকার কালে পরিচিত কি? অপরিচিত ব'লেই মনে হয়। সে-সকলের অস্তিত্ব এখন আছে কি? অথচ সে-সকল বাঙালীর গুণপনায় ও মর্যাদায় ছিল ভরপুর। সে কথা কেউ স্বীকার করবেন কি? অতীত কি ভুলে যেতে হবে?

প্রবাসী বাঙালী সম্বন্ধে, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে কত অমূল্য কথা কতভাবে রামানন্দ ব'লে গেছেন। সে-সকল এখনকার কালে বিস্মৃতপ্রায়। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় বলেছেন,—"বাংলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাষা ও সাহিত্য ভারতবর্ষে নাই।......বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বঙ্গের সংস্কৃতির সহিত যোগ রক্ষা করা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বাঙালীর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন ও রক্ষা করা 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে'র প্রধান উদ্দেশ্য।..." বলতে হবে, এই উদ্দেশ্য এখন সাধিত হয়েছে 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে'র দ্বারা। অবশ্য এ-সব খুবই কল্যাণকর। রামানন্দ তখনকার 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে'রও কত বেশী সেবা ক'রে গেছেন। কতবার কত সম্মেলনে যাওয়া, সারগর্ভ বক্তৃতা দেওয়া, জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেওয়া—এ-সকল যে কত করেছেন তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত, তার হিসেব নেই।

পূজ্যপাদ রামানন্দকে সবিনয়ে প্রণাম করি।

—০—

সেকালের প্রবাসী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বাল্যকালে যখন শান্তিনিকেতনে পড়তে গেলাম, দেখতাম, মাসের প্রথমে নিয়মিত সময়ে প্রবাসী পত্রিকা আসত। সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। শান্তিনিকেতনে অবশ্য অন্য মাসিকপত্রও আসত,—তবু প্রবাসীর সঙ্গে ছিল বিশেষ সম্বন্ধ। তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রবাসীর প্রধান লেখক, যতকাল জীবিত ছিলেন তিনিই ছিলেন প্রধান লেখক।

শান্তিনিকেতনের অন্য অনেক অধ্যাপকও, যেমন অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, জগদানন্দ রায়, প্রভৃতি প্রবাসীর নিয়মিত লেখক ছিলেন। এই-সব কারণে প্রবাসীকে আমরা কেমন যেন নিজেদের কাগজ ব'লে মনে করতাম।

ষাট বৎসরের জীবনে 'প্রবাসী' বাঙালীর মানসিকতায় যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে, বাংলার সংস্কৃতিতে যে স্পৃহনীয় স্থান লাভ করেছে—সে বিবরণ ঐতিহাসিকরা দেবেন, কারণ তা গত ষাট বছরের ইতিহাসের অন্তর্গত। আমার জ্ঞানের এলাকার মধ্যে প্রবাসী যে আসন লাভ করেছে তাই বলতে বসেছি। সেকালে প্রবাসীতে লেখা বের হওয়া একটা মস্ত সম্মান ছিল। আর সে সম্মান লাভ করতে আমাকে অল্প শরনিক্ষেপ করতে হয় নি। অবশেষে একবার, খুব সম্ভব সম্পাদকীয় অনবধানতার সুযোগে, একটি কবিতা প্রকাশিত হ'ল প্রবাসীতে। সেদিনের উল্লাস আজও ভুলতে পারি নি, পারা সম্ভবও নয়। তার পরে আরো অনেক লেখা বেরিয়েছে, প্রবাসীর পথ সুগম হয়েছে—কিন্তু সেই প্রথম প্রকাশের আনন্দ প্রথম শ্লোকের আনন্দ হয়ে বিরাজ করছে আমার মনে। প্রবাসীর বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হচ্ছে, আমারও ষাট হতে চলল। প্রবাসী মস্ত প্রতিষ্ঠান, আমি সামান্য লোক, তাই আর কিছু না হোক অন্ততঃ সমবয়স্কতার যোগ অনুভব করছি তার সঙ্গে, অর্থাৎ সমান বয়সের সমবেদনা। আশা করছি প্রবাসী আয়ুর শতক পূর্ণ ক'রে শতাব্দীর চক্রাবর্ত্তন সম্পূর্ণ করবে।

প্রবাসীর ষাট বৎসর

হুমায়ুন কবির

কবে প্রথম প্রবাসীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, সেকথা আজ স্পষ্ট মনে পড়ে না। স্কুলে থাকতেই প্রবাসী পড়তে সুরু করেছিলাম, এবং তখন থেকেই প্রবাসীর অনুরাগী হয়ে পড়ি। যখন কলেজে ভর্ত্তি হলাম, তখন বাঙলার সাময়িক সাহিত্যে প্রবাসীর স্থান অনন্য বললেও অত্যুক্তি হবে না।

রবীন্দ্রনাথের রচনা পূর্ব্বেও পড়েছি, কিন্তু সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে যখন শিখলাম তখন আমার বয়স তের-চোদ্দ হবে। প্রবাসীও বোধ হয় সেই বয়সেই আমার মনকে প্রথম নাড়া দিয়েছিল। বস্তুতঃপক্ষে, বহুদিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং প্রবাসীকে আলাদা ক'রে দেখিনি। সে সময় প্রায় প্রতিমাসেই রবীন্দ্রনাথের নতুন কোন কবিতা, প্রবন্ধ বা অন্য রচনা প্রবাসীতে প্রকাশিত হ'ত এবং সমস্ত মাস আমরা উদ্‌গ্রীব আগ্রহের সঙ্গে তার জন্য প্রতীক্ষা করতাম। প্রবাসীর প্রতি সেই প্রথম অনুরাগের দিনে রবীন্দ্রনাথের রচনা ভিন্ন তার অন্যান্য অবিসংবাদী গুণ অন্ততঃ আমাকে তেমনভাবে স্পর্শ করে নি।

কলেজে ভর্ত্তি হবার পরে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের রচনা আরো নিবিড়ভাবে ভালবাসতে এবং বুঝতে শিখলাম, সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী এবং বিদেশী সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশের সঙ্গে পরিচয়ও বাড়তে লাগল। সেই সময় থেকেই প্রবাসীর অন্যান্য রচনাও হৃদয় এবং মনকে নাড়া দিতে সুরু করে। পরে যাঁরা নানাভাবে বাঙলা সাহিত্যের সেবা করেছেন, বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই প্রথম প্রবাসীর পাতায় পরিচয় হয়। নতুন নতুন লেখক আবিষ্কার এবং বাঙলার জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের রচনা ছড়িয়ে দেবার কাজে সে যুগে প্রবাসীর যে দান, বাঙলা সাহিত্যের অনুরাগী কোনদিনই তা ভুলবে না।

আমরা তখন ভাবতাম যে প্রবাসীতে রচনা প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাহিত্যিক হিসাবে পুরোপুরি স্বীকৃতি-লাভ হয় নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যেখানে লেখা পাঠান, সেই পত্রিকায় তাঁরই লেখার সঙ্গে লেখা ছাপা হবে এটা ছিল তখনকার তরুণ লেখকদের স্বপ্ন। বস্তুতঃপক্ষে, প্রায় আট-দশ বৎসর প্রবাসী যেভাবে সাহিত্যেকের প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আমার অভিজ্ঞতায় অন্য কোন বাঙলা কাগজের বেলায় তা দেখিনি। কলেজ জীবনের শেষদিকে কিছুদিন 'বিচিত্রা' প্রবাসীর চেয়েও সাহিত্যিকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রবাসীর আধিপত্যের দিনে তার যে প্রভাব, বিচিত্রা তার শ্রেষ্ঠত্বের যুগেও তা পায়নি। প্রথম যেবার প্রবাসীতে আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, সেদিনকার আনন্দের কথা আজো স্মরণ আছে।

প্রথমদিকে প্রবাসীর সম্পাদক বা সম্পাদকীয় মন্তব্যের দিকে বেশী নজর দিইনি। তার অন্যতম কারণ হয়ত যে কুড়ি-একুশ বছর বয়স পর্য্যন্ত সাহিত্য সমস্ত মনপ্রাণকে এমনভাবে ছেয়ে রেখেছিল যে, মানবজীবনের অন্য কোনদিকে নজর দেবার বিশেষ অবকাশ পাইনি, প্রয়োজনও বোধ করিনি। রাজনৈতিক চেতনা যত বাড়তে লাগল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে যত ভাবতে সুরু করলাম, প্রবাসীর অন্যান্য অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিও ততই সজাগ হয়ে উঠল। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতামত যে সব-সময় পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে পারতাম তা নয়, কিন্তু সমস্ত সমস্যাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করবার তাঁর যে চেষ্টা ও আগ্রহ, বিপক্ষের প্রতিও সুবিচার করার তাঁর যে প্রয়াস, তাকে শ্রদ্ধা না ক'রে পারি নি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সাহস এবং স্বচ্ছ বুদ্ধি এ দুটি গুণই আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছিল।

তখনকার দিনে ইংরেজের রাজত্ব। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে রাজরোষ উদ্যত হয়ে উঠত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর সম্মান ও শ্রদ্ধা-ভালবাসা মিলত। ইংরেজকে সমালোচনা করার চেয়ে তাই তখনকার দিনে স্বদেশ-বাসীকে, বিশেষ ক'রে রাজনৈতিক নেতা বা সমাজপতিদের সমালোচনা করা বেশী কঠিন ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সরকারের সমালোচনা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের অন্যায় দেখলে তারও প্রতিবাদ করেছেন, সেকালে যে-সব কথা লোকে পছন্দ করত না তা বলতে কখনো দ্বিধা করেন নি। সত্য কথা বলবার তাঁর সাহস ছিল এবং একটু ভেবে দেখলেই স্বীকার করতে হবে যে, সব দেশে সব কালেই এ সাহস অসাধারণ। ভারতবর্ষে ত প্রচলিত প্রবাদই রয়েছে যে, অপ্রিয় সত্য না বলাই বাঞ্ছনীয়। সত্য বলতেই যখন বাধা ও নিষেধ, তখন সত্য কাজে যে বাধানিষেধ আরো বেশী হবে তাতে আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃপক্ষে, সত্য কথা বলা এবং সত্য কাজ করার সাহসের অভাবে ভারতবর্ষের জীবনে বহু গ্লানি ও দুঃখ এসেছে। মহাভারতের যুগে দুর্য্যোধনের রাজসভায় দুঃশাসনের হাতে দ্রৌপদীর অপমান দেখেও ভীষ্ম, দ্রোণ বা কর্ণ সে অন্যায়ে বাধা দেননি। বর্ত্তমান যুগের ভারত-বর্ষে যখন সাম্প্রদায়িক বা ভাষামূলক দাঙ্গায় দুর্জ্জন নিরপরাধ নিরীহ পথচারীকে আক্রমণ করে, তখনও জনসংখ্যার বিপুল অংশ সে দুষ্কর্ম্মে বাধা দিতে এগিয়ে আসে না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অন্যায় কথা ও কাজের প্রতিবাদ করবার সাহস ছিল, এবং সাহস ছিল ব'লেই বোধ হয় তিনি প্রশংসা বা নিন্দায় কোনদিন অত্যুক্তি করেন নি।

প্রবাসীর সে যুগের সম্পাদকীয় রচনায় সাহস ছাড়াও প্রতি ছত্রে স্বচ্ছ বুদ্ধির পরিচয় মিলত। সংস্কার ও পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত থেকে মুক্ত হতে না পারলে বুদ্ধি স্বচ্ছ হতে পারে না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে যে প্রাঞ্জলতার পরিচয় মিলত, তারও মূলে তাঁর স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি। কোন জিনিষকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে না পারলে সহজ ক'রে বলা যায় না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্নের সমস্ত দিক্‌ বিবেচনা ক'রে সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করতেন ব'লেই তাঁর বিচার এত সহজে সকলের মন আকর্ষণ করত। তার অর্থ কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে স্বীকৃতি নয়। আগেই বলেছি যে, সব সময় তাঁর মতামত গ্রহণ করতে পারতাম না, কিন্তু স্বীকার করি আর অস্বীকার করি, তাঁর মতকে সরাসরি উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করা চলত না। মাসিক হয়েও প্রবাসী সে যুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রশ্নে যে-ভাবে জনমত গঠন করেছে, বহুক্ষেত্রে বিদেশী সরকারকে অনুসৃত নীতি বদলাতে বাধ্য করেছে, সরকারের অন্যায় আদেশ অথবা জনতার হুজুগ এবং সাময়িক উত্তেজনার বিরুদ্ধে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছে, আজকাল তা বিশ্বাস করাও কঠিন। বোধ হয় এই-সমস্ত গুণের জন্যই রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর পত্রিকায় নিজের শ্রেষ্ঠ রচনা প্রকাশ ক'রে তাকে গৌরবান্বিত করেছিলেন।

প্রবাসী এবং তার সম্পাদককে সেকালে আমরা অভিন্ন ক'রে দেখতাম, তাই প্রবাসীর এই ষষ্টিবার্ষিকী উপলক্ষে পত্রিকা এবং তার প্রতিষ্ঠাতা উভয়কেই অভিনন্দন জানাই।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসত্যব্রত মিত্র

পৃথিবীতে এমন কোন কোন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা সাধারণ মানুষের নিক্তিতে যে মূল্য পেয়ে থাকেন তার চেয়ে বহু গুণে বড়। একজন নেশাখোর সামান্য লোক যদি জীবনে দুই-একটা বড় কবিতা লিখে থাকেন তবে মানুষের বিচারে তাঁর জনপূজ্য হতে বাধে না। একজন ধনী বিলাসী যদি লোক-দেখানো খদ্দর প'রে রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে পারেন কিংবা জেলে যেতে পারেন, তাহলে এদেশে মহাপুরুষ বা অন্ততঃ বীরশ্রেষ্ঠ হ'তে তাঁর বেশীদিন লাগে না। অনেক ক্ষেত্রে স্বল্প বা অধিক প্রতিভা-সম্পন্ন লোকেরা দেশের লোকের মন জয় করবার জন্য নিজেদের প্রতিভা, কার্য্যপ্রণালী, বেশভূষা, জীবনযাত্রা এমন খাতে চালান যাতে ইতিহাসে তাঁদের নাম কিছু বা অধিককাল স্থায়ী হয়। এইটা হয়ে ওঠে তাঁদের একটা সাধনা। কিন্তু এমন মানুষও দেখা যায় যাঁরা ঠিক ভিন্ন প্রকৃতির। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এইরূপ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। বিনয় এবং আত্মগোপন ছিল তাঁর দুটি বড় গুণ। ইতিহাসে যারা নাম রাখতে চায় তাদের পক্ষে এ দুটি বড় দোষ। সেই হিসাবে রামানন্দবাবুর বড় দোষ দুটি ছিল। আজ ১৩ বৎসর ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর কত মানুষ দেশপূজ্য, দেশবরেণ্য হয়েছেন। কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ-প্রচেষ্টায় কোন্ কাজ করেছিলেন সেকথা কেহ আজ স্মরণ করে না। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে রামানন্দবাবুর ষষ্টি বর্ষ উপলক্ষে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লেখেন, "একজন ঐতিহাসিক সত্যই বলিয়াছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসরে ইংলণ্ডের ইতিহাস শুধু Edinburgh Review এবং English Tory Bureaucracyর মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। আমার অনেক সময় মনে হয় যে, ভারতের গত সাড়ে আঠারো বৎসরের ইতিহাস সত্যই Mordern Review এবং ভারতের বিদেশী আমলাতন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী মাত্র। এ যুদ্ধে যদি আমাদের সম্পূর্ণ জয় না হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য লোকাচার, দেশের অতীতের জের, এবং জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতাই দায়ী। মডার্ণ রিভিয়ু সম্পাদক Edinburgh Review-এর সম্পাদক হইতে কম করেন নাই।"

কিন্তু স্বাধীন ভারতের অধিনায়কদের মধ্যে কয়জন আজ Mordern Review সম্পাদককে স্মরণ করেন? তাই ১৩ বৎসর পূর্ব্বে স্বাধীনতা লাভ দিবসে শ্রীযুক্ত যদুনাথই শুধু কলিকাতায় ১৫ই আগষ্ট বিষয়ে All India Radio-র বক্তৃতায় স্মরণ করেছিলেন দুটি মানুষকে—স্বামী বিবেকানন্দ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দের দেশহিতৈষণার মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল না, বক্তৃতায় তরঙ্গবিক্ষেপ ছিল না, লেখনীতে শিল্পকলার সৌন্দর্য্য তিনি ফোটাতেন না। তিনি যুক্তি, তথ্য ও সত্যকে সবার উপরে স্থান দিতেন। তার কারণ এ নয় যে, পূর্ব্বোক্ত সকল ক্ষমতা তাঁর ছিল না। প্রকৃত কারণ এই যে, নিজের লেখনীর কৃতিত্বের দিকে মানুষের মনকে তিনি আকর্ষণ করতে চাইতেন না। তিনি চাইতেন খাঁটি যুক্তি ও সত্যের তরবারির খোঁচায় শত্রুপক্ষকে হটিয়ে দিতে। এইরূপে বাঙালীর ভাবপ্রবণ মনকে তিনি যুক্তিবাদী ক'রে তুলেছিলেন। রামানন্দ স্বয়ং একবার যদুনাথকে লেখেন, "আপনার প্রেরিত notes-গুলি পাইয়া বাধিত হইলাম। বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। আমি উহা কিয়ৎ পরিমাণে spoil করিব বোধ হয়। আমি ইচ্ছা করিয়া dull হই, অভ্যাসবশতঃ মধ্যে মধ্যে smart রকমের কিছু লিখিয়া ফেলি। কাল···ভারী চটিয়া বলিয়াছেন, অমুক (অর্থাৎ আমি) খুব সাবধানে লেখে নতুবা এতদিন I would have run him down for defamation."

রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই সাবধানতার জন্যে তাঁকে অতি নিরলঙ্কার ভাষায় সাধারণ কথায় তথ্যটুকু এবং যুক্তিটুকুমাত্র দেখাতে হ'ত। Smart কিছুর অস্থি-সন্ধিতে শক্র ব্যূহভেদ করতে পারে, dull হলে পারে না। যদুনাথই বলেছিলেন, "দেশে যেমন কংগ্রেসের ব্যাপারে তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে কি অন্যায় ও অনাচার হইতেছিল, তাহার সুদূর ফল জাতির কত হানিকর তাহা prophetic vision-এ রামানন্দবাবু দেখেন ও প্রকাশ করেন।"

নরম ও গরমপন্থীদের যুগ হতে তাঁর মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রামানন্দবাবু জাতির ভবিষ্যৎ কেমন ক'রে দেখে কোন্ পথে দেশকে চালাতে চেয়েছিলেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রেই বা কেন তাঁর লেখনী এমন ক্ষুরধার হয়েছিল একথা জনসাধারণকে না বোঝাতে পারলে রামানন্দবাবুর বিষয় লেখা বৃথা হয়। যদুনাথ এইরূপ মনে করতেন। যদুনাথ বলতেন, "উনি সাংবাদিক হইতে অনেক উচ্চ শ্রেণীর মনীষী। তাঁহার অপেক্ষা বিশ ডিগ্রি নীচের লোকের প্রশংসা তাঁর বিষয়ে উদ্ধৃত করলে তাঁর স্মৃতিকে অপমান করা হয়।"

অবশ্য কে রামানন্দবাবু অপেক্ষা বিশ ডিগ্রি নীচের লোক তা বিচার করবার ক্ষমতা সাধারণ লোকের নাই। যদুনাথের মত দুই-দশজন মানুষই তা বোঝেন। সুতরাং সাধারণ মানুষকে ওই মহা মনীষীর মূল্য বোঝাবার জন্য অনেক সময় কোনো কোনো বিখ্যাত লোকের কথা মানুষ উদ্ধৃত করে। আমরাও করি।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ও বলেছিলেন

"প্রদীপে...তাঁর ভাষা স্বাভাবিক, তাতে কৃত্রিমতা, কুটিলতা নাই। সোজা সরল শুদ্ধ বাংলা। ফেনা নাই, আড়ম্বর নাই, বিদ্যাপ্রকাশ নাই, বাচালতা নাই। এই ভাষা পড়লেই তাঁর স্বভাব স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। প্রবাসীতে যা লিখেছেন তা হতে তাঁর চরিত্রের স্পষ্ট জ্ঞান হয় না। এখানে তাঁকে যুক্তিতর্ক করতে হয়েছে। নানাদিক্ সামলে লিখতে গেলে স্বাভাবিকতা থাকে না।......রাজনীতি সকল জাতির আদি, কাজেই তাঁকে রাজনীতির সমালোচনা করতে হ'ত। কিন্তু এই হেতু তাঁকে সাংবাদিক বলা সঙ্গত মনে হয় না। আমরা বার্ত্তাবহ অর্থে—সংবাদপত্র বলি। প্রবাসীতে বার্ত্তা থাকত, কিন্তু সে পুরাতন বার্ত্তা। তাও প্রবাসীর পত্রসংখ্যার তুলনায় কতটুকু। তিনি প্রবাসীর দ্বারা শিক্ষকের কাজ ক'রে গেছেন, অন্যের সাহায্যে একটা কলেজ চালিয়ে গেছেন। রামমোহন রায় তাঁর আদর্শ ছিলেন।"

বাস্তবিক প্রবাসীর মত কাগজ ষাট বৎসর পূর্ব্বে যিনি চালিয়ে গিয়েছেন তাঁকে সাংবাদিক বলা ভুল। প্রবাসীর মত বারমাসিক পুস্তক ত সংবাদসমষ্টি নয়। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু-এর সাহায্যে তিনি একসঙ্গে তিনটি কাজ ক'রে গিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, তাকে আনন্দ দিয়েছেন এবং তার জীবন ও পারিপার্শ্বিকের সকল রকম সমস্যার সমাধান খুঁজতে সাহায্য করেছেন।

প্রাচীন একটা যুগ ছিল পৃথিবীতে যখন মানুষ মহাকাব্য পড়ত এবং লিখতও। কিন্তু জীবনযাত্রার গতি দ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মহাকাব্য ছেড়ে ছোটগল্প, নিবন্ধ, সনেট, ইত্যাদির মধ্যে নিজের জীবনের রসপিপাসাকে নামিয়ে এনেছে। এই যুগেই প্রবাসীর মত কাগজের প্রয়োজন ছিল। রামানন্দ সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই অথবা কিছু আগেই আধুনিক ভারতের মনকে তার পূর্ণ রসদ পত্রিকাগুলির সাহায্যে জুগিয়েছেন। পরে অনেক কাগজ তাঁর অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর মত ব্যাপক ও গভীর দৃষ্টি পরবর্ত্তীদের মধ্যে দেখা যায় নি। তিনি অন্য লেখকদের ও শিল্পীদের সাহায্যে যা পরিবেশন করতেন তা ত ছিলই, তদুপরি তিনি নিজে যত বিষয়ে লিখতেন খুব কম লোকই তা একক লিখতে পারেন। আজকাল ত এদেশে কাউকেই তা লিখতে দেখি না। যাঁর জ্ঞান, বিদ্যা ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পুঁজি যতটুকু তিনি তার মধ্যেই লেখেন। তা ছাড়া এমন অনেক বিষয় আছে যা অকুতোভয় মানুষ ছাড়া লিখতে সাহস করে না।

রামানন্দবাবুর মৃত্যুর পর ভাই পরমানন্দ বলেছিলেন, "বাংলা দেশ আধুনিক শিক্ষার ফল অন্য প্রদেশের

পূর্ব্বেই লাভ করেছিল। বাংলা দেশে ধর্ম্মসংস্কারক ও রাজনৈতিক নেতাও অনেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রামানন্দবাবুকে এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে ধরা ঠিক যায় না। তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ যে শ্রেণীতে ধরা যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। এই শ্রেণীতে স্বামী বিবেকানন্দকেও ধরা যেতে পারে। এঁরা বাংলার তথা হিন্দু ভারতের নবজাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন। এই কারণে এঁদের তথাকথিত নেতাদের মধ্যে গণ্য করা চলে না। হিন্দু সংহতির কাজে এঁরা ছিলেন অগ্রদূত। বর্ত্তমান সময়ে এই জাতীয় কাজ করেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং সেই হেতু জাতি-জাগরণের অগ্রদূতদের মধ্যে তাঁকেই তৃতীয় স্থান দেওয়া যায়।"

রামানন্দবাবু হিন্দুসংহতির চেষ্টা এবং হিন্দুর স্বার্থ বাঁচাবার চেষ্টা চিরদিন করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভারতকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান সৃষ্টিরও ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বিশেষ ক'রে অখণ্ড বাংলা দেশকে রক্ষা করার চেষ্টা তিনি আজীবন ক'রে গিয়েছেন। খণ্ডিত বাংলায় এবং হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান সৃষ্টিতে বাঙালীর যে কি অশেষ দুর্গতি হবে তা তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির সাহায্যে ভারতের সকল নেতার আগে বুঝেছিলেন। এই কারণে মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁর মতের বিরোধ ছিল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে রামানন্দবাবু যেমন লড়েছিলেন তেমন খুব কম লোকই লড়েছিলেন। অখণ্ড ভারতই ছিল তাঁর আদর্শ। হিন্দু-মুসলমান, তপশীলী জাতি, ইত্যাদি অসংখ্য ভাগে ভারতের মানুষকে ভাগ ক'রে যে ভারতের সর্ব্বনাশ করা হবে তা তিনি বহুপূর্ব্বেই বুঝেছিলেন। হরিজনদের বিশেষ সুবিধা দেবার কথা যখন মহাত্মাজী ১৯৩৩-এ তোলেন সেই সময় রামানন্দ তাঁর আপত্তি মহাত্মাকে জানান। মহাত্মা দীর্ঘপত্রে স্বপক্ষ সমর্থন ক'রে শেষে বলেন, "I would invite you to share my faith in the reform and the reformers and believe with me that if we are true, the Harijans will be true and all will be well. If you find nothing in my letter that appeals to you I would like you to strive with me and tear my argument to pieces. You know the regard that I have for you. If it admits of enhancement, it would only be enhanced by your frank and fearless criticisms."

এই চিঠির পর দেড় মাস না যেতেই মহাত্মাজী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লেখেন,

"Dear Ramananda Babu,

I must trouble you once more. You must have seen Dr. Ambedkar's alternative to the panel system in the Yervada Pact. I should esteem your opinion on his suggestion, if not for public at least for my private use."

পূর্ব্বেই বলেছি, হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, অবাঙালী, বর্ণহিন্দু, তপশীলী, ইত্যাদি অনেক ভাগে দেশকে ভাগ করার পক্ষপাতী রামানন্দবাবু ছিলেন না। কিন্তু কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও ইংরেজ সরকার যখন এইগুলিই খাড়া করছিলেন তখন রামানন্দবাবু ভারতীয়ের হয়ে, হিন্দুর হয়ে, বাঙালীর হয়ে নানাভাবে লড়াই করেছিলেন। এরূপ ক্ষমতা সামান্য লোকের হয় না। বাংলা ১৩৪০ সালে তিনি প্রবাসীতে লেখেন, "...অতএব বাঙালীদিগকে ভারতীয় স্বরাজ এবং তাহার অন্তর্গত বঙ্গীয় স্বরাজ এই উভয় প্রকার স্বরাজের জন্য একসঙ্গেই সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহা কঠিন কাজ। কিন্তু ইহা খুব উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিত না চালাইলে, পূর্ণ স্বরাজের পর বাঙালীর কেবল ইংরেজাধীনতাটা ঘুচিবে বটে, কিন্তু 'প্রবাসী'তে বারবার বর্ণিত অন্যান্য রকমের বঙ্গীয় পরাধীনতাটা ঘুচিবে না।" বাঙালী আজ একথা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন কি? তিনি অনুন্নত শ্রেণীর হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহায় চিরজীবন ছিলেন কিন্তু তিনি মানুষকে দিয়ে "আমি ছোট জাত" বলিয়ে পার্লামেন্টের আসন দখলের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই সব কারণে তাঁকে যেমন হিন্দুর হয়ে লড়তে হয়েছে, তেমনি তাদের

ভিতরের বিভিন্ন caste-এর জন্যও লড়তে হয়েছে। কয়জন মানুষ এত ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের মানুষের স্বার্থ দে'খে তাদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করতে পেরেছেন?

দেশের ও বাহিরের অসংখ্য সমস্যা সম্বন্ধে দ্রুত ভাববার এবং সমাধানের উপায় বলবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল ব'লেই বহু বিশ্ববিখ্যাত মানুষ তাঁর পরামর্শ চাইতেন। তাঁদের মধ্যে গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রভৃতিকে ধরা যায়। এসব বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া সহজ নয়। স্থানাভাব তার একটি কারণ। আর একটি কারণ এই যে, বিখ্যাত লোকের চিঠি সঞ্চয় ক'রে রাখা রামানন্দবাবুর অভ্যাস ছিল না। অগণিত গণ্যমান্যের চিঠি তিনি নষ্ট ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। তবু কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কমিটি একবার অভিযান করেন। তাতে বাংলা দেশে প্রতিক্রিয়াজনিত বিক্ষোভ ও আন্দোলন হয়। সুভাষচন্দ্র গানটি আদ্যোপান্ত গীত হয় ইহাই সম্ভবতঃ চাইতেন, রামানন্দবাবুও তাই চাইতেন। এই সময় সুভাষবাবু রামানন্দবাবুকে লেখেন, "আপনি যদি মহাত্মাজীকে বন্দেমাতরমের বিষয় লেখেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আপনার সাহায্য এ বিষয়ে একান্ত দরকার। আমি জানি না 'ওয়ার্কিং কমিটি' এ বিষয়ে কি করিয়া বসিবেন—কমিটিতে আমি একমাত্র বাঙ্গালী। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে কবিকে অনুরোধ করিবেন মহাত্মাজীকে লিখিবার জন্য। আমি কবিকে লিখিয়াছি, কিন্তু কি ফল হইবে জানি না।...আমার বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।"

একান্ত দরকার কথাটি underline ক'রে সুভাষচন্দ্র রামানন্দবাবুর উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করেছেন। সুভাষচন্দ্রকে যখন কংগ্রেসের সভাপতি করা হয় তার পূর্ব্বে ১৫ বৎসর কোনো বাঙালীকে কংগ্রেস সভাপতি করা হয় নি। যোগ্য বাঙালী যে কে আছেন অনেকে ভেবে পেতেন না। রামানন্দবাবু বলেন, সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস-সভাপতি মনোনীত করতে। এ বিষয়ে সুভাষের পক্ষে সকল যুক্তিই তিনি দেখিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যে 'স্যর' উপাধি বর্জ্জনের সময় রামানন্দবাবুর পরামর্শই কেবল নিয়েছিলেন এবং সেইমত কাজ করেছিলেন তা আজ অনেকেই জানেন। এণ্ড্রুজ কবিকে একাজ করতে বারণ করেন। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় সম্বন্ধে রামানন্দ কিভাবের সহায়তা করতেন তা রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বোঝা যায়। যখন তিনি বাংলা ১৩১৮ সালের শেষে একবার বিদেশযাত্রার জন্য তৈয়ারী হন তখন রামানন্দবাবুকে লিখেছিলেন, "বিদ্যালয়ের জন্য একটি অধ্যক্ষসভা স্থাপনের প্রস্তাব আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আপনি ছাড়া আর কাহারও নাম মনে পড়িতেছে না।"

বিশ্বভারতী কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ (অবৈতনিক) হয়েছিলেন রামানন্দবাবু। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি তা ছেড়ে দেন; কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বভারতী যেভাবে যোগস্থাপন করেন তা রামানন্দবাবু অনুমোদন করেন নি। বোধ হয় ৬ই ভাদ্র, ১৩৩২, তারিখে তিনি পদত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথ যে সব রাজনৈতিক কাজে জড়িত হতেন, অনেক সময়ই তিনি সে বিষয়ে রামানন্দ-বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। রামানন্দবাবুর বড়াই-করা অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তিনি এ বিষয়ে গল্প ক'রে বেড়াতেন না। রবীন্দ্রনাথ রামানন্দবাবুকে একবার একজন বিখ্যাত লোকের কোনো কার্য্যের নিন্দা করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু রামানন্দবাবু সময়টা উপযুক্ত নয় মনে ক'রে তা করেন নি। পরে কবি লেখেন, "আপনি আমাকে অনুতাপের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছেন।" এরূপ বহু উদাহরণ দিয়ে তাঁর মত মানুষের মূল্যবৃদ্ধি করা যায় না। তিনি নিজ কার্য্য ও চরিত্রে এই বিশ্বের সুধী-সমাজকে নিজের মূল্য বুঝিয়ে গিয়েছেন। যদিও তাঁর স্বদেশবাসীরা তাঁর ঋণ ইতিমধ্যেই ভুলে যাচ্ছেন। আমাদের দেশে নিজের ঢাক নিজে বাজিয়ে লোকে বড় হয়, অকবি কবিখ্যাতি পায়, অসাহিত্যিক সাহিত্যিকখ্যাতি পায়, কেবল নিজেরা নিজেদের প্রচার করে ব'লে। এমন দেশে রামানন্দবাবু সর্ব্বদা বলতেন, "আমি সামান্য মানুষ", "আমি সাহিত্যিক

নই", "আমি পণ্ডিত নই", "আমি Camp-follower", ইত্যাদি। সুতরাং তাঁকে যে এদেশ ভুলে যাবে সে ত খুবই স্বাভাবিক। তবু বাংলার চরম দুর্গতির দিনে দু'চার জন খাঁটি মানুষের মুখে শোনা যায়, "আজ যদি রামানন্দবাবু থাকতেন!" তবে এ কথা কাগজে-কলমে লিখতে তারা সাহস করে না। কারণ, রামানন্দবাবু ত কোনো party-র ছিলেন না। তিনি ছিলেন একক। তিনি চিরজীবন স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আশা করেছিলেন, ভারতকে পরাধীনতার পাশ থেকে মুক্ত দে'খে যাবেন। সে আশা তাঁর পূর্ণ হয় নি। স্বাধীনতা-লাভের পর ভারতে যে অসংখ্য সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তিনি যদি জীবিত থাকতেন তবে সমস্যাস্রষ্টারা এতখানি নির্ভয়ে চলতে পারত না ব'লে আমাদের বিশ্বাস। দেশে কোনো সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক লোক যদি অসত্যের, ভীরুতার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত না থাকেন, তবে মিথ্যাচারী ও অত্যাচারীরা কাকে ভয় করবে? ১৭ বছর পূর্ব্বে যখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় তখন তাঁর অনুরক্ত বন্ধু ক্ষিতিমোহন সেন বলেছিলেন—"আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে যে সব মহাপুরুষ চলিয়া যান তাঁহাদের স্থান আর পূর্ণ হয় না। রবীন্দ্রনাথ গিয়াছেন, তাঁহার আসন শূন্য থাকিবে। রামানন্দ চলিয়া গেলেন, তাঁহার আসনও শূন্য থাকিবে।"

আমরাও সেই কথা বলি। বিশ্বনিয়ন্তা যে সত্যকেই জয়যুক্ত করবেন এ কথা তাঁর মত অন্তর দিয়ে কম লোকেই বিশ্বাস করে, তাই তাঁর স্থানে দাঁড়াবার মানুষ পাওয়া যায় না।

—০—

প্রবাসী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নিজ ভূমে যবে প্রবাসী ভারতবাসী,
সে নামেই তুমি দেখা দিলে হেথা আসি'।
দেবতার তেজ করিয়া সঙ্গোপন
এলে যেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
মধ্য আকাশে তখন যদিও রবি,
ম্লান ও মলিন দেশ, দীনতার ছবি।
শব-সাধনার তখনো হয় নি শেষ—
ফেরে দুর্গতি, দুর্নীতি, দুঃখ ক্লেশ।
কচিৎ কোথাও গোপনে জ্বলিছে ধুনী,
মুক্তির লাগি' আহুতি দিতেছে গুণী।
তুমি গ'ড়ে দিলে অভিনব পটভূমি,
জাতির দৃষ্টিভঙ্গী ফিরালে তুমি।

স্থূল পঙ্কিল ছিল যা জাতির রুচি,
তুমি ক'রে দিলে সূক্ষ্ম এবং শুচি।
ধ্বংস করিতে যাহা কিছু শিবেতর,
এলে দীন বেশে বিপুল শক্তিধর।
লেখনী করিলে তীক্ষ্ণ ও সংযত,—
সব্যসাচীর নিশিত শরের মত।
ভাষাই তোমার পাশুপত অস্ত্র,
পশুবল তাতে ভয়ে হ'ল ত্রস্ত।
রবির বীণার মহাসঙ্গীত সুর—
নিকট করিল যা ছিল দূর সুদূর।
দেখিলে, দেখালে, পুলকে বিস্ময়েতে,—
বঙ্গের রবি—বিশ্বের রবি হতে।

অভিনন্দিত করিলে বারংবার,
পুণ্যোদয় সে গান্ধী মহাত্মার।
ঘটালো ভারতে যাঁহার আবির্ভাব,
গোটা দেশ আর জাতির মুক্তিলাভ।
কেশর লুটায়ে যাঁহার চরণ-তলে
পশুরাজ হ'ল মানুষ ভূমণ্ডলে।
লোকোত্তর যে প্রতিভায় ধনী দেশ,
দেখাইলে তার নব নব উন্মেষ।
রঙে ও রেখায় যে ভাব লুকানো আছে,
তুমিই প্রকাশ করিলে সবার কাছে।
বন্ধুর মত আনন্দে হাত ধরি'
দেখাইয়া দিলে সে মাধুরী—মরি! মরি!
রসিক শিল্পী কত কবি মহাজন,
সুশোভিত তব করিয়াছে অঙ্গন।
কতই ভ্রমর এল গেল গুঞ্জরি'—
সজল নয়নে আজিকে তাদিকে স্মরি।
তোমার সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত পরিচয়,
আজ ভেবে দেখি—অল্প দিনের নয়।

রবি-পারিজাত পরিমণ্ডলে সবে,
পাত পাতিয়াছি অমৃতের উৎসবে।
রবিরে দেখেছি কত আপনার করি',
এখনো যে মোরা সেই গৌরবে মরি।
আজিও তোমাকে দে'খে আনন্দ পাই
কৈশোরের সে উষ্ণতা কমে নাই।
তব জয়রথে কুসুম ছড়াই ফের,
হে প্রবাসী তুমি আত্মীয় আমাদের।
বিরাট্ সাধনা একটি তপস্বীর
তোমাকে করেছে সেবাব্রতী পৃথিবীর।
জন্মদিন যে আজিকে ষষ্টিতম,
সুস্থ সবল রহিয়াছ মনোরম।
ধন্য হয়েছ সাধকের কৃপা লাভে।
কত শতাব্দী তোমারে প্রণমি' যাবে।
সহায় হউন স্বয়ং যোগেশ্বর,
সঙ্গে রহুন পার্থ ধনুর্দ্ধর,
যেন অখণ্ড জীবন কর্ম্মময়
চির-দিবসের কীর্ত্তি হইয়া রয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা ও অসাধারণ কর্মশক্তির দ্বারা মানুষকে আনন্দ দিয়েছেন এবং নানা প্রকারে মানুষের কল্যাণ করেছেন। তাঁর অন্য কাজ ছেড়ে দিলেও, তিনি যে ৯ বৎসর বয়সে শেক্সপীয়ারের ম্যাক্‌বেথ অনুবাদ করেছিলেন তা ছেড়ে দিলেও তিনি লিখেছেনই ত ৬৭।৬৮ বৎসরের অধিক কাল। লিখেছেন আনুমানিক মুদ্রিত বৃহৎ রয়্যাল আটপেজি আকারের ১৭।১৮ হাজার পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয়ই শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলেও তিনি কাব্য ছাড়া অন্যরকম পুস্তকও লিখেছেন বিস্তর। তাঁর কবিত্বের উন্মেষ হয় প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে, তাঁর শৈশবে বললেও চলে। পরে তিনি যে-সব কবিতা ও কাব্য-গ্রন্থ লিখেছেন, তা ছাড়া তাঁর গদ্য কবিতা, গদ্য কাব্যও বহুসংখ্যক আছে। তাঁর উপন্যাস, নাটক ও গল্প—সবগুলিই কাব্য।

কাব্য ভিন্ন তিনি ধর্ম, অধ্যাত্মতত্ত্ব, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, দর্শন, ছন্দ, গ্রন্থসমালোচনা, বিদেশভ্রমণ, প্রভৃতি বিষয়ে এত প্রবন্ধাদি লিখেছেন ও বক্তৃতা করেছেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলির নাম করাও সোজা নয়। তা ছাড়া, তাঁর পত্রাবলী আছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুক-পরিহাসাত্মক লেখা আছে, হেঁয়ালী নাট্য আছে, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য আছে, "পঞ্চভূতের ডায়ারী" নামক পুস্তক আছে যাকে কোন শ্রেণীতে ফেলা সুকঠিন। তিনি যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের জন্যে লিখেছেন, তেমনি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যেও গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া—এমন কি বর্ণপরিচয়ের বহিও, লিখেছেন। বাস্তবিক, বই লিখে, গল্প ব'লে, গান বেঁধে, গান গেয়ে, ছবি এঁকে, অভিনয় ক'রে এবং আরও নানা রকমে ছোট ছেলেমেয়েদিগকে আনন্দ তিনি যত দিয়ে গেছেন, এবং ভবিষ্যতেও দেবার উপায় ক'রে রেখে গেছেন, এমন আর কেও নয়। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যই ত তাদিগকে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া। এই বিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থায় তিনি তাদের জন্যে কত নূতন খেলার সৃষ্টি ক'রে তাদের খেলার সঙ্গী হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের তাঁরই কাছে তাঁরই বিরুদ্ধে একটি নালিশ ছিল যে, তিনি বৈজ্ঞানিক কিছু লেখেন নি। চার বৎসর পূর্বে "বিশ্বপরিচয়" লিখে তিনি তাঁদের সে ক্ষোভ দূর ক'রে গেছেন। এ-সব ছাড়া তাঁর নিজের লেখা ইংরেজী বইও অনেকগুলি আছে যেগুলি তাঁর বাংলা বইয়ের অনুবাদ নয়। তাঁর বাংলা অনেক বইয়ের অনুবাদ পৃথিবীর পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য যত অধিক ভাষায় হয়েছে, ভারতবর্ষের আর কোন লেখকের তা ত হয়ই নাই, অন্য কোন দেশেরও আধুনিক কোনও লেখকের হয়েছে ব'লে আমি জানি না। তাঁর কোন কোন বইয়ের জার্মান অনুবাদ এত বেশী বিক্রী হয়েছিল যে, মার্কের দর বিষম প'ড়ে না গেলে তিনি বহু বহু লক্ষ টাকা প্রকাশকদের কাছ থেকে পেতে পারতেন এবং বিশ্বভারতীর জন্যে তাঁকে কোন উদ্বেগ সহ্য করতে হ'ত না।

ইয়োরোপের অনেক বিখ্যাত লোকের লেখা পত্রাবলী আছে। আমরা যতটা জানি, তাঁদের কারও পত্রাবলী সাহিত্যিক উৎকর্ষে এবং বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীকে অতিক্রম করে নাই। তাঁর লেখা একখানা পোস্টকার্ডও সাহিত্যরসাপ্লুত।

১৯২৫ সনে তিনি প্রথম ভারতীয়-দার্শনিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় এবং পরে বিলাতে হিবার্ট লেকচার্স দিতে আহূত হওয়ায় তাঁর দার্শনিকত্ব প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃত হয়।

তিনি অনেক মাসিকের সম্পাদকের কাজ ও সাংবাদিকের কাজ দীর্ঘকাল অসামান্য প্রতিভা ও দক্ষতার সহিত করেছিলেন এবং ভবিষ্যতে-প্রসিদ্ধ অনেক লেখকের লেখা সংশোধন ক'রে তাঁদিকে সাহিত্যিক কৃতিত্বলাভে সমর্থ করেছিলেন।

তাঁর গান ও গীতরচনা, তাঁর প্রতিভা ও শক্তির আর একটি দিক্‌। ধর্ম, দেশভক্তি, প্রেম, প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি দু'হাজার বা আরও বেশী বহু ও বিচিত্র ভাবোদ্দীপক গান বেঁধেছেন ও তাতে সুর দিয়েছেন। ছয় শত গানের রচয়িতা শুবার্টকে পাশ্চাত্ত্য মহাদেশের লোকেরা পৃথিবীর সবচেয়ে অধিক গানের রচয়িতা মনে করে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রায় চারগুণ গান বেঁধেছেন। বয়সকালে তাঁর গলাও ছিল চিত্তহারী, চমৎকার ও বিস্ময়কর। তিনি চলতি অর্থে ওস্তাদ নন—যদিও ওস্তাদী গানের শিক্ষা তাঁর হয়েছিল ও ওস্তাদী তিনি বুঝতেন। গানের কথা সৃষ্টি, সুর সৃষ্টি, এবং কণ্ঠে কথা ও সুরের সাহায্যে বহু বিচিত্র ধ্বনিরূপের সৃষ্টি—এই ত্রিবিধ কৃতিত্বের সমাবেশে এদেশে তাঁকে অদ্বিতীয় সংগীতস্রষ্টা ব'লে মনে করি।

আমরা অনেকেই কেবল নয়নগোচর রূপ দেখি, রবীন্দ্রনাথ অধিকন্তু শ্রবণগোচর রূপও দেখেন। তাঁর গানগুলির দ্বারা তিনি বাংলা দেশকে বহুপরিমাণে গ'ড়েছেন। তাঁর অনেক গানে ভগবদ্ভক্তি ও দেশপ্রীতির অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়।

তিনি ছিলেন সুনিপুণ অভিনেতা এবং অভিনয়ের সুদক্ষ শিক্ষক। কবিতার আবৃত্তিতে এবং প্রবন্ধ গল্প নাটক ও উপন্যাসের পঠনে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর সাধারণ কথাবার্তাও ছিল সাহিত্যধর্মী ও সুরসাল। ভাব ও চিন্তার ব্যঞ্জক বহুবিধ সুরুচিপূর্ণ কলাসম্মত মনোজ্ঞ নৃত্যের তিনি স্রষ্টা ও শিক্ষক। দৈহিক সামর্থ্য যতদিন ছিল, নিজেও নৃত্যনিপুণ ছিলেন।

প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তাঁর প্রতিভার একটা নূতন দিক্‌ খুলে যায়। তা চিত্রাঙ্কন। তাঁর চিত্র পাশ্চাত্ত্য বা প্রাচ্য কোন শ্রেণীতে পড়ে না, কারও কাছে শেখা নয়। এ তাঁর নিজস্ব। তাঁর চিত্রাবলী সাধারণত: কোন গল্প বলে না ব'লে সর্বসাধারণের বোধগম্য ও উপভোগ্য না হলেও বিদেশে ও এদেশে সমঝদারেরা এর অসাধারণ গুণ মানেন।

বঙ্গের আধুনিক চিত্রকলার উৎপত্তি যে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রাণনা থেকে, সে সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলার কবি (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) আর্টের সূত্রপাত করলেন, বাংলার আর্টিষ্ট (অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ) সেই সূত্র ধ'রে একলা একলা কাজ ক'রে চলল কতদিন।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে তিনি যা করেছেন, অন্য কোন লেখক তা করেন নি। তাঁর লেখায় বাংলা সাহিত্য প্রাদেশিকতা ও দেশিকতা অতিক্রম ক'রে সমগ্র বিশ্বের দরবারে পৌঁছেছে। তার মধ্যে সমগ্র জাগতিক ভাব ও চিন্তার ধারা খেলছে, অথচ যা একান্ত বঙ্গের ও ভারতের, তাও তাতে আছে। যদি কোন বিদেশী কেবল তাঁর লেখা পড়বার জন্যেই বাংলা শেখেন, তা হলেও তাঁর শ্রম সার্থক হবে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনে তিনি রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্মীরূপে নেমেছিলেন। যখন সন্ত্রাসনবাদ মূর্ত হ'ল, তখন তিনি তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করলেন। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্মী তিনি বেশীদিন থাকেন নাই, কিন্তু তাতে বরাবর অন্যতম চিন্তানায়ক ছিলেন—এ বৎসরও মৃত্যুর কিছুদিন আগেও ছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের কাণ্ডের প্রতিবাদ তিনিই প্রথম করেন এবং তার কার্যত: প্রতিবাদ স্বরূপ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। যে-সব সভায় তাঁর অধিনায়কত্বের প্রয়োজন হয়েছে, তাতে অল্পদিন আগেও তিনি সভাপতি হয়েছেন। সম্প্রতিও তাঁর বাণী, উপলক্ষ্য ঘটলেই, সকল দেশভক্তকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে।

রাষ্ট্রকে অবস্থাবিশেষে কর দেওয়া বা না-দেওয়ার প্রজাদের অধিকার এবং স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব-বন্ধন বরণ এবং তার গৌরব ও আনন্দ, তিনি ১৯০৯ সনে "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে প্রথম এবং পরে ১৯২৯ সনে "পরিত্রাণ" নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে ব্যক্ত করেন। "মুক্তধারা" নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এইরকম কথা বলেছেন। "গীতাঞ্জলি"র ইংরেজি অনুবাদ দ্বারাই তিনি বিশ্বসাহিত্যিক-বাঞ্ছিত নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এত বড় ইংরেজি লেখক তিনি ছিলেন এবং ইংরেজি লেখার জন্যে ১৭।১৮ বৎসর বয়সেই বিখ্যাত অধ্যাপক হেনরি মর্লির ছাত্র হিসাবে তাঁর প্রশংসা

পেয়েছিলেন, কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত নিজের ইংরেজি লেখার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কি অলোকসামান্য নম্রতা!...

"অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ" ইত্যাদি লম্বাচোড়া রব দেশে উঠবার অনেক আগে থেকেই তাঁর [illegible]রে ও শান্তিনিকেতনে, "অস্পৃশ্য" পাচক ও অন্যান্য ভৃত্য বরাবর নিযুক্ত হয়ে আসছে অবাধে।

যে-সকল নারীকে সমাজ পতিতা বলে (কিন্তু দুশ্চরিত্র পুরুষকে পতিত বলে না) তাদের প্রতি কবির করুণার অন্ত নাই। তাঁর পরিচয় তাঁর "চতুরঙ্গ" গ্রন্থের ননীবালার কাহিনীতে পাই, আর পাই "কাহিনী" গ্রন্থের 'পতিতা' কবিতায় এবং "চৈতালী"র 'করুণা' ও 'সতী' কবিতা দুটিতে। আরও দৃষ্টান্ত আছে।

রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ও পরিচালনা নিরপেক্ষভাবে দেশের—বিশেষ ক'রে পল্লীর, হিতকর কাজ করবার প্রয়োজন ও পদ্ধতি তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্বে নির্দেশ ক'রে নিজের জমিদারীতে ও সুরুলে তদনুসারে কাজ করিয়ে এসেছিলেন।

পাবনার যে প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক কনফারেন্সে তিনি সভাপতির কাজ করেন এবং বাংলা ভাষায় সভাপতির অভিভাষণ রচনা ও পাঠের প্রথম দৃষ্টান্ত দেখান, তাতে তাঁর কর্মপদ্ধতি তিনি সভার সম্মুখে উপস্থিত করেন।...

আন্তর্জাতিকতা নামে অভিহিত তাঁর বিশ্বমানবপ্রেমের আভাস তাঁর অনেক আগের রচনাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্ট পাওয়া যায় "প্রবাসী"র প্রথম সংখ্যার জন্যে প্রায় একচল্লিশ বৎসর আগে লিখিত সেই কবিতায়—যার গোড়ায় আছে,

> "সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
> সেই ঘর মরি খুঁজিয়া;
> দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
> সেই দেশ লব যুঝিয়া।"

তিনি তাঁর "ন্যাশনালিজম্" নামক ইংরেজি গ্রন্থে সেই স্বাজাতিকতাই গর্হিত বলেছেন যা বিদেশ ও বিজাতির ধন গ্রাস করতে ও তাদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। সব সাম্রাজ্যবাদ এর অন্তর্গত এবং নাৎসিবাদ সর্বাধম সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। পরদেশদ্রোহিতা না-ক'রে যে স্বাজাতিকতা স্বদেশের কল্যাণ করতে চায়, কথায়, কাব্যে, বক্তৃতায়, গানে ও কাজে চিরদিনই তিনি তার সমর্থক ও অন্যতম প্রধান অনুপ্রাণক।

অনেক বৎসর আগে তিনি শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম স্থাপন করেন, তাই পরে বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন আশ্রমসমূহের আদর্শের ভিত্তির উপর এর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। এখানে শিক্ষালাভ আনন্দে হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা সরল, অনলস, বিলাসিতাবিহীন জীবন যাপন করবেন; অধ্যাপকদের প্রভাব বিদ্যার্থীদের উপর ও বিদ্যার্থীদের প্রভাব অধ্যাপকদের উপর পড়বে; সকল ঋতুতে প্রকৃতির প্রভাব তারা অনুভব করবেন; ভারতের ও অন্য সকল দেশের জ্ঞানের ও ভাবের নানা প্রবাহ এখানে অবাধে প্রবাহিত হবে; সকলে শ্রদ্ধাবান্ ও শুচি থাকবেন এক ও অসীমের চরণে মাথা নত ক'রে; এখানকার শিক্ষা শুধু পণ্ডিত প্রস্তুত করবে না, আত্মনির্ভরশীল উপার্জকও প্রস্তুত করবে; শুধু জ্ঞানের চর্চা এখানে হবে না, সঙ্গীত-চিত্রকলা-আদি সুকুমার কলার অনুশীলনও হবে; আবার, বস্ত্র-বয়ন-আদি নানাবিধ কারুশিল্প ও কৃষি শিক্ষা দেওয়া হবে এবং গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যে সচ্ছলতায় সৌন্দর্যে আবার আনন্দের নিলয় করবার চেষ্টা হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা কেবল জ্ঞাতা ও জিজ্ঞাসু হবেন না, কর্মী ও স্রষ্টাও হবেন; বিদ্যার্থীরা ব্যষ্টি-ও-সমষ্টি-গত ভাবে যথাসম্ভব স্বশাসক হবেন;—সংক্ষেপে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য এইরূপ।

দৈহিক আত্মরক্ষা বিষয়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এবং পরোক্ষভাবে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কেরাও যাতে অন্য যে-কোন দেশের লোকদের সমকক্ষ হয়, রবীন্দ্রনাথের সেদিকে দৃষ্টি ছিল। তিনি স্বয়ং ছেলেবেলা ও

কাল্পনিক প্রাণী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

কৈশোরে বাড়ীর পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তি করতেন। বিশ্বভারতীতে ছেলেমেয়েদের জাপানী জিউজিৎসু শেখাবার জন্যে তিনি জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন জিউজিৎসু-ওস্তাদ আনিয়েছিলেন। তাঁর কাছে অনেক ছেলেমেয়ে বেশ জিউজিৎসু শিখেছিল। অধ্যাপকেরাও ২।১ জন, যেমন স্বর্গগত গৌরগোপাল ঘোষ বেশ শিখেছিলেন। আমরা কবিকে দুঃখ করতে শুনেছি যে, বিশ্বভারতীর বাইরে স্বদেশবাসীরা এত বড় জাপানী জিউজিৎসুবিদের কাছে আত্মরক্ষার নানা কৌশল শিখতে আগ্রহ দেখান নাই।

লাঠি খেলা, ছোরা থেকে আত্মরক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ, ইত্যাদির কৌশল কবির সামনে ছাত্রছাত্রীদিগকে দেখাতে আমরা দেখেছি। শান্তিনিকেতনই তাদের এ-সকলের শিক্ষার স্থান। ছাত্রদের মধ্যে স্বশাসন তিনি প্রবর্তিত করেন। তাদের নিজেদের নায়ক ও অধিনায়ক এবং তাদের দোষত্রুটির বিচারের জন্য তাদেরই দ্বারা তাদেরই মধ্য থেকে বিচারক নির্বাচন প্রথা তিনি প্রবর্তিত করেন। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার সময় তাদের উপর কোন পাহারা না রেখে তাদের সততা ও আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করার প্রথাও তিনি প্রবর্তিত করেন।...

তাঁকে "গুরুদেব" সম্বোধন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আরম্ভ করান, ও সতীশচন্দ্র রায় প্রচলিত করেন।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রত্যহ একা একা ১৫ মিনিট ধ্যানের এবং সকাল সন্ধ্যা সম্মিলিত স্তবগান দ্বারা উপাসনা রবীন্দ্রনাথ নিজের বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করেন।

বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য কবি "লোকশিক্ষা সংসদ" স্থাপন ক'রে গেছেন। এর জন্যে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর অশেষ সম্ভাব্যতা আছে।

কবি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা শুধু এ অর্থে নয় যে, এর আদর্শ ও পরিকল্পনা তাঁর, এবং তিনি এর জন্যে যথাসাধ্য টাকা দিয়েছেন, টাকা সংগ্রহ করেছেন, ঘরবাড়ী বানিয়েছেন; পরন্তু এই অর্থেও যে, তিনি এর জন্যে শেষ পর্যন্ত পরিশ্রম করেছেন, এর কেরাণীগিরি পর্যন্ত করেছেন, স্বয়ং ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে অসাধারণ নৈপুণ্য ও ধৈর্য সহকারে পড়িয়েছেন। কিছুদিন আগেও নিজের কবিতা ব্যাখ্যা করেছেন; গান, অভিনয়, নৃত্য শিখিয়েছেন, তাদের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন; তাদের গল্প ব'লে চিত্তবিনোদন করেছেন, তাদের সঙ্গে খেলা করেছেন, মন্দিরে উপাসনা ও ভাষণ দ্বারা অনুপ্রাণনা দিয়েছেন, তাঁর স্বর্গগতা সহধর্মিণী প্রথম অবস্থায় নিজের অলঙ্কার এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছেন এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদেরকে দিনের পর দিন পরম সমাদরে স্বহস্তে রেঁধে খাইয়েছেন। দেহমনের অলোকসামান্য সৌন্দর্যের অধিকারী কবির অন্য ব্যসন ত ছিলই না; পান তামাকের অভ্যাস পর্যন্ত না থাকায় তিনি সকলের আদর্শ 'গুরুদেব' ছিলেন।

কবি দ্বাদশ বার পৃথিবীর নানা দেশে বেড়িয়ে ভারতের লোকদের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকদের যোগ স্থাপন ও বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর জাতিসমূহের অন্যতম আন্তর বন্ধনরজ্জু এবং উদ্যোগী জগৎশান্তিকামী।

বহু বৎসর পরেও তাঁর শ্রমশীলতায় বিস্মিত হয়েছি। পরে বার্দ্ধক্যে ও ভগ্নস্বাস্থ্যে তিনি ঠিক তেমনটি ছিলেন না বটে, কিন্তু তখনও অনেক যুবকের চেয়ে তিনি বেশী পরিশ্রম করতেন। এই সেদিনও গান্ধীজী তাঁকে দুপুরে বিশ্রাম করতে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর অসামান্য মেধার ও প্রতিভার পরিচয়ও শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

ঋষিদের যে আধ্যাত্মিক সত্য দৃষ্টির শক্তি ছিল আমরা পড়েছি, রবীন্দ্রনাথের তা ছিল। তাঁর বহু ধর্মোপদেশে কবিতায় ও সঙ্গীতে তার পরিচয় আছে। বিলাসী তিনি ছিলেন না, আবার কৃচ্ছ্রসাধকও বরাবর ছিলেন না। যদিও নিজের সম্বন্ধে কখনও কখনও অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা করতেন। জীবনকে তিনি ভালবাসতেন। তিনি বলেছেন:

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

কিন্তু মৃত্যুকেও তিনি মাতৃহস্তের মত স্নেহময় ও নির্ভরশীল মনে করতেন, তাই মৃত্যু সম্বন্ধে বলেছেন :

"সে যে মাতৃপাণি,
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি'।
স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে,
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

কবি নারীকুলের—বিশেষ ক'রে বঙ্গনারীদের, দরদী যে কত বেশী ছিলেন, তা বলতে পারি না। তিনি তাদের জন্যে যা করেছেন ও করতে চেয়েছিলেন তা সংক্ষেপে বলা যায় না। কেবল নারীদের জন্যই একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবার ইচ্ছা তাঁর ছিল; অর্থাভাবে তা ঘ'টে ওঠে নি। বিশ্বভারতীর আর্থিক অসচ্ছলতায় তিনি যখন বড় বেশী উদ্বিগ্ন হতেন, তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, আর সব তুলে গিয়ে কেবল কলাভবন, সঙ্গীতভবন ও নারীদের জন্যে শিক্ষণ-ব্যবস্থা সমেত শ্রী-ভবনটি রাখবেন। কবি তাঁর সহধর্ম্মিণীর পরলোক-যাত্রার পর "স্মরণ" শীর্ষক কবিতাগুলি লিখেছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর অন্য কোন গ্রন্থেও তা নাই। তাঁর কথাবার্ত্তাতেও তিনি এ বিষয়ে নির্বাক্ থাকতেন। ১৩৪৬ সালে পৌষের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিতে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাতে আমরা দেখতে পাই, সহধর্ম্মিণীর প্রতি কবির প্রেম কি গভীর ছিল। কবির সন্তানস্নেহ, ভৃত্যদের প্রতি সদয়ব্যবহার, প্রভৃতির সন্ধানও তাতে আছে। কবিকে যাঁরা বুঝতে চান, তাঁদের এই প্রবন্ধটি পড়া একান্ত আবশ্যক।

কবি অন্যান্য বিষয়ে যেমন অসাধারণ, শোকও পেয়েছেন সেইরূপ অত্যধিক, এবং সহ্য করেছেন সেইরূপ অসাধারণ ধৈর্য ও সংযমের সহিত।

আকাঙ্ক্ষা ছিল, কবির আগে আমার মৃত্যু হবে। রবীন্দ্রবিহীন জগতের কল্পনা কখনো করি নাই। ভাবি নাই রবীন্দ্রবিহীন জগৎ দেখতে হবে। চোখ কান যাই বলুক, বিশ্বাস হচ্ছে না যে তিনি নেই। এখনো মনে হচ্ছে, শান্তিনিকেতনে গেলেই আবার তাঁর বার্দ্ধক্যের সেই শুচিশুভ্র রূপ দেখতে পাব যার ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরের অনুপম শ্রী বিচ্ছুরিত হ'ত। "ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে"—যদিও বুদ্ধি বলছে তিনি আছেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৮।

"তুমি কেমন ক'রে গান কর যে গুণী"

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-সাহিত্য বাঙালীর পরম সম্পদ্। তা বাঙালীর মুখে ভাষা দিয়েছে, বাঙালীর সাহিত্যকে মর্য্যাদা দিয়েছে। সে সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রে যে বিপুল রসভাণ্ডার সঞ্চিত হয়েছে তা অনন্তকাল ধ'রে বাঙালীকে আনন্দ দান করবে। এক কথায় বলতে গেলে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবন যেন তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে। তাই দুর্গোৎসবের মতই রবীন্দ্র-জন্মোৎসব বাঙালীর অন্যতম বার্ষিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

কেন যে এমন হ'ল তার উত্তর সহজেই পাওয়া যায়। বাস্তবিক রবীন্দ্র-সাহিত্য এমন বিস্ময়কর সৃষ্টি যে তা দে'খে হতবাক্ হয়ে যেতে হয়। তা যেমন বিরাট্ তেমন ব্যাপক। কবির সুদীর্ঘ জীবন ধ'রে অজস্র ধারে তা রচিত হয়েছে। তার বৈচিত্র্যও ব'লে শেষ করা যায় না। তাঁকে আমরা সাধারণতঃ কবি আখ্যা দিয়ে থাকি; কিন্তু কি বিষয় নিয়ে যে তিনি লেখেন নি তা আবিষ্কার করা শক্ত হয়ে পড়ে। তার পর আসে রচনার উৎকর্ষের কথা। তার তুলনা হয় না। এক কথায় পরিমাপে, বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও মাধুর্য্যে তা অদ্বিতীয়, তা অনন্যসাধারণ।

কিন্তু এ হেন বিরাট্ রবীন্দ্র-সাহিত্য ত একদিনে গ'ড়ে ওঠে নি? তা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছিল। তা তাঁর সমগ্র জীবনকে আশ্রয় ক'রে নানা বিচিত্র অনুভূতি ও উপলব্ধির ভিতর দিয়ে দীর্ঘ সময় ধ'রে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য, প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে কত বিচিত্ররূপে তা পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। তা নিত্য নূতন রসের উৎস আবিষ্কার করেছিল। সে পরিণতির ইতিহাস বড় বিচিত্র।

তখন ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। তাঁর নিপুণ হস্তের সেবা পেয়ে বাংলা-সাহিত্য সবে একটা বিশিষ্ট মর্য্যাদা পেতে সুরু করেছে। সে যুগে বাঙালীর দেশাত্মবোধ ফোটে নি। আত্মমর্য্যাদাবোধও প্রতিষ্ঠালাভ করে নি। পাশ্চাত্ত্য জাতির পৌরুষ এবং সংস্কৃতি তার চোখ-ঝলসান রূপ দিয়ে বাঙালীর মনকে এমন অভিভূত করেছিল যে, সব বিষয়েই সে আদর্শ খুঁজত পশ্চিম দেশের মধ্যে। দেশের কোনো লোক কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে, তার পরিমাপ কষত তারা পাশ্চাত্ত্য সমাজের অনুরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাঁর তুলনা ক'রে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র যখন দুর্গেশনন্দিনী লিখে বাংলার পাঠক-সমাজকে বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে ফেললেন, তখন এই নবোদিত সাহিত্যিককে তাঁরা অভিনন্দিত করলেন 'বাংলার স্কট' ব'লে।

নবীন রবীন্দ্রের সহিত প্রথম পরিচয়ও বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অনুরূপ ভাবেই সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম জীবনে রচিত কবিতার ভাবের সুগভীরতা ও ভাষার লালিত্য তাঁদের মনকে স্পর্শ করে। তাঁরা দেখলেন, শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবিদের রচনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার ক্ষমতা সে রচনা রাখে। তাঁরা মুগ্ধ হলেন এবং সেই কারণেই বাংলার শেলী বা বাংলার ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ব'লে তাঁকে অভিহিত করলেন। বাংলা-সাহিত্যের ভাগ্যে তার থেকে বড় কিছু জুটতে পারে তা ছিল তাঁদের ধারণার অতীত।

কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার দীপ্তি শীঘ্রই প্রমাণ ক'রে দিল তিনি অনন্যসাধারণ। সে অতুলনীয় প্রতিভার পরিমাপের উপযুক্ত মাপকাঠি পশ্চিম জগতে পাওয়া যাবে না। শীঘ্রই আরও বিস্ময় এল। তাঁর গীতাঞ্জলি ও শিশুর কতকগুলি কবিতার স্বকৃত ইংরেজী অনুবাদের ভিত্তিতে ১৯১৩ সনে তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। সাহিত্যিকের জন্য শ্রেষ্ঠ যে বরমাল্যের ব্যবস্থা পশ্চিমের মানুষ করেছে, তা সে দেশেরই লোক মুগ্ধ হয়ে তাঁর কণ্ঠে অর্পণ করল। সে দেশের মানুষের নয়ন দিয়ে এ দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করল, বাংলা-সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য এমন প্রতিভা-দীপ্ত লেখকের হস্তে তার সেবার ভার পড়েছে।

তার পরেও দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধ'রে তিনি বাংলা-সাহিত্যের সেবা ক'রে গেছেন। রাশি রাশি তাঁর রচনা বাংলা-সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে। তাঁর রচনা বার বার বাঙালীর মনকে মুগ্ধ করেছে। সে রচনার খ্যাতি অবাঙালীর মনকে আকৃষ্ট করেছে। সারা ভারতের মানুষ তাঁর সাহিত্য প'ড়ে তৃপ্তি লাভ করেছে। সে খ্যাতি দেশের গণ্ডি ডিঙিয়ে সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর রচনা সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে বাংলা-সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ব'লে পরিগণিত হয়েছে। আমাদের রবীন্দ্রের দীপ্তি আকাশের রবির ন্যায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য যে এত বিরাট্, এত সুন্দর, এত মধুর, এই শেষ কথা নয়। এই সাহিত্যে এমন একটি বিশিষ্টতা পাই যা অন্য কোনো সাহিত্যরথীর রচনায় বিরল। অন্য কবি সুখের কথা লিখেছেন, দুঃখের কথা লিখেছেন। অন্য কবি অত্যাচারের কথা লিখেছেন, উৎপীড়নের কথা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ সে সব কথা লিখেছেন, তার অতিরিক্তও কিছু লিখেছেন। সকল সুরকে নিমজ্জিত ক'রে একটি বড় সুর তাঁর সাহিত্যে ধ্বনিত হয়েছে, যা অন্য কোথাও পাই না। তা আনন্দলোকের সন্ধান পেয়েছে। তাই তা আনন্দের বার্ত্তাবহরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সকল রচনার মধ্যে আনন্দ যেন ভ'রে গিয়ে উপচে পড়েছে। তাই তিনি বলেছেন :

"সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দ হাসিতে ভরা।
যেদিক্ পানে নয়ন মেলি
ভাল সবই ভাল।" (গীতাঞ্জলি।)

তাঁর চোখে মানুষের জীবন সুন্দর ঠেকেছে, মধুর ঠেকেছে, মনোহর ব'লে প্রতিভাত হয়েছে। তাই তিনি মানব-জীবনকে "আনন্দ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ" বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যে যেন আনন্দ মূর্ত্তিমান্ হয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আশ্চর্য্য লাগে ভাবতে, বিশ্বকে কি চোখে তিনি দেখেছিলেন যাতে তাঁর নিকট সবই মধুর বেশে রূপ নিয়েছে। কোন্ মায়া-অঞ্জন তিনি চোখে মেখেছিলেন যা তাঁকে এই দিব্যদৃষ্টি এনে দিয়েছিল?

এ প্রশ্ন শুধু আমাদের কৌতূহলী মনে জাগে নি। তাঁর মনেও এ প্রশ্ন উঠেছিল। তার উত্তরও তিনি দিয়েছিলেন। সে উত্তর তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর দীর্ঘ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। এক রকম বলা চলে, এ যেন তাঁর কাব্য-জীবনেরই ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস। সত্যের সন্ধানে তিনি সারা জীবন ধ'রে যে সাধনা করেছিলেন এ তারই ইতিহাস। নানা বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সেই সাধনা তাঁকে আনন্দলোকে উপনীত ক'রে দিয়ে গেছে।

সেই ইতিহাসকে বুঝতে হলে কতকগুলি প্রাথমিক কথা বলা দরকার।

মানুষের তিনটি প্রধান বৃত্তি আছে—জ্ঞান, কর্ম্ম ও অনুভূতি। মানুষের মন এক মুহূর্ত্ত ব'সে থাকে না। এক গভীর নিদ্রা ব্যতীত অন্য সকল সময় তার মন এই তিনটি বৃত্তি নিয়ে ব্যাপৃত। হয় সে জ্ঞান আহরণ করে, না হয় কর্ম্ম করে, না হয় অনুভব করে। তার মনে যেন অহরহ এই ত্রিবেণী সঙ্গমের ধারা বয়ে চলেছে।

এখন, জ্ঞান-বৃত্তি আমাদের কোনো বস্তুকে জানতে শেখায়। এই বৃত্তি, যাকে জানি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ ঘটাতে পারে না। তাকে আমরা বাহির হতেই জানি। দুয়ের মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে যে সম্পর্ক তা তাই শুষ্ক, তাই নীরস। তা জ্ঞেয় বস্তুর অন্তরের পরিচয় দেয় না।

অন্যদিকে কর্ম্মবৃত্তি মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে। আমরা সাধারণতঃ কর্ম্ম করি স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে। নিজের স্বার্থ কি ভাবে সংরক্ষিত হয়, তাই হ'ল কর্ম্মের লক্ষ্য। এই কর্ম্মবৃত্তি তাই অহমিকাবোধে নিয়ন্ত্রিত।

মানুষ নিজের মত কারও প্রতিষ্ঠা চায় না। অর্থ, যশঃ, প্রতিপত্তি, প্রভৃতি হ'ল কর্ম্মের প্রেরণা। কর্ম্ম তাই মানুষের মনকে সংকুচিত করে, কর্ম্ম তাই মানুষকে অপর হতে বিচ্ছিন্ন করে।

অনুভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ প্রেম বা ভালবাসা। এই বৃত্তিই সেই ক্ষমতা রাখে যা অপরকে আপন করে, যা দুয়ের মধ্যেকার ব্যবধান সরিয়ে দিয়ে পরস্পরের অন্তরের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে। জ্ঞান অপরের সহিত যে সম্পর্ক স্থাপন করে তা বাহিরের সম্পর্ক। জ্ঞানের পথে অপরকে জানি, প্রেমের পথে অপরকে পাই। প্রেম মানুষকে অহমিকা-মুক্ত করে।

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, সত্যের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধির সংযোগ ইস্কুলে, কর্ম্মের সংযোগ আপিসে এবং প্রেমের সংযোগ ঘরে। প্রেমের যোগই আনন্দের যোগ।

> "এক কথায় সত্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ আমাদের ইস্কুল, প্রয়োজনের যোগ আমাদের আপিস, আনন্দের যোগ আমাদের ঘর। ইস্কুলেও আমরা সম্পূর্ণভাবে থাকি না, আপিসেও আমরা সম্পূর্ণভাবে ধরা দিই না, ঘরেই আমরা বিনা বাধায় নিজের সমস্তটাকে ছাড়িয়া দিয়া বাঁচি। ইস্কুল নিরলঙ্কার, আপিস নিরাভরণ আর ঘরকে কত সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া থাকি।" (সাহিত্য।)

প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি বিরাজমান তাঁকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এক চিরন্তন লীলান্বেষী সত্তা রূপে। সমস্ত বিশ্ব জুড়ে তাঁর লীলা-রসধারা প্রবাহিত। তিনি নিত্য চঞ্চল, নিত্য নূতন কিন্তু চিরন্তন। তিনি আপনাকে সৃষ্টির প্রবাহের মধ্যে বাঁধেন আবার নিজেই সে বন্ধন ছিন্ন ক'রে নিজেকে মুক্ত করেন। ভাঙা এবং গড়া নিয়ে তাঁর খেলা। তিনি দস্যুর মত চিরাভ্যাসের মেলাকে ভেঙে দেন। তিনি পুরাতনের আবর্জ্জনাকে নির্ম্মম হস্তে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলেন। তিনি নিত্য কালের মায়াবী। বার বার নব বরবেশে প্রকৃতিকে জয় ক'রে নিতে তিনি অভিলাষী। প্রাচীন সঞ্চিত ধনে তাঁর একান্ত অবহেলা। কারণ তাঁর শক্তি অনন্ত, "মূল্যহীনকে সোনা" করবার যাদুমন্ত্র তিনি জানেন।

> "বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার,
> সৃষ্টি তাহার খেলা,
> দস্যুর মতো ভেঙে চুরে দেয়
> চিরাভ্যাসের মেলা।
> মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
> পরশ-পাথর হাতে আছে তার,
> তাই ত প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
> উদ্ধত অবহেলা।" (মহুয়া।)

তিনি নটরাজ। যে ছন্দে তিনি নৃত্য করেন আনন্দ তার মূল সুর। সেই নৃত্যরত চরণের ধ্বনি কবির চিত্তে বাজে। সুখ-দুঃখ তার ছন্দ, ভাঙা-গড়া তার ছন্দ, জন্ম-মৃত্যু তার ছন্দ। কি গভীর প্রাণমাতানো আনন্দ তার প্রেরণা:

> "কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ,
> দিবা রাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ।" (অরূপ-রতন।)

যে সত্তা সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এই ভাবে বিরাজমান তাঁর সত্যরূপ তিনি এই ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এই সর্ব্বব্যাপী সত্তাকে তিনি জেনে ক্ষান্ত হন নি, তাঁকে একান্ত আপনজন রূপে পেতে চেয়েছিলেন। তাঁকে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভিত্তিতে প্রেমাস্পদরূপে তিনি পেতে চেয়েছিলেন।

এই যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, এ ঠিক ভক্তির ভিত্তিতে ভক্তরূপে পাওয়া নয়। তিনি পেতে চেয়েছিলেন তাঁকে সাম্যের ভিত্তিতে সখারূপে। পরম সত্তা কত বিরাট্, কি গভীর ধীশক্তির তিনি আধার, আর কবি কত ক্ষুদ্র, কত

নগণ্য। তবু সাম্যের ভিত্তিতে ভালবাসার সম্পর্কের মধ্যে তাঁকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর কোনো দ্বিধাবোধ জাগে নি। তাঁর একান্ত বিশ্বাস, পরম সত্তা তাঁর সহিত সাম্যের ভিত্তিতে মিলনের জন্যে উন্মুখ। তাঁর দৃঢ় প্রতীতি, তাঁকে নইলে ত্রিভুবনেশ্বরের "প্রেম হ'ত যে মিছে।" পরম সত্তা তাঁর সহিত মিলনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন।

এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে মিলনের যে তীব্র বাসনা তাঁর মনে জেগেছিল তার গভীরতা, না পাওয়ার দুঃখে যে অসহ্য বেদনাবোধ তাঁর অন্তরকে ক্ষুব্ধ করেছিল তার তীব্রতা, তাঁর মধ্য-জীবনের কবিতাগুলিকে বিচিত্র ক'রে তুলেছিল। এই কবিতাগুলিকে বক্ষে ধারণ ক'রেই গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির কাব্যমালঞ্চ এমন মনোহর হয়ে উঠেছিল। সেখানে আছে পাবার আকুতি, না পাওয়ার বেদনা এবং মিলনের আনন্দ। পরম সত্তার সহিত এই বিরহ-মিলন গাথায় এই তিনটি সুর ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে।

কোথাও দৃঢ় প্রতীতির ভিত্তিতে তিনি বলেছেন:

"আমার মিলন লাগি'
তুমি আসচ কবে থেকে!
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে?" (গীতাঞ্জলি।)

কোথাও বিচ্ছেদের বেদনা দুর্বিসহ হয়ে উঠলে করুণ সুরে তিনি গেয়েছেন:

"প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে;
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।" (গীতাঞ্জলি।)

কোথাও অনুভূতি জাগে, পরম সত্তার সাড়া যেন তিনি পেয়ে গেছেন। প্রকৃতির খেলার মধ্যে তাঁর স্পর্শ যেন তিনি পাচ্ছেন:

"এই যে তোমার প্রেম ওগো,
হৃদয়-হরণ!
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।" (গীতাঞ্জলি।)

কিন্তু এই মিলনের আনন্দ তাঁর জীবনে স্থায়ী হয় নি। গভীরতর উপলব্ধির ফলে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভিত্তিতে পরম সত্তাকে বোধ হয় পাওয়া যায় না। যিনি সব জায়গায় ছড়িয়ে আছেন তাঁকে এক জায়গায় পাওয়া যায় না। পরম সত্তার কোন বিশেষ রূপ নাই। তিনি বিশ্বের সকল রূপের মধ্যেই ব্যাপকভাবে বিরাজমান। কোন বিশিষ্ট রূপ তাঁর নাই। এই অর্থে তিনি অরূপ। অপর পক্ষে বিশ্বের বর্ণবৈচিত্র্যময় ইন্দ্রিয়-গোচর যে রূপ বর্ত্তমান, তার আড়ালেই তিনি রয়ে গেছেন। তাঁকে বিশ্লিষ্ট আকারে এক জায়গায় পেতে গেলেই তাঁকে হারাতে হবে।

তাই তিনি এক জায়গায় বলেছেন:

"বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন, তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন। মনই নানার মধ্যে সেই এককে দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে, সেই এককে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে।" (ধর্ম্ম।)

দ্বৈতের ভিত্তিতে যে মিলন তা সম্ভব হয় দুই ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট সত্তার মধ্যে। এখন, ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তার কতকগুলি গুণ থাকে। প্রথম, তা তার পারিপার্শ্বিক হতে বিচ্ছিন্ন এবং সেই বিচ্ছেদবোধ তার বেশ পরিস্ফুট।

দ্বিতীয়, তা অন্য বিভিন্ন ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তার সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করতে সক্ষম। মানুষ ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমি একটি মানুষ। আমার চেতনা আছে যে আমি পারিপার্শ্বিক হতে বিশিষ্ট। আমার আত্মচেতনাবোধ আছে। আমি শুধু ভাবি, জানি, ভালবাসি তা নয়, আমি জানি আমি এই সব ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি ব্যক্তি-বিশেষ। এইখানেই আমার ব্যক্তিত্ববোধ। ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে অপরের সহিত আমার ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে সেখানেই, যেখানে আমি হতে যিনি অপর তিনিও ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তা। তা না হলে ত ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হতে পারে না? সেই কারণে জড় পদার্থের সহিত সে-সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব নয়। অন্য জীবের সহিতও সে সম্বন্ধ সম্ভব নয়। তাদের চেতনা আছে, খানিক পরিমাণ ভাব আদান-প্রদানের ক্ষমতা আছে। কিন্তু তাদের আত্মচেতনা নাই, নিজেকে স্বতন্ত্র ক'রে জানবার ক্ষমতা নাই। সেই কারণে ব্যক্তিত্ববোধও নাই।

জড়, জীব ও ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তা ভিন্ন আর এক ধরণের সত্তা আছে। তারা জড় নয়, জীব নয়, মানুষের মত ব্যক্তিত্ববিশিষ্টও নয়। তারা স্বতন্ত্র ধরণের সত্তা। সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে, তাদের অবস্থিতি আরও সূক্ষ্ম পর্য্যায়ে এবং তারা অত্যন্ত জটিল বস্তু।

এদের আমরা নৈর্ব্যক্তিক সত্তা বলতে পারি। জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত একটি জাতি এই নৈর্ব্যক্তিক সত্তার একটি জটিল প্রকাশ। তার প্রকাশের ভিত্তি সমগ্র জাতির প্রতি ব্যক্তিবিশেষটি। সেই জাতির ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, আকুতি তাকে যে পথে নিয়ে যায় সেই জাতির অভিব্যক্তি সেই পথে। এই সত্তার অবস্থিতি কোন ব্যক্তি-বিশেষে নাই। তার প্রকাশ সেই বিশেষ দেশের কোন বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র দেশ, সকল মানুষ, তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, আকুতি, সবকিছু জড়িয়ে তার প্রকাশ। এর সত্তা আছে কিন্তু ব্যক্তিত্ব নাই। সেই জাতির কোন বিশেষ ব্যক্তি যদি তার সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়, পারবে না। কারণ তার প্রকাশ এমন জটিল, এমন সূক্ষ্ম, এমন ব্যাপক, যে তার ব্যক্তিত্বগুণ থাকা সম্ভব নয়।

তাই তিনি বলেছেন :

"যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে ব'সে আছেন, তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।" (গুরু।)

অরূপরতন নাটকে তিনি বলেছেন :

> "যে জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে,
> ভালোবাসে আড়াল থেকে,
> আমার মন মজেছে সেই গভীরের
> গোপন ভালোবাসায়।"

তিনি এইভাবে একদিন উপলব্ধি করলেন যে, পরম সত্তা নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। এক্ষেত্রে তাঁর সহিত মিলনের নূতন পথ তিনি আবিষ্কার করলেন। আলাদা একা একা নির্জ্জনে তাঁর সহিত বিচ্ছিন্ন মিলনে তিনি আর আকর্ষণ বোধ করলেন না। বিস্তৃততর ক্ষেত্রে সবার মধ্যে যে প্রকাশ তার ভিতর দিয়েই তিনি তাঁর সহিত মিলন কামনা করে-ছিলেন। আপন মনে একাকী মিলন নয়, সবার তিনি যেখানে আপন সেখানেই পরম সত্তার সহিত মিলন ছিল তাঁর কাম্য। তাই তিনি বলেছিলেন :

> "বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
> সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
> নয়কো বনে, নয় বিজনে,
> নয়কো আমার আপন মনে,
> সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
> সেথায় আপন আমারো।" (গীতাঞ্জলি।)

যাকে ভালবাসি তাঁকে প্রীতি করি, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই, তাঁর সেবা করি। এখন "যে জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে" তাঁর সেবা কি ভাবে করব? তিনি বলেছেন, সেটা সম্ভব হয়, সেবা ও পূজার পাত্র হিসাবে সমগ্র মানবজাতিকেই যদি গ্রহণ করি। বিশ্বমানবের কল্যাণে, বিশ্বমানবের সেবায় আত্মনিয়োগই তাঁকে প্রীতি করবার, তাঁর সেবা করবার প্রকৃষ্ট পথ। এই যুক্তির সপক্ষে তিনি একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন।

তিনি বলেছেন :

"মাতা যেমন একমাত্র মাতৃ-সম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর ও অব্যবহার্য্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান—এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম্ম করি।" (ধর্ম্ম।)

নারীর নানা রূপ থাকে। বিভিন্ন মানুষের নিকট বিভিন্ন রূপে তাঁর প্রকাশ। কারও কাছে তিনি কন্যা, কারও কাছে ভগিনী, কারও কাছে মাতা। কিন্তু সন্তানের নিকট তাঁর সব থেকে ঘনিষ্ঠ, সব থেকে প্রকট প্রকাশ মাতৃরূপে। পরম সত্তাকে একত্র কোথাও বিশেষ রূপে পাই না। তিনি সমগ্র বিশ্বে নানা বিচিত্র রূপের মধ্যে গোপনে বিরাজমান। এক্ষেত্রে মানুষের নিকট সব থেকে ঘনিষ্ঠরূপে, সব থেকে প্রকটরূপে তিনি যে ভাবে প্রকাশ, সেই ভাবেই তাঁকে প্রীতি করতে হবে, সেই ভাবেই তাঁকে সেবা করতে হবে। পরম সত্তার আমাদের নিকট সব থেকে প্রকট প্রকাশ মানবরূপে। নিখিল মানবকে সেবা করলেই তাঁর সেবা করা হয়, নিখিল মানবের কল্যাণ-কর্ম্ম করলেই তাঁর কল্যাণ করা হয়।

এই চিন্তাধারাই আর একটু রূপান্তরিত হয়ে তাঁর সাহিত্যে আর একটি সুন্দর উপলব্ধিরূপে প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বমানবের মধ্যে পরম সত্তার যে প্রকাশ, তা বিশেষ ক'রে যেমন মানুষের নাগালের মধ্যে এসে যায়, তেমনি যে মানুষ উপেক্ষিত, পদদলিত, যে মানুষ সর্ব্বহারা, তার মধ্যে তাঁর প্রকাশ যেন আরও প্রকট, আরও গভীর। তিনি তাই বলেছেন, রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে পরম সত্তার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা বৃথা। কারণ, তিনি ত সেখানে নাই। তিনি বিশেষ ক'রে আছেন যারা সর্ব্বহারা, যারা অবহেলিত, যারা নগণ্য, যারা কঠোর পরিশ্রম ক'রে ক্ষুধার অন্ন আহরণ করে তাদের মাঝখানে। তাই তিনি বলেছেন :

"তিনি গেছেন যেথায় মাটী ভেঙে
করচে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটচে যেথায় পথ
খাটচে বারো মাস।" (গীতাঞ্জলি।)

এই হ'ল রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস। এই হ'ল পরম সত্তাকে জানা ও পাওয়ার ইতিহাস। সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত ক'রে, গন্ধ, বর্ণ ও গানে জগতের বিচিত্র জীবনকে রঞ্জিত ক'রে যিনি সৃষ্টি-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করছেন, তাঁকে শুধু সত্য নয়, সুন্দররূপে তিনি উপলব্ধি করেছেন। তার পর ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভিত্তিতে তাঁকে একান্ত আপনজন রূপে পেতে চেয়েছেন। কিন্তু বিশেষরূপে তিনি কোথাও তাঁকে খুঁজে পান নি। শেষে তিনি বুঝেছেন, এক স্থানে কোথাও তাঁকে বিশেষরূপে পেতে চাওয়া ভুল। কাজেই তাঁর সহিত প্রশস্ত মিলনের ক্ষেত্র হ'ল বিশ্বমানব। বিশ্বমানবকে সেবা করা, বিশ্বমানবকে ভালবাসাই তাঁকে পাবার প্রশস্ত পথ। তাঁর সাহিত্যের সাধনার মধ্যে এই ভাবে জানা ও পাওয়ার বিভেদ ঘুচে গিয়েছে। যিনি সত্য তিনি সুন্দর হয়েছেন, যিনি সুন্দর তিনি মঙ্গলময় রূপে কল্যাণ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়েছেন। তাই আনন্দলোকের দ্বার অর্গলমুক্ত হয়েছে। জ্ঞান, কর্ম্ম ও সেবাবৃত্তির যুগপৎ তৃপ্তি কোন্ পথে, এ সাহিত্য তার সন্ধান এনে দিয়েছে।

এই ভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা শুধু সত্যকে পাই না, সুন্দরকে পাই না, মঙ্গলকেও পাই। তাই হ'ল এ

সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বিশিষ্টতা। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য অন্তরকে বিকশিত করে, মনকে আত্মকেন্দ্রিকতা-মুক্ত করে। তার পাবনী শক্তি আমাদের মার্জিত করে। আমাদের বিশ্বজনীন [illegible] প্রেরণা দেয়। তা শুধু মধুর নয়, তা মঙ্গলময়। তাই তার মধ্যে আনন্দ এমন জমাট বেঁধেছে। তা আমাদের সহিত আনন্দলোকের সংযোগ স্থাপন করেছে। এ সাহিত্য অপূর্ব, এ সাহিত্যের তুলনা মেলে না। এ সাহিত্যের যিনি স্রষ্টা তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদনের ভাষা আমরা খুঁজে পাই না। তাই তাঁর বাণীই উদ্ধৃত ক'রে আমাদের বলতে হয়:

"তুমি কেমন ক'রে গান কর যে গুণী
আমি অবাক্ হয়ে শুনি কেবল শুনি।"

—•—

নারী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শান্তিনিকেতনে অতুলপ্রসাদ ও আমার সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে ১লা জানুয়ারী, ১৯২৭ সনে সকালে কবি বলেন লণ্ডনে তাঁর প্রথম রোমান্সের কথা। কবি আমাকে প্রায়ই বলতেন যে ভোগের চাবিটি আছে সংযমের হাতে—অর্থাৎ অসংযমে ভোগ হয়ে ওঠে দুর্ভোগ। নরনারীর সম্বন্ধে এ কথা খাটে সবচেয়ে বেশি—বলতেন তিনি—কেননা এ আদান-প্রদানে দম্পতি পরস্পরের টানে সবচেয়ে লাভবান্ হয় পবিত্রতার আবহে। সেদিন তিনি তাই শেষে বলেছিলেন আমাদের (তীর্থংকর, ১৪৬ পৃঃ):

> "আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব ক'রেই: যে-কোন মেয়ের ভালবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখি নি···প্রতি মেয়ের স্নেহ বলো, প্রীতি বলো, প্রেম বলো—আমার মনে হয়েছে একটা প্রসাদ—'ফেভর'। কারণ আমি এটা বার বারই উপলব্ধি করেছি যে প্রতি মেয়ের ভালোবাসা···আমাদের মনের বনে কিছু না কিছু অফোটা ফুল ফুটিয়ে রেখে যায়—সে-ফুল হয়ত পরে ঝ'রে যায়—কিন্তু তার গন্ধ যায় না মিলিয়ে।"

যেদিন সকালে কবি অতুলদা ও আমার সামনে এই সব কথা বলেন সেদিন সন্ধ্যায় আমি ওঁকে একলা পেতে চেয়েছিলাম কোনো বিশেষ কারণে। সৌভাগ্যবশে সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর কাছে কেউ ছিল না। তিনি একদৃষ্টে আকাশে নানারঙা মেঘের দিকে চেয়ে দেখছিলেন, তারা ক্ষণে ক্ষণে কেমন রং বদলাচ্ছে বহুরূপীর মত। একটি মৌমাছি তাঁর শুভ্র কেশের চার পাশে পরিক্রমা করছিল। কি সুন্দর যে তাঁকে দেখাচ্ছিল অস্তাকাশের রাঙা আলোয়!···

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কবি হাসলেন তাঁর চিরস্নিগ্ধ হাসি। বহুরূপীর মতনই তাঁর মুখের ও মনের ভাব বদলাত ক্ষণে ক্ষণে। বললেন, কি? চুপ ক'রে কেন? হানো তোমার প্রশ্নবাণ! নিশানা প্রস্তুত।

আমি হেসে বললাম: আপনাকে এমন ছবির মতন দেখাচ্ছে যে, যুদ্ধং দেহি 'মুড আমার' উবে গেছে।"

কবি পরিহাসের সুরে বললেন : রাখো হে রাখো। তোমাকে কি আমি চিনি নি হাড়ে, হাড়ে? ভালোমানুষি তোমাকে মানায় না—কিন্তু রোসো, আলো নিতে আসছে। চলো যাই আমার বসবার ঘরে।

কবির সামনে চৌকি টেনে নিয়ে বললাম : মেয়েদের সম্বন্ধে আপনি আজ সকালে যা যা বললেন, আমি লিখে রেখেছি। আপনাকে দেখিয়ে নেব কাল-পরশু। কিন্তু আজ এ সম্বন্ধে আরো কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে—যদি আপনার সময় থাকে—

কবি (হেসে) : অত বিনয়ও তোমাকে মানায় না হে। ধরো নিজমূর্তি। বলো কি প্রশ্ন? মেয়েরা ছেলে না হয়ে মেয়ে হ'ল কেন?

আমি (হেসে) : আপনি অন্তর্যামী। সত্যিই আমার জিজ্ঞাস্য ছিল—মেয়েরা যে আজকের দিনে ষোলো আনা পুরুষালি ঢঙে দীক্ষা নেবার বায়না ধরেছে—বলা সুরু করেছে যে, নারী ও পুরুষের সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব একই—এ সম্বন্ধে আপনার কি মত?

কবি : উত্তরে বলতে হবে আমাকে একটা অতি পুরোনো কথা—যাকে ইংরেজীতে বলে প্ল্যাটিটিউড। কারণ আমি বরাবরই ব'লে এসেছি, নারী পুরুষকে পূর্ণ করতেই এসেছে, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে নয়। কথাটা শুনতে খানিকটা সেকেলে শোনাতে পারে—কিন্তু কোনো উপলব্ধি যদি সত্য হয় তবে সময়ের শিলমোহরে খতিয়ে তার শ্রীবৃদ্ধিই হয়। তাই মামুলি শোনালেও আমি নিরুপায়—আমাকে বলতেই হবে সেই একই কথা, যে, পুরুষের কীর্তির প্রতিযোগী হ'তে চেয়ে যদি নারী কোমর বেঁধে পুরুষের আখড়ায় নামে তবে তাতে ক'রে শেষ পর্যন্ত তার লাভ হবে না—হবে ক্ষতি। কারণ জীবনকে যা সুষমিত করে না তাকে হাতিয়ে নিতে ছুটলে মেয়েদের অন্তর কোনো গভীর তৃপ্তি পেতেই পারে না। শ্রীমস্তিনী রাজত্ব করুক তার নিজের জগতে—যার নাম শ্রী, সুষমা, মাধুরী। তাকে জেগে থাকতে হবে তার স্বভাবে—আরো এই জন্যে যে, তার সহধর্মী সহজেই ভুলে যায় যে, তার পৌরুষ শক্তি পুরুষের পরুষ সভ্যতায় অজস্র ফাটল ধরাবার শক্তিকেই প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে—জান্তে বা অজান্তে। মেয়েরা এই অস্থিরতার রসদ জোগালে চলবে কেন? তাদের লক্ষ্মীসত্তার মঙ্গলস্পর্শে হারিয়ে-যাওয়া ভারসাম্যকে তাদেরই যে হবে ফিরিয়ে আনতে, সারিয়ে তুলতে; পুরুষের সভ্যতা দিশা হারায় সহজেই; নৌকা তার ঝড়-তুফানে সহজেই ওঠে দুলে—তাই মেয়েদেরই 'পরে ভার, তাকে ঠিক পথে চালানো। নইলে ভরাডুবি হবেই হবে।

আমি ('একটু ভেবে) : কিন্তু তাহ'লে কি বলতে চান আপনি, যে, পুরুষের যেসব অধিকার আছে মেয়েরা সেসবের অনধিকারী?

কবি : ঠিক তা নয়। আমি শুধু বলতে চাই যে, মেয়েদের স্বধর্ম পুরুষের স্বধর্মের প্রতিরূপ নয়। আমি বলছি না যে, সে পুরুষের সহযোগিতা করবে না—হ'তে হবে বৈকি পুরুষের সহচরী—অনেক সময়ে তার দিশারিও সে হ'তে পারে—কিন্তু তাকে মনে রাখতেই হবে যে, সহযোগিতা মানে নয় অনুকরণ। সে যখন পুরুষের সেই ভাবে সহায় হবে যেভাবে সহায় আর কেউ হ'তে পারে না—তখনই সে হবে তার পূর্ণ সহযোগিনী—সংহত, নিটোল। তাই আমি বলি যে, সমাজে মেয়েদের সব আগে চাইতে হবে তার নিজের স্থানটি খুঁজে নিয়ে সেখানে বিরাজ করা—পুরুষের কর্মক্ষেত্রে এসে জায়গা জুড়ে বসা নয়। আর এ পারে তারা তখনই যখন তারা স্বধর্মে সুখাসীন হয়।

আমি : এ কথা সত্যি। কিন্তু তা ব'লে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে এসেও তারা তার কাজের খানিকটা ভার নিতে চাইবে না কেন?

কবি : সে কাজে তাদের স্বভাব সাড়া দেয় না ব'লে। পুরুষের নানা কাজে রাজ্যের ধুলোবালি, বিক্ষিপ্ততা, মুখরতা, হানাহানি—সেখানে মেয়েরা এলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়বে যে! কি জানো? (একটু থেমে) আসলে

মেয়েদের শক্তি সক্রিয় হয় নীরবে গোপনে গহনে—খানিকটা গাছের শিকড়ের মতো, পুরুষ কৃতকৃত্য হয় নিজেকে প্রসারিত ক'রে—শাখাদের মতো—তার আন্দোলন, হিন্দোলন, কর্মিষ্ঠতা। কিন্তু এই বাহ্য কর্মিষ্ঠতার বাণী ফল ফলে তখনই যখন গহন ভূগর্ভে তার শিকড় অচল অটল থাকে। নইলে সে উপর দিকে বাড়তে না বাড়তে নিজের ভারেই পড়বে নুয়ে। মেয়েরা হ'ল এই সহিষ্ণু মাটি, যে ধারণ করে—শিকড়কে জোগায় রস, যাতে ক'রে সে বিকশিত হয়ে নিজমূর্তি ধরতে পারে।

আমি : কিন্তু, মাপ করবেন, একথার সমর্থ শুধু এই-ই নয় কি যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ আছে ?

কবি (মৃদু হেসে) : যদি না থাকত তাহলে কি এই বিশ্বলীলা চলতে পারত যুগ যুগ ধ'রে ? আমি তো ভাবতেই পারি নে। যদি স্ত্রীলোক ঠিক পুরুষের মতন একই ধার নিয়ে জন্মাত, একই খেলা খেলতে—তাহলে জীবনের যে-গতির সঙ্গে আমরা পরিচিত তার ছন্দপতন হ'ত কবে। (আবার হেসে) কিন্তু ভাগ্যবলে জীবনযাত্রায় মেয়েরা ছেলেদের প্রতিচ্ছবি নয়—সহযাত্রিণী, তাই লীলার গতি আজো থেমে যায় নি। আর সেই জন্যেই প্রকৃতি মেয়েদেরকে দিয়েছেন ঠিক সেই সব গুণ যা পুরুষের মধ্যে তেমন বিকাশ পায় নি—লজ্জা, বিনম্রতা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, ইত্যাদি। নইলে পুরুষের অশান্ত কর্মজগৎ হ'য়ে দাঁড়াত অপলূকা। আসলে মেয়েরাই যে প্রাণস্পন্দনের ধারয়িত্রী, শক্তির খেলার ধাত্রী, ক্লান্তিতে তারাই তাপ হরণ করে পদে পদে। তারা না থাকলে জীবন হয়ে দাঁড়াত অর্থহীন উচ্ছলতা, অস্থায়ী উত্তেজনা, লক্ষ্যহারা চঞ্চলতার সমষ্টি, আর তার পরেই আসত অন্তহীন অবসাদ—কতকটা—কি বলব—যেমন নেশার পরে আসে শ্রান্তির প্রতিক্রিয়া।

আমি : অনেকে বলেন, মেয়েরা সৃষ্টি করতে পারে শুধু জীবনের নিচের তলায়, কাজেই উচ্চতর সৃষ্টিলোকে তারা থাকবেই থাকবে পুরুষের হুকুমবরদার।

কবি : ছি ছি। মেয়েদের এমন ছোট ক'রে দেখার কথা আমি ভাবতেই পারি না। জীবনে তাদের দানকে আমি খুবই বড় মনে করি। কেন বলি শোনো।

জৈবলোকে পুরুষের শক্তিবীজ যেমন আড়ালে থেকে ভ্রূণ থেকে জীবসৃষ্টির সূচনা করে—স্ত্রী তাকে ধারণ ও লালন ক'রে ধীরে ধীরে রূপায়িত করে, ঠিক তেমনি মনের রাজ্যে তার অদৃশ্য প্রেরণাই বীজের মতন পুরুষের অবচেতনায় সক্রিয় হয়ে তার সৃষ্টিকে সফল করে। তাই মেয়েদের সৃষ্টি শুধু জৈবলোকেই আবদ্ধ নয়—পুরুষ তার মনোলোকে স্ত্রীশক্তিকে ঠিক তেমনি কামনা করে তার মানস সৃষ্টির জন্যে, যেমন স্ত্রী তার গর্ভে পুরুষের বীজকে কামনা করে নবজীবন সৃষ্টির জন্যে। কেবল হয়েছে কি, পুরুষের মনকে সে উদ্বোধিত করে খানিকটা তার প্রেরণাদাত্রী শক্তিকে আড়ালে রেখে, তাই পুরুষের সৃষ্টির কাজে আমরা মেয়েদের দানকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না সচরাচর।

আমার মনে প'ড়ে গেল—কবির একটি কবিতার কয়েকটি চরণ :

"বলেছিনু 'ভুলিব না' যবে তব ছল ছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।…
তবু জানি একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে
গানের ফসল মোর এ-জীবনে উঠেছিল ফ'লে,
আজো নাই শেষ ; রবির আলোক হ'তে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীণ
তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছো অন্তরে আমার,—
বিশ্বের অমৃত-ছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে

ক্ষণে ক্ষণে,—অকারণ-আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান।" (পূরবী—কৃতজ্ঞ।)

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম: আপনি যা বলছেন তাতে তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে মেয়েদের আত্মসিদ্ধির পথ পুরুষের থেকে আলাদা।

কবি: খতিয়ে তাই বটে। প্রধান কথা হ'ল মনে রাখা যে, প্রকৃতি মেয়েদের গড়েন নি ঠিক পুরুষের পুরুষালি ঢঙে চলতে, তারই চলা-পথে তারই বুলি রপ্ত ক'রে। নদীর স্রোতধারা যা চায় তার দুই তীর ঠিক তা চায় না। একটা চলে, অন্যটা বাঁধে; অথচ ওদের গড়ন আলাদা ব'লেই ওরা পরস্পরকে সার্থক করে। দুই তীর খাড়া হয়ে নদীকে ধারণ করে ব'লেই তার স্রোত চলে সমুখবাগে—নইলে নদী নদী থাকত না, হ'ত জলা।

আমি: তাহলে পুরুষ ও নারীর গোড়াকার চাহিদা আলাদা—এই না?

কবি (হেসে): ধরেছ এইবার।

আমি: কিন্তু আলাদা ঠিক কী ভাবে একটু খুলে বলবেন?*

---

* ১৯২৫ সালে ৮ই এপ্রিল তারিখে মেয়েদের সঙ্গে কবির সম্বন্ধে আমার যে দীর্ঘ আলোচনা হয়—বিবাহ-প্রসঙ্গে—তার অনুলিপি তীর্থংকর দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপা হয়েছে। এই সঙ্গে সেটুকু পড়লে কবির বক্তব্য আরো বিশদ হবে।

সংসারে সব রূপের সব প্রকাশের মধ্যেই তাই তিনি চিরদিন সন্ধান ক'রে ফিরেছেন অরূপের, যার রঙেই রূপ হ'য়ে ওঠে অপরূপ, প্রকাশ হয় চরিতার্থ।

একথা আমি প্রথম বুঝবার কিনারায় আসি এক অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায়, যেদিন তিনি নারী সম্বন্ধে তাঁর এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিটিরই আভাস দিয়েছিলেন। আমার Among the Great-এর সব শেষে আমি প্রকাশ করেছি তাঁর এই অপূর্ব ভাষাটি—আমার স্বকৃত ইংরেজিতর্জমায়। কবি এ-তর্জমাটি পরে প'ড়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মূল বাংলা অনুলিপিটি প্রকাশ করি নি সে সময়ে—কারণ ইচ্ছা ছিল এ বিষয়ে কবির সঙ্গে আর একবার নিরালায় ব'সে আলোচনা ক'রে পরে প্রকাশ করব। কিন্তু দুঃখের বিষয় Among the Great প্রকাশিত হবার পরে কবির সঙ্গে আমার মূল বাংলা কথালাপটির রিপোর্ট হারিয়ে যায় কবির অনেকগুলি মূল্যবান্ চিঠির সঙ্গে। এ-দুঃখ আমার যাবে না কোনদিন। কিন্তু সে অন্যকথা। এ ভাষাটির ভূমিকা শেষ করি।

১৯২৭ সালে যখন আমি দ্বিতীয়বার য়ুরোপে যাই তখন এ-কথালাপের রিপোর্টটি টাইপ ক'রে পাঠাই হাভেলক এলিস সাহেবকে। তিনি আমাকে এ-সম্বন্ধে সোচ্ছ্বাসে লেখেন:

"It gives me joy to find that Tagore says clearly, at almost every point, what I have said, or tried to say cleariy, in my book **Man and Woman.** On the whole I could hardly desire to see a more beautiful presentation in a short space, of a conception which corresponds to my own, than what Tagore has put into this conversation, with a skill in speech beyond me,"

কিন্তু এলিস সাহেবের Man and Woman বইটি প'ড়ে আমি একটু নিরাশই হয়েছিলাম। কেননা তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে কবির বক্তব্যের কিছু মিল থাকলেও কবি তাঁর কথালাপের মধ্যে দিয়ে নারীর স্বরূপের যে নিটোল মাধুর্য ও অপরূপ মহিমাটি ফুটিয়ে তুলেছেন, এলিস সাহেবের বহির্মুখী দৃষ্টিতে সে-মহিমাটি আদৌ মূর্ত হয়ে ওঠেনি। এ শুধু আমার নিজের কথা নয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমও আমাকে লিখেছিলেন একটি পত্রে। তাঁর মন্তব্যটি গভীর ব'লে এখানে উদ্ধৃত করলাম, আরো এই জন্যে যে, রবীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় আত্মার একটি পরম প্রকাশ, আমার এ-ধারণা কৃষ্ণপ্রেমের পত্রে পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। তিনি লিখেছিলেন তাঁর আলমোড়ার তপোবন থেকে (১৪. ৯. ৪৫):

"I have just finished reading your conversation with Rabindranath in **Among the Great.** In particular I liked the discussion on the separate **Dharma** of Man and Woman. Nothing I have ever read of his struck me as so deeply and sensitively true. I dare say Havelock Ellis did say something of the sort in his own way, but I am quite sure it didn't have the sensitiveness of Rabindranath's treatment nor will it have beeu delineated against a spiritual background..."

ভারতের এই আত্মিক আবহের মূল্য সম্বন্ধে বিবেকানন্দ তথা শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন তাঁদের নানান্ সুচিন্তিত মতামত। সে-সবের সারমর্ম এই যে, এই অধ্যাত্মসংস্কার ভারতীয় ভাবুকের সহজাত। রবীন্দ্রনাথ নারী সম্বন্ধে তাঁর যে আধ্যাত্মিক ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি ফুটিয়ে তুলেছেন তার গোড়াকার কথাটি এই যে নারী পুরুষের আত্মার আত্মীয়া—শক্তিস্বরূপিণী। এ-দৃষ্টিভঙ্গি য়ুরোপের চিন্তার আবহে আজ পর্যন্ত ফুটে ওঠে নি ব'লেই আরো বহু য়ুরোপীয় ভাবুক তাঁর নারীর মূল্যায়ন সম্বন্ধে সচকিত হয়ে উঠেছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের প্রশস্তিটি উদ্ধৃত করলাম শুধু এই কথাটির 'পরে জোর দিতেই।

আমার অনেকদিন থেকেই এ-আলাপটির অনুবাদ করার ইচ্ছা ছিল, তবে নানা কারণে হয়ে ওঠে নি। আজ যথাসাধ্য কবির শৈলী ও ভঙ্গি বজায় রেখে এটি প্রকাশ ক'রে তৃপ্তি বোধ করছি। স্থলে স্থলে কবির শৈলীকে আদর্শ ক'রে অনুবাদ ঠিক মূলানুগ না ক'রে ভাবানুগ করেছি।

আর এ-সূত্রে একটি অঙ্গীকার করতে পারি অকুতোভয়েই: যে, কবির মূল বক্তব্যটির 'পরে আমি কোথাওই রং চং লাগাই নি বাহাদুরি দেখাতে চেয়ে।

কবি : ধরো, পুরুষ বেশি বয়সে অস্বাভাবিক অনেক কিছুর সঙ্গে ঘর করতে পারে, নৈর্ব্যক্তিক হ'তে পারে, এমন কি অসামাজিকও হ'তে তার তেমন বাধে না। কিন্তু মেয়েরা স্বভাবতই আমাদের প্রকৃতির ব্যক্তিগত, সাংসারিক সামাজিক রূপকে ভালোবেসে ফেলে। এককথায়, পুরুষ মানুষকে বরণ করে যখন সে কাছে আসে, মেয়েরা মানুষকে বরণ করে সে মানুষ ব'লে। তাই দেখতে পাবে যে, মেয়েদের কাছে মানুষ মানুষ ব'লেই যতটা বাস্তব, স্পষ্ট, পুরুষের কাছে ততটা নয়। আর ঠিক সেই জন্যেই পুরুষেরা মেয়েদের কাছে শুধু যে বেশি প্রেরণা পায় তাই নয়—তাদের স্নিগ্ধতায় ও বরণে প্রাণের খোরাক পায়। তাদের এই শক্তিকেই নাম দেওয়া হয়েছে হ্লাদিনী শক্তি—যে-শক্তি নিরন্তরই আমাদের মনে আনন্দের রস চারিয়ে দিচ্ছে। এ-শক্তি তাদের খানিকটা সহজাতই বলব—স্বধর্ম—যেমন দোয়েলের স্বধর্ম চঞ্চলতা, তুষারের—শুভ্রতা। তাই তো আমরা আমাদের একঘেয়ে কর্মচক্রের চাপে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের সান্নিধ্যে পাই এত আরাম—তারা আমাদের টানে যেমন চুম্বক টানে লোহাকে। তাদের হ্লাদিনা শক্তিই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। একথাকে কবিত্বের অত্যুক্তি বলা চলে না, কেননা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার এই-ই এজাহার—চিরন্তন, অপ্রতিবাদ্য, স্বতঃসিদ্ধ।

কবি আত্মমনস্ক ভাবে ব'লে চললেন—মনে হ'ল আমার যেন কবিতার ঝংকার শুনছি : তাই জন্যে পুরুষ মুক্তি চায় যেখানে মেয়েরা চায় নীড় বাঁধতে, একথা মেনে নিলেও দেখা যায় যে পুরুষ পুরোপুরি সিদ্ধিলাভ করতে পারে না শূন্যব্যাপ্তির মধ্যে। আমি তোমাকে একবার বলেছিলাম, বুদ্ধদেবকে সুজাতার স্নিগ্ধ সেবার কাছে হাত পাততে হয়েছিল, খৃষ্টদেবকে মার্থা ও মেরির কাছে। মানুষের আত্মবিকাশের ইতিহাসে এই সত্যটিরই পরিচয় পাই বার বার। তাই এমন কি শিব যে শিব—তাঁর তপস্যাও ভিতরে ভিতরে চেয়েছিল পার্বতীর কোমল হাতের কমনীয় সেবা-পরিচর্য্যা।

আমি : এটুকু বুঝতে আমাকে বেগ পেতে হয় নি। কেবল আপনার একটি কথা আমার কাছে এখনো প্রাঞ্জল হয় নি। আপনি কি বলতে চাইছেন যে, মুক্তি চায় শুধু পুরুষ—মেয়েদের মুক্তির দরকার নেই?

কবি : না, তা নয়। আমার বলবার উদ্দেশ্য—উচ্ছ্বাস, আবেগ, ইহলৌকিকতা মেয়েদের কাছে যত দরকার পুরুষদের কাছে তত নয়। অন্য ভাষায়, মেয়েরা পূর্ণ আত্মসিদ্ধিতে পৌঁছয় প্রেম ও নীড়ের মাঝে—যেখানে পুরুষের চাই মুক্তির অবকাশ—অনাসক্তির আবহ। পুরুষ আত্মবোধের চূড়ায় পৌঁছয় যখন সে বরণ করে অসীমের অভিসার—সে ঘরে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে না—সার্থক হবার জন্যে তার চাই নিত্য নব আবিষ্কার।

আমি : মেয়েরাও কি চায় না অসীমের অভিসার?

কবি : চায় বৈ কি। প্রতি সার্থকতায়ই অসীমের ছায়া কিছু না কিছু পড়বেই—তা সে সার্থকতা যত সামান্যই হোক না কেন—ঠিক যেমন যে-কোনো হর্ষ কি পুলক চিরন্তন আনন্দের কিছু না কিছু আভাষ দেবেই দেবে। (হেসে) দেখো, বাইরে গিয়ে যেন আমার বদ্‌নাম রটিয়ো না এই ব'লে যে, আমি ব'লে বেড়াচ্ছি—মেয়েরা চিরদিনই নাবালিকা, কাজেই অসীমের স্বপ্ন, আশার বেসাতি করতে অক্ষম। মেয়েরাও যখন মানুষ তখন অসীমের অভিসারে তাদেরও চলতে হবে মুক্তি পেতে—বটেই তো। আমি কেবল জোর দিতে চাই এই কথাটির 'পরে যে, তাদের মুক্তির পথ ও পদ্ধতি আলাদা। কারণ অসীমকে, চিরন্তনকে তাদেরও না পেলেই নয়—কেবল পুরুষের মতন তারা তাকে চাইবে না ব্যাপ্তি ও অনাসক্তির মধ্যে দিয়ে : চাইবে বন্ধন ও সংহতির মাধ্যমে।

আমি : আর একটু খুলে বলবেন?

কবি : একটু চোখ চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবে—প্রকৃতি পুরুষকে খানিকটা ছাড়া দিয়ে চেপে ধরেছে মেয়েদেরকে। ফলে পুরুষও শোধ তুলেছে ব'লে—বেশ আমিও তোমাকে ছাড়ব—থাকব না তোমার অনুগত। মেয়েরা ঠিক এভাবে প্রকৃতির অবাধ্য হ'তে পারে না। বুঝলে?

আমি : এখনো একটু ঝাপসা লাগছে।

কবি : একটা দৃষ্টান্ত নাও। গোপাকে ছাড়তে চাওয়ার তাগিদ যেভাবে বুদ্ধের কাছে ছিল তাঁর পৌরুষের স্বধর্ম, গোপার কাছে বুদ্ধকে ছাড়তে যাওয়া ঠিক সেভাবে সম্ভব ছিল না তার মেয়েলি স্বধর্ম মেনে।

আমি : আপনি কি বলতে চাইছেন যে, গোপার পক্ষে বুদ্ধকে ত্যাগ ক'রে মুক্তি খোঁজা হ'ত অস্বাভাবিক!

কবি : এইবার ধরেছ।

আমি : কিন্তু কেন অস্বাভাবিক—বলবেন?

কবি : কারণ গোপা ছিল নারী। তাই তার স্বভাব ত্যাগের ফাঁকার মধ্যে টিঁকতে পারত না যেভাবে পেরেছিলেন বুদ্ধ—সহজেই।

আমি : কিন্তু এমন নারী কি দেখা যায় না—যারা খানিকটা পুরুষালি ধাঁচেই গড়া?

কবি : কে অস্বীকার করছে? পুরুষালি মেয়ে বা মেয়েলি পুরুষ জগতে থেকে থেকে এখানে ওখানে দেখা যায় তো বটেই। কিন্তু তা ব'লে কি বলবে যে, মেয়েলি পুরুষ পুরুষের প্রতিনিধি, বা পুরুষালি মেয়ে মেয়েদের? এদের বলতেই হবে ব্যতিক্রম।

আমি : কিন্তু আপনি যে বলছেন বুদ্ধ গোপাকে সহজেই ছাড়তে পেরেছিলেন, তিনি স্বভাবে পুরুষ ছিলেন ব'লে, তার নিহিতার্থটি ঠিক কী আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলবেন? আমার জিজ্ঞাস্য—ডাক শুনলে মেয়েরাও কি এইভাবে ছাড়তে পারে না সব কিছু? পুরুষের পক্ষে অসীমের ডাকে সাড়া দেওয়া বেশি সহজ হবে কেন? তাছাড়া নারীর কাছে পুরুষ যেমন অপরিহার্য, পুরুষের কাছেও কি নারী ঠিক তেমনি অপরিহার্য নয়? না, আপনি বলতে চাইছেন যে, প্রেম পুরুষের বিকাশের পক্ষে খানিকটা বাহ্য—না হ'লেও চলে?

কবি (আত্মমনস্ক): না—ঠিক তা আমি বলতে চাই নি। কারণ এভাবে বললে আমার বক্তব্যটিকে খানিকটা বিকৃত করাই হবে—মনে হবে যেন আমি এ যুগের কর্ম ও নৈপুণ্যের বাণীতে সায় দিই—যার সঙ্গে সৌন্দর্য ও সুষমার কোনো লেনদেনই নেই। সৌন্দর্য ও সুষমাকে বর্জন ক'রে কর্মে আনন্দ কোথায়? তুমি জানো—আমি বরাবরই দুঃখ পেয়েছি আমাদের আধুনিক সভ্যতা সৌন্দর্যকে পাশ কাটিয়ে উত্তরোত্তর শুষ্কতার দিকেই ঝুঁকছে ব'লে। বারবারই আমি বলেছি যে, এতে জগতের মঙ্গল নেই। সঙ্গে সঙ্গে বলেছি যে এই হারিয়ে-যাওয়া সুষমাকে ফিরিয়ে আনতে পারে কেবল মেয়েরা। পুরুষের সৃষ্ট সভ্যতায় তারা যদি এসে বেশি ক'রে যোগ দেয় তবেই রক্ষে কাজেই আমি একথা বলতেই পারি না যে মেয়েদের না হ'লে পুরুষের খাসা চলে। গোপা বুদ্ধকে প্রথম থেকেই একটুও ভালো না বাসলেও বুদ্ধের ক্ষতিবৃদ্ধি হ'ত না এমন কথা বলাটা হবে মূঢ়তা! গোপার প্রেম বুদ্ধের কাছেও ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয় ছিল যেমন ছিল গোপার কাছে বুদ্ধের প্রেম। তফাৎ এই যে, দাম্পত্য প্রেম গোপার কাছে ছিল সর্বস্ব, বুদ্ধের কাছে আত্মবিকাশের সহায়, শক্তি। অন্য ভাষায়, প্রেমের আবেগ নারীকে ধারণ করে মেরুদণ্ডের মত—যেখানে পুরুষকে সে তার পথ-চলায় আলো ধরে, দিশা দেখায়—অপরূপ সে আলো দিশা—কে না মানবে? কিন্তু তাই ব'লে বলা চলে না এই তার জীবনের চরম পরম লক্ষ্য। বুঝলে?

আমি (একটু চুপ ক'রে থেকে): বুঝেছি—কিন্তু···মাফ করবেন···তাহ'লে কি বলতে হবে যে, মেয়েরা মহত্ত্বে পুরুষের সমান নয়?

কবি : তা কেন? শুধু বলা—যে, দু'জনের স্বভাব ও ছন্দ আলাদা, আর আলাদা ব'লেই সৃষ্টির লীলায় বৈচিত্র্য আজো ফুরোল না। স্ত্রী যদি স্বভাবে স্বতন্ত্র না হ'ত তাহ'লে বিশ্বলীলার প্রকাশের ও লাবণ্যের প্রাণস্পন্দন থেমে যেত কবে! বস্তুতঃ, সৃষ্টির প্রেরণা নিজেকে নিত্য নতুন ক'রে রচনা করতে চায় ব'লেই প্রকৃতি একজনকে অপরের প্রতিরূপ ক'রে গড়তে চান নি। এক কথায়, নারী ও পুরুষকে স্বভাবে ভিন্নধর্মী ক'রেই তৈরি করা হয়েছে ব'লেই উভয়কে একলক্ষ্য হয়ে আলাদা ছন্দে চলতে হবে—যদি তারা কৃতকৃত্য হ'তে চায়।

... ...

কবিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, বললেন : আমি আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলি, স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য ঠিক কোনখানে বোঝাতে।

পুরুষকে আমি নাম দিই জন্মজিজ্ঞাসু—অসীমের অধরার অভিসারী—এ অসীম অধরাকে মুক্তি, নির্বাণ, ভগবান্, যে-নামই দাও না কেন। তাই কোন উপলব্ধি যতই বড় হোক না কেন, তাকে পরম সার্থকতায় পৌঁছে দিতে পারে না যদি সে তাকে বাঁধে—তাকে নোঙরছাড়া করতে বাধা দেয়। প্রেম তার কাছে খুব বড় উপলব্ধি হ'তে পারে, তার জীবনকে আলো করতে পারে—কিন্তু কেবল এই সর্তে যে সে বন্ধন হয়ে দাঁড়াবে না।

নারীর মুক্তি বা সার্থকতা অন্য পথের পথিক। তাই প্রেম তাকে শুধু আলো দেখায় না—ধারণ করে তার সত্তার কেন্দ্র—উপজীব্য হয়ে। এই জন্যে পুরুষ না পারলেও সে পারে শুধু প্রেমের কাছে হাত পেতে জন্ম সার্থক করতে।

... ...

কবি একটু থেমে ব'লে চললেন তাঁর গাঢ় মধুর কণ্ঠে : সব গভীর প্রেমেই পাওয়া আর না-পাওয়া চলে হাত ধরাধরি ক'রে। তাই বিদ্যাপতি গেয়েছিলেন,

জনম অবধি হম রূপ নিহারল, নয়ন ন তিরপিত ভেল।...
লাখ লাখ জুগ হিয় হিয় রাখল, তইও হিয় জুড়ল ন গেল!

আমরা জীবনে কোন কিছুই পাওয়ার মতন পেতে পারি না যতদিন সে আমাদের সত্তার সঙ্গে মিশে ম'জে লীন হ'য়ে না যায়—আর এ-পরম প্রাপ্তি হাতে আসে না যদি আমরা তাকে না দিয়েই পেতে চাই। প্রেমের উপলব্ধিকে পেতে হ'লে দিতে হয় গভীর অনপনেয় বেদনার মূল্য। এ দাম দিতে না চাইলে প্রেমকে উপলব্ধি করা যায় না—সে হয়ে ওঠে না আমাদের বিকাশের পরম সম্পদ্। কেউ বাইরে থেকে কিছু দিলেই তাকে পাওয়া যায় না—কোন মহৎ সম্পদ্কেই চাইতে না চাইতে মেলে না। আমাদেরকে হ'তে হবে তার যোগ্য, করতে হবে তাকে অর্জন—যদি ডাক আসে তবে প্রাণের রক্ত দিয়ে তাকে অঙ্গীকার করতে হবে। নইলে সে-পাওয়া হবে না সত্য, প্রেম আমাদের বরণমালা পরিয়ে উজাড় ক'রে দেবে না তার যা কিছু আছে।

নারী ও পুরুষ কিভাবে পরস্পরের কাছে প্রার্থী—কি ভাবে এর রিক্ততা ওর সম্পদের কাছে হাত পেতে সার্থক হয়ে ওঠে, তার একটি বড় সুন্দর নিটোল ছবি কবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন নারীর ভাবকে তারার স্বরে আরোপ ক'রে—যার মর্ম আমি পরে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম বিদেশে। কবিতাটির নাম কবি দিয়েছেন "অতিথি" :

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি' দিলে নারী,
মাধুর্যসুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে ; যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হ'তে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা ; নির্জন এ-বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ গগনে
ঊর্ধ্ব হ'তে একতানে এল প্রাণে আলোকেরি বাণী—
শুনিনু গম্ভীর স্বর, 'তোমারে যে জানি মোরা জানি ;
আঁধারের কোল হ'তে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষিতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।'
তেমনি তারার মতো মুখে মোর চাহিলে কল্যাণী,
কহিলে তেমনি স্বরে, 'তোমারে যে জানি আমি জানি।'
জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি,—
'প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।'

—০—

রবীন্দ্রনাথ ও রাষ্ট্রচেতনা

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কবিকৃতি, ধর্মচিন্তা, সমাজবোধ ও রাষ্ট্রচেতনা প্রভৃতি ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মানস ও মনীষা, ভাবনা ও কার্য্যক্রম বিচিত্র ও সমৃদ্ধ হইলেও প্রধানতঃ তাহা সৌন্দর্য্যবোধ হইতে উৎসারিত বলিয়া নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের রাজনৈতিক দিক্ লইয়া তাহার প্রসার খুবই অল্প, মূলগত প্রশ্ন লইয়া কিছু স্পষ্ট মতামতই তাঁহার লেখায় ও ভাষণে পাওয়া যায়। তবে স্বদেশের মর্য্যাদায় ইংরেজ শাসকগণের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা যেখানে ও যখন রূঢ় আঘাত হানিয়াছে সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে দাস ও প্রভু এই দুই শ্রেণীর প্রভেদ বর্ত্তমান বলিয়া যে-ধারণা শ্বেতকায়জাতির মনে বদ্ধমূল হইয়া নিজেদের প্রভুজাতিভুক্ত ও শ্বেতেতরগণকে দাসশ্রেণীভুক্ত বলিয়া ভাবিতে শিখাইয়াছিল; নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্য কায়েম রাখিবার জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া, তাহাদের চিরকালের জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও নিরুপায় করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টার ন্যায় নিষ্ঠুরতা ও অধর্ম্মকে ইম্পিরিয়ালিজম্, ন্যাশান্যালিজম্ প্রভৃতি বুলিদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহাকে যে শ্বেতকায়গণ গৌরবের বস্তু করিয়া তুলিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র নিন্দা ও কঠোর সমালোচনা "রাজা প্রজা", "কালান্তর", প্রভৃতির মধ্যে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

> "রাজ্য বিস্তার মদোদ্ধতই। ইংলণ্ড আজকাল উষ্ণমণ্ডলবাসী জাতিমাত্রকে আপনাদের গোষ্ঠীর গরুর মত দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অদ্য আমাদের হীনতার অবধি নাই, এ কথাও সত্য, কিন্তু উষ্ণমণ্ডলভুক্ত ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর মজুরী করিয়া থাকে নাই, থাকিবে না।"*

ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা-লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৃথিবীতে অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া সমাজচ্যুত ছিল, তাহাকে যে সেই অবস্থা হইতে আবার বিশ্বসমাজে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হইতে হইবে, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-লাভের সম্ভাব্যতা ক্ষীণ পরিদৃষ্ট হইলেও ভারত যে নিজস্ব ক্ষমতায় বিশ্বের প্রতিভাদীপ্ত স্থানে মর্য্যাদাময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার ক্ষমতা রাখে, তাহাতে আস্থাবান্ হইয়া আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে রবীন্দ্রনাথ বার বার আহ্বান জানাইয়াছেন। অন্তরে বাহিরে তিনি এই মন্ত্র প্রচারের তাগিদ অনুভব করিয়াছিলেন এবং "প্রবাসী" পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ "ছোটবড়" ও "স্বাধিকারপ্রমত্তঃ", প্রভৃতি প্রবন্ধে তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন:

> "ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব না, কিছুতেই না * * * * বাহিরের দিক্ হইতে স্বাধীনতা পাওয়া, এমন ভুল যদি মনে আঁকড়াইয়া ধরি তবে বড় দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙ্গিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়া অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব এ কথা যে বলে সে লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না * * * * * ভিক্ষার ডাকে আমরা মানুষ হইব না।"

রবীন্দ্রনাথের মানসে এই ভাবের উৎপত্তি তাঁহার গৃহের পরিবেশজাত। দেশের চিন্তাধারার সহিত তাঁহাদের বাড়ীর চিন্তাধারার যে প্রভেদ ছিল, শৈশবকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রভাবাধীন হইয়া পড়েন এবং "জীবনস্মৃতি"তে তিনি সুন্দর ভাবে তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:

> "সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোক দেশের ভাষা ও দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। * * * আমাদের বাড়ীর সাহায্যে হিন্দুমেলা নামে একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল * * * * ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তি করিবার চেষ্টা সেই প্রথম হয়।"

এই ভাবধারা কিশোর বয়স হইতে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। ১৩০৫ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় 'অপরপক্ষের কথা'য় তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের জননায়কগণের ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি প্রণালীতে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াসে হতাশ হইয়া লিখিয়াছিলেন :

"তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া আমাদের মনে আশ্বাস হয় না * * * দেশকে কেমন করিয়া স্পর্শ করিতে হয় ? দেশের ভাষা বলিয়া, দেশের বস্ত্র পরিয়া।"

রবীন্দ্রনাথ এই দেশের ভাষায় দেশের কথা বলিবার প্রথম সুযোগ পাইলেন, পাবনায় রাষ্ট্রিক আলোচনা সম্পর্কিত সভায় ১৩১৪ সালে প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিরূপে ভাষণ প্রদানকালে। তিনি তাঁহার ভাষণ শুধু মাতৃভাষায় প্রদান করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই, এই ভাষণে তিনি আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদেও স্বদেশীয়ানা প্রবর্ত্তন, দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য কর্মোদ্যোগকে ফিরানো এবং আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইবারও আবেদন জ্ঞাপন করেন। আমাদের দেশের নেতৃশ্রেণীর রাজদরবারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজনীতি পরিচালন, আবেদন-নিবেদনের পদ্ধতি ও মেকী সাহেবীয়ানার প্রতি তীব্র ধিক্কার এই ভাষণের ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত। এই সব কারণে পাবনা কনফারেন্স আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন দিকে যাত্রার সূচনা হিসাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমাদের রাষ্ট্রিক চেতনার এই নবজাগরণে রবীন্দ্রনাথের দান অমূল্য। রাজনীতিক্ষেত্রে মাতৃভাষায় আলোচনার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা অবশ্যই তিনি পূর্ব্বে রাজসাহী সম্মেলনে করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় একজন নিখিল ভারতীয় নেতার আপত্তির ফলে তাহা সফল হয় নাই। আত্মশক্তিতে আস্থা রাখিয়াও আবেদন-নিবেদনের পন্থা পরিহার করিয়া চলিবার আহ্বান অবশ্যই তিনি উনবিংশ শতকের প্রায় শেষ দিকে ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের ছাত্রদের কাছে 'ভিক্ষায়াং নৈবনৈব চ' কবিতা মারফৎ প্রথম জ্ঞাপন করেন। দেশের ভূষণকে অঙ্গের ভূষণ করার কথাও তিনি তাঁহার 'নববর্ষ' শীর্ষক কবিতায় বলিয়াছেন। নববর্ষ বরণ করিতে গিয়া প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন,

"নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা।"

এই কবিতাটিতেই আছে,

"রাজা তুমি নহ হে মহাতাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয়,
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।"

এবং বঙ্গভঙ্গজনিত বিদেশীবর্জ্জন ও স্বদেশীগ্রহণ আন্দোলনকালে গাহিয়াছিলেন,

"পরব না আর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি।"

আত্মশক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার বাসনা বঙ্গভঙ্গজনিত আঘাতে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে; তাই দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে' লিখিলেন :

"আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্রমূর্ত্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একই মাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।"

তাঁহার 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন :

"বিধাতার কৃপা ঝড়ে জাহাজকে যে ঘাটে আনিয়া ফেলিয়াছে ইহার নাম আত্মশক্তি। এইখানে যদি আমরা কেনাবেচা করিতে পারিলাম ত পারিলাম, নতুবা অতলস্পর্শ লবণাম্বু-গর্ভে ডুবিয়া মরাই আমাদের শ্রেয় হইবে।"

আমাদের করণীয় কি সে সম্বন্ধেও তিনি 'বঙ্গদর্শন'-এ ইঙ্গিত দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

"আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য্য আমাদের নিজের হাতে লইতে হইবে··· চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্ব্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব।"

স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, কৈশোরে যে স্বাদেশিকতা গৃহপরিবেশ ও হিন্দু মেলা আন্দোলনের ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনে উন্মেষিত হইয়াছিল তাহা স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে ধীরে ধীরে আচারে ব্যবহারে ও দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হইয়া উঠিতেছিল। বিংশ শতকের প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাদা পাঞ্জাবী, সাদা উত্তরীয় ও পদযুগলে সাদা কটকী কাজ করা চটিজুতা পরিহিত মনোহর বেশে আসিতেন তাহা আমার বাল্যে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই পোশাক অল্পকাল মধ্যে বাবুসমাজের পোশাক হইয়া উঠে। তাঁহাদের বৈঠকখানাও শিক্ষিত সমাজের বৈঠকখানার শোভা সোফা টেবিল প্রভৃতির পরিবর্ত্তে, সুন্দর দেশীয় কেতায় শোভিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিংশশতকের প্রারম্ভেই তাই গাহিতে পারিয়াছিলেন:

"কাঞ্চন থালি নাহি আমাদের অন্ন নাহিক জুটে,
যা আছে মোদের এনেছি আজিকে নবীন পর্ণপুটে।"

রবীন্দ্রনাথ শুধু পথ দেখাইয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, যে পথকে তিনি ধ্রুবপথ রূপে বুঝিয়াছিলেন সেই পথে অগ্রসর হইতে, হাতে-কলমে গ্রামসংগঠনের রচনাত্মক ধারা প্রবর্ত্তনের জন্য প্রথমে তিনি পাবনা জেলার শিলাইদহ অঞ্চলে এবং পরবর্ত্তী জীবনে বোলপুর সুরুলে যে ধারা রূপায়ণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন সেই ধারা আজিও অতি উচ্চ পর্য্যায়ের সফল পদ্ধতিরূপে পরিচিত আছে।

এই রচনাত্মক দিক্ ভিন্নও বিদেশী শক্তি যখনই আমাদের লাঞ্ছিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে তখনই স্বভাবতঃ এই মধুরভাষী মহানায়কের সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ বজ্রকঠোর মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। বিদেশী শাসকের মূঢ় অহমিকা মাতৃ-ভূমির লাঞ্ছনা যখনই করিয়াছে, বজ্রের দৃঢ়তা তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁহার "নাইট" উপাধি ত্যাগ, মিস্ এলিনর র্যাথবোনকে পত্র, প্রভৃতিতে তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহারও পূর্ব্বে ১৯১৭ সালের জুন মাসে ভারতবর্ষের আত্মশাসনের অধিকার সমর্থন করিয়া আন্দোলন প্রবর্ত্তন করার "অপরাধে" শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট যখন নির্ব্বাসিত হন, তখন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মিষ্টার কামিং ও পুলিশের পক্ষে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দিয়া জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ সভা করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপনে সাহসী হইলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন; ফলে কোনও রাজনৈতিক নেতা প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সকল ভীতিকে অতিক্রম করিয়া দুর্জ্জয় সাহসে 'রামমোহন লাইব্রেরী' গৃহে এক জনসভায় 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' নামক রচনা পাঠ করিয়া স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করেন যে, "এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব?" এই বক্তৃতা যাঁহাদের শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁহাদের মানসপটে নিশ্চয়ই সেই দিনের স্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরের আরোহণ-অবরোহণ, চক্ষুর অগ্নিস্ফুরণ ও সমস্ত দেহভঙ্গীর পরিবর্ত্তন বিস্মৃত হইবার জিনিস নহে। এই সকলের মধ্য দিয়া তাঁহার অন্তরের তীব্র প্রতিবাদ এমনভাবে ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল যাহা বিরল। কত বড় অপমানবোধে পীড়িত ও কত বেদনা! আহতচিত্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির অবমাননা ও বেদনাকে যেভাবে মূর্ত্তি দিয়াছিলেন তাহা যে না দেখিয়াছে তাহাকে ভাষা দিয়া বুঝানো অসম্ভব। এই অপরূপ মূর্ত্তিতে তাঁহার আবির্ভাব আবার প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ মিলিয়াছিল অক্টারলোনী মনুমেণ্টের পাদদেশে হিজলী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদার্থে আহূত সভায় সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের সময়।

বক্সা বন্দীশালায় আবদ্ধ বাঙ্গলার মুক্তিসাধকগণকেও তিনি অন্তরের অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন।

ভারতের চিরন্তন আদর্শ পঞ্চশীলের প্রতি স্বাধীন ভারত যে আস্থা ঘোষণা করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার বহু পূর্ব্বেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শগত ভেদের স্বরূপ অনুভব করিয়া প্রাচ্যের এই আদর্শের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :

"সাম্রাজ্যিকতাবোধকে য়ুরোপ যেমন পরম মঙ্গল ব'লে বোধ করেছে এবং সেজন্য বিচিত্র ভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে—বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ ব'লে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকেই উদ্বোধিত করবার জন্য তার চেষ্টাকে পরিচালনা করেছে। * * * ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি, তাকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোট ক'রে, মিথ্যা ক'রে তুলতে পারব না। আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড়ো রকম ক'রে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে। জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ, বিরোধ, বিচ্ছেদ নয়; ছোট বড় আত্মপর সকলের মধ্যে উদার ভাবে প্রবেশের যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব।"

রবীন্দ্রনাথ সাম্যের সত্যকার পূজারী ছিলেন। 'বিচিত্রা'য় তাঁহার এই মতের স্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাই। তিনি লিখিয়াছেন :

"যেখানেই একদলের অসম্মানের উপর আর একদলের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই তার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে বিপদ্ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যায় সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম্ম। * * * যদি সহজে সাম্য স্থাপিত হয় তাহলেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই! মানুষ যেখানেই মানুষকে পীড়িত করবে, সেখানেই তার সমগ্র মনুষ্যত্ব আহত হবেই, সেই আঘাত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।"

যে বৎসর রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষ পূর্ত্তি হয় সেই বৎসর তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবে ভাষণদান প্রসঙ্গে তিনি ভারতে ইংরেজ-শাসনের রুদ্ররূপ দর্শনে ব্যথিত-চিত্ত হইলে নৈরাশ্যবোধ না করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আশা ব্যক্ত করেন, আজ তাহা সফল হইয়াছে। তিনি এই ভাষণে বলিয়াছিলেন :

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে, কী লক্ষীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। * * * আজ আশা ক'রে আছি পরিত্রাণকর্ত্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা ক'রে থাকব সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে সে শোনাবে এই পূর্ব্বদিগন্ত থেকেই। * * * আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল প্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। * * * মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ ব'লে মনে করি। এই কথা আজ ব'লে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতামদমত্ততা ও আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ্ নয় তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।" (সভ্যতার সংকট।)

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় ও অসাম্যে এতদূর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি বিশ্বনিয়ন্তার নিকট এই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন :

"মহাকাল-সিংহাসনে সমাসীন বিচারক,
শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আন বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নরঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন,

নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।"

সাম্রাজ্যবাদী লালসার বীভৎস রূপ দেখিয়া সেই দানবের ধ্বংস ভিন্ন পৃথিবীর মুক্তি নাই বুঝিয়া নববীরগণকে আহ্বান জানাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস,—
বিদায় নেবার আগে তাই—
ডাক দিয়ে যাই—
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

—০—

সাময়িক পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সাময়িক সাহিত্য বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ অথবা ধারাবাহিক উপন্যাস। গত দুই শত বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যদেশে সাময়িক সাহিত্যের যে বিপুল প্রসার হয়েছে—সে সম্বন্ধে বহু গবেষণা, আলোচনা সে দেশে হয়ে গেছে। পাশ্চাত্ত্য শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই সব পত্রিকার মাধ্যমে তাঁদের সাময়িক কথা বা চিরন্তনী বাণী প্রকাশ ক'রে গেছেন।

বাংলা দেশে সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস খুব পুরাতন নয়—দেড়শ বৎসরও হয় নি; তার মধ্যে প্রথম কয়েক দশকে যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে ছিল ধর্মালাপ, সামাজিক মতামতের আলোচনা, পূর্ব ও পশ্চিমের সংঘাত এবং প্রাচ্যের প্রাচীন সংস্কৃতির মূল্যায়ন প্রচেষ্টা; আর ছিল পাশ্চাত্ত্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথ যখন পড়তে শিখলেন তখন বাংলা দেশে কয়খানাই বা পত্রিকা ছিল। 'অবোধবন্ধু' পত্রিকা (১৮৬৩), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), প্রভৃতি ছিল বালক রবীন্দ্রনাথের মানসিক ভোজের প্রধান সামগ্রী। 'অবোধবন্ধু'র গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল। এর ভাষা স্কুলের ভাষার 'অনুবৃত্তি' ব'লে মনে হ'ত না। "বাংলা ভাষায় বোধ করি এই প্রথম মাসিকপত্র—যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত।...বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন 'অবোধবন্ধু'কে প্রত্যূষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।" (বিহারীলাল, আধুনিক সাহিত্য।)

বাংলার সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে 'বঙ্গদর্শন'এর আবির্ভাব যুগান্তকারী ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ যে প্রশস্তি-প্রবন্ধ লেখেন তাতে বলেন, "পূর্বে কি ছিল এবং কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে লাগিলাম।...কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য।"

রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হ'ল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১২৮১), তখন তাঁর বয়স বারো বৎসর মাত্র। সে সময়ে বঙ্গদর্শনের তৃতীয় বৎসর চলছে, বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর, কমলাকান্তের দপ্তর, কৃষ্ণচরিত্র ও রজনী বের হচ্ছে। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা বের হয় ১৮৪৩ সনে; ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ছিল এই পত্রিকার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই পত্রিকা এক হিসাবে ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজ তথা ঠাকুরবাড়ীর সম্পত্তি। সুতরাং নিজ পরিবারের দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচনা মুদ্রণে কোনো বাধা ছিল না। 'অভিলাষ' নামে দীর্ঘ কবিতাটি এতেই প্রকাশিত হ'ল (১২৮১, অগ্রহায়ণ)। কয়েক মাস পরে মুদ্রিত হয় 'অমৃতবাজার পত্রিকায়'—'হিন্দুমেলার উপহার'। হিন্দুমেলার অধিবেশনে (১২৮১, মাঘ) বালক রবীন্দ্রনাথ সেটি পাঠ করেন (১৮৭৫, ফেব্রুয়ারী ১১)। তখন অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল দ্বৈ-ভাষিক সাপ্তাহিক—কিছুটা বাংলা, কিছুটা ইংরেজি। 'প্রতিবিম্ব' নামে একটি মাসিক বের হয় ১২৮২, বৈশাখ মাসে; এর সম্পাদক ছিলেন রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ; ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক—সে খবর পাই আমরা তাঁর জীবনী থেকে। 'প্রতিবিম্ব'তে 'প্রকৃতির খেদ' নামে যে কবিতাটি আছে তার অপর একটি পাঠ পাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দু'মাস পরে (১২৮২, আষাঢ়)। 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি নিয়ে 'প্রতিবিম্বে' বেশ বড় একটা নোট আছে। এটি বালক কবি পাঠ করেন বিদ্বজ্জন-সভায়,—সেদিন সে সভায় কলকাতার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কবি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন,

"এমন সময় 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্য 'প্রলাপ' নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে সুরু করিয়াছিলেন।"

'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকা রাজসাহী হতে ১২৭৯, অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়; 'বঙ্গদর্শন' বের হয়েছে সেই বৎসরের গোড়ায়। এই 'জ্ঞানাঙ্কুর' কলকাতায় উঠে আসে ও 'প্রতিবিম্বে'র সঙ্গে ১২৮২, অগ্রহায়ণ মাসে মিলিত হয়। সুতরাং 'প্রতিবিম্ব' পৃথক্ ভাবে ১২৮২, বৈশাখ-কার্তিক পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে থাকবে—আমরা কেবল প্রথম সংখ্যাটি দেখেছি। আমাদের মনে হয় রামসর্বস্ব পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় ও সুপারিশে বালক কবির 'বনফুল' কাব্যোপন্যাস 'জ্ঞানাঙ্কুর'-'প্রতিবিম্ব' মিলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকায় বের হয়। এটাই কবির প্রথম দীর্ঘ কাব্য—যদিও পুস্তকাকারে ছাপা হয়ে বের হয় 'কবিকাহিনী'র দু'বৎসর পরে (১৮৮০, মার্চ)।

বিলাত যাত্রার পূর্বে 'কবিকাহিনী' ও বিলাত থেকে ফেরবার পর 'বনফুল' ছাপার হরফে বই আকারে কবি প্রথম দেখেন। এই 'জ্ঞানাঙ্কুর'-'প্রতিবিম্ব পত্রিকার মাধ্যমে বালক-কবির প্রথম কাব্যোপন্যাস 'বনফুল' ও প্রথম লিরিক কবিতাগুচ্ছ 'প্রলাপ' বের হয়, আর প্রথম গদ্য সমালোচনাও। 'বনফুল' একবারই মুদ্রিত হয়; তার পর বহু বৎসর পরে অচলিত সংগ্রহে তার স্থান হয়েছে; কিন্তু তাঁর লিরিক 'প্রলাপ' বা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্যের সমালোচনাপূর্ণ গদ্যরচনার স্থান কোন গ্রন্থমধ্যে এখনও হয় নি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কবিতা, কাব্যোপন্যাস, গদ্য-সমালোচনা সাময়িক পত্রিকার মধ্যেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হ'ল।

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোল বৎসর; স্কুলে পাঠিয়ে লেখাপড়ার আশা সকলে ত্যাগ করেছেন; এমন সময়ে ১৮৭৭ সনে জুলাই মাসে তাঁদের বাড়ী থেকে 'ভারতী' পত্রিকা বের হ'ল। রবীন্দ্রনাথের মত এত অবসরই বা কার, শক্তিই বা কার, তাঁর লেখনী ঐ মাসিকের অনেকখানি দখল ক'রে বসল। 'ভারতী' যখন বের হয় (১২৮৪, শ্রাবণ) তার পূর্বে 'বঙ্গদর্শন' অদৃশ্য হয়েছিল, চার বৎসর বিপুল গৌরবে সাহিত্য-সমারোহ করার পর। 'ভারতী' যে বৎসর প্রকাশিত হয় (১২৮৪, শ্রাবণ), সেই বৎসরেই বৈশাখ মাসে 'বঙ্গদর্শন' আবার দেখা দিয়েছিল দু' বৎসর বন্ধ থাকার পর। 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভারতী' কয়েক বৎসর পাশাপাশি চলার পর 'বঙ্গদর্শন' উঠে যায়, 'ভারতী' প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল চলতে থাকে। এর মধ্যে প্রায় বিশ বৎসর রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হয়

'ভারতী'র পাতায়। ষোল বৎসর বয়সে ভারতীর প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে স্থরু হ'ল লেখা; লিখে চললেন 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনা ও 'ভিখারিণী' নামে গল্প। তৃতীয় সংখ্যায় আরম্ভ হ'ল উপন্যাস 'করুণা' ও ভানুসিংহের কবিতা। এই পত্রিকায় তাঁর 'কবি-কাহিনী' মাসে মাসে বের হতে থাকে; এছাড়াও কবিতাও আছে, প্রবন্ধ আছে। নিজেদের ঘরের কাগজ না থাকলে বোধহয় এমনভাবে অজস্র ও বিচিত্র রচনা প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না। এই সাময়িকপত্র-মাধ্যমে তরুণ কবি তাঁর সাহিত্যসাধনার অকুণ্ঠিত প্রশংসা পেয়েছিলেন 'সাধারণী', 'বান্ধব', প্রভৃতি পত্রিকা হতে।

'ভারতী'র পাতায় বৎসরের পর বৎসর কবির কত যে প্রবন্ধ, কবিতা, গান ছাপা হয়েছিল, তার তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। সতেরো বৎসর বয়সে ইংলণ্ড যাবার আগে যে-সব গদ্যপ্রবন্ধ লেখেন, বিলাত থেকে যে পত্রধারা সম্পাদকের কাছে পাঠান সবই 'ভারতী'তে ছাপা হয়। বিলাতে ও দেশে ফিরবার পথে জাহাজে ব'সে যে কাব্যখানি রচনা করেন সেই 'ভগ্নহৃদয়' ছাপা হয় এই পত্রিকায়। অবশ্য 'ভগ্নহৃদয়ে'র ৩৪টি সর্গের মাত্র ছ'টি এতে বের হয়।

বিলাত থেকে ফিরে আসার পর আবার স্থরু হয়েছে বিচিত্র রচনা। তরুণ লেখকের প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় মাসের পর মাস চলে। এছাড়া 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১২৮২, জুলাই), আলোচনা (১২৮৫, এপ্রিল) ও সমালোচনা (১২৮৮, মার্চ) নামে যে তিনটি গদ্যপ্রবন্ধ-পুস্তক অচলিত খণ্ডদ্বয়ে আশ্রয় পেয়েছে—তার অধিকাংশ রচনা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। কবিতার মধ্যে অচলিত শৈশবসংগীত (১৮৮৪, মে) এই পত্রিকার মাধ্যমেই প্রচারলাভ করে।

সাহিত্যিক সৃষ্টিধারা চলছে 'ভারতী'তে—আর তাঁর ধর্মীয় বা সমাজ-সম্পর্কিত কর্তব্য পালিত হচ্ছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায়। বিলাত থেকে আসার পরেই ব্রহ্মসংগীত রচনা স্থরু হয় আঠারো বৎসর বয়সে—তার ধারা চলে প্রায় তিন দশক: সেই ব্রহ্মসংগীত প্রায় সবই বের হয় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় বছরের পর বছর। এই ভাবে যুগপৎ চলছে এই 'বিচিত্রের দূতে'র সৃষ্টির খেলা।

এমন সময় 'বালক' (১২৯২) পত্রিকা বের করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী। বাড়িতে অনেকগুলি বালকবালিকা বড় হয়েছে—তাদের উপযোগী পত্রিকা নেই তখন। সম্পাদিকা হলেন জ্ঞানদানন্দিনী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার বারো আনি খোরাক যোগান। 'মুকুট' গল্প, 'রাজর্ষি' উপন্যাস এবং হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭) ব'লে যে দুইটি বই দেখি—তার অনেকগুলি প্রকাশিত হয় 'বালক' ও 'ভারতী'তে। শিশুদের জন্য কবিতা—যা পরে শিশু কাব্যখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়, তার সূচনা হয়েছে এই সময়ে। এছাড়া সমাজবিষয়ক প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, কত বিচিত্র রচনা। 'বালক' এক বৎসর চ'লে 'ভারতী'র সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখনী নিরন্তরই চলেছে। নূতন পত্রিকা 'নবজীবন' ও 'প্রচার' সাহিত্য (১২৯১, শ্রাবণ) এল এই সময়ে—এসব কাগজেও তাঁর লেখা আছে। অথচ এসব পত্রিকা যে কবির মতের ও মনের মত—তাও নয়; কিন্তু লেখার জন্যে অনুরোধ—তা সে যেখান থেকেই আসুক, রক্ষা ক'রে লেখা দিতেন; এ অভ্যাস তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

১২৯১-এ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে তিনি যেসব প্রবন্ধাদি লিখে বঙ্কিমের সঙ্গে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তার অধিকাংশ প্রকাশিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'ভারতী'তে।

১২৯৮, বৈশাখ মাসে 'হিতবাদী' নামে সাপ্তাহিক কাগজ বের হ'ল; শেয়ারমত টাকা দিলেন অনেকে। রবীন্দ্রনাথের খুব উৎসাহ। স্থরু করলেন ছোটগল্প—বাংলা সাহিত্যে নূতন প্রচেষ্টাই বলব তাকে। এর আগে ছোটগল্প রচনার চেষ্টা তিনিও করেন, অন্য দু'চারজনেও হাত লাগান। তবে এ পর্যন্ত ঠিক রূপটি কারও হাতে গ'ড়ে ওঠেনি। ছয়টি গল্প ছয় সপ্তাহে লেখার পর—লেখা দিলেন বন্ধ ক'রে। সম্পাদকগোষ্ঠীর ফরমাইস আরও হালকা জিনিসের। ফরমাইসমত গল্প সৃষ্টির রেওয়াজ তখনও হয় নি।
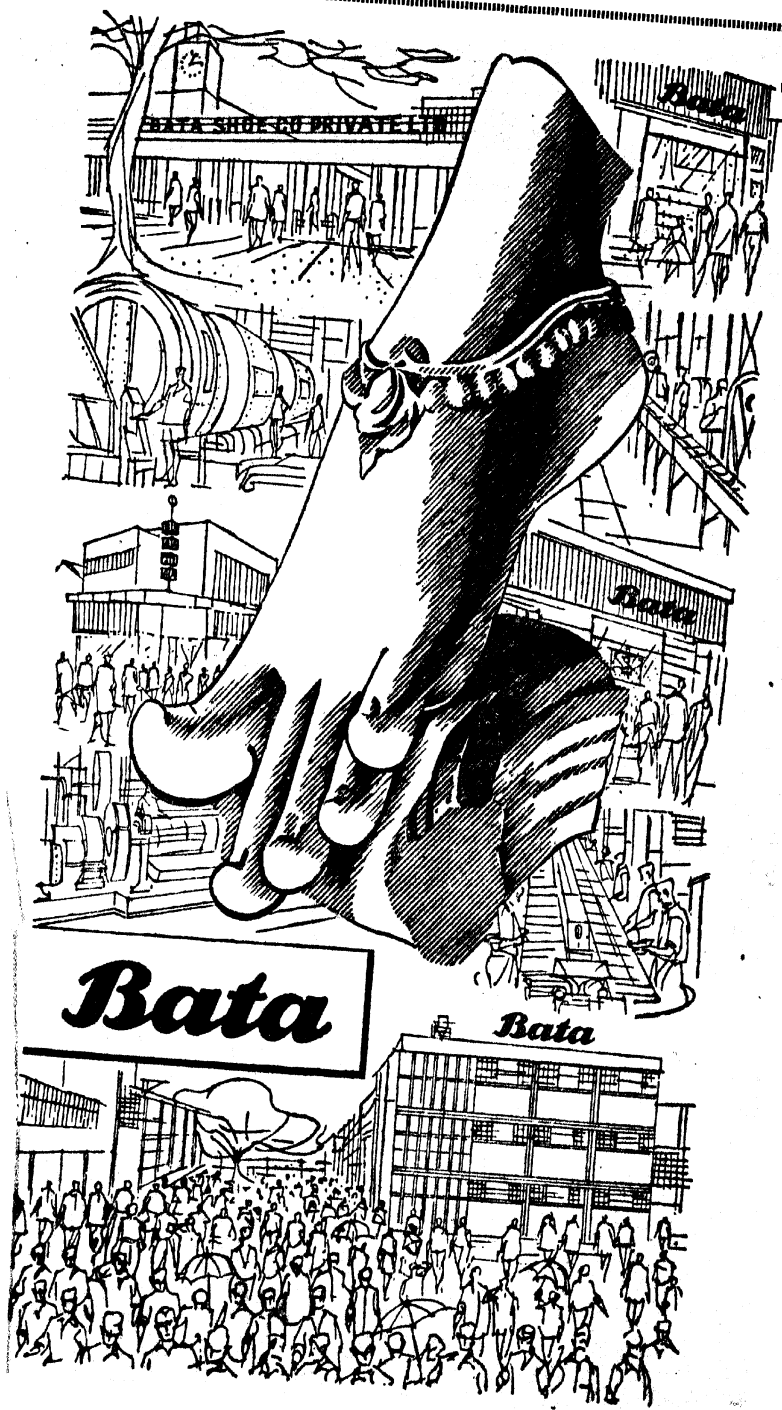
Bata
Bata
Bata
Bata

সাহিত্যে নূতন সাধনা সুরু হ'ল এই বৎসরের শীতের মুখে—'সাধনা' পত্রিকার আবির্ভাব হ'ল ১২৯৮ সালে অগ্রহায়ণ মাসে। এটিও বাড়িরই কাগজ। সদ্য গ্রাজুয়েট সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সৌম্যেন্দ্রনাথের পিতা) হলেন সম্পাদক। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে এই ধরণের সাহিত্য-পত্রিকা ঘরের কড়ি খরচ ক'রে প্রকাশ করতে হ'ত। সুধীন্দ্রনাথ ত সম্পাদক হলেন—কিন্তু লেখার যোগান দেবে কে? সেখানে রবিকা' ছাড়া উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে মা-সরস্বতী স্বয়ং ভর করলেন। প্রথম বৎসরের বার মাসে বারটি গল্প, তা ছাড়া 'য়ুরোপ-প্রবাসীর ডায়ারি'। মাঝে তিন মাসের জন্যে বিলাত ঘুরে আসেন—তারই বর্ণনা—মূল খসড়া কেটে-ছেঁটে সাহিত্যের আসরে দেবার মত ক'রে দিলেন। চার বৎসর 'সাধনা' চলে (১২৯৮, অগ্রহায়ণ থেকে ১৩০২, কার্তিক)—শেষ বৎসরে কবি স্বয়ং হন সম্পাদক। এই কয় বৎসরে তাঁর লেখার তালিকা, তার বৈচিত্র্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

'শিক্ষা' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' প্রকাশিত হয় 'সাধনা'র পাতায়। 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' সুপরিচিত বই—ধারাবাহিক ভাবে প্রায় মাসে মাসে 'সাধনা'য় বের হয়েছিল। এ ছাড়া রাজনৈতিক প্রবন্ধ সুরু হয়। পূর্বেকার যুগের রচনা থেকে এর সুর বেশ চড়ায় বাঁধা। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', 'ইংরেজের আতঙ্ক', 'রাজনীতির দ্বিধা', 'অপমানের প্রতিকার', 'সুবিচারের অধিকার', প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়লে এখনও মন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পত্রিকার মাধ্যমেই বাঙালী সেদিন ভাববার খোরাক পায়। 'সাধনা'য় সুরু হয় পুস্তক সমালোচনা, সাহিত্য আলোচনা। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অনেকগুলি প্রবন্ধ এই সময়ের রচনা। রবীন্দ্রনাথ ও 'সাধনা'র যুগ নিয়ে বেশ ভাল রকম একটি নিবন্ধ রচনা করা যেতে পারে।

বেশিদিন একটা কাগজে লেখনীচালনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন রবীন্দ্রনাথ—তাই 'সাধনা'র মৃত্যু তাঁর হাতেই হল। তার প্রধান কারণ আর্থিক হলেও একটা কাগজে নিয়মিত ধরাবাঁধা লেখা সরবরাহ করা তাঁর কবি-প্রকৃতিরও বিরোধী। কাগজ উঠে গেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বন্ধুকে সংবাদটা জানান।

'সাধনা' থেকে মুক্তি পাবার বছর দুই পরে 'ভারতী'র সম্পাদনাভার কবির স্কন্ধে ন্যস্ত হ'ল (১৩০৫)। আবার ক্ষীণস্রোতা ফল্গুধারা প্লাবনরূপে দেখা দিল। ছোটগল্প, রাজনীতিক প্রবন্ধ, পুস্তক সমালোচনা, কবিতা, কাব্যনাট্য, লোকসাহিত্য, প্রসঙ্গকথায় পূর্ণ। এমন সাহিত্য-সমারোহ কচিৎ দেখা যায়।

মাঝে দুইটা বৎসর একটু ভাঁটা—সাময়িক পত্রিকা মনের মত নাই। তবে 'প্রদীপ' নামে প্রথম যে সচিত্র (বর্ণচিত্র) মাসিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় ও বৈকুণ্ঠনাথ দাসের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়, তার সঙ্গে কবির যোগ স্থাপিত হয়; এটি ঘটে ১৯০০ সালের কাছাকাছি—'ভারতী'র সম্পাদনা ত্যাগের কিছুকাল পরে।

বিংশ শতকের সুরুতে পত্রিকা-জগতে যুগান্তর এল—'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা নবকলেবরে দেখা দিল। যে রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' লুকিয়ে চুরিয়ে পড়তেন—সেই 'বঙ্গদর্শনে'রই নাম নিয়ে তার পুনরাবির্ভাব হ'ল; রবীন্দ্রনাথকেই হতে হ'ল তার সম্পাদক। সম্পাদক তিনি হলেন বটে, কিন্তু তার বৈষয়িক ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হলেন না, সে সবের ভার রইল শৈলেশ মজুমদারের উপর। ইনি কবি-বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা—'মজুমদার লাইব্রেরী' নামে প্রকাশনীর মালিক। এই প্রকাশনী থেকে রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য-গ্রন্থ' মোহিতচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হ'ল ১৩০৮ সালের বৈশাখে। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য'র কবিতা, 'চোখের বালি' উপন্যাস,*

---

* 'চোখের বালি' বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক চলে ১৩০৮, বৈশাখ থেকে ১৩০৯, কার্তিক পর্যন্ত। এই গল্পটির খসড়া ১৩০৭ সালের গোড়ায় করেন; ২৬ শ্রাবণ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্রে জানান যে, বিনোদিনীর 'সুদীর্ঘ কাহিনী'টি খাতার মধ্যে অসমাপ্ত অবস্থায় প'ড়ে আছে। সমসাময়িক 'সাহিত্য' পত্রিকা ১৩০৮, ফাল্গুনে ইঙ্গিত করেন যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমা' গল্প থেকে এর অনেক কিছুই গৃহীত। 'উমা' প্রকাশিত হয় ১লা ফাল্গুন, ১৩০৭। অথচ 'বিনোদিনী'র খসড়া প্রস্তুত হয়েছিল ঐ বৎসরের গোড়ায়।

'হিন্দুত্ব ও বর্ণাশ্রম' সম্বন্ধে প্রবন্ধরাজি, সমসাময়িক পত্রিকার সমালোচনা যুগপৎ প্রকাশিত হয়ে চল্‌ল। নূতন পত্রিকার টানে উচ্ছ্বসিত হ'ল কবি-প্রতিভার বিচিত্র বিকাশ। এই সমসাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হ'ল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের। ইনি 'টোয়েনটিয়েথ সেনচুরি' নামে এক মাসিকপত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুচ্ছ—যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়েছিল—তার একটি সুন্দর সমালোচনা করেন। কবিকে তা মুগ্ধ করে। ব্রহ্মবান্ধবের 'হিন্দুত্ব' সম্বন্ধে রচনা কবির মনকে নাড়া দেয়। পত্রিকার মাধ্যমে এই পরিচয়েরই ফলে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হলে ব্রহ্মবান্ধব এলেন সেখানে। সে ইতিহাস বলবার স্থান এটা নয়।

বঙ্গদর্শনে 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', দুটো পুরো উপন্যাস বের হয়। এ ছাড়া স্মরণ, উৎসর্গ ও শিশুর কবিতা। প্রবন্ধরাজির তালিকা দিতে গেলে এ প্রবন্ধ অকারণ দীর্ঘ হয়ে পড়বে। প্রায় নয় বৎসর এই পত্রিকার সম্পাদকরূপে থাকার সময়ে (১৩০৮-১৬) তিনি যে অন্য কাগজে লেখা দেন নি, তা নয়। ১৩০৮ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'নষ্টনীড়' গল্পটি বের হয়। মাঝে ১৩০৯ সালে 'সমালোচনী'* নামে একটি মাসিকের সম্পাদকত্ব করতে দেখি। বঙ্গদর্শন প্রকাশের সমকালীন একটি পত্রিকা এলাহাবাদ থেকে 'প্রবাসী' নামে বের হয়; 'কায়স্থ পাঠশালা' নামক কলেজের অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে এই পত্রিকাটি বের করেন। রবীন্দ্রনাথ এই নতুন পত্রিকার জন্য লিখে পাঠান—'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া' কবিতাটি। এই হ'ল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'প্রবাসী'র প্রথম সম্বন্ধ। ১৩১৩ সাল পর্যন্ত গভীর যোগ স্থাপিত হয় নি—কবি 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে তখন ব্যস্ত; তা ছাড়া শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছেন।

১৩১৪ সাল, ভাদ্র মাস থেকে 'প্রবাসী'তে কবির 'গোরা' উপন্যাস সুরু হ'ল (১৯০৭, আগষ্ট); তার পূর্বে বের হয় ছোট গল্প 'মাষ্টার মশায়'। রামানন্দবাবু কবিকে এক সময়ে তিন শ' টাকা দিয়ে বলেন, তাঁর সুবিধা হলে যেন একটা গল্প লিখে দেন। কবির মনে হ'ল যে, তিন শ' টাকার মত বড় একটা কিছু দেওয়া উচিত। তাই সুরু করলেন 'গোরা'। ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাস থেকে ১৩১৬ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত বত্রিশ মাস চলেছিল ধারাবাহিক এই উপন্যাস। ইতিপূর্বে এত বড় উপন্যাস কোন বাংলা পত্রিকায় বোধ হয় বের হয় নি। 'জীবনস্মৃতি'র খস্‌ড়া নতুন ক'রে লিখে দিলেন প্রবাসীর জন্য; এ বইখানি ১৩১৮, ভাদ্র থেকে ১৩১৯, শ্রাবণ পর্যন্ত এক বৎসর চলে। 'অচলায়তন' পুরো নাটকটি ১৩১৮ সালের আশ্বিন সংখ্যায় ছাপা হয়।

এখন থেকে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনা—কবিতা, গান, ধর্মদেশনা, সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হতে থাকল। 'প্রবাসী'র মধ্যে ১৩১৪ সাল থেকে ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রচনারাজি, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা, তাঁর পত্রাবলী, সম্পাদকীয় বিবিধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে যে অজস্র আলোচনা আছে—তার তালিকা যদি প্রস্তুত হয় তবে দেখা যাবে সাময়িক পত্রিকা কি পরিমাণে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণের কাছে পরিচিত ক'রে দেবার সহায়তা করেছিল।

কিন্তু কবির মন যুগপৎ নতুন কাগজ হলেই সাড়া দেয়। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কেদারনাথ দাশগুপ্ত 'ভাণ্ডার' নামে এক মাসিক বের করলেন (১৩১২), রবীন্দ্রনাথকেই তার সম্পাদক হতে হ'ল। দেশের সমস্যা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে এর পাতায় পাতায়। স্বদেশী যুগের প্রথম স্বদেশী সংগীতগুলি (বাউল) এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই গান একদিন বাঙালীকে কি ভাবে উন্মত্ত ক'রে তুলেছিল, তার কথা অনেক লোকের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়।

১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকত্ব নিলেন (১৯১১)। বহুকাল পরে আদি ব্রাহ্ম-

---

* রবীন্দ্রনাথকে এই শ্রেণীর অপবাদও শুনতে হয়েছিল; আরেকবার ঘটে 'চার অধ্যায়' বের হ'বার পর। সুতরাং সাময়িক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনাই কেবল প্রকাশিত হয়েছিল, তা নয়, তাঁর অনুকূল-প্রতিকূল সমালোচনাও অনেক বের হ'ত। শ্রীআদিত্য ওহদেদার, তাঁর 'রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধারা' গ্রন্থে এই ইতিহাস আংশিকভাবে আলোচনা করেছেন।

সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য চেষ্টা দেখা দিল। যে 'তত্ত্ববোধিনী' এককালে বাংলাদেশের চিন্তার ক্ষেত্রে মুখ্য পত্রিকা ছিল, তা ক্ষীয়মাণ আদি ব্রাহ্মসমাজের কুক্ষিগত থেকে অত্যন্ত হীনপ্রভ হয়ে পড়েছিল। কবির ইচ্ছায় এই কাগজটি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মুখপত্র হল। বিলাত থেকে লেখা অনেক পত্র-প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রথম দেখা যায়। সেগুলি পরে 'পথের সঞ্চয়' নামে মুদ্রিত হয়েছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চার বৎসর সম্পাদক ছিলেন—শেষ দিকটায় নামমাত্র; তার পর সে সম্বন্ধও ছিন্ন ক'রে দেন। নতুন কাগজের টান এসেছে। প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি, আমাদের জাতীয় সংগীত ব'লে যা স্বীকৃত হয়েছে সেই 'জনগণ মন' গানটি ব্রহ্মসংগীত রূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় (১৩১৮, মাঘ)।

প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার মুখে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' কবির জন্মদিনে (১৩২১, বৈশাখ) প্রকাশিত হ'ল। আমার মনে হয় এটা Harland সম্পাদিত Yellow Book (1894-97)-এর আদর্শে গড়া। নতুন পত্রিকার আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথের মন সাহিত্যের নানা পথে ধাবিত হচ্ছে। 'বলাকা'র নতুন কাব্য দেখা দিল এই মাসিকের পাতায়। আবার সুরু হ'ল ছোটগল্প। মাঝে 'ভারতী'র সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের তাগিদে কয়েকটা ছোটগল্প লিখেছেন (১৩১৮, আশ্বিন, পৌষ)। 'সবুজপত্রে'র চারটে ছোটগল্পের যোগসূত্রে গ'ড়ে উঠল 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। এ গল্প 'সাধনা'র যুগের গল্প থেকে অনেক তফাৎ। 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি'তে যে যৌন-সমস্যার আলোচনা আছে এ গল্পে তা আরও জটিল হয়েছে। গল্প-উপন্যাসের আধুনিকতা নতুন রূপ নিয়েছে 'চতুরঙ্গে'। আরো নতুন সুর ধ্বনিত হ'ল 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। এই উপন্যাস নিয়ে সাময়িকপত্রে বেশ আলোড়ন চলে—কারণ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কবি সমাজের নতুন সমস্যা সৃষ্টি ক'রে পাঠকদের উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেছেন। কবিকে আপন মত ও কথা সমর্থন করবার জন্য একবার লেখনী ধরতে হয়।

যুদ্ধের সময়ে তাঁর প্রবন্ধ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', প্রভৃতি 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়; বহু রাজনৈতিক প্রশ্ন ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যার আলোচনা আছে। কবির মীমাংসা রাষ্ট্রবুদ্ধিমানরা গ্রহণ করেন নি; কিন্তু দেখা যাচ্ছে কবিই দ্রষ্টা।

যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য গান্ধীজী নামলেন। রবীন্দ্রনাথের এই সময়ে লিখিত কয়েকখানি ইংরেজি পত্র বিশেষভাবে স্মরণীয়; তার মধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর অবিস্মরণীয় পত্র, যা তিনি বড়লাট চেম্‌সফোর্ডের উদ্দেশ্যে লিখে দৈনিক কাগজে মুক্ত করেন,—তা ইতিহাস হয়ে আছে (১৯১৯, জুন)। এই পত্র লেখবার পূর্বে তিনি পরামর্শ করেন একমাত্র রামানন্দবাবুর সঙ্গে। সে কাহিনী রবীন্দ্রনাথের জীবনীর অন্তর্গত ঘটনা।

কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একই মানসলোকের মধ্যে বাস করা অসম্ভব। স্বদেশী আন্দোলন যখন রুদ্র পন্থার দিকে গেল—কবি তখন নেমেছিলেন 'গ্রামোদ্যোগ' কার্যে; স্বদেশী সমাজকে মূর্তি দানের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এবারও যুদ্ধশেষে তাঁর মন গেল বিশ্বমানবতার দিকে। শান্তিনিকেতনকে গ'ড়ে তুলতে হবে ভাবী-কালের উপযোগী ক'রে। অতীত ভারতের যা বরণীয়, মধ্যযুগীয় সন্ত পার্ষদদের যা স্মরণীয় ও বর্তমান পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা গ্রহণীয়—তা দিয়ে রচতে হবে ভাবী ভারতকে। সেই ভাবনা থেকে শান্তিনিকেতনস্থিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে কেন্দ্র ক'রে রচলেন 'বিশ্বভারতী'। তার মুখপত্র হ'ল 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা (১৩২৬)। 'বিশ্ব-ভারতী' সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ বের হ'ল এরই পৃষ্ঠায়। শিক্ষার সমবায় সাধনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় বিচিত্র সংস্কৃতির কথাই এসে পড়ছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইসলাম, খৃষ্টানী, সবগুলিকে নিয়ে হবে ভারতসাধনা বা বিশ্বসাধনা। এই কথা যখন প্রচারিত হ'ল, তখন দেশব্যাপী অসহযোগনীতি, খিলাফৎ আন্দোলন চলছে। কবি বললেন, 'এহ বাহ্য, আগে কহ আর'। স্বদেশ সত্য—কিন্তু তার থেকেও মহাসত্য বিশ্বমানবভূমি।

যুদ্ধান্তে য়ুরোপ থেকে কবি অসহযোগ-নীতির সমালোচনা ক'রে যে পত্রধারা এন্‌ড্রুজ সাহেবকে লেখেন, সেগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল রামানন্দবাবু সম্পাদিত 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায়। প্রসঙ্গতঃ বলি, এই মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায়

কবির রচনার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—এবং তা বিলাতের কয়েকজন মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় কবির গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর মতামত এই মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে অবাঙালীর দৃষ্টিগোচরে আসে; গান্ধীজী কবি সম্বন্ধে যা কিছু জানতে পারতেন, তা প্রধানতঃ মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত অনুবাদ থেকেই। 'রাশিয়ার চিঠি'র মধ্যে একটি মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় অনুদিত হয়ে বের হলে ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার—এমনকি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কী পর্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন সে ইতিহাস হয়ত অনেকেই জানেন।

১৩৩১ সালে কবির নতুন নাটক 'রক্তকরবী' গোটাটাই প্রবাসীর একটি সংখ্যায় বের হ'ল (আশ্বিন); এই নাটকটি নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে এমন বোধহয় কবির আর কোন নাটক নিয়ে হয়নি।

নূতন পত্রিকার প্রেম আবার টানল। 'বিচিত্রা' নামে মাসিক এল সাহিত্যের দরবারে (১৩৩৪)। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ফ্রান্স থেকে রবীন্দ্রনাথের উপর প্রবন্ধ লিখে ডক্টরেট নিয়ে এসেছেন; ধনীর পুত্র তাই বহু টাকা ব্যয় ক'রে 'বিচিত্রা' বের করলেন, সম্পাদক হলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, ভানুসিংহের পত্রাবলী, জাভাযাত্রীর পত্র, যোগাযোগ উপন্যাস, পারস্যভ্রমণ, ছোট উপন্যাস (গল্প?) দুই বোন, মালঞ্চ, বিচিত্রার পাতায় প্রকাশিত হ'ল।

কিছুদিন প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা প্রকাশিত হয় নি। পরে সেখানে দক্ষিণ আমেরিকার পত্রধারা (যাত্রী) বের হ'ল। আর দিলেন ধারাবাহিক উপন্যাস 'শেষের কবিতা'। নষ্টনীড়, চোখের বালি, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে একদিন যেমন বাঙালী পাঠককে নতুন সমস্যায় বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছিল—'শেষের কবিতা' আধুনিক সাহিত্যিক-দেরও তেমনি বিস্মিত করল। মাসের পর মাস প্রবাসীর পাতায় অমিত রায়, লাবণ্য, কেটি মিত্তির প্রভৃতির শাব্দিক দ্বন্দ্ব, তাদের প্রেমের সমস্যা—বাঙ্‌লার শিক্ষিত তরুণ সমাজকে বিশেষভাবে চঞ্চল ক'রে তোলে। নতুন উপন্যাসের ধারা সুরু হ'ল।

বিশেষ কয়েকটি পত্রিকার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দরদ থাকা সত্ত্বেও—কেউ তার পত্রিকার জন্যে লেখা চাইলে তিনি কখনও 'না' করতেন না—তা সে কাগজ যতই অকিঞ্চিৎকর হোক। যারা সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সুরু করেছে মাত্র, নতুন কথা নতুন ভাষায় বলবার চেষ্টা যারা করছে, তারাও কবির সামান্য একটা লেখা পেলে খুশী হ'ত। কবি তাদের কোনদিন বঞ্চিত করেন নি। এমন সব পত্রিকায় লেখা দিয়েছেন—যাদের নাম লোকে ভুলে গেছে—যাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত এখন লুপ্ত।

'কল্লোলযুগে'র লেখকরা মনে করতেন যে, রবীন্দ্র ঠাকুর পথ জুড়ে ব'সে আছেন—তাঁর সম্বন্ধে কড়া কড়া কথা লিখতে তাঁরা পিছ্‌পা হতেন না। কিন্তু সেই 'কল্লোলে'র জন্য যখন লেখা চাইলেন তাঁরা, কবি পাঠিয়ে দিলেন লেখা। কবির মধ্যবয়সে সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকা ছিল তাঁর রূঢ় সমালোচক; কিন্তু সেই পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যখন 'আগমনী' নামে বার্ষিকীর জন্য লেখা চেয়ে পাঠালেন তখন কবি তাঁর কবিতা পাঠিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তাঁর মাতৃস্মৃতি এই 'আগমনী' বার্ষিকীতে একমাত্র বের হয় (১৩২৬)।

নিতান্ত সাম্প্রদায়িক বা টেকনিক্যাল পত্রিকা ছাড়া বাংলা দেশে এমন কাগজ খুব কম ছিল, যাতে রবীন্দ্রনাথের কিছু-না-কিছু লেখা খুঁজে না পাওয়া যায়। আমরা একটা তালিকা দিলাম, কিন্তু তা হয়ত সম্পূর্ণ নয়; কারণ গত ষাট বৎসরের সমস্ত পত্রিকা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। আশা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ বিষয়ে নিখুঁত আলোচনা করতে প্রয়াসী হবেন। আমার মনে হয়, বেশ ভাল একটি থীসিস্ বা গবেষণাগ্রন্থ লেখবার মত বিষয় এটি। আরও ভাল হয় যদি কেউ বাংলার সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র কিভাবে বাঙালীর মনকে গ'ড়ে তুলেছে, তা নিয়ে ব্যাপকতর আলোচনা করেন।

যেসব সাময়িক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনা আছে, তার একটা অসম্পূর্ণ তালিকা এখানে দিলাম। যে পত্রিকাগুলি নিয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা হ'ল তাদের নাম এখানে বাদ দিয়েছি।

অলকা	প্রভাত (নগেন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত)	মাসিক বসুমতী
আঙুর	প্রভাতী	মুকুল
আনন্দবাজার পত্রিকা	প্রাচী (ঢাকা)	মুক্তধারা
উত্তরা	বঙ্গবাণী	মোসলেম ভারত
উপায়	বঙ্গলক্ষ্মী	যুগান্তর
কবিতা	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা	রূপ ও রীতি
কল্লোল	বাঁশরী	রূপশ্রী
চতুরঙ্গ	বৈজয়ন্তী	লাঙল (নজরুল সম্পাদিত)
জয়শ্রী	ভাইবোন	শতদল
দীপিকা	ভাণ্ডার (বঙ্গীয় সমবায় বিভাগ)	শনিবারের চিঠি
দেশ	ভারতবর্ষ	শ্রীহর্ষ
ধূমকেতু (নজরুল সম্পাদিত)	ভূমিলক্ষ্মী	সখা ও সাথী
নিরুক্ত	মন্দিরা	সন্দেশ
পরিচয়	মানসী	সমসাময়িক
পরিচারিকা	মানসী ও মর্ম্মবাণী	সওগাত
প্রবর্তক	মাস পয়লা	সাহানা

—০—

ইংরেজি গীতাঞ্জলির সূচনা

শ্রীক্ষিতীশ রায়

অনুবাদে রবীন্দ্রসাহিত্য বড় বেশি ব্যাপক বিষয়। অল্পপরিসরে এ বিষয়ে সব কথা গুছিয়ে বলা সম্ভবপর হবে ব'লে মনে হয় না। সুতরাং বক্তব্য একটু সংহত ক'রে অনুবাদক রবীন্দ্রনাথের বিষয়েই দু'চার কথা লিখব। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, তর্কবিতর্ক—এই সব আখ্যান বা তথ্যমূলক রচনার অনুবাদও বর্ত্তমান প্রসঙ্গ থেকে বাদ থাক। কবির স্বকৃত অনুবাদের করণকারণ, ধরণধারণ, রীতিপদ্ধতি—এ সব খুঁটিনাটি বিচারও এই নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। আমরা আজ বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করব কবি কখন, কি সূত্রে প্রথম তাঁর নিজের লেখা কবিতা অনুবাদের কাজে হাত দিলেন এবং কেমন ক'রে পৌঁছুলেন ইংরেজি গীতাঞ্জলির চরম সার্থকতায়।

কবির বয়স তখন সতেরো। প্রথম ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন বিদেশে পাড়ি দেবার জন্যে। সেই সময় সর্বপ্রথম তাগিদ অনুভব করলেন ইংরেজি ভাষায় তাঁর কবিআনা জানান দেবার। তাঁর সেই কিশোর বয়সের 'কবিকাহিনী' যাঁকে অনুবাদ ক'রে শুনিয়েছিলেন, তাঁর তা ভাল লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন, "He read and translated it
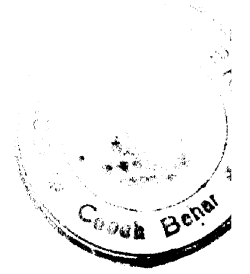
to me till I knew the poem by heart." কিন্তু হায়, হৃদয়ে যে ভাষান্তরিত কবিকাহিনী লেখা রয়ে গেল তাকে ত আজ নজীরস্বরূপ হাজির করা যাবে না !

সুতরাং চ'লে আসা যাক ইতিহাসে। ১৮৯০ সন—কবির বয়স তখন ২৯। আবার বিলেত পাড়ি দিচ্ছেন তিন মাসের ছুটিতে, ফিরে এসে জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে। সঙ্গে বাল্যবন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত এবং কবিতার খাতা। এই খাতাই হ'ল 'মানসী'র পাণ্ডুলিপি যা এখন রবীন্দ্রসদনে সুরক্ষিত। 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটি লোকেন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল। অনুমান হয় বন্ধুবরের অনুরোধে কিংবা প্ররোচনায় কবি এ-কবিতার তর্জমায় হাত দেন। 'মানসী'র খাতায় এই-যে তর্জমা, এটিই হয়ত তাঁর প্রথম লিখিত চেষ্টা নিজের কবিতাকে বিদেশী সাজে সাজাবার। গোড়ায় মূল বাংলা :

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে।
খুঁজিতেছি কোথা তুমি,
কোথা তুমি !
যে-অমৃত লুকানো তোমায়,
সে কোথায় !
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।···

এবার ইংরেজি :

I clasp both thine hands in mine,
and keep thine eyes prisoner
with my hungry eyes ;
Seeking and crying, where art thou,
where, O where !
Where is the immortal flame
hidden in the depth of thee !
As in the solitary star of the dark
evening sky
The light of heaven, with its
immense mystery is quivering,
In thine eyes, in the depth of their darkness
There shines a soul beam
tremulous with a wide mystery.

মূল বাংলার অর্থ ও ব্যঞ্জনা এর মধ্যে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা দে'খে এ অনুবাদ চট্ ক'রে বাতিল ক'রে দিতে

ইচ্ছে হয় না। তৎসত্ত্বেও কবি যে এ-অনুবাদ সমাপ্ত করলেন না এবং শেষ পর্যন্ত এটি একপ্রকার বর্জনই করলেন তার কারণ হয়ত এই যে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি-নবীশ কবিবন্ধু এই নিরলংকার গদ্য অনুবাদ অনুমোদন করেন নি। এই অনুমানের স্বপক্ষে বলা চলে যে, ১৯১১ সনে যখন রামানন্দবাবু মডার্ণ রিভিয়ু-এ প্রকাশের জন্যে অনুবাদ চেয়ে কবিকে চিঠি লেখেন, তখন জবাবে পান লোকেন্দ্রনাথ-অনূদিত দুটি কবিতা। একটি তার মধ্যে 'নিষ্ফল কামনার'ই অনুবাদ।

আরও ৭ বছর পরে ১৯১৮ সনে যখন 'Lover's Gift' প্রকাশিত হ'ল তখন কবি স্বয়ং 'নিষ্ফল কামনা'র যে রূপান্তর ঘটালেন তা অতি নির্মমভাবে সংক্ষিপ্ত। আলোচ্য অনুচ্ছেদের অনুবাদ দাঁড়াল এই :

I clasp your hands, and my
heart plunges into the dark
of your eyes seeking you...

অনুবাদচর্চায় কবির এই বিবর্তন কৌতূহলের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু পূর্বেই বলেছি—অনুবাদের কলাকৌশল আমাদের আলোচনার বাইরে। সুতরাং ফিরে আসি ইতিহাসে।

ইংরেজি ভাষায় রবীন্দ্ররচনা-প্রচারে আর একজন উদ্যোগী ছিলেন তাঁর বিজ্ঞানীবন্ধু আচার্য জগদীশচন্দ্র। ১৯০০ সনের শেষদিকে তিনি লণ্ডন থেকে লিখছেন :

"তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে (রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে), আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে···তুমি সার্বভৌমিক।"

পুনরায় লিখছেন :

"তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই···।"

জগদীশচন্দ্রের এই চেষ্টা তখন সার্থক হয় নি। 'কাবুলিওয়ালা' গল্প অনুবাদ করিয়ে তিনি 'Harper's Magazine-এ পাঠিয়েছিলেন। সে-অনুবাদ ফেরত আসে; পত্রিকা-সম্পাদক জানান, অনুবাদ তাঁরা প্রকাশ করেন না।

১৯১৩ সনে যখন খবর এল রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তখন সম্ভবতঃ সবচেয়ে খুশী হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন :

"বন্ধু, পৃথিবীতে এতদিন তোমাকে জয়মাল্য-ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল।"

কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্দ্ধনা জানাবার জন্যে যাঁরা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন সেই সব গুণগ্রাহীদের পুরোধা ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র।

জগদীশচন্দ্রের পরেই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৯০৯ থেকে প্রায় অব্যাহত ধারায় রবীন্দ্ররচনার ইংরেজি অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ু পত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছোটগল্প-লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সিস্টার নিবেদিতা, যদুনাথ সরকার, আনন্দ কুমারস্বামী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, পান্নালাল বসু প্রমুখ গুণমুগ্ধগণ।

রামানন্দবাবুর বিশেষ ইচ্ছা হ'ল কবি এবার তাঁর কিছু কবিতা স্বয়ং অনুবাদ ক'রে দেন। রবীন্দ্রনাথ রহস্য ক'রে জবাব দিলেন :

বিদায় করেছি যারে নয়নজলে
এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে···

ইস্কুল পালানো ছেলে তিনি, তাঁর কলম থেকে কি ইংরেজি বেরোবে? পরবর্তীকালে রামানন্দবাবু লিখেছিলেন, নাছোড়বান্দা সম্পাদকের যে তাগিদ, তার চাইতে জোর তাগিদ এসেছিল কবির আত্মপ্রকাশধর্মী প্রতিভা এবং ইংরেজি সাহিত্যের সরস্বতীর কাছ থেকে। রামানন্দবাবু প্রথম জীবনে মাস্টারি করেছেন। একদিন তাঁর হাতে কয়েকটি কাগজ দিয়ে কবি বললেন: "দেখুন, মাস্টারমশাই, চলবে কিনা।" তিনটি কবিতার অনুবাদ—'মানসী' থেকে একটি, 'উৎসর্গ' থেকে দুটি। এই হ'ল সর্বপ্রথম তাঁর কবিতার স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ—যা তিনি প্রকাশার্থ দেন। এ-ঘটনা ১৯১২ সনের প্রথম দিক্‌কার।

এর পর যা ঘটল তার মধ্যে অদৃষ্ট পুরুষের অদৃশ্য হস্ত অনুমান ক'রে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অসুস্থ শরীরের চিকিৎসার জন্যে বিলেত যাবেন। যাত্রার মুখে বাধা পড়ল। বিশ্রাম নেবার জন্যে চ'লে গেলেন সেই পুরাতন শিলাইদহের পদ্মাতীরে। তখন চৈত্র মাস, আমের বোলের গন্ধে বাতাস ভরপুর। মন ভরাবার জন্যে—তাঁর নিজের ভাষায়—একটা 'অনাবশ্যক' কাজ নিলেন। এই 'অনাবশ্যক' কাজই হ'ল গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, নৈবেদ্য ও খেয়া, প্রভৃতি বই থেকে একটির পর একটি কবিতা ইংরেজি ভাষায় তর্জমা ক'রে যাওয়া।

ছোট্ট খাতাটি প্রায় ভ'রে উঠল। মে মাসে যখন বিলেত পাড়ি দিলেন, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর সঙ্গে, তখন সেই ছোট খাতাটিও গেল তাঁর সঙ্গে। উদ্দেশ্য—ডেকচেয়ারে ব'সে ব'সে সারা পথ দুটো-একটা ক'রে আরও কবিতার তর্জমা ক'রে চলবেন।

লণ্ডনে পৌঁছে ঘটল আবার এক বিপর্যয়। সেই প্রথম underground যাতায়াতের অভিজ্ঞতা;—রথীন্দ্রনাথ ভুলে ফেলে এলেন তাঁর বাবার 'অ্যাটাসে কেস' যার মধ্যে ছিল সেই ছোট্ট অনুবাদের খাতাটি। হারানো সম্পত্তির খোঁজে ছুটলেন তিনি Tube Station-এ। 'অ্যাটাসে কেস্'টা ফিরে পেলেন Lost Property Office-এ। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

কলকাতায় রোটেনষ্টাইন্-এর সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটেছিল অবনীন্দ্রনাথের সহায়তায়। রোটেনষ্টাইন কবির বসবাসের জন্যে বাড়ী ঠিক ক'রে দিলেন Hampstead Heath অঞ্চলে। কথাপ্রসঙ্গে একদিন এই ইংরেজ শিল্পী বাঙালী কবির কবিতার নমুনা দেখতে চাইলেন। ছোট্ট খাতাটি এবার কাজে লাগল। দু'দিন পরে শিল্পী যখ উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কবিতার গুণগান করলেন, কবি তা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তখন রোটেনষ্টাইন সেই খাতা দেখতে দিলেন তাঁর কবিবন্ধু Yeats-কে।

একদিন সন্ধ্যায় রোটেনষ্টাইনের আমন্ত্রণক্রমে Yeats 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকটি কবিতা প'ড়ে শোনালেন সুধীজন-সমক্ষে। তার পর যা ঘটল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে এণ্ড্রুজ বলেছিলেন Keats-এর ভাষায়:

> Then felt I like some watcher of the skies
> When a new planet swims into his ken.

Fitzgerald কৃত Omar Khayyam-এর অনুবাদ বেরোবার পর প্রাচ্য দেশের কাব্য নিয়ে এমন একটি গভীর ও ব্যাপক আলোড়ন পশ্চিমের মনোজগতে আর দেখা যায় নি।

বাস্তবিকপক্ষে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। মাতৃভাষায় সুপ্রতিষ্ঠ কোন প্রবীণ লেখক বিদেশী ভাষায় এমন সার্থকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছেন ব'লে জানা যায় না। এই সার্থকতার অন্যতম কারণ, মূল বাংলায় যেমন ইংরেজি অনুবাদেও তেমনি, একই ব্যক্তিসত্তা, একই কবিপ্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল। ভাষান্তরের যান্ত্রিকতা অতিক্রম ক'রে এ-কাব্যগুলি যেন সৃষ্টিশীল মনের আপন রসে আপনি মজেছিল।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি কেবল বাংলা গীতাঞ্জলির পুরোপুরি অনুবাদ নয়, আবার ঠিক ঠিক আক্ষরিক অনুবাদও নয়। এর পেছনে আছে নূতন সৃষ্টির প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"আর একদিন যে ভাবের হাওয়ায় মনের মধ্যে রসের উৎসব জেগে উঠেছিল, সেইটিকে আর একবার আর এক ভাষার ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে উদ্ভাবিত ক'রে নেবার জন্যে কেমন একটা তাগিদ এল।"

এই উদ্ভাবনা নূতন আবির্ভাবের মতো। একেই বলা চলে emotion recollected in tranquility. কাব্য অনুবাদের চরম পরীক্ষা—অনুবাদের ভাষার সাহিত্যে অনূদিত কাব্যের স্থায়ী আসন অধিকার করা। ইংরেজি গীতাঞ্জলি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। Yeats ও Bridges-সম্পাদিত কাব্যসংকলনে তার স্বীকৃতি আছে। Andre Gide-প্রমুখ স্বনামখ্যাত কবিরা ইংরেজি গীতাঞ্জলি নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ ক'রে সেই স্বীকৃতি স্পষ্ট করেছেন। স্পষ্টতর হয়েছে তা Edward Thompson-এর একটি ছত্রে :

"This is a book that will stir men as long as the English language is read."

অতঃপর অন্য টীকা নিষ্প্রয়োজন।

কেবল সাহিত্যের নয়, ইতিহাসের দিক্ থেকেও Gitanjali-র তাৎপর্য অবিস্মরণীয়। এই একখানি গ্রন্থ জগতের সম্মুখে তুলে ধরেছিল রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিক পরিচয়। প্রাচীর সঙ্গে প্রতীচীর, বিশ্বের সঙ্গে ভারতের হিরণ্ময় যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। এই মহাগ্রন্থের একটি কবিতা এই কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

Thou hast made me known to
friends whom I knew not. Thou hast
given me seats in homes not
my own. Thou hast brought the
distant near and made
a brother of the stranger

—•—

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতে শিক্ষাশিল্পের ক্রমবিকাশ

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

আধুনিক স্বাধীন ভারতের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্প স্থান পাইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে, অর্থাৎ ১৯০১ সনে, ভারতীয় শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষাপদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে শিল্পশিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রথম প্রয়াস আমরা দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে। নবীন ভারতের শিক্ষা-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সর্ব্বভারতীয় আদর্শে এই সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষার প্রচেষ্টা শান্তিনিকেতনের নিভৃত আশ্রমিক পরিবেশে যখন আরম্ভ হয় তখন পরাধীনতায় ম্লান ভারতবর্ষে মৌলিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ক্ষেত্র কতই না অনুর্ব্বর ও সঙ্কুচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সাহিত্য, বহুমুখী-প্রতিভা, কর্ম্ম-উদ্যোগের গভীরতা ও বিশ্বখ্যাতির অন্তরালে আদিযুগের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের মৌলিক শিক্ষাদানের প্রয়াস আজ সম্ভবতঃ সকল শিক্ষাব্রতীর সম্পূর্ণ ভাবে অনুধাবন করিবার সুযোগ হয় না। কিন্তু ইহার প্রয়োজন আছে।

শান্তিনিকেতন শিক্ষা-প্রচেষ্টার মৌলিকত্ব সম্পর্কে একাধিক বিদেশী শিক্ষাবিদ্ প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। ১৯৫৪ সনে একজন আমেরিকান শিক্ষাবিদ্ (Jay B. Nash) ভারত-দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি 'Skill Learning

and Childhood Education'* নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পচর্চা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৪ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের সূচনা ও উপসংহারের পংক্তি কয়টি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

"Ever since my visit to Santiniketan in 1954, I have been thinking of the importance of the education of the young people of India. It represents some of the most basic concepts of living that I witnessed in my trip around the world. Practice in the skill is the beginning of the development of the 'mind'—to be exact the brain, for it is with the brain that we think. In a real way 'the hands are the eyes of the brain.' Every finger or hand co-ordination means a brain connection—the more types the skill the more connections—hence the more ability to think."

প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন :

"For these reasons the Visva-Bharati founded by Rabindranath Tagore and carried on by the capable, trained and faithful staffs of the school to-day, is of great importance to India and the world at large. In a way the West needs this philosophy more than the East for we have lost sight of fundamentals. We are short-circuiting the education process. If any of us is to guide education, we must start with fundamentals and these are the basic skill."

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাশিল্প-দর্শন বুঝিতে হইলে প্রথমেই তাঁহার কর্মদর্শন জানিতে হয়।

"মানুষ যতই কর্ম করছে, ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য ক'রে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলই স্পষ্ট ক'রে তুলেছে—মানুষ আপনার নানা কর্মের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে আপনাকেই নানা দিক্ থেকে দেখতে পাচ্ছে।

"এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মতো ভয়ঙ্কর বন্ধন নেই। অস্পষ্টতাকে ভেদ ক'রে উঠবার জন্যই বীজের মধ্যে অঙ্কুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধ্যে ফুলের প্রয়াস। অস্পষ্টতার আবরণকে ভেদ ক'রে সুপরিস্ফুট হবার জন্যই আমাদের চিত্তের ভিতরকার ভাবরাশি বাহিরে আকার গ্রহণের উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের আত্মাও অনির্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে মুক্ত ক'রে বাহিরে আনবার জন্যই কেবলই কর্ম সৃষ্টি করছে। যে কর্মে তার কোন প্রয়োজনই নেই, যা তার জীবনযাত্রার পক্ষে অনাবশ্যক তাকেও সে তৈরি ক'রে তুলছে। কেননা, সে মুক্তি চায়। সে আপনার অরূপের আবরণ থেকে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেখতে চায়, পেতে চায়। ঝোপঝাড় কেটে সে যখন বাগান তৈরি করে তখন কুরূপতার মধ্য থেকে সে যে সৌন্দর্যকে মুক্ত ক'রে তোলে সে তার নিজেরই ভিতরকার সৌন্দর্য—বাহিরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তি পায় না। সমাজের যথেচ্ছাচারের মধ্যে সুনিয়ম স্থাপন ক'রে অকল্যাণের বাধার ভিতর থেকে যে কল্যাণকে সে মুক্তিদান করে, সে তারই নিজের ভিতরকার কল্যাণ—বাহিরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তিলাভ করে না। এমনি ক'রে মানুষ নিজের শক্তিকে, সৌন্দর্যকে, মঙ্গলকে, নিজের আত্মাকে নানাবিধ কর্মের ভিতরে কেবলই বন্ধনমুক্ত ক'রে দিচ্ছে। যতই তাই করছে ততই আপনাকে মহৎ ক'রে দেখতে পাচ্ছে—ততই তার আত্মপরিচয় বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।...মানুষের মধ্যে এই

* The Visva-Bharati Quarterly, Volume 22, Spring Number, 1956-57.

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বনদেবী

শিল্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(প্রবাসী— বৈশাখ, ১৩[illegible] হইতে পুনর্মুদ্রিত)
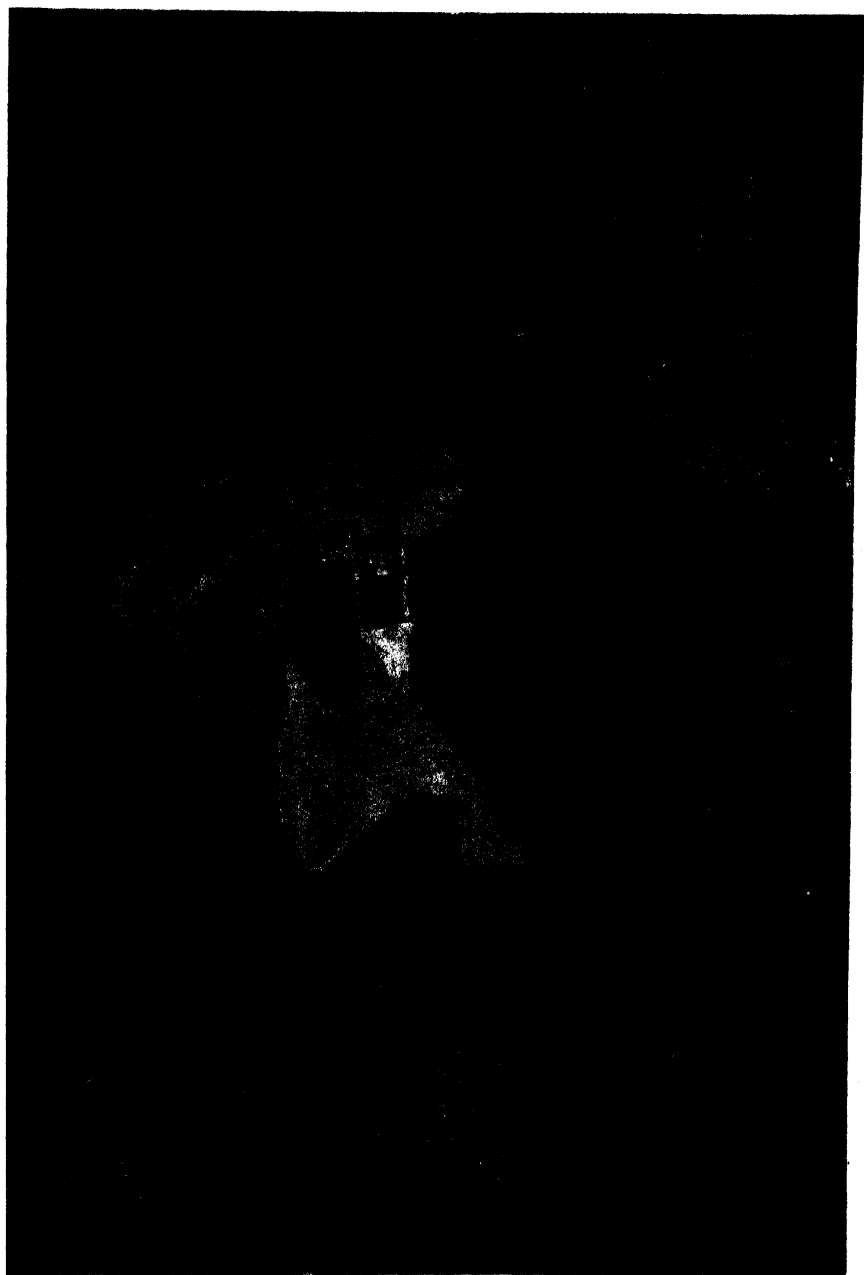
যে জীবনের আনন্দ, এই যে কর্মের আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য। এ কথা বলতে পারব না, এ আমাদের মোহ; এ কথা বলতে পারব না যে একে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্মসাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব না। ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনই মঙ্গল নয়। বিশ্বমানবের নিরন্তর কর্ম-চেষ্টাকে তার ইতিহাসের বিরাট্ ক্ষেত্রে একবার সত্যদৃষ্টিতে দেখো।...

..."কর্মের স্রোত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ্ ঠেলে ফেলছে, অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা সত্য নয় যে, মানুষ দায়ে পড়ে কর্ম করছে—তার একদিকে দায় আছে, আর একদিকে সুখও আছে। কর্ম একদিকে অভাবের তাড়নায়, আর একদিকে স্বভাবের পরিতৃপ্তিতে। এইজন্যই মানুষ যতই সভ্যতার বিকাশ করছে, ততই আপনার নূতন নূতন কর্মকে সে ইচ্ছা ক'রেই সৃষ্টি করছে।"

(শান্তিনিকেতন, দ্বিতীয় খণ্ড, কর্মযোগ।)

রবীন্দ্রনাথের এই জীবনদর্শন ও কর্মযোগের বাণী শান্তিনিকেতনের মন্দিরে সেখানকার কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের নিকট উচ্চারিত হইয়াছিল। এ বাণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাশিল্পদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কর্মযোগের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ ও শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করিয়াছেন। আর সেই আলোচনাতেই শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পশিক্ষার স্থান সম্পর্কে তাঁহার মত ব্যক্ত হইয়াছে।

"শিক্ষাকে জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে তাকে বিদ্যালয়ের গড়া কৃত্রিম সামগ্রী ক'রে তুললে তার অনেকখানি আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হয়। এদের জীবনারম্ভের সুদীর্ঘকাল প্রতিদিন মনক্লিষ্ট হয়ে তার স্বাভাবিক শক্তি যে কত নষ্ট হয়, আমরা তার হিসাব স্পষ্ট আকারে দেখতে পাই না ব'লেই বুঝতে পারি নে।

"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের লক্ষ্য এই যে, এখানে ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষাকে তাদের অখণ্ড প্রাণপ্রকৃতির ও মনঃপ্রকৃতির বিচিত্র লীলার অঙ্গরূপেই যেন গ্রহণ করতে পারে।

"এই লক্ষ্য যদি আমরা যথার্থভাবে সাধন করি তবে এখানকার ছাত্রছাত্রী, এখানকার শিক্ষক ও তাদের পরিজনবর্গের পক্ষে এই বিদ্যালয় যথার্থ আশ্রম হয়ে উঠবে। ইস্কুল হয়ে থাকবে না।

"প্রাচীনকালে একদিন ভারতবর্ষে এই আদর্শই প্রচলিত ছিল।"

(পাঠভবন পত্রমালা, ১, বিশ্বভারতী।)

বিশ্বমানবতার উপাসক মহামানব রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের এই অনিন্দ্য আদর্শকে ভারতের ভাবীশিক্ষার আদর্শরূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় আদর্শ দেশের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ ছিল না। ইহার ফলস্বরূপ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়কে অবলম্বন করিয়াই বিশ্বভারতী গড়িয়া উঠা সম্ভব হইয়াছে। বিশ্বমানবতার রূপ একটি মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে শিশুজীবনের আন্তরিক যোগস্থাপনের প্রচেষ্টা তিনি শান্তিনিকেতনে করিতে যত্ন লইয়াছিলেন। গাছপালা ও পাখীর বিষয়ে প্রাত্যহিক জ্ঞানের দিক্; তাদের প্রতি দৈনন্দিন সেবার দিক্; লোকালয়ের সহিত যোগসাধন; ব্রতীকৃত্য শিক্ষা; লোক-ব্যবহার বা সামাজিক রীতিপালন; শিক্ষক, গুরুজন ও ছাত্রদের মধ্যে ভদ্র ব্যবহার; অতিথিসেবা; সময়ানুবর্ত্তিতা; পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য্যশিক্ষা; লৌকিকতা ও সৌজন্যচর্চ্চা; আত্মকর্তৃত্বের চর্চ্চা; কিছুই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ ও শিক্ষাপ্রণালী হইতে বাদ পড়ে নাই।

দেশের প্রচলিত বিদ্যালয়ে দেহ ও মনের সহযোগিতামূলক শিক্ষার অভাব রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন:

"মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার শক্তির মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ আছে। পরস্পরের সহযোগিতায় তারা বল লাভ করে।

"দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার প্রথায় আমরা সাধারণতঃ পুঁথিগত কয়েকটি বিষয় বাছাই

ক'রে নিয়ে আর সমস্তকে অস্বীকার করি।…………তাই নোট নেওয়া মুখস্থ করা বিদ্যায় তাদের মন যে পরিমাণ বস্তু পায় সে পরিমাণ খাদ্য পায় না।

"দেশের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষারও প্রবাহ বেগ পায় না। অনেক ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি, তার কারণ এই যে, শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবী কোনই আমল পায় না। সেই অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে।"

দেহের চর্চ্চা ও হাতের কাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশ এই যে :—

"দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছিনে। দেহের দ্বারা আমরা যে সকল কাজ করতে পারি সেই সব কাজের চর্চা—যে চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়। সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়। সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে।

"আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষ ভাবে কোন না কোন হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ ক'রে দেওয়া চাই। আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চায় মনও সজীব হয়ে ওঠে। যে সব ছেলেকে আমরা নির্বোধ ব'লে মনে করি তাদের অনেকেরই সুপ্তচিত্ত এই দৈহিক কর্ম্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা ক'রে আছে। দেহের অশিক্ষা, মনের শিক্ষার বল হরণ ক'রে নেয়। তাছাড়া যার দেহ শিক্ষিত হয়নি সে যত বড় পণ্ডিতই হোক, সংসার ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবনধারণ করতে হয়—সে অসম্পূর্ণ মানুষ, এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকে বাঁচাতে হবে। এ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ কোন কোন অভিভাবকের কাছ থেকে আমরা বাধা পাব; সে বাধাকে স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য হবে না।" (পাঠভবন, পত্রমালা, ১, বিশ্বভারতী।)

গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপ্রণালীতে শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমরা শান্তি-নিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বিশ্বভারতীর বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস মহাশয়ের রচিত "আমাদের শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে পাই।* সেই আদিযুগের ছাপা নিয়মাবলীতে পাওয়া যায় যে, নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কাপড়-চোপড়, বাসন, প্রভৃতি ছাত্রদের বাড়ী হইতে সঙ্গে আনিতে হইত। আর সেইসঙ্গে প্রত্যেককে একটি কাঠের বাক্সে ছুতোরের হাতিয়ার, যথা—করাত, হাতুড়ি, বাটালি, র‍্যাঁদা ও তুরপুন আনিতে হইত। এই যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন :

"আগেই বলেছি আমাদের প্রত্যেকের একটি ক'রে কাঠের কাজের হাতিয়ার ভরা বাক্স ছিল। একজন জাপানী ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর কাছে আমরা ছুতোরের কাজ খানিকটা শিখেছিলাম। নিজেদের জন্য ডেস্ক, শেল্‌ফ্‌ ও ছোট আলনা চলনসই রকম তৈরী ক'রে নিতে শিখে গেলাম। সেই জাপানী ভদ্রলোক, নাম তাঁর ভুলে গেছি, একবার দুটি নৌকো তৈরী করার আয়োজন ক'রে ফেললেন। তাঁর নির্দেশমতো আমরা কাঠগুলি ধ'রে থাকতাম—তিনি সেগুলি চেঁচেছুলে করাত দিয়ে প্রমাণসই ক'রে কেটে নৌকোতে লাগাতেন, মাঝে মাঝে আমাদের দিতেন দু'একটা মোটা কাজ। যেমন র‍্যাঁদা দিয়ে একমেটে ক'রে চাঁচা। পরে তিনি সেটাকে তাঁর মনের মতো ক'রে মসৃণ ক'রে চেঁচে নিতেন। যখন নৌকো দুটি সম্পূর্ণ তৈরী হ'ল তখন তাঁর আর আমাদের উল্লাস দেখে কে, আমরা এমন ভাব করতে লাগলাম যেন, কাজটা আমরাই হাঁসিল ক'রে ফেলেছি। একটি নৌকোর নাম হ'ল 'সোনার তরী', সেটি ছোট, তার খোলটার আকৃতি ছিল সমুদ্রের জাহাজের মত। অন্যটির নাম দেওয়া হ'ল 'চিত্রা', সেটি ছিল আকারে বড়ো, তার তলাটা চ্যাপটা। নৌকো দুটির নিজ নিজ নাম, সামনের গলুইয়ের একপাশে লিখে, তাদের তালদীঘিতে ভাসান হ'ল। ছুটিছাটার দিনে নৌকা-বিহার করার অনুমতি পাওয়া যেত।"

সে যুগে শান্তিকেতনে শুধু কাঠের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থাই ছিল, তাহা নয়। তখনকার ছেলের দল বাগান

করা শিখিত। ব্যায়াম, খেলাধূলা বরাবরই ছিল এবং আছেও। তখন ছেলেরা মুক্ত পরিবেশে পশুপাখী, গাছপালা, ঋতু পর্য্যবেক্ষণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করিত। গৌর প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে একটি কুয়া ছিল, সেই কুয়ার উপর রবীন্দ্রনাথ উইণ্ডমিল বসাইযাছিলেন। ছাত্রদের মনে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা সৃষ্টির এরূপ বহুবিধ প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, ছেলেরা গাভীপালন এবং দুগ্ধদোহনও শিখিবে। সেই ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই সকল শিক্ষাপ্রচেষ্টা পরিপূর্ণ রূপ না পাইলেও নিস্ফল হইয়াছে একথা বলা যায় না। কারণ কোন শিক্ষাব্যবস্থা দেশকালের নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া সহজে উর্দ্ধে উঠিতে পারে না, উঠিতে গেলেও তাহাকে সমাজজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়।

১৯২১ সনে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠার পর আমি ১৯২৩ সনে শ্রীনিকেতনে ছাত্ররূপে যোগ দেই। সেই সময় হইতে শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্র নানাভাবে সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে বলা যায়। কলাভবনে চিত্রবিদ্যার সঙ্গে শিল্পের যোগ ঘটিয়াছে। বিনয়ভবনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে (বি. এড্.), শ্রীনিকেতনে বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে, কুটিরশিল্প কেন্দ্রে বহুবিধ শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে। বিশ্বভারতীর শিল্পশিক্ষার সম্প্রসারণে শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দানও সামান্য নয়।

ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে বিদেশী সরকারও দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পশিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে একাধিকবার কমিশন বসাইয়াছেন। এও সত্য যে, কমিশনগুলির মুদ্রিত সুপারিশ ভারতের শিক্ষাশিল্প-বিবর্তনের ইতিহাসের অঙ্গ। কিন্তু ইংরেজ আমলে আবশ্যিক ও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ ছিল। সেজন্য শিক্ষাশিল্পের অগ্রগতি সামান্যই হইয়াছিল। তাহা ছাড়া এটাও উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ডের শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা প্রবর্তন ১৯০৪ সনের পূর্ব্বে সম্ভব হয় নাই।

অন্যপক্ষে আমরা দেখিতে পাই, ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ্য করিয়া জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় এবং সেই সঙ্গে 'জাতীয় শিক্ষা' পরিকল্পনার জন্ম। বাংলাতে 'জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্' বলিয়া সংস্থা সেই সময়েই স্থিতি লাভ করিয়াছিল এবং পরিষদের উদ্যোক্তারা শিল্পকেও নীতিগত ভাবে শিক্ষার অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। পরে ১৯২১ সনে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হইলে পর দেশের সর্বত্র আবার "জাতীয় বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠার ধুম পড়িয়া যায়। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিল্পও শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছিল। কিন্তু জাতীয় শিক্ষার এই অভ্যুত্থান ছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামের অঙ্গ ; সেজন্য সুচিন্তিত শিক্ষা-পরিকল্পনা তখন মূর্ত্ত হইবার অবকাশ পায় নাই। কিন্তু পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভের জন্য সংগ্রামের ফলে ১৯৩৫ সনে দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হয়। সংগ্রাম-পরিচালক, ভারতের জননায়ক মহাত্মা গান্ধী তখন দেশের সার্ব্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষানীতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সেই সময়কার প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী ও বিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মিবৃন্দকে এক সম্মিলনীতে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। ১৯৩৭ সনের ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর বর্দ্ধা শহরের নবভারত বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এই সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। সৌভাগ্যবশতঃ আমিও আমন্ত্রিত হইয়া ইহাতে যোগ দিয়াছিলাম। ভারতের শিক্ষা-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে এই সম্মিলনীর দান স্মরণীয়। সম্মিলনীর আমন্ত্রণ-পত্রে ও পরে অধিবেশন-কালে ভারতের ভাবী শিক্ষার আদর্শ ও নীতি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি শিক্ষাব্রতী মাত্রেরই জানা প্রয়োজন। এই ভাবে দেশে বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। এই শিক্ষানীতির সমালোচনা দেশে অনেক হইয়াছে। দেশের শিক্ষাশিল্প-বিবর্ত্তনের ইতিহাসের এক পর্য্যায়ে বুনিয়াদি শিক্ষানীতির স্থান ও দান সামান্য নয়। এখানে আমরা বুনিয়াদি শিক্ষায় শিল্পের স্থান ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাশিল্প-চর্চ্চার আবশ্যকতা সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথ বিদেশী শাসনের আমলে শিক্ষার একটি আদর্শ পরিকল্পনাকে শান্তিনিকেতনের আবাসিক শিক্ষায়তনে রূপ দিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং যাহাতে আশ্রমের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই বিশেষভাবে কোন না কোন হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ হইতে পারে সে বিষয়ে তাঁহার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। ইহার কারণও তাঁহার উক্তি হইতে উপলব্ধি

করিতে পারা যায়। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩৩২ বঙ্গাব্দে গুরুদেব বর্ত্তমান লেখকের 'কাঠের কাজ' নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন:

"বিদ্যাশিক্ষায় আমাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবে এ কথাই খাঁটি। কিন্তু পুঁথিপড়া মানুষই যে পুরা মানুষ তাহা বলা যায় না। অথচ এ সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যাবিভাগের লজ্জা নাই। তাই দীর্ঘকাল ধরিয়া সে আমাদের কানে এই মন্ত্র দিয়া আসিয়াছে, যে ভদ্রলোককে পুরা মানুষ হইতে হইবে না। ভদ্রলোকের চোখ ভাল করিয়া দেখিতে না শিখুক, কান ভাল করিয়া শুনিতে না শিখুক, হাত ভাল করিয়া কাজ করিতে না শিখুক, তাহাতে কোন অগৌরব নাই, কেবল যেন সে পড়িতে শেখে। আমাদের মতে পঙ্গুতাই ভদ্রসমাজের লক্ষণ, হাত-পাগুলোকে অপটু করিয়া তুলিলে ভদ্রতা পাকা হয়। ইহার ক্ষতি ততদিন বুঝিতে পারি নাই যতদিন বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের একমাত্র মোক্ষলাভ ছিল চাকরীধামে, কেরাণীতীর্থে। সেখানে জায়গার টানাটানি ঘটিতেই দেখা গেল, তাহার মত অসহায় প্রাণী আর জীবলোকে নাই। সংসার-সমুদ্রে পুঁথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র ভেলা ছিল তাহাদের এবার নৌকাডুবির পালা। সেই সঙ্কটের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেকেও আজ হাতে ও কলমে দুইদিকেই শক্ত হইতে হইবে। এই তাগিদ আসিয়াছে।"

মহাত্মা গান্ধী দেশের নেতারূপে সমগ্র জাতির আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পথকে নিরঙ্কুশ করার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—"ছেলেমেয়েদের পরিপূর্ণ শিক্ষার আধার হইবে আয়কর শিল্প।" পল্লীবাসীদের দুরবস্থা মহাত্মা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহার শোচনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন এবং আবশ্যিক শিক্ষাকে সকলের গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য বুনিয়াদি শিক্ষায় আয়কর শিল্পের প্রবর্ত্তন কামনা করিয়াছিলেন।

"আমার মতে একমাত্র কর্ম্মকেন্দ্রী শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তন দ্বারাই দেশের দুর্গতি দূরীকরণ সম্ভব। আমার নিজের এ সম্পর্কে কতক অভিজ্ঞতা আছে; দক্ষিণ আফ্রিকায় টলষ্টয় ফার্ম্মে আমি নিজের ও অন্যের সন্তান-সন্ততিকে কাঠের কাজ, জুতা-তৈরির কাজ, ইত্যাদি হাতের কাজের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা পরিবেশন করিয়াছি।...আর আমি সুনিশ্চিত বলিতে পারি যে আমার ও অন্যের সেই সকল ছেলেমেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুই হারায় নাই।...আজ দেশে দক্ষ ছুতোর, কামার অধিকাংশ পল্লীতে পাওয়াই দুষ্কর। দেশের পল্লীর শিল্প মৃতপ্রায়।"

সেজন্য হরিজন পত্রিকায় তিনি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন:

"The remedy lies in imparting the whole art and science of a craft through practical training and therethrough imparting the whole education."

মহাত্মার নির্দ্দেশমত বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে শিল্প কতখানি রূপ পাইয়াছে, কতখানি পায় নাই এবং কেন—সে বিচারে যাওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বুনিয়াদি শিক্ষার মূলভিত্তি এখানে আলোচ্য।

এ সম্পর্কে মহাত্মার নির্দ্দেশ ছিল:

"অহিংসাই হইবে বুনিয়াদি শিক্ষার মূলভিত্তি। আমাদের ছেলেমেয়েদের, আমাদের ঐতিহ্যের উপযুক্ত প্রতিনিধি হইতে হইবে। আর তাহা শুধু আত্মনির্ভরশীলতা-দানকারী শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন দ্বারাই সম্ভব। ইউরোপ আমাদের আদর্শ নয়। ইউরোপের সংস্কৃতি হিংসার ভিত্তিতে গঠিত, কারণ হিংসায় ইউরোপ বিশ্বাস করে। রাশিয়ায় বিপুল সংস্কার ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহার সমগ্র গঠন বলপ্রয়োগের ও হিংসার ভিত্তির উপর নির্ভরশীল।" (মহাত্মা গান্ধী—হরিজন।)

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষার আদর্শ, বিশ্বমানবতার আদর্শ ও মহাত্মার অহিংস মানবসমাজ গঠনের আদর্শের মধ্যে ভাষার প্রভেদ থাকিলেও ভাবের বৈষম্য নাই। হিংসা জয় করিতে না পারিলে বিশ্বমানবতার বিকাশ কখনই সম্ভব নয়। হিংসা জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে শুধু বাধাই সৃষ্টি করে না, সভ্যতারও অগ্রগতিকে ব্যাহত করে।

গুরুদেব ও মহাত্মার শিক্ষার আদর্শ আমরা কতখানি জীবনে গ্রহণ করিয়াছি, দেশবাসীকেই তাহার উত্তর দিতে হইবে। ব্যক্তিগত জীবনে যাঁহারা তাহা করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য ও সকলের প্রণম্য।

আজ স্বাধীন ভারতের লোকায়ত্ত সরকার দেশে বুনিয়াদি শিক্ষা বিস্তার করিতেছেন। আজ স্বাধীন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্থা (The All India Council for Secondary Education) ভারতের শিক্ষাদপ্তরের প্রতিভূরূপে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা (Draft Syllabus for Higher Secondary Education) রচনা করিয়াছেন ; এই পরিকল্পনায় বহুবিধ শিক্ষাশিল্পের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাজ্য-সরকারসমূহের শিক্ষাদপ্তর তাহা রূপায়িত করিতে সবেমাত্র সচেষ্ট হইয়াছেন। ষাট বৎসর পূর্ব্বে গুরুদেব প্রথম সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষার আদর্শকে রূপ দিতে গিয়া শিক্ষাশিল্পকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়াছিলেন। ষাট বৎসরের মধ্যে সেই আদর্শ কালচক্রে দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা সকলেরই জানিবার বিষয়।

মহাত্মা গান্ধী কামনা করিয়াছিলেন যে, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমন হইবে যে দেশবাসী আমাদের মহান্ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে আমাদের প্রাচীন মহান্ ঐতিহ্যের রূপ কি ছিল ?

শান্তিনিকেতন আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গুরুদেব বলিয়াছেন, "প্রাচীনকালে একদিন ভারতবর্ষে এই আদর্শই প্রচলিত ছিল।" প্রশ্ন হইতে পারে—সেই আদর্শের স্বরূপ কি ? মানবজীবনে শিল্পচর্চ্চার সার্থকতা সম্পর্কে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর ঋষি অনুষ্ঠান দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন : "শিল্পচর্চ্চার উদ্দেশ্য আত্মসংস্কৃতি ও জীবনকে ছন্দোময় করা। শিল্প-চর্চ্চা সকলেরই অবশ্যকরণীয়।"

গুরুদেবের প্রার্থনামূলক গানেও আমরা সেই আদর্শের সন্ধান পাই :

"যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ !"

পরাধীনতার গ্লানির মধ্যে আমরা সুদীর্ঘকাল যাপন করিয়াছি। আজ আমরা আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছি। এখন শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবনের সংস্কার ও তাহাদের জীবনে শান্ত ছন্দ সঞ্চারিত করার আহ্বান আবার দেশের শিক্ষকদের দ্বারে উপস্থিত। এ ত অতি মহান্ আহ্বান, জাতীয়-সংস্কৃতির উর্দ্ধায়ন এই পথেই সম্ভব। দেশের শিক্ষকমণ্ডলী এই আহ্বানে সাড়া দিতে পারিলেই শিক্ষাশিল্পেরও যথার্থ রূপ লোক-জীবনে মূর্ত্ত হইতে পারে, আমাদের সমাজও স্বকীয় পথে শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে।

—*—

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্যারিসে একদিন

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

১৯২০ সাল। রবীন্দ্রনাথ প্যারিসে। গ্রীষ্মকাল, শহরের রাস্তাঘাট চোখ-জুড়োনো, গন্ধেভরা ফুলে ফুলে আলো করা।

শহরের এক বিখ্যাত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কান্-সাহেব, মস্ত বড় ব্যাঙ্কার। নগরপ্রান্তে সেন্ নদীর ধারে তাঁর বসতবাড়ী। তার পাশেই প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা ছিমছাম মনোরম এক বাগানবাড়ী, নানা জাতের ফুল-ফলের গাছপালা দিয়ে ঘেরা। বাগানের ভিতর একটা জাপানীধরণের কাঠের বাড়ীও আছে। এই বাগানবাড়ী কান্-সাহেব পৃথিবীর সব মনীষীর উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন। এখন এটা তাঁদের একত্র হবার একটা ক্লাব, সেখানে থাকা-খাওয়ার খুবই ভাল বন্দোবস্ত আছে। ঘটা ক'রে ক্লাবের নাম দেওয়া হয়েছে, ওতুর দ্যু মঁ, অর্থাৎ কি না, 'বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।'

এই বাগানবাড়ীর উপরতলায় রবীন্দ্রনাথের বাসস্থান স্থির হয়েছে। জানলা খুলে দিলেই দেখা যায়, সামনে নোংরা, ঘোলাটে, খালের মত সেন্ নদী। তার উপর দিয়ে চলেছে ছোট ছোট ষ্টীম্ লঞ্চ, গাধাবোট, মেছোডিঙি। ফরাসী লোকগুলো অনেকটা আমাদেরই মত ঢিলেঢালা, আয়েসী। চারদিকে ঠেলাঠেলি, দৌড়ঝাঁপ, হাঁকডাক। তিরিশ মাইল দূরের একলা-ষেঁড়ে ইংরেজদের একেবারে বিপরীত। নদীর ওপারে গাছের ছায়াস্নিগ্ধ শ্যামশ্রী ছবির মত সাঁ৷ ক্লু গ্রাম। দূর থেকে দেখতে অতি মনোহর। এখানে, এখনও নাম হয় নি এই রকম, আর্টিষ্ট, লেখক, নটনটীর বসতি।

ওতুর দ্যু মঁ-তে প্রত্যহই সকাল-সন্ধ্যেয় রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রচুর লোক-সমাগম। লেখক, কবি, নাট্যকার, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, এক্সপ্লোরার, আর্টিষ্ট, সঙ্গীতকার, প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ, কেউই বাদ যান না। তা ছাড়া মাদাম দ্য নোয়াই, মাদাম দ্ব রিমঁ—দুই স্ত্রী-কবি সর্বদাই তাঁকে ঘিরে ব'সে আছেন। আমরা দূর থেকে দেখা দিয়ে মানে-মানে স'রে পড়ি।

অভ্যাগতদের সমাদরে দুপুরে লাঞ্চ ও বিকেলে শরবত খাওয়ানোর ভার কান্-সাহেব নিজেই নিয়েছেন। মাঝে-মাঝে রাত্রে ভূরিভোজের ব্যবস্থা তিনিই করেন। আমরা ইতরজনে মজাদার ফরাসী রান্না চেখে পরিতৃপ্ত হই। পানসে ইংরেজি খানার বিস্বাদ তখনও মুখে লেগে আছে—মুখ বদলাই।

রবীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লেক্‌চার দিতে যান। এই সেদিন মুসে গীমেতে বাংলার বাউল সম্বন্ধে তাঁর চমৎকার এক বক্তৃতা হয়ে গেল। হল্-এ লোক আর ধরে না। আবার ওরই মধ্যে সুবিধা মত মাদ্‌লেন্, নোতর্ দাম, সাক্রে কুয়োর, প্রভৃতি ধর্ম্মমন্দিরগুলো পরিক্রমণ করাও হচ্ছে, দিনগুলো জলের মত কেটে চলেছে।

ইতিমধ্যে একদিন কান্-সাহেব প্রস্তাব করলেন, কনসারভেতোয়র দ্য মুজিক্-এ নিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ইউরোপের নামজাদা সুরকারদের রচিত রাগ-রাগিণীর কনসার্ট শুনিয়ে আনবেন। অদৃষ্ট প্রসন্ন থাকায় আমিও নিমন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত হলুম না। কান্-সাহেবের সঙ্গে তাঁরই প্রকাণ্ড রেনো গাড়ি চ'ড়ে যাওয়া গেল।

কনসারভেতোয়রের বিশাল হল্। একদিকে শ্রোতাদের আসন, আর একদিকে লম্বাচওড়া এক মঞ্চ। তার উপর বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসেছেন প্রায় একশো জন বাজনদার। তাঁদের দু-দিকে দুটো গ্র্যাণ্ড পিয়ানো। সকলেই একই রকমের কালো পোষাক পরেছেন। কোটের বুক খোলা, তারই মধ্যে দিয়ে সাদা ধবধবে শক্ত ক'রে ইস্ত্রি করা ঝকঝকে সার্ট দেখা যাচ্ছে, তার নিচে এক চিল্‌তে কালো কোমরবন্ধের মত ওয়েষ্টকোট। পায়ে মিশমিশে কালো ট্রাউসার্স। বাজনদারদের সামনে আমাদের দিকে পিছন ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন কনসার্টের কন্‌ডাকটর, হাতে তাঁর রুলারের মত এক দণ্ড।

বাজনা বেজে উঠল। একশো লোকের হাত একসঙ্গে উঠছে নামছে। বাঁশীর মত যন্ত্রে একসঙ্গে ফুঁ দিতে, গাল ফুলে উঠছে আবার চুপসচ্ছে। শব্দের এক প্রচণ্ড ঝঙ্কার শুধু কানে এসে ধাক্কা মারল, মানে কিছুই বোঝা গেল না। তবে বেশ প্রত্যয় হল যে, মনোজগতে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের মিলনের উপায় সঙ্গীতে নয়। সঙ্গীতরাজ্যে দুই দেশের ইডিয়মের মধ্যে এমনই আকাশ-পাতাল তফাৎ যে, খাঁচার পাখী আর বনের পাখীর মত কাছে এসেও কেউ কাউকে কাছে পায় না।

সুরের গভীর অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় একটু আলোর রেখা দেখা গেল। মনে হ'ল, এ ত চেনা সুর। পুরনো ব্রহ্মসঙ্গীত যেন কেউ গলায় না গেয়ে যন্ত্রে বাজাচ্ছে। যেন দীর্ঘ মরুভূমি পেরিয়ে এক মরুদ্যানে আসা গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ চোখ বুজে ধ্যানস্থ। সুরকার বাখের রচিত সংগীত।

খানিক পরে ইণ্টারভল্-পর্ব। অন্ধকার হল্-এ এক সঙ্গে হাজার বাতি জ্ব'লে উঠল। শ্রোতারা আসন ছেড়ে উঠলেন। কান্-সাহেব ইঙ্গিত করলেন, এই অবসরে একটু চকোলেট খেয়ে আসা যাক। এ চকোলেট লাল-নীল-সবুজ-হলদে রাংতা-মোড়া, রিবন-আঁটা ঝকমকে বাক্সবন্দী, মেয়েদের উপহার দেবার যোগ্য চকোলেট নয়। এ

হচ্ছে, দুধে ঘোঁটানো, ঘন ক'রে জ্বাল দেওয়া পাতলা চকোলেট, চুমুক দিয়ে খেতে হয়। ফরাসী দেশে ইংরেজদের দেশের মত চায়ের চল্ ততটা নেই। সকালে বিকেলে চায়ের বদলে চকোলেট কি কফিরই রেওয়াজ বেশি। তা ছাড়া ক্ষণে-ক্ষণে গলা ভিজোবার জন্যে হরেক রকমের মদ্য ত আছেই।

কান্-সাহেব আমাদের দু মিনিটে বুলভার বঁ নুভেলে নিয়ে এসে ফেললেন। এই রাস্তারই ৩৯ নম্বর বাড়ীতে রেস্তোরাঁ প্রেভোস্ত। সেখানে শুধুই চকোলেটের কারবার। সে চকোলেটের খ্যাতি সমস্ত প্যারিস শহর জুড়ে। বিশেষ এক কায়দায় ঘোঁটানো, জ্বাল দেওয়া; তার কৌশল অন্যে জানে না। কান্-সাহেব আমাদের চাঁদোয়া-দেওয়া ফুটপাতের উপর টেবিলে না বসিয়ে রেস্তোরাঁর ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন। হেড্-ওয়েটারের কানে কানে কি যেন বললেন। বসতে-বসতেই দু দিকে দুই কানা-ওয়ালা জাম্‌বাটিভরা ধোঁয়া-ওড়া চকোলেট আমাদের সামনের ছোট-ছোট মার্বলঘেরা টেবিলে এসে পৌঁছল।

মরিস লেভি আর আমি একটু তফাতেই বসেছিলুম। আমাদের সামনে এক টেবিল ছেড়ে একটি ছেলে আর মেয়ে ব'সে। ফিসফিস ক'রে কথা বলছে, চকোলেটে চুমুক দিচ্ছে, আর নিজেদের কথাতেই নিজেরা মশগুল হয়ে হাসছে। ছেলেটি কি যেন লিখছে আর তাই প'ড়ে মেয়েটাকে শোনাচ্ছে, বোধ হয় কবিতা। কেননা, এ বয়সে প্রায় সব ছেলেরই অল্পবিস্তর পদ্যলেখার বাতিক থাকে। ছেলেটার বয়েস অল্প, সবে গোঁফের রেখা উঠেছে, গালের দু-ধারে জুলপিকাটা; কোঁকড়া কোঁকড়া একমাথা তামার রং-এর চুল। পরনে নীল রঙের জীন্-এর পাতলুন আর নীল রং-এর সিল্কের গলাবন্ধ ব্লাউজ, টাই-কলারের বালাই নেই। ঐ বয়েসের সাধারণ ফরাসী ছেলেদের চেয়ে দেখতে একটু সুশ্রী। মেয়েটিও কম-বয়েসী। দেখতে একেবারে সুন্দরী না হলেও, হাব-ভাবে, ধরণ-ধারণে, সাজ-সজ্জায়, কহনে-বলনের অঙ্গভঙ্গিতে ঐ বয়েসের ইংরেজ মেয়েদের চেয়ে ঢের বেশি চটকদার, অনেক বেশি আত্মস্থ।

তারা একবার-একবার অতি সন্তর্পণে রবীন্দ্রনাথকে আড়চোখে দেখে নিচ্ছে। তাঁর পোশাক-আশাক প্রাচ্য দেশের মতো ঢিলে-ঢালা। পা-পর্যন্ত-লম্বা জোব্বা, মাথায় মখমলের টুপি। ফরাসী দেশে সুবিধা এই, যে-কোন রকমেরই পোশাক প'রে বার হওয়া যাক না কেন, কেউ অভদ্রের মতো তাকিয়ে থাকবে না; ইংরেজদের দেশের মতো রাস্তার হতভাগা ছোঁড়ার দল পিছনে-পিছনে হাততালি দিতে-দিতে চলতে থাকবে না, মুখ ভ্যংচাবে না, অশিষ্ট কথা উচ্চারণ করবে না, বিশেষতঃ কালো চেহারা হলে আর রক্ষা নেই। ফরাসী দেশে কাফ্রী, ভারতবাসী, সিংহলী, সুদূর প্রাচ্যের আনামী, মালয়ী, ইন্দোচীনে, এদের বিচিত্র স্বদেশী পোষাক প'রে বেরোলে, কেউ সেটাকে একটা অদ্ভুত ঘটনা ব'লে মনে করে না। তাই সহজে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিও কিছু ঘটে না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চেহারাটা ত ভিড়ে লুকোবার মতো নয়। আর খবরের কাগজে, ম্যাগাজিনে তাঁর ছবি এত ছাপা হয়েছে যে, সশরীরে দেখলে চিনতেও এক মিনিট দেরী হয় না। আমাদের সামনের টেবিল থেকে তাই বারকতক খিলখিলে হাসির মধ্যে অস্পষ্ট 'তাগোরে তাগোরে' শব্দ কানে ভেসে এল। বুঝলুম, তারা রবীন্দ্রনাথকে ধ'রে ফেলেছে। আমরা বেশ তারিয়ে-তারিয়ে চকোলেট চাখ্‌ছি, এমন সময় ছেলেটি আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে আওড়াতে সুরু ক'রে দিল:

Lá oú l' esprit est sans crainte
et où la tête est haut portée . . . .

অর্থাৎ, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' ইত্যাদি, রবীন্দ্রনাথের ইংরিজি গীতাঞ্জলির আঁদ্রে জিদ্ কৃত ফরাসী অনুবাদের একটা কবিতা। ছেলেটির গলা বেশ জোরাল। মধুর না হলেও, কর্কশ নয়।

আমরা স্তব্ধ। রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত, কিন্তু প্রফুল্ল। ছেলেটি কবিতাটির আগাগোড়া আপনমনে আবৃত্তি ক'রে গেল। শেষের দু লাইনে তার মুখের ভাব গেছে বদলে, চোখ দুটো যেন কোন্ দূর-দূরান্তে ভেসে চলেছে:

Dans ce paradis de liberté, mon Père,
permets que ma patrie s'éville.

(Into that heaven of freedom, my father,
Let my country awake.)

হঠাৎ যেন মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল, ইওরোপের লোকেরা স্বাধীন বটে, কিন্তু এখনও তারা মুক্তির আস্বাদ পায় নি। রবীন্দ্রনাথই সেই আস্বাদ তাদের দিতে পারবেন।

আবৃত্তি শেষে ফস্‌ ক'রে একটা পাতলা চটি বই পকেট থেকে বের ক'রে নিয়ে ছেলেটি তার কাগজের মলাট উল্‌টিয়ে রবীন্দ্রনাথের সামনে ধরল। বুকপকেট থেকে একটি ফাউণ্টেন পেনও বের ক'রে এগিয়ে দিল। ভাবটা, দয়া ক'রে কিছু লিখে দিন। রবীন্দ্রনাথ একটু মুচকি হেসে টাইট্‌ল্‌ পেজে নিজের নাম সই ক'রে দিলেন।

আমরা আবার কনসারভেতোয়রে ফিরে এলুম। তারপর সুরসাগরে ডুব, কিন্তু অরূপরতন পাবার কোন আশা নেই। ছেলেটির মুখচ্ছবি কবিতার শেষে তার ধ্বনির মতোই চোখের উপরে ভেসে উঠল। মনে হ'ল, যেন সে আমাদের অতি নিকট আত্মীয়।

—*—

স্মৃতিতীর্থ

শ্রীসীতা দেবী

রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন, প্রায় কুড়ি বৎসর হতে চল্‌ল। এর মধ্যে তাঁর বিষয়ে বলা হয়েছে ঢের, লেখাও হয়েছে প্রচুর। প্রতি বৎসরই তাঁর জন্মোৎসবের সময় তাঁর কথা আমরা শুনছি। কিন্তু তাঁর কথাও ব'লে শেষ করা যায় না এবং শুনে মনে পরিপূর্ণ তৃপ্তিও আসে না, আরো শুনতে ইচ্ছা করে। তাঁর সান্নিধ্যলাভের মহা সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁদের প্রত্যেকেরই স্মৃতিভাণ্ডারে এমন সব কথা সঞ্চিত আছে, যা সর্ব্বসাধারণের কাছে জানা নয়। তাই কয়েকটি কথা লিখছি।

আমার বয়স যখন চার বৎসর মাত্র, তখন রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম দেখি। আমার পিতৃদেব তখন এলাহাবাদে বাস করতেন। জন্মাবধি তাঁকে কোন না কোন মাসিকপত্র সম্পাদন করতে দেখেছি। এই সূত্রেই হয়ত প্রথম তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। পরে এই পরিচয় গভীরতর আত্মীয়তায় পরিণত হয়।

বিকালে একদিন বাবা সবে কলেজ থেকে ফিরে এসে বিশ্রাম করছেন, এমন সময় আমাদের 'মহারাজ' অর্থাৎ পাচক ব্রাহ্মণ মহা ব্যস্তভাবে এসে খবর দিল যে, বাইরে দু'জন রাজা এসেছেন। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন তাঁদের কোথায় বসান হয়েছে। পাচক বল্‌ল যে, সে তাঁদের নিজের খাটিয়া পেতে বসিয়ে রেখে এসেছে। বাবা ব্যস্ত হয়ে বাইরের দিকে গেলেন, আমিও শৈশবের কৌতূহল নিয়ে তাঁর পিছন পিছন ছুটলাম। উপকথায় বর্ণিত রাজাদের অলোকসামান্য রূপের বর্ণনা অনেক শুনেছিলাম, রাজার চেহারা কেমন হয় তার একটা ছবিও কল্পনাতে ছিল। কিন্তু অভ্যাগত রাজার চেহারা দে'খে অবাক্‌ হয়ে ভাবলাম, রাজা যে এত সুন্দর হয়, তা জানা ছিল না। পরে বাবার কাছে শুনলাম যে ইনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গে যিনি এসেছিলেন তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ। অশিক্ষিত গ্রাম্য-পাচক সেদিন তাঁকে রাজা ব'লে চিনেছিল, জগতের লোক পরে ত তাঁর এ মর্য্যাদা স্বীকার ক'রে নিল। রূপ তাঁর দেবদুর্লভ ছিল ঠিকই, কিন্তু অতখানি সুন্দর চেহারা সংসার খুঁজলে আরো দু-একটা পাওয়া যেত হয়ত। কিন্তু তাঁর চেহারায় এমন কিছু ছিল যা দে'খে তাঁকে শুধু মানুষ ব'লে মনে হ'ত না, যেন মানবদেহধারী আর কিছু। আমার এক বন্ধু একদিন বলেছিলেন যে, বাল্যকালে প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দে'খে মুগ্ধবিস্ময়ে তিনি ভেবেছিলেন, ইনিও মানুষই বটে, তবে ঠিক আমাদের মত মানুষ ত নয়? আর একবার গল্প শুনেছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ একদিন কৃষ্ণকুমার মিত্র

মহাশয়ের বাড়ী গিয়েছিলেন দেখা করতে। উপরে খবর পাঠিয়ে তিনি নীচে গাড়ীতে অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় বাড়ীর একটি বালক পাহাড়ী ভৃত্য এসে হাজির। বড় গাড়ী দে'খে তার বোধহয় একটু লোভ হয়েছিল। সে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার গাড়ীতে আমাকে একটু চড়তে দেবে?" রবীন্দ্রনাথ তখনই তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে খানিকটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন। এদিকে বাড়ীর লোকরা ত অবাক্। গাড়ীই বা কোথায়, রবীন্দ্রনাথই বা কোথায় এবং বালক ভৃত্যই বা কোথায়? যা হোক, অল্পপরেই সমস্যার সমাধান হ'ল, সকলে ফিরে আসাতে। রবীন্দ্রনাথ চ'লে যাবার পরে বালককে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "তুমি কার হুকুমে গাড়ীতে চড়েছিলে?" সে বল্‌ল, "ঐ যে রাজা ভিতরে বসেছিলেন, তাঁকেই বলেছিলাম। তিনি নিয়ে গেলেন।"

এর আট-নয় বৎসর পরে এলাহাবাদের বাস উঠিয়ে দিয়ে বরাবরের মত কলকাতায় চ'লে আসি। ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে আবার রবীন্দ্রনাথের দর্শন পাই। আমরা থাকতাম তখন কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশে এখানে 'দেবালয়' ব'লে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে বক্তৃতা, গান, আলোচনা, প্রভৃতি প্রায়ই হ'ত। প্রতিষ্ঠাতার নিমন্ত্রণে এখানে রবীন্দ্রনাথকে দু'দিন আসতে দেখি, দুবারই গান করেন ও কিছু আলোচনা করেন। আগে কোন বিজ্ঞাপন বোধহয় দেওয়া হয়নি, তবু ছোট ঘর ভ'রে গেল এবং গলিতেও ভীড় জ'মে গেল।

১৯১০-এর শেষ দিক্ থেকে আমরা শান্তিনিকেতন আশ্রমে যাতায়াত আরম্ভ করি। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে উৎসব হয়, সেইখানেই যাই। এবারে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আসি। সেবার আশ্রমে তিন-চার দিন ছিলাম। আদরযত্ন যা পেয়েছিলাম, তা আমাদের একেবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিল। শিক্ষকরা ও ছাত্ররা কোনদিকে কোন ত্রুটি রাখেন নি, যদিও তখনকার দিনে ওখানে আয়োজনের প্রাচুর্য্য ছিল না। স্বয়ং কবি এমন আন্তরিক স্নেহে সকলকে গ্রহণ করেছিলেন, যা ভাবলে এখনও বিস্ময়ে ও ভক্তিতে চিত্ত অভিভূত হয়ে যায়। অল্পবয়স্কা, অপরিণতবুদ্ধি বালিকা তখন। কি মহা ঐশ্বর্য্য যে পাচ্ছি তার ধারণা পরিপূর্ণ ক'রে তখনও হয় নি, আভাস পেয়েছিলাম খানিকটা মাত্র। যে কদিন ছিলাম, তিনি দিনে দু'তিন বার আমাদের খোঁজখবর নিতেন, এবং যতরকম আবদার আমরা করতাম, সব রক্ষা ক'রে চলতেন। তাঁর শ্রান্তিও ছিল না, ক্লান্তিও ছিল না। আহার ও বিশ্রামের জন্যে অতি অল্পসময়ই তাঁর বরাদ্দ ছিল। চ'লে যখন আসি আমরা, তখন মধ্যরাত্রির পর, নিজে লণ্ঠন হাতে ক'রে হেঁটে এসেছিলেন আমাদের বিদায় দিতে।

এর পর বহুকাল পর্য্যন্ত, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যখনই যে-কোন কারণে উৎসবাদি হয়েছে, আমরা তাতে উপস্থিত থেকেছি। এই উৎসবগুলিতে প্রায়ই নাট্যাভিনয় হ'ত, এবং নিতান্ত অসুস্থ না থাকলে রবীন্দ্রনাথ নিজেও রঙ্গমঞ্চে নামতেন। তিনি অতি উৎকৃষ্ট দরের অভিনেতা ছিলেন, এবং একেবারে বৃদ্ধ হয়ে যাবার আগে পর্য্যন্ত নাচতেও পারতেন খুব ভাল। তবে কোন ছদ্মবেশ ত তাঁকে আড়াল করতে পারত না? যে ভূমিকাতেই নামুন, ষ্টেজে এসে দাঁড়ালে তিনি যে রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতে একেবারেই ভুল হ'ত না। তাঁকে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধবয়সে যুবক জয়সিংহ ও কবিশেখরের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছি, সেখানেও তিনি নিজেকে লুকোতে সমর্থ হন নি। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে আমরা শান্তিনিকেতনে গিয়ে বৎসর দুই বাস করি। আমার ছোট ভাই প্রসাদ (ডাকনাম মুলু) এই সময়ে আশ্রমের বিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে ভর্ত্তি হয়। তার স্বাস্থ্য দুর্ব্বল ছিল, এজন্য স্থির হয় যে, তাকে বোর্ডিং-এ না রেখে, বাড়ীতে রাখা হবে। মুলু, আমরা দুই বোন ও আমাদের বাবা ওখানে একটি ছোট বাড়ী নিয়ে থাকব। মুলু বাড়ীতে থেকেই পড়বে।

মুলুর দৈহিক স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তবে মনে অদম্য উৎসাহ ছিল। ওখানকার নিকটবর্ত্তী গ্রাম ভুবনডাঙার ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে একটি নৈশ বিদ্যালয় করেছিল। এই বিদ্যালয়ের খরচ চালাত সে পুরনো খবরের কাগজ বিক্রী ক'রে। বাড়ীতে কাগজ অনেক আসত, সেগুলি সে নিত। রবীন্দ্রনাথ মুলুকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, নিজে মধ্যে মধ্যে পুরনো খবরের কাগজ নিয়ে আসতেন তাকে দেবার জন্যে, বলতেন, "মুলুর ভাণ্ডারে দিও।" আমরা

তখন নীচু বাংলা ও দেহলীর মাঝামাঝি একটি জায়গায়, একটি কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। মাটির দেওয়াল আর খড়ের চাল। এ বাড়ীটি এখন আর নেই।

রবীন্দ্রনাথ এত লোকের মধ্যে থাকতেন, সহস্ররকম কাজে ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু ক্ষুদ্রতম বালক বা বালিকার দাবি কখনও ভুলতেন না। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁকে দেখেছি বিদেশী ষ্ট্যাম্পের সংগ্রহকারী বালককে খাম থেকে ষ্ট্যাম্প খুলে দিতে বা উদ্বিগ্না কোন জননীকে তার পীড়িত শিশুর জন্যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতে। দিয়েই আবার নিজের কাজে ফিরে যেতেন। বিশ্রাম যে কখন করতেন বুঝতে পারতাম না। সমস্ত সময়ই দেখতাম লিখছেন, পড়ছেন বা পড়াচ্ছেন। বিদ্যালয়ের ক্লাশ অনেক সময়ই নিতে দেখতাম। পড়ানোর পদ্ধতিটি তাঁর নূতন রকম ছিল। তিনি পড়াবেন এবং ছেলেরা ব'সে শুনবে, এতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। ছাত্রদেরও ব'লে যেতে হ'ত কি তারা বুঝল, বা শুনল। অনেকে ইংরাজী বলতেই পারত না, তবু তিনি বলিয়ে ছাড়তেন। ইংরাজীটাই সাধারণতঃ পড়াতেন। বিদ্যালয়ে পড়ানো ছাড়াও ঘরে মাঝে মাঝে ক্লাশ করতেন এমন লোক নিয়ে, যারা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী নয়। আমি, দিদি এবং তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা, অনেকদিন তাঁর কাছে শেলী পড়েছি। যখন বিদ্যালয়ে ক্লাশ নিতেন, তখন তাঁর পড়ানো দেখবার জন্যে মিঃ এনড্রুজ থেকে আরম্ভ ক'রে অনেকে চারপাশ ঘিরে ব'সে যেতেন। নূতন গান যখনই তৈরী হ'ত, তখনই গানের ক্লাশ ব'সে যেত। রাত্রে কখন শুতে যেতেন বুঝতে পারতাম না। অতি নিকট প্রতিবেশী ছিলাম, কিন্তু যত সকালেই উঠি, কখনও তিনি ঘুমিয়ে আছেন দেখতাম না। তাঁর দোতলার বারান্দায়, পূর্ব্বদিকে মুখ ক'রে ধ্যানে ব'সে আছেন, এই দৃশ্যই দেখতাম।

মুলুর নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মাঝে মাঝে পিক্‌নিক্ করতে আমাদের বাড়ী আসত। তাদের জন্যে রান্নাবান্নাটা আমরাই করতাম। তাদের মধ্যে হিন্দুও ছিল, মুসলমানও ছিল। কিন্তু একসঙ্গে খেতে কখনও আপত্তি করত না। রবীন্দ্রনাথ খবর পেলেই এসে তাদের খাওয়া দেখতেন। শিক্ষকরা ও বড় ছাত্ররা এসে প্রায়ই পরিবেশনের কাজে সাহায্য করতেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রম ছিল তখন একটি বিরাট্ পরিবারের মত এবং তিনি ছিলেন এর গোষ্ঠীপতি। সামান্যতম উৎসব কারো বাড়ীতে হতে পারত না, যাতে তিনি উপস্থিত না থাকতেন।

তখনকার কালে তিনি বেশীর ভাগ সময় আশ্রমেই থাকতেন, তবে মধ্যে মধ্যে নানা কাজে কলকাতায়ও চ'লে যেতেন। কৌতুকচ্ছলে আমাদের বলতেন, "আশ্রমের ভার তোমাদের উপর দিয়ে যাচ্ছি। শাসনকার্য্যে যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

নিজে অসাধারণ কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন, অন্য কেউ যে কিছু না ক'রে ব'সে আছে এটাও তিনি দেখতে পারতেন না। সবে বি. এ. পাস ক'রে আমি তখন সেখানে গিয়েছি, কত রকম কাজের ভার যে দিতেন আমার উপর তার ঠিকানা নেই। আমি ওখানকার ছাত্রী ছিলাম না, তবে শিক্ষয়িত্রীরূপে কাজ করেছিলাম অনেক দিন। বড় ছেলেদের ইংরাজী অনুবাদের ক্লাশ নেওয়া, ছোটদের ইতিহাস ও বাংলার ক্লাশ নেওয়া পড়েছিল আমার কাজের অংশে। ছোটরা অনেক সময় মজার মজার উত্তর দিত ইতিহাসের প্রশ্নের। একদিন একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, বাইরের শত্রু যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসত তখন তারা কোন্ পথে আসত? তাতে সে উত্তর দিল, "হিমালয়ে সিঁধ কেটে"। রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বদা খবর নিতেন ছেলেরা কেমন পড়া করছে। এহেন উত্তর শুনে তিনি অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করলেন। নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়কে ডেকে বললেন, "নেপালবাবু মশায়, আপনারা কোন খোঁজই রাখছেন না, এদিকে হিমালয়ে যে সিঁধ কাটা হয়ে গেল। আমি ত চিন্তিত হয়ে পড়েছি।"

সেই সময় 'অনুবাদ চর্চ্চা' ব'লে বোধহয় একখানি বই সঙ্কলিত হয়। নানা জায়গার থেকে ইংরাজী passage নিয়ে তা বাংলা করা হ'ত, এবং এই বাংলা আবার মূল ইংরাজী না দে'খে ইংরাজী করা হ'ত। এই কাজে অনেকদিন

আমি তাঁর সাহায্য করেছিলাম। একবার অনুবাদ ক'রে নিয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ প্রায় তখনই তখনই সংশোধন ক'রে দিতেন। তাঁর সংশোধন করা খাতা এখনও আমার কাছে একখানি আছে। চিঠির নকল ক'রে দেওয়া এবং ছোট প্রবন্ধ নকল ক'রে দেওয়া, এসব কাজও কিছু কিছু করেছি।

রাজনৈতিক বিষয়ে সারাক্ষণই বাবার সঙ্গে তাঁর আলোচনা চলত। তখন দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থা অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক ছিল। রাজনৈতিক মতামত এঁদের দু'জনের প্রায় একরকমই ছিল। কলকাতায় থাকার সময়ও তিনি প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়ী, বাবার সঙ্গে আলোচনা করতে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অবস্থা নিয়েও নিরন্তর কথাবার্ত্তা হত। বাবাও জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শান্তিনিকেতনের জন্যে ভেবেছেন এবং যথাসাধ্য করেছেন। মুলু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মারা যাবার পর আমরা ওখানকার বাস উঠিয়ে চ'লে আসি। বাবা এর পরেও অনেক সময় ওখানে গিয়ে থাকতেন এবং কাজে সহায়তা করতেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করলে আর ত শেষ হতে চায় না। যেমন মহাসমুদ্র বা নগাধিরাজ হিমালয়ের সম্পূর্ণ চিত্র আঁকা যায় না তুলি দিয়ে, তেমনি এই মহাপুরুষকে সমগ্ররূপে দেখানো দুঃসাধ্য। তবে যতটুকু দেখানো যাক, তাই-ই দেশবাসীর কাছে পরম সম্পদ্, পরম বিস্ময়। লেখক রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকবেন তাঁর রচনার মধ্যে, কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথ ত আর ধরা দেবেন না মানুষের কাছে, যখন তাঁর মুগ্ধ ভক্তবৃন্দ ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হবেন। এই মনে ক'রে এই সামান্য কথা ক'টি লিখছি। যাঁরা তাঁকে চোখে দেখেছেন, কাছে গিয়েছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিষয় যত সামান্য কথাই হোক, আগ্রহের সঙ্গে পড়বেন। যাঁরা তাঁকে চোখে দেখেন নি, বা কাছে পান নি, তাঁরাও আগ্রহ ক'রেই পড়বেন আশা করি। অতিমানব তিনি ছিলেন সকল দিক্ দিয়েই, কিন্তু সাধারণ মানুষ কখনও তাঁর কাছে যেতে বাধা পায় নি। যে কাছে গিয়েছে, সেই মুগ্ধ হয়েছে, ভালবেসেছে। শান্তিনিকেতনে তিনি যেন সব পরিবারেরই আপন ছিলেন। কলকাতার থেকে ফিরে যেতেন, প্রতিবেশীর বাড়ীতে ছেলেপিলের জন্য মিষ্টান্ন নিয়ে যেতেন অনেক সময় নিজের হাতে ক'রে। ওখানে সব জিনিষ সব সময় পাওয়া যেত না, সেই জন্যে কাছে যারা থাকত, তারা ভাগ পেত তাঁর ঘরে ভাল জিনিস এলে। আমরা দুই বালিকা, বাবার সঙ্গে ছিলাম ওখানে, খুব গোছানো সংসার হবার কথা নয়, তাই পাঁউরুটি থেকে আরম্ভ ক'রে নানা জিনিষ আমাদের দিয়ে যেতেন।

তাঁর কথা বলবার ধরণটা ছিল অপূর্ব্ব এবং একটু অসাধারণ। আমরা, যারা সারাক্ষণ ধারে-কাছে থাকতাম, তারা ঠিক অর্থই বুঝতাম, কিন্তু হঠাৎ যারা প্রথম শুনত, তাদের ভুল বোঝা অসম্ভব ছিল না। পরবর্ত্তীকালে নানা জায়গায় নানা কথা প'ড়ে এবং শুনে মনে হয়, অনেকেই তাঁর কথার মানে ঠিক বোঝেন নি।

অল্পবয়স্কদের সঙ্গ তিনি বেশী পছন্দ করতেন, নিজের বয়সীদের চেয়ে। আমরাও সুবিধা পেলেই তাঁকে ঘিরে ব'সে থাকতাম। সেই সময় কোন মান্যগণ্য অতিথি উপস্থিত হলে কিছুতেই তিনি আমাদের উঠতে দিতেন না। বলতেন, "আমাকে একলা ফেলে পালাবে না।" ছোটদের সাহিত্যসভায় তাঁকে অনেক সময় উপস্থিত দেখা যেত, যদিও তরুণ সাহিত্যিকবৃন্দ তাতে মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে যেতেন। কিন্তু যতই ভয় পান, গুরুদেবকে না ডাকার কথা ভাবাই যেত না। যা কিছু হোক, যত সামান্যই হোক, দর্শক ও শ্রোতা হিসাবে গুরুদেবের ডাক পড়বেই। সার্কাস, ম্যাজিক, সব কিছুতে তিনি যেতেন। ছেলেরা আশ্চর্য্য আইস ক্রীম-এর কল বানিয়ে তাতে কুলফি মালাই তৈরি ক'রে খাওয়াতে এলেও আপত্তি করতেন না। ছাত্রছাত্রীদের আনন্দমেলায় উপস্থিত হতেন, যখনই শান্তিনিকেতনে থাকতেন। মেলায় বিক্রী করবার জন্যে নিজের হাতে কবিতা লিখে দিয়েছেন, বেশ চড়া দরে বিক্রী হয়ে গেছে এও দেখেছি। অভিনয়, ছোটদের হোক বা বড়দের হোক, সব তাতে উপস্থিত হতেন। নিজে ছোটবেলা কখন কি কি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তার গল্প খুব করতেন।

ওখানে মেয়েদের একটা হাতে লেখা কাগজ ছিল। পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সেটির নাম দিয়েছিলেন 'শ্রেয়সী'। মেয়েরাই এতে লিখত শুধু। রবীন্দ্রনাথ পরিহাস ক'রে অনুযোগ করতেন যে, তাঁকে কেন লেখক

শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। কয়েকটি অতি অল্পবয়স্কা বালিকার নাম ক'রে বলতেন, "আমি কি তাদের চেয়েও খারাপ লিখি?" খারাপ যে লেখেন না তা বুঝাবার জন্যে দুই-এক দিন পরেই নবরচিত 'পাত্র ও পাত্রী' নামক একটি গল্প প'ড়ে শোনালেন। গল্পটিতে এক শ্রেণীর মেয়ের সম্বন্ধে কিছু তীব্র মন্তব্য ছিল। পড়া শেষ হ'লে আমাকে বললেন, "সীতা, তোমাদের বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক remarks আছে, ওগুলো seriously নিও না যেন।"

ছোটদের ছোট ব'লে অবহেলা নিজে ত কখনই করতেন না, অন্য কাউকে করতে দেখলেও বিরক্ত হয়ে যেতেন; বিশেষ ক'রে তাদের জন্যে আধ আধ ভাষায় রচিত বই দেখলে রাগ করতেন। নিজে লিখেছিলেন, "তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা, ক্ষুদ্র তাহা নয়।" কোন ক্ষুদ্রকে তিনি কখনও তুচ্ছ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিধ কৃতি ও বাঙালীর কর্ত্তব্য

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের (personalityর) কথা, তিনি মানুষটি কিরূপ, তাহার আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া, তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার কথা, তাঁহার কৃতির কথা বলিতে গেলে তাহাকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায় ;—প্রথম, তিনি যাহা লিখিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার রচনাবলী (গানগুলি তাহার অন্তর্গত) ; দ্বিতীয়, বিশ্বভারতী। এই উভয়ের মধ্যে যোগ আছে।

যাঁহারা তাঁহার কৃতির এই দুই অংশেরই গুণগ্রাহী, তাঁহাদের রবীন্দ্রজয়ন্তী করা বা তাহাতে যোগ দেওয়া পূরা আন্তরিক। যাঁহারা তাঁহার কৃতির মধ্যে অন্ততঃ রচনাবলীর বা অন্ততঃ বিশ্বভারতীর গুণগ্রাহী, রবীন্দ্রজয়ন্তীর সহিত তাঁহাদেরও যোগ অনেকটা আন্তরিক।

তাঁহার রচনাবলীর গুণগ্রাহিতার প্রমাণ দেওয়া যায় ও পাওয়া যায় যদি আমরা সেগুলি পড়ি, অধ্যয়ন করি। বাস্তব প্রমাণ আরও ভাল করিয়া দেওয়া যায়, যদি ক্রয়সমর্থ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালী মহিলা ও পুরুষ তাঁহার বইগুলি কিনিয়া বাড়ীতে রাখেন ও পড়েন। তাহাতে তাঁহাদের আনন্দ ও চিত্তোৎকর্ষ হইবে। অনেকে পান তামাক বিড়ি সিগারেট সিনেমায় খরচ করিতে পারেন, কিন্তু কবির পুস্তকগুলি কিনিতে গেলে কল্পনা করেন তাঁহাদের সামর্থ্য নাই। অথচ আমরা ইউরোপের কোন কোন হোটেলের ভৃত্যদিগকে তাহাদের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বহির অনুবাদ কিনিয়া তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর লইতে দেখিয়াছি।

কবির বহিগুলি ক্রয় করিবার আর একদিক্ দিয়া হিতকারিতা আছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের সমুদয় লাভ বিশ্বভারতী পান। বিশ্বভারতী যত টাকা পাইবেন, কবির শিক্ষাপরিকল্পনা সেই পরিমাণে বাস্তব আকার ধারণ করিতে পারিবে। সুতরাং যাঁহারা কবির গ্রন্থসমূহ ক্রয় করিয়া তাঁহার প্রতিভার গুণগ্রাহিতার ও তাঁহার কবিত্বের রসজ্ঞতার প্রমাণ দিবেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা বিশ্বভারতীরও গুণগ্রাহিতার প্রমাণ পরোক্ষভাবে দিবেন।

বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রনাথ কি চোখে দেখেন তাহা অতি সংক্ষেপে বলি। গান্ধীজীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি ১৯৪০ সালের ২রা মার্চ্চের হরিজন পত্রিকায় বাহির হয়। সেই চিঠির মধ্যে কবি বলিয়াছেন, "Visva-Bharati is like a vessel which is carrying the cargo of my life's best treasure," "বিশ্বভারতী একটি নৌকার মত যাহা আমার জীবনের সর্ব্বোত্তম ধনরত্ন বহন করিয়া চলিতেছে।" ইহা কবির একটি খেয়াল নহে। আমরা কখনও ইহাকে সে চোখে দেখি নাই।

বাঙালী জাতির মধ্যে কাহারও রবীন্দ্রনাথের কৃতির গুণগ্রাহিতা নাই, আমাদের ধারণা এরূপ নহে। অগণিত লোকের আছে। আমাদের আবেদন এই যে, যাঁহাদের আছে তাঁহারা "কেজো" হউন, তাঁহাদের গুণগ্রাহিতা বাস্তব রূপ ধারণ করুক। তাঁহারা অনেকেই বিশ্বভারতীর আজীবন বা সাধারণ সভ্য হইতে পারেন, কবির রচনাবলী কিনিতে পারেন, অন্ততঃ প্রতি মাসে তাঁহার একখানি করিয়া ছোট বহি কিনিতে পারেন। যাঁহাদের এরূপ সামর্থ্যও নাই, তাঁহারা তাঁহার কোন-না-কোন আদর্শের সফলতার জন্য পরিশ্রম করুন। আমরা সকলে এইভাবে কাজ করিলে রবীন্দ্রজয়ন্তী আন্তরিকতাপূর্ণ ও সার্থক হইবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮।

শতবার্ষিকী

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি কি কেবলি কবি ? বাণী তব শুধু মনোহর
শব্দের বুদ্বুদপুঞ্জ,—অনিন্দিত ছন্দের নির্ঝর,—
সুরের কুহেলিবাষ্প ? এসেছিলে এ দুর্ভাগা দেশে
ক্ষণিক আনন্দ দিতে শুধু তুমি নেচে গেয়ে হেসে,—
সন্ধ্যাভ্র-কুঙ্কুম দিয়া রচিবারে আকাশে প্রাসাদ,
কল্পনাবিলাসী শিল্পী ? এর চেয়ে বড়ো কোনো সাধ
ছিল না অন্তরে তব ? এর চেয়ে বড়ো কোনো দান
যাওনি বিশ্বের তরে রাখি' তুমি, ওগো মহাপ্রাণ
বিশ্বমানবের বন্ধু ? কাব্য তব প্রেমদূতী হ'য়ে
শুধু করিয়াছে খেলা যুবতী যুবকচিত্ত ল'য়ে
মধুগন্ধী নীপকুঞ্জে ? ছিল নাকি তেজের ভাণ্ডার
পুষ্প-আস্তরণে ঢাকা বহ্নিদীপ্ত অন্তরে তাহার,—
শান্তির জাহ্নবীধারা ? তোমার বাঁশরী কলস্বনা
শুধু মধুময়ী করি' মলিন মর্ত্যের ধূলিকণা
কর্তব্য করেছে সাঙ্গ ? অন্যায়ের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাতে
বন্দীর শৃঙ্খলভেদী জয়শঙ্খ বাজেনি কি তা'তে,—
নির্জিতের রুদ্ধ-অশ্রু সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জন ?
জানি, তব কবিখ্যাতি জয়মালা করেছে অর্জন
দেশে দেশে। কিন্তু যবে সে মালা পরালে ভালোবেসে
দুখিনী মায়ের কণ্ঠে জীর্ণ তার পর্ণগৃহে এসে,—
স্বপ্নে হেরি' অতীতের রাজরাজেশ্বরী মূর্তি তার
সেদিন করো নি পণ পঙ্কশয্যা ঘুচাতে মাতার,—
পরাইতে রাজবেশ কর্মে জ্ঞানে বীর্যে সমুজ্জ্বল ?
নাওনি কঠিন ব্রত সে সঙ্কল্প করিতে সফল,—
অভিশপ্ত দেশাত্মার প্রাণদৈন্য-মোহমুক্তি লাগি ?
দুরূহ দায়িত্ব ল'য়ে দীর্ঘ রাত্রি কাটাওনি জাগি'
অতন্দ্র কঠিন শ্রমে ? তুচ্ছ করি' বৈরাগ্যসাধনে
হাসিমুখে আপনারে বাঁধোনি কি সহস্র বাঁধনে,
জ্বালিতে আনন্দদীপ নৈরাশ্যের অকূল আঁধারে
কোটি নিরানন্দ চিত্তে ? চূর্ণ করি' পথের বাধারে—
আঘাতে অগ্রাহ্য করি' চলেনি তোমার জয়রথ—
তব মাতৃ-আশীর্বাদ—পার হ'য়ে সমুদ্র পর্বত
ধরণীর প্রান্তে প্রান্তে ? সংসারে ফিরিতে লক্ষ কাজে,
ধ্যানের আসনখানি রাখোনি কি পাতি' বক্ষোমাঝে
দিবসে নিশীথে ? আজি কে দেখাবে তথ্য করি' জড়ো,
তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি ছিলে কতখানি বড়ো,—
তোমার যে পরিচয় 'কবি' অংশ কতটুকু তার,—
ওগো কর্মী, ওগো বীর, ওগো বন্ধু মানব-আত্মার !

দিনশেষে গেছ চলি' ক্লান্তদেহে অসমাপ্ত রাখি'
তোমার দুষ্কর ব্রত। মৃত্যু-যবনিকা দেছে ঢাকি'
আজি তব প্রিয়রূপ। শুধু মৃত্যুহীনা বাণী তব
নিঃশব্দে জাগিয়া আছে কি আশা বহিয়া অভিনব
দূর ভবিষ্যৎ পানে। খুঁজিতেছে, কে লইবে তুলি'
হাস্যমুখে অসম্পূর্ণ তোমার কল্যাণ-কর্মগুলি
এ দুর্দিনে, দুঃসাহসী কে চলিবে সমুন্নতশিরে
অভ্রভেদী অসত্যেরে লজ্জা দিতে, নীরন্ধ্র তিমিরে
জ্বালিবে মঙ্গলদীপ ; আর্তধরা বিদ্বেষে বিবাদে,
বরষিবে শান্তিবারি কে হেথায় তব আশীর্বাদে।
বৃথা চেষ্টা, দগ্ধ দেশে নাহি তব উত্তর-সাধক।
ভকতি গদ্গদচিত্ত মুগ্ধ যত মূর্তি-উপাসক,—
দিনেক চলেনি যারা তোমার কাব্যের সরণিতে,—
তোমারে চিনে না যারা,—তব জন্ম-শতবার্ষিকীতে
তাহারা করিছে ভিড় জয়ধ্বনি দিতে তারস্বরে,—
সভায় সঁপিতে মাল্য ফুল্ল তব প্রতিকৃতি 'পরে।
তব জন্মদিন হ'তে শতবর্ষ হ'ল আজি গত,
সকৃতজ্ঞ দেশবাসী তাই কি মিলেছে শ্রদ্ধানত
তোমারে অর্পিতে পূজা, করিবারে পুণ্যাহ পালন ?
কিন্তু হেথা শ্রদ্ধা কোথা ? চারিদিকে মূঢ় আস্ফালন,
সাড়ম্বর বিড়ম্বনা ! মঞ্চে মঞ্চে যান্ত্রিক চীৎকার
উপকরণের পুঞ্জ, তুমি শুধু উপলক্ষ্য তা'র
অদৃষ্টের পরিহাসে ! সহস্র নগরে গ্রামে চলে
আজি তব স্মৃতিপূজা সযত্ন সজ্জিত সভাস্থলে
সুরে ও বেসুরে গীত নির্বাচিত তোমারি সঙ্গীতে,—
নৃত্যছন্দে আন্দোলিত পুরাঙ্গনা-বরাঙ্গ-ভঙ্গীতে,—
বাগ্মীর বক্তৃতাদীপ্ত তব কলাকীর্তির বিচারে।
তোমার মধুর মূর্তি পূজা পায় ষোড়শোপচারে
ঘরে ঘরে। দেশবাসী জানে শুধু, 'তুমি ছিলে কবি,
নয়ন-ভুলানো তব ছিল রূপ, সাক্ষী আছে ছবি।'
এ জানা যথেষ্ট মানে ; কিন্তু তব সত্যরূপখানি,—
যার পরিচয় বহে তোমার জীবন, তব বাণী,—

রক্তাক্ত যে রণক্ষেত্রে,—ঘর্মাক্ত যে সুকঠিন শ্রমে,—
ক্লেদাক্ত যে পঙ্কোদ্ধারে, তার কথা কে ভেবেছে ভ্রমে?
বহুরূপে অপরূপ সে মূর্তি তোমার জয়োৎসবে
আঁধার ঘরের রাজা, চিরদিনই অন্ধকারে র'বে?

আজি তব জন্মোৎসব; সুদীর্ঘ জীবন ধরি' তুমি
যা দিয়েছ—জানাইছে তাহারি স্বীকৃতি জন্মভূমি।
উদ্বেলিত জনসিন্ধু গাহিতেছে আকাশ মুখরি'
তোমার বন্দনাগীতি, আরোহিয়া উচ্চ মঞ্চোপরি
উচ্চারিছে পূজামন্ত্র গুণীজ্ঞানী যত জননেতা।
কি যোগ্যতা তাহাদের কিন্তু আজ কে বলি' দিবে তা?
ক'জন পড়েছে তব সাহিত্য আদ্যন্ত শ্রদ্ধাভরে?
ক'জন তোমার শিক্ষা জীবনে লয়েছে,—বক্ষ 'পরে
তোমার বেদনাবহ্নি অসঙ্কোচে করেছে গ্রহণ?
যাহাদের নিত্যকর্ম প্রবলের শ্রীপদ লেহন,—
দুর্বলের রক্তপান, বিদ্যা-বুদ্ধি-ধর্ম-ব্যবসায়ী,—
শিকার-সন্ধানী সেই স্বার্থমগ্ন অন্ধগুহাশায়ী
শীতরক্ত সরীসৃপ কি বুঝিবে তোমার মহিমা?
তারা কি শিখাবে অন্যে, তাদেরি দৈন্যের নাহি সীমা।
পড়িবে মিলনমন্ত্র কোন্ গুণে তারা দ্বন্দ্বপ্রিয়?
কেহ বা পণ্ডিত—খায় রাজভোগ বঞ্চিয়া আত্মীয়,
কেহ শ্রেষ্ঠী, কেহ মন্ত্রী,—দরিদ্রের অন্ন কাড়' চুরি
লক্ষপতি,—অর্থবলে সভাস্থলে বৈদগ্ধ্য বিচ্ছুরি'
অন্যের রচনা পড়ে; বক্তৃতা দুষ্পাচ্য মনে হ'লে
নারীনৃত্যতৃপ্তচিত্ত শ্রোতা উঠি' যায় দলে দলে।
এ উৎসবে তুমি কোথা? চিত্র তব উৎসবসজ্জার
অঙ্গ শুধু—সাক্ষ্য শুধু সে তোমার দুরন্ত লজ্জার।
এই তো সেদিন মাত্র গেছ চলি', তব পরিচয়
এরই মাঝে ভুলি' দেশ করিবে কৌতুক-অভিনয়
তব স্মৃতি-পূজা ছলে? মাতিবে স্পর্দ্ধিত আয়োজনে
সুবিপুল অপব্যয়ে লজ্জা দিতে প্রতিদ্বন্দ্বী জনে?
তব পরিচয় দিতে শুধু র'বে কিঙ্কিণী-ঝঙ্কার?
পূজার হোমাগ্নিশিখা,—পৌরুষের কোদণ্ড টঙ্কার—
যাবে মুছি' স্মৃতি হ'তে? আগামী দিনের ভাগ্যহত
যাত্রিদল জানিবে না আজীবন কত ক্ষতিক্ষত
সহ্য করি' কি সম্পদ্ গেছ রাখি' তুমি স্নেহভরে
তাদের পাথেয় লাগি'? রজনীর প্রথম প্রহরে
কোন্ দীপ গেছ জ্বালি' সে দূর পথের বার্তা দিতে—
যে পথে আপন বীর্যে মহত্ত্বের অমরাবতীতে
উত্তরিবে মর্ত্য নর সুকঠিন কর্তব্য সাধিয়া?
তৃপ্ত র'বে শুধু তারা দিব্য তব মূর্তি আরাধিয়া,—
করিবে না রসাস্বাদ তোমার কাব্যের? ক্ষণকাল
স্তম্ভিত বিস্ময়ে তব হেরিবে না সেই ইন্দ্রজাল
ভাষার বাঁধনে যার স্বর্গেমর্ত্যে রাখী হ'ল বাঁধা?
রাজভয় লোকভয় তুচ্ছ করি' করিতে সমাধা
মহাকার্য, পথে নাহি বাহিরিবে তব শঙ্খরবে,—
ভগ্নচিত্তে দিতে আশা, দিতে ভাষা মৌন মূক সবে,—
নিরন্নেরে অন্ন দিতে,—লাঞ্ছিতে বঞ্চিতে দিতে মান?
দীর্ঘদিন ঊর্ধ্বাকাশে নিঃসঙ্গ জ্বলেছ, হে মহান্,
আজো তুমি সঙ্গীহীন। তোমার সমানধর্মা বলি'
যারা করে অহঙ্কার, মান্য চায় ভক্তদলে ছলি'—
তারা কোথা, তুমি কোথা? তোমার মহিমা বুঝিবার
মোদের ক্ষমতা নাই; কেবল অবোধ শ্রদ্ধা সার:
সে শ্রদ্ধা পাঠায়ে দিনু জনতার জয়ধ্বনি সাথে
তোমার চরণোদ্দেশে আজি এই বৈশাখী প্রভাতে।
নির্বুদ্ধির দুর্বুদ্ধির স্বার্থান্ধের অপূর্ণ পূজায়
যে লজ্জা—সে আমাদের, তোমার কিছু না আসে যায়
জানি তাহে। তুমি আজ গেছ যেথা অস্তসিন্ধু-পারে,
অতীতের শত কবি জানি সেথা নন্দিছে তোমারে:
অনির্বাণ বহ্নিজ্বালা তোমার বক্ষের জুড়ায়েছে
জননীর স্নেহস্পর্শে। ধরাতলে সভাস্থলে নেচে
আমরা পূজিব, তুমি হও বা না হও তুষ্ট তা'তে।
আঁধার ঘনায়ে আসে, হীনতার এ তামসী রাতে
দূর বনগন্ধসম তোমার আশার বাণী বহে,
"মরে না, মরে না কভু, সত্য কভু মরিবার নহে।"
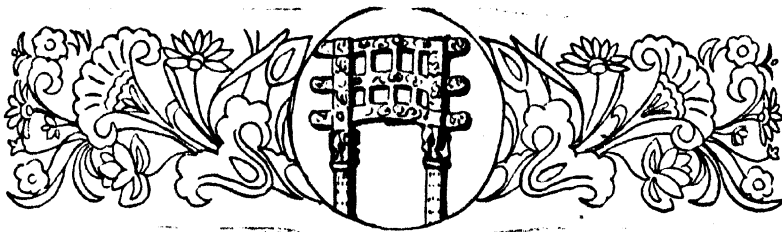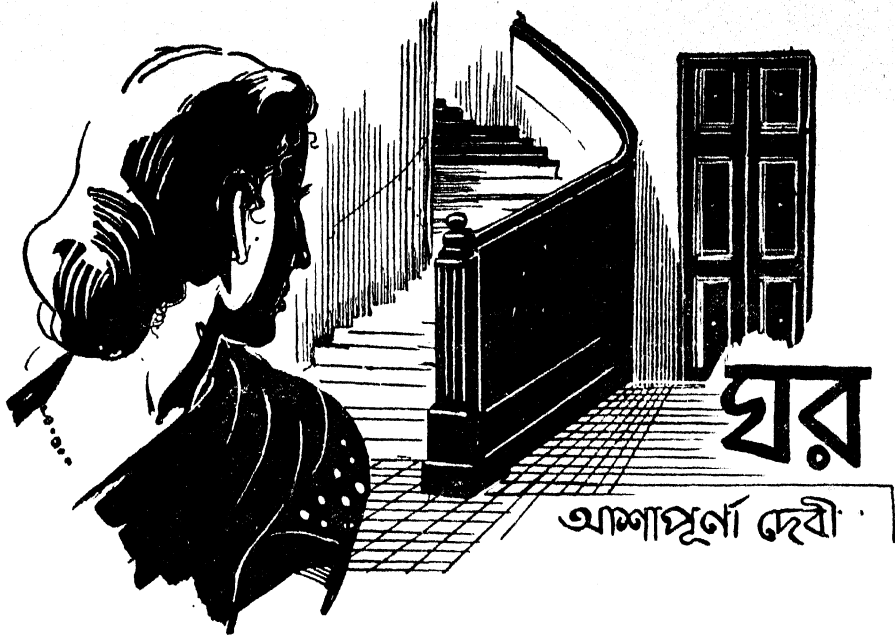
না, প্রেমও নয়, ভালবাসাও নয়, শুধু ভাললাগা। এই এতগুলো বছর ধ'রে হাজার রকমের বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছে ছবি, আর দে'খে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, ওটা শুধু ভাললাগা। জীবনের প্রথম ভাললাগা।

কিন্তু জীবনের প্রথম ভাললাগার একটা আকর্ষণ আছে বৈ কি! রীতিমতই আছে। নইলে বাপের বাড়ী এলেই অনবরত বাড়ীর ঐ পশ্চিম প্রান্তের ছোট দরজাটা কেন ছবিকে এমন তীব্র আকর্ষণে টানতে থাকে? সিঁড়ির তলার ছোট দরজাটা। যেখান থেকে ছবিদের ভাড়াটেদের বাড়ীতে ঢুকে পড়া যায়।

বাড়ী তৈরীর সময় বাড়ীর লাগোয়া গায়ে আর একখানা বাড়ী তৈরি ক'রে ফেলেছিলেন ছবির বাবা, ঢাকের পাশে টেমটেমির মত, অক্ষরের পাশে হসন্তের মত। মস্ত তিনতলা বাড়ীটার পাশে এতটুকু একছিটে দোতলা। তবে মেজেগুলো মোজেকের, দোর-জানলাগুলো পালিশ করা, সিঁড়িটা চওড়া।

তা হঠাৎ এই ফাউ বাড়ীটুকু বানাবার সখ হয়েছিল কেন ছবির বাবার? কেন আর? বড়টির ভরণপোষণের খরচা তোলা! প্রথম থেকেই তাই ভাড়াটে বসিয়েছিলেন। আর দুই বাড়ীর যোগাযোগ রক্ষার্থে রেখেছিলেন সিঁড়ির তলার ওই দরজাটি। যে দরজা দিয়ে ফ্রক-পরা ছবির আনাগোনা ছিল দিনে অন্ততঃ দুশো বার।

আজও বুঝি তাই ওই দরজাটা এমন প্রবলভাবে টানতে থাকে ছবিকে।

কম দিন ত হ'ল না? ষোল-সতের বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু কই, আকর্ষণের তীব্রতাটা কমেছে কই? গাড়ী থেকে নেমে মাকে-বাবাকে প্রণাম করেই মনটা উসখুস করতে থাকে, আর দৃষ্টি বারে বারে গিয়ে পড়ে ওই দরজাটার ওপর। খোলা আছে না বন্ধ আছে? শুধু ভেজিয়ে বন্ধ, না খিল-ছিটকিনির প্রয়োগ রয়েছে? আজও মার সঙ্গে কথা বলতে বলতেও বেশ কয়েকবার দৃষ্টিটা ঘুরে এল। বন্ধ রয়েছে। আগে আগে ত সর্ব্বদাই খোলা প'ড়ে

থাকত। ইদানীং মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে, আজ যেমন রয়েছে। কিন্তু আজকের বন্ধটা বড্ড যেন অটুট, অচল, গম্ভীর! বাতাসের ঝাপটে শিথিল হয়ে গিয়ে ছবিকে পথটা সহজ ক'রে দেবে, এমন কোন আশা নেই মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন?

অথচ ওপরতলাগুলোয় ওঠবার আগেই নীচের তলা থেকেই 'সৌজন্য পর্ব্বটা' শেষ ক'রে যাওয়া কত সুবিধে! নিজেদের বাড়ীটা ত লোকে লোকারণ্য। তা ছাড়া দোতলায় কম সময় থাকলে দোতলাবাসিনীর রাগ, আর তিন তলায় উঠতে দেরি হলে তিনতলাবাসিনীর ব্যঙ্গ হাসি। দুটোকেই সমান ভয় করে ছবি; রাগ আর ব্যঙ্গ! দুজনকেই সমান ভয় করে, বড় আর মেজ। মা বাবা ত বুড়ো হয়ে ইস্তক নীচেই বাস বেঁধেছেন।

তা তাই তাঁদের কাছেই কি কোলের মেয়েটাকে বেশীক্ষণ থাকতে দেন তাঁরা? সময় দেন খানিকটা সাড়া-শব্দের মধ্য দিয়ে ছবির আগমনবার্ত্তাখানি পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণা করতে? দেন না। চুপি চুপি খালি বলতে থাকেন, "যা মা, বড় বৌমার সঙ্গে দেখা ক'রে আয়, রাগী মানুষ! যা মা, মেজ বৌমা আবার যে মেয়ে!"

অগত্যাই চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে ব'লে ফেলতে হয়, "যাই, তবে ও বাড়ীটা সেরেই একেবারে ওপরে চ'লে যাই।" যেন 'ও বাড়ীটা সারা' একটা কর্ত্তব্যের দায় মাত্র। আর সেই দায়টা মিটলেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারে ছবি। পায় স্বস্তি। শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ীতে আসার নির্দ্দায় স্বস্তি! সত্যিই ত, দুরূহ একটা কাজের দায় মাথায় ঝুলিয়ে রেখে কেমন ক'রে করবে বৌদিদের সঙ্গে খোশগল্প, ভাইপোদের সঙ্গে খুনসুটি, আর ভাইঝিদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি?

অতএব ও বাড়ীটা সেরে যাওয়াই ভাল।

যায়ও তাই, বরাবরই যায়। এসেই মাকে আর বাবাকে প্রণাম করে, দু'চারটে কথায় কুশলবার্ত্তা লেনদেন ক'রে চ'লে যায় ওবাড়ী। গিয়েই হৈ হৈ ক'রে হাঁক পাড়ে, "মাসীমা গো, কোথায় ডুব মেরে ব'সে আছেন? মেয়েটা যে শ্বশুরবাড়ী থেকে এল তা দৃক্‌পাতই নেই?"

অবিশ্যি এটা হচ্ছে সেই তখনকার কথা, যখন ছবির কিছুদিন মাত্র বিয়ে হয়েছে আর মিহিরের মাও বেঁচে আছেন। তার পর ত কতরকম পট-পরিবর্ত্তনই হ'ল!

মিহিরের বিয়ে হ'ল, মিহিরের মা মরলেন, কাচ্চা-বাচ্চায় বেশ জমজমাটি সংসার হয়ে উঠল মিহিরের। এদিকে ছবিকেও তার বিধাতা কত বিচিত্র রূপেই বিকশিত করলেন।

অপরিবর্ত্তিত রইল শুধু ওই দরজাটার আকর্ষণ। আর মিহিররাও যেন এ বাড়ীতে মৌরসীপাট্টা নিয়েছে। শুধু পাড়ার লোকই নয়, মিহিররা বুঝি নিজেরাও ভুলে গেছে বাড়ীটা ওদের নিজের না, ভাড়াটে বাড়ী!

তা তখন ছবির ডাক-হাঁকে মিহিরের মা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেন, হয়ত রান্না করতে করতে, হয়ত মালা জপতে জপতে, হয়ত বা আরও অন্য কিছু করতে করতে। এসে হেসে বলতেন, "মেয়েটা শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে, এ কি আর দৃক্‌পাত না করার কথা? মেয়ে ত তাহলে আমার মুণ্ডুপাত ক'রে ছাড়বে। কখন এলি?"

"সেই কখো—ন।" ব'লে আসার ক্ষণটুকুকে অনুমানের বিস্তৃতক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়ে ছবি দ্রুতলয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে, "তা চেহারাখানা ত বেশ বাগিয়েছেন দেখছি মাসীমা! আর কতদিন ভূতের খাটুনি খাটবেন? বৌ আনুন?"

মিহিরের মা উদাস উদাস গলায় বলতেন, "আর বৌ! বিয়ের কথা হলেই ত খালি ফষ্টি নষ্টি ক'রে কথা উড়িয়ে দেয়। চারদিক্ থেকে সম্বন্ধ আসছে, একটা বাঁধতে পারছি না। খাসা খাসা মেয়ের ফোটো এসে পড়ছে, আর হতভাগা ছেলে কেবল তাদের ব্যাখ্যানা করছেন, এর চেহারাটা গোবর-গণেশ, ওর মুখটা পুলিশ পুলিশ, এই সব ছুতো।"

"কেন জানিস্? ছবিগুলো 'ছবি' নয় ব'লে।"

"ছুতো করা বার করছি" ছবি শাসনকর্ত্তার ভঙ্গিতে উত্তর দিত। "কোথায় আছেন বাবুসাহেব? ধ্যানে না যোগে? মেয়েদের চেহারার ব্যাখ্যানা করা ঘোচাচ্ছি।"

মামামা কি সত্যিই নির্ব্বোধ ছিলেন? মাসীমা কি বুঝতে পারতেন না, এটা শাসনের ছলে সান্নিধ্যের সুযোগ সন্ধান? ঘরসংসারী গিন্নীকর্ত্তা মানুষরা কি সত্যিই উপন্যাসের নায়িকার মা-বাপের মত অবোধ হয়? নিজেদের বয়স পার হয়ে গেলেই কি লোকেরা তরুণ-তরুণীর হৃদয়-রহস্য বিস্মৃত হয়ে যায়?

যায় কিনা ঈশ্বর জানেন! কিন্তু বিস্মৃত হবার ভাণটা মিহিরের মা অন্ততঃ দেখাতেন। নিঃসন্দিগ্ধ গলায় বলতেন, "ওকে শাসন করতে যদি কেউ পারে ত তুই-ই পারবি। যা একটু ব'কেঝকে দেখগে। আছে, ঘরেই আছে।"

ঘর। দোতলার সেই একখানি ঘর, টানা লম্বা, নীচের তলার দুখানা ঘরের ছাতটা জোড়া। যে ঘরটা জুড়ে শুধু বই আর কাগজ। আর যে ঘরটায় ঢুকলেই মনটা কেমন যেন ছলছলিয়ে ওঠে ছবির।

তর তর ক'রে উঠে যেত ছবি। যেমন সেই ফ্রক-পরা বেলায় উঠত, দিনে দু'শ বার।

চেঁচাতে চেঁচাতেই যেত, "কি গো মিহিরদা, আছ ত বাড়ী?"

মিহির হাতের বই ফে'লে উঠে দাঁড়িয়েই ফের ব'সে প'ড়ে বলত, "এই যে এলেন কথার ভটচায্যি!"

"তা সে তুমি যাই বল, আজ তোমার বিচার হবে।" বিছানার ওপরই ব'সে প'ড়ে চোখ ভুরু নাচিয়ে, হাতমুখ নেড়ে ছবি বলত, "ভদ্রলোকের মেয়েদের ছবি দে'খে ব্যাখ্যানা করা হয়, কিসের জন্যে শুনি?"

মিহির হয়ত একটা হাই তুলে বলত, "কিসের জন্যে তা নিতান্তই শুনবি?"

"শুনব না মানে? শুনব ব'লেই ত রেগে আগুন হয়ে ছুটে এলাম।"

"রেগে আগুন হয়ে?" মিহির মৃদু হেসে বলত, "না আহ্লাদে ডগমগ করতে করতে?"

"আহ্লাদে? ওমা সে কি গো মিহিরদা? কবে তোমার বিয়ে হবে ব'লে দিন গুনছি ব'সে ব'সে, আর—"

"দিন গুনছিস বুঝি? ও, তা হ'লে ত ভুল হ'ল। তোর মুখ চোখ দে'খে মনে হচ্ছিল কিনা আহ্লাদে ডগমগ করছিস।"

"কি করব, আমার মুখই যে হাসি হাসি। কাঁদলেও মনে হয় হাসছি, রাগলেও মনে হয় হাসছি।"

মিহির ওর আলো ঝলমলে মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলত, "হওয়াই স্বাভাবিক। ছবি ত? বিধাতা একবার যেমন ভাবে এঁকে রেখেছিলেন সেই ভাবই রয়ে গেছে।"

"আচ্ছা বেশ! আমার কথা থাক। শোন, বল শীগগির, কোন ছবিই পছন্দ করছ না কেন?"

"কেন জানিস্? ছবিগুলো শুধু 'ছবি' নয় ব'লে। দেখলেই বেশ বোঝা যাচ্ছে 'ওরা রাগ হলে রাগবে, মান হলে কাঁদবে'।"

"শুধু এই জন্যে রিজেক্ট ?"

"শুধু এই জন্যে।"

"চমৎকার ! এ শুধু একজনকে লজ্জায় ফে'লে রাখা।"

"লজ্জাটা কিসের ?"

"তার বর উঠতে বসতে খোঁটা দিচ্ছে তাকে, 'তোমার কারণে একটা সোনার কার্ত্তিক ছেলে সন্নিসী হয়ে রইল'।"

"তাই নাকি ? এমন খোঁটা খেতে হয় ? গুমোরে অহঙ্কারে তার ত তাহলে ল্যাজ ইয়া মোটা হচ্ছে বল ?"

"বটে ? ল্যাজ ! বাংলা ভাষা এমনই দীন যে ওর চাইতে একটু সভ্য শব্দ খুঁজে পেলে না ?"

"পেতে পারা অসম্ভব ছিল না, তবে কিনা ঠিক অমনটি জুৎসই হ'ত না।"

"ওই সব গ্রাম্য ভাষাগুলোতেই দেখছি তোমার ভারি জুৎ। আর যত ফ্যাসান কনে পছন্দের বেলা। শীগগির যা হোক একটা কিছু মিটিয়ে ফেল বলছি। মাসীমার কষ্ট আর দেখা যায় না।"

"হুঁ, তাই নাকি ? ছেলের চেয়ে বোনঝির দরদ ! ক'দিনের জন্যে এসেছিস ?"

"কুল্যে ছুটি দিন।"

"একটা দিন ত এখানেই কাটালি। যা পালা। বৌদিরা নাক নাড়া দেবে।"

"ভয় করছে ?" মুচকে হেসে বলত ছবি।

"হ্যাঁ, তা করছে। তোর মেজ বৌদির রহস্যাচ্ছাদিত মুখখানি মনে প'ড়ে ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।"

"আমারও।"

"তবু দিব্যি ব'সে আছিস ?"

"ওই ত জ্বালা। যাই, উঠি।"

"এই ছুদিনের মধ্যে আরও বার ছুচ্চার জ্বালাতে আসবি ত ?"

"মাত্র ছু'চার ? সই দিতে পারছি না। বেশী হয়ে পড়াই সম্ভব।"

"নাঃ, এই জ্বালাতেই দেখছি তাড়াতাড়ি বিয়ে ক'রে ফেলতে হবে আমায় ; তখন আর উঁকিটি দিতে আসতে হবে না। তখন শক্ত ঘাঁটি, পুলিস প্রহরা।"

"বুদ্ধি থাকলে পুলিসের পাগড়ী থেকেও চুরি করা যায়, বুঝলে ?"

"বুঝলাম। এখন উঠবি ?"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি। বাবাঃ ! কি অপমান ! আর জন্মেও আসব না।"

"পাগল ! কালই ত আসবি।"

তা কথাটা মিথ্যা নয়। কালই আসত।

তারপর পরিস্থিতি ঘুরল, এত অসুখে পড়লেন মিহিরের মা, আর এত আক্ষেপ সুরু করলেন যে, মিহির নিজে উদ্যোগ ক'রে বিয়ে ক'রে বসল।

বৌ দেখতে শুনতে ভাল, লেখাপড়ায় মন্দ না, সদাহাস্যমুখী।

কিন্তু ছবি কি কখনও বিদ্বেষের চোখে দেখেছে সেই বৌকে ? না, তা দেখে নি। আসা-যাওয়া ? না, তাও বন্ধ করে নি। দিব্যি ভাব জমিয়ে নিয়েছে বৌ-এর সঙ্গে। আর বাপের বাড়ী এলেই যথারীতি হানা দিয়েছে ও-বাড়ী।

অবিশ্যি ইদানীং নিজেরই আসাটা ক'মে গেছে অনেক। পতিকুলে বধূ-মূর্ত্তি থেকে এখন গৃহিণী-মূর্ত্তির লীলা

চলছে, আদৌ না আসারই কথা। তবু বিধবা বুড়ো মা বেঁচে, তাই আসা। বাবা গিয়েছেন সেই কবে যেন, তখন যা এসে অনেক দিন ছিল। কিন্তু তখন ত সদ্য মাতৃবিয়োগে কাতর মিহির বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিজে দেশভ্রমণে বেরিয়েছে। দেখাই হয় নি।

পরে মিহির যখন গুছিয়ে ঘর-সংসার করছে, দোতলার ঘরের সেই কাগজপত্রের রাশি চালান গেছে নীচের তলার ভাঁড়ার ঘরে, আর দোতলার ঘরে ঘরজোড়া চৌকি, ট্রাঙ্ক, সুটকেস, বিছানা, কাঁথা, তখনকার দৃশ্যটা এই ধরণর হ'ত ;—যথারীতি ও-বাড়ীতে ঢুকে প'ড়েই নীচের তলায় আর না দাঁড়িয়ে সোজা চ'লে যেত দোতলায়। দরজার এদিক্ থেকে চেঁচাত, "মে আই কাম ইন ?"

তাড়াতাড়ি পর্দ্দা সরিয়ে বেরিয়ে আসত মিহিরের বৌ সুতপা। হেসে হেসে বলত, "যার জন্যে হৃদয়-দুয়ার পর্য্যন্ত খোলা, তার আবার এ প্রশ্ন কেন ?"

"চাবি লাগাবার লোক এসেছে যে। কখন কোন সুযোগের মুহূর্ত্তে চাবি দিয়ে বসেছে কিনা তার ঠিক কি ? সাবধান হওয়াই ভাল।"

"তা বটে, এসো। সাবধানে পা টিপে টিপে এসো।" হাসতে হাসতে ঘরে নিয়ে যেত ওকে সুতপা।

এরা দু'জন অনুচ্চারিত একটা বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে দিব্যি সহজ স্বচ্ছন্দ। বরং একটু আড়ষ্ট হ'ত মিহির। হয়ত প্রথমটায় ভারি-সারি হয়ে ওঠা ছবিকে 'তুই' না ব'লে 'তুমি' বলত। কিন্তু সে ত ঝড়ের মুখে তৃণখণ্ড।

ছবির কথার ঝড়ে কোথায় উড়ে যেত সেই আড়ষ্টতাটুকু। পা টান টান ক'রে খাটের ওপরই ব'সে থাকত ছবি। আর অজস্র কথা বলত, আর হয়ত বলত, "নাঃ, মিহিরদা বৌকে এখনো লোক-লৌকিকতা শেখাতে পার নি। এই যে একটা কুটুম্বদের বৌ এসে ব'কে ব'কে গলা শুকোচ্ছে, তাকে এক পেয়ালা চা অফার করবে ত ?"

সুতপা মৃদু হেসে বলত, "কেন, আর একটু সুবিধে হয় তাহলে, কেমন ?"

মিহির হাসত, বৌয়ের দিকে তাকিয়ে বলত, "তোমার মত একটা তুচ্ছ প্রাণী ওর অসুবিধে ঘটাচ্ছে, এই তোমার বিশ্বাস নাকি ?"

"নিজেকে কে কবে অত তুচ্ছ ভাবে বল ? স'রে গিয়ে তোমাদের সুবিধে ক'রে দিলাম, এটুকু ভাবতেও আত্মপ্রসাদ আছে।" ব'লে হাসতে হাসতে চ'লে যেত সুতপা।

"মেয়েটা কি গো ? জেলাসির বালাই নেই !" বলত ছবি।

মিহির ওর চোখের, বাতাসে আর কৌতুকে কাঁপা, বড় বড় পল্লবগুলোর দিকে তাকিয়ে বলত, "জেলাসির কিছু থাকলে ত জেলাসি হবে ?"

"কিছু নেই ?"

"একেবারে কিছু না। কেউ কি সন্ন্যিসী হয়ে বেরিয়ে গেছে, না বিরহী যক্ষ হয়ে ব'সে ব'সে নিঃশ্বাস ফেলছে ?"

"সেই ত দুঃখু !"

"হলে ভাল হ'ত, তাই না ?"

"ভীষণ !"

তারপর ? কথার পিঠে কত কথা। জীবনে যত কথা কওয়া হয়, কেউ তার হিসেব রাখতে পারে ? তার পর চা খেত, খাবার খেত, এ বাড়ী থেকে ডাক পড়লে চ'লে আসত।

বড় ভাজ বলত, "এসেই ও বাড়ীতে ছুট। এ আর বদ্‌লাল না তোমার।"

ছবি বলত, "স্বভাব কখনও বদ্‌লায় ?"

মেজ বৌদি মুচকি হেসে বলত, "খুব যা হোক দেখালে বাবা ! শ্যাম কুল দুই-ই বজায় রাখলে।"

ছবি বলত, "তা হলেই বোঝ। তোমাদের চাইতে আরো কত বেশী ক্যাপাসিটি !"

মা বলতেন, "সর্ব্বদা ও বাড়ীতেই বা ছুটিস কেন বাপু? মিহিরের বৌও ত বিরক্ত হতে পারে?"

ছবি বলত, "বাড়ীতে অতিথি এলে মানুষে বিরক্ত হয় না মা, হতে পারে জন্তুতে। তা জন্তুর বিরক্তিকে কে মানে?"

মা হাত উল্টে বলতেন, "কি জানি!"

সত্যি, মেয়েকে তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না। বকতেও পারেন না। বয়সের ব্যবধান অনেকটা। শেষ বেশ কোলের মেয়ে।

তা সে ধরণের দিনটাও গেছে।

এখন মিহিরের ছেলে-দুটো কথা শিখেছে। ডাকতে শিখেছে। গাড়ী থেকে নামতে দেখলেই ছুটে আসে 'পিসী পিসী' ক'রে। ঝুলে পড়ে হাত ধ'রে। উদ্ঘাটন করতে চায় পিসীর উপহারের সম্ভার। আগে ওদের বাড়ীতেই নিয়ে যায় টেনে।

এখানে ভাজেরা বলাবলি করেন, "নিজের ভাইপোদের চাইতে দামী খেলনা, দামী খাবার!" কিন্তু ছবি ওসব ইঙ্গিত গ্রাহ্যও করে না।

কিন্তু আজ আর ছুটে আসে নি ওরা। মিহিরের ছেলেরা। আজ ওই দরজাটা কড়া ক'রে বন্ধ, বাতাসের ঝাপটে খুলে যাবে এ ভরসা নেই।

বন্ধ, সে ত দেখা হয়ে গেছে, তবু চোখ বারে বারেই ওই দিকে ছোটে। মা বলেন, "ছোট বাড়ীখানা আমার নামে ছিল, সে ত চিরকালের জানা? কি বল, জানতিস না ছবি?"

ছবি মাথা নাড়ে, "শুনে এসেছি ত তাই।"

"তবে? আমার নামে ট্যাক্স, আমার নামে সব। এখন সেই কথা তুলেছি ব'লে তোর দাদা-বৌদির যে খুব গোঁসা।"

"সে কথা তোলবার কি হ'ল?"

"ওই যে বলেছি, বাড়ীটা আমি বেঁচে থাকতেই তোর নামে লিখে দেব, তাই"—

"আমার নামে?"

"তবে আবার কি? মাতৃধনে মেয়েরই অধিকার। এমনিই পাবার কথা, তবে নাকি দিনকাল খারাপ তাই একেবারে পাকাপাকি দানপত্তর ক'রে ফেলতে চেয়েছি, তাই।"

"তা ও বাড়ীর দরজাটা বন্ধ কেন?"

"সে আবার আর এক কীর্ত্তি! ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া, মিহিরের ছেলে বুঝি আমাদের মন্টুকে মেরেছিল, মেজ বৌমা রেগে আগুন হয়ে দরজাটায় ইস্কুরূপ এঁটে দিয়েছে।"

"চমৎকার!"

"তা কেউ কমও যায় না। বাড়ী খুঁজতে বলা হয়েছিল ব'লে, মিহিরের বৌ বলে কি না, 'আজকাল কি আর বাড়ী পাওয়া যায় মাসীমা? আর এত সস্তায় এমন বাড়ী এখন পাবই বা কোথায়?' দেখছিস বেইমানি? সস্তার কালে ছিলি ব'লে চিরকাল সেই সুখ ভোগ করবি?"

ছবি এত কথার পিঠে শুক্‌নো শুক্‌নো গলায় বলে, "মিহিরদাকে উঠে যেতে বলা হয়েছে?"

"ওমা, উঠে যেতে বলব না? তোর বাড়ী, তুই ভোগ করছিস, এটুকু দে'খে যদি মরি, তবেই না আমার দেওয়া সার্থক! পাঁচজনের সংসারে একখানা ঘরে মাথা গুঁজে প'ড়ে আছিস।"

তা সত্যি বটে!

সেই প'ড়ে থাকার বিরুদ্ধে সর্ব্বদা বিদ্রোহ করছে ছবি। অহরহ ছটফটাচ্ছে। কেবলমাত্র একটুখানি আস্তানার অভাবে কিছুই হচ্ছে না। একটা বাড়ী পেলে এখুনি সব জ্বালা মেটে।

বাড়ী পাচ্ছে সে,—সত্যিকার পাওয়া।

আস্ত একখানা বাড়ী।

কী আশ্চর্য্য! মা ত আগে কোনদিন বলেন নি? সংকল্পটা কি হঠাৎ? ছবির বর এই অভাবনীয় আনন্দের বার্ত্তা পেয়ে কি বলবে? এখুনি গিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে বার্ত্তাটা। অবিশ্যি এখুনি না হোক, রাত্রে ত যেতেই হবে? বাপের বাড়ীতে রাত কাটান এখন দৈবাতের ঘটনা। ছবির নেই অবকাশ, আর ছবির দাদাদের নেই জায়গা। বিরাট্ তিনতলা বাড়ীখানা কেমন ক'রে যেন অদ্ভুত রকমের ছোট হয়ে গেছে।

এবার থেকে সে গ্লানি ঘুচতে পারে ছবির। মাকে দেখতে এসে বৌদিদের কাছে জায়গা চাইবার গ্লানি। কিন্তু কি ক'রে?

দেখছিস বেইমানি? সস্তার বাজারে ছিলি ব'লে চিরকাল সেই সুখ ভোগ করবি?

মিহিরকে উঠিয়ে দিয়ে?

দীর্ঘরাত জেগে আলোচনা চলল বরের সঙ্গে। বাড়ীটা মা হঠাৎই দেবার সংকল্প করলেন, না, বরাবর ইচ্ছাটা ছিল গোপনে? দাদারা বৌদিরা কোন্ আলোকে নেবে এটা? শেষ পর্য্যন্ত দরজার ওই স্ক্রুটা আঁটাই থেকে যাবে না ত? এমনি সব আলোচনা।

একসময় কথায় কথায় বর হেসে বলে, "আজ আর তাহলে তোমার ও বাড়ী যাওয়া হয়নি?"

"না।"

"তাহলে আজ মস্ত একটা লাভের সঙ্গে বড় একটা লোকসানও হ'ল তোমার?"

"শুধু বড়? বিরাট্।" ব'লে পাশ ফিরে শুল ছবি।

তারপর?

তারপর আর-একদিন বাপের বাড়ী গিয়ে মার কাছ থেকে দানপত্রখানা নিয়ে এল ছবি।

তারপর?

তারপর চলে জল্পনা-কল্পনা। তিনতলার প্ল্যান যখন রয়েছে, তখন দোতলার ছাতের মাথায় তিনতলা একখানা ঘর বানিয়ে বৌদিদের মাথা সমান হবে না কেন ছবি? তা ছাড়া, ঘর বাড়ালেই লাভ। নীচের ঘর দুটো ত ঘর-গেরস্থালীর কাজে। কিন্তু দোতলার ঘরখানা? বর বলে, "ওটা বসার ঘর হিসেবে সাজিয়ে রেখে, নতুন ঘরখানায় শোওয়া—"

ছবি মাথা নাড়ে, "না, নতুন ঘরে শোওয়া নয়, তিনতলায় একহারা একখানা ঘর, শীতে হিম রোদে তাত, শোওয়া দোতলার ঘরেই। ওটাই বরং চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজিও তুমি।"

"তিনতলায় বসার ঘর?"

"তাতে কি? যদি তিনতলাতেই ফ্ল্যাট হ'ত?"

"তা বটে। কিন্তু সবই ত আকাশকুসুম। মিহিরবাবু বাড়ী না ছাড়লে—"

কথাটা সত্যি।

মিহির এখনও পর্য্যন্ত বাড়ী ছাড়ছে না। কেবল বলে, "বাড়ী খুঁজে পাচ্ছি না।" তা তুই যদি এই ভাড়াতে বাড়ী খুজে বেড়াস, পাবি কোথা বাবু? কিন্তু কী অন্যায়! বর বলে, "না, তোমার মিহিরদার ভালবাসার প্র[illegible] করতে পারছি না। তোমার অসুবিধেটা ত মোটেই বুঝতে চাইছেন না?"

ছবি ভ্রূকুটি ক'রে বলে, "বোঝাতে হবে।"

"কি করবে? রাস্তা দিয়ে ঘুরে গিয়ে একদিন ব'লে কয়ে বোঝাবে? তোমার কথা না এড়াতেও পারে।"

"আমার দায় পড়েছে।"

"তবে আর শ্বশুরবাড়ী-লব্ধ বাড়ীতে বাস করা হ'ল না আমার।"

"হবে না মানে? উকিলের চিঠি দাও।"

"উকিলের চিঠি!"

"হ্যাঁ। অবাক্ হবার কি আছে? নিজে থেকে যদি না ওঠে, ভাড়াটে ওঠাতে যা যা করতে হয়, করতে হবে বৈ কি?" ভারী রূঢ় শোনায় ছবির গলাটা। আশাভঙ্গের আশঙ্কায় বেজায় ক্ষেপে থাকে আজকাল। এরপ[illegible] বর আর কথা কয়ে উত্তর পায় না। আজকাল বড় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে ছবি।

তাড়াতাড়ি ঘুমোয় কিনা কে জানে? কিন্তু একসময় ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে ছবি,—নতুন পাওয়া বাড়ীতে কেমন ক'রে একলা নিজের সংসার পেতেছে, তারই স্বপ্ন। কেমন ছিমছাম, ফিটফাট, কেমন সাজান গুছান সুন্দর পাঁচজনের সঙ্গে মাথা গুঁজে থাকা নয়, নিজের মনের মত ক'রে থাকা। স্বাধীনভাবে, সুন্দরভাবে। এ ক'মাস ধ'রে মনে মনে সেই দোতলার ঘরটা খালি ক'রে ফে'লে নিজের জিনিষপত্র দিয়ে যেভাবে সাজিয়েছে ছবি, সেই ছবিটা স্বপ্নের মধ্যে বার বার ঝলসে ওঠে। সেখানে ছবির বহু লীলা! এই এখানে ড্রেসিং টেবিলের সামনে চুল বাঁধছে, ত ওই ওখানে জানলার কাছে বেতের চেয়ারে ব'সে উল বুনছে। এই এখানে টেবিল ঝাড়ছে, ত ওই ওখানে খাটের বিছানায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চাদর পাতছে।

কিন্তু?

কিন্তু ঘরের এখানে ওখানে বিছানায় চেয়ারে আরও যে একজন ছায়া ফে'লে ফে'লে ঘুরে বেড়াচ্ছে? সে কেন মোটেই ছবির বরের মত দেখতে নয়? স্বপ্নের সব-কিছুই উল্টোপাল্টা হয় ব'লে?

শাশুড়ী সুমঙ্গলার স্নানের সময় বধূ মাধুরী তাঁর দীর্ঘ শুভ্র কেশে তেল দিয়ে দিচ্ছিল। মাথায় হাত দিলে সুমঙ্গলার বড় আরাম লাগে। এই সময় তাঁর তাই মনটা প্রসন্ন থাকে। সে কথা মাধুরী বেশ বোঝে। দুই-একটা চুলের গোড়া খুঁটে দিতে দিতে মাধুরী একটু সলজ্জ হেসে বললে "মা গো, একটা কথা বলব, রাগ করবে না ত?"

সুমঙ্গলা বললেন, "রাগ করব কেন মা? মেয়ের কথায় কি মা রাগ করে?"

মাধুরী বললে, "মা, অনেকদিন বাড়ী ছেড়ে বেরোই নি, শরীরটাও ভাল ঠেকে না। তাই মাসকয়েকের জন্যে একটু বাবার ওখানে ঘুরে আসব ভাবছি। বাবা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন।"

সুমঙ্গলা খুশী হলেন মনে হ'ল না। বললেন, "এই ত আমরা তিনটি মাত্র প্রাণী। তার মধ্যে আবার তুমি কয়েক মাস থাকবে না। সমস্ত ঘরসংসার যে খাঁ খাঁ করবে, বাছা। তোমার মায়ের, বলতে নেই, আর দু'একটা ছেলে-পিলে আছে। কিন্তু আমার ত নাড়তে চাড়তে তোমরাই সর্ব্বস্ব। বিধাতা তোমার কোলেও একটা গুঁড়ো দিলেন না আজ পর্য্যন্ত। কার মুখ চেয়ে আমি দিন কাটাব বল ত?"

মাধুরী চুপ ক'রে রইল। একটা কথা বলি বলি ক'রেও তার মুখ দিয়ে বার হ'ল না। আজ দশ বৎসর তার বিবাহ হয়েছে। এই দীর্ঘ দিনে কোন শিশুর কচি মুখের হাসি তাদের ঘর আলো করে নি। প্রথম চার-পাঁচ বৎসর শাশুড়ী বৌ দুজনেই আজ নয় কাল হবে ভেবে ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিতেন। কিন্তু চার-পাঁচ বৎসরের প্রতীক্ষায় আশা মুকুল যখন শুকিয়ে আসতে লাগল তখন বধূ গোপনে নানা ডাক্তারের বাড়ী এবং শাশুড়ী প্রকাশ্যে ঠাকুর-দেবতার দরজায় দরজায় ঘোরা সুরু করলেন। বাড়ীতে হরি-সঙ্কীর্ত্তন হয়, ছুটির দিন হলেই শাশুড়ী পূজার অর্ঘ্য নিয়ে বৌকে সঙ্গে ক'রে পট্টবস্ত্র প'রে কালীঘাটে দৌড়ান, ছেলে একটি চাইই চাই। 'হে ঠাকুর, মুখ তুলে চাও'। কিন্তু আজও ত ঠাকুর মুখ তুলে চাইলেন না। এই তিন বছর আগেও শাশুড়ী বৌ-ছেলেকে নিয়ে হরিদ্বার কাশী প্রয়াগ সর্ব্বত্র ঘুরে পূজো দিয়ে এসেছেন। তবু আজও ত ঘরের শূন্যতা ঘুচল না। দশ বৎসর ধ'রে তিনটি বয়স্ক মানুষ আপন আপন পূজা-পাঠ, অঙ্কশাস্ত্র আর আচার-বড়ি-জেলি নিয়ে দিনের বারো ঘণ্টা সময় একই ছন্দে প্রত্যহ কাটিয়ে

চলেছেন। অসম পদক্ষেপে কেউ তার তাল কাটতে এল না। সুমঙ্গলার বাল-গোপালের অলঙ্কার বছর বছর বেড়েই চলেছে। অধ্যাপকের অধ্যাপনা এক থেকে তিন কলেজে ব্যাপ্ত হয়েছে। মাধুরীও রসনাতৃপ্তির নিত্য নূতন উপায় পরীক্ষা ক'রেই চলেছে। কিন্তু সবই সেই ধীর সুষমছন্দে। শিশু-তাণ্ডবের স্থান কেবল এঁদের স্বপ্নবিহারে। ভোর রাত্রে মার কোলে দাপাদাপি ক'রে বাসন-কোসন ছড়িয়ে ভেঙ্গে ফে'লে, আলো ফোটবার আগেই সে কলহাস্যে মার তন্দ্রা টুটিয়ে আঁধারে মিলিয়ে যায়। সূর্য্যের আলোর প্রখরতার সঙ্গে সঙ্গে সে মুখের স্মৃতিও ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে আসে।

পরদিন মাধুরী আবার বললে, "মা, তুমি অমত ক'রো না। আমি স্বপ্নাদেশ পেয়েছি, আমাকে পিতৃসেবা করতেই হবে। এ আদেশ আমি ঠেলতে পারব না।"

স্বপ্নাদেশ শুনে শাশুড়ী কিছু বলতে পারলেন না। কি জানি, কোন্ দেবতা আদেশ করেছেন? বলা ত যায় না, কার আশীর্ব্বাদে কোন্ ধন লাভ হয়? মাধুরী বললে, "তা ছাড়া ছোট বোন বাঁশরীর শরীর বড় খারাপ। দিবারাত্রি চোখের যন্ত্রণায় কাঁদে। চোখে আলো সয় না। ঘর অন্ধকার ক'রে রাখে। দিনে বেরোয় না ঘরের বাইরে। এমন সময় আমি কাছে না থাকলে তাকেই বা কে দেখবে আর বাবাকেই বা কে দেখবে?"

সুমঙ্গলা বললেন, "লোকের অভাব হবে না। মা আছেন, বৌ আছে, তারা কি আর দেখবে না? তবে তুমি আদেশ পেয়েছ, তার উপরে ত আর কথা নেই?"

মাধুরী বললে, "গত জন্মে কিছু পাপ করেছিলাম, এ জন্মে যদি এমনি ক'রে প্রায়শ্চিত্ত না করি, তবে কি ঠাকুর কোন জন্মে আমার প্রতি সদয় হবেন? মা ত কাজের বার, তাঁর সেবা কে করবে, তাঁর দুঃখে সান্ত্বনা আমি না দিলে কে আর দেবে? আমার সমস্ত মনপ্রাণ বলছে, এবার আমায় যেতেই হবে। ওই সেবাতেই আমার শাপমোচন হবে।"

বধূর মুখে বড় বড় কথা শুনে শাশুড়ী ভয় পেয়ে গেলেন! বললেন, "তাই হবে মা। তুমি ওখানে ক'মাস কাটিয়ে এস। দেবতা তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।"

মাধুরী বললে, "কঠিন তপস্যা না করলে আমার ঘর পূর্ণ হবে না, মা। আমায় চেষ্টা করতেই হবে। তার পর সিদ্ধিলাভ হয় কিনা দেবতা দেখবেন।"

আবার সেই পূজাপাঠ, গঙ্গাস্নান। মাধুরী যাবার আগে প্রত্যহ এই পুণ্যার্জ্জনেই ক'দিন মেতে রইল। শাশুড়ী বলতেন, "মা, তোমার দুর্ব্বল শরীর ব্রত-উপবাসে একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে। তুমি এত বাড়াবাড়ি ক'রো না।"

মাধুরী কিছু বলত না। পূজার ঘরে গিয়ে বাল-গোপালের সম্মুখে মাথা পেতে আধ ঘণ্টা প'ড়ে থাকত। সংসারে থেকেও সে সংসারের দিকে তাকাত না। বৃদ্ধা শাশুড়ীকে এখন থেকেই ভাঁড়ার আর রান্নাঘরে ছুটোছুটি সুরু করতে হ'ল। এমনকি, ছেলের খাবার সময়ও বৌকে পাওয়া যায় না।

অবশেষে মাধুরী বাপের বাড়ী চ'লে গেল। যাবার সময় শাশুড়ীর পা ধ'রে অনেকক্ষণ কাঁদল। বললে, "মা, যা অপরাধই করি না কেন, সন্তান ব'লে ক্ষমা ক'রো, ফিরে এসে যেন তোমার মুখে হাসি দেখতে পাই। তোমার আশীর্ব্বাদ যেন জীবনটাকে ঘিরে রাখে।"

যা মনে করেছিল, তাই হ'ল।

বাপের বাড়ী এসে দেখল কারুর মুখে হাসি নেই। কিন্তু তবু মাধুরীকে পেয়ে তারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। মাকে প্রণাম করতেই মা বুকে টেনে নিয়ে বললেন, "মাধুরী, তুই বুঝে নে মা সব। বাবাকে ত দেখছিস, একেবারে শয্যা নিয়েছেন। নাওয়া-খাওয়া কিছু নেই। আমি সেধে সেধেও পারি না। বৌমা ছেলেমানুষ, ওঁকে

ঘাঁটাতে সাহস পায় না। তার ওপর মাসখানেক পরেই বাপের বাড়ী যাবে। আর বাঁশরীর আশা ত ছেড়েই দিয়েছি। সে ঘর থেকেও একবার বেরোয় না। তাকে কে দেখে তার ঠিক নেই, সে আর কার কি করবে? যেমন পোড়াকপাল নিয়ে জন্মেছিল, সবই তেমন। না হলে বছর না ঘুরতেই সিঁদুর লোহা ঘুচবে কেন? ভেবেছিলাম, খিষ্টান মিশনের ইস্কুলে দিলে পড়াশুনো ক'রে মনটা অন্যদিকে চ'লে যাবে, দিনগুলো সহজে কেটে যাবে এজন্মের মত। তাও কি একটা বাধিয়ে বসল। এখন, কি যে হয় বলা যায় না। ওকে আমি হিসাবের মধ্যে ধরি না আর।"

দোতলার ছোট একটা ঘরে চারদিকের সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে বাঁশরী ছোট একটা তক্তপোশের উপর চোখ বুজে ব'সে ছিল। ঘরে কোন বই কাগজপত্র নেই, সেলাই ফোঁড়াইও নেই। কারণ অন্ধকারে এসব কাজ চলে না। শুধু একটা গ্রামোফোন রেকর্ড বেজে চলেছে—

"মীরাঁকে প্রভু গিরিধর নাগর,
জব মিলকে বিছুড় না জায়ে॥"

অন্ধকারেই ঘরের কোণে চৌকির উপর একটি পিতলের কৃষ্ণমূর্তি, তার পদপ্রান্তে তামার পুষ্পপাত্রে ফুল, ঘরটি ধূপ ও পুষ্পের গন্ধে আমোদিত। দরজা খিল দেওয়া নয়, ভিতর থেকে ভেজানো। মাধুরী দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে প্রথমে অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলে না। রুদ্ধ দরজা খোলা পেয়ে পুষ্পের সুবাস তার মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল। অন্ধকারে চোখের দৃষ্টিটা অভ্যস্ত হবার আগেই বাঁশরীর দুটি কোমল হাত তার গলাটি [illegible]র মত জড়িয়ে ধরল। বাঁশরী ডুকরে কেঁদে উঠল। মাধুরী তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত দিয়ে বললে, "চুপ, চুপ, চুপ। অমন উতলা হয় না। ঠাকুরকে ডাক্‌। তিনি অগতির গতি, অসহায়ের সহায়।"

বাঁশরী তার মুদিত চোখদুটি মাধুরীর মুখের দিকে তুলে বললে, "দিদি, তুমিই আমার একমাত্র সহায়। তোমার ডাকে ঠাকুর সাড়া দেবেন, আমার ডাক তাঁর কানে যাবে না। আমি আর সইতে পারি না ভাই। ব'লে দাও কি করব। তুমি পুণ্যবতী।"

মাধুরীর মনে পড়ল সেই ছেলেবেলার কথা। তারা দুটি বোন ছিল যেন একসুরে বাঁধা দুটি যন্ত্র। মাধুরীর মুখের দিকে চেয়েই বাঁশরীর হাসিকান্না খেলাধুলা সব চলত। কেউ যদি বলত, "বাঁশরী, বেড়াতে যাবি?" বাঁশরী উল্টে প্রশ্ন করত, "দিদি কি যাবে?" কেউ একটা সন্দেশ দিলেও বলত, "দিদিরটা কই?" তার কোন কাজই ঐ একরত্তি দিদির পরামর্শ ছাড়া সে করত না। দিদির বিয়ে হয়ে যাবার পর বাঁশরী আর কারুর কথা শুনতে চাইত না। বড় একরোখা জেদী হয়ে গিয়েছিল। জোর ক'রে বিয়ে দিয়েও ফল হ'ল না। এক বছরেই মৃত্যু এসে বন্ধন কেটে দিল।

নূতন ক'রে বাঁশরীর চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার এল। খাওয়া-দাওয়ার সব নূতন ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু মাধুরীরও শরীর ভাল থাকছে না, সে বললে। ওষুধ-বিষুধ, দুধ-ফল তার জন্যেও রোজ আসে। মাধুরীই দু'হাতে টাকা খরচ করছে। মা যদি বলেন, "অমন জলের মত টাকাগুলো ঢেলে দিচ্ছিস কি ক'রে মাধু?"

মাধুরী বলে, "আহা! আমার ছোট বোনটা। ক'দিনই বা ওর জন্যে করা? চ'লে গেলে আর ত করতে আসব না?"

দিনের বেলা মাধুরী সারা বাড়ীতেই ঘোরে। বাপের ওষুধ-পথ্য খাওয়া-দাওয়া সব সেই দেখে। নানা কথায় তাঁর মনটা প্রসন্ন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু দিনে বা রাত্রে বিশ্রামের সময় সে বাঁশরীর ছোট্ট ঘরেই শোয়। কেউ বললেও অন্য কোন ঘরে যায় না। বলে, "তোমরা বড় অবুঝ। মেয়েটা একবার ঘর থেকে বেরোয় না। একলাটি থেকে যে পাগল হয়ে যাবে। আমারও শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করে, এক জায়গায় থাকাই ভাল।"

এমনি ক'রেই মাসের পর মাস কাটতে লাগল। মাধুরীর শাশুড়ী সুমঙ্গলা বারে বারে ডেকে পাঠান; মাধুরী

কেবলই বলে, "শীঘ্রই আসছি। আমার শরীরটা একটু সারুক। বড় কাহিল হয়ে পড়েছি। খাওয়া-দাওয়ায় মোটে রুচি নেই।"

হঠাৎ একদিন খবর এল সুমঙ্গলার কাছে, মনোতোষকে পাঠিয়ে দিতে হবে শ্বশুরবাড়ী। অসময়ে মাধুরীর একটি পুত্র-সন্তান হয়েছে। এ রকম অবস্থায় সে আর পিতৃসেবা করতে পারবে না। তার বাড়ী ফিরে যাওয়াই ভাল। নিতান্ত যে ক'দিন নাড়াচাড়া করা যায় না, সেই সময়টুকুই সে এ বাড়ীতে থাকবে।

সুমঙ্গলা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। কিন্তু অভিমানও হ'ল বৌয়ের উপর। তিনি অবশ্য এ সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু বৌ আগে কেন একটুখানি জানায় নি? তাঁর এত সাধনার ধন, তিনি একটু-কিছু সাধ-আহ্লাদ করলেন না, সোনার চাঁদের জন্যে কোন আয়োজন করা হ'ল না। মাধুরী লিখলে, "মা, দুঃখ ক'রো না। ছেলেকে ধ'রে রাখতে না পারলে, মা দ্বিতীয় ছেলের নাম রাখে ফেল্‌না, এককড়ি, কুড়ুনি, কত কি। ছেলে তাতে দেব-মানবের কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পায়। আমি তাই ছেলেকে সমাদর ক'রে আনতে চাই নি। ও শঙ্খ-ঘণ্টা না বাজিয়েই বেঁচে থাক, আমাদের ঘর আলো হয়ে থাকবে। কারুর কোন কুদৃষ্টি যেন ওর উপর না পড়ে এই আশীর্ব্বাদ ক'রো। অনেক দুঃখের ধন, জাঁকজমক ক'রে নাই-বা আগমন ঘোষণা করলাম। ভগবান্ দিয়েছেন, চিরদিন বুক দিয়ে যেন আগলে রাখতে পারি।"

মনোতোষ ছেলে কোলে ক'রে বললেন, "একেবারে তোমার মত দেখতে, কোনখানে অন্যরকম নয়।"

মাধুরী বললে, "এতদিন ধ'রে আমি তপস্যা করলাম, আমার মত হবে না ত কার মত হবে?"

মনোতোষ বললেন, "তুমি পুণ্যবতী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভগবান্ কি আর সব সময়েই মানুষের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে কাজ করেন?"

মাধুরী বললে, "তুমি একটিও ও-রকম কথা উচ্চারণ করবে না। ভগবানের বিচার করবার অধিকার আমাদের নেই।"

মাধুরী ছেলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাবে। বাড়ীতে সকলের ম্লান মুখ। মাধুরীর বাবা কিছু সাম্‌লেছেন, কিন্তু এখনও বিছানা ছেড়ে বেশী নড়েন না। মেয়ে চ'লে যাচ্ছে ব'লে তিনি বড় ব্যস্ত হচ্ছেন। কেবলই বলছেন, "ওখানে গিয়ে সব ভাল থাকবে ত? আমাকে ভাল ক'রে খবর দিও।"

মাধুরী বললে, "এতকাল যেখানে ভাল ছিলাম, আজ ভাল থাকব না, একথা কেন ভাবছ বাবা? শান্ত হও।"

বাঁশরী আজকাল ঘর থেকে বেরোয় মাঝে মাঝে। চোখে একজোড়া বড় কালো চশমা, কখনও ছাড়ে না। সবচেয়ে ব্যাকুল হয়েছে সে। একবার দিদিকে জড়িয়ে ধরে, একবার খোকাকে জড়িয়ে ধরে। বলে, "দিদি, তুই যে আমার সব। কি ক'রে তোকে ছেড়ে থাকব? এখানে আমার দিকে কেউ দেখবে না, কেউ আমার কথা ভাববে না।"

মাধুরী বলে, "আসব রে আসব। তোকে কি আমিই কখনও ভুলে থাকতে পারব?"

বাঁশরী মাধুরীর হাত ধ'রে বললে, "আমিও যাব ভাই, তোর বাড়ী মাঝে মাঝে।"

মাধুরী চিন্তিত মুখ ক'রে বললে, "ট্রেণে ক'রে যাওয়া-আসা, গেলেই ত আর ফেরা যায় না; তা হলে থাকতে হয় দিনকতক।"

বাঁশরী বললে, "আমি ত কারুর কিছু ক্ষতি করব না। দু'দিন থাকলে তুই রাগ করবি ভাই?"

মাধুরী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "না না, রাগ কেন করব? তবে কুটুমবাড়ী ত? বেশী থাকা ত চলে না?"

বাঁশরী বললে, "সে কি আর আমিই বুঝি না? যেতাম না, তবে মন যে বোঝে না।"

যাবার সময় বাঁশরী নিজের হাতের একগাছা চুড়ি খুলে মাধুরীর হাতে গুঁজে দিল। "এইটুকু দিয়ে খোকার

একটা সরু চেন ক'রে দিও ভাই।" হাতের উপর টপ টপ্ ক'রে তার চোখের জল ঝ'রে পড়ল। খোকাকে বুকে ক'রে সে কান্না থামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু চোখের জল যেন আরও বানের মত ডেকে এল। এত কান্না বাঁশরী কখনও কাঁদে নি।

মাধুরী কঠিন মুখ ক'রে বললে, "যাবার সময় অমন ক'রে চোখের জল ফে'লে অকল্যাণ করিস্ না বাঁশরী।"

বাঁশরী খোকাকে নামিয়ে দিয়ে স'রে দাঁড়াল। মাধুরী দ্রুতগতিতে গাড়ীতে উঠে পড়ল, ফিরে তাকাল না।

সুমঙ্গলা বাড়ীতে কলি ফিরিয়েছেন। মাধুরীর ঘরে খোকার জন্যে নূতন খাট এসেছে। রূপোর ঝিনুক-বাটি গড়িয়ে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখেছেন। আলনায় মাধুরীর জন্যে নূতন লাল পেড়ে গরদ আর খোকার জন্যে এক গোছা জামা। সারা বাড়ী তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ করছে। মাধুরী ঘরের দরজাতে পা দিতেই জোড়া শাঁখ বেজে উঠল। সুমঙ্গলা কাছে এসে দাঁড়ালেন। মাধুরী নীচু হয়ে এক হাতে শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁর কোলে ছেলে তুলে দিল। তিনি প্রথমেই ঠাকুর-ঘরের দরজায় একবার প্রণাম ক'রে ছেলে কোলে ক'রেই মেঝেতে বসলেন। ছেলের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দে'খে বললেন, "মাতৃমুখী পুত্র সুখী। একেবারে তোমার ছবি, বৌমা।"

নাতি কোলে পেয়ে সুমঙ্গলার পূজাপাঠ প্রায় ঘুচে গেল। তিনি চব্বিশ ঘণ্টাই নাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন মনে হয়। হয় ছড়া কেটে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন, নয় রকমারী নক্‌সার কাঁথা সেলাই করছেন, নয় দুধের বোতল সাজাচ্ছেন। ছেলে যেন মাধুরীর নয়। যেন সুমঙ্গলারই। অতটুকু শিশু, এরই মধ্যে তাঁর গলার আওয়াজ চিনেছে, তাঁর দিকে তাকালে চোখ ফেরায় না, এই সুমঙ্গলার ধারণা। প্রায়ই বলতেন, "দেখ দেখ—বৌমা, খোকন তোমার দিকে তাকায় না, আমার দিকে চায়।"

মাধুরী আপত্তি করত না, বলত, "তা ত হবেই। আগে ত তুমি, তবে ত আমি।"

সুমঙ্গলা বলতেন, "রাগ ক'রে বলছ মা? আমি ত ঠাট্টা করছিলাম। মায়ের চেয়ে বেশী কি ছেলে কাউকে ভালবাসতে পারে?"

সুমঙ্গলা স্নেহভরে বধূর দিকে তাকাতেন। তাঁর একমাত্র পুত্রের বধূ, বরাবরই তিনি মাধুরীকে ভালবাসেন। কিন্তু নাতি পেয়ে বধূর প্রতি ভালবাসাও যেন তাঁর দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে, নানা কাজে, নানা কথায় তিনি তা মাধুরীকে বুঝিয়ে দিতে চান।

বাপের বাড়ী থাকতে মাধুরীর অবসর কাটত বাঁশরীর সঙ্গে তার ঘরে। পিতৃসেবার নাম ক'রে সে গিয়েছিল, কিন্তু পিতার চেয়ে বাঁশরীর সেবাই সে বেশী করেছিল। শ্বশুরবাড়ী ফিরে এসে বাঁশরীর কথা যে তার মনে আছে, দে'খে বোঝা যেত না। বাঁশরী নিজেই একদিন আপন অস্তিত্ব ঘোষণা ক'রে খবর দিল, "দিদি, আমি এখনও আছি। তোমার বাড়ীতে শীঘ্র একদিন আমায় দেখবে, তবে ভয় নেই, আমি কুটুমবাড়ী বাস করব না। যে মিশনারী স্কুলে আমি পড়তাম তাদেরই একটা ছোট স্কুলে কলকাতায় আমায় কাজ দিয়ে পাঠাচ্ছে। ওরা থাকতে ঘর দেবে। অনেকদিন পর তোমাদের দেখব। চিঠিতে মনের কথা সবাই লিখতে পারে না, আমি ত পারিই না। দিন গুন্‌ছি, কবে দেখব। তুমি ত জানই, এখানে তুমি ছাড়া আমার দিকে তাকাবার কেউ ছিল না। কিন্তু তা নিয়ে কোন নালিশ করবার অধিকার আমার নেই, কখনও করব না। শুধু মানুষের শূন্য মনের হাহাকারটুকু, তোমাকে জানাচ্ছি। সর্ব্বহারার শূন্যতা কি অতলস্পর্শী!"

বাঁশরীর চেহারা আরও শীর্ণ হয়ে গিয়েছে, চোখে এখনও কালো চশমা। তবে যন্ত্রণা নেই, বলে। শাড়ী পরা ছেড়ে আজকাল ধুতি-পাড় কাপড় পরছে, হাতের চুড়ি দু'গাছাতে ঠেকেছে। এবারে মাধুরীকে দে'খে সে চোখের

জল ফেলল না। ঘরে ঢুকে প্রণাম ক'রে কিসের অপেক্ষায় যেন চারিদিকে তাকাতে লাগল। মাধুরী বলল, "কি চাস্ রে? খোকাকে দেখবি? চল্, সে ত মার ঘরে রাজত্ব করছে।"

সুমঙ্গলার ঘরে খাটের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন সুমঙ্গলা। খোকা তাঁর বুকের উপর উপুড় হয়ে ঘুমোবার ভাণ করছে। মাধুরী ঢুকেই বললে, "দেখছিস্ ত? এত মাথায় তুলতে আমি পারি না।"

কথার আওয়াজে খোকার ঘুম একেবারেই টুটে গেল। সে খুশী মুখ ক'রে ঘাড় ঘুরিয়ে বাঁশরীর দিকে তাকাল, যেন কতকালের চেনা। তার পর হাত-দুটি বাড়িয়ে দিল। বাঁশরী বিস্মিত হয়ে বললে, "ওমা, আমার কাছে আসবে?"

সুমঙ্গলা বললেন, "তুমি মায়ের মত দেখতে কি না? তাই তোমাকে দেখেই খুশী। ভারী চালাক ছেলে। ও সব বোঝে।"

বাঁশরী সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, "খোকার নাম কি রাখবেন মা?"

সুমঙ্গলা বললেন, "আমার ত ইচ্ছে বেণুগোপাল রাখি, বেশ বেণু বেণু ব'লে ডাকব।"

মাধুরী বললে, "না, না, অত সেকেলে নাম ভাল নয়। কি বলিস্ বাঁশি? গোপাল যদি হয় ত শুধু গোপালও বরং ভাল।"

বাঁশরী বললে, "হ্যাঁ, বাঁশি, বেণু, এসব অপয়া নাম। তার চেয়ে আশীষ, নির্ম্মাল্য, দেবদত্ত এসব নাম ঢের ভাল। দেবতাকেই ত স্মরণ করা হয়?"

"আয় রে খোকন, ঘুমুবি আয়।"

মাধুরী বললে, "সেই ভাল, আমি ওকে আশীষ ব'লেই ডাকব।"

ততক্ষণে খোকা দুই হাতে বাঁশরীর চোখের চশমা ধ'রে টানাটানি সুরু ক'রে দিয়েছে। তার মা-ঠাকুরমার চোখে চশমা নেই, সুতরাং এটা নূতন জিনিষ। বাঁশরী কিছুতেই খোকার মুঠি থেকে চশমা ছাড়াতে পারে না। তাই দে'খে সুমঙ্গলা খোকাকে ডাকলেন, "আয় রে খোকন, ঘুমুবি আয়।" হাত ধ'রে টানাতেও খোকা বাঁশরীর কোল থেকে নামল না।

বাঁশরী খোকাকে আদর ক'রে বললে, "তুমি যাবে না? আচ্ছা, চল, আমি তোমাকে ঘুম পাড়াই। কত দিন তোমায় দেখি নি।"

বাঁশরী খোকাকে কোলে ক'রে মাধুরীর ঘরে নিয়ে চলল। সুমঙ্গলা আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "বাবা, মাসী এক মুহূর্ত্তেই জয় ক'রে নিয়ে গেল।"

বাঁশরীর কোলে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ক্লান্ত হয়ে শেষে খোকা ঘুমিয়ে পড়ল। বাঁশরী তাকে কোলে ক'রেই ব'সে রইল। যাবার সময় খোকাকে চুম্বন ক'রে বাঁশরী বললে, "দিদি, আমি কালও একবার আসব। ছেলেটাকে একটু দে'খে যাব।"

মাধুরী বললে, "আসবি বইকি, হাজার বার আসবি।"

পরদিনও খোকা বাঁশরীকে দে'খে একগাল হেসে সুমঙ্গলার কোল থেকে লাফিয়ে তার কোলে চ'লে এল। সুমঙ্গলা চাবির তাড়া বাজিয়ে, গলার হার দেখিয়ে খোকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু খোকা মাসীর চশমা খুলে নেবার খেলাতেই মেতে রইল। মাধুরী বাঁশরীর কোল থেকে টেনে নিয়ে খোকাকে শাশুড়ীর কোলে দিয়ে দিল। খোকা কিন্তু আবার বাঁশরীর কাছে আসবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুমঙ্গলা হেসে বললেন, "নাও গো মাসী, বুড়ী ঠাকুরমাকে খোকার পছন্দ নয়।"

বাঁশরী অপ্রস্তুত মুখ ক'রে খোকাকে বুকে চেপে ধরল। বললে, "দুষ্টু ছেলে কোথাকার!"

ইস্কুলবাড়ীতে বাঁশরীর বাসা। কিন্তু সে প্রত্যহই বিকালে দৌড়ে আসে বোনের বাড়ীতে। বাড়ী ফিরে রাত জেগে খোকার জন্যে ফুলের ঝালর তোলা ফ্রক, পাখী আঁকা কাঁথা তৈরী করে। খোকা তাকে দেখলে দূর থেকেই দন্তহীন মুখে স্বাগত হাসি হাসে। খোকাকে ফে'লে ফিরতে বাঁশরীর রাত হয়ে যায়। শাশুড়ী পাছে বেশী ক্ষুণ্ণ হন, তাই মাধুরী থেকে থেকে খোকাকে তুলে নিয়ে তাঁর কাছে দিয়ে আসে। "নাও মা, ওর খাবার সময় হয়ে যাচ্ছে।"

শাশুড়ী অবশ্য খুশী হন, কিন্তু খোকার খাওয়ার পরে বাঁশরী এসে আবার তাকে নিয়ে যায়। নূতন নূতন খেলা শেখায়, "তাই তাই কর ত সোনা, হাত ঘোরাও ত যাদু।" খোকা সঙ্গে সঙ্গে মাসীর নকল ক'রে কচি হাত দুটি ঘোরায়, নানা অস্পষ্ট আওয়াজ করে, মাসীর কথাগুলিও বলতে চায়। সুমঙ্গলা বোঝেন যে, তাঁর বয়সে কচি ছেলের সঙ্গে এত মাতামাতি করা সহজ নয়; বাঁশরীর গলায় "নাচ ত তুলারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে," শুনেই খোকন যেরকম তড়াক্ তড়াক্ ক'রে লাফাতে থাকে তা তিনি সামলাতে পারেন না; বাঁশরীর মত খাট থেকে মেঝে আর মেঝে থেকে খাটে ছেলেকে শতবার ওঠানো নামানোও তাঁর সাধ্য নয়; তবু তাঁর অভিমান হয়, তিনি এত ক'রেও ছেলেকে বশ করতে পারলেন না, আর মাসী এসেই দু'দিনে ছেলেটাকে যাদু ক'রে নিলে। কেবলই তাঁর ভয় হ'ত, এত মাথা কুটে যাকে পেলেন সেও বুঝি পর হয়ে যাবে।

মাঝে মাঝে বাঁশরী খোকাকে নিজের ইস্কুলবাড়ীতেও নিয়ে যায়। সুমঙ্গলার তা পছন্দ হয় না, মনোতোষও মাঝে মাঝে এক-আধবার বলেন, "সারাদিন মাষ্টারী ক'রে বাড়ী ফিরি, তাও তুমি ছেলেটাকে বোনকে দিয়ে দাও, আমি একটু দেখতে পাই না। আমি পুরুষ হলেও গৃহী ত?"

মাধুরী বলে, "আহা, ওর যে কেউ নেই।"

সে বোঝে যে শাশুড়ী ও স্বামীর বিরক্তি হতেই পারে, সেজন্যে তারও মাঝে মাঝে রাগ হয়, বাঁশরীর উপর। কিন্তু বোনকে কিছু বলে এমন ক্ষমতা মাধুরীর নেই। কেবলই অভিমান ভরে মনে হয়, কেন বাঁশরী এমন বোকা? কেন তার এত আসক্তি? এ বাড়ীতে তিনটে মানুষ যাকে নিয়ে মেতে আছে তার উপর সে কেন ভাগ বসাতে আসে? শূন্যতাই যার অদৃষ্টে লেখা আছে, সে কেন নিজেকে অন্য চিন্তায় ডুবিয়ে দিতে পারে না? কথায় কথায় একবার বলেছিল, "বাঁশি, পূজো-আর্চ্চা কিছু করিস্? আর ত ছেলেমানুষটি নেই, ধর্ম্মচিন্তাও ত করা উচিত?"

বাঁশরী বলেছিল, "হ্যাঁ দিদি, বাল-গোপালের ধ্যান করি, অন্য দেবতার ধ্যান আমার আসে না। কি করি বল? মনকে বাগ মানাতে পারি না।" মাধুরীর মুখটা ম্লান হয়ে গেল।

বাঁশরী প্রতিদিনই দেরী ক'রে বাড়ী ফিরত। বাড়ী বলতে ত একখানা ঘর, ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লেও চলে। যদি ক্ষুধা না থাকে, সেদিন খায়ও না।

সেদিন মাধুরীর বাড়ী গিয়ে দেখল, সুমঙ্গলা বর্ষায় বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, মাধুরী সেঁক-তাপ নিয়ে ব্যস্ত, খোকা ঘরে একলা প'ড়ে কাঁদছে। বাঁশরী ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নিল, আদরে সোহাগে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল। আজ বাঁশরীকে পেয়ে মাধুরী যেন অনেকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সারা দুপুর সুমঙ্গলা আর খোকা দুজনের মধ্যে টানাপোড়েন করতে করতে তার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল। রাত্রে বাঁশরী বাড়ী যাবার সময় খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু মাধুরীর দুধ-ফল দেওয়া হয় নি শাশুড়ীকে, মনোতোষও অভুক্ত। বাঁশরী বললে, "দিদি, তোমার ত এখনও কাজ বাকী, খোকাকে দেখবে কে? আমি আজ ওকে নিয়ে যাই। আমার বেশ মজাই হবে। এমনিতে ত নিয়ে যেতে তোমরা দাও না? আজ নিশ্চয় মানা করবে না।"

মনোতোষ বললেন, "থাক্ না, আমি দেখব এখন।"

বাঁশরী বললে, "আপনি পুরুষ মানুষ, আপনার দ্বারা ও সম্ভব হবে না।"

মনোতোষ বললেন, "হয় কি না হয় দেখই না।"

বাঁশরী বললে, "সে আপনি পরে দেখবেন," ব'লে সে খোকাকে তুলে নিয়ে চ'লে গেল।

মনোতোষ ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললেন, "ঘুমন্ত ছেলেটাকে টেনে নিয়ে গেল। কি রকম জোর-জবরদস্তি করে, বাবা!"

মাধুরী বললে, "শুধু ত জোর-জবরদস্তি করে না। প্রাণ দিয়ে খাটেও ওর পিছনে।"

বাঁশরীর কানে কোন কথা গেল না। সে গুন্ গুন্ ক'রে গান করতে করতে সিঁড়ি নামছে,

"ধন ধন ধন, বাড়ীতে ফুলের বন,
এ ধন যার ঘরে নেই তার বৃথাই জীবন।"

মাঝরাত্রে বাঁশরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল, খোকার গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। এমন আশঙ্কা ত সে করেনি? কি হবে? মনোতোষের কথা ঠেলে সে খোকাকে তুলে এনেছে। তার উপর বৃদ্ধা সুমঙ্গলা যদি টের পান? লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না সে। সারা রাত ছেলের মাথায় জলহাত বুলিয়ে, হাওয়া দিয়ে ভোর না হতেই বাঁশরী উঠে বসল। খোকাকে সে এখুনি বাড়ী ফিরে দিয়ে আসবে। সুমঙ্গলা বিছানা ছেড়ে উঠবার আগেই খোকার বাড়ী পৌঁছান চাই। মুখ ধুয়ে একটু জলও খেল না সে। শাড়ীটা বদলে খোকাকে শাল মুড়ি দিয়ে কোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পথে লোকজন সবে চলতে সুরু করেছে।

মনোতোষের বাড়ীর দরজার কড়া নাড়তেই ঝি দরজা খুলে দিয়ে অবাক্ হয়ে বললে, "এত ভোরে দিদিমণি?"

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে কিন্তু নানা কণ্ঠের ধ্বনিতে নিদ্রিত পুরীতে এসেছে ব'লে মোটেই মনে হ'ল না। বাঁশরী একটু স্থির হয়ে দাঁড়াল। শোনা গেল সুমঙ্গলা বলছেন, "কাল সারা দিনরাত খোকাকে দেখি নি, তাই ভোরে উঠেই দেখতে এলাম, তা এরই মধ্যে তাকে মাসীর বাড়ী চালান ক'রে দিয়েছ?"

মাধুরী ভীতকণ্ঠে বলছে, "না মা, কাল রাত্রেই বাঁশি তাকে নিয়ে গিয়েছে।"

সুমঙ্গলা বললেন, "বাবা, এত দরদ! মার চেয়ে যে ভালবাসে তার নাম ডা'ন।"

বাঁশরীর কানের ভিতরটা যেন জ্ব'লে গেল। কিন্তু পীড়িত শিশুকে নিয়ে আর কতক্ষণ সে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবে? ভীত স্খলিত পদে তাকে ঘরে গিয়ে ঢুকতেই হ'ল। খোকাকে ধীরে বিছানার উপর শুইয়ে দিতেই সুমঙ্গলা ঝাঁপিয়ে এসে তুলে নিলেন।

"ইস্, গা যে আগুন! কি করেছ বাছা ছেলেটাকে?" বাঁশরী উত্তর দিল না। খোকার জ্বর কমেছে, কিন্তু তা নিয়ে তর্ক করবার সাহস তার হ'ল না।

সুমঙ্গলা বললেন, "দেখ বাছা, তুমি বৌমার আপন বোন, তোমাকে আর আমি কি বলব? কিন্তু আমাদের অনেক মাথাকুটে পাওয়া ওই ত একরত্তি ছেলে, ওর উপর ভাগ বসাতে চেও না। ভগবান্ যার ভাল করেন নি তার আদর সোহাগে কারুর ভাল হয় না।"

মাধুরী ও বাঁশরী এক সঙ্গে মুখ নীচু করল। কোন কথা তাদের মুখে এল না। শুধু বাঁশরীর চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়তে লাগল আর মাধুরীর মুখটা রক্তহীন সাদা হয়ে গেল। সুমঙ্গলার ক্রোধাগ্নি একটু যেন স্তিমিত হয়ে এল। তিনি ঘর ছেড়ে হন্ হন্ ক'রে নিজের ঘরে চ'লে গেলেন। বাঁশরী চোখের জল মুছে নিয়ে বললে, "দিদি, আমি যাই। খোকন ভাল হয়ে যাবে, দেখিস্।"

মাধুরী আর কিছু বলবার আগেই বাঁশরী সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে চ'লে গেল। খোকার দিকেও ফিরে তাকাল না।

মাধুরী ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। কেঁদে বলল, "ভগবান্, অপরাধীকে ক্ষমা ক'রো, দুঃখীকে দয়া ক'রো।"

"আমাদের অনেক মাথাকুটে পাওয়া ওই ত একরত্তি ছেলে, ওর উপর ভাগ বসাতে চেও না।"

বাঁশরী আর আসে নি। দিন-দশেক পরে মাধুরী তার স্কুলে খোঁজ করতে গিয়েছিল। বৃদ্ধা মিশনারী মেম বললেন যে বাঁশরী সুদূর পশ্চিম ভারতে অন্যকাজে চ'লে গিয়েছে। সে দেশে থাকতে চায় না। কথা বলতে বলতে বৃদ্ধার চোখ সজল হয়ে আসছিল। তিনি বললেন, "বড় দুঃখ পেয়েছে মেয়েটি। প্রভু সকলকে শান্তি দেন, তাকেও দেবেন। আমার হাতে এই চিঠি সে দিয়ে গিয়েছে, ডাকে দিতে বারণ করেছিল, বলেছিল, যদি তার দিদি খোঁজ নিতে আসে তবে যেন তাকেই শুধু দেওয়া হয়।"

মাধুরী দেখল, নাম ঠিকানাহীন বন্ধ একটি খাম। খুলে দেখল লেখা আছে—

"তুমি ত সবই জান; যখন বিশ্বাস ক'রে প্রতারিত হয়েছিলাম তখন তুমিই একমাত্র আমাকে রক্ষা করেছিলে, ক্ষমা করেছিলে।

তুমি আমার মুক্তির উপায় না ক'রে দিলে আজ আর আমি পৃথিবীতে থাকতাম না। পঙ্কে পদ্ম জন্মেছিল, তুমি তাকে মাথায় ক'রে রেখেছ, তাতেই আমার তুষ্ট থাকা উচিত ছিল। মূর্খ আমি, লোভে জড়িয়ে তোমার সংসারে দাবানল সৃষ্টি করতে যাচ্ছিলাম। তাই দূরে চ'লে যাচ্ছি, বুঝেছি, আমার অপরাধের শাস্তি আমায় নিতেই হবে। ভুলের বোঝা আর বাড়াব না।

যদি কখনো আমার খবর চাও—এই যে আমার মমতাময়ী ধর্ম্মমা, এঁর কাছে খবর নিও।"

নীচে কোন নাম সই নেই। মাধুরী চিঠিখানা কয়েকবার প'ড়ে শেষে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলল। যাবার সময়ে বললে, "মা, এই আমার দুঃখী বোনই আমার জীবনে স্বর্গসুখ দিয়েছে। বিধাতা আমাকে যে-সম্পদ্ দেন নি, কোনও দিন দেবেনও না, তা আমি পেয়েছি, এই আমার দুঃখী বোনের কাছে। মেয়েটা যাকে ভালবাসে তার জন্যে সব করতে পারে। সেই জেদেই নিজের মাথায় অভিশাপ ডেকে এনেছিল। ওর দুঃখে আমার সুখ আমি চাই নি। সে-কথা মানুষ মাত্রেই বুঝবে। কিন্তু এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল?"

—০—

একটা কাঁচের পুতুল।

একদিন যখন নতুন ছিল পুতুলটা, মাথার চুল ছিল কুচকুচে কালো। লাল লাল ঠোঁটদুটো হাসত আর কালো চোখদুটো চেয়ে থাকত বাবলীর দিকে। সামনের হাতটা একটা পাখা ধ'রে থাকত। পাখাটার রঙটা সবুজ।

এমন আশ্চর্য্য দামী পুতুল নয়, বা এখন আর নতুনও নেই। রঙ উঠে গিয়েছে, বিশ্রী হয়ে গিয়েছে পুতুলটা। কিন্তু তবু বাবলীর ওটাই পছন্দ।

সুদেষ্ণা পুতুলটাকে দেখতে পারে না। আর বাবলী সে কথা জানে। তার বয়স চার বছর। সব-কিছু সে বুঝতে পারে না। তার মাকে সে আরও কম বোঝে। কিন্তু মা যে তার ও পুতুলটাকে পছন্দ করে না, সে কথা সে খুব ভাল বুঝতে পারে।

বাবলী তাই পুতুলটাকে তার সব খেলনার নীচে লুকিয়ে রেখেছে।

একটা ছোট পুতুলের উপর সুদেষ্ণা কি রকম চ'টে যেতে পারে দে'খে বাবলী ভয় পেয়েছে আর রণেন আশ্চর্য হয়েছে। তবে রণেন সব কিছু তলিয়ে বুঝতে চায়। মানুষের আচার-আচরণের মধ্যে যুক্তি খুঁজে খুঁজে মরে ঐ রকমই মন তার, তাই তার মনে হয়েছে, সুদেষ্ণা পুরনো, রঙচটা, বিবর্ণ কিছু ভালবাসে না। সহ্য করতে পারে না কেন পারে না তাও সে বুঝতে চেষ্টা করেছে ও বুঝেছে।

বুঝেছে, যে, সুদেষ্ণা গত সাত বছরের দারিদ্র্য, জীবনসংগ্রামের চেষ্টায় জীবনটা থেকে রঙ এবং রস ধীরে ধীরে স'রে যাওয়ার চেহারাটা, এই সব ভুলতে চায়। মনে রাখতে চায় না। ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার পর তাদের জীবনে যে অধ্যায়টা নেমেছিল, আজকে আবার সুখ-সচ্ছলতার পুনর্বাসিত স্বর্গের নিরাপত্তায় ফিরে এসে, সে সেই অধ্যায়ট মুছে ফেলতে চায়।

সেদিন সুদেষ্ণা ছিল নেহাতই তার স্ত্রী। আজকে সে তার বাইরেও আর একটা পরিচয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে সে-ও কাজ করছে। আর বিদেশী বিমান-অফিসে রিসেপশনিষ্ট-এর কাজে টাকার অঙ্কটিও সুন্দর। সুদেষ্ণা এম কথাও ব'লে থাকে,—স্কুলটিচারের কাজ, আর বোঝা বোঝা খাতা দেখা, মাগো, ভাবলেই ক্লান্তিকর লাগে।

আর যে-সব মেয়ে সরকারী অফিসে কেরাণী, তাদের সম্পর্কেও সুদেষ্ণা বিস্মিত হয়। তারই ছোট বো কৃষ্ণাকে বলেছে কথায় কথায়,—কি ক'রে যে পারিস্ তোরা! দশটা পাঁচটা ঐ ভিড় ঠে'লে ঠে'লে যাওয়া আসা তার ওপর আবার ইউনিয়ন, মাইনে নিয়ে গোলমাল! ভাবলেও আশ্চর্য্য লাগে।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কাল-বৈশাখী

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩২৮ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

কৃষ্ণা স্মিত মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে; ঠিক মুখে, তাকিয়ে জবাব দিতে পারে নি। কৃষ্ণার চেহারায়, চোখে ভঙ্গীতে ক্লান্তি এবং অবসন্নতা। সুদেষ্ণা যখন কথা বলেছে, হাত দু'খানা কাজ করেছে। ম্যানিকিওর করা আঙুল-গুলো যেমন পটারির নতুন টি-সেটটার টিপট থেকে চা ঢেলেছে। স্টেনলেস ষ্টিলের চামচ দিয়ে সাদা চিনির কিউব তুলেছে। সাদা প্লেটে সন্দেশ, কলা আর কেক তুলে কৃষ্ণার হাতে দিয়েছে। তার পর সুদেষ্ণার টুকটুকে লাল ঠোঁটদুটো হেসেছে। সুদেষ্ণা বলেছে,—একদিন বাড়ী গিয়ে ব'লে আসব দাদাকে। বলব, বোনকে কেরাণী বানিয়ে ওর বয়সটাকে বুড়িয়ে দিচ্ছ কেন?

কৃষ্ণা সে কথারও জবাব দেয় নি। জবাব দিতে পারে নি। ঈষৎ অপ্রতিভ হাসি হেসে উঠে পড়েছে। বলেছে,—তোমার সময় হলে একবার যেয়ো। বৌদি বলছিল, বাড়ীর কাছে রথের মেলা হবে। বাবলীর ভাল লাগবে বেড়াতে গেলে।

—রথের মেলা? সেই যাবে, আর কতকগুলো মাটির খেলনা, আরও কত কি কিনে আনবে।

কৃষ্ণা আর কথা বলে নি। সুদেষ্ণার এ-সব কথা শুনতে শুনতে রণেনের হঠাৎ রাগ হয়েছে, মনে হয়েছে, এ সবই সুদেষ্ণার বাড়াবাড়ি। এমন ভাবে সুদেষ্ণা কথা বলছে যেন সে কোনদিন ঐ শেয়ালদর ঘিঞ্জি অঞ্চলে একটা দোতলা বাড়ীতে কুড়ি বছর অবধি কাটায় নি। বোনেদের সঙ্গে ভাগ ক'রে একটা আধময়লা বিছানায় ঘুমোয় নি। রথের মেলায় ছোট-বয়সে ঘুরে ঘুরে খেলনা পুতুল কেনে নি।

রণেন বলেছে,—কৃষ্ণা, আমি যাব বাবলীকে নিয়ে। বৌদিকে ব'লো। আর শোন, নৃপেনদাকে ব'লো আমার জন্যে যেন কয়েকটা ভাল বেলফুলের কলম জোগাড় ক'রে রাখেন।

এই-সব কথা বাবলী তার ঘর থেকে শুনেছে। মার কথা শুনতে শুনতে তার যেমন ভয় হয়েছে, অস্বস্তি হয়েছে,—বাবার কথা শুনে তেমনি ভাল লেগেছে। তার মেলায় যেতে ভাল লাগে, মামাবাড়ীতে যেতে ভাল লাগে, মামাতো ভাইবোনেদের সঙ্গে হুটোপাটি করতে ভাল লাগে। মামীমা মার মত সুন্দর সুন্দর কাপড় পরে না,—মার মত অফিস থেকে ট্যাক্সি ক'রে বাড়ী আসে না। মামীমা বাড়ীতে থাকে। তাকে যত ইচ্ছে খালি পায়ে ঘুরতে দেয়, খেলা করতে দেয়।

মাটির রান্নাবাড়ীর খেলনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে পারে বাবলী,—মামীমা সেগুলোকে জঞ্জাল বলে না, নোংরা বলে না। বাবলী যদি নিজে নিজে যেতে পারত, রাস্তা চিনত, জানত,—তাহলে একদিন বাড়ীর পেছনের গলি থেকে ভাঙ্গা কাঠের ঘোড়াটা (সেবার সুমতি এনে দিয়েছিল), তুলোর বেরালটা (মামী এনে দিয়েছিল জন্মদিনে), রান্নাবাড়ীর একপ্রস্থ মাটির খেলনা (সুমতি এনেছিল), সবগুলো তুলে এনে মামীমার কাছে রেখে আসত।

কিন্তু গলিটাতে সে কোনদিনও নামতে পারবে না। মা অফিসে চ'লে গেলে বাবলী পা উচু ক'রে জানলায় মুখ রেখে দেখেছে, ঘোড়াটার রঙ কেমন বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়েছে।—বেরালটা জলে কাদায় নোংরা একটা পচা বেরালই হয়ে গিয়েছে। পচা, ঘেয়ো একটা বেরাল।—এই কথাই মাও বলেছিল, বেরালটা ফে'লে দেবার সময়। আর রান্নাবান্নার হাঁড়ি-কড়াগুলো ভেঙেচুরে গিয়ে এখন কেমন অসহায় হয়ে প'ড়ে আছে।

যা পুরনো, ভাঙ্গাচোরা তাই মা ফে'লে দেয়। এখন বাবলী বুঝতে পারে যে, মা তাকেও ভালবাসে না। ভালবাসা বুঝতে পারে না। বাবলী যে ওদের ভালবাসত, ওরাও যে তাকে ভালবেসেছে।—এখন যে ওরা ওখানে গলিতে,—নোংরায় কাদায় জলে শুয়ে শুয়ে থুবড়ে প'ড়ে বাবলীর দিকে চেয়ে থাকে,—মনে মনে বলে, বাবলী, এখন তুমি ডোনাল্‌ড ডাকের ছবি আঁকা সুন্দর খাটে ঘুমোও,—সিল্কের নেটের মশারির নীচে নরম সাদা বালিশে মাথা ডুবিয়ে রাখ, ঘর আর পর্দা আর কার্পেটের রঙে রঙ মেলান তোমার একটা ছবি আঁকা কাবার্ড আছে, তাতে কত না সুন্দর সুন্দর খেলনা থরে থরে সাজান; সে-সব খেলনা আমাদের মত কালীঘাট, শেয়ালদ' বা

ভবানীপুরের ফুটপাথ থেকে আসে নি। বাবলী, এখন তুমি আমাদের ভুলে গিয়েছ। আমাদের তুমি আর ভালবাস না। এখন আমরা ঠাওার আবর্জ্জনায় তোমার ভালবাসা থেকে ছিট্‌কে প'ড়ে একেবারে আবর্জ্জনা হয়ে গেছি।

বাবলীর চোখছুটো ভরসা পায় না, তার মনটা কাঁদে। জানলা দিয়ে ছুটো হাত বাড়িয়ে বাবলী ওদের বলতে চেয়েছে,—আমি তোমাদের ভালবাসি, আমি তোমাদের ভুলি নি। তার সেকথা ওদের কাছে পৌঁছয় না, পৌঁছয় নি। কেননা তার পরেও বাবলী দেখেছে, ওরা আরও জঞ্জাল হয়ে গিয়েছে। বাবলীর ভালবাসা না পেয়ে।

কিন্তু বাবলী তার ছোট্ট চার বছরের মনটাকে নিয়ে বেশীক্ষণ একা একা থাকতে পারে নি। ঘুম ভেঙে তার আয়া উঠে এসেছে। বলেছে,—বাবলী, আবার তুমি উঠে এসেছ? চল, মা আসবে। চল বাবলী, তুমি পার্কে যাবে।

বাবলী জানে, আয়াও মার দলে। আয়া তাকে সুন্দর জামা পরাবে, পার্কে নিয়ে যাবে। যখন তারা বেড়িয়ে ফিরে আসবে, তখন মার কাছে অনেক লোক এসেছে, বাইরের ঘরে, পর্দ্দার ওপারে, বড়দের হাসি দিয়ে, কথা দিয়ে একটা নিষিদ্ধ জগৎ সৃষ্টি হয়েছে।

বাবলীর ঘর থেকে বাবলী সেই জগৎটাকে অনুভব করতে পেরেছে। সে জগতে মা না ডাকলে বাবলীর ছাড়পত্র নেই।

বাবলী ঘুমোতে যাবার আগে মা একবার এসেছে। পর্দ্দা সরিয়ে ঢুকে, নিজের মনের খুশিতে উপচে-পড়া গলায় বলেছে,—কি করেছ সারাদিন? আয়া বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল? পার্কে গিয়েছিলে? ফল খেয়েছিলে?

বাবলীর মুখটা তখন নৈর্ব্যক্তিক হয়ে গিয়েছে। সে সব কথাগুলোর উত্তর দিয়েছে ছোট ছোট কথায়। তার পর বিছানায় ঢুকে পড়েছে। বিছানায় ঢুকে ঘুমোবার আগে সে সেই কাঁচের পুতুলটা বের করেছে বালিশের তলা থেকে। পুতুলটাকে বুকের কাছে চেপে ধ'রে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে সে সুমতির কথা মনে করেছে। যেদিন সুমতি চ'লে গেল, সেদিন সুমতি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সুমতির চোখটা কেঁদে কেঁদে লাল হয়েছিল। সে বলছিল,—বাবলীকে আমি আর খেতে দেব না। নিয়ে যাব না বেড়াতে। রান্নার কাজ করব শুধু।

মা সেকথা শোনেনি। অফিসে বেরোবার সময় মার বেশী কথা বলবার সময় ছিল না।

ফিরে এসে মা যখন দেখেছিল, নতুন কাপড়, বিছানা, কিছুই সুমতি নিয়ে যায় নি; আয়না, দাঁতভাঙ্গা চিকণি, একটা থলে, পানের কৌটোটা,—সবই সুমতি রেখে গিয়েছে, তখন মা রেগে সুমতিকে কি সব বিচ্ছিরি রাগের কথায় বকেছিল,—বাবলীর সেকথা মনে পড়ে রোজ, আর রোজ রাতে চোখের জলে বালিশটা ভিজে যায়। পুতুলটা তার কথা বোঝে, বুঝতে পারে। পুতুলটা বোঝে, সুমতি তাকে ভালবাসত, বকত না। তার সঙ্গে রান্নাবাড়ী খেলত, তাকে গল্প বলত। সুমতি বলত না, সে ঘর নোংরা করেছে,—তাকে রাক্ষসের গল্প বলত,—তাকে মোয়া, নাড়ু, আচার বানিয়ে দিত। সুমতির ঘাম ঘাম গন্ধ, হলুদের ছোপ লাগা কাপড়ের আঁচল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিত। তাকে একলা ঘরে শুইয়ে আলো নিবিয়ে চ'লে যেত না।

তখন বাবলী খুব সুখী ছিল।

এই কাঁচের পুতুলটাকে জড়িয়ে হাতের মুঠোয় ধ'রে, বাবলী সেই-সব জীবনের সেই-সব দিনের স্বাদটা ধ'রে রাখতে চেয়েছে।

বাবলী যে তার নিজের একটা জগতে এমনি ক'রে স'রে স'রে যায়,—ঐ ছোট্ট মেয়েটার যে মনটা আছে, সেটা যে তার হাতের বাইরে—সুদেষ্ণা তা দে'খে আশ্চর্য্য হয়েছে। সে রণেনকে বলেছে,—ঐ সুমতিই মেয়েটাকে নষ্ট ক'রে গিয়েছে। গ্রাম্যতার প্রশ্রয় আর আদর দিয়ে দিয়ে। রণেন বলতে চেষ্টা করেছে,—আহা, ওকে ও ভালবাসত, মানুষ করেছিল ছোট বেলা থেকে।

—মানুষ করতে হলে ঐ সব গ্রাম্যসংসর্গ থেকে মেয়েকে সরিয়ে রাখাই দরকার।

আশ্চর্য্য লেগেছে সুদেষ্ণার যে, বাবলী আজকাল তার কাছে কেমন একটা দূরের মানুষ হয়ে থাকে।

কোথায় যে আড়ালটা আছে, বুঝতে পারে না সুদেষ্ণা। আর বুঝতে না পারলে সুমতির ওপর তার আবার রাগ হয়।

সুমতি যখন এসেছিল, সুদেষ্ণার তখন বড় দরকার ছিল সুমতিকে। তখন তাদের অবস্থা টালমাটাল। বাবলীর জন্মের সম্ভাবনার পিছনে যদিও আধুনিক দুই স্বামী-স্ত্রীর সুপরিকল্পিত এক চিন্তা ছিল,—তবুও সুদেষ্ণার মনে হয়েছিল, মেয়েটা যেন দুর্ভাগ্যের বন্যার মুখে ভেসে এল। ডেকে আনল বন্যাকে।

তখনই সুদেষ্ণা কাজ করার কথা ভাবল। তার আগে সে ছিল, সৌন্দর্য্য আর সপ্রতিভতার ছাড়পত্রে বড়লোক স্বামীর সঙ্গে বিয়ে-হওয়া মধ্যবিত্ত এক মেয়ে। আর রণেনও তাকে একটা সুখের উত্তাপে সুন্দর জীবন দিয়েছিল। সুখ বলতে দু'জনেই বুঝেছিল, চলবার ফেরবার অবাধ স্বাধীনতা, দায়-ভারবিহীন একটা মুক্ত জীবন। সে জীবনে যখন বাধা পড়ল তখন সুমতি তাদের বাড়ীতে এল। তখন তারা এ ফ্ল্যাট-বাড়ীতে আসে নি। দুইখানা ঘরে কোনমতে সংসার চালাবার দিন সেগুলো। তখন বারো টাকা মাইনেতে আধময়লা কাপড় পরা, অশিক্ষা, গ্রাম্যতা আর স্নেহ-সহানুভূতির পাঁচমেশালী মানুষ সুমতি ছাড়া অত ঝক্কি, অত ঝামেলা কেউ সামলাতে চাইত না, পারত না। কিন্তু সুদেষ্ণা বোঝেনি যে, ঐ আধবুড়ো মানুষটা এমন কিছু দিচ্ছে বাবলীকে যা অনেক শূন্যতার পরিপূরক। স্নেহ, মমতা, আদর, প্রশ্রয় সবই সে দিয়েছিল বাবলীকে।

সেই-সব দিনের পক্ষেই সুমতি ভাল ছিল। সুদেষ্ণার জীবনটা যখন পাল্টাতে সুরু করল, সুমতি আর তাল রাখতে পারল না। সুদেষ্ণা অকৃতজ্ঞ নয়, সুমতিকে তবু সে রাখতে চেয়েছিল।

নতুন জীবনটা যেমন ঝকঝকে, নিয়ম-বাঁধা, সুন্দর হয়ে উঠছে,—সুদেষ্ণা মানুষগুলোকে তেমনই ঢেলে সাজতে চাইল। সুমতি তখন বেঁকে বসল। একদিন বলল,—দিদিমণি, আমার বিছানাপাটি সব ত ভাল, তবে জমাদারকে দিয়ে দিচ্ছ কেন?

—তোমাকে নতুন বিছানা দিয়েছি সুমতি!

সুমতি তখন কিছুই বলল না, কিন্তু সুদেষ্ণা দেখল, কয়লার ঘরের কোণে পুরনো বিছানাগুলো লুকিয়ে রেখেছে সুমতি। সেগুলো সে বাড়ীতে দেবে তার বোন-পোকে। সুদেষ্ণা তখন সুমতিকে বুঝিয়েছিল। কিন্তু সুমতি কেমন যেন বেয়াড়াপনা করতে লাগল। সুদেষ্ণার অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল। সুমতি ধোয়া থান পরবে না। ব্লাউজ সায়া ব্যবহারে তার আপত্তি। পান দোক্তা খাবার অভ্যাস সে ছাড়বে না। পায়ে চটি পরবে না। তখনও সুদেষ্ণা ওকে সহ্য করতে পেরেছিল, কিন্তু বাবলীকে ও একেবারে দখল ক'রে ব'সে আছে মনে-প্রাণে, দে'খে সুদেষ্ণা আর ধৈর্য্য রাখতে পারল না।

নতুন ঘরে নতুন নতুন খেলনা। কিন্তু যখনই দেখে, সুদেষ্ণা দেখে মেয়েটা সুমতির সঙ্গে রান্নাবাড়ী আর ঘর-সংসার খেলছে।

গরীবের মত। ভাঙাচোরা টিনের কৌটো, মাটির ঘোড়া, তুলোর বেরাল নিয়ে খেলা। আর সুমতি ওকে কি শিখিয়েছে,—মেয়েটা আপনমনে বক্‌বক্ করে ব'সে ব'সে।

সুদেষ্ণার মনে হয়েছে, এগুলো বাবলীর মনের উপর অসুস্থ একটা প্রভাব ছড়াচ্ছে।

রণেন অবশ্য সুদেষ্ণার মত তলিয়ে বুঝতে পারে নি, বুঝতে চায় নি। সে বলেছে,—বাবলী ওকে ভালবাসে। ওকে সেইজন্যেই আমরা ছাড়াতে পারি না। সুদেষ্ণা বলেছে,—আশ্চর্য্য! ভালবাসার জিনিষ কি একটাই থাকে? ও কতটুকু মেয়ে! আজ যদি ভাল দে'খে নতুন আয়া রাখি, তাকেই ও ভালবাসবে।

সুদেষ্ণা ইদানীং বাবলীর সমস্ত কাজকর্ম্মের দায়ভার নতুন আয়ার হাতে তুলে দিচ্ছিল, খাওয়া-দাওয়ার নতুন ব্যবস্থা।

[illegible] তা কি জানত সুদেষ্ণা? হঠাৎ অফিস ছুটি হ'ল দুটোর সময়। তাই সুদেষ্ণা [illegible] ফিরেছিল।

ঘরে বাবলী ছিল না। নতুন আয়া শুয়ে ছিল। সুদেষ্ণা বলতে সে জানাল, বাবলী সুমতির সঙ্গে ভাত খাচ্ছে।

—বেলা দুটোর সময়?

—রোজই খায়।

রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে ব'সে সুমতি ভাত খাচ্ছিল। কোলে ব'সে বাবলীও খাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে। দে'খে সুদেষ্ণা এত রেগে গিয়েছিল যে, কথা বলতে পারে নি। সুমতি বোঝে নি। হেসে বলেছিল,—রোজই এ সময় দুটো খাইয়ে দিই বৌদিদি, নয়ত ঘুমোতে চায় না।

সুদেষ্ণা চেঁচিয়ে একটা ঝড় তুলেছিল।

সুমতি অত সহজেই সব অধিকার ছেড়ে চ'লে যায় নি। রণেন এসে দাঁড়ালে সমান তেজে চেঁচিয়ে বলেছিল, —কোথায় ছিলে বৌদিদি, যখন ছ'মাসের মেয়ে আমার কোলে ফে'লে দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে যেতে? কোনদিন ওকে খাইয়েছ? পরিয়েছ? কার হাতে, কার কোলে পিঠে এত বড়টা হ'ল? খাবার কথা বলছ? আমার হাতে চিরকালটা খেল, আজ আমি হলাম নোংরা, সেকেলে? হায় বাবলী! আমি তোকে অসভ্য করছি? আমি তোর শত্রু? সুমতি মাথাটা দেয়ালে ঠুকে কেঁদে কেঁটে অনর্থ করেছিল।

সুদেষ্ণা দেখে, মেয়েটা সুমতির সঙ্গে রান্নাবাড়ী আর ঘরসংসার খেলছে!

সুমতি আর বাবলী দু'জনেরই ভরসা ছিল, রণেন একটা সুবিচার করবে।

বাবলী কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছিল। আর সুমতি সমস্ত তেজ, সমস্ত রাগঝাল ঝেড়ে ফে'লে, কেঁদে কেঁদে মিনতি করেছিল।

তবু সুমতির থাকা হ'ল না।

বাবলীর উপর থেকে সুমতির সমস্ত প্রভাবটা মুছে ফেলতে চায় সুদেষ্ণা। তাই নতুন নতুন খেলনায় সে বাবলীর মনের শূন্যতা ভরাতে চেয়েছে।

তবু পারছে না। সুদেষ্ণার মনে হয়, বাবলীর এই প্রতিরোধ না ভাঙতে পারলে সে হেরে যাবে।

কাঁচের পুতুলটার কথা সুদেষ্ণা জানত না। বাবলীর জন্মদিন এগিয়ে এল। সুদেষ্ণা তার অফিসের এক অফিসারকে ব'লে বিলেত থেকে একটা নতুন পুতুল আনাতে চাইল। পুতুলটা হাঁটবে, মাথা দোলাবে, কথা কইবে।

ঠিক সেজন্যেও নয়। বাবলীর ঘরটা পরিষ্কার করতে গিয়ে সে কাঁচের পুতুলটার খোঁজ পেয়ে গেল।

পুতুলটা হাতে নিতেই সুদেষ্ণার আর একটা মুখ মনে প'ড়ে গেল। যাবার কালে সুমতিই না এই পুতুলটা দিয়ে গিয়েছিল বাবলীকে?

সুদেষ্ণার মনের মধ্যে জ্বালার অনুভূতিটা ওঠে আর নামে, তাকে খোঁচা দিয়ে আবার ঝিমিয়ে যায়।

জন্মদিনের সন্ধ্যাটা উৎরে গিয়েছে। বাবলীর ভাল লাগবে ব'লে মামাবাড়ীর সকলকে ডেকেছিল মা। বাবলীর মনে হয়েছে, মা আজকে যেন খুব ভালবাসার মতন হয়ে গিয়েছে। আর ভয় পেতে হবে না মাকে।

নতুন যে পুতুলটা এনেছে মা, সন্ধ্যাবেলা তাকে দেখতেই সবাই ব্যস্ত ছিল। আশ্চর্য্য সুন্দর পুতুলটা। হাঁটতে পারে, কথা কইতে পারে।

এখন সবাই চ'লে গিয়েছে। মা আর বাবা ব'সে কথা কইছে এখনও। বাবলীর মনে হয়েছে, আজকের আনন্দের ভাগটা সে সুমতিকে দিতে পারবে না। তাই কাঁচের পুতুলটাকে সে আজ বুকে জড়িয়ে নিয়ে শুতে চেয়েছে। সুদেষ্ণা আর রণেন কথা কইছিল। হঠাৎ বাবলীর কান্না শুনে তারা চমকে ওঠে। পর্দ্দা সরিয়ে চোখের জলে গাল ভাসিয়ে ঘরে ঢোকে বাবলী। সুদেষ্ণা কিছু বলার আগেই সে বলে,—আমার কাঁচের পুতুল ফে'লে দিয়েছ কেন?

অভিমান নয়, রাগ নয়, যেন চ্যালেঞ্জ করছে বাবলী।—কেন ফে'লে দেবে তুমি? কেন, কেন, কেন?

বাবলীকে থামাতে পারে না রণেন। থামাতে পারে না সুদেষ্ণা।

—মাসী আমাকে যা যা দেবে, সব তুমি ফে'লে দেবে কেন? কি করেছে ওরা তোমার?

সুদেষ্ণা রাগতে গিয়েও রাগতে পারে না। সে বোঝায়, রণেন বোঝায়। বাবলী বলে,—কে চায় তোমার নতুন নতুন খেলনা?

—আচ্ছা, আমি কালই তোমার পুতুলটা এনে দেব।

—তুমি ছুঁড়ে ফে'লে দিয়েছ। ও ভেঙে গিয়েছে, আমি জানি না?

কাঁদতে কাঁদতে ঘেমে গিয়ে ফুঁপিয়ে বাবলী শ্রান্ত হয়ে পড়ে। রণেন তাকে বিছানায় শুইয়ে শান্ত করে, সান্ত্বনা দেয়।

আশ্চর্য্য হয়ে, আহত হয়ে সুদেষ্ণা চেয়ে থাকতে পারে শুধু। ঘরটা এখনও ঝলমল করছে। রঙীন বেলুন দুলছে বাতাসে। টেবিলে কেকটার পাশে ছোট ছোট রঙীন মোমবাতিগুলো দাঁড়িয়ে।

বাবলী ঘুমিয়ে পড়েছে। সুদেষ্ণা তার পাশে এসে দাঁড়ায়, চেয়ে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, কোথায় কোন্‌খানে ভ'রে রেখেছিল পুতুলটা? যার অভাবে এমন ফাঁকাটা সৃষ্টি হ'ল যেটা সে কিছুতেই ভরাতে পারবে না।

বাবলী ঘুমের মধ্যে অল্প অল্প ফোঁপায়। আজকের রাতটা কালকের সকালে পৌঁছে যাবে। সুমতিকে সে ভুলে যাবে। ঐ পুতুলটার কথাও তার মনে থাকবে না।

সবই হবে। কিন্তু আজকে ঐ পুতুলটাই শুধু ভাঙে নি তার মা। সেই সঙ্গে তার মনটা, তার বিশ্বাসটা ভেঙে দিয়েছে।

বড়রা ছোটদের মন কোনদিনও বুঝবে না। এই একটা কাঁচের পুতুল ভেঙে মা বাবলীর মনটাকে ভেঙে দিয়েছে।

ভেঙে দিয়ে তার কাছে ছোট হয়ে গিয়েছে মা। ঐ একটা ছোট্ট কাঁচের পুতুলের কাছে হেরে গিয়েছে,—নিঃশেষে হেরে গিয়েছে।

—•—

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ড্রাইভার সোহনলাল বাঁকা হাসি হেসে বললে, "তোর এ দেমাক থাকবে না, চ'লে যেতে চাস্ যা না, তোর মত দু'গণ্ডা মেয়েমানুষ রাখবার ক্ষমতা আমার আছে। তোর জন্যে লইলীকে আমি ছাড়তে পারব না। লইলীও এ বাড়ীতে থাকবে; তোর ইচ্ছে হয় থাক্, ইচ্ছে হয় চ'লে যা। দুটো বৌ-এর খরচ কুলোবার মত মুরোদ আমার আছে।"

পূর্ণিয়া স্বামীর শ্লেষবাক্যে তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠল। বললে, "দশজন সাক্ষী ক'রে আমাকে ঘরে এনেছ। আমি ঘরের বৌ, আমি ঐ বাজে মেয়েমানুষকে নিয়ে এক সংসারে থাকতে পারব না। যদি আমাকে নিজের মান দিয়ে রাখতে পার তবে আমি থাকব, নয়ত আমি চললাম। দু'খানা হাত আছে, অন্নের চিন্তা করি না। কিন্তু আমি যদি বাপের বেটী হই, খাঁটি আহীর মেয়ে হই, তবে তোমার দোরে ভাত-কাপড়ের জন্যে ভিখিরীর মত প'ড়ে থাকব না।"

পূর্ণিয়া হাঁফাতে লাগল, তার ঈষৎ গৌর মুখখানা রাগে উত্তেজনায় লাল টকটকে হয়ে উঠল। মাথার কাপড় স'রে গিয়ে রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষণকাল সোহন ঐ ক্রুদ্ধা সিংহীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। গোলমাল শুনে লইলী এসে রঙ্গস্থলে দাঁড়াল। মধুর মত মিঠা ঢেলে বলল, "সোহন, আমার জন্যে তোর বিয়ে-করা বৌ সংসার ছেড়ে চ'লে যাবে, সে কি হয়? তুই তোর বৌকে নিয়েই ঘর কর্, আমি আমার পথ দেখি।" ব'লে বাঁকা হাসি হেসে ঝমর্ ঝমর্ পায়জেব বাজিয়ে লইলী এসে সোহনের পাশে দাঁড়াল।

লইলীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চোখের চটুল চাহনি, পাৎলা রাঙা ঠোঁটের মিষ্টি হাসি সত্যিই সুন্দর। আঁটসাঁট গড়নের শরীরখানাতে ভরা-যৌবনের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে, বয়স বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। জরির কাজ-করা একখানা লাল চুনট করা ঘাঘরা পরেছে লইলী, ফুলতোলা চোলীতে বক্ষোদেশ এঁটে বেঁধেছে। আর তার উপর ছড়িয়ে দিয়েছে হাওয়ার মত ফুরফুরে ওড়না। মাথার কোঁকড়া চুলগুলো ফাঁপিয়ে বেশ নতুন ধরণের খোঁপা বেঁধেছে, তাতে গুঁজেছে একগুচ্ছ কুন্দকলি।

নিমেষে সোহনলালের মুখের কঠিন রেখা বদলে গেল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে লইলীর দিকে চেয়ে সোহন এগিয়ে এল।

লইলীর হাত ধ'রে বললে, "চল্, ওঘরে, কিছু ভাবিস্‌নে, আজই রতলামওয়ালীকে আমি রতলামে ছেড়ে দিয়ে আসছি, দেখব ত, সারা জীবন সে কি ক'রে কাটায়? মেয়েমানুষের অত স্পর্দ্ধা ভাল নয়।"

পূর্ণিয়া লইলীর দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে চাইল। কিন্তু সোহনের তাচ্ছিল্যভরা কথা, আর লইলীর প্রতি ঘোর আসক্তি, তার হৃদয়কে তীব্র ব্যথায় খান্ খান্ ক'রে দিতে লাগল। তার চোখের জলও যেন শুকিয়ে গেল, সে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল।

সোহন তাকে পৌঁছে দিয়ে এল মৌ পর্য্যন্ত। ফিরে যাবার সময় বললে, "ঘর তোর খোলা রইল, যখন ফিরে আসতে চাস্ চ'লে আসিস্।"

পূর্ণিয়া রুক্ষস্বরে বললে, "আহীর মেয়ে মাথা নোয়ায় না বেতমিজ মেয়েলোকের কাছে।"

ইন্দোরের টিকেট কেটে সেই রাতেই ফিরে চলল সোহন। বেঞ্চে শুয়ে শুয়ে আধ-জাগ্রত, আধ-নিদ্রিত অবস্থায় অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল। তার যতটা খুশী হওয়া উচিত ছিল, ততটা খুশী হয়ে উঠতে পারল না। মনটা কেমন যেন অবসাদে ভ'রে গেল। সোহন সত্যি বুঝি ভালবেসেছিল রতলামওয়ালীকে, তাই তাকে ছেড়ে দিয়ে মুষড়ে পড়ল।

পূর্ণিয়া চ'লে এল ছোট ভাই-এর কাছে। তাদের সংসার সে-ই গ'ড়ে তুলেছিল, তাই ভাই, ভাই-বৌ তাকে সাদরে টেনে নিল নিজেদের কাছে। তার পর এক যুগ কেটে গেছে। সুখে-দুঃখে, অবহেলায় দিন কাটিয়েছে পূর্ণিয়া। তার নিজের সুখ, বিলাসিতা সব ছেড়ে দিয়েছিল। কোনদিন ভাল ক'রে চুল আঁচড়ায় নি, একখানা ভাল শাড়ী পরে নি। কপাল আর সিঁথি থেকে সৌভাগ্যের চিহ্নটুকু মুছে ফেলেছে। খুলে ফেলেছে পায়ের আঙুল থেকে তার এয়োতির চিহ্ন বিছিয়া (রূপোর আংটি), হাতে শুধু কয়েকগাছা কাঁচের চুড়ি, আর পায়ে একগাছা মল, এই তার ভূষা। তার লাবণ্যভরা দেহ শুকিয়ে উঠেছে, মুখের কোমল ভঙ্গিমা দূর হয়ে কাঠিন্য এসে গেছে। একটা কঠোর রুক্ষতার আবরণে ঢেকে পূর্ণিয়া নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছে। কিন্তু এত ক'রেও পূর্ণিয়া নিজের মনের রসকে নিঃশেষ ক'রে শুকিয়ে তুলতে পারে নি।

দিনে সে কাজকর্ম্মে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে। রান্না ক'রে ভাই, ভাই-বৌকে খাওয়ায়, মেয়ে শুকদেবী আর ছেলে মহীন্দরকে যত্ন করে, আর বেশীর ভাগ সময় কাটায় ভাই-ঝি ইন্দিরকে নিয়ে। কত রকমে তাকে সাজায়, রূপকথা শোনায় আর গীত গায়। তার জীবনমরুতে এই শিশু তিনটিই 'ওয়েসিস্'। মনের মধ্যে নিমেষের তরেও সোহনকে উঁকি মারতে দেয় না। কিন্তু রাত্রে,—রাত্রে যখন সে মুক্ত আকাশের নীচে খাটিয়ায় তার কর্ম্মক্লান্ত দেহ এলিয়ে দেয়, তখন বলিষ্ঠ সোহন এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়।

পূর্ণিয়া তার ভরা-যৌবনের সুখোজ্জ্বল জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। এক এক সময়ে নিজেকে বড় অসহায় মনে করে। সোহনকে ভুলবার জন্যে পূর্ণিয়া তাকে পরিপূর্ণভাবে ঘৃণা করতে চায় কিন্তু পারে না। মনটা তার ঘুরে ফিরে সোহনের দুটি মাংসপেশীবহুল হাতের মধ্যেই বন্দী হতে চায়। এভাবে নিজের মনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে পূর্ণিয়া দেহমনে বিধ্বস্ত হতে চলেছে।

ভোরের দিকে মূলমন্ত্র আউড়িয়ে পূর্ণিয়া নিজেকে কঠোর ক'রে তোলে,—আমি যদি আহীর মেয়ে হই, তবে বেতমিজ মেয়েলোকের কাছে মাথা নোয়াব না। ঘাঘরা-পরা উচ্ছলযৌবনা লইলীর চেহারা চোখে ভাসে। পূর্ণিয়া সব স্মৃতি মুছে ফে'লে নিজেকে সংসার-আবর্ত্তে ডুবিয়ে দেয়।

সেদিন কি একটা ব্রত, রান্নাবান্নার পাট নেই। পূর্ণিয়া দোরগোড়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিল। একে একে তার বিগত জীবনের কথা মনে পড়তে লাগল। কবে কোন্ শৈশবে তার প্রথম বিয়ে হয়েছিল বাসুদেবের সঙ্গে, সে নিজেই ভাল ক'রে মনে করতে পারে না। খেলাঘর থেকে পূর্ণিয়াকে তুলে এনে বিয়ের পাটে বসিয়েছিল। অস্পষ্ট মনে জাগে শুধু বাজনা, আলো, রোশনাই, আহীর নাচ, আর নিজের নতুন জম্‌কালো সাজপোশাক, গয়না। যখন পূর্ণিয়া

কিশোরী তখন আর-এক পালা উৎসব-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে বাসুদেব এসে তাকে নিয়ে গেল নিজের সংসারে গৃহিণী ক'রে। শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-দেবর-বেষ্টিত সংসারে এসে চঞ্চলা বালিকা পুর্ণিয়া স্থির, শান্ত, কিশোরী বধূতে পরিণত হয়ে গেল। বাসুদেব পুর্ণিয়ার চেয়ে বয়সে একটু বেশী বড়ই ছিল। তার স্বভাব ছিল ধীর, স্থির। সে পুর্ণিয়াকে খুবই ভালবাসত। কিন্তু মুখের উচ্ছ্বাসে সে গভীর ভালবাসা প্রকাশ পেত না।

সে জাতে আহীর, তার সংসারে লক্ষ্মীদেবীর অকৃপা ছিল না। সে পুর্ণিয়াকে খুবই সুখে রাখল। শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যুর পর পুর্ণিয়াই হ'ল সর্ব্বরকমে সংসারের কর্ত্রী। সে তার নিপুণ হস্তে ছোট সংসারখানাকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে তুলল।

পুর্ণিয়ার মনে হ'ল, কত সুখেই না তার দিনগুলো কেটেছে। বিকেল হলেই পড়শী সখীদের নিয়ে পুর্ণিয়া চ'লে গেছে বেড়াতে, রাস্তার পাশে ফুলের ঝোপ থেকে ফুলের গুচ্ছ তুলে এ-ওর খোঁপায় পরিয়েছে। বনবিহঙ্গীরা হেসে খে'লে বেড়িয়ে ফিরেছে ঘরে। তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখিয়ে গৃহকর্ম্মে মন ঢেলেছে পুর্ণিয়া। স্বামী আসবে এক্ষুণি, আজকাল সে এক শেঠের বড় গোমস্তা। বাপ মারা যাবার পর গোয়ালাগিরির পাট তুলে দিয়ে সে এই চাকরি নিয়েছে। ত্রিশ টাকা মাইনে, আর সবজী-বাগিচার জন্যে এক টুকরো জমি। তা ছাড়া তার ঘরেও বহু ভেট আসে কার্য্যকারণে। কাজেই সুখের সংসারে অভাব নেই কিছুর। বাসুদেব পুর্ণিয়াকে দু-চারখানা গয়না একে একে গড়িয়ে দিয়েছে। পুর্ণিয়া যখন বড় বড় ফুলতোলা লাল শাড়ীখানি প'রে, লাবণ্যভরা গোল গোল হাতে রুটি বেলত, তখন তার গলায় বাসুদেবের দেওয়া সোনার মোহর গাঁথা মোটা হারটা ঝিক্‌মিক্ ক'রে দুলত, বাসুদেব মুগ্ধদৃষ্টিতে তাই চেয়ে দেখত। বাসুদেব খেতে বসত আর পুর্ণিয়া গরম গরম রুটি ভেজে থালায় পরিবেশন করত। বাসুদেবের মুখে একটা পরম তৃপ্তি ও শান্তির আভাস খে'লে যেত। ধীর শান্ত বাসুদেব কথা বড় বলে না, কিন্তু তার মুখের পরিতৃপ্তিই পুর্ণিয়াকে পরম সুখী ক'রে তুলত। কর্ম্মক্লান্ত বাসুদেবের কাছে পুর্ণিয়া তখন সখী-পরিবৃতা সেই হাস্যমুখরা চঞ্চলা কিশোরী নয়, সে তখন ধীর স্থির গৃহলক্ষ্মী, মুখে সলজ্জ একটু মধুর আভা।

* * * * *

আজ যেন কি হয়েছে, পুর্ণিয়া কিছুতেই ভুলতে পারছে না সেই পুরনো দিনগুলো। মনে পড়ল চোত-বৈশাখ মাসে সেই আম কুড়োবার ধুম। সইরা ছুটে ছুটে আম কুড়োয়, আর কে আগে কত আম কুড়োবে তাই নিয়ে হুটোপাটি ঝগড়া। তার পর সেই কাঁচা আম কেটে নুন লঙ্কাগুঁড়ো লাগিয়ে খাওয়া, আর সখীদের মধ্যে কত কানাকানি, হাসাহাসি, কত কথা, কোন বর্ষীয়সী নারীকে দেখলে তখুনি সংযত হয়ে যাওয়া। সেই বুড়ী মতিয়ার কথা যেন এখনও কানে ভাসে,—"এই ছুঁড়ীর দল, ঘরে ফিরে যা, ভর দুপুরে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে! যদি উপদেবতা ভর করে তখন মজাটা টের পাবি।" পুর্ণিয়া হাসি চেপে বলত, "না, না, বুড়ীমা, আমরা এখুনি ঘরে ফিরছি, একটু আমের ঝাল খাবে বুড়ীমা?" বুড়ী মতিয়া ফোকলা মুখে হাসি টেনে বলত, "মর্ যা ছুঁড়ী, তোদের মত যেন আমার নয়া যৌবন এসেছে? দাঁতে ধার আছে নাকি যে আম কচ্ কচ্ ক'রে খাব?" পুর্ণিয়া, লখিয়া, শান্তা, এরা সব হেসে ভেঙ্গে পড়ে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে পুর্ণিয়া ভাবে, কত আনন্দের দিনই না কেটেছে।

পুর্ণিয়ার যখন প্রথম সন্তান মেয়ে শুকদেবীর জন্ম হ'ল, তখন স্বামী-স্ত্রীর কি আনন্দ! আর যখন ছেলে মহীন্দরের জন্ম হ'ল, তখন ত একেবারে হৈ চৈ লেগে গেল।

শ্বশুরবাড়ীর সবাই এসে ভিড় করতে লাগল, বাপের বাড়ী রতলামে। পুর্ণিয়ার কাকা ব্যাণ্ড-পার্টি আনালে, আর নিজের বন্দুক দিয়ে এমনই গুলী ছুঁড়ল যে, ঘরের একটা দেওয়ালের অনেকখানি জায়গা ধ্ব'সে পড়ল। দশদিন ধ'রে বাড়ীতে উৎসব চলল। ঘাঘরা, ওড়না প'রে, কানে লম্বা দুল ঝুলিয়ে, নারীর বেশ ধ'রে সেই একদল পুরুষের কি নাচ গান! মাস-তিনেক পর বাসুদেব পুর্ণিয়া আর ছেলে মহীন্দরকে নিতে এল। সঙ্গে তত্ত্ব এনেছিল পুর্ণিয়ার জন্যে একটা সুন্দর শাড়ী, ছেলের জন্যে টুপী, জাঙ্গিয়া, কুর্ত্তা আর গলার একছড়া সোনার হার। আর তা ছাড়া দু'চার

রকমের মিঠাই। পুর্ণিয়ার বাপের বাড়ীর লোকেরা, আর কাকা বললে,"হ্যাঁ, জামাই তত্ত্বতালাস করতে জানে বটে।"

পুর্ণিয়া ভাবত, আহা, সংসারটা কি সুখের জায়গা, কিন্তু তার কপালে সে সুখ বেশী দিন সইল না। মাস দু'য়েক যেতে না যেতেই বাসুদেব টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হ'ল। পুর্ণিয়া ভাল ডাক্তার এনে দেখাল, কিন্তু রোগের কোন উপশম হ'ল না। বাসুদেব বুঝতে পারল, তার আয়ু ক'মে আসছে। সে পুর্ণিয়ার হাতখানা নিজের দুর্বল হাতে ধ'রে রাখল, আর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। এক সন্ধ্যায় বাসুদেব ভরা যৌবনে পুর্ণিয়াকে অভাগিনী ক'রে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিল। পুর্ণিয়া চীৎকার ক'রে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

বহুদিন পরে আজ মৃত বাসুদেবের সেই রোগক্লিষ্ট মুখখানা মনে পড়াতে পুর্ণিয়ার দু চোখে জলের ধারা নামল। খানিকটা কেঁদে পুর্ণিয়া শান্ত হ'ল। বুড়ো কাকার কথা মনে পড়ল। কাকাই ত তার বর্ত্তমান এ জীবনের জন্যে দায়ী।

চল্ লইলী ও ঘরে, তোরসঙ্গে কথা আছে।

বাসুদেবের মৃত্যুর পর পুর্ণিয়ার স্বভাব একেবারে বদ্‌লে গেল। সে বাচ্চা ছেলেমেয়ে-দুটিকে নিয়ে ঘরের কোণেই দিন কাটাতে লাগল। সইদের সঙ্গে সে আর হাসি-তামাসা করে না, আম কুড়োতে, ফল কুড়োতে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় না। সে স্তব্ধ গম্ভীর, যেন উদ্দাম তরঙ্গিণী চলতে চলতে বাধা পেয়ে হঠাৎ থমকে পড়েছে।

বুড়ো কাকা এসে বললে, "দেখ্ পুর্ণিয়া, তোর এ শুকনো মুখ, যোগিনীর বেশ আর আমি দেখতে পারি নে, আমি তোর আবার বিয়ে দেব।"

পুর্ণিয়া শিউরে উঠে বললে, "না, না, সে হয় না।" কিন্তু কাকা শুনল না, সমাজে পাট বিয়ের চল আছে তাই গাঁয়ের মোড়লকে ধ'রে অনেক খোঁজখবর ক'রে তবে ইন্দোরের পাওয়ার হাউসের ড্রাইভার সোহনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলে। সোহনের বৌ একটি চার বছরের মেয়ে রেখে মারা গেছে, সেই থেকে সোহন বেসামাল। যথেষ্ট রোজগার করছে অথচ ঘর শূন্য। প্রায়ই সোহন বন্ধুদের পাল্লায় প'ড়ে বাইরে রাত কাটায়। তাই সোহনও মা-মরা মেয়ের জন্যে একটা আশ্রয় খুঁজছিল। এ বিয়ের প্রস্তাব আসতেই সে সহজে রাজী হয়ে গেল।

পুর্ণিয়ার মেয়ে শুকদেবী আর ছেলে মহীন্দরের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে সে গ্রামের মোড়লদের সাক্ষী ক'রে পাট বিয়ে ক'রে পুর্ণিয়াকে ইন্দোরে নিজের ঘরে নিয়ে এল।

বাসুদেব ছিল গম্ভীর, আর পুর্ণিয়া ছিল শান্ত গৃহবধূ। আর সোহন বাসুদেবের একেবারে বিপরীত স্বভাবের। সে চঞ্চল, প্রাণবন্ত, আমুদে, উচ্ছৃঙ্খল। পুর্ণিয়ার বুকে যে চঞ্চলা হাস্যমুখরা লুকিয়েছিল, সে এবার জেগে উঠল যুবক সোহনের উদ্দাম প্রেমের স্রোতে। বড় আনন্দে আবার সুখের নীড় বাঁধলে পুর্ণিয়া।

সৌখীন সোহনের পাল্লায় প'ড়ে তাকে সাজগোজ করতে হ'ত বেশ। হয়ত কোনদিন ভাল ক'রে চুল আঁচড়ায় নি। সোহন একটা কাঁচি হাতে নিয়ে এসে বলত, "এই বৈরাগিনী, এদিকে আয়, তোর চুলগুলো কেটে দি।" হাসতে হাসতে পূর্ণিয়া ছুটে পালাত। সস্তার সুগন্ধি তেল ঢেলে পরিপাটি ক'রে চুল আঁচড়ে এসে বসত সোহনের কাছে। ধীরে ধীরে পূর্ণিয়া সোহনের উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ ক'রে টেনে নিল সংসারে। কিন্তু তার সে সুখও বেশী দিন সইল না। বছর পাঁচেক না যেতেই তার অদৃষ্টে ধূমকেতু দেখা দিল।

অতীত স্মৃতি পূর্ণিয়াকে বিহ্বল ক'রে তুলল। তার মুখে এতক্ষণ একটা শান্ত করুণ ভাব ছিল, এবারে মুখে কাঠিন্য ফুটে উঠল সেদিনকার কথা মনে ক'রে।

সোহনের ছোট্ট মেয়ের বিয়ে। সোহন তার যথাসাধ্য ধুমধাম করল মাতৃহীনা মেয়ের বিয়েতে। পূর্ণিয়াই সেজেগুজে সোহনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মেয়ের বিয়েতে মায়ের শুভকাজগুলি করল। বিয়ে সুন্দর মত হ'ল। বিয়ের ভোজও শেষ হ'ল। বাইরের নিমন্ত্রিতরা চ'লে গেছে। পূর্ণিয়া আর সোহন ক্লান্ত হয়ে একটু বসল বিশ্রামের আশায়।

এমন সময় নূপুরের রুণুঝুনু আওয়াজ তুলে একটি তরুণী এসে দাঁড়াল। বললে, "সোহন, এই বুঝি তোর পাট বিয়ের বৌ!" কথার ধরণ আর হাসি শুনে পূর্ণিয়া চমকে উঠল। সোহন উত্তর দেবার আগেই নাচের ভঙ্গিতে হেলেদুলে তরুণীটি পূর্ণিয়ার কাছে এগিয়ে গেল, বললে, "দেখতে এলাম—সোহনের চাঁদকে, যাকে পেয়ে সোহন আমাদের ভুলেছে।"

পূর্ণিয়া সারাদিনের কর্মক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়েছিল খাটিয়াতে। ত্রস্তে লাফিয়ে উঠে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে চাইলে ওর দিকে। সোহন তাড়াতাড়ি উঠে তরুণীর হাত ধ'রে বললে, "চল্ লইলী ও ঘরে, তোর সঙ্গে কথা আছে।"

পূর্ণিয়ার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে সর্বাঙ্গে গয়নার ঝিকমিক তুলে ঘাঘরা-পরা তরুণী চ'লে গেল সোহনকে নিয়ে। পূর্ণিয়ার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। কে এই সর্বনাশী, কেমন তার কথা, কেমন তার চাউনি! কে এই লইলী? তবে কি তার সুখের সংসারে আগুন লাগল?

দুঃস্বপ্নের মত রাতটা কাটল। ধীরে ধীরে পূর্ণিয়া লইলীর সব কথা জানতে পারলে। সর্বনাশী তাকে পুরোপুরি আবার উচ্ছৃঙ্খলতার পথে টেনে নিয়ে চলেছে। পূর্ণিয়া প্রাণপণ চেষ্টায়ও তাকে ফেরাতে পারল না। তার পর যেদিন সোহন এসে তাকে বললে, লইলীও তার সঙ্গে এ বাড়ীতে থাকবে, তখনই তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল তারপরই ছাড়াছাড়ি।

পুরোনো স্মৃতির আলোড়নে পূর্ণিয়ার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবল, তার কি হতভাগ্য জীবন! কপালে বহু দুর্ভোগ ছিল তাই বছর-কয়েকের জন্যে পাট বিয়ে ক'রে কপালে কালিমা লিপ্ত ক'রে এল সে যদি বাকী জীবনটা স্বামী বাসুদেবের স্মৃতি বহন ক'রে বৈধব্য-জীবন কাটাত, তা হলে তার জীবনে এই লাঞ্ছনা আসত না।

সোহনলাল যখন তাকে রতলামে ছেড়ে আসে তখন সে মাস-চারেকের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সোহন তা জানত না। তার ভাই-এর বাড়ীতে এসে যথাসময়ে শিশু জন্ম নিল, কিন্তু আঁতুড়েই মারা গেল। আর দুঃখে কষ্টে অপমানে ভগ্নস্বাস্থ্যে পূর্ণিয়া রোগের ধাক্কা থেকে বহু কষ্টে বেঁচে উঠল। তিক্ত হয়ে ভাবলে, সোহন তাকে দেহমনে রিক্ত ক'রে দিয়েছে সত্য, কিন্তু সে কি তাকে নিঃশেষে ভুলতে পেরেছে? এই সোহনের উচ্ছল প্রেমের স্পর্শেই ত তার হৃদয় পুষ্প বিকশিত হয়ে উঠেছিল মাধুর্য্য নিয়ে, কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে সেটা মুদিত হয়ে গিয়েছে অকালে। না, সে সোহনকে ক্ষমা করবে না।

* * * *

মেয়ে শুকদেবীর বিয়ে। সোহনলালকে নিমন্ত্রণ করল পূর্ণিয়ার ভাই। সোহনও অনেক শাড়ী কাপড় গয়না ও মিঠাই নিয়ে শুকদেবী ও জামাইকে আশীর্ব্বাদ করতে এল। কিন্তু পূর্ণিয়া কিছুতেই সোহনের সঙ্গে দেখা করতে গেল না। নানা কাজের বাহানা ক'রে আড়ালে আড়ালেই রয়ে গেল, আর চোখের জল মুছতে লাগল। বিয়ের পরদিন জামাই-মেয়ে বিদায় হবার পর সোহনও যাত্রার উদ্যোগ করল। টাঙ্গাতে মালপত্র চাপিয়ে সে বহু চেষ্টা করল পূর্ণিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু বিয়েবাড়ীর কুটুম্বিনীদের মধ্য থেকে পূর্ণিয়াকে বের করা সহজ নয়। একটা ঘরের ভেতর লুকিয়ে জানলার ভেতর দিয়ে পূর্ণিয়া টাঙ্গার দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল কাঠের পুতুলের মত।

ঘোড়া খুরের আওয়াজ তুলে টাঙ্গা নিয়ে ছুটল। পূর্ণিয়ার মনে হ'ল টাঙ্গাটা যেন তারই বুকের উপর দিয়ে ঘড় ঘড় ক'রে চ'লে যাচ্ছে। অশ্রুজলে তার চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এল। পূর্ণিয়া ভাবলে, তার ত ছিল সব, এখনও আছে। ইচ্ছে করলেই সে নিজ সংসারে স্ত্রীর দাবীতে বসতে পারে, কিন্তু নাঃ, ছিঃ, যে দুধে মাছি প'ড়ে গেছে, সে দুধ সে স্পর্শ করতে পারবে না।

—*—

বাঙালী হিন্দুরা যেন জার্মেনীর ইহুদী। জার্মান ইহুদীরা ও তাহাদের বাপ পিতামহ, প্রপিতামহ জার্মেনীর মানুষ। কিন্তু জার্মেনী তাহাদিগকে নিজের বলিয়া স্বীকার ত করিলই না, অধিকন্তু তাহাদের উপর অত্যাচার করিল, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। বাঙালী হিন্দুরা বাঙলা দেশ হইতে তাড়িত এখনও হয় নাই বটে, ভারতবর্ষ হইতেও তাড়িত হয় নাই বটে; কিন্তু বাংলা দেশে তাহারা সরকারী ব্যবহার এরূপ পাইতেছে, যেন তাহারা বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই। বঙ্গের বাহিরেও তাহাদের সেই দশা। বিহার প্রদেশে, যুক্তপ্রদেশে, আসামে, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য উৎপীড়িত; তাহারা যদি চাকরী পায় সেটা তাহাদের উপর দয়া; যদি কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিছু উপার্জন করিতে পারে সেটাও অন্যদের দয়া; বৈজ্ঞানিক সরকারী পরিভাষা হইবে, সেখানে বঙ্গের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিনিধি কেহই নাই। তাহারা যেন বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই, ভারতবর্ষেরও কেউ নয়, ভারতবর্ষের জন্যও কখনও কিছু করে নাই। সুতরাং যেমন, যদি জার্মান ইহুদীদিগকে কেহ বলিত, "ওহে, দেশের জন্য কিছু কর," তাহা হইলে তাহারা বলিতে পারিত, "আমাদের দেশ কোথায়?" সেইরূপ যদি কেহ বাঙালী হিন্দুদিগকে বলে, "দেশের জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত, দেশের জন্য কিছু কর," তাহারাও বলিতে পারে, "কোথায় আমাদের দেশ?"

প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গ,
—আশ্বিন,—১৩৪৭।

ষাট বৎসরের বাংলা ও বাঙালী

শ্রীকালিদাস নাগ

ষাট বছর আগে যে দেশকে 'বাংলা' ব'লে জেনেছি সে দেশ নেই, কিন্তু বাংলা ভাষা আছে। ভাষাতাত্ত্বিক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৫ সনে Barcelona PEN ক'ংগ্রেসে বলেছিলেন, পূর্ব্ব-ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা বাংলা প্রায় ৬০ মিলিয়নের মাতৃভাষা, তাই পৃথিবীর সপ্তম ভাষা হওয়ার দাবী রাখে। দু'বার দু'দফা 'পার্টিশান'-এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক, অর্থাৎ আজ মোট ৩০ মিলিয়ন।

হঠাৎ এ অবস্থা বাঙালীদের হয় নি, সেটা আমাদের বুঝতে হবে। ভারতের অন্য জাতি- ও ভাষা-জাগরণের আগে বাংলাতেই ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি গঠন সুরু হয় রাষ্ট্রচেতনা ও ঐক্যমন্ত্রের আদিগুরু রামমোহনের যুগে (১৭৭২-১৮৩৩)। ব্রিষ্টলে তাঁর অকাল-মৃত্যুর ৫০ বছরের মধ্যে দেখি, রামমোহনের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৬) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রথম সম্পাদক (১৮৫১-৫৬) এবং বাংলার প্রবীণ নেতারূপে পরামর্শ দিচ্ছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১ম কংগ্রেস-সভাপতি), প্রভৃতি কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠাতাদের। ১৮৮৫ সালে দ্বারকানাথ-পুত্র দেবেন্দ্রনাথের মোটা ১০০১৲ দান তাঁদের খাতায় উঠেছিল। তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ ২৪।২৫ বছর বয়সে রামপ্রসাদী সুরে স্বদেশী গান লিখেছেন কংগ্রেসের জন্য, "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।" যুবক রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ সালে দ্বিতীয়বার বিলাত পরিভ্রমণ সেরে চীন, জাপান ও আইরিশ জাতীয়তাবাদীদের অনেক খবর দেশে আনেন ও তাঁদের 'সাধনা' পত্রিকায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রচার সুরু করেছেন। দেবদুর্লভ কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ সে যুগে কংগ্রেসকে মাতিয়েছেন, একক কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) 'বন্দেমাতরম্' (নিজ সুরে) গান ক'রে। ১৩০০ সালের চৈত্র শেষে ঋষি বঙ্কিম দেহত্যাগ করার কয়মাস আগে 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন বঙ্কিমের সভাপতিত্বে; অথচ 'আনন্দমঠে'র রচয়িতা ঋষি বঙ্কিমের উত্তর-সাধক যে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) সে কথা বাঙালীরা প্রায় ভুলতে বসেছে ও তার শাস্তিও পেয়েছে। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন, কমলাকান্ত, অনুশীলন ও প্রবন্ধমালা রবীন্দ্র-গদ্যের ভূমিকা।

"স্ব-ভাষায় শিক্ষার মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াই দেশের স্থায়ী উন্নতি; ইংরেজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব। অন্যের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগ স্বীকারেই প্রকৃত কার্য্যসিদ্ধি।"

বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯৪ সালে রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তি শুনে মনে মনে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, যেমন করেছিলেন ১৮৮১ সালে তাঁর বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় দে'খে। রবীন্দ্রনাথের দু' বছরের কনিষ্ঠ নরেন্দ্র দত্তও (১৮৬৩-১৯০২) পরে বলেছিলেন, চালাকি দ্বারা মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হয় না। স্বামী বিবেকানন্দরূপে তখনও বেলুড়ে মন্দির স্থাপন তিনি করেন নি; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ শুধু ধর্ম্মে নয়, কর্ম্মেও বাঙালীকে সৎ ও সচেতন হতে অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দকে গান্ধীজী এবং পণ্ডিত নেহরুও স্মরণ করেছেন

১৯ শতকের শেষ দশকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী গড়ে তুলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতীয় কংগ্রেস এবং সেখানের প্রবাসী ভারতীয়দের নির্য্যাতনের কথা কলকাতা কংগ্রেসে (১৯০১) গান্ধীজী প্রথমে তোলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন (প্রায় ৩৯ বছরেই) শেষ শয্যা নিয়েছেন, তাই গান্ধীজী চেষ্টা ক'রেও তাঁর দর্শন পান নি। সুরেন্দ্র বন্দ্যোর রিপণ কলেজে গান্ধীজী ব'সে 'স্বেচ্ছাসেবক'রূপে কংগ্রেসী চিঠিপত্র লিখেছেন ও শিশির ঘোষ ও ভূপেন্দ্র বসু প্রমুখ বাঙালী নেতারা গান্ধীজীর সমর্থক ছিলেন।

সে যুগেই আবার দেখি, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫১) আই-সি-এস ছেড়ে বরোদারাজের আশ্রয়ে শিক্ষাব্রত সুরু করেছেন। নতুন ক'রে তাঁর মাতৃভাষা বাংলা অরবিন্দ শিখছেন ও 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ, দয়ানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে গভীর আলোচনা ক'রে জাতিগঠনে মন দিয়েছেন (১৮৯৩-১৯০৩)। আইরিশ নেতা Parnell-এর প্রতি অরবিন্দের অনুরাগ প্রমাণ করছে যে, ভারতীয় নেতারা ইংরেজ-নির্য্যাতিত আইরিশদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনেরও চেষ্টা করছেন। এর বহু পূর্ব্বেই রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই চেষ্টা ক'রে গিয়েছেন। আবেদন ও নিবেদনের ডালি নিয়ে ইংরেজ প্রভুদের বরণ করা বৃথা, কবি রবীন্দ্রনাথও সেটি স্পষ্ট ক'রে গদ্যে ও পদ্যে বহুবার বলেছেন। মারাঠার একচ্ছত্র নেতা বালগঙ্গাধর তিলক 'নরম পন্থা' ছেড়ে 'গরম' দল (Extremist) গড়েছেন। শাদা শাসক হত্যার পালা পুণা থেকে বারীন ঘোষের বাংলা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, উত্তর বঙ্গের শহীদ প্রফুল্ল চাকীর গুরুরা বঙ্গচ্ছেদের (১৯০৫) আগে থেকেই কঠোর 'সন্ত্রাস-বাদ' (Terrorism) ও গুপ্ত সমিতি সুরু করেছেন।

বড়লাট কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে ভারতশাসন করেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাদেশিকতার উত্তেজক প্রধানতঃ বাঙালীদের প্রতি বিরূপ হন। তাঁর বাঙালীবিদ্বেষ উৎকট ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কনভোকেশন-বক্তৃতায় সারা জাতিকে মিথ্যাবাদী বলায় পরদিন সকালের অমৃতবাজার পত্রিকায় লাটসাহেব দেখেন যে, তিনিও যে চীন সম্রাটের কাছে মিথ্যাচরণ ক'রে এসেছেন সেটি কার্জনের স্বরচিত বই থেকে বাংলার সাংবাদিক ছেপে দিয়েছেন। বিবেকানন্দের আইরিশ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার হাত এখানে ছিল শোনা যায়। এ একেবারে অসহ্য—তাই বাঙালীকে "ভাতে মেরে টিট্ করা চাই"। বাংলা পার্টিশানের মূল কারণ এইখানে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম এতকাল অখণ্ডভাবে যে বাংলার অঙ্গীভূত ছিল, তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে প্রথম খণ্ডিত-বাংলা এবং বিহার উড়িষ্যার (ক্লাইবের দেওয়ানী) শাসন চলল। রাজ্য-শাসন-অজুহাতে শাস্তি পড়ল একা বাঙালীরই মাথায়। কত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিধি-বিধান, এমন কি ছাত্র-শাসন সার্কুলার, প্রভৃতি জারি ক'রে ইংরেজ বাঙালীদের পঙ্গু করতে চেষ্টা করেছে, তার তালিকা করলে বড় গ্রন্থ হয়ে দাঁড়ায়।

কার্জন-পার্টিশানের প্রায় দশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী'তে লেখেন (১৮৯৪): "আজকাল হিন্দু-মুসলমানবিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে···আমরা কি গোপনে বলি না যে, এই উৎপাতের প্রধান কারণ, ইংরাজেরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না, তাহাদের রাজনীতির মধ্যে প্রেমনীতির স্থান নাই। ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষ্যা বেশী করিয়া বপন করিয়াছে।" গান্ধী ও জিন্না অবশ্য এ প্রবন্ধ পড়েন নি!

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ২০ বছরের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িকতা-বিষের নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ অবধি দে'খে মর্ম্মাহত হয়ে গেছেন। 'কালান্তর' গ্রন্থে আমার সঙ্গে কবির (১৯২২) পত্রালাপে তার জলন্ত প্রমাণ আছে। কবির শেষ জীবনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal Award), গৃহবিচ্ছেদ ও মহাত্মাজীর অনশন নিবারণে কবির একান্ত আগ্রহ স্মরণ করায় বাংলার স্থায়ী সঙ্কট-(crisis)-গুলিকে। শ্যেন-দৃষ্টি দিয়ে দেশবরেণ্য নেতা রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর সঙ্কট-ত্রাণে কত প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গান লিখেছেন, এমনকি গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার Passive Resistance বা অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্বে ধনঞ্জয় বৈরাগীর রূপে তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে (১৯০৯) গেয়েছেন:

"ওরে আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।"

যখন রবীন্দ্রনাথ এ গান গেয়েছেন তখন বাংলার ঘরে ঘরে আগুন লেগেছে। অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়েই একমাত্র মুক্তি, এ সত্য বাঙালী তরুণরাই প্রথম বুঝে প্রাণের মূল্যে সারা দেশকে বুঝিয়েছে,—আজ সে কথা ক'জন মনে রাখে? বাংলার তথা ভারতের এই অগ্নিযুগের ইতিহাস আজও (খণ্ডিত আলোচনা হয়ে থাকলেও) প্রায়

অলিখিত। তবু মারাঠী নেতা তিলক ও পাঞ্জাব-কেশরী লাজপৎ রায় বাংলার আন্দোলনে পূর্ণ সহযোগ করেছেন, তাঁদের পরে অন্য প্রদেশের নেতারা সতর্কে এগিয়েছেন। বাংলার আধুনিক ইতিহাস লেখা হলে হয়ত সেটি সবাই বুঝবে।

আত্মাহুতি দিলে তবেই স্বাধীনতা আসবে—এটা বাঙালী প্রথম থেকেই বুঝেছিল। ১৮৫৭ সালের Mutiny মৃত্যুযজ্ঞের মধ্যে কবি রঙ্গলাল তাঁর পদ্মিনীতে লেখেন:

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?"

সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জে উঠেছে হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত,' ও সত্যেন ঠাকুরের 'জয় ভারতের জয়' গানটিকে বঙ্কিমচন্দ্র অভিনন্দন করেছেন। বাঙালী নেতারা গণ-সংযোগ ও স্বাবলম্বন শিক্ষা দিয়েছেন (১৮৬৩ সালে) হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা ক'রে ও মনীষী রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা', ইত্যাদি প্রকাশ ক'রে। ১৮৭২এ (শ্রীঅরবিন্দের জন্মসন) বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ ক'রে নব প্রেরণা ও নবযুগের সূচনা করেছেন। ক্রমশঃ তাঁর 'বন্দেমাতরম্' ও 'আনন্দমঠ' জাতীয় শক্তিকে রূপ দিয়েছে, কেন্দ্রীভূত করেছে। সেই আদর্শে শ্রীঅরবিন্দ পরে 'ভবানীমন্দির' লেখেন। ১৮৯৩ সালে আশৈশব ইংলণ্ডে লালিত ও শিক্ষিত শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় ভাব ও সাহিত্য বিকাশে নেমেছেন। সেই বছরই দেশপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ Chicago Parliament of Religions সভায় চিরন্তন ভারতের বাণী শুনিয়েছেন ও জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ দেশনেতা সন্ন্যাসীরূপে বাংলার প্রাণশক্তির উদ্বোধন ও তরুণদের অনুপ্রাণিত ক'রে গেছেন। নেতাদের মধ্যে দীর্ঘজীবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ। এঁদের বিরাট্ রচনা, গদ্যে ও পদ্যে যখন ভাল ক'রে সবাই পড়বে, তখন হয়ত বুঝবে ১৯শ শতক থেকে ২০শ শতকের প্রথমার্দ্ধ প্রায় শেষ ক'রে, এঁরা কি অমোঘ ইঙ্গিত ক'রে গেছেন; বাঙালী ছাত্রছাত্রীদেরই এই ঋষি-ঋণ শোধ করতে হবে।

বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৬-১৯১১) রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন ও এই পুণ্যব্রতা নারী বাগবাজার থেকে বরোদা গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর অনুজ বারীন ঘোষ বহুবার যাতায়াত ক'রে ১৯০৫ সালে দাদা অরবিন্দকে বরোদা থেকে বাংলায় আনেন। অরবিন্দ "জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের" অধ্যক্ষ রূপে কাজ সুরু করেন। জ্বলন্ত লেখা তাঁর দেখা দিতে সুরু করে বিপিনচন্দ্র পালের প্রতিষ্ঠিত 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায়। তার দু'জন সাক্ষী এখনও জীবিত—বিবেকানন্দের অনুজ পণ্ডিত ভূপেন দত্ত ও প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। তাঁদের সহযোগী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সহকর্ম্মীরূপে কিছুকাল শান্তিনিকেতনে কাজ ক'রে শেষে কলকাতায় আসেন ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকার দীপ্ত রচনায় সারা বাংলাকে মাতিয়ে ইংরেজের জেলেই দেহত্যাগ করেন। অন্যদিকে বিপ্লবী যুবকদল বারীন ঘোষের নেতৃত্বে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ ও মানিকতলা বাগানে বোমা তৈরি ও গুপ্তহত্যার আয়োজন ক'রে ধরা পড়ে। আইরিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে রুশ বিপ্লববাদেরও খবর তখন এদেশে পৌঁছেছিল কিনা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নি। কিন্তু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (দেবেন্দ্রনাথের অর্থসাহায্যে) ১৮৭৮ সালে ইউরোপ ও রাশিয়া ভ্রমণ ক'রে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাদিতে রুশ চিন্তাধারা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। কম্যুনিজমের আগে Anarchism ও Nihilism শব্দরূপ বাংলায় ঢুকতে সুরু করে। কিন্তু গান্ধী (১৮৬৯), লেনিন (১৮৭০) ও বিপ্লবী অরবিন্দ (১৮৭২) সবাই এক বিরাট্ বিপ্লবযুগেই জন্মান। তাঁরা নিজ নিজ পথ খুঁজে, অত্যাচারীদের হটিয়ে দেশের সাধারণ মানুষদের স্বাধীনতা-যুদ্ধে নামান। ইউরোপ ও U. S. S. R. "খোঁজ পরিষদ্" সে যুগের কাগজপত্র থেকে যত ছেপেছে, আমাদের Mutiny (১৮৫৭-৫৯) বিষয়ে সম্প্রতি চর্চ্চা সুরু হলেও বাংলা ভাষায়, বহুধা ধ্বংসীকৃত কিন্তু কিছু কিছু রক্ষিত, অনেক মূল্যবান্ দলিলপত্র আজও প্রকাশিত হয় নি। স্বাধীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে

অগ্রণী হয়ে 'সংবাদপত্রে এ কালের কথা' (১৯০০-১৯৪৭) প্রকাশ করালে, বাংলা বিপ্লবের ইতিহাস রক্ষা পাবে। বাঙালী সর্ব্বাগ্রে এগিয়ে অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিন পালের নেতৃত্বে শুধু চিন্তানায়কত্ব করেছে তা নয়—এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী জীবন-উৎসর্গও ক'রে 'শহীদ' হয়েছে। স্বদেশীযুগের সাহিত্য প্রধানতঃ দলিল ও অধুনা-দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা-পুস্তিকাদির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। স্বাধীন ভারতের Home Minister-দের আশু কর্ত্তব্য সে-সব স্বাধীনতার দলিল রক্ষা ও প্রকাশ করা। 'আনন্দমঠের' প্রেরণায় সে-যুগে অরবিন্দ যে 'ভবানী-মন্দির' লেখেন সেটি বাজেয়াপ্ত হলেও Rowlatt-মিত্র মশাই পড়েন ও Lord Ronaldshayকে পড়তে দেন। এই হদিশ পেয়ে ভবানী-মন্দির বহু কষ্টে মৌলানা আজাদ সংগ্রহ করেন—তার টাইপ কপি বন্ধু সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের কাছে দিল্লীতে দেখেছি, কিন্তু আজও ছাপা হতে দেখিনি। ক্ষুদিরাম, কানাই, অরবিন্দ, উল্লাসকর, বারীন্দ্র, প্রভৃতি ধরা পড়ার পর সেকালের চিঠি ও কাগজ পুলিস নষ্ট করলেও এখনও বাংলা ভাষায় স্বাধীনতার ইতিহাস লেখার সবচেয়ে বেশী মাল-মশলা মিলবে।

স্বদেশীযুগের প্রায় দশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননী,
রেখেছ বাঙালী ক'রে মানুষ করনি।"

এই আক্ষেপের জবাব দিয়ে গেছে বাঙালী তরুণ-তরুণী—মানিকতলা থেকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র জীবন বলি দিয়ে; তাদের কাহিনীও প্রায় অলিখিত।

কারারুদ্ধ তরুণদের হাতে পায়ে শৃঙ্খলের কঠিন শব্দ জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের কানে পৌঁছেছিল। তাই তিনি গেয়েছিলেন :

"(ওরে) শিকল তোমায় কোলে ক'রে
দিয়েছি ঝঙ্কার,
(তুমি) আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহঙ্কার।"

রবীন্দ্রনাথই ১৯০৪ সনে বাংলা তথা সারা ভারতের National Planning, প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা দেন তাঁর অমূল্য 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে :

"এই সময় বাঙালীকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাহা যেন একেবারে উল্টাপাল্টা হইয়া না যায়; বাহিরে অর্জ্জন করিতে হইবে ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে, কিন্তু আমরা আজকাল—

'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর'।"

'স্বদেশী সমাজ' নামকরণ রবীন্দ্রনাথের; কবি হয়েও তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের নিখিল-ভারতীয় রূপ দিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে তিনি 'প্রায়শ্চিত্ত' থেকে 'রক্তকরবী' নাটকে ও 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' থেকে 'চার অধ্যায়' উপন্যাস রচনায় তাঁর সাহিত্যকেও দার্শনিক ভিত্তি দিয়েছেন। এ যুগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' কবির প্রধান মুখপাত্র হয়েছিল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পরাধীন ভারতীয়দের স্বাবলম্বী ও স্বাধীন হওয়ার দীক্ষা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভব নয়, তাই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আমাদের গড়তে হবে, এই নতুন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তকও বাঙালী রবীন্দ্রনাথ, মনীষী গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীঅরবিন্দ; এঁরা যে 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্'-এর ভিত্তিপত্তন করেন সেটি সর্ব্বজনবিদিত। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ রুশ চিন্তানায়ক টলষ্টয়-এর রচনা গভীরভাবে পড়েছেন ও উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

"[illegible] যে একটি মাত্র সাধক য়ুরোপে [illegible] আসনে বসিয়া নিরন্তর অরণ্যে রোদন করিয়া [illegible] (তাঁর বয়স তখন প্রায় ৮০) সেই টলষ্টয় রাশিয়ার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি :

"The strength of the Government lies in the people's ignorance and the Government knows this and will, therefore, always oppose true enlightenment···It is strange to see good wise people spending their energies in a struggle against the Government but carrying on this struggle on the basis of whatever task the Government itself likes to make."

বলা বাহুল্য, এই উক্তি ও এই বিপ্লবী চিন্তাধারার জন্য শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে বহুকাল নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়েছে এবং গান্ধীজীও একথা বুঝে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে টলষ্টয়ের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার সুরু করেন। আমার 'Tolstoy and Gandhi' গ্রন্থে ভাষ্যসহ তাঁদের দু'জনের সব চিঠি ছেপেছি ও সেই গ্রন্থ মস্কো টলষ্টয় মিউজিয়াম ও তাঁর জন্মস্থান Yasna Poliyana গ্রন্থাগারে দিয়ে এসেছি। বাঙালীর বৈষ্ণব নেতা বাবা ভারতীর 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থ ও বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' টলষ্টয় সযত্নে পড়েন। চিন্তা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা যে অগ্রণী সে কথা গোখ্‌লে থেকে সুরু ক'রে অনেক সর্ব্বভারতীয় নেতারা স্বীকার করেছেন এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে (১৯০৮-২৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভারতের প্রায় সব শ্রেষ্ঠ ভাষা ও বৌদ্ধ পালি তিব্বতীতে শিক্ষাদানও সুরু হয়। Indian History and Culture বিষয়ে ক্লাশ গড়াও এখানে প্রথম সুরু করেন স্যার আশুতোষ।

এই সময় আবার বিজ্ঞান-শিক্ষা বিস্তারে স্যার আশুতোষ সচেষ্ট হন। ১৯০৮ সনে University Jubilee থেকে সুরু ক'রে দশ বছরের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা তিনি পান প্রসিদ্ধ দুই ব্যবহারজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার তারকনাথ পালিতের নিকট। এই দুই দানবীরের দানেই ভারতে প্রথম University College of Science গ'ড়ে ওঠে। এখানে ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন বসু থেকে সুরু ক'রে কত শিষ্য-প্রশিষ্য আজ ভারতের না[illegible] বিজ্ঞান ও শিল্প (Industry) বিভাগে কাজ করছেন। Palit Professor সি. ভি. রামন ১৯৩০ সনে কলিকা[illegible] অধ্যাপকরূপেই দ্বিতীয় নোবেল প্রাইজ পান। এশিয়া থেকে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান 'গীতাঞ্জলি'র অমর কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯১৩)।

এ সবের মূলে আছে দু'জন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের যুগব্যাপী সাধনা :—ডাঃ জগদীশ বসু (১৮৫৮-১৯৩৮) ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)। তাঁরা যে-সব গবেষণা করেছেন তার সাড়া শুধু সারা ভারতে নয়, বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক মহলেও সংবর্দ্ধনা পেয়েছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষক-শিরোমণি হলেও বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষিত বাঙালীদের কঠোর সমালোচনা ক'রে গেছেন তার প্রমাণ 'বাঙালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার'। পরে তাঁরই শিষ্যেরা (৺রাজশেখর বসু অন্যতম B.C.P.W. সংগঠক) নানা পরীক্ষায় ও সংগ্রামে জয়ী হয়ে ব্যবসায়ে বাঙালীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে বেঙ্গল ইমিউনিটি ও ক্যালকাটা কেমিক্যাল প্রভৃতি ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিষ্ঠানগুলি তার স্থায়ী নিদর্শন। ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে কিছু এগিয়ে মার খেলেও বীমা ব্যবসায়ে বাঙালী কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তবু এটি আজও নিখুঁত সত্য যে, আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে অগ্রণী হলেও বাঙালী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বহু পশ্চাতে এবং বাঙালী বেকারদের সংখ্যা হয়ত সবচেয়ে বেশী। অর্থকরী বিদ্যা ও কার্য্যকরী শিক্ষার দিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যথাযোগ্য মনোযোগ দিলে—শুধু বি-এ, এম-এ উপাধিধারী বেকারসংখ্যা না বাড়িয়ে, কেবল সাংস্কৃতিক (cultural) শিক্ষার অত্যধিক বিস্তার না ক'রে—তরুণ-তরুণীদের জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে সাহায্য করতেন। ১ লক্ষ ২০ হাজার বিদ্যার্থী-সংখ্যা কিন্তু আজ বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের নিষ্ফল জীবন বাঙালীসমাজের ভিত্তি শিথিল করছে।

অধিক বাঙালী ব'লে যে আমরা পরিচয় দিতে লজ্জা পাই তার কারণ অনাবশ্যক শিক্ষা। কারণ, ভোজাইদের মত বাংলা দেশেই কল-কারখানা সবচেয়ে বেশী আজও দেখা যায়। অথচ কলকাতা তথা মফঃস্বলের বিরাট শিল্পকেন্দ্রগুলিতে বেশীর ভাগ শ্রমিকই বেহারী, ওড়িয়া অথবা তৈলঙ্গী। এদের বাদ দিলে রেলোয়ে ষ্টেশন বা কর্পোরেশনের কাজ অচল। অথচ অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালী বেকার, কেরাণী বা অফিসের বেয়ারা হতে উদ্গ্রীব। এই শোচনীয় অবস্থা হবে ও কি উপায়ে শেষ হবে? কবে বাঙালী শ্রমের মূল্য ও শ্রমিকের মর্য্যাদা বুঝবে? U.S.S.R. পরিক্রমা শেষ ক'রে এই কথাই সর্ব্বাগ্রে আমার মনে হ'ল। Tsarist রাশিয়া আমাদেরই মত পিছিয়ে ছিল। ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ এই ৩০ বছরের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধের কঠিন পরীক্ষা পার হয়ে বিজয়ী সোভিয়েটের নরনারী আজ সারা জগতে (ও বহির্জ্জগতের বিশাল ব্যোমমার্গে) অগ্রণী।

১৯১২তে বঙ্গচ্ছেদ প্রত্যাহার ক'রে ইংরেজ লাট হার্ডিঞ্জ যখন নতুন রাজধানী দিল্লী প্রবেশ করবেন তখন তাঁর উপর বোমা পড়ল। (জাপানপ্রবাসী ৺রাসবিহারী বসুর নাম এর সঙ্গে জড়িত।) ইংরেজ শাসকদল বাঙালীকে পিষে মারতে এবার বদ্ধপরিকর হ'ল, তার ফলেই Rowlatt Act (১৯১৮)। অমৃতসরে হত্যাকাণ্ডের প্রথম প্রতিবাদ করেন, কোন রাজনৈতিক নেতা নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি ১৯১৯ সালে সমগ্র জাতির হয়ে প্রতিবাদ জানালেন সম্রাটের 'নাইট' উপাধি ফেরত দিয়ে। তৎজনিত ইংরেজ রোষ তাঁকে ও তাঁর প্রতিষ্ঠানকে কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল তার কিছু পরিচয় পাই যখন কবিগুরুর সঙ্গে বিলাতে (১৯২০-২১) কাটাই। 'রবীন্দ্রসদন' দপ্তর থেকে তার অনেক প্রমাণ ক্রমশঃ পাওয়া যাবে। ইউরোপ ছাড়া আমেরিকার (USA Journals) ফাইলও ঘাঁটা দরকার। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, শিকাগো, কালিফোর্নিয়ার প্রবাসী বাঙালীর এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ইতিমধ্যে গান্ধীজী দীর্ঘ ২১ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের নেতৃত্ব ক'রে 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন সেখানে সুরু ক'রে ভারতে ফেরেন ও চম্পারণ নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রথম ভারতে সত্যাগ্রহ সুরু করেন। ১৯১৬-৪৬ এই দীর্ঘ ৩০ বছরের অহিংস-যুদ্ধে গান্ধীজী ইংরেজদের শেষে বাধ্য করেন 'ভারত ছাড়' (Quit India) ডাক স্বীকার করতে।

১৯০৬ সনে দেখেছি, সভাপতি দাদাভাই নৌরজিকে কলকাতা কংগ্রেসে প্রথম ইংরেজী ভাষণের মধ্যে যাদুমন্ত্র বৈদিক 'স্বরাজ' উচ্চারণ করতে। দশ বছর পরে ১৯১৭ সনে কলকাতা কংগ্রেসে আবার দেখলাম, শান্ত অথচ অজেয় গান্ধীজীর মূর্ত্তি। তিনি সপরিবারে প্রথমেই শান্তিনিকেতনে ওঠেন কিন্তু তাঁর গুরুস্থানীয় গোখ্‌লের অকাল-মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে পশ্চিম ভারতে চ'লে যান। ১৯১৭ কংগ্রেসে যত নেতাদের দেখেছিলাম,—তিলক, খপর্দ্দে, মালবীয়, বিপিনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ,—সবাই যেন অতীত ইতিহাসের ছবি, কিন্তু মোহনদাস গান্ধী ভবিষ্যতের প্রতীক। তিনি যখন বাসন্তী দেবী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অতিথি হন, তখন সে কথা গান্ধীজীকে জানাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ও তিনি আমার সাহচর্য্যে রচিত রমাঁ রলাঁর 'Mahatma Gandhi' প'ড়ে সুখী হন। ১৮৮৫ থেকে ১৯১৫ এই ৩০ বৎসরের কংগ্রেসের এক বিরাট ইতিহাস (এখনও অলিখিত) আছে, কিন্তু তার পর ৩০ বছরের কাহিনী একেবারে গান্ধী-কেন্দ্রিক। এখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বাংলা পিছিয়ে পড়ল তা সুস্পষ্ট। আর্থনীতিক সাধনায় ভারতের বহু মুখ্য জাতির পিছনে পড়েছি আমরা, সেকথাও নিষ্ঠুর সত্য। তার ফলভোগ করছে সবচেয়ে চিন্তাশীল বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং তাদের মরণ-বাঁচনের উপরেই নির্ভর করছে বাঙালী ও তার সংস্কৃতি। এ নিয়ে বহু আক্ষেপ শুনছি, কিন্তু গঠনমূলক কোন কাজের প্রারম্ভ দেখছি না।

এই সব জটিল সমস্যার সমাধান করতে সুরু করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে' ও পরে 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', প্রভৃতি পত্রিকায়।

প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আবার ১৯০৭ সন থেকে ইংরেজী 'মডার্ণ রিভিয়ু' প্রকাশ ক'রে নিজ পত্রে জাতীয় সংগঠনমূলক সম্পাদকীয় আলোচনা সুরু করেন ও সুচিন্তিত-প্রবন্ধ-লেখকদের একত্র করেন।

দেশব্যাপী শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার মানের ও আর্থিক উৎকর্ষ সাধন ও সারাদেশের সাধারণ মানুষের প্রাণে রাষ্ট্রনীতিক চেতনা জাগরণে প্রবাসী-সম্পাদকের দান স্মরণীয়। প্রবাসীর ৬০ বছরের বিষয়সূচী ছাপা হলে তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

মিশনারী 'সমাচার-দর্পণ' ও রামমোহনের 'সংবাদ-কৌমুদী' থেকে সুরু ক'রে বাংলায় শতাব্দীকালাবধি বহু পত্রিকা উঠেছে, ডুবেছে, কিন্তু জাতির জীবনে ছাপ রেখে গেছে। গান্ধীজী অহিংস যুদ্ধ ঘোষণা করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অবধি তাঁর মাতৃভাষা গুজরাটী ও হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষায় মহাত্মাজী এক বিরাট্ সাহিত্য গ'ড়ে গেছেন। বাংলা দৈনিকেরও প্রবল প্রকাশ এই গান্ধী যুগ থেকে সুরু হয়। এক্ষেত্রে কলকাতার সংবাদসেবীরা কেন্দ্রস্থানীয় হয়ে আছেন; জাপান ছাড়া বাংলার মত উচ্চমানের পত্রিকা-সাহিত্য এশিয়ার অন্যত্র দেখি নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে সুরু ক'রে চাষ-আবাদ, কলকারখানা, ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণ প্রত্যহ পড়ছে ও তার ফলও শীঘ্র আমরা পাব আশা করি। মন্ত্রভেদ (Ideologyর ঝগড়া) ও মতদ্বৈধ থাকলেও শ্রমিক ও ধনিক সমস্যার সুসঙ্গত সমাধান হয়ত বাংলা দেশে হবে। কিন্তু বর্ত্তমানের 'সঙ্কট' এইখানে যে, ধনিক-শ্রমিক সম্প্রদায় অধিকাংশই অ-বাঙালী, এবং বাঙালী যেন মসীজীবী ও শুধু চাকরি সম্বল। এ অবস্থার আশু প্রতিকার না হলে বিপ্লব আসবে, তার বজ্রনির্ঘোষ যেন আজ এইখানেই শোনা যায়; কোটি কোটি টাকার লুট হচ্ছে কলকাতায়, হরিজনদের নিয়ে হরির লুট সুরু না হলে বিপ্লব অনিবার্য্য।

ক্রুদ্ধ ইংরেজ বাঙালীকে শুধু হাতে মারেনি, ভাতেও মেরেছে; তার অসংখ্য নজির আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে আত্ম-চৈতন্য জাগাবার ও প্রতিকার-চিন্তনের চেষ্টা বাঙালীদের নেই কেন? হুইটলে কমিশন (labour) থেকে লিনলিথগো কমিশন (agriculture) পর্য্যন্ত ইংরেজ আমলে অনেক গবেষণা হয়েছে মানুষের খাটুনি ও খাদ্যসমস্যা নিয়ে। কিন্তু তার ফল ভারতের অন্যত্র ফললেও বাঙালীর বিশেষ কোন সুবিধা হয় নি। অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে অগণ্য চাষী, বাংলায় পলে পলে মরেছে, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা ফলবতী হয় নি। ১৯৪১ সনে শেষ বিদায়ের পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ যখন লিখছেন 'সভ্যতার সঙ্কট' তখনই যে বাঙালী চরম পরীক্ষায় নেমেছে। ১৯৪২-৪৩ সনের সঙ্কটকালে দেশ-সেবার প্রতীক 'মুক্তিসাধক' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শয্যা নিলেন ও কবির অনুসরণ করলেন।

ভারত ছাড়ার আগে ইংরেজ শুধু বাংলাকে নয়, এতকালের অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত ক'রে গেল। পূর্ব্ববঙ্গ যে দেশকে আমরা বলেছি ও যেখানে অগণ্য নরনারী স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছেন—তাকে আজ বলতে হয় পূর্ব্ব-পাকিস্থান; কিন্তু বাংলাই সেখানে রয়ে গেল রাষ্ট্রভাষা, এবং আর্থনীতিক সমস্যা এপারে-ওপারে সমানই। বিরাট্ নদনদী সেই একই খাতে দুই রাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। কিন্তু এদের মানুষদের সখ্য, প্রীতি ও সহযোগ কি নতুন ক'রে সত্য হয়ে উঠবে না? এ প্রশ্ন স্বাধীনতার পর জেগেছে ও জাগবে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্য রচনার সমজদারও ওপারে কম নয়। রবীন্দ্রশতাব্দী-উৎসবে তাঁদের আসা চাই। কারণ পূর্ব্ববঙ্গে ব'সে বহু মুসলিম ফকির ও আউল-বাউলের অলিখিত সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ চিরস্মরণীয় ক'রে গেছেন (মানুষের ধর্ম্ম—দ্রষ্টব্য)।

রবির 'অন্তর্দশা'য় বহু সাহিত্যিক উভয়বঙ্গে দেখা দেন। তাদের মধ্যে মনীষী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও হিন্দু-মুসলিম ভক্তদের সুরলহরী অবিভক্ত বাংলার সম্পদ্ হয়ে আছে। রেকর্ডে ও ফিল্মে এঁদের শিল্পসৃষ্টি জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে লক্ষ লক্ষ বাঙালীকেই টানবে। এক ভাব ও ভাষার ভিতর দিয়ে দুই বাংলার এক নতুন সহযোগ ও নব নব সৃষ্টি-সূচনা হয়ত অচির-ভবিষ্যতেই হবে। বিদেশী শাসকদল স'রে যাবার পর 'রাজা-প্রজা'র সংজ্ঞা ও সম্বন্ধ যখন আমূল বদলেছে, তখন সাধারণ মানুষই তাদের সমস্যার সার্থক সমাধান করবে। আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে দাঁড়িয়ে আর বেশী কাল্পনিক আশার কথা মনে ঠাঁই পায় না। নিরাশার মধ্যে আর দু'চারটি আশার কথা ব'লে আলোচনা শেষ করি।

মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে আজ পড়াশুনো শেষ করার আগে থেকেই উপার্জ্জন-সচেতন হয়ে উঠছে, কারণ স্বভাবতঃ তারা মা-বাবা-ভাইবোনদের আকর্ষণে পরিশ্রম করতে রাজী, রাষ্ট্রিক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এদের প্রবেশ করার বহুল সুযোগ দিতে হবে, তবে frustration-সঙ্কট দূর হবে।

নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাও প্রায় ব'সে থাকে না, শিক্ষিকা ও সেবিকা (nurse) রূপে মেয়েরা কাজ করতে নেমেছে। অন্যায় লজ্জা ভুলে ট্রাম-বাস-যাত্রীদের conductor রূপে ভদ্রবংশীয় যুবকরা পরিশ্রমী ও সন্তোষজনক কর্ম্মী হয়ে উঠছে।

কলকাতার বিরাট্ সওদাগরী আড়ত ও ষ্টক এক্সচেঞ্জ, হোটেলাদি, অবাঙালীরই হাতে, কিন্তু মফঃস্বলে দোকানে পসারে ও যানবাহনের দৈনিক কাজ ক'রে বহু বাঙালী জীবিকা অর্জ্জন করছে ও করবে। বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে—সে দেশের ভাষা শিখে বাঙালীরা কাজ সুরু করছে।

রুজি রুটি ও ডালভাতের সন্ধান ত জীবধর্ম্ম; সেখানে ঘাটতি পড়ায় বাঙালী যে শাস্তি পেয়েছে, একদিন তার শেষ হবে। কিন্তু "শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি", তাকে চরম সন্তোষ দেবে না। বাঙালীর সাহিত্য ও শিল্প, তার আদর্শ ও ভাবধারা, আমাদের মহাপুরুষ থেকে সুরু ক'রে সাধারণের প্রাণকে প্রতিনিয়ত তরঙ্গিত করে; সেই অলক্ষ্য প্রাণ-সমুদ্র, সেই বিরাট্ ঐতিহ্যই বাঙালীর চিরন্তন সম্পদ্। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর থেকে সুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ পর্য্যন্ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা অমোঘ ইঙ্গিত ও আশ্বাস দিয়ে গেছেন। বিংশ শতক পূর্ণ করার আগেই বাঙালী যেন তাঁদের 'উত্তরসাধক' হবার গৌরব লাভ করে।

—•—

···বলপ্রয়োগ আর 'হিংসা' এক জিনিষ নয়। আত্মরক্ষার জন্যে বলপ্রয়োগে, দুর্ব্বলের সাহায্যের ও রক্ষার জন্যে বলপ্রয়োগে হিংসার লেশমাত্র নাই ততক্ষণ যতক্ষণ না বল যার উপর বা বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হচ্ছে তাকে মেরে ফেলা, জখম করা বা অন্য প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করা না হচ্ছে, কিংবা সেরূপ অভিপ্রায় সেই বলপ্রয়োগে না থাকছে। আত্মরক্ষার জন্যে, আবশ্যক হলে, আততায়ীকে বধ করা পর্য্যন্ত আমরা অবৈধ মনে করি না। তবে একথা ঠিক যে, কেউ যদি আক্রান্ত হ'লেও, আত্মরক্ষার জন্যে আবশ্যক সাহস ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও এবং আততায়ীকে বধ করা ছাড়া আত্মরক্ষার অন্য উপায় না থাকলেও, বরং নিজের প্রাণ দেন তবু আততায়ীর প্রাণ বধ করেন না, বা করতে চান না, তাঁর সাত্ত্বিকতা স্বীকার করা যেতে পারে।

কিন্তু মনে করুন যদি কোন দুর্বৃত্ত কোন নারীর সতীত্ব নাশ করবার উপক্রম করে, এবং তাকে বধ করা ছাড়া সেই দুষ্কর্ম্মে বাধা দেবার অন্য উপায় না থাকে, তা হলে তাকে বধ করা বৈধ এবং বধ না করাই অধর্ম্ম এবং তার দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে দেওয়া অহিংসা নয়, ঘৃণ্য কাপুরুষতা।···

আর একটা কথাও বলা দরকার। আমরা যদিও মনে করি যে দুর্বৃত্তদের হিংসা সদ্য সদ্য ব্যর্থ করবার জন্যে বলপ্রয়োগ, এমন কি হননও আবশ্যক হতে পারে, তা হলেও আমাদের বিশ্বাস শুধু বলপ্রয়োগ দ্বারা, শুধু হিংসার দ্বারা, হিংসা (অর্থাৎ অপরকে বধ করবার বা অপরের অনিষ্ট করবার প্রবৃত্তি) নির্ম্মূল করা যেতে পারে না। বলপ্রয়োগ দ্বারা দুর্বৃত্তকে হিংসাত্মক কাজ থেকে নিরস্ত ক'রে তার পর তার সঙ্গে সপ্রেম অহিংস সাত্ত্বিক ব্যবহার দ্বারাই তার হিংসাপ্রবৃত্তি নির্ম্মূল হতে পারে। এই জন্যেই হিন্দুশাস্ত্রে (মহাভারতে) উপদিষ্ট হয়েছে, "অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্" (অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে); এবং বৌদ্ধশাস্ত্রেও পালি ভাষায় ঠিক এর অনুরূপ উপদেশ আছে।

এই হেতু আমরা মহাত্মা গান্ধীর মত পুরোপুরি অহিংসা মানুষের অস্তিত্ব আবশ্যক মনে করি, তাঁকে শ্রদ্ধা করি,—উপহাস করি না। এ বিষয়ে তাঁর সম্বন্ধে লঘচিত্ততা গর্হিত।

বিবিধ-প্রসঙ্গ, প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩৫৮

রাষ্ট্রচেতনায় ষাট বৎসর

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবাসীর ৬০ বৎসর প্রপূর্ত্তি উপলক্ষে প্রবাসীর কর্ত্তৃপক্ষগণ যে স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাতে বিংশ শতকের প্রথম ষাট বৎসরের রাষ্ট্রনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্ত্তনের ধারা সন্নিবেশের সঙ্কল্প অতি সমীচীন হইয়াছে ; কেননা এই ষাট বৎসরের সকল প্রগতিমূলক কার্য্যেই 'প্রবাসী'র ও প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ যোগ ও মহৎ অবদান সুবিদিত। এই ধারার কোনও বিষয়ই 'প্রবাসী'র সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নহে।

উনবিংশ শতকের ধারাপ্রবাহেরই যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন বিংশ শতকের ধারাতে প্রকাশ পাইয়াছে। উনবিংশ শতকে ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় ইংরেজ-সংস্পর্শহীন ও আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল কার্য্যধারা প্রবর্ত্তনের প্রশ্ন যে উদিত হয় নাই, তাহা নহে এবং বিপ্লবপন্থার চিন্তাও ক্ষুদ্র বীজাকারে সেই সময়েই উদ্ভূত হইয়াছিল। ফাডকের বিদ্রোহ, গণপতি উৎসব, র‍্যাণ্ড হত্যাকাণ্ড, প্রভৃতি বিপ্লবীচিন্তার প্রাথমিক স্ফুরণ, তেমনই রবীন্দ্রনাথের 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' কবিতা, শ্রীঅরবিন্দের ইন্দুপ্রকাশে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী, প্রভৃতি আত্মনির্ভরশীল জাতীয়তা-আন্দোলনের প্রাথমিক প্রকাশরূপেই উনবিংশ শতকে আবির্ভূত হয়। তবে উনবিংশ শতকে রাজনীতির ধারায় আজ যে ধারাকে "আবেদন নিবেদনের থালা বহিয়া বহিয়া নতশির" বলিয়া শ্লেষ করা হয়, সেই ধারাই সঙ্গতকারণে প্রবল ছিল ও বিংশ শতকের প্রথম দশকেও উহারই প্রাধান্য দেখিতে পাই।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, এই আন্দোলনের সম্বন্ধে যে শ্লেষ বর্ত্তমানে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহা বিচারের মানদণ্ডে অনুচিতই প্রমাণিত হয়। এই ধারার ধারক ও বাহকগণ দাসসুলভ মনোভাববশতঃ খয়ের খাঁ হইয়া কিছুটা রাজনীতিক সুখ-সুবিধা ভোগের আশায় আন্দোলন পরিচালন করিতেন মনে করিলে ভুল হইবে। সুসম্বদ্ধ রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম বিকাশ ঘটে রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরিহর দত্ত, প্রভৃতি ভারতের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে যে আন্দোলন তুলেন তাহা অবশ্যই 'পিটিশন'-এর আকারে রচিত হইয়া সরকার সমীপে পেশ হইত; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি-সাধনায় ব্রতী এই দল, ভারতের রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতার জন্য চেষ্টিত না হইয়া কেন যে এই দরবারের পন্থা বাছিয়া লইলেন তাহা আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদের জীবন-ধারার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ ও অসমঞ্জস মনে হয়, কিন্তু ইংরেজ-বিবর্জ্জিত রাষ্ট্রনীতিক সাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া তাঁহারা কেন এই ধারাকে শ্রেয় মনে করিলেন তাহা ইংলণ্ড-প্রবাসকালে তথা হইতে তাঁহার এখানকার অনুচরদের উদ্দেশে লিখিত ও জেনোবিয়া জাহাজযোগে প্রেরিত ও পরে প্রসন্নকুমারের 'রিফরমার' পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রেই রামমোহন পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়

রিফরমার তখন ইংরেজ ও স্কচ র‍্যাডিক্যালিষ্টদের দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং অতি উৎকট স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী। ভারতের পক্ষে অনুকুল যে গণতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হওয়া উচিত বলিয়া রিফরমারের কর্তৃপক্ষের মনে উদিত হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়া অতি উগ্র ও উৎকট রাজনীতিক মতবাদ প্রচার দ্বারা তাঁহারা দেশের রাষ্ট্রিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। যে কারণে তাহাকে সংযত করিয়া আবেদন-নিবেদনের পন্থা অনুসরণই অবস্থানুসারে কাম্য বলিয়া রামমোহন রায়ের ভাবনার উদয় হইয়াছিল, তাহা এই ইংরেজী ভাষায় লিখিত পত্রে রূপ পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন যে—"যদিও ইহা অতীব সত্য যে, একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে বিদেশী রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা ও রাষ্ট্রনীতিক পরাধীনতার অন্যান্য ক্ষতির কথা বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব, তথাপি গ্রেটব্রিটেনের সহিত আমাদের সম্পর্কজনিত যে-সমস্ত উপকার আমাদের হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া বর্ত্তমান অবস্থাকে স্বীকারই শ্রেয়।" তিনি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় আমাদের রাষ্ট্রচিন্তার অনগ্রসরতা হেতু আমরা তাহা দূর হওয়া না পর্য্যন্ত স্বাধীন হইলে সে-স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিব না। সেজন্য তিনি আরও শত বৎসর ইংরেজ রাজত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এই শতবর্ষ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষিত হইলে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া ভারতবাসী যে মনোবলের অধিকারী হইবে, তাহার বলে প্রতিটি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি ভারত অর্জ্জন করিবে এবং ব্রিটেন যদি সুবিচার করে তাহা হইলে ভারত ব্রিটেনের শক্তিশালী পরম মিত্র হইবে, অন্যথায় অতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুরূপে বিভীষিকার কারণ হইবে।

রিফরমারের দল অতি উগ্র যে রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারে রত ছিলেন, রামমোহনের এই দূরদৃষ্টি তাঁহাদেরও আবেদন নিবেদনের মাধ্যমকে অবস্থানুযায়ী শ্রেষ্ঠ পন্থারূপে গ্রহণে প্রবৃত্ত করে। এই ধারাই উনবিংশ শতকের রাজনীতি ক্ষেত্রের প্রধান ধারারূপে প্রবাহিত থাকে এবং এই ধারার অনুসরণেই বিংশ শতকেও ধারক ও বাহকরূপে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, ভুপেন্দ্রনাথ বসু, অম্বিকাচরণ মজুমদার, প্রভৃতির দেখা পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহারাও নিছক ধামাধরা শ্রেণীর লোক ছিলেন না। উনবিংশ শতকেই যখন আনন্দমোহন, দুর্গামোহন, দ্বারকানাথ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন তখন সমাজের কার্য্য পরিচালনের জন্য যে গণতান্ত্রিক ধারায় সংবিধান রচনা করেন তাহার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল, স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধানের উপযুক্ত করিয়া মানুষ গড়িয়া তোলা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফাল্গুন এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাষায় লেখেন, "অন্যায়ের উপর ন্যায়, অসাম্যের উপর সাম্য, রাজার উপর প্রজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া পৃথিবীব্যাপী একটি মহা সাধারণতন্ত্রের আয়োজন হইতেছে।"

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দমোহন, দ্বারকানাথ, প্রভৃতির সহিত সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ ছিল, সেজন্য বলা যায় যে, সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় ভাবনাও অনুরূপ ছিল। তাই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ন্যায় সুগভীর অন্যায়ের প্রতিবাদে ইংরেজী দ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলনে সিংহবিক্রমে আত্মনিয়োগ করিতে সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত হন নাই। মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিফর্মে বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করাতে সেই পথেই স্বায়ত্তশাসন-কর্মে ভারতবাসী কার্য্যকরী শিক্ষা-

লাভ করিয়া স্বাধীনতালাভের অধিকতর উপযোগী হইবে বিশ্বাসেই তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেজন্য বয়োবৃদ্ধ এই জননায়ক সম্মানের লোভে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন বলিয়া যে অপবাদ দেওয়া হইয়া থাকে তাহা অত্যন্ত ভুল বিচার। বিংশ শতকে আবেদন-নিবেদনের পন্থা পরিহার করিয়া আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইতে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করেন, সেই বিপিনচন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক ও লালা লাজপত রায়ও গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ না দিয়া 'রেস্‌পন্সিভ কো-অপারেশন'-এর মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন ও বিপিনচন্দ্র পাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এক স্বয়ংশাসিত অঞ্চলরূপে ভারতকে স্থাপনের জন্য আগ্রহী হইয়াছিলেন। ভারতের জনগণের শিক্ষার অভাব ও দারিদ্র্য, আত্মরক্ষা-ব্যবস্থার দুর্দ্দশা, প্রভৃতি চিন্তা করিয়াই পূর্ণ স্বাধীনতার বাসনাকে সংযত রাখিয়া ব্রিটেনের নিকট যথাসম্ভব ক্ষমতা আদায়ের তাঁহারাও পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের এই প্রবৃত্তি কখনও দাস-মনোভাব-সঞ্জাত নহে, পরিপূর্ণ দেশভক্তিরই এক বিশিষ্ট বিকাশ। এই কথাগুলি স্মরণে রাখিয়া বিংশ শতকের রাজনীতিক ধারাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেশপ্রেম-সঞ্জাত সকল ধারাগুলির মূল্যায়ন সম্ভব হইবে। রামানন্দবাবু সেই মনোভাব ও সেই দৃষ্টি লইয়াই এই-সমস্ত ধারার বিচার করিয়া 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয়গুলিতে মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় রামানন্দবাবু এই মত প্রকাশ করেন যে, "আমরা স্বশাসনের সম্পূর্ণ যোগ্য নহি, কোনও জাতিই নহে। আমরা স্বশাসনের একেবারে অযোগ্যও নহি, কোনও জাতিই নহে। অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। আমরা ঐ উপায়ের দ্বারাই অধিক হইতে অধিকতর যোগ্য হইতে চাই—উহাই একমাত্র উপায়।" স্বশাসনের যোগ্যতা অর্জ্জনের উপায়রূপে বিংশ শতকের সকল ধারাই কিছু-না-কিছু কাজ করিয়াছে এবং সে-হিসাবে আবেদন-নিবেদনের পথ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথ, অহিংস অসহযোগের পথ ও রক্তাক্ত-সংগ্রাম-প্রচেষ্টার পথ, সকলেরই অবদান আছে এবং সকল পন্থাতেই কিছু-না-কিছু ফল লাভ করাতেই আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া প্রগতিশীল স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। আবেদন-নিবেদনের পথে শক্তিশালী সঙ্ঘরূপে ঊনবিংশ শতকে কংগ্রেস যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা বিংশ শতকের প্রথম কুড়ি বৎসরও প্রবাহিত ছিল এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগের পন্থা গ্রহণ করে। ঊনবিংশ শতকে ভারতবাসীকে আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিতে যে ডাক রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তাহার প্রবল বিকাশ দেখা দেয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ১৯০৬ সনে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া। দেশবাসীর প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ব্রিটিশ সরকার যখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিলেন, 'আবেদন-নিবেদন'-পন্থীগণও তখন তাহার বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিলেন কিন্তু এই পন্থা পরিবর্ত্তন করিয়া আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ গঠনের প্রয়োজনীয়তা তখন একশ্রেণীর ভাবুকের মনে উদিত হয়। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি-বিলাসী ছিলেন না; কিন্তু দেশের এই গভীর ক্ষোভ তাঁহাকে তীব্র ভাবে স্পর্শ করে। তাই তিনি নূতন মন্ত্রের সার্থক উদ্গাতারূপে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লিখিলেন—"আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্র মূর্ত্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একই মাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব। সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।" শুধু মন্ত্রই তিনি উচ্চারণ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই, সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থারও তিনি আভাস দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য্য নিজের হাতেই লইতে হইবে। চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব এবং সর্ব্বনাশা মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব।" কবিতায় কবিতায় ও গানে গানে তিনি এই বাণীকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, প্রভৃতির নেতৃত্বে গরমপন্থীরূপে পরিচিত রাজনীতিক দল এই মন্ত্রেরই প্রচার করিয়া দেশবাসীকে আত্মশক্তিপরায়ণ হইবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। আন্দোলন ব্যাপক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লালা লাজপত

রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, মুঞ্জে, খপর্দে, প্রভৃতি বাঙ্গলার বাহিরের কতিপয় নেতা এই ভাবধারা গ্রহণ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া দিলেন।

এই সময়ে শাসকবর্গের রুদ্ররূপ একদল তরুণের মনে এই প্রত্যয় জন্মায় যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল যে-কোনও উপায়েই হউক ভাঙিয়া স্বাধীন হইতেই হইবে এবং ইতালীর কর্বোনারীদের আদর্শে গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা স্বাধীন হইবার কল্পনায় তাঁহারা দল বাঁধিতে আরম্ভ করেন। প্রমথনাথ মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দলের নেতা ছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ

এই তিনটি ভিন্ন পথাশ্রয়ী দলেরই প্রচেষ্টা দেশের স্বাধীনতা আনিতে সহায়তা করিয়াছে এবং সেজন্য প্রত্যেকেরই দান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'তে এই তিন দলের আদর্শগত সংঘাতের সূচনা-কালেই এই মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, "অনেকে মনে করেন কেবলমাত্র চরমপন্থী ও অসহযোগীরাই স্বাধীনতা চান এবং তাঁহাদের অবলম্বিত উপায়েই স্বাধীনতা পাওয়া যাইতে পারে। ঐ উপায়েই যে স্বাধীনতা পাইবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু যাঁহারা মধ্যপন্থী, নরমপন্থী, উদারনৈতিক বা মডারেট নামে অভিহিত, তাঁহারা আপাতত যাহা চাহিতেছেন, তাহা পূর্ণ স্বাধীনতা না হইলেও তাঁহাদের অনেকের চরম লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া আমাদের ধারণা। তাঁহারা এখন যাহা চাহিতেছেন, তাহা স্বাধীনতা পাইবার একটি ধাপ হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। এই জন্য তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতার উল্টা দিকে যাইতেছেন মনে করি না।"

পূর্ব্বোক্ত তিন ধারায় এদেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন যখন পুরাদমে চলিতেছে তখন জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডে দেশের জনমনে যে প্রবল ইংরেজ-বিরোধিতা জাগ্রত হয় তাহাকে এক নূতনতর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ধারায় প্রবাহিত করিয়া মহাত্মা গান্ধী নিরস্ত্র জাতির মুক্তির অভিনব উপায় প্রবর্ত্তন করিলেন—এই ধারা অসহযোগ আন্দোলন ও অহিংস সংগ্রাম নামে পরিচিত। এই ধারায় স্বাধীনতা অর্জ্জন অসম্ভব বলিয়া কোন কোন মহল হইতে সমালোচনা হইলে রামানন্দবাবু 'প্রবাসী'তে লেখেন যে, "আমরা মনে করি যুদ্ধ না করিয়াও স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে। * * * যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইতে গেলে যত অধ্যবসায়, সাহস ও স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, বিনা যুদ্ধে স্বাধীন হইতে গেলে তাহা অপেক্ষা কম অধ্যবসায়, সাহস ও স্বার্থত্যাগে চলিবে না—বরং বেশী চাই। অন্যের প্রাণ আমরা লইব না, কিন্তু নিজের প্রাণ দিতে হইতে পারে।"

পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিলে, যে-কোনও উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন একান্ত প্রয়োজন বোধে ভারতবর্ষ ত্যাগের পর সুভাষচন্দ্র বিদেশে ভারতীয়দের এবং বিশেষ ভাবে বন্দী ভারতীয় সৈনিকগণকে মুক্ত করিয়া তাহাদের সহায়তায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মি (সংক্ষেপে আই এন এ) গঠন করেন, তৎপর বাহির হইতে সশস্ত্র ভারতীয় বাহিনী লইয়া আসিয়া ভারতের মুক্তির জন্য যে প্রচেষ্টা করেন তাহা, এবং ভারতস্থ ইংরেজের অধীন ভারতীয় নৌবাহিনীর কতিপয় সদস্যের সশস্ত্র অভ্যুত্থানও ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের সহায়ক হইয়াছিল।

এই প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন ধারার মূল্যায়ন করিয়া স্থান নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু প্রতিটি ধারার বিশেষ বিশেষ দান সম্পর্কে আলোচনা সহজ। দেশের যখন রাষ্ট্রনীতিক চেতনা বিন্দুমাত্র ছিল না বলা চলে, সে সময়ে জাতীয় দাবী-দাওয়া সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করিয়া তোলারূপ মহৎ কার্য্যে নরমপন্থী বলিয়া বর্ত্তমানে পরিচিত দলের চেষ্টাই প্রথম জাতীয় চেতনা জাগ্রত করে। সংঘবদ্ধ হইয়া জাতীয় দাবী উত্থাপন, রূঢ় আঘাতের পর বিদেশী-বর্জ্জন আন্দোলনের ব্যাপকতা দ্বারা ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষকে রাষ্ট্রনীতিক খাতে প্রবাহিত করা, প্রভৃতি দেশের স্বাধীন-পথে যাত্রার সুবিধা করিয়া দিয়াছে। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মনে রাজনৈতিক জাগরণ আনিয়াছে। অন্তঃপুরিকাদিগকেও বাহিরে আসিয়া সর্ব্ববিধ স্বরাজ-প্রচেষ্টায় যোগ দিতে এই সময়কার কংগ্রেস প্রবৃত্ত করিতে পারিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোককে নির্ভীক ভাবে দুঃখবরণ করিতে প্রস্তুত করিয়াছে, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও আদর্শ ত্যাগ না করিতে দৃঢ়ব্রতী করিয়াছে, প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও জাতীয় পতাকার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে জনমনে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে। অবশ্য তাহার পূর্ব্বে বাংলার বিপ্লববাদী দলের তরুণরা "ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান" গাহিয়া মৃত্যুভয় পরিহার করিয়া, অকুতোভয়ে দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার বাসনা শিক্ষিত তরুণদের মনে জাগাইয়াছিল। স্বাধীনতা-অর্জ্জনের পথে প্রথম ধাপ নির্ভীকতা ও মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার বাসনা জাগাইয়া সেই পথে এক মহান্ পাদক্ষেপে জাতিকে আগাইয়া দিয়াছিল ; অহিংস সংগ্রাম সেই ভাবধারাকে ব্যাপক ভাবে জনমনে সঞ্চারিত করিয়া যে আন্দোলনের সৃষ্টি করে, তাহাতে ব্রিটিশ সরকার বুঝিতে পারেন যে, ভারতকে বেশীদিন আর অধীনে রাখা সম্ভবপর হইবে না ; যদি আর একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া উঠে তাহা হইলে অসন্তুষ্ট ভারত ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে ভীষণ ক্ষতির কারণস্বরূপ হইয়া উঠিবে। তাহা অপেক্ষা ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া সেই শত্রুতা নিবারণের পথ প্রস্তুত করাই ভাল। বিশ্বযুদ্ধের সময় গান্ধীজীর নির্দ্দেশে কংগ্রেস কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত "ভারত ছাড়" আন্দোলনের ব্যাঁপকতায় ইংরেজ শাসকদের মনে এই ভাব আরও প্রবল হইয়া উঠে। তাহার পর আই এন এ এবং নৌবাহিনী-বিদ্রোহে ইংরেজ স্পষ্ট অনুভব করে যে, ভারত-অধিকার এবং উহার রক্ষণ এদেশীয় সামরিক বাহিনীর যে-সহায়তায় সম্ভবপর হইয়াছিল, ভারতকে অধীনে রাখার কাজে তাহা আর ত পাওয়া যাইবে না, বরং সেই বাহিনীই মুক্তিযুদ্ধে সর্ব্বাধিক ক্ষতি হানিবে। দেশের জনমন অসন্তুষ্ট, প্রধান সম্বল সেনাবাহিনীর প্রতিও ভরসা রাখা চলে না, ইহা অনুভব করিয়াই ইংরেজ ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে সম্মত হয়। কাজেকাজেই এই স্বাধীনতা অর্জ্জনে প্রতিটি বিভিন্ন ধারারই অবদান আছে। কেহই নিরর্থক নহে এবং দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সকল ধারাই সার্থক, আর এই-সকল ধারার কাজগুলিকে নৈতিক সমর্থন দান করিয়া 'প্রবাসী' যে বিগত ষাট বৎসর অতি উত্তমরূপে দেশের সেবা তথা মুক্তির জন্য অক্লান্ত প্রয়াস করিয়া আসিয়াছে তাহা ভবিষ্যৎ ভারতবাসী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে।

সুভাষচন্দ্র বসু

স্বাধীনতার স্বরূপ

শ্রীচাণক্য সেন

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রোজ আপনি বার বার নিজের চেহারাখানা দে'খে নেন। নিজের চোখে নিশ্চয় আপনি ভয়ানক কুৎসিত নন ; চেহারা দে'খে একেবারে হতাশ আপনি হ'ন না। যত্ন ক'রে খুঁটে দেখেন, চামড়ায় কি ভাঁজ পড়েছে, নাকি চুল আরও পাকল ; নাকি রংটা তেমন খোলতাই লাগছে না। আপনি যদি স্ত্রীলোক হন, তাহলে আয়নার বুকে স্ব-রূপের সঙ্গে আপনার গভীর মিতালি। বার বার চুল-চেরা দর্শনেও আপনার পরিতৃপ্তি নেই।

অনেক মানুষ নিয়ে তৈরী হ'লেও একটা দেশের কিছু নিজস্ব অবয়ব নেই যা সে আয়নায় দেখতে পারে। দেশের ব্যক্তিত্ব মানুষ নিয়ে ; বহু মানুষের সম্মিলিত দৃষ্টি নিয়ে তার বহিঃ- ও অন্তর্দৃষ্টি। ভারতবর্ষ নামক যে আমাদের দেশ, শত ইচ্ছে থাকলেও, উঠে দাঁড়িয়ে আয়নায়—এমনকি অন্তহীন সমুদ্রের সুনীল জলেও—সে তার প্রতিচ্ছবি, স্ব-রূপ দেখতে পারে না ; আমরা যারা ভারতবর্ষের অধিবাসী, আমরাই শুধু তার হয়ে এই আত্মদর্শন চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু ভারতবর্ষ বিরাট্ ; আমরা ক্ষুদ্র ; ভারতবর্ষ মৃত্যুহীন স্রোতস্বিনী, সভ্যতার প্রভাত হ'তে প্রবাহিতা, আমরা ক্ষণজীবী, ক্ষীণদৃষ্টি। ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে তার সামান্য একটা অংশ শুধু আমাদের চোখে পড়ে ; অন্ধদের হস্তীদর্শনের মত, আমাদের দৃষ্টির ক্ষুদ্র সীমায় যেটুকু ধরা পড়ে, তাকেই আমরা বলি, ভারতবর্ষ। এ দৃষ্টি দিয়ে ভারতবর্ষকে বিচার করা চলে না ; ভারতবর্ষকে চেনাই যায় না।

তা ছাড়া, আয়নায় প্রতিচ্ছবি দেখার নাম অবশ্যই আত্মদর্শন নয়। আপনার দেহাকৃতিই শুধু ফোটোতে ধরা পড়ে, মানসরূপ ফুটে ওঠে শুধু ততটুকু, যতটুকু আপনার চোখে মুখে তা প্রচ্ছন্ন। কৃতী ভাস্কর যদি আপনার প্রতিমূর্তি গড়েন, তাহলে হয়ত তিনি আপনার মুখে এমন-কিছু ফুটিয়ে তুলবেন, যা আপনার চেহারায় আপাতদৃষ্টিতে অনুপস্থিত। এপ্‌ষ্টিনের তৈরী জবাহরলাল নেহেরুর 'হেড্' দেখলে আপনি সহজে বুঝবেন প্রতিচ্ছবি ও অন্তঃছবির প্রভেদ কোথায় ও কত। তেমনি, ভারতবর্ষের স্বরূপ-দর্শনে প্রতিচ্ছবির সঙ্গে অন্তঃছবিও আমাদের দেখতে হবে, যদি আমরা তাকে সত্যিকার দেখতে চাই। ভারতবর্ষের বাহ্যিক প্রতিকৃতি মোটামুটি সবারই কমবেশি জানা আছে, যদিও, যেহেতু ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন ও বৃহৎ, তার সামগ্রিক রূপদর্শন আমাদের দুঃসাধ্য, বিদেশীদের প্রায় অসাধ্য।

ক্যাথারিন মেয়ো যে-ভারতবর্ষের চেহারা প্রায় ত্রিশ বছর আগে এঁকেছিলেন, সে-ভারতবর্ষ ছিল না, বা আজও নেই, তা নয় ; কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে রমাঁ রলাঁর দেখা ভারতবর্ষও ছিল, আজও আছে।

আজও বিদেশীরা ভারতবর্ষকে সাধারণত দুটো বা তিনটে চশমা এঁটে দেখে। প্রথম চশমায় দেখতে পায়, বিচিত্র এ প্রাচীন দেশ ; তার জীবনধারা সাবেকীপথে ধীরবহ ; উত্তেজিত, বিশ্রাম-বিমুখ শহরের সঙ্গে নিরুত্তাপ পরিশ্রান্ত গ্রামগুলির দুস্তর ব্যবধান ; ধনসম্পদ্-উৎপাদনকে বহুমাত্রায় ছাপিয়ে-ওঠা মানুষ-উৎপাদন। দ্বিতীয় চশমায় বিদেশী দেখে, স্বাধীন ভারতের নির্মাণ ও গঠনপ্রয়াস ; দেখে, সহানুভূতির ভদ্র চোখে, এবং অপ্রিয় বিশেষ কিছু বলতে দ্বিধা করে ; দেখে, নতুন ভারতের নতুন 'মন্দির'গুলি—বড় বড় উচ্চশির কলকারখানা, বাঁধ, বহুমুখী প্রজেক্ট। দে'খে প্রশংসা করে, কেননা অগ্রগতির এসব প্রতীকের সঙ্গে বিদেশী সুপরিচিত। তৃতীয় চশমা চোখে এঁটে বিদেশী দেখতে চায়, বিশ্বজোড়া যে ক্ষমতার লড়াই চলছে, তাতে ভারতবর্ষের স্থান কোথায় ; হোক না সে অদলীয়, তথাপি তার প্রত্যেকটি ব্যবহারের তাৎপর্য্য বিদেশী বুঝতে চেষ্টা করে দলীয় বিচারবুদ্ধি দিয়ে। কিছু দে'খে তারা আশ্বস্ত হয়, কিছু দে'খে শঙ্কিত।

এই ত গেল বিদেশীর কথা। আমরা কোন্ দৃষ্টিতে স্বাধীন ভারতবর্ষকে দে'খে থাকি ? প্রধানতঃ দুই চোখে : আঞ্চলিক ও সামগ্রিক। দেশের যে বিপুল জনসংখ্যা গ্রামীণ ও নিরক্ষর, তাদের কথা ছেড়ে দিতে হবে ; তাদের দৃষ্টি নিতান্তই স্থানীয়। শ্রমিকের নজর কিছুটা প্রশস্ত ; একে ত সে শহরতলীর মানুষ, তার ওপর কারখানা তাকে

অর্থনীতির ঘূর্ণিপাকে এনে ফেলেছে ; অর্থনীতি বর্তমান সমাজের প্রধান কাঠামো। মধ্যবিত্ত তার নিজের জীবন-সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, দৃষ্টি তার স্বভাবত আঞ্চলিক। তার মধ্যে আঞ্চলিক সমস্যা যতটুকু স্পন্দন জাগায় জাতীয় সমস্যা ততখানি নয় ; ধরুন, বাংলা বা বাঙালীর সমস্যা আমাদের মনকে যে-রকম বিচলিত করে, সর্বভারতীয় সমস্যা ততখানি করে না, যদি-না সে সমস্যা আঞ্চলিকতা অতিক্রম ক'রে সহজেই সামগ্রিক হ'য়ে ওঠে। আমাদেরই মত ভারতের অন্যান্য রাজ্যে, মানুষের দৃষ্টি আজ বেশির ভাগ আঞ্চলিক। পাঞ্জাবী চায় পাঞ্জাবী সুবা ; অসমীয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে বাঙালী বিতাড়নকে 'পবিত্র কর্তব্য' মনে করে ; তামিলনাদে নালিশ জ'মে ওঠে উত্তর-ভারত কর্তৃক দাক্ষিণাত্যকে 'অবহেলা'র ; হিন্দীভাষী চায় হিন্দীভাষার আশু সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা। এক কথায়, স্বাধীনতার চতুর্দশ বছরে আমরা সবাই হয় বাঙালী, নয় অসমীয়া, ওড়িয়া, তামিল, তেলুগু, পাঞ্জাবী, গুজরাতী। আমরা এখনও পুরোদস্তুর হিন্দুস্থানী নই। বিদেশে গিয়ে আমরা পরিচয় দি' ভারতবাসী ব'লে ; স্বদেশে আমরা আঞ্চলিক কৃষ্টির পরিচয়ে পরিচিত।

আঞ্চলিক ও জাতীয় মানসের দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের আরও একটা দৃষ্টি দানা বেঁধেছে, যার নাম প্রশাসনিক। রাজধানী দিল্লীর এ দৃষ্টি বহুলাংশে নিজস্ব। নতুন ভারত নির্মাণে শাসককুলকে আমরা সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়েছি ; তার একটা সর্বভারতীয় দৃষ্টি গত তের বছরে গ'ড়ে উঠেছে। দিল্লীতে ব'সে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষকে যে প্রশাসনিক দৃষ্টিতে দেখা হয় তার বিশ্লেষণে কয়েকটা বিশেষত্ব চোখে পড়ে। প্রথম, একজাতিত্ব। বহু ভাষা ও সংস্কৃতির দেশ ভারতবর্ষকে রাজকুল একজাতির চেহারায় দেখতে চেষ্টিত ; এ দৃষ্টিতে ক্ষেত্রবিশেষে গলদ থাকলেও, এর সর্বভারতীয় ব্যাপকতায় মূল কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে, নির্মাণ ও গঠন। দশ বছর ধ'রে যোজনা-মাফিক জাতি-গঠনের যে প্রয়াস দেশে চলছে, তার ফলে জন্মেছে সর্বভারতীয় আর্থনীতিক দৃষ্টি, যার মুখ্য বাহন বিজ্ঞান : সায়ান্স ও টেক্‌নলজি।

তাহলে আমরা কি পেলাম ? স্বাধীন ভারতবর্ষকে বিদেশী দেখে দুটো মাপে : বর্তমান যুগোপযোগী সভ্যতার পথে কতখানি সে এগোল, এবং বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার লড়াইয়ে তার স্থান হ'ল কোথায়। ভারতবাসী আমরা, আমাদের স্বাধীনতাকে দেখি চার-চোখে : আঞ্চলিক, সামগ্রিক, প্রশাসনিক ও বৈজ্ঞানিক। আমরা, আঞ্চলিক সমস্যায় ঝাপসা-চোখ হ'য়েও বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ একজাতিতে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং একজাতিই সে থাকবে। কিন্তু আমাদের সবল জাতীয়তাবাদ আঞ্চলিকতাকে এখনও জয় করতে পারে নি ; আঞ্চলিকতা যে জাতীয়তাবিরুদ্ধ তা আমরা মানতে চাইনে। এমনি ক'রে স্বাধীন ভারতে জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদে সংঘাত চলছে, কিছুদিন চলবে ; অবশেষে একদিন দু'এর সমন্বয় আমরা খুঁজে পাব। যেহেতু দীর্ঘদিন ভারতবর্ষের জনসমষ্টির মধ্যে বাস্তব আদানপ্রদান ধীরগতি ছিল, যেহেতু এখনও আমরা বহুলাংশে একে অন্যের কাছে অপরিচিত, তাই আঞ্চলিকতা বর্তমান অবস্থার স্বাভাবিক বিকাশ। এ বিকাশের জন্য দায়ী আমাদের অতীত ইতিহাস। আমাদের নেতারা অবশ্যই, আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে না উঠেও আঞ্চলিকতাকে গালাগাল দেবেন। কিন্তু আঞ্চলিকতা দূর হবে তাঁদের তিরস্কারে নয়, যুগের প্রয়োজনে, কালের অলঙ্ঘনীয় আদেশে। ভারতবর্ষের ভাবগত একজাতিবোধ সুপ্রাচীন ; কিন্তু ইংরেজই প্রথম তাকে রাষ্ট্ররূপ দিতে পেরেছিল। পেরেছিল কিসের জোরে ? কেবলমাত্র রেলপথ, ডাক-তার-বেতার, বন্দর ও সর্বভারতীয় প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনীর জোরে। ইতিহাস হঠাৎ দ্রুতগতি এগিয়ে যেতে পেরেছিল নবনির্মিত বৈজ্ঞানিক যাত্রাপথে।

নতুন যে ভারতীয় জাতি স্বাধীন ভারতবর্ষে গ'ড়ে উঠছে তারও যাত্রাপথ বিজ্ঞান। আঞ্চলিকতা যখন আমাদের মন জুড়ে আছে, তখন, যেন আমাদের দৃষ্টির বাইরে নতুন একটা ভারতবর্ষও গ'ড়ে উঠছে। এ ভারতবর্ষের বাহন বিজ্ঞান। এর জীবনরসদ জোগাচ্ছে বিদ্যুৎ, রেলপথ, বিমানপথ, বড় বড় বন্দর, বিরাট্ বিরাট্ কারখানা, প্রশস্ত রাজপথ। এ ভারতবর্ষ তৈরী হচ্ছে উদ্যোগে ও প্রশাসনে। অত তাড়াতাড়ি তৈরী হচ্ছে না যতটা আমাদের

আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন, কিন্তু তথাপি তার নির্মাণ সুনিশ্চিত চলছে। চলবে আভ্যন্তরীণ জীবন-তাগিদে; প্রতিযোগী প্রতিবেশীর চাপে; বহির্বিশ্বের আহ্বানে। আজ সর্বভারতে প্রতিদিন যে লোকচলাচল, বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক আদানপ্রদান হচ্ছে, পনের বছর আগে তা ছিল অভাবনীয়। ভারতবর্ষের বহুকালের আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা, আভ্যন্তরীণ ভৌগোলিক দূরত্ব, অনেকখানি কেটে গেছে, প্রতিবছর আরও কাটছে। গ্রামীণ জনতা দলে দলে আসছে শহরে; এক রাজ্যের লোক প্রতিদিন বহু সংখ্যায় অন্য রাজ্যে যাচ্ছে; এক রাজ্যের বিদ্যুৎ অন্য রাজ্যকে আলো দিচ্ছে; এক রাজ্যের নদী অন্য রাজ্যের মাঠ ভেজাচ্ছে; এক রাজ্যের কাঁচা লোহা অন্য রাজ্যে ইস্পাত হচ্ছে; এক রাজ্যের খনিজ তেল পাইপ দিয়ে একাধিক অন্য রাজ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। নিতান্ত প্রয়োজনের চাপে আমাদের সংবিধানের অধিকাংশ সংশোধন কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে; যখনই আঞ্চলিক সংকট দেখা দেয়, দাবী উঠছে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের। বিপদে পড়লে কোনও রাজ্য যখন কেন্দ্রীয় সাহায্য চায়, সে জানে এ সাহায্য আসবে অন্য সব রাজ্য থেকে। সর্বভারতীয় প্রশাসনের ক্ষমতা ও প্রয়োজন দুই-ই বাড়ছে; এবং, সর্বোপরি রয়েছে আমাদের সর্ব-ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, জাতীয় ঐক্যের সর্বপ্রধান নিদর্শন।

সুতরাং, আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব ভবিষ্যতে যে দৃঢ়তর হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই; এক্ষেত্রে সংশয় অদূরদর্শিতার পরিচয়। যত দিন যাবে, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ তত বলিষ্ঠ হবে, বৈজ্ঞানিক উপাদানে। অবশ্য বিজ্ঞান যত এগিয়ে চলবে আমাদের মন তত এগোবে না; কোনও দেশে কোনও কালে তা হয় নি। পৃথিবীর সব দেশের মানুষই এখনও বলে, সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়; আবার সবাই জানে, সূর্য ঘোরে না, প্রদক্ষিণরতা পৃথিবী। আমরা আমাদের আঞ্চলিকতার দৃঢ় সংস্কারে বহুদিন কমবেশি আবদ্ধ থাকব, তৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষ, বিজ্ঞানের ও প্রশাসনের পথে, জাতীয়তার স্তরে স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে চলবে।

আমাদের আঞ্চলিকতার প্রধান আশ্রয় ভূমি-ব্যবস্থা ও ভাষা। মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষের ভূমি-ব্যবস্থার ব্যাপক ও মৌলিক সংস্কার এখনও হয় নি। পুরাতন জমিদারী ব্যবস্থা লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু এ পরিবর্তন বৈপ্লবিক নয়, এতে কারুর চোখে একবিন্দু জল আসে নি। উত্তর ও পূর্ব ভারতে জমিদারীপ্রথা এতই অন্তঃসারহীন ও মানুষের স্নেহবঞ্চিত হয়ে পড়েছিল যে তার বিলোপসাধনে ক্ষতি হয় নি, প্রায় কারুরই; এমন কি জমিদারদেরও লাভ হয়েছে। বড় বড় জমিদারী ভেঙে অপেক্ষাকৃত ছোট জমিদারী তৈরী করার বেশি ভূমিসংস্কার এদেশে এখনও হয় নি। যদি কখনও হয়, আঞ্চলিকতার মূলে কঠিন আঘাত পড়বে। জমিকে আশ্রয় ক'রে সংস্কার, রীতি-নীতি, সাবেকী মূল্যায়ন ও পুরাতন ভাব-ভাবনা যত বেশী বেঁচে থাকে তত আর কিছুতে নয়। এ জন্যই সংস্কারপন্থীরা ভূমি-ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের ঘোরতর পরিপন্থী। আমাদের দেশের আর্থনীতিক ও সামাজিক লক্ষ্য সমাজতন্ত্র বলা হয়ে থাকে; তথাপি আর্থিক ব্যবস্থার শতকরা ৯৬ ভাগ ব্যক্তি-স্বত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ অবস্থা কেবলমাত্র ভূমির ব্যক্তি-স্বত্ব ব্যবস্থার জন্য। ভূমিকে সমবায়স্বত্বের বা সমবায়-ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে এলে সমাজের আর্থিক-ব্যবস্থার (economy) আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। এবং তাতে আমাদের আঞ্চলিকতা অনেকখানি বিদূরিত হবে। আঞ্চলিকতা প্রধানতঃ গ্রামাশ্রয়ী; গ্রাম যখন নাগরিক সভ্যতার উত্তাপ পাবে, আঞ্চলিকতার বরফ জোর গলতে সুরু করবে।

আঞ্চলিকতার অন্য মুখ্য আশ্রয় ভাষা। ইংরেজ একটি সর্বভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি করতে পেরেছিল ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। তার পেছনে ছিল দুর্ধর্ষ রাজশক্তি। এখনও ইংরেজী ভাষাই আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাতীয়তাবোধের বাহন। সর্বভারতীয় ভাববিনিময় এখনও একমাত্র ইংরেজীতেই সম্ভব। বহু ভাষার দেশ ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষা সমান অগ্রসর নয়। কোন্ ভাষা ও সাহিত্য কতখানি অগ্রসর অন্য ভাষাভাষীরা তার খবর পর্যন্ত রাখেন না। অথচ আশ্চর্য এই, প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষার গত দশ-বার বছরে যথেষ্ট প্রসার হয়েছে; সাহিত্য নতুন ভাবে পল্লবিত হয়েছে। প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের মধ্যে স্বকীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি নতুন

মমতা দেখা দিয়েছে। ঘরের কাছের একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ওড়িয়া ও অসমীয়া সাহিত্য গত দশ বছরে অভাবনীয় বিকাশলাভ করেছে; এ বিকাশের (সঙ্গীত ও কলা ক্ষেত্রেও) বেশীর ভাগ রসদ নেওয়া হয়েছে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে; কিন্তু তার জন্য বাঙ্গালীর প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে দ্বেষ ও হিংসাই বেশী গ'ড়ে উঠেছে। মানুষের মনোবৃত্তির বিচারে এটাই স্বাভাবিক। যতদিন পর্যন্ত ওড়িয়া ও অসমীয়া সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্প অনগ্রসর ছিল, বাঙ্গালীর কাছে ঋণ স্বীকারে লজ্জা ছিল না; এখন যেহেতু তারা নিজেরাই এগোতে চায়, কৃতজ্ঞতার বোঝা দুঃসহ।

ভাষা বা সংস্কৃতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনের বিপজ্জনক দিকটাই আমাদের সহজে চোখে পড়ে; এর পেছনে যে গঠনমূলক, বিকাশ-জ্ঞাপক প্রাণপ্রাচুর্য আছে তা আমরা ভুলে যাই। এ বছরের শীতকালে নতুন দিল্লীতে 'আজাদ স্মারক বক্তৃতা' প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আরণল্ড টয়েনবী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, ভাষা-ভিত্তিক রাজনীতির সবটাই খারাপ নয়; ভারতের ব্যাপক জনজাগরণের অন্যতম বিকাশমাত্র। আর্থনীতিক, দলীয় রাষ্ট্রনীতিক বা গোষ্ঠীর স্বার্থের জঘন্য প্ররোচনায় এ বিকাশ ভয়ংকর রূপ নিয়েছে আসামে; কিন্তু অসমীয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতির আত্মপ্রতিষ্ঠার যেটুকু বাসনা বিদ্যমান্, বেপরোয়া ও দুর্বিনীত হ'লেও তা পরিণামে শুভ।

ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের আন্দোলন এদেশে ১৯১৭ সন থেকে চ'লে এসেছে; জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিরাটতর প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল এ দাবীও প্রবাহিত। আজ এ দাবী মানা উচিত কি অনুচিত, জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি নজর রেখে তার বিচার হবে। এ বিচারের ফল যাই হোক, ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রনীতিক সত্তার দাবী মুখরতর হবে, যতদিন না তাকে পরিপূর্ণতা দেওয়া যায়। আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজ যত দৃঢ় হবে, মানুষের সার্বভৌম অধিকার যত স্বীকৃত হবে, ততই প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষার রাষ্ট্রনীতিক দাবী মুখর হয়ে উঠবে। আজ যে-সব ভাষা অনগ্রসর—যেমন উপজাতিদের ভাষা—অনতিদূর ভবিষ্যতে তারাও, গতির উত্তাপে, নতুন দাবী তুলবে।

আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির রাষ্ট্রনীতিক দাবী মেনে নেওয়ার কয়েকটি বিশেষ অন্তরায় বর্তমান। জাতীয় ঐক্য আমাদের এখনও যথেষ্ট বলবান্ নয়; বিভাগ-মুখী প্রত্যেকটি আন্দোলনকেই স্বভাবতঃ জাতীয়তার দিক্ থেকে আমরা সন্দেহ ও ভয়ের চোখে দেখি। অর্থনীতি আমাদের এতটা প্রসারিত, উন্নত নয়, যাতে প্রত্যেক নাগরিক জীবনযাপনের সুস্থ উত্তেজনায় ডুবে থাকতে পারে। আমাদের এমন কোনও জাতীয় ভাষা নেই যা সমস্ত ভারত-বাসীর ভাব-ভাবনার বাহন হতে পারে।

হিন্দীকে সংবিধানে কেন্দ্রীয় ভাষার স্থান দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু ভাষা হিসাবে সে এখনও দুর্বল, তার সাহিত্য গত কয়েক বছরের অভূতপূর্ব বিকাশ সত্ত্বেও, অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর। বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ নিয়ে যে উত্তর ভারত, সেখানে হিন্দীর রাষ্ট্রনীতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যতই না সরব হোক, এ প্রতিষ্ঠা আসতে পারে কেবলমাত্র অ-হিন্দী অঞ্চলের সক্রিয় সহযোগিতায়। এ সহযোগিতা আজ বহুলাংশে অনুপস্থিত, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে। অথচ হিন্দীবিরোধীরাও স্বীকার করেন, হিন্দী একদিন কেন্দ্রীয় ভাষায় উত্তীর্ণ হবে, যেমন আসাম সরকার স্বীকার করেন, ভারতবর্ষ ছাড়া আসাম বা অসমীয়া সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নেই। আমরা অতএব আবার সেই আপাত-সমান্তরাল দুই ভাবধারার সম্মুখীন। আশার কথা, এ দুই ভাবধারা সত্যিই সমান্তরাল নয়; সামগ্রিক ভাব প্রতিনিয়ত আঞ্চলিক মানসকে প্রভাবিত করছে; বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক সভ্যতার কৃপায় তার জয় অনিবার্য।

অধ্যাপক টয়েনবী ভারতের স্বাধীনতার যে-বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গলময় মনে করেছেন তা হ'ল সর্বধর্ম, সর্বভাবসমন্বয়ের সক্রিয় প্রচেষ্টা। ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাব ব'লেই আমরা ভুলে যাই, যে অদলীয় (বা সর্বদলীয়) বৈদেশিক নীতি স্বাধীনতার পরে আমরা গ্রহণ করেছি তা আমাদের ঐতিহ্যের অবশ্যম্ভাবী বিকাশ। ধর্মে আমরা যেমন সকল ধর্মকে গ্রহণ করেছি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতেও তেমনি আমরা সব মতবাদকে একত্র করতে চেষ্টিত। বিশ্বের সবগুলি শ্রেষ্ঠ সংবিধান থেকে পথের নিশানা সংগ্রহ ক'রে আমরা আমাদের সংবিধান রচনা করেছি। অর্থনীতি ক্ষেত্রে, সমাজতন্ত্র আমাদের লক্ষ্য হ'লেও, কোনও তন্ত্রকেই আমরা একেবারে বর্জন করি নি।

কোনও নির্দিষ্ট কেতাব-দুরস্ত পথ বেছে না নিয়ে, সব পথের পাথেয় অর্জন করবার যে প্রয়াস স্বাধীন ভারতবর্ষে চলছে, তা সার্থক না ব্যর্থ হবে আজ বলা কঠিন। কিন্তু ভারতবাসী এ প্রয়াসে অভ্যস্ত, অন্য কিছুতে তার মন ভরে না। আমাদের স্বাধীনতা একদিকে যেমন পঞ্জাব-গুজরাট-সিন্ধী-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ নিয়ে একজাতি সমন্বয়ে বিনিযুক্ত; তেমনি আমাদের অর্থনীতিও ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের পাঁচমেশালি; আবার তেমনি আমাদের বৈদেশিক নীতি সকল দেশের সঙ্গে ভাব রেখে চলতে প্রয়াসী। এ ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন আলাদা; কিন্তু এই হ'ল ভারতবর্ষের স্বরূপ।

মানুষের যেমন ভাণ ও ভণিতা থাকে, দেশ ও জাতিরও তেমনি। অনেক সময় এ ভাণ ও ভণিতা সজ্ঞান নয়। স্বাধীন ভারতবর্ষেরও কতগুলি ভাণ ও ভণিতা আছে। যতই আমাদের স্বাধীনতা পাকবে ততই আশা করা যেতে পারে, এগুলো থেকে আমরা মুক্ত হব। সমস্যা ও সংকট থেকে দূরে সহৃদয়তা প্রচার সহজ; তাদের সম্মুখীন হ'লে ব্যবহার আপনা থেকেই পরিবর্তিত হয়। কালের একটা অমোঘ নিয়ম আছে,- জীবনের দাবীর মতই তা কঠিন। আমরা যতই সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করব তত বাড়বে আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি। কাল আমরা যাকে মিত্র ভেবেছিলাম, আজ সে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী; আজ যাকে মিত্র ভাবছি, কাল হয়ত তার অন্য পরিচয় পাব; আজ যে বন্ধু, কালও যে সে তাই থাকবে, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি এমন সমতলভূমি নয়। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিটি সংকট-কালে আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থ কি ও কোথায় তা বুঝতে পারব কি না। যদি পারি এবং যদি সেইমত আমাদের নীতির চতুর বিনিয়োগ হয় তাহলে আমাদের স্বাধীনতা সবল হবে।

নির্দিষ্ট নীতি ও 'বাদে'র দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে বিচার করতে যাওয়া ধৃষ্টতা। কোনকিছুই আমরা ঠিকমত করতে পারছি না, কিন্তু অনেক কিছু মোটামুটি ক'রে যাচ্ছি। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ব'লে আমরা গর্বিত; গণতান্ত্রিক অধিকারকে আমরা বড় স্থান দিয়েছি; অথচ আমাদের দেশের বিরাট সংখ্যাধিক মানুষ সর্বজনবিদিত কারণে গণতন্ত্রের বাইরে। আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে যতই না কেন মূল্য দি, রাষ্ট্রকে আমরা পরিপালকের স্থানে বসিয়েছি; আমাদের দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী কোন না কোন উপায়ে রাষ্ট্রের দাক্ষিণ্য গ্রহণ করেছেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আমরা একবিন্দু বিসর্জন দিতে নারাজ; অথচ, আমাদের সংবাদপত্রগুলির সংবাদ-পরিবেশনে 'স্বাধীনতা' নিতান্তই সীমাবদ্ধ; বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার গলদ সবটুকু জেনেও আমরা তার সংশোধন করতে পারছি না; আমাদের সবরকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্র দেশে দানা বাঁধে নি, কেবলমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত কতগুলি কলকারখানা ও বহুমুখী প্রজেক্ট তৈরী হয়েছে। আমরা স্বাধীন হয়েছি কিন্তু বিদেশী প্রভাব আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অনেক বেড়েছে। আমরা এশিয়া-আফ্রিকার 'নেতৃত্ব' লাভ করেছি, কিন্তু সাদা চামড়ার মানুষকে এখনও আমরা সবচেয়ে বেশী সমীহ করি; অশ্বেতকায়দের বড় একটা পাত্তা দি' না।

এই যে-সব পরস্পরবিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্য, এরাই আমাদের স্বাধীনতাকে সজীব করেছে। আমরা এখনও পাকা-পোক্ত, স্থির-স্বভাব জাতিতে পরিণত হই নি। আমাদের সবকিছুই 'ফুটন্ত হাঁড়ি'র মধ্যে সেদ্ধ হচ্চে। অল্প সময়ে অনেক কিছু একসঙ্গে আয়ত্ত করার যে দুরূহ সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি তাতে এ অবস্থা অনিবার্য। অনেক স্তরের ভারতবর্ষ আজ একসঙ্গে মিলেমিশে এক অদ্ভুত জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছে। গরুর গাড়ীর কাল মিশে গেছে জেট প্লেনের কালের সঙ্গে; মাটির তেলের বাতি জ্বলছে বিজলীবাতির সঙ্গে; গরুতে টানা ঘানির যুগ আণবিক যুগের সঙ্গে। কোন্ ভারতবর্ষ সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে, বোঝা বা বোঝান সহজ নয়। তবে একথা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় যে, গরুর গাড়ী, মাটির তেলের বাতি ও পশু-টানা ঘানির যুগ ক্রমাগত পেছনে হঠবে; যে ভারতবর্ষ ধীরে আস্তে, ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে, রূপ নেবে তা যন্ত্রসভ্যতার ভারতবর্ষ।

পরিবর্তনের, নতুন যুগসভ্যতা, যুগধর্মের অনেক কিছু আমাদের মন এখনও মানতে পারছে না। আমরা এখনও সাবেকী কায়দায় রাষ্ট্রনীতি অভ্যাস করি, গণতন্ত্রে যার কোন স্থান নেই। আমরা ভুলে যাই, গণতন্ত্রের মূল-

মন্ত্র আপোস ; পরস্পরবিরোধী স্বার্থ ও সংস্কারকে মিলিয়ে-মিশিয়ে চলবার নাম গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের কোনও সর্বাত্মক নীতি নেই, যেমন আছে সাম্যবাদের। নাগরিকের সবটুকু মানসকে দখল করতে চায় না গণতন্ত্র, তাকে যথাসম্ভব ইচ্ছা-বিলাসী হ'তে দেয়। আমরা যখন বলি, রাষ্ট্র ভারতবর্ষের জনতাকে জাগিয়ে তোলে নি, তখন ভুলে যাই, গণতন্ত্র কোন জনতাকে জাগায় না, জাগ্রত জনতাই গণতন্ত্রকে সবল করে। গণতন্ত্রে যেমন নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃত, তেমনি তার ভোট না-দেবার অধিকারও স্বীকৃত। না-মানবার বা স্রেফ উদাসীন থাকবার অধিকার গণতন্ত্র সমানভাবে স্বীকার করে। যত দিন যাবে ততই আমরা রাষ্ট্রনীতির প্রতি উদাসীন হব, এবং ততই আমাদের গণতন্ত্র দৃঢ় হবে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, কর্মে জীবন পূর্ণ হলে রাষ্ট্রনীতির উত্তাপ ক'মে আসবে ; আমাদের চিত্ত শান্ত হবে। ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক পথে চলতে চলতে হয়ত দেখব, বেশ একটি পুষ্ট রাষ্ট্রতন্ত্র এদেশে তৈরী হয়ে গেছে। হয়ত বা আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা মোটামুটি ধনতান্ত্রিকই থেকে যাবে। কিন্তু যে যান্ত্রিক বিপ্লব সুরু হয়েছে তা আমাদের অনেকখানি নিয়ে যাবে—যে 'তন্ত্রে'ই আমরা চলি না কেন।

ভাবক্ষেত্রে জাতীয় সংগ্রাম যে বিপ্লব এনেছিল তা আজ নিঃশেষিতপ্রায়। কিন্তু অন্য কোনও বিপ্লব এখনও দানা বাঁধে নি, অদূর ভবিষ্যতে বাঁধবে ব'লে মনে হয় না। ভাবক্ষেত্রে অতএব আমরা চলব দীর্ঘ অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে। যে-সব মূল্যবোধ জাতীয় সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে গ'ড়ে উঠেছিল ইতিমধ্যেই তাতে ক্ষয় দেখা দিয়েছে। এ অবক্ষয় চলবে। একদিকে আমাদের ঐহিক সম্পদ্ বাড়বে, অন্যদিকে মানস সম্পদ্ কমবে। দেখব, যাঁদের দেবতা ভেবেছি তাঁরা নিতান্তই সাধারণ মানুষ ; যে-সব আলোর ঝলকে ভুলেছি তা শুধুই আলেয়া। আমাদের মোহ কাটবে। চিন্তাশক্তি চাবুক খেয়ে সক্রিয় হবে। আমাদের নেতা-বিমুগ্ধ ভাব কেটে যাবে। আমরা নিজের মূল্য বুঝব। তখন পাব আমরা নতুন পথের, নতুন মূল্যবোধের সন্ধান। তাতে শূন্যের চেয়ে শাঁস থাকবে বেশি।

—০—

রসমালঞ্চের মালাকর

শ্রীকালিদাস রায়

মহারাণী রসেশ্বরী ব'সে আছে বিরসবদন
হস্তে তার ন্যস্ত গণ্ড। পুষ্প-আভরণ
সুরভি করে না তার বরতনু। নেই সে সুন্দর
তার পুর-মালঞ্চের স্বেচ্ছা-বন্দী দাস মালাকর,
বুলবুল সম যেবা ফুল-ফুল খেলা
করিত, প্রভুত্বে দৃপ্ত সর্ব কর্মে করি অবহেলা,
পারিষদ দলে যার সভামঞ্চে মিলিত না দেখা,
আসিত যে একা
সৌগন্ধ্যে মোদিত করি' সারাপথ রাণীর দুয়ারে
মধুপ কঞ্চুকী হয়ে অন্তঃপুরে আনিত যাহারে।
মালঞ্চে মাধবী-মঞ্চে শোভা আর নাই নাই হায়!
সে সুগন্ধ নাই কুন্দে রজনীগন্ধায়।
পলাশে বিলাস নাই নিরুল্লাস ঝরে অযতনে,
শল্লকী পশেছে বেলা-মল্লিকার বনে।
সান্ধ্য যুথী-স্তবকের গাঁথি' কেহ লীলায়িত হার,
দোলাইতে কম্বুকণ্ঠে সে রাণীর আনে না ক আর।
ফুলের কঙ্কণ গড়ি' নব ছন্দে কেহ পদ্মপাতে
পরাতে মৃণালভুজে আনে না প্রভাতে।

কারো করে সমর্পণ করে না সে রাণী,
পদ্মের কলিকা সম অর্ধাঞ্জলিখানি।
অশোকের রক্তরাগে চিত্রিত চরণে
অঙ্গুলিপ্রান্তের রেণু মুছি' কেহ লয় না চুম্বনে।
চাহিয়াছে কত বিদ্যাধর
উদ্যানবিদ্যায় বিজ্ঞ, মালঞ্চের হতে মালাকর,
চাহিয়াছে পুরস্কার, খ্যাতি, যশোমান,
বেতন যোগ্যতাযোগ্য, নানা ভোগ্য—সেবাপ্রতিদান,
চাহিয়াছে দিবসের সারি' কর্ম শত,
তুষিতে ভূষিতে তারে অবসর মতো।
হীরামুক্তা স্বর্ণভূষা আনি রাশি রাশি
সাজাইতে সে শ্রীঅঙ্গ চাহিয়াছে কত শিল্পী আসি'।
মহারাণী আজো অন্য সেবকে না চায়,
একে একে সকলেরে ম্লান হাস্যে দিয়াছে বিদায়।
রাণীর বরাঙ্গে তাই নাই আজো পুষ্পিত উল্লাস,
মনের মানুষ কই? তারে স্মরি' ত্যজে তপ্তশ্বাস।
গোধূলি ঘনায় যত সন্ধ্যার আলসে
সেই তপ্তশ্বাসে সারা মালঞ্চ ঝলসে।
পুষ্প ফুটে ঝরে আজো, তনুস্বর্গে লভে না সদ্‌গতি,
বসন্ত বিদায় লয়, পুষ্পবনে শোকাকুলা রতি।

—●—

আমি পৌঁছলাম,—তখন কলকাতায় চারিদিকে একটা বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে। সভাপতি এবং প্রধান অতিথি বেছে তাঁদের অভিভাষণ, কিছু প্রবন্ধপাঠ, আবৃত্তি এবং সেগুলি শোনাবার জন্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে ঘিরে রাখতে সাংস্কৃতিক আয়োজন—নৃত্য, গীত বাদ্য, ইত্যাদি।

বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায় না, অন্ততঃ সব ক্ষেত্রে নয়। কেন তা বলতে গেলে অনেক কথা এসে পড়ে। সে-সবের প্রয়োজন নেই এখানে; শুধু আমার দুর্ভোগের কথাটাই বলব।

তৃপ্তি যখন পাই না, তখন সাধ্য মত গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করব, সেইটাই স্বাভাবিক নয়? তাই করিও। আমি এসে পৌঁছেছি এক দিন আগে। খবর পেলাম, এসেছিল কয়েকজন। গুটি-সাত কার্ড আর কাগজের চিরকুটও রেখে গেছে, নাম-ধাম ঠিকানা লেখা, পাঁচটিতে আবার আসবে সেকথাও এবং কোন্ সময়টা আসবে।

দীর্ঘ রেলপথের ক্লান্তি আছে, তবু তাড়াতাড়ি স্নানাহার কোনরকমে সেরে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে; ফিরলাম বেশ রাত ক'রেই। ওদের আসবার একেবারে শেষ সময় দিয়ে গিয়েছিল ভবানীপুরের দুটি যুবক, রাত ন'টা, আমি ফিরলাম রাত সাড়ে দশটায়; ভবানীপুরের ছেলেদের যখন শিবপুর পর্যন্ত ধাওয়া করবার তিলমাত্র সম্ভাবনা থাকবে না। অন্ততঃ আমি যা ভেবেছিলাম।

এসে শুনলাম, তারা ন'টা থেকে সওয়া দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল আমার জন্য, তারপর উঠে যায়। আবার মিনিট-পাঁচেক পরে এসে খানিকক্ষণ ব'সে ছিল, শেষ উঠে যায় আমি আসবার মিনিট-তিনেক আগে।

তবে একেবারে শেষবারের মত যায় নি। কাল আবার আসবে ব'লে গেছে, একটা চিঠিও দিয়ে গেছে।

তাড়াতাড়িতে লেখা, এবং খুব সংক্ষিপ্ত, এদিকে ট্রাম-বাসের সময় উৎরে যাচ্ছে ত?

লিখেছে, আমাকে চাই-ই ওদের। অমুক সময় থেকে অমুক সময়ের মধ্যে আমি যেন বাড়ী থাকি, কিংবা কোথায় থাকব যেন জানিয়ে দিই; যেখানেই থাকি, ওরা খুঁজে পেতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চিঠি আছে আমার নামে, সেটাও হাতে হাতে দেবে।

দেখলাম, সাহিত্যেও বেশ হাত আছে। সবশেষে একটা লাইন জুড়ে দিয়েছে, যার মানে হয়, আমি মিথ্যা একটা ভাঁওতা দিয়ে ওদের অযথা ঘোরাব না—এ বিশ্বাসটা ওদের আছে। লাইনটুকু খুব সংযত এবং সতর্ক, ভাবী সভাপতির সম্মানটা পুরোপুরি বজায় রেখে লেখা; কিন্তু উদ্দেশ্যটা মোটেই অস্পষ্ট নয়।

রেলযাত্রার ক্লান্তির ওপর সমস্ত দিন অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়ান, তার ওপর এই দুশ্চিন্তা, শরীর আর বইছে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শয্যা আশ্রয় করলাম। মনটা বিষণ্ণ হয়ে রইল। মিথ্যা ভিন্ন পরিত্রাণের কোন উপায়ই দেখছি না। শেষে আমার নব-বর্ষটা এই দিয়েই আরম্ভ করতে হবে?

সকালবেলায় যখন উঠলাম, দেহটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে, মনটাও খুব হালকা। দেহমনের এইরকম অবস্থায় যেমন হয়; সমস্যাটার একটা সমাধানও পেয়ে গেছি। বিছানায় শুয়ে শুয়েই ভবানীপুরের সেই চিঠিটুকু নিয়ে আসতে বললাম, একটা বই আর একটা কলম। বইয়ের ওপর ওটা উল্টে রেখে জবাবটা লিখে দিলাম।

লিখলাম,—মার্টিনের ছোট লাইনের ওদিকে আমার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে, বারোটা থেকে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত আমায় ওদিকেই থাকতে হবে।

সত্য কথাই, তবে অবশ্য "ইতি-গজ" জাতীয়। মহাপুরুষেরই আবিষ্কার, তাঁকে মনে মনে প্রণাম জানালাম।

ওরা বেলা একটার সময় খোঁজ নিতে আসবে ব'লে গিয়েছিল। আমি এগারোটার সময় বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ীটা একটা পঞ্চাম্নয়।

আমার নববর্ষের বৈশাখ যে এমন রুদ্র-মোহন রূপ নিয়ে দেখা দেবে, তা কবে ভাবতে পেরেছিলাম?

ঘণ্টাখানেকও গেল না, আমাদের গাড়ী শহরতলির বাড়ীঘর, রাস্তা-ঘাট ছাড়িয়ে বাইরে এসে পড়ল, পল্লী-বাংলা যেখানে বৈশাখের জন্য তার আসন পেতে রেখেছে।

দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, নিষ্পাদপই বলতে হয়, শুধু দূরে গুটিতিনেক খেজুরের হালকা ছায়ায় দুটি রাখাল ছেলে একটি গাছে হেলান দিয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে। একটি তার শ্রোতা, আধ-বসা হয়ে চেয়ে রয়েছে তার আঙুলের খেলার দিকে। দুটি গরু, আলের গায়ে যেটুকু ঘাস পেয়েছে খুঁটে খুটে খেয়ে যাচ্ছে, ল্যাজের কেশগুচ্ছ পিঠের ওপর গিয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে। হুহু ক'রে একটা উষ্ণ হাওয়া একটানা বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে জলন্ত ইথারের ঝিকিমিকি হাওয়াটা বহুদূরে ধুসর ক্ষেতের ওপর হঠাৎ আবর্তিত হয়ে একটা ঘূর্ণি উঠল। ক্ষীণ একটি ধুসর রেখা, ক্রমে ধুল আর শুকনো পাতায় পুষ্ট হতে হতে ছুটল মাঠের এক দিক্ থেকে অন্যদিকে।

মোড় ঘুরে একটা গ্রামের প্রান্তে হঠাৎ এসে পড়েছে আমাদের গাড়ীটা। আম-কাঁঠাল, জাম, নারকেলের টানা বাগান; পানায় ঢাকা পুকুর; বাঁশের ঝাড় লুটিয়ে পড়েছে ধারে ধারে। মুক্ত আকাশের প্রখর রৌদ্র তার দীপ্তি হারিয়ে গ'লে গ'লে নেমে আসছে এখানকার ঘাসে-ঢাকা মাটির ওপর। বৈশাখ কি এখানে পৌঁছুবার ছাড়পত্র পায় নি এখনও? না, রুদ্র সন্ন্যাসী শান্তশ্রী গৃহী হয়ে করল গৃহ-প্রবেশ?

আমাদের গাড়ী ছুটে চলেছে আকাশতলে বিছানো এই সাদা-কালোর ছকের ওপর দিয়ে স্টেশনের পর স্টেশন ছুঁয়ে ছুঁয়ে। দোল লাগছে গায়ে, কখনও জোর কখনও মৃদু। ঘুম বুলিয়ে দিচ্ছে চোখে; চেয়ে আছি একরকম জোর ক'রেই। ঘুমিয়ে পড়লে এ দুর্লভ দৃশ্য আর দেখব কবে?

বেলা যখন প্রায় পাঁচটা, আমাদের গাড়ী একটা স্টেশনে এসে দাঁড়াল। আর সবগুলা থেকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিচ্ছিল, এখানে দাঁড়িয়েই রইল। ইঞ্জিন থেকে নিশ্চিন্ত বিরতির একটা টানা সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে, যেন লম্বা দৌড়ের পর বিশ্রাম নিচ্ছে খানিকটা।

বিশ্রাম নেওয়ার মত জায়গাটিও। বড় বড় গাছ চারিদিকে, তাদের নিবিড় ছায়া ছোট্ট স্টেশন আর লাইন
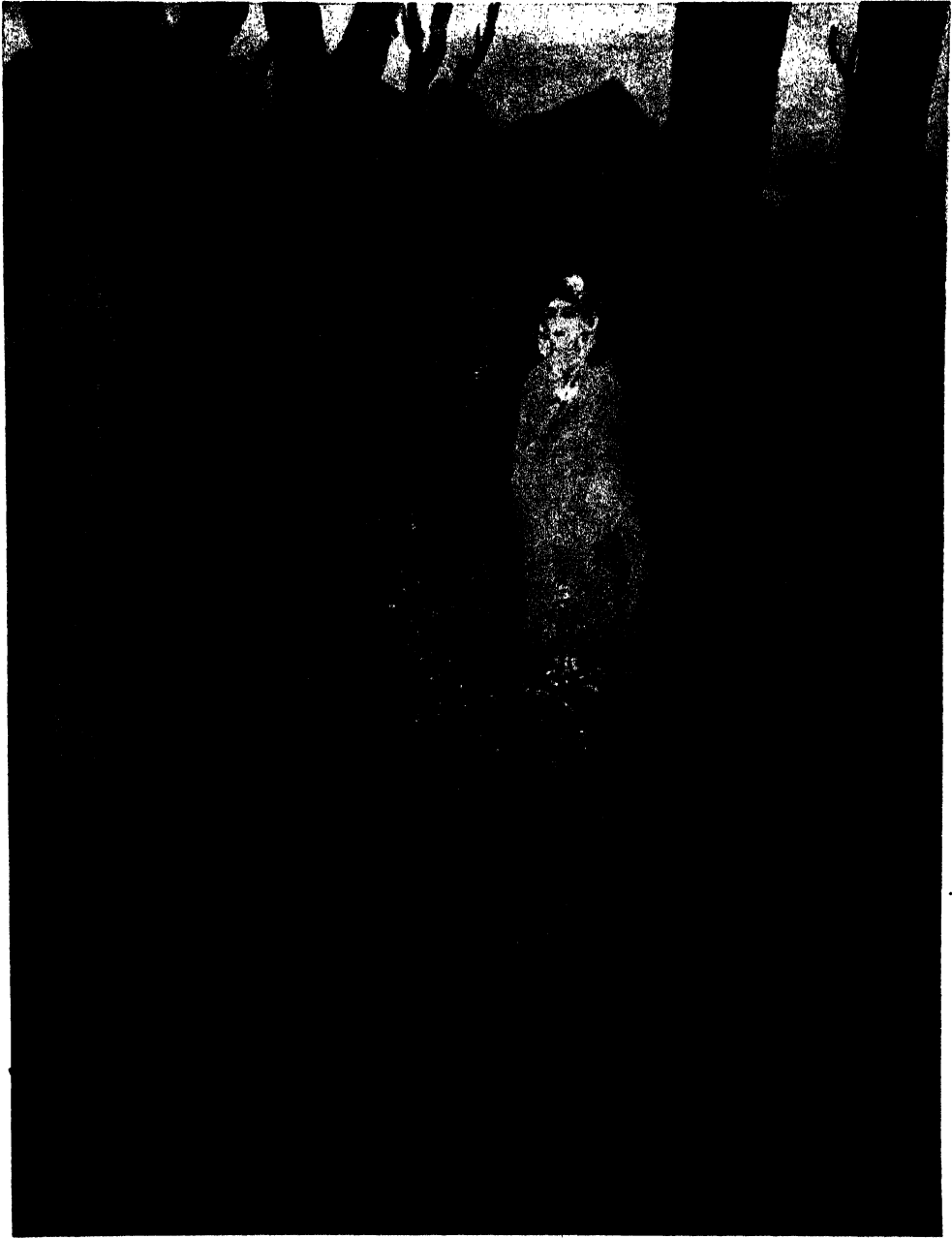
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা
শিল্পী শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩৩৩ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

পাতা ইয়ার্ডটুকুকে যেন কোল পেতে নিয়ে ব'সে আছে। সমস্ত দিনের দাহ,—সেটা হয়ত এখানে পৌঁছাতেও পারে নি কখনও, আরও যেন শান্ত হয়ে এসেছে। বড় স্নিগ্ধ মনোরম ব'লে বোধ হচ্ছে। চুপ ক'রে ব'সেই ছিলাম সামনে সবুজ উৎসবের দিকে চেয়ে, আমার সঙ্গী যুবকটি বলল,—"একটু নেমে দাঁড়াবেন না? দেরি হবে। সামনের স্টেশন থেকে ডাউন ট্রেণটা আসবে, তবে এটা ছাড়বে।"

হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম, এ ছেলেটির কথা বলা হয় নি। আমার সঙ্গে হাওড়াতেই উঠে এই গাড়ীরই অন্য দিকৃটায় আমারই মত একটা কোণ নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। যেন একটু বিমর্ষ, মাঝে মাঝে হাতের মুঠায় মুখটা চেপে, বেশ চিন্তান্বিতই হয়ে উঠছে যেন। একটু মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল আমার, বিশেষ ক'রে বার-দুই ওদিকে দৃষ্টি গিয়ে পড়তে যখন দেখলাম, একটু কৌতূহলের সঙ্গে আমার দিকে আছে চেয়ে।
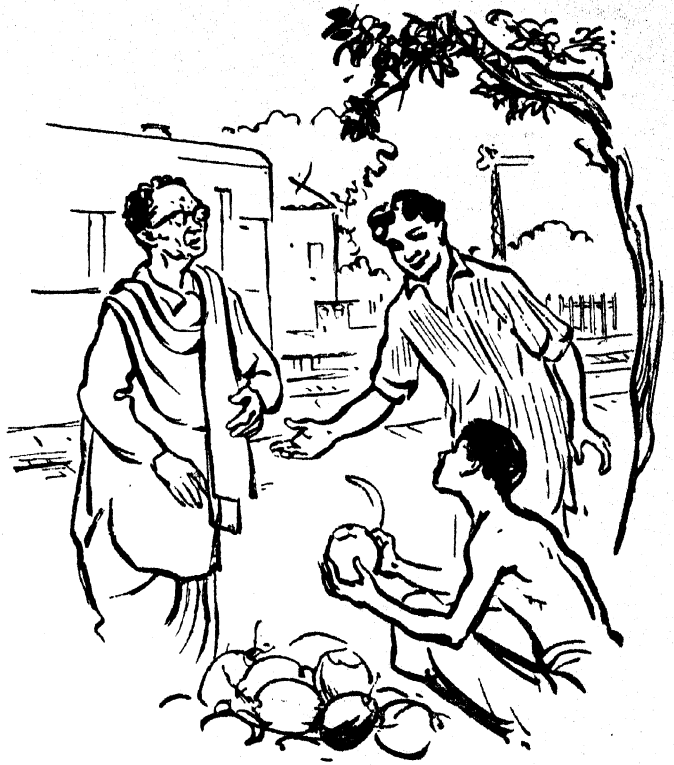
এই, বাবুকে একটা কেটে দে।

গাড়ীর যাত্রাপথ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, গাড়ী খালি হতে হতে আগের স্টেশনটায় যখন মাত্র আমরা দুজন বাকি, ছেলেটি কয়েকবার ইতস্ততঃ ক'রে উঠে এসে একটা নমস্কার ক'রে আমার সামনের বেঞ্চটায় বসল।

আলাপ-পরিচয় আরম্ভ হ'ল। কোথায় যাচ্ছি, ও কোথায় যাবে, আসছে কোথা থেকে—এই ধাঁচের। আমার উদ্দেশ্যটা প্রকাশ ক'রে বলবার নয়, একটু আবছা আবছাই বললাম,—এই লাইনের শেষ স্টেশনে যাব, একটু কাজ আছে, আবার আজই ফিরব শেষ ট্রেণে। ও শুনলাম এই স্টেশনেই নামবে। এর পর স্বভাবতই আলোচনাটা আকাশের অবস্থার দিকে এসে পড়ল,—কী দারুণ রোদের তাত—জলের নাম নেই—এক টুকরা মেঘ নেই আকাশে!

কাছাকাছি স্টেশন, আমাদের গাড়ীটা ঐ ক'টা কথার মধ্যে এসে পড়ল। যুবকটি নমস্কার ক'রে নেমে যেতে যেতে আমায়ও নেমে দাঁড়াতে বলল, দুটা গাড়ীর মিল হবে এখানে, দেরি হবে। গাড়ীতে তাত, সামনের নিবিড় ছায়াটা টানছেও, আমি নেমে পড়লাম।

ছেলেটির মাঝে মাঝে সেইরকম চিন্তান্বিত হয়ে পড়বার ভাবটা যেন যেতে চাইছে না। কপালে তর্জ্জনীটা টিপে মাথা নীচু ক'রে একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড়টা উঁচু ক'রে স্টেশনের ওদিকৃটায় গলাটা তুলে মাথা

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু দেখল। নিবিড় আগাছার জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে একটা হাত-তিনেক চওড়া কেটে রাস্তা এঁকেবেঁকে চ'লে গেছে, খানিকটার পর আর দেখা যায় না ; মনে হ'ল যেন ঐ পথেই কারুর প্রত্যাশা করছে ও। তার পর আবার দৃষ্টি নামিয়ে কপালে তর্জ্জনীটা ঠেকাতে ওর যেন হঠাৎ কি একটা মনে প'ড়ে গেল ; ঘুরে আমার মুখের দিকে চাইল, সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এসে চোখে কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন করল,—"মাফ করবেন···আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে···" বুকটা ধক্ ক'রে উঠল, মার্টিনও বাঁচাতে পারল না শেষ পর্য্যন্ত।

মনটা খুব সংযত ক'রে নিয়ে একটু হাসি টেনে আনবার চেষ্টা ক'রে বললাম,—"তা দে'খে থাকবেন, এতে মাফ করবার কি আছে ? কিম্বা আমার মতন অন্য কাউকে দে'খে থাকবেন, কেননা আমি ত থাকি না এখানে···"

"কোথায় থাকেন ?" তীব্র দৃষ্টিতে আমার কথা বলার ভঙ্গিটা যেন লক্ষ্য করছিল ; বাধা দিয়ে করল প্রশ্নটা।

একটা ছেলে 'ডাব' হেঁকে যাচ্ছিল, বলল,—"এই, বাবুকে একটা কেটে দে।"

—পরিচয়টা বেশি ক'রেই দিয়ে ফেলেছি। ঘামটা শুকিয়ে আসছিল, আবার গলগল ক'রে নামল। আমতা আমতা ক'রে বললাম—"আমি থাকি বাংলার বাইরে—সেই হার···"

নার্ভাস হয়ে গিয়েই পরিচয়টা আরও পূর্ণ ক'রে দিতে যাচ্ছিলাম, ঠিক এই তালের মাথায় "জগা ! জগা এসেছিস্ ?" ব'লে একটা শব্দ হ'তে ছেলেটি পাক দিয়ে ওদিকে ঘুরে দাঁড়াল।

একটি ওরই বয়সের ছেলে হন হন ক'রে এগিয়ে আসছে আগাছার মধ্যে দিয়ে, হাতে একগাছা মালা। বলতে বলতেই আসছে,—"প্রেসিডেণ্ট ফাউণ্ড ? (President Found ?) পেলি সভাপতি ? আমার ভাই একটু দেরী হয়ে গেল—এমন আটকে গেলুম—স্টেজ ঠিক করা—আর্টিস্ট্‌দের মেক্-আপ্···কৈ তিনি ?···"

এসে পড়েছে। দাঁড়িয়ে পড়ল। একবার আমার দিকেও চাইল। ছেলেটি বিমর্ষ কণ্ঠে বলল,—"পেলুম না ভাই। বিশ্বাস কর, সমস্ত কলকাতা ঘেঁটে বেড়িয়েছি রোদ মাথায় ক'রে। শ্যামবাজার, চিৎপুর, আহিরিটোলা এদিকে বালিগঞ্জ···"

"উফ্। তোকে এসে ফিরিস্তি ঝাড়বার জন্যে পাঠিয়েছিলুম ? মিত্র-এ্যাণ্ড-ফ্রেণ্ডস্, বেঙ্গল, রঞ্জনী—গিয়েছিলি এসব জায়গা ? সভাপতি প্রধান-অতিথির গুদোমে গিয়েছিলি ?···শেষ অবধি ফকুরের দলই জিতল। এত সিওর ছিলুম ! ডিম জোগাড় ক'রে রাখাও হয় নি। উফ্ !"

—নিজের মাথার চুল খামচে ব'সে পড়তে যাচ্ছিল, "জগা" ব'লে আগের ছেলেটি হাতটা ধ'রে ফেলল ওর. বলল,—"শোন্, কথা আছে।"

একটু চাপা গলাতেই বলল, তার পর হাতটা ধ'রে স্টেশনের দিকে নিয়ে চলল। খানিকটা গিয়ে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দে'খেও নিল আমায় ; দু'জনেই। তার পর স্টেশনের টিনের দেয়ালের আড়াল হয়ে পড়ল।

এর ওপর আবার সেই চিরন্তন দলাদলির হাঙ্গামও আছে ! বেরাল-ডাক, পচা ডিম। রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে কি যে করব কিছু ঠিক করতে পারছি না, এমন সময় ঢং ঢং ক'রে গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় বুদ্ধিটা জুগিয়ে গেল। জানাও ছিল,—যে-গাড়ীটা পরে আসে সেইটেই রেলের নিয়ম-মতো আগে দেয় ছেড়ে। ছেলেটা অন্য একজনকে ডাব দিয়ে হেঁট হয়ে আমারটা কাটতে আরম্ভ করেছে ; দরকারও ছিল খুব, কিন্তু আর দ্বিধা মাত্র না ক'রে সামনের গাড়ীটা টপ্‌কে ওদিক্‌কারটায় উঠে বসলাম। বেশ গা-ঢাকা ভীড়ও রয়েছে। গাড়ীটা বোধ হয় লেট্ ছিল, ছেড়েই সঙ্গে সঙ্গে গতিবেগ দিয়ে দিল।

ওরা ওদিক্ থেকে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টি ফেলছে। ডাবওলা ছেলেটাকে প্রশ্ন ক'রে গাড়ীটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে আরম্ভ করেছে। আমার গাড়ী ততক্ষণে অনেকখানি বেরিয়ে এসেছে স্টেশন থেকে।

সেখান থেকে দেখলাম, প্রসেশনের মতো ক'রে রিক্সা এগিয়ে আসছে আগাছার মধ্যে দিয়ে। সামনে একটা ক'রে পতাকা বাঁধা।

চারটে পর্যন্ত দেখলাম, তার পর আমাদের গাড়ীটা একটা বাঁকের মাথায় ঘুরে আড়ালে প'ড়ে গেল।

—•—

মশারির আড়ালে দু'জনের দেখা হলেই আজকাল আর অন্য কথা নেই। অনীতা তাঁর স্বামীকে যা শুনিয়ে যান তার একই সুর, একই মর্ম। দেবী সব সময় সন্ত্রস্ত। কে জানে কে কখন তাঁর বা তাঁর প্রিয়জনের কি জানি কি অনিষ্ট করে। যতই তিনি দেখছেন আর যতই তিনি ঠেকছেন, ততই তিনি শিখছেন যে, দেশের উপর দিন দিন অন্ধকার নেমে আসছে। লোকগুলো কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। তাদের জীবনে শান্তি নেই ব'লে তারা যেন শপথ করেছে যে, আর কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। অন্যের অহিত ক'রেই তাদের আনন্দ।

শেখর তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে যত্ন করেন যে, মন্দ সব সময় সক্রিয় যদিও, ভাল তার চেয়েও শক্তিমান্। গোড়াতে যাই হোক না কেন, আখেরে ভালই হয়। মন্দ করতে চাইলেও মন্দ করা যায় না। মন্দ করতে গেলেও ভাল হয়ে যায়। এর একটি ক্লাসিকাল উদাহরণ হ'ল চন্দ্রহাস।

"চন্দ্রহাসের কাহিনী জান ত?" শেখর মনে করিয়ে দেন। "চন্দ্রহাসকে বিষ দিতে ব'লে মন্ত্রী চিঠি লিখেছিলেন তাঁর পুত্রকে। চিঠিখানা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল স্বয়ং চন্দ্রহাস। জানত না যে ওটা তার মৃত্যুর পরোয়ানা। শ্রান্ত হয়ে বেচারা গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়ে। ওই পথ দিয়ে ফিরছিল মন্ত্রীকন্যা বিষয়া। অচেনাকে দেখে তার ভাল লেগে

যায়। কৌতূহলী হয়ে সে নিদ্রিতের জেব থেকে তার পরিচয়পত্র টেনে নিয়ে পাঠ করে। এই সেই রাজপুত্র চন্দ্রহাস! মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে রাজ্যহারা। হ্যাঁ! এমন সুন্দর ছেলেটিকে বিষ দিয়ে বধ করতে হবে! কিছুতেই না। বিষয়া তার নিজের চোখের কাজল মুছে নিয়ে নখ দিয়ে 'বিষ' শব্দটির শেষে 'য়া' জুড়ে দেয়। চন্দ্রহাস টের পায় না। চিঠি পৌঁছে দেয়। মন্ত্রীপুত্র পরম সমাদরে চন্দ্রহাসকে বিষয়া সম্প্রদান করে। আশাতীত, কল্পনাতীত সৌভাগ্য! এর জন্যে তাকে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করতে হয় নি। করবার যা কিছু তা করেছে অনিষ্টকারী ও ইষ্টকারী শক্তিদ্বয়। তার অজ্ঞাতসারে।"

"কেউ যদি তার অনিষ্ট করতে না চাইত," শেখর বলতে থাকেন, "তা হলে চন্দ্রহাস কি বিষয়াকে পেত? একজনের পর একজন তার অনিষ্ট করতে যায় আর ফল হয় বিপরীত। চন্দ্রহাস অবশেষে ভারতবর্ষের সম্রাট্ হয়। বলতে গেলে তার অনিষ্টকারীদেরই অনুগ্রহে। তেমনি কে জানে আমরাও—"

"থাক্, থাক। হয়েছে, হয়েছে। তোমার মতো আশাবাদী আর দেখিনি। আমি যে কি কষ্টে দিন কাটাই সে আমিই জানি।" অনীতা তাঁর স্বামীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, "তোমার খালি পুরাণ আর কোরাণ আর ইতিহাস আর দর্শন। আর রবি ঠাকুর। জীবনে কি যে হয় আর কি যে হয় না, সেইটেই তোমার জানা নেই শুধু।"

এই ব'লে তিনি রায় দেন, "জীবনে ও-রকম হয় না।"

ওটা যেন একটা চ্যালেঞ্জ। অমন ভাবে চ্যালেঞ্জিত হয়ে শেখর প্রথমটা অপ্রস্তুত হন। তার পর তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ কেমন ক'রে বেরিয়ে যায়, "না বলিয়ে আমাকে ছাড়বে না, জীবনে যে কথা বলিনি।"

অনীতার ধারণা, তিনি তাঁর স্বামীর জীবনের অ আ থেকে হ ক্ষ পর্যন্ত যাবতীয় সংবাদ রাখেন। অনুস্বর বিসর্গ চন্দ্রবিন্দুও বাদ যায় না। তিনি চমকে ওঠেন। সন্দিগ্ধ হন।

"জীবনে যে কথা বলনি! কোন্ কথা বলনি! কোন্ কথাটা বাকী আছে জানতে এই পঁচিশ বছরে!" অনীতা অভিমানের সুরে বলেন।

তাঁদের বিবাহের রজত-জুবিলি আসন্ন। শেখর তাঁকে আদর ক'রে বলেন, "যা মনে করেছ তা নয়। এ আমার ছেলেবেলার কথা। ছেলেবেলায় আমি একজনের মন্দ করতে চেয়েছিলুম। হয়ে গেল ভাল। তখন আমি জ্ব'লেপুড়ে মরি। কতকটা ওই মন্ত্রী-মশায়ের মতো আর কি! যদিও বিষদানের মতো রোমাঞ্চকর বা বিষয়াদানের মতো রোমান্টিক কিছু নয়। নারীর সংস্রব নেই। না, তাই বা কেমন ক'রে বলি?"

অনীতার কৌতূহল জাগ্রত হয়। তিনি ফোঁস্ ক'রে ওঠেন। "তাই বল।"

২

"ছেলেবেলায়," শেখর আস্তে আস্তে সুতো ছাড়েন, "আমি আমার পিসীর বাড়ী গিয়ে কিছুদিন থাকি। খেলার সাথী একটি বালিকাকে আমি ফিরে এসে ভুলতে পারিনে। চিঠি লিখি। কিন্তু চিঠির পর চিঠি লিখেও তার উত্তর পাইনে। যে আমাকে একবেলা না দে'খে থাকতে পারত না সে কি আমার কথা একদিনও ভাবে না? আশ্চর্য হই। বিশ্বাস হয় না যে সে, আমার চিঠি পেয়েও নিরুত্তর রয়েছে। আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিল যাদু। আহা! সে বেচারা অল্পবয়সে মারা যায়। নইলে তার যেমন বুদ্ধি! সে একটা বড়গোছের উকীল কি মোক্তার না হয়ে পারত না। সে-ই আমাকে বুদ্ধি দেয় যে, চিঠি নির্ঘাত পূর্ণিমার হাতে পৌঁছবে যদি ডাকটিকিট না মেরে বেয়ারিং পাঠাই।"

"তার পর?" অনীতার নেশা লেগেছিল।

"তার পর আমি যাদুর কথামতো কাজ করি। খামে বন্ধ চিঠি বিনা টিকিটে ডাকে দিই। অনেকদিন পর্যন্ত

অপেক্ষা করি। শেষে হাল ছেড়ে দিই। একদিন ডাকপিয়ন এসে আমার খোঁজ করে। বলে, চিঠি আছে। তা শুনে আমি ত সপ্তম স্বর্গে। সে কিন্তু পরক্ষণেই জুড়ে দেয়, চার আনা পয়সা লাগবে। তা শুনে আমি ত চিত্তির। তখনকার দিনে চার আনা পয়সা বড় চারটিখানা কথা নয়। আজকালকার হিসেবে এক টাকা চার আনা। ছোট একটি ছেলে পাবে কোথায় সেকালের সেই চার আনা পয়সা? যার টিফিনের বরাদ্দ মোটে দু' পয়সায় দশটা গজা। বাড়ীতে চাইতে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে যে! ভয়ে আর ভাবনায় আমার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে।"

"বেচারা!" সান্ত্বনা দেন অনীতা। "বেয়ারিং চিঠির বেয়ারিং উত্তর দিয়েছেন প্রেয়সী।"

"শোন তামাসা। পিয়ন বলে, দাদা, এ চিঠি ডবল বেয়ারিং। শুধু বেয়ারিং হলে দু'আনা লাগত। চিঠিখানা ডাকে ছাড়বার সময় চারটি পয়সা খরচ ক'রে একখানা টিকিট মারতে ভুলে গেলে কেন? ওঁরা তোমার চিঠি রিফিউজ করেছেন।"

অনীতা হো হো ক'রে হেসে ওঠেন। শেখরও এতকাল পরে করুণ রস সঞ্চার করতে পারেন না। অগত্যা হাসেন।

"তার পর কি হ'ল শোন। পিয়নকে তখন পয়সা দিতে পারিনে। সেও চিঠিখানা আমাকে দেয় না। বলে, 'আচ্ছা, এ চিঠি রইল আমার কাছে। পরে পয়সা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস। নইলে কে জানে ডাকঘর হয়ত বাবুমশায়কে নোটিশ পাঠাবে। সরকার কি তার হকের পাওনা ছেড়ে দেবে? কড়ায় গণ্ডায় উশুল করবে।' তা শুনে আমি যেমন ক'রে পারি সেইদিনই চারটি আনা সংগ্রহ ক'রে চিঠিখানা ছাড় করিয়ে আনি। তার পর ছিঁড়ে ফেলি। পূর্ণিমাকে চিঠি লেখা সেই শেষ। ধীরে ধীরে ওকথা আমি ভুলে যাই। কাউকে বলিনে আমার আক্কেল-সেলামীর ইতিকথা। বুদ্ধিদাতা যাদুগোপালকেও না।"

অনীতা ভেবেছিলেন, এইখানেই ইতি। তা নয়।

শেখর কিছুক্ষণের জন্যে স্মৃতির অতলে নেমে যান। উঠে এসে বলেন, "সেই সময় বা তার এক-আধ বছর পরে আমাদের ক্লাসে একটি নতুন মুখচন্দ্রের উদয় হয়। কলকাতার ছেলে। দারুণ চালিয়াৎ। ধরাকে সরা জ্ঞান করে। লেখাপড়ায় যেমন পশ্চাৎপদ, খেলাধূলায় তেমনি অগ্রসর। খেলতে না জানে কি? ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন। অনায়াসেই দলপতি ব'নে যায়। ও যা বলবে তাই আইন ব'লে মেনে নিতে হবে। তুমি যদি বই খুলে দেখাও যে আইন ও-রকম নয় তা হলে তুমি হ'লে ওর চক্ষুঃশূল। তোমাকে যতরকমে পারে অপদস্থ করবে, অপমান করবে। একদিন আমার হাতটা টেনে নিয়ে এমন এক মোচড় দেয় যে আমি চেঁচিয়ে উঠে লজ্জায় চুপ মেরে যাই। সে ও তার ভক্তবৃন্দ হেসে আকুল।"

অনীতা মন্তব্য করেন, "নেহাত বদ্ ছেলে ত।"

"না। একেবারে যে বদ্ তাই বা কেমন ক'রে বলি?" শেখর সংশোধন করেন।

"সৎ লোক ব'লে ওর বাবা বেণীমাধববাবুর সুখ্যাতি ছিল। ছেলেগুলিও বাপের গুণ পেয়েছিল। বরং ফেল করবে, তবু পরীক্ষায় নকল করবে না। বরং মাস্টারমশায়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে বকুনি খাবে বা লাস্ট বেঞ্চে চালান যাবে, তবু লুকিয়ে বই দে'খে বলবে না। তাই প্রমোশন না পেয়ে এক-এক ক্লাসে দু' বছর ক'রে আটক থাকে আর বয়স বাড়ায়। রাজীব আসলে আমার সমবয়সী নয়। আমার দাদার বয়সী। দেখতেও লম্বা-চওড়া। সে ত আমার কাছে বাধ্যতা দাবী করবেই। বিশেষতঃ কলকাতার ছেলে যখন।"

অনীতার আগ্রহ জন্মেছিল। তিনি জানতে চান, কি হ'ল তার পর।

"তারপর একদিন একটা নাটকের অভিনয় উপলক্ষে সে আমাকে কেরিকেচার ক'রে সবাইকে হাসায়। উটের পিঠে শেষ কুটো। আমিও ক্ষেপে গিয়ে প্রতিশোধ চিন্তা করি। মানছি, আমার মুখের ভাষা কলকেতী বাংলা নয়। উচ্চারণ ভাল নয়। তা ব'লে সকলের সামনে আমার ভাষা নিয়ে ব্যঙ্গ করা! আমি প্রতিশোধ চিন্তা করি। কিন্তু

কিই বা করতে পারি আমি! গায়ের জোরে ত ওর সঙ্গে পারব না, হঠাৎ মাথায় এল সদ্য-পঠিত সংস্কৃত বচন। পশু সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ। নিপাতিতঃ না ব্যাপাদিতঃ? রাজীব অবশ্য সিংহ নয়, আমিও নই শশক। তুলনাটা আমার পক্ষে খুব গৌরবের নয়। তবু আমি আমার বুদ্ধির জোরে ওকে জব্দ করতে পারি। বুদ্ধিটাও আপনি জুটে গেল। সেই বেয়ারিং চিঠি লিখে যা শিখেছি তারই প্রয়োগ।"

অনীতা উচ্চকিত হয়ে বলেন, "সে কি রকম?"

"ছেলেমানুষীর চূড়ান্ত!" শেখর হেসে বলেন, "এখন ত হাসি পাচ্ছে। তখন মনে হয়েছিল, ওর মতো চমৎকার প্রতিশোধ আর হতে পারে না। বাবার দেখাদেখি আমিও ক্যাটালগের জন্যে চিঠি লিখতুম নানান কোম্পানীকে। কেউ পাঠাত, কেউ পাঠাত না। একখানা ক্যাটালগ বাবা আনিয়ে দেবেন না জেনে আমিই পাঠাতে লিখি। উত্তর পাইনে। উবেরায় কোম্পানীর খেলার ক্যাটালগ। কেনবার সামর্থ্য ছিল না। দে'খেই সুখ। একদিন করলুম কি, না, উবেরায় কোম্পানীকে চিঠি লিখে নীচে নাম সই করলুম রাজীবের। তার পর চিঠিখানা বেয়ারিং ছাড়লুম এই আশায়, যে, উবেরায় রিফিউজ ক'রে রাজীবকে ডোবাবে। বেয়ারিং চিঠি রিফিউজ করলে সেটা হবে ডবল বেয়ারিং। বাছাধনকে গাঁট থেকে বার করতে হবে চারটি আনা পয়সা। আর নয়ত কানমলা খেতে হবে বাপের হাতে। শাস্তি থেকে তার নিস্তার নেই। চার আনা হলেও জরিমানা ত বটে?"

অনীতা শিউরে ওঠেন। "ছি ছি! তুমি পরের সই জাল করেছিলে? ধরা পড়লে কি ফ্যাসাদে পড়তে, বল দেখি? ধরা কি তুমি পড়তে না ভেবেছিলে? ছেলের নাম জাল হয়েছে দে'খে বেণীবাবু পুলিসে খবর দিতে পারতেন। চালিয়াৎ বনাম জালিয়াৎ।"

"তখন কি সে-সব কথা ভাববার মতো বয়স হয়েছিল আমার?" শেখর সাফাই দেন কাষ্ঠ হেসে। "না। সে রকম কিছু ঘটেনি। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ। এখন শোন, কি হ'ল। চিঠিখানা ডাকে দেবার পর রোজ একবার ডাকঘরে হাজিরা দিই বিকেল পাঁচটায়। সে সময় ডাক বিলি হয়। পোস্টমাষ্টার এক এক ক'রে নাম ডাকেন। আমরা যারা হাজির থাকি, সাড়া দিই। তখন আমাদের চিঠি আমাদের যার যার হাতে দেন। আমার নামে প্রায়ই একটা না একটা ক্যাটালগ বা খবরের কাগজের নমুনা থাকে। নিজের গরজেই আমি যাই। কিন্তু নজরটা রাজীবের বেয়ারিং চিঠির উপরেও। রাজীব যায় না। তার তেমন কোন গরজ নেই। যদিও তাদের বাসা ডাকঘরের কাছেই। তার বাবার নামে চিঠি আসে। কিন্তু তার নামে না।"

"তার পরে?" অনীতার কৌতূহল উদগ্র হয়ে ওঠে।

"তার পরে? তার পরে যা হ'ল তা অবিশ্বাস্য। একদিন পোস্টমাষ্টার আলী সাহেব একখানা চমৎকার প্যাকেট হাতে নিয়ে পড়েন, 'আর. এল. মিটার এস্কোয়ার। রোজ ভিলা। ওহে, তোমরা কেউ বলতে পার এখানে মিটার সাহেব ব'লে কেউ এসেছেন?' 'কই, চিনি না ত।' আমার মুখ তখন শুকিয়ে আমসী। আমিও ব'লে উঠি, 'কই, চিনি না ত।' আমার বন্ধু যাদু ছিল সেখানে। সে জানত না যে এটা আমারি কীর্তি। বলল, 'আমি চিনি, সার। এ হ'ল বেণীবাবুর ছেলে রাজীবলোচন মিত্র। দেখি, দেখি, কি এসেছে? ওঃ! উবেরায়ের ক্যাটালগ!' আমার ত মাথা হেঁট। আমি তখন মা ধরণীকে বলছি দ্বিধা হতে। কে একজন ছুটে গিয়ে রাজীবকে ডেকে আনে। রাজীব সেই ক্যাটালগখানার উপর নিজের নাম-ঠিকানা দে'খে অবাক্। সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল। বলে, 'আমি ত লিখি নি। এ হ'ল মামার কাজ।' ক্যাটালগখানা খুলে সে উচ্ছ্বসিত। আর্ট পেপারে ছাপা কতরকম খেলার সরঞ্জামের ছবি। আমাদের চোখে ফিল্ম স্টারও অত সুন্দর নয়। তখনও ফিল্ম স্টারের যুগ আসেনি। রাজীবের ফূর্তি দেখে আমার বুকে শেল বিঁধতে লাগল। ভাগ্যিস্ কেউ জানত না যে আমিই দায়ী। নইলে আমার লজ্জার ষোল কলা পূর্ণ হ'ত। কালো মুখ নিয়ে সিদিন আমি বাড়ী ফিরি। আর রাজীবকে নিয়ে তার ভক্তরা মিছিল ক'রে বেড়ায়। এমন সৌভাগ্য কখনও কারও হয়নি। উবেরায় পাঠিয়েছে রঙীন ছবিওয়ালা ক্যাটালগ। নিশ্চয় মামার কাজ। এমন মামা আছে কার!"

অনীতা হাসি চেপে কপট দুঃখের সুরে "হায়! হায়!" করেন।

শেখর হাসতে হাসতে বলেন, "অত বড় ট্র্যাজেডী আমার জীবনে খুব কম ঘটেছে। তখন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছি। দু' দু' বার পোস্টকার্ড লিখে আমি উবেরায়ের কাছ থেকে সাড়া পাইনি। দুক পয়সা খরচে আমি যা পেলুম না, রাজীব পেয়ে গেল কোম্পানীর দু' আনা লোকসান করিয়ে। কেন এমন হয়? তখন বুঝতে পারিনি। এখন পারি। চিঠিখানা ছিল খামে বন্ধ। আর ঠিকানা দেওয়া ছিল, রোজ ভিলা। নামটাও সংক্ষিপ্ত। আর পদবীটাও সাহেবী বা ইঙ্গবঙ্গ। তাই কোম্পানী সাড়া দিয়েছে।"

৩

এর পরে দু'জনেই চুপচাপ।

"শুনলে ত? জীবনে যে কথা বলিনি। দেখলে ত? মন্দ করতে চাইলেই মন্দ করা যায় না। কেউ একজন আছেন যিনি মন্দ হতে দেন না। এই বিশ্বজগতের অভ্যন্তরে আছে এক কল্যাণকারিণী শক্তি। সে মন্দ হতে দেয় না।" দার্শনিকতা সুরু করেন শেখর।

ঘুম পাচ্ছিল অনীতার। তিনি থামিয়ে দিয়ে বলেন, "তার পর সেই ছেলেটার কি হ'ল? সেও কি চন্দ্রহাসের মতো সম্রাট্ হ'ল?"

"চন্দ্রহাসের ছিল চাঁদের মতো হাসি। সেই গুণে সে সব বৈগুণ্য জয় করল। আর রাজীবের?" শেখর নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেন, "রাজীবের ছিল ঘোড়ার মতো হাসি। সত্যি ঘোড়ার মতো। ও যখন হাসত তখন অনেকদূর থেকে শোনা যেত আর মনে হ'ত ঘোড়া ডাকছে।"

অনীতা হাসি চেপে বলেন, "ওটা কিন্তু তোমার কল্পনা। কল্পনায় ক্ষতিপূরণ। তুমি যখন ওর মন্দ করতে পারলে না, তখন কল্পনা করলে যে বিধাতা ওকে ঘোটকহাস করেছেন।"

"ঘোটকহাস!" শেখর তারিফ ক'রে বলেন, "বা! নামটি ত খাসা! তখনকার দিনে তুমি ছিলে না। থাকলে অমন একখানা নাম আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে দিত। ঘোটকহাস! তার চেয়ে মজার নাম আর কি হতে পারে? সংস্কৃতসাহিত্যে কে একজন ছিলেন, তাঁর নাম ঘোটকমুখ। বাপমায়ের দেওয়া নাম। বোধ হয় তখনকার কালে ওটা ছিল গৌরবের বিষয়। যেমন অশ্বিনীকুমার।"

"তার পর কি হ'ল তা ত বললে না? রাত হয়ে যাচ্ছে। শেষ কর।" অনীতা আর জেগে থাকতে পারছিলেন না।

"তারপর!" শেখরের স্মৃতি একটু একটু ক'রে ফিরছিল। "তারপর কি হ'ল ঠিক মনে নেই। তবে এটা ঠিক যে রাজীবের সঙ্গে আমার আড়ি চলতে থাকল। ভাব হ'ল না। বছর-কয়েক পরে ওর বাবা বদলি হয়ে যান। আর ওর সঙ্গে দেখা হয় না। কালেভদ্রে খবর পাই যে ওরা কলকাতায় থাকে। কিন্তু কী করে, পড়াশুনার কতদূর, পাশ না ফেল, এসব আমি জানি নে। কেউ আমাকে জানায় না। একবার কলকাতা গিয়ে আমার পুরোনো বন্ধু বারীনের মুখে শুনেছিলুম, রাজীবের বাবা বেণীবাবু মারা গেছেন। রাজীবকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। ব্যস। ওই পর্যন্ত। ওর বেশী না।"

অনীতা একটু আফসোসের সুরে বলেন, "তা হলে এইখানেই ইতি?"

"না। এইখানেই ইতি নয়।" স্মরণ ক'রে বলেন তাঁর স্বামী। "রাজীবের সঙ্গে আমার আরো একবার দেখা হয়েছিল। সে এক বিচিত্র যোগাযোগ।"

"শুনি। শুনি।" উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন অনীতা। "কী হ'ল ছেলেটার?"

"তখন সে আর ছেলেটা নয়।" হেসে বলেন শেখর। "বিশ একুশ বছর বাদে আমিও আর ছেলেটি নই।

আমি একটা জেলার হর্তাকর্তা বিধাতা। গেছি মফঃস্বলে টুর করতে। সঙ্গে লোকলস্কর। উঠেছি রাসি ত্রাদার্সের বাংলোয়। সেটার অবস্থান আত্রাই নদীর নির্জন বাঁকে। সেখানে কেউ আমাকে জালাতন করতে আসবে না। আমি বর্ষার নদীর দৃশ্য উপভোগ করব। আর ঠাণ্ডা মাথায় ফাইল ক্লিয়ার করব। রাশি রাশি ফাইল আমার সামনে, পেছনে, ডান দিকে, বাঁ দিকে। মেজের উপর। খাটের উপর। আমি কাজের লোক। যেখানেই যাই কাজ আমার সঙ্গে যায়। মোলাকাতীদের আমি এড়াতে চাই। তারা একবার বসতে পেলে উঠতে চায় না। বড় বেশী বকে আর বকায়। কেন এসেছে তা হাতে রাখে। কিছুতেই ফাঁস করবে না। নিতান্তই যখন গা তুলতে হয় তখন আসল কথা ঝুলি থেকে বেরোয়। বলে, 'ও! ভালো কথা। সার কি আমার একটু উপকার করতে পারবেন?' এখন, এর জন্যে আমার আধঘণ্টা সময় নষ্ট করার কী দরকার ছিল, বল দেখি? আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। সেইজন্যে ও-রকম একটা বাংলোর সন্ধানে আমি ছিলুম। সরকারী নয়। অনুমতি আনিয়ে নিতে হয়। অনুমতি ওরা সহজে দেয় না। বার বার অজুহাত দেখায়। আমার কাছে কী একটা দরবার ছিল ওদের। আমিও ঝোপ বুঝে কোপ দিই। মিলে গেল অনুমতি। তাই আমি এক মণ ফাইল নিয়ে টুরে যাই ও আত্রাই-তীরে নির্জনবাস করি। লোকালয় থেকে দূরে।"

"হাঁ, একবার তুমি আত্রাই ঘাটে টুরে গেছলে বটে। মনে পড়ছে আমার। আমারও সাধ ছিল। কিন্তু খুকু সবে হয়েছে। তাকে নিয়ে যাওয়া যায় না।" অনীতা বলেন।

"না। নিয়ে যাওয়া যায় না। স্টেশন থেকে নৌকোয় ক'রে নদী উজিয়ে স্রোত পেরিয়ে বাংলোয় যেতে হয়। গেলে আমাকে কাজ করতে দিত না।" শেখর বলেন।

"ওটা কিন্তু," অনীতা প্রতিবাদ করেন, "তোমার ভুল ধারণা। তিন মাসের মেয়ে তোমাকে কাজ করতে দিত না? কী যে বল!"

"উঁহু। তিন মাসের নয়।" শেখর প্রতিবাদের প্রতিবাদ করেন। "চার মাসের।"

"যার নাম চাল ভাজা তারই নাম মুড়ি।" অনীতা টিপ্পনী কাটেন।

"যার মাথায় পাকা চুল তারই নাম—" শেখর পূরণ করতে সাহস পান না।

"বল, বল। যা মুখে আসে বল। প্রাণ খুলে বল।" অনীতা অভিমান করেন। "জানি তোমার মনে কী আছে। বরাবর জানতুম। তবে অমন পশুর মতো স্পষ্টবাদী না হলেই পারতে। বর্বর যারা তারাও তোমার চেয়ে সভ্য।"

তিনি পেছন ফিরে শোন। শেখর বেচারা অপ্রতিভ হয়ে বিস্তর সাধ্যসাধনা করেন। বলেন, "ওটা একটা প্রবাদ-বচন। তুমি ওর এক লাইন আওড়ালে, তা শুনে আমি তার পরের লাইনটা উদ্ধার করলুম। আমি তো নিজে বানিয়ে বলি নি। আমার মনের কথা ত' নয়। তোমার মাথায় পাকাচুল কোথায় যে তুমি ওটা গায়ে পেতে নিচ্ছ?"

এমনি ক'রে কেটে যায় বেশ কিছু সময়। অবশেষে অনীতার অভিমান ভাঙে। তিনি তাগিদ দেন, "শেষ কর। শেষ কর।"

"হাঁ। এইবার করি।" শেখর এক নিঃশ্বাসে ব'লে যান। "বাংলোয় ব'সে ফাইল-টাইল সরিয়ে রেখে তোমার মুখ ধ্যান করছি আর খুকুর কথা ভাবছি আর সিগারেট খাচ্ছি আর নদীর দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় চাপরাশি ঘরে ঢুকে সেলাম ক'রে বলে, 'কোম্পানীকা ছোটা বাবু হুজুরকো সেলাম করনেকে লিয়ে আয়া।' আমি মনে মনে বিরক্ত হই। কিন্তু কোম্পানীর লোক যখন, তখন একেবারে হাঁকিয়ে দিতে পারি নে। বলি, কুর্সি দো। বাবুকে বেশীক্ষণ বসে থাকতে হয় না। আমি তার গলার স্বর শুনে আকৃষ্ট হই। বারান্দায় গিয়ে নমস্কার বিনিময় করি। তার পর সে ও আমি দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকি। কথা বলি আমিই প্রথম।

রাজীব, তুমি! সে একটু মুচকি হেসে বলে, 'আপনি বলব, না তুমি বলব?' আমি বলি, তুমি আমার বাল্যবন্ধু। আপনি বলবে কেন? ওঃ! কতকাল পরে দেখা। সে বলে, 'হাঁ। কতকাল পরে। আমি ত ভয়ে আসতেই চাই নি। কী জানি, বাবা! বড়লোক। চিনতে পারবে কি না। হয়ত চাপরাশিকে দিয়ে ব'লে পাঠাবে, সময় নেই। সাত-পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত ঝুঁকি নিই। লোকে বলে, খুব ভদ্র। তার প্রমাণ ত হাতে হাতে পেয়ে গেলুম। বসতে দিলে, দেখা দিলে, চিনতে পারলে। আমি কিন্তু কোনো মতলব নিয়ে আসি নি। এলুম এমনি একবার তোমাকে চোখে দেখতে। তোমাকে বলতে যে, ছেলেবেলায় তোমার সঙ্গে আমি ভাল ব্যবহার করি নি। তার জন্যে আমি সত্যি খুব দুঃখিত ও লজ্জিত। তুমি ত আমার কোনো ক্ষতি কর নি। আমিই গায়ে প'ড়ে তোমাকে নাকাল করেছি। এখন বল, তুমি আমাকে ক্ষমা করলে কি না।' এই ব'লে সে আমার দিকে করুণ নয়নে তাকায়। আমি গ'লে যাই। বলি, ক্ষমা অনেকদিন আগেই করেছি। ছেলেবেলার কোনো বন্ধুর উপর আমার লেশমাত্র রাগ নেই। তোমরা সবাই মিলে আমাকে এগিয়ে দিয়েছ। আমি যা হয়েছি তা তোমাদেরি সংস্পর্শে ও সংঘাতে। আঘাতেরও দরকার ছিল বই কি? চলার জন্যে ঠেলারও দরকার হয়।"

এখন বল, তুমি আমায় ক্ষমা করলে কি না।

অনীতা এতক্ষণ ধৈর্য ধ'রে শুনছিলেন। ঝঙ্কার দিয়ে বলেন, "দার্শনিকতা বাদ দাও।"

"আচ্ছা। আচ্ছা।" শেখর ব'লে যান, "রাজীবের সঙ্গে সেদিন কথাবার্তা ফুরোতে চায় না। সে যতবার উঠতে যায়, আমিই তাকে বসতে বলি। তাকে নিয়ে আসি ঘরের ভিতরে। চা খেতে দিই। আমার চাপরাশি, বেয়ারা, খানসামা অবাক্ হয়ে যায় কোম্পানীর ছোটবাবুর আপ্যায়ন দে'খে। অকালে পিতৃহীন হয়ে রাজীব পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ম্যাট্রিক পাশ করার আশাও তার ছিল না। অঙ্কে কাঁচা। আমি ততদিনে বি-এ পাশ করেছি। চাকরির বাজারে ম্যাট্রিক ফেল একটি যুবক পাত্তা পাবে কেন? সর্বত্র দূর্ দূর্, ভাগ্ ভাগ্। তবে তার নামযশ ছিল খেলোয়াড় হিসেবে। এমন নামযশ যে, শিয়ালকোট থেকে উবেরায় কোম্পানী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে ক্যাটালগ পাঠাত। ফী বছর এসে হাজির হ'ত তাদের ক্যাটালগ। তার ধারণা ছিল, তার মামা তার হয়ে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, মামা নয়। তা হলে কে তার হয়ে লিখবে? কেউ না। তার নামযশ শিয়ালকোট অবধি পৌঁছেছে। এক বাংলা দৈনিকপত্রে সে খেলার রিপোর্টার হয়ে ঢোকে। বাংলাটা কোনোরকমে গুছিয়ে লিখতে জানত। সেই সুবাদে খেলোয়াড়-মহলে সকলের সঙ্গে চেনাশোনা হয়ে যায়। সাহেবদের সঙ্গেও। তাঁদের কৃপায় সে সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, কলম্বো, এডেন ঘুরে এসেছে। চা বাগানে একটা কাজ জুটিয়েছিল। অত দূরে থাকা তার পরিবারের পোষায় না। পাটের কারবারে কাজ নিয়েছে। সিরাজগঞ্জ থেকে সম্প্রতি বদলি হয়ে আর্মাই ঘাটে এসেছে। কলকাতা যাওয়া-আসার পক্ষে আরো সুবিধে। পরিবার কলকাতায়

থাকেন। এসব জায়গায় আরামের কোয়ার্টার্স্ পাওয়া যায় না। ছোটবাবু থেকে বড়বাবু হতে এখনো বহুৎ দেরি। তেমন উচ্চাভিলাষও নেই। বরাবরই সে একটু আয়েসী মানুষ। খাটতে ভাল লাগে না। খেলতে ভাল লাগে। তবু কেমন ক'রে যে এতদূর উন্নতি করতে পেরেছে, এটা একটা প্রহেলিকা। সে কি এর যোগ্য? না, অদৃষ্ট তার সহায়? তাকে যেন কেউ কিক্ করতে করতে ফুটবলের মত উপরে তুলে দিচ্ছে।"

অনীতা কণ্ঠক্ষেপ করেন। "প্রথম কিক্‌টা কে দিয়েছিল তা কি সেদিন ওকে বলেছিলে তুমি? তুমিই ত চন্দ্রহাসের মন্ত্রীমহাশয়। চন্দ্রহাসের না, ঘোটকহাসের।"

"ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ।" শেখর বলেন, "ওর হাসি কিন্তু অবিকল ছেলেবেলার মত। আর সব অন্য রকম। ঘোটকহাসকে সেদিন আমি বলি-বলি ক'রে কিছুতেই বলতে পারলুম না যে উবেরায়কে লিখেছিলুম আমিই। কথাটা চেপে গেলুম। কেন তার জীবনের একমাত্র সম্বল তার নামযশে বিশ্বাস কেড়ে নিই? এমন তার নামযশ যে, বাল্যকালেই শিয়ালকোট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাই না উবেরায় তাকে কী বছর ক্যাটালগ পাঠায়! ঘোটক কিন্তু আমাকে ভাবিয়ে দেয়। প্রথম কিক্‌টা আমি না-হয় দিয়েছিলুম, কিন্তু একটামাত্র কিকে ত সে এতদূর ওঠে নি? তাকে উপরে তোলার জন্যে আরো কিকের দরকার হয়েছে। দিয়েছে কারা? সম্ভবতঃ ঈর্ষ্যাকাতর সহকর্মীরা। তাকে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করি, ওহে রাজীব, তোমার প'ড়ে যাবার ভয় নেই? ফুটবল ত আকাশে উঠে মাটিতে প'ড়ে যায়। রাজীব বলে, 'ভয় ছিল। এখন আর নেই। যতবার চাকরি গেছে ততবার দেখেছি, চাকরি আপনি এসে জোটে। আমাকে খুব বেশী ভাবতে হয় না। আরে, ভাবব কী? আমি কি ছাই ভাবতে জানি! তোমরা হলে ভাবুক লোক। দিনরাত ভাবো। আমি বেপরোয়া খেলোয়াড় মানুষ। অত ভাবতে গেলে খেলা মাটি হয়। বেকার হলেও আমি মাথায় হাত দিয়ে বসব না। খেলব। খেলতে থাকব। খেলা যারা ভালোবাসে তারা আমাকেও ভালোবাসবে। গড়ের মাঠের দিকেই আমি গড়াতে গড়াতে চলেছি। এর পরের বদলিটা আশা করি কলকাতার হেড আপিসে হবে। যে-কোন একটা আজেবাজে কাজ পেলেও আমি খুশী। এমন কি পিয়নের কাজ যদি দেয়, তাতেও আমি রাজী। ছেলেবেলায় সেই বাবুয়ানা আমি বাবার অস্থির সঙ্গে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছি। পরিবারের জন্যেই আমার ভাবনা, নিজের জন্যে নয়। তা ওরা পথে বসবে না। শ্বশুর-মশায় যথেষ্ট সম্পত্তি দিয়ে গেছেন'।"

৪

এর পরে শেখর নীরব। অনীতা সুধান, "এই শেষ?"

"এই শেষ দেখা। কিন্তু শেষ নয়। আরো দশ বছর পরে আমার কোর্টে একদিন কী একটা মামলা ছিল। সাক্ষী দিতে এসেছিল রাতুল। রাজীবের ছোট ভাই। সাক্ষীর কাঠগড়ায় আমি তাকে চিনতে পারি নি। কোথাকার কে রাতুলচরণ মিত্র। আমার কী? মামলার পর খাসকামরায় ব'সে কাগজপত্র সই করছি এমন সময় হাতে এল রাতুলের নামের কার্ড। অন্যমনস্কভাবে বললুম, আচ্ছা, ভিতরে নিয়ে এস। চেয়ে দেখি রাতুল দাঁড়িয়ে আছে সামনে। টিপে টিপে হাসছে। তৎক্ষণাৎ চিনতে পারি। বলি, আরে তুমি! বোস। বোস। এত বড় হয়েছ! তখন ত এতটুকু ছিলে। এমনি ক'রে বাক্যালাপ সুরু হয়। রাতুল স্বাধীন ব্যবসা করে। কার্ডবোর্ডের কারবার। দাঁড়িয়ে গেছে। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করি, রাজীব কেমন আছে?... 'দাদা?' রাতুল একটু আশ্চর্য হয়ে বলে, 'জানেন না বুঝি! দাদা ত নেই। সে মারা গেছে বছর তিন-চার আগে।' আমি তা শুনে স্তম্ভিত। মারা গেছে! কী ক'রে মারা গেল! কী হয়েছিল? রাতুল জবাব দেয়, 'যুদ্ধ যখন বাধে তখন দাদা বলে, আমি কি চিরটাকাল কেরাণীগিরি করবার জন্যেই জন্মেছি নাকি? ক্লাইব যদি আজীবন কেরাণীগিরি করত তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করত কেটা? এতদিন ওরা আমাদের যুদ্ধবিদ্যা শেখবার সুযোগ দেয় নি। এবার দিচ্ছে।

ওদেরি অস্ত্রে ওদের তাড়াতে হলে এই তার মওকা। বয়সটা একটু বেশী হয়ে গেছে, এই যা মুশকিল। আটত্রিশকে যেমন করে হোক তেত্রিশ করতে হবে। সত্যি সত্যি সে গেল লড়াই করতে। মা'র নিষেধ না শুনে। বৌদিকে কাঁদিয়ে। তিন-তিনটে ছেলেমেয়ে। তাদের মায়া কাটিয়ে। তার পর শোনা গেল, সে মালয়ে জাপানীদের হাতে বন্দী হয়েছে। পরে একসময় জানা গেল, সে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে ইমফলে লড়েছে। তার পরেই অন্ধকার। কেউ বলতে পারে না কী যে হ'ল তার। যুদ্ধ শেষ হলে পরে আই এন এ কের্তাদের মুখে খবর পাওয়া গেল যে, ক্যাপ্টেন মিত্তির ইম্ফল থেকে পশ্চাৎ অপসরণের সময় অনাহারে প্রাণ হারান। পরে বর্মায় গিয়ে অনুসন্ধান ক'রে তার সমর্থন পাওয়া গেল'।"

"হায়, হায়! অ-না-হারে মারা যায়! অনা-হা-রে!" অনীতা আর্তস্বরে বলেন।

শেখর আবেগভরে বলেন, "সেইরকমই ত শুনলুম। কী করা যায়! যুদ্ধে সবাই ত বাঁচে না? যারা মারা যায় তাদের সবাই ত অস্ত্রাঘাতে মরে না? কেউ কেউ পেটের অসুখেও মরে। তা হলেও যোদ্ধা ওরা সকলেই। বীর ওরা কেউ কারো চেয়ে কম নয়। আমাদের রাজীবও বীরের মত লড়েছে। বীরের মত মরেছে। ভারত যে স্বাধীন হয়েছে তার জন্যে সাধুবাদ রাজীবকেও দিতে হয়। বেঁচে থাকলে বড়জোর সে ডেপুটি মিনিষ্টার কি পার্লা-মেণ্টারি সেক্রেটারী হ'ত। কিন্তু ম'রে গিয়ে সে অমর হয়েছে।"

অনীতা চোখ মোছেন। "আহা, বেচারা! কোথায় কোন্ তেপান্তরের মাঠে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত না খেতে পেয়ে মারা গেল! তুমিও যেমন! কেন আমাকে এতদিন রাজীবের গল্প বল নি?"

"বলি নি আমার নিজের অপরাধ ঢাকতে। তুমিও যেমন! আমাকে জালিয়াৎ ব'লে খোঁটা দিতে। বেচারা রাজীব!" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, তার শত্রু না মিত্র।

—০—

আমরা বিদ্যার্থীদের সম্বন্ধে কতকগুলি সেকেলে মত পোষণ করি। তাহার মধ্যে প্রধান মতটি এই, যে, ছাত্র বা বিদ্যার্থী যত দিন ঐ নামে পরিচিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহার প্রধান কাজ হইবে বিদ্যা অর্জ্জন, জ্ঞান লাভ, ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহারা যাহা হইবেন, করিবেন তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া। ইহা শুধু বহি পড়িয়া করা যায় না। প্রকৃতির গ্রন্থও অধ্যয়ন করিতে হইবে, প্রকৃতির প্রভাব অনুভব করিতে হইবে। সমসাময়িক ঘটনাবলী ও প্রচেষ্টাসমূহের খবর রাখিতে হইবে, বিদ্যার্থীর প্রধান কাজ যাহা তাহা অবহেলা না করিয়া রাষ্ট্রিক ও সামাজিক নানাবিধ দেশের কাজও করিতে হইবে। কিন্তু ছাত্রদিগকে কোন বিষয়ে নেতৃত্বের অভিলাষ মাত্র হইতেও দূরে থাকিতে হইবে। "তরুণ" ও বিদ্যার্থীদের কর্ত্তব্য এক নহে। বিদ্যার্থী নহেন, ছাত্র নহেন, এরূপ যুবকের সামর্থ্য থাকিলে তিনি সম্পূর্ণরূপে কোন প্রকার লোকহিতকর কাজে আপনার শক্তি নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু যে যুবক বিদ্যার্থী, ছাত্র, তাঁহার তাহা করা উচিত হইবে না, এই জন্য, যে, তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য অন্যবিধ। তিনি যদি অ-ছাত্র কোন যুবকের মতো নিজের সম্পূর্ণ শক্তি কোন রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কাজে নিয়োগ করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তবে তাহা করা উচিত। বিদ্যার্থী নামটা রাখিব, বাপমায়ের টাকায় প্রতিপালিত হইব, কিন্তু শিক্ষক ও বাপমায়ের পরিবর্ত্তে কোন "জননায়কে"র আজ্ঞা অনুসারে বিদ্যা অর্জ্জনটি ছাড়া আর সব নানা কাজ ও অকাজ করিয়া বেড়াইব, ইহা অসঙ্গত ও অনুচিত ব্যবহার।

"মশায়, তবে কি দেশের ডাক শুনিব না?"

অবশ্যই শুনিবেন—যদি তাহা অমুক চন্দ্র অমুকের, অমুক মোহন অমুকের, অমুক লাল অমুকের, অমুক নাথ অমুকের ডাক না হইয়া, বাস্তবিক দেশের ডাক হয়। দেশটা ত মাটির। তাহার উপর যে লোকগুলি বাস করে তাহারাই দেশ। যাঁহারা দেশের ডাকের কথা বলেন, তাঁহারা স্ব স্ব মনকে হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিবেন, "তুমি কয়জন সাধারণ লোকের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া থাক, কয়জন নিরক্ষর লোককে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়াছ? কয়জন দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত লোকের অন্ন জুটাইয়া দিয়াছ, কয়জন রুগ্ন লোকের চিকিৎসা সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছ, কয়জনকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখাইয়াছ, কয়জন বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, গৃহহীনকে আশ্রয় জোগাড় করিয়া দিয়াছ, কয়জন অত্যাচরিতা নারীকে রক্ষা করিয়াছ, দেশ শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কয়জন লোককে রাষ্ট্রনীতির জ্ঞান দিতে চেষ্টা করিয়াছ, সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের পুলিসের ভূস্বামীর ধনিকের অত্যাচার হইতে দরিদ্রদিগকে বাঁচাইবার কি উপায় করিয়াছ?

পতাকা ঘাড়ে করিয়া "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক" বলিয়া চীৎকার করিলে এবং তীব্র করিয়া উত্তেজক বক্তৃতা শুনিলেই দেশের ডাকে সাড়া দেওয়া হয় না।

বিবিধ প্রসঙ্গ,
—প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৩

বাঙ্গলার আর্থনীতিক ইতিহাস

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

বাঙ্গলাদেশের ষাট বছরের আর্থনীতিক ইতিহাস বিচার করিতে হইলে অতীতের কথা একটু জানিয়া লইতে হয়। বাঙ্গলাদেশ এখন শিল্পের দিকে ঝুঁকিয়াছে এবং শিল্পোন্নতিতেই বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ নিহিত, ইহা সকলেই বিশ্বাস করিতেছে। অতীতের বাঙ্গলাতেও শিল্প ছিল কিন্তু প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব সবচেয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে বাঙ্গলায়। ব্রিটিশ বৃহৎশিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য আসিয়া বাঙ্গলার শিল্প ধ্বংস করিয়াছে। বাঙ্গলার শিল্প ছিল বিকেন্দ্রীকৃত এবং তার শক্তি ছিল হাত। ব্রিটিশ শিল্প হইল কেন্দ্রীভূত এবং তার শক্তি হইল ষ্টীম। এই অসম প্রতিযোগিতা সহ্য করিয়াও বাঙ্গলার শিল্প আত্মরক্ষা করিতেছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর যখন রাজশক্তি ব্রিটিশ শিল্পের সহযোগিতা করিতে লাগিল তখনই ঘটিল বাঙ্গলার নিজস্ব শিল্পের সর্ব্বনাশ। রাজশক্তি এবং বণিক্‌শক্তির মিলিত আক্রমণ বাঙ্গলার শিল্প সহ্য করিতে পারিল না।

কাপড়

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, বাঙ্গলাদেশে চার রকমের কাপড় তৈরি হইত—ক্ষৌম, দুকূল, পত্রোর্ণ এবং কার্পাসিক। ক্ষৌম বস্ত্র ছিল মোটা, তুলা মেশানো পাট বা শণের কাপড়। উৎপাদন-কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা উত্তরবঙ্গ। দুকূল ঐ কাপড়েরই মিহি সংস্করণ। তিন রকমের দুকূল কাপড় ছিল—সাদা এবং নরম, তৈরি হইত দক্ষিণ বঙ্গে; কালো এবং অত্যন্ত নরম, তৈরি হইত উত্তর বঙ্গে; উদীয়মান্ সূর্য্যের মত রং, তৈরি হইত কামরূপে। পত্রোর্ণ ছিল একপ্রকার বন্য রেশম, উহা তৈরি হইত পুণ্ড্রবর্দ্ধন, মগধ এবং কামরূপে। কার্পাসিক ছিল সূতী কাপড় কৌটিল্য বলিতেছেন,—কার্পাসিক বস্ত্র ভারতের সর্ব্বত্র তৈরি হইত, তবে বঙ্গদেশ এবং আর ছয়টি জায়গার কার্পাসিক ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কৌটিল্যের আমলে অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বাঙ্গলাদেশ সূতী, রেশম এবং পাট শণ ও তুলা মিশ্রিত বস্ত্রশিল্পে প্রভূত উন্নতি করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্য্যন্ত এই ঐতিহ্য বজায় ছিল। হাতে কাটা সূতায় হাতের তাঁতে এই সব বস্ত্র উৎপন্ন হইত। নবম শতাব্দীতে আরব বণিক্ সুলেমান বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—বাঙ্গলায় একরকম কাপড় পাওয়া যায় যাহা পৃথিবীর কোথাও উৎপন্ন হয় না। এই কাপড় এত মিহি এবং নরম যে একটি আংটির ভিতর দিয়া উহা টানিয়া নেওয়া যায়। সুলেমান এই কাপড় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

১৭৮০ সাল নাগাদ ইংলণ্ড নকল মসলিন তৈরির চেষ্টা করে কিন্তু কলের সূতা বাঙ্গলার মেয়েদের হাতে কাটা সূতার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। ১৭৮৫ সালে ইংলণ্ডে কলের টাকুতে যখন মিহিসূতা কাটা সম্ভব হইল, বাঙ্গলার কাপড়ের কপাল পুড়িল সেইদিন। ইংলণ্ডে বাঙ্গলার মসলিন আমদানী বন্ধ করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সফল হন নাই, এইবার ১৭৯০ সাল নাগাদ উহা চিরতরে বন্ধ হইয়া গেল।

চিনি

১৪৫ সালে অর্থাৎ ১৮১৫ বৎসর পূর্ব্বে ঈলিয়ান লিখিয়াছেন—গঙ্গাতীরে প্রাচ্যদেশে একপ্রকার খাগড়া পাওয়া যায় যাহা পিষিলে একপ্রকার মধু বাহির হয়। ১২৫০ সালে মার্কো পোলো বাঙ্গলায় আসিয়া প্রচুর চিনি দেখিয়া-

ছিলেন। বাঙলাদেশ হইতে ইংলণ্ডে চিনি রপ্তানী হইত। ১৭৯১ হইতে ১৭৯৯ এই নয় বছরে ইংলণ্ডে বাঙলার চিনি রপ্তানী করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমস্ত খরচ বাদে শতকরা ৩৩ টাকা লাভ করিয়াছিল। ইংলণ্ড ছাড়া বাঙলার চিনি আমেরিকা, সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা, পারস্য এবং আরব দেশেও রপ্তানী হইত। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ইউরোপীয় চিনি শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য বাঙলার চিনির উপর চড়া শুল্ক বসানো হয়। ম্যাকফার্সন লিখিয়াছেন—বাঙলাদেশ সমগ্র ইউরোপের জন্য চিনি সরবরাহ করিতে পারে, যদি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের চিনির খাতিরে তার উপর শুল্ক চড়াইয়া দাম বেশী বাড়ানো না হয়। ১৭৯০ সালে এন্থনি ল্যাম্বার্ট লিখিয়াছেন—বাঙলার প্রত্যেক জায়গায় চিনি তৈরি হয় এবং এই চিনি ইউরোপ, চীন এবং বাটাভিয়ার চিনির সমান উৎকৃষ্ট। বাঙলায় এমন জেলা ছিল না যেখানে আখ জন্মিত না। সবচেয়ে ভাল আখ জন্মিত রংপুর, বর্দ্ধমান, বীরভূম এবং মেদিনীপুরে। জার্মেনীতে বীট চিনি তৈরি আরম্ভ হয় অনেক পরে ১৮৪০ সালে। ক্যালকাটা ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিনে ক্যাপ্টেন শ্রীম্যান লিখিয়াছেন—বাঙলাদেশে ভাল সার দেওয়া জমিতে বিঘা প্রতি ১০ মণ আখ হইত, উৎকৃষ্ট জমিতে হইত ২০ মণ।

কয়লা ও লোহা

ভারতের প্রথম কয়লাখনি আবিষ্কৃত হয় বাঙলাদেশে সীতারামপুরে ১৭৭৪ সালে। নারায়ণপুরীতে জেসপ কোম্পানীর প্রথম ম্যানেজার হোমফ্রে দামোদর উপত্যকায় রাণীগঞ্জ কয়লা-খনির প্রথম লিখিত বিবরণ প্রকাশ করেন ১৮৩৭ সালে। পালামৌর কালেক্টর হিট্‌লি বীরভূমের কয়লাখনি আবিষ্কার করেন। খনি হইতে কয়লা উত্তোলন এবং বিক্রয়ের প্রথম লাইসেন্স পায় সুমনার এণ্ড হিট্‌লি কোম্পানী। ১৮৪১ সালে বর্দ্ধমানের সিংঘরাণ, নালা, বরাকর, রাণীগঞ্জ, সালমা এবং চিনাকুরি খনি হইতে কয়লা উত্তোলন চলিতে থাকে। তখন কলিকাতায় কয়লার দাম ছিল পাঁচ আনা মণ, ইহার মধ্যে তিন আনা তিন পাই ছিল আনিবার খরচ। ১৯৪০ পর্য্যন্ত প্রায় একশত বৎসর কয়লার দাম খুব বেশী বাড়ে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও উহা ছয় আনা মণ ছিল। ১৮৫৪ সালে রাণীগঞ্জ কয়লাখনির উপর দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ চালু হইবার পর হইতে কয়লার খনির কাজ অনেক বাড়িয়া যায়। ব্রিটিশ বণিকেরা সমস্ত ভাল খনি দখল করিয়া নেয়।

কুটীর-শিল্প হিসাবে ইস্পাত তৈরি ব্যাপকভাবে চলিত বীরভূমে। ১৭৭৪ সালে ইন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মা বীরভূমের পাহাড়ী জায়গায় ইস্পাত তৈরির লাইসেন্স ভারত সরকারের নিকট প্রার্থনা করেন এবং দশ বছরের জন্য উহা দেওয়া হয়। ১৮৫২ সালে বীরভূম জেলার দেওচাতে প্রায় ত্রিশটি চুল্লীতে লোহা-পাথর গলাইয়া লোহা বাহির করা হইত। উহাকে বলা হইত কাঁচা লোহা। কাঁচা লোহা হইতে পাকা লোহা বা ইস্পাত তৈরি হইত। কাঁচা লোহা তৈরি করিত মুসলমানেরা, পাকা লোহা করিত হিন্দুরা। একটি চুল্লীতে সপ্তাহে ২০ হইতে ২৫ মণ ইস্পাত তৈরি হইত। ইহারা কাঠকয়লা দিয়া লোহাপাথর গলাইত। এই লোহা তৈরির খরচ পড়িত দেড় টাকা মণ। হিকির গেজেটে দেখা যায় কলিকাতায় বীরভূমের লোহার দর ছিল পাঁচ টাকা মণ। বিলাতি লোহার দর ছিল সেখানে ১০ হইতে ১১ টাকা মণ। ১৮৫১-৫২ সালের জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার রিপোর্টে বলা হইয়াছে—বীরভূমের ইস্পাত রেল লাইনের পক্ষে ততটা উপযুক্ত না হইলেও উহা এত শক্ত এবং নমনীয় (toughness and malleability combined with softness) ছিল যে উহার দ্বারা অন্যান্য কাজ ভালই চলিত।

শিল্প ধ্বংস

পলাশীর যুদ্ধের আগেই ইংরেজ বণিক্ বাঙলায় আসিয়া ব্যবসা সুরু করিয়াছিল এবং উহাদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্প ও ব্যবসা নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। ব্রিটিশ বণিকৃদের আক্রমণ হইতে দেশীয় শিল্প রক্ষার প্রবল চেষ্টা করিলেন মীরকাশিম। তিনি স্থির করিলেন, দেশীয় বণিকৃদের সঙ্গে ইংরেজ বণিকৃদের অসম প্রতিযোগিতা

চলিতে দিবেন না। ইংরেজ বণিক্ শুল্ক দেয় না, দেশী বণিক্‌কে শুল্ক দিতে হয়। ইহাতে স্বদেশী জিনিষের দাম বেশী পড়িয়া যায়। মীরকাশিম ইংরেজের নিকট শুল্ক আদায় করিয়া দেশী ও বিলাতি জিনিষের দাম সমান করিতে চেষ্টা করিলেন। এই বিষয়ে কোম্পানীর দপ্তরে লেখা মীরকাশিমের চিঠিতে এই কয়টি বিষয় জানা যায়—

(১) ইংরেজের অত্যাচারে প্রত্যেক গ্রাম ও জেলা ধ্বংস হইয়া যাইতেছিল; লোকের দৈনন্দিন অন্ন জোটা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

(২) রাজস্ব আদায় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। নবাব লিখিয়াছেন—'আমার প্রায় এক কোটি টাকা আয় কমিয়া গিয়াছে।'

(৩) ইংরেজরা যদি মনে করে শতকরা ৯ টাকা শুল্ক অত্যধিক তবে তাহাদের ব্যবসা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া উচিত।

(৪) নবাবের কর্ম্মচারীরা ইংরেজ বণিক্‌দের দুষ্কর্ম্মে বাধা দিতে গেলে তাহাদিগকে মারধর করা হয়।

মীরকাশিম যখন দেখিলেন, ইংরেজের নিকট হইতে কিছুতেই শুল্ক আদায় করা যাইবে না, তখন তিনি দুই বৎসরের জন্য শুল্ক বাতিল করিবার আদেশ দিলেন অর্থাৎ জানাইয়া দিলেন দেশী বণিক্‌দেরও উহা দিতে হইবে না। রাজকোষের সমূহ ক্ষতি সহ্য করিয়াও দেশীয় লোকের স্বার্থের খাতিরে তিনি এই আদেশ দিলেন। মীরকাশিম বুঝিয়াছিলেন যে সমান প্রতিযোগিতায় ইংরেজ কিছুতেই দেশী বণিক্‌দের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে না। শুল্ক দেয় না বলিয়াই তাহারা এত লাভ করে। মীরকাশিমের এই আদেশে ইংরেজ ক্ষেপিয়া গেল। ইহারই পরিণাম উদয়নালার যুদ্ধ এবং মীরকাশিমের পরাজয়।

১৭ই মার্চ্চ, ১৭৬৯ তারিখ বাঙ্গলার আর্থনীতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐ দিন হইতে বাঙ্গলার শিল্প ধ্বংসের সুচিন্তিত প্ল্যান চালু হইল। কোম্পানী বলিল যে বাঙ্গলাদেশে শুধু কাঁচা রেশম তৈরি হউক এবং রেশম বস্ত্র বয়ন বাঙ্গলাদেশে বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। তাহারা আরও বলিল যে, রেশম সুতা যাহারা কাটে এবং কাটিয়ে সুতা জড়ায় তাহাদিগকে বাড়ীতে কাজ করিতে না দিয়া কোম্পানীর কুঠীতে আনিয়া খাটানো হউক, তাহা হইলে উহারা আর বাড়ীতে কাপড় বুনিবার সুযোগ পাইবে না। এই নিয়ম প্রচলিত হইল।

১৭৮৩ সালে ব্রিটিশ কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটি উপরোক্ত ব্যবসার উল্লেখ করিয়া নবম রিপোর্টে বলিলেন—"উহাতে একটি পাকা পলিসির প্ল্যান রহিয়াছে, বাধাদান এবং উৎসাহদান দুই-ই উহাতে আছে। বাঙ্গলার শিল্প ধ্বংসে নিশ্চয়ই উহা ভালভাবে কাজ করিয়াছে। ঐ শিল্পপ্রধান দেশের সমগ্র চেহারা উহার ফলে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। ব্রিটেনের শিল্পের কাঁচা মাল সরবরাহের ক্ষেত্ররূপে উহাকে পরিণত করিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে।"

এই ব্রিটিশ শিল্প-নীতিই স্বাধীনতার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে। ব্রেটন উড সম্মেলনের মূলনীতিও ইহাই ছিল।

বাঙ্গলার শিল্প ধ্বংসের সঙ্গে সমানে চলিল তার রক্তমোক্ষণ বা Economic Drain। বাঙ্গলার যে রাজস্ব আদায় হইত তার এক-তৃতীয়াংশ কোম্পানীর লাভ হিসাবে ইংলণ্ডে চলিয়া যাইত। তদুপরি সিভিল ও মিলিটারী সার্ভিসে নিযুক্ত ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদ আরও বহু টাকা বিলাতে যাইত। যে সব ইংরেজ বণিক্ এদেশে আসিয়া লক্ষপতি হইত তাহারাও দেশে ঐ টাকা পাঠাইয়া দিত। ভেরেলেষ্ট ১৭৬৬, ১৭৬৭, এবং ১৭৬৮ এই তিন বৎসরের একটি আমদানী রপ্তানীর হিসাব তৈরি করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় ঐ তিন বৎসরে ইংলণ্ড হইতে ভারতে আমদানী হইয়াছে ৬০ লক্ষ টাকা, আর রপ্তানী হইয়াছে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকা। যাহা আমদানী করিয়াছে তার দশ গুণ বাহিরে পাঠাইয়াছে।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬৭ তারিখে ভেরেলেষ্টই লিখিতেছেন:

"আগে বাঙ্গলা হইতে দিল্লীতে যে টাকা যাইত তাহার অনেকটা বাঙ্গলার বাণিজ্যে ফিরিয়া আসিত। এখনকার নবাবের রাজ্যে ইহা কত

বদলাইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ইউরোপীয় কোম্পানী এই দেশের টাকায় নিজেদের মূলধন বাড়াইয়াছে, কিন্তু এই দেশের সম্পদ একটি পয়সাও বাড়ে নাই।"

৫ই এপ্রিল, ১৭৬৯ তারিখে ভেরেলেষ্ট লিখিতেছেন :

"এ ভাবে শোষণ চলিতে থাকিলে কোন দেশ যতই সম্পদশালী হউক না কেন বেশী দিন টিঁকিতে পারিবে না।"

এই শোষণই স্বাধীনতা পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়াছে এবং ইহার সবচেয়ে বড় আঘাত ও চাপ সহিতে হইয়াছে বাঙ্গলাদেশকে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে বাঙ্গলার ও ভারতের সমস্ত শিল্পদ্রব্য রপ্তানী বন্ধ হইয়া গেল। এই সময় হইতে ইংলণ্ডে ভারতের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য দাঁড়াইল তুলা, কাঁচা রেশম, সোরা আর নীল। কাপড় এবং চিনি রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

বেকার সমস্যা

কোম্পানীর শিল্পনীতির ফলে বাঙ্গলাদেশে দারুণ বেকার সমস্যা দেখা দিল। ১৮৫৬ সালের ১৩ই জুন 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিলেন :

"**উপজীবিকা সাধন**—এই স্থানে এক বিষয় বিবেচনা করা উচিত যে কোন দেশে প্রচুর ভোজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় সে সমুদয় বস্তু সেই দেশস্থ সকল ব্যক্তির মধ্যে অংশীকৃত না হইলে ফলাভাব, যেহেতু লোকেরা উৎপাদিত দ্রব্যের যেরূপ অংশ প্রাপ্ত হইবেক সেইরূপ অংশেই তাহারদিগের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইতে পারে। এই দেশে নানাবিধ দ্রব্য জন্মিলেও যদ্যপি কোন ব্যক্তি তাহার কিয়দংশ প্রাপণে অশক্ত হয় তবে সেই দ্রব্যরাশি দ্বারা তাহাদের কি উপকার সম্ভবে? সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের অংশই প্রজা-বৃদ্ধির এক বিশেষ কারণ স্বীকার করিতে হইবেক।"

'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বেকার সমস্যার মূলনীতি এই সামান্য কয়টি কথার ভিতর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

বাঙ্গলায় ধনতান্ত্রিক শিল্পের অভ্যুদয়

বাঙ্গলার শিল্পের ধ্বংসস্তূপের উপর ভারতে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক বৃহৎ শিল্প, এবং তার প্রথম ও প্রধান ঘাঁটি হইল বাঙ্গলাদেশ। এদিকে চলিয়াছে নীল এবং রেশম কুঠী। কয়লা-খনির সন্ধান মিলিবার পর কয়লার ব্যবসা বড় হইয়া উঠিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম বাঙ্গালী যিনি বুঝিয়াছিলেন, শিল্পের এই নূতন গতি রোধ করা যাইবে না। ব্রিটিশ শিল্প-ব্যবস্থা আমাদেরও আয়ত্ত করিতে হইবে এবং উহাদের সঙ্গে সমান তালে শিল্পক্ষেত্রে নামিতে হইবে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন লবণবোর্ডের দেওয়ান। বোম্বাই প্রদেশে পারসী ব্যবসায়ীরা তখন শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। প্রিন্স দ্বারকানাথ 'কার ঠাকুর কোম্পানী' গঠন করিলেন। কার ঠাকুর কোম্পানী প্রতিষ্ঠার পর 'সমাচার দর্পণ' লিখিলেন :

"এতদ্বিষয় মনোযোগ করণের যোগ্য বটে যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়দের ন্যায় বাণিজ্য করিতে এবং এজেন্ট ও বিদেশীয় বাণিজ্য ব্যাপারে যে হিন্দু প্রথম প্রবর্ত্ত হন তিনি উক্ত বাবুই কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বোম্বাই নগরে ব্যবসায়ীরা এতদ্রূপ বিদেশীয় বাণিজ্য কার্য্য অনেক কালাবধি করিতেছেন।"

কার ঠাকুর কোম্পানী ১৮৩৯ সালে ছয় মাসে শতকরা ২০ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছিল।

১৮৪০ সাল পর্যন্ত বাঙ্গলায় কাপড়ের কল বসাইবার চেষ্টা হয় কিন্তু উহা সফল হইল না। বোম্বাইয়ে ডাভার ১৮৫৪ সালে কাপড়ের কল আরম্ভ করিলেন। এই মিল বিলাতি যন্ত্রপাতি, বিলাতি কয়লা এবং বিলাতি টেকনি-সিয়ান নিয়া আরম্ভ হইয়াছিল; পরে পেটিট এবং টাটারা কাপড়ের কল স্থাপনে নামেন।

চটকল প্রথম স্থাপিত হইল বাঙ্গলায়। ১৮৫৪ সালে রিষড়ায় প্রথম চটকল কাজ আরম্ভ করিল। স্থাপয়িতার

নাম অকৃল্যাণ্ড। ১৮৫৭ সালে বরানগর চটকল স্থাপিত হইল। এই কল এত লাভজনক হইল যে ইহার পর চটকল স্থাপনের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। ইহাতে এত লাভ হইত যে, এদের নাম দাঁড়াইয়া গেল টাকশাল। শতাব্দী শেষ হইবার আগে বাঙ্গলায় ৩৬টি চটকল স্থাপিত হইল। ইহাদের একটিও বাঙ্গালীর নহে, সবগুলি ইংরেজদের। ১৮৯৫ সালে বিদ্যুতের আলো প্রচলিত হইল। তখন মিল-মালিকেরা রাত্রে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাইয়া কাজের সময় বাড়াইয়া দিল। ইহাতে এত সুবিধা হইল যে ১৮৯৬ হইতে পাঁচ বছরে আরও ১৯টি নূতন কল স্থাপিত হইল।

১৮৫৬ সালে কাঁচের কারখানা আরম্ভ হইল। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিলেন (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৫৬):

"এই ভারতবর্ষের ঝাড়-লণ্ঠন ও অন্যান্য কাঁচের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণার্থ কতিপয় ব্যক্তি গ্লাস কোম্পানী নামে এক নূতন কোম্পানী গঠনের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহারা অংশ বিক্রয় দ্বারা ৫০০,০০০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক এই ব্যবসায় নিযুক্ত হইলেন; এ দেশে গ্লাস প্রস্তুত হইলে অল্প ব্যয়ে সকলে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইংলণ্ড ফ্রান্স ও আমেরিকার বণিকেরা প্রতি বৎসর এই ভারতবর্ষে ৫০০,০০০ লক্ষ টাকার কাঁচের দ্রব্য প্রেরণ করিতেছেন এবং তাহা যখন অনায়াসে বিক্রয় হইতেছে তখন এদেশে গ্লাস প্রস্তুত হইয়া অল্প মূল্যে বিক্রীত হইলে সাধারণে অবশ্য তাহার ব্যবহার করিবেন।"

ম্যানেজিং এজেন্সির অভ্যুদয়

নূতন শিল্প বিস্তারের সুযোগ যাহাতে বাঙ্গালীর হাতে চলিয়া না যায় তার জন্য ইংরেজ প্রথম হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ইংরেজ বুঝিয়াছিল যে, শিল্পসংগঠনে বাঙ্গালী ইংরেজ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিব, ভারতবাসীর টাকায় কারবার চালাইব কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজেদের করায়ত্ত রাখিব—এই মনোবৃত্তি হইতেই ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার উদ্ভব হয়। এই প্রথা পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গালাদেশেই উহার জন্ম এবং এখানেই উহা সর্ব্বাধিক শোষণ চালাইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতেই ম্যানেজিং এজেন্সির সূত্রপাত। তখন যেগুলিকে এজেন্সি হাউস বলিত, সেইগুলিই পরে আরও বড় এবং আরও দৃঢ় হইয়া ম্যানেজিং এজেন্সিতে পরিণত হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে দেশী এবং বিদেশী উভয়বিধ মূলধনই শিল্প-ক্ষেত্রে আসিয়াছে এবং সমস্ত মূলধন বিদেশীর কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। কলিকাতার এণ্ড্রু ইউল, গিলাণ্ডার্স আরবুথনট, ম্যাকলাওড, জার্ডিন স্কিনার, জর্জ্জ হেণ্ডার্সন, মার্টিন বার্ণ, অক্টেভিয়াস ষ্টীল, প্রভৃতি ম্যানেজিং এজেন্সি কোম্পানী ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথমে এইগুলি অংশীদারী কোম্পানী ছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে ইহাদের মাত্র ৭টি লিমিটেড কোম্পানী ছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ইহাদের মধ্যে লিমিটেড কোম্পানীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্টরা কোম্পানী পরিচালন করে, লাভের টাকার বেশীর ভাগ পকেটস্থ করে—কিন্তু নিজেদের টাকা কম খাটায়; অধিকাংশ টাকা বাহিরের অংশীদারদের নিকট হইতে তোলে। ইহারা কি ভাবে ক্ষমতা করায়ত্ত রাখে, টেরিফ বোর্ড রিপোর্টে তাহা দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ মনে হয় শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার হাতে না থাকিলে বুঝি কোম্পানীর কর্ত্তৃত্ব রাখা যায় না। ইহা ভুল। অংশীদারেরা অধিকাংশই সারা দেশে ছড়াইয়া থাকেন। তিন সপ্তাহের নোটিশ পাইলেও সকলের পক্ষে কলিকাতায় সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় না। অতি অল্পসংখ্যক অংশীদারই বার্ষিক সাধারণ সভায় আসেন। প্রায় কোন ম্যানেজিং এজেন্টকেই আজকাল শতকরা ১৪।১৫ ভাগের বেশী শেয়ার হস্তে রাখিতে হয় না। টেরিফ বোর্ডের তদন্তে ১৯৩২ সালে দেখা গিয়াছে যে, মহালক্ষ্মী কটন মিলের ম্যানেজিং এজেন্ট শতকরা ১০ ভাগ এবং মোহিনী মিলের ম্যানেজিং এজেন্ট শতকরা মাত্র ৫ ভাগ শেয়ার হাতে রাখিয়াই কোম্পানী চালাইতেছেন। ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল একমাত্র বাসন্তী কটন মিলে। তাঁহারা শতকরা ৮০ ভাগ শেয়ার নিজেদের হাতে রাখিয়াছিলেন। নৈহাটি চটকলের মোট শেয়ার ১৯৩৭ সালে ছিল ১৭,৫০০, তন্মধ্যে

ম্যানেজিং এজেন্ট হিলজার্সের শেয়ার ছিল মাত্র ১৫৫। ইহারা মোট মূলধনের হাজার-করা মাত্র ৮ টাকা দিয়াছিল। কেলভিন চটকলের ১৭ হাজার শেয়ারের মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্ট ম্যাকলাওড হাতে রাখিয়াছিল ৭৫ শেয়ার, মোট মূলধনের হাজারকরা ৪ টাকা মাত্র তাহারা দিয়াছিল। বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশীদারদের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া ইহারা ধীরে ধীরে নিজেদের হাতের শেয়ার কমাইয়া আনিয়াছে। নৈহাটি চটকলে হিলজার্সের প্রদত্ত মূলধন ১৯০৬ সালে ছিল হাজার করা ১০২ টাকা, ১৯৩৪-এ উহা কমিয়া হয় মাত্র ৮ টাকা।

ম্যানেজিং এজেন্সি ক্রমশঃ কাপড়, চট, চিনি, লোহা, প্রভৃতি বড় শিল্প হইতে সুরু করিয়া দেশলাই, কৃষির যন্ত্রপাতি, সাবান, প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইল। ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে না পারিয়া ছোট শিল্প মাথা তুলিতে পারিল না। ম্যানেজিং এজেন্সির অধিকাংশই ছিল ইংরেজ, ইহাদের সহিত গবর্ণমেণ্টের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলিয়া ইহাদের কোন কাজে বাধা দেওয়া যাইত না। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে ইহাদের ক্ষমতা ও অধিকার আরও পাকা হইয়া গেল।

প্রথম প্রতিবাদ

ম্যানেজিং এজেন্সির কার্য্যপ্রণালী গোপন, উহাদের হিসাবপত্রও ছিল গোপন। অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবাসী এই পদ্ধতির বিপদ্ বুঝিতে পারিল কিন্তু প্রথম প্রতিবাদ করিতে নামিল বাঙ্গালী। প্রতিকারের উপায় নাই, ক্ষমতা বিদেশীর হাতে। পাল্টা কারখানা করিতে গেল, ইংরেজ বণিকের অর্থবলের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। স্বদেশী মনোভাব জাগ্রত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই, বাঙ্গালী ইহা উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার আগে এবং ম্যানেজিং এজেন্সি দ্বারা শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও বহির্ব্বাণিজ্য কুক্ষিগত হইবার বছর ত্রিশেকের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিল। ক্ষমতা যখন পরের হাতে, তাহা কাড়িয়া আনিবার সম্ভাবনা সম্প্রতি যখন নাই, বিদেশীর সঙ্গে আর্থনীতিক প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকিবার ভরসাও যখন নাই, তখন স্বদেশী মনোভাব জাগ্রত করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতে হইবে, বাঙ্গালী ইহা বুঝিয়াছিল। বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া স্বদেশী শিল্পকে গবর্ণমেণ্ট যদি সংরক্ষণ না দেয় তবে আমাদের পক্ষে বেশী দামে দেশী জিনিষ কেনা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। দেশের সম্পদ্ বিদেশে প্রেরণের রক্তশোষণ বেশীদিন হইতে দিলে দেশ বাঁচিবে না, বাঙ্গালী ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল।

বাঙ্গালী যখন ঠেকিয়াছে, বিপদ্ বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না তখন—১৮৭০ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঙ্গালীকে সতর্ক করিলেন এবং ইউরোপীয় বণিক্‌দের সহিত প্রতিযোগিতায় সঙ্ঘশক্তি অর্জ্জন করিতে বলিলেন। তত্ত্ববোধিনী লিখিলেন :

"বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগী হওয়াতেই এদেশের সভ্যতা-স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে ও অত্রত্য সুপ্রসিদ্ধ অনুপম শ্রীসমৃদ্ধি কেবল পুরাবৃত্তের বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমাদের ইচ্ছা যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না লইয়া আমরা স্বয়ং সকল বিষয়েই আমাদের দেশের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু অর্থাভাবে তাহা হয় না। কি উপায়ে আমাদের দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে, সাধারণের মধ্যে বাণিজ্যস্পৃহা কিরূপে সঞ্চারিত হইতে পারে, এই সকল বিষয় আলোচনা করা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা এক ব্যক্তি কি দুই ব্যক্তির কর্ম্ম নহে। আমাদের মহাজনগণ একত্রিত হইয়া যদি একটি সভা স্থাপন করেন তাহা হইলে উহা দ্বারা অনেক কাজ হইতে পারে। এই প্রকার সভা না থাকাতে আমাদের বণিক্-মণ্ডলীর মধ্যে মহৎ অভাব রহিয়াছে। এই সভার দ্বারা যেরূপ আমাদের দেশের বাণিজ্যের উন্নতি সেইরূপ প্রত্যেক মহাজনের নিজ নিজ স্থান প্রসিদ্ধ হইতে পারে। ঐক্যের অভাবে এতদ্দেশীয় মহাজনদিগকে কত অসুবিধা ও কত অপমান সহ্য করিতে হয়। ঐক্যগুণের যে কি ফল তাহা সম্প্রতি সেরাজগঞ্জের প্রজারা উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। যে সকল মহাজনের পাট রেলওয়ে কোম্পানীর গুদামে দগ্ধ হইয়াছিল, সেরাজগঞ্জে ঐক্য না হইলে, তাহার মূল্য প্রাপ্তির কিছুমাত্র আশা ছিল না।"

তখন ইংরেজদের বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশীয় চেম্বারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি তত্ত্ববোধিনী সকলকে সচেতন করিতেছেন।

টেকনিকাল স্কুল এবং ভোকেশনাল স্কুলের আবশ্যকতাও বাঙ্গালী অনুভব করিয়াছিল। ১৮৭৬ সালে তত্ত্ববোধিনী লিখিলেন—

"অর্থকরী ও লোকোপকারী বস্তুশিক্ষার অভাব বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আর একটি দোষ। গবর্ণমেণ্ট যদি স্থানে স্থানে শিল্প ও শ্রমিক বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করেন তাহা হইলে দেশের মহোপকার সাধন হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কেবল গবর্ণমেণ্টের মনোযোগী হইলে হইবে না। আমাদের দেশের ধনাঢ্য লোকদিগেরও বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।"

ভোকেশনাল স্কুলকে তাঁহারা বলিয়াছেন শ্রমিক বিদ্যালয়।

কেবলমাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নহে, বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, ভারতী, প্রভৃতি পত্রিকাতেও দেশের আর্থনীতিক অবস্থার আলোচনা চলিতে লাগিল। আর্য্যদর্শনে শ্রীহরপ্রসাদ এই স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রবন্ধ "বাঙ্গালী গরীব কেন" এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ সালে উহা প্রকাশিত হয়।

প্রতিকারের উপায় চিন্তা

আর্থনীতিক শোষণের নাগপাশ হইতে কিরূপে মুক্তি আসিবে বাঙ্গলাই ভারতে সর্ব্বপ্রথম সেই চিন্তায় মন দিয়াছে। হিন্দুমেলার একটি অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল শিল্পপ্রদর্শনী। সাহিত্যে ও জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে অর্থনীতি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল।

প্রমথনাথ বসু ভারতীতে লিখিলেন—

"কৃষকের ক্ষতি, শিল্পজীবীদের দুরবস্থা, শস্যের রপ্তানী বৃদ্ধি, টাকার অপব্যয়। রেলরোড এবং সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা, উহার নির্ম্মাণে যে সব মূলধন লাগিয়াছে তাহার অধিকাংশ জোগাইয়াছেন ব্রিটনবাসীরা, উহা পরিচালিত হয় ব্রিটনবাসী দ্বারা। টেলিগ্রাফও ব্রিটিস ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা নির্ম্মিত এবং পরিচালিত। ব্রিটিস কৃত এবং ব্রিটিস চালিত ৯ হাজার মাইল রেলরোডের পরিবর্ত্তে যদি ভারতবাসী কৃত এবং ভারতবাসী চালিত ৯০ মাইল রেলরোড দেখিতাম, তাহা হইলে ভারতবাসীর উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইত।"

হিন্দুমেলা, জাতীয়-গৌরব-সঞ্চারিণী সভা, ন্যাশনাল পেপার, প্রভৃতি জাতীয় শিল্প-প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিতে লাগিল। ইহার সবই উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের কাজ এবং এই কাজই স্বদেশী যুগের নবজাগরণের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছে। এই কালের এক বিশিষ্ট আন্দোলন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় নারী-সমাজের প্রচেষ্টা। ১৮৮৭ সালে সখি-সমিতি গঠিত হয়। মহিলা শিল্পমেলা আরম্ভ হয়। সখি-সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী এবং উহার সদস্যা ছিলেন মৃণালিনী দেবী (রবীন্দ্রনাথের পত্নী), সৌদামিনী গুপ্ত (বি. এল. গুপ্তের পত্নী), প্রসন্নতারা গুপ্তা (কে. জি. গুপ্তের পত্নী), সরলা রায় (পি. কে. রায়ের পত্নী), চন্দ্রমুখী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রভৃতি। মহারাণী স্বর্ণময়ী, মহারাণী কুচবিহার, রাণী পতিতপাবনী দেবী, বরোদার মহারাণী, ডব্লিউ. সি. বোনার্জ্জির পত্নী হেমাঙ্গিনী দেবী, মহীশূরের মহারাজা, প্রভৃতি সখি-সমিতিকে অর্থসাহায্য করিতেন। ইঁহাদের দ্বারা পরিচালিত শিল্পমেলার আয়ও কম হইত না। প্রথম বছরেই আয় হইয়াছিল ২৮৯০ টাকা। এখনকার প্রায় ৩০ হাজার টাকা।

সংবাদপত্রদের মধ্যে অনেকে তখন জাতীয়তাবাদী এবং আর্থনীতিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকিতেন। 'ভারতী' এ বিষয়ে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে। বাঙ্গালী যুবকদের বিদেশে পাঠাইয়া শিল্প শিখাইয়া আনিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল। 'ভারতী' এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন এবং ১৯০২ সালে লিখিলেন—

"যদি কোন ভদ্র-সন্তান শিল্প শিক্ষার্থ জাপান গমনেচ্ছু হন বা কোন দেশীয় কারিগরকে পাঠাইবার অভিলাষ করেন, জাপানে থাকিবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ভারতী কার্য্যালয়ে সংবাদ লইলে সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।"

শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে ইউরোপ অপেক্ষা জাপান ভারতীয়দের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক হইবে ইহা তাঁহারা তখনই বুঝিয়াছিলেন এবং কোন্ কোন্ শিল্প জাপানে শেখা যাইবে তাহাও স্থির করিয়াছিলেন। 'ভারতী' লিখিলেন—

"ভারতবর্ষে শিল্প শিক্ষার উপায় এখন এক রকম নাই বলিলেই চলে। ইউরোপে গিয়া শিক্ষা করাও অসম্ভব। কারণ প্রথমতঃ ইউরোপে শিক্ষা বহু ব্যয়সাধ্য, দ্বিতীয়তঃ ইউরোপে ভারতবাসীদিগকে শিক্ষা দিতে প্রায় কেহই রাজী হয় না। আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল জাপান। ভারতবর্ষীয় ভদ্রসন্তান ও জাতব্যবসায়ী কারিগর উভয়ের পক্ষে কোন্ কোন্ লাভজনক শিল্পশিক্ষার দ্বার জাপানে উন্মুক্ত আছে তাহাদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। তালিকাটি কোন জাপানী সম্ভ্রান্ত পুরুষ আমাদিগকে দিয়াছেন।

ভদ্রসন্তানের পক্ষে

খনি, কাঁচ, মৃৎশিল্প (দেশী মাটির কাজ), চীনা মাটির কাজ, তৈল শোধন, যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জাহাজ নির্ম্মাণ, স্থপতি-বিদ্যা, কাগজ, রং করা, ঔষধ প্রস্তুত, **decorative designing**, ললিতকলা।

কারিগরের পক্ষে

কাংস্য ও স্বর্ণ-রৌপ্যের কাজ, গালার কাজ, ছুতোরের কাজ, লোহা ঢালাই, চীনামাটির কাজ, সিমেণ্ট, কাঁচের কাজ, এমব্রয়ডারি, এনামেল, তাঁত-বোনা, ঘড়ি নির্ম্মাণ, ল্যাম্প নির্ম্মাণ।

একটি ভদ্রলোকের মাসিক ৮০ টাকায় এবং একজন কারিগরের পক্ষে মাসিক ৪০ টাকায় সেখানে খরচ সঙ্কুলান হয়।"

১৯০২ সালে স্বদেশী আন্দোলনের তিন বছর আগে এবং আজ হইতে ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে বাঙ্গালীদের যে-সকল শিল্প শিখিয়া আসিতে বলা হইয়াছে, তার জন্য সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, সেই-সমুদয় শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজও রহিয়াছে। বাঙ্গলার আর্থনীতিক জীবন সংগঠনে সে যুগের নেতারা কতখানি দূরদৃষ্টি লইয়া নামিয়াছিলেন এই তালিকা তাহারও প্রমাণ।

বাঙ্গলায় শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা বিপুল পরিমাণে অর্থসাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দুইটি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং ডাঃ নীলরতন সরকার। ইহার জন্য দুজনেই প্রচুর ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন। 'ভারতী'র সম্পাদিকা তখন ছিলেন সরলা দেবী চৌধুরাণী। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'ভাণ্ডার' পত্রিকা বাঙ্গলার আর্থনীতিক সংগ্রামে প্রেরণা জোগাইতে লাগিল। তাঁহারা আর্থনীতিক পরিভাষা প্রণয়নও আরম্ভ করিলেন। Exploitation শব্দের আমরা অর্থ করিয়াছি 'শোষণ', তাঁহারা বলিলেন 'লভ্য নিষ্কর্ষণ'।

বাঙ্গালী অলস এবং শ্রমবিমুখ,—এই অপবাদ এখনও আছে, তখনও ছিল। আত্মবিশ্লেষণ তখনও হইয়াছে এবং ত্রুটি সংশোধনের প্রেরণা ভালভাবেই দেওয়া হইয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায় 'বাঙ্গালী গরীব কেন' প্রবন্ধে তাহার জবাব দেওয়া হইল—

"বাঙ্গলার লোক অলস বলিয়া তো আজকাল সকলেই বাঙ্গালীকে গালি দিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহা সত্য? বাস্তবিক কি আমরা বড় অলস? বোধ হয় না। ভদ্রলোকের মধ্যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে পরিশ্রমী লোক কম বটে, কিন্তু চাষারা তো সকলেই পরিশ্রমী, সকলেই খাটে, আর আমরা যে কোন গ্রন্থ খুলি, দেখিতে পাই বাঙ্গালীরা বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী। বাঙ্গালীরা পরিশ্রমী একথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ধনোৎপাদনে উচ্চদরের পরিশ্রম একটুও করা হয় না। চাষা লোকের যৎসামান্য বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, তাহারাই খাটে। কোন ভদ্রলোক বা বুদ্ধিমান্ লোক তাহাদের সাহায্য করিতে রাজী নহেন।

"বাঙ্গলার ভূমি উৎকৃষ্ট হইলেও পরিশ্রমের দোষ ও সঞ্চয় না থাকায় ফসল জন্মানর বিশেষ ব্যাঘাত হইতেছে। আমাদের জাতীয় চরিত্র পরিবর্ত্তিত না হইলে আমাদের পূর্ব্বোক্ত দুইটি দোষ যাইবে না।"

এখন যন্ত্রের যুগ আসিয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে শিল্পপ্রচেষ্টায় বাঙ্গালী শ্রমবিমুখ নহে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় যুদ্ধে কলিকাতায় বোমা পড়িলে কলকারখানার অবাঙ্গালী শ্রমিকেরা দেশে চলিয়া গিয়াছিল। তখন সমস্ত কারখানা চালাইয়াছে বাঙ্গালী শ্রমিক। যুদ্ধের পর আবার তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে এবং পূর্ব্বের কাজ অধিকার করিয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর নিস্তারণ চক্রবর্ত্তী তাঁর রিপোর্টে বাঙ্গলার কলকারখানায় অবাঙ্গালী শ্রমিক নিয়োগের জন্য দায়ী করিয়াছেন মালিকদের মনোভাব এবং সর্দ্দার মারফৎ শ্রমিক সংগ্রহ প্রথাকে। জাহাজের খালাসীর কাজ বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানেরাও পারে এবং করিতে ইচ্ছুক আছে, হাওড়া পিপ্‌লস ইঞ্জিনিয়ারিং কর্ত্তৃক খালাসী ট্রেণিং ব্যবস্থায় তাহা দেখা গিয়াছে। কিন্তু কাজে নামিয়া তাহারা পাকিস্থানী

খালাসীদের বহুবিধ চালে ও অত্যাচারে টিঁকিতে পারে নাই। মোট বহা, মাটি কাটা জাতীয় নিছক কায়িক শ্রম বাঙালী পারিয়া উঠিত না, কিন্তু এই-সকল ক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রচলনের পর বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখতার আর কোন কারণ নাই।

আর্থনীতিক ভেদনীতি

বহু বাঙ্গালী যুবক জাপান হইতে শিল্প শিখিয়া আসিল এবং মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ডাঃ নীলরতন সরকার, প্রভৃতির সাহায্যে শিল্প গড়িয়া তুলিতে লাগিল। ইহাতে ইংরেজ বণিক্‌সমাজ প্রমাদ গণিল। এই সময়ে সুরু হইল স্বদেশী আন্দোলন। বাঙ্গালীর উপর ইংরেজ ক্ষেপিয়া গেল। তাহারা বুঝিল, সামরিক শক্তি হয়ত তাহাকে বাঙ্গালী যুবকের বোমা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে কিন্তু শিল্প-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই সর্ব্বনাশ। বাঙ্গালীর সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে সমান প্রতিযোগিতায় ইংরেজ পারে নাই, ইহা সে জানে। ছোট বড় উভয়বিধ শিল্পেই বাঙ্গালী ইংরেজকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। রাজনীতি ক্ষেত্রের ন্যায় অর্থনীতি ক্ষেত্রেও তাহারা ভেদনীতি প্রয়োগ সুরু করিল। আদর করিয়া তাহারা কলিকাতায় আনিয়া বসাইল মাড়োয়ারীকে। পাটের ব্যবসা বাঙ্গালীর একচেটিয়া ছিল। চটকল ছিল ইংরেজের হাতে। তাহারা স্থির করিল মাড়োয়ারীর মারফৎ ছাড়া পাট কিনিবে না। বাঙ্গালী এই ব্যবসা হইতে বিতাড়িত হইল। মাড়োয়ারীর সঙ্ঘশক্তি ছিল। * একক বাঙ্গালী সঙ্ঘবদ্ধ ইংরেজ ও মাড়োয়ারীর নিকট পরাজিত হইল। পাটের পর বস্ত্র, খাদ্য, চিনি, প্রভৃতির পাইকারী ব্যবসা মাড়োয়ারীর হাতে চলিয়া গেল। বাঙ্গালী তখন রাসায়নিক দ্রব্য, সাবান, কাঁচ, কাগজ, চীনামাটির বাসন, প্রভৃতি শিল্প ও ব্যবসায়ে আত্মরক্ষার চেষ্টায় মন দিল। কিন্তু এখানেও অসম প্রতিযোগিতা প্রবলতম বাধা হইয়া দাঁড়াইল। বাঙ্গালীর শিল্প গড়ে আর ভাঙে। বাঙ্গালী সস্তা সুন্দর বিলাতি কাপড় ফেলিয়া চড়া দরে মোটা কাপড় স্বদেশী বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইল কিন্তু বাংলায় বঙ্গলক্ষ্মী এবং আর গুটিকয়েক মিল ভিন্ন বস্ত্রশিল্প স্থাপিত হইল না। উহা চলিয়া গেল বোম্বাই এবং আমেদাবাদে।

স্বদেশী যুগ হইতে স্বাধীনতা পর্য্যন্ত এই একটানা সংগ্রাম এবং অসম প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টাই বাঙ্গালীর আর্থনীতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার একটানা ইতিহাস। ব্যাঙ্ক এবং বীমা ব্যবসায়ে বাঙ্গালী বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, শেষরক্ষা করিতে পারে নাই। মাড়োয়ারীর পর বাংলায় আসিয়াছে গুজরাতী। বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত শিল্প হয় বন্ধ হইয়াছে নচেৎ মাড়োয়ারী বা গুজরাতীর হাতে চলিয়া গিয়াছে।

স্বদেশীর পর এবং স্বাধীনতার আগে বাঙ্গালীকে শিল্পক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁহার বেঙ্গল কেমিক্যাল এখনও দাঁড়াইয়া আছে। উহার দুইটি বিশেষত্ব—প্রথমতঃ ম্যানেজিং এজেন্সি বর্জ্জিত এত বড় প্রতিষ্ঠান ভারতে খুব কম আছে, দ্বিতীয়তঃ এখনও উহা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী-পরিচালনাধীনে রহিয়াছে। যন্ত্র-শিল্পে ইংরেজ মার্টিনদের সঙ্গে যোগ দিয়া রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই কার্য্যে বাঙ্গালীর দক্ষতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। একক বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায় গঠিত যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানরূপে টিঁকিয়া গিয়াছে এবং সারা ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যন্ত্রশিল্পরূপে পরিচিত হইয়াছে আলামোহন দাশের ইণ্ডিয়া মেসিনারি। রাসায়নিক শিল্পে বাঙ্গালী যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল তাহাও এখন যেন ক্রমশঃ মন্দীভূত হইবার লক্ষণ দেখা দিতেছে।

রাজশক্তি ও বৈশ্যশক্তি

আর্থনীতিক জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাঙ্গালীর ব্যর্থতার দায়িত্ব তার নিজের যতটা, তার চেয়ে বেশী দায়ী বাঙ্গলা দেশে অবাঙ্গালী বৈশ্যশক্তির সঙ্গে বাঙ্গলার রাজশক্তির মিলন। বিদেশী ও দেশী বণিক্ এবং বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্ট একত্র হইয়া যে অচলায়তন সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ভাঙিয়া ফেলিতে না পারিলে বাঙ্গালীর আর্থনীতিক জীবন পুনর্গঠনের কোন আশাই নাই। বাঙ্গালীর বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই, ঘরেও উপার্জ্জনের প্রায় সকল ক্ষেত্র হইতে সে বিতাড়িত। মীরকাশিমের যুগে বাঙ্গলার আর্থনীতিক ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালী বিতাড়ন-কালে বাঙ্গালী শিল্পজীবী রাজশক্তির যেটুকু সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল আজকাল তাহা হইতেও বঞ্চিত। বাঙ্গলার অর্থনীতি ক্ষেত্রে আজও সেই দুই শতাব্দী পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি চলিতেছে। এই অসহায় অবস্থা শুধু যে আর্থিক দিক্ হইতেই ক্ষতিকর তাহা নহে, ইহাতে জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙিয়া পড়িতেছে। সমস্যাকে অস্বীকার এবং অগ্রাহ্য করিলে নিজেকে খর্ব্ব করা হয়। আপনাকে খর্ব্ব করার দ্বারা যে আত্মত্যাগ আসে তাহা মানুষকে ও জাতিকে মুক্তির উল্টা পথে লইয়া যায়।

—•—

ভারতীয় ক্ষেত্রে বিগত ষাট বছরের দার্শনিক চিন্তাধারা

(১৩০৭-১৩৬৭)

শ্রীসরোজকুমার দাস

ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারে কোনও গ্রন্থ বা নিবন্ধের অবতারণা করিতে উদ্যত রচয়িতাকে তৎসম্পর্কে অধিকার ও প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। এই নিবন্ধের "প্রয়োজন" স্থান-কাল প্রভাবে এতই সুস্পষ্ট যে তার পুনরুক্তি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। এর অধিকার নির্দ্দেশকল্পে বলিতে হয় যে, প্রথমতঃ এই ষাট বৎসরের মধ্যে যে-সব চিন্তাশীল ভারতীয় মনীষী, ভারতীয় ও অভারতীয় অর্থাৎ প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দর্শনের তুলনামূলক সমালোচনার মাধ্যমে স্বকীয় মত বা গবেষণা প্রতিপাদিত করিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ, 'দর্শন' বা 'দার্শনিক' শব্দের যে অর্থ সাধারণ্যে প্রচলিত, তাহার সীমিত অর্থে আবদ্ধ না রাখিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাও, দর্শনের ব্যাপকতম অর্থে, 'দার্শনিক চিন্তাধারা'র অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে "দর্শন" শব্দটির একটি কার্য্যকরী সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা প্রাথমিক কর্ত্তব্য মনে হয়। বলা বাহুল্য যে "দর্শন" শব্দটির যৌগিক বা যোগরূঢ় অর্থ এবং তার ক্রমবিবর্ত্তন-পদ্ধতি অনুধাবন করার চেষ্টা স্থান-কাল বিবেচনায় সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। বিশেষজ্ঞদের অনুসরণ করিয়াই বলিব যে, তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন অর্থে—ইংরাজী Philosophyর প্রতিশব্দরূপে—সংস্কৃত সাহিত্যে "দর্শন" বা "দার্শনিক" শব্দটির প্রয়োগ অতিবিরল, নাই বলিলেও চলে। সাধারণ ভাবে "দর্শন" শব্দের ব্যবহার হইতে যে বৈকল্পিক অর্থাবলী সংগ্রহ করা যায়, তাহাদের তালিকা এইভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হয় :—(১) প্রথম, ঐন্দ্রিয়ক বা চাক্ষুষ জ্ঞান, (২) দ্বিতীয়, মনশ্চক্ষুঃ দ্বারা মানসবস্তু বা অন্তঃকরণবৃত্তি সকল নিরীক্ষণ, (৩) তৃতীয়, ধ্যানের দ্বারা সত্যবিশেষের উপলব্ধি বা ধ্যানজ প্রমা, যেমন রামায়ণে আছে—"দৃষ্ট্বা বৈ ধ্যান-চক্ষুষা" অথবা রামানুজের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে—"ভাবনাপ্রকর্ষাদ্ দর্শনরূপতা"—ধ্যান বা চিন্তনের অবিচ্ছিন্ন বিস্তার বা উপচয় হইতে যে দর্শনরূপের উদ্ভব হয়, (৪) চতুর্থ, অলৌকিক অনুভূতি বা সমাধিজাত প্রজ্ঞা। এই সমস্ত অর্থ ব্যতিরেকে উত্তর-কালে "দর্শন" শব্দটি বিচার, বিশ্লেষণ, সমীক্ষণ-প্রসূত বিশিষ্ট মতবাদে, এই অর্থে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অতএব সর্ব্বসাকল্যে "দর্শনে"র এই অর্থই গ্রহণীয়—মতবাদ বা চিন্তা-পদ্ধতি দ্বারা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে, মননের আনুকূল্যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সাহচর্য্যে পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধ করিয়া ভাষায় প্রকাশ ও এই প্রণালীতে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা।

"দর্শন" শব্দের ইতিবৃত্ত হইতে এই প্রতীতি হয় যে, লোকসিদ্ধ প্রণালীলব্ধ যে লৌকিক জ্ঞান (এবং বিশেষ অর্থে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বও অন্তর্গত), তাহা দর্শনের অধিকারভুক্ত। এই জন্যই ব্যাপকতম অর্থে দর্শনের সহিত জীবনের অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক—একেবারে নাড়ীর যোগ বলা যায়। এক্ষেত্রে সহজবোধ্য হয়, যদি বলা যায় যে, চিত্রার্পিত অনুলেখনে সমদ্বিবাহু একটি ত্রিভুজের শীর্ষভাগে "জীবন"কে সন্নিবিষ্ট করিলে তলদেশের দুইকোণে যথাক্রমে "সাহিত্য" ও "দর্শন" স্থান পাইতে পারে। কোণদ্বয়স্থিত দুইটিই, অর্থাৎ "সাহিত্য" ও "দর্শন", জীবনের গহনগুহাহিত "জিজ্ঞাসা"র সঞ্জাত ও সংবর্দ্ধিত এবং এই জিজ্ঞাসার প্রকৃষ্ট নির্ব্বাচন (definition) জীবন-যোনি-প্রযত্ন (instinctive activity) এই অভিধানে। বিচার ও মীমাংসাসম্ভূত জ্ঞানের উৎসস্বরূপ এই যে "জিজ্ঞাসা", তাহার জীবনপুরঃসরপ্রবৃত্তির মধ্যেই সন্ধান পাই ইহার প্রাণস্পর্শ ও জৈবপ্রেরণার। সাংখ্যদর্শনে বলা হয় যে "বোধ" বা "জ্ঞান" প্রকৃতি-জন্য বিকারের অনুগ্রহ- বা পশ্চাদ্‌গ্রহণ-প্রসূত ফলমাত্র (যচ্চেতনাশক্তেরনুগ্রহঃ তৎফলং প্রমা বোধঃ)। এই উক্তিটির যেন প্রতিধ্বনি করিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ডেনমার্কদেশীয় প্রখ্যাত দার্শনিক স্যোরেন্ কার্কেগার্ড (Sören

Kierkegaard)—যাঁকে আধুনিক যুগের "কেবলাস্তিত্ববাদ" (Existentialism)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিপোষক বলা যায়—এই প্রসঙ্গে একটি ভাবগর্ভ উক্তি করিয়াছিলেন—"We live forwards but understand backwards," অর্থাৎ "জীবনের গতি পুরোভাগে কিন্তু অবগতি পশ্চাদ্‌গমনে"। জীবন আগ্রহপূর্ব্বক, চিন্তন অনুগ্রহাত্মক। ইংরাজী Reflection (re + flectere) শব্দটির মৌলিক অর্থ এই পরাবৃত্ত-গতিরই আভাস দেয়, জ্ঞান বা অবগতি-সম্পর্কে। বিচার, মীমাংসা বা চিন্তনের সহজধারা যেন শার্দ্দূলবিক্রীড়িত গতিচ্ছন্দ।

এই কিঞ্চিদূর্দ্ধ অর্দ্ধশতাব্দীকালব্যাপী দার্শনিক চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের তুলনামূলক সমালোচনা-প্রসঙ্গিত ও প্রভাবিত মনন এবং অনুশীলন। বিস্তৃততর পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে এই পরম্পরাসম্বন্ধ, অন্যোন্যপরিপুষ্ট মননশীলতা কেন্দ্রীভূত প্রগতিশীল এক যুগমানসেরই পরিচায়ক। বস্তুতঃপক্ষে এই অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ ও পারস্পরিক পরিপুষ্টি (cross-fertilisation)—কি সাহিত্যানুশীলন, কি দার্শনিক আলোচনার, কি শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে—চিরাগত ভারতীয় মননশীলতার সুপরিস্ফুট পরিচয় দিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তন এক নূতন ভূমিকায় উত্তীর্ণ করিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ, বিবর্ত্তন সম্পর্কে একটি তথ্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাধারণতঃ, "বিবর্ত্তন" ত্রিতয়াত্মকভাবে ব্যাখ্যাত—সাম্য, বৈষম্য ও সংহতি বা সমন্বয়। সাম্যাবস্থায় যাহা থাকে অব্যক্ত ও অপরিস্ফুট, বিবর্ত্তনমুখে তাহাই হয় ব্যক্ত বা পরিস্ফুট। বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতদের মতে এই পদ্ধতিগত অভিব্যক্তি বিবর্ত্তন নামের অপব্যবহার মাত্র। যে বিবর্ত্তনে কেবলই আবর্ত্তন আছে কিন্তু উদ্বর্ত্তন নাই, ভূতপূর্ব্বের সমাবেশ আছে কিন্তু অপূর্ব্ব বা অভূতপূর্ব্বের সৃষ্টি স্বীকার নাই, তাহা বিবর্ত্তনবাদের ছায়ামাত্র। অথর্ব্ববেদোক্ত "উচ্ছিষ্ট"-সঞ্জাত অপূর্ব্বের যে উদ্ভব বা "অতিসৃষ্টি" স্বীকৃত হইয়াছে তাহা সাম্প্রতিক দর্শনালোচনার বিষয়ীভূত উদ্বর্ত্তনাত্মক অভিব্যক্তিবাদের (Emergent evolution) পূর্ব্বাভাস বলা অযৌক্তিক হইবে না।

এই ভূমিকায় আলোচ্য পর্ব্বের প্রথম দশকে যে দুইজন প্রখ্যাত মনীষী দর্শনালোচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও মনীষিপ্রবর কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ঐতিহ্যগত ভারতীয়দর্শন-বিজ্ঞানসত্তার বিংশ শতাব্দীর সুপ্রতিষ্ঠিত আঙ্গিকে (technique) বিবৃত ও প্রচারিত করাই ছিল ইঁহাদের বিশেষত্ব। এ বিষয়ে এই দুই মনীষীর মধ্যে ছিল যেন এক সংকল্পগত পূর্ব্ব-সিদ্ধ সামঞ্জস্য। ইঁহাদের মধ্যেও ছিল চরিত্রগত এক ভাবসাম্য—প্রচারবিমুখ আত্মসমাহিত মননশীলতার জীবন। মনীষী অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ক্ষেত্রে এই মননশীলতার জীবন এইরূপ আত্মকেন্দ্রিক, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যপ্রভাবিত ছিল যে, সাধারণ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে তাঁহার রচনাবলী হইত অতি দুরূহ ও দুরধিগম্য। অধ্যাপনার আসরে বা আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁহার অনন্য-সাধারণ প্রতিভা স্বভাবসিদ্ধ রসবৈদগ্ধ্যপ্রভাবে অপূর্ব্ব প্রকাশমাহাত্ম্য লাভ করিত। যাঁহারা স্বল্পভাষী এই মানুষটির কথোপকথন, অভিভাষণ বা প্রতিভাষণ শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই "অলৌকিক চমৎকারকারী" রসের স্বরূপ যে কিভাবে সকল সহৃদয়ব্যক্তির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্য সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার আভাস পাইয়াছেন। কিন্তু তত্ত্বদর্শন বা অনুলেখনের ভূমিকায় যখন তিনি উত্তীর্ণ হইতেন, তখন যেন অন্য আর এক মানুষ। তখন মনে হইত যেন এক অনন্যলভ্য মানসলোকে, বৈদান্তিক ব্রহ্মেরই মত "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ" অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্বের সমস্ত রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু অভিমন্যুর মত এই প্রজ্ঞানঘন ব্যূহভেদ করিয়া বাহিরে আসিবার মন্ত্রটি অধিগত করিতে পারেন নাই। ইংরাজ কবি শেলীর কথায় বলা যায়—এ যেন কবিজনসুলভ প্রাতিভ-জ্ঞানালোকসম্ভারে রচিত আপনারই আবরণ ("Like a poet hidden in the light of his own thought")।

তাঁহার দার্শনিক উত্তরাধিকারের সর্ব্বোত্তম অধিকারী, জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্য মনীষিপ্রবর কৃষ্ণচন্দ্রের রচনাবলী-প্রকাশ-প্রসঙ্গে, তাঁহার প্রতিভার এই যে দ্বৈপায়নবৃত্তি, তৎসম্পর্কে একটি প্রামাণিক উক্তি করিয়াছেন প্রথম খণ্ডের "অবতরণিকা"তে। "বহুল-সংখ্যা ছিল তাঁহার রচনাবলী। কিন্তু তাঁহার লিখিত রচনাবলী ও মৌখিক ভাষণাবলীর মধ্যে দেখা যায় রচনাপদ্ধতিগত এমন ব্যবধান ও বৈষম্য যাহা বাস্তবিকই চমকপ্রদ। মৌখিকভাষণে তাঁহার

উচ্চাঙ্গের গুরুগম্ভীর দর্শনালোচনা পর্য্যন্ত লঘুহাস্যপরিহাসবিজল্পিত থাকিত। অধিকন্তু এই সব আলোচনার প্রাঞ্জলতা ও বিচারসহতা ছিল সমভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ বক্তা সর্ব্বদাই তাঁহার বক্তব্য উদার, অকুণ্ঠভাবে ব্যাখ্যান করিতেন। কিন্তু লেখনী ধারণ করিলেই তিনি হইতেন প্রায় স্বতন্ত্র অন্য এক ব্যক্তি। তখন তাঁহার বিশদবিস্তৃতি হইত অন্তর্হিত এবং রচনাতেও দেখা যাইত এমন একটি প্রকাশবিরোধী ভাব, যাহার ফলে তাঁহার রচনায় স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জলতার পরিবর্ত্তে আবির্ভূত হইত সূত্রাত্মক, অবগুণ্ঠিত এক প্রকাশভঙ্গী। কোথায় থাকিত তখন সেই সাবলীল-গতিচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গী ; নিবন্ধ-রচয়িতা তাঁহার নিবন্ধের বিশ্বতোমুখ মূলসূত্রটি লিপিবদ্ধ করিয়াই যেন দায়মুক্ত—যেন তেন প্রকারেণ ব্যাখ্যানের দায় তখন বর্ত্তাইত হতচকিত, বিস্ময়বিমুগ্ধ পাঠকের উপর। রচনা-প্রাচুর্য্যের তুলনায় প্রকাশের স্বল্পতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার একটি কারণ এই যে, তিনি তাঁহার অত্যল্পসংখ্যক রচনাতেই পূর্ণাঙ্গ পরিণতির সার্থকতা দান করিয়া গিয়াছেন।"* এটিও বোধ হয় স্বষ্টিধর্ম্মী প্রতিভার একটি লক্ষণ। যদিও শুনিতে ব্যাজস্তুতির মতন তবুও কবিযশঃপ্রার্থী রসিকতাচতুর 'চিরকুমারসভা'র অক্ষয় লঘুসুরের কবিতায় এরই আভাস বোধ হয় দিয়াছিল—"সখা, শেষ করা কি ভালো ? তেল ফুরোবার আগেই আমি নিবিয়ে দেব আলো।"

অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রথম মনীষাদ্যোতক ও সম্ভাবনাপূর্ণ প্রকাশিত গ্রন্থ—বেদান্ত-দর্শন পাঠ-সঞ্চয়ন ("Studies in Vedantism")। ইহাই ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক (১৯০১ সনের) প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য মনোনীত দর্শনসংক্রান্ত নিবন্ধ। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ বেদান্ত-পরিক্রমা বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থমালার তৃতীয় সংখ্যক গ্রন্থরূপে [(University Studies—No 3) ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত হইয়া ১৯০৯ সনে] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি নবযুগের গবেষণামূলক পঠন-পাঠনার দিগ্‌দর্শন-নির্দ্দেশক, প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সমাদরণীয়। বিশেষতঃ বেদান্ত-দর্শন-সম্পর্কে যে পিষ্ট-পেষণ, সূত্র-ভাষ্য-টীকা-ব্যাখ্যান-ক্রমে, আবহমানকাল চলিয়া আসিয়াছে, তাহারই অবরুদ্ধগতি উদ্ধারসাধন করিয়া বেদান্তদর্শনকে অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বমানব-চিত্ত-ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করিলেন। সেই মুক্ত আকাশের প্রসাদ-বায়ু, চিরাগত বদ্ধস্রোত চিন্তাধারাকে, নবীন প্রাণস্পর্শে করিল সমীরিত ও সঞ্জীবিত। "বেদান্ত-পাঠ-সঞ্চয়নে"র এই ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ব্যতীত গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবনেও ইহার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। "ছায়া সতত পূর্ব্বগামিনী"—এই প্রবাদবাক্য বোধহয় অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে গ্রন্থকারের উত্তর জীবনে, তত্ত্ব-বিদ্যার এষণায়। সুধী পাঠকের কাছে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, জর্ম্মণ্যদেশীয় বর্ত্তমান যুগের মনীষী দার্শনিক কাণ্ট্ ও হেগেল একদিকে এবং অন্যদিকে ভারতীয় বেদান্ত-দর্শন, এই দুই চিন্তাধারা অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্রের দার্শনিক মতবাদ প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছিল ; কিন্তু স্বকীয় মৌলিকতা বা মতবাদের বৈশিষ্ট্য শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণই ছিল।

অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্রের মতবাদ এই প্রবন্ধে প্রতিপাদন ও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক ও অধিকার-বহির্ভূত। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী অধ্যাপনা ও মননশীলতায় নিবেদিত জীবনে যে চিন্তাপ্রসূনরাজি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার স্মৃতিসৌরভ ও কৃতিবৈভব কথঞ্চিৎ অনুভব করা যাইতে পারে তাঁহার রচনাবলী-উদ্ধৃত বাক্যমাধ্যমে। প্রথমতঃ, "বেদান্ত-পাঠ-সঞ্চয়ন" ভূমিকাতে ইতিকর্ত্তব্যতার স্বপক্ষে এমন একটি সারগর্ভ উক্তি করিয়াছেন, যাহা অনুরূপ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাঁহার মতে সাহিত্যিক ব্যাখ্যাতা বা টীকাকারের তুলনায় দর্শন সম্বন্ধীয় ভাষ্যকার স্বাধিকার অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারেন, বিশেষতঃ দর্শন-ব্যাখ্যাতা যখন সাংগঠনীসংস্থানবর্জ্জিত, উৎপ্রেক্ষাসঞ্জাত-তত্ত্বধারক মূলবাক্যসমূহ আলোচনা করেন। মূল-সম্মত অনুবাদ এক্ষেত্রে সহজ সাবলীলগতিতে দার্শনিক মতবাদে পর্য্যবসিত হয় এবং ইহাতে বুদ্ধিবিচারগত কোন অসত্যাচরণ বর্ত্তায় না।.

"A philosophic commentator, especially on unsystematised texts embodying specu-

* Studies in Philosophy, Krishnachandra Bhattacharyya, First Volume P. X, edited by Sri Gopinath Bhattacharyya.

lative truths, has a far wider latitude than a literary commentator. Exegetical interpretation here inevitably shades off into philosophic construction; and this need not involve any intellectual dishonesty."

এই অনুবাদ প্রসঙ্গমুখে জীবনের চলমান ধারার সহিত সুদূরপরাহত, অচলায়তন-নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদের যৌগাযোগ কিরূপে রক্ষা করা যায়, এ সম্বন্ধে অবতরণিকাংশের শেষভাগে একটি প্রেক্ষাসমুজ্জ্বল মন্তব্য আছে, এই ভাবার্থে :—"একটি সুসংবদ্ধ দার্শনিক মতবাদ কয়েকটি নিষ্প্রাণ প্রকল্প-সংযোজনারূপে দেখা অকর্ত্তব্য। এটি একটি জৈব শিল্পসাধনার বস্তু এবং এর বাস্তবসত্তাভিমুখী গতিবেগ থাকা সত্ত্বেও এর একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিসত্তা লক্ষিত হয়। এজন্য এটিকে প্রয়োজনানুযায়ী পারিভাষিক দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসূনোপযোগী কৃতবিদ্য দার্শনিকগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পত্তি জ্ঞান করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে এটিকে জীবনের সামগ্রী এবং অপরিসীম প্রয়োজনাত্মক সাহিত্যের সামগ্রীরূপে গ্রহণ করা বিধেয়।"

"A true philosophic system is not to be looked upon as a soulless jointing of hypotheses, it is a living fabric which, with all its endeavour to be objective, must have a well-marked individuality. Hence it is not to be regarded as the special property of academic philosophy-mongers, to be hacked up by them into technical views, but it is to be regarded as a form of life and is to be regarded as a theme of literature of infinite interest to humanity."

"বেদান্তপাঠ-সঙ্কয়নের" প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুসমূহের ক্রমিক পদ্ধতিতে উল্লেখ বা আলোচনা এস্থলে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ও অবাঞ্ছনীয়। তথাপি অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্রের সহজাত প্রতিভা ও মনীষার নিদর্শনস্বরূপ দুই-একটি তত্ত্বোপলব্ধির উল্লেখ করা যায়। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ্‌রাজির মধ্য দিয়া বেদান্ত-দর্শনের সীমানায় যে দেবতাতত্ত্ব "বহুদেববাদ", "একদেব" বা "একেশ্বরবাদ" অথবা "অভিমানী দেবতা"র ভূমিকায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহার বিবিধ ব্যাখ্যান যাস্কের "নিরুক্ত" (দৈবত-কাণ্ড) হইতে রাজা রামমোহন রায়, এমনকি শ্রীঅরবিন্দের রচনাতে আমরা পাই। নিরুক্ত মতে যিনি দান করেন অথবা উদ্দীপনা দেন বা দীপ্তিবিস্তার করেন বা দিব্যলোকবাসী, তিনিই দেবতা (দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো বা ইতি নিরুক্তম্)। অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্রের মতে "প্রত্যেক দেবতার অধিকারে এক-একটি লোক নির্দ্দিষ্ট আছে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যে কোন নির্ব্বিশেষ, নিরবচ্ছিন্ন ঐক্যতত্ত্ব আমাদের বোধগম্য করিতে হইলে কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই তাহা গ্রহণীয় নয়, কিন্তু প্রকারভেদগত বোধিবিশেষ-মাধ্যমেই উপলব্ধব্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেমন চাক্ষুষ দর্শনে উপলব্ধি হয় দৃশ্যমান জগৎ ও দর্শনক্রিয়ার ঐক্যবিধায়ক 'সূর্য্য' নামক দেবতার।" অধিকন্তু ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে "সাধারণজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয় ও বিষয়ীর প্রচলিত যে বিভেদ, তাহারই আবির্ভাব হয় লোক ও দেবতার প্রভেদ-ভূমিকায়। প্রভেদ মাত্র এই যে, সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়ীরই মুখ্যত: প্রবৃত্তি; পক্ষান্তরে বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানালোচনায় বিষয়ের যে স্থান, দেবতা তার সমধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও উচ্চতর ভূমিকায় আরূঢ়। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে যাহা ব্যক্তিগতভাবে আমার বস্তু-উপলব্ধিরূপে স্বীকৃত, তাহাই উচ্চস্তরে দেবতার ভূমিকায় লোকবিশেষে স্বপ্রকাশমহিমায় দীপ্যমান।"

"Every 'devata' demands a 'loka'. Psychologically put, an absolute unity, to be real, must be not only thought but realised in some sort of 'intuition'...The distinction between the subject and object in ordinary knowledge appears in the absolute sphere as a distinction between 'loka' and 'devatā.' Only in ordinary knowledge, the subject takes the lead, whereas here the 'devatā' which corresponds to the object, is the higher reality. What is from the lower standpoint 'my' intuition of an object, is from the higher standpoint, a

'devatā' shining, revealing himself in a loka." ('Studies in Vedāntism', University Studies, No. 3, p. 19.)

এইরকম প্রতিভা একাধারে বিশ্লেষণাত্মক মনীষা ও সমন্বিত দৃষ্টি—কেবলমাত্র ভারতবর্ষে কেন, সমসাময়িক বিশ্বজাগতিক সর্জ্জনমূলক দর্শনালোচনার ক্ষেত্রে বিরলোপম, নাই বলিলেও চলে। যিনি এই ভূমিকায় দর্শনালোচনার মূল্যায়নে একমাত্র অধিকারী, সেই সর্ব্বজনবরেণ্য ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচয়-প্রভাবে কোন একটি জিজ্ঞাসু উচ্চপদস্থ বৈজ্ঞানিক বাঙালীকে বলিয়াছিলেন—"অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্রকে যথার্থ 'দর্শনাচার্য্য' আখ্যা দেওয়া যায়। (তাঁর তুলনায়) আমরা দর্শনমতের ব্যাখ্যাতামাত্র।" ("Prof. K C. Bhattacharjya is alone a true philosopher of our time ; we are only expositors.") এই সুস্পষ্ট, সারগর্ভ অথচ স্বল্পাক্ষরবিশিষ্ট উক্তির উপর কোন টীকা-টিপ্পনীর অবকাশ আছে মনে হয় না।

এই প্রথম দশকেই আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের "ডক্টরেট্" নিবন্ধ আনুষঙ্গিক ও সমপর্য্যায়ভুক্ত নিবন্ধের সহিত একত্র "Positive Science of the Ancient Hindus" গ্রন্থ নামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি যদিও অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্রের "Studies in Vedāntism"-এর প্রকাশের পরবর্ত্তী, তথাপি সম্পূর্ণ অনস্বীকার্য্য যে, যুক্তিবিচারসহ দর্শনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সমালোচনা-পদ্ধতির প্রথমতম আচার্য্য ও প্রবর্ত্তক ছিলেন ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের প্রারম্ভকাল হইতেই তাঁহার পঠন-পাঠন, আলাপ-আলোচনা, এমন কি "New Essays in Criticism" নামক প্রকাশিত কাব্য-সমালোচনার গ্রন্থে ইহার পূর্ব্বাভাস ও সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়—বিশেষতঃ তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও বিশ্বতোমুখী দৃষ্টির। এ বিষয়ে তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ছিল বস্তুতঃই তুলনারহিত বা অতুলনীয়। আচার্য্যদেবের কোন এক ভক্ত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, দার্শনিক গ্রন্থরচয়িতা (১৩৩৮ সালের চৈত্র মাসের) "প্রবাসী"তে লিখিয়াছিলেন—"দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার যে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা আছে তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ কোন গ্রন্থ তাঁহার নাই। জাগতিক দৃষ্টিতে ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে এক মহা পরিতাপের বিষয়।" বর্ত্তমান লেখক এই সারগর্ভ উক্তির সমর্থনে, অপরপক্ষে যে দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা প্রার্থনীয়, তাহার যে উল্লেখ করেন, বোধহয় তাহা এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে। সত্যই "জাগতিক বা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ইহা যে আক্ষেপের বিষয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা ভুলিলেও চলিবে না যে, প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ মাপকাঠিতে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিমাপ করা চলে না। এই জাতীয় প্রতিভা সম্পর্কে যথার্থই Rabbi Ben Ezra-র ভাষায় বলিতে হয়—

'Not on the vulgar mass
Called 'work' must sentence pass.'
Things' done that took the eye and had the price.'

এ প্রসঙ্গে ডেমোক্রেসী বা গণতন্ত্রের যতই দোহাই পাড়ি আর জ্ঞানাভিমানীর আভিজাত্যবাদ বলিয়া যতই উপহাস করি, এই ব্যাপারে 'পংক্তিভোজন' চলে না। সেজন্য আমার মনে হয়, আপাতদৃষ্টিতে যাহাকে ব্যর্থসাধনা বলিয়া মনে হয়, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহাই তাঁহার অসাধারণত্ব প্রতিপন্ন করে।"* এই আলোচনাসূত্রে আচার্য্যদেবের সহিত কথোপকথন-লব্ধ দুইটি উক্তির উল্লেখ করিব। ১৯২৯ সালে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসের মধ্যে বিদেশ হইতে ফিরিবার পরেই তাঁহার সহিত দেখা করি। প্রথমবার যখন দেখা হয় তখন বিদেশে কি কি গবেষণা সংক্রান্ত কাজে ব্রতী ছিলাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনের উল্লেখে বলিলেন, "দেখ, ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে অনেকেই লিখেছেন বটে, কিন্তু কেউ তার spiritটা ধরতে পারেন নি।" অন্য প্রসঙ্গের উত্থাপনে এই আলোচনা ব্যাহত হইল বটে, কিন্তু পরে তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া পথে বাহির হইয়াই আমার স্বতঃই মনে হইল যে, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে (তাঁহার "ভাইস্-চ্যান্সেলর" বা উপাচার্য্য পদে আসীন থাকার মধ্যে) ১৯২৪ সনে তদানীন্তন রেজিষ্ট্রার

* সুধাবরেণ্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রবর্ত্তিত "পরিচয়" পত্রিকায় ১৩৪০ শ্রাবণ সংখ্যায় আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রসঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দর্শনবিদ্ সুব্রহ্মণ্য আয়ার কর্তৃক যে Syllabus of Indian Philosophy প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে, ভারতীয় দর্শনের স্বরূপ তিনি কি চক্ষে দেখিতেন, তাহার কথঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। দ্বিতীয়বার যখন তাঁহার সহিত দেখা হয়, জানিতে পারিলাম যে বাহুমূলে এক স্নায়বিক বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন। সেজন্ত অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আমার সহিত কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। নানাবিধ আলাপের পর হিন্দুদর্শন ও দার্শনিক চিন্তাধারা কিরূপে যুগে যুগে ক্রমাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে তাহার একটি স্তায়সঙ্গত এবং ঐতিহাসিক প্রাঞ্জল বিবৃতি তাঁহার নিকটে পাইলাম। তাঁহার ক্ষীয়মাণ স্মৃতিশক্তির এই শেষ-অবদান একটি ক্ষুদ্র পত্রাকার "ডায়েরী"তে যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিলাম। হঠাৎ চাহিয়া দেখি, আচার্য্যদেব শয্যার উপরে স্থির হইয়া বসিয়াছেন এবং কিরকম যেন আত্মসমাহিত-ভাবে বলিতেছেন, "দেখ, আমি চিরদিন এমন একটা নিখুঁত পরিপূর্ণতার সন্ধান ক'রে ফিরেছি যে কোনও দিন আর কিছুই ক'রে উঠতে পারলাম না। যখনই একটা কিছু করতে বা লিখতে যাই, তখনই মনে হয়, বুঝি বা একটা সুসংহত চিন্তার গণ্ডি গ'ড়ে তুল্‌ছি। এটা আমার একান্তই প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাই আমার স্মরণীয় কিছু ক'রে বা রেখে যাওয়া হ'ল না।" বস্তুতঃ, এখানেই এই সত্যান্বেষী, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানৈকব্রত জীবনের "ট্র্যাজেডি"। কথাগুলি অপর যে কোনও লোকের মুখে অসহনীয় দম্ভের মতই শোনাইত, কিন্তু তিনি যেভাবে বলিলেন তাহাতে কথাগুলি নিরবলেপ, শিশুসুলভ, সরল আত্মনিবেদনের মতই শোনাইল। ইহার পর ১৯৩৫ সনে ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারতীয় দর্শন-মহাসম্মেলনের দশম অধিবেশনে আচার্য্যদেবের উদ্দেশে যে "সপ্ততিতম জন্মোৎসব" জয়ন্তী, প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে বাংলার তথা বিভিন্ন প্রদেশের কৃতবিদ্য দর্শনাধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক তাঁহার মনীষা ও প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন করিবার প্রচেষ্টা করেন। সভার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রিয় সুহৃৎ আচার্য্যদেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে তুলনামূলক-সমালোচনা-পদ্ধতির অনুবর্ত্তন করিয়া "প্রবাসী"র কলেবর অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন জ্ঞানতপস্বী মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বকীয় ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট তুলনামূলক দার্শনিক প্রবন্ধের সমারোহে। ১৩২৩, বৈশাখ (এপ্রিল, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ) সংখ্যার "প্রবাসী"তে প্রথমতঃ পাই "পরাবিদ্যা ও অপরা বিদ্যা" নাম্নীয় প্রবন্ধ এবং তাহার পর হইতে অব্যাহতভাবে প্রায় প্রতি মাসেই এক-একটি এইভাবে প্রভাবিত রচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল, ১৩২৬, সালের শ্রাবণ সংখ্যার "প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দর্শনে পথিমধ্যে কোলাকুলি" শীর্ষক প্রবন্ধ পর্য্যন্ত। ১৩২৬, পৌষের সংখ্যায় এই ভাবের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দর্শনের দুরূহ তত্ত্বগুলি হাস্য-পরিহাসোচ্ছল তারক-রসের সংমিশ্রণে কিরূপে লঘু-পরিপাক করিয়া তোলা যায়, তাহার অদ্বিতীয় নিদর্শন ছিল, মনস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধরাজি। দুই-একটি স্বচ্ছ, সরল উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করা সমীচীন হইবে মনে হয়। ১৩২৩, আষাঢ়ের সংখ্যায় "পুরাতন গ্রীসে ভারতের ভারতীর অজ্ঞাতবাস" প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছিলেন, "খুব সম্ভব যে পিথাগোরাসের সাংখ্যদর্শন আমাদের দেশীয় সাংখ্যদর্শনের একটি ফ্যাঁকড়া ডাল। সাংখ্যশব্দের অর্থ সংখ্যা সম্বন্ধীয়। ফলেও এরূপ দেখা যায় যে সংখ্যা-নির্ব্বাচনের প্রাচুর্য্য সাংখ্যদর্শনে যেমন—এমন আর কোন দর্শনেই নহে···অতএব এরূপ অনুমান শুধুই কেবল একটা অনুমানমাত্র নহে যে পুনর্জন্মবাদের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাবাদটিও পিথাগোরাস্ ভারতসরস্বতীর জ্ঞানভাণ্ডার হইতে চুপি চুপি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস-প্রণেতা ভেবারের (Weber) চমকপ্রদ পরিকল্পনা। পিথাগোরাস্ এবং পিথাগোরীয়-সম্প্রদায়ের দর্শনালোচনা-প্রসঙ্গে উক্ত দর্শনের সহিত বৌদ্ধদর্শনের অন্যূন বারশটি ভাবসাম্য এবং গ্রীক পিথাগোরাস্ শব্দের অর্থ (=পণ্ডিত, বা প্রবুদ্ধব্যক্তি) এবং 'বুদ্ধ' শব্দের মৌলিক অর্থের একাত্মতা দেখিয়া Weber অনুমান করিয়াছেন যে পিথাগোরাস্ এবং বুদ্ধ একই ব্যক্তি। এই অনুমান ঐতিহাসিক তথ্যে প্রতিষ্ঠিত কি গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত, তাহা এখানে বিচার্য্য নয়। অনুধাবন করিয়া দেখিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয় এই ভাবসাম্যের ভার-প্রাচুর্য্যে—তুলনামূলক আলোচনার উৎকর্ষব্যঞ্জক ইহা একটি পরম নিদর্শন। দ্বিতীয়তঃ উল্লেখ করি, ১৩২৪, মাঘ

(বা জানুয়ারী ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের) সংখ্যায় উৎকট-প্রায় প্রবন্ধ—"তর্কপ্যালেসের দুর্ভেদ্য পিরিমেকটের মধ্য দিয়া কানজ-বেদান্তে প্রবেশ"। প্রবন্ধ-রচয়িতার একটি উক্তি প্রামাণ্য এবং আমার অত্যন্ত মনোমত ছিল বলিয়াই এখনও স্মৃতিপথারূঢ় আছে—"কান্ট আমাদের দেশের আচার্য্যদিগের ন্যায় সত্যৈক-লক্ষ্য তদ্গতচিত্ত সাধু মহাত্মা ছিলেন—dialectic-বাজদিগের ন্যায় লুকোচুরি খেলিতে জানিতেন না মূলেই।" যখন "সাংখ্যবেদান্ত" ঐন্দ্রিক ও বিশেষজ্ঞানৈকান্ত দর্শনে এম্-এর বিষয়রূপে অধ্যয়ন করি, তখন এই প্রবন্ধটি আমার অতি মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী হয়। পাঁচ বৎসর পরে যখন "বিশ্বভারতী"তে দর্শনাধ্যাপনার কাজে তিন বৎসর ব্রতী ছিলাম, সেই অবসরে একদিন মনস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ পাই। আমার এম্-এ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সময়ে তাঁহার এই তুলনামূলক আলোচনা যে আমার যথেষ্ট আনুকূল্যসাধন করিয়াছিল তাহা জানিয়া এমন তৃপ্তিব্যঞ্জক, বালসুলভ প্রাণখোলা উচ্ছ্বসিত হাসি হাসিলেন যে তাহার স্মৃতি এখনও ম্লান হইয়া যায় নাই। এইরকম জ্ঞানতপস্বীর পাণ্ডিত্যানুযায়ী স্বভাবসিদ্ধ সারল্য লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় শ্রৌতবিধান রচিত হয়—"ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া বালসুলভ সারল্যে অবস্থান করিবেন" ("তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ")।

এই সময় বা ইহার অব্যবহিত পরেই, তৃতীয় দশকের প্রথম হইতেই তুলনামূলক দর্শনালোচনার সম্প্রসারিত ধারা প্রবাহিত হইল। ইংরাজীতে এবং প্রতীচ্যদর্শনের আঙ্গিক অবলম্বনে "ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস" (History of Indian Philosophy, Vol. I) প্রথম খণ্ড রচনা করিলেন মনস্বী দর্শনাধ্যাপক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তাঁহার পঞ্চম খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থখানি এবং অপরাপর ইংরাজী ও বাংলাতে প্রকাশিত দার্শনিক গ্রন্থনিচয় এক যুগসন্ধির সূচনা করিল। তন্মধ্যে অগ্রগণ্য ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় দর্শন ও তদনুবর্ত্তী হিন্দুজীবনদর্শন (Hindu View of Life) এবং অনতিবিলম্বে প্রদত্ত "হিবার্ট" বক্তৃতা (Hibbert Lectures) সংক্রান্ত আধ্যাত্মিক (ভাবে প্রভাবিত) জীবনদর্শন (The Idealist View of Life) গ্রন্থত্রয়। ক্রতপারম্পর্য্যগতিতে এই তিনখানি অতুলনীয় ভাবভাষাসমৃদ্ধ গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারাকে, আধুনিক প্রতীচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আঙ্গিকে, আন্তর্জাগতিক দার্শনিক চিন্তাক্ষেত্রে, যে সম্মানিত আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবেন। অবশ্য ইতিপূর্ব্বে ১৯১৮ সনে "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন" (The Philosophy of Rabindra Nath Tagore) এবং "সাম্প্রতিক দর্শনে ধর্ম্মের আধিপত্য" ("Reign of Religion in Contemporary Philosophy") এই দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি এবং ১৯৩০ হইতে ১৯৬০ পর্য্যন্ত তদীয় লিখিত গ্রন্থ বা গ্রন্থাকারে সংগৃহীত বক্তৃতামালা তাঁহাকে আধুনিক চিন্তাজগতে যুগপ্রবর্ত্তকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ করিয়াছে তাঁহার এই কিঞ্চিদূন অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী প্রকাশিত গ্রন্থরাজির ও চিন্তাধারার যথাযথ মূল্যায়ন এই প্রবন্ধের অধিকার-বহির্ভূত। এই আলোচ্য পর্ব্বের শীর্ষভূত, একচ্ছত্র অধিনায়কের পদ যে একমাত্র ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনেরই প্রাপ্য, এই অকুণ্ঠ সর্ব্বানুমোদিত স্বীকৃতিই আমাদের এই আলোচনার প্রধান উপজীব্য।

সমান্তরাল রেখার মতোই উপচিত হইয়াছে শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শনের মূলতত্ত্ব, তাঁহার ভাগবতজীবনের শেষ ত্রিশ বৎসরে। তাঁহার "Essays on the Gita" বা গীতা নিবন্ধের যুগ হইতে এই "দিব্যজীবন"("Life Divine")-এর যুগ পর্য্যন্ত একটি চলমান ধারা আছে। তাঁহারই কথায় বলা যায়, জীবনকে "সুপ্রামেন্টাল্ (Supra-mental) বা অতি-মানস স্তরে তোলাই হচ্চে আমার মিশন (mission)।" এই ব্রতচর্য্যায় নিবেদিত জীবনে "পূর্ণযোগ" সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়া যে "আরোহণ-অবরোহণ" কোটিদ্বয়সঞ্চারী "দিব্যজীবনে"র অভিব্যক্তি রূপায়িত করিয়াছেন তাঁহার শেষজীবনের গ্রন্থনিচয়ে, তাহার যথাযোগ্য সমালোচনা করা বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা। হয়ত পণ্ডিচেরী আশ্রমের "পূর্ণযোগ" সাধক কোনও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, "দিব্যজীবন"-প্রভাবিত লেখক এই অভাব পূর্ণ করিবেন।

এই পরিকল্পনার সর্ব্বশেষের স্থান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনদর্শন-আলোচনা—মুখ্যতঃ তাঁহার "The

Philosophy of our People" (1925) বা "আমাদের জাতীয় দর্শন", "The Religion of Man" (Hibbert Lectures, 1930) এবং "মানুষের ধর্ম্ম" (কমলা লেকচার, ১৯৩৩) অবলম্বনে। "আমাদের জাতীয় দর্শন" বক্তৃতাটি ১৯২৫ সনে ডিসেম্বর মাসের ১৯শে তারিখ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধুনালুপ্ত "সিনেট হলে" নিখিল ভারতীয় দার্শনিক সম্মেলনের প্রাথমিক অধিবেশনে প্রদত্ত হয়। তাঁহার জীবনদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইতিপূর্ব্বে "সবুজ পত্র" পত্রিকায় [,১৩২৪, আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় (১৯১৭, অক্টোবর)] "আমার ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে দিয়াছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহারই ভাষায় বলি, "ধর্ম্মবোধের এই যাত্রা—এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত··· আমার রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্ম্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্ম্মবোধ, যে-প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আরেকদিকে অদ্বৈত ; একদিকে বিচ্ছেদ, আরেকদিকে মিলন ; একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি ও সৌন্দর্য্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গিয়েছে। যা' বিশ্বকে স্বীকার ক'রেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে ; যা' যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও একেকে পূজা করে। আমার ধর্ম্ম যে-আগমনীর গান গায়—

'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক জয়······'

এই আগমনীর গান সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল কবিগুরুর আগামী জীবনে নানা ভাবে—গানে, কবিতায়, প্রবন্ধ-রচনায়, পূর্ব্বপরিকল্পিত বক্তৃতায়। 'দুয়ার ভেঙে'ই যেন নব আলোকের ঝরণাধারা, বহন করিয়া আনিল মুক্তির বার্ত্তা, উত্তীর্ণ করিল তাহাকে বিশ্ববোধের মুক্ত-অঙ্গনে। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই আলোকের একটি রেখা-সম্পাত (১৯২৫-এর দার্শনিক মহাসম্মেলনের প্রাথমিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে) "আমাদের জাতীয় (জীবন) দর্শনে"র মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। ইংরাজীতে লেখা কবিগুরুর অভিভাষণের সুর ও ভাব বাংলা অনুবাদে সংরক্ষিত করা যায় না জানি, তথাপি এখানে প্রয়োজনবশে করিতে হইল। "তত্ত্ববিদ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মুক্তির তত্ত্ব ভারতবর্ষে আমাদের জীবন প্রভাবিত করেছে, আমাদের হৃদয়াবেগের উৎসসমূহ গভীরভাবে স্পর্শ করেছে এবং নানাভাবে আমাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি কবিতার পক্ষ বিস্তার ক'রে যেন স্বর্লোকের উদ্দেশে উত্থিত হয়।"

আমাদের দেশে বিভিন্ন দর্শন ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ে মুক্তিকে নঞর্থক, কামনাবিহীন, অভাবাত্মক অবস্থারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথায় "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়"। "কারণ বিশ্বই হচ্চে সৃষ্টিকর্ত্তার আনন্দরূপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি, আনন্দকে দেখচিনে—সেইজন্য রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করচে—আনন্দকে যেমনি দেখব, অমনি কেউ আর আমাদের কোন বাধা দিতে পারবে না। সেই ত মুক্তি। সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয়, প্রকাশের মুক্তি। তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মুক্তি কোনখানে ?—প্রেমে। যখনই জানব প্রয়োজনই মানব-সমাজের মূলগত নয়—প্রেমেই এর নিগূঢ় এবং চরম আশ্রয়—তখনই এক মুহূর্ত্তে আমরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যাব। কিন্তু এও চরম সত্য নয়।"

"যদি বলি মানুষ মুক্তি চায় তবে মিথ্যা বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশী চায়—মানুষ অধীন হতেই চায়। যার অধীন হলে অধীনতার অন্ত থাকে না তারই অধীন হবার জন্য সে কাঁদছে। সে বলছে, 'হে পরম প্রেম, তুমি যে আমার অধীন, আমি কবে তোমার অধীন হব ? অধীনতার সঙ্গে অধীনতার পূর্ণ মিলন হবে কবে ? যেখানে আমি উদ্ধত, গর্ব্বিত, স্বতন্ত্র সেইখানেই আমি পীড়িত, আমি ব্যর্থ। হে নাথ, আমাকে অধীন ক'রে, নত ক'রে, আমাকে বাঁচাও'।"

ইহাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, ভারতীয় ধর্ম্মসাধনায় এই অসাম্প্রদায়িক মুক্তির বাণী এদেশের লোকচিত্ত-ক্ষেত্রে কী ভাব-গৌরবে ও ভাষার লালিত্যে আজও সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই সব সহজধারার মরমী সাধক ও কবি একেবারেই পণ্ডিতসমাজে অপাংক্তেয়। এই রকম একটি বাউল কবির "মুক্তি"-বাদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্বৎসমাজে,

একাধিকবার সাগ্রহসমর্থনকল্পে উল্লেখ করিয়া, তথাকথিত অনগ্রসর চিন্তা ও সাধনার ধারাকে যে বিদ্বৎসমাজে এক সম্মানিত আসন কবিগুরু দিয়া গিয়াছেন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, তিনি প্রথমতঃ ভারতীয় দার্শনিক সম্মেলনের অভিভাষণের উপসংহার করেন যে বাউলের অপূর্ব্ব একটি গানে, তাহারই ইংরেজী অনুবাদে উপসংহার করেন "মানুষের ধর্ম্মে" (হিবার্ট লেকৃচার)-এর "আধ্যাত্মিক মুক্তি" শীর্ষক ত্রয়োদশ-অধ্যায়-সন্নিবিষ্ট বক্তৃতাটিতে। সেটি ছিল মূলতঃ এই :

"হৃদয় কমল উঠ্‌তেছে ফুটি কত যুগ ধরি,
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কি করি ?
ফুটে ফুটে কমল ফুটার না হয় শেষ,
এই কমলের যে এক মধু, রস যে তায় বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর, পারো না যে তাই,
তাইতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই।"

যেমন মুক্তিতত্ত্বে তেমনি সৃষ্টিতত্ত্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সমপর্য্যায়ে উপলব্ধি করা যায়। প্রসঙ্গতঃ, প্রথমেই মানুষের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশকল্পে বলিয়াছেন যে, মানুষ বিশ্বভূমীন ও সনাতন। কারণ এই যে মানুষ, তার জন্মভূমি ত্রিতয়াত্মক—একযোগে ও একাধারে—পৃথিবীলোক, স্মৃতিলোক ও আত্মিকলোক। তাঁহার কথাতেই স্পষ্ট সমর্থন আছে যে, "হিবার্ট লেকৃচারে" বা "মানুষের ধর্ম্ম" (কমলা লেকৃচার) বক্তৃতায় এই মানবসত্য, "এই সর্ব্বমানুষের জীবন-দেবতার কথা বল্‌তে" চাহিয়াছেন। বাউল ইহাকেই বলিয়াছে "মনের মানুষ।" "সহজধারা"র সাধনায় বাউলসম্প্রদায় ত যুগে যুগেই গাহিয়াছে—

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে ?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর মিলিয়াছিল—"মনের মধ্যে মনের মানুষ কর অন্বেষণ।"

তবেই দেখা যায়, মানুষের স্বভাবে দুই রূপ বা দ্বৈপায়নবৃত্তি—এক কোটিতে তার জীবভাব, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ; অপর কোটিতে তার সর্ব্বগত বিশ্বভাব। জীবভাবে, তার সম্বল, তথ্য ; বিশ্বভাবে, তার অধিকার বা ঐশ্বর্য্য, সত্য। এই তথ্য ও সত্য, সীমা ও অসীম মিলাইয়াই মানুষ সত্য ও সম্পূর্ণ। এই যে সত্যদৃষ্টি কোন দার্শনিক মতবাদের শেষ উত্তর বা উপসংহার হিসাবে তিনি পান নাই—পাইয়াছিলেন তাঁহার উপলব্ধিতে—

"আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য—ভালবাসার অমৃত" (পত্রপুট—১৫)।

তাই ত সম্ভব হইয়াছিল সকল সুর-বৈভব ও ভাবগাম্ভীর্য্য-সমৃদ্ধ গীতনৈবেদ্যে, সৃষ্টির প্রথম রহস্যকে "প্রতিসৃষ্টি"র দীপালোকে উজ্জ্বলিত, উচ্ছ্বসিত করিয়া তোলা—

"হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ?"

এই যে তিনি আমার মাঝারে নিজেকে দান করিয়া মধুর রসে আপনাকে দেখিতেছেন—এ রহস্যের মূল রহিয়াছে এই উপলব্ধিতে যে, তিনি রসস্বরূপ, তিনি আনন্দরূপে, অমৃতময়রূপে যাহা কিছু দেখিতেছি তাহার মধ্যে প্রকাশিত। কারণ যেখানেই রস সেখানেই দ্বৈত বা বহুত্বের উদ্ভব। আর যেখানেই রসোপলব্ধি সেখানেই চিত্তের উপস্থিতি অনুমিত এবং রসসঞ্চালন দ্বারা জীবসত্তা সূচিত হয় (যত্ররসস্তত্রচিত্তমনুমীয়তে। রসসঞ্চালনাদিনা জীবসত্তাবঃ সূচ্যতে)। সৃষ্টির অর্থ ই হইতেছে চিত্তের সৃষ্টি, হৃদয়মনের সৃষ্টি—সেটা কালের সৃষ্টি নয়। তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞান বিচার-বিশ্লেষণের প্রণালীতে অণুপরমাণুর ভিতর দিয়া এমন এক রেখাকারমাত্রিক (metrical world) জগতে পৌঁছিয়াছে

যে সেখানে সৃষ্টির আভাস মাত্র পাই না। ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এডিংটনের প্রামাণ্য গ্রন্থ (গিফোর্ড লেক্‌চার পর্য্যায়ের) —"দৃশ্যমান পার্থিব জগতের স্বরূপ" ("The Nature of the Physical World")। কবির দৃষ্টিতে "আমার জগৎ" একাধারে সত্য, সম্পূর্ণ ও সুন্দর রূপে "সৃষ্টি" কথাটি সার্থক করে। রবীন্দ্রনাথের মতে "সৃষ্টি হয় এই বোধে যে জগৎটা আমার—আমার জ্ঞানের, আমার হৃদয়াবেগের, আমার আনন্দ বা সৌন্দর্য্যানুভূতির যোগেই সৃষ্টি হয়—ওটা রেডিয়ো চাঞ্চল্যমাত্র নয়।" ঈথর পদার্থের কম্পনেই আলোকের সৃষ্টি হয় না, আলোকের উদ্ভব আলোকের অনুভবে। আমি যে মুহূর্ত্তে দেখিতেছি, সেই মুহূর্ত্তে সেই দেখার যোগে সৃষ্টি হইতেছে—

"আমারই-চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ
চুনি উঠ্‌ল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠ্‌ল আলো
পূবে পশ্চিমে।"…

এই "আমি"র কাব্যভাষ্যে কবি বলিয়াছেন—

"এ আমার অহংকার
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকারপটেই
বিশ্বকর্ম্মার বিশ্বশিল্প।"

এখানে অবশ্য নানাবিধ বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক উঠিতে পারে। কেহ দেখিবেন ইহার মধ্যে ভারতীয় দর্শনের "দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ" অথবা "সৃষ্টিদৃষ্টিবাদের" ছায়াপাত, কেহ বা আবিষ্কার করিবেন দেবতাতে অবিমিশ্র মানবিকতার আরোপ কিংবা অপরিমার্জ্জিত অহঙ্কারকে দেবতার আসনে উত্তীর্ণ করিবার ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র। কেহ বা বলিবেন যে, ইহা ত একেবারেই কাণ্ট্‌ ও হেগেলের সার-সংমিশ্রিত রসায়ন। সবই মানিয়া লওয়া গেল—কিন্তু ততঃ কিম্‌?

তাই সর্ব্বশেষ কথায় এবার আসা যাক। তাঁহারই অতুলনীয় ব্যাখ্যানের ভাষায়—"অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন, সেইটে হ'ল মনের দিক্‌। সেই দিকেই দেশকাল, সেই দিকেই রূপরসগন্ধ, সেই দিকেই তাঁর প্রকাশ। অসীমের বাণী অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্ছে অহমস্মি। 'আমি আছি' এইটিই হচ্ছে সৃষ্টির ভাষা। এই এক 'আমি আছি'ই লক্ষ লক্ষ 'আমি আছি'তে ছড়িয়ে পড়েছেন—তবু তাঁর সীমা নেই। যদিচ আমার 'আমি আছি' সেই মহা 'আমি আছি'রই প্রকাশ কিন্তু তাই ব'লে একথাও বলা চলে না যে, এই প্রকাশে তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত।" তাই "আমার জগৎ" সম্পর্কে এই শেষ তত্ত্ব ও সত্য জানিয়াছেন ও জানাইয়া গিয়াছেন যে, "এই জগতের জলস্থল আকাশ আমার হৃদয়ের তন্ত দিয়ে বোনা, নইলে আমার ভাষার সঙ্গে এর ভাষার কোন যোগই থাকত না; গান মিথ্যা হ'ত, কবিত্ব মিথ্যা হ'ত, বিশ্বও যেমন বোবা হয়ে থাকৃত, আমার হৃদয়কেও তেমনি বোবা ক'রে রাখত।… আমি ধন্য যে, আমি পান্থশালায় বাস কর্‌চি নে, রাজপ্রাসাদের এক কামরাতেও আমার বাস নির্দ্দিষ্ট হয় নি; এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি; সেই জন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টিভূতের আড্ডা নয়; এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, আমার প্রেমের মিলন-তীর্থ।"

এ তত্ত্বও চরম তত্ত্ব নহে—সকল বোঝাপড়া, জানাশোনার পারে যে অজানার অনিশ্চয়তা তাহাতেই বোধহয় সকল আকুতির সমাপ্তি ও পরিতৃপ্তি। মহাপ্রয়াণের প্রায় ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে (২৩শে জুন, ১৯৪১ তারিখে বিশু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত এবং প্রবাসীতে ১৩৪৮, কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত) একটি পত্রে তদানীন্তন মনের ভাব যথাযথ প্রকাশ করিয়া কবিগুরু লিখিয়াছিলেন—

"আমার মনে পড়ে বেদের সেই বাণী 'কো বেদঃ' অর্থাৎ কে জানে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি

জানেন, কিংবা জানেন না। এমন সন্দেহের বাণী বোধহয় আর কোনো শাস্ত্রে প্রকাশ হয় নি যে, যাঁর সৃষ্টি তিনি আপন সৃষ্টিকে জানেন না। সৃষ্টি তাঁকে বহন ক'রে নিয়ে চলে। আসল কথা, চরম প্রশ্নের কোন উত্তর নেই।"

বলা বাহুল্য, "ঋগ্বেদসংহিতা"র শেষ পর্য্যায়ে, "দশম মণ্ডল"স্থ সেই জানা-অজানার দোলায় সমর্পিত চরম তত্ত্ব কবির এই পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—

"কো অদ্ধা বেদ কইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুতইয়ং বিসৃষ্টিঃ
অর্বাগ দেবা অস্ত বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভুব।"

তাই বুদ্ধদেবের মতই বলিলেন, আমি "চরমের কথা" বলিতে আসি নাই, আমি "পথের কথা"ই বলিব। তাহাতেই কবিগুরুর জীবন-দর্শন লাভ করিল তাহার চরম ও পরম সার্থকতা। "প্রথম দিনের সূর্য্য" যেভাবে অভিনন্দিত হইয়াছিল ধীরোদাত্ত সঙ্গীতে তাহারই অনুরণন চলিল শেষ পর্য্যন্ত একই সুরে—

"প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি?
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চ'লে গেল
দিবসের শেষ সূর্য্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি?
পেল না উত্তর॥"

এই "পশ্চিম সাগরতীরে"র মধ্যে যে দ্যোতনা রহিয়াছে তাহার উপর আর এক শতাব্দীর সূর্য্য কি আলোকপাত করিবে?

—০—

নারীরক্ষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, যে, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করা এবং তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিবার জন্ত শিক্ষা দেওয়া আমাদের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। নারীর সম্মান রক্ষার জন্ত আত্মোৎসর্গের ও আত্মবলিদানের কাহিনীসমূহ হিন্দু কিম্বদন্তী ও ইতিহাসের অমূল্য রত্ন; এ সকল কাহিনী অগণিত পুরুষ-পরম্পরায় ভারতীয়দিগকে মহত্তের মত বাঁচিতে ও মরিতে প্রেরণা দিবে; যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি চাও, বিদেশীর প্রভুত্ব হইতে মুক্তি চাও, না, বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনার শৌর্য্যে ভারতনারীর সম্মান, দেহ ও প্রাণের নিরাপদ্ অবস্থা চাও? তাহা হইলে আমি বলিব, উভয়ই চাই। কিন্তু আমাকে যদি দুটির মধ্যে কেবলমাত্র একটি বাছিয়া লইতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে আমি নারীর নির্ভয় নিরাপদ্ অবস্থাই নির্ব্বাচন করিব। এই যে দুটি আনুমানিক নির্ব্বাচ্য অবস্থা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম, তাহা ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলের অবস্থার সহিত অপরিচিত লোকদের নিকট অদ্ভুত মনে হইতে পারে। কিন্তু অনেক সময় আমার এইরূপ মনে হইয়াছে, যে, রাজনৈতিক ভাবনায় ভাবুক কতকগুলি ভারতীয় ব্যক্তির মনের গতি এরূপ, যে, তাঁহাদিগকে দেশের উক্ত অবস্থার মধ্যে একটি মাত্র বাছিয়া লইতে বলিলে তাঁহাদের নির্ব্বাচন আমার বিপরীত হইবে।

আমি জানি, দেশের স্বাধীনতার উপরেও নারীরক্ষার সামর্থ্য নির্ভর করে;

বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৩৩।

বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি ধারা

শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙলা দেশ যখন ঘোর অশিক্ষা ও অন্ধ কুসংস্কারের গভীর তিমিরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, তখন থেকেই ইংরেজ বণিকসম্প্রদায়ের মাধ্যমে ইংরেজ রাজশক্তি এদেশে কায়েমী বন্দোবস্ত সৃজন ক'রে তুলেছিল। ইংরেজ বণিকেরা তাদের সঙ্গে এনেছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। ইংরেজ জাতির ইতিহাস ও ইংরেজী সাহিত্যের প্রাণপ্রাচুর্য্য বাঙলা দেশের হিন্দু যুবসম্প্রদায়কে নিতান্তই অভিভূত ক'রে ফেলেছিল। ইংরেজের আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা সব-কিছুরই কদর তখন এত বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, বাঙ্গালী ছেলেরা বিনা দ্বিধায় সে-সকলের অনুকরণে মত্ত হয়ে পড়েছিল। দেশীয় ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা, দেশীয় সংস্কৃতির উপরে অবজ্ঞা তখন চরম সীমায় উঠেছিল। দলে দলে লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিল। সেই ঘোর সঙ্কটের দিনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তাঁর নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় ওজস্বিনী ভাষায় দেশের পুরাতন ঐতিহ্যের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বেদ, উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌-পৌরাণিক যুগের ধর্ম্ম-সংস্কৃতির ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার তিনি নূতন ক'রে তুলে ধ'রে এক নূতন রেনেসাঁসের অবতারণা ক'রে গেছেন। সেই আবহাওয়ার সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের হয়েছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের বাঙ্গলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, এবং সে ভাষাই ব্যবহার হ'ত সকল কাজেই। বাঙ্গলা ভাষাকে তাঁরা অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখে দেন নি। কিন্তু তাঁরা ইংরেজী সাহিত্যকেও আদর করতে জানতেন। তাঁদের বাড়ীর আবহাওয়া শেক্‌স্‌পীয়ারের নাট্যরস সম্ভোগে আন্দোলিত এবং স্যার ওয়াল্‌টার স্কটের প্রভাবও সেখানে ছিল প্রবল। সে সময়ে দেশপ্রীতির উন্মাদনা দেশে প্রকট হয় নি। কেবলমাত্র রঙ্গলালের "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" এবং কিছু পরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তির কামনার সুর ভোরের পাখীর কাকলির মত সবে শোনা যাচ্ছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকেরা তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে 'হিন্দুমেলা'র আয়োজনে উঠে-প'ড়ে লেগে গিয়েছিলেন। এঁদের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। পুণ্যশ্লোক রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ভারত-উদ্ধারের মহাযজ্ঞের হোতা ও নির্ভীক পুরোহিত। সেই সময় থেকেই বঙ্গ-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যবহুল বিবিধ বিন্যাসগুলি দেশ-বাসীদের সামনে পরিবেশন ক'রে বহু গুণী, জ্ঞানী লোক সকল বাঙ্গালী জাতির পুনর্জ্জাগরণের প্রয়াস ক'রে আসছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে সম্বন্ধে দ্বিমত হতেই পারে না। তাঁরা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

কিন্তু বঙ্গ-সংস্কৃতির পুনঃপ্রচার কার্য্যের মধ্যে বিপদের সম্ভাবনাও যে সঙ্গোপনে নিহিত আছে, সে কথাও আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার ব'লে মনে করি। আমাদের নিত্য-নিয়ত অবহিত থাকতে হবে যে পুরাতনের পুনরুজ্জীবন করলেই জাতির পুনর্জ্জাগরণ হয় না। জাতিগত সংস্কারের ভালও আছে, মন্দও আছে। নীরটুকু বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু গ্রহণের যে উপদেশ আছে, জাতীয় জীবনের সংস্কৃতির রস উপভোগ ব্যাপারেও সে উপদেশ প্রযোজ্য। প্রাচীন প্রথা ও রীতি-নীতির পুনঃপ্রচলন করাটাই জাতির প্রগতির পরিচায়ক ব'লে ধ'রে নিলে ভুল করা হবে। কেননা আমাদের পুরাতন সংস্কার ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে বহু শতাব্দীর মূঢ় কুসংস্কার এবং বহু যুগের অন্ধবিশ্বাস প্রবেশ ক'রে গিয়েছিল। পুরাতনের পুনঃপ্রচলন ব'লে সেই-সকল কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে যদি বিচারবুদ্ধি দিয়ে ছেঁটে না ফেলি তবে জাতিকে মরণের মুখেই এগিয়ে দেওয়া হবে। সংস্কারের মধ্যে যেটা খেলো, ভিত্তিহীন ও অসত্য সেটাকে বর্জ্জন ক'রে, যে-সকল সংস্কার জাতির সত্যকার জীবনের পরিচায়ক সে-সকলের উদ্ধার করতে পারলেই জাতীয় সংস্কৃতির ঐশ্বর্য্যকে ফিরে পাওয়া যাবে।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ঝড়ের মাঝে

শ্রীনন্দলাল বসু

(প্রবাসী— বৈশাখ, ১৩৪৮ হইতে পুনর্মুদ্রিত)
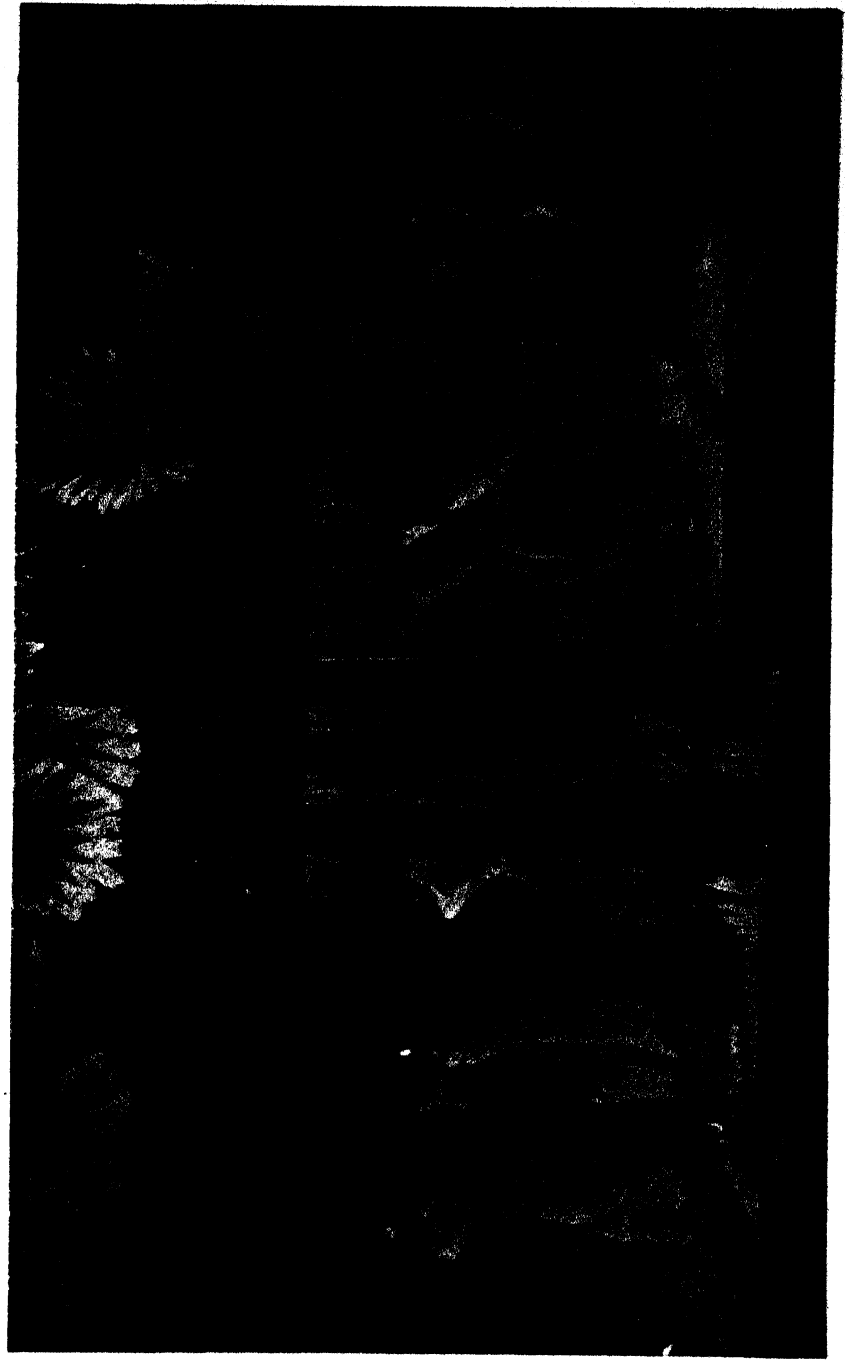
কথায় বলে শুনেছি যে, বাঙ্গলার সংস্কৃতি খুঁজতে হবে গ্রামে, শহরে নয়; কেননা গ্রামেই বাঙ্গলার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা সম্ভব ও সহজ। একথা খুব ঠিক এবং মানি। কিন্তু একথাও আমাদের সততই মনে রাখতে হবে যে, গ্রাম্যতাই বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির নামান্তর মাত্র নয়; আমরা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে নিশ্চয়ই প্রয়াসী হব, কিন্তু তাই ব'লে গ্রাম্যতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজি হতে পারব না। আমাদের যে অনাদি অতীত অনন্তকাল ধ'রে চেয়ে ব'সে আছে, সেই অতীতের দিকে নিশ্চয়ই আমরা চোখ ফেরাব এবং তাকে কথা বলিয়ে আমাদের সত্যিকারের ঐতিহ্যগুলির সন্ধান বের ক'রে চিনে নেব। আমাদের জাতীয় জীবনের সেই সকল অনাদি অতীত সংস্কৃতি-সমৃদ্ধি আমরা পুনরুদ্ধার ক'রে আমাদের অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় স্বরূপ কাজে লাগাব—এই কথাটাই আমাদের অতি অবশ্য মনে রাখতে হবে।

বাঙ্গলার সংস্কৃতি আবহমান কাল থেকেই চ'লে আসছে বহুমুখী ধারায় কাব্যে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে, নৃত্যে, চিত্রে ও আলপনায়, দোল-দুর্গোৎসবের ঠাকুর দালানে, চণ্ডীমণ্ডপে ও হরিসভায়, কীর্ত্তন ও কথকতার আসরে, কবির লড়াইয়ে ও ব্রতপালনের মেয়েলি ছড়ায়, খেলার মাঠের ক্রীড়াকৌতুকে এবং বার মাসের তের পার্ব্বণে, গাজনতলায় ও মেলা-প্রাঙ্গণে। বিষয়টির ব্যাপকতা ও পরিধি এতই বিস্তৃত যে, এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে এর যে কোন একটি ধারার কথা খুঁটিয়ে লেখা সম্ভব নয়। অতএব বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি বিশেষ ধারার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করব এই প্রবন্ধে।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই বাঙ্গলা দেশের নানা জায়গায় মেলা বসে। ঘুরে ফিরে শান্তিনিকেতনে আসবার তিন মাসের মধ্যে এই বীরভূম জেলাতেই চার-চারটে মেলা দেখলাম;—শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা, অজয়নদ-তীরস্থিত জয়দেব কবির বাসস্থান কেন্দুলীর মেলা, শ্রীনিকেতনের মাঘমেলা এবং ফাল্গুন মাসে সিউড়ীর বড়বাগানের মেলা। শুনেছি কবি চণ্ডীদাসের বাসস্থান নান্নুরেও বেশ ঘটা ক'রে মেলা হয়। এই সময় মেলাগুলিতে বিস্তর জন-সমাগম হয়, কেনাবেচা হয় প্রচুর এবং খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে বিস্তর। যাত্রা, বাউলের গান, কীর্ত্তন, কথকতা ও কবির লড়াই, দেশী ম্যাজিক, নাগর-দোলা এবং জনসাধারণের মনোরঞ্জনের আরো কত কি আয়োজন করা হয়। বৎসরান্তে দূর দূর গ্রাম থেকে লোকেরা এসে সম্বৎসরের কাপড়, চাদর, জুতা, লণ্ঠন, হাঁড়িকুঁড়ি, শাবল, খন্তা, কোদাল ও নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনে নিয়ে যায়। এই সব সওদা করা ছাড়াও তারা মেলাতে পায় আনন্দ। এই সব মেলায় ছোট বড় নেই—স্ত্রী-পুরুষ সবাইয়ের সমান প্রবেশাধিকার। মেলার নানা উদ্দেশ্যের মধ্যে বড় একটি উদ্দেশ্য হ'ল গ্রামবাসীদের একঘেয়ে নিরানন্দ জীবনে একটুখানি আনন্দ এনে দেওয়া এবং সেই আনন্দের ভিতর দিয়ে তাদের সামনে দেশের প্রগতির নিদর্শনগুলি তুলে ধ'রে তাদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তার করা। বৈষ্ণব-পদাবলী-কীর্ত্তনের মোহন সুরে ভগবৎপ্রেমের ভক্তি-প্রস্রবণে তাদের হৃদয়-মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। বাউল গানে তারা সাড়া পায় প্রাণের মানুষের। দেশের এই সব প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে অনেক ভেজাল, অনেক কলুষ প্রবেশ করেছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই; কিন্তু সে-সব ভেজালগুলিকে ছেঁটে ফেলে পুরাতন ভাল জিনিষগুলিকে এবং আধুনিক কালের উৎকৃষ্ট ভাবধারাকে জুড়ে দিতে পারলে আমাদের জাতীয় জীবনের যে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হবে তাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার সংস্কৃতির বহুল প্রচার হয় এই-সব মেলার মাধ্যমে।

মেলাতে বাউল গানের কথা আগেই বলেছি। কেন্দুলীর মেলায় বাউল-সমাবেশ সুপ্রসিদ্ধ। বাউল গান বাঙ্গলা দেশের নিতান্তই নিজস্ব সম্পদ্। বাউলেরা বাড়ী বাড়ী গান ক'রে ঘুরে বেড়িয়ে নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জন করেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তা ছাড়াও তাঁরা বড় কাজ ক'রে থাকেন। তাঁরা দেশাচরিত ধর্ম্মের ধার ধারেন না। তাঁরা সহজিয়া উপাসক। তাঁদের গান আমাদের দেশের একটি বিশিষ্ট সাধনার ধারাকে উচ্ছ্বসিত ক'রে রেখেছে। বাউল গানের মধ্যে দেহতত্ত্ব প্রভৃতি নানা ভাবধারা দেখতে পাওয়া যায়। মানবদেহস্থিত পরমাত্মাকে বাউলেরা "মনের মানুষ" ব'লে অভিহিত করেছেন। একমনে তার একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজিয়ে বাউল

সেই মনের মানুষটিকে খুঁজে বেড়িয়েছেন সারা দেশময়। বাঙলা দেশের সুবিখ্যাত বাউল লালন ফকির গান ক'রে বলেছেন—

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।"

এই অজানার আকুল অন্বেষণ, এটি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ অবদান। এই ভাবটি দেখতে পাই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ রচিত বাউল গানে—

"তোরা যে যা বলিস্ ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপল-চরণ সোনার হরিণ চাই।
সে যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাঁধা।
তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে, লাগায় চোখে ধাঁধা।
তবু ছুটব পিছে মিছে-মিছে পাই বা নাহি পাই—
আমি আপন মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই।"

ভালবাসার ধনকে খুঁজে পেয়েও হারিয়ে ফেলার মর্ম্মন্তুদ বেদনাকে অনির্ব্বচনীয় সুরে রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন গানে—

"তোমায় নতুন ক'রেই পাব ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণ,
ও মোর ভালবাসার ধন।
দেখা দেবে ব'লে তুমি হও যে অদর্শন,
ও মোর ভালবাসার ধন।"

তার পর একদিন মানুষের সংজ্ঞা আসে যে কোথায় বাইরে তাঁকে খুঁজে মরছি—তিনি ত রয়েছেন আমার অন্তরের মাঝখানেই। তখনি মানুষ সেই উপলব্ধির কথা প্রকাশ করে গানে—

"আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।
সে আছে ব'লে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে।
সে আছে ব'লে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়।
সে সঙ্গে থাকে ব'লে,
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দখিন-সমীরণে।"

বাইরে খুঁজে বেড়াবার পালা সাঙ্গ ক'রে ভক্ত যখন ভগবান্‌কে হৃদয়ের অন্তঃপুরেই দেখতে পায় তখন তার কাছে বিশ্বজগৎ এক নূতন বেশে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে এবং তখনই ভক্ত সকল দৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করে। এই ভাবটিকে অতি চমৎকার ক'রে বাউলের সুরে গুরুদেব ফুটিয়ে তুলেছেন—

"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকলখানে।
আছে সে নয়নতারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যে-দিক্ পানে।"

মানুষ যখন নিজের বুকের মধ্যে প্রিয়তমের সন্ধান পায় তখনই সে আপন অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তোলে ডেকে ডেকে গান গেয়ে গেয়ে—

"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন 'পরে,
প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো।"

দেবতাকে সে প্রশ্ন করে—

"হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহপ্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান?"

সে শুধায়—হে প্রিয়, তুমি ত আমার নয়ন দিয়ে তোমারই রচিত বিশ্বছবি দে'খে নিলে এবং আমার শ্রবণ দিয়ে তোমারই অমৃতসঙ্গীত শুনে নিলে—তোমার সাধ কি মিটল?

করজোড়ে সে নিবেদন করে—

"এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর,
পুণ্য হোলো অঙ্গ মম, ধন্য হোলো অন্তর।"

সে বলে—হে প্রভু, আমি ত ধন্য হলাম; কিন্তু তোমার সাধ কি মিটল আমাকে দিয়ে—

"ওগো অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম?"

এই যে ভক্ত ও ভগবানের একাত্মতা, এটি ভারতীয় নানা সাধকের বাণীতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মনে হয় এই ভাবধারাটি বিশেষ ক'রে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করেছে বাঙ্গলা দেশের বাউল গানে, বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের সুমধুর কীর্ত্তনে ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ও সাহিত্যে। আমাদের বাঙ্গলা দেশের নানা রসমধুর ভাবধারার মধ্যে এটি একটি বিশিষ্ট ধারা। একে সনাতন সত্যের অপূর্ব্ব সুন্দর বিকাশ ব'লে মনে করি। এর মধ্যে ভেজাল মাত্র নেই। বঙ্গ-সংস্কৃতির এটি একটি অমূল্য অবদান।

—o—

এখন যুবসংঘ, ছাত্রসংঘ, তরুণসংঘে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। ছাত্রশক্তি, তরুণশক্তির কথা ঘন ঘন পড়িতে ও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সব সংঘের নেতারা বালক ও যুবকদিগকে বাস্তবিকই দলবদ্ধ করিতে ও কোন ভাল কাজে লাগাইতে পারিয়াছেন কিনা জানি না। তাঁহারা স্বয়ং কোন কল্যাণ-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন কিনা তাহাও জিজ্ঞাস্য। কারণ, স্বয়ং অসিদ্ধ যিনি, তিনি অন্যের সিদ্ধিলাভের সহায় হইতে পারেন না। উত্তেজনার ও হুজুগের সৃষ্টি যে হইয়া থাকে তাহা খবরের কাগজের বড় বড় অক্ষরের হেড লাইনেই বোঝা যায়।......যে সকল ছাত্রছাত্রী ও অন্য লোকদের কৈশোর আছে, যৌবন আছে, তাঁহাদিগকে আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়, যাঁহার যেরূপ সুযোগ ও অবসর তদনুসারে গ্রামে নগরে বাসগৃহে মাঠে ঘাটে রাস্তায় আফিসে কারখানায় দেশের মূর্ত্তি দেখুন, দেশের লোককে চিনুন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে আপনার জন করুন, নিজে ভাল হইয়া তাঁহাদের হিতসাধন করুন।......

দেশসেবার নানা পথ ও উপায় আছে। আমাদের দেশ অজ্ঞের দেশ, রুগ্নের দেশ, অস্পৃশ্যের রুগ্নের দেশ, অত্যাচরিতা নারীর দেশ, দরিদ্রের দেশ।

আমাদের যাহার যেদিকে প্রবৃত্তি শক্তি সুযোগ আছে, তাঁহাকে সেই দিকে খাটিতে হইবে। কিন্তু কিছু করিতে হইবে, কেবল কথা শুনিলে ও শুনাইলে চলিবে না।

বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।

বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

পূর্বকথা

বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি জানতে হলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পদার্থবিদ্যায় মানবের জ্ঞান কোথায় এসে পৌঁছেছিল সে বিষয়ে একটা মোটামুটি হিসাব নেওয়া দরকার।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদার্থবিদ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল, আর তাতে নিউটনের বলবিদ্যা ও ম্যাক্স্ওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয়তত্ত্ব আপনাদের প্রভাব বিস্তার ক'রল। নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার রাজত্ব চলল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। যেসব প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটছে তা হচ্ছে পদার্থসমূহের মধ্যে পরস্পরের ক্রিয়ার ফলে; এই ক্রিয়া পদার্থকণিকার মধ্যে মহাকর্ষের বলে সম্পাদিত হচ্ছে, আবার কোথাও তা হচ্ছে ওই কণিকারা যে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকীয় আধান বহন করছে, তাদের জন্যে। ফ্যারাডের কল্পনা অনুসরণ ক'রে ম্যাক্স্ওয়েল বললেন যে, সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত হয়ে ঈথর ব'লে একটি মাধ্যম আছে যার মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় বল পরিচালিত হয়। বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় অবস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে ঈথরে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ উত্থিত হয়। এর একটা বড় উদাহরণ হ'ল আকাশের বিদ্যুৎ, যা চলে বিপরীত আধানে আহিত দু'খানি মেঘের মধ্যে; এই বৈদ্যুতিক ক্ষরণের সঙ্গে থাকে তড়িৎচুম্বকীয় ঊর্মিমালা, আর তা বহু রকমের হয়—দৃশ্য আলোক থেকে অদৃশ্য রেডিও-তরঙ্গ পর্যন্ত।

প্রকৃতির রাজ্যে জীব ও জড়ের মধ্যে অবস্থিত যে অগণিত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ আছে তাদের সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান বেড়ে যেতে থাকল। ডিমক্রিটসের সূত্র থেকে আরম্ভ ক'রে ডলটন ও তাঁর পরবর্তীকালীন বিজ্ঞানীদের পরীক্ষামূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সূত্রে বলা হ'ল যে প্রকৃতিতে লব্ধ প্রত্যেক যৌগিক পদার্থ কতকগুলি মৌলিক অবিনশ্বর উপযোগাঙ্গ দিয়ে গঠিত; এদের বলা হ'ল অ্যাটম; এক এক রকম অ্যাটমের ভর একেবারে সুনির্দিষ্ট। কোন পদার্থের ওজন বা ভার হ'ল তার এই ভরের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ। এই পৃথিবীতে মৌলিক অ্যাটমের সংখ্যা হ'ল 92টি। উনবিংশ শতাব্দীর একটা বড় রকমের সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, রাসায়নিক মিলন যখন ঘটে তখন সমগ্র ভর অটুট থাকে, তার কোনরকম হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

আরও দেখা গেল, মৌলিক পদার্থকে সংযুক্ত ক'রে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা যায়। ভলটীয় কোষে এইরকমটা ঘটে। এই তড়িৎপ্রবাহ তাপ সৃষ্টি করে, একটা মোটর চালাতে পারে, আবার এই মোটর একটা ওজনকে উপরে ওঠাতে পারে। এই ওজনের স্থিতীয় শক্তি গতীয় শক্তিতে পরিণত হতে থাকে, যখন এ মাটিতে নামতে থাকে। এখানে এল শক্তির নিত্যতাতত্ত্ব। এই ব্রহ্মাণ্ডে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি আছে, সেই শক্তি বিভিন্ন রূপ নিচ্ছে—গতীয়, তাপীয়, বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক,—কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে এই শক্তির পরিমাণ ধ্রুব, এ বাড়েও না, কমেও না।

উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা পরস্পর নিঃসম্পর্কীয় আর দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করল, এরা হ'ল পদার্থ ও তরঙ্গ। পদার্থ সম্বন্ধে মোটামুটি পরিষ্কার একটা ধারণা আমাদের হয়েছে। এক টুকরা পাথর আমরা কুড়িয়ে নিলুম আর বাহুর শক্তি প্রয়োগ ক'রে একটি লক্ষ্যের দিকে তাকে ছুড়লুম। বায়ুর মধ্যে ওই টুকরাটির গতিপথ আমরা দেখে যেতে পারি, ঢিলটা লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করল এও দেখতে পাই। ওই টুকরাটাকে ফিরিয়ে পেতে পারি, আর লক্ষ্যবস্তুকে যদি সজোরে আঘাত না করে তবে এও দেখি, যে, ওই ঢিলের আকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

অন্যদিকে জলের উপরে ভাসন্ত একটি গোলাকার বলকে যদি তালে তালে উপর নিচে উঠানো নামানো যায় তবে তজ্জনিত আলোড়ন সমকেন্দ্রীয় তরঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দূরে জলের উপর যদি একটা ফাতনা ভাসতে থাকে তবে দেখা যাবে, তরঙ্গ তার চলার সঙ্গে ফাতনাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না, ফাতনাটি একই জায়গায় ওঠানামা করছে। এই রকমের ঢেউ যে শক্তি বহন ক'রে নিয়ে যায় তার বড় রকমের প্রমাণ আমরা দেখি, যখন সমুদ্রতরঙ্গ কিনারার কাছে অবস্থিত একটি নৌকার গায়ে বা সেখানে দণ্ডায়মান কোন লোকের দেহে আছড়ে পড়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যে-মাধ্যম দিয়ে তরঙ্গ ধাবিত হয় সেই মাধ্যম চলে না, তবে ওই মাধ্যম হ'ল শক্তির বাহক। শব্দতরঙ্গ ও ওই রকমের ঢেউ, তা চলে বায়ু, জল ও কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে। আমাদের চারদিকে যে ঈথর রয়েছে তারই মধ্য দিয়ে আলোক প্রসারিত হচ্ছে, তার বেগ হ'ল প্রতি সেকেণ্ডে 1,86,000 মাইল, অর্থাৎ 3×10^{10}cm। তরঙ্গরূপে আলোকের এই বিস্তার আমরা চোখে দেখি না বটে, তবে এ সম্বন্ধে অনেক পরোক্ষ সাক্ষ্য আছে। ব্যতিচার (interference) ও ব্যাবর্তন (diffraction) প্রমাণ করে যে আলো এই রকম তরঙ্গে প্রবাহিত হয়। আলোকের তরঙ্গগতি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি চিত্তাকর্ষক প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। খালি চোখেও রামধনুতে আমরা বর্ণালির নয়নাভিরাম লাল, হলদে, সবুজ, নীল, বেগুনি রং দেখি ; কুয়াশার মধ্য দিয়ে চন্দ্রের উজ্জ্বল বেষ্টক-মণ্ডল দেখি ; পাতলা জলীয় বাষ্পে আবৃত কাচের প্লেটের মধ্য দিয়ে আলোক শিখা লক্ষ্য করলে গোলাকার রঙিন বৃত্ত দেখতে পাই। এ সবই ঘটছে, আলোক ও আমাদের চোখের মধ্যে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার বণ্টনের মধ্য দিয়ে আলোকের ব্যাবর্তনের ফলে। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যতিচার ও ব্যাবর্তন তরঙ্গগতিরই বৈশিষ্ট্য, পদার্থকণিকার গতির জন্য তা হতে পারে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ অবধি যেসব মতবাদ দিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনা মীমাংসিত হচ্ছিল তা হ'ল এই—

(1) দেশ হ'ল ত্রিমাত্রার, আর ইউক্লিডের জ্যামিতি হতে এর ধর্ম স্থিরীকৃত হয়,

(2) এই দেশের মধ্যে পরের পর ঘটনাসমূহ ঘ'টে চলেছে,

(3) এই দেশে বস্তু আছে,

(4) ঈথরও এই দেশে অবস্থিত।

ধরে নেওয়া হ'ল,—(ক) দেশ ও কাল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, (খ) ব্রহ্মাণ্ডে পদার্থের পরিমাণ ও শক্তির পরিমাণ ধ্রুব, আর এর একটা অপরটাতে পরিবর্তিত হয় না, (গ) বস্তু ও তরঙ্গ উভয়ের সত্তা পৃথক্‌, একটির অপরটিতে রূপান্তর সম্ভব নয়।

নব পদার্থবিদ্যা

পদার্থবিদ্যার নবযুগ আরম্ভ হ'ল 1895 খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে। কাচের নলে স্বল্প চাপে অবস্থিত গ্যাসের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-মোক্ষণ পাঠালে এক রকমের আলো দেখা যায় (নিয়ন গ্যাসযুক্ত নলে এই রকমের আলো বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহৃত হয়)। এই স্বল্প চাপে উদ্ভূত আলো নিয়ে অনুসন্ধান চলছিল। জে. জে. টম্‌সন লক্ষ্য করলেন যে ওই রূপ ক্ষেত্রে নলের মধ্যে এক নূতন রকমের কণিকার উৎপত্তি হয়, আর নলের মধ্যে যে গ্যাসই ব্যবহৃত হোক না কেন—হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, প্রভৃতি, সকল ক্ষেত্রে ওই কণিকারা হুবহু এক। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ওই কণিকা নেগেটিভ আধানে আহিত, আর এর ভর, সবচেয়ে হাল্কা যে হাইড্রোজেন অ্যাটম, তার ভরের প্রায় 1860 ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই কণিকার নাম দেওয়া হ'ল ইলেকট্রন। পদার্থের গঠন সম্পর্কে তড়িতীয় মতবাদের এই হ'ল সূচনা। একটি অ্যাটমের তড়িতীয় গঠন সম্বন্ধে প্রচলিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব করলেন রাদারফোর্ড 1911 খ্রীষ্টাব্দে। এই মতবাদে ধ'রে নেওয়া হ'ল, প্রতি অ্যাটমে পজিটিভ আধানে আহিত একটি নিউক্লিয়স আছে যেখানে ওই

অ্যাটমের প্রায় সমস্তটা ভর সংহত হয়েছে। ওই নিউক্লিয়সে যদি 2 একক পজিটিভ আধান থাকে তাহলে ওই নিউক্লিয়সের বিভিন্ন কক্ষে 2টি ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটি অ্যাটমকে অতি ক্ষুদ্র একটি সৌরমণ্ডল রূপে মনে করা যেতে পারে, যেখানে পজিটিভ আধানে আহিত নিউক্লিয়স হ'ল সূর্য আর তার চারদিকে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রনরা হ'ল গ্রহ। পার্থক্য হ'ল এই যে, সৌরমণ্ডলে সূর্য ও গ্রহগণের মধ্যে রয়েছে মহাকর্ষ-বল, আর এখানে কাজ করছে পজিটিভ নিউক্লিয়স ও নেগেটিভ ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণ-বল। নিউক্লিয়সের গঠন সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।

বায়ুশূন্য নলে ইলেকট্রনের উৎপত্তি হতে শিল্পে অনেক মূল্যবান্ আবিষ্কার হতে থাকল। দেখা গেল, একটি প্ল্যাটিনম বা একটি টান্‌গ্‌স্টেন তার যদি খুব উত্তপ্ত করা যায়, আর তা যদি একটি প্রায় বায়ুশূন্য কাচের নলের মধ্যে থাকে, তবে ওই তার একটি উত্তপ্ত তড়িদ্-দ্বারের কাজ করে যার থেকে ইলেকট্রন নির্গত হতে থাকে। এখন, ওই নলে যদি দুই বা ততোধিক অ্যানোড গ্রিড থাকে তবে ওই কাচের ভাল্‌ভ্ হতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের রেডিও-তরঙ্গ ছাড়া বা ধরা যেতে পারে। তারবিহীন টেলিগ্রাম ও টেলিফোন, শব্দপ্রসার, টেলিভিসন,—এসব সম্ভব হয়েছে এই ইলেকট্রন ভাল্‌ভের সাহায্যে।

1895 খ্রীষ্টাব্দে রন্‌টগেন লক্ষ্য করলেন যে, প্রায় বায়ুশূন্য একটি কাচের বাল্‌বের মধ্যে যদি তড়িৎমোক্ষণ চলতে থাকে তবে বিশেষ অবস্থায় তার থেকে একরকম অদৃশ্য বিকিরণ নির্গত হয় যা কালো বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ ফটোগ্রাফি প্লেটকে কালো ক'রে ফেলে। মোক্ষণনলে ক্যাথোড হতে নির্গত ইলেকট্রনরা যে ধাতব পাতে গিয়ে ধাক্কা দেয় সেখানেই হয় এই একস্‌-রশ্মির উৎপত্তি। পরে দেখা গেল, একস্‌-রশ্মি হ'ল তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। পদার্থের মধ্য দিয়ে চললে এই বিকিরণ শোষিত হয়, শোষণের হার ওই পদার্থের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। চামড়ার থলির মধ্যে একটি টাকা আছে; একস্‌-রশ্মি এর মধ্য দিয়ে গিয়ে একখানি ফটোগ্রাফি কাচের উপর পড়ল; ফটোগ্রাফি প্লেটটি কালো কাগজ দিয়ে ভালরকমে মোড়া; প্লেটের উপর একটা ছায়া-ফটোগ্রাফ হ'ল, থলির চামড়াজনিত হাল্কা ছায়ার উপর ওই মুদ্রার একটি ঘন ছায়া দেখা দিল। চিকিৎসাক্ষেত্রে রোগনির্ণয়ে একস্‌-রশ্মি ব্যবহারের এই হ'ল মূল কথা; এই তত্ত্ব প্রয়োগে জানা গেল, দেহের হাড় ভেঙেছে কিনা। একটি পদার্থের মধ্যে একস্‌-রশ্মি কতদূর প্রবেশ করবে তা নির্ভর করবে রশ্মির তীক্ষ্ণতার উপর আর বিপরীত ভাবে ওই পদার্থের ঘনত্বের উপর।

প্রায় এই সময়, 1896 খ্রীষ্টাব্দে, বেকারেল আর একটা মূল্যবান্ আবিষ্কার করলেন। তাঁর টেবিলের টানায় একটা বদ্ধ প্যাকেটে কতকগুলি ফটোগ্রাফি কাচ ছিল আর তার উপর ছিল কয়েকটি খনিজ দ্রব্য। প্লেটগুলি ডেভেলাপ করে তিনি দেখলেন যে সেগুলি কালো হয়ে গিয়েছে। এর কারণ তখন তিনি বুঝতে পারলেন না। পরে তিনি রন্‌টগেন রশ্মি আবিষ্কারের কথা অবগত হলেন, আর জানলেন যে তার থেকে একরকম তীক্ষ্ণ বিকিরণ বেরয় যা সম্পূর্ণভাবে আবৃত ফটোগ্রাফি কাচকে আক্রান্ত করে। বেকারেল লক্ষ্য করলেন যে, যে-সব খনিজদ্রব্যে ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম থাকে সাধারণতঃ তাদের দ্বারা এইরকম ঘটে। ফ্রান্সে পেয়ার ও মারি কুরী ও পরে ইংলণ্ডে রাদারফোর্ড, সডি ও অন্য গবেষকদের অনুসন্ধানে এই দাঁড়াল, যে, সবচেয়ে ভারি ওই দুটি মৌলিক পদার্থ দৃঢ় বা অব্যয় নয়, তারা অবিরাম রশ্মি বিকীর্ণ করছে। পরে বিভিন্ন পরীক্ষা হতে জানা গেল যে এই বিকিরণ তিনটি বিভিন্ন রকম বিকিরণের সমষ্টি; তারা হ'ল, (ক) আল্‌ফা-কণিকা, যা হ'ল পজিটিভ আধানে আহিত হিলিয়ম অ্যাটম; লকিয়ার সূর্যতে এর অবস্থিতি প্রথম আবিষ্কার করেন; (খ) বিটা-কণিকা, যা হ'ল ইলেকট্রন আর যা প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসছে; আর (গ) গামা-রশ্মি, যা হ'ল অতি তীক্ষ্ণ একস্‌-রশ্মি। কুরী-দম্পতির ও রাদারফোর্ডের আবিষ্কারের পর আমরা এসে পড়লাম বিংশ শতাব্দীতে।

ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম সমন্বিত খনিজ পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা গেল যে, তারা প্রত্যেকেই আল্‌ফা বা বিটা কণিকা বিকিরণের ফলে সম্পূর্ণ এক নূতন মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই রকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চ'লে পরিশেষে তারা প্রাকৃতিক সীসার অনুরূপ পদার্থে পৌঁছে তাদের পরিবর্তনের পালা সাঙ্গ করছে। এদের প্রত্যেকের পরিণতি যেরকম সীসায়, তার রাসায়নিক ধর্ম প্রাকৃতিক সীসার অনুরূপ, কিন্তু তার ভর ভিন্ন। অভিন্ন রাসায়নিক ধর্ম অথচ ভর বিভিন্ন এই রকম মৌলিক পদার্থকে বলা হয় আইসোটোপ। আইসোটোপদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাবে। পিচব্লেণ্ড নামে খনিজ পদার্থ, যাতে প্রধানতঃ ইউরেনিয়ম অক্সাইড থাকে, তা হতে কুরীরা প্রচণ্ড তেজস্কর মৌলিক পদার্থ রেডিয়ম পৃথক্ করতে সমর্থ হলেন। একটি বায়ুশূন্য ফ্লাস্কে বরফ নিয়ে তার মধ্যে অল্প একটু রেডিয়ম রাখা হ'ল, দেখা যাবে ওই রেডিয়ম হতে যে তাপ বেরতে থাকবে তা বছরের পর বছর ওই বরফ গলাতে গলাতে চলবে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, গরম ঠাণ্ডা ক'রে এর কার্যকারিতা বাড়ানো কমানো যায়; কিন্তু উষ্ণতার কোনরকম পার্থক্য রেডিয়ম হতে নির্গত রশ্মির হ্রাসবৃদ্ধি করে না, উষ্ণতা যাই হোক না কেন, একই হারে রশ্মি বেরতে থাকে। ওই সব পরীক্ষা হতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, (ক) তেজস্ক্রিয় পদার্থ হতে যে তাপ নির্গত হয় তা কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ঘটে না, (খ) তেজস্কর অ্যাটমের নিউক্লিয়স ভেঙে যাবার ফলে এই তাপ জন্মায় আর নিউক্লিয়স থেকে নির্গত হয় আল্‌ফা বা বিটা কণিকা; সুতরাং (গ) দেখা যাচ্ছে, তেজস্ক্রিয়তা হ'ল এক প্রক্রিয়া যার ফলে মৌলিক পদার্থ স্বতঃই রূপান্তরিত হচ্ছে।

1911 খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড ধাতব পদার্থের খুব পাতলা একটি চাদরের মধ্য দিয়ে অতি দ্রুত আল্‌ফা-কণিকা পাঠালেন আর তার বিক্ষেপ লক্ষ্য করলেন; এই বিক্ষেপ দে'খে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, এ্যাটম একটি কঠিন নিরেট বস্তু নয়; এতে একটি অন্তঃস্থ বস্তু আছে, যাকে বলা হয় নিউক্লিয়স; এই নিউক্লিয়স অতি ক্ষুদ্র একটি বস্তু, আর এ পজিটিভ আধানে আহিত; এই নিউক্লিয়সকে বেষ্টন ক'রে চারদিকে ইলেকট্রনের দল নিজ নিজ কক্ষে ঘুরছে। সমগ্র অ্যাটমটির ব্যাস নিউক্লিয়সের ব্যাসের প্রায় এক লক্ষ গুণ বড়। একটা সুদৃঢ় মৌলিক পদার্থের যে রূপান্তর সম্ভব তা রাদারফোর্ড দেখালেন 1917 খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি দ্রুত আল্‌ফা-কণিকা দিয়ে নাইট্রোজেনের নিউক্লিয়স বিধ্বস্ত করলেন আর তার থেকে বেরিয়ে এল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন কণিকা। প্রাচীন যুগে কিমিয়াবিদ্যা-বিশারদরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, পদার্থের রূপান্তর সম্বন্ধে এই হ'ল তার প্রথম পরীক্ষামূলক সাক্ষ্য। এই পরীক্ষা হতে বিজ্ঞানীদের মনে এই কথাটি বদ্ধমূল হ'ল যে, একটি অ্যাটমের কোন নিত্য সত্তা নেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান দিয়ে একটি অ্যাটম গঠিত।

শতাধিক বছর আগে প্রাউট নামে একজন ব্রিটিশ রসায়নবিদ্ ইঙ্গিত করেছিলেন যে হাইড্রোজেন অ্যাটম হ'ল একমাত্র উপাদান যা দিয়ে ভারি অ্যাটমরা গঠিত হয়েছে। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অ্যাটম-ভার যখন সূক্ষ্মভাবে নির্ণীত হতে থাকল তখন দেখা গেল যে, সবক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফল প্রাউটের কল্পনার সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না। 1930 খ্রীষ্টাব্দে স্যাড্‌উইকের আবিষ্কারের পর থেকে আমাদের ধারণায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটল। আমরা এখন জানলাম যে, অনেক প্রকার নিউক্লিয়স ভেঙে পাওয়া যায় একরকমের কণিকা, যার ভর একটি হাইড্রোজেন ভরের খুব কাছাকাছি, কিন্তু যার কোন আধান নেই। এই নতুন কণিকার নাম দেওয়া হ'ল নিউট্রন। নিম্নলিখিত অনুমিতি দিয়ে একটি নিউক্লিয়সের ভর ও তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের হিসাব নেওয়া যায়—

(ক) নিউক্লিয়সে আছে Z একক পজিটিভ আধান আর তার চারদিকে কাছাকাছি খোলায় ইলেকট্রনরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক গুণাবলী নির্ভর করে ইলেকট্রনের সংখ্যা ও তাদের বণ্টনের উপর;

(খ) প্রতিটি নিউক্লিয়স দু'রকমের কণিকা দিয়ে গঠিত, প্রোটন (ভর 1·008, আধান 1) আর নিউট্রন (ভর 1·009, আধান 0)। সমগ্র অ্যাটমটির ভর নিউক্লিয়সে অবস্থিত প্রোটন নিউট্রনের ভরের সমষ্টি; ঈষৎ যে ব্যতিক্রম দেখা যায় তারও কারণ মীমাংসিত হয়েছে;

(গ) অ্যাটমের রাসায়নিক গুণাবলী নির্ভর করে নিউক্লিয়সে অবস্থিত পজিটিভ আধানের পরিমাণের উপর, আর তা আসছে এতে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যা হতে ;

(ঘ) অ্যাটম-ভর (প্রোটন ও নিউট্রনের মিলিত ভর) বিভিন্ন অথচ প্রোটনের সংখ্যা এক, এই রকমের একাধিক অ্যাটম-নিউক্লিয়স থাকতে পারে ; সম-সংখ্যক প্রোটন থাকার জন্য রাসায়নিক ধর্ম একই হবে ; এদের বলা হয়েছে আইসোটোপ। ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম ভেঙে যে সব বিভিন্ন অ্যাটম জন্মায় তাদের মধ্যে এই আইসোটোপ দেখা যেতে লাগল। 1911 খ্রীষ্টাব্দে জে. জে. টম্‌সন অতেজস্কর নিয়নে আইসোটোপ লক্ষ্য করলেন। তার পর থেকে শতাধিক আইসোটোপ আবিষ্কৃত হয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত তালিকায় কয়েকটি হাল্কা অ্যাটম ও তাদের আইসোটোপদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হ'ল। একটি মৌলিক পদার্থ X-এর এই রকম চিহ্ন দেওয়া হচ্ছে—X^{M}_{A}। এখানে M হ'ল ভর-সংখ্যা, আর তা হচ্ছে প্রোটন ও নিউট্রনের সমবেত সংখ্যা ; আর A হ'ল এর অ্যাটম-সংখ্যা, সেটা হ'ল এতে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যা।

সারণী—1

নিউক্লিয়সের উপাদান	সংকেত	ভর
প্রোটন	H_1	1·008
নিউট্রন	H^1_0	1·009

সারণী—2

মৌলিক পদার্থ	1 সংকেত	2 প্রোটন	3 নিউট্রন	4 2 + 3	5 ভর	6 435 এর পার্থক্য ভর-mu এককে	7 শক্তি-তুল্যাঙ্ক 10⁶ ইলেকট্রন-ভোল্ট এককে
হাইড্রোজেন	H^1_1	1	0	1·008	1·008		
ডয়টেরন	H^2_1	1	1	2·017	2·015	·002 mu	1·80 Mev
ট্রাইটিয়ম	H^3_1	1	2				
হিলিয়ম	He^3_2	2	1				
	He^4_2	2	2	4·034	4·004	·030 mu	28·0 Mev
লিথিয়ম	Li^6_3	3	3	6·051	6·017	·034 mu	3·12 Mev

চতুর্থ ও পঞ্চম সারির সংখ্যাগুলি তুলনা করলে দেখা যাবে, প্রোটন ও নিউট্রনের হিসাব হতে নিউক্লিয়সের যে ভর আসে, পরীক্ষালব্ধ ভর সব সময় তাদের চেয়ে কম। এ রকম হবার হেতু পরে আলোচনা করা যাবে। আমরা লক্ষ্য করছি, হাইড্রোজেনের তিনটা আইসোটোপ আছে H^1_1, H^2_1, H^3_1, আর হিলিয়মের আছে দুটো আইসোটোপ He^3_2, He^4_2। সংকেতের উপরের সংখ্যা জানাচ্ছে প্রোটন ও নিউট্রনের সমবেত-সংখ্যা, আর নিচের সংখ্যা ব'লে দিচ্ছে কতগুলি প্রোটন আছে। ইউরেনিয়ম, রেডিয়ম, থোরিয়ম প্রভৃতি ভারি তেজস্ক্রিয় পদার্থ যখন আপনা হতে ভাঙে তখন দেখা যায়, যা ভাঙছে তার ভর সব সময়, ভেঙে যাতে যাতে দাঁড়াচ্ছে, তাদের সমবেত ভরের চেয়ে বেশি।

একটা ভারি তেজস্কর-নিউক্লিয়স অন্যরকমেও ভাঙতে পারে। 1938 খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে হান এ-সম্বন্ধে যা লক্ষ্য করেন তা অনুসরণ ক'রে দেখা গেল যে ইউরেনিয়মের 235 আইসোটোপ মন্থরগতি নিউট্রন শোষণ ক'রে নিয়ে দুটো প্রায় আধাআধি সমভারের মৌলিক পদার্থে বিভক্ত হয় ; এরা হ'ল বেরিয়ম ও পটাসিয়ম। এই প্রক্রিয়াকে ইংরেজিতে বলা হয় ফিসন। প্রতি ফিসনে দুটো বা তিনটে ক'রে নিউট্রন নির্গত হয়, আর প্রতিবারে কিছু পরিমাণে শক্তি মুক্ত হয়। এই ফিসন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি ক'রে অ্যাটম রিঅ্যাক্টর ও অ্যাটম বোমা নির্মিত হয়েছে। 1905
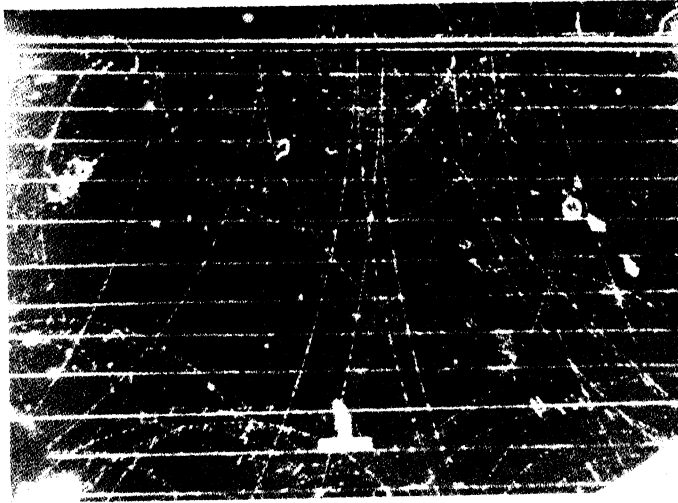
গামা ফোটনের ইলেকট্রন সৃষ্টি।
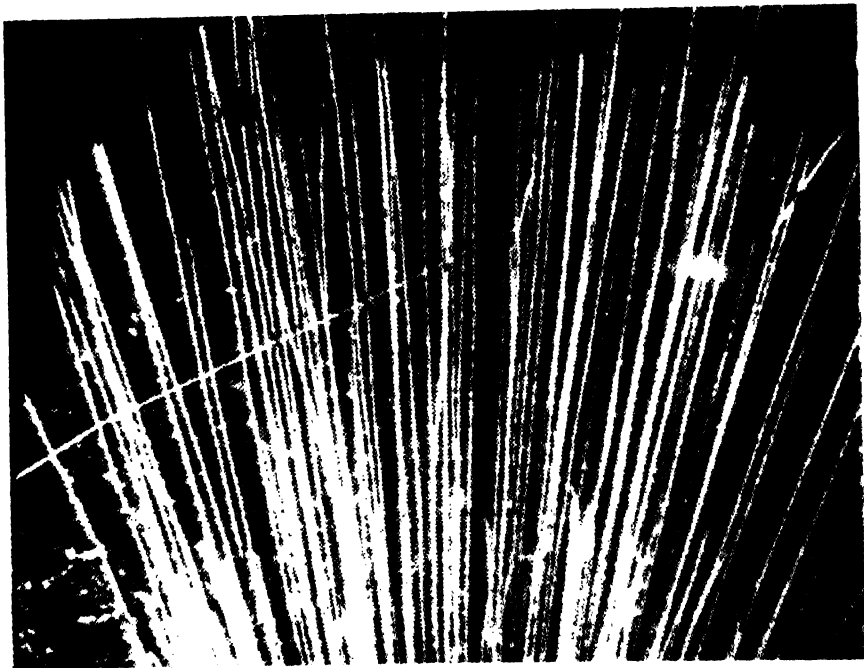
উইলসন কক্ষে আলফা-কণিকার পথ।

উইলসন কক্ষে একস্‌-রশ্মি ফোটনের পথ।
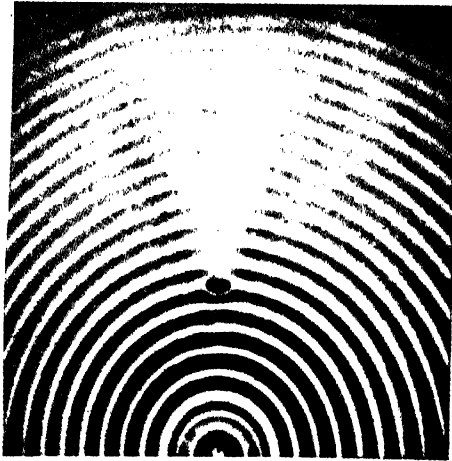
জলের উপরিভাগে চলন্ত তরঙ্গ বাধা পাওয়ার রূপ।

দৃশ্য আলোক ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে চলার ফলে ব্যাবর্ত্তনজনিত রূপ।
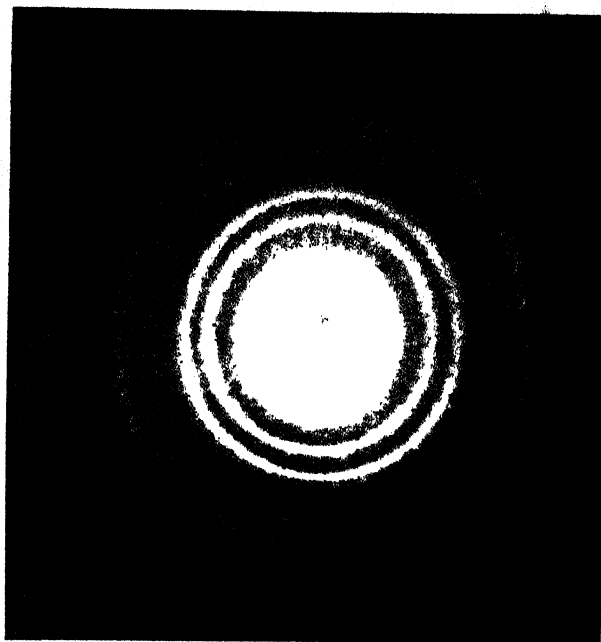
স্ফটিকচুর্ণের মধ্য দিয়ে যাবার ফলে ইলেকট্রনগুচ্ছের ব্যাবর্ত্তনের রূপ।
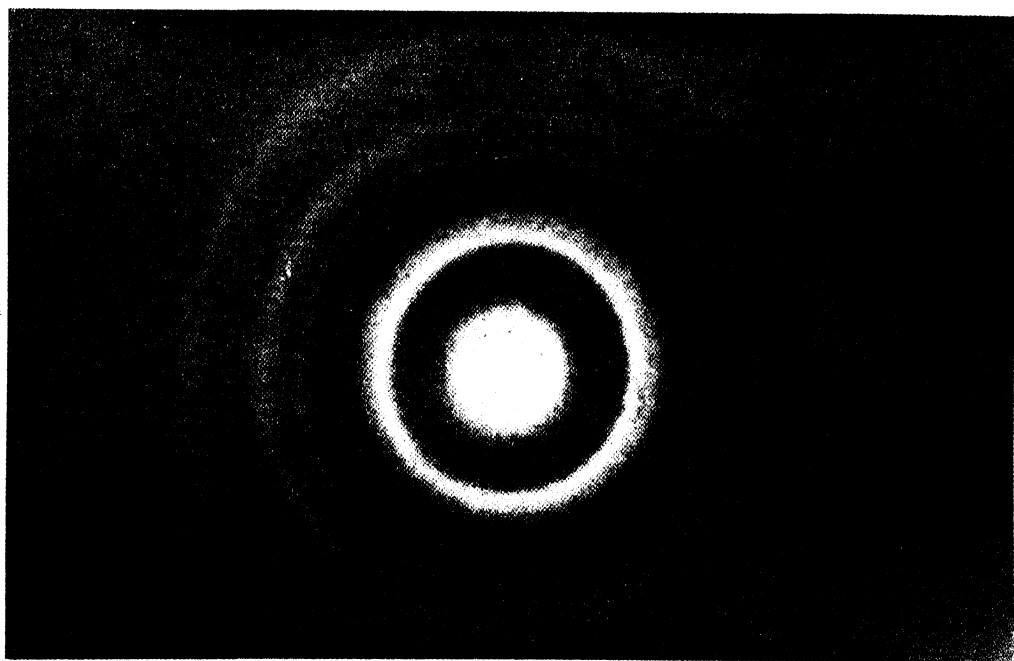
স্ফটিকচূর্ণের মধ্যে দিয়ে যাবার ফলে একস্-রশ্মি ফোটনের ব্যাবর্ত্তনজনিত রূপ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে পেটেন্ট আপিসে কাজ করতে করতে আইনষ্টাইন আপেক্ষিকবাদের যে বিশেষ তত্ত্ব ঘোষণা করেন, তা দিয়ে মীমাংসিত হল, কেন কতকগুলি অ্যাটমের গঠন বেশ সুদৃঢ়, আর কেনই বা অপরগুলি আপনা হতে ভেঙে ভেঙে চলেছে।

আপেক্ষিকবাদ

মনে করা যাক, ট্রেনের এক কামরায় একজন ব'সে আছেন, কামরার জানলাগুলি সব বন্ধ ; ট্রেন যেই ছাড়ল লোকটি একটা হেঁচ্‌কা টান অনুভব করলেন, হাতে যদি কাপভর্তি চা থাকে, কিছুটা চা চলকে পড়তে পারে ; বাইরের কিছু তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, তবুও তিনি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে, ট্রেন ছেড়েছে। কিছুক্ষণ পরে ট্রেন যখন ধীরভাবে চলতে রইল তখন তিনি আর কোন আলোড়ন অনুভব করবেন না, কাপের চাও নড়চড়া করবে না। চলন্ত ট্রেনের শব্দ ও কম্পন যদি দূর করতে পারা যায়, তবে তিনি যে প্রকোষ্ঠে বসে আছেন তা চলছে বা স্থির আছে তিনি বুঝতে পারবেন না। এই যে বিভ্রান্তি, এ তিনি বিশেষ ভাবে অনুভব করবেন যদি তিনি একটা শান্ত হ্রদের উপর চারিদিকে বন্ধ একটি পালের হাওয়ায় চলন্ত নৌকার মধ্যে অবস্থান করেন। এখানে তিনি যদি একটা বল ছেড়ে দেন তবে তা খাড়া উল্লম্বভাবে মেঝেতে পড়বে। এই অবস্থায় ওই কক্ষের মধ্যে কোন পরীক্ষা হতেই তিনি স্থির করতে পারবেন না যে, ওই কক্ষটি সমগতিতে চলছে বা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তিনি যদি ওই কক্ষের একটি জানলা খুলে বাইরের দিকে তাকান আর দেখেন, সামনে দিয়ে গাছপালা, বাড়িঘর ছুটে চলেছে, তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা হতে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসবেন যে, বাইরের ওই জিনিসগুলি স্থির আছে, তাঁর নৌকাটাই চলেছে। তীরে দাঁড়িয়ে কোন দর্শক যদি জানলার ভিতর দিয়ে ওই কক্ষের দিকে তাকান তা হলে তিনি লক্ষ্য করবেন যে, যে-বলটা ফেলা হ'ল তা একটি বাঁকা পথ নিয়েছে খাড়াভাবে পড়ে নি। গতি সম্বন্ধে নিউটনের আপেক্ষিকবাদ খাটিয়ে এসব মীমাংসা করা যায়। মোটের উপর এই সব সিদ্ধান্ত হ'ল : (ক) একটি বন্ধ ঘরে কোন রকম যান্ত্রিক পরীক্ষা দিয়ে আমরা স্থির করতে পারি না যে, ওই ঘর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বা অপরিবর্তিত গতিতে ছুটে চলেছে ; (খ) একটা নিয়মও ঠিক ক'রে দেওয়া যায়, যার সাহায্যে ওই একই যান্ত্রিক পরীক্ষা দু'জন দর্শক দুই বিভিন্ন রকমে বর্ণনা করবে, একজন ওই ঘরের মধ্যে অবস্থান করছে, দ্বিতীয় জন ওই ঘরের সাপেক্ষে অপরিবর্তিত গতিতে ছুটে চলেছে।

কোপারনিকস ও কেপলারের সময় হতে জ্যোতিষজ্ঞরা আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, তাদের গতিপথ সুমীমাংসিত হয় যদি এই কয়টি কথা ধ'রে নেওয়া যায়। প্রথম, পৃথিবী তার কক্ষে ঘুরছে আর 24 ঘণ্টায় এক পাক ঘোরা শেষ করছে ; দ্বিতীয়, সৌরমণ্ডলীর একটা গ্রহ হ'ল পৃথিবী আর 365 দিনে এই পৃথিবী সূর্যকে একবার বেষ্টন করছে ; তৃতীয়, নক্ষত্রদের একটি ছায়াপথের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবী অবস্থিত, আর অন্য ছায়াপথের সম্পর্কে এর অবস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে। একটা প্রশ্ন জ্যোতিষজ্ঞদের মনকে আলোড়িত করছিল,—আকাশে কিছু আছে কিনা যার সম্পর্কে একটি নক্ষত্রের বা একটি গ্রহের পরমগতি নির্ণয় করা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে বহু বিজ্ঞানী মনে করতেন যে, আকাশে দূরতম নক্ষত্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে স্থির অটল অবস্তুগত একটা কিছু আছে ; এর নাম তাঁরা দিলেন ঈথর। এই মাধ্যমের মধ্যে তরঙ্গের সাহায্যে সেকেণ্ডে 186000 মাইল বেগে আলোক-সংকেত ধাবিত হয়। 1880 খ্রীষ্টাব্দ হতে এই ঈথরের মধ্যে পৃথিবীর বেগ মাপবার জন্য আলোকতরঙ্গ নিয়ে অনেকরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। মাইকেলসন ও মরলির পরীক্ষা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছিল। কিন্তু সব পরীক্ষার ফলাফল ছিল নেতিবাচক ; অর্থাৎ পরীক্ষামূলক কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না যে, পৃথিবী ঈথরের মধ্য দিয়ে চলেছে।

1905 খ্রীষ্টাব্দে যুবক আইনষ্টাইন যখন তাঁর সুবিখ্যাত বিশেষ আপেক্ষিকবাদ প্রকাশ করলেন তখন সকল সমস্যার সমাধান হ'ল। দুটো কথা তিনি ধ'রে নিলেন—এক, যেভাবেই আর যেখান হতেই মাপা হোক না কেন

আলোকসংকেতের বেগ একেবারে ধ্রুব। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক ; খুব দূরের নক্ষত্র হতে যে আলোকসংকেত আসছে তার বেগ সেকেণ্ড প্রতি ওই 186000 মাইল হবে, যেখান থেকে মাপা হচ্ছে তা স্থির থাকুক বা সেকেণ্ডে 10,000 মাইল বেগে ওই নক্ষত্রের দিকে চলুক। আইনষ্টাইনের দ্বিতীয় স্বীকৃতি হ'ল এই : সকল ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক নিয়মাবলী অটুট থাকে, অর্থাৎ কোন পরীক্ষা দিয়ে স্থির করা যাবে না যে, যে-স্থান হতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে তা এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে বা সমবেগে চলেছে। সাধারণতঃ আলোকের বেগের তুলনায় পদার্থের বেগ খুবই কম, তাই আইনষ্টাইনের সমীকরণে যে সংশোধন $\frac{v}{c}$ আসে তা একেবারে নগণ্য ; কাজেকাজেই এই সব গতিশীল পদার্থ সম্বন্ধে নিউটনের নিয়মগুলি অভ্রান্ত ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশিত হবার আগেই বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে এটা জানা গিয়েছিল যে, একটি ইলেকট্রনের ভর ধ্রুব নয়, এর ভর তার বেগের উপর নির্ভর করে। বেগের সঙ্গে ভরের কি রকম পরিবর্তন ঘটে, আইনষ্টাইনের সূত্র হতে তার হিসাব করা যায়। আপেক্ষিকবাদের আর কয়েকটি ফলাফল হ'ল এই : একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য বা ঘড়ির টিক্‌টিকের মধ্যে সময় দু'জন লোকের কাছে দু'রকম হবে, যদি এদের একজন স্থির পৃথিবীর উপরে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করে, অপরজন তার হিসাব নেয়—সমবেগে চলন্ত ট্রেন হতে। এই সব অদ্ভুত ফলাফল বেশ বোঝা যাবে যদি ট্রেনের বেগ আলোকের বেগের কাছাকাছি হয়। টম্‌কিন্স ইন্ ওয়ান্‌ডারল্যাণ্ড নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে অধ্যাপক গ্যামো কল্পনা করছেন যে, আলোকের বেগ সেকেণ্ডে 186000 মাইল না হয়ে যদি ঘণ্টায় 20 মাইল হয়, তাহলে টম্‌কিন্সের দৃষ্টির সামনে দিয়ে যে লোক সাইকেল চ'ড়ে যাচ্ছে তার দেহ একেবারে চেপ্‌টা ব'লে মনে হবে, আর তিনি যখন সাইকেল চ'ড়ে যাবেন তখন দেখবেন, তাঁর হাতঘড়ি ও টাউনহলের ঘড়ির মধ্যে সময়ের মিল নেই, তাঁর ঘড়ি খুব আস্তে চলেছে।

আইনষ্টাইনের সবচেয়ে বড় রকমের ভবিষ্যদ্বাণী হ'ল এই, ভর ও শক্তি এক অন্যতে রূপান্তরিত হতে পারে। ভরের নিত্যতা ও শক্তির নিত্যতা ব'লে পৃথক্ পৃথক্ কোন তত্ত্ব নেই ; এই ব্রহ্মাণ্ডে ভর ও শক্তির সমষ্টি হ'ল নিত্য, অব্যয়। কোন ভৌতিক বা রাসায়নিক পরিবর্তনে যদি E পরিমাণ শক্তির লাভ বা লোকসান ঘটে তবে বুঝতে হবে, ওই প্রক্রিয়ায় ভরের পরিবর্তন হয়েছে $m=\frac{E}{c^2}$, যেখানে c হল 3×10^{10}cm প্রতি সেকেণ্ডে। কোন এক সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া ধরা যাক ; ধরা যাক 2 গ্র্যাম হাইড্রোজেন 16 গ্র্যাম অক্সিজেনের সঙ্গে মিশছে আর তার ফলে 18 গ্র্যাম জল উৎপন্ন হচ্ছে ; এখানে 58100 ক্যালরি তাপের উদ্ভব হচ্ছে। আইনষ্টাইনের হিসাব অনুসারে এই তাপের সমতুল পদার্থ হবে এক গ্র্যামের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। নিশ্চয়ই এতটা ভর লোপ পেয়েছে ; কিন্তু এ ত যাচাই করবার কোন উপায় নেই। বিজ্ঞানী সবচেয়ে সূক্ষ্ম যে তুলা নির্মাণ করেছেন তারও এ ভর-পার্থক্য ধরবার ক্ষমতা নেই। সুতরাং সাধারণ রাসায়নিক পরিবর্তনে আমরা অনায়াসে পদার্থের ভরের নিত্যতা ধ'রে নিতে পারি।

এখন আমরা নিউক্লিয়স সম্পর্কে নব রসায়নবিদ্যা হতে উদাহরণ নিই। নিউক্লিয়সের ফিউসনের কথা ধরা যাক। আমরা পরে বিবেচনা করব ফিসন ব্যাপার, যেমন একটি ইউরেনিয়ম নিউক্লিয়স একটি নিউট্রনের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে নতুন নিউক্লিয়স তৈরী করল, তা আপনা হতে ভেঙে গিয়ে দুটো ছোট নিউক্লিয়সে পরিণত হ'ল।

(১) নিউক্লিয়সের ফিউসন।—আগেকার 2 নম্বরের সারণীতে হাইড্রোজেন ও তার আইসোটোপদের ভরের মান দেওয়া হয়েছে। ফিউসন সম্বন্ধে পরীক্ষায় নিম্নের দুটি পরিবর্তন হতে প্রভূত পরিমাণে শক্তি মুক্ত হয় :

(ক) $H_1^2+H_1^2\ H_1^3+n_0^1+\Delta m$; এখানে Δm হল ভরের হ্রাস আর ইহাতে $\Delta mc^2=3{\cdot}29$ Mev শক্তি মুক্ত হয়।

এই প্রক্রিয়া আরম্ভ করতে হলে ভারি হাইড্রোজেন গ্যাসের উষ্ণতা প্রায় 50 মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তুলতে হবে। বর্তমানে 5 মিলিয়ন ডিগ্রী অবধি তোলা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এখনও তাপজনিত ফিউসন সম্ভব হচ্ছে না।

সমুদ্রজলে ভারি হাইড্রোজেনের পরিমাণ অফুরন্ত বলা যেতে পারে। এই ফিউশন প্রক্রিয়া যদি কম ব্যয়ে কাজে লাগানো যায় তবে শক্তি সম্বন্ধে পৃথিবীবাসীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এই রকমের প্রক্রিয়া হতে মেটানো সম্ভব হবে।

(খ) অন্য আর এক প্রক্রিয়া হতে আরো অধিক পরিমাণ শক্তি মুক্ত হয়।

$$H^3_1 + H^2_1 \rightarrow He^4_2 + n^1_0 + \Delta_m, \quad \Delta_m c^2 = 17.6 \text{ MEV}$$
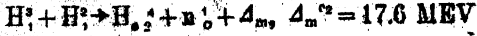
ট্রিটিয়ম খুব কম পাওয়া যায় ব'লে এই প্রক্রিয়ার ব্যবহার হয় না।

(২) নিউক্লিয়সের ফিসন।—যুদ্ধের ব্যাপারে ও মানবের দৈনন্দিন কাজে নিউক্লিয়সের অন্যরকম পরিবর্তনের ব্যবহারিক প্রয়োগ চলেছে। 1938 খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে হান লক্ষ্য করলেন যে ইউরেনিয়ম নিউক্লিয়স যদি মন্থরগতি নিউট্রনের সঙ্গে মিলিত হয় তবে তাতে ক'রে যে নতুন নিউক্লিয়সের সৃষ্টি হবে তা হবে অপ্রতিষ্ঠ, তা দুটি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হবে, ভরের কিছুটা হ্রাস পড়বে, ফলে প্রচণ্ড রকমের শক্তি দেখা দেবে। এখানে নিউক্লিয়সকে এক ফোঁটা তরল পদার্থরূপে পরিগণিত করা যেতে পারে, যা একটা নির্দিষ্ট আয়তন ছাড়িয়ে গেলে দুটি ছোট ছোট ফোঁটায় বিভক্ত হয়। পরবর্তী অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ইউরেনিয়মের 235 আইসোটোপই মন্থরগতি নিউট্রন শোষণ ক'রে ও দুই টুকরা হয়ে যায়। এই রকমে প্রক্রিয়ায় প্রতি ফিসনে দুই-তিনটি ক'রে নতুন নিউট্রন জন্মলাভ করে। নির্গত এই নিউট্রনের গতি মন্দীভূত ক'রে যদি আবার তাকে দিয়ে অপর একটি 235 ইউরেনিয়ম নিউক্লিয়সকে আঘাত দেওয়া যায়, তবে এই ফিসন প্রক্রিয়া অবিরাম ভাবে চালানো যেতে পারে। অ্যাটম বোমা তৈরির কাজে 238 ইউরেনিয়ম থেকে 235 ইউরেনিয়ম পৃথক্ ক'রে নেওয়া হয়। এই ফিসন প্রক্রিয়ার শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে বিভিন্ন রকমের রিঅ্যাক্টর ব্যবহৃত হচ্ছে; একটি সরল রিঅ্যাক্টরে থাকে অ্যালুমিনিয়ম নলে আবদ্ধ বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ম, আর অতি-মাত্রায় পরিশুদ্ধ গ্র্যাফাইট দণ্ড দিয়ে তা পৃথকীকৃত করা হয়েছে। এই গ্র্যাফাইটের কাজ হ'ল ফিসনে যে দ্রুত নিউট্রন জন্মায় তাদের বেগ মন্দীভূত করা; এতে এরা পরবর্তী 235 ইউরেনিয়ম অ্যাটম কর্তৃক শোষিত হতে পারে। এই গ্র্যাফাইট দণ্ডকে বলা হয় মডারেটর। ফিসনে যে তাপ জন্মায় তা সরিয়ে ফেলবার বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। একটা সহজ ব্যবস্থা হল, প্রবল চাপযুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড সঞ্চালিত করা। এই গ্যাস যে তাপ শোষণ করল তা দিয়ে ষ্টীমচালিত যন্ত্র চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় ষ্টীম প্রস্তুত করা হয়। আমাদের দেশে বোম্বাইতে যে অ্যাটমীয় শক্তি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, তাতে তিনটা রিঅ্যাক্টর চালু করবার ব্যবস্থা আছে, এদের মধ্যে সবচেয়ে যেটি বড়, যাকে বলা হয় ক্যানেডা-ভারত রিঅ্যাক্টর, তাতে সম্প্রতি কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। একটা আনন্দের কথা এই, এখানে যেসব বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম দণ্ডের প্রয়োজন তা ভারতের খনিজ হতেই প্রস্তুত হবে।

আইনষ্টাইনের ভর-শক্তি সম্পর্কীয় সম্বন্ধের আর একটি ব্যবহারিক প্রয়োগের কথায় আসা যাক। একটি ইলেকট্রন, একটি অ্যাটম নিয়ে যেখানে হিসাব সেখানে তাপের সাধারণ একক ক্যালরির মাত্রাটা খুবই বড়। সে সব ক্ষেত্রে মাপজোখের অপর এক একক ব্যবহৃত হয়, আর তা হ'ল ইলেকট্রন ভোল্ট। তড়িৎবলক্ষেত্রে একটা ইলেকট্রন এক ভোল্ট বিভব পার্থক্যের মধ্য দিয়ে যখন যায় তখন তার শক্তির যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে বলা হয় ইলেকট্রন-ভোল্ট। 1928 খ্রীষ্টাব্দে ডিরাক এক ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, 1·02 মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্টের বেশি শক্তিধর গামা-রশ্মি যদি কোন নিউক্লিয়সের কাছ দিয়ে যায় তবে সেই গামা-রশ্মি একজোড় পজিট্রন-ইলেকট্রনে পরিবর্তিত হতে পারে। সেই তত্ত্ব অনুসারে 1·02mev-র দু' হাজার গুণ বেশি শক্তিধর গামা-রশ্মি নিজেকে হারিয়ে একজোড় পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রোটন (যাকে বলা হয় অ্যান্টি-প্রোটন) প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে। ডিরাকের ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমান কালে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। মানবের তৈরী যন্ত্রে এখন একটি আহিত কণিকাকে 10 মিলিয়ন ভোল্ট (10^{10}ev) শক্তিসম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। কসমিক রশ্মিতে মাঝে মাঝে এক-একটি কণিকার সন্ধান পাওয়া যায়, যার শক্তি এরও দশ মিলিয়ন গুণ বেশি, অর্থাৎ 10^{17}ev যুক্ত। এই প্রবন্ধের পরিশেষে কতকগুলি চিত্র দেওয়া হ'ল যাতে দেখা যাবে, একটি মাত্র উচ্চ শক্তিধর কসমিক-রশ্মিকণিকা কি ক'রে বহুসংখ্যক কণিকার সৃষ্টি করছে।

এখন আমরা দেখব, বস্তু ও তরঙ্গ সম্বন্ধীয় পদার্থবিদ্যার পূর্বতন ধারণা কি ভাবে বর্তমান শতাব্দীতে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তার আগে আমরা অনুধাবন ক'রে নি, এই শতাব্দীতে গত শতাব্দীর অন্য-সব ধারণার কিরকম রদবদল ঘটেছে।

1। তড়িৎ একটি অবিচ্ছিন্ন তরল পদার্থ নয়। পজিটিভ ও নেগেটিভ আধান হ'ল কতকগুলি পজিটিভ ও নেগেটিভ এককের সমষ্টি, যাদের সংকেত বিপরীত কিন্তু মান এক।

2। অ্যাটম যে একেবারে অবিনশ্বর তা নয়। প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন এই তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তুর একক দিয়ে অ্যাটম গঠিত।

৪। ভর ও শক্তির নিত্যতা তত্ত্ব পৃথক্ ভাবে সত্য নয়। এদের এক অন্যতে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে এই দুই-এর সমষ্টি অটুট ও অব্যয়।

4। দৈর্ঘ্য, সময় ও ভর নিত্য—এই স্বতঃসিদ্ধের উপর ভিত্তি ক'রে নিউটন তাঁর পদার্থবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেন; যেখান থেকে এদের মাপা হচ্ছে তাদের গতি যেরকম হোক না কেন, দৈর্ঘ্য, সময় ও ভরের পরিমাপের কোন পার্থক্য ঘটবে না—এই ছিল নিউটনের কথা। বর্তমান শতাব্দীতে নিউটনের এ ধারণার পরিবর্তন ঘটল, দেখা গেল এদের মান নির্ভর করে, যেখান থেকে মাপা হচ্ছে তার আপেক্ষিক গতির উপর।

বস্তুকণা ও তরঙ্গ

বস্তুকণা ও তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা ব'লে আমরা দেখব, আমাদের পূর্ব ধারণার কি রকম পরিবর্তন ঘটল যখন 1900 খ্রীষ্টাব্দে প্ল্যান্‌ক্ তাঁর কোয়ান্টম-বাদ প্রচার করলেন।

বস্তুকণার একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, যখন এ চলতে থাকে তখন বিভিন্ন সময়ে এর গতি অনুসরণ করা যায়; বস্তুকণা তার শক্তি নিয়েই চলে, আর শক্তি পুরোপুরি ভাবে বা আংশিক ভাবে অপর বস্তুকে দিতে পারে যখন সে তাকে ধাক্কা দেয়।

আলোক-তরঙ্গ যখন অবিচ্ছিন্ন ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন সমস্ত স্থান জুড়ে তার শক্তি চালিত হয়; এই তরঙ্গ যখন একটা বস্তুকণাকে আঘাত করে তখন সমগ্র শক্তির একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র ওই বস্তুকণা লাভ করে; এর পরিমাণ নির্ভর করে ওই বস্তুকণা আলোকের উৎস হতে কত দূরে অবস্থিত তার উপর। ধরা যাক, কোন বায়ু-শূন্য স্থানে একটি প্ল্যাটিনম বা টান্‌গ্‌স্টেন তারকে খুব বেশি রকম উত্তপ্ত করা হ'ল। ওই উত্তপ্ত তার হতে এখন ইলেকট্রন বেরচ্ছে, বিকিরণও নির্গত হচ্ছে। আহিত ইলেকট্রনরা বস্তুকণা হিসাবে বিচ্ছিন্নভাবে বেরচ্ছে, আর তরঙ্গ ওই বস্তুর সমস্ত দেহ হতে অবিচ্ছিন্ন হয়ে নির্গত হচ্ছে—এই রকমই কল্পনা করা হ'ত। আলোক-তরঙ্গে ব্যতিচার ও ব্যাবর্তন আছে, বস্তু-কিরণে সে রকম কিছু নেই।

বিকিরণ সম্বন্ধে কোয়ান্টম-বাদ

কয়লার মত একটি কালো পদার্থকে বায়ুশূন্য স্থানে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা হচ্ছে; পদার্থটি আলো দিতে আরম্ভ করল; আলোর রং বদলাতে রইল, লাল হতে কমলা, তার পর হলদে, শেষ অবধি তা সাদা আলো দিতে থাকল। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে শক্তির বণ্টন উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে; এর কারণ ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। বার্লিনে প্ল্যান্‌ক্ এ সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করছিলেন, শেষ 1900 খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক যুগান্তরকারী কল্পনার আশ্রয় নিলেন। তিনি বললেন, বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক অবিচ্ছিন্ন ভাবে নির্গত হচ্ছে না, এক এক প্যাকেটে, এক এক বাণ্ডিলে পৃথক্ পৃথক্ হয়ে বেরচ্ছে, উত্তপ্ত তার হতে যেমন ইলেকট্রন বেরয়। প্রতি প্যাকেটে কিন্তু

শক্তির পরিমাণ স্থির নেই, তা নির্ভর করছে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর ; তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত কম, বাণ্ডিলে শক্তির পরিমাণ তত বেশি। প্ল্যান্ক্ ওদের সম্বন্ধটা একটা সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করলেন, তা হ'ল $E=\frac{hc}{\lambda}$

এখানে h হ'ল একটা ধ্রুব, যাকে বলা হয় প্ল্যান্কের ধ্রুব।

এর পর 1905 খ্রীষ্টাব্দে আইনষ্টাইন এই কোয়ানটম মতবাদের এক মূল্যবান্ প্রয়োগ করলেন। বহু পূর্বে, 1887 খ্রীষ্টাব্দে, হার্জ লক্ষ্য করেছিলেন যে, একটি চক্‌চকে ধাতব প্লেটের উপর যদি অতি-বেগনি রশ্মি পড়ে তবে প্লেটটি পজিটিভ তড়িতে আহিত হয়। এর কারণ পরে বোঝা গেল ; ওই প্লেট থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাবার ফলে ওই রকম ঘটে। ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের সিদ্ধান্ত হতে আসে যে, আলোকের ঔজ্জ্বল্যের উপর নির্গত ইলেকট্রনের শক্তি নির্ভর করে। পরীক্ষায় সেরকম দেখা গেল না। লক্ষ্য করা গেল, আলোকের উৎস থেকে যদি প্লেটটাকে সরিয়ে নেওয়া হয়, যাতে করে নিপতিত আলোকের ঔজ্জ্বল্য কমে আসে, তাতেও নির্গত ইলেকট্রনের শক্তি ঠিক থাকে, একটুও কমে না। এতে শুধু ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে যায়, এই মাত্র। অন্য দিকে দেখা গেল, ইলেকট্রনের শক্তি নির্ভর করে আপতিত আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর ; তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত ছোট হয়, নির্গত রশ্মির শক্তি তত বেড়ে যায়।

আইনষ্টাইন বললেন যে, এসব পর্যবেক্ষণ সুমীমাংসিত হয় যদি আমরা প্ল্যান্কের কোয়ানটম মতবাদ প্রয়োগ ক'রে ধ'রে নিই যে, আলোক এক-একটি বাণ্ডিলে বেরচ্ছে, আর সেই বাণ্ডিলেই শোষিত হচ্ছে। এই রকম বাণ্ডিলের নাম দেওয়া হ'ল ফোটন। একটি গ্যাসের বা একখণ্ড ধাতব চাদরের অ্যাটম সমগ্র ফোটনের শক্তি শোষণ ক'রে নেয় আর ছাড়ে, শক্তি হ'ল $\frac{hc}{\lambda}$-এর অনুপাতিক। তা হলে এই কথা দাঁড়ায়, তরঙ্গবাদ প্রয়োগ ক'রে যেরকম ধ'রে নেওয়া হয়েছিল আলোক তরঙ্গে প্রসারিত হয়, ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয় ; আলোক এক-একটি বাণ্ডিলে বিকীর্ণ হয় আর সেই ভাবেই শোষিত হয়। কিন্তু একটা অ্যাটম একটা ফোটনের সমগ্র শক্তি যদি শোষণ করতে না পারে তবে ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়াবে ? এর উত্তর পাওয়া গেল এ. এম. কম্‌পটনের পরীক্ষায় 1923 খ্রীষ্টাব্দে। কম্‌পটন লক্ষ্য করলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে যখন একটি এক্স-রশ্মি ফোটন কোন একটি গ্যাসের মধ্য দিয়ে যায় তখন ওই ফোটন অ্যাটমের সহিত সংযুক্ত একটি ইলেকট্রনকে ধাক্কা দিতে পারে, আর তার ফলে ওই ফোটনের কিছুটা শক্তি ইলেকট্রনে সঞ্চালিত হবে ; আঘাতকারী ফোটনে যে শক্তি ছিল, ধাক্কার ফলে তা ওই ফোটনে ও ইলেকট্রনে ভাগাভাগি হয়ে যাবে ; এদের গতিপথ নির্দ্ধারিত হবে দুটি স্থিতিস্থাপক বস্তুর ঘর্ষণ সম্বন্ধীয় নিয়ম প্রয়োগ ক'রে। ফোটন কিছুটা শক্তি হারায়, ফলে এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটে।

এই সব পরীক্ষা হতে দেখা যাচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ফোটন বস্তুকণার মত ব্যবহার করে, অন্যদিকে ব্যতিচার ও ব্যবর্তন পরীক্ষা জানায় যে, এই ফোটনের প্রকৃতি তরঙ্গের মত,—বোর যেমন সংজ্ঞা দিচ্ছেন, এর একটার প্রকৃতি অপরটার পরিপূরক। এই দুই রূপের কোন্‌টা প্রকাশ পাবে তা নির্ভর করবে পরীক্ষার বিন্যাসের উপর।

বস্তুকণা

ফোটনের যখন দুইটি বিভিন্ন রূপ দেখা গেল তখন প্রশ্ন উঠল, বস্তুকণার, বিশেষভাবে ইলেকট্রনের, এই দুই রকমের মূর্তি আছে কিনা। 1924 খ্রীষ্টাব্দে লুই. ডি. ব্রগলি প্রকৃতিতে প্রতিসাম্যের কথা চিন্তা ক'রে এই কল্পনা করলেন যে, ফোটনে যখন বস্তুকণার রূপ আছে তখন বস্তুকণাতেও তরঙ্গের প্রকৃতি দেখা যাবে। কিন্তু বস্তুকণা যদি তরঙ্গ-প্রকৃতির হয় তবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কত হবে ? ডি. ব্রগলি ফোটনের সঙ্গে তুলনা করলেন।

একটি বেগযুক্ত বস্তুকণার কেবলমাত্র শক্তি নয়, ভরবেগও আছে। এই ভরবেগ $p=mv$, m—ভর, v—বেগ। ফোটনের পক্ষে অনুরূপ সম্বন্ধ হচ্ছে $p=\frac{E}{c}=\frac{h}{\lambda}$। ডি. ব্রগলি ধ'রে নিলেন যে বস্তুকণার সম্বন্ধে অনুরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান, অর্থাৎ $p=mv$।

তা হলে দাঁড়াচ্ছে $mv=\frac{h}{\lambda}$, অর্থাৎ বস্তুকণার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য λ হ'ল $\frac{h}{mv}$। একটি ইলেকট্রনের ভর সবচেয়ে কম, একটি হাইড্রোজেন অ্যাটমের ভরের প্রায় 1830 ভাগের এক ভাগ, সুতরাং সমবেগসম্পন্ন একটি ইলেকট্রনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হবে সবচেয়ে বড়। বস্তুকণা সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা হয়েছে ইলেকট্রন রশ্মিগুচ্ছের সাহায্যে।

বিংশ শতাব্দীতে উন্নত পদার্থবিদ্যার প্রধান কয়েকটি তত্ত্বের মূল কথাগুলির উল্লেখ করা হ'ল।

ফোটন ও ইলেক্‌ট্রন উভয়ের সুসমঞ্জস প্রকৃতির তত্ত্বীয় দিক্‌টা আলোচনা করার পূর্বে আমরা দেখি, কণিকা ও তরঙ্গ, এদের এই দ্বিবিধ ধর্ম কি ক'রে পরীক্ষায় নিরূপিত হতে পারে।

কণিকাধর্ম সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক আলোচনা

1912 খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত সি. টি. আর. উইলসনের মেঘকক্ষ হ'ল প্রথম যন্ত্র যাতে কণিকাগুলির গতিপথ নিরীক্ষিত হ'ল। এই কক্ষে আহিত ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন ও আল্‌ফা-কণিকার পথ সাদা সাদা রেখারূপে প্রতিভাত হতে থাকল। দেখা গেল, রেখাগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন, আবার অন্যত্র তারা ধারাবাহিকরূপে চলেছে। এক্‌স-রশ্মি ও গামারশ্মি জনিত যে ফোটন অ্যাটমকে আঘাত ক'রে ইলেক্‌ট্রন সৃষ্টি করে, উইলসন কক্ষে সেই ইলেক্‌ট্রনের গতিপথ লক্ষ্য ক'রে এক্‌স-রশ্মি গামা-রশ্মির পথ নির্ধারিত হতে থাকল।

(ক) চিত্র (1)—উইলসনকক্ষে আল্‌ফা-কণিকার পথ। একটি আল্‌ফা-কণিকার আঘাতে নাইট্রোজেন নিউক্লিয়স বিধ্বস্ত হবার ফলে যে প্রোটন জন্মাল সেই প্রোটনের গতিপথ হ'ল চিত্রের তীরচিহ্নিত রেখাটি।

চিত্র (2)—উপর থেকে গামা ফোটন এসে এক জোড় ইলেক্‌ট্রন সৃষ্টি করল। চুম্বকীয় বলক্ষেত্রে পজিটিভ ও নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রন বিপরীত দিকে বেঁকে গেল।

চিত্র (3)—এখানে উইলসনকক্ষে এক্‌স-রশ্মি ফোটনের পথ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফোটনের পথে অ্যাটম ভেঙে ভেঙে যে সব ইলেক্‌ট্রন জন্মাচ্ছে তারাই ফোটনের পথ দৃষ্টিগোচর করাচ্ছে।

(খ) ফোটন ও ইলেক্‌ট্রনের তরঙ্গ-প্রকৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষা।

(1) ব্যতিচার। (এ দেখানো হয় নি)।

(2) ব্যাবর্তন।

আলোক-তরঙ্গ একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে গিয়ে ব্যাবর্তনের একটি রূপ সৃষ্টি করেছে। একটি সংকীর্ণ গুচ্ছের এক্‌স-রশ্মি বা ইলেক্‌ট্রন-ধারা স্ফটিকচূর্ণের মধ্য দিয়ে চ'লে অনুরূপ ব্যাবর্তন-সজ্জা তৈরী করছে।

চিত্র (1)—জলের উপরিভাগে চলন্ত তরঙ্গ বাধা পেয়ে যে রূপ নিয়েছে।

চিত্র (2)—দৃশ্য আলোক একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে চলার ফলে ব্যাবর্তনজনিত যে রূপ নিয়েছে।

চিত্র (3)—স্ফটিকচূর্ণের মধ্য দিয়ে যাবার ফলে এক্‌স-রশ্মি-ফোটনের ব্যাবর্তনজনিত রূপ।

চিত্র (4)—ইলেক্‌ট্রনগুচ্ছ স্ফটিকচূর্ণের মধ্য দিয়ে যাবার ফলে যে ব্যাবর্তন ঘটেছে, সেই ব্যাবর্তনজনিত রূপ।

তত্ত্বীয়-আলোচনা

প্রাকৃতিক ঘটনার পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে আমাদের এতদিনের যে প্রকাশ-ভঙ্গি ছিল, ইলেক্‌ট্রন ফোটনের এই দুর্জ্ঞেয় দ্বৈতরূপ তাতে বাধা ঘটাল। এরা কণিকা না তরঙ্গ তা নির্ভর করছে যে যন্ত্র নিয়ে আমরা পরীক্ষা করছি তারই উপর। আজও অবধি এমন পরীক্ষা খুঁজে পাওয়া গেল না যাতে একই সঙ্গে এর দু'রকমের রূপ ধরা পড়ে। সুতরাং ওই রশ্মি যাত্রা করল আর আমাদের যন্ত্রে তা ধরা পড়ল, দুই-এর মাঝে এর প্রকৃত রূপটি যে কি সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যেমন ধরা যাক, মেঘকক্ষ, ফটোগ্রাফি প্লেট, গাইগার গণক নিয়ে যদি পরীক্ষা করা যায় তবে এর কণিকারূপ ধরা পড়বে ; আবার এর তরঙ্গ-প্রকৃতি দেখা দেবে যদি (ক) একে দুটি ক্ষুদ্র রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে ফটোগ্রাফি প্লেটে ফেলা যায় যেখানে ব্যতিচার হচ্ছে, অথবা (খ) স্বল্পপরিমিত স্ফটিকচূর্ণের মধ্য দিয়ে যদি একে চালনা করা যায়, যেখানে হচ্ছে ব্যাবর্তন।

ইলেক্‌ট্রন ফোটনের যাত্রা করা আর তাদের যন্ত্রে এসে পৌঁছান, এই দুই-এর মাঝে ওদের সঠিক অবস্থাটা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় থেকে যাবে, বোর এই কথা বললেন। কিন্তু কোয়ানটম মতবাদের প্রবর্তক প্ল্যাঙ্ক ও আইনস্টাইন এবং তাঁদের মতাবলম্বীরা এর প্রতিবাদ ক'রে বললেন যে, ওই অজ্ঞেয়বাদ কোন কাজের কথা নয়। পদার্থবিদ্যাবিদ্‌কে বিশ্বাস করতেই হবে যে যন্ত্রে ফেলে মাপা হোক বা না হোক, ওই ইলেক্‌ট্রন-ফোটনের যন্ত্রনিরপেক্ষ একটি নির্দিষ্টরূপ সত্তা ও রূপ আছে, তবে তা কি, আজও আমরা তার হদিস পাচ্ছিনে।

বরন্, হাইসেন্‌বার্গ, পাউলি, হাইটলার, প্রভৃতি নবীন বিজ্ঞানীদল, যাঁরা আইনস্টাইনকে গুরু ব'লে মেনে থাকেন, তাঁরা কিন্তু বোর-এর কথাতেই সায় দেন।

চাঁদে উঠব কেন

পরিমল গোস্বামী

রাশিয়ানরা ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৭, তারিখে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ (স্পুটনিক-১) পৃথিবীর আকর্ষণ-সীমার বাইরে কক্ষপথে পাঠাতে সমর্থ হয়। এটি একটি গোলক।

এ যুগকে তাই স্পুটনিকের যুগ বলা হয়। তার আগে হাজার বছরের কল্পনা এবং আকাশপথে হাউই ছোঁড়ার ইতিহাস আছে। স্পুটনিকের অব্যবহিত আগের ধাপ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকের ভী-টু নামক রকেট।

মানুষের প্রকৃতিকে জানবার এবং তাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা মানুষের আবির্ভাবের পর থেকেই। কিন্তু সংস্কার এবং ভাবাবেগ বর্জন ক'রে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ রীতিতে প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করবার পদ্ধতি এসেছে অনেক পরে। বিনা যন্ত্রে শুধু দিনের পর দিন আকাশে তাকিয়ে থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান গ'ড়ে উঠেছে। রাশি ভাগ করা হয়েছে, বছর মাস সপ্তাহ দিন চিহ্নিত করা হয়েছে, ক্যালেণ্ডার তৈরি হয়েছে, গ্রহের অবস্থান নির্ণীত হয়েছে, চাঁদের মাসিক অবস্থান, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, গ্রহণ, প্রভৃতি কত জিনিস জানতে পারা গেছে।

তার পর এল দূরবীন। আগেকার কয়েকটি ধারণা উল্টে গেল দূরকে কাছে এনে দেখার ফলে। গ্যালিলিও আকাশের বাসিন্দাদের নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। কিন্তু নতুন কিছু বলতে গেলে আগে খুব সহজে পার পাওয়া যেত না। গ্যালিলিও বললেন, এতকাল যে লোকে জেনে এসেছে, পৃথিবী স্থির আছে আর সূর্য ঘুরছে, সে কথা ঠিক নয়, তার উল্টোটা ঠিক। এ কথায় তিনি শাস্তি পেলেন অতি কঠোর, কিন্তু পৃথিবী আর অন্য গ্রহেরা সেই থেকে সূর্যের চারদিকে নিয়মিত ঘুরে আসছে, সূর্য স্থির আছে। অবশ্য পরে আরও জানা গেছে, সূর্য নিজেও পাক খাচ্ছে তার অক্ষে। পৃথিবী একবার পাক খায় প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায়, কিন্তু সূর্যের পাক খেতে লাগে সাতাশ দিন। পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ করতে লাগে এক বছর, কিন্তু সূর্য তার ন'টি গ্রহকে নিয়ে তার নিজের কক্ষপথে ঘুরছে। সে কিন্তু পার্থিব এক বছরের ব্যাপার নয়, একটি মহাজাগতিক বছর লাগে কক্ষ-পরিক্রমায়। সেটা পার্থিব হিসেবে মাত্র ২৫ কোটি বছর।

যাই-হোক, তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানে নতুন মত প্রবল বাধা পেয়েছে, কারণ ধর্মীয় মতের সঙ্গে তা মেলেনি। বিজ্ঞানের অন্য কোনো বিভাগ কিন্তু এমন গোঁড়ামির বাধা পায়নি—একমাত্র বিবর্তন-বিজ্ঞান ছাড়া। যদিও গ্যালিলিও যে বাধা পেয়েছিলেন, তার তুলনায় তা তেমন কিছু নয়।

কিন্তু আকাশ-পথে মানুষের মতবাদের বাধার শক্তি আর কতটুকু? আকাশ নিজেই যে কঠিন বাধা সৃষ্টি ক'রে ব'সে আছে! মহাকর্ষের বাধা, বাতাস-হীনতার বাধা, ওজন-হীনতার বাধা, আরও কত রকম বাধা। প্রথমে যদি বা আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠা গেল, ওজন-হীনতা বাতাস-হীনতার বাধাও দূর করা গেল, তখন শূন্য থেকে ভূতেরা পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করবে। নিশানা হয় তো ঠিক নেই, কোনোটাই মাথায় লাগল না, তখন মার আরম্ভ হ'ল মহাজাগতিক রশ্মির। সে রশ্মি তরঙ্গজাত রশ্মি নয়, সে হচ্ছে হাল্কা মৌলের পরমাণু-কেন্দ্র—মহাজগতের গভীর প্রদেশ থেকে প্রবল বেগে ছুটে চলেছে চতুর্দিকে। সে কি বিষম বেগ তা আমরা কল্পনা করতে পারব না। পৃথিবীর হাওয়া এই আক্রমণ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে দিচ্ছে, এবং সে নিজে ভীষণ মার খেয়েও আমাদের রক্ষা করছে। তা ভিন্ন এক্স রশ্মি, ইনফ্রারেড রশ্মি এবং আলট্রাভায়োলেট রশ্মির হাত থেকেও আমরা রক্ষা পাচ্ছি ঐ বাতাবরণের জন্যই। এই পরম বন্ধু হাওয়ার সীমা ছাড়িয়ে গেলে, কে শূন্যচারী মানুষের রক্ষার ভার নেবে?

মানুষের অগ্রগতি আজ এমন একটি প্রশ্নে এসে ঠেকেছে। খুবই বিস্ময়কর। এতদূর যে আসা যাবে, তা তার কল্পনারও অগোচর ছিল একদিন। কত হাজার বছরের সভ্যতা মানুষের। কিন্তু এই হাজার হাজার বছর ধ'রে আধুনিক বিজ্ঞান বলতে যা বোঝায়, তার পথের সন্ধান সে পায়নি। কিন্তু পাবামাত্র হঠাৎ তার প্রায় সকল স্বপ্ন অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। বাষ্পশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক বিরাট্ বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। মানুষের প্রতিকৃতি কাগজে ধরা, কণ্ঠস্বর কলে ধরা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, সিনেমা, এক্স-রশ্মি, সিনেমায় কথা বলা, মোটর, বেতার, রেডিও, বিমান, ইত্যাদি এখন এমন পরিচিত হয়ে গেছে যে ওর মধ্যে যে কিছু বিস্ময় থাকতে পারে এখন আর মনেই হয় না। কিন্তু ভাবতে বসলে এখনও ধারণা করা যায় না, কি ক'রে এসব সম্ভব হ'ল। তার পর বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—পরমাণুর সন্ধান পাওয়া এবং তার কেন্দ্র বিদীর্ণ ক'রে এক প্রচণ্ড তেজ মুক্ত ক'রে দেওয়া। এ তেজের ধ্বংসক্ষমতার পরীক্ষা হয়ে গেছে, কল্যাণক্ষমতা এখনও অপরীক্ষিত।

বিস্ময়ের সীমা কোনোদিকেই নেই। তবু মহাশূন্যের বিস্ময় এমন বিরাট্ যে তার অধিকাংশই অঙ্কের চিহ্ন ভিন্ন অন্য কোনোভাবে বোঝা যায় না। ধারণার অতীত একেবারে। আর এই শূন্য-পথে ওড়ার চেষ্টাতেই মানুষ সবচেয়ে বেশি দুর্দশা ভোগ করেছে। এ দুর্ভোগ যেমন মানুষের হাতে (যেমন, পূর্বে গ্যালিলিওর কথা বলা হয়েছে), তেমনি আকাশের হাতে। আকাশ মানুষের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেনি। এখনও করছে না।

কিন্তু আকাশের দিকে যখন মানুষের মনোযোগ এখন অনেক বেশি আকৃষ্ট হয়েছে, তখন তাকে আর ঠেকানো যাবে ব'লে মনে হয় না। তবে গ্রহগ্রহান্তরে যেমন-খুশি ঘুরে বেড়ানোর কল্পনা এখনও প্রায় অলীক কল্পনার স্তরেই আছে। চাঁদে না পৌঁছনো পর্যন্ত তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। শুধু পৌঁছনো নয়, ফিরে আসার কথাটাও কম জরুরি নয়। এইটে অভ্যাস হয়ে গেলে তবে দূরদূরান্তে পাড়ি জমানোর কল্পনা হয়তো সফল হতেও পারে। মানুষের বুদ্ধির যে রকম দ্রুত উন্মেষ ঘটছে, তাতে এখন আর এসব রূপকথা বা সায়েন্স-ফিকশনের স্তরে নেই; সম্ভাবনার স্তরে পৌঁছেছে। হয়তো যথাসময়ের একটু আগেই পৌঁছেছে, এই যা। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মনে এ বিষয়ে যে সন্দেহই থাক, জনসাধারণের মনে কোনো সন্দেহই নেই। তারা কিছুকাল ধ'রেই, চাঁদে যাবার সম্ভাবনার কথা শোনামাত্র, মহাশূন্যযাত্রী জাহাজের টিকিট কেনার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠছে।

অনেকে নক্ষত্র-ভ্রমণের কথাও উচ্চারণ করে। অবশ্য এ বিষয়ে যথাযথ ধারণা না থাকাতেই করে। নক্ষত্রের ত্রিসীমানায় কোনো বস্তু সাকার থাকতে পারে না। প্রচণ্ড উত্তাপে সব গ্যাস হয়ে যাবে—অথবা মূল পরমাণু, অথবা তাও ভেঙে বিদ্যুৎ কণিকায় পরিণত হবে। কি প্রচণ্ড উত্তাপ তার ধারণাও করা সম্ভব নয়, একমাত্র অঙ্কের সংখ্যা দে'খে যেটুকু বোঝা যায়। ঈশ্বর যদি থাকেন তবে তিনি সর্বব্যাপী, এ রকম কথা বলা হয়। কিন্তু তা যদি হয় তবে তিনি এই অনন্ত কোটি সূর্যের উত্তাপ সহ্য করেন কি ক'রে? সেও আবার স্থির সূর্য কোনোটাই নয়। প্রত্যেকটি ঘূর্ণায়মান এবং কক্ষ-পরিভ্রমণকারী সূর্য, যার সংখ্যা শুধু আমাদের বিশ্বেই ১৫ হাজার কোটি। এ রকম হাজার হাজার কোটি সূর্য সম্বলিত বিশ্ব মহাশূন্যে কত যে আছে তার হিসেব করা দুঃসাধ্য। রেডিও-টেলিস্কোপ এই-সব দূর-দূরান্তের বিশ্ববার্তা কিছু কিছু সংগ্রহ করতে সুরু করেছে সম্প্রতি। নিশ্চিত জানা গেছে, বিশ্বে বিশ্বে সংঘর্ষও চলছে প্রচণ্ড। এমন অবস্থায় সর্বব্যাপী ঈশ্বরের কি অবস্থা, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সর্বাঙ্গে আগুন জ্বালিয়ে এ কি খেলা!

এ সবই মানুষের কল্পনার বাইরে। যেমন কল্পনার বাইরে—বিশ্ব সৃষ্টি হ'ল কি ক'রে, এর আদি ইতিহাস কি। কেউ বলছেন, অণ্ড থেকে বিশ্ব সৃষ্টি হ'ল। অণ্ড অর্থাৎ প্রকাণ্ড একটা আদিম পরমাণু—প্রাইমিভ্যাল অ্যাটম। তার বাইরে স্থান এবং কাল কিছুই ছিল না। স্পেস ও টাইম ঐ অণ্ড ফাটার পরে জন্মেছে। এঁদের বলা হয়েছে বিবর্তনবাদী। আর একদল বলেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আদিহীন। মহাজাগতিক ধূলি ও গ্যাস থেকে এক-একটা জগৎ রূপ নিচ্ছে, আবার লয় পাচ্ছে। একটা ভাঙছে, আর একটা জন্ম নিচ্ছে। মোটের উপর যা ছিল তাই থেকে যাচ্ছে।

এঁরা স্টেডি-স্টেটবাদী। এ ছাড়াও আরও অনেক মতবাদ আছে। কিন্তু কি যে সত্য, তা কে জানবে? এ এক মহা বিস্ময়—যেমন বিস্ময় পরমাণু-জগৎ, তেমন বিস্ময় বিশ্বব্রহ্ম-জগৎ। তাই তো বিশ্বপরিচয়ের লেখক মহাকাশের-গ্রহনক্ষত্রের কথা লিখেও এ বিস্ময়ের শেষ পেলেন না, তাই তিনি আমাদের মনের সকল বিস্ময়কে মুখর ক'রে গেয়ে উঠলেন:

"আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"......

কিন্তু এ গান শেষ করামাত্র গানের মোহ ভুলতে হবে। চাঁদে উঠতে হবে যেমন ক'রে হোক। দূরদৃষ্টির অনেক বাধা তাহলে চ'লে যাবে। অবশ্য এর মধ্যে স্পোর্টের অংশও কম নেই—অভিনবত্বের আনন্দশিহরণ, দুর্লঙ্ঘ্যকে লঙ্ঘন করার গৌরব, ইত্যাদি। আসল উদ্দেশ্য—অজানাকে জানার চেষ্টা, জ্ঞানের রাজ্য বিস্তার করা।

সূর্যের জন্ম যখন হয়েছে, তখন মৃত্যু তো একদিন ঘটবেই। শেষ হবার আগে সূর্য ক্রমে কেঁপে উঠবে, 'লাল দৈত্য' নাম পাবে, প্রাণীদের পোড়াবে, গ্রহদের পোড়াবে এবং দশ কোটি বছর চলবে তার ধ্বংসের খেলা। তার পর আত্মধ্বংস। ক্রমে আকারে আরও বাড়বে এবং ধক্‌ধক্‌ জ্বলতে থাকবে। তার পর বিপুল বিস্ফোরণ এবং পরে 'শ্বেত বামন'-এ পরিণতি।

সূর্য ও গ্রহের জন্ম ও মৃত্যুর ইতিহাস
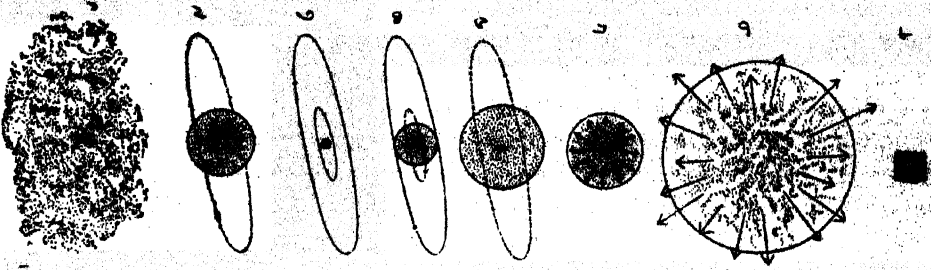
১। মহাশূন্যে ব্যাপ্ত মহাজাগতিক ধূলিকণা ও গ্যাস।
২। ঐ ধূলি ও গ্যাস ঘনীকৃত হয়ে প্রথম তারা ও গ্রহের সৃষ্টি।
৩। তারা এখন মুখ্যক্রমে স্থিত। এর আয়ু ৮০০ কোটি বছর।
৪। তারাটি মুখ্যক্রম অতিক্রম ক'রে লাল দৈত্যে পরিণত।
৫। তারাটি এখন আরও বড় হয়েছে। গ্রহে আর প্রাণীর চিহ্ন নেই—সব জ্বলে পুড়ে গেছে। ৪র্থ ও ৫ম অবস্থার মোট আয়ু প্রায় ১০ কোটিবছর।
৬। তারা এখন ধুঁকছে।
৭। আয়তন ও দীপ্তি বহুগুণ বর্ধিত। এর নাম এখন নবতারা।
৮। কালো অংশের ভিতরে ছোট শাদা তারাটি এর চরম পরিণতি। এর নাম এখন শ্বেত বামন।

অথবা অতদূর যাবার দরকার কি? আমাদের সূর্য্য গবর্মেণ্ট-রেজিষ্টার্ড সূর্য রূপে পরিচিত থাকা কালেই এই পৃথিবীতে পঞ্চম আর একটি তুষার যুগ আসতে পারে, এমন কথা বলছেন বিজ্ঞানীরা। উত্তর মেরু থেকে চারদিকে তুষার ঠেলে চ'লে আসবে, তখন উত্তরের লোকেরা পালাবে কোথায়? উদ্বাস্তু হয়ে দক্ষিণ দিকে চ'লে আসবে, কিন্তু খাবে কি? হয়তো ততদিনে মানুষ প্রকৃতি-শক্তিকে আরও আয়ত্ত করবে, প্রতিকূলতার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করবে। অথবা মেরু-বরফ গলতে আরম্ভ করলে সমুদ্রের জল যখন ক্রমে উঁচু হতে থাকবে তখন কি হবে? মানুষ আবার তার আদি অবস্থা মাছের জীবনে ফিরে যাবে কি? কিন্তু আরও দূর ভবিষ্যতে, বহু লক্ষ কোটি বছর পরে, যখন সূর্য, গ্রহ, সব লোপ পাবে, সেই শেষের দিনের কথা স্মরণ ক'রে আজ থেকেই কি আমাদের দুশ্চিন্তা আরম্ভ হয় নি? অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না, এমন প্রাণ-কণিকা থেকে বিবর্তনের পথে পৃথিবীর প্রাণীকুলের চরম সৃষ্টি এই মানুষের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা দূরের কথা, হানাহানি, হিংসাদ্বেষও থাকবে না, এমন অবস্থা কল্পনা করতেও ভয় হয়। এত আয়োজন কি সব শূন্যে মিলিয়ে যাবে? এ কল্পনায় মন খারাপ হয় বৈ কি। মানুষ জীবন বা সম্পত্তি বীমা করে যে উদ্দেশ্যে, আমরা সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের লক্ষ কোটি বছরের ভবিষ্যৎটা বীমা করতে চাই।

কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব ? কি জাতীয় প্রোপেলার দিলে তবে তা সম্ভব ? মহাশূন্যে যতটা পারা যায় উঠে উঠে দেখতে হবে, বহু লক্ষ কোটি বছর পরেও পৃথিবীটাকে বাঁচানোর কোনো উপায় আছে কিনা। মানুষের মহাশূন্য-অভিযানের ইচ্ছার পিছনে তার অবচেতন মনে এই সব দুশ্চিন্তা আছে অবশ্যই। তাই সে প্রথমত: আন্তগ্রহিক আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞানীদের আগে ধারণা ছিল, আমাদের সূর্যের পাশ দিয়ে আর একটি সূর্য পার হয়ে যাবার সময় আকর্ষণে সূর্য-দেহ থেকে গ্রহবস্তু বেরিয়ে এসেছিল। অ্যাডামের বুকের হাড় থেকে ঈভের জন্মের মতো। কিন্তু বর্তমানের বিজ্ঞানীরা এটা মানতে পারছেন না। তাঁরা বলেন মহাজাগতিক গ্যাস ও ধূলি পিণ্ডাকার হতে হতে যখন আপন চাপে সেই পিণ্ডের অন্তর জ্ব'লে উঠল তখন হ'ল সূর্যের সৃষ্টি। আশেপাশে প্রচুর উদ্বৃত্ত মহাজাগতিক গ্যাস ও ধূলি ছিল, তারা ছোট ছোট আকারে গ্রহরূপে সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে সৌরজগৎ রচনা করল।

কিন্তু এটি ব্যাখ্যার আধুনিক রূপ হলেও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এটি অবশ্যই নয়। এটি আদৌ ব্যাখ্যা কিনা তাও বলা যায় না। আরও পরে হয়তো আরও অনেক তথ্য জানা যাবে। কিন্তু গ্রহসৃষ্টির ব্যাপারটা যত সহজে বলা হ'ল, তত সহজ অবশ্যই নয়। তারা সবাই angular momentum বা কৌণিক ভরবেগ পেয়ে একই প্লেনে একই রকমে ঘুরছে কেন, তার ব্যাখ্যা গ্রহসৃষ্টির শেষ ব্যাখ্যার সঙ্গে অনেকখানি সম্পর্কিত হলেও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়।

যাই হোক, আমাদের সূর্য অন্যান্য অধিকাংশ নক্ষত্র থেকে অনেক ভদ্র। সে অতিকায় নয়, তার তেজ বিকিরণ অতি নয়, অতএব তার আয়ু অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে, যত বেশিই হোক, আয়ু একদিন তো ফুরিয়ে যাবেই, তখন আমাদের সেই বহু লক্ষ কোটি বছর পরের বংশধরেরা কেউ বেঁচে থাকবে না, এর প্রতিকার চিন্তা আজ থেকেই যদি আমরা না করি, তবে ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের কর্তব্যে ত্রুটি থাকবে।

মহাশূন্যের পথ অনেকটা নিরাপদ্ হলে কত কি যে জানা যাবে, তা ভেবে বিজ্ঞানীরা এখন থেকেই উল্লসিত। একটা বড় দূরবীন নিয়ে একবার চাঁদে পৌঁছতে পারলে হয়। তার আগে এই পৃথিবীতেই রেডিও-টেলিস্কোপ নামক বিরাট কান তৈরি হয়েছে মহাকাশের বাণী শোনার জন্য। কত যে গোপন খবর লক্ষ কোটি আলোক-বৎসর দূর থকে সেই কানে এসে পৌঁছচ্ছে তার হিসেব নেই। এর সঙ্গে বায়ুর পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত কোনো স্থানে প্রতিফলক টেলিস্কোপ বসাতে পারলে চক্ষু এবং কর্ণ দুইয়ের মধ্যে যদি কোনো বিবাদ্ থেকে থাকে তবে তা মিটে যাবে অনেকখানি।

মনে করা যাক, আমাদের সূর্য যেদিন নোটিস দেবে, 'আমার জড়ত্ব এসে গেছে, তোমরা এখন নিজেদের পথ দেখ,' সেদিন মানুষ কি করবে ? অন্য নতুন সূর্যকে ডেকে এনে বসাবে তার জায়গায় ? বৃদ্ধ সূর্যকে রিটায়ার করিয়ে দেবে ? কিন্তু তা সম্ভব নয়। সূর্যের তেজ কমলেও, এমন কি নিবে গেলেও স্থান ছাড়তে রাজি হবে না। এমন অবস্থায় আর একটি বিকল্প ব্যবস্থা কল্পনা করা যাক। যদি দেখা যায় কোনো নবীন সূর্য তার প্রয়োজনীয়-সংখ্যা গ্রহ পায়নি, এবং আমাদের পৃথিবীর মতো একটি গ্রহকে তার কোনো একটি কক্ষে গ্রহণ করার মতো স্থান খালি আছে, এবং বোঝা যায়, সেখানে আমাদের পৃথিবীটাকে নিয়ে পৌঁছে দিতে পারলে এখানকার সূর্যের মতোই আলো এবং উত্তাপ পাবে, তা হলে সে চেষ্টা করা যেতে পারে। অবশ্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সমেত সেখানে নিয়ে যাবার কোনো উপায় বার করতে হবে। আপন কক্ষ ছাড়ানো খুব কঠিন কিন্তু এমন কল্পনা করতে বাধা কোথায় ? সৌরজগতের সঙ্গে তুলনা করা হয় পরমাণুর গঠনকে। মাঝখানে কেন্দ্র বা অতি-পরমাণু (এটি নিউক্লিয়াসের রবীন্দ্রনাথকৃত পরিভাষা) তার চারদিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনসমূহ। এই ইলেকট্রনের আপন কক্ষ ত্যাগ ক'রে যাওয়ার অভ্যাস পরমাণু সৃষ্টির আদি থেকেই। তা যদি হয় তবে সৌরজগৎ-রূপ পরমাণু থেকে পৃথিবী-রূপ একটি ইলেকট্রন কক্ষ ত্যাগ করলে খুব বেআইনি হবে ব'লে মনে হয় না।

এইভাবে পৃথিবীকে নতুন সূর্যের কোনো 'টু-লেট' ঝোলানো কক্ষে চালান ক'রে দেবার স্বপ্ন দেখছি। হয়তো সেই সূর্য প্রথমে এই নতুন গ্রহটার গা শুঁকে দেখবে, ঠকিয়েছে কি না। যদি বোঝে, গ্রহটি আত্মীয় হবার যোগ্য নয়, তা হলে গোঁফ ফুলিয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ আওয়াজ করতে থাকবে, তার পর আস্তে আস্তে গা-সহা হয়ে যাবে এবং পরে আদর ক'রে গা চাটতে থাকবে।

এ রকম কোনো উদ্দেশ্য সাধন আদৌ হবে কি না তা আজকের দিনে আমাদের যুক্তিসঙ্গত কল্পনার বাইরে। আজ মহাশূন্য-অভিযানের আরম্ভ মাত্র, এবং এখনও (সেপ্টেম্বর, ১৯৬০) মানুষ গ্রহান্তরে যেতে পারে নি। চাঁদে একটি রকেট পৌঁছেছে মাত্র। কিন্তু তবু মহারহস্যের দরজার কাছে তো আসা গেছে, দরজা খোলার শব্দও আসছে কানে। সম্মুখে অসীম সম্ভাবনা।

১

রঘুনাথ তালুকদার ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইয়াছিল। ভাগ্যলিপি ললাটেই লেখা থাকে, ইহাই জনশ্রুতি, কিন্তু ইহাও সুবিদিত যে, সে লিপির অর্থ কোথায় সার্থক হইবে তাহা অন্বেষণ-সাপেক্ষ। যাহার জন্ম বঙ্গদেশে, তাহার ভাগ্য হয়ত বোম্বাই শহরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। যাহার জন্ম শহরে, তাহার ভাগ্যোদয় হইল হয়ত অরণ্যে। যে সব ভাল ছেলে একের পর এক পরীক্ষার বেড়াগুলি কৃতিত্ব সহকারে উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে সাফল্যের সম্মুখীন হয়, রঘুনাথ সে দলের ছেলে নয়। সে একটা পরীক্ষাতেও পাস করিতে পারে নাই। পাঠ্য পুস্তকগুলির কাঠিন্য এবং বুদ্ধির দুর্ব্বলতাই যে কেবল তাহার সাফল্যের অন্তরায় হইয়াছিল তাহা নয়, তাহার পিতামহ, পিতামহী এবং পিসীমাও বাণী-মন্দিরের পথে উত্তুঙ্গ বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বদ্ধ ধারণা ছিল, রঘু রামায়ণ-মহাভারতটা যদি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে তাহা হইলেই শিক্ষার চরম হইল, স্কুল-কলেজে পড়িয়া আর কি হইবে? ওই ত ঘোষেদের বাড়ীর ক্যাবলা এম-এ পাস করিয়াও ক্যাবলাই থাকিয়া গিয়াছে, একটি পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে না, নানারকম কিম্ভূতকিমাকার পোষাক পরে আর চালিয়াতি করে। বস্তু কিছু নাই। তাঁহারা আরও বলিতেন, রঘুর ভাবনা কি? তাহার দাদা প্রভু নিশ্চয় রঘুকে ত্যাগ করিবে না। সে শ্বশুরবাড়ী হইতে যে বিষয় পাইয়াছে তাহাতে দুই ভাইয়ের হাসিয়া-খেলিয়া সারাজীবন চলিয়া যাইবে। রঘুর পিতামহ, পিতামহী এবং পিসীমা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন সত্যই রঘুর হাসিয়া-খেলিয়াই চলিয়াছিল। সে গাছে চড়িত, পুকুরে সাঁতার দিত, বন্দুক দিয়া পাখী শিকার করিত, ফুটবল খেলিত, যে কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অগ্রণী হইত এবং রামায়ণ শুনিত। রামায়ণ পড়িবার মতো বিদ্যা তাহার ছিল না, পাড়ার ঠাকুর-মহাশয় প্রত্যহ রামায়ণ পাঠ করিতেন, তাহাই শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়া রঘুর চিত্ত-সংস্কার করিত।

এইভাবে কিছুদিন বেশ চলিল। কিন্তু পিতামহ-পিতামহী-পিসীমা কেহই অমর ছিলেন না। যথাকালে তাঁহারা সাধনোচিত ধামে গমন করিলেন। পিসীমাই সর্ব্বশেষে গেলেন। তখন রঘুর বয়স বাইশ বৎসর। অতঃপর

প্রভুর স্বরূপ প্রকটিত হইল। দেখা গেল, তিনি মহাপ্রভু। সংক্ষেপে একদিন বলিয়া দিলেন—বাপের পয়সা খরচ করিয়া এতদিন তোমাকে অনেক খাওয়াইয়াছি, পরাইয়াছি, তোমার অনেক অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছি। আর করিব না। এইবার তুমি নিজের রাস্তা দেখ।

রঘুনাথ সহজে নিজের রাস্তা দেখে নাই। প্রভুর ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষ্যাক্লিষ্ট এক উকিলের সহায়তায় প্রায় বিনা খরচে মামলা-মোকদ্দমাও করিয়াছিল, কিন্তু কিছু হয় নাই। প্রভুর শ্বশুর কন্যাকে যাহা দিয়াছিলেন তাহা কন্যার নামেই স্ত্রী-ধন স্বরূপ দিয়াছিলেন, রঘু তাহার কিছুই পাইল না। রঘুর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল বসতবাড়ীখানি এবং তিন বিঘা ধেনো জমি। তাহারই অর্দ্ধাংশ সে পাইল। কিন্তু এরূপ হৃদয়হীন দাদা-বৌদিদির সান্নিধ্য রঘু সহ্য করিতে পারিল না। সে তাহার অংশটুকু উক্ত উকিলকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া একদিন বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। উকিল মহাশয় তাঁহাকে পাঁচশত টাকা মাত্র দিয়াছিলেন।

এই পাঁচশত টাকা সম্বল করিয়া রঘু নানা স্থানে ঘুরিল, নানা ঘাটের জল খাইল, নানা লোকের সহিত আলাপ করিল। দেখিল, রামায়ণে যদিও রামকে আদর্শ পুরুষ বলা হইয়াছে এবং এদেশে রাম-মহিমা যদিও বহুকাল হইতে কীর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু কার্য্যকালে কেহই রামের মতো হইতে চায় না। রাবণের মতো হইবার দিকেই সকলের বেশী ঝোঁক। সকলেই ধন চায়, মান চায়, প্রতিপত্তি চায়, সকলের উপর—এমন কি ইন্দ্র চন্দ্র অগ্নি বরুণের উপরও প্রভুত্ব করিতে চায়। পর-স্ত্রীকে হরণ করিয়া বা ফুস্‌লাইয়া ভোগ করিবার ইচ্ছা বেশীর ভাগ লোকেরই। এই নিদারুণ সত্য আবিষ্কার করিয়া রঘু কিন্তু দুঃখিত হইল না, তাহার মনেও বাসনা জাগিল, সে-ও রাবণ হইবে। যেদিন এ বাসনা তাহার মনে জাগিল সেদিন সে দেখিল, তাহার পকেটে মাত্র একটি আড়ময়লা দশ টাকার নোট আছে। মাত্র এই সম্বল লইয়া রাবণ হওয়া যায় না। অনতিবিলম্বে অমিত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে হইবে। কিন্তু কিরূপে? বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে সহসা তাহার চমকলালের কথা মনে পড়িল। কিছুদিন পূর্ব্বে সে তাহাকে একটি পত্রও লিখিয়াছিল। তাহার ঠিকানাটা জানা আছে। তাহার কাছে গেলে কেমন হয়? সে নাকি 'বিজনেস্' করিয়া লাল হইয়াছে এবং সকলকে চমকাইয়া দিয়াছে। সার্থক-নামা ব্যক্তি। পুরাতন বন্ধুও। রঘুনাথ তাহার নিকট যাওয়াই স্থির করিল।

চমকলালের সহিত রঘুনাথের ঘনিষ্ঠতার আদি কারণ লোভ। চমকলাল বৈষ্ণববংশের সন্তান। তাহাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় মাছ-মাংসের নামোচ্চারণ পর্য্যন্ত করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু কুসঙ্গে মিশিয়া চমকলাল মাছ-মাংসের স্বাদ পাইয়াছিল। সুবিধা পাইলেই লুকাইয়া-চুরাইয়া ওই নিষিদ্ধ আমিষগুলি সে সানন্দে ভক্ষণ করিত। কিন্তু তাহার সবিশেষ লোভ ছিল পক্ষীমাংসের প্রতি। এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিত রঘুনাথ। রঘুনাথ পক্ষী শিকারে সিদ্ধহস্ত ছিল। রঘুনাথেরও পক্ষী লইয়া বাড়ীতে যাইবার উপায় ছিল না। কারণ পিতামহী অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। সুতরাং পক্ষী শিকার করিয়া প্রায়ই তাহা বাগানে, মাঠে বা ঝিলের ধারে ঝলসাইয়া গলাধঃকরণ করিতে হইত। চমকলাল এইভাবে এককালে অনেক ঘুঘু-পোড়া খাইয়াছে। রঘুনাথ ঘুঘুই বেশী শিকার করিত, হাঁস, তিতির বা হরিয়াল বড় একটা জুটিত না। ঘুঘুর মাধ্যমে উভয়ের প্রণয়টা বেশ জমাট বাঁধিয়াছিল।

চমকলাল বলিল, "তোকে ত এক্ষুণি একটা খুব ভাল কাজ দিতে পারি, কিন্তু তুই পারবি কি?"

"পারব না কেন, কি কাজ—"

চমকলাল কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরদৃষ্টিতে রঘুনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "কিছু বলবার আগে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আমার কাজ যদি ভাল না লাগে ছেড়ে দিতে পার, কিন্তু আমাদের কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করতে পাবে না। যদি কর প্রাণ যাবে। এতে রাজি?"

"প্রাণ যাবে?"

"প্রাণ যাবে। তোমারও যাবে, আমারও যাবে—"

"কি রকম রোজকার হবে এতে?"

"বছরখানেকের মধ্যেই লক্ষপতি হতে পারবে।"

"বলিস্ কি? রাজি আছি। প্রতিজ্ঞা করলাম আমার দ্বারা কখনও কিছু প্রকাশ হবে না।"

"তামা-তুলসী-গঙ্গাজল ছুঁয়ে শপথ করতে হবে।"

রঘুনাথ তাহাই করিল। তারা-তুলসী-রমাকান্ত চমকলালের বাড়ীতেই ছিল।

তখন চমকলাল বলিল—"আমাদের কাজ হচ্ছে নোট জাল করা। জর্মানি থেকে ভাল মেশিন আনিয়েছি। দশ টাকার নোটই জাল করছি এখন। কিছুদিন পরেই একশ' টাকার নোটে হাত দেব। নোট ম্যানুফ্যাকচার হয় এক জায়গায় আর সেগুলোকে পাচার করতে হয় নানা জায়গা থেকে। তোমাকে একটা সেন্টারের চার্জে দিতে পারি। জায়গাটা বড় নির্জ্জন, সেখানে থাকবার মতো বিশ্বাসযোগ্য কোনও লোকই পাচ্ছি না।"

আমাদের কাজ হচ্ছে নোট জাল করা

"আমাকে কি করতে হবে?"

"সেখানে আমাদের একটা কাছারি আছে, সেই কাছারিতে তোমাকে ম্যানেজার সেজে যেতে হবে। কাছারি এককালে আমাদের জমিদারির কাছারি ছিল। এখন কেউ থাকে না। এর সঙ্গে নোট জালের কোন সম্পর্ক নেই। কাছেই পাহাড় আর নদী আছে। তোমার কাজ হবে, সেই নদীর উপরে গেরুয়া-রঙের পাল তোলা কোনও নৌকো আসছে কি না লক্ষ্য করা। নৌকো দেখলেই তাকে ডাকবে এবং জিজ্ঞেস করবে, খড়্কে বাটা মাছ আছে? সেটা যদি আমাদের নৌকো হয় তাহলে মাঝি বলবে—আছে, কিন্তু সবাইকে বেচি না। আপনি যদি ভাল দাম দেন, দিতে পারি। তখন তুমি তিনকোণা পিতলের চাকতিটি বার ক'রে তাকে দেখাবে। সে তৎক্ষণাৎ চাকতিটি নিয়ে একটি ছোট বাক্স তোমাকে দেবে। সেই বাক্সর ভিতর নোট আছে। বাক্সটি নিয়ে তুমি পাহাড়ের উপর চ'লে যাবে আর সেখানে একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গা আছে, সেই জায়গায় রেখে চ'লে আসবে। তার পরদিন দেখবে, বাক্সটি সে জায়গায় নেই, তার জায়গায় নগদ একশোটি টাকা রয়েছে। এই টাকাটি তোমার নগদ মজুরি। এ ছাড়া বিজনেসের শেয়ারও তোমাকে দেব। কাছারির ম্যানেজার হিসাবে দু'শো টাকা মাইনে এবং খাওয়া-দাওয়ার খরচও পাবে।"

"পিতলের তিনকোণা চাকতি কোথায় পাব?"

"আমিই দেব। নম্বর দেওয়া অনেক চাকতি আছে আমাদের। কিন্তু আর একটি অসুবিধা আছে। খাওয়ার খরচ আমরা দেব বটে, কিন্তু সেখানে চাকর বা রাঁধুনী রাখা চলবে না। স্বপাক খেতে হবে। মাইল তিনেক দূরে একটা গ্রাম আছে, সেখানে জিনিসপত্র পাওয়া যায়। একটা সাইকেল রেখো, তাহলেই সহজে আনতে পারবে। আমিই দেব একটা সাইকেল তোমাকে। একটা বন্দুক আর একটা বাইনকুলারও দেব।"

রঘুনাথ অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল।

বলিল, "এ যে উপন্যাসের মতো শোনাচ্ছে!"

"উপন্যাস ত কল্পনা, আর এটা হ'ল সত্যি। সুতরাং উপন্যাসের চেয়েও ভাল। তুই রাজি আছিস্ ত? একা নির্জ্জনবাস করতে হবে কিন্তু।"

"তুমি মাঝে মাঝে যাবে ত?"

"কখনও-সখনও যাব। আমাকে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে হয় ত, তোমার ওখানে যাবার পালা যখন আসবে তখন যাব। রাজি ত?"

"রাজি।"

২

স্থানটি রঘুনাথের বড়ই ভাল লাগিল। মনোরম স্থান। শুধু যে নদী, পাহাড় এবং আরণ্য সৌন্দর্য্যের জন্যই মনোরম তাহা নয়। রঘুনাথের মনে হইতে লাগিল, একটা অনির্ব্বচনীয়, অনবদ্য শোভা যেন চতুর্দ্দিক্ হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। সে শোভার বর্ণনা করা যায় না, তাহা চক্ষু-গ্রাহ্য নহে, সূক্ষ্মরূপে তাহা সমস্ত অনুভূতিকে আবিষ্ট করে। রঘুনাথের মনে হইতে লাগিল, সে যেন কোন দেবস্থানে আসিয়াছে। একটা অদৃশ্য মহিমা, অবর্ণনীয় পবিত্রতা যেন সমস্ত স্থানটাকে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। বড় বড় পাহাড়, বিরাট্ বিরাট্ বনস্পতি, এমন কি ওই চটুলা নদীটা পর্য্যন্ত যেন সসম্ভ্রমে কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। রঘুনাথও অভিভূত হইল।

যে কাজের জন্য রঘুনাথ আসিয়াছিল, সে কাজও বেশ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছিল। সে মাত্র একমাস আসিয়াছে, এই একমাসের মধ্যেই গেরুয়া-পাল-তোলা নৌকা বার পাঁচেক দেখা দিয়াছে। প্রথম দুইবার নৌকায় গেরুয়া রঙের পাল ছিল কিন্তু পরে সাদা পাল উড়াইয়াই নৌকা আসিয়াছে। কারণ, যে লোকটি নোটের বাক্স লইয়া আসে, তাহার সহিত জানা-শোনা হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, "নতুন লোকের কাছেই আমরা প্রথম প্রথম গেরুয়া-পাল উড়িয়ে যাই। পরে আর দরকার হয় না। বার বার গেরুয়া-পাল উড়িয়ে আসাটা নিরাপদ্‌ও নয়, পুলিসের সন্দেহ হতে পারে।"

রঘুনাথ সাধারণতঃ পাহাড়ে পাহাড়ে কাটাইত। ইহার প্রথম কারণ, পাহাড়ের উপর হইতে সমস্ত নদীটা দেখা যায়। দ্বিতীয় কারণ, ওই পাহাড়ী জঙ্গলে প্রচুর পাখী। ঘুঘু, বন-পায়রা, তিতির প্রায়ই শিকার করিত সে। দিনের বেলা রান্নার হাঙ্গামা সে করিত না। রাঁধিত রাত্রে—পাখীর মাংস আর আলোচালের ভাত। দিনের বেলাটা সে চিঁড়া-মুড়ি-দই মিষ্টি খাইয়া কাটাইয়া দিত। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া সে বন্দুক কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া পড়িত এবং সমস্ত দিন পাহাড়ে পাহাড়ে পাখীর পিছনে পিছনে ঘুরিত। বস্তুতঃ, শিকার করিবার সুযোগ না থাকিলে রঘুনাথ এই নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব স্থানে টিঁকিতে পারিত কি না সন্দেহ। এবং এই শিকারের সূত্র ধরিয়াই সে একদিন তাহার অদ্ভুত আবিষ্কারটা করিয়া ফেলিল।

রঘুনাথ সাধারণতঃ নদীর তীরের পাহাড়গুলির উপরই বিচরণ করিত। কিন্তু এ পাহাড়গুলির পিছনেও আরও অনেক পাহাড় ছিল, অনেক বড় বড় পাহাড়। রঘুনাথ মধ্যে মধ্যে ওই পাহাড়গুলির দিকে প্রলুব্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিত। তাহার মনে হইত, ওখানে নিশ্চয় আরও নানারকম পাখী আছে। সে দূরহইতে কয়েকবার ময়ূরের ডাক শুনিয়াছে। বন্য মুরগীর ডাকও শুনিয়াছে। তাহার ধারণা, ক্লরিকানও ওই জঙ্গলে নিশ্চয়ই আছে। ক্লরিকানের মাংস এক জমিদার বন্ধুর কৃপায় একবার খাইয়াছিল। চমৎকার! স্বাদটা যেন আজও মুখে লাগিয়া আছে। সে মনে মনে রোজই বলিত—ওই পাহাড়গুলো একবার ঘুরে দেখতে হবে।

একদিন সে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। যে পাহাড়ে সে রোজ ওঠে সেই পাহাড়ের গা বাহিয়া সে ধীরে ধীরে নামিতেছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, এই পাহাড় হইতে নামিয়া দুই পাহাড়ের মধ্যে যে ঘন অরণ্যটা আছে সেটা পার হইয়া ওপারের পাহাড়টায় চড়িবে। কিন্তু কিছুদূর নামিতেই বাধা পড়িল। ভয়ঙ্কর বাধা। কোথা হইতে বিরাট্ একটা গোক্ষুর সর্প আসিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। রঘুনাথ আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সাপটা কিন্তু তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল না। ফণা তুলিয়া মূর্ত্তিমান্ নিষেধের মতো একস্থানে স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিল। রঘুনাথ শিকারী মানুষ, তাহার লোভ হইল, ওটাকে খতম করিয়া দিলে কেমন হয়। দো-নলা বন্দুকে গুলী ভরাই ছিল, ফায়ার করিল। রঘুনাথের হাতের লক্ষ্য প্রায়ই অব্যর্থ হয়। কিন্তু এবার ব্যর্থ হইল। গুলী লাগিল না, সাপটাও দাঁড়াইয়া রহিল। আর একবার

ফায়ার করিল রঘুনাথ। এবারও লাগিল না। সাপটা কিন্তু ফণা তুলিয়া তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ভাবটা যেন—কতবার মারিবে মার না, দেখি তোমার দৌড় কতদূর! রঘুনাথ সভয় বিস্ময়ে সাপটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর ফায়ার করিতে সাহস করিল না। সাপটা আরও খানিকক্ষণ সেইভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে নীচের জঙ্গলে মিলাইয়া গেল। ইহার পর যে-সব বিস্ময়কর ঘটনা-পরম্পরা রঘুনাথের সাধারণ বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিল, এই ঘটনাটিতেই তাহার সূত্রপাত। কিন্তু এটিকে রঘুনাথ অলৌকিক বলিয়া একবারও মনে করে নাই। সে বিস্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে বিস্ময় সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে নাই।

দ্বিতীয় দিন রঘুনাথ পাহাড় হইতে নামিবার চেষ্টা করিল না। সে সমতলের উপর দিয়াই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী অরণ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইল। দূরবর্ত্তী যে দোকান হইতে সে প্রত্যহ খাবার আনিতে যাইত, সেই দোকানের মালিককে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, ওই বড় বড় পাহাড়গুলিতে ওঠা যায় কি না, গেলে কোন্ পথ দিয়া ওঠা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, দুই পাহাড়ের মাঝে যে জঙ্গল আছে সেই জঙ্গলের ভিতর সরু পথ আছে একটা। অনেক ঘুরিয়া সেখানে পৌঁছিতে হয়। রাস্তাটা তিনি বলিয়া দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "ওদিকে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। দু'একজন যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, মারা পড়েছে—"

"তাই না কি? কাল একটা প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ দেখেছিলাম।"

"অনেক কিছু আছে ওখানে। এ অঞ্চলের কোনও লোক ওদিকে যায় না। ওই জঙ্গলের ভিতর শিকার করবার মতো অনেক জন্তু-জানোয়ার আছে, শিকারীর পক্ষে খুব লোভনীয়, কিন্তু আমার মনে হয় না যাওয়াই ভাল।"

"সঙ্গে আমার বন্দুক থাকবে, জানোয়ারকে ভয় করি না।"

"ভয়টা ঠিক জানোয়ারের নয়—"

"তবে?"

দোকানদার একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "সবাই বলে ওখানে দেবী জি আছেন?"

"দেবী জি কি? মেয়ে মানুষ?"

"তাই ত শুনি। আমি নিজের চোখে দেখি নি কখনও। কেউই বোধ হয় দেখে নি। কিন্তু গুজব যে ওই পাহাড়ের এক গুহায় এক দেবী জি থাকেন—"

রঘুনাথ দোকানদারের নিকট ইহার বেশী আর কোনও খবর পায় নাই। দোকানদার যদিও তাহাকে যাইতে বারণ করিয়াছিল কিন্তু সে বারণে সে কর্ণপাত করিল না। সে আরও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। অজানার আহ্বান তাহাকে উতলা করিয়া তুলিল। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী ওই অরণ্যের গহনে কি রহস্য পুঞ্জীভূত হইয়া আছে তাহা দেখিতেই হইবে—একটা জেদ যেন তাহাকে পাইয়া বসিল।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই যাত্রা করিল সে। অনেক দূর হাঁটিয়া যখন সে জঙ্গলের এক প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল তখনও পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ কিছু মনে হয় নাই। সে নির্ভয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করিল। শাল বন। ছোট বড় অনেক শালগাছ এবং অসংখ্য ছোট ছোট গুল্ম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই কিন্তু তাহার মনে হইল—ঠিক কি যে মনে হইল তাহা তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে হয়ত বলিতে পারিত না—কিন্তু তাহার মনে হইল, সে যেন অনধিকার প্রবেশ করিতেছে। একটা অদৃশ্য বাধার প্রাচীর যেন স্থানটাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। রঘুনাথ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়াই রহিল। তাহার পর তাহার মনে হইল—না, এভাবে সময় নষ্ট করা ত ঠিক হইতেছে না। এতদূর যখন আসিয়াছি শেষ পর্য্যন্ত যাইব। কিন্তু সে যাইতে পারিল না। যাইবার উপক্রম করিতেই একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সম্মুখের সু-উচ্চ শালগাছে একটা বিরাট্‌কায় বন্যকুক্কুট উড়িয়া আসিয়া বসিল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ। রঘুনাথ শিহরিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল, যেন কোন প্রহরী সতর্ক করিয়া দিতেছে। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু আশ্বস্ত হইল সে। বন্দুক হাতে আছে, ভয় কি। উপর্য্যুপরি দুইবার ফায়ার করিল। কিছুই হইল না মোরগের, একটি পালক পর্য্যন্ত পড়িল না। সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া সে আর একবার ডাকিয়া উঠিল—কোঁকর কোঁ···। সাপটার কথা মনে পড়িল রঘুনাথের। তাহারও ত গায়ে গুলী লাগে নাই, সে-ও ত এমনি স্পর্দ্ধাভরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে আর বন্দুক তুলিতে সাহস করিল না। ভাবিল—থাক না মোরগটা, যত ইচ্ছা ডাকুক, আমি বনের ভিতর ঢুকিয়া পড়ি। কিন্তু সে ঢুকিতে পারিল না। পা তুলিতেই ঘর ঘর ঘর ঘর একটা আওয়াজ হইল, রঘুনাথের মনে হইল কর্কশকণ্ঠে কে যেন হাসিতেছে। চোখ তুলিয়াই

রঘুনাথের বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। বিরাট্ একটা ভালুক পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া সামনের পা দুইটি দুই হাতের মতো দুইদিকে বিস্তার করিয়া দিয়াছে। তাহার চোখ-মুখের ভাব যেন—খবরদার, আর এক পা-ও এগিও না। রঘুনাথ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। মোরগটা আবার ডাকিয়া উঠিল। রঘুনাথের মনে হইতে লাগিল, সেই ঘর্ঘর-হাসিটা যেন তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কোথাও কিছু নাই।

পরদিন আর সে অরণ্যে ঢুকিবার চেষ্টা করিল না। কিন্তু তাহার কৌতূহল শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। সেদিন নদীর ধারের যে পাহাড়টার উপর সে রোজ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই পাহাড়েই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং বাইনকুলার দিয়া দূরের পাহাড়টাকে, পাহাড়ের পাদদেশের ঘন অরণ্যকে দেখিতে লাগিল বারবার। দেখিয়া দেখিয়া যেন আশা মিটিতেছিল না, কিন্তু এই রহস্যের উপর আলোকপাত করিতে পারে এমন কিছুই তাহার চোখে পড়িল না। মাঝে মাঝে নদীর দিকেও সে দেখিতেছিল, কোন নৌকা আসিতেছে কি না। এমন সময় হঠাৎ একটা আশ্চর্য্য জিনিস তাহার চোখে পড়িল। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী অরণ্যের একটা অংশ কিছুদূরে গিয়া নদী-তীরাভিমুখী হইয়াছে। এ জঙ্গল খুব ঘন নহে। একটা সরু পথের দুইপাশে সারি সারি কয়েকটা উচ্চশীর্ষ দেবদারু গাছ একটা বীথিকা সৃষ্টি করিয়াছে। জনশ্রুতি, ওই পথ দিয়া একটি বাঘ নদীতে জল খাইতে আসে। সেজন্য ও পথের কাছা-কাছি কেহ যাইতে চাহে না। রঘুনাথ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সেইদিকে একদল পাখী ধীরে ধীরে উড়িয়া চলিয়াছে। একরকম পাখী নয়, নানারকম পাখী অদ্ভুত শ্রেণীবদ্ধ শৃঙ্খলায় যেন একটি বিচিত্র বর্ণাঢ্য চন্দ্রাতপের ন্যায় আকাশপথে ভাসিয়া চলিয়াছে। চতুর্দ্দিকে প্রখর রৌদ্র, কিন্তু ওই পাখীর চন্দ্রাতপ খানিকটা স্থান ছায়াময় করিয়াছে আর সেই ছায়ায় হাঁটিয়া চলিয়াছেন এক অপরূপ লাবণ্যময়ী নারী। তাঁহার পিছনে পিছনে একটা দৈত্য কাপড়-গামছা এবং একটি উজ্জ্বল কলস বহন করিয়া চলিয়াছে। আরও ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া রঘুনাথের মনে হইল, দৈত্যটি একটি বিরাট্কায় হনুমান্ এবং কলসটি সম্ভবতঃ সোনার। বিস্মিত রঘুনাথ আরও দেখিল, সেই নারী যখন দেবদারু-বীথিকার সমীপবর্ত্তী হইলেন তখন দেবদারু গাছ মাথা নত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রঘুনাথ অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিল, তিনি ধীরে ধীরে নদীতে নামিলেন, মনে হইল যেন নদীর তরঙ্গমালা তাঁহার পাদবন্দনা করিতেছে। হনুমান্ তাঁহার হাতে কাপড়-গামছা দিয়া কলসটি নদীতীরে নামাইয়া রাখিল, তাহার পর একটি দেবদারু গাছের শীর্ষে উঠিয়া বসিয়া রহিল। ইহার অব্যবহিত পরেই যাহা ঘটিল তাহাও অদ্ভুত। একটা দুগ্ধধবল কুজ্ঝটিকায় নদীর ঘাট অবলুপ্ত হইয়া গেল। সেই মহিমময়ী নারীকে আর দেখা গেল না। রঘুনাথের বুঝিতে বাকী রহিল না যে ওই কুজ্ঝটিকার অন্তরালে তিনি স্নান সমাপন করিতেছেন। একটু পরেই কুজ্ঝটিকা মিলাইয়া গেল। তিনি স্নান সমাপন করিয়া তীরে উঠিলেন। হনুমান্ও দেবদারু গাছ হইতে নামিয়া নদী হইতে এক কলস জল ভরিয়া লইল এবং সেটি মাথায় করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। দেবদারু গাছগুলি আবার প্রণত হইল, পাখীর চন্দ্রাতপ আবার আকাশে ভাসমান হইয়া তাঁহার মস্তকে ছায়াপাত করিতে করিতে চলিল। একটা অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য কল্পনা যেন রঘুনাথের বিস্মিত নয়নের সম্মুখে মূর্ত্ত হইয়া মিলাইয়া গেল। ইনিই কি দেবী জি? নিশ্চয় ইনিই। এমন অপরূপ লাবণ্য রঘুনাথ আর কখনও দেখে নাই। রঘুনাথ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন আলোকের আভা বিচ্ছুরিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তিনি বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রঘুনাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল। দেবী জি যে পথে আসিলেন এবং গেলেন সেই পথের দিকেই পা বাড়াইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এই দেবদারুর সারি ত ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার দেখিয়াছে, কিন্তু দেবী জিকে আর কখনও দেখে নাই ত। ইনি কে? তাঁহাকে আর একবার দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জাগিল। কিন্তু ইহাও সে অনুভব করিল, উনি নিজে কৃপা না করিলে দেখা পাওয়া যাইবে না, এখানকার সমস্ত আরণ্য প্রকৃতি, সমস্ত পশুপক্ষী, এমন কি সর্প পর্য্যন্ত উঁহার সেবায় নিযুক্ত। সকলেই যেন উঁহাকে আগলাইয়া রহিয়াছে। সে কি করিয়া দেবী জির সান্নিধ্য লাভ করিবে, কি করিলে তিনি কৃপা করিবেন, এই অসম্ভব অলৌকিক ব্যাপার কি করিয়া দিবালোকে সম্ভব হইল—এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে ক্রমশঃ সেই দেবদারু গাছের সারির কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। একবার তাহার ইচ্ছা হইল, দেবী জি যে পথ দিয়া বনের মধ্যে গেলেন, সেই পথে গেলে কেমন হয়? কিন্তু ওই বিরাট্কায় হনুমানের চেহারাটা মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। সে নিশ্চয়ই বাধা দিবে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিল।

নদীর দিকে চাহিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। যে নৌকাটা তাহাকে নোটের বাক্স দিয়া যায়, সেই নৌকাটা তীরের কাছাকাছি আসিয়াছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া আরও দুইটি নৌকা। সমস্ত পুলিশের নৌকা। কারণ সে নৌকার আরোহীদের সকলেরই মিলিটারী পোষাক এবং হাতে বন্দুক। রঘুনাথের বুঝিতে বাকী রহিল না যে এত সাবধানতা সত্ত্বেও চমকলালের নৌকা বামালসুদ্ধ ধরা পড়িয়াছে। তিনটি নৌকাই দেখিতে দেখিতে তীরে ভিড়িল। পুলিস অফিসাররা নীচে নামিয়া তাহার দিকেই অগ্রসর হইল। একজন পরুষকণ্ঠে আদেশ করিল—এই, এদিকে এস। রঘুনাথ আর কালবিলম্ব করিল না—ঊর্দ্ধশ্বাসে বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। দেবী জি যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথেই ছুটিতে লাগিল। আরও দুইবার বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। বনের মধ্যে কিছুদূর যাইতেই সে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই ঘটিল। বজ্রপাতের মতো শব্দ হইল—হুপ্, হুপ্। ঘূর্ণিতলোচন প্রকটিত-দংষ্ট্রা হনুমান্ এক লম্ফে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

আর্ত্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল রঘুনাথ—"মা, মা, দেবী জি, আমাকে বাঁচান—"

সম্মুখেই একটি পুষ্পিত লতামণ্ডপ ছিল। তাহার ভিতর হইতে দেবী জি বাহির হইয়া আসিলেন এবং হনুমান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মহাবীর, কিছু ব'লো না ওকে। আসতে দাও—"

হনুমান্ সরিয়া গেল। রঘুনাথ দেবী জির পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—"আমাকে রক্ষা করুন দেবী জি, আমাকে পুলিসে তাড়া করেছে—দয়া ক'রে আমাকে বাঁচান।"

"মহাবীর, দেখ ত কে ওকে তাড়া করেছে—"

হনুমান্ একলম্ফে বাহিরে চলিয়া গেল। রঘুনাথ নিঃশঙ্ক হইল। মহাবীরকে পরাস্ত করিয়া পুলিসের লোক বনে ঢুকিতে পারিবে না, তা সে যত বড় শক্তিমান্ পুলিসই হোক না কেন।

"তুমি কে? তোমার নাম কি?"—দেবী জি প্রশ্ন করিলেন।

"আমার নাম রঘুনাথ।"

"রঘুনাথ?"

দেবীর কপোল রক্তিমাভ হইয়া উঠিল।

"এখানে কি কর?"

"চাকরি করি—"

"কি চাকরি?"

রঘুনাথ কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল। সে যে জাল-নোট পাচার করিবার জন্য এখানে আসিয়াছে, একথা বলিতে তাহার শুধু ভয় নয়, লজ্জাও করিতে লাগিল। মনে হইল, দেবীর নিকট মিথ্যা কথা বলাটা কি সমীচীন হইবে? তাছাড়া উঁহার নিকট সত্য গোপন করা যাইবে কি? দেবীরা ত অন্তর্যামিণী। সরলভাবে সত্য কথাই বলা ভাল। অকপটে সব কথা সে খুলিয়া বলিল। সর্ব্বশেষে বলিল, "মা, আমি নিতান্ত গরীব। আমার ভাই আমাকে দূর ক'রে দিয়েছে। অভাবে প'ড়েই আমি এ হীন কাজ করছি। টাকা না থাকলে যে এক পা-ও চলবার উপায় নেই মা—"

দেবী জি প্রসন্ন দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"কত টাকা চাই তোমার?"

এ প্রশ্নের জন্য রঘুনাথ প্রস্তুত ছিল না। একটু থতমত খাইয়া গেল।

"কত টাকা হলে চলবে তোমার, বল"—পুনরায় প্রশ্ন করিলেন তিনি।

রঘুনাথ ভাবিল, কম করিয়া বলি কেন। ইনি দেবী, ইচ্ছা করিলে অসম্ভব প্রার্থনাও পূর্ণ করিতে পারেন। বলিল—"অন্ততঃ লাখখানেক টাকা ব্যাঙ্কে না থাকলে আজকালকার দিনে সংসারে স্বচ্ছন্দে চলা যায় না।"

দেবী জির মুখের হাসি আরও প্রসন্ন হইল।

বলিলেন—"আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে—"

রঘুনাথকে লইয়া তিনি গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুদূর গিয়া একটি উন্মুক্ত প্রান্তর পাওয়া গেল। প্রান্তরটি ঘন সবুজ দূর্ব্বায় সমাচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিকে তালগাছের সারি। রঘুনাথ সবিস্ময়ে দেখিল, প্রান্তরের উপর একটি সোনার হরিণ চরিতেছে। তাহার মাথায় শাখা-প্রশাখাময় বিরাট শৃঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণদ্যুতি। দেবী জিকে দেখিয়া

হরিণটি আগাইয়া আসিল। দেবী জি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমার শিং দুটো একে দিয়ে দাও। বেচারা গরীব। তোমার শিং দুটোতে যত সোনা হবে তাতে এর জীবন চ'লে যাবে। দিয়ে দাও ওকে, ও আমার শরণাপন্ন হয়েছে—"

হরিণ যাহা করিল তাহা আরও বিস্ময়কর। সে পিছনের বাম পদ দিয়া দক্ষিণ শৃঙ্গটি এবং দক্ষিণ পদ দিয়া বাম শৃঙ্গটি খুলিয়া ফেলিল। কপালের দুই পাশে দুইটি গোলাকৃতি রক্তাক্ত চিহ্ন রহিল কেবল। হরিণের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। সে আবার চরিতে আরম্ভ করিল।

"ওই দুটো তুমি নিয়ে যাও। দুটোর ওজন দশ-পনেরো সের ত হবেই। খাঁটি সোনা। আশা করি এতে চ'লে যাবে তোমার।"

রঘুনাথ নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিল।

"তুলে নাও—"

রঘুনাথ বিরাট্ শৃঙ্গ দুইটি তুলিতে গিয়া দেখিল, বেশ ভারী। তবু অনেক কষ্টে সে দুই হাতে দুইটাকে ঝুলাইয়া লইল। তাহার পর তাহার মনে হইল—বাহিরে গেলেই ত এখনি ধরা পড়িবে। তাছাড়া এই স্বুবর্ণ-শৃঙ্গের জন্য কি জবাবদিহি দিবে সে? এই অবিশ্বাস্য সত্য কথাটা ত কেহ বিশ্বাসই করিবে না।

সে দেবী জিকে বলিল—"মা, এখানে কোথাও আমাকে কয়েকদিনের জন্যে আশ্রয় দেবেন? এই বড় বড় সোণার শিং নিয়ে ত বাইরে যাওয়া যাবে না। গেলেই একটা হৈ চৈ প'ড়ে যাবে। তার চেয়ে আমি এখানে ব'সে এগুলোকে ছোট ছোট টুকরো ক'রে বাইরে নিয়ে যাব—"

দেবী জি বলিলেন—"আমার গুহায় অনায়াসেই থাকতে পার। সেখানে কুড়ুল কাটারি সব আছে। এস, দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। ভালই হবে, আমি কয়েকদিন থাকব না এখানে, তুমি আমার গৃহস্থালী দেখাশোনা ক'রো। এস—"

দেবী জি অগ্রসর হইলেন। রঘুনাথ অনুসরণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ হইতেই প্রশ্নটা রঘুনাথের অন্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু সঙ্কোচবশতঃ সে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছিল না। আর সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। কুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"মা, আপনার পরিচয় ত দিলেন না। কে আপনি?"

রঘুনাথ নিজের কর্ণকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না।

দেবী জি উত্তর দিলেন—"আমি জনকনন্দিনী সীতা।"

রঘুনাথ অভিভূত হইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত্ত।

তাহার পর বলিল—"কিন্তু রামায়ণে লেখা আছে আপনি পাতাল প্রবেশ করেছিলেন—"

"করেছিলাম। কিন্তু আমার মা বসুন্ধরা বললেন, তুমি ফিরে যাও। পতি-গৃহই নারীর কাম্য স্থান। রামও তোমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছেন। তুমি ফিরে যাও। ফিরে এসেছি। কিন্তু তাঁকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। শুনেছি এখানে রাম-রাজ্য স্থাপিত হয়েছে, তিনি নিশ্চয়ই তাহলে কোথাও আছেন। আমি মহাবীরের সহায়তায় নানা প্রদেশ ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছি, যদি কোথাও তাঁকে দেখতে পাই। কাল পম্পা সরোবরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে—"

"কিন্তু ওই সোনার হরিণ কি ক'রে এল এখানে—"

"এখানে আসবার কয়েকদিন পরেই ও হঠাৎ আপনা থেকেই এল একদিন। বললে—মা, আমিই আপনার কষ্টের কারণ হয়েছিলাম ব'লে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি। আজ আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, আর আমি পালাব না, আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে থাকব। আমাকে দয়া ক'রে আশ্রয় দিন। সেই থেকে ও আছে—"

"ও অমন অনায়াসে শিং দুটো খুলে দিলে কি ক'রে?"

"ও মায়াবী, ও সব পারে।"

৩

মহাবীরের সঙ্গে সীতা পম্পা সরোবরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যাওয়াটাও একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। এ যুগে যে ইহা ঘটিতে পারে তাহা রঘুনাথের সুদূর কল্পনারও অতীত ছিল। তাঁহাকে বহন করিবার জন্য দিব্যকান্তি পুষ্পকরথ আসিয়াছিল। তাহা প্রাণহীন ধাতুনির্ম্মিত রথ নহে, তাহা সজীব, তাহার আচরণ সম্ভ্রমপূর্ণ।

সে আসিয়া স-সম্ভ্রমে বলিল—"মহাবীরের নির্দেশ অনুসারে আমি এসেছি। কোথায় আপনাকে নিয়ে যাব বলুন—"

"পম্পা সরোবরে—"

দেবী রথের উপর আসীন হইলেন। রথ উড়িয়া গেল। মহাবীর একলম্ফে শূন্যে উঠিয়া রথকে অনুসরণ করিতে লাগিল। মনে হইল, বিরাট্ একটা ধূসর মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে। সম্ভবতঃ ওই মেঘ পুষ্পকরথকে আবৃতও করিয়াছিল, কারণ পুষ্পকরথকে আর দেখা গেল না।

রঘুনাথ স্বর্ণশৃঙ্গ দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিল। তাহার মনে হইতেছিল—ওজনে অন্ততঃ আধ মণ হইবে। আধ মণ খাঁটি সোনা! লক্ষ টাকার অনেক বেশী পাইবে। কিন্তু মাত্র লক্ষ টাকাতে কি সে সুখে থাকিতে পারিবে? শুনিতেই লক্ষ টাকা। আজকাল সমস্ত জিনিসপত্র যা অগ্নিমূল্য। একটা সাধারণ মোটরকার কিনিতেই ত হাজার বিশেক টাকা লাগিয়া যাইবে। দেবী জির কাছে আরও বেশী কিছু চাহিলে ভাল হইত। তাহার পর সে ভাবিল—ওই হরিণটার কাছেই চাহিয়া দেখা যাক না। পায়ের খুরগুলো যদি খুলিয়া দেয়, আরও কিছু টাকা হইবে। হরিণের শিং লইবার পর সে আর হরিণের কাছে যায় নাই। গুহায় বসিয়া সেগুলিকে ছোট ছোট করিয়া কাটিতেই ব্যস্ত ছিল। খুরের কথা মনে উদয় হইবামাত্র সে হরিণের সন্ধানে বাহির হইল। গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিল, হরিণের শিং দুইটি আবার গজাইয়াছে, ঠিক তত বড় এবং তেমনি সুন্দর শাখা-প্রশাখাময়। রঘুনাথ ধীরে ধীরে হরিণের কাছে গেল। ভাবিল, খুর না চাহিয়া, শিং দুইটাই আবার চাওয়া যাক।

"ভাই হরিণ, তোমার এ শিং দুটোও আমাকে দাও না—"

হরিণ ঘাড় ফিরাইয়া তাহার দিকে একবার চাহিল, তাহার পর যেমন ঘাস খাইতেছিল, খাইতে লাগিল।

"ভাই হরিণ, দাও না শিং দুটো। তোমার ত আবার গজাবে। দাও না ভাই—"

হরিণের পিছনের দিকে গিয়া তাহার গায়ে হাত দিল রঘুনাথ। তড়াক্ করিয়া হরিণটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শিং বাঁকাইয়া তাড়া করিল তাহাকে। রঘুনাথ ছুটিতে ছুটিতে গুহায় ফিরিয়া আসিল। সে কেমন যেন অপমানিত বোধ করিতেছিল। একটা হরিণ—তা হউক না সোনার হরিণ—তাহাকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করিবে? সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা চিন্তা তাহার মনে খেলিয়া গেল। বন্দুকের এক গুলীতে ওটাকে শেষ করিয়া দিলে কেমন হয়! সঙ্গেই ত বন্দুক এবং গুলী আছে। চিন্তাটা তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। তাহার বন্দুকের গুলী যে বারবার ব্যর্থ হইয়াছে এ কথা সে ভুলিয়া গেল, তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, সমস্ত হরিণটাকে যদি লইয়া যাইতে পারি, কয়েক মণ সোনা পাইব। বন্দুকে গুলী ভরিয়া বাহির হইয়া গেল সে।

হরিণ মাঠের মাঝখানে নির্ভয়ে চরিতেছিল। রঘুনাথ ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা, খুব কাছাকাছি আসিয়া বুকের নিকট গুলী করিবে। খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল রঘুনাথ। হরিণের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। সে যেমন চরিতেছিল, চরিতে লাগিল। খুব নিকটে আসিয়া রঘুনাথ ক্ষণকালের জন্য মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। কি অপূর্ব্ব স্বর্ণকান্তি! কান দুইটা মাঝে মাঝে নাড়িতেছে, আলোক ঠিকরাইয়া পড়িতেছে যেন। সমস্ত হরিণটা যদি পায় সে 'মাল্‌টি-মিলিয়নেয়ার' হইয়া যাইবে। এদেশে আর থাকিবে না, আমেরিকায় গিয়া আকাশচুম্বী বাড়ী কিনিবে।

গুলী করিবার সঙ্গে সঙ্গে হরিণ অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার স্থানে আবির্ভূত হইল একটি বিকট রাক্ষস।

রঘুনাথ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

"কে, আপনি—"

"আমি মারীচ রাক্ষস। তুই কি জানিস না, যে, আমিই সোনার হরিণের রূপ ধরেছিলাম? পাষণ্ড লোভাতুর, তুই দেবীকে প্রতারণা করেছিস্, কিন্তু আমাকে ঠকাতে পারবি না। দূর হ—"

চুলের মুঠি ধরিয়া মারীচ রঘুনাথকে শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া দিল।

চুলের মুঠি ধরিয়া

চূর্ণিত-মস্তক রঘুনাথের মৃতদেহটা পাহাড়ের উপর পড়িয়া ছিল। পাশে বন্দুকধারী কয়েকজন পুলিস অফিসারও ছিলেন। একজন বলিতেছিলেন—"আমার গুলীটাই ঠিক মাথায় লেগেছিল—"

আর একজন বলিলেন—"আমিও ফায়ার করেছিলাম। হয় ত আমারটা লাগে নি। লোকটা বনে ঢুকে পড়ল কিনা? ওই হনুমান্‌টা তেড়ে না এলে আমি ঠিক বনের মধ্যে ঢুকে জীবন্তই ধরতাম ওকে। আমার কিন্তু আশ্চর্য্য লাগছে, হনুমান্‌টাকেও গুলী করেছিলাম, কিন্তু তার ত কিছু হ'ল না—"

"মিস্‌ করেছিলে—"

"আর একটা কথা। লোকটা বনের মধ্যে ঢুকেছিল, আপনার গুলী যদি ওর মাথায় লেগে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মরবার কথা। ও পাহাড়ে এল কি ক'রে?"

"কোনও জানোয়ার টেনে এনেছে বোধ হয়—"

"কিন্তু খায় নি ত?"

"কি জানি!"

—•—

ইন্দুমতী ভাবছে। কি ভাবছে তা বলা বড়ই কঠিন। ফুলবাগানে যখন এলোমেলো ঝড় বইতে থাকে তখন ফুল কি ভাবে, তা কি কেউ বলতে পারে?

ইন্দুমতীকে আজ একদল লোক দে'খে গেছে। এখন রাত দশটা। তার সামনে একখানা ব্যাকরণ খোলা। কিন্তু সে দিকে তার দৃষ্টি বা মন কিছুই নেই। চাকুরিজীবী ইন্দুমতী চাকরি আর ব্যাকরণ ফে'লে আজ শুধু ভাবছে।

মেয়ে পছন্দ হয়েছে পরীক্ষকদের। যেমন হয়ে থাকে। এবং যেমন হয়ে থাকে, পছন্দ হলেও পাওনাতে আটকাবে। কারণ এ পক্ষে এক পয়সাও দেবার উপায় নেই। এর আগে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘ'টে গেছে তিনবার। এবারেও তাই ঘটবে, এ তো জানাই আছে।

শিক্ষিত মেয়ের রুচিতে আঘাত লাগে। তবে ক্রমে সহ্য হয়ে যায়। উপায়ই বা কি? এ রকম না হলেই বা কি হতে পারত? মেয়েরাই পছন্দ ক'রে বিয়ে করতে পারবে, এমন অবস্থা হলেই বা কি হ'ত? মাত্র একদিন কয়েক মিনিট দে'খেই পছন্দ করার প্রথা চালু থাকলে সব উল্টেও তো যেতে পারে। আগে তো এককালে উল্টোই ছিল। তখন ছেলেরা সারবন্দী ব'সে যেত, মেয়ে এসে একটাকে পছন্দ ক'রে গলায় দড়ি পরাত। দড়িটা থাকত ফুল দিয়ে ঢাকা।

এই সব হাস্যকর কথা ভাবতে ভাবতে ইন্দুমতী হারিয়ে গেল চিন্তারণ্যে। সংস্কৃতির সবেগ উন্নতি চলছে, স্বয়ংবর প্রথা আসতেই বা বাধা কোথায়? সমাজ তো এক জায়গায় ব'সে থাকতে পারে না বেশিদিন। চাকার মতো ঘুরে ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছে। যেন নিশাচর বাদুড়। দিনের বেলা আকাশে পা তুলে ঝোলে, রাত্রে মাথাটা আকাশে উঠে যায়। দুইই চরম।

কিন্তু ইন্দুমতী আজ সত্যিই স্বয়ংবরা হতে চলেছে যে! সখীরা তাকে নানা রত্ন-অলঙ্কারে সাজিয়ে দিচ্ছে। চাকুরে মেয়ের রূপ তো কেউ দেখে না, এইবার দেখবে। একটুখানি মেঘ। স'রে গেছে সে মেঘ। পূর্ণ চাঁদের মায়া! না। সাজের উস্কানিতে রূপের চাপা আগুন জ্ব'লে উঠেছে। মেঘ নয়, চাঁদ নয়। সূর্য।

স্বয়ংবর সভায় জনারণ্য। পাণিপ্রার্থী নয় তারা সবাই। সবাই প্রায় দর্শনপ্রার্থী। মাত্র সাতজন যুবক এসেছে ইন্দুমতীকে লাভ করতে। যেন সূর্য-রথের সাতটি অশ্ব। যেন গানের সাতটি স্বর। উদারা থেকে তারা সব। মোটা থেকে মিহি এবং মধ্যবর্তী সবগুলো পর্যায়। কেউ বলী, কেউ ক্ষীণাঙ্গ, কেউ ঝাঁকড়াচুলো, কারো হাতের আঙুলে ছোট ছোট সূর্য জ্বলছে, কারো পোষাক আধা সাহেবী। কেউ সোনার কেস্ থেকে সিগারেট বা'র ক'রে কেসের উপর ঠুকছে, কেউ পকেট থেকে আয়না চিরুনি বা'র ক'রে চুল ঠিক ক'রে নিচ্ছে, কেউ হাতের মোটা ছড়ি মাটিতে ঠুকছে। ধৈর্য থাকছে না কারোই।

প্রায় পঁচিশ হাজার দর্শক। আসর সরগরম। রঞ্জি স্টেডিয়ামে সভার ব্যবস্থা হয়েছে। দর্শকের আসনে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের প্রায় সমান সমান। তারা অধিকাংশই উল বুনছে, কেউ শস্তা সিনেমা কাগজ ওল্টাচ্ছে। কেউ নিজেদের সময়ের অভিভাবক-চাপানো স্বামীদের নিন্দা করছে। কেউ ইন্দুমতীর বিষয়ে আলোচনা করছে। সমাজ-বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ের এত বড় একটা ঘটনা, কৌতূহলের সীমা নেই কারো। মেয়েদের গ্যালারিতে ঈর্ষামিশ্রিত আলোচনাই সবচেয়ে বেশি জমে উঠেছে। কিন্তু ইন্দুমতীর বাছাই-রীতি ভবিষ্যতের জন্য যাদের নির্দেশিকার কাজ করবে, সেই কুমারী মেয়েরা কেউ একটি কথাও বলছে না। তারা দম বন্ধ ক'রে যথাসময়ের অপেক্ষা করছে।

গোঁড়ারা কেউ এ সভায় আসেনি, তারা এটাকে পাইকেরী হিসেবের ছ্যাবলামি ব'লে উড়িয়ে দিয়েছে, এবং মন্তব্য করেছে কলিকাল পূর্ণ হ'ল।

সাতজন প্রার্থী, কিন্তু আগেই বলা আছে মনোনয়ন কম্পাল্‌সরি নয়। মানে, সাতের মধ্যে কাউকে পছন্দ না হলেও একজনের গলায় মালা পরাতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন প্রতিযোগিতামূলক রচনায় প্রতিযোগীদের মধ্যে অনেক সময় কোনো একজনও যোগ্য না হতে পারে। এ রকম সর্তের একটা উদ্দেশ্য আছে। ইন্দুমতী এই সব প্রার্থীদের সম্পর্কে রিপোর্ট শুনে ঘরে ব'সেই কার গলায় মালা পরাবে ঠিক করতে পারত, কাজটা সহজে হ'ত, কিন্তু সেটা তার উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য—এতকাল পুরুষেরা তার উপর যে অপমানের বোঝা চাপিয়েছে তার প্রতিশোধ নেওয়া। কাউকে পছন্দ না করা। সবই অন-দি-স্পট করা হবে। মোষ-হাটে মোষ-পছন্দের স্তরে নিয়ে যাবে সে এই অনুষ্ঠানকে। সকল প্রার্থীর মুখে প্রকাশ্যে চুনকালি নিক্ষেপ করবে সে। এইটি করতে পারলে তার প্রতিশোধ-বাসনা চরিতার্থ হয়।

কথাটা সুনন্দা ভিন্ন আর কেউ জানে না। তার এ ব্যাপারে পুরো সমর্থন। খুব খুশী সে, কারণ তাকেও অনেকে দে'খে গেছে—চুল টেনে, দাঁত গুনে এবং টেনে, হাঁটিয়ে, কথা বলিয়ে। কিন্তু তবু কারো পছন্দ হয় নি। কারণ তার ডানদিকের উপরের মাড়ির শেষ দাঁতটি সামান্য একটু ভাঙা। টর্চ ফে'লে দাঁত পরীক্ষা করা হয়েছে। সুন্দর দাঁত দে'খে কৃত্রিম মনে ক'রে টেনে টেনে পরীক্ষা করা হয়েছে।

তবু সুনন্দা ইন্দুমতীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভয় হতে পারেনি। কি জানি, যদি কারো গলায় মালা দিয়ে বসে। একদিক্ দিয়ে সুখের অবশ্যই, কিন্তু পরিকল্পনাটা মাটি। অতএব খুব সতর্ক থাকতে হবে।

কত ক্যামেরা, কত ফ্ল্যাশ, কত রিপোর্টার। কত মুভি, ডকুমেণ্টারি ছবির সরকারী ব্যবস্থা। সবাই শুভ মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হয়ে ব'সে আছে। যথাসময়ে ইন্দুমতী ও সুনন্দার প্রবেশ ঘটল সেই মহাপ্রাঙ্গণে। সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা-দেখায় অভ্যস্ত হাজার হাজার ছোকরা শিস দিয়ে উঠল। মেয়েরা শাঁখ বাজাতে লাগল, মিলিটারি প্রহরার ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল, কারণ খেলার মাঠের দুর্ঘটনা এখানে ঘটলে বাংলা দেশের কলঙ্ক। প্রার্থীদের সবারই পক্ষে উগ্রসমর্থক দলের অভাব ছিল না। রেফারির উপর আক্রমণ কলকাতার একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে রেফারি স্বয়ং ইন্দুমতী। তাই এত সতর্কতা।

ইন্দুমতীকে সঙ্গে নিয়ে সুনন্দা প্রথমেই এলো কুসুমকানন করের কাছে। তার চুল অবিন্যস্ত। হাওয়ায় চতুর্দিকে উড়ছে, মুখ-চোখের উপর এসে পড়ছে, কিন্তু তখনই হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। চোখে মদির ভাব। সুনন্দা বলল, ইনি কুসুমকানন কর। আধুনিক কবি। এঁর খ্যাতি আগুনের মতো দেশময় জ্বলছে। এঁর কবিতার প্রধান গুণ এই যে তার প্রত্যেকটি লাইন বীজমন্ত্রের মতো, একটি লাইন ভাঙলে পাঁচ ভল্যুম বই হয়। এঁর 'রকপাখী' নামক কবিতার এক লাইনের একটিমাত্র শব্দ নিয়ে গবেষণা ক'রে একজন ডি. ফিল. পেয়েছে। পুরো কবিতাটি একটি রত্নখনি বিশেষ। একজন সমালোচক বলেছেন, তা বিস্ফোরকের গুণবিশিষ্ট। উপযুক্ত আধারে পুরলে ডাইনামাইট। পাহাড় ধসানো যায়। নোবেলের আবিষ্কার। আর নোবেল পুরস্কারের জন্যই এঁর কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পাঠানো হয়েছে কমিটির হাতে।

শুনতে শুনতে কবি নিজেই গদগদ হয়ে গলাটা একটু এগিয়ে দিল। ইন্দুমতী সুনন্দার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা গলায় বলল, এখানে হাড়িকাঠ নেই কেন? সুর চড়িয়ে বলল, অটোগ্রাফের খাতাখানা এগিয়ে দাও। সুনন্দা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে খাতা বার ক'রে কুসুমকাননের হাতে দিল। কুসুমকানন কয়েক মুহূর্ত আধবোজা চোখে আকাশের দিকে চেয়ে থেকে খাতায় লিখল:

ইন্দু—বিন্দু ?
সিন্ধু।
চুচুচু—কিশি।
কিলিমানজারো—লুনিক্।
ল্যুনাটিক। আইক।
U-2 ! দাউ টু ব্রুটাস !
নিকিতা। কিতা, কিতা।
—কুসুমকানন।

আবার ঘাড় নামালো খাতাখানা ফিরিয়ে দিয়েই। কুসুমকাননের সমর্থকদল খুব উল্লাস করতে লাগল। ইন্দুমতী খাতাখানা কেড়ে নিয়ে একটি নমস্কার ক'রে ওখান থেকে স'রে গেল। কবি হতাশভাবে একটি সিগারেট ধরাল উর্ধ্বে মাথা তুলে। কবির ক্ষীণ সমর্থকেরা শুধু একটি সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাসে আকাশকে [illegible] করল।

অতঃপর সুনন্দা ইন্দুমতীকে নিয়ে এলো শ্বেতাঙ্গ-পোষাকধারী এক কৃষ্ণাঙ্গের কাছে। গোল মাথা, গোল মুখ। পুরু ঠোঁট। ছোট ছোট দুটি চোখ। ঘোলাটে দৃষ্টি। দু'নম্বর শেডের কাঁচ দিয়ে ঢাকা। দু'হাতে আটটি আংটি। কব্জিতে খুব বড় দামী ঘড়ি। ঠোঁটে কিছু রং লাগানো। সুনন্দা বললে, ইনি মিস্টার চার্বাক। সিনেমাশিল্পে কয়েক কোটি টাকা ঢেলেছেন। পাত্র-পাত্রী নিয়োগ সব এঁর হাতে। যে-কোনো মেয়েকে ইনি গ্লেমার গার্ল ক'রে দিতে পারেন, তার ছবি ছাপিয়ে, তার বাণী প্রচার ক'রে। কি বলব সখি, এঁর হাতের মেয়ে তারকা হওয়ামাত্র লাখ টাকা ফী, চারদিক্ থেকে টানাটানি প'ড়ে যায়। কত কাঁচা ছেলে কুকুর সেজে গিয়ে তার ঘরের আশেপাশে ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়ায়। প্রত্যেকের জিভ বার করা, লালা-ঝরা জিভ। যে-কোনো মেয়ের পক্ষে এমন লোভনীয় মুরুব্বি আর হতে পারে না। সিনেমা-আকাশে যত অতিকায় তারকা, যত নোভা সুপারনোভা দেখা যায়, তার প্রায় সবই এঁর গড়া। মানী লোক, ভীষণ ইনফ্লুয়েন্স্। ইনি নামে চার্বাক, জীবনদর্শনে চার্বাক।

ইন্দুমতী অটোগ্রাফের খাতাখানা এগিয়ে দিতে ইঙ্গিত করল। খাতায় চার্বাক লিখল: তুমিই আমার পরবর্তী তারকা (যদি মালা পাই তোমার)।

ইন্দুমতীর মনটা হঠাৎ দুলে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল, কি যেন ভাবছে। ওদিকে সমর্থকদল উৎসাহ দেবার জন্য ভীষণ হল্লা আরম্ভ করেছে, সৈন্যদল তীব্র দৃষ্টি রাখছে সবদিকে। কিন্তু কিছুই হ'ল না। সুনন্দা কৌশলে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ইন্দুমতীকে সরিয়ে দিল। চার্বাক-বিরোধীরা বিড়াল ডাকতে লাগল দর্শকের আসন থেকে। চার্বাকের চোখে আগুন জ্বলল এবং তা ধোঁয়ারঙের চশমা ভেদ ক'রে দৃশ্যমান হ'ল। তবে আগুন নেবানোর এক অদ্ভুত কৌশলও সঙ্গে ছিল। সেটি জল না হলেও তরল পদার্থ, এবং তা পকেট থেকে পাকস্থলীতে যেতে দেরি হ'ল না।

সুনন্দা ইন্দুমতীকে এর পর নিয়ে গেল পরবর্তী প্রার্থীর কাছে। বলল, এঁর নাম প্রভঞ্জন ভঞ্জ। ওঁর গলাই ওঁর পরিচয়। দেখা গেল, গলার দুটি পাশ অস্বাভাবিক রকমের ফোলা। কণ্ঠসঙ্গীতে ওস্তাদ। গানের সময় মাথা এত ঝাঁকাতে হয় যে তার ফলে গলা লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে। প্রভঞ্জন একবার গান গেয়ে একটি লোককে মেরে ফেলেন। শ্রোতাদের মধ্যে একজন ছিল হার্টের রুগী। গানের আরম্ভে প্রভঞ্জন এমন বজ্রফাটা হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন যে তাতে চমকে গিয়ে সেই শ্রোতা মারা যায়। এই নিয়ে দাঙ্গা বাধে। তখন প্রভঞ্জন ঘুঁসি মেরে আর একটি লোককে খুন করেন। বিচারে ফাঁসির হুকুম হয়। ইনি গলা এবং হাত দু'দিক্ থেকেই মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক সাব্যস্ত হলেন। কিন্তু ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও এঁর মৃত্যু হ'ল না। এঁর গলার পেশী এমন শক্ত হয়ে গেছে যে দড়ির সাধ্য কি তাকে এক চুল চাপ দেয়। সেই থেকে এঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং ইনি কণ্ঠবাজ উপাধিতে ভূষিত হন। কণ্ঠবাজ মানে কণ্ঠবজ্র, অথবা মতান্তরে গলাবাজ, মানে গলাবাজিতে যিনি ওস্তাদ। গলার ভিতর এবং বাহির দুদিকে সমান শক্তি। এমন গলায় মালা পরানো যে-কোনো মেয়ের পক্ষে মহাভাগ্যের কথা। নির্ভরযোগ্য শক্ত গলা না পেলে মেয়েরা ঝুলে থাকবে কিসের ভরসায় ? ইনি আজ যে এখানে একজন প্রার্থী হয়ে আসতে ভরসা পেয়েছেন, সে তো ঐ গলার গৌরবে।

ইন্দুমতীর ইঙ্গিতে সুনন্দা যথারীতি অটোগ্রাফের খাতাখানা এগিয়ে দিল। প্রভঞ্জন অটোগ্রাফ লিখতে আরম্ভ করতে ইন্দুমতী তাঁর গলাটা ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখতে লাগল। ওদিকে প্রভঞ্জনের সমর্থকেরা কনসার্ট বাজাতে

আরম্ভ ক'রে দিয়েছে দর্শকের আসনে ব'সে। অটোগ্রাফের খাতা ফিরিয়ে নিয়ে দুজনে স'রে গেল ওখান থেকে। বাজনা হঠাৎ থেমে গেল। ইন্দুমতী অটোগ্রাফের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখল, যে বাণী দিয়েছেন তা দুর্বোধ্য, কেননা তা এক লাইন স্বরলিপি মাত্র। বোধ হয় কোনো মূল্যবান্ রাগ হবে। পূর্বরাগের অনুষঙ্গ কিছু।

সুনন্দা ইন্দুমতীকে এবারে নিয়ে এলো প্রণয়সুন্দর পালের কাছে। বলল, ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত উপন্যাস-লেখক প্রণয়সুন্দর। এঁর লেখায় যত লোক কেঁদেছে এমন আর কারো লেখায় নয়। এঁর লেখা প'ড়ে যত তরুণ-তরুণী বিগড়েছে এমন আর কারো লেখায় নয়। সুনন্দার কথায় ইন্দুমতীর হঠাৎ মনে পড়ল, কয়েক বছর আগে স্কুলে পড়ার সময় এঁর লেখা প'ড়েই পাড়ার এক স্কুলের ছেলের সঙ্গে বম্বে পালানোর শখ হয়েছিল। মনে পড়তে মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল একটুক্ষণের জন্য। দর্শকের আসনের বাইনোক্যুলারধারী সমর্থকেরা আনন্দধ্বনি ক'রে উঠল তা দে'খে। ইন্দুমতী ভীষণভাবে চমকে উঠে সুনন্দাকে অটোগ্রাফের খাতাখানা ওঁর দিকে এগিয়ে দিতে বলল। প্রণয়সুন্দর তাতে লিখল, প্রাণের ইন্দুমতী, তোমাকেই আমি আমার পরবর্তী উপন্যাসের নায়িকা করব। সে হবে আমার 'ম্যাগ্‌নাম ওপাস্'। এক বিরাট উপন্যাস ফেঁদেছি, শুধু নায়িকার অভাবে এগোচ্ছে না। দাম হবে পঁচিশ টাকা। মনে রেখো, পঁচিশ টাকা দামের উপন্যাসের নায়িকা হবে তুমি। ইতি। তোমারই প্রণয়ী-সুন্দর।

ইন্দুমতী খাতাখানা নিয়ে চোখ বুলিয়ে দেখল, অটোগ্রাফ নয়, প্রণয়-পত্র! সে প্রণয়সুন্দরকে নমস্কার ক'রে পরবর্তী প্রার্থীর কাছে এগিয়ে গেল। এই প্রার্থীর সমর্থকসংখ্যা বোধ হয় একটু বেশি ছিল, তাদের উল্লাসধ্বনিতে ইডেনগার্ডেনের গাছপালা শিহরিত হতে লাগল। এই গণ্ডগোলে ইন্দুমতী সুনন্দাকে বলতে লাগল, প্রণয়সুন্দরের ঢং দেখলে? কি দুঃসাহস! একেবারে প্রাণের ইন্দুমতী? 'শো' শেষ হলে উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, এমন লেখা বৈধ কি না।

হট্টগোল কিছু শান্ত হতেই সুনন্দা পরবর্তী প্রার্থীর পরিচয় দিতে লাগল। এঁর নাম আলফা-বীটা। এঁর গায়ের ঢিলে পাঞ্জাবী প্রায় পা পর্যন্ত পড়েছে, ওটা এঁর আসল পোষাক নয়। নিচে শুধু ল্যাঙট পরা আছে। এঁর

খাটো টুলে বসার ভঙ্গিতে লাফাতে লাগল

পাশে যে প্লাস্টিকের থলে দেখছ, ওর মধ্যে ছোলা আর বাদাম-ভাজা আছে। ঐ এক থলে খাদ্য শেষ ক'রে উনি সিদ্ধি খাবেন সন্ধ্যাবেলা। এঁর খাটো চুল, গোল মাথা, ইংরেজদের সেকেলে 'রাউণ্ড হেড' সম্প্রদায়ের লোকের মতো। এই সুবিখ্যাত আলফা-বীটা হচ্ছেন কুস্তিবীর গামার শিষ্য। গামার মতো আলফা-বীটারও অনেক শিষ্য আছে। ডেলটা, এপসিলন, ডিগামা, জিটা, থিটা, আইওটা থেকে একেবারে ওমেগা পর্যন্ত। সবাই বিখ্যাত ওস্তাদ।

গোপাল
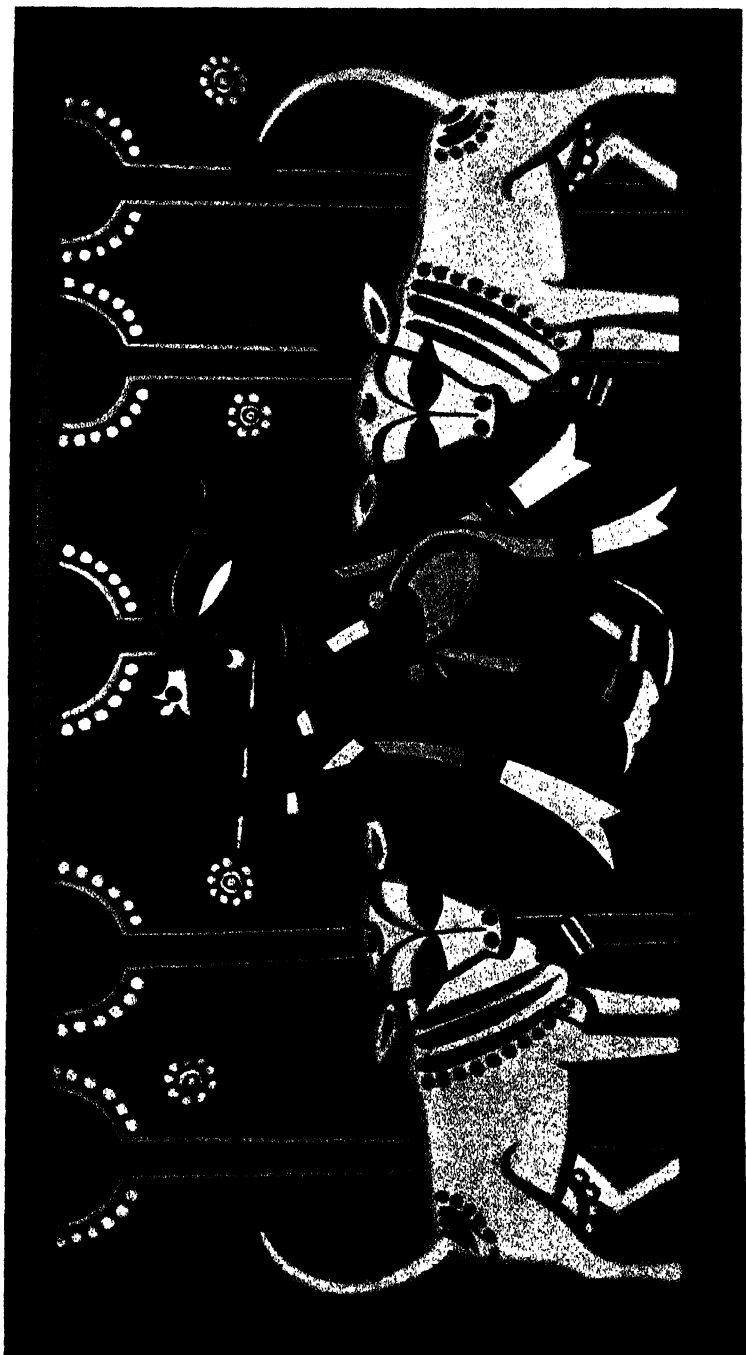
শ্রীযামিনী রায়

সুনন্দার কথা এই পর্যন্ত এগোতেই আলফা-বীটা একটানে পাঞ্জাবীটা খুলে ফেলে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। খালি গা, গলায় তক্তি। বিরাট ভুঁড়ি। দেখতে ভারী সুন্দর। সহসা তিনি দেহটাকে নিচু ক'রে খাটো টুলে বসার ভঙ্গিতে লাফাতে লাগলেন, আর, এক রকম অস্ফুট ধ্বনি ক'রে হাঁটুর উপর মাঝে মাঝে চাপড় মারতে লাগলেম। তার পর সোজা দাঁড়িয়ে ভুঁড়ির নাচ আরম্ভ করলেন। সে কি নাচ! সমর্থকেরা সেই তালে তাল রেখে গ্যালারিতে পা ঠুকতে লাগল। মনে হ'ল, ইন্দুমতী দৃশ্যটা খুবই উপভোগ করছে। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। তার ইঙ্গিতে সুনন্দা অটোগ্রাফের খাতাখানা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল। আলফা-বীটা খপ ক'রে খাতাখানা নিয়ে গর্জন ক'রে উঠলেন এবং দুহাতে সেই চামড়া বাঁধানো মোটা খাতার সবগুলো পাতা একটানে ছিঁড়ে ফেলে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন। কব্জির জোর দে'খে ইন্দুমতী স্তম্ভিত।

ইন্দুমতী তাঁকে নমস্কার ক'রে ওখান থেকে স'রে যেতেই আলফা-বীটার সমর্থকেরা মাথা নিচু ক'রে রইল। সৈন্যরা না থাকলে কি হ'ত বলা যায় না। তারা খুব সতর্ক ছিল।

এর পর সুনন্দা ইন্দুকে নিয়ে এলো সত্যেরজয় সাধুর কাছে। সুনন্দা এঁর পরিচয় দিতে লাগল: সত্যেরজয় সাধু টাকার উপর শুয়ে থাকেন, টাকায় স্নান করেন, টাকা নিয়ে খেলা করেন। এত বড় দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী এদেশে আর নেই। বিজ্ঞানীদের বড় বন্ধু। অনেক বিজ্ঞানীকে ইনি পালন করেন। এঁর অসীম ক্ষমতা। দেশের লোকের প্রাণ এঁর হাতে। ইনি ইচ্ছে করলে সমস্ত ভোট কিনে সাধারণ নির্বাচনে জিততে পারতেন, দেশশাসনে অংশ নিতে পারতেন, কিন্তু ইনি বাইরের জাঁক পছন্দ করেন না। ইনি নীরব কর্মী হতে ভালবাসেন। বৈদেশিক মুদ্রা এদেশে যা কিছু বাঁচছে তার বেশির ভাগই বাঁচছে এঁর পরিকল্পনায়। অর্থাৎ এঁর ভেজাল পরিকল্পনায়। দেশের যাবতীয় খাদ্য এবং ওষুধ-পথ্যে ভেজাল মেশানোর যত কারখানা আছে তার বারো আনার মালিক ইনি। যত খাদ্য বা পথ্য বা ওষুধ এদেশে পাওয়া যায় তার সঙ্গে আধাআধি ভেজাল মেশানো মানেই হচ্ছে, খাদ্যপথ্যওষুধের পরিমাণ ডবল করা। যে সব সাধু ধাপ্পা দিয়ে টাকা ডবল করে, ইনি সে দলের সাধু নন। ইনি না থাকলে খাদ্য-পথ্য-ওষুধের এই বৃদ্ধি ঘটত না। মানে, যতটা বৃদ্ধি ইনি করেছেন, ততটাই ঘাটতি হ'ত, আর তা আনতে হ'ত বিদেশ থেকে, অন্যথা প্রজারা ক্ষেপে যেত। ইনি দেশকে এই সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাচ্ছেন।

ইন্দুমতী খুব খুশীমনে কথাগুলো শুনছিল, শুনে মুগ্ধ হচ্ছিল। পুলকে দুটি চোখ নাচছিল। দর্শকেরা বাইনোক্যুলার দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল তা। সমর্থকেরা আনন্দ-কোলাহল করছিল। এমন সময় সুনন্দার কনুইয়ের গুঁতোয় ইন্দুমতী চমকে উঠে সত্যেরজয়কে নমস্কার ক'রে পরবর্তী প্রার্থীর কাছে গেল। সুনন্দা বলল, ইনি হচ্ছেন অজা বঙ্গালারি। এঁর জন্ম থেকেই ছাগলের মতো একটুখানি দাড়ি চিবুকের নিচে দেখা যায়, সেইজন্য নাম রাখা হয় অজা। এখানে যত প্রার্থী এসেছেন তাঁদের থেকে ইনি একেবারেই স্বতন্ত্র। ইনি বাঙালী, কিন্তু বাংলায় কথা খুব কম বলেন, সরকারী ভাষায় এঁর অধিকার বেশি ব'লে ইনি গর্বিত।

অজা এ কথায় খুশিতে দাড়ি চুলকোতে লাগলেন। সুনন্দা বলতে লাগল, এঁর বিরাট্ এক দেশহিতকর লক্ষ্য আছে এবং সে লক্ষ্যে ইনি দৃঢ় এবং নিশ্চিত পদে এগিয়ে চলেছেন। এঁর লক্ষ্য এক, কিন্তু পথ দুই। ইনি দেশকে ভাষাগত সঙ্কীর্ণতা থেকে বাঁচাবেন, অন্ততঃপক্ষে বাঙালীকে বাঁচাবেন।

অজা খুশী হয়ে গলার ভিতর থেকে বরাহসুলভ একটি ধ্বনি বার করলেন—বাত সচ্চি হ্যায়। এই পরিমাণ বাংলা ইনি অনায়াসে বলতে পারেন।—সুনন্দা বলতে লাগল,—বাংলা দেশ, বাঙালী সংস্কৃতি আর বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালী জাতি এমন মেতে উঠেছে যে স্বাধীন ভারতে বাঙালীই একটি বড় সমস্যা। আধখানা ভাগ ক'রেও ওদের দমানো যায় নি। তাই ইনি ঠিক করেছেন, প্রথমে বাংলার চারদিক্ থেকে বাঙালী তাড়িয়ে বাংলা দেশে এনে জড়ো করবেন, এবং তার পর বাংলা দেশে যে সব বাঙালী চাকরি করছে তাদের চাকরি থেকে তাড়াবেন। এই হ'ল এঁর পরিকল্পনার একদিক্। আর একদিক্ হচ্ছে, বাঙালীর বাংলা ভাষা ভুলিয়ে দেওয়া। এই দুটি কাজে ইনি সফল হলে ভারতবর্ষ নিশ্চিন্ত।

অজা খুব গর্বিতভাবে গলাটা একটু বাড়িয়ে দিলেন। ইন্দুমতী লক্ষ্য করল, চুলের ভিতর দুপাশে দুটো শিঙের মতো কি যেন উঁচু হয়ে আছে। দে'খে তার এত ভাল লাগল, যে, সে যেন মুহূর্তে আত্মহারা হয়ে উঠল। সুনন্দা তাঁর দুখানা পায়ের দিকে ইন্দুমতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তার মনে হ'ল বেশ শক্ত পা, এবং তাতে মোটা ভারী বুট। বুঝতে পারল, বাঙালী-দলনে এঁর পটুত্ব সহজ এবং সলীল। ইন্দুমতী একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল।

ডানদিকে চেয়ে দেখল, আর কোনো প্রার্থী নেই। প্রার্থী ফুরিয়ে গেছে। ইন্দুমতী মূঢ়বৎ আপন প্রতিজ্ঞা ভুলে অজার গলায় মালা পরিয়ে দিল। সুনন্দা বার বার কনুইয়ের গুঁতো দিয়েও তার চেতনা ফেরাতে পারল না, ইন্দুমতী কি এক স্বর্গীয়ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারী ব্যাণ্ড বেজে উঠল। সমর্থকদের, আর অসমর্থকদের মিলিত চিৎকার তার মধ্যে ডুবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি গুরুতর দুর্ঘটনা ঘ'টে গেল ইন্দুমতীর প্রায় পায়ের কাছে।

কাব্যের উপেক্ষিতা সুনন্দা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে! কে আর এখন তাকে ফার্স্ট এড্ দেয়। পরাজিত প্রার্থীরা ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মূর্চ্ছিত অবস্থাতেও সুনন্দা আপন গরজেই এক চোখ খুলে রেখেছিল সবার দিকে। সত্যেরজয় সাধু যখন তার পাশ দিয়ে ইন্দুমতীর মুণ্ডপাত করতে করতে ছুটে যাচ্ছিলেন তখন সুনন্দা হঠাৎ এমনভাবে নিজের একখানা পা তাঁর পথে স্থাপন করল, যার ফলে তিনি বাধা পেয়ে সুনন্দার পাশে
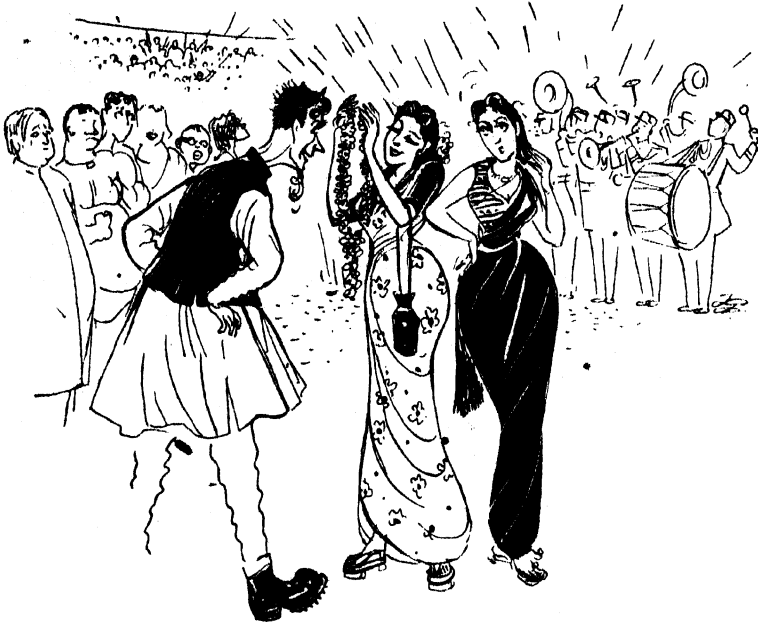
ইন্দুমতী আপন প্রতিজ্ঞা ভুলে অজার গলায় মালা পরিয়ে দিল

উল্টে প'ড়ে গেলেন। সুনন্দা তৎক্ষণাৎ ব্যাগ থেকে আর একটি মালা বার ক'রে সাধুর গলায় পরিয়ে দিয়ে বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগল, also ran···তাই বা কি কম?

মিলিটারী ব্যাণ্ড দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠল। সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল গ্যালারির দিগন্ত থেকে। ইন্দুমতা চমকে উঠে প্রস্তুত হ'ল। অফিসের উপরের ধাপে প্রমোশন পেতে হলে হিন্দি পরীক্ষা দিতেই হবে। হিন্দি ব্যাকরণই পড়ছিল সে এতক্ষণ।

দূর ঘড়িতে বারোটা বাজল ঢং ঢং ক'রে।

—•—

শীত পড়বার পর থেকেই শুরু হয়। সদর দপ্তর থেকে হুকুম আসে জেলার দপ্তরে। জেলার দপ্তর থেকে মহকুমায়। মহকুমা থেকে আসে গঞ্জের থানায়। থানা থেকে ইউনিয়ন বোর্ডে। থানার দারোগা সকাল থেকেই ব্যস্ত। ছোট থানা। তিনটে চৌকিদার নিয়ে কাজ চালাতে হয়। তার মধ্যে গরুর জাব দেওয়া আছে, বাগান কোপানো আছে, বাজার করা আছে। হাটের দিনটাতেই কাজটা বেশি। সাত দিনের মধ্যে একটা দিন হাট। চৌকিদার গোকুল হাটে যায়। মাছের দরকারটাই বেশি। বড় মাছটা আগেই ছোঁ মেরে তুলে নেয় গোকুল।

খদ্দেরের ভিড়ের মধ্যে হাঁ হাঁ ক'রে ওঠে জগা মালো।

বলে—ও-মাছটা নিলে চলবে না চৌকিদার—মাছ আজকে ওঠে নি বেশি।

—চলবে না মানে? ইয়ারকি পেয়েছিস্?

গোকুলের সরকারী তকমাখানা চকচক ক'রে ওঠে রোদ লেগে। মালকোচা-মারা ধুতির ওপর চামড়ার বেল্টটা ঘুরিয়ে বাঁধা। তার মধ্যখানে পেতলের তকমা। তকমার ওপর ইংরেজী অক্ষর লেখা। হাতে একটা লাঠিও থাকে গোকুলের।

বলে—চলবে না মানে? চলবে না মানে কী? কী পেয়েছিস্ তোরা? মগের মুল্লুক? তোর মাছ ধরা একেবারে ঘুচিয়ে দেব না—

এর পর আর কথা বাড়াবার সাহস হয় না জগা মালোর। চৌকিদারের ঝাঁকড়া চুল আর মোটা লাঠিটার দিকে চেয়ে জগা মালো কেমন এক নিমেষেই মিইয়ে আসে। আর উচ্চবাচ্য করবার সাহস হয় না তার। আবার মাছ বেচতে বসে। অন্য খদ্দেরের সঙ্গে গরম-মেজাজে কথা বলে। কিন্তু গোকুল তখন অন্য দিকে চ'লে গেছে। গোকুলকে অন্য অনেক জিনিষ নিতে হবে। লাউ, কুমড়ো, বেগুন, উচ্ছে, সবই দরকার।

বাজারটা দারোগাবাবুর পায়ের কাছে রাখতেই দারোগাবাবু কাজ করতে করতে সেদিকে চেয়ে দেখে। বলে—কী রে, কী মাছ পেলি?

তার পর মাছটার চেহারা দে'খে বলে—বড় মাছ পেলি না? এতে কুলোবে?

গোকুল বলে—জগা মালোর আজকাল বড় বাড় বেড়েছে হুজুর, বলে মাছ দেবে না—

—কেন?

—আজ্ঞে, গায়ের জোর।

দারোগাবাবু বলে—তা ধ'রে নিয়ে এলি না কেন বেটাকে? চালান ক'রে দিতুম—

এ-সব সাধারণ ব্যাপার। এ-সব ব্যাপারে গোকুল চৌকিদার নিজের ক্ষমতার অপব্যয় করা পছন্দ করে না। এক-একবার অনেক দূরে যেতে হয় সরকারী কাজে। সমন জারি করতে হলে বাগমারী ছাড়িয়ে পাঁচ ক্রোশ দূরে কোটচাঁদপুরে যেতে হয়। সাত ক্রোশ দূরে পলাশডাঙায় যেতে হয়।

রাস্তায় পড়ে বাগমারী। বাগমারীর ভুবন ময়রার কদমার নাম আছে। ফাঁপা কদমা একটা মুখে পুরে দিয়ে এক ঘটি জল খেলে পেটটা ঠাণ্ডা হয়। গোকুল সোজা গিয়ে একবারে মাচার ওপরেই ব'সে পড়ে।

—কী খবর গোকুল?

ভুবন ময়রা বৃদ্ধ লোক। পাক্ চড়াতে চড়াতে মাচার ওপর গোকুলকে বসতে দেখেই ভুবন ময়রা অভ্যর্থনা করে। বলে—এদিকে কী করতে?

—আর বলেন কেন দত্তমশাই, সরকারী কাজে আর নিঃশ্বাস ফেলবার যো আছে আমাদের! এই যাচ্ছি সরকারী হুকুম তামিল করতে—সরকারী কাজে মজাও যত আবার ঝামেলাও তত—

ভুবন ময়রা জিজ্ঞেস করে—তা তোমাদের গঞ্জের খবর কী গোকুল?

গোকুল বলে—খবর বড় খারাপ দত্তমশাই—

—কেন? কী হলো আবার!

গোকুল বলে—আজ্ঞে, এবার আর ট্যা-ফুঁ করা চলবে না কারো দত্তমশাই, সবাইকে ধ'রে চালান দিতে হবে সদরে—

—কী রকম?

—আর কী রকম? সরকারী-হুকুম বেরিয়ে গেছে সদর-দপ্তরে। এবার জেলার দপ্তরে খবর আসছে। তার পর আমাদের গঞ্জে আসতে যা দেরি! সরকারী কাজের অনেক ঝঞ্ঝাট দত্তমশাই, জানেন! যত মজা, তত ঝঞ্ঝাট! এই পনেরো বচ্ছর সরকারী কাজ ক'রে দেখছি তো, বড় ঝামেলা—

ভুবন ময়রা বলে—তা হুকুমটা কী বেরোচ্ছে গোকুল?

—বেরোচ্ছে না দত্তমশাই, বেরিয়ে গেছে, এই গঞ্জে আসতে যা দেরি! জগা মালোর কাছে একটা মাছ নিয়েছিলুম, বুঝলেন দত্তমশাই, এই এতটুকু এক চিলুতে একটা মাছ, আমাকে একেবারে রেগে মারতে এল ঘুঁষি উঁচিয়ে—

—সে কী?

ভুবন ময়রাও জগা মালোর ঔদ্ধত্যের কথা শুনে অবাক্ হয়ে যায়।

বলে—বল কি গোকুল, সরকারী লোককে ঘুঁষি মারতে আসে?

গোকুল বলে—তা এইবার জব্দ দত্তমশাই, এইবার মাছ না দিলে একেবারে আর কথাটি নয়, সদরে দেব চালান ক'রে, হুকুম বেরিয়ে গেছে—

তারপর একটু থেমে বলে—তা যাক্ বাজে কথা—আজ কদ্‌মা'র পাক্ কেমন দাঁড়ালো দত্তমশাই?

ভুবন ময়রা সেই কথাই ভাবছিল এতক্ষণ। বললে—কদ্‌মা নেবে নাকি গোকুল?

গোকুল জিভ্ কাটলে। বললে—আজ্ঞে, না না, আমি কদ্‌মা কী করবো—দারোগাবাবু বলছিল আমাকে—তাই বলছি—

—কী বলছিল?

—দারোগাবাবু বলছিল—গোকুল তুই তো যাচ্ছিস কোটচাঁদপুরে, বাগমারীতে ভুবন ময়রাকে ব'লে আমার নাম ক'রে সের পাঁচেক কদ্‌মা নিয়ে আসিস্ তো—

ভুবন ময়রার বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো। বললে—সের পাঁচেক?

গোকুল বললে—আজ্ঞে, মুশ্‌কিল তো আপনিই করেছেন দত্তমশাই, আপনার কদ্‌মার যে নাম-ডাক ছড়িয়ে গেছে সরকারী মহলে, দারোগাবাবুর শ্বশুরমশাই চেয়ে পাঠিয়েছেন। বলেছেন—বাগমারীর ভুবন ময়রার কদ্‌মা সের পাঁচেক পাঠিয়ে দিও! তা সরকারী লোক কী করবে, দোষ তো আপনারই, এত ভালো কদ্‌মা আপনি করেন কেন?

তা শুধু বাগমারীর কদ্‌মাই নয়, পলাশডাঙার চিঁড়ে, কোটচাঁদপুরের দই, বল্লভপুরের মানকচু, সব জোগাড় ক'রে গোকুল যখন সমন জারি ক'রে ফেরে তখন রাত।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের বাড়ির কাজ-কর্ম হলে গোকুলের আর দেখা পাওয়া যাবে না ক'দিন। তখন আর গোকুলকে পাওয়া যাবে না কোথাও।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে—কী গো গোকুল, তোমার যে আর দেখাই পাওয়া যায় না, কোথায় ছিলে?

গোকুল বলবে—আজ্ঞে, সরকারী কাজে।

—তা সরকারী কাজ কি দিনরাতই চলে তোমার?

গোকুল বলে—আজ্ঞে, সরকারী কাজের তো মজাই ওই, দিনমানও নেই, রাতও নেই—এ-কাজে যত মজা তত ঝামেলা—

—তা কী এমন সরকারী কাজ গোকুল?

গোকুল বলে—আজ্ঞে, পেসিডেনের মেয়ের বিয়ে গেল কি না—

—তা প্রেসিডেণ্টের মেয়ের বিয়েও কি সরকারী কাজ বলতে চাও গোকুল?

গোকুল বলে—পেসিডেনই যে সরকার আজ্ঞে, সরকার আর পেসিডেন্ কি আলাদা দব্য, মশাই?

সত্যিই, গোকুলের চোখে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টও যা, ওর সরকারও তাই। গঞ্জের প্রেসিডেণ্ট বড় রাশভারি লোক। তাঁর মহাজনী-কারবার আছে, মাছের কারবার আছে, পাট, তিসি, তামাকের কারবারও আছে। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর প্রেসিডেণ্ট-এর বাড়িতে গিয়ে একবার হাজ্‌রে দিতে হয় গোকুলকে।

বিশ্বাস মশাই গোকুলকে দেখেই ধম্‌কে ওঠেন। বলেন—সারাদিন কোথায় ছিলি রে গোকুল?

—আজ্ঞে গিচ্‌লাম পলাশডাঙায় সমন জারি করতে।

—তা সমন জারি করতে চৌপোর দিন লাগে? বল্, কোথায় গিয়েছিলি?

—আজ্ঞে বাগমারীতে ভুবন ময়রার কাছ থেকে সের পাঁচেক কদ্‌মা নিয়েছিলুম দারোগাবাবুর জন্যে, আর আসবার সময়···

—আসবার সময়?

—আসবার সময় পলাশডাঙা থেকে চিঁড়ে এনেছিলাম, কোটচাঁদপুর থেকে এক হাঁড়ি দই আর বল্লভপুর থেকে এক হাত একটা মানকচু—

বিশ্বাস মশাই বললেন—সে-সব কোথায় রাখলি?

—আজ্ঞে, রেখেছি চণ্ডীমণ্ডপে—কাল সক্কালে দারোগাবাবুকে দিয়ে আসবো।

বিশ্বাস মশাই ভালো ক'রেই জানতেন দারোগাবাবুর কথাটা বাজে কথা। বললেন—নিয়ে আয় সব এখানে, আমার সামনে হাজির কর্, দেখি কী এনেছিস্—

গোকুল সবগুলো সামনে এনে হাজির করে। কদ্‌মা সের পাঁচেকই বটে, তার পর আছে দই, চিঁড়ে, মানকচু!

বিশ্বাস মশাই সব জিনিষগুলো দেখলেন। বললেন—এগুলো সব ভেতরে দিয়ে আয়—

গোকুল একবার দ্বিধা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু সরকারের নুন খেয়ে সরকারকে তাচ্ছিল্য করতে নেই। ভেতরে গিয়ে প্রেসিডেন্টের বাড়ির ভাঁড়ার-ঘরে তুলে দিয়ে এল জিনিষগুলি।

বাইরে আসতেই বিশ্বাস মশাই বললেন—কালকে আবার যাবি, বুঝলি?

—কোথায় হুজুর?

বিশ্বাস্ মশাই ধমকে ওঠেন।

—কোথায় ব'লে দিতে হবে নাকি আমাকে? দারোগাবাবুর জিনিষ দারোগাবাবুকে পৌঁছে দিতে হবে না?

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই গোকুল আবার বেরোয়। আবার গিয়ে হাজির হয় বাগমারীতে। আবার গিয়ে ভুবন ময়রার মাচার ওপর বসে।

ভুবন ময়রা বলে—কী গো গোকুল, কী খবর? আবার কী মনে ক'রে?

গোকুল্ গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বলে—আর কী করতে দত্তমশাই, সরকারী কাজে!

—তা সরকারী কাজ কোথায় পড়ল আবার?

গোকুল বলে—এই আপনার কাছে—

—আমার কাছে সরকারী কাজে? আমি আবার কী করলাম গোকুল?

গোকুল হাসে। বলে—আজ্ঞে, দোষ তো আপনারই, আপনার কদ্‌মার এত নাম-ডাক হয় কেন, সেইটে আগে বলুন?

ভুবন ময়রা বলে—তা আবার কি সের পাঁচেক কদ্‌মা দরকার?

গোকুল জিভ্ কাটে, বলে—সে কি দত্তমশাই! আমি কি সে-কথা বলতে পারি আপনাকে। আমি সরকারের চৌকিদার, আমি কেবল সরকারী হুকুম তামিল করতে পারি—তাই তো বলি, সরকারী কাজে মজা আছে বটে, কিন্তু ঝামেলাও কম নয়—

—তা কী হুকুম গোকুল?

গোকুল বলে—এবার সের পাঁচেক নয় দত্তমশাই। দারোগাবাবু একটা কদ্‌মা মুখে দিয়ে বললে—ভুবন বড় খাসা কদ্‌মা করে রে—তা সের পাঁচেক তো শ্বশুর-মশাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমার বাড়ির জন্যে একটু আন্‌লি না গোকুল? তা আমি বললুম—তা আনবো, দত্তমশাই তো তেমন লোক নয়,আরো এক সের বললেই দিয়ে দেবেনখন্—

ভুবন ময়রা হাসতে লাগলো।

বললে—কিন্তু গোকুল, দারোগাবাবু যে এখখুনি নিয়ে গেল দু'সের কদ্‌মা—

গোকুল অবাক্ হয়ে গেল। বললে—সে কি? নিয়ে গেলেন? কখন নিয়ে গেলেন!

ভুবন বললে—এই তো এখখুনি, এই চার দণ্ড আগে—দারোগাবাবু নিজে যাচ্ছিল পলাশডাঙায়!

—সঙ্গে চৌকিদার কে ছিল?

—নবীন।

—এই দেখ কাণ্ড রে! দারোগাবাবুর ভুলো মন তো, আমাকে যে কদ্‌মা আনতে বলেছে, তা একদম্ ভুলে গিয়েছে দারোগাবাবু!—কী কাণ্ড,—যাই আবার বলিগে যাই—

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গোকুল এসে দাঁড়াল। বল্লভপুরের ঝাঁকড়া বটগাছটা পেরিয়ে, বেঁটে আমগাছতলায় গোকুলের পিসীর বাড়ি। বাড়ির সামনে থেকেই গোকুল ডাকলে—মুকুন্দ—অ মুকুন্দ—

গোকুলের ডাক শুনেই মুকুন্দ দৌড়তে দৌড়তে এসেছে।

—অই বাপ্ এসেছে, বাপ্ এসেছে—

—এই যে বাবা, কেমন আছ বাবা?

গোকুল ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে।

পিসীও এল পেছন-পেছন। বিধবা পিসী। এসে দাওয়ার সামনে দাঁড়াল।

বললে—হ্যাঁ রা গোকুল, এই তোর আসা, ব'লে গেলি গেল হপ্তায় কদ্‌মা নিয়ে আসবি, এখেনে খাবি, আমি রেঁধে-বেড়ে ব'সে রইলুম, শেষকালে ভাত-তরকারী নষ্ট হলো—এই তোর কথার ঠিক?

—তা কী ক'রে আসবো বলো পিসী ! এ কি আমার ক্ষেতের কাজ, যে ছুট্ বললেই চ'লে আসবো ? এ যে সরকারী কাজ পিসী ! সরকারী কাজের যে ঝামেলা বেশি—এ কাজে যত মজা, তত যে ঝামেলা—

পিসীও কম নয়। মুখ নাড়া দিয়ে উঠলো।

বললে—ঝাঁটা মারি অমন সরকারী কাজের মাথায় ! তা হলে তোমার ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখো তুমি, আমি ঝাড়া হাত-পা হই বাপু, পরের ছেলে নিয়ে আমার এ কী জ্বালা—আমি আর পারবো না রাখতে তোর ছেলেকে ! দিন-রাত বাপ্ বাপ্ ব'লে কাঁদে—ও কি তেমন ছেলে !

মুকুন্দ তখনও বাপের কোলে উঠে বাপকে আঁকড়ে ধ'রে আছে। বাপকে যেতে দেবে না।

বলে—আমার কদ্‌মা এনেছ বাপ্ ?

গোকুল ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—তোমায় তো বলেছি পিসী, আর দু'টো দিন সবুর করো, তখন নিয়ে যাবো মুকুন্দকে। মুকুন্দকে কি চেরটাকাল তোমার কাছে রাখবো বলেছি ? এই পেসিডেনকে বলেছি পিসী, বুঝলে, বলেছি যে ঘর আমায় একটা দিতে হবে,—এই ঘরটা পেলেই মুকুন্দকে নিয়ে যাবো, বুঝলে ? সরকারী কাজের তো ঝামেলাই এই, কথা দিয়ে কথার খেলাপ করতে হয়—সরকারী কাজ তো তুমি করলে না পিসী, করলে ঠেলাটা বুঝতে। এ কাজে যত মজা, তত ঝামেলা—

মুকুন্দ তখনও বাপের বুকের ওপর মুখ গুঁজে প'ড়ে রয়েছে।

পিসী ছেলে-বাপের এই দৃশ্য দে'খে আর দাঁড়াল না সেখানে।—ভারি একেবারে মায়া ছেলের জন্যে ! যখন আসবে না তো আসবে না, একেবারে এক যুগ দেখা নেই। আবার দেখা হলেই ছেলে অন্ত প্রাণ। মুখে আগুন অমন বাপের !

ছেলে মুখ তুলে বললে—আমার কদ্‌মা আনলে না বাপ্ ?

গোকুল বললে—আনছিলুম বাবা, কিন্তু পেসিডেনবাবু যে সব নিয়ে নিলে। সরকারী কাজের তো ঝামেলা তুমি বোঝ না বাবা, বড় হয়ে সরকারী কাজ যখন করবে বাবা, তখন বুঝবে—সরকারী কাজে মজা থাকলে কী হবে, ঝামেলাও যে অনেক—

মুকুন্দ আবার বড় হবে ! মুকুন্দ আবার সরকারী চাকরি করবে !

ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে গোকুল ডাকলে—ও পিসী, পিসী—

পিসী আবার এল। বললে—ছেলের সোহাগ হলো ?

গোকুল সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—এই টাকাটা রাখো পিসী, মাইনে পেলে ওমাসে আবার টাকা দিয়ে যাবো বেশি ক'রে। একটু দুধ-টুধ খাইও মুকুন্দকে, বুঝলে, মা-মরা ছেলে, বুঝতে পারছো তো—

—তা একটা টাকায় কী ক'রে চলবে বাপু ? দিন-কাল কী রকম পড়েছে, বুঝতে পারো না তো ! সংসার তো ঘুচিয়ে দিয়েছ বউটাকে মেরে—

গোকুল পিসীকে শান্ত করে।

বলে—ওই দেখ, তুমি আবার প্যান্ প্যান্ সুর করলে। বলেছি তো মাইনে পেলে টাকা দিয়ে যাবো। আর সামনেই তো টিকের মরশুম আসছে—তখন কত টাকা তোমার দরকার, একেবারে ঢেলে দেব টাকা—যত নিতে পারবে !

পিসী ঠোঁট উল্টোল।

—ওঃ, টাকার গুমোর দেখাচ্ছে—

—গুমোর নয় পিসী, গুমোর নয়—এবার টিকের মরশুম এলে আর কাউকে ছাড়ান্-ছোড়ন নেই, টাকা নেব তবে ছাড়বো, আমার নাম গোকুল চৌকিদার—সরকারী ক্ষেমতা দেখিয়ে দেব না একেবারে—

তারপর মুকুন্দকে বলে—যাও বাবা যাও, সন্ধ্যে হলো, ঘরে যাও, আমি তোমার জন্যে কদ্‌মা এনে দেব, যত কদ্‌মা খেতে পারবে তুমি, তত দেব—লক্ষ্মী বাবা আমার—

ছেলেকে ঘরে তুলে দিয়ে গোকুল আবার গঞ্জের দিকে রওনা দেয়।

তা দেখতে দেখতে টিকের মরশুম এসে গেল।

শীত পড়ার পর থেকেই সুরু হয়। টিকের মরশুমে দু'টো পয়সা হাতে আসে। প্রথমে জেলা থেকে হুকুমটা আসে মহকুমায়। মহকুমা থেকে থানায়, তার পর থানা থেকে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে। প্রেসিডেন্টের অফিসও বদলায়। আগে ছিল পলাশডাঙায়, তারপর ছিল কোটচাঁদপুরে, এখন হয়েছে গঞ্জে। বিশ্বাস মশাই-এর বাড়ি একেবারে গঞ্জের ভেতরে। যখন যিনি প্রেসিডেন্ট, তখন তাঁর বাড়িতেই বোর্ডের অফিস্।

আগে থেকেই গোকুল ব'লে রেখেছিল বিশ্বাস মশাইকে।

অন্যবারে নবীন যায়, অন্য কেউ যায়। এবার গোকুলের পালা। আর তারপর যদি তেমন-তেমন টিকের মরশুম পড়ে তো কারো আর নাইবার-খাবার সময় থাকে না। তখন থানার সব চৌকিদারের তলব পড়ে। এবার যখন নোটিশ এল তখন গোকুল মালকোঁচা বেঁধে তৈরি।

এবার জেলা থেকে এলো ছোকরা একজন টিকে-বাবু। নতুন চাকরি তার। আগে আড়তে কয়ালি করতো। ধান চাল তিসি মষণে মাপতো। সে আড়ত উঠে যাওয়ায় এখন এই কাজ পেয়েছে।

বলে—সে উঠে গেছে ভালোই হয়েছে, এখন আরাম ক'রে পায়ের ওপর পা তুলে থাকবো—কেউ কিছু বলবার নেই—

সত্যিই তোফা আরাম। মাইনে চার আনা রোজ। আর একটা ঘোড়া। ঘোড়ার খাই-খরচও দেওয়া হয়। মাস-কাবারি বিল ক'রে জেলায় পাঠিয়ে দিলেই স্যাংশান্ হয়ে আসে সদরে। তা সব মিলিয়ে চৌদ্দ-পনের টাকা হবে মাসে। হিসেব ক'রে দেখেছে টিকে-বাবু। আগে আড়তে পেত সাত টাকা। এখন বেড়েছে, ডবল হয়েছে বলা যায়। আর এ চাকরিতে খাটুনি কম। আসলে ঘোড়ার আর খরচ কী। যা এদিক্-ওদিক্ থেকে খুঁটে খেতে পারে খাবে। তবে বিল ঠিকই হবে ঘোড়ার বাবদে।

সব শুনে গোকুল বলে—তা সরকারী চাকরির তো মজাই ওই—যত ঝামেলা, তত মজা—

ঘোড়ায় চ'ড়ে এসেছিল টিকে-বাবু।

প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস মশাই বললেন—আসলে এবার মামুদপুরেই ভয়টা বেশি, ওই দিক্ থেকেই খবরটা এসেছে—

টিকে-বাবু জিজ্ঞেস করলে—মামুদপুর এখান থেকে কতদূর ?

বিশ্বাস মশাই বললেন—সে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমার চৌকিদার গোকুল আছে, সে-ই সঙ্গে যাবে—

গোকুল বললে—হ্যাঁ, আমি তো আছি, আমি মামুদপুরে নিয়ে যাবো, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না—

গোকুল একটা ঢোল নিলে কাঁধে তুলে। আর টিকে-বাবু ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে বসলো। একটা ওষুধের বাক্স ছিল সঙ্গে, সেটা রইল কাঁধে ঝোলানো।

গোকুল বললে—আমি ঘোড়ায় উঠবো টিকে-বাবু ?

নিরঞ্জন বললে—না বাপু, এ সরকারী ঘোড়া, ভার সইতে পারবে না।

তা পাঁচ ক্রোশ হাঁটতে পেছপা নয় গোকুল। সকালবেলা বিশ্বাস মশাই-এর বাড়ি থেকে ফ্যানে-ভাতে খেয়ে বেরোল দু'জনে। প্রথম পড়ে বাগমারী, তার পর পলাশডাঙা, তার পর কোটচাঁদপুর, তার পর বল্লভপুর—তার পর হলো মামুদপুর। মামুদপুর ছোট জায়গা। না আছে হাট, না আছে একটা চৌকিদার, না আছে দোকান-পাট কিছু। গরীব মানুষ সব মামুদপুরের বাসিন্দা। বাঁশ কেটে কেটে চ্যাচারি তৈরি করে। সেই চ্যাচারি দিয়ে ঝুড়ি হয়। সেই ঝুড়িই হলো মামুদপুরের প্রধান পণ্য। গঞ্জ থেকে ব্যাপারীরা আসে মামুদপুরে। ঝুড়ির দাদন দিয়ে যায় আগাম। তারপর ঝুড়ি তৈরি হলে মাল নিয়ে যায়। তখন আবার দাদন দিয়ে যায়। দেনা প'ড়ে থাকে বছর-ভোর। সে-দেনা আর এ জন্মে শোধ হবার নয়। শেষ হয়ও না। বাগ্দী, মুচি, ডোম, এই সব প্রজা সেখানে। ছোট ছোট খুবরি খুবরি ঘর। একবার ঝড় উঠলো তো সব উল্টে-পাল্টে ছত্রখান হয়ে গেল সব ঘর-দোর। তখন আবার ব্যাপারীরা আসে দলে দলে। আবার আগাম দাদন দিয়ে যায়। তারাও হাত বাড়িয়ে আগাম দাদন নেয়। সেই দেনা শোধ যদি কখনও হয় তো তার তিন পুরুষ পরে। তখন ম'রে ভূত হয়ে গেছে দেনদার-পাওনাদার, সবাই। তখন পাওনাদারের তস্য পুত্রের পুত্রের সঙ্গে দেনদারের তস্য পুত্রের পুত্রের সঙ্গে লেন-দেন চলছে।

পথে বাগমারীতে আসতেই গোকুল হাঁক দেয়—ও দত্তমশাই—

—কী গো গোকুল, কোথায় ?

—আর কোথায় ? সরকারী কাজে ! টিকের মরশুম পড়েছে মামুদপুরে। সরকারী কাজের এই তো ঝামেলা—

মামুদপুর নিয়েই সদর-জেলার মাথা-ব্যথা বেশি। বড় নোংরা, বড় গরীব মানুষগুলো। ম'রে হেজে গেলেও রা কাড়ে না তারা। জন্তু-জানোয়ার ম'রে গেলে সে আর ভাগাড়ে ফেলে না, কেটে রান্না ক'রে খায়। টাকা ধার করতেই শিখেছে তারা, শোধ দিতে শেখেনি। শোধ যা করে তা-ও গতর দিয়ে। আবার সে দেনার বেশির ভাগই গতর দিয়েও শোধ হয় না। পুরুষানুক্রমেও না।

সেই মামুদপুরের লোক একদিন সকালবেলা ঢোলের শব্দ শুনে চমকে ওঠে।

সকালবেলা কে ঢোল বাজায় ! কী হয়েছে গা ? কিসের বাদ্যি ? কার পুজো ?

ছেলে-বুড়ো সবাই ভিড় ক'রে গিয়ে দাঁড়ায় মা-মঙ্গলচণ্ডী-তলায়। মা-মঙ্গলচণ্ডী-তলা মামুদপুরের দেবস্থান। বাতাসা মুড়কি দিয়ে কেউ কেউ মানত করে দেবস্থানে। দুর্যোগ, অসুখ-বিসুখ, মড়ক, যা কিছু হোক গাঁয়ে, তার একমাত্র ভরসা মা-মঙ্গলচণ্ডী !

আপদ্-বিপদে মামুদপুরের মানুষের আর কেউ নেই। সরকার নেই, হাকিম নেই, থানা নেই, ডাক্তার-বদ্যি কিছুই নেই। আছে শুধু নির্বাক্ মৃন্ময়ী দেবী মা-মঙ্গলচণ্ডী ! মঙ্গলচণ্ডীর দয়ায় অনেক আপদ্-বিপদ্ থেকেই রক্ষে পেয়েছে মামুদপুরের মানুষ।

তা সেই মামুদপুরে সরকারী লোক দে'খে ভয় পেয়ে গেল ছেলে-বুড়ো সবাই। ন্যাংটো-ন্যাংটো ছেলেমেয়েরা গিয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলো। ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে নিরঞ্জন তখন বসেছে মা-মঙ্গলচণ্ডীর দাওয়ায়। আর গোকুল চৌকিদার তখন ঠাই-ঠাই ক'রে ঢোলে চাঁটি মারছে।

সবাই তখন আসে নি।

গোকুল চীৎকার ক'রে বললে—কোথায় রে, আর সবাই কোথায় গেল ?

—এজ্ঞে, সব্বাই তো এইচি হুজুর !

গোকুল বলে—সরকারী চৌকিদার আমি, সরকারী কাজে এসেছি, হুকুম না-মানলে সব্বাইকে চালান ক'রে দেব,—বুঝলি—

সবাই ভক্তিভরে শোনে গোকুলের কথা। যারা আসে নি তারাও এসে হাজির হয়। ভিড় হয়ে যায় চার-দিকে। সরকারী হুকুম না-মানলে চালান হয়ে যাবে সকলের।

—হুকুম হয়েছে, টিকে নিতে হবে সকলকে !

এক বুদ্ধগোছের লোক বলে—আজ্ঞে, টিকে আমরা কেন নিতে যাবো খামোকা, ও যে গো-রক্ত আজ্ঞে—

গোকুল বলে—সরকারী হুকুম, নিতেই হবে, এই টিকে-বাবু এসেছে টিকে দিতে—না-নিলে চালান ক'রে দেব সদরে—

—কিন্তু গো-রক্ত কেমন ক'রে শরীলে নিই হুজুর, আমরা হলাম হিন্দু যে আজ্ঞে !—

গোকুল বলে—তাহলে চলুন টিকে-বাবু, থানার দারোগাবাবুকে খবর দিয়ে দিই, কেউ টিকে নেয় নি, চালান ক'রে দিন সদরে—

ব'লে ঢোল-টোল গুছিয়ে উঠে পড়বার জোগাড় করে গোকুল। টিকে-বাবুও ঘোড়ায় ওঠবার বন্দোবস্ত করে।

ততক্ষণে বুড়োরা একসঙ্গে জড়ো হয়ে কি যেন পরামর্শ করে। সরকারী চৌকিদারকে ফেরত দেওয়া হচ্ছে, দারোগাবাবু এসে চালান ক'রে দেবে সকলকে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায় সকলের।

একজন এগিয়ে যায়। বলে—ও চৌকিদারবাবু, বলি রাগ করেন কেন ?

গোকুল চীৎকার ক'রে ওঠে। বলে—রাগ ? রাগ করলাম কখন ? সরকারী কাজে কি রাগ করবার ফুরসুৎ আছে হে ? এ তোমাদের ঝুড়ি তৈরি নয়, এর নাম সরকারী চাকরি, পান থেকে চুণ খসবার জো নেই এখেনে—

—তা আপনিই বলুন হুজুর, দোষটা আমাদের কি ! গো-রক্ত শরীলে নেব ? ধম্ম ব'লে তো একটা জিনিষ আছে ! মাথার উপর ভগমান ব'লে তো একজন মানুষ আছে !

গোকুল বলে—তা তো আছেই ! টিকে না দিতে চাও তো খেসারত দাও—

—কিসের খেসারত ?

—এই যে সরকারী-লোক এত পথ ঠেঙিয়ে এল, তার খেসারত দিতে হবে না। ওম্‌নি ওম্‌নি যাবে ?

—তা খেসারত আমরা না-হয় দেব, বলুন আজ্ঞে, কত খেসারত দেব ?

গোকুল বললে—যা সরকারী আইন আছে তাই দিতে হবে, বেশী আমি একটা আধলা নেব না, ভয় নেই তোমাদের—

—আপনি বলুন হুজুর, কত ?

—মাথা-পিছু দু'গণ্ডা পয়সা।

মাথা-পিছু দু'গণ্ডা পয়সা, কম নয়। তা হোক, তবু তো গো-রক্ত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু মামুদপুরের মানুষের সেই দু'গণ্ডা পয়সাই যে কোত্থেকে আসে তার ঠিক নেই। ঘষা মরচে-পড় কলঙ্ক-ধরা পয়সা যে সব কোথায় এতদিন লুকিয়েছিল কে জানে, সেই সব জড়ো ক'রে এনে হাজির করতে লাগলো তারা।

টিকে-বাবু বললে—যখন "মায়ের-দয়া" হবে তখন কিন্তু সরকারকে দুষো না—এই ব'লে রাখছি—

—আজ্ঞে, আমরা গরীব লোক, আমাদের মা-মঙ্গলচণ্ডী আছে—

টাকা-কড়ি হিসেব ক'রে নিয়ে উঠলো গোকুল।

টিকে-বাবু বললে—কত হলো গোকুল ?

—তা হয়েছে ভাল। আপনার ভাগে তিরিশ টাকা, আমার ভাগেও তিরিশ টাকা—

তা হয়েছে ভাল। আপনার ভাগে তিরিশ টাকা,
আমার ভাগেও তিরিশ টাকা।

—টিকের মরশুমে কি তোমরা এই রকমই পাও ?

গোকুল বললে—আজ্ঞে, সব বার কি আর পাই টিকে-বাবু, অন্য চৌকিদারেরা নেয়। আমার একটা মা-মরা ছেলে আছে, তা তারই জন্যে খরচে কুলোতে পারি না, পিসীর কাছে থাকে, তা এবার ভাবছি এই টাকাটা নিয়ে যাবো পিসীর কাছে। সব পাওনা-গণ্ডা শোধ ক'রে ছেলেকে নিয়ে আসবো এবার, অনেক দেনা হয়ে গেছে কিনা পিসীর কাছে—

—পিসীর কাছে দেনা কেন ?

গোকুল বলে—বউ-এর অসুখের সময় পিসী সাবু খাইয়েছে, বার্লি খাইয়েছে সোহাগ ক'রে, বউটা বাঁচলো না, তা তার দেনা তো আমাকে শোধ করতে হবে টিকে-বাবু, তারপর আমার ছেলেকে খাওয়াচ্ছে-পরাচ্ছে, তারও খরচ আছে।

রিপোর্ট দিতে হবে বিশ্বাস মশাই-এর কাছে। মামুদপুর গ্রামের সব লোককে টিকে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বাস মশাই খাতায় লিখে নিলেন। সেই রিপোর্ট যাবে থানায়। থানা থেকে সদরে। সদর থেকে জেলায়।

গোকুল ভেবেছিল একদিন ছুটি নিয়ে মুকুন্দকে আনতে যাবে। পথে বাগমারী। বাগমারীর ভুবন ময়রার দোকান থেকে কদমা নিয়ে একেবারে পিসীর কাছে যাবে।

কিন্তু তা হলো না, বিশ্বাস মশাই আড়ালে ডাকলেন।

বললেন—গোকুল—

—আজ্ঞে—

—এ দিকে আয়।

গোকুল গিয়ে দাঁড়াল প্রেসিডেন্টের সামনে।

প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন—টিকে দিয়েছিস্?

—আজ্ঞে, সে তো আপনাকে এখ্খুনি বললুম, আপনি খাতায় রিপোর্ট লিখে সদরে পাঠিয়ে দিলেন—

—সে কথা হচ্ছে না, টিকে দেওয়া হয়েছে কি না, বল্?

গোকুল একটু ঘাবড়ে গেল বিশ্বাস মশাই-এর চেহারা দে'খে।

বললে—না হুজুর—

—কত পেলি?

গোকুল আর একবার চাইলে প্রেসিডেন্টের মুখের দিকে।

বললে—হুজুর, তিরিশ টাকার মতন—

—দেখি—

পয়সাগুলো চণ্ডীমণ্ডপে লুকিয়ে রেখে এসেছিল গোকুল। সেখান থেকে এনে দিলে পুঁটুলিটা।

বিশ্বাস মশাই পয়সাগুলো গুনলেনও না, কিছুই না। নিয়ে ক্যাশ্-বাক্সের মধ্যে রেখে দিলেন।

গোকুল আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললে—হুজুর, আমার ছেলেটার জন্যে একটা জামা কিনবো ভেবেছিলাম, আর কিছু দেনা ছিল পিসীর···

—সে পরে হবে!

ব'লে বিশ্বাস মশাই উঠলেন। বললেন—আবার তোকে যেতে হবে মামুদপুরে—তখন নিস্।

তা সত্যিই, দু'দিন বাদেই যে আবার গোকুলকে মামুদপুরে যেতে হবে, তা গোকুল তখন জানতো না। জরুরী চিঠি এল জেলা থেকে। জেলার দপ্তর থেকে সদরে। সদর থেকে মহকুমায়। মহকুমা থেকে গঞ্জের থানায়। আর তারপর থানা থেকে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস মশাই-এর অফিসে।

দারোগাবাবু বললেন—গোকুল, তুই মামুদপুরে টিকে দিস্ নি?

—আজ্ঞে, দিয়েছি হুজুর!

—তা হলে সদর থেকে নোট্ এল যে!

—তা কি জানি হুজুর, 'মায়ের দয়া' যখন হয় তখন কি টিকে-ফিকে মানে হুজুর?

দারোগাবাবু বললেন—যা যা শীগ্‌গির যা, জরুরী চিঠি, বিশ্বাস মশাই-এর কাছ থেকে পরোয়ানা নিয়ে যা—এবার যে-ক'টা বাকি আছে, ধ'রে ধ'রে সকলকে টিকে দিবি, কাউকে ছাড়বি না। যে টিকে দিতে চাইবে না, তাকে চালান দিয়ে দেব সদরে—

ঘোড়ায় চ'ড়ে টিকে-বাবু আবার এসে হাজির।

গোকুলকে দে'খেই বললে—কি গো গোকুল, কি কেলেঙ্কারী দেখ দিকিনি, সবাই সন্দেহ করছে আমরা নাকি টিকে দিই নি—এবার আর কাউকে রেহাই দেব না, বুঝলে, শেষকালে চাকরি খোয়াবো নাকি

বাগমারীতে ভুবন ময়রার দোকানের সামনে আসতেই গোকুল চীৎকার করে উঠলো।

—কি দত্তমশাই—

ভুবন ময়রা মুখ বাড়িয়ে বললে—কি গো গোকুল, আবার কোথায়?

গোকুল বললে—আর কোথায়, সরকারী কাজে! এখন যাচ্ছি, ফেরবার সময় আসবো—সের দু'য়েক রসমু রেখে দেবেন, দারোগাবাবুর জন্যে—

কিন্তু মামুদপুরে সেবারে এক মহামারী কাণ্ড। মামুদপুরের মানুষ-জন আর বাঁচে না। মায়ের দয়ায় সারা গ্রাম উজাড় হয়ে যাবার অবস্থা। মা-মঙ্গলচণ্ডীর পুজো দিয়েও আর রেহাই পায় না কেউ। গঞ্জ থেকে ব্যাপারীরা এসে গেছে টাকা নিয়ে। দশ টাকা দাদন দিয়ে কুড়ি টাকার হাত-চিটেতে সই করিয়ে নিচ্ছে। তাই

জন্যেই আবার ভিড় কত! নদীর ধারে পরপর প'ড়ে আছে মড়াগুলো—সৎকার করবার লোক নেই। মা-মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরের সামনে কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে।

তারপর একদিন সবাই অবাক্ হয়ে দেখলে, ঘোড়ার চ'ড়ে সেই টিকে-বাবু আসছে, আর সঙ্গে সেই চৌকিদার।

গোকুল যেতেই ভিড় হয়ে গেল চারদিকে।

সবাই বলে—এবার টিকে দিয়ে দেন হুজুর—

গোকুল তখন শাসায়। বলে—কেমন, বলেছিলাম না টিকে দিতে, তখন তোমরা বললে, 'গো-রক্ত'—ও নেব না আমরা—আমাদের মা-মঙ্গলচণ্ডী আছে—এখন কেমন জব্দ! এখন মরো সব, মরো—আমি টিকে দেব না—

ছেলে-বুড়ো সবাই হাত বাড়িয়ে দেয়।

বলে—আমরা মুরুখ্যু মানুষ, কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি। ক্ষেমা-ঘেন্না ক'রে নেন হুজুর, গ্যান, কোথায় দেবেন টিকে, দিয়ে গ্যান্—

গোকুল তখন বেঁকে বসেছে। বললে—ক্ষেমা-ঘেন্না ওম্‌নি করলেই হলো! এ কি তোমার ঝুড়ি তৈরি, এ সরকারী হুকুম—সরকারী হুকুম না মানলে জরিমানা দিতে হবে না?

—কেন, জরিমানা কেন লাগবে হুজুর!

—জরিমানা লাগবে না? এই যে সরকারী লোক আমরা, এত সময় নষ্ট ক'রে গেলুম এলুম, এর খরচ দেবে কে?

কথাটা প্রণিধানযোগ্য!

সবাই ভাবতে লাগলো। তা তো বটেই। সেবার ফেরত দেওয়া হয়েছে টিকে-বাবুকে। জরিমানা চাওয়া তো অন্যায় নয়! বললে—কত জরিমানা লাগবে হুজুর?

—এবার ডবল লাগবে। সেবার লেগেছিল দু'গণ্ডা পয়সা, এবার মাথাপিছু চারগণ্ডা লাগবে—

তা তাই সই। মামুদপুরের লোকরা বললে—তা তাইই দেব হুজুর, আপ্পনি গ্যান আমাদের টিকে, আমরা মারা গেলাম—

কোথা থেকে আবার সব পয়সা আসতে লাগলো হুড় হুড় ক'রে। পুরোন কলঙ্ক-ধরা কত পুরুষ আগেকার পয়সা। পয়সাগুলো কোঁচড়ে বেঁধে নিয়ে একটা একটা ক'রে হিসেব করতে লাগলো। অর্দ্ধেক লোক ম'রে গেছে মামুদপুরের। তবু ভাগে পড়বে পঞ্চাশ টাকা ক'রে প্রায়। দু'জনের ভাগ। টিকে-বাবুরই লাভ। সেবার বিশ্বাস-মশাই তিরিশটা টাকাই নিয়ে নিলে। এবার আর বিশ্বাস-মশাইএর বাড়ীতে যাওয়া নয়। এবার সোজা পিসীর বাড়ী। পিসীকে নিয়ে পয়সাগুলো দিলে নিশ্চিন্তি!

পয়সা গুনতে গুনতে গোকুল সকলের দিকে চেয়ে বলে—বুঝলে হে, এ তোমাদের ঝুড়ি বানানো নয়, এ সরকারী পয়সা, এর একটা এদিক্-ওদিক্ হলে চাকরিটা খতম। সরকারী কাজে মজাও যেমন, আবার ঝামেলাও তেমনি—

টিকে দিতে দিতে প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেল।

টিকে-বাবু বললে—এবার কত হলো গোকুল?

—এবার আরো বেশি হতো, কিন্তু সব ম'রে-ঝ'রে গেল, কি ক'রে হবে! আপনার ভাগে পঞ্চাশ টাকা—আমারও পঞ্চাশ—

আবার বাগমারী। বাগমারীতে এসেই গোকুল বললে—আপনি তাহলে সোজা চ'লে যান টিকে-বাবু, আমি একবার পিসীর বাড়ী যাবো—তারপর যাবো আপিসে—

ভুবন-ময়রার মাচার ওপর ব'সে গোকুল গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে ফেললে।

ভুবন-ময়রা বললে—কি গো গোকুল, কখন এলে?

—আজ্ঞে, আর বলেন কেন, সরকারী কাজের মুখে আগুন, সকাল থেকে খাওয়া নেই দাওয়া নেই, এই হুকুম তামিল করছি কেবল।

—ওতে কি? পয়সা নাকি? এত পয়সা?

—আজ্ঞে হাঁ, সরকারী পয়সা।

—এত পয়সা কোত্থেকে আনলে গোকুল?

—কোত্থেকে আবার, জরিমানা তুললুম! সরকারী কাজের মজাই এই, বুঝলেন দত্তমশাই, এতে যত মজা তত ঝামেলা—

তারপর একটু থেমে বলে—দিন্, দারোগাবাবুর বরাদ্দ কদ্‌মা দিন দু'সের—

দু'সের কদ্‌মা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে গোকুল উঠলো।

ভুবন ময়রা জিজ্ঞেস করলে—তাহলে খাওয়া-দাওয়া?

গোকুল বললে—সরকারী কাজে খাওয়া-দাওয়া নেই দত্তমশাই। সাধে কি আর বলি, সরকারী কাজে যত মজা তত ঝামেলা—

লাঠিটা বাঁ হাতে নিয়ে গোকুল চললো। ডান হাতে পয়সার পুঁটলি আর দু'সের কদ্‌মা। পিসীকে আজকে দু'কথা শুনিয়ে দেবে গোকুল। রোজ-রোজ কেবল টাকার কথা তুলে খোঁটা দেয়। টাকা দেখাচ্ছে গোকুলকে। আর দু'চারটে টিকের মরশুম পেলে গোকুল দেখিয়ে দেবে! গঞ্জের মধ্যেই একটা কোঠা তুলবে তখন গোকুল। তখন আর মুকুন্দকে পিসীর কাছে রাখতে হবে না, গঞ্জের ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেবে। তারপর প্রেসিডেণ্ট বিশ্বাস মশাই আছে, দারোগাবাবু আছে। তাদের ব'লে একটা সরকারী কাজে ঢুকিয়ে দেবে মুকুন্দকে। অবশ্য সরকারী কাজে ঝামেলা আছে, কিন্তু মজাও তো আছে!

মাথার ওপর সূর্য্যটা গন্ গন্ করছে আগুনের ডেলার মত!

বল্লভপুরের ঝাঁকড়া বটগাছটা পেরিয়ে বেঁটে আমগাছ তলায় গোকুলের পিসীর বাড়ী।

গোকুল বাড়ীর সামনে গিয়ে ডাকলে—মুকুন্দ, অ মুকুন্দ—

হঠাৎ কেমন যেন গা'টা ছম্ ছম্ ক'রে উঠলো। অন্যবার গোকুলের ডাক শুনেই যেমন দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে মুকুন্দ, তেমন তো এল না!

বেরিয়ে এল পিসী! আর পিসীর সঙ্গে সঙ্গে আরো পাড়ার কয়েকজন মেয়েমানুষ!

গোকুলকে দে'খেই পিসী হাউ-মাউ ক'রে কেঁদে উঠলো।

গোকুল বললে—কি হলো পিসী? হলো কি? মুকুন্দ কোথায়?

হঠাৎ পিসীর কান্না যেন আরো বেড়ে গেল। সঙ্গের মেয়েমানুষগুলোও আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলো।

পিসীর যেমন কাণ্ড! পিসীর এ রকম ন্যাকামী দে'খে দে'খে গোকুলের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

বললে—সরকারী কাজে কি আর ফুরসৎ আছে পিসী, এ তো তোমার ক্ষেতের কাজ নয় যে ইচ্ছে হলো করলুম না, এ তো তা নয়, সরকারী হুকুম তামিল করতেই হবে, এতে যত মজা, তত ঝামেলা—! তা এই নাও, এই কদ্‌মা ধরো—আর তোমার টাকা এনেছি—পঞ্চাশ টাকা বারো গণ্ডা তিন পয়সা আছে—নাও—

পিসীর মুখে এতক্ষণে কথা বেরোল।

—তুই এখন এলি গোকুল, মুকুন্দ যে আর নেই রে—

—কেন?

গোকুল সেই ধুলো পায়েই একেবারে ঝড়ের মতন গিয়ে ভেতরে ঢুকেছে। মুকুন্দ শুয়ে আছে একটা মাদুরের ওপর। তার সারা গায়ে গুটি। তাকে আর চেনা যায় না। কালো কুচ-কুচে সারা গা। প্রাণহীন দেহটা নড়ছেও না চড়ছেও না। শুধু ডান হাতটা এক পাশে চিৎ হয়ে প'ড়ে আছে। মনে হলো যেন হাত পেতে বাবার কাছে কদ্‌মা চাইছে। সেবার কদ্‌মা খেতে চেয়েছিল মুকুন্দ।

হঠাৎ গোকুলের গলাটার ভেতরে যেন ব্যথা ক'রে উঠলো। বলতে গেল—সরকারী কাজের মজাও যত ঝামেলাও তত—সরকারী চাকরির জ্বালাটা তো বুঝলে না পিসী···

কিন্তু বলতে গিয়েও আর কথা বেরোল না গোকুলের মুখ দিয়ে। তার হাতের পোঁটলা দুটো হাত থেকে প'ড়ে সব কদ্‌মা সব পয়সা ছত্রখান হয়ে গেল।
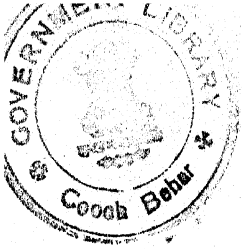
বাংলা দেশে গত ষাট বৎসরের শিক্ষা

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন.

১

বাংলা দেশের শিক্ষার কথা বলিতে বা ভাবিতে গেলে শুধু বাংলা দেশকে লইয়া থাকিলেই চলিবে না। আজও যেমন, ষাট বৎসর পূর্বেও তেমন, একশত বৎসর পূর্বেও তেমন, বাংলার শিক্ষার সহিত ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার যোগ যথেষ্ট। তবে সময় বিশেষে শিক্ষার প্রকৃতি বা প্রসারের তারতম্য অবশ্য আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত বাংলাকে বহু বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইয়াছে; পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলো এখানে যতটা ও যত পূর্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, ভারতবর্ষের অন্যত্র হয়ত ততটা ও ততখানি প্রকাশ পায় নাই। বিশেষ করিয়া তখন বাংলা দেশের কলিকাতা শহর ছিল সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী বা রাজশক্তির কেন্দ্র। গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধির বাসস্থান ছিল এই কলিকাতায়। তাই বাংলা দেশের শিক্ষার কথা বলিতে গেলে সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষার কথাও খানিকটা আসিয়া পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা দেশের শিক্ষা কি অবস্থায় ছিল, সে বিষয়ে পরবর্তীকালে একেশ্বরবাদী উইলিয়ম এডামের বিবরণী বিস্তৃত এবং বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। তাঁহার বিবরণী তিন ভাগে ১৮৩৫ জুলাই, ১৮৩৫ ডিসেম্বর ও ১৮৩৮ এপ্রিলে রচিত। পূর্বে যেসব অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, প্রথমটিতে ছিল তাহার সংক্ষিপ্তসার, দ্বিতীয়টিতে ছিল শুধু রাজশাহীর অন্তর্গত নাটোর থানার বিবরণ, তৃতীয়টিতে আছে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, এবং বিহারের ত্রিহুত ও দক্ষিণ বিহারের পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান। প্রথমটিতে পরিচয় পাই, ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধনীদের সাহায্য না লইয়াই, দেশের জনসাধারণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির—বাংলা ও বিহারে তাহাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। লোকসংখ্যা চার কোটি ধরিলে প্রতি চারিশত লোকের জন্য এক-একটি বিদ্যালয়। গ্রামের সংখ্যা দেড় লক্ষের বেশি, সুতরাং অধিকাংশ গ্রামেরই ছিল নিজস্ব বিদ্যালয়। এই সকল বিদ্যালয়ের রূপ যে কি প্রকার ছিল, নিতান্ত শিশুদের পাঠশালা ছিল—না রীতিমত বড় স্কুল ছিল, তাহা লইয়া বিচার-বিতর্কের অবসর থাকিতে পারে। কিন্তু শিক্ষার জন্য উৎসাহ যে ছিল জ্বলন্ত ও তাহার জন্য ব্যবস্থা ছিল যে প্রচুর, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

তবে বাংলা দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন প্রথমটা কলিকাতা শহরেই এক প্রকার আবদ্ধ ছিল। মিশনরীদের চেষ্টা ছিল, তবে তাহা মুখ্যত ধর্মপ্রচার, সঙ্গে সঙ্গে শিশুশিক্ষণ। কোম্পানীর প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থ উপার্জন। তাই ধর্মান্তরীকরণ অথবা শিক্ষাপ্রদানের কাজকর্ম নিতান্ত সন্দেহের চক্ষেই দেখিতেন। মিশনরীরা এজন্য কলিকাতায় আসর জমাইবার চেষ্টা না করিয়া শ্রীরামপুরেই কর্মকেন্দ্র স্থাপনা করিলেন—সেখানে তখন ওলন্দাজদের অধিকার। আসলে শিক্ষাদানটা যে দেশশাসনেরও অতি প্রযোজনীয় অঙ্গ, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট নিজের দেশেও সেযুগে এ কথাটায় বড় একটা সায় দিতেন না। ইংলণ্ডে তো শিক্ষাবিষয়ক প্রথম আইন হয় ১৮৭০ সালে! অর্থাৎ শিক্ষা যে সরকারের শাসনসংক্রান্ত একটা ব্যাপার, শিক্ষানীতি স্থির করা ও শিক্ষাদান করা যে সরকারের অবশ্যকর্তব্য, তাহা ততদিনে স্বীকৃত হইল।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী যখন পার্লামেণ্টের নিকট আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন সাহায্য মঞ্জুর করিবার সময় লোকহিতৈষী সদস্য বা সদস্যেরা এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে এইরূপ একটা শর্তও বসাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু বরাদ্দ টাকা কি ভাবে ব্যয় হইবে তাহা বাহির করাও প্রথমটায় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা হউক, ক্রমে কোম্পানীর মন এইদিকে গেল এবং ১৮২৩ সালে কাউন্সিল অফ এডুকেশন স্থাপিত হইল। কোন্ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে, কি কি বিষয় শেখানো চলিবে, কয়েক বৎসর তাহা লইয়া বিচারবিতর্ক চলিল। ইতিমধ্যে বেসরকারী বিদ্যালয়ও দেশে কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে; হিন্দু কলেজ ত ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারী নীতি ইংরাজী শিক্ষার অনুকূলে হওয়ার পর

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মেজর উডের ডেস্‌প্যাচে এ বিষয়ে বিস্তৃত পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ভারতবর্ষের বৌদ্ধিক শিক্ষার সনদ intllectual Charter of India নামে ইহা বর্ণিত হইত। প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া সরকারী উচ্চবিদ্যালয় থাকিবে, এবং বিদ্যালয়ের পাঠক্রম পরিদর্শন ও পরীক্ষাদি গ্রহণের ব্যবস্থাও থাকিবে। তাহার উপর কলেজ প্রভৃতিতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্ত প্রতিষ্ঠান এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে চলিবে। তদনুসারে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা—এই তিনটি প্রেসিডেন্সী শহরে ১৮৫৭ সালে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই শিক্ষানীতির সার্থকতা পরীক্ষা করিবার জন্য পঁচিশ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৮২ সালে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বসিল। উডের ডেস্‌প্যাচ অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাহায্য দিবার কথা, কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সে সাহায্য পৌঁছাইত না; কমিশন নবগঠিত স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান—জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের উপর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করিবার দায়িত্ব দিতে চাহিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একেবারেই কেতাবী ছিল, ব্যবহারিক বিদ্যা অর্জন করিবার জন্য কোনও পাঠক্রম, কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। শিক্ষা-কমিশন এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠক্রমের পাশাপাশি 'বি' কোর্সের ব্যবস্থা করিলেন, নীতিশিক্ষার প্রয়োজন বোধে নীতিবিষয়ক পাঠ্য পুস্তক পড়াইবার কথাও কমিশন বলিলেন।

ইহাতেও সমস্যার কোনও সমাধান হইল না। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা তো হইলই না, শুধু দায়িত্ব দিলে কি হইবে? তা ছাড়া ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করিয়া উচ্চবিদ্যালয়ে কোনও সন্তোষজনক ব্যবস্থাই করা গেল না। ইতিমধ্যে লর্ড কার্জন এ দেশে বড়লাট হইয়া আসিলেন। শিক্ষানীতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। আমরা বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

লর্ড কার্জন ১৯০১ সালে সংস্কারের চেষ্টা আরম্ভ করেন, সুতরাং ষাট বৎসর পূর্বে বাংলা দেশের শিক্ষায় এক নবযুগের আরম্ভ হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন, ইহাও লক্ষণীয়;—শান্তিনিকেতনের তপোবনের শিক্ষার আদর্শ অন্যদিক্ দিয়া নবযুগের সূচনা করিয়াছিল।

২

অন্তত আমাদের দেশে দেখিতে পাই, শিক্ষা ও রাজনীতি পাশাপাশি চলিয়াছে। সিপাহী হাঙ্গামা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, স্বায়ত্তশাসনমূলক পল্লী ও জেলাবোর্ডের গঠন ও হাণ্টার কমিশন, কার্জন সাহেবের গর্জন ও র‍্যালে কমিশন প্রায় একই সময়ের ব্যাপার। ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের, শিক্ষা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চলিয়াছে, ইহার পিছনে সুপরিকল্পিত কোনও নীতি নাই, কার্জন এ অবস্থার পরিবর্তন চাহিয়া ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বসাইলেন, তাহার সভাপতির নামানুসারে পরিচয় হইল র‍্যালে কমিশন বলিয়া। ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাসে এই কমিশন নিযুক্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশার্থীর ভিড় বাড়িয়া চলিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাদের মতে আশঙ্কার কারণ ছিল যথেষ্ট। ১৮৮২ সালে উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৫,৪৪৮—১৯০১ সালে তাহা বাড়িয়া হয় ২,৫১,৬২৬। ভারতের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা মিলিয়া ছিল ৭,৪২৯; ১৮৮৫ সালে তাহার দ্বিগুণ; ১৮৮৯ সালে ১৯,১৩৮; ১৯০৬ সালে ২৪,৯৬৩। লর্ড কার্জন প্রমাদ গণিলেন, শুধু রাজনৈতিক কারণে নয়, শিক্ষা-নৈতিক কারণেও বটে। তাঁহার আশঙ্কা হইল, তবে কি আমাদের দেশে শিক্ষার মান বলিয়া কিছু নাই? বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেই হইল? কেমন করিয়া এই ক্রমবর্ধমান সংখ্যার রাশ টানিয়া রাখা যায়, পাশের সংখ্যাই বা কেমন করিয়া কমানো যায়! বাংলা দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল—

১৮৭২ সালে ২,১৪৪
১৮৮২ „ ৩,০০০
১৮৮৫ „ ৪,৩১৭
১৮৮৮ „ ৬,১৩৪
১৯০২ „ ৭,০০০-এরও বেশি।

কর্তারা বলিলেন, ইংরাজীর মান এত নীচু, তাই বুঝি পাশ করিয়াছে এত বেশী! আরও একটা কথা,—পড়াশুনা, সমস্ত জ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের চৌহদ্দীতে আবদ্ধ, ইহাও বেশী পাশের একটা কারণ। আসলে প্রকৃত শিক্ষার মান বাড়াইতে হইবে। সংস্কারের কথা তো অনেকদিন হইতেই চলিতেছিল। কমিশনও তাই সংস্কারের উপর

জোর দিলেন। কলেজে পড়িলে কোনও বেতনই লাগে না, এমন কলেজও সেদিন বাংলা দেশে ছিল। কমিশনের নির্দেশ হইল, একেবারে বিনাবেতনে পড়া চলিবে না, সর্বনিম্ন বেতন যাহা ধার্য করা হইবে তাহা দিতে হইবে, অবশ্য বিশেষ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের কথা স্বতন্ত্র। আর একটা কথা, পড়ানোর মান বাড়াইতে হইলে যে সব কলেজ দ্বিতীয় গ্রেডের, অর্থাৎ যেখানে শুধু দুই বৎসর, শুধু আই-এ পড়ানো হয়, তাহাদের ক্রমে উঠাইয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। সরকারী নূতন শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রস্তাব ছিল, পরীক্ষাকে এতখানি প্রাধান্য দেওয়া হইবে না তাহাও বলা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রভাব দৃঢ়তর করিয়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শাসন ও পরিচালনার জন্য নূতন করিয়া সেনেটের সদস্যদের মধ্যে শতকরা আশী জন মনোনয়নের ব্যবস্থাও হইল।

ইতিমধ্যে লর্ড কার্জনের শাসননীতি অনুসারে বাংলা দেশকে দুই ভাগ করার প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতে চলিল। একই ভাষাভাষী বঙ্গমাতার সন্তানদের লইয়া দুই বিভিন্ন প্রদেশে রাখিবার কথায় দেশময় তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইল। সভাসমিতি বাংলার সর্বত্র হইতে থাকিল। লোকে মনে করিল, কার্জনের শিক্ষানীতি একটা আবরণ মাত্র, প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল, এদেশ যাহাতে আরও বেশীদিন পরপদানত থাকে, সেজন্য শিক্ষা-সংকোচন। শিক্ষাসংস্কার নয়, শিক্ষা-সংহার। সেনেটে সরকারী প্রভাবের দৃঢ় বন্ধনে দেশের লোক স্বভাবতই খুশী হইতে পারিল না, মনে করিল, ইহা বুঝি পয়োমুখ বিষকুম্ভ।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরাজ সরকারের ছাত্র-দমননীতি এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় করিল ও অসন্তোষ বাড়াইল। কার্লাইলের সার্কুলার তাহাতে ইন্ধন জোগাইল। পটলডাঙ্গার চারু মল্লিকের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ১৯০৫-এর অক্টোবরে সমবেত সকলে দৃঢ়বাক্যে সংকল্প গ্রহণ করিলেন, এই সার্কুলার মানা হইবে না। রংপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশে রংপুর জেলা-স্কুলের প্রধান শিক্ষক অন্য শিক্ষকদের উপর ছাত্রদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের ভার দিলেন, যাহাতে ছাত্রেরা রাজনৈতিক বা 'বয়কট' আন্দোলনে যোগ না দেয়। ইহার অল্পকাল পরে কলিকাতায় পান্তির মাঠে রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষিবর্গ বিদেশীর বিজাতীয় শিক্ষা বর্জন করিয়া জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয়বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করিবার জন্য আবেদন জানান। তাহার পরই সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে এক লক্ষ টাকা দান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন, সেজন্য তখনই প্রকাশ্য সভায় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দেন। জাতীয় শিক্ষার জন্য দানের স্পৃহা সংক্রামক হইয়া উঠিল—গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন। একজন দাতা নগদ দুই লক্ষ টাকা ও প্রকাণ্ড বাড়ী দান করিলেন। কেহ বা বৎসরে ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দিলেন। জাতীয় শিক্ষার জন্য ভগিনী নিবেদিতা প্রেরণা জোগাইলেন, আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় অগ্রণী হইয়া আসিলেন। স্বয়ং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতিকল্পে তাঁহার সুচিন্তিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া ও পরামর্শ এবং উপদেশ দিয়া বিশেষ করিয়া জাতীয় শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার সহায়তা করিলেন। বাংলা সরকারের সচিব রিসলি সাহেবের সার্কুলার বাহির হইল—ছাত্রেরা কোনও সভাসমিতিতে যোগ দিতে পারিবে না। জাতীয় আন্দোলনের বন্যায় এই সব বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া দেশের বহু স্থানে জাতীয় শিক্ষা

পরিষদের আশ্রয়ে বহু জাতীয় বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিল। তাহার মধ্যে বেঙ্গল টেকনিকাল ইনষ্টিটিউট পরে যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনলজি ও কিছুকাল আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষার সেই বীজ নানা অসুবিধার মধ্য দিয়া এখন মহামহীরুহে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

জাতীয় আন্দোলন ক্রমশই তীব্রভাবে রাজনৈতিক কর্মধারায় প্রবাহিত হইল। দমননীতির চণ্ডতায় তাহা তখনকার মত গোপন পথে ছুটিল। একেই তো সাধারণের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ পাকা করিয়া ধরিবার মত তখন উৎসাহ ও ধৃতি কম ছিল, তাহার উপর আবার স্যর আশুতোষের পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ। ১৯০৬ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শুধু ১৯১৪ পর্যন্ত কেন, পুনরায় ১৯২১ হইতে দুই বৎসর তিনি উপাচার্য। ১৯১৭ হইতে ১৯২৪ পর্যন্ত তিনি স্নাতকোত্তর বিভাগের সভাপতিও ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানান্বেষণা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জগতের মধ্যে বরেণ্য করিবার প্রচেষ্টা জনসাধারণ অভিনন্দিত করিয়াছিল—তিনিও সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য। জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িলে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের আশা অল্প, এই ধারণাও ছাত্রসমাজকে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে নিরুৎসাহ করিয়া তুলিয়াছিল।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৩

১৯১৭ সালে লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাইকেল স্যাড্‌লারকে সভাপতি করিয়া ভারত সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসাইলেন। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্যর আশুতোষের নেতৃত্বে স্নাতকোত্তর বিভাগ কেন্দ্রিত করিয়াছিল। গৌহাটিতে ইংরাজী এম্-এ ভিন্ন অন্যত্র এম্-এ পড়ানো উঠিয়াই গেল। কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকদের সহযোগিতায় আরম্ভ হইল বাংলার উচ্চতম শিক্ষাকেন্দ্র,—বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়োগের মাধ্যমে ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কলেজের চেষ্টায় একই কেন্দ্রে স্নাতকোত্তর শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। ভারতীয় ভাষা, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব—নূতন নূতন বিভাগ খোলা হইল; উচ্চতম শ্রেণীতে মৌলিক চিন্তাশক্তির উন্মেষ যাহাতে সম্ভব হয়, শুধু পরীক্ষা পাশ নয়, অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে যাহাতে জ্ঞান হয়, সেজন্য গবেষণাকে ও গবেষণার পদ্ধতিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়েই যোগ দিলেন—মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ-শাস্ত্রী দ্রাবিড়, অধ্যাপক সি. ভি. রামন্, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্, অধ্যাপক তারাপোরেওয়ালা, বাঙ্গালী অধ্যাপকদের ত কথাই নাই। কিন্তু ১৯২৪ সালেই স্যর আশুতোষের দেহান্ত হয়। যে সুবিপুল সম্ভাবনা সে কারণে বাস্তবে পরিণত হইতে পারিল না, যে অগ্রগতি মধ্যপথেই ব্যাহত হইল, তাহার কথা বলিয়া আর লাভ নাই। কিন্তু বাংলার মনীষাকে ও শিক্ষার্থী-সমাজকে জাগাইবার এই প্রয়াস নানাদিকে আত্মপ্রকাশ করিল। এই কেন্দ্রিত ব্যবস্থার ফলে উচ্চশিক্ষার পঠন-পাঠনের মানও কিছুটা উন্নত হইয়া থাকিবে।

স্যাড্‌লার কমিশনের সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে, জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন যে আর-একবার বাংলা দেশকে নাড়া দিল, সে কথা বলা প্রয়োজন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের এক প্রধান অঙ্গ হইল স্কুল কলেজ বর্জন। ত্রিধা বর্জনের অন্তর্ভুক্ত হইল বিদ্যালয় বর্জন। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এবার স্বয়ং সুভাষচন্দ্র (তখনও তিনি নেতাজী হন নাই) গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন বা জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়া শিক্ষা ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনে ত্রিধা বর্জননীতি সাময়িক ভাবে প্রবল হইলেও

তাহার প্রভাবও সাময়িক হইল। স্যর আশুতোষের দৃষ্টান্ত ও বিরাট্ ব্যক্তিত্বের সম্মুখে তাহা দানা বাঁধিতে পারিল না; সেনেটে সমাবর্ত্তন উৎসবে লর্ড লিটনকে তিনি যে দৃপ্ত উত্তর করিয়াছিলেন, স্বাধীনতার সংকল্পের কথা বলিয়াছিলেন, স্বাধীনতার দাবি যে সর্বপ্রথম দাবি—তাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষিত-সমাজ ও যুব-সমাজ নিশ্চয়ই তাঁহাকে মনে-প্রাণে সমর্থন জানাইয়াছিল।

স্যাড্‌লার কমিশনের কথা এবার বলিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহা নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন হইলেও ইহার সিদ্ধান্তগুলি দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যেমন পূর্বে বলিয়াছি, বাংলা দেশের শিক্ষাপ্রগতির সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রগতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত। কমিশন বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের কথাই বলিলেন। উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের বিশেষ করিয়া শিক্ষণবিদ্যা শিক্ষা, স্কুলগুলির সর্বোচ্চ শ্রেণী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির প্রথম দুই শ্রেণীতে যাহারা পড়িতেছে তাহাদের পাঠক্রম নির্দেশ, পরিচালনা ও পরীক্ষার জন্য এক স্বতন্ত্র বোর্ড গঠনের কথাও কমিশন অনুমোদন করিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি-পরীক্ষার জন্য দুই বৎসর নয়, একটানা তিন বৎসরের প্রস্তুতির কথাও কমিশনের অন্যতম প্রস্তাব। ছাত্রদের শৃঙ্খলায় আনা ও আচরণে সংযম শিক্ষার জন্য আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় চাই—তাহাও বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন অভিপ্রেত বলিয়া জানাইলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া দাঁড়াইল। আজ অতীতের কথা ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, স্যাড্‌লার কমিশনের অনেক সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তবে তাহা কার্যে পরিণত করিতে বহু বিলম্ব হইয়াছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই হয়ত গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থকৃচ্ছ্রতা, আমাদের সমাজের, বিশেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষণশীলতা এবং দেশব্যাপী রাজনৈতিক অশান্তি হয়ত ইহার কারণ।

৪

মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান, লবণ সত্যাগ্রহ, গোলটেবিল বৈঠক ও ব্যক্তিগত বা একক সত্যাগ্রহের ভিতর দিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশ বিগত হইল। কিন্তু রাজনীতি দেশের সকল দিক্‌কে আচ্ছন্ন করে নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিতেছিল—১৯২২-এ যদি দশটি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৬-৩৭-এ দেখি পনেরটি। কিন্তু বরাবরই ত আমরা বলিয়া আসিয়াছি, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশ সম্বন্ধে, আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হইল না, শুধু উচ্চশিক্ষায় ত প্রকৃত উন্নতি হইবে না। গোখলে মহাশয় তাঁহার প্রস্তাব সরকারকে দিয়া গ্রহণ করাইতে পারিলেন না, যদিও সে প্রস্তাবে প্রথমে মিউনিসিপাল এলাকার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করাইবার কথাই হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়ে তাঁহার চিন্তাভাবনা হরিজন পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করিতেছিলেন। শিক্ষা-শাস্ত্রীদের লইয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য ওয়ার্ধায় এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়, তাহাতে মাতৃভাষাকে শিক্ষার একমাত্র শিক্ষণীয় ভাষা করিয়া এবং শিশুর পরিবেশ বিবেচনা করিয়া কোনও হাতের কাজের সাহায্যে সাত বৎসর ব্যাপী শিক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং বিস্তৃত পাঠক্রম প্রণয়নের জন্য ডক্টর জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে এক কমিটি নিযুক্ত করা হয়। শিক্ষার ভিত্তি এই স্তরে বলিয়া, এই পরিকল্পনা বুনিয়াদি শিক্ষা নামে পরিচিত হইয়াছে। ইহাতে কয়েকটি গুরুতর পরিবর্তনের কথা বলা হইয়াছিল:—এই শিক্ষা ৬+ হইতে ১৪+ বৎসরের ছেলেমেয়েদের দিতে হইবে; ইহা অবৈতনিক ও আবশ্যিক হইবে, ইহার মাধ্যম হইবে এমন কোনও হাতের কাজ যাহা সমাজের কোনও অভাব দূর করিবে, যাহা বিক্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের চলতি খরচ মিটিবে; মাতৃভাষাই শিখানো হইবে, ইংরাজী নয়। দেশের সর্বত্র শিক্ষা ছড়াইয়া দিতে হইলে, সকলের শিক্ষা প্রচলন করিতে হইলে বুনিয়াদি শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষা। ১৯৪৫ সালে ওয়ার্ধায় জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে গান্ধীজী দৃঢ়ভাবে বলেন, এই নূতন শিক্ষা শুধু সাত-আট বৎসরের ব্যাপার নয়, ইহা আমরণ চালাইতে হইবে। এই শিক্ষা চলিবে কি না তাহা লইয়া দেশের সর্বত্র পরীক্ষা চলিতে থাকিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা সমিতি স্যর জন সার্জেন্টের নেতৃত্বে বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিল, কিন্তু আট বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ৫ বৎসরে ও ৩ বৎসরে, জুনিয়র ও সিনিয়র স্তরে রাখিয়া দিল।

বাংলা দেশেও বুনিয়াদি শিক্ষা লইয়া আলোচনা চলিতে থাকিল। বর্ধমান জেলায় পল্লী অঞ্চলে জাতীয়তা-বাদী কর্মীরা শিক্ষা লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন, হাতের কাজকে মাধ্যম করিয়া কতদূর অগ্রসর হওয়া যায় তাহা দেখিতেছিলেন, শিক্ষা কতদূর স্বাবলম্বী হয় তাহাও তাঁহাদের অনুসন্ধানের বিষয় ছিল; ইহা ১৯৪৭ সালের অনেক পূর্বের কথা। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় বুনিয়াদি শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কলেজী শিক্ষা, প্রভৃতি

বিষয় লইয়া এক শিক্ষা-সম্মেলনও বসিয়াছিল, প্রচুর মতানৈক্য সত্ত্বেও তাহাতে শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষার ভাবীরূপ সম্বন্ধে অবশ্যই চিন্তা করিয়াছিলেন। ক্রমে বুনিয়াদি শিক্ষণ বিদ্যালয়, বুনিয়াদি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় একাধিক স্থাপিত হইল। প্রথম দিকে শিক্ষণার্থী শিক্ষককে ওয়ার্ধায় পাঠাইতে হইয়াছিল, এখন আর সে প্রয়োজন নাই। প্রাথমিক শিক্ষালয়কে ক্রমে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পরিবর্তন করিবার কথা; এখন নামে পরিবর্তন হইতেছে, কর্মে পরিবর্তন বা বস্তুগত্যা পরিবর্তন বিশেষ দেখা যায় না। বুনিয়াদি বিদ্যালয় আজ কোণঠাসা হইয়া আছে, হাতের কাজ মাধ্যম হওয়া দূরে থাকুক, ইহাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে না। বহু বিদ্যালয়ে হাতের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থাই নাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিও সমান ঔদাসীন্য। বার তের বৎসর পূর্বে শিক্ষা-সম্মেলনে বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে যে অনাগ্রহ দেখা গিয়াছিল, আজও তাহা দূর হয় নাই। সরকারী মহল হইতে যে চেষ্টা হইতেছে তাহা পর্যাপ্ত নহে। সব দেখিয়া মনে হয়, জুনিয়র সিনিয়র ভেদ উঠাইয়া দিয়া শিক্ষার কাল অখণ্ডরূপে আট বৎসর ধরিলেই বুঝি ভাল হইত। এখন তো শুনিতেছি, বাংলা দেশে পূর্বের মত প্রাথমিক বিভাগেই ইংরাজীও শিখাইতে হইবে। ইহা কি প্রগতি, না পশ্চাদপসরণ?

এ পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের কথা বলা গেল। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসঙ্গে আসা যাক। বাংলা দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন হয় ১৯৫০ সালে, তাহা গৃহীতও হয়, কিন্তু কার্যত চালু হইতে আরও এক বৎসর লাগে। যে ১৯৫১ হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পশ্চিম বাংলায় চলিয়া আসিতেছে। স্বাধীন ভারত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বসে ১৯৪৯ সালে, উপাচার্য মুদালিয়রের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বসে ১৯৫৩ সালে। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রয়োজনও দেখা গিয়াছিল পরীক্ষার্থীর সংখ্যাবাহুল্যে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, অথচ এই পরীক্ষা লওয়া, পাঠ্যপুস্তকের বিধান দেওয়া, পাঠক্রম প্রস্তুত করা, স্কুল ভাল চলিতেছে কি না তাহা পরিদর্শন করা—এ সকল প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ নয়; কলেজগুলির সুপরিচালনা ও উপাধি-পরীক্ষা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে গৃহীত হয় তাহার, ও প্রত্যক্ষভাবে স্নাতকোত্তর বিভাগের সুব্যবস্থা করাই হইল প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। স্যাড্‌লার কমিশনও এ কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, কার্যে পরিণত হইতে দেরী হইল। ১৯৫১ সাল হইতে আজ পর্যন্ত দশ বৎসর ধরিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কাজ করিয়া চলিয়াছে। এ বৎসর পরীক্ষার্থীরা প্রথম 'হায়ার সেকেণ্ডারি' পরীক্ষা দিল—মোটামুটি দশ হাজার ছাত্র এইবার পরীক্ষা দিয়াছে, আর প্রায় এক লক্ষ দুই হাজার ছাত্র স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছে। সকল স্কুলে হায়ার সেকেণ্ডারি পাঠক্রম অনুসরণ করিবার ব্যবস্থা হয় নাই, কিন্তু কালক্রমে করার কথা। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠক্রমে অনেক বিকল্প আছে, ছাত্রেরা নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী ও পরবর্তী জীবনের আকাঙ্ক্ষিত গতি অনুসারে বিষয় নির্বাচন করিতে পারিবে। বিপদ্ হইয়াছে, এ বিষয়ে যথোচিত প্রস্তুতি হয় নাই—বিষয় আছে, শিক্ষক নাই, পাঠক্রম আছে, পাঠ্যপুস্তক নাই, আর যদি বা পাঠ্যপুস্তক রচিত হইয়াছে তাহা আবার ছাত্রদের বয়সের অপেক্ষা না রাখিয়া বিপুল আয়তনের বলে ছাত্র ও শিক্ষকের শিরঃপীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা লইয়া বিভ্রাটের এখনও শেষ হয় নাই—বার বার পরীক্ষা করিয়া এ বিষয়ে উপযুক্ত বিধান ও ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত হয়ত এমনই চলিতে থাকিবে। যাহারা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা চলিবে না, এক বৎসর ধরিয়া প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে প্রস্তুত হইতে হইবে।

৫

আলোচ্য ষাট বৎসরের পরার্ধে, অর্থাৎ স্পষ্ট করিয়া ধরিতে গেলে ১৯৩৬-এর কাছাকাছি, বিশেষত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে শিক্ষার ব্যাপারে আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। মাদাম মণ্টেসরি এ দেশে আসিয়া তাঁহার শিক্ষাদান-নীতি প্রচার করেন। তা ছাড়াও বুনিয়াদি শিক্ষার পূর্বে, অর্থাৎ প্রাক্-বুনিয়াদি শ্রেণীর চার-পাঁচ বৎসরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি বাংলা দেশে ক্রমেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। ইহা সুলক্ষণ, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, এ পর্যন্ত শিক্ষাদানকর্মে শিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা খুবই সামান্য ছিল। সভাসমিতিতে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হইত, কিন্তু কার্যত বেশী কিছু করা সম্ভব হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশে শিক্ষকদের শিক্ষণ-বিভাগ খোলেন, শিক্ষাগ্রহণের কাল সংক্ষিপ্ত; তিন বৎসর পরে refresher course-ও খোলেন, অর্থাৎ যাঁহারা শিক্ষকতা করিতেছেন তাঁহাদের পুরাতন বিদ্যা ঝালাইবার জন্য গ্রীষ্মাবকাশে একমাস ব্যাপী এক সংক্ষিপ্ততর ব্যবস্থা করেন; ১৯৩৯ সাল হইতে পুরা দস্তুর শিক্ষাশাস্ত্রে উপাধির জন্য বি. টি. কোর্স

খোলেন। এখন বাংলা দেশে বহু বি. টি. কলেজ হইয়াছে ও হইতেছে। শিক্ষণ-শিক্ষা গ্রহণ করিলে মাহিনা বাড়িবে, মর্যাদাও বাড়িবে—এই প্রতিশ্রুতিতে বা আশ্বাসে বৎসর বৎসর শিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৪০ সালে শান্তিনিকেতনেও এই উদ্দেশ্যে "বিনয় ভবনে"র প্রতিষ্ঠা হয়। সর্বত্রই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি, যাহাতে শিক্ষার মান বাড়ে। শিক্ষণবিদ্যায় উপাধি পরীক্ষার পাঠক্রম দশ মাস—কিন্তু শিক্ষণবিদ্যায় অনুরাগী ও শিক্ষিত শিক্ষক আরও বেশী চাই বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণশাস্ত্রকে (Education) স্নাতক বিভাগের বিকল্পবিধানে পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; আবার শিক্ষণ বিভাগের ও শিক্ষণশাস্ত্রের মান ও মর্যাদা বাড়াইবার জন্য স্নাতকোত্তর বিভাগেও ইহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, গবেষণাও আরম্ভ হইয়াছে, পরলোকগত জিতেন্দ্রমোহন সেন এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেন।

বয়স্ক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টার কথাও এখানে বলা উচিত। দুইটি এক জিনিস নহে, কিন্তু আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টা দিয়াই বয়স্ক শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরম্ভ করিতে হয়। ১৮৮২ সালে হাণ্টার কমিশন উল্লেখ করিয়া যান যে কলিকাতার নিকটবর্তী কয়েকটি কারখানায় শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য নৈশ-বিদ্যালয় আছে, যতদূর সম্ভব সর্বত্র নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত করার জন্য তাঁহারা নির্দেশ দেন। শতাব্দীর প্রথমে বাংলায় ১০৮২ নৈশ বিদ্যালয়ের সংখ্যার উল্লেখ দেখি, তাহাতে প্রায় সাড়ে উনিশ হাজার জন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা লাভ করিতেছিল। শ্রমজীবীদের মধ্যে আন্দোলন ও শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টা সত্ত্বেও বিশেষ করিয়া বলিবার মত উন্নতি দেখা যায় নাই। এখানে ইহা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যালয়ে যাহাদের প্রবেশের পথ নাই তাহাদের জন্য রবীন্দ্রনাথ লোক-শিক্ষাসংসদ গঠনের দ্বারা বিদ্যার্জনের পথ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, বাংলায় বয়স্ক-শিক্ষার এই বিভাগের সার্থকতা অনেকেই নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়াছেন।

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই অন্যান্য দেশে যেমন, ভারতেও এবং বাংলা দেশেও তেমনি বয়স্ক-শিক্ষার দিকে লোকের মন পড়িয়াছে, সরকারী বেসরকারী প্রচেষ্টা চলিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় মন্ত্রীদের মনোযোগ সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালের পরিসংখ্যানে আশানুরূপ ফল দেখা যায় নাই—৫৫৭ বিদ্যালয়ে ১৩৯৬৩ জন শিক্ষা পাইতেছে। গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচীর মধ্যেও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান স্থান পাইয়াছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার পাঠক্রম ইত্যাদি রচনা করিবার জন্য কমিটি নিযুক্ত করেন। সরকারী অর্থানুকূল্যে কিছু কিছু চেষ্টা অবশ্য হইতেছে। শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন বিভাগে এ কার্য পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রতিবার গ্রীষ্মের দীর্ঘাবকাশের পূর্বে ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতি এই কর্মে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য প্রবাসীর প্রাক্তন সম্পাদক মহাশয়ের আহ্বানের কথা মনে পড়ে। আমরা এ দিকে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহার পরিমাপ হয়ত আগামী লোকগণনার হিসাবে দেখা যাইবে। অভিজ্ঞ সমাজসেবী বলিলেন, এখন বাংলা দেশের শতকরা ষাটজন সাক্ষর হইয়াছেন; এতদূর উন্নতি হইয়াছে মনে করা কঠিন, হইলে আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। সরকারী কর্মীরা সাবধান হইয়া বলেন, শতকরা পঞ্চাশ জন।

১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে দেখা গিয়াছিল পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের অক্ষর-পরিচয়ের হিসাব—শতকরা ২৪·৫ জন, গ্রামাঞ্চলে ১৭·৭ আর সহরাঞ্চলে ৪৫·২—সে তুলনায় শতকরা পঞ্চাশ হইলেও পূর্বের প্রায় দ্বিগুণ হইবে, ইহা কম কথা নয়।

গত ষাট বৎসরে স্ত্রীশিক্ষার প্রগতি আমাদের দেশে কিরূপ হইয়াছে আলোচনা করিবার সময়ও প্রবাসীর প্রাচীন সম্পাদক মহাশয়ের কথা মনে না হইয়া পারে না। মনে পড়ে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা-সমিতির চেষ্টা, পাঠক্রম নির্ধারণ ও বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের কথা। ১৯৩৭ সালের পরিসংখ্যান দৃষ্টে জানা যায়, ছেলেমেয়ে একই শিক্ষালয়ে পড়িতেছে বাংলা দেশের এরূপ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১,৮১,৩২৭, পৃথক্ শিক্ষালয়ে পড়িতেছে এরূপ ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল ৫,৫২,০৬২—মোট ৭,৩৩,৩৮৯ জন। ইহাও কত অপর্যাপ্ত ছিল! মেয়েদের মধ্যে অক্ষর-জ্ঞান ছিল মাত্র শতকরা তিনজনের, এবং যেখানে শতকরা ১৫ বা ২০ জনের বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করার কথা, সেখানে শতকরা মাত্র ২.৩৮ জন পাঠ গ্রহণ করিতেছিল। স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থায় উন্নতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই—আজকাল গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা একত্র পাঠ গ্রহণ করিতে পারে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তাহাদের কোনও বেতন দিতে হয় না। যেখানে দুইটি মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি পাওয়ায় বাংলার কবি তাঁহার মনের আনন্দ কাব্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেখানে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকছাত্রীর সংখ্যা হাজারে হাজারে দাঁড়াইয়াছে, স্নাতকোত্তর বিভাগে তাহাদের সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় কম নয়, কোনও কোনও বিভাগে বেশী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় কলা ও বিজ্ঞান শাখায় ছাত্রীদের উচ্চস্থান দেখিয়াও আজ আর কেহ বিস্মিত হয় না। তাহাদের সর্বোচ্চ শিক্ষাগ্রহণে উৎকর্ষ প্রমাণিত হইয়াছে, গবেষণাও মান্যতা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। মেয়েদের স্বতন্ত্র পাঠক্রম আজকাল বিকল্প বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানও হইয়াছে।

৬

কিন্তু এই ষাট বৎসরে আমাদের স্কুলের চেহারা কি বদলাইয়াছে? না, এখনও স্কুলের সঙ্গে খেলার জায়গা নাই, বাগানের ব্যবস্থা নাই, শান্ত পরিবেশ নাই, নিকটে ক্ষুদ্র সরোবর বা নদী নাই যাহা দেখিলে চোখ জুড়ায়, নলকূপের জলে পিপাসা দূর করিবার ব্যবস্থাও হয়ত নাই। ছাত্রের মন শান্ত হইবে কি করিয়া, কখন সে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে? কবিগুরু শিক্ষা-ব্যাপারে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। সেদিকে ত আমাদের দৃষ্টি নাই। দ্বিতীয় কথা, অর্থপুস্তক কি বিদ্যালয় হইতে চলিয়া গিয়াছে? দুঃখের বিষয়, যেমন যেমন পরীক্ষার, পাঠ্যপুস্তকের ও পাঠদানের 'মান' বাড়িতেছে, 'মানের বইয়ের' সংখ্যা ও আয়তনও তেমন তেমন বাড়িতেছে। 'কিশলয়বোধিনী' হইতে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত তাহার পরিসর। ইহাও ত এই ষাট বৎসরের প্রগতি। বিদ্যালয় আবার শুধু বই পড়ার জায়গা নয়, বাহিরের শুচিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শুচি থাকিবার উপকরণও এখানে থাকা চাই। এ ছাড়া সরবে হউক আর নীরবে হউক, প্রার্থনার জন্য নিয়মিত সময়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সময়নিষ্ঠা চাই। শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হওয়া চাই—তাহা হইলে শিক্ষার্থীদের একটা হাতের কাজও জানা চাই, তাহা শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং নিয়মিত অভ্যাসও করিতে হইবে; তাহাতে জীবিকার সংস্থান হইতে পারে একথা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, হইলে ত খুবই ভাল, কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তা হইবে ও সৌন্দর্যবোধ জন্মিবে, অন্তত সেই দিক্ দিয়া হাতের কাজ নির্বাচন করিতে হইবে। শ্রেণীর মধ্যে ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে, কোনও কোনও স্থানে রাখা হইয়াও থাকে, সংখ্যা-বাহুল্যে প্রকৃত শিক্ষাদান যে অসম্ভব হইয়া উঠে সে কথা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন, আর ছাত্রদের সংখ্যা বাড়াইলে উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়াইতে হইবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, শুধু শিক্ষা ছাত্রদের স্বাবলম্বী করিতে পারে না। তাঁহার কথা স্বীকার করিলে ছাত্রদিগকে শ্রমশিল্পও অবশ্যই অভ্যাস করাইতে হইবে। কিন্তু শুধু পূর্তবিদ্যা শিখাইলে কি হইবে? সঙ্গে সঙ্গে কুটীর-শিল্প না শিখাইলে, শ্রমে অভ্যস্ত ছাত্রদিগকে শিল্প বিষয়ে অবহিত ও অভ্যস্ত না করাইলে ত সমাধান সম্ভবে না। এই আপত্তি মৌলিক আপত্তি;—বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী উপন্যাসে ত্রিবিধ মূর্খের কথা বলা হইয়াছে, যে আত্মরক্ষা করিতে পারে না সে এই তিন প্রকারের মধ্যে এক প্রকারের মূর্খ, এবং সেই দিক্ দিয়া দেখিলে আমরা আত্মবিশ্বাস হারাইয়া মূর্খ-শ্রেণীর পর্যায়ে পড়িয়াছি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উপর যে কখনও ইংরাজী, কখনও আমেরিকান, কখনও সোভিয়েট শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাব পড়িবে ঘটনাচক্রে তাহা বোধ হয় অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের দেশের প্রয়োজন ও জাতির প্রয়োজন বুঝিয়া আমাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালীর জগতে দাঁড়াইবার স্থান হইল শিক্ষার ভিত্তিতে। অন্নবস্ত্রের মত শিক্ষার ব্যবস্থাও দাবি করিয়া উদ্বাস্তু সর্বহারা বাঙ্গালী প্রমাণ করিয়াছে যে বাঙ্গালী শিক্ষাপ্রাণ জাতি। তাহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে তাহার শিক্ষাপ্রগতির উপর। সেজন্য অবশ্যই নির্ভর করিতে হইবে সুপরিকল্পিত শিক্ষানীতি ও সুপরীক্ষিত পাঠক্রমের উপর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষ জেম্‌স্ সাহেবের কথা স্মরণ করি—

"Nothing useful can be accomplished solely by sweeping ordinances from headquarters and the announcement of a grandiose programme. If good is to be done, it will be done by the quiet effort of myriads of humble workers, inspired and patiently organised by educational captains."

চল্লিশ বৎসরেরও অধিক হইল এই কথাগুলি তিনি তাঁহার "Education and Statesmanship in India" নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। এখন দৃশ্যপটের পরিবর্তন হইয়াছে, যে প্রসঙ্গে তিনি এই সাধারণ সত্যটি বলিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে; তথাপি এ কথা খুবই সত্য যে শুধু বড় বড় কর্মসূচীর ঘোষণা দ্বারা নয়, শুধু কেন্দ্র হইতে আমূল পরিবর্তনের পথে বৈপ্লবিক বিধানের দ্বারাও নয়, কল্যাণ করা যদি সম্ভব হয় তবে শিক্ষা বিষয়ে নেতৃস্থানীয়দের দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য নীরব কর্মীর সাধনার দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে।

—•—

বাংলা দেশে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষা

শ্রীত্রিগুণাচরণ সেন

বাংলা দেশে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থার সূত্রপাত হইয়াছে এক শতাব্দীরও কিছু পূর্ব্বে। বিদেশী সরকার বাংলার তথা ভারতের কল্যাণের জন্য এ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিনা সে বিচার ঐতিহাসিক করিবেন। তবে ইংরেজ সরকার যখন বুঝিতে পারিলেন যে সুদূর ইংলণ্ড হইতে উচ্চ বেতনে ইঞ্জিনীয়ার আনিয়া কাজে নিযুক্ত করিলেও তাহার সঙ্গে দক্ষ সাহায্যকারী আনয়ন করা বহু ব্যয়সাপেক্ষ, তখন অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ে পূর্ত্তকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য কিছু লোককে এদেশে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা সম্মত হইলেন।

এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুকলেজে ১৮৪৩-৪৪ সালে পূর্ত্তবিজ্ঞান (Civil Engineering) পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করা হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে সে ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয় নাই। ১৮৫৬ সালে 'Civil Engineering College, Calcutta' নামে একটি কলেজ কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং রাইটার্স বিল্ডিং-এর কয়েকটি কক্ষে এই কলেজের ক্লাস খোলা হয়। কিন্তু পরে পড়াইবার সুব্যবস্থার জন্য ১৮৬৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজকে যুক্ত করিয়া দিবার ফলে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের আর কোন পৃথক্ অস্তিত্ব রহিল না। ১৮৮০ সালে বাংলা সরকার শিবপুরে একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন করেন এবং তাহার নাম দেন 'Government Engineering College, Howrah'। উহাই পরবর্ত্তীকালে 'Civil Engineering College, Sibpur' এবং ১৯২০ সালে 'Bengal Engineering College' নামে পরিচিত হইয়া উঠে। বাংলা দেশে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য শিবপুরের এই কলেজটিই প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান।

এদেশে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেও ইংরেজী বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং ইংলণ্ডে তৈয়ারী জিনিষ যাহাতে এদেশে অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিবার জন্য নিয়ম করা হইল, যে, বিলাতের নির্দ্দিষ্ট মান অনুযায়ী (British Standard Specification) জিনিষ প্রস্তুত না হইলে তাহা এদেশের সরকারী কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে না। এই ব্যবস্থার ফলে এদেশের লোককে ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ও যন্ত্রাদির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়াই থাকিতে হইল।

ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার কালে তৎকালীন সরকার যে মনোভাব দেখাইয়াছিলেন তাহাও বেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে অধ্যক্ষ এবং তিনজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার কথা ছিল। অধ্যক্ষ মহাশয় যখন অধ্যাপকদের নাম সুপারিশ করিয়া পাঠান তখন অঙ্কের জন্য কোন ইংরেজ অধ্যাপক সেই সময়ে পাওয়া না যাওয়ায় তিনি প্রতিভাবান্ কোন বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করিবার সুপারিশ করেন এবং বাবু মহেন্দ্রলাল সোম নামে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের নাম প্রস্তাব করেন। তদানীন্তনকালে বাংলা সরকার এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তাহা হইতে তাঁহাদের মনোভাব বেশ সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়—

"With regard to the nomination of Baboo Mohendra Lall Shome to officiate as Professor of Mathematics on the full salary assigned to the officer, I am desired to state that Lieut. Governor objects, on principle, to give to a Native of this country a salary which is considered sufficient to attract an English candidate; but in this instance His Honour will permit it as a strictly temporary arrangement in the understanding that it must not become a precedent."

এই পদের জন্য মাহিয়ানা ছিল ৩৮০৲ টাকা।

যাহা হউক, ১৮৮৬ সালে এই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে সুসংবদ্ধ হইলেও, শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ উন্নত ধরণের ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের পর দেশের অবস্থা শান্ত হইতেও কয়েক বৎসর কাটিয়া যায় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও শাসক ও শাসিতের মধ্যে সংঘাত চলিতেই থাকে। এক পক্ষ বন্ধনকে সুদৃঢ় করিতে ও অপরপক্ষ সেই বন্ধনকে শিথিল করিতে যত্নবান্ হন। ইংরেজ সরকারের ভেদনীতিমূলক শাসন-

ব্যবস্থার ফলে বঙ্গভঙ্গ এবং তাহারই প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯০৬ সালে কয়েকজন বাঙ্গালী দেশপ্রেমিক 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্'-এর সৃষ্টি করেন। ঠিক এই একই সময়ে আরও একটি প্রতিষ্ঠান, 'Society for the Promotion of Technical Education in Bengal', স্থাপিত হয় এবং শিল্পবিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যাশিক্ষা দেশের উন্নতি প্রচেষ্টার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হয়। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান 'Bengal Technical Institute' নামে ৯২, আপার সার্কুলার রোডে একটি কলেজ স্থাপন করেন। ১৯১০ সালে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সহিত একত্রিত হইয়া যায়। এই সময়ে পরিষদের সদস্যরা উপলব্ধি করেন, যে, ইংলণ্ড ছাড়া ইউরোপের অন্য দেশে এবং আমেরিকায় এখানকার ছাত্রগণকে পাঠাইয়া সুশিক্ষিত করিয়া আনিতে পারিলে এদেশে শিক্ষাদান কার্য্য উন্নত ও সহজতর হইবে এবং ইংরাজী পদ্ধতি ব্যতীত অন্য পদ্ধতির সহিতও এদেশের লোকের যোগাযোগ স্থাপিত হইবে। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য কয়েকজন মনীষী বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন এবং কয়েকজন মেধাবী ছাত্রকে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আমেরিকায় প্রেরণ করেন। কারিগরী ও যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। ১৯১৩ সালে আমেরিকায় প্রেরিত ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন দেশে ফিরিয়া জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্তর্গত বেঙ্গল টেকনিকেল ইনষ্টিটিউটে শিক্ষাদান কার্য্যে যোগদান করেন। বিদেশী অধ্যাপক এবং সরকারী সাহায্য ছাড়াও কারিগরী ও যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষা এই সম্পূর্ণ স্বদেশী প্রতিষ্ঠানে পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এই শিক্ষায়তন এই জন্যই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৯২৮ সালে এই শিক্ষায়তনটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'College of Engineering & Technology, Bengal' রাখা হয়।

এইখানে উল্লেখযোগ্য, যে, সরকার-পরিচালিত বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল

"to meet the very great demand in the Department of Public Works of Bengal and the versed in the methods of applying the science and art of Europe to the architectural and Lower Provinces, generally, for Executive Engineers scientifically educated and practically building requirements of India with Indian means. . . . . . that Asst. Executive Engineers and Surveyors, Assistant Engineers, Overseers, Draughtsmen, Artificers, Agents, etc., could be with advantage in the proposed College."

সেনাবাহিনীর কিছু কিছু শিক্ষাও এই কলেজে চলিতে পারে, তাহাও উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু জনসাধারণের দ্বারা স্থাপিত এবং সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে পরিচালিত বেঙ্গল টেকনিকেল ইনষ্টিটিউটে সাধারণ পূর্ত্তবিজ্ঞান (Civil Engineering) শিক্ষার পরিবর্ত্তে বহুব্যয়সাধ্য ও বহুকষ্টে সংগৃহীত উপকরণাদির সাহায্যে তড়িৎ ও যন্ত্রনির্ম্মাণ বিজ্ঞানের (Electrical ও Mechanical Engineering) শিক্ষাদান করা হইত এইজন্য, যাহাতে এখানকার শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ স্বাধীনভাবে কলকারখানা স্থাপন করিতে পারে এবং নূতন নূতন ব্যবসা সৃষ্টি করিয়া স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে। শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরণের মনোভাব যাহাতে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে পারে সেজন্য শিক্ষকেরা সতত সচেষ্ট থাকিতেন। এ কথা ভাবিতেও এখন বিস্ময় বোধ হয়, যে, এই বাংলা দেশেই মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষাক্ষেত্রে এই নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিবার জন্য, সরকারের রোষদৃষ্টি সত্ত্বেও, লোকের অভাব হয় নাই অথবা অর্থেরও অনটন ঘটে নাই।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে অনেক জায়গায় অনেক প্রকারের কারিগরী ও কুটীরশিল্পের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল—কিন্তু নানা কারণে ঐগুলি বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অখণ্ডিত বাংলায় উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সামান্য হইলেও, কারিগরী ও শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত এই কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম করা যাইতে পারে—

শিবপুরে	বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ।
যাদবপুরে	কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি।
কলিকাতায়	কলিকাতা টেকনিকেল স্কুল।
বর্দ্ধমানে	এম. বি. সি. ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি।

ঢাকায়	আসাহুল্লাহ্ স্কুল অব ইঞ্জিনীয়ারিং।
হুগলীতে	মোবারলি টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট।
ময়নামতীতে	সার্ভে স্কুল বা জরীপ বিদ্যালয়।
বিষ্ণুপুরে	কে. জি. টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট।

স্বাধীনতালাভের পর ভারত সরকার শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য ১৯৪৫ সালে নলিনীরঞ্জন সরকারের নেতৃত্বে একটি কার্য্যকরী সভা নিযুক্ত হয় এবং সেই সভার সুপারিশ অনুযায়ী ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে চারিটি বৃহদায়তন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে উচ্চ-শিক্ষার জন্য যাহাতে বিদেশে যাইতে না হয় এবং যুদ্ধোত্তর শিল্পসংস্থাসমূহে যাহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাব না হয় সেই উদ্দেশ্যে এই কলেজগুলি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব্বাঞ্চলের কলেজটি পশ্চিম বাংলায় স্থাপিত হইবে স্থির হয় এবং এজন্য জমি সংগ্রহ করিতে কোনো অসুবিধা হয় নাই ;- খড়্গপুরের সন্নিকটস্থ হিজলী জেলকে রূপান্তরিত করিয়া এই কলেজের কাজ আরম্ভ করা হয়। এইভাবে ১৯৫১ সালে খড়্গপুরে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত এই কলেজটি এখন সগৌরবে বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী লাভ করিবার ও গবেষণা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার কেন্দ্ররূপে বিরাজ করিতেছে। বিভিন্ন দেশ হইতে আগত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর অধীনে অধ্যয়ন করিবার ও তাঁহাদের নির্দ্দেশ অনুসারে গবেষণা করিবার যে সুযোগ এই কলেজটিতে ব্যবস্থিত হইয়াছে তাহা সত্যই অপূর্ব্ব।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুরেও একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বর্ত্তমান বর্ষে স্থাপিত হইয়াছে। এই বৎসরই এখানে সর্ব্বপ্রথম পাঁচ বৎসরব্যাপী পঠন-ব্যবস্থার উপযুক্ত ছাত্র ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য এইরূপ কলেজ স্থাপন করা ছাড়া, ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পসংস্থাসমূহের জন্য অদূর ভবিষ্যতে যে ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরী-বিদ্যায় অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন হইবে, সেই চাহিদা মিটাইবার জন্য নিখিল ভারত শিল্পবিজ্ঞান-শিক্ষা-পরিষদ্ প্রস্তাব করেন, যে, প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলিতে অধিকতর সংখ্যক ছাত্র ভর্ত্তি করা প্রয়োজন। এই সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার দুইটি কলেজেই ছাত্র ভর্ত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রয়োজনমত গৃহ, যন্ত্রপাতি ও গবেষণাগার, প্রভৃতির জন্য সরকার আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করেন। এইভাবে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ১৯৫৭ সালে সম্প্রসারিত হয়।

ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রী কলেজ যেমন স্থাপিত হইল, তেমনি ওভারসিয়ার, ড্রাফট্‌স্‌ম্যান, সুপারভাইজার, ফোরম্যান, ইত্যাদির কাজের জন্য যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায় সেই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় পলিটেকনিক্ এবং ট্রেনিং সেণ্টার স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৯ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি বৎসর একটি দুইটি করিয়া পলিটেকনিক্ পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত করিয়া বর্ত্তমানে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ষোলটি। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত দুইটি 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ট্রেনিং সেণ্টার' কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহু শিক্ষার্থীর কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ করিয়া দিতেছে।

কারিগরী ও যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষার অনুপাতে শিল্পবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা যদিও যথেষ্ট প্রসার লাভ করে নাই তবুও এ কথা বলা চলে যে এই বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় নাই।

ভবিষ্যতে যাহাতে শিল্পবিদ্যার প্রসার ঘটে তাহার যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলায় এরূপ শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির নাম উল্লেখযোগ্য :

বহরমপুরে—কলেজ অব টেক্‌স্‌টাইল টেকনোলজি। সেরিকালচারেল ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউট।

শ্রীরামপুরে—কলেজ অব টেক্‌স্‌টাইল টেকনোলজি।

কলিকাতায়—কলেজ অব লেদার টেকনোলজি। স্কুল অব প্রিণ্টিং টেকনোলজি। বেঙ্গল সিরেমিক ইন্‌ষ্টিটিউট। মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ।

ব্যাণ্ডেলে—বেঙ্গল সার্ভে ইন্‌ষ্টিটিউট।

বাংলা দেশের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলিতে যে-সব বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ আছে, নিম্নের তালিকা হইতে সে সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে :

শিবপুর কলেজ—পূর্ত্ত বিজ্ঞান (Civil Engineering), তড়িৎযন্ত্র বিজ্ঞান (Electrical Engineering), যন্ত্র বিজ্ঞান (Mechanical Engineering), যোগাযোগ-যন্ত্র বিজ্ঞান (Tele-communication Engineering), খনি বিজ্ঞান (Mining Engineering), ধাতু বিজ্ঞান (Metallurgical Engineering), স্থাপত্য বিজ্ঞান (Architecture)।

যাদবপুর কলেজ—তড়িৎযন্ত্র বিজ্ঞান, যন্ত্র বিজ্ঞান, রাসায়নিক যন্ত্র বিজ্ঞান (Chemical Engineering), যোগাযোগ-যন্ত্র বিজ্ঞান, পূর্ত্ত বিজ্ঞান, ফলিত ভূ-বিজ্ঞান (Applied Geology)।

হিজলী, খড়্গপুর কলেজ—পূর্ত্ত বিজ্ঞান, তড়িৎযন্ত্র বিজ্ঞান, যন্ত্র বিজ্ঞান, যোগাযোগ-যন্ত্র বিজ্ঞান, ধাতু বিজ্ঞান, স্থাপত্য বিজ্ঞান, নৌ-যন্ত্র বিজ্ঞান (Naval Architecture), কৃষি বিজ্ঞান (Agricultural Engineering), রাসায়নিক যন্ত্র বিজ্ঞান।

দুর্গাপুর কলেজ—পূর্ত্ত বিজ্ঞান, তড়িৎযন্ত্র বিজ্ঞান, যন্ত্র বিজ্ঞান, ধাতু বিজ্ঞান।

কলিকাতা নৌ-যান বিজ্ঞান কলেজ—নৌ-যান বিজ্ঞান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—ফলিত রসায়ন ও ফলিত পদার্থবিদ্যা।

১৯৫৯ সালে ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রী পাইবার জন্য পশ্চিম বাংলার তিনটি কলেজে কত ছাত্র প্রবেশ করিবার জন্য আবেদন করে এবং কত ভর্ত্তি হয় তাহার একটি মোটামুটি হিসাব নিম্নে উল্লেখ করা হইতেছে—

	ভর্ত্তির সংখ্যা	আবেদনকারীর সংখ্যা
খড়্গপুর কলেজ	৩৩৬	প্রায়—৬,০০০
শিবপুর কলেজ	৩৮০	" ৩,০০০
যাদবপুর কলেজ	৩৭০	৪,৫৬৫

এই সংখ্যা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, কলেজগুলিতে স্থানাভাব বশতঃ কত বহুসংখ্যক আবেদনকারীদিগকে হতাশ হইয়া ফিরিতে হয়। অবশ্য ইহাদের মধ্যে কতকাংশ ছাত্র পলিটেক্‌নিক্‌গুলিতে ভর্ত্তি হইয়া থাকে। কাজেই পলিটেক্‌নিক্‌গুলিতে ছাত্র ভর্ত্তির সংখ্যা কিরূপ তাহা দেখা যাইতে পারে। ১৯৫৯ সালের ছাত্র ভর্ত্তির হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

		ছাত্র ভর্ত্তির সংখ্যা	আবেদনকারীর সংখ্যা
১।	হুগলী ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজি,	১৮০	১,৬৪০
২।	যাদবপুর পলিটেক্‌নিক্‌	১৯৪	৩,১২৪
৩।	জলপাইগুড়ি পলিটেক্‌নিক	১৬২	৪০৫
৪।	কে. জি. ইন্‌ষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি, বিষ্ণুপুর	১৮০	৮৯৯
৫।	রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, বেলুড়	১৮৯	৯৫৮
৬।	রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘরিয়া	১৮৯	১,১৯৫
৭।	শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্পবিদ্যাপীঠ, সিউড়ি	৬১	৩৪৪
৮।	মুর্শিদাবাদ ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেকনোলজি, কাশিমবাজার	১৫৮	৩৯৪
৯।	এম. বি. সি. ইন্‌ষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি, বর্দ্ধমান	১৯৮	৯০১
১০।	বি. পি. সি. ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেকনোলজি, কৃষ্ণনগর	১২৬	৭৫৬
১১।	ঝাড়গ্রাম পলিটেকনিক	১২০	৬৩৭
১২।	পুরুলিয়া পলিটেকনিক	১৩৩	৩৯৩
১৩।	জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিক, খিদিরপুর	১২০	১,০৫৬
১৪।	আসানসোল পলিটেকনিক,	৮০	৫০৩
১৫।	কলিকাতা টেকনিকেল স্কুল	{৩২৩ / ১১১	৪০৪
১৬।	বিড়লা ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেকনোলজি	ছাত্র ভর্ত্তি আরম্ভ হয় নাই।	

উপরোক্ত সংখ্যা অনুসারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য শিল্পবিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার জন্য বহু-সংখ্যক ছাত্র যথেষ্ট আগ্রহবান্‌। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে শুধু আগ্রহবান্‌ হইলেই প্রবেশের ব্যবস্থা করা চলিবে না। এই শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত ছাত্র মনোনয়ন করাও এক বিরাট্‌ সমস্যা। শুধু লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও,—ধৈর্য্য, শ্রমশীলতা, পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, প্রভৃতি গুণও ছাত্রদের থাকা প্রয়োজন।

পশ্চিম বাংলায় বেকার-সমস্যা একদিকে যেমন প্রবল, অন্যদিকে প্রতি বৎসর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করিয়া কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী কলেজে বা পলিটেকনিকে স্থান না পাইয়া বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনেকে বলেন, এরূপ অবস্থায় দেশে কারিগরী ও শিল্পশিক্ষার কেন্দ্র আরও অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হইলে ভাল হইত। কিন্তু বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে চাকুরী এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত, এইরূপ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের দায়িত্ব ও ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য-সরকার উভয়কেই বহন করিতে হয়। জনসাধারণ যদি নিজেদের চেষ্টায় কোন প্রতিষ্ঠান সার্থকভাবে গঠন করিতে পারেন তবে সরকার তাঁহাদের সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ নহেন।

প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে, যন্ত্রবিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় আমাদের প্রয়োজন মেধাবী, শ্রমসহিষ্ণু ও স্থির-মস্তিষ্ক ছাত্র এবং কুশলী, অভিজ্ঞ ও সহানুভূতিশীল শিক্ষক। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষায়তনগুলিতে সত্যকারের বিচক্ষণ শিক্ষকের অত্যন্ত অভাব। শিল্পবিজ্ঞানের ও যন্ত্রবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের উন্নতির আর-একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত শিক্ষায়তনের বিশেষ যোগাযোগ। আমেরিকা, জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডে নানা শিল্প-প্রতিষ্ঠান তাহাদের সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষায়তনের সাহায্য গ্রহণ করেন। আমাদের দেশে কিন্তু এ ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত হয় নাই। ইহার কারণ, আমাদের দেশের শিল্পপতিরা শিক্ষায়তনগুলির প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে সহানুভূতিশীল নহেন। আশা করা যায় যে সরকারী পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত—জাতীয় শিল্পসংস্থাগুলির সহিত এই সকল যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষায়তনগুলির যোগাযোগ স্থাপিত হইলে দেশে যন্ত্র- ও শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইবে।

—০—

একরকম অবাঙালী ভারতীয় আছে যাহারা মনে করে, বঙ্গের প্রতি বিশেষপ্রকার অবিচারের কথা বলিলে, তাহার প্রতিকার চাহিলে, প্রতিকার-চেষ্টা করিলে তাহা বাঙালীদের প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা। বঙ্গে জিনিস বেচিয়া বা বঙ্গে আসিয়া অপর সকলে ধনী হউক, কিন্তু বাঙালীরা দরিদ্রতর হইতে থাকুক, এ অবস্থায় বাঙালীরা অসন্তুষ্ট ও প্রতিকারেচ্ছু হইলে তাহা তাহাদের প্রাদেশিকতা। বঙ্গের সংস্কৃতিতে, বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে, কিছু উৎকর্ষ আছে বলিলে তাহা বাঙালীদের প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও অহমিকা। তাহাদের বিবেচনায় বাঙালীরা যে সকল বিষয়ে অধম, ইহা মানিয়া লইলে তবে আমরা উদারচিত্ত বলিয়া গণিত হইবার যোগ্য হইব। এরূপ উদারচিত্ত আমরা হইতে চাই না। অন্যদিকে বাঙালীরা সব বিষয়ে বড়, তাহাদের কোনো বিষয়ে অযোগ্যতা নাই, শক্তিহীনতা নাই, কোনো দোষ নাই, ইহা আমরা মনে করি না, বলি না।

বিবিধ প্রসঙ্গ—প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪৫।

ষাট বৎসর পূর্ব্বের ছাত্রজীবন

শ্রীভূপতিমোহন সেন

প্রবাসী-কর্তৃপক্ষ থেকে অনুরোধ এসেছে, গত ষাট বৎসরে বাংলা দেশের ছাত্রজীবনে কি পরিবর্ত্তন এসেছে তার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখতে। সেকাল ও একালের কথা লিখতে গেলেই আমাদের মতো প্রৌঢ়দের মনে হয় যে সেকাল আর একালের তুলনাই হয় না। তখন চালের মণ ছিল ৩৲ টাকা, গাওয়া ঘি পাওয়া যেত টাকায় এক সের। মানুষ যে সুখে ছিল তার আর সন্দেহ কি। তবে এ প্রশ্নটাও মনে জাগে, যে, কার ঘরে কত টাকা ছিল? চালের দাম ৩ টাকা থেকে ৫ টাকায় উঠলে দেশে দুর্ভিক্ষ হ'ত কেন?

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে আমার বিদ্যাশিক্ষা সুরু হয়। সুতরাং এই প্রবন্ধে কিছুটা জীবনস্মৃতির রেশ থাকবে। আশা করি তাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে না। বর্ত্তমানের প্রশ্ন ও সমস্যা বড় হয়ে আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ক'রে রাখে। ভবিষ্যৎ অজানার অন্ধকারে। বর্ত্তমান যখন অতীতের গর্ভে লীন হয় তখন প্রশ্ন ও সমস্যার ভাল-মন্দ যে রকমেরই হোক একটা মীমাংসা হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা আর নাই। শিক্ষা সম্পর্কেও সেরকম একটা মনোভাব থাকা বিচিত্র নয়। এর থেকে কতটা সাধারণ সূত্র বের করা যায় তা বিবেচ্য।

আমার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় উত্তরবঙ্গের এক মফস্বল সহরে। সহরের লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। ইংরাজী বিদ্যালয় মাত্র একটি, সরকারী। কয়েক বৎসর পরে আর-একটি বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দুশো আন্দাজ। সুতরাং শিক্ষার প্রসার যে ব্যাপক ছিল তা নয়। অধিকাংশ ছাত্রই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। ব্যবসায়ী শ্রেণীর ছাত্র কিছু ছিল, কিন্তু তারা সাধারণতঃ স্কুলের পাঠ শেষ করবার আগেই জীবিকার সন্ধানে কাজে ঢুকে যেত। স্কুলের মাহিনা ছিল ১৲ টাকা থেকে ২৲ টাকা। মেয়েদের একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ছাত্রীসংখ্যা ৫০।৬০ জন। সাধারণতঃ ১০।১২ বৎসরেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। সুতরাং লেখাপড়া বেশী এগোত না। এই তো হোল শিক্ষার পরিসর।

তার পর শিক্ষার মান। উপরের চার ক্লাসে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরাজী। তবে শিক্ষকরা ইতিহাস, ভূগোল, প্রভৃতি বিষয় বাংলাতেই বুঝিয়ে দিতেন। পরীক্ষায় উত্তর অবশ্য দিতে হ'ত ইংরাজীতে। সুতরাং অনেক বিষয় কণ্ঠস্থ করা ভিন্ন গতি ছিল না। ছাত্রদের পক্ষে ইতিহাস কিংবা ভূগোলের প্রশ্নের উত্তর নিজের তৈরী ইংরাজী ভাষায় দেওয়া সাধ্যের বাহিরে। স্মরণশক্তির উপর চাপ পড়ত, তাতে এই উপকার হ'ত, যে, ইংরাজীতে খানিকটা দখল জন্মাত। বর্ত্তমানে ছাত্রদের কলেজে উঠে অধ্যাপকদের বক্তৃতা বুঝতে যেমন অকূল পাথারে পড়তে হয়, সে রকম হ'ত না। মনে আছে, স্কুলে দু-একটি ছেলে দেখেছি, যারা বিতর্কসভায় অনর্গল ইংরাজী ব'লে আমাদের বিস্ময় ও ঈর্ষার উদ্রেক করত। শিক্ষকদের মধ্যেও কেউ কেউ স্বচ্ছন্দে ইংরাজী বলতে পারতেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার বিষয় ছিল, খ্যাতনামা ইংরাজ লেখকদের গ্রন্থ থেকে সঙ্কলন, ইংরাজী রচনা ও বাংলা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ, অঙ্কে পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি, সংস্কৃতে হিতোপদেশ ও রামায়ণ থেকে সঙ্কলন, ব্যাকরণ, ইংরাজী থেকে বাংলায় অনুবাদ ও বাংলা রচনা, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতের শাসন-পদ্ধতি, ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল ও সামান্য বিজ্ঞান। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নে কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং মোটের উপর বিষয়গুলির উপর অনেকটা দখল না থাকলে পাশ করা সম্ভব হ'ত না। তবু পাশের হার ছিল শতকরা ৫০।৬০এর মাঝামাঝি। প্রশ্ন কঠিন হলে তা নিয়ে যে হৈ চৈ করা যায়, তা আমাদের কল্পনায়ও স্থান পায় নাই। গ্রেস মার্ক কখনও দেওয়া হ'ত ব'লে জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মপদ্ধতি অনেকটা বিধির বিধান হিসাবেই ধ'রে নেওয়া হ'ত।

এ তো গেল আইনকানুনের কথা। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে আমার মনে স্থায়ী রেখাপাত ক'রে গেছেন। এখন শোনা যায়, কোন কোন শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে নিজেদের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা আলোচনা করেন। এমন কি, কলিকাতায় শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে আলোচনা ও শোভাযাত্রায় ছাত্ররা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

আমাদের বাল্যকালে এটা কল্পনারও অতীত ছিল। তখনকার দিনে শিক্ষকদের বেতন যে উঁচু ধরণের ছিল তা নয়। ছোট সহরে আর্থিক বৈষম্য খুব প্রকট ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে অসচ্ছলতা থাকলেও অশান্তি খুব বেশী ছিল না।

শিক্ষক মহাশয়েরা সাধারণতঃ যোগ্য ব্যক্তিই ছিলেন এবং নিজেদের চরিত্রগুণেই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ছাত্ররা যে সবাই বইয়ে মুখ গুঁজে পড়াশুনা করত আর শিক্ষকদের কথা মেনে চলত তা নয়। দুরন্ত ও অমনোযোগী ছাত্রের অভাব ছিল না, কিন্তু সম্মুখে অশ্রদ্ধা দেখান কিংবা অবাধ্যতা করা দেখা যেত না। কয়েকজন শিক্ষকের কথা বিশেষভাবে মনে আছে। তাঁদের মধ্যে হেডপণ্ডিত মহাশয় বিশেষভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত পাঠের মাঝে মাঝে মহাভারত কিংবা প্রাচীন কবিদের দুই-চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে শোনাতেন। তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল, কুরু রাজসভায় সুতপুত্র কর্ণের দৃপ্ত সদম্ভ উক্তি :

সুতো বা সুতপুত্রো বা যোবা কোবা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্ ॥

আমি সারথিই হই বা সারথিপুত্রই হই, উচ্চকুলে জন্ম দৈবের হাতে, আমার হাতে আছে শৌর্য্য। পঞ্চতন্ত্রের ফিকে ব্যবহারিক সদুপদেশের মধ্যে এই বীরোচিত উক্তি অন্ততঃ আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। মেঘদূতের একটা পংক্তি মনে আছে—

যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।

এর ছন্দের মধ্যে যে সংযম ও গাম্ভীর্যের ইঙ্গিত আছে তা আমার শিশুমনের মধ্যেও ফুটে উঠেছিল। অন্যদিকে প্রতি রবিবার তিনি আমাদের গীতাশিক্ষা দিতেন। সব কথা পুরোপুরি বুঝবার ক্ষমতা ছিল না, তবে নিষ্কামকর্মের আদর্শ মনে ব'সে গিয়েছিল। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে অনেক সময় বলতেন। কৃষ্ণ যে জ্ঞান, শৌর্য্য ও চরিত্রে আদর্শ পুরুষ ছিলেন সেটা আমাদের কাছে ফুটিয়ে তুলতেন। তখনও বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র পড়ি নাই, সুতরাং কথাগুলি আমাদের কাছে একবারে নতুন এবং প্রচলিত মতবিরোধী ব'লে আশ্চর্য্য মনে হ'ত।

আরেকজন শিক্ষকের কথা মনে পড়ে। সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছেন। একদিন আমাদের ক্লাসে (Class VIII-এ হবে) শেক্‌স্‌পিয়রের জুলিয়াস্ সীজার থেকে ব্রুটাস ও মার্ক এণ্টনীর বক্তৃতা প'ড়ে শুনিয়েছিলেন। তাতে যে কতটা চমৎকৃত হয়েছিলাম তা কথায় বলা যায় না। আমাদের সময় স্কুলের প্রাইজ বই সাধারণতঃ ইংরাজীই হ'ত। ইংরাজী সাহিত্যের মহারথাদের কাব্যসংগ্রহ তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ছাত্রদের মধ্যেও কথাটা প্রচলিত ছিল, যে, ভাল ক'রে ইংরাজী শিখতে হলে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্য খ্যাতনামা লেখকদের গ্রন্থ পাঠ অবশ্যকর্ত্তব্য। সব সময় যে সব লেখাই বুঝতে পারতাম তা বলতে পারি না। একবার Wordsworth-এর লাইন "Milton, thou should'st be living at this hour" প'ড়ে Paradise Lost পড়বার মন হয়েছিল। ওয়েব্‌স্টার অভিধান থেকে শব্দের অর্থ ও classical allusion খুঁজে বের করতে করতে উৎসাহ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। স্কুলের প্রাইজ বইয়ের মধ্যে Smiles-এর Self Help, Todd's Students' Manual, Plain Living and High Thinking প্রভৃতি সদুপদেশপূর্ণ বই বিশেষ লক্ষণীয় ছিল। আমেরিকার দুই প্রেসিডেণ্ট, যাঁরা গ্রামের কুটীরে জীবন আরম্ভ ক'রে শেষ জীবনে White House-এ উন্নীত হয়েছিলেন, তাঁদের জীবনী আদর্শ ব'লে গণ্য হ'ত। বিদ্যাসাগরের জীবনীও সমপর্য্যায়ের।

বাংলা সাহিত্যে বেশী সময় দেওয়া যেত না। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' ছাড়া অন্য কবিতা প্রায় দুর্ব্বোধ্য ছিল। তবে কাশীরাজের সভায় কোশলনৃপতির দুই ছত্র কথায় শুধু যে দ্বারীর চোখ ছলছল করেছিল, তা নয়,—একটি তরুণ পাঠকের চোখেও জল এসেছিল। নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' তখনকার দিনে নামকরা কাব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও খানকয়েক পড়েছিলাম—অবশ্য লুকিয়ে।

খেলাধূলার বেশ চল ছিল। অধিকাংশ ছাত্রই একটু আধটু খেলত। যারা বেশী মেতে যেত, তাদের লেখাপড়ায় শৈথিল্য প্রায় নিশ্চিত ছিল। সিনেমা তখনও আসে নি। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ছিল—ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলা দেখা। মোহন বাগানের শিব ও বিজয় ভাদুড়ীর খেলা দেখেছি। তাঁদের ক্রীড়াকৌশল দে'খে আমরা হতবাক্ হয়ে যেতাম। পরে এঁরা I. F. A. Shield-এ প্রথম ভারতীয় বিজেতা দলে ছিলেন।

যাত্রাগানের বেশ প্রচলন ছিল। তবে সাধারণতঃ রাত ৯টা থেকে আরম্ভ হয়ে সমস্ত রাত চলত ব'লে

দেখবার সুবিধা হ'ত না। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উৎসবে সাতদিন ধ'রে তখনকার খ্যাতনামা মতিলাল রায়ের যাত্রা গান হয়েছিল। সমস্ত দিন ধ'রে শুনেছি। তখন ভাল লাগবার ক্ষমতা ছিল অসীম। সুতরাং ভীমের কাগজের গদা আস্ফালন ও অর্জ্জুনের বাঁশের ধনুকে টঙ্কার শুনে কোন রকম অসামঞ্জস্য কিংবা হাসির ব্যাপার ব'লে মনে হ'ত না। চারিদিকে দর্শকবৃন্দ-পরিবৃত আসরকে দণ্ডকারণ্য কল্পনা ক'রে নিতেও কোন অসুবিধা হ'ত না।

আমার ছাত্রাবস্থার একটি বিশেষ ঘটনা, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও তার প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলন। তার পূর্ব্বে যখন রঙ্গলালের "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে?" কিংবা হেমচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ' পড়েছি, তখন একটা অব্যক্ত বেদনায় প্রাণ ভ'রে যেত। স্বদেশী আন্দোলনে তা মূর্ত্ত হয়ে উঠল। যখন সমগ্র জাতির প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও লর্ড কার্জন বাংলার মন থেকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দূর করবার জন্য বদ্ধপরিকর, তখন বাংলাদেশ তার অসহায় অবস্থা বিশেষ ক'রে অনুভব করল। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের সংকল্প গ্রহণ ক'রে সে অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। সে বৎসর ৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার গ্রীয়ার পার্কে বিরাট্ জনসভায় অসুস্থ আনন্দ মোহন বসু তাঁর রোগশয্যা থেকে উঠে সমগ্র জাতিকে এই মহাসংকল্পে আহ্বান জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্ত্র ছড়িয়ে গেল। সত্যি সত্যি মরা গাঙ্গে বান এল। সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি হতে লাগল। স্বদেশী-ব্রত নাও, বিদেশী বণিকের দর্পচূর্ণ হোক, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশী শিল্পের উন্নতি হোক। সর্ব্বত্রই সেই এক প্রার্থনা—"বাংলার মাটি, বাংলার জল পুণ্য হোক।" দেশব্যাপী আন্দোলনে সবাই যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ক্ষান্ত ছিলেন তা নয়। কিছু কিছু লোক বিলাতী কাপড়ের দোকান পিকেট ক'রে তাদের কারবার বন্ধ করবার চেষ্টা সুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এল পুলিশ, ধরপাকড়, মামলা-মোকদ্দমা। তখন নেতারা শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। যাঁরা রাজ-নৈতিক আন্দোলনে নামতেন, তাঁরা দেশকে ভালবাসতেন ব'লেই নামতেন। পুরস্কার ছিল, রাজরোষ ও সময় সময় নিগ্রহ। কৃষ্ণকুমার মিত্র ও অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রথম বিনা বিচারে মান্দালয়ে কারারুদ্ধ হন। তাতে সমগ্র দেশ বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়। তখন জন-কয়েক অসহিষ্ণু যুবক সভাসমিতি ও স্বদেশী গ্রহণের সংকল্পে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, বোমা তৈরী করতে সুরু করেন। হঠাৎ একদিন সকালবেলা খবরের কাগজ খুলে দেখা গেল যে—মজঃফরপুর সহরে বোমার আঘাতে দুই মেম-সাহেবের অপমৃত্যু ঘটেছে। জানা গেল, যে, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট, যাঁর হাতে অনেক যুবক কঠোর শাস্তি ভোগ করেছে, তাঁরই উদ্দেশে বোমা ছোঁড়া হয়েছিল। এইটাই সন্ত্রাসবাদীদের প্রথম প্রচেষ্টা। পরে আরো অনেক কাণ্ড ঘটেছে, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। এই সব বিভীষিকাময় কার্য্যের জন্য সেকালের ছাত্রসমাজে একটা বিমূঢ়ভাব এসেছিল। কেউ কেউ ভাবত, যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন ফল হবে না, যদি তার পেছনে না থাকে সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্য-কলাপ। অন্য পক্ষে বাংলার অনেক স্থিরচিত্ত নেতাদের মত ছিল, যে, গুপ্তহত্যার দ্বারা দেশের মুক্তি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ এ সমস্যা নিয়ে এক সভায় 'পথ ও পাথেয়' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। কবি অবশ্য সমাজের নৈতিক পরিবেশ ও সমাজ-সংগঠনের উপরই জোর দিয়েছিলেন। এই দ্বন্দ্বের একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে।

এখনকার ছাত্রদের সব চেয়ে বড় পরিবর্ত্তন যা চোখে পড়ে, সেটা হচ্ছে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতামতের প্রভাব ও তার অভিব্যক্তি। সেকালে ছাত্র ইউনিয়ন ব'লে কোন বস্তু ছিল না। কলেজে খেলাধূলার জন্য ক্লাব ছিল। সে বিষয়ে মফস্বল কলেজেই বেশী উৎসাহ দেখেছি। কলিকাতার ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ যা ছিল তা নামজাদা দলের খেলা দেখবার জন্য। এর কারণ সহজেই বোঝা যায়—কলিকাতায় খেলার মাঠের অভাব। ১৯২০ সালের কাছাকাছি ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্কের সুযোগ দেবার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথমে অধ্যাপকদের দ্বারাই সেগুলি চালিত হ'ত। ক্রমশঃ রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের প্রভাববিস্তারের এই সুবর্ণ সুযোগ দেখতে পেয়ে ইউনিয়নগুলিকে হাত করবার চেষ্টা আরম্ভ করল। ফলে এই সব সমিতির নির্ব্বাচনের সময় যে রকম প্রচারপত্র বেরুতে লাগল, তাতে মনে হ'ত, যেন একটা বিধানসভার নির্ব্বাচন হচ্ছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দেয়াল ঢাকা প'ড়ে যেত। শোনা যায়, বেশ কিছু টাকাও খরচ হ'ত। একবার একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করেছিলাম, যে, ইউনিয়নের নির্ব্বাচনে হৈ চৈ ক'রে লেখাপড়ার ক্ষতি করা হয় কেন? এতে কার কি লাভ হয়? উত্তর এল, এ-সবের ভিতর দিয়ে কেমন ক'রে পরে বিধানসভার নির্ব্বাচন চালাতে হবে, আমরা তাই

শিখছি। অর্থাৎ, নিজের কৃতিত্ব বাদ দিয়ে কি ক'রে পরের ঘাড়ে পা দিয়ে উপরে উঠা যায় তারই মকস্! টীকা অনাবশ্যক।

সঙ্গে সঙ্গেই হরতাল ও অনধ্যায়। তখন বিদেশী শাসনের যুগ। সঙ্গত কারণেরও অভাব ছিল না। আজ এই দেশনেতা গ্রেপ্তার হলেন, কাল অন্য দেশনেতা কারাগারে বন্দী হলেন, তাতে অনেক ছাত্রই উত্তেজনার মুখে ভেসে যেত।" বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে এত মাতামাতি ছিল না। ক্লাস কামাই ক'রে দেশভক্তির পরিচয় দিতে গেলে পরীক্ষার সময় হালে পানি পেত না। সাতদিনে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য নোট বইয়ের অভাব ছিল। না থাকলেও সেগুলি যে নির্ভরযোগ্য নয় তা বিজ্ঞানের ছেলেদের বুঝতে কষ্ট হ'ত না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যত ছাত্রসংখ্যা বাড়তে লাগল, ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ততই ক'মে আসতে লাগল। ফল, পরীক্ষার ঘরে গোলমাল, বেঞ্চি ভাঙ্গা, তত্ত্বাবধায়কদের উপর হামলা। এর শেষ কোথায় তা কে জানে?

একটা বিষয়ে একালের জিৎ হয়েছে। ৫০।৬০ বৎসর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়লেই বিদ্যাচর্চ্চার পর্ব্ব শেষ হয়ে যেত। গবেষণা চালাবার মত বিদ্যা, ইচ্ছা বা সঙ্গতি সাধারণ কৃতী ছাত্রদেরও থাকত না। কলেজের শেষ পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের ভার কাঁধে করতে হ'ত। তখন জ্ঞানচর্চ্চার পরিবর্ত্তে অর্থচিন্তাই প্রকট হয়ে দেখা দিত। এই সময় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র ছাত্রদের কাছে নতুন আদর্শ তুলে ধরলেন। ক্রমে দুটি একটি ক'রে কৃতী ছাত্র তাঁদের সহযাত্রী হলেন। সেই সময়েই ডাঃ রামন সরকারী চাকুরীর সঙ্গে পদার্থবিদ্যায় গবেষণা সুরু করেন। পরে এর সাফল্যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার স্থাপিত The Indian Association for the Cultivation of Science (ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা) নামক প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বে সুপরিচিত হ'ল। রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিতের অর্থানুকুল্যে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এবং কৃতী ছাত্রদের কৃতিত্ব প্রমাণ করবার সুযোগ এল। স্বাধীনতার পর অবশ্য অনেক জাতীয় বিজ্ঞানাগার স্থাপিত হয়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে তাদের থেকে অনেক সুফল পাওয়া যাবে।

—*—

প্রাদেশিক চাকরীর বেলায় ঠিক আইনের বাধা না থাকিলেও, বিহার উড়িষ্যা বিহারী উৎকলীয়দের জন্য, আগ্রা-অযোধ্যা তাহার অধিবাসীদের জন্য, পঞ্জাব পঞ্জাবীদের জন্য ইত্যাকার রীতি ও রব প্রচলিত আছে। কিন্তু বাংলাদেশ বাঙালীর জন্য এরূপ রীতি ও রব বাংলা গবর্ণমেন্ট প্রচলন, উত্থাপন বা সমর্থন করেন নাই! বাঙালীরাও এ বিষয়ে কাযতঃ বিশেষ কিছু করে নাই। ফলে বঙ্গের সরকারী আফিস, মিউনিসিপ্যাল আফিস, সওদাগরী আফিস, রেলওয়ে আফিস, ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতিতে যত অ-বাঙালী চাকুরো আছে এবং বঙ্গের বড় ছোট ব্যবসাবাণিজ্যে নিযুক্ত কারবারী অ-বাঙালী কলকারখানা, রেলওয়ে, জাহাজঘাটা, প্রভৃতিতে নিযুক্ত শ্রমিক অ-বাঙালী যত আছে, বঙ্গের বাহিরে সমগ্র ভারতবর্ষে তত রোজগারী বাঙালী নাই। বাংলা ভারতবর্ষের একটি অংশ। দেশের সব অংশের মধ্যে সুযোগ, দক্ষতা ও ক্ষমতা অনুসারে কর্ম্মীর এবং উপার্জ্জকের আদান প্রদান হইবে। ইহা নিবারণের জন্য আইন করা যায় না, উচিতও নহে। প্রাদেশিক সকল কার্য্যক্ষেত্রের এবং রোজগারের সুযোগের উপর সতত সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া যোগ্যতার দ্বারা প্রত্যেক প্রদেশের লোককে যথাসম্ভব সেই প্রদেশের সব কাজ নিজেদের হাতে রাখিতে হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ-- প্রবাসী কার্ত্তিক, ১৩৩৬।

মাটির প্রদীপ

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সহস্র কাজের মাঝে
যদি পাও মুহূর্তের দুর্লভ বিশ্রাম,
অবসর যদি ঘটে কদাচ কখনো ;
অথবা নির্লিপ্ত মন একান্ত নির্জনে
বিগত দিনের কোনো স্তিমিত আলোকে
জেগে ওঠে বিমূঢ় বিস্ময়ে—
তখন খুঁজিয়া দেখো,
বেশি দূরে নয়,
ক্ষীণ-শিখা মাটির প্রদীপ
কেঁপে কেঁপে স্থির হয়ে যায়।
কতটুকু আলো তার, তবু সে আলোকে
অস্পষ্ট অনেক ছায়া ধরা দেয়,
তখনই মিলায়।

মাটির প্রদীপ সে তো দিতে পারে না কো
অজস্র আলোক, তাই ম'রে যায় গভীর লজ্জায় ;
ভীরু, তাই উৎসব-সভার এক কোণে
এড়ায়ে সবার দৃষ্টি—জ্ব'লে জ্ব'লে শেষ হতে চায়।

যে মৃত্তিকা সর্বসহা
তাই দিয়ে গড়ান প্রদীপ ;
জীবনে সে দেখিয়াছে অনেক নির্বাণ,
কভু ঝড়ে, কভু বা ফুৎকারে।
তুচ্ছ ক্ষুদ্র জীবনের ধূমাঙ্কিত কালি—
সে তো নহে শেষ কথা তার—
অন্তরের অমুলেহে সে তো একদিন
গৃহের নিভৃত কোণে, বাসর-শয্যার এক পাশে
সারা রাত্রি জ্বলেছিল আনন্দে উজ্জ্বল !
স্মৃতি তার নহে তুচ্ছ—উৎসবের আলোক-সজ্জায়।
মাটির প্রদীপ তার কিছুমাত্র নাহি অহঙ্কার,
তবু তার মঙ্গল-আলোকে
অদৃশ্য ইঙ্গিত থাকে কোনো এক শুভসূচনার।

—•—

ধূপছায়া

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ধূপ পুড়ে পুড়ে গন্ধ বিলায়
কতটুকু তার আয়ু
ক্ষীণ ছায়া কারো দৃষ্টিতে পড়ে না কো ;
মাটির প্রদীপে যে আলোর শিখা
নিবু নিবু তবু জলে—
বেপথু মনের আশা-নিরাশায়
তাহারে আড়াল করি,
অনেক দিনের কামনা জাগাই
শুধু ক্ষণিকের তরে।
যার লাগি ধূপ পুড়ে হ'ল ছাই
ছায়া হ'ল নিঃশেষ,
তার নিঃশ্বাসে সুগন্ধ যায় উবে।
সংশয়-ঘন অন্ধকারের যবনিকা ভেদ করি'
তখনো দীপের ক্ষীণালোক শিখা
নিভিবার আগে হঠাৎ জ্বলিয়া ওঠে।
পাষাণ-দেবতা তবু নিশ্চল,
ফিরেও দেখে না অপমৃত্যুর দাহ।

ধূপছায়া সে তো ধূসর স্মৃতির ব্যথা
কামনারে ঘিরে থাকে,
নিরালা ঘরের স্তব্ধ আঁধারে
বিনিদ্র বিভাবরী—
দেখেছে এমন কতশত ধূপ
আপনার মাঝে আপনি দহিয়া মরে।

প্রভাতে যখন বন্ধ দুয়ার খুলি—
দেখি, সে মাটির প্রদীপ শুধুই কালি,
দেখি, সে মাটির শূন্য প্রদীপে
দগ্ধ দশার অবসিত মহিমারে।
তখনো বাসরে ধূপের গন্ধ
আরতি-শেষের বেদনায় থরো থরো।

—•—

মমি

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আমি যদি কথা কই, যদি মোর চোখে ভাঙে ঘুম,
অতীতের জাদু দিয়ে ভেঙে দিই এই জাদুঘর,
দু' হাজার বছরের যে অতীত নির্বাক্ নিঝুম,
সে অতীত মোর ডাকে ফিরে এসে হবে যে মুখর।
তুমি চেনো পিরামিড্, এরেকের পাথরের পথ,
স্ফিঙ্ক্স্, আর ভেঙে পড়া সুপ্রাচীন কার্নাক থাম,
তুমি জানো মরুতটে কোথা আছে সিম্বেল পর্ব্বত,
রোজেটা-পাথরে-লেখা রাজাদের শুধু ক'টি নাম।
হায় রে পণ্ডিত, তুমি তাই নিয়ে প্রমত্ত অধীর,
কবর খুঁড়েছ তুমি, লুঠে নিয়ে গেছ রত্নধন,
আমেনি-সমাধি ভাঙি', শূন্য করি' থিবিস্ মন্দির,
মিশরের অভিশাপ অলক্ষিতে করেছ বরণ।
শিখেছ আমেনটেপ, ইখনাটন্, আখেনটাটেন্,
রেমেসিস্, থাটমোস্, নেবোটেপ্, টুটেন্‌খামেন্।

হে আমনদেব, তুমি ক্ষমিও না কখনো উহারে,
অরুন্তদ অপমৃত্যু দিও তুমি তস্করের ভালে;
হে খুফ্রু, সিংহের বেশে জেগে আছ মিশরদুয়ারে,
জগতে ছড়ায়ে দাও তব রোষ-বহ্নি-শিখাজালে।
বাজপক্ষী হে মেনেশ, নভোধরিত্রীর প্রভু তুমি,
ফিরে এস একবার দ্বিমুকুট পরি' তব শিরে,
সেমেরখেটের মত দস্যুহীন কর মাতৃভূমি;
উশেফাস, জেগে ওঠ দীর্ণ করি' শিলা-সমাধিরে।
খাসেখেম্, কথা কও হোরাসের চিত্রিত লিপিতে,
শুধু বল—"ওরে মূর্খ, মিশরের মধ্যাহ্ন-গরিমা
কতটুকু জান তুমি? কবেকার হারানো অতীতে
বৃথা আজ খুঁজে মর স্বপ্নাতীত ঐশ্বর্য্যের সীমা!
মনেথোর জ্ঞানচর্চ্চা,—তা'রো হায়, কতটুকু জানো?
হে আটন, ভস্ম কর, অগ্নিশর হানো, আরো হানো!"

বয়ে চলে নীলনদ, তটে কাঁপে প্যাপিরস-বন,
পার্শ্বে তার শস্যক্ষেত্রে অসিরিস্ করে আশীর্বাদ,
আখ্‌টেটন নগরীতে ঝ'রে পড়ে চন্দ্রের কিরণ
আকাশে ছবির মত ফ্যারাওর শুভ্র সে প্রাসাদ।
নেমেছে স্বপ্নের মায়া তালকুঞ্জে পাষাণ-মন্দিরে,
কল্লোলিত নীলজলে আকাশের নীল গেছে মিশি',
সহসা শুনিনু, কানে কে যেন বলিল ধীরে ধীরে—
"হে তরুণ পুরোহিত, আসিয়াছি ফ্যারাও-মহিষী।
চমকি' চাহিয়া দেখি, রূপোজ্জ্বলা চঞ্চলা তরুণী
অতি সূক্ষ্ম আবরণে রাখিয়াছে আনন আবরি',
দ্রুত নিঃশ্বাসের তালে হৃদয়ের বার্তা যেন শুনি;
শিরে তার স্বর্ণচূড়া, স্বর্ণসর্পী ঘিরেছে কবরী।
নির্জ্জন নিশীথে শুধু তটে বাজে ঢেউয়ের মঞ্জীর,
এসেছে একটি তৃষ্ণা রূপ ধরি' রূপসী তন্বীর।

কহিল সম্রাজ্ঞী ধীরে,—"আটন দিবার অধিপতি,
আমন ধরার স্রষ্টা, অসিরিস দেবতা শস্যের,
হাথর দুগ্ধের দেবী, হোরাসের মেঘলোকে গতি,
আইসিস্ জলদেবী অধীশ্বরী নদী ও মৎস্যের।
এ সব দেবতা-নামে আজি হবে শপথ তোমার,—
কোনদিন কারো কাছে বলিবে না এই গুপ্ত কথা,
যতদিন বক্ষতলে জীবনের রহিবে সঞ্চার,
ততদিন ওষ্ঠে তব থাকে যেন চির নীরবতা।
শোন তবে বলি আজ, রূপমুগ্ধ আমেনটেপের
বিদেশিনী পত্নী আমি, মন মোর আজো আছে পড়ি'
একটি যুবার কাছে মরুপারে দূর সুমেরের;
লয়ে যাও এই লিপি তার পাশে, এ মিনতি করি,
আর এই পুরস্কার লহ বন্ধু,"—চকিতে তাহার
বেণী-বন্ধনের এক রত্ন-পুষ্প দিল উপহার।

হেরিলাম চন্দ্রালোকে দুই বিন্দু অশ্রু টল্‌টল্
সে নীলনয়নকোণে। শ্রদ্ধাভরে আমি হস্তে তাঁর
উপহার দিলাম ফিরায়ে, কহিলাম আবেগ-চঞ্চল—
"আজ্ঞাধীন দাস সম লইলাম তব কার্য্যভার।
রত্নপুষ্পে হে সম্রাজ্ঞি, লোভ মোর নাই কোনদিন,
মাগি' লব শুভক্ষণে যদি পুনঃ হেথা আসি ফিরে
মোর আকাঙ্ক্ষিত ধন। আমি আছি চিরদীনহীন
হেথা নিঃস্ব পুরোহিত জলদেবী আইসিস মন্দিরে।"
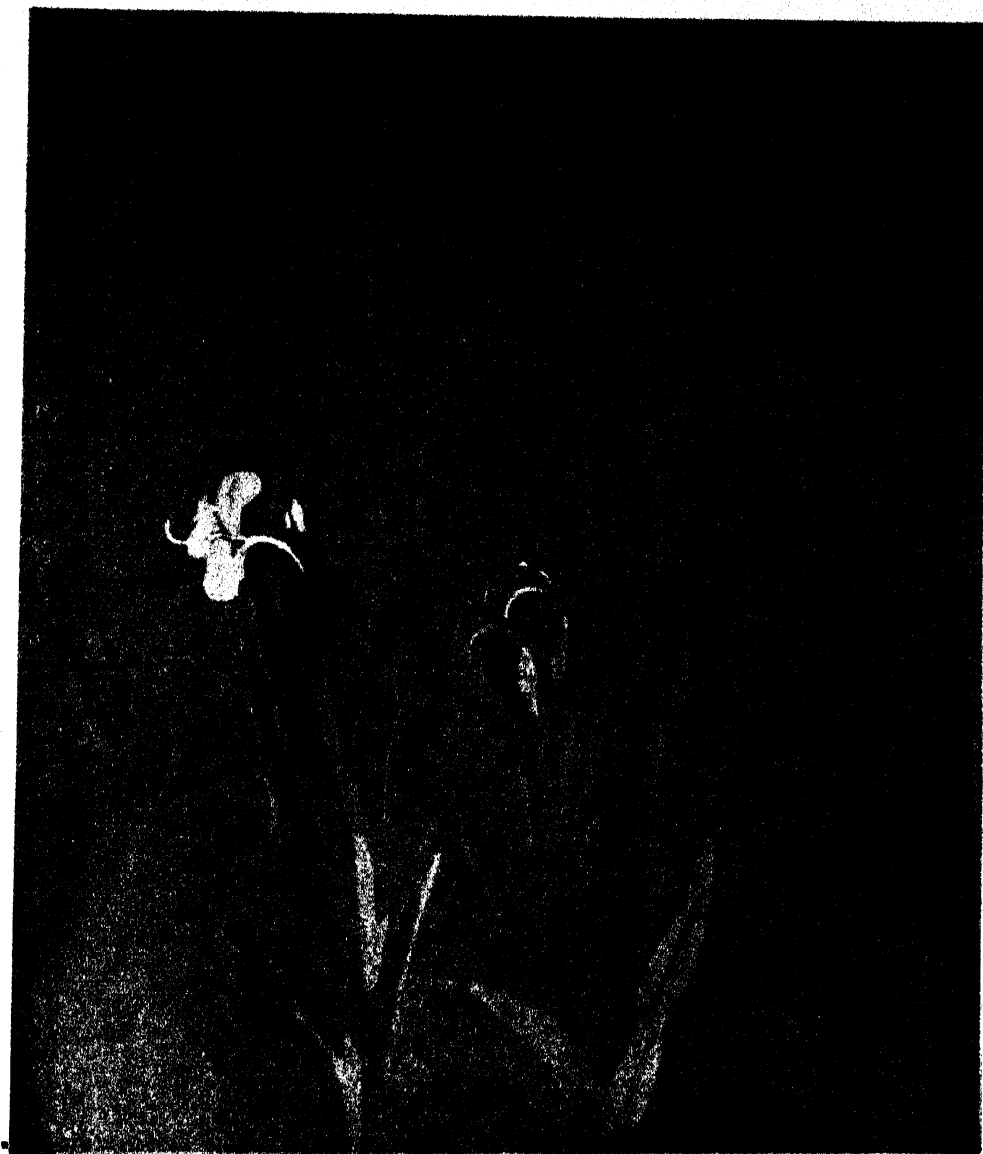
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

দোলন চাঁপা

শ্রীনন্দলাল বসু

চিত্রাধিকারিণী শ্রীযুক্তা শ্রীমতী দেবীর সৌজন্যে

(প্রবাসী— বৈশাখ, ১৩৪৪ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

যামিনী অতীত প্রায়, পূর্ব্বাকাশে জ্বলে শুকতারা,
নীরবে লইয়া লিপি কটিবস্ত্রে বাঁধিনু যতনে,
সম্মুখে উন্মত্ত বেগে ছুটিয়াছে নীলজলধারা,
তটে প্যাপিরস বন মর্ম্মরিছে অশান্ত পবনে।
লোকচক্ষু-অগোচরে অশ্বপৃষ্ঠে আসন্ন উষায়,
ছুটিলাম মরুপথে আকাঙ্ক্ষিত সুমের যেথায়।

দীর্ঘ তিনমাস পরে ফিরিলাম লইয়া উত্তর।
আইসিস মন্দিরের গুপ্তকক্ষে গভীর নিশীথে
দেখা হ'ল রাজ্ঞীসনে। উদ্বেলিত বিরহী-অন্তর
প্রিয়ের সে লিপিখানি সযতনে চাহিল দেখিতে।
আমি পড়িলাম লিপি,—"কত যুগান্তের আশা বুকে
অধীর শাশ্বত তৃষ্ণা জেগে আছে দীপশিখা সম
এ প্রেমের বেদীমূলে ; বিরহী আজিও শীর্ণমুখে
ব'সে আছে প্রতীক্ষায় ; হায়, কবে কেটে যাবে তম।"
দেখিলাম নীলনেত্রে অশ্রুধারা বাধা নাহি মানে,
ঝরিয়া পড়িল গণ্ডে, দীপালোকে সৌন্দর্য্য অপার
এমন দেখি নি কভু ! মুগ্ধনেত্রে চাহি' তাঁর পানে
কহিলাম—"হে সম্রাজ্ঞি, এইবার দিন উপহার !"
সুন্দরী কহিল ধীরে—"যাহা চাহ, দিব তা' এখন।"
আমি কহিলাম—"চাই ও অধরে একটি চুম্বন।"

সহসা দাঁড়াল রাজ্ঞী দৃপ্তমুখে স্ফুরিত অধরে,
বলিল সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে—"দুঃসাহসী হে বন্ধু আমার,
এ কামনা পূর্ণ হবে, এ চুম্বন দিব ক্ষণতরে,
ক্ষমা কর আইসিস, লও আজ শ্রেষ্ঠ উপহার।"
রাজ্ঞীরে বাহুতে বাঁধি' দিনু মুখে নিবিড় চুম্বন,
কাঁপিল সে তনুলতা, তার পর কিছু নাহি জানি,
সহসা ছুরিকাঘাতে অঙ্গে মোর শোণিত-প্লাবন
উথলিল, যন্ত্রণায় চেপে ধরি দীর্ণ বক্ষখানি।
পিশাচী হেনেছে ছুরি, পড়িলাম পাষাণ-চত্বরে
রক্তের তরঙ্গমাঝে। মরণের শেষ দৃষ্টি দিয়া
হেরিলাম সে চুম্বন তখনো কাঁপিছে ফুল্লাধরে।
তারপর চিরনিদ্রা, শেষে দেখি উঠেছি জাগিয়া
এ এক নূতন দেশে জানি না সে কত যুগ পরে !
—একটি বিস্মৃত তৃষ্ণা আজো কাঁদে মমির অন্তরে।

শব্দার্থবোধিকা :—মমি=আশ্চর্য্য উপায়ে সংরক্ষিত অতি প্রাচীন মিশরীয় মৃতদেহ। পিরামিড=মিশরের ফ্যারাওদের জগদ্‌বিখ্যাত সমাধিস্তূপ। এরেক=মিশরের প্রাচীন নগর। স্ফিঙ্কস=বিরাট্ সিংহ-দেহ নরমূর্ত্তি। কার্নাক=মিশরের প্রাচীন মন্দির। সিম্বেল পর্ব্বত=মিশরের পুরাতত্ত্বময় পর্ব্বত। রোজেটা পাথর=প্রস্তরে হায়রোগ্লাইফিক্ অক্ষরে লেখা রাজাদের নামাবলী। আমেনি সমাধি=পর্ব্বতগুহায় ফ্যারাওদের সমাধি-কক্ষ। থিবিস মন্দির=মিশরের প্রাচীন মন্দির। আমেনটেপ, ইখনাটন, আখনটাটেন, রেমেসিস্, থাটমোস, নেবোটেপ, টুটেনখামেন=সুবিখ্যাত ফ্যারাওগণ। আমেনদেব=প্রাচীন মিশরের প্রধান দেবতা। খুফ্‌রু=সিংহমূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ফ্যারাও। মেনেস=মিশরের বাজপক্ষী-চিহ্নধারী ফ্যারাও। প্যাপিরস=হোগ্‌লাজাতীয় লম্বা ঘাস। সুমের=মিশরের প্রতিবেশী রাজ্য। নীলনদ=মিশরের নাইল্ নদী।

—•—

একটি বিশাল গাছ

শ্রীমণীশ ঘটক

প্রভঞ্জন হার মানে। গোঙায় নিষ্ফল রোষে
বিদ্যুৎগর্ভ বারিবাহ। সুতীক্ষ্ণ ফলকাঘাতে
দীর্ণ করে দিগঙ্গন লক্ষজিহ্ব শাণিত বিজলী।
অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতু আত্মঘাতী পরিক্রমাশেষে
অন্তরীক্ষে হয় অন্তর্দ্ধান। এত রঙ্গ, কে সে দেখেছে ?
একটি বিশাল গাছ, মাথা যার আকাশে ঠেকেছে।

অসংখ্য শেকড়ওলা অগণন শিশুর মতন
মাটির বুকের রস তিলে তিলে করেছে শোষণ।
গাছ, বহু বাহু মেলে ডালে ডালে শাখায় শাখায়
নগ্না প্রকৃতিরে দৃপ্ত আসঙ্গের আহ্বান জানায়।
উচ্চশির, মানে না সে ঝড়ঝঞ্ঝা গ্রীষ্ম বর্ষা হিম,
শুধু দেখে কত দূর, কত উঁচু, অনন্ত নিঃসীম।
অগ্ন্যুদ্গার, ভু-কম্পন, সর্ব্বনাশা প্রলয়-প্লাবন,
ভূগর্ভের স্তরে স্তরে সঙ্গোপনে কত বিবর্ত্তন,
পারে নি তাহারে আজও অঙ্কশায়ী করিতে ধূলায়,
সে বিরাট্, সে মহান্, তপস্বী সে মৌন মহিমায়।
ধ্যাননেত্রে দেখে দূর সাগরের অশ্রান্ত লহর,
অভ্রংলিহ গিরিরাজ, সেই শুধু তাহার দোসর।

অলঙ্ঘ্য করাল কাল। লক্ষকোটি বর্ষপরে হের
নাগলোকে কৃষ্ণকালো অঙ্গারের স্তূপ। বসুধার
গর্ভতাপে ক্ষণে ক্ষণে হীরা ওঠে ফুটে। জাতিস্মর
সন্তপ্ত স্বপ্নেতে ভাবে, এত রঙ্গ করেছিল কে সে ?
একটি বিশাল গাছ, মাথা যার আকাশে উঠেছে।
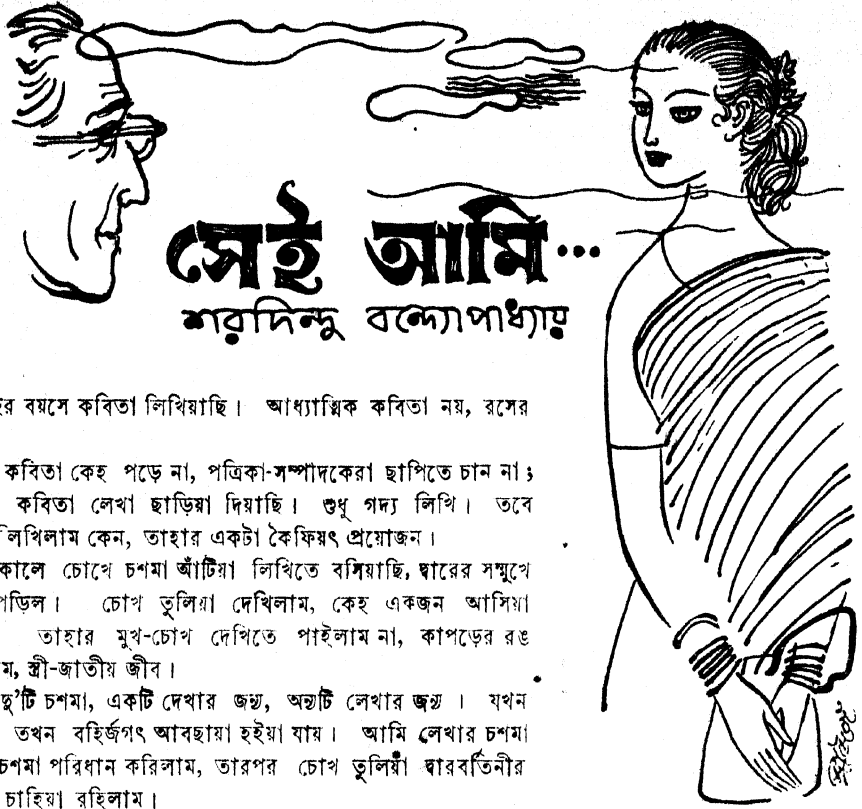
সেই আমি...

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ষাট বছর বয়সে কবিতা লিখিয়াছি। আধ্যাত্মিক কবিতা নয়, রসের কবিতা।

আমার কবিতা কেহ পড়ে না, পত্রিকা-সম্পাদকেরা ছাপিতে চান না; তাই ইদানীং কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছি। শুধু গদ্য লিখি। তবে আজ কবিতা লিখিলাম কেন, তাহার একটা কৈফিয়ৎ প্রয়োজন।

কাল সকালে চোখে চশমা আঁটিয়া লিখিতে বসিয়াছি, দ্বারের সম্মুখে একটি ছায়া পড়িল। চোখ তুলিয়া দেখিলাম, কেহ একজন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মুখ-চোখ দেখিতে পাইলাম না, কাপড়ের রঙ দেখিয়া বুঝিলাম, স্ত্রী-জাতীয় জীব।

আমার দু'টি চশমা, একটি দেখার জন্য, অন্যটি লেখার জন্য। যখন লিখিতে বসি, তখন বহির্জগৎ আবছায়া হইয়া যায়। আমি লেখার চশমা খুলিয়া দেখার চশমা পরিধান করিলাম, তারপর চোখ তুলিয়া দ্বারবর্তিনীর পানে অপলকে চাহিয়া রহিলাম।

সতেরো-আঠারো বছরের একটি কুমারী মেয়ে। বর্ণনার প্রয়োজন নাই; সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী সুনয়না মেয়ে, এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে। ভাবভঙ্গীতে সহজ স্বচ্ছন্দতা। কিন্তু আমি যে তাহার পানে নিষ্পলক চাহিয়া ছিলাম, তাহার কারণ তাহার স্নিগ্ধমধুর যৌবনশ্রী নয়, অন্য কারণ ছিল।

সে বলিল, 'আসতে পারি?'

বলিলাম, 'এস।'

সে আমার টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি নাকের উপর চশমাটা ভাল ভাবে বসাইয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে দেখিলাম। শেষে বলিলাম, 'কি দরকার বল তো?'

সে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, 'আপনি লিখতে বসেছিলেন, আমি এসে বিরক্ত করলুম!'

লেখার খাতা সরাইয়া রাখিয়া বলিলাম, 'তা হোক। তোমার নাম কি?'

সে বলিল, 'আমার নাম মল্লী—মল্লী মিত্র। আমি মা-বাবার সঙ্গে দেশ বেড়াতে বেরিয়েছি, এখানে তিন-চার দিন আমরা থাকব। আপনি এখানে থাকেন জানি, তাই কলকাতা থেকে বেরুবার আগে আপনার ঠিকানা জোগাড় করেছিলুম।'

মল্লীকে একটু পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। বলিলাম, 'বোসো। তুমি কি বেথুন কলেজে পড়ো? আমি একবার বেথুন কলেজে গিয়েছিলাম, অনেক ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভাবছি, তুমি হয়তো তাদেরই একজন।'

মল্লী বসিল না, বলিল, 'না, আমি গোখলেতে পড়ি। আপনি আমাকে আগে দেখেন নি।'

আমি আবার খানিকক্ষণ তাহার মুখখানি দেখিয়া বলিলাম, 'ও কথা যাক। তুমি আমার মতন একটা বুড়োকে দেখবার জন্যে নিশ্চয় আসো নি। কি চাই বলো।'

তাহার হাতে একটি শ্রীনিকেতনের চামড়ার ব্যাগ ছিল, সে তাহার ভিতর হইতে একটি মরোক্কো-বাঁধানো খাতা বাহির করিয়া আমার সামনে রাখিল, বলিল, 'আমার অটোগ্রাফের খাতায় আপনার হাতের লেখা নেই।'

খাতাটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম, অনেক মহাজনের করাঙ্ক তাহাতে আছে; কেহ উপদেশ দিয়াছেন, কেহ শুধুই দস্তখৎ মারিয়াছেন।

আমি কলম লইয়া নিজের নাম লিখিতে উদ্যত হইয়াছি, মল্লী বলিল, 'একটু কিছু লিখে দেবেন না?'

কলম রাখিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম, শেষে বলিলাম, 'তুমি কাল বিকেল বেলা আর একবার আসতে পারবে?'

মল্লী বলিল, 'আসব।'

বলিলাম, 'আচ্ছা। আমি তোমার জন্যে কিছু লিখে রাখব। আর দেখ, কাল যখন আসবে, তোমার খোঁপায় বেলফুলের বেণী প'রে এস। বেণী কাকে বলে জানো? এদেশে খোঁপায় পরার মালাকে বেণী বলে।'

সে ক্ষণেক অবাক্ হইয়া আমার পানে চাহিল। হয়তো ভাবিল, লেখকত্ব ও পাগলামির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। তারপর একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল।

তাহার খাতাটি নাড়াচাড়া করিতে করিতে অনেক চিন্তা করিলাম, অনেক হিসাব নিকাশ করিলাম। আঠারোতে আঠারো যোগ দিলে ছত্রিশ হয়, তাহাতে আঠারো যোগ দিলে হয় চুয়ান্ন। ঠিক ধরিয়াছি। মল্লী··· বাসন্তী···মিত্র···বসু···গোত্র গোত্রান্তর···দিদিমা···ঠাকুরমা···

তারপর কবিতা লিখিলাম—

> তোমারে হেরিয়াছিনু একদিন কুঙ্কুম-অরুণিত সন্ধ্যায়
> স্মরণ-সরণি ধরি' আজিও সেদিন পানে মন ধায়।—
> তোমার নয়নে ছিল পল্লব-ছায়া-করা স্বপ্ন-মদির সুখতন্দ্রা
> কবরী ঘেরিয়া সখি ফুটিয়া উঠিয়াছিল মল্লীমুকুল মধুগন্ধা···

কিন্তু আর বেশী কবিতা উদ্ধৃত করিব না, পাঠক-পাঠিকারা চটিয়া যাইতে পারেন।

আজ সূর্যাস্তের সময় মল্লী আসিল। তাহার কবরীতে মল্লী-মুকুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বলিলাম, 'বোসো।'

মল্লী বসিল, উৎসুক চোখে আমার পানে চাহিল।

বলিলাম, 'এই নাও তোমার খাতা। কবিতা লিখে দিয়েছি। এখন প'ড়ো না, ফিরে গিয়ে প'ড়ো।'

মল্লী কবিতাটি বহু যত্নে ব্যাগের মধ্যে রাখিল। তখন আমি বলিলাম, 'তুমি কাল বলেছিলে, আমি তোমাকে আগে দেখি নি। কথাটা ঠিক নয়। আমি তোমাকে আগে দেখেছি।'

মল্লী বিস্ময়োৎফুল্ল মুখে বলিল, 'দেখেছেন! কবে? কোথায়?'

বলিলাম, 'সেই যে—নির্জন বালুচরের ওপর দিয়ে ছোট্ট একটি নদী বয়ে যাচ্ছিল, পশ্চিমের আকাশে সূর্য্যাস্তের হোলীখেলা চলছিল—সেইখানে আমি তোমায় দেখেছিলাম। তোমার মনে পড়ছে না?'

মল্লী স্বপ্নাতুর চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'না, আমার তো মনে পড়ছে না। কবে—কতদিন আগে—?'

মনে মনে আগেই হিসাব করিয়া রাখিয়াছিলাম, তবু হিসাবের ভান করিয়া বলিলাম, 'চল্লিশ বছর আগে।'

মল্লীর চোখ-দুটি বিস্ফারিত হইয়া খুলিয়া গেল, তারপর সে কলস্বরে হাসিয়া উঠিল, 'চল্লিশ বছর আগে! কিন্তু আমার বয়স যে মোটে আঠারো বছর।'

বলিলাম, 'তা হবে। চল্লিশ বছর আগেও তোমার বয়স ছিল আঠারো। তখন তোমার নাম ছিল বাসন্তী।'

সে উচ্চকিত হইয়া প্রতিধ্বনি করিল, 'বাসন্তী! কিন্তু বাসন্তী যে আমার—'

'দিদিমার নাম।'

মল্লী কিছুক্ষণ অধরোষ্ঠ বিভক্ত করিয়া চাহিয়া রহিল, 'হ্যাঁ। আপনি জানলেন কি ক'রে?'

প্রশ্নের উত্তর দিলাম না, বলিলাম,—'আমার কাছে তোমার নাম মল্লী নয়, বাসন্তী। কাল তোমাকে দে'খেই চিনতে পেরেছিলাম।'

'আপনি আমার দিদিকে চিনতেন !'

অতঃপর তাহাকে অনেক কথা বলিলাম যাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই। কাহিনীতে প্রজনন-বিজ্ঞান বাঞ্ছনীয় নয়। শেষে প্রশ্ন করিলাম, 'তোমার দিদি ভাল আছেন ?'

মল্লী ছলছল চক্ষে বলিল, 'দু'বছর আগে দিদি মারা গেছেন।'

অনেকক্ষণ পরে কথা কহিলাম। বলিলাম, 'না। তোমার দিদি বেঁচে আছেন, চিরদিন বেঁচে থাকবেন। আমিও চিরদিন বেঁচে থাকব। তোমার নাৎনীর বয়স যখন আঠারো বছর হবে তখনও আমরা বেঁচে থাকব। কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।—আচ্ছা, আজ তুমি এস। আবার দেখা হবে।'

দেখার চশমা খুলিয়া লেখার চশমা পরিয়া ফেলিলাম। গদ্য লিখিতে হইবে। কবিতার দিন গিয়াছে।

—০—

তিন প্রহর

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

এক

ঘুমের মায়া মনকে জড়ায়
আকাশ শুধু হাসে।
বসুন্ধরা শূন্যে গড়ায়
গতির পরিহাসে॥

রাত্রি নেবায় দিনের চিতা
ক্লান্ত দেহের গ্রন্থি।
সুপ্তি কাঁপে স্বপ্নভীতা
দ্বৈতমায়াপন্থী॥

জিজ্ঞাসারা ঘুমিয়ে থাকে,
কেই বা দেবে জবাব ?
ওপরতলার মনকে ঢাকে
নীচের তলার স্বভাব॥

যায় না ধরা সূক্ষ্ম সে মন
ইলেকট্রনের চেয়ে।
দর্পণে যা'র স্বয়ম্বরা
একটি প্রেমিক মেয়ে॥

দুই

আলোটা জ্ব'লেই নিবে গেল,
রাত্রি জড়ালো মন।
আকাশের তারা বনের জোনাকি
দু'চোখের বিভ্রম,
কে জানে গহন বন-মর্ম্মরে
চঞ্চল কেন মন॥

আলোটা জ্ব'লেই নিবে গেল।
উন্মন পথ ঘাট।
এ যুগে অচল ভাঙা মন্দিরে
অগ্নিমন্ত্র পাঠ,
ক্রূর ক্রেংকারে ডাকে কালপেঁচা
রাত্রির সম্রাট॥

তিন

দুই পারে দুই মন,
মধ্যিখানে আলোর সেতু মুখর সারাক্ষণ।
রঙবেরঙের জ্বলছে মশাল কাঁপছে হাজার ছায়া,
হঠাৎ ঝড়ে নিবছে শিখা নিষ্ঠুরতার মায়া॥
এপার চেয়ে থাকে,
ওপার আঁধার দেয় না সাড়া আর্ত ঝিঁঝিঁর ডাকে।
শব্দমুখর আলোর সেতু অনন্তকাল কাঁপে,
দুই পারে দুই মনের বাণী মৌন অভিশাপে॥

সমাধান

জরাসন্ধ

প্রফেসরদের বসবার ঘরের সামনে কয়েকটি থার্ড-ইয়ারের ছেলে জটলা করছিল। ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল গুপ্ত সাহেব ক্লাস ক'রে ফিরছিলেন; হাতে হাজিরি খাতা। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে, তোমাদের কি খবর?' একটি ছেলে ব'লে উঠল, 'আজ্ঞে, স্যার, টি. পি. এম্'—থমকে গিয়ে, দাঁতে জিব কেটে সংশোধন করল, 'প্রফেসর মহলানবিশ আসেন নি।'

—আসেন নি? তাই ত! তাঁর আবার কি হল?

ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা তরুণ অধ্যাপক, শুধু খ্যাতনামা নয়, দীর্ঘনামা—তপোধীরপ্রসাদ মহলানবিশ। ছাত্রছাত্রীদের মুখে তিন অক্ষরের টি. পি. এম্।

ছেলেরা তখনো অপেক্ষা করছে। কারণ অনুমান করতে ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের অসুবিধা হল না। তবু প্রশ্ন করলেন, আর ক্লাস নেই তোমাদের?

সমবেত উত্তর—আজ্ঞে, না স্যার।

—বাড়ী যেতে চাও?

এবার আর উত্তর এল না। প্রয়োজনও কিছু ছিল না। তার বদলে সবগুলো মুখে ছড়িয়ে গেল একটি অর্থপূর্ণ হাসির ঝলক।

আচ্ছা, যাও—ব'লে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ঘরে ঢুকলেন।

আফিসে গিয়ে সেদিনকার ডাকের ফাইলটা খুলতেই পাওয়া গেল ছুটির দরখাস্ত। জরুরি পারিবারিক কারণে একমাসের ছুটি চেয়েছেন প্রফেসর মহলানবিশ। গুপ্ত সাহেবের ভ্রূদেশে কুঞ্চন দেখা দিল। পারিবারিক কারণ! পরিবার বলতে ত একটি বছর-দুয়েকের ছেলে। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই মা হারিয়ে ব'সে আছে। তারই কোনো অসুখ বিসুখ করল না ত? একবার খবর নেওয়া দরকার।

কলেজের পর অনেকদিন বাদে বাগবাজারের পুরানো বাসায় যখন পৌঁছলেন গুপ্ত সাহেব, তপোধীর নিবিষ্ট মনে একটা বই দেখছিল। ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করলেন, খোকা কেমন আছে?

—আরে, দাদা যে। আসুন আসুন। কি বলছিলেন? খোকা? ভাল আছে।

—ছুটি নিচ্ছ যে? কি ব্যাপার?

—একটু বসুন। এটা সেরে নিয়ে বলছি।

—কি বই ওটা?

—রেডি রেকনার।

—রেডি রেকনার! ও দিয়ে কি হবে?

—হিসেব টিসেব করতে সুবিধে হয়। তাই একটা কিনে নিয়ে এলাম। প্রায়ই লাগে ত। এই যেমন ধরুন, এখনি আমার দরকার—মাসে আঠার টাকা হিসাবে সাড়ে বার দিনের মাইনে কত। অঙ্ক কষে বের করতে হলে অন্ততঃ আধঘণ্টা লাগবে। তাও হয়ত ভুল করব। আর এখানে আধ মিনিটে নির্ভুল উত্তর পেয়ে যাচ্ছি। কত সুবিধে!

—একমাস পরে কি তোমার ঐ রেডি রেকনার-মাহাত্ম্য শুনতে এলাম?

—দাঁড়ান না! অত ব্যস্ত কেন?—ব'লে, একটা কি নাম ধ'রে ডাকতেই একজন ঝি গোছের স্ত্রীলোক জড়সড় হয়ে মাথায় খানিকটা ঘোমটা টেনে দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়াল। তপোধীর নোট এবং রেজগিতে মিলিয়ে কিছু টাকা ওর দিকে এগিয়ে ধ'রে বলল, এই নাও তোমার বারদিন এক বেলার মাইনে—সাত টাকা সাত আনা তিন পয়সা। ভাল ক'রে গুনে দ্যাখ।

আমি আর কি গুনব, বাবা? আপনিই ত দে'খে দিয়েছ। ব'লে, হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে যেতেই তপোধীর বলল, একে নিয়ে বাইশটি হ'ল, বুঝলেন দাদা? রেডি-রেকনার ছাড়া কি ক'রে চলে, বলুন।

—বাইশটি মানে?

—মানে, গড়পড়তা মাসে প্রায় একজন। অর্থাৎ, ছেলের বয়স হ'ল তেইশ মাস। তার জন্যে ঝি-চাকরে মিলে মোট এই বাইশ জন গেল। আমি কাউকে তাড়াই নি। সব রেজিগ্‌নেশন।

গুপ্ত সাহেব হেসে উঠলেন—এই ব্যাপার! তারপর সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরে বললেন, তা হোক; ছেলেপিলে একটু দুরন্ত হওয়া ভাল। কিন্তু তুমিই বা কি ক'রে সামলাবে? তার চেয়ে বরং তোমার শ্বশুরবাড়ীতে—

—না, দাদা। ওঁরা অবিশ্যি বরাবরই তাই বলছেন। কিন্তু আপনি ত সবই জানেন। ঐটুকুই তার শেষ চিহ্ন। কাছছাড়া করতে ইচ্ছা করে না।

—বুঝি সবই। কিন্তু কি করবে বল?

মিনিট কয়েক বিরতির পর বললেন, তা হলে এক কাজ কর। তোমার কোন আত্মীয়া-টাত্মীয়া কেউ যদি থাকেন—

—সে চেষ্টাও করেছি। আমার এক পিসীমা আছেন। বাবার খুড়তুতো বোন। নির্ঝঞ্ঝাট বিধবা। আমাকে খুব স্নেহ করেন। সব শুনে-টুনে আগ্রহ ক'রেই এলেন। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। কত বাঘা ছেলে মানুষ হয়েছে তাঁর হাতে।...তাঁকে দিয়েও হ'ল না।

—তিনি চ'লে গেছেন?

—অনেক দিন। মাসখানেক থাকবার পর বললেন, 'আমার সাধ্যি নয় বাবা। আমাকে তুমি বাড়ী রেখে এসো।' কাজেই এবার—

—নিজেকেই পিসীমার জায়গায় বহাল করতে চাও?

—তা ছাড়া আর কি করি?

—ও সব তোমাকে দিয়েও হবে না। সেই জন্যেই, আগেও বলেছি, এখনো বলি, বাপ ছেলে দু'জনকেই দেখতে পারেন, এমন একটি বিশেষ ব্যক্তির দরকার। বল ত খোঁজ করি।

—রক্ষে করুন স্যার। এখন শুধু মাইনে আর ক্ষতিপূরণের উপর দিয়ে যাচ্ছে। আপনার কথা শুনে শেষকালে ডিভোর্সের দায়ে পড়ি আর কি?

গুপ্ত সাহেবের আরেক দফা উচ্চ-হাসির উচ্ছ্বাস উঠেই হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। তপোধীরের উৎকল-

বাসী ঠাকুরটি ছুটতে ছুটতে এসে ব'সে পড়ল বাবুর পায়ের কাছে। দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কী হ'ল। ঠাকুর একটা বিকট আওয়াজ বের ক'রে কেঁদে উঠল, খোকাবাবু মারি দিলা।

—মারি দিলা। কোথায়?

ঠাকুর হাত দিয়ে মাথার পিছনে ক্ষতস্থানটা দেখিয়ে দিল। বড় রকমের জখম না হলেও খানিকটা জায়গা কেটে গেছে, কিছু রক্তপাতও হয়েছে তার সঙ্গে। যথারীতি ব্যাণ্ডেজাদির ব্যবস্থা করা হ'ল। ও সব সরঞ্জাম বাড়ীতেই মজুত থাকে।

পাচক মহারাজের সালঙ্কার বর্ণনার ভিতর থেকে আসল ঘটনা যেটুকু সংগ্রহ করা গেল, সেটা হচ্ছে এই: উনুনে কি একটা চাপিয়ে ঠাকুর গিয়েছিল ভাঁড়ার-ঘরে তেল আনতে। হঠাৎ খোকাবাবু কোত্থেকে এসে মহা-উৎসাহে খুনতি নাড়তে সুরু করেছিলেন। অগ্নিকাণ্ড আশঙ্কা ক'রে ঠাকুর ছুটে এসে হাতটা ধ'রে একটু সরিয়ে দিতেই প্রলয় সুরু হয়ে গেল। প্রথমে কিছুক্ষণ সেই নোংরা মেঝের উপর সটান শুয়ে প'ড়ে বিপুলবেগে হাত-পা ছোঁড়া এবং ঠাকুরের পিঠের উপর জুতোসমেত পদাঘাত। তাতেও ক্রোধশান্তি হয় নি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সেই খুনতি দিয়েই মাথার উপর বসিয়ে দিয়েছেন এক ঘা।

তপোধীর ভাবতে লাগল, এই ঘা-টা খোকার হাত থেকে না এসে যদি তার বাবার হাত থেকে পড়ত, অনায়াসে ৩২৩ ধারার মামলা চলতে পারত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা চলবে না; যেহেতু আততায়ী শিশু এবং ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড অনুসারে অপরাধ করবার যে ন্যূনতম বয়স, তা এখনো হয় নি। কিন্তু যার মাথায় খুনতি পড়ল, তাকে ত আর পিনাল কোড দেখিয়ে ঠাণ্ডা করা যায় না। অথচ প্রতিকারও একটা চাই। ঠাকুর তখনই 'মাহিনা' দাবি ক'রে বসল। প্রাণের দায়ে চাকরি করতে এসেছে ব'লে প্রাণটা ত আর দিতে আসে নি? ন্যায্য কথা। তপন আবার রেডি-রেকনার খুলতে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আর দরকার হ'ল না। গুপ্ত সাহেব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু বখশিস (অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ) কবুল ক'রে তখনকার মত মহারাজকে নিরস্ত করলেন।

এই ব্যাপারটা উপলক্ষ্য ক'রে অধ্যাপকের মনে একটা জটিল প্রশ্ন ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল। অনেকেই একে লঘু ক'রে দেখবেন, বলবেন এর আর প্রতিকার কি? যা করছে তার গুরুত্ব বা ফলাফল উপলব্ধি করবার বয়স যতদিন না হচ্ছে, ততদিন শিশুকে শুধু পাহারা দিয়ে রাখা ছাড়া আর কি উপায় আছে? শুধু দে'খে থাকা, সে নিজের বা অন্যের কোনো গুরুতর অনিষ্ট না ক'রে বসে। এ ছাড়া সত্যিই কি আর কিছু করবার নেই? তপোধীর মনে মনে বলল, আছে। একথা সবাই জানে, শিশু মাত্রেই নিষ্ঠুর। অন্যের কষ্ট দে'খে আনন্দ পাওয়াই তার প্রকৃতি। চলতে চলতে কেউ যদি আছাড় খেয়ে পড়ে, আমি আপনি তাকে ধ'রে তুলবার চেষ্টা করব, অন্ততঃ দৃশ্যটা উপভোগ করব না, কিন্তু একটি বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে হাততালি দিয়ে হেসে উঠবে। আপনার কষ্ট তার কাছে মজা। ব্যাঙ, টিকটিকি, পাখীর ছানা শুধু নয়, নিরীহ দুর্বল মানুষের উপরেও অযথা অত্যাচার ক'রে ওদের উল্লাস। সুতরাং, ওদের ঐ প্রকৃতিগত নিষ্ঠুরতার পথ ধ'রেই প্রতিকারের সূত্র খুঁজতে হবে। আঘাত দিয়ে দেখাতে হবে, আঘাত বস্তুটা কী। বুঝিয়ে বা উপদেশ দিয়ে ফল হবে না। যাকে শাস্তি দেওয়া বলে, মারধোর, না খেতে দেওয়া, আটকে রাখা, তাতেও ঠিক কাজ দেবে না। বরং উল্টো ফল ফলতে পারে। তাতে ক'রে কোনো কোনো ছেলে হয়ত আরো নির্মম, আরো বেপরোয়া হয়ে উঠবে। আসল দরকার realisation বা উপলব্ধি; মারলে যে ব্যথা লাগে, সেই সত্যটা ওর উপর দিয়ে, অর্থাৎ ওকে দৃষ্টান্ত ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া।

মনে মনে এই রকম একটা সংকল্প নিয়ে তপোধীর উঠে পড়ল। কিন্তু কোথায় সে আততায়ী? উপরে সবগুলো ঘর, বারান্দা, কলতলা ঘুরে শোবার ঘরের সামনে আসতেই একটা কড়া মিষ্টি গন্ধ নাকে এল। দরজা বন্ধ ছিল, খুলতেই চক্ষুস্থির। দাড়ি কামাবার পর ড্রেসিং-টেবিলের সামনে ব'সে তপন রোজ একটু ক'রে স্নো মেখে থাকে। শিশিটা থাকে একটা উঁচু তাকের উপর। কালই একটি বড় সাইজের দামী শিশি কেনা হয়েছে। তার ভিতরকার প্রায় সবখানি বস্তু খোকার কপালে গালে চিবুকে গলায় বেশ পুরু ক'রে মাখানো। লেপন-ক্রিয়া তখনো পুরো দমে চলছে। বসবার ধরণটা ঠিক বাপের মত। বাইরে ঝি-চাকর থাকে ব'লে, এই সময় তপোধীর দরজাটা অনেকদিন বন্ধ ক'রে দিয়ে থাকে। সে বিষয়েও ত্রুটি হয় নি।

বাবাকে ঘরে ঢুকতে দে'খে সাদা সাদা দাঁত ক'টি বের ক'রে খোকা মহানন্দে হেসে উঠল। টুল থেকে নেমে এল ছুটতে ছুটতে এবং এক রাশ স্নো-জড়ানো ছোট্ট হাতখানা বাবার মুখের দিকে বাড়িয়ে পাখীর সুরে ব'লে উঠল,

'বাপি, মাখি।' অর্থাৎ, এসো, তোমাকেও খানিকটা মাখিয়ে দিই। তপনের প্রথমেই বিস্ময় লাগল, শিশিটা পাড়ল কেমন ক'রে? তবে কি ভুল ক'রে ওটা ড্রেসিং-টেবিলেই ফেলে গিয়েছিল? না, তা নয়। তাকের ঠিক নীচেই একটা টুল। সেটা থাকে ওধারে খাটের পাশে, এবং সেখান থেকে এতখানি পথ তাকে বেশ কষ্ট ক'রেই টেনে আনতে হয়েছে।

খোকাকে নিজেই ধুইয়ে-মুছিয়ে পড়বার ঘরে নিয়ে গেল তপোধীর। টেবিলের উপর যে পিন-কুশনটা থাকে তার থেকে একটা পিন তুলে নিয়ে ছোট্ট আঙুলের ডগায় আস্তে ক'রে ফুটিয়ে দিল। উঃ, ব'লে হাত টেনে নিল খোকা। তপোধীর বলল, 'মেরো না, লাগে। বুঝলে খোকা? লাগে।' কাছেই একটা রুল ছিল। তাই দিয়ে ঠুক ক'রে লাগিয়ে দিল মাথায়। খোকা সেখানটায় হাত বুলোতে লাগল। তাকে কাছে টেনে নিয়ে আবার বোঝাল তপোধীর, 'মারতে নেই; ব্যথা।' খোকা কি বুঝল, সে-ই জানে। বড় বড় দু'টো শঙ্কিত চোখ মেলে তাকিয়ে রইল বাবার মুখের পানে।

পরদিন বাজার-থেকে ফিরতেই কানে গেল তিনটা বিড়ালছানার একটানা চীৎকার। দিন-চারেক হ'ল হয়েছে ছানাগুলো। কয়লার ঘরে একটা ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছে চাকরটা। বাজারের থলে নামিয়ে দিয়েই সে ঐ দিকে ছুটে গেল। গিয়েই এক হাঁক—'বাবু, শীগ্‌গির আসুন।' তপোধীর তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে, খোকা গম্ভীর হয়ে ব'সে আছে কয়লার গাদায়। বাঁ হাতে সেই পিন-কুশন, ডান হাতে একটি খোলা পিন। চাকর বলল, 'ঐ দেখুন, খোকাবাবু ছানাগুলোর গায়ে পিন ফোটাচ্ছে।' বাবাকে দে'খেই মহা উৎসাহে ব'লে উঠল—উঃ, উঃ। অর্থাৎ পিতা যে পরীক্ষাটা মানব-শিশুর উপর চালিয়েছিলেন, অনুগত পুত্র সেইটাই প্রয়োগ করেছে মার্জার-শিশুর উপর। এত বড় একটা সুচিন্তিত এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট, এক দিনের মধ্যেই এমন ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে, অধ্যাপক স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছিল তপোধীর। খোকার সবচেয়ে বড় ব্যাধি হ'ল—বড়দের অনুকরণ। খোকা ত নয়, বুড়ো খোকা। কোনো খেলনার দিকে তার খেয়াল নেই। সে ঠাকুরের মত রান্না করবে, ঝি-এর মত বাটনা বাটবে, বাবার মত ইজি-চেয়ারে শুয়ে মোটা মোটা বই পড়বে, চাকর যে বিড়ি খেয়ে টুকরোটা ফে'লে দেয়, তাই কুড়িয়ে এনে ঠিক তারই মত পা ছড়িয়ে ব'সে টানতে থাকবে। সাবান তোয়ালে নিয়ে কলতলায় ব'সে নিজেই স্নান করবে। ঝি করিয়ে দিতে এলে শুধু যে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে তাই নয়, তার চুল টেনে, কাপড় ছিঁড়ে, খামচি কেটে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসবে।

কিছুদিন আগে কোনো বেলজিয়ান জার্নালে তপোধীর একটা লেখা পড়েছিল। তার আলোচ্য বিষয় ছিল—শিশুর অনুকরণ-প্রিয়তা। লেখক এই ব'লে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, শিশু-মনকে নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করবার মত ভাল খেলনা পৃথিবীর কোনো দেশই আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে নি। নিজেদের রাজ্যে মনের খোরাক পায় না ব'লেই তারা বড়দের এলাকায় খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। বড়দের কাজে নাক গলায়। কথাটা তপোধীরের মনে লেগেছিল। তার নিজের খোকার বেলাতেও এটা আংশিক সত্য। ঠিক ভাল খেলনা বলতে যা বোঝায় তা ওর নেই। ঐ দিকে অবিলম্বে নজর দেওয়া দরকার। ব্যাপারটা ব্যয়-বহুল। কিন্তু উপায় কি? একটি মাত্র ছেলেকে মানুষ করতে হলে অর্থের দিক্‌টায় কড়াকড়ি করা চলে না।

সেইদিনই বিকাল বেলা বেরিয়ে হগ-মার্কেটে ঘুরে ঘুরে কতগুলো দামী খেলনা কেনা হয়ে গেল। নির্বাচনে তিনটা দিকেই জোর দেওয়া হ'ল—রূপ, গতি ও শব্দ। সুন্দর রংচং-এ ডলপুতুল, স্প্রিং-এ চলা মোটর গাড়ী, উড়ো জাহাজ, মিষ্টি-সুরের পিয়ানো, জলতরঙ্গ এবং বাঁশি। একটা মাদুরের উপর খোকাকে বসিয়ে তার চারদিকে খেলনাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে তপোধীরও বসল তার পাশে। একবার দু'বার ক'রে প্রতিটি জিনিষ বাজিয়ে, চালিয়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে দিল। খোকা খুব খুশী, সঙ্গে সঙ্গে মেতে উঠল অতগুলো খেলনা নিয়ে। তপোধীরও খুশী হয়ে নীচে নেমে গেল, এবং এই ভেবে আশ্চর্য হ'ল, ছেলে ভোলাবার এই সহজ এবং সনাতন রাস্তাটা এতদিন তার নজরে পড়েনি।

শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকখানা নামকরা বইও ঐ সঙ্গে কিনে এনেছিল মহলানবিশ। ব্যাধি যে স্তরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এখানে সেখানে বা এখন তখন একটু আধটু আংশিক উপশম দিলে চলবে না, রীতিমত ধারাবাহিক

চিকিৎসার প্রয়োজন। এই এক মাস ধ'রে সেটাই হবে তার প্রধান কাজ। এবারে যে নতুন ঝিটি বহাল করা হয়েছিল, তার সঙ্গেও কথা হয়ে গেছে; খোকার সম্পর্কে সব কিছুই যেন তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে করা হয়।

একখানা বই-এর একটা অধ্যায় তখনো শেষ হয় নি, হঠাৎ উপর থেকে খোকার সেই চিলের মত চিৎকার। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখল, খেলনাগুলো যেমন ছিল প্রায় তেমনি প'ড়ে আছে। খোকা ওপাশের বরান্দায়। বাবার জুতোয় কালি লাগিয়ে বুরুশ করতে সুরু করেছে। চাকর কাছে যেতেই তারস্বরে প্রতিবাদ—অর্থাৎ দূরে রহ। তপোধীরের মনে হ'ল, একটু আধটু জোর না করলে চলবে না। ওখান থেকে ওকে তুলে নিয়ে খেলনা সমেত শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দরজায় শিকল তুলে দিল। খোকা কিছুতেই থাকবে না। প্রথমে চিৎকার, কান্না, তারপর দরজায় দুমদাম লাথি। কিছুক্ষণ এই জাতীয় বিক্ষোভ প্রদর্শন চলবার পর আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তপোধীর আশান্বিত হয়ে উঠল, এতক্ষণে ওষুধ ধরেছে। অমন সুন্দর সুন্দর খেলনা! তার নিজেরই ইচ্ছা করছে, একটা বেলা ঐগুলো নিয়ে কাটিয়ে দেয়। আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে চুপি চুপি দরজাটা খুলেই মনে হ'ল, এইমাত্র এখানে একটা খণ্ড প্রলয় হয়ে গেছে। খাটের উপরে বালিশ, বেডকভার যা কিছু ছিল, সব মেঝের উপর গড়াগড়ি, লিখবার টেবিলের বইখাতা পেন্সিল কাগজপত্র চারদিকে ছত্রাকার। ঘরের এক কোণে একটি হারমোনিয়ম ছিল বেশ যত্ন ক'রে কাপড় দিয়ে ঢাকা, তাকে টেনে আনা হয়েছে মাঝখানে। রীডগুলোর উপর বলপ্রয়োগের চিহ্ন, বেলো করবার জায়গাটা ছেঁড়া, ধ'রে তুলতেই ভিতর থেকে কিঞ্চিৎ তরল পদার্থের নিঃসরণ হ'ল। অর্থাৎ যন্ত্রটিকে নানাভাবে অপদস্থ করবার পর শেষ পর্যন্ত তার উপরে একটি জলীয় অপকর্ম ক'রে রাখা হয়েছে। পাশেই প'ড়ে আছে অধ্যাপকের অতি আদরের পার্কার কলমটি। তারও আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন। লিখবার টেবিলে রাখলে পাছে খোকাবাবুর সন্ধানী দৃষ্টির কবলে প'ড়ে যায়, তাই ঐ মূল্যবান্ বস্তুটিকে বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু খেলনাগুলো গেল কোথায়? বাবাকে শূন্য মাদুরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দে'খে খোকারই বোধহয় হুঁস হ'ল। ও পাশের জানালার ধারে ছুটে গিয়ে নীচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বেশ উত্তেজিত ভাবে ব'লে উঠল—দুঃ দুঃ। তপোধীর গিয়ে দেখল, ঠিকই বলেছে খোকা। সে আপদ্‌গুলোকে জানালা গলিয়ে একেবারে রাস্তায় দূর ক'রে দেওয়া হয়েছে, এবং পাড়ার একপাল ছেলেমেয়ে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি সুরু করেছে। সম্ভবতঃ নিজের এই অসামান্য কৃতিত্বের আনন্দ খোকাবাবুর মনে গভীর আবেগ-সঞ্চার ক'রে থাকবে। নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারল না। ছুটে গিয়ে বাবাকে দুহাতে জড়িয়ে ধ'রে মহা উল্লাসে খলখল হেসে উঠল। চোখের কোলে গণ্ডের পাশে কিছুক্ষণ আগেকার কান্নার চিহ্ন তখনো লেগে আছে। তার উপরে এই সরল সাদা মাতাল হাসি। শিশির-ভেজা স্থলপদ্মের উপর যেন ছড়িয়ে গেল একঝলক অরুণালোক। মুহূর্ত্ত-মধ্যে সব ভুলে গিয়ে তপোধীর ছেলেকে কোলে তুলে নিল।

কোনো আধুনিক মার্কিন দার্শনিকের একখানা সদ্যপ্রকাশিত বই এইমাত্র শেষ ক'রে তপোধীর হঠাৎ আবিষ্কার করল, এতদিন সে একেবারে উল্টোপথে চলেছিল। গ্রন্থকার লিখেছেন, শিশু-মনের সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির একটা অলক্ষ্য কিন্তু গভীর যোগ আছে। সেই যোগ যতটা অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে, ঠিক সেই পরিমাণে সুগম ও সহজ হবে তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ। সহরের কৃত্রিম পরিবেশে যে-সব ছেলেমেয়েরা বেড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে নানা বিকার দেখা দেয়। চারাগাছের মত চারা-মানুষের জন্যেও চাই প্রচুর জল বাতাস আকাশ আলো। অত্যন্ত খাঁটি কথা। কিন্তু এই অভিশপ্ত কলকাতার সহরে এসবগুলোরই অভাব। তবু তারই মধ্যে যতটা পাওয়া যায়, তার সুযোগই বা ক'জন নিয়ে থাকে? বাগবাজারের একটা ছোট গলির মধ্যে তপোধীরের বাসা। সেখানে প্রকৃতি নেই; কিন্তু কাছেই গঙ্গা। সে কথাটা যেন সে ভুলেই বসেছিল এতদিন। স্থির ক'রে ফেলল, কাল থেকেই রোজ সকাল-সন্ধ্যা খোকাকে নিয়ে সে গঙ্গাতীরে বেড়াতে বেরোবে। পেরাম্বুলেটরটা অনেকদিন অকেজো হয়ে প'ড়ে আছে। হাঁটতে শেখার পর খোকা আর ওটা চড়তে চায় না, চড়ার চেয়ে চালানোটাই বেশি পছন্দ করে। তাই ব্যবহার করা হয় নি। ওটা এবার কাজে লাগবে। বাসা থেকে গঙ্গা বেশ খানিকটা পথ। সবখানি হেঁটে যাওয়া-আসা সম্ভব নয়।

বাগবাজারের গঙ্গাতীর। একফালি সরু রাস্তা, একদিকে পোর্ট কমিশনের রেল লাইন, আর একদিকে খাড়া পার, ইট দিয়ে বাঁধানো। এইমাত্র সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, গঙ্গার পশ্চিম পারে কলকারখানার মাথার উপর ধূমমলিন আকাশের গায় তার বর্ণচ্ছটা এখনো মিলিয়ে যায় নি। তপোধীর ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছিল এবং খোকাকে ডেকে
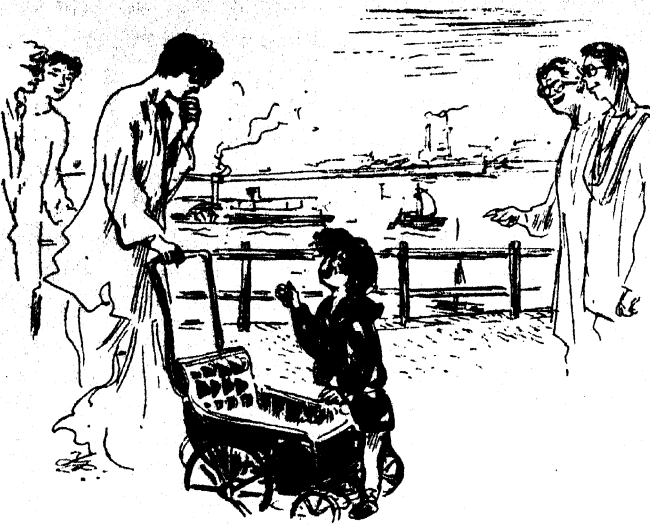
বাবা কেন গাড়ীতে উঠছে না

ডেকে বলছিল, 'কী সুন্দর নদী দেখেছ খোকা, আর কত নৌকো? ঐ ত্মাখ আকাশ, কত রঙ!' হঠাৎ এক লাফ দিয়ে গাড়ির উপর উঠে দাঁড়াল খোকা। গাঙ্গের প্রকৃতির প্রেরণা কিনা ঠিক ধরা গেল না; তবে এটা বোঝা গেল—সে নামতে চায়। বাবা যতই বলে, ব'সে থাকো খোকা, নামে না,—ততই চেঁচিয়ে লাফিয়ে তুমুল কাণ্ড। লোক জড়ো হয়ে গেল। এক প্যাণ্ট-পরা ছোকরা একটু শ্লেষ মিশিয়ে বলল, 'দিন না নামিয়ে? এখন থেকে গাড়ি চড়তে নাই বা শেখালেন।' তা ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। কিন্তু তাতেই সমস্যা মিটল না। নামিয়ে দিতেই খোকা হ্যাণ্ডেলটা দখল ক'রে বলল, বাপি, বছি। অর্থাৎ এবার সে হবে চালক আর বাবা সওয়ার। যে-কথা সেই কাজ। পা ঠুকে বিকট চিৎকার—বাবা কেন গাড়িতে উঠছে না। তপোধীর কী যে করবে, কিছুই ভেবে পেল না। একদল লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। হঠাৎ কি মনে ক'রে খোকার মত বদ্‌লে গেল। বাবাকে ছেড়ে শূন্য গাড়িটাই বেপরোয়া ঠেলতে সুরু ক'রে দিল। আরও বিপদ্। খোকা চলার চেয়ে টলেই বেশি। ঐটুকু সরু পথ। কোনো রকমে একবার পাটা স'রে গেলে তিরিশ ফিট নিচে একেবারে জলে গিয়ে পড়বে। অথচ বাধা দেয় কার সাধ্য? ছুঁতে গেলেই চিলের মত চিৎকার, মনে হচ্ছে, এখনই মাথার শিরাগুলো ছিঁড়ে যাবে। তাই ব'লে ছেড়ে দেওয়াও যায় না। জোর ক'রে বাহুটা চেপে ধরতেই সে গাড়িটাকে মারল এক ধাক্কা এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঢালু পাড় বেয়ে গড়াতে গড়াতে পড়ল গিয়ে গঙ্গাগর্ভে। খোকা খুশী হয়ে ব'লে উঠল, যাঃ। তারপরেই চলল ওটা ধ'রে আনতে। তপোধীর এবং আরো দু'একজন লোক তাড়াতাড়ি ধ'রে ফেলল। বলা বাহুল্য, খোকাবাবুর সেটা মনঃপূত হল না। কোলে তুলে নিতেই প্রথমে বাবার চশমাটা টেনে ফেলে দিল, তারপর দু'হাতে চুল টেনে, জামা ছিঁড়ে, কেঁদে, খামচে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে লাগল। তাতেও যখন ফল হল না, নীচু হয়ে নাকের উপর বসিয়ে দিল দাঁত।

আধ ঘণ্টা পরে একহাতে ছেলে আরেক হাতে নাক চেপে ধ'রে অধ্যাপক মহলানবিশ যখন বাড়ী গিয়ে পৌঁছল, মার্কিন দার্শনিক নিরাপদ্ দূরত্বে ব'সে হয়ত তখন শিশুদের অবাধ স্বাধীনতার গুণগান ক'রে আর একখানা মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত।

পরদিন সকালে উঠে তপোধীর প্রথমেই একটা বিজ্ঞাপনের মুসাবিদা নিয়ে পড়ল। দুচার বার কাটা-ছেঁড়ার পর যা দাঁড়াল, সেটা এই রকম:—

'একটি বছর দুয়েকের খুনী-ভাবাপন্ন দুর্দ্দান্ত ছেলেকে মানুষ করিবার জন্য প্রচুর ধৈর্যশীলা এবং প্রভূত বলশালিনী নার্স আবশ্যক। উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। ফোটো এবং মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সহ সত্বর আবেদন করুন।

ছেলেটির সর্বপ্রকার ভার লইতে ইচ্ছুক ও সমর্থ কোন আবাসিক প্রতিষ্ঠানের আবেদনও যথারীতি বিবেচিত হইবে।'

বিজ্ঞাপনটা একই সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক কাগজে প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রে ফিরে আসতেই সেদিনকার ডাকে দুটো জিনিষ পাওয়া গেল। একটা বিদেশী পার্সেল, তার মধ্যে "শিশুমন—তার বিকার ও প্রতিকার" সম্বন্ধে দুখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; আর একখানা খামের চিঠি, লিখেছেন শ্বশুরমশায়। পার্সেলটা না-খোলাই প'ড়ে রইল

টেবিলের উপর। চিঠিখানা পর পর ছবার পড়ল তপোধীর, যদিও বক্তব্য সরল ও সামান্ত ; দ্বিতীয় বার পড়বার মত কিছুই ছিল না। সেই একই অনুরোধের পুনরুক্তি করেছেন শ্বশুরমশায়। তাঁদের সকলেরই একান্ত ইচ্ছা, স্থলেখাকে ওর হাতে দিয়ে চিরকালের সম্পর্কটা বজায় রাখেন। মা-মরা ছেলেটারও একটা সুরাহা হয়।

স্থলেখা ওঁদের দ্বিতীয়া কন্তা. দিদির চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট। এই জাতীয় চিঠি আগেও অনেক এসেছে। কিন্তু ৺সুজাতার শূন্ত স্থানে আর কেউ এসে বসবে, ভাবতেই পারা যায় না। এই সব কথা ব'লেই শ্বশুর-শাশুড়ীকে এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু তাঁরা নিরস্ত হন নি। প্রতি চিঠিতেই কুশল প্রশ্নের সঙ্গে ঐ প্রসঙ্গটাও জুড়ে দিয়েছেন। ব্যাপারটা একরকম অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। নতুন ক'রে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করে নি। আজ যেন মনটা কেমন ভারাতুর হয়ে উঠল। হঠাৎ মনে হ'ল, সে বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ।

—'তপোধীর আছ নাকি?' গুপ্ত সাহেবের গলা।

—এই যে আসুন, দাদা।

—দেখতে এলাম, তোমার নতুন থিওরিগুলো—ও কি, নাকে কি হ'ল?

মনটা নরম হয়ে ছিল। নাসিকা-ঘটিত ব্যাপারের একটি সরস বর্ণনা দিল তপোধীর। গুপ্ত সাহেব তাঁর সেই অট্টহাসির ঝড় তুললেন। তার পর বললেন, ঠিকই হয়েছে। তোমার ঐ কেতাবী বিদ্যার অত্যাচার ও আর কত সইবে বল? ওসব এবার ছাড়ো। একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচুক ছেলেটা।

—কিন্তু আমাকে যে হাঁপ ছাড়তে দিচ্ছে না।

—ও যা চায় পেলেই দেবে। ঝি, চাকর, বাবা—কারুরই তখন দরকার হবে না।

ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। অন্তদিন হ'লে তপোধীর হেসে উড়িয়ে দিত। আজ কোনো কথা বলল না। মনটা আবার উদাস হয়ে উঠল।

বিজ্ঞাপন বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল চাকরি-প্রার্থিনীর ভিড়। ষোল থেকে ছাপ্পান্ন, নানা বয়সের কুমারী, সধবা এবং বিধবার দল বিচিত্র বেশে এবং ভঙ্গীতে তাঁদের গুণাবলীর লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে অধ্যাপককে অভিভূত ক'রে ফেললেন। কাকে ফেলে কাকে রাখা যায়, কিছুতেই স্থির ক'রে উঠতে পারল না তপোধীর। একটা প্রশ্ন, যা প্রথম দিকে খেয়াল হয় নি, এখন রীতিমত সমস্যা হয়ে দেখা দিল। একটি অনাত্মীয়া মহিলাকে ছেলের নার্স হিসাবে এই বাড়ীতে স্থান দেওয়া—বাড়তি ঘর অবশ্য আছে, তবু, সমীচীন হবে কি? একটু বেশী বয়স দে'খে নিলে হয়ত তেমন দোষের হবে না। কিন্তু স্ত্রীজাতির বয়স-নির্ণয়ের চেয়ে শক্ত কাজ আর কিছু নেই। বয়স্থা এবং বয়স্ক— এ দুয়ের সীমারেখা যে কোথায়, চেহারা ও সাজ-পোষাক দে'খে ধরে কার সাধ্য? অন্ততঃ তপোধীর সে বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ।

শিশু-সদন জাতীয় কয়েকটি সংস্থাও দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটির নাম 'বালাতঙ্ক-নিকেতন।' তাদের তরফ থেকে যে নারী-প্রতিনিধি দেখা করতে এলেন, তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই অধ্যাপকের বুকের ভিতরটা শিউরে উঠল। নামটার সার্থকতা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল না। প্রথমেই প্রশ্ন করল, দুষ্টুমি করলে বাচ্চাদের আপনারা মারধোর করেন কি?

নারীমূর্তিটি তাঁর সবগুলো ভয়াল দন্ত একসঙ্গে বিকশিত ক'রে হাসলেন এবং ভগ্ন-কাঁসর-নিন্দিত কণ্ঠে বললেন, আজ্ঞে না। চোখ, মুখ দাঁতের সাহায্যেই আমরা সবরকম ডানপিটে ছেলে শায়েস্তা করি। হাত তুলতে হয় না।

নিয়মাবলীতেও তাই দেখা গেল। নার্সদের চেহারাই ওঁদের প্রধান মূলধন। খুঁজে খুঁজে নানা দেশ থেকে এই সব হৃৎকম্প-দায়িনী ছুরীদের সংগ্রহ করতে হয়। সংসারে সবাই চায় রূপ। পুরুষের বেলায় না হলেও চলে, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলায় প্রতি ক্ষেত্রেই এ বস্তুটি অপরিহার্য। একটিমাত্র ব্যতিক্রম এই 'বালাতঙ্ক-নিকেতন', যেখানে রূপসীর চেয়ে কুরূপার কদর বেশী। নারীজাতির মধ্যে একটিমাত্র রসের সন্ধান পেয়েছেন এঁরা—তার নাম বীভৎস রস। প্রতিষ্ঠানটিকে মনে মনে বাহবা জানালে তপোধীর। বিশেষ বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহিলাটিকে বিদায় দিল।

সকাল আটটা থেকে দশটা ইন্টারভিউ। তপোধীর স্থির করেছিল আজই ব্যাপারটা শেষ ক'রে ফেলবে। এ পর্যন্ত যাঁরা এসেছেন এবং দরখাস্ত পাঠিয়েছেন তাঁদের মধ্য থেকেই একজন বা একটি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা

হবে। কিন্তু হঠাৎ একটি দরকারী কাজে বেরিয়ে যেতে হ'ল। ফিরল প্রায় সাড়ে ন'টার কাছাকাছি। সদর দরজা পার হতেই বসবার ঘরের ভিতর থেকে কানে এল একটি পরিচিত কিন্তু বিস্মৃতপ্রায় নারীকণ্ঠ—আপনাদের ত কতবার ক'রে বললাম, নার্স আমাদের দরকার নেই। আপনারা এবার আসতে পারেন।

কে একজন প্রশ্ন করল, 'লোক নেওয়া হয়ে গেছে?' কয়েক সেকেণ্ড বিরতির পর উত্তর এল—হ্যাঁ।

উঠোনে পা দিয়েই চমকে উঠল তপোধীর,—সুজাতা! কি আশ্চর্য বিভ্রম! সুজাতা নয়, সুলেখা। চোখোচোখি হতেই মেয়েটির মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল এক ঝলক রক্তরাগ। কোলে ছিল খোকা। তাকেই আরো জোরে বুকে চেপে ধ'রে ত্রস্তা হরিণীর মত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

সেই মুহূর্তে ওদিক্ থেকে ছুটতে ছুটতে এল একটি কিশোর, ৺সুজাতার ছোট ভাই। জামাইবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে হাসিমুখে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়াল। তপোধীর তার কাঁধ দুটো ধ'রে নাড়া দিয়ে বলল, কখন এলে তোমরা?

—এই ত ঘণ্টাখানেক। বাবাও এসেছেন।

—কোথায় তিনি?

—বেরিয়েছেন। এখখুনি এসে পড়বেন।

উপরে উঠে শোবার ঘরে ঢুকতেই একেবারে মুখোমুখি দেখা। এবার আর পালানো সম্ভব হ'ল না, বোধহয় সে ইচ্ছাও ছিল না। পরণে একখানা হালকা সবুজ রঙ-এর তাঁতের সাড়ি, কাঁধ ও বুকের উপর দিয়ে নেমে গেছে তার গাঢ় লাল পাড়। কিছুক্ষণ আগেই স্নান সেরে নিয়েছে। ভিজে চুলের বোঝা পিঠের উপর ছড়ানো। মুখে সামান্য প্রসাধনের প্রলেপ। কপালে একটি সযত্ন-রচিত কুমকুমের টিপ। তপোধীর পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল। সুলেখা এগিয়ে এসে প্রণাম ক'রে বলল, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আপনার মক্কেলরা সেই কখ-ন থেকে এসে ব'সে আছে।

—আমার মক্কেল!

—তা ছাড়া আর কি?

—কই, কাউকে দেখলাম না।

—ওমা! সব চ'লে গেছে? ঈস্!

—তাড়িয়ে দিলে আর থাকে কি ক'রে?

—কে আবার তাড়াল?

—তা জানিনে। তবে, একজন কেউ ত সত্যিই দরকার। খোকা-টাকে দেখবার—

—সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না মশাই, বাধা দিয়ে তেড়ে উঠল সুলেখা। তারপর স্বর নামিয়ে মাটির দিকে চেয়ে বলল, বাবা বলেছেন, খোকাকে আমি দেখব।

সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না মশাই

—শুধু খোকাকে? হঠাৎ ব'লে ফেলল তপোধীর।

—তা ছাড়া আবার কাকে?—তড়িৎগতিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সুলেখা। তপোধীর মুখে কিছুই বলল না। উত্তরটা বোধহয় লেখা ছিল তার চোখের তারায়। সেইদিকে চেয়ে দু'খানি সুন্দর ভ্রূর মাঝখানে ফুটে উঠল একটি বিশেষ কুঞ্চন। নীচের ঠোঁটখানা উলটে দিয়ে বলল, আমার বয়ে গেছে।

—•—

দেরী ক'রে ওঠা অভ্যেস বালকৃষ্ণ আহুজার, কিন্তু আজ সাত সকালে ঘুম ভাঙল, চট ক'রে উঠে প'ড়ে বারান্দায় চ'লে এলেন। শোবার ঘর থেকে বেরোবার সময় দেখলেন, ধর্মপত্নী কমলা আহুজা তখনও সুনিদ্রিত ; সামান্য হাঁ-করা মুখে, প্রসাধনের অভাবে তাঁর প্রকৃত বয়সের স্বাভাবিক পরিচয় প্রকাশিত। সামান্য কৌতুক অনুভব করলেন বালকৃষ্ণ আহুজা : নিজের এ মুখচ্ছবি ভাগ্যিস কমলা দেখতে পান না! পেলে দ্বিতীয়বার ফেস্-লিফ্‌টের জন্য আর একরাশ টাকা বেরিয়ে যেত।

বারান্দায় এসে দেখলেন সবে প্রভাত হয়েছে, কাগজ আসবার সময় হয় নি। চোখে ঘুম লেগে রয়েছে, ভাবলেন, এখনও ঘণ্টাখানেক শোওয়া যায়। কিন্তু বুঝতে পারলেন, মন এমন অস্থির যে ঘুম আর আসবে না। বাংলো-বাড়ীর চতুর্দিকে প্রশস্ত তৃণভূমি ; ডান দিকের লন্‌টাকে বালকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন ক'রে সবুজ ও নরম রেখেছেন ; ওখানে পামগাছের নীচে সন্ধ্যাবেলা চেয়ার পেতে বন্ধুবান্ধবীদের নিয়ে তাঁরা কখনো-সখনো বসেন, গালগল্প করেন। কাল সন্ধ্যায় পাতা আরাম কুরশিটা এখনো গাছতলায় রয়েছে ; বালকৃষ্ণ আহুজা এগিয়ে গিয়ে তাতে বসলেন। সকালটা চমৎকার সুন্দর। সামান্য শীত পড়েছে, ঝির ঝির প্রভাতী হাওয়া। আকাশ আশ্চর্যরকম শান্ত, বিস্তৃত নীলের বুকে হালকা শাদা মেঘ। রাজকার্য সমাপ্ত ক'রে বালকৃষ্ণ আহুজা যখন বাড়ী ফেরেন রোজ, তখন রজনীর প্রথম প্রহর ; মাঝে মধ্যে, একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পত্নী কমলাকে নিয়ে পার্টিতে, ক্লাবে যেতে হয়। রোজ অনেক রাত্রি পর্যন্ত পুনরায় দেশসেবায় মনোনিবেশ করেন ; যখন শুতে যান, মধ্যরজনী অতিক্রান্ত ; ঘুম ভাঙলে প্রভাত অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ, রোদ বেশ একটু উত্তপ্ত। উষাকালীন প্রকৃতির এই শান্ত গম্ভীর সৌন্দর্য অনেকদিন চোখে পড়ে নি, মনে লাগে নি। হলদে, ফ্যাকাশে কাগজের ফাইল দেখতে দেখতে দৃষ্টি কেমন ঝিমিয়ে এসেছে।

ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে সিগারেট কেস বার ক'রে ধূমপানে প্রবৃত্ত হলেন বালকৃষ্ণ আহুজা। মনে একটা চাপা উত্তেজনা, অস্থির আনন্দ। প্রভাতী প্রকৃতির পানে সতৃষ্ণ নয়নে বার বার তাকালেন। মনে যেন কী একটা সুর গুঞ্জন ক'রে উঠল। গানের সুর নয়, বালকৃষ্ণ আহুজা টের পেলেন, আনন্দের সুর। নিয়মের বাইরে জীবনকে

প্রতিষ্ঠা দেওয়ার আনন্দে মন তাঁর শান্ত উষার হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁপল। এই যে এমন প্রথম প্রভাতে পামগাছের নীচে আরাম কুরশিতে দেহ এলিয়ে তিনি হেমন্তের সৌন্দর্য উপভোগ করছেন, এর মধ্যেও বে-নিয়মের আনন্দ।

বালকৃষ্ণ আহুজার মত মানুষদের দিনগুলি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রয়োজনের শৃঙ্খলে বন্দী। কৃপণ বিধাতা একটি দিনকে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আয়ু দিয়েছেন: কেমন ক'রে কোথায় যে সে নিঃশেষ হয়ে যায় বালকৃষ্ণ যেন জানতেই পারেন না। দিন কেন, বছর পর্য্যন্ত কী ভয়ানক স্বল্পায়ু! পরাধীন ভারতবর্ষে কিন্তু এমন মনে হত না। দিনগুলি দীর্ঘ ছিল, বছর দীর্ঘায়ু। অবসর ছিল অনন্ত, তাড়াহুড়ো কম। স্বাধীন হবার পর ভারতবর্ষ চলছে না, ছুটছে। সে যেমন অস্থিরচিত্ত, তেমনি দ্রুতগতি। ফলে বালকৃষ্ণ আহুজাদের দিন গেছে, রাত গেছে, বছর গেছে। সব নমো রাষ্ট্রদেবায়। নিজের বলতে কিছু যে নেই বাকী।

সারাটা জীবন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে রাষ্ট্রসেবা করেছেন বালকৃষ্ণ আহুজা। এখন বিদায়ের মুহূর্ত সমাগতপ্রায়। অথচ অন্তরে কেন যেন তৃপ্তি নেই, যেন ক্ষোভের গুরুভার। সার্থকতা নামক মুকুট মাথায় বসেছে, কিন্তু অন্তরে তার কোন ছটা লাগে নি। আমি অনেক বড় হয়েছি ভাবতে অহংকার হয়, কিন্তু তেমন যেন আনন্দ হয় না।

আজকের এই নতুন সকালে অবশ্য বালকৃষ্ণ আহুজার মনে অন্য ভাবনা। এ দিন যদি সাধারণ দিন হত, দপ্তর থেকে বয়ে-আনা ফাইল নিয়ে বসতেন। আজ কেমন একটা বিদ্রোহের নেশা মনে লেগেছে। ভাবছেন, এক্ষুণি, আজ সকালে আমার নতুন পরিচয় মানুষ পাবে। তারা জানবে না, চিনবে না নতুন আমাকে। চুয়ান্ন বছরের একটানা রাষ্ট্রসেবার পুরস্কার যে বালকৃষ্ণ আহুজা, তার আপাত-স্তিমিত আত্মা থেকে যে বিদ্রোহীর জন্ম হল, তার পরিচয় পাবে না কেউ। শুধু জানব আমি আর বিধাতা।

সচকিত বালকৃষ্ণ ফটকের বাইরে জীর্ণ সাইকেলের কর্কশ আওয়াজ শুনলেন। বড় বড় পা ফেলে গেলেন এগিয়ে।

যে লোকটা সাইকেল থেকে নেমে ফটক খুলে ভেতরে এল, এর আগে কোনওদিন সাহেবের চেহারা তার চোখে পড়ে নি। বিস্মিত সম্ভ্রমে সে থামল, আনত হয়ে সম্মান জানাল; প্রভাতী সংবাদপত্র এগিয়ে দিল। হাতের মৃদু ইসারায় বালকৃষ্ণ তাকে দাঁড়াতে বললেন। বুকের মধ্যে কেমন একটা আলোড়ন; বড় ক'রে নিঃশ্বাস নিলেন। ঝট ক'রে কাগজের মধ্যবর্তী পৃষ্ঠা খুললেন। চোখ মুখ উদ্ভাসিত হল। দেখতে পেলেন, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় চার-কলম শিরোনামা নিয়ে মুদ্রিত সেই বিদ্রোহের ইস্তাহার! নীচে কালো হরফে রচয়িতার ছদ্মনাম 'ইউলিসিস্ ওল্ড'। লম্বা সরু মসৃণ অক্ষরগুলি অপার বিস্ময়ের দুর্বার আকর্ষণ! বালকৃষ্ণ আহুজা চোখ তুলতে পারলেন না। খস্‌খস্ জুতোর আওয়াজ শুনে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন, বেচারা কাগজওয়ালা তখনও দাঁড়িয়ে।

"বাড়তি দুটো কাগজ হবে?"—প্রশ্ন করলেন বালকৃষ্ণ আহুজা।

"এখন তো হবে না, হুজুর," লোকটি সবিনয়ে নিবেদন করল। "আধ ঘণ্টার মধ্যে এনে দিতে পারি। দুখানা চাই?"

"তাহ'লে পাঁচখানাই এনো।"

বালকৃষ্ণ আহুজা কাগজখানা হাতে নিয়ে গাছতলায় ফিরে যেতে দেখলেন, পা কাঁপছে। মনে মনে হাসলেন। আমি দেখছি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছি! উত্তেজিত হওয়া আমার বারণ! আবার রক্তের চাপ বেশি বেড়ে যাবে। দ্বিতীয় বার ষ্ট্রোক হ'লে আর হয়ত বাঁচব না। তবু আজকের উত্তেজনাটা তাঁর ভাল লাগল। এ যেন তারুণ্যের উত্তেজনা; প্রথম প্রেমের উত্তাপ! বিদ্রোহ ও প্রেমের উৎস কি এক? বিদ্রোহী বালকৃষ্ণ আহুজাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে আই. সি. এস বালকৃষ্ণ আহুজার মুখে বক্র হাসি ফুটল। যেন শুনতে পেলেন সে বলছে, বড় দেরী হয়ে গেল।

চেয়ারে ব'সে প্রবন্ধ পড়লেন। খুশী মনে প্রশংসা করলেন 'ইউলিসিস্ ওল্ড'-এর। তার প্রত্যেকটি যুক্তি অকাট্য, তথ্য ও পরিসংখ্যানের সমাবেশ কুশলী সেনাপতির সৈন্য-সমাবেশের মতই দুর্লঙ্ঘ্য। প্রবন্ধের ভাষাও চমৎকার; উষ্মাহীন, বিনীত, কোমল। পুরো তিন-কলম বিস্তৃত প্রবন্ধ; আগাগোড়া প্রাঞ্জল, সুখবহ। আভিজাত্য বেড়েছে সম্পাদকীয় নিবন্ধে, যাতে তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা ও পূর্ণ সমর্থন।

যৌবনে বালকৃষ্ণ আহুজার বড় সাধ ছিল ইঞ্জিনীয়র হবেন। পিতার নির্দেশে বিলেতে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে হলেন আই-সি-এস। নির্মাতা না হ'য়ে শাসক হলেন। কিন্তু কর্মজীবনে সুযোগ পেলেই তিনি নির্মাণ করেছেন—স্কুল, পুল, টাউন হল, হাসপাতাল। ড্রয়িং করেছেন নিজে, অধস্তন সরকারী ইঞ্জিনীয়ররা সোৎসাহে মেনে নিয়েছে। বালকৃষ্ণ আহুজার আসল নেশা কিন্তু হয়ে দাঁড়াল ভারতবর্ষের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ্। পরে, পরিদর্শন ক'রে, পারদর্শীদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনায় তিনি এ দুটো বিষয়ে দস্তুরমত বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন। তাঁর আসল কর্মস্থান বিহার। বিহারের এমন কোনও নদী-নালা নেই, যার নাড়ী-নক্ষত্র বালকৃষ্ণ আহুজা না জানেন। বিহারের কোথায় কোন পার্বত্য অঞ্চলে, কোন অনধ্যুষিত জঙ্গলে কি পরিমাণ খনিজ দ্রব্য লুক্কায়িত, তা নিয়ে বালকৃষ্ণের অনেক মৌলিক আন্দাজ ছিল ; সেগুলিকে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। ইচ্ছে ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষের নদ-নদী শাসনে সারা জীবনের সুদীর্ঘ অনুশীলন একদিন কাজে লাগাবেন।

সে সাধ পূর্ণ হবার সুযোগ পেতেই বালকৃষ্ণ আহুজার জীবনে প্রথম বিরাট্ সংঘাত এল।

বিহারেরই একটা নদী-শাসন পরিকল্পনা তৈরীর ভার পড়েছিল বালকৃষ্ণের ওপর। অথবা নিজেই তিনি এ ভার গ্রহণ করেছিলেন। নদীটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীর, ঘনিষ্ঠ, দীর্ঘ। পত্নী কমলার চেয়েও যেন একে তিনি বেশি জানেন। বাঁধ-পরিকল্পনা তৈরীর আগে তিনি যত্ন ও শ্রমের কার্পণ্য করেন নি। পুঁথি-পত্র পড়া ছাড়া বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, প্রয়োজন মত বিদেশ থেকে জটিল বিষয়ে মতামত আনিয়েছেন। যে পরিণত খসড়া তিনি দাখিল করেছেন, বৈজ্ঞানিক, আর্থিক ও সামাজিক দিক্ থেকে তা নিখুঁত।

নিখুঁত বলেই সংঘাত বাঁধল। বালকৃষ্ণ আহুজার শঙ্কিত চোখের সামনে সে খসড়ায় ভেজালের আক্রমণ শুরু হ'ল। এমন সব সংশোধন গৃহীত হ'ল যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, যার প্রকৃতি একমাত্র রাজনৈতিক, অথবা ব্যক্তি-বা-গোষ্ঠী-নৈতিক। প্রতি স্তরে বালকৃষ্ণ বাধা দিলেন, সকলে তাঁর প্রতিরোধ দে'খে বিস্মিত, তাঁকে নিরস্ত করতে বার বার চেষ্টিত হল। কিন্তু অনেক ল'ড়েও তিনি হারলেন। দেখতে পেলেন, সিভিল সারভেন্টদের মধ্যে 'কর্তার-খুশিতে-কর্ম' ধর্ম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। যা শুনলে উপরিওয়ালা খুশী হবেন না, তা কেউ বলতে চায় না ; যা প'ড়ে তিনি বিরক্ত হবেন, তা কেউ লিখতে চায় না। যে বাঁধ-পরিকল্পনা বালকৃষ্ণ অনেক পরিশ্রমে তৈরী করেছিলেন তার পরিবর্দ্ধিত, পরিশোধিত রূপ তাঁকে পীড়িত করল।

কিন্তু হেরেও তিনি হার মানতে চাইলেন না। আত্মা তাঁর বিদ্রোহ ক'রে উঠল।

এক সপ্তাহ খেটে বিদ্রোহের ইস্তাহার রচনা করলেন বালকৃষ্ণ আহুজা।

সহরের সেরা সংবাদপত্রের সম্পাদক অনেক দিনের বন্ধু। তাঁকে বাড়ীতে আহারে আমন্ত্রণ করলেন বালকৃষ্ণ আহুজা। আহারের পর চলল দুঘণ্টা ব্যাপী গোপন আলোচনা। ইস্তাহার দে'খে সম্পাদক বিস্মিত হলেন, পাঠ ক'রে আনন্দিত। বললেন, "লেখাটা ত চমৎকার! কিন্তু ফলাফল ভেবে দেখেছ?"

"চুয়ান্ন বছর চলছে। আর বাকি এক বছর। তার মধ্যে আট মাস ছুটি পেতে পারি।"

"চাইলে, রিটায়ার ক'রেও, ভাল কিছু একটা পেতে পারতে।"

"দরকার নেই। গ্রামে গিয়ে চাষ করব ভাবছি।"

"পলিটিক্স ক'রো। অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস-দের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ত প্রস্তুত।"

"দেখো, আমার নামটা যেন কেউ না জানতে পারে।"

"তা দেখা যাবে। কিন্তু সন্দেহ তুমি এড়াতে পারবে না।"

"সে আমি সামলে নেব।"

"এই বুড়ো বয়সে বিদ্রোহের মানে কি? কী হবে একটা প্রবন্ধ ছাপিয়ে?"

"সারাটা জীবন মান নিয়ে কাজ করেছি। আজ নিজের কাছে বড় অপমানিত লাগছে। ওটা আমার জবানবন্দী। বিধাতার আদালতে। একেবারে যে হারি নি তার প্রমাণ।"

"আগামী রবিবারে ছাপব। দেখি, একটা সম্পাদকীয়ও লিখতে পারি কিনা। তাতে প্রবন্ধের মান বাড়বে।"

পরবর্তী দিনগুলি এক অভিনব অভিজ্ঞতায় কাটল বালকৃষ্ণ আহুজার। তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর অন্তর জুড়ে ব'সে আছে বিদ্রোহী বালকৃষ্ণ। রহস্যময় তার প্রভাব। সে নতুন স্বপ্নের স্বাদ এনে দিল। অজ্ঞাত,

ওটা আমার জবানবন্দী। বিধাতার আদালতে।

আকর্ষণীয় জীবনের তাপ লাগল অন্তরে। নিজেকে নবীনরূপে দেখতে পেলেন ভারত-বর্ষের ঘটনাবহুল রঙ্গমঞ্চে। তিনি নন, তাঁর দেহে সেই বিদ্রোহী বালকৃষ্ণ। সে লড়ছে, লড়ছে, লড়ছে। তার শত্রু শুধু এক: ভেজাল। যে-ভেজাল জীবনে বন্যার মত প্রসারিত। খাদ্যে, ঔষধে, চিন্তায়, আদর্শে, লক্ষ্যে, কর্তব্যে। এ সবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বিদ্রোহী বালকৃষ্ণ। কোনও মত নিয়ে নয়, কোনও পথ নিয়ে নয়। শুধু একটি দাবী নিয়ে: নির্ভেজাল হবার দাবী। ধনতন্ত্রই কর আর সমাজতন্ত্রই কর, নির্ভেজাল হও। ডান পথেই চল, বাঁ পথেই চল, বা মধ্যপথ বেছে নাও, নির্ভেজাল হও। তোমাদের মনন, কর্ম, সাফল্য, ব্যর্থতা সব নির্ভেজাল হোক। রাজনীতি কর ভেজাল না মিশিয়ে। অর্থনীতি কর নির্ভেজাল হয়ে। এই হ'ল বিদ্রোহী বালকৃষ্ণের মন্ত্র। তার সংগ্রাম আত্মপ্রতারণার, পর-প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে। সে রোজ সংবাদপত্রে তার প্রাণের প্রদাহ নিবেদন করছে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে; পাঠ ক'রে মানুষের চোখ খুলছে, মন খুলছে। জনসাধারণ তাকে যেচে এসে নির্বাচন করেছে পার্লামেন্টে, যেখানে সুবিনীত ভাষায়, অকাট্য যুক্তিতে বার বার সে শুধু সবকিছুর ভেজাল দেখিয়ে দিচ্ছে; মিনতি করছে, নির্ভেজাল হও।

বালকৃষ্ণ আহুজা বুঝলেন, এ তাঁর দিবাস্বপ্ন; বুঝে লজ্জিত, সংকুচিত হলেন। কিন্তু অন্তরস্থ বিদ্রোহীকে সযত্নে লালন না ক'রে পারলেন না। অনেক দিবাস্বপ্ন, অনেক কল্পনায় তাকে পুষ্ট ক'রে তুললেন। দেখলেন, অবসর পেলেই তার সঙ্গে কথোপকথনে মগ্ন হয়ে যান। কথা বলতে ভাল লাগে, নেশা লাগে। সুযোগ পেলেই সে আঙুল দিয়ে তাঁকে ভেজাল দেখিয়ে দেয়।

কাজ করতে করতে সহসা টের পান, সে বিদ্রোহী কথা বলছে।

বলছে, এই দেখ, এটা ভেজাল; সত্য ও মিথ্যার খিচুড়ি।

বলছে, তুমি এগুলি যা লিখলে তা ঠিক নয়। ন্যায়ের মুখোস পরিয়ে অন্যায়কে সাজালে।

বলছে, এই যে লোকটাকে তুমি অত সম্মান দিলে, এ ভয়ানক ভেজাল; সন্ধান করলেই জানতে পারবে, কত গলদ এর জীবনে।

বালকৃষ্ণ আহুজার কর্মযোগে শিথিলতা এল। দু-একবার উপরিওয়ালার কাছে মৃদু তিরস্কার পেলেন। "জেনে-শুনে তুমি এসব কী লিখেছ?"

উত্তরে ব'লে ফেললেন, "জানি ব'লেই ত লিখেছি?"

শুনতে পেলেন বিরক্তির কণ্ঠ: "তুমি কি বুড়ো বয়সে বিদ্রোহী হলে? যাও, নতুন ক'রে লিখে নিয়ে এসো।"

রবিবারে প্রবন্ধটি ছাপা হ'ল। বার বার পাঠ ক'রে বালকৃষ্ণ আহুজা পরিতৃপ্ত হলেন। বিদ্রোহী বালকৃষ্ণ চেঁচিয়ে উঠল, "আমি জিতলাম।"

বালকৃষ্ণ আহুজা বললেন, "এবার তুমি হারবে।"

প্রায় প্রতি রবিবারেই দপ্তরে যান, আজ আর গেলেন না। সামনের বারান্দায় আরাম কেদারায় গা এলিয়ে বসলেন, কোলে গ্রাহাম গ্রীণের উপন্যাস। পড়তে গিয়ে দেখলেন, চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। অন্তরের উত্তাপ দেহের ক্লান্তির সঙ্গে মিশে বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি করল। মনটা যেন কিসের অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনতে লাগল।

টেলিফোন বাজল; বালকৃষ্ণ আহুজা চমকালেন। সাধারণতঃ তিনি টেলিফোন ধরেন না, আজ বড় বড় পা ফে'লে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললেন।

মন যাঁর প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনছিল তাঁর ভারী কর্কশ কণ্ঠস্বর অপর প্রান্তে শোনা গেল:

"গুড্ মর্ণিং, আহুজা।"

"গুড্ মর্ণিং, রাও।"

"—কাগজে প্রবন্ধটা দেখেছ?"

"না ত? এখনও কাগজই খুলি নি।" নির্বিকার কণ্ঠস্বর বালকৃষ্ণ আহুজার।

"দেখ নি এখনো? সর্বনাশ! এ প্রবন্ধ লিখল কে?"

"কিসের প্রবন্ধ? কোন্ বিষয়ে?"

"তা নিজেই দেখতে পাবে! এক কাজ কর। প্রবন্ধটা প'ড়ে নাও। তারপর দশটায় আমার এখানে চ'লে এস।"

"একটা সিনেমার টিকেট কাটা ছিল!" করুণ স্বর আমদানী করলেন আহুজা।

"রাখ তোমার সিনেমা", ও প্রান্তে কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণতর হ'ল। "এখুনি দক্ষযজ্ঞ লেগে যাচ্ছে। একটু আগে মন্ত্রীমশাই ফোন্ করেছিলেন। আমিও, তোমার মত কাগজ পড়ি নি। ক্রিসেন্থিমামগুলো 'পট' করছিলাম, এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে, একটা রবিবারের সকালও খালি পাই নে। উনি ত রেগে আগুন। ধারণা, যা মনে হ'ল, তুমিই বেনামীতে প্রবন্ধটা লিখেছ।"

"আমি? বেনামীতে?"—হাসি চেপে আকাশ থেকে পড়লেন আহুজা। "হোয়াট এ্যান্ আইডিয়া! আমি কেন বেনামীতে লিখতে যাব?"

"আমিও তাই বলেছি। আচ্ছা, বিহারের প্রজেক্ট নিয়ে তুমি কাউকে কিছু বল নি ত?"

"এমন নিশ্চয় কিছু বলিনি, যা বলা উচিত নয়।"

"আচ্ছা। তুমি এসে যাও। তারপর বাকী কথা হবে।"

টেলিফোন নামিয়ে বালকৃষ্ণ আহুজা টের পেলেন, দেহ অস্থির। কান, চোখ, মুখ তেতে উঠেছে। আর মনের মধ্যে লুকানো বিদ্রোহী হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

সেক্রেটারী রাও সাহেবের বাংলোয় বালকৃষ্ণ আহুজা এসে হাজির হলেন ঠিক দশটায়। দুজনের মোটামুটি একটা বন্ধুত্ব আছে। রাও সাহেব আহুজাকে নিয়ে দপ্তর-ঘরে বসালেন। দুজনে নিজস্ব সিগারেট বার ক'রে এক জলন্ত কাঠিতে জ্বালালেন। তারপর শুরু হ'ল তাঁদের গুরুতর আলোচনা:

"প্রবন্ধটা পড়েছ?"

"পড়লাম।"

"কি মনে হ'ল প'ড়ে?"

"সুলিখিত, সুযুক্তিপূর্ণ।"

"কী বললে?"

"তথ্যের সমাবেশ জোরাল। দৃষ্টিকোণ বৈজ্ঞানিক। মূল বক্তব্য অকাট্য।"

"কী সর্বনাশ! তাহ'লে কি তুমিই—"

"না। আমি ওটা লিখি নি। আমি হ'লে ওরকম ক'রে লিখতাম না।"

"মন্ত্রী মশায় কিন্তু ভয়ানক চটেছেন।"

"চটবারই কথা।"

"তাঁর ধারণা, ভেতর থেকে সাহায্য না পেলে এ ধরণের হাটে-হাঁড়ি-ভাঙা অসম্ভব।"

"অনুমান মাত্র। দেশে বুদ্ধিমান্ লোকের অভাব আমরা যতটা মনে করি ততটা নেই।"

"তুমি দেখছি ব্যাপারটা হাল্কা ক'রে দেখতে চাইছ।"

"সংবাদপত্রে ত কত লেখাই ছাপা হয়। তা নিয়ে বেশী মাথা ঘামালে রাজত্ব চলে না।"

"এ কেসটা যে তা নয় সে তুমি বিলক্ষণ জান। পঁচিশ কোটি টাকা খরচ হবে, জনসাধারণের টাকা—"

সেইটাই ত সুবিধে—জনসাধারণের টাকা, মানে কারো টাকা নয়।

"সেটাই ত সুবিধে। জনসাধারণের টাকা মানে কারুর টাকা নয়।"

"আজ তোমাকে বড্ড বেশী হাল্‌কা-মেজাজ মনে হচ্ছে। এটা কৌতুকের বিষয় নয়। ব্যাপারটা এখানেই থামবে না। এ নিয়ে পার্লামেন্টে প্রশ্ন হ'তে পারে।"

"হ'লে তার উপযুক্ত জবাবও দেওয়া যাবে।"

"কে দেবে?"

"যে সর্বদা দিয়ে থাকে। আমরা।"

"যে-সব সমালোচনা করা হয়েছে, সেগুলো সবই যে ভয়ানক সত্য।"

"তাহলে সেগুলো গ্রহণ ক'রে প্ল্যান বদ্‌লে দেওয়া যাক।"

"অর্থাৎ, তোমার মৌলিক প্ল্যানই বজায় থাকুক!"

"নয়ত, সমালোচনার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হোক।"

"তোমাকে যথেষ্ট সীরিয়স মনে হচ্ছে না।"

"রবিবারের সকালে, নগদ-পয়সায়-কেনা সিনেমার টিকেট নষ্ট ক'রে সংবাদপত্রে-ছাপা একটা প্রবন্ধ নিয়ে অতিরিক্ত সীরিয়স হ'তে পারছি না।"

"দেখ, আহুজা। বিচক্ষণ ও সুদক্ষ হয়েও তুমি যে সেক্রেটারী হ'তে পারলে না, তা শুধু একটা গুণের অভাবে। তুমি বড় একগুঁয়ে। তাই 'জয়েণ্ট' হয়েই হয়ত তোমায় অবসর নিতে হবে। তুমি আমার বন্ধু। তোমাকে উপদেশ দি'। জীবনে তিনটে স্থির-সত্য আমি গ্রহণ করেছি; তার জোরে আমার যা কিছু প্রতিষ্ঠা। কর্তার ইচ্ছেয় কাজ করবে। কোন কাজ তাড়াতাড়ি করবে না। প্রত্যেকটা ঘটনাকে সংকটের গুরুত্ব দেবে।"

"থ্রি পিলার্‌স্ অব্ উইজ্‌ডম্।"

"তা বলতে পারো। ভাবলেই প্রত্যেকটি মূলনীতির তাৎপর্য বুঝবে। কর্তা যা চান তা করা আমাদের ধর্ম। নীচের মহলের প্রস্তাব যত সহজে অগ্রাহ্য, ওপর-মহলের প্রস্তাব তত সোৎসাহে গ্রাহ্য। তোমার আদর্শ, কর্তাকে খুশী রাখা; কর্তা খুশী, ত দুনিয়া খুশী। আর দেখ, কোন কাজ যদি চটপট ক'রে ফেল, তাহলে তার গুরুত্ব ক'মে যাবে। বিশেষ জরুরী কাজ অবশ্যই চট ক'রে করিয়ে নিতে হয়; কিন্তু তাতে এত বেশী লোককে এমন তাড়া দিয়ে এত বেশী সময় নিযুক্ত করবে যাতে কর্তা বুঝতে পারেন, কাজটা কত ভারী এবং কি অল্প সময়ে তুমি তা হাঁসিল করেছ! আমার তৃতীয় মূলনীতি দ্বিতীয়েরই পরিব্যাপ্তি। কোন কিছুকেই হাল্‌কা মনে গ্রহণ করবে না; সর্বদাই দেখাতে হবে, কী বিরাট ভার তুমি অহরহ বহন করছ, অথচ তোমার কাঁধ সোজা, মেরুদণ্ড স্থির! সর্বদাই তুমি গভীর চিন্তায়, মননে নিমগ্ন; প্রত্যেকটি সামান্যতম বিষয়ে তোমার দৃষ্টি সজাগ। দিনরাত সংকট সামলাতে সামলাতে তুমি সংকটত্রাতা হয়ে গেছ, মন্ত্রী মশাইয়ের তোমাকে ছাড়া একদণ্ড চলে না। এসব হ'ল সার্থক সচিবের কর্মবেদ। আমি মাঝে মাঝে কি ভাবি জানো? রিটায়ার করার পরে একটা বই লিখব,—হাউ টু বি অ্যান্ আইডিয়েল এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর্।"

"খুব ভাল হবে", আহুজা সায় দিলেন। "চাই কি, বড় কারুর ভূমিকা পর্যন্ত পেয়ে যেতে পারো।"

"সে এমন কিছু ব্যাপার নয়। ভূমিকা লিখবার জন্য তাঁরা তৈরী হয়েই রয়েছেন। কিন্তু এখন তোমার এই রচনাটা নিয়ে কি করা যায়?"

"আমার রচনা মানে?"

"আহা, চটো কেন? তোমার রচনা মানে, তোমার বিভাগীয় রচনা। অর্থাৎ, এর ঝক্কি পোহাতে হবে তোমাকেই।"

"আগে পুল আসুক, তবে ত পার হব!"

"মন্ত্রীমশাইকে কি ব'লে বোঝাব?"

"তা তুমিই বিলক্ষণ জান। শুধু এটুকু ব'লো, আমি ওটা লিখি নি।"

"ঠিক বলছ ত?"—আহুজার ভুঁড়িতে টোকা মেরে রাও সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

করমর্দনের সুযোগে জবাবটা উচ্চারণ করলেন না বালকৃষ্ণ আহুজা।

এবার একটি একটি ক'রে 'পুল' আসতে লাগল। পরের দিন দপ্তরে মন্ত্রীর গৃহে তলব হ'ল আহুজার। মন্ত্রী যত প্রশ্ন করেন আহুজা তত বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হ'ন একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার এ-জাতীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতায়! মন্ত্রী যখন বললেন, চেষ্টা ক'রেও প্রবন্ধকারের পরিচয় উদ্ধার করতে পারেন নি, আহুজা উষ্মার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন, গণতন্ত্রে সম্পাদক-শ্রেণীর মান ও অহংকার কী অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়ে গেছে! মন্ত্রী বললেন, পার্লামেন্টে প্রশ্ন হ'লে কী করা যাবে? আহুজা আশ্বস্তি দিলেন, সে ভার তাঁর নিজের।

এর পর চলল বালকৃষ্ণ আহুজার আত্মরক্ষা। বিদ্রোহী বালকৃষ্ণকে তিনি শক্ত ক'রে শাসন করলেন; লেজ গুটিয়ে সে পালাল। এক সপ্তাহ পরিশ্রম ক'রে বালকৃষ্ণ আহুজা বৃহৎ একটি নিবন্ধ তৈরী করলেন। ইউলিসিস্ ওল্ড-এর প্রত্যেকটি বক্তব্য তাতে টুকরো টুকরো ক'রে কাটা হ'ল। সরকারী পরিকল্পনার নিখুঁত কল্যাণকামী, বিজ্ঞান-পুষ্ট আকৃতি ও প্রকৃতি বিশদভাবে তিনি ব্যাখ্যা করলেন। বালকৃষ্ণ আহুজা বাহবা পেলেন কর্তাব্যক্তিদের। তাঁর তৈরী নিবন্ধ সামনে রেখে মন্ত্রী পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের সমালোচনা নস্যাৎ ক'রে দিলেন।

দিন পনেরর মধ্যে উত্তেজনা থেমে গেল। বালকৃষ্ণ আহুজার বয়স বেড়ে গেল যেন পাঁচ বছর। কাজে মন বসে না। দেহ মন ক্লান্ত। বড় বেশী ঘুম পায়। মাথায় কেমন একটা ভার লেগে থাকে।

দীর্ঘ ছুটির আবেদন করলেন বালকৃষ্ণ আহুজা।

ক'দিন ধ'রে একটা ফাইল টেবিলের ধারে প'ড়ে ছিল। ছুটিতে যাবার আগের দিন বালকৃষ্ণ আহুজা সেটাকে টেনে সামনে আনলেন। ময়লা, সস্তা ফিতে খুলে কাগজগুলির ওপর চোখ রাখতে ঘুমে দৃষ্টি ভারী হয়ে এল। আধ-ঘুমন্ত আহুজা পাতাগুলো প'ড়ে গেলেন।

ফাইলের জন্ম ইউলিসিস্-ওল্ড লিখিত প্রবন্ধ থেকে। প্রবন্ধটিকে কাগজ থেকে কেটে সযত্নে মোটা কাগজে আঠা দিয়ে লাগান হয়েছে। তারপর কেরাণী থেকে সেক্রেটারী পর্যন্ত বহু মানুষের মন্তব্য জ'মে সে তৈরী হয়েছে, বড় আকারের ফাইল। প্রায় শেষ মন্তব্যের জন্য উপস্থিত বালকৃষ্ণ আহুজার টেবিলে।

পার্কার কলমটা শক্ত ক'রে ধরলেন বালকৃষ্ণ আহুজা। তারপর সজোরে বড় বড় হরফে লিখলেন, "এ ব্যাপারটা মিটে গেছে। বলা বাহুল্য—কাগজে ছাপা প্রবন্ধটি কোনও দুষ্ট, দুর্বুদ্ধি-প্রণোদিত অজ্ঞ লোকের লেখা। প্রবন্ধের বক্তব্য বৈজ্ঞানিক নয়, পরিসংখ্যান নির্ভুল ত নয়ই। মন্ত্রী মহাশয় পার্লামেণ্টে প্রবন্ধটির প্রত্যেক যুক্তি খণ্ডন করেছেন, এবং যে অসদুদ্দেশ্য নিয়ে তা লেখা হয়েছিল তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন।"

লিখতে লিখতে আবার ঘুম পেয়ে গেল। টেনে টেনে নামটা সই করলেন।

হঠাৎ যেন ভূত দে'খে আঁৎকে উঠলেন বালকৃষ্ণ আহুজা। ফাইলের হলদে কাগজে নিজের মৃত মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন।

গভীর, নিস্তরঙ্গ নিদ্রায় মাথাটা ভেঙ্গে পড়ল সেই বিবর্ণ হলদে কাগজের ওপর।*

* কাহিনী ও চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

—*—

সকল প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন প্রবল হইয়াছিল। তাহার ফলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অনেক লক্ষপতি মিল-মালিক ক্রোড়পতি হইয়াছেন। সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙালী যুবকেরা স্বরাজ লাভার্থ প্রবল আন্দোলন প্রভৃতি করিয়াছিলেন। তাহার ফলে অন্য অনেক প্রদেশ কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট পাইয়াছে। বঙ্গে অধিকতম সংখ্যক যুবক ও যুবতী বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্দী থাকিবার পর এবং অনেকের আত্মহত্যা ও যক্ষ্মা প্রভৃতিতে মৃত্যু হইবার পর, এবং কাহারও কাহারও চিররুগ্ন ও অক্ষম হইবার পর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্রমশঃ খালাস পাইতেছেন। স্বাধীনতার জন্য যাহারা প্রাণপণ করিয়াছিলেন বা করিয়াছিলেন বলিয়া পুলিশ অনুমান করিয়াছিল বঙ্গেই এরূপ অধিকতম সংখ্যক ব্যক্তি কেবল গ্রাসাচ্ছাদন প্রার্থী হইয়াছেন। বাঙালীর প্রাধান্য এই সকল বিষয়ে।

বিবিধ প্রসঙ্গ—প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪৫।

গত ষাট বৎসরে বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক পরিবর্ত্তন

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বর্ত্তমানে আমাদের সর্ব্ব-শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক আচার-ব্যবহার দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বর্গীর হাঙ্গামা ও পলাশীর যুদ্ধের পর যে রাষ্ট্র-বিপ্লব আসিয়াছিল তাহাতে ও তাহার পরবর্ত্তী দেড় শত বৎসরে যে পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, বিগত ৫০।৬০ বৎসরে, বিশেষ করিয়া সন ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের পর হইতে তাহার চতুর্গুণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে—একথা বহু বিজ্ঞ চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। এখন এমন সময় আসিয়াছে যে, ৫০।৬০ বৎসর আগে আমাদের আচার-ব্যবহার কি ছিল ও কিভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করা দরকার। এই পরিবর্ত্তন ভাল কি মন্দ তাহার আলোচনা করিব না—সে বিষয় সমাজতত্ত্ববিদ্‌দেব হাতে ছাড়িয়া দিলাম।

একটা বড় কথা এইখানে বলিয়া রাখি ; এই সব পরিবর্ত্তনের ফলে পূর্ব্বে যে আঞ্চলিক পার্থক্য ছিল তাহা লুপ্ত না হইলেও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। যেমন, পর্দ্দার কড়াকড়ি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের ছিল ; এখন সব জায়গায় পর্দ্দা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বা উঠিয়া যাইতেছে, ফলে পর্দ্দার কড়াকড়ি খুবই কম—পার্থক্যও কম।

পর্দ্দা-প্রথা

হিন্দুযুগে মেয়েরা স্বচ্ছন্দে চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইত। ভারতে মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দা-প্রথার প্রচলন আরম্ভ হইল। প্রথমে মুসলমানদের দেখাদেখি আভিজাত্যের পরিচায়ক হিসাবে ; পরে মুসলমানেরা সুন্দরী বৌ-ঝি দেখিলেই বলপূর্ব্বক তাহাদের লুট করিতে থাকায় সামাজিক শুচিতা রক্ষার জন্য হিন্দুদের মধ্যে মেয়েদের ঘরের বাহিরে যাওয়া বন্ধ হইল। ক্রমশঃ পর্দ্দা-প্রথার কড়াকড়ি আরম্ভ হইল। বাংলায় বড়লোক, ভদ্রলোক ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে পর্দ্দা-প্রথা থাকিলেও, যাহাকে আমরা "উৎকট" পর্দ্দা-প্রথা বলিয়া মনে করি, সাধারণতঃ এইরূপ পর্দ্দা-প্রথা ছিল না। গ্রামের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পর্দ্দা-প্রথা ছিল না বটে, তবে তাহাদের মধ্যেও মেয়েদের অযথা গৃহের বাহির হওয়া নিন্দার ছিল। পর্দ্দা-রক্ষা করা ভদ্র হওয়ার, আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত। শ্যামা গোয়ালিনী বাড়ী বাড়ী দুধ জোগান দেয় ; পর্দ্দার ধার ধারে না। ক্রমে শ্যামার পয়সা হইল, শ্যামা ক্রমে ক্রমে পর্দ্দানশীন হইল। কলিকাতায় বড়লোকদের মধ্যে পর্দ্দার কিছুটা বাড়াবাড়ি ছিল।—৫০।৬০ বৎসর আগেও বেশই ছিল। তখন কোন কোন বাড়ীর মেয়েদের যোগ-যাগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিতে হইলে পাল্কি করিয়া যাইতে হইত। পাল্কির উপর ঘেরাটোপ, যাহাতে মেয়েদের কেহ দেখিতে না পায়, মেয়েরাও কাহাকেও দেখিতে না পায়। পাছে মেয়েরা ঝিয়ের সঙ্গে সড় করিয়া পাল্কির দরজা খুলিয়া কিছু দেখে, এজন্য পাল্কির হাতলে তালাবন্ধ করা হইত। গঙ্গার ঘাটে পাল্কি পৌঁছাইলে মেয়েরা যে পাল্কির বাহিরে আসিত তাহা নহে। আধখানা পাল্কি গঙ্গাজলে ডুবান হইত—পাল্কির ভিতরের জলে মেয়েরা গঙ্গাস্নান সারিতেন। তাহার পর স্নান সারা হইলে টোকা মারিতেন ; পাল্কি জল হইতে তুলিয়া বেহারারা বাড়ীমুখে রওনা হইত। ইহাকে আমরা "উৎকট পর্দ্দা" বলিব। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বা মফঃস্বলের শহরে এ রকমটি ছিল না। জমিদার-বাড়ীর মেয়েরা গঙ্গাস্নানে আসিলে পাল্কি বা গাড়ী হইতে নামিয়া গঙ্গাস্নান সারিতেন, ঠাকুর দেখিতেন ; সঙ্গে ঝি, দ্বারবান প্রভৃতি থাকিত। মধ্যবিত্ত ঘরের বৌ-ঝিয়েরা "গিন্নী-বান্নী" বয়স্কা স্ত্রীলোকের সহিত গঙ্গাস্নানে, ঠাকুর দেখিতে যাইতেন। যাঁহাদের পাল্কির পয়সা নাই, তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া ঠাকুর দেখিতে বা গঙ্গাস্নানে যাইলে বে-আব্রু বা বে-পর্দ্দা হইতেন না ; কোনওরূপ নিন্দা হইত না। সাধারণতঃ ইঁহারা অন্দরের বাহির হইতেন না, বাড়ীর লোক ছাড়া বাহিরের অনাত্মীয় পুরুষদের সঙ্গে আলাপ করিতেন না। বাড়ীর বাহির হইলে মাথায় ঘোমটা দিয়া যাইতেন ; ঘোমটা এমন দীর্ঘ হইত যে, তাঁহাদের মুখ দেখা যাইত না, গায়ে চাদর থাকিত। গৃহিণীরা, যাঁহাদের বয়স ৫০।৬০ হইয়াছে, তাঁহারা মাথায় কাপড় দিয়া, গায়ে চাদর ঢাকা দিয়া পথ চলিতেন। পথে বাহির হইলে পুরুষের সঙ্গে বড় একটা কথা কহিতেন না। কোন দোকানের জিনিষ কিনিতে হইলে সঙ্গী পুরুষকে বলিতেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে পর্দ্দা-প্রথায় ভাঙ্গন ধরিতে থাকে। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বা তাহার কিছু পর হইতে পর্দ্দা-প্রথা প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। দুই-এক জায়গায় পর্দ্দা-প্রথা পর্দ্দা-ঢাকা অবস্থায় আছে। আগে মেয়েরা যাত্রাগান, থিয়েটার শুনিতেন বা দেখিতেন চিকের আড়াল হইতে। এখন পুরুষদের সঙ্গে আলাদা বসিলেও সম্পূর্ণ বে-পর্দ্দা হইয়া বসেন। এখন নব-বধূও মাথায় মুখ-ঢাকা ঘোমটা দেন না; নব-বধূর মুখ দেখিতে যাইলে আগে নব-বধূ চোখ বুঁজিয়া থাকিতেন; এখন 'প্যাট-প্যাট' করিয়া চাহিয়া থাকেন। বহু মেয়েই রাস্তা-ঘাটে, ট্রামে, বাসে বা রেলে ঘোমটা না দিয়া সম্পূর্ণ বে-পর্দ্দা যাতায়াত করেন। মাথায় কাপড়ও দেন না। সকলের সামনে পরিচিত পুরুষদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন, কথাবার্ত্তা অপরে শুনিতে পায়। তবে অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে দায়ে না পড়িলে বা কাজ না থাকিলে বড় একটা কথা বলেন না।

এই পর্দ্দাহীনতা শুধু কলিকাতায় বা মফঃস্বলের শহরে আবদ্ধ নহে; পল্লীগ্রামেও ছড়াইয়া পড়িতেছে। তবে বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা, যাঁহারা পর্দ্দা-প্রথার আড়ালে মানুষ হইয়াছেন, কতকটা পর্দ্দা মানিয়া চলেন; আর তাঁহাদের বাড়ীর ঝি-বৌয়েরা বে-পর্দ্দা হইয়া চলেন। যেটুকু পর্দ্দা এখনও পল্লী অঞ্চলে আছে, তাহা আগামী দশ বৎসরের আগেই সম্পূর্ণ লোপ পাইবে বলিয়া মনে হয়। পর্দ্দা-প্রথা দ্রুত মরিতেছে বা লোপ পাইতেছে। ইং ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে পর্দ্দা-প্রথার সুযোগ গ্রহণ করিয়া কিছুটা জাল ভোট চালান হইয়াছিল। ইং ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে এইরূপ জাল ভোটের পরিমাণ সিকি হইয়াছে। পর্দ্দা উঠিয়া যাওয়ার দুইটি সুফল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি, মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার হার খুবই কমিয়া গিয়াছে; দ্বিতীয়, মেয়েদের স্বাস্থ্য কিছুটা ভাল হইয়াছে।

ইংরাজী ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর সময়ে হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। যাঁহাদের প্রশ্ন করা হয় তাঁহাদের অধিকাংশই প্রাদেশিক সরকারের পদস্থ কর্ম্মচারী। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিজেদের গোঁড়া (orthodox) বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের গোঁড়া হিন্দু বলিয়া ধরা হইয়াছে। যাঁহারা তদ্রূপ unorthodox বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদের unorthodox ধরা হইয়াছে। হিসাবটি আমরা নিম্নে দিলাম।

	যাঁহারা নিজেদের গোঁড়া নহেন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদের অনুপাত শতকরা হিসাবে
ব্রাহ্মণ	৫৪·৪
কায়স্থ	৮২·৫
বৈদ্য	৭৫·৯
নমঃশূদ্র	৮৩·৩
অন্যান্য জাতি	৭৮·৯
সর্ব্বমোট	৬৯·৬

পর্দ্দা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত এইরূপ লিখিত আছে যে :—

As regards **purdah** also there were few correspondents prepared to stand out for its rigorous perpetuation. Here, however, there is a strong feeling, particularly amongst the old-fashioned or orthodox, that it is possible to go too far in relaxation. It is generally stated that **purdah** exists only in a very restricted form both in villages where all the inhabitants are known to one another and also in towns where there is greater freedom of movement. Many thoughtful persons are entirely averse from any such free association of the sexes as is characteristic of Western countries and consider that it would, for many years to come, lead to abuses of a serious nature. Comradship between the sexes is foreign to Indian tradition, and is not recommended to the Indian mind by those of its aspects in Europe and especially America which receive the widest advertisement."

(Bengal Census Report, 1931, p. 399.)

মেয়েদের বে-পর্দ্দা হওয়ার কিছু কিছু কুফল দেখা যাইলেও অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির মত, যে, পর্দ্দা-প্রথা

খারাপ। তাঁহারা কেহই পর্দা-প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে রাজি নহেন। আর মেয়েরা একবার পর্দার বাহিরে যখন আসিয়াছেন, তখন কি তাঁহাদের পুনরায় পর্দার ভিতর পুরা সম্ভব হইবে? শেষোক্ত আশঙ্কা কিছু পরিমাণ কমিয়াছে।

স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী নিজেকে পর্দানশীন গণ্য করিয়া হাইকোর্টে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁহার জন্ত কমিশন জারি করা হয়। ২২ কলিকাতা উইকলি নোট্‌স্ ১৪৭ পৃঃ দেখুন। যে যে কারণে প্রীভস্ সাহেব তাঁহার অনুকূলে কমিশন জারি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভাষায় নিম্নে দিলাম :—

"I do not think that the lady who, I am satisfied on the evidence, has abandoned entirely the protection of the **purdah,** and who, upon the evidence before me, I cannot see has any intention of resuming it, ought to be compelled, having regard to the feelings of her class, to appear in the witness-box and I am not prepared to force her to do so, because, I think, that the Indian point of view, which I think should be respected, would be that although the lady has abandoned the **purdah** for the purposes to which I have already referred, it would be something in the nature of an outrage if I were to compel her, having regard to her social position, to appear in the witness-box to give evidence in Court."

এক্ষণে ভারতীয় মত পরিবর্তিত হইয়াছে। বে-পর্দা স্ত্রীলোকেরা কমিশনে সাক্ষ্য দিবার দাবি করিতে পারেন না। দাবি করিবার দরকারও বোধ হয় নাই।

আগে মেয়েরা, শিক্ষিতা মেয়েরাও ঘর-সংসার লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। এখন অনেকে চাকুরি করেন। যাঁহারা চাকুরি করেন তাঁহাদের মধ্যে অবিবাহিতা বা বিধবাদের সংখ্যা ও অনুপাত বেশী হইলেও, বেশ কিছু সংখ্যক বিবাহিতা মেয়ে সংসারের অভাব না থাকিলেও চাকুরি করেন।

বিবাহ

পূর্ব্বে বিবাহ শুধু স্বজাতির মধ্যেই ছিল তাহা নহে; স্বশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। যেমন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রের সহিত ছেলে বা মেয়ের বিবাহ দিতেন না। স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ়ী-শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ; তিনি যখন তাঁহার সেজো মেয়ের বিবাহ সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার জে. চৌধুরীর সঙ্গে দেন (আন্দাজ ১৯০১ সাল) তখন তাঁহার নিন্দা হয়। অথচ উভয়েই বিলাত-ফেরত। দক্ষিণ-রাঢ়ী; উত্তর-রাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হইত না। স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ (বঙ্গজ) তাঁহার এক দৌহিত্রের সহিত দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থকন্যার বিবাহ দেন। এই বিবাহে যাহাতে তাঁহার অপর কন্যা, স্যর অশোক রায়ের মাতা উপস্থিত হইতে না পারেন, তজ্জন্য তাঁহার জ্ঞাতি দেবর ভবনাথ রায় চৌধুরী তাঁহাকে টাকির বাড়ীতে চাবি দিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা ১৯০২ সালের কথা; আর আনুমানিক ১৯৪০ সালে ভবনাথবাবুর নিজ পৌত্রীর দক্ষিণ-রাঢ়ীর সহিত বিবাহ হইয়াছে। বৈদ্যদের মধ্যে, সদ্‌গোপদের মধ্যে অনুরূপ বিধি-নিষেধ ছিল। শ্রীখণ্ডের বৈদ্য অপরের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিতেন না; পশ্চিমকুলের সদ্‌গোপ সহজে পূর্ব্বকুলে বিবাহ করিতেন না। এখন এই সব নিয়মের শিথিলতা হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যেও হিন্দুমতে বিবাহ হইতেছে। আমার আত্মীয়-কুটুম্বগণের মধ্যে এইরূপ ৪।৫টি বিবাহ হইয়াছে। এ বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান করি নাই।

ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি বিধি-নিষেধ ছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীন-কন্যার বিবাহ দেওয়া কিরূপ দুঃসাধ্য ছিল, তাহা সকলেই জানেন। কায়স্থদের মধ্যেও পর্য্যা-মিলন হওয়া প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ম ছিল। যেমন নন্দবাবু তাঁহার আদি-পুরুষ হইতে ২৫-এর পর্য্যায়ের, অর্থাৎ অধস্তন ২৫শ পুরুষ; তাঁহার বিবাহ ২৩, ২৫ বা ২৭ পর্য্যায়ের কন্যার সহিত হইবে; ২৪ বা ২৬-এর সহিত হইতে পারে না। এখন এই সব নিয়ম বড় একটা কেহ মানে না।

আগে কায়স্থ সমাজে 'পাকা-দেখা' বা আশীর্ব্বাদের দিন "পত্র" হইত। যিনি মর্য্যাদায় উঁচু তিনি অপরের পুত্র বা কন্যার সহিত অমুক দিনে অমুক লগ্নে বিবাহ দিবার লিখিত চুক্তি করিতেন। লাল আলতায় তুলট-কাগজের উপর তিন-পুরুষের নাম দিয়া লেখা হইত—একটি রূপার টাকা দিয়া এই কাগজ মুড়িয়া ভাঁজ করিয়া অপর পক্ষের হাতে দেওয়া হইত। এখন "পত্র" হওয়া একেবারে উঠিয়া গিয়াছে।

আগে সম্বন্ধ আসিলে পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠী-বিচার করা হইত। এখন অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ বিচার করা হয় না।

স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। অথচ হিন্দুমতে শালগ্রাম শিলা রাখিয়া বিবাহ হইতেছে বসুতে বসুতে, ঘোষে ঘোষে, স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ভাগ্যে ১৯৪৬ সালের ২৮নং আইন পাশ হইয়াছিল, নচেৎ এই সব বিবাহের কি গতি হইত? এ বিষয়ে ব্রাহ্মণরা এখনও পূর্ব্ব-নিয়ম মানিয়া চলেন।

নব-বধূ বরের বাড়ীতে আসিলে নানারূপ স্ত্রী-আচার ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পালন করা হইত। এখন কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়াছে। অনেক প্রৌঢ়া গৃহিণীরা সব নিয়ম জানেন না।

পূর্ব্বে কন্যা-সম্প্রদান ভূমি-স্পর্শ করিয়া করা হইত—বাড়ীর একতলার ঘরে গঙ্গা-মৃত্তিকা লেপিয়া তাহার উপর আসন বা পিঁড়া পাতিয়া। এখন দোতলায়ও বিবাহ হয়—কেহ কোনরূপ ওজর-আপত্তি করে না; পুরোহিতেরাও কিছু বলেন না।

কন্যা-সম্প্রদান একটি পুণ্যকার্য্য; যজ্ঞ বিশেষ। এ জন্য কন্যার পিতা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া সারাদিন উপবাস বা দুধ, সন্দেশ খাইয়া কন্যা-সম্প্রদান করিতেন। বরও অনুরূপ উপবাস করিতেন। এই নিয়মের যে পূর্ব্বে ব্যতিক্রম ছিল না তাহা নহে; তবে সকল পিতাই কন্যা-সম্প্রদান করিতে উৎসুক ছিলেন। এখন পিতা নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করিতে এত ব্যস্ত যে কন্যা-সম্প্রদান করিতে আদৌ আগ্রহ নাই। গরীব জ্ঞাতি বা মামা কন্যা-সম্প্রদান করেন। শোভাবাজারের রাজারা নিজে কন্যা-সম্প্রদান করিতেন না, বলিতেন যে, বরের হাঁটু ধরিব না; এ জন্য তাঁহাদের কিছু নিন্দা ছিল। এখন বিশেষ করিয়া বড়লোকদের বাড়ী পিতার কন্যা-সম্প্রদান প্রায় আশ্চর্য্য ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ বিলাত-ফেরত হইলেও নিজে কন্যা-সম্প্রদান করেন। এ জন্য বহু লোককে মন্তব্য করিতে শুনিয়াছি যে, বিলাত-ফেরত হইলে কি হয়, এদিকে খুব গোঁড়া। আজকাল বর আর পূর্ব্বের ন্যায় উপবাস করে না। পূর্ব্বে সম্প্রদান-স্থলে যাঁহারা যাইতেন, তাঁহারা শালগ্রাম শিলা আছেন বলিয়া জুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেন; এখন অনেককে জুতা পরিয়া সম্প্রদান-স্থলে ঢুকিতে দেখিয়াছি।

বিবাহের পূর্ব্বে বরকে স্ত্রী-আচারের জন্য অন্দরে লইয়া যাওয়া হয়। স্ত্রী-আচার এক রকম নহে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন বংশে বিভিন্ন রকমের। আমাদের বাড়ী এক রকম; আমার বোনেদের বাড়ী আর এক রকম। দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ সমাজে ৩, ৫ বা ৭ জন স্ত্রীলোক বরের চারিদিকে নানাবিধ বরণের দ্রব্যাদি লইয়া ঘোরেন; উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ সমাজে ৩, ৫ বা ৭ জন পুরুষ বড়, বড়-কাঠিতে রঙীন নেকড়ার মশাল জ্বালাইয়া ঘোরেন। বৈচিত্র্য কিরূপ, ইন্দিরা দেবীর পুস্তক পাঠে কিছুটা জানা যাইবে। ইহার রকম এত যে সংখ্যা করা যায় না; নানারূপ তুক্-তাক্ মেয়ে-জামাইয়ের কল্যাণে, জামাই যাহাতে মেয়ের বশ হয় তাহার জন্য করা হইত। রকমারী আলপনা দেওয়া হইত; পিটুলীর "শ্রী" (তাহাও কি এক রকমের?) করা হইত।

এখন এই স্ত্রী-আচারের ধুম ও বাহুল্য আর আনুষঙ্গিক তুক্-তাক্ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। অনেকেই কি করিতে হইবে জানেন না।

বরকে পূর্ব্বে বাসর-ঘরে নানারূপ পীড়ন করা হইত। কান মলিয়া দেওয়া ত সহজ কথা; মাথায় গাঁট্টা, আলপিন অবধি ফুটাইয়া দেওয়া হইত। সহরে এইরূপ অত্যাচার কম হইলেও ছিল; পল্লী অঞ্চলে খুব বেশী প্রচলন ছিল। এখন এইরূপ অত্যাচার, কি সহরে কি পল্লীগ্রামে, একদম উঠিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে বর-যাত্রীদের আহারের পূর্ব্বে কন্যা-যাত্রীরা আহার করিত না বা করিতে পাইত না। কন্যা-যাত্রীরা আগে আহার করিলে নাকি বর-যাত্রীদের অপমান করা হয়। এই প্রথার ভাঙ্গন ৫০।৬০ বৎসর আগে সহর বা সহরতলীতে আরম্ভ হইলেও পল্লীগ্রামে প্রবল ছিল। এখন সর্ব্বত্র এই নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। এখন যে যখন আসে সে তখন খাইয়া চলিয়া যায়; কেহ কোনরূপ ওজর আপত্তি করে না।

পূর্ব্বে বর-যাত্রীরা, বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামের বর-যাত্রীরা কনের বাড়ীতে আসিয়া নানাপ্রকার অত্যাচার, ইতরামি করিতেন—এইরূপ করাটা নাকি বাহাদুরি। বর-পক্ষ বলিলেন যে, ২৫ জন বর-যাত্রী আসিবে; সঙ্গে লইয়া আসিলেন ১০০ জন। দেখা যাউক, কন্যা-পক্ষ ঠকেন কি না। আসরে বসিবার কার্পেট ছুরি দিয়া কাটা; তামাকের জলন্ত গুল্ ফ্যাকা সাজিয়া ফরাসের উপর ফেলিয়া দেওয়া, খাইতে বসিয়া লুচি কাঁচা বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া, পাঁজার খোলা ছাড়াইয়া খাওয়া, ইত্যাদি করিতেন। রাঢ়দেশে এইরূপ নোংরামি খুব বেশী হইত—যাহার থেকে 'রেঢ়ো-বর-যাত্রী' কথার উৎপত্তি। পল্লীগ্রামে বর-যাত্রীদের থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইত; তাঁহারা গৃহস্থকে

অনর্থক জ্বালাতন করিতেন। এখন এইরূপ ইতরামি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। ৫০ বছর আগে হইতে উঠিতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একেবারে শেষ হইয়াছে। বিবাহের পরদিন বর-কনেকে আনিবার সময় বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে গ্রাম-ভাঁটি, ঠাকুর-প্রণামী, নাপিত বিদায়, শয্যাতোলানি, প্রভৃতির টাকার অঙ্ক লইয়া কথা কাটাকাটি, বাজে তর্ক, ঝগড়া, এমন কি ইতরামি পর্য্যন্ত হইত। গ্রাম-ভাঁটি আদায়ের জন্য মেয়ের গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোককে, বর-কর্ত্তার গলায় গামছা দিয়া টাকা আদায় করিব, বলিতে শুনিয়াছি। এখন লোকে এইজন্য বিবাহের আগেই "গায়ে গায়ে" শোধ দিবার কথা কহিয়া রাখেন। বরপক্ষও কিছু দিবেন না; কন্যাও শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া ননদ-ক্ষেমী, দোর-ছাড়ানী, ঠাকুর-প্রণামী, ইত্যাদি দিবেন না। এই প্রথা, বিশেষ করিয়া ইহার অত্যাচার, একেবারে উঠিয়া গিয়াছে।

ছাঁদনাতলায় নাপিতের ছড়াকাটা মায় খিস্তি বিবাহের আবশ্যিক অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। বয়েদের নাপিত ছেলেমানুষ, ভাল ছড়া জানে না, সাধু! তুমি একবার ছড়া কাট ত। সাধু মেয়েদের নাপিত। ছড়া কাটিয়া তাক্ লাগাইয়া দিল। বিবাহ-বাড়ীতে নাপিতের অসম্ভব প্রতিপত্তি ছিল। নাপিত—জাত নাপিত ও কৌলিক নাপিত (যে নাপিতের বাপ-পিতামহ আমার বাপ-পিতামহর বিবাহ দিয়াছে) এর খুব প্রতিপত্তি ছিল। আমার বড় বোনের বাড়ীতে তাহাদের দেশের নাপিত কলিকাতায় আসিতে পারিবে না বলিয়া বিবাহের দিন পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন কৌলিক নাপিত নাই; নাপিত হইলেই হইল, তাহা সে বাঙ্গালীই হউক বা খোট্টাই হউক। তাহার জাতি সম্বন্ধে খোঁজ বড় একটা লই না। অনেক জাত-নাপিত কৌলিক ব্যবসা করা হীন কাজ বলিয়া মনে করেন। বিবাহের দিন বরকে নূতন ক্ষুরে কামাইতে হইত—এই ক্ষুর নাপিতের প্রাপ্য। এক্ষণে সেফ্‌টি রেজারের যুগে বর নিজেই কামায়। নাপিতের ভাগে লবডঙ্কা। কনেকে আলতা পরাইবার জন্য সধবা নাপিতানীর ডাক পড়িত। পাত আলতা জলে গুলিয়া নাপিতানী আলতা পরাইত ও পায়ের নখে নানা রকমের ফুল আঁকিত। এখন এই সব 'পাট' উঠিয়া গিয়াছে; পল্লী অঞ্চলে দুই-এক জায়গায় ক্ষীণভাবে কিছু কিছু আছে।

কনে পিঁড়ার উপর বসিয়া থাকিত। বর বরণ হইলে কনেকে পিঁড়াসুদ্ধ বরের চারিদিকে দক্ষিণাবর্ত্ত করিয়া সাতবার ঘোরান হইত; তাহার পর 'বর বড় না কনে বড়' বলিয়া পিঁড়া উঁচু করিয়া ধরা হইত। এখন অনেক জায়গায় কনে হাঁটিয়া বরের চারিপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। এইরকম ছোটখাট অনেক আচার উঠিয়া যাইতেছে বা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এগুলি অনাবশ্যক বাজে আচার বলিয়া শিষ্ট সমাজের ধারণা হইয়াছে, ইচ্ছা করিয়া তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। আমাদের মেয়েরা অনেকটা রক্ষণশীল হইলেও ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে।

বর সাধারণতঃ কনের অপেক্ষা বয়সে বড়। কত বড়? এ বিষয়ে ইং ১৯২১ সালের বাংলার সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট টমসন সাহেব একটি হিসাব করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় যে গড়ে স্বামীর বয়স ২০.৭৩ বৎসর; আর স্ত্রীর বয়স গড়ে ১২.০৩ বৎসর; উভয়ের পার্থক্য ৮.৭ বৎসর। হিন্দুদের মধ্যে এই পার্থক্য আরও বেশী ছিল। এখন বর ও কনের উভয়ের বিবাহের বয়স বাড়ায় এই পার্থক্য কমিয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বহু-বিবাহের সামান্য আলোচনা করা যাউক।

আমাদের আলোচ্য সময়ের প্রারম্ভে বহু-বিবাহ একেবারেই কমিয়া গিয়াছিল; বহু-বিবাহ বিশেষ নিন্দার ও হেয় ছিল। কিরূপ নিন্দার ও হেয় তাহা নিম্নের ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে। পানিহাটীর দ্বাদশ মন্দির শিবের প্রতিষ্ঠাতা নরেন্দ্রকুমার দত্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র; তিনি তাঁহার ম্যানেজার, ভাগিনেয় সুবাদ প্রথমা স্ত্রী থাকিতেও পুত্র হয় নাই বলিয়া পুনরায় বিবাহ করায়, তাঁহাকে জুতা মারিয়া বরখাস্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স ৫৫।৫৬; আর ম্যানেজারের বয়স ৪০।৪৫। ঘটনাটি আন্দাজ ১৮৯০ সালের। বহু-বিবাহ ছিল না বলিলেই হয়; এখন আরও কম। আলিপুর জজকোর্টের ৭০০ উকীলের মধ্যে মাত্র একজনের দুটি বিবাহ—তাহাও প্রথমা পত্নী রুগ্না বলিয়া। এখন ত আইন করিয়া (১৯৫৫ সালের ২৫ নং আইন) বহু-বিবাহ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শহরের ও শহরতলীর শিক্ষিত ভদ্রসমাজে মেয়েদের বিবাহ ২০।২২এর আগে হয় না; অজ পাড়াগাঁয়েও ১৫।১৬র কম বয়সে বিবাহ কেহ বড় একটা দেয় না। পূর্ব্বে কলিকাতার কায়স্থ সমাজে, এমন কি বিলাত-ফেরতদের মধ্যেও বাল্য-বিবাহের খুব প্রচলন ছিল। Risley সাহেব বলিয়াছেন the Kayasthas are addicted to child-marriages। এখন সেই সমাজেই মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়িয়া ২২।২৩ হইয়াছে। গত ২।৩ বৎসরে যে ২৫।৩০টি বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম তাহাতে কনের বয়সের গড় ঐরূপ। ছেলেদের বয়স ৩০।৩২এর উপর।

আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের অভিজ্ঞতাও ঐরূপ। সময়ে সময়ে পাত্রপক্ষ পাত্রীর বয়স কুড়ির কম বলিয়া বিবাহ দিতে অ-রাজি বলিয়া শুনিয়াছি।

বিধবা-বিবাহ

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিলেও এবং এখানে ওখানে দুই-একটি বিধবা-বিবাহ দিলেও সমাজে বিধবা-বিবাহ চলে নাই। ৫০।৬০ বৎসর আগে বিধবা-বিবাহ দিলে কন্যার পিতা নিন্দিত ও প্রায় "একঘরে" হইতেন। ইং ১৯০৬ সালে কোন জেলা কোর্টের সরকারী উকীল তাঁহার বিধবা কন্যার বিবাহ দেন। ফলে তাঁহার সহকর্মীরা এক টেবিলে বসিয়া তামাক খাইতেন না; এবং তাঁহার সঙ্গে মামলা-সংক্রান্ত কথাবার্তা ছাড়া অন্য কোনও কথা বলিতেন না। এখন বিধবা-বিবাহের প্রতি এইরূপ বিরূপ ভাব আদৌ নাই। সমাজে, বিশিষ্ট ভদ্রসমাজেও দুই-একটি বিধবা-বিবাহ হইতেছে। বিধবা-বিবাহ এখন ব্যক্তিগত রুচির, মতিগতির উপর নির্ভর করে; আগে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে যে সামাজিক শাসন ছিল, এখন তাহা আদৌ নাই। পক্ষান্তরে সহানুভূতি আছে প্রচুর।

বিধবাদের প্রতি ব্যবহার

বিধবা হওয়া দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। যে বিধবা হইয়াছে তাহার দুর্ভাগ্যে সহানুভূতির পরিবর্তে সাধারণ গৃহস্থ সংসারে তাঁহার প্রতি কু-ব্যবহার করা হইত; বিশেষ করিয়া যদি তাহার পুত্রসন্তান না থাকিত। কি বাপের বাড়ী, কি শ্বশুরবাড়ী সর্ব্বত্রই তাহার প্রতি কটাক্ষ করা হইত। বাপের বাড়ীতে মা বাঁচিয়া থাকিলে কতকটা সহানুভূতির চক্ষে মেয়েকে দেখিতেন; কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে শাশুড়ী তাহাকে তাঁহার পুত্রের অকালমৃত্যুর একমাত্র কারণ জ্ঞান করিয়া বিধবার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেন; দুর্ব্যবহার না করিলেও উঠিতে বসিতে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতেন। যা' ননদদের ত কথাই নাই। বাপের বাড়ীতেও অনুরূপ অবস্থা, ভাজ বা ভাই ভালচক্ষে তাহাকে দেখিতেন না। সংসারের যাবতীয় শ্রম-সাধ্য কাজ, বাসন মাজা, জল তোলা, রান্না করা তাহার উপর ঠেলিয়া দিয়া নিজেরা আরাম করিতেন। একেই ত বিধবার একবেলা নিরামিষ আহার, তাহার উপর মাসে দুইটি করিয়া একাদশী। বিধবার আহারের দিকে কেহ নজর দিত না, পাতে কখনও একটু ঘি পড়িত না। তরি-তরকারীর মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, বিটপালম, ইত্যাদি খাইতে নাই, পুঁইশাক খাইতে নাই, ইত্যাদি নানারূপ ব্যবস্থা হইত। কিন্তু শাস্ত্রে যে গব্যঘৃত, সৈন্ধব লবণের ব্যবস্থা আছে তাহাও তাহাকে দেওয়া হইত না।

বিবাহাদি কোনও শুভ-কার্য্যে তাহাকে যাইতে দেওয়া হইত না, দেখিতে দেওয়া হইত না, মাঙ্গলিক কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে দেওয়া হইত না। এমন ব্যবহার করা হইত যাহাতে তাহার নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কার আসিত। এক বিধবা একটু আমসত্ত্ব খাইয়াছিল বলিয়া শাশুড়ী ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ছুটিলেন ব্যবস্থা লইতে, বিধবা-বধুর কতখানি পাপ অর্শাইয়াছে। একাদশীর দিন উপবাস করিয়াও বহু বিধবাকে রান্না করিতে হইত। দ্বাদশীর দিন পারণের ব্যবস্থা, কিন্তু দুখানি বাতাসা ও এক ঘটি জল।

পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে এইরূপ অনাদর, হতশ্রদ্ধা খুব প্রবল ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে হাওয়া পাল্টাইতে লাগিল। এখন এইরূপ অনাদর, হতশ্রদ্ধার ভাব পল্লীগ্রামে কিছু পরিমাণ থাকিলেও শহরে ও শিষ্ট-সমাজে খুবই কমিয়া গিয়াছে। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি যে, যাঁহারা নিজে বিধবা তাঁহারা সদ্য-বিধবার কষ্টের ভার যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করিতেন। পড়ার সেজ গিন্নী নিজে বিধবা; তিনি পাড়া বেড়াইতে আসিয়া উদ্ভট উদ্ভট ব্যবস্থা দিয়া যাহাতে সদ্য-বিধবার কষ্ট বাড়ে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা তাঁহাকে আমল না দেওয়ায় তিনি কর্ত্তার উপর রুষ্ট হইলেন। বলিতে লাগিলেন, ও বাড়ীর কর্ত্তাটি খাঁটি খ্রীষ্টান; শাস্ত্র (অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় পদী-পিসির বেদবাক্য) মানে না; মরিলে নরকে যাইবে, ইত্যাদি। এইরূপ বহু সেজ গিন্নী দেখিয়াছি।

সর্ব্বক্ষেত্রেই যে বিধবাদের এইরূপ অযত্ন করা হইত, তাহা নহে। বড়লোকদের কথা বাদ দিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে এমন শাশুড়ী দেখিয়াছি, যিনি বিধবা-বৌমার জ্বর হইয়াছে বলিয়া কালিঘাটে যাওয়া স্থগিত রাখিয়াছেন। এমন শাশুড়ীও দেখিয়াছি যে, মেজ ছেলে মাকে তীর্থভ্রমণ করাইবার ব্যবস্থা করিলে বিধবা বৌয়ের তীর্থভ্রমণের সমস্ত ব্যয় নিজ হইতে দিয়া নিজে সঙ্গে করিয়া তীর্থদর্শন করেন ও করান। এজন্য তাঁহাকে গায়ের গহনা বেচিতে হইয়াছিল। অনুযোগ করিলে বলিলেন, যে, বৌমায়ের ত এ জীবনে কিছু হইল না, তবু পরকালের কিছু সঞ্চয়

হউক। আমরা এমন শ্বশুর-শাশুড়ী দেখিয়াছি যে, বিধবা পুত্রবধূ মাছ খাইতে পায় না বলিয়া তাঁহারাও মাছ খাওয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। শাশুড়ী খালি একাদশীর দিন গোপনে মাছভাজা খাইতেন। আমাদের পাড়ার সিংহদের বাড়ীর মেজবৌ বিধবা, ছোটবৌ সধবা হইলেও মাছ খান না—এক একাদশীর দিন ছাড়া। এইরূপ ভাল পরিবার কিন্তু খুবই সংখ্যালঘু।

শিক্ষার দ্রুত বিস্তার এই পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হয় নাই। বিধবারা প্রায়ই নিরক্ষরা, বাড়ীর বাহির হইতেন না; এজন্য তাঁহাদের বিষয়-বুদ্ধি কম ছিল। সম্পত্তি থাকিলে দেওর-ভাসুরে বা ভাগেতে ঠকাইত। খাজনা বাকী ফেলিয়া ধানজমি নীলাম করান ও বে-নামে ডাকিয়া লওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। এখন তাঁহারা অনেকটা শিক্ষিত, বাড়ীর বাহির হন, সহজে ঠকান যায় না। লোকের মতিগতিরও কিছুটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এক ভাই যদি বিধবাকে ঠকাইতে চাহে, অপর ভাই বাধা দেয়।

পূর্ব্বে কারণে অকারণে বিধবাদের চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা রটিত এবং লোকেও সহজে তাহা বিশ্বাস করিত। এখন যে-কোন কারণেই হউক কুৎসা রটনা কম, রটিলেও লোকে সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। জাতি যে চরিত্রবান্ হইয়াছে তাহা নহে, তবে জাতির মতিগতির বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিচার-বুদ্ধি বাড়িয়াছে, সহজে কোনও কুৎসা বিশ্বাস করিতে চাহে না।

বিধবাদের আচার-ব্যবহার

পূর্ব্বে বিধবারা সাদা থান পরিতেন, সাদা থান ছাড়া অপর কিছুই পরিতেন না। শীতকালে সাদা শাল বা র‍্যাপার বা কম্বল গায়ে দিতেন। এখন অনেকে সরু নরুণ-পাড় ধুতি ব্যবহার করেন বাড়ীতে, বাহিরে অবশ্য সাদা থান পরেন। আমাদের শোকের চিহ্ন সাদা, ইংরেজদের কালো। শোকের চিহ্নস্বরূপ মোটা কালোপাড় কাপড় পরিয়া অনেক বিধবাকে সভাসমিতিতে যোগদান করিতে দেখিয়াছি—ইঁহারা সকলেই কিছু নব্যা বা ব্রাহ্ম নহেন। অনেকে আনুষ্ঠানিক হিন্দু। পেড়ে কাপড় পরিলে আজকাল আর বিধবাদের জাতি যায় না বা নিন্দা হয় না।

আমাদের পটলি দিদি, পাড়া সুবাদে দিদি, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁহার স্বামী মন্মথবাবু দেওঘরে হাওয়া খাইতে গিয়া হঠাৎ মারা যান। সাদা থান পাওয়া যায় নাই বলিয়া পটলি দিদি (বয়স ষাটের উপর) পেড়ে ধুতি পরিয়া অশৌচ গ্রহণ করেন। তিন-চার দিন বাদে দেশে ফিরিলে কি নিন্দা! সাদা থান পাওয়া যায় নাই—এ কি সম্ভব? নিশ্চয়ই অনাচার। শ্রাদ্ধের আগে পটলি দিদির প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার, ইত্যাদি মন্তব্য তাঁহার জ্ঞাতিগোষ্ঠী ত করিয়াছিলই, ব্রাহ্মণেতর জাতির অনাচারী ব্যক্তিরাও করিয়াছিলেন। মন্মথবাবুর শ্রাদ্ধে খাওয়া উচিত কিনা, এ সম্বন্ধে ঘোঁট হইয়াছিল। ইহা চল্লিশ বছর আগেকার কথা। এখন হইলে কেহই গ্রাহ্য করিত না।

পূর্ব্বে বিধবারা সায়া, সেমিজ, ইত্যাদি পরিতেন না। এজন্য নিতান্ত বয়স্কা না হইলে, যুবক আত্মীয়-কুটুম্বের সামনেও বাহির হইতেন না। এখন সায়া, সেমিজ সকলেই প্রায় পরেন। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকে জুতা, এমনকি ঘাসের চটি পর্য্যন্ত পরিতেন না, সধবারাও পরিতেন না, বিধবাদের ত কথাই নাই। এখন শিষ্ট-সমাজে বিধবারা পায়ে ঘাসের চটি পরিয়া বাড়ীর বাহির হন। পল্লী অঞ্চলে কিন্তু এখনও পূর্ব্বের ভাব বজায় আছে। তাদৃশ অর্থের অভাবও একটা কারণ বলিয়া মনে হয়।

বিধবারা পূর্ব্বে একবেলা আলো চালের হবিষ্য করিতেন। রাত্রিতে দুধ, ফল, মূল, ছানা বা সন্দেশ খাইতেন। এখন নিষ্ঠাবান্ বাড়ীতেও সিদ্ধ চাউল খান—রাত্রিতে অবস্থা অনুযায়ী লুচি, পরোটা বা রুটী খান। পূর্ব্বে বিধবারা পান বা দোক্তা খাইতেন না; দুই-এক জায়গায় পান খাইলেও দোক্তা খাইতেন না। এখন অনেকেই পান ও দোক্তা খান, এমন কি পল্লী অঞ্চলেও।

পূর্ব্বে অনেকে বিধবা হইবার পর ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করিতেন না, কবিরাজী করাইতেন। সত্তর-আশী বৎসর পূর্ব্বে বিধবাদের জ্বর হইলে কুইনাইন খাইতে আছে কিনা এ বিষয়ে ভট্টাচার্য্য-বাড়ী হইতে বিধান আনাইতে হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। রাজমোহন দত্তর বিধবা ইং ১৯১১ সালে মারা যান। তাঁহার ছেলেরা জীবদ্দশায় মারা যাওয়ায় তিনি পৌত্রদের তাঁহার পায়ে হাত দিয়া শপথ করান যে তাঁহারা যেন তাঁহার শেষ সময়ে ডাক্তারী ঔষধ না খাওয়ায়। এখন সকলেই ডাক্তারী চিকিৎসা করান, এমনকি লিভার এক্সট্রাক্ট, ইত্যাদি ব্যবহার করেন।

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নিয়ম থাকিলেও একাদশীর দিন বিধবাদের উপবাস করাই নিয়ম ছিল। এই একাদশীর কি রকম কড়াকড়ি ছিল তাহার একটা উদাহরণ দিই। গল্পটি রাজা সুবোধ মল্লিকের কাছে শুনিয়াছি। "একাদশী"

ঘোষেদের বাড়ীতে বিধবারা নির্জ্জলা উপবাস করিত। "একাদশী" ঘোষের মেয়ে আট বৎসর বয়সে বিধবা হয়। চৈত্র মাসে একাদশীর দিন চুরি করিয়া জল খাইয়াছিল বলিয়া "একাদশী" বাবু তাঁহার কন্যার মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইঁহারা কায়স্থ। ঘটনাটি অবশ্য সত্তর-আশী বৎসর আগেকার।

এখন এইরূপ বাড়াবাড়ি নাই। অনেক স্থলে বিধবারা একাদশীর দিন রাত্রিতে জল-টল খান এবং তাহাতে তাঁহাদের নিন্দা বা কোনরূপ সমালোচনা হয় না।

পূজা-পার্ব্বণ ও ধর্ম্মীয় আচার-ব্যবহার

পূর্ব্বে সকল হিন্দু গৃহস্থের বাড়ী সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়া ও শাঁখ বাজান হইত। সহরে টবের উপর তুলসীগাছ রাখা হইত। এখন হয় না। আমাদের পাড়ায় ৩০।৩৫টি বাড়ীর মধ্যে ১০।১২টি বাড়ীতে শাঁখ বাজে।

৬০।৭০ বৎসর আগে প্রত্যেক বাড়ীর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা তর্পণ-পক্ষে ১৫ দিন ধরিয়া নিত্য তর্পণ করিতেন ও মহালয়ার দিন অর্দ্ধেক বাড়ীতে শ্রাদ্ধ হইত। ঐদিন তর্পণ শ্রাদ্ধ করাইবার ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইত না। এত কলার পেটো কাটা হইত যে, এই অমাবস্যার নাম 'কলাকাটা' অমাবস্যা হইয়াছিল। যাঁহাদের তাদৃশ সঙ্গতি বা সামর্থ্য ছিল না, তাঁহারা গঙ্গায় তিলতর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সিধা দিতেন। অনেকেই এই ১৫ দিন নিরামিষ আহার করিতেন। নারায়ণ দত্তর ৬ ছেলে, বয়স ৪০ থেকে ২০; সকলেই গঙ্গায় ১৫ দিন ধরিয়া তিলতর্পণ করিত ও মহালয়ার দিন জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রাদ্ধ করিত। এখন এরকমটি দেখি না। বাড়ীতে তর্পণ-শ্রাদ্ধ করা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। নিত্য-তর্পণও হয়ত এক ভাই করেন, অন্য ভায়েরা করেন না।

পূজা-অর্চ্চনা, ব্রত করার অবস্থাও অনুরূপ; খুব দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। আগে বৈশাখ মাসে কুমারী মেয়েরা নানারূপ ব্রত করিত, এখন প্রায়ই করে না। সকাল বেলায় কিছু খাইয়া স্কুলে, পাঠশালায় যায়। আগে গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা-মৃত্তিকার শিব তৈয়ারী করিয়া অনেক গৃহিণী পূজা করিতেন। অধর মিত্রের মা এক হাতে বুকের কাপড়ের ভিতর হাত রাখিয়া শিবলিঙ্গ মায় গৌরী-পট্ট তৈয়ারী করিয়া শিবপূজা করিতেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছি যে, গঙ্গাতীরে বড় একটা কেহ শিবপূজা করে না। যাঁহারা বাড়ীতে নিত্য শিবপূজা করিতেন তাঁহাদের সংখ্যাও কলিকাতা অঞ্চলের কায়স্থ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কমিয়া গিয়াছে। শতকরা ১০ জন করেন কিনা সন্দেহ।

সাধারণতঃ গৃহস্থ-বাড়ীতে বছরে চার বার লক্ষ্মীপূজা হইত। লক্ষ্মীর নৈবেদ্যতে নানারকমের ভাল ভাল ফল, মিষ্টান্ন দেওয়া হইত। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া গৃহিণীরা এই সব প্রসাদ বিতরণ করিতেন। এখন কোনও মতে নমঃ নমঃ করিয়া লক্ষ্মীপূজা হয়। পূর্ব্বে পৃথগন্ন হইলে প্রত্যেক সরিকই নূতন লক্ষ্মী পাতিতেন। এখন বড় একটা কেহ নূতন লক্ষ্মী পাতেন না। নিবারণ ঠাকুর তাঁহার যজমানদের মধ্যে গত ২০ বৎসরে তিনটি নূতন লক্ষ্মী পাতিয়াছেন। বাবু লক্ষ্মীপূজার ফল কিনিতেছেন, দোকানীকে বলিলেন, পয়সায় পাঁচটা পেয়ারা দিতে পার? মুসলমান ফলওয়ালা বলিল, বাড়ীতে কি বাঁদর আছে? বাবু বলিলেন, না! লক্ষ্মীপূজা হইবে।

দুর্গোৎসব বাঙালীর জাতীয় উৎসব। বাড়ীর দুর্গোৎসব ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। নূতন করিয়া বড় একটা কেহ দুর্গোৎসব করেন না। গত ৬০ বৎসরের মধ্যে যদি পৈতৃক দুর্গোৎসব শতকরা ২৫।৩০টি উঠিয়া থাকে, জমিদারী প্রথা লোপের সঙ্গে সঙ্গে এই ৭।৮ বৎসরে আরও ৫০টি উঠিয়া গিয়াছে। এখন বারোয়ারী দুর্গোৎসবের সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাও বেশীর ভাগ কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে দলাদলি সূত্রে। কলিকাতা সহরে আড়াই হাজার দুর্গোৎসব হয়। ইহার অর্দ্ধেক চাঁদার পূজা। বারোয়ারী পূজায় যে ব্যয় হয় তাহার শতকরা ১০।১৫ ভাগ মূর্ত্তির জাঁকজমকে, ৬।৭ ভাগ পূজায়, বাকীটা সব ধুমধামে।

পূর্ব্বে সরস্বতী-পূজার দিনে ছাত্ররা ঘটের সামনে বই রাখিয়া অঞ্জলি দিত। সরস্বতী ঠাকুরের মূর্ত্তি আনিত না, ভাসান দিতে হইবে। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কি ভাসান দেওয়া যায়? এখন কিন্তু সরস্বতীর মূর্ত্তি পূজার খুবই বাহুল্য দেখা যায়—আর ইহার শতকরা ৯৯টি চাঁদার।

পূর্ব্বে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধন হইত, যন্ত্রপাতির পূজা হইত। গত ১৫ বৎসর যাবৎ বিশ্বকর্ম্মার মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহার পূজা হইতেছে। আর এই মূর্ত্তির সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। সবই চাঁদার পূজা।

শক্তি-পূজায় বলি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

আগে যাঁহারা তিলক কাটিতেন তাঁহাদের বাড়ীতে মাছ ঢুকিলেও তাঁহারা মাছ খাইতেন না। এখন তাঁহারা মাছ ও মাংস দুই-ই খান। শশী বিশ্বাস গলায় কণ্ঠিধারণ করিলেও মুর্গী খায়।

আগে বলির মাংস ধ'নে, আদা দিয়া রাঁধা হইত। পেঁয়াজ, রশুনাদি দেওয়া হইত না। এখন অর্দ্ধেক স্থলে পেঁয়াজ দেওয়া হয়। শ্যামসুন্দরের প্রসাদী ক্ষীর, আঁসপাতের সহিত কেহ খাইত না। উঠিয়া আচমন করিয়া খাইত। এখন অতশত হাঙ্গামা করা পোষায় না, মাছের পাতেই খান।

পূর্ব্বে ঘরে ঘরে মাদুলি, তাবিজ, তাগা ধারণ করিত। এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে—ঝাড়-ফু কে কেহ বড় একটা বিশ্বাস করে না।

পূর্ব্বে কার্তিক মাসে ঘরে ঘরে আকাশ-প্রদীপ দেওয়া হইত। এখন ঘরে ঘরের পরিবর্ত্তে শতকরা দশটি গৃহে দেওয়া হয় কিনা সন্দেহ। যাঁহাদের গঙ্গার তীরে বা খুব কাছে বাড়ী তাঁহাদের মধ্যেও পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্কল্প করিয়া সারা মাঘ মাসে নিত্য গঙ্গাস্নান করিতে দেখি না। পূর্ব্বে অনেককে চাতুর্ম্মাস্য করিতে দেখিয়াছি, এখন কাহাকেও দেখি না।

পূর্ব্বে পুরুষরা পঞ্চাশ পার হইলে, আর মেয়েরা রজঃনিবৃত্ত হইলে তান্ত্রিক দীক্ষা লইতেন ও জপ করিতেন। যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁহারাও দীক্ষা লইতেন, মালা জপ করিতেন। এখন দীক্ষা লওয়া খুবই কমিয়া গিয়াছে। আমাদের জানিত এক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বাড়ীর কথা বলিব: কর্ত্তারা ৬ ভাই, ৬ জনেই দীক্ষা লইয়াছিলেন। ইহাদের ১৯টি পুত্রসন্তান—ইহাদের মধ্যে ১১ জন দীক্ষা লইয়াছিলেন। ছয় কর্ত্তার ৮৩টি নাতি, ইঁহাদের মধ্যে ৭ জন দীক্ষা লইয়াছে। পৈতৃক গুরু ত্যাগ করিয়াঅনেকে আবার মঠের সন্ন্যাসীদের কাছে দীক্ষা লইতেছেন। কেহ কেহ fashionable গুরুর শিষ্য হইতেছেন।

পূর্ব্বে জননাশৌচ লোকে মানিত। বিবাহের দিন স্থির করিবার সময় বাড়ীর বৌয়েদের মধ্যে কে কবে নাগাদ প্রসব হইবে তাহার খোঁজ-খবর লইয়া দিন স্থির করা হইত। যদি সন্তান হয় তাহা হইলে অশৌচ হইবে। কি করিয়া কন্যা সম্প্রদান করা যায়, বা কি করিয়া বর মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। আজকাল জননাশৌচ বড় একটা কেহ মানে না। পূর্ব্বে মরণাশৌচের নিয়ম-কানুন যথাযথ ভাবে পালিত হইত। এখন প্রথমেই অশৌচের দিন সংক্ষেপ করা হইতেছে। পূর্ব্বে কায়স্থগণ ৩০ দিন অশৌচ পালন করিতেন, পরে তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া যাঁহারা উপবীত ধারণ করিতেন তাঁহারা ১২ দিন অশৌচ পালন করিতেন। এখন উপবীতী বা অনুপবীতী সকলেই ১০ দিনে অশৌচ সারেন। পূর্ব্বে নিজের বা পিতার পিতৃব্য মারা গেলে নিরামিষ আহার, দাড়ি গোঁফ চুল না কামান, জুতা পায়ে না দেওয়া, প্রভৃতির রেওয়াজ ছিল। এক্ষণে সকলেই জুতা পায়ে দেন, গোপনে চপ্-কাটলেট খান, কেবল লোক-দেখাইবার জন্য দাড়ি গোঁফ কামান না। বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধে মস্তকমুণ্ডন করিতেও অনেকের আপত্তি। পূর্ব্বে বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধে লোকে সাধ্যাতীত ব্যয় করিতেন। এখন কোনও ক্রমে দায়সারা গোছের কাজ করেন। আমরা এক বড়লোকের ছেলে বাপের কিরূপ শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার কথা বলিব। বাপ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার স্থাবর সম্পত্তি ছেলের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। ছেলে বাপের শ্রাদ্ধে মাত্র দেড় হাজার টাকা ব্যয় করিলেন। তখন অবশ্য death-duty, estate-duty হয় নাই। পূর্ব্বে বড়লোকেরা বাপ-মায়ের দানসাগর শ্রাদ্ধ করিতেন। গত ত্রিশ বছরে কলিকাতায় দানসাগর শ্রাদ্ধ হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। শ্রাদ্ধের ব্যয় খুবই কমিয়া গিয়াছে। সপিণ্ডীকরণ নমঃ নমঃ করিয়া সারা হয়। বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করার রেওয়াজ উঠিয়া যাইতেছে—বাপ-মায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ অনেকে করেন, কিন্তু পিতামহ বা প্র-পিতামহের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে দেখি না। এক রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ও পাইকপাড়ার রাজাদের বাড়ীতে প্র-পৌত্র প্র-পিতামহের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করেন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে অনেকে এইরূপ বাৎসরিক শ্রাদ্ধ না করিলেও মৃত্যু-তিথিতে ১২টি বা ৫টি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। এখন যেখানে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ হয় সেখানেও ব্রাহ্মণকে সিধা ধরিয়া দেওয়া হয়—ভোজন করান হয় না।

সামাজিক আচার ও ব্যবহারাদি (বাহিরের)

পূর্ব্বে যুবকরা প্রৌঢ়দের, প্রৌঢ়েরা বৃদ্ধদের, বৃদ্ধেরা অতি-বৃদ্ধদের সমীহ, সম্মান করিয়া চলিতেন। বড়দের সামনে ছোটরা তামাক, বিড়ি বা সিগারেট খাইতেন না। ঘরে আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইতেন; কোন অনুরোধ করিলে 'যে আজ্ঞা' বলিতেন। এখন ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। নরেশচন্দ্র দত্ত ('যিনি পরে লক্ষ্ণৌয়ের পোষ্টমাষ্টার

জেনারেল হইয়াছিলেন) মুঙ্গের ডিভিসনের পোষ্ট আফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তাঁহার সম্পর্কে মেজ ভায়রা-ভাই রায়বাহাদুর হেমচন্দ্র বসু মুঙ্গেরের সরকারী উকীল। বয়সে হেমবাবু নরেশবাবু অপেক্ষা ৫।৬ বৎসরের বড়। উভয়েই সন্ধ্যার পর বাঙালী ক্লাবে যান। নরেশবাবুর তামাক বড় প্রিয়। ক্লাবে গিয়াও গড়গড়ায় তামাক টানেন, কিন্তু হেমবাবু আসিলে তামাক বন্ধ করেন। পাশের ঘরে গড়গড়া টানেন। একদিন পাশের ঘরে গড়গড়া টানিতেছেন, এমন সময় হেমবাবু আসিলেন। গড়গড়ার ভড়র ভড়র আওয়াজ আসিতে লাগিল। রায়সাহেব অমূল্য চাটুয্যে নরেশবাবুকে অপ্রস্তুত করিবার জন্য বলিলেন, হেম আসিয়াছে, গড়গড়ার আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। নরেশবাবু বলিলেন, hearsay evidence, হেমবাবু বিশ্বাস করিবেন না, বলিয়াই তামাক খাওয়া বন্ধ করিলেন।

এখন এইরূপ বয়স্কদের সম্মান দেখানটা বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। সকলেরই 'খাতির-নাদারত' ভাব।

পূর্ব্বে বাড়ীতে ভদ্রলোক আসিলে তাঁহাকে পান-তামাক দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত। এখন তৎপরিবর্ত্তে চা দেওয়া হয়। পূর্ব্বে চায়ের চলন ছিল না; বাড়ীতে চা-পাতা ও চায়ের সরঞ্জাম থাকিলেও কালেভদ্রে চা খাওয়া হইত—বর্ষাকালে ২।৩ দিন, শীতের সময় ৪।৫ দিন, অনেকটা ঔষধের মতন। এখন প্রায় সব বাড়ীতেই দুই বেলা চা চলে। পূর্ব্বে পল্লী-অঞ্চলে চা দুষ্প্রাপ্য ছিল, এখন সেখানেও চায়ের দোকান হইয়াছে। আগে গৃহস্থ-বাটীতে হুকা, সম্পন্ন হইলে রূপা দিয়া বাঁধান হুঁকা থাকিত। অতিথি, অভ্যাগতদের তামাক দেওয়া হইত। এখন হুঁকার পাট পাল্কির ন্যায় উঠিয়া গিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে আসিয়াছে সিগারেট, বিড়ি; পানের প্রচলন কমিয়া আসিতেছে। যেখানে পান-খাওয়া বা পান-দেওয়া এখনও আছে, সেখানেও আগেকার ন্যায় পানে বহুপ্রকার মশলা দেওয়া উঠিয়া গিয়াছে। পানে খাইবার সুপারি কাটা একটি কলা-শিল্প ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। খুব সরু সরু করিয়া কাটা, বা খুব পাতলা পাতলা চাকতি করিয়া সুপারি কাটা হইত। তাহাও জলে ভিজাইয়া বা দুধে সিদ্ধ করিয়া নরম করা হইত। দাসী দিদি একটি পানে পাঁচ পানের খিলি করিতে পারিতেন। পাঁচটি খিলিই একটি বোঁটায় ঝুলিত। এখন এই সব পাট উঠিয়া গিয়াছে। জর্দ্দা, সুরতি, প্রভৃতির ব্যবহার খুব কম ছিল।

পূর্ব্বে সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে, পূজা-পার্ব্বণে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, আত্মীয়-কুটুম্ব ও অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধববর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত। প্রতিবেশী বাদ যাইতেন না বটে, কিন্তু প্রতিবেশী বলিয়াই ঢালা নিমন্ত্রণ হইত না। সম্পন্ন গৃহস্থরা অবশ্য পাড়া হিসাবে সকলকেই নিমন্ত্রণ করিতেন। এই সীমিত নিমন্ত্রণের ফলে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া আত্মীয়-কুটুম্বদের মধ্যে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ ও সুবিধা হইত। খাওয়া আসন পাতিয়া, কলাপাতায় হইত, পদের তাদৃশ বাহুল্য ছিল না। কর্ম্মকর্ত্তার দৃষ্টি থাকিত, সকলকে তৃপ্ত করিয়া ভাল জিনিষ, খাঁটি জিনিষ খাওয়ান হইল কিনা সেইদিকে। ব্রাহ্মণদের জন্য আলাহিদা ঘরে ব্যবস্থা হইত। কর্ম্মকর্ত্তা আসিয়া বলিতেন যে, পাতা হইয়াছে, ব্রাহ্মণরা গাত্রোত্থান করুন। তারপর স্বজাতি ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে খাইতে বলিতেন। জাতি-ভেদের প্রাবল্য থাকিলেও ব্রাহ্মণেতর জাতিদের একত্রে খাইতে বড় একটা আপত্তি দেখা যাইত না। যেখানে আপত্তি হইতে পারে, সেখানে কর্ম্মকর্ত্তা কৌশলে কাজ সারিতেন। অনুকূল দাস জাতিতে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়, পাছে নবশাখ ও কায়স্থরা একসঙ্গে বসিতে আপত্তি করে, এইজন্য কর্ম্মকর্ত্তা আসিয়া বলিলেন যে, অনুকূল সম্পর্কে জামাই, উহাকে আগে বসাইয়া দিই, বলিয়া আলাহিদা ঘরে অনুকূলের আহারের ব্যবস্থা করিলেন। রাজা সুবোধ মল্লিকদের বাড়ীতে মহারাজকুমার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছেন। পাছে তিনি পিরালি ব্রাহ্মণ বলিয়া অন্য ব্রাহ্মণেরা আপত্তি করে বা তাঁহাকে কোন শ্লেষসূচক কথা বলে, এজন্য আলাদা ঘরে সোনার থালায় তাঁহাকে খাওয়ান হইল। ইহা ইং ১৯০২ সালের কথা।

এখন নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। আমি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, এজন্য ৯২ জন কাউন্সিলারকে ও যাবতীয় পদস্থ কর্ম্মচারীদের নিমন্ত্রণ করা হইল। ভোটের দালালদের ও ওয়ার্ডের বিশিষ্ট চাঁইদের নিমন্ত্রণ করা হইল। স্থানীয় কংগ্রেসের ও কমিউনিষ্ট পার্টির পাণ্ডাদেরও বাদ দেওয়া যায় না। আমার সামাজিক প্রতিপত্তি দেখাইবার জন্য 'সাতপুল্লার' রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তিনিও আসিয়াছেন। আমার আত্মপ্রসাদ বাড়িয়া গেল। তাঁহাকে খাতির করিতে আমি এত ব্যস্ত যে, অন্য সব অতিথি-অভ্যাগতদের দিকে নজর রাখা সম্ভব হইল না। তাহার পর খাইবার পদও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পংক্তিভোজন উঠিয়া গিয়াছে। টেবিলে কাগজ পাতিয়া 'দাঁড়াভোজের' ব্যবস্থা হইয়াছে। রাম, শ্যাম আগে আসিল, তাহাদের বসাইয়া দেওয়া হইল। তারপর আসিলেন যদু, মধু, তাঁহাদেরও বসাইয়া দেওয়া হইল। একটু পরে আসিলেন হরিপদ ও কৃষ্ণপদ—তাঁহাদেরও বসাইয়া দেওয়া

হইল। ততক্ষণে রাম, শ্যামের খাওয়া শেষ হইয়াছে, তাহারা উঠিয়া পড়িল। এক পাড়ার লোক বা কুটুম্ব হইলেও আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ মিলিল না। তারপর সকলেই জুতা পায়ে খান—আগেকার হিসাবে এইটি দারুণ অনাচার।

আগেকার দিনে কর্ম্মকর্ত্তা সকল নিমন্ত্রিতদের সমান আদর, আপ্যায়ন করিতেন; বড়লোক, গরীবলোক, পদস্থ বা অ-পদস্থ বলিয়া কোনরূপ তারতম্য করিতেন না। এখন কিন্তু অন্যরকম। বড়লোকের, পদস্থলোকের বিশেষ খাতির। 'সাতপুরার' রাজা বাহাদুর আসিয়াছেন, তিনি খাইবেন না, তাঁহাকে লইয়া কর্ম্মকর্ত্তা ও তাঁহার ভাইয়েরা তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাত কচলাইতেছেন। এদিকে যে পরিবেশনের গোলমালে অর্দ্ধেক লোক খাইতে না পাইয়া উঠিয়া যাইতেছে, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। এখন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ, ইত্যাদি জাতিভেদ উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আর একরকমের জাতিভেদ প্রকট হইয়াছে. বড়লোক, পদস্থলোক, গরীবলোক। মোটরে আসিলে, ট্যাক্সিতে আসিলে, রিক্সায় আসিলে এক-এক রকম খাতির-যত্ন। আমরা এক জজের বাড়ী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। কর্ম্মকর্ত্তা আমাদের বড় ছাদে যাইতে বলিলেন। মুন্সেফ, ডেপুটী, আয়কর অফিসাররা ছোট ছাদে বসিলেন। আর রায়বাহাদুর, জজেরা মার্ব্বেল পাথরের মেঝেয় বসিলেন। বড় ছাদে সরপুরিয়া, সরভাজা পড়িল না। ছোট ছাদে সরপুরিয়া পড়িল, সরভাজা পড়িল না। মার্ব্বেল পাথরের বারান্দায় দুই-ই পড়িল। বড় ছাদে মাছের দাগা ছোট ছোট। ছোট ছাদে মাছের দাগা বড় বড়। মার্ব্বেল পাথরের বারান্দায় মাছ ত পড়িলই, চিংড়ি মাছের 'চীনে-কাবাব' পড়িল। আমরা পাইলাম কাঁচি সিগারেট ও সাদা পান। মার্ব্বেল পাথরের বারান্দায় পড়িল ষ্টেট এক্‌প্রেস, সিগার ও তবক দেওয়া কাশীর পান। এইরূপ পার্থক্য হামেশাই লক্ষ্য করিতেছি।

শ্রাদ্ধে (নিয়ম-ভঙ্গের কথা বাদ দিয়া) ও কন্যার বিবাহে নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা হইত। কেহ তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইত না। ৫০।৬০ বছর আগে হইতে মেয়ের বিবাহে মাছের চলন দেখিয়াছি। কিন্তু এইটি ব্যতিক্রম বলিয়া গণ্য হইত। কথা উঠিত, 'নগেন ঘোষ মেয়ের বিবাহে মাছ করিল কি বলিয়া', ইত্যাদি। এখন মাছ না হওয়াই দোষের, সঙ্গে সঙ্গে মাংস। প্রায় বিশ বৎসর আগে ৺ললিত মিত্রের কন্যার বিবাহে গিয়াছি। ৩০।৩৫ রকম নিরামিষ পদ; একজন বলিলেন, সবই যে নিরামিষ। রামমোহনবাবু (বয়স ৬০।৬৫) বলিয়া উঠিলেন, ললিত যে বাপ থাকিতে মারা গিয়াছে, তাহার ত শ্রাদ্ধে খাওয়া হয় নাই, তাই এই ব্যবস্থা। রামমোহনবাবুর এই উক্তি শুনিতে পাইয়া কন্যার পিতামহী কাঁদিতে কাঁদিতে পাশের ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন। আমরা কতদূর 'অ-সামাজিক' হইয়াছি এই একটি ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে।

আগে হুঁকার প্রচলন ছিল। বৈঠকখানায় তিন-চারটি হুঁকা থাকিত। অবস্থা ভাল হইলে রূপা-বাঁধান হুঁকা। একটিতে কড়ি-বাঁধা, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের জন্য। বৈঠকে আমপাতা বা কলাপাতা—যিনি হুঁকায় মুখ দিয়া টানিবেন না তিনি নল তৈয়ারী করিয়া লইবেন। বিবাহাদি আসরে গড়গড়া আসিত। এখন হুঁকা-গড়গড়ার রেওয়াজ একদম উঠিয়া গিয়াছে। গড়গড়া যাদুঘরে স্থান পাইয়াছে, হুঁকা দুর্লভ সামগ্রী। এমন কি হালুইকর বামুনের মুখেও বিড়ি।

সামাজিক আচার ও ব্যবহার (ঘরের ভিতর)

গৃহের ভিতরেও আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনকে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন বলা চলে। আগে বাড়ীর পুরুষরা দিনের বেলায়, এক আহারের সময় ব্যতীত বাড়ীর ভিতরে বা অন্দর-মহলে বড় একটা যাইতেন না। ছোট ছোট ছেলেদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রীতে দেখা হইত না—দেখা হওয়াটা নিন্দার। দরকার হইলে পুরুষরা সাড়া দিয়া অন্দরে যাইতেন। শ্বশুর, ভাসুরের সামনে ত বটেই, এমন কি বয়সে বড় দেওরের সামনেও বাড়ীর বৌরা ঘোমটা দিয়া যাইতেন। শ্বশুর, ভাসুরের সঙ্গে কথা কহিতেন না; খুব দরকার হইলে দরজার আড়াল হইতে ছোট ছেলে বা মেয়েকে মধ্যস্থ রাখিয়া তাহার মারফত কথাবার্ত্তা চালাইতেন। যেমন খোকার গা গরম, পুড়িয়া খাইতেছে, তিন বার বমি করিয়াছে, ইত্যাদি। বয়োকনিষ্ঠ দেওরের সঙ্গে কথা কহিতেন অবাধে ও খেলাধূলা করিতেন। এজন্য হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী দেওর বৌদিদির স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারী হইতেন। ভাসুর হইতেন না। ভাসুরের সঙ্গে কথা কহিতেন না। ভাসুর ভাদ্র-বৌয়ের মুখ অবধি দেখিতে পাইতেন না। এজন্য কথায় বলে 'ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক'। অর্থাৎ এক বাড়ীতে থাকিলেও বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ।

পূর্ব্বে বাড়ীর বৌরা শ্বশুর-শাশুড়ীকে বলিতেন, ঠাকুর-ঠাকুরুণ, ভাসুরকে বলিতেন বড়-ঠাকুর বা বটুঠাকুর, দেওরকে বলিতেন ঠাকুর-পো, ননদকে বলিতেন ঠাকুর-ঝি। শ্বশুর-শাশুড়ীকে বাবা-মা বলা আরম্ভ হইয়াছে ৫০।৬০ বৎসর আগে হইতে। এখন ঠাকুর-ঠাকুরুণ বলা একদম উঠিয়া গিয়াছে। ভাসুর হইয়াছেন বড়-দা, দেওর ছোট-দা, ননদরা দিদি হইয়াছেন। শ্বশুর, ভাসুরের সঙ্গে বৌয়েরা আজকাল কথা বলেন। আগে বৌয়েরা মামা-শ্বশুর, পিস্-শ্বশুরের সামনে বাহির হইতেন না, এখন হন। শাশুড়ী জামাইয়ের সঙ্গে কথা কহিতেন না, এখন কহেন। বেহাই-বেহানে কথা হইত না, এখন হয়। নন্দাইয়ের সঙ্গে বৌয়েরা কথা না কহিলেও রহস্য করিতেন, এখন কথা কহেন।

মুখ-ঢাকা ঘোমটা একদম উঠিয়া গিয়াছে। গৃহিণীরাও মাথায় কাপড় বড় একটা দেন না। স্বামী-স্ত্রীতে দিনের বেলায় দেখা ত হয়ই এমন কি অপরের সম্মুখে কথাবার্ত্তাও হয়। অনেক জায়গায় শাশুড়ী বৌদের বড়-বৌমা, মেজ-বৌমা বলেন না, নাম ধরিয়া ডাকেন। ভাসুর ডাকেন ন-বৌমা, ছোট বৌমা। দেওর বৌদিদি বলিত, এখনও বলে, তবে দুই-এক জায়গায় নাম ধরিয়া ডাকিতে শুনিয়াছি, যেমন ইলা-দি।

পূর্ব্বে বিবাহিত বোনেদের মধ্যে বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ হইত না। কথায় বলে 'রাজায় রাজায় দেখা হয়, তবু বোনে বোনে দেখা হয় না'। এখন প্রায়ই দেখা হয়। ভায়রা-ভাই বাড়ীতে আসেন, অন্দরেও যান।

পূর্ব্বে বিবাহের পর বধূ বাপের বাড়ীতে থাকিত। পুষ্পবতী হইলে শুভদিন দেখিয়া স্বামীর 'ঘর' করিতে আসিত—সঙ্গে অনেক জিনিষ-পত্র দেওয়া হইত। 'ঘর' করিতে আসিলে সহজে বধূকে বাপের বাড়ী পাঠান হইত না। প্রথম সন্তান মামার বাড়ীতেই হইত। শিশু ৪।৫ মাসের হইলে অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বাপের বাড়ী আসিত। প্রসূতিকে অনেক নিয়ম-কানুন পালন করিতে হইত। যেমন কাঁকড়া, চালতার অম্বল, খেসারির ডাল খাইবে না। সন্ধ্যার সময় ছাদে যাইবে না, ইত্যাদি। এখন এই সমস্ত নিয়ম-কানুন উঠিয়া গিয়াছে। বিবাহের অল্পদিন পর হইতেই বধূ স্বামীর 'ঘর' করে, যাহা ইচ্ছা তাহাই খায়।

আঁতুড়-ঘরের যেরূপ ব্যবস্থা ছিল তাহাতে প্রসূতির অনাবশ্যক কষ্ট হইত; অনেক সময় প্রাণ-সংশয় হইত। ভাল ধাই প্রায়ই পাওয়া যাইত না। এখন বহু উন্নতি হইয়াছে।

পূর্ব্বে শাশুড়ী পুত্রবধূকে নিজের মেয়ের মত আদরযত্ন বা স্নেহ করিতেন না। খুব কম শাশুড়ীরই সমদর্শন ছিল। অনেকে বধূর সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিতেন না। আর বেশ কিছু শাশুড়ী 'বৌ-কাঁটকি' ছিলেন। বৌ আসিয়া ছেলেকে পর করিয়া দিল, মনের মধ্যে সর্ব্বদা এই ভাব প্রবল। ছেলের কাছে বৌয়ের নিন্দা, বৌকে জ্বালাযন্ত্রণা, খোঁটা দিতেন। তত্ত্ব মনের মতন না হইলে বাপ-তুলিয়া সমালোচনা করিতেন, সময়ে সময়ে প্রহারও করিতেন। এখন এই সমস্ত বিষয়ে খুব বড় রকম পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বৌ-কাঁটকি শাশুড়ী শিক্ষিত, সহর-ঘেঁষা, ভদ্রঘরে নাই বলিলেই হয়। স্ত্রীর উপর কু-ব্যবহার হইলে পূর্ব্বে ছেলেরা লজ্জায় বা অন্য কারণে চুপ করিয়া থাকিত। এখন স্ত্রীর পক্ষে দাঁড়াইয়া মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে। আগে ঘরের মধ্যে গৃহিণীর যে একাধিপত্য ছিল, তাহা লোপ পাইয়াছে। এখন তিনি সংসারের মধ্যে 'মান্যগণ্য' একজন। স্থানে স্থানে বৌয়েদের হাত-তোলা, ছেলেরা মায়ের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখেন না।

ঠাকুরমা দিদিমাদের প্রভাব

আগে ঠাকুরমা, দিদিমারা সন্ধ্যার পর জপ-আহ্নিক সারিয়া নাতি-নাতনীদের লইয়া নানাপ্রকার গল্প করিতেন। কখনও ভূতের গল্প, কখনও রাজপুত্রের, সাতসমুদ্র ও তেরনদীর, কখনও বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প করিতেন। একটু বড় হইলে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প করিতেন ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন। কখনও কখনও দেশের বড়লোকদের কীর্ত্তিকলাপের গল্প বলিতেন। এই সব গল্প হইতে পুরাণের চরিত্র সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান হইত ও উপদেশ পাওয়া যাইত। একটা উদাহরণ দিই: কথা হইতেছে হাইকোর্টের জজ আশুবাবু তাঁহার এজলাসে নিজের ছেলেকে ও জামাইকে ওকালতি করিতে দিতেন। ইহা লইয়া আশুবাবুর বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হয়। আশুবাবু নাকি বলিয়াছিলেন যে, দেখাও কোন্ মামলায় আমার ছেলে, জামাই উকীল বলিয়া আমি পক্ষপাতিত্ব বা অবিচার করিয়াছি। দিদিমা শুনিয়া বলিলেন যে, আশুবাবুর কাজটা ভাল হয় নাই। আমরা তখন উকীল হইয়াছি, বলিলাম, দিদিমা তুমি মামলা-মোকদ্দমার কি বোঝ? তুমি ত ইংরেজী জান না, আশুবাবুর

ভুল ধরিতেছ। দিদিমা বলিলেন, শোন, একটা গল্প বলি। তাহার পর আশুবাবুর ভুল দেখাইয়া দিব। কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে নাই। এজন্য ৮৪ পরগণার অধীশ্বর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাজপেয়ী যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞে কাশী, কাঞ্চী হইতে বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। যজ্ঞ শেষ হইবার পর যখন এই সব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বিদায় দিতেছেন তখন খবর আসিল যে, মহারাজার জমিদারীতে এক শ্বেতবরাহ ধরা পড়িয়াছে। শ্বেতবরাহের রং হইতেছে ধবধবে সাদা, খুর চারিটি জোড়া। সাধারণ শূয়োরের ন্যায় চেরা নহে ও দোফলা খড়্গা। খবর শুনিতে পাইয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বলিলেন, মহারাজা যজ্ঞের ফল হাতে হাতে পাইলেন। মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? তাঁহারা বলিলেন যে, এই শ্বেতবরাহের মাংস দিয়া আপনি আগামী অমাবস্যায় মাংসাষ্টক শ্রাদ্ধ করুন, আপনার ২১ কোটি কুল উদ্ধার হইবে। মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাকী মাংস কি হইবে? তাঁহারা বলিলেন, আপনারা খাইবেন। মাহারাজা তখন বলিলেন, যে, তিন দিন বাদে আপনাদের কথার জবাব দিব। তাহার পর মহারাজা উপবাস করিয়া এ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ও তিন দিন বাদে বলিলেন যে, আমি মাংসাষ্টক শ্রাদ্ধ করিব না। মহারাজার এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন, মহারাজা, আপনি শাস্ত্র-বাক্য বিশ্বাস করেন না। মহারাজা বলিলেন, শাস্ত্র সত্য। আমি মাংসাষ্টক শ্রাদ্ধ করিলে আমার ২১ কোটি কুল উদ্ধার হই[illegible]ত্য, কিন্তু আমি ৮৪ পরগণার সমাজপতি। আমি যদি শ্বেতবরাহের মাংস খাই, আমার দেখাদেখি অন্য লোকে বুনোশূয়োর মারিবে ও শ্বেতবরাহ ধরিয়াছি বলিয়া মাংসাষ্টক শ্রাদ্ধের ভান করিয়া শূয়োর খাইতে আরম্ভ করিবে। সমাজে শূয়োরের মাংস খাওয়া চালু হইবে। আশুবাবু ঠিক বিচার করেন, তবে তাঁহার দেখাদেখি ছোট ছোট জজ, ম্যাজিষ্ট্রেটেরা ছেলে, জামাইকে নিজের এজলাসে হাজির হইতে দিবে ও অবিচার করিবে। আশুবাবুর এ কাজটা ভাল হয় নাই। বুঝিলে?

এইরূপ উপদেশপূর্ণ কথাবার্ত্তা আজকাল বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। এখন ছেলেমেয়েদের বেশী বয়সে বিবাহ হওয়ার দরুণ অনেকেই নাতি-নাতনীর মুখ দেখিতে পান না। তাহারা কিছু বড় হইলে তবে ত গল্প করিবেন? আর নাত-নাতনীরা বড় হইতে না হইতেই স্কুল-পাঠশালায় পড়িতে যায়। সন্ধ্যার পর তাহাদেরও নিয়মিত গল্প শুনিবার অবসর কম। পূর্ব্বের ন্যায় একান্নবর্ত্তী পরিবার না থাকায় ঠাকুরমা-দিদিমাদের কিছু সংসারের কাজ করিতে হয়—তাঁহাদেরও সময়ের অভাব।

একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা

একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা ভাঙিতে সুরু করিয়াছে বহুদিন। একই পুরুষের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র একত্রে বাস করিত। কালক্রমে বংশবৃদ্ধি হেতু কর্ত্তার মৃত্যুর পরে কর্ত্তার পুত্রগণ আলাহিদা হইতেন—এইটিকে আমরা স্বাভাবিক কারণ বলিব। খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো ভাইয়েরা স্ব স্ব পুত্র-কন্যা লইয়া একত্রে বাস করিত। এস্. সি. বোস তাঁহার 'Hindus As They Are' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, কতকগুলি একান্নবর্ত্তী পরিবারকে ছোট ছোট উপনিবেশের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। একটি পরিবারের জনসংখ্যা পাঁচশত জন। ইহা ইং ১৮৮৩ সালের কথা। আমরা যে সময়ের কথা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিব সে সময়ে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে ভাইয়ে ভাইয়ে একান্নবর্ত্তী থাকিতেন আমরণ। তাঁহাদের মৃত্যুর পর খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো ভাইয়েরা আলাহিদা হইত। আর এখন বাপ-মায়ের দুই জনের মৃত্যু অবধি অপেক্ষা না করিয়া বাপের মৃত্যুর পরই ভাইয়ে ভাইয়ে আলাহিদা হইবার আগ্রহ দেখা যায়। জায়গায় জায়গায় বাপ-বেটা আলাহিদা থাকেন। হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র অনুযায়ী একই বংশের সকলেই একান্নবর্ত্তী আছেন ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা অন্যরূপ। কিরূপ দ্রুত একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা লোপ পাইতেছে তাহার একটা খসড়া হিসাব দিবার চেষ্টা করিব। ১৯০১ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে যে ২০।২২টি পরিবারে খুড়তুতো-জ্যেঠতুতো ভাইয়ে একান্নবর্ত্তী ছিলেন, বর্ত্তমানে ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০ সালে তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে আলাহিদা শতকরা ৬০ জন। এই অনুপাত আরও বাড়িত, কিন্তু কয়েক স্থলে বাপ বা বাপ-মা বাঁচিয়া আছেন। যে-সব বংশে ঐ সময়ে শুধু ভাইয়ে ভাইয়ে একান্নবর্ত্তী ছিলেন, এখন তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে আলাহিদার অনুপাত শতকরা ৭৫ জন। হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রে আলাহিদা হইবার পর পুনরায় মিলিত হইবার ব্যবস্থা আছে—কিন্তু এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কেহ যে পুনরায় মিলিত হইয়াছেন এইরূপ খবর পাই নাই। কোন কোন স্থলে বাড়ী ভাড়ার অসুবিধা হেতু বা সংসার খরচ কমাইবার জন্য

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আশ্রমের দৃশ্য—শান্তিনিকেতন
শ্রীনন্দলাল বসু

(প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩৪১ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

একাধিক ভাই একত্রে থাকিলেও ইঁহাদের "একান্নবর্ত্তী পরিবার" না বলিয়া common mess-এ আছেন বলাই সঙ্গত। মোটের উপর একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ বহুবিধ। আর উঠিয়া যাওয়ার রেট বা হার বাড়িতেছে বই কমিতেছে না বলিয়া মনে হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারে যে পরস্পরের সুখ-সুবিধার জন্য নিজেকে সংযত করিতে হয়, বর্ত্তমান আত্মকেন্দ্রিক যুগে সে ভাব খুবই কম এবং দ্রুত আরও কমিয়া যাইতেছে।

বিবিধ

একটি প্রবন্ধে সব বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নহে। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদে, আহারে-বিহারে, এঁটো-কাঁটা বিচারে, সংসারধর্ম্ম পালনে, সঞ্চয়ের ও মিতব্যয়িতা ইত্যাদির বহু বিষয়ের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই সব বিষয়ের সামান্য সামান্য ইঙ্গিত দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

আমার এক খুল্ল-পিতামহী সংসারের ২৫।৩০ জন লোকের জন্য তরকারী কুটিতেন। তাঁহাদের আয় তখনকার দিনে ৪০।৫০ হাজার টাকা। তরকারীর খোসা বাছিয়া সিদ্ধ করিয়া গরুকে খাইতে দিতেন। কৃপণ-স্বভাব ছিলেন না। নিত্য ব্রাহ্মণ-সজ্জন দুঃস্থদের ৪।৫৲ টাকা দান করিতেন। এ ছাড়া খুল্ল-পিতামহ আলাহিদা দিতেন। এখন এমনটি দেখি না। মুনসেফ বা ডেপুটি গৃহিণীরা স্বয়ং কুটনা কোটেন না। স্বামী ব্রহ্মানন্দের এক জ্যেঠাইমার শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। প্রায় হাজার লোককে তাঁহারা খাওয়ান। আমাদের জন্য ডাবের ব্যবস্থা ছিল। ডাব খাইয়া ফেলিয়া দিলে খোসাগুলি কাটিয়া এক জায়গায় জড় করা হইতেছে দেখিয়া প্রশ্ন করি, কি হইবে? বলিলেন, রৌদ্রে শুকাইয়া বর্ষাকালে উনান ধরান হইবে। কোন জিনিষ বৃথা ফেলিয়া দিতেন না। প্রদীপের রেওয়াজ এমন-কি ঠাকুরঘর হইতেও উঠিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে এঁটো-কাঁটা বিচারের বাড়াবাড়ি ছিল। ভাত খাইবার পর খাইবার স্থান শুধু জল দিয়া পরিষ্কার করিলেই হইত না, গোবরজল ছড়া দিতে হইত। এঁটো গেলাসের জল গড়াইয়া অন্য বাসনে লাগিলে জল দিয়া ধুইলে হইত না, পুনরায় ছাই দিয়া মাজিতে হইত। এখন এই সব নিয়ম প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে বা অতি দ্রুত উঠিয়া যাইতেছে। অনেকে আবার টেবিলে খান, টেবিল জল দিয়াও ধোন না।

পূর্ব্বে হাঁসের ডিম অশুদ্ধ বলিয়া উহা খাওয়া অনাচার বলিয়া গণ্য হইত। এখন মুর্গীর ডিম অনেকে খান। পূর্ব্বে নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থের বাড়ীতে পেঁয়াজ, গাজর, টোমেটো, চীনে শাক (সেলেরী) ঢুকিত না, ফুলকপি, বাঁধাকপি চলিলেও ওলকপি, বীট পালঙ্ সহজে চলিত না। এখন খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই।

মেয়েরা আজকাল জুতা পরেন, এমনকি বিধবারা পর্য্যন্ত। পুরুষদের চাদর বহুদিন উঠিয়া গিয়াছে। অনেকে লুঙ্গী, পায়জামা পরেন। রাজা সুবোধ মল্লিকের কাকা বাড়ীতে পায়জামা পরিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'সাহেব' মল্লিক হয়। এখন বাড়ীতে পায়জামা পরাটাই নাকি সংস্কৃতির লক্ষণ। পূর্ব্বে লাল-পাড় শাড়ীর খুব মান ছিল, গৃহিণীরা পরিতে ভালবাসিতেন। অল্প-বয়স্কারা পাছা-পাড় শাড়ী পরিতেন—এখন পাছা-পাড় কাপড় উঠিয়া গিয়াছে। ছাপান শাড়ীর রেওয়াজ হইয়াছে। প্রসাধন-দ্রব্যের রকম ও ব্যবহার অত্যন্ত বাড়িয়াছে। সুগন্ধি নারিকেল তৈলে কেহ সন্তুষ্ট নহেন। অলমিতি বিস্তারেন।

—*—

শতবার্ষিকী স্মৃতিসভা ও বার্ষিক জন্মোৎসব বাঙালীকে মনে পড়াইয়া দেয়, যে, বঙ্গে কত বড় বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বহুবিধ কৃতিত্ব আমাদিগকে তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিভা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহাতে আমাদের আনন্দ হয়, আমরা গৌরব বোধ করি। কিন্তু এই গৌরব-বোধের সঙ্গে অহংকার আসিবার সম্ভাবনা। হয়ত অনেকের, হয়ত খুব বেশীসংখ্যক বাঙালীর অহঙ্কার জন্মিয়াছে—আমরা কি যে সে জাতি? আমাদের মধ্যে অমুক, অমুক, অমুক জন্মিয়াছেন। বঙ্গে প্রকৃত মহৎ লোক যত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিবার মত জীবন আমরা যাপন করিতেছি কিনা তাহা আমাদের চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ—প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪৫।

সমাজসেবায় বাংলার ষাট বৎসর

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়*

আজ বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। সমাজের বিভিন্ন স্তরে সেবাধর্ম্মের যে বিস্তৃতি, জনসাধারণের মধ্যে কল্যাণ-ব্রতের যে পরিব্যাপ্তি, অতীতের যবনিকা উন্মোচন করিলে দেখা যাইবে, উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির মুখে তাহার স্বচনা। দেশ তখন নানাবিধ কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রথম প্লাবনে সমাজব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত ও সংশয়সঙ্কুল। কাণ্ডারী নাই যে পথ দেখাইবে; নেতা নাই যে সংস্কার করিবে। আলো কোথায়? অন্ধকারে যে দিগ্‌দিক্ ঢাকিয়া গেল!

দেশের এই সঙ্কটজনক অবস্থায় যিনি প্রথম পথনির্দ্দেশ করিলেন, তিনি হইলেন রাজা রামমোহন রায়। সামাজিক কুপ্রথার মূল উচ্ছেদ করিয়া তাহার আমূল সংস্কার, স্ত্রীজাতির উন্নতি-সাধন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার দ্বারা জ্ঞানের উন্মেষণ, বাল্যবিবাহ প্রথার অবসান, প্রভৃতি কল্যাণধর্ম্মের প্রসারকল্পে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন, জাতিভেদ দেশের উন্নতির পথে অন্তরায়, সমাজের সুষ্ঠু বিকাশের পরিপন্থী। প্রতিষ্ঠিত হইল ব্রাহ্মসমাজ। সমাজসেবা ইতিহাসের ইহাই হইল প্রথম অধ্যায়।

তিনি যে বীজ বপন করিলেন, নিজের জীবদ্দশায় তাহাকে পত্রপুষ্পে বিরাট্ মহীরুহে পরিণত হইতে দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। অপরপক্ষে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের অবসানও ঘটে নাই। দেশের সৌভাগ্য, এই সময় অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বাংলাদেশে এমন কয়েক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিল, যাঁহাদের নেতৃত্বে দেশের চিন্তাধারা তথা কর্ম্মধারার একটা বিরাট্ পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং এই পরিবর্ত্তন শুভ ও কল্যাণেরই স্বচনা করিল। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতে হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং বিবেকানন্দকে। সাধনা, বক্তৃতা ও সাহিত্য-স্বষ্টির মধ্য দিয়া সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইঁহারা আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সমাজকে সংস্কারমুক্ত করিয়া তাহার কল্যাণ সাধন এবং দেশবাসীর হৃদয়ে সেবাধর্ম্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধির পথ সুগম ও সার্থক করিয়াছিলেন।

সমাজ-বিবর্ত্তনের প্রথম ধাক্কার মুখে উনবিংশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি ঘটিল। কিন্তু ভিত্তিস্থাপনের কাজ ত সমাধা হইয়াছে। সৌধ নির্ম্মাণের দায়িত্ব নিল বিংশ শতাব্দী। এবং শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পৌঁছিয়া আজ একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, বিংশ শতাব্দী তাহার ষাট বৎসরের সমাজসেবা প্রচেষ্টার যে রূপদান করিয়াছে, তাহার মধ্যে সার্থকতা আছে, গৌরব আছে। মহাপুরুষের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই।

এই সার্থক সমাজসেবার পুরোভাগে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতে হয়, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাশ, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রভৃতি মনীষীদের। ইঁহাদের ব্যক্তিগত চেষ্টা ভিন্ন ও ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে ইঁহারা সমাজসেবার যে আদর্শ ও অবদান রাখিয়া গিয়াছেন দেশবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে চিরকাল তাহা স্মরণ করিবে। সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণে, জনশিক্ষার বিস্তারে, স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও মর্য্যাদা উন্নয়নে ইঁহাদের দান অপরিসীম। সুতরাং বাংলা যে তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নিকট আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিবে, ইহাতে বিচিত্র কি?

দেশ যখন এমনই ধাপে ধাপে সমাজসেবার পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাহাকে নূতন করিয়া প্রেরণা জোগাইলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার ভক্তের আর অবধি রহিল না। কিন্তু নীরব ভক্তির অর্ঘ্যে তাহারা গুরুদেবের সেবায় সন্তুষ্ট রহিল না। গুরুদেব যে আদর্শে বিশ্বাসী, তাহাকেই রূপ দিতে তাহারা কৃতসংকল্প হইল। সুতরাং গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে এই ভক্তের দল কর্ম্মযোগের সাধনায় আত্মনিবেদন করিল। সেখানে মামুলী শিক্ষার ছেদ ঘটিল। আরম্ভ হইল সেই শিক্ষা যাহা মানবধর্ম্মের অন্তরায় নয়—মানবধর্ম্মে বিশ্বাসী। সেই শিক্ষা, যাহা শিক্ষিতকে

* পশ্চিমবঙ্গ রেডক্রশের চেয়ারম্যান।

জনসাধারণ হইতে বিভক্ত করিয়া একটা পৃথক্ শ্রেণীতে পরিণত করে না, পরন্তু জনসাধারণের উন্নতি-কামনায় যে শিক্ষায় দীক্ষিত সমাজে চেতনা জাগ্রত থাকে। ছায়াঘন গ্রামের আবহাওয়ায় সমাজসেবা সেখানে সক্রিয়। গুরু-দেবের সুপ্রেরণায় শান্তিনিকেতন সেই আদর্শ প্রচারের ব্রতে দীক্ষা নিল।

আসিল স্বদেশী আন্দোলন। নেতারা উপলব্ধি করিলেন, দেশের উন্নতি ও মুক্তিসাধন করিতে হইলে সমাজকে সেইসঙ্গে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সমাজ ও দেশ অভিন্ন। একাংশকে পঙ্গু রাখিয়া দেশের মুক্তিসাধন অসঙ্গত নয়, অসম্ভব। সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলন যত তীব্র ও প্রবল হইতে লাগিল, সমাজের বিভিন্নমুখী উন্নতির চিন্তা ও ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে অব্যাহত রহিল। বস্তুতঃ সেই সময়কার স্বদেশী সঙ্গীত, নাটক ও যাত্রার মাধ্যমে দেশবাসীর মনে যেমন স্বাদেশিকতা-বোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল, তেমনই উহার মাধ্যমেই সমাজসেবার কাজও একই সঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করিল।

"না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না" প্রভৃতি স্বদেশীযুগের গানের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল, মাতৃজাতির উন্নতিসাধন। নেতারা বুঝিয়াছিলেন, অজ্ঞতা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নারী-জাতিকে শাসন, শোষণ ও নিষ্পেষণ করিয়া দেশের উন্নতি ও মুক্তি অসম্ভব। সুতরাং মাতৃজাতির অবস্থার উন্নয়ন, ছোট ছোট কুটিরশিল্পের সাহায্যে সমাজকে স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা দেওয়া, যুব-সম্প্রদায়কে আত্মসচেতন হইতে সাহায্য করা সমাজসেবারই নামান্তর। সুতরাং এইদিক্ হইতে জাতীয় কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সেবার যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, এবং তাহাতে যে সাফল্যলাভ করিয়াছিল, তাহার কৃতিত্বও কম নহে।

প্রসঙ্গতঃ, এই সমাজসেবা আন্দোলনে বঙ্গদেশের দৈনিক, মাসিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাদির অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একথা আজ ভাবিতে আনন্দ হয়, যে, লেখনী মারফৎ ইঁহাদের অক্লান্ত সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। আজ দিকে দিকে সমাজসেবার যে ব্যাপক চেষ্টা দেখিতে পাই, তাহার উৎস যোগাইতে ইঁহারা কার্পণ্য করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের চেষ্টা যে ফলবতী হইয়াছে ইহার গৌরব অবশ্যই তাঁহাদের প্রাপ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সমাজসেবার কার্য্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান উনবিংশ শতাব্দীর শেষে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের কার্য্যের প্রসার ঘটে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে। একদা ভাগীরথীর নির্জ্জন তীরে বিবেকানন্দের অন্তরে যে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বপ্ন জাগে, আজ তাহাই একটি সুবৃহৎ সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া নানা জনহিতকর সমাজসেবার ধর্ম্মে ব্যাপৃত। তেমনই অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, লিট্‌ল্ সিষ্টার্‌স্ অব দ্য পুওর (Little Sisters of the Poor) ফরাসীর একটি ভারতীয় শাখারূপে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ দীর্ঘ ৭৮ বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান ষাট বৎসর ও ততোধিক বয়সের আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে। রেভারেণ্ড অনাগারিক ধর্ম্মপাল ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। ৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গৃহ। বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশাসন অনুযায়ী আজ দীর্ঘকাল ইহা মানব-সেবায় ব্রতী।

নিম্নে আরও কয়েকটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া গেল :

কলিকাতা মুসলিম অর্ফানেজ : প্রতিষ্ঠা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে। ৪০০ অনাথ, আতুর, সহায়-সম্পদহীনা ও বিধবার আশ্রয়স্থল।

কলিকাতা ডেফ এ্যাণ্ড ডাম্ব স্কুল : প্রতিষ্ঠা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে। মূকবধিরদের শিক্ষা-কেন্দ্র—যাহাতে তাহারা সমাজের বোঝা না হইয়া উপযুক্ত নাগরিক হইতে পারে।

সারদেশ্বরী আশ্রম এবং ফ্রি হিন্দু গার্লস স্কুল : ২৬নং মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট। প্রতিষ্ঠা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। উদ্দেশ্য—স্ত্রীজাতির বিদ্যা ও শিক্ষার প্রসার এবং দুঃস্থা স্ত্রীলোক ও বিধবাদের আশ্রয় ও অন্নবস্ত্রের সংস্থান।

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড লালবিহারী শাহ। ডায়মণ্ড-হারবার রোডে ২০০ অন্ধ বালক ও ৬০ জন অন্ধ বালিকার থাকিবার ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। বাহিরের অন্ধ বালকবালিকারাও এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুযোগ লইয়া থাকে। এখানে সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে—যাহাতে অন্ধেরাও স্বাবলম্বী হইয়া সমাজের প্রয়োজনীয় নাগরিকের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে।

সোসাইটি ফর দ্য প্রটেকশন অব চিলড্রেন ইন্ ইণ্ডিয়া : ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। ২বি, ক্যামাক ষ্ট্রীটে ইহার

অফিস। ঠাকুরপুকুর ও সোদপুরে ইহাদের দুইটি আবাসিক বিদ্যালয় আছে। বালকবালিকার সংখ্যা দ্বিশত। নিজেদের আবাসে আশ্রয়দান ছাড়াও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ইঁহারা বহু দুঃস্থ শিশুর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকেন।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে আরও বহু সমাজসেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহারাও ব্যাপক ভাবে নানা জনহিতকর কার্য্যে লিপ্ত আছে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নাম করিতে হয়, ভারতীয় রেডক্রশ সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। তদবধি ইহা দেশের সর্ব্বত্র দুঃস্থ, পীড়িত ও আর্ত্তের সেবায় নিযুক্ত। মহামারীর প্রকোপে, ঝড় বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে, দেশে যে দুঃখ ও দুর্দ্দশার সৃষ্টি হয়, রেডক্রশ সমিতি অকৃপণ হস্তে তাহার সাহায্যে অগ্রসর হয়। প্রসূতির চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা, শিশুদের দুগ্ধ বিতরণ, ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর ভিটামিন বড়ি সরবরাহ, নিঃস্ব ও অনাথ জনের চিকিৎসা ও ঔষধপত্রের সাহায্য, কম্বল ও জামাকাপড় বিতরণ, প্রভৃতি বিবিধ জনহিতকর কার্য্যের দ্বারা রেডক্রশ সমাজসেবা ও ধর্ম্ম পালন করে। পল্লীতে পল্লীতে দুগ্ধ-বিতরণ-কেন্দ্র খুলিয়া, স্থানে স্থানে প্রসূতি-সদনের ব্যবস্থা করিয়া রেডক্রশ কতভাবে এবং কত দিকে যে তাহার কার্য্য বিস্তৃত করিয়াছে সংক্ষেপে তাহার পূর্ণ পরিচয় সম্ভব নয়। শুধু সামান্য দুই-একটি উদাহরণ দিলেই ইহার কাজের ব্যাপকতা সম্বন্ধে কিছু ধারণার সৃষ্টি হইবে।

বিগত বৎসর পশ্চিমবঙ্গের নয়টি জেলায় যে ভীষণ বন্যা হয়, তাহাতে পীড়িতের চিকিৎসা, আর্ত্তের আশ্রয় ও অন্নবস্ত্রের সংস্থান ব্যতীত, যে-সমস্ত সন্তানসম্ভবা নারী বন্যার ফলে একান্ত অসহায় অবস্থায় উপনীত হন, রেডক্রশ তাঁহাদের সাহায্যের জন্য পাঁচ হাজার মেটারনিটী ব্যাগ বিতরণ করে। এই ব্যাগে প্রসূতি ও তাহার সন্তানের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাবদ একখানা কম্বল, পাঁচটি ফ্রক, তিনটি কাঁথা, সাড়ে চার পাউণ্ড গুঁড়া দুগ্ধ, প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় হইতেই রেডক্রশ কলিকাতা ও বিভিন্ন জেলায় দুগ্ধ-বিতরণ-কেন্দ্র স্থাপন করে। ১৯৫৮ সালে উহার সংখ্যা ছিল ১৭৯৭, গড়ে দৈনিক ৯,৭০,৩১০ জনের উপযোগী দুগ্ধ ইহা হইতে সরবরাহ করা হয়। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পায় দৈনিক গড়ে ৬৭২ জন রোগী।

বর্ত্তমানে বাংলাদেশে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নানা জনহিতকর কার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাদের সকলের পূর্ণ বিবরণী দেওয়া সম্ভব নয়। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কার্য্যাবলীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ : এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব হইল ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে অগণিত তীর্থস্থান আছে—তাহাতে তীর্থযাত্রীগণের যে অশেষ দুর্গতি ও পীড়ন সহ্য করিতে হয়, তাহার অবসান ঘটাইয়া ইঁহারা উহাদের পূর্ণ সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। এতদ্বিষয়ে এই সঙ্ঘ আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছেন। সমাজের তীর্থকামী অগণ্য নরনারী পাণ্ডা-পুরোহিতের হাতে যে অকথ্য লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন সহ্য করিত, এই সঙ্ঘের ঐকান্তিক চেষ্টায় সে অনাচারের প্রায় পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এই দিক্ দিয়া ইঁহাদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। ইহা ব্যতীত —বন্যা, মহামারী, প্রভৃতি নানাবিধ সঙ্কট সময়েও জনসাধারণের সেবা ও সাহায্যে এই সঙ্ঘের অক্লান্ত উৎসাহ।

মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি : শ্রীযুগলকিশোর বিড়লা ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমাজের এবং দুঃস্থ মানবজাতির সেবাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। কাজও করেন প্রচুর। দেশে যখনই বিপদ্ ঘনাইয়া আসিয়াছে মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি কখনও পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন নাই। বিগত দেশবিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ নরনারী যখন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী হয়, তখন ইহাদের মধ্যে মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি যে সেবা ও সাহায্যের কাজ করেন, তাহা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে।

পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা সমিতি : ইহার প্রতিষ্ঠা করেন, বর্ত্তমানে ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অশোককুমার সেন। এই প্রতিষ্ঠান সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত আছে।

হিন্দু মিশন : ইহার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সত্যানন্দ। এই মিশনের কার্য্যেও খানিকটা বৈশিষ্ট্য আছে। হিন্দুধর্ম্ম একান্তই প্রসার-বিমুখ। অন্যান্য ধর্ম্মের মত ইহাতে ধর্ম্মান্তরিত করার কোন ব্যবস্থা বা প্রয়াস নাই। ফলে সাধারণ ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য যাহারা একবার সমাজের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহাদের ফিরিয়া আসিবার আর কোন পথ থাকে না। ফলে নানা অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্নীতি সমাজ-জীবনকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া তোলে। সমাজের এই দিকের

যাহাতে সংস্কার হয়, হিন্দু মিশন সেজন্য বিশেষ অবহিত হইয়াছেন। নানা প্ররোচনায় পড়িয়া, কিংবা বিনা দোষে অথবা লঘুপাপে যাহারা সমাজের বাহিরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়, হিন্দু মিশন পুনরায় তাহাদের সমাজে ফিরিয়া আসিতে সাহায্য করেন। যে সমস্ত নারী নানা কারণে সমাজের আশ্রয় হইতে বঞ্চিতা, মিশন তাহাদের আশ্রয় ও শিক্ষা দিয়া স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য করেন। সমাজের একটা বিশেষ দিকের সেবা ও সংস্কারে ইঁহারা বিশেষ যত্নশীল।

আরও নানা প্রতিষ্ঠান নানা ভাবে সমাজে সেবায় নিযুক্ত। ইহাদের সকলের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। তবে এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতি, পিপ্‌লস্‌ রিলিফ কমিটি, আর ডব্লিউ এ সি, সেভ দ্য চিল্‌ড্রেন্‌স্‌ কমিটি, চিল্‌ড্রেন্‌স্‌ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, রিফিউজ, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইহা ভিন্ন বাংলার জিলায়, মহকুমায় ও পল্লীতে আরও যে কত প্রতিষ্ঠান লোক-চক্ষুর অন্তরালে, নীরবে সমাজ-সেবার কাজে ব্যাপৃত তাহার কোন পরিচয়ই ত ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকিবে না। ইহাদের আড়ম্বর সামান্য, আয়োজন অপ্রচুর, কিন্তু উৎসাহ ও আদর্শের অন্ত নাই। ইহাদের না আছে কোন প্রচার-কার্য্য, না আছে দেশ-বিখ্যাত নেতা বা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা। তথাপি ইহাদের যে চেষ্টা ও যত্ন, উৎসাহ ও ধৈর্য্য, তাহা হয়ত সাড়ম্বরে কোনদিন দেশবাসীর দৃষ্টিগোচরে আসিবে না; কিন্তু যাহারা ইহাদের দ্বারা উপকৃত, ইহাদের সাহায্যে সুস্থ ও সবল জীবন যাপনের সুযোগপ্রাপ্ত, তাহারা ইহাদের কখনও ভুলিতে পারিবে না। দেশ হয়ত জানিল না, ইহারা কতভাবে সমাজের সেবা করিয়া গেল, কিন্তু তাহাতে তাহাদের সেবাধর্ম্মের মর্য্যাদার কোন হানি হইবে না।

আজ দেশ স্বাধীন, সুতরাং দেশবাসীর দায়িত্বও প্রচুর। দেশকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবার ভার দেশবাসীর। কাজেই যে আদর্শ ও প্রেরণায় বিবিধ সমাজ-সেবী প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে, তাহাদের উপর আজ গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত। কেবলমাত্র আদর্শ ও প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া যদি আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হই, তবে সমাজব্যবস্থার পূর্ণ উন্নতি। অন্যথায় নাম ও যশের মোহে আদর্শচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী।

—•—

বঙ্গের কতগুলি অংশ বিহার ও আসাম প্রদেশে চলিয়া যাওয়ায় নানাদিক্ দিয়া বাঙালীদের ক্ষতি হইয়াছে। বাংলা গবর্ণমেণ্টের আয় কমিয়াছে। নানা আরণ্য ও খনিজ-দ্রব্যপূর্ণ কয়েকটি অঞ্চল বিহার প্রদেশ ও আসাম প্রদেশে চলিয়া যাওয়ায় বাঙালীদের ও বাংলা গবর্ণমেণ্টের তাহা হইতে ধনী হওয়ার বাধা হইয়াছে। স্বাস্থ্যকর ও বিরল-বসতি অঞ্চলগুলি বঙ্গের বাহিরে যাওয়ায় কেবল ঘন-বসতি রোগজীর্ণ অঞ্চলগুলিতে থাকিয়া বাঙালী জাতির বৰ্দ্ধিষ্ণু ও আরও লোকবহুল হওয়ায় বাধা ঘটিয়াছে। যেসকল অঞ্চল বঙ্গের মধ্যে থাকিলে বাঙালী তথায় স্বভাবতঃই চাকরী অথবা সরকারী ঠিকা আদি পাইতে পারিত, এখন সেখানে তাহার নিমিত্ত পরমুখাপেক্ষী ও পরানুগ্রহকামী হইতে হইয়াছে। যেসকল অঞ্চল বঙ্গে থাকিলে তথাকার বাঙালী ছেলেমেয়েরা স্বভাবতঃই অবাধে বাংলাভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা পাইতে পারিত, এবং গুণানুসারে যোগ্যতম হইলে বৃত্তি পাইতে পারিত, এখন তাহাদের সেইসব ন্যায্য সুবিধালাভ পরানুগ্রহ-সাপেক্ষ হইয়াছে। মোটের উপর এই সব অঞ্চলে আবালবৃদ্ধবনিতা সব বাঙালীর মনে একটা নিকৃষ্টতার, একটা পরবশতার চাপ পড়িতেছে। ইহা সাতিশয় অকল্যাণকর ও অবাঞ্ছনীয়।

• বিবিধ প্রসঙ্গ--প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৫৫।

রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজসেবা

স্বামী গম্ভীরানন্দ

সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমাজসেবা এদেশে নূতন না হইলেও হিন্দু সন্ন্যাসীদের পক্ষে গৃহস্থ বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর সেবায় নিযুক্ত হওয়া এযুগে এক অভিনব ব্যাপার। আবার এই সেবায় যাঁহারা ব্রতী তাঁহারা ইহাকে শুধু লৌকিক কল্যাণসাধন হিসাবে গ্রহণ করেন না; কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস, এই সেবাধর্ম্মের সাহায্যে আধ্যাত্মিক কল্যাণলাভ হয়, এবং ইহারই আনুকূল্যে ক্রমে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবদনুভূতি পর্য্যন্ত হইতে পারে; কারণ গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে ইহার সমর্থক বহু উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দই এই সেবাধর্ম্ম বা অধ্যাত্মমার্গের আধুনিক প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে ইহা পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পাদমূলে বসিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোনও একদিন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণ "নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন" এই কথাটি ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। ব্যখ্যাকালে "সর্ব্বজীবে দয়া" পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট—তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" দক্ষিণেশ্বরে উচ্চারিত সে বাণী সেদিন শুনিয়াছিলেন অনেকেই; কিন্তু মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শুধু ভাবী বিবেকানন্দ। বাহিরে আসিয়া তিনি তখনই অপরকে বলিয়াছিলেন, "কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম! শুষ্ক, কঠোর ও নির্ম্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন!···সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি (কেহ) ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ, অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।...যাহা হউক, ভগবান্ যদি কখনও দিন দেন ত আজি যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্ব্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫ম খণ্ড, ২৬৮-৬৯ পৃঃ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ

ভগবান্ তাঁহাকে সে শক্তি দিয়াছিলেন—শুধু প্রচারের জন্য নহে, এই ভাবালম্বনে প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার জন্যও বটে। অনেকের ধারণা স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হইয়া এই সেবাকার্য্যের উদ্বোধন করেন। বর্ত্তমান জগতে প্রতিষ্ঠাবান্ ও সাফল্যমণ্ডিত পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব হইতে কেহই মুক্ত নহেন। তাহাদের কার্য্যধারা ও কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দও অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা প্রমাণিত

স্বামী বিবেকানন্দ

হয় না যে, তিনি সর্ব্বপ্রকারে পাশ্চাত্ত্যের নিকট ঋণী। মূল ভাবধারা ভারতের নিজস্ব বস্তু, এবং পাশ্চাত্ত্যপ্রভাব হইতে মুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে তাহা রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। আর সমাজসেবাও ভারতে নূতন নহে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীনকালে, বিশেষতঃ বৌদ্ধযুগে ভারতে বহুপ্রকার সঙ্ঘবদ্ধ সেবাকার্য্য পরিচালিত হইত এবং ভারতেতর দেশ উহা হইতে শিক্ষালাভ করিত।

সে যাহা হউক, পাশ্চাত্ত্য-বিজয় হইতে ভারতে প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার মহাসমাধি লাভের সাত বৎসর পরে, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে উহা আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান বেলুড় মঠের জমি কিনিয়া স্বামী বিবেকানন্দ উহাতে রামকৃষ্ণ মঠের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন। ক্রমে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রও উহাতে স্থাপিত হয় এবং বেলুড়ের এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া ভারত ও ভারতেতর দেশে বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। সাধারণ লোক এই উভয় প্রতিষ্ঠানকেই রামকৃষ্ণ মিশন নামে উল্লেখ করিলেও, আইন ও বাস্তবতার দৃষ্টিতে উহারা বিভিন্ন। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্য্য সেবা। উহা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, প্রভৃতিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের দুঃখ দূরীকরণ (রিলিফ), পীড়িতের সেবা (হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী), শিক্ষা (স্কুল, কলেজ, পুস্তকাগার, ছাত্রাবাস, ইত্যাদি), জনশিক্ষা (মাস্ এডুকেশন), গ্রামোন্নয়ন, নারীজাতির উন্নয়ন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, কৃষি, ইত্যাদি মঠবিভাগের প্রধান কার্য্য ধর্ম্মপ্রচার। কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগেও মিশনের অনুরূপ কার্য্যাদি করা হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নামে পরিচালিত এই কার্য্যাবলীর সম্পূর্ণ পরিচয়লাভের জন্য আমাদিগকে এই মঠ ও মিশন উভয়ের প্রতিই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে। অতএব ইহারা পৃথক্ প্রতিষ্ঠান হইলেও আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা উভয়ের কার্য্যের বিবরণ এরই সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্র একই স্থলে—বেলুড়ে সংস্থাপিত। মিশনের গবর্ণিং বডি এবং মঠের ট্রাষ্টিরা ব্যক্তি হিসাবে অভিন্ন এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী সাধু-ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ নরনারীরা প্রয়োজনমত উভয় বিভাগের কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করেন। এই হিসাবেও উভয় প্রতিষ্ঠানের আলোচনা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে করা কঠিন।

এখানে আরও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, মঠ-মিশনের প্রধান কার্য্যাবলী আত্মত্যাগী সাধু-ব্রহ্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হইলেও কার্য্যপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বহু বেতনভোগী শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, নার্স, ইত্যাদিকে নিয়োগ করিতে হইয়াছে। আর একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, প্রত্যেক কেন্দ্রের ধনসম্পত্তি ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পৃথক্‌ভাবে সংরক্ষিত হয় এবং উপযুক্ত অডিটারের দ্বারা পরীক্ষিত হয়। সকলের পরিচালনার দায়িত্ব বেলুড়ের প্রধান কেন্দ্রদ্বয়ের উপর ন্যস্ত থাকিলেও অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করা বিষয়ে প্রতি কেন্দ্রের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে এবং এক কেন্দ্রের অর্থ অন্যত্র লওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মিশনের কেন্দ্রগুলির পরিচালনের জন্য স্থানীয় লোকের দ্বারা গঠিত ম্যানেজিং কমিটি আছে। ঐ সব কমিটি বেলুড়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সর্ব্ব-বিষয়ে দায়ী। মঠবিভাগের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে সর্ব্বতোভাবে বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিদের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হয়।

এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আধ্যাত্মিক, মানসিক ও দৈহিক ক্ষেত্রে মানুষের সর্ব্ববিধ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের সমবেত চেষ্টায় দেশ-বিদেশে বহু স্থায়ী কেন্দ্র, শাখাকেন্দ্র, প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

তন্মধ্যে ভারতবর্ষে আছে ৪৪টি মিশনকেন্দ্র, ২৯টি মঠকেন্দ্র এবং ১৫টি মঠ-মিশনের সম্মিলিত কেন্দ্র। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব পাকিস্থানে আছে ২টি মিশনকেন্দ্র, ৩টি মঠকেন্দ্র এবং ৬টি সম্মিলিত কেন্দ্র। ব্রহ্মদেশে আছে ২টি মিশনকেন্দ্র, সিংহলে আছে ১টি মিশনকেন্দ্র। সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাস্-এ আছে ১টি করিয়া মিশনকেন্দ্র। সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড এবং আর্জেন্টিনাতে আছে ১টি করিয়া মঠকেন্দ্র এবং ইউনাইটেড স্টেট্‌স্-এ আছে ১০টি মঠকেন্দ্র। বিদেশের মঠকেন্দ্রগুলির একমাত্র কর্ত্তব্য ধর্ম্মপ্রচার এবং বিদেশীর নিকট ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয়প্রদান।

পীড়িতদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যাহারা মঠ-মিশনের সেবা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি দিলেই এই বিরাট্ আয়োজন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা হইতে পারে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৩টি হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ২৫,২২৫ জন রোগীর সেবা হয় এবং ৬৫টি দাতব্যচিকিৎসালয়ের বহির্বিভাগে ২৮,৫৮,৮৮০ জন রোগী ঔষধ গ্রহণ করেন। শিক্ষাবিভাগে ঐ বৎসর ২টি সাধারণ কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৭৮০; ৩টি বি টি কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৪১; অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ছিলেন ৫৬৬ জন ছাত্র। ৩টি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,১৪৫; এবং অন্যান্য শিল্পবিদ্যালয়ের ঐ সংখ্যা ছিল ৬৫৭; ৬৭টি ছাত্রাবাস ও অনাথাশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪,৪০৭। ঐ সময়ে অন্যান্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল ৫০,৫০২।

ব্রিটিশ আমলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়া, জনসাধারণের সাহায্যে স্বাধীনভাবেই গড়িয়া উঠিতেছিল। সুতরাং অভাব-অনটন এবং কর্ম্মীদের পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বদাই তাঁহাদের সহায় ছিলেন। কাশীতে প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমটি মাত্র চারি আনা সম্বল লইয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু তাহার সেবার পরিধি এখন বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসও অনুরূপ। সাধারণের একটা ভুল ধারণা আছে যে, রামকৃষ্ণ-মঠ-মিশন আমেরিকা হইতে প্রচুর অর্থ পায়। দুই-একটি স্থলে সত্যই আমেরিকার দানে মঠ-মিশন অশেষ উপকৃত হইয়াছে। যথা, বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠাকালে এবং পরে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্ম্মাণকালে আমেরিকার টাকাই একমাত্র সম্বল ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু দেশ-বিদেশে অন্যান্য যেসব সেবাশ্রম বা শিক্ষায়তনাদি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ঐগুলির পরিচালনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহার কিছুই আমেরিকা বা কোন ভারতেতর দেশ হইতে আসে না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কখনও কাহারও দুই-এক হাজার টাকা পাঠাইবার কথা আমি বলিতেছি না। এই দুর্মূল্যের সময়ে যে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় হয়, তাহা আসে দেশের জনসাধারণের ও দেশের সরকারের নিকট হইতে। অবশ্য বিদেশের কাজ বিদেশীরাই সম্পূর্ণরূপে চালাইয়া থাকেন; এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেবা ও শিক্ষাকার্য্যে ভারত সরকার, প্রধানতঃ বিদেশবাসী ভারতীয়দের সেবাকল্পে, কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া থাকেন।

ভারতে এ পর্য্যন্ত যেসব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কলিকাতাবাসীদের নিকট কয়েকটি বিশেষ সুপরিচিত। যেমন রহড়ার বালকাশ্রম, বেলঘরিয়ার ছাত্রাবাস ও ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, বেলুড়ের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কলিকাতার শরচ্চন্দ্র বসু রোডে রামকৃষ্ণমিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, লেকের ধারে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিটিউট অব কালচার, নরেন্দ্রপুরে বিভিন্ন শিক্ষায়তন, সরিষার বিবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি। বঙ্গের বাহিরে মাদ্রাজ ও অন্যান্য দক্ষিণাঞ্চলেও বহু উল্লেখযোগ্য ও বিশালকায় শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু উত্তর ভারতে রোগীদের জন্য স্থাপিত সেবাশ্রমেরই প্রাধান্য দেখা যায়। যথা রাঁচিতে টি বি সেনেটরিয়াম, কাশীতে সেবাশ্রম, বৃন্দাবন, কনখল, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, প্রভৃতি স্থানে হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারী, ইত্যাদি। দিল্লীতেও এই প্রকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে, যাহাতে রোগীদের সেবা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার ও শিক্ষাপ্রচারও হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, ধর্ম্মক্ষেত্রে মঠ ও মিশনের সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্মের মৌলিক ও সার্ব্বজনিক ভাবগুলিই প্রচারিত হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব দূর করিয়া সমন্বয়-সাধনেই সেবাব্রতীরা সচেষ্ট থাকেন।

সেবার ক্ষেত্র সুবিশাল। আবার যেসব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাদিগকে যুগপ্রয়োজন অনুযায়ী পূর্ণাবয়ব করিয়া তোলাও এক গুরু দায়িত্ব। নূতন ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনি আবশ্যক প্রাচীন ক্ষেত্রগুলিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সেবার সর্ব্বপ্রকার আয়োজন ও সম্ভারে পরিপূর্ণ করা। সঙ্গে সঙ্গে সেবাব্রতীর সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাঁহাদের শিক্ষণও সমভাবে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। তাই সব দিক্ ভাবিয়া মঠ-মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ আপাততঃ কিছুকাল প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ান অপেক্ষা প্রাচীনগুলির সৌষ্ঠব সাধন ও কর্ম্মীদের সংখ্যা ও কার্য্যক্ষমতা

বৃদ্ধির প্রতিই অধিক দৃষ্টি দিতে চাহেন। স্বামী বিবেকানন্দ বহুবার বলিয়াছেন যে, মানুষ প্রস্তুত হইলে অর্থের অভাব ঘটে না। মঠ ও মিশনের অভিজ্ঞতা এই উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করে। মঠ-মিশনের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। জনসমাজ তাঁহাদের নিকট প্রারব্ধ ক্ষেত্রসমূহে এবং আরও নবীনতর ক্ষেত্রে বহু আশা রাখে। সে আশা পূর্ণ করিতে হইলে মঠ ও মিশনকে স্বীয় ভাবগাম্ভীর্য্য এবং কর্মোদ্যম অব্যাহত রাখিয়া সর্ববিষয়ে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া ধীরপদক্ষেপে সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে।

মঠ ও মিশনের সাফল্যের পশ্চাতে রহিয়াছে কয়েকটি বিশেষ কারণ। স্বামী বিবেকানন্দ পদদলিত ও ম্রিয়মাণ ভারতের নিকট অতীতের গৌরব শুনাইয়া, ভবিষ্যতের সোনার ছবি দেখাইয়া এবং বর্ত্তমানের অধঃপতনের মধ্যেও উন্নতির সম্ভাবনা উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহাকে তাহার চিরাচরিত ধর্ম্মাবলম্বনে সাহসভরে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। ভারতের জনসমষ্টিকে সংহত করিবার মূলমন্ত্র তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এই সেবাব্রতের মধ্যে—যেখানে ধর্মের ভিত্তিতে বড়-ছোট ভেদ ভুলিয়া, জাতিবর্ণের কথায় কান না দিয়া, প্রত্যেক ভারতবাসী অপরের সেবায় আত্মবিসর্জ্জন দিতে পারিবে। তিনি সে আদর্শ প্রতিষ্ঠার ভার দিয়াছিলেন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের হস্তে। রামকৃষ্ণ-মঠ-মিশনের সাধুরা তাই শুধু ভাবপ্রবণ না হইয়া উৎসাহী কর্ম্মী, এবং অন্তরের ভাবরাশিকে কার্য্যক্ষেত্রে রূপায়িত করিতে বদ্ধপরিকর। এই আন্তরিকতা, সহৃদয়তা ও সততার পরিচয় পাই, যখন লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান স্থানে স্থাপিত দাতব্যচিকিৎসালয়ে দেখিতে পাই, পর্দ্দানশীন মুসলমান রমণীরাও অন্যস্থলে না যাইয়া নিঃসঙ্কোচে রামকৃষ্ণ মিশনে ঔষধ লইতে আসেন। ইহারই পরিচয় পাই অন্যস্থলেও যখন দেখি, পাশাপাশি অন্য সুপরিচালিত হাসপাতাল থাকিলেও সাধুদের দরিদ্রসংস্থানে রুগীর ভিড় লাগিয়া যায়। শিক্ষাক্ষেত্রেও রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রদের সদাচার ও সুশিক্ষা সম্বন্ধে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। অর্থের সদ্ব্যবহার এবং প্রয়োজন স্থলে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগও সাফল্যের অন্য কারণ। ধর্ম্মের সহিত রাজনীতিকে বিজড়িত না করিয়া তাঁহারা ধর্ম্মক্ষেত্রে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তাই খাসিয়া পাহাড়ে মিশনের যেমন আদর, ব্রহ্মদেশেও তেমনি। আবার স্বামী বিবেকানন্দের সেবার আদর্শ অনুযায়ী সেবার গণ্ডী কোন ক্ষেত্র-বিশেষে নিবদ্ধ না থাকিয়া উহা মানবজীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়াছে এবং মঠ-মিশনকে কার্য্যের অশেষ সুযোগ প্রদান করিয়াছে। মঠ-মিশন শুধু অতীতের কৃষ্টি ও ধর্ম্মের প্রচারক বা বাহক নহে; ভবিষ্যৎ মানবজীবন গঠনের গুরুদায়িত্ব তাহাদের উপর। এই দায়িত্বের কথা ভাবিয়াই মঠ-মিশনকে ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা স্থির করিতে হইবে।

—•—

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বিকাশ

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

১

"১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বাগবাজারে ডিস্‌পেনসারী লেনে তিন টাকা ভাড়ায় একখানি ঘর নেওয়া হয়। তথায় ৪।৫টি সেবকসহ ব্রহ্মচারী(১) অবস্থান করেন। ছেলেরা বাক্সে করিয়া ট্রামে বাসে ট্রেনে অর্থসংগ্রহ করিত। কিন্তু ঘরখানি অন্ধকূপ। তথায় রান্নাবাড়া করিয়া আহারান্তে ব্রহ্মচারী সকলকে নিয়া গঙ্গাঘাটে শুইয়া থাকিতেন। বৃষ্টি নামিলে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া ঐ ঘরে আশ্রয় লইতেন।

"ভাদ্র মাসে শোভাবাজার ষ্ট্রীটে ১৮ টাকায় দুইখানা কোঠা ভাড়া করিয়া কলিকাতা আশ্রম স্থানান্তরিত হইল। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী জনৈক ব্রহ্মচারী(২) সেখানে থাকিয়া কার্য্য করিতেন। দুই আনা কি চারি আনা চাঁদা আদায়ের জন্য পায়ে হাঁটিয়া কালিঘাট, ভবানীপুর, প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। বহু বড়লোকের দারোয়ানের নিকট দুর্ব্যবহার ভোগ করিতে হইত। হাত হইতে চাঁদার খাতাটি কাড়িয়া নিয়া রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিত।"—শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য-জীবনচরিত।

(১) সঙ্ঘনেতা। (২) সঙ্ঘের বর্ত্তমান সহ-সভাপতি শ্রীমৎস্বামী বিজ্ঞানানন্দজী।

সূচনা

এ হ'ল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গোড়ার কথা। আজ ভারত ও বহির্ভারতে সঙ্ঘের বিরাট্ অবদান—সঙ্ঘের রিক্ত সন্ন্যাসীর নিঃস্বার্থ সেবার কথা জাতি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। এই বিরাট্ সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ ছিলেন আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী। পূর্ব্ববঙ্গের এক অখ্যাত গ্রাম বাজিতপুর। ফরিদপুর জেলার ঐ নিভৃত পল্লীর বুকে বিষ্ণুচরণ ভূঞার গৃহ আলোকিত ক'রে ১৮৯৬ সালের কলিযুগাদ্যা পুণ্যময়ী মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে নেমে এল দেবশিশু। বাল্য-নাম বিনোদ—ব্রহ্মচারী বিনোদ। আবাল্য কঠোর সাধনার যে বীজ তিনি জাতিগঠনের সেবায় সন্ন্যাসী-সঙ্ঘরূপ উর্ব্বর ক্ষেত্রে বপন করেছিলেন, তা আজ অসংখ্য শাখাপল্লব বিস্তারপূর্ব্বক মহামহীরুহে পরিণত। তার সুশীতল ছত্র-ছায়াতলে তৃষিত, তাপিত, আর্ত্ত, পীড়িত মানুষ পেল পরম আশ্রয়—সঙ্ঘ-সাধনার অমৃতময় ফলের আস্বাদ লাভ ক'রে সে পরিতৃপ্ত—ধন্য!

স্বামী প্রণবানন্দ

১৯১৩ সন। তখন বিদ্যার্থী বিনোদকে কেন্দ্র ক'রে রীতিমত একটা দল গ'ড়ে উঠল। তারা মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করত, বিলিয়ে দিত নিরন্নের সেবায়; সারারাত জেগে রোগীর সেবা করত, বিপদাপদে প্রতিবেশীদের সহায়তা করত বিনোদের ইঙ্গিতে। পনের বছরের বালক! আজন্ম নেতা—আচার্য্য। ফুলের সৌরভের মত তার গুণ-রাশি ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত জীবন-সাধনার পথে এগিয়ে এল যুবক কিশোর-দল! যে সব চিহ্নিত সন্তান তাঁর মধুর ও পবিত্র সংস্পর্শে আসত, তিনি তাদের জীবনকে নিষ্কলুষ ক'রে গড়ে তুলবার খোরাক জোগাতেন—তাঁর ভবিষ্যৎ বিরাট্ কর্ম্মযোজনার উত্তর-সাধকরূপে তৈরী ক'রে নিতেন নিজ হাতে। ছেলেদের চরিত্র-গঠনই ছিল তাঁর ব্রত। এ ভাবে বাজিতপুর সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তখন ১৯১৭ সন।

১৯১৮ সন, আশ্বিন মাস। রুদ্রা প্রকৃতি ঘূর্ণিবাত্যারূপে বয়ে গেল সারা পূর্ব্ববঙ্গের উপর দিয়ে ভীমবেগে। দুর্দ্দশায় প'ড়ে মানুষ হ'ল দিশাহারা। ব্রহ্মচারী তাঁর নিজ হাতে গড়া সেবকদের নিয়ে এগিয়ে এলেন—ক্ষুধিতের অন্নদান সেবার ব্রত নিয়ে—অভীষ্ট কর্ম্মযোজনার প্রথম পাদক্ষেপ সুরু হ'ল। মাদারীপুরের জননেতা সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও কলিকাতার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর প্রচেষ্টায় দু'টো সেবা-সমিতি কাজে নামল। বহু যুবক কর্ম্মী এ সেবা-ব্রতে আত্মনিয়োগ করলেন। ব্রহ্মচারীর সঙ্গে হ'ল তাঁদের যোগাযোগ। ১৯১৯ সনে এই সেবাকার্য্যকে উপলক্ষ্য ক'রে মাদারীপুর সেবাশ্রমের জন্ম হ'ল।

দু'টি যুবক, ব্রহ্মচারীর বেশ। ত্যাগ-তপস্যা, আর বিবেক-বৈরাগ্যের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি; কী সরল, অনাড়ম্বর তাদের জীবনের গতি। নাম কুমুদ আর মধু।* ব্রহ্মচারী বিনোদের মনের মত ক'রে গড়া—তাঁরই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত। দু'জনে মিলে বাজিতপুর সেবাশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে এলেন খুলনা সহরে। ব্রহ্মচারীর আদর্শ উদ্দেশ্যের পরিচয় পেয়ে উকিল নগেন্দ্রনাথ সেন দু'জনকেই স্বগৃহে স্থান দিলেন—নানাভাবে সহায়তা করতে লাগলেন। স্থানীয় সহৃদয় উকিল জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের গৃহ-শিক্ষকের হ'ল প্রাণ-সংশয় পীড়া; স্নেহশীলা জননীর মত দু'জনে সেবা করলেন গৃহ-শিক্ষকের। জাতিগঠনের শিক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতির উদার আদর্শ—বসুধৈব কুটুম্বকম্ ভাব নিয়ে জীব-সেবা—জীবে শিবজ্ঞান—নরে নারায়ণ। ব্রহ্মচারীর প্রেরণাময়ী বাণী—"সকলকে সকল প্রকার

* কুমুদ—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বর্ত্তমান সভাপতি—শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী। মধু—সঙ্ঘের বর্ত্তমান যুগ্ম সম্পাদক—শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী।

সেবায় নিপুণ হইতে হইবে ; শিরদার ত সরদার, যে প্রাণপণে সকলের সেবাব্রত করিতে প্রস্তুত—সে-ই প্রকৃত নেতার আসন লাভ করিবার অধিকারী।"

তাদের সেবা-নৈপুণ্য, মধুর সংযত গতিবিধি, পবিত্র সংযমময় জীবন-সাধনায় আকৃষ্ট হ'ল খুলনাবাসী। জ্যোতিশবাবু অগ্রণী হলেন। খুলনা সেবাশ্রম গ'ড়ে উঠল।

পূর্ব্ববঙ্গের সে দুর্দ্দিনে ব্রহ্মচারী বিনোদ অর্থসংগ্রহের জন্য একদল কর্মী নিয়ে এলেন কলকাতায়। তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ জে. এন. মৈত্র, পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর সংযোগ সাধিত হ'ল। ব্রহ্মচারীর ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য, তাঁর জাতিগঠন ও সমাজসংস্কার মূলক ভবিষ্যৎ কর্ম্মপরিকল্পনার পরিচয় পেয়ে তাঁরা নানাভাবে সহায়তা করতে লাগলেন।

১৯২১ সন, অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। জাতির সেবায় উৎসৃষ্টপ্রাণ যুবকগণ জেগেছিল নেতৃবৃন্দের দৃপ্ত আহ্বানে। তারা স্কুল কলেজ ছাড়ল, গীতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের বিজয়নিশান উড়িয়ে তারা বেরিয়েছিল দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের ব্রত নিয়ে। কেউ হ'ল বিপ্লবী ; কেউ সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করল, কেউ বা সুকঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ ক'রে বেছে নিল ত্যাগময় সন্ন্যাস-জীবন—'ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ'—শুভ্রশির ঋষি ভোগান্ধ মানবের সামনে ধরেছিলেন—উপনিষদের ব্রহ্মবাণী—একমাত্র ত্যাগেই অমৃতত্ব—অমর জীবনের শোক মোহ ভয় বিরহিত নিত্য শান্তিময় জীবনের এই ত্যাগমন্ত্র। আর সঙ্ঘনেতার ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত হ'ল—ধর্ম্ম কি ?—"ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্য।" এ সময় ব্রহ্মচারীর কর্ম্মযজ্ঞে আত্মনিবেদন করেছিল বহু যুবক। পরম আশ্রয় লাভ ক'রে তাদের জীবন হ'ল ধন্য—পবিত্র ! সে বছর খুলনার দুর্ভিক্ষ এক স্মরণীয় ঘটনা। সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের রাক্ষসী ক্ষুধা মেটানোর দায়িত্ব নিয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গ'ড়ে তুললেন সঙ্কটত্রাণ সমিতি। ব্রহ্মচারীর অপরিসীম কর্ম্মশক্তি, অদ্ভুত সংগঠন-প্রতিভা, অদম্য উৎসাহ ও নিষ্ঠাপূর্ণ সেবা-নৈপুণ্যের যাদুস্পর্শে তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ প্রভাবিত হয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র।

জনসেবা

যেখানে দুঃখ, যেখানে ব্যথা, বেদনা আর অশ্রুজল—সঙ্ঘ-দেবতার সেবার সুশীতল হস্ত আজ সেখানে বরাভয়-রূপে সুপ্রসারিত। যখনই ভারতের বুকে এভাবে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটেছে, অগণিত ব্যথাতুর নর-নারীর সেবায় সঙ্ঘ আত্মনিয়োগ করেছে সর্ব্বপ্রযত্নে। বিহারের ভূমিকম্প, মেদিনীপুরের বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যা, উড়িষ্যার বন্যা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, আসামের ভূমিকম্প, বিহার উড়িষ্যা উত্তরবঙ্গের বন্যা, ঢাকার দাঙ্গা, নোয়াখালির হত্যাকাণ্ড, অঞ্জারের ভূমিকম্প, বাংলা আসাম ও গুজরাটের বন্যা, প্রভৃতি দুর্দ্দিনে সঙ্ঘ তার ভিক্ষামাত্র সম্বল ক'রে ব্যাপকভাবে সেবাকাজ করেছে। কুম্ভ মেলা, পুরীর রথযাত্রা মেলা, কাশীতে অন্নকূট মেলা, সাগর-সঙ্গমে গঙ্গাসাগর মেলা, গয়াধামে পিতৃপক্ষ মেলা, প্রভৃতিতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের আনাগোনা—সঙ্ঘ ছুটে চলে তার ত্যাগব্রতী সেবা-পরায়ণ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে, সেবাকার্য্যে যোগদান করে সন্ন্যাসী। সঙ্ঘনেতার অমোঘ নির্দ্দেশ—"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে সংহত করিয়া বিরাট্ সঙ্ঘ-শক্তি গঠন কর,—পরিত্রাণ কর পতিতকে, রক্ষা কর বিপন্নকে, শান্তি সুখ দাও সন্তপ্তকে, আশ্রয় দাও নিরাশ্রয়কে।"—সঙ্ঘের বুকে এ অভ্রান্ত নির্দ্দেশ আজ বাস্তবরূপে প্রকটিত।

সংগঠন

আশাশুনিতে প্রধান কেন্দ্র খোলা হ'ল। পল্লী-উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হ'ল। গ্রামে গ্রামে চরকা, তাঁতশালা, মাদুর ও বেতের কারখানা খোলা হ'ল, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হ'ল। বহু ত্যাগীকর্ম্মী ও সাময়িক স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিল এ সংগঠন কাজে। সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল গ্রামীণ মানুষের নৈতিক-চরিত্র-গঠন পর্ব্ব। ব্রহ্মচারী চেয়েছিলেন ধর্ম্ম-ভিত্তিক জাতি-গঠন। প্রকৃত মানুষ গড়াই হ'ল তাঁর প্রধান কাজ। দেহের খোরাক জোগানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিতে লাগলেন মনের খোরাক। এ দেশের আদর্শ কি—তা তিনি সহজ ভাষায় বললেন—"এদেশ ভগবান্‌কেই লইয়া জীবন জনম কাটাইয়াছে ও কাটাইতে চায় ; যে দেশ জড়বাদকে চরমবাদ বলিয়া ধরিয়াছে, এ দেশ সে দেশ নয়,—এ দেশ চায়—নীতি-ধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতা।"

ধর্মভিত্তিক জাতিগঠন পদ্ধতি

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ নামকরণের মধ্যেই তাঁর ধর্মভিত্তিতে জাতিগঠন পরিকল্পনার যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ ;—"আমি সঙ্ঘ-শক্তি সৃষ্টি করতে চাই, সমগ্র ভারত এই সঙ্ঘের কর্মক্ষেত্র, ভারতীয় জাতির পুনর্গঠনই আমার সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। সনাতন বৈদিক আদর্শই হবে এই সঙ্ঘের ভিত্তি—সুতরাং আশ্রম শব্দটি এ সঙ্গে জড়িত থাকুক। জাতি সমাজ ব্যক্তির সর্ব্ববিধ সেবাই হবে সঙ্ঘের কার্য্য।" আজ 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ' নামকরণ সার্থক। ধর্মভিত্তিতে জাতির পুনর্গঠন পন্থা ও লোককল্যাণকর পরিকল্পনাগুলি সঙ্ঘ-নেতা তাঁর বিভিন্ন যুগান্তকারী আন্দোলনের ভিতর জাতির সামনে রেখে গেছেন।

২

আদর্শ-শিক্ষা বিস্তার ও ছাত্রসমাজে নৈতিক আন্দোলন

বর্তমান ছাত্রসমাজের উন্মার্গগামিতা লক্ষ্য ক'রে সকলেই অস্বস্তি বোধ করছেন। ভগবৎবিমুখতা ও নৈতিক চরিত্রগঠনমূলক শিক্ষার অভাবই এর মূল কারণ। ১৮৬০ সালের ৫ই জুন—একশত বছর আগে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর প্রথম প্রকাশিত 'Young Bengal, this is for you' শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন :

"It is impossible, my friend, to calculate the amount of mischief which has been brought in our country by Godless education. Not only has it shed its baneful influence upon the individual but it has proved an effective engine in counteracting the social advancement of the people and in rendering more frightful the intellectual, domestic and moral destruction of the millions of our countrymen."

যুগ-প্রয়োজনে ছাত্রসমাজে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রচলন যে অপরিহার্য্য তা' সঙ্ঘনেতা তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বললেন,—"ছাত্রসমাজের দুঃখ-দুর্দশা আর চোখে দেখা যায় না। তখনকার ছাত্র ছিল ত্যাগ-সংযম-সদাচার-পবিত্রতা ও দৃঢ়তা প্রভৃতি সদ্গুণের প্রতিমূর্ত্তি, এখন তার বিপরীত। আজ এ ছাত্রসমাজকে গড়িয়া তোলাই দেশের প্রকৃত কাজ। ছাত্রগণ ভবিষ্যৎ জাতি, তাদের উন্নতি অভ্যুদয়ের উপরই জাতির উন্নতি অভ্যুদয় নির্ভর করিতেছে।"

সঙ্ঘনেতা তাঁর এই বাণীকে বাস্তবরূপ দান ক'রে গেছেন তাঁর ছাত্রসমাজে নৈতিক আন্দোলনের ভিতর। প্রাচীন গুরুগৃহের আদর্শে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, আবাসিক বিদ্যালয়, আদর্শ বিদ্যার্থী-ভবন। বিদ্যার্থীদের বিলাসহীন, স্বাবলম্বী, কঠোর সংযমময় জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়া হয় এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সঙ্ঘের এ কেন্দ্রগুলি প্রকৃত মানুষ গড়ার কেন্দ্র।

সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় ধর্মশাস্ত্র পরীক্ষা বোর্ড গঠিত হ'ল। এই বোর্ডের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সুকুমারমতি বিদ্যার্থীদের রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, প্রভৃতি পড়ানো হয় ; বছরের শেষে তাদের পরীক্ষা গৃহীত হয়ে থাকে। ১৯৫২ সাল থেকে এ পরীক্ষা বোর্ডের কাজ আরম্ভ হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ চরিত্রগুলি তারা নিজ জীবনে প্রতিফলিত ক'রে নিজেদের জীবনকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুলবার সুযোগ লাভ করছে সঙ্ঘের এই প্রচেষ্টার দ্বারা। ১৯৫৮-৫৯ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, প্রভৃতি রাজ্যে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে আদর্শ শিক্ষা-সম্মেলন-সমূহ উদ্‌যাপিত হয়। ঐ সকল অনুষ্ঠানে ভারতের বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যোগদান করে-ছিলেন। শিক্ষা-সমস্যা ও ছাত্রসমাজে নৈতিক জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সকল সম্মেলনে প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়েছিল।

সন্ন্যাসী সংগঠন

১৯২৪ সালে ব্রহ্মচারী বিনোদ সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তাঁর সন্ন্যাস নাম হ'ল আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী। তিনি জাতি ও সমাজ সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ ক'রেই সন্ন্যাসী-সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। মহান্ আদর্শে অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে "আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—যে-সকল তরুণ মহান্ আচার্য্যের চৌম্বক আকর্ষণে আত্মনিবেদন করেছিলেন মূলতঃ তাঁদের নিয়েই এ সঙ্ঘের রচনা। তিনি বলতেন, "আমার সঙ্ঘ হবে দ্বিতীয় বুদ্ধের সঙ্ঘ। আমি সমগ্র দেশ ও জাতিকে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের মত নূতন আদর্শ ও তপঃশক্তিতে সঞ্জীবিত করতে

চাই। এ যুগে ব্যক্তি সমাজ ও জাতির পক্ষে যা কল্যাণকর, তা আমার চিন্তা বাক্য কার্য্যের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলে শিখিয়ে যাব।" দেশে নৈতিক আদর্শের ব্যাপক প্রচার প্রতিষ্ঠা ক'রে ব্যষ্টি-জীবন গঠনই ছিল, তাঁর ধর্মভিত্তিতে জাতিগঠনের মূল কথা। তিনি নিজের জীবনের প্রতিটি চিন্তা, চেষ্টা, ও কর্মধারা সঙ্ঘের ভিতর প্রকটিত ক'রে রেখে গেছেন। তিনি সন্ন্যাসিগণকে উৎসাহিত ক'রে বলতেন, "তোমরা সনাতন আদর্শে গঠিত হইয়া আর্য্য ঋষিদের আসনে উপবেশনপূর্ব্বক এই ধঃপতিত দেশকে নীতি ও ধর্ম্মের পথে পরিচালিত করিবে। নীতি ও ধর্ম্মের কথা প্রচারের জন্য—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য বিঘোষণের জন্য তোমরা আসিয়াছ। সেই বৈদিক যুগের আদর্শ ও বৌদ্ধযুগের বিশিষ্ট ভাব লইয়া সঙ্ঘ-সন্তানদিগকে সমগ্র দেশের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দেশবাসীকে সঙ্ঘের ভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।" —সঙ্ঘগীতা।

তীর্থ-সংস্কার

"নামিনু শ্রীধামে ; দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।"

বাংলা ১৩০১ সালে ১২ই ফাল্গুন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডার এই ভয়াবহ চিত্র এঁকে গেছেন। তীর্থক্ষেত্রগুলিতে এক শ্রেণীর পাণ্ডার জুলুমবাজীর বিষয় ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির পুণ্য পাদপীঠ এই তীর্থ-কেন্দ্রগুলির যুগযুগব্যাপী অনাচার কদাচার ও সর্ব্বোপরি পাণ্ডার অত্যাচার নিবারণকল্পে সঙ্ঘ-নেতা সম্পূর্ণ নির্বিরোধ সেবা ও গঠনমূলক কর্মপন্থা অবলম্বন ক'রে তীর্থ-সংস্কার আন্দোলন করেছিলেন। এই এই পরিপ্রেক্ষিতে গয়া সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা হ'ল তাঁর অমরকীর্ত্তি। ভারতের বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ তীর্থ-কেন্দ্রগুলিতে সঙ্ঘের তীর্থ-সংস্কার কার্য্য সুবিদিত। তীর্থযাত্রিগণ গয়া, কাশী, প্রয়াগ, পুরী, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, নবদ্বীপ, প্রভৃতি তীর্থ-কেন্দ্রগুলিতে আজ আপন-গৃহের স্বচ্ছন্দ ও নিঃসঙ্কোচ ভাব নিয়ে নিরাপদ্ আশ্রয় লাভ করেন। সঙ্ঘের এই তীর্থ-সংস্কারকেন্দ্রগুলির বিরাট্ অট্টালিকাগুলি প্রধানতঃ সহৃদয় দেশবাসীর অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভাগ্যকুলের স্বর্গীয় দানবীর কুমার প্রমথনাথ রায়ের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠিত ঐ তীর্থকেন্দ্রসমূহে নির্ম্মিত গৃহগুলির সংস্কারসাধনের জন্য একটি স্থায়ী অর্থভাণ্ডার গঠন ক'রে স্বর্গীয় কুমার বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত জগন্নাথ রায় মহাশয় তাঁর পরমারাধ্য পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। সঙ্ঘের তীর্থ-কেন্দ্রগুলির মূল উদ্দেশ্য শুধু যাত্রিসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণ নয়, পরন্তু তীর্থস্থানের পুঞ্জীভূত কলুষ-কালিমা দূরীভূত ক'রে ভারতীয় সংস্কৃতির মহিমা প্রচার ও এক ধার্ম্মিক, নৈতিক ও পবিত্র-ভাবপ্রবাহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

সমাজ-সংস্কার

হিন্দুসমাজ-সমন্বয় আন্দোলন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের জাতিগঠন ক্ষেত্রে এক অমূল্য অবদান। যখন বাংলার হিন্দু অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তা ও ভেদবিবাদে শতাধাবিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছিল, তখন সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব হিন্দুজাতিকে শক্তিশালী, সঙ্ঘবদ্ধ ও আত্মরক্ষণক্ষম ক'রে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য হিন্দুসমাজ-সমন্বয় আন্দোলন ক'রে গেছেন। ১৯৩৮ সনের আগষ্ট মাসে কলিকাতায় নেতৃবৃন্দদের নিয়ে আয়োজিত হল এক বিরাট্ সম্মেলন, বাংলার দুর্গত হিন্দুর পুনরভ্যুত্থানের পথ নির্ণয়ের জন্য হিন্দু মিলন মন্দির ও রক্ষীদল গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এতে যোগ দিয়েছিলেন—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, নিশীথচন্দ্র সেন, স্যার নীলরতন সরকার, স্যার ইউ. এন. ব্রহ্মচারী, বি. বি চাটার্জ্জি, এস্. এন. ব্যানার্জ্জি, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মৃণালকান্তি ঘোষ, কুমার প্রমথনাথ রায়, স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠিত মিলন-মন্দির ও রক্ষীদলগুলি পল্লী উন্নয়ন কাজে সহায়তা ক'রে চলেছে। এর মাধ্যমে, হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তা নিবারণ, শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্যচর্চ্চা, গ্রামবাসীগণের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠন, সেবাকার্য্য, আদিবাসী উন্নয়ন, প্রভৃতি কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে।

সঙ্ঘনেতা বললেন, "এ পতিত জাতিকে উদ্ধারের জন্য আমাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। হীন অন্ত্যজ জাতিকে কোলে তুলিয়া লইতে হইবে। এদেশের আলস্য, ঔদাস্য, জড়তাকে দূর করিয়া দেশের প্রাণে কর্ম্মশক্তি জাগাইয়া দিতে হইবে এবং দেশকে মহামুক্তির পথে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।"

আদিবাসী ও অনুন্নত উন্নয়ন

সমগ্র ভারতের জন-সমষ্টির এক তৃতীয়াংশ এই আদিবাসী ও তথাকথিত অনগ্রসর শ্রেণীর নরনারীর উন্নয়নকল্পে সঙ্ঘ আজ বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উচ্চবর্গের অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুদের সমপর্য্যায়ে উন্নীত করার জন্য সঙ্ঘ তাদের ভিতর শিক্ষা, সদাচারবিধি প্রবর্ত্তন করছে। সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় এদের ভিতর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, ব্যায়ামাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়। আর অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পশিক্ষা ও আর্থিক সাহায্য দান করা হচ্ছে। সর্ব্বোপরি তাদের নৈতিক চরিত্র উন্নয়নমূলক ধার্ম্মিক ও সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রচলিত করা হচ্ছে এই সঙ্ঘের মাধ্যমে।

শবরজাতি। এরা শিক্ষা-দীক্ষায় নিতান্ত অনগ্রসর, বৃটিশ সরকার এদের অপরাধপ্রবণ উপজাতি ব'লে চিহ্নিত ও সমাজে অপাংক্তেয় ক'রে রেখেছিল। আজ সঙ্ঘ এই যাযাবর শ্রেণীর সমাজবহির্ভূত জাতির পুনর্বাসন করেছে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে। আজ তারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পতিত-উদ্ধার লীলার এ অনুবর্ত্তন সঙ্ঘের জাতিগঠন পরিকল্পনার আর একটি বাস্তব রূপ। আমরা এ প্রসঙ্গে প্রবাসীর ১৩৬০ সালের পৌষ এবং ১৩৬১ সালের চৈত্র সংখ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

ভারত ও বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার

ভারত ও বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার* সঙ্ঘের আর একটি অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি। সন্ন্যাসী, কর্ম্মী ও ও প্রচারকদের নিয়ে হ'ল চারণ দল। ভারতের মর্ম্মবাণী প্রচার হ'ল এই চারণ দলের উদ্দেশ্য। আসমুদ্র হিমাচল তার প্রচার ক্ষেত্র। তারা প্রতিটি গৃহে সঙ্ঘের বাণী প্রচার করেন—সঙ্গে সঙ্গে করেন সঙ্ঘের গঠনমূলক কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলের সঙ্গে ঘটে এক বিরাট্ গণসংযোগ। ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন নাম দিয়ে সঙ্ঘ বহির্ভারতে প্রেরণ করল প্রচার-দূত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই সাংস্কৃতিক মিশনের মাধ্যমে চলেছে ব্যাপক প্রচার। মালয়, সুমাত্রা, সিঙ্গাপুর, বর্ম্মা, পূর্ব্ব-আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্সে প্রচারিত হ'ল ভারতীয় সংস্কৃতি—হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ। স্থায়ী কেন্দ্র গ'ড়ে উঠল দক্ষিণ আমেরিকায় বৃটিশ গায়েনা আর ত্রিনিদাদে। সেখানে আবাসিক আদর্শ বিদ্যালয় ও হিন্দু বিজ্ঞান-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—আর ঐ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বামী পূর্ণানন্দজী ভারতের শাশ্বত বাণী প্রচার ক'রে চলেছেন—অসংখ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে। অমৃতের বার্ত্তাবহ ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের সন্ন্যাসী প্রচার করছেন অমৃতের বাণী সঙ্ঘ-নেতার বীরকণ্ঠের বীর্য্যপ্রদ বাণী—"হে ভারত, ভুলিও না তুমি ঋষির বংশধর ; তোমার সমাজ ও রাষ্ট্র, ঋষির দিব্য হস্তে গঠিত, অনুশাসিত, পরিচালিত ; তোমার জীবনের প্রতিটি কর্ত্তব্য ঋষিনির্দ্দিষ্ট। ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্য তোমার জাতীয় জীবনের মূল আদর্শ। এই আদর্শকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাক। পড়িয়া গেলেও বিনাশ নাই। পুনরভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী।"

মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা যে সঙ্ঘের সূচনা, আজ সিদ্ধ সমাহিত মহাপুরুষের সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও কঠোর তপঃসাধনার দিব্য প্রভাবে তাহা প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় বিকশিত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মনীষী ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় পদ্মভূষণ সঙ্ঘনেতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে যথার্থই বলেছেন,—"বাস্তবিক স্বামীজি-প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ শুধু একটি প্রাণহীন নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠান নহে। ইহা সতত ক্রিয়াশীল, সজীব ও বর্দ্ধমান। ইহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় শক্তির একটি বিশেষ উৎস আছে ; যাহার বলে ইহা দিন দিনই জাবদেহের ন্যায় নিরন্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। সঙ্ঘের এই নিয়মিত বৃদ্ধি ও বিকাশের মূল কারণ—অলৌকিক তপঃশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।"

---

* বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার বিষয়ে আমরা প্রবাসীর ১৩৫৮ সালের শ্রাবণ, পৌষ ও চৈত্র এবং ১৩৫৯ সালের মাঘ সংখ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

—০—

ব্রাহ্ম আন্দোলন ও সমাজ-সেবা

শ্রীযোগানন্দ দাস

ভূমিকা

কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে রোগী যদি কোনো সামান্য রোগ চিকিৎসা করাতে যান, তবে তাঁর রোগের উপস্থিত লক্ষণগুলি বিচার ক'রে ডাক্তার সাধারণতঃ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রোগ যেখানে জটিল ও পুরাণো, সেখানে দরকার পড়ে রোগী ও রোগের পুরাণো ইতিহাসের, এমন-কি কোনো কোনো রোগের মূল উৎস ধরবার জন্য রোগীর বংশ-পরিচয়েরও প্রয়োজন ঘটে।

তেমনি, বাঙালীর বর্তমান অবস্থা বুঝতে গেলে, তার পুরাণো ইতিহাসেরও প্রয়োজন আছে। তার বর্তমান ও গত ষাট বছরের সঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, যদি তার পিছনের একশো বছরের পটভূমিকা বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ থেকে যাই। কারণ, বর্তমান শতাব্দীর জন্ম গত-শতাব্দীরই গর্ভে। সুতরাং, মানব-সেবাতেও, গত ষাট বছরের ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ করতে গেলে প্রয়োজন ঘটে তার আগেকার অন্ততঃ আরো ষাট বছরের পরিচয় নেবার।

আজ বাংলা ও বাঙালী সর্বত্র অবহেলিত এ কথা সত্য বটে, কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে, বাংলার ইতিহাস-বিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে, মহামতি গোখলে বলেছিলেন, "আজ বাংলা যা ভাবছে, আগামী কাল সারা ভারত কাজে তাই করবে।" কেন গোখলের এই স্বীকৃতি?

তার কারণ, গত শতাব্দীতে বাঙালী এমন কিছু করেছিল, যার জন্য বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় পর্যন্ত বহু অবাঙালীর মতো মরাঠী গোখলেকেও স্বীকার করতে হয়েছিল বাংলার এই নেতৃত্বকে। সেটি কি?

সেটি হ'ল, ইংরেজ এদেশে শাসনকর্তা হ'য়ে চেপে বসবার পরে দুই সভ্যতার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে ভারতীয় সমাজের যে একটা বিরাট্ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, সেই ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ সেদিন ধরা পড়েছিল সকলের আগে বাঙালীর চেতনায়। সে-যুগে বাংলার ও বাঙালীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল,—যার জন্য সারা শতাব্দী ধ'রে বাংলা সারা ভারতের নেতৃত্ব ক'রে গিয়েছে,—পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয়, উভয় সভ্যতার সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ ভারতীয় সমাজের ও সমাজ-বোধের এক নূতন আদর্শ সৃষ্টি। সেটা করেছিল এই বাঙালীরই মস্তিষ্ক, গত শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকেই। কি ধর্মে, কি সমাজ-সেবায়, কি রাষ্ট্রনীতিতে, কি অর্থনীতিতে, কি সঙ্গীতে ও চিত্রকলায়, কি সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায়, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে মূল ভিত্তি ক'রে এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলিকে তার সঙ্গে সমন্বিত ক'রে এই নূতন আদর্শ। বাঙালীর এই সৃষ্টিমূলক প্রতিভার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলা দেশ থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে। একই চিন্তা ও সাধনার ঐক্যসূত্রে, বাংলার একই ভাবাদর্শ, সমাজ-বোধ ও কর্ম-প্রেরণা ভিতর থেকে গ'ড়ে তুলছিল সারা শতাব্দী ধ'রে একটা ঐক্যবোধ, যেটা হ'ল জাতীয়তার জনক। তাই সারা ভারত সেদিন স্বীকার করেছিল বাংলার ও বাঙালীর নেতৃত্বকে।

এই আদর্শ-সৃষ্টির মূলে, গত যুগের বাঙালী, মরাঠী, গুজরাতী, ওড়িয়া, পঞ্জাবী, বিহারী, অহমিয়ার ঐক্যবোধের মূলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অসাধারণ মনস্বী জ্ঞানতপস্বী ও কর্মবীর, নব ভারতের স্রষ্টা, জন্মে বাঙালী কিন্তু চিন্তায় আদর্শে ও সাধনায় বাংলার ও সমগ্র আফ্রো-এশিয়ার মধ্যে আধুনিক যুগের সর্বপ্রথম বিশ্বজনীন মানুষ রামমোহন রায়। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, বাঙালী হয়েও বিশ্বজনীনতার ও মহামানবতার, খণ্ড-মানুষ থেকে পূর্ণ মানুষের এই ভাবাদর্শের অবিচ্ছিন্ন ধারাই জন্ম দিয়েছিল বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও বর্ণের সমন্বয়ে একটা মহাভারতীয় জাতীয়তা-বোধকে; একটা সৃষ্টিমূলক বিপ্লবী নূতন বাংলাকে নেতৃত্ব দিয়েছিল সারা ভারতের; বাংলার ভাবে সারা ভারতকে উদ্বুদ্ধ ও ভাবিত করেছিল এবং বাংলার জন্য বিশ্বের দরবারে একটা বড় রকমের আসন রচনা করেছিল। তাই, গত শতাব্দীতে ও বর্তমান শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত, 'আজ' বাংলা যে পথ দেখিয়েছে 'আগামী কাল' সারা ভারত সেই পথে চলেছে।

নব যুগের বিরাট্ পরিবর্ত্তনের ইতিহাসে, নব আদর্শে ও নব পদ্ধতিতে মানব-সেবা বা সমাজ-সেবাতেও জাতীয় প্রচেষ্টা হিসাবে বর্ত্তমান যুগের ভারতবর্ষে এই বাঙালীই প্রধানতম পথপ্রদর্শক।

ভারতে জনসেবার আদর্শ: পুরাতন ও নূতন

সামন্ত যুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও জনসেবার ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত। পুণ্যলোভেই হোক বা স্বাভাবিক দয়াদাক্ষিণ্যের জন্যই হোক, রাজা, জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের বা ব্যক্তিবিশেষদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা দানই ছিল লোকসেবার উৎস। এইটেই হ'ল পুরাতন আদর্শ।

আধুনিক যুগে ভারতের নূতন আদর্শ যা' পশ্চিম থেকে এদেশে এসে পৌঁছলো ইংরেজের সংস্পর্শে, সেটা হ'ল জাতীয়তা ও গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রের ভাবাদর্শ ভারতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে রূপপরিগ্রহ করল, ধর্ম থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত। লোকসেবাতেও এই নব আদর্শ নিল নূতন রূপ। এ যুগের লোকহিত শুধু রাজার, শুধু জমিদারের, শুধু কয়েকজন ধনীর ব্যক্তিগত কীর্তি নয়, আপামর জনসাধারণের নূতন মিলিত সৃষ্টি। জনসাধারণের প্রেরণায় ও চাঁদার টাকায় জনসাধারণের সংঘবদ্ধ প্রয়াসে যে লোকহিত, সেই আধুনিক গণতান্ত্রিক লোকহিতই গত শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষে লোকহিতের নব আদর্শ ও নবীন রূপ। লোকহিতের এই নূতন সৃষ্টিতে বাঙালীর জাতীয় অবদান অনস্বীকার্য।

জনসেবায় এই সংঘবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রণালীর আরম্ভ এদেশে ইংরেজের হাতে। দুর্ভিক্ষ প্লাবন প্রভৃতিতে প্রথম ত্রাণ বা 'রিলিফ' সংগঠন করেন 'সাহেবলোকেরা' ও সাহেব কোম্পানীরা। এঁদের সঙ্গে, এই গণতান্ত্রিক প্রথার 'রিলিফ' সংগঠনে, প্রথম বাঙালী যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে আছেন দু'জন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি,—ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৮২১ সালে ১৪ই মার্চ কলকাতার চুণাগলিতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে সাহেবী প্রচেষ্টায় যে চাঁদা তোলা হয়, তাতে পাওয়া যায় ৭ জন হিন্দু ও ১ জন মুসলমানের নাম, বাকী সব 'সাহেবলোক'। এই সাতজনের মধ্যে ছিলেন রামমোহন ও দ্বারকানাথ। এর পরে আয়র্লণ্ডে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, সেখানেও দাতা হিসাবে পাওয়া যায় বিশ্বজনীন বাঙালী রামমোহনের নাম। এক শতাব্দীরও পরে আয়র্লণ্ডের বিপ্লবী নেতা ডি. ভ্যালেরা রামমোহনের ও রামমোহনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ এই দানের উল্লেখ ক'রে ভারতবর্ষের প্রতি আয়ারের কৃতজ্ঞতা জানান।

আজ ভারত সরকার যখন মিশরে, কোরিয়ায় বা ভারতের বাইরে অন্যত্র সাহায্য পাঠান, তখন ভুলেও একথা মনে করেন না যে, এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক একজন বাঙালী, যাঁর কাছে সারা ভারত ঋণী।

কিন্তু শুধু রামমোহন বা দ্বারকানাথ প্রভৃতির ব্যক্তিগত দানেই নব যুগের বাংলার নব পদ্ধতির লোকসেবার শেষ নয়। এই লোকহিত-বুদ্ধি পৌঁছে গেল বাঙালীর আরো গভীরতর মর্মে। রামমোহন লোকহিতকে আধুনিক যুগের 'ধর্মের' একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ ব'লে ঘোষণা করলেন। এমন কি, এ কথা পর্যন্ত বললেন যে, লোকসেবাই প্রকৃত ঈশ্বরসেবা।

ধর্ম ও লোকহিত

১৭৫০ শকে (খ্রীঃ ১৮২৮) ৬ই ভাদ্র রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রভৃতি হিন্দুসমাজের বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মিলে জাতিধর্মনির্বিশেষে বিশ্বজনীন ব্রহ্মোপাসনার জন্য ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। 'ব্রহ্মোপাসনা' পুস্তিকায় রামমোহন এর রীতি নির্দেশ করলেন। সেখানে তিনি এই ধর্মের দু'টি মাত্র লক্ষণ দিয়েছেন: প্রথম, হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান্ প্রভৃতি সকল ধর্মের ও জাতির মানুষের জন্য সকল শাস্ত্রের উপাস্য একই ঈশ্বরের উপাসনা, যা'তে মানুষে-মানুষে বিরোধ ঘুচে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীর সব জাতির মানুষই যে একই মানব-পরিবারভুক্ত এই বোধ জন্মায়, এবং 'ধর্মের' দ্বিতীয় লক্ষণ বলেছেন, লোকহিত। এর জন্য, তিনি নিজে কোনো কথা না ব'লে তাঁর রীতি অনুযায়ী একটি বিখ্যাত শাস্ত্রবাক্য (মহাভারত) উদ্ধৃত করেছেন:

"পরিনির্মথ্য বাগ্‌জালং নির্ণীতমিদমেব হি। নোপকারাৎ পরো ধর্মো নাপকারাৎ পরং অঘম্ ॥"

অর্থাৎ, 'ধর্ম' বিষয়ে যত কচ্‌কচি বা বাগ্‌জাল, সে-সমস্ত মন্থন ক'রে এই সার কথা উদ্ধার করা গেল যে, পরের উপকার করার চেয়ে বড় ধর্ম নেই, পরের অপকার করার চেয়ে বড় পাপ নেই।

বহুযুগ পরে, রামমোহন রায় পুনরায় এ দেশে ধর্মের সেই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ (মহাভারতে ও অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে এ ধরণের অনেক উক্তি আছে, এবং বৌদ্ধধর্মে এই আদর্শ বিশেষ ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল),—সামাজিক আদর্শ, লোকহিতের আদর্শ তুলে ধরলেন। রামমোহনের যে 'বিশ্বজনীন ধর্ম' বা ব্রাহ্মধর্ম তা' জাতিধর্মনির্বিশেষে এক ঈশ্বরের আরাধনা ও এই লোকহিতের ধর্ম বা মানবধর্ম ছাড়া আর বেশী কিছু নয়, কোনো পৃথক্ ধর্ম নয়।

রামমোহনের প্রিয়তম মটো, যেটি তিনি প্রায়ই বল্‌তেন এবং যেটি তাঁর ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পরে তাঁর সমাধি-গাত্রে ক্ষোদিত থাকে, সেটি হ'ল হাফেজের একটি ফার্সী বয়েৎ যার ইংরেজী হ'ল, "The true way of serving God is to do good to man," অর্থাৎ 'লোকহিত করে যেইজন সে-ই সত্য সেবিছে ঈশ্বর।'

ব্রাহ্ম সমাজে সেবা-ধর্মের সুরু

'ধর্ম' সম্বন্ধে ব্রাহ্ম 'সমাজের' প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায়ের চিন্তাধারা এবং সেবাধর্মমূলক ও জাতিধর্ম-ও-বর্ণ-নির্বিশেষে জনসাধারণের 'সমাজ'-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত 'ব্রহ্মোপাসনার' আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের 'ধর্মের' অঙ্গীভূত হয়ে যায়। তাই দেখা যায়, ১৮৩২ সালে আজ থেকে ১২৮ বছর আগে রামমোহনের জীবিতকালেই, সতীদাহ নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টকে ও রামমোহন রায়কে ধন্যবাদ দেবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে যে জনসভা হয়, সেই সভায় সম্পূর্ণ জাতীয় প্রচেষ্টায় ও দ্বারকানাথের প্রস্তাবনায় উড়িষ্যা জলপ্লাবনে আর্তত্রাণের উদ্বোধন হয়। এই শতাধিক নামের চাঁদার তালিকায় একজনও 'সাহেবলোকের' নাম পাওয়া যায় না। বাংলা দেশের (এবং বোধ হয় ভারতের) এই প্রথম গণতান্ত্রিক ও জাতীয় (অর্থাৎ 'সাহেবলোকে'র অনু-প্রেরণা-বর্জিত) সংঘবদ্ধ সাহায্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল বাঙালী কর্তৃক অবাঙালীর সেবা,—রামমোহনের সেই বিশ্বজনীন ধর্ম বা 'ইউনিভার্স্যাল্ রিলিজ্যন্'-এর আদর্শ।

ব্রাহ্মসমাজে রামমোহনের পরবর্তী নেতা রবীন্দ্রনাথের পিতা ও দ্বারকানাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সংস্কৃত ভাষায় ব্রহ্মোপাসনায় সংজ্ঞা বা 'মন্ত্র' রচনা করলেন: 'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব' অর্থাৎ, ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য সাধন বা লোকহিতই ব্রহ্মোপাসনা।

তা ছাড়া, ১৮৩০ সালে রচিত ব্রাহ্মসমাজের 'ট্রাস্ট ডীড' অনুসারেও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য দুটি: প্রথম, জাতিধর্ম নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের জন্য ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠা ও দ্বিতীয়, লোকহিত।

সুতরাং জনগণের সংঘবদ্ধ সমাজ-সেবা ও লোকহিতের ইতিহাস ব্রাহ্মসমাজে 'ধর্মের' আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে একটা অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন সাধনার ইতিহাস। এর সূচনা বাঙালীরই হাতে, বাংলা দেশ থেকে সম্পূর্ণ জাতীয় প্রয়াস হিসাব এর ধারা সমগ্র ভারতে প্রবাহিত হয়েছে, এবং ভারতের অন্যত্র গত শতাব্দীর তৃতীয় পাদের মধ্যেই এই বিষয়ে বাংলার অনুকরণ হয়েছে।

সমাজ-সেবায় গত ষাট বছরের পটভূমিকা: উনিশ শতাব্দীর শেষ ষাট বছর

ব্রাহ্ম সমাজে আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী সমাজ-সেবা গোড়া থেকেই দুই ভাবে হয়েছে: (১) সংঘবদ্ধ সাময়িক সংকটত্রাণ, (২) স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান। সমাজ-সেবা সম্বন্ধে মনে রাখা দরকার, আধুনিক যুগের সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টি অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক সমাজসংস্কার থেকে শুরু ক'রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, শ্রমিককল্যাণ পর্যন্ত বহু প্রচেষ্টাই সমাজ-সেবার বা 'সোশিয়্যাল সার্ভিস-এর অন্তর্গত। সকল ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম আন্দোলনের অবদান বিষয়ে বলা এখানে সম্ভব নয়।

সাময়িক সংকটত্রাণ

১৮৩২—উল্লিখিত উড়িষ্যা প্লাবন।

১৮৬১—উত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষত্রাণ (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে)। এই উপলক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার পরে একটি মর্মস্পর্শী আবেদন করেন। তার ফলে, সেইখানেই বহু গহনা বস্ত্র প্রভৃতি পড়তে থাকে। বিক্রয়লব্ধ অং

আর্তত্রাণে যায়। আয়র্ল্যণ্ডের দুর্ভিক্ষে রামমোহন-রচিত আবেদনই ভারতীয় কর্তৃক সংকটত্রাণের প্রথম আবেদন। মহর্ষির এই আবেদনটি সারা ভারতে এ-বিষয়ে দ্বিতীয় 'পাব্লিক্ এ্যাপীল্।'

১৮৬৬—উড়িষ্যায় ও মেদিনীপুরে।

১৮৭৬-৭৭—চট্টগ্রামে সাইক্লোন্ ও পরে ওলাউঠা মহামারীতে স্থানীয় ব্রাহ্মরা "Society of Brahmo Friends" গঠন করেন এবং বাড়ী বাড়ী গিয়া ঔষধপথ্যাদি বিতরণ করেন।

১৮৭৭—বোম্বাই প্রদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। স্থানীয় 'প্রার্থনা সমাজ' (পশ্চিম ভারতের ব্রাহ্মসমাজ) ত্রাণকার্য সংগঠন করেন। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে একজন কর্মীর মৃত্যু হয়।

১৮৮৫—বীরভূম দুর্ভিক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে ব্যাপকভাবে **একশো গ্রাম** নিয়ে সেবার কাজ সংগঠন করা হয়। এই দুর্গতসেবার কর্মীদের মধ্যে ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ও পরে কংগ্রেসের সভাপতি আনন্দমোহন বসু, ভারতসভার ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহ-সম্পাদক এবং চা-বাগানের শ্রমিকবন্ধু ও 'অবলাবান্ধব' দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চা-বাগানের কুলীদের উপর অত্যাচারের মর্মস্পর্শী কাহিনী সংবলিত গ্রন্থের প্রণেতা (যে-বই তখনকার বড়লাট লর্ড রিপনের হাতে পড়ে ও তিনি যে-বই কুলী আইন সংশোধনের সময় ব্যবহার করেন), সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তেজস্বী প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, নীরব সমাজসেবক ডাঃ নীলরতন সরকার, প্রভৃতি। এই দুর্ভিক্ষ-ত্রাণে ভারত-সভা ও আদি ব্রাহ্মসমাজ সহযোগিতা করেন এবং রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এর তহবিলে অর্থদান করেন। ব্রাহ্মসমাজ থেকে যখন এই সব জনকল্যাণ কাজ হচ্ছে তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন কর্মী সভ্য।

১৮৮৭—ত্রিপুরায় দুর্ভিক্ষে। **১৮৮৮**—ঢাকার দুর্ভিক্ষে।

১৮৯২—ডায়মণ্ড হারবার ও ২৪ পরগণার অন্যত্র প্লাবনে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত, প্রভৃতির দ্বারা সংগঠিত।

১৮৯৩—বিক্রমপুরে। **১৮৯৪**—পুনরায় ঢাকায়।

১৮৯৭—এই বছরে ব্যাপক ভাবে জগদীশপুরে, মহেশমুণ্ডায়, টাঙ্গাইলে ও এলাহাবাদে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক সেবার কাজ সংগঠিত হয়। সমগ্র দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে অনেকগুলি লঙ্গরখানা খোলা হয় এবং দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষার প্রথা চালু করা হয়। ব্রাহ্মসমাজের এই কাজে সাহায্য করবার জন্য পরবর্তী কালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 'ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ' গ্রন্থের প্রণেতা রেঃ ডাঃ জে, টি, সাণ্ডারল্যাণ্ডের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে 'ইণ্ডিয়ান্ ফেমিন্ ব্রাহ্মসমাজ ফাণ্ড' গঠিত হয় এবং ঐ ফাণ্ড থেকে ত্রিশ হাজারের উপর টাকা পাওয়া যায়।

১৯০০—১৯০০ সালে, 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা-বৎসরে, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও রাজপুতানার দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজকে ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে নামতে হয়। এই বারে সর্বপ্রথম এই কাজে আর্যসমাজের সহযোগিতা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক যে-সব লঙ্গরখানা খোলা হয়, তাতে দৈনিক দু'শো থেকে ন'শো দুর্গতকে অন্ন দেওয়া হ'ত। এই দুর্ভিক্ষে আর্যসমাজ যে সব অনাথ বালক সংগ্রহ করেন, ব্রাহ্মসমাজ পাঁচ মাস পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করেন। এই প্রথম বাঙালী কর্মী ইতিহাস-বিখ্যাত চিতোর সহরে গিয়ে বহু রাজপুত দুর্গতদের বাঁচাবার সাহায্য করেন। এবারেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধনাশ্রমের সেবাবিভাগ কর্মী জুগিয়েছিলেন। এবারেও ইংলণ্ডের 'ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন্ ইউনিটেরিয়ান্ এসোসিয়েশন' থেকে সাত হাজার টাকা সাহায্য পাওয়া যায়।

প্রতিষ্ঠান

১৮৬০—'শুভকরী সভা', বালী। ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক ও সুদীর্ঘকাল কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত তত্ত্ববোধিনী সভার বহু সভ্যের দ্বারা স্থাপিত। অন্যান্য কাজের মধ্যে এই সভা দরিদ্রদের সাহায্য দিতেন এবং অক্ষম ও বিধবাদের সাহায্য করতেন।

১৮৬৩—কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা' এই বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা থেকে ঔষধপথ্যাদি দান করা হ'ত।

১৮৬৪—'হিতকরী সভা', উত্তরপাড়া। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তেলিনীপাড়ার অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি তত্ত্ববোধিনী সভার বিশিষ্ট সভ্যদের দ্বারা স্থাপিত। শুভকরী সভার মতো এই সভারও অন্যতম কাজ ছিল দরিদ্র-সেবা, বিধবাদের সাহায্য ও স্ত্রীশিক্ষা।

১৮৭০—এই বছরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক ইতিহাস-বিখ্যাত 'ভারত সংস্কার সভা' ('ইণ্ডিয়ান্ রিফর্ম্ এসোসিয়েশন্') প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালীর এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অবাঙালী ক্রিশ্চান্ লেখক মণিলাল পারেখ বলেন, "...the institution did not only a great deal of good but being *the first of its kind set an example which has been increasingly followed since.*" (Italics mine. PAREKH : *The Brahmo Samaj : A Short History*. p. 101.)

১৮৭২ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একশোর উপর এবং ১৮৯৯ সালের মধ্যে পূর্বে রেঙ্গুন, এবং উত্তর-পশ্চিমে বেলুচিস্থান থেকে দক্ষিণে কইম্বাটুর পর্যন্ত প্রায় সওয়া দু'শো ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলিতে ভারত সংস্কার সভার সমাজসেবার কর্মধারা আংশিকভাবে অনুসরণ করা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সভ্যগণ বাংলার 'ইণ্ডিয়ান্ রিফর্ম্ এসোসিয়েশনের অনুসরণে 'অল্ ইণ্ডিয়া রিফর্ম্ এসোসিয়েশন' স্থাপন করেন। এইভাবে সমাজ-সেবাতেও বাংলার ভাব ও কর্মধারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে "increasingly followed" ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার ভারত সংস্কার সভার কাজ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল : (১) দাতব্য, (২) সুলভ সাহিত্য, (৩) গণশিক্ষা, (৪) স্ত্রীশিক্ষা ও (৫) মদ্যপান-সংযম বা 'টেম্পারেন্স'। দাতব্য বিভাগে কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়, তার মধ্যে কলকাতার উপকণ্ঠে বেহালার চিকিৎসালয়টি প্রধান। ঐ

চিকিৎসালয়ের প্রধানতম কর্মী ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, যিনি পরে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বা জটিয়া বাবা ব'লে প্রসিদ্ধ হ'ন। সুলভ সাহিত্য বিভাগে সারা ভারতে সর্বপ্রথম এক পয়সার সাপ্তাহিক 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি প্রধানতঃ রায়ত (চাষী) ও শ্রমিকদের (মজদুর) জন্য লেখা। কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রভৃতি এর লেখক ছিলেন। গণশিক্ষা বিভাগে শ্রমিকদের জন্য অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়। স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে ফিমেল্ নর্ম্যাল স্কুল বা শিক্ষয়িত্রী ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। মদ্যপান-সংযম আন্দোলন খুব জোরের সঙ্গে চালু করা হয়। বাংলায় ও বাংলার বাইরে শতাধিক ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলির সঙ্গে, বিভিন্ন প্রদেশে, দাতব্য চিকিৎসালয়, দাতব্য ভাণ্ডার, নৈশ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও জনসাধারণের জন্য পাঠাগার, প্রভৃতি স্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষা ও মদ্যপান-সংযম আন্দোলন ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা খুব জোরের সঙ্গে চালু করা হয়। এই ভাবে ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে সমাজ-সেবার বাংলা দেশ থেকে উদ্ভূত বাঙালীর একই ভাবাদর্শ ও কর্মপ্রেরণা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা ভারত বাংলার নেতৃত্ব স্বীকার করতে থাকে। মদ্যপান-সংযম আন্দোলনে 'প্রবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাজ বিলাতের কাগজে প্রশংসার সঙ্গে উল্লিখিত হয়।

১৮৭৭—'পান্ধারপুর ফাউণ্ডলিং হোম এণ্ড অর্ফ্যানেজ' (বোম্বাই)। অনাথাশ্রম। ১৮৭৫ সালে ব্যক্তিগত ভাবে বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের বিশিষ্ট সভ্য লালাশঙ্কর উদিয়াশঙ্কর ত্রিবেদী দু'একটি অনাথ বালক প্রতিপালন সুরু করেন। ১৮৭৭ সালে সরাসরি একটি প্রতিষ্ঠান ঐ অনাথদের নিয়ে প্রার্থনা সমাজের অঙ্গীভূত হয়, 'পান্ধারপুর ফাউণ্ডলিং হোম এণ্ড অর্ফ্যানেজ' এই নামে।

১৮৭৭—'ন্যাশন্যাল এসাইলাম্ ফর্ অর্ফ্যান্স এণ্ড ডেষ্টিটিউট্ চিল্ড্রেন'। অনাথাশ্রম। জাতীয় প্রচেষ্টা হিসাবে অনাথাশ্রমেরও প্রথম পরিকল্পনা বাঙালীর। লাহোর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, উর্দু ও হিন্দী ভাষায় পুস্তক প্রণেতা, পঞ্জাবের অন্যতম বাঙালী নেতা নবীনচন্দ্র রায় ১৮৭৬ সালেই উক্ত অনাথাশ্রমের প্রস্পেক্টস্ প্রকাশ করেন এবং ঘোষণা করেন, ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই অনাথাশ্রমগুলিতে অনাথ বালক-বালিকাদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ভবিষ্যতে স্বাবলম্বনের জন্য অর্থকরী বিদ্যা শেখানো হবে। ১৮৭৭ ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে এই অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে মধ্যপ্রদেশে নবীনচন্দ্র কর্তৃক জমিদার ও প্রজার সমান অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত "ব্রাহ্মগ্রামে" স্থানান্তরিত হয়। ইংরেজী ভাষায় নবীনচন্দ্রের অনাথাশ্রমের পরিকল্পনা বা প্রস্পেক্টস্ বহুল-প্রচারিত হ'বার পরেই প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'পান্ধারপুর ফাউণ্ডলিং হোম্ এণ্ড অর্ফ্যানেজ'-এর সৃষ্টি।

১৮৮০—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লোকহিতের জন্য 'হিতসাধিনী-সভা' স্থাপন করেন।

১৮৮০—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার উইল্ অনুযায়ী চারজন ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত ক'রে অন্ধদের শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেন। ক্যালকাটা ব্লাইণ্ড স্কুলের সূত্রপাত কি এই থেকেই? অনুসন্ধান আবশ্যক।

১৮৮৬—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে দুঃস্থদের সাহায্য দেবার জন্য একটি 'চ্যারিটি ফাণ্ড' স্থাপন করেন। এই ফাণ্ড থেকে মাসে মাসে দুঃস্থ বিধবা প্রভৃতিদের সাহায্য দেওয়া হয়। এ ছাড়া বাঙালীর দ্বারা আরব্ধ নিখিল ভারতীয় "ব্রাহ্ম-সম্মিলনী"র অধীনে একই উদ্দেশ্যে একটি 'অনাথ ভাণ্ডার' আছে।

১৮৯১, ২৭ জুন—'দাসাশ্রম'। একাধারে দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, আতুরাশ্রম বা 'ইনফার্মারি'। সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। **"ভগবানের পুত্র-কন্যাগণের সেবা করিলে প্রকৃত ভগবানের সেবা হয়"** ইহাই দাসাশ্রমের মূল মন্ত্র। "দাসদলভুক্ত প্রত্যেকেরই মানবসেবাই প্রধান ব্রত।" (দাসী, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১২৯৯, পৃঃ ৮)। দু'বছরের মধ্যে শূর্পানগর, শিবহাটি, কোড়ামারা, চেরাপুঞ্জি, নওগাঁ, নলধা ও জালালপুর, বাংলা ও আসামের এই সাত জায়গায় শাখা স্থাপিত হয়। ভগবদ্ভক্ত কর্মীরা রাস্তা থেকে কুষ্ঠ রোগী পর্যন্ত কোলে ক'রে হাসপাতালে নিয়ে আসতেন ও পাছে আত্মপ্রচার হয় ও অহঙ্কার জন্মে এই জন্য তাঁরা নিজেদের নামে পরিচয় না দিয়ে 'দাস' ও 'দাসী' এই নামে আত্মপরিচয় দিতেন। এই জন্যই প্রতিষ্ঠানের নাম 'দাসাশ্রম'। পশ্চিম ভারতের 'সার্ভেন্ট অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র বা 'ভারতের দাস সমিতি' নাম সম্ভবত বাংলার অনুপ্রেরণায়, এই 'দাসাশ্রম' থেকেই। কারণ, বাঙালীর কীর্তি ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ও বিস্তৃতি তখন ভারতের সর্বত্র এবং বোম্বাইয়ের 'অল্ ইণ্ডিয়া রিফর্ম সোসাইটি' আর মহিলা-সমাজ', (এর কথা পরে বলা হয়েছে) প্রভৃতি নামকরণ থেকে দেখা যায় যে, সে-সময়ে নামকরণ বিষয়ে বোম্বাই অনেক সময়ে বাংলা দেশকে অনুসরণ করত। তা ছাড়া, দাসাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখনকার দিনের ভারত-বিখ্যাত বাঙালী আনন্দমোহন বসু এবং দাসাশ্রমের নিজস্ব একটি বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা থাকাতে তার প্রচার ছিল ভারতের সব জায়গায় যেখানে যেখানে বাঙালী থাকতেন, যাঁরা অবাঙালীদের কাছেও দাসাশ্রমের জন্য চাঁদা তুলতেন। সুতরাং দাসাশ্রমের নাম বোম্বাই প্রদেশে ও গুজরাত-প্রভৃতি অঞ্চলে সুপরিচিত ছিল। 'দাস' 'দাসীর' আবরণ ভেদ ক'রে যতদূর জানা যায়, এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন, প্রাণহরি দাস, ইন্দুভূষণ রায়, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী, প্রভৃতি ১৮৯২ সালে দাসাশ্রমের মুখপত্রস্বরূপ 'দাসী' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যা আষাঢ় মাসে। সম্পাদক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বাংলাদেশে এবং খুব সম্ভব সারা ভারতে জনসেবা বিষয়ে এই প্রথম সাময়িক পত্রিকা। 'দাসী'তেই বাংলা ভাষাভাষী অন্ধদের শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক 'ব্রেইল্' প্রণালী অনুযায়ী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ভাবিত সর্বপ্রথম বাংলা বর্ণমালা প্রকাশিত হয়। পরে লালবিহারী সাহ কর্তৃক এর পরিবর্তিত সংস্করণ গৃহীত ও চালু হয়েছে।

১৮৯২—'মহীপৎরাম রূপরাম অনাথাশ্রম।' আমেদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে স্থাপিত। আগে থেকেই ঐ ব্রাহ্মসমাজ থেকে মিল অঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়েছিল। উক্ত অনাথাশ্রমের ১৫০ অধিবাসীকে অর্থকরী শিক্ষা (vocational education) দেওয়া হয়। এর বার্ষিক আয় ছত্রিশ হাজার টাকা।

১৮৯২—'কলিকাতা অনাথাশ্রম' (Calcutta Orphanage)। নববিধান সমাজের ভক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বহু কাজ করেছে।

১৮৯২—'ব্রাহ্ম পরিচর্যাশ্রম'। শিবনাথ শাস্ত্রীর দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে স্থাপিত। ১৮৯৩ সালে নাম বদলে হয় 'সাধনাশ্রম'। এর একটি 'সেবা-বিভাগ' আছে। তার শিক্ষা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে বহু জনহিতকর কাজ হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে, মহাত্মা গান্ধীর অনেক আগে থেকেই, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্য-প্রদেশ, উড়িষ্যা, আসাম, বাংলা, প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাপকভাবে হরিজন আন্দোলন। ১৮৯৭ সালের এলাহাবাদ, মহেশমুণ্ডা, টাঙ্গাইল, প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দুর্ভিক্ষে এই 'সেবা-বিভাগ' অনেক কর্মী জুগিয়েছিলেন।

১৮৯৩—'কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়'। 'ব্রাহ্ম এডুকেশন সোসাইটি'র অধীন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ভক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনিই ছিলেন গোড়ার থেকে আজীবন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। প্রথমে এর ক্লাস বসত সিটি কলেজেই।

১৮৯৩—কুষ্ঠাশ্রম। ১৮৯৩ সালের 'দাসী' পত্রিকা থেকে জানা যায়, দাসাশ্রমের সম্পর্কে একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত হয়েছে (সম্ভবত ১৮৯২ সালে)। পরে দেওঘরে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসুর অনুপ্রেরণায় ও চেষ্টায় একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত হয়।

১৮৯৩—'হীরানন্দ লেপার এসাইলাম।' কুষ্ঠাশ্রম। শুধু বাংলা দেশে নয়, সুদূর সিন্ধু দেশের মাঘোপীর নামক জায়গায় নববিধান সমাজের সাধু হীরানন্দের নামে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা দয়ারাম গিদুমল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই কুষ্ঠাশ্রমে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত সত্তরটি কুষ্ঠরোগীর বাসের ও "Curative bath"-এর বন্দোবস্ত ছিল।

১৮৯৬—'লিটল্ ব্যাণ্ড অফ মার্সি'। ছোটদের মধ্যে সেবার ভাব জাগাবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই সমিতি অনেক কাজ করেছিল। এ ছাড়া, মদ্যপান সংযম আন্দোলন-সম্পর্কে কেশবচন্দ্র 'ব্যাণ্ড অফ হোপ' বা 'আশা বাহিনী' সংগঠন করেন। ব্রাহ্মসমাজের অধীনে বা প্রভাবে চালিত একাধিক স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে 'আশা বাহিনী' গঠিত হয়।

নারীকল্যাণ—বাংলায়

ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে বাংলায় ও বাংলার অনুসরণে বাংলার বাইরে নারীদের মধ্যেও জনসেবার প্রবৃত্তি জাগে। ১৮৭৯ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা 'বঙ্গ মহিলা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষার উন্নতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও এঁদের কর্মসূচীতে ছিল (১) রোগীর শুশ্রূষা করা, (২) বাড়ীর মধ্যে যারা লেখাপড়ায় অনগ্রসর (যেমন ঝি-চাকর প্রভৃত) তাদের পড়ানো এবং (৩) দরিদ্রা নারীদের সাহায্যদান। এই সাহায্য শুধু নগদ টাকা দিয়েই করতেন না, সূচী-শিল্পের দ্বারা নিজেদের শ্রমলব্ধ অর্থেও এই সাহায্য করা হ'ত।

ঐ বছরেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে কেশবচন্দ্র সেন 'আর্য মহিলা সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদেরও অন্যতম কাজ ছিল নারীকল্যাণ ও দরিদ্রসেবা।

বাংলার বাইরে

বাংলার অনুসরণে বোম্বাইয়ের প্রার্থনা সমাজ থেকেও মেয়েরা ১৮৮২ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'আর্য মহিলা সমাজ'। পরিষ্কার বোঝা যায়, কেশবের আর্য মহিলা সভার 'আর্য' শব্দ এবং কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বঙ্গ মহিলা সমাজের 'মহিলা সমাজ' অংশ মিলিয়ে বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের 'আর্য মহিলা সমাজ' প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হয়। খুব সম্ভব বাংলা দেশের ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের এই সংঘবদ্ধ নারীকল্যাণ প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা বাংলা দেশ থেকে বোম্বাই নিয়ে যান পণ্ডিতা রমাবাঈ। কারণ আর্য মহিলা সমাজের কাজের মধ্যে প্রার্থনা সমাজের মেয়েদের সঙ্গে পাওয়া যায় রমাবাঈয়ের নাম। বোম্বাইয়ের এই নারীকল্যাণ প্রতিষ্ঠানটি (১) সন্তানসম্ভবা নারীদের এবং দরিদ্রা জননীদের বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ করতেন, (২) ছাত্রীদের জন্য ছাত্রী-নিবাস খোলেন এবং (৩) Indian Nurses' Social Club প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া বহু জনহিতকর কাজ এঁরা করেছেন। বোম্বাই ছাড়াও ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ফলে ভারতের অন্যান্য অনেক জায়গায় মেয়েদের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় নারীকল্যাণ প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠতে থাকে। এখানেও দেখা যায়, নারীকল্যাণেও বাংলার প্রভাব ভারতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

শ্রমিক কল্যাণ

জাতীয় প্রচেষ্টা হিসাবে মজদুর বা শ্রমিক কল্যাণেরও সুরু বাংলা দেশেই। ধর্মে "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার" বোধ ব্রাহ্মসমাজে গত শতাব্দীর তৃতীয় পাদে খুব প্রবল হওয়াতে শ্রমিকদের কল্যাণের প্রতি ব্রাহ্ম নেতাদের দৃষ্টি পড়ে। ১৮৬৬ সালে বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশব-শিষ্য শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগর মিল শ্রমিকদের জন্য অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় খোলেন, তাঁদের নিয়ে শ্রমিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রমিকদের মধ্যে অপব্যয় বন্ধ করবার জন্য 'আনা-ব্যাঙ্ক' স্থাপন করেন, যা'তে তাঁরা সারা দিনের রোজগার দিনান্তে মিলের বাইরেই ভাটিখানায় খরচ না ক'রে সংসার খরচ হাতে রেখে বাকিটা ঐ ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারেন। সর্বনিম্ন এক আনা পর্যন্ত জমা দেওয়া চলত ব'লে ঐ ব্যাঙ্কের নাম রাখেন 'আনা ব্যাঙ্ক'। প্রথম যেদিন ব্যাঙ্ক খোলা হয়, সেদিন জমা দেবার অভ্যাস চালু করবার জন্য শশিপদ নিজের টাকা থেকে শ্রমিকদের মধ্যে এক আনা ক'রে বিতরণ করেন। ১৮৭০ সালে শশিপদ সস্ত্রীক বিলেত যান। বাঙালী রামমোহন রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়) যেমন প্রথম ভারতীয় ব্রাহ্মণ যিনি কালাপানি পার হ'য়ে বিলেত যান, তেমনি শশিপদের স্ত্রী, ব্রাহ্মণবংশীয়া রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি লোকাচারের শাসন তুচ্ছ ক'রে কালাপানি পার হ'য়ে বিলেত গিয়েছিলেন, সেই সময়ে শশিপদ পার্লামেন্টের মারফৎ ইংলণ্ডের শ্রমিক আইনের মতো ভারতের জন্যও একটি শ্রমিক কল্যাণ আইন পাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সক্ষম হ'ন নি। ফিরে এসে ১৮৭৪ সালে তিনি শ্রমিক কল্যাণের জন্য 'ভারত শ্রমজীবী' (প্রচার, ১৫,০০০) পত্রিকা বার করেন। বরাহনগরে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের

সহযোগিতায় শশিপদ মারফৎ যে মদ্যপান-সংযম আন্দোলন হয় তা'রও উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক কল্যাণ। ঐ আন্দোলনের জের স্বরূপ তাঁকে একবার হাজত বাস করতে হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনের ফলে শ্রমিক অঞ্চলে কোথাও কোথাও ভাটিখানা উঠে গিয়ে সেখানে সাধারণ পাঠাগার হয়। ১৮৭০ সালে কেশব কর্তৃক ভারত সংস্কার সভা প্রতিষ্ঠার পরেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মসমাজ মারফৎ শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতির দ্বারা বাংলা দেশের শ্রমিক কল্যাণ আন্দোলন ভারতের অন্যত্রও অনেক বিস্তৃতি লাভ করে।

বিধবাশ্রম

সতী (বিধবা) দাহ নিবারণ ও বিধবা বিবাহ আন্দোলনের জন্মও যেমন এই বাংলা দেশেই রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রভৃতির হাতে, স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনের দ্বারা বিধবাদের স্বাবলম্বনের জন্য বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠার শুরুও তেমনি এই বাংলা দেশেই। গত শতাব্দীর অষ্টম দশকেই শশিপদ কর্তৃক বরাহনগরে ভারতের প্রথম বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। তা'তে বিধবাদের অর্থকরী বিদ্যা শেখানো হ'ত। এর পরে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে 'হিন্দু বিধবাশ্রম' নামে প্রতিষ্ঠানটি হয়। নোয়াখালির দাঙ্গার পরে এ'টি উঠে এসে বর্তমানে কলকাতার কাছে নিমতায় আছে, শ্রীমতী মনীষা রায়ের তত্ত্বাবধানে। বাংলার দেখাদেখি মাদ্রাজে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরে ভারতের অন্যত্র বহু জায়গায় বিধবাশ্রম হয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীতে গত ষাট বছরে

বর্তমান শতাব্দীতেও গত ষাট বছরের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ 'ধর্মে'র অঙ্গ হিসাবে অবিচ্ছিন্ন ধারায় সাময়িক ত্রাণ ও প্রতিষ্ঠান দুই ভাবেই সমাজ সেবার কাজ ক'রে এসেছেন এবং এখনো করছেন। ১৯০০ সাল থেকেই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ পৃথক্ ভাবে বা মিলিত ভাবে প্রায় প্রতিটি দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, মহামারী, প্রভৃতিতে দুর্গতদের সাহায্য দানের সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গঠনমূলক নীতিতে ত্রাণকার্য ('কন্‌ষ্ট্রাকৃটিভ রিলিফ') সংগঠন করেছেন। এই সব সাময়িক আর্তত্রাণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য (১) গত ১৯৪৩ সালের বাংলার ব্যাপক দুর্ভিক্ষে সেবা সংগঠন ও (২) গত ১৯৫৮ সালে বাংলার ব্যাপক প্লাবনে সেবা সংগঠন।

১৯৪১ সালে বার্মা থেকে বোমাবর্ষণের ফলে আগত উদ্বাস্তুদের, ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরের বন্যায় ও ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষে দুর্গতদের সাহায্যের জন্য ব্রাহ্মসমাজ থেকে সেবা সংগঠন করা হয়। ঐ উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালে নববিধান সমাজ থেকে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর নেতৃত্বে 'নববিধান রিলিফ মিশন' এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে 'ব্রাহ্মসমাজ রিলিফ মিশন' গঠিত হয়। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানই সে সময়ে অপূর্ব কাজ করেছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ব্রাহ্মসমাজ মারফৎ ও প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অর্থ, বস্ত্র, প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপে ছয়টি কেন্দ্রে ও কলকাতার দু'টি কেন্দ্রে কয়েক মাস ধ'রে প্রতিদিন প্রত্যেক লঙ্গরখানায় গড়ে এক হাজার ক'রে আট হাজার দুর্গতদের জন্য লঙ্গরখানা খোলা হয়। এই সব লঙ্গরখানার জন্য মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি থেকে প্রচুর সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। কলকাতায় ও বন্যাপীড়িত অঞ্চলে কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয়, দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র, দরিদ্র মধ্যবিত্ত দুর্গত পরিবারদের জন্য সুলভ শস্যভাণ্ডার, দুর্গত ছাত্রদের জন্য ছাত্রনিবাস, প্রভৃতি খোলা হয়। কম্বল, জামা-কাপড়, প্রভৃতি বহুল পরিমাণে বিতরণ করা হয় এবং গঠনমূলক ত্রাণের জন্য দুর্গত অঞ্চলে সূতা বুনবার জন্য তুলা জোগানো হয় এবং কলিকাতায় সূচীশিল্প কেন্দ্র খোলা হয়, যার দ্বারা দুর্গতরা ভিক্ষার উপর নির্ভর না ক'রে নিজের শ্রমের দ্বারা রোজগার করতে পারেন।

ঐ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা ত্রাণকার্য সংগঠনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৯৪২ সালের বিপ্লব বাংলাদেশে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় খুব জোর হয়। ঐ সব অঞ্চলের বহু অধিবাসী ঐ বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন। ইংরেজ সরকারের কাছে সি. আই. ডি-র কল্যাণে তাঁদের তালিকা ছিল। বন্যা- ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে যে-সব সরকারী রিলিফ অফিসার ছিলেন তাঁদের কাছে সেই তালিকা থাকত এবং সেই তালিকা অনুযায়ী তাঁরা 'সাহায্য তালিকা' তৈরী করতেন, যাতে বিপ্লবী পরিবাররা বঞ্চিত হ'ন বা কম পান। যে-সব রিলিফ প্রতিষ্ঠান কাজ করতে যেতেন তাঁদের পৃথক্ পরিদর্শনের "পরিশ্রম লাঘব করবার জন্য" সেই সব তালিকা দেওয়া হ'ত এবং সেই সরকারী তালিকা অনুসারে সাহায্য দানের "অনুরোধ" জানানো হ'ত। তার নাম ছিল সরকারের সহিত সহযোগিতা। নববিধান রিলিফ মিশন ও ব্রাহ্মসমাজ রিলিফ মিশন উভয়েই এই "অনুরোধ" অগ্রাহ্য করেন এবং নিজেরা গ্রামগুলি পরিদর্শন ক'রে, নিজের চোখে স্থানীয় "সাহায্য দানের" অবস্থা প্রত্যক্ষ ক'রে নিজস্ব তালিকা অনুযায়ী সাহায্য বিতরণ করেন। ফলে, ইংরেজ সরকার কর্তৃক জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর মেদিনীপুরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় এবং ইংরেজ সরকারের 'ব্ল্যাক্-লিষ্ট'-এ ব্রাহ্মসমাজ রিলিফ মিশনের নাম উঠে যায়, যাতে এঁরা সরকারের কাছে বা সরকার-ভক্ত ধনীদের কাছ

থেকে সাহায্য না পান বা কম পান। গ্রাম সংগঠনে উৎসগাকৃত-জীবন নিরুপমা দেবী ও শিশিরকুমার সেনের নেতৃত্বে কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ রিলিফ মিশনের মূল কেন্দ্রে গঠনমূলক ত্রাণ-পরিকল্পনার অন্তর্গত যে সূচীশিল্প কেন্দ্র খোলা হয়, তাতে দুর্গতদের তালিকায় অনেক বিধবা ও অন্যান্য মেয়েদের নাম রাখা হয় যাঁদের স্বামী বা নিকট আত্মীয়েরা ১৯৪২ সালের আন্দোলনে মিলিটারির গুলিতে নিহত হ'ন। সমাজসেবায় ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান্ প্রভৃতি ভেদাভেদ করেন না এবং মনে করেন, অন্যান্য দুর্গতদের মতো 'পলিটিক্যাল সাফারার'রাও দুর্গত অন্যান্যদের মতো দুর্গত-সাহায্য লাভে তাঁদেরও সমান অধিকার আছে। কি অর্থসংগ্রহে, কি সাহায্য দানে, কি কর্মী সংগঠনে ব্রাহ্মসমাজ জাতিধর্মনির্বিশেষে বরাবর সেবার কাজ করেছেন।

বাংলা দেশের গত ব্যাপক জলপ্লাবনে, ১৯৫৮-৫৯ সালে, বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের সম্মেলনে ব্রাহ্মসমাজ রিলিফ মিশন নূতনভাবে পুনর্গঠিত হয় এবং হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান্ বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় ও সমর্থনে বিভিন্ন জেলার অনেকগুলি কেন্দ্রে কাজ হয়। ব্রাহ্মসমাজের রীতি অনুযায়ী রিলিফ মিশনের কর্মীরা সরকারী অথবা বেসরকারী কোনো রিপোর্টের উপর একান্তভাবে নির্ভর না ক'রে প্রয়োজন বোধে এক কোমর জল ভেঙে বা ডিঙ্গি যোগে জলাবদ্ধ গ্রামগুলিতে নিজেরা গিয়ে স্থানীয় অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে সাহায্য-তালিকা তৈরী করেন। সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয় ডাল, আলু, কম্বল, জামা, কাপড়, ঔষধ, প্রভৃতি। গঠনমূলক সাহায্য পরিকল্পনায় করা হয় ধানভানা ও সুতাকাটার ব্যবস্থা।

বর্তমানে, ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে অবস্থিত ব্রাহ্মসমাজে অনেকগুলি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এখানে কেবল কলকাতার কয়েকটির নাম দেওয়া হ'ল :

(১) **'চ্যারিটি ফাণ্ড'**। জাতিধর্মনির্বিশেষে দুঃস্থ, অক্ষম, বিধবা, প্রভৃতিদের এই ফাণ্ড থেকে সাহায্য দেওয়া হয়। বর্তমান সম্পাদক শ্রীজ্ঞানসেবক চট্টোপাধ্যায়। ঠিকানা, সাধারণ ব্রহ্মসমাজ, ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

(২) **ব্রাহ্মসমাজ রিলিফ মিশন**। দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, প্রভৃতিতে সেবা সংগঠনের প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সভাপতি, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু ও অন্যতম সহ-সভাপতি, ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি ও বর্তমানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ। ঠিকানা, ঐ।

(৩) **ব্রাহ্মসমাজ মহিলা ভবন** (কলিকাতা ও কোন্নগর)। দুঃস্থ ও অসহায় মেয়েদের বিভিন্ন অর্থকরী ও সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সামাজিক ও নৈতিক জীবনগঠনে সাহায্য করা হয়। নোয়াখালি দাঙ্গার সময়ে উদ্বাস্তু মেয়েদের নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের শুরু। দর্জির কাজের অর্ডার নেওয়া হয় এবং চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে মেয়েদের দ্বারা সাধারণ্যে বিক্রয়ের জন্য নানা প্রকার আচার প্রভৃতি প্রস্তুত হয় যা'তে যতদূর সম্ভব বিক্রয়লব্ধ অর্থে প্রতিষ্ঠানটি স্বাবলম্বী হ'তে পারে। বর্তমান সম্পাদিকা, শ্রীঅর্চনা মিত্র। ঠিকানা, ঐ।

(৪) **ব্রাহ্মসমাজ বাল্যভবন**। জাতিধর্মনির্বিশেষে পিতৃহীন ও অভিভাবকহীন অল্পবয়স্ক ছেলেদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়বার প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষে অনাথ বালক নিয়ে প্রতিষ্ঠানের শুরু। বর্তমান সম্পাদক, শ্রীসরল দেব। ঠিকানা, ঐ।

(৫) **হিন্দু বিধবাশ্রম, নিমতা**। (পূর্বে উল্লিখিত)।

(৬) **দাতব্য চিকিৎসালয়** (হোমিও)। ঠিকানা ব্রাহ্ম সম্মেলন সমাজ, ৯ ডক্টর রাজেন্দ্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

এ ছাড়া (ক) বাংলায় ও বাংলার বাহিরে অনেকগুলি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে দাতব্য চিকিৎসালয়, নৈশ বিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার, বালিকা বিদ্যালয়, প্রভৃতি এবং (খ) দু'শোর উপর (কয়েক লক্ষ টাকার মতো) ট্রাস্ট ফাণ্ড আছে, যার আয় থেকে বিবিধ সমাজ-সেবার কাজ করা হয়।

ব্রাহ্মসমাজে সমাজ-সেবার বিবরণ 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' (ইংরেজী, ১৮৮৩ সনে প্রতিষ্ঠিত) ও 'তত্ত্বকৌমুদী' (বাংলা, ১২৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত) এই দুই সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়, ও সমস্ত হিসাবপত্র চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট কর্তৃক পরীক্ষিত হয়ে সাধারণ ব্রহ্মসমাজের বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণীতে প্রকাশিত হয়।*

---

* গ্রন্থপঞ্জী : প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'বাংলার নারীজাগরণ'; যোগানন্দ দাস, 'বাংলার জাতীয় ইতিহাসের মূল ভূমিকা বা রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন'; সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও সরোজেন্দ্রনাথ রায়, 'ব্রাহ্মসমাজ, দি ডিপ্রেস্‌ট ক্লাসেজ এণ্ড আন্‌টাচেবিলিটি' (ইংরেজী); 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার'; 'তত্ত্বকৌমুদী'; 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'; 'ধর্মতত্ত্ব' 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন্'; 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক কার্যবিবরণী'।

পুরবৈঁয়া

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা সুন্দর একটি বাংলো।

ধরিত্রী বুঝলে, ভদ্রমহিলা ধনীর গৃহিণী। পদস্থ কোনো রাজকর্মচারীর, কি অমনি কারও।

সামনে মনোরম ফুল-বাগান। ডিম্বাকৃতি একটি সবুজ 'লন'। তাকে বেষ্টন ক'রে অনতিপ্রশস্ত লাল রাস্তা। গাড়ীবারান্দায় একখানা মোটর দাঁড়িয়ে। হয়ত সাহেব এখনই ফিরলেন, কি হয়ত কোথাও বেরুবেন।

ওরা ফটকে ঢুকতেই বারান্দার সিঁড়ির মাথায় দুটো প্রকাণ্ড এ্যালসেশিয়ান কুকুর এমন সগর্জনে অভ্যর্থনা জানালে যে, ধরিত্রী থমকে দাঁড়াল।

ভদ্রমহিলা কুকুর-দুটোকে ধমক দিলেন। পিছনে চেয়ে ধরিত্রীকে বললেন, ওরা কিছু বলবে না। চ'লে আসুন।

ধরিত্রী পিছন পিছন চলল, বারান্দায়, সেখান থেকে ড্রইং রুমে। একটা সোফায় বসল।

কুকুর-দুটোও ওর পিছু পিছু এসে সোফার দু'পাশে দাঁড়াল, অত্যন্ত ভয়ংকর ভাবে। ধরিত্রী ওদের দিকে চাইতে সাহস করলে না। যেন ওরা নেই এমনিভাবে দুরু দুরু বক্ষে অন্যদিকে চেয়ে রইল।

বেশ ত ছিল মন্দিরে। ভদ্রমহিলার কথায় ভালো আহার্য ও আশ্রয়ের লোভে কেন যে সে এখানে এল, ভাবতে তার মনে অনুতাপ হচ্ছিল। ভদ্রমহিলাই বা বাড়ীতে দুটো ভয়ংকর কুকুর আছে জেনেও একটা অদ্ভুত বেশধারী সন্ন্যাসীকে আহ্বান ক'রে কেন নিয়ে এলেন, ভেবে ভদ্রমহিলার উপর তার রাগই হচ্ছিল। নিয়ে এলেনই যদি, ওকে এমনি দুটো হিংস্রদর্শন জন্তুর জিম্মায় রেখে চ'লে গেলেন কোথায়?

মিনিট পনেরো এমনিভাবে কাটল। ঠিক যেন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

সে একটা আশ্চর্য অনুভূতি!

মনে হ'ল সে বেঁচে নেই। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় মৃত। যেখানে ভয় নেই, ভরসাও নেই এমনি একটা শূন্যে দোল খাচ্ছে!

রাস্তার মধ্যে যদি হঠাৎ দু'দিক্ থেকে দুটো পুলিশ এসে তার দু'পাশে দুটো রিভলবার নিয়ে দাঁড়াত, এ অনুভূতি তাহলেও আসত কি না সন্দেহ। পুলিশ আর যাই হোক, মানুষ। তার কার্যকলাপ, মনোভাব পরিচিত। কিন্তু জানার মধ্যে ভয়, সে একরকম। অজানার মধ্যে ভয় অন্যরকম।

এমনি কাটল পনেরো মিনিট।

তার পরে গৃহিণী এলেন। পিছনে ঠাকুরের হাতে একটা পাথরের রেকাবীতে কিছু ফল-মিষ্টি।

টেবিলের উপর সেগুলো রেখে পাশের একটা চেয়ারে তিনি বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, চা খান ত?

ধরিত্রী ওঁর মুখের দিকে চাইলে। অপূর্ব সুন্দর একটি মাতৃমূর্তি। বিদেশে, এই শ্রেণীর বাংলোয় 'মেমসাহেব' নামে অভিহিত যে শ্রেণীর মহিলার রং-করা মুখ তার চোখে পড়েছে, সে শ্রেণীর নয়।

রং খুব উজ্জ্বল নয়, বরং একটু চাপা। দেহ ঈষৎ স্থূল। ভরন্ত মুখে পাউডারের চিহ্ন নেই। কোমল আয়ত দুই চোখ থেকে স্নেহ যেন ঝ'রে পড়ছে। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছে।

ভদ্রমহিলাও দেখলেন, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ এবং প্রচুর দাড়ি সত্ত্বেও ধরিত্রীর বয়স ত্রিশে পৌঁছুতে এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে।

ধরিত্রীর সাহস এল। বললে, তার জন্যে আপনাকে যদি উঠতে হয়, তাহলে চা খাই না।

—তার মানে?

—তার মানে,—মুখ না ফিরিয়েই চোখের ইঙ্গিতে কুকুর-দুটিকে দেখিয়ে ধরিত্রী বললে,—এই দুটির জিম্মায় আমাকে একলা ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না।

ভদ্রমহিলা এবারে হেসে ফেললেন। বললেন, আমি জানতাম সন্নিসীদের ভয় নেই।

—আমিও তাই জানতাম। এখন জানলাম, অন্তত কুকুর সম্বন্ধে আছে।

—বাঘের সম্বন্ধে?

—এখন পর্যন্ত ত নেই।

—সামনে পড়লে কি হবে জানেন না।

—না।

ঠাকুর তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে চায়ের জন্যে ব'লে ভদ্রমহিলা বললেন, তাহলে বইতে তপোবনের কথা যা পড়েছি,—বাঘে-হরিণে খেলা করছে,—সে কোথায়?

—বইতে। আর বোধ হয় কল্পনায়।

—আর কোথাও নেই?

—আমি ত দেখিনি। আমি দেখেছি সর্বত্র হিংসা।

—তাই বটে।

ভদ্রমহিলা কি যেন কিছুক্ষণ আপন মনে চিন্তা করতে লাগলেন। সম্বিৎ ফিরে আসতে ডাকলেন, মহারাজ!

ধরিত্রী হাত জোড় করলে,—আমাকে মহারাজ ব'লে অপরাধী করবেন না। আমি আপনার সন্তান।

—তবু সন্ন্যাসী ত। সন্ন্যাসী কারও পিতা নয়, সন্তান নয়, ভাই নয়, বন্ধু নয়। শুধু সকলের গুরু।

কাতর কণ্ঠে ধরিত্রী বললে, কিন্তু আমার সন্ন্যাস আবরণ মাত্র। সন্ন্যাসের কিছুই আমি জানি না।

কথাটা দ্ব্যর্থবোধক। ভদ্রমহিলা কিন্তু বিনয় অর্থেই গ্রহণ করলেন। বললেন, বেশ, তাই হবে। তুমি আমার সন্তান। তোমাকে পেয়ে আমার কুল পবিত্র হ'ল। রাত্রে তোমার খাবার কি ব্যবস্থা করি বল।

—যা হবে তাই। আমার জন্যে পৃথক্ কিছু করার দরকার নেই।

ভদ্রমহিলা হাসলেন।—পৃথক্ ব্যবস্থাই করতে হবে। এ বাড়ীতে যা হয় তা তোমার চলবে না। বল কি খাবে?

ধরিত্রী বললে, তাহলে মাছের ঝোল আর ভাত। বাংলা দেশ ছেড়ে পর্যন্ত খাইনি।

—বেশ তাই হবে।

তখনই ড্রইং রুমের ভিতর দিয়ে গৌরকান্তি দীর্ঘকায় ইংরাজি-পোষাকপরিহিত একটি ভদ্রলোক কোনোদিকে না চেয়ে মোটরে গিয়ে বসলেন।

ভদ্রমহিলা অন্যমনস্কভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটু পরে আবার বললেন, বেশ তাই হবে।

ভদ্রমহিলা, নাম সুললিতা, কেন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, রাত বারোটার মধ্যেই ধরিত্রী নিজের শয়নকক্ষের ভিতর থেকেই তার ইঙ্গিত পেলে যখন পানোন্মত্ত অবস্থায় মেজর দত্ত ফিরলেন।

অনেক দিন পরে নরম বিছানা পেয়ে ধরিত্রীর জোর ঘুম এসে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা মোটা গলার চীৎকারে এবং অনেকগুলো কাঁচের বাসন পড়ার শব্দে সে চমকে উঠে বসল।

কি ব্যাপার! ডাকাত পড়ল না কি?

ধরিত্রী তার ঝুলি থেকে রিভলবারটা বার করতে যাচ্ছিল। এমন সময় সুললিতার গলা পাওয়া গেল:

আর না। যথেষ্ট হয়েছে! অনেক বাসন ভেঙেছ! চল, শোবে চল।

মেজর দত্ত—ডাকাত নয়, নিশ্চয়ই মেজর দত্ত,—মনে হ'ল গলা একটু নামল। অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে ইংরিজিতে আরও গালাগালি দিতে দিতে, বোধ হয় সুললিতার পিছু পিছু, শোবার ঘরে চ'লে গেলেন।

ধরিত্রী খুব ভোরে ওঠে, কিন্তু সুললিতা আগেই সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, রাত্রে দুটো কুকুরই ছাড়া থাকে। অপরিচিত অতিথির একা ওঠা নিরাপদ্ নয়। তাদের ভয়ে চাকর-বাকর ওঠবার আগে উঠতে সাহস করছিল না।

একটু পরে চাকর কুকুর-দুটোকে বাঁধতে বাইরে বেরিয়ে এল। প্রাতঃকৃত্য সেরে বাগানে পায়চারী করতে লাগল।

আশ্চর্য মানুষের জীবন!

কখন কোথায় থাকবে, কি অবস্থায় থাকবে কেউ জানে না। কে জানত, কাল রাত্রে তার জন্যে ডেরাডুনের একটি মনোরম বাংলোয় তার বিছানা পাতা রয়েছে! কোথায় কলকাতার দুর্দান্ত বিপ্লবীজীবন। আহার কখনও জোটে, কখনও জোটে না। এক পকেটে নিজের প্রাণপক্ষী আর অন্য পকেটে রিভলবার নিয়ে জরুরী কাজে সকল সময় ঘোরা। যত বাঁচা, ভয়ংকর ভাবে বাঁচা। কালবৈশাখীর মতো বাঁচা। রুদ্রভৈরবের মতো বাঁচা।

আর শৈলপুরী এই ডেরাডুন। শান্ত, মন্থর এর জীবনযাত্রা। যেন হিমালয়ের ছায়ায় ধ্যানমগ্ন। এইখানে এসে সে মা পেয়ে গেল, আশ্রয়ও পেয়ে গেল।

ধরিত্রী পিছনের দিকে চাইলে। শান্ত, সুন্দর, ছবির মতো একটি বাংলো। অথচ কাল মধ্যরাত্রে, এবং বোধ করি প্রতি মধ্যরাত্রেই, এর ধ্যান ভেঙে যায়। তাণ্ডব শিবনৃত্য আরম্ভ হয়ে যায়।

কেন?

মেজর দত্তের মদ্যপান?

অথচ আর একটু পরেই তিনি উঠলেন। সদ্য ক্ষৌরীকৃত, প্রশান্ত গম্ভীর মুখ। সে মুখে গত রজনীর উন্মত্ততার চিহ্নমাত্র নেই। কোনো দিকে না চেয়ে অফিসঘরে চ'লে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বাবুর্চি-বেয়ারাদের মধ্যে তাড়া প'ড়ে গেল। উর্দি প'রে, তকমা লাগিয়ে তারা নিঃশব্দে নানা কাজে ছুটোছুটি করে।

এরা কারা? কোথায় ছিল এতক্ষণ?

দূরে, পিছনদিকে বাবুর্চিখানা। এরা সেইখানেই থাকে। মেজর সাহেবের নিষিদ্ধ খানা সেইখানে রসুই হয়।

গৃহের কর্ত্রী সুললিতা। গৃহসংলগ্ন রান্নাঘরে ঠাকুরের রান্না। ধরিত্রীর রান্না সুললিতার তত্ত্বাবধানে সেইখানে হয়। সুললিতা মাছ খান। কিন্তু মাংস-ডিম-পেঁয়াজ-রসুন স্পর্শ করেন না।

সকালে চাকরদের কাছ থেকে এ খবর ধরিত্রী পেলে। এ বাড়ীতে সন্ন্যাসী হিসাবে তার আগমনই প্রথম নয়। এর আগে আরও অনেক সত্যকার ভারী ভারী সন্ন্যাসী এসেছেন। বাঙালীই বেশী, তবে অন্য প্রদেশবাসী সন্ন্যাসীও অনেক এসেছেন।

যে ঘরে ধরিত্রী কাল রাত্রিযাপন করেছে, ওটা সন্ন্যাসীদের জন্যেই নির্দিষ্ট।

কারও কাছে মন্ত্র নিয়েছেন?

না বোধ হয়।

সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে উপদেশ শোনেন? শাস্ত্র-কথা?

তাও না।

তবে?

সন্ন্যাসী, বিশেষ ক'রে বাঙালী সন্ন্যাসী চোখে পড়লেই তাদের টেনে নিয়ে আসেন। তাঁদের জন্যে প্রচুর আহারের আয়োজন করেন। থাকবার ব্যবস্থা করেন। তার পর একদিন তাঁরা চ'লে যান।

এই?

এই। পূজো-আর্চা, সাধন-ভজন কিছু নয়। শুধু রোজ সন্ধ্যায় মহাদেবজির মন্দিরে যান। ব্যস।

আর সাহেব?

মহাদেবজির মতো। কি বাড়ী, কি অফিসে সাড়া পাওয়া যাবে না। অত্যন্ত গম্ভীর। কাউকে কিছু বলেন না। কিন্তু সবাই ভয় পায়। দোবের মধ্যে যেদিন পার্টি থাকে সেদিন ত কথাই নেই, অন্য দিনও দুপুররাত্রে ফিরে এসে···

সে ত ধরিত্রী নিজের কানেই শুনেছে: ইংরিজি নোংরা গালিগালাজ আর বাসন-ভাঙা।

ব্যস, ওই পর্যন্ত। মা এসে দাঁড়াতেই কেঁচো। সুড় সুড় ক'রে তাঁর পিছু পিছু শোবার-ঘরে চ'লে যাবেন।

ছেলেমেয়ে নেই?

একটি ছেলে। বিলেতে রয়েছে। কি যেন পড়তে গেছে।

তা যাক। কিন্তু মেজর ও মিসেস দত্ত আশ্চর্য একটি দম্পতি। একজন আহারে-পোশাকে আচার-ব্যবহারে ইউরোপীয়। আর একজন শুদ্ধাচারী হিন্দুরমণী। পরস্পর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্মী। অথচ মধ্যরাত্রের ঘটনাটুকু ছাড়া দিনরাত্রির অবশিষ্ট সময়ে দাম্পত্য-জীবন সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব!

চাকরটা বললে, ব্যস, ওই পর্যন্ত। সত্যই কি ওই পর্যন্ত? তার পরে আর কিছু নেই? কে জানে আর কিছু আছে কি না। ধরিত্রীর এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু তার মনের উপর কি যেন একটা ভারী জিনিস চেপে বসেছে। ওঁদের সম্বন্ধে, বরং বলতে হয় মিসেস দত্তের সম্বন্ধে ভাবতে তার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়ল।

সুললিতার সঙ্গে যখন দেখা হ'ল তখন তিনি পূজোর ঘর থেকে বেরিয়ে ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন। বোধ হয় কলতলায়। হাতে পূজোর থালা-বাসন। সেইগুলো মাজতে যাচ্ছেন। পরিধানে তাঁর চওড়া লাল-পাড় গরদের শাড়ি। পিঠে ভিজে এলোচুল গেরো দিয়ে বাঁধা। সদ্য স্নানে গায়ের রং ঝক ঝক করছে।

ধরিত্রীকে চলতে চলতে ব'লে গেলেন, আপনি যেন বাইরে যাবেন না। দর্জিকে খবর পাঠিয়েছি, সে এখুনি এসে মাপ নেবে।

—মাপ! কিসের মাপ?

—আপনার পাঞ্জাবীর।

তিনি কলঘরে ঢুকে গেছেন।

ধরিত্রী ড্রইং রুমে গিয়ে বসতেই এ্যালসেশিয়ান দুটি দু' পাশে পাহারায় এসে বসল। একটু পরে ঠাকুর এল একটি রেকাবিতে জলখাবার নিয়ে। চাকর পিছু পিছু জলের গ্লাসটা নামিয়ে দিয়ে গেল। একটু পরে চা নিয়ে এল।

খাওয়া শেষ হতেই কালো জোব্বা-পরা শ্বেতশ্মশ্রু দর্জি এল। পাঞ্জাবীর মাপ নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে চ'লে গেল।

কলের মতো কাজ।

ধরিত্রী উঠতে পারে না। দু'পাশে কুকুর দুটো নড়ে না। তাদের শান্ত করবার জন্যে ধরিত্রী দু'টুকরো খাবার দুজনের জন্যে মেঝেয় ফেলে দিয়েছিল। ছোঁওয়া দূরে থাক, খাবারের দিকে কুকুর দুটো চাইলে না পর্যন্ত। বরং কি রকম যেন চাপা গোঁ গোঁ শব্দ করলে, যা ধরিত্রীর কাছে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হ'ল না। ভয়ে সে আরও শক্ত হয়ে গেল!

এই অবস্থায় সুললিতা ফিরলেন। পরণে সাদাসিধে একখানা শাড়ি। প্রশান্ত মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা। ধরিত্রীর পাঞ্জাবীর দিকে চেয়ে বললেন, ওরকম রঙের কাপড় বোধ হয় পাওয়া যায় না। ছুপিয়ে নিতে হয়, না?

—হ্যাঁ।

—দর্জিকে বললাম! সে তো ঘাড় নেড়ে চ'লে গেল। কি করবে কে জানে।

সুললিতা হাসলেন: আপনার জুতো জোড়াও কি গেরুয়া রঙে ছোপানো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ধরিত্রী খুব লজ্জা পাচ্ছিল। জুতো জোড়ার আর কিছু নেই। এই রকম সুসজ্জিত ড্রইংরুমে কার্পেটের উপর দিয়ে চলবার যোগ্যতা হারিয়েছে।

সুললিতা বললেন, আজ বিকেলে ওরও ব্যবস্থা করতে হবে।

কুণ্ঠিত ভাবে ধরিত্রী বললে, না, না। এখনও কিছুদিন চলবে।

মুচকি হেসে সুললিতা বললেন, তখন আমাকে পাবেন কোথায়?

ধরিত্রীও হাসল। বললে, ভারতবর্ষে সব কিছুই দুর্লভ বটে, কিন্তু একটি জিনিস অত্যন্ত সুলভ: মা। এখানকার পথে-ঘাটে মা ছড়ানো রয়েছেন।

ব'লেই ধরিত্রী এবং সেই সঙ্গে সুললিতাও কেমন গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

সুললিতা চিন্তা করছিলেন, তাই বটে। ভারতবর্ষের মেয়েরা যেন শুধু মা, আর কিছু নয়।

ধরিত্রী ভাবছিল, শুধু মা নয়, প্রিয়াও ছড়ানো। কারো চোখে অফুরন্ত স্নেহ, কারো বুকে অনন্ত প্রেম।

সুললিতা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাপ-মা আছেন?

—আছেন।

—তাঁদের ছেড়ে আসতে তোমার কষ্ট হ'ল না?

—হয়েছে বই কি।

—তবে এলে কি ক'রে?

—ইচ্ছে ক'রে কি কেউ আসে মা। আসতে হয়।

ধরিত্রীর গলার স্বরটা ভারী শোনাল।

সুললিতা কিন্তু রেগে গেলেন। বললেন, কেন, আসতে কি কেউ মাথার দিব্যি দিয়েছিল?

ওঁর রাগ দে'খে ধরিত্রী হেসে ফেললে। বললে, দিব্যি কেউ দেয় না মা। তবু ছেলেকে মায়ের কোল ছেড়ে যেতে হয়।

—কেন হয়?

—কি জানি মা, কিন্তু হয়। আপনার ছেলেকে বিলেত যেতে হয়েছে। কেন হয়েছে?

—সে গেছে পড়তে। আবার ফিরে আসবে।

—আমি বেরিয়েছি অন্য জিনিসের খোঁজে। হয়ত আর ফিরব না। ব্যাপারটা কিন্তু একই।

—তুমি ফিরে যাও বাবা। তাঁরা কত কষ্ট পাচ্ছেন।

সুললিতা আঁচলে চোখ মুছলেন। ধরিত্রী নিঃশব্দে ব'সে রইল। বোধ করি মনে মনে একটু হাসলও।

জটা এবং দাড়ি কামিয়ে, নতুন গৈরিক প'রে ধরিত্রীর চেহারা বদলে গেল। যেন কমনীয়-কান্তি নবদীক্ষিত তরুণ সন্ন্যাসী।

সুললিতা খুশী হয়ে বললেন, দেখ দেখি বাবা, কি চেহারা কি ক'রে রেখেছিলে! যদি ফেরবার পথ থাকে, আমি তোমার মা, আমি বলছি, বাড়ী ফিরে যাও।

সুললিতার কথায় ধরিত্রী অত্যন্ত ম্লান ভাবে হাসল। বললে, ফেরবার পথ নেই মা।

—তা হলে আর কি হবে।

সুললিতা যেন রাগ ক'রেই চ'লে গেলেন।

আবার সে একা। দু' পাশে এ্যালসেশিয়ান দুটির কড়া পাহারা!

এ ত বড় মুশকিল!

এ ক'দিন সে কুকুর দুটির দিকে চাইতেই সাহস করে নি। আজ একবার আড়ে-আড়ে চাইলে। নির্বিকার মুখ। নির্লিপ্ত দৃষ্টি।

কি মনে হ'ল, অতি সন্তর্পণে ডানদিকের কুকুরটার গায়ে হাত দিলে। কুকুরটা বিরক্তিসূচক কোনো শব্দ করলে না। বরং যেন তার গা ঘেঁষে ঈষৎ স'রে এল।

ধরিত্রী ভরসা পেলে। তার মন থেকেও কুকুর দুটি সম্বন্ধে বিরূপতা এবং ভয় কিছু ক'মে এল। এবারে সস্নেহে হাত বুলোতে লাগল। কুকুরটা মাথাটা তার হাঁটুর উপর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে সেই স্নেহস্পর্শ যেন অনুভব করতে লাগল।

হঠাৎ তার মনে হ'ল বাঁ দিকে পায়ের কাছে কি যেন খস খস করছে। চমকে চেয়ে দেখে বাঁ দিকের এ্যালসেশিয়ানটিও তার পায়ের কাছে ঘেঁষে এসেছে।

মন্দ নয়।

ধরিত্রী সস্নেহে তারও পিঠে হাত বুলোতে লাগল।

সকলের কাজ আছে, শুধু ধরিত্রীরই কাজ নেই। আর কাজ নেই এ্যালসেশিয়ান দুটির। সুতরাং দেখতে দেখতে তিন বেকারের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জ'মে গেল।

ধরিত্রী সোফায় বসলে ওরা দুটিতেও সোফার উপর তার দু'পাশে বসে। ধরিত্রী বাগানে বেড়াতে বেরুলে তারাও পিছু পিছু ঘোরে। ধরিত্রী বাইরে বেরুলে ওরা সঙ্গে যেতে পারে না। যতক্ষণ সে না ফেরে ততক্ষণ অস্থির ভাবে ঘর-বার করে আর এক রকম গোঁ গোঁ আওয়াজ করে। বোঝা যায়, ওদের মন খুশী নয়, বিরক্ত হয়েছে। ধরিত্রী ফিরলেই দু'টিতে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে একসঙ্গে চীৎকার করে।

ভাবটা, আমাদের ফেলে রেখে এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কাজটা ভালো হয় নি। আমরা খুব বিরক্ত হয়েছি।

ওদের বিভিন্ন রকম ডাকের অর্থ যেন ধরিত্রী বুঝে গেছে।

ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর ক'রে ধরিত্রী বলে, খুব রেগে গেছিস, না রে? একটু বেশি দেরি হয়েছে। ভেরি সরি।

কুকুর দুটো ল্যাজ নাড়ে।

তার অর্থ, রেগেছিলাম। কিন্তু তোকে দে'খে এখন আর রাগ নেই।

ধরিত্রী লক্ষ্য করলে, দুই বন্ধুর মধ্যে হিংসারও অভাব নেই। অন্যমনস্ক ভাবে একজনকে আদর করলে অন্যজন ঈর্ষান্বিত হয়। এক রকম ঘড় ঘড় আওয়াজ করে। সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রী সচেতন হয়। তাকেও আদর করে।

কিন্তু এত বন্ধুত্ব সত্ত্বেও ধরিত্রীর হাতে ওরা খায় না। সুললিতা ছাড়া কারুও হাতেই খায় না। ক্ষুধা পেলেও না। তখন সুললিতার পিছু পিছু ঘুরবে।

সুললিতা হেসে বলেন, এই এক আমার 'ভরতের হরিণশিশু' হয়েছে, জানলে বাবা। ছেলেকে ছেড়ে দিব্যি রয়েছি। কিন্তু এদের ছেড়ে একটা দিনও বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। না খেয়ে ম'রে প'ড়ে থাকবে, তবু কারও দেওয়া খাবার ছোঁবে না!

ধরিত্রী বলে, সত্যি। ভারী মায়াবী। আমাকে ত দিনরাত্রি নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কাল রাত্রে কি করেছি জানেন?

—কি করেছ?

—মেঝেয় শুতে হয়েছে।

—সে কি?

—হ্যাঁ। খাটটা তিন জনের পক্ষে ছোট। দু'জন শোবারও উপায় নেই, অন্যটা রেগে যাচ্ছে!

সুললিতা হাসতে লাগলেন: তাই নাকি? আহা রে! আজ তিনজনেরই ব্যবস্থা করব।

ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু এ ব্যবস্থার মানে কি? কোথাও যার বেশিদিন থাকা নিরাপদ নয়, তার জন্যে ব্যবস্থা করার অর্থ হয় না। যাত্রার সঙ্গী খুঁজতে একদিন সন্ধ্যায় ধরিত্রী মহাদেওজির মন্দিরে গেল। ওখানে প্রায়ই সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। অমনি একটা দলের সঙ্গে জুটতে পারলে সুবিধা হয়। পুলিশের দিক্ থেকে, এবং অন্যান্য সমস্ত দিক্ থেকেই নিরাপদ্ হওয়া যায়।

দু'তিন দিন ঘুরতেই একটা দল পাওয়া গেল। 'পূরব' যাবে। ব্রহ্মহ্রদে স্নানান্তে পুণ্যসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে।

"ব্রহ্মহ্রদে গিয়া স্নান করহ ত্বরিত।
তবে ত হাতের টাঙ্গি হইবে স্খলিত॥"

ধরিত্রী ভাবলে, সেই ভালো। এদের সঙ্গেই যাওয়া যাক। যেখানে পরশুরামের হাতের টাঙ্গি স্খলিত হয়ে তাঁর

মাতৃহত্যা-জনিত পাপের স্খালন হয়েছিল, ততদূর যেতে পারে ভালোই, না পারে তাতেও ক্ষতি নেই। কাল সকালেই সন্ন্যাসীরা যাত্রা করবেন।

ধরিত্রী খুশী হয়ে ফিরে এল বটে, কিন্তু সুললিতাকে বলতে আর পারে না। অথচ না বললেও নয়। অবশেষে বললে।

সুললিতা শুনেই চমকে উঠলেন। এর জন্যে যেন তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এ বাড়ীতে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী এসেছেন-গেছেন। যখনই তাঁরা এসেছেন তখনই সুললিতা জানতেন তাঁরা যাবেনও। কাল না যান, পরশু যাবেন। কিন্তু ধরিত্রীর ব্যাপারটা কি ক'রে যেন স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। সেও যে একদিন যাবে একথাটা তিনি যেন ভাবেনই নি।

কিন্তু তিনি বাধাও দিলেন না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে যেন ধাক্কাটা সামলালেন। বুঝলেন, ধরিত্রী এখানে থাকতে আসে নি। তাকে যেতে হবে। কালকের দিনটা আটকালে পরশু ছেড়ে দিতে হবে।

শুধু বললেন, বেশ।

জিজ্ঞাসা করলেন, কখন যাবে?

—কাল ভোরে।

আবার বললেন, বেশ।

ব'লে নিজের কাজে চ'লে গেলেন।

ধরিত্রীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। এতক্ষণ তার দুশ্চিন্তা ছিল, কি ক'রে কথাটা সুললিতার কাছে পাড়বে, কি ক'রে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি আদায় করবে। কিন্তু অত্যন্ত সহজে অনুমতি যখন পাওয়া গেল, ধরিত্রীর মনটা তখন খারাপ হয়ে গেল। এত সহজে ছাড়া পেতে যেন সে চায় নি।

আবার সে গেল মন্দিরে। সন্ন্যাসীদের ব'লে এল, সে ভোরেই এসে পৌঁছবে। ওঁরা যেন তার জন্যে একটু অপেক্ষা করে। ও নিশ্চয়ই আসবে।

ঘুম থেকে উঠেই ধরিত্রী ষ্টোভ জ্বলার শব্দ পেল। তখনও অন্ধকার রয়েছে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে, রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। ষ্টোভের আওয়াজও সেইখান থেকেই আসছে। একটা চাকর ঘোরাফেরা করছে। আর একখানা শাড়ির কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে। সুললিতা নিশ্চয়ই।

ধরিত্রীর বুকের ভিতরটা ধবক্ করে উঠল। ষ্টোভ জ্বলছে। এত ভোরে সুললিতা নীচে। সাহেব কি অসুস্থ?

ভয়ে ভয়ে ধরিত্রী রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

একবার অপাঙ্গে ওর দিকে চেয়েই বললেন, হাত-মুখ ধুয়ে এস। তোমার খাবার তৈরি।

তবু ভালো। অসুখ নয়। তারই জন্যে সুললিতা উঠেছেন এত ভোরে।

তৈরি হয়ে নিতে ধরিত্রীর মিনিট পনেরো লাগল। যে টেবিলে সে খায়, যে টেবিলে এই ক'দিন ধ'রে খাচ্ছে, সেই টেবিলে তার চা এবং খাবার দেওয়া হয়েছে।

যে চেয়ারে সে বসে তার দু'পাশে এ্যালসেশিয়ান দু'টি ইতিমধ্যেই আসন গ্রহণ করেছে। সামনে সুললিতা।

ধরিত্রী চোরের মতো বসল নিজের চেয়ারে। কারও মুখের দিকে চাইবার সাহস নেই। চ'লে যাওয়াটা যেন কত বড় অপরাধ।

কিছুক্ষণ পরে কুকুর দু'টির দিকে চাইলে।

সুললিতা হেসে বললেন, ওরা বুঝতে পেরেছে তুমি চ'লে যাচ্ছ।

ধরিত্রী চমকে উঠল। এতক্ষণ ধ'রে সে শুধু সুললিতার কথাই ভেবে এসেছে। ওদের কথা একবারও মনে হয় নি।

বললে, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। কতবার এখান থেকে সরাতে চাইলাম, দু'টোর একটাও নড়ল না।

—আশ্চর্য! কি ক'রে বুঝলে?

—কি জানি। বোধ হয় যেমন ক'রে বোবা ছেলেরা বোঝে তেমনি ক'রে। কাল থেকেই দেখছি, ওদের মন ভালো নেই।

জন্তুদের চেয়ে মানুষ অনেক বেশী নিষ্ঠুর।

সুললিতা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, জন্তুদের চেয়ে মানুষ অনেক বেশী নিষ্ঠুর।

ধরিত্রী কথা বললে না। তার সংস্কার বলছে, বিপ্লবীকে কাঁদতে নেই, মনের মধ্যে মায়িক দুর্বলতার স্থান নেই। কিন্তু মন সে কথা মানছে না। চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। মাথা তুলতে পারছে না।

পাহাড়ের চুড়ার উপর থেকে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। দূরে দু'টি-একটি পাখী ডাকতে সুরু করেছে।

সুললিতার পায়ের ধুলো নেবার জন্যে ধরিত্রী উঠল।

তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে সুললিতা বাধা দিলেন: ও কি, ও কি! সন্ন্যাসীর প্রণাম গৃহস্থকে নিতে আছে?

অবরুদ্ধ কণ্ঠে করজোড়ে ধরিত্রী বললে, আমি আপনার সন্তান।

গায়ের গেরুয়ার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে বললে, এটা খোলস মাত্র।

—তা হোক, তা হোক।—দু'পা পিছিয়ে গিয়ে সুললিতা বললেন, খোলসটাও সামান্য নয়।

ধরিত্রী কুকুর দু'টির দিকে চাইলে। ধরিত্রী উঠতেই তারাও উঠে দাঁড়িয়েছে। কেমন যেন চনমনে ভাব। একটা অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ উঠছে তাদের কণ্ঠ থেকে। লেজ নড়ছে ঘন ঘন।

ধরিত্রী সুললিতাকে বললে, এদের সরিয়ে দেওয়া যায় না?

—দেখি।

সুললিতা উঠলেন।

সাধারণত তিনি উঠলেই কুকুর দু'টো ওঠে। তাঁর পিছু পিছু ঘোরে। আজ কিন্তু তাঁর দিকে চাইলও না। শুধু ধরিত্রীর দিকে চায়, অস্ফুট শব্দ করে আর লেজ নাড়ে।

ধরিত্রী তাদের গায়ে স্নেহভরে হাত বুলোতে লাগল।

আর যায় কোথায়? তারা উদ্দাম হয়ে উঠল। দুই-পা ধরিত্রীর বুকের উপর পর্যন্ত প্রসারিত ক'রে কেমন এক রকম আর্তনাদের মতো শব্দ করতে লাগল।

হতাশভাবে ধরিত্রী ব'সে পড়ল। যাওয়া বুঝি হয় না।

তাকে এই বিঘ্ন থেকে উদ্ধার করবার জন্যে সুললিতা তাদের বাকলস্ ধরে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে যেন ভূমিকম্প আরম্ভ হয়ে গেল। তারা মুহুর্মুহু দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দরজা ভেঙে পড়বার মতো। নখ দিয়ে আঁচড়ায় আর আর্তনাদ করে।

সুললিতা ভীতভাবে বললেন, আর দেরি ক'রো না। বেরিয়ে পড়।

ধরিত্রী ঝুলিঝাম্পা কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় প'ড়েই প্রায় ছুটতে আরম্ভ করল দুই কানে আঙুল দিয়ে। যখন অনেক দূর চ'লে গেছে তখনও কানে বাজছে কুকুর দুটোর কান্না: আঁউ, আঁউ, আঁউ। আর তার সঙ্গে দেওদারের পাতার শব্দ।

আর,

আর চোখে রুমাল দিয়ে সুললিতা সোফায় ব'সে। চোখের জল রুমালের বাধা মানছে না। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে সর্বদেহ।

তাও যেন শোনা যায়!

দু'পাশে দেওদার বন। উঁচু-নীচু পাহাড়ে পথ। পথ চলেছে পুরবৈঁয়া।

—•—

আমরা আগে একাধিক বার সেন্সাস রিপোর্ট হইতে সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, বঙ্গের বাহিরে ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে যত বাঙালী আছে, বঙ্গে সেই সেই প্রদেশের লোক তদপেক্ষা বেশী আছে। এই কলিকাতা শহরেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক যত আছে, সেই সেই প্রদেশে তাহা অপেক্ষা অনেক কম বাঙালী আছে। বঙ্গের বাহিরে বাঙালীরা যে যে প্রদেশে মোট যত রোজগার করে, সেই সেই প্রদেশের লোকেরা বঙ্গে মোট উপার্জ্জন তার চেয়ে অনেক বেশী করে। বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা বাংলা দেশে যত টাকা পাঠায় বা আনে, বঙ্গ-প্রবাসী ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা বাংলা দেশ হইতে নিজ নিজ প্রদেশে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা পাঠায় ও লইয়া যায়। বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের শতকরা যতজন কর্ম্মস্থানে বাড়ী করিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া আছে, এবং উপার্জ্জিত টাকা তথায় ব্যয় ও সঞ্চয় করিতেছে, বঙ্গ-প্রবাসী অবাঙালীদের শতকরা ততজন বঙ্গে ঘরবাড়ী করিয়া ইহার স্থায়ী বাসিন্দা হয় নাই এবং তাহাদের রোজগারের অধিকাংশ এখানে ব্যয় ও সঞ্চয় করে না।

বাংলা দেশের বাহিরের বাঙালীদের ও বঙ্গ-প্রবাসী অবাঙালীদের মধ্যে আর দুটি প্রধান প্রভেদের উল্লেখ করিব। বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা প্রধানতঃ বিদেশী গবর্ন্মেণ্টের অফিসে, আদালতের আশ্রয়ে ও সম্পর্কে বাংলাদেশ ছাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহারা অনেকটাই পরানুগ্রহ-জীবী। বঙ্গ-প্রবাসী অবাঙালীরা কলকারখানায়, কৃষিক্ষেত্রে, রেলওয়ে ষ্টেশনে, জাহাজঘাটায় ও নৌকায় শ্রমে নিযুক্ত, কিংবা কলকারখানার ও ছোট বড় কারবারের মালিক; সুতরাং তাহারা ততটা বিদেশীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে না। বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদিগকেও এমন সব বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে স্বাবলম্বনের প্রয়োজন। বাঙালীরা বঙ্গের বাহিরে প্রধানতঃ যে সব প্রদেশে গিয়াছেন, সেখানে প্রথম প্রথম তাঁহারাই শিক্ষালয় স্থাপন ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যে নেতৃত্ব বা সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং এখনও এইরূপ সব কাজের সহিত তাঁহাদের যোগ আছে। বঙ্গ-প্রবাসী অবাঙালীরা বাংলার জন্য শিক্ষালয় স্থাপন প্রভৃতি কাজ করেন নাই; তাঁহারা প্রধানতঃ নিজেদের রোজগারের কাজেই মন দিয়াছেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে বিধবাদের, নিগৃহীতা নারীদের ও অনাথ শিশুদের সাহায্যের জন্য এবং হিন্দু সমাজ সংরক্ষণের জন্য অল্পসংখ্যক মাড়োয়ারী অর্থব্যয় করিতেছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাঁহারা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু কলিকাতার অবাঙালী লক্ষপতিদের সংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।

বাংলা দেশে বিস্তর অবাঙালীর আগমনে বাঙালীর চেতনা হইয়াছে বা হওয়া উচিত যে, বাংলা দেশ ধনের খনি, এখানে কাহারও অনাহারে থাকা সম্ভবপর নহে। বাংলা দেশ হইতে যে এত টাকা রোজগার হইতে পারে, তাহা বাঙালীরা জানিত কি? অতএব, বঙ্গে কতপ্রকার রোজগার হইতে পারে, তাহা বঙ্গ-প্রবাসী অবাঙালীদের নিকট হইতে বাঙালীদের শেখা উচিত। অবশ্য এই অবাঙালী উপার্জ্জকরা স্কুল খুলিয়া বাঙালীদিগকে নিজেদের উপার্জ্জনের বিদ্যা ও কৌশল শিখাইয়া দিবে না। কিন্তু বাঙালীদের উদ্যোগিতা ও চেষ্টা থাকিলে তাহারা তাহা আবিষ্কার ও আয়ত্ত করিতে পারিবে। বুদ্ধির অভাব বাঙালীর নাই; কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের অনিশ্চিত লাভের উপর নির্ভর করিবার সাহস, অবিলাসিতা মিতব্যয়িতা ও শ্রমশীলতা বাঙালীকে অর্জ্জন করিতে হইবে। অনেক অবাঙালী এই সব বিষয়ে তাহাদের শিক্ষক হইবার যোগ্য।

প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গ, ভাদ্র, ১৩৩৬ সাল।

কামরাটা মনে হ'ল এক মুহূর্তে সমস্ত ট্রেনটা থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে মানুষের পাতা লাইন থেকে স'রে গিয়ে সমস্ত সময়ের স্রোতেরও বাইরে চ'লে গেছে।

জানলার ওপর হেলান দিয়ে রাখা মাথাটার রুক্ষ চুলগুলো ট্রেনের দৌড়ের আনুষঙ্গিক হাওয়ার ঝাপটায় উড়ছে না, নীহারিকা-লোকের তারাগুঁড়োন শূন্যতাই বুঝি বয়ে যাচ্ছে সমস্ত দেহ-মন চেতনার ভেতর দিয়ে।

অনেক, অনেকক্ষণ, কতক্ষণ সে জানে না, কাটল এমনি ক'রে।

দুরন্ত মেল ট্রেন প্রচণ্ড বেগে, অন্ধকার-গুঁড়োন স্ফুলিঙ্গই যেন দু'পাশে ছড়িয়ে শব্দের ঝড় হয়ে সীমাহীন বিস্তৃতির ওপর দিয়ে বয়ে গেল, আলোর দ্বীপের মত নগণ্য স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে।

ট্রেনের গতি মন্থর হওয়ার সঙ্গে দু'দিক্ থেকে আলোর মিছিল সাজিয়ে জংশন স্টেশনটা এগিয়ে আসার সঙ্গে তার চেতনাও ধীরে ধীরে সহজ স্বাভাবিকতায় নেমে এল।

নিয়ন আলোয় ঝলমল জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থেমেছে।

কামরায় সে একা।

ও পাশের বার্থে যে দু'জন বসেছিলেন তাঁরা সেই আগের স্টেশনে নেমে যাবার পর আর অন্য কিছুর খেয়াল তার ছিল না।

কামরার দরজাটাও যে লক্ করা হয় নি, ট্রেন ছাড়বার পর তাও সে লক্ষ্য করে নি।

তার মন সেই কুয়াশা-মোছা রাত্রে পশ্চিম-ঘাটের পাহাড়ী চড়াই-এর পথে তখন চ'লে গেছে।

পৃথিবী থেকে একেবারে পৃথক্ একটি রোমাঞ্চিত রাত্রিতে তা'রা হারিয়ে যেতে চেয়েছিল। সেই রাত্রিই যেন নেমে এসেছিল কুয়াশার গুণ্ঠন নিয়ে দূর নক্ষত্রলোক থেকে তাদের চারিধারে।

স্বপ্নের মত যার সমাপ্তি, কি রূঢ় বাস্তবতাতেই তার সূত্রপাত!

দুনিয়ার বুঝি নীরসতম শহর বোম্বাই, সেই বোম্বাই-এর নীরসতম না হোক অত্যন্ত নিষ্প্রাণ একটি স্টেশন ভিলে পার্লে।

ইলেকৃট্রিক ট্রেন থেকে নেমে টিকিট দেখাবার জন্যে পকেট থেকে বার ক'রে হাতে নিয়ে ওভার-ব্রীজে ওঠবার মুখে বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। শিবঠাকুরের এ আপন দেশে নিয়ম-কানুন খাম-খেয়ালী। এক-একদিন— প্ল্যাটফর্মে নেমে যেখানে খুশি যাও, কেউ বাধা দেবার নেই। আর আজ ওভার-ব্রীজে ওঠবার সিঁড়িতেই টিকিট-

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পক্ষি-মিথুন

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

(প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৪ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

ঠেকায় দাঁড়িয়ে। তার সামনে একটি মেয়ে টিকিট খুঁজতে গিয়ে হাতের ব্যাগটা ওলট-পালট ক'রে নিজেও হয়রাণ, পেছনের সারবন্দী অন্য যাত্রীদেরও আটকে রেখেছে।

একটু রূঢ়ভাবেই পেছন থেকে ললিত বলেছিল,—আপনি যদি একটু পাশে স'রে গিয়ে ব্যাগ ঘাঁটেন, অন্যেরা সময়মত একটু স্টেশন থেকে বেরুতে পেরে বাধিত হয়।

বিনীত বিদ্রূপের খোঁচাটুকু মেয়েটির লেগেছিল কি না লক্ষ্যও করে নি।

সে স'রে দাঁড়াতেই টিকিটটা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওভার-ব্রীজ দিয়ে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

ভিলে পার্লেতে বাস্-এর যা দুরবস্থা! প্রথমটায় গিয়ে জায়গা না পেলে দ্বিতীয়টা কখন আসবে তার ঠিকই নেই।

আজকাল অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে বলা যায় না। তখন ও পোড়া স্টেশনে ট্যাক্সিও পাওয়া যেত না।

গাড়ীটা দু'দিন খারাপ হয়ে কারখানায় দিতে হওয়ার দরুণই এই সব যন্ত্রণা।

প্রথম বাসটা ধরতে না পারলে আজও সিগারেট কোম্পানীর ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতিটা রাখা যাবে না।

কাজের গুণে তার আবদার অত্যাচার এরা অনেক সয় বটে, কিন্তু বোম্বাই শহর অন্য ধাতুতে গড়া। এখানে শিল্পীর রাশ চাঁদির শিকলে টানা।

যা ভয় করেছিল তাই। প্রথম বাস্ ছেড়ে যাচ্ছে। বোম্বাই-এর বাস্-এ লাফিয়ে গিয়ে ওঠা যায় না। গোনা-গুনতি সীট ভর্তি হলেই আর ঠাঁই নেই।

যার জন্যে এই বিপদ্, মনে মনে সে মেয়েটার মুণ্ডপাতই করছে, এমন সময় পেছন থেকে শুনতে পেলে—মাপ করবেন, আপনি মিঃ মুস্তাফি না!

গলার স্বরেই চমকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। ফিরে দাঁড়াবার পর মুখের বিরক্তিটা ফুটতে না ফুটতেই চোখের মুগ্ধ বিস্ময়ে হারিয়ে গেল।

সেই দেরী ক'রে দেওয়া মেয়েটিই বটে। কিন্তু দেরী হওয়ার সমস্ত দুঃখ-জ্বালা যেন সার্থক হয়ে গেছে।

সুন্দরের সাধনা যে কখনো হেলাভরেও করেছে, এ মেয়ে তার কাছে মূর্ত এক স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

না দে'খে শুধু গলার স্বরেই ভেতরটা স্নিগ্ধতায় ভ'রে গিয়েছিল, চোখের দৃষ্টি সে স্নিগ্ধতাকে কোন্ সুরের মূর্ছনায় যেন পৌঁছে দিলে।

কোমরে শাড়ীর প্রান্ত গোঁজার বিশিষ্ট ধরণে গুর্জর দেশের ছাপটুকু শুধু বোঝা যায়, কিন্তু তার পর আর সব দেশকালের বিচারের বাইরে।

কোন আশ্চর্য কবির একটি অজানা গানের কলি যেন শরীরিণী হয়ে ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়েছে।

মনে যখন এই প্রায় বাতুল মাত্রাহীন উচ্ছ্বাস চলেছে, বাইরে তখন সে যথাবিহিত ভদ্রতার সঙ্গে হেসে মেয়েটির কথার উত্তর দিয়েছে।

হ্যাঁ, আমার নাম তাই বটে!

নাম জানার আগ্রহ কেন, মুখ ফুটে সে কথা আর জিজ্ঞাসা করে নি।

মেয়েটিই নিজে থেকে বলেছিল,—আপনার একজিবিশনে আমি গেছি, আপনাকে সেখানেই দেখেছি। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আমার বিশেষ ইচ্ছে। একদিন আপনার স্টুডিওতে যেতে পারি?

সে অনুমতি চাইবার উপযুক্ত অবসর বা জায়গা যে এটা নয়, সে কথাটা মনেও বুঝি হয় নি।

সানন্দে সম্মতি দিয়ে বলেছে,—নিশ্চয়, যেদিন খুশি। অবশ্য বিকেলে।

মেয়েটি হাসিমুখে ধন্যবাদ দিয়ে চ'লে গেছে, কাছেই অপেক্ষা-করা একটি বেশ দামী চেহারার গাড়ীতে উঠে।

মেয়েটির নামধাম পরিচয় জানে নি, গাড়ীর নম্বরটাও লক্ষ্য করে নি। শুধু অভিভূত হয়ে বিনা উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থেকেছে। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করা আর হবে না। ক্যালেণ্ডারের ছবি আঁকার একটা শাঁসালো বায়না ফস্কে যাবে, কিন্তু কিছুতেই কিছু আসে যায় না।

স্টেশনের বাইরেই বাজার সুরু। খোঁপায় লাগাবার ফুলের সাজ থেকে সুরু ক'রে কলা বেগুন মুগ সীমের-বীচি কলাই পর্যন্ত নানা জিনিষের পসারিণীরা রাস্তার ধারে তাদের সওদা ছড়িয়ে ব'সে আছে। রাস্তায় পথচারী

আর খরিদদারদের ভিড় আর কোলাহল। থেকে থেকে তীক্ষ্ণ কর্কশ একটানা কুহর তুলে ইলেকট্রিক ট্রেন যাওয়া-আসা করছে।

কিন্তু এ সবকিছু তার কাছে অবাস্তব হয়ে গেছে।

ছবি আঁকাই তার কাজ হলেও ভাবালু স্বপ্নের জগতে সে বিচরণ করে না। আঁকার পাকা হাতের সঙ্গে পাকা সাংসারিক বুদ্ধির জোরেই সে খ্যাতির নগদ মূল্যও সংসার থেকে আদায় করতে পেরেছে এই বয়সেই।

আজ কিন্তু সদ্য সাবালক হওয়া ছেলের মত প্রথম কবিতা-পড়া স্বপ্নালুতাই যেন তাকে নিজের অজ্ঞাতে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।

এ কি শুধু তার নিজেরই সাময়িক দুর্বলতা, না ওই মেয়েটির কোন অদৃশ্য দুর্জ্ঞেয় প্রভাব!

মৃদুলার সঙ্গে পরিচয় হবার পর মনে হয়েছিল, দ্বিতীয় অনুমানটাই যেন সত্য।

পরিচয় অবশ্য কিই বা হয়েছে। নামটুকু শুধু জেনেছে মাত্র। আর কিছু জানবার চেষ্টা করে নি, দরকারও বোধ করে নি কখনও।

তখনই মনে হয়েছে, এমন কেউ কেউ আছে, নাম-ঠিকানা বাইরের বিবরণ যার বেলা অবান্তর। শুধু একটা নাম দিয়ে তার রহস্যকে চিহ্নিত ক'রে রাখার বেশী আর কিছু করা যায় না।

রহস্যই সত্যি। রোমাঞ্চকর কিছু নয়, শুধু বিহ্বল, বিস্মিত, তার সঙ্গে একটু বুঝি উদ্বিগ্ন একটা অনুভূতি।

মেয়েটি অদ্ভুত। সাধারণ ত নয়ই, ঠিক যেন স্বাভাবিক সুস্থও নয়। ছবি সে নিজে আঁকে ব'লেই তার আলাপ করবার আগ্রহ। প্রথম দিন কয়েকটা ছবি সঙ্গে ক'রেও এনেছিল।

ছবি দে'খে মুস্তাফি চমকিত হয়েছিল। আনাড়ির তুলি নয়। সত্যিই নিপুণ হাত। কিন্তু সেটা বাহ্য। আসলে ছবি যা নিয়ে আঁকা তাই অদ্ভুত অস্বাভাবিক।

যে ক'টি ছবি এনেছিল তার প্রত্যেকটির বিষয় মৃত্যু। দুঃখের, ভয়ের, মৃত্যু নয়, তার স্বপ্নাবিষ্ট রহস্য। মৃত্যুই যেন সেই পরম-রহস্যময় প্রেমিক, জীবনকে সমস্ত তুচ্ছ আকর্ষণ থেকে যে ভুলিয়ে নিয়ে যায়; তারই কাছে সেই আশ্চর্য দীপ, সমস্ত প্রহেলিকার যা মীমাংসা ক'রে দেবে।

মৃদুলার কথাও ওই সুরে বাঁধা। একটা অলৌকিক জগতের অবাস্তব সুর।

কথা সে খুব কমই বলেছে ওই সামান্য কয়েকটি দিনের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে, কিন্তু প্রতিটি উচ্চারণে যেন হৃদয়ের একেবারে গভীরে এসে তার সত্তার রহস্যমাধুর্য মিশিয়ে দিয়েছে।

আর কারুর মুখে, অন্য কোন পরিবেশে সে-সমস্ত কথা হয়ত কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ কাব্যময় আতিশয্য মনে হ'তে পারত। মৃদুলার মুখে, তার গলার স্বরে, তার বলার অনায়াস অকৃত্রিম ভঙ্গিতে তা হয় নি।

কোনদিন হয়ত রাত্রে কোলাবার কজওয়ের ওপর ব'সে বলেছে,—আমার কেন এমন মনে হয় বলতে পারেন? মনে হয়, এই যা কিছু দেখছি মুগ্ধ হয়ে, এ যেন একটু আঙুল দিয়ে ঘষলেই মুছে যায়, সত্যকার আর এক আশ্চর্য ছবি তাহলে ফুটে বেরুবে। এক-এক সময়ে নিজের অজ্ঞাতে আমি হাতটা বাড়িয়েও ফেলি।

ব'লে সেই অপরূপ লঘু হাসি হেসে উঠেছে যা হাসি না দীর্ঘশ্বাস বোঝা যায় না।

সেই পশ্চিম-ঘাটের চড়াই-এর দুর্গম বাঁকেও সেদিন এমনি কথা বলেছিল।

সামনে অতল অন্ধকার খাড়াই। চারিদিকে কুয়াশার স্বপ্নময় বিস্তার। দূরে সমতলের রেল লাইনেরই ক'টা অস্পষ্ট আলোর বিন্দু যেন আকাশের নক্ষত্রলোক থেকেই ছিটোন। তা'রা অন্ধকার শূন্যতার মাঝখানেই দুলছে।

মৃদুলার অনুরোধেই এই কুয়াশার রাতে তা'রা গাড়ীতে পুণা যাবার জন্যে বেরিয়েছিল। এ পর্যন্ত পরিচয় হওয়ার মধ্যে মৃদুলার এই প্রথম ও শেষ অনুরোধ। একটু অস্বাভাবিক, মৃদুলার আর সব-কিছুর মত।

চড়াই-এর বাঁকটার কাছে এসে মৃদুলাই একটু গাড়ীটা থামাতে বলেছিল। তার পর তাকে নিয়ে এই অন্ধকার অতলতার কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

অত ধারে যেও না মৃদুলা! আমার ভয় করে।

আমার ত করে না!—কুয়াশার সঙ্গে তার হাসি যেন মিশে গেছল।

ওই ব্যাগটা আবার বয়ে নিয়ে আসার কি দরকার ছিল?

বাঃ, ওতে যে আমার সব পাথেয়।
—মৃদুলার গলায় কৌতুকের স্বর যেন নয়,
—যদি এই কুয়াশাভরা শূন্যতায় হঠাৎ হারিয়ে যাই? আমার কি মনে হচ্ছে জানো, আমি যেন এই খাড়াই-এর কিনারা থেকে পা বাড়িয়ে দিতে পারি এখনই। প'ড়ে যাব না। শুধু কুয়াশার পর্দা আমার চারিধারে ঘিরে আসবে, কুয়াশার কোমল ঢেউ আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ওই যেখানে মৌমাছির মত নক্ষত্রের ঝাঁক গুঞ্জন করছে সেই আশ্চর্য আকাশে।

কুয়াসার কোমল ঢেউ আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

ও কি করছ?—মৃদুলা যেন সত্যিই একটা পা একটু বাড়াতে মুস্তাফি হাত বাড়িয়ে তাকে ধ'রে ফেলেছিল! সচেতন ভাবে এই প্রথম। এর আগে কোনদিন তাকে স্পর্শও করে নি।

করে নি কেমন একটা যুক্তিহীন আশঙ্কাতেই বুঝি।

ওই স্বপ্নতনু মেয়েটি একটু স্থূল স্পর্শ লাগলেই বুঝি মিলিয়ে যাবে।

এখন একটু অবাক্ হয়ে বলেছিল,—এ কি, তুমি কাঁপছ যে!

ঠাণ্ডায় বোধ হয়!—প্রায় চুপি চুপি বলেছিল মৃদুলা, অস্ফুট মর্মরের মত।

ব্যাগটা নিয়ে এসেছ কিন্তু কোটটাই এসেছ ফে'লে!—মুস্তাফি মৃদু অনুযোগ করেছিল।

নিয়ে আসবে গিয়ে?—মৃদুলা ঠিক অনুরোধ যেন করে নি।

মুস্তাফি কোটটা আনতেই গিয়েছিল।

ফিরে এসে আর মৃদুলার দেখা পায় নি। সত্যিই কুয়াশার ঢেউএ যেন ভেসে চ'লে গেছে।

স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নে মেশানো সে রাত্রির কথা কোনদিন ভুলবে না।

উন্মাদের মত খুঁজেছিল। তার পর উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে খাণ্ডালায় পুলিশের কাছে গেছল খবর দিয়ে সাহায্য চাইতে।

অদ্ভুত লেগেছিল পুলিশের ব্যবহার।

মৃদুলার বর্ণনা শুনে তারা যেন চমকে উঠেছে। একজন অফিসারের মুখে একটু বাঁকা হাসি।

মুস্তাফিকে তারা খুটিয়ে খুঁটিয়ে কবে কোথায় কেমন ক'রে মৃদুলার সঙ্গে আলাপ জিজ্ঞাসা করেছে। মৃদুলা সম্বন্ধে কি কতটুকু জানে তার বিবরণ নিয়েছে।

মুস্তাফিকে সঙ্গে নিয়ে তখনই সেই চড়াই-এর বাঁকে গিয়েছে জায়গাটা দেখাবার জন্যে। খোঁজাখুঁজি করেছে অনেকক্ষণ। বিফল হয়ে তারপর মুস্তাফিকে ছেড়ে দিয়েছে নাম ঠিকানা রেখে।

ব্যাপারটা, কি মুস্তাফি জানতে চেয়েছে বিমূঢ় উদ্বেগে।

সময় হলে জানতে পারবেন।—তা'রা আর বেশী কিছু বলেনি।

সময় আর হয় নি। মুস্তাফি তারপর কিছুদিন নিজের কাজে বোম্বাই ছেড়ে এসেছে। ফিরে গিয়েও কোন কিছুই জানতে পারে নি। মৃদুলা একটা নাম। কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া একটা গান শুধু। তার আর কোন পরিচয় জানে না। খোঁজ করবার উপায় নেই। থাকলেও, কি জানতে হবে ভয়ে বোধ হয় করত না।

মনের মধ্যে সংশয়ের রক্তাক্ত কাঁটাটাই শুধু বিঁধে থেকেছে।

সে কাঁটাটা এতদিনে কি স'রে গেল?

বোম্বাই ছাড়বার পর যে দুজন ভদ্রলোক মাঝের স্টেশনে উঠেছিলেন, আগের স্টেশনেই তাঁরা নেমে গেছেন। অন্যমনস্ক ভাবে তাঁদের দু-একটা কথা শুনেছে। শুনতে শুনতে এক সময়ে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে।

কথাবার্তায় বোঝা গেছে দুজনেই পুলিশের বড় চাকরে।

দেশবিদেশে জাল-পাতা একটা বিরাট্ লুকিয়ে-সোনা-চালানের দল ধরার গল্প হচ্ছিল। তাদের অদ্ভুত ফন্দি-ফিকির আর দলের লোকের এমন সব ভোল ভেক নেবার কথা যা সন্দেহের প্রায় অতীত।

চাঁইদের অনেককেই ধরবার পরও সব খেই না পাওয়ার দরুণ পুলিশকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে মামলা সাজাতে। "রহস্যের অনেক সূত্র যার কাছে পাওয়া যেতে পারত, সেই একটি বহুরূপী অত্যন্ত ধূর্ত অসামান্য মেয়ে ত একেবারে নিরুদ্দেশ। পুলিশের প্রায় চোখের ওপর দিয়ে সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

ঘটনার কিছুদিন বাদে পশ্চিম-ঘাটের এক অতল খাদের তলায় একটি মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছল। আত্মহত্যা হতে পারে কিংবা কোন ঘন কুয়াশার রাতে অসাবধানে প'ড়ে গিয়েছিল হয়ত। মেয়েটির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। পুলিশ যার সন্ধান করছে সেই মেয়েটি সম্ভবতঃ নয়। কারণ কোন চিহ্ন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তার কাছে একটা এ্যাটাচি ব্যাগ গোছের পাওয়া গেছল ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায়। তাতে শুধু ক'টা অদ্ভুত ছবি। পুলিশের যাকে দরকার তার কাছে অন্ততঃ ওরকম ছবি থাকবার কথা নয়।

না, নয়! নয়!—মুস্তাফি বুঝি চীৎকার ক'রেই বলতে চেয়েছিল।

অফিসার দুজন নেমে গেছেন।

আর মুস্তাফি সেই অন্ধকার কুয়াশার ঢেউ-এ ভেসে,—নক্ষত্রের ঝাঁক যেখানে মৌমাছির মত গুঞ্জন করছে, সেই জগতে কখন চ'লে গেছে।

পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে যে পালিয়ে ফিরেছে তার মৃদুলা সে নয়, সে নয়!

তার মৃদুলা সেই রহস্য-মধুর জগৎ থেকে ভুল ক'রে একবার ভেসে আসা একটা সুরের ঝলক, যে জগৎ এই সামনের দৃশ্যমান্ ছবিগুলোকে একটু ব্যাকুল হয়ে মুছে দিলেই ফুটে বার হবে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন দ্বারা জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক হিন্দু বাঙালীদের প্রতি অবিচার করিয়াছে। ইংরেজরা সাধারণতঃ বাহুবল, অস্ত্রবলকেই বল মনে করে। সে বল হিন্দু বাঙালীদের নাই। কিন্তু সত্য ও ন্যায় তাহাদের পক্ষে। সত্য ও ন্যায়কে বলদৃপ্ত লোকেরা তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে, শক্তিহীন মনে করিতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

হিন্দু বাঙালীরা অন্য যেদিকে যত বলহীনই হউক, একটি কাজ তাহাদের অগ্রণীরা করিয়াছেন এবং এখন ও ভবিষ্যতেও করিবেন। ভারতবর্ষের যে সকল লোক ভারতের এবং কিয়ৎ পরিমাণে জগতের লোকমত গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু বাঙালী মনীষীদের সংখ্যা নগণ্য নহে। এই মনীষীদের অনেকে এখন পরলোকগত কিন্তু সকলে নহেন; এবং তাঁহারা আধ্যাত্মিক বলহীনও নহেন।

বলহীন হিন্দু বাঙালী আপনাদের শক্তি ও সাধ্য অনুসারে ভারতবর্ষের ও ভারতবর্ষের বাহিরের জগতের রাষ্ট্রনৈতিক ও অন্য মত গঠন করিতে থাকিবে।

—প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গ, আষাঢ়, ১৩৪৩।

চম্পক

তিন অঙ্কের নাটক

মনোজ বসু

[পুস্তকাকারে বেরুনোর আগে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিরাজকাটি গ্রামে 'চাষকুঠি'। বড়-ফটক মঙ্গলঘট ও ফুলে-পাতায় সাজানো। ফটকের উপরে সদ্য-তৈয়ারি রসুনচৌকির ঘর। ফটকের দু-পাশে পাকা দেয়াল। দেয়ালে চাষসম্বন্ধীয় নানা প্রাচীর-চিত্র—গ্রাম্য পটুয়ার আঁকা।

চাষকুঠির মালিক রাজকৃষ্ণর মেয়ে চম্পকের বিয়ে আজ। রসুনচৌকি বাজছে। রাজকৃষ্ণর ছেলে ধ্রুব (বয়স বাইশ) ফটকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করছে। সঙ্গে পুরানো কর্মচারী ভুতনাথ।

বেলা ডুবে ঘোর হয়ে আসে।

প্রেক্ষাগৃহ থেকেই নানা বয়সের মেয়েপুরুষ মঞ্চে উঠছেন। তাঁরা নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত। ধ্রুব কাউকে নমস্কার করছে, কাউকে প্রণাম করছে। যথাযোগ্য কথাবার্তা বলছে। একটি ছোট মেয়ে গোলাপফুল দিচ্ছে সকলকে। ফটক দিয়ে এঁরা ভিতরে যাচ্ছেন।

ধ্রুব। বড়-বৈঠকখানায় বসবার জায়গা। মেয়েরা সোজা দোতলায় উঠে যাবেন।

রাখাল বৌ-ছেলেপুলে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

রাখাল। বর এসে পৌঁছয় নি ?

ধ্রুব। না—

রাখাল। (বৌয়ের প্রতি) কি গো, বললাম না তাড়ার কিছু নেই ? বর এলে বাড়ি বসেই টের পাবে। রাজকেষ্ট ঘোষের মেয়ের বিয়ে চুপিসাড়ে হবে না। বাজনায় তোলপাড় পড়বে, আলোয় আলোয় দিনমান হবে।

ভুতনাথ। ঘটা তো অনেক হতে পারত দত্তমশায়। বুড়ি ঠাকুরমা বর্তমান—তাঁর সাধের নাতনী। আর এ-বাড়ির এই হলগে প্রথম কাজ। কিন্তু দেশের যা অবস্থা—

রাখাল। বিয়ে গোধূলিলগ্নে হবে শুনেছিলাম—

ধ্রুব। বর-বরযাত্রী পাঁচটার ট্রেনে স্টেশনে নেমেছেন। দুটো বাস্ রিজার্ভ করা আছে আমাদের। গণপতি-কাকা নিজে কলকাতা চলে গেছেন—সেখান থেকে তিনি ব্যবস্থা করে নিয়ে আসছেন।

ভুতনাথ। একলা বর হলে কখন এসে যেত ! সঙ্গে বরযাত্রীরা—ট্রেন থেকে নেমেই কি আর বাসে চাপবে ? পান খাবে, সিগারেট খাবে। হয়ত বা মিঠাইর দোকানে ঢুকে রসগোল্লা সাঁটতে বসে গেল। একটা রাত্রির লাটসাহেব ত ! জানে, তাড়া নেই—শেষরাত্তির অবধি লগ্ন।

রাখাল। উঁহু, সকাল সকাল ঢুকে গেলেই ভাল। কলকাতার খবর যা শোনা যাচ্ছে—

রাখালরা ভিতরে চলে গেলেন। রসুনচৌকি কিছুক্ষণ আগে বন্ধ হয়েছে। বাজনদাররা মই বেয়ে নেমে এল।

বাজনদার। দাদাবাবু, বর আসার দেরি হবে। আমরা একটু ঘুরে আসিগে।

ধ্রুব। উঁহু, দেরি কে বলল ? এক্ষুনি এসে পড়তে পারে। বাজি-বাজনা, মশাল-টশাল নিয়ে বর এগুতে সব হাটখোলায় গিয়ে বসে আছে।

বাজনদার। চা খেতে যাচ্ছি। ও-পক্ষের সাড়া পেলেই আমরা এদিকে লেগে যাব।

বাজনদাররা চলে গেল। এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী—ক্ষিতীশ, এলেন।

ক্ষিতীশ। কি ধ্রুব, বর আসে নি, গোধূলিলগ্নে তবে আর হল না ! রাজকেষ্ট কোথা ?

ধ্রুব। (হেসে) বাবাকে আটক করে ফেলেছেন ঠাকুরমা। সম্প্রদান করবেন, সেজন্য সমস্ত দিন উপোসি।

ঠাকুরমা ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিলেন। ভর সন্ধ্যেবেলা কেউ শুয়ে থাকতে পারে—বলুন না দাদু? ঠাকুরমা কোন কথা শুনবেন না। ঘরের মধ্যে বসে বাবা ছটফট করছেন।

ক্ষিতীশ। ছটফট করবে না, মেয়ের বাপ যে! ওদিকেও তেমনি আবার মায়ের ছেলে। বড় শক্ত ঘানিতে পড়েছে রাজকেষ্ট।

ক্ষিতীশ উচ্চ হাসি হাসতে লাগলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাঁচিল-ঘেরা সদর-উঠানের এক অংশ। ফটকের এবং রসুনচৌকি-ঘরের পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। নধর ছুটো ইউক্যালিপটাস-চারা ফটকের দু-পাশে। গরু-ছাগলে নষ্ট না করে সেজন্য চারা দুটো ইট দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। দূরপ্রান্তে সারি সারি পাঁচটা ধানের গোলা। দোতলা ভিতর-বাড়ির অংশ নজরে আসে।

ইঁদারা। হাতদুয়েক উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। দড়ি-বাঁধা বালতিতে করে একজনে জল তুলছে, দু-জন ভারী অবিরত ভিতর-বাড়ি জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

রাজকৃষ্ণ এসে পড়লেন। মুখে মোটা চুরুট।

রাজ। এতক্ষণে একটা ট্যাঙ্ক ভরতি হল। হবে না বাপু, একজনে পেরে উঠবে না। দড়ি-বালতি নিয়ে আরও একজন লেগে পড়ুক। ভারীও দু'জন নয়, চার জন—

ক্ষিতীশ প্রবেশ করলেন।

ক্ষিতীশ। ধ্রুব যে বলল, গিন্নিঠাকরুন তোমায় ঘরের মধ্যে কয়েদ করেছেন। পালিয়ে এসেছ?...আরে, ইঁদারার সব জল যে তুলে ফেললে!

রাজ। কী করা যায় বলুন কাকা। এত মানুষের খাওয়া-আঁচানো সমস্ত তোলা জলে। পুকুর-ঘাটে কাউকে নামতে দেওয়া হবে না।

জল-তোলা লোকটা। পুকুরের সমস্ত মাছ সকালবেলা আজ মরে ভেসে উঠল। জলে কেউ বিষ দিয়েছে।

রাজ। জল খারাপ করে দিয়ে যজ্ঞি নষ্ট করার মতলব।

ক্ষিতীশ। (নিশ্বাস ফেললেন) মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ রাজা। আমি আজকের লোক নই—তোমার বিয়ের কথা মনে পড়ছে। পড়শিতে পড়শিতে গলাগলি—হিন্দু-মুসলমান তখন আমরা পর ছিলাম না। কাজিপাড়ার রহমৎ কাজির বাপ বুড়ো ইব্রাহিম কাজি সোনার মাকড়ি দিয়ে বৌরাণীর মুখ দেখে গেলেন। মনে পড়ছে?

রাজ। আজ সেই সব মানুষ জন্তু-জানোয়ার হয়ে উঠল।

ক্ষিতীশ। ঐ যে, গিন্নীঠাকরুন আসছেন। পালিয়ে এসেছ, বোঝ ঠেলা এবার।

যোগমায়া প্রবেশ করলেন।

যোগ। বেরিয়ে পড়েছিস রাজা? সকাল থেকে ত চরকির মতো ঘুরছিস। বললাম, একটুখানি জিরিয়ে নে—

রাজ। কাজের বাড়ি, এত মানুষজন আসছেন, এখন কি পড়ে থাকা যায়? তোমার নাতনীর সম্প্রদানটা হয়ে যাক—ততক্ষণ কিছু বোলো না সোনা-মা। তার পরে ধুম্ করে শুয়ে পড়ব, দু'দিনের মধ্যে আর উঠে বসছি নে। যা করবার ওরাই সব করবে।

যোগ। হ্যাঁরে রাজা, আমার মুকুট এল কই? চন্দ্রহার বিক্রি-করা একটি হাজার টাকা বের করে দিলাম, গণপতি টাকা নিয়ে আজও গেছে, কালও গেছে—

ক্ষিতীশ। গণপতি দায়িত্ব নিয়েছে যখন, কোন ভাবনা নেই গিন্নিঠাকরুন। এমন কাজের মানুষ হয় না।

যোগ। নাতনীকে মুকুট পরিয়ে রাজরাণী সাজিয়ে আমি সম্প্রদানের পিঁড়িতে বসাব। কতদিনের সাধ আমার!

রাজ। তাই শুনেই গণপতি জেদ করে চলে গেল। মায়ের সাধ মেটাতেই হবে। এসব গয়না গেঁয়ো স্যাকরা গড়তে পারে না, সেইজন্যে কলকাতা অবধি ছুটল। কিন্তু কলকাতার কথা যা শোনা যাচ্ছে—

ক্ষিতীশ। তা বলে গণপতির কেউ কিছু করতে পারবে না। গণপতি না হয়ে ওর নাম প্রহ্লাদ হওয়া উচিত ছিল। জলে ডুববে না, আগুনে পুড়বে না—ভারি সতর্ক, বড় বুদ্ধিমান্।

রাজ। স্টেশন থেকে গণপতি বরযাত্রীদের একেবারে বাসে তুলে দিয়ে আসবে। সেইজন্তে বোধ হয় দেরি। মুকুট তুমি ঠিক সময়ে পেয়ে যাবে মা—

যোগমায়া ফটকের দিকে চললেন।

রাজ। ধ্রুবকে কিছু বলতে হবে না মা, গণপতি এলেই তোমার কাছে হাজির করে দেবে।…কী ব্যস্তবাগীশ দেখুন কাকা! চললেন—।

ক্ষিতীশ। মা যার না আছে, তার কিছুই নেই। রাজা, তুমি বড় ভাগ্যবান্।

পিওনকে সঙ্গে করে ভূতনাথ প্রবেশ করলেন।

ভূতনাথ। ঐ যে রাজাবাবু, ওখানে।…টেলিগ্রাম এসেছে।

রাজ। টেলিগ্রাম? দেখি—

সই করে টেলিগ্রাম নিলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে খাম ছিঁড়লেন। ভূতনাথ চলে গেলেন।

রাজ। ও, লাহোর থেকে এসেছে। দাদা দিয়েছেন।

ক্ষিতীশ। তোমার আবার দাদা?

রাজ। নীলমাধব রায়। আমি ঘোষ, উনি রায়। তবু আমার বড়দাদা। বড়দাদার কথা মা উঠতে বসতে জিজ্ঞাসা করছেন।…লাহোর থেকে টেলিগ্রাম আসতে দশ দিন লেগে গেল।

ক্ষিতীশ। খবর কি লাহোরের?

রাজ। কলকাতায় যা, লাহোরেও তাই। মানুষ হন্যে হয়ে গেছে। মস্তবড় ফ্যাক্টরি দাদার—জলের দামে সমস্ত বেচে দিয়ে চলে আসছেন।

যোগমায়া ফিরে যাচ্ছেন। রাজকৃষ্ণ ডাকলেন—

রাজ। ও মা, শোন শোন। টেলিগ্রাম এল লাহোর থেকে। হ্যাঁ, তোমার বড় ছেলের কাছ থেকে।

যোগমায়া দ্রুত চলে এলেন।

যোগ। কী লিখল নীলমাধব? আছে কেমন তারা? এসে পৌঁছল না—আমার জয়া-দিদি বিয়ে দেখতে পাবে না।

রাজ। আসছেন সামনের বুধবারে। তার মানে, তোমার নাতনী-নাতজামাই যেদিন দ্বিরাগমনে আসবে। অতবড় ফ্যাক্টরি লাখ দুই টাকায় বেচে দিয়ে জয়াকে নিয়ে চলে আসছেন। তবু যে বেচতে পেরেছেন, প্রাণে প্রাণে আছেন, সেই ভাগ্যি।

যোগ। কেন রে? কী হল আবার সেখানে?

রাজ। এদিকে যা, সেখানেও তাই। হিন্দু-মুসলমানে হাঙ্গামা—

যোগ। (আগুন হলেন) দেখ্, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমায় ও-সব শোনাতে আসিস নে। শয়তানের মিথ্যে রটনা। চোখে দেখলেও বিশ্বাস করব না। যেন মুসলমানদের আমি জানি নে, যেন হিন্দু নিয়ে ঘরবসত করি নি!

ক্রুদ্ধ ভাবে যোগমায়া ভিতর-বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

রাজ। হাঙ্গামার কথা মা কিছুতে বিশ্বাস করবেন না। বলতে গেলে রেগে যান।

ক্ষিতীশ। এ কি বিশ্বাস হবার কথা? নেহাৎ চোখের উপরে দেখছি, তাই। যমরাজকে ডাকি, আর দেরি কোরো না, নজরটা ফেল এইবারে। বেঁচে থাকলে কত কী যে দেখতে হবে!

ক্ষিতীশ চলে গেলেন। ধ্রুব এল।

ধ্রুব। (হাতঘড়ি দেখে) সাড়ে-আটটা বাজে বাবা, বর আসে না—এগিয়ে দেখে আসবে কেউ?

এক কর্মচারী—অনাদি, হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় বলছে।

অনাদি। সর্বনেশে ব্যাপার রাজাবাবু—

রাজ। কি, কি হয়েছে অনাদি?

অনাদি। কলকাতার গোলমাল এখানেও এসে পড়ে বুঝি! বাসি-বিয়ের ভোজের মাছ ধরাতে নিকারি-বাঁধালে গিয়েছিলাম। শুনলাম, রহমৎ কাজির ছেলে, কলকাতায় থেকে সেই যে কলেজে পড়ত—তাকে নাকি মেরে ফেলেছে। তাই নিয়ে খুব সোরগোল। কাজিপাড়ায় একগাদা বিদেশি মানুষ—তাদের চিনি নে, জানি নে। যা সব বলছে, শুনে কানে আঙুল দিতে হয়।

রাজ। তাই ত, গণপতি এসে পড়লে যে হত! মাতব্বরদের সঙ্গে তার দহরম-মহরম—সঠিক অবস্থা বোঝা যেত তার কাছে।

সহসা নজর পড়ে, বাড়ির ভৃত্য কাসেম আলি ঘোরাফেরা করছে। অনাদি তার উপর খিঁচিয়ে উঠল।

অনাদি। এই, তুই বেটা ঘুরঘুর করিস কেন এদিকে? কি শুনছিস? যা, নিজের কাজে যা—

কাসেম আলি চলে গেল।

রাজ। কাসেম ত এ বাড়িরই ছেলে। কতটুকু বয়স থেকে আছে আমাদের কাছে!

অনাদি। না রাজাবাবু, ওদের কাউকে বিশ্বাস নেই। চরবৃত্তি করছে কি না কে জানে! ওদের পাড়ায় গিয়ে খবরাখবর দিয়ে আসবে।

ধ্রুব। ঐ ত, ঐ যে গণপতি-কাকা—

রাজ। এই যে, ফিরেছ তবে গণপতি? যা ভাবনা হচ্ছিল!

গণপতি প্রবেশ করল।

গণপতি। ফিরব না কেন রাজাবাবু, কি হয়েছে? স্টেশনে নেমে দেখি, বর-বরযাত্রী নিয়ে ওঁরা বিয়াল্লিশ জন। দুটো বাসের ভিতর বিয়াল্লিশ জনকে ঠেসে বোঝাই করে দিয়ে তবে রওনা হয়েছি। কাজে ফাঁক রাখা গণপতির কুষ্টিতে নেই।

ধ্রুব। তা সত্যি, গণপতি-কাকা খুঁত রেখে কাজ করেন না।

রাজ। শোন, অনাদি এক সাংঘাতিক কথা বলছে। কাজিপাড়া নাকি খুব গরম। বাইরের মানুষ বিস্তর এসে জমেছে। কলকাতার দাঙ্গায় রহমৎ কাজির ছেলেটা মারা পড়েছে।

গণপতি। তাতে আমাদের কি? দুনিয়া লোপাট হয়ে যাবে রাজাবাবু, এই সিরাজকাটি গাঁয়ের দিকে কেউ চোখ বড় করে তাকাবে না। আপনার এই চাষকুঠির দিকে ত নয়ই। মানুষের মনে কৃতজ্ঞতা থাকবে না? বড়-বিল সমুদ্দুর হয়ে ছিল। সমুদ্দুর শুকিয়ে ফেলে কত রকম কলকব্জা খাটিয়ে সেখানে আজ সোনা ফলাচ্ছেন। এমন বাড়ি নেই, যারা অন্তত একটা-দুটো গোলা বাঁধে নি। মানুষ ভেবে দেখবে না এই সব? স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়েছিলাম। সেই ট্যাক্সি ঘুরিয়ে মাতব্বরদের কাছে আবার এক দফা জেনে বুঝে এলাম। তাদের ছেলেরা আজকে সারারাত্তির আমাদের গাঁয়ের পথে পাহারা দিয়ে ঘুরবে।

রাজ। নিশ্চিন্ত করলে গণপতি। আর, মায়ের সেই জিনিষটা—যে জন্যে এই ডামাডোলের মধ্যে কলকাতা ছুটে গেলে।

গণ। একেবারে খাস মোতিচাঁদ ক্ষেত্রির ফার্ম থেকে নিজে বসে থেকে গড়িয়ে আনলাম। মনের মতো একখানা জিনিষ। দেখুন—

সুদৃশ্য গয়নার কৌটা বের করল। খুলতে যায়।

রাজ। এখানে নয় গণপতি। চল, ভিতরে চল। মা'র জিনিষ মা'র হাতে দিইগে। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

রাজকৃষ্ণ ও গণপতি ভিতরে যাচ্ছেন।

তৃতীয় দৃশ্য

চাষকুঠির দোতলার সুসজ্জিত কক্ষ। বিয়ের কনে চম্পক একেবারে জানলার সঙ্গে মিশে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে—হঠাৎ নজরে পড়ে না। একটি মেয়ে—তপতী, ঘরে ঢুকল। এদিক-ওদিক চেয়ে চম্পককে দেখতে পেয়েছে। টিপটিপি এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে।

তপতী। চোর ধরেছি—চোর! এই যে। এদিকে আয় তোরা—এই ঘরে।

হুড়মুড় করে শোভনা, স্বাতী ও অলকা ঢুকল।

চম্পক। কি রে? কোথায় চোর?

তপতী। কিছু বোঝেন না, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না! কনে সাজাতে হবে, এদিকে কনে পাওয়া যায় না। বাড়িময় হৈ-চৈ—কনে পালিয়েছে। কনে যে এদিকে জানলায় দাঁড়িয়ে বরের পথ চেয়ে আছে, তা বুঝব কেমন করে?

চম্পক। তাই বুঝি! মাথা ধরেছে। জানলার ধারে এখানটা ঝিরঝিরে হাওয়া—

শোভনা। এই গরমে সমস্তটা দিন কাঠ-কাঠ উপোস—মাথার কী দোষ বল।

যোগমায়া প্রবেশ করলেন।

যোগ। তোদের মা, দিদিমা, দিদিমার দিদিমা, সবাই এই দিনে উপোস করেছিলেন। তখন আরো ছিল আট-বছরে গৌরীদান—ধিঙ্গি ঠানদিদিরা সাজগোজ করে এসে কনে-পিঁড়িতে বসত না।

চম্পকের মা জ্যোতির্ময়ী ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছেন।

জ্যোতি। উপোসই বা কিসের! ভাতটাই শুধু খায় নি। লুচি-দই সন্দেশ-রসগোল্লা আমি জামবাটি ভরে দিয়ে গেছি।

যোগ। (ক্রুদ্ধ স্বরে) মায়া যে উথলে উঠল বৌ! চিরজন্মের একটা দিন আজকে, মন্দিরে যাবার মতো মন করে বরের সঙ্গে বাসরঘরে ঢুকতে হয়।

চম্পক। মা খাবার দিয়েছিল, আমি তা ছুঁই নি ঠাকুরমা। ঐ দেখ, তাকের উপরে তোলা রয়েছে।

যোগ। (একগাল হেসে) কেমন, পারলে বৌ নিজের মেয়ের সঙ্গে? দিদি আমার পার্বতী, মহাদেবের তপস্যায় আছে।

জ্যোতি। বলেছ ঠিক কথাই মা। বর আসার সময় হয়ে গেল, কাপড়টা অবধি বদলায় নি। ছাই-মাখা তপস্বিনী হয়ে আছে। নিয়ে যা মা তোরা, দেরি করিস নে—

মেয়েরা চম্পককে নিয়ে কনে সাজাতে গেল। রাজকৃষ্ণ ও গণপতি প্রবেশ করল।

রাজ। মা, তুমি উতলা হচ্ছিলে। দেখ, গণপতি নিয়ে এসেছে তোমার জিনিষ।

গণপতি গয়নার কৌটা খুলে মুকুট বের করল।

গণপতি। পছন্দ হয় কি না বলুন। আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি। কলকাতার দোকানপাট সব বন্ধ। মোতিচাঁদ ক্ষেত্রির সঙ্গে পুরানো ভাবসাব। দোকান খোলার উপায় নেই তো পিছন-দরজা দিয়ে কারিগর ঢুকিয়ে দু'দিনে আমার কাজটা তুলে দিল।

জ্যোতি। তুমি ছাড়া এ কাজ অন্য কারও সাধ্য হত না গণপতি।

গণপতি। আজ্ঞে না। আমি নই, আমি কিছু করি নি। সমস্ত গিন্নীমার আশীর্বাদ। আপনি তখনো আসেন নি বৌরাণী, দু দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে এই বাড়িতে অতিথ হলাম। গিন্নীমা সজনে-চিংড়ি আর ভাত খাওয়ালেন সামনে বসে থেকে। পোলাও-কালিয়া তার পরে তো কতই খেয়ে থাকি। কিন্তু সেদিনের ঋণ সারা জীবনে শোধ হবে না। রাজাবাবু পর্যন্ত দোমনা। বললেন, না গণপতি, কাজ নেই। মেয়ের গয়না দেওয়া ফুরিয়ে যাচ্ছে না, চারিদিক্ ঠাণ্ডা হোক। এমন মনিবের কথা অমান্য করে আমি কলকাতায় ছুটে গেলাম।

জ্যোতি। যা সমস্ত শোনা যাচ্ছে কলকাতার ব্যাপার—

গণপতি। আপনারা শুনেছেন, আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম। কলকাতা আর নেই। সত্যিই নেই—রক্তগঙ্গা। পচা মড়ায় রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

রাজ। বোলো না, বোলো না। মা ঐ দেখ রেগে যাচ্ছেন। মানুষ খারাপ—মানুষ মানুষকে মেরে ফেলছে, এ উনি কিছুতে বিশ্বাস করবেন না। বলবেন, শয়তানের রটনা।

এমন সময় চম্পককে নিয়ে মেয়েরা এল। কনেচন্দন-আঁকা ললাট। গয়না ও সাজসজ্জায় ঝলমল করছে। গণপতি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

গণপতি। আহা-হা, চোখ জুড়িয়ে যায়। মা আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী।

চম্পক একে একে সকলকে প্রণাম করছে। সকলে আশীর্বাদ করছেন।

যোগমায়া। ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক দিদি। নাতজামাইকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবি।

রাজ। চির-আয়ুষ্মতী হও মা, সর্বসুখী হও।

জ্যোতি। সাবিত্রী-সমতুল হও, পাকা চুলে সিঁদুর পোরো।

গণপতি। স্বামীপুত্তুর নিয়ে সুখে ঘর কোরো মা-জননী, শতেক বছর পরমায়ু হোক।

রাজ। মুকুট পেলে তো মা? তোমার সাধ পূরণ হল। চল গণপতি—

রাজকৃষ্ণ ও গণপতি চলে গেল। জ্যোতির্ময়ীও গেলেন।

যোগ। (মুকুট হাতে নিয়ে) মাথায় পর এইবারে দিদি। দু-চোখ ভরে দেখি।

চম্পক। ধ্যেৎ—

তপতী। ও কি ভাই! এই হাঙ্গামার মধ্যেও ঠাকুরমা সাধ করে গড়িয়ে এনেছেন—

যোগ। সাধ কী বলিস রে, চুক্তি রয়েছে আমাদের মধ্যে। কতটুকু তখন! জোড়া পায়ে ঝুমঝুম করে বাড়িময় ছুটে বেড়াত। যাত্রার-দল এল গাঁয়ে সেবার। রাণীর মাথায় মুকুট দেখে দিদি-ভাই বায়না ধরল, অমনিধারা মুকুট পরবে। সেদিন বলেছিলাম, তোর বিয়ের দিন অবধি যদি বেঁচে থাকি, মুকুট পরিয়ে রাণী সাজিয়ে নাতজামাইয়ের পাশে দাঁড় করাব।

চম্পক। আসল রাণীরাই এখন তো মুকুট ফেলে দিয়েছে। সত্যি বলছি ঠাকুরমা, আমাদের এই চড়ুইপাখির চেহারায় ও-জিনিষ মানায় না। তোমার ভারিক্কি গতর—মুকুট পরে তুমিই নাতজামাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িও।

যোগ। অত ঠ্যাকার ভাল নয় লো দিদি। সাজগোজ করে মুকুট পরে সত্যি যদি দাঁড়াই, নাতজামাই আমায় নিয়েই বাসরের দোরে খিল দেবে। তুই সারারাত মেনি-বেড়ালের মতো দোরগোড়ায় মিউমিউ করবি। কিন্তু দোর খুলব না, বলে দিচ্ছি।

চম্পক। মিউমিউ করব না ঠাকুরমা, কথা দিয়ে দিলাম। কনের তো নড়া-দাঁত—হামানদিস্তায় পান ছেঁচে পাঠাব জানলা দিয়ে। বাস, পাকা কথা হয়ে গেল। তুমি পর এবারে দেখি—

চম্পক যোগমায়াকে মুকুট পরাতে যায়। যোগমায়া চেঁচিয়ে ওঠেন।

যোগ। বৌমা, তোমার আদুরে মেয়ের আদিখ্যেতা দেখে যাও। কত ঝঞ্ঝাট করে জিনিষটা আনা হল তা সে কিছুতে পরবে না।

জ্যোতির্ময়ী এসে তাড়া দিয়ে উঠলেন।

জ্যোতি। কী, হচ্ছে কি চম্পক? মায়ের মনে কষ্ট হবে বলে গণপতি প্রাণ হাতে করে কলকাতা ছুটল, আর তুমি এখন —

তপতী। দেখি, দিন তো ঠাকুরমা, আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

চম্পক আপত্তি করল না। তপতী মুকুট পরিয়ে দিল তার মাথায়। সকলে তারিফ করছে। গণপতি ব্যস্তসমস্ত ভাবে এসে পড়ল।

গণপতি। আপনাকে খুঁজছি বৌরাণী। গুলাবপাশটা—

চম্পকের দিকে নজর পড়ে মুগ্ধ হয়ে রইল।

গণপতি। মোতিচাঁদ শেঠজি জিনিষটা একবার দেখাল। ভাল জিনিষ, জানি। কিন্তু কত ভাল, সেটা এই চম্পক-মায়ের মাথায় উঠবার আগে বুঝতে পারি নি। কষ্ট আমার সার্থক হয়েছে।

লজ্জা পেয়ে চম্পক তাড়াতাড়ি মুকুট খুলে ফেলল।

জ্যোতি। এই দেখ, মেয়ে লজ্জায় মরে, তুমি ওই সব বলে আরও বিগড়ে দিলে।

গণপতি। (হেসে) আমি চলে যাচ্ছি। দাঁড়িয়ে দেখবার সময় আছে আজকের দিনে? গুলাবপাশটা দিয়ে যান মা, আসরে গোলাপজল ছিটাতে লাগবে।

জ্যোতির্ময়ী ও গণপতি চলে গেলেন।

যোগ। খুলে ফেললি কেন দিদি?

তপতী। গণপতিবাবু একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। এ মুকুট এমনি মাথার জন্যেই তৈরি।

যোগ। পর দিদিভাই। দেখি। দেখে দেখে আশ মেটে না।

চম্পক। পরব ঠাকুরমা। ছাড়বে না, সে তো জানিই। এখন রেখে দিই। পিঁড়িতে যখন বসতে হবে, সেই সময় তুমি পরিয়ে দিও।

মুকুট কৌটার মধ্যে পুরে আলমারির মাথায় রাখল। রসুনচৌকি বেজে উঠল। তপতী জানলায় তাকিয়ে দেখে উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে—

তপতী। বর আসছে। মশাল জালিয়ে আসে ওই যে সব। কত আলো! আলো-আলোময় হয়ে গেছে।

যোগ। ওরে আয় তোরা সব মেয়েরা। উলু দিবি, শাঁখ বাজাবি, খই ছড়াবি।

যোগমায়ার সঙ্গে মেয়েরা সব বেরিয়ে গেল। রইল তপতী ও চম্পক।

তপতী। আয় চম্পক, জানলার ধারে চলে আয়। আগেভাগে এখান থেকে বর দেখে নিই। আয় না রে, কে দেখছে? চলে আয়—

চম্পককে জোর করে জানলায় নিয়ে গেল। হঠাৎ বহুকণ্ঠের আর্তনাদ। রসুনচৌকি স্তব্ধ। চম্পক ও তপতী এ ওকে জড়িয়ে পাংশু-মুখে কাঁপতে কাঁপতে জানলা ছেড়ে এল। জানলা দিয়ে আগুনের হলকা ভলকে ভলকে ঘরের মধ্যে আসে। ধ্রুব ছুটে এল।

ধ্রুব। পালাও। দাঙ্গার লোক ঢুকে পড়েছে। আগুন দিয়েছে, লুটপাট করছে। একতলায় নেমে যাও শীগগির—

অনাদি এসে পড়ল।

অনাদি। সর্বনাশ হয়েছে। গিন্নীমা আছেন কি নেই।

চম্পক। ঠাকুরমা?

অনাদি। গিন্নীমা দুয়োর এঁটে রুখতে গেলেন। এমন ধাক্কা দিল, গড়াতে গড়াতে সিঁড়ির তলায়। আর গণপতিকেও শুনলাম মেরে ফেলে একেবারে খালের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

চম্পক, তপতী ও ধ্রুব পাগলের মতো ছুটে বেরুল। কাসেম আলি প্রবেশ করল।

অনাদি। মাতব্বরদের সঙ্গে গণপতির এত ভাবসাব, তাকেই শেষ করল সকলের আগে! কী হবে কাসেম আলি? জিনিষপত্তোর চুলোয় যাকগে, মানুষ ক'জনকে বাঁচাবার কী উপায়?

অনাদি চলে গেল। কাসেম আলিও যাচ্ছিল। আলমারির মাথায় মুকুটের কৌটা দেখে নিয়ে নিল। কাঁধে গামছা কাসেমের। গামছাটা গায়ে জড়িয়ে তারই নিচে লুকাতে যাচ্ছে। এমনি সময় দু-জন লুঠেরা— ধরা যাক তাদের নাম কালু ও সোনা, ঢুকে পড়ল।

কালু। কি সরালি ওটা? তুই তো দলের নোস। বের কর্।

কাসেম। এদ্দিন ত দল ছিল না—দল আজকেই মোটে করলে। তা চলে এলাম তোমাদের দলে। কত বচ্ছর এ বাড়িতে আছি। আমার দাবি সকলের আগে।

সোনা। (পান-খাওয়া রাঙা দাঁত বের করে হাসে) বলেছে ঠিক কথা। একটা জিনিষ তো মোটে—নিতে দে কালু, নিতে দে। পুরানো লোক তুই—বাড়ির কোথায় কি আছে, সুলুক-সন্ধান দিতে হবে।

কাসেম। দেব, দেব। খোঁজদারির ভাগ কিন্তু দু'আনা। হেঁ-হেঁ, বাঁধা রেট বাবা—

ঘরের ভিতর যা-কিছু আছে, তিনজনে জড় করছে। জ্যোতির্ময়ী ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

জ্যোতি। কাসেম আলি, চম্পক ছিল যে এই ঘরে?…ওঃ, তুইও দলের মধ্যে? নিমকহারাম, জানোয়ার—

জ্যোতির্ময়ী ছুটে চলে গেলেন।

সোনা। (হাসতে হাসতে) তা কিন্তু বলে গেল ঠিক কথা। তুই শালা আমাদের উপর দিয়ে যাস। তোর জন্যে আলাদা দোজখ বানাবে। যা আছে, তাতে ভর সইবে না।

লুঠের মাল নিয়ে তারা বেরিয়ে গেল। বাইরে তুমুল কোলাহল। এ ঘরে কেউ নেই। ক্ষণপরে রাজকৃষ্ণ টলতে টলতে এলেন। লাঠি মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, রক্তের ধারা ললাট বেয়ে গড়াচ্ছে। কী যেন খুঁজছেন রাজকৃষ্ণ। জানলা দিয়ে আগুনের শিখা দেখা যায়—ছুটে তিনি জানলায় গেলেন। হাততালি দিচ্ছেন।

রাজ। আলো, কত আলো—কত আলো!

দরজায় কাসেম আলি। রাজকৃষ্ণ মুখ ফেরালেন।

কাসেম। রাজাবাবু? কী সর্বনাশ! মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে?

রাজ। দেখে যা। কত আলো, দেখে যা হতভাগা। এমন জন্মে দেখেছিস? আমার চম্পার বিয়েয় যা আলোটা হল, মহারাণী ত্রিভুবন-মোহিনীর বিয়েয় এমনধারা হয় না। হে-হে-হে—

রাজকৃষ্ণ উন্মাদ হাসি হাসছেন। মাথা খারাপ হয়েছে, বোঝা যায়। কাসেম আলি তাঁর পাশে জানলায় এসে গামছাখানা ব্যাণ্ডেজের মতন মাথায় বেঁধে দিচ্ছে। রাজকৃষ্ণর খেয়াল হল অবশেষে।

রাজ। আমি আলো দেখছি, তুই ব্যাটা মাথায় পাগড়ি বেঁধে 'ঙ' বানিয়ে দিচ্ছিস আমায়?—খোল্-খোল্—

রাজকৃষ্ণ খুলে ফেলতে যান। কাসেম আলি বাধা দিচ্ছে।

চতুর্থ দৃশ্য

সদর উঠান। এখন ভয়াবহ ভিন্ন চেহারা। রসুনচৌকির নতুন-বানানো ঘর দাউদাউ করে জ্বলছে। চারিদিকে বেড়া আগুন। রক্তবরণ আকাশ— আকাশেও যেন আগুন ধরে গেছে। রসুনচৌকি-ঘর মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। চারিদিকে বীভৎস আর্তনাদ। চম্পক ছুটতে ছুটতে এল। তাকে তাড়া করেছে ক'জনে। ধরে ফেলে আর কি! একটা গয়না খুলে তখন দূরে ছুঁড়ে দেয়। তারপর এই চলল—গয়না ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে এদিক্ সেদিক্।

চম্পক। নে, এই নে। ওই নিগে যা, ওই—ওই—

গয়না পাঁচিলের ওপারে ছুঁড়ে দিচ্ছে। গয়নার লোভে লুঠেরারা আগুনের মধ্য দিয়ে বাইরে চলে গেল। চম্পক আবার ভিতর-বাড়ির দিকে যাবে, এমনি সময় কালু এসে পথ আটকাল।

চম্পক। নেই, কিচ্ছু নেই আর। ছুঁড়ে দিয়েছি সব। কুত্তার দল খেয়োখেয়ি করে মরছে। একেবারে কিচ্ছু নেই, কি নিবি?

কালু। তোমায় নেব। তুমি আছ দেখন-হাসি—

চম্পক। আমায়?

চকিতে সে একবার চারিদিকে দেখে নিল। তারপর পাগলের মতো উচ্চহাসি হেসে ওঠে।

চম্পক। আমায় ধরবি? ধরে নিয়ে যাবি?

ইঁদারার কাছে চলে গেল। কালু তাড়া করেছে। চম্পক ইঁদারা ঘিরে পাক দেয়। কালু ধরতে পারে না। এমনি সময় সোনা এল।

কালু। ভারি ফিচেল মেয়েটা। খেলাচ্ছে। ওদিকে গিয়ে বেড় দে সোনা-ভাই। দেখি, এবারে কোথায় যায়।

চম্পক। ধরবি নাকি? ধর্—ধর্—

সোনা বিপরীত দিক্ দিয়ে আসছে তো চম্পক ঝাঁপ দিল ইঁদারায়। জলে পড়বার আওয়াজ। সোনা কালু ঝুঁকে পড়ে দেখছে।

কালু। ভেসে রয়েছে। ওই যে, দেখ্ না। শুনতে পাচ্ছ দেখন-হাসি? উপর থেকে দড়ি ফেলে দিচ্ছি। দড়ি কষে ধর, টেনে তুলব।...একলা পারা যায় না, তুইও ধর্ সোনা-ভাই আমার সঙ্গে। টান দে, জোরে—জোরে—হেঁইও—

বালতি-বাঁধা দড়ি ইঁদারায় নামিয়ে দিয়েছে। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদে চম্পক প্রথমটা দড়ি ধরেছিল। তারপর ছেড়ে দিল। টাল সামলাতে না পেরে এরা দু'জনে পড়ে গেল দু'দিকে। সোনার বেশি লেগেছে। ধুলো ঝেড়ে পিঠ বাঁকাতে বাঁকাতে সে চলে গেল।

কালু। তবে রে! আমরা সরে গেলে চুপি চুপি উঠে পড়বি ভেবেছিস? বজ্জাতি ভেঙে দিচ্ছি, দাঁড়া—

ইউক্যালিপটাস-চারা ঘেরা ইট এনে এনে ফেলছে ইঁদারার ভিতর।

কালু। কেমন? কেমন? ইঁদারা ভরাট করে জ্যান্ত-কবর দিয়ে দেব। উঠতে আর কোনদিন না হয়।

জ্যোতির্ময়ী ছুটে এলেন এই সময়। ইট হাতে কালু থমকে দাঁড়ায়।

জ্যোতি। মেয়ে কোথায় গেল? আমার চম্পক? ছুটে এল এই দিকে—

কালু। ইঁদারার ভিতরে লাফিয়ে পড়েছে। বলছি, উঠে আয়। দড়ি ফেললাম, ইট মারছি—তবু উঠবে না।

কালু স'রে পড়ল।

জ্যোতি। (আর্তকণ্ঠে) না মা, উঠিস নে—উঠিস নে। পৃথিবী হস্নে হয়ে গেছে। মানুষ নেই—বাঘ-সিংহি। উঠিস নে তুই, আমিও যাচ্ছি।

জ্যোতির্ময়ী ইঁদারার পাঁচিলে দাঁড়িয়েছেন, লাফিয়ে পড়বেন। কাসেম আলি পেছন দিক্ দিয়ে এসে চিলের মতন ছোঁ মেরে তাঁকে ধরে ফেলল।

জ্যোতি। (মুখ ফিরিয়ে) গায়ে হাত দিলি, এত বড় আস্পর্ধা? শয়তান, বেইমান, কেন আমায় এসে ধরলি?

কাসেম। ভাবগতিক তোমার ভাল ঠেকে না মা-ঠাকুরুন। ইঁদারায় ঝাঁপ দিয়ে মরবে—

জ্যোতি। এই তো চাস তোরা। মেয়ে গেছে, শাশুড়ি গেছেন—আমিও তাঁদের পথে যাব। ছেড়ে দে বলছি। ছাড়্, ছাড়্—

রাজকৃষ্ণ এসে পড়লেন। কপালে গামছার ব্যাণ্ডেজ। তবু রক্ত গড়িয়ে আসছে। তিনিও তাড়া দিয়ে ওঠেন।

রাজ। ছাড়, ছাড় বলছি—

রাজকৃষ্ণের অবস্থা দেখে জ্যোতির্ময়ী হাহাকার করে ওঠেন। ইঁদারা ছেড়ে এসে স্বামীর হাত ধরলেন। কাসেম আলি বলছে—

কাসেম। মরবার দিনই বটে মা-ঠাকরুন! রাজাবাবুর এই দশা। দাদাবাবু ওদিকে আগুনে আধপোড়া হয়ে ছটফট করছে, তোমাদের ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে—

ধ্রুব এল।

ধ্রুব। মা, ও মা, আগুনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে—

রাজকৃষ্ণ পিছন ফিরে ছিলেন, মুখ ফেরালেন।

ধ্রুব। বাবা, বাবা গো!

কাসেম। দেখছ কী দাদাবাবু? রাজাবাবুর এই দশা। তোমার এই। আর মা-ঠাকরুন মরতে চলেছেন। দিব্যি হবে। চাষকুঠির ঘোষেদের নিশানা থাকবে না দুনিয়ার উপর।

জ্যোতি। (কঠোর দৃষ্টিতে কাসেমের দিকে তাকালেন) কী মতলব তোর নেমকহারাম?

কাসেম। মতলব? এই বাড়িতে, এই গাঁয়ে তোমাদের থাকা হবে না। খালের ঘাটে যেতে হবে। এক্ষুনি। দেশ ছেড়ে চলে যাবে। আমার দুই ছেলে করিম-রহিম ডিঙি নিয়ে তৈরি হয়ে আছে।

জ্যোতি। তোর কিসের মাথাব্যথা শুনি?

কাসেম। পুরানো মাহিন্দার যে আমি! বেইমান, শয়তান। আমার চেয়ে দাবি কার এ বাড়িতে? খোড়ো ঘরে থাকি, তোমরা গেলে পাকা দালান দখল করে থাকব। (কণ্ঠস্বর কাতর হয়ে উঠল) দাদাবাবু, মাকে ধরে নিয়ে এস। মায়ের মাথার ঠিক নেই। আমি রাজাবাবুকে নিচ্ছি। উঃ, কী রক্ত! তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে। তোমারও কী রকমটা দাঁড়ায়—পোড়ার ঘায়ে মলম-টলম দরকার।···দাদাবাবু, দেরি করলে হবে না।

ধ্রুব। এস মা—

কাসেম আলি রাজকৃষ্ণকে ধরে নিয়ে চলেছে। ধ্রুব জ্যোতির্ময়ীর হাত ধরেছে। কয়েক পা গিয়ে জ্যোতির্ময়ী ধ্রুবর হাত ছাড়িয়ে ছুটে এসে পড়লেন ইঁদারার চাতালের উপর। ইঁদারার পাঁচিলে মাথা কুটছেন।

জ্যোতি। মা, ওরে মা চম্পা, চতুর্দোলায় উঠে শ্বশুরবাড়ি যাবি, তোকে আজ জলের মধ্যে রেখে যাচ্ছি মা আমার।

রাজকৃষ্ণও ব্যস্তভাবে গিয়ে পড়লেন জ্যোতির্ময়ীর পাশে।

রাজ। জলের মধ্যে? বিয়ের কন্যে জলে পড়ে রইল—আরে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে! উঠে আয় মা। চম্পক, চম্পা, চম্পি, শুনতে পাস—উঠে আয় রে বজ্জাত বেটি—

ইঁদারায় ঝুঁকে প'ড়ে ডাকতে লাগলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

খাল। জঙ্গলে ভরা আঘাটা। আবছা অন্ধকারে দেখা যায়, ডিঙি বাঁধা আছে একটা। ভাটার টানে দুলছে। জল পড়ছে কোন দিকে কলকল মৃদু আওয়াজে। ঝিঁঝিঁর ডাক। জোনাকি।

জ্যোতি। আর কদ্দুর যেতে হবে কাসেম আলি?

কাসেম। এই তো, এসে গেছি। নৌকো আঘাটায় ঝোপের আড়াল করে রেখে দিয়েছে। কষ্ট হয়েছে মা, বুঝতে পারছি। দশ পা-ও তো একসঙ্গে কখনো হাঁট নি! কিন্তু চাষকুঠির রাজাবাবু, চাষকুঠির বৌরাণী, চাষকুঠির দাদাবাবুকে সকলের নজরের সামনে বুক ফুলিয়ে সদরঘাটে নিয়ে তুলব, সেদিন আর নেই মা। হায়, হায়—আজকে হল কেঁচোর মতন বুকে ভর দিয়ে যাওয়া।···কী হল রাজাবাবু? দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? চলুন। ঐ যে নৌকো—উঠতে হবে এইবার।

জ্যোতি। ওঠ—

রাজ। উঠব মানে? বলিহারি আক্কেল! মেয়েটা এল না এখনো। (খিঁচিয়ে উঠলেন) তোমারই দোষ। আদর দিয়ে দিয়ে গাছ-বাঁদর করে তুলেছ। জলে পড়ে রইল। সবাই চলে এলাম, তার আসা হয় না।

কাসেম। (নৌকোয় ছেলেদের ডাকছে) করিম, রহিম, তোরা একবার ডাঙায় নেমে আয়। সামাল করে তুলে নে এঁদের। জল-কাদা ভেঙে ওঠা তো অভ্যেস নেই—

রহিম ও করিম নেমে এল। রহিম রাজকৃষ্ণকে ধরেছে, কিন্তু গোঁ ধরে আছেন তিনি। নড়বেন না। মাকে ছেড়ে ধ্রুব এগিয়ে এসে বাপের হাত ধরল।

ধ্রুব। চল বাবা—

রাজ। না, যাব না। চম্পা আসুক।

ধ্রুব। চম্পা আগে গিয়ে ঐ কদমতলার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজ। গেছে? দেখেছিস তুই? তাহলে চল। চল শীগগির। দেখ দিকি, একলাটি দুড়দাড় করে চলে গেল। ডাকাত মেয়ে—রাতবিরেতে ভয়ও করে না!

রাজকৃষ্ণ সকলের আগে নৌকোয় গেলেন। রহিম তাঁর সঙ্গে। ধ্রুব ও জ্যোতির্ময়ী একটুখানি পিছিয়ে গেছেন। কাসেম আলি করিমকে কাছে ডাকল।

কাসেম। শোন্ একটা কথা। খুব সামাল হয়ে যাবি। নরম হাতে বোঠে মারবি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বড়-চাচা বলে পরিচয় দিবি রাজাবাবুর। দাঙ্গায় চাচা ঘায়েল হয়েছে, বলবি। বড়-চাচা সে ত মিছে কথা নয়—বাপের চেয়ে বেশি করেছেন উনি তোদের।

করিম। জী হাঁ—

কাসেম। সদরে সোজা হাসপাতালের ঘাটে নিয়ে তুলবি। হাসপাতালে তুলে দিয়ে তার পরে ছুটি। তখন আর কেউ কিছু করতে পারবে না।

করিম। জানো আব্বা, এত হাঙ্গামা কিন্তু একটা মিথ্যে ধুয়ো তুলে দিয়ে। রহমৎ কাজির ছেলে এই একটু আগে গাঁয়ে ফিরে এল।

কাসেম। বলিস কি রে? যাকে মেরে ফেলেছিল কলকাতায়?

করিম। জী হাঁ। নৌকোয় করে আমাদের সুমুখ দিয়ে সে কাজিপাড়ার দিকে চলে গেল।

ধ্রুব। মিথ্যে রটিয়ে মানুষ ক্ষেপিয়েছে?

কাসেম। মানুষের চামড়া গায়ে পরে কত শয়তান যে কত রকম মতলবে দুনিয়ার উপর ঘোরে, ছেলেমানুষ তুমি তার কি বুঝবে দাদাবাবু? হায়, হায়, হায়—কত সংসার উচ্ছন্নে গেল, কত লোক মারা গেল বিনি দোষে!

ধ্রুব ডিঙিতে উঠেছে। জ্যোতির্ময়ী সতর্ক ভাবে এগুচ্ছেন। কাসেম আলি একটা থলি এগিয়ে দিল তাঁর দিকে।

কাসেম। মা, এইটে হাতে নিয়ে ওঠ—

জ্যোতি। কি?

কাসেম। টাকা। লুঠ করে নগদ যা পাওয়া গেছে, তার দু-আনা আমায় খোঁজদারির বখরা দিল। আমি হাত পেতে নিলাম। মা যাচ্ছেন, দাদাবাবু রাজাবাবু যাচ্ছেন, টাকার যে আমার বড্ড দরকার! না নিয়ে উপায় নেই।

জ্যোতির্ময়ী ফিরে দাঁড়িয়ে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন কাসেম আলির দিকে।

জ্যোতি। দাও। পথের সম্বল তুমি জুটিয়ে দিলে কাসেম আলি। কেন নেব না?

কাসেম। আমার ত কিছু নয়। টাকা তোমাদেরই, তোমাদের চাষকুঠির। আর এটাও নিয়ে যাও মা—

শৌখিন কৌটায় সেই মুকুট কাসেম আলি এগিয়ে ধরল। জিনিষটা দেখে জ্যোতির্ময়ী আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন।

জ্যোতি। মুকুট—আমার চম্পকের মুকুট? এ মুকুট যিনি সাধ করে গড়িয়েছিলেন, তিনি নেই। যাকে পরাতেন, সে-ও নেই। এ নিয়ে কি করব কাসেম আলি? আমি নিতে পারব না।

কাসেম। মা, অবুঝ হোয়ো না। রাজাবাবু আর দাদাবাবুকে নিয়ে বিদেশ-বিভুঁই জায়গায় যাচ্ছ—ওদের বাঁচিয়ে তুলতে হবে। তুমি শক্ত না হলে কেউ ওরা বাঁচবে না।···নাও মা, তোমার ওই হাতে নিয়ে নাও এটা।

জ্যোতির্ময়ী মুকুট নিয়ে নিলেন।

জ্যোতি। কাসেম আলি, কত অকথা-কুকথা বলেছি, বেইমান জানোয়ার বলে গালিগালাজ করেছি। কিছু মনে করিস নে বাবা।

কাসেম। জানোয়ার বলেছিলে, আমায় তা লাগবে কেন? মানুষ যারা জানোয়ার হয়ে গেছে, তাদের গায়ে লাগবে। খোদার ফজলে আবার সব ভাল হয়ে যাবে, তাঁর কাছে দোয়া কর মা—

জ্যোতি। মানুষের উপর একেবারে বিশ্বাস হারিয়েছিলাম কাসেম আলি। তোকে দেখে আবার বাঁচবার ইচ্ছা হয়।

জ্যোতির্ময়ী ডিঙিতে উঠলেন। করিম রহিম বোঠে বাইছে। আকাশে চাঁদ উঠল। চারিদিক জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করে। ডিঙি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হল। কূলের উপর কাসেম আলি হাঁটু গেড়ে বসে আকুলকণ্ঠে খোদার নামে দোয়া পাড়ছে—

কাসেম। খোদা মেহেরবান, তোমার দুনিয়া ভাল করে দাও। মানুষ ভাল হয়ে যাক। খোদা মেহেরবান—

প্রথম অঙ্ক শেষ

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ষ্টেশনে উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নিয়েছে। মালপত্রে গণ্ডি-ঘেরা, সেই গণ্ডির মধ্যে এক-একটা সংসার। শুয়ে বসে আছে সব, কোটনা কুটছে, খাচ্ছে, ইত্যাদি। পাশাপাশি এমনি দুটো সংসার আমাদের নজরে আসে। একটিতে প্রৌঢ় ভবরঞ্জন ও স্ত্রী সুবাসিনী, অন্যটিতে রাজকৃষ্ণ ও ধ্রুব। ধ্রুব অসুস্থ, শয্যাশায়ী। সুবাসিনী পাশে নর্দমার ধারে থালা-বাসন ধুচ্ছেন।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। রেল-পুলিশের এক কর্তা-ব্যক্তি হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়ল।

রেল-পুলিশ। এইও, শুনছ? উঠে যেতে হবে। রেল-স্টেশন এটা—কায়েমি ঘরবসতের জায়গা নয়।… শুয়ে শুয়ে পা দোলাচ্ছ, কে হে বটে নবাব বাহাদুর? কথা কানে যায় না?

ভবরঞ্জন তড়াক করে উঠে বসল।

ভব। আজ্ঞে হ্যাঁ, যাচ্ছে। খুব যাচ্ছে—

রে-পু। চলে যেতে হবে স্টেশন ছেড়ে।

ভব। যাব। আলবৎ যাব।

রে-পু। ভাসা-ভাসা কথা অনেকবার হয়েছে। যাবে কাল দুপুরের আগেই। না গেলে জোর করে লরীতে পুরে ট্রানজিট-ক্যাম্পে ছেড়ে দিয়ে আসবে। উপরওয়ালার হুকুম।

ভব। আজ্ঞে হ্যাঁ। কালকেই যাব।

পুলিশের লোক এগিয়ে যেতে ভবরঞ্জন পিছন থেকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। রাজকৃষ্ণ অর্থহীন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভবরঞ্জন এবার তাঁকে উদ্দেশ করে বলছে—

ভব। কলা, কলা! যেতে বয়ে গেছে, কি বলেন মশায়?

রাজকৃষ্ণ হেসে ঘাড় নাড়লেন।

ভব। কী জন্যে যেতে যাব? ক্যাম্পে নিয়ে যাক কি স্বর্গে নিয়েই তুলুক, সুড়সুড় করে আবার চলে আসব। এমন জুত কোথায়? কি বলেন?

রাজকৃষ্ণ সজোরে ঘাড় নাড়লেন।

রাজ। হে-হে—এমন জুত কোথায়?

হি-হি করে হাসেন।

ভব। ধরুন না কেন, বৃষ্টিবাদলায় দুনিয়া ভেসে যাক, আমাদের গায়ে একফোঁটা জল পড়বে না। তার উপরে বিবেচনা করুন, সন্ধ্যা হতে না হতে বিজলি-আলো আপনা-আপনি জ্বলে উঠল, এক পয়সার কেরোসিন খরচা নেই। কি বলেন মশায়?

রাজ। সত্যিই তো, সত্যিই তো—হি-হি-হি—

সুবাসিনী বাসন ধোওয়া শেষ করে গামছায় মুছে শিয়রের দিকে রাখলেন। কথাবার্তায় যোগ দিলেন এবারে।

সুবাসিনী। কার সঙ্গে কথা বলছ?—পাগল।

ভব। বাসনপত্তোর ধুয়ে-মুছে রাখলে—রান্না হবে না?

সুবাসিনী। মাড়োয়ারিবাবু আজ যে খিচুড়ি খাওয়াবে সকলকে।

ভব। বটে! (রাজকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে) দেখছেন মশাই? এই আর এক মজা। আজ ইনি খিচুড়ি খাওয়াচ্ছেন, কাল তিনি পুরি-জিলিপির ঠোঙা বিলি করছেন, পরশু সে চিঁড়ে-দইয়ের ফলার দিচ্ছে—মচ্ছব লেগেই আছে।

রাজ। ভারি মচ্ছব—হি-হি-হি—

ভব। এই সুখ ছেড়ে কোন বেটা আহাম্মক চলে যাবে বলুন তো?

ভবরঞ্জন ধপাস করে শুয়ে পড়ে বিপুল বেগে পা নাচাতে লাগল। ছেঁড়া শাড়ি-পরা বিবর্ণ-মূর্তি জ্যোতির্ময়ী প্রবেশ করলেন। হাতে বাজারের থলি। রাজকৃষ্ণ হাত বাড়ালেন, জ্যোতির্ময়ী একটা সিগারেট দিলেন স্বামীর হাতে।

জ্যোতি। (কাতর কণ্ঠে) চুরুট আনতে পারি নি। মোটে চোদ্দটা পয়সা—চুরুট আনতে গেলে ছেলের বার্লি কেনা হয় না। আজকে এইটে ধরাও, কাল তোমায় চুরুট দেব। এক সের ঠোঙা নিয়ে গেছে, রাত্রে দাম দিয়ে যাবে। এক টাকা দশ পয়সা। আবার তখন বড়লোক।

রাজকৃষ্ণ স্ত্রীর দিকে একবার তাকালেন, আর একবার হাতের সিগারেটের দিকে। তারপর মুখের মধ্যে সিগারেট পুরে কপকপ করে চিবাতে লাগলেন।

জ্যোতি। ও কি, ও কি? অত রাগ করতে হয়! সিগারেট চিবোচ্ছ, মাথা ঘুরবে যে এক্ষুনি—

সুবাসিনী অন্তরঙ্গভাবে জ্যোতির্ময়ীর কাছ ঘেঁষে এলেন।

সুবাসিনী। মাথা খারাপ বুঝি তোমার কর্তার?

জ্যোতি। (স্নেহদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে) কিন্তু হুঁশ কী রকম দেখ দিদি। চুরুট খাওয়ার নেশা—এই একটি মাত্র নেশা ওঁর। চুরুটের বদলে সিগারেট দিয়েছি, ঠিক ধরে ফেলেছেন।

সুবাসিনী। বড্ড কষ্ট তোমার ভাই। স্বামী পাগল, ছেলে ভুগে ভুগে সলতের মতন নেতিয়ে আছে—

জ্যোতি। আমার মতন সুখ কারো ছিল না দিদি। ছেলেমেয়ে শাশুড়ী-স্বামী লোকজন অতিথি-অভ্যাগত নিয়ে ভর-ভরন্ত সংসার। তল্লাটের মানুষ আমার স্বামীকে রাজাবাবু বলে ডাকত। রাজার বৌ রাণী হয়—আমায় বলত বৌরাণী। সেই রাণী এখন চোদ্দ পয়সার বাজার সেরে এসে রাজপুত্রের একটুখানি বার্লি ফুটিয়ে দিয়ে কাগজ-আঠা নিয়ে এবারে ঠোঙা বানাতে বসে যাবেন।

জ্যোতির্ময়ীর গলা ধরে এলো, তিনি চুপ করে গেলেন।

সুবাসিনী। কি কাজ করতেন তোমার স্বামী?

জ্যোতি। চাষবাস। হ্যাঁ দিদি, শিক্ষিত লোকেরা যার নামে নাক সিঁটকায়। শ্বশুর ছিলেন ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার সাহেবের ছেলে সায়ান্সের বড় ডিগ্রি নিয়ে শহর ছেড়ে পৈতৃক গাঁয়ে এসে উঠলেন। বললেন, আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে মান্ধাতার যুগের লাঙল ঠেলে আর জলের জন্য আকাশমুখো তাকিয়ে থেকে কোনদিন দুঃখ ঘুচবে না। বড়-বিলে জলের তুফান বইত, জল সরে গিয়ে মাটি বেরুল। ট্রাক্টর এসে-পড়ল, কত রকমের সার! সোনা ফলে সেই বিলে এখন। বলতেন, শহরে আমি একটা মানুষই বড়লোক হয়ে থাকতাম। আমার দেখাদেখি এখন পাঁচখানা গাঁয়ের মানুষ বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যাদের জন্যে এত করলেন, সেই তারাই একদিন মাথা ফাটিয়ে দিল। ছেলে আগুনে আধপোড়া হয়ে বেরুল। তিন মাস হাসপাতালে রেখে শুধুমাত্র প্রাণটুকুই ফিরিয়ে আনতে পেরেছি দিদি।

কথা শেষ হল না। ধ্রুব ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল—

ধ্রুব। খিদে পেয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল মা।

জ্যোতি। জেগেছিস বাবা? বার্লি এনেছি—ফুটিয়ে দিই এক্ষুনি।

জ্যোতির্ময়ী এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে সুবাসিনীকে প্রশ্ন করেন—

জ্যোতি। উনুন ধরায় নি কেউ যে এখনো? বার্লিটা ফুটিয়ে নিতাম।

ভবরঞ্জন ধাঁ করে উঠে বসলেন।

ভব। তবে আর বলছি কেন! সম্পৎলাল মাড়োয়ারি খিচুড়ি-ভোগ দিচ্ছে আজ। বলে কিনা এই সব ছেড়েছুড়ে ক্যাম্পে চলে যাও। আবদার!

রাজ। আবদার! হি-হি-হি—

লোহার উনুনে পকৌড়ি-ভাজা হচ্ছে, সেই উনুন হাতে ঝুলিয়ে পকৌড়িওয়ালা। সুবাসিনী তাকে ডাকলেন—

সুবাসিনী। এই পকৌড়ি, এই যে—এদিকে—

পকৌড়িওয়ালা। গরমাগরম পকৌড়ি-ভাজা, খেতে মজা…ক'পয়সার ?

সুবাসিনী। খদ্দের নই। রোগা-ছেলের বার্লিটুকু ফুটিয়ে দাও বাপু তোমার উনুনে।

পকৌড়িওয়ালা। ধ্যুৎ! যত বাজে ঝামেলা। (সুর ধরল) গরমাগরম পকৌড়ি-ভাজা—

সুবাসিনী। তুমি ছেলেপুলে নিয়ে সংসারধর্ম কর। সংসার একদিন আমাদেরও ছিল। কোন দোষঘাট করি নি, তবু সব খুইয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পথে বসেছি।

পকৌড়িওয়ালা চলে যাচ্ছিল, ফিরে এসে উনুন নামিয়ে রাখল। হাত বাড়িয়ে বলে—

পকৌড়িওয়ালা। দাও—

বার্লি-গোলা এলুমিনিয়ামের বাটি উনুনে বসাল পকৌড়ির কড়াই নামিয়ে রেখে। ধ্রুব ইতিমধ্যে পোঁটলাপুঁটলি ও বালিশ ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়েছে। জ্যোতির্ময়ী তার মাথায় হাত বুলাচ্ছেন।

জ্যোতি। সব খুইয়ে পথে এসে বসেছি। আমার ধ্রুব ভাল হয়ে উঠুক—আবার সমস্ত হবে।

রাজকৃষ্ণ হঠাৎ হেসে উঠে ঘাড় নাড়লেন।

রাজ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সমস্ত হবে—হি-হি-হি—

জ্যোতির্ময়ী চকিতে স্বামীর দিকে তাকালেন। স্বামীর ডান হাত নিয়ে নিলেন মুঠোর ভিতর।

জ্যোতি। সমস্ত হবে আবার। কি বল ?

রাজ। হবে—

জ্যোতি। তুমি ভাল হবে আবার ? ধ্রুবর আগের চেহারা হবে ?

রাজ। হবে—

জ্যোতি। ঘর-বাড়ি হবে ? মান-ইজ্জত হবে ?

রাজ। হবে, হবে, হবে—

জ্যোতি। মানুষজন ভাল হবে আবার ? সুখ আসবে ? শান্তি আসবে ?

রাজ। আসবে—

জ্যোতি। সব আসবে। কিন্তু আমার চম্পক আর ফিরে আসবে না।

রাজ। আসবে, আসবে। আলবাৎ আসবে সে বেটি। হি-হি-হি—

জ্যোতি। আসবে ? কেমন করে আসবে বল। সে আর আসতে পারবে না—

জ্যোতির্ময়ী আকুল হয়ে কাঁদছেন। পকৌড়িওয়ালা বার্লি ফুটিয়ে দিয়ে চলে গেল। এ-পাত্রে ও-পাত্রে ঢালাঢালি করে কিছু জুড়িয়ে নিলেন, তারপর ধ্রুবর মুখে বার্লির বাটি ধরলেন। দু'জন যাত্রী যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্রথম যাত্রী। রাজাবাবু না ? সিরাজকাটির রাজাবাবু—

দ্বিতীয় যাত্রী। দূর! ভিখারি একটা। রাজাবাবুর ত মাথা কাটিয়ে আগুনে ফেলে দিয়েছিল ?

প্রথম যাত্রী। মানুষটা কে তবে ? রাজাবাবুর ভূত ? (দশ টাকার নোট বের করল) দিয়ে দিই। রাজাবাবু দু'হাতে মানুষকে দিতেন—হতেও পারে, আজকে তাঁর এই দশা।

দ্বিতীয় যাত্রী। একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবি তো—সাপ না ব্যাঙ ? (রাজকৃষ্ণের প্রতি) হ্যাঁ গো, কোত্থেকে এসেছ ? ঘর কোন জেলায় তোমাদের ?

জ্যোতির্ময়ী তাড়াতাড়ি জবাব দেন।

জ্যোতি। ফরিদপুর—

দ্বিতীয় যাত্রী। দেখলি ? সিরাজকাটির রাজাবাবুর যদি এমনি হাল হয়, সেদিন বেগুনতলায় হাট বসবে, কলাগাছে মূলো ফলবে।

যাত্রী দু'জন চলে গেল। রেল-পুলিশের লোক ফিরছে এই দিক দিয়ে।

রে-পু। খেয়াল রেখো, কাল দুপুরের মধ্যে চলে না গেলে জোর করে লরীতে পোরা হবে—

বলতে বলতে পুলিশের লোক চলে গেল।

জ্যোতি। দুপুর অবধি কেন—রাত থাকতেই চলে যাব আমরা।…তোকে নিয়েই মুশকিল ধ্রুব। হাঁটতে

পারবি নে তো,—ছোট্টবয়সের মতো কোলে উঠে যাবি। (হেসে) এতটুকু ছোট্ট খোকামণি আমার! কোলে উঠিস ত রিক্সার ক'টা পয়সা বেঁচে যায়।

ধ্রুব। ভয় পেয়ে গেলে মা? যাবার কথা আগেও অমন কতবার বলেছে।

জ্যোতি। আজকে সত্যি বড্ড ভয় পেয়েছি। পুলিশের ভয় নয়। যাত্রীগুলো চিনে ফেলে দশ টাকা ভিক্ষে দিতে যাচ্ছিল তাদের রাজাবাবুকে। কোনখানে তখন মুখ ঢাকব; দিশা পাই নে। রাজাবাবু অনেক দিয়েছেন, অনেকেই তাঁই দিতে আসবে। সর্বস্ব খুইয়ে বাস্তু হারিয়ে চলে এসেছি, কিন্তু ভিক্ষুক আমরা কিছুতে হব না ধ্রুব।

ভবরঞ্জনের কানে যেতে আবার উঠে বসলেন। সুবাসিনীকে বলছেন—

ভব। শুনছ গো? এই মশায়রা চলে যাবেন। পোঁটলাপুঁটলি সরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওপাশে জায়গা খানিকটা বাড়িয়ে নেবে। নতুন কেউ এসে পড়বার আগেই।

পুনশ্চ শুয়ে পড়ে ভবরঞ্জন পা নাচাচ্ছেন।

শেষরাত্রি। ঘুমুচ্ছে সবাই। স্বপ্ন দেখে রাজকৃষ্ণও ধরমড়িয়ে উঠে বসলেন। ঘুম-চোখে চারিদিক রহস্যাচ্ছন্ন লাগে।

কে যেন ডাকছে দূর থেকে: বাবা, বাবা গো!—ডাক ক্রমশ নিকটে আসে। উঠে পড়লেন রাজকৃষ্ণ, ছুটলেন ডাক আন্দাজ করে।

দেয়ালে ছবিওয়ালা রঙিন পোষ্টার—সেই পোষ্টার ঢেকে চম্পকের মূর্তি এসে দাঁড়াল। বিয়ের কনের সজ্জা।

রাজ। চম্পা, চম্পি, চম্পকলতা, এসেছিস মা আমার?

চম্পক। বাবা, বড্ড অন্ধকার ইঁদারার মধ্যে। ভয় করে। জলে ভারি শীত। যেন গা কেটে নেয়, দম আটকে আসে।

রাজ। (আগুন হয়ে উঠলেন) হবেই ত! অবাধ্য মেয়ে, পাজি মেয়ে। আমরা সবাই চলে এলাম—

চম্পক। (কাতর কণ্ঠ) ইটের বোঝা যে চাপিয়ে দিল মাথার উপর। উঠি কেমন করে বাবা?

রাজ। ইটের বোঝা—তাই বটে! যাক গে, এসে ত গেছিস। সেই বিয়ের কাপড়চোপড়—মা আমার সোনার প্রতিমা!...ঐ দেখ, তোর মা। পাশে ধ্রুব ঘুমুচ্ছে। দাঁড়িয়ে কি দেখিস—আয়, আয়। ওদের ডেকে তুলি, কত আনন্দ করবে!

ট্রেনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল কিছুক্ষণ থেকে। হুড়মুড় করে এক্সপ্রেস-গাড়ি ষ্টেশন পার হয়ে বেরিয়ে গেল। প্রখর হেডলাইটে ওয়েটিংরুম ক্ষণিক উদ্ভাসিত হল। রাজকৃষ্ণ চেয়ে দেখেন, সেই আলোর সঙ্গে চম্পকও মিলিয়ে গেছে। দেয়ালে যথাপূর্ব রঙিন পোষ্টার। রাজকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে সেই দেয়ালে হাত বুলাচ্ছেন।

গাড়ির আওয়াজে জ্যোতির্ময়ীও ওদিকে তড়াক করে উঠে বসলেন। ধ্রুবকে ডাকছেন—

জ্যোতি। ধ্রুব, ধ্রুব, নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস বেরিয়ে গেল।...ও কি, তুমি কেন ওদিকে?

রাজ। বৌরাণী, চম্পা এসেছিল। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

জ্যোতি। ওঠ রে ধ্রুব। তোর বাবা স্বপ্ন দেখে সেই রকম উঠে পড়েছেন্। বকছেন।...সকাল হয়ে এল রে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। ওঠ—

ধ্রুব চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসল। ব্যস্তভাবে জ্যোতির্ময়ী পোঁটলাপুঁটলি গোছাচ্ছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলকাতার উপকণ্ঠে বাগানবাড়ি। ফাঁকা জমি খানিকটা—একদিকে একতলা পাকা দালান।

শেষরাত্রির আবছা আঁধারে দেখা যায়, ছায়ার মতো মানুষজন খড়ে-ছাওয়া চাল বয়ে আনছে, খুঁটি পুঁতছে। দেখতে দেখতে চালাঘর উঠে গেল ফাঁকা জায়গায়। মানকচু-গাছ এনে বসাল পৈঠার পাশে। তুলসি-চারা অন্যদিকে। আরও সব মানুষ চাল ও বাঁশ-খুঁটি নিয়ে যাচ্ছে এদিকে-ওদিকে। ঠকাঠক বাঁশ কাটার শব্দ। অর্থাৎ আরও ঘর উঠছে নেপথ্যে।

চালাঘরের কাজকর্ম সেরে যাদব, কেশব এবং একটি অল্পবয়সি মেয়ে প্রতিমা দাঁড়িয়ে তারিফ করছে।

প্রতিমা। ময়দানবের কাণ্ডকারখানা! এক রাত্রে একটা পাড়া বসে গেল, চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না।

যাদব। পুরানো চাল, পুরানো বাঁশ-খুঁটি কিনে সমস্ত কেষ্টপুরের খালপারে জমা রাখা ছিল। চিরকাল আমরা যেন ঘরবসত করে আসছি, নতুন বানানো নয়। পুলিশ এসে হুট করে তাড়াতে পারবে না।

কেশব। বিনি দোষে যথাসর্বস্ব খুইয়ে একটুকু ভিটেমাটির জন্যে মানুষ সব পাগল হয়ে ঘুরছে। উপায় কি আছে বল?

প্রতিমা কথার ধারা ঘুরিয়ে নেয়।

প্রতিমা। কলোনি হল। নাম কি দেওয়া হবে ডাক্তার-জ্যেঠা?

কেশব। আমি বলি, একেবারে চূড়োয় চেপে ধর। যার উপরে নেই। জওহর-কলোনি। কলোনি ত অলিতে গলিতে—যে যা-ই নাম দিক, এর চেয়ে উঁচুতে যেতে পারবে না।

যাদব। ক্ষেপেছ ডাক্তার? তোমার জওহরলাল কি আসতে যাবেন ঘুঘুডাঙায়? যে নাম দিলে কাজ হবে। পুলিশ নিয়ে উৎখাত করতে আসবে ত—থানার ও. সি. হলেন ভৃগুভূষণবাবু। আমি বলি, ভৃগু-কলোনি নাম দেওয়া যাক।

বিনোদ প্রবেশ করল।

বিনোদ। নাম হতে কি বাকি এখনো? বাগানবাড়ির যিনি খোদ মালিক, সেই নামে। নরেশ্বর কলোনি। লিখে নিয়ে এসেছি একেবারে। টাঙিয়ে দাও যাদব। হ্যাঁ, ঐখানটা।—উঃ, বড্ড খাটনি গেল। হাত-পা মেলে গড়িয়ে নেওয়া যাক একটু।

লাল শালুর উপর সাদা অক্ষরে কলোনির নাম, ইত্যাদি। দালানের দেয়ালে সেখাটা টাঙিয়ে দিয়ে এরা চলে গেল।

ভোর হল। ক্রমশ বেলা হল একটু। বাগানবাড়ির মালিক নরেশ্বর দে চৌধুরির কর্মচারী বনমালী ও হরি বরকন্দাজ প্রবেশ করল।

বনমালী। রিফিউজি ঢুকে পড়েছে হরি। কত চালা বেঁধে ফেলেছে! বড়বাবু আসছেন—তার মধ্যেই কী কাণ্ড!

হরি। নাচঘরে ধোঁয়া কিসের অত? উনুন ধরাচ্ছে বোধ হয়।

বনমালী। ঐ নাচঘরের মেজেয় কত কত নাম-করা বাইজির ঘুঙুর বেজেছে, ঝুলন্ত ঝাড়লণ্ঠন অবধি নেশায় বুঁদ হয়ে গেছে—যত হাঘরে সেইখানে ঢুকে কিনা পুঁইডাটার চচ্চড়ি চাপায়। বড়বাবু এসে আজ রক্ষে রাখবেন না।

কথা বলতে বলতে দু'জনে এগুচ্ছে। মঞ্চ ঘুরছে ধীরে ধীরে। দালানের সামনে এসে দেখা গেল, দরজার তালা ভাঙা। হরি বরকন্দাজ চেঁচিয়ে ওঠে—

হরি। দালানের তালা ভেঙে ফেলেছে গোমস্তা মশায়।

বনমালী। তাইত রে! তালা ভেঙে ঘরে ঢোকে, এত বড় আস্পর্ধা! আগাছার জড় এক্ষুনি শেষ করব পাইক-দরোয়ান এনে। বড়বাবু এসে পড়বার আগেই। আয়, কারা ভিতরে আছে দেখি—

তৃতীয় দৃশ্য

দালানের ভিতরটা দেখা যায় এবার। আগে শৌখিন শয়ন-কক্ষ ছিল, এখন পরিত্যক্ত। আসবাবপত্র দামি, কিন্তু পুরানো ও ধূলিমলিন। মেহগ্নির বৃহৎ খাটে ডবল গদি, চাদর-বালিশ নেই। বিনোদ ঐ গদির উপরে আরাম করে গড়াচ্ছিল। বাইরে বনমালী ও হরির উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে সে ছটফট করছে। বাইরে পালাবার উপায় নেই, ভিতরে কোথাও লুকোবার জায়গা খুঁজছে। দুটো গদি খাটের উপর—একটা গদি উঁচু করে বিনোদ তার নিচে সেঁদিয়ে গেল।

হরি বরকন্দাজ এই সময় গলা বাড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিল।

হরি। লোক নেই গোমস্তা মশায়।

দু'জনে দালানের ভিতর ঢুকল।

বনমালী। লোক নেই, কিন্তু লোকে নিশানা রেখে গেছে। কাণ্ডখানা চেয়ে দেখ্ হরি। কর্তা-মশায়ের অয়েলপেন্টিং-এর পেরাকে শিকে টাঙিয়ে হাঁড়িকুঁড়ি ঝুলিয়েছে। সরিয়ে সমস্ত সাফসাফাই করে ফেল্। বড়বাবু এসে দেখলে আমাদের মুণ্ডু কেটে ফেলবেন।

হরি। (দারোয়ান বাবুদের হয়েছে) আমাদের মুণ্ডু কেটে তো মুনাফা নেই। পারেন ত ওদের কাটুন, রাতারাতি যারা পাড়া বসিয়ে ফেলল।

বনমালী। বড়বাবুকে কদ্দিন থেকে বলছি, বাগানবাড়ির ব্যবস্থা করে ফেলুন। ভূতের বাড়ি হয়েছিল, চোর-ডাকাত আর ম্যালেরিয়ার ভয়ে কেউ এদিককার ছায়া মাড়াত না। রামচরিত্র মাড়োয়ারি তিন শ' টাকা কাঠা দিতে চাচ্ছিল। তা পাঁচ শ' করে দর হেঁকে উনি কোন পাঁসালো খদ্দেরের পিছুপিছু ঘুরতে লাগলেন—

হরি। পাঁচ শ'র জায়গায় এরা ত পাঁচটা পয়সাও দেবে না।

ইতিমধ্যে বনমালী একটা বিড়ি ধরিয়ে খাটের গদিতে চেপে বসেছে। এক লাফে সে উঠে পড়ল।

বনমালী। ওরে হরি, ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? খাট যেন নড়ছে!

হরি। ভূমিকম্প—কই, না। ঘরও ত নড়বে তা হলে।

বনমালী। খাট নড়ছে না—গদি, গদি। জন্তু-জানোয়ার ঢুকে পড়ল নাকি? যা জঙ্গল—

বনমালী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে। হরিও এদিকে এল।

হরি। আধখানা ঠ্যাং দেখা যায় ঐ যে—

বনমালী টিপিটিপি এগিয়ে উপরের গদি উঁচু করে তুলল।

বনমালী। শুধু ঠ্যাং কি রে, পুরো মানুষ একটা।···এই, কে রে তুই? কে? কে?···রা কাড়ে না, নড়াচড়া করে না—ওরে হরি, কেউ মড়া ঢুকিয়ে গেল নাকি আমাদের গোলমালে ফেলবার জন্য?

হরি। (নজর করে দেখে) মড়া না হাতী! ছুতো ধরে পড়ে আছে। নবাব খাঞ্জে খাঁর মতো পা নাড়ছিল একটু আগে।···কে তুই? বড়বাবুর খাস কামরার তালা ভেঙে কোন মতলবে তুই হানা দিয়েছিস?

বনমালী। শ্রীল শ্রীযুত নরেশ্বর দে চৌধুরিবাবুর বাগানবাড়িতে অনধিকার-প্রবেশ এবং সম্পত্তি-তছরূপ—বোবা সেজে পার পাবি নে। এর পরে বন্দুকধারী পুলিশ আসবে, থানা-আদালত হবে—

বিনোদ। আমায় বললেন কিছু?

হরি। এই যে, এতক্ষণে কথা ফুটেছে!

বনমালী। (মুখ ভেঙচে) আমায় বললেন কিছু! আকাশ থেকে পড়লি, না বিলেত থেকে এলি চাঁদ? মানে মানে এক্ষুনি দলবল সহ যদি চলে যাস তো রক্ষে। যাবি কিনা, সোজাসুজি বল্।

বিনোদ। শুনতে পাই নে। কি বল গো তোমরা? জরবিকার, কানে তালা লেগে আছে।

বনমালী। ওরে হরি, কানে তালা, শুনতে পায় না। কান দুটো শোলোক করে দে দিকি লাঠির আগা দিয়ে।

লাঠির আগা লোহায় বাঁধানো। বিনোদের গায়ে খোঁচা দিল হরি।

বিনোদ। বাবা রে, মেরে ফেলল একেবারে—

বনমালী। বাবা বুলিতে ভুলবি নে হরি। বিদেয় না হওয়া অবধি ছাড়াছাড়ি নেই। আমি হুকুমদার; মরে বাঁচে সেজন্যে ষোলআনা দায়ী আমি।

আরও দু-একটা খোঁচাখুঁচিতে বিনোদ মর্মান্তিক আর্তনাদ করে খাট থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ল।

বনমালী। অ্যাঁ, ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেন হঠাৎ?

হরি। কাপ ধরেছে।

বিনোদের আর্তনাদে উদ্বাস্তু মেয়েপুরুষ কয়েকজন ছুটে এল। তার মধ্যে প্রতিমা, কেশব এবং যাদবও আছে।

কেশব। শেষ করে দিলে লোকটাকে?

হরি। পড়েছে ত ঐটুকু উঁচু থেকে। এমন ননীর পুতুল নিয়ে কেন এস পরের জমির উপর?

কেশব। ভুগে ভুগে দেহে কিছু ছিল না। আমারই অষুধ খাচ্ছে দু-মাসের উপর। অষুধের জোরে কোনমতে চলে ফিরে বেড়াত।

বিনোদের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কেশব নাড়ি দেখছে। নাড়ি পায় না। মণিবন্ধ থেকে প্রায় বগল অবধি উঠে গেল। মুখ বাঁকিয়ে কান্নার সুরে বলে—

কেশব। নেই—

প্রতিমা। কি বলছ ডাক্তার-জ্যেঠা, বাবা আমার নেই?

কেশব। নেই। এই খুনে ছুটোর কাজ। অত মারধোরে কড়কড়ে জোয়ানমরদ অবধি চোখ উলটে পড়ে—

হরি। মারধোর কোথা দেখলে তোমরা? যথাধর্ম বল।

বন। (হরিকে দেখিয়ে) এই বেটা গোঁয়ার-গুণ্ডা—ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। বললাম যে রোগা মানুষটা বেহুঁস হয়ে রয়েছে, নেড়ে চেড়ে মিষ্টি করে বাপু-বাছা ডেকে যদি সাড়া নিতে পারিস—

হরি। এখন তা-না না-না ভাঁজলে হবে না। লাঠি খোঁচাতে কে বলেছিল? হুকুমদার—মরে বাঁচে তার জন্যে ষোলআনা দায়িক তুমি—

বন। আমি বলেছি খোঁচাখুচি করতে? কখন? কোন্ নচ্ছার বলেছে এমন কথা? কোন্ উল্লুক? কোন্ হাড়হাভাতে?

প্রতিমা। ডাক্তার-জ্যেঠা, পালাচ্ছে ওই ওরা—

বন। হুঁ, পালাচ্ছি! কার ভয়ে পালাতে যাব? কাকে কেয়ার করি? ভাল ডাক্তার আনতে যাচ্ছি—এম, বি., বি. এস.। সেই ডাক্তার পরীক্ষা করবে। হাতুড়ে গেঁয়ো ডাক্তারে বোঝে কচু।

বনমালী ও হরি পায়ে পায়ে পিছচ্ছিল, এবারে একছুটে বেরিয়ে গেল। বিনোদকে ঘিরে যারা হা-হুতাশ করছিল, হি-হি করে তারা হেসে ওঠে।

কেশব। উঠে পড়্ বিনোদ, বেঁচে ওঠ্। কত ঢং-ই জানিস! বুঝে নিয়ে আমিও কেমন গণ্ডায় আণ্ডা মিশিয়ে গেলাম।

বিনোদ উঠে বসল।

চতুর্থ দৃশ্য

দালানের বাইরে (দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যের মতো)।

বনমালী ও হরি বেরিয়ে পালাচ্ছে। নরেশ্বর দে চৌধুরি কয়েকজন পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে এসে পড়েছেন, একেবারে তাঁর মুখোমুখি পড়ে গেল।

নরেশ্বর। দাঁড়াও বনমালী। কী ব্যাপার? নিজের বাগানবাড়ি—আমিই যে চোখে দেখে চিনতে পারি নে। পাড়া বসে গেছে দস্তুরমতো। এইখানটায় ত কাঁঠালগাছ ছিল একটা।···কদ্দিন ধরে এই সব বানাচ্ছে, কিচ্ছু তোমরা দেখ না। পান খাবার মোটামুটি বন্দোবস্ত আছে—অ্যাঁ?

বনমালী। কালীঘাটের কালীমায়ের দিব্যি, বাগবাজারের মদনমোহনের দিব্যি। বুধবার দিনও এসে গেছি। ফাঁকা জায়গা। হরিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন হুজুর—

এমনি সময় দালানের ভিতর থেকে উদ্বাস্তুরা বেরিয়ে এল। বিনোদ অগ্রবর্তী।

বনমালী। আরে মশায়, তুমি যে মরে গিয়েছিলে এক্ষুনি—

বিনোদ। বেঁচে উঠেছি। নয়ত তোমায় নিয়ে যে ফাঁসিতে লটকাত। ভূত হয়ে আমার পিছনে লাগতে।···প্রণাম হই বড়বাবু, পদরজ দিন—

বিনোদ সাষ্টাঙ্গে নরেশ্বরকে প্রণাম করল। একরকম জোর করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় মুখে দিল।

বিনোদ। কদ্দিন ধরে পথ চেয়ে আছি, হুজুর নিজের কলোনিতে কবে একবার দর্শন দেবেন—

নরেশ্বর। আমার কলোনি—মানে?

বিনোদ। মহানুভব দাতা আপনি—বাগানবাড়িতে কলোনি প্রতিষ্ঠা করে আশ্রয়দান করেছেন। গরিব আমরা বটে, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নই। আপনার কীর্তি-কথা সমস্ত লিখে দিয়েছি। ওই যে, পড়ে দেখুন—

কৌতূহলী নরেশ্বর দেয়ালের ধারে গিয়ে বালুর লেখা সশব্দে পড়ছেন।

নরেশ্বর। 'মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুত নরেশ্বর দে চৌধুরি মহাশয় বাস্তুহারাদের হিতার্থে ভূমিদান করিয়া অত্র কলোনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।'

প্রতিমা ইতিমধ্যে দালানের দরজা খুলে চৌকাঠের উপর এসে নরেশ্বরের গলায় মালা পরিয়ে দিল। শাঁখ বেজে উঠল। চটাপট হাততালি। রাগ করে নরেশ্বর গলার মালা ছিঁড়ে ফেললেন।

নরেশ্বর। মালার নিকুচি করেছে! তেল-সিঁদুরে ভবী ভুলবে না। ভূমিদান আমি করি নি। আমার বাপ-ঠাকুরদা চোদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ আমরা দান করি নে। শাঁসালো খদ্দের পেয়েছি, ভূমি বেচে দেব। ভদ্রলোক এক্ষুনি জায়গা দেখতে আসবেন। ফ্যাক্টরি হবে এখানে।

প্রতিমা। আমাদের কি হবে?

নরেশ্বর। উঠে চলে যাবে। আপোষে না গেলে কোঁৎকার ব্যবস্থা হবে।

যাদব। ছেলেপুলে নিয়ে এতগুলো মানুষ চিরকাল ঘরবসত করছি—বললেই অমনি চলে গেলাম! ইয়ার্কি!

বনমালী। কী মিথ্যুক রে বাবা! বুধবারে এমনি সময় কাঁঠালতলা এই জায়গায়? বলছে কি না চিরকালের বসত!

বাইরে মোটরের শব্দ। নরেশ্বর সচকিত হল।

নরেশ্বর। মোটর থামল যেন! দেখে আয় ত হরি।···এসে গেছেন—এসে গেছেন! ডেকে নিয়ে আয়।

বিনোদ। (বনমালীর প্রতি) তুমি বললে ত হবে না। চালাঘরের চেহারা দেখে দশেধর্মে বলবে পাড়াটা নতুন কি পুরানো।

নরেশ্বর। আঃ, চুপ কর দিকি। সে বিবেচনা পরে।···আসুন, আসুন। মা'টিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন? বেশ, ভাল। ভবিষ্যতে মায়েরই ত সব!

নীলমাধব ও তাঁর মেয়ে জয়া প্রবেশ করল। নীলমাধবের বয়স আটচল্লিশ; জয়ার ষোল।

নীল। গাড়িতে উঠে পড়ল জয়া। কী সব কেনাকাটা আছে, যাবার পথে সেরে যাবে।···খালি জায়গা কতটা হবে বলুন ত—

নরেশ্বর। নক্সায় সমস্ত আছে। চোখে দেখে এখন কিছু বুঝবেন না।

বিনোদ। (নীলমাধবের প্রতি) আপনি এখানে ফ্যাক্টরি বসাবেন সার? আমাদের অবস্থা ভেবে দেখুন। সর্বস্ব ফেলে এসে এইখানে একটু মাথা গুঁজে আছি। সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছাড়ার দুঃখ উদ্বাস্তু না হলে বোঝা যায় না।

জয়া উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল সামনের চালাঘরের ভিতরে। প্রতিমা জয়ার কাছে সম্ভবত আকুতি জানাতে যাচ্ছিল। জয়া ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলল।

জয়া। বাবা, আমি চললাম।

নীল। কি হল?

জয়া। উঃ, ছাগল-ভেড়ার মতো মানুষ কি করে যে থাকে! এমন জায়গায় আসে কখনো!

নীল। (রাগ করে) ছিঃ ছিঃ, এই লেখাপড়া শিখছ তুমি? একটা ভদ্রতা-জ্ঞান নেই!

জয়া। কি করি বাবা; গা ঘুলিয়ে আসছে। আমি বরঞ্চ কেনাকাটাগুলো সেরে আসি।

জয়া চলে গেল। মোটরগাড়ির চলে যাওয়ার শব্দ।

নীল। মা নেই, সেইজন্যে এমনি হয়েছে। মেয়ের দোষের জন্য আমি মাপ চাচ্ছি।

বিনোদ। হাতী পাঁকে পড়ে আছি। উদ্বাস্তু বলে সবাই হেনস্থা করে, আপনার মেয়েই বা ছাড়বেন কেন, যাক গে, ও-সমস্ত গা-সওয়া হয়ে গেছে। যা বলছিলাম, আজ্ঞে। আমাদের এখান থেকে উৎখাত করবেন না সার। আপনার টাকা আছে, ফ্যাক্টরির জায়গাজমি অনেক পেয়ে যাবেন।

নীল। ফ্যাক্টরি হবে না এখানে।

নরেশ্বর। কেন, হল কি সার? ঘাবড়ে গেলেন নাকি? এই যত দেখতে পাচ্ছেন—মাছি-পিঁপড়ে ছুঁচো-আরশুলা। রাতে রাতে ক'খানা বাবুয়ের বাসা বেঁধেছে, আজ রাত্রের মধ্যে আবার চৌরস মাঠ হয়ে যাবে। আজ্ঞে হ্যাঁ, লুকোছাপা নেই আমার কাছে, বড় গলা করে বলছি। দয়া করে কাল সকালে আর একবার পায়ের

ধুলো দেবেন। দেখেশুনে খুশি হয়ে ষোলআনা খাস জমির হিসাব নিয়ে তবে বায়না করবেন। একটা দিন দেরি হয়ে গেল, এই যা।

নীল। কাল নয়, বায়না আমি আজকেই করব। জমি নিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু ফ্যাক্টরি হবে না এখানে। বাস্তুভিটে একবার এঁরা ছেড়ে এসেছেন—আবার কোনদিন না ছাড়তে হয়, আমি তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করব। বাগানবাড়ি খরিদ করে আপনাদের নামে নামে লিখে দেব আমি।

কেশব নতুন চালাঘরের ঝাঁপ ধরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন ; ছুটে এসে নীলমাধবের হাত জড়িয়ে ধরলেন। আর্দ্র কণ্ঠস্বর।

কেশব। এমন মানুষ আছে এখনো দুনিয়ার উপর ! আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। জয় হোক আপনার !

যাদব। মানুষ নন, দেবতা— দেবতা !

নীল। না ভাই, উদ্বাস্তু। আপনারা যা, আমিও তাই। লাহোরের ভরতনগর এলাকায় ফ্যাক্টরি আমার—বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস। বছরের পর বছর তিলে তিলে বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছিলাম। ছেড়ে আসতে হল। তবে আপনাদের চেয়ে অদৃষ্ট ভাল—আধাআধি দামে বিক্রি করতে পেরেছি। খালি হাতে আসতে হয় নি।

বিনোদ। নামটা আপনার বলুন সার—

নীল। নাম কেন ?

বিনোদ। কলোনির নাম পালটাব। লেখাটা নামিয়ে আন্ রে যাদব। নতুন করে লিখতে হবে। ছ্যাঁচড়া লোকের নাম কেন রাখতে যাব ? কলোনি আপনার নামে।

নরেশ্বর চঞ্চল হয়েছেন। সরে পড়বার জন্য ব্যস্ত।

নরেশ। বায়না-পত্র আজকেই হচ্ছে তা হলে ?

নীল। হ্যাঁ। মুশাবিদা ঠিক করে ফেলুনগে। মেয়েটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। ফিরে এলেই যাব।

নরেশ্বর, বনমালী ও বরকন্দাজরা চলে গেল।

যাদব। দুও দুও ! পারলে আমাদের বাস ওঠাতে ?

বিনোদ। কই সার, নামটা বলুন। 'নরেশ্বর' তুলে দিয়ে সেই নাম বসানো হবে।

নীল। রাজকৃষ্ণ। আমার নাম নয়, আমার ছোট ভাইয়ের। সহোদর ভাই নয়, তার চেয়ে অনেক—অনেক আপন। হয়ত সে নেই। হয়ত সে উদ্বাস্তু হয়ে আপনাদেরই মতন পথে পথে ঘুরছে।

কেশব একটা ছেঁড়া-কাঁথা হাতে করে এলেন। কাঁথা পেতে দিলেন।

কেশব। দাঁড়িয়ে কেন সার, বসুন একটুখানি আমাদের মধ্যে। আপনাকে বসতে দেবার মতো কিছুই নেই আমাদের।

নীল। বটেই ত ! বড়লোক আমি, টাকার মালিক। সোনার পাতে হীরের কুচি ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর বসে থাকি। (কাঁথার উপর বসলেন)···টাকা, টাকা ! রাজকৃষ্ণের নাম করলাম, তার বাপ মস্তবড় ব্যারিস্টার। টাকার পাহাড় করেছিলেন। আজকে সিরাজকাটি তাদের পৈতৃক বাড়ি দেখুন গিয়ে। শ্মশান। ছাই উড়ছে।

যাদব। আপনি গিয়েছিলেন সেই অবধি ?

নীল। হ্যাঁ। কিন্তু পৌঁছুতে দেরি হয়ে গেল। কেউ নেই তখন, কিছু নেই। দাঙ্গাবাজ কতকগুলোকে পুলিশে ধরেছে। আসামিদের মুখে যা-সমস্ত শোনা গেল, গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। নবেলে-নাটকে এমনধারা ঘটে না।

প্রতিমা এল বাটিতে কয়েকটা গুড়ের নাড়ু ও এক গেলাস জল নিয়ে।

প্রতিমা। গুড়ের নাড়ু কয়েকটা। আমরা আর কি দেব ? খেয়ে একটু জল খান। আপনার মুখে দেবার মতো নয়—

নীল। বিদেশ-বিভুঁয়ে পড়েছিলাম মা, কে এসব মুখে এনে ধরবে ? যখন ছোট্ট ছিলাম, ইস্কুল থেকে ফিরে এলে মা এমনি বাটিতে করে এনে দিতেন। চার বছর বয়সে গর্ভধারিণী মা হারিয়ে আমার সেই মাকে পেয়েছিলাম। রাজকৃষ্ণর মা তিনি।

নীলমাধব একটা মাছ মুখে দিয়ে চকচক করে পরিতৃপ্তির সঙ্গে জল খেলেন। গল্প বলে চলেছেন।

নীল। আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার। লাউডন স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণদের পাশাপাশি বাড়ি। ফুড-পয়জনিং হয়ে এক-দিনের আগু-পিছু বাবা-মা দু'জনেই গেলেন। চার বছরের তখন আমি। রাজকৃষ্ণর মা এসে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। আমার মা হলেন। তারপর রাজকৃষ্ণের জন্ম হল। তখনও যে বাড়ির বড় ছেলে আমি, রাজকৃষ্ণের বড় ভাই। কলেজে দু'জনে আমরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের (নমস্কার করলেন) কাছে পড়েছি। সায়ান্স-কলেজে তাঁর ছোট্ট খোপের মধ্যে গিয়ে মুড়ি-চিঁড়েভাজা খেয়েছি। তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, চাকরি করব না জীবনে। রাজকৃষ্ণ গেল কৃষি-কাজে, আমি শিল্প-প্রতিষ্ঠায়। লিলুয়ায় ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস করলাম, সুবিধা হল না। শেষে আমার শ্বশুরমহাশয় লাহোরে নিয়ে গিয়ে এক সাইকেল-ফ্যাক্টরির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। অনেক বড় হল সেই কারখানা, ক্রমশ আমার একার হয়ে গেল।

এমনি সময় জয়া প্রবেশ করল। তার পিছনে ড্রাইভার বড় দুটো প্যাকেট এনে নামাল।

নীল। জয়া এসে গেছে। উঠি এবারে, নরেশ্বরবাবুর বাড়ি যাব এখান থেকে।...এ কি রে, কেনাকাটা করে এখানে আবার বয়ে আনলি কেন?

জয়া। কম্বল আছে ক'খানা। (কেশবকে) আপনি নিন তো একটা। আর ছেঁড়া-কাঁথাটা দেশলাই জেলে পুড়িয়ে ফেলুন। বাবা, তুমি ওর উপরে বসেছ? আমার তো পা মুছতেও ঘেন্না করে।

একখানা ভাল কম্বল বের করে কেশবকে দিল।

জয়া। এই জামা-কাপড় কতকগুলো। (প্রতিমাকে) এমন ছেঁড়া-কাপড় পরে বে-আব্রু হয়ে বেরোও কেমন করে? লজ্জায় ঘেন্নায় আমারই তো মাথা কাটা যাচ্ছে।

একটা শাড়ি প্রতিমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

জয়া। বাবা, চল শিগ্‌গির। আঁস্তাকুড়ে বেশিক্ষণ থাকলে বমি করে ফেলব।

নীলমাধবের হাত ধরে জয়া বেরিয়ে গেল।

প্রতিমা। দেমাকে মটমট করছে। বড়লোকের মেয়ে অনেক দেখা আছে—হ্যাঁ!

কেশব। বলিস নে প্রতিমা, ও মেয়ের শুধু মুখের কথাই শুনলি? কাজকর্ম দেখে বুঝলি নে? করুণাময়ী জগজ্জননী—নিন্দে করলে পাপ হবে।

কেশব ওঁদের সঙ্গে রাস্তা অবধি চললেন। অন্য সকলে প্যাকেট খুলে কাপড়-জামা কম্বল ইত্যাদি দেখছে।

বিনোদ। যাদব, অফিসে নিয়ে গিয়ে নতুন করে লিখে ফেল্—রাজকৃষ্ণ কলোনি। উঁহু, কলোনি বিলাতি কথা, কলোনি নয়—পল্লী। রাজকৃষ্ণ-পল্লী। সরস্বতীকে ত গুলে খেয়ে আছিস—অনেকগুলো যুক্তাক্ষর—বানানে গোলমাল করে ফেলিস নে।

লালুর লেখা নিয়ে যাদব চলে গেল। জ্যোতির্ময়ী, ধ্রুব ও রাজকৃষ্ণ প্রবেশ করলেন। জ্যোতির্ময়ী ধ্রুবকে সন্তর্পণে প্রায় কোলে তোলার মতো করে নিয়ে আসছেন। রাজকৃষ্ণ প্রতিমার কাছে চলে গেলেন। পুঁথি পড়ার মতন করে তাকে দেখছেন।

রাজ। তুই—তুই চম্পক?...না-না-না, সে বেটি ত পাতালের তলে—

প্রতিমা। মোলো যা! কোথাকার পাগল! (সরে গেল।)

বিনোদ। কারা তোমরা? কি চাই?

জ্যোতি। নতুন কলোনি হচ্ছে শুনতে পেলাম।

বিনোদ। হচ্ছে মানে? হয়ে গেছে। জবরদখল নয়, ষোলআনা আইন-সম্মত কলোনি।

জ্যোতি। আমরা একটু জায়গা চাই। মাথা গুঁজবার আশ্রয়।

বিনোদ। নেই। সব প্লট খতম।

জ্যোতি। বড্ড বিপন্ন। মাথা কাটিয়ে দিয়ে স্বামীর এই অবস্থা করেছে। অসুখে ভুগে ভুগে ছেলে কঙ্কালসার।

কেশব ফিরে আসছে, দেখা গেল।

বিনোদ। প্লট থাকলেও ত পেতেন না। কলোনি পিঁজরাপোল নয়। লড়নেওয়ালা জোয়ানমরদের জায়গা—মারধোর খেয়েও যারা মাটি কামড়ে থাকবে।

কেশব। আঃ, বিনোদ! একদিন আমরা মানুষ ছিলাম, পথের কুকুর ছিলাম না এমনধারা। অতিথি-

অভ্যাগত আসত, লোকের বিপদে বুক দিয়ে পড়তাম। সে সমস্ত ভুলে যেও না।···হায়-হায় মা-জননী, সোনার ছেলের এ কী দশা করে এনেছ!

জ্যোতি। অসুখে ভুগে ভুগে—

কেশব। না-খাওয়ার অসুখ মা। গেঁয়ো হাতুড়ে ডাক্তার আমি, কিন্তু চোখে দেখেই বুঝেছি। এই অসুখ আজকে ঘরে ঘরে।

কেশব কাছে এসে ধ্রুবর চোখের পাতা টেনে দেখলেন, নখের উপর আঙুল টিপে দেখলেন।

কেশব। ওরে মা, এক ফোঁটা রক্ত নেই যে গায়ে—

জ্যোতি। দুটো-চারটে দিন অন্তত মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে দিন। তার ভিতরে ব্যবস্থা করে নেব। ভোর-বেলা থেকে ঠেলা খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছি। জায়গা না হলে কোথায় রেখে ছেলের চিকিচ্ছে করি বাবা?

কেশব। এই চালাটা আমায় দিয়েছে। এইখানে ওঠ তোমরা। আমি একলা মানুষ—গাছতলায় বারাণ্ডায় যেখানে হোক শুয়ে পড়লেই হল। কিন্তু চিকিচ্ছের কি হবে মা? দু-দশ দাগ অষুধ খাওয়ার চিকিচ্ছে নয়। দুধ, ফল, মাখন, জ্যান্ত-মাছ···আর কিছুদিন পরে, ডিম, মাংস—মবলগ টাকার চিকিচ্ছে।

প্রতিমা। সেই মানুষটি আবার আসবেন। তাঁকে অবস্থার কথা জানালে বোধ হয়—

জ্যোতি। ভিক্ষে? মরে যাব, কিন্তু ভিক্ষের দান হাত পেতে নিতে পারব না। সরকারি ডোলও নয়। ভাল হয়ে গিয়ে আমার এম. এস-সি. পাশ ছেলে আর কিছু না জোটে তো স্টেশনে মোট বইবে; আমি ঠোঙা বাঁধি—সেই সঙ্গে না হয় রাঁধুনিবৃত্তি করব কোনখানে। কিন্তু ভিক্ষের অন্ন আমাদের গলা দিয়ে নামবে না।

কেশব। বলছ কি মা! এমনি কথা কারও মুখে শুনতে পাই নে। সবাই 'দাও' 'দাও'—করে। ভিটে ছেড়ে এসে মানুষগুলো মরে গেছে। মরার পরে ভূত নয়—ভিক্ষুক হয়ে আজ তারা পথে পথে বেড়ায়।

পঞ্চম দৃশ্য

গয়নার দোকান—'জুয়েলারি হাউস'। আর একটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—'পুরানো সোনারূপা এখানে উচিত মূল্যে ক্রয়বিক্রয় হয়'। লোহার আলমারির মাথায় গণেশের মূর্তি। সুরপতি এসে প্রণাম করল। কয়েকটা ধূপকাঠি ধরিয়ে দিল গণেশের এপাশে-ওপাশে। কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল ছিটাল। বিড়বিড় করে কি মন্ত্র পড়ল খানিকক্ষণ। লোহার আলমারির গায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। চাবির থোলো বের করে আলমারি খোলে। দুই ডালা দুই দিকে প্রসারিত করল; ঝকঝক করে উঠল ভিতরের সাজানো গয়না।

একজন কর্মচারী—বিপিন, প্রবেশ করল।

সুরপতি। বিপিন এসে গেছ? কারিগর এল সবাই? বোসো তুমি একটু। কাল সেই যে সীতাহারের অর্ডার দিয়ে গেল, কাজটা বুঝিয়ে দিয়ে আসি কারিগরদের। ক্যাটলগটা দাও ত—

ক্যাটলগ হাতে সুরপতি বেরিয়ে গেল। বিপিন কাউন্টারের সামনে বসল। জ্যোতির্ময়ী প্রবেশ করলেন।

বিপিন। দোকানে ভিক্ষে দেওয়া হয় না। বাড়ির দরজা ঐ দিকে। সকালবেলা এস, দুটো করে পয়সা পাবে।

জ্যোতি। (উষ্ণ কণ্ঠে) ভিক্ষে চাইতে কে এসেছে?

বিপিন। (সকৌতুকে) ও, ভিক্ষে নয়? তা হলে খদ্দের বুঝি! গয়না কিনতে এসেছে? বস, বস। পাখাটা খুলে দিই—কেমন? কি গয়না দেখাব? মুক্তোর চিক, না হীরের ব্রেসলেট?

জ্যোতি। গয়না বিক্রি করতে এসেছি।

আঁচলের তলা থেকে মুকুট বের করলেন। বিপিনের চোখ বড় বড় হল।

বিপিন। অ্যাঁ, ছেঁড়া বস্তায় বাদশাভোগ চাল! কোন বাড়ি থেকে হাতিয়েছ বল দিকি?

জ্যোতি। না নেবেন ত চলে যাচ্ছি। এসব কথা শুনতে আসি নি।

বিপিন। রাগ কর কেন? ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসে কাজকর্ম হয় না। দাঁড়াও একটু, ছোটবাবু এসে যাবেন এক্ষুনি। চোরাই মালের দায়ে না পড়ি, সেটা দেখতে হবে ত!

সুরপতি ফিরে এল। বিপিন চোখ ইসারা করে তার দিকে।

বিপিন। দেখুন ত ছোটবাবু, কিনতে পারা যায় কিনা? বলছি যে এসব কাজকর্ম সামাল হয়ে করতে হয়। তড়িঘড়ি হয় না। আচ্ছা, জিনিষটা দেখুন আগে আপনি—

সুরপতি মুকুট হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।

সুর। আরে দূর! মেকি মাল।—সোনা নয়, গিলটি। মুক্তো নয়, কাচ।

জ্যোতি। বুঝেছি। ধাপ্পা দিয়ে গ্রাস করতে চাইছেন। গরজে পড়ে এসেছি, বুঝেছেন সেটা।

সুর। ধাপ্পা? বেশ, দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন ধাপ্পা। কষ্টিপাথরে কষে দেখাচ্ছি। পাথর বের কর ত বিপিন।

বিপিন বড় ছোট পাঁচখানা কষ্টিপাথর কাউণ্টারের উপর রাখল। সুরপতি সবক'টি পাথরের উপর মুকুট কষে দেখাচ্ছে।

সুর। দাগ দেখে ত বুঝবে? গিনিসোনার দাগ উপরের এইগুলো। ঝকঝক করছে। আর তোমার জিনিষের দাগ এই।

জ্যোতি। হতে পারে না। কক্ষনো না। তোমরা ঠকাচ্ছ।

সুর। মানুষে মিথ্যে বলে, পাথরে তা বলবে না।...বেশ, দাদাকেই দেখিয়ে আনি। তাঁর চেয়ে ত কেউ ভাল বুঝবে না।

একটা কষ্টিপাথর হাতে করে সুরপতি ভিতরের দিকে গেল। নেপথ্যে গণপতির উত্তেজিত কণ্ঠ।

গণপতি। জোচ্চুরি করে ঝুটোমাল গছাতে এসেছে। চলে যেতে দিস নে, পুলিসে খবর দে। হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাক।

চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে এল গণপতি। জ্যোতির্ময়ীকে দেখে স্তম্ভিত। নিঃশব্দতা ক্ষণকাল। জ্যোতির্ময়ী তার পরে ধীর কণ্ঠে বললেন।

জ্যোতি। তোমায় মেরে ফেলে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল—না গণপতি?

গণপতি। আজ্ঞে হ্যাঁ। দিয়েছিল বৌরাণী। মরি নি। ভাসতে ভাসতে পারে এসে গেলাম।

জ্যোতি। পার হয়ে এসে এত বড় দোকান খুলেছ। টাকা পেলে কোথায়? লুঠের বখরা?

গণপতি চুপ করে রইল।

জ্যোতি। কাসেম আলির দুই ছেলে বলেছিল বটে, তুমি মর নি। বলেছিল, রহমৎ কাজির ছেলের মৃত্যু রটিয়ে মানুষ ক্ষেপানো তোমারই কাজ। বলেছিল, দাঙ্গাওয়ালারা কখন এসে পড়বে, সমস্ত প্ল্যান তুমি ছকে দিয়েছিলে। আমি বিশ্বাস করি নি। কী দোষে করেছিল, বল আমার চম্পক? বল,—বল—

গণ। না বৌরাণী, কক্ষনো না। যে দিব্যি করতে বলবেন—

জ্যোতি। চম্পক মরবে, সে তুমি জানতে। মরা মেয়ের মাথার মুকুট আসল কি ঝুটো কোনদিন যাচাই হবে, ভাবতে পার নি। কেমন?

গণ। মুকুট হয়ত বদলে গেছে বৌরাণী। মোতিচাঁদ ক্ষেত্রির মাল ঝুটো হতে পারে না।

জ্যোতির্ময়ী বড় কষ্টিপাথরটা তুলে নিয়েছেন। চোখ-মুখ পাগলের মতো।

জ্যোতি। মানুষ মিথ্যে বলে, কিন্তু পাথরে মিথ্যে বলবে না।

সজোরে পাথরখানা ছুঁড়ে মারলেন গণপতির চোয়ালে। তারপরে আরও একটা, তারপরে আরও। পাঁচটাই মারলেন।

আর্তনাদ করে গণপতি পড়ে গেল। খুন, খুন—বলে চেঁচাচ্ছে এরা। মানুষজন ছুটে এল। জ্যোতির্ময়ীকে ধরেছে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাগান-বাড়ি। পূর্ব দৃশ্যের কোলাহল প্রবলতর হয়েছে বাইরের দিকে। খুন, খুন—এই কথাটা বেশি প্রকট। উদ্বাস্তু বাসিন্দারা যে যেখানে ছিল, এসে ভিড় করেছে। বাইরের জনতার কতক এসে ঢুকল। জনতার লোক অ আ ই ইত্যাদি নামে অভিহিত করছি।

অ। খুন, খুন!

বিনোদ। কে খুন হ'ল?

অ। জুয়েলার গণপতি।

আ। দোকানে ঢুকে গয়না সরাচ্ছিল। গণপতিবাবু ধরতে গেলেন ত পাথর ছুড়ে মারল। খুনি বেটাছেলে নয়—মেয়েলোক।

এই সময়ে ই ছুটতে ছুটতে এল।

ই। মেয়ে ডাকাত। এই কলোনিতে থাকে। নিয়ে আসছে হাতকড়ি দিয়ে।

হাতকড়ি-দেওয়া জ্যোতির্ময়ীকে নিয়ে কনেস্টবল ও পুলিস-অফিসাররা প্রবেশ করল। পিছনে জনতা।

ও. সি.। আপনাদের কলোনির বাসিন্দা—

বিনোদ। না সার, মিথ্যে কথা। কলোনির কেউ নয়। আমরা সব নির্বিরোধী শান্তিপ্রিয় মানুষ। এখানে এক দয়ার অবতার আছেন—কেশব। তাঁর কাছে কাঁদাকাটা করে দু-চার দিনের জন্য এরা ঐ চালাঘরে এসে উঠেছে।

সেকেণ্ড-অফিসার। সার্চ করব। চোরাই মাল মিলতে পারে।

দুটো কনেস্টবল এবং জনতার ভিতর থেকে দু'জনকে নিয়ে সেকেণ্ড-অফিসার মসমস করে চালাঘরে ঢুকছে।

জ্যোতি। (ব্যাকুল কণ্ঠে) আস্তে, আস্তে! আমার ধ্রুব ঘুমুচ্ছে ওখানে। ক্ষিধের জ্বালায় ছটফট করে শেষরাতে নেতিয়ে পড়েছে। ঘুমুতে দিন ওকে—ছেলে আমার টের না পায়।

বলতে বলতেই ধ্রুব চালাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ধ্রুব। মা, মাগো—

জ্যোতির্ময়ীর অবস্থা দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। টলে পড়ে যায় বুঝি। টলতে টলতে মা'র কাছে এল। আর দেখা গেল, রাজকৃষ্ণ বাইরের দিক থেকে এসে চালাঘরের খুঁটি ধরে ফিকফিক করে হাসছেন।

ধ্রুব। মা, ওমা, কি করেছ? কোথায় নিয়ে চলল তোমায়?

জ্যোতি। যেখানে চম্পক গেছে। ফাঁসিকাঠে চড়ে মেয়ের কাছে চলে যাব।

রাজ। ও, চম্পকের কাছে যাচ্ছ? বেশ, বেশ। গিয়ে দুটো থাবড়া দিও ত। চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এস।

জ্যোতির্ময়ী ও. সি-র দিকে চেয়ে কাতর হয়ে বললেন।

জ্যোতির্ময়ী। হাত দুটো একটিবার খুলে দিন দারোগাবাবু, দয়া করুন। জন্মের শোধ ছেলেকে একবার বুকে নিই। জন্মের মতো আমার স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে যাই।

ও. সি.। মানুষ খুন করে এল। কাঁচা রক্ত শুকোয় নি—ঢং করছে যেন গেরস্ত-ঘরের সতীসাধ্বী অন্নপূর্ণা!

ধ্রুব। ওমা, খুন করেছ?…আমার মা যে কুকুর-বেড়ালের গায়ে একটু লাঠি ঠেকালে সইতে পারে না!

জ্যোতি। না, খুন আমি করি নি। কেউটেসাপ মারলে কি খুন করা হয়?…উঁহু, সাপের আমি অপমান করলাম। ঘাট না হলে সাপেও ছোবল মারে না।

সেকেণ্ড-অফিসার ইত্যাদি চালাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সে. অ.। না, ঘরে মাল রাখবে, এরা কি তেমনি? ঘাগী মেয়েলোক—হাতের তাক কী রকম! পাথর একেবারে মোক্ষম জায়গায় ঝেড়েছে। কত জায়গায় আরও কত কাণ্ড করে এসেছে, ঠিক কি!

ও. সি.। শুনুন। সামাল করে দিয়ে যাচ্ছি আপনাদের। বাইরে থেকে নানান ধরনের ক্রিমিন্যাল এসে পড়ছে শহরে। বড় বড় গ্যাং হয়েছে। বাঁচতে চান ত এসব দলের সংস্পর্শে থাকবেন না। শান্তিপ্রিয় লোক বললেন কিনা, সেজন্য বলছি।…চল—

জ্যোতির্ময়ীকে নিয়ে পুলিসদল বিদায় হল। জনতাও সরে গেল। ধ্রুব সজল চোখে চেয়ে আছে। রাজকৃষ্ণ হি-হি করে হাসছেন।

বিনোদ। হাঁ করে কী দেখছ বাপধন? বেরিয়ে পড়। এক্ষুনি।

ধ্রুব। কোথায়?

বিনোদ। কলোনি ছেড়ে। চোরের দশদিন, সাধুর একদিন। ভালয় ভালয় সরে পড়, গলাধাক্কা দিয়ে তাড়ানো—সেটা কি খুব ভদ্রতা হবে?

যাদব এল। হাতে জড়ানো শাল।

যাদব। বেরিয়ে যাও। কেশব-ডাক্তারের দয়ায় ঠাঁই পেয়েছিলে, তা বিস্তেসাধ্যি দুটো দিনও চেপে থাকতে পারলে না। নিজে উঠতে পারে না ত মা মাগিকে ঠেলে পাঠিয়েছে।

বিনোদ ইতিমধ্যে চালাঘরে গিয়ে দমাদম পোঁটলা-পুঁটলি, মাদুর বালিশ ছুঁড়ে দিচ্ছে। রাজকৃষ্ণ বালিশটা তুলে নিয়ে ধুলো ঝাড়ছেন। ধ্রুব এসে বাপের হাত ধরল।

ধ্রুব। চল বাবা—

রাজ। না, যাব না। কক্ষনো না। আমার বালিশ ধুলোয় ফেলল কেন? কেচে দিক আগে।

বিনোদ হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে এল।

বিনোদ। যাবে না—ইয়ার্কি? তুমি যাবে না, তোমার ঘাড় যাবে—

যাদব। বিনোদ-দা, লেখাটা আমার হয়ে গেছে।

বিনোদ। টাঙিয়ে দে। আপদ বিদেয় করে আসি—তার পরে দেখব।...বেরো, গুঁতো না খেয়ে নড়বি নে কিছুতে?

বিনোদ ধাক্কাধাক্কা দিল রাজকৃষ্ণকে। ধ্রুব বাপের হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে গেল। দালানের দেয়ালে ইতিমধ্যে যাদব লেখা টাঙিয়ে দিয়েছে—'রাজকৃষ্ণ-পল্লী'। বিনোদ ফিরে এসে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে দেখছে।

বিনোদ। বাঃ, দিব্যি হয়েছে। রাজকৃষ্ণ-পল্লী। বেশ! রাজ-কৃষ্ণ প-ল্লী—

দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জেলখানা। লোহার গরাদের ওদিকে জ্যোতির্ময়ী, এদিকে ধ্রুব। ধ্রুব দেখা করতে এসেছে মায়ের সঙ্গে। অনতিদূরে এক জেল-কর্মচারী। তিনি লক্ষ্য রাখছেন এদের উপর।

ধ্রুব। কাছে এস মা। আর একটু কাছে। পা দু'খানা সরিয়ে দাও।

জ্যোতি। জন্মদিনে প্রণাম করতে আসবি, সে আমি জানতাম। কিন্তু এ মাসের ইণ্টারভিউ ত আগেই হয়ে গেছে—

ধ্রুব। সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে বলতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করে দিলেন। বড় ভাল লোক। কত যে সুখ্যাতি করলেন তোমার! জেনানা-ফাটকের তুমি মাসিমা, কারও কোন বিপদ হলে ঝাঁপিয়ে পড়—

জ্যোতি। হ্যাঁ, খুনির আবার সুখ্যাতি!

ধ্রুব। করে না বুঝি! পাবলিক-প্রসিকিউটার—সরকারের খয়ের খাঁ বলে যাঁর চিরকালের বদনাম—মামলার সময় আমি ত সোজা চলে গেলাম তাঁর কাছে। বুড়োমানুষ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন: অপরাধ নয়! তোমার মা'র? সাংঘাতিক অপরাধ।

জ্যোতি। জজ আর জুরিদের তিনি এমন করে কেস বোঝালেন, খুনের দায়ে ফাঁসি না হয়ে জেল।

জমাদার এসে এক টুকরো কাগজ কর্মচারীকে দিল।

কর্মচারী। আপনি ভিতরে গিয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেন ধ্রুববাবু।

জমাদার চাবি খুলে দিল, ধ্রুব গরাদের ওপারে গেল। মঞ্চ একটু ঘুরতে ঐ দিকটা সামনে চলে এল। মা আর ছেলে, মুখোমুখি দু'টো টুলের উপর।

ধ্রুব। পাবলিক-প্রসিকিউটর বললেন, সাংঘাতিক অপরাধ করেছেন তোমার মা। গণপতি লোকটাকে এক ঘায়ে না মেরে আগুনের ছেঁকা দিয়ে দগ্ধে দগ্ধে মারা উচিত ছিল।

জ্যোতি। কিন্তু কলোনির লোকগুলো? আমি যা-ই করে থাকি, তোদের কোন দোষ? খুনির ছেলে আর খুনির স্বামী বলে দূর-দূর করে পথে বের করে দিল। তুই উঠতে পারিস নে, তা বলে এক লহমার সময় দিল না।

ধ্রুব। ভালই ত হল মা। ভয় হয়েছিল, রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ব। ঠিক উল্টো। শক্তির জোয়ার এল দেহে, রোগপীড়ে কোথায় পালাল! তিনটে টুইশানি এসে গেল পর পর। মনে হত, ভগবানই সব জুটিয়ে দিচ্ছেন মামলার তদ্বিরের যাতে অসুবিধা না হয়। আরও কী আশ্চর্য যোগাযোগ! রায় বেরবার পর কোর্ট থেকে ফিরছি। পথে জ্যেঠাবাবুর সঙ্গে দেখা। গাড়িতে পুরে আমাদের বাড়ি নিয়ে তুললেন। নাটকের একটা অঙ্ক শেষ হয়ে গিয়ে যেন আবার নতুন অঙ্ক।

জ্যোতি। হ্যাঁরে, আমার কথা বলিস নি ত ওবাড়ির কাউকে?

ধ্রুব। না। চুপি চুপি এসে তোমায় দেখে যাই মা। কাউকে বলি নে, কেউ জানতে পারে না।

জ্যোতি। খবরদার, খবরদার! ভুলেও কখনো মুখ দিয়ে না বেরিয়ে পড়ে!

ধ্রুব। দাঙ্গায় কত লোক গেছে! জ্যেঠাবাবু জানেন, চম্পক আর ঠাকুরমায়ের মতো তুমিও—ও কি মা, কাঁদছ তুমি? কেঁদ না!

ধ্রুব জ্যোতির্ময়ীর চোখ মুছিয়ে দিল।

জ্যোতি। হ্যাঁ বাবা, কাঁদি আমি। ভাবতে গেলে কান্না পেয়ে যায়। চম্পকের জন্য কাঁদি, সেকেলে সরল মানুষ আমার শাশুড়ির জন্য কাঁদি। সব চেয়ে বেশি কাঁদি চাষকুঠির বৌরাণীর জন্য। সে-ও মরে গেছে। একদিন কেউ যার মুখ দেখতে পেত না, খুনের দায়ে বছরের পর বছর সে জেলে পচছে।

ধ্রুব। সাড়ে-তিন বছর তো কেটে গেল। বাকি আড়াইটে বছরও দেখতে দেখতে যাবে। একটা একটা করে আমি মা দিন গুনে যাচ্ছি।

জ্যোতি। সেই ত আরও ভয় ধ্রুব। বেরুতে একদিন হবে। কেমন করে তখন লোকের মুখে তাকাব? নতুন বৌ সিঁদুর-কৌটো হাতে একদিন চাষকুঠির উঠোনে দাঁড়িয়েছিলাম, তোর ঐ জ্যেঠাবাবুরা ছিলেন। সেই একটিমাত্র দিনের দেখা। এবারে দেখবেন, জেল-খাটা খুনে কয়েদি সেই বৌরাণী। এ লজ্জা আমি রাখি কোথায় ধ্রুব? কেন তোরা ফাঁসি হতে দিলি নে?

ধ্রুব। কোন লজ্জা নেই। অগ্নিময়ী মা তুমি আমার। সংসারের যেখানে যত মা আছেন, আমার মা সকলের চেয়ে বড়।

জ্যোতি। লোকে তা মানবে না। সবাই জানে, গয়না চুরি করতে দোকানে ঢুকে মালিককে খুন করেছি। তোর জ্যেঠাবাবু আর জয়াও তাই মনে করবে।

ধ্রুব। জ্যেঠাবাবু দেবতুল্য মানুষ। মুখ সিঁটকাতে পারে অবশ্য—হ্যাঁ মা, ঐ মেয়েটা—জয়া। আস্ত এক বিষপুঁটুল। আজকে, জান মা, হুকুম হল ছ-টার মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে। জ্যেঠাবাবুকে দিয়ে বলাল। তার মানে, কেমন করে টের পেয়েছে, বাইরে আমার বড় দরকার—

জ্যোতি। অমন হত না, আমি নিজের কাছে রেখে যদি নাড়াচাড়া করতে পারতাম। তাই আমার সাধ ছিল রে—জয়াকে বৌ করে ঘরে তুলব।

ধ্রুব। ওসব ভুলে যাও মা। লোকে হাসবে। আমরা নিরন্ন, তারা বড়লোক। সে ছাত্রী আর আমি মাস্টার—এ ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নীলমাধবের বাড়ির একখানা সুসজ্জিত ঘর। একদিককার দেয়াল ঘেঁসে গদি-আঁটা বড় চেয়ার। চেয়ারখানা ফুল দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো।

বুড়ো চাকর বাদলরাম—খোঁচাখোঁচা দাড়ি, জবুথবু চেহারা—ঝাড়ন হাতে এটা-ওটা সাফ করছে। তার মানে দায়সারা গোছের এক-একটা ঝাড়ি দিচ্ছে এখানে-ওখানে।

পাশের ঘরে অনেকগুলো মেয়ের কথাবার্তা ও কলহাস্য। জয়া হাঁক দিয়ে উঠল সেখান থেকে।

জয়া। মাস্টারবাবু এলেন বাদল-দা?

বাদল। না দিদিমণি।

জয়া প্রবেশ করল।

জয়া। একটা কথাই শিখে রেখেছিস—না, না, না… না কি হাঁ! নড়েচড়ে দেখে আসবি ত?

বাদল। সন্ধ্যে থেকে পাঁচ-সাত বার ত দেখে এলাম। মাস্টারবাবু মাছি-মশা নয় যে অজান্তে এক ছিদ্দিরের ভিতর সেঁদিয়ে বসে আছে।

জয়া। খালি আজেবাজে বকিস তুই বাদল-দা। যেখানেই থাকুন, সন্ধ্যা ছ'টার ভিতর এসে পড়বেন। আমার কথা কেউ শোনে না বলে বাবাকে দিয়ে বলিয়েছি। বাবার কথা ফেলবেন, সে কখনো হতে পারে না।

বাদল। হল ত তাই। আর সেই জন্মে আমি বকুনি খেয়ে মরি।

জয়া। মরণ আমার, কলেজের ওদের নেমন্তন্ন করে এনেছি! এক ঘণ্টার উপর সবাই হা-পিত্যেশ বসে।... বাদল-দা, সন্ধ্যে থেকে তুই অনেক খেটেছিস। আর একটিবার যা লক্ষ্মীসোনা। মোড় অবধি ঘুরে দেখে আয়। লাইব্রেরিতেও একবার উঁকি দিয়ে আসিস, সেখানে যদি বসে থাকেন। সকলের কাছে মাথা কাটা যাচ্ছে আমার।

বাদলরাম বেরিয়ে গেল। ক'টি মেয়ে দরজায় উঁকি দিচ্ছে। তার মধ্যে তনিমা, ছায়া আর মঞ্জুলা এ-ঘরে এল।

তনিমা। আর থাকতে পারব না জয়া। বাড়িতে বকবে।...ডাকাডাকি করে নিয়ে এলে, খাওয়া-দাওয়া হল, কিন্তু পরবর্টা কি তা-ও ত জানতে পারলাম না।

জয়া। (উত্তেজিত কণ্ঠে) আমার মতিচ্ছন্ন। শনি ভর করেছিল আমার কাঁধে।

তনিমা। আচ্ছা, চললাম। কিছু মনে কোরো না ভাই।

তনিমা চলে গেল। তার সঙ্গে আরও কয়েকটি মেয়ে।

জয়া। ছায়া-মঞ্জু তোরা দু-জনে থাক। ছায়ার ত ঐ পাশের বাড়ি। মঞ্জুলা, তোদের বাড়ি বরঞ্চ একটা ফোন করে দিচ্ছি।

ছায়া। সত্যি, তাজ্জব লাগছে। এতক্ষণ ধরে আছি—কেন আছি তা কিন্তু কেউ জানি নে।

জয়া। সব অনুষ্ঠানে আগেভাগে বলে দেয়। বললে আর নতুনত্ব কি! ভেবেছিলাম, অবাক করে দেব।

বাদলরাম ফিরল।

বাদল। না, কোন পাত্তা নেই দিদিমণি—

ছায়া। মাস্টারবাবু না-ই যদি আসেন! যা করবার, শুরু করে দে। সত্যি ত আর সারারাত্তির থাকা যাবে না।

জয়া। ঠিক! আর দেরি নয়। বাদল-দা, শোন্—ঐ চেয়ারের উপর গিয়ে বোস্ তুই।

বাদল। আমি? পাগল না ক্ষেপা! আমি কোন দুঃখে চেয়ারে বসতে যাব?

জয়া। বসবি নে ত ফুল-টুল দিয়ে কি জন্মে সাজালাম?...বসবি নে? বেশ, আমার কথা না শুনলি ত আমিও তোর কথা শুনব না। যখন দুধ নিয়ে আসবি, ছুঁড়ে ফেলে দেব দুধের গ্লাস।

বাদল। এ তোমার বড্ড জুলুমবাজি দিদিমণি। বাপের জন্মে কখনো বসেছি চেয়ারের উপর?

জয়া। বেশ, বসিস নে। রাত্রে আজ কিছু খাব না। কাঠ-কাঠ উপোস।

বাদল। আরও দিদিমণিরা সব আছ। দেখ, বুড়োমানুষের ভোগান্তিটা দেখে যাও। তোমরা এ রকম করে থাক বাড়িতে?

বাদল সন্তর্পণে চেয়ারে বসল। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে।

বাদল। ওরে বাবা রে—

ছায়া। কি হল?

বাদল। গিলে খাচ্ছে দিদিমণি। পাতালে চলে যাচ্ছি।

জয়া। কিছু হবে না বাদল-দা। হাত দুটো বেশ শক্ত করে ধরে বোস্।

বাদল। নাও, যা করতে হয় তাড়াতাড়ি সেরে ফেল। উঠে পড়তে পারলে বাঁচি রে বাবা।

জয়া। এই মালা গলায় পরতে হবে।

ফুলের মালা বাদলরামের গলায় পরিয়ে দিল।

বাদল। ওরে বাবা, কুটকুট করছে। এক বোঝা জঙ্গল। তুমি পর দিদিমণি। নয়ত দিদিদের কাউকে পরাও। আমি পারব না।

বাদল মালা খুলে ফেলল। জয়া তাড়া দিয়ে ওঠে।

জয়া। তিন দিনের মধ্যে আমি যদি জলগ্রহণ করি বাদল-দা—

বাদল তাড়াতাড়ি আবার মালা পরল।

জয়া। জন্মদিন হল তোমার, আর মালা পরতে যাবে দিদিমণিরা?

ছায়া। বাদলের জন্মদিন আজ? চমৎকার, চমৎকার! সত্যি নতুনত্ব আছে। বড়দের জন্মদিন নিয়ে সবাই ত মাতামাতি করে—

বাদল। জন্মদিন কি বলছ?

মঞ্জুলা। বুঝতে পারছ না? ফাল্গুন মাসের এই তেসরা তারিখে তুমি জন্মেছিলে—

বাদল। ফাল্গুন মাসে কেন জন্মাতে যাব গো? আমি হয়েছি ভাদর মাসে। আমার মা বরাবর বলে এসেছে, ভাদ্দর মাসে বড় ভন্নার মধ্যে হয়েছি। তাই আমার বাদল নাম।

জয়া। মা বললেই হল। আমরা যে হিসেবপত্র করে অঙ্ক কষে দেখলাম, ফাল্গুন মাসে হয়েছিস—

বাদল। হলাম তবে তাই, না হলে ত দুধের গেলাস ছুঁড়ে দেবে –

জয়া। মঞ্জুলা ভাই, গান এবারে। সেই যে গানটা বলে দিয়েছি।

বাদল। ও গাইয়ে-দিদি, কম করে গেয়ো। বড্ড কুটকুট করছে।

মঞ্জুলা গান গাইল। জয়া দেরাজ খুলে একটা কাগজ বের করছিল। এই ফাঁকে বাদল মালাটা খুলে ফেলে। জয়াকে ফিরতে দেখে চক্ষের পলকে গলায় পরে আবার ঠিক হয়ে বসেছে।

জয়া। এবার জন্মদিনের অভিনন্দন। পড়ছি, চুপ করে বেশ মন দিয়ে শুনবি বাদল-দা।

বাদল। মালা?

জয়া। গলায় থাকবে। বকবক করিস নে, শোন্। (পড়ছে) পঁচিশ বৎসর আগে ধরাধামে তুমি এক নবীন আগন্তুক এলে। আত্মীয়জনে শঙ্খ বাজিয়ে নবজাতকের অভ্যর্থনা জানাল।

ছায়া। সে কি রে, পঁচিশ বছর মানে? ও বাদলরাম, তোমার বয়স নাকি পঁচিশ—এক কুড়ি আর পাঁচ?

বাদল। তিন কুড়ি আর দশ।

জয়া। বললেই হল? হিসেবে পেয়ে যাচ্ছি—

বাদল। তবে তাই। এক কুড়ি আর পাঁচ। আমার ছোট মেয়ে আর আমি একবয়সি।

মঞ্জুলা। (হেসে উঠল) বেশ মজা!

জয়া। মজা কিসের দেখলি?

মঞ্জুলা। বুঝতে পেরেছি। জন্মদিন মাস্টারবাবুর। তিনি এলেন না বলে বাদলের এই দুর্ভোগ।

জয়া। তা বই কি! সমস্ত আমার বাদল-দার জন্যে। ছোট্ট বয়স থেকে কত ভালবাসে আমায় বাদল-দা! থাম্, পড়তে দে অভিনন্দনপত্র—

(পড়ছে) সেদিন কেউ স্বপ্নেও জানত না, নিয়তি কী নিষ্ঠুর ভবিষ্যৎ গড়ে রেখেছে তোমার জন্য। কিন্তু বীর তুমি, অমিত শক্তিতে বাধাবিপত্তি বিচূর্ণিত করে—

ধ্রুব এসেছে। আড়চোখে জয়া দেখে নিয়েছে। পড়ার সুর সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল।

এক গেঁয়ো চাষা। অসভ্য অভব্য। কথা দিয়ে কথা রাখে না। অন্যে অপদস্থ হোক এই তোমার চক্রান্ত

বাদলরাম এতক্ষণে ধ্রুবকে দেখতে পেয়ে চেয়ার থেকে এক লাফে নেমে এল।

বাদল। (কাঁদো-কাঁদো) মাস্টারবাবু, সন্ধ্যে থেকে তোমায় খোঁজাখুঁজি চলছে। না পেয়ে শেষটা আমায় নিয়ে বসাল। তোমার এই সমস্ত আমার ঘাড়ে চাপান দিয়েছে।

টং করে ঘড়ি বাজল। দেয়াল-ঘড়িতে সাড়ে-আটটা। মঞ্জুলা লাফিয়ে উঠল।

মঞ্জুলা। ওরে জয়া, সাড়ে-আটটা। মা কুচিকচি করে কাটবে আমায়। চললাম।

ছায়া। আমিও—

দু-জনে দ্রুতপায়ে বেরুল। জয়া তাদের এগিয়ে দিতে গেল।

বাদল। মাস্টারবাবু, বোসো গিয়ে চেয়ারের উপর।

ধ্রুব। দরকার হবে না বাদল-দা। বান্ধবীদের ডেকে সকলের মাঝখানে আমায় বসিয়ে যা-সমস্ত শোনাবার আয়োজন, এমনই তা শুনে নিয়েছি।

জয়া ফিরে এল।

জয়া। কি শুনেছেন?

ধ্রুব। অসভ্য গেঁয়ো-চাষা আমি—

জয়া। গায়ে টেনে নেবেন না। সে বলেছি আমার বাদল-দাকে। গাঁয়ে ওর বাড়ি নয়? ওর ছেলেপুলেরা চাষবাস করে না? জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

ধ্রুব। আমার বাবারও চাষকুঠি ছিল। বাবার মতন আমারও চাষবাস নিয়ে গাঁয়ে থাকবার কথা। চাষী হয়ে গ্রামে থাকায় লজ্জার কিছু আছে, আমি মনে করি নে।

জয়া। নেই-ই ত। চাষকে অশ্রদ্ধা করি বলেই আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে…ছ'টায় আসবার কথা, এলেন না কেন?

ধ্রুব। ভাগ্যিস আসি নি। অভিনন্দন-পত্র আরও তাহলে রসিয়ে পাঠ হত—কেমন? বেচারা বাদলরামকে বসিয়ে মজা তেমন জমল না বুঝি?

জয়া। বয়ে গেছে। কাল এগজামিন। সকাল সকাল আসতে বলেছিলাম ক্যালকুলাসের ক'টা অঙ্ক বুঝে নেব বলে।

ধ্রুব। কালকে রবিবারে এগজামিন?

জয়া। কাল না হল পরশু। অঙ্ক বুঝে নিয়ে কাল সমস্তটা দিন ধরে প্রাকটিস করতাম। জানেন, আমার একেবারে কিচ্ছু তৈরি নেই। গোল্লা পাব।

ধ্রুব। পড়বেন না, তৈরি হবে কিসে?

জয়া। আপনিই ত পড়ান না—

ধ্রুব। আর পড়াব না।…না, আমার ক্ষমতা নেই আপনার মতো ছাত্রীকে পড়াবার। যার উপর শ্রদ্ধা নেই, তাকে দিয়ে পড়ানোর কাজ হয় না। পণ্ডশ্রম।

জয়া। কে বলে শ্রদ্ধা নেই?

ধ্রুব। ঐ যে তার পরিচয়। গালিগালাজ একলা দিয়ে সুখ হয় না, কলেজের মেয়েদের জুটিয়ে আনতে হয়। আমি চলে যাব—আত্মসম্মান খুইয়ে আপনাদের সোনার দাঁড়ের পাখি হয়ে আর থাকব না।

তৃতীয় দৃশ্য

সেই বাড়িরই একটা সাদামাঠা ছোট ঘর। খাটের উপর রাজকৃষ্ণ বসে। পাশে নীলমাধব। কিছু ফল আছে টিপয়ের উপর।

নীল। তোমায় বলি রাজা। ছেলে তোমার মহামানী দুর্যোধন। গাল-ভরা একটা কথা শিখে রেখেছে—আত্মসম্মান। আমাদের সময় ও বালাই ছিল না। ষোল বছর তোমাদের ভাত খেয়েছি, কোনদিন ত গলায় আটকে গেল না। আর তিনটে দিন যেতে না যেতে ধ্রুব বলে কিনা গলগ্রহ হয়ে থাকতে পারব না জ্যেঠাবাবু। বাপ-জ্যেঠার সঙ্গে পাশাপাশি পিঁড়িতে বসে খাওয়া—সেটা হল পরের অন্ন। খেতে নাকি আত্মসম্মানে বাধে। আত্মসম্মানের বস্তা এক-একটি!

রাজ। হি-হি-হি, বস্তা এক-একটি—

নীল। আমাদের ভিতরের সম্পর্ক ওরা কি বুঝবে!…কী করি, শেষটা বলতে হল—জয়াকে তুমি পড়াও বাপু, অঙ্ক আর কেমিষ্ট্রি পড়াও। হায়রে কপাল, তোমার ছেলে চাকরি করছে আমার কাছে!

রাজ। হেঁ-হেঁ, চাকরি করছে—

নীল। আর মেয়েটাও তেমনি ত্যাঁদোড়। সে পড়বে না, ধ্রুবও ছাড়বে না। চব্বিশ ঘণ্টা নালিশ আর নালিশ। যত গোলমালের মূলে হল ওই পড়া। আরে বাপু, মাস্টার আছিস থাক—পড়াতে কে বলছে? আমার নতুন কনসারনের ডিরেক্টর হবি দু'জনে—অত বি.এ. ডিগ্রি এম.এ. ডিগ্রি কোন কাজে লাগবে শুনি?

রাজ। হুঁ, হুঁ—

নীল। বৌরাণীও যদি আজ থাকতেন! জয়ার জন্মের পর তিনি চিঠি দিয়েছিলেন জয়ার মাকে: জয়াকে চাই আমি দিদি, ধ্রুবর বৌ করে নেব।…সেইটে করতে পারতাম, গজকচ্ছপের লড়াই ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

ধ্রুব এসে ঠক করে প্রণাম করল।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
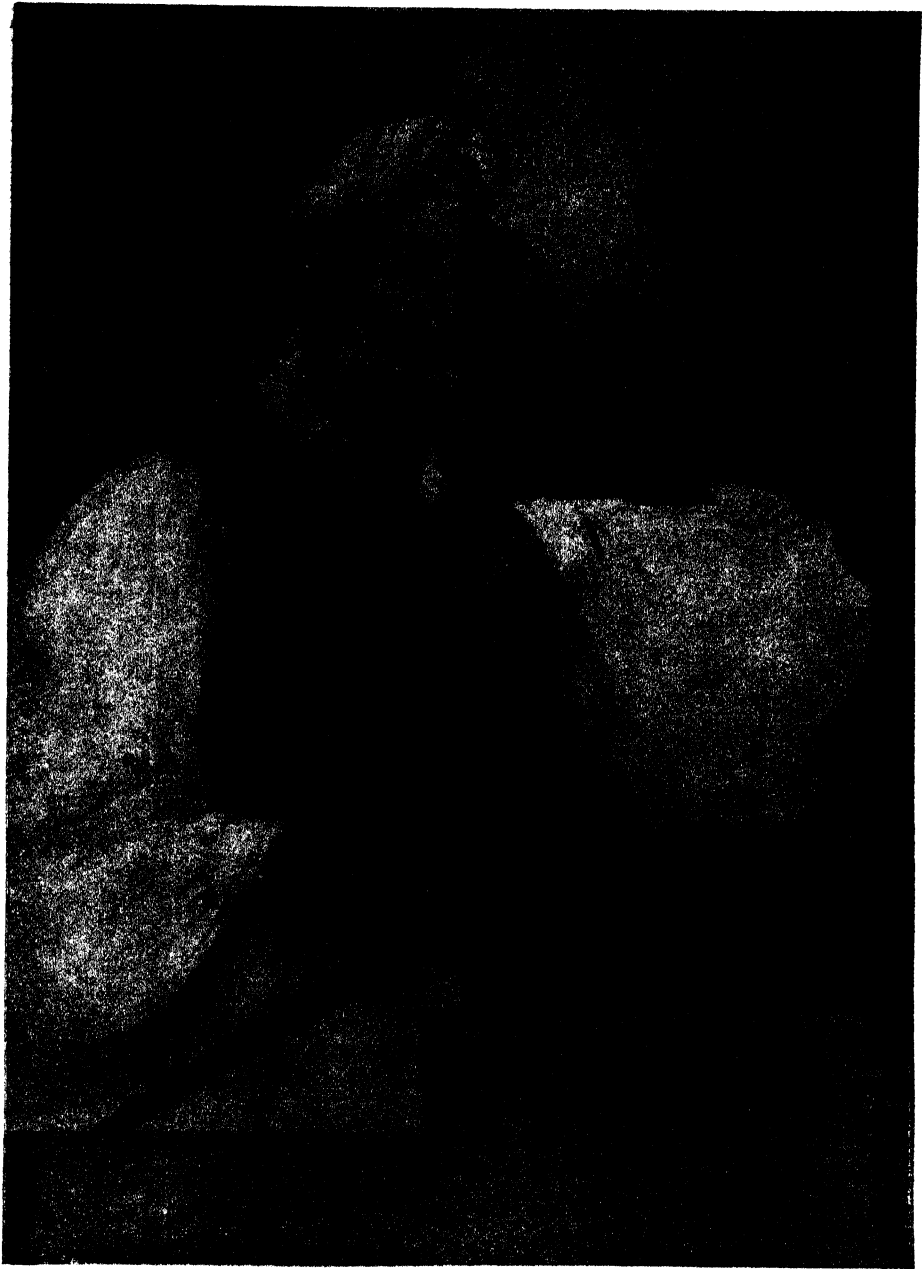
মুসাফির
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

(প্রবাসী — ১৩৩৪, আষাঢ় হইতে পুনর্মুদ্রিত)

নীল। মেজাজি প্রণাম—হয়েছে আবার কিছু। ব্যাপার কি?

ধ্রুব। চলে যাচ্ছি বাবাকে নিয়ে।

নীল। ঠিক ধরেছি। তুমি যাবে, কিন্তু বাপকে আবার সঙ্গে টানছে কেন?

বলতে বলতে নীলমাধব ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছেন।

নীল। ইচ্ছে হলেই অমনি বাপের হাত ধরে বেরুনো যায় না। জান, রাজা আমার ভাই—তোমার জন্মের আগে থেকে ভাই সে আমার! কাণ্ডজ্ঞানহীন দুর্বিনীত ছেলে—তুমি বললেই ভাইকে অমনি ছেড়ে দেব? পথে তোমাদের পেলাম। তোমায় তখন চিনি নে, ছুটে গিয়ে ভাইকে জড়িয়ে ধরলাম। অসুস্থ মানুষটাকে আবার তুমি পথে নিয়ে তুলবে? বাপের বড্ড আপন-জন হয়েছ? আমার মুখের উপর বলতে লজ্জা হল না লেখাপড়া-জানা আকাট মুখ্যু কোথাকার!

ধ্রুব। বেশ, আমি একলাই তবে যাব।

নীল। বলিহারি! ছাত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়! লোকে শুনে বাহবা-বাহবা করবে। কাপুরুষ অপদার্থ মাস্টার—ছাত্রীকে দুটো কানমলা দিতে পার না।

ধ্রুব। কানমলা—ওঁকে?

নীল। হ্যাঁ, ওঁকে। উনি কি লাট সাহেব? আজ্ঞে-আজ্ঞে করে আরও মাথাটা খেয়েছ মেয়ের। ভাবে, অমন স্কলার মানুষ যখন সম্ভ্রম করে কথা বলে, না জানি কী ধনুর্ধর হয়ে গেছি!···হ্যাঁ, ছাত্রছাত্রী বেয়াড়াপনা করলে কানমলা দিতে হয়। মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি—মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে। এখনকার মাস্টারদের নাক-কাঁদুনি—চললাম!

ধ্রুব। গালাগালি আমাকেই দিচ্ছেন জ্যেঠাবাবু। কিন্তু ব্যাপারটা শুনবেন ত! আজ আমার জন্মদিন—

নীল। (সকৌতুকে হেসে) তোমার কিন্তু সেটা খেয়াল ছিল না বাবা!

ধ্রুব। জন্মদিন—খেয়াল থাকবে না কেন?

নীল। তাই ত বলল জয়া। বৌরাণী লাহোরে আমাদের চিঠিপত্র দিতেন। সেই চিঠির গাদা খুঁজে খুজে জয়া তোমার জন্মতারিখ বের করেছে। আমায় বলল, আগেভাগে কিছু বলা হবে না, অবাক করে দেব। মেয়েটা একলা হাতে জন্মদিনের সমস্ত আয়োজন করেছে, কলেজের মেয়েদের নেমন্তন্ন করে এনেছে—

ধ্রুব। মেয়েদের শুনিয়ে শুনিয়ে আমার অপমান করবেন, আসল মতলব তাই। অভিনন্দন-পত্রে গালিগালাজ—

জয়া প্রবেশ করল।

নীল। গালিগালাজ?

জয়া। রাত হয়েছে বাবা। গল্প জুড়ে বসলে জ্ঞান থাকে না। খাওয়া-দাওয়া করবে কখন?

নীলমাধব জ্বলে উঠলেন।

নীল। ধ্রুব চলে যাচ্ছে এ বাড়ি ছেড়ে—

জয়া। তা ত যাবেনই এগজামিনের মুখে। সে হবে না, আমার পাশ না হওয়া পর্যন্ত যাওয়া চলবে না। বাবা তুমি স্পষ্ট করে বলে দাও।

ধ্রুব। আমিও স্পষ্ট করে বলছি জ্যেঠা বাবু, পাশ ওঁর কোন দিন হতে হবে না। পাশ করিয়ে যেতে হলে আমায় চিরজীবন এ বাড়ি পড়ে থাকতে হবে।

নীল। কেউ তোর জ্বালায় থাকতে চায় না। বজ্জাত বিচ্ছু মেয়ে। এক ঘরে একলাটি থেকে থেকে অন্ত কারও ঠেশ সইতে পারিস নে।

জয়া। কি করেছি বল। কেউ এসে মিথ্যে করে লাগাবে, আর অমনি তুমি—

নীল। করেছিস বই কি! অ্যাঁ, কী যেন করল আবার! বল না হে ধ্রুব। এই ত খুব এতক্ষণ বকবক করছিলে।

ধ্রুব। অভিনন্দন-পত্রে গালিগালাজ—

জয়া। গালি দেওয়া উচিত ছিল বাবা। মেয়েরা এসে ফিরে চলে গেল, মুখটা আমার কোথায় থাকল

জিজ্ঞাসা করি? তবু আমি কিছু করি নি। এই ত অভিনন্দন-পত্র। গালিগালাজ কোথায়, বের করে দেওয়া হোক।...তা নয়। আমি খিদে বকুনি খাব, তার ছুতো খুঁজে খুঁজে বেড়ানো। আমি সকলের চোখের বিষ। বেশ, আমিই চলে যাচ্ছি হস্টেলে।

জয়া কান্না চাপতে চাপতে চলে গেল।

নীল। নাও, হল ত? বের কর কী গালিগালাজ করেছে। দেখাও।

অভিনন্দন-পত্র পড়তে পড়তে ধ্রুব চলে গেল।

নীল। (রাজকৃষ্ণকে) ধ্রুব যাচ্ছিল, আবার জয়াও চলল। হয়েছে ভাল। তার চেয়ে তুমি আর আমি—আমরা দু-ভাই চলে যাই রাজা।...কিন্তু দুটোয় যে দু-মুখো বেরুল, তার কি উপায়?

রাজ। হুঁ, উপায়—

নীল। কত সময় কত বুদ্ধি দিয়েছ রাজা। হুঁ-হাঁ দিয়ে গেলে হবে না, ভেবেচিন্তে বল একটা কিছু—

রাজ। একটা কিছু—

নীল। ঠিক বলেছ। ঠিক। একটা কিছু করতেই হবে। বড্ড হুটোপাটি লাগিয়েছে। দুই লড়নেওয়ালা। তোম ভি মিলিটারি, হাম ভি মিলিটারি।...দুটোয় জুড়ে গেঁথে দেওয়া যায় যদি—কি বল, তোমার কি মত?

রাজ। হুঁ-হুঁ, হুঁ-হুঁ—

নীল। আমি কন্যাকর্তা। আমার তরফের মত আছে। ষোলআনার উপর আঠারআনা। তুমি বরকর্তা। কিন্তু মুশকিল—তোমার মাথাটা একটু ইয়ে মতন কি না। যদি আজ বৌরাণী থাকতেন! অবিশ্যি তাঁরও একটা মত পাওয়া গিয়েছিল—জয়াকে ধ্রুবর জন্য চেয়ে রেখেছিলেন।

রাজ। হুঁ—

নীল। গণ্ডগোলের মধ্যে কোথায় যে চিঠি হারিয়ে গেছে। থাকলে ধ্রুবর সামনে মেলে ধরতাম। পাকা দলিল। তার উপরে আর কথা চলত না।

জানলা দিয়ে চিঠি এসে পড়ল। জয়াও ঢুকল।

নীল। আরে, এই ত সেই চিঠি। চিঠি কোত্থেকে এল রে জয়া?

জয়া। বাতাসে উড়ে এসে পড়ল বাবা।

নীল। তুই ফেলেছিস। খুজে পেতে তুই রেখে দিয়েছিলি। তোর মত আছে, বোঝা গেল।

জয়া। কিসের মত বাবা?

নীল। ধ্রুবর সঙ্গে বিয়ে দেব তোর। মত না থাকলে কক্ষনো চিঠি বের করতিস নে।

জয়া। খোঁজ করছ, সেইজন্য বের করে দিলাম। চিঠি লেখালেখির সময় মত ত নাও নি, এখন তবে সে কথা কেন?

নীল। এখন যে বড় হয়েছিস। লেখাপড়া শিখেছিস। তোর যদি কোন রকম আপত্তি থাকে—

জয়া। থাকলে কি হবে? আমার কথা কবে তুমি শুনে থাক? তুমি যখন জেদ ধরেছ, ও তুমি করবেই। আমি কেন উল্টো কথা বলে মুখ হারাতে যাই।

নীল। হুঁ, বুঝলাম...বুঝলাম। বেটি বড় চালাক! দেখি সে বাবু আবার কি বলেন। আত্মসম্মানের বস্তা—দেখি জিজ্ঞাসাবাদ করে। ধ্রুব, ধ্রুব!

জয়া। হুঁ, ভারি ত মানুষ—তাকে আবার জিজ্ঞাসা!

নীল। দেখ, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবি নে। এই জন্যেই ত লাগে তোর সঙ্গে।

ধ্রুব আসছে দেখে জয়া চলে গেল।

নীল। শোন ধ্রুব। জয়ার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চাই। আমি মত দিয়েছি। জয়া আমার সুশীলা মেয়ে—আমার মতেই তার মত। আর তোমার মায়েরও মত আছে—

ধ্রুব। (চমকে) মায়ের মত কি করে পেলেন?

নীল। হেঁ-হেঁ, পেয়েছি বই কি!...দেখ, পড়ে দেখ। মত কি তিনি আজ দিয়েছেন?

ধ্রুবর হাতে চিঠি দিলেন। ধ্রুব চিঠি পড়ল।

ধ্রুব। হবে তাই। কিন্তু দেরি হোক জ্যেঠাবাবু।

নীল। দেরি—কত দেরি?

ধ্রুব। এই ধরুন আড়াই বছর, তিন বছর—

নীল। কক্ষনো না। বড্ড বাড়িয়েছ তোমরা। আরে, তিন বছরে ত লাঠালাঠি শুরু করবে। দেরি খুব ত পনের-বিশ দিন। ফাল্গুনের যে শেষ তারিখ। চৈত্র মাস সামনে, অকাল পড়ে যাচ্ছে।

জয়া প্রবেশ করল।

জয়া। খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাবা।

নীল। হ্যাঁ, চল। কত বড় ভাবনার আজ সুরাহা হয়ে গেল! চল রাজা। আয় তোরা—

রাজকৃষ্ণকে ধরে নিয়ে নীলমাধব চলে গেলেন। জয়াও যাচ্ছিল, ধ্রুব ডাকল।

ধ্রুব। শুনুন একটা কথা—

জয়া খুব কাছে এল।

ধ্রুব। আমায় ক্ষমা করুন। এত সব লিখেছেন অভিনন্দন-পত্রে—আমি উল্টো ভেবেছিলাম। আপনার আয়োজন আমার জন্য পণ্ড হয়ে গেল।

জয়া। মুখে কী আপনার? হাঁ করুন ত দেখি। দেখি, দেখি। ভকভক করে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। হুঁ, পায়োরিয়া—

টিপয় থেকে কমলালেবুর কোয়া নিয়ে জয়া ঠেসে দিল ধ্রুবর মুখে। ধ্রুব ফেলে দিল সেটা। চটে গেছে।

ধ্রুব। দুর্গন্ধ বেরোয় আমার মুখ দিয়ে?

জয়া। বলার ভুল। গণ্ডা গণ্ডা 'আপনি' বেরোয়। দুর্গন্ধের চেয়েও অসহ্য। ছাত্রীকে কেউ 'আপনি' বলে না। 'তুমি' বলতে হয়।

ধ্রুব। ছাত্রী আর থাকছ কোথা?

জয়া। তবে ত তুইও বলতে হবে সময় সময়।

ধ্রুব। যাঃ—

খিলখিল করে হেসে উঠল।

চতুর্থ দৃশ্য

নীলমাধবের বাড়ির সদর-দরজা। নীলমাধব ও রাজকৃষ্ণ। রসুনচৌকি বাজছে চম্পকের সেই বিয়ের দিনের মতো। রাজকৃষ্ণ বড় উল্লসিত।

রাজ। ওই—ওই—

নীল। হ্যাঁ, শানাই বাজছে। ধ্রুব আর জয়ার বিয়ে হয়ে গেল, সেই জন্যে বাজছে।...ভাল লাগছে রাজা? বড্ড যে স্ফূর্তি! তাল দিয়ে দিয়ে নাচা হচ্ছে আবার! থাক, থাক—লোকে দেখলে নিন্দেমন্দ করবে। তুমি বরের বাপ, নতুন কুটুম্ব আমার। বেহাই। ভাই ছিলাম, বেহাই হলাম আজকে।...শানাইওয়ালা, এবারে বন্ধ কর। কাজকর্ম চুকে গেল, আর কেন? খুব ভাল হয়েছে, নেমে এস।

বাজনা থামিয়ে বাজনদারেরা এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

নীল। যাও, খাওয়াদাওয়া করগে। সকালবেলা বখশিশ—

বাজনদার। জো হুকুম—

তারা চলে গেল।

নীল। বৌরাণীর সাধ ছিল, জয়াকে বৌ করে নেবেন। জয়ার মা'রও সেই ইচ্ছে। বেয়ান বলে হাসি-তামাসা করে চিঠি লেখালেখি চলত। আজকে কেউ নেই—না জয়ার মা, না ধ্রুবর মা। মা বলে ডেকে জোড়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেবে, সে ভাগ্য হল না ওদের। (নিশ্বাস ফেললেন) তবু ভাল, যা তাঁরা চেয়েছিলেন সেটা পূরণ হল।...ক্লান্ত হয়ে পড়েছ রাজা? আর কি, সবই ত মিটে গেছে। শুয়ে পড়গে এবার।...বাদল, ওরে বাদল—

বাদলরাম প্রবেশ করল।

নীল। রাজাকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দে। মশারি ভাল করে গুঁজে ঘরের আলো নিভিয়ে দিবি। রাজকৃষ্ণ-পল্লীর ওঁরা এখনো আসেন নি, আমি আর একটু থাকি।

বাদল রাজকৃষ্ণকে নিয়ে চলে গেল। ছায়া মঞ্জুলা ইত্যাদি মেয়েরা এবার চলে যাচ্ছে।

নীল। বাড়ি চললে মা তোমরা?

ছায়া। অনেকক্ষণ হৈ-হৈ করা গেল। ওরা এখন বিশ্রাম করুক।

মঞ্জুলা। জয়া তবু শক্ত আছে, বর ঝিমিয়ে পড়েছে একেবারে। এখন থাকা মানে কষ্ট দেওয়া ওদের।

নীল। জয়ার মা-বোন নেই। ধ্রুবরও নেই। বড় দুর্ভাগা। বোনের কাজ মায়ের কাজ তোমরাই করে দিলে। কী বলে যে আশীর্বাদ করি মা তোমাদের—

মেয়েরা চলে গেল। রাজকৃষ্ণ-পল্লীর যাদব, কেশব, বিনোদ প্রভৃতিকে দেখা গেল এই সময়।

নীল। আসুন, আসুন—

বিনোদ। পেটের ধান্দায় সকলে নানান জায়গায় ছড়িয়ে থাকি। জুটিয়েপুটিয়ে আনতে দেরি হয়ে গেল।···চারিদিক ঠাণ্ডা—এর মধ্যেই মিটে গেল?

নীল। গোধুলি-লগ্নের বিয়ে। আর লোকজনও বেশি বলি নি। আমি লাহোরে পড়ে থাকতাম, বরপক্ষও মফস্বলের। শহরে লোকের সঙ্গে জানাশোনা আমাদের কম। তা ছাড়া দেশের এই দুর্দিন—মানুষের আশ্রয় নেই, খাবার ব্যবস্থা নেই। এর মধ্যে বাড়াবাড়ি কিছু করতে যাওয়া অন্যায়। লজ্জার ব্যাপার! নিতান্ত যেটুকু নইলে নয়। নিমন্ত্রিত যাঁরা ছিলেন, এক ব্যাচেই হয়ে গেল।···সোজা ছাতে চলুন আপনারা। এখনই বসে পড়বেন।

কেশব। আদর্শ দেখালেন বটে সার। একটিমাত্র মেয়ে—ভগবানের দয়ায় অভাবও কিছু নেই। কিন্তু বিয়ের কাজ নমো-নমো করে সেরে মবলগ টাকা দান করে দিলেন।

যাদব। কলোনির সবাই আমরা টাকাটা সমান ভাগ করে নিয়েছি। ঘর পিছু দু-শ' চল্লিশ টাকার মতন। জমি দিয়েছিলেন, ঘর বাঁধার ব্যবস্থা করে দিলেন এবারে।

কেশব। এমনি দরদ সকলের থাকলে সোনার পৃথিবী হয়ে যেত।

নীল। না না, অত করে বলছেন কেন? নিজে ঘরবসত ছেড়ে এসেছি, ভিটে হারানোর দুঃখ বুঝতে পারি মর্মে মর্মে। আমি এক বাস্তুহারা, আবার যাকে জামাই করলাম সে-ও।

কেশব। আমাদের ঘর করে দিলেন সার—আপনার মেয়ে-জামাই চিরকাল সুখ-শান্তিতে ঘর করবে।

নীল। চলুন, ফেরবার সময় আশীর্বাদ করে যাবেন ওদের।

পঞ্চম দৃশ্য

বাসরঘর। বিশাল শয্যা। কোণে একটা প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলছে। আবছা অন্ধকার। বাসরে ওরা দু-জন—জয়া আর ধ্রুব।

জয়া। ঝিমিয়ে-পড়া ভাব তোমার। মন খুব খারাপ লাগছে?

ধ্রুব। না জয়া। এই ত, কত হাসাহাসি করলাম এতক্ষণ ধরে।

জয়া। হাসির সঙ্গে চোখও ছলছল করছিল। অত হাসছিলে কান্না চাপবার জন্য। দেখ, আমার কাছে লুকোতে পারবে না, সে চেষ্টা কোরো না। (একটু থেমে) কেন দুঃখ, তা-ও আমি জানি।

ধ্রুব। কেন?

জয়া। এই এক ঝগড়াটে হতচ্ছাড়া মেয়ে চিরজীবনের মতো কাঁধে চেপে গেল।

ধ্রুব। দুঃখ হওয়া আশ্চর্য নয় জয়া। এত বড় ভাগ্য আজ আমার জীবনে—কিন্তু কার কাছে নিয়ে যাই বৌয়ের মুখ তুলে দেখে প্রাণভরে যিনি আশীর্বাদ করবেন? সব থেকেও আমার কিছু নেই জয়া। বাবার ঐ অবস্থা—

জয়া। বাবার কী আনন্দ আজ দেখেছ? শানাই বাজায়, আর ছুটে ছুটে সেইখানে চলে যান। বসাতে পারি নে, খাওয়াতে পারি নে—

ধ্রুব। বাবার মনে পড়ছে চম্পকের বিয়ের রাত্রি। আর কেউ না জানুক, আমি ওঁর মুখ দেখে বুঝেছি। চম্পকের কথা ভাবছেন। কালরাত্রি—স্বপ্ন ভেঙে যাবার মতো কী কাণ্ড হয়ে গেল এক রাত্রের মধ্যে! চম্পক গেল, ঠাকুরমা গেলেন, বাবা বেঁচে থেকেও নেই। আর মা আমার—

ধ্রুব আকুল হয়ে পড়ল।

জয়া। আছেন তিনি—

চমকে ওঠে ধ্রুব। জয়ার মুখের দিকে তাকায়।

ধ্রুব। কোথায়?

জয়া। ঐ যে দেয়ালে। সেকালের দুই সখী ওঁরা—আমার মা, আর শাশুড়ি-মা। মায়ের ছবি ছিলই, তোমার ঘর থেকে ওঁর ছবিটা এনে পাশে টাঙিয়ে দিয়েছি। আমাদের জীবনের এত বড় আনন্দ-ক্ষণ মায়েরা দেখবেন না, সে কি হয়? দেয়াল থেকে দেখছেন ওই তাকিয়ে তাকিয়ে।

সুইচ টিপে জয়া একটা আলো জ্বেলে দিল। দেয়াল উদ্ভাসিত হল। পাশাপাশি দু'টি ফোটোগ্রাফ—জয়ার মা, আর বৌরাণী জ্যোতির্ময়ী।

জয়া। কী সুন্দর এই মায়ের চেহারা! চোখে কোনদিন দেখি নি—যেন রাজরাজেশ্বরী।

ধ্রুব। অনেক দিনের ছবি। চাষকুঠির নতুন বৌরাণী। পরে কি আর এই চেহারা?

জয়া। যে লোকে আছেন, আরও সুন্দর জ্যোতিষ্মান চেহারা আজ—

ধ্রুব। (জ্যোতির্ময়ীর ছবির কাছে গিয়ে) মা, মাগো, তোমার কত সাধের জয়া বৌ হয়ে এল, তুমি তা চোখে দেখতে পেলে না।

জয়া। দেখেছেন ঠিকই তিনি। আকাশ-পারের তারা হয়ে দেখছেন।

জয়া জানলা দিয়ে তারা-ভরা আকাশের দিকে আঙুল দেখাল। জেল থেকে ছাড়-পাওয়া জ্যোতির্ময়ী জানলার বাইরে।

জয়া। কে? ও কে?

ধ্রুব। কই, কোথায় কে?

জয়া। কোন ডাইনি। ঝাঁকড়া চুল। প্যাট-প্যাট করে দেখছিল আমাদের।

ধ্রুব। (সে-ও দেখতে পেয়েছে) না না, কেউ নয়। চোখের ভুল তোমার।

জয়া। ভুল নয়, ঐ যে পালাচ্ছে। চোর, চোর! বাগানে চোর ঢুকে পড়েছে।

জয়ার চিৎকারে বাইরেও বহুকণ্ঠে 'চোর, চোর'—চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। ধ্রুব ঘর ছেড়ে ছুটল।

জয়া। তুমি কোথা যাও?…শোন, শোন। চোর ধরতে তোমায় যেতে হবে না। বাসর ছেড়ে বেরুতে নেই—

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাড়ির সংলগ্ন বাগানের প্রান্তে ঝুরি-নামা বটগাছ। জ্যোতির্ময়ী তার ভিতরে পালিয়েছেন। হাঁপাচ্ছেন ছুটোছুটির ক্লান্তিতে। পাশে ধ্রুব।

ধ্রুব। মাগো, কেন তুমি এলে? কী করি তোমায় নিয়ে? কোন্‌খানে পালাই?

জ্যোতি। আজ বিকালে হঠাৎ ছাড় হয়ে গেল ধ্রুব। আড়াই বছর মকুব করে দিয়েছে।

ধ্রুব। রাতটুকুও থাকতে দিল না?

জ্যোতি। ওরা থাকতে বলেছিল। কিন্তু আজকে তোর বিয়ে। তুই আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলি। আর একদিন আমার চম্পকেরও বিয়ে হচ্ছিল। মেয়ের বিয়ে জ্বলেপুড়ে গেল। যখন বাইরেই এসেছি—ছেলের বিয়ে একটু চোখে দেখব না, সে আমি পারি? কে যেন পায়ে দড়ি দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল। এসেছি কি এখন! মানুষজন ছিল বলে ঢুকতে সাহস হয় নি। কাজের বাড়িতে আর দশটা ভিখারির সঙ্গে আমিও ভিখারি হয়ে ঘুরছিলাম।

ধ্রুব। এখন কী উপায় করি মা?

জ্যোতি। তুই সরে যা। উঠে যা আমার কাছ থেকে। পরিচয় দিস নে। চোর, চোর—করছে, তুইও ওদের সঙ্গে চোর বলে চেঁচামেচি কর।

ধ্রুব। কি বলছ মা! আমি তোমার পরিচয় দেব না—চোর বলে ধরিয়ে দেব?

জ্যোতি। খুনি মায়ের ছেলে হয়ে তুই কেন খাটো হবি সকলের কাছে? জয়া-মা আমার ছেলেমানুষ—তার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। আজ আমার কোন দুঃখ নেই বাবা। ছেলে আর ছেলের বৌ পাশাপাশি দু-চোখ ভরে দেখে নিয়েছি। কত দিনের সাধ আমার! সাধ মিটেছে। চোর বলে ওরা পুলিশে দিক, আবার জেলে নিয়ে পুরুক—কিছু আর ডরাই নে।

টর্চের আলো এদিক-ওদিক পড়ছে। নেপথ্যে যাদবের কণ্ঠস্বর।

যাদব। ওই—ওই যে, বটগাছের শিকড়বাকড়ের মধ্যে। এই দিকে এস সবাই, ঘিরে ফেল। সামাল! ওরা কিন্তু খালি হাতে থাকে না—

আলো পড়ল জ্যোতির্ময়ীর মুখের উপর। বিনোদ, যাদব ও আরও কয়েকজন প্রবেশ করল।

বিনোদ। আরে, সেই শয়তানী। কলোনিতে যে গিয়ে উঠেছিল। মা ছেলে দুটোই এখানে জুটেছে।

যাদব। জেল থেকে কবে বেরুলি? বেরিয়েই অমনি কাজে নেমেছিস?

ধ্রুব। সম্ভ্রম করে কথা বল আমার মায়ের সঙ্গে।

বিনোদ। ওঃ, গোঁসাই ঠাকরুন! সম্ভ্রম করতে হবে!

ধ্রুব ঘাড়-ধাক্কা দিল বিনোদকে। নীলমাধব ক্ষণপূর্বে এসেছেন।

নীল। কী বলছ ধ্রুব? মা ত মারা গিয়েছেন তোমার?

ধ্রুব। এই আমার মা। সর্বংসহা জননী আমার!

নীল। বৌরাণী?

ধ্রুব। না, চাষকুঠি নেই, কুঠির বৌরাণীও নেই। আমার মা—

বিনোদ। খুনে মেয়েমানুষ সার। খুন করে জেলে গিয়েছিল। চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি যে ফাঁসি হয় নি।

যাদব। জুয়েলার গণপতিকে খুন করেছিল সার।

ধ্রুব। চাষকুঠির এক বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী গণপতি—

নীল। থাক, থাক—বলতে হবে না। গণপতির সমস্ত চক্রান্ত আমি শুনে এসেছি দাঙ্গার আসামিদের মুখে। হিংস্র জানোয়ার মারলে সরকারি পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে—গণপতির জন্যে ত পুরস্কার পাওয়া উচিত।

জয়া প্রবেশ করল।

নীল। ওরে জয়া, দেখছিস কি? তোর শাশুড়ি—আমাদের কত আদরের বৌরাণী। রাজার বৌকে একদিন কত সমারোহ করে ঘরে তুলেছিলাম। মা-লক্ষ্মী আজ কোন সাজে এসেছেন আমার বাড়ি! ওরে ধ্রুব, ওরে জয়া, ঘরে নিয়ে তোল শিগগির মা'কে।

জয়া ছুটে জ্যোতির্ময়ীর কোলের কাছে চলে গেল।

জয়া। মা, মাগো—

জ্যোতি। মা বলে ডাকছ? আমার চম্পক অমনি করে ডাকত। মা, আমায় ঘৃণা করবে না?

জয়া। আপনার ছেলে বলেছে বুঝি? সব জায়গায় আমার নিন্দে রটিয়ে বেড়ায় মা। বাবার কাছে বকুনি খাওয়ায়। আমার মা নেই, মায়ের কথা গোপন করে এসেছে এই সাড়ে-তিন বচ্ছর। জানলায় দেখেই ও চিনেছে, তবু আমায় কিছু বলল না। মায়ের ও একলা ছেলে হয়ে থাকবে—জ্ঞান হয়ে অবধি আমি মা বলে ডাকি নি, তবু আমায় মেয়ে হতে দেবে না।

সজল চোখে জয়া জ্যোতির্ময়ীকে তুলে ধরেছে। ধ্রুব আর এক পাশে। ঘরে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে। এমনি সময় রাজকৃষ্ণ ঘুম ভেঙে চোখ মুছতে মুছতে এসে পড়লেন। এক মুহূর্ত অবাক হয়ে রইলেন জ্যোতির্ময়ীর দিকে তাকিয়ে। তার পরে হি-হি হা-হা প্রবল হাসি হাসতে লাগলেন।

জ্যোতি। (জয়ার মুখ তুলে ধরে) চেন একে?

রাজ। চিনব না আবার! খুব চিনি—খুব-খুব—

জ্যোতি। বল দিকি কে?

রাজ। বলব? চম্পক—চম্পি—তোমার আদুরে মেয়ে। দেখা দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে যায়। কতবার পালিয়েছে। এইবার আটকে ফেলেছি, আর যেতে দিচ্ছি নে।

শেষ

ষাট বছরে বাংলা গদ্য

শ্রীসুকুমার সেন

বিংশ শতাব্দীর সমবয়সী প্রবাসী। দুইই এখন ষাটের কোঠায়। এই ষাট বছরে বাংলা গদ্যে কি পরিবর্তন এসেছে তা বলতে হবে। আধুনিক বাংলা গদ্য যাকে বলে ষাটের কোলে ষষ্ঠীর দাস। তবে সে ষাটের কোল ঠিক বিংশ শতাব্দীর নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ষাট বছর ধরে পাকাভাবে কলম চালিয়ে এসে বাংলা গদ্যকে সমর্থ করে গেছেন। প্রধানতঃ তাঁরই বিভিন্ন স্টাইল অনুসরণ, অনুকরণ এবং অপসরণ ও অপকরণ করে এখনকার সাহিত্যের কাজকারবার চলছে। একথা মনে রাখা আবশ্যক।

বর্তমান শতাব্দীর ভালো গদ্য-লিখিয়েরা অধিকাংশই প্রবাসীর নিয়মিত লেখক ছিলেন। সেই জন্যে যদি কোন একখানি পত্রিকাকে আধুনিক বাংলা গদ্যের বাহক বলতে হয় ত সে প্রবাসী। তার পরে রবীন্দ্রনাথের কথা ধরি। তাঁর গদ্যশিল্পের চূড়ান্ত রূপ যাতে নিটোল নিখুঁতভাবে পাই, সেই জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল (১৩১৮-১৩১৯)।

প্রথমে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ধরি। ইনি পাকাপোক্ত পুরানো লেখক। বিদ্যাসাগরের কলম যখন থামে নি তখনই দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববিদ্যা' লিখেছিলেন। তার পর ভারতীতে ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রবন্ধ। প্রবাসীতে বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়মিত লেখক হয়ে দেখা দিলেন এবং তাঁর অননুকরণীয় স্টাইলে নূতন শক্তি ও নবীনতা দেখা দিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা 'গীতাপাঠ' প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে বের হয়েছিল (১৩১৮-১৩১৯)। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক যে প্রবন্ধ চৈত্র মাসে ওভার্টুন হলে পড়েছিলেন তা ১৩১৯ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল। কারো কারো প্রবন্ধটি ভালো লাগে নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির প্রশংসা করে একটি মন্তব্য লিখেছিলেন। তা আষাঢ় মাসে 'আলোচনা' শীর্ষকে ছাপা হয়েছিল। এই মন্তব্যের প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি। এর থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্টাইলের পরিচয় পাওয়া যাবে।

> বিগত বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীমন্ রবীন্দ্রনাথের পর্যালোচিত "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা" পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে, প্রাচীন ভারতের রহস্যপূর্ণ ইতিহাসের নানারঙের বহিরাবরণের মধ্য হইতে মস্তক বিভাজন করিয়া তাহার ভিতরের কথাটি, যাহা এতদিন সহস্র চেষ্টা করিয়াও আলোকাভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়া উঠিতেছিল না, এইবার তাহার সে চেষ্টা বাঞ্ছানুরূপ সাফল্যলাভ করিবে তাহার অরুণোদয় দেখা দিয়াছে ; তবে যে চতুর্দিকে কর্কশ কা কা ধ্বনি হইতেছে—রজনী প্রভাতের সম-সমকালে তাহা হইবার কথা। এতদিনের ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের এই যে একটা দস্তুরমতো পাকা রকমের গোড়াপত্তন হইল, ইহা বঙ্গ-সরস্বতীর ভক্ত সন্তানদিগের কত না আনন্দের বিষয়।

গীতাপাঠের একটু নমুনা দিচ্ছি।

> আজিকের এই একটিমাত্র শ্লোকের অর্থব্যাখ্যা অন্যান্যবারের গণ্ডাতিনেক শ্লোকের অর্থব্যাখ্যার স্থান জুড়িয়া কলেবর বিস্তার করিয়াছে অনেক। অতএব আজ এইখানেই থামা যুক্তিসিদ্ধ।

তার পরে নাম করব যোগেশচন্দ্র রায়ের (১৮৫৯-১৯৫৬)। যোগেশচন্দ্রের প্রবন্ধ আগে ভারতী ও সাহিত্যে বার হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রবাসীর প্রবন্ধগুলিতে তাঁর চিন্তার ও স্টাইলের বৈশিষ্ট্য বেশি প্রকট হয়েছিল। যোগেশ-চন্দ্রের স্টাইলের সঙ্গে হরপ্রসাদের স্টাইলের মিল ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা এক-আধটা বার হয়ে থাকবে। তিনি সাহিত্যের আসরে কতকটা অন্যদলের লোক ছিলেন। যোগেশচন্দ্র-হরপ্রসাদের স্টাইল বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কমলাকান্ত-প্রবন্ধগুলির ভাষার দ্বারা সাক্ষাৎ প্রভাবিত। এঁদের স্টাইল মিতভাষী অথচ দুর্বোধ দুর্গম নয়, সাধুভাষাশ্রয়ী কিন্তু চলিত-ইডিয়মবিরোধী নয়। এঁদের প্রবন্ধ শিক্ষা দিতে চায় না, বুঝিয়ে দিতে চায় না, যেন নিজের শিক্ষা, নিজের বোঝা নিজেকে বোঝাচ্ছেন। হরপ্রসাদ সাহিত্যরসকে প্রয়োজন মত আমল দিয়েছেন। কিন্তু যোগেশচন্দ্রের স্টাইল যাকে বলে precise বা পর্যাপ্ত, এবং বিষয়ের মাপসই, তা বৈজ্ঞানিক হোক চাই ঐতিহাসিক হোক। যোগেশচন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা করেন নাই। প্রাচীন সাহিত্যের যতটুকু আলোচনা করেছেন তা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে। ১৩১৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' প্রবন্ধের গোড়ার

দিকু থেকে খানিকটা নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত করছি। যোগেশচন্দ্রের প্রবন্ধে কোন কোন যুক্তাক্ষরের নিজস্ব বানান লক্ষ্য করতে হবে। নিচের উদ্ধৃতিতে ইংরেজী ক্যাপিটাল হরফের রীতিও লক্ষণীয়।

নিজের বিষয়ে নিজের জ্ঞানের সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে একদিকে যেমন অহমিকা প্রকাশ পায়, অন্যদিকে পাঠকের নিকট তেমন বিজ্ঞাপন মনে হয়। কিন্তু যে বিষয়ে লিখিতে বসিতেছি, ঘুরাইয়া লিখিলেও তাহাতেও অহমিকা প্রকাশের আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া, বিষয়টা ঠিক নিজের নয়। বাঙ্গালা শব্দ বাঙ্গালার; তাহাতে কেবল তোমার আমার সম্বন্ধ নাই। বিশেষতঃ সাহিত্য-পরিষদ্ গত কয়েক বর্ষের পত্রিকায় আমার বাঙ্গালা শব্দকোষ সঙ্কলনের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। কেহ কেহ ভাবিয়াছেন আমি রাঢ়ের গ্রাম্য-শব্দ সংগ্রহ করিতেছি, এই সংগ্রহে কৌতূহলীর দুর্বহ কালকর্তনের সুবিধা হইবে, বাঙ্গালা ভাষার ইষ্ট সাধিত হইবে না। ইহারও একটা উত্তর আবশ্যক।

আমার বাঙ্গালা ভাষা-চর্চ্চার ইতিহাস কৌতুকাবহ। ইহার আরম্ভ খেলায়; এখন খেলা দিয়া এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে শতবার মনে হইয়াছে শেষ হইলে বাঁচি। আট দশ বৎসর পূর্বে কখনও ভাবি নাই, বাঙ্গালা ভাষার শব্দ অক্ষর প্রভৃতি লইয়া কালক্ষেপ করিতে হইবে, কিংবা বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার যোগ্যতা হইবে। বর্ষাকালে একদিন অপরাহ্ণে অনেকক্ষণ ধরিয়া বৃষ্টি হইতেছিল, নিত্য লেখা-পড়ায় মন গেল না। সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রাপ্ত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্কলিত 'বাঙ্‌লা ক্রিয়াপদের তালিকা' চোখে পড়িল। দুই এক পৃষ্ঠা উলটাইতে উলটাইতে মনে হইল আরও কি্রয়াপদ আছে। তালিকার শেষে অনুরোধপত্র ছিল যে, নূতন কি্রয়াপদ মনে হইলে তালিকায় লিখিতে হইবে, বাঙ্গালা শব্দ একত্র করিতে হইবে। যাঁহারা জানেন তাঁহারা লিখিবেন, পরিষদের সম্পাদকের অনুরোধ পালন করিবেন; আমি খেলাচ্ছলে নূতন কি্রয়াপদ লিখিতে বসিলাম। লিখিতে বসিলাম, কিন্তু কলম চলিল না। কি্রয়াপদটা এই না অই?

প্রবাসীর ও মডার্ণ রিভিউর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইংরেজীতে কৃতবিদ্য এবং একদা ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। ইংরেজী লেখায় তাঁর কুশলতা সকলেই স্বীকার করত। তিনি বাংলায় কোন বই লেখেন নি বলে বাংলা লেখকরূপে তাঁর নাম নেই। কিন্তু তিনি অত্যন্ত চমৎকার ঝরঝরে বাংলা লিখতেন। আধুনিক বাংলা গদ্যের ইতিহাসে রামানন্দবাবুর ভঙ্গিহীন স্টাইলের বিশেষ মূল্য আছে। ১৩১৬ সালের আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসী বিবিধ-প্রসঙ্গ থেকে রামানন্দবাবুর গদ্যের পরিচয় দিই।

অনেকে আমাদের ঔদার্য্যাদি গুণের প্রশংসা করিয়া নিজ প্রবন্ধ বা কবিতা ছাপিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে অনুরোধ করেন। আমরা যে অসামান্য ঔদার্য্যসম্পন্ন ও গুণগ্রাহী তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু তথাপি সত্য কথাটা ত বলিতে হয়? আর সেটা এই যে কাহাকেও উৎসাহিত বা নিরুৎসাহ করা প্রবাসীর উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বিবেচনায় যাহা পাঠিকা ও পাঠকদিগের হিতকর ও প্রীতিকর, দেশের ও মানব-সমাজের পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহা প্রবাসীতে প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য। ইহাতে কোন লেখক উৎসাহিত হইলে আনন্দের বিষয়, কেহ যদি নিরুৎসাহ হন ত ক্ষমা করিবেন। কারণ 'নূতন লেখক সৃষ্টি' করা আমাদের সাধ্যাতীত। যাঁহাদের শক্তি আছে ও অবসর আছে, তাঁহারা এই ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা নূতন পুরাতনের বিচার করি না। কিন্তু তথাপি কোন বিষয়ে প্রথিতযশা লেখকের প্রকাশযোগ্য লেখা হাতে থাকিতে নূতন লেখকের তদ্রূপ বিষয়ে লিখিত প্রকাশযোগ্য লেখা অগ্রে ছাপিতে কোন সম্পাদক ইচ্ছা করেন না।

কোন কোন "উদীয়মান কবি" কবিতা পাঠাইয়া এই আশ্বাস দেন যে প্রেরিত কবিতাটি ছাপা হইলে প্রতি মাসে আমাদের ঐরূপ একটি করিয়া কবিতা প্রাপ্তি ঘটিবে। আজকাল বড় ভয়ে ভয়ে কাগজ চালাইতে হয়,—কবে কি লিখিয়া রাজদ্রোহাপরাধে দণ্ডিত হইতে হইবে, এই ভয়। তাহার উপর কবিযশঃপ্রার্থীরা এরূপ ভয় দেখাইলে উভয়বিধ ভয়ে আমাদের আয়ু হ্রাস হইতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর দু'জন বড় বাংলা গদ্য-লিখিয়ে প্রবাসীর লেখকমণ্ডলীর অন্তর্গত ছিলেন না। একজন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর একজন প্রমথ চৌধুরী।

অবনীন্দ্রনাথের স্টাইল কোন বড় লেখকের বা লেখকদের বই পড়ে শেখা নয়। ছেলেবেলায় দাসীদের কাছে যে রূপকথা শুনতেন, সেই রূপকথার ভঙ্গির উপর তাঁর বাংলা স্টাইল গড়ে উঠেছিল। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর বিশিষ্ট রচনায় রূপকথার রূপ কিংবা রূপকথার রঙ অথবা রূপকথার রূপ ও রঙ দুইই স্পষ্ট বিদ্যমান। প্রথমে ধরা যাক 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৫)।

এমনি করে দিন যায়। ছোট-রাণীর সাতমহলে সাতশ' দাসীর মাঝে দিন যায়; আর বড়-রাণীর ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বাঁদর-কোলে দিন যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে গেল। বড়-রাণীর যে দুঃখ সেই দুঃখই রইল,—মোটাচালের ভাত, মোটা সুতোর শাড়ি আর ঘুচল না। বড়-রাণী সেই ভাঙাঘরে দুঃখের দুঃখী, সাথের সাথী বনের বানরকে কোলে নিয়ে ছোট-রাণীর সাতমহল বাড়ী, সাতখানা ফুলের বাগানের দিকে চেয়ে চেয়ে কাঁদেন।

এর পরে চিত্রশিল্পীর লেখনীতে রূপকথার রূপ ফিকা হয়ে এল। তিনি ইতিহাস থেকে যে বিষয় বেছে নিলেন তার লিপিচিত্রণে রূপকথার রঙের ছোপ পড়ল। 'রাজকাহিনী'তে (প্রথম খণ্ড ১৯০৯) সহজ ভাষায় অল্প আয়োজনে নিপুণ শব্দচিত্রণ পরিস্ফুট হ'ল। ১৩১৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত 'অরিসিংহ' থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করছি।

হঠাৎ ঘোড়ার খুড়খড় শব্দে চমকে উঠে, রাজকুমার চেয়ে দেখলেন, আমবাগানের ফাঁকে একটুখানি সবুজ ক্ষেত, তার মাঝে সেই নীল আঙিয়া পরা তরুণী রাজপুতকন্যা, পশ্চিম বাতাসে অড়হরের ক্ষেতে ঢেউ উঠছে, একদল টিয়া পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে, বেলা শেষে কিনার আলো নিবু নিবু, পাথরের মত পরিষ্কার আকাশ, তার কোলে কালো মেঘের সরু রেখা। রাজকুমার শিকার শেষে বাড়ী চলেছেন। নদীর ধারে যেখানে গ্রামের পথ আর মাঠের রাস্তা এক হয়েছে সেইখানে দুইজনে আর একবার দেখা হল; বালিকা মাথায় জলের কলসী নিয়ে মাঠ ভেঙে গ্রামে চলেছে, সঙ্গে দুটি চিকন কালো ছানা ভৈঁষ।

অতঃপর অবনীন্দ্রনাথের লেখায় দুটি রীতি চলতে লাগল। একটি রাজকাহিনীর সরলরীতি। আর একটিতে দেখা দিলে ক্ষীরের-পুতুলের রূপকথার রীতি আলপনার চিত্রবিচিত্র জালবুনানি নিয়ে। দ্বিতীয় রীতি শেষ পর্যন্ত চলেছিল। প্রথম রীতি 'পথে-বিপথে'ই পর্যবসিত, তবে শিল্পপ্রবন্ধাবলীতে পুনরুজ্জীবিত। দ্বিতীয় রীতির বিশিষ্টতম রচনা 'ভূতপতরীর দেশ' ও 'খাতাঞ্জির খাতা' (১৯১৫)।

ভারতীর সহকারী সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর বন্ধু প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিশিষ্ট স্টাইলে গল্প-উপন্যাস লিখতেন তা অবনীন্দ্রনাথের রচনারীতিকে অবলম্বন করে উদ্ভূত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এক শ্রেণীর নবীন লেখক এই স্টাইল অবলম্বন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকার' স্টাইলও কোন কোন তরুণ লেখক অবলম্বন করেছিলেন। 'লিপিকা'র কয়েকটি বিশিষ্ট 'কথিকা' প্রথমে প্রবাসী পত্রিকায় বার হয়েছিল।

এ-শতকের বাংলা কবিতা

নিখিলকুমার নন্দী

"No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists." T. S. Eliot.

"The activities of our age are uncertain and multifarious. No single literary, artistic or philosophic tendency predominates." Aldous Huxley.

১

গত ষাট বছরের বাংলা কবিতার মোটামুটি চরিত্রবিচারের কাজে ওপরের দুটি উদ্ধৃতিই খুব প্রয়োজনীয়। একদিকে বুঝতে হবে, উক্ত ষাট বছরের প্রথম চল্লিশ বছরেরও অধিককাল রবীন্দ্রনাথের মত প্রবল প্রতিভার সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে চিহ্নিত, যিনি সূর্যের মত, যিনি বাঙালী কবিসম্প্রদায়ের কাছে একটি অজস্রউৎসসম্ভব ঐতিহ্যের মত। আবার তিনি সহজ সতেজ একটি বৃহৎ বৃক্ষের মত, যার মূল আরো চল্লিশ বছর পূর্বের উনিশ শতকী মাটিতে, যার পল্লবঘন ফুল ও ফল মধ্যবিশ শতকী আকাশে অঞ্জলিবদ্ধ, যদিও 'মাটির পাত্রখানি' ততদিনে ভেঙেচুরে মাটিতেই মিশেছে। তবু তিনি আছেন।

আজকের নাস্তিকদের মধ্যেও কীভাবে কোন্ গুণে সেই আস্তিক মহাপুরুষ সঞ্চারিত হয়েছেন তার বিশ্লেষণই একহিসেবে এই শতকের কবিতার বিশ্লেষণ। অন্যদিকে 'বহু শক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চ'লে গিয়ে স্বল্প শক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন' যে এসেছে, প্রমথ চৌধুরী যার সত্যপরিহাসে-মেশা বীরবলী ইংগিত করেছিলেন তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' প্রবন্ধে, তার হিসেবনিকেশ করলেও এ-শতকের কাব্য-আন্দোলনের চেহারাটা ধরা পড়বে। মনে হয়, প্রখর যুক্তিবাদী মানুষ ব'লেই তিনি বিশ শতকী 'industrialisation'এর spiritকে সেদিনই

নিখুঁত বুঝেছিলেন—কল্পনা ও আবেগ-সর্বস্বতায় যে-সৃষ্টির নির্ভর তাতে একটি মৌলিক ঐক্যভাব সম্ভব, পক্ষান্তরে বাস্তববাদী বিজ্ঞানবাদী মননপন্থায় উক্ত সৃষ্টিকর্মে এক যৌগিক বৈচিত্র্যই প্রত্যাশিত—হাক্‌সলির মন্তব্যের নিহিতার্থে যার আরেক নির্দেশ। কিন্তু এ নিয়ে বাক্যবিস্তার আপাততঃ এ-আলোচনার বহির্ভূত। আবার উল্লিখিত 'স্বল্প শক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকদের' সুবিস্তৃত বিশ্লেষণও স্বল্পাকার এই একটি প্রবন্ধের পক্ষে নিশ্চয়ই দুরাশা ও দুঃসাধ্য। তাই বড় বড় যুগবিভাগের মধ্যে টেনে এনে মোটা তুলির টানে আমাদের এ-শতকী প্রধান কবিদের সঙ্গে অন্তত মুখ-পরিচয়টা যদি সারতে পারি, তাহলে কবিতার দিক্ থেকে সমকাল সম্পর্কে কিছুটা চেনাজানা বুঝি হয়। বহুজনের বহুপ্রকার রস-আবেদনমূলক, রূপকর্মগত আচরণ, প্রয়োগ ও প্রতিপত্তিকে এক লহমায় দেখে নিতে গেলে যে-অসম্পূর্ণতার বোধ স্বতঃসিদ্ধ তাকে এ-প্রসঙ্গে আগেই স্বীকার ক'রে নেওয়া ভাল।

সুতরাং, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের এ-শতকী প্রধান কবিদের সম্পর্ক, এবং তাঁদের পরস্পর-সম্পর্ক ও স্বতন্ত্র কীর্তিকলাপ কেবলমাত্র স্পর্শ করাই আমাদের এখনকার অভিপ্রেত। সুবিধার্থে মোটা তুলির টানে তিনটি কল্পবিভাগ করব: ১৯০১-১৯২০, ১৯২১-১৯৪০, ১৯৪১-১৯৬০। যথাক্রমে নাম দেব: রবীন্দ্রনাথ-আচ্ছন্ন কাল, রবীন্দ্রনাথ-বিচ্ছিন্ন কাল, রবীন্দ্রনাথ-প্রচ্ছন্ন কাল। বলা বাহুল্য, এই যুগবিভাগ কেবল আপাততঃ গ্রাহ্য। কেননা সময়ের হিসাবে ও কাব্যপ্রবণতার নিয়মে প্রতিযুগেই অন্য যুগলক্ষণ অস্পষ্ট নয়; যেমন, প্রথম কল্পে রবীন্দ্র-অনুকারী ও রবিতাপে আচ্ছন্ন কবিদের পাশেই সত্যেন্দ্রনাথ, বিশেষতঃ প্রমথ চৌধুরীর স্বকীয়তা দেখা গেছে, আবার দ্বিতীয় কল্পে রবীন্দ্র-বিচ্ছিন্নতার পাশে পাশে রবীন্দ্র-আচ্ছন্নতা না হোক, রবীন্দ্র-প্রচ্ছন্নতা সমবেগে বয়ে গেছে, তেমনি তৃতীয় কল্পের মূল লক্ষণ রবীন্দ্র-প্রচ্ছন্নতা সত্ত্বেও অন্য চিহ্ন অবর্তমান নয়। তবু এখনকার মত এই গড়পাপ্টা হিসাব না মেনে উপায় নেই। কেননা এমনি একটা ছকে ফেলে তবে আমরা এই বিচিত্র-পরীক্ষা-নিরীক্ষাবহুল ও বিবিধ মননে চিন্তনে জটিল ঘটনা-কণ্টকিত শতাব্দীর কাব্যপ্রয়াসকে একটি প্রবন্ধপরিসরে মাত্র আংশিক অনুধাবনেই সফল হতে পারি। সংকীর্ণ স্থলে অভিষিক্ত করছি ব'লে সব কবিকেই সমান মর্যাদায় ও ব্যাপকভাবে জ্ঞাপিত বা কীর্তিত করা নিশ্চয়ই অসম্ভব। কেউ কেউ যদি অনবধানে বা দূরবীক্ষণী দৃষ্টিপাতের দরুণ বাদ প'ড়ে যান, যেহেতু তা আদৌ আশ্চর্য নয়, তা মার্জনীয় এই কারণে যে সাধারণ বিশ্লেষণে অনুল্লিখিত হলেও বিশেষ মর্জি, ভঙ্গি বা বক্তব্য-বিচারের সুনির্দিষ্ট এলাকায় হয়ত তাঁরা অলঙ্ঘনীয় হবেন।

২

উপর্যুক্ত প্রথম কল্পের এক প্রান্তে 'স্বদেশী' ভাব ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বাঙালিয়ানা, আরেক প্রান্তে বিশ্ব-মহাযুদ্ধের, রাশিয়ায় বলশেভিকবিজয়ের, ভারতে গান্ধীকেন্দ্রিক প্রথম গণ-অভ্যুত্থানের সর্বভারত-ভাবনা ও নিখিল-পৃথিবী-প্রবণতা। কবিতা-চর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই উভয় কোটিতেই প্রবক্তা ও নেতা। তরুণতরদের মধ্যে আদ্য পর্বে 'শুভ উৎসবে'র বলেন্দ্রনাথ (প্রধানত চতুর্দশপদীর লেখক) ও সতীশচন্দ্র রায় প্রধান কবি, অন্ত্যপর্বে সত্যেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। প্রথমোক্ত কবিদ্বয় অবশ্য অকালমৃত্যুতে অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত। তুলনায় সে যুগে তাই দেবেন্দ্র-নাথ সেনের ইন্দ্রিয়াসক্ত গার্হস্থ্য প্রেম ও অক্ষয়কুমার বড়ালের আত্মানুসন্ধান প্রভাবশালী এই অর্থে যে তাঁরা সব সত্ত্বেও অনেকটা রবীন্দ্রব্যতিরেকী, এবং হয়ত সেজন্যেই পরবর্তী কল্পের অন্যতম প্রধান কবি মোহিতলালের প্রেরণাস্থল। দ্বিতীয় দশকের অন্যান্য মুখ্য কবিদের, বিশেষতঃ করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সঙ্গে এঁদের আত্মীয়তাও লক্ষ্যযোগ্য,—অবৃহৎ সুখ-দুঃখ-ভাবনা, প্রকৃতিপ্রীতি, ভক্তিপ্রাণতা (বৈষ্ণবতা) ও এক রকম নির্বিরোধ আত্মমগ্নতায়। শেষ-উনিশশতকী পল্লীকেন্দ্রিক বাঙালী জীবনের চাঞ্চল্যহীনতা প্রথম-বিশশতকী জীবনের অল্পাধিক অকম্পিত ধৈর্যে সংলগ্ন ও সংরক্ষিত হয়েছে এঁদেরই মধ্যস্থতায়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার নিত্য নবীন পরিচিতি ও মহাযুদ্ধ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনযাপনা ও ভাবনার ভঙ্গিতে ক্রমে ক্রমে যে ধাক্কা দিয়েছে তার অনুধাবন ও অনুশীলনে এঁদের অক্ষমতা পরযুগের কবিদের পক্ষে একটি বিশেষ শিক্ষা। এমন কি রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল পরিণতি-সন্ধানও এঁরা জীবনচর্যা ও কাব্যচর্চায় অঙ্গীকার করতে পারেন নি। এ ভাবেই 'নবযুগ' আসে। নইলে এ কল্পের অন্ত্যপর্বের প্রধান কবি, বিশ্বকবিতার স্বাদ-সংগ্রহের ঈর্ষাযোগ্য ভাণ্ডারী, সত্যেন্দ্রনাথও কেন করুণানিধান প্রভৃতির মত রবীন্দ্রনাথের মানসী-চিত্রা-চৈতালি-কল্পনা-ক্ষণিকা-নৈবেদ্য-খেয়া-গীতাঞ্জলিতেই আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন! 'সবুজপত্রের' প্রমথ চৌধুরী-সংস্পর্শ ও 'যৌবনে দাও রাজটিকা'র পৌরোহিত্যে এসেও 'বলাকা'র জীবন-বাসনা ধরতে

পারলেন না। ভাবতে কষ্ট হয়, সে যুগে কেবল বলাকার 'সিঁড়িভাঙা ছন্দ'ই অনুকৃত হ'ল (দ্রষ্টব্য, ডঃ সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ)। অথবা এটাই ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক, বিশেষত যখন ভাবি ললিত কথায়, সহজ ভাবের ও সরল বিষয়ের বিষয়ী যত অনায়াস-সম্ভব, দুর্গম চিন্তা ও দুর্নিরীক্ষ্য দর্শনে সাবলীল সাড়া তত প্রত্যাশিত নয়; তবে আর দুর্গমের মাহাত্ম্য কী, আর সেজন্যে এত তপশ্চর্যাই বা কেন? অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথ দু'একটা বড় জিনিস দিয়ে গেলেন, ছন্দোবৈচিত্র্য বহুকথিত, রাবীন্দ্রিক তত্ত্ববিশ্বাসের বিশ্ববীক্ষা নয়, বাস্তব প্রয়োজনবোধের বিশ্বমুখিতা; শিশুসুলভ কৌতূহলাক্রান্ত হলেও জীবনের ব্যাপকতায় সহজ অবগাহনের উল্লসিত ঈপ্সা। এবং করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, প্রভৃতির আবেগাতিশয়ে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে কিছু 'reason'-এর ছোঁয়া, প্রমথ চৌধুরীতে যা খোঁচা হয়ে দেখা দিল ও বাংলা কাব্যের অস্থিতে রয়ে গেল।

৩

শতকের প্রথম দিকেই পল্লী-জীবনের ঘরভাঙা আরম্ভ হয়েছে, বলেন্দ্রনাথের 'শুভ উৎসবে' সেই উদ্বাস্তুর মর্মব্যথা স্মরণীয়, বিশ শতকের প্রথম পাদেই তার সমূহ সর্বনাশের স্বরূপ নাড়া দিয়ে গেছে সত্যদৃষ্টি-সম্পন্ন চেতনাকে। বিশ্ব-ভূকম্পনের পর সেই নাড়া-খাওয়া চেতনা বাঙালীর কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হ'ল, সে-কণ্ঠ গ্রামবাংলার আত্মমুখী, ভীরু ও উদাসী কণ্ঠ নয়, সাহসী নাগরিকের সমুৎসুক কণ্ঠ. নিরুপায় ও অনর্থক নিসর্গবিলাসী বা ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত নয় সে-উচ্চারণ, সেই স্বরে মোহভঙ্গ আশাভঙ্গের উত্তপ্ত বেদনা আছে; কিন্তু সে-বেদনা বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্বনাগরিকের বেদনা এবং এ-বেদনাই অতঃপর বাংলা কাব্যকে নিয়ন্ত্রিত করবে।

ইংরেজী কাব্যে Bridges-এর Testament of Beauty-র অক্ষয় সৌন্দর্যবাদ ধোঁয়া হয়ে গেল, কালান্তরের উপযুক্ত ভাষ্য হিসেবে এলিঅটের The Waste Land শিরোপা পেল। বাংলা দেশেও বুদ্ধিবাদী প্রমথ চৌধুরী শোনালেন: 'পক্ষে পক্ষে ঘুরে আসে সংশয়-প্রত্যয়'। অতঃপর সেই দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতার প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্যপাঠ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মরীচিকা-মরুমায়া-মরুশিখায়, 'গোবি-সাহারা'র প্রখরপ্রতপ্ত ধূসর বালুরাশির অভিজ্ঞতায়; রাবীন্দ্রিক 'কল্পনা'র 'নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা' তখন কল্পনামাত্র। যতীন্দ্রনাথের 'দুঃখবাদ' তাই এক হিসেবে ঈশ্বর-প্রকৃতি-প্রেম-এর ঐশ্বর্যে-ঘেরা কাল্পনিক মানবতা থেকে নিরাভরণ সর্বস্বহারা রিক্ত দুঃখী বাস্তব মানুষের দিকে বাংলা কবিতার নবপ্রয়াণ। সমকালীন মোহিতলালের 'ভোগবাদ' যেমন উপনিষদ্-আশ্রিত "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ" র রাবীন্দ্রিক মানব ধর্মের বিপরীত, তেমনি রবীন্দ্র-প্রতিক্রিয়া-জাত হওয়া সত্ত্বেও মানুষী আবেদনে তা সে-যুগে, প্রথম কল্পের গোড়ার দিকে (১৯২১-২৭), মূল্যবান্ মনে হয়েছে এ জন্যে যে সূক্ষ্ম মননে-চিন্তনে-দর্শনে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা যুদ্ধক্ষত তখনো বহন করছে। ত্যাগতিতিক্ষার তাত্ত্বিক আদর্শ জানা গেছে, আসলে সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োগে আপ্তবাক্য ছাড়া তা আর কিছু নয়, এবার ভোগাবাসনার পথকেই শেষাবধি খুঁড়ে দেখা যাক, তৃষ্ণানিবৃত্তি আছে কি নেই। Creed হিসেবে দেখলেই তবে এমনি একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন। পাশ্চাত্ত্য কবি Swirnburne প্রভৃতির কাব্যধারানুসরণে ও প্রাচ্য ওমর-খৈয়াম-হাফিজের কল্পনা-ভঙ্গিতে আকৃষ্ট হয়েই মোহিতলাল মূলত এই দেহবাদ দাঁড় করিয়েছেন। সমকালের করতালি তাতে যুক্ত হয়েছে। দেহবাদী মোহিতলালের প্রসঙ্গে গোবিন্দদাসের 'আমি তারে ভালবাসি অস্থি-মাংস সহ' পংক্তিগুলির রেখা কঠিন অস্পষ্টতালেশহীন স্বাভাবিক পেশল কামনার নির্ভীক সম্ভাষণ স্মরণে আসে। তবে নানা কারণে মোহিতলাল যেমন académic ও একটি কালধর্মাশ্রিত আন্দোলনের মুখপাত্র, গোবিন্দদাস তেমনি এ বিষয়ে নিছক স্বতঃস্ফূর্ত ও casual। বরং সুধীরকুমার চৌধুরী সে যুগে আধুনিক জীবনবোধাক্রান্ত প্রত্যক্ষ ও অসাপেক্ষ মানুষী প্রেমকবিতার যে মুখবন্ধ করেছিলেন তার মূল্য, তত্ত্বপ্রতিষ্ঠায় নয়, সত্য-স্বীকৃতিতে সমধিক। আর তাই তিনি যে-বিদ্রোহের বাণীরূপ দিতে চেয়েছেন সেদিন তা হ'ল 'প্রণামের মত'; নজরুল-মোহিতলাল-সুলভ ধিক্কার ও অহমিকায় তা আচ্ছন্ন নয়। সে জন্যেই বুঝি তখনকার কবিযশঃপ্রার্থী তরুণেরা উক্ত কবির বেগবান্ অথচ প্রশান্ত মনস্বিতাকে প্রাণের গভীরে গ্রহণ করেছিলেন। 'প্রকৃতি'কে ত্যাগ ক'রে মানুষের নিতান্ত দেহমনোগত প্রবৃত্তি-প্রকৃতির নিকুণ্ঠ বিবৃতিদানে ও উক্ত বিষয়ানুষঙ্গে কবিতার তার বেদনার্দ্র আবেদনকেই উপভোগ্য ও বিবেচ্য ক'রে তুলতে নজরুল তৎপর ছিলেন। শাশ্বত নিসর্গ-নিবিষ্ট জীবন সম্পর্কে অনাস্থা এনে দিয়ে যুদ্ধ এই একান্ত মানুষী (জৈবও বলা যায়) ক্ষণিক সুখস্পৃহাকেই বাড়িয়ে দিয়ে গেল। পরে যদিও জানা গেল, এ জীবনাচরণেও স্বস্তি নেই, ইন্দ্রিয়জ বাসনার

চরিতার্থতাই পরম শান্তি নয়, কিন্তু ততদিনে আমরা অতৃপ্ত শ্রান্তিতে 'দোলন-চাঁপা'র কবি নজরুল, 'দুঃখবাদী', 'কালোপাহাড়' ও 'মোহমুদ্গরে' মুগ্ধ হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ থেকে বাংলা কবিতার নতুন শক্তিপরীক্ষা এ ভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। প্রমথ চৌধুরী পথনির্দেশ করেছিলেন, সদ্য উল্লিখিত চারজন নেতৃত্ব দিলেন। কয়েকজন অতি তরুণ পাশ্চাত্ত্যকাব্যপ্রবণ যুবক সেই নেতৃত্বে সহজেই সাড়া দিতে অগ্রণী হলেন। দ্বিতীয় কল্পের স্থায়ীতর-প্রভাব-সন্ধানী কাব্য তৈরি হতে আরম্ভ করল। তবে রবীন্দ্রনাথে তাঁদের বিমুখতা ছিল না, তারুণ্যের অত্যুৎসাহে কেবল তাঁর অফুরন্ত জীবনীশক্তি ও নিত্যনতুন আধুনিকতাকে তাঁরা বুঝতে পারেন নি। একটি লৌকিক মানুষজন্মের 'এক অঙ্গে এত রূপ' অতি তরুণ কল্পনায় সঠিক মহত্ত্বে ধরা দিতে পারে না। প্রবীণরাই পারেন নি। আগের যুগে রবীন্দ্রনাথের চিত্রা-কল্পনা-নৈবেদ্য প্রভৃতিতে তাঁদের পূর্বোল্লিখিত আচ্ছন্নতা সেই প্রমাণ। এঁদের রবীন্দ্রবিচ্ছেদও কতকাংশে তাই; অথচ কাব্যানুশীলনে অব্যবসায়ী, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-চিন্তায় ভাবগ্রাহী, রবীন্দ্রনাথেও সমুৎসুক এঁদের আপাত-রবীন্দ্রবিমুখতা নিষ্ফল হয় নি; বরং উত্তরকালীন কাব্য-আন্দোলনের নতুন নতুন পর্যায়ে এঁরাই পাথেয় ও পথনির্দেশ। রবীন্দ্র-বিরাগের যতখানি চিত্র 'কল্লোল' 'প্রগতি' 'কালি-কলমে'র পাতায় সেদিন ধরা পড়েছে ব'লে মনে করা হয় তার সবটাই সত্যচিত্র নয়। আসলে এর অনেকখানি ছিল 'শো': অপরকে ও নিজেকে বোঝানো যে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র নন। তাঁর প্রবলতম শারীরিক-মানসিক সমুপস্থিতির মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য চিন্তাব্যতিক্রম ফলিয়ে তুলতে একটা রাজকীয় পোশাকের প্রয়োজন। রবীন্দ্র-বিমুখতা সেই পোশাক। বড় গাছকে ঠেকা দিতে যে বড় ঠেকোর প্রয়োজন সে হয়ত ওই গাছেরই একটি ডাল কেটে বানানো। তা বুঝেছিলেন ব'লেই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই রবিদ্রোহিতায় সস্মিত অংশ গ্রহণে কার্পণ্য করেন নি। 'শেষের কবিতা'র অমিত তার অন্যতম পরোক্ষ নিদর্শন। তখন একদিকে ছিল যেমন রবীন্দ্রনাথকে সদম্ভে এড়িয়ে যাওয়ার মুখর বাসনা, অন্যদিকে ছিল তেমনি তাঁকে গভীরে স্বীকার ক'রে জীবনবোধের দিগন্তকে প্রসারিত করার নীরব সাধনাসিদ্ধি; পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-বাহিত নিত্যনবীন চিন্তাধারাকে তাঁরই ভাবে-ভাষায় সঞ্চারিত ও সঞ্জীবিত করা আপন জীবনের প্রস্তুতি-প্রয়াসে, প্রয়োগনীতিতে, বৈদগ্ধ্যে ও পরাক্রমে, এক কথায় আত্মসন্ধানী স্বাতন্ত্র্যে। রবীন্দ্রনাথ ধমনীতে আছেন, তিনি ছাড়া বৃহৎ বিশ্ব স্নায়ুতে সক্রিয় হোক। উদ্যমে রবীন্দ্রনাথ ও কবি স্বয়ং, উদ্যোগে ও প্রেরণায় আর-সবাই। এটুকু মেনে নেবার পর জানতে দোষ নেই যে কবি হিসেবে প্রধানতঃ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসুই প্রত্যক্ষ রবি-দ্রোহিতায় বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন এই কল্পের প্রথম দিকে; মধ্য ও শেষদিকে যেমন বিষ্ণু দে ও সমর সেন। প্রধানত কবি না হলেও এ-পথে কবিপক্ষে যুগধর্মোচিত বিচার ও যুক্তির সুস্পষ্ট ঘোষণা পাই অন্নদাশঙ্কর রায়ে (দ্রষ্টব্য, মনে মনে—কালিকলম ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৩৫): '…হঠাৎ যেন Inferno-র পর্দা খুলে গেছে, আমরা দেখছি এই পৃথিবীটাই যে Inferno এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের চোখে পড়ে নি, আমরাই কলম্বসের মত আবিষ্কার করলুম, সত্যের সঙ্গে সুন্দরের যে কত ব্যবধান তা আমরা যেমন বুঝি তাঁরা কি তেমন বুঝতেন?…উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার জগৎ থেকে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) আমাদের জগতে উড়ে এসেছিলেন, তাঁর বার্তা উপনিষদের বার্তার মত অসহ্য আনন্দের বার্তা, সে-বার্তা যখন শুনি তখন মনে হয় না যে, শহরে শহরে slum আছে, গ্রামে গ্রামে শ্মশান, ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব আছে, দেশে দেশে যুদ্ধ।…'

এই রাবীন্দ্রিক 'অসহ্য আনন্দের বার্তা' যুদ্ধোত্তর মানসিক অবসাদে, ভারসাম্যহীন সামাজিক অপচয়ে, অর্থনৈতিক বাজার-মন্দায় ও মধ্যবিত্ত জীবনের বহুবিধ সংকটে, বিশেষত বেকারসমস্যায় কৃতবিদ্যের লাঞ্ছনায় ও স্ববিরোধে কণ্টকিত উৎপীড়িত সংশয়িত নাগরিক প্রাণে স্বতই আর সাড়া জাগাতে অক্ষম হ'ল। জীবনযাত্রার সুর ছিঁড়ে গেছে, মান নেমে গেছে; অথচ জীবনপিপাসা সে-তুলনায় ঊর্ধ্বগতি। মোহিতলাল বা নজরুলের ভোগবাদ সেদিক্ থেকে উল্লেখযোগ্য সমকালীন লক্ষণ, যদিচ মোহিতলালে ব্যাপারটা বহুদূর শিক্ষাগত, নজরুলে যা আগাগোড়া জীবনাচরণগত, পরবর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্রে আবার সেই 'পেগানিজম্' অনেকটাই বীক্ষাগত। নজরুলের উচ্ছ্বসিত আবেগপন্থা এবং যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের সংযত যুক্তিপন্থা প্রেমেন্দ্রে এসে প্রথম সত্যকার 'আধুনিক' ফসল ফলালো। অথচ প্রেমেন্দ্র মিত্র দ্বিতীয় কল্পকক্ষের আধুনিকতায় পুরোহিত হয়েও রবীন্দ্রনাথে অবিমুখ। তার কারণ হয়ত তাঁর বোধশক্তির প্রবীণতা, যা তাঁকে সমকালীনদের মধ্যে বিশিষ্ট ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে ও অতিতরুণদের নেতৃত্ব (বুদ্ধদেব বসুও তা স্বীকার করেছেন তাঁর অধুনালুপ্ত ১৯৩২-এর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', ১ম সংস্করণে ছাপা 'দুইজন আধুনিক কবি' প্রবন্ধে)। ভাবধর্মে তিনি চরম বিপ্লব তখনই ঘটালেন, সেই 'প্রথমা'র যুগে, যখন একই পানপাত্রে

তিনি ভারতীয় ঋষির ভূমাদর্শ ও পাশ্চাত্ত্য মনীষীর বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বিশেষত মার্ক্স্‌বাদ, সমান আগ্রহে গ্রহণ করলেন। চরমপন্থী না হয়েই অবিমিশ্র মানবপ্রস্থানে কাব্যের স্পষ্টতর জড়তাহীন নবীনযাত্রা স্পন্দিত ও ছন্দিত করলেন। তাঁর প্রসঙ্গে তখনকার সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতটি অন্নদাশঙ্করের এই পংক্তিটিতে হুবহু মেলে: 'প্রকৃতি ভুলায়েছিল, মানব ভুলালো।' এই সূত্রে লক্ষণীয় যে 'তাঁর কল্পনা সংসারের তুচ্ছ খুঁটিনাটি থেকে মানুষের ভাগ্য-বিধাতার চরণপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত; পুরোনো খবরের কাগজ, ভাড়াটে বাড়ী থেকে আরম্ভ ক'রে সীমাহীন আকাশে ঘূর্ণ্যমান গ্রহ-উপগ্রহ পর্যন্ত তার গতিবিধি।' (বুদ্ধদেব বসুর পূর্বোক্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য।)—সারাংশে সামান্য মানুষ ও অসামান্য মানবনিয়তিই তাঁর মূলপাঠ্য। প্রাচীন ভঙ্গিতে প্রকৃতি-রসস্বরূপ-নিরীক্ষা তাঁর কাব্যে প্রথমাবধি তাই অদৃশ্য, অন্ততপক্ষে অশরীরী। রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতিভুঞ্জনের চরম ক'রে ছেড়েছেন, তা তিনি নিজেও বুঝতেন। 'জন্মদিনে'র সেই বহুশ্রুত কবিতায় তার সম্যক্ বিশ্লেষণ আছে। অধিকন্তু পাওয়া যাচ্ছে তাঁর মানবজিজ্ঞাসা-সম্পর্কিত নিজস্ব অসম্পূর্ণতার সেই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি (সবচেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে, ইত্যাদি), যা পরবর্তীদের পটভূমি।

'জীবনযাত্রার বেড়া' যাঁদের পক্ষে বাধা হয় নি তাঁরা সহজেই সে-পথে তাই অনেকদূর এসেছেন। প্রথম তূর্য বেজেছিল প্রেমেন্দ্রের ছুতোর-কামার-কুলি-মজুরের চারণ গান, পাঁওদলের পঙ্কলগ্ন পদশব্দে, জনতার কলরবে; তারপর ব্যক্তির সাম্রাজ্যঘোষণায়, 'নীলকণ্ঠে'র 'সিংহহিংস্র' মৃত্যুপণ আত্মসমীক্ষায়। আরও পরে স্বদেশের ভৌগোলিক ও আধ্যাত্মিক স্বগত অভিনিবেশে একে একে বাঙালী মধ্যবিত্তের মননে-চিন্তনে সূর্যরশ্মিসম্পাত ঘটিয়েছেন তিনি। নজরুলের রণদামামা অনেক আগেই থেমে গেছে। তা আজ স্মৃতিমাত্র। প্রেমেন্দ্রের Democracyও আজ তাঁর ও অন্যান্য কবিদের আত্মস্বরূপ-উন্মোচনী মুহুর্মুহু নিদাদ-ঝঙ্কারে প্রহত। তাতে আমাদের লাভই হয়েছে। 'জনৈক' (ফেরারী ফৌজ) যেখানে অসম্পূর্ণ অবহেলিত খণ্ডিত, জনতা (কাঠের সিঁড়ি-সম্রাট্) সেখানে শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্রের ছবি ও খবর ছাড়া আর কী। তাই ব্যক্তির গৌরবসন্ধান ও ব্যক্তিত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠাই আজ কবিকৃত্য। প্রেমেন্দ্র সেখানকার অক্লান্তকর্মী।

উক্ত কবির আযৌবন প্রবীণতার অভিজ্ঞান তাঁর বহুকথিত 'প্রজ্ঞা' হতে পারে, অন্য কথায় তাঁর সুবিচিত্র অভিজ্ঞতাও; কিন্তু আমাদের কাছে আজ কবির যা প্রধান আকর্ষণ তা হল তাঁর নির্বিকল্প সত্যসন্ধানী মানব-মুখিতা, ও তত্ত্বলেশহীন বাস্তববাদী এক অভিনব আধ্যাত্মিকতা। সহজসাধন ও বৈষ্ণবকবিতার দেশে রাবীন্দ্রিক কালে লালিত এই রক্তাক্ত কবিচিত্ত আজন্ম নিগূঢ়তত্ত্ববাদী ও অন্তরঙ্গ স্বরূপসন্ধানী। পাশাপাশি সমকালীন বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যে পাওয়া যাবে বহিরঙ্গ রূপনির্মাণ ও রূপজিজ্ঞাসায় দুর্মর আসক্তি, যা কখনো কখনো (বিশেষত বুদ্ধদের কঙ্কাবতী ও নতুন পাতায়) প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের ইন্দ্রিয়পরতাকে স্মরণ করায়। 'ভারতী'র কবিগোষ্ঠীও ইন্দ্রিয়পরবশ ছিলেন—কেবল সত্যেন্দ্রনাথ নন, শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথও 'আলোর ফুলকি' ইত্যাদিতে ইন্দ্রিয়াসক্তি-সিক্ত আশ্চর্য 'তুলির লিখন' লিখেছিলেন। গদ্যের ঠাটে লেখা হলেও সেগুলি মৌলিক মনোহর কবিতাই এবং সেখানে ইন্দ্রিয়জ উপভোগের ওপারে জীবনের নিগূঢ়ার্থ সন্ধানে মন বারবার ডুবে যায়। যেমন 'বিচিত্রা'র ছন্দোবদ্ধ টুকরিগুলি থেকে 'অলকানন্দা' গান পর্যন্ত নিশিকান্তের জমকালো ও চরম ইন্দ্রিয়বিলাসিতায়ও অতীন্দ্রিয়তার, এবং অন্ত্যপর্বে স্পষ্টত সাম্প্রদায়িক আধ্যাত্মিকতার আভা লেগেছিল। কিন্তু এখানে কেবল ইন্দ্রিয়পারবশ্যই নয়, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বহির্মুখিতাও এসেছে যা 'ভারতী' 'বিচিত্রা'র কথঞ্চিৎ ইঙ্গিত থাকলেও শেষ পর্যন্ত অনায়ত্ত। সর্বব্যাপী মানসিক প্রস্তুতি শাণিত ফলার মত টান টান হয়ে উঠতে আরো কিছুকাল কেটে যেতে দিল। অতঃপর এল নতুন পর্ব, যে অধ্যায়ের অন্যতম লক্ষণ ছিল বোহেমিয়ানিজ্‌ম্। কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের থেকে এই হাওয়াবদল এসেছিল প্রধানত গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে; হ্যুট হামসুন, যোহান বোয়ার, প্রভৃতির নাম বিশেষত প্রাসঙ্গিক আরো এজন্যে যে অচিন্ত্যর 'বেদে' গল্পগুচ্ছে তাঁদেরই প্রথম উপযুক্ত প্রতিরূপ ধরা পড়ল। তাঁর সেকালের কবিতায়ও ('অমাবস্যা' 'প্রিয়া ও পৃথিবী' দ্রষ্টব্য) সেই 'উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা'ময় জীবনের ভোগবাদ স্বাক্ষরিত। রবীন্দ্রনাথের 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন'এর কল্পনাবিলাস বা নজরুলের অনুরূপ এক বা একাধিক পংক্তির প্রোজ্জ্বল প্রাণোল্লাস থেকেও এই মূলত মননস্পৃহাগত কাব্যচর্চা অনেক দূরে বাহিত। 'ভারতী' 'বিচিত্রা' প্রসঙ্গে বলেছি, নজরুল সম্পর্কেও বলব, কেবল ঐন্দ্রিয়িক বা ধমনীশিরার ক্ষণসুখ-উল্লসিত উত্তেজনায় নয়, স্থায়িত্বশীল স্নায়বিক প্রয়োজনবোধে ও মানসিক তাড়নাতেই উক্ত কবিপ্রবৃত্তির জন্ম। এবং এই অন্তর্থক চেতনার সংক্রামেই ক্রমাগত কাব্যান্দোলনে তার ভূমিকা সাময়িক অথচ অলঙ্ঘনীয় হয়ে উঠল। কবিজীবনে সাহসিক পদক্ষেপ হিসেবেও, তথা ঐতিহাসিক

বিচারে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পরিণামে বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য দুজনেই রবীন্দ্রনাথে অবসিত, কিন্তু বুদ্ধদেবের সুবিশিষ্ট কবিক্ষমতা (কবিতারচনাগত বহুবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা ছাড়াও যা অন্যত্র প্রতিবিম্বিত, যেমন তাঁর দুরন্ত বিদেশী কাব্য-প্রবণতা ; প্রকৃতপক্ষে তা এতদূর বিস্তৃত যে রবীন্দ্রদর্শনের আনন্দবাদে আজন্মদীক্ষিত হওয়ার পর তিনি আজও বোদলেয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য লেখকদের পাপচেতনায় সমুৎসুক, তাঁর সাম্প্রতিকতর ভাববিষয় ও বাগ্বিধিতে যার ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়), তাঁর কিছু প্রেমের কবিতায় বক্তব্যের দিকে ধরা পড়েছে, তাঁর আগে এভাবে নিছক শরীরী প্রেমের কবিতা কেউ লেখেন নি, প্রণয়িনীর স্বাদে-গন্ধে-উত্তাপে-স্থস্পর্শে যা উন্মাদের মত তন্ময়। যদিচ কিশোরসুলভ আবেগে ও আবেদনে তা অপরিণত, তবু বলব, সোজাসুজি ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে এত স্পষ্ট ব্যঞ্জনার বিহ্বল ও বিমুগ্ধ কবিতা সেকালে খুবই কম চোখে পড়েছে। তাঁর সমকালীন কবিবন্ধু অজিত দত্তের প্রথম যুগীয় কয়েকটি নিটোল সনেটে, (দ্রষ্টব্য 'কুসুমের মাস') এমনি ঘনিষ্ঠ-মধুর যৌবনারম্ভের প্রেম আলোছায়া সাজিয়েছে—বুদ্ধদেবের অস্থিরতা ও উচ্চতার বিপরীত সেখানে শান্ত শীতলতার রাজত্ব। বলা দরকার, উভয় কবিই শীতলস্বভাব, তবে বুদ্ধদেব যখন ব্যাকুল ও উতল, অজিত তখন নম্র ও স্নিগ্ধ। যে জাতীয় প্রেমকবিতার উল্লেখ এইমাত্র করেছি তার সূচনা নজরুলে ছিল ; কিন্তু যেহেতু তাঁর মার্জনা বা পরিণতি ছিল না, সহজ স্ফূর্তিই যেখানকার প্রধান বিবেচ্য, দূরপ্রসারী আন্দোলনে নায়ক হওয়া সেখানে দুরূহ। নজরুল সে নায়ক নন, তবে অন্তত প্রেমের বা ইন্দ্রিয়সুখের কবিতায় 'কণিকা' বা 'কাজরীপঞ্চাশতে'র (সত্যেন্দ্রনাথ) conceit থেকে (পূর্বোল্লিখিত বুদ্ধদেবের আলোচনা দ্রষ্টব্য) নজরুল যে অনেক বেশি সময়োচিত তাৎপর্য্য ও অর্থময়তার কবি তা আজ আর অস্বীকার্য নয়। কেবল সহজাত কবিপ্রতিভায় অনাস্থা থাকায় বুদ্ধদেবে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'ই সক্রিয় ; সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ। এবং প্রেমেন্দ্রের মত বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'য় যাত্রারম্ভ করতে পারেন নি অথবা সুধীন্দ্রনাথের মত 'পূরবী' ও 'মহুয়া'য়। 'সবুজের অভিযান' প্রেমেন্দ্রকেই বিশেষ ভাবিয়েছে, অন্তত সামাজিক 'বিধিবিধান যাচায়' তাঁর অগাধ আগ্রহ ও অবাধ প্রচেষ্টা সেই সূত্রে কিয়দ্দূর অনুধাবনাযোগ্য। 'অন্য কোনখানে' আহ্বানের প্রতিক্রিয়া সাধনাও ছিল।

মধ্যবিত্ত তরুণ মননে আশু-অবলম্বনযোগ্য তেমন উত্তেজক কিছু না থাকায় একালের কবিতায় নৈরাজ্যের তিক্ততা, আশাভঙ্গের অবসাদ ও আত্মকণ্ডূয়নের অস্বস্তি বারবার দেখা গেছে। তবে ভরসা এই, ভারতীয় ও বাঙালী জীবনচর্য্যার সুপ্রাচীন ইতিহাস কোন না কোন ভাবে কবিদের আশ্রয় দিয়েছে, বৃহৎ বিশ্বচিন্তাপ্রেক্ষিতকেও যে তাঁরা ক্রমশঃ কাজে লাগাবার মত প্রস্তুত হয়েছিলেন, এ-প্রতিপত্তিও স-রবীন্দ্রনাথ তাঁদের। জীবনানন্দ দাশে এর সম্যক্ চেহারাটা আদ্যন্ত চোখে পড়ে। শুরু থেকেই এক আশ্চর্য সূক্ষ্ম, প্রায় অননুভূতপূর্ব ও দুরুচ্চার্য নিখিল বিরহবেদনার কবি তিনি, বাংলাদেশে যাঁর পূর্বসূরী বিরল। অথচ উপনিষদের আবহাওয়ায় তিনি মানুষ, রবীন্দ্রনাথের প্রতি স্পষ্ট কোন বিমুখতাও তাঁর কাব্যে কখনো ছায়া ফেলে নি। গোড়া থেকেই তিনি দূরের—আমাদের অতি-অভ্যস্ত সব অভিজ্ঞতার ওপারের, অস্বচ্ছ অথচ সমুপস্থিত কোন কঠোর 'বোধে' ভারাক্রান্ত এবং আচ্ছন্ন। মানুষের ইতিহাসে যন্ত্রণা অবক্ষয় নশ্বরতার পৌনঃপুনিকতা পাঠ করেছেন, সভ্যতার নামে চরম বর্বরতার ছবি দেখেছেন, প্রেমের ভানে অপ্রেমের, সমাজহিতের ছদ্মবেশে স্বার্থসিদ্ধির। এবং তাঁর এ বেদনাবোধ এমনই নির্মম শূলাহতের বেদনাবোধ যে বাংলা কাব্যে এমন 'গভীর-গভীরতর' আত্মিক যন্ত্রণাচিত্রের শিল্পী অদ্যাবধি দ্বিতীয়রহিত। তাঁর পরিণত বয়সের কবিতায়ও তাই আশা-আলো-আনন্দের ছবি যেখানে পরিষ্কার ফুটেছে, আত্ম-যন্ত্রণাক্ষতের চিহ্ন সেখানেও লুপ্ত হতে দেখা যায় নি। এবং এ অবস্থায় তাঁর কাব্যে যদি কোন ফুলের নামগন্ধ না মেলে, ডঃ সুকুমার সেন যা ইঙ্গিত করেছেন, অনুযোগ করব কী ভাবে। পৃথিবীর 'কঠিন-কঠিন অসুখ' জেনেও ত এ-কবি বলে যেতে পেরেছেন 'মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে' এবং দুর্মর প্রাণশক্তির গুণে কঠিন জীবনের শেষে নিবিড় অন্ধকারেও বিদ্যুচ্চমকের মত 'চন্দ্রমল্লিকার রাত ভালো' বলতে পেরেছিলেন, কিছুক্ষণের জন্যেও অন্তত, হোক objective ভঙ্গিতে, ফুলের ও আলোর উৎসবে জাগতে চেয়েছিলেন। সময়ের দিকে চেয়ে, স্মরণ করি, কত অসহায় ক্ষোভ ও অনিবার্য দুঃখক্লিষ্টতার ভারে আক্রান্ত হয়ে সেদিন তিনি বলেছিলেন : 'আমরা যে তিমিরবিনাশী হতে চাই !' এই অব্যর্থ কালচেতনার ধারায় বর্তমানকে চিনে ও জেনে তাই স্পষ্টত বুঝি যে জীবনানন্দ এই দ্বিতীয় কল্পের একটি আজন্মবিচিত্র দুঃখবোধলাঞ্ছিত নিয়তপরিণতিপ্রবণ দুর্দান্ত কবিপ্রতিভা যার নীড়ে পরবর্তী-পরবর্তী কবিশাবকদের জন্যে প্রয়োজনীয় শীতোত্তাপের অনেক সঞ্চয়।

আজ বিশ-শতকী এক প্রধান বিশ্বসাহিত্যিকের কলমে Suicide-এর দর্শন সুনিপুণ বিশ্লেষণে বলয়িত হয়ে

উঠেছে ; তার অন্তত দশ বছর আগে, তারও 'আট বছর আগের একদিন' উপলক্ষকে জীবনানন্দ আত্মহত্যার অন্ধকার পটভূমি হিসেবে 'বিপন্ন বিস্ময়ে'র পাণ্ডুর ও স্ফুরিত ওষ্ঠাধর চিত্রিত করেছিলেন। আমাদের কাছে সে অভিজ্ঞতা মৃত্যুচিন্তায় বিজড়িত নবজন্মেরই অভিজ্ঞতা। অনুধাবন করি তাকে।

চার ধার থেকে মার খেতে খেতে মরণটাকেই সত্য ব'লে আঁকড়ে ধরা—এই এ-কালের কবিনিয়তি। 'মরতে মরতে মরণটারে শেষ ক'রে দে একেবারে'—রাবীন্দ্রিক এ-গীতসুধা আজ আর তাই হয়ত ততখানি মাতায় না উত্তরসূরীকে, যতখানি মাতায় জীবনানন্দের মরণাস্তিক 'শাশ্বত রাত্রি', প্রেমেন্দ্রর 'নীলকণ্ঠ', সুধীন্দ্রনাথের 'নিখিল নাস্তির মৌন', বৈদেশিক কামুর Philosophy of Suicide।

অন্ধ হলে সত্যি প্রলয় বন্ধ থাকে না। ধর্মের নামে, প্রকৃতির নামে, সর্বশেষে বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতার নামে অনেক 'আত্মরতি' হয়েছে, তাতে নিরবধি আনন্দসুধাপান ত দূরের কথা, মাত্র একটি জন্মেও সে-সৌভাগ্য, যদি তা সৌভাগ্য হয়, অনেকে বহন ও রক্ষা ক'রে যেতে পারেন নি, এমনকি রবীন্দ্রনাথও না ; গভীর নীতিজ্ঞান থেকে যিনি একদা বলেছিলেন : 'মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ'। 'পারের খেয়ায় ভাষাহীন শেষের উৎসবে' যাওয়ার প্রাক্কালে স্বয়ং তাঁর শেষ বিশ্বসম্ভাষণ কী ?

> তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'
> বিচিত্র ছলনাজালে,
> হে ছলনাময়ী।
> মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
> সরল জীবনে।
> এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্বেরে করেছ চিহ্নিত,
> তার তরে রাখো নি গোপন রাত্রি।
> তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
> যে পথ দেখায়
> সে যে তার অন্তরের পথ,
> সে যে চিরস্বচ্ছ,
> সহজ বিশ্বাসে সে যে
> করে তারে সমুজ্জ্বল।

'পূরবী'র 'সাবিত্রী' বসুন্ধরা চাপা পড়েছেন 'পত্রপুটের' কোমলে-কঠোরে 'উদাসীন' পৃথিবীর কঠিন শিলাতলে, 'সে যে আজ বহুদিন হল' ; অবশেষে 'সভ্যতার সঙ্কটে'র ছায়াচ্ছন্ন অন্তিম প্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল 'ছলনাময়ী'র ছবি ! 'সরল জীবনে' 'সহজবিশ্বাসী' মহাকবির এই রিক্তপ্রায় পরিণতি বস্তুত বিশ শতকেরই এতাবৎকালীন সর্বনাশা পরিণতি।

উদ্ধৃত ছত্রে-ছত্রে শব্দগুলি যেন একেকটি অব্যর্থ সত্যোচ্চারণ। প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্প্রতিক কালে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে কবিবিবেচনার যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে সম্যক্ বিশ্লেষণ করলেই এর অমোঘ নিরিখ ধরা পড়বে। অন্যান্য দেশের কথা আপাতত থাক। বাংলাদেশেই উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চিন্তাশীল মানুষের ভাব ও কর্মজগতের আশ্রয় ও অবলম্বন হিসেবে ক্রমান্বয়ে ধর্ম, দেশহিত, প্রকৃতিপ্রীতি ও মানবপ্রেম পরস্পর যুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে চলাচল করেছে। কবিবিবেকেও 'সাড়া তার জেগেছে তখনি'। কিন্তু তাতে মানুষের মানসিক যন্ত্রণাবোধ ও ক্লিষ্টতার ইতিহাসই সুবিস্তৃত হয়েছে। দেখা গেছে, ধর্মের নামে প্রতিমা-পূজা অথবা ব্রহ্মবাদ উভয়ই মানুষকে বিভ্রান্ত, ভাববিভোর ও অর্ধোন্মাদ করেছে, দেশহিতের নামে সহিংস সন্ত্রাসবাদ অথবা অহিংস অসহযোগ রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে মামলা হানে, প্রকৃতিপ্রীতির ছদ্মবেশে নিষ্প্রাণ পল্লীপ্রবণতা অলস কল্পনার হাস্যকর বিলসন হয়ে ওঠে, চর্বিত-চর্বণের অভ্যাসে রাবীন্দ্রিক কল্পনার মহত্ত্বকেও অর্থহীন পুনরাবৃত্তির তুচ্ছতায় নেমে আসতে হয়। তাঁর মাত্রাজ্ঞান কেবল তাঁকেই বাঁচিয়েছে—যথাসময়ে 'পুনশ্চ' দিয়ে নবস্বরে নতুন ছিন্নপত্রকাব্য শুরু করেছিলেন, মৃত পল্লীর পদ্মাস্মৃতিসার শিলাইদহ পর্বের পুনর্লিখন না ক'রে সজীব শান্তিনিকেতনের সমীপবর্তী 'কোপাই'-চিত্রণে উদ্যোগী হয়ে ; অবশ্য এ-কল্পের একটি দুর্লভ পল্লীকাব্য-উদ্যমের চারুচিত্র পাই জসিম উদ্দীনে 'পূর্ববঙ্গগীতিকা'র শেষতম ও সার্থকতম উত্তরসাধক, যাঁর সহজাত কবিক্ষমতাকে ভর ক'রে দূরস্মৃতির সলিলসমাধি থেকে উঠে এসে পদ্মার নতুন চর তার লাবণ্যময় সত্য স্বাস্থ্যে আমাদের সঙ্গে বুঝি তার দুরূহ সাক্ষাৎ-সম্ভাবনার শেষ

স্বাক্ষর রেখে গেছে : 'কাল সে আসিবে মুখখানি তার নতুন চরের মতো'; প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, চতুর্থ দশকের শেষে, পূর্বাঞ্চলের অশোকবিজয় রাহার শ্রীহট্টের পাহাড়ী মেঘ, আগুন-রঙা মেয়ে ও নদী কয়েকটি চিত্রল নক্সায় আরো আশ্চর্যরূপে ধরা দিয়েছিল, আর মানবপ্রেমের নামে একদিকে নবভাবের 'কিশোরীভজন' (নেহাতই স্বকীয়া—পরকীয়ার দুঃসাহসিকতা ত নেই-ই, এমনকি রবীন্দ্রনাথ-ভাবিত স্বকীয়া-পরকীয়ার সৎসাহসিকতাও না,—আধুনিক 'বিবাহের চেয়ে বড়' ভাবতান্ত্রিকরাই তা পারেন নি, অন্যেপরে কা কথা,—দ্রষ্টব্য, দিলীপ রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি—ডঃ সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ) ও অন্যদিকে মহামানবদের পাদপদ্মপূজা ও নরনারায়ণী নামকীর্তন। এতে প্রকৃত বুদ্ধিজীবী ও মুক্তমনা মানুষ কোথায় পৌঁছতে পারে! নিরাশ্রয় যুক্তিবাদ যদিচ ঈশ্বর ও ধর্ম, দেশহিত বা নিসর্গের ভাববিলাস ছাড়তে পারে, স্পর্শ-দর্শগণ্য মানুষকে ত পারে না। উক্ত মানুষ নিয়েই তার নব-পথাতিবাহন আরব্ধ হল। প্রত্যক্ষ যুগের পরিচিত 'বিড়ম্বিত' মানুষকে নিয়ে। কল্পিত, পরিকল্পিত 'আমি' বাস্তব 'আমি'কে পথ ক'রে দিল। এখন কেবল নব্য বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি তার সহায় ও পাথেয়।

কিন্তু নবীন বিজ্ঞান যার উপায়, সেই মানুষ ত নবীন নয়। সে হল 'প্রবীণ' ও 'পরম-পাকা'। ঝিমাতে-ঝিমাতেও আদিম স্বার্থসিদ্ধি ও প্রাচীন আত্মমগ্নতার অভিশাপে বিচলিত, বিব্রত, বিকৃত। তাই একটি মহাযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ সরাতে-না-সরাতেই আরেক মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি সমাধা হল 'কাঁচা' বিজ্ঞানের পাপবিদ্ধ ব্যবহারে। কবি-চিত্তের অন্তিম ভরসাও ধুলোয় গড়াল। সামগ্রিক মানবকল্যাণে বিজ্ঞানশক্তি মুক্তহস্ত হ'ল না, কবিরা যা আশা করেন, সভ্যতার ক্ষয়কাজে ও মানুষের বিনাশে তাকে বাঁধা হল। এর পর কবিকণ্ঠে যদি কর্কশ আর্তনাদ বেরোয় তা আমাদের কান পেতে শুনতেই হবে :

বুক যার অন্ধকার চোখে তার এ-আলো নেভাও।
উদ্ভাসিত চেতনার অলীক এ-বিভ্রম ঘুচায়ে
ডোবাও আদিম পঙ্কে,
নখদন্ত-আস্ফালিত
তামসিক জীবনের রুধিরাক্ত গহন প্রবাহে।
(প্রেমেন্দ্র মিত্র)

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মত।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতি বৈতানিক,
বস্তুতঃ কাপড় পরে লজ্জাবশত।
(জীবনানন্দ দাশ)

চারিদিকেই পোড়ো জমি, ফাঁকা মানুষ,
শান্তি শুধু গ্রন্থাগারের অন্ধকারে।
শিথিল স্নায়ু শীতল শিরা রক্তহীন
উচ্চচূড় আলস্যের অকালজরা
ব্যর্থতায় তিক্ততায় নিত্য মরা—
হায়রে ভীরু শুভ্র কামে শৃঙ্খলিত!
(বুদ্ধদেব বসু)

নিয়ে যাও তোমার আকাশ, দেবতা,
তারার জ্যোৎস্নায়
করো না আর সুদূরের ইসারা,
মাটির গন্ধ আমাদের রক্তে
দেহে বিসর্পিত শুধু কবরের অন্ধকার।
(সঞ্জয় ভট্টাচার্য)

আমার কাজই হল দিন আনা, দিন গুনে' যাওয়া,
সোনা সোনা গান ভানা, সাইরেনের গান শুনে যাওয়া,
আমার অনেকদিন হাতে হাতে দিন গুনে' যাওয়া,
প্রাণভরে' গান করে' অনশনে গান শুনে' যাওয়া,
সৃষ্টিময় জীবনের সুর্যে সুর্যে পদ্মাক্রান্ত গান। (বিষ্ণু দে)

অংশবিশেষে নয়, সুধীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন জুড়েই শতাব্দীর এই 'ক্রন্দনরোল' ধ্বনিত, তাঁর সমগ্র কাব্য জুড়েই 'সৃষ্টিময় জীবনের স্বর্গে স্বর্গে পরাক্রান্ত গান'। যুক্তি ও বিজ্ঞানে অনমনীয় আস্থা ছিল তাঁর, পরিণামে বিজ্ঞানের হঠকারিতায় তাই তাঁর আবেগভারাক্রান্ত হতাশ্বাস যেন এমনি : Et tu, Brute ? Then fall, Caesar ! সুধীন্দ্রনাথের নিখিলচেতনা, আত্মবিশ্লেষণ ও জীবনজিজ্ঞাসা যেমন অতিশয় প্রবল ছিল, তাঁর নৈরাশ্য ও বৈকল্যচিন্তা, মহতী বিনষ্টির নিশ্চয়তাবোধ ছিল ততই প্রখর ও অনায়াস। তাঁর নিজস্ব বোধপরিণতির গণনায় তাই শতকীয় যন্ত্রণাবোধের প্রতিচ্ছবি ধাপে ধাপে পরিণামপ্রাপ্ত। '৩০-'৪০-এর উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসের অবশ্যম্ভাবী রিক্ততা-বোধ, মৃত্যু-নিশ্চয় শূন্যতা ও বিষণ্ণতার জ্ঞানে তাঁর ধ্রুপদী ছন্দোবন্ধে কেলাসিত হয়েছে :

ধূমায়িত রিক্ত মাঠ, গিরিতট হেমন্ত লোহিত'
তরুণতরুণীশূন্য বনবীথি চ্যুতপত্রে ঢাকা,
শৈবালিত স্তব্ধ হ্রদ, নিশাক্রান্ত বিষণ্ণ বলাকা
ম্লান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহিত।

এই 'অকস্মাৎ'-এর ক্ষণিক ভার যথাসময়ে চিরকালের কঠোর ইতিহাস হয়ে দেখা দিল :

মনেরে বুঝায়ে বলি মৃত্যুমাত্র নিশ্চিত ভুবনে,
গ্রহ, তারা, নীহারিকা ধায় নিত্য বিয়োগের পথে।

ইতিমধ্যে ঈশ্বর প্রকৃতি ও প্রেমের প্রসঙ্গে যাবতীয় প্রাচীন মূল্যবোধ ভেঙেচুরে তচনচ হয়ে গেছে। যেমন ঈশ্বরকল্পনার অনৌচিত্যে তাঁর উক্তির ক্রমবিকাশ :

হায়, ভগবান,
হায়, হায়, ব্যর্থ ভগবান,
হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
প্রতিজ্ঞাবিস্মৃত কল্কি কিংবদন্তী শিবের ত্রিশূল
শূন্যকুম্ভ পুরাণ, সংহিতা।

এই অংশে বিশেষ লক্ষণীয় হল, ঈশ্বরে যে শুধু সৃষ্টিতে অনিপুণ ও অসার্থক, তাই নয়, যথার্থপ্রলয় সাধতেও তাঁর অক্ষমতা আজ প্রমাণিত, সুতরাং এ-পংক্তিবিন্যাসে কবির চরম তিক্ত ও বিরক্ত, এমন কি cynical মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে।

নিসর্গ-সংসর্গে বহুকথিত নিভৃতি ও রহস্যরীতির কল্পনা তাঁর কাছে উপহাসের ছল :

নব সংসার পাতি গে আবার চলো
যে কোনো নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে যেখানে অন্তত লোনাজলও
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে।

আর প্রেমের বহুশ্রুত চিরন্তন 'ঐশ্বর্য' সম্পর্কে তাঁর অভিমত :

অসম্ভব প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ ;
অসঙ্গত চিরপ্রেম, সংবরণ অসাধ্য, অন্যায়।

সুতরাং 'নিরবলম্ব নিখিলে সে আজ একা' যেহেতু 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী', কেবল :

যন্ত্রণাই জীবনে একান্ত সত্য, তারি নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে।

মানুষের অন্যান্য অসংখ্য অসাধুতার কথা না হয় থাক, কিন্তু নিখিল মারণযজ্ঞে বিজ্ঞানের আহুতি এ-কল্পের কবিদলে সর্বাপেক্ষা কঠোর আঘাত হেনেছে। 'শতাব্দীর সমান বয়সী' কবি সুধীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই অতীতবিমুখ। যেকালে তিনি স্পষ্টত আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেন :

…বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।

তখনো তিনি এই 'প্রত্যেক নিমেষে'র ক্রূর মৃত্যুযন্ত্রণা নিয়তিকে একেবারে মেনে নিতে অক্ষম, তবে যে জীবনের উচ্ছেদকেই সম্পূর্ণ মেনে নিতে হয়, দেখা যাচ্ছে, তাই তিনি 'অগ্রজ কবির অটল বিশ্বাসে' স্থিত হয়ে সঘন আবেগে বলছেন : 'এখনো গেল না ভোলা তীর্থরজে রক্তের অঞ্জলি'।

তবে আশা কোথায়, ভরসা কে, বিশ্বাস কিসে? একপক্ষ গেলেন জনসঙ্গমে, গণআন্দোলনে, সাম্যবাদের আলোয়; অন্যপক্ষ তির্যক্ জীবনতৃষ্ণায় (আদৌ বিতৃষ্ণায়), কুটিল নেতিবাদে, বিক্ষুব্ধ শ্লেষ ও কশাঘাতের নৈরাজ্যে, অন্ধকারে। 'মজ্ঝিম নিকায়' চিরকালের 'সহজ' পথ, আলো-আঁধারির, সরলতা ও জটিলতার, আত্মসন্ধান ও বিশ্লেষণের দুর্গমতম পথ, পরিণতবুদ্ধির প্রায় সবাই গেলেন সে-পথে।

৪

তৃতীয় কল্পের সূচনা হল। এর একদিকে সমর সেনের বুদ্ধিজীবী নিরাবেগ নৈরাশ্যধূসর নাগরিকতা, বিষ্ণু দের 'সন্দীপের চর' পূর্বকাব্য পর্যায়ে যার মুখবন্ধ রচিত হয়েছে। অন্যদিকে মার্ক্সিস্ট্ পন্থায় 'সন্দীপের চর' উত্তর বিষ্ণু দের নতুন কাব্যপর্যায় সমর সেনের 'রোমান্টিক নই আমি মার্ক্সিস্ট্' ঘোষণালাঞ্ছিত সাম্যবাদের 'শুভঙ্করী' স্বস্তিবচন। শিল্পত্ব ও কাব্যগুণে বিশেষত দ্বিতীয়োক্তের এ পর্যায়ী কবিতাগুলির মূল্য সামান্য। কিন্তু যে পর্যন্ত সমর সেন সুশিক্ষিত নাগরীবিদ্রূপের নেতিবাদে আচ্ছন্ন ছিলেন, কিছু সংহত সুন্দর কবিতা সত্যি সত্যিই লিখতে পেরেছিলেন তিনি। পেরেছিলেন, তিনি তাঁর আঁকাবাঁকা কুটিল চিন্তায় ও তুখোড়, বেপরোয়া বাগ্‌জালে এতদিনকার গদ্যছন্দের অবশিষ্ট রঙ-রস-আবেশ মুছে নেওয়া সত্ত্বেও, অথবা সেজন্যেই। চৌরঙ্গির পথে-পথে সভ্যতার যে বর্বর ছবি তিনি তুলে ধরলেন তার ভূমিকা যত সাময়িক হোক, গুরুত্ব অসামান্য ছিল। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে অবৈধ-গর্ভিণী উর্বশীর আবির্ভাব এই লম্পট সভ্যতার ইতিহাসে কেবল একটি বিস্মৃত অধ্যায় নয়। কিন্তু সমর সেনের নঙর্থকতা কালান্তরে পাশ ফিরল না, তিনি দিনান্তের অবসন্ন গানই বাঁধলেন, অন্যদিনের সকালী জলসায় তাঁর বীণাকে নীরব ও নিস্পন্দ দেখতে হল। তাঁর অনুগামী কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিণতিও অনুরূপ। যত চাতুর্যময় ও যৌক্তিকই হোক, ক্রমাগত বামাচারের ক্লান্তির চেয়ে এক হিসেবে এই নীরবতা শ্রেয়। বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথ ও রবি-অনুষঙ্গের প্রতি আত্যন্তিক বিরূপতায় একদা সমর সেনের মতই উদ্দাম ছিলেন, কিন্তু বয়োপ্রবীণতা তাঁকে উপযুক্ত উপলব্ধির দাক্ষিণ্যে উর্বর করেছে; তিনি যথাসময়ে উগ্র বামপন্থা ছেড়ে দক্ষিণপন্থায় ঝুঁকেছেন। বস্তুত আছেন তিনি সেই 'সহজের' মাঝের রাস্তায়, অনেক ভাবনা ও রূপচর্চার অভিজ্ঞতা তাঁর করতলে, উভয় প্রান্ত মেলাবার ব্রতে সেখানে তিনি আজ অন্য পাঁচজন প্রবীণদের মত দুশ্চরব্রতী। সেখানে তিনি প্রজ্ঞাপ্রবল প্রেমেন্দ্র, অনুভূতিপ্রখর জীবনানন্দ, উপলব্ধিগাঢ় সুধীন্দ্র, এমন কি আধ্যাত্মিকতালীন অমিয় চক্রবর্তীর সহগামী। রবীন্দ্রনাথ আজ আর ত্যাজ্য নন, ভোগ্য। কখনো বা লক্ষ্যও।

'সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমার আনন্দভৈরবী', 'কোন সকালে'র আনন্দ-আহ্বানে সাড়া দিতেও তিনি আজ অপ্রস্তুত নন। রাত্রির বহুপথচারী তিমিরবাস সমাপ্ত।

আর সবাইকে দেখা যায় পথ খুঁজে খুঁজে পথের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন, চোখে-মুখে চিন্তার রেখা, উদ্বেগের ছায়া, ক্লান্তির কালো, সর্বোপরি যন্ত্রণাদহনের নীল। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর চিরাভ্যস্ত গৈরিকে ঈষৎ সন্দেহ হয়। সন্দেহ হয় নিকট প্রতিবেশী ব'লে ভাবতে। কবি হিসাবে বুদ্ধদেব যতই খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ হোন, তাঁর মধ্যে এক রকম যন্ত্রণার অভাব ছিল না, কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর নিরুদ্বেগ, নিঃশঙ্ক ও নির্বিকার কালবিচারে অকল্পনীয়। দেশে দেশে উড়ে উড়ে কবিতাশিল্পে তিনি নতুন নতুন বাক্যনির্মিতি ও কলানৈপুণ্য দিয়ে গেলেন, কেবল হয়ত নিজেকেই দিলেন না। অন্তত শতকের যূপবদ্ধ ক্লিষ্ট রক্তাক্ত চেহারায় তাঁকে দেখা গেল না একবারও। রাবীন্দ্রিক সংসর্গ তাঁর এজন্যে কতটা দায়ী বলা কঠিন। তিনি যে নিখিলমিলনের প্রত্যয়ে, আদ্যকাল থেকেই সুস্থিত, তাঁর এই সহজ সন্তোষে সাম্প্রতিক 'বিদগ্ধ'দের সায় পাওয়া কঠিন। অবিশ্যি 'বিনিময়ে'র মত পরমাশ্চর্য প্রেমের কবিতাও তিনি লিখেছেন।

সাম্যবাদের পথে যে কবিরা অগ্রসর হয়েছিলেন সেকালে তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রধান বিষ্ণু দে, সমর সেন, অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রথম দুজনের কথা আগেই বলেছি। অরুণ মিত্র গুরু থেকেই সোজা পথ বেছেছিলেন, সমর সেনের অনুসরণে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত তির্যক্ বিদ্রূপাশ্রয়ী কবি তিনি কখনো

ছিলেন না। একেবারে ফ্রন্টের 'লাল ইস্তাহার'ও লিখেছেন তিনি, স্বতঃস্ফূর্ত কবিতাকে কিন্তু কখনো বিসর্জন দেন নি—চমকপ্রদ ছন্দভাঙ্গের কশাঘাতে (negative) কিংবা স্লোগানের বিক্ষোভে (positive) প্রচুর প্রাণশক্তিসম্পন্ন বিমলচন্দ্র ঘোষ বা সুভাষ যা করেছেন। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে শেষোক্ত জন গভীরার্থে সত্যকার অনুসন্ধানী হয়েছেন ও কয়েকটি ভালো কবিতা স্পষ্টতই লিখেছেন। শতাব্দীর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার নাতি-বিস্তীর্ণ কালে একদল সাম্যবাদী স্লোগা'ন ও মার্কস্‌বাদের তত্ত্বতাৎপর্য-ঘোষণাকেই 'positive' কবিতা বলতেন। সৌভাগ্যের বিষয় জন্মভূমি রাশিয়ার ভাবান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নবজাতকদের চেহারাও পাল্টাচ্ছে। 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে' ইত্যাদি পংক্তিবিন্যাসে নবীন-প্রবীণ অনেকেই সাম্যবাদের দুর্বল ভাববিলাসে মেতেছিলেন একদিন (এর মূল গায়েন ছিলেন তখনকার তরুণ দিনেশ দাস —বহির্মুখী ও সাময়িক কবিতা রচনায় যিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সমকালে হরপ্রসাদ মিত্রেও চতুষ্পার্শ্বিক জীবন সম্পর্কে, যথেষ্ট সুগভীর না হলেও, একটা অনুসন্ধিৎসার ভাব প্রথমাবধি লক্ষণীয়, উভয়েই ছন্দোচাতুর্যে ঈষৎ মোহগ্রস্ত); পাশাপাশি অপরিণত সুকান্তের 'পূর্ণিমা-চাঁদ ঝলসানো রুটি'র প্রতিচ্ছবিও যখন অনেক বেশি আন্তরিক, সবল ও সঙ্গত মনে হয়েছে। অবিশ্যি তাঁকে নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতির ক্লান্ত পর্বও আজ চুকে গেছে; এখন মূল বিশ্বাসে সুস্থিত থেকে অনুত্তেজিত সৎ প্রকৃতির 'সর্বহারার গান' বাঁধার পালা। তার জন্যে জনগণের কবিরই অপেক্ষা করতে হবে। আপাতত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কৌণিক কবিতায় মার্কস্‌বাদী ইতিহাস ও মানবসভ্যতা-বিচারের মূল্যায়নই সম্ভব আর উক্ত বিজ্ঞানচিন্তা সম্পর্কে অল্পাধিক আবেগাত্মক মানসিক সংস্কার প্রস্তুত ক'রে তোলা। সেভাবেই প্রকৃত কম্যুনিস্ট্ সাহিত্যের উপযুক্ত ঐতিহ্য ও জন্মলগ্ন নিকটতর হতে পারে। আবু সয়ীদ আইয়ুবের একটি মূল্যবান্ আলোচনার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য...'it may be said that communist literature will be real only when communism has passed out of the stage of orthodoxy and has become a tradition. (Modern Bengali Poetry : Longmans Miscellany, 1943.) সেই প্রস্তুতিপর্বের বর্তমান অধ্যায়ে কবিতাকে 'ছুটি' দিতে না চেয়ে কেবল তার অবয়বকে ছেঁটে দিয়েছেন অরুণ মিত্র—গদ্যের ছোট ছোট অনুচ্ছেদে তিনি কবিতাকে সাজাচ্ছেন, নিজের প্রতীতি ও প্রত্যয়কে অবাধে প্রতিফলিত করতে চাইছেন তাঁর ব্যবহারিক গদ্যচালে কবিতার ধ্বনি ছিটিয়ে। এ পরীক্ষা সফল হলে বাংলা কবিতায় আরেকটি দরজা খুলবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্টান্ট্ ও চাতুর্যপ্রীতি এখনো একেবারে কাটে নি, তবে তিনি অনেকখানি সহজ হয়ে এসেছেন—আহৃত সত্য ও তত্ত্বের বোঝায় তাঁকে আজকাল কদাচিৎ ক্লিষ্ট লাগে। মণীন্দ্র রায় অদ্যাবধি বেশ সাবলীল ও অক্লান্ত। বিষ্ণু দে তাঁর মধ্যে একদা যে প্রতিশ্রুতি দেখেছিলেন তার মর্যাদা তিনি এভাবে হয়ত রক্ষা করেছেন। আবেগপন্থায় বিশ্বাসী কবি হিসেবে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সাফল্য এক সময় সুচিহ্নিত ছিল। অজস্র লেখার মহদ্দোষ যে ভাব-কেন্দ্রিকতার অভাব তা যেমন মণীন্দ্র রায়ে ক্রমেই প্রতীয়মান, মঙ্গলাচরণের আকস্মিক বিরতি তেমনি ব্যক্তিগত কারণে অনিবার্য হলেও কবিপরিণামের দিকে অসহায়ক। তরুণতরদের মধ্যে আবেগগাঢ় মননপন্থায় প্রাগ্রসর মৃগাঙ্ক রায়, রাম বসু, জগন্নাথ চক্রবর্তী ও শঙ্খ ঘোষের সংহত শক্তিপরীক্ষার উল্লেখ এখানেই বাঞ্ছনীয়। 'সমুদ্রকন্যা'য় মৃগাঙ্ক রায়ের কবিচেতনা মননে প্রদীপ্ত ও মৌলিক হয়েও আবেগে মন্থর; অরুণ মিত্রের মত গদ্যকবিতার নতুন ঠাট নির্মাণে তিনি সিদ্ধকাম হতে পারতেন।

শঙ্খ ঘোষ 'দিনগুলি রাতগুলি' জুড়ে যখন ধ্বনিত করেছিলেন, 'কঠিন নয় কঠিন নয় বাঁচা কঠিন নয়,' তখন তাঁর এ প্রতীতিতে প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা না থাক, জীবনযাপনের যন্ত্রণাহত স্বীকৃতি ছিল, কাছের মানুষকে ঘরে টানতে পারেন নি ব'লেও একরকম বিফলতাবোধ ও অধীরতা অস্বচ্ছ ছিল না। 'দুধারে আঁধার জল পাতাল নাড়ায়' এই দ্বিধা-সংশয়ের পাড়াতেও বসতি করেছেন তিনি। আজ তাই তাঁর সুস্থির ইচ্ছার অনায়াস প্রকাশ ঘটতে দেখা যাচ্ছে :

> যে যায় দূরে অনেক দূরে অনেক দূরে দূরে
> অনেক ঘুরে ঘুরে,
> যে চায় তাকে আনিস ডেকে আনিস ঘরে আনিস
> ঘরের কাছে আছে ঘরের মানুষ।

এঁদের এবং মধ্যপন্থায় যাঁরা ব্রতী তাঁদের একটি বড় সুবিধে আজ এই যে দ্বিতীয় কল্পের কবিদের তুলনায় তাঁরা রবীন্দ্র আবহে অধিকতর স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথকে তাপবলয় মনে হয় না আর, তাঁর

[illegible] অনেক আলোচনার বেলা। এমন কি রবীন্দ্রনাথের গানে যে 'আ[illegible] [illegible] এখনকার কবি ও কবিযশঃপ্রার্থীর রক্তস্রোতে সলীল। বুদ্ধদেববাবু এখনকার এমনি [illegible] (অরুণ সরকার) রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদের শিক্ষা বা দীক্ষা শত কথায় দিতে পারেন নি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটা গানের ভাঙা কলি 'ভাবনা আমার পথ ভোলে' উক্ত কবিসত্তাকে শিহরিত ক'রে এই সিদ্ধান্তে সহজেই পৌঁছে দিয়েছে 'সংশয়বিমুক্ত চিত্ত; তাঁর স্থান তর্কাতীতে, মনে।' এবং এতে একটা অত্যন্ত উপকার এই হয়েছে যে গত দশ বারো বছরে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দাবাখেলায় বিভিন্নভাবে বাঙালী যত মার খেয়েছে, সে-মারের ওপর মাথা তুলবার সহিষ্ণুতা ও আত্মপ্রত্যয় কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যেত না—যদি না এখনকার নবীন কবিসম্প্রদায়ের পেছনে বৃহৎ সদ্যআলোচিত কবিগোষ্ঠীর 'উদ্যত অঞ্জলি' আকাশে নিবদ্ধ থাকত—যে আকাশ, সব সত্ত্বেও, অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ও চিরন্তন বাংলা দেশ। আজ তাই ঈশ্বর বা ধর্মবোধ, প্রকৃতিপ্রেম অথবা মানবিকতা কবিতার মধ্যে দিয়েই কবিকে আঘাত করছে সর্বাধিক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু কবিতায় ও সহস্র গানে একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার। বিশেষত প্রকৃতির শ্রাবণী-ফাল্গুনী আকাশ তাঁর অপার করুণায় দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তৃত। সমুদ্রের মত। সঞ্জয়বাবুর উক্তিমত 'সমুদ্রের থেকে দূরে চ'লে এসে শুনি তবু সমুদ্রের স্বর'; রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠই হয়ত আজকের কবিকণ্ঠে ধ্বনিত, কিন্তু আজ যা অবলীলায় অক্লেশে ও সগৌরবে সাধিত, গতকাল তা সম্ভব ছিল না, কেননা সেই ধ্বনি ধ'রে রাখার উপযুক্ত শঙ্খ তখনো তৈরি হয়নি, রবীন্দ্রনাথে অতিরিক্ত আচ্ছন্ন অক্ষমতায় অথবা ইচ্ছাকৃত-বিচ্ছিন্ন শক্তিমত্তায়। নতুন ভাবাভঙ্গি, বর্ণনারীতি এবং ভাঙাচোরা ও ভরপুর উভয় জীবননীতির সাম্প্রতিক মূল্যবোধাক্রান্ত গ্রহণ-বর্জনে যে উর্বর কবি-মানসিকতা প্রস্তুত হয়ে উঠেছে তাতে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি বর্তমানে অনেক বেশি নিরাপদ ও নিশ্চিত। মধ্যপন্থী তরুণতরদের অন্যতম অগ্রণী ও প্রধান কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (এঁর মধ্যে সঞ্জয়বাবু যে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দেখেছিলেন তা যথার্থ। দ্রষ্টব্য পঞ্চম দশকের কাব্যোত্তম—আধুনিক কবিতার ভূমিকা) তাই যখন তাঁর 'প্রথম নায়ক' কাব্যনাট্যের একটি চরিত্রের মুখে এই রবীন্দ্রাশ্রিত সুদীর্ঘ দার্শনিক আলাপ জুড়ে দেন:

তবে কিনা যন্ত্রণা পাওয়াটা
ব্যর্থ না-ও হতে পারে। কারো কারো শুধুই অমৃতে
রুচি নেই, সুশোভন, মৃত্যুরও সুতীব্র স্বাদ নিতে
ইচ্ছা হয় কখনো-কখনো। শুধু তা-ই নয়, এই
মৃত্যুর আস্বাদ নিয়ে যাত্রা শুরু যার, শুধু সে-ই
হয়তো কখনো পায় অমৃতের স্থির অধিকার।
আমি তা পাই নি, সুশোভন। আমি মৃত্যুকে আমার
শত্রু বলে কল্পনা করেছি; আমি দুঃখকে কখনো
বন্ধু বলে গ্রহণ করি নি। আমি মূর্খ, তাই কোনো
যন্ত্রণার মূল্য হাতে না নিয়েই আনন্দের হাটে
পৌঁছতে চেয়েছি। তাই গিয়ে দেখি সমস্ত কপাটে
খিল তোলা।...

তখন মনে হয় না এটি অবাঞ্ছনীয়, মনে হয় না এ খামখেয়ালি রবীন্দ্রপ্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়। বরং মনে হয়, জীবন অনেক দহন, অনেক বিপত্তি ও ব্যাধির ব্যবধি পেরিয়ে ধ্রুবতাকে ধরতে চাইছে, একে নিছক কল্পনাবিলাসের উপকরণ না হয়ে মনে হতে থাকে একটি লক্ষ্যময় জীবনদর্শনে ও কবিপরিণামে পৌঁছবার প্রয়োজনীয় পথাতিবাহন। প্রসঙ্গত এ-সিদ্ধান্ত অনুচিত নয় যে নীরেন্দ্রনাথই এখন তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কবি। কেননা, অভীষ্ট পরিণতিতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সম্প্রতি উক্ত কবিচেতনা এতই ব্যথিত বিড়ম্বিত উদ্বিগ্ন ও উৎসুক যে তাঁর ভাব্য অদূর ভবিষ্যতেই একটি স্থিরতর দিগ্বলয় ছুঁতে পারবে ব'লে মনে হয়।

নীরেন্দ্রনাথের সমকালীন অন্য একাধিক কবির মধ্যেই অনেক সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু কেউ অসম্পূর্ণ, কিউ খণ্ডিত, কেউ-বা অমনোযোগী ও বীতনিষ্ঠ। নরেশ গুহ ও বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় সমাপ্ত; বিশেষত প্রথমোক্তের কাব্যরূপ এত মার্জিত ও মনোহর ছিল যে তাঁর অসম্পূর্ণতা যদি চিরকালের হয় তবে তা খুবই দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের অভাব আছে, যে জন্যে অসামান্য বিদ্যুচ্ছটার পাশেপাশেই তাঁর আকাশে তুচ্ছ মেঘের এত পঙ্কিল ঘনঘটা। মার্জনার অনিচ্ছায় বা অচেষ্টায় অথবা মনঃসংযোগের

অভাবে তাঁর প্রচুর কবিকৃতি পরিণতিমুখী না হয়ে বিনাশিত হচ্ছে। কাব্যে তাঁর [illegible] সমাহ্যাতিক ঘনিষ্ঠ আত্মস্থতার অভাব প্রায়শই লক্ষণীয়। তাছাড়া মনে হয়, 'দূরের আকাশ' [illegible] যে শুভ আবেগের সংক্ষিপ্ততম দৃষ্টিপ্রমুখ পরিবেশে প্রভূত প্রসাদ ছিল আজ তা নানা ভাবে, অভিজ্ঞতাবৃত্তের [illegible] বিশেষত, বিক্ষিপ্ত। ক্ষণ-প্রতীতির বিদ্যুদ্দীপ্তি যথেষ্ট নয়, শাশ্বত প্রত্যয়ের স্থির প্রোজ্জ্বলতা পেতে গেলে প্রাথমিক বোধ-পরিচ্ছন্নতার একটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, কেন্দ্রাতিগ থেকে কেন্দ্রাভিগে শক্তি-চালনার প্রয়োজন হয়, যা আজও বেগবলিষ্ঠ অরুণ সরকারে এক রকম অসাধিত।

চিত্রকল্পবিশ্বাসী কবির পক্ষে প্রাঞ্জল হওয়া হয়ত কঠিন, তাই সঞ্জয়বাবু দীর্ঘ সাত আট বছর আগেও সাম্প্রতিক কবিদের সম্পর্কে আলোচনায় (নীরেন্দ্রবাবু প্রসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত) কয়েকটি সুলক্ষণের অন্যতম হিসেবে সুনীল নন্দী প্রসঙ্গে এই উৎসাহী উক্তি করেছিলেন যে তিনি 'চিত্রকল্পে বিশ্বাসী হয়েও প্রাঞ্জল।' এই ক'বছরে সুনীলকুমার নন্দীর কবিতা সংখ্যায় অনেক নয়, কিন্তু গুণগত বিচারে পরিণততর এবং পূর্বোক্ত বোধপরিচ্ছন্নতা তিনি আয়ত্ত করেছেন ব'লেই মনে হয়, যার পরে তাঁর পথখোঁজার পরিশ্রমে ও অনিশ্চয়ে বিরাম আসবে, তিনি সম্পূর্ণ আত্মনিবিষ্ট হতে পারবেন। সেই ঈপ্সিত সাময়িক স্বস্তি ও লক্ষ্য-সংহতির সঙ্কেত এখানে পাওয়া যাচ্ছে :

> সবুজ প্রান্তরে দেখলে বন্ধুত্বে নিবিড় ওই শান্তবহ হেমন্তের নদী—
> ওকেও তো যেতে হয় শ্রাবণে উন্মাদ হয়ে সমুদ্র অবধি
> ভাসিয়ে তীরের মায়া,…
> …আবিষ্ট ব্যাকুল বাহু খুলে খুলে হয়তো কে জানে
> ভূমিও তো যেতে পারো সমুদ্রের মত কোন উধাও সন্ধানে।

অরবিন্দ গুহর গতিপ্রকৃতিও দর্শনীয় এজন্যে যে 'দক্ষিণনায়ক' রূপে একদা তিনি অতিশয় দাক্ষিণ্যপূর্ণ ছিলেন, প্রেমের আহ্বানে চঞ্চলচিত্ত, কিঞ্চিৎ প্রগলভ্‌ও ; সঞ্জয়বাবুর পূর্বোক্ত আলোচনায় যেজন্যে তাঁর প্রসঙ্গে খুব আশাপ্রদ উক্তি ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি অরবিন্দবাবুর মধ্যে একটি অন্য লক্ষণ স্পষ্ট হচ্ছে, তাঁর পূর্বজীবনের বিপরীত শ্লেষাত্মক দিক্, শক্তির নিশ্চিত প্রকাশ থাকলেও তা স্বস্তিপূর্ণ নয় এজন্যে, যে মনে হতে পারে, অপূর্ণকাম আশ্লেষেই এই শ্লেষের জন্ম, অসিদ্ধ প্রেমে অপ্রেমের। কবির পক্ষে তা অগৌরবের ব্যক্তিগত জীবনে বলছি না, কবিতায়ই তার ম্লান দাগ কোন কিছুতেই ঢাকা পড়বে না। শামসুর রহমনকেও কখনো এই আবর্তে পড়তে দেখেছি। চিত্রকল্পনির্মাণে তিনিও নিপুণ। বিশেষত 'still life' এর ছবি দেখাতে তাঁর সাফল্যের জুড়ি হালফিল খুব একটা চোখে পড়ে নি। কিন্তু নিঃস্রোত ঘরের ছবিতে প্রয়োজন নেই আর, স্বাস্থ্যের খোঁজে আজ তরঙ্গভঙ্গুর বাইরের জগতে বেরিয়ে যেতে হবে। শ্রীহীন, নিরানন্দ, নিষ্প্রাণ অন্ধকারকে ভালোবেসে ক্ষয়ে যাওয়াই যায়, সর্বগ্রাসী দুরবস্থার ওপর জয়ী হওয়া যায় না। দ্বিতীয় কল্প যেমন অন্য কোনখানের ডাক শুনে 'আমি সুদূরের পিয়াসী'র ধ্রুবতাকে আঁকড়ে ধ'রে পথে বেরিয়ে পড়েছিল, আজ আবার তারই নতুনতর প্রতিধ্বনি, উদ্দামতর পুনরাবৃত্তি, পরিণততর পুনরালিঙ্গন আবশ্যক।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তরুণতমদের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রতিশ্রুতিবান্ ও প্রবলশক্তি। 'একটি অনুভব' দ্রষ্টব্য একা এবং কয়েকজন যাঁর শুরুতেই এত গভীরস্বাদী ও তুঙ্গস্পর্শী তাঁর বিচিত্র অনুভবের ঐক্যবন্ধে যে ভাবমূর্তি দানা বাঁধবে, বিশেষত তাঁর কবিকৃতিতে নাটকীয় উপাদান যখন প্রচুর, তার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতে আশা করি অনেকেই আস্থাশীল।

এখানে উল্লেখ্য যে আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের নিশ্চিন্ত আত্মস্থতার নিরাবেগ, আলোক সরকারের সুচতুর প্রসাধন-প্রবণতার অতিরেক ও আনন্দ বাগচীর বহুগামী বাসনার অগভীরতা আজ আর খুব আশাজনক ভবিষ্যতে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে না। ইতস্তত চারদিকে আরও কয়েকজন শক্তিমান্ তরুণের কাব্যপ্রয়াস নানা ভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করছে ; কিন্তু এখনো এখানেই তাঁদের প্রসঙ্গপাত অসম্ভব।

আত্মানুসন্ধান ও আত্মকেন্দ্রিকতা কখনোই এক নয়, অত্যন্ত আলাদা ; কিন্তু বিভ্রমাত্মক। তাই প্রথমের নামে অতিরিক্ত আত্মসমাহিত যেমন সম্ভব হলেও নঙর্থক, ভঙ্গি ও বিন্যাসের বিকল আতিশয্য তেমনি আপাতত আকর্ষণীয় হয়েও অনিরাপদ্। বিশেষত দ্বিতীয়োক্তের ক্ষেত্রে মনে হতে পারে : 'অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকেছিল অত্যন্ত রঞ্জনে।' বাংলা দেশের জাতীয় জীবন আজ নানাভাবে ব্যাহত ও ক্ষয়িত। কবিতায় তার ছায়াপাত হোক, কিন্তু কবিতাই ক্লিষ্ট হতে থাকবে, অবসন্ন হয়ে পড়বে, নিরবলম্ব ও নিঃস্ব দেখাবে তাকে, এ খুবই মর্মান্তিক।

ব্যক্তি-সমাজ-সময়গত পরাভবের প্রতিফলনার্থে একালে কৃষ্ণচূড়ার কাব্যভূমিকা :

কৃষ্ণচূড়া কৃষ্ণচূড়া এখনো তুমি আছো,
কোন্ সাহসে বুক বেঁধেছো কোন্ দুরাশার বাঁচো।
(কৃষ্ণচূড়া—নরেশ গুহ)

অথবা,

থাক্, কৃষ্ণচূড়া
অবাক করার মত তেমন বদন আজ পৃথিবীতে নেই।
(থাক্ কৃষ্ণ চূড়া—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

তেমনি 'সুদূর শঙ্খচিলে' ভালোবাসার পলাতকছবি আর 'ঝাউবৃক্ষের পাতা'য় আপন ব্যর্থতার পরিমাপ :

এ হৃদয় ঝাউবৃক্ষের পাতা
যার জানালায় দুবাহু বাড়ায়
নেই সেইজন ঘরে আগে।
(জন্মদিনে—অরুণকুমার সরকার)

এবং সামাজিক বিপর্যয়লিপি পাঠান্তে লৌকিক মাঙ্গলিকী ও ঈশ্বরভাবনায় জলাঞ্জলি :

মঙ্গলশঙ্খের কণ্ঠে সন্ধ্যার প্রার্থনা ব্যর্থ, ঈশ্বর বধির।
(নীলকণ্ঠ—সুনীলকুমার নন্দী)

ফলত যাবতীয় নাগরিক জীবনযাপনাগত যাতনার সারাৎসার :

আনন্দের সিংহাসনে এখানে যন্ত্রণা সমাসীনা!
এখানে শুধুই অশ্রু ঝরে।
(জল পড়ে পাতা নড়ে—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

এপর্যন্ত স্বীকার্য।

বিশেষত যখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের আসাযাওয়া আছে এখনকার রক্ততালে, আবেগ ও মননের যুক্ত ক্রন্দনাট্যে বেজে চলেছে গত ত্রিশ বছরের কাব্য-আন্দোলনের বিস্তৃত করতালি। যদিচ 'আনন্দের সিংহাসনে'ই 'যন্ত্রণা সমাসীন' তথাপি, অথবা সেজন্যেই, নিসর্গরঞ্জিনী কৃষ্ণচূড়ার আবির্ভাব স্থানকালের বিচারে নির্লজ্জ ও দুঃসাহসিক, তাই অসহ্য এবং তার পাশেই 'হায় ভালোবাসা', 'সুদূর শঙ্খচিল' ও 'ঈশ্বর বধির'। উত্তরাধিকারের সবগুলি মৌল লক্ষণই সুপরিস্ফুট। সুতরাং অনিবার্য রবীন্দ্রনাথের গানের তরণীতে ভাসমান রবীন্দ্রপ্রচ্ছন্ন এই কবিকল্পে 'অশ্রুর রসে ভরা' সফল কবিতাকে আমরা সমধিক মূল্য দিতে শিখেছি। ভাবটা এমন যেন 'রঙে রঙ করা 'হাসির ফুলের' 'ঝরা' নিয়তির পরিহাসে আর প্রয়োজন নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বা সত্যেন্দ্রনাথের হসন্তিকা দূরের কথা, Nursery Rhymeকেও সুস্থ-ব্যক্তিক রঙ্গে 'ভারতী'র সুকুমার রায় বা সামাজিক বিদ্রূপ ব্যঙ্গে চল্লিশ-পঞ্চাশের প্রেমেন্দ্র, বিষ্ণু দে, অন্নদাশঙ্কর যেভাবে বাঁকিয়ে চুরিয়ে সময়োচিত ধাক্কা লাগিয়ে গেলেন তার সম্যক মর্যাদাও আমরা সবসময় দিতে আজ অসমর্থ। সম্প্রতিককালের পরাভূত লাঞ্ছিত ও কক্ষচ্যুত জীবনীশক্তিই এজন্যে দায়ী। গত কয়েক বছরের প্রলয়ঙ্কর ইতিহাসে বাঙালীর জাতীয় জীবন যেভাবে ধ্বংসে পড়েছে—বিড়ম্বিত নীরক্ত বিরক্ত রিক্ত ব্যক্তিজীবনের হাহাকার সেখানে আরো করুণ ও ভয়াবহ—তাতে কবিতাকে যে বিষণ্ণ, ম্লান ও ম্রিয়মাণ দেখাবে তাতে আর আশ্চর্য কী। তবু বলব এ অবস্থায় একটি দুর্লক্ষণ ক্রমেই বৃহত্তর আকারে কুটিল হয়ে আমাদের অবস্থাকে আরো শোচনীয় করে তুলবে হয়ত। নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে যাওয়ার লক্ষণকে আর বাড়তে দেওয়া যায় না। বুঝতে হবে, 'মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে'র শোক-সঙ্কেত শুধু ব্যক্তির ভাগ্যহীনতা নয় সমগ্র জাতির দুরদৃষ্ট সেখানে জড়িত।

আমাদের হাড়ে এক নির্ধূম আনন্দ আছে জেনে
পঙ্কিল সময়স্রোতে চলিতেছি ভেসে;
তা না হলে সকলি হারায়ে যেত ক্ষমাহীন রক্তে—নিরুদ্দেশে।

অক্ষমার রক্তস্রোত সত্যি চাই না, তবে অক্ষমতার অসহায় কান্নাকেও দুহাতে সরিয়ে দিয়ে সপ্রাণ জীবনের রক্তাক্ত ও সহৃদয় উপলব্ধির সিদ্ধি-সন্ধান নিশ্চয়ই চাইব।

বস্তুত 'কান্নাকে শরীরে নিয়ে' 'কার ঘরে কয় কৌটা আলো' আর দেওয়া যায়? 'অথচ যন্ত্রণা নিয়ে আকাঙ্ক্ষার হাওয়া সত্যিই রাত্রির জানালায়' যদি আসে, তাকে আসতে দেব, 'বকুলের-গন্ধে-নিশি-পাওয়া শিল্পীর আশায়।' মুখচোখের বিকারে ও বাইরের ব্যবহারে যে কান্না তার মূল্য অসার; জীবনযন্ত্রণা গভীর অস্তিত্বের যন্ত্রণা হোক, শৃঙ্খলিত জীর্ণ বাসনা-যাপনের দিনগত পাপক্ষয়েও অন্তরের ঋজুতা না মুছুক, রক্তের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মরবে না, ক্ষণে ক্ষণে ধানুকী ছিলার টানে কবিকণ্ঠ আস্ফালিত হবে সুপরিচিত এই আহত জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকেই, বর্তমান ও অনাগত কাব্যকল্পের জীবন ও কবিতায় গভীর অনুপ্রবেশের আত্মদান সার্থক হবে তখনই। পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভাষ্যমত 'in the evolution of poetry towards greater intimacy with the daily life of man lies its only hope of survival'। অতএব 'স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে শুদ্ধির তাণ্ডবে', সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্কল্প সুদৃঢ় সম্মিলিত নবীন সমুদ্রযাত্রার পথে শত বজ্রপাত সত্ত্বেও আজ সর্বাগ্রে সুনিশ্চিত হওয়া চাই যে আত্মপ্রবঞ্চনার আশ্বস্ততায় নয়, নিরাবিল-বিশ্বস্ত প্রাণস্পন্দনেই, জীবনানন্দর প্রসঙ্গান্তর প্রতিধ্বনিকে ঠিক-ঠিক উচ্চারিত হতে শোনা যাচ্ছে: 'হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় নাকি।'

—•—

বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর

(১৯০০-৬০)

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

১

বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বহন ক'রে বিংশ শতকের জন্মলগ্নে দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চোখের বালি' নিয়ে। 'চোখের বালি'র খসড়া 'বিনোদিনী' ১৩০৭ সালে, অর্থাৎ ১৯০০-এ রচিত হয়। তারই পূর্ণাঙ্গ রূপ 'চোখের বালি'। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২-এ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন, ঐ পত্রিকায় বার হয় 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল বাংলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্বমূলক, সমস্যাগর্ভ বাস্তবপন্থী উপন্যাসের পথপ্রদর্শক। কিন্তু শিল্পী ও সংস্কারকের দ্বন্দ্বে বঙ্কিম-প্রতিভা শেষ পর্যন্ত কাম্য-শিল্পোৎকর্ষ লাভ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা-বিবাহের বিরোধী ছিলেন সত্য, কিন্তু বিধবা-বিবাহের ও অসবর্ণ বিবাহের সমর্থক রমেশচন্দ্র তাঁর 'সমাজ' ও 'সংসার' নিয়ে শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বহু যোজন দূরে চিরদিনই অবস্থান করবেন। রবীন্দ্রনাথ যখন 'চোখের বালি' রচনা করেছিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্রকেই স্মরণ করেছিলেন, রমেশচন্দ্রকে নয়।

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'নষ্টনীড়' একই সঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। একদিন বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবপন্থী উপন্যাসের সূচনা করেছিলেন, কুন্দ ও রোহিণীর প্রতি অকরুণ হয়েও নারীর 'ব্যক্তিত্ব'কে স্বীকার করেছিলেন, তাদের 'বিদ্রোহ'কে প্রকাশ করেছিলেন—যদিও বিষ ও পিস্তলের গুলিতে তাদের জীবননাট্যের যবনিকা টানা হয়েছে। এবারকার 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তার উত্তরাধিকারী হয়ে এলেন, 'নীতিবাদী'র দণ্ডটি গ্রহণ করলেন না। গঠনের দিক্ থেকে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল-এর অনুসরণ রবীন্দ্রনাথকে অবশ্যই করতে হয়েছে—কারণ বাংলা উপন্যাসে জটিলতাধর্মী প্লট-এর গঠন বঙ্কিমই করেছেন। পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ সাজিয়ে, গল্পরসে পাঠকের মনকে কৌতূহলী ও চকিত-বিস্মিত ক'রে, ব্যষ্টি-চরিত্র ও ঘটনার বিশ্লেষণ ও সামঞ্জস্য ঘটিয়ে একটি আখ্যান গ'ড়ে তোলা এবং তার organic unity রক্ষা করার দুরূহ দায়িত্ব বঙ্কিমই প্রথম বহন করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে form বা structure-এর জন্য বিব্রত হতে হয় নি। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'র ভূমিকায় লিখেছেন:

"সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল 'চোখের বালি'তে।"

কিন্তু মনোবিশ্লেষণের শক্তিশালী পদক্ষেপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ অলক্ষ্য নয়। পিতামহ ভীষ্মের তূণ থেকেই সব্যসাচী অর্জ্জুন শরসংগ্রহ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রভাব 'চোখের বালি'তে দেখা যায়। আখ্যান, চরিত্র, ঘটনা—সব-দিকেই তার নিদর্শন সুস্পষ্ট। তবে রবীন্দ্রনাথ 'বিনোদিনী'কে 'রোহিণী' থেকে অনেক বেশী complex চরিত্র রূপে দাঁড় করাতে পেরেছেন। কোনও অলৌকিক বা অতি-নাটকীয় ঘটনার আশ্রয় নেন নি, পরন্তু সম্ভাব্য ও সঙ্গত ঘটনার নিপুণ বিন্যাসে 'চোখের বালি' আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার ক'রে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে "সুমতি-কুমতি" জাতীয় অনেকটা নাটকীয় রীতি অবলম্বন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ রীতি বর্জন ক'রে মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রকে বহুদূর প্রসারিত করেছেন। 'বিনোদিনী'র শেষ অবলম্বন তীর্থবাস সে যুগের রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিকই হয়েছে। যে-রবীন্দ্রনাথ পরে এই নিয়ে ঈষৎ আক্ষেপ করেছেন তিনি ভিন্ন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৩ থেকে নতুন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। যাই হোক, 'চোখের বালি' যদিও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে বহুলাংশে অনুসরণ করেছে কিন্তু শিল্পরূপের দিক্ থেকে তাকে অনেক পিছনে ফেলে গেছে। 'চোখের বালি'র পর রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন'-এ 'নৌকাডুবি' প্রকাশ করেন—(১৩১০ বৈশাখ—১৩১২ আষাঢ়)। এই উপন্যাসের গ্রন্থনে শিথিলতা আছে, 'চোখের বালি'র সংহতি নেই। গল্পের ঘটনাগুলি 'probable' হলেও 'convincing' হয় নি। তবে যে ক্রটির জন্য রবীন্দ্রনাথকে প্রগতিশীল সমালোচকেরা নিন্দা করেছেন—সেই ক্রটি তখন অনিবার্য ছিল। হিন্দু নারীর স্বামী সম্বন্ধে ও পরপুরুষ সম্বন্ধে 'সংস্কার' সেকালে সাম্প্রতিক যুগের ধারণা থেকে পৃথক্ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লিখেছেন :

"এ-সব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়। কোনো একজন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবাররূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদ মাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে।"

নৌকাডুবির কমলা আধুনিকের চোখে 'প্রগতিশীল' না হতে পারে-কিন্তু সে 'রিয়াল'।

২

'গোরা'য় রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'র পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছেন। ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাসে 'প্রবাসী'তে 'গোরা'র শুরু হয়, ১৩১৬ সালের চৈত্র মাসে শেষ হয় (অর্থাৎ ১৯০৭ থেকে ১৯০৯ গোরা রচনার সময়।) রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'কে বিংশ শতকের পটভূমিকায় স্থাপন করেন নি। এই কালের পটভূমিকায়, অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলন বা ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বাতাবরণে তিনি রচনা করেন সবুজপত্রের যুগে 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)। গোরার পটভূমি উনবিংশ শতকের শেষপাদ, কেননা গোরার জন্ম ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে।

গোরা বাংলা কথা-সাহিত্যে প্রথম মহাকায় উপন্যাস। ছন্দোবদ্ধ মহাকাব্য যেমন প্রাচীন যুগের সঙ্গে বাঁধা, গদ্যরচিত মহোপন্যাস তেমনি বর্তমান কালের সমস্যা-জটিল জীবনের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ। বাংলাদেশে উনিশের শতকের শেষ অংশ ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ দলাদলি, হিন্দু-ব্রাহ্ম সংঘাত, 'নব্যহিন্দুত্ব' আন্দোলনের মাথা নাড়া, বিবেকানন্দের আহ্বান, 'স্বদেশী' চিন্তার ও কর্মপ্রণালীর মধ্যে বিচিত্র দ্বন্দ্বে তরঙ্গচঞ্চল। এই সব আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া নরনারীর জীবনকে আবর্তিত ও রূপান্তরিত করেছে—সেই 'totality' গোরা উপন্যাসে মূর্ত হয়েছে। 'গোরা'-চরিত্র কল্পিত হয়েছিল 'সিস্টার নিবেদিতা'কে আদর্শ রেখে। সেইজন্যই গোরা আইরিশ। সেইজন্যই গোরার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয়েছিল। নিবেদিতাকেও হিন্দু-সমাজ, এমনকি রামকৃষ্ণ মিশনও যোগ্য সমাদর করেন নি। যাই হোক, উপন্যাস হিসাবে গোরা বাংলা কথা-সাহিত্যে একটি অক্ষয় স্তম্ভ। যে Revivalism আমাদের রেণেসাঁস-এর সঙ্গে চিরদিনই যুক্ত ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, এমনকি রবীন্দ্রনাথও তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। 'গোরা' চরিত্রের প্রথম অংশে Revivalism-এর জয়গান, শেষ অংশে সকল সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, জাতীয়ত্ব, সাম্প্রদায়িক ধর্ম থেকে তার মুক্তি। এ মুক্তি প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই মুক্তি। গোরায় রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ artist ও thinker।

৩

বিংশ শতকের প্রথম দশক বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। স্বদেশী গানে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধ-রচনায় দেশে তখন জীবন-চাঞ্চল্যের সাড়া প'ড়ে গেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরীশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদের দেশাত্মবোধক নাটক তখন খুব জনপ্রিয়। 'অগ্নিযুগ'-এর সূত্রপাতও এই সময়ে। কিন্তু উপন্যাসে এই যুগের প্রভাব বেশি নেই।

তখনও হয় সামাজিক, ব্যঙ্গবিদ্রূপের, নয়, নীতি উপদেশের অথবা অতি-নাটকীয় রোমান্স-এর যুগ চলছে। এই পর্যায়ে ত্রৈলোক্যনাথের 'ফোকলা দিগম্বর' (১৯০০), মুক্তামালা (১৯০১), ময়না কোথায় (১৯০৪), যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু-র শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (১৯০২), নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের তমস্বিনী (১৯০০), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, নাগরিক সমাজের যে ব্যাপ্তি, মধ্যবিত্ত সমাজের যে প্রসার, শিল্পবিপ্লবের যে সূচনা অন্যান্য দেশে হয়েছে, আমাদের দেশে তা হয় নি। ফ্রান্সে ভলতেয়র, দিদেরো, হুগো, বালজাক, জোলা যেমন ভাবে রাজতন্ত্র, স্বৈরাচার ও শোষণের বিরোধিতা ক'রে নির্যাতিত হয়েছেন, আমাদের দেশে সেরকম ঘটে নি। আর রুশ-সাহিত্যের কথা ত প্রশ্নের বাইরে। তখনো আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণীর আন্দোলন আর সে আন্দোলনও 'নরমপন্থী'দের হাতে। উগ্রপন্থীরা লক্ষ্যহীন। তাছাড়া ইংরেজ সম্পর্কে তখনো আমাদের মোহভঙ্গ হয় নি, মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রা ভারসাম্য হারায় নি। তখন একদিকে বিবেকানন্দের কর্মযোগের প্রভাব; অন্যদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আহ্বান; অপরদিকে আই. সি. এস. অথবা ব্যারিস্টারির আকর্ষণ, অথবা শেষ পর্যন্ত কেরাণীগিরি। সাহিত্যের মধ্যে কাব্যচর্চাই তখন বেশ প্রবল।

'চোখের বালি'র পর 'নৌকাডুবি' রচিত হবার পূর্বে এলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রমাসুন্দরী' নিয়ে। 'রমাসুন্দরী' 'ভারতী'তে বেরিয়েছিল ১৩০৯-১০ সালে। উপন্যাসটি বৈশিষ্ট্যহীন। কিন্তু 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২) বিশিষ্টতাপূর্ণ। বিশেষত: গদাই পাল চরিত্রটি অতুলনীয় সৃষ্টি। তাঁর 'রত্নদীপ' (১৯১৫) ও 'সিন্দুর কৌটা' (১৯১৯) বাংলা উপন্যাসে বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে শুধু নয়, তিনি মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রভাতকুমার বিলাত-ফেরত হলেও হিন্দু-সংস্কার-এর জয় দেখালেন সিন্দুর কৌটায়। সহজ-ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির জন্য যে কৃতিত্ব আমরা শরৎচন্দ্রকে দান করি, তার কিছু প্রভাতকুমারের প্রাপ্য।

৪

এই সময়ে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হল। তখন স্বদেশী আন্দোলন ও অগ্নিযুগের দাহ নেই, যে-বেগে জোয়ার এসেছিল সেই ধরণে তার ভাঁটাও হল তীব্র। আর ১৯১১-র ঘোষণার পর ভাঙা বাংলা জোড়া লাগায় সবার ক্ষোভ চ'লে গেল। শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' বার হল ১৯১২-তে। তারপর দ্রুতগতিতে এল 'বিরাজ-বৌ' (১৯১৪), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭)। শরৎচন্দ্র সাহিত্যে 'গুরুবাদ' মেনে নিয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরুর আসনে বসিয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক হন নি। শরৎচন্দ্র সাধারণ-শিক্ষিত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী ছিলেন, কিছুকাল ভবঘুরে ও সন্ন্যাসীর জীবনও যাপন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইল কিংবা রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি বা গোরা পাঠকসাধারণের সুবোধ্য হয় নি। শরৎচন্দ্র বোধ্য ভাষায়, পরিচিত সমাজের চেনা নর-নারীকে নিয়ে এলেন। তারকনাথের 'স্বর্ণলতা', রমেশ দত্তের 'সংসার' ও 'সমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবউ'-এর সঙ্গে অবশ্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে এক পংক্তিতে বসানো চলবে না। শরৎচন্দ্র আর একটি কথা তুললেন: "সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলি নে, কিন্তু একেই তার নারী-জীবনের চরম ও পরম শ্রেয় জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি।" শরৎচন্দ্রের বই পড়া সেদিন নিশ্চিত ব্যাপার ছিল। যেমন এককালে ছিল 'বিষবৃক্ষ' বা 'চোখের বালি' পড়া। রূপ বর্ণনা, পরিবেশ বর্ণনা, প্রভৃতি শরৎচন্দ্র প্রায় বর্জন করলেন। গল্পের যে যাদুশক্তি মন ভোলায় শরৎচন্দ্র সেই গল্প-কথকের আর্টকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিলেন। তার সঙ্গে মিশেছিল সামাজিক অভিজ্ঞতা, মানবিক সহানুভূতি ও শিল্পীর স্বচ্ছ দৃষ্টি। তবে শরৎচন্দ্র নিজেকে যতই 'বিদ্রোহী' বলুন, তিনি দেবদাসকে যক্ষ্মাগ্রস্ত, কিরণময়ীকে পাগল, রমাকে কাশীবাসিনী, বিরাজকে কুষ্ঠরোগিণী করেছেন। তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছেন অন্নদাদিদি—যিনি অম্লানবদনে কলঙ্কের পসরা মাথায় নিয়ে বিধর্মী, শ্বশুরহত্যাকারী, নেশাগ্রস্ত, লম্পটের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিলেন। তাই নারীকে অতিমাত্রায় idealize করা শরৎচন্দ্রের ত্রুটি ব'লেই গণ্য হবে। শরৎচন্দ্রের জীবন সম্পর্কে ধারণা যতটা বিস্তৃত বা ব্যাপক ততটা গভীর নয়—এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য উদ্দেশ্য নিয়ে। শরৎচন্দ্র অনেকটা ডিকেন্স-এর মতো social novel লিখবার প্রেরণা বোধ করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে সেজন্য ভাবপ্রবণতা, অশ্রুসজলতা যেমন আছে, তেমনি সমাজের বিরুদ্ধে প্রশ্নও আছে। 'যাদের চোখের জলের হিসেব কেউ নিলে না' তাদের হয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এদিকে আসেন নি,

বাস্তব-সমাজ-নিরপেক্ষ রোমান্টিক কল্পনার প্রকাশ দেখা দিল 'রমলা'য়। ১৩২৯-এর 'প্রবাসী'তে এই উপন্যাস বার হয়। এ যে জগতের নরনারীর উপন্যাস সে জগৎ আমাদের বাস্তব-অভিজ্ঞতা ও পরিচয়ের বাইরে স্বপ্নের মায়াময় জগৎ ব'লেই মনে হয়। তার তুলনায় মণীন্দ্রলালের পরবর্তী কালের উপন্যাস 'জীবনায়ন' (১৯৩৬) জীবন-ধর্মী। অরুণ ও উমা চরিত্র-দুটি পাকা হাতে আঁকা। 'জীবনায়নে'র পূর্বে তিরিশ দশকের প্রথম দিকেই 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত স্থপরিকল্পিত 'শৃঙ্খল' (গ্রন্থাকারে পরবর্তীকালে নাম হয় 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা') উপন্যাসে সুধীরকুমার চৌধুরী রোমান্টিকতা ও বাস্তববোধের গাঢ়তর সমন্বয় সাধন করেন। উক্ত গ্রন্থের ঘটনা-সন্নিবেশ ও চরিত্রচিত্রে যুগের অস্থির ও অনিশ্চিত চিহ্ন বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্যে উপস্থিত।

উনিশের শতকে বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার শুরু। বিদ্যাসাগর, ভূদেব, মেরি কার্পেণ্টার, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের প্রচেষ্টায় সে শিক্ষা প্রসারিত হতে থাকে। উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী দেবী নিজের আসন স্থায়ী ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁর দীপনির্বাণ, বিদ্রোহ, স্নেহলতা, কাহাকে, তার প্রমাণ। কিন্তু বিংশ শতকে বহু লেখিকা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিলেন। একসঙ্গে এ রকম প্রথম শ্রেণীর বহু লেখিকার আবির্ভাব ইংরেজি বা ফরাসী সাহিত্যেও দেখা যায় না। বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে এলেন অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, গিরিবালা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, প্রভৃতি শক্তিময়ী লেখিকারা। অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী হিন্দুসমাজের পারিবারিক ও গার্হস্থ্যজীবনের বিশ্বস্ত কাহিনী রচনা করেছেন। অন্যদিকে সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর উপন্যাসে আধুনিক শিক্ষিতা নারীর মর্য্যাদা, হৃদয়বেদনা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী রবীন্দ্রপন্থার লেখিকা নন। বরং তাঁরা শরৎচন্দ্রের ধারার সঙ্গে যুক্ত কিন্তু শরৎচন্দ্রের ছায়া নন। অনুরূপা দেবী একদিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' রচনা করেছেন—রামগড়, ত্রিবেণী। আবার বাংলাদেশের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকদের কেন্দ্র ক'রে লিখেছেন 'পথহারা', অন্যদিকে 'মা', 'গরীবের মেয়ে', 'উত্তরায়ণ', প্রভৃতি উপন্যাসে যে-সংযম, মনোবিশ্লেষণ, ঘটনা-সংঘাতের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তিনি প্রথম শ্রেণীর লেখিকা হবার যোগ্যতা প্রদর্শন করেছেন। নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ও 'দিদি' স্মরণীয় রচনা। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ও 'দিদি' দুখানি উপন্যাসেই ত্যাগের মহিমা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। গল্পও চমৎকার ভাবে বলা হয়েছে। চরিত্রসৃষ্টিতে নিরুপমা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে'র সতী এবং 'দিদি'র সুরমা অপূর্ব সৃষ্টি। বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথ 'সুভা' গল্পে যেমন একটি মূক মেয়েকে এনেছিলেন, নিরুপমা দেবী তাঁর 'শ্যামলী' উপন্যাসে একটি মূক কন্যার হৃদয়ের অব্যক্ত হাহাকার উচ্চাঙ্গের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রূপায়িত করেছেন। শৈলবালা ঘোষজায়ার একটি গল্প 'প্রবাসী'র প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেছিল (১৯১৫)। উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেখ আন্দু, জন্ম-অপরাধী, বিপত্তি, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা।

সীতা দেবী ও শান্তা দেবী যেন রত্নটি ভগ্নীদ্বয়ের মত বাংলা সাহিত্যে এলেন। সীতা দেবীর উল্লেখযোগ্য রচনা 'রজনীগন্ধা', 'বন্যা', 'মাতৃঋণ'। এসব উপন্যাসে তত্ত্ব নেই, প্রচার নেই, কোনও দুর্বোধ্যতা নেই, অসংলগ্নতা নেই। 'রজনীগন্ধা'য় নারীহৃদয়ের যে-প্রেম, 'বন্যা'য় নারীর যে বিদ্রোহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং মাতৃঋণে নারীর যে মমতা ও অধিকাররক্ষা ফুটে উঠেছে তাতে বাংলা উপন্যাসে আধুনিক দৃষ্টির ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। বিষয়বস্তু বা দৃষ্টিভঙ্গির দিক্ থেকে শান্তা দেবী তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নীর সমগোত্রীয়া। ১৯১৯-এ প্রবাসী পত্রিকায় 'শ্রীসংযুক্তা দেবী' ছদ্মনামে তাঁরা দুবোনে 'উদ্যানলতা' লিখেছিলেন। শান্তা দেবীর দুখানি উপন্যাস উল্লেখযোগ্য,—চিরন্তনী (১৯২১) ও জীবনদোলা (১৯৩০)। চিরন্তনী ও রজনীগন্ধা প্রায় একই ধরণের উপন্যাস। লেখিকার কৃতিত্ব দেখা দিয়েছে 'জীবনদোলা'য়। একটি বিধবা নারী গৌরী এর নায়িকা। কুন্দ, রোহিণী, বিনোদিনী, দামিনী বা সতী—সবার থেকে এ চরিত্র স্বতন্ত্র।

উপন্যাস-ক্ষেত্র দেশ ছেড়ে বিদেশে গেল। একদিকে শরৎচন্দ্রের রচনায়, অন্যদিকে দিলীপকুমার রায়, অন্নদাশঙ্করের লেখায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে দেখা দিল বর্মা। তাঁর 'পথের দাবী'র মূল ঘাঁটি বর্মা, যদিও নায়ক-নায়িকা বাঙালী। দিলীপকুমার ও অন্নদাশঙ্কর নিয়ে গেলেন ইউরোপে। কিন্তু বহিরঙ্গের এই বৈচিত্র্যের জন্যই উপন্যাসগুলির মূল্য নয়। যাকে আমরা Intellectualism বলি, যা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বিশ শতকের শুরু থেকেই দেখা দিয়েছিল, আমাদের বিংশশতকের দ্বিতীয় দশকে 'গোরা' ছাড়া আর কোথাও তা নেই। আর 'গোরা'র

ঘটনা উনিশের শতকের শেষ পাদে স্থাপিত। সেখানে বিংশ শতকের সমস্যা, মননশীলতা, বুদ্ধিবাদের স্থান হয় নি। 'সবুজপত্র' বাংলা দেশে ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রতীক প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে Intellect-এর চর্চা শুরু করে। সেখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, সাহিত্যিক ও দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক সর্বশাস্ত্রের ভোজ চলত। দিলীপ-কুমার ও অন্নদাশঙ্কর সেই মননশীলতার দিকটি নিয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনই ইউরোপে বাস করেছেন, শিক্ষালাভ করেছেন, মুক্ত মন নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার কথা ভেবেছেন। দিলীপকুমারের 'মনের পরশ' (১৯২৬), 'রঙের পরশ' (১৯৩৪), 'বহুবল্লভ', 'দু'ধারা' (১৯৩৫) উপন্যাসগুলিতে অন্নদাশঙ্করের সর্বাত্মক মননশীলতার চেয়ে প্রেম ও হৃদয়-সম্পর্কের বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের দিকটি আলোচিত হয়েছে।

অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য' বৃহৎ উপন্যাস। এ উপন্যাসে প্রচলিত গল্পকথন, চরিত্রসৃষ্টি, পরিবেশ-সৃষ্টি নেই। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর দুর্লভ মাত্রাবোধের অধিকারী। তিনি জানেন কোথায় থামতে হয়। 'সত্যাসত্য' দীর্ঘকাল ধ'রে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর শুরু ১৯৩২-এ, শেষ ১৯৪২-এ। তিনি 'সত্যাসত্য'কে যে স্তরে উন্নীত করেছেন সেখানে তিনি অপরাজেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল, রুশ বিপ্লব, বলশেভিক-মেনশেভিক দ্বন্দ্ব, শ্রমিক আন্দোলন, প্রেম ও বিবাহ, pacifist আন্দোলন, ধর্মোন্মত্ততা, কিছুই অন্নদাশঙ্করের দিগন্তবিস্তারী বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি থেকে বাদ পড়ে নি। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে চিন্তাশীল তরুণমন যে সব প্রশ্নের সমাধান খুঁজে খুঁজে ফিরেছে, অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য' তারই 'এপিক' রূপায়ণ। অথচ শেষ গল্প একটি উপসংহারে এসে ঠেকেছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহানা' (১৯৩৫-৪৩) এই পর্যায়ের রচনা। এখানে অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসের মত সারা বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সমাজনৈতিক সমস্যা ও প্রশ্নের তর্কবিতর্ক নেই; প্রথম দুটি পর্বে মনস্তত্ত্ব নয়, মনোবিকলনতত্ত্ব (revolt of sex-নয়) সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রধান রীতিতে খগেনবাবু, সুজন ও রমলাদেবীর জীবনেতিহাস আশ্রয় ক'রে বিশ্লেষিত হয়েছে। তৃতীয় পর্বে সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারা সাম্যবাদ, শ্রমিক আন্দোলন সবই এসেছে এই মননশীলতার পথ বেয়ে। শেষাংশে খগেনবাবু ও রমলার বিচ্ছেদ ঘটল রাজনৈতিক কর্মাদর্শের জন্য। খগেনবাবু শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিলেন—'রমলা' প্রকৃতি, সে জীবনের ভোগ-স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিত্যাগ করল না। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের কথাসাহিতের মননশীলতা, মনোবিকলন, যৌনচেতনা, বুদ্ধিধর্মিতা ধূর্জটিপ্রসাদ বুদ্ধিজীবী হিসাবে অবগত। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবেও যে তিনি কত বড় তার পরিচয় এই ত্রয়ী উপন্যাস।

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১) এই পর্যায়েরই রচনা। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের উপন্যাসে এই ধরণের মননশীলতা দেখা যাচ্ছে না। মননশীলতার ক্ষেত্রে যেমন দিলীপকুমার, অন্নদাশংকর, ধূর্জটিপ্রসাদ,—বাংলা দেশের গ্রাম-জীবনের, তার মাটি ও মানুষের নতুন পরিচয় দেখা দিল বিভূতিভূষণ, তারাশংকর ও সরোজ রায়চৌধুরীর উপন্যাসে। বিভূতিভূষণ উপন্যাসের ক্ষেত্রে আগে এসেছেন, ১৯২৯-এ তাঁর 'পথের পাঁচালী' বার হয়। তারাশংকরের প্রকৃত উপন্যাস 'ধাত্রী-দেবতা' বার হয় ১৯৩৯-এ। সরোজবাবুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপন্যাসত্রয় ময়ুরাক্ষী, গৃহকপোতী, সোমলতা, বিভূতিবাবুর পর বার হয়েছে।

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' বাংলা উপন্যাসে একটি নতুন দিক্ খুলে দিল। ক্রমোদ্‌ভিন্ন শিশুমন ও নিসর্গজীবনের রহস্যময় অন্তরঙ্গতা আর তারই সঙ্গে মন্দগতি ইছামতীর মত গ্রামীনজীবনের স্রোতবহ রূপ আশ্চর্য অকৃত্রিমতায় ফুটে উঠল। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসখানিকে অভিনন্দন জানালেন। পরে বিভূতিবাবুর অনেক বই বার হয়েছে কিন্তু 'পথের পাঁচালী'-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তারাশংকরের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব তিরিশের শুরুতে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে আসেন তিরিশের শেষে। 'ধাত্রীদেবতা' ১৯৩৮-এ শনিবারের চিঠিতে বার হয়। 'কালিন্দী' বার হয় ১৯৪০-এ। তারাশংকরের রচনায় আত্মপ্রকাশ করল রাঢ় অঞ্চল, বীরভূমের জমিদার, জোতদার, আধিয়ার, বাউরী, সাঁওতাল, ভূমিহীন চাষী—যাদের কথা উপন্যাসে ব্যাপক রূপ পায় নি, যদিও শৈলজানন্দের ছোটগল্পে এরা পূর্বেই স্থান পেয়েছিল। তারাশংকর যে যুগে অর্থ, পদ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা কিছুর জন্য লেখেন নি। মাটি ও মানুষের তিনি বন্ধু, ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের নায়করূপে যাঁদের এঁকেছেন তাঁদের প্রতিও ব্যঙ্গ করেন নি। আবার তাঁর শিবনাথ নন্‌কোঅপারেশনে জেলে গেছে, অহীন কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। সরোজকুমার মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বোষ্টম-বৈরাগী-জীবনের মহাকাব্য রচনা করলেন পূর্বোক্ত ত্রয়ী উপন্যাসে। তাঁর কাহিনীতে নাটকীয়তা নেই, গল্প-বলায় আড়ষ্টতা নেই, নদীর স্রোতের মত সে ব'হে গেছে। ১৯৩৬-এর থেকে বাংলাদেশে মার্ক্‌সবাদ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী

মহলে তথা প্রাক্তন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত রাজনৈতিক কর্মীমহলে প্রসার লাভ করে। এক সময় নজরুল ইসলাম সাম্যের গান গেয়েছিলেন, "ইন্টারন্যাশনালে"র ভাষান্তর করেছিলেন, কিন্তু তখনও সাম্যবাদ ছিল আবেগময় মানব-প্রীতির দৃষ্টি থেকে দেখা। কিন্তু এবার মার্ক্‌সবাদ তার বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদ নিয়ে বাঙালী তরুণ বুদ্ধিজীবীমহলে আলোড়ন তুলল। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে আর উড়িয়ে দেওয়া চলল না। প্রগতি লেখকসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং এই সঙ্ঘের নেতৃস্থানীয় অনেকেই মার্ক্‌সপন্থী দৃষ্টিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তখনকার উপন্যাসে এই দৃষ্টির সুষ্ঠু প্রয়োগ বেশি দেখা গেল না।

তিরিশের যুগে আরেক জন শক্তিশালী লেখক দেখা দিলেন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন আর সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তিনি প্রয়োগ করলেন প্রথমে যৌনসমস্যা সম্পর্কে। ফ্রয়েডীয় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আমাদের চিরাচরিত ও পোষিত ধারণা, সংস্কার ও taboo-গুলির মুখোশ ছিঁড়ে দিয়েছিল— মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাসী হয়ে রচনা করলেন তাঁর ক্লাসিক উপন্যাস—'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬-এ)। মাণিকবাবু কল্লোলীদের হামসুন-পন্থী নন। তিনি ফ্রয়েড-পন্থী—মনোবিকলন তত্ত্বের নিষ্ঠাবান্ ছাত্র। বিভূতিবাবুর উপন্যাসে যশোর, তারাশংকরে বীরভূম, সরোজকুমারে মুর্শিদাবাদ আর মাণিকে এলো পদ্মানদীর চর।

মাণিক সারা বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যেকে সেদিন চমকিত করেছিলেন তাঁর বলিষ্ঠ, নিরাসক্ত, বৈজ্ঞানিক দুঃসাহসী প্রচেষ্টায়। তিনি নিজে লিখেছেন :

"ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। কোন সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ দিতে পারি নি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব মিটিয়েছি।"

ঔপন্যাসিকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকার ও প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"বিজ্ঞানচর্চা না করেও এবং সম্পূর্ণরূপে নিজের অজ্ঞাতসারে হলেও ঔপন্যাসিক খানিকটা দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।"

উদ্ধৃতি দুটিতে যেকথা বলা হ'ল মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পকর্ম তারই সাক্ষ্য।

প্রুস্ত ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌-এর টেকনিকে রাজনৈতিক বন্দীজীবনের একটি দিনের পূর্বস্মৃতিমূলক উপন্যাসে গোপাল হালদারের 'একদা' (১৯৩৯) বাংলা সাহিত্যে অনন্য। মনন ও হৃদয়াবেগ, বাস্তবধর্মিতা ও জীবনজিজ্ঞাসা, আত্মানুসন্ধান ও বিশ্লেষণে 'একদা' অ-সাধারণ উপন্যাস।

১০

জার্মানীর রুশিয়া আক্রমণ এবং জাপানের পার্ল-হারবারে বোমা ফেলবার সময় থেকে পৃথিবীর রাজনৈতিক চাকা ঘুরে গেল। ভারতবর্ষ ১৯৩৯-৪০-এ যুদ্ধ ঠিক টের পায় নি। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরের পর থেকে পোড়ামাটি-নীতি, ইভাকুয়েশন, যুদ্ধপ্রস্তুতি, ক্রমশঃ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, বিদেশী সৈন্য আমদানিতে কলকাতা থেকে বাংলা দেশের গ্রামান্ত অবধি যুদ্ধের কালোছায়া ও কালোবাজার ছেয়ে গেল। তখন এলো ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন। এই সময়ের পূর্বে সাহিত্যিকেরা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শিল্পীসঙ্ঘ স্থাপন করেন, কিন্তু গোলমাল বাধল আগস্ট আন্দোলনের পর থেকে। কংগ্রেসপন্থী সাহিত্যিকেরা কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘ গঠন করলেন—কিন্তু কেউ জেলে গেলেন না। কমিউনিস্টপন্থী ও ফ্যাসিস্টবিরোধীরা এই যুদ্ধকে public war বলে ঘোষণা করলেন এবং সেই সময়ে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকেরা তার নেতৃত্ব করেন। তারাশংকর এর কিছু আগে 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' লিখেছেন; যুদ্ধ ঠিক তাঁকে তখনো স্পর্শ করে নি। সুখী, স্বয়ংসম্পূর্ণ, যৌথ শতগ্রামের পরিকল্পনা করেছেন তারাশংকর। আর যুদ্ধের ও রাজনৈতিক সংঘাতের পটভূমিকায় লিখলেন 'মন্বন্তর'। সেখানে তিনি কমিউনিস্ট কর্মীকে নায়ক ক'রে তাদের জীবনাদর্শ ও কর্মপন্থাকে সমর্থন জানালেন। যুদ্ধের সঙ্গে এসেছিল ১৩৫০-এর মহামন্বন্তর। তার রূপ সেদিনকার ছোটগল্পে জীবন্ত ভাবে ধরা পড়েছে। এ যুগে আর্ট ও জার্ণালিজমের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছে তাতে উপন্যাসে রক্তসঞ্চার হয়েছে। উপন্যাস ও রাজনীতি মিলেছে—সেটাই সে যুগে স্বাভাবিক ছিল। সেদিন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় চ'লে এলেন মার্ক্‌স-পন্থায়। একদিন ফ্রয়েডকে গ্রহণ করেছিলেন কোনও "সস্তায় কিস্তি মাৎ" করবার জন্যে নয়—বৈজ্ঞানিক প্রবণতায়, এখন

মার্ক্‌সকে গ্রহণ করলেন—তার কারণ, দেখেছিলেন, সমাজের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা না জানলে সমাজকে জানাটাই অপূর্ণ থাকে। বিংশ শতকের সবচেয়ে জোরালো দুটি শক্তি ফ্রয়েডবাদ ও মার্ক্‌সবাদ তাঁর রচনায় সমন্বিত হয়েছে।

যুদ্ধের বাজারে ঔপন্যাসিকদের trade-এর দিক্‌ থেকে সুবিধা হ'ল। নগদ পয়সা দিয়ে বই কেনা reading public শতগুণ বেড়ে গেল। তারা বিশেষ কোন উচ্চাঙ্গের বই চায় নি, মোটা, উত্তেজক বই চেয়েছিল। কিন্তু মানতেই হবে, সেদিন আমাদের প্রবীণ, প্রতিষ্ঠিত লেখকরা বিশেষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। মানবজীবনের চিরন্তন রহস্য, হৃদয়াবেগ, মেঘ ও রৌদ্রের কাহিনী তখনও রচিত হয়েছে। তারাশংকরের 'কবি', অমলাদেবীর 'চাওয়া ও পাওয়া', বনফুলের 'মৃগয়া' তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু সাধারণ লেখকের 'সস্তা' লেখায় বাজার ছেয়ে গেল।

১১

এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু-আগমন, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ চলা শুরু করল। যুদ্ধের সময় যে দুর্নীতি, চোরাকারবার চলছিল তা থামল না, যুদ্ধ-ফেরত বিকৃতরুচি যুবক দলে দলে ফিরল, যুদ্ধের সময়ের 'মাসাজ ক্লিনিকে'র দরজা খোলা রইল। অর্থনীতি ও নীতি দুয়ের পাল্লাই নেমে গেল। মধ্যবিত্ত সমাজের এক বিরাট্‌ অংশ ধ্বসে গেল—আরেক অংশ সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার পূর্ণফল পেলো। যুদ্ধ আমাদের অনেক অন্যায় বেড়া ভেঙেছে—তার চেয়েও বেশি ভেঙেছে ন্যায়, নীতি, সাধুতা, অর্থাৎ human values-এর বেড়া। আর অর্থোপার্জনের নেশা এবার ঔপন্যাসিকদের পেয়ে বসল। তার সঙ্গে এল রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের লোভ। এল চলচ্চিত্রের গল্প লেখার প্রতিযোগিতা। আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা সার্থক উপন্যাস 'জাগরী' যুদ্ধোত্তরকালে রচিত। ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির একজন কর্মীর স্মৃতিমন্থন দিয়ে উপন্যাসের শুরু। গান্ধীবাদী বাবা, মা জেলে। কমিউনিস্ট ভাই জেলের বাইরে অপেক্ষমান। চারটি চরিত্রের এক রাত্রির স্মৃতিমন্থনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি গ'ড়ে উঠেছে। সতীনাথ ভাদুড়ী প্রত্যেকটি চরিত্রকে যথাশক্তি 'সহানুভূতি'র সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। সেখানে তিনি নিরাসক্ত শিল্পী। প্রবীণদের মধ্যে যুদ্ধোত্তর যুগে তারাশংকর দুখানি অপরূপ 'Saga' ধর্মী উপন্যাস লেখেন, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'। তার পর থেকে তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের অপমৃত্যু—তিনি আজ নানা ভাবে 'যোগভ্রষ্ট'। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন পথ খুঁজছিলেন কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। প্রবোধকুমারের 'হাঁসুবানু', 'পুষ্পধনু' immature লেখা। প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুনশী'তে ঐতিহাসিক ও রসিক চিত্তের নিদর্শন পাই। বনফুল নতুন দিগন্ত প্রসারিত করেছেন 'স্থাবর' ও 'জঙ্গমে'। গোপাল হালদারও কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছেন—তাতে যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা প্রধানতঃ ধরা পড়েছে। গজেন্দ্রনাথ মিত্র সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লিখেছেন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—'বহ্নিবন্যা'। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যেন যথার্থই 'জাতিস্মর', তাঁর 'গৌড়মল্লার' প্রাচীন ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত চমৎকার লেখা। সঞ্জয় ভট্টাচার্য বাইরের জগতের চেয়ে মনের জগতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দুরূহ-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। মনোজগতের যে-স্তরে চেতন-অচেতনের সূক্ষ্ম টানা-পোড়েন তার স্মরণীয় শিল্পরূপ 'সৃষ্টি'।

১২

প্রবীণদের কথা ছেড়ে দিলে ১৯৪২-এর পর থেকে বহু শক্তিশালী নবীন ঔপন্যাসিক দেখা দিয়েছেন; তাঁদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, সন্তোষ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রাণতোষ ঘটক, অমিয় মজুমদার, বিমল মিত্র, অসীম রায়, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে লীলা মজুমদার ও প্রতিভা বসু পাঠকমনে স্থায়ী জায়গা ক'রে নিয়েছেন। উনিশের শতকের পটভূমিকায় উপন্যাস লিখেছেন বিমল মিত্র—'সাহেব বিবি গোলাম', প্রাণতোষ ঘটক—'আকাশ-পাতাল', সমরেশ বসু—'উত্তরঙ্গ'। অমিয় মজুমদারের 'নীল ভুঁইয়া'ও এই পর্যায়ভুক্ত। এঁরা রোমান্স লিখবার জন্য ঠিক এগুলি লেখেন নি। আধুনিক কালে মানুষকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পটভূমিকায় রেখে (অর্থাৎ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি) দেখবার যে প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে, ত্রুটি সত্ত্বেও তাকে সাধু প্রচেষ্টা বলতে হবে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পদসঞ্চার' একটি সার্থক সৃষ্টি; তাঁর সমকালীন জীবন নিয়ে লেখা 'শিলালিপি', 'লালমাটি' অনবদ্য রচনা। রাজনৈতিক আদর্শকে যিনি শিল্পীজীবনে গভীরভাবে গ্রহণ করেন তাঁর উপন্যাস যে 'প্রচার' না হয়ে 'শিল্প' হয় নারায়ণবাবুর রচনা তার দৃষ্টান্ত। নরেন্দ্র মিত্রের

পথ ভিন্ন। যৌনসমস্যা সম্পর্কে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তিনিই তার ধারাকে বহন করেছেন। 'চেনা মহল' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। সমরেশ বসুর প্রগতিশীল দৃষ্টি শিল্পীর অভিজ্ঞ মানবিক সহবেদনা তাঁকে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকে মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। 'গঙ্গা' ও 'ত্রিধারা' তাঁর দুই স্তরের জীবনের দুটি বিশিষ্ট উপন্যাস। জটিল নাগরিক জীবনের বিকৃত অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের যন্ত্রণা পাঠে সন্তোষ ঘোষ কুশলী শিল্পী। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অবক্ষয়ী দৃষ্টির লেখক। যদিও 'ন্যাচারালিস্ট'দের মতো তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী। অসীম রায়ের 'একালের কথা', ও 'গোপালদেব' উপন্যাসে প্রতিশ্রুতির আভাস আছে। এই প্রসঙ্গে আরও লেখকের নাম করা উচিত—ছদ্মনামী দীপক চৌধুরী ও অবধূতের। দীপক চৌধুরীর 'নরকে এক ঋতু' বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। সে উদ্দেশ্য, ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা। 'অবধূত'-এর উপন্যাস 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'কে বলা হয়েছে 'শ্মশানের মহাকাব্য'—মহাকাব্য শব্দটির এমন অপপ্রয়োগ কদাচিৎ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এটিকে বলা যায় 'মহাকাব্যের শ্মশান'। মধ্যবিত্ত হিন্দু পাঠকমনে তান্ত্রিক সাধু ও 'শক্তি'সাধনা সম্পর্কে ভয়মিশ্রিত কৌতূহল বাসা বেঁধে আছে। চতুর 'অবধূত' সেই কৌতূহলকে exploit করেছেন। একটির পর একটি বীভৎসদৃশ্য ছকের পর ছক পেতে ফেলা হয়েছে, যাতে মনের স্বাস্থ্য ঘুলিয়ে উঠতে দেরি না হয়। ষ্টেফান জাইগ-এর এর একটি গল্পে আছে ফ্রান্সে জনৈক আমেরিকান অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল অধ্যাপনার বিষয় সম্পর্কে। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—ধর্ম ও যৌনতত্ত্ব। অবধূত সেই 'কম্পাউণ্ড মিক্‌স্‌চার' বানিয়েছেন।

আজ আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের পরিধি অনেক প্রসারিত হয়েছে। তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় ছিল রাঢ়, সমরেশ বসুতে 'গঙ্গা', মনোজ বসুতে খুলনা চব্বিশ পরগণার সমুদ্রসীমান্ত বাদা (জলজঙ্গল), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ে 'চর ইসমাইল' 'উপনিবেশ', অমরেন্দ্র ঘোষে 'চর কাশেম', প্রফুল্ল রায়ে নাগা দেশ (পূর্বপার্বতী), জরাসন্ধে কারা ও কয়েদী-জীবন (লৌহকপাট), বরেন বসুতে প্রত্যক্ষ সৈনিকজীবন (রংরুট), নারায়ণ সান্যালে উদ্বাস্তুজীবন (বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প), গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যে যন্ত্রনগরী (ইস্পাতের স্বাক্ষর), গোলাম কুদ্দুসে মুসলমান পরিবারে বাঁদী-জীবন (বাঁদী), চাণক্য সেনে আফ্রিকার 'সূর্যহারা অরণ্যের মানুষ' (রাজপথ-জনপথ), আরও অনেক দেখানো যায় এভাবে। কিন্তু এই বাস্তবতা, বৈচিত্র্য, অভিনবত্ব থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসের যে depth আমরা চিরদিন বড় ব'লে মনে করি তার পরিচয় বেশী পাওয়া যাচ্ছে না। টেক্‌নিকের দিক্ থেকেও অনেক পরীক্ষা নিষ্ঠার সঙ্গে চলছে—আবার কখনও বা সিনেমার টেক্‌নিককে উপন্যাসে নিয়ে আসা হচ্ছে।

উপন্যাস জাতীয়-জীবনের দর্পণ। আজ জাতীয়-জীবনে স্বস্তি কম, নিশ্চয়তা কম, ভাববার সময় কম। যেমন রাশি রাশি স্কুল হচ্ছে কিন্তু শিক্ষার মান উঠছে না, তেমনি অসংখ্য উপন্যাস রচিত হচ্ছে—কিন্তু উপন্যাসের মান নামছে। অগণ্য 'ফিল্‌ম্' তৈরী হচ্ছে কিন্তু দেখবার 'অযোগ্য' ফিল্‌ম্‌ই বেশি। তার কারণ প্রযোজক বহু হয়েছে, প্রকাশকও হয়েছে প্রচুর। প্রযোজকের চাই 'হিট' ফিল্‌ম্, প্রকাশকের চাই হিট নভেল। এই অসুস্থ প্রতিযোগিতায় দুইই চোরাবালিতে পা ফেলছে। এইসূত্রে পূর্ব-বাংলার কথাসাহিত্যের প্রসঙ্গ আলোচনা করা উচিত, বাঙালী মুসলমান-সমাজ পাকিস্তান হবার পূর্ব পর্যন্ত একান্তই গ্রামীন ও কৃষিনির্ভর ছিলেন। মধ্যবিত্তের সংখ্যা ছিল খুব কম। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হবার পর সেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের দ্রুত প্রসার ঘটেছে। মুসলমান মেয়েরা বোরখা খুলে আলোয় বেরিয়ে এসেছে। সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। মুসলমান অধ্যাপিকা ছেলেদের ক্লাসে পড়াচ্ছেন। এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবে মুসলমান-সমাজ আলোড়িত হচ্ছে—এবার তার উপন্যাস নবধর্মে উজ্জীবিত হবে। আর একদিকে তরুণ লেখকদের মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর মমতা দেখা দিয়েছে। আশা করা যায়, পূর্ব-বাংলার কথা-সাহিত্য অবক্ষয়ের পথে না গিয়ে মানুষের জীবনের মহাকাব্য রচনায় অগ্রগামী হবে।

ষাট বছরের বাংলা উপন্যাসের শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সৎ বাঙালী পাঠক বাংলা উপন্যাসের প'রে আস্থা সম্পূর্ণ হারাবে না। কেননা এখনও মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী লেখক আছেন।

অরণ্য-মাতা

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

অনেক দিন আগেকার একটি স্মৃতির সৌরভে মন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। মেটাজীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বোম্বাই শহরে। তাঁর সঙ্গেই ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে একদিন কল্যাণ যাত্রা করলাম—ট্রেন ভাড়াটা কে দিলে তা অবশ্য বলতে পারি না।

যথাসময়ে কল্যাণে নেমে কিছুক্ষণ হেঁটে একটা জঙ্গলে এসে পৌঁছনো গেল। জঙ্গলের সামনের দিক্‌টা, অর্থাৎ যে দিক্‌টা লোকালয়ের দিকে, সেদিক্ থেকে আরম্ভ ক'রে ভেতরের প্রায় আধমাইলটাক লম্বা ও আধমাইলটাক প্রস্থ জমি পরিষ্কার ক'রে আবাদ করা হচ্ছে। আমরা জঙ্গলে ঢুকে সরু রাস্তা দিয়ে খানিকটা ভেতরের দিকে গিয়ে একখানা পাতা-দিয়ে-ছাওয়া ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মেটাজী উচ্চৈঃস্বরে কয়েকবার কি একটা ব'লে চীৎকার করতেই ঘরের ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে জবাব দিয়ে কে বেরিয়ে এল,—একজন বেঁটে মত বেশ ষণ্ডা গোছের লোক, হাঁটুর ওপরে মালকোঁচা-মারা ধুতি পরা, গায়ে একটা ফতুয়া গোছের হাতকাটা জামা। জামাটার সামনের দিকে একটা বড় তাপ্পি-মারা পকেট।

আমার সঙ্গে ছিল আমার চিরকালের সঙ্গী বাবাকালী। সে আস্তে আস্তে বললে—এ যে ছুনু সর্দার দেখছি।

যাই হোক, লোকটা কাছে এসে একবার আমাদের আপাদ-মস্তক দে'খে নিল, তার পর মেটাজীর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ ক'রে দিল। মেটাজী ও ছুনু সর্দার আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অগ্রসর হ'তে লাগল আর আমরা তিনজনে তাদের পদানুসরণ করতে লাগলাম।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিছুদূর গিয়ে বিরাট্ একটা ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হলাম। দেখলাম, একদিকে অনেকখানি জায়গা নিয়ে কলার বাগান করা হয়েছে। বেঁটে বেঁটে কলাগাছ, তাতে কাঁদিভর্তি বড় বড় মোটা কলা

গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে ঠেকেছে। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখা গেল, সেখানে চিচিঙ্গের ক্ষেত করা হয়েছে—তিন-চার হাত লম্বা হাজার হাজার চিচিঙ্গে উঁচু মাচা থেকে মাটির দিকে ঝুলছে। বড় বড় মানুষের সমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল দু'হাতে সরিয়ে তার মধ্যে রাস্তা ক'রে মেটাজী ও ভুলু সর্দার আগে চলেছেন ও তাঁদের পেছনে আমি ও আমার দুই সঙ্গী বাবাকালী ও পরিতোষ চলেছি। সম্মুখে পিছনে আশেপাশে মোটা মোটা বড় বড় গাছ—সে সব গাছের চেহারাও কখনো দেখি নি, নামও শুনি নি। এই সব গাছে জাহাজের কাছির মতন মোটা ও শক্ত পাকানো পাকানো লতা ঝুলছে। কোনো জায়গায় জঙ্গল এত ঘন যে গাছের মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি হয়ে আছে। কতদিন যে সেখানকার জমিতে সূর্যালোক স্পর্শ করে নি তার ঠিকানা নেই, জায়গাটা একেবারে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে আছে। এক জায়গায় দেখলাম, অনেকখানি জমি পরিষ্কার ক'রে লাঙ্গল দিয়ে চষা হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন স্ত্রীপুরুষে মিলে সেই জমি থেকে আগাছা ও পাথর ইত্যাদি বেছে এক জায়গায় জড় করছে।

আমরা আসতেই তারা দাঁড়িয়ে উঠে অবাক্ হয়ে আমাদের দেখতে লাগল। পুরুষগুলির গায়ে কোনো জামা নেই, কোমরে একখণ্ড বস্ত্র জড়ানো, তাতে কোনো রকমে লজ্জা নিবারণ হয়েছে মাত্র। মেয়েদের দেহেরও উত্তরার্ধ এক রকম নগ্ন বললেই চলে। তাদেরও কোমরে একটু বস্ত্র জড়ানো। পুরুষ কিংবা স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত রোগা। পুষ্টিকর খাদ্য ত দূরের কথা— কোনো রকমের খাদ্য তাদের পেটে পড়ে কি না সন্দেহ।

সকলেই অদ্ভুত এক রকমের দৃষ্টিতে বিশেষ ক'রে আমাদের তিনজনকে দেখতে লাগল। মেটাজী ও সর্দার আমাদের আগে আগে যাচ্ছিলেন, এইখানে মেটাজী পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন—এই এদের সঙ্গে তোমাদের কাজ করতে হবে। কাজ এমন হাতীঘোড়া কিছুই নয়—একটা বাচ্চা ছেলেকে বললেও সে করতে পারে।

এই অবধি ব'লে আবার তাঁরা কথা বলতে বলতে অগ্রসর হ'তে লাগলেন।

আমাদের সামনে ও পেছনে বিস্তীর্ণ অরণ্য, দক্ষিণে ও বামে পাহাড়ের সারি। মনে হয় যেন প্রকৃতি দেবী জঙ্গলের দু-দিকে উঁচু পাথরের দেওয়াল গেঁথে রেখেছেন। এক-এক জায়গায় জঙ্গল সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে—দুদিকের পাহাড় অনেক কাছাকাছি হয়েছে। দেখলাম, প্রায় সর্বত্রই এই পাহাড়ের গা বেয়ে নিরন্তর জল ঝরছে—তারই ফলে পাহাড়ের গায়ে শেওলা জমেছে। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় দেখা গেল একখণ্ড প্রকাণ্ড পাথর, তারই ওপর দিয়ে একটি শীর্ণ জলধারা এসে নীচে একটা ডোবার মতন সৃষ্টি হয়েছে।

মেটাজী আমাদের বললেন—এই দেখ, কেমন সুন্দর ঝরণা, এরা এই জল খায়।

কিছুদিন আগে কুঞ্জবাবু আমাদের কাছে যে ঝরণার কথা বলেছিলেন, বোধ হয় এই সেই ঝরণা। আরও কিছুদূর অগ্রসর হবার পর মনে হ'ল যেন এতক্ষণে আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছি। ছোট-বড় গাছ ও লতায় মাথার ওপরে চাঁদোয়ার মতন একটা আচ্ছাদন সৃষ্টি হওয়ায় জায়গাটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ও নির্জন ব'লে মনে হতে লাগল। এখানকার পথও পরিষ্কার নয়, বেশ বুঝতে পারা গেল যে এদিকে লোকজন বড় একটা কেউ আসে না।

আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রায় দশ-বার জন নারী ও পুরুষ শ্রমিক যে আমাদের অনুসরণ করছিল তা আমরা টেরই পাই নি। এইখানে এসে দাঁড়াতেই তারা আরও কাছে এগিয়ে এসে আমাদের ভালো ক'রে দেখতে লাগল। কিন্তু সর্দার রক্তচক্ষু বার ক'রে বিকট চীৎকার ক'রে তাদের ভাষায় কি সব বলায় তারা সকলেই ধীরে ধীরে ফিরে চ'লে গেল। সর্দার মহাশয়ের এই বিকট চীৎকার শুনে তাঁর মেজাজের কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে, অর্থাৎ আমরা যাতে বুঝতে পারি—মেটাজীকে বললেন—শূয়োরের বাচ্চারা অত্যন্ত পাজি, শয়তান ও অসম্ভব রকমের চালাক। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভুলে ডাণ্ডাটা ফেলে এসেছি—হাতে ডাণ্ডা নেই, বুঝতে পেরেছে যে এখন আর মারতে পারবে না, অমনি আমাদের পেছু পেছু এসেছে মজা দেখতে! কাজে কোনো রকমে ফাঁকি দিতে পারলে হয়।

আমরা একটা লাঙ্গল-চষা জমিতে পাথর ও আগাছা বাছবার কাজে লিপ্ত হলাম।

আমাদের সঙ্গে আরও অনেকে কাজ করত, তাদের মধ্যে একটি অল্পবয়সী মেয়েও ছিল—বোধ হয় পনের-ষোল বছর বয়স। মেয়েটি অত্যন্ত রোগা কিন্তু বসন্তের বাতাস পেয়ে যেমন কোনো কোনো শুকনো কাঁটাগাছেও ফুল ধরে, তেমনি তার দেহে যৌবনের আগমনীর সামান্য আমেজ লেগেছে মাত্র।

খুব কাছাকাছি এসে পড়ায় কি যেন বললে।

একদিন কাজ করতে করতে খুব কাছাকাছি এসে পড়ায় সে আমাকে কি যেন বললে। তার কথা ভালো ক'রে বুঝতে না পারায় আমি আরও কাছে স'রে আসায় সে দাঁড়িয়ে উঠে তার মাকে ডাকলে। মা দূরে আমাদের ক্ষেতেই কাজ করছিল, মেয়ের ডাক শুনে এক রকম ছুটে কাছে এল। মায়ের দেখাদেখি বাপ, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, তারাও সকলে কাছাকাছিই কাজ করছিল—ছুটে এগিয়ে এল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কি করা উচিত ভাবছি, এমন সময় সেই মেয়েটি আবার কি সব কথা তাদের জানালে। এবার বুঝলাম, আমাদের থাকবার জায়গা নিয়েই ওরা ভাবছে। তারা বলতে লাগল—তোমাদের যে জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে—সে জায়গাটা ভালো না। আমাদের বাড়ীর কাছেই তোমরা একটা ঝোঁপড়ি তৈরি ক'রে নিয়ে সেইখানেই বসবাস কর। আমরা অনেক ঘর সেখানে কাছাকাছি বাস করি।

সংসারে অনাবিল সুখও যেমন নেই, তেমনি অনাবিল দুঃখও দুর্লভ। মনে হ'ল এই দুঃখের আকাশেই আমার অরণ্যমাতা সেই মেয়েটির মায়ের মধ্যে রূপ ধরতে আরম্ভ করেছেন। আমরা বললাম—বেশ, কিন্তু যতদিন না ঝোঁপড়ি তৈরি হবে, তত-দিন না হয় স্টেশনে গিয়ে শোওয়া হবে।

সেই জঙ্গলের ঘাস তোলবার জন্যে আমরা তিন জনের প্রত্যেকেই ছ'পয়সা ক'রে পেতাম। ওরা সে কথা শুনে বললে, আমরা সকলেই রোজানা দু'আনা ক'রে পেয়ে থাকি। তোমাদের রোজ থেকে ওরা দু'পয়সা ক'রে মারে।

এ সব কথা জানা সত্ত্বেও আমরা ঐ ছ'পয়সাতেই দিন চালিয়ে নিতে লাগলাম। কিন্তু আর বেশীদিন ও রকম চলল না। প্রতিদিন জঙ্গল থেকে স্টেশন এবং স্টেশন থেকে জঙ্গল—এই প্রায় দশমাইল হাঁটা, তার ওপরে দিন ভোর রোদে পরিশ্রম, এক বেলা প্রায় উপবাস ও সন্ধ্যাবেলা অর্ধাহার—রাত্রে শয্যাহীন পাথরের মেজেতে শোওয়া—এই সব কারণে আমাদের সকলেরই শরীর খারাপ হয়ে চলেছিল।

স্টেশন থেকে ভোরবেলা জঙ্গলে আসবার সময় আমরা সেই চার-পাঁচ মাইল দৌড়েই পার হ'লাম, কিন্তু ক্রমেই আমাদের গতির বেগ কমে আসতে লাগল। ইদানীং আসতে যেতে পথে অনেকখানি সময় বিশ্রাম করতে হ'ত। এক আমার অবস্থাই এমনি হ'ল যে, স্টেশন থেকে আর জঙ্গলে পৌঁছতে পারি না। বন্ধুদের বললাম—আমায়

একখানা রুটি দিয়ে তোরা চ'লে যা, আমি এইখানেই প'ড়ে থাকি—বিকেলবেলা স্টেশনে যাবার সময় আমায় তুলে নিয়ে যাস।

তারা আমার কথা মানলে না—বললে—ধ'রে ধ'রে নিয়ে যাব।

কিন্তু তখন আমার হু-পা ও দেহ অবশ হয়ে আসছিল। হু'কদম চ'লেই আবার ব'সে পড়লাম। কালী বললে—আচ্ছা, তুই আমার পিঠে চড়্।

ধীরে ধীরে তার পিঠে চ'ড়ে হুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু এক রশি পথ যেতে না যেতে কালীর অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল। সে আমাকে নামিয়ে দিয়ে একেবারে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ প'ড়ে থেকে সে উঠল বটে, কিন্তু আমাকে আর পিঠে নিতে পারলে না। এবার পরিতোষ—আমার অরণ্যজীবনের আর একজন সঙ্গী, আমাকে তার পিঠে সওয়ার ক'রে নিলে। কিন্তু তার অবস্থাও আমাদের চাইতে ভাল থাকবার কথা নয়। কিছুদূর চলতে না চলতে সেও আমাকে নামিয়ে দিয়ে বললে -একটু বিশ্রাম ক'রে নিই, তারপর আবার চড়িস্।

কিন্তু তার অবস্থা দে'খে আমি বললাম --এবার আমি নিজেই যেতে পারব।

যাই হোক, কোনরকমে বসে শুয়ে হেঁটে গড়িয়ে কর্মস্থলে ত গিয়ে পৌঁছন গেল। আমার অবস্থা দে'খে সহকর্মীরা সকলেই সহানুভূতি দেখাতে লাগল। কেউ কেউ বললে—তোমাদের ডেরায় গিয়ে শুয়ে থাক। কিন্তু সেই মেয়েটি ও তার মা বললে—না, না,—তা হলে সর্দার আজকের রোজ দেবে না। তার চেয়ে তুমি এইখানেই ব'সে থাক, ব'সে না থাকতে পারলে শুয়ে থাক। সর্দার আসছে দেখতে পেলে আমরা তোমায় তুলে দেব—তখন একটু কাজের ভান ক'রো।

তখুনি আমাদের কাছাকাছি যত মজুর ও মজুরণী কাজ করছিল তাদের মধ্যে খবর চালাচালি হয়ে গেল যে, সর্দারকে দূরে দেখতে পেলেই যেন আমাদের সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়।

আমি ত আর ক্ষণবিলম্ব না ক'রে মাটিতে দেহ বিছিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে সর্দারকে দূরে দেখতে পেয়ে সেই মা এসে আমায় তুলে দিলে। তখনো আমার আচ্ছন্ন অবস্থা কাটে নি। তবু সেই অবস্থাতেই ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে কাজের ভান করতে লাগলাম। সর্দার এসে যথারীতি চেঁচামেচি ক'রে চ'লে গেল। সবাই মিলে বলতে লাগল—সর্দার চ'লে গেছে—এবার শুয়ে পড়।

বলামাত্র আমি আবার শুয়ে পড়লাম। সেইখানে প'ড়ে প'ড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম বলতে পারি না। কালীচরণ আমায় ঠেলে তুলে বললে—চল, ঘরে চল।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করলাম। এত অসুস্থ বোধ করছিলাম বটে, কিন্তু দেহে বিশেষ তাপ ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে স্নান ক'রে উঠে এলাম। ঝরণার ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগলাম। তারপর রুটি আর জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়া গেল। যথাসময়ে উঠে আবার কাজ করতে গেলাম বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে আবার শরীর খুব খারাপ বোধ করতে লাগলাম। কাছেই সেই রোগা মেয়েটির মা কাজ করছিল। শরীরে আমি যে অস্বস্তি বোধ করছিলাম, আমাকে দে'খেই সে তা বুঝতে পেরে তার ভাষায় ও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে যে, এখন আর সর্দার এদিকে আসবে না, তুমি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়তে পার।—আমিও নিশ্চিন্তে ধরণীর কোলে নিজেকে বিছিয়ে দিলাম।

তখন দিন প্রায় অবসান হয়ে এসেছে, পাখীদের চীৎকারে বনভূমি সরগরম। দূরে সুদূরপ্রসারী বনশ্রেণী। গাছের পর গাছ সবলে ধরণীমাতাকে আঁকড়ে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের সারি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট মেঘলোকে মিলিয়ে গেছে, যেন সত্য ও কল্পনায় জড়াজড়ি হয়ে গেছে। মন আমার শূন্য—চোখও ধীরে ধীরে বুঁজে এল।

কতক্ষণ পরে জানি না যখন চোখ চাইলাম—দেখলাম, আমার বন্ধুরা ও আরও কয়েকজন মজুর-মজুরণী আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরিতোষ বললে—তুই ইষ্টিশন অবধি হেঁটে যেতে পারবি নে। আজ রাত্রির মত এদের বাড়ীতে গিয়ে থাক্। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, আমরা চললাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চারদিকের আরও অনেকে অনেক কথা বলতে লাগল। তাদের ভাষা অবোধ্য হ'লেও বুঝলাম যে তারা আমায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। আমি কিন্তু তখন প্রায় অজ্ঞান, নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আমার কি হ'তে চলেছে যেন তা খানিকটা বুঝতে পেরেছিলাম, তাই তাদের এই প্রবোধবাক্য কানেই যাচ্ছিল মাত্র, অন্তরে কোনই প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না। তারপর বন্ধুরা কখন চ'লে গেল, কখন সেই স্ত্রীপুরুষের দল

আমাকে তুলে কখনো চ্যাংদোলা ক'রে, কখনো ঝুলিয়ে, কখনো হিঁচড়ে, কখনো হাঁটিয়ে নিয়ে চলল তাদের ঘরের দিকে—এ যাত্রার স্পষ্ট চেতনা আমার নেই।

শুধু মনে পড়ে, আমি চলেছি তো চলেইছি, কখনো অর্ধচেতন, কখনো অচেতন অবস্থায়। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন যুগযুগান্ত ধ'রে এই জরাভার বহন ক'রে চলেছি, এই বন্ধুর পথ বেয়ে কত জীবন পার হয়ে চলেছি, এর আরম্ভ নেই, শেষও নেই। চলতে চলতে কখনো সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা, কখনো বা পারিপার্শ্বিক বস্তু সম্বন্ধে সামান্য চেতনা—তারপরে সম্পূর্ণ অচেতন।

যখন সামান্য জ্ঞান ফিরে এল তখন বুঝতে পারলাম, আমি একটা ঝোঁপড়ির মধ্যে শুয়ে আছি। মাথার ওপরে পাতার আচ্ছাদন, তারই শত সহস্র রন্ধ্র দিয়ে অজস্রধারায় চন্দ্রালোক ঝ'রে পড়ছে আমার অঙ্গে—আমার চারিদিকের মাটিতে—এখানে ওখানে সেখানে।

চোখ চেয়েই আমার মুখ দিয়ে মাতৃনাম উচ্চারিত হ'ল। ক্ষীণকণ্ঠে ডাক দিলাম—মা—মা।

কণ্ঠ দিয়ে শব্দ বেরুনো মাত্র একখানি শীর্ণ কঙ্কালহস্ত আমার কপালে এসে পড়ল। সে হাতের স্পর্শ কঠিন ও কর্কশ হ'লেও স্পর্শের অতীত মাতৃহৃদয়ের যে বাৎসল্য সেই অনুভব আমার মনে ও শরীরে সঞ্চারিত হয়ে আমায় যেন মৃত্যুর দুয়ার থেকে টেনে নিয়ে এল। আজ মনে ভাবি, সৃষ্টিকর্তা কি অপূর্ব কৌশলে সেই অরণ্যের মধ্যে আমার জন্য একখানি মাতৃহৃদয় সঞ্চিত ক'রে রেখেছিলেন।

আমার অরণ্যমাতা বিড়বিড় ক'রে কি সব বলতে বলতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদেই সেই মেয়েটি—যার মাধ্যমে আমরা এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, সে এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে আমার দু'হাত ধ'রে টেনে তুলে বসালে। আমি ততক্ষণে অনেকটা আরাম বোধ করছিলাম। মেয়েটি, তার বাবা ও ভাই সকালে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল।

ছোট একখানা নীচু ঘর পাহাড়ের গায়ে ঘেঁষা, অর্থাৎ একদিকের দেওয়াল হচ্ছে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে শেওলা ধ'রে আছে, তাই বয়ে নিরন্তর জল পড়ছে। তাই সেই দিকে বেশ চওড়া একটা নালা ক'রে রাখা হয়েছে, কারণ বর্ষাকালে পাহাড়ের গা বেয়ে বেশ তোড়ে জলধারা নামে। ঘর নীচু, কোনরকমে ঘাড় নীচু ক'রে একজন পুরুষ মানুষ দাঁড়াতে পারে। গাছের সরু সরু ডাল লম্বা ও আড়াআড়ি ভাবে সাজিয়ে চাল করা হয়েছে। কোন কোন ডাল মধ্যে ঝুলে প'ড়ে সাংঘাতিক খোঁচার মতন হয়ে আছে। অনভ্যস্ত ব্যক্তির চোখে নাকে লাগলে বিষম কাণ্ড হতে পারে। চালের সহস্র অবকাশ দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। ঘরের তিনদিকের দেওয়ালও সেই মেকদারের। ঘরের মেঝে অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে। তারই মধ্যে এক জায়গায় স্রেফ কাঁচা ও শুকনো পাতার শয্যায় একটি বালক ঘুমোচ্ছে—এদেরই ছোট ছেলে। অদূরে এক কোণে একখানা বড় পাথরের ওপরে ছোট্ট একটি মাটির প্রদীপ জ্বলছে।

ঘরের এক কোণে মেঝে খুঁড়ে একটি উনুন করা হয়েছে—সরু ও ছোট ছোট শুকনো গাছের ডাল দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। বাড়ীর বড় মেয়ে, অর্থাৎ আমাদের সেই প্রথম বন্ধু তারই সামনে ব'সে রুটি তৈরি করছে। আধ ইঞ্চি মোটা ও গ্রামোফোনের দশ ইঞ্চি রেকর্ডের মত গোল বাজরার রুটি তৈরি হচ্ছে। চাকি নেই—বেলুন নেই, বড় বড় কালো কালো সেই বাজরার আটার তাল, অর্থাৎ লেচি নিয়ে স্রেফ দু'হাতে পটাপট শব্দে পিটে পিটে অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে রুটি তৈরি ক'রে সেই গনগনে আগুনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আবার লেচি ছিঁড়ছে। আশ্চর্য এই যে প্রত্যেকটি রুটি মাপে দশ ইঞ্চি গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত গোল ও প্রায় আধ ইঞ্চি মোটা।

রুটি তৈরি করতে করতে ঠিক সময় বুঝে মেয়েটি আগুনের মধ্যে ফেলা রুটিখানা আবার উল্টে দিচ্ছে। আমি ব'সে ব'সে সেই দৃশ্য দেখছিলাম, এমন সময় আমার অরণ্যমাতা উঠে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে একটা সদ্যভাঙা গাছের ডাল টেনে নিয়ে এসে তা থেকে পড়্‌পড়্‌ ক'রে কতকগুলো পাতা ছিঁড়ে নিয়ে হাতের তেলোয় ফেলে দু'হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেগুলোকে থেঁতো করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কিছুক্ষণ এই প্রক্রিয়ার পর পাতাগুলো নরম হয়ে এলে আমাকে সে হাঁ করতে বললে। আমি হাঁ করতেই সেই পাতার কয়েক ফোঁটা রস নিংড়ে আমার মুখে দিয়ে বললে—যা, এবার তুই ভাল হয়ে যাবি।

আরও কিছুক্ষণ কাটবার পর রুটি তৈরি হয়ে গেল। সবার ভাগে একখানা ক'রে রুটি। সেই পাঁচ বছরের শিশু ও ঘরের কর্তা—আধবুড়ো—সবাই সমান ভাগ। বলা বাহুল্য, আমিও একখানা রুটি পেলাম।

কালো কাঠের মত শক্ত বাজরার রুটি। তার মধ্যে এক আধটা আস্ত বাজরা বা বাজরার খোসা খোঁচার মত শিং উচিয়ে রয়েছে, যা বেকায়দায় গলায় বিঁধে গেলে সাংঘাতিক মাছের কাঁটার কাজ হতে পারে। আমি অন্য সবার দেখাদেখি তাই একটু একটু ভেঙে মুখে দিয়ে খেতে আরম্ভ ক'রে দিলাম।

বাজরার রুটি খেতে খুব খারাপ নয়, তার ওপর ক্ষিদের মুখে সে খাদ্য অমৃতের মতন লাগতে লাগল। বিনা তরকারীতে খেতে একটু অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পেরে মেয়েটি তার মাকে কি বললে। মেয়ের কথা শুনে মা কাছেরই একটা ছোট গর্ত থেকে কি সব বেছে বেছে তুলে আমার হাতে দিয়ে বললে—এই দিয়ে খাও—ভাল লাগবে।

দেখলাম, কালো কালো কতকগুলো নুনের টুকরো।

আমাকে সেই নুনটুকু দেওয়ামাত্র ছেলেমেয়েরা সকলেই বায়না ধরলে। তখন মা আবার সেই গর্ত থেকে কারুকে বেছে, কারুকে বা গর্তের মাটি চেঁছে নুন দিয়ে, নিজেও খানিকটা সেই নোনতা মাটি চেঁছে নিয়ে তাই টাকনা দিয়ে দিয়ে রুটিখানা খেয়ে ফেললে। সেই একখানা রুটি খেতেই আমার প্রায় পনেরো মিনিট সময় লেগে গেল ও পেটও ভ'রে গেল। কিন্তু অন্য সবাই দেখলাম, দু'তিন মিনিটের মধ্যেই রুটি নিঃশেষ ক'রে ফেললে। সকলেরই—এমন কি পাঁচ-ছয় বছরের বাচ্চাটিরও মুখ দেখে মনে হ'ল যে খেয়ে তাদের পেট ভরল না, আরও অন্ততঃ গড়ে দু'খানা ক'রে রুটি খেতে পারলে হ'ত। কিন্তু উপায় নেই!

ঘরের কোণে একরাশ শুকনো পাতা জড়ো করা ছিল। আমি এতক্ষণ মনে করেছিলাম যে, উনুন জ্বালাবার জন্য সেগুলো সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়েছে, কিন্তু খাওয়ার পরেই দেখা গেল, এক একজনে দু'হাতে ক'রে এক এক বোঝা পাতা তুলে এনে একটুখানি ক'রে জায়গায় তাই বিছিয়ে বিছানার মতন ক'রে সেখানে যে যার শুয়ে পড়ল—মাথায় বালিশ নেই, ভুমির উপর একখানা ছেঁড়া বস্ত্র পর্যন্ত নেই। তাদের কাণ্ড দেখছি, এমন সময় আমার অরণ্যমাতা এক বোঝা পাতা এনে এক কোণে বিছিয়ে আমায় ইঙ্গিতে বললে—শুয়ে পড়।

ঘরের কোণে টিম্‌টিম্ ক'রে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছিল, সেটাকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে সেও শুয়ে পড়ল। আমি কোঁচা খুলে সেই পাতাগুলোর ওপর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। যদিও মাটিতে বিনা উপাধানে শোওয়া অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল তবুও সেই প্রায় ভিজে মাটির ওপর শুতে প্রথমটা বেশ অসুবিধা হতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতে করতেই চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেলাম, দেহের অসুবিধার কথা আর মনেই রইল না।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার—এক কোণে সেই উনুনের আগুন ভস্মরাশির ভেতর থেকে একটু চকচক করছে—আমার চারপাশে প্রায়নগ্ন কয়েকটি নরনারীর কঙ্কাল প'ড়ে রয়েছে। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর আধপেটা সিকিপেটা খেয়ে স্রেফ শ্রান্তিতে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে প'ড়ে আছে। বাইরে নিস্তব্ধ বনানী—স্তব্ধ নিঝুম—তারই মধ্যে মাঝে মাঝে কিসের যেন চীৎকার উঠছে—হয়ত কোন রাত-পাখীর কিংবা কোন জানোয়ারেরও হতে পারে।

আমার চোখে ঘুম নেই। সমস্ত দিনই ঘুমিয়ে কেটেছে। মাথার মধ্যে নানারকম চিন্তা এসে জুটতে লাগল। মনে হতে লাগল—আমি কোথাকার লোক—কেমন ক'রে এদের মধ্যে এসে এখানে রাত্রে শুয়ে আছি। কি অসম্ভব সংঘটন।

আমার চারপাশে এই যারা শুয়ে আছে—যারা কিছুদিন আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, অথচ আজ তারা পরমাত্মীয়ের মতন আমার জীবন রক্ষা করেছে—এদের সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ! কোন্ অজ্ঞাত বন্ধনের মায়ায় আমার প্রতি বাৎসল্য জেগে উঠেছে এই অরণ্যমাতার হৃদয়ে! এই পরিবারের ছেলেমেয়েরা সকলেই আমাকে ভাইয়ের মতন শুশ্রূষা ক'রে সুস্থ করবার চেষ্টা করছে। ভাবতে ভাবতে এদের প্রতি, এমনকি সেই বনভূমির প্রতি আমি যেন আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করতে লাগলাম।

মনে হতে লাগল—জন্মান্তরে এই বনভূমিই ছিল আমার মাতৃভূমি, এখানকার ছেলেমেয়েরা ছিল আমার সেদিনের সঙ্গী ও সঙ্গিনী—বিশেষ ক'রে এই পরিবারের সঙ্গেই ছিল আমার বিশেষ সম্বন্ধ। সেই আকর্ষণেই আজ আমি অভাবিতরূপে এদের আশ্রয়ে এসে পড়েছি। তা না হ'লে আজ আমি অসুস্থ না হয়ে পরিতোষ বা কালী—এদের মধ্যে যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারত।

ভাবতে লাগলাম—এখান থেকে কিছু দূরেই ত বোম্বাই নগরী, কিন্তু সেখানকার সুখ-দুঃখ-ভোগ-ঐশ্বর্য-সমারোহের কিছুই এরা জানে না, সেখানকার জীবনযাত্রার কোন প্রতিক্রিয়াই এদের জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত হয়

নি। সকালসন্ধ্যে দু'খানা মোটা মোটা অখাদ্য বাজরার রুটি—তাও আবার বিনা তরকারীতে—যেখানে একদিন সামান্য একটু নুন রাখা হয়েছিল—সেখানকার মাটি চেঁছে নিয়ে তাই দিয়ে খাওয়া—এমনি ক'রেই একদিন এই মাটিতেই তারা এখানকার জীবন শেষ ক'রে দিয়ে চ'লে যাবে।

ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল। কয়েকবার উঠে বসলাম। সেই জীর্ণ কুটীরের চাল ও আশপাশের দেওয়ালের শত সহস্র ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে অজস্রধারায় চন্দ্রকিরণ বর্ষিত হচ্ছিল। সেই আলোতে দেখলাম—চারদিকের ঘুমন্ত সেই মানুষগুলিকে—যেমন বাল্যকালে রাত্রে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখতাম আমার আপনার জনকে। কালের কোন্ আবর্ত্তনে আবার আমি এদের মধ্যে ফিরে এসেছি?

এই ফিরে আসার মধ্যে কি কোন প্রাকৃতিক রহস্য, কোন ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতে লাগলাম—এদের অবস্থা—এদের দারিদ্র্যদুঃখ দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টিকর্তা আমায় এদের মধ্যে এনে ফেলেছেন। এদের নগ্ন অঙ্গে বস্ত্র দিতে হবে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে এদের বুকে। এই সব চিন্তা করতে করতে নিবিড় বেদনার সঙ্গে এক গভীর আনন্দের চেতনায় আমার বুকের মধ্যে গুরুগুরু করতে লাগল—কাঁপতে কাঁপতে আবার শুয়ে পড়লাম।

একদিন এই সংকল্প মনের মধ্যে নিয়ে সংসারসমুদ্রে জীবনতরণী ভাসিয়েছিলাম। তারপরে সুখ-দুঃখ, শোক-তাপ, ভোগ-দুর্ভোগ, সাফল্য-দারিদ্র্যের তরঙ্গাঘাতে ভেসে চলেছিলাম—কখনো স্রোতের মুখে কুটোর মতন—কখনো বা তরঙ্গের বিপরীতে, কখনো এসেছে তমসাময়ী ঝটিকাচ্ছন্ন রাত্রি, কখনো বা নাতিশীতোষ্ণ আনন্দময় স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাত। ঘাটে ঘাটে বন্দরে বন্দরে নতুন অভিজ্ঞতার সম্ভার বোঝাই ক'রে—অতীতে কখন কোন একদিন—কোন দীন দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের অন্তরে ভাই ব'লে আলিঙ্গন করেছিলাম—তাদের মাকে মা ব'লে ডেকেছিলাম, —তাদের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করব, তাদের অবস্থা উন্নত করব ব'লে গভীর রাতে নিজের অন্তরের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—কোথায় মনের কোন্ অতলে তলিয়ে গেল আজ তাদের অস্তিত্ব? তার লেশমাত্রও কি মনে রইল না?

তাদের স্থানে কত শয়তানকে আলিঙ্গন করলাম ভাই ব'লে, কত মহৎকে পদাঘাত করলাম শত্রু ব'লে—এমনি ক'রে বহু দিন—বহু বৎসর দুর্লভ মানব জীবনের তৃতীয়াংশ ক্ষয় ক'রে একদিন জীবন-তরণী চড়ায় আটকে গেল। একদিন আকস্মিক বজ্রপাতের মতন অভাবিত রূপে মনে প'ড়ে গেল, সেই আমার জীবনপ্রভাতের ফেলে আসা দিনটির কথা—সেই আমার অরণ্যমাতার স্নেহাঞ্চলে বেঁধে রাখা একটি রাতের স্মৃতির সুরভি ফুলের কথা।

—*—

আমাদের দেশের সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরা যদি লোককে বিশ্বাস করাইতে চান যে, তাঁহারা বাস্তবিকই শ্রেণীহীন সমাজ চান, তাহা হইলে একদিকে তাঁহাদিগকে যেমন পাশ্চাত্য ধাঁচের শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিতে হইবে এবং স্বয়ং শ্রেণীহীনতাসঙ্গত জীবনযাপন করিতে হইবে, তেমনই অন্যদিকে তাঁহাদিগকে জা'তের (casteএর) বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে হইবে। তাঁহারা দ্বিজ কোনো জাতের হইলে উপবীত ফেলিয়া দিতে হইবে এবং নিজের বা পুত্রকন্যার বিবাহে জা'ত ভাঙিতে হইবে। আমরা অবশ্য তাঁহাদিগকে জা'ত ভাঙিতে কোনই অনুরোধ করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি, জা'তও রাখিব অথচ শ্রেণীহীন সমাজও চাহিব,—এটি চলিবে না। যদি সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরা জা'ত রাখিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদের সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ খাঁটি জিনিষ নহে বুঝিতে হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৫।

পাহাড়তলির হাটে

শ্রীকালীপদ ঘটক

সাঁওতাল পাড়ার ডুমন মাঝি। লোকটি বড় ভাল। কারো কোনো সাতে পাঁচে থাকে না। ঝাঁটিপাহাড়ী মৌজায় গোটাগুটি একখানা লাঙ্গল ঘোরে ডুমন মাঝির, দশ-বারো বিঘে ধানী জমির চাষ। নিজের হাতেই লাঙ্গল চষে ডুমন, গায়ে-গতরে খেটেখুটে ক্ষেত-খামারে শস্য ফলায় প্রচুর। মোটা ভাত আর মোটা কাপড় যোগান দেয় তার মাটি। হাতের কাছে জঙ্গল, ঝাঁটিপাহাড়ের লাগাও। কাঁড় ধেনুকটা হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে বেরোয় ডুমন। শিকার দু'একটা মিলে যায়, বনবরা, নয় খরগোস; নিদেন একটা শামকল পাখী। কোনোদিক্ থেকেই অবস্থা কিছু খাটো নয় ডুমনের। দুঃখ শুধু একটি, নেহাৎ সেটা বরাতের ফের, ভাগ্যটা বেশ ভাল নয় ডুমনের। তা না হলে বেঠাওক্কা ডেঙ্গো জরে মেঝেনটা হঠাৎ মারা প'ড়ে যাবে কেন? ভাঙ্গন ধরেছে ওইখানটায়। উপযুক্ত সন্তান নাই ডুমনের—না একটা বেটা, না একটা বেটী; বেটাবেটী কিছুই হ'ল না। সে দুঃখও কোনোরকমে সয়ে নিয়েছিল ডুমন, কিন্তু মেঝেনটাও যে শেষ পর্য্যন্ত মারা প'ড়ে গেল। দু' কুড়ি চার বয়স হ'ল ডুমন মাঝির, এই বয়সে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
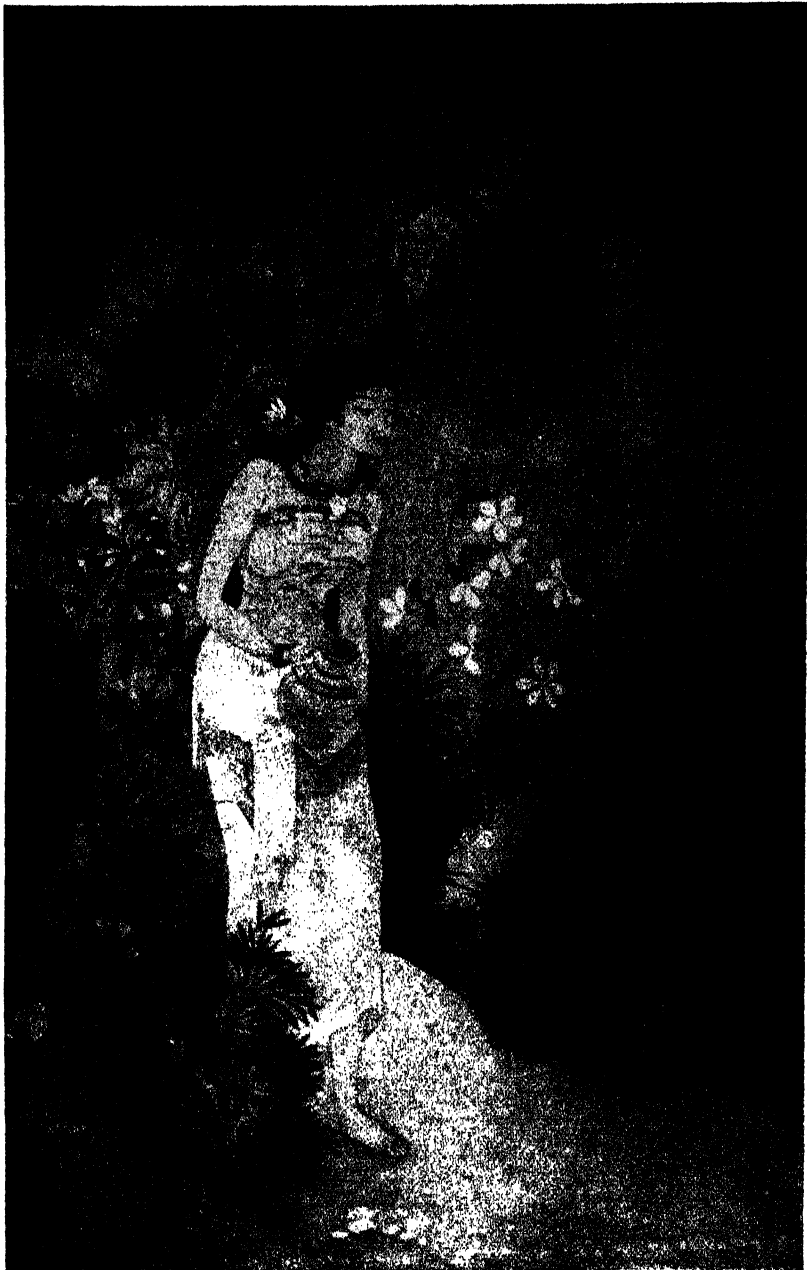
শকুন্তলা
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার
(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

নতুন ক'রে করবার যে আর নাই কিছু। ঘরসংসারের ঝামেলা নিয়ে বেশ খানিকটা বেকায়দায় প'ড়ে গেছে ডুমন। লবেজানির একশেষ যাকে বলতে হয়।

ডুমন মাঝি ক্রমশই যেন হতাশ হয়ে পড়ল। পাড়ার অন্যান্য মাঝিমোড়লরা সলা দিলে ডুমন মাঝিকে, আর এক দফা সাঙা করতে। মেঝেন একটা না হলে তার চলে কেমন ক'রে? ডুমন মাঝির মন কিন্তু সায় দেয় না, আসলে তার ভাগ্যটাই যে ভাল নয়। তা না হলে একটা ছেলেমেয়ে পর্য্যন্ত হ'ল না কেন ডুমনের, এত বয়স পর্য্যন্ত? বোঙ্গার কাছে বারে বারে মানত করেছে ডুমন আর তার বৌ, মাথা খুঁড়েছে মারাং বুরুর কাছে,—হেই ঠাকুর, একটি ছেলে দে, হেই ঠাকুর, একটি মেয়ে দে, বেটা না হয় বেটী—যা হোক কিছু হোক একটা। কই হ'ল, বেটা বেটী কিছুই হ'ল না। উপরন্তু ডুমনের বৌটা সুদ্ধ মারা গেল দিন চার-পাঁচ জেলো জ্বরে ভুগে। আসলে যে মারাং বুরুর ইচ্ছে নয় যে, ডুমন মাঝির বাড়-বাড়ন্ত হোক। কি হবে আর সাঙা ক'রে? বাবলাবনির জানগুরু ঠিকই বলেছে, অপদেবতার দিষ্টি পড়েছে ডুমনের উপর, বংশরক্ষা তার কিছুতেই হবে না। সেই জন্যেই ত মেঝেনটা তার বেঠাওক্কা মারা প'ড়ে গেল। এত বড় একটা গুনিৎকারের কথা কি আর মিথ্যে হতে পারে? বেটাবেটী ভাগ্যে নাই ডুমনের। তা হলে আর সাঙা ক'রে লাভ? সাঙাই কর আর যা-ই কর, ছেলেপিলে আর হচ্ছে না; জানগুরু তোতামাঝি গুনে-গেঁথে খাঁটী কথাই ব'লে দিয়েছে। মিছামিছি এই বয়সে পয়সাপাতি খরচ ক'রে কি জন্যে আর ও ঝামেলার পথে পা বাড়াতে যাবে ডুমন? জানগুরুর উপর টেক্কা দিয়ে এসব ক'রে লাভ আছে কিছু? মরুকগে ছাই, সাঙাসাদি আর করতে চায় না ডুমন মাঝি; যা হয় তাই হোকগে।

বছর দুই-তিন এইভাবেই কোনোরকমে চোখ-কান বুজে কাটিয়ে দিলে ডুমন। সংসার কিন্তু অচল হয়ে উঠল। খেটেখুটে সারা বছরের ফসল তুলতে হয়। লাঙ্গল গরু হাল ফাল সবই আছে ডুমনের, নাই শুধু হেফাজতের মানুষ। তিনবেলা হাত পুড়িয়ে ভাত-জলটা পর্য্যন্ত নিজের হাতেই ক'রে খেতে হচ্ছে ডুমন মাঝিকে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য কি আর হতে পারে? এক পাল শুয়োর ছিল ডুমনের, ছিল এক ঝাঁক হাঁসমুর্গী। ঠিকমতো খেতে না পেয়ে মারা প'ড়ে গেল কতকগুলো, কতকগুলো চোরে নিয়ে গেল, বাকিগুলো পাহাড়তলীর হাটে গিয়ে আধ কড়েতে বেচে দিয়ে এল ডুমন। কি হবে আর ওসব জঞ্জাল জমিয়ে রেখে? হেফাজতের মানুষ কোথায়? ডুমন মাঝির ধনদৌলত খাবে কে? একে একে যেতে বসেছে সবই, ঠেকা দেবে কেমন ক'রে ডুমন? ঘরসংসার বিষয়আশয় নিজের হাতেই সবকিছু গ'ড়ে তুলেছিল ডুমন মাঝি। আজ না-হয় বিলকুল সব নিজের হাতেই চুকিয়ে দিয়ে যাবে। গোটাকয়েক হাঁসমুর্গী ছাগল ভেড়া এমন আর কি মুল্যবান্ পদার্থ? একে একে সবই যাবে। তা যাকগে, তার জন্যে আর কোনো আফশোষ নাই ডুমন মাঝির।

শ্মশান-বৈরাগ্যে ধরল বুঝি ডুমন মাঝিকে! মাঝে মাঝে তাই কেমন যেন মরীয়া হয়ে ওঠে। পালের সেরা তার মোরগদুটোর জন্যে আজও কিন্তু দুঃখ হয় ডুমনের, ও দু'টোকে আজও কিন্তু ভুলতে পারে নি। হঠাৎ একদিন সকালবেলা চরতে গিয়ে কোথায় যে তারা উধাও হয়ে গেল তার আর কোনো হদিশ পাওয়া গেল না। গেল হয়ত ঝাঁটিপাহাড়ের দাগী চোর ওই পাহাড়ে' বেটাদের পেটে, কিম্বা হয়ত পাতাড়ির বনে পথ হারিয়ে ঢুকে পড়ল গিয়ে বড় জঙ্গলের মধ্যে। কে আর ওদের পিছু পিছু ধাওয়া ক'রে বেড়ায়? ও কাজ ছিল ডুমন মাঝির মেঝেনের। সেও গেছে, পিছু পিছু তার মোরগদুটোও গেল। পহর খানেক রাত থাকতে বাং দিত মোরগদুটো,—ক্যাঁ-ক্যাঁ-কোঁকৃকো—ক্যাঁ-ক্যাঁ-কোঁকৃকো—। জেগে উঠত ডুমন মাঝি। বলদ-জোড়াকে পেট ভ'রে খোল-কুঁড়ো খাওয়াত, তার পর সে গরুদুটোকে জোয়ালের সঙ্গে জুতে নিয়ে লাঙ্গল-মই কাঁধে ফেলে বেরিয়ে যেত হাল বাইতে। মোরগদুটো পাখা ঝাপটে এক লাফে গিয়ে উঠে পড়ত ডুমন মাঝির খড়ো চালের মটকায়। দূর থেকে চেয়ে থাকত ডুমনের দিকে, রাঙা ঝুঁটি উঁচু ক'রে গলা ফুলিয়ে বাং দিয়ে উঠত—ক্যাঁ-ক্যাঁ-কোঁকৃকো—। বিদায়-সম্ভাষণ জানাত বুঝি ডুমন মাঝিকে। সাঁওতাল পাড়ার মোড়ে গিয়ে মহুলবনের শুড়ি পথে বাঁক ফিরবার মুখে আর একটিবার পিছু ফিরে তাকাত ডুমন। মটকা থেকে ডুমন মাঝিকে লক্ষ্য ক'রে তেমনি ভাবেই ঠিক বাং দিচ্ছে তার জোড়া-মোরগ,—ক্যাঁ-ক্যাঁ-কোঁকৃকো—। সেই আওয়াজে জেগে উঠত ভোরের আকাশ, সোনার আলো ছড়িয়ে। জেগে উঠত সারা সাঁওতাল পাড়া, নতুন দিনের নতুন স্বপ্ন নিয়ে।

মোরগদু'টো আজ নাই। ডুমন মাঝির জীবনের বন্ধন একে একে খ'সে পড়ছে। আছে শুধু ডুমন মাঝি, শূন্য ভিটে আঁকড়ে। আর আছে তার বুড়ো-হাবড়া বলদ-জোড়া, ডুমন মাঝির হালের হেতের। খাটতে খাটতে বুড়ো

হয়ে গেল বলদদুটো। বুড়ো নয় ঠিক, আধবুড়ো। চাষ-আবাদের কাজটা ওদের দিয়েই কোনোরকমে চালিয়ে যাচ্ছে ডুমন। দামড়া গরু কেনা ত আর হ'ল না, নতুন তাজা দামড়া গরু তার সামলাবে কে? থাকত একটা জোয়ান বেটা, দামড়া কেনা সাজত। সে সাধ ত আর মিটল না ডুমন মাঝির, মিটবেও না আর ইহজীবনে। বলদ-দুটোকেও আর ধ'রে রেখে লাভ নাই, এইবেলা ওদের বেচে ফেলাই ভাল। জমি ক'বিঘে অন্য কারও হালে বসিয়ে দেবে ডুমন মাঝি। হাতামুঠো যা পায় তাতেই কোনোরকমে দিন চ'লে যাবে ডুমনের। বলদ-জোড়া বেচে দিয়ে একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট হতে চায় ডুমন। বেচতেই হবে, বে-কায়দা এ ভূতের বেগার খাটতে চায় না আর ডুমন মাঝি। কার জন্যে সংসার, কি হবে এই ভূতের বেগার ঠেলে?

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে গরুদুটোকে ভরপুর এক পেট খাইয়ে নিলে ডুমন। হাটে চলল বেচতে। সঙ্গী জুটে গেল সাঁওতাল পাড়ার পিথু মাঝি। একছালা কুল্তিকলাই ঘাড়ে ঝুলিয়ে পিথু মাঝি হাটে যাচ্ছে কুল্তি বেচতে। ভালই হ'ল, এককে দুই বড; দুই মাঝিতে গল্প করতে করতে কাটি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল পাহাড়তলির ঘাটিয়ার পথ ধ'রে।

ওই পিথু মাঝিই সবার আগে সলা দিয়েছিল ডুমনকে, সাঙা করবার জন্য। পাশের গাঁয়ের বিধবা একটি মেঝেন পর্য্যন্ত ঠিক ক'রে ফেলেছিল ডুমন মাঝির জন্যে। ভেবে চিন্তে ডুমন কিন্তু নিজে থেকেই পিছিয়ে গেল শেষ পর্য্যন্ত। জানগুরুর অব্যর্থ দৈববাণী, বংশরক্ষা ত হবে না ডুমনের, বেটার মুখ দেখা ভাগ্যে নাই যে ডুমন মাঝির। তা হলে আর নতুন ক'রে মেঝেন এনে লাভ?

কথায় কথায় পিথু মাঝি সেই পুরানো কথাই পেড়ে বসল আর একদফা। ডুমন মাঝিকে লক্ষ্য ক'রে বললে,—বলদ-দুটো তুই বেচিস না ডুমন, জমিজমা পরের হাতে তুলে দিলে শেষতক তুই পথে ব'সে যাবি।

পথে ত অনেক আগেই বসেছে ডুমন, এ আর এমন নতুন কথা কি? অতি সহজ ভাবেই জবাব দিলে ডুমন মাঝি,—না বেচে আর উপায় নেই পিথু, এরা যে আমার বোঝা হয়ে উঠল।

হালের হেতের চাষী-লোকের সম্পদ্। এও কখনো বোঝা হয়! আসলে এর কারণটা হ'ল অন্য। পিথু মাঝি আবার বললে,—আমি আবার বলছি ডুমন, ঘুরেফিরে সেই একই কথাই বলছি,—ওই সিংরায় মাঝির বেটীটাকে তুই সাঙা কর্, যদি বাঁচতে চাস ত এ ছাড়া আর পথ নাই।

ডুমন মাঝি বলদদুটোর পিঠে হেলেবাড়ির মৃদু একটু ঘা দিয়ে কদমটা আর একটু বাড়িয়ে দিলে। পিথু মাঝির প্রস্তাবটা শুনে মনে মনে একটু হাসলে ডুমন, বললে,—সাঙা, এ তুই কি বলছিস পিথু, এই বয়েসে আবার সাঙা?

পিথু মাঝি কুল্তি-কলাইয়ের ছালাটা কাঁধ পাল্টে পুনরায় ব'লে উঠল,—তোর চেয়ে অনেক বেশী বয়েসে কত লোক যে সাঙা করছে। আমাদের থালপোতার হপন কাকার বয়েস কত হ'ল জানিস, দু' কুড়ি পার তের বছর। কদমডাঙ্গার পচন মাঝির আধবুড়ী মেঝেনটাকে গেল বছর সাঙা ক'রে নিয়ে চ'লে এল। শুনিস নাই নাকি?

ডুমন মাঝি একটু চোখ তেড়ে বললে,—কিন্তু পচন মাঝির মেঝেনটা ত ডান ব'লে শুনেছিলাম।

পিথু মাঝি প্রতিবাদ ক'রে বললে,—কে বললেক ডান, ডান-ডাখিনী কিছুই লয়, ওটা শুধু ওকে শ্বশুরঘর থেকে খেদাড়বার মতলব। ওর যে একটা ছেলে হয়েছে গেল বছর, হপনকাকার জম্মিত। ডান-ডাখিনীর কি ছেলে হয়?

সেও ত একটা কথা বটে। ডান-ডাখিনীর কি ছেলে হয় কখনো? বাজে লোক কত আজগুবি গুজব যে রটায়। ডুমন মাঝির হাসি পেতে লাগল। পিথু মাঝি পুনরায় বললে,—সাঙা ত আমাদের হর্দম চলছে ডুমন। বিয়ের পর সাঙা, আবার সাঙার পরেও সাঙা; ইরকম ত হামেশাই চলছে।

ডুমন মাঝি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললে,—হঁ তা চলছে, উ কথাটি মিছে লয়, সাঙা আমাদের হর্দম চলছে।

ডুমনের কথাটা ছোঁ মেরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল পিথু মাঝি,—তুই তা হলে এমন ধারা কেনে বিগড়ে গেলি ডুমন? সিংরায় মাঝি আমাকে অনেক ক'রে সেধেছে, লোকটাকে তাই কথা দিয়ে ফেলেছিলাম। এখনো যদি মত হয় তোর—আসছে মাসে দিব লাগাঁই, সিংরায়ের বেটী রাণ্ডি মেঝেনের সঙ্গে। করবি সাঙা?

ডুমন মাঝি এবার হো হো ক'রে ফেটে পড়ল হাসির চোটে, বললে,—রাণ্ডি মেঝেনকে নিয়ে কি করব রে, সাঙা করতে হবেক নাকি! আরে দূর্ দূর্—লাজের কথাটি আর নাই বলিস, সাঙা-টাঙা আর আমি করতে লারব পিথু। রাণ্ডি মেঝেন বলবেক কি রে, ই বাবা!

নিজের মনেই বেকুবের মত আর একদফা হো হো ক'রে হেসে উঠল ডুমন।

কথায় কথায় পৌঁছে গেল এসে পাহাড়তলীর হাটিয়ায়। ঝাঁকড়া একটা চাকলতা গাছের নীচে বলদদুটোকে একপাশে বেঁধে দিলে ডুমন মাঝি। পিথু মাঝি এগিয়ে গেল মসলাপটির দিকে, কুত্তিকলাইয়ের বস্তা খুলে ব'সে পড়ল আটচালার একপাশে। পাশের একটা জামগাছ থেকে কতগুলো ডালপালা ভেঙ্গে এনে বলদ দুটোর মুখের সামনে ধ'রে দিলে ডুমন। গরুদুটোর গায়ে পরম যত্নে হাত বুলোতে লাগল। বছর পনের আগে বয়স যখন এদের দু'-দাঁত মোটে, ঠিক সেই সময় এই গরুদুটো সাড়ে বারো টাকা দাম দিয়ে কিনেছিল ডুমন, একেবারে কাঁচা-কচি দামড়া অবস্থায়। বয়স হ'ল যখন চার দাঁত, ছোট্ট একটা লাঙ্গল বানিয়ে পিছু হালে দামড়া-দুটোকে জুড়ে দিলে ডুমন মাঝি। ছ'-দাঁতে হ'ল নওজোয়ান, দামড়া যেন কুদতে লাগল। বয়স যখন 'কড়দরুণ'—বলদ ত নয়, যেন বাচ্চা দুটো হাতী। কুরল বেয়ে মাটি তুলেছে, ডুমন মাঝির পাঁচ বিঘে ডাঙ্গা জমিকে থেঁসে মেড়ে থামাল ক'রে বানিয়ে দিয়েছে কলমকাঠির ক্ষেত। হালের হেতের, মা-লক্ষ্মীর বাহন। এরাই এসে ডুমন মাঝির ভাগ্য ফিরিয়েছে। ডুমন মাঝি আদর ক'রে ডাইনাঙ্গী বলদটার নাম দিয়েছিল ডাইনেমাটি, আর ডুমনের বৌ বাঁওয়ালীটার নাম রেখেছিল পক্ষীরাজ। দেখতে দেখতে তেজ কমে গেল ডাইনেমাটির, বুড়ো হয়ে গেল পক্ষীরাজ। দাঁত ক'টা ক্ষইতে আরম্ভ করেছে, ভাঁজ প'ড়ে আসছে শিঙে। বয়স এখন 'নতুন', মানুষের বেলা বলা হয় যাকে প্রৌঢ়। তবু আরো বছর-পাঁচেক হাল এরা ঠিক বাইতে পারত, তাগদ কিছু ছিল এখনো গায়ে-গতরে। ঠিক মত এদের তরিবত ক'রে খাওয়ায় কে, হেফাজতের মানুষ নাই যে ডুমন মাঝির! শেষতক তাই বেচে দিতে আসতে হ'ল। দাম যে কত পাওয়া যাবে কে জানে। ডাইনেমাটির কুড়ি তিনেক, আর পক্ষীরাজের আড়াই কুড়ি,—হবে না? তা হবে, অন্তত কুড়ি পাঁচেক টাকা হরেদরে এসে যাবে ডুমনের। যা আসে তাই আসুক, টাকার দিকটা আজ বড় নয় ডুমন মাঝির কাছে। কোনরকমে এদের বিদেয় ক'রে দিয়ে একেবারে ভারমুক্ত হতে চায় ডুমন, সংসারের ঝামেলা থেকে নিশ্চিন্তে ছুটি পেতে চায়।

জামপাতা খেতে খেতে পক্ষীরাজ হঠাৎ থেমে গেল কেন? ক্ষিদেটা হঠাৎ প'ড়ে গেল নাকি? পক্ষীরাজের সামনে তাড়াতাড়ি ব'সে পড়ল ডুমন, ছোট্ট একটা কচি ডাল তার মুখের সামনে তুলে ধরলে। ডালটা একটু শুঁকলে পক্ষীরাজ, লকলকে জিভ বের ক'রে স্পর্শ করলে একটুখানি, পাতা কিন্তু আর খেলে না। ডাইনেমাটি ওপাশ থেকে জামডালটায় কামড় দিয়ে ছিনিয়ে নিলে ডুমন মাঝির হাত থেকে। চিবুতে লাগল সামনের দিকে মুখ উঁচু ক'রে। পক্ষীরাজ কিন্তু নিঝুম মেরে গেল। জামপাতায় তার রুচি নাই। কতকগুলো শ্বেতী সরষের খোল কিনে এনে গরু-দুটোকে এইবেলা খাইয়ে দেবে নাকি ডুমন, গো-জাতির সবচেয়ে যা প্রিয় খাদ্য? খেয়ে নিক আজ পেট ভ'রে, যাবার আগে।

যত খুশি খেয়ে নিক; খালি পেটে ওদের বিদেয় করতে চায় না ডুমন।

মুদী পটির দিকে এগিয়ে গেল ডুমন মাঝি। নগদ পাঁচসিকে পয়সা দিয়ে সের আড়াইয়েক শ্বেতী খোল কিনে গামছার খুঁটে বেঁধে নিলে। পিথু মাঝি কুত্তি বেচছে আটচালার এক পাশে, সের চারেক আর প'ড়ে আছে বস্তায়। তাড়াতাড়ি ফিরে এল ডুমন, গরুর হয়ত খদ্দের লাগবে, হাটিয়া এবার জ'মে আসছে।

দূর থেকে হঠাৎ চোখে পড়ল ডুমনের, চাকলতা গাছের নীচে জামজুড়ির জহুর পাইকার ডাইনেমাটির চোয়াল দুটো ফাঁক ক'রে বয়স দেখতে আরম্ভ করেছে। একজন ধরেছে মুণ্ডুখানা, শিং দুটো শক্ত ক'রে চেপে ধরেছে আর একজন। ভাঁটার মত বড় বড় চোখদুটো ট্যারচাভাবে আকাশ পানে মেলে জিভ বের ক'রে অতি করুণভাবে চেয়ে আছে বলদটা। ছটফট করছে প্রাণপণ। বিজকে গেছে ডাইনেমাটি, খুব সম্ভব দাড়িওয়ালা পাইকার দে'খে।

হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এল ডুমন। দূর থেকেই সে চীৎকার জুড়ে দিলে—খবরদার—খবরদার, আমার ডাইনে-মাটির গায়ে হাত দিস না বেটারা, ভাল চাস ত স'রে দাঁড়া।

ডুমন এসে সামনে দাঁড়াল। জহুর মিয়া চেনা পাইকার, ডুমনকে দে'খেই বলে উঠল জহুর—বলদদুটো বেচবি নাকি রে?

ডুমন মাঝি একটু তিরিক্ষিভাবে জবাব দিলে—বেচবো কি বেচবো না সে আমার খুশি। এখান থেকে তোরা স'রে দাঁড়া, গরু আমার চকছে।

ডুমন মাঝির তাড়া খেয়ে দলবল নিয়ে একটু স'রে দাঁড়াল জহুর। বললে—বয়েস দেখা আমার হয়ে গেছে, এইবার কি দাম লিবি বল্ দেখি বলদ-জোড়ার?

সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল ডুমন মাঝি—গরুকে এখন আমি খাওয়াব, দামটাম তোকে বলতে পারব না। যদি কিনতে চাস ত খানিক ঘুরে আয়গা যা।

ডুমন মাঝির মেজাজটা বেশ শরিফ নাই। জহুর মিয়া একটু আমতা আমতা ক'রে বললে—তা বেশ ত, নাস্তা ক'রে আমরা ঘুরে আসি ততক্ষণ, দামদস্তুর ক'রে নিলেই হবে।

এগিয়ে গেল জহুর মিয়া দলবল নিয়ে। ডুমন মাঝি খোলের পোঁটলাটা খুলে ব'সে পড়ল বলদত্বটোর সামনে। শ্বেতী খোলের গন্ধ পেয়ে নিশপিশ ক'রে উঠল গরু-ত্বটো। এক একটা ঢেলা নিয়ে মুখের সামনে ধ'রে দেয় ডুমন মাঝি। কাড়াকাড়ি ক'রে সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেয় পঙ্খীরাজ আর ডাইনেমাটি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাবাড় হয়ে গেল পোঁটলাটা। এতক্ষণে বলদ-ত্বটো কিছু শান্ত হ'ল, মুখে চোখে ফুটে উঠছে আহারের পরিতৃপ্তি। ডাইনেমাটির গলাটা আলগাভাবে জড়িয়ে ধ'রে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগল ডুমন। স্থিরভাবে গলা বাড়িয়ে আরাম খাচ্ছে ডাইনেমাটি, আদর খাচ্ছে ডুমন মাঝির ; বরাবরকার অভ্যাস। আজই কিন্তু শেষ, ডুমনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক আজ একেবারেই ছিন্ন হয়ে যাবে, আর হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই। দীর্ঘদিনের দোসর, এতকালের সঙ্গী, এইটুখানি বয়স থেকে ডুমন এদের ঘাস-জল খাইয়ে 'মানুষ' করেছে। মায়া একটু হয় বৈ কি? গরু কাড়ার মায়া, সেও যে একটা কম মায়া নয়। হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে ডুমন মাঝি।

ডাইনেমাটি ডুমন মাঝির কাঁধের উপর গলা রেখে পিঠের দিকে হঠাৎ মুখ গুঁজলে কেন? এরা কি তবে বুঝতে পেরেছে যে ডুমন মাঝি এদের আজ বেচে দিয়ে যাবে পাগাড়তলীর হাটে? বলদটাকে আর একটুখানি শক্ত ক'রে চেপে ধরলে ডুমন, হাত বুলিয়ে আদর ক'রে বললে—আমি যে তোদের যত্ন আত্তি করতে পারছি না বেটা, না খেতে পেয়ে কোন্‌দিন যে এবার মারা প'ড়ে যাবি। তোদের মরামুখ আমি দেখব কেমন ক'রে?

ডুমন একটু থেমে গেল। ঝ'রে পড়ল একটা দীর্ঘশ্বাস, একটুখানি দম নিয়ে পুনরায় বললে—তার চেয়ে আমাকে এবার তোরা খালাস দে বেটা, এবার আমাকে খালাস দে।

ডুমন মাঝির চোখত্বটো হঠাৎ ছলছল্ ক'রে উঠল। তাড়াতাড়ি গামছার খুঁট দিয়ে চোখ ত্বটো একবার মুছে নিলে ডুমন। ডুমন মাঝির পিঠের উপর ডানদিকটায় কিসের যেন একটা শিরশিরে স্পর্শ, সারা দেহ যেন কাঁটা দিয়ে উঠল ডুমনের। পাশ ফিরে হঠাৎ তাকাল ডুমন। লক্‌লকে জিভ বের ক'রে পিছন দিক্ থেকে পঙ্খীরাজ তার গা চাটছে। ডুমন মাঝি গাঢ়স্বরে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল—পঙ্খী, যাবার বেলা আবার ঢুমনী আরম্ভ করলি বেটা? আমি তোদের বেচব, হাটিয়ায় তোদের বেচে দিয়ে যাব ; কাল থেকে কার গা চাটবি চাটিস।

বলদ-ত্বটোর উপর রাগ ক'রেই যেন একটুখানি তফাতে গিয়ে ব'সে পড়ল ডুমন, একটা মহুল গাছে ঠেস দিয়ে। শালপাতার একটা চুৃবি ধরিয়ে টানতে লাগল নিজের মনেই। ডাইনেমাটি আর পঙ্খীরাজ, এ নাম-ত্বটোও যে ডুবে গেল আজ থেকে। এরা আজ শুধু বলদ, চার পা-ওলা জন্তু ; কিনবে যারা তাদের কাছে এ নামের কোন দাম নাই। শুনলে হয়ত হেসে উঠবে, ডুমন মাঝির পাগলামী। ডাইনেমাটি আর পঙ্খীরাজ, এও কখনও হয় নাকি, ডুমন মাঝির পাগলামীই ত!

কিন্তু বলদ-ত্বটোকে যখন বেচতেই হবে, ও নিয়ে আর এত কথা ভাবছে কেন ডুমন? ভেবে আর কোন লাভ আছে? কি হবে ছাই ও নিয়ে আর তুঃখ ক'রে?

মনে মনে একটা বোঝাপড়া ক'রে ফেললে ডুমন। তাড়াতাড়ি এবার বেচে ফেলাই দরকার। পাইকাররা আসুক, আসুক এবার পাইকাররা, ডুমন মাঝি প্রস্তুত।

গরুর বেপারী জহুর মিয়া ফিরে এসে দাঁড়াল ডুমন মাঝির সামনে। বললে—কি মাঝি, বলদজোড়ার দাম কি লিবি বল্ দেখি? ঠিক এক কথা ব'লে দে, জানাচেনা লোকের সঙ্গে হিজ্জাহিজ্জি আমি করতে চাই না।

ডুমন মাঝি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকাল একবার জহুর মিয়ার দিকে। দাম ত একটা বলতেই হবে ডুমনকে। ভেবে-চিন্তে ব'লে ফেললে ডুমন—পাঁচকুড়ি টাকা দে গা যা।

দাড়িয়াস জহুর মিয়ার চোখত্বটো যেন কপালে উঠল, বললে—সে কি মাঝি, একটু বুঝে-সুঝে দাম বল্। কুড়ি-তিনেক টাকা পাবি, দিতে হয় ত দিয়ে দে।

ডুমন মাঝি কি যেন একটু ভেবে নিলে, বললে—দূর হে, এই হাতীর মতন বলদটোর কি তিনকুড়ি টাকা দাম হয়?

ডুমন মাঝির পঙ্খীরাজের গায়ে হাত রেখে হঠাৎ ব'লে উঠল জহুর মিয়া—এই গরুর পিঠে হাত দিয়ে বলছি মাঝি, বাজারদর ঠিক এই রকমই চলছে। তুই না-হয় গিয়ে যাচাই ক'রে দেখে আয়।

গো-খাদক জহুর মিয়া গরুর পিঠে হাত দিয়ে শপথ করছে। বিশ্বাস কেউ করুক চাই না করুক, জহুরের কিছু এসে যায় না। গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, কিনতে গিয়ে ওই জন্তুর পিঠে হাত দিয়েই শপথের কাজটা সেরে নেয় জহুর। যা-হোক কিছু একটা হাতের কাছে পেলেই হ'ল। বেদে পাড়ায় সে-বার মুর্গী কিনতে গিয়ে সনাতন সাপুড়ের খরিস সাপের ঝাঁপিটাই হঠাৎ চেপে ধরেছিল জহুর, শপথ ক'রে বলেছিল—'এই সাপ ছুঁয়ে বলছি উস্তাজ, হাঁস-মুর্গীর বাজারদর একদমসে ডাউন'। অবশ্য নিজের মাল বেচবার সময় জহুর মিয়া ঠিক একই ভাবে জীব-জানোয়ার স্পর্শ ক'রে শপথ ক'রে যায়, সাফাই গায় ঠিক একই ভাষায়। শুধু বাজারদরের কাঁটাটা থাকে উল্টো দিকে ঘোরানো, তফাৎ শুধু এইটুকু।

জহুর মিয়ার কথাটা কিন্তু বেশ মনঃপূত হ'ল না ডুমন মাঝির। তিনকুড়ি টাকায় কি এত বড় হেতের ছুটো ছেড়ে দেওয়া যায়? কপালটা একটু কুঁচকে বললে ডুমন—যা তাহলে, তিনকুড়ি টাকায় নাই দিব।

জহুর মিয়ার নেহাৎ মেহেরবাণী, তাই হেঁকে দিয়েছিল তিনকুড়ি। ডুমন মাঝির খাঁই দেখে তোবা ক'রে স'রে পড়ল জহুর। কিন্তু জহুর মিয়া স'রে পড়লে কি হবে? আড়কাঠি তার ঘুরে বেড়াচ্ছে আশে-পাশে। তাদেরই একজন এগিয়ে এল ওপাশ থেকে। ডাইনেমাটির লেজটা হঠাৎ আচ্ছা ক'রে মুচড়ে দিলে। আধবুড়ো গতর নিয়েও ধড়ফড়িয়ে লাফিয়ে উঠল ডাইনেমাটি। ডুমন মাঝি জ'লে উঠল, তিরিক্ষিভাবে ব'লে উঠল ডুমন—ছাজটা অমন ক'রে মুচাড়সি কেনে হে, তোর কানটা যদি অমনি ক'রে মুচাড়ে দি খোলামকুচি দিয়ে, ভাল লাগবেক তোর?

হাসতে হাসতে জবাব দিলে আড়কাঠি—বলদের তোর তেজ দেখছি মাঝি। তা তেজ-তামস সব গ'ড়ে গেইছে বেবাক। তা হোকগে, ওদের চেয়ে আমি আরও পাঁচ টাকা বেশী দিব, তিনকুড়ি পাঁচ; রাজী আছিস?

ডুমন মাঝি তড়পে উঠল—তোকে আমি নাই বেচবো, যাঃ। বলদের আমার ছাজটা যে জখিম ক'রে দিলি বেটা, হুরুকে যা তুই এখান থেকে।

ডাইনেমাটির ল্যাজটা ছু'হাত দিয়ে টেনে টেনে ড'লে দিতে লাগল ডুমন। কে জানে, ল্যাজটা বেটা ভেঙেই দিলে নাকি!

জহুর মিয়ার ছু'নম্বর দালাল এগিয়ে এল অপর দিক্ থেকে। এসেই একটা হেলেবাড়ি দিয়ে পঙ্খীরাজের টিকের উপর, অর্থাৎ কিনা পিঠ বরাবর পিছন দিকের উঁচু মত হাড়টায়, ঝড়াম্ ক'রে ঝেড়ে দিলে এক লাঠি। কাবু হয়ে পড়ল পঙ্খীরাজ, বে-জায়গায় লাঠির আঘাত খেয়ে কুঁকড়ে উঠল একদম সে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব'লে উঠল ডুমন—টিকটা যে একদম ফুটাই দিলি বেটা, গরুটাকে অমন ক'রে ঠেঙালি কেনে বল্ ত? এ কি তোর বাবার গরু পেয়েছিস নাকি?

ছু' নম্বর কিন্তু চটল না। বত্রিশ পাটি দাঁত বের ক'রে জবাব দিলে,—টিকে কাঠি দিয়ে দেখে নিলাম মাঝি, লাফঝাঁপ কিছু করছে কি না। তা কই লাফালো, টেংরির জোর থাকলে ত?

ডুমন কিন্তু নিজেই এবার লাফিয়ে উঠল, বললে—তাই ব'লে তুই ঠেঙাবি আমার গরুকে? বুনো হেঁড়োল কোথাকার।

হাসছে তবু আড়কাঠি। এসব ওরা গায়ে মাখে না। তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল,—তিনকুড়ি দশ, পুরোপুরি তিনকুড়ি দশ। বেচবি গরু?

ওদিক্ থেকে এগিয়ে এসে রুখে দাঁড়াল এক নম্বর। চোখ পাকিয়ে ব'লে উঠল ছু' নম্বরকে লক্ষ্য ক'রে,—তুই বেটা আবার কোত্থেকে এলি রে, পাইকেরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাল কিনতে চাস? মাল আমি এই চাপড়ালাম, তিনকুড়ি দশ,—আমি দিব তিনকুড়ি দশ।

ডাইনেমাটির পিঠের উপর ঝড়াম্ ক'রে ঝেড়ে দিলে এক থাপ্পড়। আদালতের ডুগডুগির জোরে বাঁশগাড়ী যেন কায়েম ক'রে ফেললে।

ফুঁসে উঠল দু'নম্বর, চোখ তেড়ে ব'লে উঠল,—কোথাকার এক কসাইখানার দালাল, আমাদের এই জোয়াত থেকে মাল নিয়ে গিয়ে কসাইখানায় জবাই করতে চাও? চিকু মিয়া থাকতে কিন্তু সেটি হচ্ছে না। মাল আমি এই হাটতলায়, তাগদ থাকে ছিনিয়ে নিয়ে যা।

পক্ষীরাজের গলার দড়াটা চাকলতা গাছ থেকে খুলে নিয়ে দু'হাত দিয়ে টেনে ধরলে চিকু মিয়া। গরুটা যেন সে কিনেই ফেলেছে। দেখাদেখি তার ডাইনেমাটির পাগা খসিয়ে গলাটা তার গামছা দিয়ে বেঁধে ফেললে দু'নম্বর মিয়া সাহেব। চিকুমিয়াকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললে,—কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে এগিয়ে আয় বেটা, গরু আমি ছাড়লে ত?

দু'ধার থেকে দু'জন মিলে টানতে লাগল দুটো গরুকে।

হঠাৎ যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেল ডুমন। বলদ দু'টোকে বেখাওকা হাতিয়ে নিয়ে দু'দিক থেকে দু'জন এরা স'রে পড়তে চায় নাকি? ভাবগতিকটা বেশ ভালো বুঝছে না ডুমন। চোর বাটপাড়ের পাল্লায় এসে প'ড়ে গেল নাকি ডুমন মাঝি?

চোর না হলেও লোকগুলো যে একনম্বর বাটপাড় সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? আসলে ওদের মতলবটা হ'ল, ডুমন মাঝিকে হাটিয়া থেকে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলা। সেইখানে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত পাটাশ খেয়ে পড়বে ডুমন, ওই তিনকুড়িতেই মাল বেচবার পথ পাবে না।

ডুমন একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে পক্ষীরাজের দড়াটা হঠাৎ দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলে। চোখ তেড়ে ব'লে উঠল ডুমন,—গরু আমি বেচবো না, তুই বেটাদিকে গরু আমি কিছুতেই বেচবো না।

ও কি, ও বেটা আবার ডাইনেমাটিকে নিয়ে গজগজ ক'রে চলল কোথায়? কসাইখানায় নিয়ে গিয়ে ভ'রে দেবে নাকি? অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠল ডুমন, হাটিয়ার দিকে মুখ ক'রে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল—পিথু মাঝি—হেই পিথু মাঝি, ডাইনেমাটিকে ওরা কসাইখানায় ধ'রে নিয়ে গেল।

কোথেকে হঠাৎ উদয় হ'ল এসে জহুর মিয়া। ডুমন মাঝিকে ভরসা দিয়ে বললে,—এ কি মগের মুলুক নাকি, জবরদস্তি গরু ধ'রে নিয়ে গেলেই হ'ল? থাম্ মাঝি তুই, দেখছি আমি।

হন্‌হন্ ক'রে এগিয়ে গেল জহুর। চিকু মিয়ার ঘাড় ধ'রে টানতে টানতে এনে হাজির ক'রে দিলে ডুমন মাঝির সামনে। গরুদুটোকে টেনে হিঁচড়ে কায়দা ক'রে পাগায় পাগায় বেঁধে ফেললে ডুমন। চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল,—গরু আমি তোদের বেচবো না, ভাল চাস ত স'রে যা সব ইখান থেকে।

জহুর মিয়া ব'লে উঠল—ও বেটারা সব এক নম্বর চোর, সেরে পুরে কাউকে দাম দেয় না। আমি দেব তোকে তিনকুড়ি দশ, হাতে হাতে নগদ টাকা গুনে নে।

কোমর থেকে টাকা রাখবার গেঁজিয়াটা তাড়াতাড়ি খসিয়ে ফেললে জহুর। দাম দিতে চায় তিনকুড়ি দশ, লাভলোকসান যা-ই থাক তার নসিবে।

জহুর মিয়া ভাল ক'রেই জানে, অজয়পারের লালগঞ্জের হাটে এই বলদের দাম উঠবে দেড়শ' টাকার উপর। লোকসানের কোন কথাই ওঠে না। ডুমন মাঝি কিন্তু বিষিয়ে উঠল, বললে,—গরু আমি তোদের বেচবো নাকো যা। গুটেক যদি বাড়াবাড়ি করিস—সাঁওতালীতে খবর দিয়ে দিব, বুঝবি তখন মজাটা। তীরেঁই দিব সব বেটাদিকে।

সাঁওতালী তীর, সে এক বড় কঠিন জিনিস। সহজে এরা রাগে না, রাগলে কিন্তু আর রক্ষা নাই। একগুঁয়ে জাত, বিগড়ে গেলেই প্রমাদ। দল বেঁধে সব একবার যদি কাঁড়-ধেনুক নিয়ে রুখে দাঁড়ায়—তা হলেই হ'ল, পাইকারের বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবে একেবারে। ডুমন মাঝির তাড়া খেয়ে এতক্ষণে থাতে এল জহুর মিয়ার দল। এদিক্ ওদিক্ স'রে পড়ল একে একে।

বলদদুটোকে দড়ি ধ'রে টানতে টানতে এগিয়ে চলল ডুমন। হাটতলার অপর প্রান্তে মহুলগাছের একটা গুঁড়ির সঙ্গে ডাইনেমাটি আর পক্ষীরাজকে শক্ত ক'রে বেঁধে দিলে। কারো যদি গরজ থাকে—এইখানে এসে কিনে নিয়ে যাক। কিন্তু এ কি, পক্ষীরাজের টিক বেয়ে যে রক্ত ঝরছে! ঠেঙ্গিয়ে দিয়ে গেল পাইকার বেটা, একেবারে জখম ক'রে দিয়ে গেল গরুটাকে। ডাইনেমাটি আবার গা-ঢালা দিয়ে ব'সে পড়ল যে! কসাইখানার নাম শুনে ভড়কে গেল নাকি? এরা হয়ত বুঝতে পেরেছে ওই কসাইখানার দালালদের হাতেই এদেরকে আজ তুলে দিয়ে

একমাথা কালো কিসকিসে চুল।

রয়েছে ডুমন মাঝি। [illegible] কি করতে পারে ডুমন, এদেরকে যে না বেচে আর উপায় নাই। ডাইনেমাটি কাঁদছে নাকি! পঙ্খীরাজ যে নেতিয়ে পড়ল টিকের ব্যথায়। ভড়কেই ওরা গেল হয়ত, ডুমনকে আজ ছেড়ে যেতে হবে কিনা? যাবার আগে ডুমনকে এরা জব্দ ক'রে দিয়ে গেল বেশ। বুকের পাঁজরাগুলো যে ভেঙে দিয়ে গেল ডুমনের!

বলদ-দুটোর দিকে ঠায় একদৃষ্টে চেয়ে আছে ডুমন। বত্রিশ নাড়ীতে পাক দিচ্ছে ডুমন মাঝির। এ যে আবার এক নতুন বিপদ, পাহাড়তলীর হাটে হঠাৎ গরু বেচতে এসে এ আবার কি ফ্যাসাদে পড়ল ডুমন।

গরুদুটোর উপর রোখ চেপে গেল হঠাৎ ডুমন মাঝির। পাগলের মত একটা হুঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠল,—ডাইনেমাটি, ডাইনেমাটি, বেকুবের মতন কাঁদছিস কেনে বেটা, চোখদুটো এমন ছলছল করছে কেনে?

কান্না পেলেই চোখ ছলছল একটু করে বই কি? কে জানে, কাঁদছে হয়ত বা ডাইনেমাটি। চোখদুটো কিন্তু ছলছল করছে আর একজনের, সে ডুমন মাঝির নিজের।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে ঝাড়লে ডুমন আর এক ধমক,—পঙ্খীরাজ—? এইবেলা তোদের বিদেয় করতে না পারলে এরপর যে তোদের হাড়-চামড়াগুলো বেচতে হবে আমাকে। তোদের মরামুখ আমি দেখব কেমন ক'রে বেটা?

হাউ হাউ ক'রে এবার কেঁদেই ফেললে বুঝি ডুমন মাঝি। হাত-পা ছেড়ে ধপ্ ক'রে বসে পড়ল মাটির উপর। চোখ বুজে কি ভাবতে লাগল ডুমন। এদের বাঁচাবার কি কোন উপায় নাই! নিজের হাতে এদের যত্নআত্তি যে করতে পারছে না ডুমন মাঝি।

কুস্তি বেচা শেষ ক'রে পিথু মাঝি খুঁজে বেড়াচ্ছে ডুমনকে। দূর থেকে দেখতে পেয়ে হাঁক দিলে একটা পিথু,—ডুমন মাঝি, হেঁই ডুমন মাঝি।

সজাগ হয়ে উঠল ডুমন। চকিতের মত এদিক্-ওদিক্ একবার তাকাল, সাড়া দিলে দূর থেকেই—কে?

পিথু মাঝি প্রায় ছুটতে ছুটতে ডুমন মাঝির সামনে এসে দাঁড়াল, বললে,—সারা হাট তোকে খুজে বেড়াচ্ছি, হিথাকে এসে ব'সে আছিস কেনে রে?

ডুমন মাঝি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকাল একবার পিথু মাঝির দিকে। মুখ টিপে টিপে হাসছে পিথু। হাসতে হাসতে বললে,—তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। ভাদুপাড়ার সিংরায় মাঝি হাটে এসেছে, রাঙি মেঝেনকে সঙ্গে নিয়ে। তোর সঙ্গে রাঙির সাঙা দিতে চায়, এখনো আমাকে হাতে ধ'রে সাধছে। করবি সাঙা?

ডুমন মাঝির সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। সাঙা, সাঙা করতে হবে নাকি ডুমনকে!

বলদ দুটোর দিকে করুণভাবে একবার তাকাল ডুমন। তারপর সে হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে ব'লে উঠল,—করব সাঙা, সাঙা আমি করব পিথু, করতেই হবেক সাঙা। যা, তুই ওদের খবর দিয়ে আয়।

পিথু মাঝি উৎসাহিত হয়ে ব'লে উঠল,—চল্ তা হলে আমার সঙ্গে, কনেটা একবার নিজের চোখেই দে'খে আসবি। তা ছাড়া ওই সিংরায় মাঝির সঙ্গে পাকা কথাটা তোরই কওয়া ভাল।

সেও ত একটা কথা বটে। পাকা কথাটা ডুমন মাঝিকেই কইতে হবে বইকি? সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল ডুমন, বললে,—চল তা হলে, কাজটা একদম সেরেই আসা যাক।

কতকগুলো ডালপালা ভেঙ্গে বলদ-দুটোর মুখের সামনে ধ'রে দিলে ডুমন। ডাইনেমাটি আর পঙ্খীরাজ একটু যেন সজাগ হয়ে উঠল। কতকটা যেন নিজের মনেই ব'লে উঠল ডুমন, ঘাবড়াস না বেটারা, সবুর। তোদের বাঁচার উপায় করতে চলল ডুমন মাঝি। সাঙা আমি করবই, নিঘ্যাৎ সাঙা করব।

পিথু মাঝির পিছু পিছু এগিয়ে চলল ডুমন। খানিকটা দূর গিয়েই থমকে দাঁড়াল পিথু। দূর থেকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে সিংরায় মাঝির বেটীটাকে। ঝাঁকড়া একটা করঞ্জাগাছের নীচে চুপচাপ ব'সে আছে রাঙি মেঝেন।

ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে দূর থেকেই তাকাল একবার ডুমন মাঝি। মেঝেন একটা ব'সে আছে বটে। বয়স কত হবে মেঝেনটার, তা এক দেড়কুড়ি হবে বইকি? দোহারা চেহারা, মাথায় একমাথা কিসকিসে কালো চুল, পরণে একখানা সাঁওতালী তাঁতের লাল ডগোমগো চওড়াপাড় শাড়ী। চোখে রাঙি মোটা ক'রে কাজল পরেছে। সৌখিন আছে মেঝেনটা। দেখতে-শুনতে ভালই বলতে হবে।

ডুমন মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে রাঙির দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল পিথু। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—তোর বাপটা কোথায় গেল রাঙি?

জবাব দিলে রাঙি মেঝেন,—হাল কিনতে গেইছে।

ডুমনকে নিয়ে ফিরল পিথু। এগিয়ে চলল লাঙ্গলপটির দিকে। একটুখানি গিয়েই অশথগাছের ছায়ায় শুকনো একটা গদিকাঠের উপর ডুমন মাঝিকে বসিয়ে দিলে পিথু। বললে,—সিংরায় মাঝিকে আমি খবর দিয়ে আসি, তুই ততক্ষণ এইখানেই বোস্। পান একখিলি খাবি নাকি ডুমন?

ওসব বালাই নাই ডুমনের, পান ডুমন খায় না। পিথু কিন্তু দিকুপিড়াদের* দেখাদেখি হাটিয়ার দোকান থেকে পান কিনে খেতে শিখেছে। পুনরায় ব'লে উঠল পিথু,—খা কেনে এক খিলি, ঠোঁট দুটো একটু রাঙাই লে, রাঙি মেঝেন ভাল বলবেক।

ডুমন মাঝি যেন বিজকে উঠল আবড়গরুর মত, বললে,—দূর্—দূর্—এ তুই কি বলছিস পিথু, রাঙি মেঝেন ভাল বলবেক কি রে!

হো হো ক'রে হেসে উঠল ডুমন। পিথু মাঝি এগিয়ে গেল হাসতে হাসতে।

ডুমন মাঝি দূর থেকে অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে রাঙির দিকে। গায়ে গতরে যৌবন যেন ঠেলে উঠছে রাঙির। কে বলবে যে এতখানি বয়স হয়েছে। দেখতে শুনতে বেশ ভালই আছে মেঝেনটা। কিন্তু ডুমন মাঝিকে সত্যিই কি সে পছন্দ করবে? ডুমনের যে বয়স হয়ে গেল দু'কুড়ি পার।

তা হোক, তাতে এমন কিছু দোষ হয় না; ডুমন মাঝি পোক্ত আছে যথেষ্ট। এই বয়সেই তিন জোয়ানের মহড়া নিতে পারে ডুমন। ঠিক আছে, ডুমন মাঝি ঠিকই আছে। কোনো দিক্ থেকেই রাঙি মেঝেনের অযোগ্য নয় সে।

দূর থেকে রাঙির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ডুমন। রাঙি ওকে লক্ষ্য করে নি। করঞ্জা গাছের ছায়ায় বসেছিল এতক্ষণ রাঙি মেঝেন, উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। ধবধবে শাড়ীর লাল ডগডগে পাড়খানা সেঁটে যেন ব'সে আছে উচল বুকের একপ্রান্তে। রাঙা নদীর ঢেউ খেলছে পাহাড়তলীর ঢল বেয়ে। গুঁড়ি বাইলে রাঙি মেঝেন। করঞ্জা গাছের বেদির উপর হাট-বাজারের পোঁটলাগুলো কায়দা ক'রে বেঁধে নিচ্ছে। বুকের বাঁ দিকটা ঈষৎ যেন ঝিলিক

---

* দিকুপিড়া—সাঁওতালেতর জনজাতি।

দিচ্ছে শাড়ীর ফাঁকে। ছটকে যেন বেরিয়ে এল একখানা তীর, বিদ্ধ করলে ডুমন মাঝিকে। ডুমনের চোখ-দুটোকে চুম্বকের মত সেঁটে ধরলে যেন। থ মেরে গেল ডুমন।

ডুমন মাঝির হ'ল কি আজ হঠাৎ? চোখদুটো তার এমনধারা বেয়াদপি সুরু করলে কেন? ভীমরথী ধরল নাকি ডুমন মাঝির?

নিজের মনেই হঠাৎ যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেল ডুমন। কিন্তু লজ্জা পাওয়ার ব্যাপার ত ঠিক নয় এটা! ওকেই যদি শেষ পর্য্যন্ত মেঝেন করতে হয়? দেখেশুনে একটু পরখ ক'রে নিতে দোষ আছে কিছু? ওটা হ'ল নারী-অঙ্গের শোভা, পুরুষজাতের তৃপ্তি, সন্তানের আধার। ওই স্তনদুটোই যে বাঁচিয়ে রাখে তার গিদরেকে, তিলে তিলে মানুষ ক'রে তোলে। নইলে মারাং বুরুর ছিষ্টিটা যে একেবারে লয় পেয়ে যেত!

গিদরে? কার গিদরে! গিদরের কথা আবার ভাবতে যায় কেন ডুমন মাঝি? গিদরে ত তার হবে না। জানগুরুর চেতাবনী, বেটার মুখ দেখা ভাগ্যে নাই যে ডুমন মাঝির। বিয়েই কর, আর সাঙাই কর, গিদরে গিদরী হবেক নাই আর ডুমনের।

তা না হয়, না হোকগে, সে দুঃখটা কোন মতে সয়ে নেবে ডুমন; নিজে ত সে বেঁচে যাবে একঘেয়ে এই নাকোয়ালী থেকে। বেঁচে যাবে তার ডাইনেমাটি, বেঁচে যাবে পঙ্খীরাজ; সেও ত একটা কম কথা হ'ল না? তা হলে আর আপত্তি কি ডুমনের? রাঙি মেঝেনকে সাঙা করতে দোষ আছে কিছু? তা না হলে ঘরসংসার তার সামলাবে কে?

কথাগুলো খুব খাঁটি। কিন্তু তার চেয়ে একটা খাঁটি কথা ঠিক মত হয়ত ধরতে পারছে না ডুমন। রাঙি মেঝেনের আথাল-পাথাল ওই যৌবনের আকর্ষণ, সেও কি একটা কম কথা হ'ল? ডুমনমাঝির জৈবধর্মী নিঃসুপ্ত পৌরুষকে অজান্তে তার দিগদড়ি বেঁধে টানছে রাঙি। ডুমন হয়ত টের পায় নি। হাঁ ক'রে সে চেয়েই আছে রাঙির দিকে।

ডুমনের দিকে পিছন ফিরল রাঙি। সোজা হয়ে দাঁড়াল। সাঁওতালী নক্সা-পাড় নতুন-কেনা শাড়ী একখানা ভাঁজ করছে। ফুলগোঁজা তার এলো খোঁপায় জিঞ্জির বাঁধা চাঁদি রূপোর ঘুঙুর। কেশবতী কন্যে রাঙি।

খোঁপা এলিয়ে চুলগুলো ওর খুলে দিলে হয়ত গিয়ে পাছায় পড়বে। পাছাভারী মেয়েমানুষ গেরস্তালীর লক্ষী। ধান ভানতে ঢেঁকীর গড়ে এরা পাড় দেয় সবচেয়ে ভাল।

দুর থেকে বলদ-দুটোকে একবার লক্ষ্য ক'রে দেখে নিলে ডুমন। ঠিক আছে, নিশ্চিন্তে ওরা পালা খাচ্ছে কাড়াকাড়ি ক'রে। ডুমন আবার চোখ ফেরালে রাঙি মেঝেনের দিকে।

বছর-সাতেকের পুঁচকে একটা ছোঁড়া এসে রাঙির কোলে উঠে পড়ল কখন। গলা জড়িয়ে দোল খাচ্ছে, চুমু খেলে একবার রাঙি মেঝেন। কে বটে ও গিদরেটা? একমাথা কালো কিসকিসে বাবড়ি চুল, পরণে একটা হলুদ রঙের ধড়ি, গলায় ঝুলছে লাল টুকটুকে কুঁচ ফলের মালা! কালো পাথরে ছেনি দিয়ে খোদাই করা যেন একখানা মূর্ত্তি, চাইলে যে আর চোখ ফেরানো যায় না। কার বটে এই গিদরেটা? আসমান থেকে নেমে এল নাকি? ডুমন মাঝি স্বপ্ন দেখছে না ত? কে রে, কে বটিস কে তুই? কোন্ গেরামের দুলাল, কোন্ বাপ-মার বুক জুড়ানো ধন? চোখদুটো যে জুড়িয়ে দিলি ডুমন মাঝির!

ব্যস্তবাগীশ পিথু মাঝি ছুটতে ছুটতে এসে খাঁ ক'রে একটা বিড়ি গুঁজে দিলে ডুমন মাঝির মুখে। বললে—লেঃ—একটা চুটি খা।

ডুমন যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। পিথু মাঝিকে দেখেই তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল ডুমন,—রাঙির কোলে ওই গিদরেটা কে রে?

পিথু মাঝি জবাব দিলে—রাঙি মেঝেনের বেটা।

—রাঙি মেঝেনের নিজের বেটা? চকিতের মত ব'লে উঠল ডুমন।

পিথু মাঝি জবাব দিলে,—নিজের না ত কি রাস্তা থেকে ধ'রে এনেছে? রাঙি মেঝেনের ওই একটাই বেটা। রাঙি যখন রাঁড় হয়, ছেলেটার তখন বয়স ছিল মোটে বছর-তিনেক।

ডুমন মাঝি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—কই, আগে ত সে-কথা জানাস নাই আমাকে?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে পিথু—জানিয়েছিলাম বইকি? রাঙি মেঝেনের একটা ছেলে আছে, এ কথা ত সবাই

জানে। সে যাকগে, সিংরায় মাঝিকে তাড়াতাড়ি আমি ধ'রে নিয়ে আসি, কথাবার্ত্তাটা এইখানেই পাকা হয়ে যাক।

ছুটল আবার পিথু মাঝি হাটিয়ার মধ্যে দিয়ে। ডুমন মাঝি অবাক্ মেরে গেল। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাকাল একবার রাঙি মেঝেনের গিদরেটার দিকে। ওরা ছুটোই যে খুব সুন্দর, কাকে ফেলে কার দিক্ পানে চাইবে ডুমন? যেমন্ মা, তার তেমনি ছেলে। এতখানি ভাগ্যের কথা ডুমন যে আদৌ ভাবতে পারে না। রাঙিকে কি সিংরায় মাঝি সত্যি সত্যি তুলে দেবে ডুমন মাঝির হাতে?

তা হয়ত দেবে। ওই সিংরায় মাঝিই ত পিথু মাঝির মধ্যস্থতায় ডুমন মাঝিকে বারে বারে সেধেছে। জোত-জমা, বিষয়-আশয় কম কিছু নাই ডুমন মাঝির। পাড়ার মধ্যে খাটো নয় সে কারও চেয়ে। সেই জন্যেই ত সবার আগে ডুমন মাঝিকে পছন্দ করেছে সিংরায়। তা হলে আর কথা কি, এ সাঙা আর না হয়ে যায় না। সাঙা ত প্রায় হয়েই গেল, ডুমন শুধু মত করলেই হয়।

ঘুরে ফিরে রাঙি মেঝেনের ছেলেটার দিকেই বারে বারে যে চোখ পড়ছে ডুমনের! এর মধ্যেই মায়া প'ড়ে গেল নাকি? তা গেল, তা একটু গেল বই কি?

দূর থেকে ছেলেটার দিকে গভীর একটা দৃষ্টি মেলে মনে মনে হঠাৎ ব'লে উঠল ডুমন মাঝি—জানগুরু, মুর্গাবনির ডাকসাইটে জানগুরু তোতা মাঝি, তোর চেতাবনী কিন্তু ডুমন মাঝি ব্যর্থ ক'রে দিলে। ওই ত বেটা, জলজ্যান্ত দামাল ছেলে, বেটার মুখ আজ সত্যি সত্যি দেখে নিলে ডুমন। কই ফলল তোর চেতাবনী?

ঝাঁটিপাহাড়ের ওপার পানে বাবলা বনির দিকে মুখ ক'রে জানগুরু তোতা মাঝির উদ্দেশে দূর থেকেই হো হো ক'রে একবার হেসে উঠল ডুমন মাঝি, চেতাবনীর ভূত-ভাগানো উৎকট এক বিদ্রূপের হাসি। হ'ল কি আজ ডুমনের, লোকটা শেষ পর্য্যন্ত পাগল হয়ে না যায়।

পাগল কিন্তু হয় নি ডুমন। তোতা মাঝির ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ ক'রে বেটার মুখ সে দেখে নিয়েছে। লোকে হয়ত বলবে, ওটা কাটবেটা, ডুমন মাঝির নিজের বেটা নয়। তা বলে ত বলুক, এতেই ডুমনের কাজ চ'লে যাবে। হ'লই বা সে কাটবেটা, বেটা ত একটা বটে।

সিংরায় মাঝিকে ধ'রে নিয়ে এল পিথু মাঝি। কথাবার্ত্তা সঙ্গে সঙ্গে পাকা হয়ে গেল। ভাবী জামাই ডুমন-মাঝিকে গুড়জল খাইয়ে পাকাপাকিটা হাটতলাতেই সেরে ফেললে সিংরায় মাঝি। লগন বাঁধবার দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেল। আসছে মাসে বিয়ে।

যাক, এ এক রকম ভালই হ'ল, পিথু মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরল ডুমন। পাগায় পাগায় ছাঁদ দিয়ে বলদ ছুটোকে বেশ শক্ত ক'রে বেঁধে নিলে। বেঁচে গেল ডুমন মাঝির পক্ষীরাজ আর ডাইনেমাটি। এদের দিয়েই নতুন ক'রে আবার চাষবাসের কাজ সুরু করবে ডুমন। রাঙি এসে পেট পূরে এদের খাওয়াবে। আর ঝাঁটিপাহাড়ের ধারে গিয়ে গরু চরাবে ওই ডুমন মাঝির বেটা। ব্যস্—আর চাই কি, ডুমন মাঝি নিশ্চিন্ত।

ঘরমুখো বলদ-ছুটো জোর কদমে হেঁটে চলেছে। পিথু মাঝি মৃদু একটু হেসে বললে ডুমন মাঝিকে লক্ষ্য ক'রে—তবে যে আগে বলছিলি করব নাকো সাঙা? কেমন, এবার হ'ল ত?

পক্ষীরাজ আর ডাইনেমাটির লেজ-ছুটো হঠাৎ ঈষৎ একটু মুচড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে ব'লে উঠল ডুমন—তা এক কাণ্ড হ'ল বেটে।

বঙ্গের বাণিজ্য প্রথমতঃ বিদেশী ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয়দের কবলিত, এবং তাহার পর মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পার্সী, কচ্ছী, সিন্ধী, মাদ্রাজী, পঞ্জাবী, দিল্লীওয়ালা মুসলমান, প্রভৃতির অধিকৃত। বড় ব্যবসায়ে বাঙালীর স্থান নাই বলিলেও চলে।···বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্ক্‌স্ এবং তদ্বিধ দুই-একটি অপেক্ষাকৃত ছোট কারখানা ছাড়িয়া দিলে বঙ্গে বাঙালীর কারখানা কোথায়? বড় কারখানা একটিও নাই বলিলে হয়। ছোট ব্যবসা, এমনকি ময়রার দোকান পর্য্যন্ত সব অবাঙালীর হাতে গিয়াছে বা যাইতেছে। কলকারখানার মজুর কারিগর, রেলওয়ে ও জাহাজঘাটার কুলী, শহরের মুটে মজুর, মিউনিসিপ্যালিটির মিস্ত্রী মজুর কারিগর, নৌকার মাঝি, গৃহভৃত্য ও পাচক প্রভৃতি অধিকাংশ অবাঙালী।

কিন্তু কেহ নিরুৎসাহ ও নিরাশ হইবেন না। বাঙালী বুদ্ধিতে কাহারো অপেক্ষা কম নহে।···ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেকটা অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিয়া, সাহসে ভর করিয়া থাকিতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে যাহা অনিশ্চিত মনে হইতে পারে, সমষ্টিগতভাবে তাহা নিশ্চিত। তাহার প্রমাণ চাকরী- ও ওকালতী-প্রিয় বাঙালী জাতি অপেক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্যপ্রিয় পূর্ব্বোল্লিখিত জাতিসকল বিত্তশালী।

প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গ—চৈত্র, ১৩৩৩।

বাংলা লোক-সাহিত্যের বৈচিত্র্য

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা লোক-সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে যে-পরিমাণ রূপ-ও বিষয়-গত বৈচিত্র্য দেখা যায়, অন্যত্র তাহা দেখা যায় না। সমগ্র হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চলে লোক-সাহিত্যে যে-সকল বিষয় অবলম্বন করা হইয়াছে, বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল আয়তনে তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে ব্যবহৃত বিষয়ের সংখ্যা তাহার তুলনায় অনেক বেশী। ইহার কতগুলি নিগূঢ় কারণ আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করিতে পারি।

প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় চরিত্র যেমন তাহার নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠে, তেমনই লোক-সাহিত্যও প্রধানতঃ দেশের প্রত্যক্ষ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই বিকাশ লাভ করে। বাংলা দেশের প্রকৃতি ইহার সমগ্র বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল ব্যাপিয়া যে এক, তাহা নহে;—ইহা কোথাও নদনদীবিধৌত, কোথাও অরণ্যাকীর্ণ, কোথাও নীরস প্রস্তরভূমি, কোথাও বা তরাই অঞ্চল। একই বাংলা-ভাষার মধ্য দিয়া এই জাতির মধ্যে যে ঐক্যই গড়িয়া উঠুক, এই বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যবর্তী হইয়া ইহার জীবনাচরণে যে কোন অখণ্ড ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ সমগ্র হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চলের কথাই যদি ধরি, তাহা হইলেও দেখিতে পাই যে, উত্তর ভারতের গঙ্গার সমগ্র উপত্যকাভূমি ব্যাপিয়া প্রকৃতির কোন বৈচিত্র্য নাই, সুতরাং জীবন যেমন সেখানে বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই, তেমনই ইহার ধ্যান, ধারণা, চিন্তা ও কর্মের মধ্যেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইতে পারে নাই। উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার দক্ষিণ ভাগ, যেখানে বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা ভারতবর্ষকে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারত, এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, সেখানকার অধিবাসীদিগের জীবনাচরণের সঙ্গে ইহার উত্তর কিংবা দক্ষিণ ভাগের সমতল ভূমির অধিবাসীর জীবনের যোগ নাই। সেইজন্য ইহার লোক-সংস্কৃতির ইতিহাস স্বতন্ত্র। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া নর্মদা ও গোদাবরীর উপত্যকাভূমি ব্যাপিয়া প্রকৃতির যে একটি অখণ্ড রূপ দেখা যায়, তাহা আশ্রয় করিয়াও এই অঞ্চলের অধিবাসীর মধ্যে যে লোক-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও যে বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ তাহা বলিবার উপায় নাই। এমনকি, তাহা হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চল অপেক্ষাও বৈচিত্র্যহীন। ইহার কারণ, এই বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ চোখে পড়িলেও তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য চোখে পড়ে না। পর্বত এবং অরণ্যাই ইহার রূপ, ইহার মধ্যে জীবন যত কঠিনই হউক, তাহাতে কোন বৈচিত্র্য নাই, ইহার জীবনসংগ্রামের যে ধারা তাহা সর্বত্রই এক। সেই জন্য ইহাতেও প্রধানতঃ অভিন্ন প্রকৃতির লোক-সাহিত্যই গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাংলা দেশ প্রধানতঃ নদীমাতৃক হইলেও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের নদ-নদীগুলিরও প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরীর যে রূপ, তিস্তা, করতোয়া, কংসাই কিংবা দামোদর, রূপনারায়ণ, ময়ূরাক্ষীর সেই রূপ নহে। ভাগীরথী, মধুমতী, ইছামতী, ভৈরব, ইত্যাদির রূপও পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর নদ-নদী হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং নদ-নদীর সঙ্গে নানা ভাবে সমাজের যে যোগ স্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা বাংলা দেশের সর্বত্র অভিন্ন পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। সেইঅনুসারেই এই সকল অঞ্চলে জীবনধারা যে ভাবে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার লোক-সাহিত্যও সেই ভাবেই বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে, এক অখণ্ড পরিচয় লাভ করিবার অবকাশ পায় নাই।

সমগ্র হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চলে ভজন গানের এক ব্যতীত দুইটি সুর শুনিতে পাওয়া যায় না, এমনকি সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর হইতে আরম্ভ করিয়া নর্মদা, গোদাবরীর উপত্যকা দিয়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সীমা পর্যন্ত সমগ্র আদিবাসী অঞ্চলে ঝুমুর গানেরও একই অভিন্ন সুর শুনিতে পাওয়া যায়। অথচ, এই আদিবাসী অঞ্চলের সর্বত্রই ভাষা অভিন্ন নহে—এই বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া অষ্ট্রীক, দ্রাবিড় ও ইন্দোইউরোপীয় ভাষার বিভিন্ন শাখা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি ইহাদের মধ্যে লোক-সঙ্গীতের সুর-গত যেমন বৈচিত্র্য নাই, তেমনই

বিষয়-গত কোন বৈচিত্র্যও দেখা যায় না। কিন্তু এক বাংলা দেশেরই পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের বিষয় ও সুরের দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। পশ্চিম-সীমান্ত-বাংলার লোক-সঙ্গীতের মৌলিক ভিত্তি ঝুমুর, উত্তর বাংলার ভাওয়াইয়া, পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালি ও দক্ষিণ বাংলার সারি, ইহাদের প্রত্যেকেরই এমন এক-একটি স্বাতন্ত্র্য আছে যে, তাহা দ্বারা ইহারা পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট গুণগুলি এই-সকল বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিচয়কে আশ্রয় করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে; শুধু তাহাই নহে, যতদিন পর্যন্ত ইহাদের বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিচয় অপরিবর্তিত থাকিবে ততদিন তাহাদের অন্তর্গত লোক-সাহিত্যেরও কোন পরিবর্তন সাধিত হইতে পারিবে না।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার কথা বাদ দিলেও ইহার আরও একটি বিষয়ে যে বৈচিত্র্য আছে, তাহার ফলেও এ দেশের লোক-সাহিত্যে বিষয়গত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কথা এখানে উল্লেখ করিতে পারি। বাংলা দেশের প্রতিবেশী রূপে যে-সকল বিভিন্ন ভাষাভাষী আদিম জাতি এখনও বাস করে, তাহারা মূলতঃ বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত, ইহাদের জীবনধারাও সেই অনুযায়ীই পরস্পর স্বতন্ত্র। বাংলার চতুঃ-সীমান্তবর্তী লোক-সাহিত্যের উপর ইহাদের যে কেবল বাহ্য প্রভাবই অনুভব করা যায়, তাহাই নহে,—অনেক সময় ইহার অন্তঃপ্রকৃতি ইহাদের জাতীয় জীবনের রসোপকরণ দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশেই আদি-বাসীর অস্তিত্ব আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বাংলা দেশের প্রতিবেশী কিংবা অধিবাসী আদিবাসীদিগের একটি পার্থক্য এই যে, বাংলা দেশে ইহাদের জাতিগত সংখ্যাই যে কেবল অধিক, তাহাই নহে—বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর সংস্কৃতি দ্বারা ইহারা এখানে নিজেরাও প্রভাবিত হইয়াছে। ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বিহার, আসাম ও উড়িষ্যায় আদিবাসীর সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আসামে এক ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতি ভিন্ন অন্য কোনও আদিম জাতি নাই। বিশেষতঃ ইহারা সেখানে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছে—অসমীয়া ভাষা কিংবা অসমীয়া সংস্কৃতি দ্বারা ইহারা আদৌ প্রভাবিত হয় নাই। বিভিন্ন জাতির জীবনধারা হইতে পরস্পর উপকরণ বিনিময় করিয়া যেমন জাতীয় সংস্কৃতি ও সংহতি গড়িয়া উঠে, আসামে তাহা হইবার সুযোগ হয় নাই। ইহাতে একদিক্ দিয়া ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির কয়েকটি শাখা এবং অপর দিক্ দিয়া একটি প্রতিবেশী ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির সংস্কৃতির প্রভাবের ফলেই আধুনিক কালে একটি সাংস্কৃতিক জীবন গড়িয়া উঠিবার প্রয়াস পাইতেছে। বিহারে ইন্দো-ইউরোপীয়, অষ্ট্রীক ও দ্রাবিড়-ভাষী বিভিন্ন জাতি বাস করা সত্ত্বেও ছোটনাগপুর পরগণা আশ্রয় করিয়া আদিবাসী-সমাজ একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে—উত্তর-বিহারের হিন্দীভাষীদিগের সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই। উড়িষ্যাতেও যে-সকল দ্রাবিড় ও অষ্ট্রীক-ভাষাভাষী উপজাতি বাস করে, তাহাদের সঙ্গেও ওড়িয়া কিংবা অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয়-ভাষীদিগের সাংস্কৃতিক যোগ নাই। যেখানে ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পায়, সেখানে সাংস্কৃতিক যোগ গড়িয়া উঠিতে পারে না।

উপরে বাংলা দেশের যে তিনটি প্রতিবেশী প্রদেশের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাদের সঙ্গে তুলনায় বাংলা দেশের ইতিহাস স্বতন্ত্র। বাংলা দেশের অভ্যন্তরে কিংবা ইহার কোন অংশে বাস করিয়াও আসাম, বিহার কিংবা উড়িষ্যার মত কোন জাতি নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে নাই। উক্ত তিনটি প্রদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক জীবন যেমন অনেক সময়ই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া টিকিয়া আছে, বাংলা দেশে তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহার অর্থ এই নহে যে, এ দেশে কোনকালেই ভারতীয় আদিবাসীর কোন শাখারই অস্তিত্ব ছিল না; প্রকৃত কথা এই যে, অন্যান্য প্রদেশের মত ইহাতেও প্রাচীনতম কাল হইতেই মানব-জাতির বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছে, তারপর ক্রমে ক্রমে তাহারা অন্যান্য প্রদেশের আদিবাসীর মত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া না থাকিয়া বাঙ্গালীর একটি বৃহত্তর সমাজ-জীবনের মধ্যে একাকার হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশের সাধারণ জন-গোষ্ঠীর আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট আদিম জাতির রক্তের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহারা আজ এমন ভাবে এ দেশের জীবনের সঙ্গে মিশিয়া আছে যে আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের মধ্যে বিজাতীয়তা কিছুই অনুভব করা যায় না। বিভিন্ন, এমনকি বিপরীতধর্মী সাংস্কৃতিক উপকরণের মধ্য দিয়া স্বাঙ্গীকরণের কাজ বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে যত সহজে সম্ভব হইয়াছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে তাহা তত সহজে সম্ভব হয় নাই। ইহাদের প্রত্যেকটি অধুনাবিস্মৃত জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণগুলিকে স্বাঙ্গীকরণ করিয়া বাংলার লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ইহার মধ্যে এত

বৈচিত্র্য দেখা যায়। যদি স্বাঙ্গীকরণের পরিবর্তে কেবলমাত্র পরিবর্জনের নীতি গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে এ দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এত বৈচিত্র্য দেখা দিতে পারিত না।

বাংলার প্রতিবেশী রূপে যে-সকল আদিবাসী এখনও বাস করে, তাহাদের মধ্যে যে জাতিগত বৈচিত্র্য দেখা যায় ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের মধ্যভাগেই হউক কিংবা তাহাদের প্রতিবেশীরূপেই হউক, এত অধিক বিভিন্ন জাতির আদিবাসী বাস করিতে দেখা যায় না। এই সব বিভিন্ন প্রকৃতির আদিবাসী-সমাজের এক কিংবা একাধিক অংশ বাঙ্গালীর সঙ্গে নানা ভাবে যোগ স্থাপন করিয়া বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে যেমন নিজেদের কিছু কিছু উপকরণ উপহার দিয়াছে, তেমনই বাঙ্গালীর নিকট হইতেও বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের স্বাঙ্গীকরণের একটি বিশেষ শক্তি আছে বলিয়াই, এ দেশের সীমান্তবর্তী আদিবাসী-সমাজের বহু উপকরণ বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার লোক-সাহিত্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইবার ইহা একটি প্রধান কারণ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একটু স্পষ্ট করিয়া দেওয়া যাক।

বাংলা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি উপজাতি বাংলা ভাষা গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর জীবন নানাভাবে যেমন প্রভাবিত করিয়াছে, তেমনই ইহাদের সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারাও সেই অঞ্চলের বাঙ্গালী-সমাজকে নানা ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।—ইহাদের মধ্যে দুইটি উপজাতিই প্রধান, একটির নাম লোধা ও অপরটির নাম শবর। উড়িষ্যায় যে বিভিন্ন উপজাতি এখনও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বসবাস করে, ইহারা তাহাদেরই অংশ; নানা কারণে মূল শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া বাঙ্গালী-সমাজের প্রতিবেশী রূপে দীর্ঘকাল যাবৎ বাস করিবার ফলে বাঙ্গালী ও ইহাদের মধ্যে কালক্রমে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক উপাদানের আদান-প্রদানের ফলে বাংলার এক আঞ্চলিক সংস্কৃতি পুষ্টিলাভ করিয়াছে। সুতরাং এই অঞ্চলের লোক-নৃত্য কিংবা লোক-সাহিত্য যখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তখন তাহাতে কেবলমাত্র বাঙ্গালী-জীবনের প্রভাবই অনুভব করা যায় না, একটি আদিবাসী জাতির মৌলিক উপকরণগুলিও তাহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই দুইটি উপজাতিই মূলতঃ কৃষিজীবী, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও কৃষিজীবনের উপরই ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, সুতরাং একটি অভিন্ন সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবন অবলম্বন করিয়া এখানে একটি অভিন্ন প্রকৃতির সংহত সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে। সমাজ-জীবনের এই সংহতির উপরই এখানে লোক-সাহিত্য একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু এই অঞ্চলের ইতিহাস এখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। আদিবাসী ও বাঙ্গালী লোক-জীবনের মিলিত রূপের উপর একদিন উড়িষ্যার হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব এখানে বিস্তারলাভ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। আদিবাসী এবং বাঙ্গালীর এই মিশ্র একটি সমাজের উপর যখন উড়িষ্যা হইতে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব আসিয়া বিস্তৃতি লাভ করিল, তখন পূর্ববর্তী সমাজ-জীবনের মূল উৎপাটন করিয়া যে তাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তাহা নহে, ইহার ভিত্তির উপরই তাহা আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। তাহার এই ফল হইল যে, এখানে সংস্কৃতির কতকগুলি বিভিন্ন উপকরণ একাকার হইয়া গেল। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপকরণের একীকরণের দ্বারা সংস্কৃতির শক্তি বৃদ্ধিই পায়—হ্রাস পায় না। মণিপুরই ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। মণিপুরে একদিকে নাগাজাতির আদিম সংস্কৃতি এবং অপর দিকে ব্রহ্মদেশের সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ হইতে আগত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃতি, ইহাদের সংমিশ্রণ হইয়াছে। এখানে কোন কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই। আদিম নাগাজাতির সংস্কৃতির ভিত্তির উপর ব্রহ্মদেশীয় রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশীয় সংস্কৃতি যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তেমনই বাংলাদেশ হইতে শ্রীহট্ট কাছাড়ের পথে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের যুগে বৈষ্ণবধর্মের উপকরণ গিয়াও প্রভাব স্থাপন করিয়াছে। এই তিন বিভিন্ন প্রকৃতির সাংস্কৃতিক উপকরণের সংমিশ্রণের ভিতর দিয়াই মণিপুরী সমাজ-জীবনের বিকাশ হইয়াছে। সেইজন্য মণিপুরী নৃত্য, বাদ্য, সঙ্গীত, ইত্যাদি ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট উপাদান হইতে পারিয়াছে। বাংলা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতি যে এতখানি শক্তিলাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ, আদিম নাগাজাতির মৌলিক জীবন-সংস্কারে যে প্রাণশক্তি (vitality) ছিল, উক্ত অঞ্চলের লোধা-শবর জাতির তাহা ছিল না; কিন্তু ইহাদের প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য নাই।—এই ভাবেই লোক-সংস্কৃতির পুষ্টি হইয়া থাকে, ইহার ব্যতিক্রম অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণের অভাবে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক জাতিসমূহের সংস্কৃতির বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠে।

উড়িষ্যার হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে বাংলার উক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সামাজিক জীবনে

যে বিভিন্ন লোক-সংস্কৃতির উপকরণ বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে পটুয়া-সঙ্গীত এবং চিত্রিত পট অন্যতম। বাংলা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটিমাত্র অংশে উদ্ভব এবং বিকাশ লাভ করা সত্ত্বেও ইহার পটুয়া সঙ্গীত যেমন বাংলা লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গরূপে গণ্য হইয়াছে, তেমনই চিত্রিত পটও এ দেশের লোকশিল্পেরই একটি বিশিষ্ট নিদর্শন রূপে গণ্য হইয়া থাকে। ইহা পশ্চিম-সীমান্ত-বাংলার বিভিন্ন অংশে প্রচার লাভ করিয়াছে, পূর্ববঙ্গে ইহার একটি বিশিষ্ট রূপ প্রচলিত আছে। ইহার সঙ্গীতাংশ লোক-সাহিত্য এবং চিত্রাংশ লোক-শিল্প। ইহাতে পুরাণকে নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী ইচ্ছামত পুনর্গঠন করিবার যে অনাচার দেখা যায়, তাহা আদিম সমাজের প্রভাব-জাত। দেবদেবীকে নিজস্ব গার্হস্থ্য জীবনের পরিবেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবার যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্মবোধ-জাত, এবং কাহিনীর মৌলিক প্রেরণা উড়িষ্যার হিন্দু ধর্মের প্রভাব-জাত। তিন দিক্ হইতে ইহা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ইহার এই অঞ্চলের একটি অখণ্ড রস-বস্তুরূপে পরিণতি লাভ করিবার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হইতে পারে নাই। বাঙ্গালীর লোক-সমাজের ইহা একটি চিরকালীন বৈশিষ্ট্য।

বাংলার পশ্চিম-প্রান্তবর্তী আর একটি অঞ্চলের কথা এখানে উল্লেখ করা যাক। বীরভূম জেলার উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম অঞ্চলে দুইটি প্রবল আদিবাসী জাতির বাস—ইহারা পাকুড় মহকুমার অন্তর্গত রাজমহল পাহাড়ের অধিবাসী সৌরিয়া পাহাড়িয়া জাতি ও সাঁওতাল পরগণার নিম্নভূমির অধিবাসী সাঁওতাল জাতি। সৌরিয়া পাহাড়িয়া জাতির ভাষা দ্রাবিড় এবং সাঁওতাল জাতির ভাষা অষ্ট্রীক জাতীয়। সৌরিয়া পাহাড়িয়াকে মালে বলা হয়। ইহারই একটি শাখা বাংলা ভাষা গ্রহণ করিয়া মাল পাহাড়িয়া বলিয়া পরিচিত। ইহারা মূল মালে জাতিরই প্রতিবেশী। কিন্তু মালে নামক আর একটি বাংলা ভাষাভাষী জাতি সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম জেলার সমতল ভূমির অধিবাসী হইয়া কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা যে দ্রাবিড়-ভাষী মালে জাতিরই বংশধর, বর্তমানে বাঙ্গালীর ভাষা এবং বাঙ্গালী কৃষকের জীবন-ধারা গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী-সমাজের মধ্যে একাকার হইয়া বাস করিতেছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ইহারা এ দেশের সমতলভূমির যখন অধিবাসী হইল, তখন তাহাদের পার্বত্য-জীবনের সংস্কার সম্পূর্ণ বিসর্জন দিল না, বাংলার জীবনের সঙ্গে মিশিয়া ইহার মধ্যে তাহা সঞ্চারিত করিয়া দিল। ইহাদের প্রতিবেশী এবং বাংলার অধিবাসী সাঁওতাল জাতিও তাহাই করিল। ইহার ফলে বীরভূম জেলার সমতলভূমিতেও তিনটি সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হইল,—প্রথম বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কার, দ্বিতীয়তঃ দ্রাবিড়-ভাষী পার্বত্য মালে জাতির সংস্কার এবং কৃষিজীবী অষ্ট্রীক-ভাষী সাঁওতাল জাতির সংস্কার। কারণ সাঁওতাল জাতিও পশ্চিম দিক্ হইতে ক্রমে অগ্রসর হইয়া বীরভূম জেলার মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে এবং বাংলা ভাষা গ্রহণ করিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে একাকার হইয়া বসবাস করিতেছে, ইহাদের মধ্যেও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হইয়াছে। এই তিনটি বিভিন্নমুখী সংস্কৃতির একত্র স্বাঙ্গীকরণের ফলেই বীরভূম জেলাতেও বাংলার লোক-সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়িয়াছে,—সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, শিল্পকলায় ইহার বিচিত্র বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই অঞ্চল হইতেই বাঙ্গালীর লোক-সংস্কৃতির বিচিত্রতম উপকরণের সন্ধান পাইয়াছিলেন। মনসা, ভাদু, ঝুমুর, কীর্তন ও বাউলের গানে; রায়বেঁশে, ঢালী, ভাঁজো ও কাঠি নৃত্যে, মৃৎপট ও গৃহচিত্রশিল্পে, ও সেলাই ও বুনানির কর্মে এই অঞ্চল বাংলার লোক-সংস্কৃতির এক বিস্ময়কর অধ্যায় যোজনা করিয়াছে। ইহা কেবল-মাত্র জাতি-বিশেষের দান নহে, তাহা হইলে ইহার মধ্যে এত বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইত না, ইহা বিভিন্ন জাতির সমবেত দান বলিয়াই এত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে।

এইবার বাংলা দেশের পূর্বাঞ্চল হইতেও দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। পশ্চিম বাংলার বীরভূম জেলার মত উত্তর-পূর্ব বাংলার মৈমনসিংহ জেলাও লোক-সাহিত্যের দিক্ দিয়া বিশেষ সমৃদ্ধ, এমনকি সমগ্র বাংলা দেশের মধ্যে এই বিষয়ে ইহাকেই যদি সমৃদ্ধতম অঞ্চল বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলেও ভুল হইবে না। এই অঞ্চল হইতেই 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামক লোক-সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, বাংলার একমাত্র উপকথা (animal tales) সংগ্রহ 'টুনটুনির বই' স্বর্গত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কর্তৃক এই অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংগৃহীত রূপকথা-সংগ্রহ 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝোলা' এবং ব্রতকথা-সংগ্রহ 'ঠানদিদির থলে' মৈমনসিংহ জেলারই পশ্চিমাঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই অঞ্চল হইতে যে কত লোক-সঙ্গীত, প্রবাদ, ছড়া ও পুরাকাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার কারণ কি? দেখা যায় যে, এই অঞ্চলেও আদিবাসীর সংস্কৃতির সঙ্গে

বাঙ্গালী সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হইয়াছে। মৈমনসিংহ জেলার উত্তর ভাগে গারো পাহাড়ের উপর গারো নামক এক প্রবল মাতৃতান্ত্রিক ইন্দোমোঙ্গলয়েড জাতির বাস। ইহাদের এক অংশ হাজং নাম গ্রহণ করিয়া মৈমনসিংহ জেলার উত্তর ভাগের সমতল ভূমিতে বসবাস করিতেছে, বাংলা ভাষা এখন তাহাদের মাতৃভাষা, সেই সূত্রেই বাঙ্গালীর আচার যেমন তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই নিজেদের আচার-বিচার এবং সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারা বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার সাহায্য করিতেছে। এই অঞ্চলেরই সংলগ্ন পূর্বাঞ্চলে খাসিয়া ও জয়ন্তী পাহাড়। তাহাতেও খাসি নামক মাতৃতান্ত্রিক এক ইন্দোমোঙ্গলয়েড জাতি বাস করে। তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রভাবও এই অঞ্চলের সাধারণ জনসমাজের উপর বিস্তার লাভ করিয়াছিল। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল আসামের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া ইহার সঙ্গে আসামের বিভিন্ন ইন্দোমোঙ্গলয়েড জাতির সম্পর্ক যত নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল, বাংলার কেন্দ্রীয় সংস্কৃতির যোগ তত নিবিড় হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইতে পারে নাই। বিশেষতঃ এই অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসী মূলতঃ বোড়ো নামক ইন্দোমোঙ্গলয়েড জাতির শাখা-ভুক্ত ছিল। ইহার উপর কালক্রমে যখন একদিক্ দিয়া হিন্দু সংস্কৃতি এবং অপর দিক্ দিয়া মুসলমান-সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করিল, তখন এখানেও আদিম জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে ইহাদের সাংস্কৃতিক উপকরণের সংমিশ্রণ হইল। এই সংমিশ্রণের মধ্য দিয়াই স্বাঙ্গীকরণও সহজ হইয়া আসিল। ফলে বাংলার লোক-সাহিত্য এখানে এক বিচিত্র পরিণতি লাভ করিল। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক একটি বিশেষ রূপ আছে, ইহার লোক-সাহিত্যের মধ্যে ইহার সেই বিশেষ রূপটি বিধৃত হইয়াছে।

এই অঞ্চলের বিশিষ্ট লোক-সঙ্গীত জারিগান ও ঘাটু গান। উভয়ই নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীত। জারিনৃত্যের মধ্যে আসামের আদিবাসী-নৃত্যের রূপটি ধরা পড়ে।—মুসলমান-সমাজের হাতে পড়িয়া জারিগান এখন মুসলমান ধর্মের কাহিনী-বিষয়ক সঙ্গীতে পরিণত হইলেও ইহাতে আসামের অন্যান্য ইন্দোমোঙ্গলয়েড জাতির সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিচয় অস্পষ্ট হইয়া নাই।

বাংলা দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ অংশে বিভিন্ন সময় সমুদ্রচারী বিভিন্ন জাতি যে বসতি স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের লোক-সাহিত্যে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম-নোয়াখালীর সমুদ্রতীর কিংবা পদ্মা-মেঘনার উপত্যকার লোক-সঙ্গীতে ইহাদের প্রভাব আজও অনুভব করা যায়।—ইহাদের প্রধান লোক-সঙ্গীত সারিগান, ইহা প্রধানতঃ নৌকা বাইচের সময়ই গাওয়া হয়। ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসী জাতির মধ্যেও সমুদ্রে নৌকা বাইচের সময় যে সুর ও সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়, তাহার সঙ্গে বাংলা দেশের এই অঞ্চলের নৌকা বাইচের গান ও তাহার সুরের বিস্ময়কর ঐক্য দেখা যায়।

বাংলা দেশের পূর্বতম সীমান্তে ত্রিপুরা ও পার্বত্যত্রিপুরা অঞ্চলে যে-সকল জাতি বাস করে তাহারা ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতিভুক্ত হইলেও তাহাদের ভাষা প্রধানতঃ বাংলা। কোন কোন অঞ্চলে ইহারা দুইটি ভাষাই ব্যবহার করে,—নিজের মাতৃভাষা ও বাংলা ভাষা। বৈষ্ণব ধর্মের সূত্রে বাংলা ভাষা ইহাদের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে রিয়াং নামক উপজাতির যে লোক-কথা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলার বহু লোক-কথা তাহাদের মধ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। সাংস্কৃতিক উপকরণ কখন কোন্ পথে কি ভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করে, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং আজ যে জাতি অরণ্যে ও পর্বতে আশ্রয় লইয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালবর্তী হইয়া বাস করিতেছে, সে যে একদিন বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপুষ্টিতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে নাই, উহা বলিবার উপায় নাই। আজ বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চলের অরণ্যে পর্বতে যাহারা আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা একদিন বাংলার সমতলভূমির অধিবাসী ছিল, তাহাদের একটি বৃহৎ অংশ এ দেশের জন-সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে; ইহাদের মৌলিক জাতিগত পরিচয়ে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য ছিল বলিয়াই বাংলার লোক-সাহিত্যে আজ এই বৈচিত্র্য দেখা যায়।

—•—

ষাট বছরের ছোটদের সাহিত্য

শ্রীছায়া দেবী

আমরা যখনই কিছু লিখতে যাই তখনই আমাদের মনে ছোটবেলার শোনা গল্প বা পড়া গল্পগুলি অজ্ঞাতসারে প্রভাব বিস্তার করে। বয়স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি-প্রবৃত্তির অনেক বদল হয় সত্য, কিন্তু বহুদূরাগত সঙ্গীত ধ্বনির মত, নিশীথ রাত্রির মায়া-স্বপ্নের মতই তার অস্পষ্ট প্রভাবের রেশ লেগে থাকে মনে। ছোটবেলায় যে লেখা আমরা পড়ি, তার প্রভাব আমাদের জীবনে বহুদূর বিস্তৃত হয়ে যায়। ছোটবেলায় কল্পনার পাখা ডানা মেলে কতদূরে উড়ে যায় কে জানে তার দিশা! কল্পনার রঙে-রসে সহজ সুন্দর লেখা উপযুক্ত হলে বড়দের মনকেও কম আকর্ষণ করে না।

বড়দের সাহিত্যে যেমন নানা দিক্, অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে, প্রতিটি বিভাগ নিয়ে আলোচনাও কম হয়নি, সেইরকম ছোটদের সাহিত্যেও নানা দিক্ ও বিভাগ আছে। সাতরঙা আলোকের মতই তার রঙীন লাবণ্য ও সুষমা। যদি প্রতিটি বিভাগ ধ'রে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় তবেই হয়ত এই আলোচনা হবে সুসম্পূর্ণ। তবুও মনে হয়, বর্ত্তমান আলোচনায় শ্বেত পুষ্পে, রঙীন কুসুমে মিলিত মালা উপহার দিলেও একেবারে অশোভন লাগবে না। আমার মনে হয়, ছোটদের জন্য যথার্থ ভাল লেখার মূল্য বড়দের জন্য ভাল লেখার চেয়ে কম নয়। প্রকৃতপক্ষে ছোটদের সাহিত্যের স্থান খুবই উর্দ্ধে। কারণ ইচ্ছে করলেই ছোটদের মনে প্রবেশ করা যায় না, তার জন্য ধৈর্য্য ও সাধনা দরকার। শিশু-মনের সামনে একটু একটু ক'রে মায়াপুরীর দ্বার উদ্ঘাটন করতে পারলে তবেই তাদের মনে বিস্ময় আর কৌতুহল জাগিয়ে তোলা যেতে পারে। বিগত ষাট বছরের শিশু-সাহিত্য নিয়ে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, আলোচনা ও চিন্তা করবার ক্ষেত্রে শিশু-সাহিত্যের স্থান সর্ব্বাগ্রে। কারণ, মানসিক পটভূমিকায় শিশুদের জন্য সাহিত্যই চির উজ্জ্বল ও অম্লান থাকে।

শুধু কি তাই? সহজ সুন্দর, সরল মানসিকতার প্রেরণাও লাভ করতে পারে ছোটরা এই পথেই। কল্পনার রঙে-রসে সহজ সুন্দর ছোটদের কাহিনীই একদিন যথার্থ ভাবী সাহিত্যিকদের গ'ড়ে তোলে। ঊনবিংশ শতকের শেষে নবোদিত তরুণ সূর্য্যের মতই প্রথম শিশু-সাহিত্যের উন্মেষ হয়। তারপর ধীরে ধীরে উজ্জ্বল প্রতিভায় সাহিত্য-গগন আলোকিত ক'রে তোলে। আজ থেকে ষাট বছর আগে শিশু-সাহিত্য বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। কিছু কিছু মুখে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী, রূপকথা, ভূতুড়ে গল্প,—এ ছাড়া পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ এবং বৌদ্ধ-জাতকের কিছু কিছু গল্প ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছোটদের জন্য ছিল ব'লে মনে হয় না।

ছোটদের জন্য যাঁরা প্রথম ভাবতে সুরু করেন তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, প্রমদাচরণ সেন, দক্ষিণারঞ্জন এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, এই-সব সাহিত্যিকবৃন্দই প্রথম অগ্রণী এবং শিশু-সাহিত্য গঠনের জন্য প্রভূত প্রয়াস করেন। সত্যি কথা বলতে কি, এ'দের রচনা ও চেষ্টার দ্বারাই প্রথম শিশু-সাহিত্যের গোড়া-পত্তন হয়।

শিশু-সাহিত্যের প্রথম যুগের কথা বলতে গেলে প্রথমে শিশু মাসিকপত্রিকাগুলির কথাই আগে মনে আসে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রমদাচরণ সেন 'সখা' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, প্রকৃতপক্ষে তখনই শিশু-সাহিত্যের প্রথম সূচনা, আরম্ভ এবং প্রথম প্রচেষ্টাও বলা যেতে পারে। তার আগেকার স্বল্পায়ু পত্রিকাগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সখা প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরে ভুবনমোহন রায় 'সাথী' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

আজকের দিনে ভাল হোক, মন্দ হোক, ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের হাতে নানারকম মাসিক-পত্রিকা এবং বই দেখা যায়। কিন্তু তখনকার দিনে ছোটদের সাহিত্য-প্রচার এত সহজসাধ্য ছিল না। বহু হতাশার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে যাঁরা শিশু-সাহিত্যকে এত বড় ক'রে তুলেছেন, তাঁদের কথা ভাবলে চমৎকৃত হয়ে যেতে হয়।

তাই তখনকার দেশের অবস্থায় একসঙ্গে দু'খানা মাসিক-পত্রিকা চালানো সম্ভব হ'ল না, প্রথমে সখা ১৮৯৪

সালে বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে যাবার পর 'সখা' পত্রিকাটি 'সাথীর' সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'সখা ও সাথী' এই নামে ১৩০১ সালে প্রকাশিত হয়। এর পর দু'খানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'মুকুল' এবং 'বালক' প্রকাশিত হয়। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী এক সময় মুকুলের সম্পাদক ছিলেন। মুকুলে দুটি উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিক রচনা "বিদ্রোহী বালক" এবং "দুঃখীরা" (লে মিজারাবেলের অনুবাদ) প্রকাশিত হয়। 'বালক' পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রথম প্রকাশিত হয়, পরে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এর সম্পাদনা করেন। রবীন্দ্রনাথের শিশু-সম্পর্কিত অনেক রচনা 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর পরে আমরা পাই প্রথম পর্য্যায়ের 'সন্দেশ' পত্রিকা, প্রথমে যার সম্পাদক ছিলেন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর মৃত্যুর পরে সুকুমার রায় সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। প্রথম পর্য্যায়ের 'সন্দেশে'র অবসান ঘটবার পর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সন্দেশের ভার গ্রহণ করলেন সুবিনয় রায়চৌধুরী। শিশু-সাহিত্যের প্রথম যুগে ছবি ছাপায়, রকমারী সুন্দর রচনায় 'সন্দেশ' সকলের মনোহরণ করেছিল সন্দেহ নেই। তখনকার দিনে মুদ্রণযন্ত্র এবং ছবি ছাপানোর ব্যবস্থা দুই-ই ছিল অসম্পূর্ণ। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীই প্রথমে নূতন ধরণের ব্লক তৈরির ব্যবস্থা প্রচলন করলেন এবং মুদ্রণযন্ত্রের উন্নতির জন্য প্রভূত প্রয়াস করেন। এখনকার দিনে শোভন প্রচ্ছদপট, সুন্দর কাগজে রঙীন চমৎকার ছবি এবং গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের সঙ্গে ছোট ছোট ছবি, সবেরই মূলে এই রায়চৌধুরী পরিবারের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা। কিন্তু অত যত্ন ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও 'সন্দেশে'র অবসান ঘটল।

শিশু-সাহিত্য গঠন একদিনে সম্ভব হয়নি, শিশুদের মানসিক উপকরণের কিছু প্রয়োজন আছে, একথাও কেউ ভাবত না। কিন্তু পড়তে শেখার পর সুযোগ পেলে ছোটরা বড়দের পাঠ্য ও অপাঠ্যগুলি লুকিয়ে প'ড়ে রসগ্রহণের চেষ্টা করত। কারণ গল্প পড়ার স্পৃহা (পড়তে পারলে ছোট বড় কার আর থাকে না?) ওই পথে তৃপ্ত করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সেই সময় প্রথম যুগ-প্রচেষ্টার নিদর্শনস্বরূপ 'ছোটদের বেতালপঞ্চবিংশতি'র নাম করতে হয়। উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ যুগপুরুষের প্রতিভার চিহ্ন বহন করেছে ওই গ্রন্থখানি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বইখানি যখন লিখেছিলেন তখন পাঠক-সমাজে প্রভূত আলোড়ন জেগে উঠেছিল। কারণ, তখন বাংলা-সাহিত্যে এরকম বই ছিল না বললেও চলে। পরবর্ত্তী কালেও এই ধরণের বই সুলভ হয়নি। রূপকথা যুগের প্রথম সৃষ্টি।

এই থেকে ক্রমে ক্রমে অনেকেই অনুভব করতে লাগলেন ছোটদের সাহিত্যের কত প্রয়োজন আছে। ছোটদের অন্তরের তাগিদ কত বেশী, ভালো রচনা পেলে তারা কত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে তার প্রমাণ পেতে কিছু দেরী হ'ল না। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'কঙ্কাবতী' প্রকাশিত হওয়ার পর ছোটদের মহলে কতখানি সাড়া জাগিয়েছিল, এক কথায় তার কিছুই বলা চলে না। ফ্যান্টাসি বা অবাস্তব স্বপ্নকে নিয়ে এমন অপূর্ব্ব রচনা ছোটদের সাহিত্যে আজও বেশী নেই। ত্রৈলোক্যনাথ মূলতঃ বড়দের লেখক ছিলেন, তবুও তাঁর রচনা ছোটদের মনে কতখানি সাড়া জাগিয়েছিল, সেকথা নূতন ক'রে হয়ত বলবার প্রয়োজন কিছু নেই। কিন্তু এইভাবেই ক্রমশঃ ছোটদের সাহিত্য-পথের অগ্রগতি সুরু হ'ল, ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন লেখকদের অনেকে। প্রতিভার জয়পতাকা উড়ল অনেক রচনায়।

ছোটদের মানসিকতাকে অনুভব ক'রে, ভাষার সৌন্দর্য্য এবং কাহিনীর গতিবেগ দিয়ে কল্পনার নীল সমুদ্র থেকে রূপকমল তুলে দিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। ছোটদের সাহিত্যে, বিশেষ ক'রে রূপকথার ক্ষেত্রে লেখক যা দিয়ে গিয়েছেন, তা চিরদিনের শিশুদের হৃদয়ে গাঁথা থাকবে। দক্ষিণারঞ্জনের শ্রেষ্ঠ লিখনভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে, ভাষা ও কাহিনীর অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছে তাঁর রচিত প্রতিটি কাহিনীতে। ছোটদের জন্য প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যরস বিতরণ করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জনের নাম চিরউজ্জ্বল থাকবে।

ছোটদের হৃদয়-উপযোগী উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত রচনায় যাঁরা সাহিত্যরসকে দীপ্ত ক'রে গেলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দান কম নয়। তাঁর রচিত কবিতাগুলি কিশোরদের প্রাণে যে আবেগ সঞ্চার করেছিল, আদর্শচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল তা প্রভাতসূর্য্যের আলোকের মতই। বাংলা কিশোর-কবিতায় 'কথা ও কাহিনী' একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। তবে এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, রবীন্দ্রনাথ শিশুদের নিয়ে অনেক রচনা লিখেছিলেন সত্য, কিন্তু তার অধিকাংশই বড়দের উপভোগ্য। দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে শিশুদের মনস্তত্ত্ব ও জীবনযাত্রার পরিচয় দর্শনে যে রসানুভূতি, তার নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর অধিকাংশ রচনায়। একথা চিরদিনই স্বীকার্য্য যে রূপকথার প্রথম যুগে, অতি অল্প হলেও, রবীন্দ্রনাথের রচিত রূপকথাগুলি প্রথম শ্রেণীর।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দীনেন্দ্রকুমার রায় ইত্যাদির রচনা থেকে কিশোরদের সাহিত্য সমৃদ্ধ ও পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। ছোটদের সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ গল্প সঞ্চয়ন 'বকুল পরী'। কাহিনীর গুণে মন ভুলে যায়, একবার পড়লে স্মৃতিপট থেকে সহজে মুছবে না। হেমেন্দ্রপ্রসাদ মূলতঃ বড়দেরই লেখক, ছোটদের জন্য যে বেশী কিছু লিখেছেন তাও নয় তবুও তাঁর রচিত 'বকুল পরী' একটি শ্রেষ্ঠ রূপ-রোমাঞ্চের বই, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। অনুরূপ ভাবে সুন্দর সরস গল্পগুচ্ছ উপহার দিলেন দীনেন্দ্রকুমার রায় "মজার কথা" প্রকাশ ক'রে। রসালো রসালের মতই গল্পগুলি রসপুষ্ট ও মনোহর, সম্পূর্ণ শিশু-চিত্তের উপযোগী উপরোক্ত গ্রন্থ দুটির প্রতিটি গল্প।

যথার্থ শিশু-সাহিত্য রচনার প্রথম যুগে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং তাঁর পরিবারবর্গের দানের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় "শিশু-ভারতী" কত উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা ছিল, বর্ত্তমান যুগের যে-কোন শিশুপত্রিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। উপেন্দ্রকিশোরের সহজ সরল রচনা টুনটুনির বই থেকে আরম্ভ ক'রে সুকুমার রায়, সুখলতা রাও, সুবিনয় রায়, কুলদারঞ্জন রায় এবং পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত তাঁদের অনবদ্য রচনাগুলির দ্বারা যুগসৃষ্টি করলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, অনাবিল হাস্যকৌতুক, সুমিষ্ট সরস গল্প, রোমাঞ্চকর অভিযান এবং হাস্যরসাত্মক নাটক-নাটিকা, প্রতিদিকেই এঁদের রচনাগুলি নব-বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

সম্ভবতঃ রায়চৌধুরী পরিবারের দৃষ্টান্তই লেখক-মহলকে উদ্বুদ্ধ করে, প্রেরণা জাগায়। তাঁদের সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী লেখকদের রচনা-কাল থেকে এই কথাই অনুমান করা যায়। কেননা এর পর থেকেই আবির্ভাব ঘটল বহু প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকের এবং সেই সঙ্গে নানারকম শিশু-পত্রিকার। সন্দেশের তিরোধানের পর একে একে উদয় হ'ল মৌচাক ১৩২৭, শিশুসাথী ১৩২৯, খোকাখুকু ১৩৩০, রামধনু ১৩৩৪, মাসপয়লা ১৩৩৫, ইত্যাদি আরো বহু পত্রিকা। ছোটবড় খ্যাত-অখ্যাত মিলিয়ে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত ৪৮।৫০ খানি ছোটদের পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ পত্রিকাই মরসুমী ফুলের মতই বসন্তবাহার দেখিয়ে ঝ'রে গিয়েছে।

আজ পর্য্যন্ত এত সব পত্রিকায় লিখেছেন কম লেখক-লেখিকা নয়, বাংলা শিশু-সাহিত্যের এক এক বিভাগে তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলা ১৩২৯-৩০ সাল থেকে সুরু ক'রে ১৩৫০ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ২০।২১ বছর মাসিকপত্রগুলির তথা শিশু-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ গিয়েছে বলা যেতে পারে। যাঁরা একদিন শিশু-সাহিত্যকে প্রাণ দিয়েছেন তারপর তাকে পত্রপুষ্পে শোভিত করেছেন, সেই তাঁদের রচনার ক্ষেত্রগুলির কথা আলোচনা করা দরকার। বহু প্রতিভাবান্ লেখক-লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছে শিশু-পত্রিকাগুলির মাধ্যমে, পরবর্ত্তী কালে বহু পত্রিকা লুপ্ত হয়ে গেলেও তাঁদের গুণের স্বীকৃতি ঘটেছে ওই পথেই।

আজ পর্য্যন্ত যত বুদ্ধিদীপ্ত, বাস্তবভঙ্গিমাসম্পন্ন, প্রতিভায় উজ্জ্বল পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে মৌচাক এবং রামধনুর স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের সমন্বয় এই পত্রিকা-দুটিতে বিশেষভাবে লক্ষিত হ'ত। স্বর্ণসূত্রে গাঁথা হীরকমণির মতই পত্রিকা-দুটির অধিকাংশ রচনাগুলি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। কারণ, শিশু-সাহিত্যের মধ্যযুগে তথা স্বর্ণযুগের প্রারম্ভে ওই পত্রিকা-দুটিতে লিখতেন প্রথমে ভারতীগোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ এবং পরে কল্লোলযুগের লেখকরাও। মৌচাকে লিখতেন, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণীন্দ্রলাল বসু, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অন্নদাশঙ্কর রায়, ইত্যাদি। এ ছাড়া 'রামধনু'কে যাঁরা রঙীন করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, পূর্ব্বোক্তদের কেউ কেউ ছাড়াও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রলাল রায়, প্রবোধরঞ্জন সেন, সুবোধ বসু, কার্ত্তিক মজুমদার, অমলেন্দু সেন, মৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অরবিন্দ গুহ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। মহিলা লেখিকাবৃন্দের মধ্যে লীলা মজুমদার।

যে কয়েকটি শিশু-পত্রিকার স্থান খুবই উচ্চে ছিল তার মধ্যে "খোকাখুকু" যে অন্যতম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্নিগ্ধ ও মনোরম রচনাসম্ভারে পূর্ণ ছিল পত্রিকাটি। নিশিকান্ত সেনের সম্পাদনায় উচ্চদরের শিশু-পত্রিকা হবার সব গুণগুলিই এতে ছিল। পরবর্ত্তী কালের "শিশুসাথী"তে কতকটা অনুরূপ গুণ, সহজ সারল্য, সুমিষ্ট কোমলতার ভাব দেখা যায়। "শিশুসাথী" শুধু মাসিক হিসাবে সুন্দর ছিল তাই নয়, পূজা-বার্ষিকীগুলোও হ'ত অতি সুন্দর। এই পত্রিকাটির অন্যতম বিশেষত্ব ছিল, সুকুমার কোমল মনোবৃত্তিগুলিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেত এবং এই জন্য অজ্ঞাত, অখ্যাত লেখকদের রচনাও সহজেই এতে স্থান পেত। এতে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বসু, হেমেন্দ্রলাল রায়, কালীপদ

চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, জগদানন্দ রায়, আশাপূর্ণা দেবী, রবীন্দ্রনাথ সেন, ইত্যাদি আরো অনেকে। একদা অনেক উচ্চদরের পত্রিকা প্রকাশিত হয়েও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে নি, তার মধ্যে ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "মাসপয়লা", প্রভাতকিরণ বসু সম্পাদিত "ভাইবোন" এবং "জলছবি" উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ছিল। তখনকার দিনের সমুদয় শিশু-মাসিকপত্রিকাগুলির কথা ভাবলে মন শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে। রঙে-রসে, রূপে রেখায় মাসিক পত্রিকাগুলিই যে কিশোর-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? চিরদিনের আলোকবর্ত্তিকা বহন ক'রে চলেছে ঐ শিশু-মাসিকপত্রিকাগুলিই।

প্রতিটি সাহিত্য-তারকা আপন শিল্পসাধনায় কিশোর-সাহিত্যকে গ'ড়ে তুলেছেন আলোর দীপ্তিতে। অনবদ্য প্রকাশভঙ্গি ও সরস ঘটনা নিয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের বিশেষ বিশেষ রচনাগুলির সম্পর্কে অবহিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। সাহিত্যের কুঞ্জবনে কত ফুলই যে ফোটে, কত পাখীই যে ডাকে সব ত নজরে পড়ে না। আজও সন্ধান করলে হয়ত দেখা যাবে, পুরনো বই এবং মাসিক পত্রিকার পাতায় কত অজ্ঞাত সুন্দর লেখা লুকিয়ে আছে। বহু লেখক-লেখিকার প্রতিভা বিকশিত হয়েছে বিশেষ একদিকে, আবার অনেকের প্রতিভার বিকাশ দেখা যায় দুই-তিন দিক্‌কে কেন্দ্র ক'রে। একে একে রচনার ক্ষেত্র হিসাবে লেখাগুলি আলোচিত হওয়া দরকার। ছোটদের সাহিত্যের বিভিন্ন দিক্‌গুলি বহু সাহিত্যিক আলোকিত করেছেন।

শিশু-সাহিত্যের একমাত্র রূপকথা বিভাগ নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই বিরাট্ প্রবন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। যদিও বর্ত্তমান যুগে অনেক বড় বড় লেখক-লেখিকারা রূপকথা লিখবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ লেখাই হয়েছে কৃত্রিম—না আছে কথার গঠন আর না আছে রূপের বাহার। ভাষার সৌন্দর্য্য এবং কাহিনীর গতিবেগ দুটোরই একান্ত অভাব। যান্ত্রিক ভঙ্গিমা অথবা অতিরিক্ত রকম উচ্ছ্বাস, দুটোই পীড়াদায়ক। সহজ সরল রূপকথা নিয়ে অনেক সাহিত্যিক স্বপ্নের জাল বুনেছেন, শিশু-সাহিত্যের সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর অংশ এই রূপকথা। জন্মের কয়েক বছর পরে শিশু প্রথম ভাবরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে; তখন ছোট ছোট উপকাহিনী-গুলি এবং সুমধুর ভাবে বর্ণিত রূপকথাগুলি মনোহরণ করে। প্রত্যেকটি বিদেশী ভাষায় অসংখ্য রূপকথা ও উপকাহিনী রচিত হয়েছে নানাধরণের কাহিনী ও ভঙ্গিমাকে আশ্রয় করে। পৃথিবীর শিশুমনকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে এই রূপকথা।

"এক যে ছিল রাজা" এই দিয়ে যার সুরু, কতরকম ভাবে, কতরকম ভঙ্গিমায় তার বর্ণনা দিয়েছেন দরদী কুশলী লেখকরা। এই রূপকথাকে অনায়াসেই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: শৈশব-রূপকথা, কৈশোর-রূপকথা, যৌবন-রূপকথা। সবুজের কোমল আভার মতই স্নিগ্ধ শিশুমনহরণকারী রূপকথা রচনা করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জনের নাম পূর্ব্বাহ্নেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া সুখলতা রাওয়ের "গল্পের বই" এই শ্রেণীর অন্তর্গত, একেবারে শিশুমনের উপযোগী সরস সুমিষ্ট রচনা ফুটন্ত মল্লিকা ফুলের মতই। নিছক শিশুমনের উপযোগী রচনা "আলোর ফুলকি" শিশু-সাহিত্যে যুগান্তর এনেছে বললে অত্যুক্তি করা হয় না। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কতখানি আন্তরিকতা ও দরদ দিয়ে শিশু-সাহিত্যকে গড়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁর অধিকাংশ রচনাগুলিতে ফুটে রয়েছে। এছাড়া "শকুন্তলা" এবং "ক্ষীরের পুতুল" এই দিক্ থেকে অনবদ্য রচনা ঠিক রজতোজ্জ্বল ঝর্ণাধারার মতই। "সাঁওতালী উপকথা"ও ঠিক এই ধরণের শিশু-সাহিত্যের অন্তর্গত, এই রচনাটিতে শিবরতন মিত্রের সহজ সারল্য শিশুমনকে মুগ্ধ করবে।

"আলোককণা" কিশোরমনের উপযোগী সুন্দর সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ সেনের শুধু এই লেখাটি নয়—তাঁর অপরাপর রচনাগুলিও তাঁর কৈশোর রূপকথার অপূর্ব্ব নিদর্শন। উপরোক্ত রচনাটি ছাড়াও "অরুণ আলো" অপর একটি সুমধুর রচনা। কিশোর সাহিত্যে প্রবোধরঞ্জন সেনের এই রচনাটি যথার্থ কৃতিত্বের নিদর্শন। এছাড়া "নিঝুমপুরী" কিশোর সাহিত্যের উপযোগী সরস রচনা, নিশিকান্ত সেন শুধুমাত্র 'খোকাখুকু'র সম্পাদনা ছাড়াও অতি উৎকৃষ্ট রচনা-সম্ভারেও কিশোর-সাহিত্য গঠন করেছেন। এই প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত "মামচু ও মুস্কিল-আসান" উল্লেখযোগ্য রচনা। "সুয়োরাণীর সাধ" কিশোর-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ সেনের অপূর্ব্ব দানের নিদর্শন।

রূপ ও কথার রঙীন আবেশে যাঁরা সাহিত্যরসকে ভ'রে তুলেছেন, সেই সব রচনার মধ্যে "গল্পের ঝরণা", "পাঁচ সাগরের ঢেউ", "গল্পের মায়াপুরী" এবং "গল্পের আলপনা" এই কয়েকটি বই যৌবন-রূপকথার সেরা রচনা।

হেমেন্দ্রলাল রায় স্বপ্নলোককে ফুটিয়েছেন উজ্জ্বল অক্ষরে। তাঁর রচনায় যে চারু-কৌশল তার উপমা সহজে মেলে না, প্রতিটি শব্দচয়নে তিনি অসাধারণ কারুকার্য্য দেখিয়েছেন। তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত হলে বুঝতে অসুবিধা হয় না সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি করেছেন লেখক। ঐ জাতীয় রূপকথা আর যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁদের রচনার মধ্যে "পদ্মের জন্ম", "ভুলো বিশিয়া" এবং "মনোবীণা" কিছুটা রঙীন স্বপ্নমাখানো। নরেন্দ্র দেবের প্রথম দিকের রচনাগুলি অনির্ন্দনীয় ছিল সন্দেহ নেই। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর রচিত "সাপের বাঁশী" কিছুটা এই জাতীয় রচনা। এছাড়া "বনের বিহঙ্গ" এবং "ময়ূরকূট" এই রচনা দুটিও এই শ্রেণীতে পড়ে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা-নৈপুণ্য শুধু বড়দের ক্ষেত্রে নয়, ছোটদের সাহিত্য-রচনাতেও ময়ূরের পাখার মতই উজ্জ্বল ছিল। রূপ-সাহিত্য গঠনে যাঁরা দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নূতন ধরণের রচনা-নৈপুণ্যে অনেকেই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু "কল্পকথা" এবিষয়ে একটি অপূর্ব গল্প-সংগ্রহ ; যদিও বিদেশী গল্প বা অধিকাংশ জাপানী রূপকথার অনুবাদ, কিন্তু সফল ও সার্থক অনুবাদ। স্নিগ্ধ মধুর এর প্রতিটি রচনা। হেমেন্দ্রলালের সঙ্গে রচনাভঙ্গিতে পৃথক্ হলেও সাহিত্যসৃষ্টিতে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় রূপ-করুণ দিক্‌টা গ্রহণ করেছিলেন, যার আবেদন সারা জন্ম ভ'রে থাকে। রোমাণ্টিক কল্পনার আভা করুণরসে পরিসিক্ত। এ ছাড়া অপর একটি নূতন ধরণের সফল রচনা "চীন-জাপানের উপকথা"। এই রচনাটি ছাড়াও সত্যচরণ চক্রবর্ত্তীর অপরাপর রচনাগুলি কম সার্থক নয়।

রূপকথা ছাড়াও শিশুসাহিত্যের অন্যান্য দিক্‌গুলি সফল করবার চেষ্টা করেছেন বহু সাহিত্যিক। ছোটদের সাহিত্যে যাঁরা কাব্য ও নাটিকা রচনা করতে প্রবৃত্ত হন তাঁদের মধ্যে সুকুমার রায় এবং নিশিকান্ত সেনের নাম করেছি। এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নেই, হাসির কবিতা এবং নাটিকা রচনায় সুকুমার রায় ছিলেন অদ্বিতীয়। নির্ম্মল হাস্যরসে তিনি ছোটদের প্রিয় কবি ছন্দের জাদুকর সুনির্ম্মল বসুর পূর্ব্বসূরী ছিলেন। তাই "আবোল তাবোল", "খাই খাই", "ঝালাপালা" বাংলা শিশুসাহিত্যে ক্ল্যাসিক।

শিশুমনের ভাব-গম্ভীরতা এবং ছন্দরঙীন বৈচিত্র্যে সুনির্ম্মল বসুর রচিত কবিতাগুলির ঝঙ্কার মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী। অন্যান্য বিষয় নিয়ে লিখলেও স্বভাবতঃ ইনি হাস্যরসপ্রধান কবি ছিলেন। রঙীন প্রজাপতির মতই শিশুচিত্তাকর্ষক রচনা "আলপনা", "হরূরা", ইত্যাদি রচনাগুলি। প্রকৃতপক্ষে ছোটদের কাব্যসাহিত্যে সুনির্ম্মল বসুর স্থান অপূরণীয়। ছোটদের সাহিত্যে নিছক হাস্যরসপ্রধান কবি সুলভ নয়, তবে এই প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্করের "ছবি ও ছড়া"র কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। ছোটদের কাব্যসাহিত্য গঠনে ও রচনায় অপরিসীম কৃতিত্ব ছিল যোগীন্দ্রনাথ সরকারের। এই লেখকের প্রতিভা যে কত বেশি ছিল এক কথায় তার কিছুই বলা যায় না। "হিজিবিজি", "রাঙাছবি", "নূতন ছবি", "আষাঢ়ে স্বপ্ন", "হাসিরাশি", ইত্যাদি আরো বহু রচনা ও সংগ্রহ থেকে প্রমাণ হয় শিশু-হৃদয়ের রসানুভূতি ও নিপুণতা তাঁর কত বেশী ছিল। শিশুদের কাব্যসাহিত্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দান ছিল যথেষ্ট।

ক্রমে ক্রমে ছোটদের সাহিত্য যাঁরা ভাবগম্ভীর ও কাহিনীমূলক কবিতায় সমৃদ্ধ করলেন তাঁদের মধ্যে কুমুদ-রঞ্জন মল্লিক এবং কালিদাস রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছোটদের কাব্য-সাহিত্যের মধ্যযুগকে এঁরা অলঙ্কৃত করেছেন কবিতা-কুসুমে। কুমুদরঞ্জনের "অজয়" এবং কালিদাস রায়ের "পর্ণপুট" দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা। রূপ-কবিতা রচনায় স্বপ্নকুসুম ফুটিয়েছেন সাহিত্যের কুঞ্জবনে, দক্ষিণারঞ্জন ছাড়াও অন্যান্য কবিদের মধ্যে কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকিরণ বসু, ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ইত্যাদি। এছাড়াও সরল স্নিগ্ধতা, সুমিষ্ট কোমলতার দিক্ দিয়ে যাঁরা সার্থক সৃষ্টি করেছেন তাঁদের মধ্যে জসীমউদ্দিন, বন্দে আলি মিয়া, প্রভাবতী দেবী প্রমুখ লেখক-লেখিকারা আছেন। তন্দ্রামধুর, ছায়াগম্ভীর রচনা লিখেছেন মোহিতলাল মজুমদার, অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ইত্যাদি। এছাড়াও যতীন্দ্রমোহন বাগচী, হেমচন্দ্র বাগচী, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, ইত্যাদি কবিদের রচনাও ছোটদের সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে।

সার্থক নাটিকা বড়দের সাহিত্যেই দুর্লভ, ছোটদের ক্ষেত্রে ত কথাই নেই। রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর", "শারদোৎসব", "মুকুট", ইত্যাদি রচনাগুলি ছাড়া সুরচিত নাটক-নাটিকার সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এই রচনাগুলি আজকের যুগে নিশ্চয় ক্ল্যাসিক এবং বুদ্ধিপ্রবণ কিশোরচিত্তের উপযোগী। একেবারে ছোটদের উপযোগী নাটিকার দৃষ্টান্ত স্বরূপ "পিত্তিরক্ষা" (নিশিকান্ত সেন), "ফলসা গাছের জলসা" (সুনির্ম্মল বসু), "সোনার কাঠি" (নরেন্দ্র দেব এবং রাধারাণী দেবী), "বুদ্ধির্যস্য" (সুবোধ বসু), ইত্যাদির নাম করা যায়। ছোটদের নাটকনাটিকার কিছু

অভাব পূরণের চেষ্টা করেছিলেন নিশিকান্ত সেন, "কেয়াফুল" একটি উল্লেখযোগ্য বই। পরে এ বিষয়ে লীলা মজুমদার, অখিল নিয়োগী, বিমল ঘোষ এবং সমর চট্টোপাধ্যায় সামান্য কিছু চেষ্টা করেছেন।

যেসব লেখক ছোটদের সাহিত্য সংগঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও একথা ঠিক, অনেকের রচনা ছোটদের সাহিত্যে হাস্যরস এবং সামাজিক দিক্‌গুলি পরিপুষ্ট করবার চেষ্টা করেছে। ছোটদের মানসিকতাকে অনুভব ক'রে সেই অনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করা বড় সহজসাধ্য কাজ নয়। এসব দিকে যাঁরা সফল সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অনুরূপা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রলাল রায়, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, দিলীপকুমার রায়, প্রফুল্লচন্দ্র বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিশোর-সাহিত্যের প্রথম যুগে দক্ষিণারঞ্জনের "চারু ও হারু", "ফার্ষ্ট বয়", "লাষ্ট বয়", ইত্যাদি সার্থক রচনা। এই বিষয়ে আর একটি সফল রচনার কথা উল্লেখ করা যায় নিশিকান্ত সেনের "আশ্চর্য্য মুকুট"।

পরবর্ত্তীকালে ছোটদের সামাজিক সাহিত্যে সফল রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অনুরূপা দেবীর "মহিম", অচিন্ত্য সেনগুপ্তের "দুই ভাই" এবং "উঁচুনীচু", তারাশঙ্করের "কান্না", প্রবোধ সান্ন্যালের "দুরাশার ডাক", বুদ্ধদেব বসুর "মা ভাই বোন", বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আম আঁটির ভেঁপু"। এছাড়াও আশাপূর্ণা দেবীর গল্পসংগ্রহগুলি শিশু-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। তা ছাড়া ছোটদের সাহিত্যে সামাজিক গল্প ও উপন্যাস রচনায় শরৎচন্দ্রের দান ছিল কম নয়। এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিশুদ্ধ হাস্যকৌতুক রচনায় "বিবাগীর বিড়ম্বনা" এবং "বেড়াতে যাবার বিখ্যাত স্থান" দিলীপকুমারের দুটি অপূর্ব্ব রচনা। এছাড়া প্রফুল্লচন্দ্রের "হোঁদল কুৎকুৎ" ও "মাণিক জোড়", মনোরঞ্জনের "এপ্রিল ফুল" এবং "চায়ের ধোঁয়া" গল্পগ্রন্থ দুটি উল্লেখযোগ্য, বিশেষভাবে "নিখিল বঙ্গ জীবনীসংঘ" গল্পটি। ব্যঙ্গ-কৌতুক রচনায় "শিবরাম চকরবরতির মতো কথা বলার বিপদ্", "মণ্টুর মাষ্টার", ইত্যাদির বিশিষ্টতা আছে। এছাড়া রঙ্গ-কৌতুকে অবনীন্দ্রনাথের "ভূতপত্রীর দেশে", "পোড়ালঙ্কার পুঁথি" নূতন ধরণের রচনা।

সাহিত্যের স্বর্ণযুগে যাঁদের অভ্যুদয় তাঁদের মধ্যে হাস্যরস নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রলাল নিঃসন্দেহ একজন শক্তিশালী লেখক। বিশেষতঃ হাস্য-করুণ রচনায় লেখকের মৌলিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ "ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প", "নূতন কিছু", "বলি তো হাসবো না", "হালকা হাসির খাতা", "বীরবলের বনিয়াদী চাল", ইত্যাদি। এছাড়া হাস্য-রোমাঞ্চ রচনায় প্রেমেন্দ্রের "ঘনাদার গল্প"। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটদের ক্ষেত্রেই সমধিক সফল, কিন্তু সে বিষয়ে তিনি সচেতন ব'লে মনে হয় না। ছোটদের সাহিত্যে হাস্যরস-রচনায় যাঁরা সাফল্য অর্জ্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, অমলেন্দু সেন, আশাপূর্ণা দেবী, ইত্যাদির নামও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বিকাশ দত্ত এবং বিমল দত্তের নামও স্মরণযেগ্য।

সাহিত্যের মধ্যযুগে রূপকথা, সামাজিক ও হাস্যরসের মত সাহিত্যের অন্যান্য দিক্‌গুলি অর্থাৎ ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে রচনাগুলি প্রভূত পরিমাণে উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। এবিষয়ে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রকান্ত দত্ত, অশ্বিনী শর্ম্মা, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য এবং জগদীশচন্দ্র বসু, হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, জগদানন্দ রায়, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, ইত্যাদির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভ্রমণ-কাহিনীতে যাঁরা সাফল্য অর্জ্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনাথ বিশ্বাস, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ গোস্বামী, ইত্যাদি।

"ইতিহাসের গল্প" (ক্ষেত্রগোপাল), "পৌরাণিক গল্প" (বিশ্বেশ্বর), "ভগবানের চাবুক" (হেমেন্দ্রকুমার রায়), "অসি বাজে ঝন্‌ঝন্" ও "মহাকালের পূজারী", "গল্প হলেও সত্যি" (ধীরেন্দ্রলাল ধর), "কম্যাণ্ডার কবুতর" ও "পয়সার ডায়েরি" (যোগেশচন্দ্র), "মজার দেশ" (বৈদ্যনাথ), "চরণিক" (মোহনলাল), "যারা ছিল দিগ্‌বিজয়ী" (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত), "ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতে" (হেমেন্দ্রকুমার রায়) বিশিষ্ট রচনা। এছাড়াও অপরাপর বইগুলির নাম বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হ'ল না। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে "অতীতের পৃথিবী", "জীবজগতের অ আ ক খ", "গাছ-পালার কথা", "বিজ্ঞানের পৃথিবী" উল্লেখযোগ্য।

এগুলি ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথের "রাজকাহিনী" এবং যোগেন্দ্রলাল গুপ্তের "বাংলার ডাকাত" খুবই স্মরণযোগ্য।

বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদ গল্প ও গ্রন্থগুলির কথাও যথেষ্ট আলোচনার যোগ্য। এই ধরণের অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য রচনা আছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা যতদূর আলোচনা ক'রে এসেছি তাতে একথা নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধে নেই, ছোটদের সাহিত্যে অজস্র সম্পদ্ ছড়িয়ে আছে, সে সম্পদ্ বড়দের মনপ্রাণকেও মুগ্ধ না ক'রে পারে না। কারণ রচনার নৈপুণ্যে, বিষয়-বস্তুর অভিনবত্বে এবং সুনিপুণ শব্দচয়নে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিকরাও কম প্রচেষ্টা করেন নি। কিন্তু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়নগুলি বিচারের সময় সযত্নে রোমাঞ্চকর ও রহস্যজনক রচনাগুলিকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। উচ্চ শ্রেণীর গল্প ও উপন্যাসের তালিকা তৈরী করবার সময় কেন যে রহস্য ও রোমাঞ্চকর রচনাগুলিকে পরিত্যাগ করা হয় তার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেকের ধারণা, রহস্য রোমাঞ্চ বলতে বোঝায় জঘন্য কতকগুলি ডিটেকটিভ গল্প, এছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আসলে যে তা নয় একটু ধীরভাবে বিচার করলেই বোঝা যায়। শ্রীঅরবিন্দ রচিত "এ্যাবলাডির দরজা", এবং অনুরূপা দেবীর "হেমলক", এই ধারণার অনেক পরিবর্ত্তন আনে। কাজেই রোমাঞ্চকর সাহিত্যেও শ্রেণীভেদ আছে বুঝতে অসুবিধে হয় না। ভালভাবে চিন্তা করলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং অভিযান সম্পর্কিত রচনাগুলিকে এবং ভৌতিককাহিনী ও এ্যাডভেঞ্চারমূলক রচনাগুলিকে রোমাঞ্চ-সাহিত্যে স্থান দিতে কারও দ্বিমত হবে ব'লে মনে হয় না।

বিচিত্র ধরণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অভিযান নিয়ে যে রচনাগুলি লিপিচাতুর্য্যে এবং কাহিনী-পরিবেশনে সফল তার মধ্যে রমেশচন্দ্র দাসের "সাগরিকা", "অজ্ঞাত দেশ", "পাতালনগরী", "নিরুদ্দিষ্টের দল", ইত্যাদির নাম করতে হয়। এগুলি মৌলিক রচনা না হলেও, প্রাণের স্পর্শ এই সব রচনায় মিলে গিয়েছে। "আশ্চর্য্য দ্বীপ" কুলদা-রঞ্জন রায়ের এই ধরণের একটি সফল রচনা। রমেশ দাসের মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে "লাইট হাউস রহস্য", "আফ্রিকার বনেজঙ্গলে", অনুসন্ধানী মনের সামনে জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। এছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্রের "পৃথিবী ছাড়িয়ে", "পাতালে পাঁচ বছর", "ময়দানবের দ্বীপ" এবং ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের "রঙ্গিলাপাহাড়ের নীল কুঠি" এবং "ধূমকেতু" এশ্রেণীর সুন্দর রচনা। তা ছাড়া হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন", "ময়নামতীর মায়াকানন", "ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন", "অমৃত দ্বীপ" এবং "মান্ধাতার মুলুকে" বাংলা শিশু-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম।

তাছাড়া অভিযান ও এ্যাডভেঞ্চারমূলক রচনাগুলির মধ্যে মণীন্দ্রলাল বসু রচিত "অজয়কুমার" একটি উৎকৃষ্ট রচনা। ভাষা ও কাহিনীর অপূর্ব্ব বিকাশ দেখা যায় তাঁর রচনায়। কিশোরদের হৃদয়-দুয়ারে যাঁরা প্রবেশ করেছেন এই লেখকের স্থান তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। এছাড়াও হেমেন্দ্রলাল রায়ের "দুর্গম পথের যাত্রী" একটি অতি সুন্দর রচনা। হেমেন্দ্রলালের সাহিত্য-জীবনের শেষ রচনাটির ভাষা ও কাহিনী অতি মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী। আদর্শবাদী বীর তরুণদের স্বার্থত্যাগ ও দেশাত্মবোধক অভিযান নিয়ে ধীরেন্দ্রলাল ধরের অধিকাংশ রচনাগুলি, "কামানের মুখে নানকিং", "প্রলয়ের পথিক", "আবিসিনিয়া ফ্রন্টে" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিছুটা প্রচারধর্ম্মী ভঙ্গি না থাকলে ধীরেন্দ্রলাল ধরের রচনাগুলি আরোও উৎকৃষ্ট হ'ত। অভিযানমূলক রচনাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রলাল রায়ের "অভিশপ্ত", নূতন ধরণের রচনা।

এই ধরণের রচনার পরে বাকি থাকে ভৌতিক ও গোয়েন্দা কাহিনীগুলি। এই ধরণের কাহিনী যাঁরা লিখেছেন, নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হেমেন্দ্রকুমার রায়। বিশেষতঃ ভৌতিক কাহিনী রচনায় লেখকের সমকক্ষ কেউ-ই নেই। ষ্টোকারের রচিত বিশ্ববিখ্যাত রচনা "ড্রাকুলা"র ছায়া নিয়ে তাঁর কোন কোন রচনা, সম্পূর্ণ অনুবাদ সেগুলি নয়। "মানুষ পিশাচ", "প্রেতাত্মার প্রতিশোধ", "বিশাল গড়ের দুঃশাসন", "মোহনপুরের শ্মশান", এগুলি সেই ধরণের রচনা যা পড়ার পরেও চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখবে। এই ধরণের আর একটি গল্পসংগ্রহ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "অসম্ভব", লিপিচাতুর্য্যে প্রশংসনীয়।

সকরুণ রহস্যময়, সাবলীল রচনায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর রচিত "কাশী-কবিরাজের বিপদ্", "দুটি মন্তর ও আরক", প্রভৃতি গল্পগুলির তুলনা নেই। এমন উন্নত ধরণের রহস্যময় ছোট গল্প, ছোটদের সাহিত্যেও বেশী নেই। অনেকটা এই ধরণের রচনা কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের "মর্ম্মর"। উৎকৃষ্ট গোয়েন্দাকাহিনী বলতে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের "পদ্মরাগ" ও "সোনার হরিণ" উল্লেখযোগ্য রচনা। বুদ্ধিদীপ্ত বিচারভঙ্গিমা, কথন-কৌশল লেখকের বিশেষত্ব। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের "জয়পরাজয়", "রীতিমত

এ্যাডভেঞ্চার", রীতিমত কুশলী লেখকের রচনা। এছাড়া সুকুমার দে সরকারের "মনটা হু হু করে" এবং "হানাবাড়ী" চিত্তাকর্ষক রচনা। এছাড়াও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "জেরিনার কণ্ঠহার", "সুন্দরবনের রক্তপাগল", "জয়ন্তের কীর্ত্তি", "অমাবস্যার রাতে", "অন্ধকারের বন্ধু" রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। রোমাঞ্চকর রচনাহিসাবে "আবার যখের ধন", "বিভীষণের জাগরণ" এবং প্রবোধ ঘোষের "আজও তারা ডাকে" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সব রচনা এবং লেখকদের নাম করা সম্ভব না হলেও, এ পর্য্যন্ত যাঁদের নাম উল্লেখ করা হ'ল, এই সব লেখক-লেখিকারা বাংলা কিশোর-সাহিত্যের কোন না কোন দিক্ উজ্জ্বল করেছেন। এঁদের মধ্যে বহু লেখক-লেখিকার অনেক রচনাই বিশেষভাবে আলোচিত হবার যোগ্য। অনেক ভাল রচনার মর্য্যাদা দিতে আমরা জানি না তাই যুগসঞ্চিত ধুলো তাদের ওপরে জমে।

আধুনিক যুগে যথার্থ প্রতিভাপূর্ণ রচনার একান্ত অভাব দেখা গিয়েছে, বত্রিশ ভাজার মাসিক পত্রিকা এবং লঘুধরণের রচনাই একমাত্র সম্বল। এ যুগের শিশু-পত্রিকার লেখক-লেখিকাদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, ইন্দিরা দেবী, অখিল নিয়োগী, বিমল ঘোষ, প্রভৃতি আছেন, কিন্তু লঘুধরণের রচনার দিকেই তাঁদের পক্ষপাত। লীলা মজুমদারের হাল্কা রচনাগুলিতে এখনো কিছুটা সরস আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, "হলদে পাখীর পালক", সুন্দর রচনা। এছাড়া প্রশান্ত চৌধুরীর ও জয়ন্ত চৌধুরীর কিছু কিছু হাল্কা সরস রচনা "জন্মতিথি", "হাওয়া বদল"।

কালের মানদণ্ডে যে সব রচনা যুগ-পরবর্ত্তী শিশুদেরও মুগ্ধ করবে, সেই ত রচনা! তবে এমন প্রতিভাবানও কেউ কেউ আছেন যাঁরা এদিকে মনোযোগ দিলে ছোটদের সাহিত্য আবার নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হবে।

বিগত ষাট বছর থেকে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, পরবর্ত্তী ষাট বছরের শিশু-সাহিত্য আমাদের কী দেবে সেটাই ভাববার বিষয়।*

---

* প্রবন্ধটিতে কয়েকজন শিশু-সাহিত্য-রচয়িতার নাম বাদ পড়েছে, যাঁদের নাম না থাকলে প্রবন্ধটির অঙ্গহানি হবে ব'লে মনে হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী শুধু যে মুকুলের সম্পাদক ছিলেন তা নয়, অতি সুন্দর সুন্দর শিশুপাঠ্য গল্প লিখতেন এই পত্রিকাতে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নাম করতে হয় শিশু-মাসিক পত্রিকা "বালকে"র – (১২৯২) প্রথম সম্পাদিকারূপে। তাঁর ছোট ছোট নাটিকাও আছে, "টাক্ ডুমাডুম্ ডুম্", "সাত ভাই চম্পা", প্রভৃতি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত "আরব্য উপন্যাস" বালক-বালিকাদের অত্যন্ত আদরের জিনিষ ছিল। কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত শিশু-সাহিত্য রচনায় প্রসিদ্ধ। এঁর অনেক বই আছে। স্বর্গীয়া প্রিয়ম্বদা দেবীর অবদান শিশু-সাহিত্যে কম নয়, এগুলির নাম তখন সকলের মুখে ফিরত। সবগুলির নাম মনে পড়ে না, "একলব্য", "অনাথ", "দেড়আঙুলে", প্রভৃতি কয়েকটির নাম মনে পড়ছে। এগুলি শিশু-সাহিত্য-জগতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করেছিল। স্বর্গীয়া কামিনী রায়ের "গুঞ্জন" নামে শিশুদের জন্যে রচিত একটি অতি সুখপাঠ্য কবিতার বই আছে।

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রমদারঞ্জন রায় মহাশয় "সন্দেশ" পত্রিকাতে শিকারকাহিনী লিখতেন, ধারাবাহিক ভাবে। এইগুলি কখনও বই হয়ে বেরিয়েছিল কিনা জানি না, তবে এগুলি এত সুলিখিত ছিল যে অনেক বয়স্ক লোকও এগুলি বারবার ক'রে পড়তেন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভোঁদড় বাহাদুর" শিশুদের অত্যন্ত আদরের বই।

স্বর্গীয় ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু রচিত "লাল কালো" একটি প্রসিদ্ধ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "ভাস্তের জন্মকথা" নামে একটি সুখপাঠ্য বই লেখেন। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে "পারস্য উপন্যাস" বার হয়। এরও সংকলনের ভার বোধ হয় চারুবাবুই গ্রহণ করেন। শ্রীমতী শান্তা দেবী ও শ্রীমতী সীতা দেবীর তিনখানি বই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। "হিন্দুস্থানী উপকথা", "হুকাহুয়া" ও "আজব দেশ" বই ক'টির বহুল প্রচার ঘটেছে। অনুবাদ-সাহিত্যে এদের নাম ভুলে যাবার নয়।

সম্পাদক, প্রবাসী ষষ্টিবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ।

নাইট্রোজেন সমস্যা*

শ্রীনীলরতন ধর

উদ্ভিদ্ জীবনে নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয়তা

নাইট্রোজেন উদ্ভিদ্ ও জীবদেহের অন্যতম উপাদান। ক্লোরোফিল, প্রোটিন এবং জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক অনেক পদার্থে ইহা বিদ্যমান। প্রতিটি সজীব কোষের মূল উপাদানই হ'ল নাইট্রোজেন। এক কথায় বলা যায়, নাইট্রোজেন ছাড়া জীবন সম্ভব নয়।

মৌলিক অবস্থায় নাইট্রোজেন একটি বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাসীয় পদার্থ। আমাদের চারিদিক্ ব্যেপে যে বায়ু আছে তার শতকরা ৮০ ভাগ হ'ল নাইট্রোজেন গ্যাস। প্রতি একর জমির উপর যে বায়ুস্তর আছে তাতে নাইট্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ ৩৫,০০০ টন।

মটর জাতীয় গাছপালা (legumes) ছাড়া অন্য কোন উদ্ভিদ্ সোজাসুজি বায়ু থেকে নাইট্রোজেন গ্যাস গ্রহণ ক'রে দেহের পুষ্টি-সাধন করতে পারে না। মৌলিক নাইট্রোজেন অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হলে তবেই তা উদ্ভিদের পক্ষে আত্মীকরণযোগ্য হয়, নতুবা নয়।

সার ব্যবহারের প্রাচীনতা

অনেকের ধারণা, আজ থেকে প্রায় ১২,০০০ বছর আগে মানুষ প্রথম কৃষিকার্যের সূচনা করে। সভ্যতার আদিম প্রভাতে এক যুগ এল যখন যাযাবর মানুষ তার গৃহপালিত পশুদল নিয়ে এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করল। কৃষিকর্ম সুরু করল। তখন সে জীবজন্তুর মলমূত্রাদি থেকে উৎপন্ন সারের উপকারিতা দেখতে পেল। সেই থেকে সুরু হ'ল জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য সারের ব্যবহার।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সার হিসেবে গুয়ানো (guano) ব্যবহার করা হচ্ছে। গুয়ানো হ'ল সাগরতটে সঞ্চিত সিন্ধুশকুন, কচ্ছপ, সীল প্রভৃতি জীবের মল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে সাররূপে জীবজন্তুর অস্থির ব্যবহার প্রচলিত হয়। আর ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিগ্‌বি (Sir Kenelm Digby) জানান যে, জমিতে খনিজ সোরা (saltpetre) ব্যবহার করলে শস্যের উৎপাদন বাড়ে।

জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য সার ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য সর্বপ্রথম জানা যায় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে। তখন দ্য স্যুস্যুর (N. T. de Saussure) উদ্ভিদ্-ভস্ম বিশ্লেষণ করেন। এর মধ্যে কতগুলি যৌগিক পদার্থের সন্ধান পেয়ে তিনি বলেন, উদ্ভিদ্ এইসব যৌগিক পদার্থ গ্রহণ করেছে মাটি থেকে। সারের মাধ্যমে এইসব পদার্থ সরবরাহ করার কথা মানুষ চিন্তা করতে লাগল। সেই থেকে সুরু হ'ল বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সার ব্যবহারের প্রচলন।

নাইট্রোজেন শিল্প

আকাশে যখন তড়িৎ ঝিলিক দেয়, তখন বায়ুমণ্ডলের কিছু নাইট্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ হয়ে নাইট্রোজেনের বিবিধ অক্সাইড তৈরি হয়। সেগুলি বৃষ্টির জলে দ্রবিত হয়ে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। অনুমান করা হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবীতে এইভাবে বছরে প্রায় ১,০০০ লক্ষ টন নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে আবাদী জমির পরিমাণ ৫০,০০০ লক্ষ একর। প্রতি বছর বায়ুমণ্ডল থেকে ৬০—১০০ লক্ষ টন নাইট্রিক অ্যাসিড পড়ে এইসব জমির উপরে। এই অ্যাসিড মৃত্তিকাস্থ বিবিধ রাসায়নিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাইট্রেট-জাতীয় লবণ উৎপন্ন করে। আর উদ্ভিদ্ শিকড়ের সাহায্যে সেইসব লবণ গ্রহণ ক'রে তা থেকে দেহের পুষ্টিসাধন করে।

---

* রুড়্‌কীতে ভারতীয়-বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৮তম অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণের সংক্ষেপিত অনুবাদ।

অনুবাদক—শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ।

বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের অফুরন্ত ভাণ্ডার। নাইট্রোজেন কাজে লাগাতে পারলে তার। বিজ্ঞানীরা এজন্য ভেবেছেন, কতক পরিমাণে সফলও হয়েছেন।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিশই (Henry Cavendish) সর্বপ্রথম বায়ুর মধ্যে [illegible] তড়িৎশিখা (electric arc) সৃষ্টি ক'রে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করতে সক্ষম হন। এইভাবে বায়ুর নাইট্রোজেন থেকে আমাদের ব্যবহারযোগ্য পদার্থ প্রস্তুত করার নাম নাইট্রোজেন স্থিরীকরণ (Fixation of Nitrogen)। অতঃপর নরওয়ের দুই বিজ্ঞানী বার্কল্যাণ্ড (C. Birkeland) এবং আইডের (S. Eyde) প্রচেষ্টায় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ্ধতি শিল্পে সার্থক হয়ে ওঠে। তখন থেকেই এই পদ্ধতি অনুসারে নাইট্রিক অ্যাসিডের উৎপাদন আরম্ভ হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক শক্তির শতকরা ১—২ ভাগ মাত্র সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়, কাজেই এতে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনের ব্যয় পড়ে খুবই বেশি। যে-সব দেশে সস্তায় জল-বিদ্যুৎ (Hydro-electricity) উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল, সেই-সব দেশেই শুধু এই পদ্ধতি প্রচলিত হয়। বর্তমানে কোন দেশেই আর এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না।

এরপর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী হাবের (Fritz Haber) নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন এই দু'টি মৌলিক পদার্থ থেকে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের শিল্প-পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণটি এখন সস্তায় তৈরি করা হয় বস-প্রণালীতে (Bosch process)। এর কিছুদিন আগেই (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে) প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ওস্ওয়াল্ড (W. Ostwald) এবং তাঁর জামাতা ব্রাউয়ের (Brauer) অ্যামোনিয়াকে বায়ুদ্বারা উপচিত ক'রে (oxidation) নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেন। এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা উত্তপ্ত প্ল্যাটিনামের তার-জালি প্রভাবক (catalyst) রূপে ব্যবহার করেন। এইভাবে বিজ্ঞানীদের স্বপ্ন সফল হয়েছে, তাই স্বল্পব্যয়ে বায়ুর নাইট্রোজেন থেকে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া এবং নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করা এখন সম্ভব হচ্ছে। এই দু'টি পদার্থ থেকেই এখন রাসায়নিক সার উৎপন্ন করা হয়।

বর্তমানে বায়ু থেকে মোট ৭৪০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ উৎপন্ন করা হয়। এর মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ সংশ্লেষিত অ্যামোনিয়াজাত পদার্থ, আর বাকি ১৫ ভাগ হ'ল ক্যাল্সিয়ম সায়ানামাইড। আবার কৃষি-কার্যের উদ্দেশ্যে মোট যে পরিমাণ নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ হ'ল নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন সার, ১০ ভাগ কয়লাজাত অ্যামোনিয়া এবং ১০ ভাগ চিলি দেশজাত সোরা।

সম্প্রতি হার্টেক (Hartek) এবং দণ্ডেস (Dondes) পরমাণু-শক্তির সাহায্যে নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ সংশ্লেষণের উপায় উদ্ভাবন করেছেন। সংকুচিত বায়ুর ভিতর দিয়ে ইউরেনিয়ম-২৩৫ থেকে প্রাপ্ত তেজরশ্মি পাঠিয়ে তাঁরা ১০—১৫ ভাগ নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। হার্টেক আন্দাজ করেছেন যে, এই উপায়ে এক অণু-ভার (gram-molecule) পরিমাণ ইউরেনিয়মের সাহায্যে ২৫৮ টন বিশুদ্ধ নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করা সম্ভব হবে। এইভাবে যে নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যাবে তার মূল্য হবে ১০,০০০ ডলার, আর এজন্য যে পরিমাণ ইউরেনিয়ম প্রয়োজন তার মূল্য ৬,০০০ ডলার। এ থেকেই বোঝা যাবে যে, এই প্রণালীটি শিল্পে সার্থক ক'রে তোলা মোটেই অসম্ভব নয়।

বর্তমানে পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলিতেও নানাপ্রকার নাইট্রোজেন-শিল্প গ'ড়ে উঠছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, এই শিল্পগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বিভিন্নরূপ কারখানায় প্রতিদিন ১০০ টন অ্যামোনিয়া উৎপাদন করতে হলে কি বিরাট্ মূলধন প্রয়োজন তা নীচের তালিকা থেকেই বোঝা যাবে। গরীব দেশগুলির পক্ষে এ একটা খুব বড় সমস্যা।

	প্রাকৃতিক গ্যাস	খনিজ তৈল	কয়লা	কোক-চুল্লী	রিফর্মার গ্যাস
নিয়োজিত মূলধন (ডলার হিসেবে)	৩১,৫০,০০০	৪০,৯৮,০০০	৪২,৪৮,০০০	৩৬,২০,০০০	২৯,৮০,০০০

তা ছাড়া নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থসমূহের উৎপাদনের তুলনায় তাদের চাহিদা দিন দিন এমন দ্রুততালে বেড়ে চলেছে যে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নয়। এইসব দেখে শঙ্কান্বিত বিজ্ঞানীরা এখন থেকেই নাইট্রোজেনের নূতন নূতন উৎস সন্ধানে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন।

জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব পূরণের বিকল্প উপায়

সুদীর্ঘকালের গবেষণার ফলে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, জৈব যৌগসমূহ যে শুধু মাটির ভৌতধর্মের উন্নতি সাধন করে তা নয়, মাটির মধ্যে এগুলি ধীরে ধীরে উপচিত হয় (slow oxidation) ব'লে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ সংশ্লেষণে সহায়তা করে। এর ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে। উপরন্তু মাটিতে কার্বহাইড্রেট থাকলে নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ কম ব্যয় হয়, যেমন প্রাণিদেহে কার্বহাইড্রেট অথবা চর্বি থাকলে নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিনের ক্ষয় নিবারিত হয়।

কচুরিপানা আমাদের দেশের স্বাস্থ্য বিপন্ন ক'রে তুলেছে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, মাটির সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় ইহা নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ সংশ্লেষণে সহায়তা করে। আলোতে সংশ্লেষণ-ক্রিয়া দ্রুত হয়। আর ক্ষারকীয় ধাতুমল (basic slag) থাকলে তা আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। কাজেই এককালের অভিশাপ আজ বরে পরিণত হ'তে পারে।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে মটরজাতীয় গাছপালা চাষ করার প্রথা সব দেশেই প্রচলিত আছে। অনুমাণ করা হয়েছে যে, এই ভাবে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ একর প্রতি ১১২ পাউণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আমরা খড়ের মাধ্যমে জমিতে শতকরা ০·৫ ভাগ হিসেবে কার্বন যোগ ক'রে দেখেছি যে, আলো এবং ক্যাল্‌সিয়ম ফস্‌ফেটের উপস্থিতিতে এর ফলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ একর প্রতি ২১৫ পাউণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি হ'তে পারে। কাজেই জমিতে লাঙ্গল দেবার সময় ক্যাল্‌সিয়ম ফস্‌ফেট ও খড়ের মিশ্রণ প্রয়োগ করলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ নিশ্চয়ই অনেকখানি বাড়বে।

স্মরণাতীতকাল থেকেই সার হিসেবে গোময় ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, ইহা যে শুধু উদ্ভিদের পক্ষে পুষ্টিকারক পদার্থসমূহ সরবরাহ করে তা নয়, ইহা নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ সংশ্লেষণেও সহায়তা করে। কাজেই এর সাহায্যে সমগ্র পৃথিবীর আবাদী জমিগুলিতেই নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। অনুমাণ করা হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ১,৪০,০০০ লক্ষ টন গোময় সার উৎপন্ন হয়। চাষের ফলে ইহা মাটির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ৭০-৮০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। উপরন্তু এর সাহায্যে প্রায় সমপরিমাণ নাইট্রোজেন বায়ু থেকে মাটিতে স্থিরীকৃত হয়। তাই গোময় সার প্রয়োগ করলে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে কারাকার (Karraker) এ সম্পর্কে গবেষণা ক'রে নিম্নলিখিত ফল পেয়েছেন :

জমিতে প্রদত্ত সার (তিনটি শস্যক্ষেত্রের গড়)	মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ (একর প্রতি পাউণ্ড হিসেবে)	শস্য উৎপাদন (একর প্রতি বুশেল হিসেবে)
সার প্রয়োগ না ক'রে	১,৬০০	১৭
গোময় সার প্রয়োগ ক'রে	১,৭৬০	৩৬
গোময় সার এবং ফস্‌ফেট প্রয়োগ ক'রে	১,৯৯০	৫১

ফস্‌ফেটের সঙ্গে গোময় সার প্রয়োগ ক'রে যে ভাল ফল পাওয়া যায় তা অন্যান্য পরীক্ষার সাহায্যেও প্রমাণিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের রথামস্টেডে একটি পরীক্ষা করা হয়। একটি জমিতে একর প্রতি ১৪ টন হিসেবে গোময় সার (যার মধ্যে ২০০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন বিদ্যমান) দেওয়া হয় এবং ১৮৪৩ সাল থেকে আরম্ভ ক'রে প্রতি বছরই এখানে গম চাষ করা হয়। এই জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ আগে ছিল শতকরা ০·১২২ ভাগ, কিন্তু এখন তা দাঁড়িয়েছে শতকরা ০·২৭৪ ভাগ, অর্থাৎ নাইট্রোজেনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। অপরদিকে অন্য জমিতে ৮৬ পাউণ্ড হিসেবে অ্যামোনিয়ম সাল্‌ফেট, অথবা ১২৯ পাউণ্ড হিসেবে সোডিয়ম নাইট্রেট দিয়ে এবং প্রতি বছর গমের চাষ ক'রে দেখা গেছে যে, নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ার বদলে আগের চেয়ে আরও কমে গেছে।

কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে অন্যান্য উপাদানের প্রয়োজনীয়তা

আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছি যে, বিভিন্ন জৈব পদার্থের মিশ্রণ, যেমন—গোময় সার, খড়, গাছপাতার অবশেষ, প্রভৃতি এবং ক্যাল্‌সিয়ম ফস্‌ফেট্‌ জমিতে মেশালে সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে নাইট্রোজেন, পটাশ, ফস্‌ফেট্‌, প্রভৃতি উপাদান সরবরাহ করে এবং নাইট্রোজেন স্থিরীকরণ প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং সর্বোপরি মাটির প্রশমতা রক্ষা ক'রে জমির উর্বরতা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করে। এজন্য অনেকদিন থেকেই আমরা

জমিতে ফস্‌ফেট্ সার প্রয়োগ করার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে আসছি। এই উদ্দেশ্যে ধাতুমল, খনিজ ফস্‌ফেট্, প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এতদিন পর্যন্ত মানুষ পৃথকৃভাবে জৈব পদার্থ এবং ফস্‌ফেট্ ব্যবহার করার কথা চিন্তা ক'রে এসেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এই দু'রকম পদার্থ এক সঙ্গে প্রয়োগ করলে আরও বেশী সুফল পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণই হ'ল তার উৎপাদিকাশক্তির নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড। বিভিন্ন দেশের পরীক্ষা থেকে আরও বোঝা গেছে যে, মাটির সঙ্গে খড় না মিশিয়ে যে পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশী পাওয়া যায় খড় মিশিয়ে।

স্থায়ী কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে গোময় সার এবং কৃত্রিম সার একত্রে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা লাভজনক হয়, কারণ এগুলি মাটিতে ক্যাল্‌সিয়ম কার্বনেট ও নাইট্রোজেন সরবরাহ করে, বায়ুর নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করে নাইট্রোজেন যৌগিক উৎপাদনে সহায়তা করে, আর মাটির নাইট্রোজেন এবং মৃত্তিকাজাত লিগ্‌নিন্-ফস্‌ফোরস্-নাইট্রোজেন-ঘটিত সারাংশ সংরক্ষণ করে। এই সারাংশকে হিউমাস (humus) বলে।

শস্য উৎপাদনে নাইট্রোজেনের কার্যকারিতা

একথা প্রায়ই বলা হয় যে, খাদ্য-শস্য উৎপাদনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মৌল হ'ল নাইট্রোজেন। এক কিলোগ্রাম পরিমাণ সার প্রয়োগ করলে ফসলের উৎপাদন কত কিলোগ্রাম বাড়ে তার নির্দেশ নীচের তালিকায় দেওয়া হ'ল:

জমির প্রকার ভেদ	চাষের জমিতে			স্থায়ী চারণ-ভূমিতে		
সারে ব্যবহৃত মৌল	নাইট্রোজেন	ফস্‌ফোরস	পটাসিয়ম	নাইট্রোজেন	ফস্‌ফোরস	পটাসিয়ম
দেশের নাম						
নরওয়ে	৯	৩	৫	১১	৬	৪
সুইডেন	১৪	১১	৭	১৪	১১	৭
ডেনমার্ক	১৮	৪	২	১২	৫	৩
যুক্তরাষ্ট্র	১৬	৫	৫	...	...	...
আয়ার্ল্যাণ্ড	২০	৮	৮	...	...	...
নেদারল্যাণ্ডস্	১৯	৬	৩	১০	৬	৪
ফ্রান্স	১৯	৫	২.১	...	...	...
জার্মেনী	১৯	৮	৪	৯	১০	৫
সুইজার্ল্যাণ্ড	১৮	৮	৪	৯	১০	৫
গ্রীস	১৫	৫	৩	...	...	...
ইটালী	১১	৩	...	১২	৪	৩
গড়—	১৬	৫	৪	১১	৭	৪

অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত পৃথিবীর অর্থনৈতিক মানচিত্রে নীচের তালিকাটি সংযোজিত হয়েছে। প্রতি হেক্টরে (প্রায় ২½ একর) এক কিলোগ্রাম (=২.২ পাউণ্ড) নাইট্রোজেন প্রয়োগ ক'রে ফসলের উৎপাদন কত কিলোগ্রাম বৃদ্ধি পায় তাই এখানে দেখানো হয়েছে।

নাইট্রোজেনের পরিমাণ	ফসলের উৎপাদন কত কিলোগ্রাম বৃদ্ধি পায়			
	গম	ধান	আলু	ঘাস
হেক্টর প্রতি এক কিলোগ্রাম	১৭	১৭	৮৪	১৭

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ-এর রিপোর্টে প্রকাশ যে, ভারতের জল-হাওয়া অনুযায়ী যে পরিমাণ নাইট্রোজেন জমিতে প্রয়োগ করা হয়, গড়ে তার প্রায় দশগুণ ধান উৎপন্ন হয়।

অতিরিক্ত সার ব্যবহার লাভজনক নয়

আমাদের ধারণা এই যে, নাইট্রোজেনের পরিমাণ যত বাড়ানো যাবে সঙ্গে সঙ্গে ফসলের উৎপাদনও তত

বাড়বে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। কারণ, পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, একর প্রতি ১২৫ পাউণ্ডের চেয়ে বেশি নাইট্রোজেন ব্যবহার করলে অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের জন্য ফসলের পরিমাণ আর বাড়ে না। উপরন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১২৫ পাউণ্ড হিসেবে নাইট্রোজেন প্রয়োগ ক'রে যে পরিমাণ ফসল পাওয়া গেছে, তার চেয়ে কম পাওয়া গেছে ১৮৮ বা ২৫০ পাউণ্ড হিসেবে নাইট্রোজেন প্রয়োগ ক'রে। ফস্‌ফেটের বেলায়ও অনুরূপ ফল পাওয়া গেছে। কাজেই আমার মতে, কৃত্রিম সারের কার্যকারিতার কথা অনেক সময়ই বাড়িয়ে বলা হয়। "The law of diminishing return"—এই প্রবচনটি এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার।

চাষের জন্য নাইট্রোজেনের চাহিদা

১৯৫৬ সালের হিসেবে দেখা যায় যে, সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ১০,০০০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে। আর অন্যান্য ফসল, যেমন ডাল, আলু, চিনি, প্রভৃতি উৎপন্ন হয়েছে প্রায় ৭,০০০ লক্ষ টন। সুতরাং সমগ্র পৃথিবীতে চাষের জন্য বছরে প্রায় ১,০০০ লক্ষ টন (১৭,০০০ ÷ ১৬) নাইট্রোজেন সার প্রয়োজন। কিন্তু শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বছরে মাত্র ৭০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন সার পাওয়া যায়। সুতরাং নাইট্রোজেনের যেরূপ চাহিদা তার অতি সামান্য অংশই এখন কারখানাগুলিতে উৎপাদিত হচ্ছে।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১,৫০০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য এবং প্রায় ৮৫০ লক্ষ টন অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কাজেই সেখানে খাদ্য উৎপাদনের জন্য ১৫০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে ১৫-২০ লক্ষ টন রাসায়নিক নাইট্রোজেন, মটরজাতীয় গাছপালার সাহায্যে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন ২০ লক্ষ টন এবং গোময় সার সম্ভবতঃ ১০ লক্ষ টন, অর্থাৎ মোট প্রায় ৫০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন সার, ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

অনুমান করা হয়েছে যে, রাশিয়ায় খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রতি বছর প্রায় ১৫০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন প্রয়োজন। ১৯৫৮ সালে রাশিয়ায় ১২৪ লক্ষ টন খনিজ সার উৎপন্ন করা হয়, তন্মধ্যে নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ টন। রাশিয়ায় পরিকল্পনা করা হয়েছে যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সার উৎপাদনের পরিমাণ এর তিন গুণ করা হবে এবং তার ফলে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগ বাড়বে।

১৯৫৬ সালে ভারতে যে ফসল উৎপাদিত হয়েছে তার পরিমাণ (লক্ষ টন হিসেবে):

ধান—৩১৬, জোয়ার—১৮৪, সরগম—১৬৭,
গম—১২৩, ভুট্টা—৩৭, বার্লি—৩৪

অর্থাৎ, মোট ৮৬১ লক্ষ টন। সুতরাং ভারতে নাইট্রোজেনের চাহিদা হ'ল বছরে প্রায় ৫৫ লক্ষ টন। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারখানায় উৎপন্ন নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ (লক্ষ টন হিসেবে):

সিন্ধ্রি—১'১৮৯, দক্ষিণ আর্কট—০'২০৩, নাঙ্গল—০'৪০৬,
রাউরকেল্লা—০'৭১১, বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ—০'৩৬৬

অর্থাৎ, মোট ২'৮৭৫ লক্ষ টন মাত্র। ভারতে নাইট্রোজেনের যে চাহিদা, সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের এখনও অনেক দেরী আছে। সুতরাং আমাদের বিকল্প ব্যবস্থাগুলির কথাও বিশেষ ভাবে চিন্তা ক'রে দেখা দরকার। এ দিক্ দিয়ে চীন এবং জাপানের প্রথা বিশেষভাবে বিবেচ্য।

জাপানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ১৩ লক্ষ টন হিসেবে নাইট্রোজেন উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। চীনদেশেও এখন নাইট্রোজেনের চাহিদা খুব বেশি। শুধু তাই নয়, চীনদেশে কৃত্রিম সারের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। জৈব পদার্থের ব্যবহার চীনদেশেই সবচেয়ে বেশি হয়। মানুষের মলও সেখানে শতকরা ৭০ ভাগই জমির সাররূপে ব্যবহার করা হয়। মোট আবাদী জমির শতকরা ৫০ ভাগে মলঘটিত সার এবং স্থায়ী সার, ২০ থেকে ৩০ ভাগে 'কম্পোস্ট' (compost) সার এবং ১০ থেকে ১৫ ভাগে 'সবুজ সার' (green manure) ব্যবহার করা হয়। অনুমান যে, চীনারা বছরে ১০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন, ৫ লক্ষ টন পটাসিয়ম এবং ২'৫০ লক্ষ টন ফস্‌ফোরস ব্যবহার করে। সেখানে হাজার হাজার বছর ধ'রে জমি চাষ হ'লেও শস্য উৎপাদনের পরিমাণ অনেক দেশের চেয়েই বেশি। জমির উৎপাদিকা শক্তি যে কমে নি তার প্রধান কারণ, সেখানে কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জৈব সার ও হিউমাসের পরিমাণ রাসায়নিক সারের তুলনায় অনেক বেশি।

জাপানেও জৈব সারের সাহায্যে প্রচুর হিউমাস উৎপন্ন হয়, তা কৃত্রিম সার সহযোগে ব্যবহার করা হয়। জাপানে সার হিসেবে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে :

উৎপাদন	পরিমাণ	(একর প্রতি পাউণ্ড হিসেবে)
জৈব পদার্থ	৩,৭১১	৪,৬৪০
নাইট্রোজেন	১০৫	১৩১
ফস্‌ফোরস	৩৫	৪৪
পটাসিয়ম	৫৬	৭০

নিম্নলিখিত পরিমাণ অনুযায়ী সার ব্যবহার ক'রে সেখানে একর প্রতি ৮০ বুশেল হিসেবে ধান পাওয়া যায়।

সার	পরিমাণ	(একর প্রতি পাউণ্ড হিসেবে)		
		নাইট্রোজেন	ফস্‌ফোরস	পটাসিয়ম
কম্পোস্ট সার	৫,২৯১	২৬·৪	৫·৯	২৭·১
সবুজ সার	৩,৩০৬	১৯·২	১·১	১৯·৬
সোয়াবীনের খইল	৩৯৭	২৭·৮	১·৭	৬·৪
সুপার ফস্‌ফেট	১৭৪	......	১২·৮	...

এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, খাদ্য-শস্য উৎপাদনের জন্য বর্ধিত হারে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ ব্যবহার করাও অবশ্য কর্তব্য। পৃথিবীর সব দেশগুলিতেই এখন এই সত্য ক্রমশঃ উপলব্ধি হচ্ছে।

অন্যান্য সার প্রয়োগের সার্থকতা

উদ্ভিজ্জাত কার্বন-ঘটিত যোগসমূহ, যেমন সেলুলোজ, অন্যান্য কার্বহাইড্রেট, লিগ্‌নিন প্রভৃতি, মৃত্তিকায় হিউমাস প্রস্তুতিতে সাহায্য করে, মাটির ভৌত ধর্মের উন্নতিসাধন করে এবং বায়ু থেকে ব্যবহারযোগ্য নাইট্রোজেন যৌগিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ারও সুবিধা করে। বিবিধ ব্যাক্‌টিরিয়ার ক্রিয়ায় মাটির নাইট্রোজেন উপাদান ব্যয় হয়। কার্বন-ঘটিত যৌগ মাটিতে থাকলে সেই ব্যয় অনেকাংশে নিবারিত হয়। তাই মাটির নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগসমূহ সংরক্ষণের জন্যও কার্বহাইড্রেট প্রয়োগ অবশ্য প্রয়োজন। তার জন্য উদ্ভিদের অবশেষ, খড় এবং গোময় সার ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া ঘাস থেকেও প্রচুর জৈব পদার্থ পাওয়া যেতে পারে। ফসল কাটার পরে শস্যক্ষেত্রে উদ্ভিদের যে সব গোড়া প'ড়ে থাকে সেগুলি হালচাষ ক'রে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার রীতি প্রশংসনীয়। তবে এই রীতি অনুসরণ করা হ'লেও, শস্যক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, ১,০০০ পাউণ্ড হিসেবে আরও কার্বন প্রয়োগ করা দরকার। অর্থাৎ, এজন্য একর প্রতি ৪ টন হিসেবে গোময় সার প্রয়োগ করা উচিত। বলা বাহুল্য, মাটিতে কার্বন-ঘটিত যৌগসমূহের পরিমাণ কম হ'লে হিউমাস নষ্ট হবে এবং তার ফলে জমির উর্বরতা কমে যাবে।

মাটির ক্যাল্‌সিয়ম কার্বনেট বায়ুস্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ক্রিয়ায় ধীরে ধীরে ক্যাল্‌সিয়ম বাই-কার্বনেটে পরিণত হয় এবং বৃষ্টিজলে ধুয়ে চলে যায়। এজন্য কৃষিব্যবস্থায় চক, মার্বেল, চুণ প্রভৃতি বরাবরই উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ ক'রে আসছে। বিগত শতাব্দীতে শস্য উৎপাদনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চুণ এবং গোময় ব্যবহার করা হ'ত।

হিল্‌গার্ড (Hilgard)-এর মতে, ভাল ফসল পেতে হ'লে ক্যাল্‌সিয়ম কার্বনেটের পরিমাণ বেলে মাটিতে শতকরা ০·১ ভাগ এবং এঁটেল মাটিতে শতকরা ০·৬ ভাগের কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সাধারণ ভাবে বলা যায়, প্রায় সব রকম মাটিতেই শতকরা ২—৩ ভাগ ক্যাল্‌সিয়ম কার্বনেট থাকলে ভাল ফল পাওয়া যায়। চুণ প্রয়োগ করলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যা উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং পুষ্টিকারক পদার্থ গ্রহণের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু অতিরিক্ত চুণ প্রয়োগ করলে হিউমাসের প্রোটিন-জাতীয় জৈব অংশ তাড়াতাড়ি নাইট্রেট-জাতীয় খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। তখন উদ্ভিদ্ তা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার আগেই, তা জলে ধুয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। উপরন্তু চুণের ক্রিয়ায় পটাস এবং অন্যান্য মৌল এমন অবস্থায় পরিণত হয় যা উদ্ভিদ্ আর গ্রহণ করতে পারে না। তাই ইউরোপের সর্বত্রই একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে,

Lime and lime without manure
Makes both farm and farmer poor.

'কম্পোস্ট' সারে গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেন প্রথমে থাকে শতকরা ৫—৮ ভাগ, কিন্তু ক্রমে পরিমাণ আরও বাড়তে থাকে। 'কম্পোস্ট' ক্রমাগত গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেন, ফস্‌ফোরস, পটাসিয়ম এবং অন্যান্য মৌল সরবরাহ করতে থাকে। লেডি বল্‌ফোর (Lady Eve Balfour) বলছেন, একর প্রতি ৫ টন 'কম্পোস্ট' ব্যবহার করলেই যথেষ্ট হয়। 'কম্পোস্ট'-এ যদি শতকরা ০·৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে, তা হলে ৫ টন 'কম্পোস্ট' থেকে ৫০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন পাওয়া যাবে। এর মধ্যে ৩০—৩৫ পাউণ্ড গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পাওয়া যাবে এবং উদ্ভিদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সব সময়ই কিছু পরিমাণ গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেন পাওয়া যায় মৃত্তিকাস্থ নাইট্রোজেন থেকে। হিউমাস-লব্ধ নাইট্রোজেনের পরিমাণ যত বাড়ে, অন্যান্য উৎস থেকে নাইট্রোজেনের চাহিদা তত কমে।

রাজস্থান, মহীশূর, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে ক্ষার-জমি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে অস্থিচূর্ণ এবং খড় অথবা চিটে-গুড়ের মিশ্রণ প্রয়োগ ক'রে আমরা চমৎকার ফল পেয়েছি। অনুরূপ ভাবে, 'কম্পোস্ট' প্রস্তুতির গবেষণায় দেখা গেছে যে, ক্ষারকীয় ধাতুমল এবং খনিজ ফস্‌ফেট নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ সংশ্লেষণে সাহায্য করে। যেখানে ফস্‌ফেটবিহীন 'কম্পোস্ট'-এ নাইট্রোজেনের পরিমাণ হয় শতকরা ০·৫—০·৮ ভাগ, সেখানে ফস্‌ফেট-মিশ্রিত 'কম্পোস্ট'-এ নাইট্রোজেনের পরিমাণ হয় শতকরা ১—২ ভাগ। ফস্‌ফেটবিহীন 'কম্পোস্ট'-এর তুলনায় ফস্‌ফেট-মিশ্রিত 'কম্পোস্ট'-এ গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেনের পরিমাণও বেশি হয়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আলো, ফস্‌ফেট ও গাছপাতাই সহজে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। ভারতে অনেক সরকারী কৃষিক্ষেত্রেই খড় ও ক্ষারকীয় ধাতুমল ব্যবহার ক'রে ফসলের উৎপাদন শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। সাফোক-এ লেডি বল্‌ফোর একটি কৃষিক্ষেত্রে বার্লির খড় (একর প্রতি ২০·৬ হন্দর) এবং ক্ষারকীয় ধাতুমলের (একর প্রতি ৯৯ পাউণ্ড ফস্‌ফোরস পেণ্টক্সাইড হিসেবে) মিশ্রণ ব্যবহার ক'রে প্রতি একরে ৩০·৪ হন্দর বার্লি উৎপাদন করেন। অথচ অ্যামোনিয়ম সাল্‌ফেটরূপে ১১২ পাউণ্ড নাইট্রোজেন ব্যবহার ক'রে পান ২০·৬ হন্দর। আর কোন সার না দিয়ে কৃষিক্ষেত্র থেকে পান মাত্র ১৪ হন্দর।

বন-জঙ্গলে গাছ-পাতা থেকে এবং কৃষিক্ষেত্রে ঘাস থেকে হিউমাস সৃষ্টি হয়। কৃষিক্ষেত্রের উর্বরতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মানুষ পচাপাতার সার বা হিউমাস ব্যবহার ক'রে আসছে আবহমান কাল ধ'রে। তাছাড়া মানুষ বলতে গেলে সভ্যতার প্রথম যুগেই জানতে পেরেছে যে, গোময় সার কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে খুবই উপকারী। কিন্তু সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গাছপালার সংখ্যা ক্রমশঃ কমছে। তাছাড়া কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গবাদি পশুর পরিবর্তে কলের লাঙ্গল, ট্রাক্টর প্রভৃতির ব্যবহার বাড়ছে। এর ফলে গোময় সারের ব্যবহারও ক্রমশঃ কমছে। তাই কৃষককে নিতান্ত বাধ্য হয়েই আগের চেয়ে বেশি ক'রে রাসায়নিক সারের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। কিন্তু অনেক দেশেই পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, বেশি মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে তাতে মৃত্তিকার হিউমাস অংশ হ্রাস পায়।

অধ্যাপক বনডর্ফ (Bondorff) বলেছেন, কৃত্রিম সার মাটিতে জৈব পদার্থ সংযোজিত করে না, তাই হিউমাস বিয়োজন বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষার ফলে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে মাটিতে প্রচুর নাইট্রেট উৎপন্ন হয়। নাইট্রেট উপচায়ক (oxidising agent), নাইট্রেট হিউমাস বিয়োজন করে। এর ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়। কাজেই শুধু রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে একটি গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হয়। অবশ্য হিউমাসের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে, বহুকাল ধ'রে। রথামস্টেডের ঐতিহাসিক পরীক্ষাতে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

গোময় সার এবং রাসায়নিক সার পরস্পরের পরিপূরক। কাজেই আমার মতে, রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে তার পরিমাণ কখনই একর প্রতি ১০০ পাউণ্ডের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত নয়। আর সেই সঙ্গে সর্বদাই গোময় সার, খড়, 'কম্পোস্ট' এবং অন্যান্য জৈব-পদার্থ প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য, যাতে হিউমাস হ্রাস না পায়।

উপসংহার

শস্যোৎপাদনের জন্য সারা পৃথিবীতে নাইট্রোজেন চাহিদা কেবলমাত্র রাসায়নিক নাইট্রোজেন দ্বারা মেটানো

কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু বিবিধ জৈব-পদার্থ আলো এবং ক্যালসিয়ম কস্‌ফেটের সহযোগে স্থায়ীভাবে জমিজমার উর্বরতা বৃদ্ধি করতে পারে।

নানাদেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো হলেও, এও মর্মান্তিক সত্য যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আজও অন্নবস্ত্রহীন। ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশ, মিশর, তুরস্ক, ইটালি, গ্রীস, প্রভৃতি দেশে মাথাপিছু দৈনিক ১,৬২০—২,৫০০ ক্যালরি শক্তি দেয় এমন পরিমাণ খাদ্য ও ৫·৬—২০·৫ গ্রাম প্রাণিজ প্রোটিন খাদ্য মারফৎ দেওয়া সম্ভব হয়। বিজ্ঞানসম্মত আদর্শ খাদ্যের মান অনুসারে মাথাপিছু দৈনিক খাদ্যে ২৮০০ ক্যালরি এবং প্রাণিজ প্রোটিন ৪০ গ্রাম অবশ্যই থাকা উচিত। সোভিয়েট রাশিয়াতেও খাদ্যে প্রাণিজ প্রোটিনের পরিমাণ আদর্শ মানের চেয়ে কম।

ইউরোপের অনেক দেশ নিজ দেশে উৎপন্ন খাদ্যে নিজেদের চাহিদা মেটাতে পারে না। যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, প্রভৃতি দেশ নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য-শস্য উৎপাদন করতে পারে না। কিন্তু তাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, তাই তারা বিদেশ থেকেই তা আমদানী ক'রে নিজেদের চাহিদা মেটাতে পারে।

পাশ্চাত্ত্য দেশবাসী জীবনের বিবিধ সমস্যা বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে সমাধান করেছে, প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে বিজ্ঞান ও শিল্প উন্নয়নের সাধনা গত ৫০০ বছর ধ'রে চলেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশবাসী বিজ্ঞানকে সত্য ব'লে জেনেছে, সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানীর পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে শিখেছে। সে দেশের বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নির্ভুলভাবে পরীক্ষা করেছে এবং তা থেকে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। তাই তারা প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় বহুলাংশে সফল হয়েছে।

অপর দিকে ভারতে বৈজ্ঞানিক যুগের সূচনা হয়েছে মাত্র ৬০ বছর হ'ল। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশে বার বার বিদেশীরা এ দেশ আক্রমণ করেছে, দেশের শান্তি শৃঙ্খলা চিন্তাশক্তি বার বার ব্যাহত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পরাধীনতার ফলে মানসিক পঙ্গুতা এসে গিয়েছে। মানসিক দাসত্ব থেকে আজও আমরা মুক্তি পাই নি। তাই আধুনিক কালে বিজ্ঞান-সাধনার সূচনা হলেও, গবেষণার শ্রমসাধ্য অনুশীলনের চাইতে প্রচার ও সুলভ জনপ্রিয়তার মোহাচ্ছন্নভাব রয়ে গেছে বেশি। আমাদের দিক্‌ভ্রান্ত হ'লে চলবে না, সত্য অভিসারী হতে হবে। জাতির উন্নতির জন্য আমাদের আরও অধ্যবসায়ী এবং আরও পরিশ্রমী হতে হবে। ১৭৯৪ সালে গিলোটিনে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে অমর বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ার যে বাণী দিয়েছিলেন, তারই পুনরুক্তি ক'রে বলি :

—It is not required, in order to merit well of humanity and to pay tribute to one's country, that one should participate in brilliant public functions that relate to the organisation and regeneration of empires. The scientist, in the seclusion of his laboratory, and study, may also perform patriotic functions. He can hope, by his labours, to diminish the mass of ills that afflict the human race and to increase its enjoyment and happiness; and should he, by the new paths which he has opened, have helped to prolong the average life of man by several years, or even by only several days, he can then aspire to the glorious title of benefactor of humanity.

—•—

সরস্বতী-পূজার বিস্তার ও বিদ্যানুরাগ বৃদ্ধি

অনেক বৎসর হইতে বাংলাদেশে ছাত্রছাত্রীর দ্বারা সরস্বতী-পূজা খুব অধিক সংখ্যায় হইতেছে, অন্য কোন প্রদেশে এত হয় না। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে যে, বাঙালীরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিদ্যানুরাগী হইতেছেন। সর্ব্বভারতীয় ষ্টাটিস্‌টিক্সে প্রকাশ, মোট জনসংখ্যার শতকরা যতজন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালয়ে যায়, তাহার সংখ্যা বঙ্গে সর্ব্বোচ্চ নহে, অন্য কোন কোন প্রদেশে তদপেক্ষা বেশী। বঙ্গের টাকায় এবং বাঙালীর প্রদত্ত সুযোগে ডাঃ রামন্ রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হইলেন, নোবেল প্রাইজ পাইলেন, ডাঃ কৃষ্ণন্ রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হইলেন, ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ দেশে বিদেশে বিখ্যাত হইলেন। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় না যে, বাঙালীদের মধ্যে বিদ্যাভক্তি খুব বাড়িয়াছে।

প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গ, চৈত্র, ১৩৪৬।

বাংলার সঙ্গীত-সংস্কৃতি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

বাংলার সঙ্গীত-সংস্কৃতির আলোচনায় বাংলা দেশের প্রাচীনতা বা তার গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, প্রভৃতি দেশের বা জাতির নাম যে রামায়ণাদি মহাকাব্যে ও পুরাণ-সাহিত্যে পাওয়া যায় একথা স্বীকার্য। অবশ্য পুরাণাদিতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, প্রভৃতি দেশ বা জাতিকে অনার্য ব'লেও অভিহিত করা হয়েছে। খ্রীষ্টীয় ৫ম-৭ম শতকে মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে উল্লেখ করেছেন: "চতুঃস্বরাৎ প্রভৃতি ন মার্গঃ শবর-পুলিন্দ-কাম্বোজ-বঙ্গ-কিরাত-বাহ্লীকান্ধ্রবিড়ব-নাদিষু প্রযুজ্যতে"। চারস্বরযুক্ত গান স্বরান্তরশ্রেণীভুক্ত, সুতরাং তা আর্যজাতিসেবিত মার্গ বা গান্ধর্ব সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে না। শবর, পুলিন্দ, কাম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত প্রভৃতি জাতির গানে এক থেকে চার স্বরের সমাবেশ ছিল, সুতরাং তা আর্যগোষ্ঠীভুক্ত পবিত্র গান ছিল না। এ থেকে বোঝা যায়, মতঙ্গ প্রকারান্তরে বঙ্গকে শবর, পুলিন্দ কিরাত, প্রভৃতির মতো অনার্য দেশই বলতে চেয়েছেন। অথচ সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক্‌ থেকে এ সব জাতি যে বেশ উন্নত ও মার্জিতরুচিসম্পন্ন ছিল তা ইতিহাস থেকে জানা যায়। অযোধ্যা ও লঙ্কা এই উভয় প্রদেশের সভ্যতা, ঐশ্বর্য, শিল্প ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনায় যেমন লঙ্কার গৌরব ও আভিজাত্য কোন অংশে ন্যূন নয় ব'লে প্রমাণিত হয়, তেমনি লঙ্কাধিপতি রাবণকে অনার্যের পরিবর্তে আর্যকুলরত্ন বলাই সমীচীন মনে হয়। সে রকম অঙ্গ, কলিঙ্গ, কিরাত, দ্রাবিড়, বাহ্লীক, প্রভৃতির সঙ্গে বঙ্গ তথা বাংলা দেশ বা বাঙালী জাতিকে সম্পর্কিত করলেও তার কিংবা সে-সকল দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির অবদানের কথা চিন্তা ও পর্যালোচনা করলে কখনই তাকে বা তাদেরকে অনুন্নত অনার্য দেশ ব'লে অভিহিত করা সমীচীন হবে না।

পূর্বে বঙ্গ, বঙ্গদেশ বা বাংলার প্রাচীন রূপ ও পরিধি এখনকার মতো খণ্ডিত ও ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট ছিল না। তখন বঙ্গের নাম ছিল বৃহৎ বঙ্গ বা বৃহত্তর বাংলা। বৃহত্তর বাংলার সীমানা বিস্তৃত ছিল আসাম, বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যাকে নিয়ে। শ্রদ্ধেয় ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' পুস্তকে এই বৃহত্তর বাংলার সাংস্কৃতিক রূপের পরিচয় দিয়েছেন অভিনব ভাবে। তিনি বলেছেন: "ইহার উত্তরে আকাশস্পর্শী হিমাদ্রি-শৃঙ্গ, দক্ষিণে তমলুকপ্রান্ত-সমাশ্রিত বিশাল বারিধিবক্ষ, পূর্বে আরাকানের নিবিড় অরণ্য, পশ্চিমে মগধের সীমান্তে ছোটনাগপুরের কান্তারভূমি। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী বিপুল সমতলক্ষেত্র,—চিরসবুজ, নিত্য নূতন শ্রী, শস্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার,—কুন্দ, অপরাজিতা, সন্ধ্যামালতী, নবমল্লিকা ও পদ্মের রাজ্য—'পদ্মোৎপলঝষাকুলা' শত দীর্ঘিকার পুণ্যতীর্থ,—বুদ্ধ, চৈতন্য, পার্শ্বনাথ, দীপঙ্কর, রামকৃষ্ণ, শঙ্করদেব, প্রভৃতি নরদেবতার পদরজঃপূত এবং বিজয়, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, বসন্তপাল, স্থিরপাল, প্রভৃতি কীর্তিমান্‌ শিল্পীদের নিকেতন,—চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা, কালীঘাট, প্রভৃতি ভারত-বিশ্রুত তীর্থভূমি,—জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নব্যন্যায় ও মসলিনের জন্মভূমি—এই মহাদেশই আমাদের বৃহৎ বঙ্গ।" কলিঙ্গ ও মিথিলাকেও তিনি এই বঙ্গ-মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের সময়ে বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনই নয়, সঙ্গীত-সংস্কৃতিরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। কাশ্মীরী পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক কহ্লনও রাজতরঙ্গিনীতে একথা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন। বাংলার বিভিন্ন দেবায়তন বা দেবদেউল-মন্দিরাদি ছাড়া রাজসভায় ও পল্লীবাসীদের দেবাঙ্গিনায় বিচিত্র মাঙ্গলিক কর্মে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সুষ্ঠু অনুশীলন অব্যাহত ছিল। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় নট-নটীদের অভিজাতশ্রেণীর নৃত্য-গীতের সমারোহের কথা সর্বজনবিদিত এবং তারই নিদর্শন থেকে একথা অনুমান করা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০-৩০০ শতকে রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত রাজসভায় ভরত-নির্দিষ্ট নৃত্য-গীতের অনুশীলনের মতো বাংলায় সেনপূর্ব রাজাদের আড়ম্বরপূর্ণ দরবারেও অভিজাত নৃত্য-গীতের যথেষ্ট সমারোহ ও সমাদর ছিল।

বাংলার অনাড়ম্বর পল্লীতে পল্লীতে সহজ সরল সুর ও ছন্দ নিয়ে বিচিত্রশ্রেণীর গ্রাম্যগীতির প্রচলন ছিল। কর্মক্লান্ত নরনারী শান্তি ও ক্ষণিক আনন্দের জন্য নৃত্য-গীতের অনুশীলন করত এবং অনুশীলন শুধু অতীতের বাংলা দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে অনুন্নত আদিম যুগ (প্রিমিটিভ এজ) থেকে আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে।

বাংলা দেশে ঠিক নিয়মবদ্ধ রাগগীতির নিদর্শন পাই খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতকে, চর্যা ও বজ্রগীতির মধ্যে। বজ্রযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের অধ্যাত্ম-সাধনার গান হিসাবে পরিচিত থাকলেও চর্যাগীতি শাস্ত্রানুগত রাগে ও তালে লীলায়িত ছিল। অনেকের মতে চর্যাগীতি শুধুই বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সাধন-সঙ্গীত নয়, তদানীন্তন অন্যান্য যোগী-সম্প্রদায়ের সাধনগীতি হিসাবেও পরিচিত ছিল। পরবর্তী নাথযোগীদের নাথগীতির মধ্যেও সাধনরহস্যের স্পর্শ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকে বাংলার সঙ্গীত-সমাজে দেখা দিল প্রবন্ধগীতির রূপ নিয়ে গীতগোবিন্দের পদগান। অনেকে গীতগোবিন্দকে নাটগানের পর্যায়ভুক্ত বলেন, কিন্তু তার অভিজাত ক্ল্যাসিকেল প্রবন্ধরূপ থেকে তা মোটেই প্রমাণ হয় না। গীতগোবিন্দের রাগরূপ আজকালকার গঠন ও বিকাশ থেকে ভিন্ন হলেও শাস্ত্রীয় ষড়ঙ্গযুক্ত ও রসচাতুর্যে অপূর্ব ছিল। মঙ্গল, ধবল, পাঞ্চালী বা পাঁচালী, চর্চরী, প্রভৃতি গানের প্রবন্ধ-রূপেরও অনুশীলন ছিলই। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের নামকীর্তন পরবর্তী পদাবলীকীর্তন থেকে সহজ-সরল হলেও শাস্ত্রীয় রাগে ও তালে লীলায়িত ছিল। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদগান শ্রীচৈতন্যের বিশেষ প্রিয় হলেও বৌদ্ধাচার্য- ও যোগীসম্প্রদায়-সেবিত সাধনাত্মক চর্যা ও বজ্রগীতির রূপ ও গায়নশৈলী সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। নাটগীতি, যাত্রাগান, পাঁচালী ও বাউলগানের প্রাচীন রূপ এবং সঙ্গে সঙ্গে গীতগোবিন্দ ও কৃষ্ণকীর্তনাদির ভিত্তিতেই তিনি নামকীর্তন সৃষ্টি ও প্রচার করেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ১৫শ-১৬শ শতকে বাংলার বৈষ্ণব কবিরা নেপাল ও তিরহুতে (ত্রিহুত) ব্রজবুলি ভাষায় কাব্য ও পদগীতি রচনা করেন। গৌড়কে কেন্দ্র ক'রে বাংলা মিথিলার সঙ্গেও মিতালি পাতিয়েছিল ও ফলে বৈষ্ণব পদগাতি মিথিলা, নেপাল, মোরঙ্গ, তিরহুত, প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। নৈপালী, তিরোতিয়া ও তিরোতিয়া ধানশ্রী রাগগুলি বৃহত্তর বাংলারই অবদান হিসাবে বঙ্গ-সংস্কৃতির গৌরবের কথা প্রমাণ করে।

আঠার শতকের গোড়ার দিকে ভারতচন্দ্র রায় ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের (সম্ভবতঃ ১৭২০—১৭৩০) সময় কৃষ্ণ ও কালীকীর্তনের রূপ নিয়ে বাংলার সঙ্গীত কিছুটা বৈঠকী আকারে (Classico-Bengali) পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া ঠাকুর নরোত্তম যখন ১৬শ শতকের শেষাশেষি আচার্য শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে বৃন্দাবন থেকে বাংলায় ফিরে আসেন ও অভিজাত প্রবন্ধগীতি ধ্রুবপদের অনুরূপ শৈলীতে আলাপাদিযুক্ত রস-কীর্তন বা লীলাকীর্তনের প্রবর্তন করেন তখন বাংলার সমাজে নিশ্চয়ই মার্জিত রুচির বৈঠকী বাংলাগানের কিছুটা প্রচলন ছিল অনুমান করা যায়। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকের সঙ্গীতশাস্ত্র 'গীতপ্রকাশ' উড়িষ্যায় রচিত হলেও সমগ্র বাংলা দেশে তার প্রচার ও প্রভাব ছিল এবং বাংলার সঙ্গীতগ্রন্থ সঙ্গীত-দামোদর, সঙ্গীতসার-সংগ্রহ, প্রভৃতিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

খ্রীষ্টীয় ১৮শ-১৯শ শতকের সন্ধিক্ষণে বাংলা-সঙ্গীতের জগতে একটি নবজাগরণ (রেণেসাঁস) দেখা দিয়েছিল। রামনিধি গুপ্ত তথা নিধুবাবু (১৭৪১-১৭৪২ অথবা ১৮৩৮-৩৯ খ্রীঃ) বাংলাগানে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন। হিন্দুস্থানী ঢঙ্ পুরোমাত্রায় থাকলেও তাঁর টপ্পাভাঙ্গা বৈঠকীগান বাংলার মেজাজ ও আদর্শকে নিয়েই পরিপুষ্ট ছিল। ঠিক সে সময়েই বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ ও বৈঠকী মজলিসে টপখেয়াল তথা হিন্দুস্থানী টপ্পাভাঙ্গা খেয়ালের প্রবর্তন দেখা যায়। অবশ্য এই টপখেয়াল হিন্দুস্থানী খেয়াল ও টপ্পা থেকে বেশ স্বতন্ত্র ছিল। এই অভিজাত বৈঠকী গানের পাশাপাশি বিচিত্র পল্লীগীতি ধারারও প্রচলন ছিল। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন, ১৯শ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা দেশের পল্লীসমাজে কি ধরণের গীতি ধারার প্রচলন ছিল সে সম্বন্ধে জয়নারায়ণ ঘোষাল 'করুণানিধান বিলাস' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

> 'সঙ্কীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর,
> গড়াহাটী রানিহাটী বিরহ মাথুর।
> অভিসার মীলনাদি গোষ্ঠের বিহার,
> কবি পশ্‌তো তালফেরা শুনিতে মধুর।
> পাঁচালি অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর,
> কথকতা তরজাতে শাড়িতে প্রচুর।
> ভবানী শুবের গান মালসী মাথুর,
> গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী বিজয়াতে ভোর।

বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর,
গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর।
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর,
শ্রবণে যাহার গান ভকত আতুর।
কালীয়দমন রাস চণ্ডীযাত্রা ধীর।
রচিল চৈতন্যযাত্রা রসে পরিপূর।
সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর,
বাঙ্গালার নব গান নূতন ঝুমুর।'

ঠাকুর নরোত্তম প্রবর্তিত বিলম্বিত লয়ের রসকীর্তন ছাড়া কীর্তনের অন্যান্য ধারার তখন সৃষ্টি হয়েছে। পাঁচালী, কথকতা, রামায়ণগান, তর্জা, মাল্‌সীগান, জারি, ঝুমুর, প্রভৃতির স্বচ্ছন্দ গতি তখন সমাজের বুকে অব্যাহত। মধুসূদন কিন্নর বা মধু কানের ঢপকীর্তন তখন পাঁচালী, কৃষ্ণযাত্রা, চৈতন্যযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, নাটগীতি, প্রভৃতির মতো পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে গীত হ'ত। ঢোল-কাঁসির সমতালে তর্জা, বাদাই, ছড়া, প্রভৃতি গান সাধারণশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মুসলমানদের জারি ও দেবীবিষয়ক মালসীগান কৃষ্ণ- ও কালী-কীর্তনের মত আদরণীয় ছিল। খেউরগান ছিল শৃঙ্গার-রসাত্মক। তাই অভিজাত-সমাজে তার বিশেষ প্রচার ছিল না। কবিগান রুচিবিলাসীদের কাছে আদরণীয় ছিল। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন খ্রীষ্টীয় ১৯শ শতকের মধ্যভাগে কবিগান তরজার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল। তরজার লড়াইয়ের শেষ-কবিদের মধ্যে ছিলেন বনমালী দাস, ঈশ্বরচন্দ্র সাঁতরা, নন্দলাল রায়, গোপালচন্দ্র পাল, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি বিশ্বাস, প্রভৃতি আখড়াই, হাফ-আখড়াই, প্রভৃতির প্রচলন প্রায় এ সময়েই হয়। তদানীন্তন বাঙ্গালার জমিদার ও সৌখীন সমাজ আখড়াই ও কবিগানের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাংলার সঙ্গীত-সংস্কৃতির এ-সকলও একটি রূপ।

তাছাড়া ১৮শ-১৯শ শতকের মাঝামাঝি সময়েই বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের আমদানী শুরু হয়। শেষ মোগল সম্রাট্ শাহ্ আলম (২য়) নামেমাত্র দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। দরবারের সঙ্গীত-শিল্পীরা তাঁর অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যখন দিল্লী ছেড়ে ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তখন কয়েকজন সেনী-ঘরের প্রথিতযশ মুসলমান শিল্পী বাংলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও আশ্রয় গ্রহণ করেন। চুঁচুড়া, হুগলী, শ্রীরামপুর, গোবরডাঙ্গা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া), কৃষ্ণনগর, ঢাকা, গৌরীপুর, বেতিয়া, মুক্তাগাছা, আগরতলা, কুমিল্লা, প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন ও ফলে বাংলার উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, ধ্রুপদ ও খেয়ালের অনুশীলনের দিকে বাংলার সঙ্গীতপিপাসুদের মন আকৃষ্ট হয়। কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে বিশেষভাবে সঙ্গীতশিক্ষার কেন্দ্র রচিত হ'ল। শিক্ষার প্রেরণা যোগালেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা সৌরন্দ্রীমোহন ঠাকুর ও আরো অনেকে। সেনী-বংশের বাহাদুর খাঁ ও প্যাখোয়াজী পীর বক্স ধ্রুপদ ও পাখোয়াজ শিক্ষার বীজ রোপণ করলেন বিষ্ণুপুরে তদানীন্তন রাজা রঘুনাথ সিংহের (২য়) আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে। গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, নিতাই নাজীর ও বৃন্দাবন নাজীর—এঁরা ছিলেন বাহাদুর খাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ ভট্টাচার্য বা যদুভট্ট, প্রভৃতি পরবর্তী সঙ্গীতশিল্পী।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি আমরা মহারাজ ভারতচন্দ্রের কথা। ভারতচন্দ্র ও পরবর্তী কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন অভিজাত সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। শোনা যায়, তাঁর রাজসভা কিছুদিনের জন্য অলঙ্কৃত করেছিলেন ওস্তাদ রসুল বক্স। পরে ওস্তাদজী আসেন শ্রীরামপুর রাজবাটীতে। শ্রীরামপুরের রামদাস গোস্বামী রসুল বক্সের ছাত্র ও পরে রামদাস গোস্বামীর কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা করেন কাশীর বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামপুরের নিমাইচন্দ্র ঘোষাল, প্রভৃতি। তাছাড়া গোবরডাঙ্গায় বাবু সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ায় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, লাল-গোলায় রাজারাও, জগদিন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর, নাটোরে মহারাজ জগদীশচন্দ্র রায়, বেতিয়ায় মহারাজ নন্দকিশোর, ময়মনসিংহে মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য, ময়মনসিংহ-গৌরীপুরে রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মুক্তাগাছায় রাজা জগৎকিশোর আচার্য, আগরতলায় রাজা বীরবিক্রম বাহাদুর, রামগোপালপুরে হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ঢাকায় প্রসন্নকুমার বণিক, আসাম-গৌরীপুরে প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, প্রভৃতির নাম বাংলা দেশে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বাংলায় সেনী-ঘরের ধ্রুপদগীতির প্রচার হয় যেমন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর মাধ্যমে, তেমনি সদারঙ্গঘরের

খেয়ালের প্রচার হয় মহম্মদ খাঁর মাধ্যমে। শোনা যায়, কানাইলাল চক্রবর্তী ও মাধবলাল চক্রবর্তী এঁরা দু'জনে প্রথমে মহম্মদ খাঁর কাছে বিষ্ণুপুরে খেয়াল শিক্ষা করেন। তদানীন্তন বিষ্ণুপুরের রাজা মদনমোহন সিংহ ধ্রুপদগীতির মতো খেয়ালগানেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুর্শিদাবাদে বড়ে মিঞা ও ছোটে মিঞা, হসনু খাঁ ও হদ্দু খাঁ, হীরা, বুলবুল; চুঁচুড়ায় রামচন্দ্র শীল; কলকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে মৌলাবক্স, গয়ার হনুমানদাসজী, কানাইলাল ঢেঁড়ী, আলিবক্স, দৌলত খাঁ; ত্রিপুরাধিপতি বীরমাণিক্য বাহাদুরের, তানসেনের বংশধর প্রসিদ্ধ রবাবী কাশেম আলি খাঁ, প্রভৃতির নাম বাংলার সমাজে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রচার-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাংলার জমিদারদের সহায়তায় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটি "সঙ্গীত-সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন ও তার সদস্য ছিলেন নাটোরের তদানীন্তন মহারাজ, এবং আশুতোষ চৌধুরী, মন্মথনাথ মিত্র, কবি রবীন্দ্রনাথ, প্রভৃতি। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, মৌলাবক্স, হনুমানদাসজী প্রভৃতির মতো যদুভট্টও ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। সামান্য দিনের জন্য হলেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যদুভট্টের কাছে অনেকগুলি খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেছিলেন এবং এই শিক্ষা তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার বিকাশকে সমুজ্জ্বল করেছিল। ইংরেজী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যদি কবিগুরুর সঙ্গীত-রচনার কাল শুরু হয় ধ'রে নেওয়া যায় তবে আজ থেকে ৬০ বছর আগে অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গান-রচনার প্রথম যুগ সমাপ্ত হয় বলা যায়। কেন না ১৯০০ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি তাঁর সঙ্গীত-রচনার মধ্যযুগ পরিগণনা করা হয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যদুভট্ট ছাড়াও বাল্যকালে বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র, প্রভৃতির কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন।

বাংলা দেশে টপ্পার সূচনা নিধুবাবু থেকে শুরু ক'রে ১৯শ শতকের গোড়ার দিকে দাশরথি রায় ও শ্রীধর কথকে পূর্ণ হয়। পরে নাথু খাঁ, রমজান খাঁ, ইমাম বাঁদী, শ্রীজান বাইজী, গণপৎরাও ভাইয়া সাহেব, শ্যামলাল ক্ষেত্রী, গয়ার হনুমানদাসজীর সুযোগ্য পুত্র শোনেজী, মৌজুদ্দীন, ওস্তাদ বাদল খাঁ, প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলার মাটিতে খেয়াল ও টপ্পার মহিমময় রূপ প্রচারিত হয়।

বাংলা দেশে ঠুংরীর প্রচলন ইতিপূর্বেই ছিল। তবে ১৯শ শতকের মাঝামাঝি লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ যখন (১৮৫৬ খ্রীঃ) কলকাতা মেটিয়াবুরুজে বসবাস করেন তখন আবার লক্ষ্ণৌ-ঠুংরীর সৌখীন রূপ বাংলার গুণী-সমাজে সমাদর লাভ করে। নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ নিজে একজন দরদী সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। তাঁর মেটিয়াবুরুজ দরবারের সঙ্গে তদানীন্তন ভারতের বহু বিশিষ্ট শিল্পীর যোগাযোগ ছিল। গোয়ালিয়রের আলি বক্স, গোয়ালিয়রের তাজ খাঁ, লক্ষ্ণৌয়ের আহম্মদ খাঁ, বাসৎ খাঁ, মুরাদ আলি খাঁ, কাশিম আলি খাঁ, ছোটে মিঞা, প্যারে খাঁ, পাঞ্জাবের মুবারক আলি খাঁ, রামপুরের সাদিক আলি খাঁ, প্রভৃতি অভিজাত শিল্পীরা ওয়াজেদ আলি শাহের মেটিয়াবুরুজ-দরবার অলঙ্কৃত করতেন। তাছাড়া বাঙ্গালী উস্তাদদের মধ্যে যদুভট্ট, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র মিত্র, প্রভৃতিও নবাবের দরবারের শোভা বৃদ্ধি করতেন। নবাব নিত্যনিয়মিত-ভাবে মুসলমান ও হিন্দু শিল্পীদের নিমন্ত্রণ ক'রে তাঁর দরবারে গান করাতেন ও তার ফলে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এবং এমনকি বাংলার ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে বহু সঙ্গীতশিক্ষার্থী ও সঙ্গীতপ্রেমিক উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শোনার ও শেখার সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিলেন। বাংলা দেশে নূতন ক'রে উচ্চাঙ্গ বা অভিজাত সঙ্গীতের অনুশীলনের জগতে জাগরণ সৃষ্টি করার মূলে নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলায় সঙ্গীত-সংস্কৃতির রূপ যুগে যুগে বিবর্তিত হলেও তা রসধারা ও সৌন্দর্যসৃষ্টির আদর্শ থেকে মোটেই বিচ্যুত ছিল না। বাংলা দেশে যে-সকল প্রথিতযশ মুসলমান ও হিন্দু সঙ্গীত-শিল্পী সঙ্গীত-সংস্কৃতি ও তার অনুশীলনকে সচ্ছল ও গৌরবমণ্ডিত করেছেন তাঁদের মধ্যে ককুভ খাঁ, মহম্মদ আলি খাঁ, আমীর খাঁ, উজীর খাঁ, ইমদাদ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, নাসিরুদ্দীন খাঁ, বাদল খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ, এনায়েৎ খাঁ, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারীমোহন গুপ্ত, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দীননাথ হাজরা, ভগবানচন্দ্র সেন, রাধিকামোহন গোস্বামী, বিশ্বনাথ ধামারী, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র, শ্যামলাল গোস্বামী, শ্যামলাল ক্ষেত্রী, গণপৎ রাও, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র দত্ত, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, মহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে বাংলা দেশে সঙ্গীতের প্রসারতার ক্ষেত্রে যাঁরা অকুণ্ঠভাবে সহায়তা দিয়ে প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, পাথুরিয়াঘাটার

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, হরেন্দ্রনাথ শীল, দুলীচাঁদ শেঠ, মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভৃতির নাম স্মরণযোগ্য। বাংলা দেশে একদিকে উস্তাদ বাদল খাঁ যেমন হিন্দুস্থানী কণ্ঠসঙ্গীতের প্রচারকল্পে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন, অপরদিকে যন্ত্র-সঙ্গীতের প্রচারে উস্তাদ আমীর খাঁ, উস্তাদ এনায়েৎ খাঁ, উস্তাদ মসিদ খাঁ ও উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর কৃতিত্বও কম নয়। বাঙালী জাতি সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

বাংলার সঙ্গীত-সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মসমাজের দানও অফুরন্ত। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ ও ভজন সঙ্গীতকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত ও অসংখ্য বাংলা ধর্ম-সঙ্গীত রচনা ক'রে ব্রাহ্মসমাজ বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে এক নব-জাগরণের সৃষ্টি করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্মসমাজের প্রেরণা লাভ ক'রেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুশীলনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাছাড়া রবীন্দ্রযুগে কান্তকবি রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নজরুল ইসলাম, প্রভৃতির গান বাংলার সঙ্গীত-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান বাংলায়ই শুধু নয়, ভারতে শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করেছে। কবিগুরুর শুভ শতবার্ষিকী জন্মোৎসব-সমারোহ সমাগত; বাংলার সঙ্গীত-জগৎই শুধু নয়, বিশ্বের সাংস্কৃতিক জগৎ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে অকুণ্ঠভাবে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করবে। বাঙালী ভাব-প্রবণ ও অনুকরণপ্রিয় হ'লেও চিরদিন সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী ও সৌন্দর্য-পূজারী। সঙ্গীত-সংস্কৃতিই তার সভ্যতা, শিল্প-চাতুর্য ও অধ্যাত্ম-সাধনার গৌরবময় সামগ্রী এবং এই সামগ্রীই তার অন্তরের সাবলীলতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও অপার্থিব রসধারার মর্মকথা সমগ্র বিশ্ববাসীর দরবারে প্রকাশ ও প্রমাণ করবে।

—•—

বাংলার রাগপ্রধান সঙ্গীত

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

রাগপ্রধান সঙ্গীত, এই কথাটির যথার্থ অর্থ হ'ল সেই প্রকার সঙ্গীত, যাতে রাগের বিশিষ্ট রূপ প্রকাশিত হয়। রাগপ্রধান শব্দটি নতুন এবং এটি সরকারী সাঙ্গীতিক অভিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; কিন্তু আসলে রাগপ্রধান সঙ্গীত বা রাগসঙ্গীত এদেশে বহুকাল হতেই প্রচলিত রয়েছে। বৌদ্ধ দোঁহাবলী ও বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলীতে যে-সকল গীত বা কীর্ত্তন আছে সেগুলিতে বহু রাগের নামও লিখিত রয়েছে। ঐ সকল রাগের রূপ তখন কি ছিল তা বর্ত্তমান সময়ে নির্ণয় করা কঠিন; তা ছাড়া পরবর্ত্তী কীর্ত্তনীয়াগণ পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনদের প্রদত্ত সুর অব্যাহত রাখতে পেরেছেন কি না তাও বলা যায় না। তবে আমরা বাংলার রাগসঙ্গীতের উদাহরণ নিধুবাবুর টপ্পা, দাশুরায়ের পাঁচালী, বিদ্যাসুন্দরের গান ও প্রসিদ্ধ যাত্রা গানে যথেষ্টই পেয়ে থাকি। নিধুবাবুর টপ্পা রাগাঙ্গে ও ক্রিয়াঙ্গে এতই উচ্চ স্তরের ছিল, যে, তা সোরি মিঞার রচিত মূল টপ্পা গানের সহিত তুলনায় হীন ব'লে বিবেচিত হ'ত না। যাত্রা গানের যুগের পর যাত্রাভিনয়ের পরিবর্ত্তে যখন কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে গিরীশচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, অর্দ্ধেন্দুশেখর, প্রভৃতির নেতৃত্বে নাট্যাভিনয়ের যুগ আরম্ভ হ'ল, তখন নাট্যসঙ্গীতের মাধ্যমে উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতের পরিবেশন কিছু কম হয় নি।

তবে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর ব্রহ্মউপাসনার সময় যে উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীত অনুষ্ঠিত হ'ত, তার মান, মূল্য ও মর্য্যাদা অতুলনীয় ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যে গভীর শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্ট হ'ত, তার উপযোগী সঙ্গীতরূপে বাংলা ধ্রুপদ গান ও মৃদঙ্গ বাদ্য অনুষ্ঠিত হ'ত। মহর্ষি স্বয়ং ধ্রুপদ গানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ গায়ক যদু ভট্ট শেষ জীবনে অধিকাংশ সময়ই জোড়াসাঁকোর মহর্ষি-ভবনে বসবাস করতেন। ইনি উৎকৃষ্ট গীত-রচয়িতা ও সর্ব্বপ্রকার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সুদক্ষ হ'লেও তাঁর প্রতিভার বিশিষ্ট বিকাশ হয়েছে ধ্রুপদ সঙ্গীতে। মহর্ষি-ভবনের ও আদি ব্রাহ্মসমাজের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আবহাওয়ায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

বাল্য ও কৈশোর বয়স কেটেছে। রবীন্দ্রনাথ বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছেন, এ সকলের অধিকাংশই ধ্রুপদ পদ্ধতিতে রচিত, তবে খেয়াল, টপ্পা ও কীর্ত্তনের সুরেও রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে শুধু আধুনিক সঙ্গীতের অর্থাৎ মিশ্র সুর বিশিষ্ট সঙ্গীতের জন্মদাতা বললে ভুল বলা হবে,—তিনি বাংলা রাগপ্রধান সংগীতেরও একজন প্রধান প্রবর্ত্তক। এ বিষয়ে তাঁর উত্তরসাধক ছিলেন তাঁরই অগ্রজ কবি, নাট্যকার ও গীতিকার স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। বাংলার রাগপ্রধান সঙ্গীতে তাঁর অবদানও যথেষ্ট মূল্যবান্। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজে যে সাধনার আবহাওয়া সৃষ্টি করেন, তা ছিল ভক্তির আবেগে পরিপূর্ণ। কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীগণ ভাবের আবেগে ব্রহ্মসঙ্গীত ও কীর্ত্তন গাইতেন। ব্রহ্মানন্দের রচিত গানে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পার প্রভাব যথেষ্ট পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ ধ্রুপদের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি অতি উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন এবং ধ্রুপদ ও খেয়াল পদ্ধতিতে অনেক বাংলা গান রচনা করেছিলেন। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর উদাত্ত স্বদেশী সঙ্গীতে ও নাট্যসঙ্গীতে রাগপ্রধান বাংলা গানের এক নতুন পথ খুলে দিয়েছেন, তাতে ইংরেজী কবিতার ছন্দ থাকলেও আমাদের রাগসঙ্গীতের আবেদন কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। রজনী সেনের অনেক গান রাগপ্রধান গানের অন্তর্গত। অতুলপ্রসাদের গানে টপ্‌খেয়াল ও ঠুম্‌রির মাধুর্য্য ফুটে উঠেছে। দিলীপকুমার, তাঁর পিতা ও অতুলপ্রসাদের পরই বাংলার রাগসঙ্গীতের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করেছেন। এঁর অনেক ভজন ও স্তোত্র, রাগের আবেদনে পরিপূর্ণ। বহুমুখী প্রতিভাশালী কাজী নজরুল উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতের একজন বিশেষ ভক্ত। আধুনিক গান, ভজন, প্রভৃতিতে তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি-প্রতিভার পরিচয় যেমন আমরা পাই সেইরূপ বাংলা খেয়াল গানেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় কিছুমাত্র কম নয়। স্বর্গীয় জ্ঞান গোস্বামীর অনুপম কণ্ঠে গীত, নজরুলের বাংলা খেয়ালের গ্রামোফোন রেকর্ড অমরতার আসন পাওয়ার যোগ্য।

অনেকে মনে করেন বাংলা ভাষায় রচিত খেয়াল, টপ্পা বা ঠুম্‌রিই রাগপ্রধান বাংলা গান। কিন্তু এইভাবে রাগপ্রধান গানের গণ্ডি নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই। বাংলা ধ্রুপদ সঙ্গীতও উপেক্ষণীয় মোটেই নয়। যে-সকল গানে রাগ ও রূপের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সুরের রচনা হয়, সেই সব গানকে রাগপ্রধান বলা উচিত। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পূর্ব্বের বৈষ্ণব মহাজনগণ ও আধুনিক কবিগণ অসংখ্য কীর্ত্তন, কাব্যসঙ্গীত ও নাট্য-সঙ্গীত রচনা করেছেন, যে-সকলের মধ্যে গানের পদ অনুযায়ী সুর রচিত হয়েছে। পদগুলি ভাবের বাহন। এই সকল গানে ভাব ও পদই মুখ্যবস্তু। সুর আনুষঙ্গিকরূপে যুক্ত হয়েছে, ভাবের মাধুর্য্য ও পদের সৌন্দর্য্য প্রকাশের জন্য। কিন্তু রাগপ্রধান সঙ্গীতে ভাবের প্রধান বাহনই হ'ল রাগ। গানের পদগুলি রাগের সুর অনুযায়ী রচিত হয়েছে। সুর এখানে মুখ্যবস্তু ও পদগুলি সুরের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত। ছন্দযুক্ত সুর ব্যতীত গানের সৃষ্টি হয় না। গানের পদগুলি সুর ও ছন্দ অনুযায়ী গঠিত হয়। এই সকল গান রাগপ্রধান আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত। এরূপ গানে যে একই রাগ প্রয়োগ করতে হবে, তার কোন মানে নেই। সুরের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারলে, সমজাতীয় একাধিক রাগে একটি গান রচিত হতে পারে। রাগপ্রধান গানে যে তানের প্রয়োগ করতেই হবে এরূপ মতের আমরা পক্ষপাতী নই। ধ্রুপদে হাল্কা তান নেই, মীড়, গমক, বিস্তার, বাট, ও উপজের স্থান তাতে আছে, এতে বিলম্বিত তান ব্যবহারের কোন বাধা নেই। খেয়ালে সব রকম তানেরই ব্যবহার চলে। রাগপ্রধান গান যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন ক'রেই রচিত হতে পারে, তবে তাতে রাগের প্রকাশ থাকা চাই। কোন কোন চিন্তাশীল লোক ব'লে থাকেন, যে রাগসঙ্গীতের যুগ শেষ হয়ে গেছে। তাঁরা রাগসঙ্গীতের সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রকাশপথ খুঁজে পান না। কিন্তু আমরা জানি যে, রাগসঙ্গীত একটা বাঁধাধরা পদ্ধতিতে পুনরাবৃত্তি করবার ধারা নয়। এতে নতুন সৃষ্টি ও ব্যক্তিগত প্রতিভা বিকাশের সীমাহীন অবকাশ রয়েছে। প্রাচীন মার্গ সঙ্গীতেও তা ছিল এবং এখনকার রাগসঙ্গীতেও তা আছে। প্রাচীনকালে যেমন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার মতো মার্গ ও দেশী সঙ্গীত পাশাপাশি ভাবে প্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছে, আজকের দিনেও তেমনি রাগপ্রধান সঙ্গীত কাব্য-নাট্য-পল্লী-লোকসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে প্রগতির পথ পাবে না কেন?

—:—

বেগমপুর স্টেশনে গাড়ী থামার কথা পাঁচ মিনিট, কিন্তু পনের মিনিট পার হয়ে গেল, গাড়ীর ছাড়বার নাম নেই।

ডিনার শেষ ক'রে প্রণব একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। আলগোছা টান দিচ্ছিল মাঝে মাঝে। নেশার দিকে মন নেই, টানের কায়দাতেই মালুম হচ্ছিল।

সত্যিই মন ছিল না। শক্ত একটা কেস্ সামনে। একগাদা উকিল মিলে কেস্‌টাকে প্রায় নষ্ট ক'রে এনেছিল, আপিলের দড়ি বেঁধে যাতে সেটাকে উদ্ধার করতে পারে সেই কথাই প্রণব চিন্তা করছিল।

জমিজমার ব্যাপার। আসামী-ফরিয়াদীর মধ্যে লতায় পাতায় একটা সম্পর্কও ছিল। জমি ভাগ হয়েছিল, কেবল একটা বাঁশঝাড় বাদে। সেটা নিয়েই গোলমাল পেকে উঠেছিল। বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ খুলে দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। হুঙ্কার ছেড়ে।

দু'জনেই জখম হয়েছিল, তবে অনুকূল হাজরা চালাক লোক, প্রথমে গিয়ে থানায় নালিশ ঠুকে দিয়েছিল। তারপর তারই প্ররোচনায় সঙ্গীর দল অনুকূলকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিল। একুশটা দিন কাটাতে পারলেই তিনশ ছাব্বিশের ধারায় পড়বে আসামী। এসব অনুকূলের খুব জানা।

বেকায়দায় পড়েছিল ফটিক হাজরা। মারও খেয়েছিল বেশী আবার সাজাও হ'ল। ছ' মাসের সশ্রম কারাদণ্ড।

ফটিকের আত্মীয়স্বজন তখন এসে পড়েছিল প্রণবের কাছে। ব্যারিস্টার প্রণব সেনের দরজায়।

প্রণব সেন এমন কিছু পুরনো ব্যারিস্টার নয়। এখনও তার গাউনের জেল্লা ফিকে হয় নি। তবে পর পর ক'টা কেসে খুব নাম করেছে। নকুলেশ্বর হত্যাকাণ্ড, বাগবাজারের নোট জালের কেস্‌টা, আর সব চেয়ে আনকোরা মহিমপুরের মন্দিরের ক্যাশ ভাঙ্গার কেলেঙ্কারীর ব্যাপার।

ফটিকের বউ একেবারে পা জড়িয়ে ধরেছিল। ফটিকের বুড়ো বাপ কোণে দাঁড়িয়ে দুটো হাত জোড় করেছিল। প্রণব রাজী হয়েছিল। ঠিক আছে, রেখে যাও কাগজপত্র।

তিন্ দিন তিন রাত কাগজ ঘেঁটে প্রণব রাস্তা একটা বের করেছিল। ছোট্ট একটা ফাঁক। অরিজিনাল সাইডের উকিলরা খেয়ালই করে নি, কিন্তু সেই রন্ধ্রপথে মুক্তির আলোর ঝিলিক দেখা যাচ্ছে।

আপীলের ব্যাপার, সাক্ষী ডাকা চলবে না। আইনের কোন ত্রুটি বের করতে হবে। এভিডেন্স এ্যাক্টের কোন ফুটো। যার জন্য গোটা সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যেতে পারে, কিংবা প্রসিডিওর কোডের কোন অসতর্ক অনিয়ম। যার ওপর জোর দিয়ে বিচারপতির রায় বানচাল করা যেতে পারে।

হাইকোর্ট বন্ধ। মাস খানেকের আগে খুলছে না, তাই নথিপত্র নিয়ে প্রণব পুরী রওনা হয়েছে। কলকাতার অন্তহীন জনতা আর বিরামহীন চীৎকারের মধ্যে কাজ করার ভারি অসুবিধা। মগজ খোলে না, টিন টিন ক্যাপ্‌স্টান পোড়ান সত্ত্বেও।

এ-সব বিষয়ে কাছাকাছির মধ্যে পুরী ভাল লাগে প্রণবের। নীলের অসীম বিস্তার। হোটেলের বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে তার ওপর ঢিলেঢালা ভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে বেশ লাগে। সাক্ষ্য-সওয়াল, উকিলদের বিতর্ক, আসামীর এজাহার সব-কিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণ করার পরম মুহূর্ত।

হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে নজর পড়তে প্রণবের খেয়াল হ'ল। আধ ঘণ্টা কেটে গেছে, অথচ ট্রেনের চাকা একটি পাকও ঘোরে নি। সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে প্রণব সেটাকে জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিল। নিকষ কাল আঁধারে একটা জলন্ত প্যারাবোলা এঁকে সিগারেটটা পাশের লাইনের ওপর গিয়ে পড়ল।

প্রণব প্ল্যাটফর্মে নামল।

অনেকেই নেমে পায়চারি করছে। ছোট্ট স্টেশন, স্টেশনের অনুপাতেই চায়ের স্টল কিন্তু তার সামনে জমাট ভীড়। এক কাপ চায়ের জন্য জান কবুল ক'রে সবাই লড়ছে। একটু দূরে জলের কল। এক লোটা জলের জন্য সেখানেও পাণিপথের যুদ্ধ চলেছে!

বাতাসে শীতের আমেজ। প্রণব ফ্ল্যানেলের প্যান্টের দু পকেটে দু হাত ডুবিয়ে গার্ডের দিকে এগিয়ে গেল। গার্ড অবশ্য তার গাড়ীর কাছে নেই। ইঞ্জিন ড্রাইভারের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

কি ব্যাপার বলুন তো? গাড়ীর এরকম অচল অবস্থা কেন? গার্ড একবার ফিরে দেখল! বোধ হয় প্রশ্নকর্তার পদমর্যাদার দিকে চোখ বোলাল, তারপর বলল, গাড়ী এখন কখন ছাড়বে কিছু বলা যাচ্ছে না।

কারণ?

আগের স্টেশনে একটা মালগাড়ী ডি-রেইল্‌ড্ হয়ে গেছে। সেটা না সরানো পর্যন্ত গাড়ী ছাড়া সম্ভব নয়।

তার মানে?

গার্ড বিগলিত হাস্যে বলল, এক ঘণ্টাও হ'তে পারে আবার ছ' ঘণ্টাও হ'তে পারে।

আর কিছু খোঁজ করা বৃথা। একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রণব নিজের কামরায় ফিরে এল।

বরাত ভাল। সারা কামরায় একেবারে একা। ভ্রমণে এই স্বাচ্ছন্দ্যটুকু প্রণবের সর্বদা কাম্য। হাত-পা ছড়িয়ে শোয়াই শুধু নয়, সেজন্য সমস্ত কামরাটার কোন প্রয়োজন নেই। অনেক সময় নথিপত্র হাতে নিয়ে প্রণব আর্গুমেন্ট শুরু করে। বেশ জোর গলায়। সেই সময় কোন সহযাত্রী থাকলে অসুবিধা হবার কথা বৈ কি।

নথিপত্র নয়, এবার প্রণব হালকা একটা ডিটেকটিভ বই তুলে নিল। বাংলা নয়, ইংরেজী। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে গোটা সতের খুন ক'রে দুর্বৃত্ত এক শহর থেকে আর শহরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ সারা টেক্সাসের পুলিশ-বাহিনী কিছুই করতে পারছে না, অবিশ্বাস্য এমন এক কাহিনী বেশীক্ষণ প্রণবকে আকৃষ্ট করতে পারল না।

বইটা সরিয়ে রেখে প্রণব আবার প্ল্যাটফর্মে নামল। এবার নামবার আগে মাফলারটা ভাল ক'রে গলায় জড়িয়ে নিল। বাইরে ঠাণ্ডা বাড়ছে। দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড়। বস্তির মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে। প্রণব চিরকালই একটু শীত-কাতুরে। উত্তরে বাতাসের ছোঁয়া লাগলেই কাশতে শুরু করে।

এবার সারা প্ল্যাটফর্ম একবার পায়চারি করল। প্ল্যাটফর্মে ভীড় কম। সবাই যে যার কামরায় গিয়ে উঠেছে।

গাড়ী ছাড়বার অবশ্য কোণ লক্ষণ নেই। সিগন্যালের লাল আলোটা ভ্রুকুটির মত বোধ হচ্ছে।

একটা উড়ে আসা শালপাতা জুতোর তলায় চেপে দাঁড়িয়েছিল প্রণব, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে চমকে মুখ ফেরাল।

পান্থদা। পান্থদা।

বাসবী সানিয়াল নয়, কেতকী মজুমদারও না, কিন্তু গলাটা খুব চেনা।

এগিয়ে গিয়েই প্রণব চিনতে পারল।

আভা বসাক। পীতাম্বর মুদী লেনের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। শুধু তাই নয়, দুটি বোনের মধ্যে কনিষ্ঠতমা।

থার্ডক্লাশ কামরায় জানলা দিয়ে প্রণবকে ডাকছে।

পুরনো কথা স্মরণ ক'রেই প্রণব পকেট থেকে সিগারেট কেস্ বের ক'রে একটা সিগারেট ধরাল। ঠোঁটের বাঁ-দিকে চেপে। আড়চোখে নিজের দামী স্যুটটার দিকে নজর দিয়ে ধীর পায়ে আভার কামরার সামনে এসে দাঁড়াল।

বিলেত থেকে কবে ফিরলে পান্থদা? কথাটা যেন প্রণবকে নয়, সারা কামরার লোকদের আভা শোনাল। তার পরিচিতের মধ্যে বিলাত-ফেরতও একজন আছে, এবং তার ডাকে এখনও সাড়া দেয়।

আভার প্রশ্নের দিকে প্রণবের কান ছিল না। সে শুধু অবাক্ হয়ে দেখছিল, প্যাক করা সার্ডিনের মতন এত স্বল্পপরিসর জায়গায় কি ভাবে এত লোক থাকে। একজনের থেকে আলাদা ক'রে আর একজনকে দেখার উপায় নেই। অখণ্ড মানব-সত্তা।

ততক্ষণে আভা কোণের দিকে চেয়ে বিগলিত কণ্ঠে বলছে, ওগো, সেই যে পান্থদার কথা তোমায় বলেছিলাম? মস্ত বড়লোকের ছেলে। আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু।

যাঁকে উদ্দেশ ক'রে বলা তিনি তখন কোলের ওপর একটা বাচ্চাকে নিয়ে ঘুম পাড়ানর আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। দু হাতে বাচ্চাটিকে চাপড়াচ্ছিলেন আর মুখে ঘুমপাড়ানী গানের কলি।

স্ত্রীর কথায় মুখ ফেরালেন।

জানলার ফ্রেমে বাঁধানো একটি নিরীহ মধ্যবিত্ত মুখ। বিরাট্ গোঁফের চামর, মাথায় চুলের সংখ্যা খুব বেশী নয়। যে ক'গাছা আছে, বড় জোর বছর খানেক থাকবে, তারপর অবারিত টাক। মসৃণ, চিক্কণ।

গাড়ীর আলোর কিছুটা প্রণবের মূল্যবান্ স্যুটের ওপর পড়েছিল। চক্‌চক্ করছিল সিল্কের মাফলার। দামী সিগারেটের গন্ধটাও কামরার ভেতর ঢুকেছিল বোধ হয়।

আধ ঘুমন্ত মেয়েকে মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দুটো হাত জোড় করার ভঙ্গীতে বললেন, নমস্কার স্যর, আপনার কথা আভার কাছে খুব শুনেছি।

মানুষটার আপাদমস্তক প্রণব নিরীক্ষণ করেছিল। গভীর মনোযোগ দিয়ে। খুঁজে খুঁজে, বেছে বেছে এই পতিদেবতা যোগাড় করেছে আভা। কিংবা যোগাড় হয়ত করে নি, পীতাম্বর মুদী লেনের মেয়েরা বর বাছাই করে না। তোড়জোড় ক'রে তাদের ঘাড়ে বর চাপান হয়। তেমনই হয়ত হয়েছে আভার বেলা।

কি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলে যে? কি দেখছ এত? আভা আবার প্রশ্নের খোঁচা দিল।

সিগারেটটা ঠোঁট থেকে না সরিয়েই প্রণব বলল, তোমার সংসার দেখছি।

সংসারই বটে। বেঞ্চের এক কোণে আভা। তার পাশে সারি সারি তিনটি শুয়ে আছে। কোন্‌টি খোকা, কোন্‌টি খুকু বোঝবার উপায় নেই। মেঝেয় পতিদেবতা, তাঁর কোলে চতুর্থ সন্তান। এ ছাড়া এপাশে-ওপাশে ট্রাঙ্ক, বেতের ঝুড়ি, চুপড়ি, গোটানো বিছানা নারকেল দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

একটু বুঝি অপ্রস্তুত হ'ল আভা। মাথা নীচু ক'রে বলল, সংসারই বটে। সাতজন্মে তো আর বাইরে বেরোনো হয় না। ব'লে ব'লে তিন বছর বাদে বেরিয়েছি। কাকে বাদ দিই বল? তবু তো বড় মেয়েটাকে আনি নি। শাশুড়ীর ঘাড়ে রেখে এসেছি।

হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এইভাবে আভা জিজ্ঞাসা করল, তুমি, তুমি কোথায় যাচ্ছ পান্থদা?

পুরী। জানলার কাছ থেকে স'রে এসে প্রণব উত্তর দিল। কামরার মধ্যে এক বুড়ো বিশ্রীভাবে কাশছে। ঈশ্বর জানেন কি রোগ। কি ভাবে এরা চলাফেরা করে! জীবন্ত মোটঘাটের মতন একজনের ঘাড়ে একজন। মাঝখানে চুল-সরু ফাঁকও নেই।

পুরী? বাঃ, কি মজা! আভা ছেলেমানুষের মতন উল্লসিত হয়ে উঠল, আমরাও পুরী যাচ্ছি। ভালই হ'ল, দেখা হবে সেখানে। সমুদ্রে স্নান করতে নিশ্চয়ই যাবে পান্থদা?

উত্তরটা প্রণব এড়িয়ে গেল। বলল, গাড়ী এখন সারা রাত বোধহয় এখানে থাকবে।

হ্যাঁ, সবাই বলছিল, কোথায় বুঝি একটা এ্যাক্সিডেন্ট্ হয়েছে। কি মুশকিল দেখ তো। কাল পৌঁছতে কত বেলা হবে ঠিক আছে ?

প্রণব একবার গোটা কামরার দিকে চাইল তারপর আভার দিকে। চোখ কুঁচকে হাসির ভাণ ক'রে বলল, এস, নেমে এস। একটু হাঁটা যাক।

আভার সারা মুখে আরক্ত ছোপ। আড়চোখে একবার স্বামীর দিকে, একবার কামরার আর সকলের দিকে দেখে নিল।

প্রণবকে আভা উত্তর দেবার আগেই ভদ্রলোক বললেন,যাও না, বেড়িয়ে এস একটু। ভেতরে যা গুমোট গরম!

আভা উঠে পড়ল। পরণের শাড়ীটা হাত দিয়ে গুছিয়ে নিল। দু'হাত দিয়ে চুলটা ঠিক করার চেষ্টা করল, তারপর স্বামীর দিকে ফিরে আবার বলল, তা হ'লে আমি নামি একটু ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন গাড়ী ছাড়বে না। আমি বাচ্চুটাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করি।

প্রণব হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে দিল। সাবধানে শাড়ী সামলে আভা নেমে পড়ল।

একটু এগিয়ে প্রণবের পাশাপাশি আসতে প্রণব বলল, বল এবারে তোমার কি জিজ্ঞাস্য। ওই এক কামরা লোকের সামনে কখনও কথার উত্তর দেওয়া যায় ?

আভা একবার পিছন ফিরে দেখে নিল। ভাবটা যেন, একটা মানুষের দৃষ্টি বুঝি পিছু নিয়েছে। আভার চালচলন, কথাবার্ত্তার ওপর কড়া নজর রাখছে।

জিজ্ঞাসা করছিলাম, কবে ফিরলে বিলেত থেকে ? আভা একটু সহজ হবার চেষ্টা করল।

বিলেত থেকে ? সিগারেটের মুখে জমা ছাইটা প্রণব টুস্‌কি মেরে ফেলে দিল, তা বছর আষ্টেক হবে। প্র্যাক্‌টিসই করছি বছর সাত।

মাসীমা কেমন আছেন ?

মাসীমা ? মনে মনে প্রণব ভেবে নিল, মাসীমা মানে প্রণবের কাকীমা। আভাদের প্রতিবেশী। কাকীমার বাড়ীতেই আভার সঙ্গে আলাপ।

কাকীমা বছরখানেক মারা গেছেন। হার্টের এ্যাটাক। তুমি বাপের বাড়ী যাও না বুঝি, কর্ত্তা ছাড়ে না ?

প্রণবের ব্যঙ্গটা আভা পাশ কাটাল। বলল, ভাড়াটে বাড়ী ছিল তো আমাদের ? বাবা আর ওখানে থাকেন না। পেন্সন নিয়েছেন, দেশের বাড়ী রাণাঘাটে আছেন।

মনে মনে প্রণব হিসেব করল। আজ থেকে প্রায় বছর কুড়ি আগের কথা। সবে বোধ হয় আই-এ পরীক্ষা দিয়েছে প্রণব কিংবা আই-এ ক্লাসেই যেন পড়ে। কাকার বাড়ী সত্যেন আচার্য রোডে। মাঝে মাঝে প্রণব যেত সেখানে। দু'এক রাত কাটিয়েও আসত। কাকা শেয়ার মার্কেটের দালাল, নানারকমের ছোট ছোট কারবার ছিল। রংএর, কাঠ-চেরাইয়ের, ঢেউটিনের। কাকার সঙ্গে প্রণবের কালেভদ্রে দেখা হ'ত। যত ভাব ছিল কাকীমার সঙ্গে।

নিঃসন্তান কাকীমা। প্রণব এলে আর ছাড়তে চাইতেন না।

কাকার বাড়ীর পিছনে পীতাম্বর মুদী লেন। সেই গলির গোটা-কতক মেয়ে কাকীমার কাছে আসত। সেলাই শিখতে, গান শিখতে। জন তিনেক আসত, তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে সুন্দরী ছিল আভা।

প্রণবের সঙ্গেই আভার ভাব ছিল বেশী। অবশ্য একজন প্রায় কৈশোর-উত্তীর্ণ ছেলের সঙ্গে একটি কিশোরী মেয়ের যেমন ভাব সম্ভব।

প্রথম বেফাঁস কথাবার্ত্তা শুরু করেছিলেন কাকীমা।

আভার সামনেই কাকীমা প্রণবকে বলেছিলেন, একটা কাজ করলে হয় পানু।

কি কাকীমা ?

তোর মা-বাবা তো তোর জন্য খুব বড়লোকের মেয়ে খুঁজবে ? ইয়া গোলগাল আদুর পুতুল প্যাটার্ণ চেহারা, সঙ্গে টাকার পোঁটলা আনবে, এমনই এক মেয়ে। তার চেয়ে তুই বরং গরীবের সুন্দরী একটা মেয়ে বিয়ে কর্। দেখবি, তোর মা আর বাবা কিরকম লাফাতে আরম্ভ করে।

গরীবের সুন্দরী মেয়ে কথাটা কানে যেতেই প্রণবের চোখ আভার ওপর গিয়ে পড়েছিল।

মাসীমাটা কি অসভ্য। মুখ চোখ লাল ক'রে আভা ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

প্রণবের বিয়ের কথা বাড়ীতে কেউ ভাবছিল না, আর ভাবার কথাও নয়। তখন তার পড়ার সময়, কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, প্রণবের মনে অর্ধস্পষ্ট এক ছবি ফুটতে শুরু করেছিল। পাড়ায় দেখা চেলী আর সিঁথিমৌর-পরা কনের ছবি। কনের মুখের সঙ্গে আভার মুখের কোন প্রভেদ নেই।

আভা কিন্তু তারপর আর লজ্জা করে নি। সহজভাবেই প্রণবের সামনে এসেছে। চায়ের কাপ, খাবারের থালা এনেছে। লুডো খেলেছে। সন্থ শেখা গানের দু'এক কলিও শুনিয়েছে কাছে ব'সে।

কথাটা প্রণবই আবার বলেছে।

কাকীমা রান্নাঘরে। এদিকের ঘরে আলোও জ্বালা হয় নি। রাস্তার আলোর কিছুটা ঘরে এসে পড়েছে।

সেলাইয়ের সরঞ্জাম নিয়ে আভা সবে উঠছিল, প্রণব এসে হাজির।

জান আভা, কোনরকম ভণিতা না ক'রেই প্রণব বলতে শুরু করেছিল, আমি কাকীমার কথাই শুনব।

কি কথা ?

বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করব না। বড়লোকের মেয়েদের আমার বিশ্রী লাগে। আধ-আধ সুরে কথা বলে, মুখে ঠোঁটে একগাদা রং মাখে। গরীবের মেয়ে আমার ভারি পছন্দ।

এবার কিন্তু আভা পালিয়ে যায় নি। কিছুক্ষণ প্রণবের দিকে চেয়েই মাথা নীচু করেছিল।

তারপর অনেকক্ষণ পরে বলেছিল, কিন্তু গরীবের মেয়ে বিয়ে করলে যদি তোমার বাপ-মা রাগ করেন ?

প্রণব একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল, এখনই তো আর বিয়ে করছি না। বি-এ পাশ না করলে তো বিয়ের প্রশ্নই উঠছে না। তখন নিজে চাকরি খুঁজে নেব। মা-বাপের আপত্তি শুনবই বা কেন ?

পৃথিবীতে গরীবের সংখ্যা বড় কম নয়, তাদের অনেকেরই মেয়ে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আভা কি ক'রে ভেবে বসল যে প্রণব যে গরীবের মেয়ে বিয়ে করতে চায়, সে মেয়ে আভা।

সেদিন আভা অনেকক্ষণ ছিল প্রণবের কাছে। কাকীমার দেওয়া খাবার আর চা হাতে ক'রে এনেছিল প্রণবের সামনে। কাছে বসে খাইয়েছে, কিন্তু সোজাসুজি তার সঙ্গে কথা বলতে পারে নি। যতবার কথা বলার চেষ্টা করেছে, রাজ্যের কুণ্ঠা এসে ঘিরে ধরেছিল তাকে।

শুধু প্রণব যাবার সময়ে সিঁড়ির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আভা জিজ্ঞাসা করেছে, আবার কবে আসবে ?

প্রণব একটু অন্যমনস্ক ছিল, আভার কথাটা ঠিক কানে যায় নি। আভার দিকে ফিরে বলেছিল, কিছু বললে ?

বলছি, আবার কবে আসবে ?

কবে আসব ? মনে মনে প্রণব হিসাব করেছিল, সামনের রবিবার আসব। থাকবে তো তুমি ?

আভা ঘাড় নেড়েছিল। হ্যাঁ, থাকব।

রবিবার কিন্তু প্রণব আসতে পারে নি। আসার মুখেই বাধা। একদল সহপাঠী এসে হাজির। একেবারে সিনেমার টিকেট কেটে।

রবিবার আসে নি প্রণব, সোমবার এসেছিল।

ইচ্ছা ক'রেই পীতাম্বর মুদী লেন ঘুরে। আভাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে। আভা কিন্তু ধারে-কাছে কোথাও ছিল না।

আভার দেখা মিলেছিল কাকীমার ঘরে। আভা মাথা নীচু ক'রে বসেছিল আর কাকীমা চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন।

এরই মধ্যে ঘাড় ঘুরিয়ে আভা প্রণবকে দেখে নিয়েছিল। সারা মুখ অভিমানে আতপ্ত।

কাকীমা রান্নাঘরে ঢুকতেই আভা প্রণবের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

খুব লোক যা হোক।

কেন, কি করেছি ?

কাল তো খুব এলে ? ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছে।

আর বল কেন, একপাল বন্ধু এসে জুটেছিল। ধ'রে নিয়ে গেল সিনেমায়।

আঁচলের কোণ আঙুলে জড়াতে জড়াতে আভা ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলেছিল, জানি তো, বন্ধুরাই সব। অন্য লোকের কথা মনে থাকবে কেন ?

এই সময় প্রণব এক দুঃসাহসিক কাজ করেছিল। এক পা এগিয়ে এসে আভার দুটো হাত নিজের হাতের মধ্যে ধ'রে বলেছিল, নাগো না, তুমিই আমার সব।

শীতের হাওয়ায় বেতসপাতা কাঁপার মতন থর্ থর্ ক'রে আভার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠেছিল। বিদায়ী সূর্যের সবটুকু রঙের ছোপ তার মুখে।

খুব মৃদুকণ্ঠে আভা বলেছিল, কাল তোমাকে দেব ব'লে একটা জিনিস এনেছিলাম।

আমার জন্য? কি?

শাড়ীর মধ্য থেকে খুব সন্তর্পণে একটা বেলকুঁড়ির মালা বের ক'রে আভা প্রণবের হাতের মুঠোয় ভ'রে দিয়েছিল। বাসি মালা, দু'একটা কুঁড়িতে কাল কাল দাগ হয়েছে। বেশীর ভাগ ফুলই শুকিয়ে ম্লান।

তবু অদ্ভুত আবেগে প্রণব মালাটা হাতের মধ্যে চেপে ধরেছিল। ওটা যেন মালা নয়, আভার জীবন, অনাদৃত, অবহেলিত।

তার পর থেকে এ বাড়ীতে আসা প্রণবের বেশ বেড়ে গেল। আভাও ঠিক এসে জুটতে লাগল।

কাকীমা মনে মনে একটু প্রমাদ গণলেন। ঘি আর আগুনের সনাতন উপমাটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

ঠিক এই সময়ে কি হয়েছিল প্রণব কিংবা আভা কারুরই তা জানা নেই। সম্ভবত কাকীমা প্রণবের মাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন কিংবা আভার এ বাড়ীতে আসার আসল উদ্দেশ্যটা কেউ আভার বাপের গোচরীভূত ক'রে থাকবে।

না গো, না, তুমিই আমার সব।

ফলে প্রণব আর আভা দু'জনেরই এ বাড়ীতে আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় প্রণব বি. এ. পরীক্ষা নিয়ে কিছু ব্যস্তও ছিল। ঠিক করেছিল পরীক্ষাটা চুকে গেলে যেমন ক'রে হোক আভার সঙ্গে দেখা করবে। আভাকে ছাড়া তার জীবন অর্থহীন, এ ধরণের দু'একটা মামুলী হা-হুতাশও প্রণব করেছিল।

পরীক্ষা শেষ হ'ল। নিশ্চিন্ত অবসর! আভার সঙ্গে দেখা করার মুখেই এক বাধা।

একদিন নীচে হৈ চৈ শুনে সিঁড়ি দিয়ে নেমেই প্রণব অবাক্। একটি মহিলা, ছুটবুট পরিহিত একটি ভদ্রলোক, আর একটি অসামান্য সুন্দরী তরুণী ড্রয়িংরুম প্রায় আলো ক'রে ব'সে।

প্রণবকে দেখে তার মা চেঁচালেন, এস পানু, কাকা-কাকীমাকে প্রণাম ক'রে যাও।

বিস্মিত লজ্জাক্লিষ্ট প্রণব কোনরকমে প্রণামপর্ব শেষ ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই বিপদে পড়ল।

তরুণীটি স্মিতহেসে বলল, পানুদাকে তা হলে আমারও তো প্রণাম করা উচিত।

কথা শেষ করার আগেই তরুণীটি উপুড় হয়ে প্রণবের পায়ের ধুলো নিয়েছিল।

প্রণবের অবস্থা কাহিল। মডার্ণ হিস্ট্রির পরীক্ষার দিনও শরীরের এমন অবস্থা হয় নি। প্রশ্নপত্র শক্ত হওয়া সত্ত্বেও।

এতক্ষণ পরে প্রণবের মা সহজ হয়েছিলেন। ছেলের দিকে ফিরে বলেছিলেন, আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা পাশাপাশি বাড়ীতে ছিলাম। আমার বিয়ে হয়ে যেতে সইয়ের কি কান্না। এতদিন এঁরা লক্ষ্ণৌ ছিলেন, বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছেন।

প্রণব যথাকর্তব্য ঘাড় নেড়ে গেল। মার বান্ধবী, তাঁর স্বামী আর মেয়ে এ পর্যন্ত বেশ বোঝা গেল। কিন্তু এ বাড়ীতেই থাকবেন নাকি এঁরা? চলতে-ফিরতে রোজ এই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হবে? মুখোমুখি?

ব্যাপারটা একটু পরেই জানা গেল বিশদভাবে।

মিস্টার গুপ্ত সরকারের বড় চাকুরে। মাসান্তে মাইনের অঙ্কটা বেশ লোভনীয়। পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কিছু রোগও সংগৃহীত করেছেন। যেমন প্রেশার আর ডায়বেটিস্। এখন একান্ত ইচ্ছা, বহাল তবিয়তে থাকতে থাকতে একমাত্র সন্তানের একটা গতি করা। ইতিমধ্যে কিছু পাত্র নেড়ে-চেড়ে দেখছেন, কিন্তু পছন্দসই একটাও নয়।

এমন চৌখস মেয়েকে তো আর যার তার সঙ্গে জুতে দেওয়া যায় না? যে কোন একটা ঐতিহ্যহীন মধ্যবিত্ত বংশে এ রত্ন তো আরোপিত করা যায় না? তাই ইদানীং মিস্টার গুপ্ত খুব চিন্তিত।

মেয়ের নাম শমিতা। শুধু লেখাপড়া নয়, নাচ-গান আবৃত্তি, চৌষট্টিকলার প্রায় অনেকগুলোতেই পারদর্শিনী।

মিস্টার গুপ্ত কাছাকাছিই ফ্ল্যাট নিলেন, যাতে দুই পরিবারে যোগাযোগটা অক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রণব যেত মাঝে মাঝে। শমিতাও প্রায় আসত। প্রথম প্রথম পড়ার ঘরে ব'সে কথাবার্তা হ'ত, তার পর সিনেমা, মার্কেটিং, গঙ্গার ধার। প্রথমে শুধু ভাল লাগার মুকুল, তার পর সান্নিধ্যের ছোঁয়ায় সে মুকুল ভালবাসার শতদল হয়ে উঠেছিল।

দু' পক্ষের অভিভাবকদের যে এ মেলামেশায় পূর্ণ সম্মতি ছিল, সেটা তাঁদের ভাবগতিক দেখেই বোঝা যেত। প্রণব শমিতাদের বাড়ী গেলেই, মিস্টার গুপ্তর স্ত্রীকে নিয়ে বেরোবার জরুরী দরকার পড়ত, আবার শমিতা এলে প্রণবের মা আর বাবা কোন ছল-ছুতোয় বেরিয়ে যেতেন। কিংবা একতলায় ব'সে গল্প করতেন দু'জনে, পারতপক্ষে ওপরে উঠতেন না।

প্রণব বি. এ. পাশ করার পরেই কথাটা উঠেছিল। বিয়েটা সেরে ব্যারিস্টারী পড়তে যাওয়াটাই বিধেয়। দিনকাল সুবিধার নয়। কোথা দিয়ে কি হয়ে যাবে, তার চেয়ে মজবুত খুঁটিতে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টাই ভাল। একটা পিছটান থাকবে।

এই সময় আভা একটা মারাত্মক কাজ করেছিল। চিঠি লিখেছিল প্রণবকে। দীর্ঘ তিন পাতা চিঠি। আভার বাবাকে আভা সবই বলেছে। বাবা তো আকাশের চাঁদই বুঝি পেয়েছিলেন দু'হাতের মধ্যে। কোথাও কোন অসুবিধা নেই। শুধু একবার এসে দাঁড়াক প্রণব, একবার দেখা করুক।

চিঠিটা পড়তে পড়তে প্রণবের সারা গা জ'লে উঠেছিল। দু' হাতে চিঠিটা দুমড়ে দুমড়েও রাগ যায় নি। চিঠিটা যেন আভার হৃদয়, কিংবা অশিক্ষিতা, গ্রাম্য, নিঃস্ব একটি মেয়ের অর্থহীন প্রলাপ। তার সাধ্যের অতীত এক সাধের ছবি।

শমিতা আর আভা, পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তুলনা করতেও প্রণবের লজ্জা হয়েছে। ড্রাইভিং জানে শমিতা, গীটার বাজায়, সাঁতার কাটে। অনর্গল ইংরেজীতে চমৎকার কথা বলতে পারে। আর আভা! আভার সম্বল শুধু একটা বোনার কাঁটা কিংবা ছুঁচ। মধ্যবিত্ত-সংসারের প্রয়োজনীয় দুই অস্ত্র। সংস্কার আর রিপু, সস্তা দরের উল কিনে সারাটা হেমন্তকাল ব'সে ব'সে সোয়েটার বোনা, শীতের প্রকোপ থেকে সংসারকে বাঁচানোর জন্য।

আভার দৃষ্টতায় শুধু বিরক্তই নয়, মনে মনে প্রণব শঙ্কিতও হয়েছিল। কিছু বলা যায় না, বাপের হাত ধ'রে কিংবা একলাই যদি এ বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ায়। ইনিয়ে-বিনিয়ে অনুনয়ের তুলি বুলিয়ে কোন আশা বিবর্ণ ছবিগুলোয় রং ফলাবার চেষ্টা করে? তা হলে?

কিন্তু আভা আসে নি। আসেও নি, চিঠিও লেখে নি।

শম্পিতার সঙ্গে প্রণবের বিয়ে হবার আগেই আভার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, এ খবর প্রণব কাকীমার মারফতই পেয়েছিল। আরও শুনেছিল, মেয়েটা বিয়ের দিন খুব কান্নাকাটি করেছিল।

তার পর প্রণব আভাকে ভুলে গেছে। সমুদ্রপারের অতি ব্যস্ত দিনগুলোর মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল আভা। পীতাম্বর মুদী লেনের ছোট্ট শড়কটা নতুন ব্যারিস্টারী সনদ পাওয়া প্রণব সেনের মনের ডাইরেক্টরিতে স্থান পায় নি।

তার পর এই দেখা। এত বছর পরে।

প্ল্যাটফর্মের প্রায় শেষে দাঁড়িয়ে আভাই হঠাৎ কথাটা বলল, তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে, পানুদা?

কথাটা এত আচমকা যে, প্রণব শিউরে উঠল। ঘন অন্ধকার। আভাকে দেখা যাচ্ছে না। তার সীমন্তে এয়োতীর সিন্দুররেখাও নয়। শুধু তার কণ্ঠস্বর, অনেকগুলো দিনের ওপার থেকে যেন ভেসে আসছে। সেদিনের কুমারী আভাই বুঝি কৈফিয়ৎ দাবি করছে।

চিঠি? দেশলাইটা জ্বালাতে গিয়েও প্রণব জ্বালাতে পারল না। হাতটা বেজায় কাঁপছে। শীতে কি? না দেহ কাঁপাবার মতন শীত আর কোথায়?

সিগারেট জ্বালাবার বার-দুয়েক ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে প্রণব বলল, চিঠি? কিসের চিঠি?

বাঃ রে, আমি যে তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম?

বল কি; শুনে এ বয়সেও রোমাঞ্চিত হচ্ছি। প্রণব দুর্বলতা ঝেড়ে সহজ হবার চেষ্টা করল। বেয়াড়া সাক্ষীকে সওয়ালের জালে আটকাতে না পারলে যেমন প্রতিপক্ষের কাছে অ্যানিমিক হাসি ফোটাবার প্রয়াস করে, ঠিক তেমনই।

সত্যি লিখেছিলাম।

কি লিখেছিলে? প্রণব ঘুরে দাঁড়াল। উদ্দেশ্য এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে একটু চলাফেরা করা।

যাক, এত বছর পরে সে আর জেনে তোমার লাভ নেই। সে ভাষাও মনে নেই, বলবার সে মনও নেই।

প্রণব একবার ভেবে নিল।

বলা যায় না। একবার যখন শুরু করেছে, তখন আভা হয়তো পুরোনো কথার জের টানবে। মেয়েদের মন এসব বিষয়ে বেশী কৌতূহলী। তার চেয়ে আভাকে একবার পার্থক্যটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। উদ্বাহু বামনের চাঁদ ছোঁয়ার আশার সমগোত্র।

চল, একটু হাঁটি আস্তে আস্তে।

আভা আর প্রণব ফিরল।

নিজের ফার্স্ট ক্লাশ কামরার সামনে এসে প্রণব ইচ্ছা ক'রেই দাঁড়াল। বলল, দাঁড়াও, সিগারেটের টিনটা নিয়ে আসি।

দরজা খুলে প্রণব কামরায় ঢুকল। জানালার কাঁচের মধ্যে দিয়ে বাইরে চোখ ফেরাতেই আর এক জোড়া বিস্মিত, প্রায় বিমূঢ় চোখের সাক্ষাৎ মিলল। উঁকি মেরে আভা কামরার আভিজাত্য আর সম্পদ্ দেখছে।

প্রণব মনে মনে হাসল। মুখে বলল, নীচে দাঁড়িয়ে কেন, ওপরে উঠে এস।

আভা বুঝি এইরকম একটা আহ্বানের অপেক্ষাতেই ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে এসে গদি আঁটা বেঞ্চে বসল। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লক্ষ্য করল। ছুটো পাখা, দেয়াল আয়না, এধারে ওধারে নীল বাতি।

তোমার কর্তা কি করেন? প্যাকেটের উপর একটা সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে জিজ্ঞাসা করল।

রেল অফিসে, খুব শান্ত, নিস্তেজ গলায় আভা উত্তর দিল। পাশ পায় ব'লেই তো বেরুতে সাহস করলাম, নয়তো একগাদা টাকা দিয়ে টিকেট কিনে কখনও আমাদের মতন লোক বেরোতে পারে।

নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে প্রণব বলল, কলকাতাতেই তো থাক?

না, আভা ঘাড় নাড়ল, রাজপুরে আছি। সোনারপুর থেকে ট্রেনে যেতে হয়। তুমি, তুমি সেই আগের বাড়ীতেই আছ নিশ্চয়? তোমাদের তো নিজের বাড়ী।

না, বাড়ী বিক্রী ক'রে দিয়েছি। বড় পুরোণো ধাঁচের বাড়ী ছিল। নতুন বাড়ী কিনেছি রাসেল ষ্ট্রীটে!

কথা শেষ ক'রে প্রণব সিগারেট ধরাল। পাখার হাওয়া থেকে কাঠি বাঁচিয়ে।

খুব বড়লোকের বাড়ী বিয়ে করেছ, সে খবর যোগাড় করেছি। মিষ্টিটা বাদ পড়ল, এই আপশোস।

কেন, বাদ যাবে কেন মিষ্টি, প্রণব উঠে দাঁড়াল, একদিন কর্তাকে নিয়ে এস আমাদের রাসেল ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। অবশ্য আগে থেকে একবার ফোন ক'রে এস, নয়তো এত ব্যস্ত থাকতে হয়; মক্কেলের কেস্ তো আছেই, তার ওপর পার্টি, মিটিং, কিছু না কিছু লেগেই আছে।

আভা একবার ভাবল সেই পুরোণো মালাটার কথা জিজ্ঞাসা করবে। মালাটা আজও আছে কি না এমন অর্থহীন প্রশ্ন নয়, শুধু মালাটার কথা প্রণবের মনে আছে কিনা?

কিন্তু তার আর অবকাশ মিলল না। প্রণব বলল, চল, তোমার কামরায় পৌঁছে দিয়ে আসি। দেরী হ'লে ভদ্রলোক বিচলিত হয়ে উঠবেন, ভাববেন কি জানি পুরোণো প্রেমিকের সঙ্গে স্ত্রীটি হয়তো হাওয়াই হয়ে গেল!

এধরণের একটা কথায় আভার লজ্জায় আরক্ত হয়ে যাবার কথা, কিন্তু এমন লঘু সুরে পরিহাসের ভঙ্গীতে প্রণব কথাগুলো বলল যে খুব বিস্বাদ লাগল। আভার মনে হ'ল, প্রথম কৈশোরে যেটুকু ঘটেছিল, সেটার মধ্যে যে কোন অকৃত্রিমতা ছিল, এটুকুও যেন আজকের প্রণব বিশ্বাস করতে নারাজ।

আভা নেমে পড়ল। পিছন পিছন প্রণব।

আভার কামরায় প্রায় সবাই নিদ্রিত। আভার স্বামীও আভার খালি জায়গাটাতে গুড়ি মেরে শুয়েছেন। একটা হাত মাথায়। নিশ্চিন্ত নিদ্রা। স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে নেমে গেছে, এমন দুশ্চিন্তার একটি রেখাও মুখে পড়ে নি।

কি মুশকিল, তোমাকে ফিরায়ে দিনু তোমার রাখাল, এমন কথা যে বলব, ভদ্রলোক সে উপায় রাখলেন না। আরামে ঘুমাচ্ছেন।

দরজার হাতল ঘোরাতে ঘোরাতে প্রণব বলল।

আভা কোন উত্তর দিল না। লোকজন বাঁচিয়ে নিজের জায়গায় যাবার চেষ্টা করল।

আচ্ছা, চলি আভা। প্রণব স'রে গেল।

একবার মুখ তুলেই আভা মুখ নীচু করল। তার উত্তর দেবার সময় নেই। ছেলেমেয়েগুলোকে ঠিক ক'রে শোয়ানোর ব্যাপারে ব্যস্ত।

প্রণব নিজের কামরায় ফিরে এল। জানলার কাছে পা ছড়িয়ে বসল। মনে মনে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করল। একটা মধ্যবিত্ত মেয়ের অন্যায় স্পর্ধার সমুচিত উত্তর দিতে পেরেছে ভাবতেও ভাল লাগল। কবে কখন একটুখানি ছোঁয়া, তাই নিয়েই এরা কল্পনার জাল বুনে যায়। নিজের সীমারেখা, আয়ত্তের পরিধির কথা ভাবে না।

বার দুয়েক প্রণব হাই তুলল। ঘুমোবার প্রয়াস। ফেলে দেওয়া বইটা পড়ার চেষ্টা, কিন্তু কিছু হবার নয়।

আবার উঠে মকদ্দমার নথিপত্র বের করল। সাক্ষীদের এজাহারগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। নতুন যদি কোন ফাঁক নজরে আসে।

তারপর এক সময়ে নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। গাড়ীর চলার কোন আশা নেই। সারাটা রাত হয়তো এখানেই থাকবে।

কোটের কলারটা উল্টে দিয়ে প্রণব পায়চারী শুরু করল।

অনেকে ঘুমাচ্ছে, অনেকে জেগে আছে। কেউ কেউ আবার গানও ধরেছে। একটার পর একটা কামরা প্রণব পার হয়ে গেল।

চলতে চলতেই প্রণবের খেয়াল হ'ল। এইখানেই বোধ হয় আভাদের কামরা। ট্রেনের ঠিক মাঝামাঝি। কাচের মধ্যে দিয়ে উ কি দিয়ে দেখতে দেখতে প্রণব থেমে গেল। হ্যাঁ, এই কামরা।

ছেলেমেয়েগুলো সব অকাতরে ঘুমুচ্ছে। তাদের গায় চাদর ঢাকা। এদিকের কোণে ভদ্রলোকও গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তাঁর মাথাটা আভার কোলের উপর।

আভা ঘুমোয় নি। নিবিষ্ট মনে স্বামীর মাথায় একটা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর একটা হাত স্বামীর বুকের ওপর।

আভার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টায় প্রণব জানলার খুব কাছাকাছি গেল, কিন্তু আভার সাড় নেই। একদৃষ্টে স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। সে দৃষ্টিতে গভীর মমতা আর প্রেম।

হঠাৎ প্রণবের বুকের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা। পুরোণো একটা ব্যথা মাঝে মাঝে দেখা দেয়।

খুব আস্তে জুতোর শব্দ না ক'রে প্রণব স'রে এল। মাথা নীচু ক'রে।

নিজের কামরায় ফিরে এসে একটা বেঞ্চে নিজেকে ছেড়ে দিল। মূল্যবান্ পরিচ্ছদ, অভিজাত কামরা, হাতের রেডিয়ম ঘড়ি, হীরের আংটি সব যেন ব্যঙ্গ করছে প্রণবকে। এত দামী আভরণ দিয়েও নিজের দীন অবস্থা ঢাকতে পারেনি প্রণব। ধরা প'ড়ে গেছে।

অনেক বলা সত্ত্বেও শমিতা আসেনি। শমিতা দার্জিলিং গেছে তার লক্ষ্ণৌয়ের পুরোণো বন্ধু ডক্টর মজুমদারের সঙ্গে। সমুদ্র তার সহ্য হয় না, পাহাড় ছাড়া তার স্বাস্থ্যও টেঁকে না।

প্রণব দুহাতে মাথাটা চেপে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ল। কোন মমতাময়ী মধ্যবিত্ত মেয়ের কোলের ওপর নয়, কঠিন, কঠোর নারকেলের ছোবরা দেওয়া গদীর ওপর।

—০—

ভাষানুযায়ী প্রদেশ ও ভারতীয় মহাজাতি গঠন

বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে নানাভাষাভাষী লোকেরা স্থায়ীভাবে বাস করে। অনেক দেশী রাজ্যেরও বাসিন্দারা নানাভাষাভাষী। সুতরাং ভারতবর্ষকে কেবলমাত্র এক ভাষাভাষী, এরূপ অনেকগুলি প্রদেশ ও রাজ্যে ভাগ করা সম্ভবপর নহে। তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে। কারণ, আমাদিগকে একটি ভারতীয় মহাজাতি গড়িতে হইবে। তাহাতেও নানাভাষার লোক আছে ও থাকিবে। তাহাদের পরস্পরের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হওয়া উচিত। এক-একটি প্রদেশে কেবল এক ভাষাভাষী লোক স্থায়ীভাবে থাকা অপেক্ষা নানাভাষাভাষী একাধিক লোকসমষ্টি থাকিলে এরূপ জীবন যাপনের শিক্ষা ও অভ্যাস ভাল করিয়া হয়। সেই জন্য, আমরা ভাষানুসারে নূতন নূতন প্রদেশ গঠন পছন্দ করি না।

আমাদের বক্তব্য এই, যে, সাবেক ব্যবস্থা বা অবস্থানুসারে হউক, কিংবা নূতন ব্যবস্থা অনুসারেই হউক, ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীদিগকে কোন এক প্রদেশভুক্ত হইয়া থাকিতে হইলে, কোন ভাষাভাষীকেই কোন প্রকার সুবিধা ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করা অত্যন্ত অন্যায় হইবে। যোগ্যতা যাহাদের সমান, ভাষা-ধর্ম্ম-বংশ-জাতি নির্বিশেষে তাহারা সমান সুবিধা পাইতে অধিকারী। যেহেতু কোন বাঙালী বিহার উড়িষ্যা, আসাম বা অন্য কোন প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা, অতএব বাঙালী বলিয়াই কেন তাহাকে অসুবিধায় ফেলা হইবে?

প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গ, বৈশাখ ১৩৪২।

এক বছর পরে সরকারী দপ্তর থেকে দরখাস্তের জবাব এল। হাসপাতালে সিট পেয়েছে অমিতা।

দরখাস্তের কথা ভুলেই গিয়েছিল সবাই। অমিতা নিজেও। এক বছর আগের কথা মনে থাকবার নয়। একটা সংসার যেখানে দৈনন্দিন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলছে সেখানে অমিতা কবে দরখাস্ত করেছিল হাসপাতালে যাবার তা কি মনে থাকে! সাধারণ রোগ নয় তার। জ্বর হ'ল, দেহের যন্ত্রণায় ছটফট করল, শুয়ে থাকল দু' চারদিন, মিকশ্চার খেল ডাক্তারের, তারপর একদিন ভাল হয়ে গেল। এ তো সে রোগ নয়।

রোগটা প্রথমেই ধরা পড়েছিল তার। ছবি তোলার পর ডাক্তার বললেন—ভাববার কিছু নেই, সবে ধরেছে। বাড়ীতে থেকেই ইন্‌জেকশান নিতে হবে আর বিশ্রাম, ভাল খাওয়া ,ব্যস্।

শাশুড়ী বললেন—ছেলেপিলের ঘর!

ডাক্তার একটু ভেবে বললেন—তা হলে হাসপাতালে যাওয়াই ভাল। অবশ্য আলাদা ঘর, খাবার থালা-বাসন আলাদা ক'রে সকলের সংস্পর্শ এড়িয়ে থাকা সম্ভব হলে হাসপাতালে না গেলেও চলবে।

সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল।

—তবে হাসপাতালেই দিন! ক'দিনই বা লাগবে! দু'এক মাসের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবে। আজকাল এটা তো কিছুই নয়! এতে ভয় পাবার কারণ নেই।

ভয় বাড়ীসুদ্ধ লোক পেয়েছিল ঠিকই। বাড়ীর বৌ। সমস্ত সংসারটাকে সে-ই মাথায় ক'রে রেখেছে। তার রোগে ভয় পাওয়ার চেয়ে সংসার চলবে কি ক'রে সেই ভাবনাই পেয়ে বসেছিল সকলকে।

রণজিৎ আর তার বন্ধু-বান্ধব চেষ্টা ক'রেও সিট পেল না। তবে একে-ওকে ধ'রে পথ পেল একটা। এম-এল-এ-র সই দিয়ে সরকারের কাছে দরখাস্ত করল। সিট খালি হলেই পেয়ে যাবে আশ্বাস দিলেন সরকারী দপ্তর।

প্রথম প্রথম দু'চার দিন ইন্‌জেক্‌শান ওষুধ চলেছে। তারপর কেমন ক'রে সব দিক্‌টাই ঢিলে হয়ে এসেছে। মাস্টারীর টাকাটা হাতে এলে ওষুধ কেনার চেয়ে চাল কেনার কথাটা আগে মনে এসেছে। তারপর সংসারের যে খরচগুলো না করলেই নয় তা সেরে ইন্‌জেক্‌শান এসেছে দু'চারটে। অনিয়মিত ওষুধ, ভাল খাবারের বদলে

সংসারের নৈমিত্তিক ব্যাপার, আর বিজ্ঞানের আওতায়। তাই কোন উপকারই হ'ল না বাড়ীতে। [illegible] হাসপাতালে ছাড়া সারবে না। অমিতা নিজেও জানে তাই। দু'চারদিন কান্নাকাটিই করল। খোকনকে [illegible] কাছে থাকতে চায় না। এক বছরের শিশু যাকে চোখের সমুখে রেখে মা ছাড়া থাকবে কেন।

তাই দু'মাস পরে সবাই প্রায় মিলেমিশে গেল। জ্বর যেটুকু আসত, রাত্রে। কাশিও দু'চার বার খুকখুক ক'রে। বাইরের থেকে কোনটাই দেখতে মারাত্মক নয়।

বেশ ভুলে গিয়েছিল বাড়ীর লোকে। শুধু রণজিৎ এক-একদিন গায়ে হাত দিয়ে বলত—জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে যেন।

—ও কিছু নয়। আজ জল ঘেঁটেছি বেশী ক'রে, তাই।

—কেন? প্রয়োজন কি ছিল? রণজিৎ প্রশ্ন করেছে।

হেসে ফেলেছে অমিতা। মা বুড়ো মানুষ। উনি পারেন এত কাচতে?

আর কথা নেই রণজিতের। প্রথম প্রথম ভেবেছিল ঝি রাখবে একটা। হয়নি। মার বয়স হয়েছে। সারা জীবন এই ক'রেই আসছেন। এবারে তাঁর বিশ্রামের সময়। তাঁকে সংসারের কাজ করতে দিতে চায় না রণজিৎ।

অগত্যা দু'চার দিন পর অমিতাকেই নামতে হয়েছে। সকালের চা মা করেছেন অনেক সময় লাগিয়ে। মুখে দিতে পারে নি রণজিৎ আর সমীর।

মাকে সরিয়ে দিয়ে অমিতাকেই বসতে হয়েছে চায়ের কেটলি নিয়ে। চা খেয়ে হাসি ফুটেছে সকলের মুখে।

বেশ চলছিল। ভুলে গিয়েছিল অমিতার রোগের কথা প্রায়। এমন সময় হাসপাতালে সিটের জবাব এসে হাজির।

খোকনকে কোলে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে অমিতা।

—কিসের চিঠি গো?

—তোমার হাসপাতালের সিটের।

অমিতার ফ্যাকাসে মুখটা আরও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। মুখের সামান্য রক্তিম আভাটুকুও চুষে নিয়েছে খামের ঐ পত্রখানা।

খোকন অমিতার কোলেই ছিল। দুধ খাচ্ছিল মনের আনন্দে। তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছে ও।

—কি হ'ল?

বালিসে মুখ গুঁজে উদ্গত অশ্রুকে লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছে অমিতা।

মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে রণজিৎ বলেছে—ছিঃ! অমন মন খারাপ করলে চলে?

—না, না, আমি হাসপাতালে যাব না! তোমরা আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচ। আমি যাব না, খোকনকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

—একটা মাস তো মোটে! খোকনকে আমি দেখিয়ে নিয়ে আসব মধ্যে মধ্যে। ওঠ অমিতা, অবুঝ হ'লে চলে না লক্ষ্মীটি!

হাসপাতালে যাবার সময় যাবে না খোকন মায়ের কোল ছেড়ে।

—যাও বাবা, ঠাকুমার কাছে যেতে হয়।

বুঝতে পেরেছে খোকন, মা চ'লে যাচ্ছে তাকে ছেড়ে। আঁকড়ে ধ'রে থাকল মাকে।

প্রণাম করল অমিতা শাশুড়ীকে।

—এস মা! এস! তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে এসে তোমার সংসার তুমি বুঝে নাও মা।

জোর ক'রে খোকনকে মায়ের কোলে তুলে দিয়ে চ'লে গেল অমিতা। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে দ্রুতপায়ে। একবার ফিরেও চাইল না।

রণজিৎ হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দিয়ে এল অমিতাকে। অমিতা মন খারাপ ক'রে ব'সে ছিল বেডের ওপর। নতুন এক জগৎ দেখছে সে। এখানে মা নেই, খোকন নেই, রণজিৎও নেই। ওর চারপাশে রোগী। কেবিনের

একটা সিট পেয়েছিল অমিতা। চারটে সিটের বাকী তিনটাতে যাঁরা আছেন তাঁদের দুজনেরই শক্ত কেস্। অপারেশন হবে। একজনের একটা ফুসফুস বাদ দেবার আশঙ্কা আছে।

জমাদার, ওয়ার্ড বয়, নার্স সকলে ব্যস্ত অমিতার সিটটাকে সংস্কারের চেষ্টায়। অন্য রুমের রোগিণীরা এসেও হাজির। নতুন কেউ এলেই এঁরা এমনি ক'রে এসে ভিড় করেন। কে এল, কেমন রোগী তার হিসাব নেন। বিশেষ ক'রে সার্বজনীন বুড়ী দিদিমা আসবেনই! তাঁর একটা ফুসফুস বাদ যাবে অপারেশনে। তিনি অনেক হাসপাতাল ঘুরে এখানে এসেছেন। হাই ব্লাডপ্রেশার। ব্লাডপ্রেশার না কমলে অপারেশন হবে না। তাই অপেক্ষা করছেন, খাওয়া-দাওয়াও নিয়ন্ত্রিত।

পাশের বেডের সুলোচনা এগিয়ে এল। কি নাম ভাই তোমার?

— কতদিন রোগ ধরা পড়েছে?

—দু'দিকে না একদিকে?

—উনি স্বামী বুঝি?

—বাড়ীতে চিকিৎসা হয় নি?

নানা জনের নানা প্রশ্নে অমিতা বিব্রত হয়। তবু হাসিমুখে জবাব দেবার চেষ্টা করে।

রণজিৎ চুপচাপ ব'সে। নার্সের কাছ থেকে কি কি লাগবে তার একটা হিসাব নেয়। দিদিমা প্রায় মুখস্ত বলার মত ব'লে চলেন—সিস্টার বলার আগেই। দুটো সুজনী, বালিসের ঢাকনা, দুটো গ্লাস, বাটি, সাবান, টুথপেস্ট, শাড়ী চারখানা।

সুলোচনা বলে—থার্মোমিটার!

—গবর্ণমেণ্ট বেড, থার্মোমিটার এমনিতেই পাওয়া যাবে। দিদিমার মুখস্ত সব।

রণজিতের কথা বলার সুযোগ কম। মেয়েদের মাঝে কি বলবে? সিস্টারের দিকে চেয়ে বলল—আমি জিনিষগুলো নিয়ে আসি কিনে?

—এখনই দরকার নেই, আপনি বিকালের দিকে এসে দিয়ে যাবেন।

ভাল লাগছে না অমিতার ওদের এই গায়ে-পড়া ভাবকে। রণজিৎ এবার যাবে। ওর সঙ্গে দুটো কথা বলবে ভেবেছিল।

রণজিৎ উঠে পড়ে। অমিতার দিকে চেয়ে বলে—যাই এবারে!

অমিতাও উঠে দাঁড়ায়। দু' পা এগিয়েও আসে কিছু বলবে ব'লে। মুখে এসেছিল বলে—খোকনকে দেখো! রাত্রে তুমিও না-হয় ওর কাছেই শোবে। বলতে পারল না।

সুলোচনা ততক্ষণে রণজিতের সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন কতকালের চেনা ও। বলে—ভাববেন না কিছু; আমরা তো আছি!

তবু রণজিৎ দাঁড়িয়ে রইল। বিয়ে হওয়ার চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কোনদিন ওদের ছাড়াছাড়ি হয় নি।

যাবার আগে মনটা একটু খারাপই হয়ে যায়। বিকালে সে আসতে পারবে না। সমীরকে পাঠাতে হবে। বেকার ভাই। এসব কাজ তার দ্বারাই ভাল হবে।

অমিতা দাঁড়িয়ে থাকে রণজিতের মুখের দিকে চেয়ে। সকলেই এ সময়টায় হঠাৎ চুপ ক'রে আছে। দু'জনেই একদৃষ্টে চেয়ে আছে পরস্পরের দিকে। বলার যা কিছু আছে চোখের নীরব ভাষায় তারা বলে। এত লোকের সামনে তাদের মনের কথা কি ভাবে প্রকাশ করবে? কত কথাই মনে আসছে। ভিড় ক'রে আসছে কথার মালা।

—যাই!

ঘাড় নাড়ল অমিতা।

আর দেখা যায় না রণজিৎকে। বিছানায় এসে ব'সে পড়ে অমিতা। মনটা তার হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে। চীৎকার ক'রে বলতে চাইল—আমাকে নিয়ে যাও! মনে হ'ল ছুটে চ'লে যায় রণজিতের সঙ্গে। কেন সে এখানে থাকবে? একা একা? কেন সংসার ছেড়ে, তার খোকনকে ছেড়ে সে থাকবে? কি হয়েছে তার? কি অপরাধ করেছে সে? কোন্ পাপে সে স্বামী-পুত্র ছেড়ে এই নির্বান্ধব হাসপাতালে থাকবে? কে তাদের এমন ক'রে আলাদা ক'রে দিল? কেন? কেন?

যে সুলোচনার ওপর একটু আগেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল অমিতা সেই সুলোচনাই এগিয়ে এসে বসে চেয়ারটা টেনে। সহানুভূতিতে গ'লে গিয়ে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলে—মন কেমন করছে ভাই স্বামীর জন্ম ?

—না তো ! মুখ নামিয়েই কথার জবাব দেয় অমিতা।

—লজ্জা কি ! ও তো করবেই ! বিয়ের পর ও ছাড়া এমন আপন আর কে আছে ?

ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানায় অমিতা। বলে—খোকনের জন্যে ভাল লাগছে না।

—ও, খোকনের কথা ভাবছ। কত বয়স ?

—এক বছর।

—আহা ! একটু চুপ ক'রে থেকে বলে—সত্যি, আমারও ভাল লাগে না। খোকনের জন্যে মনটা হু হু করে। মনে হয়, কতদিন দেখি নি। কেমন আছে সে ! কি করছে !

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায় সুলোচনাও। জানালা দিয়ে দূরের তালগাছটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। পাতাগুলো হাওয়ায় কেমন শির্ শির্ ক'রে কাঁপছে।

—আমার খোকনের বয়স চার বছর। ভারী দুরন্ত ! বল ভাই, ঐ দুরন্ত ছেলেকে কখনও ও সামলাতে পারে ! যে ভালমানুষ !

সুলোচনার সঙ্গে আলাপে বেশ সহজ হয়ে এসেছে অমিতা ! মৃদু হেসে বলেছে—খুব ভালমানুষ বুঝি আপনার উনি !

লজ্জায় মুখটা রাঙা হয়ে উঠল সুলোচনার। বলল—বড্ড ভালমানুষ, কাউকে একটা কথা বলতে পারে না মুখ তুলে। ভারী লাজুক !

স্বামীর কথা বলার সময় মুখটা নামিয়ে কথা বলছিল ও, এবারে মুখ তুলে বলে—তোমার উনিও কিন্তু ঐ রকমই মনে হ'ল ! নয় ?

হাসিমুখেই সমর্থন জানাল অমিতা। ভালই লাগছে সুলেচনাকে। রণজিৎ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেমন খারাপ লাগছিল এখন সে রকম মনে হচ্ছে না।

দিনের বেলা কাটে ভাল। মুশকিল হয় রাত্রে। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। ঘরে ঘরে মশারি টাঙানো। মানুষ দেখা যায় না। মনে হয় মৃত্যুপুরী। ঘরের মধ্যে শবদেহগুলোকে মশারি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। মানুষ নেই এখানে।

কিন্তু ভুল ভাঙে। পাশের ঘরে কাশির শব্দে। দিদিমার বোধহয় রাত্রে ঘুম আসে না। কাশেন প্রায় সারা রাত্রি ধ'রে।

আবার চুপচাপ। সুলোচনার নাক ডাকছে ! সবাই ঘুমুচ্ছে। ঘুম আসছে না অমিতার। উঠে দাঁড়ায় জানালার ধারে। সামনের তালগাছ ক'টাকে ভুতের মত দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছে জড়াজড়ি ক'রে। রাতচোরা পাখী একটা এসে বসে তালগাছের উপর।

ঘণ্টা বাজানোর শব্দে চম্‌কে ওঠে অমিতা। কে ঘণ্টা বাজাচ্ছে ? বেড-পেশেণ্ট সেই বাচ্চা মেয়েটা বোধ হয়। কত আর বয়স হবে মেয়েটার, বারো-তেরো বড় জোর। ওয়ার্ড-নার্সকে ডাকছে, নয়ত জমাদারকে। সাড়া নেই কারও।

মেয়েটা ঘণ্টা বাজিয়েই চলেছে।

আশ্চর্য, কারও সাড়া নেই। মশারিগুলো একবার নড়ছেও না। মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে অমিতার। বাথরুমে যাবে নাকি একবার ? মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল ঢেলে আসবে নাকি ?

ষোল নম্বর ঘরের মধ্য দিয়ে গিয়ে বারান্দায় পড়ল অমিতা। বারান্দার সুমুখেই দেওয়াল-ঘড়িটা টক্ টক্ ক'রে বেজে চলেছে, বারোটা।

ওয়ার্ড-নার্সদের ঘরের পাশ দিয়েই বাথরুমে যেতে হয়। আশ্চর্য, সিস্‌টার ঘুমুচ্ছে নাক ডাকিয়ে টেবিলের ওপর কম্বল বিছিয়ে। ওধারে জমাদাররা কয়েকজনই গোল হয়ে ব'সে তামাক খাচ্ছে বোধহয়, কেউ কেউ ঝিমুচ্ছে। ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছে না নাকি ?

আর ঘণ্টা শোনা যায় না। ক্লান্ত হয়ে ঘণ্টা বাজান বন্ধ করেছে মেয়েটা বোধহয়। নয়ত সিস্‌টার হাজির হয়েছে।

আবার চারদিক্ শান্ত। মাথায় জল দিয়ে আসার পরও ঘুম আসে না অমিতার। সারা হাসপাতালের রোগীরা মরেছে। কেবল সে-ই বেঁচে। জেগে আছে, তালপত্র খাঁড়া নিয়ে রাজপুত্রের মত সে জেগে আছে। চিন্তার জোয়ার আসছে।

কি করছে খোকন এখন? ঘুমিয়েছে? না, মাকে বিরক্ত করছে? তাকে না পেয়ে কি কাঁদছে? না, ঘুমের ঘোরে খুঁজছে অমিতাকে। চিৎ হয়ে ঘুমোয় না দুষ্টুটা। পাশ ফিরে অমিতাকে আঁকড়ে ধ'রে শুয়ে থাকবে। ঘুমের মধ্যেও ভয় খোকনের, মা যদি পালিয়ে যায়। অমিতা পাশ ফিরে এদিকে শুয়ে থাকলে দুষ্টুটা ঘুমের মধ্যেই হাত বাড়িয়ে মাকে খুঁজবে। মাকে আঁকড়ে না ধ'রে ঘুম আসে না বাবুর।

ঘুম আসে না অমিতারও। ঘুম চ'ড়ে গিয়েছে, মা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। খোকন খুঁজছে মাকে, পাচ্ছে না। জেগে উঠে কাঁদছে। ওর ঘুমও ভয়ানক, খোকনের এপাশে ও শুয়েছে হয়ত। নাগালের মধ্যে কাউকেই পাচ্ছে না খোকন। হয়ত ওকেই পেয়েছে, আঁকড়ে ধরেছে ওকে। ওর হুঁশ নেই, ও পাষাণের মত প'ড়ে আছে। কারও সাড়া না পেয়ে খোকন কাঁদতে শুরু করেছে। বলতে পারছে না মায়ের কথা। মাকে খুঁজছে ঘুম-ভাঙা চোখে আঁতি-পাঁতি ক'রে। তার পর!

খোকন কাঁদছে নিশ্চয়ই! মাকে দেখছে না, ঘুম ভেঙে উঠলেই দুধ খায় ও। দুধ পাচ্ছে না, বলতে পারছে না মনের কথা! মা, মা, ক'রে ডাকছে।

মা হয়ত ওকে তুলে দিয়েছেন, খোকনকে রাখতে না পেরে। কেউ রাখতে পারছে না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে ও এক চড় কষিয়ে দিয়েছে খোকনের গালে।

না, ঘুম আসবে না। উঠে বসেছে অমিতা। কি করবে? চ'লে যাবে এক দৌড়ে নাকি! গিয়ে আবার ফিরে আসবে? শুধু খোকনকে এক নজর দেখে আসবে, খোকন ঘুমিয়ে থাকলে তার ঘুম ভাঙাবে না। ঘুম ভেঙে কাঁদতে থাকলে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আবার ফিরে আসবে। হয় না! যাওয়া যায় না! যদি পাখা থাকত তার, উড়ে চ'লে যেত। কেউ জানতে পারত না। খোকন ঘুমিয়ে থাকলে একটা চুমু খেয়ে চ'লে আসত চুপে চুপে, ভারী মজা হ'ত, কেউ জানতেও পারত না।

শেষ রাত্রের দিকে কোন সময় ঘুমিয়ে পড়েছে অমিতা। ঘুম ভেঙেছে ভোরবেলায়। দিদিমার স্তোত্রপাঠ শুনে। দিদিমা সুর ক'রে ঠাকুর-দেবতার নাম নিচ্ছেন। কত ভোরে ওঠেন দিদিমা! ভোরে উঠে ফুল তোলা সারা। তার পর ফুল নিয়ে স্তোত্র পাঠ করা। দিদিমার মাথার কাছে কালী, দুর্গা, রামসীতার ছবি। ছবির মাথায় একটি ক'রে জবা ফুল। সারা দিন রাত ফুলগুলো থাকে ঠাকুরের মাথার ওপরে পেরেকটায় আটকে। সকালে বাসি ফুল ফেলে দিয়ে আবার নতুন ফুল।

—ওং জবাকুসুমসঙ্কাশং—

চমৎকার! ভারী ভাল লাগে অমিতার শুয়ে শুয়ে শুনতে। পরিষ্কার স্পষ্ট উচ্চারণ! একটু জোরেই দিদিমা মন্ত্র বলেন। আশ্চর্য, পাশের পনেরো নম্বর বেডের বৌটির কিন্তু কানের কাছে দিদিমার স্তোত্রপাঠ শুনেও ঘুম ভাঙে না। কারও নয়। অভ্যাস হ'য়ে গেছে বোধহয়। অমিতার কিন্তু ঘুম ভেঙেছে। চোখদুটো জ্বালা করছে।

এবারে একে একে সব উঠছে। দিদিমা যেন এলার্ম্ বেল্। সুলোচনা, আরতি, আট নম্বরের সুনীতি সবাই উঠছে একে একে। এবারে বেড়াতে বার হবে ওরা।

—যাবে নাকি ভাই—সুলোচনা অমিতাকে ডাকে।

—আমি যাব!

—কেন। তোমার ওয়াকিং দেয় নি! ওঃ, তুমি তো সবে নতুন এসেছ। তোমার কনফারেন্সই হয় নি, তা…

—চলুন যাই! আমার তো বেড়ানোয় নিষেধ নেই।

চল!

জামা-কাপড়টা পালটে বেরিয়ে পড়ল অমিতা। আর কেমন সুন্দর হাওয়া। যেন কারাগারের বাইরে এসেছে। এমন উন্মুক্ত ফুরফুরে হাওয়া এ পৃথিবীতে আছে! হাওয়ায় কেমন যেন সুন্দর গন্ধ ভেসে আসছে একটা। ফুল ফুটেছে গাছগুলোয়। ঘরের মধ্যে কেমন যেন রোগের উৎকট গন্ধ। বাইরে থেকে ঘরে ঢুকলে টের পাওয়া যায়। ভ্যাপসা গন্ধ।

—আঃ! জোরে জোরে প্রশ্বাস নেয় অমিতা। প্রাণ ভ'রে হাওয়া টানে। বিশুদ্ধ হাওয়া চ'লে যাক ফুসফুসের ভিতরে। সমস্ত রোগ-জীবাণুকে উড়িয়ে নিয়ে যাক।

সার সার নার্স ডাক্তারদের কোয়ার্টার। ওদের মেয়েরা বেণী ঝুলিয়ে কলেজ স্কুলে যাচ্ছে। হরিণঘাটা থেকে দুধের গাড়ীটা এসে পৌঁছাল। কণ্ট্রাক্টারের লোক একপাল ছাগল নিয়ে যাচ্ছে কিচেনের দিকে। খবরের কাগজের হকাররা সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে ঝড়ের বেগে চলেছে। দলে দলে ছেলে আর মেয়েরা বেড়াতে বার হয়েছে। ডাক্তার অধিকারী খালি গায়ে রকে ব'সে আছেন বেতের চেয়ার পেতে। বাইরের কয়েকটা বাচ্ছা ছেলেমেয়ে সাজি নিয়ে ফুল তুলছে হাসপাতালের ফুলগাছে।

নতুন জগৎটাকে নতুন ভাবে দেখছে অমিতা। বেশ ভাল লাগছে। রাত্রিতে ঘুম না আসার ক্লান্তি এখন আর নেই। এমন চমৎকার সকাল হাসপাতালে। রোজ আসবে সে।

—বাঃ, দেখুন দেখুন! বাচ্ছাটা কেমন সুন্দর হাঁটছে মায়ের হাত ধ'রে।

—কে বল তো?

—কি জানি! এ বৌটাকে দেখি নি তো!

খিল খিল ক'রে হেসে উঠল সুলোচনা। ওমা। বৌ কোথায়! ও যে আমাদের মিনুদি! সিস্টার।

লজ্জা পেল অমিতা। সত্যি সিস্টার ব'লে মনেই হয় না। শাড়ী প'রে, মাথার ওপরে ঘোমটা, সিঁথিতে সিঁদূর, গলায় মটরমালা হার, হাতে চুড়ি, ছেলের হাত ধ'রে সকালে বেড়াতে বার হয়েছে যে তাকে মা ছাড়া আর কি ভাবা যায়? এই বৌটিই যখন নার্সের পোষাক প'রে যাবে তখন চেনা যাবে না। তখন মনে হবে, এ মা নয়, বধূ নয়—এ শুধু সিস্টার। এ যে সিস্টার চেনাই যায় না। তাদের ওয়ার্ডেই ছিলেন তো উনি সকালে। তাই তো! অথচ চেনা যায় না। এ যেন অন্য মানুষ! পোষাক বদলানোর সঙ্গে মানুষটাও পালটেছে। আকাশ-পাতাল তফাৎ সিস্টার মিনতি আর মা মিনতিতে।

—দেখছেন কেমন হাঁটছে খোকা! থপ্ থপ্ ক'রে। কেমন সুন্দর!

—তোমার খোকা বুঝি এখনও হাঁটতে শেখে নি?

ভুলে ছিল অমিতা। আবার মনে করিয়ে দিল খোকনের কথা। দুদিন হ'ল মাত্র হাসপাতালে এসেছে। মনে হচ্ছে, খোকনকে কতদিন দেখে নি সে। কেমন আছে খোকন? কি করছে!

সমীর এসেছিল কাল বিকালে। অমিতার যা যা দরকার তা নিয়ে। সমীরকে দেখে খুশীই হয়েছিল। রণজিৎ চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, তাকে নির্ব্বাসনে রেখে গেল রণজিৎ আর কোনদিন আসবে না এ পথে। আর কোনদিন কারও সঙ্গে দেখা হবে না। খোকনের জন্য মন খারাপ ক'রে গুমরে গুমরে কাঁদবে সে। শরীর আরও খারাপ হবে। তারপর একদিন ঐ বুড়ো লোকটার মত তাকেও বেড খালি ক'রে দিয়ে ঠাণ্ডা-ঘরে নিয়ে যাবে। হাসপাতালে অমিতা আসার পরেই একটা লোককে ঢাকা দিয়ে দুজন জমাদার নিয়ে যাচ্ছিল ডি-এম-ওয়ার্ডের পাশ দিয়ে, সকলেই দেখছিল। তাদের ওয়ার্ড, ডি এম ওয়ার্ড, হান্ড্রেড বেড, সব ব্লকেরই মানুষ উঁকি মারছিল।

—কি নিয়ে যাচ্ছে? সুলোচনাকে উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করেছিল অমিতা।

—মরা! আমাদের ওপরের ব্লকে মারা গেল একটা বুড়ো পেশান্ট।

—মারা গেল!

—হাঁ! বেড পেশান্ট তো! একেবারে শেষ সময়ে হাসপাতালে এসেছে।

আর কথা বলতে পারে নি অমিতা। দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ঐ পরিণতি তারও হবে নাকি!

মন খারাপ ক'রে ব'সে ছিল অনেকক্ষণ। তারপর তাস খেলা শুরু করার জন্যে যেই ডেকেছে সুলোচনা অমনি খেলায় মেতেছে সে। ভুলে গিয়েছে আর সব।

—খোকন কেমন আছে ঠাকুরপো?

সমীর আসতেই প্রথম প্রশ্ন অমিতার।

—ভালই! ঘুমুচ্ছে দেখে এসেছি।

—কাঁদে নি? আমায় খোঁজে নি?

একবার কেঁদেছিল! তারপর মা কোলে নিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে।

খোকন শুধু একবার কেঁদেছিল শুনে ভাল লাগল না অমিতার। আরও কি বলতে গেল। দিদিমা এসে হাজির। এই তো সব এসে গেছে দেখছি! এটি কে, দেওর বুঝি?

—হাঁ!

—বেশ! তবে আর তোমার ভাবনা নেই! তোমাদের দেখতে আসার তো লোক আছে! আর আমাদের! যম ছাড়া কেউ নেই।

দিদিমা চ'লে গেল অত্যন্ত সহজে। সুলোচনাও। বুঝি সুযোগ দিয়ে গেল কথা বলার বাড়ীর লোকের সঙ্গে।

—তোমার দাদা এল না যে!

—বারে! দাদার স্কুল আছে না? ফিরতে তো সেই সন্ধ্যে—

সত্যিই ভুলে গিয়েছিল অমিতা। লজ্জা পেল।

—বস না চেয়ারটায়!

—বসছি!

—ভাল ক'রে বস।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই বসল সমীর। নিতান্তই বৌদির অনুরোধে।

—তোমার দাদা যেদিন আসবে খোকনকে যেন নিয়ে আসে!

—আচ্ছা! এবারে আসি বৌদি! সময় হয়ে এল যাবার!

এখনই উঠে যাবে? থাকবে না আর একটু! কেন? থাকল না। চ'লে গেল সমীর।

দিদিমা ক্ষেপে গিয়েছে! ওঁর ভাসুরপো এসেছিল একদিন! ঘরেও ঢোকে নি! সুলোচনা এসে কথা শুরু করল। তারও মন খারাপ। কেউ আসে নি তারও—

কেন! রোগীর ঘরে ঢুকতে ভয় পায়! রাজরোগ তো! এর ছোঁয়ায় বিষ। এ রোগ হ'লে কেউ আসবে না। কেউ ছোঁবে না। অত আপনার স্বামী-পুত্র, সেও না!

এ কথা ভাবে নি অমিতা। সত্যি! তবে? কি ক'রে থাকবে এখানে? কোন্ আশায়! তাই কি সমীর অমন ক'রে দাঁড়িয়েছিল? বসতে বলায় বসল যেন আলতো ভাবে, অনিচ্ছায়, এ ঘরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে। তাই অত তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। সেই জন্যেই কি সে আসে নি, ভাইকে পাঠিয়েছে? কই, বাড়ীতে তো এ রকম ছিল না। হাসপাতালে আসায় সে কি অন্য মানুষ হয়ে গেল?

নিমেষের মধ্যে ভুলে গেল অমিতা বাড়ীর কথা। খোকনের কথা। রণজিতের কথাও। কেন এল সে হাসপাতালে, বাড়ীতে থাকলেই পারত। একটু বিশ্রাম, ভাল খাওয়া, ইনজেকশান, তাহলেই ত ভাল হয়ে যেত। সেই ত হতে দেয় নি। দুধ এসেছে আধ সের ক'রে রোজ তার জন্যে। অমিতা খায় নি। খোকনকে একবারের জায়গায় তিনবার খাইয়েছে। সে বুড়ী হ'তে চলেছে, সে কি খোকনকে না খাইয়ে দুধ খেতে পারে? স্বামী খেটে খেটে রোগা হয়ে গেল, তাকে চায়ে একটু বেশী ক'রে দুধ না দিয়ে সে দুধ খাবে! কি হয়েছে তার যে সবাইকে বঞ্চিত ক'রে দুধ খেতে হবে!

সে তা খায় নি, তা কোনো মেয়েই পারে না। আর পারে নি ব'লেই এ রোগ। কতদিন খায় নি পেট পুরে কেউ জানে না। সকলকে খাইয়ে বেলা একটা-দু'টোর সময় অমিতা কি দিয়ে ভাত খাচ্ছে কাউকে খোঁজ নিতে দেয় নি। আর তাই ক'রেই সে রোগ বাধিয়েছে।

কিন্তু কেন? কেন এ রোগ! কোনো অন্যায় ত সে করে নি। স্বামী-পুত্র সংসারের জন্যে তার নিজের কিছুই সে রাখে নি। কোন পাপ সে করে নি। এ সংসারে এসে নিজের জন্যে ভাবে নি ব'লেই কি এ রোগ! কেন এ রকম হবে? এ অবিচার কেন? সে ত ইচ্ছা ক'রে কম খায় নি। পেট ভ'রেই ত খেতে চেয়েছে, সবাইকে খাওয়াতে চেয়েছে! কেন পারে নি? কেন পারে না? কে জবাব দেবে? কেন সকলের যে সেবা করবে, সে এই রকম রোগে ভুগবে? সকলের থেকে আলাদা হয়ে যাবে?

কয়েকদিন মন খারাপ হয়ে রইল। মনে হ'ল এ জগতে সে একা। এখানে কেউ তার আপনার নয়। এই

কালরোগ তাকে মুক্ত পৃথিবীর আলো-হাওয়া থেকে কেড়ে নিয়ে এসে হাসপাতালের এক কোণে বন্দী ক'রে রেখেছে।

বিকালে সকলেই বেড়াতে বেরিয়েছে। বসেছিল মুখ ভার ক'রে অমিতা।

রণজিৎ এসে হাজির।

না, ঐ ত এসেছে। ভোলে নি ত! তাই কখনও ভুলতে পারে? সবাই আছে তার। মিছামিছি মন খারাপ করেছে সে। খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠল অমিতা। রণজিৎ আসতেই ছুটে গিয়ে প্রণাম করল স্বামীকে।

—কি হ'ল? হঠাৎ প্রণাম যে!

—বা রে, প্রণাম করব না! গুরুজন যে—

—ওরে বাবা! গুরুজন-টন নই! আমি তোমার—

স্বামীর হাতটা হঠাৎ টেনে নিল ওর কোলের ওপর।

—যাও! চল, বাইরে যাই! মাঠে ব'সে গল্প করব।

হাসপাতালের উত্তর দিক্‌টায় ভিড় কম। মেটে রাস্তা ওদিকে। বড় বড় ঘাসবন। বেশ নির্জন। সেখানে গিয়ে বসল দু'জনে।

—তোমার চেহারা কিন্তু বেশ ভাল হয়েছে, চেনা যায় না, দেখলে মনে হয়—

যাঃ! নববধূর মতো লজ্জায় মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল অমিতার। চোখদুটো নামিয়ে ব'সে রইল একটুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে স্বামীর সারা দেহের উপর চোখ বুলিয়ে বলল—তোমার চেহারা কিন্তু খারাপ হয়েছে!

—হবে না! তুমি নেই! তোমার জন্য ভেবে ভেবে—

—আহা-হা—তাই বুঝি একখানা পত্র দিতেও পার না!

—আসব আসব করছি ক'দিন থেকে, তাই আর পত্র দেওয়া হয় নি।

—খোকন কেমন আছে? কাঁদছে না?

—না, ভালই আছে!

—রাত্রে আমায় খোঁজে না?

—খোঁজে না আবার! রাত্রেই রাখা দায়! তোমার জন্য মন কেমন করে বোধ হয়। গুমরে গুমরে একটু রোগা হয়ে গিয়েছে।

আর শুনতে পারে না অমিতা একথা। তার খোকন তার কথা ভেবে রোগা হয়ে গিয়েছে। যে শিশুর এক মুহূর্তও মাকে ছেড়ে থাকার কথা নয় সে আট-দশ দিন মাকে ছেড়ে আছে। সে আর পারে না। পৃথিবীতে সকলকে ছেড়ে সে থাকতে পারে কিন্তু খোকনকে ছেড়ে নয়। খোকন বিনা তার বাঁচতে ইচ্ছা করে না। কি হবে ভাল হয়ে, যদি খোকনই শুকিয়ে যায়।

—শোনো! স্বামীর হাতটা হঠাৎ টেনে নিল ওর কোলের ওপর।

অন্যমনস্ক ছিল রণজিৎ। একটু বুঝি চমকে উঠেছিল অমিতা ওকে ছুঁতেই!

—কি হ'ল! স্বামীর মুখের দিকে চাইল অমিতা।

—কিছু না ত! কি হ'ল রণজিৎ বুঝল না কিছু! চেয়ে চেয়ে দেখছিল, অমিতার মতো কত মেয়ে-বৌ

বেড়াচ্ছে। এরা সকলেই রোগী। দলে দলে এত মেয়ে-পুরুষ হাসপাতালে আসছে! কি অবস্থাই হয়েছে দেশের! কিভাবে বাড়ছে এই রোগ দিনের পর দিন।

—ওঃ! স্বামীকে অন্যমনস্ক দেখে হাতটা ছেড়ে দিল অমিতা। সে ছুঁতেই চমকে উঠল কেন রণজিৎ? সে কি চায় না যে অমিতা তাকে স্পর্শ করুক? অমিতা ছুঁলেই কি তার রোগ ওকে আক্রমণ করবে? একজনকে ছুঁলেই কি রোগ তার দেহে সংক্রামিত হয়? অমিতা কি তাই চায় নাকি? সে কি সেই কথা মনে ক'রেই ছুঁয়েছে তার স্বামীকে!

যাবার সময় হয়ে এল। ওরা উঠে এল ঘরে। তার পর চ'লে গেল রণজিৎ।

যাবার আগে ভেবেছিল খোকনকে একদিন নিয়ে আসার কথা বলে। মনেও হয় নি। তার ক্ষয়রোগ। সে সকলের অস্পৃশ্য। তাকে ছুঁলেই রোগ হবে। সে মানুষ নয়, আজ শুধু রোগী।

দিনরাত নানা রকমের ভাবনা অমিতাকে ভাবায়। এর মধ্যে রণজিৎ আরও দু' দশ বার এসেছে, সমীরও। বার বার বলেছে অমিতা খোকনকে আনতে। খোকনকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে। ছ' মাসে কত বড় হয়েছে? রোগা হয়েছে কতখানি? আনে নি কেউ।

হঠাৎ পত্র দিল রণজিৎ। খোকনকে নিয়ে আসছে সে। পত্র পেয়ে আনন্দে নেচে উঠল অমিতার সারা দেহমন, খোকন আসছে। তার খোকন। উঃ, কতদিন তাকে দেখে নি সে। যে একটু চোখের আড়াল হলেই সারা দুনিয়া অন্ধকার দেখত অমিতা, সেই খোকনকে ছাড়া সে ছ' মাস হাসপাতালে আছে।

—জান সুলোচনাদিদি—আজ খোকন আসবে! রণজিতের খোলা চিঠিটা হাতে ক'রেই এগিয়ে গেল ওর সুমুখে।

—তাই নাকি!

চারটে থেকে ভিজিটিং সুরু। দুপুরে রোজ খেয়ে ঘুমোয় ও। সেদিনে ঘুম এল না। তার সাত রাজার ধন এক মাণিক আসছে। যে খোকন তার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে ঘুমোত। মা ছুঁয়ে না থাকলে যার ঘুম আসত না সেই সোনা আসছে। এমন আনন্দের দিন তার জীবনে আর আসে নি। তার খোকনকে সে দেখবে ছ' মাস পরে! ছ' মাস নয় ছ' বছর, ছ' যুগ যেন!

বেলা তিনটে থেকে সাজতে বসল অমিতা। খোকন আসবে মার কাছে। হাসপাতালে আসার পর যে নতুন শাড়ীটা দিয়েছিল রণজিৎ সেটা পরল। কপালে সিঁদুরের টিপটা দিল বড় ক'রে। বাড়ীতে খোকনকে যখনই আদর করতে গিয়েছে তখনই মায়ের কপালের সিঁদুর-টিপটা একদৃষ্টে চেয়ে দেখেছে ও। তার পর টিপটাতে হাত বাড়িয়েছে। টিপটাকে সারা কপালময় অমিতার ছড়িয়ে দিয়েছে। কপালে চোখে মুখে সিঁদুরগুলো ঝুর ঝুর ক'রে ঝ'রে পড়েছে।

সেই খোকন আসছে। কোলে এসেই অমিতার সিঁদুরের টিপ দেখবে। হাত দিয়ে ছড়িয়ে দেবে সিঁদুরগুলোকে সারা কপালে।

চারটে বাজল। অমিতা ঘর-বার করল। কই, আসছে কই! শিশুর মতো ছট্‌ফট্‌ করতে দেখে দিদিমা বললেন—বলি কনের সাজ হয়েছে ছেলের জন্যে, না ছেলের বাপের জন্যে!

—যান! দিদিমা ভারী ইয়ে—

আসে না। তবু আসে না। চারটে বেজে দশ মিনিট হয়ে গেল।

আসছে! আসছে খোকন। ঐ যে! লাল বুশ-সার্ট খোকনের গায়ে। যেটা সে পছন্দ ক'রে কিনিয়েছিল রণজিৎকে দিয়ে। জামাটা একটু বড় বড় হয়েছিল তখন। সেই জামাটাই ত! ভারী সুন্দর দেখায় খোকনকে ওটা পরলে।

—খোকন! সোনা! রণজিৎ ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ছুটে গেল অমিতা।

খোকন বাপের কাঁধে মাথা রেখে অন্যদিকে তাকিয়েছিল। মার কথা শুনে ঘাড় ঘোরাল।

—খোকন! বাবু রে!

খোকন নির্বিকার। মায়ের দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল।

বাবু রে! মা ডাকছে—মা! যাও!

বাবার কথায় খোকন আর একবার মায়ের দিকে চেয়ে বাবাকে আঁকড়ে ধরল।

—কই! খোকন! আমার মাণিক! এস! কোলে এস! রাগ হয়েছে বুঝি মায়ের ওপর! এস! বাপন্ এস।

খোকন আসবার কোনো লক্ষণই দেখল না।

কি হ'ল! তার খোকন তাকে ভুলে গেল। চিনতে পারল না মাকে যে খোকন তার কোল-ছাড়া কারও কোলে যেত না, তাকে জড়িয়ে ধরে রাত্রি না শুলে যার ঘুম আসত না, সেই খোকন ভুলে গেল মাকে!

একবার মায়ের দিকে চেয়ে বাবাকে আঁকড়ে ধরল।

—খোকন! একটু চেঁচিয়ে ডাকল অমিতা।

তবু মুখ ঘুরিয়ে রইল দেড় বছরের বাচ্চাটা।

—আমি তোর মা খোকন! আয় বাবা! কান্নায় ভেঙে পড়ল অমিতা, হাউ হাউ ক'রে ডুকরে কেঁদে উঠল।

এল না তার খোকন! যাকে সে হাসপাতালে আসবার সময় মায়ের কোলে দিয়ে আসতে পারে নি। যে আঁকড়ে ধরেছিল তাকে দু'হাত দিয়ে। জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে যাকে শাশুড়ীর কোলে দিয়ে আসতে হয়েছিল, সেই খোকন। যে তার শয়নে-স্বপনে সমস্ত চিন্তা-ভাবনায় জড়িয়ে আছে। তার দেহের অণু-পরমাণুতে তার স্নেহ-ভালবাসায়, তার নারীত্বে, তার অস্থিমজ্জায়, হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যে খোকন খেলা করে, ঘুমোয়, সেই খোকন! আসবে না। তার আত্মজ তার কাছেই আসবে না। যাকে এমন করে ভুলে যাবে মায়ের খোকা। মায়ের ওপর কোনো লোভই নেই তার।

মাথাটা গরম হয়ে ওঠে অমিতার। যে ছেলের জন্যে দীর্ঘ ছ'মাস সে অপেক্ষা ক'রে আছে সে-ই ভুলে গেল। মা হয়ে সে পারবে না ঐটুকু শিশুকে কোলে আনতে! খোকনের কোনো লোভের কথাই কি মার মনে নেই?

আছে। মনে আছে অমিতার। পারবে। সে যে মা। তাকে পারতেই হবে।

ভুলে গেল অমিতা সে নারী। সে স্ত্রী। সুমুখে দাঁড়িয়ে একজন পুরুষ মানুষ। বাইরের যে কেউ হঠাৎ ঢুকতে পারে এ সময় কেবিনে।

সব ভুলে গেল অমিতা। শুধু তার মধ্যে জেগে রইল সন্তানের জীবন-নির্ভর চিরন্তন সেই মা। সে মা ছাড়া আর কিছু নয়।

অমিতা তাড়াতাড়ি ব্লাউজের বোতাম খুলে খোকনের সুমুখে মাতৃস্তনটা তুলে ধরল—বাপন্—নন্ খাবি নে—একটুকাল চেয়ে রইল খোকন মায়ের মুখের দিকে। তার পর মাকে চিনতে পেরে দু'হাত বাড়িয়ে দিল মায়ের কোলে আসার জন্য। মায়ের চোখে নেমেছে একদিকে জলের ধারা আর একদিকে হাসি। রণজিৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের চোখে-মুখে কান্নাহাসির খেলা দেখছে।

তৃষাতুর মাতৃহৃদয়জ্বালা জুড়াতে মাও দুই হাত বাড়িয়ে দিল।

—না, আমাদের যে যক্ষ্মা! তাই ঘরে আসেন না বাবু। পাশের ঘরেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দিদিমা ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে চলেছে তার আত্মীয়ের ব্যবহারে।

যক্ষ্মা! দিদিমার কথা কানে যেতেই যে হাত অমিতা বাড়িয়েছিল খোকনকে কোলে নেবে ব'লে, সে হাত নামিয়ে নিল। তারও যে যক্ষ্মা। এই রোগ নিয়ে তার খোকনকে কোলে নেওয়া যায়? এই কথাটা সে ভুলে গিয়েছিল কেমন ক'রে?

—না, খোকন না, আমি তোর কেউ নই! আমি কেউ নই।

দ্বিগুণ কান্নায় ভেঙে পড়ল অমিতা বিছানার ওপর।

খোকন মায়ের কোলে আসার জন্য তখনও হাত বাড়িয়েই আছে।

—•—

স্কুল থেকে ফিরে স্ত্রী বললেন, 'তোমার দপ্তরী নিয়ে এসেছি। ইনি আমাদের স্কুলের সব বই বাঁধান। চমৎকার লোক।'

চমৎকার লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ছোটখাটো রোগা মানুষ, শ্যামল রঙ, কালো চাপদাড়ির ভেতর প্রসন্ন হাসি। বেশ সৌখিন, জালিগেঞ্জীর ওপর ধপধপে পাঞ্জাবী, পরিষ্কার নতুন টুপি, লুঙ্গিটা সিল্কের, পায়ের কালো জুতোজোড়া চকচক করছে। কপালে হাত তুলে অভিবাদন জানালো আমাকে: 'সেলাম বাবু!'

বেশ লাগল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'একটু ভাল ক'রে বাঁধিয়ে দিতে পারবেন তো মিঞা সায়েব? বইগুলো কিন্তু দামী।'

প্রসন্ন হাসিটি সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল, ভারী সুন্দর দাঁতগুলি। জবাব এল, 'কাজ দেখে খুশী হলে তবেই পয়সা দেবেন বাবু। আর মেহেরবানি ক'রে আমাকে আজিজ ব'লেই ডাকবেন—আমি তো আপনাদেরই হুকুমের চাকর।'

এই হ'ল আজিজ দপ্তরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

প্রথম দর্শনেই মন খুশী হ'ল বটে, কিন্তু খট্‌কা গেল না। বইগুলো কেবল দামী নয়—দুষ্প্রাপ্যও বটে। একখানা খোয়া গেলে আর যোগাড় করা সম্ভব নয়। অনেকটা এই কারণেই ভরসা ক'রে যাকে-তাকে বাঁধাতে দিতে পারি নি এতদিন।

মনের ভাবটা স্ত্রী অনুমান করলেন।

'তুমি কিছু ভেবো না। আজ দশ বছর আমাদের স্কুলের কাজ করছেন।'

'হাঁ বাবু, বড় দিদিমণি আমার সবই জানেন। নিমকহারামি করব আপনাদের সঙ্গে? সে নয় করলাম, কিন্তু মাথার ওপর খোদা আছেন—তাঁকে তো ফাঁকি দিতে পারব না?'

তবু বিশ্বাস ক'রে সব বই দিতে পারলাম না—কিছু দিলাম।

নিয়ে এল নির্দিষ্ট দিনে—একেবারে নির্দিষ্ট সময়ে। সুন্দর বাঁধিয়েছে—অনুযোগ করবার কিছু নেই। দামও যে বেশী চাইল তা নয়।

'পছন্দ হয়েছে বাবু?'

'হাঁ, বেশ হয়েছে।'

আরো কিছু বই এনে দিলাম।

ওকে দিয়ে তুমি ঘড়ি আর তারিখ মিলিয়ে নিতে পারো।

তার পর ধীরে ধীরে আজিজ মিঞা দিনযাত্রার সঙ্গে অচ্ছেদ্য হয়ে গেল। মাষ্টারীর জীবনে আর কিছু না হোক—স্তূপাকারে বই এসে জমেছে, তার সঙ্গে নানা রকম পত্র-পত্রিকা তো আছেই। ফুটপাথ থেকে প্রায়ই ছাই উড়িয়ে টুকুরো-টাকুরা রত্ন সংগ্রহ করি—সেগুলোকেও ভাল ক'রে বাঁধিয়ে না নিলে চলে না। অতএব আজিজ মিঞাকে প্রায় প্রত্যেক মাসেই একবার ক'রে স্মরণ করতে হয়।

ফলও পেয়েছি। নিজের শেল্‌ফ আর আলমারীগুলোর দিকে তাকালে আগে প্রায় গা ঘুলিয়ে উঠত। ছেঁড়া, আধ-ছেঁড়া, উইলাগা, পোকা-কাটা, বিশৃঙ্খল বইয়ের গায়ে হাত দিতে ইচ্ছে করত না, একখানা দরকারী বই খুঁজতে গেলে তিনটে আলমারী আর দুটো শেল্‌ফ্ হাঁটকাতে হ'ত এবং তাতে যে পরিমাণ ধুলো হাতে, মুখে, চুলে এসে জড়ো হ'ত—তার কাছ থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্যে আধখানা সাবানই খরচ হয়ে যেত। কিন্তু আজিজ মিঞা আসবার পরে আলমারীগুলোর চেহারাই বদলে যাচ্ছে। ধূলি-মলিন সরস্বতীর গায়ে লক্ষ্মীশ্রী লেগেছে, বাঁধানো বইগুলো ঝকৃঝকৃ করছে নতুনের মত, যারা জীর্ণতার প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছেছিল, তারা সোনালী লেখার অলঙ্কারে যেন নবযৌবন ফিরে পেয়েছে।

একটি দিনের জন্যেও আজিজের কথার খেলাপ হয় নি। রোদ-বৃষ্টি-শীত-ঝড়—সব মাথায় বয়ে, ঠিক দিনটিতে, ঠিক সময়ে আমাকে বই পৌঁছে দিয়ে গেছে। স্ত্রী হেসে বলেছেন, 'ওকে দিয়ে তুমি ঘড়ি আর তারিখ মিলিয়ে নিতে পারো।'

কাজের তাড়া না থাকলে দু'দশ মিনিট ব'সে গল্প ক'রে যেত কোনো কোনো দিন। ঘর-সংসারের কথাও হ'ত।

দেশ ঢাকায়। বিয়ের তিন বছর পরেই স্ত্রী মারা যায়—একটি এক বছরের ছেলে রেখে। বড় ভালবাসত স্ত্রীকে—আবার বিয়ে করবার কথা ভাবতেও পারে নি। (এখানে আমার একটু কেমন কেমন লেগেছিল। যাদের ভেতর চারটি বিয়ে করবার ধর্মীয় নির্দেশ আছে—প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুতেই তার এমনি বৈরাগ্য এসে গেল!) আগে ঢাকাতেই বই বাঁধাইয়ের কাজ করত, স্ত্রীর মৃত্যুর পরে আর ওখানে থাকতে পারল না, চ'লে এল কলকাতায়। ছেলে এক দূর-সম্পর্কের চাচা-চাচীর স্নেহে বড় হতে লাগল।

কলকাতায় এসে কারিগর হয়ে ঢুকেছিল, ক্রমে আলাদা দপ্তরীখানা খুলল। নানা জায়গায় কাজ পায়—

বাবুরা মেহেরবানি করেন, আল্লার দোয়ায় ব্যবসা এখন ভালই চলছে। মেশিনও কিনেছে। বছর চারেক হ'ল ছেলেকে কাছে এনেছে—এখন চৌদ্দ-পনের বছর বয়স—বাপের কাজে সে-ই সাহায্য করে।

বলতে বলতে উজ্জ্বল চোখ আরও জলজল্ ক'রে উঠত আজিজের। পরিতৃপ্ত গর্বে ভ'রে উঠত মুখ।

'ছেলের মতো ছেলে বটে বাবু—আমার আলি! এই বয়সেই যেমন পরিষ্কার কাজ—তেমনি হাত চলে। পনের-বিশ কর্মার বই দেখতে দেখতে তৈরি হয়ে যায়। বলে, বা-জান, আমি আর একটু বড় হই, তার পর তোমায় আর এ-সব কাজে হাত লাগাতে দেব না। তখন তুমি কেবল তাকিয়া ঠেস দিয়ে গুড়গুড়ি টানবে।'

আমি বলতাম, 'সব বাপই তো ছেলের কাছ থেকে এই রকম আশা করে আজিজ! এর চাইতে সুখের কথা আর কি আছে!'

আজিজের জলজলে চোখে এইবার জল এসে যেত: 'আশীর্বাদ করুন বাবু, ছেলেটা আমার বেঁচে থাকুক।'

এম্‌নি চলছিল—এর মধ্যে কখন থম্‌থম্ ক'রে উঠল আকাশ। রায়ট্ বাধল কলকাতায়।

যুদ্ধ আর মন্বন্তরের সমস্ত কলঙ্ককে আরও কালো ক'রে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তের বন্যা নামল। সকাল-সন্ধ্যা, রাত্রি-দিন, এক অমানুষিক দুঃস্বপ্নের রূপ নিলে। মানুষের ভেতরকার জানোয়ারকে একবার জাগিয়ে দিলে সে সভ্যতার কাঁটাটাকে যে কত পেছনে ঘুরিয়ে দিতে পারে, চোখের সামনে ফুটে উঠল তার নগ্ন নির্লজ্জ প্রমাণ। উৎকট হিংসা আর বীভৎস সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বাষ্পে সূর্যের চোখ অন্ধ হ'ল, বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেল, রাত্রির অন্ধকারের বুক ফাটিয়ে দিকে দিকে নাচতে লাগল আগুনের জিভ, নরক থেকে উঠে আসতে লাগল কোলাহল, মিলিটারীর রাইফেলের গুলী আর কালী বোমার আওয়াজে হিন্দুর ঈশ্বর এবং মুসলমানের আল্লা এক সঙ্গে বধির হয়ে গেলেন।

বেঁচে আছি, না প্রেতলোকে বাস করছি—সে খবরটাও তখন মনের কাছে স্পষ্ট নয়। কলেজের দরজায় অনির্দিষ্টকালের জন্যে তালা ঝুলছে। প্রাণ হাতে ক'রে বাজারে বেরুনো ছাড়া সাধ্যমতো বাড়ীর ভেতরে মুখ লুকিয়ে থাকি—পথে বেরুলেই চোখে পড়ে, পোড়া ছাই আর ফুলে ওঠা মরা। কলকাতার উজ্জ্বল নীল আকাশ আর উষ্ণ সূর্যের আলো থেকে যেন কার মন্ত্রবলে চ'লে গেছি আণ্ডার-গ্রাউণ্ডের ভেতর—একটা দুর্গন্ধভরা অন্ধকূপে ব্যাধিগ্রস্ত কতগুলো ইঁদুরের মতো অন্তিমের অপেক্ষা করছি।

তখন কোথায় আজিজ দপ্তরী—কোথায় কে!

ধীরে ধীরে দাঙ্গাটাও অভ্যস্ত হয়ে এল। ক্রমশ: ছোরা-চালানো আর হুল্লোড় হাঙ্গামা কতগুলো অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। সেগুলো বাঁচিয়ে চলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। সারা কলকাতাই কতগুলো টুকরো টুকরো ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল। নিজের সীমান্ত না পেরুলে মোটের ওপর নির্ভাবনা।

এমনি একদিন দুপুরে একতলার বসবার ঘড়ে কী একটা পড়ছিলাম। নির্জন গলিটা মধ্যরাতের মতো স্তব্ধ—সদর রাস্তা থেকে কখনো কখনো দু'একটা মিলিটারি লরী কিংবা বাসের আওয়াজ আসছিল। এমন সময় হঠাৎ কে ডাকল: 'বাবু!'

তাকিয়ে দেখি, জানালার গরাদে ধরে একটি মানুষ দাঁড়িয়ে।

রোগা অস্থিসার চেহারা, গায়ে ময়লা ফতুয়া, পরণে ছোট একটুকরো ধুতি। মাথায় বড় বড় রুক্ষ চুল। চোয়াল-বসা গাল, দুটো উদ্‌ভ্রান্ত চোখ। আবার ভাঙা গলায় ডাকল: 'বাবু!'

বললাম, 'কী চাও তুমি?'

'আমাকে চিনতে পারলেন না বাবু? আমি আজিজ দপ্তরী!'

আজিজ দপ্তরী! চোখের সামনে গড়ের মাঠের মনুমেণ্টটা হঠাৎ ডিগবাজী খেয়ে উঠে দাঁড়ালেও অতখানি চমক লাগত কি না সন্দেহ! সেই নতুন টুপি, কালো চাপদাড়ি, সৌখান ধোপ-দুরস্ত জামাকাপড়, সেই এক মুখ প্রসন্ন হাসি! কোথায় গেল সেই আজিজ মিঞা! তার বদলে এ কে দাঁড়িয়ে রয়েছে জানালার সামনে!

তবু আজিজই বটে। বাঁ-হাতের অনামিকায় ওই তামার আংটিটাই তার প্রমাণ।

সভয়ে বললাম: 'কোন্ সাহসে তুমি এ পাড়ায় এসে ঢুকেছ আজিজ? কেউ যদি তোমায় চিনতে পারে—'

উদ্‌ভ্রান্ত চোখ মেলে আজিজ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে: 'জান নিয়ে নেবে—তার চেয়ে আর বেশি কী করবে বাবু! আজ এক মাস হ'ল আমার আলি তালতলায় গিয়েছিল,

বলেছিল, বাজান, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব। আজো সে ফেরে নি। আমার ঘর পুড়ে গেছে—[illegible] হয়ে গেছে। কোনোদিন এক মুঠো খেতে পাই, কোনোদিন পাই না। বাবু, বেঁচে থেকে আমি কী করব?'

একটা হাতুড়ির ঘা দিয়ে কেউ যেন আমার হৃৎপিণ্ডটাকে গুঁড়িয়ে দিলে। পৃথিবীতে এমন অন্যায় আছে—যার বিরুদ্ধে নালিশ করবার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না; এত বড় দুঃখ আছে—যার সান্ত্বনা দেবার শক্তি কোনো মহামানবও কোনোদিন আয়ত্ত করতে পারে নি।

যে ভাবে বসেছিলাম, সেই ভাবেই অনেকক্ষণ ব'সে রইলাম। আজিজের চেহারাটা যেন চোখের সামনে ছায়া হয়ে গেল।

স্তব্ধতার ওপর কয়েকটা বুদ্বুদের মতো আজিজের স্বর ফুটে উঠল: 'দুটো টাকা আমায় দিতে পারেন বাবু? কাল থেকে খাই নি—আর না পেরে ভাবলাম, যা হবার হোক, একবার প্রোফেসার সাহেবের কাছেই যাই। দেবেন দুটো টাকা? দিনকাল ফিরে এলে বই বাঁধিয়ে শোধ ক'রে দেব।'

পাঞ্জাবিটা গায়েই ছিল, কয়েকটা টাকাও ছিল পকেটে। তাড়াতাড়ি পাঁচটা টাকা ওর হাতে দিয়ে বললাম: তুমি দেশে চ'লে যাও আজিজ—কলকাতায় আর থেকো না।'

আজিজ জবাব দিলে না। শুধু একবার ভাঙা গলায় বললে: 'সেলাম বাবু।'—তারপর কুঁজো হয়ে, নিজের শরীরটাকে একটা অসহ্য ভারের মতো টানতে টানতে চ'লে গেল সামনে থেকে।

হাতের বইটা আমার টেবিলের ওপর প'ড়ে রইল। এতক্ষণে কাজে এল, দুপুরের নৈঃশব্দ্য ছাপিয়ে গলির ওদিকের তেতলা বাড়ীটা থেকে সেই ভদ্রমহিলা আবার কান্না আরম্ভ করেছেন। দিন সাতেক আগে ওঁর বড় ছেলে ফলপট্টির কাছে গুণ্ডার ছুরিতে খুন হয়ে গেছে!

সেই মুহূর্তে চূড়ান্ত তিক্ততার ভেতরে আমার মনে হ'ল, বাংলা দেশের একটি মানুষেরও আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই, প্রত্যেকেরই এখন আত্মহত্যা করা উচিত।

দেখতে দেখতে পাঁচটা বছর পার হয়ে গেল। যুদ্ধ থামল, পাকিস্তান হ'ল, উদ্বাস্তুর ঝাঁক এল। এর মধ্যেই সুখে-দুঃখে আবার সেই ঢিমে-তেতালার জীবনযাত্রা। সেই কলেজের ক্লাস, কিছু উপরি-রোজগারের আশায় মুখে রক্ত-তোলা খাটুনি, খবরের কাগজ প'ড়ে রাজনীতি কপচানো, বাজার করা, কালে-ভদ্রে সিনেমায় যাওয়া, ওষুধ-ডাক্তার, বাড়ীওলার সঙ্গে খিটিমিটি।

কলকাতার রাস্তা থেকে দাঙ্গার রক্ত মুছে গেছে, উদ্বাস্তুরা গা-সওয়া হয়ে গেছে, যেমন ছিলাম তেমনিই আছি। এমনি সময় আবার একদিন: 'সেলাম বাবু সাহেব আমি আজিজ দপ্তরী।'

কলেজ-ফেরত দ্রুতপায়ে আসছিলাম, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়েও থমকে পড়তে হ'ল। সেই পাঁচ বছর আগেকার দিনটা ফিরে এল মনের সামনে।

সসংকোচে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম আজিজের দিকে। কি বলা যায়?

আজিজ বললে: 'বাসা বদ্‌লেছেন বাবু? গিয়ে আমি খোঁজ পেলাম না।'

সেই আজিজ—না, সে আজিজ আর নেই! আর দাড়ি রাখে নি। মাথার চুলগুলো এই পাঁচ বছরে শাদায়-কালোয় একাকার হয়ে গেছে। গায়ে একটা পুরোনো ছিটের হাফ শার্ট, পরণে ময়লা চেক লুঙ্গি। চোখের দৃষ্টি ঘোলা। কী একটা রোগে ভুগছে মনে হয়—যেন ধুঁকছে অল্প অল্প।

আলির কথা জিজ্ঞেস করি সে সাহস আমার ছিল না। বললাম: 'দেশে গিয়েছিলে?'

'হাঁ, ঢাকায়। পাকিস্তান হ'ল—ভাবলাম এবার ওখানেই কাজটাজ করব। কিন্তু সুবিধে হ'ল না বাবু। এম্‌নিতেই কাজ কম, তার ওপর এখানকার সব দপ্তরী গিয়ে পড়েছে এক সঙ্গে। তাদের কারো কারো ভালো মেশিন আছে—তদ্বির আছে। আমাদের মতো গরীবকে আর কে পোছে—বলুন। তাই ভাবলাম, ফিরেই যাই কলকাতায়—বাঁচতে তো হবে!'

বাঁচতে হবে—এই কথাটা আমিও ভাবলাম। স্ত্রী নেই—একমাত্র ছেলেটি ছিল, সেও গেছে। তবু বাঁচতে হবে আজিজ মিঞাকে। তার কাজ চাই।

'কিছু বই-টই যদি থাকে বাবু—যদি ঠিকানাটা দেন—'

ঠিকানা দিয়ে বললাম : 'এসো রবিবার দিন।'

রবিবার দিন যখন আমার বাসায় এল, তখন ওকে দেখে আমার স্ত্রীর চোখে জল এসে গেল।

'তোমার অসুখ নাকি আজিজ ?'

আজিজ শীর্ণ হাসি হাসল।

'মানুষের শরীর মা! খোদা যখন যেমন রাখেন!'

আশ্চর্য লোক! এর পরেও ভগবানে বিশ্বাস হারায় নি।

স্ত্রী বললেন : 'স্কুলে যাও না কেন ? গেলেই তো কাজ পাবে।'

আজিজ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল : 'না বড়দিদি, ইস্কুলের কাজ নেবার হিম্মৎ আমার আর নেই। অন্যের কারিগর হয়ে খাটি—ফাঁকে ফাঁকে অল্প-স্বল্প নিজের কাজ করি। ও আর আমি পারব না। আপনার দয়া চিরদিন মনে থাকবে—আল্লাহ-তালা আপনার ভালো করবেন।'

আবার সেই আল্লা! চিৎকার ক'রে একটা প্রচণ্ড ধমক দিতে ইচ্ছা হ'ল লোকটাকে। কিন্তু ওর অদ্ভুত শান্ত মুখ আর নির্বাপিত নিষ্প্রাণ চোখের দিকে তাকিয়ে আমি চুপ ক'রে গেলাম।

কতগুলো মাসিকপত্র বাঁধানোর ছিল, তাই দিয়ে বিদায় করলাম আজিজকে।

সাতদিনের কথা ছিল, এল পনেরো দিন পরে।

'পরের মর্জির ওপর কাজ করি বাবু, তার ওপর হাতে পয়সা ছিল না, এতদিন বোর্ড কিনতে পারি নি। তাই একটু দেরী হয়ে গেল।'

দেরী হয়েছে—তাতে কিছু আসে-যায় না, কিন্তু বইয়ের পাতা খুলেই আমার চক্ষুঃস্থির। বৈশাখ সংখ্যার পরে চৈত্র সাজিয়েছে, তার পরে আষাঢ়—পরের সংখ্যাটা ফাল্গুন। বিজ্ঞাপনের পাতাগুলো পর্যন্ত রেখে দিয়েছে। এক-খানা পত্রিকার ভেতর কি একটা চিঠি রাখা ছিল, সেটা শুদ্ধ বাঁধিয়ে ফেলেছে। কয়েক জায়গায় এমন ভাবে আঠা ফেলেছে যে, তিন-চারটে ক'রে পাতাই জুড়ে গেছে তাতে।

সমস্ত সহানুভূতি তৎক্ষণাৎ চরম বিরক্তিতে গিয়ে পৌঁছুল।

'এ কি কাণ্ড করেছ আজিজ—মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমার ? বৈশাখের পর চৈত্র, ফাল্গুনের পর আশ্বিন। বইগুলোকেই একেবারে শেষ ক'রে দিয়েছ।'

দাঙ্গার সেই দুর্দিনগুলোর ভেতরে, আলিকে হারিয়ে, সর্বস্বান্ত হয়ে যেদিন আজিজ আমার কাছে টাকা চাইতে এসেছিল, সেদিন তার চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না, অসহ্যতম আঘাতে আর শোকে সে জল শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ আজিজ ঝর্ ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেলল।

'রাত জেগে কাজ করেছি বাবু, ধোঁয়া ধোঁয়া দেখেছি চোখে, মাথারও বোধ হয় ঠিক ছিল না। আমাকে মাপ করবেন বাবু, আমি যাই—'

আমি যেমন অপ্রস্তুত, তেমনি লজ্জিত বোধ করলাম।

'কোথায় যাচ্ছ—পয়সা নিয়ে যাও।'

'পয়সা কোন্ মুখে নেব বাবু! আপনার ক্ষতি ক'রে দিয়েছি, পয়সা আপনি আমায় কেন দেবেন। আমাকে মাপ করুন—'

জোর ক'রেই টাকা দিলাম। তিনটে টাকা পাওনা হয়েছিল, একটার বেশী কিছুতেই নেওয়াতে পারলাম না।

'এতে যে তোমার বোর্ডের দামও উঠবে না আজিজ!'

'থাক্ বাবু, পরে হবে—' চোখের জল মুছতে মুছতে প্রায় ছুটেই আজিজ পালিয়ে গেল। অনেকবার ডেকেও ওকে আমি ফেরাতে পারলাম না। শুধু একটা অবরুদ্ধ স্বর যেন অনেক দূর থেকে কানে এল : 'নেমকহারামি করেছি বাবু—নেমকহারামি করেছি আপনার সঙ্গে—'

আজিজের দেখা পেলাম আবার মাস-পাঁচেক পরে।

সকালে বেরুতে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি দোরগোড়ায় বসে অল্প অল্প ধুঁকছে। ছেঁড়া গেঞ্জী গায়ে, পরণে আরো ছেঁড়া একটা লুঙ্গি। দরজার বাইরে পা দিয়েই আমি থমকে গেলাম।

'ব্যাপার কী আজিজ ? কী হয়েছে ?'

'বই আছে বাবু?—বই দেবেন?'—টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।

বললাম, 'তুমি তো ভয়ানক অসুস্থ মনে হচ্ছে! বই বাঁধাতে পারবে?'

'পারব বাবু—পারতেই হবে আমাকে! আছে কিছু? দিন আমাকে—এখুনি দিন! আজ সন্ধ্যাবেলাতেই দিয়ে যাব।'

আমি বিব্রত বোধ করলাম। কী করা যায় ঠিক ঠাহর করা গেল না।

'আমি নেমকহারাম নই বাবু—খোদা জানেন। বই দিন।'

'কমলাকান্তের দপ্তর'টা ছিঁড়ে গেছে—ক্লাসে পড়াতে অসুবিধে হয়। বিভ্রান্ত ভাবে সেইটে নিয়ে এসেই ওকে দিলাম। বললাম, 'কিন্তু তোমার শরীরের যা অবস্থা দেখছি, তুমি কি পারবে?'

'পারব বাবু—আজ সন্ধ্যেবেলাতেই দিয়ে যাব—'

আজিজ কাঁপা হাতে আমাকে সেলাম ক'রে টলতে টলতে চ'লে গেল। আমি বোকার মতো তাকিয়ে রইলাম।

বিকেলে নীচের সেই ঘরটিতে বসেছিলাম। কতগুলো প্রুফ দেখতে হচ্ছিল, তার মধ্যেই মন আর চোখ মগ্ন ছিল। এমন সময় শুনলাম: 'বাবু!'

আজিজ!

আজিজ মাতালের মতো টলছে। ঘোলা চোখ দুটো অন্ধকারে ডোবা—যেন কোনো কিছু সে দেখতে পাচ্ছে না কোথাও। হাতের আঙুলগুলো থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে তার।

'বই ফেরত নিন্ বাবু—পারলাম না। আমার বুকের ভেতরটা শুষে খেয়ে নিয়েছে, আর আমার সময় নেই। আমার পাঁচ টাকার দেনা আর শোধ হ'ল না—'

কাঁপা হাতের ভেতর থেকে বইটা মেজের ওপর প'ড়ে গেল। বাঁধায় নি।

ডাকলাম: 'আজিজ—আজিজ—'

'আমায় মাপ করবেন বাবু, আপনার অনেক দয়া—'

গলির দেওয়াল ধ'রে ধ'রে আজিজ চ'লে গেল—যেন প্রত্যেকটি পদক্ষেপ সে অনন্ত শূন্যের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে। আমি বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম দৃশ্যটা, এবারও ওকে ফিরে ডাকবার শক্তি আমার ছিল না।

আজিজ চ'লে গেল। আমি জানি, আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

বইটা আমি কুড়িয়ে তুলে নিলাম। চোখ পড়ল, জানলা দিয়ে বিকেলের এক টুকরো লাল রোদ এসে পড়েছে টেবিলের ছোট্ট সরস্বতী মূর্তিটার ওপর। হঠাৎ মনে হ'ল, মূর্তিটার গায়ে কে যেন এক আঁজলা রক্ত মাখিয়ে দিয়েছে—দাঙ্গার রক্ত!

—০—

কিছুদিন হইতে এরূপ দুএকটা কথা শোনা যাইতেছে, যে, বাংলাদেশের অমুক লেখকের আগে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ও গণিকারা ভারতীয় বা বঙ্গীয় সাহিত্যে স্থান পায় নাই। এরূপ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। আমরা সাহিত্যের বিস্তৃত জ্ঞানের দাবী করিতে পারি না, কিন্তু ঐরূপ মন্তব্যের বিপরীত দু-একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের নায়িকা বসন্ত-সেনা গণিকা ছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম প্রণীত 'চণ্ডীকাব্যে' কালকেতু, ফুল্লরা, খুল্লনা, প্রভৃতি অভিজাত বা "ভদ্র" শ্রেণীর লোক ছিলেন না। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকে নিম্নশ্রেণীর পুরুষ ও নারী আছে। তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে নিম্নশ্রেণীর অনেক পুরুষ, নারী এবং বারবিলাসিনীও আছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে নিম্নশ্রেণীর লোক আছে। 'সধবার একাদশী'তে অধিকন্তু গণিকা আছে। তাঁহার অন্য নাটকগুলিও এইসব দিক্ দিয়া বিবেচ্য।

'গণসাহিত্য', 'প্রগতিসাহিত্য,' ইত্যাদি নামে অভিহিত সাহিত্যের উৎকর্ষাপকর্ষের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল তথ্যের দিক্ দিয়া দু-একটা কথা বলিলাম।

বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৫৫।

১

উর্ম্মিলার সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ের আলাপ হওয়াটার মধ্যে একটুখানি নূতনত্ব ছিল। জ্যোতির্ম্ময় এই পাড়ার বহু পুরাতন বাসিন্দা, বাড়ী তাহাদের নিজেদের। তাহার ঠাকুরদাদা বাড়ীটি আরম্ভ করেন, এবং একতলা অবধি নির্ম্মাণ করিয়া বেশ কয়েক বৎসর সেখানে বাস করিয়া মারা যান। জ্যোতির্ম্ময়ের বাবা রামগতি দুতলাটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং এখন পুত্র, কন্যা ও পত্নী সহ এই বাড়ীতেই বাস করিতেছেন। চিরকাল হাঁপানীর রুগী, তাই

তাড়াতাড়ি কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বাড়ীতেই বসিয়া আছেন। সমস্ত দিন নিজের পরিচর্য্যা করাই এখন তাঁহার একমাত্র কাজ। গৃহিণীর সঙ্গে বচসাতেও অনেক সময় কাটে। অসময়ে কর্ম্মত্যাগ করার পেন্সন তিনি বেশী পান না। পুত্র জ্যোতির্ম্ময় এখন পর্য্যন্ত যাহা আয় করে তাতে সংসার কষ্টে চলে, সময়-অসময়ের জন্ম কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। ইহা হিসাবী মানুষ রামগতি সহ্য করিতে পারেন না। গৃহিণী সুখদা অতি ঢিলাঢালা স্বভাবের মানুষ, অত হিসাব করিয়া চলিতে পারেন না। এই লইয়া স্বামীর সহিত তাঁহার নিত্য খিটিমিটি লাগিয়া থাকে।

জ্যোতির্ম্ময় এখন কলেজের লেকচারার, তাহা ছাড়া প্রাইভেট্ ট্যুশনও গোটা দুই করে। ইহাতে যে আয় হয় তাহাতে চারজনের সংসার ত চলা উচিত। কিন্তু গৃহিণী কিছুই গুছাইয়া করিতে পারেন না। কন্যা আরতিও মায়ের স্বভাব পাইয়াছে, কোন বিষয়ে হিসাব তাহার স্বভাবেই নাই। কাজেই ধার-কর্জ্জ তাঁহাদের সংসারে লাগিয়াই থাকে।

জ্যোতির্ম্ময় সেদিন কলেজ হইতে বাহির হইয়াই দেখিল, একটা কিছু গোলমাল বাধিয়াছে। রাস্তায় সারিসারি ট্রাম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। নড়িবার তাহাদের কোন্ উদ্দেশ্য নাই, চালক, কন্ডাক্টার, টিকিট-বিক্রেতা সকলেই নামিয়া বেশ আরামে এধার-ওধার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আরোহীরাও সকলেই নামিয়া পড়িয়াছে। ফুটপাথ লোকে লোকারণ্য। পুরুষরা একটু ক্রুদ্ধভাবে বকাবকি করিতেছে, মেয়েরা কিঞ্চিৎ অসহায় ভাবে এদিক্-ওদিক্ তাকাইতেছে।

ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ একটি মেয়ের দিকে জ্যোতির্ম্ময়ের চোখ পড়িল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রং, বড় বড় চোখ, খুব বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। কিন্তু বড় বেশী রোগা মনে হয়। ইহাকে যেন সে সম্প্রতি কোথায় দেখিয়াছে। তাহার চট্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল। তাহাদের পাশের বাড়ীতেই ইহারা সম্প্রতি ভাড়াটিয়া আসিয়াছে। মাত্র দু'জন লোক, একটি প্রৌঢ়া ও এই তন্বী তরুণীটি।

বাঙালী পাড়ায় পাড়া-প্রতিবেশী কাহারও হাঁড়ির খবর জানিতে বাকী থাকে না। ঝি-চাকরেরা এ বিষয়ে প্রধান রিপোর্টারের কাজ করে। বাড়ীর অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরাও কম যায় না। তাহাদের দেখাশোনা, গল্প করার স্থান ও কাল রুচিভেদে ভিন্ন রকমের। মেয়েরা ছাদে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে ভালবাসে। ছেলেরা অলি-গলি ও বড় রাস্তায় দাঁড়াইয়া আড্ডা জমাইতে বেশী ভালবাসে। বাড়ীতে জ্যোতির্ম্ময়ের একটি তরুণী বোন আছে আরতি, এবং একটি প্রৌঢ়া ঝি আছে নিস্তারিণী। কাজেই সদ্য আগত প্রতিবেশিনীদের সব রকম খবর পাইতে বেশী দেরী হয় নাই জ্যোতির্ম্ময়দের।

মেয়েটিও কোন মেয়েদের কলেজে কাজ করে। যদিও চেহারা দেখিয়া তাহাকে মনে হয় কলেজের ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী নয়। প্রৌঢ়া তাহার মাসীমা, বোধ হয় ঊর্ম্মিলার মা বাপ কেহ নাই। নামটা আরতিই সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার প্রাণের বন্ধু শোভা যে কলেজে পড়ে, ঊর্ম্মিলা সেখানেই কাজ করে। খুব বেশীদিন সে কাজে যোগ দেয় নাই। ক'দিন আগেই বা সে পাশ করিয়াছে? দেখিলে ত বয়স কুড়ি-বাইশের বেশী মনে হয় না।

জ্যোতির্ম্ময়ের বিকালেই ছেলে পড়াইতে বাহির হইতে হয়। বাড়ী গিয়া কাপড়-চোপড় বদলাইয়া সামান্য জলযোগ করিয়া সে বাহির হইয়া পড়ে, এবং ছেলে পড়ান ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সন্ধ্যার পর বেশ একটু দেরী করিয়াই বাড়ী ফেরে।

কিন্তু এখন যদি ট্রাম আবার চলিবার আশায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে বা ঘুরিতে হয়, তাহা হইলে সমস্ত কাজেই দেরী হইয়া যাইবে। কাজে ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস জ্যোতির্ম্ময়ের নাই, সে ইহা পছন্দও করে না। ট্রামের আশা ত্যাগ করিয়া অন্য কোন উপায়ে তাহাকে বাড়ী পৌঁছিতে হইবে। এদিক্-ওদিক্ ট্যাক্সির জন্য সে ঘুরিয়া-ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল।

এমন সময় ঊর্ম্মিলা দ্রুতপদে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কুণ্ঠিতভাবে তাহাকে একটা নমস্কার করিয়া বলিল, "আমি আপনাদের পাশের বাড়ীতেই থাকি।"

জ্যোতির্ম্ময় একটু বিস্মিত হইয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তা ত জানি। আপনারা অল্পদিনই এসেছেন, না?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "মাসখানিকও হয় নি এখনও। আজ আমায় একটু বিপদে পড়তে হয়েছে। বিশেষ কারণে আজ আমার একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছান দরকার। কিন্তু শুনছি ত ষ্ট্রাইক হয়েছে, আজকে ট্রাম আর চলবেই

না হয়ত। বাড়ী কি ক'রে যাব বুঝতে পারছি না। এই দারুণ ভীড় আর ঠেলাঠেলির মধ্যে বাস্-এ ওঠাও আমার পক্ষে অসম্ভব। ট্যাক্সি পেলে যেতে পারি, কিন্তু ট্যাক্সি নিয়েও ত মারামারি হচ্ছে। আপনি যদি একটা জোগাড় করতে পারেন তা হলে আপনার সঙ্গে আমি যেতে পারি কি? আপনার কোন অসুবিধে নেই ত?"

জ্যোতির্ময় বলিল, "অসুবিধা বিন্দুমাত্রও নেই। তবে যা ব্যাপার দেখছি, তাতে ট্যাক্সি জোগাড় করাও প্রায় অসম্ভব। আচ্ছা, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি চেষ্টা ক'রে দেখি। এইখানেই থাকবেন কিন্তু।"

দ্রুতপদে ভীড়ের গভীরতম অংশ পার হইয়া সে একটু অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় গিয়া দাঁড়াইল। দূরে আরোহীসহ একটা ট্যাক্সি আসিতেছে দেখা গেল। যদি এইখানেই আরোহী নামিয়া পড়ে তাহা হইলে জ্যোতির্ময় গাড়ীটাকে দখল করিতে পারে।

সৌভাগ্যক্রমে ট্যাক্সিটা গতিবেগ থামাইয়া জ্যোতির্ময়ের অনতিদূরেই আসিয়া দাঁড়াইল। এবং জ্যোতির্ময় সেটার কাছে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র দেখিল ভিতরে তাহারই বন্ধু অখিল বসিয়া পয়সা গুনিতেছে ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া দিবার জন্য। দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া জ্যোতির্ময় বলিল, "তুই নাম্ দেখি তাড়াতাড়ি, আমি গাড়ীটা নিলাম, এখনই আমাকে যেতে হবে।"

"খুব তালের মাথায় এসে জুটেছিস," বলিয়া অখিল নামিয়া গেল। জ্যোতির্ময় ট্যাক্সিটাকে সামনে অগ্রসর হইতে বলিয়া এতক্ষণে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

ঊর্মিলা ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে। জ্যোতির্ময় মুখ বাহির করিয়া ডাকিল, "চট্ ক'রে চ'লে আসুন" বলিয়া গাড়ীর দরজাটা খুলিয়া ধরিল। ঊর্মিলা তাড়াতাড়ি আসিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "বাঁচলাম বাবা। আর খানিকক্ষণ এই গরমে দাঁড়িয়ে থাকতে হলেই হয়েছিল আর কি!"

জ্যোতির্ময় তাকাইয়া দেখিল, মুখ তাহার সত্যই লাল হইয়া উঠিয়াছে। চোখ দুইটাও যেন সজল হইয়া আসিয়াছে। সে বলিষ্ঠ পুরুষমানুষ, ভীড়ে আর গরমে তাহারই মাথা ঘুরিতেছে। এই ক্ষীণাঙ্গী যুবতী যে অসুস্থ বোধ করিবে সে আর বিচিত্র কি?

জিজ্ঞাসা করিল, "—কলেজেই কাজ করেন বুঝি?"

ঊর্মিলা বলিল, "হ্যাঁ, বাড়ী থেকে বড় দূর। কিন্তু উপায় কি? পছন্দমত বাড়ী আর পছন্দমত চাকরী একসঙ্গে ত পাওয়া যায় না?"

জ্যোতির্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "এর আগে কোন্ পাড়ায় ছিলেন?"

ঊর্মিলা বলিল, "ভবানীপুরেই ছিলাম। তবে ঘরগুলো বড় damp, একতলার ঘর। ডাক্তার বারণ করলেন ব'লে সে বাড়ী ছেড়ে দিলাম। এবারে দোতলার ঘর পেয়ে অনেক সুবিধে হয়েছে। পাড়াটা চুপচাপও আছে বেশ। আপনারা কতদিন আছেন এখানে?"

জ্যোতির্ময় বলিল, "আমি ত জন্মাবধিই এখানে। ঠাকুরদাদা বাড়ী করেছিলেন, আমরা সেই থেকে এখানেই থেকে গিয়েছি।"

ঊর্মিলা বলিল, "যাক, একদিক্ দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত আছেন। দু'দিন অন্তর বাড়ী বদল করতে হয় না। অবশ্য এতে জীবনে বৈচিত্র্য আসে একটু, তবে জ্বালাতনও কম আসে না। আমি তিন বছরের ভিতর তিনবার বাড়ী বদল করলাম। কিছু না কিছু অসুবিধা সব জায়গাতেই। এবারে অবশ্য এখনও অসুবিধা কিছু বুঝছি না, তবে কুড়ি-পঁচিশ দিন মাত্র এসেছি।"

কথা বলিতে বলিতে তাহাদের পাড়া আসিয়া গেল। ঊর্মিলাদের বাড়ী আগে পড়ে, জ্যোতির্ময় সেইখানেই গাড়ী দাঁড় করাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। ঊর্মিলা নামিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "ভাড়াটা ত আমারই দেওয়া উচিত।"

ভাড়া চুকাইয়া দিয়া জ্যোতির্ময়ও নামিয়া পড়িল। বলিল, "সেটা আবার হয় নাকি? আপনি না এলেও বাড়ী ত আমি আসতামই।"

ঊর্মিলা বলিল, "চলি তা হ'লে। নমস্কার। আবার দেখা হবে, পাশেই যখন থাকি।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "নিশ্চয়ই হবে। এর আগেই আমাদের আলাপ-পরিচয় হওয়া উচিত ছিল, অতি নিকট প্রতিবেশী ব'লে। তবে বাঙালীরা বড় কুণো, জাতি হিসাবেই; এবং আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাও বড় বিচিত্র।"

"তা সত্যি" বলিয়া উর্ম্মিলা চলিয়া গেল, জ্যোতির্ম্ময়ও মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া নিজেদের সদর দরজার ভিতরে ঢুকিয়া গেল। সবার আগেই সামনে পড়িল আরতি। বিস্ময়ে তখন তাহার চোখ প্রায় ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। দাদাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদা, তুমি উর্ম্মিলাদিকে কোথা থেকে নিয়ে এলে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "রাস্তা থেকে।"

আরতি বলিল, "কি যে বল! তিনি রাস্তায় কি করছিলেন এই দুপুর রোদে?"

তাহার দাদা বলিল, "করবেন আর কি? ট্রাম চলছে না দেখে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।"

আরতি বলিল, "ওঁর সঙ্গে তোমার কবে আলাপ হ'ল?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আজই। আচ্ছা এখন কথা বন্ধ কর্ দেখি, আর আমার চা-টা এনে দে। এমনিতেই আমার দেরী হয়ে গেছে।" বলিয়া বোনকে একরকম ঠেলিয়া সরাইয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেলে। ঝি নিস্তারিণী অল্পক্ষণ পরেই চা জলখাবার লইয়া আসিল। চা খাইতে খাইতে জ্যোতির্ম্ময়ের চোখের সম্মুখে নব-পরিচিতা তরুণীর মুখখানা বার বার ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। বড় রোগা, যদিও মুখখানা সুন্দর। কি রকম সপ্রতিভ আর সহজ ভাবে আলাপ করিয়া লইল। জ্যোতির্ম্ময়েরও কোন সঙ্কোচ বোধ হয় নাই, মেয়েটির সঙ্কোচের অভাব দেখিয়া। আধুনিকা অনেক মেয়েই সে দেখিয়াছে, আলাপও অনেকের সঙ্গে করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সহিত স্বচ্ছন্দভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে সময় লাগে। নানা জনের নানা রকম হাব-ভাব। কেহ বেশী লাজুক, কেহ অতি প্রগল্‌ভা। কেহ যেন প্রথম পরিচয়ে চোখে দেখিতেই পায় না, আবার কেহ বা প্রথম সাক্ষাতেই বৌদিদি বা শ্যালিকার মত রসিকতা করিতে বসে। এই মেয়েটির ধরণ-ধারণে অযথা আড়ষ্টতা কোথাও নাই, অথচ গায়ে পড়া ভাবও কিছুমাত্র নাই।

"চলি তাহলে, নমস্কার! আবার দেখা হবে।"

ছেলে পড়ানো হইয়া গেল, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করা ও বেড়ানোর পালা শেষ করিয়া সে প্রায় রাত সাড়ে ন'টার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিল। আরতি খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পড়িতে বসিয়াছে। ছেলে বাড়ী না ফিরিলে মা খান না, তিনি নিস্তারিণীর সঙ্গে গল্প করিতেছেন এবং বাবার শয়নকক্ষ হইতে প্রবল কাশির শব্দ শোনা যাইতেছে।

জ্যোতির্ম্ময়ের ঘুম ভাঙ্গিবার সময়ের কোন স্থিরতা নাই। শুইতে যাইবার সময়েরও কিছু ঠিক নাই। আজ কেন জানি না ভোর বেলাই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আরতির পড়াশুনায় মন আছে, সে সকালেই উঠে। দাদাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পার্কে যাচ্ছ নাকি?"

দাদা বলিল, "গেলেও হয়, তুই যাবি?"

আরতি ঘাড় দুলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি আবার যাব, দু'দিন বাদে পরীক্ষা না?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "বেড়াবি ত আধঘণ্টা। তাতে আর পড়ার কি ক্ষতি হবে?"

আরতি চটি পরিতে পরিতে বলিল, "আচ্ছা, চল।"

পার্কটা দূরে নয়। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই তাহারা সেখানে পৌঁছিয়া গেল। লোকজন কিছু কিছু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বেশীর ভাগই অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের দল। ঠেলাগাড়ীতে শিশু মনিবদের চড়াইয়া আয়াও কয়েকজন ইহারই মধ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

আরতি জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদা, ঊর্মিলাদি কি subject পড়ান জান?"

দাদা বলিল, "আমি সেটা কি ক'রে জানব? তোদেরই ত জানবার কথা। ডিটেক্‌টিভ লাগিয়ে সবাইকার সব খবর ত তোরাই বার করিস্।"

আরতি বলিল, "আহা ডিটেক্‌টিভ ত কত! যত সব ঝি আর রাঁধুনি। তারা জানে নাকি কিছু? কার কে আছে, কার বিয়ে হয়েছে বা হবে, আর রোজ বাড়ীতে ক'পয়সার বাজার হয় এই অবধি ত তাদের দৌড়। শোভাটাকে জিজ্ঞাসা করলে সে হয়ত বলতে পারে।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "যাঁর সম্বন্ধে তোমার এত কৌতূহল, তিনি কিন্তু এইদিকেই আসছেন। অতএব সাবধানে কথা বল।"

আরতি চাহিয়া দেখিল, ঊর্মিলা পার্কের গেটের ভিতরে ঢুকিতেছে। জ্যোতির্ময় দেখিল, কাল ইহাকে যতটা রুগ্ন ও ক্ষীণজীবী মনে হইয়াছিল, সারারাত বিশ্রামের পর আজ আর ততটা মনে হইতেছে না। কলেজের শাদা পোষাকের পরিবর্ত্তে এখন বেশ-ভূষায় একটু রং-এর আমেজ লাগিয়াছে। তাহাতে তাহাকে আরও অল্পবয়স্কা মনে হইতেছে, এবং ইহাও তাহার যুবাপুরুষের চক্ষু অস্বীকার করিল না, ভালই দেখাইতেছে।

আরতি নীচু গলায় বলিল, "বাবাঃ, কি রোগা ভদ্রমহিলা। তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিও।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "তা দেওয়া যাচ্ছে। তোমার যা কিছু জ্ঞাতব্য সব জেনে নাও। উনি কি ক'রে এত রোগা থাকতে পেরেছেন সেটাও জেনে নিও। মোটা হওয়ার আফ্‌শোষ ত তোমার লেগেই আছে।"

আরতি বলিল, "তোমার মত সাত ফিট্ লম্বা যদি হতাম, তা হলে মোটা হলেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু আমি যে আবার লম্বাও নয়। তোমাকে কেউ মোটা বলবে না, বরং লম্বা-চওড়া সুপুরুষই বলবে। আর আমাকে ত এরই মধ্যে ক্লাসের মেয়েরা 'তাবোল' ব'লে ক্ষ্যাপাতে আরম্ভ করেছে।"

ঊর্মিলা এতক্ষণে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। সহাস্যে জ্যোতির্ময়কে নমস্কার করিয়া বলিল, "ইনি আপনার বোন বুঝি?"

জ্যোতির্ময় হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এই আমার ছোট বোন আরতি।"

আরতির হাত ধরিয়া ঊর্মিলা বলিল, "কোন্ কলেজে পড়?"

আরতি কলেজের নাম বলিল। আরো বলিল, "নিতান্ত বাড়ীর কাছে ব'লে ওখানে ঢুকেছি। পড়াশুনা ভাল হয় না। ওটার চেয়ে আপনাদের কলেজে ঢের ভাল পড়া হয়।"

ঊর্মিলা হাসিয়া বলিল, "পড়া ভাল আর কোথায় হচ্ছে? কত বেশী মেয়ে ঢুকিয়ে কত বেশী টাকা আদায় করা যায়, এ ছাড়া কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের আর কোনদিকে ত দৃষ্টি নেই? নিজেরা পড়াই, বুঝতেই ত পারি। পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়ে দেড়শ' দু'শ মেয়েকে কিই-বা পড়াব। বেশীর ভাগ মেয়ের ত মুখই চিনি না।"

আরতি বলিল, "শোভাকে চেনেন? সেকেণ্ড-ইয়ারে পড়ে, তবে ওর যা subject, আপনি তাকে পড়ান কিনা জানি না।"

ঊর্মিলা বলিল, "শোভাকে চিনি। মেয়েটি পড়ায় বেশ ভাল, আর সামনের বেঞ্চে ব'সে বলে বোধহয় চোখে পড়েছে গোড়ার থেকে। আমি ত লজিক্ পড়াই, বাংলাও পড়াই। দু' ক্লাসেই দেখি ওকে। তোমার খুব বন্ধু বুঝি ও?

আরতি বলিল, "হ্যাঁ, স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি কি না? কলেজে উঠে আলাদা আলাদা জায়গায় চ'লে গেলাম। তবু আমাদের ভাব আগের মতই আছে। ও প্রায়ই আসে আমাদের বাড়ী।"

ঊর্মিলা বলিল, "এইবার এলে দুজনে এসো আমার বাড়ী। সারা বিকেল ত আমি একলা ঘরে ব'সে থাকি। এ পাড়ায় এখনো কারো সঙ্গে আলাপ হয় নি।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "বাঙালী পাড়ায় এই ত মুশ্‌কিল। মানুষ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল বড় উগ্র কিন্তু

interest খুব বেশী নয়। আপনার বাড়ীতে ক' আনার বাজার হয়, জানতে আশেপাশের বাড়ীর গৃহিণীরা খুবই ব্যস্ত হবেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে তার অর্দ্ধেকও ব্যস্ত হবেন না। পুরুষমানুষরা এর চেয়ে কিছু কম সঙ্কোচ করেন। তবে যে পরিবারে পুরুষ কেউ নেই সেখানে অগ্রসর হতে কেউই সাহস করবেন না। আমাদের যে আলাপ হ'ল, সেটা নিতান্ত ট্রাম কোম্পানীর কৃপায় বা নির্ম্মমতায়, যেটাই ধরুন।"

উর্ম্মিলা বলিল, "কাল আপনি যদি ঠিক ঐ সময় ওখানে উপস্থিত না থাকতেন, তা হলে কি যে করতাম জানি না। বাড়ী ফিরতে বোধহয় রাত দশটা বেজে যেত, এবং মাসীমা ততক্ষণে থানায় খবর দিতে ছুটতেন। আমি যে আবার প্রাণ গেলেও ঠেলাঠেলির মধ্যে যেতে পারি না। যখন বেরোলে চলে, তার প্রায় আধঘণ্টা আগে বেরুই একটু ভীড় কম পাব এই দুরাশায়। কলেজটা যদি আর একটু কাছে হ'ত তাহলে হেঁটেই যেতাম। হাঁটতে কিছু অসুবিধে লাগে না আমার।"

আরতি বলিল, "যা গরম, রাস্তায় পা-ই ফেলা যায় না। চটি আটকে যায় 'পিচে।' নইলে আমিও ত হাঁটতেই পারতাম। আমার কলেজ বেশী দূর নয়।"

উর্ম্মিলা বলিল, "আমরা যে আবার ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। পুজোর ছুটি না পেলে আমাদের চলেই না। না হ'লে সারা গ্রীষ্মকালটা ছুটি দিয়ে দিলে মানুষগুলো বাঁচত, না হয় পুজোর সময় ফুর্ত্তিটা একটু কম হ'ত।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সে আর ক'টা মানুষ বা বাঁচত? যারা স্কুলে কলেজে পড়ে আর পড়ায়, তারাই ত? অন্যদের সমানেই রোদে ঘুরতে হ'ত।"

উর্ম্মিলা বলিল, "নিজের ভাবনাই ভাবছি আর কি? কাল আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় নি আমাকে সাহায্য করবার জন্যে। সে ত্রুটিটা সেরে নেব?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ও ত্রুটিটা সংশোধন করতে গেলেই নতুন একটা ত্রুটি হবে। ভারি ত ব্যাপার! একটা ট্যাক্সি জোগাড় করাকে নিশ্চয় আপনি একটা অসমসাহসিক ব্যাপার মনে করছেন না?"

উর্ম্মিলা বলিল, "দেখুন, ছোট করতে চাইলে প্রায় সব কিছুকেই ছোট করা যায় এবং বাড়াতে চাইলে বাড়ানোও যায় অধিকাংশ জিনিষকেই। তবে আপনি যখন এটা নিয়ে আর কথা কইতেই অনিচ্ছুক, তখন রইল ওটা। কিন্তু বেশ রোদ উঠে পড়েছে, আমাকে এর পর যেতে হয়। রোদ আবার আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না। আমি মানুষটা এমন যে অতীতকালের স্পার্টায় জন্মালে আমাকে ঠিক পাহাড়ের থেকে ছুঁড়ে নীচে ফেলে দিত। জীবনসংগ্রামে যোগ দেওয়ার কোন যোগ্যতাই আমার নেই। তাই যতটা পারি সেটাকে এড়িয়ে যাই।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "অতীত কালের স্পার্টায় মানুষের গায়ের জোরের যোগ্যতা ছাড়া আর কোন যোগ্যতাকে ত স্বীকার করা হ'ত না? এখন মানবসমাজের এইটুকু উন্নতি হয়েছে যে মানুষের দেহের যোগ্যতা ছাড়া মন ও মস্তিষ্কের যোগ্যতাগুলোও স্বীকৃতি পাচ্ছে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "তা বটে, সেদিক্ দিয়ে দেখতে গেলে অবশ্য আমাকে না মেরে ফেললেও চলে। আচ্ছা চলি এখন।" বলিয়া আরতির হাত ধরিয়া বলিল, "শোভা এলে তাকে নিয়ে নিশ্চয় যেও আমার বাড়ী। আর সে না এলেই বা কি? তুমি একলাই যেতে পার, দাদাকেও নিয়ে যেতে পার। তোমার মা গেলেও আমার মাসীমা খুব খুশী হবেন। কিন্তু তাঁকে ও আর আমি আগে আসতে বলতে পারি না, আগে নিজে যাব তবে ত?"

জ্যোতির্ম্ময়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখুন, প্রতিবেশী হিসেবে আমরা বাঙালীরা ভাল নয়, এ কথা ত কয়েক-বার বললেন। নিজে যে সাধারণ বাঙালীর চেয়েও খানিকটা ভাল সেটা প্রমাণ করুন এখন। আরতি যখন যাবে, আপনিও যাবেন তার সঙ্গে।"

জ্যোতির্ম্ময় মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইলেও মুখে বলিল, "যেতে খুব আনন্দের সঙ্গেই রাজী আছি। তবে বিপদ্ এই যে আরতি বিকেল ছাড়া আর কোন সময়ে free থাকে না এবং আমি বিকেলে ছেলে পড়াই, কাজেই কোন-দিনই বিকেলে free থাকি না ছুটির দিন ছাড়া।"

উর্ম্মিলা বলিল, "এই রবিবারে যাবেন।"

২

রবিবার আসিতে খুব যে দেরী হইল তাহা নয়। পার্কে তাহাদের দেখা হইয়াছিল শুক্রবারে। মায়ের

শনিবারটা তাড়াতাড়িই কাটিয়া গেল। রবিবার আসিবামাত্র. বোঝা গেল যে পাশের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইবার কথা আর যেই ভুলিয়া থাক, আরতি ভোলে নাই। সকাল হইতে বার তিন তাড়া লাগাইল দাদাকে, "হট্ ক'রে যেন বেরিয়ে চ'লে যেওনা বিকেল বেলা। আজ উর্ম্মিলাদির বাড়ী যেতে হবে মনে আছে ত?"

মনে যথেষ্টই ছিল, তবে দাদাকে বাধ্য হইয়া মুখে বলিতে হইল, "তুমি থাকতে মনে না রাখবার জো আছে? ঠিক যাব, ভাবনা নেই।"

বেলা পাঁচটা আন্দাজ বৈকালিক প্রসাধন ও চা খাওয়া শেষ করিয়া ভাই বোনে পাশের বাড়ীতে চলিল। ঝি-চাকরেরা পাশের বাড়ীর লোকদের চেনে, কাজেই তাহারা যে কাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে উর্ম্মিলার চাকরের ভুল হইল না। সোজা দোতলায় তাহারা উঠিয়া গেল। চাকর তাহাদের বসিবার ঘরে বসাইয়া বলিল, "দিদিমণিকে খবর দিচ্ছি।"

উর্ম্মিলা আসিবার আগে যেটুকু সময় ছিল সেটুকু ভ্রাতা ও ভগ্নীতে বসিয়া ঘর ও বারান্দার সজ্জা দেখিয়া কাটাইয়া দিল। আরতি দেখিল, বসিবার ঘরের চেয়ার, সোফা প্রভৃতি বেশ দামী, ও অন্যান্য গৃহসজ্জার উপকরণ-গুলিও খেলো সস্তা জিনিষ নয়। ছবি বেশী নাই, তবে যা আছে দেখিতে ভালই লাগে। ঘরে ফুলদানিতে টাট্কা ফুল রহিয়াছে। কোণে একটি সুদৃশ্য কাঁচের আলমারীতে নানা-দেশীয় খেলনা, পুতুল, প্রভৃতি সাজান রহিয়াছে। আরতি মনে মনে ভাবিল, 'বাবা, এরা বেশ বড় লোক আছে। আমাদের মত নয়।'

জ্যোতির্ম্ময় ভাবিল, 'মেয়েটি যে শুধু এম্ এ পাশ তাই নয়, রীতিমত cultured বাড়ীর মেয়ে। কোথাও বেসুর বাজে নি গৃহসজ্জার মধ্যে। জানালা-দরজায় শ্রীনিকেতনের পরদা, দেওয়ালের গায়ে নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথের ছবি। বারান্দায় শাদা গন্ধপুষ্পের সমারোহ। এঁরা আমাদের মত লোকদের পাড়ায় থাকবার যোগ্য মানুষ নয়। এখানে এসে জুটলেন কেন? পয়সা-কড়ির কিছুমাত্র অভাব আছে ব'লে ত একটুও মনে হচ্ছে না। বিশ্বজগৎ ব'লে যে একটা বস্তু আছে তাও জানেন দেখছি। এঁদের বাড়ীর কেউ একজন নিশ্চয়ই চীন, জাপান ও ইন্দোনেশিয়া ঘুরে এসেছেন, তা এই curio collection দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

ভিতরের দিকের একটি ঘরের পরদা ঠেলিয়া একজন প্রৌঢ়া মহিলা এই সময় আসিয়া ঢুকিলেন। বেশ আধুনিক ভাবেই সুসজ্জিতা, তবে খুকী সাজিবার কোন চেষ্টা নাই। সম্ভবতঃ বিধবা, তবে গলায় হার এবং এক হাতে ছোট সোনার হাতঘড়ি। হীরার আংটিও এক আঙুলে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। যৌবনে সুন্দরী ছিলেন বুঝিতে ভুল হয় না। এই নাকি মাসীমা? ইঁহাকে পূর্ব্বে জ্যোতির্ম্ময় দেখে নাই।

ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, "আমি উর্ম্মিলার মাসী। ও আসছে এখনি। তোমরা বোস। দুপুরে এক জায়গায় যেতে হয়েছিল ওকে। ফিরতে একটু দেরী হয়ে গেল। যা গরম, বিকেলে স্নান না ক'রে পারে না।"

অভ্যাগত দুজনেই তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময় তাঁহাকে নমস্কার করিল, আরতি ঢিপ করিয়া একটা প্রণামই করিয়া বসিল। তাহার পর তাঁহার অনুরোধে আসন গ্রহণ করিতে না করিতে উর্ম্মিলা আসিয়া ঢুকিল।

সে স্নান করিয়া আসিয়াছে, তবে চুল ভিজাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় চুল বাঁধে নাই। সুদীর্ঘ চুল পিঠ ছাইয়া হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আরতি তাহার চুলের তারিফ করিল মনে মনে। আর সাজিতেও দিব্য জানেন ইনি। কচি কলাপাতার রঙের শাড়ীখানাতে কেমন মানাইয়াছে!

ঘরে ঢুকিয়াই উর্ম্মিলা বলিল, "অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম, না?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "অনেকক্ষণ এমন কিছু নয়। এই মিনিট দশ-বারো হবে। ব'সে ব'সে আপনার ছবির আর curio-collectionগুলো দেখছিলাম।"

উর্ম্মিলা বলিল, "collection ত কত! চারখানা ছবি আর একটা ছোট glass case, অবশ্য ছবি আরও দু'চারখানা আছে অন্যান্য ঘরে।"

উর্ম্মিলার মাসীমা বলিলেন, "সে দেখতে হলে ওর বাবা অতুলানন্দবাবু বেঁচে থাকতে আসতে হ'ত। এই সব জিনিষ কেনার প্রচণ্ড বাতিক ছিল ভদ্রলোকের। স্ত্রী মারা যাবার পর সে বাতিক আরও বেড়ে গেল। ঐ নিয়েই থাকতেন। তারপর তিনি মারা যাবার পর সংসার ত ভেঙে গেল। জিনিষপত্র বেশীর ভাগই এধার-ওধার

গুদামে ঠেলা হল। দু'চারটে তার থেকে ঊর্মিলা বেছে নিয়েছে, নিজে আলাদা বাড়ী করবার সময়। আচ্ছা, তোমরা বোস। আমাকে একটু বাইরে যেতে হচ্ছে এখন। আরো আগে বেরোবার কথা, কিন্তু এমন ভীষণ গরম যে বেরোতে পারি নি।"

ঊর্মিলা হাসিয়া বলিল "গরম, আর রোদ সহ্য করতে না পারাটা আমাদের একটা বংশগত রোগ।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ও রোগ অল্পবিস্তর সকলের আছে। তবে উপায় ত নেই, উপেক্ষা করতেই হয় ওটাকে।"

ঊর্মিলার মাসীমা সুলাজিনী এই সময় প্রস্থান করিলেন। ঊর্মিলা বলিল, "আপনাদের চা দিতে বলি একটু? আমিও খাই নি এখনও।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "চা অবশ্য খেয়েই এসেছি আমরা, তবে যদি আমাদের জন্যে বেশী হাঙ্গাম না করতে হয়, তা আর একবার খেতে আপত্তি নেই।"

আরতি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, ভাগ্যে সে দাদাকে সঙ্গে আনিয়াছিল, না হইলে অতি চমৎকার ব্যাপার হইত। সে ত একটা কথাও বলিতে পারিতেছে না। ইহারা যে এতখানি আলাদা রকমের তাহা সে মনে করে নাই। এখানে আসিয়া অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীর মত হৈ হুল্লোড় করা যায় না। ঊর্মিলাদি দেখিতে ছেলেমানুষ বটে, তবে বড় বেশী ভারিক্কী প্রকৃতির বোধ হয়। দাদাই ভাল পারিবে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে। মাসীমাটিকে দেখিয়া ত ভয়ই লাগে। যেন রাজা-রাজড়ার বাড়ীর মানুষ।

চা আসিয়া পড়িল। খাওয়ার আয়োজন দেখিয়া বুঝা যায়, আগে হইতেই ঊর্মিলা প্রস্তুত ছিল অতিথির জন্যে। অবশ্য আড়ম্বর কিছুই নাই।

ঊর্মিলা চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "ছবি খুব ভালবাসেন আপনি?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "দেখতে ভালবাসি, তবে বুঝতে যে সব সময় পারি তা নয়। কিন্তু না বুঝলেও সুন্দর জিনিষ মনকে ত কম আকর্ষণ করে না?"

ঊর্মিলা বলিল, "আকৃষ্ট হবার মত মন থাকা চাই ত?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সেটা অবশ্য বলতে পারেন। রুচিটাও যদি ভাল না থাকে এবং ভাল জিনিষকে ভাল ব'লে বোঝবার বুদ্ধিটাও যদি না থাকে, তা হলে মানুষ হয়ে না জন্মানই ভাল।"

ঊর্মিলা বলিল, "ও মাপকাঠিতে মাপলে ত আমাদের দেশে প্রায় সব ক'টা মানুষই বাদ পড়ে। সাহিত্যে, আর্টে, সঙ্গীতে কোথায় বা আপনি ভাল রুচির পরিচয় পাচ্ছেন?"

আরতি এধার-ওধার তাকাইতে তাকাইতে আবিষ্কার করিল, ঘরের এক কোণে ভারি সুন্দর একটা এস্‌রাজ দাঁড় করান রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "ঊর্মিলাদি, এস্‌রাজটা আপনার নাকি? আপনি গান করেন?"

ঊর্মিলা বলিল, "না, ওটা মাসীমার, উনি ভীষণ গান-পাগলা মানুষ। নিজে গাইতে বাজাতেও এককালে বেশ ভাল পারতেন। আজকাল আর নিজে গাইতে চান না, তবে কোথাও ভাল গান হচ্ছে শুনলেই গিয়ে হাজির হন। আজও এক জায়গায় গানের জল্‌সা হচ্ছে শুনে চ'লে গেলেন।"

আরতি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নিজে গান করেন না?"

ঊর্মিলা বলিল, "এখন আর করি না, ছোটবেলায় শিখেছিলাম। হঠাৎ নিউমোনিয়া হ'ল একবার, তখন থেকে ডাক্তারই বারণ ক'রে দিলেন গলা বেশী strain করতে। তারপর থেকে গলার চর্চ্চা ছেড়ে পড়ার চর্চ্চা ধরলাম। তুমি বুঝি গান খুব ভালবাস?"

আরতি বলিল, "গাইতে ভাল পারি না। তবে শুনতে খুব ভালবাসি।"

নানা বিষয়ে কথা চলিল। খানিক পরে হাতঘড়িতে সময় দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময় উঠিয়া পড়িল। বলিল, "আর আপনার সময় নষ্ট করব না। আলোচনাটা বেশ জমেছিল যদিও। আমরা ত এলাম, এরপর আপনি একদিন আসুন।"

ঊর্মিলা বলিল, "যাব ত নিশ্চয়ই। আপনি যে আবার বিকেলে বাড়ী থাকেন না। আচ্ছা, সামনেই ত ইস্টারের ছুটি আসছে, তখন ত ছেলে পড়ানর উৎপাত থাকবে না, তখন যাব।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সেই ভাল। যদিও আমার private ছাত্ররা আমার চারদিনের অনুপস্থিতিই চাইবে, তা আমি ভাবছি দু'দিন অন্ততঃ সকালে গিয়ে এক এক ঘণ্টা পড়িয়ে আসব।"

ঊর্মিলা বলিল, "এ রকম ক'রে অভিশাপ কুড়োবেন না। বেচারারা ছুটিতে গিয়ে একটু আনন্দ করবে, তা না, আপনি গিয়ে আবার তাদের পড়াতে বসাবেন!"

জ্যোতির্ময় বলিল, "এখন বেশী আনন্দ করলে পরীক্ষার সময় যে বড়ই নিরানন্দের কারণ হবে। আমার নিজের সুনামটাও বজায় রাখতে হবে ত?"

ঊর্মিলা বলিল, "তা বটে, মানুষে যতটা আনন্দের দাম দিতে পারে ততটাই তার পাওয়া ভাল।"

জ্যোতির্ময় একটু সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে ঊর্মিলার দিকে তাকাইল, এ কথা কেন? তাহার পর ওটাকে কথার কথা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল।

আরতি ছুটিয়া গিয়া মায়ের ঘরে হাজির হইল। জ্যোতির্ময় বুঝিল এখন মন-প্রাণ খুলিয়া সব কথা মাকে জানাইতে হইবে, না হইলে ত আরতির পেটের ভাত হজম হইবে না। একবার ভাবিল, সেও গিয়া মায়ের ঘরে মাদুর পাতিয়া বসিয়া যায়, তাহার পর আর গেল না। দাদার সামনে হয়ত আরতির স্বাধীনভাবে কথা বলিবার সুবিধা হইবে না। নিজে বাহির হইয়া পড়িল। বন্ধু-বান্ধবের অভাব নাই। তাহাদের সঙ্গে ঘুরিয়া গল্প করিয়া অন্যদিন যেমন সময় আসে, সেই রকম সময়েই ফিরিয়া আসিল।

আরতি ঘরের দরজা ভেজাইয়া পড়িতে বসিয়াছে। মা বারান্দায় বসিয়া কি একটা শেলাই লইয়া ব্যস্ত। ছেলেকে দেখিয়া বলিলেন, "খাবি নাকি এখন?"

জ্যোতির্ময় বলিল, "খেতে পারি।"

মা তাহার খাওয়ার আয়োজন করিতে করিতে বলিলেন, "পাশের বাড়ীর ওরা খুব বড় লোক নাকি রে?"

ছেলে খাইতে আরম্ভ করিয়া বলিল, "খুকী বলেছে নাকি এ কথা? না, খুব বড়লোক ত মনে হ'ল না? তবে খুব উচ্চশিক্ষিত ঘরের মেয়ে। চাল-চলন বনিয়াদি ধরণের।"

মা বলিলেন, "মেয়েটি দেখতে মন্দ নয়, তবে বড় রোগা, মা-বাপ নেই, যত্নআত্তি পায় না বোধ হয়। তা মাসী ত একজন আছেন শুনি, তিনি সংসার দেখেন না?"

জ্যোতির্ময় হাসিয়া বলিল, "সংসার দেখেন কিনা জানি না, তবে নিজেকে খুব ভাল ক'রেই দেখেন।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুব মোটা-সোটা বুঝি? দূর থেকে দেখেছি একদিন। তা বেশী ভারী ত মনে হ'ল না।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "আরে রাম, মোটা হতে যাবেন কোন্ দুঃখে? বয়স ঢের হয়েছে, তোমার চেয়ে বড়ই হবেন। অথচ এমন ফিট্‌ফাট্ সুন্দর যে দেখলে চেয়ে থাকতে হয়।"

তাহার মা বলিলেন, "তা বাছা বড়লোক ওরা, অভাব ত কিছুর নেই? ওরা সাজবে না ত কে সাজবে? এই দেখ না আমাকে, এমন কিছু থুড়ি-চাপা বুড়ী নই। তবু বছরে একখানা ফরসা কাপড় পরবারও অবসর হয় না আমার।"

গল্পের আভাস পাইয়াই আরতি পড়া ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। এটা তাহার বরাবরের অভ্যাস। মায়ের কথার শেষ অংশটুকু শুনিয়াই বলিল, "আহা, সেটা অভাবের জন্যেই আর কি? তবু যদি বাক্সে এখনও দশ গণ্ডা ভাল কাপড় না থাকত। নিজেও পরবে না আমাকেও দেবে না।"

তাহার দাদা বলিল, "সেই খোঁটাটা দিতেই তাড়াতাড়ি ছুটে এলি বুঝি?"

আরতি বলিল, "তা নয় অবশ্য। আজ আর পড়ায় মন লাগছে না। বিকেলে এত রকম কথা শুনলাম যে, সেগুলোই মাথার মধ্যে বিজ্‌বিজ্ করছে। আচ্ছা দাদা, ঊর্মিলাদির মাসীমাটিকে তোমার কেমন লাগল? আমার ত দেখে ভয়ই লেগে গেল।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "ভয় লাগবার মত ত কিছু দেখলাম না। দেখতেও বেশ ভাল, কথাও ভাল ভাবে বললেন এবং পরে শুনলাম যে গান-বাজনা খুব ভালবাসেন। এতে ভীতিজনক কি আছে?"

আরতি বলিল, "কি জানি, মাসী বলতে ত আমরা ঠিক ঐ রকম মানুষ বুঝি না? এই আমার নিজের মাসীদের মত কিছু একটা ভাবি আর কি?"

তাহার মা বলিলেন, "তাদের দুঃখ-কষ্টের কপাল বাছা। তাদের অত ঢাকাই ধুতি আর হীরের আংটি প'রে বেড়াবার সুবিধে কই?"

জ্যোতির্ময়ের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, সে অতঃপর উঠিয়া পড়িল। ভাবিল, একদিন বেড়াইতে গিয়া ত

পট

শ্রীযামিনী রায়

বিহার-শহীদ স্মারক, সমগ্র কম্পোজিশন
ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

আরতির দশদিন গল্প করিবার মাল-মসলা জুটিয়া গেল। কিন্তু শুধু আরতিকে দোষ দিলে চলিবে কেন? তাহার নিজের মনের মধ্যেও কি একটি উজ্জ্বল সুন্দর মুখের ছবি বার বার ভাসিয়া উঠিতেছে না? একটি কোমল মধুর কণ্ঠস্বর বার বার কানের কাছে বাজিতেছে না? জন্মাবধি তাহার এই পাড়াতেই বাস। বহুদিনের চেনা প্রতিবেশী চারিদিকেই। কিন্তু কাহার কথা বা সে ভাবে? কাহারও চিন্তা কি কখনও মনের মধ্যে একবারও তরঙ্গ তোলে?

ঈস্টারের ছুটি হইতে দিন দুই-তিন বাকী ছিল। আরতিকে ডাকিয়া জ্যোতির্ময় বলিল, "ওদের বাড়ী গিয়ে ত বেশ খেয়ে-দেয়ে এলে। উনি এলে যেন শুধু চা দিও না। এবং বসবার ঘরটার কিছু সংস্কার করা সম্ভব হয় ত ক'রো। আর মাকে হাতে-পায়ে ধ'রে রাজী ক'রো একখানা ফরসা শাড়ী পরতে।"

আরতি বলিল, "চেষ্টা ত করছি সব ক'টা করবারই। শোভাটাকে আসতে লিখেছি, সে খুব কথা বলতে পারে। আমি ত ভেবেই পাই না উর্ম্মিলাদির সঙ্গে কি বিষয়ে কথা কইব। ওঁরা সব বড় বড় বিষয়ে কথা বলতে ভালবাসেন, অর্দ্ধেক কথার মানেই বুঝতে পারি না আমি। অবশ্য কথার জন্য ভাবনা নেই কিছু, তুমি ত বাড়ীতে আছ। মাকে পরিষ্কার শাড়ী পরানোও এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। তবে বসবার ঘরের ত যা দশা, ওর ছিরি আর আমি ফেরাব কি দিয়ে?"

"যাই হোক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ত ক'রে রাখিস্। নেহাৎ গেঁয়ো ভূত না ভাবেন।"

আরতি ঘাড় দুলাইয়া বলিল, "সে ত করবই।" করিলও চেষ্টা যথাসাধ্য। ঘর পরিষ্কার করিল, মায়ের বাসনের সিন্দুকে একটা কট্কী পিতলের ঘটি ছিল, সেটা মাজিয়া-ঘষিয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া তুলিল। তাহাতে সাজাইয়া রাখিল গন্ধরাজ ফুল ও একগোছা সবুজ পাতা। আরতির বড় বোন মিনতির বিবাহ হইয়া গিয়াছে বেশ কয়েক বৎসর আগে, সে একই পাড়ায় কিছু দূরে বাস করে। তাহার বাড়ীতে কারুকার্য্যমণ্ডিত চামড়ার আচ্ছাদন দেওয়া গোটা কয়েক নতুন মোড়া ছিল। ভগ্নীপতির সখের জিনিস। সেই কয়টিকে সে কয়েক দিনের জন্য ধার করিয়া আনিল।

আরতির দাদা তারিফ করিয়া বলিল, "তুই যে কানাকড়ি দিয়ে ভেল্‌কি খেলছিস্ রে। ঘরটাকে ত চেনাই যাচ্ছে না। তা তোর উর্ম্মিলাদি আজ আসবেন, না কাল?"

আরতি বলিল, "আজই বিকেলে আসবেন। আমি সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম, দেখলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে অর্কিডের গাছে জল দিচ্ছেন। আমায় দেখতে পেয়ে বললেন, আজ সবাই বাড়ী থাকবে ত বিকেলে? আমি আসছি।"

"আগের থেকে জানা থাকা ভাল," বলিয়া জ্যোতির্ময় নিজের কাজে চলিয়া গেল।

বিকাল হইতেই আরতি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, পাছে কোথাও কিছু ত্রুটি ঘটে এই ভাবনায় সে আকুল। মাকে তাড়া দিয়া দিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। কড়াইশুঁটির কচুরী যেন ঠিক সময়ে ভাজা হয়। মা যেন হাত-মুখ ধুইয়া, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরিয়া থাকেন। তেল-মাখা হাত ও হলুদ-মাখা শাড়ী লইয়া যেন উর্ম্মিলাদির সামনে হাজির না হন। দাদার সাজসজ্জা সম্বন্ধেও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, তবে তাড়া খাইবার ভয়ে কিছু বলিল না। দাদা অপরিষ্কার হইয়া কোন সময়েই থাকে না এই যা ভরসা। কার্য্যকালে অবশ্য দেখা গেল যে, দাদা বেশ ফিট্‌ফাট্ হইয়াই বসিয়া আছে।

শোভা আসিয়া জুটিল। উর্ম্মিলারই আসিতে একটু দেরী হইল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আরতি যখন প্রায় বিরক্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম তখন দেখা গেল যে, উর্ম্মিলাদের বাড়ীতে সদর দরজা খুলিল, এবং উর্ম্মিলা চঞ্চল লঘুপায়ে পথটুকু অতিক্রম করিয়া তাহাদের বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। আরতি ছুটিল নীচে। শয়নকক্ষ তিনটি উপরে, যাইবার সময় চাপা গলায় ডাক দিয়া গেল, "দাদা, উর্ম্মিলাদি এসেছেন।"

শোভা আর আরতি পরস্পরকে একটি করিয়া চিমটি কাটিয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইল। শোভা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "কলেজে ত একেবারে গুরুমা, অথচ বাড়ীাত বাহার দিতে ত্রুটি করেন না।"

আরতি বলিল, "ত্রুটি করবেন কেন ভাই? পয়সা আছে, বয়স আছে, রূপও আছে মোটামুটি।"

শোভা বলিল, "একটু গায়ে গত্তি লাগলে ছিল ভাল। ফিগারটা আরো সুন্দর হ'ত।"

আরতি বলিল, "তা হাড়-গোড় বার করা ত নয়? আমার মত হওয়ার চেয়ে একটু বেশী slimও ভাল।"

ইতিমধ্যে উর্ম্মিলা হাস্যমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং জ্যোতির্ময়ও উপর হইতে নামিয়া আসিল। জ্যোতির্ময়কে দেখিয়া হাসিয়া নমস্কার করিয়া উর্ম্মিলা বলিল, "কলেজ ছুটি হওয়ার আনন্দে এমন নিশ্চিন্ত মনে দিবা-নিদ্রা দিয়েছি যে বেরোতেই দেরী হয়ে গেছে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "বেশী আগে বেরিয়েই বা কি হ'ত ? এ বাড়ীতেও ঘুমের প্রকোপ কম ছিল না।"

আরতি অভ্যাগতাকে সাদরে লইয়া গিয়া বসিবার ঘরে বসাইল। উর্ম্মিলা বলিল, "আপনাদের বসবার ঘরটা ঠাণ্ডা আছে কিন্তু, আমাদের ঘরের চেয়ে। বোধ হয় একতলা ব'লে। পশ্চিমে দেখতাম, গরমের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্ত মাটির তলায় বড়লোকেরা ছোট ছোট ঘর তৈরি ক'রে রাখে। অন্ধকার, কিন্তু উত্তাপহীন।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমি হ'লে কিন্তু অমন ঘরে থাকতে রাজী হতাম না। বরং গরম ভোগ করা ভাল, তবু আলো বাতাস সবকিছু থেকে cut-off হয়ে থাকা ভাল নয়!"

উর্ম্মিলা বলিল, "কবরের মধ্যে থাকার মত খানিকটা। নিশ্চিন্ত শান্তি আছে কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্য নেই।"

শোভা আর আরতি একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। অর্থাৎ আরম্ভ হইল অতঃপর বড় বড় কথা। তবে ঠিক এই সময় আরতির মা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করায় কথার মোড় ফিরিয়া গেল। উর্ম্মিলা উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মাসীমার আজ একটু জ্বরের মত হয়েছে, নইলে তাঁকে নিয়েই আসতাম।"

কথাবার্ত্তা নানা বিষয়ে হইতে লাগিল। আজও বেশীর ভাগ কথাই জ্যোতির্ম্ময় বলিল। তাহার মা ঘর-করণার অনেক কথা বসিয়া বসিয়া বলিলেন, এবং আরতিকে লইয়া উর্ম্মিলার বাড়ী যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কথার এক ফাঁকে উর্ম্মিলা জ্যোতির্ম্ময়কে জিজ্ঞাসা করিল, "সকালে গিয়েছিলেন নাকি ছাত্র পড়াতে ?"

জ্যোতির্ম্ময় হাসিয়া বলিল, "গিয়েছিলাম। আপনার কথাই ঠিক, তারা একটুও খুশী হয় নি।"

উর্ম্মিলা বলিল, "কুঁড়েমি করার মত আরামের জিনিষ কি আর কিছু আছে ? মনে আছে যখন কলেজে পড়তাম, তখন কোন প্রফেসরের অসুখ করেছে শুনলে মনে যে ভাবের উদ্রেক হ'ত, তাকে সহানুভূতির ভাব কিছুতেই বলা যেত না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমার স্বাস্থ্যটা এমন অনাবশ্যক রকম ভাল যে ছাত্রদের এদিক্ দিয়ে কোন আনন্দের খোরাক আমি মোটেই জোটাতে পারি না।"

উর্ম্মিলা বলিল, "আমি এদিক্ দিয়ে অতি সুবিবেচক। কত যে কামাই করি তার ঠিকানাই নেই। নিতান্ত বাংলা দেশ ব'লে আমার এখনো চাকরী যায় নি। এখানে ত কাজ করায় কেউ বিশ্বাস করে না ?"

আরতির মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শরীর বুঝি খুব খারাপ মা ?" উর্ম্মিলা বলিল, "খুব খারাপ নয়, তবে ভালও কিছু নয়। খাবার যা খাই ওষুধও তার সমান খাই।"

জ্যোতির্ম্ময় ভাবিল, 'তোমার চেহারা দেখেই তা বোঝা যায়।'

তাহার মা বলিলেন, "তোমার মা তোমায় কত বড়টি রেখে গেছেন ?"

উর্ম্মিলা বলিল, "তিন বছরের। তাঁকে আমার মনেই নেই।" খানিক পরে সে উঠিয়া পড়িল। জ্যোতির্ম্ময় তাহার সঙ্গে গিয়া তাহার বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। উর্ম্মিলা বারণ করিল না।

৩

উর্ম্মিলার জীবনটা প্রথম হইতেই একটা সম্পদ্ ও রিক্ততার সমন্বয়ের ক্ষেত্র ছিল। উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পয়সাকড়ির কোন অভাব তাহাদের কোনদিন ছিল না। ঠাকুরদাদা বিষয়সম্পত্তি খানিকটা রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার আয়েই তাহাদের ক্ষুদ্র সংসার স্বচ্ছলভাবেই চলিয়া যাইত। বাপ অতুলানন্দ বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, এবং একটা শখের প্রফেসারিও করিতেন। তবে কতকগুলি নির্ব্বোধ ও অনিচ্ছুক মানব-সন্তানকে বিদ্যাদান করার বৃথা চেষ্টা করায় তাঁহার কোন উৎসাহ বা আনন্দ ছিল না। নিজের লেখাপড়া, প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা ও ঐতিহাসিক নানা গবেষণার দিকেই তাঁহার ঝোঁক ছিল বেশী। একমাত্র সন্তান উর্ম্মিলা এবং তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী সুভাষিণী তাঁহার খুব বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করিতেন না। অবশ্য তাঁহাদের কোন অভাব বা অনাদর ছিল না। সংসারটা সম্পূর্ণ রূপেই সুভাষিণীর হাতে ছিল। তিনি যেমন ইচ্ছা চালাইতেন, যাহা খুশি করিতেন। অতুলানন্দ কোনদিন কোন হিসাব লইতে আসিতেন না। তাঁহার ব্যক্তিগত খরচের জন্য সুভাষিণী যাহা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি খুশী ছিলেন। তাঁহার বিলাসগুলিও ভদ্রগোছের ছিল। সুতরাং এগুলির পিছনে অর্থব্যয় করিলে পত্নী বাধা দিতেন না। স্বামীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিটা মনে মনে পছন্দই করিতেন এবং অতুলানন্দের কেনা বই ও অন্যান্য জিনিষ সযত্নে সাজাইয়া রাখিতেন। স্বামীর সাহচর্য্য খুব বেশী পাইতেন না। তবে সময়

কাটাইবার জন্য তাঁহার মেয়ে ছিল, বন্ধু-বান্ধব ছিল, বাপের বাড়ীর অনেকগুলি আত্মীয়স্বজন ছিল। তাঁহারা তিন বোন, তিনজনই সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা, বিবাহও তাঁহাদের বড়লোকের ঘরেই হইয়াছিল।

হঠাৎ অল্প বয়সে সুভাষিণী মারা গেলেন। অতুলানন্দের সংসার এইবার ভরাডুবি হইবার উপক্রম হইল। উর্ম্মিলার জন্য একটা বাড়ী দরকার, তাহাকে দেখিবার জন্য মানুষও দরকার, তা না হইলে বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া দিয়া অতুলানন্দ বোধ হয় সন্ন্যাসীই হইয়া যাইতেন। কিন্তু বালিকা কন্যার লালন-পালনের ভার এখন তাঁহাকে লইতেই হইবে। বেশী বেতনের আয়া আসিয়া খুকীকে মানুষ করিবার ভার গ্রহণ করিল, একটু দূরে থাকিয়া মাসীমারা উপদেশ দিতে লাগিলেন। ঘর-সংসার দেখার ভার অতুলানন্দের এক বিধবা ভগিনী গ্রহণ করিলেন এবং সরাসরি আয়ার সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইলেন। উর্ম্মিলার মাসীরা দূর হইতে পিসীমার অজ্ঞতা সম্বন্ধে অবজ্ঞা জানাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য ইহাতে অবস্থার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না।

এইভাবে বেশ কয়েকটা বৎসর কাটিয়া গেল। উর্ম্মিলা বিশেষ স্বাস্থ্যবতী হইতে পারিল না। তাহার অযত্ন অনাদর হইত না, পড়াশুনা, গান-বাজনা, ছবি আঁকা, সেলাই সবই সে শিখিতেছিল। ভাল ভাবেই শিখিতেছিল এবং সর্ব্বক্ষেত্রে সুনাম অর্জ্জন করিতেছিল। তবে অতন্দ্রিত স্নেহদৃষ্টি লইয়া কেহই তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিত না। তাহার অসুখ করিলে ওষুধ আসিত, ডাক্তার আসিত এবং ক্রমে ক্রমে অসুখ সারিয়াও যাইত। অতুলানন্দ স্ত্রীর মৃত্যুর পর পড়াশুনার মধ্যে আরো বেশী ডুবিয়া গিয়াছিলেন। উর্ম্মিলা যতক্ষণ শয্যাগত না হইত ততক্ষণ তিনি তাহার জন্য অনাবশ্যক উদ্বেগ অনুভব করিতেন না। মেয়ে খায়-দায়, পড়াশুনা করে, ইহা জানিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাহার একটি বিবাহ দিয়া ফেলিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইবার ভাবনাটাও মাঝে মাঝে তাঁহাকে পাইয়া বসিত। মেয়ের বয়স প্রায় ষোল হইতে চলিল, দু'এক বৎসরের ভিতর তাহার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। পাত্র একটি মনে মনে স্থিরও করিয়াছিলেন। তাঁহার এক বন্ধু-পুত্র সুদেব। বয়সে অবশ্য উর্ম্মিলার চেয়ে বেশ কিছু বড়, কিন্তু তাহাতে কি-ই বা এমন আসিয়া যায়? ছেলে স্বাস্থ্যবান, মোটামুটি সুপুরুষ, স্বভাব-চরিত্রে কোথাও কোন খুঁৎ নাই। ইহারই ভিতর আইন-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সে বেশ সুনাম অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার পিতা ভূদেব অতুলানন্দের বিশেষ বন্ধু ও প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক গবেষণায় তাঁহার সহযোগী। এ বিষয়ে দুই বন্ধুতে কথাও মাঝে মাঝে হইয়াছে। ভূদেবের পুত্রবধূ হিসাবে উর্ম্মিলাকে পছন্দই আছে। কোন খুঁৎ মেয়েটির নাই বলিলেই হয়। এক স্বাস্থ্যটা তত মজবুত নয়। তবে সুদেবের মায়ের পাল্লায় পড়িলে এ ত্রুটিও থাকিবে না। বাড়ীতে তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়া একটা যজ্ঞের মত ব্যাপার। গৃহিণীর সমস্ত সময় ও সমস্ত উৎসাহ এইদিকেই চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীর লোকগুলিকে দেখিলে কাহারও সন্দেহ থাকে না যে, এরা খায়-দায় ভাল। ভূদেবের ইহাতে আপত্তি নাই। পয়সা যখন আছে তখন না খাইবে কেন? তবে গৃহিণীর আর একটি বাতিক আছে, তাহাতে তিনি কিছু অসুবিধা বোধ করেন। গৃহিণী অতিশয় শুচিবায়ুগ্রস্তা। বাড়ীত সারাদিন ধোওয়া-মোছা হইতেছে। ঘরে ঢুকিলেই ফিনাইলের গন্ধে নাক জ্বলিয়া উঠে, এবং সন্ধ্যা হইতে না হইতে D. D. T.র পিচকারি চলিতে থাকে। বাসনপত্র কার্বলিক সোপ ও গরম জলে অনেকবার ধোওয়া হয়। ঔষধ সেবন, টিকা ও inoculation নেওয়া নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির অন্তর্গত। সুদেব এ বিষয়ে মায়ের পুরোপুরি সহকারী।

তাহার বয়সের একজন যুবকের এতখানি পিট্‌পিটানি উর্ম্মিলার অত্যন্ত হাস্যকর লাগিত। তবে মুখে কোনদিনই সে কিছু বলিত না। কারণ পিতা এই পরিবারটিকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। উর্ম্মিলা সুদেবকে কিছু যে অপছন্দ করিত তাহা নয়। এই একটি বিষয় বাদ দিলে সুদেবের প্রতি তাহার শ্রদ্ধাই ছিল, এবং সে যে একজন গুণবান্ যুবক তাহা সে স্বীকারও করিত। তবে তাহার সম্বন্ধে হৃদয়ের কোন আকর্ষণ সে কোনদিন অনুভব করে নাই। তাহাদের দুইজনের বিবাহ হইতে পারে, এ রকম একটা কানাঘুষা মধ্যে মধ্যে শুনিত, তবে সে দিকে বেশী মন দেয় নাই। ইচ্ছা ছিল এম্ এ পাশ করিবার পর সে এসব ভাবনা ভাবিতে বসিবে।

তাহার ষোল বৎসর বয়সে রক্তের চাপের অসুখে দিন দুই-তিন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অতুলানন্দ হঠাৎ মারা গেলেন। পিতৃমাতৃহীনা উর্ম্মিলা সংসারে একেবারে একলা দাঁড়াইল। এতদিন তবু স্নেহহীন হইলেও একটা নীড়ের মধ্যে সে ছিল, এখন নীড়ও ভাঙিয়া গেল। হৃদয়ের ভিতরও নিদারুণ শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল সে।

কেহ তাহার নাই। আছে শুধু টাকা। খাওয়া-পরার অভাব তাহার হইবে না, কিন্তু ভালবাসা সে কাহারও

কাছে পাইবে না, নিজেও কাহাকেও ভালবাসিতে পারিবে না। বাধা কিছু নাই। কিন্তু কেহ ত তাহার হৃদয়কে আকর্ষণ করে না।

ঊর্মিলাকে কোথায় রাখা হইবে তাহা লইয়া এখন আত্মীয়স্বজনরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বড় মাসীমার ছেলে-মেয়ে ছিল। ছোট মাসীমা সন্তানহীনা বিধবা। কিন্তু বড় মাসীমার ছেলেমেয়েদের ঊর্মিলা বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিত না। সেখানে থাকিতে সে রাজী হইল না। ছোট মাসীমা তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর দিকে এক আত্মীয়ের সঙ্গে বাস করিতেন, সেখানে যাওয়াও চলিল না। বোর্ডিংএ থাকিয়া পড়াশুনা করাই স্থির হইল। ছুটির সময় এক-একজন মাসীমার বাড়ী পালা করিয়া আসিয়া থাকিলেই চলিবে। পিসীমা কাশী চলিয়া গেলেন এবং সংসারের জিনিষপত্র বিভিন্ন আত্মীয়ের গৃহে গুদামজাত হইল।

বোর্ডিংএ যাইবার আগে ছোট মাসী সুলাজিনী একবার ঊর্মিলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার বাবার ইচ্ছা ছিল তোমার বিয়েটা দিয়ে যাবার, তা না হবেই বা কেন? ভিতরে ভিতরে শরীর ভাঙছে তা বুঝতেই পারছিলেন। তা পাত্রও এক রকম স্থির ক'রে গেছেন, তাদের সম্পূর্ণ মতও আছে। এ সব বোর্ডিংএ ছুটোছুটি না ক'রে একেবারে ঘরসংসারে ঢুকে যাওয়াও মন্দ নয়। বল ত ব্যবস্থা করতে পারি।"

ঊর্মিলা মাথা নাড়িল, বলিল, "না, ছোট মাসী, দরকার নেই এখন, পড়াশুনা কিছুই হয় নি এখনও। এ রকম মুখ্যু হয়ে সংসারে আমি ঢুকব না। এম্ এটা পাশ ক'রে নি আগে, তারপর ইচ্ছে হয় সংসারে ঢুকব, ইচ্ছে না হয় চাকরী করব।"

মাসীদেরও খুব বেশী উৎসাহ ছিল না। নিজেদের বিবাহ তাঁহাদের অল্প বয়সেই হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সম্মতি আছে কি না তাহাও কেহ জানিতে আসে নাই। খুব সুখী তাঁহারা হইতে পারেন নাই, এবং তাহার জন্য অনেকাংশে দায়ী করিয়াছেন বাল্যবিবাহকে।

ঊর্মিলা পড়াশুনা করিতেই ঢুকিল এবং সব পরীক্ষায় বেশ ভাল ভাবে উত্তীর্ণ হইল। তখনই বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়িতে ইচ্ছা করিল না। বলিয়া কহিয়া ছোট মাসীকে রাজী করাইল তাহার সঙ্গে থাকিতে। আলাদা করিয়া ছোট সংসার ফাঁদিল। চাকরী একটা মাঝারী গোছের জুটিয়া গেল।

জীবনযাত্রা বৈচিত্র্যহীন ভাবে চলিতে লাগিল। আনন্দ কিছু ছিল না ইহার মধ্যে, তবে উৎপাতও ছিল না। ভালবাসিবার কেহ ছিল না, ভালবাসা পাইবারও কোন সুযোগ ছিল না। সুদেব কালেভদ্রে চিঠি লিখিত, নিতান্তই সাধারণ চিঠি। সেই ভাবেই উত্তর দিয়া ঊর্মিলা নিশ্চিন্ত হইত। সুদূর ভবিষ্যতে কোনদিন হয়ত ইহারা খুব কাছাকাছি আসিবে, এ সম্ভাবনাটা থাকিয়াই গেল। ঊর্মিলার কোন তাড়া ছিল না, এবং সুদেবেরও কোন কিছু তাড়া ছিল না। সে তখন পসার বাড়াইতে অত্যন্ত ব্যস্ত। ভাবী পত্নীর চিন্তায় রক্তে তাহার কোন দোলা লাগিত না। তবে ঊর্মিলাকে ভাবী পত্নীরূপে চিন্তা করিতে মন্দ কিছু তাহার লাগিত না।

এইভাবে কতকগুলি দিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ ঊর্মিলা সর্দ্দিজ্বর ভোগ করিল বার দুই। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন একতলার ঘর ছাড়িয়া দিতে। বাড়ী খোঁজা চলিতে লাগিল, এবং মাসখানেক পরে জ্যোতির্ম্ময়দের পাড়ায় একটি ছোট ফ্ল্যাট পাওয়া গেল। ঊর্মিলা ও তাহার ছোট মাসীর ঘরগুলি ভালই লাগিল। পাড়াটাও নিরিবিলি। ট্রাম-বাসের গোলমাল নাই, লোকগুলিও শান্তিপ্রিয় গৃহস্থ গোছের। তাহারা পুরাতন বাড়ী ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল এখানে।

কয়েকটা দিন গুছাইয়া বসিতেই কাটিয়া গেল। ছোট মাসী এধার ওধার তাকাইয়া বলিলেন, "মন্দ নয় পাড়াটা। দুপাশের বাড়ীতে মানুষও কম, হট্টগোল নেই। এ পাশে ত এক বুড়ো মানুষের কাশি ছাড়া আর কোন শব্দ শুনি না। একটি বেশ সুপুরুষ ছেলে আছে, মেয়েও আছে একটি, বোধ হয় কলেজে পড়ে।"

ঊর্মিলারও চোখে পড়িল ছেলেটি ও মেয়েটি। ঝি তারার মায়ের সাহায্যে তাহারা প্রতিবেশীদের অনেক খবরই জানিয়া ফেলিল। সে যে পাড়ায় চাকরী করিতে যায়, সেই পাড়ারই এক ছেলেদের কলেজে জ্যোতির্ম্ময়ও কাজ করে। আরতি এ পাড়ার কলেজেই পড়ে।

আরতিদের বাড়ীতেও নূতন প্রতিবেশিনীদের অনেক খবর পৌছিল। ছোট মাসীর সাজসজ্জা ও চেহারার বিষয়ে অনেক বাড়ীতেই অনেক আলোচনা শোনা গেল। জ্যোতির্ম্ময়ের কানেও কিছু কিছু কথা গেল কিন্তু সেগুলি

তাহার মন পর্য্যন্ত পৌঁছিল না। ক'দিন পরেই আসিল সেই ট্রাম স্ট্রাইক্ ও তরুণী প্রতিবেশিনীকে উদ্ধার করিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দেওয়া।

যাওয়া আসা অতঃপর চলিতেই লাগিল মধ্যে মধ্যে। আরতির পরীক্ষার পড়ার এত উৎপাত না থাকিলে আরোই ঘন ঘন হইত বোধহয়। তবে যাইবার উৎসাহ যাহার সবচেয়ে বেশী ছিল সে একেবারে একেলা যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিত। হয় মা, নয় বোন কাহারও সঙ্গ তাহার প্রয়োজন হইত। একটা রবিবারে আরতির অন্য কোথাও নিমন্ত্রণ ছিল। সেদিন বলিয়া কহিয়া মাকেই রাজী করাইয়া জ্যোতির্ময় সঙ্গে লইল। মায়েরও ছোটমাসী সম্বন্ধে কৌতূহল থাকায় তিনিও অসম্মত হইলেন না। ভাল অথচ অনেকদিনের পুরানো একটি ঢাকাই শাড়ী পরিয়া তিনি প্রতিবেশিনী সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। গহনাগুলির জন্য দুঃখবোধ করিলেন, থাকিলে পরিয়া দেখাইয়া দিতেন যে তাঁহারাও নিতান্ত হা-ঘরে নয়, হীরার গহনা না থাক, সোনার গহনা আছে। কিন্তু গহনা ত বড় মেয়ের বিবাহে কিছু খরচ হইয়াছে, কিছু বা বন্ধক পড়িয়াছে। আর ক'খানাই বা ছিল?

সৌভাগ্যক্রমে ছোট মাসী বাড়ী ছিলেন সেদিন। তিনি এক নজরেই আরতির মাকে চিনিয়া লইলেন। নিতান্তই হিন্দু গৃহস্থঘরের মানুষ। ইঁহাকে লইয়া ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান্, বা বড়ে গোলাম আলিখানের গল্প চলিবে না। Beethoven বা Mozartএর নামও ইনি নিশ্চয়ই শোনেন নাই। সুতরাং ঘরসংসার, ঝি-চাকর, বাজার দর, প্রভৃতির গল্পই চলিতে লাগিল। এ সবগুলির সঙ্গেও যে সুলাজিনীর কিছু পরিচয় কোনদিন ছিল না তা নয়। বড় মানুষ হইলেও হিন্দু সনাতন সমাজের মানুষ ত? আত্মীয়স্বজন নানা অবস্থারই ছিল এককালে।

জ্যোতির্ম্ময় ঊর্ম্মিলার সহিত কথা কহিতে কহিতে মায়ের কথাবার্ত্তার দিকে কান রাখিতেছিল একটু। খুব অদ্ভুত কিছু আবার তিনি না বলিয়া বসেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তেমন কিছু বলিলেন না। সুলাজিনীও নিপুণ মাঝির মত আলাপের তরণীটিকে এমন নিরাপদ্ ধারায় চালাইয়া লইয়া গেলেন যে, বিপদের সম্ভাবনাও রহিল না।

ঊর্ম্মিলা বলিল, "বাঙালীর মেয়ে অথচ রান্নাবান্না বা ঝি-চাকরের গল্প করতে পারে না এমন বোধহয় একটিও নেই?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আপনার কি খুব খারাপ লাগে ওরকম গল্প?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "খারাপ লাগে না, তবে একঘেয়ে লাগে। ও জিনিষটা যারা নিজে হাতে ক'রে চালায় তাদের যতটা ভাল লাগে, অন্য লোকের ততটা ভাল লাগে না। আমি ত নিজের হাতে কিছুই করি না, তাই খুব বেশী রস পাই না জিনিষটার মধ্যে। মায়ের সংসার চুকে গেল আমি যখন তিন বছরের। তারপর এল পিসীমার সংসার। তিনি আবার নিজের কাজে অন্য কোন মানুষের হস্তক্ষেপ মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। তারপর ত সংসার বলতে আর কিছুই রইল না। এখন একটা যা হোক ছোটমত সংসার হয়েছে, তা ছোট মাসীই যা দেখবার দেখেন।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "একেবারে কিছু অভ্যাস রাখছেন না, যদি কখনও বড় সংসার দেখতে হয় তখন ত অত্যন্ত জ্বালাতন হতে হবে।"

ঊর্ম্মিলা ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "সে কোনদিন হবে কি না-হবে তার কোন ঠিকানা নেই। যদি হয় কখনও তা হলে গোড়ার থেকে সব শিখতে হবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ের মা বলিলেন, "এ সব না শিখে কি আর মেয়েছেলের উপায় আছে মা? ঘরসংসার করতেই হবে, তা যত লেখাপড়া শেখই না কেন?"

মা আবার কি বলিতে কি বলিয়া বসিবেন ভাবিয়া জ্যোতির্ম্ময় তাড়াতাড়ি অন্য একটা কথা পাড়িয়া বসিল। ছোট মাসীও এই সময় চা আনিতে বলিয়া আর একদিকে কথাবার্ত্তার মোড় ঘুরাইয়া দিলেন। সেদিন গল্প আর খুব জমিল না। তবে বসিয়া বসিয়া প্রতিবেশিনীর সুধাকণ্ঠস্বরের তুচ্ছ কথাগুলিও জ্যোতির্ম্ময়ের শুনিতে অসম্ভবরকম ভাল লাগিয়া গেল। এই দুইজন মানুষ নিজেদের সম্বন্ধে তখন পর্য্যন্ত খুব বেশী সচেতন হইয়া ওঠে নাই। জ্যোতির্ম্ময়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার স্রোতে কোথা হইতে একটা মাধুর্য্যের ধারা আসিয়া মিশিতেছিল, সে সম্বন্ধে সে মধ্যে মধ্যে একটু বিস্ময় অনুভব করিত। তবে খুব বেশী মনোযোগ দিয়া কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইত না। একটা যেন তন্দ্রার মত আবেশ তাহার বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঠিক স্বপ্ন দেখার অবস্থা নয় আবার পরিপূর্ণ জাগরণও নয়।

ঊর্ম্মিলা নিজেকে হয়ত আরো খানিকটা বেশী বুঝিত। তাহার শূন্য জীবনের মধ্যে কোন্ এক নূতন অতিথির

"এসব না শিখে কি আর মেয়েছেলের উপায় আছে মা?"

পদধ্বনি যেন বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার অনুভূতিগুলি ক্রমেই যেন বেশী করিয়া তীব্র হইয়া উঠিতেছে চোখ আগের চেয়ে বেশী দেখে, কান আগের চেয়ে বেশী শোনে। পাশের বাড়ীতে মেয়েলি উচ্চকণ্ঠে যখন আরতির মা ডাকেন "জ্যোতি!" তখন উর্ম্মিলার কানে তাহা গানের মত আসিয়া লাগে। ভাবে, সার্থক নাম রাখিয়াছিলেন তোমার পিতামাতা। জ্যোতির্ম্ময়ের কণ্ঠস্বর খুব বেশী শোনা যায় না, কিন্তু যখনই শোনা যায়, তাহা কানের ভিতর দিয়া কোন্ একজনের হৃদয়ে স্পর্শ রাখিয়া যায়।

সেদিন বাড়ী ফিরিতেই দেখা গেল শোভা ও আরতি একসঙ্গেই ফিরিয়াছে। মাকে দেখিয়া আরতি জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন লাগল মা ওদের বাড়ী গিয়ে?"

মা বলিলেন, "মন্দ লাগবে কেন বাছা? লোকজনের সঙ্গে মিশতে ভালই লাগে। তবে ওরা বড় মানুষ, খুব ঘন ঘন গেলে যদি বেশী গায়ে পড়া ভাবে ত জানি না।"

আরতি আর শোভা দু'জনে প্রায় এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, "উর্ম্মিলাদি মোটেই ওরকম মানুষ নয়।" জ্যোতির্ম্ময়ের কানে কথাটা কেমন যেন বেসুরো বাজিল। তাহারা খুব কি ঘন ঘন যায়? তাহারা যতবার গিয়াছে উর্ম্মিলাও ততবার আসিয়াছে। ইহাতে কোথাও কিছু মনে করিবার আছে নাকি? উর্ম্মিলাকে দেখিলে এ বাড়ীর সকলেই অত্যন্ত খুশী হয়। সে নিজে যে সকলের চেয়ে বেশী খুশী হয়, তাহা অবশ্য পরিষ্কার করিয়া নিজের কাছে স্বীকার করিল না। সেইভাবে উহারাও খুশী না হইবে কেন? উর্ম্মিলাকে দেখিয়া ত বিন্দুমাত্রও অখুশী মনে হয় না?

আরতি আর শোভার প্রতিবাদে একটু অপ্রস্তুত হইয়া গৃহিণী বলিলেন, "না, না, ওর কথা বলছি না। ও মেয়েটি বড় ভাল। তবে ওর মাসীর যেন একটু জাঁক বেশী। আমাদের মত যে নয় সেটা বড় বেশী বুঝিয়ে দেয়।"

জ্যোতির্ম্ময় সকালে উঠিয়া পার্কে বেড়াইতে যাইত মাঝে মাঝে, এখন কিন্তু রোজই যায়। কোনদিন আরতি সঙ্গে থাকে, কোনদিন থাকেও না। উর্ম্মিলারও আসিতে ভুল হয় না। প্রথম প্রথম অত্যন্ত শাদাসিধা ভাবে আসিত, এখন সাজপোষাকে রং-এর আমেজ বেশী লাগে, কবরী-রচনায় যেন বেশী সময় যায়। জ্যোতির্ম্ময়ের চোখ এই পর্য্যন্ত বোঝে যে ইহাকে আগের চেয়েও সুন্দর দেখায়, কিন্তু কেন সুন্দর দেখায় তাহার খোঁজ লইতে যায় না। আনন্দ পায়, কিন্তু কিসের জন্য সে আনন্দ তাহা ভাবিয়া দেখে না।

জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ না হইলেও কাঁটা কাহারও পায়ে ফুটিতেছিল না। সংসার চালানোর ব্যাপারে জ্যোতির্ম্ময় কোনদিনই হস্তক্ষেপ করিত না। টাকাকড়ি যাহা তাহার দিবার তাহা পিতার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইত। মা বাবা মিলিয়া তাহার পরে ভাগ বাঁটোয়ারা যাহা করিবার তাহা করিতেন। ধার-কর্জ্জ বেশ কিছু আছে, এবং তাহা লইয়া কর্ত্তা-গৃহিণীর দুশ্চিন্তারও অন্ত নাই, তাহা সে জানিত, কিন্তু এসব বিষয়ে আলোচনায় কখনও যোগ দিত না। ধার করিবার সময় ত কেহ তাহার সঙ্গে পরামর্শ করে নাই, এখন শোধ করিবার

সময় হয়ত তাহার ডাক পড়িবে। কিন্তু যতদিন না পড়িতেছে, ততদিন উহার ভিতর মাথা গলাইবার প্রয়োজন কি? নিজের পড়াশুনা, বন্ধু-বান্ধব, কাজকর্ম এই লইয়াই তাহার দিন কাটিত। এখন জীবনে আর এক নূতন রসের সঞ্চার হইয়াছিল, সে চিন্তাতেও কম সময় যাইত না।

উর্ম্মিলারও ঘর-সংসারের ভার অতি সংক্ষিপ্ত ছিল। চাকর ঝি, দুই জনই বহুদিনের পুরানো, ছোট মাসীর হাতেই তাহারা গড়া। তিনি যেভাবে কাজকর্ম করা পছন্দ করেন, তাহারা সেই ভাবেই করে। ঘড়ি ধরিয়া দিনের কাজ চলে। চাকর-বাকর ফাঁকি দিতে চায়ও না, পায়ও না। ঠিক সময় অবসর পায়, ঠিক সময় মাহিনা পায়। কথাবার্ত্তা ভদ্রভাবে বলে। ঝি তাহার মা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, কারণ মা-ঠাকরুণ ও দিদিমণির পরিত্যক্ত কাপড়-জামা সমস্তই সে পায়। চাকর তারণ ইহাতে বিশেষ বিরক্ত, কিন্তু কর্ত্তা-স্থানীয় যখন কেহই নাই সংসারে, তখন বিরক্ত হওয়া ছাড়া আর কিই বা করিবার আছে?

ভূমিকম্প দেশকে বিধ্বস্ত করিয়া দিবার আগে কোন সাড়া দেয় না। অসাবধান গৃহস্থ ও পথিক একেবারে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ধ্বংসের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়ায়। সেদিন সকালকার ব্যাপারটা ঠিক সেইরকম ভাবেই ঘটিয়া গেল।

বাড়ীতে তখন কর্ত্তা-গিন্নী ভিন্ন বিশেষ কেহ ছিল না। জ্যোতির্ম্ময় কলেজে গিয়াছে, আরতিও নাই। হঠাৎ কর্ত্তার ঘর হইতে প্রবল কাশির শব্দ শুনিয়া, সুখদা শয়নকক্ষে ছুটিয়া আসিলেন। হাতে একখানা খোলা চিঠি লইয়া কর্ত্তা প্রায় মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিতেছেন।

হাঁপানীর বাড়াবাড়ি হইলে যে-সব ব্যবস্থা ছিল, তাহা প্রায় সবগুলি অবলম্বন করিয়া গৃহিণী রামগতিকে খানিকটা সুস্থ করিলেন। কিন্তু দেহ একটু সুস্থ হইলেও মন তাঁহার একটুও সুস্থ হইল না। বার বার কাশিতে কাশিতে ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, "জ্যোতিকে তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠাও, আমি এ কি সর্ব্বনাশের মধ্যে পড়লাম!"

জ্যোতিকে ডাকিবে কি করিয়া? বাড়ীতে টেলিফোন নাই, পাড়ায় আছে বটে, কিন্তু টেলিফোন করিবে কে? সুখদা টেলিফোন করিতে জানেন না। রামগতি উঠিতে পারেন না। আরতিও বাড়ী নাই। অবশেষে সুখদা গিয়া উর্ম্মিলাদের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। মাসীমা ও দিদিমণি বাহির হইয়া গিয়াছেন, তবে তারণ বড়লোকের বাড়ীর পুরানো চাকর, সে টেলিফোন করিতে জানে। নম্বর দিলে সে পাড়ার ওষুধের দোকান হইতে টেলিফোন করিতে পারে দাদাবাবুকে। অগত্যা সেই ব্যবস্থাই করা হইল। সুখদা আবার প্রায় ছুটিতে ছুটিতেই বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় টেলিফোনে এমন জরুরী ডাক পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেল। খুব বেশী প্রয়োজন না হইলে মা নিশ্চয়ই উর্ম্মিলার চাকরের শরণাপন্ন হইতেন না। বাবার অসুখ ত লাগিয়াই আছে। হঠাৎ কি বাড়াবাড়ি হইল? যাহা হোক, তাড়াতাড়ি অধ্যক্ষকে বলিয়া ছুটি লইয়া সে ট্যাক্সি করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

পল্লী এখন জনশূন্য। সব বাড়ীরই কাজের লোকরা যে যাহার কাজে চলিয়া গিয়াছে।

বাড়ীতে ঢুকিয়া সোজা উপরে চলিল বাবার ঘরে। সুখদা মাটিতে বসিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। রামগতি খোলা চিঠি একখানা হাতে করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন। মুখে সম্পূর্ণ হতাশার ভাব।

জ্যোতির্ম্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?" তাহার বাবা চিঠিখানা তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন। পড়িতে পড়িতে জ্যোতির্ম্ময়ের মুখ একেবারে কালো হইয়া আসিল।

৪

জ্যোতির্ম্ময়ের বড় বোন মিনতির পাঁচ-ছয় বৎসর আগে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে মেয়ের রং কালো, কাজেই বাবা-মা খুব সহজে নিষ্কৃতি পান নাই। পাত্র মন্দ ছিল না অতএব তাহাদের দাবী-দাওয়াও মন্দ ছিল না। রামগতির জমান পয়সা একটাও ছিল না। সম্বল বাড়ীখানি এবং গৃহিণীর তিন-চারখানা গহনা। পণের টাকা, বিবাহের অন্যান্য খরচের টাকা এক পরিচিত ব্যক্তির কাছে ঋণ গ্রহণ করা হইল, বাড়ীখানি বন্ধক দিয়া। ছ'হাজার টাকা ধার করিতে হইয়াছিল। বিবাহ ভালয় ভালয় হইয়া গেল, কন্যা সুখেই আছে। এদিকে ঋণের টাকা সুদে-আসলে মিলিয়া যে এখন প্রায় দশ হাজার টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে। রামগতির যে এদিকে খেয়াল ছিল না তাহা নহে, কিন্তু উপায় কিছুই করিতে পারেন নাই। আরতির বিবাহও ত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। জ্যোতির্ম্ময়

উপযুক্ত ছেলে, তাহার বিবাহ দিয়া যদি কিছু লাভ করা যায়, তাহা হইলেই আরতির বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু পুত্র বিবাহে একেবারে নারাজ। কৃতবিদ্য উপার্জ্জনক্ষম ছেলে। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত কোন কাজ করা যায় না? ছেলে বিবাহই করিতে চায় না, তা পণ লইয়া বিবাহ! এই সব কথাবার্ত্তা মাঝে মাঝে হয়, হঠাৎ নীল আকাশ হইতে অশনিপাত।

যে ভদ্রলোক টাকা ধার দিয়াছিলেন তিনি হঠাৎ মারা গিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্ররা আর দেরী করেন নাই। এই মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক টাকা অন্ততঃ দিলে তাঁহারা রামগতিকে আরো এক বৎসরের সময় দিতে পারেন। না হইলে সরাসরি বাড়ী দখল করিতে তাঁহারা অগ্রসর হইবেন। টাকা যখন ধার দেওয়া হয় তখন এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল।

জ্যোতির্ম্ময় চিঠি পড়িয়া বলিল, "এইরকম অবস্থা পর্য্যন্ত গড়াতে দেওয়া হ'ল কেন?"

রামগতি বলিলেন, "আমি ম'রে ম'রে আর কত দেখব? উপায় কিছু আছে আমার? কি রোজগার করি আমি? পেন্সনের টাকা আমার চিকিৎসাতেই যায়। তুই একদিনও এসব দিকে চেয়ে দেখেছিস্?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "চাইতে বললে চাইতাম। টাকা ধার নেওয়া থেকে এ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে তুমি ক'বার কথা বলেছ? আমাকে এখন বললে কি হবে? মাসের আর বড় জোর দশ-বারো দিন বাকী আছে, এর ভেতর পাঁচ হাজার টাকা তোমায় কে দেবে?"

সুখদা বলিলেন, "আমার গায়ে ত এককুচো সোনা নেই। খুকীর হাতে একজোড়া বালা।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তাতে কি হবে? আত্মীয় বা বন্ধু এমন কেউ আছে যে এক কথায় পাঁচ হাজার টাকা বার ক'রে দেবে?"

রামগতি বলিলেন, "কেউ নেই।"

সুখদা বলিলেন, "তবে কি মাসান্তে আমি এই রুগ্ন বুড়ো মানুষ আর কুমারী মেয়ের হাত ধ'রে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াব?"

পুত্র বলিল, "সব মানুষের কি নিজের বাড়ী থাকে? তারা ত রাস্তায় থাকে না?"

তাহার মা বলিলেন, "তুই ত বললি এক কথা। বাড়ী ভাড়া পাওয়া আজকাল সহজ? আর তোমরা বাপ-বেটায় মিলে যা উপায় কর, তার অর্দ্ধেক ত বেরিয়ে যাবে ছোট্ট একটা বাড়ী নিতেই? অভ্যাসও করেছ বড়মানুষি, একঘরে একজনের বেশী থাকতে পার না। তখন পারবে সবসুদ্ধ একঘরে থাকতে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তবে কি করতে হবে আমাকে, তাই বল না? পাঁচ হাজার টাকা সময় থাকলে মানুষ পারে জোগাড় করতে। কিন্তু সময় কোথায়?"

তাহার মা বলিলেন, "তুই যদি মত দিস্ ত এক উপায় আছে।"

পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায় শুনি?"

সুখদা বলিলেন, "মিত্তিররা কাল আবার লোক পাঠিয়েছিল। আসবাবপত্র গহনাগাঁটি না যদি চাই, তত্ত্ব-তালাশও যদি বাদ দিই তাহলে তারা নগদ ছ' হাজার টাকা দিতে রাজি আছে। শুধু দু' হাত এক করে দেওয়া। জোগাড়-জাগাড় কিছুই করতে হবে না, এ মাসে দিন আছে। ওদের মেয়ে দেখতে খারাপ নয়।"

জ্যোতির্ম্ময় একেবারে চুপ করিয়া গেল। এমন একটা দুর্দ্দৈব যে তাহার সামনে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে তাহা সে একেবারে মনে করে নাই। নিজেকে বিক্রয় করিয়া তাহাকে এই মানুষগুলির বাসস্থান রক্ষা করিতে হইবে? বিবাহ সে কাহাকে করিবে? এ মেয়েকে সে কোনদিন চোখে দেখে নাই, তাহার কণ্ঠস্বর শোনে নাই। মানুষের হৃদয়ের যে অন্তরতম স্থানে তাহার প্রেয়সীর আসন, তাহা কি শূন্য আছে এখনও? কাহাকে সেখানে সে অনধিকার প্রবেশ করিতে দিবে? তুচ্ছ কয়েকটা টাকার বিনিময়ে? নিজেকে বলি দিয়াও ত সে এই অসহায় জীবগুলিকে চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত করিতে পারিবে না? এক বৎসর পরে আবার দাবী আসিবে। তখন আর কি দিয়া এই রাক্ষসীর ক্ষুধা মিটিবে?

মা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন, "কথা বলছিস না কেন? তোর মত নেই এতে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "মত থাকবার মত কথা কি এটা? বাড়ী বিক্রী হওয়া বন্ধ করার জন্য আমাকে বিক্রী করতে হবে?"

রামগতি ভাঙা খনখনে গলায় বলিলেন, "নিজের মেয়ের বেলায় ত পণ না দিয়ে রেহাই পাই নি। ছেলের বিয়েতে যদি পণ নিই তা এমন কি অন্যায় হবে? সবাই ত নিচ্ছে। এ ছাড়া আর কি করব বল? তোমার পছন্দ নয় বুঝতে পারছি। কিন্তু এইটুকু স্বার্থত্যাগ যদি না কর তা হলে সত্যিই আমরা পথে বসব।"

"কথা বলছিস্ না কেন? তোর মত নেই এতে?"

এইটুকু স্বার্থত্যাগ? কি করিয়া সে বুঝাইবে এই কাণ্ডজ্ঞান-হীন বৃদ্ধকে যে কোথায় তাহার বাজিতেছে? নিজেকে সে আগে ভাল করিয়া বোঝে নাই। কিন্তু নিজের আকাঙ্ক্ষাকে আর ত অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখা যায় না? তাহার মানসলোকে যে মুখ তারার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর চিরকালের মত একটা কালো যবনিকা টানিয়া দিতে হইবে। তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল কামনা-বাসনার অবসানও সেই সঙ্গে হইয়া যাইবে। টাকার বিনিময়ে নিজেকে সে বিক্রয় করিবে, কিন্তু যাহার কাছে বিক্রয় করিবে তাহাকে মূর্ত্তিমতী দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু মনে করিতে পারিবে কি?

বাপ-মায়ের দিকে তাহার আর তাকাইতে ইচ্ছা করিল না। "কাল সকালে ভেবে বলব," বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া রহিল, ভাবিল, ভাগ্যে ক্ষুণাক্ষরেও আমি তাহাকে জানিতে দিই নাই। সে যদি আমার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিত, তাহা হইলে দুর্ভাগ্য রাখিবার জায়গা এ জগতে আর পাওয়া যাইত না। ভগবান্ আমাকে অন্ততঃ নারীহত্যার পাতক হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। নিজে আত্মহত্যাই করিতে হইবে প্রায়, কিন্তু আর যখন কোন উপায় নাই, তখন এইভাবেই মাতৃ-পিতৃঋণ শোধ করিতে হইবে। উর্ম্মিলা আমার পাশের বাড়ীতে থাকে, অথচ আমি আর তাহার জীবনের কোথাও থাকিব না। এক পৃথিবীর মানুষ, এই পর্য্যন্ত। তবে সে কোনদিন জানিবে না যে কত নিকটে তাহার আমি আসিয়াছিলাম একদিন, আবার নীরবেই সরিয়া গেলাম। সহ্য যদি না করিতে পারি তাহা হইলে কলিকাতার কাজ ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে। আর একটা মানুষ আমার এই ভাগ্যবিপ্লবের সহিত জড়িত হইবে, তাহাকে লইয়া আমি কি করিব? প্রচলিত অর্থে তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করা ত অসম্ভব। অথচ তাহার ত দাবী আছে, সে কেন বঞ্চিত হইবে? এ সমস্যার সমাধান কোথায়?

আরতি কলেজ হইতে ফিরিয়া দাদাকে চা খাইতে ডাকিতে আসিল। জ্যোতির্ম্ময় দরজা খুলিয়া বলিল, "আর এখন খাবার ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না, এখানেই দিয়ে যা।"

চা জলখাবার আনিয়া আরতি বলিল, "তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে নাকি দাদা? মুখটা কেমন যেন দেখাচ্ছে।"

"না, কিছু হয় নি," বলিয়া জ্যোতির্ম্ময় আবার একখানা মাসিক পত্র মুখের সামনে তুলিয়া ধরিল।

বিকালবেলায় নিয়মমত ছেলে পড়াইতে চলিয়া গেল। কাজের ভিতর ডুবিয়া থাকিলে মনটা তবু কিছু শান্তি পায়। বাহির হইয়া একবার উর্ম্মিলাদের বাড়ীর দিকে তাকাইয়া দেখিল, বারান্দায় কেহ নাই।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, আবার তাহার বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া গোলমাল বাধিয়াছে। হাঁপানির আক্রমণ এবারে প্রবলতর। মা বসিয়া কাঁদিতেছেন, আরতি শুষ্ক বিষণ্ন মুখে এক কোণে দাঁড়াইয়া আছে।

ডাক্তার ডাকা, ঔষধ কিনিয়া আনা, প্রভৃতি অবশ্যকর্ত্তব্য কাজগুলি সারিয়া জ্যোতির্ম্ময় বারান্দায় দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতরের দৃশ্যের দিকে চাহিয়া রহিল। এই ত তাহার সংসার! ইহার মধ্যে কোন্ মানুষটাকে সে নিজের ভাবনা ভাবিতে বলিবে? বাবা ত একেবারেই অক্ষম ও রুগ্ন। এত যত্নে থাকিয়াও তাঁহার কষ্টের সীমা নাই, অসন্তোষের সীমা নাই। মা অজ্ঞ ও স্ত্রীলোক। ঘরের ভিতরে বসিয়া সংসারের কাজ করা ছাড়া, আর কোন প্রকার

জীবনযাত্রার প্রণালী তাঁহার জানা নাই। আর আরতি, সে ত বালিকা মাত্র। যা করিতে হয় জ্যোতির্ম্ময়কেই করিতে হইবে। এ সংসার সৃষ্টি সে করে নাই। কিন্তু এ সংসারের সমস্ত দায়িত্বই তাহার। সে যদি নিজের মনুষ্যত্বকে বিক্রয় করিতে না রাজী হয়, তাহা হইলে অতি স্বার্থপর বলিয়া সংসারে তাহার নাম থাকিয়া যাইবে।

হঠাৎ পাশের বাড়ীর বারান্দা হইতে উচ্চমধুর কণ্ঠে ঊর্ম্মিলা ডাকিল, "আরতি!"

আরতি তখন সবে স্নানের ঘরে ঢুকিয়াছে, সান্ধ্য-স্নান সারিবার জন্য। জ্যোতির্ম্ময় বারান্দার কোণের দিকে সরিয়া গেল, এখান হইতেই পাশের বাড়ীর সঙ্গে কথার আদান-প্রদান ভাল চলে। তাহাকে দেখিয়া ঊর্ম্মিলার মুখ হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সেই পরিমাণেই যেন জ্যোতির্ম্ময়ের মনের ভিতরটা কাল হইয়া গেল।

ঊর্ম্মিলা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাবা এখন কেমন আছেন?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "বিকালটা খানিক ভাল ছিলেন। এখন আবার বাড়াবাড়ি চলছে।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "কি কষ্টকর অসুখ! উনি কি অনেকদিন এই রোগে ভুগছেন?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কষ্টকর খুবই ত। যে ভোগে শুধু তার পক্ষেই নয়, যে দেখে তার পক্ষেও। অনেক-দিনেরই অসুখ, আমরা ত বড় হয়ে অবধি দেখছি।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "অনেক সময় দৈব-চিকিৎসায় সেরে যায় না?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এঁর ত সারল না। মাদুলিও নিয়েছিলেন।"

ভিতর হইতে চা খাওয়ার আহ্বান আসাতে ঊর্ম্মিলা ভিতরে চলিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময় আবার অন্যদিকে সরিয়া আসিল। মায়ের কান্নাকাটি ও আরতির ভীত ত্রস্ত ভাব দেখিয়া সে রাত্রে আর বাড়ীর বাহির হইতেই পারিল না।

ভোরবেলা উঠিল বটে, তবে পার্কে বেড়াইতে আর গেল না। মা ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "এই একটু আগে ঘুমুলেন। তুই এখন একটু ঘুরে আসতে পারিস।"

ছেলে বলিল, "থাক্, দরকার নেই।

রাগ করিয়া কথা বলিতেছে ভাবিয়া মা বিরসমুখে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। দিনের কাজ আবার পূর্ববেগে চলিতে লাগিল। কর্ত্তা বেশ ঘণ্টা-দুই ঘুমাইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং পার্শ্বে উপবিষ্টা স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতি বলেছে কিছু?"

সুখদা বলিলেন, "এখনও ত বলে নি কিছু। ডাকছি এই ঘরেই। তোমার সামনেই বলুক।"

আরতি গিয়া দাদাকে ডাকিয়া আনিল। রামগতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঠিক করলে তুমি? মেয়েদের বাড়ী আজ খবর দিতে হবে, বিয়ে যদি কর। ওদের কিছু ত ব্যবস্থা করতেই হবে, মেয়ের বাড়ী যখন?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আর কোথাও কোনো ব্যবস্থা করা যখন সম্ভব নয়, তখন এই-ই করতে হবে। টাকার জন্য আমাকে একটা প্রতারণার ব্যাপারে যেতে হ'ল, এই যা দুঃখ। তবে এ বিয়ে নিয়ে কোথাও কোন ঘটা করতে যেও না। কাউকে বলার দরকার নেই!"

মা বলিলেন, "সে কি? বৌ এলে যেমন-তেমন একটা বৌভাত ত করতে হবে, আত্মীয়-কুটুম ডেকে? নইলে মেয়ের মা-বাপ ভাববে কি?"

"এরপর নানা কারণেই ওদের অনেক কিছু ভাবতে হবে। ও সব উৎপাত করার চেষ্টা ক'রো না, তা হলে আমি বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যাব।" বলিয়া জ্যোতির্ম্ময় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। স্নান করিয়া খাইয়া কলেজ যাইবার সময় পর্য্যন্ত আর কোন কথা বলিল না মা বা বাবার সঙ্গে।

সুখদা যথারীতি ঘটকীর সাহায্যে খবর পাঠাইলেন ক'নের বাড়ীতে।

জ্যোতির্ম্ময়ের দিন কাটিতে লাগিল একটা যেন দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়া। পার্কে যাওয়া সে ছাড়িয়া দিল। বারান্দায় যেদিকটায় গেলে ঊর্ম্মিলার বারান্দাটা বড় বেশী চোখে পড়ে সেদিকেও আর পদার্পণ করে না। কলেজে যাইতে-আসিতে তাহার কেবলই ভয় হয় পাছে ঊর্ম্মিলার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। ও মুখ আর সে চোখে দেখিতে চায় না। ঊর্ম্মিলা তাহাকে কি ভাবিতেছে কে জানে? কিছুই কি ভাবিতেছে? জ্যোতির্ম্ময়ের বিবাহের কথা কি তাহাদের কানে পৌঁছিয়াছে? তাহারা কাহাকেও জানায় নাই বটে, কিন্তু এ সমস্ত কথা কখনও লুকানো থাকে না। মা ঝিকে বলিবেনই এবং ঝি পাশের বাড়ীর ঝিকে বলিবে। সুতরাং ঊর্ম্মিলার জানিতে বাধা কি?

জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে কোনদিন ভালবাসার কথা বলে নাই। কোন ব্যবহারেও তাহা প্রকাশ করে নাই। তবু উর্ম্মিলা কি এই জীবনপ্লাবী প্রেমের কোন আভাসই পায় নাই? না পাইয়াও থাকিতে পারে। তাহার মনে কি আছে জ্যোতির্ম্ময় জানে না। জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিলে সে খুশী হয়। তাহার বন্ধুত্বে উর্ম্মিলার আনন্দ আছে। তাহার সান্নিধ্যও সে কাম্যই মনে করে। কিন্তু তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে জ্যোতির্ম্ময়ের মূর্ত্তি কি প্রবেশ করিয়াছে? জ্যোতির্ম্ময় জানে না। আর এখন জানিয়া লাভই বা কি?

আরতি বলিল, "দাদা আর পার্কে যাওই না যে? আমি কাল একলাই গিয়েছিলাম। উর্ম্মিলাদি তোমার কথা জিজ্ঞেস করলেন। অসুখ করেছে নাকি জানতে চাইলেন। তাঁর নিজেরও শরীর ভাল যাচ্ছে না, আরও যেন শুকিয়ে গেছেন।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কি হয়েছে তাঁর?"

"কি একটা ইংরিজি নাম বললেন ভুলে গেছি।"

তাহার দাদা আর কিছু বলিল না দেখিয়া আরতি চলিয়া গেল। মায়ের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তাহাদের পরিচিত ঘটকী ঠাকুরাণী বসিয়া আছে। মেয়ের বাড়ী হইতে সে ভাল খবরই আনিয়াছে। তাঁহারা আর চার দিন পরেই বিবাহ দিবেন। বরপক্ষ যেমন চাহেন সেইরূপ শাদাসিধা ভাবেই বিবাহ হইবে। গায়ে হলুদের তত্ত্ব করিতে হইবে না, শুধু তেল, হলুদ ও একখানা কোরা শাড়ী পাঠাইয়া দিলেই চলিবে।

আরতি বলিল, "এ রাম, ছিঃ, এই রকম ক'রে আমার দাদার বিয়ে হবে? অমন রাজপুত্তুরের মত চেহারা! বর সাজলে কি সুন্দর দেখাত!"

মা কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমার কপাল! ছেলে যা রাগ ক'রে বিয়ে করছে তা দেখে ত আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। এখন বৌ নিয়ে ঘরে তোলা যায় তবেই। শান্তি কিছু হবে না, বুঝতেই পারছি। নিতান্ত নিরুপায়, তাই। আবার বছরখানেক পরে কি হবে কে জানে?"

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা জ্যোতির্ম্ময়কে জানান হইল। সে নীরবে শুনিল। তাহার দিক্ হইতে আর কোন উদ্যোগ-আয়োজনের বালাই ছিল না, শুধু কলেজ হইতে দু'দিনের ছুটি লইল।

বিবাহের দিন সকালে সুখদা ভয়ে ভয়ে ছেলের গায়ে একটু তেল হলুদ ছোঁয়াইয়া দিলেন। অন্যান্য আচার সবই বাদ গেল। ছেলের প্রলয়গম্ভীর মুখের দিকে তাকাইয়া সুখদা আর কোন কথা কহিতেই সাহস করিলেন না।

বেলা বাড়িতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ের সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পাট নাই। নিজের ঘরে শুইয়া সে যে কি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে, তাহার ঠিক নাই। এই অশুভ দুর্য্যোগ তাহার জীবনকে স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কলিকাতা-বাসের ইচ্ছাটা ফুরাইয়া গিয়াছিল। দু'চার জায়গায় ইহার মধ্যে খোঁজও সে লইয়াছে। কলিকাতার বাহিরে কাজ পাওয়া কিছুই তাহার অসম্ভব নয়। সহজেই পাইতে পারে। শীঘ্রই পাইতে পারে। বিবাহের পর সে চলিয়াই যাইবে। মা বাবা অবশ্য আপত্তি করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের সব আবদারই যে তাহার রাখিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? কিছুদিন ত সে নিষ্কৃতি পাক, তাহার পর ভাবিয়া-চিন্তিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।

হঠাৎ বোনের ডাকে তাহার চমক ভাঙিল। বেলা ত পড়িয়া আসিয়াছে। কি ব্যাপার? শুনিয়াছিল ত যে গোধূলি-লগ্নে বিবাহ। এতক্ষণ বরের জন্য গাড়ী একটা আসার কথা।

আরতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, ডাকছিস্ কেন?"

আরতি ভীতকণ্ঠে বলিল, "মা খবর নিতে বলছেন, বাবা বড় ব্যস্ত হচ্ছেন।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কোথায় খবর নিতে হবে? আর খবর নেবেই বা কে?"

আরতি বলিল, "মা বলছেন, তুমি যদি জামাইবাবুকে বল, ত তিনি খবর নিয়ে দেবেন।"

জ্যোতির্ম্ময় আর কথা না বাড়াইয়া ভগ্নীপতির কাছে একটা চিঠি লিখিয়া ঝিয়ের হাতে পাঠাইয়া দিল। নিজেও খানিক বিস্মিত হইয়া উঠিল। ভাগ্য আবার কি নতুন খেলা খেলিতে প্রস্তুত হইতেছে কে জানে?

আধঘণ্টা খানিক পরে ঝি ফিরিয়া আসিল। হাতে খামে বন্ধ করা চিঠির জবাব। খাম ছিঁড়িয়া জ্যোতির্ম্ময় পড়িল। এ আবার কি কাণ্ড? ভগ্নীপতি চিঠিতে জানাইয়াছেন, যে, বিবাহ আজ হইতেই পারে না। কন্যাকে

সকাল হইতেই পাওয়া যাইতেছে না। চারিদিকে লোক বাহির হইয়াছে খুঁজিতে, থানাতেও খবর দেওয়া হইয়াছে। কন্যার সন্ধান মিলিলে তখনই খবর দেওয়া হইবে।

প্রথমেই একটা মুক্তির আনন্দে জ্যোতির্ময়ের মন প্লাবিত হইয়া গেল। বাঁচিলাম, কিন্তু সে আনন্দের উচ্ছ্বাস বেশীক্ষণ রহিল না। যে দুর্যোগ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহা ত থাকিয়াই গেল। কোন্ উপায়ে এখনই সে টাকা জোগাড় করিবে? দিন সাত-আটের বেশী আর সময় নাই।

আরতিকে ডাকিয়া চিঠিখানা বাবার হাতে দিয়া আসিতে বলিল, নিজে নীচের বসিবার ঘরে গিয়া বসিল, মাথা ঠাণ্ডা করিয়া এখন চিন্তা করা দরকার। কিন্তু চিন্তা করিয়াও কোন কূলকিনারা দেখা যায় না। ভগ্নীপতি গুরুতর সংসারভার-পীড়িত, তাঁহার কাছে কোন আশা নাই। আত্মীয়স্বজন সকলেই দরিদ্র। বন্ধুবান্ধব তাহার আছে বটে অনেক কিন্তু এহেন ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারে এমন কে আছে? সকলেই অল্পবয়স্ক, সবে সংসারে প্রবেশ করিয়াছে।

উপরতলায় মা তখন উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতেছেন। ইহাই তাঁহার নিয়ম। নীরবে কোন শোকদুঃখ তিনি সহ্য করিতে পারেন না। ইহার পর রামগতির কাশি ও হাঁপানি শুরু হইবে। আরতি ভীত হইয়া বাবার ঘরে ও দাদার ঘরে ছুটাছুটি করিবে। কোনদিনই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

বাহিরে পদধ্বনি শুনিয়া তাকাইয়া দেখিল, দিদি ও জামাইবাবু আসিতেছেন, বুদ্ধি করিয়া বাচ্চাকাচ্চাগুলিকেও সঙ্গে আনেন নাই। ঘরে ঢুকিয়া জামাইবাবু বলিলেন, "তুমি উপরে যাও গো, মাকে একটু ঠাণ্ডা কর গিয়ে। অমন মড়াকান্না জুড়েছেন কেন? আমাদের ত ছেলে, মেয়ে ত নয়? অন্নপূর্ণা হতে হবে না তাকে। পাড়া প্রতিবেশী ভাববে কি?"

মিনতি উপরে চলিয়া গেল, জামাই ভবেশ বলিল, "আচ্ছা বিপদ্ যা হোক। তবে টাকাকড়ির ব্যাপারে একটা অসুবিধা থেকে গেল তাই, না হলে মেয়ের যা পরিচয় পেলাম, তাতে তোমার গলায় যে ঝোলে নি, সে তোমার সৌভাগ্য।"

জ্যোতির্ময় কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি পরিচয় পেলেন মেয়ের?"

ভবেশ বলিল, "আমার এক ভগ্নাপতি থাকে ওদের পাশের বাড়ীতে, তার কাছে এখনি ফোন করেছিলাম। শুনলাম, মেয়ে পাড়ারই এক বখাটে ছেলের সঙ্গে প্রেম চালাচ্ছিলেন এতদিন। সে আবার ভিন্ন জাতের, রোজগারও বিশেষ কিছু করে না। তাই মা-বাপ ব্যস্ত হয়ে বিয়ে দিয়ে দিতে চাইছিলেন মেয়ের। সুপুরুষ হ'লে যদি মেয়ের মন বসে, তাই তোমার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন।"

আরতি সিঁড়ির মুখ হইতে ডাকিয়া বলিল, "জামাইবাবু, বাবা তোমাকে উপরে ডাকছেন একবার।"

ভবেশ উপরে চলিয়া গেল এবং জ্যোতির্ময় বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, মেয়েটা আমার নমস্যা, যতই না লোকে তার নিন্দা করুক। আমি পুরুষ হইয়া যাহা পারি নাই, সে অল্পবয়স্কা মেয়ে হইয়া তাহাই পারিয়াছে। নিজেকে বিক্রয় করিতে রাজী হয় নাই।

হঠাৎ বাহির হইতে কে বলিল, "একখানা চিঠি আছে।"

জ্যোতির্ময় তাকাইয়া দেখিল পাশের বাড়ীর চাকর তারণ দাঁড়াইয়া আছে। সে হাত বাড়াইতেই চিঠিখানা আলগোছে তাহার হাতে দিয়া তারণ আবার দরজার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

জ্যোতির্ময় খাম খুলিয়াই চিঠির নীচের নামটা দেখিল। উর্ম্মিলাই বটে। সে লিখিয়াছে বিনা সম্বোধনেই।

"আপনার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে আমার এখনই দেখা হওয়া দরকার। আপনার বা আমার বাড়ীতে হবে না। কারণ এটা আমি এখন কাউকে জানাতে চাই না। যদি পার্কে যেতে পারেন এখন, তা হ'লে ভাল হয়। আমার শরীর ভাল নেই। নইলে সিনেমা-টিনেমায় গেলেও হ'ত। উত্তর দেবেন এবং খামে বন্ধ ক'রে দেবেন।

উর্ম্মিলা।"

জ্যোতির্ময় মিনিট খানিক নীরবে বসিয়া রহিল, তাহার পর কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিল,

"আমি এখনই যাচ্ছি পার্কে। জ্যোতির্ময়।"

৫

পার্কটায় বিকালে ভীড় কিছু বেশী হয়। ছেলেপিলে এবং মেয়েদের ভীড়। পাড়ার কাছাকাছির মধ্যে ঐ একটিমাত্র বেড়াইবার জায়গা। কিছু দূরে অবশ্য লেকের বিস্তৃততর উদ্যান আছে, তবে অতটা হাঁটিতে অনেকেই পছন্দ করেন না। আর এত মেয়ের ভীড় যেখানে সেখানে দর্শক ও শ্রোতা হিসাবে পাড়ার যুবকবৃন্দ সর্ব্বদাই হাজির থাকে।

সকাল হইতে জ্যোতির্ম্ময়ের নাওয়া খাওয়া কিছুই হয় নাই। কিন্তু এই রকম মলিন শ্রীহীন বেশে তাহার যাইতে ইচ্ছা করিল না। খাওয়ার ব্যবস্থা যা হয় পরে হইবে, এই ভাবিয়া আগে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া কাপড়-চোপড় বদ্‌লাইয়া ফেলিল। আরতিকে বলিল, "মাকে বলিস্ আমি একটু বেরুচ্ছি। ঘণ্টা-খানিকের মধ্যে ফিরব। দিদি আর জামাইবাবুকে ততক্ষণ বসতে বলিস।" আরতি কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

পার্কে যথারীতি ভীড়। তবে মাঝে মাঝে একটু ফাঁকা জায়গাও আছে। ভিতরে ঢুকিয়া জ্যোতির্ম্ময় দেখিল, উর্ম্মিলা পার্কের এক কোণে ঘাসের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। চেহারাটা ভাল দেখাইতেছে না, কেমন যেন শুষ্ক বিবর্ণ মুখ।

তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া নমস্কার করিয়া বসিয়া পড়িল জ্যোতির্ম্ময়। বলিল, "সারাদিন দারুণ উৎপাতের মধ্যে ছিলাম। স্নানাহার কিছুই হয় নি। তাই সামান্য একটু দেরী হয়ে গেল আসতে। আপনি কি অনেকক্ষণ এসে ব'সে আছেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "বেশীক্ষণ আসি নি। এই পাঁচ-দশ মিনিট হবে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "চেহারাটা দেখে আপনাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "অসুস্থই আছি একটু। আমার স্বাস্থ্য ত কোনদিন ভাল নয়? যতটা সাবধানে থাকা উচিত তা আমি থাকি না। কি জানি কেন নিজেকে নিয়ে বেশী হৈ চৈ করতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমার স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করতে আমি আসি নি। গত কয়েকটা দিন আপনাদের উপর দিয়ে বড় বিপদ্ গেল। খবরটা ঝি-চাকরদের মারফৎ পাওয়া! তারা অনেক সময়ই ইচ্ছামত রঙ চড়ায়। ঠিক ব্যাপারটা কি তা বুঝেছি কি না জানি না। আমার তখন অসুখ ছিল। তা না হলে নিজে গিয়ে খবর নেওয়া চলত। তবে সেটাও হয়ত আপনি পছন্দ করতেন না।"

জ্যোতির্ম্ময় একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, "দেখুন, নিজেদের জীবনের দৈন্য আর কুশ্রীতা মানুষ লুকিয়েই রাখতে চায়, এমন কি খুব বড় বন্ধুর কাছ থেকেও। নইলে আপনি আমার বাড়ীতে আসবেন আর সেটা আমি অপছন্দ করব এটা ত সম্ভব নয়? তবে কি জানতে চান বলুন, আমি যা ঘটেছে তাই বলব।"

উর্ম্মিলা বলিল, "আপনাদের বাড়ী নিয়ে একটা গোলমাল চলছে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "চলছে বটে। আমার দিদির বিয়ের সময় বাবা বাড়ী বন্ধক দিয়ে খানিকটা টাকা ধার নিয়েছিলেন। তাড়াতাড়িতে আর কোনো উপায় খুঁজে পান নি বোধ হয়। না হলে ঐ রকম termsএ কেউ টাকা ধার নেয় না। আমাকে তখন কিছু বলেন নি, বললে হয়ত আমি বাধা দিতাম। সেই টাকা সুদে আসলে এখন এমন একটা অঙ্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, যা শোধ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এই মাসের শেষ ক'টা দিন মাত্র সময়। এর মধ্যে কিছু জোগাড় করা সম্ভব নয়। বাড়ীটা যাবেই মনে হচ্ছে।"

উর্ম্মিলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আজ আপনার বিয়ের কথা ছিল?"

জ্যোতির্ম্ময় একটু ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "ঠিকই শুনেছেন। এ-সব খবর কখন চাপা থাকে না। তবে সেটা হয় নি দেখতেই পাচ্ছেন। বিক্রী করবার আর কিছু ছিল না, তাই শেষ চেষ্টা ক'রে দেখছিলাম যদি নিজেকে বিক্রী ক'রে কোন ব্যবস্থা হয়।"

উর্ম্মিলা বলিল, "ভগবান্ কি মনে ক'রে কি করেন, তা বোঝা ত মানুষের সাধ্য নয়? নিজে আপনি একদিক্ দিয়ে বেঁচে গেলেন, কারণ, এ রকম বিয়ে করা কোনও আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অন্য বিপদ্ যেটা সেটা ত থেকেই গেল?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তা ত রয়েইছে।"

ঊর্মিলা একটুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "একটা কথা বলছি, শুনে রাগ করবেন না। অত্যন্ত সঙ্কোচ হচ্ছে বলতে, তবু আমি বলব, আমি আপনাকে সব টাকাটাই দিতে পারি, যদি আপনি নিতে রাজি হ'ন।"

জ্যোতির্ময় ত বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। এত টাকা এই তরুণী কোথা হইতে দিবে? আর সে ঊর্মিলার কাছে এত বড় ঋণে জড়িত হইতে পারে কি? যাহাকে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া ধন্য হইতে চায়, তাহার নিকট হইতে লইতে হইবে এই টাকার বোঝার ঋণ?"

কথা বলিতেছে না দেখিয়া ঊর্মিলা উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "খুব রাগ করলেন?"

জ্যোতির্ময় মুখ তুলিয়া বলিল, "রাগ করি নি, তবে বিস্মিত হই নি এমন কথা বলব না। এতগুলো টাকা আপনি একসঙ্গে কি ক'রে দেবেন, বুঝতে পারছি না।"

ঊর্মিলা বলিল, "আমার কিছু অসুবিধা নেই। পৃথিবীতে আর যারই অভাব থাক, টাকার অভাবটা আমার নেই। বাবা টাকাকড়ি মন্দ রেখে যান নি। নিজেও চাকরী করি। খরচ বলতে আমার বিশেষ কিছু নেই। সংসার চালান ছোট মাসী। তাঁর ছেলে-পিলে নেই, স্বামীও নেই, টাকাকড়িও যথেষ্ট আছে। খরচটা বেশীর ভাগ নিজেই দিয়ে দেন। আমি সামান্য কিছু দিই। মাইনের টাকাটাও পুরো আমার খরচ হয় না। ব্যাঙ্কের টাকা ব্যাঙ্কেই প'ড়ে থাকে। খানিক Fixed Deposit-এ আছে, খানিক এমনি ছড়ানও আছে। আমি সহজেই দিতে পারি, কিন্তু আপনি নিতে কেন সঙ্কোচ করছেন?"

জ্যোতির্ময় বলিল, "নিজের মনকে আমি রাজী করাতে পারছি না, কি ক'রে এটা আমি নেব আপনার কাছ থেকে? আমি পুরুষ, আপনার চেয়ে বয়সেও অনেক বড়।"

ঊর্মিলা বলিল, "আমি ছোট, আর মেয়ে, এই আমার অপরাধ? এর জন্যে আমি আপনাকে একটু সাহায্যও করতে পারব না? পুরুষ যদি হতাম তাহলেই টাকা নিতে আপনার কোন আপত্তি থাকত না?"

জ্যোতির্ময় বলিল, "তা থাকত না। আপনি ভাববেন না যে, আমি আপনার এই offer-এর মূল্য বুঝছি না। এটা প্রায় বিধাতার আশীর্ব্বাদের তুল্য জিনিষ আমার কাছে। কিন্তু কি ক'রে নেব?"

ঊর্মিলা বলিল, "আপনার আর কোথাও বাধছে না। আত্মাভিমানে বাধছে। একটা সামান্য মেয়ের কাছে ঋণী থাকতে চান না। কিন্তু আজই যে কাজ করতে যাচ্ছিলেন টাকার খাতিরে, এটা কি তারও চেয়ে অরুচিকর?"

জ্যোতির্ময় স্বীকার করিল, "তা নয় অবশ্য।"

ঊর্মিলা বলিল, "তবে নিন টাকাটা আপনি। অনেক সঙ্কোচ কাটিয়ে তবে এ প্রস্তাব আমি করতে পেরেছি। আপনাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, নিজের সবচেয়ে বড় বন্ধু মনে করি। এ রকম বিপদেও যদি আমি নিজে কিছু না করতাম আপনার জন্যে, তাহলে নিজের কাছে অত্যন্ত ছোট হয়ে যেতাম, টাকাকড়ির উপর চিরদিনের মত আমার ঘৃণা এসে যেত। এ দুঃখ আপনি আমায় দেবেন না। হলেই-বা মেয়ে। মেয়েও ত মানুষ?"

জ্যোতির্ময় একদৃষ্টে ঊর্মিলার দিকে তাকাইয়া রহিল। সে-দৃষ্টি ঊর্মিলা দেখিল না, সে অন্য দিকে চাহিয়া কথা বলিতেছিল। দেখিলে বোধ হয় বিস্মিত হইত এবং বুঝিলে আনন্দে তাহার জীবন প্লাবিত হইয়া যাইত।

কয়েক মিনিট পর জ্যোতির্ময় বলিল, "আচ্ছা টাকাটা আমি নিলাম। প্রথমে আপত্তি করেছিলাম, সে কথাটা আপনি ভুলে যাবেন। বন্ধুর কাছ থেকে নিতে আমার লজ্জা নেই।"

ঊর্মিলার মুখে আবার তাহার প্রশান্ত সুন্দর হাসি ফিরিয়া আসিল। বলিল, "বাঁচালেন আপনি আমাকে। আবার কখন কি ক'রে বসবেন ঝোঁকের মাথায়, আর চিরজীবন কষ্ট পাবেন তাই নিয়ে, এ ভয় আমার ছিল। আচ্ছা, আপনার ত সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয় নি, আপনাকে আর আটকে রাখব না। কাল সকালেই আমি পার্কে আসব, একটু বেশী ভোরেই আসব। নিয়ে আসব চেকটা, ঋণের শেষ রাখতে নেই যে বলে তা কথাটা ঠিকই। একেবারে চুকে যাক, আচ্ছা উঠুন তবে।"

দু'জনে ফিরিয়া চলিল। পার্কের গেটের কাছে আসিয়া ঊর্মিলা বলিল, "আমাকে ঐ সামনের ওষুধের দোকানটা ঘুরে যেতে হবে। একটা ওষুধের অর্ডার দিয়ে রেখেছি।"

সে দোকানের দিকে চলিল। জ্যোতির্ময় বাড়ীর পথ ধরিল। এক বিচিত্র অনুভূতিতে তাহার মন তখন ভরিয়া উঠিয়াছে। মাথার ভিতর সে যেন এই কয়েকদিন নরকের আগুন বহন করিয়া বেড়াইয়াছে। তাহা জুড়াইয়া

যেন তাহার অমৃতস্পর্শ। বুকের উপর যে পাষাণ-ভার চাপিয়া ছিল, তাহাই যে কে তুলিয়া লইল। ঊর্মিলা স্বীকার করিয়াছে সে জ্যোতির্ময়কে সবচেয়ে বড় বন্ধু মনে করে, তাহাকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। বন্ধুর বিপদে আকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে তাহাকে সাহায্য করিতে। এবং সেও যেমন-তেমন সাহায্য নয়। যে কোন বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ এহেন ক্ষেত্রে পিছাইয়া যাইত। অকাতরে অম্লানবদনে এতগুলি টাকা দিয়া বসিল।

শুধুই বন্ধুত্ব, শুধুই শ্রদ্ধা, আর কিছুই নাই কি তাহার মনে? চোখের দৃষ্টির মধ্যে আরো কি একটা ভাব ক্ষণে ক্ষণে উঁকি মারিয়া যাইতেছিল, সেটা স্পষ্ট নয়। ইহাও কি সেই ভাব যাহার স্রোত জ্যোতির্ময়কে প্রায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে? জনতার ভীড়ের মধ্যে বসিয়া তাহাকে এতক্ষণ কথা বলিতে হইয়াছে, না হইলে নিজেকে সে সংযত রাখিতে পারিত কি? ঊর্মিলাকে আলিঙ্গন করিয়া জীবনের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করিয়া তাহার হৃদয়দ্বারে দান করিয়া আসিত না কি? সে কি আনন্দ করিয়া এই অর্ঘ্য গ্রহণ করিত, না স্মিত কৌতুকহাস্যে ফিরাইয়া দিত? কিন্তু লগ্ন ত পার হইয়া গেল। আকাশ আবার সুনীল হইয়া হাসিতেছে তাহার চোখে, বাতাসের মধুর স্পর্শ প্রিয়ার স্পর্শের মতই দেহে সুধা-প্রলেপ দিতেছে। কিন্তু মনের ভিতর আবার এত বড় শূন্যতা কোথা হইতে আসিল? কি তাহার পাইবার ছিল, আর কিই-বা সে পাইল না? ঊর্মিলার আহ্বানে কেন সে ছুটিয়া গিয়াছিল? বাড়ীর কাছে আসিয়া সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল। এখনই হাজার প্রশ্ন তাহার উপর বর্ষিত হইবে, তাহাকে উত্তর দিতে হইবে অতি সাবধানে, কেহ যেন ঘুণাক্ষরেও সত্য কথা জানিতে না পারে। ঊর্মিলা চায় না এ কথা কেহ জানে, এ ইচ্ছা তাহাকে পূর্ণ করিতেই হইবে।

বাড়ীর সদর দরজায় ঢুকিতেই ভবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে উপরের কান্নাকাটি সহ্য করিতে না পারিয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছে। জ্যোতির্ময়কে দেখিয়া বলিল, "আমি তাহলে চলি এখন, কাল সকালে এসে পরামর্শ করব তোমার সঙ্গে। মিনতি এখন রইল এখানেই। মাকে এখনও শান্ত করা যাচ্ছে না। আমি ন'টা সাড়ে ন'টা আন্দাজ এসে বাড়ী নিয়ে যাব এখন।" বলিয়া চলিয়া গেল।

জ্যোতির্ময় আস্তে আস্তে উপরে উঠিতে লাগিল। পিতা মোটামুটি শান্ত ভাবেই শুইয়া আছেন। তাঁহার অবস্থা যেন উদ্বেগ অনুভব করারও উপরে চলিয়া গিয়াছে। মরণপারের শান্তির মতই কি একটা ভাব তাঁহার চিত্তের উপর নামিয়া আসিয়াছে। সুখদার আর চীৎকার করিবার ক্ষমতা নাই, তবু ঘরের কোণে বসিয়া ফোঁপাইতেছেন। আরতি নীচে রান্নাঘরে ঝিয়ের সাহায্যে রান্নাবান্না সারিবার চেষ্টা করিতেছে। মিনতি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। জ্যোতির্ময়কে দেখিয়া মিনতি বলিল, "জ্যোতি ত সকাল থেকে না খেয়ে আছিস্! একটু চা ক'রে আনব, নয়ত একটু সরবৎ?"

সকলেই অপেক্ষা করিতেছিল তাহার অস্বীকৃতির। সে যখন প্রশান্ত কণ্ঠে বলিল, "নিয়ে এস, তবে সরবৎই একটু। চা আর এই গরমে খেতে ইচ্ছে করছে না।" তখন সকলেই শুনিয়া অবাক্। সে যেন মহা নিশ্চিন্ত! রামগতি ত চটিয়াই গেলেন। অমনোনীতা কন্যা বিবাহ করিতে হয় নাই, শ্রীমান্ সেই আনন্দেই ডগমগ। আজ বাদে কাল গিয়া যে পথে বসিতে হইবে সে খেয়াল নাই। মাও তাহাই ভাবিলেন, তবে ছেলেকে তিনি ভয় করিতেন খানিকটা, সুতরাং তাহার উপর রাগ করিতে ভরসা করিলেন না, শুধু নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন। এত লেখাপড়া করিয়াছে, তবু এইটুকু কাণ্ডজ্ঞান নাই। মিনতি সাত-সতেরো বুঝিল না, তাড়াতাড়ি নীচের রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

আরতি জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা ফিরেছে দিদি?"

মিনতি বলিল, "এই ত এল। সারাদিন খাওয়া নেই, ঘুম নেই, একটু সরবৎ ক'রে দিই।"

আরতি চিনি লেবু প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া দিল। বলিল, "আচ্ছা দিদি, দাদার মত সুন্দর দেখতে বর কি পথে-ঘাটে বসে আছে? মেয়েটা পালিয়ে গেল কেন?"

মিনতি বলিল, "কে জানে বাপু, আগে নাকি কার সঙ্গে ভালবাসা ছিল। মা-বাপকেও বলিহারি যাই, যার-তার সঙ্গে মেয়েকে মিশতে দিলেই হ'ল?"

আরতি বলিল, "আজকাল ত ভাই সকলেই মেশামিশি করে। আমাদের বাড়ীতেই এক চলে না। তাও ত দাদা দেখ প্রায়ই পাশের বাড়ীতে যাওয়া-আসা করে। ঊর্মিলাদিও ত আসেন, কই, কেউ ত কিছু বলে না।"

দিদি বলিল, "এদের জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে, কত লেখাপড়া করেছে। আর এ মেয়ের ত মা-বাবাও নেই, কেই-বা বারণ করছে? তা মেয়েটি বেশ ভাল না রে?"

আরতি বলিল, "খুব ভাল ভাই। খোকা ওর যা প্রশংসা করে।"

মিনতি সরবৎ লইয়া উপরে চলিল। জ্যোতির্ম্ময় তখনও বারান্দায় ঘুরিতেছে। মিনির হাত হইতে সরবৎ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আর কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা আছে বাড়ীতে? না বাইরে থেকে খেয়ে আসতে হবে?"

ভুবনের কাজের পালা শেষ করিয়া এতক্ষণে উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "বাইরে খেতে হবে কেন? খুকী ত রান্না চাপিয়েছে। আমি যাচ্ছি নীচে, এখনি সেরে ফেলব।" বলিয়া তিনি নামিয়া গেলেন। মিনতি দিয়া তাহার খাবার সামনে ধরিল।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পায়চারী করিয়াও জ্যোতির্ম্ময় সে রাত্রে উর্ম্মিলার দেখা পাইল না। রামগতি ওষুধের গুণে ঘুমাইয়া পড়িলেন। বাড়ীর আর সকলের খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেল। খানিক পরে ভবেশ আসিয়া মিনতিকে লইয়া গেল।

শুইয়া পড়িয়া জ্যোতির্ম্ময় ভাবিতে লাগিল, সত্যই অলৌকিক ঘটনার যুগ চলিয়া যায় নাই। আজ ত তাহার নিশ্চিন্ত আরামে নিজের চির-অভ্যস্ত শয্যায় শুইয়া থাকার কথা নয়? জীবনের একটা কালরাত্রিই আজ আসিবে বলিয়া সে ধরিয়া রাখিয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তে এ কি মুক্তির আনন্দ! কিন্তু মুক্তির আনন্দই কি তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া আছে? কোথায় আনন্দের অনুভূতি? ঋণ ত তাহার থাকিয়াই গেল, কিন্তু নিজেকে বিক্রয় করিতে ত পারিল না। যে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল সেটাতে তবু কিছু দেনা-পাওনার ব্যাপার ছিল। তাহার নিজের মূল্য অবশ্য ছ' হাজার টাকা মাত্র নয়, তবে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয়ই ত সে সত্যই হইতেছিল না? দায়িত্ব অনেকখানি তাহাকে ঘাড়ে লইতে হইত, ইহারই পরিবর্ত্তে অর্থসাহায্য পাইত, কিন্তু এখানে যে সে কিছুই দিতে পারিল না। এ ঋণ ত আগাগোড়াই ঋণ।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সে জানে না। ভোর রাত্রের দিকে একবার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন চারটা বাজিয়া গিয়াছে। আবার এখন ঘুমাইলে উঠিতে বেলা হইয়া যাইবে। সে উঠিয়া পড়িল, মুখ হাত ধুইয়া কাপড়-চোপড় বদ্‌লাইয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। আকাশটা কিছু পরিমাণ স্বচ্ছ হইতেই আরতিকে ডাকিয়া বলিল, "ও রে, উঠে সদর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিবি আয়, আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি।"

আরতি কোন মতে শাড়ী জড়াইয়া চলিল নীচে দাদার সঙ্গে। যাক, এ আপদের বিবাহ না হইয়া দাদার মুখে আবার হাসি ফুটিয়াছে। প্রাণে শান্তি আসিয়াছে। হতভাগী মেয়েটা দাদার উপকারই করিল পলাইয়া গিয়া। তবে এই বাড়ীর ব্যাপার লইয়া হাঙ্গামা ত থাকিয়াই গেল।

জ্যোতির্ম্ময় দ্রুতপদে পথটুকু অতিক্রম করিয়া গেল। এ পাড়ার সদাজাগ্রত চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। ইহারই মধ্যে হয়ত তাহাদের নামে কথা উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার কানে অবশ্য আসে নাই, কিন্তু অন্যরা শুনিয়া থাকিবে।

পার্কে তখনও জনসমাগম হয় নাই। দু'একটা মালী কাজ করিতেছে। একটা খালি বেঞ্চিতে বসিয়া জ্যোতির্ম্ময় অপেক্ষা করিতে লাগিল। সুখের দুঃখের নানা চিন্তাধারা মিশিয়া তাহার মনটাকে কেমন যেন উদ্বেল করিয়া তুলিল। জীবনটা এমনভাবে জড়াইয়া পড়িল কেন? এই ত মাত্র কয়েকটা দিন আগে জগতে তাহার কোন দুঃখ ছিল না? অবশ্য আনন্দও ছিল না। বেদনা যে কি বিপুল হইতে পারে, আজ তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে। আবার আনন্দের সম্ভাবনাও যে কি অত্যাশ্চর্য্য তাহাও কি সে বোঝে না?

উর্ম্মিলা আসিতেছে দেখা গেল। জ্যোতির্ম্ময়ের পাশে আসিয়া বসিয়া বলিল, "আপনি যে আজ রাত থাকতেই উঠে পড়েছেন দেখছি। অবশ্য বেশী উদ্বেগ থাকলে মানুষের ঘুম হয় না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "উদ্বেগটা সত্যই বেশী সেটা স্বীকার করা ছাড়া উপায় কি?"

হাতের ঝোলান ব্যাগ হইতে একটা চেক্ বাহির করিয়া উর্ম্মিলা জ্যোতির্ম্ময়ের হাতে দিল, বলিল, "সাবধান ক'রে রাখুন, ছোট্ট কাগজের টুকরো ত হাওয়ায় না উড়ে যায়।"

জ্যোতির্ম্ময় বহুমূল্য কাগজের টুকরাটিকে নিজের ওয়ালেটের ভিতর ঢুকাইয়া পকেটে রাখিল। বলিল, "ধন্যবাদ জানাবার চেষ্টা করব কি? কিন্তু ভাষার অপব্যবহার ক'রে ক'রে আমরা ত দেউলে হয়ে গেছি, কোন্ ভাষায় বা আমি আপনাকে জানাব যে আমি কি অনুভব করছি!"

"ছোট্ট কাগজের টুকরো ত ? হাওয়ায় না উড়ে যায়।"

ঊর্মিলা বলিল, "কি হবে জানিয়ে ? ব্যাপারটাকে কোন অত formal ক'রে তুলতে চাইছেন ? দিয়ে দেবেন একদিন যখন সুবিধা হয়। বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এমন নেওয়া-দেওয়া চলেই ত ?"

জ্যোতির্ময় বলিল, "কি জানি চলে কিনা। কাল বিকেল অবধি ত মনে হয় নি যে জগতে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন আমার কেউ আছে। অবশ্য আপনাকে তখন মনে মনেই বাদ দিয়েছিলাম, আপনিই যে শেষে মূর্ত্তিমতী করুণা হয়ে দেখা দেবেন সেটা সম্ভব মনে হয় নি।"

ঊর্মিলা বলিল "আচ্ছা, কি এমন করেছি, আমি ? নিজেরই যে এখন অপ্রস্তুত লাগছে আমার। Please আপনি এটা নিয়ে অত কথা বলবেন না। অত বেশী স্থান দেবেন না ওটাকে মনের মধ্যে। দান, খয়রাৎ কিছুই করছি না ত ? কতকগুলা টাকা ব্যাঙ্কে পড়েছিল, না হয় আপনার কাছে রইল ? যখন সুবিধা হবে দিয়েই ত দেবেন। যতদিন পরে হোক, যত কম কম ক'রে হোক, আপনার সুবিধামত দেবেন আপনি, আমার বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হবে না।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "কোনদিন যদি না দিতে পারি ?"

ঊর্মিলা বলিল, "কোন অসুবিধা তাতেও আমার হবে না।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "তাহলে কি আর আমি বলব বলুন ? একটা চিঠি অন্ততঃ আমার কাছে নিন্ ? টাকাটা যে নিয়েছি তার একটা স্বীকৃতি কোথাও থাকু ?"

ঊর্মিলা সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, কি হবে চিঠি নিয়ে ? আমি কি মামলা করতে যাব আপনার নামে টাকার জন্যে ?"

জ্যোতির্ময় বলিল, "যতদিন আপনি বেঁচে আছেন আর আমি বেঁচে আছি, ততদিন মামলা হবে না ঠিকই। কিন্তু মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কথা বলা যায় না। আমি ম'রে যেতে-পারি অসময়ে, তখন আমার আত্মীয়েরা এ ঋণ যদি স্বীকার না করেন ?"

ঊর্মিলার মুখের উপর কিসের যেন কালো ছায়া নামিয়া আসিল। বলিল, "তখন ঐ টাকাটার জন্য আমি কি দুঃখ করতে বসব ? তার চেয়ে অসংখ্যগুণে বড় ক্ষতি কি আমার হয়ে যাবে না ? বন্ধু যদি সত্যিই বন্ধু হয় তবে তার মূল্য কি টাকা দিয়ে কখনও নিরূপণ করা যায় ?"

জ্যোতির্ময় জিজ্ঞাসা করিল "আপনিও ত চিরজীবী নন। যদি হঠাৎ চ'লে যান, আপনার উত্তরাধিকারীরা যাতে বঞ্চিত না হন তার কোন ব্যবস্থা করবেন না ?"

উর্ম্মিলা বলিল, "আমার উত্তরাধিকারী ? কেউ নেই, কেউ কোনদিন হবেও না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সে কি ? একথা কেন বলছেন ?"

উর্ম্মিলা হাসিয়া বলিল, "এমনি বললাম। আমার কুষ্টিতে আমার পরমায়ু বড় অল্প আছে, ঘর-সংসার করার সময় হবে না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সর্ব্বনাশ! আপনি সত্যি ঐ সব কথা বিশ্বাস করেন নাকি ?"

উর্ম্মিলা বলিল, "বিশ্বাস খুব যে করি তা নয়। তবে নিজের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে মনে হয়, কথাটা ফ'লে যাওয়া অসম্ভব নয়। রোগের বোঝা বহন ক'রে কতদিন একলা একলা চলতে পারব কে জানে ?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "নিজের আরও কেয়ার নেন না কেন আপনি ? কলকাতায় না থেকে খুব ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকেন না কেন ?"

উর্ম্মিলা বলিল, "একেবারে বনবাসে যেতে ইচ্ছে করে না যে। এমনিতেই ত আমি রামায়ণের উর্ম্মিলার মত 'কাব্যে উপেক্ষিতা'। আমার নামে অনেকে আছে। কিন্তু কার্য্যতঃ কেউই নেই। তার উপর যদি আবার চেনা মানুষের সমাজ থেকে চ'লে যাই, তা হলে আমার নামও কেউ মনে রাখবে না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এটা আপনি ঠিক কথা বললেন না।"

উর্ম্মিলা বলিল, "সাধারণভাবে কথাটা বললাম। এক-আধজন exception আছেন ব'লেই ত বিশ্বাস করি আর আশা করি, নইলে কি বেঁচে থাকা যায় ?"

পার্ক এখন লোকজনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল, জ্যোতির্ম্ময় উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আমাকে ত আজ অনেক আগে বেরিয়ে পড়তে হবে এই সবের ব্যবস্থা করতে। কাজেই উঠলাম। আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পারলাম না। তবে ভগবান্ নিশ্চয় এটা দেখলেন। কৃতকর্ম্মের পুরস্কার তিনিই দেন, তাই নিজে যা করতে পারলাম না সেই ভার তাঁর হাতেই দিলাম। এ কথায়ও কি আপনি রাগ করবেন ?"

উর্ম্মিলা বলিল, "না, ভগবান্ যদি কিছু দেন ত মাথা পেতে নেব।"

৬

বাড়ী ফিরিয়া জ্যোতির্ম্ময় দেখিল যে সকলেই উঠিয়া পড়িয়াছে। বাবা গম্ভীর বিরস মুখে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে চা খাওয়ানোর জোগাড় হইতেছে। মা কাজকর্ম্ম নিয়মমত করিতেছেন। তবে তাঁহারও মুখ ভার। আরতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সে যেমন পড়া করিয়া বারান্দায় ঘোরে তেমনই ঘুরিতেছে।

মা ছেলেকে চা-রুটি আনিয়া দিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করবি কিছু ঠিক করেছিস্ ?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আজ ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে যাব। বাবার কাছে যে চিঠিটা তারা দিয়েছে সেটা এনে দিও আমাকে।"

মা বলিলেন, "তারা কি আর শুনবে কোন কথা ? অনেকদিন হয়ে গেল একটা পয়সা দিতে পারেন নি। চাকরিটাও ছেড়ে দিতে হ'ল। তোর বিয়ে দিয়ে কিছু পাবেন ভেবেছিলেন, তারও কোন ব্যবস্থা করা গেল না। ওদের আর দোষ কি দেব বল ? নিজেদের পাওনা-গণ্ডা সবাই ফিরে চায়।"

জ্যোতির্ম্ময় মনে মনে বলিল, 'পাওনা-গণ্ডা ফিরে চায় না, এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে। মনে হয়, ফিরে না পেলেই যেন বেশী খুশী হয়।' মায়ের কথার উত্তরে কিছুই বলিল না।

স্নান করিয়া আসিয়া বলিল, "আজ আমাকে অনেক আগেই বেরুতে হবে। তোমার হয়ত ততক্ষণে রান্না হয়ে উঠবে না, আমি না-হয় বাইরেই কিছু খেয়ে নেব।"

মা রাজী হইলেন না, যাহা রান্না হইয়াছিল তাহা দিয়াই ভাত বাড়িয়া ছেলেকে খাইতে বসাইয়া দিলেন। আরতি আসিয়া তাহাকে সেই সকল নষ্টের মূল চিঠিখানা দিয়া গেল।

বাহির হইবার সময় একবার পাশের বাড়ীর বারান্দার দিকে তাকাইয়া গেল। সেখানে কেহ নাই, তবে পাশের জানলাটার পরদার আড়ালে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া মনে হইল। উর্ম্মিলাই ত। কিন্তু বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায় নাই কেন ? তাহার কোমল সুন্দর মুখখানা দেখিয়া আজ যে যাত্রা শুরু হইত তাহা জ্যোতির্ম্ময়ের জীবনে কল্যাণ ছাড়া আর কিছু বহন করিয়া আনিত না।

চেক্ ভাঙাইতে, পাওনাদারের বাড়ী গিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে এবং তাহাদের বিস্ময়সাগরে হাবুডুবু খাওয়াইয়া টাকা ফেরত দিতেই তাহার সারা সকালটা কাটিয়া গেল। অনেক বেলা করিয়া তবে কলেজে পৌঁছিল। বাড়ীর দলিলখানা ফেরত পাইয়াছিল, মোটা পাটকরা কাগজখানা থাকিয়া থাকিয়া তাহার বুকের কাছে খোঁচা মারিতে লাগিল। এটা অতঃপর নিজের কাছে রাখাই ভাল। কারণ বাবার আবার কখন কি প্রেরণা আসিবে তাহার ঠিকানা নাই। আর বাড়ী ত তাঁহার হাতছাড়া হইয়াই গিয়াছে ধরিতে হইবে। তাঁহার আর কোন দাবী থাকিতে পারে না বাড়ী সম্বন্ধে। জ্যোতির্ম্ময়কেই যখন উদ্ধার করিতে হইয়াছে তখন আপাতদৃষ্টিতে বাড়ী তাহারই। আর ভগবানের চক্ষে আর একজনের, যাহার সহায়তায় এ কাজ সে করিতে পারিল। মনে মনে এই কথাটা ভাবিয়া সে একটু সান্ত্বনা লাভ করিল। একেবারে নিঃস্ব এখন আর সে নয়। বাড়ীখানার দাম এখনকার বাজারে হাজার চল্লিশেক টাকা হইবে, যদিও বাবা ছয় হাজারের জন্য ইহা নষ্ট করিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বোঝাপড়া একটা করিতেই হইবে। তাঁহাদিগকে কিছুই খুলিয়া বলা সম্ভব হইবে না, এইখানেই বিপদ্।

ফিরিয়া আসিয়া স্নান করিল, করিয়া চা খাইতে বসিল। বাবা তখনও তাহাকে ডাকেন নাই। মাও সামনে আসেন নাই। আরতি চা আনিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। নিজেই সে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় সুখদা আসিয়া ঢুকিলেন। ছেলের দিকে উদ্বেগ-আকুল দৃষ্টিতে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "ওরা কি বলল রে জ্যোতি?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "চল, বাবার ঘরে গিয়েই বলছি। প্রত্যেক জনকে আলাদা আলাদা ব'লে আর কি হবে?"

সুখদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ঘরে গিয়া দাঁড়াইলেন। রামগতি শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বললে ওরা?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সব টাকা দিয়ে ওদের সঙ্গে ত চুকিয়ে এলাম। কিন্তু মনে ক'রো না যে বাড়ী তোমার free হয়ে গেল।"

দ্বিতীয় কথাটা যেন শোনেন নাই, এমনভাবে রামগতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "সব টাকা দিয়ে? কোথায় পেলে তুমি দশ হাজার টাকা?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "পাব আর কোথায়? চুরি-ডাকাতি করি নি, ধারই করেছি। তবে যতদিন না সুদে-আসলে সে টাকা শোধ হচ্ছে ততদিন এ বাড়ী আমার ব'লেই ধরে নিতে হবে। কারণ, ধার শোধ আমিই করব।"

রামগতি কাশিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাই তাঁহার শেষ অস্ত্র। বলিলেন, "আখেরে তোমারই হবে। আমি আর ক'দিন? এই যা ধাক্কা খেলাম তা সামলে উঠলে হয়। দুটো দিনের জন্যে কেন আর আমাকে বেইজ্জৎ করা? বাড়ীটা আমার আছে, এই ভেবেই আমার যা শান্তি। তেমনি অবিবাহিত মেয়ের ভার এখনও অবধি আমারই।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "টাকা যাদের কাছে পেয়েছি, বাড়ী এখন তাদের কাছে বন্ধক পড়ল ধ'রে নাও। ওর ওপর আর তোমার অধিকার কি? বাস বড় জোর করতে পার, তবে আমার নামে transfer ক'রে দিলেও তা পারবে। আরতির বিয়ের ভারও আমিই নেব। আর এ সব ব্যবস্থা যদি তোমার পছন্দ না হয়, বাড়ীর নামে মাত্র অধিকারী হয়েই যদি খুশী থাকতে চাও ত তাও বল, তা হলে টাকা আমি ফেরত নিয়ে নিচ্ছি। ফিরিয়ে দিচ্ছি সে টাকা যার কাছে ধার করেছি, তারই কাছে। তুমি আর দু'দিন বাড়ীর অধিকারী হয়ে থাক।"

রামগতি কাশিতে কাশিতে বলিলেন, "সে আর কি ক'রে হয়। এই বাড়ীতেই আমার জন্ম, এই বাড়ীতেই আমার মৃত্যু। তুমিই রাখ বাড়ী। উকিলবাবুকে খবর দিয়ে দিও। তিনিই এসে ব্যবস্থা করবেন।"

জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া গেল। দলিলখানা নিজের দেরাজে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া সে এইবার ছাত্র পড়াইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইল। এই দারুণ উৎপাতে বাধ্য হইয়াই তাহাকে কর্ত্তব্যে খানিকটা অবহেলা করিতে হইল। এই কয়েকদিন বন্ধু-বান্ধবের সহিত বেড়ান বা গল্প করিতে যাওয়াও তাহার ঘটিয়া উঠে নাই।

পড়ান শেষ হইল আটটা আন্দাজ। অখিলদের বাড়ীতে একটু বেড়াইতে গেল। সৌভাগ্যক্রমে তাহাকে বাড়ীতেই পাইল। দুইজনে হাঁটিতে হাঁটিতে তাহাদের পরিচিত এক কফি হাউসের দিকে চলিল। অখিল জিজ্ঞাসা করিল, "বেশ খোশ্ মেজাজ দেখছি, দায়মুক্ত হয়েছ নাকি?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "একজনের হাত থেকে ত মুক্ত হলাম, তবে ধার ক'রেই মুক্ত হওয়া ত? ধার শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত একেবারে দায়মুক্ত হলাম কি ক'রে বলব?"

অখিল বলিল, "হবে সবই আস্তে আস্তে। অত টাকা চট্‌ ক'রে কার কাছ থেকে পেলে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সেটা ত এখন আলোচনা চলবে না, পরে হয়ত জানতে পারবে।"

অখিল বলিল, "দেখ বাপু, নিজেকে বাঁধা দিও না। ও বড় risky ব্যাপার। দুর্য্যোগটা কখনও কখনও শুভলগ্নে শেষ হয় বটে, কিন্তু চিরকাল বৌয়ের তাঁবেদার হয়ে থাকতে আর খোঁটা খেতে ভাল লাগে না। বরং বাড়ীই আবার বাঁধা দিও।"

জ্যোতির্ম্ময়ের কানে কথাটা দারুণ বেসুরো বাজিল। মুখে বলিল, "সে ভয় এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র নেই। কিছুই বাঁধা দিতে হবে না। তবে রোজগারটা বাড়াবার চেষ্টা করতে হবে এখন থেকে।"

অখিল বলিল, "সে ত হবেই। নিবারণবাবু ত retire করছেন এই গ্রীষ্মের ছুটির পর। কাজটা তোমায় দেবার কথা হচ্ছে নাকি?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমি ত শুনি নি, তুমি কার কাছ থেকে শুনলে?"

"কাল পরশু দু'দিনই লাইব্রেরীতে কথা হচ্ছে শুনলাম। আজ-কালের মধ্যেই তোমার ডাক পড়বে। শ'খানিক টাকা ত ঐখানেই বেড়ে গেল।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "অবশ্য কাজটা পেলে।"

"ও পেয়েই যাবে," অখিল বলিল। "এইবার ভাল দেখে একটি বিয়ে কর দেখি, বাপের সুপুত্তুর হয়ে। সংসারে মন বসবে। কাজেকর্ম্মে মন বসবে। কলিকালে বেশীদিন আইবুড়ো থাকা ভাল নয়, তাও আবার কলকাতার শহরে।"

তাহার যে একটা ফাঁড়া সবেমাত্র কাটিয়াছে তাহা আর জ্যোতির্ম্ময় বলিল না। ব্যাপারটা এমনি অরুচিকর যে মুখে আনিতেই তাহার কেমন একটা বিতৃষ্ণা লাগে। বন্ধুর কথার উত্তরে বলিল, "ভাল বিয়ে কাকে বলে?"

অখিল বলিল, "এই দেখতে শুনতে ভাল, ভাল বংশের, খানিকটা লেখাপড়া জানা মেয়ে। তোমার পরিবার ত খুব আধুনিক-পন্থী নয়, কাজেই স্ত্রী খুব উগ্র আধুনিকা না হলেও চলবে। তবে শ্বশুরবাড়ী এমন দেখে ক'রো যে কখনও যদি পঁচিশটা টাকা ধার চাও, তখন যেন খালি হাতে ফিরে না আসতে হয়।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "অর্থাৎ বৌ সকল দিক্‌ দিয়ে ভবিষ্যতে insurance-এর কাজ করবে এই ত? আমার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-সুবিধের দিক্‌টা দেখবার দরকার নেই?"

অখিল বলিল, "তার মানে?"

"তার মানে, সে আমাকে চাইবে কিনা স্বামীরূপে তা জানব কি ক'রে? আমারও ত তাকে পছন্দ না হতে পারে?"

অখিল বলিল, "সে হ'ল আলাদা কথা। তা হলে আগে love-এ পড়ে তবে বিয়ে করতে হয়। তোমার আবার এই Romeo বাতিক আছে তা ত জানতাম না। তা কলকাতার ত অসুবিধের কিছু নেই। বড়সড় আধুনিক মেয়ে ত সর্ব্বত্র, আর তোমার মত চেহারা নিয়ে প্রেম করতে চাইলে কে বা তোমাকে refuse করবে? মন পড়েছে নাকি কোথাও?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "পড়লে পরে খবর দেব।"

আরো খানিক্‌ ঘোরাঘুরির পর জ্যোতির্ম্ময় বাড়ী ফিরিল। শুনিল উকিলবাবুর কাছে খবর গিয়াছে, তিনি কালই আসিবেন বলিয়াছেন। মিনতি ও ভবেশ আসিয়াছিল, তাহারা জ্যোতির্ম্ময়ের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাড়ী ছাড়াইয়া লওয়া হইয়াছে শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত অবাক্‌ হইয়া গিয়াছে।

খাইয়া-দাইয়া নিজের ঘরে শুইয়া জ্যোতির্ম্ময় অনেকক্ষণ একটা বই পড়িবার চেষ্টা করিল। কিছুতেই মন লাগিল না। অখিলের কথাগুলি ক্রমাগত তাহার মনে ঘুরপাক খাইতে লাগিল। সে বন্ধুকে বলিল বটে, যে সে নিজেকে বাঁধা দেয় নাই, কিন্তু কথাটা পুরোপুরি সত্য কি? বাঁধা ত সে নিজেকে দিয়াই ফেলিয়াছে। কিন্তু সে কি টাকার জন্য বাঁধা দেওয়া? ছি, ছি, এমন কথা উর্ম্মিলার মনে কখনও আসিতে পারে না। সে যে ফুলের মত নিষ্পাপ, পবিত্র। এইরকম একটা ফন্দী করিয়া সে জ্যোতির্ম্ময়কে বন্ধনের মধ্যে ফেলিতে চায়, একথা ভাবাই যায় না। আর জ্যোতির্ম্ময়ের প্রতি তাহার চিত্ত যে আকৃষ্ট হইয়াছে তাহারই বা স্থিরতা কি? জ্যোতির্ম্ময়কে সে খুব বড়

বন্ধু মনে করে, এই বলিয়াই সে টাকা দিয়াছে। তাহাই বিশ্বাস করিয়া জ্যোতির্ময় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না কেন?

কিন্তু সত্যই যে পারে না? নিজে যেখানে সে সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেছে, তেমনি প্রাণঢালা ভালবাসাই সে চায়। ইহার ভিতর টাকার কথা কেন আসিল? এই টাকা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারও অধিকার নাই, উর্ম্মিলার দিকে হাত বাড়াইবার। উর্ম্মিলাও কি মনে করিতে পারে না যে ঋণের দায় হইতে মুক্ত হইবার জন্যই জ্যোতির্ম্ময় তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে? ছি!

এ তাহার জীবনে কিসের আবির্ভাব ঘটিল? এ কি বিষ না অমৃত? ভাগ্য তাহাকে অম্লান কুসুমের মালা পরাইয়া দিয়া গেল, কিন্তু প্রতিটি ফুলের সঙ্গে যে কাঁটা? একটি একটি করিয়া কাঁটা তাহাকে তুলিয়া ফেলিতে হইবে, তবেই তাহার নিষ্কৃতি। কিন্তু ফুল কি ততদিনে শুকাইয়া যাইবে না?

শেষরাত্রে বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘুম ভাঙিল যখন তখন একটু যেন বেলা হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। উর্ম্মিলা এখনও হয়ত পার্কেই বেড়াইতেছে। একবার মুখখানাও দেখা যাইবে, কথা বলার সময় নাই থাক? তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া সে বাহির হইয়া গেল। পার্ক তখন লোকে ভরিয়া উঠিয়াছে। ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার আসর খুবই জমিয়া উঠিয়াছে। একটা দোলনায় দুটি বাচ্চা উঠিয়া প্রাণপণে দোল খাইতেছে এবং তাহাদেরই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া উর্ম্মিলা দাঁড়াইয়া আছে।

জ্যোতির্ম্ময় ধীরে ধীরে ঠিক তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "ছোটবেলায় নিজেরও খুব দোলার সখ ছিল নাকি?"

উর্ম্মিলা ফিরিয়া তাকাইল, বলিল, "কোথায়? ভুগতে ভুগতেই দিন যেত, কে বা দুলতে দিচ্ছে? আর ছেলেপিলের যে আবার খেলার দরকার তা আমার বাবার মনেই থাকত না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ছোটবেলাটা আপনার বড় lonely হয়ে কেটেছে, না?"

উর্ম্মিলা বলিল, "বড় বেলাটাই বা তার চেয়ে কম কি? যখন যেখানে বাস করেছি, একজন কি বড়জোর দু'জন সঙ্গী নিয়েই দিন কাটিয়েছি। বাড়ীভর্ত্তি লোক গিজ্‌গিজ্‌ করছে, এ কখনও চোখেও দেখি নি।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "বেশী মানুষ এক সঙ্গে দেখার ভাল মন্দ দুটো দিক্ আছে। এক, মানুষ সম্বন্ধে বিরক্তি ধ'রে যায়, আর এক, তারা বড় বেশী চেনা হয়ে যায়। তাদের ভিতর রহস্য আর কিছু থাকে না। আপনি বেশী মানুষ দেখেন নি তাই মানুষ চিনতেও পারেন নি।"

উর্ম্মিলা বলিল, "চিনি না একেবারেই কি? তা ত মনে হয় না। আর সব মানুষ ত একরকম নয়। কয়েকটাকে দেখলে বাকী কয়েকটাকে চিনবার কি সুবিধে হয়?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তা হয় না বোধ হয়। অল্পবয়স্কা মেয়ে আমিও কম ত দেখি নি, কলেজে পড়াইও দু'চারজনকে। কিন্তু তাদের চিনেছি ব'লে আপনাকে চেনার কোন সাহায্য হয় নি আমার। আপনি একেবারে সম্পূর্ণ অন্যরকমের।"

উর্ম্মিলা বলিল, "এই দুদিনের ধাক্কায় আপনার মনটা একটু বিচলিত হয়ে গেছে। ক্রমে ঠিক হয়ে যাবে। আমি অত্যন্ত সাধারণ, প্রায় আপনার ছাত্রীদেরই মত। তবে কপালটা একটু খারাপ, সেই জন্য আমার আচরণ-গুলো মাঝে মাঝে একটু অদ্ভুত হয়।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কপাল খারাপ বলছেন কেন? মা বাবা নেই ব'লে? এটা খুব অসাধারণ নয়।"

উর্ম্মিলা বলিল, "শুধু মা বাবাই কি নেই? কেউই যে নেই। এ নিদারুণ একাকিত্ব ভাল লাগে না আর। শরীরটা বড় খারাপ, যদি বেশ সুস্থ সবল হতাম, তাহলে মনের ভিতর আরও অনেক জোর থাকত। কিন্তু আসল কথাটা ত জানা হ'ল না? বাড়ী সম্বন্ধীয় উৎপাত ভাল ভাবে উৎরে গেছে ত?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ভালভাবেই উৎরেছে, এখন টাকা কোথায় পেলাম এই প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হচ্ছি চারদিক্ থেকে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "যতই জর্জ্জরিত হোন, ওটা কিছুতেই জানতে দেবেন না কাউকে। আমি ত বাড়ীতে কাউকে বলি নি, এক ছোট মাসীমা ছাড়া।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "শুনে বোধ হয় খুব বিরক্ত হয়েছেন, না?"

উর্ম্মিলা বলিল, "বিন্দুমাত্র না। উনি একটু অদ্ভুত ধরণের মানুষ। ওঁর বয়সের বাঙালী মহিলার যে রকম হওয়া উচিত, উনি একেবারেই সে রকম নয়। ওঁকে দেখে কি খুব usual type মনে হয়?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তা হয় না। আমাদের বাড়ীতে ত তিনি একটা গল্প করার বিষয়।"

উর্ম্মিলা বলিল, "চেহারাটা খুব exotic কিনা। বাঙালী মনে হয় না। প্রথম পরিচয়ে অনেকেই ভাবে যে, তিনি কাশ্মীরী কি পাঞ্জাবী। ধরণ-ধারণও বাঙালী গিন্নীদের মত নয়। সারাদিন ভাঁড়ার আর রান্নাঘর করেন না। টাকা আছে অনেক কিন্তু সে বিষয়ে দৃষ্টি নেই। গান, বাজনা, আর দেশ বেড়ানো এই নিয়েই থাকেন। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে যে, তাঁর সঙ্গে ঘুরি। কিন্তু উনি আবার যাদের সঙ্গে ঘোরেন, আমার তাদের পছন্দ হয় না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "পছন্দও হয় এবং দেশও বেড়ান, এমন বন্ধু নেই একজনও?"

উর্ম্মিলা বলিল, "দেখি ত না। এবারেই গ্রীষ্মের ছুটিতে একজনরা দার্জ্জিলিং যেতে টানাটানি করছেন। বুঝতে পারছি না, তাঁদের ডাকে সাড়া দেব কিনা।"

জ্যোতির্ম্ময়কে আজ কিসে পাইয়া বসিয়াছিল তাহার ঠিকানা নাই। সাধারণতঃ সে উর্ম্মিলার অন্তরঙ্গ হইবার কোন চেষ্টা করিত না। ব্যক্তিগত জীবনের কোন কথা জানিতেও চাহিত না। আজ তাহার কেবলই ইচ্ছা করিতে লাগিল, উর্ম্মিলার জীবনের খুঁটিনাটি সব কথা ক্রমাগত শোনে। তাহার আত্মীয় কাহারা, তাহার বন্ধু কাহারা? জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহাদের সাহচর্য্যটা কি খুব বেশী অরুচিকর? না হলে দার্জ্জিলিং গেলে আপনারই উপকার হ'ত বোধ হয়। যত গরম বাড়ছে আপনার শরীরও তত খারাপ হচ্ছে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "এমনিতে তাঁরা লোক যে কিছু মন্দ তা নয়। ভদ্র শিক্ষিত লোকই। আলাপও আমাদের সঙ্গে বহুকালের। ভূদেববাবু আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। তিনি এখন বুড়ো হয়ে retire ক'রে গেছেন, তাঁর ছেলেই এখন সংসার দেখেন, মায়ের সহকারীস্বরূপ। আসলে কর্ত্তা এবং গিন্নী উভয়ই ভূদেববাবুর গিন্নী। ছেলে অবশ্য ক্রমেই তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হয়ে উঠছেন। মা ও ছেলে দুজনে সারাক্ষণ বিশ্বসংসার পরিষ্কার ও বীজাণুমুক্ত ক'রে ফেলছেন, এবং খাওয়ার ক্যালোরি মাপছেন এবং নিজেদের ওজন নিচ্ছেন। এইটাই তাঁদের relaxation ও recreation। ওঁদের বাড়ী ঘণ্টাখানিক বসতেও আমি পারি না। তা একমাস থাকব কি ক'রে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আপনার পক্ষে শক্ত বটে। ছোটমাসীকে নিয়ে নিজে কোথাও ঘুরে আসতে পারেন না? না অসুবিধে হয়?"

উর্ম্মিলা বলিল, "উনি ত আবার লম্বা পাড়ি দেবার চেষ্টায় আছেন। শ্বশুরবাড়ীর কোন্ এক আত্মীয় দেশে কিছুদিনের জন্য ইউরোপ ঘুরতে যাচ্ছেন, থেকেও যেতে পারেন দু'চার বৎসর। ছোটমাসী তাঁদের সঙ্গে যাবেন ঠিক করেছেন। আমাকে ত তা হলে কোন বোর্ডিং-এ আশ্রয় নিতে হবে, না হয় ভূদেববাবুর চিকিৎসালয়ে ঢুকতে হবে। দুটি সম্ভাবনাই সমান ভয়াবহ।"

জ্যোতির্ম্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁরা কি কলকাতায় থাকেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "না, ভূদেবের প্র্যাক্‌টিস ত পাটনায়। বাড়ী-ঘরও সব ওরা ওখানেই করেছে।"

জ্যোতির্ম্ময়ের মনের ভিতরটা কেমন যেন বিচলিত হইয়া উঠিল। কে এই ভূদেব? ইহার সঙ্গে উর্ম্মিলার অনেক দিনের পরিচয়? পরিচয়ের বেশী আর কিছু আছে কি? উর্ম্মিলার বর্ণনায় ত তা মনে হয় না। আবার জিজ্ঞাসা করিল, "উনি ডাক্তার নাকি?"

উর্ম্মিলা বলিল, "না, ওকালতি করেন। ভয়ানক পরিশ্রমী লোক। বয়সের তুলনায় এরই মধ্যে বেশ পসার ক'রে ফেলেছেন।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কপালজোর থাকে অনেকের।"

উর্ম্মিলা বলিল, "অমন কপালজোরে কাজ নেই। মানুষ যদি একটা কল হয়ে যায়, তাকে আপনি ভাল বলেন নাকি?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "পৃথিবীতে এঁদেরই লোকে successful মানুষ বলে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "বাইরের জীবনে এটা success বটে, তবে অনেক ক্ষেত্রে এর মূল্য দিতে হয় ভিতরের জীবনের সম্পূর্ণ বিফলতা দিয়ে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সব সময়েই তা নয় হয়ত। অন্ততঃ প্রথম প্রথম নয়। পরে হয়ত proportion জ্ঞান চ'লে যায়। কিন্তু সেই ভেবে কি মানুষ সাংসারিক ক্ষেত্রে সফলতার জন্যে চেষ্টা করবে না? তাই কি বলেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "তা বলি না অবশ্য। কিন্তু আমার মতামতের মূল্যই বা কি এ সব বিষয়ে? আমার জীবনে success কোনদিন আসবে ব'লে মনে হয় না, বাইরের জীবনেও না, ভিতরের জীবনেও না। যাক গে, ওসব ভেবে আর কি হবে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আপনার আজ এমন pessimistic mood কেন? কোন কারণে বেশী upset হয়ে আছেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "এই অনিশ্চয়তাগুলো ভাল লাগছে না। কোথাও একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার জো নেই। ক'দিনের বা জীবন, শুধু দৌড়ে-বেড়াতেই কেটে যাবে। আমি মানুষটা শান্তিপ্রিয়, কিন্তু ভগবান্ আমায় শান্তি দেবেন না কোনদিন।"

জ্যোতির্ম্ময় ব্যথিত হইয়া বলিল, "কেন এমন কথা ভাবছেন আপনি? জীবনের ক'টা দিনই বা কেটেছে আপনার? এখনও ত সব সম্ভাবনাই আপনার সামনে রয়েছে। মানুষের জীবন চিরকালই কি একরকম যায়? কেউ প্রথমে সুখ-শান্তি পায়, কেউ বা পরে পায়। কর্ম্মফল ব'লে যদি কিছু জিনিষ সত্যি থাকে, তাহলে আপনার জীবনে আনন্দ, শান্তি, সুখ সবই পরিপূর্ণ হয়ে আসা উচিত।"

উর্ম্মিলার মুখে একটা রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। বলিল, "আপনি যেটাকে মস্ত বড় পুণ্য কর্ম্ম ভাবছেন, ভগবানের চোখে সেটা হয়ত ঠিক সেভাবে ধরা দেয় নি। তিনি শুধু বাইরের কাজটা দেখেন না ত, ভিতরের motiveটাও দেখেন।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "বুঝলাম না আপনার কথাটা ঠিক। আমার মতে ত motiveটা কাজটার চেয়ে আরও বড় ছিল।"

উর্ম্মিলা বলিল, "ওসব এখন কিছু ঠিক করা যাবে না। চিত্রগুপ্তের দরবারে হাজির হয়ে হয়ত হিসেবটা ঠিক হতে পারে।"

জ্যোতির্ম্ময় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, "চিত্রগুপ্তের দরবারে হাজির হতে হবে? তার আগে এর মীমাংসা হবে না? কেন তা ভাবছেন? একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অপরাধ নেবেন না। আমার কোন কথায় বা কাজে কি বিরক্ত হয়েছেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "না, না, তা নয়, তা নয়। কি কথাই বা এত হয়েছে আপনার সঙ্গে? দেখছেন ত আমার অবস্থা, আমার মন এখন নিজের ভবিষ্যতের চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে। ছোটমাসী যদি সত্যিই চ'লে যান, তা হলে ত আমায় আবার আশ্রয় খুঁজতে বেরুতে হবে? একেবারে একলা থাকা যায় না। অন্ততঃ আমি পারি না। অন্য মানুষ হলে Y. W. C. A. প্রভৃতি জায়গায় থাকতে পারত, কিন্তু আমি আবার অচেনা লোকের ভীড়ও সহ্য করতে পারি না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "রোদ বেশ চড়া হয়েছে, এর পর ত বাড়ী ফেরা উচিত। মনে কিন্তু আমি বড় অশান্তি নিয়ে যাচ্ছি। কিছু একটা দুঃখের কারণ ঘটেছে আপনার, কিন্তু আপনি সেটা আমাকে জানতে দেবেন না। যে বন্ধুত্ব আমাকে এত বড় বিপদ্ থেকে উদ্ধার করল, সে আপনার বেলা কোন কাজই করতে পারবে না? আমি শুধু দান নিতেই পারি? প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই? এত বড় পরাজয় স্বীকার করা কত শক্ত তা জানেন?"

উর্ম্মিলার চোখে জল আসিয়া পড়িল। বলিল, "যদি এমন কিছু হ'ত যা মানুষকে বলা যায়, তা হলে আপনাকে বলতাম। কিন্তু ভগবান্ ছাড়া আর কাউকে জানান যায় না, এমন দুঃখও মানুষের থাকে।" চোখ দুইটা মুছিয়া ফেলিল।

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এর উপরে আর কি বলব? যা হোক, একটা মানুষ চাইছে আপনার জন্যে কিছু করতে সেটা মনে রাখবেন। ক্ষমতা আমার খুবই সীমাবদ্ধ তবু ইচ্ছাটা তার চেয়ে বড়। জীবনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধ আর সাধ্য সমান তালে পা ফেলে না। তবু করতে চাওয়ার ইচ্ছাটার কিছু মূল্য আছে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "তা ত জানি। কতটুকুই বা মানুষ করতে পারে? তবু ভগবানের বিচারে তার না করা

কাজ, না বলা কথা, কিছুরই দাম কি কম? আচ্ছা এখন চলি তবে।" অন্যদিন নমস্কার করিয়া যায়, আজ এমনিই চলিয়া গেল।

জ্যোতির্ম্ময় সেখানেই খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। রহস্য-যবনিকা বার বার উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। আড়ালে যাহা আছে তাহা ধরা দিতে দিতে ধরা দেয় না।

৭

উর্ম্মিলার জীবনে একটা সন্ধিক্ষণ ঘনাইয়া আসিতেছিল। জন্মাবধি নিশ্চিন্ত নির্ভরে কাহাকেও আঁকড়াইয়া সে থাকিতে পারে নাই। মা গেলেন, বাবাও গেলেন। নানা ঘরে ঘুরিয়া, নানা মানুষকে অবলম্বন করিয়া সে বড় হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরে অভাব কিছু ছিল না, হৃদয়ের রিক্ততা ছিল অতলস্পর্শী। কাহারও কাছে ভালবাসা পায় নাই, কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই। পড়াশুনা শেষ করিয়া কাজে ঢুকিয়া সে একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। হয়ত এখন ছোটমাসীর সঙ্গে একসঙ্গে থাকিলে সে খানিকটা শান্তিতে থাকিতে পারিত। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সুলাজিনীকে সে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করিত। ইনি গুরুজনগিরি ফলাইতে ভালবাসিতেন না। বোন্‌ঝির সহিত ইঁহার বন্ধুত্বেরই সম্বন্ধ ছিল। এবং পরের জীবনে কোন কারণেই বেশী হস্তক্ষেপ করিতেন না। নিজের যৌবন-কালটা গুরুজনের উৎপাতে বেশ খানিকটা নষ্ট হইয়া যাওয়াতে তাঁহার এই জাতীয় উৎপাতের উপর ঘৃণাই ছিল। এই বাড়ীটায় আসিবার পর উর্ম্মিলার জীবনে ভগবান্ প্রথম প্রেমের পরশমণি ছোঁয়াইয়া দিলেন। প্রতিবেশী যুবকটিকে সে নিজে প্রথমে লক্ষ্য করে নাই। সুলাজিনীর কাছে শুনিল যে পাশের বাড়ীতে একটি সুদর্শন যুবক আছে। যৌবনের ধর্ম্মই কৌতূহল। উর্ম্মিলা ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল, জ্যোতির্ম্ময়ও তরুণী প্রতিবেশিনীকে ভাল করিয়া দেখিল। আশ্চর্য্য সুন্দর না হোক, দেখিতে বেশ ভালই লাগে, চোখে-মুখে ভারি একটা মাধুর্য্যের স্পর্শ আছে।

দু'জনের চক্ষে দু'জনে মাঝে মাঝে ধরা পড়িয়া যাইত। উর্ম্মিলা লজ্জিত হইয়া ভাবিত যে ছেলেটি নিশ্চয়ই আমাকে উগ্ররকম কৌতূহলী মনে করে। জ্যোতির্ম্ময় ভাবিত, পাশের বাড়ীতেই আছি অথচ আলাপ করিবার কোন উপায় নাই। আমাদের এক আজব দেশ।

পনেরো-কুড়ি দিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল। পাশের বাড়ীর যুবকটি যে যখন-তখন হাঁক-ডাক করিয়া বাড়ী মাথায় করে না, ইহা অত্যন্ত ভাল লাগিল উর্ম্মিলার। তা ছাড়া তাহার আর একটি গুণ সে খুব শীঘ্রই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। জ্যোতির্ম্ময় অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নোংরা কাপড়-চোপড় পরিয়া বা নামমাত্র কাপড় পরিয়া সে লোকের চক্ষুপীড়া একেবারেই উৎপাদন করে না। এই উৎপাতটি উর্ম্মিলা মোটেই সহ্য করিতে পারিত না। বাড়ী খোঁজার সময় দু' চারখানা ভাল ফ্ল্যাটও সে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এই রকম প্রতিবেশীর উৎপাতে।

এমন সময় সেই ট্রাম ষ্ট্রাইকের দিন এই দুইজন মানুষ অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া পড়িল, এবং আলাপ-পরিচয়ও হইয়া গেল। দু' পক্ষেরই আগ্রহ ছিল খানিকটা, কাজেই আলাপটা খুব দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। উর্ম্মিলাই প্রথম নিজের কাছে নিজে ধরা পড়িল। সর্ব্বনাশ, এ সে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! দু' মাস আগে যে মানুষ জগতে আছে বলিয়াই সে জানিত না, আজ হঠাৎ সে কোথা হইতে আসিয়া তাহার মনের সবখানি জুড়িয়া বসিল? নিজের অবস্থায় ভয় পাইল, দুঃখিতও হইল। এখন পর্য্যন্ত অপর পক্ষ হইতে কোন সাড়া সে পায় নাই। জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে বন্ধু হিসাবে বেশ বড় স্থান দিয়াছে মনের মধ্যে, এইটুকুই বুঝিতে পারে। দেখা হইলে সে খুশী হয়, এইটুকুই যা।

অসুস্থ শরীরটা তাহার বেশী মানসিক বিপ্লব সহ্য করিতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে প্রেমের স্পর্শ সে পায় নাই। এখন ইহার আনন্দ ও বেদনা একই সঙ্গে তাহাকে বড়ই উন্মনা করিয়া তুলিল। জ্যোতির্ম্ময় কোনদিন ভালবাসিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবে এ সম্ভাবনা কি কিছু আছে কোথাও? তাহার ভাবিতেও ভয় হয়। তাহাদের সমাজে অবশ্য সম্বন্ধ করিয়া বিবাহই বেশী হয়, ইহার ব্যবস্থা যে একেবারেই করা না যায় তাহা নয়। কিন্তু যদি জ্যোতির্ম্ময়ের মত না হয়? সে লজ্জা, সে বেদনা উর্ম্মিলা তাহা হইলে রাখিবে কোথায়? সুদেব যোগ্য পাত্র হওয়া সত্ত্বেও সে তাহাকে বিবাহ করিবার কথা চিন্তা করিতে পারে না কেন? সে তাহাকে ভালবাসে না। অপর পক্ষ ত বিবাহ

করিতে প্রস্তুতই। আগ্রহও তাহার আছে হয়ত। কিন্তু বিবাহটাকে এভাবে একেবারেই মাটির পৃথিবীর, স্থূলের জিনিষ করিয়া ফেলিতে কিছুতেই উর্ম্মিলার মন উঠে না।

ছোটমাসী সুলাজিনী প্রথম হইতেই ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। তবে উর্ম্মিলার ব্যক্তিগত জীবনে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে ভালবাসিতেন না। উর্ম্মিলা যদি চায় তাঁর সাহায্য, সে ক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করিতে পারেন। মেয়ের বয়স হইয়াছে প্রায় চব্বিশ বৎসর। নিজের ভাগ্য নির্ণয় করিবার অধিকার ও ক্ষমতা তাহার থাকা উচিত। জ্যোতির্ম্ময়কে তাঁহার পছন্দই ছিল। দেখিতে সুদর্শন, ধরণ-ধারণে অতি বিনয়ী ও ভদ্র। তবে উর্ম্মিলা যেভাবে তাহাকে হৃদয় দান করিয়া বসিয়াছে, তাহার দিক্‌ হইতেও ঠিক ততখানি উন্মুখতা আছে কিনা উর্ম্মিলার জন্য, তাহা তিনি জানিতেন না। অপছন্দ করিবার মত মেয়ে উর্ম্মিলা নয়, তবে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিয়া ত মানুষকে ভালবাসান যায় না?

এই সময় জ্যোতির্ম্ময়দের বাড়ী লইয়া বিপদ্‌ ঘটিল। উর্ম্মিলা কলেজ হইতে বাড়ী আসিয়া শুনিল যে, জ্যোতির্ম্ময়ের পিতা হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়ায়, তারণের সাহায্যে টেলিফোন করিয়া জ্যোতির্ম্ময়কে বাড়ীতে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। তখন হইতেই সে ব্যগ্র হইয়া রহিল পাশের বাড়ীর খবরাখবরের জন্য।

খবর ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ী লইয়া যে মহাবিপদ্‌ ঘটিয়া যাইতেছে, তাহা নিস্তারিণী এবং তারার মায়ের মারফতে সোজাসুজি উর্ম্মিলার কানে পৌঁছিতে লাগিল। মনে-প্রাণে একটা দারুণ অস্থিরতা অনুভব করিতে লাগিল উর্ম্মিলা। কয়েক হাত মাত্র দূরে বসিয়া কিছুই সে করিতে পারিবে না জ্যোতির্ম্ময়ের জন্য? এই তাহার ভালবাসার শক্তি নাকি? ইচ্ছা করিলেই ত সে পারে। টাকার অভাব তাহার নাই। কিন্তু কি করিয়া একথা সে তুলিবে? জ্যোতির্ম্ময় কি অপমানিত বোধ করিবে না? উর্ম্মিলা বন্ধু বটে, কিন্তু স্ত্রীলোক। তাহার নিকট ঋণী হইতে জ্যোতির্ম্ময়ের ভাল লাগিবে না। তাহার আত্মাভিমানে বাজিবে। উর্ম্মিলার প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাবের পরিবর্ত্তে মনে একটা বিরাগ আসিয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়। সভয়ে উর্ম্মিলার মন পিছাইয়া গেল। সে সহ্য করিতে পারিবে না এ দারুণ সম্ভাবনাকে।

কিন্তু তারপরে যে খবর আসিল তাহা উর্ম্মিলাকে একেবারে শয্যাশায়ী করিয়া দিল। জ্যোতির্ম্ময় বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইতেছে পণের অর্থের খাতিরে। উর্ম্মিলার চোখে সমস্ত জগৎ সংসারটাই যেন কালো হইয়া গেল। কি তাহার করা উচিত এখন? কেমন করিয়া সে নিজেকে রক্ষা করিবে? জ্যোতির্ম্ময়কে রক্ষা করিবে? জ্যোতির্ম্ময়ও যে নিদারুণ বেদনা বোধ করিতেছে এ ব্যাপারে তাহা বুঝিতে তাহার কিছুই দেরী হইল না। সামনাসামনি সাক্ষাৎ এ ক'দিন হয় নাই, কিন্তু দূর হইতে জ্যোতির্ম্ময়ের কালিমাচ্ছন্ন মুখ সে প্রায়ই দেখিতে পায়। মনে তাহার নিরন্তর হাহাকার বাজিতে থাকে। ছি, ছি, স্ত্রীলোক হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়া, এতই শক্তিহীন, অক্ষম সে? চোখের সামনে জ্যোতির্ম্ময় যদি ডুবিয়া মরে, তবুও লোকলজ্জার খাতিরে সে হাত বাড়াইয়া তাহাকে টানিয়া তুলিতে পারিবে না?

মরিয়া হইয়া একদিন সুলাজিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের একবার উচিত নয় ওদের খবর নেওয়া ছোটমাসী?"

সুলাজিনী বলিলেন, "বুড়ো-বুড়ী কিছু ভাববে না গেলে, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় পছন্দ না করতে পারে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "কেন?"

সুলাজিনী বলিলেন, "নিজেদের দুঃখের কথা কি সবাই সবাকার কাছে বলতে চায়? বিশেষ যে দুঃখের মূলে দারিদ্র্য, সে দুঃখ মানুষ লুকিয়ে রাখতেই চায়। অল্প বয়সে মানুষ বড় sensitive থাকে ত?"

উর্ম্মিলা বলিল, "কিছুই তা হলে করবার নেই?"

ছোটমাসী বলিলেন, "এখন ত কিছু দেখছি না। আরও দু'চারদিন দেখ।"

আরও দু'চারদিন? তখন ত জ্যোতির্ম্ময়ের বলিদান হইয়া যাইবে? তখন আর উর্ম্মিলা দেখিয়া করিবে কি? দারুণ মর্ম্মযাতনায় সে এইবার শয্যা গ্রহণই করিল। বলিল, "ছোটমাসী, আমার বোধ হয় জ্বর আসছে। স্নান, খাওয়া কিছুই চলবে না। আজ কলেজ কামাই-ই হবে।"

সুলাজিনী বলিলেন, "তোর দেখছি গরম পড়তেই বেশ রীতিমত অসুখ ক'রে গেল। এবার ছুটিতে পাহাড়ে যাবারই ব্যবস্থা করতে হবে।"

সারাদিন উর্ম্মিলার স্নানাহার হইল না। জ্বর সামান্য আসিয়াছে। পাশের বাড়ী আজ ছেলের বিবাহ, কোন

টানিয়া লইলেই সকল ব্যথা-যন্ত্রণার অবসান ঘটিত। জ্যোতির্ময়ের নিজের জীবনেও ইহার চেয়ে বড় কোন আকাঙ্ক্ষা, কোন কামনা ছিল না। যদি তাহাকে উর্ম্মিলা ভালইবাসিয়া থাকে, সে কি জ্যোতির্ম্ময়ের চেয়েও বেশী ভালবাসা দিতে পারিয়াছে?

কিন্তু মাঝে এই টাকার প্রাচীর যে অভ্রভেদী হইয়া দাঁড়াইয়া গেল? কোথায় থাকিবে তাহার আত্মসম্মান যদি এই ঋণ আগে শোধ না করিয়া সে উর্ম্মিলাকেই আগে গ্রহণ করিতে চায়? কেহই অন্যকিছু ভাবিবে না, তাহার কাজের একই অর্থ সকলেই করিবে। উর্ম্মিলার টাকা অনেক আছে, সেইটাই আসল লক্ষ্য জ্যোতির্ম্ময়ের। কন্যাটিকে গ্রহণ করিয়া সে ব্যাপারটিকে শোভন করিল এই পর্য্যন্ত। উর্ম্মিলার সাহায্য দানেরও এই অর্থই হইবে। উপযুক্ত ও সুদর্শন পাত্রটিকে হস্তগত করিবার জন্য সে আগাম মূল্য দিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু এ সব ত বাহিরের কথা। যে যাহা খুশি মনে করুক না। সেইজন্য কি উর্ম্মিলাকে এমনি করিয়া কাঁদাইতে হইবে? সে অসুস্থ, সে একাকী। তাহাকে নিজের বাহুবন্ধনে টানিয়া লইতে কোনই আপত্তি নাই জ্যোতির্ম্ময়ের। তাহা হইলে বাহিরের এই সব তুচ্ছ নিন্দা, তুচ্ছতর সমালোচনার কথা কি ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়? কিন্তু উর্ম্মিলার নিজের মনেই যদি সন্দেহ থাকে? সেও যদি ভাবে যে জ্যোতির্ম্ময় তাহার অর্থের ঋণ এইভাবে শোধ করিতে চাহিতেছে?

অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। জীবনে তাহার একসঙ্গে এত সমস্যা কেন আসিয়া জুটিল? বাড়ীর সমস্যা যদি বা মিটিল, তাহার চেয়েও কঠিনতর সমস্যার আবার উদ্ভব হইল কেন? কিছু না করিয়া বসিয়া থাকা যায়। ইহাতে নিজের প্রতি যে নিষ্ঠুরতা তাহা যেমন করিয়া হোক জ্যোতির্ম্ময়কে সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু তাহার জীবনের লক্ষ্মীর এতখানি বেদনার কারণ সে হইবে কি প্রকারে? চোখের উপরে এ দৃশ্য সে দেখিবে কি প্রকারে?

তাহার উপর উর্ম্মিলার সাংসারিক পরিস্থিতির কথা সে যাহা শুনিল তাহাও এক ভাবনার বিষয়। যদি ভগ্নমনে কলকাতা ছাড়িয়া চলিয়াই যায়, তাহা হইলে আবার কবে কোথায় জ্যোতির্ম্ময় তাহার নাগাল পাইবে? সুদেবের আবত্তের ভিতর একবার গিয়া পড়িলে, জ্যোতির্ম্ময়ের পক্ষে আবার তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনা কঠিন কাজই হইবে। জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এই ভাবিয়াই উর্ম্মিলা চলিয়া যাইবে। তখন যদি আরো কাহারও কাছে ভালবাসা পায় বা ভালবাসার অভিনয়ই শুধু দেখে, তাহার মন সেদিকে ফিরিয়া যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?

ভাগ্যের হাতে সকল সমস্যা সমাধানের ভার ছাড়িয়া দিয়া যদি বসিয়া থাকা যাইত, তাহা হইলে মহাকাল হয়ত এই জটিল গ্রন্থি মোচনে সহায়তা করিতেন। কিন্তু সময় কোথায়? আগেকার যে সঙ্কট সে পার হইয়া আসিল, তাহাতেও সে কয়েকদিন মাত্র সময় পাইয়াছিল। এবারেও তাই। গ্রীষ্মের ছুটি হইতে আর অল্পই বিলম্ব আছে, তাহার পর উর্ম্মিলা হয়ত তাহার জীবনপথ হইতে সরিয়াই যাইবে।

বাড়ীটা বিক্রয় করিয়া দিলে এখনই সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু পীড়িত পিতার মুখ চাহিয়া সে তাহা করিবার কথা ভাবিতে পারিল না। মনোভঙ্গে তাহা হইলে বৃদ্ধের মৃত্যু ঘটিবারই সম্ভাবনা। মা ও বোন নিজেদের অত্যন্তই অসহায় বোধ করিবে। নিজেদের থাকারও কোন ভাল ব্যবস্থা এখনই সে করিতে পারিবে না। সব ব্যবস্থাই সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু কালের রথের ঘর্ঘরধ্বনি এখনই ত শোনা যাইতেছে, সে জ্যোতির্ম্ময়ের জন্য অপেক্ষা করিবে না।

৮

উর্ম্মিলা বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া খানিকক্ষণ শুইয়াই রহিল। কোথায় যে তাহার মন উধাও হইয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। জ্যোতির্ম্ময় কি তাহার মনের কথা কিছু বুঝিতে পারিয়াছে? হইতেও পারে। সে নিজের হৃদয়ের ব্যথাকে খুব বেশী ঘোমটা পরাইয়া রাখিতে পারে নাই। বুঝিয়া যদি থাকে তাহাতে ক্ষতিই বা কি? সে ত একেবারে লুকাইয়া রাখিতে চাহে না নিজেকে?

জীবনের কি ব্যবস্থা এখন সে করিবে? সুলাজিনী যদি দীর্ঘদিনের জন্য দেশ ছাড়িয়া যান, সে কি তাহা হইলে একলা এখানে থাকিতে পারিবে? সম্ভব নয়। তাহার স্বাস্থ্য এতটাই দুর্ব্বল যে, এভাবে থাকিতে সে সাহসই করিবে না। অন্য মাসীর বাড়ী থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা এখন রাখিতে চাহিবেন কিনা উর্ম্মিলা তাহা

জানে না। আর কলিকাতায় থাকিয়াও কতদূরেই তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। জ্যোতির্ম্ময়কে সে চোখেও দেখিতে পাইবে না। তবে আসিয়া দেখা ত করিতে পারে? ডাকিলে জ্যোতির্ম্ময়ও গিয়া দেখা করিয়া আসিতে পারে। তাহারই কি চেষ্টা করিবে?

কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় যদি একেবারেই মুখ ফিরাইয়া লয়? এখনই কি তাহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয় নাই? তবে হয়ত উর্ম্মিলা রজ্জুকে সর্পভ্রম করিতে পারে, আবার তাহার অনুমান সত্যও ত হইতে পারে? এই কয়েকদিন আগে সে ত অন্যত্র বিবাহ করিতে প্রস্তুতই হইতেছিল। যদিও অনিচ্ছা সত্ত্বে এবং অত্যন্ত দায়ে পড়িয়া। কিন্তু উর্ম্মিলা কি পারিত অতখানি দায়ে পড়িলেও? পারিত না। এটুকু সে নিজের কাছে স্বীকার করিল না যে সংসারের দায় কাহাকে বলে তাহা সে জানিতই না। জীবনে কখনও তাহাকে নিজের ভাবনা ছাড়া অপরের ভাবনা ভাবিতে হয় নাই। সংসারে অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মানুষ নিজের হৃদয়ের দাবীকে কতখানি স্থান বা দিতে পারে? উর্ম্মিলার তাহা জানা ছিল না।

সুলাজিনী এই সময় ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "খুব খানিক রোদ লাগিয়ে এলি ত? শরীরটার দিকে একটু নজর দে। ছুটিতে কোথায় যাবি বল্ ত?"

উর্ম্মিলা বলিল, "তুমি কোথায় যাবে যদি সেটা ঠিক ক'রে বল, তা হলে আমারও plan করার সুবিধে হয়।"

সুলাজিনী বলিলেন, "Continent-এ যাওয়া প্রায় ঠিকই ক'রে ফেলেছি। কতদিন আর বা চলতে ফিরতে পারব? আর চেনাশোনা ভাল সঙ্গী পাওয়াও অত সহজ নয়। তবে অনিলদের যেতে এখনও মাস দুই দেরী আছে। এই দু মাস তোকে নিয়ে আমি দার্জ্জিলিংএ গিয়ে থাকতে পারি।"

উর্ম্মিলা বলিল, "কোথায় থাকবে?"

সুলাজিনী বলিলেন, "আমরা হোটেলে বা sanatorium-এ থাকব। ভূদেববাবুরাও ত দার্জ্জিলিং-এ যাচ্ছেন, মোটামুটি দেখাশোনা করতে পারবেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "ছুটির পর আমার দশা কি হবে?"

সুলাজিনী বলিলেন, "এখানকার ফ্ল্যাট আমি রেখেই যাব। কারণ এক বছর পরে ফিরে এসেই বাড়ী পাব কোথায়? তারণও থাকবে। তুই ইচ্ছা করলে একজন ভাড়া করা companion নিয়ে থাকতে পারিস। পাশ না করা নার্স জাতীয় মেয়ে আজকাল যথেষ্ট পাওয়া যায়। তবে একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল না হয় সেটা দেখে নিও, সম্পূর্ণ অচেনা অজানা হ'লে একটু risk আছে।"

উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসা করিল, "এ ছাড়া আর কিছু ব্যবস্থা হ'তে পারে না?"

সুলাজিনী বলিলেন, "আর কি ব্যবস্থা বল? আর এক হয় যদি কলকাতা ছেড়ে দাও, পাটনায় গিয়ে থাক। তোমাকে ওরা যথেষ্টই দেখাশোনা করবে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "ওদের বাড়ী আমি থাকতে পারব না।"

সুলাজিনী বলিলেন, "ওদের বাড়ী না-হয় নাই থাকলে। সহজেই ওখানে একটা ভাল কাজ পেতে পার। গর্ভনেসের কাজ, না হয় স্কুলের কাজ, একটা কিছু নিয়ে থাকা আর কি? নইলে তোমার টাকার দরকারই বা কি? আমিও ভাবছি, তোমাকে যা দেবার আমার তা খানিকটা দিয়েই যাব, বেরোবার আগে। অনেকদিনের জন্যে যাওয়া, বুড়ো মানুষ, শরীর গতিকের কথা বলা ত যায় না?"

উর্ম্মিলা বলিল, "আবার আমার ঘাড়ে ও বোঝা চাপান কেন?"

সুলাজিনী বলিলেন, "টাকারও যে দরকার আছে জগতে? ওতে মানুষের ভালবাসা কেনা যায় না, আর পরমায়ু কেনা যায় না, আর সবই কেনা যায়। দেখ, আমার জীবনে আর ত কিছুই নেই। তবু টাকাগুলো ছিল ব'লে স্বাধীনভাবে চলতে ফিরতে পারছি।"

উর্ম্মিলা বলিল, "যা খুশি তোমার। আমি এখনই ভেবে ঠিক করতে পারছি না কি করব। ভূদেববাবুদের কাছাকাছি বেশীদিন থাকতে আমার ভাল লাগে না।"

সুলাজিনী বলিলেন, "অভ্যাস করবার চেষ্টা কর। হয়ত ঐ ঘরেই শেষ অবধি ঢুকতে হবে।"

উর্ম্মিলা উঠিয়া বসিল, বলিল, "ও কথা কেন বলছ মাসী? ও ঘর বা অন্যঘর কোথাও যদি না ঢুকি? একলা কি থাকা যায় না? তুমি কি থাকছ না?"

সুলাজিনী বলিলেন, "আমার মত শক্ত হাড় কি তোর? আমি যা সয়েছি তা সইতে পারবি? তার চেয়ে একটা ঘর-সংসারের মধ্যে থাকা ভাল। বিরক্তির কারণ সারাক্ষণই জুটবে, তবু চারদিক একেবারে শূন্য হয়ে থাকবে না। ওটা বড় ভয়ানক অসহ্য জিনিষ। আর সুদেব স্বভাবচরিত্রে খারাপ নয়, যদিও ওর পিটুপিটুনিটা হাস্যকর। তোকে আদরযত্ন ক'রেই রাখবে মনে হয়।"

উর্মিলা আবার শুইয়া পড়িল, বলিল, "দরকার নেই আমার আদরযত্নে। আমার একলাই ভাল।"

সুলাজিনী বলিলেন, "এখন তাই বলছ বটে, তবে বুড়ো বয়স অবধি বেঁচে থাকলে সুর বদলাবেই।"

আজও তাহার শরীর ভাল লাগিতেছিল না। তবু সারাদিন একলা বসিয়া নানা দুশ্চিন্তায় নিজের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া লাভ কি? কলেজে তবু কথা বলিবার লোক আছে। কাজও কিছু আছে। ভুলিয়া হয়ত থাকা যাইবে। সে ধীরে ধীরে কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

কিন্তু এই গরমে ট্রামে চড়িয়া লোকের ভীড়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া যাওয়ার মত অবস্থা তাহার ছিল না। তারণকে একটা ট্যাক্সি ডাকিতে পাঠাইয়া সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময় জ্যোতির্ম্ময়ও কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। উর্ম্মিলাকে দেখিয়া বলিল, "কলেজে যাচ্ছেন, না অন্য কোথাও?"

উর্ম্মিলা বলিল, "কলেজেই যাব, তবে ট্রামে চড়বার মত সাহস আর খুঁজে পাচ্ছি না নিজের মধ্যে। তাই ট্যাক্সি আনতে পাঠিয়েছি।"

জ্যোতির্ম্ময় একবার তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, "শরীর খারাপ থাকলে নাই বা গেলেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "একলা একলা শুয়ে খালি দুশ্চিন্তা ভোগ করার চেয়ে একটা কাজের মধ্যে থাকা ভাল।"

জ্যোতির্ম্ময় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "অধিকাংশ দুশ্চিন্তাই হাল্‌কা হয়ে যায় যদি ভাগ ক'রে নেওয়া যায়।"

উর্ম্মিলা বলিল, "ভাগ একেবারেই করা যায় না এমন দুশ্চিন্তাও আছে যে? ভগবান্ একমাত্র তার ভাগ নিতে পারেন। তবে আমার সব দুশ্চিন্তাই যে এক শ্রেণীর তা ত নয়? অদূর ভবিষ্যতে কি করব আমি, কোথায় যাব, এ ভাবনাও আমার কম নয়।"

তারণ ট্যাক্সি লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে দেখা গেল। জ্যোতির্ম্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "বিকেলে পার্কে যাবেন নাকি আজ?"

উর্ম্মিলা বলিল, "যেতে হয়ত পারি। আপনি ত সে সময়ে ছেলে পড়ান?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "যেটাকে আগে পড়াতে যাই সেটার জ্বর হয়েছে। অন্যটাকে পড়ানোর জন্যে সাতাটায় বেরোলেই চলবে। আপনি যাবেন কিন্তু।"

"আচ্ছা" বলিয়া উর্ম্মিলা ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল।

উর্ম্মিলার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা ত করিল, কিন্তু কোন্ সান্ত্বনা তাহাকে জ্যোতির্ম্ময় দিতে পারিবে? সে জানে না। কিন্তু উর্ম্মিলার কোমল করুণ মুখে এই তীব্র বেদনার ছায়া সে সহ্য করিতেও পারে না। কোথাও কোন উপায় কি নাই? নিজে সে দুঃখ সহিতে প্রস্তুত আছে, ত্যাগ স্বীকার করিতেও প্রস্তুত আছে, শুধু আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে মন পিছাইয়া যায়।

কলেজে গিয়াও উর্ম্মিলার বিশেষ কোন লাভ হইল না। ভাল করিয়া পড়াইতে পারিল না। কমনরুমে বসিয়া বসিয়াই সে বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়া দিল। জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত দেখা করিবার ব্যবস্থা ত করিয়া আসিল, কিন্তু তাহাতে কিছু লাভ হইবে কি? তাহার মুখের দিকে তাকাইলেই ত উর্ম্মিলার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে। এই নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণা নিজেকে ক্রমাগত দিয়া কি লাভ? সে যেন চোখেই দেখিতে পায়, জ্যোতির্ম্ময় অল্পে অল্পে তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে। তবু যতক্ষণ সেই প্রিয় মুখ চোখে দেখা যায় ততক্ষণ সে লোভ সম্বরণ করিতে পারে না।

বাড়ী ফিরিয়া স্নান করিয়া, চা খাইয়া, সে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। আজ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহাকে স্বাভাবিক থাকিতে হইবে। নিজের বেদনাকে এতখানি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখান কি ভাল? নারীর

প্রেমে গোপনতার একটু প্রয়োজন আছে। প্রতিদান পাইয়া সে যতক্ষণ না মর্য্যাদা লাভ করে ততক্ষণ যেন তাহাকে "আলোতে দেখায় কালো, কলঙ্কের মতো।" কিন্তু সে মর্য্যাদা উর্ম্মিলা কি কোনদিন পাইবে?

জ্যোতির্ম্ময়ই প্রথম গিয়া পৌঁছিল পার্কে। তখনও উর্ম্মিলা আসিয়া পৌঁছায় নাই। জ্যোতির্ম্ময়ের আহ্বানে সে আসিতেছে। আজও কি চোখের জল লইয়াই তাহাকে ফিরিতে হইবে? আর একটু যদি ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় জ্যোতির্ম্ময়ের কাছে, তাহা হইলে কর্ত্তব্য নিরূপণ করা একটু সহজ হয়। তাহাকেই চায় কি? জ্যোতির্ম্ময়ের মন একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল: এ কি নিদারুণ সমস্যা? দুইটা মানুষ এমন করিয়া পরস্পরকে চাহিতেছে, অথচ তাহাদের কাছে আসিবার উপায় নাই!

দূরে উর্ম্মিলার মূর্ত্তি দেখা গেল। জ্যোতির্ম্ময় উঠিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। উর্ম্মিলাই প্রথম কথা বলিল, "আজ ট্যাক্সি পেতে বড় দেরী হ'ল। তাই ঠিক সময় বাড়ী ফিরতে পারলাম না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আপনার শরীর ভাল না থাকলে যান কেন? আপনার কিই বা এমন দায় পড়েছে চাকরি করার? শরীর না সারা অবধি বাড়ীতে ব'সে থাকলেই পারেন?"

উর্ম্মিলা ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আপনাকে কখনও একেবারে একলা থাকতে হয় নি, না?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সে সুযোগ আর পেলাম কোথায়? কেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "সে যে কি দারুণ বিরক্তিকর ব্যাপার তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তার চেয়ে অসুস্থ শরীরে কাজ করাও ভাল।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "বিরক্ত হওয়া তবু ভাল, কিন্তু একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়া ভাল নয়। আপনি ক্রমেই যেন বেশী ক'রে রোগা হয়ে পড়ছেন। এবারের ছুটিটা কাজে লাগান। বেশ ভাল জায়গায় থেকে আসুন।"

উর্ম্মিলা বলিল, "যাবার কথা ত হচ্ছে দার্জ্জিলিং-এ। যাবই সম্ভবতঃ। তবে তার পরে যে কি হবে তা ভগবান্‌ই জানেন।"

জ্যোতির্ম্ময়ের মুখ একটু যেন বিষণ্ণ দেখাইল, বলিল, "আপনার ছোটমাসী কি বিলেত যাওয়া একেবারেই ঠিক ক'রে ফেলেছেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "যাবেন ব'লেই ত মনে হচ্ছে, বছরখানেকের জন্যে। আমি মোটেই ভেবে পাচ্ছি না যে, এই একটা বছর আমি কি ক'রে কোথায় কাটাব। ছোটমাসী গোটা দুই তিন alternative দিলেন, তার কোনটাই আমার পছন্দ হ'ল না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কি সেগুলো শুনতে পারি?"

উর্ম্মিলা বলিল, "যেমন ছিলাম তেমনিই থাকব, শুধু মাসীর বদলে একটি ভাড়া-করা সঙ্গিনী নিয়ে, এই হ'ল প্রথম প্রস্তাব।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এটাতে বিশেষ অসুবিধে কি? নাড়ানাড়ি করার troubleটা ত বাঁচবে? আর পাড়া-প্রতিবেশীও চেনা। উপকার কেউ করুক বা নাই করুক, অপকার কেউ করতে চাইবে না।"

উর্ম্মিলা বলিল, "একেবারে একলা কখনও থাকি নি। অসুস্থ মানুষের পক্ষে চিন্তাটা একটু ভয়াবহ। ভাড়া করা লোক পছন্দ মত পাওয়া শক্ত। নার্সজাতীয় যেসব মেয়ে এই ধরণের কাজে আসে তাদের চব্বিশ ঘণ্টার সাহচর্য্য আমার সহ্য হবে কিনা জানি না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এখানে থাকলে একেবারে অরক্ষিত আপনি থাকবেন না, এটুকু আশ্বাস আপনাকে দিতে পারি। আমি অবশ্য অনাত্মীয়, কিন্তু তা হ'লেও একেবারে কাজে লাগব না, তা মনে হয় না।"

উর্ম্মিলা বলিল, "কাজে লাগতে ঠিকই পারেন, তবে লাগবেন না, এটাও ঠিক।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

উর্ম্মিলা বলিল, "এখানেও আমি যে মেয়ে এবং আপনি যে পুরুষ সে বাধাটা আসবে। অন্যের কথায় আমি যতটা কান দিই, আপনি তার চেয়ে একটু বেশীই দেন।"

জ্যোতির্ম্ময় একবার ভাবিয়া দেখিল। কথাটা হয়ত ঠিক। লোকে কি বলিবে তাহা সে ভাবে বইকি? কিন্তু উর্ম্মিলা কি একেবারেই ভাবে না?

বলিল, "খানিকটা কান দিই, তা ঠিকই। সমাজে থাকতে হলে দিতে হয়। কিন্তু কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করব না সেটার জন্যে, এও বলতে পারি।"

উর্ম্মিলা বলিল, "কর্ত্তব্য ত এটাকে বলা যায় না। আমার দেখাশোনা যদি আপনি না করেন তা হলে কেউ আপনাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট বলবে না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমি নিজে হয়ত বলব।"

উর্ম্মিলা বলিল, "কেন ?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এটা কি আবার ব'লে বোঝাতে হবে ? আপনি এই ক'টা দিন আগে কি নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে এসে আমাকে একটা বড় বিপদ্ থেকে বাঁচান নি ? প্রতিদানে ঠিক ততটাই আমি না করতে পারি, কিন্তু সাধ্যায়ত্ত যা আছে তাও করব না ? তা হলে ত নিজেকে মানুষ ব'লে ভাবতে পারব না।"

উর্ম্মিলা বলিল, "একটা কথা আপনাকে বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ভয়ও করছে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "মানুষটা আমি ভয়ানক কিছু নয়। ব'লেই দেখুন।"

উর্ম্মিলা বলিল, "যদি আমার কথাটা ভুল হয়, এমনকি অন্যায়ও হয়, তা হলেও ক্ষমা করবেন, অপরাধ নেবেন না ?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আপনার উপক্রমণিকা দেখে এবার আমারও ভয় করতে আরম্ভ করেছে। কি বলবেন জানি না, তবু বলছি আমি কিছু মনে করব না।"

উর্ম্মিলা একটুখানি ঘুরিয়া বসিল যাহাতে জ্যোতির্ম্ময় তাহার মুখ না দেখিতে পায়। তাহার পর বলিল, "আপনাকে টাকা দিতে চেয়েছিলাম ব'লে কি আপনি বিরক্ত হয়েছিলেন ? আমার কি সেটা অন্যায় আস্পর্দ্ধা প্রকাশ পেয়েছিল ? নিজেকে কি আপনি অপমানিত মনে করেছিলেন ?"

জ্যোতির্ম্ময় কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। কথাগুলি সত্য নয়। উর্ম্মিলার প্রতি বিরক্ত সে হয় নাই এবং তাহার আচরণকে অন্যায় আস্পর্দ্ধা নিশ্চয়ই মনে করে নাই। কিন্তু তাহার আত্মসম্মান কি লাঞ্ছিত হয় নাই ? তাহার পুরুষের অহঙ্কার কি অপমানিত হয় নাই ? কিন্তু ইহার জন্য যদি বিরাগ কোথাও তাহার মনে আসিয়া থাকে তাহা হইলে সে বিরাগ কাহার উপর ? অদৃষ্টের উপর, নিজের দুর্ভাগ্যের উপর।

উর্ম্মিলা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কথার উত্তর দেবেন না ?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "দিচ্ছি। এ প্রশ্ন করবার প্রয়োজন যে আপনার হ'ল সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। বোধ হয় আমার ব্যবহারে বিষম ত্রুটি কোথাও হয়ে থাকবে। ইচ্ছাকৃত নয় সেটা, বিশ্বাস করুন আপনি। আপনি টাকা দিতে চাওয়ায় প্রথম বিস্ময় এবং তারপর গভীর কৃতজ্ঞতা, এ ছাড়া আর কোন ভাব আমার মনে আসেনি। আপনার আচরণকে আস্পর্দ্ধা মনে করবার মত আস্পর্দ্ধা আমার মনে কি ক'রে আসবে ? নিজের অক্ষমতার জন্যে নিজের কাছে লজ্জা বোধ হয়েছিল, সেটাকে অপমান জ্ঞান করা বললেও হয়ত বলা যায়। কিন্তু সে অপমানও আমিই আমাকে করেছি। আপনার দিক্ থেকে তা আসেনি।"

উর্ম্মিলা বলিল, "আপনার কথা আমি বিশ্বাস করলাম। কেন একথা আমি জানতে চাইলাম তাও আপনাকে বোঝান সহজ নয়, তবে কয়েকদিন ধ'রে মনে হচ্ছিল যে, আমাদের যে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা ছিল সেটার চেহারা যেন বদলে যাচ্ছে। এই টাকার প্রাচীরটা মাঝে একটা আড়ালের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমিই এর উপলক্ষ্য মনে ক'রে বড় আঘাত পেয়েছিলাম।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমার কোন্ কথায় বা কাজে আপনার এ ধারণা হ'ল ? আপনার মনে অকারণেই আঘাত লাগেনি। নিজেকে বড় কৃতঘ্ন মনে হচ্ছে।"

উর্ম্মিলা আবার তাহার দিকে ফিরিয়া বসিল। বলিল, "কোন কথায় না, কোন কাজে না। আবহাওয়ার ভিতর অদৃশ্য একটা কিছু ছিল, হয়ত আমার অনুমান মাত্র। কিছু মনে করবেন না। কথাটা ব'লে আপনাকে ব্যথা দেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু আপনার বন্ধুত্ব এতবড় জিনিষ আমার কাছে যে সেটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল। যাক্, এক দিক্ দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম, কথাটা না বলতে হ'লেই ভাল ছিল। তবু পারলাম না। আপনি সত্যি কিছু মনে করলেন কি ? শুধু ভদ্রতাসঙ্গত উত্তর একটা দেবেন না। সত্য কথাই বলুন, আমি সহ্য করতে পারব।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "সত্য কথাটা অন্য কিছু নয়। আমি কিছু মনে করিনি অর্থাৎ বিরক্ত হইনি, তবে দুঃখ হয়েছে। এমন কথা উঠতে পারল কেন? কোথাও একটা অপরাধ আমি করেছি। কিন্তু সেটা ত আপনি স্বীকারই করবেন না।"

উর্মিলা বলিল, "কি স্বীকার করব? সত্যিই definite কোন কথায় বা কাজে আমার এ ধারণা হয়নি। থাক না-হয় একথা এখন। মানুষের মনের একেবারে অন্তরতম জায়গার কথা নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করা বোধহয় ঠিক নয়। আপনার সময়ও বোধহয় শেষ হয়ে এল?"

জ্যোতির্ময় বলিল, "আর বারো তেরো মিনিট আছে। আমাদের ত বাড়ীতে কথা বলার সুযোগ নেই, কাল সকালেও এখানেই আসবেন।"

উর্মিলা বলিল, "তাই আসব।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "গ্রীষ্মের ছুটির পর কোথায় থাকবেন তার অন্য ব্যবস্থাগুলোও শোনা হ'ল না।"

উর্মিলা বলিল, "আর এক মাসী আছেন, তাঁর কাছেও থাকা যায়। তবে সে বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলিকে আমার ভাল লাগে না।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "আপনি একলা মানুষ হওয়াতে আপনার পছন্দ-অপছন্দগুলো খুব কড়া রকমের। আমরা যারা চিরকাল একরাশ মানুষের মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়েছি তারা অন্য মানুষগুলোকে যেমন-তেমন ক'রে accept ক'রে নিই, পছন্দ-অপছন্দের কথা অত ভাবি না। ভবিষ্যতে যদি কোন বড় সংসারে আপনাকে পড়তে হয় তা হলে এই নানারকম মানুষের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে আপনার কষ্ট হবে।"

উর্মিলা বলিল, "এ উৎপাতটা হয়ত এবারের মত এড়িয়েই যাব।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "ওটা একেবারে নিশ্চিত ক'রে বলা কি সহজ? অদৃষ্ট ত অ-দৃষ্টই। মানুষ ত সামনে সবটা দেখতে পায় না।"

উর্মিলা বলিল, "দুই কারণে ভাবি আর কি? এক, ভাত-কাপড়ের লোভে আমায় সংসারে ঢুকতে হবে না। দ্বিতীয়, একলা থাকার ভয়েও অবাঞ্ছিত কোথাও গিয়ে জুটতে হবে না। আর তৃতীয়, ভগবান্ একদিকে আমার সহায় আছেন, বেশীদিন এ পৃথিবীতে আমাকে থাকতে হবে না। কোনরকম ক'রে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেওয়া।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "সত্যই একথা মন থেকে বলছেন? এটা আপনার বিশ্বাস? না, সংসারের উপর অভিমান ক'রে বলছেন?"

উর্মিলা বলিল, "বিশ্বাস খানিকটা আছে, পুরোপুরি না হোক। আর অভিমানও ছেলেবেলা থেকেই আছে। আকারে প্রকারে স্বভাবে এমনই কি দয়ামায়ার অযোগ্য হয়ে জন্মেছিলাম আমি? কিন্তু দয়ামায়া কোথাও কোনদিন পেলাম না কেন?"

জ্যোতির্ময় উঠিয়া পড়িল, বলিল, "আমার যাবার সময় হ'ল। কাল সকালে আসবেন, যদি শরীর ভাল থাকে। একটা কথা শুধু ব'লে যাই, দয়ামায়া কোথাও পাননি ভাবছেন, এ কথাটা সত্য নয়।"

উর্মিলা বলিল, "হয়ত নয়, কিন্তু আমি তার পরিচয় বিশেষ কিছু পাইনি।"

"জীবনটা দীর্ঘ ব্যাপার, হয়ত কোথাও অপেক্ষা ক'রে আছে আপনার জন্যে। আচ্ছা আসি" বলিয়া জ্যোতির্ময় চলিয়া গেল।

উর্মিলা অত্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়ীর পথে ফিরিয়া চলিল। একদিকে মনটা একটু যেন হাল্কা হইয়াছে মনে হয়। অন্যদিকে নিরাশা তাহার আরো বাড়িয়া গেল। তাহার প্রতি জ্যোতির্ময়ের বিরাগ নাই কিছু, টাকা দিয়া সে যে জ্যোতির্ময়কে রক্ষা করিতে গিয়াছিল তাহাতে সে অপমানিত জ্ঞান করে নাই নিজেকে।

অন্যদিকে জ্যোতির্ময়ের মনে বিরাগ যেমন কিছুই নাই, অনুরাগও সম্ভবতঃ কিছুই নাই। গভীর কৃতজ্ঞতা আর কর্তব্যবোধ, এই উর্মিলার পাওনা তাহার কাছে। আর কিছুই নয়। কোনদিনই কি আর কিছু ছিল না? না, সেটা উর্মিলার কল্পনা মাত্র? কিন্তু এ বিষয়ে ভুল করা কি এতই সহজ?

বাড়ী আসিয়া দেখিল, ছোটমাসী কোথায় বেড়াইতে গিয়াছেন। একটা চেয়ার টানিয়া বারান্দায় বসিয়া সে আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল।

৯

সুলাজিনী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন উর্মিলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তবে তাঁহার ঘরে ঢোকার শব্দে জাগিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মাসী, কোথায় গিয়েছিলে?"

সুলাজিনী বলিলেন, "বড়দির বাড়ী একটু ঘুরে এলাম। বহুকাল যাই নি, হয়ত এখন বহুদিন আর দেখা হবে না। নতুন বৌটাকেও দেখলাম।"

উর্মিলা বলিল, "কি রকম বৌ?"

সুলাজিনী বলিলেন, "মোটা, বেঁটে, কালো, রূপের ধুচনী একেবারে। প্রচুর টাকাকড়ি পেয়েছে। আরো পাবে সেই লোভে প'ড়ে দিয়েছে।"

উর্মিলা বলিল, "প্রসূনদা অত নাকতোলা মানুষ, আর টাকার লোভে ঐ রকম বিয়ে করল? ওর বন্ধুরা এতে হাসল না?"

সুলাজিনী বলিলেন, "কে জানে? শুনলাম অসুখের ছুতো ক'রে বৌভাত করে নি। হতে পারে এই কারণেই।"

উর্মিলা বলিল, "উঃ, কি মর্য্যাদাই বৌয়ের কপালে জুটেছে। লোকের সামনে বার সুদ্ধ করা যায় না! ঘরের মধ্যে নিয়ে খুব বোধহয় ঠোনা লাগায়।"

সুলাজিনী বলিলেন, "হতে পারে, কে জানে? তবে বাইরের থেকে ত বৌকে কিছু অখুশী লাগল না। বেশ সেজেগুজে এক গা গয়না প'রে ব'সে আছে।"

উর্মিলা বলিল, "আর কি খবর?"

ছোট মাসী বলিলেন, "খবর আর ত কিছু দেখলাম না। তবে বড়দির আর্থিক অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন হয়েছে মনে হ'ল। একতলার একটা দিক্ ভাড়া দিয়ে দিয়েছে।"

উর্মিলা বলিল, "তবেই হয়েছে। দরকার হলেও আর ওদের ওখানে থাকা চলবে না। আগে আর কিছু না থাক, জায়গাটা ছিল।"

সুলাজিনী বলিলেন, "হ্যাঁ, সুবিধা হবে না ওখানে। দেখি, তুই চল্ ত আগে দার্জিলিং, তার পর সেরে সুরে উঠে একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। লোক নিয়ে এখানে থাকাটা তোর পছন্দ নয়, না?"

উর্মিলা বলিল, "না ছোটমাসী। এখানে আমি থাকতে পারব না।" তাহার গলার স্বরটা কাঁপিয়া গেল, চোখেও যেন জল আসিয়া পড়িল।

সুলাজিনী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুই সুদেবকে বিয়ে ক'রে নে না? চেষ্টা করলে শেষ অবধি সবই পারা যায়। ভালবাসতে পারবি না হয়ত, তবে স্বস্তিতে থাকতে পারবি। ছটফটানিটা থাকবে না। নিজেকে নিয়ে ক্রমাগত কাটা-ছেঁড়া করা, সে বড় যন্ত্রণার ব্যাপার।"

উর্মিলা বলিল, "কি যে তুমি বল ছোটমাসী? ঐ রকম বিয়ে আমি এখন আর করতে পারি? আমি ত কচি খুকী নই? আমার মন ব'লে একটা জিনিষ গ'ড়ে উঠেছে। আমি যেখানে নিশ্চিত জানি যে ভালবাসতে পারব না, সেখানে কি ক'রে বিয়ে করব?"

সুলাজিনী বলিলেন, "আমিও এককালে তাই-ই ভাবতাম, কিন্তু বিয়ে করতে রাজি হলাম শেষ পর্য্যন্ত। ভালবাসতে পারি নি, তবে তোর মেসো লোক খুব মন্দ ছিলেন না। নিদারুণ অসুখী হতে হয় নি। অবশ্য তোর পক্ষে এখনই বিয়ে করা সম্ভব নয়। মন যার উপর পড়েছে তাকে খানিকটা অন্ততঃ ভুলতে ত হবে।"

উর্মিলা উত্তর দিল না। কাহাকে ভুলিবে সে? যাহাকে ভালবাসিয়াছে, সে যতই দূরে সরিতেছে, ততই এই নিদারুণ ভালবাসার ফাঁস তাহার গলায় মরণ-আলিঙ্গনের মত আঁটিয়া বসিতেছে। হৃদয়ে এই দহনজ্বালা লইয়া কি অন্য কোন পুরুষকে স্বামীরূপে চিন্তাও করা যায়?

একটু পরে বলিল, "ছোটমাসী, আমি বরং চাকরিটা ছেড়েই দি। এখানে আর আসব না। কলকাতায় থাকলেও অন্য জায়গাতেই থাকব। আর শরীর যা হয়ে আসছে, ট্রামে চ'ড়ে, রোদে পুড়ে কাজ করার ক্ষমতা আর হবে না।"

সুলাজিনী বলিলেন, "তা সে ছেড়ে। দরকারই বা কি ? একেবারে চব্বিশ ঘণ্টা মানুষ ব'সে ব'সে কাটাতে পারে না, তাই যা হোক একটা কিছু নিয়ে থাকা। তোর যা আছে তাল ক'রে invest ক'রে রাখলে, একলা তোর বেশ চ'লে যাবে। তা হাজার ত্রিশ দিয়ে যাব আমিও। যা আছে তা তিন ভাগ ক'রে দিলাম আর কি ?"

উর্মিলা বলিল, "বাকী দু' ভাগ কার ঘাড়ে চাপাচ্ছ ?"

"বড়দির মেয়েরা পাবে কিছু কিছু, তা সে আমার মরার পরে। ছেলেদের আর টাকার দরকার নেই। নিজে যা উড়িয়ে দিয়ে যেতে না পারব, তাই তাদের দেব। তোকে আগেই দেব, একলা থাকবি, বেশী টাকার দরকার কখনও হতে পারে।"

উর্মিলা আর কথা বলিল না। পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল। সুলাজিনী নিজের ঘরে কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেলেন। ঘুম আসে না। খাওয়ার চিন্তা-মাত্রেই অরুচি আসে। এ সে কোন্ পথে চলিয়াছে ? স্বাস্থ্য কি একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে ? তাহার মা যক্ষা রোগে মারা গিয়াছিলেন, তাহারও অদৃষ্টে তাহাই আছে কি ? এত শীঘ্র এই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে হইবে ? প্রিয়ের মুখ আর সে দেখিবে না ? চোখের জলে উর্মিলার বালিশ ভিজিয়া গেল। খানিক পরে তারার মা ডাকাডাকি করিয়াও তাহাকে তুলিতে পারিল না। রাগ করিয়া গিয়া সুলাজিনীর কাছে নালিশ করিল, "এবার রোগে পড়বে মা তোমার বোন্‌ঝি। অর্দ্ধেক দিন ত না খেয়েই কাটছে।"

সুলাজিনী উত্তর দিলেন না। মনে মনে বলিলেন, 'রোগে পড়তে আর বাকী আছে কি ? তাও এমন রোগ যার কোন চিকিৎসা নেই। দূর ছাই, এ পাড়ায় না এলেই হ'ত। ঠিক যাবার আগে যদি মেয়েটার বেশী অসুখ করে, তাহলে ওকে ফেলে আমি যাব কি ক'রে ? আবার এবার যদি না যেতে পারি ত এ জন্মে আর এমন সুযোগ পাব না।'

ভোরবেলায় উঠিয়া উর্মিলা বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। তখনও লোকজন কেহ সেখানে নাই। একটা পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায় বসিয়া রহিল, একরাশ ঝরা ফুলের মধ্যে।

জ্যোতির্ম্ময়ের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে আজই চুকাইয়া দিয়া গেলে কেমন হয় ? চোখে তাহাকে দেখা, কানে তাহার গলার স্বর শোনা, এ মহা ঐশ্বর্য্য এখন তাহার আছে। কিন্তু জীবন হইতে নিঃশেষে যাহা খসিয়া পড়িবেই, কেন আর তাহাতে লোভ করা ? জীবন-পথে দু'দিনের দেখা, দু'দিনের শোনা। মরিতে সব মানুষ ভয় পায়। উর্মিলাও পায়। কিন্তু তাহার যা ভবিষ্যৎ তাহাতে মৃত্যু ত শান্তিদাতা বন্ধুরূপেই আসিবে ? জীবনে যাহা পাইল না, মরণের পরে তাহা পাইলেও পাইতে পারে। জ্যোতির্ম্ময় চোখের জল হয়ত ফেলিবে না, কিন্তু তাহার মনটা করুণার্দ্র হইতে পারে। দেখিলে তাহাকে খুব কঠোর প্রকৃতির মানুষ বলিয়া বোধ হয় না।

হঠাৎ কানের কাছে জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এমন গভীর কি চিন্তায় ডুবে আছেন যে পায়ের শব্দটাও শুনতে পেলেন না ?"

উর্মিলা ফিরিয়া তাকাইল। জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কি ভাবছিলেন এত ?"

উর্মিলা বলিল, "এই সব গুছিয়ে নিচ্ছিলাম মনে মনে। কোথায় যাব, কি করব না করব।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কোথায় যাবেন স্থির করলেন ?"

উর্মিলা বলিল, "ছুটি হলে দার্জ্জিলিং যাচ্ছি। সেখান থেকে সম্ভবতঃ এখানে আর ফিরব না। দু'চার দিনের জন্যে আসতে পারি ছোটমাসীকে see off করতে। তারপর হয় পাটনায়, নয়ত কলকাতার কোন হস্টেলে থাকতে পারি। শরীর যদি আরও খারাপ হয়, তা হলে কোন নার্সিং হোম-এ আশ্রয় নেব।"

জ্যোতির্ম্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "এখানকার কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন ?"

উর্মিলা বলিল, "হ্যাঁ, ছেড়েই দেব। আজই resign দেব।"

"কাল রাত্রের মধ্যেই সমস্ত ঠিক হয়ে গেল !"

উর্মিলা বলিল, "আর দেরী ক'রে লাভ কি বলুন। নিশ্চিত দুঃখও সহ্য করা সহজ, ক্রমাগত সংশয়ের চেয়ে। আমার অদৃষ্টে যখন দুঃখ আর loneliness ছাড়া আর কিছুই নেই, তখন সেইটাই আমি মেনে নিলাম। শরীর আমার যেভাবে ভেঙে যাচ্ছে, তাতে আর বেশীদিন সংশয়ের দোলায় দুললে আমি আর টিকব না। তাই এই ব্যবস্থাই করলাম।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আপনার মত ক'রে নিজের একটা ব্যবস্থা আমি যদি ক'রে নিতে পারতাম ত বেঁচে যেতাম।

কিন্তু হাজার বাঁধনে আমি বাঁধা। তিন-চারটে একেবারে অক্ষম লোকের সম্পূর্ণ ভার আমার উপরে। আমার জীবনের মধ্যেই তারা বেঁচে আছে। তাদের ফেলতে আমি পারি না, চাইও না। তবে আমি একেবারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে বসেছি এই ভীষণ বন্ধনের মধ্যে। আমার অন্তরের মানুষ যে সে চিরদিনই হয়ত অনাহারে মরবে এদের আহার জোটাতে গিয়ে।"

নিজের ভিতরের কথা এমন করিয়া জ্যোতির্ম্ময় কোনদিনই তাহাকে বলে নাই। উর্ম্মিলা স্তব্ধ হইয়া গেল। একটু পরে বলিল, "ভগবান্ মানুষের আনন্দকে বড় কঠোর চোখে দেখেন। বেশীর ভাগ মানুষ কিছুই পায় না, আর যারা পায় তারাও এমন মূল্য দিতে বাধ্য হয় যে উপভোগ করার ক্ষমতাও আর তাদের থাকে না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "হয়ত তাই। তবু মূল্য দিয়ে পাওয়াও ভাল। আপনার ছুটি হচ্ছে কবে?"

উর্ম্মিলা বলিল, "আর সাত দিন আছে।"

জ্যোতির্ম্ময় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "মানুষের জীবন অদ্ভুত জিনিষ। তার এক-একটা খণ্ড আলাদা ক'রে দেখলে একরকম দেখায়, আবার সবগুলো খণ্ড একত্র ক'রে সমগ্রভাবে দেখলে আরেক রকম দেখায়। আমাদের জীবনের যে পরিচ্ছেদ শেষ হতে চলল সেটার নাম দেওয়া যায়, 'Ships that Pass in the Night'; কিন্তু মহাকাল ত এখনও লেখা শেষ করেন নি, শেষ পরিচ্ছেদে এখনকার এই পরিচ্ছেদের স্থান কি রকম দাঁড়াবে বলা যায় না।"

উর্ম্মিলা বলিল, "হয়ত সমগ্র লেখাটার মধ্যে এর কিছুই থাকবে না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সেটা সম্ভব নয়। আচ্ছা, কাল সকালে আবার দেখা হবে। আসবেন ত?"

উর্ম্মিলা বলিল, "আসব।"

দুইজনে উঠিয়া পড়িয়া একসঙ্গে ফিরিয়া চলিল। জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সামান্য একটু সুখবর ছিল, কিন্তু আপনার আর কোন interest লাগবে না শুনতে। এখানকার সব বন্ধন ত আপনি কাটাতেই বসেছেন।"

উর্ম্মিলা বলিল, "তবু শুনি। বন্ধন ত শুধু এখানকার মাটিটার সঙ্গে নয়, যে এখান থেকে স'রে গেলেই সব খ'সে যাবে মনের উপর থেকে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কলেজে একটু promotion পেলাম আর কি। একটা বেশী মাইনের post-এ গেলাম।"

উর্ম্মিলা বলিল, "অত্যন্ত খুশী হলাম শুনে। আপনার উপর চাপ হয়ত একটু কমবে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সামান্য কিছু কমবে। খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, তবে যাই হোক, তার জন্যেই আমি কৃতজ্ঞ। খুব বড় সৌভাগ্য কিছু আমার জীবনে আসবে না, সেই জন্যে ছোটখাট যা আসে তাকেই আদর ক'রে নিই।"

উর্ম্মিলা বলিল, "কেন আসবে না? নিশ্চয় আসবে। আমি যেন চোখেই দেখতে পাচ্ছি। আপনার জীবনে ভগবান্ সৌভাগ্য দেবেন, সার্থকতা দেবেন।"

জ্যোতির্ম্ময় উর্ম্মিলার দিকে চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কি ক'রে দেখছেন? দেখবার ত কথা নয়? বন্ধু ব'লে খানিকটা সুদৃষ্টিতে দেখেন, তাই এই wishful thinking, নইলে এখন পর্য্যন্ত যা ঘটেছে তাই দিয়েই বিচার করতে হলে আমার জীবন দুঃখের জীবনই হবে। ব্যর্থতা বই সার্থকতা তাতে থাকবে না।"

উর্ম্মিলা বলিল, "বাইরের দিক্ থেকে দেখতে গেলে আপনার জীবন খুব ব্যর্থ হয়েছে একথা কেউ বলবে না। এত ভাল স্বাস্থ্য আপনার, এটাও একটা মস্ত asset; স্বাস্থ্যের মূল্য তারাই বোঝে যাদের ভগবান্ ও সম্পদ্ থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমি যদি এত রুগ্ন না হতাম, আমার জীবনের ইতিহাসই অন্যরকম হ'ত। আপনি লেখাপড়া যথেষ্ট করেছেন, খুব ভাল ক'রে করেছেন। সাংসারিক অবস্থাও খুব খারাপ বলা যায় না, আমাদের দেশের পক্ষে। সবচেয়ে বড় যে, খুব নিদারুণ শোক আপনাকে কিছু পেতে হয় নি।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আপনার চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে পারলে সুখী হতাম। আমার চোখে যে ছবিটা পড়ে সেটা অত মনোরম নয়। স্বাস্থ্য ভাল এটা ঠিক, রোগে প'ড়ে থাকতে হয় না কখনও। লেখাপড়া খানিকটা করেছি সেটাও ঠিক। তবে সাংসারিক অবস্থা কিছুই ভাল নয়। তার পরিচয় নিজেই ত পেলেন ক'দিন আগে। শোকও সামনে অনেক আসছে, তার আভাস ত হাওয়ায় ভাসছে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "মানুষ হয়ে জন্মানোর এই ত বিপদ্। ভগবান্ নির্ম্মম হাতে দায়টা নিয়ে নেন। কিসের জন্যে

মূল্য দিচ্ছি তাও ত সব সময় বোঝা যায় না। জীবনের শেষের দিনে বোঝা হয়ত যায়, কিন্তু তখন জেনে কি কিছু লাভ হয়?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সাংসারিক দিক্ দিয়ে লাভ কিছু হয় না, তবে মানুষের ভিতরের জীবনে একটা চরিতার্থতার ছাপ প'ড়ে যায় হয়ত। সেটা কম লাভ নয়। যদি পুনর্জ্জন্ম ব'লে কিছু থাকে, তাহলে তার মধ্যে হয়ত এই চরিতার্থতাকে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া যায়।"

উর্ম্মিলা বলিল, "সে বিশ্বাস থাকলে ত? আপনি পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করেন?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "বিশ্বাস করি তা জোর ক'রে বলতে পারি না, তবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।"

বাড়ী আসিয়া পড়িল। উর্ম্মিলা বলিল, "আরো কয়েকটা দিন এই রোদে পোড়া আর ট্রামে চড়া বাকী আছে। ট্রামে চড়তে হবে না মনে ক'রে খারাপও লাগছে কিন্তু, যদিও ওটা আমার পক্ষে এমন কিছু আরামের জিনিষ ছিল না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "মানুষ অভ্যাসের দাস। অনেক কিছুই miss করবেন এখানকার, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে। আচ্ছা, কাল আবার দেখা হবে।"

উর্ম্মিলা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িল। যাক্, যাহা ফুরাইবে, তাহাকে ফুরাইতে দেওয়াই ভাল। জীবন সত্যই 'ক্ষণিকের গান'। ইহাকে চিরস্থায়ী ভগবান্ করেন নাই, মানুষ সে চেষ্টা করে কেন? ইহার ভিতর অক্ষয় অমর কি আছে? ভালবাসা? তাহা কি মৃত্যুকেও পরাজিত করে?

সুলাজিনী হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "ও রে দেখ্, জিনিষপত্র এখন থেকে খানিক খানিক ক'রে গোছাতে শুরু কর্। কি রেখে যাবি, কি নিয়ে যাবি। নইলে শেষের দিকে বড় তাড়াহুড়ো হয়ে যায়। ঘর-সংসারের জিনিষ ত সবই থেকে যাবে। এক বছর পরে ঘুরে এসে এখানেই উঠব। কাপড়-চোপড়, গহনা-গাঁটি, বই, ছবি, curio, কত লটবহর যে জমেছে। তার ভিতর কাপড়-চোপড় আমার সঙ্গে যাবে, গহনা ব্যাঙ্কে থাকবে। এখন এই সব দামী ছবি, বই, বাজনা, curio এ সব ভরসা করে তারণের কাছেই রেখে যাব? নষ্ট হবে না ত?"

উর্ম্মিলা বলিল, "চাকর-বাকরে কি ও সবের মূল্য বুঝবে? একজন কেউ যদি একটু দেখাশোনা করত। জ্যোতির্ম্ময়বাবুকে ব'লে দেখব? তিনি ত পাশেই থাকেন, তাঁর খুব বেশী অসুবিধে হবে না।"

সুলাজিনী বলিলেন, "সে হলে ত সবচেয়ে ভাল হয়। বল্ না তাকে? আজ তার সঙ্গে আর তোর দেখা হবে?"

উর্ম্মিলা বলিল, "দেখা করলে দেখা হবে। আগে বিকেলে কলেজ থেকে ফিরেই ছেলে পড়াতে যেতেন। এখন একটা ছাত্রের জ্বর হওয়াতে সাতটা অবধি বাড়ীতেই থাকেন।"

সুলাজিনী বলিলেন, "তবে ওকে লিখে দে বিকেলে এখানে এসে চা খেতে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "তুমি লেখ মাসী, সেটাই ভাল দেখাবে।"

সুলাজিনী ঠোঁট বাঁকাইয়া একটু হাসিলেন। অবশ্য উর্ম্মিলার অলক্ষ্যে। তারপর দামী চিঠির কাগজে দু' ছত্র নিমন্ত্রণ-লিপি লিখিয়া, সুদৃশ্য খামে ভরিয়া পাশের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় তখন স্নান করিতে যাইতেছিল। চিঠি পাইয়া বেশ কিছু বিস্মিত হইল। বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কেন? যাহা হউক, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদ জানাইয়া চিঠির জবাব পাঠাইয়া দিল।

উর্ম্মিলা বসিয়া বসিয়া খানিক মনে মনে জিনিষ গুছাইতে লাগিল। কাপড়-চোপড় ও বিছানা ছাড়া দার্জ্জিলিংএ এত কিছু লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। তবে যদি এখন আর কলকাতায় না আসে, পাটনায় থাকে, তাহা হইলে আরো কিছু জিনিষপত্র লইতে হইবে। সংসার করার বা সংসার সাজানোর কোন জিনিষের প্রয়োজন হইবে না। বইগুলি তাহার বড় প্রিয়, বড় আদরের জিনিষ, কিন্তু সেগুলিও রাখিয়াই যাইবে বেশীর ভাগ। কতদিনে এখানে আবার সে ফিরিবে? আর কি কখনও ফিরিবে? রুগ্ন দেহ তাহার এখন একেবারে বিশ্রাম চায়। অন্তর্মন আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু বিশ্রাম কোথায়, শান্তি কোথায়? ছোটমাসী অবশ্য যে পরামর্শ দিতেছেন, তাহা তাঁহার মতে ভাল। নিজে যাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাহাকে পান নাই, কিছুদিন পরে অন্য এক ভদ্রলোককে বিবাহ করিয়াছিলেন। আনন্দ পান নাই, তবে স্বীকার করেন যে, শান্তি খানিকটা পাইয়াছিলেন। এখন ত ভালই আছেন, নিজের মতে।

কিন্তু ঊর্ম্মিলা ত তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে এখনই চলিতে সক্ষম নহে। আর কাহারও কথা ভাবাই তাহার পক্ষে অসম্ভব। যদি কোন সময়ে সে জ্যোতির্ম্ময়কে খানিকটা ভুলিতেও পারে, তখন অন্য চিন্তা মনে স্থান দেওয়া হয়ত সম্ভব, যদিও মন তাহাও অস্বীকার করে। আর ততদিনে ভগবান্ হয়ত অন্য উপায়ে তাহার সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিবেন।

সেদিন কলেজে গিয়া সে বাকী কয়েকদিনের ছুটি লইয়া আসিল। এখন পড়াশুনা কিছুই হয় না। শুধু যেদিন কলেজ বন্ধ হইবে সেদিন গিয়া দেখা করিয়া আসিলেই হইবে। তাহার ইচ্ছা করে না, কিন্তু ছাত্রীদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহাকে স্বীকার করিতেই হইল। এই সব বিদায় নেওয়ার যন্ত্রণা কেন আর। কেহই তাহাকে দু'দিন পরে মনে রাখিবে না, কিন্তু ছাড়িয়া যাইবার সময়টিকে অশ্রুসজল ও বেদনাকাতর করিয়া তুলিবে। ইহাই মানুষের স্বভাব। সে নিজেও কি সকলকে মনে রাখিবে? তাহাও সম্ভব নয়।

তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। এখনই জ্যোতির্ম্ময় আসিয়া পড়িতে পারে। ছোটমাসী স্নানের ঘরে ঢুকিলে সহজে আর বাহির হইবেন না। তারার মাকে বলিয়া রাখিল, পাশের বাড়ীর দাদাবাবু আসিলেই তাঁহাকে যেন উপরের বসিবার ঘরে আনিয়া বসায়। অন্য দিনের চেয়ে কিছু আগে চায়ের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিল।

মিনিট পাঁচ-দশ পরেই তারার মা আসিয়া খবর দিল যে, দাদাবাবু আসিয়াছেন। ঊর্ম্মিলা তাড়াতাড়ি বসিবার ঘরে চলিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময় দাঁড়াইয়া বইয়ের আলমারি দেখিতেছে। ঊর্ম্মিলাকে দেখিয়া বলিল, "আজ অনেক আগেই ফিরেছেন দেখছি। এরই মধ্যে স্নান-টান হয়ে গেছে।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "আগেই চলে এলাম। এখন ক্লাস-টাস কিছুই হচ্ছে না। ব'লেই এলাম আর যাব না। শেষের দিন গিয়ে দেখা ক'রে আসব।"

জ্যোতির্ম্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েরা farewell দিচ্ছে বুঝি?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "হ্যাঁ, ঐ ওদের এক ফ্যাশন্। কান্নাকাটি ক'রে, ভাঙাগলায় গান গেয়ে একটা উৎপাত ঘটানো। ভাল লাগে না আমার। কিন্তু ওরা কথা শোনে না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আপনার যা বয়স তার পক্ষে মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে আপনি বড় bitter হয়ে যাচ্ছেন। মন থেকেই হয়ত করে, আপনাকে ভালবাসে ব'লেই করে, ফ্যাশন ব'লেই নয়। এটা বিশ্বাস করলে আর অত বিরক্ত হতেন না।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "সত্যই bitter হয়ে যাচ্ছি। অতিরিক্ত বঞ্চিত হওয়ার ফল এটা। মায়ের কোলে যারা মানুষ হয় তাদের এমন স্বভাব হয় না। আর বিদায় নেওয়াকে আমি ভীষণ ভয় করি। মনে জোর কম, নিজের চোখেও জল এসে যায়, এবং পরে তাই নিয়ে লজ্জা বোধ করি।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কাউকে ছেড়ে যেতে যদি কান্না আসে তাতে লজ্জার কি আছে? ভালবাসাটা কি অপরাধ?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "হ্যাঁ, অপরাধই বলব এক এক ক্ষেত্রে। সব মানুষকে ভালবাসবার অধিকার সব মানুষের থাকে না।"

বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

জ্যোতির্ম্ময় মনে মনে ভয়ানক অশান্ত হইয়া উঠিল। এ কথা ঊর্ম্মিলা বলিতেছে কেন? তাহাকে কি তিরস্কার করিতে চায়, না নিজেকেই ভর্ৎসনা করা তাহার উদ্দেশ্য?

সুলাজিনী এই সময় ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ঊর্ম্মিলার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "চা আনতে বলিস্ নি বুঝি এখনও? কলেজ থেকে এসেছে ও, সে খেয়াল আছে?"

সে খেয়াল সত্যই ছিল না ঊর্ম্মিলার। মাসীর কথায় লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি ঘণ্টা বাজাইয়া তারণকে চা আনিতে বলিল। সুলাজিনী চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। ঘরের আবহাওয়া বড় থমথমে হইয়া আছে। তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে ইহা বড় অস্বস্তিকর। অবস্থাটা সহজ করিয়া লইবার জন্য বলিলেন, "আমরা কিছুদিনের জন্যে বেরোচ্ছি, শুনেছ বোধ হয়?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "হ্যাঁ, ওঁর কাছে শুনলাম। বাড়ীটা ত রেখেই যাচ্ছেন?"

"উৎপাত করেন না ব'লেই বরং দুঃখিত হই।"

সুলাজিনী বলিলেন, "বাড়ী রেখেই যাচ্ছি, জিনিষপত্র প্রায় সবই রেখে যাচ্ছি। চাকরও একটা রেখে যাচ্ছি। এক বছর ত দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এসে একেবারে বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়তে না হয় সেটা দেখতে চাই। তাই তোমার উপর একটু উৎপাত করব ভাবছি, যদি কিছু মনে না কর।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "উৎপাত করেন না ব'লেই বরং দুঃখিত হই। মনে হয় আমাকে কোন কাজেরই যোগ্য মনে করেন না।" বলিয়া একবার উর্ম্মিলার মুখের দিকে তাকাইল। সে সেইরকম বিরস গম্ভীর মুখেই বসিয়া আছে।

"আমি অন্ততঃ কাজের যোগ্যই মনে করি, না হলে কাজ চাপাতে যাব কেন? অনেক দামী জিনিষ রেখে যাব, চাকরে ত তার কদর বুঝবে না? যদি একটু দেখ মাঝে মাঝে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "নিশ্চয়ই দেখব। চাবি কার কাছে থাকবে?"

সুলাজিনী বলিলেন, "আলমারির চাবি সব তোমায় দিয়ে যেতে চাই, ঘরের তালার চাবি চাকরের কাছেই থাকবে। বাজনা আছে কতকগুলো, সেগুলো কাপড়ে জড়িয়ে মুড়ে রেখে যাব, তুমি বা আরতি মাঝে মাঝে নেড়ে-চেড়ে দেখো, পোকায় কাটছে কি না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "শক্ত কাজ কিছু নয়, সহজেই পারব।"

উর্ম্মিলা বলিল, "আমার বইয়ের আলমারি দুটোর সব বই আরতির বড় ভাল লাগে। ও যদি পড়তে চায়, ওকে পড়তে দেবেন।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কাজ করার জন্যে পুরস্কারও হাতে হাতে পাওয়া যাবে দেখছি। আরতি যে সুযোগটা পাবে, তার দাদাও আশা করি সেটার থেকে বঞ্চিত হবে না।"

সুলাজিনী বলিলেন, "শোন কথা, এও আবার ব'লে দিতে হবে নাকি?"

১০

রাত্রি বারোটা-একটা পর্য্যন্ত উর্ম্মিলা ঘুমাইতে পারিল না। সন্ধ্যাবেলার দেখা হওয়াটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগিতে লাগিল তাহার কাছে। তাহারা নিভৃতে দুই-তিনটার বেশী কথা বলে নাই। তাহার পরেই সুলাজিনী আসিয়া পড়িয়াছিলেন এবং সমস্তক্ষণই ঘরে ছিলেন। আবহাওয়া হাল্কা হইয়া গিয়াছিল। উর্ম্মিলা দুই-চারিটার বেশী কথা বলে নাই। জ্যোতির্ম্ময় এমনভাবে কথা বলিয়া গিয়াছে যেন সামনের ছাড়াছাড়িটা কিছুই নয়। দুদিন বাদে আবার যে যার জায়গায় ফিরিয়া আসিবে। এবং জীবন আগেরই মত চলিতে থাকিবে।

সুলাজিনীর সম্বন্ধে অবশ্য এটাই ঠিক। এক বৎসর পরে তিনি ফিরিয়া আসিবেন এবং আসিয়া এখানেই উঠিবেন। কিন্তু উর্ম্মিলা? এই একটা বৎসর কি বহন করিয়া আনিতেছে তাহার জন্য? হইতে পারে, জীবনের অবসানই তাহার অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কেন ভগবান্ মানুষের ভবিষ্যৎ জানিতে দেন না? সে যদি নিশ্চিত

করিয়া জানিত যে সে বাঁচিবে না, তাহা হইলে আজই গিয়া নিজের হৃদয়ের আনন্দ ও ব্যথা মিশ্রিত অর্ঘ্য তাহার প্রিয়তমের কাছে নিবেদন করিয়া আসিত। যে চলিয়া যাইবে তাহার ত আর লজ্জা বা সঙ্কোচের প্রয়োজন হয় না? কিন্তু সে ত জানে না। হয়ত মরিবে না, বাঁচিয়াই থাকিবে। সংসারের পাষাণ কারাগারে বন্দিনী হইয়া পড়িবে না ত? এমন ভুল যেন তাহার না হয়। বেদনায় আজ সে প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতিনী হওয়ার দুঃখ ইহার উপর যেন আর বহন করিতে না হয়। অবশ্য কাহার সম্বন্ধে বা এ ভাবনা? তাহার ভালবাসা কেহ ত গ্রহণ করে নাই! বুক ভরিয়া কাহারও কাছে প্রেমের সম্পদ্ সে পায় নাই। তবু নিজের কাছে বিশ্বাস রক্ষা করিয়াই যেন সে চলে।

কাল জ্যোতির্ময়কে সে বলিয়াছিল, সকলকে ভালবাসিবার অধিকার সকলের নাই। কিন্তু হায়, ভালবাসা যে কোনও আইন মানিয়া চলিতে চায় না? যে উর্মিলাকে চায়, উর্মিলা তাহাকে চায় না। উর্মিলা যাহাকে চায় সে ত মুখ ফিরাইয়া আছে। কখন্ ঘুমাইয়া পড়িল, বুঝিতে পারিল না।

ভোরের আলোয় চোখ মেলিয়া স্থির করিল, আজ জ্যোতির্ময়ের কাছে বিদায় লইয়া সে চলিয়া আসিবে। কি প্রয়োজন আর? নিজেকে আর যন্ত্রণা দিয়া কি হইবে? কিন্তু পারিবে কি? অন্ততঃ চেষ্টা করা যাক্।

পার্কে গিয়া দেখিল, আজ জ্যোতির্ময়ই আগে আসিয়া বসিয়া আছে। উর্মিলাকে দেখিয়া বলিল, "কাল রাত্রে ঘুমোতে প্যারেন নি বুঝি? চেহারাও ভাল দেখাচ্ছে না।"

উর্মিলা বলিল, "ঠিকই ধরেছেন। দুশ্চিন্তা জিনিষটার একটা নেশা আছে। সময় মত ঠিক এসে হাজির হয়।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "দেখুন, জিনিষটাকে একটু সহজ ক'রে নেওয়া যায় না কি? কাল ব'সে ব'সে আপনাদের ঘরে তাই ভাবছিলাম। এক বৎসর অন্য জায়গায় গিয়ে থাকা খুব কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। অত্যন্ত প্রিয়জনকেও ছেড়ে যেতে হয়। কিন্তু মানুষ আবার ফিরে ত আসে? জীবনের সূত্র আবার জোড়াও লাগে? আজ যে সমস্যার কোন সমাধানই পাওয়া যাচ্ছে না, কালে তার সমাধানও ত হয়ে যায়?"

উর্মিলা বিস্ফারিত নেত্রে জ্যোতির্ময়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কি উর্মিলাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে? হয়ত তাই। কিন্তু উর্মিলার দুঃখ বোঝে কি সে?

মুখে বলিল, "সাধারণভাবে কথাটা ঠিকই। কিন্তু আমার অবস্থাটা ঠিক সাধারণ নয় যে? আমি ত জানি না, আমি আর ফিরতে পারব কি না। সামনে মনে হয় মৃত্যুই যেন অপেক্ষা ক'রে আছে। আর না-হয় তার চেয়েও বড় সর্ব্বনাশ।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "দোহাই আপনার, এ রকম কথা আপনি বলবেন না। কেন মৃত্যু আসবে আপনার সামনে? এ যে একেবারে ভুল ধারণা? একটু অসুস্থ আছেন, সেরে যাবেন। মনে আশা রাখুন, এত কষ্ট নিজেকে দেবেন না। চুপ ক'রে ব'সে দেখা ছাড়া আর যে আমার কিছুই করবার নেই। এর লজ্জা যে আমার কতখানি তা আপনাকে কি ক'রে বোঝাব?"

উর্মিলা বিস্মিত হইয়া গেল জ্যোতির্ময়ের আবেগে। এতটা কষ্ট পাইল সে উর্মিলার কথায়? তাহা হইলে শুধু একটু কৃতজ্ঞতা ছাড়া আরো কিছু কি তাহার মনে আছে?

জ্যোতির্ময় আবার কথা বলিল, "আপনি মরার চেয়ে বড় আর কোন্ সর্ব্বনাশের আশঙ্কা করছেন?"

উর্মিলা বলিল, "যদি এই loneliness সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার সমান মহাপাপ ক'রে বসি? সে কি মরার বাড়া সর্ব্বনাশ নয়?"

জ্যোতির্ময় বলিল, "বুঝলাম আপনার কথা। কিন্তু তার সম্ভাবনাও কি আছে?"

উর্মিলা বলিল, "নেই কি ক'রে বলব? বেঁচে থাকার লোভে আত্মিক মৃত্যু বরণ মানুষে করেছে ত এর আগে? ম্যাথিউ আর্নল্ড একটা কবিতায় বলেছিলেন, "We forget because we must, and not because we will," সেই ভয়ই আমার।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "কি বলব আপনাকে আমি? বাঁচতে হলে অনেক জিনিষ ভুলতে হয় সত্যি। কিন্তু না ভুলেও বেঁচে থাকা যায়। তারও উদাহরণ আছে মানুষের জীবনে, কাব্যে, সাহিত্যে। কিন্তু এ আলোচনা বড় নিষ্ফল। আপনি বিশ্বাস রাখুন, সব ভাল হবে। আপনার কোন অকল্যাণ হবে এ চিন্তায় আমার মন সায় দিচ্ছে না।"

উর্ম্মিলা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,"এবার আপনার wishful thinking; যাই হোক, কল্যাণ যে চাইছেন তার জন্যই ধন্যবাদ। আর দেখুন, আর একটা কাজের কথা আছে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "বলুন। কাল কাজের কথা ত শুধু আপনার ছোট মাসী বললেন, আপনি চুপ ক'রেই রইলেন। ব্যবস্থাটা আপনার ভাল লাগে নি কি?"

উর্ম্মিলা বলিল, "ভালই লেগেছে, কারণ suggestionটা আমার কাছ থেকেই এসেছিল।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "নিজে বললেন না কেন?, আমার কাছে আপনার অনুরোধের মূল্য কম হবে ভেবেছিলেন?"

উর্ম্মিলা চাহিয়া দেখিল, জ্যোতির্ম্ময়ের মুখের উপর যেন অমাবস্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। একটু অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "তা মনে করি নি। তবে ভেবেছিলাম ঘর-সংসার ছোট মাসীরই, তিনি বললেই ভাল শোনাবে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সেটা ঠিক অবশ্য। আর কি কাজের কথা আছে বলছিলেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "ঐ যে টাকাটা রইল। যদি শোনেন সত্যি আমি চ'লে গেছি, তা হলে নিজের হাতে গরীব-দুঃখীকে বিলিয়ে দেবেন। আমার আত্মীয়-স্বজনকে ফেরত দেবেন না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "যা আপনার ইচ্ছা। আপনি বোধ হয় আজ ঠিক ক'রে এসেছেন যে, আর আমাদের জীবনে দেখা সাক্ষাৎ হবে না, তাই শেষ ইচ্ছাটাও জানিয়ে দিলেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "তা ভাবি নি। তবে আমি নিজে যত কষ্ট পাচ্ছি তত কষ্ট আপনাকে দিচ্ছি অদ্ভুত সব কথা ব'লে। তাই ভাবছিলাম, আর যন্ত্রণা টেনে নিয়ে বেড়িয়ে কি হবে? না-ই দেখা করলাম আর? যাবার দিন সকালে দেখা করব।"

জ্যোতির্ম্ময়ের মুখের উপর আঁধার ছায়া আরো যেন গাঢ় হইয়া আসিল। বলিল, "তাই যদি আপনি ভাল মনে করেন ত তাই করুন। আপনার মনে যাতে শান্তি আসে, সে ব্যবস্থাই সব-আগে করা দরকার। অন্য মানুষের এতে কথা বলবার অধিকার নেই।"

উর্ম্মিলা চুপ করিয়া রহিল। আর কি বলিবে সে? এখন আর কিছু বলিতে গেলে সবই বলা হইয়া যাইবে। কিন্তু এই ভাবেই শেষ হইল তাহার জীবনের একমাত্র প্রেমের কাহিনী?

একটু পরে বলিল, "আপনি আমাকে কি ভাবছেন জানি না। হয়ত পাগল নয় নির্ব্বোধ ভাবছেন। সাধারণ একটা অবস্থাকে আমি অত্যন্ত নাটকীয় ক'রে তুলছি। কিন্তু নিজের কাছেই আমি বড় লজ্জিত। অন্য মানুষ হলে এতটা upset এই ব্যাপারে হয়ত হ'ত না। কিন্তু আমি ঠিক স্বাভাবিক ভাবে মানুষ হই নি। তাই আমার reaction-গুলোও স্বাভাবিক হয় না। যদি সত্যিই আমি অন্যায় কিছু বলছি বা করছি, তা হ'লে আপনি সেটা ক্ষমা করবেন। আমাকে হয়ত একটা sentimental fool ছাড়া আপনি আর কিছু ভাবতে পারবেন না। কিন্তু সত্যিই অন্য কোন রকম ব্যবহার করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

জ্যোতির্ম্ময় হাসিবার বিফল চেষ্টা করিয়া বলিল, "আমি কি ভাবছি তা জেনে ত কারো লাভ আছে মনে হয় না? এটা ঠিকই, ব্যাপারটাকে অন্য মানুষে এতটা seriously নিত না। আপনি পারলেন না, সেটা আপনার অপরাধ নয়। আপনার মন অত্যন্ত কোমল, দুঃখও সেই জন্যে বেশী পেলেন। কিন্তু ব'সে ব'সে কথার পর কথা ব'লে লাভ নেই কিছু। আমি অবশ্য আপনার মত কোমলহৃদয় মানুষ নয়, অবস্থায় প'ড়ে অনেকটা কঠিন আমায় হয়ে যেতে হয়েছে। তবু মন ব'লে একটা জিনিষ আমারও আছে। অনর্থক সেটাকে উৎপীড়িত করতে চাই না। তা হ'লে আমি বিদায় হই। আরো যদি কিছু করতে আপনার জন্যে পারি, সেটা ব'লে দিন।"

উর্ম্মিলা এইবার ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। চোখের জলকে আর যে ঠেকাইয়া রাখা যায় না? কি করিবে সে?

জ্যোতির্ম্ময় তাহার মুখের দিকে একবার তাকাইল। এত কষ্ট এই মানুষটাকে সে কি করিয়া দিতে পারিতেছে? ইহাকে একগুণ আঘাত দিলে তাহা যে দশগুণ হইয়া তাহার নিজের বক্ষে বাজিতেছে? আত্মাভিমান, পৌরুষের অহঙ্কার তাহাকে কি সান্ত্বনা দিতে পারিবে? এই অশ্রুভারাক্রান্ত মুখের স্মৃতিই কি তাহার জীবন-পথের একমাত্র পাথেয় হইয়া থাকিবে?

কিন্তু তাহার বুদ্ধি সায় দিল না। হৃদয়াবেগের স্রোতে সে এখনই ভাসিয়া যাইতে পারে, উর্ম্মিলাকেও

ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরে কি অনুতাপ করিতে হইবে না? উর্ম্মিলা তাহাকে ভালবাসে, ইহা সে প্রায় নিশ্চিত করিয়া বুঝিয়াছিল, কিন্তু বাধাও তাহার মনে কিছু একটা আছে। জ্যোতির্ম্ময়ের নিজের মনেও ত আছে। সময়ে ইহা দূর হইবে, এই আশায় বসিয়া থাকা ছাড়া উপায় কি? শুধু নিজের দুঃখভোগের ভাবনা হইলে সে অবিচলিতই থাকিত। কিন্তু উর্ম্মিলার দেহ-মনের অবস্থা যে বড়ই আশঙ্কাজনক? অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়া অসম্ভব নয়। দূরে থাকিয়া কি সাহায্য তখন জ্যোতির্ম্ময় তাহার করিতে পারিবে? আরো ভয়ের কারণ সে নিজেই জানাইতেছে, সে নিজেকে অন্যত্র দান করিয়া ফেলিতে পারে, একাকিত্বের বোঝা যদি একান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। ইহা সত্যই মৃত্যুর অপেক্ষাও বড় সর্ব্বনাশ, তাহাদের দু'জনের পক্ষেই। কিন্তু কি ভাবে বা ইহা নিবারণ করা যায়?

দু'তিন মিনিটের মধ্যেই উর্ম্মিলা নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইল। বলিল, "দার্জ্জিলিং-এর ঠিকানা আপনাকে দিয়ে যাব। পাটনায় যদি যাই, সেখানের ঠিকানাও দিয়ে যাচ্ছি।" নিজের হাত-ব্যাগ হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া সে ঠিকানা দুইটি লিখিয়া দিল। বলিল, "ইচ্ছা হলে চিঠি লিখবেন। আরতিকেও বলবেন চিঠি লিখতে। আর—"

সে থামিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কথাটা শেষ ক'রে ফেলুন, যা বলবেন আমি তাই করব কথা দিচ্ছি।"

উর্ম্মিলা বলিল, "যদি কোন সময়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি, সারবার আশা না থাকে, তখন ডাকলে আসবেন?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আসব, নিশ্চয়, তবে আপনি সেরে উঠবেন, এও আমি জানি।"

উর্ম্মিলা বলিল, "কি ক'রে জানবেন? মানুষ ত ভবিষ্যৎ জানে না। কথা দিলেন কিন্তু যে যাবেন। যেখানেই থাকি, যে অবস্থায়ই থাকি?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "যেখানেই থাকুন, যে অবস্থায়ই থাকুন, যাব। যদি মানুষের যাবার পথ সেখানে থাকে। আর আপনিও আসবেন, যদি আমারও সে রকম সময় উপস্থিত হয়। এটা দাবী নয়, প্রার্থনা মাত্র।"

উর্ম্মিলার চোখ দিয়া এবার জল পড়িতে আরম্ভ করিল। বলিল, "প্রার্থনা কেন বলছেন? এ রকম শুনলে কোন বন্ধু ছুটে না গিয়ে পারে? কিন্তু ভগবান্‌ও বোধ হয় এত বড় দুঃখ আমায় দেবেন না। তাঁর কাছে খুব বেশী দয়া এখনও পর্য্যন্ত আমি পাই নি যদিও।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "চোখের জল ফেলবেন না দয়া ক'রে। আমি পুরুষ মানুষ, এত লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে আমাকে যদি কাঁদতে হয় তা হলে সেটা কিছুই সুদৃশ্য হবে না। আমি ঈশ্বর-বিশ্বাসী যে খুব তা নয়। তবে কেউ যে একজন আছেন আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা তা বিশ্বাস করি। তিনি আপনার অকল্যাণ করবেন না; যা দুঃখ পেলেন অদৃষ্টের দোষে, তার চেয়ে বেশী দুঃখ তিনি আর দেবেন না। এবার আমাদের উঠে পড়া ভাল, বেলা হয়ে গিয়েছে।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া উর্ম্মিলা বলিল, "যাবার দিন সকালে আবার আসব। মাঝে যদি কিছু দরকার হয়, খবর দেব। আমি চলি তা হলে। আপনাকে একটা প্রণাম করব?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "প্রণাম করবার দরকার নেই। নেবার যোগ্যতাও আমার নেই। তবে বয়সে বড়, সেই অধিকারে আশীর্ব্বাদ করছি। আপনার সব দুঃখ দূর হোক। শান্তি আসুক মনে। দরকার হলেই ডাকবেন।" বলিয়া নিজেই উঠিয়া চলিয়া গেল। উর্ম্মিলা তাহার সামনেই কাঁদিয়াছে। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় নিজের চোখের জল তাহাকে দেখাইতে পারিল না।

এত বড় আঘাত যে তাহার জন্যই অপেক্ষা করিয়া আছে তাহা কয়েকদিন আগেও কি জ্যোতির্ম্ময় ভাবিতে পারিয়াছিল? মানুষ কখনও কাছে থাকে, আবার কখনও দূরেও চলিয়া যায়। প্রিয়তম যে মানুষ, তাহারও সঙ্গে বিচ্ছেদ জীবনে কতবার হয়। মানুষকে সবই সহ্য করিতে হয়।

কিন্তু যে বিচ্ছেদ চিরবিচ্ছেদ হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহার সম্মুখে অকম্পিত বক্ষে, শুষ্ক চক্ষে কয়জন মানুষ দাঁড়াইতে পারে? তরুণ বয়সে আরোই পারে না। জ্যোতির্ম্ময়ও পারিল না। ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়া অনেকটা সময় কাটাইয়া দিল। আরো দুঃখ এই যে, অবস্থাটা তাহারই সৃষ্টি। একবার হাত বাড়াইলেই উর্ম্মিলাকে সে বুকে পাইত। কিন্তু হাত সে বাড়াইতে পারিল না। যে লগ্ন আজ একবার ভ্রষ্ট হইল, তাহা এ জীবনে কি আর একবার আসিবে? অদৃষ্ট ত ঘন-যবনিকার আড়ালে, ওপারে কি আছে কিছুই দেখা যায় না।

দেরী দেখিয়া আরতি আসিয়া দরজা ঠেলিতে লাগিল। বলিল, "দাদা, আজ তোমার কলেজ নেই?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কলেজ আছে। যাচ্ছি।" তাড়াতাড়ি গিয়া স্নান করিয়া খাইয়া সে কলেজে চলিয়া

গেল। ভাবিতে ভাবিতে গেল, আর কোন উপায়ে আয় আরো খানিকটা বাড়ানো যায় কিনা। টাকার প্রয়োজন বড় বেশী। উর্ম্মিলার ঋণ আগে তাহাকে শোধ করিতে হইবে। তাহার পর তাহাকে নিজের জীবনে বরণ করিয়া আনিতে পারিবে। ভাগ্য যদি নিতান্ত অকরুণ না হয় তাহা হইলে এটুকু সময় সে পাইবে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টাও যদি খাটিতে হয় তাহাতেও তাহার আপত্তি ছিল না।

কাজ করিতে মন বসে না। তবু কাজ সে করিয়াই গেল। ছুটি হইবার পর বাড়ী ফিরিল না। কফি হাউসে চা খাওয়া সারিয়া, অখিলের সঙ্গে খানিক ঘুরিয়া বেড়াইল।

অখিল জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ী যাচ্ছ না, মা ভাববেন না?"

"একটু ভাবুন একদিন। আমার জন্যে কোনদিনও ত তাঁদের ভাবতে হয় নি? মাঝে মাঝে একটু ঘা দিয়ে জানিয়ে দেওয়া ভাল যে আমি একটা মানুষ। আমাকে দায় উদ্ধারের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু তাঁরা মনে করতে পারেন না।"

অখিল বলিল, "ঝগড়া করেছ বুঝি আজ? মুখের চেহারা দেখেও তাই মনে হচ্ছে। দায় উদ্ধারের যন্ত্র ত আমরা সবাই। কেউ মা-বাপের কাছে, কেউ স্ত্রীপুত্রের কাছে। আমার ত বিয়ে হয়েছে মাত্র চার বছর, এরই ভিতর গিন্নী প্রেমালাপ ভুলে গেছেন, বৈষয়িক আলাপেই কেটে যায় রাত্রের অর্দ্ধেকটা। ওটা মানুষের কপাল। তা তুমি যা কুমার কার্ত্তিকের মত দেখতে, তোমার স্ত্রী অন্ততঃ খুব বেশী মূল্য দেবেন মানুষ হিসেবে তোমাকে, যতদিন না ভুঁড়ি বাগাচ্ছ এবং মাথায় টাক দেখা দিচ্ছে। তার উপর ত প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করবে। কাজেই স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'তেই এক বৎসর কেটে যাবে না।

অখিল সম্বন্ধ করিয়া অচেনা মেয়েই বিবাহ করিয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তাই নাকি? এত দেরী লাগে? Subsequent eventএ ত তা মনে হয় নি?"

অখিল বলিল, "ও সব প্রকৃতি দেবীর কারসাজি। ওর মানে কিছু নেই। তুমি মনে মনে কনে ঠিক ক'রে রেখেছ, না? এখনও কোর্টশিপ আরম্ভ হয় নি?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তা হলে কি আর বিকাল বেলাটা তোমার সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম? আগে আয় হোক বিয়ে করার মত, তবে ত বিয়ে? আমার বৌ যিনি আসবেন তিনি শুধু শাক চচ্চড়ি ভাত খেতে পারবেন না। এবং বাসন মাজা, ঘর নিকোনও তাঁর দ্বারা হবে না।"

অখিল বলিল, "খুব বড়লোকের মেয়ে বুঝি? তা হলে ত তোমার আয় বেশী না বাড়লেও চলবে। তিনি ত আর শূন্য হাতে আসবেন না?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তুমিই না বল যে বৌয়ের তাঁবেদার হওয়া ভাল নয়? আমার সংসার আমিই চালাব, আমার বৌকে চালাতে হবে কেন?"

অখিল বলিল, "এ দিকে ত বেজায় আধুনিক, আবার অন্যদিকে সনাতনপন্থীও আছ দেখছি। পার যদি চালাতে ত খুব ভাল।"

ছেলে পড়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। কাজেই জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া গেল। বাড়ী ফিরিল ন'টায়।

সুখদা ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ? ভাবনা হয় না মানুষের?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ভাবনা ক'রে আর হবে কি? এরপর ভাবছি আর একটা ট্যুশনিই নেব, কলেজ থেকে আর বিকেলে বাড়ী আসাই হবে না। ছুটির পরে অবশ্য।"

তাহার মা বলিলেন, "খেটে খেটে শেষে রোগে পড়, দরকার কি? চ'লে ত যাচ্ছে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কোথায় চ'লে যাচ্ছে? এখুনি খুকীর বিয়ে এসে পড়লে আর চলবে না। তখন এই বাড়ী ধ'রেই টানাটানি করবে। কিন্তু দশ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ী আবার ঋণমুক্ত করতে হবে ত আগে? সে টাকাটা আসছে কোথা থেকে?"

ইহার জবাব সুখদার জানা ছিল না। তিনি প্রস্থান করিলেন, জ্যোতির্ম্ময় বারান্দায় বাহির হইয়া পাশের বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। একটা ঘরে এখনও আলো জ্বলিতেছে, তবে উর্ম্মিলার ঘর অন্ধকার। সে এখানেই আছে, ডাকিলেই সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু কতদূরে এখন সে? জ্যোতির্ম্ময়ের মন একমাত্র এখন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে। চোখ আর তাহার দেখা পাইবে না, কানও তাহার কণ্ঠস্বর শুনিবে না।

পরদিন ভোরে উঠিয়া সে লেকের বাগানে বেড়াইতে চলিয়া গেল। সকালে বাড়ীটা বড় অসহ্য লাগে, কিন্তু একলা ঐ পার্কে বেড়ানোর কথা মনেও আনা যায় না। খানিক ঘুরিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, আরতি তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া আছে। জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কি ব্যাপার, দাঁড়িয়ে যে?"

আরতি বলিল, "দাদা, উর্ম্মিলাদি বলেছেন, তাঁর এস্‌রাজটা এনে আমার কাছে রাখতে। না বাজালে নাকি খারাপ হয়ে যায়। আনব?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আনতে পারিস্ তবে যত্ন ক'রে রাখিস্। তুই গিয়েছিলি নাকি ওঁদের বাড়ী?"

আরতি বলিল, "যাই নি, বারান্দার থেকে বললেন। তা হ'লে নিয়ে আসি, বেশী রোদ উঠলে আর বেরোতে ইচ্ছে করে না।" বলিয়া নামিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময় যখন স্নান সারিয়া খাইতে বসিয়াছে তখন ফিরিয়া আসিল। হাতে তাহার এস্‌রাজ ও একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ।

জ্যোতির্ম্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কার ছবি রে?"

আরতি বলিল, "উর্ম্মিলাদির। ওঁর ত অনেক ছবি আছে, তাই একখানা চেয়ে নিলাম। বেশ উঠেছে, না?"

জ্যোতির্ম্ময় সমালোচকের দৃষ্টিতে ছবিখানার দিকে তাকাইয়া রহিল। ছবি ঠিকই উঠিয়াছে, কিন্তু সেই তরুণ কোমলতাটা তেমন ফোটে নাই। বলিল, "মন্দ নয়।"

মাঝের তিনটা দিন দ্রুতগতিতে যেন নাচিয়া পার হইয়া গেল। যখন দিনকে মানুষ ধরিয়া রাখিতে চায় তখন সে এমনি করিয়াই পালায়। আর যে দিনকে বিদায় দিবার জন্য সে ব্যগ্র তাহা অনড় পাষাণ-ভারের মত হইয়া মনের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকে। পাশের বাড়ীর আসবাব সরানো ও জিনিষপত্র নাড়ানোর শব্দ ক্রমাগত শোনা যাইতে লাগিল। কিন্তু উর্ম্মিলাকে দেখা গেল না।

যাইবার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সকালে পার্কে গিয়া জ্যোতির্ম্ময় দেখিল, উর্ম্মিলা আসিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া বলিল, "চাবিগুলো নিয়ে এসেছি, আপনাকে দিয়ে যাব?"

জ্যোতির্ম্ময় হাত বাড়াইয়া বলিল, "দিন।"

চাবির গোছাটা উর্ম্মিলা তাহার হাতের উপর রাখিয়া দিল। বলিল, "চললামই শেষ পর্য্যন্ত তাহলে। ছোট মাসী ত খুব আশ্বাস দিচ্ছেন আবার যথাকালে ফিরে আসবেন এবং ঘরসংসার ফেঁদে বসবেন ব'লে। তবে খুব একটা আশ্বাস পাচ্ছি না, এক বছরের ভিতর কত কি ঘ'টে যেতে পারে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "মন্দ যেমন ঘটতে পারে, ভালও তেমনি ঘটতে পারে?"

উর্ম্মিলা বলিল, "তা ত পারেই। আচ্ছা, আপনারা ছুটিতে কখনও বাইরে বেরোন না?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কি ক'রে বা বেরোব? বাবাকে নিয়ে কোথাও যাওয়াও যায় না, আবার তাঁকে একলা ফেলে রেখে যাবার জোও নেই।"

উর্ম্মিলা বলিল, "সে ত সত্যি। আপনার এই দিক্ দিয়ে বড় মুশকিল।"

জ্যোতির্ম্ময় হঠাৎ বলিল, "ষ্টেশনে যেতে পারি?"

উর্ম্মিলা বলিল, "যাবেন? আচ্ছা চলুন।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আপনার ইচ্ছা নয় যে আমি যাই। আচ্ছা, তা হলে নাই গেলাম।"

উর্ম্মিলা বলিল, "আপনার সামনে আর আমি কাঁদতে চাই না। আপনিও ত সেটা দেখতে চান না?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "না, চাই-না। তবে আপনি আমার চোখের আড়ালেও না কাঁদুন, এইটাই চাই। পারবেন এই অনুরোধটা রক্ষা করতে?"

উর্ম্মিলা মিনিট খানিক তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর বলিল, "চেষ্টা করব।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "পৌঁছে আমাকে একটা খবর দেবেন।"

উর্ম্মিলা বলিল, "আচ্ছা।"

জ্যোতির্ম্ময় উঠিয়া পড়িল। বলিল, "আসি তবে। বলা যায় এমন কথা ত আর কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। ভাল থাকতে চেষ্টা করবেন যথাসাধ্য। আর মনে আশা রাখবেন, সাহস রাখবেন। কখনও কোন কারণে দরকার হলে ডাকবেন। আমি যাব।"

১১

ট্রেনে তুলিয়া দিবার জন্ত বেশী লোক স্টেশনে আসে নাই। উর্ম্মিলার বড় মাসীর এক পুত্র, সুলাজিনীর এক তরুণ বন্ধু ও বাড়ীর চাকর তারণ। পার্ক হইতে বিদায় লইবার পর জ্যোতির্ম্ময়কে উর্ম্মিলা আর দেখে নাই। দেখিবার ইচ্ছাও ছিল না।

গাড়ীতে জিনিষপত্র তোলা হইল। গল্প করিবার ইচ্ছা উর্ম্মিলার বিশেষ ছিল না। সে গাড়ীতে উঠিয়াই বসিল। সুলাজিনী প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া তারণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং যুবকদ্বয়ের সঙ্গেও কথা বলিতে লাগিলেন। উর্ম্মিলা নীরবে বসিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে চাহিয়া রহিল।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। সুলাজিনী উঠিয়া আসিলেন। যুবকদ্বয় ও তারণ বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। ইঁহাদের সঙ্গে পুরুষ অভিভাবক কেহই যাইতেছিলেন না। তবে একটি পরিচিত পরিবার পাশের গাড়ীতে ছিলেন। গাড়ী বদল করিবার সময় ইঁহারা সাহায্য করিবেন, এই আশ্বাস সুলাজিনী পাইয়াছিলেন। নিজে তিনি ও উর্ম্মিলা একলা চলিতে খানিকটা অভ্যস্ত ছিলেন, সুতরাং মোটামুটি নিশ্চিন্ত ভাবেই তাঁহারা যাত্রা করিলেন।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মটা ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উর্ম্মিলা ঘুরিয়া বসিল। আর কোনদিন ফিরিবে কি? জ্যোতির্ম্ময়ের আশ্বাসবাণী তাহার মনে পড়িতে লাগিল। অনেকবার করিয়া সে উর্ম্মিলার কল্যাণ কামনা করিয়াছে, আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছে। ইহা কেন উর্ম্মিলা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে পারে না? জ্যোতির্ম্ময়ের কথা তাহার কাছে তুচ্ছ হইবে কেন? নিজের দুর্ব্বল স্বাস্থ্যই তাহার মনকে আরও দুর্ব্বল করিয়াছে। সে যে কিছু দিনের ভিতরই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িবে ইহা যেন সে নিশ্চয় করিয়াই জানিয়াছে। একবার একটু কিছু আশ্বাস যদি সে জ্যোতির্ম্ময়ের কাছ হইতে পাইত? কিন্তু সে যেন ইচ্ছা করিয়াই সমস্ত ব্যাপারটাকে অর্দ্ধঅবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিয়া দিল। শেষের দু'তিন দিনের কথাবার্ত্তায় তাহার হৃদয়াবেগের আভাস কিছুটা পাওয়া গিয়াছিল। উর্ম্মিলার সঙ্গে বিচ্ছেদ তাহারও অতিশয় বেদনার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহা সে লুকাইবার চেষ্টা করে নাই। কিন্তু কোন্ এক বিপুল বাধা তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে তাহাও অপ্রকাশ থাকে নাই। জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে ভালবাসে এ ধারণা করা যায়, কিন্তু মিলনের পথে প্রচণ্ড কোন অন্তরায়কে সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সে বাধা কি, কোথায় কখন কি ভাবে তাহার অবসান ঘটিতে পারে তাহা সে জানায় নাই। সময়ে জীবনের অনেক সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়, তাহা ঠিকই। কিন্তু সময় আছে কি উর্ম্মিলার?

হঠাৎ সুলাজিনীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ছোটমাসী, সেই ভদ্রলোক, যাঁকে তুমি গহনা খুলে দিয়েছিলে, তিনি কোনদিনই আর দেশে ফেরেন নি?"

সুলাজিনী বোন্‌ঝির দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। বলিলেন, "অনেক বৎসর পরে এসেছিলেন একবার। কিন্তু আমি ত তখন অষ্টবন্ধনে বাঁধা। অন্য মানুষের স্ত্রী। আমার সঙ্গে দেখা হয় নি।"

উর্ম্মিলা বলিল, "আচ্ছা ছোটমাসী, যদি অপেক্ষা ক'রে থাকতে, অন্য কাউকে বিয়ে না করতে, তা হলে কি তাঁকে পেতে না?"

ছোটমাসী বলিলেন, "হয়ত পেতাম। কিন্তু তাঁর মন জানবার সুযোগ ত আর হল না? তিনি কিছুদিন পরে ভারতবর্ষ ছেড়েই চ'লে যান, আর দেশে ফেরেন নি। আর বিয়ে না ক'রে থাকা আমার সম্ভবও ছিল না। বাবা মা ভয়ানক জেদ ধ'রে বসলেন, এড়াতে পারলাম না। মনও ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। একদিকে অটুট নীরবতা, অন্যদিকে পরিপূর্ণ ভালবাসা আর বিশ্বস্ততা, এ কি খুব বেশীদিন থাকে? সব মেয়েতে পারে না।"

উর্ম্মিলা বলিল, "যদি অটুট নীরবতা না হয় ছোটমাসী? যদি সাড়া পাওয়া যায় মাঝে মাঝে?"

সুলাজিনী বলিলেন, "তা হলে পারা যায়। জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত পেরেছে এও দেখেছি।"

উর্ম্মিলা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। সুলাজিনী কিছু পরে বলিলেন, "একজনের অভিজ্ঞতায় আর একজনের কিছু হয় না রে। আমরা দু'জনও খুব এক ধরণের মানুষ নয়। আমার মনে ভোগসুখের ইচ্ছাটা তোর চেয়ে প্রবল ছিল। সুন্দরী ছিলাম, বড়লোকের মেয়ে ছিলাম, পিছনে লাগবার লোকের অভাব হয় নি। তাছাড়া অভিভাবকদের অধীন ছিলাম। তুই ত কারো অধীন নয়, বয়সও আমার তখন যা ছিল, তার চেয়ে বেশী। পড়াশুনোও ঢের বেশী করেছিস। যাকে মনে ধরেছে সে ছেলেও অন্তরকম। দুর্ব্বল-চরিত্র নয়, ভীরু নয়, ও বাধা কাটিয়ে উঠতে পারবে ব'লেই মনে হয়।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "যদি না ততদিনে আমি ম'রে যাই।"

সুলাজিনী বলিলেন, "সেই একটা তোর অসুবিধে আছে বটে। আমার স্বাস্থ্য খারাপ ছিল না।"

ইহার পর তিনি মাসিক পত্রিকা পড়িতে বসিলেন। ঊর্ম্মিলার পড়ায় মন লাগিল না, শুইয়া শুইয়া দুইটা মাস কি ভাবে সে কাটাইবে তাহার চিন্তা করিতে লাগিল। কোনমতে স্বাস্থ্যটা যদি একটু ভাল করা যাইত? কিন্তু এই রকম মন লইয়া শরীর কি ভাল থাকিতে পারে? সাড়া মাঝে মাঝে পাইবে হয়ত। ছোটমাসীর কথাই কি ঠিক? জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত সে কি বসিয়া থাকিতে পারিবে জ্যোতির্ম্ময়ের আশায়? মন ত বলে পারাই সম্ভব। অকাল-মৃত্যু যদি না হয় তাহা হইলে পারিবে না কেন? তাহার জীবনে অন্য পুরুষের সংস্পর্শ ঘটার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, নাই বলিলেই চলে। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় কি তাহার জন্য বসিয়া থাকিবে? চোখের আড়াল হইলে মনেরও আড়াল হইয়া যায় মানুষ। কিসের জোরে দূর হইতে ঊর্ম্মিলা তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে?

রাত্রে কখন ঘুমাইয়া পড়িল জানিতে পারিল না। স্বপ্নলোকে সারা রাতই প্রায় জ্যোতির্ম্ময়ের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইল। মাঝে মাঝে ঘুম ছুটিয়া যায়, আর মনে হয় জীবনটা স্বপ্নই হইল না কেন?

ভোরের বেলা ষ্টীমারের পথটুকু মন্দ লাগিল না। যদিও লোকের ভীড়, ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি ভাল লাগে না। বন্ধুদের সাহায্যে খুব বেশী কষ্ট হইল না, নিরাপদে গিয়া ষ্টীমারে ভাল জায়গাতেই বসিল। কি সুন্দর হাওয়া, জলের উপর প্রভাত রবির আলোটাই বা কি সুন্দর! এই আলোই আর একজন চোখ মেলিয়া দেখিতেছে। আর এই বাতাসই তাহাকেও স্পর্শ করিয়া আসিয়া ঊর্ম্মিলার দেহকে অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে বাঁধিয়া যাইতেছে। এও একরকম সাড়া। এক দেশে আছে, একই বিশ্বজগতে আছে।

সুলাজিনী খুব গুছাইয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। ঊর্ম্মিলা বিশেষ কিছু খাইতে পারিল না। তবে একেবারে উপবাসী থাকা সুলাজিনীর বকুনিতে সম্ভব হইল না। বলিলেন, "শরীর ঠিক রাখতে হবে বাপু। দেহাতীত আনন্দের আকাঙ্ক্ষায় এখন মন ভ'রে আছে, কিন্তু সে আনন্দও দেহের মধ্য দিয়েই পেতে হবে। শরীরকে অবহেলা ক'রো না।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "ছোটমাসী যা হোক কথা বলতে পার। লেখিকা হলে না কেন? একে ত রূপ দেখে লোকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে, কথা শুনলে আরো বেশী হাঁ করত।"

সুলাজিনী বলিলেন, "লেখিকা হলেও হ'ত, তা আরম্ভ করব করব ক'রে আরম্ভটা আর করাই হ'ল না। তুই লেখা-টেখা সুরু কর্ না? বেশ আনন্দে অনেক সময় কেটে যাবে।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "ওসব আসে না আমার। একখানা চিঠিই গুছিয়ে লিখতে পারি না।"

ছোটমাসী বলিলেন, "এরপর পারবি।"

ঊর্ম্মিলা হাসিল। ছোটমাসী যেখানে থাকেন সেখানকার আবহাওয়া হাল্‌কা না করিয়া ছাড়েন না। অথচ জীবনটা তাঁহার যে খুব সুখের জীবন তাহা নয়।

পাহাড়ে উঠার পর্ব্বটা কোন সময়েই ঊর্ম্মিলার সুখের হইত না। শরীর খারাপ হইত, এবারেও হইল। সুলাজিনীর একটি হোমিওপ্যাথিক বাক্স ছিল, সেটি ছাড়া তিনি কোথাও নড়িতেন না। এবারেও তিনি ঔষধ খাওয়াইয়া শুশ্রূষা করিয়া ঊর্ম্মিলাকে আবার সুস্থ করিয়া তুলিলেন। তখন আবার সে উঠিয়া বসিয়া দেবতাত্মা নগাধিরাজের বিরাট্ মহান্ মূর্ত্তির দিকে তাকাইবার অবসর পাইল। নিজের অসুস্থতার জন্য লজ্জিত হইয়া ভাবিল, 'ছোটমাসী বুড়ো হতে চলেছেন, আর আমার চব্বিশ বৎসর বয়স। আমি বেশ ব'সে ব'সে তাঁর সেবা নিচ্ছি। সংসারে যদি কোনদিন ঢুকি, তা হলে কি চমৎকার গিন্নীই হব!'

দুপুরবেলা দার্জ্জিলিং-এ আসিয়া পৌঁছিল। ষ্টেশনটি এখানকার একটা বেড়াইবার যায়গা। কে আসিতেছে, কে যাইতেছে তাহা নিত্যকার দেখিবার জিনিষ। সুলাজিনী গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া বলিলেন, "সুদেব এসেছে রে।"

ঊর্ম্মিলা তাকাইয়া দেখিল। সুদেবকে অনেকদিন দেখে নাই। মনে হইল সে যেন আরও একটু মোটা হইয়াছে। লম্বা ত বিশেষ নয়, এইরকম পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকিলে ক্রমে তাহার পিতা ভূদেববাবুর মত বর্ত্তুলাকার হইয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। রংটা যেন আর একটু ফর্সা হইয়াছে।

সুদেব কাছে আসিয়া সুলাজিনী এবং ঊর্মিলাকে একটা সমবেত নমস্কার করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল ভালয় এসেছেন ত? পথে কোন কষ্ট হয় নি?"

সুলাজিনী বলিলেন, "ভালই এসেছি। তবে পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ ক'রে ঊর্মিলার একটু শরীর খারাপ হয়েছিল।"

সুদেব ঊর্মিলার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমার এ রোগ আর গেল না।"

ঊর্মিলা বলিল, "আমার রোগগুলো খুব একনিষ্ঠ। একবার বাসা বাঁধলে আর ছাড়তে চায় না।"

সুলাজিনী তখন তাড়া দিয়া সব জিনিষ নামানো, ব্রেকভ্যান হইতে জিনিষ আনা, প্রভৃতি কাজে সুদেবকে লাগাইয়া দিলেন। তখনই কথা বলিবার তাহাদের আর সুযোগ ঘটিল না।

স্যানাটোরিয়মে ঘর তাহারা ভালই পাইল। সুদেবরা কয়েকদিন আগেই আসিয়াছে। সে নিজে দেখাশোনা করিয়া ঘর ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, যাহাতে সুলাজিনী বা ঊর্মিলার কোন অসুবিধা না হয়।

রিক্শা হইতে নামিয়া ঘর, বারান্দা, বাথরুম সব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সুলাজিনী খুশীই হইলেন। বলিলেন, "এবার ঘর ভালই হয়েছে। গতবার ঘরটা ভাল ছিল না, ঊর্মিলা সারতেই পারল না ভাল ক'রে। পাশের ঘরে সারারাত এত হৈ চৈ চলত যে, সে একটুও ঘুমোতে পারত না।"

সুদেব বলিল, "এবার সব খোঁজ নিয়ে তবে ঘর ঠিক করেছি। ঊর্মিলার এখন ভাল ক'রে সেরে ওঠা একান্ত দরকার।"

ঊর্মিলা বক্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "বিশেষ ক'রে এখনই কেন?"

সুদেব বলিল, "বয়স বাড়ছে ত? কতদিন আর নাবালিকার মত মাসীমার উপর নির্ভর ক'রে থাকবে? আর উনি ত এখন লম্বা পাড়ি দিচ্ছেন।"

ঊর্মিলা বলিল, "সেটা অবশ্য ঠিক কথা। এই ত সারাপথ তাঁর সেবা নিতে নিতে এলাম। দেখা যাক্ কতটা সারি।"

জিনিষপত্র আসিয়া পড়িল, কুলীরা পয়সা লইয়া বিদায় হইয়া গেল। ঘর মোটামুটি গোছানোও তাড়াতাড়ি হইয়া গেল। সুদেব বলিল, "আপনারা স্নানাহার করুন তা হলে। ওবেলা বেড়াতে বেরুচ্ছেন ত? বিকেলে আসব একবার।"

সুলাজিনী বলিলেন, "হ্যাঁ এস। আমি ত বেরোবই। ঊর্মিলাও বেরোবে যদি ক্লান্ত না থাকে বেশী।"

সুদেব চলিয়া গেল। ঊর্মিলারা দু'জনে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া তারপর স্নান করিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

সুলাজিনী বলিলেন, "সুদেব আরো মোটা হয়ে গেছে, না রে?"

ঊর্মিলা বলিল, "অত খেলে কি আর মানুষ মোটা না হয়ে পারে? ক্রমেই তার বাবার মত দেখতে হয়ে আসছে।"

সুলাজিনী বলিলেন, "তুমি ত এখন আর কাউকেই ভাল দেখবে না। তোমার চোখে এখন নবীন মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে।"

ঊর্মিলা বলিল, "আঃ, ছোটমাসী কি যে সারাক্ষণ ঠাট্টা কর। শুধু ঠাট্টা করবারই জিনিষ নাকি এটা?"

সুলাজিনী বলেলেন, "সারাক্ষণ কান্নাকাটি করার চেয়ে বরং ঠাট্টা করাও ভাল। তুমি যাও বাপু, স্নানটা সেরে এস। গরম জল দিয়ে গিয়েছে।"

ঊর্মিলা স্নান করিতে গেল। শরীর তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছে না। মনও বড় অবসন্ন। তাহার উপর সারাক্ষণ যদি সুদেবের উৎপাত লাগিয়াই থাকে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। সুদেব অত্যন্ত সংযত ও সুশাসিত প্রকৃতির মানুষ। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া জানে, কোনমতেই তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয় না। প্রেমে বা রাগে উচ্ছ্বসিত হইয়া সে যাহা খুশী তাহা করিয়া বসিবে, এমন স্বভাব তাহার নয়। আবার যাহা সে করা উচিত বলিয়া স্থির করিবে, সে পথ হইতে কেহ বা কিছু তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। এখন কোন কারণে তাহার মনে হইয়াছে যে, ঊর্মিলার প্রতি খানিকটা মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। মনোযোগ সে দিবেই, ঊর্মিলার উপেক্ষা বা বিরাগ তাহাকে নিরস্ত করিবে না। এ কি নিদারুণ উৎপাত! হৃদয় তাহার এখন শতধারায় রক্তমোক্ষণ করিতেছে তাহার

সন্ত হারানো প্রিয়ের জন্ত ,এখন এই কুগ্রহের দৃষ্টি সে সহ্য করিবে কি করিয়া ? ছোটমাসীরও কি ইচ্ছা যে, সে এখন সুদেবের প্রেমে মজিয়া যায় ? মনে ত হয় না। তিনি নির্ব্বোধ মানুষ নন। ইহা যে অসম্ভব তাহা তিনি বুঝিতেই পারিবেন। তাহা ছাড়া সুদেব অপেক্ষা জ্যোতির্ম্ময়কে তিনি পছন্দ করেন ঢের বেশী। যদিও তাহার এখনকার ব্যবহার তিনিও খুব আশাপ্রদ মনে করেন না।

স্নান করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। তাহার ছোটমাসী তখন স্নান করিতে গেলেন। স্নানের পর খাওয়া-দাওয়া সারিয়া দুইজনে বিশ্রাম করিবার জন্ত শয়ন করিলেন। সুলাজিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিকেলে বেড়াতে যাবি নাকি ?"

উর্ম্মিলা বলিল, "না ছোটমাসী, আজই আমি পারব না, শরীরটা একটু সুস্থ হোক আগে, কাল থেকে যাব।"

সুলাজিনী বলিলেন, "তা হলে ভাল ক'রে ঘুমিয়ে নে। আমি খানিক পরে উঠব। সুদেব এলে আমিই তার সঙ্গে বেরোব না হয়। ওদের বাড়ী সকলের সঙ্গে দেখা ক'রে আসব।"

উর্ম্মিলা চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িয়া রহিল। তন্দ্রা খানিক আসিল বটে, তবে পুরোপুরি ঘুম আসিল না। ইচ্ছা করিতে লাগিল, উঠিয়া বসিয়া একখানা চিঠি লেখে জ্যোতির্ম্ময়কে। কিন্তু ছোটমাসী যদি জাগিয়া যান তাহা হইলে ইহা লইয়া হাসাহাসি করিবেন। তিনি বিকালে বাহির হইয়া গেলে লিখিলেই হইবে। ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল বুঝিতে পারিল না।

সুলাজিনী উঠিয়া দেখিলেন উর্ম্মিলা ঘুমাইতেছে। নিজে বাহির হইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে উর্ম্মিলাও জাগিয়া উঠিয়া বসিল। চা আসিল, চা খাওয়া শেষ হইতে না হইতে সুদেব আসিয়া উপস্থিত হইল। উর্ম্মিলার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কি, বেরোচ্ছ না নাকি ?"

উর্ম্মিলা বলিল, "না, এ বেলা আর পারলাম না। কাল সকাল থেকে বেরোব।"

সুলাজিনী বলিলেন, "চল, আমিই তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি।"

সুদেবের মুখের উপর একটা হাল্‌কা বিরক্তির ছায়া ভাসিয়া গেল, তবে অতি ভদ্রলোক হওয়ায় সে তাহা সামলাইয়া লইল। বলিল, "বেশ ত। মা আজ বাড়ীতেই থাকবেন। তা উর্ম্মিলাও ত রিক্‌শ ক'রে আসতে পারে, একলা বাড়ীতে ব'সে করবেই বা কি ?"

উর্ম্মিলা বলিল, "অতটা energy-ও আজ নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না। বই-টই প'ড়ে সময় কাটিয়ে দেব এখন।"

মিনিট পাঁচ-দশ পরেই সুলাজিনী ওভারকোট হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সুদেব যাইবার সময় বলিয়া গেল, "কাল সকালে ঠিক বেরুতে হবে উর্ম্মিলা।"

উর্ম্মিলা সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়িল। তাহার মনটা এইবার যেন মাতৃহারা শিশুর মত অসহায় হইয়া উঠিতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিতে সারাক্ষণ অভাব-বোধের মধ্যেও একটা আশ্চর্য্য পরিপূর্ণতা তাহার হৃদয়কে তৃপ্ত করিয়া রাখিত। চোখে সে দেখিতে পাইত জ্যোতির্ম্ময়কে, কানে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিত। যদিও জ্যোতির্ম্ময়ের কথাবার্ত্তায় ভালবাসার সুর লাগিত ইহা কোনক্রমেই বলা যায় না। কিন্তু উর্ম্মিলার কোন স্থানই ছিল না তাহার চিত্তে, এ কথাও বলা যায় না। আশ্চর্য্য একটা সান্ত্বনা দিবার ক্ষমতা ছিল তাহার। উর্ম্মিলার দুঃখ যে কি তাহা সে বুঝিত হয়ত, হয়ত বা বুঝিত না, কিন্তু তাহার সহিত খানিকক্ষণ কথা বলিলেই উর্ম্মিলার মনে হইত, শান্তি-সাগরে যেন সে ডুব দিয়া আসিল। এখন ত সে চোখের আড়াল, কর্ণেরও আড়াল। স্মৃতির মধ্য দিয়া শুধু তাহার স্পর্শ পাওয়া যায়। উর্ম্মিলার কথা কি সে একবারও মনে করিবে ? বিদায় লইবার সময় উর্ম্মিলা কাঁদিয়াছিল, জ্যোতির্ম্ময়ের চোখেও জল আসিয়াছিল বোধ হয়। পুরুষমানুষ লোকের সামনে কাঁদিতে পারে না বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বিদায় হইয়া গিয়াছিল। উর্ম্মিলার চোখ সজল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে ত কথা দিয়া আসিয়াছে, চোখের আড়াল হইলে সে কাঁদিবে না। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল সে। চিঠির কাগজের প্যাড্ ও কলম আনিয়া সে চিঠি লিখিতে বসিল। কি লিখিবে তাহা ভাবিবার তাহার প্রয়োজন নাই, কি গোপন করিবে তাহাই ঠিক করা প্রয়োজন। চিঠির আরম্ভে পাঠ সে কোনদিনই লিখিতে পারে না। সোজাসুজি যাহা বলিবার তাহাই বলিয়া যায়। আজও সেইভাবেই লিখিল।

"আমরা ভালয় ভালয়ই এসে পৌঁছেছি। শারীরিক কষ্ট খানিকটা হয়েছে। তা সেটা আমার মত শরীর নিয়ে না হয়েই পারে না। ছোটমাসী ভালই ছিলেন। আমার খুব সেবাযত্ন করেছেন। এবারে ঘর বেশ ভালই পেয়েছি। সুদেববাবু নিজে দেখে-শুনে সব ঠিক করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতার বদলে বিরক্তি যে কেন মনে আসছে জানি না। তিনি যখন কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়ে ওঠেন, তখন মানুষকে প্রায় অতিষ্ঠ ক'রে তোলেন।

আমি এখানে এসে সারতে পারব কিনা জানি না। এখন পর্য্যন্ত কিছু ভাল বোধ করছি না। এখানে আগেও কয়েকবার এসেছি। কাজেই হিমালয়ের সৌন্দর্য্য মনকে খুব অভিভূত করছে না। পাহাড়ের চেয়ে সমুদ্রের সৌন্দর্য্য আমার মনকে ঢের বেশী টানে। বোধ হয় মানুষের মনের যে ভাববৈচিত্র্য, সমুদ্রের মধ্যে সেটা প্রতিফলিত হয় ঢের বেশী।

আপনি কেমন আছেন? আরতি কেমন আছে? আপনার বাবা আশা করি আগের চেয়ে কিছু ভাল আছেন। আপনারা যদি দু'চারদিন এখানে ঘুরে যেতেন তাহলে বড় ভাল হ'ত।

আর কি লিখব? আপনার অনুরোধ রক্ষা করেছি। এখানে এসে কাঁদি নি। তবে চুপ ক'রে থাকা অনেক সময় কান্নার চেয়ে শক্ত। আপনি আমাদের পরিত্যক্ত বাড়ীটাতে একবারও কি গিয়েছেন?

আপনার ছুটি হয়ত হয়ে গিয়েছে। অনেক অবসর হাতে। বেড়ান কি বেশী? আমার আলমারীর বইগুলোর কোন সদ্ব্যবহার হচ্ছে কি? আরতিকে মাঝে মাঝে দু'চারখানা বার ক'রে দেবেন। ছোটমাসীর ঘরেও এক আলমারী বই আছে। তবে সবগুলোই প্রায় বেড়ানো এবং সঙ্গীত সম্বন্ধীয়। আজ এই পর্য্যন্ত।

উর্ম্মিলা।

১২

উর্ম্মিলাদের স্টেশনে যাইবার সময় জ্যোতির্ম্ময় বাড়ী ছিল না। অনেক আগেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। ফিরিল যখন, তখন পাশের বাড়ী অন্ধকার, জানালা দরজা সব বন্ধ, কোন সাড়া-শব্দ নাই। বাড়ীটা যেন মরিয়া গিয়াছে। প্রাণ-স্বরূপিণী যে ছিল, সে আর নাই।

যতই চেষ্টা করে ওদিকে না তাকাইতে, ততই চোখ ঐদিকেই যায়। রান্নাঘরে শুধু একটা আলো জ্বলিতেছে। বোধ হয় তারণ নিজের জন্য রান্না করিতেছে। ইচ্ছা করিতে লাগিল, উর্ম্মিলার ঘরে গিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া থাকে। কিন্তু আজই গেলে সেটা হয়ত ভাল দেখাইবে না। আবার বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল, এবং নানা জায়গায় ঘুরিয়া রাত করিয়া বাড়ী ফিরিল। উপরে উঠিয়া শুনিল আরতি এসরাজ বাজাইতেছে। প্রাণহীন যন্ত্র কাহাকে যেন মিনতি করিয়া কি বলিতে চাহিতেছে। আরতির ঘরের দরজার উল্টাদিকের দেওয়ালে উর্ম্মিলার ছবিখানা টাঙান রহিয়াছে।

পরদিন জ্যোতির্ম্ময়ের কলেজের ছুটি হইয়া গেল। কিন্তু সে স্থিরই করিয়াছিল, অবসর সময় শুইয়া বসিয়া কাটাইয়া দিবে না। পরিচিত কয়েকজন অধ্যাপক মিলিয়া তাহারা একটি টিউটোরিয়াল প্রতিষ্ঠান গড়িবে। পয়সা ইহাতে নেহাত মন্দ পাওয়া যায় না। সময়ও অনেকখানি কাটিয়া যাইবে।

ভোরবেলায় উঠিয়া লেকের ধারে পার্কে বেড়াইতে আসিল। বাড়ীর কাছের পার্কটাতে আর যাইতে ইচ্ছা করে না। সেখানে এখনও যেন মানসচক্ষে দেখিতে পায়, একটি ক্ষীণ তনুলতা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং ব্যাকুল হরিণ-নয়নে কোন প্রিয় অতিথির আবির্ভাবের আশায় এদিকে-ওদিকে তাকাইতেছে। তাহাকে আর কি কোনদিন ওখানে দেখা যাইবে, সেই সুধা কণ্ঠস্বর আর কি তাহার কানে বাজিবে?

বেড়াইয়া আসিয়া সে আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। চাবি লইয়া পাশের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। তারণ বসিয়া আরাম করিতেছিল। জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিয়া নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি ঘরগুলি খুলিয়া দিল। এঘর ওঘর করিয়া জ্যোতির্ম্ময় ঘুরিতে লাগিল। সুলাজিনী অতিশয় পাকা গৃহিণী। সবক'টি ঘরই অতি পরিপাটি করিয়া গুছাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। উর্ম্মিলার ঘরে গিয়া নীরবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। বইয়ের আলমারী খুলিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া বইগুলি দেখিতে লাগিল। নানা বিষয়ের নানা রকম বই। কাব্য, ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস। এখনও ইহাদের গায়ে সেই প্রিয় হাতের স্পর্শ লাগিয়া রহিয়াছে। সে হাত ধরিবার সৌভাগ্য কি জ্যোতির্ম্ময়ের কোনদিন হইবে?

ঊর্মিলার ঘরের আরাম চেয়ারটায় অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। পাপড়ি খসিয়া গেলেও যেমন ফুলের বৃন্তে কিছুটা সুগন্ধ রাখিয়া যায়, তেমনি ঘরখানিতে মৃদু সুগন্ধ একটা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। যেন অদৃশ্য কাহার দেহ-সৌরভ।

অনেকক্ষণ পর জ্যোতির্ম্ময় উঠিয়া পড়িল। আর বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিলে তারণ তাহাকে পাগল মনে করিবে। তাহাকে ডাকিয়া ঘর বন্ধ করিতে বলিয়া জ্যোতির্ম্ময় বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ঊর্মিলারা এখনও পথে। কাল পৌঁছিবে। তাহার দিনদুই পরে হয়ত জ্যোতির্ম্ময় তাহার চিঠি পাইতে পারে। সে যদি রক্তসম্পর্কের আত্মীয় হইত তাহা হইলে টেলিগ্রাম একটা পাইতে পারিত। কিন্তু আত্মীয় ত সে নয়। আত্মীয় অপেক্ষা অনেক বেশী হয়ত সে ঊর্মিলার কাছে। কিন্তু বাইরের ব্যবহারে তাহা প্রকাশ করার উপায় তাহার নাই। জ্যোতির্ম্ময় নিজেই সে পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

দুই-তিনটা দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর অতি বাঞ্ছিত চিঠিখানা তাহার হাতে আসিয়া পৌঁছিল। ছোটই চিঠি, তবু মনে হইল, চিঠিখানা হাতে করিয়া তাহার জীবন যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দিনের আলো যেন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সুধাপূর্ণ হৃদয় লইয়া যে তাহার প্রাণের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাকে সে প্রবেশের অধিকার দেয় নাই। কিন্তু তাহার জীবনও মরুভূমি হইয়া যাইতে বসিয়াছে সেই অদৃশ্য মায়াবিনীর জন্য।

চিঠিখানার প্রত্যেকটি কথা সে কতবার করিয়া পড়িল, তাহার ঠিকানা নাই। নিজেকে খালি আড়াল করিবার চেষ্টা করিয়াছে ঊর্মিলা। তবু তাহার মন ধরা দিয়াছে কতবার। নিজের ভাগ্যকে বারবার করিয়া ধিক্কার দিল জ্যোতির্ম্ময়। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য যাহা তাহাই কেন নিষ্ঠুর হাতে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইতেছে? এখনই হাত বাড়াইয়া ডাকিলেই ত তাহার প্রাণ পূর্ণ করিয়া সে এখনই ফিরিয়া আসে। কিন্তু আত্মসম্মানহীন জীবন কি তাহার প্রেয়সীর যোগ্য আসন হইবে?

চিঠির উত্তর লিখিতে গিয়া অনেকক্ষণ কলম হাতে করিয়া জ্যোতির্ম্ময় বসিয়া রহিল। তাহাকেও ত আড়াল করিয়া লিখিতে হইবে। কিন্তু কাজটা ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে। ঊর্মিলা যখন চোখের সামনে থাকে তখন তাহাকে দেখিতে পাওয়া, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া, ইহাই জ্যোতির্ম্ময়ের হৃদয়ের ক্ষুধা অনেকখানি মিটাইয়া দেয়। মুখের কথার কার্পণ্য তবু সহ্য হইয়া যায়। কিন্তু এখন যে কথা দিয়া ছাড়া তাহার নাগাল পাইবার আর কোন উপায় রহিল না? এখনও কি অত কঠোর হইয়া থাকিলে চলিবে? কথা দিয়াই ঊর্মিলাকে সান্ত্বনা দিতে হইবে না কি? তাহার মনে আশা জাগাইয়া রাখিতে হইবে না কি? সুদেবের কথা পড়িয়া জ্যোতির্ম্ময়ের হাসিও পাইল, বিরক্তিও ধরিল। ভদ্রলোক এখন ত পণ্ডশ্রম করিতেছেন। যে বিশাল আয়তলোচন প্রেমের অর্ঘ্য লইয়া নিরন্তর তাহার মুখের দিকে সূর্য্যমুখী ফুলের মত চাহিয়া গিয়াছে, সে ত এখনই অন্য কাহারও দিকে তাকাইতে পারে না; তবে ভবিষ্যতের কথা কেই বা বলিতে পারে? উপেক্ষার বালুচরের মধ্যে অনেক সময় পরিপূর্ণ ধারাও লুপ্ত হইয়া যায়। সম্প্রতি এখন এই ব্যক্তিটিকে জ্যোতির্ম্ময় প্রতিদ্বন্দ্বী রূপেই দেখিবে। ইনি বেশী মনোযোগ খরচ করিয়া ঊর্মিলাকে বেশী বিরক্ত না করিয়া তোলেন। কিন্তু এতদূরে বসিয়া তাহার কিই-বা উপায় করা যায়?

অনেকক্ষণ পর জ্যোতির্ম্ময় লিখিতে আরম্ভ করিল,

কল্যাণীয়াসু,

আপনার চিঠি পেলাম। আমার চিঠির পাঠ দেখে কিছু বিস্মিত হবেন না। আর কি লেখাই বা সম্ভব? আপনার কল্যাণাকাঙ্ক্ষী আমি, এবং বয়সেও অনেকটা বড়, তাই কল্যাণীয়াসু লেখাই সঙ্গত।

পথে কষ্ট পেয়েছেন শুনে বড় দুঃখিত হলাম। এখন পথের কষ্টটা কেটে গেছে আশা করি, এবং খানিকটা সুস্থ হয়েছেন। ছোটমাসীকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু সেটা করা ত চলে না?

সুদেববাবুর উপর অযথা বিরক্ত হবেন না। ভদ্রলোক ভাল মনে ক'রে যা করছেন, তা ভাল না লাগলেও ইচ্ছাটা তাঁর শুভ, এই মনে ক'রে বিরক্তিটা আশা করি অপ্রকাশ রাখবেন।

আপনি নিশ্চয়ই ভাল হবেন, ওখানে যাওয়ার ফলে। মনে সাহস রাখুন, ভবিষ্যতে আপনার পরিপূর্ণ কল্যাণ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, এই আশা রাখুন।

সমুদ্রটা দেখেছি, পাহাড় ছোটখাট দেখেছি। তবে হিমালয় দেখি নি। সমুদ্রটাই আমারও ভাল লেগেছে বেশী।

আমরা ভালই আছি। বাবার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি ত এখনও দেখা যাচ্ছে না। ওখানে কয়েকদিন বেড়িয়ে আসতে পারলে খুব খুশী হতাম, কিন্তু আমি কত যে নিরুপায় তা ত আপনি জানেন?

আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন জেনে খুশী হ'লাম, কিন্তু তার পরের কথাটা প'ড়ে বড় বেদনা অনুভব করছি। আপনার সকল দিক্ দিয়ে কল্যাণ হোক, দুঃখ বেদনা সব দূর হোক, এই প্রার্থনা করা ছাড়া আর কি করতে পারি? কিছু করবার আমার আছে কি? থাকলে জানাবেন। আমার সাধ্যের মধ্যে হলে অবহেলা করব না।

আপনাদের বাড়ীতে প্রায়ই যাই, আরতিও একদিন গিয়েছিল। বই দু'চারটে বার করা হয়েছে। বাজনাগুলিও একবার ঝাড়াঝোড়া হয়েছে। আরতি খুব সাবধান মানুষ, তার হাতে জিনিষ কখনও নষ্ট হয় না। আপনার এস্রাজের সুরও প্রায়ই শুনছি।

ছুটি হয়ে গেছে। এখন লেকের ধারের পার্কেই বেড়াই। অবসর সময়টা এবার নষ্ট করব না স্থির করেছি। কাজ কিছু জোগাড় ক'রে নিয়েছি। কর্ম্মহীন অবসর এবারে সহ্য হবে না।

দার্জ্জিলিং থেকে নামবেন যখন, তখন কোন্ পথে ফিরবেন তা কিছু ঠিক করেছেন কি?

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করি এর পরের চিঠিতে আপনার ভাল থাকার খবর পাব।

ইতি—

জ্যোতির্ম্ময়।

চিঠিটা তাহার খুব যে পছন্দ হইল তাহা নয়। কিন্তু আর কিই-বা সে লিখিতে পারে? সুদেব সম্বন্ধে বেশী কৌতূহল দেখান বোধ হয় উচিত নয়। নিজের কথা ঢের লেখা যায়, কিন্তু ধরা না দিয়া লেখা যায় কি? অনেকক্ষণ ভাবিয়া অবশেষে যাহা লিখিয়াছিল, তাহাই খামে ভরিয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার দিদি পুত্রকন্যা লইয়া বেড়াইতে আসিয়াছে। ভবেশও আসিয়াছে। রামগতি হয়ত আজ কিছু ভাল আছেন। বারান্দায় বাহির হইয়া চেয়ারে বসিয়া মেয়ে, নাতি ও নাতনীর সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। সেই বাড়ীঘটিত ব্যাপারের পর অভিমান করিয়া ছেলের সঙ্গে আর বেশী কথাবার্ত্তা বলেন না। ভবেশ জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিয়া বলিল, "তোমার যে আর টিকিই দেখতে পাওয়া যায় না হে? থাক কোথায়? দু'দিন এলাম এর মধ্যে, তা একদিনও দেখা পেলাম না?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এর পর পাবে, কলেজ বন্ধ হয়েছে।"

সুখদা বলিলেন, "একটা কলেজ বন্ধ হ'লে কি হবে? আর একটা ত জুটিয়ে নিয়েছ।"

মিনতি বলিল, "আর একটা কলেজ আবার কি? গরমের ছুটিতে কোন কলেজ খোলা থাকে নাকি?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "টিউটোরিয়াল কলেজ, এই প্রথম খুলল। তা তোমরা সব আছ কেমন?"

মিনতি বলিল, "আছি ভালই, তবে সংসারের জ্বালায় ত পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। ঐ ত ঠাসাঠাসি ক'রে থাকা, তার উপরে আবার বাড়ীওয়ালা নোটিস দিয়েছে। অতগুলো লোক আমরা, বাড়ীই বা কোথায় পাব ঝপ ক'রে? আর আজকাল যা ভাড়া! আচ্ছা, এই ত পাশের বাড়ীর ফ্ল্যাটটা খালি হয়ে গেল না?"

আরতি বলিল, "খালি আর কই? বেড়াতে গিয়েছেন, আবার এক বছর পরে ফিরে আসবেন।"

মিনতি বলিল, "ও, তাই বুঝি? মেয়েটি এখানে চাকরী করত না?"

আরতি বলিল, "সে কাজ ত ঊর্ম্মিলাদি ছেড়ে দিয়েছেন।"

সুখদা বলিলেন, "বড়-মানুষ, ওদের চাকরির দরকারই বা কি?"

মিনতি বলিল, "মা, জান, সেই যে জ্যোতির সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়েছিল না? সেই যে কনে পালিয়ে গেল?"

আরতি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার কি হয়েছে? আবার ফিরে এসেছে?"

মিনতি বলিল, "ফিরে এলেই বা তাকে নিচ্ছে কে? কুলত্যাগিনী মেয়ে কি কেউ রাখে? সেই যে ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়েছিল, সেটা নাকি সিনেমায় কাজ করত। এখন সেও ঐ মেয়েকে ফেলে পালিয়েছে। মেয়েটা দেখতে ভাল। সেও সিনেমায় ছোটখাট কাজ ক'রে দিন কাটাচ্ছে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "বাবাঃ, এত খবর তোমরা জোগাড় কর কোথা থেকে?"

মিনতি বলিল, "আমাদের এক আত্মীয় থাকে যে ওদের বাড়ীর পাশে। কি কাণ্ড বাবা! আগেকার

কালে যে দশ-বারো বছরের মেয়েগুলোর বিয়ে দিয়ে দিত, সেই ছিল ভাল। ধিঙ্গি ক'রে রেখে দেবে, তার পর কার কি মতি হবে কে জানে? মা যে কেন খুকীর বিয়ের জোগাড় করছ না কে জানে?

মা বলিলেন, "তোরা দেখ্ না একটু? আমি মেয়েমানুষ, আমি কি পাত্র ঠিক করতে পারি? আর তোর বাবার ত ঘর ছেড়ে বেরোবারই জো নেই।"

মিনতি বলিল, "জ্যোতির অত বন্ধুবান্ধব, একটাও জোটান যায় না?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "বিনা পয়সায় আসবেন এমন প্রাণের বন্ধু আমার কেউ নেই।"

তাহারই বিবাহে বাড়ী বাঁধা পড়িয়াছিল। সুতরাং টাকার কথা উঠিলে মিনতি চুপ করিয়া যায়। ভবেশ হাসিয়া বলিল, "তুমি নিজে এমন সুপাত্র ঘরে ব'সে আছ। দেখেশুনে একটা ভাল বিয়ে যদি নিজে কর, তা হলে সেই টাকাতে খুকীর বিয়েও হয়ে যেতে পারে।"

রামগতি এই সময় উঠিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমার বিয়ের লগ্নে শনি আছে। দেখলে না কি রকম কনে পালাল একবার? বাজারে বদ্‌নাম হয়ে গিয়ে থাকবে। সহজে কেউ আর এগোবে না।"

মিনতি বলিল, "এগোবে আবার না? তোর মত ছেলে রাস্তায় ব'সে আছে নাকি? এখনি মত দে, একগণ্ডা কনে এনে হাজির করছি। বেশ ভাল শাঁসাল কনে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এখনই কনে নিয়ে কি হবে? আগে বাড়ীটা free হোক, বৌকে খাওয়াবার মত পয়সা জুটুক, তবে ত?"

সুখদা মুখ বিরস করিয়া রান্নাঘরে প্রস্থান করিলেন। মিনতিও তাঁহার পিছন পিছন চলিয়া গেল।

কাজকর্ম্মে ডুবিয়া দিন একভাবে কাটিতে লাগিল। তবে চব্বিশটা ঘণ্টাই ত মানুষ কাজ করিতে পারে না? অবসর সময় কাটানো বড় কঠিন হইয়া উঠিল। উর্ম্মিলার ঘরে প্রায় রোজই গিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া থকে। তারণ কি ভাবে বুঝা যায় না, তবে জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিলেই সাগ্রহে অভ্যর্থনা করে। লোকটার ভূতের ভয় আছে। নির্জ্জন বাড়ীটাতে ভাল লাগে না। দেশ হইতে স্ত্রীকে আনাইয়া লইবে কি না ভাবে প্রায়ই।

পাঁচ-ছয়দিন পরে আর একখানা চিঠি আসিল জ্যোতির্ম্ময়ের নামে। একই খামের মধ্যে আরতির নামে লেখা ছোট একখানি চিঠি আছে। সেটা সরাইয়া রাখিয়া জ্যোতির্ম্ময় নিজের চিঠিখানাই পড়িতে লাগিল।

—আপনার চিঠি পেলাম। এবারেও কোন পাঠ না দিয়ে চিঠি লিখছি। কি যে লিখব সেটা বুঝতে পারি না। শ্রদ্ধাস্পদেষু লিখলে মনে হয় আপনি আমার গুরুমশায়। আর ওটা ভয়ানক বেশী formal। যদি চরণস্পর্শ করার অধিকারটা দিতেন তা হলে নাহয় শ্রীচরণেষু লেখা যেত। সেটা অত formal নয়। তবে আপনাকে লেখা একটু হাস্যকর শোনাত, কারণ আপনি বড়জোর চার-পাঁচ বৎসরের বড় আমার চেয়ে, এবং লিখলে আপনি ভয়ানক বিরক্ত হতেন। সুতরাং যেমন চলছে তেমনিই চলাই ভাল।

আমার স্বাস্থ্যের বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নি। বেড়াচ্ছি কখনও একবেলা, কখনও দু'বেলা। দুর্ব্বলতাটা কিছু কমে নি। আমি যাতে বেশী খাই তার চেষ্টা ভুদেববাবুরা সপরিবারে করছেন, কিন্তু আমি তাঁদের খুশী করতে পারছি না। তাঁরাও আমাকে কিছু খুশী করছেন না এত জ্বালাতন ক'রে। কিন্তু এঁদের বিবেকবুদ্ধি বড় প্রবল। যা কর্ত্তব্য ব'লে ধরেন তাকে কোনমতে ছাড়েন না।

আপনার কথামত নিজেকে নানা suggetion দিয়ে প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করি, কিন্তু ফল যে খুব পাই তা নয়। প্রফুল্ল না থাকার অভ্যাসটা বড় deep seated হয়ে গেছে।

আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই যান শুনে খুশী হলাম। তারণ তা হলে একটু সাবধান হয়ে চলবে।

আমার জন্য প্রার্থনা সত্যিই কি করেন? করেন যদি ত তার ফল আমি পাব। আমার নিজের প্রার্থনাগুলো ভগবানের কাছে পৌঁছয় না বোধ হয়। তিনি নীরবই থাকেন।

নিজের কাজকর্ম্ম নিয়ে আপনি ভালই আছেন বোধহয়। কর্ম্মহীন অবসর সত্যিই মানুষকে বড় গ্লানি দেয়।

দার্জ্জিলিং থেকে যখন নামব তখন কোন্ পথে যাব তা এখনও ভাল ক'রে স্থির হয় নি। পাটনায় ফিরে যাওয়াই সম্ভব। কিছুকাল সেখানে একলা থেকে দেখবার ইচ্ছা আছে যে, আমি একেবারে একলা থাকতে পারি কি না। ভুদেব আমার জন্যে একটা ভাল কাজ জুটিয়ে দিতে প্রায় প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এক বিহারী জমিদারের

তৃতীয় পক্ষের পত্নীকে শিক্ষা দিতে হবে। থাকতে হবে তাদের সঙ্গেই, তবে খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা আমার আলাদা হবে। আমি রাজী হলাম এই কারণে যে, ওখানে জমিদার মহাশয়ের অন্তঃপুরে সুদেব গুপ্তের বেশী আসা-যাওয়া মোটেই চলবে না। না হয় আমিও কিছুকালের জন্যে পর্দ্দানশীন হয়ে যাব।

আশা করি বেশ ভাল আছেন। ছোটমাসী ভালই। এর পরের চিঠিতে ঠিক জানাতে পারব যে, কবে আমরা দার্জ্জিলিং ত্যাগ করতে পারব। ছ'মাস পূরো এখানে থাকা হবে না, যা দেখা যাচ্ছে। ছোটমাসীকে কিছু আগেই যাত্রা করতে হবে, সুতরাং আমিও নেমেই যাব।

আজ এই পর্য্যন্ত।

ইতি—
উর্ম্মিলা।

চিঠিখানা বার দুই-তিন পড়িল জ্যোতির্ম্ময়। তাহার পর সেখানা হাতে করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সুদেবঘটিত উৎপাত ইহার পর বাড়িবে বৈ কমিবে না। ভদ্রলোক সম্ভবতঃ এ সুযোগটাকে বৃথা যাইতে দিবেন না। প্রণয়টাকে পরিণয়েই রূপান্তরিত করিতে চাহিবেন। এমন অবস্থায় উর্ম্মিলাকে একেবারে অরক্ষিত ভাবে তাহার ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া থাকিতে দেওয়া কি উচিত? উর্ম্মিলা সুদেবকে ভালবাসিবে না কোনদিনই; কিন্তু একাকিত্বের দুর্ব্বিবহ ভার কতদিন সে সহ্য করিতে পারিবে? নিজে যাহাকে আত্মহত্যারই মত মহা পাপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল, তাহাই কি করিয়া বসিতে পারে না? আত্মহত্যাই যে করিতে পারে না, তাহারই বা স্থিরতা কি? একমাত্র রক্ষা করিতে পারে তাহাকে জ্যোতির্ম্ময়ের প্রেম-নিবেদন। তাহাই হয়ত করিতে হইবে। উর্ম্মিলাকে হারানোর সম্ভাবনা সে কল্পনাও করিতে পারে না। না হয় নিজের পৌরুষের অহঙ্কার, নিজের আত্মাভিমান বিসর্জ্জনই দিল। টাকার ঋণ শোধ করিবার অনেক উপায় পাওয়া যাইবে পরেও। প্রথম এখন উর্ম্মিলার উপর নিজের অধিকারটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। জ্যোতির্ম্ময়ের ভালবাসাকে এখন রক্ষাকবচ রূপে উর্ম্মিলার কণ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া দরকার।

তখনই উত্তর লিখিতে পারিল না। একটু সকল দিক্ ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এ বিষয়ে অন্য কাহারও পরামর্শ লইতে তাহার মন উঠিল না। একজনের জীবনের সমস্যা অন্য কেহ বুঝিতে পারে না ঠিক, সমাধানও করিতে পারে না। তাহার নিজেরই ভাবিয়া চিন্তিয়া পথ খুঁজিয়া লইতে হইবে। উর্ম্মিলার মনের উপর অত্যাচার আর চলিবে না। এবং জ্যোতির্ম্ময়ের করুণার প্রত্যাশী হইয়া কেনই বা সে অনন্তকাল ভগ্নহৃদয়ে বসিয়া থাকিবে?

রাত্রিবেলা জ্যোতির্ম্ময় উর্ম্মিলাকে ছোট একখানা চিঠি লিখিয়া পাঠাইল। বেশী যাহাতে উতলা না হয়। আরো কিছু ভাবিয়া তবে বড় চিঠিখানা লিখিবে।

কল্যাণীয়াসু,

আপনার চিঠি পেলাম, ভাগ্যে শ্রীচরণকমলেষু লেখেন নি। আমার বয়স ত মাত্র উনত্রিশ বৎসর, এরই মধ্যে তরুণী ভদ্রমহিলাদের কাছে শ্রীচরণকমলেষু হয়ে যেতে চাই না।

আপনার চিঠিতে সুখবর যে কিছুই নেই? কেন একেবারে সারতে পারছেন না? মনের বিষাদ আর অবসাদটাকে কি চেষ্টা ক'রে একেবারে কাটান যায় না? তা হলেই শরীরটা সারে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এখানে থেকে কিছু কি করতে পারি? একজন মানুষ নিরন্তর আপনার শুভ কামনা করছে, ভগবানের কাছে নিত্য প্রার্থনা জানাচ্ছে আপনার কল্যাণের জন্যে, এ চিন্তাটা কোন আশা, কোন আনন্দ কি আপনার কাছে বহন ক'রে নিয়ে যায় না?

আপনারা কবে দার্জ্জিলিং ছাড়বেন জানাবেন। পাটনা যেতে চান যান, তবে নিজের মানসিক শান্তি যাতে ক্ষুণ্ণ হয় এমন কিছু করবেন না। এখানে থাকবার জায়গা আপনার আছে, এবং দেখাশোনা করবার মানুষও আছে, তা মনে রাখবেন। কোন অসুবিধা এখানে হবে না।

পরের চিঠিটা আরো ঢের বেশী বড় হবে। এটা তাড়াতাড়ি লিখলাম। আমরা আছি একরকম। কাজকর্ম্ম নিয়ে দিন একরকম কেটে যাচ্ছে। আরতি ভালই আছে। আজ এই পর্য্যন্ত। ইতি

জ্যোতির্ম্ময়।

১৩

উর্ম্মিলার দিন একেবারেই ভাল কাটিতেছিল না। শরীর কিছু সারে নাই, মনও যেমন নিরাশা ও বিষাদে ভরা ছিল, তাহাই আছে। বেড়ানোটা জোর করিয়া চালাইয়া যাইতেছে, কিন্তু ভাল লাগে না। সুদেব সর্ব্বদাই তাহাকে সঙ্গ দিতে আসিয়া জোটে, ইহাতে সে আরও বিরক্ত হইয়া যায়। সুদেবের সহিত তাহার বহুদিনের পরিচয়, তবে ইহার আগে সে কখনও প্রণয়ীরূপে আবির্ভূত হয় নাই। বিবাহের কথা বাল্যকালে প্রায় একবার উঠিয়াছিল, তাহার পর এক জায়গায় থামিয়াই ছিল। ইতিমধ্যে সুদেব ব্যস্ত ছিল নিজের পসার-প্রতিপত্তি লইয়া, এবং উর্ম্মিলা নিজের কাজকর্ম্ম লইয়া জীবনযাপন করিতেছিল। হঠাৎ পথের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বহিতে আরম্ভ করিল।

সুদেব এইবার বিবাহের কথা পাকা করিয়াই যাইবে স্থির করিয়া আসিয়াছিল। বয়স বাড়িয়াই চলিয়াছে, প্রায় পঁয়ত্রিশ হইতে চলিল। আর অবিবাহিত থাকিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। কাজকর্ম্মে সে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, পিতারও বিষয়-সম্পত্তির অভাব নাই। উর্ম্মিলাকে সে অবশ্য উচ্ছ্বসিত আবেগে ভালবাসে না, তাহার মনে এ জিনিষটিই নাই। তবে সে উর্ম্মিলাকে পছন্দই করে, এবং তাহাদের বাড়ীর বধূরূপে সে যে বেশ মানানসই হইবে, তাহাতেও সুদেবের সন্দেহ নাই। এবারে ভাবী বধূর সহিত খানিকটা ঘনিষ্ঠতা করিতে সে প্রস্তুতই হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু উর্ম্মিলা তাহাকে যে আমলই দিতে চায় না, ইহাতে মনে মনে সে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। উর্ম্মিলা কি তাহাকে নিজের অনুপযুক্ত মনে করে? কোন্‌দিকে সে নিকৃষ্ট? উর্ম্মিলার টাকা আছে। তাহারও টাকার অভাব নাই। উর্ম্মিলা অনেক লেখাপড়া শিখিয়াছে, সুদেবও কৃতবিদ্য, মূর্খ নয়। উর্ম্মিলা সুশ্রী দেখিতে, সুদেবও কুৎসিত নয়। তাহা হইলে আপত্তির কারণটা কোন্‌খানে? উর্ম্মিলার মনটা কি অন্য কাহারও দিকে ফিরিয়াছে? সে খবর এখন পর্য্যন্ত সুদেব পায় নাই।

বিকালবেলা বাহির হইবার জন্য উর্ম্মিলা প্রস্তুত হইতেছিল। সুলাজিনী পাশে দাঁড়াইয়া মাথার কাপড়ে পরিপাটি করিয়া পিন আটকাইতেছিলেন। পাহাড়ে ঝোড়ো হাওয়ায় মাথার চুল এলোমেলো হইয়া যায় ইহা তিনি দেখিতে পারেন না।

হঠাৎ বলিলেন, "হ্যাঁ রে, অমন সুন্দর মালাটা কিনে দিলাম সেদিন, একবারও পরলি না যে? পর্ না এই শাড়ীটার সঙ্গে, বেশ মানাবে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "সাজগোজ আর ভাল লাগছে না মাসী।"

ছোটমাসী বলিলেন, "কেন, দেখবার লোক ত এখানেও আছে। একজন ছাড়া আর কি কারও চোখ নেই?"

উর্ম্মিলা বলিল, "আছে হয়ত চোখ, কিন্তু আমার উপর সে চোখ বেশী না পড়লেই ভাল।"

সুলাজিনী বলিলেন, "পছন্দ-অপছন্দ অত বেশী ক'রে প্রকাশ করতে নেই রে। কখন্ কে কাজে লাগে বলা যায় কি? সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব রেখে চলতে হয়।"

উর্ম্মিলা বলিল, "সদ্ভাব ত রাখতেই চাই মাসী, কিন্তু গিলে খেতে চাইলে কি সদ্ভাব রাখা যায়? সুদেব আজকাল বড় বাড়াবাড়ি করে।"

সুলাজিনী বলিলেন, "বিপদ্ হ'ল দেখি তোদের নিয়ে। এমন সময়টাতেই আবার আমি থাকব না। তা পুরুষ মানুষকে দূরে ঠেলে রাখা যায় খুব rude না হয়েও। তুই যে আবার বড় বেশী সোজাসুজি।"

উর্ম্মিলা বলিল, "আমি ওসব অভিনয় করতে পারি না যে? ভাল লাগছে সেটাও যেমন লুকোতে পারি না, বিরক্ত লাগছে সেটাও লুকোতে পারি না।"

সুলাজিনী বলিলেন, "একটু চেষ্টা ক'রে আত্মগোপন করতে হয়। দেখ্ না, আমি ত ওদের দু' চক্ষে দেখতে পারি না, অথচ মুখে দেখাই যেন এমন ভালবাসার লোক আমার আর কোথাও নেই। ভূদেব বুড়ো ত প্রায় আমার সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে যাবার জোগাড় করেছে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "যদি তার ছেলেকে প্রেমে পড়াতে পারতে মাসী, তা হলে আমি বর্ত্তে যেতাম। দেখ না চেষ্টা ক'রে। তুমি ত ঢের সুন্দর দেখতে আমার চেয়ে।"

সুলাজিনী বলিলেন, "দূর! ওটা আমার চেয়ে পনেরো-ষোল বছরের ছোট হবে। না হলে কি আর পারতাম না?"

ঊর্মিলা বলিল, "ও ত আমার চেয়ে কম ক'রে বারো বৎসরের বড় হবে, ও আমার পেছনে লাগে কেন?"

সুলাজিনী বলিলেন, "পুরুষ মানুষ বড় হলে দোষ হয় না। বড় বড় কবি, লেখক, সব কত নাতনীর বয়সী ছুঁড়ির সঙ্গে প্রেম করেছে। অবশ্য তেমনি পনেরো-কুড়ি বছরের বড় মহিলার সঙ্গে প্রেম করেছেন এমন লোকের নামও ঢের আছে পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসে।"

এমন সময় বাহিরে ঠক্ ঠক্ করিয়া কড়া নাড়ার শব্দ হইল। ঊর্মিলা গলা নীচু করিয়া বলিল, "Talk of the devil and he appears', এসে ঠিক হাজির হয়েছে। এক মিনিট এধার-ওধারের জো নেই।" সুলাজিনী গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। বাহিরে সুদেব ও তাহার মাতা উপস্থিত। সুলাজিনী অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের বারান্দায় চেয়ার টানিয়া বসাইলেন, বলিলেন, "বোস, বোস, আর এক মিনিটের মধ্যেই বেরোব।"

ঊর্মিলা কাপড়-পরা সমাপ্ত করিয়া গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া আসিল। বুঝিল, গৃহিণী ঠাকুরাণীর আগমন হইয়াছে ছোটমাসীকে আট্‌কাইবার জন্য, সুদেব যাহাতে নিরুপদ্রবে ঊর্মিলার সঙ্গসুখ উপভোগ করিতে পারে। সুদেব একটু বেশী কাছে ঘেঁষিয়া আসার চেষ্টা যেদিন হইতে করিতেছে, সেইদিন হইতে মাসীর আঁচল আর ঊর্মিলা ছাড়ে না। প্রেম নিবেদন করায় ইহাতে বড় অসুবিধা হয়।

চারজনে বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমে খানিকটা পথ সকলে একসঙ্গেই গেল, তাহার পর ভুদেব-গৃহিণী আস্তে আস্তে পিছাইয়া পড়িতে লাগিলেন। মোটা মানুষ তাড়াতাড়ি হাঁটিতে পারেন না। ঊর্মিলা বিরক্ত হইল, তবে কিছু না বলিয়া সুদেবের সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল। একটা পাহাড়ী লোক অর্কিড বিক্রয় করিতেছিল। সুদেব জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ফুল ভালবাস না ঊর্মিলা?"

ঊর্মিলা বলিল, "বাসি বৈ কি? সুন্দর জিনিষ কে না ভালবাসে?"

সুদেব বলিল, "তবে অন্য লোকে সুন্দর জিনিষ ভালবাসলে অত বিরক্ত হও কেন?"

ঊর্মিলা ভুরু তুলিয়া বলিল, "সুন্দর জিনিষ ভালবাসলে বিরক্ত হই? এ ধারণা কেন হ'ল আপনার?"

সুদেব বলিল, "কোন কথায় compliment-এর আঁচ পেলেই কেন অত চ'টে যাও?"

ঊর্মিলা বলিল, "ও, এই ব্যাপার? আপনার আবার এ সব রোগে ধরল কেন? আগে ত বেশ practical লোকের মতই কথাবার্ত্তা বলতেন?"

সুদেব বলিল, "Practical লোকেরাও রক্ত-মাংসের মানুষ ত? তাদেরও মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে জানাতে যে তাদের মন ব'লে একটা জিনিষ আছে।"

ঊর্মিলা বলিল, "তা হতে পারে বটে।"

সুদেব বলিল, "ছোট থেকেই ত আমাদের আলাপ ঊর্মিলা। তখন ত মনে হ'ত আমাকে বেশ likeই করতে। কিন্তু এবারে দেখা হওয়ার পর থেকেই মনে হচ্ছে তোমার সে পছন্দটা আর নেই। আমাকে যেন অপছন্দই কর positively!"

ঊর্মিলা বলিল, "কেন যে আপনার কি মনে হয় তা আমি কি ক'রে জানব বলুন? আমার ত মনে হয় না যে আমি ব্যবহারের কোন তফাৎ করেছি।"

সুদেব বলিল, "ব্যবহারটা ত বাইরের জিনিষ, চেষ্টা ক'রে একরকম রাখা যায়। মনের কোন পরিবর্ত্তন হয় নি?"

ঊর্মিলার মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বলিল, "তাও ত আমার মনে হয় না।"

সুদেব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, কথার মারপ্যাঁচ ছেড়ে যা বলতে চাইছি তাই বলি। তোমার বাবা বেঁচে থাকতেই আমাদের বিবাহের কথা একটা উঠেছিল। বয়স ত আমাদের দু'জনেরই হয়েছে। এখন বিবাহ করলে কেউ বাল্যবিবাহ বলবে না সেটাকে। তুমি কি বল? এটাকে seriously নেবার সময় কি এখনও আসে নি? আমার ইচ্ছা, এবার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থাই ক'রে যাই, অর্থাৎ engaged হয়ে যাই। বিয়ে অবশ্য তোমার ইচ্ছামত সময়েই হবে।"

ঊর্মিলার ইচ্ছা করিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পলাইতে। পিছন ফিরিয়া দেখিল, মাসী এখনও অনেক

দূরে। কি বলিবে সে? কত বড় দুর্ভাগ্য লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? কোথায় তাহার সেই, "তৃষ্ণার শান্তি?" কত দূরে বসিয়া এ কোন্ অপবিত্র কথা সে শুনিতেছে? তাহার দেহ, মন, প্রাণ আর কি তাহার আছে? সকলই ত দয়িতের কাছে উৎসর্গীকৃত।

তবু ছোট মাসীর সদুপদেশ স্মরণ করিয়া সে রূঢ় জবাব কিছু দিল না। বলিল, "ওসব কথার এমন চট্ ক'রে জবাব দেওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ঢের ভাববার আছে। এখন আমি আপনাকে কোন জবাবই দিতে পারব না।"

সুদেব চেষ্টা করিয়া নিজের বিরক্তি দমন করিল। বলিল, "এত ভাববার আছে এখনও? সাত-আট বছর হল কথাটা উঠেছে। এর মধ্যেও তুমি ভেবে স্থির করতে পার নি যে, তুমি আমাকে স্বামীরূপে চাও কি না?

ঊর্মিলা বলিল, "এখনই যদি জবাব চান, তাহলে বলব, স্বামীরূপে আপনাকে আমি চাই না।"

সুদেবের মুখে গাঢ় কালো ছায়া নামিয়া আসিল। পথের ধারে একটা লোহার বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "বোস এইখানে। এমন সরাসরি প্রত্যাখ্যান কেন?"

এমন সরাসরি প্রত্যাখ্যান কেন?

ঊর্মিলা বসিল। বলিল, "এ কেনর কোন জবাব আমি দিতে পারব না।"

সুদেব বলিল, "আমাকেই অত্যন্ত অপছন্দ কর? না অন্য কাউকে আমার চেয়ে বেশী পছন্দ কর?"

ঊর্মিলা বলিল, "দেখুন, আমি আপনার আদালতের witness নয়। আমাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা ক'রে কিছু লাভ হবে না।"

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় সুলাজিনী ও ভূদেব-গৃহিণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুলাজিনী ঊর্মিলার মুখের দিকে তাকাইয়াই ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন। সুদেবের মাও বুঝিলেন যে ছেলের অসন্তোষের কোন একটা কারণ ঘটিয়াছে। বলিলেন, "এর পর ফিরলে হয় না? অনেকটা ত হাঁটা হল। এই দেহ নিয়ে আর খুব বেশী ওঠা-নামা করতে পারি না।"

সুলাজিনী বলিলেন, "সুদেব ঐ রিক্সটাকে ডাক দেখি। ঊর্মিলার শরীরটা ভাল নেই মনে হচ্ছে। আর হেঁটে কাজ নেই।"

সুদেব দুইটা রিক্স তাড়াতাড়ি ডাকিয়া আনিল। একটায় সুলাজিনী ও ঊর্মিলা চড়িলেন। দু'জনেই হাল্কা মানুষ। ভূদেব-গৃহিণী আর একটাতে চড়িলেন, সুদেব হাঁটিয়াই চলিল।

ঘরে ফিরিয়া উর্ম্মিলা একেবারে শুইয়া পড়িল। কাপড়-চোপড়ও ছাড়িল না। সুলাজিনী তাহার মাথার কাছে বসিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কি হল? অমন ক'রে শুয়ে পড়লি যে? খুব বাজে বকেছে?"

উর্ম্মিলা বলিল, "চূড়ান্ত যা বলবার ব'লে নিলেন। বিবাহের প্রস্তাব করছিলেন।"

সুলাজিনী বলিলেন, "আচ্ছা হাঁদা যা হোক। দেহাতী বোকা চরিয়ে চরিয়ে বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ডিম ভাঙলেই কি বাচ্চা বেরোয়? তা' দিতে হয় অনেক কাল ধ'রে। তা তুই কি বললি? ঝগড়া করিস্ নি ত?"

উর্ম্মিলা উঠিয়া বসিল। বলিল, "ঝগড়া করেছি বলা যায়, আবার নাও বলা যায়।"

সুলাজিনী বলিলেন, "সেটা কি রকম?"

উর্ম্মিলা বলিল, "যতক্ষণ engaged হবার প্রস্তাব করছিলেন ততক্ষণ রূঢ় কিছু বলি নি, শুধু বলেছি, অনেক ভেবে চিন্তে দেখে তবে আমায় জবাব দিতে হবে। তাতে তাঁর মন উঠল না। জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁকে স্বামীরূপে আমি চাই কি না। তখন বলতেই হল, একেবারেই চাই না। কেন যে চাই না সে প্রশ্নও হ'ল। আর কাউকে চাই কিনা সে খোঁজও নেওয়া হ'ল।"

সুলাজিনী বলিলেন, "বুদ্ধি-শুদ্ধি ভেমোগোয়ালার মতন। দুঃখের বিষয়, কাণ্ডজ্ঞান যখন মানুষের হয় তখন আর বিয়ের প্রস্তাব করার বয়স থাকে না। আমাকে একটু সামলে নিতে হবে আর কি? তুই যদি পাটনায় থাকিস্, তাহলে ত ওদের ভরসা খানিকটা করতেই হবে? একেবারে শেষ কথা বলা এখন চলবে না। একটু ঢেলে সাজবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "আমি আর ওর সঙ্গে বেড়াতে যাব না।"

সুলাজিনী বলিলেন, "দিন-কতক ঘাপটি মেরে শুয়ে থাক ত? তারপর আমি আছি। কাল যাব ওদের বাড়ী।"

উর্ম্মিলা আরও খানিকক্ষণ শুইয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া গিয়া বারান্দায় বসিল। চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল পড়িল। মানুষের জীবন দীর্ঘ, ইহারই ভিতর তাহার প্রাণ যেন কণ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে। কতদিন আর এই একলা পথে তাহকে চলিতে হইবে?

রাত্রে ভাল করিয়া ঘুম হইল না। স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল কিছুক্ষণ। কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে। কিন্তু মুখ তাহার দেখিতে পাইল না।

সকালে কলিকাতা হইতে চিঠি আসিল। জ্যোতির্ম্ময়ের চিঠি, আবার তারণের একখানা চিঠি। সে জানাইয়াছে যে, তাহার একলা বাড়ীতে বড় অসুবিধা হইতেছে। বাজারাদি করিতে যাইতে হইলেও বাড়ী খালি ফেলিয়া যাইতে হয়। যদি তাহার স্ত্রীকে আসিয়া থাকিতে দেওয়া হয় তাহার সঙ্গে, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

জ্যোতির্ম্ময়ের চিঠিখানা ছোট। বড় চিঠি পরে লিখিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছে। উর্ম্মিলার জন্য মনের উদ্বেগ অনেকখানিই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। অতখানি ভাবনা যাহার জন্য, তাহার জন্য মনের কোণে একটুও কি স্নেহ নাই?

চা খাওয়া শেষ হইতে না হইতে অন্যদিন সুদেব আসিয়া জোটে। আজ একটু দেরী হইতেছে।

সুলাজিনী বলিলেন, "চা খেয়ে গিয়ে শুয়ে থাক্, আমি ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। তার পর উঠে চিঠিপত্র যা লেখার লিখিস্। অমনি তারণটাকেও লিখে দিস্, স্ত্রীকে আনতে চায় আসুক।"

উর্ম্মিলা চা খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিল উপরের রাস্তা দিয়া সুদেব নামিতেছে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল। সুলাজিনী সুদেবকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। সুদেব জিজ্ঞাসা করিল, "উর্ম্মিলা আজ বেরোবে না?"

সুলাজিনী বলিলেন, "কাল থেকে শরীরটা তার ভাল দেখছি না। শুয়ে শুয়েই কাটাচ্ছে। মনটা ভাল নেই মনে হচ্ছে। বড় temperamental মেয়ে।"

শুনিয়া সুদেব খালি একবার মাথা নাড়িল। Temperamental বটে। কাহারও খাতিরে চলিবার মেয়ে নয়। স্ত্রীলোকের স্বভাবে অতটা কাঠিন্য আবার সুদেবের পছন্দ ছিল না। তাহারা একটু বাধ্য হইবে ত? না হইলে ঘর-সংসার করা চলে কি?

জিজ্ঞাসা করিল, "এখুনো ওঠেই নি নাকি?"

সুলাজিনী বলিলেন, "উঠেছিল, চা খেয়ে আবার গিয়ে শুয়ে পড়েছে। চল, আমরাই একটু ঘুরে আসি। ওবেলা বেরোবে বোধ হয়।"

সুদেব অগত্যা তাঁহার সঙ্গেই চলিল বেড়াইতে। খানিক দূর অগ্রসর হইয়া সুদেব বলিল, "আপনাদের নতুন পাড়াটা কেমন?"

সুলাজিনী বলিলেন, "ভালই। পাড়াপ্রতিবেশী শান্তশিষ্টই আছে। ধারে-কাছে বস্তি-টস্তি নেই।"

সুদেব জিজ্ঞাসা করিল, "আলাপ-পরিচয় হয়ে গিয়েছে সকলের সঙ্গে?"

সুলাজিনী মনে মনে প্রস্তুত হইয়া লইলেন। বলিলেন, "সকলের সঙ্গেই হয় নি, তবে খুব ধারে-কাছে যারা তাদের সঙ্গে হয়েছে।"

সুদেব বলিল, "উর্মিলা মেশে টেশে ওদের সঙ্গে?

সুলাজিনী বলিলেন, "তা পাশের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব হয়েছে। তারাও আসে-যায়।"

সুদেব মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। উর্মিলার মনে আর কাহারও ছায়া পড়িয়াছে কিনা জানা তাহার একান্ত দরকার। কিন্তু সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিলে সুলাজিনী কি উত্তর দিবেন? ভদ্রমহিলা যে আবার অতি সাবধানী। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, "উর্মিলা সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব ত বহুদিন থেকে চ'লে আসছে আমাদের দুই বাড়ীর মধ্যে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, উর্মিলা আমাকে মোটেই পছন্দ করে না। এর কারণ কি? অন্য কোন ছেলের সঙ্গে খুব কি মেলামেশা করে?"

সুলাজিনী বলিলেন, "কই আর? বিশেষ মিশুক মেয়ে ত নয়? সাধারণভাবে কথাবার্ত্তা সকলের সঙ্গেই বলে।"

সুদেব আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। ভাবিল, মাকে লাগাইয়া দিতে হইবে। তিনি কথা বাহির করিতে পারিবেন। অন্য কথা পাড়িয়া গল্প করিতে করিতে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল।

উর্মিলা এদিকে উঠিয়া বসিয়া চিঠির কাগজের প্যাড ও কলম লইয়া বারান্দায় গিয়া বসিল। জ্যোতির্ম্ময়কে সবই সে লিখিয়া জানাইতে চায়। কি পরামর্শ সে দিবে, কে জানে? কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেই বলিবে বোধ হয়? কিন্তু উর্মিলা পারিবে কি? লিখিল,

আপনার চিঠি পেলাম। বড় চিঠি এবার আপনাকে লিখতেই হবে মনে হচ্ছে, কারণ আমার একটু পরামর্শ চাইবার আছে। ছোট মাসীর চ'লে যাবার দিন ত এগিয়ে আসছে, আমাকেও এখান থেকে স্থেম যেতে হবে। কিন্তু কোথায় যাব সেই হচ্ছে কথা।

সাধারণভাবে কথা ছিল যে, আমি পাটনায় গিয়ে থাকব। চাকরি একটা স্থিরই আছে প্রায়। যেখানে কাজ সেখানেই থাকার কথা ছিল, সুদেব গুপ্তরা মোটামুটি তত্ত্বাবধান করতেন। এ ভাবে থাকা হয়ত সম্ভব হ'ত।

কিন্তু এখন এক বিপদ্ উপস্থিত হয়েছে। সুদেবের সঙ্গে আমার একটা বিবাহের প্রস্তাব আমার বাবা বেঁচে থাকতে একবার উঠেছিল। এতকাল এটা নিয়ে আর কেউ কিছু উচ্চবাচ্য করে নি। হঠাৎ আবার সেই কথা উঠেছে এবং সুদেব স্বয়ং এসে আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছেন। আমি অবশ্য প্রত্যাখ্যানই করেছি, তা ছাড়া আর কিই বা করতে পারতাম? এখন কথা হচ্ছে যে, এর পরও কি পাটনায় যাওয়া আমার উচিত? আমার সম্বন্ধে ভূদেববাবুদের আর কোন সদ্ভাব থাকা কি সম্ভব? অথচ ওখানে থাকতে গেলে খানিকটা অন্ততঃ ওঁদের উপর নির্ভর করতেই হবে।

আপনি কি পরামর্শ দেন? ওখানে যাওয়া কি উচিত হবে? কলকাতার কাজ ত ছেড়ে দিয়েছি। ওখানে ফিরে যেতে হলে আবার চাকরির চেষ্টা দেখতে হয়। এবং চাকরিস্থানের কাছাকাছি বাসস্থানও একটা জোটাতে হয়। এত ভার আপনার উপর চাপাতে চাই না। এ সব বিষয়ে আমার মাসতুতো ভাইয়েরা সর্ব্বদাই সাহায্য করে। তাদের জানাব।

আমার শরীর একই রকম আছে। মন আরও বেশী upset হয়ে গেছে। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষাও কি আর ভগবানের কাছে কোন মূল্য পাচ্ছে না? ক্রমেই যেন বেশী ক'রে অসহায় হয়ে উঠছি।

কেমন আছেন আপনি? আরতি কেমন আছে? এবারে খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দেবেন। ইতি

উর্মিলা।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া, চিঠি পাঠাইয়া দিয়া:উর্ম্মিলা আবার গিয়া শুইয়া পড়িল। সুলাজিনী খানিক পরে ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে সুদেব নাই। পথে আর একদল বন্ধু জুটিয়া যাওয়াতে সে তাহাদের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে

সুলাজিনী বলিলেন, "নে, নে, উঠে বোস্। এখন ত আপদ্ বিদায় হয়েছে।"

উর্ম্মিলা খাটে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরা তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করল নাকি কালকের কথা?"

সুলাজিনী বলিলেন, "করেছে কিছু কিছু। তা আমি বিশেষ ধরা-ছোঁওয়া দিই নি।

"কি জানতে চান ওঁরা?"

"জানতে চান যে তুমি আর কোথাও প্রেম করছ কি না!"

১৪

জ্যোতির্ম্ময় সেদিন সকালেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। সারাক্ষণই কাজকর্ম্ম লইয়া থাকে। আয় মন্দ হইতেছিল না। জ্যোতির্ম্ময়ের মনে ঋণমুক্ত হইবার একটা আশা ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। সম্প্রতি একটি বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপকের সঙ্গে মিশিয়া একখানা পাঠ্যপুস্তক লেখার প্রস্তাব উঠিয়াছে। ইহা যদি সত্যই ঘটিয়া ওঠে তাহা হইলে একসঙ্গে কয়েক হাজার টাকা লাভ হওয়া অসম্ভব নয়। জ্যোতির্ম্ময়ের ঋণের বোঝা সে ক্ষেত্রে অর্দ্ধেক কমিয়া যাইতে পারে। ভাল করিয়া খোঁজ করিবার জন্য তাই সে ভদ্রলোকের বাড়ী দেখা করিতে গিয়াছিল।

দেখা করার ফলটা ভালই হইল। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কারণ, চা না খাইয়াই সে বাহির হইয়া গিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া চা খাইয়া ও খবরের কাগজ পড়িয়া বেশ কিছুটা সময় কাটাইয়া দিল। এমন সময় আরতি আসিয়া গোটা দুই-তিন চিঠি রাখিয়া গেল। অন্য দুইখানা চিঠি ফেলিয়া রাখিয়া প্রথমেই উর্ম্মিলার চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

পড়িতে পড়িতে তাহার মুখের রঙ প্রায় কালো হইয়া উঠিল। চিঠিখানা হাতে করিয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলিয়া গেল। চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, কি তাহার করা উচিত এখন? ঋণমুক্ত হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার খাতিরে উর্ম্মিলাকে কি একেবারে ধ্বংসের মুখে ফেলিয়া দিতে হইবে? সুদেবের মন যখন একবার তাহার দিকে গিয়াছে, সহজে সে ছাড়িবে না। তাহাদের হাতের মধ্যে গিয়া পড়িলে উর্ম্মিলার উপর নানারকম উৎপাত ঘটার সম্ভাবনা আছে। উর্ম্মিলা একাকীই থাকিবে। মনেও তাহার দুঃখ ছাড়া সুখ নাই। দুঃসহ জীবনভার তাহাকে সর্ব্বদা পীড়ন করে। সে কখন কি করিয়া বসে তাহার ঠিকানা কি? জগতে তাহারও যে আশ্রয় আছে, ব্যগ্র বাহু মেলিয়া প্রেম যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহাও সে জানে না। জানিলে হয়ত মনে শান্তি আসিত, আশা আসিত।

না, এভাবে তাহাকে ফেলিয়া রাখা যায় না। তাহাকে জানাইতে হইবে, আশ্বাস দিতে হইবে। তাহাকে জীবনের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করিবার আগে যদি কিছুদিনের জন্য জ্যোতির্ম্ময় বিলম্ব করিতে চায়, তাহা উর্ম্মিলাকে জানাইয়া তাহার কাছে সময় ভিক্ষা লইতে হইবে। সে যদি সম্মত না হয়, তাহা হইলে জ্যোতির্ম্ময়ের অধিকার নাই তাহাকে বসাইয়া রাখিবার। সে ক্ষেত্রে তাহার উচিত, উর্ম্মিলার জীবনপথ হইতে সরিয়া যাওয়া।

কিন্তু এত ভাবাও যায় না। কল্পনাও করা যায় না। তাহার নিজের জীবনে তাহা হইলে বাকী থাকিবে কি? কাহার আশায় সে থাকিবে? এত পরিশ্রম করিয়া কোন্ গৃহ সে সাজাইবে, যদি গৃহলক্ষ্মী আলেয়ার মত অদৃশ্য হইয়া যায়? সমস্ত জীবন ভরিয়া যে রহিয়াছে তাহাকে কি তুচ্ছ পৌরুষের অহঙ্কারে বিসর্জ্জন দেওয়া যায়? তাহার পর বাঁচিয়া কি করিবে সে? বাঁচিবেই বা কেমন করিয়া?

অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল।

প্রাণাধিকাসু

উর্ম্মিলা,

তোমার শেষ চিঠিখানা অল্পক্ষণ আগে আমার হাতে এসেছে। এতদিন যে জ্যোতির্ম্ময় তোমার সামনে ছিল, আজকের পত্রলেখক সে নয়, তা বুঝতেই পারছ। আমার মুখোস খুলবার সময় এসেছে।

তোমার পবিত্র সুন্দর মনে লজ্জা বা বৃথা সঙ্কোচ ছিল না। বিধাতা সবচেয়ে বড় সম্পদ্ যা তোমাকে দিয়ে-

ছিলেন, তা তুমি লুকিয়ে রাখতে চাও নি। যাকে দান করতে চেয়েছিলে তার বোঝবার ভুল হয় নি। এদিক্ দিয়ে দেখতে গেলে তার মত সৌভাগ্যবান্ পৃথিবীতে কে আছে?

কিন্তু তার দুর্ভাগ্যেরও ত সীমা নেই আর একদিক্ দিয়ে? দু হাত বাড়িয়ে আজই ত সে তোমাকে গ্রহণ করতে পারছে না। আমাকে একটুখানি সময় দেবে, জীবনের লক্ষ্মী আমার? ঋণমুক্ত হয়ে, মাথা উঁচু ক'রে যেদিন আমি তোমাকে বুকে তুলে নিতে পারব, সেই দিনটার জন্যে আমাকে একটু অপেক্ষা করতে দেবে? খুব বেশী দিন নয়; একেবারে ঠিক বলতে পারছি না, কতদিন। তার মধ্যে যদি আমি তোমার ঋণ শোধ করতে না পারি, তাহলে সেটা স্বীকার ক'রে নিয়েই আমি তোমাকে জীবনে বরণ ক'রে আনব। আর কষ্ট কোনমতেই তোমাকে দেব না।

তুমি হয়ত বুঝতে পারবে না, এই তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে আমি কেন এত লজ্জা অনুভব করছি। পুরুষের মন, তাকে একেবারে শেষ পর্য্যন্ত বুঝতে পারা কি তোমার সম্ভব? আমি যে নিজের কাছে বড় ছোট হয়ে যাব যদি এই ঋণ শোধ ক'রে তোমার কাছে না যেতে পারি।

আমার কি কোনও যন্ত্রণা নেই মনে? কিন্তু তোমাকে সে কথা জানিয়ে লাভই বা কি? সংসারের লোকে আমার এখন বিবাহ করাটা শুধু একটা ভাল business deal ব'লেই ধরবে। টাকা নিয়েছিলাম, পরিবর্ত্তে টাকার অধিকারিণীকে বিয়ে ক'রে ঋণ শোধ দিলাম, এই অর্থই হবে। সেটা আমি উপেক্ষা করতে পারতাম, যদি না আর একটা গুরুতর সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত হ'ত। তুমি কি একেবারেই এ সন্দেহ করতে পার না যে আমি ঋণ-শোধের মনোবৃত্তি নিয়েই তোমার দিকে হাত বাড়াচ্ছি? এতদিন আমি চুপ ক'রেই বা ছিলাম কেন? এত বড় অবমাননা আমার ভালবাসার আমি সহ্য করতে পারব না উর্ম্মিলা। তোমার মনে বোধ হয় আমি অত্যন্ত ব্যথা দিয়েছি, দয়া ক'রে আমাকে ক্ষমা ক'রো। এ ভালবাসা তোমাকে প্রথম থেকে এখন পর্য্যন্ত যন্ত্রণাই দিয়েছে শুধু। কোনদিন কি এ যন্ত্রণার ইতিহাস তোমার মন থেকে মুছবে? চিরজীবনের একনিষ্ঠ ভালবাসা দিয়ে যদি এ ব্যথা তোমার মন থেকে মুছে দিতে পারি, তা হলেই আমার জীবন সার্থক হবে।

আর কি বলব উর্ম্মিলা? আমার প্রার্থনা কি পূর্ণ করবে? তোমাকে কি কঠোর দুঃখ দিচ্ছি তা ভেবে আমার বুক প্রায় ভেঙে যাচ্ছে। তবু আশা ছাড়ছি না যে, তুমি আমার আত্মসম্মান রক্ষা করতে এবং আমার ভালবাসার পবিত্রতা রক্ষা করতে এ দুঃখও স্বীকার করবে। কোন অধিকার নেই এটা আমার চাইবার। একমাত্র তুমি, তুমি ব'লেই এ সাহস আমি করলাম। একবার আমাকে রক্ষা করেছিলে তুমি, আর একবার কর। আমার অন্তরতম যে সত্ত্বা, তাকে রক্ষা কর অবমাননার হাত থেকে। ভগবানের কাছে যা চাইবার, তা তোমার কাছে চাইছি।

তার পর তোমার এখনকার সমস্যার কথা। আমি ত তোমার পাটনা যাওয়া আর সমর্থন করতে পারছি না। একবার তোমার সম্বন্ধে যে কামনা সুদেব গুপ্তের জেগেছে তার সহজে অবসান হবে না। অনেক বিরক্তি তোমার সহ্য করতে হবে। তোমার দুর্ব্বল শরীরের উপর এত উৎপাতের ফল ভাল হবে না। আমার ইচ্ছা নয় যে, তুমি যাও। কলকাতায় চ'লে এস, কোন অসুবিধা তোমার আমি ঘটতে দেব না। তারণ রয়েছে, তার স্ত্রীকেও সে নিয়ে আসছে। একজন সঙ্গিনী তোমায় আমি সহজেই স্থির ক'রে দিতে পারব। আমি ত পাশের বাড়ীতেই থাকব। তাতেও যদি তোমার অসুবিধা লাগে তা হলে আরতিকে নিয়ে আমি তোমার বাড়ীতেই থাকব। চাকরি করার তোমার কোন প্রয়োজন নেই। তাও যদি নিতান্ত করতে চাও, আমি জোগাড় ক'রে দিতে পারব। তুমি এখানেই এস।

আর একবার ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে। তোমার জীবনে আমার পরিপূর্ণ আনন্দ বহন ক'রে নিয়ে যাওয়ার কথা, তার পরিবর্ত্তে উপহার দিচ্ছি শুধু দুঃখ-বেদনা। আমি জানি কতখানি ভালবাসা আমি পেয়েছি তোমার কাছে। এই ভালবাসার শক্তিতেই আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর অভিমান ক'রো না। আর যাই কর, আমার ভালবাসায় অবিশ্বাস ক'রো না। বিশ্বাস কর, যতটা দিয়েছ তার কম তুমি পাও নি।

ছোট মাসীকে নমস্কার জানিও। তোমাকে আশীর্ব্বাদ আর সমস্ত প্রাণের ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি

তোমার জ্যোতির্ম্ময়।

আর কিছু লেখা যায় কি? কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিল। আজকার মত ইহাই থাক। এই চিঠির কি উত্তর পাইবে তাহার উপর নির্ভর করিবে তাহার ভবিষ্যতের কার্য্যপ্রণালী। উর্ম্মিলা যদি তাহাকে সময় দেয় তাহা

হইলে এখন নিরন্তর কাজ করিতে হইবে তাহাকে। একটা মুহূর্ত্তও নষ্ট করিলে চলিবে না। মনে যাহা ভাবিয়াছে সব যদি সেইভাবে করিতে পারে তাহা হইলে এই বৎসরের শেষেই প্রায় ঋণমুক্ত হইয়া উর্ম্মিলাকে সে বিবাহ করিতে পারিবে। অল্প যাহা কিছু বাকি থাকিবে তাহা পরে দিলেও বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না।

কিন্তু উর্ম্মিলা যদি আর দুঃখ সহ্য করিতে না পারে? তাহার দুর্ব্বল দেহ যদি ভাঙিয়া পড়িতে চায়? সে ক্ষেত্রে কাজের কথা, ঋণমুক্তির কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে জ্যোতির্ম্ময়কে। সমস্ত শক্তি দিয়া তখন রক্ষা করিতে হইবে উর্ম্মিলাকে। যাহার জন্য তাহার এই তপস্যা, তাহাকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারিবে না সে।

চিঠি ডাকে দিয়া জ্যোতির্ম্ময় আবার কাজে বাহির হইয়া গেল।

সুখদা বলিলেন, "ছুটির দিনগুলো কোথায় একটু শুয়ে ব'সে আরাম করবে, তা না, যেন হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। কেন রে বাপু, চ'লে ত যাচ্ছে এক রকম ক'রে।"

আরতি বলিল, "দাদা কেমন যেন হয়ে গেছে। কথা বলে না, হাসে না, খালি কাজ আর কাজ। এই বাড়ী ছাড়াবার সময় যে কার কাছে দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল, তারাই কিছু বলেছে নাকি কে জানে?"

সুখদা বলিলেন, "এই বাড়ীই হল কাল সকলের। তোর বাবাও ত ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেছেন। কি ক'রে যে এতগুলো টাকা শোধ দেবে জানি না। খাটছে ত খুব, কিন্তু ছেলে পড়িয়ে কতই বা পাওয়া যায়?"

দার্জ্জিলিং-এর অধিবাসিনীদের দিন কাটিতেছিল, গোলমালের মধ্য দিয়া। উর্ম্মিলা দুইটা দিন ত শুইয়াই কাটাইয়া দিল। কোন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করিল না। সুদেব অবশ্য প্রতিদিন হাজিরা দিতে ছাড়িল না। বারান্দায় বসিয়া একদিন উর্ম্মিলার সঙ্গে কথাও বলিয়া গেল। সেদিন অবশ্য বিরক্ত করিবার মত কোন কথা বলিল না। উর্ম্মিলার স্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর উদ্বেগ প্রকাশ করিল, পাটনায় গেলে সে যে কতটা ভাল থাকিবে তাহারও আলোচনা করিল। পাটনায় যাওয়ার ব্যবস্থাটা যে এখন পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত আছে এই ভাবটাই তাহার কথায় প্রকাশ পাইল। কাহাকে দিল, সে বিষয়ে কিছু না বলিয়া একগোছা ফুল সে টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। সুলাজিনী ফুলগুলি লইয়া ফুলদানিতে রাখিয়া দিলেন।

তাঁহারও দিন কাটিতেছিল অতিশয় কর্ম্মতৎপরতার মধ্য দিয়া। সকাল বিকাল বার-দুই করিয়া তাঁহাকে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে হয় ভূদেববাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত। ক্রমাগত নানা কথা তিনি সাজাইয়া বলিয়া চলিয়াছেন। উর্ম্মিলার হৃদয়রাজ্যে কাহারও যে বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছে, তাহা তিনি একেবারে চাপিয়া যাইতেছেন। উর্ম্মিলা বয়সের অনুপাতে অনেকখানিই ছেলেমানুষ থাকিয়া গিয়াছে, ইহাই তাঁহার প্রধান বক্তব্য। হঠাৎ বিবাহ ব্যাপারের মত একটা প্রস্তাবে সে অত্যন্ত চকিত হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে সে আগে কিছু ভাবে নাই। তাহার মন এখনও প্রস্তুত হয় নাই, স্বামী গ্রহণের জন্য। তাহাকে সময় দিতে হইবে। সাহচর্য্য দিয়া, সহানুভূতি দিয়া তাহার হৃদয়কে প্রথমতঃ জাগরিত করিতে হইবে। সরাসরি দাবী করিলে কোন লাভই হইবে না। বন্ধুভাবে প্রথমে প্রবেশ করিলে পরে স্বামীর আসন পাইলেও পাইতে পারে। হাল ছাড়িবার কোন প্রয়োজন যেমন নাই, তেমন তাড়াহুড়া করিবারও দরকার নাই।

ভূদেব এবং তাঁহার পত্নী সুলাজিনীর বাগ্মিতার কাছে একেবারেই পরাভূত হইয়া গিয়াছিলেন। সুলাজিনীর কথা যথেষ্টই যুক্তিসঙ্গত। বিবাহ করিতে বলিবামাত্রই উর্ম্মিলা বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইবে এমন মেয়ে উর্ম্মিলা নাও হইতে পারে। চিরকাল প্রায় বোর্ডিং ও পরের বাড়ী কাটাইয়াছে, ঘর-সংসার করার দিকে খুব আগ্রহ হয়ত তাহার নাই। আর কিছুদিন দেরী করায় ক্ষতি কি? উর্ম্মিলার বয়স কি-ই বা হইয়াছে? সুদেব অবশ্য বয়সে যথেষ্টই বিবাহযোগ্য, তবে না হয় একটু বেশী বয়সেই বিবাহ করিবে। স্বামী স্ত্রী খুশী হইয়া পরস্পরকে গ্রহণ না করিলে যে অসহ্য অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহার চেয়ে মন-জানাজানি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বেশী বয়সেও বিবাহ করা ভাল। ভূদেব-গৃহিণী মনে মনে উর্ম্মিলাকে "ন্যাকা" আখ্যা দিলেও মুখে কিছুই বলিলেন না। চলুক পাটনায়, তাঁহার ঘর-সংসার দেখিয়া লোভ না করিয়া কোন মেয়ে পারিবে না। কোথাও কোন খুঁৎ বাহির করুক দেখি? মাস দুই দেখিলেই যাচিয়া আসিয়া সুদেবকে বিবাহ করিবে। ভালবাসাকে বিবাহিত জীবনে খুব উচ্চস্থান দিতেন না ভূদেব-গৃহিণী। প্রথম যৌবনে টাকা-পয়সা ছিল না কিছু। কর্ত্তা আদর-সোহাগ দিয়াই সে অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেন। গৃহিণী ছেঁদো কথায় ভুলিবার পাত্রী ছিলেন না। তাঁহার প্রায়ই হাড় জ্বালা করিত। ঝগড়া হইত খুব। এখন ত তিনি পরিপূর্ণ সুখে আছেন। রং কালো হইয়া গিয়াছে, ওজন হইয়াছে দু'মণের উপর, কর্ত্তাও আজকাল সোহাগ

জানাইতে আসেন না। তবু তাঁহার গৃহিণী এখন পৃথিবীর দিকে অতি সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতেই তাকান। একেই ত বলে সুখের সংসার।

সুদেব অবশ্য এ ব্যবস্থাটাকে খুব বেশী পছন্দ করিতেছিল না। জোর করিয়া বা বক্তৃতা দিয়া উর্ম্মিলাকে জিতিয়া লইতে পারিলেই সে খুশী হইত। আর কতকাল সে বসিয়া থাকিবে? বিবাহিত জীবনযাপন করিবার ইচ্ছাটা তাহার একটু প্রবলই হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবৃত্তিকে কি ভাবে বশে রাখিতে হয় তাহা সে জানে, এতকাল সে তাহা করিয়াও আসিয়াছে। বিবাহ এ পর্য্যন্ত করে নাই, অথচ নৈতিক পতনও যে তাহার বিশেষ ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। একটু আধটু এদিক্ ওদিক্ যাওয়াকে কোন সাংসারিক-জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষই ভ্রষ্টতার লক্ষণ বলিয়া ধরিবে না। সে খবর জানেই বা কে? তবে এবার সে নিজেই চিত্তবৃত্তিকে অসংযত হইয়া উঠিতে দিয়াছিল, সেগুলি প্রায় উদ্দামই হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ধারণা ছিল যে, উর্ম্মিলা নামে না হোক কাজে বাগ্‌দত্তা হইয়াই আছে, সে হাত বাড়াইয়া এই সুন্দর সুগন্ধি ফুলটিকে পাড়িয়া লইলেই হয়। হঠাৎ কোন্ কুগ্রহের দৃষ্টি পড়িল, তাহার শুভেচ্ছার উপর? সাতভাই চম্পার গল্পের চাঁপাফুলের মত উর্ম্মিলা কি করিয়া অত উপরে উঠিয়া তাহার নাগালের সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া গেল? সুদেবের মনে বিরক্তি আর অসন্তোষের সীমা রহিল না।

বাপ-মা তাহাকে বুঝাইলেন। উর্ম্মিলা সুপাত্রী, প্রায় লক্ষ টাকার অধিকারিণী। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বংশ-মর্য্যাদায় কোন অংশে সুদেব অপেক্ষা হীন নয়। যদিই তাহার জন্য নয় মাস, ছয় মাস, অপেক্ষা করিতে হয়, তাহাতে কি এমন ক্ষতি? যে কন্যা প্রসন্ন চিত্তে তাহাকে গ্রহণ করিবে তাহার জন্যই প্রতীক্ষা করা ভাল নয় কি? জোর করিতে গিয়া সব নষ্ট করায় কি লাভ?

সুলাজিনীর সঙ্গে সে নিজে কথা বলিয়া দেখিয়াছে। ওকালতী বিদ্যা ফলাইয়া তাঁহাকে নানা ভাবে প্রশ্ন করিয়া সে ভিতরের কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সুলাজিনীকে সে চিনিতে পারে নাই। তিনি সব কথারই জবাব দিয়াছেন, অথচ কোন কথাই বলেন নাই। জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া একটি যুবক যে পাড়াতে আছে, তাহা লুকান নাই, কিন্তু এমন ভাবে তাহার কথা বলিয়াছেন যে বাস্তব জ্যোতির্ম্ময়ের কোন ছবিই সুদেবের মনে জাগে নাই। কলেজের একজন সাধারণ লেক্‌চারার, অতিশয়ই সাধারণ, বয়সেও উর্ম্মিলার চেয়ে দু-এক বৎসরের মাত্র বড়। তাহার ছোট বোনের সঙ্গে ভয়ানক ভাব উর্ম্মিলার। আরও দুই-চারিটা ছেলের নাম সেই সা[illegible] জুড়িয়া দিয়াছেন, যদিও তাহারা কোনদিনই তাঁহাদের বাড়ীতে আসে নাই। ইহাদের কাহারও প্রতি উর্ম্মিলার মন যায় নাই, সুদেব প্রায় ধরিয়াই লইয়াছে, সাধারণ ভাবে সব মেয়ের মনেই বিবাহ করিবার ইচ্ছা একটা থাকে, উর্ম্মিলার কি তাহাও নাই? চব্বিশ বৎসর বয়স হইতে চলিল, ইহা বড়ই অস্বাভাবিক লাগে সুদেবের কাছে।

যাহা হউক, সুদেব ধরিয়াই লইয়াছে আরো কিছুদিন তাহাকে উর্ম্মিলার পিছনে ঘুরিতে হইবে, তোয়াজ করিতে হইবে। তাহার পর একবার হাতে আসিলে তখন দেখা যাইবে। কুব্যবহার করিবার অবশ্য তাহার ইচ্ছা নাই, তবে নিজের মূল্য সে উর্ম্মিলাকে বুঝাইয়া ছাড়িবে।

ডাক আসিবার সময় উর্ম্মিলা উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া ছিল। শরীর মন কোনদিনই ভাল থাকে না, আজও ভাল নাই। জীবনের সমস্যার কথা সবই সে জ্যোতির্ম্ময়কে জানাইয়াছে। সে কি উত্তর দিবে কে জানে?

ডাক আসিয়া পড়িল। সুলাজিনীর চিঠিপত্র তাঁহাকে দিয়া উর্ম্মিলা নিজের চিঠি লইয়া শুইবার ঘরে চলিয়া গেল। চুলের কাঁটা দিয়া খামখানা খুলিয়া সে চিঠি বাহির করিল।

মুখখানায় হঠাৎ তাহার রক্তোচ্ছ্বাস ঘনাইয়া উঠিল। যে হাতে চিঠিখানা ধরিয়াছিল, তাহা কাঁপিয়া উঠিল। শুইয়া পড়িতে পারিলে সে যেন বাঁচে, তবু চিঠিখানা শেষ না করিয়া শুইতেও পারিল না। বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল, অবশেষে দুই চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। অবসন্ন ভাবে সে শুইয়া পড়িল।

সুলাজিনী কিছু পরে বারান্দা হইতে উঠিয়া ঘরে ঢুকিলেন। উর্ম্মিলা শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া ছুটিয়া তাহার কাছে গিয়া বসিলেন। পিঠে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে? খারাপ খবর কিছু নাকি? জ্যোতি লিখেছে ত?"

উর্ম্মিলা বলিল, "না মাসী খারাপ খবর কিছুই নয়। তিনিই লিখেছেন।"

সুলাজিনী বলিলেন, "তবে এত চোখের জল কেন? কথাটা কি শুনিই না?"

ঊর্ম্মিলা একটুক্ষণ থামিয়া বলিল, "আজ খোলাখুলি সবই স্বীকার করেছেন। তবে ঋণমুক্ত না হয়ে আমার দিকে হাত বাড়াবেন না এই তাঁর সঙ্কল্প। কিছুদিন সময় ভিক্ষে করেছেন আমার কাছে।"

সুলাজিনী বলিলেন, "পাগলা ছেলে। এই সব idealistদের নিয়ে এই ত বিপদ্। তোর টাকা আর তুই কি আলাদা নাকি? তোকে যে নেবে সে সবই নেবে। তা তুই কাঁদছিস কেন? এ ত আনন্দের কথা। সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা তোর যা ছিল তা ত গেল। দু-পাঁচ মাস অপেক্ষা করা, সেটা এমন কিছু শক্ত নয়, যদি ভাগ্য অনুকূল থাকে। তবু বুঝিয়ে সুঝিয়ে লেখ্ একখানা চিঠি। এই নিয়ে বেশী যেন upset হোস্ না। এবং পাকাপাকি বিয়ের দিন ঠিক হওয়ার আগে কাউকে জানতে দিস না। যেমন চলছে তোদের চলুক। এখন লিখতে চাস্ ত আমি উঠে যাচ্ছি," বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

ঊর্ম্মিলা উঠিয়া বসিল, তখন বুকের ভিতর রক্তস্রোত তাহার উন্মত্ত তালে নাচিতেছে। এতদিন পরে ধরা দিল? কতখানি দুঃখের মূল্য দিয়া তবে সে নিজের জীবনের একমাত্র আনন্দকে লাভ করিল। অপেক্ষা? অপেক্ষা ত করিতেই হইবে, প্রয়োজন হইলে জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত। যাহা সে দিল আর যাহা সে পাইল, মনুষ্যজন্মে তাহা কি একবারের বেশী কেহ পায়, না পাইতে চায়?

কিন্তু পত্রের কি জবাব দিবে সে? জ্যোতির্ম্ময় যাহা চায় তাহার কাছে, তাহা দিবার সাধ্য থাক বা নাই থাক, ঊর্ম্মিলাকে দিতে হইবে। জ্যোতির্ম্ময়ের জীবনের পূর্ণতার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা দিতে হইবে। ঊর্ম্মিলার ভালমন্দ যখন চাহিয়া দেখিল না সে, তখন জ্যোতির্ম্ময়ের কাছে ভিক্ষাপাত্র লইয়া যাইবে না ঊর্ম্মিলা। তাহার নিজের অপমান সে সহিতে পারিত, কিন্তু তাহার প্রেম যেখানে অবহেলিত সেখানে সে অগ্রসর হইতে পারে না। সে গ্রাহ্যই করিল তাহার আবেদন, তবে প্রেমের দেবতা জ্যোতির্ম্ময়কে ক্ষমা করিলেন কি না তাহা সে জানে না।

চিঠির উত্তর দিল।

জ্যোতি,

তোমাকে সম্বোধন করবার জন্যে আমাকে কথা খুঁজতে হয় না। তোমার নামটাই সার্থক আমার জীবনে। কোন আলো ছিল না যেখানে কোনদিন, সেখানে তুমিই আলো এনেছিলে।

তোমার ভালবাসা এতদিন আমার কাছে লুকোনোই ছিল। আশা করতে সাহস করি নি, তবে একেবারে আশা করি নি বা একেবারে বুঝি নি তাও নয়। যাক, সে সংশয়ের অবসান ত হ'ল আজ। ভগবান্ যেন এই মহা ঐশ্বর্য্যের যোগ্য আমায় করেন এই প্রার্থনাই করি।

কিন্তু ডান হাতে ক'রে যে অমৃতের পাত্র আমার মুখের কাছে তুলে ধরলে, বাঁ হাত দিয়ে তাকে আবার দূরে সরিয়ে দিতে চাইছ কেন? আমার কাছে আবার কি ঋণ তোমার? যা কিছু আমার আছে, ঊর্ম্মিলা বলতে যা কিছু বোঝায় সবই কি তোমার নয়? এই আবর্জ্জনার রাশ ফিরিয়ে দিতে পারছ না ব'লে আমাকে কাছে আসতে দেবে না? এটা কি আমার প্রতি ভালবাসার অপমান নয়? আমরা মেয়ের মন দিয়ে যতটুকু বুঝি,—লজ্জা, মান, ভয়, সব ত্যাগ না করলে পরম প্রিয়কে পাওয়া যায় না। কিন্তু তোমার মান কি বড়, তোমার ভালবাসার চেয়ে? পুরুষের মন সত্যিই বুঝি না আমি।

কিন্তু ভেবো না আমি অস্বীকার করছি তোমায় সময় দিতে। যত ইচ্ছা সময় তুমি নাও। অপেক্ষা ক'রেই থাকব। দরকার হলে জীবনান্তকাল অবধি থাকব। কুণ্ঠিত মন নিয়ে কোনদিনও এসো না তুমি আমার জন্যে। রাজার মতই এসো, বিজয়ী বীরের মতই এসো।

তবে কলকাতায় আর এখন ফিরব না আমি। তোমার তপস্যা এখন যে জন্যে, তাতে আমার দূরে থাকাই ভাল। কাঙালিনীর মত তোমার পথের পাশে দাঁড়িয়ে আমি বিঘ্ন ঘটাতে চাই না। তোমাকে ক্রমাগত দেখব অথচ তোমার দৃষ্টি হয়ত আমাকে উপেক্ষা ক'রে যাবে, মনও আমার মনকে স্পর্শ করবে না, এ ক্ষেত্রে সামনে থেকে আমি কি করব? নিজেকে আর যন্ত্রণা দিতে আমি চাই না। যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতাও আমার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ছোট মাসী ফিরে যাচ্ছেন আর কিছুদিন পরেই। সেই সময় ভূদেববাবুরাও নামবেন, আমি সেই সঙ্গে চ'লে যাব। ছোট মাসী নিরন্তর চেষ্টা ক'রে এদের মনোভাব খানিকটা বদলে দিয়েছেন। সকলেই ধ'রে নিয়েছেন আমি অনভিজ্ঞা বালিকা মাত্র, বিবাহ যে কি জিনিষ তাই জানি না। এই জন্যেই আমি ভূদেবকে প্রত্যাখ্যান করেছি।

তাঁরা আমাকে কিছুকাল সময় দিতে রাজী আছেন তৈরী হয়ে নেবার জন্যে। কিছুদিন armistice চলবে, আমার উপর কোন আক্রমণ হবে না। এই সময়টা আমি কাজে লাগিয়ে নেব স্থির করেছি।

তার পরও যদি আমার সময় না আসে, তা হলে কলকাতায়ই ফিরে যাব হয়ত। কিন্তু তার এখনও দেরী আছে।

জ্যোতি, তুমি একবারও ভেবো না যে আমি অভিমান ক'রে এইসব কথা লিখছি। অভিমান যদি থাকে ত সে ভাগ্যেরই প্রতি অভিমান। তোমার জন্যে কিছু যে আমি করতে পারলাম সেই আমার সৌভাগ্য। আমাকে দুঃখ দিলে ব'লে কখনও দুঃখ ক'রো না। সহ্য অনেক করলাম, কিন্তু তোমার ভালবাসার উপর অধিকারও আমার জন্মাল।

আমি ভাল নেই। তুমি খুব ভাল থেকো, সাধ্যের বেশী খাটতে যেয়ো না।

আমার জীবনে ভালবাসার একমাত্র পাত্র তুমি। তোমাকে নতুন ক'রে ভালবাসা আর কি জানাব?

আমাকে মনে রেখো। দুর্গম পথে চলেছ, সে পথের সাথী আমি হতে পারলাম না। ভগবান্ তোমায় রক্ষা করুন। ইতি

তোমার ঊর্ম্মিলা।

১৫

জ্যোতির্ম্ময়ের কাজকর্ম্ম ভালই চলিতেছিল, আরও ভাল যে চলিবে তাহার আভাসও সে মাঝে মাঝে পাইতেছিল। আশা করিতেছিল, এই বৎসরের শেষেই সে ঋণমুক্ত হইতে পারিবে।

ঊর্ম্মিলার চিঠি এই সময় তাহার হাতে আসিয়া পড়িল। চিঠিখানা যেন অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া আসিয়াছে। চিঠি পড়িয়া অনেকক্ষণ জ্যোতির্ম্ময় পীড়িতচিত্তে নীরবে বসিয়া রহিল। ঊর্ম্মিলা লিখিয়াছে বটে সে তাহার উপর অভিমান করে নাই, কিন্তু এ পত্রের ছত্রে ছত্রে ত অভিমান। বলিয়াছে বটে যে সে ভাগ্যের উপর অভিমান করিয়াছে, কিন্তু এখানে ভাগ্যরূপে ত জ্যোতির্ম্ময়ই বর্ত্তমান? তাহার আবেদন সে গ্রাহ্য করিয়াছে, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ের বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করে নাই। সবচেয়ে বড় কথা এই যে তাহার ভালবাসার উপরেও ঊর্ম্মিলা অভিযোগ করিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময় নিজের জীবনে প্রেমকে ছোট করিয়া এমন কোন জিনিষকে উচ্চস্থান দিয়াছে যাহা ঊর্ম্মিলা বুঝিতে পারে না।

কিন্তু নিজের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিবার কথা জ্যোতির্ম্ময়ের বিশেষ কিছু নাই। সে আর সব ভাবনা ভুলিয়া ছুটিয়া যাইতে পারে নাই, ঊর্ম্মিলার কাছে। নিজের প্রেমকে অধিকতর মর্য্যাদা দেওয়ার জন্যই যে এই অপরাধ তাহার, তাহা ঊর্ম্মিলাকে সে কেমন করিয়া বুঝাইবে। যে নিজে স্ত্রীলোক হইয়াও লজ্জা-সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়াছিল ভালবাসার খাতিরে, সে একথা মানিবে কেন? কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জীবনের সমস্যাটা ত এক নয়। নারী যেখানে সব হারাইয়াও প্রেমাস্পদের বুকে স্থান পাইয়া সার্থক, পুরুষ সেখানে নিজেকে ব্যর্থ পরাজিত মনে করে। নিজের সাধনার পথে সে ঊর্ম্মিলাকে সঙ্গিনী করিতে পারিল না, এই দুঃখে ঊর্ম্মিলা যেন জ্যোতির্ম্ময়ের জীবন-পথ হইতেই সরিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে। কিন্তু এ যে বড় সর্ব্বনাশের কথা? তাহার সমস্ত সাধনা, সমস্ত তপস্যা কি এই নিদারুণ ব্যর্থতার মধ্যে শেষ হইবে?

আর একবার তাহাকে যতটা পারে বুঝাইয়া চিঠি লিখিতে হইবে। তাহাতেও যদি ঊর্ম্মিলার মনের ক্ষোভ না যায়, তাহা হইলে জ্যোতির্ম্ময় এখন নিজের জীবনের যে ব্যবস্থা করিতেছিল তাহা আর চলিবে না। ঊর্ম্মিলাকে নিজের জীবনে আগে স্থান দিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বজীবনের ব্যর্থতা রিক্ততার স্মৃতি নিঃশেষে তাহার মন হইতে মুছিয়া দিতে হইবে। তাহার পর অন্য কাজ। এইটুকু মাত্র আশার কথা যে, ঊর্ম্মিলা জ্যোতির্ম্ময়কে কুণ্ঠিত মনে তাহার নিকট আসিতে বারণ করিয়াছে। সে মাথা উঁচু করিয়া যায় ইহাই ঊর্ম্মিলারও কাম্য। ইহারই উপর ভরসা করিয়া যদি সে এই সংশয়ের সাগর পার হইতে পারে।

কলিকাতায় আসাতে মত তাহার নাই। জ্যোতির্ম্ময়ের কাছে আসিতে সে চায় না। ইহাও অতিশয় অভিমানের কথা। ইহা মানিয়া লওয়া ছাড়া উপায় কি? যদিও সুদেবের সদিচ্ছা সম্বন্ধে সন্দেহ জ্যোতির্ম্ময়ের মনে ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছিল।

অনেক ভাবিয়া সে চিঠি লিখিতে বসিল—

প্রাণাধিকাসু,

উর্ম্মিলা, তোমার চিঠি পেলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পার নি। পারবার কথাও নয়। তবু আবার আমার আবেদন জানাচ্ছি। যা করছি, সাধ্যমত ভেবে করছি, দু'জনের কল্যাণ হবে এই ভেবে করছি। অবশ্য মানুষের বিচারের ভুল, বুদ্ধির ভুল হতেও পারে। তুমি যখন করুণা ক'রে আমায় রক্ষা করতে এসেছিলে, তখন লজ্জা, মান, ভয় বিসর্জ্জন দিয়েই এসেছিলে। তুমি আমার এ ভীরুতা সহ্য করবে কেন? কিন্তু শুধু ভীরুতাই তুমি এটাকে ভেবো না উর্ম্মিলা। আমার ভালবাসাই মনে হয় যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি আমি মাথা নীচু ক'রে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। এই ভেবে ক্ষমা করতে চেষ্টা ক'রো। আর যাই কর, আমার ভালবাসায় অবিশ্বাস ক'রো না। আমার জীবনের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে সত্য জিনিষ এটা। এরই পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য, একেই পরিপূর্ণ করার জন্য এত অপরাধ করছি তোমার কাছে।

মানুষের মনে সন্দেহ আসতে পারে উর্ম্মিলা, সে মনে ভালবাসা যতই থাক, একনিষ্ঠতা যতই থাক। নিবিড়তম মিলনের আনন্দের মধ্যেও যদি এই সন্দেহ তোমার মনে জাগে যে আমার ভালবাসায় এই ঋণশোধের প্রবৃত্তি জড়িত রয়েছে, তা হলে তার চেয়ে বড় অপমান আমার প্রেমের আর কি হতে পারে? এই সর্ব্বনাশ থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর। আর নিজেকেও রক্ষা কর এই নিদারুণ আঘাতের হাত থেকে। যাকে মহা ঐশ্বর্য্য ব'লে বুকে তুলে নিয়েছ, সে যেন তোমার বাহুবন্ধনের মধ্যে ধূলিরাশি না হয়ে যায়।

এখানে আসবে না শুনে দুঃখিত হলাম অত্যন্ত, শঙ্কিতও হলাম খানিকটা। সুদেববাবুর কথার উপর তুমি কি খুব আস্থা রাখ? আমি ত রাখতে পারছি না। তোমাকে একেবারে অক্ষুণ্ণ শান্তিতে কি তাঁরা দেবেন থাকতে? দেখ কিছুদিন চেষ্টা ক'রে। এখানে থাকার ব্যবস্থা তোমার বরাবরই থাকবে। যখনই দরকার হবে চ'লে আসবে। এর বেশী ক'রে ডাকবার অধিকার আমি হারিয়েছি। তুমি আর আমাকে এখন চোখেও দেখতে চাও না? মনে কর তোমাকে আমি দেখতে পাব না, চোখের সামনে থাকলেও। এত অপরাধ করেছি আমি? এই তোমার ধারণা আমার সম্বন্ধে?

উর্ম্মিলা, একটা কথা তোমায় ব'লে রাখছি, যে পথে এখন আমি চলেছি তাতে সম্মতি তোমার আছে ধ'রে নিয়েই চলেছি, যদিও এ সম্মতির মধ্যেও অভিমান রয়েছে, অভিযোগ রয়েছে। তবু এ সম্মতি যদি তুমি প্রত্যাহার কর, আমি এ পথ ছেড়ে দেব। অথবা বেশী অসুবিধা তোমার যদি হয় তা হলেও ছেড়ে দেব। আমাকে নিষ্ঠুর ভেবো না, অবিবেচক ভেবো না। যা কিছু আমি ব্যবস্থা করেছি সব প্রত্যাহার ক'রে নেব, তুমি বললেই। তবে আমাকে এইটুকু দয়া যদি তুমি কর, আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। নিজের শরীর মনের যত্ন ক'রো। এখানে অবহেলা ক'রে আমাকে শাস্তি দিও না এই প্রার্থনা।

আর কি লিখব তোমাকে? ভাল ক'রে ভেবে আমার চিঠির জবাব দিও। তুমি যা বলবে আমি তাই করব, নিশ্চয় জেনো। বেশী দুঃখ পেয়ে আমাকে তার দ্বিগুণ দুঃখ দিও না। তুমি এ পথে আমার সাথী হতে পারলে না ব'লে দুঃখ করেছ, কিন্তু দূরে থেকে সহায় হও।

আমরা আছি একরকম। আরতি প্রায়ই গিয়ে তোমাদের জিনিষপত্র পরিষ্কার ক'রে আসে। তারণের বৌ আসাতে কাজের বেশ সুবিধা হয়েছে।

আজ এইখানে থামলাম। আমার ভালবাসা জানাচ্ছি।

ইতি
তোমার জ্যোতির্ম্ময়।

চিঠি পাঠাইয়া দিয়া জ্যোতির্ম্ময় নিজের অভ্যস্ত কর্ম্ম লইয়া বসিল। কিন্তু আজ আর কোনকিছুর ভিতর রস খুঁজিয়া পাইল না। দুস্তর পারাবার যে সন্তরণ করিয়া পার হইতেছে, হঠাৎ তাহার চোখের সম্মুখে যদি তটভূমি মিলাইয়া যায় তাহার যে অবস্থা হয়, জ্যোতির্ম্ময়ের মনেও সেইরকম একটা হতাশা মাথা তুলিতে লাগিল। কাজ তাহার ভালই চলিতেছে, অর্থও কিছু কিছু হাতে আসিতেছে। এ সব উপার্জ্জনের কথা সে মা-বাবাকে জানায় নাই। আন্দাজে তাঁহারা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই সে তাঁহাদের বুঝিতে দিয়াছে। বাড়ী-সম্পত্তির ঋণ শোধ করিবার জন্যই প্রাণপণ করিতেছে সে, ইহাই তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন। কথাটা মিথ্যাও কিছু নয়। উর্ম্মিলা সম্বন্ধে

বিশেষ কিছু ভাবিবার তাঁহাদের কারণ নাই। তাহাদের বাড়ীঘর তদারক করিতে জ্যোতির্ময় যায়, আরতিও যায়, এটা প্রতিবেশী হিসাবে কর্ত্তব্য, ইহাই তাঁহারা মনে করেন। আরতি তরুণী, সে দাদার পরিবর্ত্তনটা বেশী লক্ষ্য করে। উর্ম্মিলাদি চলিয়া যাওয়ার পর দাদা অনেকখানিই যেন বদলাইয়া গিয়াছে। আগে যেমন মা বা বোনের গল্পের মধ্যে আসিয়া যোগ দিত, এখন আর তাহা করে না। বাবার সঙ্গেও প্রায়ই কথা বলে না। উর্ম্মিলাদি যে প্রায়ই দাদাকে চিঠি লেখে তাহা সে বুঝিয়াছে। দাদাও মস্ত মস্ত চিঠি লেখে এবং লিখিয়া আরও বেশী গম্ভীর হইয়া যায়। ব্যাপারটা যে হৃদয়ঘটিত তাহা সে ভালই বোঝে, সেইজন্য দাদাকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করে না। বাড়ীর কাছের পার্কটাতে সে একবারও যে বেড়াইতে যায় না, তাহাও আরতি লক্ষ্য করিয়াছে। মাকে কিছু বলিবে কিনা মনে মনে চিন্তা করে, তাহার পর আর বলে না, বলিয়া লাভই বা কি? দাদার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া এখনও ঘটকী আসে, আরতির হাসি পায়।

উর্ম্মিলাদের দিন কাটিতেছিল মোটামুটি একই ভাবে। সুলাঙ্গিনী সারাদিনই ঘুরিতেন, জিনিষ কিনিতেন এবং ভূদেববাবুর বাড়ীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা যেন আরো দৃঢ় হয় তাহারই চেষ্টা করিতেন। কর্ত্তা ও গৃহিণী এখন ব্যাপারটাকে মানিয়াই লইয়াছেন, দেরী আরো কিছুদিন করিতে হইবে, তাহা হউক। গৃহিণীর মনে বিশেষ করিয়া সুদেবের ভাবী পত্নী সম্বন্ধে খানিকটা ঈর্ষা সঞ্চিত ছিল, সেটা অবশ্য তিনি কাহারও কাছে প্রকাশ করিতেন না। নিজে দেখিতে আর ভালো নাই, তাঁহার মেদবহুল চেহারা লইয়া পতিপুত্রও তামাসা করে, এটা বাড়ীর মধ্যে তিনি সহ্য করিয়া যান, কিন্তু তরুণী সুন্দরী পুত্রবধূর সামনে ইহা তিনি সহ্য করিতে চান না। বৌ যতদিন না আসে, ততদিনই ভাল। ছেলের হৃদয়ের উপরেও যে বধূই মাতার চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করিবে, ইহাও ভাবিতে তাঁহার একেবারেই ভাল লাগে না।

সুদেবের মনের ক্ষোভটা অবশ্য যায় নাই। তবু উর্ম্মিলাকে আজকাল আর বেশী বিরক্ত সে করে না। তবে দেখা করিতে রোজই আসে। ব্যক্তিগত কথাবার্ত্তা বেশী বলে না, তবে নিজে যে একজন কৃতী পুরুষ তাহা জানাইবার চেষ্টাটা ছাড়ে নাই। নানা বিষয়ে আলাপ করিতে চেষ্টা করে। কলিকাতায় বাসকালীন উর্ম্মিলার দিন কি ভাবে কাটিত, সে বিষয়ে নানা প্রশ্ন করে। যুবক বন্ধু কেহ আছেন কিনা, সে বিষয়েও কৌতূহল প্রকাশ করে। খুব বেশী তথ্য অবশ্য এখনও পর্য্যন্ত সে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয় নাই। তবে জ্যোতির্ময়ের নামটা মাঝে মাঝে সে শোনে। এই যুবকটি সম্বন্ধে অস্পষ্ট একটা সন্দেহ তাহার মনে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আনন্দ ও বিষাদ মিশ্রিত একটা ভাব এখন উর্ম্মিলার চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে। হৃদয় তাহার কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু তৃষ্ণার অবসান ত ঘটে নাই? যেখানে আগে নিজের অধিকার নাই ভাবিয়া সে থামিয়া যাইত, এখন সেখানে আর থামিতে পারে না। প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। এ কোন্ বিরূপ ভাগ্য তাহাকে জলের মধ্যে রাখিয়াও তৃষ্ণায় পুড়াইয়া মারিতেছে? যে প্রিয় তাহার বিশ্বজগৎ জুড়িয়া বসিয়া আছে, তাহাকে সে পায় না কেন চোখের দৃষ্টির মধ্যে, হাতের স্পর্শের মধ্যে? কতদিন আর সে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিবে? পাইবেই কি কোনদিন? তাহার পরমায়ু আর কতটা আছে কে জানে? স্বাস্থ্যের জন্য নিজেরই তাহার দুশ্চিন্তা হয়, পাহাড়ে বেড়াইতে আসিয়া কোন উন্নতিই তাহার হয় নাই।

এক-একবার ইচ্ছা করে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে। কিন্তু নিষিদ্ধ স্বর্গের দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবার যন্ত্রণা কি সহ্য করিতে পারিবে? শরীরে যদি বা সহ্য হয় মনে ত কিছুতেই সহ্য হইবে না। আর জ্যোতির্ময়ও ত রক্ত-মাংসের মানুষ? যতই দৃঢ়চিত্ত সে নিজেকে মনে করুক, তাহারও ত তপস্যায় বিঘ্ন ঘটা অনিবার্য্য। ইহা সে করিতে চায় না। অনিচ্ছুক প্রণয়ীকে নিজের বাহুবন্ধনে টানিয়া আনিবার হীনতা উর্ম্মিলা কোনদিন স্বীকার করিবে না। জীবনে পরম লগ্ন যদি কোনদিন তাহার আসে তাহা হইলে তাহাকে ছুটিয়া যাইতে হইবে না, তাহাকেই বরণ করিয়া লইতে আসিবে তাহার প্রিয়। বসিয়া থাকা ছাড়া তাহার উপায় নাই, বসিয়াই তাহাকে থাকিতে হইবে।

সুলাঙ্গিনীর কলিকাতায় ফিরিবার দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। উর্ম্মিলাও সেই সঙ্গে পাটনা চলিয়া যাইবে। দু' একদিন বাধ্য হইয়া তাহাকে সুদেবের বাড়ী থাকিতে হইবে, তাহার পর কর্ম্মস্থানে চলিয়া যাইবে।

এমন সময়ে জ্যোতির্ময়ের চিঠি আসিল। পড়িয়া অনেকক্ষণ উর্ম্মিলা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে ভাল করিয়া ভাবিয়া উত্তর দিতে লিখিয়াছে জ্যোতির্ময়। কি ভাবিবে সে? তাহার সব ভাবা ত হইয়া গিয়াছে। জ্যোতির্ময় যেটাকে হীনতা ভাবিতেছে, তাহার মধ্যে উর্ম্মিলা কখনই তাহাকে টানিয়া আনিতে চাহিবে না। সর্ব্বস্ব

দিয়া যে ধন্য হয় না, তাহার কাছে কখনও সর্ব্বস্ব চাওয়া যায় না। উর্ম্মিলা ভিখারিণী নয়।

তবু একদিন দেরী করিয়াই সে চিঠির জবাব দিল। একবার ভাবিল, ছোটমাসীর সঙ্গে পরামর্শ করিলে হয়। তাহার পর ভাবিল, ইহা একেবারেই তাহার নিজের অন্তরতম লোকের ব্যাপার; বাহিরের লোকের দৃষ্টি ইহাতে না পড়াই ভাল। লিখিল,

জ্যোতি,

তোমার চিঠি পেলাম। আমার চিঠি প'ড়ে তোমার মনে হয়েছে, আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি নি। এটা তোমার ভুল ধারণা জ্যোতি। ক্ষমা করবার ছিলই বা কি? তুমি যেটাকে ঠিক পথ ভেবেছ, সেই পথে তুমি চলেছ। এতে আমি অপরাধ নিতে পারি কখনও? আমার সম্বন্ধে "প্রার্থনা, ক্ষমা, ভিক্ষা বা অপরাধ" এ কথাগুলো তুমি ব্যবহার ক'রো না। এসব যাঁর সম্বন্ধে লেখা যায়, তিনি মানুষের অনেক উপরে থাকেন। আমি সামান্য মানুষ, তোমার উপরে স্থান নেবার স্পর্দ্ধা রাখি না। পথে দেখা হয়েছিল, কিন্তু এখন পিছিয়ে পড়েছি। তাই ব'লে ভেবো না যে, আমি তোমাকেও পিছন দিকে টানব। পিছন ফিরে ক্রমাগত আমার দিকে তাকালে যদি তোমার বিঘ্ন হয়, তাও তুমি ক'রো না। আমি কারও পায়ের বেড়ী হতে চাই না। সহ্য করা, অপেক্ষা করা আমার অভ্যাস আছে, তাই আমি ক'রে যাব।

অল্প কয়দিন পরে ছোটমাসী কলকাতায় ফিরে যাবেন। আমিও পাটনায় যাব সেই সময়ে। এখানের ঠিকানায় আর একটার বেশী চিঠি দিও না। আমি পাটনায় পৌঁছে নূতন বাসস্থানের ঠিকানা দিলে তারপর চিঠি লিখো। আশা করছি কিছুকাল খানিকটা শান্তিতে আমি থাকতে পারব। না যদি পারি তা হলে কলকাতায়ই যাব। যেতে চাইছি না ব'লে তুমি মনে দুঃখ পেয়েছ। আমি দুঃখ দেবার জন্যে বলিনি জ্যোতি। সত্যই আমি যদি গিয়ে তোমার দৃষ্টিপথ আগলে দাঁড়াই, তাতে তোমার কাজের ব্যাঘাত হবে। তোমাকে নিষ্ঠুর আমি কি ক'রে ভাবব? আমার স্মৃতি এত মিথ্যা বলে না। দয়ামায়া লুকোতে তুমি পার নি, যদিও ভালবাসা লুকিয়েছিলে। তোমার ভালবাসায় সন্দেহ আমি করি না, কোনদিন করবও না।

আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। তোমার যে পথ, সেই পথেই চল তুমি। তাই আমি চাই।

আজ আর কি লিখব? তুমি কেমন আছ জানিও। বেশী পরিশ্রম ক'রে নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি ক'রো না। আমি ভাল থাকতেই চেষ্টা করি। স্বপ্নে জাগরণে তুমি সর্ব্বক্ষণই আমার সঙ্গেই আছ, এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা এখন। আমার ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমার উর্ম্মিলা।

চিঠি পাইয়া এবারেও জ্যোতির্ম্ময় খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার যাহা চাহিবার, তাহা চাওয়া হইয়া গেল, উত্তর যাহা দিবার তাহা উর্ম্মিলা দিল। বলিবার আর কিছু নাই, এখন শুধু কাজ করিয়া যাইবার সময়। অত্যন্ত সাধারণ ছোট একটা চিঠি সে লিখিয়া পাঠাইল উর্ম্মিলাকে, তাহাতে নিজেদের জীবনসংগ্রামের সমস্যার কথা কিছুই লিখিল না। উর্ম্মিলাকে বারবার করিয়া অনুরোধ জানাইল, কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার জন্য, যদি সে পাটনায় কোন অসুবিধা বোধ করে। এখানেও সে উর্ম্মিলার জন্য চাকরীর চেষ্টা করিয়াছে, তাহাও জানাইল। চাকরী পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

তাহার পর কাজের মধ্যে আবার ডুব দিল। দিনরাত্রির মধ্যে বিশ্রাম তাহার খুব অল্পই রহিল। মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ পড়িয়া গেল। শরীর তাহার অত্যন্ত বলিষ্ঠ হওয়ায়, ইহার চেয়ে বেশী শারীরিক অবনতি তাহার হইল না। সুখদা ও রামগতি ছেলের পরিবর্ত্তনে খুবই বিস্মিত হইয়া গেলেন। মা সাহস করিয়া ছেলেকে দুই-চারিটা প্রশ্ন করিলেন, তবে খুব সন্তোষজনক উত্তর কিছু পাইলেন না। আরতি সব বুঝিয়াও কিছু বলিল না। মাঝে মাঝে দাদার সঙ্গে উর্ম্মিলাদির ঘরবাড়ী তদারক করিতে গিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া যাইত। দাদা যেরকম স্তব্ধভাবে উর্ম্মিলার ঘরে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহাতেই তাহার মনের গভীর বিচ্ছেদ-দুঃখ আরতি খানিকটা বুঝিতে পারিত। উর্ম্মিলার উপর তাহার রাগ হইত। এমন করিয়া চলিয়া যাইবার কি প্রয়োজন ছিল? সে ত স্বচ্ছন্দেই তাহার দাদাকে বিবাহ করিয়া এখানে থাকিতে পারিত?

সুলাঙ্গিনী জিনিষপত্র কেনাকাটা শেষ করিলেন। ইহার পর জিনিষ গুছাইবার জন্য তাঁহার কলিকাতায়

ফিরিয়া যাওয়া প্রয়োজন। তবে ঊর্ম্মিলাকে পাটনার পথে রওনা করিয়া দিয়া তবে তিনি বাহির হইবেন। ভূদেব-বাবুদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা তিনি নিরন্তর চালাইয়াই যাইতে লাগিলেন।

কলিকাতায় যাইবার দু-তিনদিন আগে তিনি সুদেবদের বাড়ী সকালের দিকে একবার বেড়াইতে গেলেন। পাশের ঘরের একটি মেয়ের সঙ্গে ঊর্ম্মিলার বেশ ভাব হইয়াছিল, সে তাহারই সঙ্গে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

ভূদেবগৃহিণী আদর-অভ্যর্থনা করিয়া সুলাজিনীকে বসাইলেন। কর্ত্তা পাশের ঘরে বসিয়া কাগজ পড়িতে-ছিলেন। তিনি কাগজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন দেখিয়া একবার ভ্রূকুটি করিলেন। এই বিগত-যৌবনা সুন্দরীর মধ্যে কি যে ভূদেব আবিষ্কার করিয়াছেন তা তিনিই জানেন। মহিলা রূপবতী হইলে কি হয়, বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ইহার মধ্যে একেবারেই নাই। ভূদেব-গৃহিণী মনে মনে ইহাকে খানিকটা বিরাগের চক্ষেই দেখেন। তবে পতি ও পুত্র ইহার এতই ভক্ত যে বাহিরে কোন বিরাগ তিনি প্রকাশ করিতে পারেন না।

সুদেব জিজ্ঞাসা করিল, "ঊর্ম্মিলা কোথায় ?"

সুলাজিনী বলিলেন, "পাশের ঘরের একটা মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে, তাদের সঙ্গে বার্চ্ হিলে পিক্‌নিক্ করতে গেল।"

সুদেব বলিল, "অতটা uphill হেঁটে যাবে ? ওর শরীর ত ভাল নয়।"

সুলাজিনী মনে মনে বলিলেন, 'বাছা আমার বাঁচলে বাঁচি!' মুখে বলিলেন, "সঙ্গে রিক্‌শ, ডাণ্ডি সবই থাকবে। ক্লান্ত লাগলেই উঠে বসবে। নিজের যত্ন জানে না যে ? আমিও আবার কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি, কেমন যে থাকবে, কে জানে ?"

সুদেবের মা বলিলেন, "থাকত যদি আমার বাড়ী ত আপনাকে পুরোপুরি আশ্বাস দিয়ে দিতাম। কিন্তু অন্য লোকের বাড়ী, তারা আবার বাঙালীও নয়, কেমন থাকবে কে জানে ? তবে তারা একেবারে পাড়াগেঁয়ে নয়। আধুনিক ধরণ-ধারণ একটু জানে। ওর আলাদা রান্নাঘর ক'রে দেবে, বসবার ঘর, শোবার ঘরও আলাদা আলাদা দেবে, একটা মহলই ক'রে দিচ্ছে প্রায় ওর জন্যে। ইচ্ছামত খাওয়া-দাওয়া করতে পারবে।"

সুলাজিনী অত্যন্ত ভালমানুষ সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরা খুব পর্দ্দানশীন নাকি ? বাইরের লোক এলে-গেলে আপত্তি নেই ত ?"

ভূদেব-গৃহিণী বলিলেন, "আমি ত যখন খুশি যেতে পারি, যাইও অনেক সময়। তবে তাঁদের অন্দরমহলে পুরুষদের যাওয়ার একটু অসুবিধে আছে। তা আগে খবর দিলে তারা দেখা করার ব্যবস্থা করবে।"

সুদেব বলিল, "এই জন্যই আমি স্কুলের কাজের পক্ষপাতী। এ সব মধ্যযুগের ব্যবস্থায় আমাদের অসুবিধে হয়। অনাত্মীয় কোন যুবক ঊর্ম্মিলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে দেখলেই তারা হয়ত মূর্চ্ছা যাবে।"

সুলাজিনী মনে মনে বলিলেন, 'বেঁচে থাক্ তাদের পর্দ্দা। মেয়েটা বাঁচবে।' তাহার পর অন্য বিষয়ে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। সুলাজিনী নিজের জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিলেন। ঊর্ম্মিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সঙ্গে কাপড়-চোপড় যা আছে তাতেই চলবে ? না কলকাতায় গিয়ে আরো কিছু পাঠিয়ে দেব ?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "চলাই উচিত, ওখানে আর বেশী সাজগোজের কি প্রয়োজন হবে ? তবে একটা বাক্স আমি প্যাক ক'রে কলকাতায় রেখে এসেছি, সেটা কারো সঙ্গে পাটনা পাঠিয়ে দিতে পার। বই-টই অনেকগুলো আছে, সময় কাটাবার কাজে লাগবে। কাপড়-চোপড়ও spare দু-চারটে থাকা ভাল।"

ভূদেববাবুরা অতঃপর যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় ঊর্ম্মিলা বলিল, "ছোটমাসী, জ্যোতিকে ব'লো আমি ভালই আছি। শরীর ভাল নেই শুনলে সে বড় worry করবে।"

সুলাজিনী বলিলেন, "তাই বল্‌ব। তবে worry করার লোক একটা ধারে কাছে থাকা ভাল।"

১৬

রবিবার সকালে জ্যোতির্ম্ময়ের কাজ একটু কম। বসিয়া বসিয়া সে খবরের কাগজ পড়িতেছিল। আরতি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দাদা, ঊর্ম্মিলাদির মাসী এসে গেছেন।" বলিয়াই সে নীচের তলায় দৌড় দিল। জ্যোতির্ম্ময় উঠিয়া বোনের অনুগমন করিল।

সুলাজিনী তখন ফুটপাথে নামিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তারণ জিনিষপত্র নামাইতেছে। সঙ্গে সুলাজিনীর এক বোন-পো আসিয়াছে, সে জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিয়া নমস্কার করিল। ইহাদের সহিত মৌখিক আলাপ তাহাদের হইয়া গিয়াছিল।

জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিয়া সুলাজিনী হাসিয়া বলিলেন, "কি জ্যোতি, খবর ভাল ত?"

আগে নমস্কার করিত, এখন প্রণাম করিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ভালই আছি। ওখানে কেমন ছিলেন সকলে?"

সুলাজিনী বলিলেন, "ভাল আর কই? আমি নিজে অবশ্য সব জায়গাতেই ভাল থাকি। উর্ম্মিলা ত দেখছি কোন জায়গাতেই ভাল থাকে না। এখান থেকে যাবার আগে, বরং ভাল ছিল।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এখানেই কেন নিয়ে এলেন না, কোন অসুবিধা হত না এখানে।"

অন্য যুবকটি এই সময় প্রস্থান করিল। তারণকে জিনিষপত্র সব উপরে লইয়া যাইতে বলিয়া সুলাজিনী বলিলেন, "কথা কি শোনে? তোমার কথাই শুনল না তা আমার কথা। চল, উপরে বসবে।" বলিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। জ্যোতির্ম্ময় তাঁহার সঙ্গে উপরে উঠিয়া বসিবার ঘরে বসিল।

সুলাজিনী বলিলেন, "ঘরদোর ঠিকই আছে দেখছি। তারণ ফাঁকি দেয় নি, তোমরাও খুব ভাল দেখাশোনা করেছ। এখনও কিছুদিন নজর রেখো, যতদিন না আমি ফিরে আসি। উর্ম্মিলাও এসে পড়তে পারে, যদি বেশী খারাপ লাগে ওখানে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ওখানে সুবিধে হবে মনে হয় আপনার? ভূদেববাবুরা দেখাশোনা করবেন ঠিকমত?"

সুলাজিনী বলিলেন, "বলা শক্ত। বুড়োবুড়ী উৎপাত করবে না কিছু। গিন্নীটির একটু হিংসে আছে উর্ম্মিলার উপর, তিনি দেরীতে বিয়ে দিতেই চান, ভূদেববাবুর দেরীতেও আপত্তি নেই, তাড়াতাড়িতেও আপত্তি নেই। তবে সুদেবটাকে নিয়ে মুশকিল। অনেক রকম ক'রে বুঝিয়ে ত এলাম। এখন মাথায় সে সব ঢোকে তবে না?"

জ্যোতির্ম্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "উর্ম্মিলার উপর হিংসা কেন ভদ্রমহিলার?"

সুলাজিনী বলিলেন, "তাঁকে ত দেখ নি, দেখলে বুঝতে। মোট কথা অমন একটি সুন্দর অল্পবয়সী মেয়ে তাঁর বাড়ীতে, তাঁর চারপাশে ঘুরবে এ তাঁর ভাল লাগছে না।"

জ্যোতির্ম্ময় হাসিয়া বলিল, "কি মুশকিল। সুন্দর হওয়াটাও অপরাধ নাকি?"

সুলাজিনী বলিলেন, "কোন কোন ক্ষেত্রে বটে। ভদ্রমহিলা সুন্দর মানুষ একেবারে দেখতে পারেন না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তা হলে ছেলের জন্যে খুব কুৎসিত দেখে বৌ খুঁজলে পারতেন।"

সুলাজিনী বলিলেন, "মাদের পছন্দ যেমনই হোক, ছেলেরা ত সর্ব্বদাই সুন্দরী খোঁজে।"

আরো দু'চারিটা কথার পর জ্যোতির্ম্ময় উঠিয়া পড়িল। সুলাজিনী আরো দুইদিন থাকিয়া বোম্বাই যাত্রা করিবেন। তিনি সারাক্ষণ জিনিষ কেনা আর গোছান লইয়াই ব্যস্ত থাকিলেন।

যাইবার আগের দিন জ্যোতির্ম্ময়কে ডাকিয়া বলিলেন, "জ্যোতি, একটা কথা ব'লে যাই। Interfering old woman মনে ক'রো না। যদি শোন যে উর্ম্মিলা ওখানে বেশী অসুস্থ বা বেশী depressed হয়ে পড়েছে, তা হলে নিজে গিয়ে তাকে জোর ক'রে নিয়ে এস। তুমি নিজে গিয়ে সামনে দাঁড়ালে সে 'না' বলতে পারবে না। তাকে ত আমি চিনি? অন্য যে considerationই থাক, এটা ক'রো।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "নিশ্চয় করব।"

সুলাজিনী বলিলেন, "ঘরদোর রইল। চাকর-বাকরও রইল। কোন রকম প্রয়োজন হলে কাজে লাগাতে পার, কোন সঙ্কোচ ক'রো না।"

সুলাজিনী তাহার পরদিন চলিয়া গেলেন। ঘরে ঘরে আবার তালা পড়িল।

উর্ম্মিলা পাটনায় পৌছিয়া দু'তিনদিন ভূদেববাবুদের বাড়ীতেই থাকিবে। সেখান হইতে সে জ্যোতির্ম্ময়কে চিঠি লিখিতে চায় না। কর্ম্মস্থানে পৌছিয়া তবে চিঠি লিখিবে। সুতরাং মাঝে চার-পাঁচদিন চিঠি না পাইয়া অশান্তি ভোগ করিলেও জ্যোতির্ম্ময় কিছুই বিস্মিত হইল না।

কয়েকদিন পরে একখানা চিঠি পাইয়া খানিকটা নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিল। উর্ম্মিলা তাহার কর্ম্মস্থানে গিয়া পৌছিয়াছে। সেখানের লোকজনগুলি মন্দ নয়। ছাত্রীটি বুদ্ধিমতী, তবে ধরণ-ধারণে অতিশয় সনাতনপন্থী।

বাড়ীর আবহাওয়া মধ্যযুগের, তবে উর্ম্মিলার জন্ম তাঁহারা সব ব্যবস্থাই আলাদা করিয়া দিবেন। শরীর তাহার যেমন থাকে তাহাই আছে। তবে এক বিষয়ে সে খানিকটা নিশ্চিন্ত, সুদেবের এ বাড়ীতে প্রায় প্রবেশ নিষেধ। মাসে দুই-একবার যথোচিত নোটিস দিয়া সে সাক্ষাৎ করিতে পারে। সঙ্গে মা থাকিলেই ভাল। সুদেবের নাকি ব্যবস্থাটা বিন্দুমাত্র ভাল লাগে নাই।

নিজের মনোরাজ্যের কোন খবরই দেয় নাই উর্ম্মিলা। জ্যোতি কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তাহার কাজকর্ম্ম কেমন চলিতেছে, আরতি কেমন আছে? শেষে ভালবাসা জানাইয়া চিঠি শেষ করিয়াছে। যেন পুরুষ বন্ধুর চিঠি। তাহার হরিণ-নয়না প্রিয়তমার কোন চিহ্নই প্রায় চিঠিতে নাই। সে কি জ্যোতির্ম্ময়ের নিকট হইতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে?

অনেক ভাবিয়া চিঠির উত্তর দিল—

প্রিয়তমাসু,

উর্ম্মিলা, কয়েকদিন পরে তোমার একখানি ছোট চিঠি পেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করছি। প্রায় এক সপ্তাহ চিঠি না পেয়ে বড়ই অশান্তিতে ছিলাম; তবে তুমি আগেই জানিয়েছিলে যে, চিঠি লিখতে পারবে না, কাজেই আমি আর খোঁজ করি নি।

উর্ম্মিলা, তুমি কি অভিমান ক'রে আমার কাছ থেকে দূরে স'রে যেতে চাইছ? আমাকে এ রকম শাস্তি দিও না। যে জন্যে খাটছি, নিজেকে তোমার কাছ থেকে এত দূরে সরিয়ে রেখেছি, তাতে তোমারই কল্যাণ বেশী হবে। আমাকে বিশ্বাস ক'রো।

একবার গিয়ে কি তোমায় দেখে আসতে পারি? এর ব্যবস্থা কি করা যায় না? অভিমান ক'রে আগেই 'না' ব'লে ব'সো না। আমার মনটাকে একটু ক্ষমার চক্ষে দেখতে চেষ্টা ক'রো। আমার অবস্থা যদি তোমার হত, তা হলে কিন্তু তোমায় আমি ফেরাতে পারতাম না।

ছোটমাসী এসেছিলেন, চ'লেও গেলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক গল্প হল। তারণ এবং তার স্ত্রী ঘরদোর খুবই পরিষ্কার রাখছে। যখন খুশি এসে উপস্থিত হতে পার। সুদেব গুপ্ত যে তোমাকে বেশী বিব্রত করতে পারছে না শুনে খুব নিশ্চিন্ত হলাম।

তুমি কেমন আছ ভাল ক'রে জানিও। তোমার ছোটমাসীর কাছে যা শুনলাম, তাতে আমার মানসিক অশান্তি বাড়ল বই কমল না। ওখানে তোমার জন্যে সব ব্যবস্থা ওরা করেছে ত?

আমার ভালবাসা জেনো। চিঠির পাতায় শুকনো কথায় এর কোন স্পর্শ কি তুমি পাও? আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি, কান দিয়ে এটা শুনতে, যেমন কয়েক মাস আগে শুনতাম। ভালবাসার কথা তুমি বলতে না, কিন্তু যা বলতে তাতেই এই সুর লেগে থাকত।

আজ এই পর্য্যন্ত। তাড়াতাড়ি চিঠির উত্তর দিও। ইতি

তোমার জ্যোতির্ম্ময়।

শেষ অবধি তাহার সাধনা বিফলই হইবে বলিয়া এখন জ্যোতির্ম্ময়ের আশঙ্কা হইতে লাগিল। আবহাওয়াটা কেমন যেন একটা অমঙ্গলের আভাসে ভরিয়া উঠিতেছে। কাজ তাহার ভালই হইতেছে। টাকাটা আসিতেছে হাতে। তবু মনে হয় সব বিফল। উর্ম্মিলা ভাঙিয়া পড়িবে, হয় দেহে, না হয় মনে। তখন এ সব বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেই ছুটিয়া যাইতে হইবে জ্যোতির্ম্ময়কে। আগের উর্ম্মিলাকে কি আর সে ফিরিয়া পাইবে?

উর্ম্মিলা যখন সুলাঙ্গিনীর কাছে বিদায় লইয়া পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিল, তখন মনে হইল, জীবনের একটা পর্ব্ব যেন একেবারেই তাহার শেষ হইয়া গেল। সে যেন কোন সংসারের কোন পরিবারের জীব নয়, শুষ্ক জীর্ণ গাছের পাতা, হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে, এক স্থান হইতে আর এক স্থানে উড়িয়া পড়িতেছে। তাহার ঘর নাই, দেশ নাই। কেহই যেন নাই। তখনই মনের মধ্যে ধিক্কার জাগিয়া উঠিল। কি ভাবিতেছে সে? এই ত জগৎসংসার পূর্ণ করিয়া হৃদয় জুড়িয়া তাহার প্রাণাধিক প্রাণ বসিয়া আছে একজন। তাহাকে ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে ভুলিতে পারে না। কেন এত শূন্যতা আসে তাহার মনে?

ট্রেনে তাহার শরীর ভাল থাকে না। বিশেষ করিয়া পাহাড়ের ট্রেনে। যখন আসিয়াছিল তখন ছোটমাসী

সঙ্গে ছিলেন, সেবা-যত্নের ত্রুটি হয় নাই। এবার কি হইবে কে জানে? সঙ্গিনী মহিলা হয়ত অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন। তিনি আবার শুচিবায়ুগ্রস্তা মানুষ। আর সুদেব ত অসুস্থতার নামে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে। সে যে কি করিবে ভাবিয়াই ঊর্ম্মিলার হাসি পাইল। তাহার অসুখের ঠেলায় যদি সুদেবের প্রেমরোগ সারিয়া যায় ত ভালই হয়।

তবে ভাগ্যক্রমে এবার আর ঊর্ম্মিলার বেশী অসুখ করিল না। ছোটমাসীর কাছে যাহা ঔষধ ছিল তিনি তাঁহাই দিয়া গিয়াছিলেন। তাহাই বার দুই সেবন করিয়া সে সামলাইয়া গেল। সুদেব তাহার অসুখ হইবার সম্ভাবনা জানিবামাত্র অন্য গাড়ীতে পলায়ন করিয়াছিল। এখন আবার ফিরিয়া আসিল। ভূদেব একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাকাইলেন। অনেককাল সংসার করিয়াছেন। হৃদয় জয় করিবার প্রথম সোপান যে হৃদয়হীনতা নয়, তাহা তিনি জানিতেন।

পথে আর কোন অসুবিধা হইল না। ভূদেববাবুদের সুশৃঙ্খল সংসারে আসিয়া তাহার দেহ আরাম পাইল বটে তবে সুদেব আবার বেশী যত্ন দেখাইতে গিয়া তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। খাওয়া-দাওয়ার পর সে ছাত্রীর বাড়ী দেখিতে চলিল গৃহিণীর সঙ্গে। ছাত্রীকে মন্দ লাগিল না। বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে মনে হয়। তবে জাঁক একটু বেশী। নাম রামদুলারি। তবে ঘরসংসার সকলেরই যে তিনি দুলারি ইহা প্রতি পদক্ষেপে বুঝা যায়।

বাড়ীতে লোকজন অসংখ্য। তবে বাড়ীও প্রকাণ্ড, কে কোথায় থাকে তাহা সব সময় বুঝা যায় না। সব ঘুরিয়া দেখিবার ধৈর্য্যও ঊর্ম্মিলার রহিল না। নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরগুলি দেখিতে তাহার খারাপ লাগিল না। ছোট ঘর, তবে সংখ্যায় দুইটা ত বটে? জানালাগুলি ছোট ছোট, অনেক উপরে অবস্থিত। সেগুলির ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত চলে না। রান্নাঘরও আলাদা, ঊর্ম্মিলার জন্য পরিচারিকাও আলাদা, সে ঊর্ম্মিলার নির্দ্দেশ মত রান্না করিতে পারিবে। মাছ, মাংস তাঁহারা নিজেরা খান না তবে ঊর্ম্মিলা ইচ্ছা করিলে মাছ খাইতে পারে।

দেখিয়া শুনিয়া ঊর্ম্মিলা ঠিক করিল, কালই সে এখানে চলিয়া আসিবে। এখানে আর যা অসুবিধাই তাহার হোক, সুদেবের লোলুপ দৃষ্টির সামনে তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইবে না। কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে আজকাল ঊর্ম্মিলার দিকে তাকায়।

বাড়ী ফিরিয়া গিয়া সে নিজের সংকল্পের কথা ভূদেব গৃহিণীকে জানাইল। তিনি ভদ্রতার খাতিরে একটা মৃদু আপত্তি জানাইলেন, কিন্তু তখনি নিরস্ত হইয়া গেলেন। সুদেব খানিকক্ষণ তর্ক করিল তাহার সঙ্গে, তবে সুদেবের কোন যুক্তি মানিতে ঊর্ম্মিলা রাজী হইল না। ভূদেববাবু নিরপেক্ষ হইয়াই রহিলেন। ছেলের ব্যবহারটা তাঁহার কাছে অসঙ্গতই বোধ হইত। তবে তর্কাতর্কির ভিতরে তিনি যাইতে চাহিতেন না।

ঊর্ম্মিলা জিনিষপত্র গুছাইয়া তাহার পরদিনই কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। সেখানে মোটামুটি সাদর অভ্যর্থনাই পাইল। ছাত্রীর অবশ্য হিন্দী বাংলা মিশাইয়া গল্প করায় যত উৎসাহ, পড়াশুনায় তত উৎসাহ দেখা গেল না। এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ কেন হয় নাই ঊর্ম্মিলার তাহাতেও বিস্ময় প্রকাশ করিল। তবে নিজেই সমস্যার সমাধান একটা করিয়া লইল এই বলিয়া, যে, মা বাবা যাহার নাই, সে মেয়ের বিবাহ গরজ করিয়া দিবেই বা কে?

পরদিন হইতে ঊর্ম্মিলা ছাত্রী পড়াইতে আরম্ভ করিল। ছাত্রী আবার নিজেই গৃহিণী। কাজেই তাঁহাকে শাসন ত করা যায়ই না, বরং তিনি আবার তোয়াজের আশাই করেন। সে জিনিষটা আবার ঊর্ম্মিলার ধাতে আসে না। মাঝামাঝি একটা ধারা অনুসরণ করিয়া সে চলিতে লাগিল। সুখের বিষয়, ছাত্রী ঠাকুরাণীর শিক্ষণীয় বিষয় বেশী ছিল না। তিনি বাংলা ও ইংরাজী পড়িতে ও বলিতে শিখিতে চান এবং শেলাইয়ের শখ আছে, শেলাই খানিকটা শিখিবার ইচ্ছা আছে। ঊর্ম্মিলার কাজ মোটামুটি হাল্‌কাই। সুখ শান্তি কিছুই তাহার মনে থাকিবার কথা ছিল না, তবে দিনগুলি নিরুপদ্রবে কাটিবে বলিয়া তাহার আশা হইতে লাগিল। সুদেবের এখানে প্রবেশের অধিকার প্রায় নাই বলিলেই চলে, তবে তাহার মা প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন। একদিন সুদেবের একখানা চিঠিও অনিচ্ছুকভাবে লইয়া আসিলেন। ছেলের হৃদয়োচ্ছ্বাস যতই বাড়িতে লাগিল, তাহার মায়ের ভাবী বধূর প্রতি বিরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল।

এমনই সময় জ্যোতির্ম্ময়ের চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া চিঠি কোলে করিয়া ঊর্ম্মিলা চোখের জল ফেলিতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে দেখিতে আসিতে চায়। কেন আর অনর্থক মৃতাহুতি

দেওয়া? ঊর্ম্মিলার মনের যে দুর্নিবার তৃষ্ণা, তাহাকে আরও বাড়াইয়া কি হইবে? জ্যোতির্ম্ময়ের স্মৃতিই তাহাকে প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে আর কি সে নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিবে? এমন করিয়া নিজের আত্মমর্য্যাদাকে বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। পুরুষে যদি বা পারে নারীর পক্ষে ইহা যে প্রায় কলঙ্কের মত? যে ভালবাসার ভিতর সংযম একেবারে নাই তাহার শ্রী যে চলিয়া যায়?

নিজের বাল্যকালে একটা থিয়েটারী গান প্রায়ই শুনিত, তাহা স্মরণ করিয়া এত দুঃখেও তাহার হাসি পাইল। গানটা, "যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা চোখের দেখা দিতে এসো না।" সত্যই সে আকুল পিয়াসা কি জ্যোতির্ম্ময়ের মনে জাগিয়াছে? ঊর্ম্মিলার বিশ্বাস হয় না। যে মানুষ নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া কলিকাতায় অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, সে হঠাৎ আকুল হইয়া ছুটিয়া আসিবে ঊর্ম্মিলাকে দেখিবার জন্য? ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে একথা সে জানে। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ের স্বভাবও সে জানে। যাহা সে কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছে, ভালবাসার বন্যা তাহাকে সেখান হইতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। তবে এ চিঠি কেন? তাহাদের মন-জানাজানি ত অনেকদিনই হইয়া গিয়াছে, ইহার ভিতর একবারও ত জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে দেখিতে চায় নাই? হয়ত ছোটমাসী কিছু বলিয়াছেন যাহাতে সে খুব বেশী বিচলিত হইয়াছে। অথবা সুদেবের প্রেমোচ্ছ্বাসের সংবাদে তাহার মনে ঊর্ম্মিলার জন্য আশঙ্কা জন্মিয়াছে। না ঊর্ম্মিলার চিঠিরই ফল? সে ত কোন দিনই নিজের দেহ বা মন সম্বন্ধে ভাল খবর দেয় না?

কিন্তু নিজে যে কারণে কলিকাতায় যাওয়ার ইচ্ছা সে ত্যাগ করিয়াছিল, সেই কারণেই জ্যোতির্ম্ময়কে আসিতে বলিতে পারিল না। সে তপস্যার বিঘ্ন করিতে চায় না। জ্যোতির্ম্ময়ের কাজ আগে শেষ হোক।

আসিতে বারণই করিল। তবে যথাসম্ভব কোমল ভাবেই করিল। জ্যোতির্ম্ময়কে নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করার কথা এখনও সে ভাবিতে পারে না। যদিও নিজে সে নিষ্ঠুরতা একেবারে সহ্য করে নাই, এ কথা বলা যায় না।

জ্যোতির্ম্ময় এই চিঠি পাইল,—

জ্যোতি,

তোমার চিঠি পেলাম। কয়েকদিন তোমার কাছ থেকে কোন চিঠি না পেয়ে আমারও বড় depressed লাগছিল।

নূতন জায়গায় এসে গুছিয়ে বসেছি। ভাল লাগবার কিছু এখানে নেই। তবে উৎপাতও কিছু নেই। সুদেবের মা প্রায় আসেন, তবে তার নিজের এখানে প্রবেশ নিষেধ এই যা লাভ, চিঠিপত্র লেখে মাঝে মাঝে।

তুমি আসতে চেয়েছ এখানে? আর কেন জ্যোতি? আমাকে নিয়ে যাবার দিন যদি জীবনে আসে, তবে এসে একেবারে নিয়ে যেও। মাঝ পথে এসে লাভ নেই, তোমারও কষ্ট, আমারও কষ্ট। ভেবো না যে তোমাকে আমি দেখতে চাই না। অত্যন্ত বেশী চাই ব'লে দেখার সাহস নেই। তোমার কাছ থেকে দূরে স'রে যাবার চেষ্টা কেন করব? আর তার ক্ষমতাই কি আমার আছে?

ছোটমাসীর একটা চিঠি পেয়েছি বোম্বাই থেকে লেখা। এতদিনে তিনি অনেক দূরে চ'লে গেছেন। এক একবার মনে হয় তাঁর সঙ্গে আমিও চ'লে গেলেই পারতাম। এক বছরের জন্যে তিনি গেছেন, আমাকেও হয়ত এক বৎসরের জন্যই এখানে থাকতে হবে। তবু তাঁর কাছে থাকলে হয়ত পাটনার চেয়ে ভাল থাকতাম।

আমার উপর রাগ ক'রো না। বড় দুঃখের জীবন আমার। শারীরিক যেমন থাকি, তেমনই বোধহয় আছি। মনের দিকে আরও খারাপ। তুমি কেমন আছ? অন্য সকলে কেমন আছেন?

আমার ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমার ঊর্ম্মিলা।

চিঠিখানা পড়িয়া জ্যোতির্ম্ময় খুব বেশী বিস্মিত হইল না। যেন ইহাই সে প্রত্যাশা করিয়াছিল। সময়ের স্রোত দ্রুত ধারায় বহিয়া চলিয়াছে, কোন্ এক অশুভ তটের দিকে তাহা সে পরিষ্কার করিয়া দেখিতে পায় না, কিন্তু আশঙ্কাক্লিষ্ট হৃদয় দিয়া অনুভব করে। সে কি ঊর্ম্মিলাকে হারাইতে বসিয়াছে? সব ছাড়িয়া এখন কি তাহার ছুটিয়া যাওয়া উচিত নিজের জীবনের সর্ব্বস্বধনকে রক্ষা করিতে? কাজকর্ম্ম সবকিছু হইতে সমস্ত রস চলিয়া গেল।

কয়েক লাইনে চিঠির উত্তর দিল। দুশ্চিন্তার আতিশয্যে মুখে চোখে কালিমার প্রলেপ লাগিয়া গেল। মা বলিলেন, "ছেলে এবার অসুখে পড়বে। বলে বটে কথায়, যে, শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়, কিন্তু সত্যিই কি আর সব সয়? মানুষ কখনও অসুরের মত খাটতে পারে?"

মেয়ে আরতি মুখ হাঁড়ি করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তুমি ত সব জান।"

জ্যোতির্ময় কাজকর্ম এবার সব গুটাইয়া ফেলিবে স্থির করিল।

এই মাসটা। আর নয়। সে নিজেই আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। মনের উপর এই নিদারুণ অত্যাচার, হৃদয়ের বুভুক্ষাকে এমন করিয়া দমন করা, এ কতদিন রক্তমাংসের মানুষ সহ্য করিতে পারে? হার তাহাকে মানিতে হইবে। অনর্থকই সে উর্ম্মিলার উপর অত্যাচার করিল।

আরো বিপদ্ হইল, বেশ কিছুদিন সে উর্ম্মিলার কোন চিঠিপত্র পাইল না। আশঙ্কায় তাহার মনের ভিতরটা কাল হইয়া উঠিল। চক্ষের আড়ালে কি নিদারুণ নাট্যের অভিনয় হইতেছে তাহা কে জানে? কোথায় কি ভাবে তাহার খবর সংগ্রহ করিবে তাহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। সুদেবদের ঠিকানা সে জানে, কিন্তু তাহাদের কাছে লিখিতে প্রবৃত্তি হয় না। একবার ভাবিল আরতির নাম দিয়া লিখিবে। আবার ভাবিল উর্ম্মিলার বড়মাসীর বাড়ী গিয়া তাঁহাদের দিয়া লিখাইবে। কিন্তু তাঁহারা ত উর্ম্মিলা ও তাহার সম্পর্কের কথা কিছুই জানেন না!

তিন-চার দিন অনিদ্রায় কাটাইয়া যখন সে উর্ম্মিলারই নামে টেলিগ্রাম করিবার উপক্রম করিতেছে, তখন হঠাৎ তাহারই কাছে উর্ম্মিলার এক টেলিগ্রাম আসিয়া পৌঁছিল।

"Unwell. Removing Nursing home. Letter follows. Urmila."

জ্যোতির্ময় টাইম-টেব্‌ল্ খুলিয়া পাটনার ট্রেন দেখিতে লাগিল। তাহার পর ভাবিল চিঠিখানা পাইয়া যথা-কর্ত্তব্য স্থির করিবে। টাকাকড়ি জোগাড় করা, কলেজ হইতে কয়েক দিনের ছুটি নেওয়া, প্রাইভেট ছাত্রদের বলিয়া রাখা, এই সব কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিল।

টেলিগ্রাম পাওয়ার দু'দিন পরে চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। পড়িয়া জ্যোতির্ম্ময়ের মনে হইল, তাহার জীবনের সবক'টা আলো যেন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে, এইবার একবারে নিভিয়া গেলেই হয়। জীবনের কয়টা দিন বা তাহার কাটিয়াছে? ইহারই মধ্যে আঁধার যবনিকা নামিবার সময় হইয়া গেল?

উর্ম্মিলা লিখিয়াছে—

জ্যোতি,

অত্যন্ত দুঃসংবাদ দিচ্ছি তোমাকে। আমাকে ক্ষমা কর, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষ কি করতে পারে?

আমি কঠিন রোগগ্রস্ত। ডাক্তাররা প্রায় শেষ কথা ব'লেই গিয়েছেন। যেখানে কাজ করতাম সেখানেই ছিলাম প্রথম দিকে। ওরা যতটা বোঝে, সেবা-শুশ্রূষা করছিল। প্রথম pleurisyই হয়েছিল। ভাল ক'রে সারছি না দেখে দু'তিনজন ডাক্তার দেখানো হ'ল। তাঁরা সন্দেহ করছেন T. Bই হয়েছে।

তুমি একবার এসে আমায় দেখে যাও। কথা দিয়েছিলে, এরকম দিন যদি আসে, তা হলে তুমি আসবে। এই দেখাই হয়ত শেষ দেখা। আগের জন্মে আমি খুব বেশী পাপ ক'রে থাকব, না হলে এমন যন্ত্রণা বুকে নিয়ে মরব কেন? এ জন্মে ত কোন অন্যায় করি নি?

আমার জন্যে খুব বেশী দুঃখ ক'রো না জ্যোতি। জীবনে একমাত্র ভাল জিনিষ যা পেয়েছিলাম, তা তোমার ভালবাসা। তাও ত ভগবান্ বুকে ধ'রে রাখতে দিলেন না!

যত তাড়াতাড়ি পার এস। নীচে নার্সিং হোমের ঠিকানা দিলাম। এখানেই কয়েকদিন হ'ল আছি। এর কাছাকাছি অনেক হোটেল আছে, যে কোনোটায় এসে উঠতে পার।

ইতি
উর্ম্মিলা।

১৭

সকাল হইতেই জ্যোতির্ম্ময়দের বাড়ীতে একটা থমথমে আবহাওয়া দেখা যাইতেছে। সে আজ রাত্রের ট্রেনে পাটনায় চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং মা, বাবা, বোন, প্রভৃতিকে কিছু একটা বলিয়া যাইতে হইবে। প্রথমে

ভাবিয়াছিল, বলিবে না, কিন্তু উর্ম্মিলাকে লইয়া যদি এখানেই উঠিতে হয়, তাহার জন্ত ইঁহাদের প্রস্তুত থাকা দরকার।

মাকে ডাকিয়া বলিল, "আমি আজ রাত্রে পাটনা যাচ্ছি। উর্ম্মিলার খুব অসুখ সেখানে। যদি দরকার হয় তা হলে এখানেই নিয়ে আসতে হবে। ওর বাড়ী যেন পরিষ্কার থাকে, চাকরদের ব'লে রেখো। আর রান্নাবান্না রোগীর উপযুক্ত ক'রে রেখো। দরকার হলে তারণকে টাকা দিও, আমি রেখে যাব। সময় জানাব টেলিগ্রামে," বলিয়া অন্য কি একটা কাজে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি কথা রে? ও উর্ম্মিলাকে আনতে যাচ্ছে কেন? ওর ত বড় মাসীর বাড়ীর আত্মীয়স্বজন রয়েছে এখানে।"

আরতি মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "মা যেন কি! দাদা যে ওকে বিয়ে করবে ঠিক ক'রে রেখেছে।"

মা বলিলেন, "তা না বললে জানব কি ক'রে? আজকাল ত ছেলেমেয়েরাই কর্ত্তা বাপ-মায়ের ধার ধারে না। কবে ঠিক হ'ল?"

আরতি বলিল, "অতশত জানি না। চিঠিপত্র ত যাবার পর থেকেই লেখে। কি অসুখ কে জানে? যা রোগা মেয়ে?"

অখিলের কাছে গিয়া জ্যোতির্ম্ময় খানিকটা নিজের জীবনের ইতিহাস বলিতেই বাধ্য হইল। অবশ্য অল্পই বলিল, বেশীর ভাগ না বলাই থাকিয়া গেল। অখিল দুঃখ প্রকাশ করিল ঢের। বলিল, "ভুল হয়েছিল তোমার ওঁকে যেতে দেওয়া। এখানে প্রাণপণে খেটে টাকা রোজগার ক'রে যা লাভ করলে, তার চেয়ে তাঁকে বিয়ে ক'রে নিয়ে কাছে রাখলে ঢের বেশী লাভ করতে। মেয়েরা কাছে থাকা জিনিষটাকে বড় বেশী মূল্য দেয়। উনি আবার অত্যন্ত delicate."

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "যা হয়ে গেছে তার আর প্রতিকার নেই। এখন শেষরক্ষা করতে পারি তা হলেই ঢের। স্টেশনে যেও wire পেলেই। কি অবস্থায় নিয়ে আসব জানি না।"

অখিল সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "অত বেশী upset হয়ো না। এ অসুখ আজকাল কত হচ্ছে, কত সেরে যাচ্ছে। আর গোড়াতেই ধরা পড়েছে ত?"

আরো দুই-চারিটা কথা বলিয়া জ্যোতির্ম্ময় বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

রাত্রে ট্রেনে জায়গা ভালই পাইল, তবে ঘুম তাহার নয়নপল্লবকে স্পর্শও করিল না। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া সে কি দেখিবে তাহারই চিন্তায় তাহার মন অবসন্ন হইয়া রহিল। শেষ যে মুখ সে উর্ম্মিলার দেখিয়াছিল, বেদনা-কাতর অশ্রুসজল, তাহাই তাহার মানসনয়নে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। চিরবিদায়ের পথে বাহির হইতেছে বলিয়াই কি সে অমন করিয়া কাঁদিয়াছিল? আর মূঢ়, মূর্খ, অজ্ঞ জ্যোতির্ম্ময়, সেই কিনা তাহাকে সেই পথে ঠেলিয়া দিল? সে চলিয়া যাইতে চাহে নাই, জ্যোতির্ম্ময়ের কাছে থাকিয়া যাইতেই চাহিয়াছিল। নিজেকে কি শাস্তি দিলে যে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু তাহার ভাবিবার প্রয়োজন কি? বিধাতা ত দণ্ডবিধান করিয়াই বসিয়াছেন?

ট্রেন আবার সেই দিনই বাছিয়া বাছিয়া অনেকখানি লেট্ হইল। স্টেশনে নামিয়া হোটেল বাছিয়া উঠিতেও তাহার একটু দেরীই হইয়া গেল। তাহার পর নার্সিং হোমটার সন্ধানে বাহির হইয়া শুনিল, যে, দুপুরবেলা সেখানে বাহিরের লোক যাইতে দেওয়া হয় না। সাড়ে চারটার সময় আগন্তুকরা ভিতরে যাইবার অনুমতি পায়।

অপেক্ষা করিয়া বসিয়াই রহিল। ঠিক সাড়ে চারটা বাজিতেই গিয়া নার্সিং হোমে উপস্থিত হইল। মনের ভিতর তাহার যেন তখন অমাবস্যার রাত্রি বাসা বাঁধিয়াছে। ভিতরে ঢুকিতে কোন বেগ পাইতে হইল না। ছোট প্রতিষ্ঠান, রোগীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। সহজেই উর্ম্মিলার সন্ধান পাইল এবং তাহার কক্ষের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। দরজায় টোকা দেওয়া মাত্র অপরিচিত নারীকণ্ঠে কে ইংরেজিতে বলিল, "ভিতরে এস।" ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ছোটঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহার পরই তাহার চোখ গিয়া পড়িল উর্ম্মিলার উপর। শুইয়াই ছিল, জ্যোতির্ম্ময় ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র উঠিয়া বসিল। ঘরে একজন নার্স দাঁড়াইয়া ছিল, তৃতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করিবামাত্র সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

দ্রুতপদে উর্ম্মিলার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কেমন আছ এখন, উর্ম্মিলা?" এই কয়টা কথা

বলিতেই তাহার গলা কাঁপিয়া গেল। এই তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ পরস্পরের ভালবাসার পরিচয় পাইবার পর।

উর্ম্মিলা মুখ তুলিয়া তাকাইল। রোগা চিরকালই, তবে কঙ্কালসার কিছুই হইয়া যায় নাই। কিন্তু মুখ একেবারে রক্তশূন্য, বিবর্ণ, দুই চোখ দিয়া অবিরল ধারে জল পড়িতেছে। জ্যোতির্ম্ময়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ভাল নেই, ভাল আর কি ক'রে থাকব?"

জ্যোতির্ম্ময় তাহার খাটেই বসিয়া পড়িল। দুই হাতে তাহার মুখখানা ধরিয়া বলিল, "কেঁদো না লক্ষ্মীটি। এত ভয় পেয়েছ কেন? এ অসুখ কত হয়, কত সেরে যায়। কি তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে?"

উর্ম্মিলা জ্যোতির্ম্ময়ের হাত হইতে মুখ ছাড়াইয়া লইল। বলিল, "জ্যোতি, তুমি ঐ চেয়ারটায় গিয়ে বোস, আমার বিছানায় বোস না। আর আমাকে ছুঁয়ো না, আমি ত এখন অস্পৃশ্য, ভীষণ রোগের carrier হয়ে রয়েছি।"

"আচ্ছা, বলছ যখন চেয়ারেই বসছি।" বলিয়া সে চেয়ারটা খানিকটা কাছে টানিয়া আনিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "অস্পৃশ্য কি কারণে? রোগ কি তাও ত বোধ হয় স্থির ক'রে কেউ জানে না? ভাল ক'রে পরীক্ষা করা হয়েছে? X-Ray করা হয়েছে? ডাক্তাররা কি বুদ্ধি ক'রে তোমার কাছেই এই কথা বলেছেন? না সুদেব-বাবুরা বলেছেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "কোথায় সুদেব, যে আমায় কিছু বলতে আসবে? এ রোগের নাম শোনামাত্র তারা সবাই প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। ওর মা দিন-দুই এসেছিলেন, তাও চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে এদিকে আসেন নি। তাঁরা দূর থেকে টেলিফোন ক'রে আমার প্রতি কর্ত্তব্য করছেন।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এই মুরোদ নিয়ে সুদেব গুপ্ত প্রেম করতে এসেছিলেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "সকলের ত স্বভাব সমান হয় না জ্যোতি।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তা হয় না বটে, ভয়ও ত আবার নানা রকম আছে। কিন্তু চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হয়েছে?"

উর্ম্মিলা বলিল, "এখনও X-Ray হয় নি, অন্য পরীক্ষা করেছে। নিশ্চিত জানে না, তবে T. B. বলেই ওদের বিশ্বাস। সেই ভেবেই চিকিৎসা করছে। আমাকে বলে নি, তবে চারিদিকে সবাই কানাঘুষো ত করছে, আমি শুনতে পেয়েছি।" তাহার চোখ দিয়া আবার জল গড়াইতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তুমি কেন ভয় পাচ্ছ? চল, কালই আমি তোমায় কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে অন্ততঃ এক বছর কেটে যাবে না X-Ray করতে। করা হয় নি কেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "কোথায় যেন সস্তায় হয়, তারই তোড়জোড় করতে গিয়ে দেরী হচ্ছে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ভাল কথা, তোমার দেখাশোনা খুব ভালই হচ্ছে দেখছি। যাক, আমি কালই তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। ব্যবস্থা ওখানে অনেকটাই ক'রে এসেছি, বাকিটা টেলিগ্রাম ক'রে দিলেই হবে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "না জ্যোতি, আমি আর যাব না। যখন যেতে পারতাম তখন তুমি ডাক নি। এখন এই নিদারুণ সংক্রামক রোগ নিয়ে আমি তোমার কাছে যাব না। ক'টা দিনই বা? এখানেই শেষ হয়ে যাবে।"

জ্যোতির্ম্ময় একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। একটু পরে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "জীবন থেকে একেবারে নির্ব্বাসন দিয়ে দেবে উর্ম্মিলা? এত বড় অপরাধ আমি করেছিলাম?"

উর্ম্মিলার চোখের জল একবারও শুকায় নাই। কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, "কোথায় আমার জীবন জ্যোতি, যে তোমাকে তার থেকে নির্ব্বাসিত করব? ব্যাধি-পীড়িত ক'টা দিন মাত্র। বেঁচে যদি থাকতাম, ভাল যদি থাকতাম, তা হলে এ জীবন ত তোমারই হত। তুমিই আমার সর্ব্বস্ব ছিলে। কিন্তু এত ভালবাসার পর তোমাকে আমি ব্যাধির বীজ দিয়ে যাব না। মৃত্যুর পর যদি কিছু বাকি থাকে মানুষের, তা হলে আবার তোমায় পাব আমি। এ জীবনে দরজার বাইরে থেকেই বিদায় নিলাম।"

উর্ম্মিলার নিষেধ না মানিয়া জ্যোতির্ম্ময় আবার তাহার দুইটা হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল, "উর্ম্মিলা, দয়া কর আমাকে, এত বড় দণ্ড দিও না। আমি সহ্য করতে পারব না। তোমার এ অবস্থা আমার মূর্খতার জন্যে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে দেবে না? ক্ষতিপূরণ করতে দেবে না? এখানে থাকলে সত্যিই তুমি ম'রে যাবে। তুমি চুপ

আমার সঙ্গে। তোমাকে বাঁচিয়ে তুলতে দাও। তার পর আর আমাকে না চাও, আমি স'রে যাব তোমার জীবন থেকে। আমি কথা দিচ্ছি।"

ঊর্ম্মিলা আবার হাত টানিয়া লইল। বলিল, "না জ্যোতি, তোমার দোষে এ অসুখ হয় নি। চিরকালই যেন জানতাম, আমার এ অসুখ হবে। আমার মায়ের ছিল। মরণের পায়ের ধ্বনি আমি অনেক দিন থেকেই বুকের মধ্যে শুনছি। তোমাকে এর সংস্পর্শে আসতে দেব না আমি। তোমার সুস্থ স্বাভাবিক জীবন হোক, আমি কেন মৃত্যুর ছোঁওয়া লাগাব তার মধ্যে? এই কি আমার উচিত হবে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমাকে প্রাণদণ্ড দিয়ে তার পর আশীর্ব্বাদ করছ যে, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন হোক? এরপর আমি বাঁচতে পারব? নিজেকে আমার হত্যাকারী মনে হবে না? একটা আঘাত মানুষ সহ্য ক'রেও বাঁচে, উপরি উপরি দুটো আঘাত আমার সহ্য হবে? কেন তুমি বল নি আগে আমায় যে, আমার আচরণ ক্ষমা করতে পার নি? কতবার বলেছি তোমায় আমি যে, তুমি বললেই আমি ও পথ ছেড়ে দেব?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "জোর ক'রে তোমায় আমি টেনে আনতে চাই নি জ্যোতি। তবে যদি জানতাম যে, এই ক'টা দিনের মধ্যেই আমি ফুরিয়ে যাব তা হলে জোরই করতাম।"

জ্যোতির্ম্ময় হতাশকণ্ঠে বলিল, "এখন কেন ডাকলে? শুধু চোখে দেখবার জন্যে? আর কিছুই তোমার পাবার নেই আমার কাছ থেকে?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "চোখে দেখাই কি আমার কাছে কম? ক'দিন বা আমি তোমাকে দেখতে পেয়েছি? অনন্তকাল কাটবে আমার এই সম্বল নিয়ে জ্যোতি! আর একটা কথা ছিল, তবে তুমি হয়ত রাগ করবে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "রাগ করবার সাধ্য আর আমার এখন নেই। বল, কি বলতে চাও।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "এক রাশ টাকা প'ড়ে রয়েছে আমার ব্যাঙ্কে। ওগুলো তোমাকে দিয়ে যাব ভাবছিলাম।"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া জ্যোতির্ম্ময় প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "দোহাই তোমার ঊর্ম্মিলা, টাকার কথা আর আমার কাছে ব'লো না। এই টাকাই আমায় ধ্বংস করল। কেন এসেছিলে এই বিষ দিতে আমার জীবনে? আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পথের ভিখারী হয়ে গেলেও ভাল ছিল যে?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "আমি তোমার অপকার করছি তা ভাবি নি। তা হলে যেতাম না দিতে। না জানা অপরাধ ক্ষমা ক'রো। গরীব-দুঃখীকে বিলিয়ে দিও।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কলকাতায় গিয়েই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তোমার যা ইচ্ছে হয় ক'রো।"

ঘরে নীরবতা বিরাজ করিল খানিকক্ষণ। তারপর জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তবে চ'লেই যাব ঊর্ম্মিলা? আমার প্রার্থনা বিফলই হল?"

ঊর্ম্মিলা আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "আর কেন মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছ! আমি কি ক'রে যাব?"

জ্যোতির্ম্ময় উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "চললাম তা হলে। এই শেষ দেখা?"

ঊর্ম্মিলা বসিয়া ছিল, এইবার বিছানায় লুটাইয়া পড়িল, বলিল, "আর একবার এস। শেষের দিন ডাকব।"

"ডেকো। বেঁচে থাকলে সাড়া দেব।" বলিয়া অশ্রুঅন্ধ চোখে জ্যোতির্ম্ময় বাহির হইয়া গেল। অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায় ঊর্ম্মিলা বিছানায় পড়িয়া রহিল।

কিভাবে সে হোটেলে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোতির্ম্ময় বোধহয় বলিতে পারিত না। যখন পূর্ণ চেতনা তাহার ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল যে, দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া সে হোটেলের ঘরে বসিয়া আছে। মস্তিষ্কের ভিতর তাহার আগুন জ্বলিতেছে, হৃদয়ের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে। কি করিবে সে? কি করিয়া এ যন্ত্রণা সহ্য করিবে সে?

আজ সে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইল, ঊর্ম্মিলার জীবন হইতে। জীবনের শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্য্য তাহার যাহা ছিল, তাহা আজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। ইহার পর কি লইয়া বাঁচিবে সে, কিসের জন্য কাজ করিবে সে? জীবনে কোন্ অবলম্বন তাহার থাকিবে?

শুধু এই ত নয়, ঊর্ম্মিলাকে নিজের মূর্খতায় সে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া দিয়া আসিল। এ ধাক্কা সামলাইয়া সে বাঁচিবে না। দারুণ অভিমান সম্বল করিয়া সে পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবার পথে দাঁড়াইয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়কেও আর তাহার প্রয়োজন নাই। সময় থাকিতে সে ঊর্ম্মিলাকে ডাকে নাই, আজ অসময়ের ডাক ঊর্ম্মিলাও গ্রাহ্য করিল না।

রাত্রে ট্রেন ছিল, ইচ্ছা করিলে তখনই সে চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু কোন্ কুহকিনী আশা [illegible] পড়িয়া তাহাকে বসাইয়া রাখিল, তাহা সে জানিল না। বসিয়া বসিয়াই তাহার রাত একটু করিয়া গভীর হইতে লাগিল। খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলিয়াই গেল।

পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গেলে কেমন হয়? কিন্তু তাহার বৃদ্ধ পিতা ও অসহায় মাতার মুখচ্ছবি তাহার মানস-পটে ভাসিয়া উঠিল। ছোট বোনটাও ত অসহায়? ইহাদের কোন ব্যবস্থা না করিয়া জ্যোতির্ম্ময় কি করিয়া জীবন শেষ করিবে?

বিছানায় খানিকক্ষণ শুইয়া রহিল। মনে হইল, উত্তপ্ত অঙ্গারের উপর সে শুইয়া আছে। উঠিয়া পড়িয়া ঘরের ভিতর ঘুরিতে লাগিল। একটুখানি যেন যুক্তিতর্ক ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে লাগিল। উর্ম্মিলাকে আর একবার বুঝাইবে। জ্যোতির্ম্ময়ের কাছে সে না-ই থাকিতে রাজী হোক, কলিকাতার হাসপাতালে থাকিতে পারে, জ্যোতির্ম্ময় দেখা-শোনার ভার লইবে। জীবনে জ্যোতির্ম্ময়কে প্রিয়তমরূপে স্থান নাই দিক, বাঁচিয়া যদি থাকে তাহা হইলেও যে ঢের। হত্যার অপরাধে কলঙ্কিত হইতে হইবে না জ্যোতির্ম্ময়কে। এখানে থাকিয়া ডাক্তারদের সঙ্গে দেখাশোনা করা দরকার। তাঁহারা কি মনে করেন? X-Ray করাইয়া তাহার ফলাফল জানা দরকার। কোন পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যনিবাসে যদি লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা তাঁহারা দেন, সে ব্যবস্থাও ত করা দরকার?

আবার মনে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। হয়ত তাহার কোন সাহায্য লইতে রাজী হইবে না উর্ম্মিলা। সে ক্ষেত্রে কি করিবে সে?

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। পূর্ব্বদিক্ একটুখানি স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে। জ্যোতির্ম্ময় কণ্টকশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মাথা ধুইয়া, হাতমুখ ধুইয়া আবার আসিয়া শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

দরজার কাছে কি একটা অস্পষ্ট শব্দ হইল। কে যেন মৃদুভাবে টোকা দিতেছে। এত ভোরে কে আবার আসিল? খাটের উপর উঠিয়া বসিবামাত্র শব্দটা আবার শোনা গেল। জ্যোতির্ম্ময় এবার উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

দরজার বাহিরে ছায়ামূর্ত্তির মত উর্ম্মিলা দাঁড়াইয়া আছে। বিবর্ণ মুখের উপর দিয়া আজও চোখের জল ঝরিতেছে, দেহ পতনোন্মুখ। দেওয়াল ধরিয়া কোনমতে দাঁড়াইয়া আছে। জ্যোতির্ম্ময় দরজা খুলিবামাত্র তাহার বুকের উপর সে লুটাইয়া পড়িল, অস্পষ্ট কাতর কণ্ঠে বলিল, "জ্যোতি, আমায় নিয়ে চল তোমার সঙ্গে, আমি একলা প'ড়ে মরতে পারব না। যাবার দিন ভগবান্ তোমার কোল থেকেই আমাকে যেন নিয়ে যান।"

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, না চেতনা আছে, তাহা জ্যোতির্ম্ময় ঠিক বুঝিতে পারিল না। তাহাকে কোলে

কাল এত কঠিন হয়ে রইলে কেন? কেন আমাকে ফিরিয়ে দিলে?

তুলিয়া লইয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিল। দুই হাতে তাহার মুখ ধরিয়া অর্দ্ধ অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কেন এলে এমন ক'রে উর্ম্মিলা? কি বিপদ্‌ তোমার না হতে পারত পথের মধ্যে? আমায় একবার ডাকলে না কেন? আমি গিয়ে নিয়ে আসতাম? কাল এত কঠিন হয়ে রইলে কেন? কেন আমাকে ফিরিয়ে দিলে?"

উর্ম্মিলা চোখ খুলিয়া তাকাইল। কম্পিত ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া যেন কথা বাহির হইতে চায় না। অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "পারলাম না, কিছুতেই পারলাম না তোমাকে ছেড়ে থাকতে। যতক্ষণ তোমায় দেখি নি, ততক্ষণ শক্ত হয়ে থাকতে পেরেছিলাম, কিন্তু আর পারছি না। আমি পারব না জ্যোতি। আমার বুক ফেটে যাবে। আমি জানি, আমি অন্যায় করছি। এ দারুণ রোগ নিয়ে আমার তোমার কাছে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু দয়া ক'রে শেষ ক'টা দিন তোমার কাছে রাখ। তোমার মুখ দেখে যেন যেতে পারি। একটা দিন থাকতে পেলেও জীবন আমার সার্থক হয়ে যাবে।"

জ্যোতির্ম্ময় বিছানায় বসিয়া তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের উপর টানিয়া আনিল। উর্ম্মিলার মাথার উপর মুখ রাখিয়া এমন কান্না কাঁদিল যাহা সে বাল্যকালের পর আর কাঁদে নাই। অশ্রুজলে উর্ম্মিলার চুল ভিজিয়া গেল।

উর্ম্মিলার দেহটা কাঁপিয়া উঠিল জ্যোতির্ম্ময়ের আলিঙ্গনের মধ্যে। জ্যোতির্ম্ময়ের অশ্রুজল পড়িতেছে তাহার মুখের উপর, চুলের উপর। সে ভয়ানক অস্থির হইয়া উঠিল, বলিল, "জ্যোতি, লক্ষীটি জ্যোতি, তুমি কেঁদো না, আমি পারছি না সইতে। তোমার চোখে আমি কখনও জল দেখি নি। কেন কাঁদছ? আমি ত অনেকটা ভালই আছি এখন?"

জ্যোতির্ম্ময় মুখ তুলিয়া উর্ম্মিলার দিকে তাকাইল। সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে জ্যোতির্ম্ময়ের মুখের দিকে। সমস্ত প্রাণ যেন ছুটিয়া আসিতেছে দৃষ্টির ভিতর দিয়া।

তাহার সিক্ত নয়নপল্লবে, কম্পিত ওষ্ঠাধরে বারবার করিয়া চুম্বন করিল জ্যোতির্ম্ময়। উর্ম্মিলা শিহরিয়া উঠিয়া মুখ সরাইতে গেল, কিন্তু এমন নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ ছিল যে সরিতে পারিল না। কাতর কণ্ঠে বলিল, "এ কি করছ জ্যোতি? আমার কি হয়েছে তা কি জান না? এ রকম ক'রে আদর ক'রো না আমাকে। একটু দূরে ত রাখতে হবে আমাকে?"

জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে দূরে সরাইবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। বলিল, "দূরে সরাবার জন্যে কি বুকে ক'রে নিলাম? আর কোনদিন ত দূরে যেতে পারবে না, এইখানেই থাকবে চিরকাল।"

উর্ম্মিলা কিছুক্ষণ সজল চক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর বলিল, "আমার বুকে যে কালরোগ বাসা বেঁধেছে জ্যোতি। আমার নিঃশ্বাসেও বিষ, স্পর্শেও বিষ। যদি তোমার কোন অনিষ্ট হয়? সে যে মহা সর্ব্বনাশের কথা?"

জ্যোতির্ম্ময় সস্নেহে তাহার চুলে, মুখে, বাহুতে হাত বুলাইতে লাগিল। বলিল, "আদালতেও আসামীকে নির্দ্দোষী ধরা হয়, যতক্ষণ না সে দোষী প্রমাণিত হচ্ছে। তোমার কি হয়েছে তারই ঠিক নেই, এরই মধ্যে নিজেকেও শাস্তি দিচ্ছ, অন্যকেও শাস্তি দিচ্ছ। আগে জানা যাক ঠিক ক'রে তারপর ডাক্তারদের ব্যবস্থা মত চলা যাবে। তোমার বুকে কালরোগ কিছু নেই, শুধু অমৃত আছে আমার জন্যে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "কলকাতায় কোথায় রাখবে আমাকে? তোমাকে রোজ দেখতে পাব ত?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "দেখতে পাবে না ত আমি যাব কোথায়? সারাদিনই থাকব তোমার সঙ্গে। তোমার বাড়ীতেই উঠবে এখন, বিয়ের পর আমার বাড়ীতে আসবে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "কি পাগলের মত কথা বল! আমার মত মানুষকে কেউ বিয়ে করে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কেউ করে কিনা জানি না, তবে আমি করব। গিয়েই দুটি কাজ আমার সর্ব্বাগ্রে করতে হবে; একটি তোমার সব রকম পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া, দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা করা। তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক ঘণ্টাও ছাড়া চলবে না আমার। এই চিকিৎসাতেই তুমি সেরে যাবে, আমি বলতে পারি। রোগ হয়েছিল, আমার কাছ-ছাড়া হবার দুঃখে, সেরে যাবে একেবারে বুকের মধ্যে জায়গা পেয়ে। নিজেকে ত দেখতে পাচ্ছ না, এরই মধ্যে চেহারা কত বদলে গেছে। কাগজের মত সাদা মুখ নিয়ে এসেছিলে, আর এখন দেখাচ্ছে ভোরের আকাশের মত।"

ঊর্ম্মিলা তাহার আলিঙ্গনের মধ্যেই উঠিয়া বসিল। বলিল, "সত্যি বলছ, আমি সেরে উঠব? বেঁচে থাকব অনেকদিন? তোমার সঙ্গে থাকব?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তোমার মাথা বুকে নিয়ে কি মিথ্যা কথা বলছি? নিশ্চয় তুমি সেরে যাবে। বুড়ো হয়ে পাকা চুলে সিঁদুর প'রে ব'সে থাকবে আমার পাশে।"

জ্যোতির্ম্ময়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মাথা রাখিয়া আবার ঊর্ম্মিলা তাহার বুকের উপর শুইয়া পড়িল। বলিল, "বাঁচিয়ে নাও, যেমন ক'রে পার বাঁচিয়ে নাও। এর পর আমি মরতে পারব না। তোমায় কি ক'রে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম?"

জ্যোতির্ম্ময় তাহার কপালে চুম্বন করিয়া বলিল, "ভয়ানক অভিমান হয়েছিল তোমার ঊর্ম্মিলা। হতে পারে অবশ্য। ব্যবহারটা আমি ঠিক মানুষের মত করি নি। বুঝতে পারি নি ভাল ক'রে। এতটা শরীর তোমার খারাপ তাও ত জানতে পারি নি। আমার উপর রাগ রেখো না, আর অভিমান রেখো না। আমি সব দুঃখের ক্ষতিপূরণ ক'রে দেব। চির জীবন ধ'রে এইটাকেই আমি সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য ব'লে ধ'রে নেব। প্রায়শ্চিত্তই বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তর ভিতর এত আনন্দ থাকে না।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "বল তুমি ভগবান্‌কে। তোমার কথা তিনি শুনবেন।"

১৮

ধীরে ধীরে হোটেলের কর্ম্মব্যস্ততার তাড়া জাগিল। মানুষের চলাফেরার শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে আসার সময় এখানের চাকরবাকররা কেউ দেখেছে?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "দেখেছে, ওদেরই কাছে তোমার ঘরের নম্বর জেনে ত এলাম।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমার চরিত্র সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা ওদের হবে না। তা না হোক। এবার মাটির পৃথিবীতে নামতে হয় তা হলে। ভয় পেয়োনা, ভয় পেয়োনা।" ঊর্ম্মিলাকে এতক্ষণ সে নিজের আলিঙ্গনেই ধরিয়া রাখিয়াছিল। অবনত হইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে যাইবামাত্র ঊর্ম্মিলা হাত দিয়া নিজের ওষ্ঠাধর চাপা দিয়া বলিল, "না, লক্ষীটি না। মুখের উপর মুখ রেখো না, আমার ভয়ানক ভয় করে তোমার জন্যে। আগে X-Rayটা হয়ে যাক।"

জ্যোতির্ম্ময় হাসিয়া তাহার কোমল গণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিল, "বেশ এক tantalizing অবস্থার সৃষ্টি করেছ। তোমার কাছ থেকে কোনো অকল্যাণ আমার জীবনে আসবে না, আসতে পারে না। মানুষের মন বেশীর ভাগ সময়ই মিথ্যা কথা বলে না। আমার মনের মধ্যে কে ক্রমাগত বলছে, তোমার ও অসুখ হয়ই নি।"

ঊর্ম্মিলা বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল। বলিল, "যা তোমার খুশি জ্যোতি, আমার কথা ত তুমি শুনবে না? কিন্তু চাকরবাকরগুলো ঠিক আমাদের পাগল ভাববে, কান্নাকাটি ক'রে দুজনের যা চেহারা হয়েছে! মুখটা অন্ততঃ ধুয়ে আসি।" সে মুখ ধুইতে গেল। জ্যোতির্ম্ময় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, সত্যই তাহাকে অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত দেখাইতেছে। চব্বিশটা ঘণ্টার ভিতর তাহার জীবনে না ঘটিল কি? সর্ব্বস্ব হারাইল, আবার সর্ব্বস্ব ফিরিয়া পাইল। ইহার অনেক কমে মানুষ পাগল হইয়া যায়। তাহারও মাথাটা এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসে নাই। কিন্তু এখন ত কাজ করিবার পালা। হৃদয়াবেগের স্রোতে ভাসিয়া গেলেই এখন চলিবে না।

ঊর্ম্মিলা মুখ ধুইয়া আসিল। শাড়ীর আঁচল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "একবস্ত্রে ত এলাম চ'লে। এখন স্নান-টান করব কি ক'রে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তোমার কাপড়-চোপড় আনিয়ে নেওয়া যায় না নার্সিং হোম্ থেকে?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "মেট্রনের নামে চিঠি দিয়ে লোক পাঠালে ওরা দিয়েই দেবে। গোটা পাঁচ-ছয় কাপড়-জামা ত? সে আর ওরা রাখবে কি করতে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ওদের পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে আসা হয়নি ত? আমি গিয়ে দিয়ে আসব? দরকার হতে পারে ভেবে টাকা কিছু আমি সঙ্গেই এনেছিলাম।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "না, না, তুমি কেন দিতে যাবে? সুদেবের কাছেও অনেকগুলো টাকা দিয়েছিলাম আমার

আরম্ভ হবার সময়। ঐ ত admission নিইয়েছিল। ওকে লিখে দিই, ওখানকার পাওনা মিটিয়ে দিতে। আর তিন-চারটে স্যুট্‌কেস্‌ বাক্সও ওদের ওখানে রয়েছে সেগুলোও দিয়ে যাক।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তাই দাও। তোমার ব্যবহারে ভদ্রলোক বোধহয় খুবই মর্ম্মাহত হয়ে যাবেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "তা হবে না এখন আর। যে মেয়ের এমন সংক্রামক রোগ হতে পারে, তার সম্বন্ধে ওরা আর কোনো regard রাখতে পারে না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "পৃথিবীতে মানুষ যে কতরকম হয়! আমি ভাবছি তাকে অতি আহাম্মক, সেও সব কিছু জানলে ভাববে যে আমার মত মূর্খ আর কোথাও নেই। কার মতটা ঠিক তা এক বিধাতাই জানেন। চুলটা আঁচড়াবে নাকি? দেখ যদি আমার চিরুণীতে আপত্তি না থাকে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "আপত্তি ত তোমার থাকার কথা, আমার নয়। কিন্তু এরকম পাগল সেজে থাকা যায় না, কাজেই এটা ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। সত্যি, চেহারাটা আমার একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে!"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ক্রমেই বেশী ক'রে অন্যরকম দেখাবে। আগে কলকাতা নিয়ে ত যাই? কেন যে তুমি পাটনায় আসা স্থির করলে? দার্জ্জিলিং থেকে যদি কলকাতায় যেতে তাহলে কোনো হাঙ্গামই থাকত না।"

উর্ম্মিলা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, "তা হলেও অসুখই করত। অনন্তকাল কি কেউ গৃহহীন হয়ে পথে ব'সে থাকতে পারে? আমার যে ঘর নেই, আপনার কেউ নেই এই চিন্তাই যে আর আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। তুমিও যেন ক্রমে মনের মধ্যে ছায়া হয়ে উঠছিলে। ছায়ার ধ্যান করা যায়, কিন্তু তাকে আশ্রয় ক'রে মানুষ কতকাল বাঁচে? আমাকে ভালবাস ব'লে চিঠি যখন লিখলে তখন একবার যদি দেখা দিয়ে আসতে? মাঝে মাঝে মনে হত আমি স্বপ্নই দেখছি নাকি, না জ্যোতির্ম্ময় ব'লে কেউ সত্যি আছে?"

জ্যোতির্ম্ময় উর্ম্মিলার গলাটা একহাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "এগুলো এখন ত বেশ ব'লে যাচ্ছ, দয়া ক'রে একটু যদি লিখে জানাতে তা হলে এই বোকামীগুলো কি আমি করতুম? স্ত্রী-পুরুষের চিন্তার ধারা কতটাই যে আলাদা। আমাকে নিয়ে গৌরব করার চেয়ে আমাকে দু' হাত দিয়ে ধ'রে রাখা যে তোমার দরকার বেশী ছিল, তা কেন ব'লে দাও নি? তুমি ত অযথা সঙ্কোচ করার মেয়ে নও?"

উর্ম্মিলা বলিল, "মানুষের অভিমান হয় না জ্যোতি? এটাও আমার ব'লে দেওয়ার দরকার ছিল? তুমি খুব শক্ত হলেও মানুষ ত বটে? কোনদিন কি ইচ্ছা করে নি আমাকে কাছে পেতে, দু' হাত দিয়ে স্পর্শ করতে?"

জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "সমস্তক্ষণ করেছে, স্বপ্নে এবং জাগরণে। কিন্তু ইচ্ছাটাকে দমন ক'রে কাজ করেছি খালি, বুকের ভিতরটা যে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে সে খবরটা জেনেও জানি নি।"

উর্ম্মিলা বলিল, "তুমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হলেই পারতে। সব কামনা, সব বাসনার ঊর্দ্ধে চ'লে যেতে। আমি তোমার তপস্যা ভঙ্গই করলাম।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সন্ন্যাসী হবার মন আমার নয় উর্ম্মিলা। কামনা এবং বাসনা যে অন্য মানুষের চেয়ে বেশী ছিল? সেই কামনাটাকেই রূপান্তরিত ক'রে দেখছিলাম। কিন্তু আমার তপস্যাটা যে কতবড় মেকী জিনিষ তা ত এখন বোঝা গেল। যাকে ভাল ক'রে পাবার জন্যে এ তপস্যা, তাকেই ধ্বংস করতে বসলাম!"

উর্ম্মিলা তাহার বুকে মাথা রাখিয়া বলিল, "সব প্ল্যান যে তোমার মাটি হল, এর জন্যে রাগ কর নি ত? আমাকে যে নিয়ে যাচ্ছ, খুশী মনে নিচ্ছ ত? অনেক কাজের ক্ষতি এর পর তোমার হবে, অনেক উৎপাত সহ্য করতে হবে, তখন আমায় ক্ষমা করবে ত?"

তাহার মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "রাগ করবার, ক্ষমা না করবার জিনিষই এটা বটে! নিজেও মরতাম, তুমিও মরতে, তার উপর আমি নিজেকে হত্যাকারী জেনে মরতাম। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অবস্থাটির থেকে রক্ষা যে করলে তুমি, এই ভেবে তোমার কাল্পনিক রোগটাকেও যেন ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে।"

উর্ম্মিলার মুখ একটু বিষণ্ণই হইয়া গেল। বলিল, "কাল্পনিক যে একেবারেই নয় জ্যোতি। তোমাকে পাওয়ার আনন্দে ভুলে যাচ্ছি মাঝে মাঝে, কিন্তু কে যেন খোঁচা দিয়ে আবার মনে পড়িয়ে দিচ্ছে যে আমি condemned."

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তোমার এই অনর্থক ভয় পাওয়াটা ছাড় উর্ম্মিলা। কেন condemned হতে যাবে? ধর, তর্কের খাতিরে, তোমার যদি অসুখ হয়েই থাকে? এ অসুখ কত লোকের হচ্ছে, কত লোক সারছে, সুস্থ

স্বাভাবিক জীবনযাপন ক'রে বুড়ো হয়ে মরছে। তোমার তা হতে পারবে না কেন? কিসের অভাব হবে তোমার? চিকিৎসা, যত্ন, আদর, কোন্‌টা তুমি পাবে না? একদিনের জন্যেও আর বিচ্ছেদ তোমায় সইতে হবে না। যেখানে নিয়ে যেতে বলবে ডাক্তারে, সেখানে নিয়ে যাব, দরকার হলে Switzerland-এ নিয়ে যাব। মনে একটু আশা রাখ, বিশ্বাস রাখ। এই ত আবার চোখে জল এসে যাচ্ছে। শীগ্‌গির মুছে ফেল। এখনই চা নিয়ে আসবে। দুজনকে ব'সে কাঁদতে দেখলে তারা ভাববে কি?"

চা আসিয়া পৌঁছিল। ঘরের অধিবাসী একজন ছিল, হঠাৎ দুজন হইয়া গেল কি প্রকারে, সে বিষয়ে কৌতূহল থাকিলেও বেয়ারারা তাহা প্রকাশ করিল না। জ্যোতির্ম্ময়ের আদেশ মত আর একজনের চা লইয়া আসিয়া সাজাইয়া দিয়া গেল।

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তোমার ঠিক উপযুক্ত খাদ্য কিনা জানি না। যাই হোক, একটা দিন এই ভাবেই চালাতে হবে। কলকাতায় পৌঁছে সব নিয়মমত হবে। তুমি চা খেয়ে চিঠিদুটো লিখে ফেল। আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর ঘণ্টাখানিকের ছুটি দাও, স্টেশনে ঘুরে আসি। ভাল জায়গা না পেলে আজ রাত্রের ট্রেনে যাবই না। হোটেলে ঢের ঘর খালি আছে, তোমার খুব অসুবিধা হবে না। গোটা-দুই টেলিগ্রামও করতে হবে কলকাতায়।"

উর্ম্মিলা বলিল, "বাড়ীতে কি ব'লে এসেছ যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ?"

"ব'লেই এসেছি খানিকটা, যেটা বলি নি, সেটাও আরতি ব'লে রাখবে। মেয়েটা সবই বোঝে মনে হয়।"

উর্ম্মিলা বলিল, "তোমার বাবা-মা বড় ক্ষুব্ধ হবেন না? এরকম বৌ হবে তা বোধহয় কোনদিন ভাবেন নি?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তা আর কি করা যাবে? বৌটা আমার পছন্দমত হওয়াই ভাল।"

চা খাওয়া হইয়া গেল। উর্ম্মিলারও চিঠি লেখা শেষ হইল। বলিল, "চিঠি পেয়ে সুদেব গুপ্তর মুখটা কিরকম হয় একটু দেখবার ইচ্ছা ছিল। প্লুরিসি হয়েছে শুনে সেই যে ভদ্রলোক পালাল, আর এমুখো হয় নি। খুব disappointed হয়েছে। এতগুলো টাকার লোভ ছাড়া শক্ত ব্যাপার। সবাই ত জ্যোতির্ম্ময় নয় যে টাকার নামেই জ্ব'লে উঠবে!"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এতে আর বাহাদুরি কি জ্যোতির্ম্ময়ের? যা কাণ্ড হল এই টাকা নিয়ে! কাল সত্যি মনে হচ্ছিল, টাকা নয় এগুলো কেউটে সাপ। এদের কামড়ে জীবনটাই শেষ হয়ে গেল। তবু টাকার নিন্দাই করব না শুধু। তখন যদি অমন ক'রে না এগিয়ে আসতে আমাকে রক্ষা করতে, তা হলে তোমার মূল্য কি অত ভাল ক'রে আমি বুঝতাম? অবশ্য ভালবাসতে আরম্ভ ত ঢের আগেই করেছিলাম।"

উর্ম্মিলা বলিল, "সত্যি জ্যোতি, ক'দিনের বা আলাপ আমাদের, তারই মধ্যে একটা মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বসল। ভালবাসা জিনিষটাই এমনি, কেন যে আসে, কখন্ যে আসে তার ঠিকানা নেই। আর একটা মানুষ হয়ত বাল্যকাল থেকে সাধ্য সাধনা করছে, অথচ মন একদিনের জন্যেও তার দিকে ফিরল না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তাই ত বটে। শুভক্ষণে তাকানো চাই মানুষটার দিকে।—ফুল যেমন চেষ্টা করলে ফোটে না। এই তুমি উর্ম্মিলাকেই যদি ভাবী বধূরূপে সাবেকী প্রথা অনুসারে দেখতে যেতাম তা হলে কি আর অত ভাল লাগত, যতটা লাগল সেই ট্রাম ষ্ট্রাইকের দিনে? দরজা খুলে যখন এসে উঠলে ট্যাক্সিটাতে তখনই বোধহয় বৃদ্ধ প্রজাপতি আর তরুণ পঞ্চশর মিলে ঠিক ক'রে নিলেন যে একই জীবনরথে এদের চলতে হবে।"

চায়ের বাসন সরাইতে বেয়ারার আগমন হওয়ায় তাহাদের গল্প থামিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমি তাহলে ঘুরে আসি। তোমার চিঠিদুটো পাঠিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। যদি কাপড়-চোপড় এসে পড়ে তাহলে স্নান ক'রে নিও। আমার বেশী দেরী হবে না। ঘরে magazine কতগুলো আছে, সদ্ব্যবহার করতে পার।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

উর্ম্মিলা দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া বই ও মাসিকপত্রগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। শরীর দুর্ব্বল, এখনও বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। তবু মুখের চেহারায় একটু যেন রক্তিমার সঞ্চার হইয়াছে। পরশমণি তাহাকে আজ স্পর্শ করিয়াছে। প্রিয়তমের বুকে আশ্রয় পাইয়াছে সে। কাল সন্ধ্যায় বিছানায় পড়িয়া প্রাণপণে মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছে উর্ম্মিলা, এই প্রিয়বিরহিত জীবন শেষ হোক। আর আজ সভয়ে তাঁহাকে প্রণাম

[illegible] আমায় আমাকে জীবন হইতে ছিঁড়িয়া লইও না। এই মধুময় স্বর্গীয় প্রেমকে একটু প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে দাও।"

সময়টা ধীরে ধীরে কাটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে নার্সিং হোম্ হইতে তাহার ছোট স্যুটকেস্ ও চিঠির উত্তর আসিয়া পৌঁছিল। মেট্রন তাহার জিনিষপত্র পাঠাইয়া দিয়া শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন। উর্ম্মিলার দেয় যে অর্থ, তাহার বিল সুবের গুপ্তের কাছে পাঠান হইয়াছে। উর্ম্মিলা যে জিনিষপত্র সব পাইয়াছে তাহা যেন লিখিয়া জানায়।

উর্ম্মিলা জিনিষপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া চিঠি লিখিয়া দিল। একটা জমাদারণী বাথরুম পরিষ্কার করিতে আসিয়াছিল, তাহার সাহায্যে গরম জল আনাইয়া স্নানাদি সারিয়া ফেলিল। এখনও ত জ্যোতির্ম্ময় ফিরিল না। কালরাত্রে সারারাত জাগিয়া সে পাগলের মত কাঁদিয়াছে, এখন শান্ত অমৃতসিক্ত চিত্তে তাহার ঘুম আসিতে লাগিল। তবু চেষ্টা করিয়া জাগিয়াই রহিল। কতক্ষণে জ্যোতির্ম্ময় ফিরিয়া আসিবে, বসিয়া বসিয়া তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বসিয়া বসিয়া প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় কড়া নাড়িয়া উঠিল। উর্ম্মিলা উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। জ্যোতির্ম্ময় প্রবেশ করিয়া বলিল, "এই ত স্নানটান সেরে ফেলেছ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখখানা একবারও দেখেছ? আগের চেয়ে নিজেকে ভাল লাগছে না? কিন্তু মনে হচ্ছে, তোমার বড় ঘুম পেয়েছে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "সত্যি ঘুম পাচ্ছিল। কতকাল ঘুমোই নি তা জানি না। ওখানে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াত। কিন্তু তোমায় দেখে ঘুমটা ছেড়ে যাচ্ছে।"

জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে শিশুর মত অবলীলায় তুলিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিল। বলিল, "আমায় দেখে ঘুম টুটলে ত চলবে না? চিরকাল না ঘুমিয়ে থাকবে নাকি? খানিকটা ঘুমিয়ে নাও। খাবার নিয়ে এলে তোমায় তুলে দেব।"

নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসা করিল, "রিজার্ভেশন্ পেয়েছ?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "পেয়েছি দুটো বার্থ্ই, একটা উপরের একটা নীচের। আমি স্নান ক'রে আসি, খুব ভাল ক'রে ঘুমিয়ে নাও।"

সে স্নান করিতে যাইতে না যাইতে উর্ম্মিলার চোখ বুজিয়া আসিল। যখন জাগিল, তখন প্রায় তিনটা পার হইয়া গিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময় আরাম-চেয়ারে বসিয়া ঘুমাইতেছে। উর্ম্মিলা উঠিয়া বসিয়া ভাবিল, বেশ অবস্থা হইয়াছে দুইজনের। ট্রেনেও হয়ত বেচারার ঘুম হইবে না। আমি না সারা পর্য্যন্ত এই উৎপাত চলিতে থাকিবে।

তাহার খাট হইতে নামার শব্দে জ্যোতির্ম্ময় উঠিয়া বসিল। বলিল, "সারারাত জেগে এখন বোধহয় সারাদিন ঘুমোতে ইচ্ছা হবে। নিতান্ত সন্ধ্যার পরে ট্রেন, না হলে ঘুমোনোই যেত। এখন খাবার নিয়ে আসতে বলি?"

উর্ম্মিলা বলিল, "বল"। সে স্নানের ঘরে গিয়া মুখে চোখে জল দিয়া আসিল। খাবার যাহা আসিল তাহার সবটা তাহার খাওয়া চলিল না। তবে উপবাসও করিতে হইল না। জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "যাক, কাজচলা মত হ'ল ত? কাল থেকে ডাক্তারে যা কিছু খেতে অনুমতি দেন সবের ব্যবস্থা করা যাবে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "আঃ, একদিন না খেলে কিই বা হয়? নিজের বাড়ীতে কতদিন সকালে খেয়েছি ত বিকেলে খাই নি, বিকেলে খেয়েছি ত সকালে খাই নি।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তা না হলে এমন স্বাস্থ্য হয়? চিরজন্ম ভোগাবে আমাকে খাওয়া নিয়ে। এর চেয়ে তোমার ভূদেবগৃহিণীর মত হওয়া ভাল।"

উর্ম্মিলা বলিল, "তা আর নয়? দেখনি তাই। দেখলে আর ফিরেও তাকাতে না, ভালবাসা ত দূরের কথা। আড়াই মন ওজন মহিলার। এই রকম টপ্ টপ্ ক'রে কোলে তুলে নিতে হ'ত না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সেটা একটা অসুবিধা বটে। কিন্তু এখন কি করতে চাও? জিনিষপত্র ত কিছুই নেই যে গুছোবে। আবার ঘুমোতে চাও?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "এখনি আর না, তাহলে সারারাত জেগে থাকতে হবে। তুমি না-হয় খানিকটা ঘুমিয়ে নাও।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "দেখি, আবার যদি ঘুম পায়, তখন শুলেই হবে। সুদেববাবুর কাছ থেকে কোন উত্তর এখনও পাও নি, না?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "এখন অবধি ত না। তোমায় দেখার আগ্রহে যদি নিজে না এসে হাজির হয়।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমার কথা জানে নাকি ও?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "তা আর জানে না? ছোটমাসীর কাছে নামটা শুনেছিল, তখন কিছু সন্দেহ করে নি। শেষে নাকি আমার ছাত্রীর চাকরবাকরকে পয়সা দিয়ে বশ করেছিল, আমি কার কার নামে চিঠি লিখি জানবার জন্যে। তখন বুঝেই থাকবে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আইনের জ্ঞানটা ভদ্রলোক খুব কাজে লাগাচ্ছেন দেখছি।"

বাহিরে আবার কড়া নাড়ার শব্দে জ্যোতির্ম্ময় গিয়া দরজা খুলিল। কয়েকটা বাক্স দরজার সামনে নামানো। চিঠি হাতে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। ঊর্ম্মিলা আসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, "যাক, জিনিষপত্রগুলো ঠিকই এসেছে। গুপ্ত মশায় infection-এর ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি দেখছি। আচ্ছা, স্যুটকেসগুলো ঘরে ঢুকিয়ে রাখতে বল, আর লোকটাকে অপেক্ষা করতে বল, যদি জবাব দেবার কিছু থাকে।"

চিঠি খুলিয়া সে পড়িতে আরম্ভ করিল।—

ঊর্ম্মিলা,

তোমার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হলাম। তুমি আমার বাবার বন্ধুকন্যা, এবং আমারও আবাল্য-পরিচিত। আমাদের সংসারের একজন হবে, এ আশাও অনেকদিন ছিল। পরে অবশ্য জানলাম যে, তুমি অন্য জায়গায় হৃদয় দান ক'রে ব'সে আছ। সেটা আমাকে ঠিক সময় জানাও নি কেন তা জানি না।

যাক, সে সব ত চুকে গেছে। তুমি এখন সাঙ্ঘাতিক রোগগ্রস্ত, তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রে কোনও লাভ নেই। এখানে একটা ভাল ব্যবস্থার মধ্যে ছিলে, সেটা ছেড়ে দিয়ে অতি অশোভন ভাবে চ'লে গেলে। আমায় একবার জানানোও দরকার মনে করলে না, আর যাদের কাছে ছিলে অনর্থক তাদের ভাবালে। যদিও এখানে তোমার দেখাশোনার ভার আমার উপরেই দিয়ে গিয়েছিলেন তোমার ছোট মাসী। যাঁর কাছে গেলে, তিনি তোমার ভাবী-স্বামী হতে পারেন, তবে এখনও ত স্বামী হন নি? এ ভাবে তাঁর সঙ্গে চ'লে যাওয়াটা সমাজের চোখে নিন্দনীয় হবে।

তোমার জিনিষপত্র পাঠালাম। ঠিক আছে কিনা দেখে নিও। নার্সিং হোমের বিল্ দিয়ে যে টাকা বাকি থাকবে, তা কলকাতায় তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। ভবিষ্যৎ ঠিকানাটা লিখে পাঠিও।

আশা করি ভালই থাকবে। ভবিষ্যতে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে জানিও। ইতি

সুদেব গুপ্ত।

ঊর্ম্মিলা চিঠিখানা জ্যোতির্ম্ময়ের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, "নাও, পড়, সাবধানে কি ক'রে গালাগালি দিতে হয় শিখতে পারবে। আমি দু' লাইন জবাব লিখে দিই।"

জিনিষপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া ও নিজের ভবিষ্যৎ ঠিকানা দিয়া ঊর্ম্মিলা চার লাইন একটা চিঠি শেষ করিল। পত্রবাহককে বিদায় করিয়া দিয়া আবার আসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের পাশে বসিল। বলিল, "দেখলে চিঠি?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "দেখলাম ত। অসম্ভব stupid মানুষ। যাক, জগতে যে যার মত নিয়ে চলে। এর কাছে মানুষের হৃদয়ের মূল্য কিছু নেই, সেই মতই তার ব্যবহার। তোমার ব্যবহারটা যতই অশোভন হোক, দুটো মানুষের প্রাণ ত বাঁচল? ম'রে যেতাম দু'জনেই, তুমি অসুখে মরতে আর আমি আত্মহত্যা ক'রে মরতাম। সারা রাত কাল ঐ চিন্তাটাই মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে।"

ঊর্ম্মিলা একেবারে জ্যোতির্ম্ময়ের কোলের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "না জ্যোতি, না, কখনো এ রকম সর্ব্বনেশে কথা তুমি ভাব নি। এর চিন্তাও যে, মহাপাপ।"

জ্যোতির্ম্ময় তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "সত্যিই ভেবেছিলাম। এত যন্ত্রণায় মানুষের এ রকম চিন্তা মাথায় আসেই। কিন্তু তোমার কাছে এ-কথা আর কোনদিন বলব না। মহাপাপ বটেই, কিন্তু তখন যে নিজেকে নারী-হত্যাকারী ব'লে মনে হচ্ছিল, তাও আবার নিজের জীবনের চেয়ে প্রিয় যে ছিল, সেই নারীর হত্যাকারী। তোমার আচরণ অশোভন হোক, নিন্দনীয় হোক, আমার কাছে সেটা ভগবানের সাক্ষাৎ আবির্ভাবের মতই স্বর্গীয়। এমন কি, তিনি এসে দাঁড়ালেও কি এই ভীষণ যন্ত্রণা আমি ভুলতে পারতাম? জীবনটা ত আমার কাছে একটা নারকীয় অগ্নিকুণ্ড ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিল না।"

উর্ম্মিলা চোখ মুছিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। জ্যোতির্ম্ময়ের দুই হাতে চুম্বন করিয়া বলিল, "আমরা দু'জনেই ভীষণ বোকা, জ্যোতি। তুমি নিজের ভালবাসার মর্য্যাদা বাড়াতে গিয়ে আমাকেই প্রায় শেষ ক'রে দিয়েছিলে, আর আমি তোমাকে রোগ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে এমনই ব্যবস্থা করলাম যে, তুমিও মরতে বসলে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এর থেকে শিক্ষা যা হল, সেটা আশা করি চিরকাল মনে থাকবে। আমার জীবনে এমন কিছুকে আর স্থান দেওয়া চলবে না, যা তোমাকে অতিক্রম করতে পারে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "ওদিক্ দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত, জ্যোতি। তোমাকে অতিক্রম করতে পারে, আমার জীবনে, এমন কোনো জিনিষ আমি কল্পনাই করতে পারি না।"

জ্যোতির্ম্ময় হাসিয়া তাহার গালটা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি এত বেশী মিষ্টি কথা ব'লো না। আমি ভয়ানক প্রশ্রয় পেয়ে যাব।"

উর্ম্মিলা বলিল, "জান জ্যোতি, আমি জীবনে কখনও কারো কাছে প্রশ্রয় পাই নি। একলা তোমাকেই সব প্রশ্রয়টা দিতে হবে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সে আমার সৌভাগ্য, উর্ম্মিলা।"

সন্ধ্যার সময় গোছানো জিনিষপত্র আর একবার গুছাইয়া লইয়া দুইজনে স্টেশনের দিকে যাত্রা করিল। জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এখানের স্টেশনে আর হাওড়া স্টেশনে হাঁটাহাঁটি ক'রে তোমার আবার জ্বর না আসে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "বোধ হয় না। আজ ত ভালই ছিলাম, যদিও temperature দেখি নি। জ্বর-জ্বর ভাবটা ছিল না।"

পাটনার স্টেশনে খুব বেশী হাঁটিতে তাহাকে হইল না। গাড়ীতে উঠিয়া বলিল, "দেখ ত জ্যোতি, অন্য বার্থ দুটোতে কারা যাচ্ছে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এক মেমসাহেবের নাম রয়েছে। উপরেরটা খালিই দেখছি।"

উর্ম্মিলার বিছানাটা পাতিয়া দিয়া বলিল, "তুমি শোও, আর ব'সে থেকো না, তুমি ঘুমিয়ে গেলে আমি উপরে উঠে শোব। যতক্ষণ জেগে আছ ততক্ষণ তোমার পায়ের কাছে ব'সে থাকি।"

উর্ম্মিলা বলিল, "মাথার কাছে বোস না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তাহলে তোমার মুখটা দেখতে পাব কি ক'রে?"

গল্প করিতে করিতে উর্ম্মিলা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুমাইয়া পড়িল। অগত্যা জ্যোতির্ম্ময়ও শয়নের ব্যবস্থা করিয়া নিদ্রার চেষ্টাই দেখিল। দুই-তিনদিনের অনিদ্রায় সেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তবে রাত্রে তিন-চারবার নীচে নামিয়া উর্ম্মিলা কেমন আছে দেখিয়া গেল।

১৭

ভোর হইতে না হইতেই জ্যোতির্ম্ময়ের ঘুম ভাঙে সর্ব্বদা। সে উপরের বার্থ্ হইতে নামিয়া মুখ-হাত ধুইয়া ফেলিল। উর্ম্মিলা তখনও ভাল করিয়া জাগে নাই, তবে তাহারও ঘুম হাল্কা হইয়া আসিয়াছে বুঝা যায়। সহযাত্রিণী মেমসাহেব সুবিবেচক, পিছন ফিরিয়া ঘুমাইতেছেন দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময় উর্ম্মিলার গাল ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "এবার নলিনী খোল গো আঁখি।"

উর্ম্মিলা চোখ মেলিয়া তাকাইল। বলিল, "সূর্য্যোদয় হলে নলিনীকে আঁখি খুলতেই হয়। তাও আবার আমার জীবনের প্রথম সূর্য্যোদয়। সত্যি, এতদিন চিররাত্রির দেশের অধিবাসিনী ছিলাম।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমার নামটা অবশ্য তোমার কথাকে সমর্থনই করে, তবে কার্য্যতঃ এখনও খুব বেশী

কৃতিত্ব দেখাতে পারি নি। যদি তোমায় একেবারে সারিয়ে তুলতে পারি, তাহলে জানব আমি সার্থকনামা বটে। এ সব রোগের প্রধান চিকিৎসক হচ্ছেন সূর্য্যরশ্মি। তবে অনর্থক কথা বলছি, ওরকম কোনো অসুখ তোমার হয় নি।"

উর্মিলা বলিল, "তুমি ইচ্ছে ক'রে চোখ বুজে থাকতে চাও থাক। কিন্তু আমি তোমায় কিছু মিথ্যা বোঝাতে চাই নি। একটা স্টেশন আসছে না? দেখ ত একটু চা পাওয়া যায় কিনা। মুখ ধুয়ে চা না খেলে কেমন যেন লাগে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "হ'ল কি তোমার? খেতেও ইচ্ছে করছে? প্রায় যে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছ?"

ট্রেন থামিবামাত্র সে প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া চা সংগ্রহ করিয়া আনিল। চা খাইতে খাইতে উর্মিলা বলিল, "মন সারলে যদি শরীর সারত তাহলে সত্যিই সেরে যেতাম।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "মন সারলে যে শরীর সারে, তা নিজে বুঝতে পারছ না?"

"পারছি কিছু কিছু, তবে সাহস ক'রে বিশ্বাস করতে পারছি না। মন ভাঙলে মানুষ যে মরে এটাও ঠিক। পরন্তু প্রায় মরার কিনারায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম। বুদ্ধি ক'রে যদি ছুটে না পালিয়ে আসতাম তোমার কাছে, তাহলে শেষই হয়ে যেতাম। ভগবান্ আমায় যে পরমায়ু দিয়েছিলেন তা শেষই হয়ে গিয়েছিল। এখন যার জোরে চলছি তা তোমার ভালবাসার দান। এরপর অর্কিড ফুলের মত তোমার জীবনেই আমি বেঁচে থাকব। তোমার থেকেই আমার প্রাণের সম্পদ্ নিতে হবে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সত্যিই যদি তা হতে পারে উর্মিলা, তাহলে ত আমার প্রাণধারণ সার্থক। তোমার সুন্দর জীবনটাকে আমি ত নষ্ট করতে বসেইছিলাম, এখন নিজের জীবনের খানিকটা দিয়ে যদি তোমায় বাঁচিয়ে তুলি, তাহলেই ন্যায়বিচার হয় ভগবানের।"

দেখিতে দেখিতে হাওড়া স্টেশন আসিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময় মুখ বাহির করিয়া জনসমুদ্র দেখিতে লাগিল। উর্মিলা জিজ্ঞাসা করিল, "কাউকে expect করছ নাকি?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "অখিলটাকে আসতে বলেছিলাম। ভেবেছিলাম, যদি খুব বেশী অসুস্থ অবস্থায় তোমায় নিয়ে আসি, তাহলে সাহায্যের দরকার হতে পারে। অখিল এসেছে দেখতে পাচ্ছি, আমার ভগ্নীপতি ভবেশকেও দেখতে পাচ্ছি, ওকে বোধহয় বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

ট্রেন দাঁড়াইয়া গেল। অখিল আর ভবেশ দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আসিল। দরজা খুলিয়া নামিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এই যে এদিকে। অনেকটা সুস্থই আছেন, বেশী কষ্ট পেতে হয় নি।" উর্মিলা নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এই আমার দিদির স্বামী ভবেশ, আর ইনি আমার বন্ধু অখিল। তুমি যে কে ওঁরা সেটা জানেন।"

ভদ্রলোকদ্বয় আগে উর্মিলাকে দেখেন নাই। অখিল নমস্কার করিয়া বলিল, "জ্যোতির্ম্ময় বড় upset হয়ে গিয়েছিল। যাক, ভালয় ভালয় এসে যে গেছেন, এটা খুব ভাল। দূর থেকে ঠিক অবস্থাটা বোঝা ত যায় না? ভেবেছিল আরো বেশী অসুখ।"

ভবেশ বলিল, "এমন কি আর অসুস্থ দেখাচ্ছে? এরকম রোগা ত সব সংসারেই একটি দুটি থাকে। আচ্ছা, আমি জিনিষগুলো নিয়ে এগোই, ট্যাক্সি জোগাড় করি। এঁকে খুব আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে নিয়ে এস।"

খুব আস্তে আস্তে হাঁটিয়াই তিনজনে প্ল্যাটফর্ম্ম পার হইয়া চলিল। ট্যাক্সিতে জিনিষপত্র তোলা হইয়াই গিয়াছিল। অখিল বলিল, "আমি তবে চলি এখান থেকে, বিকেলে গিয়ে দেখা করব। ডাক্তারকে ব'লে রেখেছি তিনি কাল সকালেই আসবেন, নার্সও ঠিক আছে, সে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর চ'লে আসবে।" বলিয়া সে উর্মিলাকে নমস্কার করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল।

কতদিন পরে উর্মিলা আবার কলিকাতায় ফিরিল। ভগ্নহৃদয় লইয়া অশ্রুসজল নেত্রে বিদায় হইয়াছিল। আজ মনে আনন্দের সীমা নাই, তবে স্বাস্থ্য হারাইয়া আসিয়াছে। রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর সবই যেন বন্ধুর মত তাহাকে সম্ভাষণ করিতেছে। গাড়ী আসিয়া উর্মিলার বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল।

ফুটপাথে সুখদা, মিনতি আর আরতি দাঁড়াইয়া। দরজার সামনে তারণ আর ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া তার বৌ। দরজা খুলিয়া জ্যোতির্ম্ময় নামিতেই সুখদা অগ্রসর হইয়া আসিয়া উর্মিলাকে হাত ধরিয়া নামাইয়া লইলেন, বলিলেন, "এস মা এস, পথে কষ্ট হয় নি ত?"

উর্ম্মিলা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "না কষ্ট হয় নি, ভালই এসেছি।"

মিনতিকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল, সে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। আরতি তাহাকে প্রণাম করিল। তারণ ও তাহার বৌও অগ্রসর হইয়া আসিয়া দিদিমণিকে প্রণাম করিল।

মিনতি বলিল, "আস্তে আস্তে হেঁটে উপরে উঠতে পারবে, না চেয়ারে ক'রে নিয়ে যাবে?"

উর্ম্মিলা বলিল, "না, আমি হেঁটেই উঠছি, এখন এখানে ঐ সব করতে হলে লোক জমা হয়ে যাবে।"

সুখদা ও তারণের বৌ-এর সাহায্যে উর্ম্মিলা ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপর বসিয়া বলিল, "কতদিন পরে বাড়ী এলাম।"

তারণ বলিল, "আজ মাসীমা থাকলে কত আনন্দ করতেন। তা দিদিমণি, আপনাদের চা এখানে নিয়ে আসব? রান্নাও চড়াব, কিছুটা হয়েও আছে। ওবাড়ীর মাসীমাও করছেন, তাই সবটা আমি এখনও করি নি।"

সুখদা বলিলেন, "মাগুরমাছের ঝোলটা ক'রে রেখেছি, সেটা পাঠিয়ে দিই গিয়ে। আর বাকি সব ঐ করুক। ওখানে কি রকম খাওয়া-দাওয়া হত তা ওকে ব'লে দাও।"

উর্ম্মিলা বলিল, "তাই ব'লে দিচ্ছি। ছোটমাসী ওকে এমন তৈরি ক'রে রেখে গেছেন যে একদিন ব'লে দিলেই হবে।"

মিনতিকে বাড়ী গিয়া রান্না করিতে হইবে বলিয়া সে আর ভবেশ এই সময় চলিয়া গেল। আরতি জিজ্ঞাসা করিল, "উর্ম্মিলাদি, আপনার এস্‌রাজটা দিয়ে যাব?"

উর্ম্মিলা বলিল, "আমি নিয়ে কি করব? আমি ত এখন বাজাই না? প'ড়ে প'ড়ে নষ্ট হবে, তোমার কাছেই থাক।"

আরতিকে খুব বেশীক্ষণ উর্ম্মিলার কাছে থাকিতে বোধহয় তাহার মা-বাবা বারণ করিয়া থাকিবেন। সে একটু পরে চলিয়া গেল। সুখদাও এদিক্‌-ওদিক্‌ ঘুরিয়া যখন দেখিলেন, তাঁহার আর কিছুই করিবার নাই, তখন তিনি প্রস্থান করিলেন। তাঁহার একটু অস্বস্তিই লাগিতেছিল। যে মেয়ে আপন নয়, অথচ অতি আপন হইতে যাইতেছে তাহার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করা উচিত তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাহার উপর রোগটা যে উর্ম্মিলার কি, সে সম্বন্ধেও তাঁহার একটু আশঙ্কা ছিল। ছেলে এমন ভাবে মাখামাখি করিতেছে, ইহা তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না, অথচ তাহাকে কিছু বলিবারও সাহস ছিল না।

বাড়ী যখন খালি হইয়া গেল, তখন তারণ চা, রুটি, ডিম সব লইয়া উপরে উঠিল। উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যোতি, এখানেই চা খাবে? না মা তোমার রাগ করবেন?"

জ্যোতির্ম্ময় টেবিলের কাছে আসিয়া বলিল, "এখানেই খাই, মায়ের কোল থেকে যে খ'সে পড়ছি, সেটা মাকে বুঝতেই হবে sooner or later."

উর্ম্মিলা বসিয়া চা ঢালিতে লাগিল। বলিল, "তোমার মায়ের ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছে না জ্যোতি, আমি তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কোনো জিনিষই সবাইকার ভাল লাগে না। সম্প্রতি সর্ব্বপ্রথম তোমার যা ভাল লাগে তাই করতে হবে। আর কোনো কথা তোমার ভাববারই দরকার নেই। নার্স্‌টা তোমার এসে গেলে তুমি শুধু চুপ ক'রে শুয়ে থাকবে। ওখানে ত তাই-ই করতে, না?"

"তাই প্রায়। দু-একটা চিঠি লিখতাম। কথা বলবার কেউ ছিল না কাজেই কথা বলতাম না। বই পড়তে ভাল লাগত না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এখান থেকে চিঠি আর কাকে লিখবে? এক ছোটমাসীকে লিখতে পার। তাঁর খবর কি? পাটনায় গিয়েই ত মাথায় এমন বজ্রাঘাত হ'ল যে কারো আর খোঁজখবর নিতে পারলাম না।"

"ছোটমাসী ভালই আছেন, খুব বেড়াচ্ছেন, জিনিষ কিনছেন আর opera শুনছেন। আমার কথা বিশেষ তাঁকে লিখিনি, কেন তাঁর আনন্দটা নষ্ট করা আর।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "বিয়ের খবরও তাঁকে দেবে না? অমন মেয়ের মত দেখতেন তোমাকে!"

উর্ম্মিলা বলিল, "বিয়ে হোক ত আগে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "না হবার কারণ?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "সকলের মুখে অপ্রসন্নতা দেখে দেখে কেমন যেন মনটা দ'মে যাচ্ছে। সেখানে তুমি একলা আমার ছিলে, এখানে তুমি যেন অনেকের।"

জ্যোতির্ম্ময় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। ঊর্ম্মিলার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, "এখানেও আমি সম্পূর্ণ তোমার। আর কারো অধিকার নেই আমার উপরে। মনের আনন্দটাকে নষ্ট হতে দিও না ঊর্ম্মিলা। কোনো কারণ নেই। বিয়ে উপলক্ষ্যে যেটুকু strain হবে, তা যদি ডাক্তার বলেন যে করা যায়, তাহলে কালই দিন স্থির ক'রে ফেলব। তোমাকে সংশয়ের মধ্যে রাখব না আমি।"

ঊর্ম্মিলা জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার যদি বারণ করেন?"

"বিয়ে করতে বারণ করলে সেটা শুনব না, তবে সনাতনমতে না হয়ে শুধু রেজিষ্ট্রী ক'রেই বিয়ে হবে। তাতে ত strain নেই।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "লক্ষীটি, ডাক্তারেরা যদি বারণ করে আমায় বিয়ে করতে, তুমি ক'রো না। তোমার কোনো অনিষ্ট হলে আমি একদিনও বাঁচব না। তোমাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি, কানে কথা শুনতে পাচ্ছি, হাতের স্পর্শ পাচ্ছি, এই ত ঢের জ্যোতি?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমি যে ওতে খুশী হতে পারছি না। আমি যে তোমায় দিবারাত্রি সারাক্ষণের জন্যে চাই। দেহ, মন, প্রাণ সব চাই। সেটা কি ক'রে পাব? বিয়ে যদি না করি ত সুদেব গুপ্তের দল কতো'রা দেবেন যে, আমরা নিন্দনীয় আচরণ করছি।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "তবে তোমার যা খুশী।"

তারণ উপরে আসিয়া খবর দিল, "দিদিমণি, একজন মেয়েলোক এসেছে নীচে, বলছে সে নার্স্। উপরে নিয়ে আসব?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "নিয়েই এস। বেশ তাড়াতাড়ি এসে গিয়েছে দেখছি।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "যদি চলনসইও হয় তাহলে এখন থেকেই কাজে লাগিয়ে দাও। দিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে থাক, যেমন ওখানে থাকতে। ডাক্তার আসবার আগে একেবারে উঠো না।"

নার্স্ উপরে আসিল। লম্বা রোগা, শ্যামবর্ণা। নাম বলিল সুশীলা। অনেক জায়গায় কাজ করিয়াছে, সার্টিফিকেট সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। কাজ বুঝিয়া লইল, হাল্কা কাজ করিতে হইবে জানিয়া খুশীই হইল বোধ হয়।

ঊর্ম্মিলা তাহাকে চাবি দিয়া বলিল, "আমার ঘরে যে স্যুটকেস আছে তার থেকে জিনিষপত্র বার ক'রে গুছিয়ে রাখ। নীচে ত রান্নাঘর দেখেছ, সেখান থেকে স্নানের গরম জলটল নিয়ে এস ঘণ্টাখানিক পরে। নিজের জিনিষপত্র ঐ ছোট ঘরে রাখ।" সুশীলা চলিয়া গেল।

ঊর্ম্মিলা বলিল, "জ্যোতি, এবার তোমার কাছে হাত পাততে হচ্ছে। টাকাকড়ি কিছু নেই আমার কাছে। ব্যাঙ্ক থেকে না তোলা অবধি একেবারে কপর্দ্দকহীন।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কত দেব বল? তোমার এটা খুব অদ্ভুত লাগছে, না? অন্নপূর্ণা হয়ে ভিক্ষা করতে যাওয়া? তবে টাকাগুলো সবই তোমার, এই যা।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "ও সব আমার কিছু নয়, সব তোমার।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সেটা আবার কি রকম?"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "আমাকে যে নেবে, সে আমার যা কিছু আছে সব নেবে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আবার এই টাকা নিয়ে হাঙ্গামা বাধিও না ঊর্ম্মিলা। কার্য্যতঃ আমার ত সব হলই। নামটা তোমার যেমন আছে থাক। না হলে সকলের দৃঢ় ধারণা হবে যে টাকার লোভেই আমি তোমায় বিয়ে করছি। যে ভূতকে একবার অনেক কষ্টে ঘাড় থেকে নামিয়েছি, তাকে আবার আমার ঘাড়ে চড়তে দিও না।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "পাছে তোমায় কেউ লোভী বলে এই ভয় তোমার বড় বেশী।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "লোভী ত আমি বটেই, তবে আমার লোভটা সবটা তোমার উপরে, তোমার টাকার উপরে নয়। নাও, এখন এই তিনশ' টাকা রাখ। আরো যা দরকার হবে কাল ব'লে দিও, ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে আসব।"

টাকা হাতে করিয়া ঊর্ম্মিলা হাসিয়া বলিল, "বেশ বুড়ো কর্ত্তা-গিন্নীর মত টাকা পয়সা নিয়ে গল্প করছি।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আরম্ভ করা ভাল, এর পর করতে ত হবে? আচ্ছা, এবার গিয়ে শোও দেখি। আমিও ঘুরে আসি বাড়ী থেকে, একেবারে স্নান ক'রে আসি।"

ছুই হাতে তার একটা হাত ধরিয়া উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসা করিল, "কখন আসবে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আধঘণ্টার মধ্যেই আসব। তুমি কি ভাবো, তুমিই শুধু আমার কাছে থাকতে চাও, আমি চাই না?"

উর্ম্মিলা বলিল, "আমার মত অতটা কি আর চাও? তোমার মা-বাবা আছেন, বোনরা আছে, বন্ধুবান্ধবও আছে। আমার ত তুমি ছাড়া কিছু নেই। পিতা, পতি, পুত্র সবাইকে মিলিয়ে যে ভালবাসাটা দিয়ে থাকে অন্ত মেয়েতে, আমি তার সবটাই দিচ্ছি তোমাকে।"

উর্ম্মিলার চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "পুত্র-কন্যা যদি আসে জীবনে, তাদের জন্যে কি কিছুই বাকি থাকবে না উর্ম্মিলা?"

উর্ম্মিলা আরক্তমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "ভগবান্ আরো দেবেন তাদের জন্যে। তোমারটার উপর তারা ভাগ বসাবে না। কিন্তু যাও, ও-বাড়ীর কাজ সেরে এস, তোমার আর দেরী করিয়ে দেব না।" জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া গেল।

উর্ম্মিলা মনে মনে দিনের কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিয়া লইল। তারণকে ডাকিয়া দিন-পনেরোর মত বাজার ও ভাঁড়ারের খরচ দিয়া দিল। রোজ আর এই সব লইয়া ব্যস্ত হইতে সে চায় না। তারণ স্থলাজিনীর আমলে যেমন চালাইত তেমনি চালাইয়া যাইবে। গোয়ালা, ধোপা, প্রভৃতিকে খবর দিয়া দিবে। সুশীলাকে কাজ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর স্নানাহার করিয়া সে শুইয়াই থাকিবে, ডাক্তার যেন তাহাকে আসিয়া কিছুটা অন্ততঃ ভাল দেখেন। বিকালে জ্বর যদি না আসে তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, সে আরোগ্যের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নিজের শয়নকক্ষে গিয়া দেখিল, সুশীলা জিনিষপত্র বেশ ভাল ভাবেই গুছাইয়া রাখিয়াছে। খাটে বসিয়া বলিল, "আমার মাথায় তেল দিয়ে দাও, আর স্নানের ঘরে গরম জল দিতে বল। সাবান, তোয়ালে, শাড়ী, জামা সব নিয়ে যাও।"

সুশীলা মানুষটার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে দেখা গেল। নির্দ্দেশমত সে ঠিকই কাজ করিতে লাগিল। স্নান সারিয়া উর্ম্মিলা বাহিরে আসিয়া দেখিল, তখনও জ্যোতির্ম্ময় আসে নাই। বেশী ঘোরাঘুরি করিতে ইচ্ছা করিল না, খাটে গিয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিল, পাশের বাড়ীতে হয়ত তাহার রোগ লইয়া খুবই আলোচনা হইতেছে।

খানিক পরে তারণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার খাবার নিয়ে আসব দিদিমণি?"

উর্ম্মিলা বলিল, "নিয়ে এস"। সুশীলাকে বলিল, "ছোট একটা টেবিল নিয়ে এস এখানে, আমার আর খাবার ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না।"

বিছানায় বসিয়া খাইতে খাইতে ভাবিল, আমার প্রায় দেবীচৌধুরাণীর ব্রজেশ্বরের অবস্থা হইয়াছে, এখন সব রান্নাই ভাল লাগিতেছে। অন্যদিন নামেমাত্র খাইত, আজ যেন আহারে রুচি আসিয়াছে।

খাওয়া শেষ হইবার আগেই জ্যোতির্ম্ময় আসিয়া পৌঁছিল। বলিল, "লক্ষ্মী মেয়ে, নিয়মমত সব কাজ করছ। এর পর শুয়ে থেকো, চা না আসা অবধি উঠোই না। ঘুম পেলে ঘুমিয়ে যেও, আমি আছি ব'লে ভদ্রতা ক'রে ব'সে থেকো না। আমি তোমার আলমারীর বই পড়ব এখন ব'সে ব'সে। আর দেখ, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা এই বাড়ীতে থাকতে হলে একটু unconventional হতেই হবে, তাতে কিছু মনে করলে চলবে না। আমি তোমার শোবার ঘরে দিনের বেলা ত সারাদিনই ঢুকব, বসবার ঘরে ব'সে ব'সে রাত্রে ঘুমিয়েও যেতে পারি।"

উর্ম্মিলা খাওয়া শেষ করিয়া বাসন লইয়া যাইতে বলিল। বাসনকোশন লইয়া ঝি চলিয়া গেলে বলিল, "তুমি আমাকে বড় convention মেনেই চলতে দেখেছ, না জ্যোতি? লাজ, মান, ভয় কোন্‌টা আমি ছাড়ি নি? কাল ভোরে যদি ছুটে গিয়ে তোমার বুকে না পড়তাম, তাহলে আজ আর আমাকে এখানে ব'সে ভাত খেতে হত না। আর নিজের মনটাকেও আমি খুলে দেখিয়েছিলাম আগে, তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে। দেখ, একটা রুগ্ন মানুষকে সঙ্গ দিতে হলে, সেবা-শুশ্রূষা ক'রে বাঁচিয়ে তুলতে হলে, দূরে ব'সে সুদেবের মত টেলিফোন করলেই চলে না। তার কাছে ত থাকতেই হবে? আর কাল ট্রেনের এক কামরায় ঘুমিয়ে যদি আমার জাত না গিয়ে থাকে, ত আজ বা

কাল এক বাড়ীতে ঘুমোলেও যাবে না। সব চেয়ে বড় কথা এই যে, তোমাকে ত আমি নিজের কাছে স্বামী ব'লেই স্বীকার ক'রে নিয়েছি, তোমার অনধিকার-প্রবেশও কোথাও নেই, অনধিকার-চর্চ্চাও কিছুতে নেই।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "যাক, তোমার নিজের কাছে সব প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়ে গেছে। আমারও যে হয় নি তা নয়। তবে আত্মীয়-স্বজনের খাতিরে একটু আধটু সামাজিক নীতি ও রীতি মানতে হয়, সেইজন্যে ত বিয়েটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার চেষ্টা করছি। এতক্ষণ মা-বাবার সঙ্গে এই কথাই হচ্ছিল। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে হয়ে যেতে পারে শুনলাম, দিন আছে। কথা হচ্ছে, তুমি অতটা strain সহ্য করতে পারবে? যতই কেন না স্ত্রী-আচার ইত্যাদি ছেঁটে দিয়ে ছোট করা যাক ব্যাপারটাকে, ঘণ্টাখানিক লাগবে ত? তার পরদিনও অল্প কিছুক্ষণ কুশণ্ডিকাতে যাবে।"

উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসা করিল, "মা বাবা বিয়েতে মত দিয়েছেন তাহলে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "অমত ত কিছু দেখলাম না। যা হবেই তা মেনে নেওয়াই ভাল। তবে তোমার অসুখটা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা আছে তাঁদের মনে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "থাকবেই ত? তাঁদের একমাত্র ছেলে তুমি। আমার যদি বাঁচবার আর কোনো উপায় থাকত, তাহলে আমিও যে স'রে থাকতাম। কিন্তু ডাক্তার বারণ করলেও এখনি কি বিয়ে করবে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "করব। এটা নিয়ে তুমি আর তর্ক ক'রো না উর্ম্মিলা। এই নিরন্তর টানাটানি আমার ভাল লাগছে না। বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর আমরা দু'জনে আমাদের ব্যবস্থা করব, বাইরের কারো আর কিছু বলবার থাকবে না। আমার কথার ত উত্তর দিলে না? পারবে অতক্ষণ ব'সে থাকতে?"

উর্ম্মিলা বলিল, "পারব। আচ্ছা তোমাদের বাড়ীতেই বিয়ে হবে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "অগত্যা। তোমার বাড়ীর কেউ যদি থাকতেন, তা হলে অবশ্য এখানেই হত। কিন্তু তুমি শোও উর্ম্মিলা, বিশ্রাম কর। কাল ডাক্তার যেন তোমায় ভাল দেখেন। আমি চেয়ারটাতেই বসছি।"

উর্ম্মিলা শুইয়া পড়িয়া বলিল, "কি এখন ইচ্ছে করছে জান জ্যোতি?"

জ্যোতির্ম্ময় হাসিয়া বলিল, "নানা রকম ইচ্ছে হতে পারে এখন। তার মধ্যে কোন্‌টা তোমার হচ্ছে বলা শক্ত। আমার ইচ্ছে করছে, তোমার মুখে একটা চুমো খেতে। কিন্তু স্বামী ব'লে যদিও স্বীকার করেছ, ওটা ত করতে দেবে না?"

উর্ম্মিলা বলিল, "সেরে নিই আগে, তারপর আর কোনো বাধা ত থাকবে না? আমার ইচ্ছে করছিল, আমাদের সেই পার্কটায় যেতে। সেই যে কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় গিয়ে বসতাম, সেইখানে ব'সে গল্প করতে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "যা মেঘলা দিন, এখন ত চলে না। পরিষ্কার দিন দেখলেই ট্যাক্সি ক'রে নিয়ে যাব।"

কথা বলিতে বলিতে উর্ম্মিলা আজও ঘুমাইয়া পড়িল। প্রকৃতি দেবীই যেন তাহার শুশ্রূষার ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। জ্যোতির্ম্ময় বসিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ তাহার ভিজা চুলের উপর হাত বুলাইল, তাহার পর উঠিয়া গিয়া বসিবার ঘরে সোফায় শুইয়া সেও ঘুমাইয়া পড়িল।

দিনটা এই রকম ঘুম ও জাগরণের মধ্য দিয়াই তাহাদের কাটিয়া গেল। দুইজনেই শ্রান্তির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময় প্রায় সামলাইয়া লইল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, কিন্তু উর্ম্মিলার ক্লান্তি একেবারে অস্থিমজ্জায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহা এখনই দূর হইল না, খানিকটা কমিয়া গেল মাত্র।

সকাল বেলা চা খাওয়া শেষ হইতে না হইতে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্যোতির্ম্ময়কে রোগিণীর কাছে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "আপনিই অখিলবাবুকে দিয়ে খবর দিয়েছিলেন?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমিই। ওঁকে আনতে পাটনা যেতে হ'ল তাই নিজে ব'লে যাবার সময় পাই নি।"

ডাক্তার দেখিয়া সুশীলাও আসিয়া হাজির হইল। উর্ম্মিলাকে লইয়া যাওয়া হইল শয়নকক্ষে, পরীক্ষা করিবার জন্য। জ্যোতির্ম্ময় বসিবার ঘরেই বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার উর্ম্মিলাকে দেখিলেন। তাহার পর বসিবার ঘরে আসিয়া বসিলেন। একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে কথা বলব ত? Engaged আছেন বুঝি?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আজ্ঞে হাঁ। ওঁর মাসী এখানে নেই, আমাকেই বলবেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "অবস্থাটা খুব rundown, তবে খুব serious কিছু হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে না। তবু

X-Ray ক'রে নিন। নিশ্চিন্ত হওয়া ভাল। আর বিয়েটা এখন নাই করলেন, একেবারে ভাল ক'রে সেরে যান উনি। বিবাহিত জীবনের strain ত অনেক। সে সব ওঁর এখনই সইবে না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "বিয়েটায় এখন দেরি করা যায় না। ওঁকে দেখবার শুনবার কেউই নেই। শারীরিক অবশ্য কোন strain যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতেই হবে।"

ডাক্তার বলিলেন, "হ্যাঁ, বুঝে চললে ভাবনার কিছু নেই। তা করুন বিয়ে। বর্ষাকালটা কেটে গেলে মাস-দুই change-এ চলে যা'ন। আচ্ছা, X-Ray-র ব্যবস্থা করছি কালকের জন্যে। সন্ধ্যার সময় খবর নেবেন।"

২০

X-Ray করিতে যাইবার আগে উর্ম্মিলা একবার ভয় পাইয়া জ্যোতির্ম্ময়ের হাতটা চাপিয়া ধরিল। বলিল, "সত্যি যদি কিছু হয়ে থাকে, জ্যোতি?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "হলে হয়েছে। চিকিৎসায় সেরে যাবে। এর জন্যে আমাদের কোনো প্ল্যানের অদলবদল হবে না। একটুও ভয় পেয়ো না।"

ছবি তোলা হইয়া গেল। পরদিন বেলা দশটা আন্দাজ plate পাওয়া যাইবে। উর্ম্মিলা বলিল, "আমি যদি বিশ্বাস করতাম যে মানত করলে কিছু হয়, তাহলে সত্যি জোড়া পাঁঠা মানত করতাম। এখনও বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "অন্য কিছুর একটা কথা বল ত। তিন দিন পরে বিয়ে, সেটারও ত ভাবনা ভাবা যায়? গহনা, শাড়ী কিছু চাই না?"

উর্ম্মিলা বলিল, "একখানা নূতন শাড়ী হলেই হবে। আর কিছু চাই না। আর দেখ, একটা অনুরোধ।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কি শুনি?"

"তুমি টোপর প'রো না। অমন সুন্দর মুখ তোমার, বিশ্রী দেখাবে। আর আমার মাথায়ও যেন ঐ শোলার মুকুট না চাপায়।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, যা তোমার অভিরুচি। টোপরটাকে আমিও যে খুব ভালবাসি তা নয়, বড় বেশী গাধার টুপির মত দেখতে। আর তোমার সুন্দর মুখটাকেও অর্দ্ধেক ঢেকে দিলে কিছু ভাল দেখাবে না।"

উর্ম্মিলা বলিল, "আমি তাই ব'লে তোমার মত সুন্দর নয়।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ওসব দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মাপা ত যায় না? আমার চোখে ত তোমাকেই বেশী সুন্দর লাগে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "স্কুলে থাকতে Jane Eyreএ পড়েছিলাম, 'Beauty is in the beholder's eye, সেটাই বোধহয় সত্যি।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "হওয়া উচিত ত তাই। ভগবান্ সুন্দর সব মানুষকে করেন না, কিন্তু ভালবাসার দৃষ্টিতে সব মানুষই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। সকলের চোখে সুন্দর হওয়া ভাল, কিন্তু শুধু একজনের চোখে সুন্দর হওয়ারও মূল্য কম নয়।"

বাহির হইতে তারণ বলিল, "একখানা চিঠি আছে।" জ্যোতির্ম্ময় গিয়া চিঠিখানা লইয়া আসিল। উল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "পাটনা থেকে আসছে, সুদেব গুপ্ত পাঠিয়েছেন বোধ হচ্ছে, নইলে ওখান থেকে registered চিঠি আর কে পাঠাবে?"

উর্ম্মিলা রসিদ সহি করিয়া চাকরের হাতে দিল, তাহার পর চিঠি খুলিয়া বলিল, "শুধু চেক্। আচ্ছা মানুষ বাবা!"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "চেক্ ত তবু কাজে লাগবে। ইস্, অনেক টাকা যে? তোমার চিকিৎসায় উনি বেশী কিছু খরচ করেন নি। নিজেরই টাকা মনে ক'রে খুব হিসেব ক'রে চলছিলেন। কিন্তু চিঠি না পাওয়ায় দুঃখিত হয়েছ মনে হচ্ছে। ব্যক্তিটির জন্যে soft corner আছে নাকি এখনও হৃদয়ে?"

উর্ম্মিলা বলিল, "soft corner ত কত! ওঁর চেয়ে বুড়ো ভূদেববাবুকে আমি পছন্দ করতাম বেশী। তাই ব'লে অভদ্রতায় বালাইও থাকবে না?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমাদের দেশের ভদ্রতা অনেক ক্ষেত্রেই বড় skin deep; উপরে একটু আঁচড়ে দিলেই তলার বনমানুষটা বেরিয়ে পড়ে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "আচ্ছা জ্যোতি, কনের বাড়ীর থেকে ত বরকে অনেক জিনিষ দেয়, আমার ত মা বাবা নেই, আমি যদি কিছু দিই উপহার ব'লে, নেবে না?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তুমি যদি নাও কিছু আমার কাছ থেকে, তাহলে নেব বই কি? কিন্তু লক্ষ্মীটি, কোনো রকম ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা ক'রো না। এই সব টাকা-পয়সার উৎপাত আমাদের মধ্যে না আসাই ভাল। সোজাসুজি ধ'রে নেওয়া যাক, তোমার যা আছে, সব কিছু আমার, এবং আমার যা কিছু আছে সব তোমার।"

ইতিমধ্যে বড়মাসীর বাড়ী হইতে সকলে খবর পাইয়া হৈ হৈ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং বিবাহের যাহা ব্যবস্থা ছিল সবই উল্টাইয়া গেল। বড়মাসী ক্রমাগত মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি বেঁচে থাকতে সুভাষিণীর মেয়ের বিয়ে বরের বাড়ী গিয়ে হবে কেন? আমাদের দেশে এ রকম নিয়ম নেই। ও সব পূর্ব্ববঙ্গে হয়।" ছেলেমেয়েরাও তাঁহাকে সমর্থন করিল।

উর্ম্মিলার শরীর খারাপ, টানাটানি তাহার সহ্য হইবে না প্রভৃতি সব যুক্তিই প্রয়োগ করা হইল। অবশেষে স্থির হইল, এই বাড়ীতেই বিবাহ হইবে, বড়মাসী সদলে ভোররাত্রে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, এবং রাত্রে কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া বাড়ী ফিরিবেন। কুশণ্ডিকা পরদিন কোনো এক সময়ে করিলেই হইবে। জ্যোতির্ম্ময়কে না শুনাইয়া অবশ্য উর্ম্মিলা বড়মাসীকে অনেক কথা বলিয়া লইল এবং হাজার-দুই টাকার চেক্ লিখিয়া তাঁহার হাতে গু জিয়া দিল।

পরদিন সকাল হইতেই উর্ম্মিলা ভীত চকিত চোখে ঘুরিতে লাগিল। না জানি কি বাহির হইবে X-Rayর ফলে। জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে অভয় দিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইল না। সবশেষে বাহির হইয়া গেল। Plate লইয়া একেবারে ডাক্তারের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

ডাক্তার প্লেট দেখিয়া বলিলেন, "ভালই ত মোটের উপর! হয়ত কিছুকাল আগে সামান্য একটু ছোঁয়াচ লেগেছিল, কিন্তু সে ত নিজেই সেরে গেছে দেখছি। তবে আমার মতে মাস-তিনেক এখনও চিকিৎসাধীন থাকা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো উৎপাত না হয়। কোনোদিনই উনি খুব পালোয়ান হয়ে উঠবেন না, এটা মনে রাখবেন। Delicateই একটু থাকবেন।"

জ্যোতির্ম্ময় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ট্যাক্সি সংগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিল। উর্ম্মিলা তখন স্নান সারিয়া চুল আঁচড়াইতেছে। বাহির হইতে তাহাকে একবার ডাকিয়া জ্যোতির্ম্ময় ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

উর্ম্মিলা দ্রুতপদে তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বললেন ডাক্তার?"

দুই হাতে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ভয়ানক ব্যাপার। তুমি একেবারে সেরে গেছ। সামান্য একটু স্পর্শ করেছিল তোমাকে। তবে শরীরটা সারাতে হবে, এই রকম ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া দেহ হলে চলবে না।"

আনন্দের আতিশয্যে উর্ম্মিলা কাঁদিয়াই ফেলিল। জ্যোতির্ম্ময় তাহার মুখখানা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এখন কিন্তু আমাকে infect করার ভয় নেই।"

উর্ম্মিলার বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। বেশী ঘটা হইবে না, লোকজনও খুব অল্পই আসিবে। তবু বড়মাসী কোনোকিছু বাদ পড়িতে দিলেন না। গায়ে হলুদও হইল, বরের বাড়ী হইতে তত্ত্বও আসিল। জিনিষ সংখ্যায় খুব বেশী নয়, তবে যাহা আসিয়াছে তাহা মূল্যবান্ জিনিষ, সুরুচির পরিচায়ক। বড়মাসী হেন ধনী-গৃহিণীও খুঁৎ ধরিবার বিশেষ কিছু পাইলেন না। তাঁহার কন্যা হেনা বলিল, "বর নাকি নিজে সব কিনে পাঠিয়েছে মা।"

মা বলিলেন, "বর ত স্বয়ং কর্ত্তা, তার ইচ্ছামতই সব হচ্ছে।"

হেনা বলিল, "উর্ম্মিলাটার চেহারা কেমন খুলেছে দেখ, গায়ে বিয়ের জল পড়তে না পড়তে। আগে কিরকম শুকনো মুখ ছিল, এখন একেবারে গোলাপ ফুলটির মত দেখাচ্ছে।"

বর হাঁটিয়াই বিবাহ করিতে আসিল। কন্যার অনুরোধ মত টোপর সে পরে নাই, কনে'র মাথায়ও সোলার মুকুট পরানো হয় নাই।

আরতি বলিল, "দেখ মা, দাদাকে ঠিক রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছে না? সেই যে মেয়েটা পালিয়ে গেল, idiotটার কপালে নেই তা আর কি হবে?"

মা বলিলেন, "সবই ত ভাল হ'ল বাবা, এখন বৌটির স্বাস্থ্য ভাল থাকে তবেই।"

কর্ত্তা রামগতি বলিলেন, "আমি ছ' হাজার টাকা পণ নিচ্ছিলাম ব'লে কি রাগ ছেলের। নিজে এখন যে লাখ টাকা বাগিয়ে নিলেন?"

আরতি বিরক্ত হইয়া বলিল, "আহা, দাদা যেন টাকা দেখে গিয়েছিল?"

বিবাহ সংক্ষিপ্ত করিয়াই হইল, উর্ম্মিলা যাহাতে ক্লান্ত না হয়। আসরে তাহাকে বেশীক্ষণ বসানো হইল না, তুলিয়া লইয়া বোনরা ও বৌদিদিরা বাসরঘরেই আসিয়া সুসজ্জিত শয্যায় বসাইয়া দিল। বাহিরে খাওয়া-দাওয়ার গোলমাল কিছুক্ষণ চলিল, তাহার পর একে একে সকলেই চলিয়া গেল। তারণ সদর দরজা বন্ধ করিল, তাহার পর স্বামী-স্ত্রী ও সুশীলা মিলিয়া বাড়তি মিষ্টান্ন, দই ও মাছের সদ্গতি করিতে বসিল। বর কনে'কে বলিল, "এইবার উৎসব-সজ্জা ছেড়ে, সাদাসিধে কাপড় প'রে ঘুমোবার চেষ্টা দেখ। না হলে চোখের কোলে আবার কালি প'ড়ে যাবে। বেশী প্রেম ক'রে তোমাকে জ্বালাব না, ডাক্তারের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি।"

উর্ম্মিলা বলিল, "বাসরে জাগতে হয়, ঘুমোতে হয় না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এস, আমি ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।"

উর্ম্মিলা বলিল, "এত আনন্দে ঘুম হয় না আমার। চিরকাল রাতটাই ছিল আমার সবচেয়ে দুশ্চিন্তা করবার সময়। এখন হঠাৎ অভ্যাস বদল করতে সময় লাগবে।" কথা বলিতে বলিতে অবশেষে রাত একটার সময় তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙিল জ্যোতির্ম্ময়েরই আগে। উর্ম্মিলা তখনও তাহার বাহুবন্ধনের মধ্যে ঘুমাইতেছে। পাছে জাগিয়া উঠে সেইজন্য খুব সন্তর্পণে তাহাকে ছাড়িয়া জ্যোতির্ম্ময় মুখ ধুইতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, উর্ম্মিলা উঠিয়া বসিয়া আছে। জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিয়া বলিল, "এই না হেনাদিরা ব'লে গেল, তারা দোর আগলাবে? তুমি আগে-ভাগে উঠে পালালে কেন?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমাদের খেটে খেতে হয়, কাজেই ভোরে ওঠা অভ্যাস। বড়মানুষ শালীরা কখন আসবেন, তার অপেক্ষায় আর কত ব'সে থাকব?"

যাহা হউক, শালী-শালাজের দল অল্প পরেই আসিয়া হাজির হইলেন, এবং সারাদিনব্যাপী হৈ চৈ করিয়া অবশেষে বিকালের দিকে সকলেই প্রস্থান করিলেন।

উর্ম্মিলা একবার নিয়ম অনুযায়ী শ্বশুরবাড়ী গেল, তবে রাত্রে শুইতে আবার নিজের বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিল। এ বাড়ীটা আগলানোও হইবে, আর শ্বশুর-শাশুড়ী একটু নিশ্চিন্তও থাকিবেন। একেবারে মাস-পাঁচ পরে সে পাকাপাকি শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে। ততদিনে ছোটমাসী ফিরিয়া আসিবেন এবং উর্ম্মিলাকেও সম্পূর্ণ রোগমুক্ত বলিয়া ধরা যাইবে। বৌভাত এখন না করাই নব-দম্পতির ইচ্ছা। বিবাহের গোলমালে ইহার মধ্যে উর্ম্মিলার একটুখানি শরীরও খারাপ করিল। দ্বিতীয় দিন সকালে উঠিয়া সে বলিল, "দেখ, কেমন সুন্দর রোদ উঠেছে, যাবে একবার পার্কে?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "চল, তবে মাটিতে বসতে ত পারবে না, যা কাদা!"

উর্ম্মিলা বলিল, "বেঞ্চিগুলো খুব ভিজে থাকবে না, একটা শতরঞ্চি নিয়ে যাই, বেঞ্চির উপর বসব।"

ট্যাক্সি চড়িয়া তাহারা পার্কের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। বর্ষাকালে লোক বেশী বসে না, বেঞ্চি অনেক খালি পড়িয়া আছে। কৃষ্ণচূড়া গাছে এখন আর তেমন ফুলের সমারোহ নাই। গাছটার কাছে আসিয়া উর্ম্মিলা বলিল, "এখান থেকেই সেবার বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম। অনেক ক'রে মনকে শক্ত ক'রে এসেছিলাম যে কিছুতেই কাঁদব না, কিন্তু যেই তুমি যাবে ব'লে উঠে দাঁড়ালে আর সামলাতে পারলাম না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সেই সময় একেবারে হাত ধ'রে নিয়ে গেলেই হ'ত। কত কান্নাই যে অকারণে কাঁদতে হ'ল।"

উর্ম্মিলা বলিল, "ভালই হ'ল জ্যোতি, যার জন্যে কোন দুঃখ পেতে হয় না, তাকে মানুষ বেশী মূল্য দেয় না।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ভগবান্ শেষরক্ষা করলেন তাই এ কথা বলতে পারছ, অন্যরকম অবস্থাও হতে পারত ত?"

উর্মিলা বলিল, "যাকগে, ও ভাবতে গেলে আবার কাঁদতে হবে। এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলে মনে আছে যে জীবনের পথ দীর্ঘ, তার মধ্যে মায়া-দয়া কোথাও অপেক্ষা ক'রে আছে আমার জন্যে ?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সব কথাগুলো কি মুখস্থ ক'রে রেখেছ ?"

উর্ম্মিলা বলিল, "আর করবার ছিলই বা কি ? এইগুলোই মনে মনে জপ করতাম।"

আকাশে আবার মেঘসঞ্চার হইতেছে দেখিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিল।

বিবাহের দিন-সাত পরে এক-খানা চিঠি পাইয়া উর্ম্মিলা একেবারে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কি হ'ল আবার ? লটারির টাকা পেয়েছ নাকি ?"

উর্ম্মিলা বলিল, "টাকা ছাড়া আর কিছুতে বুঝি মানুষের আনন্দ হয় না ? ছোটমাসী ফিরে এসেছেন।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সে কি ? কোথা থেকে চিঠি লিখেছেন ?"

উর্ম্মিলা বলিল, "এই দেখ না। বোম্বাই থেকে লিখেছেন, তাও পাটনা হয়ে এসেছে। মানে কালই উনি কলকাতায় এসে পৌঁছবেন।"

এখান থেকেই সেবার বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম।

জ্যোতির্ম্ময় চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল :

মা লক্ষ্মী উর্ম্মিলা,

আমি বিশেষ কারণে হঠাৎ দেশে ফিরলাম। সামনের রবিবার কলকাতা পৌঁছব। সুদেবের চিঠিতে জানলাম যে তুমি অসুস্থ অবস্থায় জোর ক'রে পাটনা থেকে চ'লে এসেছ এবং জ্যোতির্ম্ময়কে বিয়ে করছ। খুব খুশী হলাম, ভারি ভাল ছেলে। সুদেবের অবশ্য খুব রাগ হয়েছে। তা হতে পারে, ওকে একটু বোকা বানানো হয়েছিল।

আশা করি ভাল আছ এবং খুব আনন্দে আছ। বিয়ের পর তোমার শরীর ভাল হয়ে যাবে, দেখো।

তোমাদের জন্যে একটা নূতন জিনিষ নিয়ে যাচ্ছি, দেখে খুশী হবে। আমি বেশ ভালই আছি। বড়দিদের বাড়ীর সবাই কেমন আছে ? তারণকে রান্না-বান্না ক'রে রাখতে ব'লো। কতদিন যে ভাত-মাছের ঝোল খাই নি। রসগোল্লার জন্যেও মন কেমন করে। ভালবাসা জেনো।

ইতি
ছোটমাসী।

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ভদ্রমহিলা যেরকম ক'রে কথা বলেন, চিঠিটাও লিখেছেন সেইরকম। ঠিক যেন তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছি। কাল আসছেন ভালই, পরশু থেকে ত আমায় আবার কলেজে দৌড়তে হবে। তোমার একজন সঙ্গিনী থাকবেন।"

উর্ম্মিলা বলিল, "কি নূতন জিনিষ আনছেন একটু লিখলেই পারতেন।"

রবিবার সকালে তারণকে রান্না-বান্না বুঝাইয়া দিয়া উর্ম্মিলা জ্যোতির্ম্ময়ের সঙ্গে স্টেশনে চলিল। এখন আর তাহার কোনো কষ্ট হয় না হাঁটা-চলা করিতে। চেহারাও অনেক ফিরিয়াছে।

ভাগ্যক্রমে বোম্বাই মেল সেদিন ঠিক সময়েই আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ী দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই সুলাজিনীকে তাহারা দেখিতে পাইল। জানলা দিয়া মুখ বাহির করিয়া তিনি প্লাটফর্ম্মের জনস্রোত দেখিতেছেন।

উর্ম্মিলা বলিল, "ইস্, ছোটমাসী কিরকম ফরশা হয়েছেন দেখেছ?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আগেও ত ফরশাই ছিলেন।"

গাড়ী দাঁড়াইতেই সুলাজিনী দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িলেন। উর্ম্মিলাকে সামনে পাইয়াই দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বা রে মেয়ে, কি সুন্দর দেখতে হয়েছ? জ্যোতি কি alchemy জানো নাকি? একেবারে সোনা-ক'রে দিয়েছ যে?"

উর্ম্মিলা বলিল, "যাও মাসী, আগে বুঝি আমি লোহা ছিলাম?"

মাসী বলিলেন, "লোহা হবে কোন্ দুঃখে? তুমি আমার পাতা-চাপা পদ্মকুঁড়ি ছিলে, এখন ভোরের আলোয় ফুটে উঠেছ। বরের নাম সার্থক হয়েছে।"

উর্ম্মিলা সলজ্জহাসি হাসিয়া বলিল, "বাবাঃ, ছোটমাসীর কবিত্ব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে। কিন্তু আমাদের জন্যে যে কি নূতন জিনিষ এনেছ লিখেছিলে, তার কথা ত বলছ না?"

সুলাজিনী এধার-ওধার তাকাইয়া বলিলেন, "ঐ যে আসছে দেখ না? ঐ যে মুটেগুলোর আগে আগে।"

জ্যোতির্ম্ময় ও উর্ম্মিলা তাকাইয়া দেখিল। প্রৌঢ়বয়স্ক, দীর্ঘাকৃতি এক ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। দেখিলে বিদেশী বলিয়া ভ্রম হয়, অথবা পঞ্চনদতীরবাসীও মনে করা যায়। স্মিতহাস্যে আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। সুলাজিনী বিস্মিত দম্পতিকে বলিলেন, "হাঁ ক'রে দেখছিস কি? প্রণাম কর্, তোদের ছোটমেসো নবীনমাধব দত্ত।"

প্রণাম অবশ্য ভদ্রলোক করিতে দিলেন না। দু'জনের হাত ধরিয়া সজোরে ঝাঁকাইয়া দিলেন। উর্ম্মিলা বলিল, "ছোটমাসী, এত বিদ্যে তোমার পেটে পেটে? কেন জানাও নি কিছু? কোথায় পেলে এঁকে? যাঁর গল্প করতে তিনিই ত?"

সুলাজিনী বলিলেন, "তা না ত কি? বুড়ো বয়সে কি আবার নূতন লোক পছন্দ হয়? পথেই হারিয়েছিলাম, আবার পথেই ফিরে পেলাম।"

জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা বাহির হইয়া চলিলেন। উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় দেখা হ'ল এঁর সঙ্গে?"

সুলাজিনী বলিলেন, "প্যারিসে। উনি আর বিদেশে থাকতে চাইলেন না, ব্যবসা-ট্যাবসা বেচে দিয়ে এই বত্রিশ বছর পরে দেশে ফিরলেন।"

বাড়ীতে আসিয়া পাড়া-প্রতিবেশীকে বিস্ময়সাগরে ডুব দেওয়াইয়া তাঁহারা হাঁফ ছাড়িয়া বসিলেন। পাড়া-প্রতিবেশী কে কি ভাবিল জানা গেল না। তবে তারণ ও তাহার স্ত্রী বিস্ময়ের আতিশয্যে প্রায় চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িল। অবশেষে উর্ম্মিলার তাড়া খাইয়া তবে তাহারা আবার কাজকর্ম্ম আরম্ভ করিল।

সুলাজিনী বলিলেন, "দেখ, ক'টা দিনের জন্যে উর্ম্মিলার বিয়েটা দেখা হল না। বড়দিরা এসে খুব হৈ হৈ করেছে, না?"

উর্ম্মিলা বলিল, "তা মন্দ না। আমার ত পরদিন 99 temperature উঠে গেল।"

সুলাজিনী বলিলেন, "এখন ভাল ত?"

উর্ম্মিলা বলিল, "ভালই ত আছি। তা দেখ ছোটমাসী, এখানে যদি খুব ঠাশাঠাশি হয়, আমি কি ওবাড়ী চ'লে যাব?"

সুলাজিনী বলিলেন, "আরে না, এখন ঠাশাঠাশিতে কোনো কষ্ট হবে না। তা ছাড়া উনি ত দেশের বাড়ীঘর, আত্মীয়স্বজনের খোঁজ করতে পরশু দেশে যাবেন। ফিরতে হপ্তা-দুই লাগবে, তারপর একটু বেড়াতে বেরোবার ইচ্ছে

আছে। যদিও সময়টা ঠিক বেড়াবার মত নয়। কাজেই এখন যেমন চলছে চলুক, যখন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে বসব, তখন পাকাপাকি ব্যবস্থা করব।"

তাহার পর নাওয়া-খাওয়ার পর্ব্ব সুরু হইল। নিজেদের জন্য যে মাছ তরকারি ও পায়েস তারণ লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাও বাধ্য হইয়া বাহির করিয়া দিতে হইল। নবীনমাধব বলিলেন, "এতকাল বাইরে রইলাম, কত কত দেশের কত কি খেলাম, কিন্তু বাংলা রান্নার মত কিছু আর মুখে রুচল না।"

সুলাজিনী বলিলেন, "মেমসাহেবও ত রুচল না। পঞ্চান্ন বছর অবধি আইবুড়ো কার্ত্তিক হয়ে ব'সে রইলে।"

নবীনমাধব বলিলেন, "বাংলাদেশের যে জিনিষগুলো ভাল, সেগুলি বড় বেশী ভাল। কি বল জ্যোতির্ম্ময়, তুমি আমার সঙ্গে একমত নয়?

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সম্পূর্ণ একমত।"

নবীনমাধব বলিলেন, "কিছুদিন থেকেই দেশে ফিরবার জন্যে একটা তাগিদ আসছিল মনে। তবে ভাবছিলাম, পুরনো contact সবই খ'সে গেছে, এখন গিয়ে বড় একলা লাগবে। হঠাৎ দেখলাম, পুরনো সঙ্গিনীও একজন জুটে গেলেন, যাঁর একলাই একশ' হবার ক্ষমতা আছে। নির্ভয়ে ফিরে এলাম আর কি?"

উর্ম্মিলা বলিল, "খুব ভাল করেছেন মেসোমশায়। এমন ভাল লাগছে আমার! আমি খালি ভাবতাম যে আমি ত বিয়ে ক'রে চ'লে যাচ্ছি, ছোটমাসীর না-জানি কিরকম খারাপ লাগবে একলা একলা। Loneliness ভয়ানক বিশ্রী জিনিষ।"

মেসোমশায় বলিলেন, "সেটা সময়মত বুঝে নিয়ে যে তার প্রতিকার ক'রে নিয়েছ, এটা খুব বুদ্ধির কাজ করেছ উর্ম্মিলা। আমরা বোকামী ক'রে জীবনের সবচেয়ে ভাল দিনগুলো নষ্ট করলাম। যতই কেন না ব্রাউনিং বলুন, Grow old along with me, the best is yet to be."

সুলাজিনী বলিলেন, "তবু মন্দের ভাল। শেষ জীবনটায় শান্তি ত পাওয়া যাবে।"

হঠাৎ নবীনমাধব বলিলেন, "তোমাদের খুব ভাল একটা wedding present দিতে চাই। কি নেবে বল ত উর্ম্মিলা?"

উর্ম্মিলা বলিল, "ভেবে ত পাচ্ছি না কিছু। যা দেবেন, তাই খুব খুশী হয়ে নেব।"

নবীনমাধব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমুদ্র পার হয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে না?"

উর্ম্মিলা বলিল, "খুব করে, আগে ভাবতে ভয় করত, বড় রুগ্ন ছিলাম ব'লে, এখন আর ভয় নেই।"

নবীনমাধব বলিলেন, "তা ত করবেই না, এমন চমৎকার আগ্‌লাবার লোক পেয়েছ। আমি বলি কি, তুমি আর তোমার বর ফ্রান্স বেড়িয়ে এস। দিব্যি জায়গা। বহুকাল থেকেছি, আমার কথার দাম আছে। প্যারিসের একটা নিরিবিলি পাড়ায় আমার ছোট্ট একটা বাড়ী আছে। মায়া প'ড়ে গেছে, সেটা আর বিক্রী করি নি। সেইটা তোমাকে আর জ্যোতির্ম্ময়কে দিলাম। কিছুদিন গিয়ে থেকে এস। সারা continent ইচ্ছে করলে বেড়িয়ে আসতে পারবে। আর সমুদ্রযাত্রায় উর্ম্মিলার উপকার হবে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "একেবারে Fairy Godmother-এর উপহারের মত হল যে মেসোমশায়?"

মেসোমশায় বলিলেন, "তোমার মত রাজকন্যাকে এর চেয়ে কম কি দেওয়া যায়? Fairy Godmother-ই দিচ্ছেন অবশ্য। সুলাজিনীই বললেন তোমাদের দিতে। আমি তাঁকে দেব ভাবছিলাম, তা উনি বললেন, তোমাকে দিলে ঢের বেশী কাজে লাগবে। কথাটা খুবই ঠিক।"

সুলাজিনী বলিলেন, "ওঠ দেখি এখন। অনেক compliment দেওয়া হয়েছে পরস্পরকে। চাকরগুলো বাসন তোলবার জন্যে কতক্ষণ থেকে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।"

সকলে খাবার টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। সুলাজিনী হাত ধুইতে ধুইতে বলিলেন, "আজ আর বেড়ানোর গল্প হল না তোমাদের সঙ্গে। বড়দির বাড়ী একটু ঢুঁ মেরে আসতে হবে। আর দত্ত-সাহেব ত কে তাঁর সব ব্যবসায়ী বন্ধু আছেন এখানে, তাদের সন্ধানে যাচ্ছেন।"

উর্ম্মিলা বলিল, "ছোটমাসী, হাতের এই বালা আর গলার এই পাটি হারটা ত আগে কখনও পরতে দেখি নি তোমায়? নূতন মনে হচ্ছে। বিলেতে ব'সে কি গহনা গড়াচ্ছিলে নাকি?"

স্থুলাঙ্গিনী বলিলেন, "আমায় গড়াতে হবে কেন? আর কি লোক নেই? প্যারিসে গড়ানো এগুলো। Design দেখে দেখে ওখানের স্যাকরা ঠিক ক'রে দিয়েছে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "Design দিল কে? তুমি, না মেসোমশায়? এসব পুরনো প্যাটার্ণ উনি পেলেন কোথায়?"

নবীনমাধব বলিলেন, "আমিই দিয়েছি, মন থেকে sketch ক'রে দিয়েছিলাম।"

উর্ম্মিলার মনে পড়িয়া গেল ছোটমাসীর গহনা দেওয়ার কথা। আর কথা বাড়াইল না। ভাবিল, টলষ্টয়ের 'মানুষ বাঁচে কিসে' গল্পটায় ঋষিতুল্য লেখক ঠিকই বলিয়াছেন। ধনে-জনে-মানে, কোন শান্তিই আনে না। একমাত্র সত্য অবলম্বন মানুষের এইখানেই।

স্থুলাঙ্গিনীরা বাহির হইয়া গেলেন। জ্যোতির্ম্ময় ডাকিয়া বলিল, "তোমার দ্বিপ্রহরের বিশ্রামটা বাদ দিও না। ডাক্তার ব'লে দিয়েছেন না, এক বছর সব নিয়ম মেনে চলবে?"

উর্ম্মিলা শয়নঘরে আসিয়া বসিল। বলিল, "কি কাণ্ডই হল! হয়ত অনেকে শুনে হাসাহাসি করবে, আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে। ছোটমাসী বরাবরই এই ভদ্রলোককে বড় ভালবাসতেন। ভাগ্য বিরূপ ছিল, প্রথম জীবনে পেলেন না। কিন্তু ধন্য শক্ত হাড় বাবা। বেঁচে ত ছিলেন? আমি ত ছ'মাসেই মরতে বসেছিলাম। তুমি না এসে দাঁড়ালে কবে ম'রে যেতাম।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সবাই ত তোমার মত 'পাতাচাপা পদ্মকুঁড়ি' নয়? তোমার মাসীটিও তোমারই মত রোম্যাণ্টিক। মিঃ দত্ত, আর আমি দু'জনেই একটু গল্পময় আছি। তোমাদের সাহায্য না পেলে চিরকাল আকাশের তারা গুণেই দিন কাটত হয়ত আমাদের।"

উর্ম্মিলা জ্যোতির্ম্ময়ের কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল, বলিল, "তারারা আর আকাশ থেকে নেমে তোমাদের ঘর আলো করতেন না?"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ঘর আলো ত যে কোনো আলোতেই হয়। হৃদয় আলো করতেই তারার দরকার।"

উর্ম্মিলা বলিল, "তারাগুলো কিসের টানে পৃথিবীতে নেমে এল বল ত?"

জ্যোতির্ম্ময় তাহার গালটা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "যাঁরা নেমেছেন তাঁরা ঢের সুন্দর ক'রে এর উত্তরটা দিতে পারবেন। আমরা পেয়ে ধন্য, ভাষাও প্রায় ভুলে গেছি।"
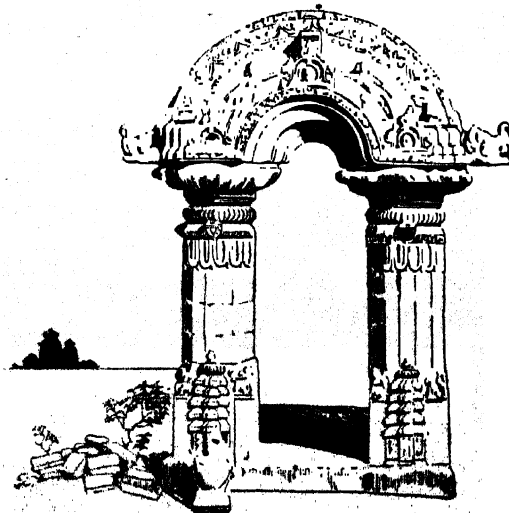
হিন্দীগান 'ভাঙা' রবীন্দ্রসংগীত

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

মূল গান থেকে ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের তথ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী-কৃত 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী-সঙ্গম' একখানি প্রামাণিক পুস্তক। গ্রন্থশেষে অন্তর্ভুক্ত তালিকা সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্রী মন্তব্য করেছেন—

"গানের প্রথম পংক্তিমাত্র দিলেও, আকর-গ্রন্থাদির উল্লেখ থাকাতে মূলানুসন্ধান অসম্ভব না হতে পারে। সুরে তালে উভয়বিধ গান শোনার সৌভাগ্য যাঁদের হবে, তাঁরা দেখবেন যে, এর মধ্যেও তিনি কতখানি মৌলিকতা দেখিয়েছেন।"

ভাঙা গানের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ মৌলিকতা যে দেখিয়েছেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই মৌলিকতা বিচিত্রমুখী। তার মধ্যে কতকগুলি হিন্দীগান-ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতে যে মৌলিকতা দেখিয়েছেন সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

রবীন্দ্রসংগীতে কথার সঙ্গে অর্থাৎ কাব্যের সঙ্গে সুর তথা সুর ছন্দ ও লয়ের মিলন যে হয়েছে এ কথা অনেকেই জানেন। মূল হিন্দীগানের কাব্যাংশের ভাব ও ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যাংশের ভাব প্রায় সব ক্ষেত্রে পৃথক্। যেহেতু রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের গুরুত্ব সমান এবং সুর কথার (কাব্যের) ভাব-অনুসারী, তদনুযায়ী ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও সুর ছন্দ ও লয়ের দিক্ থেকে মূল হিন্দী গানের চেয়ে কিছু বিশেষ পার্থক্য হয়েছে। এই পার্থক্যের সূত্রগুলি ধরতে পারাই আসল কথা।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতগুলিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—মূলানুগ রবীন্দ্রসংগীত ও মূলের ছায়াবলম্বী রবীন্দ্রসংগীত। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সংখ্যা অতি অল্প, সেজন্য গৌণ, এবং পরবর্তী শ্রেণী মুখ্য হলেও দুই-ই স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ এ-সব গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে নানা ত্রুটি দেখা দিয়েছে।

মূলানুগ রবীন্দ্রসংগীত : মূলানুগ রবীন্দ্রসংগীত অর্থে মূল গানের 'হুবহু' অনুকরণে রচিত রবীন্দ্রসংগীত। এ-রকম গানের দৃষ্টান্ত দু'একটির বেশী আছে ব'লে মনে হয় না। তার মধ্যে 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কি দুর্দিন' একটি। মূল গান 'প্রচণ্ড গর্জন সজল বরখা ঋতু' জানকী দাস রচিত ভূপালী রাগ ও সুরফাঁকতালের একটি ধ্রুপদ। মূল গান ও মূলানুগ গান দুটিই এ ক্ষেত্রে সুরেতালে একরূপ। লক্ষ্য করবার বিষয়, মূল গানটি একটি ঋতুসংগীত (বর্ষা ঋতু), আর মূলানুগ রবীন্দ্রসংগীতটি পূজা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত (ধর্মসংগীত)—যদিও বর্ষানুষ্ঠানেও গানটি পরিবেশিত হতে দেখা যায়। তুলনার সুবিধার জন্য যথাক্রমে মূল ধ্রুপদ ও মূলানুগ রবীন্দ্রসংগীতটির স্বরলিপি দেওয়া হ'ল :

ভূপালী। সুরফাঁক্তা[১] (মধ্যগতি)

প্রচণ্ড গর্জন সজল বরখা ঋতু
কাম আগম অত বিরহিনী জিয়ন তর্জন ॥
ঝট অস দামিনী মতঙ্গ সম যামিনী,
অরু ক্রম চাপ কর্কশ বুঁদ-বারি বরখন ॥
চাতক চকোর পিউ পিউ করত সোর,
মোর বিকট বোরী চতুর দিশন।
কদম্ব তরু কুসুমিত সুবাসী বৃন্দাবন
তিয়া ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া
গাবত ব্রজবাসী হরখ মন ॥

—জানকী দাস

১। সুরফাঁক্তা—সুরফাঁকতাল।

II { গা গা -রা পা | গা -া | রা সা -া -া I
প্র চ ন্ ড গ র্ জ ন ০ ০

I সপা -া পা পা | গা রা | গা -া রা সা } I
স০ ০ জ ল ব র খা ০ ঋ তু

I নধ্ -সা রা গা | রা সা | সা সা -ধ্ -া I
কা ০ ম আ গ ম অ ত ০ ০

I সা সা রা রা | গা গা | পা -া -া া I
বি র হি নী জি য় ন ০ ০ ০

I গা -পা -ধা র্সা | ধা -পা | -পা -গা -রা -সা II
ত ০ র্ জ ন ০ ০ ০ ০ ০

II { র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা র্সা -া র্সা I
ঝ ট অ স দা ০ মি নী ০ ম

I র্সা -ধা -র্রা র্সা | র্সা ধা | পঃ-গাঃ গা গা } I
ত ০ ঙ্ গ স ম যা ০ মি নী

I পা পা পা পা | গা -রা | গা -া -রা -া I
অ নু ক্র ম চা ০ প ০ ০ ০

I সা -া সা রা | গা রা | সা -া সা -া I
ক র্ ক শ বুঁ দ বা ০ রি ০

I র্সা র্সা -ধা র্রা | র্সা -র্সা | -ধা -পা -গা -রা II
ব র ০ খ ন ০ ০ ০ ০ ০

II { পা -া পা পা | পা পা | -গা -া গা -া I
চা ০ ত ক চ কো ০ ০ র ০

I গা গা ধা ধা | পা পা | পা পা -গা গা I
পি উ পি উ ক র ত সো ০ র

I রা -গা রা গা | গা পা | গা -রা সা -া } I
মো উ র বি ক ট বো ০ রী ০

I পা পা -গা পা | গা রা | সা -া -া -া I
চ তু ০ র দি শ ন ০ ০ ০

I { সা র্সা -া র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা I
ক দ ম্ ব ত রু কু সু মি ত

I র্সা র্সা -ধা র্রা | র্সা ধা | ধা -া পা পা } I
স্থ বা ০ সী বৃ ন্ দা ০ ব ন

I র্গা র্গা -া র্রা | র্সা র্সা | ধা ধা -া পা I
তি য়া ০ ই য়া ০ ই য়া ০ ই

I পা -া গা গা | -া সা | সা -া -া -া I
য়া ০ ই য়া ০ ই য়া ০ ০ ০

I সা -া সা -রা | রা গা | গা -পা পা -ধা I
গা ০ ব ত ব্র জ বা ০ সী ০

I ধা র্সা র্সা র্রা | র্সা -র্সা | -ধা -পা -গা -রা II II[১]
হ র খ ম ন ০ ০ ০ ০ ০

তুলনীয় রবীন্দ্রসংগীত

ভূপালী। সুরফাঁকতাল

প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কি দুর্দিন

II গা গা -রা পা | গা -া | রা সা -া -া I
প্র চ ণ্ ড গ র্ জ নে ০ ০

I পা[২] -া পা পা | গা রা | গা -া রা সা I
আ ০ সি ল এ কি দু র্ দি ন

I সা -া রা গা | রা সা | সা সা -ধা -া I
দা ০ রু ণ ঘ ন ঘ টা ০ ০

I সা সা রা রা | গা গা | গপা -া -া -া I
অ বি র ল অ শ নি ০ ০ ০

I গা -পা -ধা র্সা | ধা -পা | -পা -গা -রা -সা II
ত ০ র্ জ ন ০ ০ ০ ০ ০

II র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা র্সা -া র্সা I
ঘ ন ঘ ন দা ০ মি নী ০ ভু

I র্সা -ধা -র্রা র্সা | র্সা ধা | পা -া গা গা I
জ ০ ঙ্ গ ক্ষ ত যা ০ মি নী

I পা -া পা পা | গা রা | গা -া -রা -া I
অ ম্ ব র ক রি ছে ০ ০ ০

১। সঙ্গীত মঞ্জরী : রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে লিপান্তরিত।

২। মূল গানে উক্ত মাত্রায় স্বর "স পা" লক্ষণীয়।

I সা -া সা রা | গা রা | সা া সা -া I
অ ন্ ধ ন য় নে অ শ্ রু ০

I র্সা র্সা -ধা র্রা | র্সা -র্সা | -ধা -পা -গা -রা II
ব রি ০ ষ ন ০ ০ ০ ০ ০

II { পা -া পা পা | পা -া | পা -া -গা -া I
ছা ০ ড়ো রে শ ঙ্ কা ০ ০ ০

I গা -া ধা -া | পা -া | গা গা রা গা I
জা ০ গো ০ ভী ০ রু অ ল স

I রা গা -া পা | গা রা | সা -া -া -া I
আ ন ন্ দে জা গা ও ০ ০ ০

I পা -া গা পা | গা রা | সা -া -া -া I
অ ন্ ত রে শ ক তি ০ ০ ০

I সা র্সা -া র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা I
অ কু ণ্ ঠ আঁ খি মে লি হে রো

I র্সা র্সা -ধা র্রা | র্সা -া | ধা -া পা পা I
প্র শা ন্ ত বি ০ রা ০ জি ত

I র্গা র্গা -া র্রা | র্সা -া | ধা ধা -া পা I
ম হা ০ ভ য় ০ ম হা ০ স

I পা -া গা গা | -া রা | সা -া -া -া I
নে ০ অ প ০ রূ প ০ ০ ০

I সা -া সা -রা | রা গা | গা -পা পা -ধা I
মৃ ত্ যু ন্ জ য় রূ ০ পে ০

I ধা র্সা সা র্রা | র্সা -া | -ধা -পা -গা -রা II II[1]
ভ য় হ র ণ ০ ০ ০ ০ ০

এই দুটি গানই সুরে তালে একরূপ হলেও তাদের পরিবেশনরীতিতে পার্থক্য আছে—এ কথা সমঝদার শ্রোতা স্বীকার করবেন। মূল হিন্দীগানটিকে রবীন্দ্রসংগীতটির মতো গাওয়া যেমন দুষণীয়, রবীন্দ্রসংগীতটিকে হিন্দী-গানটির মতো গাওয়াও তেমনি দুষণীয়।

এই একই প্রসঙ্গে 'হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে' গানটি মনে আসে। মূল 'উড়ত বন্দন নব আবীর মে কুমকুম' গানের আংশিক স্বরলিপি ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত ও অনুস্যূত লিপির চিত্র অখণ্ড গীতবিতানে ও রবীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণী-সংগম পুস্তকে মুদ্রিত হয়েছে। তাতে উভয় গানেরই ৩২ মাত্রা-ছন্দ পরিলক্ষিত হবে। পরে ভাঙা

১ স্বরবিতান ৫৫।

রবীন্দ্রসংগীতটি ২।৩ মাত্রা-ছন্দে পরিবর্তিত হয়,১ এবং এই পরিবর্তিত ছন্দই যে 'হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে' গানটির পক্ষে উপযোগী হয়েছে, এ কথা রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দোজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করবেন।

মূল গানের ছায়াবলম্বী রবীন্দ্রসংগীত : মূল গানের ছায়াবলম্বী রবীন্দ্রসংগীতে মূল গানের প্রভাব অল্পবিস্তর থাকলেও (যেহেতু গানগুলির সুর তাল নির্দিষ্ট গানের আদর্শে যোজিত) রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতার ছাপ স্পষ্ট বিদ্যমান।—যার জন্য গানগুলি প্রধানতঃ পাঁচটি বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করছে, যথা—কাব্য (রচনার বিষয়বস্তু), আঙ্গিক,২ সুর ছন্দ ও লয়। তার মধ্যে রচনার বিষয়বস্তু যে প্রায় সকল ক্ষেত্রে পৃথক্ এ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর শেষোক্ত চারটি বিষয়, বিশেষতঃ সুর সম্বন্ধে, কিছু আলোচনা করছি।

মূল গানের সঙ্গে কতকগুলি ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের সুরের কিছু কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য না করলে পার্থক্যগুলি ধরা পড়ে না। যেমন, আজি মম মন চাহে, আজি বহিছে বসন্ত পবন, চরণধ্বনি শুনি তব নাথ, শূন্য হাতে ফিরি হে, ইত্যাদি গানে। তার মধ্যে যে-কোনো একটি গান দৃষ্টান্ত হিসাবে নিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। যেমন, 'আজি মম মন চাহে' গানটির মূল গানের কথা ও স্বরলিপি এরূপ :

বাহার। চৌতাল

ফুলি বন ঘন মোর আয় বসন্ত রি,
অব বহত পবন মন্দ মন্দ সমীরণ মন ভাবে,
জব মধুপবৃন্দ নিরত কর গুঞ্জার,
নই নই কলিয়ন পর জায় চুবক হরত ॥
কেতকী গুলাব ঔর চম্পা বকুল বেলা
অতি কোমল দল কুসুম সহিত প্রফুলিত ভই,
নাথ নাথ নিরত করত নারী নিরখ নাথ ॥

—রঙ্গনাথ

II	সন্‌া -সা	মা -া	মা মা	মা পা	মা -পা	ধমা পা	I
	ফু০ ০	লি ০	ব ন	ঘ ন	মো ০	০০ র	
I	মঃ -জ্ঞাঃ	মা মা	মণা -া	-া র্সা	ণা -ধা	ধা না	I
	আ ০	য় ব	স ০	ন্ ত	রি ০	অ ব	
I	না র্সা	র্সা র্সা	র্রা র্সা	ণা -ধা	ধা ণা	-ণা পা	I
	ব হ	ত প	ব ন	ম ন্	দ ম	ন্ দ	
I	মা মা	মা মা	মা পা	মা -পা	মজ্ঞা -া	মা পা	I
	স মী	র ণ	ম ন	ভা ০	বে ০	জ ব	
I	মজ্ঞা জ্ঞা	জ্ঞমা রা	-া সা	সন্‌া সা	মা মা	মা মা	I
	ম ধু	প বৃ	ন্ দ	নি র	ত ক	র গুন্	
I	মা -পা	-া -মা	-জ্ঞা -া	-মা -ধা	-না -র্সা	-ণধা না	I
	জা ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০০ র	

১ কাঙালীচরণ সেন কৃত ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি ৩ ও স্বরবিতান ২৫ দ্রষ্টব্য।

২ আঙ্গিক অর্থে গানের স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের কলি-সমষ্টি।

I না না | -র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা I
ন ই ০ ন ই ০ ক লি য় ন প র

I র্সা -না | র্সা র্রা | র্জ্ঞা জ্ঞা | র্রা -র্সা | -না -র্সা | -ণা -ধা I
জা ০ য় ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -পা -মা | -মা -া | -জ্ঞা -া | মজ্ঞা জ্ঞা | মা রা | সা সা II
০ ০ ০ ০ ০ ০ চু ব ক হ র ত

I { মা -ণধা | না না | -র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা র্সা | -া র্সা I
কে ০০ ত কী ০ শু লা ০ ব ঔ ০ র

I না -র্সা | র্রা -র্জ্ঞা | র্রা র্সা | -না র্রা | র্সা -া | ণা -ধা } I
চ ম্ পা ০ ব কু ০ ল বে ০ লা ০

I ধা ণা | র্সা র্রা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্রা র্সা | না র্সা | ণা ধা I
অ তি কো ০ ম ল দ ল কু সু ম স

I ণা পা | মা মা | -া মণা | -া ণা | ণর্সা ণা | -ধা -না I
হি ত প্র ফু ০ লি ০ ত ভ ই ০ ০

I না -র্সা | র্সা র্সা | -া র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা I
না ০ থ না ০ থ নি র ত ক র ত

I র্সা -না | র্সা র্রা | -র্জ্ঞা -র্জ্ঞা | -র্রা -র্সা | -না -র্সা | -ণা -ধা I
না ০ রী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -পা -মা | -মা -া | -জ্ঞা -া | মজ্ঞা জ্ঞা | মা রা | -া সা II II[১]
০ ০ ০ ০ ০ ০ নি র খ না ০ থ

তুলনীয় রবীন্দ্রসংগীত

বাহার। চৌতাল

II সা -া | মা -া | মা মা | মা মা | মা -পা | পমা মজ্ঞা I
আ ০ জি ০ ম ম ম ন চা ০ হে০ জী০

I মজ্ঞা -া | জ্ঞা মা | ণা -া | -া সণা | ণা -ধা | ধা -না I
০ ০ ব ন ব ০ ন্ ধু০ রে ০ সে ই

I না র্সা | সা র্সনা | র্রর্সা র্সণা | ণা -ধা | ধা ণধা | -ণা পমা I
জ ন মে ম০ র০ ণে০ নি ত্ ত স০ ভ গী০

১ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সংগীতমঞ্জরী গ্রন্থ থেকে আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে লিপ্যন্তরিত।

I মা মা | মা মা | মা পমা | পা -া‌ম | মা -জ্ঞা | মা পমা I
নি শি দি ন সু খে০ শো ০ কে ০ সে ই০

I মজ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞমা রা | -া সা | সা সা | মা মা | মা মা I
চি০ র আ ন ন্ দ বি ম ল চি র সু

I মা -পা | -পধা -মপা | -জ্ঞা -মা | -ণা -া | -া -র্সা | -ণধা -ণধা I
ধা ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০

I না না | -র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা I
যু গে ০ যু গে ০ ক ত ন ব ন ব

I সা -া | র্সা -র্রা | -র্রা -র্জ্ঞা | -র্রা -র্সা | -ণা -র্সা | -ণা -ধা I
লো ০ কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -পা -া | -মা -া | -জ্ঞা -া | মজ্ঞা মজ্ঞা | জ্ঞমা রা | রাস সা II
০ ০ ০ ০ ০ ০ নি০ য়০ ত শ র ণ

II { র্সণা ণধা | -ণধা না | -র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সনা | -র্সা র্সা I
প০ রা০ ০০ শা ন্ তি প র ম প্রে০ ০ ম

I র্সনা র্সা | -র্সা র্রা | -র্জ্ঞা র্রর্সা | র্সনা র্সনা | র্রর্সা র্সনা | -র্সণা ণধা } I
প০ রা ০ মু ক্ তি০ প০ র০ ম০ ক্ষে০ ০০ ম০

I ধা -না | র্সা -র্রা | র্রা র্জ্ঞা | র্রা র্সা | ণা র্সা | ণা -ধা I
সে ই অ ন্ ত র ত ম চি র সু ন্

I ণা পা | মা মা | -া ণা | -া ণা | -া র্সণা | ণধা -ণধা I
দ র প্র ভু ০ চি ত্ ত ০ স০ খা০ ০০

I না -র্সা | র্সা র্সা | -া র্সা | র্সা -া | র্সা র্সা | র্সা র্সা I
ধ র্ ম অ র্ থ কা ০ ম ভ র ণ

I র্সা -া‌ম | র্সা -র্রা | -র্রা -র্জ্ঞা | -র্রা -র্সা | -ণা -র্সা | -ণা -ধা I
রা ০ জা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -পা -া | -মা -া | -জ্ঞা -া | মজ্ঞা মজ্ঞা | মা রা | রাস সা II II[1]
০ ০ ০ ০ ০ ০ হৃ০ দ০ য় হ র ণ

মূল গানের সঙ্গে এরূপ ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের স্বরের পার্থক্য সামান্য হলেও তা ঠিক ঠিক রক্ষা করা কর্তব্য। তা না হলে স্রষ্টার সৃষ্টি খর্ব হতে বাধ্য। অবশ্য তার জন্য বিধিবদ্ধ শিক্ষা, স্মৃতি, রুচি ও সংযমের প্রয়োজন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে উল্লিখিত গানটির পরিবেশনে কিছু রীতি-ভেদ দেখা যায়। তার মধ্যে স্থায়ীর 'যুগে যুগে কত নব নব লোকে' অংশের পুনরাবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তিকালে পরিবর্তিত সুর পরিবেশন সম্বন্ধে বক্তব্য—'যুগে যুগে কত নব নব লোকে' মাত্র এই অংশ দ্বারা ভাব পূর্ণ হয় না। 'যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ' চরণটি স্থায়ী

১ স্বরবিতান ৪

অংশের পরিপূরক হিসাবে বিশেষ ভাব প্রকাশ করে। মূল গানটির স্থায়ী অংশ নয় ফেরতা অর্থাৎ এক শ' আট মাত্রা। রাগসংগীতের ধ্রুপদে দ্বিগুণ (দুন), চতুর্গুণ (চৌগুণ), ইত্যাদি লয়ের কৌশল করা হয়। এ গানটির স্থায়ী অংশ দুন করতে হলে দ্বিতীয় ফাঁক থেকে অর্থাৎ 'ফুলি বন ঘন' পর্যন্ত গেয়ে ধরতে হয়। তা না ক'রে সম্ থেকে দুন আরম্ভ ক'রে 'নই নই কলিয়ন পর' অংশ দু-বার গেয়ে স্থায়ী শেষ ক'রে, বৈচিত্র্যের জন্য দু-বার দু'রকম সুরে গেয়ে স্থায়ী শেষ ক'রে সমে ফিরে আসা সুবিধাজনক। তাতে অবশ্য বলার বিশেষ কিছু নেই। কারণ, রাগসংগীতে ধ্রুপদে ত এরূপ রীতি আছেই। কিন্তু সেই রীতি যদি রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ করে তা হলে রবীন্দ্রসংগীতের রীতি-বৈশিষ্ট্যের খর্বতার কারণ হয়। উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'নই নই কলিয়ন পর' অংশের সঙ্গে 'যুগে যুগে কত নব নব লোকে' অংশের তুলনা করলেই বিষয়টি বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদাঙ্গ গানে বাঁটের কৌশল দেখানোর রীতি নেই। বাঁট শব্দের অর্থ বাঁটোয়ারা বা বণ্টন, অর্থাৎ গানের কথাকে ভেঙেচুরে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, ইত্যাদি লয়ের কৌশল প্রদর্শন। রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে যেখানে কথা ও সুর 'অর্ধনারীশ্বর'রূপে বিদ্যমান সেখানে কথা-ভাঙাচোরার প্রশ্ন ওঠে না—এ কথা রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করবেন। কিছুদিন পূর্বে কোনো চলচ্চিত্রে 'তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন' ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতটি এক অতি উদ্ভট রীতিতে পরিবেশিত হতে শোনা গেছে। রাগসংগীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ গানে দুন ইত্যাদি লয়ের কৌশল প্রদর্শনের রীতি আছে, যদিও তা ভারতীয় সংগীতের মধ্যযুগের উদ্ভাবনা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও প্রথমে গানটি সম্পূর্ণ গেয়ে তার পর বাঁট ইত্যাদি করা হয়। কিন্তু 'তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন' গানটি উল্লিখিত ক্ষেত্রে যেরূপ ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ রীতি-বিরুদ্ধ। গান সম্পূর্ণ না গেয়েই হঠাৎ অন্তরার দুন করার নজির রবীন্দ্রসংগীতে ত পাওয়া যাবেই না, রাগসংগীতেও এরূপ নজির পাওয়া যাবে না। স্বকল্পিত রীতি-বিরুদ্ধতা কলাবিদ্যার সর্বনাশ ঘটায়।

এ পর্যন্ত যে-ক'টি ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনা করা হ'ল এগুলি সবই ধ্রুপদ অঙ্গের। এর পর খেয়াল অঙ্গের ভাঙা গান সম্বন্ধে কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করা সমীচীন মনে করি। খেয়াল অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীতেও যে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তার দৃষ্টান্তস্বরূপ সদারঙ্গ-রচিত নিম্নলিখিত গানটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

মালকোষ। ত্রিতাল (মধ্যলয়)

লাগি মোরে ঠুমক পলঙ্গনা,
রি ননদিয়া ঘর বিরণ মোহে
কহত পাল বাজে ঘুঙ্গরিয়া ॥
তন মন ধন নিত চামর করু হুঁ,
সদারঙ্গ পিয়া লাগত নিক,
গোরে গাত খুব জাত মন্দরিয়া ॥

[-মা]
II -া সা -ণা সা | সা ণসণ্ দ্া ণ্া I
০ লা ০ গি মো ০০ রে ০

I সা সা মা জ্ঞা | মা মা মা -জ্ঞা | -মা সা -ণ্া সা | সা -ণসণ্া দ্া ণ্া I
ঠু ম ক প লং গ না ০ ০ লা ০ গি মো ০০ রে ০

I সা সা মা জ্ঞা | মা মা মা -জ্ঞা | -মা সা -ণ্া সা | সা সা ণ্া -দ্া I
ঠু ম ক প লং গ না ০ ০ রি ০ ন ন দি য়া ০

I -ণা দ্া দ্া ণ্া | সা সা মা মা | মা মী মা মা | -া মা মজ্ঞা -া I
০ ঘ র বি র ণ মো হে ক হ ত পা ০ ল বা ০

I জ্ঞমা -দণা র্সা র্সণা | ণদা দমা মজ্ঞা মজ্ঞা I [ ] I   শয়ন, পঞ্চম-মালকো

জে০ ০০ ০ মুং   গ০ রি০ য়া০ ০০

মা -া II { মা মা মা মা | মদা মা জ্ঞা জ্ঞা I

না ০   ত ন ম ন   ধ ন নি ত

I মা -দা দা দা | ণা ণা র্সা -া | ণা ণা -া র্সা | -া র্সা র্সা র্সা I

চা ০ ম র   ক র হুঁ ০   স দা ০ র   ঙ্ গ পি য়া

I র্সজ্ঞা -র্সা ণা দা | দণা -দণঃর্সঃ ণা -দা } | দা মা -া মা | -া মা মা মা I

লা ০ গ ত   নী০ ০০০ ক ০   গো রে ০ গা   ০ ত খু ব

I মজ্ঞা -দা মা মা | মজ্ঞা মজ্ঞা মজ্ঞা -মজ্ঞা II [ ] II[১]

জা ০ ত মন্   দ রি০ য়া০ ০০

এ গানটি থেকে ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত—

মিশ্র মালকোষ। ত্রিতাল (ঈষৎ বিলম্বিত মধ্যলয়)

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিন রজনী কত অমৃত-রস উথলি যায় অনন্ত গগনে ॥
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি ; নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥
বসিয়া আছ কেন আপন মনে, স্বার্থ-নিমগন কি কারণে।
চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে ॥

[মা]

II সা সা ণ্া ঋা | সণ্া -সণ্া দ্া -ণ্া | সা সা সমা জ্ঞা | মা ঋা মা -জ্ঞা I

আ ন ন্ দ   ধা০ ০০ রা ০   ব হি ছে ভু   ব নে আ ০

I -মা সা -ণ্া ঋা | সা -ণ্সণ্া দ্া -ণ্া | সা সা সমা জ্ঞা | না ঋা -মা -জ্ঞা I

০ ন ন্ দ   ধা ০০০ রা ০   ব হি ছে ভু   ব নে ০ ০

I -মা সা -ণ্া ঋা | সা সা ণ্া -দ্া | -ণ্া দ্া দ্া ণ্া | সা সা সমা মা I

০ দি ০ ন   র জ নী ০   ০ ক ত অ   মৃ ত র স

I মা মা মা মা | -া মা মজ্ঞা -া | মদা -ণর্সা র্সণা ণদা | দমা মজ্ঞা মজ্ঞা -মজ্ঞা I [ ] I

উ থ লি যা   ০ য় অ ০   ন০ ০ন্ ত০ গ০   গ০ নে০ আ০ ০০

[দা]

-মা -া II { মা -া মা মা | মঋা ঋা জ্ঞা জ্ঞা | মা -দা দা দা | ণা ণা র্সা -া I

০ ০   পা ন্ ক রে   র বি শ শী   অ ন্ জ লি   ভ রি য়া ০

I ণা ণা -া র্সা | -া র্সা র্সা র্সা | র্সঋা -র্সা ণা দা | দণা -দণর্সা ণা -দা } I

স দা ০ দী   প্ ত র হে   অ০ ক্ ষ য়   জ্যো০ ০০০ তি ০

১ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী-কৃত স্বরলিপি। এ গানটি সামান্য পাঠান্তরে ও স্বরান্তরেও প্রচলিত আছে। সব ক্ষেত্রেই রাগ মালকোষ।

I | -া মা মা মা | মজ্ঞা ঋা মা মঋা | মজ্ঞা মজ্ঞা মজ্ঞা মজ্ঞা I[ ]I
নি ভৃ ত পূ র্ণ ধ রা জী ব নে কি০ র ণে০ আ০ ০০

-মা -া II { সা সা সা সা | -মা মা মা মা | মা -া মা মা | মা -া মজ্ঞা -া I
০ ০ ব সি য়া আ ০ ছ কে ন আ ০ প ন ম ০ নে০ ০

I জ্ঞা -মা মা দা | দা -মদণা ণা ণদা | দা -মা মাঃ -ঋাঃ | জ্ঞমজ্ঞা -মজ্ঞা মা -সা } I
স্বা র্ থ নি ম ০০০ গ ন০ কী ০ কা ০ র০ ০০ শে ০

[দা]
I { মা মা মা মা | মঋা মা জ্ঞা জ্ঞা | মা দা দা দা | ণা -া র্সা -া I
চা রি দি কে দে খ চা হি হৃ দ য় প্র সা ০ রি ০

I ণা -া ণা র্সা | -া সা র্সা র্সা | র্সঋা -র্সা ণা -দা | দণা -দণর্সা ণা -দা } I
ক্ষু দ্র দু কৃ খ স ব তু০ চ্ছ ০ মা০ ০০০ নি ০

I দা -মা মা মা | মা মা মা মা | মজ্ঞা -ঋা মা, মঋা | মজ্ঞা মজ্ঞা মজ্ঞা -মজ্ঞা II[ ]II[1]
প্রে ০ ম ভ রি য়া ল হ শূ ন্ ন জী০ ব নে০ আ০ ০০

উল্লিখিত মূল গান ও মূলের ছায়াবলম্বী রবীন্দ্রসংগীতটি সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। মূল খেয়ালটি প্রেম-বিষয়ক, ভাঙা 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' পূজা-পর্যায়ের। মূল গানটির স্থায়ী ও অন্তরা এই দুটি মাত্র কলি, ভাঙা গানটির স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ চারটি কলি। মূল গানটি মধ্যলয়ের, ভাঙা গানটি ঈষৎ বিলম্বিত মধ্যলয়ের। মূল গানটি মালকোষ রাগের, ভাঙা গানটির রাগ মিশ্র মালকোষ। মিশ্র মালকোষ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

কোনো কোনো ওস্তাদ-পন্থী ব্যক্তি 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' গানটির সুর মিশ্র মালকোষ রাগ হিসাবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। তাঁরা মিশ্র মালকোষের মিশ্রত্ব ঘুচিয়ে শুদ্ধিকরণের পক্ষপাতী। তাঁদের শুধু এটুকু বলা যায়, রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে রাগ-শুদ্ধিকরণের চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের রুচি ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী অর্থাৎ 'খোদার উপর খোদ্‌কারি' মাত্র। রাগের অর্থ ও নিয়মাদি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন তা তাঁর উক্তি দিয়েই প্রমাণিত হয়:

"সংগীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে, সেখানে তার নিয়ম-সংযমের যে-শুচিতা প্রকাশ পায়, বাণীর সহ-যোগে গানরূপে তার সেই শুচিতা তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যায় না বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয়-সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে। কবিতাতেও ছন্দের রীতি আছে—সে রীতি কোনো বড়ো কবি নিখুঁতভাবে সাবধানে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করেন না—অর্থাৎ তাঁরা নিয়মের উপরেও কর্তৃত্ব করেন—কিন্তু সেই কর্তৃত্ব করতে গেলেও নিয়মকে স্বীকার করা চাই। এই জন্যে নিজের সৃজনশক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই শিক্ষা ও সংযম-শক্তির বেশি দরকার হয়।"[2]

রাগসংগীতের ক্ষেত্রেও রাগ-মিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে, যেজন্য মিশ্র রাগগুলির উদ্ভব হয়েছে। সমস্ত রাগগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—শুদ্ধ, ছায়ালগ (সালঙ্ক) ও সঙ্কীর্ণ। শুদ্ধ রাগ স্ব-গঠিত, তাতে অন্য কোনো রাগের মিশ্রণ নেই। ছায়ালগ রাগে দুই রাগের এবং সঙ্কীর্ণ রাগে দুইয়ের অধিক রাগের মিশ্রণ আছে। রবীন্দ্রসংগীতে এই তিন প্রকার রাগেরই সন্ধান মেলে। তা ছাড়া, আরো কতকগুলি মিশ্রণ-বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে, যা খুব উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

রাগসংগীতে মালকোষ একটি অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত রাগ। এই রাগে ঋষভ ও পঞ্চম স্বর বর্জিত; গান্ধার ধৈবত ও নিষাদ কোমল। সংগীতের ধারা ক্রম-বহমান। গতি যেখানে রুদ্ধ, শক্তি সেখানে ক্ষীয়মাণ। মালকোষ

---

১ স্বরবিতান ৪৫

২ সবুজপত্র, ১৩২৮, ভাদ্র

রাগ খুব শ্রুতিমধুর, খুব প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও তাতে কত বিভিন্নরূপ মিশ্রণ হয়েছে। যেমন, পঞ্চম-মালকোষ—পঞ্চম-যুক্ত ও ঋষভ-বর্জিত ; চন্দ্রকোষ শুদ্ধ নিষাদ ও শুদ্ধ ঋষভযুক্ত এবং পঞ্চম-বর্জিত ; মালব—দুই গান্ধার, দুই ধৈবত ও পঞ্চম-যুক্ত এবং ঋষভ-বর্জিত ; সম্পূর্ণ মালকোষ—ঋষভ ও পঞ্চম-যুক্ত ; জোগকোষ—দুই গান্ধার, দুই নিষাদ ও পঞ্চম-যুক্ত এবং ঋষভ-বর্জিত ; জোগ—তিলং + মালকোষ ; মালকোষ-বাহার—বাহার + মালকোষ, ইত্যাদি।

মিশ্র মালকোষ রাগের 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' গানটিতে মালকোষ রাগে ব্যবহৃত স্বরের অতিরিক্ত কোমল ঋষভ ও তীব্র মধ্যম ব্যবহার হয়েছে—এই বিবেচনায় 'মিশ্র' শব্দটি প্রযুক্ত। অবশ্য তৎপরিবর্তে অন্য কোনো রাগার্থ-বোধক শব্দ ব্যবহার করলেই বা আপত্তি কি? গানটিতে তীব্র মধ্যমের প্রয়োগ অর্থসূচক মনে হয়। কারণ শুদ্ধ মধ্যম প্রশান্তি ও বিস্তারের ভাব সূচিত করে। 'শূন্য জীবনে', 'জীবনে কিরণে' (জীবনের সঙ্গে সুখ-দুঃখের দোলা জড়িত), ইত্যাদি স্থলে তীব্র মধ্যমের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। স্বরসংবাদ তত্ত্বের দিক্ থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে, কোমল ঋষভও তীব্র মধ্যম নয়, শ্রুত্যন্তরে ষড়্জ-মধ্যম-ভাবে পরস্পর-সংবাদশীল স্বর। আর একটি বিশেষ কথা, মূল গানটি ফাঁকের একমাত্রা পর থেকে আরম্ভ, কিন্তু ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতটি সম্ থেকেই আরম্ভ, অর্থাৎ 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' ছত্রটির সূচনাতেই সম্ বা প্রধান ঝোঁক। ভুবনে কি বহিছে? আনন্দধারা। 'আনন্দধারা' শব্দটিই মুখ্য এবং তাতেই সমের ঝোঁক হওয়া উচিত। রবীন্দ্রসংগীত ভাবমূলক। মূল খেয়াল গানের অনুকরণে বেচারী 'বহিছে' ক্রিয়াপদকে সমের ভার বহন করার দায়িত্ব দেওয়া কেন? ভাবের রাজ্যে ক্রিয়াপদটি সে-ভার বইবেই বা কোন্ যুক্তিতে? স্থায়ী, অন্তরা ও আভোগের শেষে 'আনন্দধারা'র 'আ' অক্ষর যে-ভাবে দোলা দিয়ে 'আনন্দধারা'য় স্থায়ী হয়, সেই বিবেচনায় 'আনন্দধারা'ই সমের গুরুত্ব বহনের উপযোগী, 'বহিছে' নয়। ভাবের দিক্ থেকে বিচার করলে অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের সূচনা ওই একই দিকে ইঙ্গিত করে।

এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের খেয়াল অঙ্গের গানে তান যোগ করার পক্ষপাতী। তান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে সুস্পষ্ট ও যথার্থ ধারণা ছিল এ স্থলে তা স্মরণযোগ্য :

"এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, তান জিনিসটা একটা নিয়মহীন উচ্ছৃঙ্খলতা নহে ; তাহার মধ্যে তাল-মান-লয় রহিয়াছে ; তাহার মধ্যে স্বরবিন্যাসের অতি কঠিন নিয়ম আছে ; শুধু তাই নয়, যে কণ্ঠ বা বাদ্যযন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া এই তান চলিতেছে তাহারও নিয়মের শেষ নাই ; সেই নিয়মগুলি কার্যকারণের বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়া কোন্ অসীমের মধ্যে যে চলিয়া গিয়াছে তাহার কেহ কিনারা পায় না। অতএব বাহিরের দিক্ হইতে যদি কেহ বলে, এই তানগুলি অন্তহীন নিয়মশৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়াই বিস্তীর্ণ হইতেছে, তবে সে একরকম করিয়া বলা যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতেও আসল কথাটি বাদ পড়িয়া যায়। মূলের কথাটি এই যে, গায়কের চিত্ত হইতে গানের আনন্দই বিচিত্র তানের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে সেই আনন্দ দুর্বল, শক্তিও সেখানে ক্ষীণ।

"গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে, তেমনি তাহারা সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। বস্তুতঃ এই তানগুলি বাহিরে ছোটে কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে। তাহারা মূল হইতে বাহির হইতে থাকে, কিন্তু তাহাতে মূলের ক্ষয় হয় না, মূলের মূল্য বাড়িয়াই উঠে।

"কিন্তু যদি এ আনন্দের সঙ্গে তানের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে উল্টাই হয়। তাহা হইলে তানের দ্বারা গান কেবল দুর্বল হইতেই থাকে। সে তানে নিয়ম যতই জটিল ও বিশুদ্ধ থাক না কেন, গানকে সে কিছুতেই রস দেয় না, তাহা হইতে সে কেবল হরণ করিয়াই চলে।

"...তানসেন আপনার মধ্যে গানের সেই আনন্দলোকটিকে পাইয়াছিলেন। ইহাই ঐশ্বর্যলোক ; এখানে অভাব পূরণ হইতেছে, ভিক্ষা করিয়া নয়, হরণ করিয়া নয়, আপনারই ভিতর হইতে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে যেখানে ভাব-প্রকাশের জন্য প্রয়োজন বোধ করেছেন সেখানে সুরের কাঠামোর মধ্যেই তান ব্যবহার করেছেন। তার অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে অন্ততঃ একটি উল্লেখ করলে বিষয়টি পরিষ্কার ও বোধগম্য হবে। মূল 'মোরে কান ভনকবা' হিন্দী গান ভাঙা 'কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল' গানটির স্থায়ীর 'ফুটে দিগন্তে অরুণকিরণকলিকা' অংশের 'কলিকা' শব্দটিতে যে-তান যোজনা করেছেন তা এরূপ :

---

১ সঞ্চয়

I রা মা রজ্ঞা -পা | -মপা -দা -পদা -ণা | দণা -র্সা -ণর্সা -র্রা | -র্সা -ণা -ধর্সা -ণর্সা I
ক লি কা ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০০

I -দা -পা -মা জ্ঞা | -রা -সা -া···
০ ০ ০ ০ ০ ০

নিবিষ্ট মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করলে বোঝা যাবে, স্থায়ী অংশের কথা সুরের সাহায্যে সত্যিই শরতের মধুর প্রাতঃকালে অরুণকিরণচ্ছটা দিগন্তে বিচ্ছুরিত হওয়ার ভাব আশ্চর্যভাবে প্রকাশ করছে। 'কলিকা' শব্দটিতে তান-প্রয়োগ কিরূপ ভাব-প্রকাশক ও অর্থবোধক, সমঝদার ব্যক্তি তা অনুভব করবেন। ভাব-প্রকাশের খাতিরে মূল গান থেকে এরূপ প্রভেদ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কিন্তু গানের বহির্ভূত তান-যোজনা যে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না, এ কথা অনেকেরই জানা আছে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের গানে তান-যোজনা করবার অধিকারীই বা কে? ভুললে চলবে না যে, রবীন্দ্রনাথ একাধারে প্রতিভাবান্ কবি ও সুরকার ছিলেন। তাঁর গানে কাব্য ও সুর মিলিতভাবে অখণ্ড ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাব-রূপ প্রকাশ করে। একমাত্র কোনো উত্তম সুরকারের পক্ষেও তান যোগ ক'রে রবীন্দ্রসংগীতকে improve (?) করা সম্ভব কি? উত্তম সুরকার হলেও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কাব্যপ্রতিভা তাঁর কোথায়? রবীন্দ্রসংগীত ত শুধু সুরের কৌশলই নয়। কাজেই, গানের বহিরঙ্গ-হিসাবে তান-যোজনার এরূপ প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রসংগীতের অখণ্ড ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাব-রূপ খর্ব হয়ই, কারণ সে-ক্ষেত্রে কথা ও সুরের মিলিত ভাব-রূপ অনুভবের ঘনত্ব তরল হয়ে যায়। এসব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি :

"হিন্দুস্থানি সংগীতে আমরা সুরের তান শুনে মুগ্ধ হই; সংগীতের সুর-বৈচিত্র্য তানালাপে কেমন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে সেইটেই উপভোগ করি, নয় কি? কিন্তু কীর্তনে আমরা পদাবলীর মর্মগত ভাবরসটিকেই নানা আঁখরের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আঁখর অর্থাৎ বাক্যের তান, অগ্নিচক্র থেকে স্ফুলিঙ্গের মত কাব্যের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে বর্ষিত হতে থাকে। সেই বেগবান্ অগ্নিচক্রটি হচ্ছে সংগীতসম্মিলিত কাব্য। সংগীতই তাকে সেই আবেগ-বেগের তীব্রতা দিয়েছে যাতে করে নূতন নূতন আঁখর তা থেকে ছিটিয়ে পড়তে পারে। গীতহীন কাব্য যেখানে স্তব্ধ থাকে সেখানে আঁখর চলে না। বিদ্যাপতি পাঠকালে পাঠক তাতে নূতন বাক্য-যোজনা করলে ফৌজদারি চলে, কারণ পাঠক তো বিদ্যাপতি নয়! কিন্তু ছন্দোবদ্ধ বিশুদ্ধ কাব্যের আদর্শে আঁখরে যে দৈন্য অনিবার্য, কীর্তনের সুরের ঐশ্বর্য সেটাকে পূরণ করে দেয় বলেই তাতে করে রসের সহায়তা করে। অতএব দেখা যাচ্ছে কীর্তনে সুরে-বাক্যে অর্ধনারীশ্বর যোগ হয়েছে। যোগের এই দুই অঙ্গের মধ্যে কে বড় কে ছোট সে বিচারের চেষ্টা করা উচিত নয়। উভয়ের যোগে যে সৌন্দর্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলে সেই সৌন্দর্যকেই হারাতে হবে। জলের থেকে অক্সিজেনকেই নিই, বা হাইড্রোজেনকেই নিই তাতে জলটাই যায় মারা। বাংলা পদগান জলেরই মত যৌগিক সৃষ্টি—দুইয়ে মিলে তবে অখণ্ড। হিন্দুস্থানি গান রূঢ়িক, তা একাই বিশুদ্ধ। সৃষ্টি ব্যাপারে রূঢ়িক শ্রেষ্ঠ না যৌগিক শ্রেষ্ঠ এ তর্কের কোনো অর্থ নেই। ভালো যা তা ভালো বলেই ভালো—রূঢ়িক বলেও না, যৌগিক বলেও না।"[১]

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের টপ্পা অঙ্গের ভাঙা গান সম্বন্ধে দু-চার কথা বলব। শোনা যায়, টপ্পা গানের উৎপত্তি পঞ্জাবের দেশী বা আঞ্চলিক সংগীত থেকে; শোরী মিঞা তার অনেকটা সংস্কার ক'রে প্রচলন করেন। কিন্তু বাংলা দেশে প্রচলিত বাংলা টপ্পার বিশেষ একটি চাল আছে, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের টপ্পা অঙ্গের গানে বিশেষ একটি মার্জিত রূপ দেখতে পাই। এই গানগুলিতে শোরী-টপ্পার 'জমজমা' অলংকরণের সেই বাহুল্য নেই অথবা বোলতান-জাতীয় অলংকরণের সাহায্যে একই কথার অংশকে হেরফের করার আতিশয্য নেই; যার ফলে টপ্পা গান একঘেয়ে ও নিরস হয়ে পড়ে। এই বাহুল্য নেই ব'লেই রবীন্দ্রনাথের টপ্পা অঙ্গের গানগুলি স্বতন্ত্র মর্যাদা পাবার যোগ্য। গানের সুরের কাঠামোতেও যে মূল গানের সঙ্গে পার্থক্য আছে, 'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে' গানটি দৃষ্টান্ত হিসাবে নিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। এ গানটির মূল 'বে পরি জাঁ। তাঁডে তাঁডে পর' গানটির যে স্বরলিপি শ্রীগোপেশ্বর

১ সাঙ্গীতিকী

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী-কৃত 'সংগীত-সুধা' পুস্তকে (১৩৩৪ সালে) প্রকাশিত হয়েছিল, তা এরূপ :

সিন্ধু। মধ্যমান

বে পরি জাঁ তাঁড়ে তাঁড়ে পর
বন রঁদিয়া বে হে মিয়া ফুলহুয়াঁ।
রনসকদে পরিয়াঁ না বে সাবরু বরু ॥
পরিয়াঁ বে পরি বন বঁদিয়া অওরণ
শকদে শোরী দে দি টপে দিয়া বরু ॥

শোরী—

II { র্সা | -ধণর্সর্সা -ণধঃ -ণা ধপঃ ধা I
বে 0000 00 0 প0 রি

I ধণর্সর্সা -ণধঃ -ণা ধঃ পা | -া মঃমপঃ -ধপমপা -ধঃমপঃ |
জাঁ000 00 0 তাঁ ড়ে 0 তাঁড়ে0 0000 0প0

| মজ্ঞা -া -রা } রজ্ঞা | রজ্ঞমমা -জ্ঞরসরা রজ্ঞমমা -জ্ঞরঃজ্ঞঃ I
র0 0 0 বন রঁ000 000দি য়া000 000

I -ঃরসঃররা পা -া | মপা পর্সাঃ -নঃ র্সা | -া র্সর্সা র্রর্রা -া |
0বে0 হেমি য়া 0 ফুল হুয়াঁ 0 0 0রন সক 0

| র্রর্জ্ঞর্মর্মা র্জ্ঞর্রঃ -র্জ্ঞাঃর্রর্সা I র্সর্রর্সর্রা -র্জ্ঞঃর্রর্রঃ র্সণধপা -মমপধা |
দে000 00 0 পরি য়াঁ000 0ন0 0000 00বে0

| -ণসর্রর্রা র্সণধপা মমপধা -ণণধপা | -মজ্ঞররা রজ্ঞমমা -জ্ঞরসরা II
00সা0 ব000 00রু0 0000 000ব রু000 0000

II { মপা | র্সাঃ -নঃ -র্সা -া I
পরি য়াঁ 0 0 0

I র্সর্রা র্রর্জ্ঞর্মর্মা -র্জ্ঞর্রঃর্জ্ঞঃ র্রর্সা | -া র্রর্রর্সণা -ধপধণা -র্সনঃর্সঃ |
বেপ রি000 000 বন 0রঁ000 0000 00দি

| (র্সা -া -া) } র্সা -া পপঃর্সঃনর্সা | র্রা র্সর্রর্সণা -ধপমমা পধণর্সা I
য়াঁ 0 0 য়াঁ 0অওর নস কদে000 0000 শোরী00

I -ঃর্সর্রঃ -র্সণধপা র্রর্রা র্জ্ঞা | র্রর্জ্ঞর্রর্সা -ণধপমা পধণর্সা -ণধপমা |
0দে0 0000 দিট পে দি000 0000 য়া000 0000

| -জ্ঞরসসা রজ্ঞমমা -জ্ঞরসরা II II
000ব রু000 0000

এ গানটি থেকে ভাঙা 'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে' গানের কাঙালীচরণ সেন-কৃত যে-স্বরলিপি প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শক ১৮৩৭ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ও পরে স্বরবিতান ৪৫-সংখ্যক খণ্ডে গৃহীত হয়েছে, তা এরূপ :

সিন্ধু। মধ্যমান[১]

II স́া -া -ণা -া -া -া ধপা ধা I
কে ০ ০ ০ ০ ০ ব০ সি

I ধণা -স́ণা -ধা -ণা -া ধা পা -া | -া -া মা পা পা -া -মপধা পধপা |
লে০ ০০ ০ ০ ০ আ জি ০ ০ ০ হৃ দ য়া ০ ০০০ স০

| মজ্ঞা -া -া -া -া -া রা জ্ঞা | রজ্ঞা -মজ্ঞা -রা রা রজ্ঞা -মজ্ঞা -রা -জ্ঞা I
নে ০ ০ ০ ০ ০ ভু ব নে০ ০০ ০ শ্ব র০ ০০ ০ ০

I -সা -া -া -া -া রা পা -া | -া -া -া মা পা পা পস́া -া |
০ ০ ০ ০ ০ প্র ভু ০ ০ ০ ০ জা গা ই লে ০

| -ননা -স́া -া -া পা স́না স́া র́া | জ্ঞ́র́া -স́র́া -জ্ঞ́ম́া -জ্ঞ́ম́জ্ঞ́র́া জ্ঞ́া র́া স́া -া I
০০ ০ ০ ০ অ নু০ প ম সু০ ০০ ০০ ০০০০ ন্ দ র ০

I -া -া নস́া -র́জ্ঞ́া র́স́া -ণধা -পমা -া | মমা -পধা -ণস́া -া স́র́া স́র́স́া -ণধা -পমা |
০ ০শো০ ০০ ভা০ ০০ ০০ ০ হে০ ০ন ০০ ০হৃ০ দ০ ০০ ০০

| মপা -ধপা -মজ্ঞরা রা রজ্ঞা -মজ্ঞরা -সরা -া II
য়ে০ ০০ ০০০ শ্ব র০ ০০০ ০০ ০

II মা পা | সা -া -া -ননা -স́া -া স́া র́া I
স হ সা ০ ০ ০০ ০ ০ ফু টি

I জ্ঞ́র́া -স́র́া -জ্ঞ́ম́া -ম́জ্ঞ́া -র́া -জ্ঞ́া স́া র́া | -া -া স́া -া -ণধা -পমা মমপধা -ণস́া |
ল০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ফু ল ০ ০ ম ০ ০০ ০০ ০০০০ ০ন্

| না স́া -া -া -া -া পা স́না | স́া -া স́া র́া স́র́স́া -ণধা -পমা -া I
জ রী ০ ০ ০ ০ শু কা০ নো ০ ত রু তে০ ০০ ০০ ০

I মা পা পজ্ঞ́া -া -া -া -া -া | স́র́া স́র́স́া -ণধা -পমা -া -া -া মা |
পা ষা ণে ০ ০ ০ ০ ০ ব০ হে০ ০০ ০০ ০ ০ ০ সু

| মপা -ধপা -মজ্ঞা -রা রজ্ঞা -মজ্ঞা -রসা রা II II
ধা০ ০০ ০০ ০ ধা০ ০ ০ ০০ রা

একটু লক্ষ্য করলেই মূল গান ও ভাঙা গানের সুরের পার্থক্য বোধ হবে। বিশেষতঃ অলংকারের বাহুল্য-বর্জন, 'কে বসিলে' অংশের 'কে' শব্দটির সুর স́ থেকে ণ স্বরে সরলভাবে অবরোহণ, 'পাষাণে' শব্দটির জ্ঞ́ স্বরে স্থিতি ইত্যাদি ভাব-প্রকাশের দিক্ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এই পার্থক্যগুলি ঠিক ঠিক রক্ষা না ক'রে গানটিকে মূল গানের ছাঁদে ফেলে গাইতে গেলেই রবীন্দ্রসংগীতটির ভাব-রূপ ক্ষুণ্ণ হবেই।

রবীন্দ্রসংগীত ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র অধ্যায়। রাগসংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের, বিশেষতঃ হিন্দীগান ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের, কতক কতক বিশেষ যোগ থাকলেও, রবীন্দ্রসংগীতকে রাগসংগীতের সম্পূর্ণ কুক্ষিগত

---

[১] স্বরলিপি দ্রুতমাত্রায় লিখিত।

ক'রে বিচার করা যেমন ভুল হবে, রাগসংগীত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হিসাবে বিচার করলেও তেমনি ভুল করা হবে। মোট কথা, হিন্দীগান ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার যে স্বতন্ত্র রীতি আছে তা অর্থাৎ গীতরূপ রক্ষা করা চাই। তা না হলে রবীন্দ্রসংগীতের ভাব-রূপ নষ্ট হবেই। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"রবীন্দ্রগীতির গীতরূপগুলি যে অত্যন্ত সুকুমার, তাদের শ্রী ও সুষমা কোনো রকম বিজাতীয় গায়কির স্পর্শমাত্র সহ্য করতে পারে না—একথা শুধু সত্য নয়, যে সকল আধুনিক উন্মার্গগামী শিল্পী রবীন্দ্রগীতি নিয়ে খেলা করবার চেষ্টা করেন, অর্থাৎ তাঁদের স্বকপোলকল্পিত গায়কি দিয়ে রবীন্দ্রগীতির উদ্ভট রূপ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন, সেই সকল free-lance-দের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার মতো অপ্রিয় কাজ আর কিছু নেই। প্রশ্ন হতে পারে, রবীন্দ্রগীতি এত স্পর্শাসহিষ্ণু কেন? প্রশ্নের উত্তর যদি নাও পাওয়া যায় তা হলেও ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না।...

"কবি-মনের নিভৃত গুহা থেকে এই গীতি যে বিশেষ ধ্বনি বহন করে এনেছে, তার একমাত্র সার্থকরূপটি ফুটে উঠেছে তার গীতরূপের মধ্যে। এখন যে-কোনো কৌশলী বা খামখেয়ালী শিল্পী গায়কির পরিবর্তন সাধন করলেই বুঝতে পারবেন গীতরূপের কিরকম অনভিপ্রেত পরিবর্তন এসে পড়ে, গীতির ধ্বনিরূপটির কতখানি উচ্ছেদ ও অবলোপ হয়। কিন্তু ধ্বনিরূপটি নিজে অনুভব করাই আসল কথা। ধ্বনিরূপটির অনুভব না হলে ঐ গীতিকে রামপ্রসাদীসুরের ছকে ফেলে গান করা অথবা কোনো প্রচলিত ধ্রুপদ-খেয়াল-খেম্‌টা-গজল বা যা-হোক একটা কিছু দিয়ে সুরে তালে গান করা একই কথা। অর্থাৎ, মনে হবে, 'কেন, এও ত একরকম বেশ লাগল, মন্দই বা কি? সুর-তাল-পদ ত বেশ ফুটে উঠেছে'। ধ্রুপদ খেয়ালের শিল্পী নিজের ইচ্ছা ও কল্পনামতো ঐ গীতটি গাইবার সময়ে 'ঢোঢ়ন্', মোঢ়ন্' 'বোঢ়ন্' 'গমক্' 'পুকার' 'সুত' প্রভৃতি গায়কি কৌশল অথবা ডাগরবান্-গুবরহারবান্ প্রভৃতি বাণীর গায়কি ফুটিয়ে তুলতে পারেন সন্দেহ নেই। জগতে ফুটে ওঠার অন্ত নেই, লাবণ্যও ফুটে ওঠে, হাম-বসন্তও ফুটে ওঠে। আসল কথা, গায়কের অনুভবটি কিরকম ফুটে ওঠা আশা করে সে সম্বন্ধে একটু অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এবং ফুটে ওঠার পর বা সঙ্গে সঙ্গে ঐ গীতির সূক্ষ্মধ্বনিটি বেঁচে থাকে কি নিস্পন্দ হয়ে যায়, এও অনুভব দিয়ে বিচার করতে হবে।"১

মূল গানগুলি যে-ঘরানা থেকেই আহরণ করা হোক না কেন, মূল গানের সঙ্গে ভাঙা গানের বিভিন্ন রকমের অল্পবিস্তর পার্থক্য আছেই। এই পার্থক্যগুলিই রবীন্দ্র-গাতরূপের বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে না পারলে গীতরূপ খর্ব হয়ই। গাতরূপের এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা, একাগ্র অনুশীলন, বদ্ধ সংস্কার অতিক্রমন ও কণ্ঠসংযম-সাধন। তা হলেই ভাঙা গানের গীতরূপ, অথবা অন্যভাবে বলা যায়, গায়কি রক্ষা করার অধিকার জন্মে। প্রশ্ন হতে পারে, গায়কি দ্বারা কি বোঝায়?

রবীন্দ্রসংগীতে সুরের ভাব ও কাব্যের ভাব এই উভয়েতে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, আবহমানকাল থেকে আমাদের সংগাতে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীবিভাগ চ'লে আসছে। যেমন বর্তমানে রাগ-সংগীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ইত্যাদি শ্রেণী দেখা যায়। এই প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার উপ-শ্রেণীও আছে। আবার যে ক্ষেত্রে একই রচয়িতার গানের সংখ্যা বিপুল, যেমন রবীন্দ্রসংগীতে, সে ক্ষেত্রেও নানা শ্রেণী-বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। সংগাতের মূলতত্ত্ব হিসাবে সুর, ছন্দ ও লয় যখন সব শ্রেণীতেই বিদ্যমান, কি কি বিশেষত্বের গুণে তা হলে এই শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব হয়? শুধু কি কাব্যের জন্য? কাব্যে বিশেষ মুড বা মেজাজের মৌলিক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত হতেও পারে, কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের রূপায়ণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে সুর-ছন্দ-লয়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ-বিধি, স্বর-প্রয়োগ, অলংকরণ, স্বর-ক্ষেপণ, কাব্য ও ভাষার উপর। এই সবকিছু মিলে প্রত্যেক শ্রেণীর গানে এক-একটি স্বতন্ত্র গীতরূপ, বা সাধারণ কথায় যাকে বলে গাওয়ার ঢং, সৃষ্টি করে—যাকে বলা যায় গায়কি।

গান কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে প্রচারিত হওয়াই ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে চিরাচরিত। গান শেখার সঙ্গে সঙ্গে গায়কিও কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে চ'লে আসে। এটা অস্বীকার করা চলে না। এ জন্যই শিষ্যকে একাদিক্রমে বৎসরের পর বৎসর গুরুগৃহে থেকে সাধনা ক'রে সংগীত শিক্ষা করতে হ'ত। সংগাত শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র মামুলিভাবে গান শেখা নয়, তার গায়কিকেও আয়ত্ত করা। গায়কি গানের কোনো-একটি বিশেষ শৈলী নয়, গায়কি হ'ল কথা, সুর, ছন্দ, লয়—তথা ভাষা, ভাব, স্বর-প্রয়োগ, স্বর-ক্ষেপণ, অলংকরণ, ইত্যাদির সমষ্টিগত সামগ্রিক রূপ, যা গানকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলে, যা বিষয়ভেদে ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি এবং যার ধারা ব্যক্তি ও সমষ্টির অনুশীলনীয়। গায়কিহীন

১ গান ও গায়কি : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল—বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৬

গান প্রাণহীন দেহের ন্যায়। গানের গায়কিকে লঙ্ঘন করলে, গান রস-ভ্রষ্ট ও ভাব-ভ্রষ্ট হতে বাধ্য। রবীন্দ্রসংগীত ও অন্যান্য বিশেষ ধারার বাংলা গানের ক্ষেত্রেও এ কথা স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক। সংগীতের সর্বশ্রেণীর ঐতিহ্যবাহী গানের সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য।

সাহিত্যে যেমন স্টাইল (style), গানে তেমনি গায়কি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন প্রতিভাবান্ লেখকদের প্রত্যেকের লেখার আশ্চর্য একটি নিজস্বতা থাকে, সংগীতের ক্ষেত্রেও সার্থক স্রষ্টামাত্রের একটি অপূর্ব নিজস্বতা ফুটে ওঠে যা থেকে অমুকের সংগীত ব'লে সঙ্গে সঙ্গে চেনা যায়। সংগীতরচয়িতা যেখানে অনুপস্থিত বা অবর্তমান সেখানে সংগীতের অনুকরণাতীত* বৈশিষ্ট্য—এই মৌলিক রূপ এবং ভাবলাবণ্য ফুটিয়ে তোলার ও পরিবেশন করার ভার বর্তে অন্য একজনের উপর, তিনি হলেন গায়ক। শ্রোতাগণ শোনেন এবং উপভোগ করেন, সমঝদার শ্রোতা যাচাইও করেন। এই স্টাইলের চাবিকাঠি গায়কের আয়ত্ত না থাকলে রচয়িতার বিশিষ্ট রসলোকের রুদ্ধদ্বারে তিনি নিরর্থক ঘা দিতে থাকেন, তবু কবাট বন্ধই থেকে যায়।

যেমন বিশেষ সাহিত্যিক স্টাইলের তেমনি বিশেষ গানের বিশেষ গায়কিরও বহু বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে বিবিধ লক্ষণ নির্দেশ করা যায় সন্দেহ নেই ; তবু মনে রাখতে হবে, সকল বিচার-বিশ্লেষণের ও পরে অবিশ্লেষণীয় কিছু থাকেই, যা হ'ল লোকোত্তরপ্রতিভাবান্ স্রষ্টার অখণ্ড ব্যক্তিত্বের ছাপ, যেটিই হ'ল সাহিত্যিক স্টাইলের বা সাঙ্গীতিক গায়কির সারভূত—যেটি কেবল শ্রদ্ধাসহকারে ও যত্নসহকারে সুদীর্ঘ অনুশীলনের দ্বারা গুরুশিষ্যপরম্পরায় বাহিত হতে পারে—বোধশীলতার গুণে, অনুরাগের কারণে অন্য কোনক্রমে নয়। রবীন্দ্রসংগীত-অনুশীলনকারীগণ এ কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখলে ভাল হয়।

আবার বলি, স্টাইল বলতেই এখানে মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর, প্রবুদ্ধ সচেতন ব্যক্তিসত্তার ছাপ বা সর্বাঙ্গীণ পরিচিতি—স্বভাবতঃই অনন্য বা অতুলনীয় ;—'ভঙ্গী' বা mannerism নয়, যেটি প্রাণহীন হতে বাধ্য বা শেষ পর্যন্ত 'ন্যাকামি'তে পর্যবসিত না হয়ে পারে না।

---

* অনুকরণ করা যায় না, কিন্তু যোগ্য ব্যক্তি শ্রদ্ধার দ্বারা, অনুশীলন দ্বারা গ্রহণ অবশ্যই করতে পারেন। না হলে এ ক্ষেত্রে ত স্রষ্টার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি লোপ পেত।

—০—

ভারতবর্ষে মার্ক্‌স্‌-বাদ ও লেনিন-বাদ প্রচার ও তদনুসারে কাজ করিতে প্রস্তুত অনেকগুলি লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বিনাশ করিয়াছে কি না, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়িল যে, মার্ক্‌স্‌-বাদ ও লেনিন-বাদ অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে ও মানব সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের পন্থা নির্দ্দেশে সকল প্রকার অধ্যাত্মবাদের বিপরীত। তাহা একরকম জড়বাদ (যাহাকে ডায়ালেক্‌টিক্যাল মেটীরিয়ালিজ্‌ম্‌ বলা হয়)। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার যদি বিনাশ হয়, তাহা হইলে মার্ক্‌স্‌-বাদ ও লেনিন-বাদ দ্বারা হইবে, ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের দ্বারা নহে। আমরা ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের ওকালতী করিবার জন্য একথা বলিতেছি না, কিন্তু যে-কার্য্যের দায়িত্ব যাহার তাহার ঘাড়েই সেই দায়িত্ব চাপান উচিত বলিয়া বলিতেছি। অবশ্য আজকাল যে গবন্মেণ্ট বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাহা আমাদের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির নিমিত্ত নহে।

মার্ক্‌স্‌-বাদ ও লেনিন-বাদের কোন গুণ নাই, বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে, কিছু গুণ আছে। কিন্তু উহা যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা নহে, ইহা বলিলে উহার প্রতি বোধ হয় অবিচার করা হইবে না, এবং উহার ভক্তেরা তাহা প্রশংসার বিষয়ই মনে করিবেন।

প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গ, মাঘ, ১৩৪৩।

রসায়নের প্রগতি

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

সূচনা

সেদিনের কথা মনে পড়ে, সে স্মরণাতীত যুগে যেদিন আদিমানব হঠাৎ দেখল পাথরে পাথর ঠোকায় আগুনের ফুলকি বের হয়। সেই আদিমানবই প্রথম রসায়নবিদ্, যে আগুন সৃষ্টি দেখেছিল, মনে ক'রে রেখেছিল, নিজের ও নিজের মানবগোষ্ঠীর কাজে লাগিয়েছিল সে আগুনকে। আদিমানব কাঠ পুড়িয়ে নিজেকে শীত থেকে রক্ষা করতে পারল। কাঁচা মাংস ঝলসিয়ে খেতে সুরু করল। নিজ আবাস-গুহার মুখে আগুন জ্বালিয়ে অন্যান্য শক্তিশালী জন্তুর আক্রমণ এড়াতে পারল।

তখন নিজে না বুঝলেও, মানুষ অকস্মাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেলল রাসায়নিক ক্রিয়া, দাহ্য বস্তুর দহনে উত্তাপ সৃষ্টি। আগুনের ব্যবহার মানুষকে এক বিরাট্ বিবর্তনের সম্ভাবনার মাঝে এনে ফেলল। কন্দ, মূল, প্রভৃতি শক্ত সব্জী, মাংস, প্রভৃতি আগুনের সাহায্যে নরম ক'রে খাওয়াতে দাঁত ও চোয়ালের কাজ ক'মে গেল। মুখের কাঠামো ক্রমে বদ্‌লে গেল। মুখের হনু ছোট হয়ে গেল। মানবের পরিপার্শ্বে জল ছিল, মাটি ছিল। জল দিয়ে মাটি মেখে রোদে বায়ুতে শুকিয়ে নিলে যেমন শক্ত হয় তার চাইতে আরও শক্ত হ'ল আগুনে পুড়িয়ে। কাদা মাটির নরম তালকে সে খুশীমত গঠন দিল, আগুনে পোড়াল। সভ্যতার আদিযুগের বাসন-কোসন, গহনাগাঁটি, খেলনা সৃষ্টি হ'ল। মহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা, প্রভৃতির মৃৎশিল্প এ সবেরই নিদর্শন।

গাছপালা কাটা, গর্ত খোঁড়া, আহারের জন্য শিকার ও শক্রর বিনাশের জন্য মানুষ পাথর ঘ'ষে তীক্ষ্ণ মারণাস্ত্র তৈরি করল।

ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত চাহিদা মেটাবার প্রয়োজন মানবকে নানা আবিষ্কার উদ্ভাবন অনুসন্ধানের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। শুধু কি তাই, তার সঙ্গে কোন কৌতূহল মেশানো ছিল না কি? না থাকলে ওরই ভেতর চিত্র-বিচিত্র রঙের ব্যবহার, মৃৎশিল্পের বিচিত্র গঠন দেখা দিল কি ক'রে? এমনি ভাবে এল চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি, এল মস্তিষ্কের বিবর্তন।

রসায়নের আদিযুগ

বিজ্ঞানের অন্যতম সোপান হ'ল পর্যবেক্ষণ। আহার্যের জন্য শিকার খুঁজতে মানুষ পথে কুড়িয়ে পেল মণি মাণিক্য রত্ন ধাতু বা ধাতব খনিজ। দেখল, খনিজ পাথর আগুনে গলে। দেখল, শিকার-করা পশুচর্মের আচ্ছাদনে শীত কমে। বিবিধ খনিজ থেকে ধাতু, ধাতু থেকে অস্ত্র, ধাতু মণি রত্ন থেকে অলঙ্কার, খনিজ বা ধাতু থেকে বাসনপত্র গড়তে শিখল। ক্রমে দেশ-দেশান্তরে মণি রত্ন ধাতু নিয়ে গিয়ে পরিবর্তে খাদ্য, চর্ম, প্রভৃতি সংগ্রহ করতে লাগল। কেবল তাই নয়, এটা-ওটা এমনি অকারণ দেখতে দেখতে মানুষের আদিম মনটি ধীরে ধীরে কালের আবর্তনে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনে বিবর্তিত হ'ল।

কাঠ পোড়ানতে কাঠকয়লা হ'ল। কাঠকয়লা জ্বালান আগুনে খনিজ পাথর বিজারিত হয়ে ধাতু প্রস্তুত হ'ল। সর্বপ্রথম তামার আকরিক থেকে তামা ধাতু আবিষ্কার হল। তামা থেকে বাসনকোসন, ছুরি ছোরা, বর্শা, তীরের ফলা সবই গড়া গেল। বলা বাহুল্য যে, এই প্রণালীতে বিশুদ্ধ তামা উৎপন্ন হয় নি, হয়েছিল অশুদ্ধ মিশ্রধাতু, যাকে বলা যেতে পারে ব্রঞ্জ। মিশর, সুমের, গ্রীস, ক্রীট, ব্যাবিলন, চীন, মহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা, প্রভৃতি প্রাচীন দেশে এর ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখা গেছে।

তারপর আবিষ্কার হল লোহা ধাতুর, লৌহ-আকরিক লাল পাথর থেকে। এটা সম্ভব হল, মানুষ বায়ু খাইয়ে

আগুনের উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে পারল ব'লে। এইসব ছোটখাটো কৌতূহল, হাতে কলমে ক'রে দেখা, অকারণ অনুসন্ধিৎসার পুঞ্জীভূত ফলস্বরূপ উত্তরকালে বিরাট্ রসায়ন-বিজ্ঞান গ'ড়ে উঠেছে। লোহা নিষ্কাশন করতে শেখাতে অনেক সুবিধা হ'ল, যা' উত্তরকালের লোহা ব্যবহার থেকে বোঝা গেল।

বলতে গেলে তামা আর লোহার আবিষ্কারের অনেক আগেই মানুষ সোনা ধাতু ও রূপা ধাতু আবিষ্কার করেছিল, কেননা ধাতু হিসেবে সোনা অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে সহজে যুক্ত হয় না। রূপাও ধাতু হিসেবে স্বল্প পরিমাণে অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে।

তবে আদিমানব সোনা ও রূপা বেশী পরিমাণে খুঁজে পায় নি। স্বল্প-পরিমাণ ব'লে খুব বেশী কাজে লাগাতে পারে নি। দুষ্প্রাপ্য ব'লে অলঙ্কারে ব্যবহার করেছিল। সোনার কাঁচা হলুদ রং চোখে ধরল, বেশী পরিমাণে খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই তার আদর বাড়ল। মানুষ ভাবল, কোন্ রহস্যময় পন্থায় তামার মত সুলভ ধাতু দুর্লভ সোনায় পরিণত হয়। আবিষ্কার-উদ্ভাবনের মূল কথাই হ'ল, দেখা আর ভাবা। আদিমানব ভাবতে পারত কি? দেখতে পেত অর্থাৎ নিরীক্ষা করতে পারত নিশ্চয়ই, নইলে আগুন উদ্ভাবন হ'ত না, পশুচর্মে শীত থেকে আত্মরক্ষা হ'ত না। ভাবতে পারত নিশ্চয়ই, নইলে কোমরে লতাগুচ্ছের বন্ধনী ব্যবহার ক'রে পশুচর্ম পরল কি ক'রে? পাথর ঘ'ষে চোখা করল কি ক'রে? পরীক্ষা-নিরীক্ষা এইগুলিরই সমষ্টিগত ফল হ'ল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন। আদিমানব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারত কি? আদিমানব না পেরে থাকলেও প্রাচীন মানব পারল। খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগেও যে মানবিক সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল, তাতে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। তখন যে সোনা রূপা সীসা তামা লোহা কাচের ব্যবহার ছিল তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এমন কি, রঞ্জনের নমুনাও দেখা গেছে। সে সময় গ্রীস (অ্যাথেন্স) মিশর (আলেকজান্দ্রিয়ায়) প্রভৃতি দেশে সভ্যতা প্রসারিত হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই শত বছর আগেও টলেমি এখানে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করেছেন। ইউক্লিড জ্যামিতি রচনা করেছেন। সুতরাং চিন্তাশক্তি যথেষ্ট বিকশিত হয়েছে। এখানে এই সময়ে সুরু হ'ল কিমিয়াবিদ্যা,—আরম্ভ হ'ল ভেল্কিবাজির সঙ্গে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের বিচিত্র সংমিশ্রণ। একদল কিমিয়াবিদ্ বললেন, তাঁরা সীসা থেকে সোনা তৈরি করতে পারেন। সেজন্য যাদুবিদ্যা জানা দরকার, যা তাঁরা সাধারণ্যে প্রকাশ করলেন না! বলতে গেলে এই হ'ল রসায়নের আদিযুগ। এটা ওটা মিশান, এটা ওটা পোড়ান, এটা সিদ্ধ করা, এইরূপ বিবিধ পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বিচিত্র সঙ্কেত দিয়ে পরীক্ষালব্ধ ফল লিখে রাখার পদ্ধতি সুরু হ'ল। গুপ্ত গাছ-গাছড়া জড়িবুটির ঔষধ বা বিষ হিসেবে ব্যবহারের উন্মেষ হ'ল।

রসায়নের মধ্যযুগ

এরপর একদল মানুষ এলেন যাঁরা কিমিয়াবিদের মত গুপ্তবিদ্যা, লৌহ-স্বর্ণ রূপায়নের চমকপ্রদ চাতুর্যের প্রচেষ্টায় প'ড়ে থাকলেন না। তাঁরা ভেষজের আবিষ্কার-উদ্ভাবনে মন দিলেন। দেখা গেল, চিন্তাশক্তি সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনহিতকল্পে তাঁরা অমৃতের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন, যাতে জরা ব্যাধি দূর হয়। বলা বাহুল্য, সে যুগে কিমিয়াবিদের তামা-লোহা বা সীসা থেকে সোনা করা যেমন সফল হয় নি, তাঁদের পরবর্তীকালের লোকেরা তেমনি অমৃতের সন্ধানও পান নি। অথচ এঁদের প্রভাব কয়েক শত বৎসর পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থেকে গেল। যাই হোক না কেন, কিমিয়াবিদ্ সোনা তৈরি করতে পারল না বটে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টায় রেখে গেল অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিবৃত্ত। ভারতবর্ষেও এইরূপ সোনা তৈরির প্রচেষ্টায় পারদ ইত্যাদি নিয়ে অনেক কাজ সমসময়ে হয়। নবম শতাব্দীতে নাগার্জুনের নাম উল্লেখযোগ্য। তার কয়েক শতাব্দী পূর্বে চরক ও সুশ্রুত অমর আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রবর্তন করেন। অষ্টম শতাব্দীতে জবীর ছিলেন আরবদেশের অন্যতম কিমিয়াবিদ্। তাঁর লিখিত বৃত্তান্তে সেকালের ধাতু নিষ্কাশন, অ্যাসিড, লবণ প্রস্তুতির অনেক প্রণালী পাওয়া গেল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রজার বেকন বারুদ প্রস্তুত করলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে বৃটিশ সেনাবিভাগ প্রথম বারুদ ব্যবহার করল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতেও কিমিয়াবিদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নি। প্যারাসেল্‌সাস তখন চিকিৎসক হিসেবে নাম করেছেন, চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক হয়েছেন। তদানীন্তন চিকিৎসাতত্ত্ব যে সব ভুয়া তা' প্রমাণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি ওষুধ হিসেবে আফিং ব্যবহার করলেন, সীসাঞ্জন, পারদ, প্রভৃতি ব্যবহার করতে লাগলেন। তাঁর দুঃসাহসিকতার ফলে অনেক কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কার হ'ল। সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হ'ল। লোহার সঙ্গে

সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় গ্যাসের বুদ্‌বুদ হয় জানা গেল। প্যারাসেল্‌সাস বললেন, ধাতু আর অধাতুর ধর্ম পৃথক্‌। তিনি রসায়ন ও ঔষধবিজ্ঞানের নতুন দিশা দিলেন।

মানুষ পেল সিন্দুর দহন ক'রে টলটলে পারদ ধাতু। ঔষধে গাছগাছড়া, সিন্দুর, প্রভৃতি পারদঘটিত পদার্থ ব্যবহার করল। পারদ আবিষ্কারের ফলে বায়ু ও অন্যান্য গ্যাসীয় পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করা সহজ হ'ল। দৈবযোগে কাচ উদ্ভাবন হয়েছিল। কাচের পাত্র তৈরি হতে লাগল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে সেসব পাত্র ব্যবহার হতে লাগল। অকারণ অনুসন্ধিৎসা তৃপ্ত করার জন্য কেবলমাত্র পরীক্ষা ক'রেই তাঁরা ক্ষান্ত হলেন না। মনের গূঢ়তম জিজ্ঞাসার উত্তরও সন্ধান করতে লাগলেন। তথ্য দেখা গেল, লিপিবদ্ধ করা হ'ল, তার থেকে তত্ত্ব গ'ড়ে উঠল। জড়বস্তুর পরীক্ষা করতে গিয়ে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, পঞ্চভৌতিক তত্ত্ব প্রণীত হ'ল। পরে বোঝা গেল, এইগুলি আদিম মৌলিক পদার্থ নয়। সোনা রূপা প্রভৃতি ধাতু, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস, তরল পারদ, এরাই মৌলিক পদার্থ। বৃটিশ বিজ্ঞানী বয়েল, ফরাসী বিজ্ঞানী লাবোয়াজিয়ের গবেষণার ফলে বিবিধ সূত্র গ'ড়ে উঠল, আধুনিক রসায়নের ভিত্তি স্থাপিত হ'ল।

বয়েল, লাবোয়াজিয়ে, প্রভৃতির প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে ফ্রান্সিস বেকন সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ধারণা দেন। বেকন নিজে পরীক্ষাদি বড় একটা করতে পারেন নি। তবে কিভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে হবে তার একটা দিশা দেন। তথ্য আহরণ করার চাইতে তত্ত্বের দিক্‌টা তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্যোগ করার আগে বেকনের মতে—

(১) সে বিষয়ে যা কিছু জানা আছে তা লিখে রাখা উচিত।
(২) সেইসব বিষয় আলোচনা ক'রে সে সবের কারণ বুঝতে চেষ্টা করা উচিত।
(৩) এইসব থেকে কি কি তথ্য পাওয়া সম্ভব তা অনুমান করা উচিত।
(৪) সেইসব তথ্য পরীক্ষা ক'রে দেখা উচিত।

প্রায় সাড়ে তিনশত বছর আগে ফ্রান্সিস বেকন বলতে গেলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাঠামো তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি বারবারই সুসংবদ্ধ চিন্তা আর যুক্তির দিকে জোর দিয়েছিলেন। বলতে গেলে এর অনেক পরে বয়েল, বেকনের তত্ত্ব অনুধাবন ক'রে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি করেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে বয়েল যৌগিক ও মিশ্রণের পার্থক্য বুঝিয়ে দেন। বয়েল গ্যাস-সংক্রান্ত সূত্র প্রণয়ন করেন। এঁর সময়ে ইংল্যাণ্ডে পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর রসায়ন-শাস্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। রসায়ন বলতে যে কেবল ভেষজ প্রস্তুতি আর সস্তায় সোনা তৈরি নয় তা বুঝিয়ে দেন।

বয়েলের প্রায় একশ' বছর পরে প্রীস্টলি, ক্যাভেণ্ডিস, লাবোয়াজিয়ে, প্রভৃতি অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস আবিষ্কার করেন। লাবোয়াজিয়ে প্রমাণ করেন, অক্সিজেনের সঙ্গে দাহ্য পদার্থের উপাদানের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে ব'লে দহন কার্য সম্পন্ন হয়। পরীক্ষার কাজে নিক্তি ব্যবহার ক'রে দহনের সময় কোন্‌ পদার্থের ওজন বাড়ে বা কোন্‌ পদার্থের ওজন কমে, কত কমে, কেন কমে বা বাড়ে, তা বুঝিয়ে দিলেন। রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির গোড়াপত্তন হ'ল। লিবিগ অনেক বিশ্লেষণ প্রণালী উদ্ভাবন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যথেষ্ট রাসায়নিক তথ্য আবিষ্কৃত হ'ল। সেইসব তথ্যের উপর নির্ভর ক'রে অনেক তত্ত্ব, অনেক সূত্র গ'ড়ে উঠল। রসায়ন হ'ল পদার্থের পরিবর্তনের বিজ্ঞান। বিবিধ পরীক্ষা ক'রে বার্থেলো, লাবোয়াজিয়ে, প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা স্থির করলেন, রাসায়নিক পরিবর্তনকালে কোন নূতন পদার্থের উদ্ভব হয় না; যা হয় সে কেবল পদার্থের রূপ-বিকার মাত্র। এ তত্ত্ব আজও অক্ষুণ্ণ আছে। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের সংজ্ঞা গ'ড়ে উঠল। বায়ু মিশ্রিত পদার্থ, জল যৌগিক পদার্থ ব'লে সুপ্রমাণিত হ'ল।

কতকগুলি তথ্য যখন অবিমিশ্র সত্য ব'লে জানা গেল, তখন তার ভিত্তিতে তত্ত্ব গ'ড়ে উঠল। আবার তত্ত্বের উপর নির্ভর ক'রে নব নব তথ্যের অনুসন্ধান সুরু হ'ল। অনেক ক্ষেত্রে আবিষ্কারও হ'ল। ডল্‌টন পরমাণু-তত্ত্ব প্রণয়ন করলেন। বললেন, মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ হ'ল পরমাণু, তিনি নাম দিলেন অ্যাটম—যা কাটা যায় না। পরমাণুর সংযোগে যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হয়। পরমাণু-তত্ত্ব অনুসরণ ক'রে রাসায়নিক বিক্রিয়াকালীন বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর যুক্ত হবার অবস্থা ধারণা করা গেল। কেবল তাই নয়, কোন্‌ পদার্থের কত ভাগ নিলে কত ভাগ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হবে তাও বলা গেল। বলা চলে, পরমাণুর হদিশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগের হিসাব-নিকাশ পাওয়া গেল।

মৌলিক পদার্থের ধর্ম আলোচনা ক'রে রুশ বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ পর্যায় সারণী (Periodic Table) গ'ড়ে তুললেন, যাতে ক'রে তৎকালে অনাবিষ্কৃত অনেক মৌলিক পদার্থের ধর্ম কিরকম হবে ব'লে দিলেন।

মাটি, জল ও বায়ুর সঙ্গে মানুষের নিত্যকালের পরিচয়। এককালে ক্ষিতি, অপ, ও মরুৎ ব'লে তাদের মৌলিক পদার্থ বলা হ'ত। রসায়নবিজ্ঞান প্রসারের সঙ্গে জানা গেল, কোনটাই মৌলিক পদার্থ নয়,—বায়ু বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণ, জল যৌগিক পদার্থ আর ক্ষিতি বিবিধ জটিল যৌগিক পদার্থের মিশ্রণ। বায়ুর অধিকাংশ হ'ল নাইট্রোজেন। বলতে গেলে এটা বায়ুর নিষ্ক্রিয় অংশ, সক্রিয় অংশ হ'ল অক্সিজেন। তা ছাড়া বায়ুতে স্বল্প পরিমাণে কতকগুলি অধিকতর নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে,—আর্গন, নিয়ন, হিলিয়ম, ক্রিপ্‌টন, জেনন। এগুলি রসায়নের প্রসারের ফলেই আবিষ্কৃত হয়েছে, এগুলি মানুষ কাজেও লাগিয়েছে।

অক্সিজেন না থাকলে জীব বাঁচত না। কাঠ কয়লা কোন কিছু পুড়ত না। শ্বাসকার্যের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। কাঠ কয়লা প্রভৃতি জ্বালানতেও কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। তা হলে কি এমন দিন আসবে, যখন বায়ুর অক্সিজেন একেবারে ফুরিয়ে যাবে? জানা গেল, উদ্ভিদ্ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে, তা দিয়ে কার্বহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈরি করে, আর অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। জীবের শ্বাসক্রিয়া আর উদ্ভিদের অঙ্গার-আত্তীকরণ প্রক্রিয়া পাশাপাশি চলছে, বায়ুতে তাই এ দু'টি গ্যাসের পরিমাণ প্রায় একই রকম থেকে যাচ্ছে। এ খবর জেনে মানুষ আশ্বস্ত হ'ল।

রসায়নের বর্তমান যুগ

মানুষের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক আজকার নয়। সভ্যতার উন্মেষে মাটির বুকে মানুষ বাসা বেঁধেছে। মাটিতে বীজ বপন ক'রে শস্য উৎপাদন ক'রে নিজেকে বাঁচিয়েছে। আবার মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছে খনিজ। পরবর্তী-কালে মাটিকে অবলম্বন ক'রে কৃষি ও খনিজ শিল্প গ'ড়ে উঠেছে—তার সঙ্গে বিস্তৃত হয়েছে রসায়ন বিজ্ঞান,—যা আজকাল অজৈব রসায়ন ব'লে পরিচিত।

মানুষ জীবজন্তুর মলমূত্র পচা গাছপাতা প্রভৃতি সার হিসেবে ব্যবহার করেছে। তার পর বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন অ্যামোনিয়ম সালফেট, অ্যামোনিয়ম নাইট্রেট, সুপারফসফেট, প্রভৃতি কৃত্রিম সার। এই সব সার জমিতে প্রয়োগ ক'রে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানো গেল। নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার ক'রে পতিত জমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা হল। কীট-পতঙ্গ অনেক খাদ্যশস্য খেয়ে নষ্ট করে। ডি. ডি. টি., গ্যামেক্সিন, প্রভৃতি কীটনাশক পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ায় ফসলের অপচয় বন্ধ করা সম্ভব হল। আগাছা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হ'ল।

ফল পাকলে গাছ থেকে ঝ'রে পড়ে, এক জাতীয় হরমোন প্রয়োগ ক'রে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা হ'ল। শুধু তাই নয়, রাসায়নিকের চেষ্টার ফলে যখন খাদ্য বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হল, তখন খাদ্য সংরক্ষণের চেষ্টা সুরু হল। এখন খাদ্য সংরক্ষণের বিবিধ উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এর ফলে ঘরে ব'সেই অষ্ট্রেলিয়ার গুঁড়া দুধ বা মাখন, ইংল্যাণ্ডের মাছ-মাংস, যবদ্বীপের আনারস, প্রভৃতি পাওয়া সম্ভব হয়। খাদ্য সংরক্ষণের একটা বড় সুবিধা এই যে, এর ফলে এক দেশের খাদ্য অন্য দেশে, কিংবা এক ঋতুর খাদ্য অন্য ঋতুতে সরবরাহ করা যায়। এ না হলে এক দেশে খাদ্যের অপচয় হত, অথচ অন্য দেশের মানুষ সেই খাদ্য পেত না; অথবা এক ঋতুতে ফল-মূলাদি খাদ্যের অপচয় হত, অথচ অন্য ঋতুতে সেই খাদ্য একেবারেই পাওয়া যেত না। সব রকম খাদ্যই এখন টিনের কৌটায় সরবরাহ করা যায়, তাই ত মানুষ সাহারা মরুভূমিতে, হিমালয়ের শিখরে—অথবা মেরুপ্রদেশের মতো জনহীন প্রান্তরেও নিঃশঙ্কচিত্তে অভিযান চালাতে পারছে।

কয়লা, পেট্রোলিয়ম মাটি খুঁড়ে তোলা হয়। পেট্রোলিয়ম থেকে পেট্রোল, কেরোসিন, মোম, প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়।

কয়লার মূল উপাদান হল কার্বন; কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন যুক্ত আছে। কাঁচা বা বিটুমিনীয় কয়লা বকপাত্রে তাপ দিয়ে পাতন করলে কয়লার উপাদান বিয়োজিত হয়। বিয়োজিত অংশ পাতিত হয়। পাতিত অংশ থেকে পাওয়া যায় অতি প্রয়োজনীয় কয়লা-গ্যাস, অ্যামোনিয়া গ্যাস, তার পর তরল চটচটে আলকাতরা, যার থেকে আবিষ্কার হয়েছে অনেক কাজে লাগানো যায় এমন অনেক-কিছু রাসায়নিক পদার্থ, যা থেকে প্রস্তুত করা গেছে বিবিধ রঞ্জক, বিবিধ ভেষজাদি।

খনিজ থেকে বিবিধ ধাতু উৎপন্ন হয়েছে। যেমন আজকার সুপরিচিত সুলভ অ্যালুমিনিয়ম ধাতু। এই সব ধাতু উৎপন্ন হয়ত হত না, যদি ষ্টীম-এঞ্জিন আবিষ্কার না হ'ত। যদি তড়িতের ব্যবহার ও তড়িৎ-বিশ্লেষণ-প্রণালী উদ্ভাবন না হ'ত। ষ্টীম-এঞ্জিনের উদ্ভাবন অনেক শিল্পের সঙ্গে রাসায়নিক শিল্পকেও বড় ক'রে তুলল। তার পর তড়িৎ-শিল্প আসায় তা আরও প্রসারিত হ'ল। অ্যালুমিনিয়াম বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে আজ আমাদের দেশে পিতল-কাঁসার বাসনের ব্যবহার কমে এসেছে। অ্যালুমিনিয়ম লোহার চাইতে অনেক হাল্কা, তবে নরম। অ্যালুমিনিয়মের সঙ্গে ম্যাগ্‌নেসিয়ম সামান্য পরিমাণে মিশিয়ে হাল্কা অথচ শক্ত মিশ্রধাতু উৎপন্ন হ'ল। যার ফলে বিমানের আবরণ গড়া সম্ভব হ'ল। অ্যালুমিনিয়ম আবিষ্কার না হ'লে বিমান-যাত্রার এত প্রচলন সহজে হ'ত না।

আরও অনেক ধাতু ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার হ'ল, যার প্রয়োগ ও প্রচলন হ'ল। ক্রোমিয়ম, মলিবডিনম, ভ্যানেডিয়ম, প্রভৃতি ধাতু লোহার সঙ্গে মিশিয়ে বিবিধ ধর্মের মিশ্রধাতু উৎপন্ন হ'ল। যাতে নানা যন্ত্রপাতি গড়া সম্ভব হ'ল। স্টেনলেস ষ্টীল বা কলঙ্ক-না-পড়া-ইস্পাতে আজকাল বাসনকোসন আসবাবপত্র তৈরি হচ্ছে। সেটা ক্রোমিয়ম-নিকেল-লোহার মিশ্রধাতু।

মানুষ দিনের পর দিন বসুন্ধরাকে নিঃস্ব ক'রে তার খনিজ সম্পদ্ লুণ্ঠন করছে। যানবাহন ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হচ্ছে, তার উপরে আছে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত প্রস্তুতি। এ সব কারণে এই লুণ্ঠনের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। বিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসা, পৃথিবীর খনিজ সম্পদ্ আর কতকাল থাকবে? এখন তাই একদল বিজ্ঞানীর দৃষ্টি পড়েছে সমুদ্রের দিকে। যুগ-যুগান্তর ধ'রে বৃষ্টি ও নদীর জলে ভূ-পৃষ্ঠের নানারকম পদার্থ দ্রবীভূত ক'রে অথবা ভাসিয়ে নিয়ে এসে সমুদ্রে ঢালছে। কাজেই সাগরজলে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে ছাড়া কমছে না। বিজ্ঞানী ভাবছেন, সাগরজলে যে সব জিনিষ ছড়িয়ে রয়েছে, সহজ উপায়ে তাদের আহরণ করতে পারলে মানুষের প্রয়োজন মিটবে অনন্তকাল ধ'রে।

সমুদ্রের জল থেকে যে খাদ্য-লবণ বা নুন তৈরি করা হয় এ কথা কারও অজানা নেই। সাগরজলে নুনের পরিমাণ শতকরা প্রায় ২·৬ ভাগ। পৃথিবীতে সোনার খনি খুব বেশী নেই, কিন্তু হিসেব ক'রে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর সব সমুদ্রের জলে মোট প্রায় ৮৩ লক্ষ টন সোনা আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই জার্মানীতে সোনার অভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল। জার্মান সরকারের নির্দেশে বিজ্ঞানী হাবের সমুদ্র-জল থেকে সোনা আহরণ করার একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। সমুদ্রের জলে যে শুধু সোনা আছে তা নয়, সেখানে ছড়ানো রয়েছে ইউরেনিয়ম, ম্যাগ্‌নেসিয়ম, তামা, লোহা, টিন, দস্তা, প্রভৃতি আরও অনেক প্রয়োজনীয় ধাতু। গত মহাযুদ্ধের সময় এরোপ্লেন ও আগুনে-বোমা নির্মাণের জন্য ম্যাগ্‌নেসিয়ম ধাতুর চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে গেল। মার্কিন দেশে সাগরজল থেকেই প্রচুর পরিমাণে ম্যাগ্‌নেসিয়ম তৈরি করার পদ্ধতিটি প্রচলিত হ'ল। অনুরূপ ভাবে প্রচুর পরিমাণে ব্রোমিণ আজকাল তৈরি করা হচ্ছে সাগরজলের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে।

রসায়নের বিভিন্ন শাখা বিস্তার

রসায়নের আদিযুগে রাসায়নিক পদার্থের অন্যান্য ব্যবহারের সঙ্গে ঔষধ হিসাবে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারও জড়িত ছিল। প্রাচীন আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার ক্রমে বাড়তে থাকে। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, প্রভৃতি বিবিধ মৌলিক পদার্থের যোজন-শক্তি তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, জৈব রসায়নের বৃদ্ধি সহজ হ'ল। জীব থেকে পাওয়া রাসায়নিক পদার্থে দেখা গেল সব সময় কার্বন ও হাইড্রোজেন থাকেই। অবশ্য-তার সঙ্গে যৌগিক বিশেষে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, প্রভৃতিও যুক্ত থাকে। তাই কার্বন হাইড্রোজেন ইত্যাদি যুক্ত অণুর কাঠামোর সংকেত যোজন-শক্তির ভিত্তিতে গঠন সম্ভব হ'ল। ক্রমে সূক্ষ্ম পরীক্ষা করার প্রণালী উদ্ভাবন হ'ল। জৈব-রসায়ন বিজ্ঞান বেড়ে চলল। আজকে জ্বালানি, ঔষধ, রঞ্জন, খাদ্য, তন্তু, প্রভৃতি বিবিধ ক্ষেত্রে জৈব রসায়নের দান সামান্য নয়।

প্রাচীনকালে মানুষ উদ্ভিদ্ থেকে দু'রকম রং তৈরি করতে শিখেছিল, লাল মঞ্জিষ্ঠা, অন্যটি নীল। আমাদের দেশেও আগে প্রচুর পরিমাণে নীলগাছের চাষ ক'রে তা থেকে নীল রং তৈরি করা হ'ত এবং তাকে ভিত্তি ক'রেই গ'ড়ে উঠেছিল শোষণ ও অত্যাচারের এক বেদনাময় ইতিহাস। ১৮৬৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানীদ্বয় গ্রীব ও লিবারম্যান এবং তার পরের বছরই ইংরেজ বিজ্ঞানী পার্কিন কৃত্রিম উপায়ে অ্যালিজারিন নামক লাল রং প্রস্তুত করার শিল্প-

পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। প্রাকৃতিক মঞ্জিষ্ঠার চেয়ে এ হ'ল বিশুদ্ধতর এবং দামে খুব সস্তা। এর অল্পকাল পরেই ১৮৭৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী বেয়ারের চেষ্টায় নীল প্রস্তুত করা সম্ভব হ'ল। কৃত্রিম নীল পরীক্ষাগারে উৎপাদন ও সস্তায় বিক্রয় আরম্ভ হতেই নীলের চাষ বন্ধ হয়ে গেল। পৃথিবীর মানুষ, বিশেষ ক'রে ভারতের গরীব চাষী, নীলের অভিশাপ থেকে মুক্ত হ'তে পারল। এই সব আবিষ্কারের ফলে রসায়নের এক নূতন শাখা গ'ড়ে উঠল। বিজ্ঞানীরা নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করলেন, কালো কুৎসিত আলকাতরা থেকেই তৈরি করলেন নানা-প্রকার উৎকৃষ্ট রং।

এ ছাড়া মানুষ গাছপালা থেকে পেয়েছে নানাপ্রকার ঔষধ, যেমন সিঙ্কোনা গাছ থেকে কুইনিন, ধুতুরা থেকে অ্যাট্রোপিন, পপিগাছ থেকে আফিং, ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন যাতে কৃত্রিম উপায়ে এই সব ঔষধ তৈরি করা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের চেষ্টা ফলবতী হয়েছে। এতকাল মানুষকে তার প্রয়োজনীয় নানা রকম রং, ঔষধ, সুগন্ধদ্রব্য, প্রভৃতির জন্য একান্তভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হয়েছে। রসায়নের যেরূপ প্রসার হয়ে চলেছে তাতে আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতেই মানুষ প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবে, তার প্রয়োজনীয় সব কিছুই সে তৈরি করবে তার পরীক্ষাগারে।

মোটামুটি পুষ্টিকর খাদ্যের উপাদান হ'ল কার্বহাইড্রেট, স্নেহ ও প্রোটিন, তার সঙ্গে সামান্য পরিমাণে ক্যাল্সিয়ম, ফসফোরস, লোহা, প্রভৃতির লবণ ও ভিটামিন।

ভিটামিন সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত করেন টাকাকি ১৮৮৫ সালে। কলে ছাঁটা চাউল খেতে অভ্যস্ত জাপানী নৌসেনারা বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়। গম এবং বার্লি খেতে দিলে সে রোগ সারে। পরে বোঝা গেল, বেরিবেরি খাদ্যে একটি অত্যাবশ্যক পদার্থের অভাবজনিত রোগ, এ জিনিষটি থাকে চাউলের উপরের আবরণে। ১৯০৬ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী হপ্‌কিন্‌স্ এবং মার্কিন বিজ্ঞানী ম্যাক্‌কলম্ প্রমাণ করেন, রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত শোধিত কার্বহাইড্রেট, স্নেহ, প্রোটিন, লবণ ও জল জীবদেহের পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়, অথচ এদের সঙ্গে সামান্য দুধ বা সুরাবীজ (yeast) মিশিয়ে দিলেই জীবদেহের স্বাভাবিক পুষ্টি বজায় থাকে। ১৯১১ সালে বিজ্ঞানী ফাঙ্ক চাউলের কুঁড়ো (rice polishings) থেকে এমন একটি পদার্থ পৃথক্ করেন যা বেরিবেরি রোগ সারাতে পারে। তিনিই সর্বপ্রথম খাদ্যের অতি প্রয়োজনীয় এই উপাদানটির নাম দেন ভিটামিন (ল্যাটিন vita = প্রাণ, amine = অ্যামোনিয়াজাত), অর্থাৎ জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক অ্যামোনিয়াজাত কোন পদার্থ। অবশ্য পরে অন্যান্য ভিটামিন সম্পর্কে গবেষণার ফলে দেখা গেল, তাদের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

খাদ্যের প্রধান উপাদান পাঁচটি। কিন্তু এই পাঁচটি উপাদান আমাদের শরীরে কোন কাজেই লাগবে না, যদি তাদের সঙ্গে ভিটামিন না থাকে। আজ পর্যন্ত ষোল রকম ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য এ, বি, সি, ডি, ই, এবং কে ভিটামিনগুলো অপরিহার্য।

বিশেষ রোগের জন্য নির্দিষ্ট ওষুধ আবিষ্কার করার চেষ্টা চলেছে অনেককাল ধ'রে; সাফল্য লাভ করা গেল কুইনিনের আবিষ্কারে সপ্তদশ শতাব্দীতে। দেখা গেল, ম্যালেরিয়া রোগের অমোঘ ওষুধ হ'ল কুইনিন। এ রোগে আরও ফলপ্রদ দু'টি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে বর্তমান শতাব্দীতে, এদের নাম কেমোকুইন এবং প্যালুড্রিন। মারাত্মক কালাজ্বর রোগও নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে ইউরিয়া ষ্টিব্‌অ্যামিনের সাহায্যে।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এরলিখ স্যাল্‌ভারসন নামক একটি ওষুধ আবিষ্কার করেন। এর সাহায্যে মারাত্মক কুষ্ঠকর্ব রোগ এবং সিফিলিস রোগ সারানো সম্ভব হয়। এরপর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ডম্যাগ প্রমাণ করেন যে, সাল্‌ফ্যানিল্‌অ্যামাইড নামক ওষুধের সাহায্যে অতি সহজেই ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস এবং অন্যান্য ব্যাক্‌টিরিয়া ধ্বংস করা সম্ভব হয়। এর ফলে চিকিৎসাশাস্ত্রে এল যুগান্তর এবং অল্পদিনের মধ্যে সাল্‌ফাজাতীয় অনেকগুলি মহদুপকারী ওষুধ আবিষ্কৃত হ'ল। এদের সাহায্যে অতি সহজেই ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস, ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস, নিউমোকক্কাস, আমাশয়-ব্যাসিলাস, প্রভৃতি জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা প্রচলিত হ'ল।

জীবজগতে যেমন, জীবাণু-জগতেও তেমনি, বেঁচে থাকার জন্য অবিরত সংগ্রাম চলছে, জীবাণুর একে অপর দলকে ধ্বংস করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; ফলে কেবল শক্তিশালী বাঁচবার অধিকার পাচ্ছে। চারপাশে অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণু ঘুরে বেড়ায়; এরা স্বাভাবিক উপায়ে বংশবিস্তার করার সুযোগ পেলে অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবীটা

ছেয়ে ফেলতে পারে। তাদের আক্রমণে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। তবে এরা প্রতিপদে শত শত শত্রুর সম্মুখীন হয়, তাই আর বংশবিস্তার করতে পারে না।

ছোট ছেলেমেয়েরা সারাদিন ধুলোমাটি নিয়ে খেলা করলেও প্রায়শ: কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় না। ১৯০৪ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ক্রষ্ট্ প্রমাণ করেন যে, মাটিতে এমন অনেক জীবাণু আছে যারা বিবিধ রোগের জীবাণু ধ্বংস করতে পারে।

দেহের কোথাও কেটে গেলে পশুরা বার বার ক্ষতস্থান চাটে। এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘা বিষাক্ত হয় না। মানুষের মধ্যেও অনেকেরই অভ্যাস আছে, কোথাও কেটে গেলে তারা ক্ষতস্থানে থুথুর প্রলেপ দেয়। কারণ, অভিজ্ঞতার ফলে তারা জেনেছে যে, এর ফলে ঘা বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি কমে যায়। ইংরেজ জীবাণুবিদ্ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ১৯২২ সালে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের লালাতে লাইসোজাইম নামক জীবাণু-নাশক একটি পদার্থ আছে। এতে চিকিৎসাজগতে একটি নূতন পথের সন্ধান পাওয়া গেল। নানাস্থানে গবেষণা চলতে লাগল। আর এবিষয়ে সবচেয়ে বেশী সাফল্যলাভ করলেন বিজ্ঞানী ফ্লেমিং নিজেই। ১৯২৯ সালে তিনিই সর্বপ্রথম পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নামক ছত্রাকের দেহ-নিঃসৃত রস থেকে। দেখা গেল, এই ওষুধের কক্কাস-জাতীয় জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা অসীম। গত মহাযুদ্ধের সময় অক্সফোর্ডের দুজন চিকিৎসক, ফ্লোরী ও চেন, এ নিয়ে বিস্তারিত পরীক্ষা ক'রে প্রমাণ করেন যে, এ ওষুধের ব্যবহারে সেপ্‌টিসিমিয়া, নিউমোনিয়া, প্রভৃতি মারাত্মক অথচ দুরারোগ্য ব্যাধির বেলাতে মন্ত্রের মতো কাজ হয়, অথচ এর বিষক্রিয়া নেই। এই আবিষ্কারের ফলে রসায়নজগতে এক দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হ'ল, আর অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর সর্বত্র এই নব আবিষ্কৃত শাসকবস্তুর (antibiotic) সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রচলিত হ'ল।

পেনিসিলিনের মতো শক্তিশালী ওষুধও কিন্তু কয়েকটি মারাত্মক রোগের বেলায় কার্যকরী হ'ল না। কাজেই নানাদেশের বিজ্ঞানীরা আরও নূতন নূতন শাসকবস্তুর সন্ধানে মেতে গেলেন। বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যান ও তাঁর সহকর্মিগণ লক্ষ্য করলেন, অনেক রোগ-জীবাণু মাটিতে পড়লে আর বংশবিস্তার করতে পারে না বরং অল্প সময়ের মধ্যেই একেবারে নষ্ট হয়ে যায় (ধনুষ্টঙ্কার, গ্যাস-গ্যাংরিন, প্রভৃতি জীবাণু অবশ্য এ ভাবে নষ্ট হয় না)। এতে তাঁদের বিশ্বাস হ'ল যে, মাটিতে নিশ্চয়ই এমন জিনিষ আছে যার ক্রিয়াতে নানারূপ রোগ-জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা গবেষণাগারে এক-একপ্রকার ভূমিবাসী জীবাণুর চাষ করেন এবং তার দেহ-নিঃসৃত শাসক-বস্তু পৃথক্ ক'রে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা ক'রে দেখেন। অনেক নিষ্ফল প্রচেষ্টার পর এরা ১৯৪৪ সালে আবিষ্কার করলেন ষ্ট্রেপ্‌টো-মাইসিন। পেনিসিলিনের মতো এরও রোগ-জীবাণু নষ্ট করবার শক্তি খুব বেশী, অথচ বিষক্রিয়া নেই বললেই চলে। যেসব রোগে পেনিসিলিন কার্যকরী হয়নি তাদের নিয়ে পরীক্ষা ক'রে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গেল। এই নূতন ওষুধের সাহায্যে দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগীকেও সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করা সম্ভব হ'ল।

পেনিসিলিন ও ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের সাফল্য লক্ষ্য ক'রে নানাদেশে আরও নূতন নূতন শাসকবস্তু আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে জোর অনুসন্ধান চলতে থাকে। এর ফলে আজ অবধি শতাধিক শাসকবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু বিষক্রিয়া থাকায় কিংবা অন্যান্য দোষ থাকায় এদের অধিকাংশই বর্জিত হয়েছে। যেগুলি মহদুপকারী ওষুধ ব'লে সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে তাদের মধ্যে ক্লোরোমাইসিটিন, অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন, প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৬৩ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী হায়াট সর্বপ্রথম সেলুলোজ থেকে তৈরি করেন সেলুলয়েড। উত্তপ্ত অবস্থায় একে ছাঁচে ঢেলে যে কোন আকার দেওয়া যায়। ঠাণ্ডা হলে এ বেশ শক্ত হয়। এ খুব সহজদাহ্য, তবে বিস্ফোরক নয়। এই হ'ল পৃথিবীর প্রথম প্লাষ্টিক্স। দৈনন্দিন প্রয়োজনের অনেক জিনিষ, যেমন চিরুণী, ব্রাশ, চশমার ফ্রেম, ইত্যাদি এ দিয়ে তৈরি করা হয়। ১৮৮৯ সালে ঈষ্ট্‌ম্যান কাচের বদলে সেলুলয়েড দিয়ে তৈরি করলেন ফটোগ্রাফীর ফিল্ম্। সেই থেকে ফিল্ম্ তৈরির জন্য সেলুলয়েডই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এরপর ১৯০৯ সালে ব্যাকেল্যাণ্ড ফিনল ও ফরম্যাল্‌ডিহাইড সহযোগে তৈরি করলেন ব্যাকেলাইট। বৈদ্যুতিক সুইচ, ঝরণা-কলম, প্রভৃতি তৈরি করার উদ্দেশ্যে এ জিনিষ ব্যবহার করা হ'ল। গ'ড়ে উঠল প্লাষ্টিক্স শিল্প। কৃত্রিম কাচ বা কাচের মত স্বচ্ছ অথচ ভঙ্গুর নয়, আবার হাল্কা এমন পদার্থও মানুষ তৈরি করেছে। আজ খেলনা, কৌটা, বোতল, দড়ি, ঝুড়ি, কৃত্রিম লতাপাতার ফুল, প্রভৃতি সবই তৈরি করা হচ্ছে প্লাষ্টিক্স দিয়ে।

১৮৮৪ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী সার্দানে সেলুলোজ থেকে তৈরি করেন কৃত্রিম রেশম। কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রাদি খুবই জনপ্রিয় হয়। বিজ্ঞানী এখন এমন প্লাষ্টিক্‌স তৈরি করেছেন যা রসায়নগত দিক্ থেকে প্রোটিনের সগোত্র। ১৯৩৫ সালে ক্যারোথারস নাইলন তন্তুর উদ্ভাবন করেছেন। এর অণুর কাঠামোর সঙ্গে রেশমের প্রোটিনের মিল খুবই বেশী। বলা বাহুল্য নাইলনের জামা-কাপড়, মোজা, প্রভৃতি এখন সর্বত্র সমাদৃত হচ্ছে। এতদিন অস্ত্র করার পর চিকিৎসকেরা সেলাই করার জন্য বিড়ালের নাড়ী শোধন ক'রে তন্তুরূপে ব্যবহার করছিলেন, আজ সেখানে প্লাষ্টিক্‌সের তন্তু ব্যবহার করা চলেছে।

বাজি ও বারুদের ব্যবহার দেশে দেশে বহু যুগ ধ'রেই চ'লে আসছে। বলা বাহুল্য, রসায়ন-চর্চার ফলেই এসবের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। হাউইয়ের বেগে উৎসরণ লক্ষ্য ক'রে বর্তমান শতাব্দীতে মার্কিন বিজ্ঞানী গডার্ড রকেট-এর পরিকল্পনা করলেন। আর রকেট-এর সাহায্য নিয়েই রুশ বিজ্ঞানীরা ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সর্বপ্রথম মহাকাশে স্থাপন করলেন নকল চাঁদ স্পুট্‌নিক। সেই থেকে গ'ড়ে উঠল রসায়নের এক নূতন শাখা, রকেট-বিজ্ঞান। এখানে ইন্ধন হিসাবে পেট্রোল ও তৎসহ তরল অক্সিজেন ব্যবহার করা হ'ল। অল্পদিনের মধ্যেই রকেট-এর এত উন্নতি হয়েছে যে, মানুষ এখন কল্পনা করতে পারছে যে, রকেটে ক'রে সে একদিন চাঁদে গিয়ে পৌঁছাতে পারবে।

পরমাণু-যুগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী বিজ্ঞানী বেকারেল একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি দেখেন, পিচ্‌ব্লেণ্ড-জাতীয় খনিজ, যাতে ইউরেনিয়ম ধাতু বা ইউরেনিয়ম যৌগিক রয়েছে, তা থেকে অবিরত এক রকম অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে আসছে। দেখা গেল, এসব রশ্মি তড়িৎবাহী, এরা ফটোগ্রাফীর প্লেটে ছাপ দেয়। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে পিচব্লেণ্ড জাতীয় তেজস্ক্রিয় খনিজ নিয়ে বিখ্যাত মহিলা-বিজ্ঞানী মাদাম ক্যুরী এবং তাঁর স্বামী পিয়ের ক্যুরী পলোনিয়ম এবং রেডিয়ম নামক দুটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করেন। দেখা গেল, এ সব ধাতু থেকে সতত তিন প্রকার রশ্মি বিকীর্ণ হয়। এদের নাম দেওয়া হ'ল তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ (radioactive elements) এবং এদের বিশিষ্ট ধর্মের নাম দেওয়া হ'ল তেজস্ক্রিয়তা (radioactivity)।

ক্রমে আরও অনেক তেজস্ক্রিয় মৌলের সন্ধান পাওয়া গেল। এদের স্বভাব বড়ই অদ্ভুত, কারণ এরা স্বতঃই ভঙ্গুর। এদের পরমাণু থেকে সততই এরূপ তেজ-কণা বেরোয়, তার ফলে মৌলটির রূপও যায় বদ্‌লে। অর্থাৎ এ মৌলগুলি বড়ই অস্থায়ী, আপনা থেকেই একটি মৌলের পরমাণু ভেঙ্গে যায় এবং অন্যপ্রকার মৌলের পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। একেই বলা হয় মৌলিক পদার্থের রূপান্তর (transmutation of elements), তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির রূপান্তর ঘ'টে চলেছে অব্যাহত গতিতে, মানুষের সাধ্য নেই তার প্রতিরোধ করে। কিন্তু অন্য অনেক মৌলের বেলায়, গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তাদের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে। কাজেই কিমিয়াবিদ্‌দের স্বপ্ন এতদিনে সফল হয়েছে বলা চলে। যে স্পর্শমণির সন্ধানে তাঁরা ক্ষ্যাপার মত খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, তাই এখন এসে গেছে মানুষের মুঠোর মধ্যে।

আগে রাসায়নিকের মতে পদার্থ ছিল অবিনশ্বর, অপরদিকে পদার্থবিদ্ বলতেন শক্তির বিনাশ নেই। কিন্তু পদার্থ ও শক্তির যোগসূত্র সে যুগের কারও জানা ছিল না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইন্‌স্টাইন তার সুবিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of Relativity) প্রকাশ করেন। এর একটি মূল সূত্র অনুসারে তিনি সবপ্রথম জানালেন যে, পদার্থ থেকে শক্তিতে এবং শক্তি থেকে পদার্থে রূপান্তর হওয়া সম্ভব।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের বেলায় কেন্দ্রক থেকে আলফা বিটা প্রভৃতি কণা বেরিয়ে যায়, তাই পরমাণুটির রূপান্তর ঘটে। পরমাণুর এইরূপ স্বাভাবিক ভাঙ্গনের ফলে খানিকটা পদার্থের বিলোপ হয়, আর তাই প্রকাশ পায় শক্তিরূপে। কার্যকারিতার দিক্ দিয়ে হয়ত এ শক্তি তাপ বা তড়িৎ-শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না, কিন্তু তাহলেও এ থেকে শক্তির এক অফুরন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেল। বিজ্ঞানী ভাবলেন, কৃত্রিম উপায়ে একসঙ্গে অনেকগুলি পরমাণু ভাঙ্গতে পারলে তাদের অন্তর্নিহিত বিপুল শক্তি মুক্ত ক'রে তাকে নিশ্চয়ই কাজে লাগানো যাবে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রক স্বাভাবিক নিয়মেই ভাঙ্গে; কিন্তু সাধারণ মৌলের কেন্দ্রক ভাঙ্গা দুঃসাধ্য, ——কিন্তু প্রক্রিয়ায় অসম্ভব ত বটেই। বিজ্ঞানী ভাবলেন, কেন্দ্রককে কোন শক্তিশালী গুলী দিয়ে আঘাত

করলে তা হয়ত ভেঙ্গে যেতে পারে। গুলী হালকা ও ছোট হ'লে তার বেগ অত্যন্ত বেশী হওয়া দরকার; তবেই তার আঘাতে কেন্দ্রক ভাঙ্গা সম্ভবপর। আবার একটি পরমাণুর তুলনায় তার কেন্দ্রক খুবই ছোট, আর ততোধিক ছোট আল্‌ফা-কণা; কাজেই নিশানা ঠিক রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিজ্ঞানী স্থির করলেন, হাজার হাজার গুলী একসঙ্গে ছোঁড়া হ'লে এদের অন্ততঃ দু-একটা অবশ্যই কেন্দ্রককে আঘাত করবে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড এরূপ পরীক্ষায় প্রমাণ করেন, আল্‌ফা-কণার আঘাতে নাইট্রোজেন পরমাণু সত্যিই ভেঙ্গে যায় এবং তা থেকে পাওয়া যায় অক্সিজেন ও প্রোটন। এইভাবে একটি মৌল থেকে অন্য আর একটি মৌলের সৃষ্টিতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এল যুগান্তর।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হান্ ও ষ্ট্রাস্‌ম্যান দেখলেন, ইউরেনিয়ামের ২৩৫-সমপদটি (isotope) নিউট্রনের আঘাতে ভেঙ্গে যায় এবং তা থেকে পাওয়া যায় বেরিয়ম ও ক্রিপ্‌টন নামের দুটি মৌল। বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখলেন, এই সময় খানিকটা পদার্থ বিলুপ্ত হয়, আর সেই পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হ'লে তার পরিমাপ হয় অতি ভয়ঙ্কর। পরমাণু ভাঙ্গার এই নূতন প্রক্রিয়ার নাম ফিসন বা বিভাজন প্রক্রিয়া (Fission Process)।

আরও পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, একেবারে বিশুদ্ধ ২৩৫-ইউরেনিয়ম থাকলে তবেই এই প্রক্রিয়া অব্যাহত গতিতে চলবে। অথচ সাধারণ ইউরেনিয়ামে ১৪০ ভাগ ২৩৮-ইউরেনিয়ামের সঙ্গে থাকে মাত্র এক ভাগ ২৩৫-ইউরেনিয়াম। সারা দুনিয়া জুড়ে যখন মহাযুদ্ধের তাণ্ডব চলেছে তখন আমেরিকায় অতি সঙ্গোপনে এক বিরাট্ আয়োজন সুরু হ'ল। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় অনেক কষ্টে খানিকটা বিশুদ্ধ ২৩৫-ইউরেনিয়াম পৃথক্ করা সম্ভব হ'ল। আর তা থেকেই তৈরি হ'ল প্রথম পরমাণু-বোমা। এই বোমার অতর্কিত আঘাতে জাপানের হিরোসিমার প্রাণচাঞ্চল্য এক মুহূর্তে নিভে গেল। সহরের পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত কিছু আর আস্ত রইল না, সাত মাইল দূর অবধি জিনিষপত্র ধ্বংস হ'ল। লোক মারা গেল প্রায় দু' লক্ষ।

২৩৫-ইউরেনিয়াম পৃথক্ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। সেজন্য অর্থব্যয় হয় অপরিমিত। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, সুলভ ২৩৮-ইউরেনিয়াম থেকে সহজেই তৈরি করা যায় প্লুটোনিয়াম। আর প্লুটোনিয়ামকে নিউট্রন কণা দ্বারা আঘাত করলে তারও বিভাজন হয় এবং সেই সঙ্গে পাওয়া যায় প্রচণ্ড শক্তি। বিজ্ঞানীরা এবারে তৈরি করলেন প্লুটোনিয়াম বোমা, প্রকাশ্যে এর পরীক্ষা হ'ল নাগাসাকির উপরে। এবারের ধ্বংস কার্য হ'ল আরও মারাত্মক ও ব্যাপক। আট মাইলের মধ্যে অবস্থিত ঘর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পর্যন্ত রইল না, একটি প্রাণীও জীবিত রইল না। মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল পঁচাত্তর হাজারের উপর।

বিভাজন প্রক্রিয়ায় পদার্থ কিভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। একাধিক পরমাণুর সংযোগে নূতন পরমাণুর সৃষ্টি হওয়ার সময়েও পদার্থের বিলোপ হওয়া সম্ভব এবং তার ফলে প্রচণ্ড শক্তি উদ্ভব হতে পারে একই নিয়ম অনুসারে। এর বৈজ্ঞানিক নাম ফিউশন বা সম্মিলন প্রক্রিয়া (Fusion Process)। বিজ্ঞানীর মতে এইরূপ একটি প্রক্রিয়াই হ'ল সূর্যের অফুরন্ত তাপশক্তির প্রধান উৎস।

সূর্যে হাইড্রোজেন আছে শতকরা ৩৫ ভাগ আর হিলিয়াম ৪০ ভাগ। হাইড্রোজেনের বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে যখন হিলিয়াম পরমাণুর সৃষ্টি হয় তখন খানিকটা পদার্থ লয় পায়। সেই পদার্থটুকু রূপান্তরিত হয় শক্তিতে।

ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম দিয়ে তৈরি বোমার বিস্ফোরণের সময় উষ্ণতা হয় প্রায় সূর্যের সমান। বিজ্ঞানী ভাবলেন, যেখানে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের বিস্ফোরণের ব্যবস্থা থাকবে সেখানে খানিকটা হাইড্রোজেন রেখে দিলেই ত কার্যসিদ্ধি হ'তে পারে। পরমাণু বোমার প্রাথমিক বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে হিলিয়ামের সৃষ্টি করে, আর তাইতে নিঃসৃত শক্তির মাত্রাও হঠাৎ আরও অনেকগুণ বেড়ে যাবে। এই মতবাদের ওপর ভিত্তি ক'রেই তৈরি হ'ল হাইড্রোজেন-বোমা। বিকিনি প্রবাল-বলয়ে এবং নেভাদার মরু-অঞ্চলে ইতিমধ্যে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ সম্পর্কে পরীক্ষা হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেছে যে, রাশিয়ার বিজ্ঞানীরাও হাইড্রোজেন-বোমা তৈরির কৌশল আয়ত্ত ক'রে ফেলেছেন। অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে রাশিয়াতেও ইতিমধ্যে হাইড্রোজেন-বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

পরমাণু-যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভেবে শান্তিকামী একদল বিজ্ঞানী এখন শান্তিপূর্ণ কাজে পরমাণু-শক্তির সদ্ব্যবহার করার জন্য সবিশেষ উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন। তাঁদের ধারণা, পরমাণু ভাঙ্গার কৌশল ইচ্ছামত [illegible]

আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত সবরকম কাজে ব্যবহার করা চলছে। আজ পর্যন্ত যতটুকু খবর প্রকাশিত হয়েছে তাতে মনে হয়, অ্যাটোমিক পাইল (Atomic pile) বা পরমাণু-চুল্লী (Reactor) নামক যন্ত্রের সাহায্যে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের ভাঙ্গনের ফলে উদ্ভূত তাপশক্তি আহরণ করা সম্ভব হবে।

এইভাবে পরমাণু-শক্তি আহরণের প্রচেষ্টা হয়ত শেষ পর্যন্ত সফল হয়ে উঠবে, কিন্তু তাতেও সমস্যা মিটবে না। কারণ পৃথিবীতে ইউরেনিয়াম-সম্পদ্ ত খুব বেশী নেই ? অনেকেই মনে করেন, পরমাণু-চুল্লীতে ইউরেনিয়ামের বদলে থোরিয়াম ধাতু ব্যবহার করা যাবে। কাজেই পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের দিক্ দিয়ে ইউরেনিয়ামের পরেই স্থান হবে থোরিয়ামের।

বিজ্ঞানী হিসেব ক'রে দেখেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহৃত হয়, পৃথিবীর সকল অধিবাসী যদি তাই ব্যবহার করত তাহলে প্রায় একশ' বছরের মধ্যেই পৃথিবীর কয়লা ও খনিজ তেল নিঃশেষিত হয়ে যেত। শিল্প-প্রয়োজনে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে শক্তির চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে; তাছাড়া পৃথিবীর জনসংখ্যাও দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে শক্তির ব্যবহার যে হারে বেড়ে যাচ্ছে তাতে মনে হয়, পৃথিবীর কয়লা, তেল, ইত্যাদি জ্বালানি সম্পদ্‌গুলি আগামী কয়েক শ' বছরের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। তাই বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীতে সভ্যতার আলোক-বর্তিকা যদি অনির্বাণ রাখতে হয় তবে শক্তির নূতন উৎস অবিলম্বে খুঁজে বের করা দরকার। আমরা এখন পরমাণু-যুগে পদার্পণ করেছি, কাজেই এখন অনুমান করা যায় যে, পরমাণু-শক্তিই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অধিবাসীদের একমাত্র অবলম্বন হবে।

১৯৪৫ সালে পরমাণু বোমার কলঙ্কময় রূপ দেখে সভ্যমানুষ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পরমাণুর আর একরূপ দেখে মানুষ বিস্মিত হয়ে গেল। এ রূপ হ'ল কল্যাণকর। পরমাণু যুগের আর একটি অবদান তেজস্ক্রিয় সমপদ (radioactive isotope)। বিজ্ঞানীদের আশা, এদের সাহায্যে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করা যাবে, সভ্যতার রূপ ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। কাজেই বিংশ শতাব্দীতে এও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

বর্তমানে নানাপ্রকার তেজস্ক্রিয় সমপদ তৈরি করা হয় কৃত্রিম উপায়ে পরমাণু-চুল্লীতে। শিল্প, কৃষি, ভেষজ, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই তেজস্ক্রিয় সমপদ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

মাদাম ক্যুরী দেখেছিলেন, রেডিয়ম থেকে নির্গত তেজ-রশ্মির পেশী-কলা (muscle tissue) ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে। তাই দুরারোগ্য ক্যান্সার বা কর্কট রোগের চিকিৎসায় রেডিয়ম ব্যবহার সুরু হয়। কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব'লে সবার পক্ষে রেডিয়ম ব্যবহার করা সম্ভব নয়। বর্তমানে রেডিয়মের পরিবর্তে কোবাল্টের তেজস্ক্রিয় সম্পদ্ ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফোরস এবং স্বর্ণও ব্যবহার করা হয় অন্যভাবে। গলগণ্ড রোগে তেজস্ক্রিয় আইওডিন ব্যবহার ক'রে অব্যর্থ ফল পাওয়া গেছে।

তেজস্ক্রিয় সমপদ প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয় রোগ সম্পর্কে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে। বাস্তবিক, এদের সাহায্যে অনুসন্ধান ক'রে প্রাণিদেহের বহু অজানা তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এদের সাহায্যে উদ্ভিদের পুষ্টি, অঙ্গার-আত্তীকরণ প্রক্রিয়া, মাটির সার থেকে বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ, প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও অনেক নূতন এবং উল্লেখযোগ্য তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয়েছে। এইভাবে উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহের গোপন তথ্যগুলি সব জানা হয়ে গেলে মানুষ নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে ইচ্ছামত তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। প্রকৃতির খেয়ালখুশির উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হবে না। আশা করা যায়, মানুষ এইভাবে ক্রমশঃ এগিয়ে চলবে সুখ সমৃদ্ধি এবং প্রাচুর্যের পথে।

শেষের কথা

বলতে গেলে সত্যকারের রসায়নবিজ্ঞান সুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আজকালকার রসায়নশাস্ত্রের গোড়াপত্তন হয়। রসায়নকে বলা হয় পরিবর্তনের বিজ্ঞান। লাবোয়াজিয়ের বিস্ময়কর দহনতত্ত্ব প্রবর্তন থেকে রসায়নবিজ্ঞান বেড়ে চলতে লাগল। সে যুগের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হ'ল ক্যাভেণ্ডিশের জলের রাসায়নিক সংযুক্তি। বিবিধ মৌলিক গ্যাস ও তাদের ধর্ম আবিষ্কার।

যেমন যেমন বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার হতে থাকল তেমনি তেমনি বিজ্ঞানীর চিন্তাধারাও সুশৃঙ্খলায়িত হতে লাগল। বিবিধ তত্ত্ব উদ্ভাবিত হ'ল। ১৭৯৭ সালে প্রুস্ট সমানুপাত সূত্র রচনা করলেন। প্রকৃতির রহস্য খানিক উন্মোচন ক'রে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন : "We must recognise an invisible hand which holds the balance in the formation of compounds." ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে ডল্টন তাঁর পরমাণুবাদ প্রবর্তন

করলেন। তার সাহায্যে গুণিতক অনুপাত সূত্র রচনা হ'ল। তারপর চলল বিবিধ যৌগিক পদার্থ প্রস্তুতি, তাদের শোধন, অণুর ভার, পরমাণুর ভার, তুল্যাঙ্ক, প্রভৃতি তত্ত্বের ধারণা। রাসায়নিক পদার্থের অণুর সংকেত প্রবর্তন। কেবল তাই নয়, নব রাসায়নিক প্রণালী, তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রণালী উদ্ভাবনের ফলে নব নব ধাতু আবিষ্কার সম্ভব হ'ল। তড়িৎ সাহায্যে এক ধাতুর উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ পড়ান সম্ভব হ'ল। এই শতাব্দীতে কেবল খনিজ পদার্থের রসায়ন নয়, জৈব পদার্থের রসায়ন-বিজ্ঞানও গ'ড়ে উঠল। ফরাসী দেশে ভকেল্যা, গেল্যুসাক, সেভ্রুউলের গবেষণার ফলে জৈব রসায়ন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল। তারপর এলেন জার্মানীতে লিবিগ, ভয়েলার, যিনি প্রথম দেখালেন অজৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে জৈব রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণ করা সম্ভব। ফরাসী বিজ্ঞানী ড্যুমা, লরাঁ, ইংলণ্ডে জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানী হোফমান, বৃটিশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম্‌সন, প্রভৃতির আবিষ্কারে জৈব রসায়ন প্রসারিত হতে থাকল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জৈব রসায়নের বিবিধ যৌগিক পদার্থ উদ্ভিদ্‌ বা প্রাণী থেকে আবিষ্কার করা হ'ল। বিবিধ পদার্থ সংশ্লেষিত হ'ল। তার সঙ্গে বিবিধ তত্ত্বও গ'ড়ে উঠল। কেকুলে ১৮৬৫ সালে বেঞ্জিন নামক তরল পদার্থের অণুর সংকেত প্রবর্তন ক'রে উত্তরকালের জৈব রসায়নের নবযুগ সৃষ্টি ক'রে গেলেন। এই সময়ে পাস্তুর মদ্যপাচন ও জীবাণুদের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে তাঁর অমর গবেষণা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঞ্চাশ বছরে জৈব যৌগিক পদার্থ সংশ্লেষ পদ্ধতি আশাতীত ভাবে বেড়ে উঠল। বেয়ারের গবেষণার ফলে উদ্ভিজ্জ নীল রঞ্জক পরীক্ষাগারে সংশ্লেষিত হ'ল। এমিল ফিশার এই সময়কার একজন দিক্‌পাল। ইক্ষুচিনি, প্রোটিন, কেফিন, প্রভৃতি বিবিধ জটিল পদার্থের অণুর কাঠামো সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে নব নব পথ উদ্ভাবন ক'রে তিনি যশস্বী হন। এই সময়ে ভিল্‌ষ্টেটার উপক্ষার-কাঠামোর সংকেত নিয়ে কাজ ক'রে গেছেন। ফুলের বর্ণ, পাতার সবুজ বর্ণ, শোণিতের রক্তবর্ণের রাসায়নিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে তত্ত্বগত রসায়নশাস্ত্রেরও সূচনা হ'ল। জার্মাণ বিজ্ঞানী হার্মাণ কপ্‌ পরমাণু ও অণুর আয়তন নিয়ে গবেষণা করেন। অণুর কাঠামোর সঙ্গে পদার্থটির ভৌতধর্মের সম্বন্ধ আছে ব'লে ধারণা করেন। হর্স্ট্‌মান থার্মডাইনামিক সূত্র রচনা করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর বিখ্যাত ভর-ক্রিয়ার সূত্র প্রবর্তন করেন। গিব্‌স্‌ তড়িৎ-রসায়ন তত্ত্বের গোড়াপত্তন করেন।

এইভাবে একই সময়ে পাশাপাশি তত্ত্ব এবং তথ্য, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ক্রমে গ'ড়ে উঠল। কতখানি গ'ড়ে উঠল, আধুনিক যুগের বিস্ময়কর আবিষ্কার উদ্ভাবনই তার প্রচণ্ড পরিচয়। আজ বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে দেখা যাচ্ছে, হয়ত কালে মানুষ প্রকৃতির উপর আর তত নির্ভরশীল থাকবে না। কৃত্রিম তন্তু প্রচলিত হয়েছে, তার বস্ত্র ব্যবহার চলছে। কৃত্রিম জ্বালানি প্রস্তুত হয়েছে, যার ওজন ও আয়তন কম, অথচ দহনগত উষ্ণতা বেশী। এমনই ইন্ধনের বড়ি গত মহাযুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যেরা ব্যাগে নিয়ে বেড়িয়েছে। প্রয়োজন মত দুই-একটি বড়ি জ্বালিয়ে জল গরম ক'রে খেয়েছে। এমনি কোন জলন্ত ইন্ধনের উৎসরণ শক্তির জন্য স্পুটনিক প্রেরণ সম্ভব হয়েছে। খাদ্যের জন্য আজও মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। তবে অনেক সংশ্লেষিত পদার্থ তার খাদ্যের রূপ স্বাদ সৌরভ বৃদ্ধি করতে পেরেছে। সংশ্লেষিত পদার্থ ব্যবহারে তরকারীতে মাংসের সৌরভ আনা গেছে, পানীয়ে লেবু বা কমলালেবু বা আপেলের সুগন্ধ পাওয়া গেছে। রোগ নিরাময়ের জন্য আর গাছ-গাছড়ার উপর বেশী নির্ভর করতে হচ্ছে না। আজ কুইনিন না হলেও ম্যালেরিয়া সারে। সংশ্লেষণ পদ্ধতি এত বেশী উন্নত হয়েছে যে ভিটামিন এ, ক্লোরোফিল, প্রোটিনজাতীয় পদার্থ, প্রভৃতি সংশ্লেষিত করা গেছে।

গত বিশ বছরে রসায়নে নবযুগের উন্মেষ হয়েছে। পরমাণু কেন্দ্রের তথ্য ও বিজ্ঞান গ'ড়ে উঠেছে। মানুষ পরমাণু ভাঙ্গার প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পেল পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে। বলা চলে, গত একশ' বছরে রসায়নের যা প্রসার হয়েছে, সভ্যতার উন্মেষের সুরু থেকে একশ' বছর আগে পর্যন্ত তা হয় নি। তবে কি সেই স্মরণাতীত-যুগের মনীষীদের প্রচেষ্টা সবই নিরর্থক হয়েছে? তা বলা চলে না। শুককীট হ'ল পরবর্তী কালের উড়ন্ত প্রজাপতির আদি অবস্থা। শুককীট দেখে কে প্রজাপতির ডানার বর্ণসুষমা অনুমান করতে পারে! সেকালের কিমিয়াবিদ্যা সেই কীট, যার থেকে জন্ম নিল চিত্রবিচিত্র সুষমামণ্ডিত প্রজাপতি। কার যে কোথায় সুরু, কার কিভাবে শেষ, কে জানতে পারে? তবে বলব, পথ থাকে ব'লে রথ চলে, রথ চলে ব'লে পথ বাড়ে। বহু লোকের বহু প্রচেষ্টায়, তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, তত্ত্ব প্রবর্তিত হয়েছে, তত্ত্ব ও তথ্যের পরস্পরের নির্ভরতায় রসায়ন ক্রমে গতিশীল হয়েছে।

ভারতীয় চিত্র ও মূর্ত্তি-শিল্পের ষাট বৎসর

সুধীর খাস্তগীর

আমি এ প্রবন্ধে যা বলব তা বই-পড়া কথা নয়। চিত্রবিদ্যা শিখবার সময় শান্তিনিকেতনে এবং কলকাতায় নানান শিল্পীদের কাছে যা জেনেছি ও দেখেছি তারই ওপর ভিত্তি রেখে আমার এ প্রবন্ধের অবতারণা। সেই কারণে চুলচেরা ইতিহাসের কোঠায় এ প্রবন্ধকে ফেলা যাবে না।

'প্রবাসী'র ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র মাধ্যমেই ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সেই শিশুকাল থেকে। এখন আমার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে—স্মরণ-শক্তির ওপর নির্ভর ক'রেই বলছি যে, সাত-আট বছর বয়সের বালক কি কৌতূহল নিয়ে 'প্রবাসী'র রঙীন ছবিগুলো দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত! শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্র ভাবে গিয়েছি ১৯২৫ সালে কিন্তু ১৯১৬ সালে শান্তিনিকেতনে গেছি বেড়াতে, তখন থেকেই ছবি আঁকায় এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের দিকে আমি আকৃষ্ট হই। কলকাতায় হগসাহেবের মার্কেটের কাছে ১২নং সমবায় ম্যানসনে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট' ছিল, সেখানে স্কুলের ছাত্র ভাবে বাৎসরিক প্রদর্শনী দেখতে যেতুম—অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, গিরিধারী মহাপাত্র, ইত্যাদির নাম ও তাঁদের কাজের সঙ্গে তখন থেকেই পরিচিত হয়েছিলাম। তাঁরা সেখানে ছবি আঁকতেন—আর সেই-সব ছবি একমাত্র 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে কিছু কিছু বার হ'ত।—মুগ্ধ হয়ে দেখতুম! তখনও ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থান সম্পূর্ণ হয় নি! গোড়াপত্তন হয়ে গেছে অবশ্য।

ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থানের পর্ব্ব বলতে গেলে আরম্ভ হয় 'প্রবাসী'র জন্মের সময়ের থেকেই। যদিও সেই সময়ে প্রবাসীতে বিখ্যাত শিল্পী রবি বর্ম্মার বহু ছবি ছাপা হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় অবনী ঠাকুরের কাছে ও মাষ্টারমশায় নন্দলাল বসুর কাছে তখনকার অনেক গল্পই আমরা শুনেছি। কি ক'রে হ্যাভেল সাহেব তাঁকে (অবনী ঠাকুরকে) কলকাতার আর্ট স্কুলের কাজে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কেমন ক'রে তাঁরা ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থানের সূত্রপাত করেন সে কথাও আপনারা নিশ্চয়ই খানিকটা জানেন। ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সিস্‌টার নিবেদিতার উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতার মূল্য সামান্য নয়।

আমি যে রকম গল্প শুনেছি সেই রকম ভাবেই বলি। কলকাতার আর্ট স্কুলে আগে ছেলেরা ইতালীয়ান মূর্ত্তির ও বিলিতি ছবির নকল ইত্যাদি করত—মূর্ত্তি ও ছবি দেখে দেখে। সত্যি-মিথ্যা জানি না—হ্যাভেল সাহেব নাকি তা পছন্দ করতেন না। তাঁর ও অবনী ঠাকুরের ইচ্ছা, ছেলেরা নিজেদের দেশের শিল্পকে অবহেলা না ক'রে সেই সব ছবির ওপরই ভিত্তি স্থাপন ক'রে ভারতীয় শিল্পের পুনর্জীবন দান ক'রে। ওঁরা নাকি সেই সব ইতালীয়ান মূর্ত্তি ইত্যাদি রাতারাতি আর্ট স্কুলের পিছনের পুকুরে ফেলে দেন—এবং তার জায়গায় মোগল কাংড়া রাজপুত ছবি দিয়ে ঘর সাজিয়ে ফেলেন। ভারতীয় চিত্রকলা আরম্ভ হয়,—অবনীবাবু জাপানী ও চীনে শিল্পীদের আঁকবার পদ্ধতি থেকে 'ওয়াশ' লাগানো আরম্ভ করেন। 'ওয়াশ' টেকনিক, আমার যতদূর ধারণা, অবনীবাবুর খানিকটা নিজস্ব হয়ে গিয়েছিল।

গল্প শুনেছি—ঈশ্বরী প্রসাদ বলে একজন শিল্পীকে ওঁরা আনিয়েছিলেন কলকাতায় মিনিয়েচার ছবির টেকনিকে কাজ শেখাবার জন্য। তাঁর আঁকা ছবি আমরা অনেক দেখেছি। তিনি অনেক সময় অবনীবাবুর ছবি আঁকার পদ্ধতি দেখে অবাক্ হয়ে যেতেন, বলতেন—"যাদুকর হ্যয় অবনবাবু—ধো-ধা ধো-ধা" অর্থাৎ রং লাগিয়ে জলে ধুয়ে পুঁছে, "অবনবাবু তসবীর বানাতা হ্যয়। ক্যা জানে ক্যাইসে বনতা হ্যয়।"

আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগে, ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থানের সময় জনসাধারণ হ্যাভেল সাহেবকে ভালো চোখে দেখেন নি। আমি শুনেছি, সে সময় অনেকে মনে করেছিল—নিজের দেশের শিল্প শিখে ফেলে ভারতীয়রা ইংরেজদের সমান সমান হয়ে যাবে সেই কারণেই নাকি হ্যাভেল সাহেবের ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থানের জন্য এত

পক্ষপাতিত্ব। জনসাধারণ সর্ব্বদাই পছন্দ করে রিয়ালিষ্টিক ছবি। হুবহু নকল ক'রে দেখাতে পারলেই তারা খুশী। ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থান করতে গিয়ে অবনীবাবু, নন্দবাবু, অসিত হালদার, ক্ষিতীন মজুমদার, বেঙ্কাটাপ্পা, সুরেন গাঙ্গুলী (ইনি অল্প বয়সেই মারা যান)—ইত্যাদি যখন সরু সরু হাত-পা—চাঁপার কলির মতো আঙুল, পটল-চেরা চোখ, মুষ্টিমেয় কোমর—অজন্তার ছবির পদ্ধতিতে আঁকা সুরু করলেন এবং সে-সব ছবি রামানন্দবাবু 'প্রবাসী'তে ছাপতে লাগলেন তখন 'জনসাধারণের' বিদ্রূপও তাঁদের কম সহ্য করতে হয় নি। সমসাময়িক কোনো পত্রিকায় বেরিয়েছিল ক্যারিকেচার,—"রাজ্ঞী পক্ষী নিরীক্ষণ করিতেছেন"—লতার মত বাহুযুক্তা এক নারী, পটলের-আকৃতির চোখের কোণা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে খাঁচার ভেতরকার পাখীটিকে দেখছেন। মাষ্টারমশাই নন্দবাবুর কাছে শুনেছি—তাঁরা বিকেলে যখন হেদো-এ বেড়াতেন তখন তাঁদের দেখিয়ে কেউ কেউ ঠাট্টাও করত—"ঐ রে, 'লম্বা-আঙুলের' শিল্পীরা যাচ্ছে—দ্যাখ, দ্যাখ"—

ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থানের এই ত গেল গোড়াকার কথা। সমবায় ম্যানসনের ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির ঘরে ও ঠাকুর-বাড়ীর 'বিচিত্রা' ঘরেই বলতে গেলে এর সূত্রপাত। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ইংরেজী চালচলন, ধরণধারণ নকল বর্জ্জন করা ফ্যাশনও হয়েছিল খানিকটা। অনেকে বলেন, ভারতীয় শিল্পের পুনর্জ্জাগরণ খানিকটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণেই। যে কারণেই সম্ভব হোক না কেন,—হয়েছিল, এবং তার জন্য দায়ী অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত, ক্ষিতীন, মুকুল, ইত্যাদি যাঁরা শিল্পীভাবে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, পি. এন. ঠাকুর, হ্যাভেল সাহেব—সেই সময়কার কয়েকজন গবর্ণর ভারতীয় শিল্পীর ছবি কিনতেন, শিল্পীদের উৎসাহ দিতে। রামানন্দবাবু প্রবাসীতে ছবি ছেপেও টাকা দিতেন শিল্পীদের—প্রচারও হত ভারতীয় শিল্পের প্রবাসী মারফত। বাংলা দেশের এই শিল্পীগোষ্ঠী থেকেই ভারতবর্ষের নানান দেশে শিল্প-শিক্ষকের কাজ নিয়ে শিল্পীরা ভারতীয় শিল্পের প্রচার সুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কলাভবনে ভারতীয় শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করেন—বোধ হয় ১৯১০ কি ১৯১২ সালের আরম্ভ থেকে। সেখানে মাষ্টারমশায় নন্দলাল বসু, সুরেন কর, শিল্প-শিক্ষার ভার নেন। অসিত হালদার মহাশয়ও কিছুকাল শান্তিনিকেতনে কাজ ক'রে প্রথমে জয়পুরে ও পরে লক্ষ্ণৌ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ হয়ে উত্তর-প্রদেশে ভারতীয় শিল্পের প্রচার করেন। অবনীন্দ্রনাথের আরেক শিষ্য শ্রীসারদা উকীল দিল্লীতে গিয়ে বাস করেন ও দিল্লীতে ভারতীয় শিল্পের প্রচার সাধনায় প্রবৃত্ত হন। জয়পুরে শৈলেন দে মহাশয় যান—শৈলেনবাবুর ছবিও প্রবাসীতে ছাপা হ'ত। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীও অবনীবাবুর ছাত্রদের মধ্যেই পড়েন, তিনি যান মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ও সেখানেই নিজের কার্য্যস্থল ক'রে নেন—তাঁর বহু কাজ প্রবাসীতে আমরা প্রকাশিত হতে দেখেছি। সিংহল দ্বীপে যান মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত—ইনি নন্দলাল বসু মহাশয়ের ছাত্র। রমেন চক্রবর্ত্তী যান প্রথমে মসুলিপত্তমে—অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার অধ্যক্ষ হয়ে, পরে দিল্লী ও মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত কলকাতার আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। অর্দ্ধেন্দ্র গাঙ্গুলী শান্তিনিকেতনে ও ওরিয়েণ্টাল সোসাইটিতে ছিলেন। এঁদের সবার ছবি প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে দেখা যেত। ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই বলতে গেলে এই সঙ্ঘেরই শিল্পীরা গিয়ে ভারতীয় শিল্পের প্রচার সুরু করেন। একমাত্র বোম্বাই প্রদেশে অনেকদিন পর্য্যন্ত ইংরেজ-শিল্পী সেখানকার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে অবশ্য অবনীবাবু, নন্দবাবু ও অসিতবাবুর অনেক ছাত্র বোম্বাই অঞ্চলে কাজ নিয়ে গেছেন।

শান্তিনিকেতনে নন্দবাবুর কাছে শিখে যাঁরা বাংলা দেশেই রয়েছেন এবং বাংলা দেশের বাইরে গেছেন তাঁদেরও সংখ্যা বড় কম নয়। শ্রীহীরাচাঁদ দুগার, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, রমেন চক্রবর্ত্তী, ভি. এস. মসোজী, ভি. আর. চিত্রা, ধীরেন দেববর্ম্মা, বিনোদ মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, এই প্রবন্ধের লেখক, নন্দলাল-পুত্র বিশ্বরূপ বসু, ইন্দ্র দুগার, সুকুমার দেউস্কর, ইত্যাদি যাঁরা নন্দলাল বসুর শিষ্য এবং যাঁরা জীবিত, সবারই বয়স এখন বোধ হয় পঞ্চাশের ওপর। অপেক্ষাকৃত কম বয়সের অনেক শিল্পীও, যাঁরা কলকাতা ও শান্তিনিকেতন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরাও বাংলা দেশে এবং বাংলা দেশের বাইরে গিয়ে নাম করেছেন। আমার এ সব কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে ভারতীয় শিল্পের পুনর্জ্জাগরণ, যা অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গ দ্বারা হয়েছিল, তা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছিল—তাকে "বেঙ্গল স্কুল" ব'লে যাঁরা ছোট করবার চেষ্টা করেন তাঁরা এই জাগরণের উচিত মূল্য দান করেন না। আজ যে ভারতীয় শিল্প প্রগতির মুখে এগিয়ে চলেছে তাই সম্ভব হত না যদি না এই জাগরণের মূলে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গ থাকতেন।

ভারতীয় শিল্পের এই পুনরুত্থানের সময় অবনীন্দ্রনাথ যখন ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকছিলেন তখন তাঁর

বড় ভাই গগনেন্দ্রনাথ আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। 'Cubism' তাঁর ছবিতে তখনই দেখা দিয়েছিল—তিনি কার্টুন ছবিও আঁকতেন—সেই সব ছবি তখন প্রবাসীতে ছাপা হত—সে জাতের 'কার্টুন' এখন আর বড় কেউ আঁকেন না। অনেক আর্ট-সমালোচককে বলতে শুনেছি যে গগনেন্দ্রনাথই ভারতীয় শিল্পে প্রথম আধুনিকতা প্রবর্ত্তন করেন। পরে বৃদ্ধবয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন আঁকতে সুরু করেন (১৯২৪।২৫) তখন তাঁর ছবিতেও 'অ্যাবস্ট্রাক্ট (abstract) form-এর অবতারণা দেখা যায়। এই সময় যামিনী রায় বিলাতী পদ্ধতিতে ছবি আঁকা ছেড়ে দেশী folk art-এর অনুসরণে ছবি আঁকা সুরু করেন। এবং এই পথে অনবরত কাজ ক'রে ইদানীং দেশে ও বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছেন।

শ্রীপ্রমোদ চট্টোপাধ্যায় প্রথমে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালায়, পরে বরোদা কলাভবনে ছিলেন। লেখক হিসেবেও ইনি নাম করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন সেই সময় এই প্রবন্ধের লেখক শান্তিনিকেতনের ছাত্র। যতদূর স্মরণ হয়, ১৯২৬ সাল একদিন গুরুদেব কলাভবনে এলেন সকালে। আমরা সকলে তাঁকে ঘিরে বসেছিলাম। মাষ্টারমশাই-এর (নন্দলাল বসুর) সঙ্গে তাঁর শিল্পালোচনা হচ্ছিল। আমরাও যে দু'একটা প্রশ্ন করছিলাম না তা নয়। কিন্তু আলোচনার বিশেষ কিছু তখন আমাদের (অন্ততঃ আমার) বোধগম্য হয় নি। Abstract art-এর কথা তখনই আমি প্রথম শুনি। মনে আছে কয়েকটি কথা। গুরুদেব বলেছিলেন, বড় ক'রে বাহুর জোরে মনের জোরে কল্পনার জোরে ছবি আঁকতে—ছোট সরু তুলী তুলে রাখতে বলেছিলেন। "মোটা তুলীতে নির্ভয়ে আঁকতে শেখ" বলেছিলেন।

এই সময় Miss Von Pott ব'লে একজন জর্মন মহিলা ভাস্কর শান্তিনিকেতনে আসেন এবং আমরা কয়জন—রামকিঙ্কর, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন বিশী ও প্রবন্ধ-লেখক মূর্ত্তি গড়া আরম্ভ করি। এর আগেও শান্তিনিকেতনে মূর্ত্তি গড়তেন কেউ কেউ। শ্রীযুক্ত দেবল, যিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন, তিনি পরে বিদেশে গিয়েও মূর্ত্তি গড়া শিখে এসেছিলেন।

ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থানের সময় মূর্ত্তি-কলা বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ মন দেন নি ব'লেই মনে হয়। উড়িষ্যা থেকে ভাস্কর শ্রীগিরিধারী মহাপাত্রকে সোসাইটিতে মাষ্টার ক'রে এনেছিলেন—তিনিই কিছু কাজ শেখাতেন ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র বসু মহাশয় বিলাতে গিয়ে নিজে করতেন। তিনি মূর্ত্তিকলা বিষয় শিক্ষা করেন ও বিদেশেই ষ্টুডিও ক'রে কাজ করেছিলেন। তাঁর কাজ বরোদা রাজপ্রাসাদে দেখেছি—হুবহু-নকল-পদ্ধতিতেই তিনি কাজ করতেন। তাঁর কাজের সচিত্র বিবরণ 'প্রবাসী'তে বার হয়েছিল মনে আছে। হুবহু-নকল-পদ্ধতিতে ভারতবর্ষে অন্যান্য জায়গায় (মাদ্রাজে ও বোম্বাই প্রদেশে) কেউ কেউ কাজ করতেন আগে থেকেই, তার মধ্যে ফড়কে, মাহ্‌ত্রের নামের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত।

বাংলা দেশ থেকে ঠাকুরবাড়ীর আত্মীয় শ্রীহিরণ্ময় রায়চৌধুরী বিলেতে গিয়ে ভাস্কর্য্য-শিক্ষা করেন। তিনি ফিরে এসে প্রথমে জয়পুর আর্ট স্কুল পরে লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলে Craft Supdt. হন। তিনিও হুবহু-নকল-পদ্ধতিতেই কাজ ক'রে থাকেন। শুনেছি শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর মূর্ত্তি-গড়ায় হাতে-খড়ি হয় হিরণ্ময়বাবুর কাছেই। আমার মনে হয়, ভারতীয় পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মূর্ত্তি-কলা প্রথম আরম্ভ হয় শান্তিনিকেতনেই—আজ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে। তাঁর জন্য মাষ্টারমশায় (নন্দলাল বসু) দায়ী। অনেকেই হয়ত জানেন না যে মূর্ত্তি গড়ায় নন্দলাল বসুর অসীম ক্ষমতা ছিল এবং এখনও আছে। তিনি আমাদের মূর্ত্তি গড়ার কাজে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করতেন এবং নিজেও ছোট ছোট মূর্ত্তি গড়তেন—যা কলাভবনে রাখা আছে। আমার মনে হয় উনি যদি মূর্ত্তিকলায় আরও কিছু সময় দিতেন তবে তাঁর হাত থেকে দেশ আরও অনেক কিছু লাভ করতে পারত। রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনেই নিজের কর্ম্মক্ষেত্র ক'রে নেন এবং সেখানে তাঁর গড়া সিমেন্টের মূর্ত্তি এখানে সেখানে রাখা আছে। ইদানীং তিনি ভারতীয় পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করেন না। বিদেশী আধুনিকতার প্রভাব তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা দিয়েছে। রামকিঙ্করের কাছে শান্তিনিকেতনে যাঁরা মূর্ত্তিকলা শিখে নাম করেছেন—তাঁরা হচ্ছেন: শ্রীশঙ্খ চৌধুরী—এখন বরোদা কলাভবনে শিক্ষকতা করেন। শ্রীযুক্ত প্রভাস সেন, ইদানীং কলকাতায় গবর্ণমেণ্ট হ্যাণ্ডিক্রাফটের ডিরেক্টর। শ্রীরুদ্র হাঞ্জি গোয়ালিয়রে শিক্ষকতা করছেন। শ্রীঅবতার সিং পাওয়ার লক্ষ্ণৌ গবর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের মূর্ত্তিকলা বিভাগে কাজ করছেন। শ্রীধর্ম্মানী সম্প্রতি দিল্লীতে কাজ করছেন। শ্রীজিতেন্দ্র গোরখপুরে য়ুনিভারসিটিতে

Asst. Professor—তিনিও শান্তিনিকেতনের ছাত্র। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—ভাস্কর্য্য শিল্পেও শান্তিনিকেতন কলাভবনের দান বড় কম নয়। শিল্পের ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতন কলাভবন ভারতবর্ষের একটি তীর্থস্থান বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষের যত শিল্পী—যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন—তাঁরা সকলেই কিছুদিন শান্তিনিকেতন কলাভবনে কাটিয়ে গেছেন। পূর্ব্বেই বলেছি, কলকাতার ওরিয়েণ্টাল সোসাইটিতে অবনীন্দ্রনাথ গিরিধারী মহাপাত্র মহাশয়কে উড়িষ্যা থেকে ভাস্কর্য্য শিক্ষক ক'রে আনিয়ে রেখেছিলেন। তিনি বহুকাল সেখানে ভারতীয় পদ্ধতিতে ভাস্কর্য্যের কাজ ক'রে বিখ্যাত হন।—তাঁর পুত্র শ্রীধর মহাপাত্র সেই সময় সোসাইটিতে ছাত্রভাবে আছেন; পরে কাজ শিখে লক্ষ্ণৌ গবর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে শিক্ষক হয়ে আসেন এবং লক্ষ্ণৌতে কাজের ক্ষেত্র ক'রে বিখ্যাত হন। এঁরা গতানুগতিক ধারায় নিখুঁত কাজ করতে ভালবাসেন। শিল্পজগতে এরও একটা স্থান আছে।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ভাস্কর্য্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে নাম করেছেন। তাঁর হাতের কাজ কলকাতায়, পাটনায়, মাদ্রাজে, দিল্লীতে ও আরও নানান জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

বাংলা দেশে কৃষ্ণনগরের পাল বংশের অনেকে মূর্ত্তিকার হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছেন—হুবহু চেহারা মিলাতে এঁরা সত্যিই ওস্তাদ। নিতাই পাল, গোষ্ঠ পাল, এঁদের নাম অনেকেই শুনে থাকবেন।

এই ত গেল মোটামুটি মূর্ত্তির কথা।

শিল্পের পুনর্জাগরণ করা হ'ল বটে, কিন্তু তার দরুণ ভারতীয় শিল্পীদের কিছুকালের জন্য পিছনে প'ড়ে যেতে হ'ল। অজন্তা, কাংড়া, রাজপুত, মোগল, পারসী ছবির ওপর ভিত্তি স্থাপন হ'ল—দ্রুত কাজ চলল—দশ বৎসরের মধ্যেই এক নূতনত্ব পেল ভারতীয় চিত্রকলা।

চিত্রকলা শিখতে বিলাত যাবারও ফ্যাশন হয়েছিল—এখনও আছে। অবনীন্দ্রনাথ সেটা পছন্দ করতেন না। উনি বলতেন—দেশের চিত্রকলা ভাস্কর্য্যের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হওয়া দরকার—ভারতবর্ষের নানান জায়গায় নানান শিল্প-নিদর্শন ছড়ানো—সে সব না দেখে বিদেশে শিখতে যাওয়া বাঁদরামী।

স্বরাজ না হওয়া পর্য্যন্ত শিল্পের এই জাগরণ সরকারী সাহায্য খুব বেশী পায় নি। কিন্তু তখন রাজা-বাদশা-নবাব-জমিদার ও পয়সাওয়ালা লোক ছিলেন—তাঁরা মাঝে মাঝে ছবি কিনে শিল্পীদের সাহায্য ও উৎসাহ দিতেন। প্রবাসী, বিশাল ভারত ও মডার্ণ রিভিয়ুতেও ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শন প্রচার হ'ত—তাতেও ভারতীয় পদ্ধতিতে যাঁরা ছবি আঁকতেন তাঁরা উৎসাহিত হতেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি, রামানন্দবাবু শিল্পীদের উৎসাহদানে কখনও কার্পণ্য করেন নি। আধুনিক প্রসিদ্ধ-শিল্পী রামকিঙ্করকে তিনিই বাঁকুড়া থেকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। প্রবন্ধ-লেখক যখন শন্তিনিকেতনের ছাত্র তখন দেশ বেড়াবার জন্য প্রবাসী, মডার্ণ রিভিয়ুতে ছবি ছেপে তিনি টাকা পাঠিয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থা কাটিয়ে যখন কর্ম্মক্ষেত্রে নামি তখন মাঝে মাঝে প্রবাসী অফিসে ছবি নিয়ে যেতাম, সেখানে সহ-সম্পাদক শ্রীনীরদ চৌধুরী ছবি নিয়ে রাখতেন—ছবি পছন্দ না হলে বলতেন—'তোমার ছবির রং এত আবছা ও সুন্দর যে ব্লক-মেকার পারবে না এর effect block-এ আনতে।' তবু তিনি সমঝদার ছিলেন ও আমাদের ছবি ছাপবার জন্য রাখতেন। পরে প্রবাসী অফিসে, ইদানীং বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের শ্রীযুক্ত পুলিন-বিহারী সেন সহ-সম্পাদকের কাজ করতেন। তাঁর সময়ও প্রবাসী, মডার্ণ রিভিয়ু-এ ভারতীয় শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এ কথা সবাইকে স্বীকার করতেই হবে—ভারতীয় চিত্রের পুনর্জাগরণের সময় প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদার, মুকুল দে, সুরেন কর ও তাঁদের শিষ্যগণের ছবি ছেপে ভারতীয় চিত্রের প্রচার-কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন—অন্য কোনো সাময়িক মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা তখন এ বিষয় একেবারেই সাহায্য করা দূরে থাক, নিন্দাই করেছে।

অর্দ্ধশতাব্দী আগে বাংলা দেশে ভারতীয় চিত্রের পুনর্জাগরণ আরম্ভ হয়েছিল; কিন্তু আজ তারই ওপর ভিত্তি রেখে এবং না রেখে অতি আধুনিকতার ধুয়ো উঠেছে। ইতিহাসে এই রকমের পুনরাবৃত্তি নূতন নয়। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যগণ পঞ্চাশ বছর আগে বিলাতী হুবহু-নকল শিল্পের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবন করেছিলেন—আজ আবার সময় এসেছে যখন অবনীন্দ্রনাথের মতই কোনো প্রতিভাবান্ শিল্পীর বিলাতী অতি-আধুনিক শিল্পের নকলনবীশ ভারতীয় শিল্পীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতীয় শিল্পের যুক্তিযুক্ত প্রগতির পথ-প্রদর্শক হয়ে কাজ করা। ভারতের শিল্পের মর্য্যাদা তবেই রক্ষা পাবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতবর্ষের নানান প্রদেশে সরকারী আর্ট এণ্ড ক্রাফট্-এর সোসাইটি সৃষ্টি হয়েছে;

সরকার থেকে শিল্পীদের কাছ থেকে চিত্র ও মূর্ত্তি ক্রয় ক'রে মুজিয়ম ক'রে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। দিল্লীতে ললিত-কলা-আকাদমী প্রতিষ্ঠান প্রগতিশীল শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। ভাল-মন্দ অনেক কিছুই সেখানে বিকিয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর নানান্ দেশের শিল্পকলার প্রদর্শনীর আয়োজন ক'রে এঁরা জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। শিল্পীর সমাদর পূর্ব্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সব সময় যে উপযুক্ত শিল্পীরাই সমাদর পান তা ঠিক নয়। ভালোমন্দ শিল্পী তৈরী হয়েছে বিস্তর। কিন্তু সেই আন্দাজে ভালো ভারতীয় শিল্প-সমালোচক তৈরী হয় নাই। অবনীন্দ্রনাথের সময়কার কুমারস্বামীর মতো শিল্প-সমালোচক এখন কেউই নাই। পুরাতন সমালোচকের মধ্যে বাংলা দেশে অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী এখনো কাজ করছেন সন্দেহ নাই কিন্তু আরো ভারতীয় উপযুক্ত শিল্প-সমালোচক দরকার। এখনো আমরা ভারতবর্ষেই বিদেশী শিল্প-সমালোচকের ওপরই প্রধানতঃ নির্ভর ক'রে আছি, এটাই আশ্চর্য্যের কথা।

ভারতবর্ষের কয়েকজন প্রতিভাবান্ আধুনিক তরুণ শিল্পীদের কথা ব'লে আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করব। বাংলা দেশে যখন ভারতীয় শিল্পের পুনর্জ্জাগরণের সাধনা চলছিল সেই সময় বোম্বাই অঞ্চলে বিদেশী শিল্পের নকল চলছিল সন্দেহ নাই। যামিনী রায় ও অমৃতা শেরগিল যখন লোক-কলা ও আধুনিক ফরাসী ভারতীয় সংমিশ্রণে কাজ ক'রে বিখ্যাত হলেন তখনই বোম্বাইয়ের তরুণ শিল্পীদের কারুর কারুর চোখ ফুটল। তাঁরা আধুনিক হবার চেষ্টায় লাগলেন।

যামিনী রায় ত লোক-কলা (কালীঘাট পটের ছবির) অনুকরণ নয়—অনুসরণ ক'রে এগোলেন। অমৃতা শেরগিল—(আধা-বিলাতী ও আধা-শিখ মহিলা) প্যারিস থেকে ফিরে এসে বুঝলেন, বিদেশী টেকনিকে দেশী ছবি আঁকা ঠিক সুবিধের হবে না। তখন তিনি দেশী ছবি কিছুটা স্টাডি ক'রে—ফরাসী-দেশী ঢংএ ছবি আঁকতে সুরু করলেন। তাঁর মধ্যে শিক্ষার্থীর দরদ এবং ক্ষমতা ছিল—যা সৃষ্টি হ'ল—তা গ্রহণীয় হ'ল। অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যু হবার পর ভারতীয় সরকার তাঁর বেশীর ভাগ ছবি ক্রয় ক'রে—মডার্ণ আর্ট গ্যালারী দিল্লীতে রেখেছেন।

পাকিস্থান হবার পূর্ব্বে লাহোরেও ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্র ছিল—হয়ত এখনো আছে। শ্রীসমরেন্দ্র গুপ্ত (অবনীন্দ্র-শিষ্য) বহুকাল লাহোরের আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। সেখানে আরো জন-কয়েক শিল্পী কাজ করেন। আব্দার রহমন চাঘতাই-ও (অবনীন্দ্র-শিষ্য, যাঁর বহু ছবি প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে) লাহোরে ভারতীয় শিল্পের চর্চ্চা করতেন। শ্রীযুক্ত রূপকৃষ্ণও (অবনীন্দ্র শিষ্য) লাহোরে ছিলেন—এখন বিলাতে বসবাস করছেন শুনতে পাই। শ্রীযুক্ত ভবেশ সান্যাল লাহোরে ষ্টুডিও খুলে বসেছিলেন—পাকিস্থান হবার পর দিল্লীতে চ'লে আসেন। তিনিও একজন ক্ষমতাশালী শিল্পী। ধনরাজ ভকতের (আধুনিক ভাস্কর) তাঁরই কাছে হাতে খড়ি হয়।

হায়দ্রাবাদে নন্দলাল-শিষ্য সুকুমার দেউস্কর সেখানকার আর্ট স্কুলে প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। কয়েক বৎসর হ'ল হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়।

দিল্লীতে শ্রীযুক্ত সারদা উকীল মহাশয়ের কাছে যাঁরা শিষ্য হয়ে নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীসুশীল সরকার এখন পাঞ্জাব আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছেন।

লক্ষ্ণৌ-এ শ্রীঅসিত হালদার মহাশয়ের ছাত্র অনেকেই নানান জায়গায় ছড়িয়ে গেছেন। শ্রীললিতমোহন সেন, শ্রীবীরেশ্বর সেনও লক্ষ্ণৌ-এর আর্ট কলেজে কাজ করতেন, এবং শিল্পসমাজে সুপরিচিত। গত প্রায় পাঁচ বৎসর হ'ল প্রবন্ধ-লেখক (নন্দলাল-শিষ্য) লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদে কাজ করছেন।

মাদ্রাজে শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর কাছে যাঁরা শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে নানান দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। আমার যাঁদের কাজের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁদের কথাই লিখছি। শ্রীগোপাল ঘোষ নিজগুণে বিখ্যাত হয়েছেন; সম্প্রতি কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজে কাজ করছেন। ইনি সত্যিই একজন প্রতিভাবান্ শিল্পী। শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত—ইনিও মাদ্রাজ আর্ট কলেজের ছাত্র—পরে বিলাত যান, সম্প্রতি দিল্লীতে মডার্ণ আর্ট গ্যালারীর কিউরেটর। শ্রীসুশীল মুখার্জ্জি—ইনি আজকাল উটকামুণ্ডে লরেন্স পাবলিক স্কুলের আর্ট মাষ্টার। কিছুকাল আগে আমেরিকা ভ্রমণ ক'রে এসেছেন। এঁরা ছাড়াও মাদ্রাজ প্রদেশের বহু শিল্পী দেবীপ্রসাদের কাছে শিক্ষা পেয়েছেন। এখন শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ কলেজের কাজে অবসর নিয়েছেন কিন্তু তাঁর ভাস্কর্য্যের কাজ পূরোদমেই চলছে।

শ্রীযুক্ত পানিকর এখন মাদ্রাজ সরকারী আর্টকলেজের অধ্যক্ষ।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

চড়াই উৎরাই
শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

(প্রবাসী — ১৩২৮, আষাঢ় হইতে পুনর্মুদ্রিত)
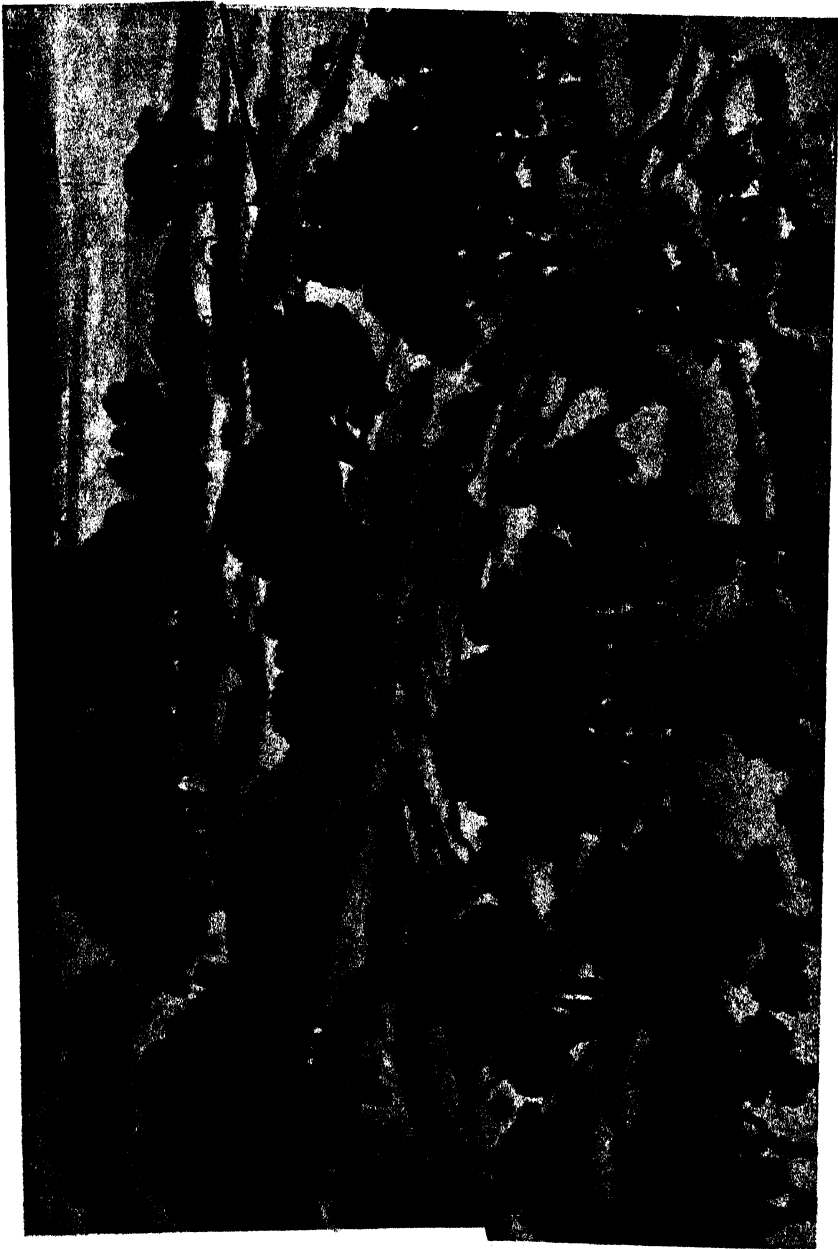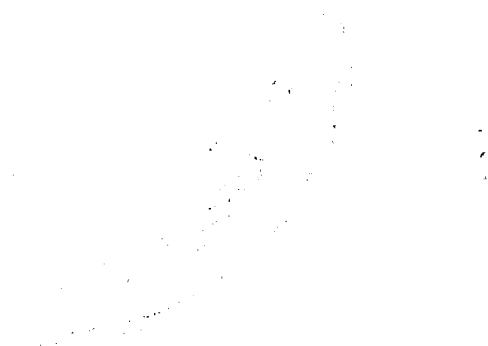
পাটনায় শিল্পের ক্ষেত্র প্রসারতা পেয়েছে। শান্তিনিকেতনের অনেক তরুণ শিল্পী সেখানে সরকারী হ্যাণ্ডি-ক্রাফ্ট-এ কাজ করছেন, সেখানে একটি আর্টস্কুলও স্থাপিত হয়েছে।

বোম্বাই আর্টকলেজে এখন ভারতীয় অধ্যক্ষ। সেখানে আধুনিক ভারতীয় শিল্প উন্নতির পথে কি অবনতির পথে তা জানি না। বরোদাতে কলাভবনে জনকয়েক প্রতিভাশালী শিল্পীর সমাবেশ হয়েছে। এন এস্ বেন্দ্রে (ইন্দোরের দেবলালিকরের ছাত্র) সেখানে ফাইন আর্ট-এর প্রফেসর। ইনি একজন দক্ষ এবং বিখ্যাত শিল্পী।

শান্তিনিকেতনের রামকিঙ্কর-ছাত্র শ্রীশঙ্খ চৌধুরীও বরোদায় কাজ করছেন। ভাস্কর্য শিল্পে ইনি যশস্বী হয়েছেন।

এঁরা সব ছাড়াও ভারতবর্ষের বহু জায়গায় বহু তরুণ শিল্পী কাজ করছেন। গোয়ালিয়রে শ্রীপ্রভাত নিয়োগী সিন্ধিয়া স্কুলের শিল্পী। ইনি ক্ষিতীন্ মজুমদারের ছাত্র।

চাকুরী না ক'রে যাঁরা 'free lance' ভাবে কাজ করছেন—এমন শিল্পীরও ভারতবর্ষে অভাব নেই। এদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে যাঁর নাম মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন শ্রীমনীষী দে। ইনি ভারতবর্ষের বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। হাত ভাল—কাজ করবার শক্তিও রাখেন। সম্প্রতি বাঙ্গালোরে আছেন শুনতে পাই। ইনিও কলকাতা ওরিয়েন্টাল সোসাইটিতে কাজ শেখেন, শান্তিনিকেতনেও ছিলেন।

শ্রীমতী অমৃতা শেরগিল ছাড়াও মহিলা শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা শিল্পের ক্ষেত্রে নাম করেছেন—তাঁদের কথা না বললে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকবে। শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয়ের দুই কন্যা শ্রীমতী গৌরী ভঞ্জ ও শ্রীমতী যমুনা সেন। দুজনেই শান্তিনিকেতনের কলাভবনে কাজ করেন। তাঁদের হাত পরিষ্কার এবং ডিজাইনে ও আলপনায় তাঁদের সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীমতী প্রেমজা চৌধুরী দিল্লীতেই থাকেন। প্রথম দিকে শ্রীসারদা উকীলের ছাত্রী ছিলেন—এখন দিল্লীতে free lance শিল্পী।

শ্রীমতী চিত্রনিভা চৌধুরী—শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্রী। ইনি ছবি এঁকে দেশে নাম করেছেন।

শ্রীমতী রাণী চন্দ—ইনিও শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। শিল্পী-পরিবারের পরিবেষ্টনে মানুষ। ইনি লেখিকা হিসাবেও যথেষ্ট নাম করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের ও নন্দলালের প্রিয় শিষ্যা।

বোম্বাই ও আমেদাবাদের আরো কয়েকজন শিল্পীর নাম করা আবশ্যক। শ্রীচাতড়া, শ্রীহেব্বর (Hebber), শ্রী আরা, শ্রী হুশেন, ইত্যাদি আধুনিক শিল্পী যথেষ্ট নাম করেছেন নিজেদের কাজ করবার শক্তি সামর্থ্য দিয়ে। অপেক্ষাকৃত অনেক তরুণ শিল্পীদের নাম করতে পারলাম না। তাঁরাও ভবিষ্যতে কাজ ক'রে নাম রাখতে পারবেন আশা রাখি।

আমেদাবাদের শিল্পী রবিশঙ্কর রাবল, যাঁর কাছে শ্রীকনু দেশাই প্রথম ছাত্র ভাবে শেখেন, এখন প্রবীণ শিল্পী। 'কুমার' ব'লে গুজরাটি ছোটদের মাসিক পত্রিকার সম্পাদক এবং উৎসাহী কর্ম্মী-শিল্পী। শ্রীকনু দেশাই ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতন কলাভবনে বছর দু'এক কাজ শিখে আমেদাবাদে ফিরে যান। এখন ফিল্ম-শিল্পী। এঁরা ছাড়াও সোমলাল সাহা, রসিকলাল, ইত্যাদি গুজরাতী চিত্রকর ভাবনগরে শিল্পের কাজ নিয়ে কাটাচ্ছেন।

বাংলাদেশে শিল্পের পুনর্জাগরণ হয়েছিল, সে কথা দিয়েই প্রবন্ধ আরম্ভ করেছিলাম—প্রবন্ধ শেষ করতে চাই বাংলাদেশের বিষয় নিয়েই।

একথা একদিন সবাইকেই মানতে হবে, শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান গত ষাট বৎসর যাবৎ সবার উপরে। এত শিল্পী ভারতবর্ষের আর কোনো প্রদেশ সৃষ্টি করে নাই। অন্য কোনো প্রদেশের শিল্পী বাংলাদেশের শিল্পীদের মতো এত দেশ-বিদেশে ছড়িয়েও নেই। বাংলাদেশ এখনো চিত্র-শিল্পে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এগিয়েই আছে, অনেক শিল্প-সমালোচকদের বক্রোক্তি সত্ত্বেও। শান্তিনিকেতনের মতো কলা-শিল্প-তীর্থের জায়গা ভারতবর্ষে কেন, আমার মনে হয় সমগ্র পৃথিবীতেও নেই। এমন শান্ত-স্বাভাবিক শিল্পসাধনার জায়গায় যাঁরা শিক্ষা পাবেন তাঁরা উঁচুদরের শিল্পীই হবেন সন্দেহ নাই।

কলকাতার সরকারী আর্টকলেজ, যেখানে হ্যাভেল সাহেব ছিলেন—যেখানে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ভারতীয় শিল্পের পুনর্জাগরণ হয়েছিল, যেখানে অবনীন্দ্রনাথ, মুকুল দে, রমেন চক্রবর্ত্তী কাজ করেছেন এবং এখন সম্প্রতি প্রতিভাবান্ শিল্পী শ্রীচিন্তামণি কর কাজ করছেন, সে জায়গায় যে একটি প্রাণবান্ শিল্পগোষ্ঠী গ'ড়ে উঠবে সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। সমগ্র ইউরোপে ফ্রান্স যেমন—সমগ্র ভারতবর্ষে বাংলাদেশের স্থানও সমতুল্য।

মূর্ত্তি- ও চিত্র-শিল্প

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসীর তরফ থেকে শিল্পকলার চর্চা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন এসেছে উত্তরের জন্য। নিম্নে আমার বক্তব্য লিখলাম।

প্রথম প্রশ্ন, বিগত ষাট বৎসরে আমাদের দেশের, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশের ক্ষমতাবান্ শিল্পীরা যত বেশী সংখ্যায় চিত্রাঙ্কনের দিকে গিয়েছেন, সে তুলনায় ভাস্কর্য্যের দিকে যাঁরা গিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। এ রকম হবার কারণ কি?

প্রশ্নোত্তর সংক্ষিপ্ত ভাষায় statistical points দ্বারা শেষ করা যেত। কিন্তু আদালতের জেরার সামনে যখন পড়ি নি তখন প্রয়োজনের তাড়ায় বাড়তি কথাকে বাদ দিতে পারলাম না।

কেনর,—কারণ খুঁজতে গেলে প্রথমেই মনে আসে চাহিদার কথা, যা গ'ড়ে ওঠে বিভিন্ন প্রভাবের সংস্পর্শে। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী, সামাজিক রীতি, প্রাচীন সংস্কার, আর্থিক সমস্যা, কৃষ্টি-সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক অনুপ্রেরণা, ইত্যাদি অনেক কিছুই জড়িয়ে থাকে প্রভাবের সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে রূপ-সৃষ্টির কথা উঠলে বলতে হয়, শিল্পীর উচ্ছ্বাসও কোন না কোন প্রভাবের উপর নির্ভর করে রূপায়িত হবার জন্য। সুতরাং প্রভাব এবং চাহিদা থেকে শিল্পীকে সম্পূর্ণ ভাবে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তা তিনি যত বড়ই বেপরোয়া স্বাধীন-চিত্ত হন না কেন, যতই নিজের বৈশিষ্ট্যকে স্বতন্ত্র করবার চেষ্টা করুন না কেন। প্রভাব ও চাহিদার প্রতিক্রিয়া যদি আংশিক ভাবেও মানা চলে তাহলে প্রমাণ হবে, কেবল আত্মতুষ্টির জন্য রূপ-সৃষ্টি শিল্পীর চরম কাম্য নয়। রূপের মাধ্যমে রস প্রকাশে যে আবেদন থাকে তাকে রসগ্রাহীর কাছে পৌঁছিয়ে দেবার আগ্রহও থাকে যথেষ্ট। এদিক্ দিয়ে শিল্পীকে একেবারে বে-হিসাবী বলা চলে না। সে জানে তার মনের কথা কি, এবং কাকে রূপকথার কাহিনী শোনাবার জন্য সে ব্যস্ত। সুতরাং, শিল্পীর মনের কথা ও প্রকাশভঙ্গী যে ভাবেই প্রভাবান্বিত হোক না কেন, বক্তব্যকে আধুনিক ultra modern চালে উদ্দেশ্যহীন বা জটিল করাটাই সব শিল্পীর প্রধান বাসনা নয়। আসলে কাজের শেষে শিল্পী খুঁজে বেড়ায় দরদীকে, যে তার কথা শুনতে চায়, বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্যকে গ্রহণ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে থাকে, শিল্পীর আনন্দে ভাগীদার হয়। রূপ-সৃষ্টি সম্বন্ধে শিল্পীর মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করলে আরো দেখা যাবে, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, বা কার্পণ্যের স্থান রসবিতরণে নেই। দম্ভের তাড়নায় শিল্পী রসগ্রাহীকে দূরে রাখে না। রূপকে abstract করায় intellectual দাপট থাকলেও ধাঁধার আড়াল নেওয়াকেই সে মহৎ কীর্ত্তি ভাবে না। অবশ্য সব শিল্পীর মনোবৃত্তি একই ছাঁচে ঢালা হবে এমনটি আশা করা অন্যায়। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক এবং যাঁরা এদিক্ দিয়ে যোগ্যতার অধিকারী তাঁদের শ্রদ্ধাস্পদ ব'লেই মানি। তবে স্বতন্ত্রবাদী আধুনিক-পন্থীদের কথা আলাদা। তাঁরা নিজেদের নিয়েই আত্মহারা হয়ে থাকেন। প্রত্যেকেই অহমের পূজায় সমাধিস্থ।

নববিধানে সংযম, শিক্ষা বা আদর্শের বালাই নেই। জবাবদিহির প্রশ্ন না থাকায়, যথেচ্ছাচারিতাই আর্টের শেষ কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলছিলাম চাহিদা-জড়িত রূপ-সৃষ্টির কথা, মূর্ত্তিকারের সংখ্যা কম কেন? প্রধান কারণ, ছবির মত মূর্ত্তির প্রচার নেই। নির্লিপ্ততার জন্য জনসাধারণকে দায়ী করা চলে না, কারণ, রসগ্রাহীর জন্ম রূপের সহিত ঘনিষ্ঠতার পরে। সুন্দরের নক্সা সাধারণ যেটুকু দেখার সুবিধা পায় তা ছবিতেই শেষ। আমাদের দেশে ভাস্কর্য্যের রূপ লুকিয়ে থাকে মন্দিরের আড়ালে। রূপ এখানে নিরবচ্ছিন্ন পূজার বস্তু, শাস্ত্রসম্মত আদর্শ রূপের মধ্যে বাঁধা, দৈনন্দিন জীবনে সুখদুঃখের কথা দেবতা বলে না, সংক্ষেপে মন্দিরের ভিতর যাঁরা প্রতিমা দর্শনের আশায় যান তাঁদের দৃষ্টি থাকে ভক্তির কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ হয়ে। মন্দিরেও আজ দেবদেবীর নতুন রূপ নিয়ে আনাগোনা নেই, কারণ পুরোহিত বিশ্বাসের বাধায় নতুনকে দেবতা ব'লে সনাক্ত করতে সাহস পায় না। বিশেষ ক'রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ভার যখন পুরোহিতের উপর তখন নতুন এলে মন্ত্রকে মানবে কি না স্থিরতা কোথায়? ফলে মন্দিরের আশ্রয়ে যে

কয়জন ভাস্কর বাঁচার ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারে তারা গতানুগতিকতার নির্দ্দেশ অনুসারে কারিগরীতেই সন্তুষ্ট, রস-চেতনা ওদের মধ্যে নেই। এই জাতীয় কারিগরকে জীবন্ত যন্ত্র ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

অপর দিকে ভাবুক রসস্রষ্টার নব-রূপের সন্ধানে এগিয়ে চলার পথ বিঘ্নে ভরা। প্রথম, ঘনিষ্ঠতার অভাবে সে রস-গ্রাহীর আসরে অনাহূত; দ্বিতীয়, আপন সত্তার দাবী করতে হলে দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য মাল-মশলার সরবরাহ একান্ত প্রয়োজন। কয়জন ভাস্কর আছেন যাঁরা উপযুক্ত সচ্ছলতার মালিক? এর উপর ধৈর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরীক্ষায় তাকে এমন ভাবেই জর্জ্জরিত হতে হয় যে মাঝ পথেই অনেকে নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ভাস্করের চলার-পথে এইখানেই বাধার কথা শেষ নয়। অতিকায় মূর্ত্তি গঠনের দায়িত্ব নিতে হলে, অটুট স্বাস্থ্য, নির্ভরশীল কর্ম্মশক্তি, form সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও সাধনায় একনিষ্ঠতা অপরিহার্য্য অবলম্বন। তুলনায় চিত্র-শিল্পীর কাজে সুবিধা অনেক বেশী। ঘাম বের-করা শারীরিক পরিশ্রম ও যাবতীয় আড়ম্বরের ঝক্কি তাকে সামলাতে হয় না।

চিত্র-শিল্পীর সংখ্যা বেড়ে ওঠায় ভিন্ন তরফে হতাশার কারণ কিছু থাকত না যদি রূপ-জগতের পথ-প্রদর্শক শিল্পাচার্য্য গুরু অবনীন্দ্রনাথ অথবা নন্দলালের মত কাজে আন্তরিকতা আধুনিক শিল্পীদের থাকত, যদি নবাগতরা দেশের মাটির সঙ্গে যোগ রেখে ঘরোয়া কথা অন্ততঃ কিছুটা বলতেন। বিদেশী ভাষার ব্যবহারে আপত্তি নেই, এমন কি সিজান অনুকরণে বিশিষ্ট দাড়ীকে শিল্পীর পাসপোর্ট হিসাবে মানতেও রাজি আছি যদি সাহেবীয়ানা, দেশী মানুষের সব-কিছুকে আত্মসাৎ না ক'রে ফেলে।

বৈদেশিক হলেই তা পরিত্যজ্য, এমন বিধানকেও সমর্থন করি না, কারণ, পাশ্চাত্ত্য প্রকাশভঙ্গীর প্রথায় যতটা বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশ আছে ততটা আমাদের নেই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রূপকল্পনার আদর্শকে তুলনা করলে দেখা যাবে, বিদেশী আদর্শে বাস্তবতাই রূপ-সৃষ্টির চরম সার্থকতা; এই কারণে রূপের সাদৃশ্য, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এদিক্ দিয়ে ভারতীয় সংস্কারবদ্ধ প্রত্যাশা সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের শিল্প-রীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট হওয়ায় শাস্ত্র-সম্মত নির্দ্দেশকে পালন না ক'রে উপায় ছিল না। এতে শিল্পীর ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস যথেষ্ট খর্ব্ব হলেও ভাবাত্মক রূপের কল্পনা এমনই দক্ষতার সহিত প্রকাশ হয়েছে যে মানুষের যে কোন স্বাভাবিক ও সহজ উচ্ছ্বাস, যেমন ভক্তি, ভয়, কাম, ক্রোধ, দুঃখ ও আনন্দ কোনটাই বাদ পড়ে নি, বরং বাস্তবকেই মহিমান্বিত ক'রে উচ্ছ্বাসের উদ্দেশ্যকে ঊর্দ্ধস্তরে তুলে নিয়েছে, যে স্তরে বিশ্বাস, বিশ্লেষণকে নিস্তেজ ক'রে আনন্দকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করার সুযোগ দেয়। রস-বিতরণের এইরূপ ঔদার্য্য পাশ্চাত্ত্য চিত্র বা ভাস্কর্য্যের রূপ-কল্পনায় কমই দেখা যায়। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, অতীতের এই বিরাট্ প্রাণশক্তি, নির্ভীকতা ও স্বাভাবিক সুস্থ বাসনাকে মানার সাহস আজ লুপ্ত। তেজস্বিতা অন্তর্দ্ধান করার কারণ কেবল আর্থিক সমস্যা নয়, পরিবর্ত্তিত সামাজিক সংস্কারের প্রভাবও আছে যথেষ্ট, চেষ্টালব্ধ নির্ব্বিকার-চিত্ততা ও নির্ম্মম নীতিবাদীদের কঠোর শাসনও জড়িয়ে থাকা অসম্ভব নয়।

প্রসঙ্গক্রমে ভাস্করের তরফ নিয়ে বলা চলে, অসাধারণ দৃঢ়চিত্ত ব্যতীত প্রকৃতিগত রুচি অনুসারে সব সময় মনের টানকে অনুসরণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, বিশেষ ক'রে যেখানে বিরুদ্ধগামী স্রোতের টান অধিকতর শক্তিশালী। ষাট বৎসর আগে যে রুচি প্রতিষ্ঠার পথে শক্তি সংগ্রহ করছিল তার পিছনে ছিলেন বিরাট্ পুরুষ অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল। সব কয়জনই ক্ষমতাশালী চিত্র-শিল্পী। তার পর নবজাগ্রত রসচেতনাকে প্রচার করার জন্য যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে হাভেল সাহেব, ডক্টর কুমারস্বামী, রামানন্দ চটোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী অগ্রণী, ব্রাউন সাহেবকেও বাদ দেওয়া চলে না। এতগুলি অসাধারণ পণ্ডিত ও রসিকের পৃষ্ঠ-পোষকতায় যে চাহিদা তৈয়ারী হয়েছিল তার সঙ্গে মূর্ত্তিকারের কোন যোগ ছিল না। যে কয়টি ক্ষমতাশালী শিল্পীর নাম করলাম তাঁদের মধ্যে একজনও চিত্রকর না হয়ে ভাস্কর হলে মূর্ত্তিকারের সংখ্যা হয়ত নগণ্যের পর্য্যায়ে পড়ত না।

প্রশ্ন:—(ক) এমন রসসৃষ্টি নিশ্চয় আছে যা চিত্র-শিল্পের আয়ত্তে নেই, ভাস্কর্য্যের আয়ত্তের মধ্যে আছে। সেটি কি?

(খ) এদেশে শিল্প-রসিকদের কাছে তার আবেদন (appeal) কি কম? যদি কম, ত কেন্ কম?

(গ) আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় চরিত্রের যা বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে এর কিছু যোগ আছে ব'লে কি আপনার মনে হয়?

উত্তর :—(ক) ভাস্কর্য্য ও চিত্রাঙ্কন উভয়ের প্রকাশরীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই কারণে উভয় ক্ষেত্রে যা প্রকাশ্য তাতে তারতম্য আসা স্বাভাবিক। ছবির বিষয়বস্তুতে যে ভাবে আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া সৃষ্টি করা চলে তা ভাস্কর্য্যে সম্ভব নয়। যেমন ছবির প্রাকৃতিক দৃশ্যে, আকাশের মেঘ, দূরের পাহাড় ও কাছের গাছকে ভাস্কর্য্যের আওতায় আনা চলে না। বাঁধা রং-এর পরিবেশন, দূর ও নিকটের পরিপ্রেক্ষিত রচনা, সর্ব্বোপরি ছবির ভিতরকার atmosphere। তুলনায় ভাস্কর্য্য কেবল নিজের রূপের উপর নির্ভর করে atmosphere-এর জন্য। সাংস্কারিক রীতি অনুসারে ভাস্কর্য্যে প্রধান আকর্ষণের বস্তু কয়েকটি সামঞ্জস্য ও অর্থপূর্ণ রেখার সমাবেশ যা অন্তর্নিহিত নীরেট রূপকে আগলিয়ে থাকে। এই জাতীয় রেখার সম্মেলনকে Frozen Rhythm বললে অত্যুক্তি হয় না। Rhythm-ই ভাস্কর্য্যের চরম সম্পদ্ যা আত্মপ্রকাশ করে আলোছায়ার পরিবেশনে। ছবিতে আলো ও ছায়া নিস্পন্দ, স্তব্ধ ও শাজানো ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে তার রূপের বিকাশ হয় আকাশের আলোককে আমন্ত্রণ ক'রে, অভিনন্দন জানিয়ে। খোদাই করা পাথর বা ঢালাই করা ভাস্কর্য্যের সহিত চলন্ত আলোর মেলামেশা যাঁরা দেখেছেন, মিলনক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় রূপের বিকাশকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে পেরেছেন তাঁরা বুঝবেন, আলোর সঙ্গে গঠিত-রূপের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আপন সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিভাবে ভাস্কর্য্য আলোর কৃপার উপর নির্ভর করে। তুলনামূলক দৃষ্টান্ত থেকে সিদ্ধান্তে আসা যাবে, ভাস্কর্য্যের আবেদন সীমাবদ্ধ। ছবির রাজ্য এদিক্ দিয়ে বহুবিস্তৃত।

(খ) সাধারণের কাছে মূর্ত্তি বা ছবির আবেদন কিভাবে আসে এবং কতটা তাদের অভিভূত করে তা প্রভাবের প্রসঙ্গে কতকটা বলেছি। আবেদনের উপলব্ধি আসে ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে। অপর দিকে রুচির সঠিক বিচার করলে প্রমাণ হবে, ব্যক্তিগত ভাবে রুচির উপর দাবী খুব কম লোকেই করতে পারে, কারণ, যাকে নিজস্ব মত ব'লে প্রচার করা হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনমতের সমর্থন। জনমত রুচির ভিত্তি গ'ড়ে দেয় অবচেতন মনের উপর। ভিত্তিরও মাল-মশলা সংগ্রহ হয় আবেষ্টনিক ও সাংস্কারিক প্রভাব থেকে। চলতি মতের বিরুদ্ধাচরণ করতে হলে সাহস ও পরিশ্রমসাপেক্ষ গবেষণার প্রয়োজন যা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের উপর আবেদন কতটা যথার্থ ও ফলপ্রদ বা কতটা গলদপূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে বলা শক্ত।

(গ) জাতীয় কৃষ্টি অর্থে বুঝি, সংস্কারবদ্ধ ও সমষ্টিগত জনমত যা এই ক্ষেত্রে কোন বিশেষ আদর্শকে অনুসরণ ক'রে চলে। জাতীয় বৈশিষ্ট্য ততক্ষণই আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বৈদেশিক প্রভাব (foreign cultural impacts) তাকে বশীভূত ক'রে ফেলে। আজকের দিনে, দেশ-বিদেশে, বহুবিধ আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে চিন্তাস্রোত চলেছে তার আকর্ষণ থেকে আমাদের দেশ বাদ পড়ে নি। এই সূত্রে ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, একই আদর্শ কোন দেশে, কোন সময়, চিরস্থায়ী হতে পারে নি। কাল-ধর্ম্মের প্রতি-ক্রিয়ায় পরিবর্ত্তনকে মানতে হয়েছে এবং মানায় বহুক্ষেত্রে জাতীয় সম্পদ্ সমৃদ্ধ হয়েছে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অধোগতির পথও দেখিয়ে দিয়েছে নির্ব্বিচারে ভাসমান সব-কিছুকে অবলম্বন করবার ফলে। আমরা চলেছি অধোগতির দিকে, আবেদন এসেছে আমাদের জন্মস্বত্বকে অস্বীকার ক'রে কৃষ্টির আসরে দেউলিয়া করার জন্য। আমাদের যা গৌরবের বস্তু ছিল তাকেও বিসর্জ্জন দিয়েছি না-বোঝা সম্পদ্ সংগ্রহের লোভে।

প্রশ্ন :—বিদেশে এই সময়কার চিত্র-শিল্পীদের ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবি যত সমাদর লাভ করেছে, মূর্ত্তি-শিল্পীদের গড়া মূর্ত্তি তা করে নি। কেন করে নি ব'লে আপনি মনে করেন?

উত্তর :—গত ষাট বৎসরের মধ্যে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে যে সব ছবি আঁকা হয়েছিল তাদের মধ্যে দুই-একটি ছাড়া সব কয়টিই আকারে অতি ক্ষুদ্র, miniature শ্রেণীভুক্ত বললে সত্যের অপলাপ হয় না। এই কারণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মূল ছবি পাঠানো ও প্রদর্শনীর [illegible] করায় কোন অসুবিধা ছিল না। বিদেশে যখন ভারতীয় ছবি সমাদর লাভ করছিল তখন ভারতে ren[illegible] সাড়া পড়েছে। সুতরাং পুনরভ্যুদয়ের আবহাওয়ায় নতুন আন্দোলনকে [illegible] কৌতূহল ও [illegible] আসা খুবই স্বাভাবিক। প্রদর্শনী উপলক্ষ্য ক'রে ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য যেভাবে প্রচার লাভ করেছিল তাতে অপ্রত্যাশিত কিছু ছিল না, কারণ, রূপের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছিল East and West-এর synthesis অবলম্বন ক'রে। দর্শক হঠাৎ অবোধ্য নতুনের মাঝখানে গিয়ে পড়ে নি। নতুন চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির সঙ্গে ওদের affinities থাকায় আমাদের ভাষা ও ভাবকে বোঝার কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি হয় নি। এতগুলি সুবিধা, নতুন ধারায় আঁকা ছবিতে জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও রসিকদের কাছে আকর্ষণের বস্তু না হলেই বরং ভিন্ন পক্ষের রুচি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হতে হ'ত।

অনেকে বলেন, যাঁরা এই প্রথায় ছবিকে ভারতীয় ধারায় ফেলবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা revivalists। এই প্রসঙ্গে কিছু বলবার আছে। Revivalism অর্থে বুঝি পুরাতনকে ফিরিয়ে আনা, মৃতপ্রায়কে পুনরুজ্জীবিত করা। অর্থ যদি ঠিক হয় তাহলে পথ-প্রদর্শক, অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালকে individualists-এর পংক্তিতে বসাতে হয়, revivalists-এর নয়। কারণ, উভয়ের কাজেই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এত বেশী যে দেশীয়ানার মারাত্মক গোঁড়ামি তাঁদের মোহমুগ্ধ করতে পারে নি। করলে রূপসৃষ্টির দাবীতে বেশ খানিকটা গলদ এসে পড়ত। কারণ, গোঁড়ামির প্রত্যাশায় যা প্রাধান্য পায় তা কতকগুলি রীতির পূজা, অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, যার সঙ্গে স্বাধীন চিন্তাশীলতার কোন যোগ নেই। তুলনায় স্বীকার করতে হয়, মূর্ত্তিকারের ভাগ্য লোভনীয় নয়। গত ষাট বৎসরের ভিতর যে কয়টি মূর্ত্তিকার বিদেশী ছাড়পত্রের কৃপায় আত্মপ্রসাদ লাভ করার সুবিধা পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা চিত্রশিল্পীর অনুপাতে শুধু নগণ্য ব'লে থামার উপায় নেই, অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিগ্ধ হতে হয়। এর প্রধান কারণ অনুমান করি, তখনকা রুচির অনুসারে উপযুক্ত আকর্ষণের অভাব, কৌতুহলোদ্দীপক কিছু না থাকায় বিদেশী সমালোচকদের খোঁজার তাগিদও ঝিমিয়ে ছিল। ঐ যুগের ভাস্কর যে ভাষার দ্বারা ভাব অভিব্যক্তির চেষ্টা করেছেন তা বেশীর ভাগই academic studyর ঊর্দ্ধে উঠতে পারে নি। এবং যারা ছাত্রনবীশীর গণ্ডী পার হয়ে জোর দিয়েই নিজেদের বক্তব্যকে প্রকাশ করেছিলেন বা করছেন তাঁদের ভাষাও বৈদেশিক, তবে বলার কথার সঙ্গে দেশের মাটির ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, সাহেবীয়ানার দোহাই পেড়ে নিজেদের অতিমানব প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ত হন নি।

ব্যাপক প্রচার সম্বন্ধে আরো একটি বাধাকে সঙ্গত ব'লে মানতে হয়, যা মূল কাজের সহিত বিদেশী রসিকদের ঘনিষ্ঠতা না থাকা। অধুনা যে কয়টি কাজ বাইরে সমাদর লাভ করেছে তা ফোটোর সাহায্যে, পরিব্রাজক সমালোচক দ্বারা।

আজকের ভাস্কর হয়ত ঝোড়ো হাওয়ায় ঘুরপাক খেত না যদি আপন গোষ্ঠীতে দরদের দৈন্য সংক্রামক ব্যাধির আকারে তাকে ঘিরে না ফেলত। যদি আমরা প্রাচীন team work-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে কাজকে বড় ক'রে দেখতাম, পরশ্রীকাতরতার পরিবর্ত্তে সৌহার্দ্য এগিয়ে চলার পথকে সহজ ক'রে দিত।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের প্রাচীন ভাস্কর্য্যের কথা আসে যা বিদেশে ছবি অপেক্ষা কিছুমাত্র কম সমাদর পায় নি, কারণ, মূল মূর্ত্তিগুলির সহিত রসিক-সম্প্রদায় ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইত্যাদি দেশের সরকারী মিউজিয়ামে রক্ষিত যে সব মূর্ত্তি কলাকেন্দ্রে বিশিষ্ট স্থান আপন সত্তায় অধিকার ক'রে রসিকদের নিকটে টেনে নিয়ে আসে, তাদের প্রকাশভঙ্গীতে যে বলিষ্ঠতা আছে তা সচরাচর তৎকালীন ছবির মধ্যে পাওয়া যায় না। খুব সম্ভবতঃ ছবিতে বিষয়বস্তু অনুসারে balancing assetsএর এলোমেলো ভাবে রচনা এর কারণ। প্যারিসের বিশ্ববিখ্যাত অমর ভাস্কর রোদাঁ দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জ নটরাজ-মূর্ত্তির বর্ণনায় এমনই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন যে মনে হয়, নিজেকে নত করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমি ছবি আঁকি, মূর্ত্তি গড়ি। কোন্‌টায় কতটা সাফল্য লাভ করেছি, অথবা মোটের উপর আমার কাজকে সুনজরে দেখা যায় কি না তার বিচার উপস্থিত স্থগিত রাখলে বলতে পারি, উভয়ের প্রতি আমার টান সমান, সুতরাং আশা করি, পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আমাকে কোন বিশেষ দলভুক্ত ক'রে দেবে না।

প্রশ্ন : সেকালের শিল্পীরা কতকগুলি শিল্পানুশাসন মেনে মূর্ত্তি গড়তেন। আজকালকার মূর্ত্তিশিল্পীর তা করেন না। দেব-দেবীর সাম্প্রতিক মূর্ত্তিগুলিতে অত্যন্ত বেশী বাস্তব আধুনিকতা লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয় যদি আপনার বক্তব্য কিছু থাকে ত বলুন।

উত্তর : দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠনে (বাৎসরিক পুজোপলক্ষ্যে মাটির ঠাকুর) অবাঞ্ছনীয় বাস্তবতার আবির্ভাব, ঠিক সাম্প্রতিক ঘটনা বলা চলে না। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও, ভিন্ন প্রকারে ঐ জাতীয় মূর্ত্তিগঠনের প্রচলন ছিল যা সাময়িক চাহিদার দ্বারা অনুপ্রেরিত হ'ত। তখন সুদর্শন পুরুষের আদর্শ ছিল পিসীমার ভাল ছেলে। যার রূপ-ব্যাখ্যায় শোনা যেত স্ফীত উদর, নধর গৌরকান্তি, যেন ননীর পুতুলটি। সুদর্শন মানুষের আদর্শে দেবতার রূপকল্পনা অশোভনীয় না হলে দৃষ্টান্ত সহজেই পাওয়া যায়, যেমন দেব-সেনাপতি কার্ত্তিক। রণবীর ননীর পুতুল হয়েই নিষ্কৃতি পান নি, উৎসবের আসরে যোগ দিতে হলে পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্যকেও মানতে হয়েছে। এই কারণে তৎকালীন ফ্যাশন অনুসারে কালাপেড়ে কোঁচান ধুতি ও খাস বিলাতী ঢংএর পাম্প-সু পরাটা ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে প'ড়ে গিয়েছিল। হাজার হোক কার্ত্তিক, দেবকুলে উচ্চবংশজাত, সুতরাং সৌখিনতার অন্ততঃ যৎকিঞ্চিৎ আভাস

থাকা দরকার। এই প্রসঙ্গে বলি, তাণ্ডব নৃত্যে অভ্যস্ত, দুর্দ্ধর্ষ ব্যায়ামবীর মহাযোগী শিবও অতিরিক্ত মেদ বহনের কর্ত্তব্য থেকে পরিত্রাণ পান নি। বাড়ন্ত উদর সৌন্দর্য্যের আদর্শ হওয়ায়, তাঁকেও বেশ মোটাসোটা চেহারা নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে দর্শন দিতে হ'ত। দৃষ্টান্ত সামনে থাকায়, এ যুগে যদি নামকরা সাঁতারু, সিনেমা-তারকা অথবা Beauty Competitionএ জয়টীকা প্রাপ্ত মিঃ বা মিস ইউনিভার্সদের মধ্যে কারো সাদৃশ্য টেনে দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়া হয় তাহলে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

দেবতা যখন সুন্দরের প্রতীক তখন নাগালের বাইরে শাস্ত্রসম্মত কাল্পনিক আদর্শকে খোঁজা অপেক্ষা, যা কাছে পাওয়া যায় এবং যা প্রত্যক্ষ তাকেই আঁকড়ে থাকা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হয়ে পড়ে। এইরূপ যথেচ্ছাচারিতা, শাসনাধীন হবার কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ, যে সূত্র থেকে শাসন আসার কথা সেইখানেই ত গলদ। ভক্তি থাকলে তবেই শাস্ত্রের বচন সম্বন্ধে মানুষ সতর্ক হয়, কিন্তু যে আবেষ্টনীতে ভক্তির পরিবর্ত্তে প্রমোদের প্রত্যাশা বেশী সেখানে সহজলভ্যকে নিয়েই উৎসবের সাফল্য খুঁজতে হয়। প্রগতিশীলতার হুজুগ যেভাবে রুখে উঠেছে তাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হবার কিছু নেই। ফোক্ আর্টের (folk art) প্রতিই উপস্থিত আকর্ষণ দেখা যায় বেশী। এই অজুহাতে যদি জগন্নাথের নবকলেবর গড়ার ভার কোন surrealism-পন্থী সাহেব মূর্ত্তিকারের উপর পড়ে এবং রথযাত্রার উৎসবে রথ টানার ভার Rolls Royce engine-এর উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে Modernism-এর প্রকোপে প্রাচীন বর্ব্বরতা মার্জ্জিত হতে পারে, কিন্তু ভক্তকে তখন খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। রথ টানায় ভীড় একটি Carnival জাতীয় sight seeing-এর আয়োজন হয়ে দাঁড়াবে। এইরূপটি কখন ঘটত না যদি পূজার উদ্যোক্তারা আমাদের প্রাচীন মূর্ত্তি বিভিন্ন মন্দির ও গুহায় দেখার সুযোগ নিতেন এবং মূর্ত্তি-শিল্পীরা প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র কিছু অধ্যয়ন করতেন।

অশোভনীয় বাস্তবতার পীড়ন থেকে বাঁচতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন। যার জন্য নিজেদেরই উদ্যোগী হতে হয়।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে, উড়িষ্যাতে এমন অনেক দক্ষ মূর্ত্তি-শিল্পী আছে যারা পুরুষানুক্রমে গতানুগতিক ভাবে এই শিল্পের চর্চ্চা বজায় রেখে চলেছে। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা এদের শিল্প-বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করা উচিত ব'লে কি আপনি মনে করেন ? যদি তা মনে করেন ত সেজন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনীয় ?

উত্তর : গতানুগতিকতার সহিত দক্ষ কারিগরীর যোগ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কেবল ছকে বাঁধা কারিগরীর উপর নির্ভর ক'রে উচ্ছ্বাস-জাত রূপসৃষ্টি সম্ভব নয়, কারণ, ফরমায় ফেলা দক্ষতা, রেলপথে চলার মত সোজাই চলে। গম্যস্থল কর্ত্তার আদেশে নির্দ্দিষ্ট হয়, চালকের ইচ্ছায় গাড়ী মোড় ঘোরে না, এমন কি গাড়ীর গতি পর্য্যন্ত হিসাবের মধ্যে না রাখলে জবাবদিহির জন্য চালককে ডাক পড়ে। সুতরাং যারা পুরুষানুক্রমে বাধ্যতামূলক কাজে অভ্যস্ত, তাদের স্বাধীন চিন্তার লোভ উত্তেজিত করলেও সাহস ও শক্তির অভাবে নতুন পথে অগ্রসর হতে পারে না। এই সূত্রে কবি ও পণ্ডিতের তুলনামূলক দৃষ্টান্ত টেনে আনা যায়। পণ্ডিত জ্ঞানী পুথিগত বিদ্যার ভাণ্ডারী, বিরাট্ সম্পদের মালিক কিন্তু ঐশ্বর্য্য ব্যবহারে অনভ্যস্ত। কবি ভাবুক ও রসস্রষ্টা। পণ্ডিত যতই পুথি ঘাঁটুন, রসসৃষ্টির প্রয়োজনে স্বতঃপ্রবৃত্ত উচ্ছ্বাস যদি অন্তরকে বিচলিত না করে তাহলে সৃষ্টির আবেগ বেকার অবস্থায় থেকে যায়, কারণ, ভাবের কেন্দ্রে পণ্ডিতের আসল কাজ পাহারাদারী, জ্ঞান ও ভাষাকে শাসনে রাখা। ঐটুকু কর্ত্তব্য পালন করতে পারলেই পণ্ডিতের চরম লাভ। একান্তই বলার তাগিদ বেড়ে উঠলে গবেষণা আঁকড়ে থাকতে হয়, যা শোনার জন্য রসিক উদ্‌গ্রীব নয়।

পৃথিবীটা যে ঘটনা-পূর্ণ স্থান, মানুষের সুখ দুঃখের কাহিনী ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে, সুন্দরের সংস্পর্শে আনন্দের খোরাক পাওয়া যায় তা পণ্ডিতের ভাবার অবকাশ নেই, সে বিদ্যার গুদামে পাহারা দিতে পারাটাই বাঁচার চরম সার্থকতা মনে করে। এই সূত্র অনুসরণ ক'রে, শিল্পবুদ্ধিকে মার্জ্জিত করার কথা বলি। "মার্জ্জিত" বললেই নতুনকে খোঁজার কথা ওঠে, আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু যেখানে কারিগরীর বাইরে, ভালমন্দের বিচার নেই কিংবা আসতে পারে না, সেখানে রসচেতনাকে নতুন আদর্শের প্রতি প্রলুব্ধ করা যায় কেমন ক'রে ? কারিগরদের মধ্যে বেশীর ভাগই হাতের কাজেই জীবন কাটায়। আগেই বলেছি, ওদের কারবার যন্ত্রচালিত, সুতরাং হাতের সঙ্গে মাথার যে যোগ থাকতে পারে সে কথা ওরা বিশ্বাস করতে চায় না। এটা দীক্ষার মূলমন্ত্র, কারণ প্রচলিত নক্সায় অদল বদল হলে ব্যবসার ক্ষতি সুনিশ্চিত। বিকি-কিনির বাজারে যাচিত জিনিষের

কাঠামোয় পরিবর্ত্তন এলে ক্রেতা দ্বিধার ফাঁপরে প'ড়ে যায়, কারণ, প্রতি গ্রামেই স্থানীয় কাজের যে বৈশিষ্ট্য থাকে তা ক্রেতার পক্ষে শুধু আকর্ষণের বস্তু নয়, প্রত্যাশাও থাকে যথেষ্ট। এছাড়া কলা-নৈপুণ্যের গর্ব্ব ত আছেই, যা স্থানীয় কারিগরের কাছে সব সময় ভিন্ন কাজের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এমত অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর কারিগরদের মার্জ্জিত করার চেষ্টায় প্রাচীন নক্সা উধাও হবেই এবং তার পরিবর্ত্তে পাম্পসু-পরা কার্ত্তিক অপেক্ষা উদ্ভট কিছু এসে যাওয়া বিচিত্র নয়। আমার মতে, রসচেতনাকে মার্জ্জিত করা সম্ভব হলেও, শিল্পী-মনোবৃত্তি চেষ্টার দ্বারা আরত্ত করা যায় না। সুতরাং দক্ষ-কারিগরের কাছ থেকে কিছু পেতে হলে ওদের কর্ম্ম-কৌশল অর্থাৎ রূপ-প্রকাশের রীতি যদি উদীয়মান শিল্পীরা কিছুটাও সংগ্রহ করতে পারে তাহলে উভয় পক্ষেরই লাভবান্ হওয়ার আশা থাকে প্রচুর। শিল্পী ও কারিগরের মধ্যে রসচেতনা ও কলা-কৌশলের আদান-প্রদান সহজেই হতে পারে যদি সরকার ও জনসাধারণ মিলিত ভাবে এদিক্ দিয়ে সচেষ্ট হন। সরকারের কথা উত্থাপন করলাম, কারণ, দূর-গ্রামে নিরালায় বসবাসের জন্য শহরের শিল্পীকে প্রস্তুত হতে হলে আর্থিক সমাগমের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে হওয়া দরকার। মূর্ত্তি-শিল্পের রসগ্রাহী এমন কাকেও জানা নেই যাঁর নিকট অর্থের জন্য শরণাপন্ন হওয়া চলে।

প্রশ্ন: ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে ভাস্কর্য্যের তথা মূর্ত্তি-শিল্পের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আপনার বক্তব্য বলুন।

উত্তর: বর্ত্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হলে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি মুখ্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

আধুনিক শিক্ষা বলতে প্রথমেই মনে আসে বাস্তববাদী আকাদামিক প্রথা। বিদেশী পদ্ধতির প্রতি হতশ্রদ্ধার প্রয়োজন দেখি না। কারণ, আজকের জীবন-ধারায় বিদেশী অনেক কিছুকেই নিজেদের ক'রে ফেলেছি। দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হলে দেখা যাবে, ঘরে বাইরে বিদেশী প্রভাবের অন্ত নেই। এমন কি উচ্চ-শিক্ষার মূল খুঁজলে পাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজীকে অবলম্বন ক'রে আমরা জ্ঞান সংগ্রহ করেছি এবং এখনও করছি। ফলে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারিক জীবনে প্রায় অপরিহার্য্য হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসার কেন্দ্রে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিধানের প্রচলন থাকলেও আজ চিকিৎসক বলতে আমরা ডাক্তারকেই বুঝি। যেসব বিদেশী প্রভাব বা সামগ্রীর ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি তাদের আজ ঘরোয়া ব'লেই মানতে হয়, বিদেশী ব'লে বাতিল করার উপায় নেই। তবে যা আত্মসাৎ করায় অজীর্ণের আশঙ্কা থাকে তা বর্জ্জন করাই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

ইংরেজীর সূত্রে ভাষার কথায় ফিরে আসি। আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে, বিদেশী কথিত বা লিখিত ভাষাকে গ্রহণ করা সঙ্গত হ'লে মূর্ত্তি গঠনেও বিদেশী ভাষাকে নিজের ব'লে মানা চলে, যদি ঘরোয়া কথা বিদেশীদের অনুকরণে আড়ষ্ট না হয়ে যায়, যদি দেশের মাটি থেকে মন না দূরে চ'লে যায়।

দ্বিতীয়, শিক্ষাপদ্ধতির প্রশ্নে আসে প্রাচীন মূর্ত্তিগঠনের প্রভাবের সক্রিয় স্বীকৃতি। এদিক্ দিয়ে কতকটা সাফল্য তখনই আশা করা চলে যখন কারিগর, শিল্পী-মনোবৃত্তি নিয়ে ভাব প্রকাশে সচেষ্ট হয়। "কতকটার" দ্বিধা, হঠাৎ এগিয়ে আসে নি, বিশেষ চিন্তা ক'রেই লিখেছি। পুরাতনকে বর্ত্তমান আবেষ্টনীর মধ্যে ফিরিয়ে আনায় দেশপ্রীতি প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় পক্ষপাতিত্ব বনাম Patriotism-এর সহিত আর্টের বিশেষ সম্ভাব নেই, কারণ, আর্টের জগৎ এতই বিস্তারিত যাকে Nationalism-এর গণ্ডীতে আটক রাখা যায় না। "A thing of beauty is a joy for ever." এই সূত্রে ছত্রটি বিশেষ ভাবে স্মরণ করি। সত্য ও সুন্দরের সঠিক বিবরণ দেবার স্পর্দ্ধা আমার নেই, তবে রূপের অন্তর্নিহিত সত্য যাই হোক, তার গুণকে স্বীকার করা নির্ভর করে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর। প্রসঙ্গক্রমে আরো বলতে চাই, আর্টের মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়, বিশেষ ক'রে উচ্ছ্বাস-জড়িত বিষয়বস্তু (subject matter), তার সঙ্গে সাময়িক আবেষ্টনীর প্রভাব একেবারে না থাকলে discord এসে পড়ে, যা আর্টের ধর্ম্ম নয়, কারণ, সুন্দরের অস্তিত্ব নির্ভর করে harmony-র উপর।

প্রাচীনকালে ধর্ম্মানুষ্ঠান অবলম্বন করে যে-সব মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলির জন্ম গুহা-স্থাপত্যের গর্ভে, মন্দিরের গাত্রে অথবা মন্দিরেরই আশে-পাশে। স্থাপত্য ও মূর্ত্তির ঘনিষ্ঠতায় যে আবেষ্টনী গ'ড়ে উঠেছিল তাতে ছিল সামঞ্জস্যের পরিপূর্ণতা। আজকের আবেষ্টনীতে পুরাতনের কোন আভাস পর্য্যন্ত নেই। বাঁচার ধারা, সুন্দরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী সব কিছু বদলে গিয়েছে। তদুপরি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পী ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট অনুশাসনের বিরুদ্ধে এমন ভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে যে নতুন আবহাওয়ার মধ্যে হাজার হাজার বৎসর আগের রূপকল্পনা, ও প্রকাশভঙ্গীর রীতিকে খাপ খাইয়ে নেওয়া দুরাশার বস্তু ব'লে মনে করি। এই দুঃসাধ্য প্রয়াসকে সামঞ্জস্যের দিকে

আনতে হলে, প্রাচীন ও নতুন ভাষায় অভিজ্ঞ শিল্পীর সহকারিতা প্রয়োজন। ভবিষ্যতের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে, কয়জন মূর্ত্তিকার আছেন যাঁর উপর এত বড় বিপদ্-সঙ্কুল দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে ?

তৃতীয়, গুরুকুল প্রথা, যা আমার মতে ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নির্ভরশীল পদ্ধতি। গুরু বলতে তাঁকেই উল্লেখ করেছি যিনি শিষ্যের কাছে শিক্ষার্থী হতে পারেন, যিনি শিক্ষাদানের শেষে শিষ্যের সাফল্যকে নিজের সাফল্য মনে করেন, শিষ্যকে বড় ক'রে তোলায় গর্ব্ব অনুভব করেন, যিনি একত্রে বন্ধু, দীক্ষাদাতা ও পিতৃস্থানীয়, যিনি দরদকে আড়ালে রেখে শাসনকে কার্য্যকরী করেন।

Mass education-এর যুগে উক্ত গুণসম্পন্ন গুরু বিরল, কারণ আজকাল শিক্ষাপদ্ধতিতে যে নব-সংস্করণ এসেছে তাতে শিক্ষককেই শিক্ষার্থীর কাছে শাসনাধীন হয়ে থাকতে হয়।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় অধ্যাপক অদল-বদল (exchange of professors) এবং ছাপানো ছাড়পত্রের (diploma, degree, ইত্যাদি) আশায় যাঁরা শিক্ষা সুরু করেন তাঁরা শিক্ষার শেষে ছাপমারা মানুষ হতে পারেন, কিন্তু শিল্পী হন কি না সন্দেহজনক।

—০—

ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগৃতি

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

১৯৫০ থেকে সুরু ক'রে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি প্রাচ্যশিল্পের প্রভাব ভারতীয় সমাজে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। এই নূতন শিল্পরুচির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ রাজা রবিবর্মা। রাজা রবিবর্মা ও তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের রচনা সমগ্রভাবে যে রুচিকে প্রকাশ করে তা আদর্শ শিল্পরুচি বলা চলে না। নূতন রকমের আঙ্গিক বা করণকৌশলের আকর্ষণেই ভারতীয় শিল্পীরা পাশ্চাত্ত্য শিল্প-আদর্শকে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছিলেন।

যদিও আমরা ব'লে থাকি যে, ইউরোপীয় শিল্প-আদর্শকে ভারতবাসী সে সময় অনুসরণ করেছিলেন, যথার্থভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই বিশেষ আদর্শকে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ না ব'লে উনবিংশ শতাব্দের British Academyর আদর্শ বলাই সঙ্গত।

British Academy ও Kensington বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীদের প্রভাব কাটিয়ে নূতন ভাবে শিল্পের সূচনা করেছিলেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ।

অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা সুরু হয় সমকালীন আদর্শ অনুযায়ী বিলেতী পদ্ধতিতে। সে সময় তাঁর আদর্শ এবং তৎকালীন শিল্পীদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। সংক্ষেপে, প্রথম জীবনে রাজা রবিবর্মা, অন্নদা বাগচী, বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইত্যাদি শিল্পীদের সমতুল্য আদর্শই অবনীন্দ্রনাথ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের পরিবর্তন যে ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে, সে বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর "জোড়াসাঁকোর ধারে" পুস্তকে স্পষ্টভাবে বলেছেন। তাঁর নানা উক্তি ও "জোড়াসাঁকোর ধারে" পুস্তকে উল্লিখিত ঘটনা থেকে এইটুকু নিঃসন্দেহে আমরা বুঝতে পারি যে, ভারতীয় পুরাতন চিত্রকলার নিদর্শন থেকে তিনি চিত্রের ক্ষেত্রে মৌলিক রচনার প্রেরণা পান।

চিত্রের মাধ্যমে ভাবপ্রকাশের ইচ্ছা বা চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে অবনীন্দ্রনাথ করেন নি। বিশেষভাবে বিলেতী Illumination ও ভারতীয় চিত্রের মধ্যে একটি মিল তাঁর চোখে পড়েছিল। তিনি অনায়াসে বুঝেছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য চিত্রপরম্পরা কেবল স্বভাবের অনুকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মৌলিক রচনায় স্বাধীনতা ও তার অনুরূপ ভাষার সন্ধান অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনে ও তাঁর রচনায় দিক্-পরিবর্তন ক'রে দিল।

অবনীন্দ্রনাথের এই নবলব্ধ প্রেরণা থেকেই প্রকাশিত হ'ল রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী। রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নিজ অঙ্কিত চিত্র

দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে, অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প-পরম্পরাকে একান্তভাবে বা বিশুদ্ধভাবে অনুসরণ করছেন না।

অবনীন্দ্রনাথের রচিত ছোট আকারের এই ছবিগুলিতে তাঁর বিলাতী শিক্ষার প্রভাব যেমন স্পষ্ট, তেমনি প্রত্যক্ষ করা যায়, ভারতীয় চিত্র-রচনার বৈশিষ্ট্যটিও আয়ত্ত করার প্রয়াস।

অবনীন্দ্রনাথের সমকালীন চিত্রকরদের রচনার সঙ্গে তুলনা করলেও এই ছবিগুলির মৌলিকত্ব ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব বুঝতে অসুবিধে হবে না। প্রাচ্যশিল্পের মণ্ডনধর্মী বাঁধুনি এবং পাশ্চাত্ত্য বর্ণপ্রয়োগের কৌশলের যোগে এ ক্ষেত্রে শিল্পের নূতন একটি ভাষার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতির মধ্যে যে প্রচুর ব্যবধান সে সময় এশিয়ার সর্বত্র বর্তমান ছিল তারই প্রথম ও সার্থক মীমাংসা পাওয়া গেল অবনীন্দ্রনাথের রচিত' কৃষ্ণলীলা বা রাধা-কৃষ্ণ চিত্রাবলীতে।

অবনীন্দ্রনাথ যখন রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তখনও তিনি তাঁর ইংরেজগুরু পামারের কাছে বিলাতী পদ্ধতিতে চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করছেন। শিল্পী পামার অবনীন্দ্রনাথের এই নূতন প্রয়াসকে অভিনন্দন জানান এবং পাশ্চাত্ত্য রীতির অনুকরণ বা অনুসরণ-চেষ্টার পরিবর্তে তাঁর উদ্ভাবিত-পথে অগ্রসর হ'তেই তাঁকে উৎসাহিত করেন।

অবনীন্দ্রনাথ যে সময় রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী রচনা করছিলেন সেই সময় ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা।

ই. বি. হ্যাভেল কেন্‌সিংটনের শিক্ষাপ্রাপ্ত অন্যান্য ইংরেজের মতই এদেশে এসেছিলেন ভারতবাসীকে পাশ্চাত্ত্য শিল্পের শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু হ্যাভেলের দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলেছিল। ই. বি. হ্যাভেলই সর্বপ্রথম ভারতবাসীকে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে সচেতন করেন। তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় অবনীন্দ্রনাথ কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে সহকারী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।

ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় শিল্পীকে ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষাদানের দায়িত্ব দেওয়া যাবে এ কেউ কল্পনাও করে নি।

হ্যাভেল সাহেবকে অবনীন্দ্রনাথ গুরু ব'লে স্বীকার করেছেন। কারণ, হ্যাভেল সাহেব অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় শিল্পের আদর্শ ও তার আঙ্গিক সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দেবার পক্ষে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সহায় হয়েছিলেন।

মোগল শৈলীর সূক্ষ্ম কারুকার্য, অনবদ্য রেখা অবনীন্দ্রনাথ পরিশ্রমের সঙ্গে আয়ত্ত করেন। যদিও রেখাচিত্রের বাঁধুনি অবনীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন, স্বভাবানুগত বর্ণব্যবহার তিনি কোনদিনই ত্যাগ করেন নি। 'শাজাহানের মৃত্যু' ছবিতে অবনীন্দ্রনাথের আঙ্গিকের যে বৈশিষ্ট্য তা তাঁর পরবর্তী রচনাতেও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত বা পরিত্যক্ত হয় নি।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের আর একটি স্মরণীয় মুহূর্ত জাপানী মনীষী ওকাকুরা কাকাজুর সঙ্গে পরিচয়। ওকাকুরা কাকাজু পণ্ডিত ফেনলসার শিষ্য এবং জাপানের শিল্প-জাগরণের ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ।

স্বামী বিবেকানন্দের নিমন্ত্রণে ওকাকুরা এদেশে আসেন। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে, বিশেষতঃ সুরেন ঠাকুরের সঙ্গে, তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। ওকাকুরার চেষ্টায় জাপানের তরুণ শিল্পী ইওকোহামা টাইকান এদেশে আসেন। টাইকান এদেশে এসেছিলেন ভারতীয় শিল্পের চর্চা করতে।

টাইকানের আঁকবার কায়দা অবনীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করে এবং টাইকানের আঙ্গিকের অনুসরণে তিনি কয়েকখানি ছবি করেন। অবনীন্দ্রনাথের এই চেষ্টার নিদর্শন স্বরূপে উল্লেখ করা যায় 'আকাশবিহারী যক্ষদম্পতি' (Yakshas of the Upper Air), 'ভারতমাতা', 'চাঁদের আলোয় জলসা' (Moonlight Party)। রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে যেমন দেখি ভারতীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করার প্রয়াস, তেমনি উল্লিখিত ছবিগুলিতে জাপানী আঙ্গিক আয়ত্ত করার কিঞ্চিৎ চেষ্টা আছে। 'যক্ষ' ছবিটি সম্বন্ধে ১৯১৪ সালে বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক Roger Fry-এর বিরুদ্ধ সমালোচনা আমাদের রসিক-সমাজে সুপরিচিত। Roger Fry-এর এই উক্তির প্রভাবে ভারতীয় রসিক-সমাজের হয়ত ধারণা হয়েছে যে, অবনীন্দ্রনাথের চিত্র জাপানী আঙ্গিকের উপর প্রতিষ্ঠিত ও জাপানী প্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন। পরপ্রত্যয়শীল বিদ্বজ্জনের পক্ষে দেখার বদলে শোনার দ্বারা এরূপ 'বিচার-বিড়ম্বনা' হবারই কথা।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের ক্ষেত্রে জাপানী প্রভাব ক্ষণস্থায়ী। এই প্রভাবের বিবর্তন অল্পকালের মধ্যেই তাঁর

প্রতিভার নিজস্ব একটি পরিণতিতে বিলীন হয়েছে। তাঁর রচিত 'বিরহী যক্ষ' বা 'ওমর খৈয়ামে'র চিত্রাবলীতে ভারত, ইউরোপ ও জাপানের পরম্পরার সমন্বয় যে সার্থক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে সে সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত খোলা-চোখ রসিকের মনে সংশয়ের অবকাশ নেই।

অবনীন্দ্রনাথের রচিত শিল্প ও তাঁর স্বকীয় 'ভাষা'ই কালে অবনীন্দ্রনাথ-ধারা তথা Tagore School বা Bengal School নামে পরিচিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পধারা ও তাঁর প্রভাব ঠিক এক বস্তু নয়।

১৯০৫ সালের কাছাকাছি অবনীন্দ্রনাথকে বেষ্টন ক'রে যে তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী মিলিত হন, তাঁরাই পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথের আদর্শ দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যমণ্ডলীর সকলেই আজ দেশের কাছে সুপরিচিত। তাঁদের প্রতিভার দান যেমন মূল্যবান্ তেমনি আচার্যরূপে তাঁদের ঐতিহাসিক মূল্যও অল্প নয়।

অবনীন্দ্রনাথের অনুবর্তীদের মধ্যে নন্দলালের প্রভাব সর্বপ্রধান। তাই নন্দলালের উল্লেখ সর্বপ্রথমে করা গেল।

নন্দলাল আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে এনেছেন প্রাচীন পরম্পরার বাঁধুনি। অজন্তা, রাজস্থান বা নেপালের চিত্র ও মূর্তির আলঙ্কারিক ছাঁদে এগুলি নন্দলালের শিল্পের মাধ্যমেই জনপ্রিয় ও শিল্পভাষার ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়েছে। অতীতের সঙ্গে নন্দলালের মনের সহজাত যোগ ভারতীয় আদর্শ আঙ্গিক ও সংস্কারকে চিত্রের ক্ষেত্রে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলতে ও প্রকাশ করতে তাঁকে সাহায্য করেছিল। আগন্তুক পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের সঙ্গে নন্দলালের পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল না। এদিক্ দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই তিনি পাশ্চাত্ত্য শিল্প ও নব্য আঙ্গিক শিখেছিলেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথকে অনুসরণ ক'রেই নব্যকালের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

অবনীন্দ্রনাথের আঙ্গিকের আশ্রয়ে নন্দলাল প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরার অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অবনীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন পরম্পরা এ দুয়ের মিশ্রণ ও সংঘাত নন্দলালের রচনার বহিরাবরণকে চিহ্নিত ক'রে রেখেছে। প্রথম জীবনে রচিত 'শিব-সতী', 'জগাই-মাধাই', 'গোকুল ব্রত', 'কুমারী ব্রত', ইত্যাদি চিত্রে যেমন তিনি অবনীন্দ্রনাথের অনুগামী, অপরদিকে রামায়ণের চিত্রাবলী বা 'অগ্নি' ইত্যাদি চিত্রে তিনি পরম্পরার অনুগামী, পরম্পরার দ্বারা প্রভাবান্বিত। ভারতীয় ভাব ও ভারতীয় আঙ্গিক, উভয় কারণেই নন্দলাল ভারতীয় শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারকরূপে প্রথম জীবনে জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের অনুবর্তী ও নন্দলালের সতীর্থ বেঙ্কট আপ্পা, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও অসিতকুমারের প্রভাব ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণে অল্প নয়।

পূর্বোক্ত শিল্পীদের মধ্যে বেঙ্কট আপ্পা মুঘল শৈলীর দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য, বর্ণাঢ্যতা, বাস্তবতা—এই তিন দিক্ দিয়েই বেঙ্কট আপ্পার রচনার বৈশিষ্ট্য। শিল্পী অসিতকুমারের মধ্যে পরম্পরার প্রভাব অপেক্ষা অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। আঙ্গিক অপেক্ষা ভাবুকতা ও কবিসুলভ রূপকল্পনা অসিতকুমারকে জনপ্রিয় করেছে। অসিতকুমারের সচেতন রূপক রচনার প্রয়াস অপেক্ষা তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে যে গীতিধর্মী lyric সুষমা তাই বিশেষভাবে তাঁর স্বকীয়।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম অনুবর্তীদের মধ্যে ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাংলার প্রাণকে যে ভাবে স্পর্শ করেছেন তার তুলনা বিরল। শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবন আশ্রয় ক'রে বাঙালীর পল্লীজীবন এবং তার সহজ সরল সরস ও ঐকান্তিক ধর্ম-সংস্কারকে প্রাণকে যেমন তিনি রূপায়িত করেছেন, তেমনি কৃষ্ণের অলৌকিক ভাগবতী লীলার মধ্য দিয়ে সেই একই কথা তিনি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। লৌকিক ও অলৌকিক উভয়ের সীমার মধ্যে ক্ষিতীন্দ্রনাথের রচনা একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পেয়েছে। বৈষ্ণব কবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উক্তি—'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'—ক্ষিতীন্দ্রনাথের প্রতিভার ক্ষেত্রেও সত্য হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম অনুবর্তীদের রচনা সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল, তার থেকে একথা সহজেই বোঝা যাবে যে, অবনীন্দ্রনাথ কোন নির্দিষ্ট নীতি পদ্ধতি তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর উপর আরোপ করার চেষ্টা করেন নি। তাঁর কাছে এসে প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী উপযুক্ত পরিবেশটি পেয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর প্রভাবে যে বিশেষ শিল্প-পরম্পরা দেখা দিয়েছিল তারই সুস্পষ্ট প্রভাব আমরা পাই পরবর্তীকালের সোসাইটি-যুগের শিল্পীদের মধ্যে।

১৯০৭ সালে ই. বি. হ্যাভেল, স্যার জন উডরফ, সিস্টার নিবেদিতা-প্রমুখ ভারত-শিল্পোৎসাহী অনেকের চেষ্টায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুবর্তীদের রচনার প্রথম প্রদর্শনী হতে থাকে এই সোসাইটির উদ্যোগে। সোসাইটি স্থাপিত হ'লেও অবনীন্দ্রনাথের বাসভবন সে সময় হয়ে উঠেছিল শিল্পীদের তীর্থক্ষেত্র বা মিলনক্ষেত্র। অবনীন্দ্রনাথের অতুলনীয় শিল্পসংগ্রহের সাহায্য নিয়েই কুমারস্বামী তাঁর Indian Drawing ইত্যাদি পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ করেন। টাইকান, উইলিয়াম রোদেনস্টাইন, ইত্যাদি বিদেশী শিল্পীরা অবনীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতিকে জানবার বোঝবার জন্য।

অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে শিল্পসৃষ্টির যে আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, তারই পরিণামে বহু তরুণ যুবক অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সকলেই যে অবনীন্দ্রনাথের কাছে সাক্ষাৎভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা করেছিলেন এমন নয় কিন্তু শিল্পরচনায় উৎসাহী বাঙালীমাত্রেই অবনীন্দ্রনাথকে গুরু ও আদর্শ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন।

এইভাবে অবনীন্দ্রনাথের আদর্শকে নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী যাঁরা সে সময় অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সারদাচরণ উকিল ও প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। এ ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে, সারদাচরণ বা প্রমোদকুমার অবনীন্দ্রনাথের নন্দলাল-প্রমুখ শিষ্যমণ্ডলীর অনুরূপ পথে শিল্প রচনা করেন নি। কিন্তু মৌলিকতা এবং ভাবুকতা (Feeling) বা ভারতীয় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এঁরা সচেতন হয়েছিলেন।

এ পর্যন্ত ভারতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কলিকাতা আর্ট স্কুলের বাইরে কোথাও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রা সভাটিকে কেন্দ্র ক'রে শিল্পশিক্ষা দেবার নূতন এক ব্যবস্থা হয়। 'বিচিত্রা'-যুগেই বাংলার লোকশিল্প সম্বন্ধে শিল্পী ও রসিকসমাজ প্রথম সচেতন হন। অবনীন্দ্রনাথের প্রামাণিক গ্রন্থ 'বাংলার ব্রত' এবং গগনেন্দ্রনাথের বহু প্রকারের উদ্যোগ ও ব্যবহারিক প্রয়োগ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'বিচিত্রা' সভার আয়ুষ্কাল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দেশে শিল্প-আন্দোলন দুটি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। একটি সোসাইটিকে কেন্দ্র ক'রে, অপরটি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীকে আশ্রয় ক'রে। এই দুই উদ্যোগের একদিকে একটি বিশেষ অধ্যায়ের অবসান, অপরটিতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা। ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির শিক্ষকরূপে নন্দলাল, শৈলেন্দ্রনাথ দে ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার তিনজনেরই উল্লেখ করা চলে। বিশেষ ভাবে ক্ষিতীন্দ্রনাথের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট। সোসাইটির কালে জাপানী প্রভাব নূতন ভাবে দেখা দেয়, অপরদিকে বাস্তবতার প্রতি নূতন আগ্রহ এই সময়ের শিল্পীদের রচনায় পাওয়া যাবে। নির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতির কড়া রুটিন বা শান-বাঁধানো পাকা সড়ক অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন নি। শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারা শিল্পী তৈরী করা যায় একথা অবনীন্দ্রনাথ কোনোদিন বিশ্বাস করেন নি। অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধে এই আদর্শের প্রভাবে যেমন বিচিত্র পথে অগ্রসর হওয়ার সাহস শিল্পীরা সঞ্চয় করেছিলেন তেমনি এই উদারতার পরিণামেই শিল্পের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সোসাইটির আওতায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে বীরেশ্বর সেন, ক্ষুমালাল সাহা, চিন্তামণি কর, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, মনীষী দে।

জাপানী প্রভাবকে জনপ্রিয় ক'রে তোলার পক্ষে বীরেশ্বর সেনের প্রভাব সর্বপ্রধান। সোসাইটির আওতায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। দেবীপ্রসাদ একাধারে শিল্পী ও ভাস্কর। অবনীন্দ্রনাথের স্টাইলকে দেবীপ্রসাদ প্রথম জীবনে যেভাবে অনুসরণ করেছিলেন, তাকে অনুকরণের পর্যায়ে ফেলা ভুল হবে না। ক্রমে দেবীপ্রসাদের চিত্রের আঙ্গিক ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হয়ে উঠছে লক্ষ্য করা যায়। বিলাতী water colour পদ্ধতির নির্যাস দেবীপ্রসাদ আয়ত্ত ক'রে তাঁর দৃশ্যচিত্র অঙ্কিত করেন। সমালোচক জি. বেঙ্কটা-চলমের মতে, অবনীন্দ্রনাথের অনুবর্তীদের মধ্যে দেবীপ্রসাদের রুচি ও মেজাজ সর্বাপেক্ষা বিলাতী-ঘেঁষা। সমা-লোচকের এই উক্তি অবাস্তব বলা চলে না।

বিলাতী প্রভাব যেমন দেবীপ্রসাদ সাহসের সঙ্গে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন তেমনি জাপানী চিত্রকলার নানা বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে তিনি কুণ্ঠিত নন। বহুবিধ আঙ্গিকের বিচিত্র সমাবেশ দেবীপ্রসাদের চিত্রে লক্ষ্য করা যাবে।

এ পর্যন্ত যে সব শিল্পীদের উল্লেখ আমরা করেছি তাঁদের প্রভাব ভারতীয় শিল্পের নব জাগরণের পথে অসাধারণ। দক্ষিণ ভারতে শিল্পের নবজাগরণ সম্ভব হয়েছে বেঙ্কট আপ্পা, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ

রায় চৌধুরীর প্রভাবে। বিশেষ ভাবে দেবীপ্রসাদের প্রভাব দক্ষিণ ভারতের শিল্প-জাগরণের ইতিহাস থেকে সহজে মুছে যাবে না।

১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর অন্যতম বিভাগ কলাভবনের সূচনা হয়। শ্রীঅসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রে আচার্য-পদে নিযুক্ত হন। (অসিতকুমার অল্পকালের মধ্যে কলাভবন ত্যাগ করেন।) রবীন্দ্রনাথ শিল্প সঙ্গীত সাহিত্য সবকিছুকেই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির ধারক বাহক রূপে দেখেছিলেন। সংস্কৃতিকেই জাগিয়ে তোলার জন্য শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তা তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছেন। সৃজনী শক্তিকে বাঁচিয়ে তোলা এবং শিল্পীর দৃষ্টি সংস্কৃতির ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রসারিত ক'রে দেওয়াই ছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের প্রাণ অনুসন্ধান করেছিলেন। ভারতীয়ত্বকে সর্বপ্রধান ক'রে দেখা অবনীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল না। সেদিকে তিনি বিশেষ কোনো প্রয়াস করেছিলেন তারও কোনও প্রমাণ নেই। অবনীন্দ্রনাথ-পরবর্তী শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয়ত্বের ছাপ দিয়েছিলেন নন্দলাল। এ কথা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। একদিকে নন্দলালের ভারতীয়-ভাব-আবিষ্ট শিল্পদৃষ্টি, অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক আদর্শ, উভয়ের সংযোগ ও সংঘাতের প্রকাশ কলাভবনের নূতন শিল্পধারায়।

এ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-পরম্পরা গ'ড়ে ওঠেছিল নাগরিক পরিবেশে। শহরের বাইরে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে শিল্পের কতকগুলি পরিবর্তন সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

বিষয়বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রয়োগ কলাভবনের শিল্পীদের রচনায় ক্রমেই স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে দেখা দেয়। গ্র্যাফিক আর্টের নবজাগরণ, ভিত্তিচিত্রের নূতন অধ্যায়, কারুকলার ক্ষেত্রে নূতন প্রাণ সঞ্চার কলাভবনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির আদর্শ ক্রমেই নন্দলালের প্রভাবে একটি নির্দিষ্ট পথে চালিত হতে দেখা যায়। ভারতীয় আঙ্গিকের অনুশীলন, অলঙ্করণ-শিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োগ—নন্দলালের শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাবে ঘটেছে।

১৯২১ সালের কাছাকাছি স্টেলা ক্রামরিশ এসে কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে পাশ্চাত্য শিল্পপ্রগতি সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করেন। Dadaism, Cubism, ইত্যাদি প্রগতিপন্থী শিল্প-আদর্শ এবং সেজান, গো-গাঁ, ভ্যান্-গাও, পিকাসো, ইত্যাদি প্রগতিশীল শিল্পীদের সৃষ্টি সম্বন্ধে যখন কলাভবনের শিল্পীরা আলোচনা বা অধ্যয়ন করছিলেন, অন্যত্র তখনও ভারতীয় শিল্পী ও রসিক-সমাজ উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বাস্তবধর্মী শিল্পাদর্শকেই ইউরোপীয় পরম্পরার চূড়ান্ত পরিণাম ব'লে জেনেছিলেন। ক্রামরিশের আলোচনা যেমন শিল্পীদের সামনে নানা সমস্যা সন্দেহ এবং কৌতূহল জাগিয়েছিল তেমনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দ্বারা পরিচালিত চীন ও জাপানের সাহিত্য শিল্প ও নন্দন-আদর্শ সম্বন্ধে সমালোচনার প্রভাব বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল।

হীরাচাঁদ দুগার, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, রামকিঙ্কর, সুধীর খাস্তগীর, ইত্যাদি শিল্পীদের রচনা নব্য বাংলার শিল্পপরম্পরায় নূতন গতি ও শক্তি দিয়েছে।

নন্দলালের প্রভাব যেমন কলাভবনের শিল্পীদের জীবনে প্রত্যক্ষ, তেমনি শান্তিনিকেতনের পরিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য নন্দলালের শিল্পী-জীবনে সুস্পষ্ট।

শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হওয়ার অনতিকাল মধ্যে নন্দলালের শিল্প, বিষয়ের দিক্ দিয়ে ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নূতন হয়ে দেখা দিল। ১৯২১ সালের রচনা 'বসন্ত' 'সন্ধ্যাদীপ', ইত্যাদি ছবিগুলির আঙ্গিক, বিষয়, আবেদন সম্পূর্ণ নূতন এবং নন্দলালের প্রতিভার ক্ষেত্রে অভাবনীয়। নন্দলালের রচিত দৃশ্যচিত্র কালী-তুলিতে করা বহু রচনায় তুলির ব্যবহাররীতি যে চীনা পরম্পরা থেকে নন্দলাল গ্রহণ করেছেন এ কথা স্বয়ং শিল্পী অস্বীকার করেন না।

নন্দলালের অলঙ্করণ, মণ্ডনের দক্ষতা এবং গঠনপ্রিয়তা চীনের তুলির টান-টোন্‌কে অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় ভাবে আত্মসাৎ করতে সক্ষম হয়েছিল। আজ এই মুহূর্তে নন্দলাল যে অসংখ্য চিত্র কালী-তুলির সাহায্যে রচনা ক'রে চলেছেন তার আকারে প্রকারে ও তার অন্তর্নিহিত অনুভূতির সম্পূর্ণ নূতন সচেতনতায় শিল্পী আমাদের সামনে রূপ-রচনার নূতন সমস্যা ও সমাধান, নূতন আদর্শ উপস্থিত করেছেন।

নন্দলালের অসংখ্য ড্রয়িং সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এইমাত্র বলা চলে যে, এত বৈচিত্র্য, বস্তু সম্বন্ধে এত গভীর ও বিচিত্র সচেতনতা সব দেশের ও সব কালের শিল্পের ইতিহাসেও বিরল।

বাংলার শিল্পপরম্পরার ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতীয় শিল্পপ্রগতির ইতিহাসে গগনেন্দ্রনাথের নাম নানাদিক্ দিয়ে স্মরণীয়। কারুশিল্পের ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম পথপ্রদর্শক। প্রথম জীবনে রচিত বহুসংখ্যক দৃশ্যচিত্র বা চৈতন্য-বিষয়ক চিত্রাবলী তাঁর শিল্পপ্রতিভাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। কালী-তুলির কাজ, হিমালয়ের দৃশ্যাবলী—বহুদিক্ দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ব'লে রসিকসমাজ মনে করেন। এ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বা ব্যক্তিত্বের যে পরিচিতি, তার তুলনায় ১৯২০ সাল থেকে তাঁর রচনার ভাবে ভঙ্গীতে ও ভাষায় নূতন বিবর্তন যেমন আকস্মিক তেমনি অভাবনীয়।

তথাকথিত 'আধুনিকতা' সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা যখন শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত হয়েছে, সে সময় কলিকাতা শহরে গগনেন্দ্রনাথ এই বিশেষ শিল্পধারার প্রত্যক্ষ প্রয়োগে কতকগুলি বিস্ময়কর রচনা করেন। এ রচনাগুলির অন্তরালে যে ফরাসী-মার্কা কিউবিজ্‌মের প্রভাব রয়েছে সে কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গগনেন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় কিউবিজ্‌ম্ যথাযথ অনুসরণের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না ক'রে মৌলিক প্রেরণায় নূতন ভাবে তাকে বিবর্তিত ক'রে তুলে ভারতীয় পরম্পরার অঙ্গীভূত ক'রে দিলেন।

ফরাসী কিউবিজ্‌মের মূল উদ্দেশ্য বস্তুর আকারদ্যোতক (dimensional) গুণকে গোচর করা ও বিচিত্র করা। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রে বস্তু প্রায় উহ্য থেকে গেছে। এ যেন আলোছায়ার রাগ-রাগিণী, তান বিস্তার বা আলাপ। প্রগাঢ় অন্ধকার ও হীরক-শুভ্র আলোর সংঘাতে, স্ফুট অপরিস্ফুট প্রায় অস্ফুট আলোকের বিকিরণ—তাঁর প্রবর্তিত Neo-Cubism-এ আমরা লক্ষ্য করি। তার চিত্রাবলীর রহস্যময় কবিত্বময় বিচিত্র নামকরণ থেকেও আমরা শিল্পীর স্বতন্ত্র মেজাজ ও পৃথক্ লক্ষ্য সহজেই অনুমান করতে বা বুঝতে পারি।

গগনেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব কিউবিজ্‌মের ধারায় ক্রমেই আলোছায়া-মায়াময় রহস্যময়, অত্যদ্ভুত, ও বিস্ময়কর একটি জগৎ আমাদের নয়নমনোগোচর করেন। The house that tells its master's fate, ইত্যাদি ছবিতে যে বাস্তব-অবাস্তবের মিশ্রণ ও বিস্ময়ের দ্যোতনা তার তুলনা চলে এড্‌গার-এলেন্-পোর রচনারই সঙ্গে। আবার বলি, গগনেন্দ্রনাথের এই বিশেষ প্রেরণার পরম পরিণতি স্ফটিকোজ্জ্বল বর্ণময় রূপকথার মতো সত্য ও মিথ্যায় মেশানো এক অপূর্ব জগতের আবিষ্কারে।

আসলে গগনেন্দ্রনাথের এই ছবিগুলি নূতন বা পুরাতন কোনো "ইজ্‌ম্"-এর শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। ভারতীয় আঙ্গিকের সঙ্গে এই সব চিত্রের কোনো সম্বন্ধ কোনো দিক্ দিয়েই পাওয়া যায় না। বিশেষ আশ্চর্যের কথা এই যে, ভারতীয় পরম্পরার সঙ্গে যোগ না থেকেও এগুলি সম্পূর্ণই ভারতীয় ভাবের প্রকাশক। সুররিয়েলিজ্‌মের আদর্শে যেমন স্বপ্ন ও জাগরণের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, গগনেন্দ্রনাথের এই সব চিত্রে অনুরূপ অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। তবে সুররিয়েলিজ্‌মে যতটা তথ্য বা তত্ত্ব-খ্যাপনের চেষ্টা দেখা যায় গগনেন্দ্রনাথের চিত্রে তার সামান্যতম চেষ্টা নেই। সাহিত্যিক ও রূপকথাকল্প যে আবেদন গগনেন্দ্রনাথের চিত্রে বর্ণে, বিষয়বর্ণনায়, বাস্তব-অবাস্তবের মিশ্রণে তৈরী হয়েছে তার তুলনা শুধু রূপকথার সঙ্গে। রূপকথার থেকে পার্থক্য এই যে, এক্ষেত্রে শিশুসুলভ কল্পনা অপেক্ষা পরিণত মার্জিত মনের প্রকাশ সমধিক।

গগনেন্দ্রনাথ নূতন কোনো শিল্প-পরম্পরার প্রবর্তক নন। তাঁর উদ্‌ভাবিত ভাষা বা বিষয়কে প্রকাশ করবার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী একান্তই তাঁর নিজস্ব। কিন্তু আধুনিক কালে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিশ্রণের মুহূর্তে, গগনেন্দ্রনাথ এই বিসদৃশ দুই পরম্পরার দূরত্বকে সরিয়ে দেবার এবং বিজাতীয় আদর্শকে জাতীয় ক'রে তোলার সৎসাহস ও ও সুকৌশল আমাদের সকলের সামনে রেখে গেছেন। সাম্প্রতিক কালে পাশ্চাত্য নানা ইজ্‌মের অনুকরণ ভারতের সর্বত্রই লক্ষ্য করা যাবে। এই অনুকরণের মধ্য দিয়ে নূতন পথ উদ্ভাবনের অকল্পনীয় সাহস সর্বপ্রথম এনেছেন গগনেন্দ্রনাথ। তাই গগনেন্দ্রনাথ নূতন কোনো পরম্পরা বা রীতির প্রবর্তক না হয়েও আজকের প্রগতিশীল শিল্পীদের সর্বাগ্রণী ও নানাভাবে সাহস ও প্রেরণা-দাতা।

অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে মতবিরোধ যতই থাক্ না কেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে অবনীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতীয় শিল্পীদের উদ্দেশ্যে ও সাধনায় যে নূতন চেতনা এনে দিয়েছিলেন তাকে অস্বীকার করা কোনো ক্রমেই সম্ভব ছিল না।

যাঁরা পাশ্চাত্য শিল্পের অনুশীলন করছিলেন তাঁরাও ভালভাবেই বুঝেছিলেন যে, শিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ভারতীয়তার প্রত্যয় এবং সুস্পষ্ট ছাপ অপরিহার্য।

এই বিশেষ ধারণা বা উপলব্ধি থেকে প্রকাশিত হ'ল যামিনী রায়ের নূতন চিত্ররূপ। শিল্পী যামিনী রায়

কলিকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র এবং পাশ্চাত্ত্য অঙ্কনরীতিতে সুদক্ষ। ১৯২০ সালের কাছাকাছি সময় থেকে তাঁর অঙ্কনপদ্ধতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আদর্শ-অনুগামী রচনা দ্বারা প্রথম তিনি রসিক-সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। 'মন্দিরদ্বারে', 'প্রসাধন', ইত্যাদি চিত্র তাঁর এই চেষ্টার উল্লেখ-যোগ্য দৃষ্টান্ত।

বাংলার পট-চিত্রের অনুসরণে যামিনী রায় যে-সব রচনা ১৯২০-২৫ সালের মধ্যে করেছিলেন সেগুলি রসিক-সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অসাধারণ প্রতিভাবান্ শিল্পী ব'লে শিক্ষিতসমাজ তাঁকে গ্রহণ করে। বাংলার পট, টেরাকোটা, ইত্যাদি থেকে শিল্পী যামিনী রায় কতকগুলি সংস্কার গ্রহণ করেছেন। ১৯৩০ সালে অধ্যক্ষ মুকুল দের উদ্যোগে যামিনী রায়ের এই জাতীয় চিত্রাবলীর প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীর ছবিগুলি বর্ণবিরল, রেখাপ্রধান এবং এর সর্বত্র গঠনের কঠিনতা সুস্পষ্ট। এই রচনাধারায় শিল্পী যামিনী রায় অতীতপরম্পরা আত্মসাৎ করার অসাধারণ ক্ষমতায় রসিকসমাজকে বিস্মিত করেন।

ক্রমে যামিনী রায়ের চিত্রে বর্ণাঢ্যতা ও পটের অনুসরণ স্পষ্টতর হয়ে দেখা দেয়। ১৯৩৫ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের মণ্ডপসজ্জার দায়িত্ব যামিনী রায়ের উপর দেওয়া হয়। নন্দলালের আহ্বানে যামিনী রায় বৃহত্তর দর্শকের সামনে নিজের শিল্পচেষ্টাকে উপস্থিত করতে সক্ষম হন।

যামিনী রায়ের জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর ভাবে ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪০ সালের কাছাকাছি তিনি খ্রীস্ট-বিষয়ক বহু ছবি বাইজেন্টাইন স্টাইলে অঙ্কিত করেন। এই সঙ্গে Impressionist স্কুলের অনুরূপ দৃশ্যচিত্র তাঁর রচনাকে ইউরোপীয় সমাজে জনপ্রিয় ক'রে তোলে।

পরবর্তীকালে শিল্পী যামিনী রায় কালীঘাটের পুতুলের অনুরূপ, আকারে বৃহৎ, কতকগুলি কাঠের মূর্তি গঠন করেন। তাঁর রচিত চিত্র ও কাঠের মূর্তি আধুনিক গৃহসজ্জার বিশেষ উপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবনীন্দ্রনাথ বা তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে যাঁরা প্রধান তাঁদের রচনার দুর্মূল্যতায় সে সব সাধারণ শিক্ষিতসমাজের হাতের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। যামিনী রায়ের চিত্রের অলঙ্কারিক শোভা তার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

কিন্তু যামিনী রায়ের জনপ্রিয় রচনাই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়। তাঁর প্রথম দিকের করা রূপধর্মী বর্ণবিরল চিত্রগুলিকেই আমরা তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় ব'লে মনে করি।

১৯২০ সাল থেকে অবনীন্দ্রনাথের নব নব শিল্প-রচনা, শান্তিনিকেতনের নূতন শিল্পীগোষ্ঠীর নানামুখী প্রচেষ্টা, নন্দলালের উত্তরকালীন রচনা, এ সবই মিলিত ভাবে যেমন এক নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে, তারই সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ্য হল, গগনেন্দ্রনাথ ও যামিনী রায়ের বিচিত্র রূপকৃতি। এই সময় কবি রবীন্দ্রনাথও চিত্রকর রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। একা রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধেই ইতিমধ্যে যে পরিমাণে আলোচনা হয়েছে, অনুরূপ আলোচনা অন্য কোনো ভারতীয় শিল্পী সম্বন্ধে হয়েছে ব'লে আমার জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বিশ্বব্যাপী কবিযশ হয়ত তাঁর চিত্রের সম্বন্ধে এরূপ আগ্রহের ও অনুসন্ধিৎসার অন্যতম কারণ।

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রূপ-রচনার যখন অনুসরণ করা যায় তখন তাঁর শিল্পপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বাঁধা পথে শিল্প শিক্ষা না করলেও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তিনি যে দক্ষতা প্রকাশ করেছেন তা অপটু বা দুর্বল ব'লে কোনো মতেই উপেক্ষা করা চলে না।

অবচ্ছিন্ন রূপকল্প (abstract form) ও নির্মাণ (construction) থেকে শুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথ সতেজ স্বাধীন রিয়েলিজ্‌মের ক্ষেত্রেও উত্তীর্ণ হয়েছেন যার সাক্ষ্য তাঁর আঁকা প্রতিকৃতিমূলক নানা রচনায়। তাঁর রচিত দৃশ্যচিত্রেও এই রিয়েলিজ্‌ম্ বা বাস্তববোধের ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর আঁকা প্রতিকৃতির মধ্যে একদিকে যেমন গভীর ও কমনীয় ভাবের ব্যঞ্জনা অন্যদিকে তেমনি দুর্বর্ষ শক্তির নাটকীয় প্রকাশ দেখি ক্ষণে ক্ষণে রেখা ও বর্ণের দেহাধার বিদীর্ণ ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, তাঁর অপ্রচুর আঙ্গিকও কখনোই তাঁর চিত্রে ক্লান্তি বা আড়ষ্টতার ভাব প্রতিফলিত করে নি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা প্রতিভার প্রত্যক্ষ প্রকাশ। ভূকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের মতো। কোন পরম্পরার মধ্যে এ রচনাকে যুক্ত করা চলে না। অথচ আধুনিক কালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রূপসংস্কৃতির সংঘর্ষের

সঙ্কটমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের এই রচনা একটি বিশেষ আত্মপ্রত্যয়ের নিদর্শন রূপে ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ পর্যন্ত বাংলা দেশের শিল্প-প্রতিভা কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। এই চেষ্টার প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতের সর্বত্র লক্ষ্য করা যাবে। শিল্পের নবজাগরণ এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতকে এক সূত্রে গাঁথবার গৌরব অবনীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। মাদ্রাজ, গুজরাট, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, সর্বত্র অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব সহজেই বিস্তৃত হতে পেরেছিল। ক্রমে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতা ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পের অনুকরণ-চেষ্টা নূতন ক'রে দেখা দিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে অনুকরণ-চেষ্টা, তার থেকে আজকের দিনের অনুকরণ-আগ্রহের বিশেষ পার্থক্য কোথাও নেই। তথাকথিত প্রগতিশীল তরুণ শিল্পীবৃন্দ ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষক নব্য-ভাবাপন্ন সমালোচকগণ বারংবার অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবের ব্যর্থতা ও তাঁর প্রভাবের ক্ষতিকর পরিণাম সম্বন্ধে দেশবাসীকে সাবধান ক'রে দেবার চেষ্টা করছেন। এ সম্বন্ধে বাদপ্রতিবাদ সম্পূর্ণ নিরর্থক। এইমাত্র বলা চলে যে, কেবলমাত্র সুনিপুণ অনুকরণ কোনো শিল্প বা সাহিত্যকে প্রাণবান্ রাখতে পারে না। অনুকরণ কখনও মূলের সমকক্ষ হয় না এ কথাও সর্বক্ষেত্রে সর্বদাই সত্য। বিশেষ ভাবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে দূরত্ব যখন ক্রমেই কমে আসছে, কোনো অনুকরণের 'বাহ্য অভিনবত্ব' দীর্ঘকালস্থায়ী হতে পারে না। শিল্পের শাশ্বত মূল্য, স্বভাবসংগত রূপ ও রসোত্তীর্ণ সার্থকতা আজ না হয় কাল, খুঁজে বার করতে শিল্পীরা বাধ্য হবেন এবং সেই অনুসন্ধানের মুহূর্তে সেই দূর বা অদূর ভাবীকালের শিল্পীরাই নিশ্চিত ভাবে উপলব্ধি করবেন, অবনীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রগোষ্ঠীর শিল্পসৃষ্টির এবং প্রভাবের যথার্থ মূল্য বা তাৎপর্য। বাংলার শিল্পপরম্পরা তথা 'Bengal school' যে দুর্বল সঙ্কীর্ণ ভাবালুতায় ভরা নির্জীব ব্যর্থ শিল্পপ্রচেষ্টা নয়, এ কথা তখনি বোঝা যাবে যখন সেই অনাগত শিল্পীরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্প-সংস্কৃতির পরম্পরায় যা কিছু মহৎ, যা কিছু সত্য, যা কিছু সুন্দর তার সার সংগ্রহ ক'রে ও সহজে আত্মসাৎ ক'রে—সম্মুখে নূতন দিগন্ত দেখে নূতন পথে পা বাড়াতে উদ্যত হবেন।

—o—

বাংলার কৃতী ভাস্কর

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র
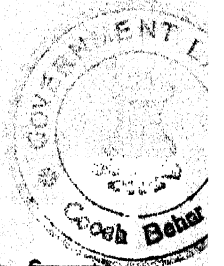
ই. বি. হ্যাভেল ও শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের মিলিত চেষ্টায় বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন বাঙালী তথা ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ একটি স্মরণীয় ঘটনা। সেদিন বাঙালী শুধু যে দেশের অমূল্য রসসম্পদ্ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল তাই নয়, বাংলার শিল্পীরা পরানুকরণ-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে জাতীয় ঐতিহ্যের অনুসরণে চিত্রকলার সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। নন্দলাল, দেবীপ্রসাদ, অসিতকুমার, মুকুল দে, সুরেন্দ্র গাঙ্গুলী, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ কর, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, সারদা উকীল, বরদা উকীল, রণদা উকীল প্রমুখ চিত্র-শিল্পীরা অবনীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরসাধকরূপে বাংলা দেশের গৌরববৃদ্ধি করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু দেবীপ্রসাদ ছাড়া এঁরা সকলেই হচ্ছেন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর্য্য শিখবার দিকে কিন্তু শিল্পীদের তেমন উৎসাহ এবং আগ্রহ পরিলক্ষিত হ'ল না।

শান্তিনিকেতনে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষার্দ্ধে শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু তাঁর শিষ্যদের কিছু কিছু মডেলিং-এর কাজ শেখাতে আরম্ভ করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রামকিঙ্কর এবং সুধীর খাস্তগীর কৃতী ভাস্কর হিসাবে খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। সুদীর্ঘকাল যাবৎ যুগপৎ চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য্যের সাধনায় ব্রতী আছেন সুধীর খাস্তগীর। বাটালি এবং ছেনির আঘাতে আজও তাঁর নব নব রূপসৃষ্টির বিরাম নেই। তাঁর আগেকার কতকগুলি কাজ প্রথম শ্রেণীর শিল্পকৃতি হিসাবে রসিকজনের স্বীকৃতি পেয়েছিল। সাম্প্রতিককালের কাজের মধ্যে

লক্ষ্ণৌ গবর্ণমেণ্ট কলেজ অব আর্ট এ্যাণ্ড ক্রাফ্ট-এর উদ্যানে স্থাপিত, রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তিটি প্রশংসার দাবি রাখে। মূর্তিটির আননে যে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ফুটে উঠেছে তা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। সুধীর খাস্তগীর শুধু শিল্পীই নন, লেখনী-চালনায়ও অভ্যস্ত। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ-রচনার ক্ষমতা তাঁর আছে। ১৯৬০ সালের জুলাই মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত তাঁর 'Artist's Joy of Creation' নামক প্রবন্ধটিতে তাঁর ভাস্কর্য্য-শিল্প-সাধনার মূলগত প্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায়। তাতে প্রসঙ্গক্রমে এক জায়গায় তিনি বলেছেন:

"I am one of those who like to bring happiness to people's life instead of sorrow through my soulpturs, whether I succeed or not that is a different question."

নন্দলাল-শিষ্য রামকিঙ্কর শুধু রূপদক্ষ ভাস্করই নন, ভাস্কর্য্য-শিল্প শিক্ষাদাতা হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব আছে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে শঙ্খ চৌধুরী ও প্রভাস সেনের কতকগুলি কাজ কলারসিকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। ১৯৫৫ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের মণ্ডপ-সজ্জার ভার প্রভাস সেন এবং শঙ্খ চৌধুরীর ওপর অর্পিত হয়। প্রভাস সেন ইদানীং অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট্স্-এর ডিরেক্টররূপে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

বাঙালী ভাস্করদের প্রসঙ্গে দু'জন বিস্মৃতপ্রায় ভাস্করের কথা উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে করি, এঁরা কেউই অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ শিষ্য ছিলেন না, ভারতীয় শিল্পের আদর্শ দ্বারাও প্রভাবিত হন নি। একজন হচ্ছেন অশ্বিনীকুমার বর্ম্মণ। তিনি বিলেতে গিয়ে ভাস্কর হিসেবে সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। তিনি একজন সুলেখকও ছিলেন। ভাস্কর্য্যশিল্প সম্বন্ধে তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ পুরনো প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি স্থায়ীভাবেই বিদেশে বসবাস সুরু করেন, দেশে আর ফেরেন নি। কয়েক বছর হল বিলেতেই তাঁর দেহান্ত হয়েছে। কৃতী সাংবাদিক দেবজ্যোতি বর্ম্মণ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ফণীন্দ্রনাথ বসুও বিলেতে একজন কৃতী ভাস্কররূপে সমাদৃত হয়েছিলেন, এঁর কাজও পাশ্চাত্ত্য ভাস্কর্য্যের হুবহু অনুকৃতি। বহুদিন আগে প্রবাসীতে এঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল।

কৃতী বাঙালী ভাস্করদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। তাঁর কথা বিশদ ভাবে পরে বলছি। ভাস্কর্য্য-শিল্পে যাঁর কাছে তাঁর হাতে খড়ি হয় সেই হিরণ্ময় রায় চৌধুরীও ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছেন। ইনি বিলেতে ভাস্কর্য্য এবং ইটালীয় পদ্ধতিতে cire pardu অর্থাৎ ব্রোঞ্জকাষ্টিং শেখেন। ইনি দীর্ঘকাল লক্ষ্ণৌ স্কুল অব আর্ট এ্যাণ্ড ক্র্যাফ্ট্-এর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এঁর কাজের মধ্যে রোমান্টিসিজ্ম্ এবং রিয়ালিজ্মের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

আর একজন প্রখ্যাত ভাস্কর হচ্ছেন দেবীপ্রসাদের শিষ্য এবং ক্যালকাটা গ্রুপ নামক প্রগতিপন্থী শিল্পীসঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রদোষ দাশগুপ্ত। তাঁর রূপসৃষ্টির মধ্যে স্বকীয়তা এবং বলিষ্ঠতার পরিচয় সুপরিস্ফুট। বর্ত্তমানে তিনি নিউ দিল্লীর ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ণ আর্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। চিন্তামণি কর মুখ্যতঃ চিত্রশিল্পী হিসাবেই খ্যাতিমান্, কিন্তু তাঁর কতকগুলি ভাস্কর্য্যকর্ম্মও কলারসিকদের স্বীকৃতি পেয়েছে। বিদেশে এ্যাপস্টাইনের কাছে তাঁর ভাস্কর্য্য-শিক্ষা হয়। আট বছর ইনি ইংলণ্ডে অবস্থান করেছিলেন।

এঁদের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ ভাস্করদের মধ্যে যিনি এই দুরূহ শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছেন তিনি হচ্ছেন শ্রীসুনীলকুমার পাল।

প্রায় পনের বৎসর আগে নেপাল-প্রত্যাগত সুনীল পালের শিল্পকর্ম্মের সঙ্গে কলিকাতার সুধীসমাজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় 'A young Indian Soulptor' শীর্ষক প্রবন্ধে তৎকালে নবোদিত এই ভাস্করের প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে কলিকাতার একটি প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারে সুনীলকুমারের জন্ম হয়। তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয় উত্তর কলিকাতার কোনো বিদ্যালয়ে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ১৯৩৫ সালে সুনীলকুমার কলিকাতার সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে তিনি ভাস্কর্য্যকে বিশেষ বিষয়রূপে নির্ব্বাচন করেন এবং সেই সময়ে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত ঐ বিদ্যালয়ের মডেলিং ডিপার্টমেণ্টে যোগদান করেন। পাঁচ বৎসর অধ্যয়নের পর ১৯৪০ সালে তিনি স্কুল ডিপ্লোমা লাভ করেন। অতঃপর কলা-শিক্ষকের ডিপ্লোমা লাভের জন্য আরো দু' বছর তিনি এই বিদ্যালয়েই থেকে যান। ১৯৪২ সালে নেপাল গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এমন একজন প্রতিভাবান্ তরুণ শিল্পীকে চেয়ে পাঠান যিনি

কতকগুলি আবক্ষ মূর্ত্তি এবং ষ্ট্যাচু নির্ম্মাণের জন্মে নেপালে আসতে রাজী আছেন। রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই কাজের জন্ত সুনীলকুমারকেই নির্ব্বাচিত করেন। ১৯৪২ সালে পাল চ'লে যান নেপালে এবং সেখানে দু' বৎসরকাল অবস্থান ক'রে কলকাতায় ফিরে আসেন।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে প্রথমে সুনীলকুমার মডেলিং এবং অঙ্কন এই উভয়ক্ষেত্রেই যে সকল কাজ করেছিলেন তাতে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের রোমান্টিসিস্টদের রচনা-শৈলীর প্রভাব সুপরিস্ফুট। কিন্তু অচিরেই তিনি প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারতীয় ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হন এবং পোর্ট্রেট-স্টাডিতে তিনি এমন একটি পন্থা উদ্ভাবন করেন যা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব।

রূপদক্ষতা এবং আন্তরিকতা তাঁর অনেকগুলি শিল্প-রচনাকে এক অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত ক'রে তুলেছে। এ সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষণীয় 'যমজ শিশু ক্রোড়ে সীতা' নামক তাঁর গড়া মূর্ত্তি।

তাঁর আগেকার কতকগুলি কাজের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় বলিষ্ঠ বাস্তবতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে 'ফকিরের মুখাবয়ব' নামক মূর্ত্তিটির কথা।

নেপালে গিয়ে সুনীলকুমার নেপালাধীশের ষ্ট্যাচু এবং স্যার যুধা শামসের প্রমুখ কয়েকজনের যে আবক্ষ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন সেগুলি তরুণ বাঙালী ভাস্করের শিল্প-নৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করছে।

কলিকাতায় ফিরে এসে পৈতৃক ভবনে তিনি যে রূপ-কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করেন, সুনীতিকুমার তাঁর নামকরণ করেন রূপপালী। এই রূপনিকেতনে তাঁর সৃজনী প্রতিভার নিদর্শনসমূহ রসিকমাত্রকেই মুগ্ধ বিস্ময়ে পুলকিত করে। সুনীলকুমারের সামনে এখনো সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ প'ড়ে রয়েছে—তাঁর নিকট দেশবাসীর এখনো প্রচুর প্রত্যাশা।

২

চিত্রকলার ন্যায় ভারতীয় ভাস্কর্য্যেরও একটা গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। কোনার্কের সূর্য্যমন্দির, খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি-নিচয়, ইলোরার কৈলাসমন্দির আজও ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে আছে। এই ভারতীয় ভাস্কর্য্য একদা চীন, জাপান, ব্রহ্ম, ইন্দোচীন এবং ইন্দোনেশিয়ার যবদ্বীপে গিয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যবদ্বীপের বোরোবুদুর মন্দির ভারতীয় ভাস্কর্য্যের চরমোৎকর্ষের নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান। ভাস্কর্য্য-শিল্পে বাংলা দেশের অবদানও উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় আজও সম্যক্ সচেতন নন। অনেকেরই একথা জানা নেই যে, পাল সম্রাটদের আমলে বাংলার ভাস্কর্য্য সুদূর নেপালে গিয়ে সেখানকার শিল্পকলাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বাংলার তথা ভারতীয় ভাস্কর্য্যের গৌরবময় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ধারক এবং বাহক হচ্ছেন শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। গত ষাট বছরের মধ্যে যে সকল কৃতী বাঙালীর জীবন-সাধনায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা দেশ একটা সর্ব্ব-ভারতীয় মর্য্যাদা অর্জ্জন করেছে, তিনি তাঁদের অন্যতম। এই ভারত-বিশ্রুত ভাস্কর সম্বন্ধে বিদগ্ধ কলাবিৎ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কয়েক বছর আগে প্রসঙ্গক্রমে এক জায়গায় বলেছিলেন :

"Bengal gave to India one great sculptor who has acquired a pan-India distinction—Deviprosad Roy Chowdhury now principal of the Government School of Arts in Madras."

অর্থাৎ, বাংলা দেশ ভারতবর্ষকে এমন একজন ভাস্কর দিয়েছে যাঁর খ্যাতি সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি হচ্ছেন মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা খ্যাতির শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছেন দেবীপ্রসাদ তাঁদের অন্যতম। তাঁর ভাস্কর্য্য এবং চিত্রকর্ম্ম ভারতের বাইরে—এশিয়ার জাপানে এবং ইউরোপের নানা দেশে সমাদৃত হয়েছে। যৌবনেই দেবীপ্রসাদ মাদ্রাজকে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্ররূপে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। সেখানে সুদীর্ঘকাল শুধু যে তাঁর নিভৃতে শিল্পকলার সাধনায়ই কেটেছে তেমন নয়, এই প্রতিভাধর শিল্প-সাধকের অক্লান্ত চেষ্টায় তত্রত্য জনসাধারণের মধ্যেও শিল্পানুরাগ জাগ্রত এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়েছে। আজন্ম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত, অভিজাত শিল্পীর সুদূর প্রবাসে এই স্বেচ্ছাবৃত নির্ব্বাসন শিল্পকলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের দ্যোতক। তাঁর জীবন যেমন বৈচিত্র্যময়, ব্যক্তিত্বও তেমনি বহুমুখী। তিনি একাধারে লেখক, শিল্পী ও একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে শিল্পকুশলতা এবং মননশীলতার এক অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হৃদয়কে

অভিভূত করে সেগুলি হচ্ছে শক্তি, সৌকর্য্যানুভূতি এবং সংবেদনশীলতা। তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যেও এগুলির প্রকাশ লক্ষণীয়। এই প্রতিভাধর ভাস্করকে অভিনন্দিত করা হয় ভারতের রদাঁ (Rodin) ব'লে।

১৮৯৯ সালের ১৫ই জুন রঙ্গপুরে বাংলার এক প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃকুল এবং মাতৃকুল উভয় দিক্‌ দিয়েই দেবীপ্রসাদের দেহে অভিজাত রক্ত বহমান। তাঁর মাতামহ ছিলেন রঙ্গপুরের মহারাজা, আর পিতামহ ছিলেন মুড়াগাছার জমিদার। দেবীপ্রসাদের পিতার নাম উমাপ্রসাদ রায়চৌধুরী। স্কুলের পরিবর্ত্তে গৃহেই দেবীপ্রসাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হয়। প্রাচুর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত বিত্তশালী পরিবারের সন্তান তিনি। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে ডন-কুস্তি, অশ্বারোহণ, জিমন্যাষ্টিক, শিকার এবং অন্যান্য ব্যয়সাপেক্ষ ক্রীড়াকৌশলাদি শিক্ষারও আয়োজন হয়।

শৈশবকালেই শিল্পকলার প্রতি দেবীপ্রসাদের গভীর অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৯ সালে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি শিল্পচর্চ্চাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং ঐকান্তিক আগ্রহ ও একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পকলার সাধনায় প্রবৃত্ত হন।

দেবীপ্রসাদের শিল্পশিক্ষা হয় তিনজন প্রখ্যাত শিল্পগুরুর নিকট: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিত্রকলা—ভারতীয় পদ্ধতি), অধ্যাপক ই. বয়েস (চিত্রকলা—পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি) এবং অধ্যাপক হিরণ্ময় রায়চৌধুরী, এ. আর. সি. এ. (ভাস্কর্য্য)। এই বিভিন্নমুখী শিক্ষার ফলে দেবীপ্রসাদের শিল্পকর্মে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির এক বিচিত্র সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। স্বতঃই স্বীয় শিল্পরচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দেশের শিল্পীদের অভিজ্ঞতাকে সহজ এবং স্বচ্ছন্দভাবে কাজে লাগিয়েছেন দেবীপ্রসাদ।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দেবীপ্রসাদ মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্ট্‌স্‌ এণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌-এর অধ্যক্ষের পদে বৃত হন। সুদীর্ঘ আটাশ বৎসর কাল কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ ক'রে ১৯৫৭ সালের জুন মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৫৪ সালে দেবীপ্রসাদ রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক নিউ দিল্লীস্থ ললিতকলা আকাদেমীর (নেশন্যাল একাডেমি অব আর্ট) প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এ ছাড়া আরো অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি আর্ট পার্চেজ কমিটির চেয়ারম্যান, অল ইণ্ডিয়া বোর্ড অব টেকনিক্যাল স্টাডিজ-এর চেয়ারম্যান এবং মাদ্রাজ ও অন্ধ্র রাজ্যের সরকারী শিল্পবিদ্যা বিষয়ক (চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য্য) পরীক্ষক সমিতির চেয়ারম্যান। তিনি টোকিওতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো আর্ট সেমিনারের সভাপতি এবং ডিরেক্টার হয়েছিলেন।

ভারতে এবং ভারতের বাইরে উভয়ত্র বিভিন্ন বিখ্যাত প্রাসাদে এবং চিত্রশালায় দেবীপ্রসাদের যে সকল চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে, অত্যুৎকৃষ্ট কলাকৌশলের জন্য সেগুলি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। সঙ্গীতজ্ঞ এবং সাহিত্যিকরূপেও রসজ্ঞমহলে তাঁর সমাদর আছে। 'প্রবাসী' এবং 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত তাঁর শিকারকাহিনী এবং ছোট গল্পসমূহ পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বুভুক্ষু মানব, জঙ্গল, পিশাচ, ইত্যাদি কয়েকখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন।

এই বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষটির সখও বিচিত্র রকমের। কুস্তি প্রভৃতিতে তাঁর অনুরাগের কথা আগেই বলা হয়েছে। ফুটবল খেলায়ও তাঁর পটুতা আছে। তা ছাড়া সাইকেলে চ'ড়ে হরেক রকমের ক্রীড়াকৌশল দেখাতেও তিনি বেশ ওস্তাদ। প্রথম যৌবনে জীবিকা অর্জ্জনের জন্যে এক সার্কাস পার্টিতে যোগ দিয়ে কিছুকাল তিনি বিভিন্ন স্থানে সাইকেলের খেলা দেখিয়েছিলেন। ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত এবং শাশ্বত (classical) সাহিত্যের প্রতিও তার অপরিসীম অনুরাগ। কিন্তু এহ বাহ্য। দেবীপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে এই যে, তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় কৃতী ভাস্কর, বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের সঙ্গে একই পংক্তিতে তাঁর আসন।

দেবীপ্রসাদের কয়েকটি শিল্পকর্ম ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। এগুলি তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি ব'লে সুধীজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় 'শহীদ স্মারকে'র (বিহার) কথা। সাতটি মনুষ্যমূর্ত্তি-সম্বলিত বিরাট্ এবং বিশিষ্ট শিল্পরচনা এটি। সেই সপ্ত শহীদের—সকলেই তারা স্কুল-কলেজের ছাত্র—মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হয়েছে এতে, ১৯৪২ সালে পাটনা সেক্রেটারিয়েটের উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করতে গিয়ে যারা ব্রিটিশের বুলেটে নিহত হয়। অনবদ্য শিল্পসুষমায় দেবীপ্রসাদের এই শিল্পকৃতি মনকে বিস্ময়াবিষ্ট করে। তাঁর 'শ্রমের জয়'ও (দিল্লী ও মাদ্রাজ) আর একটি অনিন্দ্য রূপসৃষ্টি। প্রায়শঃ এটিকে তুলনা করা হয় রদাঁ-কৃত 'বারঘারস অব ক্যালে'র সঙ্গে যদিও এটি শিল্পীর সম্পূর্ণ মৌলিক কল্পনা। এই শিল্পকর্মটি এখন স্থান পেয়েছে নিউ দিল্লীর নেশন্যাল গ্যালারির শিল্প-সংগ্রহে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক এটির প্রতিরূপ ডাকটিকিটে ব্যবহৃত হয়েছে।

এ ছাড়া তাঁর আরো কয়েকটি ভাস্কর্য্য-রচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা : (১) 'মহাত্মা গান্ধী' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দ্দেশে নির্ম্মিত দ্বিগুণ পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি।

(২) শীতাগমে (When Winter Comes), এটি আছে ভবনগরের মহারাজার শিল্পসংগ্রহে।

(৩) দ্বন্দ্ব—দ্বিগুণ পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি।

দেবীপ্রসাদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে সকল আবক্ষ মূর্ত্তি বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য :

আমার পিতৃদেব, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, মিঃ এ. এম সি. জি. সি টাম্পো, স্যার সি. ভি রামন, স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার, স্যার সি. আর রেড্ডি।

দ্বিগুণ পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তির মধ্যে বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে : মহাত্মা গান্ধী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, মহারাজা অব ত্রিবাঙ্কুর, মহারাজা অব কোচিন, ইত্যাদি।

ভাস্কর্য্যের ন্যায় দেবীপ্রসাদের চিত্র-কর্ম্মও দেশ-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর অনেকগুলি ছবি মস্কো, প্যারিস, লণ্ডন, চীন এবং অন্যান্য বহু দেশে রসজ্ঞ ব্যক্তিদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে।

দেবীপ্রসাদের আঁকা বহু ছবি প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কতকগুলি বিশিষ্ট ছবি হচ্ছে : লেপচা কুমারী, সুমাত্রার পক্ষীমিথুন, প্রাসাদ-পুতুল, ক্ষত্রিয়াণী, অভিসারিকা, মুসাফির, নির্ব্বাণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি, যখন বর্ষা নামে, ইত্যাদি।

দেবীপ্রসাদ কঠোর পরিশ্রমী, দৃষ্টি তাঁর স্বচ্ছ। শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিপ্লবী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হলেও তিনি সকল সময়েই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন। প্রথম যৌবনে মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি চিত্র-রচনা এবং মূর্ত্তি গড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সুদীর্ঘকাল যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলেছে তাঁর অক্লান্ত সাধনা। আজও তুলির টানে এবং ছেনির আঘাতে তাঁর নব নব রূপসৃষ্টির বিরাম নেই। আজ একষট্টি বৎসরের এই প্রবীণ রূপদক্ষ মর্ম্মে মর্ম্মে এক অপূর্ণতা এবং অতৃপ্তির বেদনা অনুভব ক'রে বলেন—"আরো ভালো ক'রে জানবার এবং বুঝবার জন্যে এখনো কঠোর সংগ্রাম ক'রে যাচ্ছি আমি এবং নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যে আমার চেষ্টারও অন্ত নেই।"

এই Divine discontent বা দৈবী অতৃপ্তিই শিল্পীকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা যোগাচ্ছে, তাই এখনো তিনি শিল্পসাধনায় প্রতিনিবৃত্ত হন নি, নব নব অর্ঘ্য দ্বারা শিল্পলক্ষ্মীর আরাধনায় আজো তিনি ব্রতী আছেন একাগ্র নিষ্ঠায়।

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সরকার এম, বি, ই উপাধি দ্বারা দেবীপ্রসাদকে সম্মানিত করেছিলেন। আর আজ স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র পদ্মভূষণ পদবী দ্বারা তাঁকে অলঙ্কৃত ক'রে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ গুণীর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

দেবীপ্রসাদের শ্রীমুখাৎ শিল্পের নিগূঢ় তত্ত্ব ও রসের ব্যাখ্যান শোনা মস্তবড় একটা সৌভাগ্য। তাঁর সুস্পষ্ট উক্তিগুলি শ্রোতার অন্তর স্পর্শ ক'রে এবং সুন্দরের প্রতি তার অনুরাগকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। দেবীপ্রসাদকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত রাশভারী এবং পরুষপ্রকৃতির ব'লে প্রতীয়মান হলেও কেউ যদি এই বহিরাবরণ ভেদ ক'রে তাঁর হৃদয়ের কোমলতম স্থানে ঘা দিতে পারে তা হলে তিনি তাঁর অন্তরের মণিকোঠায় সঞ্চিত সম্পদরাশি একেবারে উজাড় ক'রে ঢেলে দেন, এবং প্রত্যেকেই তাঁর সুভাষিতাবলী থেকে সার সংগ্রহ ক'রে উপকৃত হতে পারেন। রসিকজনের রসবুভুক্ষার পরিতৃপ্তি বিধানে তাঁর ক্লান্তি নেই।

এই প্রবন্ধে যে কয়জন কৃতী বাঙালী ভাস্করের জীবন ও কৃতির পরিচয় দেওয়া হ'ল তাঁরা যে বাংলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের অনুগামীর সংখ্যা বড়ই কম। চিত্রশিল্পের ন্যায় ভাস্কর্য্যের সাধনায়ও যেন অধিকতরসংখ্যক বাঙালী শিল্পী এগিয়ে আসেন, প্রকৃত শিল্প-রসিক একান্তমনে তাই কামনা করেন।

—•—

ছোট নাতিটি উদর-পীড়ায় ভুগছিল।

হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি, ইত্যাদির ছিঁটেফোঁটা দিয়েও যখন রোগটাকে কাবু করা গেল না তখন একজন বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী টোট্‌কার ব্যবস্থা দিলেন। বললেন, কচি ছেলের ধাতে কি চড়া ওষুধ সহ্য হয় গা? ওই সব ছাইভস্ম গিলিয়ে ছেলেটার ধাতটাকে শুধু বিগড়ে দিচ্ছ! তার চেয়ে আমার একটা কথা শোন—টোট্‌কা চিকিচ্ছে কর। মাত্তর তিনটি দিন—দেখই না কি হয়? এই তিন দিনে ডাক্তারবাবুরা ত গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাবে [illegible] টোট্‌কায় উবগার না হয়, কচি ছেলেটাকে তখন ডাইনের হাতেই তুলে দিও।

ব্যবস্থা দিলেন, সকালে খালি পেটে জামপাতার রস এক ঝিনুক—দু' ঝিনুক ছাগলের দুধ, তার সঙ্গে সামান্য চিনি বা মিছরির গুঁড়ো মিশিয়ে খাইয়ে দেবে। সারাদিনে দুধ-বার্লিও খেতে পারে তবে ওই ছাগলের দুধ ছাড়া অন্য দুধ নয়। এমন কি মায়ের দুধও নয়।

ব্যবস্থাটি জটিল নয়, ছাগলের দুধ জোগাড় করাই যা কঠিন। দুধ নামক যে পদার্থটি আমরা শহরে ব'সে পাই তা নির্ভেজাল ত নয়ই, কোন্ কোন্ প্রাণীদেহ থেকে আহৃত ও কি উপাদানে গঠিত তা দুধের স্রষ্টিকর্তারাই জানেন। ছাগীর দুধ ওভাবে সংগ্রহ করলে চলবে না। ছাগল আনিয়ে সামনে দুইয়ে সেই দুধ খাওয়াতে হবে। যাই হোক, এবম্বিধভাবে ছাগদুগ্ধপ্রাপ্তির ব্যবস্থা উনিই ক'রে দিলেন। টোট্‌কার সঙ্গে হোমিও-সাগুদানাও গোটাকয়েক ক'রে চালিয়েছিলাম—অবশ্য বিধানদাত্রীর অগোচরে। যার গুণেই হোক, সাত দিনের মধ্যে নাতি সুস্থ হয়ে উঠল। এবং সেই থেকেই এই কাহিনীর সূত্রপাত।

ইতিমধ্যে ডাক্তারের কাছ থেকে ছাগদুগ্ধের গুণাগুণ জেনে নিয়েছিলাম। লঘু, সহজপাচ্য, বল- ও পুষ্টিকারক। বিশেষ ক'রে শিশু ও রোগীর পক্ষে একাধারে ঔষধ ও পথ্য।

দুধের গুণাগুণ শোনা অবধি গৃহিণী মুগ্ধ এবং পুলকিত হয়েছিলেন। এবং কিছু চিন্তান্বিতও। সুযোগ মত একদিন বললেন, দেখ, একটা কথা ক'দিন থেকেই ভাবছি। একটা ছাগল পুষলে কেমন হয়? শুনি ত ছাগল পুষতে তেমন খরচ নেই। গাছের ডালপালা, কুটনোর খোলব্যাকুলা, ভাতের ফ্যান—হ'ল বা পাত-কুড়োনো একমুঠো ভাত···ছোট্ট একটা জীব, কতই বা খাবে?

শুনে উৎসাহিত হতে পারলাম না। এই শহরের ভাড়াবাড়ীতে নিজেদেরই স্থান-সঙ্কুলান হয় না, এর মধ্যে আবার ছাগল! শহরে গাছপালাই কি সহজলভ্য, যে পাতা সংগ্রহ করব?

আশঙ্কা প্রকাশ করতেই গৃহিণী বললেন, কেন, ছাদ রয়েছে না? আলসের কোণে দু'খানা দরমা ফেললে অনায়াসে ছাগল থাকতে পারবে। গাছপালার জন্যে ভারি ত ভাবনা! এতগুলো পার্ক রয়েছে, কতই ত গাছ-গাছড়া সেখানে। রাস্তার দু'ধারে ফুটপাতেও কত গাছ—গোটা দু'চ্চার ডাল কি কেউ ভেঙ্গে আনতে পারবে না?

বড় ও মেজ ছেলে একযোগে লাফিয়ে উঠল, আমি আনব মা।

গৃহিণী হেসে বললেন, এই ত হাঙ্গামা মিটে গেল। তুমি বাবু একটা ছাগল দেখ। বেশ বড়সড় ছাগল—যেমন বাবলুর দুধওলা আনত। এক টানে তিন পোয়া দুধ দেবে। ছাগল এলেই গোয়ালাকে ছাড়িয়ে দেব কিন্তু। ও ছাইভস্ম খেয়ে খেয়ে ছেলেমেয়েগুলোর চেহারা যা দাঁড়াচ্ছে! চা খেয়েও সুখ পাই নে। ছাগল এলে তবু খাঁটি দুধটা পাব—সবাই এক ঢোঁক ক'রে খেলেও গায়ে গত্তি লাগবে।

ওঁর কল্পনায় আপাতত যে রঙটি ধরেছে তা রীতিমত পাকা, সর্ব্বপ্রকার যুক্তিতর্কের জল দিয়ে ধুলেও মুছবে না। সে চেষ্টা করলাম না।

কিন্তু ছাগলের দাম শুনে আঁতকে উঠলেন গৃহিণী। এ্যাঁ, বল কি! একটা ছাগলের দাম আশী-নব্বুই টাকা!

গৃহিণীকে দমিয়ে দেবার জন্য সোৎসাহে বললাম, হবে না! দু'বেলায় এক সের পাঁচ পোয়া ক'রে দুধ দেবে যে। এক সের ছাগল-দুধের দাম কত? দু' টাকা। দু' মাসও যদি একটানা দুধ দেয়, অন্তত এক সের ক'রেও দেয় তাহলে হিসেব কর দামটা।

ফলটা হ'ল বিপরীত। গৃহিণীর চোখ-মুখ চক্‌চক্‌ ক'রে উঠল। হিসাবের জের টেনে উজ্জ্বল মুখে বললেন, তবে? তা ছাড়াও বছরে দু'বার বাচ্চা হবে। দুটো ক'রে হলেও এক গণ্ডা। খুব কম ক'রে ধরছি—পাঁচ টাকা যদি এক-একটা বাচ্চার দাম হয় তাহলে···তুমি বাপু যে ক'রে হোক ছাগল কিনে ফেল।

কি আর বলব—নিজের অস্ত্রে নিজে ঘায়েল হয়েছি! শুধু বললাম, মাসকাবারের মাইনের হিসাবটা ত তুমি জান।

ফোঁস ক'রে নিঃশ্বাস ফে'লে মুখ ভার করলেন গৃহিণী। বললেন, জানি বৈকি—সবই জানি! পোড়া অদৃষ্টে যদি সুখ-শান্তিই থাকবে ত তোমার হাতে পড়ব কেন!

বলতে পারতাম, সেজন্য দায়ী আমি নই, দায়ী তোমার পিতৃদেব। যিনি বাংলার এক মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, তিন কন্যার জনক, সওদাগরী আপিসের কেরাণী। এর বেশী কি সৌভাগ্যই বা তিনি এনে দিতে পারতেন কন্যাকে!

প্রকাশ্যে বললাম, আচ্ছা সন্ধানে রইলাম, যদি পঞ্চাশ-ষাট টাকার মধ্যে পেয়ে যাই, ধারধোর ক'রে যেমন ক'রেই হোক ছাগল একটা কিনবই।

হাঁ, তুমি আবার ছাগল কিনেছ! গোয়ালার জল গিলে গিলে পেটের নাড়িভুঁড়ির দফা গয়া হয়ে যাচ্ছে—ছাগলের দুধ জুটবে কেন বরাতে! সেই ভাগ্যি করেছি কিনা!

সে আশা আমিও অবশ্য করি নি, কিন্তু যোগাযোগটা কেমন আকস্মিকভাবেই ঘ'টে গেল।

গল্প করেছিলাম সুবীরের কাছে।

সুবীর রহস্য ক'রে বলেছিল, আচ্ছা, আমিও সন্ধানে রইলাম। বৌদির হাতের চা ছাগদুগ্ধ সহযোগে উপাদেয় হবে আশা করি।

বলেছিলাম, ওই আনন্দেই থাক।

সপ্তাহও কাটে নি—সুবীর এসে বলল, ওহে ব্রাদার, একটা সুখবর আছে। কি খাওয়াবে বল?

বুকটা ধ্বক্‌ ক'রে উঠল। রেঞ্জার্সের একখানা টিকিট কিনেছিলাম গত মাসে। মনে ছিল না। প্রতি তিন মাস অন্তরই কিনি। দশ বছর ধ'রে কিনছি। প্রথম তিন-চার বছর টিকিট কেনার সঙ্গে সঙ্গে ড্রইং-এর দিন গুনতাম দুরু দুরু বুকে। অতঃপর ভাবী পুরস্কার-প্রাপকদের তালিকা বার হলে আগ্রহ ভরে নম্-ডি-প্লুমগুলির নাম পড়তাম আর ভাবতাম—ইস্, কি ভুলই না করেছি—ওই নামটি টিকিটে না দিয়ে। পাঁচ বছর বাদে নাম-ওঠা সম্বন্ধে খানিকটা

নির্ব্বিকারত্ব লাভ করেছিলাম। তবু আশায় আশায় টিকিটটা কিনে নিয়েছি। মাত্র বছর খানেক আগে স্থির জেনেছি, আমার কপালটা পাথর-চাপাই। না হলে আপিসে সব নীচের গ্রেডে এবং ভাড়া-বাড়ীতে তিন তলায় একখানি মাত্র ঘরে দশ বছর ধ'রে ঘষড়াচ্ছি! অভ্যাসটি তবু যায় নি—টিকিট কিনেই চলেছি। টিকিট কিনতাম, সঙ্গে সঙ্গে ভুলেও যেতাম। এমনি ক'রেই চলেছে। হঠাৎ সুখবর!

আমাকে চিন্তান্বিত দেখে সুবীর বলল, লাকি চ্যাপ। কথায় বলে, যে খায় চিনি—তার চিনি যোগান চিন্তামণি।

গম্ভীরমুখে বললাম, সবাই কি চিন্তামণিকে মানে?

আলবৎ মানে যদি রসদ তিনি যুগিয়ে দেন। তোমার অন্ন-সমস্যার সমাধান হয়ে গেল আজ।

কি রকম?

ছাগল মিল গিয়া। আর লাকি চ্যাপ বলছি—এই জন্তে যে মিল গিয়া মুফৎসে।

মানে?

ওহে নাস্তিক-প্রবর—আগে বল ভগবান্ মান কি না—তবে বলব।

হাসিমুখে এমন ভাবে একটু মাথা হেলালাম—যার অর্থ 'হাঁ' 'না' দুই-ই হয়।

সুবীর সোৎসাহে সুরু করল, তাহলে শোন। আমার এক কাকা আগামী সপ্তাহে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন দিল্লীতে। তিন-চার দিনের মধ্যেই স্টার্ট করবেন। যাবতীয় জিনিষপত্রের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন—অর্থাৎ সবই সঙ্গে যাচ্ছে। কেবল একটি জিনিষ নিয়ে মুশকিলে পড়েছেন। ওঁর একটি অজা আছে। ওটিকে সঙ্গে নিলে অনেক মাশুল লাগবে। সে দেওয়াও সম্ভব নয়, অথচ ফেলে যেতেও মন সরছে না। দশ বছর ধ'রে পুষছেন—চার-পাঁচ মাসের একটি বাচ্চাকে। মায়া পড়েছে। আমাকে বলছেন, তুই নে। কিন্তু জানই ত, আমি বা আমার স্ত্রী ওই ধরণের জীবজন্তুর ঝঞ্ঝাট পছন্দ করি না। বিশেষ ক'রে ছাগল—যা নোংরার একশেষ। বলেছি, কাল জানাব। এখন তোমাদের মতটা জানতে পারলেই ওঁকে 'হাঁ' 'না'—যা হয় ব'লে দেব।

বললাম, ছাগলটা দুধ দেয় ত?

আলবৎ। বাচ্চা-টাচ্চা অবশ্য নাই। এখনও নাকি আধ সের ক'রে দুধ দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার হিসাব সুরু হ'ল। দিন আধ সের মানে মাসে পনেরো সের। যে দামে গরুর দুধ কিনি, অর্থাৎ টাকা টাকা সের ধরলেও পনেরো টাকা। খরচ কিছুই নয়। গাছের পাতা, আনাজের খোসা, পাতের ফেলে-দেওয়া ভাত-ডাল তরকারি···উৎসাহিত কণ্ঠে বললাম, আমি রাজী। কালই যেতে হবে?

তোমায় কিছু করতে হবে না—আমিই পৌঁছে দেব তোমার জিনিষ। তবে মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা থাকে যেন।

নিশ্চয়—নিশ্চয়।

•

খবর পেয়ে বাড়ীর সকলে প্রায় নেচে উঠল। গৃহিণী বাক্স খুলে একখানা দু'টাকার নোট বা'র ক'রে বড় ছেলেকে বললেন, এই বেলা দু'খানা দরমা কিনে আন গে। পুব দিকের আলসের কোণে ফেলে একখানা বাঁশ দিয়ে বেঁধে দিলে দিব্যি ঘর হবে 'খন। আজই ওটা তৈরি ক'রে রাখ বাবা।

মেজ ছেলে বলল, মা, গাছের ডাল ভেঙে আনব?

বললাম, ওসব না হয় কালই হবে, আগে আসুকই ছাগল।

গৃহিণী বললেন, কাল তোমাদের আপিস, স্কুলের ভাত দেব, না এই দিক্ দেখব? যা রে নন্তে—পাতা নিয়ে আয়।

মেয়েকে বললেন, কি কুটছিস্ রে বুড়ি? কাঁচকলার খোসা, বেগুনের বোঁটা, কপির শাকটা যেন ফেলিস্ নে, কাল ছাগলকে দিতে হবে।

রাতে বিছানায় শুয়েও ঘুমুতে পারলেন না। খানিক চুপ ক'রে থাকেন আর শুধোন, হাঁ গা, দু' বেলাতে আধ সের দুধ দেয়, না এক বেলাতে? আমার বোধ হয় দু'বেলায় তিন পোয়া দেয়। ক'টা বাচ্চা হয়েছিল? পাঁটা না পাঁটী? আপনি ম'রে গিয়েছে, না বেচে দিয়েছে? এক-একটার দাম পাঁচ টাকা ত হবেই। কি বল?

লটারিতে নাম উঠলে ওর চেয়েও মনোরম কল্পনার জাল বুনতে পারতাম কি?

যথাসময়ে ছাগল এলো। দিব্য দশাসই চেহারা, মনে হ'ল পাটনাই ছাগল। মিশ কালো নয়—ছেয়ে ছেয়ে রং, একটু চেকনাই কম, গায়ের লোমগুলি ঈষৎ কর্কশ। কোন কোন মানুষের মাথার চুল না পেকেও যেমন কিছু কঠিন ও কর্কশ দেখায়, তেমনি। একটু বেশী স্থির-শান্ত। দার্শনিক ভাবগ্রস্ত। খুটু খুটু শব্দ তুলে ছাদে গিয়ে উঠল, বার দুই ব্যা ব্যা ক'রে ডাকলও। তার পর পত্র-চর্ব্বণে মনোনিবেশ করল। বেশ শান্তশিষ্ট অজা—যেন রক্ষঃকুলে সরমা।

গৃহিণী অত্যন্ত পুলকিত। বললেন, এই রকম ভালমানুষ ছাগল চাইছিলাম। আহা, যেন মাটি দিয়েই গড়ানো। হাঁ-গা, এর কি নাম রাখি বল ত?

মুখপোড়া ছাগল খুকীর ফ্রকটা চিবিয়ে আর কিছু রাখে নি।

যা তোমার খুশি। একটু ভেবে বললাম, লক্ষ্মী রাখতে পার।

দূর—তা কখনো হয়! একটু ভেবে বললেন, আজ বুধবার ত? ওর নাম বুধি থাক।

হাঁ—দুধের সাধ ঘোলে মিটুক। গরু তো পুষতে পারব না—

সুবীর বলল, তাহলে বৌদি এক কাপ চা ক'রে খাওয়ান। বুধির দুধের চা কিন্তু। আপনি দুধ দুইতে পারবেন ত?

গৃহিণী ঘাড় নেড়ে বললেন, পারব। বাঁটে জল-হাত বুলিয়ে দুইব—ওর কষ্ট হবে না।

একটি কাঁসার বাটিতে দুধ দুইয়ে আমার সামনে এনে বললেন, এক পোয়ার একটু কম কম মনে হচ্ছে না?

একটু নয়—অনেকখানি কম।

হবে না, এই ত সবে হাক্লান্ত হয়ে এসেছে। না খাওয়া—না জিরোনো। গলার স্বর নামিয়ে বললেন, সুবীর ঠাকুরপোর সবতাতেই তাড়াহুড়ো!

ঘণ্টা দুই পরে আবারও বাটি হাতে উঠেছিলেন দেখে বললাম, এরই মধ্যে আবার দুইতে চলেছ?

বললেন, তোমার ঘটে যদি একটু বুদ্ধি থাকে! এ কি গরু যে এ বেলা দুইব—ও বেলা দুইব? ছাগলকে ছাঁকে ছাঁকে দুইতে হয়—না হলে ওরা দুধ চুরি করে।

দিন চলছিল এক রকম, নির্ব্বিবাদে নয়। প্রথম দিকে অজা-সুন্দরীকে যতটা শান্ত শিষ্ট নিরীহ মনে হয়েছিল—সে তা নয়। ক্রমে ওর জাতিগত গুণপনা প্রকাশ পেতে লাগল। অপর ভাড়াটেদের নালিশ ও প্রতিবাদ থেকে এটি বুঝতে পারলাম।

সে প্রতিবাদ নানা বিষয় নিয়ে।

কোনদিন শুনি, ও মাগো, ছাগল নাদিতে ছাদটা যে নোংরা হয়ে গেল! নাদিগুলো পরিষ্কার ক'রে ফেল দিদি, না হলে লেপ কাঁথা রোদ্দুরে দেব কোথায়?

পরের দিন: এমা, আমার কি হবে? এমন কেত্তি অপচো ত ভাল নয়। দেখলে দিদি, দেখলে—মুখপোড়া ছাগল খুকীর ফ্রকটা একেবারে চিবিয়ে আর কিছু রাখে নি। ঝাঁটা মার—ঝাঁটা মার।

আহারদাত্রীকে লাথি মেরে

তার পরের দিন : ওমা, দড়ি ছিঁড়ে আম-কাসুন্দিগুলো সব গিলেছে রাক্ষুসে ছাগল ! একগাছা শক্ত দড়িও কি জোটে নি দিদি ?

ওদিকে গৃহিণীর খাটুনিও বেড়ে গেছে। দুবেলা ছাদ পরিষ্কার রাখা, দশবার ছুটে ছুটে ছাদে উঠে দেখা—ছাগল কিছু অঘটন ঘটালো কি না, ছাগলকে খাওয়ানো, দুধ দোওয়া...একটি ছেলে মানুষ করার পুরোপুরি ধকল সইতে হচ্ছে। তবু উনি হাসিমুখে সব সইছেন। দু'বেলা দুধ যা মিলছে—তা চায়েতেই কোন রকমে কুলিয়ে যাচ্ছে—ছোট ছেলেটার জন্য গোয়ালার বরাদ্দ দুধই রাখতে হয়েছে। এক পোয়ার সামান্য কিছু বেশী দুধ, তাও পাঁচ দু বারে পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম উৎসাহের বেগটা সকলকারই ক'মে গেছে। এখন ছেলেরা সবদিন পাতা আনছে না, গৃহিণীও পাতের ফেলাছড়া ব'লে হাঁড়ীর ভাত থেকে, কিংবা নিজের ভাগ থেকে ছাগলকে খাওয়াচ্ছেন না।···প্রায়ই বলছেন, ভাত খাইয়েও যা, না খাইয়েও তাই—দুধের ত বাঁধা বরাদ্দ। "যাই বল, ছাগলটা ভারি নেমকহারাম।

মাস খানেকের মধ্যেই তার অকাট্য প্রমাণ মিলল।

সেদিন শূন্য বাটি হাতে গজ গজ করতে করতে ছাদ থেকে নেমে এলেন গৃহিণী। কাপড়ে কাদা মাখামাখি।

কি ব্যাপার ? কাপড়টার কাদা লাগল কি ক'রে ?

বাটিটা ঠক্ ক'রে মেঝের উপর রেখে বললেন, আহা, কি ছাগলই এনেছেন ! কালই একে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব। এমনও নেমকহারাম জন্তু !

বড় ছেলে বলল, মা দুধ দুইতে বসেছে যেই—ছাগলী তিড়িং মিড়িং লাফিয়ে জলের ঘটি সুদ্ধ মাকে ফেলে দিয়েছে।

গৃহিণী জ'লে উঠলেন, দেবে না—খেয়ে খেয়ে মস্তানি বেড়েছে যে ! কোথায় পরের ভুষি, শুকনো ছোলা, চিটে গুড়, নিজের পাতের ভাত পহরে পহরে মুখে ধরেছি যে—হবে না ? যমের বাড়ী যাক অমন ছাগল।

গৃহিণী চ'লে গেলে ছেলের মুখে শুনলাম—এত ক'রেও দিন দিন দুধ ক'মে যাচ্ছিল, আজ আহারদাত্রীকে লাথি মেরে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে দুর্বৃত্ত জীব।

বৈকালেও সকালের দৃশ্য পুনরভিনীত হলো।

পর পর তিন দিন একই দৃশ্য।

গৃহিণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ছাগলীটাকে যথারীতি যমভবনে যাওয়ার কথা ব'লে—আত্মগত ভাবে বলতে লাগলেন, শুধু শুধু গিলিয়ে কি লাভ? গরু হ'ত তবু গোবরের পিত্যেশ থাকত। এ যে না হোমে, না যজ্ঞিতে। বিদেয় কর, বিদেয় কর।

সুধীরকে বললাম সব কথা।

সুধীর বলল, ঘাবড়াচ্ছ কেন, আবার বাচ্ছা হলেই দুধ দেবে।

বললাম, গিন্নী মহাখাপ্পা—ওকে বিদেয় করবেনই। তুমি ভাই ওটা ফিরিয়ে নাও।

ক্ষেপেছ! সুধীর হাসল। তোমার বন্ধুপত্নীরও এ বিষয়ে কম শুচিবাই নয়। ছাগল কোনমতে সহ্য করতে পারবে না।

তাহলে ওটা যে ভাবে হোক ডিস্‌পোজ অব ক'রে দিই?

স্বচ্ছন্দে।

বাসায় ফিরতেই গৃহিণী বললেন, ঠাকুরপো রাজী হয়েছে ফিরিয়ে নিতে?

না।

তবে? আমি বাপু ওর সেবাযত্ন করতে পারব না। ছেলেরা আর গাছের ডাল আনছে না, মেয়ে রাগ ক'রে কুটনোর খোসা ফেলে দিচ্ছে। দিন রাত ব্যা ব্যা ক'রে ডাকছে ছাগলী—দুপুরে একটু চোখ বুজতে পারি নে। যত দায় ঝক্কি কি আমারই!

বললাম, তাহলে খদ্দের দেখি!

দেখ।

কেউ কেনে ভাল—না কেনে বিলিয়ে দেওয়া যাবে।

গৃহিণী নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, যা খুশি করগে।

পাড়ার মুশকিল-আসান হারু খুড়োকে ধরলাম। সব খুলে বললাম। বললাম, ভারি বিপদে পড়েছি খুড়ো—একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও।

খুড়ো অভয় দিয়ে বললেন, এ আর বেশী কথা কি? কাল পরশুর মধ্যেই ওটার গতি ক'রে দিচ্ছি।

একটু থেমে কি ভেবে বললেন, তার আগে ছাগলটাকে একবার দেখব ভাইপো। খদ্দেরের কাছে ওর রূপগুণ ব্যাখ্যান করতে হবে কি না?

বেশ ত—এখনই দেখুন।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছাগলী নিরীক্ষণ ক'রে ঘাড় নাড়লেন হারু খুড়ো।

অবাক্ হয়ে বললাম, কি ব্যাপার?

এ চলবে না। গম্ভীর ভাবে রায় দিলেন খুড়ো।

মানে?

মানে বিক্রী হবে না।

হতভম্বের মত বললাম, কেন, এত বড় পাটনাই ছাগল—

খুড়ো ঘাড় নেড়ে বললেন, এ ছাগল অমনি দিলেও কেউ নেবে না। বুড়ো ছাগল।

তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করলাম, বুড়ো ছাগল! না, না, আমার বন্ধুর কাকার বাড়ীতে ছিল মাত্তর দশ বছর। ছ'মাসের—না এক বছরের বাচ্চা উনি এনেছিলেন।

তবে! হাসলেন হারু খুড়ো। ও ত ভাগাড়ের পানে ঠ্যাং বাড়িয়েই রয়েছে! এগারো বছরের ছাগল—বুড়ো থুথুড়ো, ও কি আর বাচ্চা দেবে! আঃ বোকারাম, ডাকপুরুষের বচনটাও জান না? কি বলছে শোন:

মরা গঙ্গা বিশে শঙ্খ।
তার অর্দ্ধ বাঁচে হংস।
বাইশ বলদা—তেরো ছাগলা,
তার অর্দ্ধ বরা পাগলা।

অর্থাৎ একশো কুড়ি বছর পরমায়ু মানুষের আর হাতীর। তার অর্দ্ধেক বাঁচে 'হয়' কিনা ঘোড়া। গরুর বাইশ, ছাগলের তেরো। তা এগারো পেরিয়েছে যে ছাগলের—তার ভাগাড় পানে ঠ্যাং নয়?

শুনে গৃহিণী বললেন, বুড়োর ভীমরথী ধরেছে। মিথ্যে পয়সায় দিলে সবাই নেবে ছাগল। আমি অমনিই দেব। মণি, তুই বাবা একটা লোক দেখ—ওনার দ্বারা কিছু হবে না।

পরের দিনই বড়ছেলে একটি লোককে ডেকে নিয়ে এল। লোকটির চেহারা দেখলেই অভক্তি জন্মায়। ওর কথা শুনে ত আমার আত্মাপুরুষ খাঁচা ছাড়া।

বেশ ক'রে ছাগলটাকে টিপেটুপে—পাঁজা-কোলা ক'রে তুলে পরীক্ষা করল। তার পর হেঁড়েগলায় বলল, শালার বকরিকে কি এখুনি লিয়ে যাব বাবু?

গম্ভীর ভাবে বললাম, না। কাল খবর পাঠাব।

লোকটা হেসে বলল, ঠিক আছে। কাল সবেরে খবর ভেজবেন। কাল্লু আছে হামার নাম—সে বড় খোকাবাবু জানে। বহুৎ দিন-সে আপনাদের উমদা উমদা গোস্ খিলায়েছি। উনি-সে খবর ভেজবেন।

কাল্লু চ'লে গেলে ছেলেকে ধমকালাম, হাঁরে, তোর ঘটে কি একটুও বুদ্ধি নেই? একটা কসাইকে ডেকে এনেছিস!

গৃহিণী শিউরে উঠে বললেন, উঃ, ভগবান্ রক্ষে করেছেন। আমার ত গা হাতপা এখনও কাঁপছে। ভাগ্যিস ওকে দিয়ে দাও নি? তা হ্যাগা—ওরা কি পাঁঠার মাংস বিক্রী করে? অত বুড়ো ছাগল।

বললাম, পাঁঠার মাংস মানেই যে কোন বয়সের মাদীমদ্দ ছাগলের মাংস।

গৃহিণী বারংবার শিউরে উঠলেন, রক্ষে কর—এমন অধর্ম্মের কথা ব'লো না। ঝ্যাঁটা মারি মাংস খাওয়ার মাথায়। যাই বল বাপু—বুধিকে আমি যার-তার হাতে তুলে দেব না। আগে ভাল ক'রে লোকটাকে দেখব, তার কথাবার্ত্তার ধরণ-ধারণ বুঝব, খোঁজখবর নেব, তবে ছাগল দেব।

মনে মনে বললাম, এ যে কন্যাসম্প্রদানেরও বাড়া।

সেই থেকে মাঝে মাঝে ছাগলের গ্রাহক আসছে, ফিরে ফিরে যাচ্ছে। বড় কঠিন পরীক্ষক গৃহিণী, কোনটিকে পছন্দ আর করছেন না।

লোক এলেই বলেন, যাই বল তোমরা—বুধিকে আমি যার-তার হাতে দেব না। যে ক'টা খদ্দের দেখলাম—সবই চাষাড়ে চেহারা, বিটকেল বিদঘুটে কথাবার্ত্তা।

একদিন বিরক্ত হয়ে বললাম, বুধি ত আর আমাদের মেয়ে নয় যে, এমন ভাবে পাত্র বাছাই করতে হবে।

কি বললে? তড়িৎগতিতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। দেখতে দেখতে ওঁর মুখখানি থমথমে হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ পরে চাপা ভাঙা গলায় বললেন, তোমরা পুরুষ মানুষ, নিষ্ঠুরের জাত। তোমরাই বলতে পার একথা। ছিঃ!

কথা শেষে আর দাঁড়ালেন না।

আমি কিন্তু হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছি। বড় ছেলে কখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাই নি। ওর চুপি চুপি কথায় চমকে উঠলাম। ও বলছে, বাবা, আর কাউকে ডেকে এনো না। মা বুধিকে কিছুতেই দেবে না।

চমকে উঠলাম। ফিরে এলাম বাস্তব জগতে। বললাম, কেন রে? কেমন ক'রে বুঝলি তুই?

ছেলে তেমনি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, আমি জানি। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, তুমি ত জান না—মা আবার ছাগলটাকে যত্ন করছে। আমরা ত ডাল-পাতা আনি না—তাই একটা লোকের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছে, সে রোজ দুপুরবেলায় এক আঁটি ক'রে কাঁঠালপাতা দিয়ে যায়। মা নিজের ভাত থেকে ছাগলকে খাওয়ায়। বলে, আহা থাক, ক'টা দিনই বা বাঁচবে! আচ্ছা বাবা, ছাগলরা নাকি তেরো বছরের বেশী বাঁচে না? সত্যি?

দপ ক'রে আলো জ্ব'লে উঠল। সেই আলোয় গৃহিণীকে নূতন ক'রে আবিষ্কার করলাম।

ঠিক—ঠিক। এক গাছি নরম রঙীন সুতোই বটে। সে সুতোটা কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে কোথা থেকে এসে কি ভাবে যেন পাকে পাকে জড়িয়ে গেছে ওঁর মনের নাকুতে। টানা পোড়েনে সুরু হয়েছে বুনন। এখন হাজার উল্টো পাক দিলেও খুলবে না সে সুতো।

অন্ধ পৃথিবী

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

অমরের ঝকঝকে গাড়ীখানা অদৃশ্য হয়ে যেতেই পাশের বাড়ীর শুভা ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল। অন্যমনস্ক প্রণতিকে জিজ্ঞেস করল, কারা এসেছিলেন? কিন্তু কি রান্না করছ—ধ'রে গেল যে!

প্রণতি দ্রুত হাতে কড়াইটা নামিয়ে মুখে একটা দুঃখসূচক শব্দ ক'রে বলল, শাক-চচ্চড়ি। খাওয়া যাবে না বোধহয়!

শুভা বলে, দাদা কোথায়? বাজারে গেছেন বুঝি?

ম্লান হেসে প্রণতি বলল, মাসের শেষে বাজার হবে কেমন ক'রে শুভা? তুমি কি আমাদের নতুন দেখছ!

সত্যি সত্যিই শুভা কিছু ভেবে বলে নি। সে লজ্জা পেল।

প্রণতি বলল, বাজারের কথা থাক, যাদের কথা শুনতে চাও তাদের কথা শোন। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা তোমার দাদার ছোট ভাই আর তাঁর স্ত্রী।

শুভা প্রশ্ন করে, এর আগে কোনদিন দেখি নি ত।

প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার জন্য প্রণতি ঘুরিয়ে জবাব দেয়, অনেক দূরে থাকে। তা ছাড়া দোষ দেব কাকে। নিজেদের নিয়েই সকলকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে...আর আমি নিজেই কি কারুর খোঁজ-খবর নিতে পারি শুভা?

শুভা বলে, ওঁরা ত দেখলাম গাড়ী ক'রে এলেন। মনে হ'ল গাড়ীটা নিজেদেরই।

প্রণতি একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, হ্যাঁ নিজেদেরই। ঠাকুরপো কর্মিৎকর্মা পুরুষ। নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছেন।...ধ'রে-যাওয়া শাক-চচ্চড়ির কটু গন্ধটা তখনও আশেপাশের বাতাসকে ভারী ক'রে রেখেছে। শুভার দৃষ্টি প্রণতির মুখের উপর থেকে স'রে গিয়ে একবার চুলার পাশে নামিয়ে রাখা কড়াইটার পানে নিবদ্ধ হ'ল।

শুভার কথার ইঙ্গিতটা কতকটা আন্দাজ ক'রে নিয়েই প্রণতি মনে মনে বিব্রত হ'ল, কিন্তু প্রকাশ্যে সহজ ভাবেই সে জবাব দিল, একটুও বাড়িয়ে বলছি না শুভা। সত্যিই ঠাকুরপোকে প্রশংসা করতে হয়। এত যে বড় হয়েছেন তা ব'লে কি একটুও...এই দেখ না, মেয়ের বিয়ে দেবেন, অমনি ছুটে এসেছেন। কি না, বৌদি তুমি না গেলে সব অন্ধকার। কে এত ঝামেলা পোয়াবে? শুধু টাকা উপায় করতেই শিখেছি। ঐ একটি ছাড়া আর কানাকড়ির যোগ্যতাও আমার নেই।

বললেন বুঝি। শুভা বলে।

প্রণতি উৎসাহিত হয়ে ওঠে। অকারণে মাত্রাধিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে বলে, বললেন বৈকি? তা ছাড়া কথাটা ত আর মিথ্যে না। নইলে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব আর বলবে কেন। প্রয়োজনের দিনে পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ব'লেই না...

প্রণতির মুখের কথা লুফে নিয়ে শুভা বলে, আত্মীয়...কি বলো প্রণতিদি। আর এ হচ্ছে একেবারে সাক্ষাৎ মায়ের পেটের ভাই।

প্রণতি জবাব দিল, তুমি যে ভাবেই কথাটা ব'লে থাক শুভা—মিথ্যে নয়।

শুভা একটু হেসে বলল, না প্রণতিদি, তোমাকে যতটা সাদাসিধে মনে করি তা তুমি নও। ব'লেই সে অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল, বিয়ে কবে? সবাই যাচ্ছ ত?

প্রণতি বলল, বিয়ের ঢের দেরি। আশীর্বাদটা সামনের সপ্তাহে। বিয়ে সেই ফাল্গুনের শেষের দিকে।...

কার বিয়ের কথা বলছ বড়বৌ? ঘরে প্রবেশ করতে করতে রবি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন।

শুভা চ'লে যেতে উদ্যত হতেই রবি তাকে বাধা দিয়ে বললেন, তুমি চ'লে যাচ্ছ কেন শুভা?

শুভা জবাব দিল, মেলাই কাজ প'ড়ে আছে দাদা। অনেক আগেই আমার চ'লে যাওয়া উচিত ছিল।

রবি বললেন, কাজ থাকলে নিশ্চয় যাবে। আমি ভাবলাম, হয়ত আমি এসে পড়েছি ব'লেই তুমি চলে যাচ্ছ। তাই বাধা দিয়েছিলাম। আচ্ছা তুমি এস।

শুভা প্রস্থান করল।

রবি পুনরায় পূর্ব্ব কথায় ফিরে এলেন। বললেন, তুমি কার বিয়ের কথা বলছিলে বড়বৌ?

কথাটা খাড়া পায়ে না শুনলেই কি চলছে না? আগে জামাটা খুলে রেখে একটু বিশ্রাম ক'রে নাও, তার পরে সবই বলব। প্রণতি বলল।

রবি জামা খুলে রাখতে ঘরে প্রবেশ করলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা তক্তপোশের উপর চিত হয়ে শুয়ে থেকে একসময় উঠে এসে মাথায় নামমাত্র খানিকটা সরষের তেল ঘ'ষে গামছাটা কাঁধে ফেলে পুকুরের দিকে পা চালালেন।

প্রণতি এতক্ষণে কড়াইতে ধ'রে-যাওয়া শাকটার পানে দৃষ্টি দিল। ফেলে দিলেই ভাল হয়, কিন্তু বোতলের শেষ বিন্দু তেলটুকুও স্বামী এইমাত্র মাথায় দিয়ে পুকুরে গেলেন।...

অমরের নতুন ঝকঝকে গাড়ীটা আর কুন্তলার কানের হীরার দুলটা আর একবার ঝলসে উঠল তার মনমুকুরে।

কুন্তলার বড় মেয়ে শেলীর বিয়ে। অনুর চেয়ে শেলী বছর তিনেকের ছোট। প্রণতির একমাত্র সন্তান অনু। আজ পর্য্যন্ত একটু সোনার জলও তার গায় উঠল না। সোনা দূরের কথা একখানা ভাল শাড়ী কিনে দেবার সামর্থ্যও তার মা-বাপের নেই। বিয়ের কথা না তোলাই ভাল। হয়ত আজও প্রণতির মনে দেখা দিত না। বিয়ে করা কিংবা বিয়ে দেওয়াটা বর্ত্তমানে তাদের কাছে বিলাসিতা। অপরিহার্য্য নয়। কিন্তু মন সব সময় যুক্তি মানে না। তাই মাঝে মাঝে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। স্বামীর মতবাদকে, তাঁর যুক্তি আর সিদ্ধান্তকে, অমরের পাশ কাটিয়ে যাবার ছল ব'লে মনে করে প্রণতি। কিন্তু এ নিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ সে কোনদিন করে নি।

রাজনৈতিক বিভাগ যখন তাদের সর্ব্বহারার মত রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয়, এঁরা দুই ভাই তাঁদের সাধ্যমত সম্বল নিয়েই মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু অমর দাদার পথ থেকে স'রে দাঁড়ায়। প্রচুর যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা তাহলে আজ থেকে আলাদা হয়ে গেলাম।

রবি মুহূর্ত্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে একবার সমুখে, পিছনে, ডাইনে আর বাঁয়ে তাকিয়ে দেখলেন, তারপরে

শান্তভাবে বললেন, তাই হোক অমর। আমার পথে তোমাকে জোর ক'রে ধ'রে রাখা অন্যায় হবে। কিন্তু পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায় প্রণতি, এ হতে পারে না ঠাকুরপো।

বাধা দিয়ে রবি গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, এইটেই ঠিক হচ্ছে বড়বৌ। দুনিয়ায় অনেক পথ আর অনেক মত। আমার পথে অমরের চলতে আপত্তি থাকলে ওকে জোর ক'রে বাধা দিতে চাইছ কোন যুক্তিতে? ওকে ওর পথে এগিয়ে যেতে দাও। হয়ত অমরের এতে ভালই হবে।

এর পরে প্রণতি আর বাধা দেয় নি। ছল ছল চোখে বিদায় দিয়েছিল, কিন্তু ভাল বলতে স্বামী যে কি বোঝেন তা আজও প্রণতির বোধগম্য হয় নি। নইলে অমরের জীবনের এই বিরাট্ পটপরিবর্ত্তনকে তিনি কৃপার দৃষ্টিতে দেখেন কিসের জন্য? যদিও তাঁর এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে একটা চমৎকার যুক্তি সব সময় তিনি দেখিয়ে থাকেন যা শুনতে খুবই ভাল, এমন কি মহৎ ব্যক্তিদের সুমহান্ বাণী হিসেবেও তা অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু জীবন-যুদ্ধে যারা প্রতিদিন তিল তিল ক'রে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তাদের মুখে একথা মানায় না। প্রণতি ভাবে। আর সম্ভবত সেই জন্যই অমরের জন্য তার মনের কোণে অনেকখানি স্নেহ আর প্রীতি জমা হয়ে আছে। অমরকে সে মনে মনে অভিনন্দন জানায়।...

ধ'রে-যাওয়া শাক-চচ্চড়ির কটু গন্ধটা আবার নতুন ক'রে প্রণতির নাকে এল।...আশ্চর্য্য, এমন লোককে নিয়েই সে ঘর ক'রে চলেছে যাঁর একটা স্বাভাবিক অভাব-বোধও নেই, সুখ-দুঃখের অনুভূতিও অসাড় হয়ে গেছে।

তিরস্কার করলে হেসে হেসে বলেন, আরও একটু নীচের দিকে তাকাও বড়বৌ। আসলে সুখ-দুঃখের সত্যিকারের কোন রূপ নেই। ওটা আমাদের মনগড়া সৃষ্টি। তাছাড়া সব কাজ কি সকলে পারে?

এই অক্ষম উক্তিগুলি শুনে শুনে প্রণতির কান প'চে গেছে। আর সে শুনতে চায় না। শুনতে ভাল লাগে না।

প্রথম প্রথম অমর তার দাদাকে অর্থসাহায্য করতে চেয়েছিল কিন্তু রবি তা গ্রহণ করেন নি। স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর অক্ষমতা। বলেছেন, কোন্ পথে তোমার টাকা আসছে সে খবর আমি জানি অমর। তোমার টাকায় অভাব মোচন করার চেয়ে আমি মৃত্যুবরণ করব তবু...কথাটা তিনি শেষ করতে পারেন না, উত্তেজনায় তাঁর দু'চোখ জ্বলতে থাকে। অমর পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। দাদাকে সে মনে মনে আজও ভয় করে।

এই ঘটনার পর বহু বছর সে এ-মুখো হয়নি; আজও হয়ত আসতে সাহসী হ'ত না, কিন্তু স্ত্রী কুন্তলার প্রবল ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করতে সে পারে নি। তাছাড়া এই তার প্রথম মেয়ের বিয়ে, এ সময় অন্তত: বৌদি উপস্থিত থাকবেন না, একথা ভাবতে গিয়ে অমর মনে হয়ত একটু ব্যথাই পেয়েছিল। নিজে উপস্থিত না থাকলেও এ সময় বৌদিকে দাদা নিশ্চয় বাধা দেবেন না ব'লেই অমরের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস শুধু তার একলারই নয়, নইলে প্রণতি বলামাত্র কখনই প্রতিশ্রুতি দিতে পারত না।

অমর খুশী হয়েছে মনে হ'ল। কুন্তলার মুখে খানিক অর্থপূর্ণ হাসি ফুটে উঠেই তা মিলিয়ে গেল।

অমর কুন্তলাকে নিয়ে চ'লে গিয়েছে। আগামী রবিবার গাড়ী পাঠাবে। ঐ দিন মেয়ের আশীর্ব্বাদ। ভাবী কুটুমদের ভালমন্দ খাওয়ান হবে। প্রণতিকে রান্নার দায়িত্ব নিতে হবে। একসময় রান্নায় তার খ্যাতি ছিল। অমর ত একজন অন্ধ ভক্তই ছিল। সে কথা আজও ভোলে নি দেখে প্রণতি মনে মনে খুশী হ'ল।

এদের বাড়ীতে বধূরূপে প্রবেশ ক'রে অমরকেই সে অত্যন্ত কাছে পেয়েছিল। ওকে নিয়েই তার দিনের অনেকখানি সময় কেটে যেত। পান্টু ঘোষের বাগানের ডাঁশা পেয়ারা, লালমোহন দাশেদের কাঁচা-মিঠে আম, মুখুজ্যেদের জলপাই আর নিবারণ ঠাকুরের গাছ থেকে কত যে বাতাবি লেবু লুকিয়ে লুকিয়ে এনে দিয়েছে তার কি কোন হিসেব আছে? ভুলেই প্রায় গিয়েছিল প্রণতি—নাড়া পেয়ে আবার নতুন ক'রে মনে পড়েছে। মনে পড়ছে আরও অনেক কথা। চোখ বড় বড় ক'রে দেবরের মুখের পানে চেয়ে থেকে সে বলত, এ সব ব'লে-কয়ে আন ত ভাই?

নইলে কি চুরি ক'রে—অমর রাগ ক'রে জবাব দিত।

একদিন কিন্তু ধরা প'ড়ে গেল। প্রণতি বলেছিল, ছিঃ ভাই।

অমর খিক খিক ক'রে হাসতে হাসতে বলেছিল, গাছের দুটো ফল আনব তার আবার চাইব কি। আর চাইলে কি ওরা প্রাণ ধ'রে দিত মনে করেছ? এই এত্তোটুকু ওদের প্রাণ।

প্রণতি দুঃখ ক'রে বলত, তাই ব'লে তুমি না ব'লে আনবে ঠাকুরপো?

অমর বলত, কেন আনব না? না আনলে কি এমন আনন্দ ক'রে খাওয়া যেত?

প্রণতি রাগ ক'রে জবাব দিয়েছে, তা হোক, তুমি আর এমন কাজ ক'রো না।

অমর কুণ্ঠিত হয়ে বলত, ওদের অনেক আছে। আর, খাবার লোক নেই।

তুমি তবুও এনো না। দৃঢ়কণ্ঠে প্রণতি জানাল, তোমার দাদা শুনলে আস্ত রাখবেন না। নিতাইগণ ঠাকুরকে অনেক ব'লে-কয়ে ফিরিয়েছি। উনি তোমার দাদার কাছে যাচ্ছিলেন।

শান্ত হ'ল অমর। যুক্তি তর্ক থেমে গেল। দাদাকে সে ভয় করত, শ্রদ্ধাও করত। হয়ত আজও তার কিছুটা...

* গালে হাত দিয়ে ব'সে ব'সে এত কি ভাবছ বড়বৌ? রবি সাড়া দিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বর্তমানে ফিরে এসেছে প্রণতি। সাবধানে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন ক'রে একটুখানি হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, তুমি কতক্ষণ ফিরে এসেছ?

রবি জবাব দিলেন, খানিক আগে। কিন্তু অন্তুকে দেখছিনে কেন? কলেজ থেকে এখনও কি ফিরে আসে নি?

ফিরে এসে আবার দুপুরের ট্যুশানিতে গেছে। প্রণতি জবাব দিল। কিন্তু তুমি আর দেরি ক'রো না। এর পরে গলা-দিয়ে নামবে না।

রবির মুখে বড় সুন্দর একটু হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, নামবে বড়বৌ। আমার জন্ম তুমি ভেব না।

ঠিক কথাই রবি বলেছেন। ভেবে আর প্রণতি কি করতে পারে? নিঃশব্দে ভাতের থালা স্বামীর সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে ব'সে দেখতে লাগল কেমন ক'রে স্বামী আহার্য্যের সদ্ব্যবহার করছেন।

প্রণতি বলে, শাকটা বরং খেও না। ধ'রে গেছে।

রবি জবাব দেন, বেশ ত খাচ্ছি বড়বৌ। তেমন খারাপ লাগছে না ত?

প্রণতির চোখে জল এসে পড়ল। হয়ত তাই লুকোতেই সে অন্যত্র প্রস্থান করল। কিন্তু খানিক পরে ফিরে এসে দেখে, তাঁর খাওয়া এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে।

আর দুটি ভাত নেবে না? প্রণতি জিজ্ঞেস করে।

গ্লাসের জলটুকু নিঃশেষে পান ক'রে রবি বলেন, একতিল ফাঁক নেই বড়বৌ।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে প্রণতি বলে, তখন বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করছিলে না? ঠাকুরপোর মেয়ে শেলীর বিয়ে।

শান্ত হেসে রবি বলেন, খবরটা কে দিল তোমায়?

প্রণতি বলল, ঠাকুরপো আর কুন্তলা এসেছিল।

রবি অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, নেমন্তন্ন করতে বোধ হয়?

একটু ক্ষিপ্ত হয়ে প্রণতি জবাব দিল, নেমন্তন্ন ঠিক নয়। কোনদিন ত এসব সামাজিক কাজকর্ম করে নি, তাই আগামী রবিবার আশীর্ব্বাদ। আমি না গেলে নাকি চলবে না। এমন ক'রে বলল যে, বাধ্য হয়ে আমাকে কথা দিতে হয়েছে।

খানিক স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে থেকে অবিচলিত কণ্ঠে রবি বললেন, ভাল কর নি বড়বৌ। অমর আমার মায়ের পেটের ভাই, তবুও তাকে আমি মেনে নিতে পারি নি। খুব সামান্য কারণে—

বাধা দিয়ে প্রণতি বলল, বড় ছোটর কথা আমি জানি না, তুমি আমাকে জানতেও দাও নি।

রবি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তা জানলে তুমি আমার চেয়ে বেশী দুঃখ পাবে ব'লেই বলি নি, কিন্তু এ নিয়ে মিথ্যে কথা কাটাকাটি ক'রে কি হবে? কথা যখন দেওয়া হয়ে গেছে তখন তা রাখতেই হবে বড়বৌ।

ব'লেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আলোচনাটা এর বেশী আর অগ্রসর হতে দিতে তিনি চান না।

প্রণতি স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল।

এর পরে এই বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর দ্বিতীয় কথা হয় নি। একে অপরকে কিছুটা যেন এড়িয়ে চলতে লাগল। তাই ব'লে সময় কারুর জন্ত থেমে থাকে না। রবি অথবা প্রণতির জন্তও ব'সে রইল না। অমরের মেয়ের আশীর্ব্বাদের দিনটিও এসে পড়ল। পূর্ব্ব ব্যবস্থামত গাড়ীও এসে উপস্থিত হয়েছে।

প্রণতি নিঃশব্দে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, ঠাকুরপো গাড়ী পাঠিয়েছে। ফিরিয়ে দেব কি?

খানিক চুপ ক'রে থেকে রবি বললেন, তাই দাও। আর ড্রাইভারের কাছ থেকে ঠিকানাটা জেনে নিয়ে ব'লে দাও, ঘণ্টা খানেক পরে আমি নিজেই তোমাকে পৌঁছে দেব।

জবাব শুনে প্রণতির বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল, কিন্তু প্রশ্ন করতে ভরসা পেল না। নিঃশব্দে প্রস্থান করল।

প্রণতিকে যথাসময় পৌঁছে দিয়ে এই মাত্র রবি ফিরে এসেছেন। অমরের আর্থিক সচ্ছলতার যতটুকু খবর তিনি ইতিপূর্বে পেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ নয়। আরও ঢের বেশী পয়সার মালিক অমর। স্ত্রীকে পৌঁছে দিতে গিয়ে দূর থেকে তার বাড়ীর যতটুকু রবির চোখে পড়েছে তাতেই তিনি অনায়াসে অনুমান ক'রে নিতে পেরেছেন।

অমর আজ দশজনার একজন। বড় বড় গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা কথায় কথায় তার বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে, খানা-পিনায় যোগ দেয়। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবরা বাহবা দেয়—খোসামোদ আর সুখ্যাতি ক'রে চলে। আশে-পাশে গুন গুন ক'রে বেড়ায়। রবি এ সব পারে না—পারা সম্ভবও নয়। রক্তের সম্বন্ধ, স্নেহ-ভালবাসা সব চাপা প'ড়ে গেছে। তার বদলে দেখা দিয়েছে মর্মান্তিক ঘৃণা। অর্থের লালসা কত প্রবল হলে আশ্রয়হীন, অনাহার ক্ষুধার্ত মানুষকে প্রলুব্ধ করে···রবি আর ভাবতে পারেন না। অমরের প্রাসাদতুল্য বাড়ীখানি আবার তাঁর চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একের দেহে সৌষ্ঠব ফুটিয়ে তুলতে কত মানব-দেহ···

রবি একলা একলাই ছট্‌ফট্ করছেন। স্ত্রীর স্বামী, কন্যার পিতা অমরের কি একবারও বুক কেঁপে উঠছে না? এত নীচে সে কেমন ক'রে নামতে পারল?

কিছুক্ষণ ধ'রেই অনু পিতার এই অস্থিরতা লক্ষ্য করছিল, এতক্ষণে সে বলল, অমন করছ কেন বাবা? তোমার কি শরীর ভাল নেই?

রবি মেয়ের মুখের পানে খানিক শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলেন, কি বলছিস্ মা? শরীর? না, শরীর আমার ভালই আছে। কিন্তু গলাটা কেমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এক গ্লাস জল খাওয়াবি অনু—

অনু জল আনতে গেল।

অমর সম্বন্ধে কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা করা রবি বহুদিন পূর্ব্বেই ত্যাগ করেছিলেন। প্রণতির ও-বাড়ীতে যাওয়া নিয়েই আজ আবার নতুন ক'রে দেখা দিয়েছে। রবি নিজেকেও অনুযোগ দিলেন। সিদ্ধান্তে অটল থাকা তাঁর উচিত ছিল। প্রণতিকে এই মুহূর্ত্তে তিনি আর অনুযোগ দিতে পারছেন না। কতটুকু খবর সে রাখে?...

বাবা!—অনু জল নিয়ে এসেছে।

জলটুকু এক নিঃশ্বাসে পান ক'রে গ্লাসটি তার হাতে দিতেই অনু পুনরায় ডাকল।

রবি সাড়া দিলেন, কিছু বলবি মা?

একটু দ্বিধার সঙ্গে অনু বলল, কাকার উপর কেন তুমি এতখানি বিমুখ তা আমি জানি না, তবে এটা জানি যে, এর পিছনে কোন বড় কারণ আছে। তাই বলছিলাম...

মেয়েকে ইতস্ততঃ করতে দেখে রবি বললেন, তুই কি বলতে চাস অনু? তোর মাকে যেতে আমি বাধা দিলাম না কেন?

হ্যাঁ বাবা, অনু জবাব দিল।

রবি বলেন, সঙ্গে সঙ্গেই তোর মা কারণ জানতে চাইতেন। আমার পক্ষে তাঁকে অমরের বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া যদি-বা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তোর মার কৌতূহল মেটান সম্ভব হ'ত না অনু। সেটা আমার কাছে আরও মর্মান্তিক মা।

এ-প্রান্তে যখন রবি ছট্‌ফট্ করছেন ও-প্রান্তে তখন কুন্তলা প্রণতিকে নিয়ে মেতে উঠে এক নির্মল আনন্দ অনুভব করছে। প্রণতিকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে। শয়নঘর থেকে বাথরুম কোন কিছুই বাদ পড়ছে না। বাড়ীর কথা শেষ হতে সুরু হ'ল শাড়ী আর গহনা নিয়ে।

ভ্রূ দুটো একটু উপরের দিকে তুলে চোখ দুটো আধ বোজা রেখে বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলছিল কুন্তলা, ওর সেই স্বভাব আজও গেল না। করবেন সবই, কিন্তু একটু চেপে চেপে। আমি বলি, পয়সা দিলেই জড় যদি তা ভোগেই না এল? শুধু আয় করলেই হয় না—যথেষ্ট রেখে তা ব্যয় করতে জানাও কম কথা না। বাস করব প্রাসাদে আর পরব ক'গাছি সোনার চুড়ি? এক সেট হীরের জড়োয়ার কথা বললাম। বললেন, আমার বাপ ঠাকুর্দা কখনও তার চোখে দেখে নি। আচ্ছা তুমিই বল দেখি তাঁর বাপ ঠাকুর্দা কি কখনও এমন বাড়ীতে বাস করেছেন। এত বড় বাড়ী যার তার এক সেট হীরের জড়োয়া থাকবে না, এ একটা কথা হ'ল? শেষ পর্য্যন্ত দিতেই হ'ল। অবশ্য টাকার অঙ্কটা একটু মোটা রকমেরই···যাক গে, ও সব শুনে আর তুমি কি করবে।···

(বালিগঞ্জের রাস্তার একটা মোড়ের রিক্‌শা-স্ট্যাণ্ড। বেলা দ্বিপ্রহর। আশেপাশে গাছের ছায়া চওড়া পীচের বুক ঢেকে পড়েছে। একপাশে চওড়া, অন্যপাশে সরু পেভ্‌মেণ্ট্। চওড়া বড় পথে নানাদিক্ থেকে গলি এসে পড়েছে। একটু দূরে ট্রামের লাইন। দুই-একটা বিশেষ নম্বরের বাস্ চলেছে মধ্যে মধ্যে।

কয়েকখানা রিক্‌শা উপস্থিত আছে। দ্বিপ্রহরের অবসাদ চোখে-মুখে মাখানো তাদের অর্থাৎ রিক্‌শাওয়ালাদের। কেউ এইমাত্র সোয়ারী নামিয়ে ভাদ্রের গরমে লাল হয়ে ফিরেছে। গামছা নেড়ে বাতাস খাচ্ছে। কাছের টিউব-ওয়েল থেকে কেউ জল্ আঁজলা ক'রে তুলে মুখে-মাথায় দিচ্ছে, খাচ্ছে। একজন একখানা কলাই সানকী পেতে ছাতু মেখে দ্রুত বড় বড় গ্রাস মুখে তুলছে। ক্রমে ক্রমে একত্রে গাছের ছায়ায় ব'সে তারা সোয়ারীর অপেক্ষায় চেয়ে রইল।)

শরণ। আজ কি গরম! বাপরে বাপ!

রাম। তবু ত জুতা আছে তোমার। পীচকা রাস্তামে খালি পায়ে চলতে হয় না।

মুন্না। আরে, সোয়ারী। (উঠে নিজের রিক্‌শার কাছে গেল) আসুন।

রাম। আইয়ে, আইয়ে।

(শরণ ঘণ্টা বাজাতে সুরু ক'রে দিল। কিন্তু সুন্দরী তরুণী তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। রোদ থেকে চোখ আড়াল করতে একখানা হাত উঠল, হীরার আংটি, সোনার ব্রেস্‌লেটে হাতঘড়ি।)

রিক্‌শাওয়ালারা। ট্যাক্সির সোয়ারী।

(একখানা ট্যাক্সি মহিলাকে দেখে ধীরগতি অবলম্বন করল। তিনি ইসারা করলেন। গাড়ী থামায় উঠে ব'সে চললেন।)

শরণ। আজ রোজগার হ'ল না তেমন। মালিককে ভাড়া দিয়ে কি বা থাকবে?

রাম। ঘাবড়াও মৎ। গোটা দিন আছে না?

(রিক্‌শাওয়ালারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, চোখ কিন্তু সম্ভাব্য সোয়ারীর দিকে। লোকজন দেখলে আশায় আশায় ঘণ্টা বাজাচ্ছে।)

শরণ। সব থেকে ভাল ছিল মেমসাহেবরা থাকতে। রোগা চেহারা, হাতে একখানা ব্যাগ মাত্র। দামাদামি কিছু করত না। এক পা যেতে উঠে বসত। সিকির জায়গায় আধুলী ভাড়া দিত।

মুন্না। এখন ত এঁরাও তাই হয়েছেন। বাসে-ট্রামে ওঠা যায় না। ট্যাক্সির ভাড়া বেশী। এক পা হাঁটতে চায় না। তবে হ্যাঁ, ভাড়া বেশী দেয় না।

রাম। দেবে কি ক'রে? শাড়ী-জামা কিনতে হোবে না?

(রিক্শাওয়ালারা সমবেত হাস্য করল। শরণ বাঙালী, রাম হিন্দুস্থানী, মুন্না ওড়িয়া পরস্পরের সঙ্গে বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করছে। শরণ গুন গুন ক'রে গান ধরল—সিনেমা-সঙ্গীত।)

মুন্না। আজ সিনেমায় যাব—বৈজয়ন্তীমালার নাচ আছে।

রাম। এক ভাঁড় চা খিয়ে আসি।

(কিছুদূরে একটা নূতন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। সেখানে পিতলের কলসী থেকে চা বিক্রী হচ্ছে মাটির ভাঁড়ে। কয়েকজন মুটে-মজুর সেখানে জমা হয়েছে। রাম তাদের দলে যেয়ে মিশল।)

শরণ। শালা খোট্টার সঙ্গে পেরে ওঠা দায়। শালা ছোটে যেন ঘোড়া। মালপত্তর দেখলে আমরা পিছিয়ে যাই। ও ব্যাটা ঠিক নিয়ে নেয়।

মুন্না। ও টাকা জমাচ্ছে। দেশে ফিরে দুধের ব্যবসা করবে। গরু কিনবে।

শরণ। আর জরু?

(উচ্চাঙ্গের রসিকতা ভেবে দু'জনেই পরস্পরের পিঠ চাপড়ে, হাঁটু চাপড়ে হেসে উঠল। মুন্না একটু খৈনী মুখে দিল। এধারে একটি স্থূলকায়া মহিলা এগিয়ে এলেন। হাতে তাঁর ঝোলানো থলেয় খাতাপত্র। এরা দু'জনে ঘণ্টা বাজাতে লাগল প্রাণপণে। মহিলা এগিয়ে এসে দরাদরি সুরু করলেন।)

মহিলা। চক্রবেড়ের মোড় কিতনা?

মুন্না। দশানা নিব, মাইজী।

মহিলা। দশানা! (শিউরে উঠে) বলিস কি? এইটুকু ত পথ!

মুন্না। না মাইজী, বড় রোদ আছে।

মহিলা। তাই ব'লে কি দু' আনার পথ দশানা চাইবি? এই রিক্শাওলা, তুই কত নিবি? (শরণকে প্রশ্ন করলেন।)

শরণ। (ইতস্ততঃ ক'রে) ওই একই রেট, মাইজী।

মহিলা। কি যে বলিস! থাক গে, বাস্ আসছে। বাসেই যাই। (চ'লে গেলেন।)

শরণ। দূর ছাই। আটানায় ঠিক যেত। তুই আবার বলবি তোর সোয়ারী ভাঙাচ্ছি, তাই চুপ ক'রে রইলাম।

মুন্না। দূর, দূর! ও জেনানা বাসের সোয়ারী। বাস্ দেরী হচ্ছে দেখে সময় কাটাতে দরাদরি করল।

(ইতিমধ্যে এক মোটাসোটা ভদ্রলোক গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায় হাতে ভারী ব্যাগ ঝুলিয়ে এলেন। দেখামাত্র রাম দৌড়ে এসে তাঁকে ধ'রে ফেলল। ওদের দিকে হাসিমুখে চেয়ে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চ'লে গেল।)

শরণ। ভালই হয়েছে। ওই মোটাকে বইত কে?

মুন্না। সব থেকে সুবিধে একজন জেনানা সওয়ারী হলে। বড় জোর হাতে শাড়ীর প্যাকিট থাকে।

শরণ। তারাও ত খুব হাল্কা হয় না সর্ব্বদা। সব থেকে সুবিধে এমন জেনানা—ওই যে—আসছে।

(দু'জনে সমস্বরে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। ছিপ্‌ছিপে কর্সা চেহারার কোন একজন তরুণী এগিয়ে এল—আধুনিক বেশভূষা, দেখতে সুশ্রী। মেয়েটি একবার রিক্শার দিকে চাইল, একবার রোদের দিকে চাইল। তারপর বাসের রাস্তার দিকে অনিচ্ছুক পায়ে চলতে সুরু করল। এমন সময় পাশের গলি থেকে আর একটি তরুণী দ্রুত এগিয়ে এল। বেঁটে চেহারা, শ্যামবর্ণা, বেশভূষায় ভারী পরিপাট্য। প্রথমাকে 'গৌরী', দ্বিতীয়াকে 'শ্যামা' বলা যাক)

শ্যামা। এই…এই গৌরী, দাঁড়াও।

গৌরী। (ফিরে দাঁড়িয়ে হাসল) কি রোদ আজ দেখেছ শ্যামা?

শ্যামা। আজও কি বাসে যাবে?

গৌরী। তা ছাড়া কি?

শ্যামা। বাস্ ত দেখছি না। চল না রিক্শা ক'রে যাই।

গৌরী। (লোভী দৃষ্টিতে রিক্শার দিকে চেয়ে) কিন্তু অযথা কতকগুলো ভাড়া দিয়ে—

শ্যামা। অযথা কি? বাস্ থেকে নেমে কতটা হেঁটে তবে না গলির মধ্যে আমাদের অফিস? এখন রোজগার করছি, একটু নিজেদের জন্যে খরচ না করলে কি চলে?

গৌরী। তোমার রোজগারটুকু তোমার হাতখরচ। কিন্তু আমার ত তা নয়—সংসারে দিতে হয়।

শ্যামা। দু'জনে ভাড়া শেয়ার করলে বাসের চেয়ে কতটা বেশী আর লাগবে?

গৌরী। চল (ইতস্ততঃ ক'রে)।

(দু'জনে বাসের মুখ ছেড়ে রিক্শার দিকে এগিয়ে এল। রিক্শাওয়ালারা সবেগে ঘন্টা বাজিয়ে চলেছে প্রাণপণে। দু'জনে দেখেশুনে শরণের রিক্শা বেছে নিয়ে উঠে বসল। শরণ রিক্শা ছেড়ে দিল। ধীরে ধীরে রিক্শাটা পথের বাঁকে বড় রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মুন্না কোমরে হাত রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।)

(কয়েকদিন পরের ঘটনা। রিক্শাওয়ালারা অপেক্ষায় ব'সে, কখনও বা ঘন্টা বাজাচ্ছে। মেয়ে দু'জন এল।)

রাম। শরণকা সোয়ারী।

মুন্না। ওর রিক্শাটা সাজানো। দেখতে খুবসুরৎ শরণ। জেনানা লোগ ত ওকেই নেবে।

রাম। আরে, বাঙালী জেনানা বাঙালী লোগকো পসন্দ ক'রে নেয়।

(মেয়ে দুইজন এগিয়ে এল রিক্শার কাছে। শরণ দূরের চায়ের দোকান থেকে ইসারা ক'রে বসতে বলল। ওরা দু'জনে রিক্শা চেপে বসল।)

গৌরী। কি গরম ভাই! কেন রোজ রোজ রিক্শা চাপার অভ্যাসটা করলে বল ত? এর পরে যে বাসে উঠতে পারব না!

শ্যামা। দরকার কি? দু'জনে মিলে শেয়ারে কত আর লাগছে?

গৌরী। কিন্তু যদি দু'জনের জায়গায় একজন হই?

শ্যামা। সে আর তুমি হবে না। আমার ভাগ্যে গোটা জীবন অফিসগার্ল্ হওয়া লেখা আছে। যা কালো রূপ ভগবান্ দিয়েছেন! তোমার রূপ আছে, বর জুটবে।

গৌরী। না, ভাই। রূপেয়া ছাড়া রূপের দাম নেই।

(ইতিমধ্যে শরণ চ'লে এল। রিক্শা চলতে শুরু করল।)

রাম। এই খুবসুরৎ জেনানার জরুর সাদি হো যায়েগা। তখন শরণ কি করবে?

মুন্না। সাদির কথাই ত বলাবলি করছিল। অমন সুন্দরপানা। কতদিন আর চাকুরি করবে? কাল্যাবাবা খেটে মরবে।

(দু'জনে খৈনী সেবনে মন দিল।)

(কয়েক মাস পরের ঘটনা। বিষণ্ণ মুখে গৌরী একা দাঁড়াল পথের মোড়ে। শরণ উৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে এল। পূজার ছুটির পরে অফিস খোলার প্রথম দিনটি।)

গৌরী। (এধার-ওধার চেয়ে এক পা এগিয়ে গেল বাসের দিকে। আবার কি ভেবে ফিরে এল রিক্শার কাছে) থাক গে। (রিক্শায় উঠে বসল।)

শরণ। (হুড তুলে দিতে দিতে) ওই দিদিমণি আজ অফিস যাবেন না?

গৌরী। না। (ইতস্ততঃ ক'রে) উনি আর অফিস যাবেন না। ওঁর ছুটির মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল যে।

শরণ। তাজ্জব! (শ্যামার চেহারা মনে ক'রে।)

গৌরী। খুব ভাল বিয়ে হয়ে গেল। ওর বাবা মস্ত বড়লোক।

শরণ। (রিক্শা তুলে) আর—আপনার?

গৌরী। (একটু হেসে) আমার? আমার চাকরিটা চ'লে গেল। এই মাসের পরে আর যেতে হবে না।

(রিক্শার ঘন্টায় করুণ গান বেজে উঠল।)

(ধীরে ধীরে রিক্শা এগিয়ে গেল। দেখা গেল অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। গৌরী মেয়েটি একাই ব'সে

আছে। করুণ গানের সঙ্গে রিক্শার চাকায় চাকায় ক্লান্তি। মেয়েটির সর্বাঙ্গে শ্রান্তি মাখানো। রিক্শা চলছেই—আর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দূরে থেকে দূরে রিক্শা চলেছে। রাত্রি নেমে এল। আবছা সঙ্গীতের মধ্যে চাপা সুরে এবার রিক্শার গান শোনা গেল।)

রিক্শার গান

কঠিন পথেতে কোমল রিক্শা চলে।
রাত্রি অনেক!
—টুং টাং ক'রে করুণ রিক্শা বলে।
পীচঢালা পথ গলে না এখন রোদে।
এখন অনেক রাত!
পিঠের চামড়া-পোড়ানো রৌদ্র নয়—
তবু বড় অবসাদ,
এখন অনেক রাত।
টুং টাং ক'রে ক্লান্ত রিক্শা বলে—
রাত্রি এখন ঝরে
গলানো মোমের নরম ধারাণী যেন।
রাত্রির যত পরাগে পরাগে
ঘুমের শান্তি ঝরে।
—মন যে কেমন করে,
প্রিয় কোন্ বুকে গোপন বাসাটি চেয়ে;
ঘুমোও, ঘুমোও; রিক্শাতে-চড়া মেয়ে;
স্খলিত শিথিল পা,
আর যে চলছে না।
ধীরে ধীরে চলি ঘুমের তোমার ঢালাও সুযোগ পেয়ে।
একটু সবুর দাও না, দাও না রিক্শাতে-চড়া মেয়ে।

আর মনের থেমে গেছে যত মোটর, ট্রাম ও প্লেন;
গতির বাহন আর ত সে চলে না।
আমার মনেতে এখন রিক্শা চলে।
সে-ও ত অমনি বলে,
আর আমি পারি না,
আর আমি পারি না।
রাতের ছায়ার বাদুড়-পাখার তলে,
একটু ঘুমোও এখন, সোয়ারী ভাই।
একটু জিরেন চাই।
আর আমি পারি না।

এখন মনেতে আমার রিক্শা চলে,
শেষ হয়ে গেছে মোটর প্লেনের চাকা।
আমার মনের পাখা
জড়িয়ে লুকোয় রিক্শা-চাকার তলে,
শুধুই ক্লান্ত, ক্লান্ত রিক্শা চলে।

—•—

আপনি একটি গল্প শুনতে চান।

এক প্রেমের গল্প বলি। না, প্রেমের গল্প আপনার ভাল লাগে না, প্রেমের গল্প শুনতে চান না।

হয়ত আপনি কোনদিন প্রেমের স্পর্শ পান নি; প্রেমের বেদনা ও আনন্দ, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ জানেন নি। যে প্রেম মত্ত দিশাহারা করে, যে প্রেম ব্যর্থ উন্মাদনা আনে, কখনও মঙ্গলশঙ্খধ্বনিতে পুষ্পগন্ধবর্ণে স্নিগ্ধ প্রদীপজ্যোতিতে ঘর বাঁধায়, কখনও ক্ষুভিত কামনাভূকম্পনে ঘর ভাঙায়, প্রমত্ত দাবানলে ঘর পোড়ায়; যে প্রেম-তৃষ্ণায় রাজপুত্র সিংহাসন ত্যাগ ক'রে চ'লে যায়, মাতা সন্তানের দিকে দৃক্‌পাত করে না, স্বামী ত্যাগ ক'রে নারী পথে বাহির হয়, সে প্রেম আপনি জানেন নি। আপনি বলছেন, সেই চিরন্তন ত্রয়-বিরোধ অথবা চতুরঙ্গ, সে গল্প আপনি শুনতে চান না।

তাহলে একটা ডিটেক্‌টিভ গল্প বলি।

ডিটেক্‌টিভ গল্প, বলছেন, মামুলী প্লট। পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্টর ভুল লোকের পর ভুল লোক ধরবে, নির্দোষীকে হাজতে পুরবে, সন্দেহের কুয়াশায় চারিদিকে অপরাধীর কালো ছায়া সৃষ্টি হবে, তারপর সখের ডিটেক্‌টিভ হঠাৎ পাওয়া সূত্রে সত্যিকার খুনীর গলায় ফাঁস লাগাবে পুলিস-কুকুরের মত—এ গল্প শুনে আপনার লাভ নেই।

দেখুন, খুনের পর খুন হয়ে যাচ্ছে, অথচ খুনীকে আপনি জানতে ধরতে চান না। আপনাকে যে হত করে না, বার বার আহত করছে, মৃত করে নি, অর্দ্ধমৃত ক'রে রেখেছে, তাকে শাস্তি দিতে না পারলেও, নির্ম্মূল করতে না পারলেও, তার সন্ধান জানতে চান না!

তাহলে ভূতের গল্প বলি।

ভূত আপনি বিশ্বাস করেন না। এই আলোকিত প্রভাতে ভূতের গল্প জমবে না, বলছেন।

কিন্তু আপনি ত অবিশ্বাস্যকেই গল্পে চান; শুনতে চান কাল্পনিক নরনারীর বিরোধ-বেদনার কথা; অথচ সে নরনারী বাস্তব হবে, অর্থাৎ কল্পনাকে আপনি চান বাস্তবের মুখোসে, অলীকতা আপনার সামনে লীলা করবে বাস্তবতার অভিনেতারূপে।

আজ হেমন্তের গগনাঙ্গনে ছিন্ন মেঘদলের আনাগোনার অন্ত নাই। আকাশের বিপুল পট কোথাও ধূসর, কোথাও দীপ্ত শুভ্র, কোথাও নিবিড় কালিমাময়; তারি মধ্যে কঙ্কণঅবেষ্টিত নীল নয়নের মত ঘননীল দ্বীপগুলি ক্ষণিক ঝলমল করে, আবার শুভ্রতিমিরে মিলিয়ে যায়। পূর্ব্বদিগন্তে স্বর্ণদ্যুতির প্রখর প্রভা মাঝে মাঝে জেগে ওঠে।

এই আলোছায়াময় চন্দ্রাতপতলে কলিকাতা নগরীর পীত-শুভ্র উচ্চ প্রাসাদশ্রেণী; টিন-টালি-ছাওয়া কদাকার বস্তি, ট্রাম-বাস্‌-মোটরাকীর্ণ প্রশস্ত পথ, বক্র সর্পিল কালো পিচের গলিগুলি, উৎকণ্ঠিত জনস্রোত—প্রভাতের আলো-অন্ধকারে কখনও অদ্ভুত, কখনও অলৌকিক, কখনও বা বাস্তবের ছায়াবাজী মনে হয়।

ওই প্রাচীন জীর্ণ প্রাসাদ, তার পার্শ্বে কোন কর্বুসিয়ে-শিষ্য (Corbusier) পরিকল্পিত গগনচুম্বী ইট-কাঠ-কাচমণ্ডিত লৌহফ্রেম, গাঁথুনির উদ্ধতা, তার সামনে বীভৎস বস্তির মাটির ঘরের সারি—এর চারিদিকে অহর্নিশ কত নরনারীর কামনা লালসা অর্থলোভ হিংসা প্রেমস্বপ্ন ব্যর্থতার ক্ষুব্ধ আবর্ত ; আশা ও হতাশ্বাসের কত গল্প ওই আকাশের ধূসর মেঘস্তূপের মত গড়ছে আর ভাঙছে।

এই চতুষ্কোণ, কলিকাতা কর্পোরেশনের অযত্নরক্ষিত স্কোয়ার, ঘাস-ওঠা, রেলিং-ভাঙা।

সম্মুখে চৌমাথা।

ট্রামলাইন-লাঞ্ছিত ম্যাকাডম পথে প্রভাতেই যানে মানুষে ঠেলাঠেলি চলেছে ; তারই বুক ভেঙে একটি গলি এপার হতে ওপার চ'লে গেছে ; চৌমাথার বড় কালো পাথরগুলি অর্দ্ধভগ্ন, অসংলগ্ন। ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর আমল হতে গলিটির প্রশস্ততা বিশেষ বৃদ্ধি পায় নি, শুধু শ্রেষ্ঠী মোহনচাঁদের গলিপথ-প্রসারিত প্রাসাদশ্রেণী পাঁচ পুরুষে দু'বার পার্টিশন হয়ে খণ্ড খণ্ড বিভক্ত হয়ে গেছে। কোন অংশে করিন্থিয়ান থামগুলি ভেঙে নূতন ঘর উঠেছে, কোনদিকে শতাব্দীবিবর্ণ দেওয়ালে ইট বের-করা গহ্বর। জুড়িগাড়ীর চক্রঘর্ঘর শব্দ অশ্বক্ষুরধ্বনি আর শোনা যায় না, এখন কখনও রিক্‌শওয়ালার টুং টুং, কখনও কোন ডাক্তার বা উকীলের মোটরকারের শিঙাধ্বনি।

চৌমাথায় একটি রিক্‌শ দাঁড়িয়ে, রেশন-থলি হাতে এক প্রৌঢ়া দরাদরি করছেন বেহারী রিক্‌শওয়ালার সঙ্গে ; ছেঁড়া ফতুয়া-পরা নগ্নপদ রিক্‌শওয়ালা ভাবছে, ভাড়ার তিন টাকা বাকী, গ্রাম হতে পাণ্ডু-ভাই লিখেছে, জলে সব ধান ডুবে গেছে, ঝড়ে বাড়ীর দেওয়াল প'ড়ে গেছে, কন্যা মুন্নার জ্বর ; রিক্‌শওয়ালাটি ভাবছে আর দর বাড়ছে।

রিক্‌শটির পাশে এক বেবী-ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। যুবক মালিক-ড্রাইভার চিন্তিত ব'সে। সলিলমরুৎপীড়িত রৌদ্রতাপখিন্ন তার মুখের কালিমা ওই প্রৌঢ় ট্রামচালকের মুখের মতন, কোন দূর-যাত্রী খরিদ্দারের আশায় ফুটপাথের দিকে চেয়ে সে-ও ভাবছে, ট্যাক্সি-মূল্যের কিস্তি দু'দিন পরে, ডাক্তার সেন বলেছেন, স্ত্রীকে বারোটা ইনজেক্‌শন দিতে হবে, তারপর—

পেছনে সুবৃহৎ ক্যাডিলাক-গাড়ী হর্ণ দিলে ; খাকিসজ্জাপরা তকমা-আঁটা সোফারের চক্ষু রক্তবর্ণ। ইংরেজ কোম্পানীর বাঙ্গালী ডিরেক্টার সাহেব হর্ণের সঙ্গে গর্জ্জন করতে গিয়ে আপনাকে দমন করলেন, পার্শ্বোপবিষ্টা সিফন-শাড়ীপরিহিতা ডিরেক্টার-গৃহিণী অঙ্গুরীয়কের নীলাটি হতে চোখ তুলে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সহসা হেসে উঠলেন। সাহেবকে আপিসে নামিয়ে তিনি বাজারে যাবেন, কেনবার বিশেষ কিছু নাই, তবু নিউ মার্কেট ও পার্ক ষ্ট্রীটের দোকানগুলি ঘোরার মোহ আছে। ডিরেক্টার সাহেব ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত দশ লক্ষ টাকার একটি কনট্রাক্টের খসড়া নাইলন বুশসার্টের পকেটে রেখে দিলেন—গাড়ী থেমে গেল, চিন্তাসূত্রে ছেদ পড়ল; স্ত্রী হেসে উঠল, নারীদের এই অকারণ হাস্তে তিনি শুধু বিচলিত নয়, ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, তিনি কোন কথা বললেন না, কথা বললেই লম্বা ফর্দ্দ শুনতে হবে, শুধু টাক-ভরা মাথা নেড়ে বলে উঠলেন—হাউ সিলি।

শূন্য ট্যাক্সি ন'ড়ে এগিয়ে চলল। ক্যাডিলাক-গাড়ী তার পাশ দিয়ে হুঙ্কার দিলে ; চলল গাড়ীর স্রোত—আপিস-আদালত-ব্যাঙ্ক-বিপণি নানা পাড়ার দিকে, অর্থের কামনায় শক্তির তাড়নায় লালসার আবেগে।

ওই রিক্‌শওয়ালা, ওই যুবক ট্যাক্সি-মালিক, ওই দোতলা-বাস্‌চালক, ওই টাক-মাথা ডিরেক্টার, ওই রেশন-থলি হাতে প্রৌঢ়া, ওই কুঞ্চিত-কেশা হাস্তমুখময়ী নারী—এই পথের বিচিত্র নরনারী—

আমার লেখনী যদি গ্রামোফোনের সূচের মত ওদের মস্তিষ্কের স্মৃতিফলকে ঘুরে ঘুরে অন্তরের বেদনা-কামনা স্বপ্নের কাহিনী ধ্বনিত করতে পারত তাহলে অনেক গল্প বলতে পারতাম।

আমার পুরাতন বন্ধু চন্দ্রশেখর আসছে মনে হচ্ছে। অনেকদিন দেখি নি।

বন্ধু চন্দ্রশেখরের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দি। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সহপাঠী, লণ্ডনজীবনে ল্যাণ্ডলেডী-আলয়ে সহবাসী, প্যারিসদর্শনে সহচর, ইনি মোহনচাঁদ বংশের কলাবিত্তাধারার অক্ষুণ্ণ ওয়ারিশ।

রেখাঙ্কিত ললাট বিরলকেশ মস্তকে একাকার হয়ে গেছে, কপোলের লালিমা কালের কালিমায় মলিন, উন্নত নাসিকার পার্শ্বে দুই চক্ষুর জ্যোতিতে যৌবনের স্বপ্ন নেই জ্বালাও নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে বাত্যাহত শিখার মত কোন নিরুদ্ধ বাসনা জ্ব'লে ওঠে। আপনি টাক-ভরা মাথা গতযৌবন ম্লান পুরুষকে দেখছেন, আমার চোখে কিন্তু ভেসে ওঠে, সেই যে ঘনকৃষ্ণকেশ সুকুমার কোঁচান শান্তিপুরী ধুতি ও গিলে-করা মলমলের পাঞ্জাবী প'রে

আমার পাশে কলেজের ক্লাশে এসে বসত, প্রফেসারের লেকচারের মধ্যে নোটবুকে নরনারী-দেহ স্কেচ করত, সন্ধ্যায় আমায় টেনে নিয়ে যেত প্রপিতামহের প্রাসাদের কোন পুরাতন বৈঠকখানায়, পারস্ত-কার্পেটের ওপর গানের আসর হ'ত, চন্দ্রশেখরের তবলা বাজানোর ছন্দে বেলোয়ারী ঝাড় কেঁপে ঝলমল করত।

কলেজজীবনে তাকে ডাকতাম শেখর ব'লে, ইংলণ্ডে সে হ'ল মিষ্টার চাণ্ড, আর প্যারিসে নৈশ-জীবনে কোন কাবারেতে শ্যাম্পেন শেষ ক'রে মত্ত নৃত্যের বিরামে হুইস্কি অর্ডার করলে, তখন বলতাম, চাঁদা, আর চলবে না, এখন চল—

ভোরের আলোয় সেন নদীর পাশ দিয়ে দু'জনে ছুটে চলতাম, চন্দ্রশেখর ওভারকোট কাঁধে ফেলে jazz-এর সুরে গান গেয়ে উঠত—পেখহু পিয়া মুখ চন্দা! অথবা অপেরার সুরে গাইত—Paris ma chérie—pas sur la bouche—জলস্থল একাকার মনে হ'ত, যেন কোন মায়াকুজ্ঝটিকায় আমরা নিরুদ্দেশ চলেছি।

এত সকালে চন্দ্রশেখরকে বাহিরে দেখবার কথা নয়, আটটার পূর্ব্বে তার প্রভাত হয় না।

পরণে বর্ম্মা-সিল্কের ঘন সবুজ লুঙি, গায়ে নিদ্রা-বেশের ডোরাকাটা কোট, নয়নে এখনও নিদ্রার জড়তা, কিন্তু চঞ্চলপদে এগিয়ে আসছে। বহুদিন পরে আমাকে দেখে বিস্ময় বা কুশলপ্রশ্ন নয়, উদ্বিগ্নকণ্ঠে ব'লে উঠল, হ্যালো বোস্, আমার মেয়েকে দেখেছ? কোথায় গেল? দেখেছ?

বিস্মিতভাবে বললুম, এই সকালে মেয়েকে খুঁজতে বাহির হয়েছ?

প্যারিসবাসীর মত ঈষৎ স্কন্ধোত্তলন ক'রে বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার একমাত্র কন্যা, cette enfant terrible!

পরিহাসের সুরে বললুম, হয়ত বাড়ীতেই আছে!

ক্ষুব্ধস্বরে বললে, দেখনি বলো, দেখনি, আচ্ছা, এসো, এসো, পরামর্শ আছে!

লণ্ডন-প্যারিসে অর্থানটনে বা নারী-বিভ্রাটে আমি ছিলাম পরামর্শদাতা, সে কথা মনে পড়ল।

শেখরের প্রপিতামহের নামের গলিতে প্রবেশ করলুম, পূর্ব্ব শতাব্দীর স্মৃতিময় সঙ্কীর্ণ ছায়াময় পথ, বৃহৎ জীর্ণ সিংহদ্বারের পাশে দরওয়ান তোলা-উনান জ্বালিয়েছে, পূজার দালানে পূর্ব্ববঙ্গীয় বাস্তহারা ভাড়াটে, সিঁড়ির কম্পিত মার্ব্বেলে সাবধানে উঠতে হয়। পারস্তকার্পেট-পাতা যে ঘরে গানের মজলিস বসত, সে ঘর হতে ছাপাখানার বা হস্তচালিত যন্ত্রের শব্দ আসছে।

তেতলায় শেখরের শোবার ঘরে প্রবেশ করলুম। নানাজাতীয় আসবাববিকীর্ণ দীর্ঘ হল-ঘর অপরিসর মনে হয়, ষোড়শলুই চেয়ারের পাশে চিপেনডেলের আরামকেদারা, ষ্টীলফ্রেমের রেক্সিন-মোড়া সোফা, মার্ব্বেল ব্রেকেটের ওপর দীর্ঘ দর্পণের সোনালী ফ্রেম বিবর্ণ, যুগলপরীধৃত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন ঘড়ি অচল, তার ওপর দেওয়ালে বৈদ্যুতিক গোল-ঘড়ির কাঁটা পরিহাসবক্র ওষ্ঠের মত নড়ছে। নবীন ও প্রাচীনের ঠেলাঠেলি।

সিগারেট-টিনের সঙ্গে পকেট হতে একটা নীল কাগজ বাহির ক'রে চন্দ্রশেখর আমার দিকে ছুঁড়ে দিলে।

—নাও, পড় লেখাটা, কন্যা পত্র লিখে অদৃশ্যা, বাপ্ মরু ভেবে। কি খাবে, চা না কফি?

—কফি-ই হোক, আর কি আছে—

—আছে, আছে, তা হতে পারে, মনে পড়ে রাইনল্যাণ্ডে সেই গ্রামে হের্ গট্‌ফ্রিড তার ভাণ্ডার থেকে ওয়াইন খাইয়েছিল, সেই মোজেল ওয়াইন আনিয়েছি, কিন্তু সে স্বাদ আর নেই।

—হায়, সে বসন্ত চ'লে গেছে!

—চিঠিটা ত পড়, আমি বেশটা বদলে আসি, পরামর্শ আছে।

হাল্কা নীল কাগজে রাবীন্দ্রিক হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি, গদ্যকবিতার ছন্দে সাজান:

বাবা,

"সেদিন আমার প্রশ্ন উপহাসে উড়িয়ে দিলে।

আমি কিন্তু উত্তরের প্রতীক্ষায় আছি। আজ রাতে জবাব দিতে হবে।

কারণ, কাল সকালে উত্তর দিতে হবে আমাকে।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কুটীর

শ্রীললিতমোহন সেন

(প্রবাসী—১৩৪৫, শ্রাবণ হইতে পুনর্মুদ্রিত)
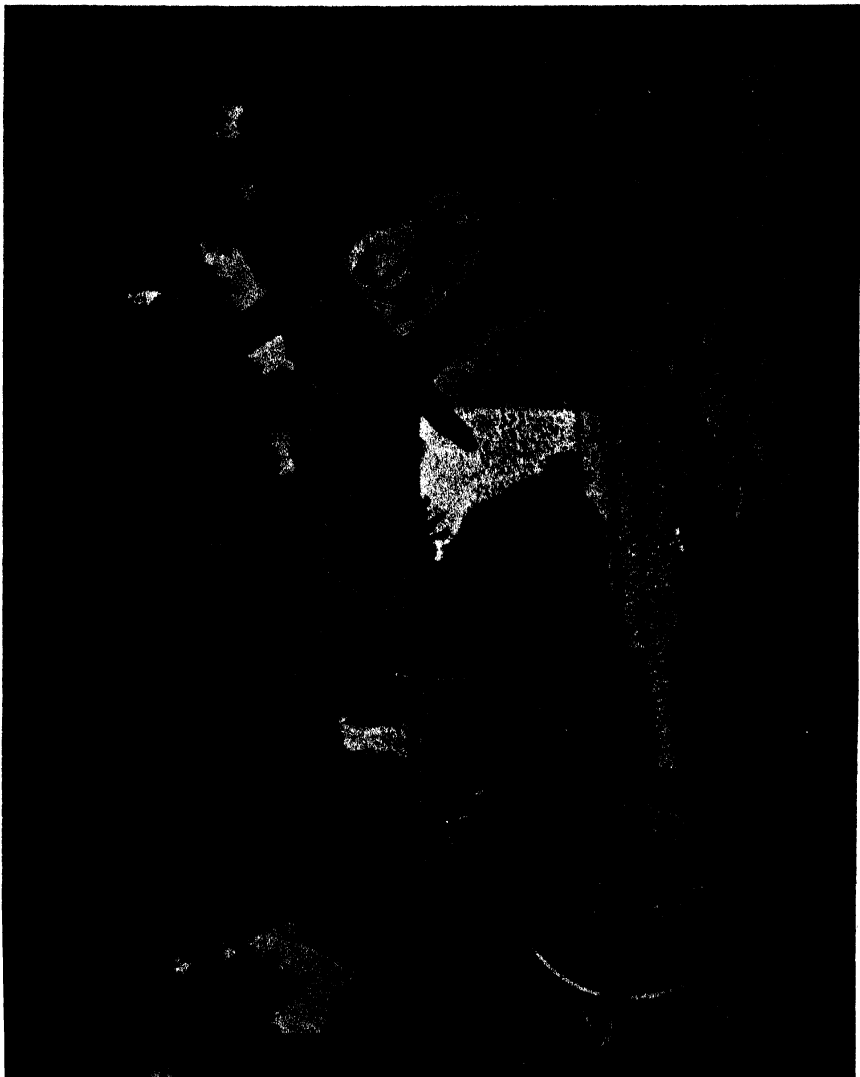
স্বর্ণ-সিনেমা কোম্পানীর ডিরেক্টর আমাকে প্রথমে ছোট পার্ট দিচ্ছেন। বলেছেন, আমার নাকি অপূর্ব্ব সিনেমা-ফেস্। এমন সুযোগ কে পায়!

আজ পৃথিবী জুড়ে সিনেমা-অভিনেত্রীর কি প্রতাপ কি প্রভাব কি যশগরিমা, ভেবছ কি!

বিশ্বখ্যাতা অভিনেত্রী স্বাধীন ভারতের মহাসম্পদ, প্রাচীন ভারতের কৃষ্টির উদ্গাতা, এ্যাম্বাসেডার যা পারবে না সে তাই পারে—দেশে দেশে মৈত্রীর আনন্দের সে সরণী। আমি অধিক লিখতে চাই না।

কিন্তু উত্তর আমায় কাল দিতে-ই হবে।

আর বইয়ের দোকানে যদি যাও, এই বইগুলি পাওয়া যায় কিনা দেখো। তা না হলে ইংলণ্ডে অর্ডার দিতে হবে। বি-এ-তে সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়ে আমার মন খুব খারাপ জানো, এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাশের চেষ্টা করব।"

তারপর অত্যাধুনিক অর্থনীতি সম্বন্ধে সাতটি পুস্তকের নাম। শেষে লেখা, "আজ মা-কে দেখতে যাবার দিন, ভুলো না। ডাক্তার ঘোষকে তুলে নিয়ে যেতে হবে, তাঁর গাড়ী কারখানায় সারতে গেছে, ভুলো না। আর আমি আজ যেতে পারব না, মা ত তা বুঝতেও পারবেন না; আমরা যাই বা না যাই, তাঁর মনে কি কোন ছায়া কোন চিহ্ন পড়ে? কে জানে?"

শেখরের স্ত্রীর পীতাভ তৈলচিত্রের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলুম, কে জানে!

বেশ বদ্‌লে শেখর এল। স্কচ টুইডের ট্রাউজার, সাদা-কালো চতুষ্কোণ-নক্সা-কাটা সার্ট, তার ওপর ফরাসী রেশমের চিত্র-শিল্পীদের ঢলঢলে লম্বা কোট (over-all), নানা রঙের দাগ লেগে বর্ণ-দানি হয়ে উঠেছে। দেহে আর অবসাদ নেই, অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য।

রূপার কফি-দানি হতে কফি ঢালতে ঢালতে শেখর বললে, কেমন পড়লে?

—উত্তর দিতে হলে লেখিকাকে আগে প্রশ্নপরীক্ষা করা দরকার, সমস্যার সমাধান বোধ হয় অন্য উপায়ে।

—অর্থাৎ

—এখানে cherchez la femme (শার্সে লা ফাম) রীতি খাটছে না, এখানে cherchez l'homme (শার্সে লোম) অর্থাৎ তরুণ যুবকটির সন্ধান লও।

—হয়ত তোমার অনুমান ঠিক, এ কথা আমার মনে হয় নি, ঠিক বলেছ, দু'চার জন যুবক মাঝে মাঝে আসত বটে, ওই বারান্দায় বৈঠক বসত, চরৈবেতি চক্র, কি আলোচনা হ'ত বলতে পারি না। তর্কের চিৎকারে আর হাসির ঝঙ্কারে চায়ের স্রোতে আর সিগারেটের ধূমে অর্থনীতিতত্ত্ব আলোচিত হ'ত ব'লে মনে হয় না।

—বোধ হয় জীবনের চিরপুরাতন তত্ত্বের সন্ধান হ'ত।

—কিন্তু কিছুদিন ধ'রে দেখছি সব চুপচাপ, কোথায় একটা গোলমাল হয়েছে।

—চক্র বোধ হয় কোন রঙীন শাড়ীতে জড়িয়ে আটকে গেছে।

—তুমি ত দেখছি কাজ বাড়ালে, শুধু মেয়েকে খুঁজলে হবে না, তার মনের মানুষ খুঁজতে বাহির হতে হবে, তার যুবক বন্ধুদের তালিকা ত আমার কাছে নেই, তারপর প্রথম যেতে হবে ma femme-কে (মা ফাম) দেখতে—জানই ত।

—জানি, এখনও ডাক্তার ঘোষের ক্লিনিকে রেখেছ, বাড়ীতে এনে রাখা যায় না?

—প্রথমতঃ, কে দেখবে, তারপর দিনরাত সেই শুভ্র স্থিরমূর্ত্তি দেখলে আমার মেয়ের মনে কি প্রভাব হবে ভাবো—ভাল লাগে না ভাবতে—কেন, কেন! মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে, আমার চিন্তার স্রোতও ঠিক ওই রকম থেমে যেত—শোন—আর এক কাপ কফি—আজ সন্ধ্যায় এসো, পরামর্শ আছে।

—এ ট্রাউজারটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

—ভোল নি দেখছি, মনে নেই, তুমি ত দরাদরি করেছিলে, পনেরো গিনিতে রফা হ'ল। শোম, এসো, আজ সন্ধ্যায়, সকালে শুধু ত কফি হ'ল।

মোটরগাড়ীর চালনচক্র চেপে ধ'রে চন্দ্রশেখর গাড়ীর গতি বর্দ্ধিত করতে চায়, বার বার বাধা পায়, ঠেলাগাড়ী বা রিক্শ, গরুর গাড়ী বা সাইকেল, ট্রাম বা পথচারী বা দোতলা বাস্ সামনে এসে পথরোধ করে, কে যেন তার ভাগ্যকে বার বার প্রতিহত করছে।

ওপাশে দরজা ঘেঁষে ডাক্তার ঘোষ ব'সে, মাঝখানে টুইডের জ্যাকেট সযত্নে পাট ক'রে রাখা, দু'জনের মধ্যে ব্যবধানের মত। মনস্তত্ত্ববিদ্ ভিষক্ বুঝেছেন, চন্দ্রশেখর আজ কোন কারণে ক্ষুব্ধমানস। রাস্তার ডানদিক্ ঘেঁষে বরাবর গাড়ী চালানো দেখে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত, মাঝে মাঝে শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন; অসংজ্ঞান মনে কোন আলোড়ন হ'ল।

শ্রীমতী ইন্দুমতীর নামাঙ্কিত ফাইলটি দেখতে দেখতে ডাক্তার ঘোষ বললেন, ইলেক্‌ট্রিক শক্ দেওয়া সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন কি? আপনার সম্মতি দরকার, গত বার আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

অদূরে চৌমাথার লোহিতালোক দেখে গাড়ী থামাতে থামাতে শেখর ব'লে উঠল, জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন, সবাই আমাকে প্রশ্ন করবেন, উত্তর দাও, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

—আপনি ত জানতে চান সারবে কি না—

—না, না, আমার জিজ্ঞাসা—যিনি উত্তর দিতে পারেন তাঁকে নাকি দেখা যায় না!

—ও, তা তাঁর বাণী শোনা যায় ত।

—ভুল, ভুল শোনা যায়, ভণ্ড সব!

—সে লোকের সঙ্গে আমার কারবার নয়, আমি মানব বা মানসলোকের কথা বলছি। ইলেক্‌ট্রিক-চিকিৎসা করলে বোধ হয় ফল পাওয়া যেতে পারে।

নীল আলো জ্ব'লে উঠল, ইঞ্জিনের গর্জ্জনে ডাক্তার চুপ করলেন।

কলিকাতার উপান্তে পেট্রল-রথ সবেগে চলল।

ব্যঙ্গের সুরে শেখর ব'লে উঠল, আপনি বলছেন ফল পাওয়া যেতে পারে, তবে নিশ্চিত কিছু নয়—পৃথিবীতে নিশ্চিত কি আছে ডক্টর ঘোষ? আপনি আজ ভাবছেন আপনার কন্যা আপনার কথা শুনে চলছে, কিন্তু কাল, কাল সে কথা শুনবে?—নিশ্চয়তার স্থিরভূমি টল্‌মল্ করছে—

ডাক্তার ঘোষ কোন উত্তর দিলেন না। ভাবতে লাগলেন, নির্জ্ঞান মন হতে কোন ইচ্ছা সংজ্ঞান মানসে সক্রিয় হয়ে উঠেছে; এই আণবিক যুগে যুদ্ধ-বিপর্য্যস্ত সমাজে উদ্বেগ-নিউরোসিস অনিবার্য্য, তাঁর থিসিসে শেখরের কেস্‌টাও আলোচনা করতে হবে।

ফাইল বন্ধ ক'রে তিনি বললেন, আপনার স্ত্রীর রোগ-ইতিবৃত্তে কিছু ফাঁক রয়েছে, আপনি কোন কোন ঘটনা বলেন নি মনে হয়, স্মৃতি-লোপে বা অনিচ্ছায় বলেন নি। আপনার সঙ্গে একদিন বসব, অতীত ঘটনাগুলি স্মরণ ক'রে উত্তর দেবেন। আপনার স্ত্রীর স্মৃতি-বিলুপ্তির বৈজ্ঞানিক কারণ ঠিক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—প্রশ্ন, শুধু প্রশ্ন! আপনি কি ভাবেন ডক্টর, নর-নারী-মন আপনাদের ওই কতকগুলি থিওরির বাঁধা পথে চলবে? যখন খানায় গিয়ে পড়ে, পথের পাশে ডোবায় ভরাডুবি হয়, তখন আর হদিশ পান না।—আমারও মনঃসমীক্ষণ করবেন নাকি!

—আপনারও করা দরকার মনে হচ্ছে। দেখবেন, সে কি বিপুল রহস্যলোক, কত গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে বিস্ময়কর ভয়ঙ্কর বাহির হয়ে আসবে, সে ভয়ঙ্করের সঙ্গে পরিচয় হলে আর ভয় থাকবে না।

—জানি, আমার প্রপিতামহদের ওই জীর্ণ প্রাসাদের মত, তার তলায় বন্ধ কুঠরিতে তিন শতাব্দীর অন্ধকার জ'মে আছে, পেছনে পোড়ো জমির ভাঙা বেদীর গহ্বরে সাপের খোলস, আর তেতলায় বৈদ্যুতিক আলো জলছে।

তরকারী-বোঝাই গরুর গাড়ীর পাশ কাটাতে গিয়ে গাড়ী প্রায় দক্ষিণের ধান-জমির দিকে কাৎ হয়ে গেল। গাড়ী থামিয়ে শেখর সম্মুখে হেমন্তশ্রীর দিকে চাইলে: এই যে সুনীলে শুভ্রে সবুজে হরিতে দিগন্তমেখলায় ঝলমল্ সৌন্দর্য্যপট, এর মাঝে শুধু কালো পিচের পথের দিকে চেয়ে, সারাক্ষণ গরুর গাড়ী আর যাত্রী-বাস্ বাঁচিয়ে ব্রেক কষ্‌তে কষ্‌তে আর গীয়ার বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে যন্ত্র-যান চালাবার জন্যেই কি সে জন্মেছে? দিগ্‌বধূদের হাতছানিতে ভুললে গাড়ী পড়বে পঙ্কময় জলায়, তবে কেন মায়াবিনী মরীচিকার সন্ধানে ছুটে যেতে ইচ্ছা করে, মন বাঁধা-পথে চলতে চায় না?

শেখরের সমুজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তার স্তব্ধ ব'সে রইলেন; উৎফুল্লতা ও বিমর্ষতা আলো-অন্ধকারের চক্র অহর্নিশার মত সংজ্ঞান ও অসংজ্ঞান মানসে ঘুরে চলেছে।

ম্যাকাডমে গাড়ী তুলে শেখর গীয়ারও তুললে।

—আর কতদূর ডক্টর?

—ওই দেখা যাচ্ছে, তাহলেও দেড় মাইল। কোটে ত দেখছি নানা রঙের ছোপের দাগ, আপনার palette আনতে পারতেন।

—আনতুম যদি ভিনসেণ্ট ভান গখের মত প্রতিভা, শুধু প্রতিভা নয় উন্মাদনা থাকত! আচ্ছা, ওই ইলেকট্রিক শক্ বলছেন—

—ও চিকিৎসায় একটা বিপদ্ আছে, রোগীর শান্তাবস্থা চ'লে যাবে, অত্যন্ত উত্তেজিত, হয়ত ধ্বংসপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে, সব ভাঙতে-চুরতে চাইবে, যাকে বলে রেভলিউশনারী।

হঠাৎ শেখর গাড়ীর গতি অতি মন্দ করলে, যেন সে গাড়ী চালিয়ে শ্রান্ত, অতি উপহাসের সুরে ব'লে যেতে লাগল: অর্থাৎ, ওই যে পদ্মভরা পুকুরের স্থিরজলে আকাশের মেঘের গাছগুলির চমৎকার ছায়াছবি, সে শুভ্রনীলপট থাকবে না, তলা হতে কালো কাদা জমানো জঞ্জাল ঘুলিয়ে উঠে পাঁক ভাসবে, আপনাদের ফ্রয়েডীয় শৈশব-জীবনের পাঁক শুধু নয়, ইয়ুং-এর মতের বহুবংশসঞ্চিত পঙ্ক, আদিম মানবমনের অন্তঃসলিলা ইচ্ছা বর্ত্তমান মানসে ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করবে—হয়ত ঠিক বলতে পারলুম না—

—না, আপনি বুঝতে পেরেছেন, সেই অতীতের ভূত ব'সে রয়েছে মনের অন্ধ কুঠরীতে। প্রহরীর মত সে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে আছে।

—কিন্তু এ স্মৃতি-বিলুপ্তির কারণ কি? আপনি বলেছিলেন, ব্রেনের কোন বিকার হয় নি।

—আমার মনে হয়েছে, মস্তিষ্কে কোন স্নায়বিক ক্ষয় হয় নি। কিন্তু স্নায়ুযন্ত্র ধর্ম্মঘট করেছে। যেমন ধরুন, কোন গানের পুরাতন রেকর্ড বাজাতে চান, তার দাগ ক্ষয় হয় নি, গ্রামোফোনে দম দিয়ে সূচ লাগিয়ে আপনি বাজাতে চাইলেন, রেকর্ড ঘুরছে, কিন্তু গান বাজছে না, সে সঙ্গীতশব্দতরঙ্গ কম্পিত হচ্ছে না, যেন জ'মে গেছে, সূচের সোনার কাঠিতে গান বাজছে না, গান ঘুমিয়ে আছে, কারণ সে জাগতে চায় না। সেজন্যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলুম, কোন মর্ম্মভেদী ঘটনার আঘাতে আপনার স্ত্রী সব ভুলে যেতে চেয়েছেন, সব ভুলে যেতে চান, যেন পুরাতন স্মৃতি-ভাণ্ডারের সকল দ্বার রুদ্ধ ক'রে প্রহরী ব'সে আছে, সংজ্ঞানের রাজ্যে কোন স্মৃতিকে প্রবেশ করতে দেবে না।

—আপনাকে ত বলেছি, সিজেরিয়ান অস্ত্রক্রিয়া হ'ল, তার পর নবজাতক ন' মাস পরে মারা গেল, তার পর অবসাদের কুয়াসা ধীরে ধীরে ঘন অন্ধকার আবরণ হয়ে গেল।

—শিশুপুত্রের মৃত্যু উনি ভুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আরও কোন ঘটনা ঘটেছিল কি? কোন ক্রোধের বা ঈর্ষার মর্মন্তুদ আঘাত, যা ভুলতে চেয়েছিলেন, মনে করুন। হয়ত আপনিও সে বেদনাকর বা অমঙ্গল ব্যাপার ভুলতে চেয়েছেন, আসংজ্ঞান মন হতে জাগাতে চান না। ওটা স্বাভাবিক, যদি জীবনের সকল ঘটনার স্মৃতির বোঝা বইতে হত তাহলে মানুষ প্রকৃতিস্থ থাকতে পারত না।

—কি ঘটেছিল? ডুব-সাঁতার দিতে হবে স্মৃতি-পঙ্কের মধ্যে—বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের সুখ-পাপড়ির পর পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলে দাও অতীত কর্দ্দমের মধ্যে—হায় সাইকোএনালিসিস!

উচ্চহাস্যে চালনচক্র ঘুরিয়ে শেখর গাড়ী চালালে।

—আর কতদূর?

—ওই দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম-দেখা মনে আছে কি?

—যদি মনেও থাকে অনুগ্রহ ক'রে ভুলতে দিন। স্মৃতির শৈবালদল ঠেলে তরী যে আর এগোতে চায় না।

গাড়ীর বেগ অতি দ্রুত হয়ে উঠল।

তিন-মহল দোতলা জমিদার-বাড়ী; সামনের দেওয়ালে নূতন বালির কাজ হয়েছে, কিন্তু চুনকাম হয় নি। বৃদ্ধ শিবশঙ্করের পাকিস্থানের জমিদারী অবলুপ্ত, দক্ষিণবঙ্গের জমিদারীও গভর্ণমেণ্ট-অধিকৃত, গভর্ণমেণ্ট হতে খেসারতের টাকা এখনও পান নি, আশা আছে। দ্বিতীয় পুত্র আফ্রিকায় ভাগ্যান্বেষণে চ'লে গেছে, কনিষ্ঠ কলিকাতায় ট্যাক্সি-লাইসেন্স পাওয়াতে সংসারের সুবিধা হয়েছে। ডাক্তার ঘোষ তাঁর এক ফ্ল্যাটে বন্ধু জমিদারকে আশ্রয় দিয়ে জমিদার-বাড়ী সস্তায় ভাড়া পেয়েছেন। শিবশঙ্করের পাঁচ-পুরুষের প্রাসাদ এখন ডাক্তার ঘোষের "মঞ্জিল"।

উন্মাদাগার বা নিরাময় দান দেন নি। কলিকাতার বহু ধনী-পরিবারের বিকলমন যুবক-যুবতী তাঁর চিকিৎসাধীন। তারা কোন উন্মাদাগারে বা স্বাস্থ্যশালায় আছে, এ কথা কাকেও জানাতে চায় না, তারা চেঞ্জে গেছে।

সিংহতোরণ দিয়ে শেখরের গাড়ী বেগে প্রবেশ করল। সিংহমূর্ত্তি দুইটির মাথা ভেঙ্গে গেছে, পায়ের থাবাগুলি আছে, কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট হাউসের প্রবেশ-দ্বার অনুকরণ ক'রে শত বৎসর পূর্ব্বে তৈরী হয়েছিল।

দোতলায় শেষ মহলে পূর্ব্বের শেষ ঘর ইন্দুমতীর, দুই জানালায় শুধু গরাদ নয়, জালও আছে, বায়ুসঞ্চালনের জন্য বিশেষ খরচ ক'রে দরজায় লোহার জাল লাগানো, রাতে তালা দেওয়া হয়, বাহির হতে পর্য্যবেক্ষণের সুবিধা, চিকিৎসাগার কারাগারের সামিল। ইন্দুমতীর সেজন্য কোন রোষ বা ক্ষোভ নেই, জানলার পাশে ব'সে কখনও শান-বাঁধানো জলাশয়ে আকাশের টলমল ছায়ার দিকে, কখনও দিগঙ্গনে পুঞ্জিত সবুজের দিকে, কখনও ধূসর মেঘস্তূপের দিকে স্থির-নয়নে চেয়ে থাকে, মাঝে মাঝে ঘরের চতুষ্কোণ ভীতা হরিণীর মত প্রদক্ষিণ ক'রে আবার স্থাণু হয়ে যায়।

ঘরে শেখর প্রবেশ করতে নার্স বাহির হয়ে গেল। আজ দর্শনদিবস ব'লে সে ঘর গোছাচ্ছিল ও সাজাচ্ছিল। গরাদ-দেওয়া গবাক্ষের পাশে ইন্দুমতী স্থির ব'সে, পীতাভ ব্লাউজের মাঝে মাঝে শ্বেত বলাকার পাখা বোনা, এক ঝলক রৌদ্র হলদে কাপড়ে জাল বুনেছে, কলাপাতারঙের শাড়ীর আঁচলে ধানের শিষের রেখাচিত্র, সিমেণ্ট-চটা মেজেতে লুটিয়ে পড়েছে। অন্যদিন রাত-কামিজের উপর একটা শাড়ী জড়ানো থাকে, আজ বিশেষ সজ্জা।

শেখর চমকে উঠল, যেন হেমন্ত-লক্ষ্মীকে কে পিঞ্জরে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। কীট্সের লাইনগুলি মনে পড়ল, Thee sitting careless on a granary floor.

ইন্দুমতী একবার মুখ ফেরাল, মর্ম্মরশুভ্র আননে জীবনের রক্তিমা নেই, আয়ত নয়ন যেন কুয়াশায় ভরা; আবার সে দিগবলয়ে ধূসর মেঘলোকের দিকে চেয়ে রইল।

অন্যদিন শেখর সামনে চেয়ার টেনে তারি মত স্থির হয়ে বসে, কখনও তার দিকে, কখনও তারি নয়ন অনুসরণ ক'রে মেঘছায়াখচিত দীঘির জলে বা দিগন্তে নারিকেলগাছগুলির দিকে চেয়ে থাকে, কখনও বা পদচারণা ক'রে কথা কয়ে যায়, কত উপহাস অনুযোগ মনবেদনা, জমানো কথার বাঁধ ভেঙে দেয়; এমনি দু'এক ঘণ্টা কেটে যায়, খেয়াল থাকে না। আগে একটা ব্যথা অনুভব করত, এখন যেন শান্তি পায়, জমানো বেদনাভার লাঘব হয়, চঞ্চলতা দূর হয়, ধর্ম্মযাজকের কাছে আত্মদোষ স্বীকার ক'রে পাপী যেন শান্তি পায়। কখনও আশ্চর্য্য আনন্দ হয়, এ যেন কোন গ্রীক ভাস্করের শতাব্দীসুন্দর মর্ম্মরমূর্ত্তির পাশে বসবার বিলাস, প্রাণের স্পন্দন আছে, জীবনের তৃষ্ণা বা জ্বালা নেই।

আজ কিন্তু শেখর স্থির হয়ে বসতে পারলে না। কিছুক্ষণ সে পদচারণ করলে, তারপর ইন্দুমতীর মুখের দিকে চেয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলতে লাগল:

"ইন্দুমতী, শ্রবণ কর, আজ প্রভাতে প্রথমা কন্যা পত্র দিয়েছেন, ছায়াচিত্রে অভিনেত্রী হবেন। এখন তোমার অভিমত কি? কি অভিমত! তুমি বলতে চাও, তার বিবাহব্যবস্থা এতদিন হয় নি কেন! এক পরিণয়-প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু জানি না কেন কন্যার পছন্দ হয় নি, শুনলাম তবলা বাজাতে বাজাতে একদিন গানের সঙ্গে তালভঙ্গ করেছিল, সেজন্য প্রত্যাখ্যাত। ইন্দুমতী, আরও শ্রবণ কর, ডক্টর ঘোষ বলছেন, তোমার ঐ মস্তিষ্কের স্নায়ুপুঞ্জ জড়িত নয়, চেতনাহীন। ওই যে ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, এখনও কি কোন বকুলমালার গন্ধ, কোন চুম্বনস্মৃতি জড়ানো নেই?—যাক্ সে কথা।"

শেখর হাঁপিয়ে উঠল, কিছুক্ষণ পায়চারী ক'রে আবার বলতে লাগল:

"শোন, ওই কেশভারের নীচে অস্থিঘেরা স্মৃতির ঘরে তোমার অপারেটার মরে নি, সে ঘুমিয়ে পড়েছে, অথবা সে ইচ্ছা ক'রে শব্দের সঙ্গে অর্থের মিলনসূত্র যোজনা করছে না, আমার এই কথার শব্দতরঙ্গ ওখানে পৌঁছাচ্ছে কিন্তু সে ধ্বনি অর্থ খুঁজে না পেয়ে মূক। ইন্দুমতী, একবার জেগে ওঠ, জেলে দাও প্রজ্ঞার প্রদীপ, ধ্বনি বাণীরূপে বেজে উঠুক—কি ভুলতে চাও তুমি? একদিন তুমি যে আমায় ভুলিয়েছিলে, সে সুখ সে কম্পন সে সব কথা কি ভুলে গেলে?"

ইন্দুমতী কিন্তু অচঞ্চলা, নিস্তব্ধা রইল। কলাগাছের পাতাগুলিতে বা খড়ের গাদায় সূর্য্যালোক যেমন ঝিকমিক করছে তেমনি আলোক ঝিকমিক করছে ইন্দুমতীর সবুজ বসনে; জীব-অভিব্যক্তিচক্রের বিপরীত দিকে ঘুরে সে যেন উদ্ভিদ্-জীবনের সঙ্গে এক হয়ে গেছে।

এই শূন্য স্তব্ধ ঘরে আর কথা বলতে শেখরের যেন কণ্ঠ আটকে গেল। অন্যদিন কত সুখস্মৃতি কত বেদনা সমস্যার কথা বলে, আজ এ রঙ্গাভিনয় শুধু প্রহসন নয়, একটা ট্রাজেডি মনে হ'ল। মূক বিবর্ণ দেওয়ালে করাঘাত ক'রে হতাশ্বাসে সে চেয়ারে ব'সে পড়ল। "বৃথা! সব বৃথা! কার্স!"

ডাক্তারের পেছনে নার্স বেহালা নিয়ে দাঁড়িয়ে। বিস্ময়-বিরক্তিতে শেখর ডাক্তারের দিকে চাইলে। লাইপজিগে-কেনা অতি পুরাতন বেহালা, একটা তার বদলাবার জন্য গাড়ীতে এনেছে।

ছেঁড়া তারের মত সে চেয়ারে প'ড়ে গেল।

ডাক্তার ঘোষ বেহালাটি ঘুরিয়ে ব'লে উঠলেন, গাড়ীতে বেহালার বাক্স দেখলুম, দেখেই কথাটা মনে হ'ল, পুরাণো জানা একটা সুর বাজিয়ে দেখা যেতে পারে। দু'তিন বার বাজান, যদি কিছু প্রতিক্রিয়া হয়, আপনিই বুঝতে পারবেন; আমি একটু পরে আসছি, নার্স, তুমিও চ'লে এস।

ঔষধ খাওয়াবার আজ্ঞার সুরে কথাগুলি ব'লে ডাক্তার চ'লে গেলেন।

বেহালা হাতে শেখর দাঁড়িয়ে উঠল। একটা তার ঢিলে হয়ে গেছে, বেসুরে বাজবে, বাজুক বেসুরে।

রঙ্গহেসে শেখর ছড়িটা ধরলে। ইন্দুমতীর পিত্রালয়ে সেই একতলার স্যাঁতসেঁতে ঘরে এই বেহালা বাজিয়ে তরুণী ইন্দুর মন মুগ্ধ করেছিল, সেই প্রথম সন্ধ্যায়-দেখা ইন্দুমতী এমন স্থূলা মোম-পুত্তলিকা ছিল না। আশাবরীর সুরস্তনিত ঘরে তার বক্ষ দুলেছে, গাভেটের দোদুল ছন্দে নয়নপল্লব কেঁপেছে, চক্ষে কি বিহ্বলতা জেগে উঠত। সে সব সুরস্মৃতিরেখা কি চিরদিনের জন্য মুছে গেছে!

শেখর উন্মনা হয়ে উঠল। কি বাজাবে সে? রিগলেত্তোর কোন গানের সুর বা ভৈরোঁ বা ভৈরবী বা পটমঞ্জরী?

বহুমূল্য রত্নের মত বেহালাখানি ধ'রে ছড়িতে সে টান দিলে। পরিণয়-রজনীতে এই সুর সে বাজিয়েছিল। বাজাতে বাজাতে সে তন্ময় হয়ে গেল। মুদ্রিত নয়নপটে জেগে উঠল, বর্ণপুষ্পগন্ধময় সুন্দরীখচিত আলোকোজ্জ্বল হলগৃহ, হর্ষশঙ্কাকম্পিত হৃদয়ের মত একটু আশার সুর কেঁপে কেঁপে বাজছে।

চমকে সে চাইলে। ইন্দুমতী উঠে দাঁড়িয়েছে, তার মুখের দিকে চেয়ে আছে, নয়নে যেন অচেতনার কুহেলিকা নেই, চক্ষুতারকায় খররৌদ্রের দ্যুতি, ভস্মাপসারিত অঙ্গারের মত। সে দৃষ্টি শেখর সহ্য করতে পারলে না।

একটা তার কেটে গেল। শেখর আর বাজাতে পারলে না, ছেঁড়া তারের মত সে চেয়ারে প'ড়ে গেল। ইন্দুমতী গৃহের চতুষ্কোণ ভ্রমণ আরম্ভ করেছে, দু'হাতে ললাটে করাঘাত করতে করতে অর্দ্ধস্ফুট আর্তনাদ করছে, যেন তার কণ্ঠ কে চেপে ধরেছে।

শেখর স্তব্ধ ব'সে চোখ বুজলে, এ অসহনীয় দৃশ্য হতে সে কোথাও পালাতে চায়।

মনে পড়ল: আলিপনা-আঁকা অঙ্গনে বিচিত্র শাড়ীর ঝলমলানি, কঙ্কণে বলয়ে ঝিকিমিকি, নারীকণ্ঠকল্লোলে হর্ষমুখরতা, চন্দনপত্রলেখা-আঁকা ললাটে সিঁথিভূষণের হীরকদ্যুতি, আর রক্তচেলির অবগুণ্ঠনমুক্ত নববধূর নয়নে এমনি দীপ্ত শুভদৃষ্টি!

মনে পড়ল: খাটের বাজুতে চামেলির গন্ধ, আসবাবের আবছায়ায় বৈদ্যুতিক ঘড়িটি জলজল করছে, শ্রাবণ-রাত্রির বিরামহীন ঝিল্লিরবের ঐকতান, আর ওষ্ঠসজলে মুখশিহরণ, বিনিদ্রা প্রিয়ার এমনি দীপ্ত মিলনদৃষ্টি।

মনে পড়ল : স্তিমিত আলোকে দেওয়ালে দীর্ঘ কালোছায়ার সারি, মুমূর্ষু শিশুর প্রতিরুদ্ধ শ্বাস বুকচাপা কান্নার মত, ধূসর আকাশে একটি তারার আলো দপ্ দপ্ করছে, বারান্দায় নিঃশব্দ পদচারণাচ্ছন্দে দিশাহারা মাতার এমনি দীপ্ত কাতরদৃষ্টি।

নার্সের কণ্ঠস্বরে চন্দ্রশেখর চমকে চাইলে।

ইন্দুমতী আবার জানালার পাশে মর্ম্মরমূর্ত্তির মত বসেছে, আবার বোধহয় চক্ষে অচেতনার কুহেলিকা নেমেছে, জীবনের কুহকদীপ্তি নেই।

ক্লাউনের মত অর্থহীন হেসে শেখর উঠে দাঁড়াল। পরক্ষণে নার্সের গম্ভীর মুখ দেখে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সিমেন্ট-চটা মেজে হতে বেহালাটা তুলে নিলে। ইন্দুমতীর স্থিরমূর্ত্তির দিকে প্রেম-করুণায় নয়, বিরক্তির সঙ্গে ক্রোধের সঙ্গে চাইলে। তার চোখ জ্বালা করছে, মাথা দপ্ দপ্ করছে। নার্সকে কোন কথা না ব'লে অতিক্রতপদে সে বাহির হয়ে গেল। যেন কোন শত্রুপুরী হতে পলাতক।

মাতালের মত টলতে টলতে চন্দ্রশেখর মোটর গাড়ীতে উঠল। ডক্টর ঘোষের এলাকা হতে পরিত্রাণ চায়। পথে ঊর্দ্ধবেগে লক্ষ্যহীন গাড়ী চালিয়ে দিলে। ইচ্ছা হল, না থেমে শুধু বেগে চালিয়ে যায়, সব লোকালয় ছাড়িয়ে নগরগ্রাম পেরিয়ে হয়ত সে পৌঁছবে সমুদ্রসৈকতে বা সুন্দরবনের শ্বাপদবহুল অরণ্যে।

শালুক-ভরা জলার ধারে পুরাণো এক গাছের পাশে গাড়ী থেমে গেল। অতিশ্রান্ত সে। জব চার্ণকের কালে শেখরের পূর্ব্বপুরুষ যখন গোবিন্দপুর গ্রামে বসতি করেছিলেন তখন এখানে গঙ্গার পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হত, বিদেশী পণ্যতরী বৃহৎ বটবৃক্ষের ঘাটে এসে লাগত। সে ঘাট আর নেই। অতি-বৃদ্ধ, বটবৃক্ষের ঝুরিনামা ছায়ায় শেখর বসল। চারিদিক্ প্রখর রৌদ্রতপ্ত, কোথাও কর্ত্তিত-ধান্য শূন্যক্ষেত্র, কোথাও-বা খড়ের স্তূপ, অদূরে বর্ষাধারাক্ষত মাটির দেওয়ালে কাঁকরগুলি শুকনো হাড়ের মত।

মনে পড়ল : জীবনের বিভ্রান্ত পথ হতে টেনে এনে ইন্দুমতী যখন গৃহরচনা করলে, মাঝে মাঝে সে ইন্দুমতীকে ও রঙের তুলি নিয়ে শরৎ-প্রভাতে বাহির হত। কোন গ্রামান্তে এসে আঁকতে বসত। কোন নরনারী বা বস্তুপুঞ্জের চিত্র নয় ; খড়ের গাদা, কালো-রাঙা মাটির দেওয়াল, পাতা-ঝরা পুরাণো গাছের গুঁড়ি এই সব ছবি ; বস্তুপুঞ্জের উপর সূর্য্যালোকসম্পাতে সপ্তবর্ণের যে চিরচঞ্চল চিত্রস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তারি কোন ক্ষণিকের মায়া-ছবিকে ইম্প্রেশনিস্ট্-রীতিতে ক্যানভাসে দ্রুতছোপের আলপনায় চিরন্তনী করবার প্রয়াস, সে বাংলার মোনে (Monet)।

চিরচঞ্চলা জ্যোতির্ম্ময়ী প্রকৃতি-বর্ণিনীর পাশে ইন্দুমতী ব'সে থাকত স্থির-জীবনের শান্তিঘটের মত। সে বর্ণকার আজ কোথায় হারিয়ে গেছে!

শেখর বুকে একটা ব্যথা অনুভব করলে, গুঁড়ির নীচে এলিয়ে পড়ল। মানসবেদনা নয়, স্নায়বিক ব্যথা মনে হল।

একটা তৃষ্ণা, শুধু জল-পিপাসা নয়, নারী-সঙ্গলিপ্সা, ভোগসুখেচ্ছা,—এই হরিত-নীল-শুভ্র শান্তিপট খান্ খান্ হয়ে যাক, একটা হল্লা হোক।

উত্তেজিতভাবে শেখর গাড়ীতে উঠল, আপন মনে ব'লে উঠল, চল সিনেমা স্টুডিওতে, একটা বোঝাপড়া করতে হবে। মনে মনে ভাবলে, হয়ত তার মেয়ে স্টুডিওতে গেছে। স্বর্ণ-সিনেমা কোম্পানীর ডিরেক্টরের সঙ্গে কটুকথা, হয়ত কলহ হবে। কলেজের মেয়েদের মধ্যে কি তার চর ছেড়ে দিয়েছে?

কিন্তু ডক্টর ঘোষ যদি তখন শেখরের মন-কথা শুনতেন, তিনি হেসে বলতেন, সত্যিই কি আপনি আপনার কন্যার সন্ধানে স্টুডিওতে যাচ্ছেন, অথবা ঝগড়া করতে? বাসনাকে মানসতল হতে ভাসিয়ে তুলুন, ভাবছেন না কি, হয়ত কোন নৃত্য-সভার স্যুটিং হচ্ছে, হয়ত সেই অভিনেত্রীটি এসেছে—

গাড়ী ঘুরিয়ে টালিগঞ্জের পথে শেখর গীয়ার তুলে দিলে।

গেট দিয়ে প্রবেশ করতে পেছনে হর্ণের অধীর তীব্র ধ্বনি ও কোলাহল জেগে উঠল। শেখর পথ ছেড়ে দিলে না, বেগে দুই নম্বর স্টুডিওর কাছে এক গাছের তলায় গাড়ী থামালে।

ঝকঝকে এক ক্রাইসলার তার রং-চটা ফোর্ড-গাড়ীর পাশ ঘেঁষে সশব্দে থামল। দরওয়ান গাড়ীর দরজা খুলে দিতেই উজ্জ্বলবেশিনী অভিনেত্রী অধৈর্য্যভাবে নামলেন, কালো-চশমায় কাচ-কড়া ফ্রেমের পাশে দুই গণ্ডে

প্রসাধনের রক্তপ্রলেপ, রূপালী রেশমের ওপর লাল-নীল-সবুজ-সোনালী চক্ররেখার গোলকধাঁধা ঝিকমিক করছে, ওই রঙীন নক্সা এখন নিউইয়র্কের ফ্যাশান, ব্লাউজে বা স্কার্টে বা মনোহর, শাড়ীতে তা বিভ্রমকর হয়ে উঠেছে।

জুতার হিল্ ঠুকে উৎসুক স্মিতমুখে অভিনেত্রী দাঁড়ালেন। তার পর এক সুদর্শন যুবক নামল, ইস্ত্রি-করা সুটের ভাঁজ নিখুঁত, হাতে হলদে মেয়েলী ক্লোক ও রূপার খিল-লাগানো হাত-ব্যাগ, বস্তু দু'টির সে বাহক। তার পর ডিরেক্টার কুণ্ডু, সদ্য হলিউড-প্রত্যাগত, ঢলঢলে পাজামার ওপর বিচিত্র ছবি-ছাপা বুশ-শার্ট, ধূমায়িত পাইপলগ্ন অধরোষ্ঠে তির্য্যক্ রেখা। নমস্কার-নত সহকারীগণের দিকে একটু মাথা নেড়ে বিরক্তির সঙ্গে বললেন, গাড়ী কার?

—জানি না স্যর!

—কিছুই জান না। কত নম্বর সুটিং হচ্ছে? তবলচি, বেহালা-বাদক এসেছে? পোলের বাঁশটা লাগানো হয়েছে—

প্রশ্নগুলির উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে তিনি অফিসের দিকে এগিয়ে গেলেন।

গাড়ী থেকে নেমে শেখর পেছনে না চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। বড় মোটর গাড়ীতে কে ব'সে, কে নামল, এ সব মাঝে মাঝে অলক্ষ্যে লক্ষ্য করলেও, আজকাল সব সময়ে সে দেখেও দেখে না; এ অগ্রাহ্যে পরিচিতা সুসজ্জিতা আরোহিণীরা ক্ষুণ্ণা হন, বিশেষতঃ গাড়ীটা যদি ঝকঝকে ক্যাডিলাক হয়।

পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনীর সুমার্জ্জিত কণ্ঠের আহ্বানে চন্দ্রশেখর থেমে ফিরে দাঁড়াল, তার অনুমান ভুল হয় নি।

বহু-প্রয়াস-সিদ্ধ কণ্ঠস্বরে সর্ব্বক্ষণই যেন কোন তারযন্ত্রের মীড়, টকি বা রেডিওর পক্ষে আদর্শ স্বর, শোধিত, বিকৃত। শাণিত কণ্ঠে যেন গান বেজে উঠল।

—চন্দরদাদা মনে হচ্ছে, চন্দরদা' নাকি, কি চিনতে পাচ্ছিলে না, অনেক বদ্‌লে গেছি! য়ুরোপ আমেরিকা ঘুরে এলুম, খুব বদ্‌লেছি নাকি চন্দরদা'!

কালো চশমা খুলে সে স্থির-নয়নে চাইলে, সুর্ম্মাটানা পক্ষ্মমধ্যে ঈষৎ-পীত তারকা হতে মোহন-রশ্মিপাত হল, যেন সম্মোহিত করতে চায়।

চন্দ্রশেখর বিস্মিত চঞ্চল হয়ে উঠল। তার পুরাণো বেহালায় কে যেন আবার ঝঙ্কার দিলে।

উত্তেজিতভাবে সে ব'লে উঠল, চিনেছি, চিনেছি, চিনেছি লিলি, মনে হচ্ছিল লিলি নাকি, দেখছি সত্যিই তুমি, লিলি না মালবিকা!

কোমল নিষাদে আবার টান পড়ল।

—শুধু মালবিকা নয়, মদনিকা, শেফালিকা, লতিকা, কণিকা, এ অধমার অনেক নাম অনেক রূপ, আমার latest দেখেছ? "কণিকা"?

শুধু মালবিকা নয়, মদনিকা, শেফালিকা, লতিকা, কণিকা—

শেখরের বিমুগ্ধ নয়নের দিকে চেয়ে সে ব'লে যেতে লাগল, ও, এ শাড়ী দেখে বুঝি বুঝে উঠতে পারছিলে না, ভাল নয় দেখতে—ফিফ্‌থ্ এ্যভিন্যুয়েতে এ stuff-টা দেখে বড় পছন্দ হল, নিউ ইয়র্কের craze। আমি কিন্তু তোমার ওই রং-ভরা ওভার-অল দেখেই চিনেছি, আজকাল কিন্তু মমার্ত্রে আর্টিস্ট্‌রা অন্য রকম কোট পরছে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে ব্যঙ্গের ছায়া দেখে মালবিকা থামল।

শেখর ভাবছিল, তার শ্বশুরবাড়ীর একতলার বালি-খসা ঘরে প্রতিবেশী কন্যা লিলি, চঞ্চলা কিশোরী বাটনা-দাগ-লাগা ডুরে শাড়ী প'রে উন্মনা ব'সে থাকত, পীত তারকায় কিসের আগুন জ্ব'লে উঠত অশোকমঞ্জরীর মত।

সুদর্শন যুবকটি ব্যস্তভাবে এসে বললে, মাজুদি, স্টুডিওতে সব তৈরি হচ্ছে।

—শোন, চন্দরদা' আর একটি নাম, 'মাজুদি'। ইনি আমার সেক্রেটারি।

—হুঁ, তা দেখতেই পাচ্ছি, কাজটা কি ক্লোক ও ব্যাগ বহন করা?

—না, না, আরও কাজ আছে, দেখছ না আমাকে তাগাদা দেওয়া, আমার fan-mail পড়া, তেমন ভাল লেখা হলে প'ড়ে শোনানো ও জেলাস্ হওয়া, তার পর সেগুলি ছেঁড়া—ক্লোকটা কেমন?

—অভিনব বটে, প্যারীতে কিনলে?

—না, লণ্ডনে কিনলুম, Terrylene, যুগটা যেন ছুটে চলছে, কত যে নতুন নতুন কাপড়, এ মাসে যা নতুন চমৎকার, আসছে মাসে তা বাসি। কি সেক্রেটারি মশাই, সব তৈয়ার—চন্দ চন্দরদা' স্যুটিং দেখবে—

—যদি গান থাকে ত শুনতে পারি—

—আছে, আছে গান, কণ্ঠে গান আছে, তাইতেই ত এত মান। এখন এ ম্যার্কিন বসন ছেড়ে শান্তিপুরী ডুরে শাড়ী পরতে হবে, কাঁধে মাটির কলসী, এলায়িত চুলে চলেছি গাগরী ভরিতে—হা, হা, মজা লাগে।

যুবকটি বিস্মিতভাবে চাইলে, মালুদি এমন প্রগল্‌ভা উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

—ওই আবার ডিরেক্টর সাহেব আসছেন, তাড়া দিতে বোধ হয়, যাচ্ছি—চন্দরদা'কে ত চেনেন।

—খুব চিনি। চন্দর সাহেব বহুদিন পর পদার্পণ করলেন। শোন, বেহালাবাদক আসে নি, মদ খেয়ে প'ড়ে আছে আর কি, তা বেহালা নাই বা বাজল।

—নাই বাজল! বা! সুরের অধিরোহণে—সে টান কেমন ক'রে আসবে—কিছুই ত বোঝেন না, আমি গাইতে পারব না, আমি পারব না!

—লক্ষীটি ভেবে দেখ, আজ গান না হলে আবার সমস্ত স্যুটিং নতুন ক'রে সাজাতে হবে, এমনিই ত খরচ বেড়ে চলেছে।

—কেন ব্যবস্থা নেই, আমার দোষ?

—না, না, তোমার দোষ কে দিচ্ছে, এই গাড়ী কিনতে হল, আরও বেশী খরচ বাড়ালে—

—তবু গাড়ীটা যদি আমার হত! যাক, কোম্পানীর গাড়ী, আমাকে ট্যাক্স দিতে হয় না, কিন্তু আমার use-এ থাকবে, at my service, এই অলিখিত কন্‌ট্রাক্ট—বুঝলে চন্দরদা'।

গাড়ীটির দিকে লিলি সুখভরা নয়নে চাইলে, ওই ঝকমকে বিশাল গাড়ীটি যেন তার বিজয়গৌরবদীপ্ত।

—আচ্ছা চন্দরদা', তোমার গাড়ীতে একটা বেহালা দেখলুম। মনে পড়ে, ইন্দুদিদের সেই স্যাঁতসেঁতে ঘরে আমার গানের সঙ্গে তুমি বেহালা বাজাতে—এত গাই কিন্তু সে সব গান আর আসে না!

—কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—বেশ, ডেকে পাঠাও, বেহালার ব্যবস্থা কর। শোন চন্দরদা', সেই পুরাণো পচা গানটা গাইতে হবে, কিন্তু যতবার গাই, নতুন অর্থ পাই। শোন, তুমি বেহালা বাজাবে—বাজাবে বেহালা আমার গানের সঙ্গে? ভুলে যাও স্টুডিও, মনে ক'রে সেই লিলির গান, বাজাবে।

শেখর উজ্জ্বলনয়নে চারিদিকে চাইলে।

—আমি! বাজাব?

—হাঁ, হাঁ, চন্দরদা!

আর তারের শাণিত সুর নেই, এ আবদারের মেয়েলী স্বর, নীল নয়নতারকা বৈদূর্য্যমণির মত জলছে।

চন্দ্রশেখর শুধু উৎসাহিত নয়, উৎফুল্লিত হয়ে উঠল। ডক্টর ঘোষ দেখলে বলতেন, দেখ, দেখ, persona গেছে বদলে, তৃষ্ণার্ত মন ভাবছে, এই ত পেয়েছি পিপাসার পানীয়।

—আচ্ছা, বাজাব বাজাব, কোন্ গান?

চন্দ্রশেখর হেসে উঠল। বেহালা আনতে গাড়ীর দিকে গেল। তারগুলি ঢিলে হয়ে গেছে, শক্ত ক'রে বাঁধতে হবে।

সেক্রেটারি যুবকটি কণ্ঠে প্রশংসার সুর এনে বলে, মালুদিদি, তুমি অসামান্যা। বেহালা-সমস্যার কেমন সহজ সমাধান ক'রে দিলে। ডিরেক্টর ত—

মালবিকা হেসে উঠল—সত্যি।

যুবকটি এ হাসির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে না।

চা-য়ের মজলিসে কাটলেট সন্দেশ বিতরণ করতে করতে কৃতার্থ নিমন্ত্রিতদের যে খুচরা হাসি বিতরণ করে, এ সে হাসি নয়; সভার অজানা ভক্তগণের প্রশংসাধারায় বা ক্যামেরার কাঁচের সামনে যে পাইকারী হাসি দীপ্ত হয়ে ওঠে, এ সে হাসি নয়; এ মালবিকার আপনমনের গর্ব্ব-সুখের হাসি; এ মনে মনে বলার হাসি—যদি অসামান্যাই না হব, তবে সেই কেরাণীনন্দিনী আজ কি ক'রে নিখিল-ভারত-বন্দনীয়া হলেন!

পাঁচতলা উঁচু সুদীর্ঘ টিনের চালা; আগে ফুটবল মাঠ ছিল, এখন ইটের দেওয়াল-ঘেরা অভিনয়লীলা-নিকেতন। অভ্যন্তরে দেওয়াল ঘিরে কাঠের সরু বারান্দায় মাঝে মাঝে বৃহৎ বৈদ্যুতিক আলোক-গোলক, অতিকায় একচক্ষু দানবের জলন্ত দৃষ্টির মত জলছে আর নিভছে। কালো মোটা তারের কুণ্ডলী সরীসৃপদলের মত চারিদিকে ছড়ানো; মেজেতে ধুলায় গড়িয়ে গেছে, দেওয়ালে উঠে গেছে, বারান্দার কাঠ পেরিয়ে শূন্যে ঝুলছে। দাগ-ধরা প্যাণ্ট ও বুশ-শার্ট-পরা যান্ত্রিক সংযোজক সহকারিগণ চারিদিকে ব্যস্ত।

উত্তরের প্রবেশদ্বার দিয়ে শেখর প্রবেশ করলে। একদিকে ক্যামেরার চক্রযান, অপরদিকে কাঠের তক্তায় নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। স্টুডিওটির পূর্ব্বে ও পশ্চিমদিকে প্রসারিত দুইটি চতুষ্কোণ; ডানদিকে খড়-ছাওয়া অর্দ্ধেক চাল, বাঁশের খুঁটিগুলিতে আলপনা আঁকা, ক্ষুদ্র গবাক্ষে কঞ্চির গরাদ, সম্মুখে অঙ্গনে তুলসীমঞ্চ, কাগজের গাছ লাগানো।

বামদিকে আধুনিক ড্রয়িংরুম সাজানো, কার্পেটের ওপর লৌহফ্রেমের রেক্সিন-মোড়া আসবাব, সামনে দেওয়াল নেই, অভ্যন্তর দেখা যায়। তার একপাশে গ্রামের মুদির দোকান, চাল-ভরা ধামা, মাটির ফল-ভরা ঝুড়ি, তেলের শিশি। অপরপাশে একটি চিতার কাঠ সাজানো, লাল কাচ দিয়ে কৃত্রিম আগুনের আভা দেখা যায়।

স্টুডিওর শেষের দিকে জলহীন খালের ওপর বাঁশের সাঁকো রচিত হয়েছে, পোলটি উঁচু প্লাটফর্ম্মে উঠে গেছে, এক কোণে তিনটি কলাগাছ কেটে লাগানো, অন্যদিকে প্লাস্টিক ফুল-ভরা কৃত্রিম কদম্বতরু। পেছনে বিশাল দেওয়াল জুড়ে শরৎ-শ্রী-আঁকা ক্যানভাস মারা হয়েছে, ঘন নীল আকাশে সাদা তুলোর মেঘের স্তূপ, বলাকার সাদা ডানা মাঝে মাঝে ছড়ানো, দিগন্তে হলদে-সবুজের মোটা রং-এর ছোপে কৃষককুটীরের আভাস, তার পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা রেখায় নারিকেল গাছের ছবি; একটা অশথগাছের মোটা গুঁড়ির ধারে নৌকার কালো লাইন টানা। এই কৃত্রিম পট যখন ক্যামেরার কৌশলে বাস্তব প্রকৃতিচিত্র হয়ে রূপালি পর্দায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে প্রকৃতি-প্রেমিক নাগরিক নরনারীগণ মুগ্ধনয়নে দেখে কৃত্রিম আনন্দরস পান করবেন, পল্লীশারদশ্রী দেখতে আর নগর ত্যাগ ক'রে যেতে হবে না।

কম্পমান সাঁকোর ওপর মালবিকাকে তিনবার আলতা-মাখা পায়ে চলতে হ'ল; কটিতে কলসী রাখার ভঙ্গী ডিরেক্টরের কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না। বনগ্রামে গিয়ে এক চাষার মেয়েকে টাকা দিয়ে মালবিকা এ ভঙ্গীটি শিখেছে। এ বাস্তব রীতি। অভিনেত্রী অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

ডিরেক্টর ব'লে উঠলেন, সে জন্যেই ত ভুল হচ্ছে। বাস্তবের অনুকরণ অভিনয় নয়, বাস্তবের বিভ্রমসৃষ্টি করাই অভিনয়, দর্শক ভাববে, এই বাস্তব।

শেখর ব'লে উঠল, ওই শূন্য কলসে কিছু জল ভ'রে দাও, তাহলে ভারবহনের ভঙ্গীটি আসবে, জল একটু ছিটকে পড়ুক, সিনেমাদর্শককে এত ফাঁকি দেওয়া কেন!

ডিরেক্টর এগিয়ে এসে কলসীর কানা একটু বেঁকিয়ে দিলেন, মুক্তকবরী আরও ছড়িয়ে দিলেন পিঠে ঘুরে শাড়ী সরিয়ে, কপালের টিপ ঠিক আছে কিনা দেখলেন, তারপর ডিরেক্টারী সুরে বলে উঠলেন, অল রাইট, টেক্!

চন্দ্রশেখর বেহালার ছড়িতে জোরে টান দিল, কেমন কর্কশ সুর বেজে উঠল, ছিলে তারগুলি বেশী জোরে বেঁধেছে।

পুরাতন হিন্দি গান ব্রজভাষায় jazzএর সুরে গাইতে হবে—গাগরি ভরিয়া চলি, ছলকে ছলকে জল—

কণ্ঠস্বরের মূর্চ্ছনায় কটিতটে গগরী দুলছে। বেহালা ঝনঝন ক'রে উঠল, পুরাতন জর্ম্মান বেহালা যেন বর্বরসুর বাজাতে রাজী নয়। বেহালাটিকে ঘাড়ে আরও চাপ দিয়ে শেখর আরও জোরে ছড়িতে টান দিলে, গায়িকার স্বরগ্রাম ছাড়িয়ে একটা ক্ষুব্ধ করুণ সুর স্টুডিও ভ'রে অনুরণিত হ'ল।

সহকারী শঙ্কিতভাবে ডিরেক্টরের দিকে চাইলে। বেহালা ত গানের সঙ্গত হবে, এ যে সঙ্গীত বেহালা-

বাজানোর সঙ্গতি হয়ে উঠল, সুরঝঙ্কারে গানের কথা হারিয়ে যাচ্ছে। ডিরেক্টর কিন্তু স্মিতমুখে সহকারীর দিকে চাইলেন।

প্রমত্তভাবে চন্দ্রশেখর বেহালা বাজিয়ে চলল। যেন সুরনদীতে বন্যা এসেছে, গর্গরী দুলছে, ডুবছে। গায়িকার গহন-ফেরা চাউনি যে গাছের আড়ালে প্রেমিকের দিকে নয়, সে বক্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টি যে তার দিকে, সে খেয়াল তার রইল না।

মাথা দোলাতে দোলাতে শেখর চারিদিকে চাইলে, যেন উত্তাল সুরসমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে কোন অজানা বন্যার তরঙ্গে সে দুলছে। ওই মেঘচিত্রিত নীল দেওয়াল, ওই কাগজের ফুল-ভরা গাছ, ওই জলহীন স্টুডিওর মেজেতে রচিত নদীর পোল, ওই প্রতিবেশী কেরাণী-কন্যা লিলি—সব সেই তরঙ্গে দুলছে গাইছে অলীক ভোজবাজির মত—সত্য সিনেমার জন্য!

সহসা সে হেসে উঠল—হা-হা-হা—কোন্‌টা অলীক, কোন্‌টা সত্য!

বেহালার এক উপহাসের সুর বেজে উঠল—আ-হা! লা-লা—!

সঙ্গীতের স্বরাধিরোহণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রইল না।

গায়িকার বক্রদৃষ্টি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, শাণিত স্বর উচ্চতর গ্রামে উঠল, যেন কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে বেহালার সুরের প্রতিযোগিতা!

মালবিকা কলসী জোরে চেপে ধরতে মাটির কলস ভেঙে খান খান হয়ে গেল, সাঁকো হতে জলের ধারা স্টুডিওর মেজেতে গড়িয়ে পড়ল, গান থেমে গেল।

বেহালা কিন্তু থামল না। কেউ বাধা দিতে সাহস করল না। অপেরেটার এক ব্যঙ্গহাসির গানের সুর স্টুডিও ভ'রে বাজতে লাগল, যেন সুরকুম্ভ ফেটে গিয়ে সপ্তসুরের ঝরঝর ধারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

একটা তার কেটে গেল। শেখর আর হেসে উঠল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শ্রান্তভাবে নিকটে এসে চেয়ারে সে ব'সে পড়ল।

নীরব স্টুডিওতে সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবাক্‌।

ম্লান হেসে শেখর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বললে, সরী লিলি, সে বেহালা আর বাজে না!

বেগে সে স্টুডিও হতে বাহির হয়ে গেল।

অফিসের পাশে তাপনিয়ন্ত্রিত একটি ছোট ঘর, ডিরেক্টরের den, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সেক্রেটেরিয়েট টেবিল বা খাড়া চেয়ার নেই, চামড়া-মোড়া স্প্রিংএর আরাম কেদারা, মোটা কাঁচের তে-পায়া পেগটেবিল, ছোট দেওয়াল-আলমারি ক্রেটনের পর্দা দিয়ে ঢাকা।

অর্দ্ধশূন্য বিয়ারগেলাস টেবিলের কাচের ওপর রেখে শেখর স্যাণ্ডউইচের প্লেটটি টেনে নিলে। ক্লান্ত উদাস দৃষ্টি।

গ্লাসে বিয়ার ভরতে ভরতে ডিরেক্টর বললেন, অনেকদিন বাদে ভাল বেহালা বাজানো শুনলুম, আমার কিছু ফিল্ম গেল, তাতে দুঃখ নেই।

শেখর কোন উত্তর দিলে না। সে শ্রান্ত ব্যথিত। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ বোধ হয় বুঝেও বুঝতে চাইলে না। আবার সে হেসে উঠল। তৃষিতের মত আর এক গেলাস বিয়ার পান করলে।

—বিয়ারটা ভাল হে।

—শোন শেখরদা, তুমি আমাদের সঙ্গে জয়েন করো, মনটা ভাল থাকবে।

—আমি!

—হাঁ, বেহালাবাদকরূপে নয়, চিত্রশিল্পীরূপে, দেখলে ত লিলগুলি, মন্তব্য না করাই ভাল, নিজেদের জিনিষ।

—আর যারা দেখবে, সকলে আসলে কিছু বুঝবে না।

—মনোরঞ্জন করাই আমাদের কাজ, চোখে ধাঁধা না লাগলে লোকে ভোলে না, জান ত। তুমি—

—আমি!

—শোন, এবার বহুবর্ণের চিত্র তুলব, আর সাদা-কালোর পুতুল নাচন নয়, লোকে শুধু রস চায় না রংও চায়,

দেখ না মেয়েদের আজকাল সজ্জার বাহার, যেন ভুবনে হোলিখেলা। পটভূমি সাতরঙে ঝলমল করবে, তোমার মোনে বা ভান গখের ছবির মত, সে পট তুমি ছাড়া কে আঁকতে পারবে—

—আমি! হা-হা-টারা-লারা—না, আর গেলাস ভ'রো না।

শেখরের উচ্চহাস্তে বেহালার কৌতুকরাগিণী বেজে উঠল। মনে পড়ল, সে এসেছে তার কন্যা সম্বন্ধে সন্ধান নিতে, বচসা করতে। সে কথা সে ভুলে গেছে। সে কথা আর যেন জিজ্ঞাসা করা যায় না। শুধু মানসিক নয়, দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করল, যেন এই ক্ষুদ্র বদ্ধ গৃহে তার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। বোতাম খুলে সে দাঁড়িয়ে উঠল।

—আরে বোস, স্যাণ্ডউইচ নাও। এরপর নৃত্য-সভা আছে, তারপর বিবাহ-দৃশ্য। মালবিকাই নাচছে, সঙ্গে সাতজন জিপ্সি, ঘাঘরা ঘোরার সঙ্গে দর্শকদের মাথাও ঘুরবে। রোমেনিয়ায় কি ওয়াণ্ডারফুল জিপ্সিনাচ দেখে এলুম, লোকে বলে, ভারতবর্ষ হতেই জিপ্সিরা গেছে।

শেখর ব'সে বিয়ারের গ্লাস টেনে নিলে।

—শোন, তারপর আবার বিবাহ-দৃশ্য তুলতে হবে, সে-ও মালবিকা বধূরূপে, তুমি একটু থেকে যাও, কয়েকটা পরামর্শ আছে।

—আমি! আবার পরামর্শ! আচ্ছা যে দৃশ্য তোলা হ'ল সে ত বিবাহের পরে—

ডিরেক্টর হেসে উঠলেন. ঠিক! এ ত জীবন-নাট্য নয়, সিনেমা ডিরেক্টরের ওইটাই সুবিধে, কাল আমাকে শাসন করে না, আমি কালকে নিয়ন্ত্রিত করি, কোর্টে বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার দৃশ্য তোলার পর শাঁখ বাজিয়ে বিবাহ-মিলনের দৃশ্য তুলি, তারপর ছবি সাজাই, ছবি জুড়ি, ছবি কাটি।

শেখর গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়াল। জীবনের ঘটনাগুলি যদি এমনি উল্টোপাল্টা সাজানো যেত! সেখানে হারানো জীবন শুধু temps perdu.

বিয়ারপ্রদীপ্ত মুখ কালো হয়ে এল।

—সরী, আমাকে যেতে হবে, মেয়ের খোঁজে বাহির হয়েছি, আমার মেয়ে—

ডিরেক্টর দাঁড়িয়ে উঠল, বিস্মিতভাবে চাইলে,—ও, সে তোমার মেয়ে—so!

শেখর শুধু উত্তেজিত নয় রোষান্বিতভাবে ব'লে উঠল—হ্যাঁ, আমার মেয়ে, কি বলেছ তাকে?

—না, না, স্টুডিওতে আসে নি, বোধ হয় আমার অফিসে এসেছিল, একটি ছোকরা ছিল সঙ্গে, আরে, আমাদের রাধারমণের ছেলে; বিশ্ববিদ্যালয়ের সব জ্ঞানার্থী আর অধ্যাপকদের ক্লাসে যায় না, সব সিনেমার স্টুডিওতে ঘুর ঘুর করছে জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য—

—তুমি কি বলেছ!

—আমি কিছু বলিনি, কোন আশা দিই নি, বিশ্বাস কর। বিয়ে দিয়ে দাও, বুঝলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও।

—আচ্ছা, সে আমি বুঝব।

—তবে খুব ভাল সিনেমা-ফেস্, ভাল গায়ও শুনেছি, দেখছ ত মালবিকাকে, একবার নাম করতে পারলে—

—দেখ ডিরেক্টর কুণ্ডু—

—আর বলতে হবে না, আমি বুঝেছি, আমারও মেয়ে আছে, নিশ্চিন্ত থাক, আমি নেব না। তুমি বরং রাধারমণের সঙ্গে দেখা কর, ওরা প্রেমের খেলা খেলতে চায়, যা বাস্তবজীবনে হচ্ছে না ব'লে স্টুডিওতে এসে লীলাভিনয় করতে চায়। নর্ত্তনদৃশ্যটা দেখে যাও, ভাল লাগবে, রাজপুতানা থেকে লাস্যময়ীদের এনেছি।

—থ্যাঙ্ক্‌স্।

রেগে শেখর বাহির হয়ে এল।

রং-চটা তার গাড়ীতে উঠবার সময় দীপ্তিময় ক্রাইস্‌লারের দিকে চাইলে. সিনেমা-অভিনেত্রীর বিজয়হাস্তের মত ঝলমল করছে। সোনালী মালোয়ায় প'রে কে বসে? না, তার মেয়ে নয়, রঙীন ছায়া!

সবেগে গাড়ী চালিয়ে সে বাহির হ'ল। পথে একপাশে গাড়ী থামালে, যেন সে দিগ্‌নির্ণয় করতে পারছে না। একটা অশান্তি অনুভব করছে। কিন্তু থামবার উপায় নেই। পাশে যাত্রী-ভরা বাসের আঘাত বুঝি লাগে; পেছনে মোটরহর্ণের অসহিষ্ণু তীক্ষ্ণধ্বনি, রিকশর টুং টাং শব্দ—সামনে এগিয়ে যেতে হবে—চরৈবেতি!

এ যেন জীবনব্যূহে সপ্তরিপুর বাণবিদ্ধ হয়ে ঘোরা, নিস্ক্রমণের পথ নাই।

অবচেতনাচালিত হয়ে শেখর কম্পিতপদে সীমার পেষণ করলে।

বড় খুকী এসেছে তোমার কাছে?

বারান্দার কালো কংক্রিটের রেলিং শ্বেতরক্ত বুগেন্‌ভিলিয়াপুষ্প-স্তবকে সমাচ্ছন্ন; তারি অন্তরাল হতে এ্যাল্‌সেসিয়ান কুকুরটি লাফিয়ে উঠল, মোটরকার থামতেই তার চিৎকার শোনা গেল; সে গর্জ্জন স্বাগতসম্ভাষণ না বিপদ্‌সঙ্কেত বোঝা গেল না।

লোহার জালি-ভরা কাচের অর্দ্ধমুক্ত দ্বারের দিকে শেখর এগিয়ে গেল, লীলা নিজেই দ্বার মুক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে; কালো চোখে কিসের কৌতুকদীপ্তি, যেন প্রস্ফুটিত পদ্মে কৃষ্ণভ্রমর দুইটির পাখা কাঁপছে। নির্ণিমেষনয়নে শেখর স্মিতাননার দিকে চাইলে, ওই পেলবশুভ্র রূপ এখনও রক্তে দোলা দেয়!

হ্যালো চন্দ্‌, পথভুলে নাকি!

বাক্যের বাণে মোহের জাল কে কেটে দিলে। শেখর এগিয়ে গেল।

সাদা গেবেডিনের ট্রাউজার্সের ওপর সোনালী রেশমের গলা-খোলা কোট হলদে কালো দাগ-ভরা; মুখের লাবণ্যে ম্লান ছায়া, পুরাণো পদ্মপাপড়ির কালিমার মত।

হাসি টেনে শেখর বললে, ঠিক পথ ভুলে নয়, বোধ হয় পথ খুঁজতে খুঁজতে—

—অর্থাৎ পথ হারিয়ে গেছে বুঝি, খুঁজে পাচ্ছ না, সাবধানী পথিক!

লীলা হেসে উঠল। এ হাসির সুর শুনে শেখর কতদিন সুখ বোধ করেছে, শুধু কৌতুক নয়, এ সুর প্রাণের রহস্য-ভরা। আজ কিন্তু মনে হ'ল, কৌতুকের মীড়ের সঙ্গে পরিহাসের মূর্চ্ছনা মিলেছে।

একটু গম্ভীরভাবে শেখর বললে, মেয়েকে খুঁজতে বেরিয়েছি, বড় খুকী এসেছে তোমার কাছে?

—ও, তুমি চন্দ্‌, তুমি বলতে চাও তোমার মেয়েকে, বড় খুকীকে খুঁজতে এলে এখানে—দেখ, দেখ সার্চ্চ্‌ ক'রে—ভেতরে এস।

এবার হাসির সুরে ব্যঙ্গের খাদ মেশানো।

—সাজটা কি দেখছ, মিস্ত্রি খাটাচ্ছি, ড্রয়িং রুমটা কি বিচ্ছিরি ডিস্‌টেম্‌পার হয়েছিল, দেখলে টেম্‌পার খারাপ হয়ে যায়, তাই নতুন প্ল্যাস্টিক রং লাগাচ্ছি, বলছে দাগ লাগলে জলে ধোওয়া যাবে। তুমি ত সেদিন পার্টিতে এলে না, তাহলে রং সম্বন্ধে পরামর্শ করতাম।

—কেন, আমার মার্জ্জনা-চাওয়া চিঠি পাও নি ?

—হ্যাঁ, সেটা বেবী বোধ হয় তার এ্যালবামে পুরেছে, তোমার ভাঁড়ের ছবিটি বেশ হয়েছিল, সেন্টা মদের ভাঁড় না ভাঁড়ের মানুষ বুঝতে পারলাম না। তা, আজকাল পার্টিতে আসছ না কেন ?

শেখর কোন উত্তর দিলে না। ককটেল-পার্টিতে আজকাল পান-মাত্রা অনেক সময় তার থাকে না, সে কথা কি ক'রে সে বলবে ? ড্রয়িংরুমের দিকে সে এগিয়ে গেল।

—শোন, তুমি দোতলায় বারান্দায় গিয়ে বোস, আমি আসছি মিস্ত্রিদের বিদেয় ক'রে।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রশস্ত সোপানশ্রেণী মুখার্জ্জী সাহেবের প্রাচীন বাড়ীর মার্কেলের সরু সিঁড়ি ভেঙে নূতন তৈরী হয়েছে ; পারস্থ কার্পেটের নক্সানুসারে মোজেইকের অধিরোহণী, মার্কেলের দৃঢ়তা আছে কিন্তু সে শুভ্র শুচিতা, সে লাবণ্য নেই। পুরাতন ইঁটের কাঠামোর ওপর নূতন দেওয়ালে দেওয়ালে নানা বর্ণের সমাবেশ, আধুনিকতার ঔদ্ধত্য।

সিঁড়ির ধাপে ধাপে শেখর বার বার থেমে দাঁড়াল। কোন্ হাস্তের অনুরণনে সে চমকে উঠল। এ ত শুধু নূতন ড্রয়িংরুম হতে লীলার কৌতুকহাস্ত নয়, এ যেন সুখস্বপ্নভরা তরুণ-তরুণীদলের উচ্ছল হাস্তধ্বনি, প্রথম যৌবনযুগের ওপার হতে প্রতিধ্বনিত।

মুখার্জ্জী সাহেবের তিন কন্যা, গম্ভীরা কর্ম্মরতা শীলা, কৌতুকময়ী লীলা আর চঞ্চলা নৃত্যনিপুণা ইলা দিদিদের সমকক্ষতার সাধনরতা, বয়সে সব এক বা ছু' বৎসরের ব্যবধান। তাদের সঙ্গে তাদের মাসতুতো বোনেরা থাকত কলেজে পড়বার জন্মে—রেবা, বিভা, ললিতা। মামাতো ভাইয়েরা আসত, পিসতুতো বোনেরা সহপাঠিনীরা আসত, কলেজের প্রথম হতে চতুর্থ বৎসরের সব প্রতিনিধি।

কত হাসাহাসি, জানাজানি, মন দেওয়া-নেওয়া ; কত সেতারের ঝঙ্কার, বেহালার মূর্চ্ছনা, পিয়ানোর সুর-সঙ্গতি ; কত অমূলক তর্ক, অকারণ পরিহাস, হঠাৎ-গাওয়া গান ; কত হৃদয়ে স্পন্দন, রক্তে চাঞ্চল্য, তরুণচিত্তে উদ্বেলতা !

কোন প্রভাতে সাইকেলে, কোন অপরাহ্নে টম্‌টম্ হাঁকিয়ে, কোন সন্ধ্যায় ভাড়াটে ফিটনে শেখর আসত। উত্তর কলিকাতা হতে এই উপান্তে আসা একটা এ্যাডভেঞ্চার ছিল। সে শুধু নবীন শিল্পী গায়ক নয়, সে তরুণ প্রেমিক।

করিডর পেরিয়ে বারান্দায় আসতে কুকুরটি আর তর্জ্জন করলে না, আদরের জন্মে কোটের ওপর পা তুলে দিলে। তার তুষারশুভ্র দেহে হাত বুলিয়ে শেখর বললে, হায় এ্যাল্‌সেসিয়ান, তুমি যদি সে যুগে থাকতে, আদর পাওয়ার আতিশয্যে হাঁপিয়ে উঠতে।

শ্রান্ত হয়ে শেখর সিঙ্গাপুরী বেতের চেয়ারে ব'সে পড়ল। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি সুরু হয়েছে। বারিবিন্দুর ঝালরের মধ্য দিয়ে সবুজ মাঠ পুকুর পামগাছের সারি ঝাপসা দেখাচ্ছে।

ওই মাঠে টেনিস-কোর্ট ছিল, ক্রীড়াচঞ্চলা তরুণীদের দেহ সঞ্চালনের ছন্দে কংক্রিটের কোর্টে টেনিসবল লাফিয়ে লাফিয়ে উঠত, হাসির স্বর ছিটকে পড়ত। ওই জলাশয় আরও বৃহৎ ছিল, তার তালকুঞ্জের ছায়ায় ছিপ নিয়ে ব'সে শুধু কি মাছ-ধরার খেলা হত !

ওই টেনিসকোর্টে তিন সেট খেলে মুখার্জ্জীসাহেব অচৈতন্ত হয়ে পড়লেন, আর চেতনা হল না। শীলা নিল আলিপুরের বাড়ী, লীলা এই বাড়ী রাখল, ইলা দার্জ্জিলিঙে "মঁ রেপো" পেলে ; সেই বাংলোয় তার চির-বিশ্রাম লাভ হয়, হঠাৎ মৃত্যু, কেউ সন্দেহ করে আত্মহত্যা, কেন ?

ওই মাঠের ওপর স্টেজ বেঁধে "মায়ার খেলা" অভিনয় হয়েছিল। শেখর সীন স্টেজ সাজিয়েছিল, লীলা হয়েছিল প্রমদা। সেই অভিনয়রাত্রির স্মৃতি উন্মনা ক'রে দেয়।

চা-ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে লীলা বারান্দায় প্রবেশ করলে। সোনালী সুতোর কাজ-করা কল্কা-ভরা সুনীল ব্লাউজে কুঞ্চিত কেশস্তবক ছড়ানো, পেলব শুভ্রাননে উষার রক্তিমাভা।

শেখর চমকে দাঁড়িয়ে উঠল। এ কি তরুণী লীলার স্বপ্নমায়া !

অভিনয়ের সুরে মুগ্ধ কণ্ঠে সে ব'লে উঠল, প্রমদা ! মধ্যে ট্রলির ব্যবধান থাকাতে সে অগ্রসর হতে না পেরে চঞ্চল।

লীলা কৌতুক হেসে উঠল, প্রথম যৌবনের ওপার হতে ভেসে-আসা উচ্ছল হাস্য, গিরিঝর্ণার সুর।

তার পর পেয়ালাতে চায়ের চামচ ঠুকে অপহাস্তে সে ব'লে উঠল, দিদি, খুব হয়েছে, বোস্।

লৌহকলকারখানাতে সোনার তার কেটে গেল।

ঝিরি ঝিরি ঝিরি বারিধারার পটে লীলার মোহন মূর্ত্তি বড় করুণ লাগল। ইবদার্দ্র চেয়ারে শেখর ব'সে পড়ল স্তব্ধ হয়ে।

রূপার চিমটাতে চিনির চতুষ্কোণ তুলে লীলা বললে, শোন, বড় সাহেব গেছেন দিল্লীতে, কাবার্ড বন্ধ ক'রে; আজ চা—ক'টা চিনি?

হাসি টেনে শেখর বললে, তৃষ্ণার্ত্তের আবার choice, চা! মরীচিকার চেয়ে চা ত ভাল। তুমি যে দিল্লী গেলে না?

—সেধেছিলেন যেতে, দু'তিনটে পার্টি দিতে হবে; জান ত আজকাল ককটেল-পার্টির পাল না তুললে অর্ডারের তরী নড়ে না. দু'তিনটে বিল নাকি পাশ করতে হবে, শুধু পার্টির সুবাতাসে নাকি হবে না, মুরুব্বির লগি ঠেলতে হবে, সোনা-বাঁধানো লগি—এ মেজসাহেবের উক্তি, কপিরাইট নেই ব'লে quote করলুম।

—তা বড় শিল্পপতির সহধর্ম্মিণী হলে এ সব করতে হবে বৈ কি।

—খুব হয়েছে, চুপ কর। কেক কেমন হয়েছে?

—বুঝেছি, তোমার স্বহস্তসৃষ্টি, স্বাদে না হলে গন্ধে।

—ও, একটু পুড়ে গেছে বুঝি, আজ উনোনটার তাপ-নিয়ন্ত্রণযন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেছে।

—তোমার কি দোষ, সমস্ত পৃথিবীর আজ এই দশা, নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র বিকল।

—অন্ততঃ তোমার ত দেখছি আজ কেমন উদাস উদাস ভাব! আমারও মাঝে মাঝে কেমন ভাল লাগে না জানো—

—ভাল লাগে না! কিন্তু বেশ ভালই ত আছ, মনে হচ্ছে সুখে—

—সুখ! হা হা! হাঁ, বেশ সুখেই ত আছি। বুঝলে চন্দ্, অত ভাববার সময় আমাদের নেই। কি ক্লাব যেন আমাদের ছিল—

—"মঞ্জুলা"।

—হাঁ, মাঝে মাঝে আমাদের আলোচনা-সভা বসত, খুব তর্কাতর্কি হত, মনে পড়ে, একবার বিষয় ছিল, সুখ কি? জীবনে সুখী কে? তখন কত রকম গাঁজাই যে বলতুম।

—এখন সে সব ভুল মনে হয়?

—ভুল হয়ত সব নয়, কিন্তু তুমি যে এক ফিলজফি কেঁদেছিলে, ক্ষণবাদ—এই মুহূর্ত্তের যে সুখ ভোগ ক'রে নাও। একটা সুন্দর উপমা দিয়েছিলে।

—বোধ হয় ওমর খৈয়াম থেকে।

—হাঁ, কি জান, ভাবতে বসলেই দুঃখ—But to think is to be full of sorrow—কে যেন লিখেছে, হাঁ, কীট্‌স্, তখন কীট্‌স্ কি ভাল লাগত, শেলীর চেয়ে—এখন—সুখী কি দুঃখী ভাববার সময় কোথায়, সকাল থেকে রাত্র রাত কাজের চাকায় ঘুরছি, শুনবে—

—বল শুনি, আমি ত তোমার চিরদিনের ধৈর্য্যশীল শ্রোতা।

—সকালে উঠেই যাও খানসামা তদারক করতে, বেয়ারা হয়ত আসে নি, বয়কে বকুনি দাও, দুধওয়ালার দেখা নেই, বেবীর লাঞ্চ কি হবে; ব্রেকফাস্ট চুকলে একটু বিশ্রাম, তার পর মালীর ফাঁকি ধর, মিস্ত্রিদের কাজ তদারক কর, টেলিফোন, পার্টির লিষ্ট তৈরি কর, ডিনারে কি রান্না হবে, কাকে 'কল' করতে হবে, মার্কেটিং, টেলিফোন আর টেলিফোন—

—ভাল ত লাগে।

—কখনও খুব ভাল লাগে, কখনও মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে, শ্রান্তি আসে, না, না, অত হিসাবনিকাশ কেন, এ ত বড়সাহেবের ব্যালেন্স-শীট তৈরি নয়, প্রতি মুহূর্ত্ত উপভোগ ক'রে যাও, হয়ত এটা বয়সের ক্লান্তি। নাও, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তুমি ত চা খাচ্ছ না।

—তোমার কাজের কথার ধারা পান করছি, যে সুরে কীট্‌স্‌ পড়তে সেই সুর শোনবার চেষ্টা করছি।

—আচ্ছা, অত কথা না ব'লে চা খেলে চা-টা ত ভাল লাগবে।

—বেশ ভাল লাগছে।

—কিন্তু তুমি সব শুনছ না, তুমি কি ভাবছ।

—মেয়েটার জন্য ভাবছি, সত্যই মেয়েটাকে খুঁজতে বাহির হয়েছি, সকালে একটা চিঠি লিখে কোথায় যে বাহির হয়ে গেল, আজকালকার মেয়েদের ঠিক বুঝতে পারি না।

—আগেকার দিনেরও কি পারতে?

—তাও বোধ হয় পারি নি, তোমরা ত বোঝবার জন্য নয়, বুঝলে ত শেষ হয়ে গেল, বুঝতে চাই না, তোমরা নিত্যকালের চিররহস্য।

—আচ্ছা, চুপ কর, সেই তরুণ চাঁদটি এখনও মরে নি দেখছি—বেশ, বুঝতে পারছ না ব'লে ভেজবার ত দরকার নেই, এদিকে স'রে এস, এ যে বেশ বিষ্টি এল!

বৃষ্টি এল ঝম্‌ ঝম্‌ ক'রে কিন্তু বাতাস স্থির, দীর্ঘ বারিরেখা তীক্ষ্ণ বাণের মত ধরিত্রী বিদীর্ণ করছে, কিন্তু দক্ষিণ দিগন্তে সূর্য্যালোকের আভা। আকাশভরা বারিধারার জলছবির দিকে চেয়ে দু'জনে পাশাপাশি বসল।

—বেশ লাগছে বিষ্টি, আচ্ছা মনটা কেমন আনমনা হয়ে যায় কেন?

—মানুষজন্মের আগে কত যুগ ধ'রে আমরা গাছ হয়ে ভিজেছি, মাছ হয়ে খেলেছি, হয়ত তারি স্মৃতি জেগে ওঠে। কেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

—চুপ কর, শুনতে দাও।

হয়ত দু'জনেরই মনে গত যৌবনের কোন বারিধারামত্ত সন্ধ্যা জেগে উঠল। হঠাৎ-আসা গানের মত লীলা গেয়ে উঠল—এ কি মায়া, এ কি ছায়া! তার কণ্ঠের সুর কখনও জলকল্লোল ছাপিয়ে কখনও ঝরঝরানির তলায় ডুবে গিয়ে বার বার কেঁপে বাজতে লাগল। সেই সুরদীপ্ত আননের দিকে শেখর চাইতে পারলে না। জলাশয়ের মুকুরে বারিপাতের মায়াচিত্রের দিকে সে চেয়ে রইল। যে প্রশ্ন কতবার জিজ্ঞাসা করতে পারে নি, সে কথা আজও বলা হ'ল না।

"মায়ার খেলা" অভিনয় শেষ হ'ল অনেক রাতে। তার পর ভোজন-পর্ব্ব। খাবার-ঘর ও বারান্দা হতে পোলাও ও শিক-কাবাবের গন্ধ, হৈ-রৈ শব্দ আসছে।

শূন্য স্টেজে শেখর কি যেন খুঁজছিল, কার সন্ধানে ঘুরছিল মনে হল, সীনের পেছনে একটি ছায়া ন'ড়ে উঠল; সেই ছায়ামূর্ত্তির সন্ধানে যেতেই দেখলে, ম্লান জ্যোৎস্নালোকে চঞ্চলা বর্ণিনীর বর্ণকায়া তালকুঞ্জের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

প্রমত্তের মত শেখর সে দিকে ছুটলে।

মেঘ-ঢাকা মায়ালোকে তালকুঞ্জের অন্ধকার ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে, চঞ্চল পদধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গেছে, শুধু তপ্ত নিশ্বাসের শব্দ।

তার পর কম্পিত দুই বক্ষের স্পর্শ-শিহরণ, যুক্ত ওষ্ঠের মিলনানুকম্পন, সেই প্রথম যৌবনের প্রথম চুম্বন।

সে কে ছিল? লীলা, না ইলা, না লতিকা?

উত্তর আজও সে জানে না।

বৃষ্টি থেমে গেছে। গান-গাওয়াও অনেকক্ষণ থেমে গেছে। ভিজে মাটির গন্ধ-ভরা বাতাস। সূর্য্যাস্তের আলোকে চারিদিক ঝিকিমিকি করছে। এ যেন কোন অজানা অপূর্ব্ব পৃথিবী।

শ্রান্ত হয়ে লীলা এলিয়ে বসল। মনের রিম্‌ঝিম্‌ সুর ক্ষণিক বেজে এমন মিলিয়ে যায় কেন? শেখরের দিকে সে অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে চাইলে, এ চাউনি শেখরের অজানা, শেখর চাইতেই সে চোখ বুজলে।

বোধ হয় হৃদয়াবেগ প্রশমিত করবার জন্যে শেখর পাশের টেবিল হতে কাগজের প্যাড ও পেন্সিল টেনে নিলে, এলায়িত লীলার রেখাচিত্র আঁকতে আরম্ভ করলে, হৃদয়ের আঁচড় পেন্সিলের দাগে ঠিক ফুটে উঠল না।

শ্বেত সারমেয় গর্জন ক'রে উঠল। লীলা সচকিতে লাফিয়ে উঠে সলজ্জভাবে চাইলে, মৃদু শ্বাস ফেলে বললে, যেন স্বপ্ন দেখছিলুম, তুমি কি ম্যাজিক প্র্যাক্‌টিস্ করছ! শোন, মার্কেটে যেতে হবে।

ভয়ের ভান ক'রে শেখর বললে, আবার মার্কেট!

—না, না, সেদিনকার মত নয়, সেদিন বোধ হয় হ'টা দোকান ঘুরিয়েছিলুম।

—ভুল হল, এগারটা—আর একটা শাড়ী কিনতে একুশখানা দেখা হয়েছিল।

—আচ্ছা, আজ তিনটে দোকান, ঘর-মোছা একেবারে নেই, আর বেবীর বিনামা, শুদ্ধ ভাষায় বললুম, আরও,—লিষ্টটা লেখ ত অনুগ্রহ ক'রে, আজকাল বড় ভুলে যাই।

পেন্সিল-স্কেচের পাশে শেখর কেনবার জিনিষের ফর্দ লিখতে আরম্ভ করল। তার স্নায়ু বোধ হয় একটু শান্ত হল।

এ্যাল্‌সেসিয়ানের শুভ্র দীর্ঘদেহ কেঁপে উঠল ধনুকের ছিলার মত, লাফিয়ে সে সিঁড়ির দিকে ছুটল।

লীলা হেসে বললে, বোধ হয় গাড়ীটা এল, বেবী বোধ হয় পার্টিতে গেল না। যাক, তোমায় আর যেতে হবে না।

—না, না, আমি যাব।

—ও দ্বিধার সুর আমি জানি, কিন্তু বড়খুকীর কথা ত কিছু শোনা হল না, কি হয়েছে তোমার মেয়ের?

—সিনেমা করবেন!

—এই!

—হাঁ, মোহনচাঁদ বংশের অনেক অর্থ অনেক অভিনেত্রীতোষণে গেছে, এবার চাঁদবংশীয়া অভিনয় ক'রে বাড়ীতে টাকা আনবেন।

—আচ্ছা, শোন, তোমাদের এক বন্ধুর ছেলেকে সেদিন সঙ্গে দেখলুম।

—রাধারমণের ছেলে বোধ হয়।

—ঠিক! যাও তাঁর কাছে, ও ছেলের চোখের চাউনি দেখেই বুঝেছি, যেন পৃথিবীতে অন্য কোন বস্তু নেই।

—অর্থাৎ অন্য সুন্দরী নারী সামনে থাকলেও সে দিকে ত—

—চুপ কর, তুমি তার বাবার কাছে যাও, কনের বাপকেই যেতে হয়, আজই যাও, তবে সন্ধ্যাবেলাতেই যাও, শুনেছি বেশী রাত হলে তিনি যে সব কথা বলেন, পরদিন সকালে তাঁর মনে থাকে না।

—ভাবছি যাব, আমার এক বন্ধুও বললে, এ ক্ষেত্রে cherchez la femme নয় cherchez l' homme.

—ঠিক বলেছেন, আমিও সায় দিচ্ছি, সব দোষই যেন মেয়েদের! আচ্ছা, আবার আসছ কবে? একটা দরকার আছে, না না, বাজার নয়, পর্দা পছন্দও নয়। জান, Verlain পড়ছি, তোমার প্রিয় কবি, কয়েকটা কবিতা তোমার মুখে শুনতে চাই।

—কবিতা পড়ছ?

—হাঁ, এখন সময় পেলে কবিতা পড়ি, বড় নভেল পড়বার সময় কোথায়, আর এই আধুনিক উপন্যাস, জীবনের দেহ-মনের অস্ত্রোপচার আর ভাল লাগে না, কবিতা পড়ি, ক্ষণিকের জন্য যেন কোন মায়ালোকে চ'লে যাই, তার স্বপ্নরেশ কাজের মধ্যেও বাজে, তবে ওই ছন্দহীন কবিতা পড়তে পারি না।

—বোধ হয় পড়তে জান না ব'লে।

—তুমি এস একদিন শুনব, দেরী ক'রো না।

চোখের ওপর চোখ রেখে লীলা কৌতুকহাসি হাসলে।

হেড-লাইট জ্বালিয়ে শেখর ভাবতে লাগল, ওই কৃষ্ণ-চক্ষুতারকার কি কথা জ্ব'লে উঠতে চায়, তা সে এত দিনেও বুঝে উঠতে পারলে না। সে মায়া নয়, সে মোহ নয়, সে প্রাণের অজানা রহস্য। সে আলো কি গৃহ-প্রদীপজ্যোতি না আলেয়া? ক্ষণিক শান্তির পর জ্বালা আসে কেন?

চৌরঙ্গীতে পৌঁছে শেখরের মনে পড়ল, আজ অপরাহ্নে ভারভাগ বিভাগ-কমিশনারের মিটিং আছে, এটর্ণী বিশেষ ক'রে যেতে বলেছে, মিটিং-এর নোটিশের কপির সঙ্গে জরুরী চিঠি দিয়েছে, কারণ, প্রপিতামহদের প্রাচীন অট্টালিকার অবশিষ্ট অংশ বিক্রি হবে না বিভাগ হবে, সে বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করতে হবে, কমিশনার সকল

অংশীদারের মতামত শুনতে চান। ইঞ্জিনিয়ার মত দিয়েছেন, বিক্রি করাই যুক্তিযুক্ত ; তিন ভাগ হতে পারে, তাহলে দুইটি নূতন সিঁড়ি ও ড্রেন সংযোগ করতে হবে, অন্ততঃ বিশ হাজার টাকা খরচ হবে ; খণ্ডিত অংশগুলির পথ গলি দিয়ে হবে না, পেছনের পরিত্যক্ত ভাঙা মন্দিরের পাশ দিয়ে যাতায়াতের পথ তৈরি করতে হবে।

সাত বছর ধ'রে এ পার্টিশন-মামলা চলছে, এটর্ণী আশ্বাস দিয়েছেন, আর চার বছরের মধ্যে শেষ হবে ; এর মধ্যে এটর্ণী-খরচ বাবদ দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। শেখরের এক গোঁয়ার খুল্লতাতপুত্রের গোমূর্খতায় মামলা শেষ হতে চায় না, প্রতি বিষয়ে প্রতিপক্ষমতের বিরুদ্ধতা না করলে সে ভাবে যথেষ্ট বৈরভাব প্রকাশ হ'ল না, সে প্রতারিত হচ্ছে, এ বিষয়ে তার পরামর্শদাতা তার এটর্ণী নয়, উকীল-কন্যা গৃহিণীই তার বড় কৌসলী।

বসতবাড়ী বিক্রি না করার পক্ষেই শেখর গত মিটিং-এ মত দিয়েছে। চৌমাথায় লাল আলো জ্বলতে, গাড়ী থামিয়ে সে ভাবতে লাগল; বিক্রি হয়ে যাক বাড়ী। এক ভাটিয়া মোটা টাকার দর দিয়েছে, এখন দাম ভাল পাওয়া যাবে। মিটিং হয়ত এতক্ষণে শেষ হয় নি, সে মিটিং-এ যাবে, জানাবে বাড়ী বিক্রিতে তার মত। হয়ত তার ভ্রাতৃজায়া এ মত-পরিবর্তনে কোন দুরভিসন্ধি বুঝবেন। এ শতাব্দীজীর্ণ সৌধাবলী বিক্রি হোক। সেদিন মোজার্ট-মিউজিক খুঁজতে গিয়ে দেখল, উইতে কেটেছে, তার পাশে ছবির ফ্রেমও কীটদষ্ট, কি হবে এই কালকীটদষ্ট অট্টালিকা রেখে, সে বালীগঞ্জে নূতন বাড়ী তৈরি করবে, হয়ত লীলার বাড়ীর মত অত বড় অত চমকপ্রদ হবে না। গ্রোপিউস-পরিকল্পিত এক আধুনিক ভিলা সে ড্রেসডেনে দেখেছিল, তারি ছবি চোখে ভেসে উঠল—নূতন বাড়ী! নূতন জীবন!

কিন্তু মিটিং-ঘরের দৃশ্যটি মনে করতেই শেখর গাড়ীর গতি মন্দীভূত করলে,—এটর্ণীর অফিসের এক কোণে ভেনেস্‌টা-পার্টিশন দেওয়া খুপরি, লাল ফিতেবাঁধা ব্রিফের বাণ্ডিল-ভরা টেবিলের একদিকে কমিশনার জজিয়তি মুখে ব'সে, জুনিয়ার ব্যারিস্টার, বয়সের অল্পতা মুখের গাম্ভীর্য্যে পূরণ করতে হয় ; টেবিল ঘিরে সাত এটর্ণী ঘেঁষাঘেঁষি ব'সে, সপ্তরথীর মত, বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে পরিহাস চলছে ; তাঁদের পাশে ও পেছনে তাঁদের মক্কেলবৃন্দ, মোহনচাঁদ-প্রাসাদের যুধ্যমান অংশীদারগণ আরও গম্ভীরমুখে ব'সে, কেউ কারও কুশল জিজ্ঞাসা করে না, বাক্যালাপ করতে চায় না, এ রণাঙ্গন ; মাঝে মাঝে কেউ উত্তেজিতভাবে কোন আত্মীয় সম্বন্ধে কটূক্তি ক'রে ওঠেন, এটর্ণী থামাতে পারে না, হেসে ব'লে ওঠে, দেখুন, আপনারাই শুধু অংশীদার নন, আমরাও মোটা ভাগ পাব।

অফিস-আদালতগামী গাড়ীপ্রবাহে এখন ভাঁটা, গৃহগামী পেট্রোলযানের জোয়ার এসেছে। শেখর ভাবতে লাগল, মিটিং এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে, এটর্ণীকে চিঠি লিখে জানালেই হবে, সে বিক্রি চায়, ভাল দাম পেলে তার অংশ এখনই বিক্রি করতে রাজী আছে ; নিউপার্কের জমিটা পাওয়া যাবে কি ?

এক মোটরকার-সঙ্গমে গাড়ী এসে থামল, হাইকোর্টের দিকে না গিয়ে শেখর পার্ক ষ্ট্রীটের দিকে গাড়ী ঘোরালে, পুরাণো সাহেবপাড়ার দিকে চলল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাদের বংশের এক শাখা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সেই হয় প্রথম পার্টিশন। নগদ টাকা নিয়ে রেভারেণ্ড গোবিন্দরাম বর্ত্তমান পার্ক ষ্ট্রীট পাড়ায় জমি কিনে বাড়ী তৈরি করেন। সে জমি বাগানবাড়ী ভাগাভাগি হয়ে অধিকাংশ বিক্রি হয়ে গেছে, অবশিষ্টাংশ এক উপশাখা-অধিকৃত, কয়েকটি ফ্ল্যাটে বিভক্ত। শেখর সেইদিকে হঠাৎ মোটর চালালে।

অন্ধগলির শেষে বালি-খসা বাড়ী, ন' ফিট উঁচু প্রশস্ত জানলাগুলির চওড়া পাখিগুলি বন্ধ। ঘোরানো নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শেখরের মনে হ'ল যেন কোন ভগ্নভিত্তি রাজপ্রাসাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, রুদ্ধ দ্বারগুলিতে ভাড়াটেদের কার্ডগুলি লাগানো।

তেতলায় উঠে শেখর হাঁপাতে লাগল। বেল্ টিপে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ভেজানো দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। চারিদিক্ অন্ধকার, অস্বাভাবিক স্তব্ধ, শুধু একটা মৃদু ধ্বনি চাপা গোঙানির মত ধূপের গন্ধের সঙ্গে মিশে আসছে। করিডরের শেষে আলোকরেখার দিকে সে এগিয়ে গেল।

শেষের ঘরের দরজার সামনে শেখর চমকে বিস্ময়মোহে নিশ্চল দাঁড়াল। বন্ধ জানলায় নীল-লোহিত নানা বর্ণের কাচের ঝিকিমিকি গথিক গির্জ্জার গবাক্ষের মত। বেদীর সাদা মার্কেলের ওপর খ্রীষ্টক্রোড়ে মাতা মেরীর দীপ্ত মূর্ত্তি, কাঠের কি পাথরের বোঝা যায় না ; দুইপাশে চারটি রূপালি বাতিদানে তিন ফুট লম্বা মোমবাতি জ্বলছে, দ্বিতীয় থাকে রঙীন ফুলদানিগুলিতে নানা জাতীয় ফুলের বর্ণশোভা। নীচে কয়েকটি জলন্ত ধূপকাঠির মধ্যে নতজানু নারীমূর্ত্তি, মেরী-মাতারই মত অচঞ্চল, এলায়িত কেশভার বুকের জমাট কুণ্ডলীর মত ধূপের ধোঁয়ায়
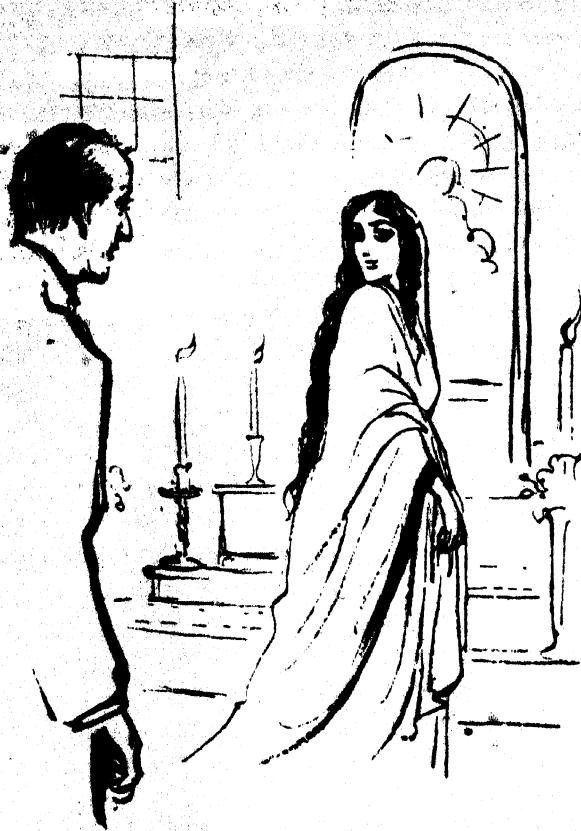
ওঃ! তুমি শেখরদাদা! এখন কি মনে ক'রে?

মিশে গেছে, শুধু একটি করুণ কণ্ঠের সুর একটানা মৃদু ধ্বনিত হচ্ছে—Ave Maria, লাটিনভাষায় উচ্চারিত মেরীস্তব। যেন মধ্যযুগীয় কোন গথিকগির্জ্জার দৃশ্যপট শেখরের নয়নসম্মুখে উদ্ভাসিত হ'ল। ইচ্ছা হ'ল, ওই স্তববাদিনীর পাশে সেও নতজানু বসে, তার বিপর্য্যস্ত চিত্তে যদি শান্তি খুঁজে পায়। প্রার্থনারতার আলোছায়ামণ্ডিত মূর্ত্তি সে উপভোগ করতে লাগল, যেন সে মধ্যযুগীয় গির্জ্জার কোন চিত্র দেখছে।

অস্ফুটস্বরে হয়ত সে ব'লে উঠেছিল—মেরী!

পূজারিণী চমকে চাইলে বিচলিত হয়ে দ্রুতছন্দে দাঁড়িয়ে উঠল, বিচলিতভাবে বললে, কে!

শেখর কোন উত্তর দিলে না, নির্ণিমেষ নয়নে সমুজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে রইল, আননে কোন্ অনির্ব্বচনীয় আভা, মাডোনা!

রুদ্ধস্বরে নারীটি বললে, ওঃ! তুমি শেখরদাদা! এখন, কি মনে ক'রে?

সে অলৌকিক আভা মিলিয়ে গেল। লজ্জিতভাবে শেখর বললে, অসময়ে এসে তোমায় disturb করলুম দেখছি।

—না, না, সুসময়েই এসেছ, তোমার কথা ভাবছিলুম। তুমি ড্রয়িংরুমে একটু বোস, ডানদিকে সুইচবোর্ড, আলো জ্বালিয়ে নিও, জর্জ্জ আবার এক নতুন নিওনলাইট লাগিয়েছে।

বেদীর পাশ হতে বাইবেল গ্রন্থ নিয়ে মেরী আবার নতজানু হয়ে বসল।

শেখর কিন্তু ড্রয়িংরুমে গেল না, সামনে খোলা ছাদে গিয়ে দাঁড়াল। অস্তরবির রক্তরাগ দিগঙ্গনার রাঙাচেলীর সোনার পাড়ের মত এখনও জলজল করছে, গোবিন্দরায়ের পোঁতা প্রাচীন দীর্ঘ গাছগুলির ঘননীল মূর্ত্তিপুঞ্জের মাথায় একটি তারা ফুটে উঠল। প্রদোষের এই স্তব্ধ ছায়ালোক যেন কোন অজানা পৃথিবী, স্বপ্নবোনার কাল।

শেখর ভাবতে লাগল, জীবনের ঊষাকাল হতে অরুণার সঙ্গে বার বার বন্ধুরূপে পরিচয়, পরিণয়ের সম্ভাবনাও হয়েছিল ইংলণ্ডে, একরূপে কাছাকাছি এসে অন্যরূপে পালিয়ে গেছে। অরুণা চিরদিন যেমন ভাবপ্রবণা তেমনি গরবিণী। আভিজাত্যের গর্ব্বে কখনও মুগ্ধ যুবকদের প্রশ্রয় দেয় নি, কখনও বা বর্ণপালনের মোহে নানা হিতকর কার্য্যে মেতে উঠেছে। রং শ্যামবর্ণ হলেও তার মুখের কৌলের সৌকুমার্য্যে চক্ষের চকিত দীপ্তিতে চটুল বাক্যের ছটায়, বিশেষতঃ পিয়ানোবাজানোতে বহু যুবকচিত্ত চঞ্চল হয়েছে কিন্তু প্রেমনিবেদনের স্পর্দ্ধা কারও হয় নি।

অরুণার আর একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন হচ্ছে, বোধ হয় কনভেন্টের স্কুলে কাজ নিয়ে ক্যাথলিক হবার সাধ।

—এ কি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?

—তোমার ছাদটি সুন্দর, আর এই সন্ধ্যার আলোর ছায়া বড় ভাল লাগে।

—তুমি ত চিরকাল এই ছায়ালোকেই থাকতে চাও, মনে মনে কি বলছিলে—

—টেনিসনের সেই কবিতাটা মনে পড়ছে, Sunset and evening star And a clear call for me—

—চলো ড্রয়িংরুমে—আমি এবার clear call পেয়েছি, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।

উপহাস্তে শেখর চাইলে, অরুণা আরও স্থূলা হয়েছে, গণ্ডের মাংস স্ফীত, আননের সেই অলৌকিক আভা মিলিয়ে গেছে, শুধু তসরের শাড়ীর চওড়া লালপাড় জলজল করছে।

ড্রয়িংরুমে নিওন-আলো জ্বালিয়ে অরুণা বললে, বোস, কফি নিয়ে আসি।

হয়ত সে কি বলবে, ভাবতে চায়।

পুরাতন ড্রয়িংরুম, টেবিলের বনাত খানিকটা উঠে গেছে, ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতার গাদার পাশে কতকগুলি খ্রীষ্টান ধর্ম্মপুস্তক, সেণ্ট অগষ্টিনের 'Confessions', সাধ্বী থেরেজার জীবনী; একখানা ভারতীয় ডিভোর্স এ্যাক্টও প'ড়ে রয়েছে।

চিরপরিচিত ছবিগুলি, এই ছবিগুলি ফ্লোরেন্সে উফিৎসি-মিউজিয়মের পাশের দোকান হতে দু'জনে পছন্দ ক'রে কিনেছিল। কাচগুলি পরিষ্কার করা হয়েছে, কোথাও মাকড়সার জাল নেই—একদিকে ফ্রা এঞ্জেলিকোর "Annunciation": স্বর্গদূতী নতজানু হয়ে সচকিতা তরুণী মেরীকে তাঁহারি গর্ভে ত্রাণকর্ত্তা যিশুর জন্ম হবে, এ শুভসংবাদ জানাচ্ছেন। অপর দেয়ালে তিনতোরেত্তোর "Crucifixion", বিরাট্ চিত্রের মধ্যবিন্দু ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের সুঠাম দেহ প্রভাত সূর্য্যের মত জ্যোতির্ম্ময় এক আলোকপিণ্ড, ক্রুশের নীচে মূর্চ্ছিতা মাতা মেরীর ওপর সে আলো ঝ'রে পড়ছে, লটারিক্রীড়ারত সৈনিকদলের কালোছায়ায় সে আলো ঝিকিমিকি করছে, রোমকপ্রতিভূ পাইলটের ওপর সে আলো প্রলয়াগ্নির মত; অন্ধকার পটভূমিকায় অগ্নিপ্রভ আলোকধারা চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত। অরুণা এই আলোকদ্যুতিতে মুগ্ধা হয়েছে।

কফি-ভরা পেয়ালা রেখে অরুণা বসল শেখরের মুখোমুখি।

—তুমি খুব ঠিক সময়ে এসেছ; অনেকগুলি কথা আছে, একটির পর একটি বলি, মন দিয়ে শোন।

এ যেন ক্লাশে ছাত্রীদের ভাষণ দিচ্ছে; শেখরের এতক্ষণে কৌতুকবোধ হ'ল।

—বলো, আমি অতি মনযোগী ছাত্র ছিলুম।

—প্রথমে, তোমার মেয়ের কথা বলি।

—কি! বড় খুকী এসেছিল নাকি? তোমার কাছে!

—হাঁ, আজ দুপুরে এসেছিল।

—দুপুরে! কি বললে, কি বললে সে, সিনেমার কথা বললে? তাহলে সকালে কোথায় গেছল?

—সকালে বাড়ীতেই ছিল, সেখান থেকেই ফোন ক'রে এল, দিশাহারা হয়ে না ঘুরে বাড়ীতেই খোঁজ করলে পারতে।

—যাক, কি বললে, কি চায়?

—আমার স্কুলে একটা কাজ চায়, কাজ খালি হয়েছে কিনা জানতে এসেছিল।

—কি বললে তুমি?

—কাজ আমি দিতে পারি, একজন শিক্ষয়িত্রী যাচ্ছেন, একটা কাজ সে করতে চায়, স্কুলে বা ব্যাঙ্কে বা অফিসে—

—বা সিনেমায়, তা মাষ্টারি ভাল।

—আমি কিন্তু দিতে চাই না, ও শুনতেই ভাল। তা ওর বিবাহের কি হ'ল?

—তুমি বলছ বিয়ে দিয়ে দিতে?

—আমি কিছু বলছি না, কিন্তু সেটাই ভাল নয় কি, ওর মা ভাল থাকলে—জান ত, এ বয়সে কত বন্দ, কত আশা জাগে, আর এক কাপ কফি দি—

শেখর অরুণার কালক্লান্ত মুখের দিকে চাইলে, সে মুখ বড় স্নিগ্ধ করুণ মনে হ'ল, অবিবাহিতা হয়ে সারাজীবন মাষ্টারি করার জীবন সে জানে। ধীরে সে বললে, ঠিক বলেছ, থ্যাঙ্ক্‌স্‌, ওর বিয়ের চেষ্টাই করছি।

নীরবে দু'জনে কফি পান করলে।

—এবার তোমার কথা বলো।

—না, আগে দাদার কথা বলি।

—জর্জ্জ কোথায়?

—বোধ হয় ব্যারিস্টার-বাড়ী গেছে, ওই যে ডিভোর্স এ্যাক্ট দেখছ, রিণির বিবাহবিচ্ছেদ করার চেষ্টা হচ্ছে। রিণি এতদিনে রাজী হয়েছে, স্বামী ত সাত বছর ছেড়ে গেছে জান, সমস্যা ছিল মেয়েটা, রিণি বলেছিল, মেয়ের বিবাহ দিয়ে তবে সে কিছু করতে পারে, না হলে হিন্দুসমাজে মেয়ের বিবাহ হবে না।

—জর্জ্জ এতদিনে বিয়ে করবে?

—মিলনের কি কাল আছে, নূতন জীবন সব সময়েই আরম্ভ করা যায়।

—রিণির মেয়ের বিবাহ ঠিক হয়েছে?

—না, মেয়েটি মারা গেছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শেখর বললে, জর্জ্জ ঠিকই করছে। ক্লান্ত চোখে সে অরুণার ব'সে-থাকার দিকে চাইলে, ভাবলে, তার জীবনে সব বেঠিক হয়ে যায় কেন?

ভাবদীপ্ত কণ্ঠে অরুণা ব'লে উঠল, তাছাড়া আমি ত চ'লে যাচ্ছি, দাদা একলা থাকবে কি ক'রে।

—তুমি চ'লে যাচ্ছ! কোথায়?

—শোন, চমকো না, এ সিরিয়স, আমি রোমন ক্যাথলিক হচ্ছি।

শেখর কৌতুক বিস্ময়ে চাইলে, বলতে যাচ্ছিল, ও, বোধ হয় প্রপিতামহীদের রক্ত জেগে উঠল, কিন্তু অরুণার মুখের দিকে চেয়ে কেমন ব্যথা অনুভব করলে। ধীরে তার হাতখানি ধ'রে দীর্ঘ আঙুলগুলিতে হাত বুলাতে লাগল। স্নিগ্ধস্বরে বললে, কি সুন্দর তোমার আঙুল, আর্টিস্টের আঙুল, পিয়ানো বাজাও এখন?

—অনেকদিন বাজাই নি, আবার tune করতে হবে।

—বেশ, ক্যাথলিক হবে. যে ধর্মমতে সত্য বিশ্বাস তা নিশ্চয় গ্রহণ করবে, কিন্তু তার জন্যে চ'লে যাবার কি আছে?

—আমি nun হব, কোন আপত্তি শুনব না। এবার clear call পেয়েছি।

উপহসিত সুরে শেখর বলতে যাচ্ছিল, সে ত অনেকবার পেয়েছ, যখন তুমি সিফং জর্জ্জেট ছেড়ে খদ্দর পরলে, আবার যখন গান্ধীবাদ ত্যাগ ক'রে বিপ্লববাদীদের ডেকে এই ঘরে চায়ের সভা বসালে, আচারের বোতলে পিস্তল লুকিয়ে রাখলে; তারপর শুনলে ইয়োরোপের আহ্বান, ইয়োরোপীয় শিল্প-সভ্যতা জীবন-রীতিই ভারতের মুক্তির পথ, ল্যাস্কীর ছাত্রী কম্যুনিস্ট হয়ে উঠেছিলে; তার পর শিক্ষার কাজ নিতে হ'ল, অন্য পথের সন্ধান পেলে না।

কিন্তু শেখর এ সব কোন কথা বলতে পারলে না, জীবন-দোলায় সেও ত অরুণার মত এক লক্ষ্য হতে আর এক লক্ষ্যে দুলেছে, জীবনের গতি নূতন পথে চলার আনন্দ পেয়েছে কিন্তু স্থির এক লক্ষ্যে চলার শান্তি ও সম্পদ্ পায় নি, এখনও দিশাহারা।

দু' ইঞ্চি মাটির টবে ছোট ক্যাক্টাসটি তুলে সে ধীরে বললে, এ বছর বুঝি ক্যাক্টাস্, ছাদেও মেলা বসেছে দেখলুম, গত বছর কি সুন্দর চন্দ্রমল্লিকা করেছিলে।

—হাঁ, ওই কাঁটাভরা গাছগুলি আমাকে যেন পেয়ে বসেছে, ছাদে চলো, দেখবে কি সুন্দর ফুল।

দু'জনে ছাদে কাছাকাছি দাঁড়াল। ম্লান চন্দ্রিকায় চারিদিক্ ছায়াচ্ছন্ন।

হাস্যস্বরে অরুণা ব'লে উঠল, শোন একটা মজার কথা। সেদিন বিনায়ক দেখা করতে এসেছিল। আমার সঙ্গে পড়ত লণ্ডন স্কুল অব একনমিক্সে।

—ও, সেই মারাঠি যুবকটি, শুধু তোমার সহপাঠী ছিল না—

—চুপ করো, এখন আর যুবক নেই, এখন ভারতীয় রাষ্ট্রবিভাগে এক বড় সাহেব, নিউইয়র্ক যাচ্ছে।

—আজ তুমি তার সঙ্গে যেতে পারতে, ম্যানহাটানের কোন বিশ-তলা ফ্ল্যাটে ব'সে ককটেল পরিবেশন করতে, পঞ্চম এ্যাভিনিউতে মার্কেটিং।

এতক্ষণে অরুণা উচ্চহাস্য ক'রে উঠল, কিন্তু এ হাস্য যেন পরিহাসের বিদ্রূপ।

—হায়, সে সৌভাগ্য হবে না, সেই অষ্ট্রিয়ান মেয়েটাকে এতদিনে বিয়ে করেছে, রেবেকা এলেনবোগেন।

শেখর কিন্তু হাসিতে যোগ দিলে না। শ্রান্ত হয়ে এক লোহার চেয়ারে ব'সে পড়ল। ধীরে বললে, একদিন সে তোমায় ভালবেসেছিল, তুমিও ভালবেসেছিলে।

—আমি! হাঁ, আজ স্বীকার করছি, আমিও ভালবেসেছি। দেখ শেখরদা, আজকাল আত্মবিশ্লেষণ করি, মাতা-মেরীর কাছে অনেক confession করি, তাতে মনের ভার লাঘব হয়। তা না হলে ধর্মের পথে এগোন যায় না।

—তোমাদের মিলন হতে পারত, হ'ল না, সেজন্য আমিই দায়ী।

—তুমি!

—তোমার বড় কাছাকাছি থাকতুম, আর কেউ ঘেঁষতে পারত না। সেবার তুমি যদি আমার সঙ্গে ইতালী বেড়াতে না গিয়ে নরওয়ে যেতে তার সঙ্গে—

—চুপ করো। না, না, তার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই, আমিও এসব ভেবেছি, তাহলে আজ ত এই নূতন জীবন আরম্ভ করতে পারতুম না, এটা আমার পাগলামি ভেব না।

—আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা পাগল আছে, বাঁধা পথে সে চলতে চায় না, সেই জন্যেই ত বেঁচে থাকতে পারি, যদি কাজের চাকায় কলের মত শুধু ঘুরতে হত—

—কিন্তু জীবনটা শুধু পাগলামি নয়, একটা পরীক্ষা।

—এগ্‌জামিনেশন না এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌ বলছ?

—দুই অর্থেই বলছি। জানো, আমি কি thrill অনুভব করছি, যদি চার্চ্চ আমাকে গ্রহণ করেন, মাতা মেরী কৃপা করেন—চ'লে যাব সেবিকারূপে কখনও আফ্রিকার কোন কাফ্রীগ্রামে, কখনও আর্জেন্টাইনের কোন অরণ্যে, কখনও সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদের ধারে কোন কন্‌ভেণ্টে, সমস্ত পৃথিবী আমার ঘর আমার আত্মীয় হবে, নিউইয়র্কে বিশতলা ফ্ল্যাটের কি লোভ দেখাচ্ছ! শেখরদা, আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন যোগ্য হতে পারি, অনেকদিন novice থাকতে হবে।

শেখর দাঁড়িয়ে উঠল। অরুণাকে সে এতদিন জানে কিন্তু তার অন্তরের এ বদ্ধ কুঠরির সন্ধান সে কোন দিন পায় নি, সে বিজন অন্তরমন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বার অরুণা ঈষৎ উন্মুক্ত করলে—সেখানে কোন্ মূর্ত্তি, কোন্ প্রদীপ জলছে?

ধীরে সে বললে, তোমার মেরী মূর্ত্তিটি বড় চমৎকার, গথিক মনে হল।

আবেগের সঙ্গে অরুণা বললে, হাঁ, নুরনবেয়ার্গের এক গির্জ্জায় দেখেছিলুম, তারি ছাঁচে গড়া, মাদার মার্গারেট আনিয়ে দিলেন। দেখবে?

হলের বড় ঘড়ি বেজে উঠল, কালের প্রহরীর বিরামহীন প্রহর গোনার টং টং ধ্বনি।

শেখর যেন স্বপ্ন হতে চমকে উঠল, রাধারমণের কাছে যেতে হবে, দেরী অনেক হয়ে গেছে। উচ্চস্বরে সে বললে, না, না, আজ থাক, আজ আমি বড় ক্লান্ত, আমাকে ক্ষমা কর, আর একদিন আসব, সেদিন পিয়ানোও শুনব।

দ্বারের কাছে নিমেষের জন্যে সে দাঁড়াল। ধূপকাঠিগুলি নিভে গেছে, বাতিগুলির শিখা কাঁপছে। ভাবলে, নতজানু হয়ে যদি সে প্রার্থনা করে, তবে সে কি শান্তি পাবে, পথসন্ধানসমস্যার সমাধান হবে?

হয়ত অরগ্যানসঙ্গীতের মধ্যে সেই পাগলটা অট্টহাস্য ক'রে উঠবে, কল্পনার রঙীন বুদ্‌বুদ ফেটে মিলিয়ে যাবে। মেরীমূর্ত্তি মিউজিয়মের শিল্পবস্তু হয়ে উঠবে।

বেগে সে বাহির হয়ে গেল।

রেস্তোরাঁও গোবিন্দরামের শতাব্দীজীর্ণ কাঠের সিঁড়ি দুলতে লাগল।

মধ্য কলিকাতার এমন সঙ্কীর্ণ দুর্গন্ধময় অন্ধকার গলির মধ্যে এমন চকমিলান চকমকে বাড়ী দেখে শেখর বিস্মিত হল না। পৈতৃক তিন মহল বাড়ীর সামনের মাঠ জুড়ে রাধারমণ নূতন বৈঠকখানামহল তৈরি করেছে, পদ্মফুলকাটা মোজেয়িক টালি বসানো অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে নিওনআলোদীপ্ত ঘরের সারি—ফরাসপাতা বড় বৈঠকখানা ঘর, তার পাশে টিল আসবাব সাজানো ড্রয়িং-রুম, অন্যদিকে সাহেবী খাবার ঘর ও খানসামার রান্নাঘর, মাঝে তাসখেলার ঘর। কয়লার খনি, ব্রেবর্ন্ রোডে আফিস, তাসের আড্ডা, স্ত্রীর সংসার, রাধারমণের জীবনের নানা মহলের মত বাড়ীটিও যেন ভাগ করা।

শেখর যখন পৌঁছাল তখন চা-সভা শেষ হয়েছে, এখনও তাসের আড্ডা ও মদিরাপানপর্ব্ব আরম্ভ হয় নি। বৈঠকখানা ঘরে ফরাসে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে রাধারমণ বসেছিল, অদূরে এক চেয়ারে কোন দালাল বা প্রার্থী ব'সে। শেখরকে দেখে সে বাজখাঁই গলায় ব'লে উঠল, আরে এস এস শেখরচন্দ্র, বহুদিন বাদে। দালালটিকে চ'লে যাবার ইঙ্গিত করে শেখরকে পেগটেবিলের পাশে এক আরাম কেদারায় বসতে বললে। টেবিলে নানা আকৃতির ও বর্ণের বোতল ও গেলাস সাজানো।

—কেমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে।

—তোমার কাছে তাজা হতে এলুম।

—তা বলো, তোমার wish কি?

—শোন রাধারমণ, একটা কাজের কথা আছে, সেজন্যে এলুম, ওসব পরে হবে।

—কাজের কথা! ব্যবসায়ের কথা হলে অফিসে, বাড়ীতে বলি না জান ত, আটটার পর relax—

—ঠিক ব্যবসায় নয়, পারিবারিক—

—পারিবারিক! সে ত বৈঠকখানা মহল নয়, অন্দরমহল—আচ্ছা বলো।

—আমার মেয়েকে ত দেখেছ বোধ হয়।

—বিলক্ষণ, খুব দেখেছি, খুব দেখছি, সেদিন গলি সচকিত ক'রে গাড়ী হাঁকিয়ে এল, আমার ছেলেটি পাশে হাঁ ক'রে ব'সে। বেশ smart.

—তোমার ছেলের সঙ্গে পড়ে।

—জানি, Economics পড়ে। সেদিন আমায় ধরেছে, কাকাবাবু, আপনার কলিয়ারীতে ত অনেক women labour, তা welfare officer চাই ত। হুঁ, এক welfare state-র গুঁতোতে ব্যবসায় গুটোতে হচ্ছে। বললুম, ওসব অফিসের ব্যাপার।

—তা অফিসে গেছল নাকি?

—না, অফিসে এখনো যায় নি, তা অন্দর-অফিসে আনাগোনা হচ্ছে দেখছি।

—হাঁ, তোমার স্ত্রী ওকে বড় স্নেহ করেন, বোধ হয় মায়ের স্নেহ পায় না ব'লে। তা তুমি কি বলো, জান ত একটা প্রস্তাব হয়েছিল—

—ও! তাই বলো, এত হেঁয়ালি কেন, আমি কয়লার ব্যবসাদার। শোন শেখর, আমার পুত্রটি পিতৃপোষিত কিন্তু মাতৃশাসিত, পরে স্ত্রী-চালিত হবেন বুঝতে পারছি। তা এ ত আমার কয়লার ডিপার্টমেণ্ট্ নয়।

রাধারমণ উচ্চহাস্য ক'রে হাঁক দিল, এই কোন্ হ্যায়?

উর্দিপরা খানসামা সেলাম ক'রে দাঁড়াল।

—ও তুমি, তুমি হবে না, তোমার প্রবেশ নিষেধ, বেহারা কোথায়?

গেঞ্জি গায়ে গজানন ছুটে এল, এঁজ্ঞে, গড়গড়া আনব?

—না, না, গড়গড়া নয়, মা-জীকে সেলাম দাও, বলো, শেখর সাহেব, আর সিগারের বাক্সটা দে—

শেখর ব্যস্তভাবে বললে, উঁাকে এখানে আনা কেন, আমি ভেতরে যাচ্ছি।

রাধারমণ হেসে উঠল—না হে, এখানে নয়, একটা মাঝামাঝি ঘর রেখেছি, no man's land, সেখানে দুই মহলের negotiations হয়।

মাথা চুলকে গজানন বললে, এঁজ্ঞে মা ত বাহিরে গেলেন।

—বাহিরে? কোথায়?

—আজ্ঞা তা ত ব'লে গেলেন না।

—সঙ্গে কে গেল, কোন্ ড্রাইভার—দরওয়ানকো বোলাও।

বুড়ো দরোয়ান শুধু দ্বারপাল নয়, পরিবারের সাংবাদিকও বটে, সকলের চলাচল আনাগোনার খবর বিভাগের কর্ত্তা।

আজ্ঞা দরওয়ান রুটি সেঁকছে। মায়ের সঙ্গে দাদাবাবু গেলেন, আর এক দিদিমণি, এনার মেয়ে। ড্রাইভারকে বললেন, 'কালকাটা সিনেমা চলো'।

—আচ্ছা', যা তুই। শুনলে ত শেখর, এখন হুইস্কি বলি।

চঞ্চলভাবে শেখর বললে, সিনেমা গেছেন? দেরী হবে?

—সিনেমা নয় হে,—ওই সিনেমার গলিতে তাঁর গুরু থাকেন। নাম শোন নি, নিত্যানন্দ স্বামী!

গালপাট্টা দাড়ি দরওয়ান পাগড়ী বাঁধতে বাঁধতে হাজির হল, নিম্নস্বরে বললে, মা-জী ত গুরুজীর বাড়ী গেছেন।

রাধারমণ উৎসুক হয়ে চাইলে।

দরওয়ান ব'লে যেতে লাগল, গুরুজী আজ সকালে এসেছিলেন, দুপুরে দু'বার টেলিফোনে না পেয়ে দাদাবাবু দিদিমণিকে নিয়ে আসেন, তাঁরা সবাই মাতাজীর সঙ্গে গেছেন, সঙ্গে ফুল চন্দন ও সন্দেশ ছিল।

রাধারমণ তাকিয়া ঠেলে উঠে বসল,—ব্যস্ চন্দ্রশেখর, তোমার কেস ফতে!

—তাহলে তোমার মত আছে।

যুক্তকর মাথায় ঠেকিয়ে রাধারমণ উচ্ছ্বসিত ভাবে ব'লে উঠল,—আমার মত! জয় বাবা নিত্যানন্দ গুরুজী! কদিন ধ'রে দেখছি যাওয়া-আসা চলছে, একবার খোকাকে একবার তোমার মেয়েকে নিয়ে গেলেন, আজ যখন দু'জনকেই নিয়ে গেছেন, আশীর্ব্বাদ মিলে গেছে, এসো, আলিঙ্গন করি।

ফরাস থেকে উঠে রাধারমণ শেখরের পাশে ইজিচেয়ারে বসল, দুই বোহেমিয়ান গেলাসে ককটেল ভরলে, কাচের সঙ্গে কাচের ঘর্ষণে সোনালী সুধা টলমল ক'রে উঠল, দুজনে একসঙ্গে গেলাস শূন্য করলে।

—তোমাকেও গুরুজীর কাছে নিয়ে যেতুম, আমারও একটা-আশীর্ব্বাদ চাই, একটা বড় কন্ট্রাক্ট পাচ্ছি, কিন্তু এখন এক কাপ্তেন সাহেবকে আসতে বলেছি, বাঙ্গালী কাপ্তেন নয় হে, জাহাজের কাপ্তেন, নরওয়েজিয়ান, আমার চেয়েও এক ফুট লম্বা, ভাবছি তাকেই নিয়ে যাই গুরুজীর কাছে, আশীর্ব্বাদ চাই!

—তুমিও কি গুরুতে বিশ্বাস করো, গুরুপূজা!

—দেখ শেখরচন্দ্র, কি বিশ্বাস করি, কি বিশ্বাস করি না এসব চিন্তা আর কেন, এসব প্রশ্নের কে উত্তর দিতে পারে? কথা হচ্ছে objective কি? কি উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হবে। তুমি ত জানো, বাবা মারা গেলেন, ভাঙা বাড়ী, মর্টগেজ-দেওয়া কয়লার খনি রেখে, আর ছেলের বিয়ে দিয়ে, দু'মেয়ের বিবাহ না দিয়ে। কলেজ ছেড়ে ব্যবসায়ে লাগলুম, objective হল—দেনা শোধ, বাড়ী মেরামত, আর একটা খনি, বোনেদের বিয়ে, তার সঙ্গে স্ত্রীর মনোরঞ্জন—তার জন্যে যেখানে পূজা দেওয়া দরকার, যেখানে ঘুস দেওয়া দরকার, যা বিশ্বাস করা দরকার, সব করেছি। সব সময় যে এক দেবীর এক গুরুর পূজা করেছি তা নয়, যাঁকে পূজা করি তিনি যদি আর ফল দিতে না পারেন, ছেড়ে দিতে হবে, নূতন ফলদাতা দেবতাকে পূজা করতে হবে, সে জন্যই হিন্দুদের এতগুলি দেবদেবী, এই হচ্ছে বেঁচে থাকার ধর্ম্ম।

—কিন্তু এই কি জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ?

—ও সব বড় কথা ব'লো না। নাও, এ মিশ্রণটা কেমন হল চাখো দেখি। এখন objective হচ্ছে কাপ্তেন সাহেবকে খুশী করা, তার জন্যে যা বিশ্বাস করতে হয় করব, ভাল দেখে একটা তৈরি কর দেখি, খানসামা একঠো ককটেল-শেকার লে আও।

উৎসাহের সঙ্গে শেখর বললে, দাও, একটা নতুন recipe মনে পড়ল।

এক রকম নয়, চার রকম ককটেল তৈরি হল, স্বাদ-পরীক্ষা হল। পঞ্চম গেলাসের পর শেখর আর স্থির ব'সে থাকতে পারছে না। তার দেহের সব অবসাদ যেমন দূর হয়ে গেছে, তেমনি মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করছে। কেবলমাত্র রাধারমণের এই পানতপ্ত বৈঠকখানা হতে নয়, ধনমত্ত বণিক্-জীবনের সকল পরিবেশ হতে সে নিষ্ক্রমণ চায়, শুধু বিরক্তিকর নয়, সব বিতৃষ্ণাময়।

—আরে বোস বোস, এঁরা এলেন বলে।

—না, রাধারমণ, থ্যাঙ্ক্‌স্‌ থ্যাঙ্ক্‌স্‌। গুড-নাইট!

অনুরোধে আবার ব'সে পড়ার ভয়ে শেখর অর্দ্ধপূর্ণ গেলাস হাতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

তার চ'লে-যাবার ভঙ্গী লক্ষ্য ক'রে রাধারমণ ব'লে উঠল, সোফারকে দেব নাকি সঙ্গে।

শেখর ফিরে চাইলে না; উচ্চস্বরে বললে, না, না, কোন দরকার নেই, আমি খুব clear দেখতে পাচ্ছি।

বস্তুতঃ মত্তাবেশে নয়, চঞ্চল কোন সুখাবেগে তার দেহমন উদ্বেলিত মনে হল, চারিদিক্ বড় হাল্কা মনে হচ্ছে, যেন কোন দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে।

মন্দ্রকণ্ঠে রাধারমণ বললে, এদিকে টলছ যে, দাঁড়াও, ড্রাইভারকে ডাকি, গাড়ী চালিয়ে যাবে।

শেখর ঘুরে দাঁড়াল, বোহেমিয়ান গেলাসে মদিরা ছলক দিয়ে উঠল, ব্যঙ্গ-স্বরে সে বললে, দেখ রাধারমণ, আমার জীবন আমি নিজেই চালাই, কোন গুরু-ড্রাইভারের দরকার হয় না।

রাধারমণ মৃদু হেসে উঠল, হা, হা, আজকাল দেখছি সে শেখরচন্দ্র নেই, আরে ব্রাদার চেপে বোস, হবু বেয়ানের সঙ্গে দেখাটা ক'রে যাও বলছি, ড্রাইভার দেব সঙ্গে, একটা accident হলে—

শেখর দীপ্তকণ্ঠে ব'লে উঠল, accident! দেখ রাধা! আমার গাড়ী আমি নিজেই চালাই, গাড়ী যদি খানায় পড়ে নিজে চালিয়েই পড়ব, কোন ড্রাইভার চালিয়ে নয়—আমি খুব clear দেখতে পাচ্ছি।

বেগে সে দরজার কাছে এগিয়ে থামল।

স্ফটিকশুভ্র পেয়ালা কে যেন হাত হতে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

কাঁচের টুকরা-মেশানো মদিরাধারার বর্ণস্রোত শ্বেতমর্ম্মরে ঝিকিমিকি ক'রে উঠল, অভ্র-আবীরের আলপনার মত।

পেছনে হাস্যোচ্ছ্বাসে বৈঠকখানা ঘর প্রতিধ্বনিত হল।

শেখর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। সেই পাগলাটা আবার অট্টহাস্য ক'রে উঠল নাকি! তার সুধাপাত্র খান্ খান্ ক'রে ভেঙে দিলে।

বেগে সে আবার রাধারমণের কাছে এগিয়ে তার হাস্যোচ্ছ্বাসদীপ্ত মুখের কাছে নত হয়ে বললে, দেখ রাধারমণ, এ পরিণয় হবে না, এ বিবাহে আমার মত নেই, মত নেই।

রাধারমণ আরও উচ্চস্বরে হাস্য করলে, মত নেই? হা, হা, মত নেই তোমার? মত দেবার অবস্থা আছে নাকি? দেখ গুরুজী মত দিয়েছেন। তোমার মত? আরে ব্রাদার স্থির হয়ে বোস, objective ভুলে যাচ্ছ, এখন objective হচ্ছে আমার পুত্রের সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহ—

শেখর যেন আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, objective! আমি clear দেখতে পাচ্ছি, তোমার এই চার মহল বাড়ীর আর এক মহল বাড়বে, কিন্তু জীবনের কোন্ মহল গড়বে, কোন্ আদর্শ পূর্ণ হবে, সে কি খোলা আকাশে নীড় হবে না নিগড়!

—ওই বোধ হয় ওঁরা এলেন, উত্তরটা তোমার বেয়ানের মুখে শুনে যাও, অথবা মেয়ের মুখে।

শেখর চঞ্চল ভীত ভাবে বললে, না, না, আমি চললুম।

বেগে সে বাহির হয়ে গেল পলাতকের মত।

চালনচক্র ধ'রে চন্দ্রশেখর বসল বটে, কিন্তু মনে হল কে যেন চঞ্চলবেগে তাহার গাড়ী চালিয়ে নিয়ে চলেছে; এক কালোছায়া তার পাশে ব'সে, তারই অঙ্গুলিনির্দ্দেশে গাড়ী থামছে, চলছে, গতিমন্দ করছে। গাড়ীর ভিতর সে চাইলে, কণ্টুইভ ক্যাকেটটি অন্ধকারে ন'ড়ে উঠল।

কখনও স্তিমিতালোকিত বক্র সঙ্কীর্ণ গলি, কখনও বৈদ্যুতিক দীপমালাদীপ্ত প্রশস্ত রাজপথ, কখনও রুদ্ধদ্বার অন্ধকার বাড়ীর সারি, কখনও নিওনালোকোজ্জ্বল কোলাহলমুখর বিপণিশ্রেণী। কোথাও উত্তেজিত জনতা পথরোধ ক'রে, কোথাও মত্ত পথচারী কটূক্তি ক'রে ওঠে, কোথাও ছায়াচিত্রগৃহের রক্তনীল আলোকস্তম্ভের ঝলমলানি, কোথাও বস্তি-গলীর নিভৃত কোণে বিলাসিনীর হাতছানি—এ যেন কোন অদ্ভুত অজানা নগরে অদৃষ্টনিয়তি-চালিত হয়ে সে পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

কখনও ব্যাকাডাম চেপে কখনও বা ফুটপাথ ছুঁয়ে বা শূন্যে লাফিয়ে ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে যাত্রীবাসের পাশ ঘেঁষে রিক্‌শর ধার দিয়ে কোন্ সারথি তার পেট্রলরথ চালিয়ে নিয়ে এল—কোন accident ত হল না!

প্রার্থনা করি, আমায় সময় দাও।

উদ্বেলিত অন্তরে শেখর শয়নগৃহে প্রবেশ করলে, যেন কোন অপরিচিত কক্ষ, রহস্যঘন স্তব্ধতাময়।

গগন-গবাক্ষ হতে চন্দ্রকরধারা ঝ'রে পড়ছে, গৃহের তিমির-পটে কোথাও আলপনা আঁকছে, কোথাও রজত-ফলকের মত অন্ধকার খান্ খান্ করছে, কিন্তু অন্ধকার দূর করতে পারছে না; শুধু মলিনবর্ণ ষোড়শলুই চেয়ারে, ইন্দুমতীর পীত তৈলচিত্রে, অরুণার জলরঙের আলেখ্যে, আসবাবের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে কে যেন মুঠা মুঠা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিয়েছে।

পরিশ্রান্ত শেখর চিপেনডেল আরামকেদারায় বিহ্বলভাবে অজানা বিস্ময়ে বসল। ছায়াচিত্রখচিত ঘরটি থম্ থম্ করছে, কারা যেন তার প্রতীক্ষায় নীরব ব'সে, গাড়ীর সেই কালো মূর্ত্তি কি এখানে জ্যোতির্ম্ময়ী ছদ্মবেশে সামনের চেয়ারে এসে বসল! শুকতারার মত তার করুণোজ্জ্বল চাউনি। নিস্তব্ধ শুভ্রতা। শেখর শিউরে উঠল।

সময় হয়েছে! এখন যেতে হবে!

তারালোকবর্ণার দিকে স্থির চেয়ে শেখর আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠল, সময়! হয়েছে! এখনি! সাত মাস কেটে গেল! জানি আমায় সাত মাস সময় দিয়েছিলে, আমি হিসাব রাখি নি, তোমার কালের হিসাব কি নির্ভুল? কি বল, কথা কও।

শুকতারাবরণী যেন অসীম নৈঃশব্দ্যে নির্ব্বাক।

অনুরোধের সুরে শেখর ব'লে উঠল, আমার যে আরও সময় চাই। এমন অতর্কিতে এমন আচম্বিতে এমন অসময়ে তুমি আস কেন? আরও সময় দিতে হবে।

কি বলছ তুমি: যিনি যম, যিনি অমোঘ শাশ্বত নিয়ম, তুমি তাঁরই দণ্ডধর, বিশ্বজগৎ নিয়মবিধৃত, মহাকালের নিয়ম ব্যতিক্রম হবে না।

প্রার্থনা করি, আমায় সময় দাও, তুমি জান, আমার কন্যার বিবাহ স্থির হয়েছে, আমার বাড়ীর পার্টিশন এখনও শেষ হয় নি, ডাক্তার আশ্বাস দিচ্ছেন আমার স্ত্রী শীঘ্রই সুস্থা হবেন—

কি বলছ তুমি: গতবারও আমি এই কথাই ব'লে সময় চেয়েছিলুম, তুমি সময় দিয়েছিলে, বলেছিলে, এখনি কোরামিন খাও। এখনও যে আমার কোন কাজ শেষ হয় নি—তোমায় প্রশ্ন করি, আমার স্ত্রী স্মৃতিহীনা, আমার কন্যার বিবাহে বাধা, আমার জীবনযন্ত্রের তার বার বার কেটে যায়—সে কি আমার দোষ? অনন্ত নিশীথগগনের মত নিরুত্তর তুমি!

না, না, ক্রুদ্ধা হয়ো না, দয়া কর, দয়া কর, আমার কন্যার পরিণয় সমাধা করতে দাও, বাড়ীর অংশ বেচে নূতন বাড়ী করব, সুস্থা স্ত্রীর হাতে সংসারের চাবি দিয়ে যাব—এইটুকু সময় দাও, আর অসমাপ্ত ছবিগুলি আঁকা শেষ করতে হবে, তার পর আমি প্রস্তুত, যাব তোমার সঙ্গে—তোমার পোর্ট্রেটও এঁকে যাব—তিমির-ছায়া নয়, এমনি হিরণ্যবরণী মায়া—এইটুকু সময় দাও।

হায়, উত্তর দাও। বল কার কাছে প্রার্থনা করতে হবে—পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, না সংহারকর্ত্তা রুদ্র, দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, না নরমুণ্ডমালিনী কালী বা দয়াময়ী মেরীমাতা, যে দেবতা যে দেবীর কাছে বল প্রার্থনা করতে, নতজানু হয়ে প্রার্থনা করব, সময় দাও, আরও জীবন দাও—

এ কি বলছ তুমি! আমাকে উপহাস ক'রে কি বলছ, কেন, তুমি ত দিবসব্যাপী এষণায় পালাবার পথ খুঁজেছ, জীবনব্যূহে রিপুদলের বাণজর্জ্জরিত হয়ে নিষ্ক্রমণের দিশা চেয়েছ। তুমি ত সুপ্তস্মৃতি পরিণীতার কাছ হতে বেদনার ঘৃণায় চ'লে এসেছ, আনন্দগানের সুর শোন নি, অলীক লজ্জাকে ব্যঙ্গ ক'রে বেহালার তার কেটেছ, যৌবনের সুখস্মৃতিশালায় পেয়েছ শুধু জ্বালা, পাগলের অট্টহাস্যের ভয়ে অরুণার ফ্ল্যাট হতে পালিয়ে এসেছ, সুধার পাত্র খান্ খান্ ক'রে ভেঙে নিশীথনগরীতে প্রেমভাবস্থায় চালকহীন বাহির হয়েছ—তুমি ত চেয়েছ মৃত্যু, এ ক্ষুব্ধ জীবনের বেদনা বিদ্বেষ ব্যঙ্গ ব্যর্থতা হতে অপসরণ। এস আমার সঙ্গে, নবলোকে নিয়ে যাব, নবজন্মে, ভয় কিসের?

যাব, যাব মৃত্যু, যাব তোমার সঙ্গে, শঙ্কা নয়, সন্দেহ জাগে।

একবার ওই ঘনরহস্যযবনিকা তুলে দেখাতে পার কেমন সে দেশ! সেখানে ত প্রেমপরিণীতার স্মৃতিবিভ্রম হয় না, সেখানে ত বেহালার সুরে সুখস্মৃতি জেগে ওঠে, তার ছিঁড়ে যায় না? সেখানেও কি প্রভাতের শুভ্র আলোয় কামনায় অর্থের সন্ধানে বাসে মোটরকারে গাদাগাদি হয়ে অফিসে আদালতে বাজারে কারখানায় ছুটতে হবে আর ধূমমলিন সন্ধ্যার রক্তছায়ায় ধুঁকতে ধুঁকতে সমস্যাসঙ্কুল গৃহে ফিরতে হবে?

শুনেছি সেখানে চিরসৌন্দর্য্যময়ী উর্ব্বশীর নৃত্যশিঞ্জিনীর ছন্দে কালের চক্র আবর্ত্তিত, নন্দনবনের পারিজাত চির-অম্লান—সেখানে কি ঋতুতে ঋতুতে নূতন ফুল নূতন ফলের ফসল হয়? সে দেশ কি সূর্য্যমণ্ডল ছাড়িয়ে নীহারিকাপুঞ্জ পার হয়ে অনন্ত জ্যোতিঃলোক অথবা অন্ধকার মহার্ণব?

বৃথা প্রশ্ন ক'রে চলেছি, তুমি নিরুত্তর, সে মহারহস্য জানতে হলে তোমার সঙ্গে যেতে হবে, কোন খবর দেবে না। জানি।

তাহলে আর একটু সময় দাও। তুমি কি শুধু আমার বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা দেখলে—কিন্তু আমি যে মর্ত্ত্যলোক ভালবাসি, এদের ভালবেসেছি, সে জন্যই এত বেদনাভার, এ অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণা শুধু আত্মসুখসন্ধান নয়, এ আত্ম-নিবেদন—আমার যে কাজ বাকি। অনন্তকাল তোমায় দেব, আমায় একটু মর্ত্ত্য-জীবনকাল দাও, তার পর মৃত্যু-রূপিণী, তোমাকে সঙ্গিনী ক'রে অনন্তকালসমুদ্রে পাড়ি দেব।

নীহারিকাবরণী মূর্ত্তি উল্কার মত জলজল চোখে শেখরের দিকে চাইলে, শেখরের চোখে ধাঁধা লাগল, আতঙ্কে সে শিউরে উঠল, সে দৃষ্টি শূলবেদনার মত তার বুকে বিঁধল। সে আলোকবর্ণা ঘনকালো ছায়া হয়ে গেছে।

আর্ত্তনাদ ক'রে শেখর কালো কার্পেটে লুটিয়ে পড়ল। বিজন গৃহান্ধকারে শুধু দীর্ঘ কাতর-শ্বাস, আর কোন ব্যথিত বাক্যোচ্ছ্বাস নেই।

বাহিরে নিশীথাকাশে কালোমেঘের স্তূপে চন্দ্রমা অবলুপ্ত।

এখন আপনি কি চান?

আমার বন্ধু শেখরের বিপর্য্যস্ত জীবনের একটি দিবসের এষণার কাহিনী আপনাদের বলেছি।

আপনি হয়ত বলবেন, এ বাসনাবিপর্য্যস্ত মর্ত্ত্যজীবন আর দীর্ঘতর ক'রে কি হবে, কয়েক মাস সময় হয়ত পাওয়া যাবে, কন্যার পরিণয় সম্পন্ন হতে পারে, প্রপিতামহের প্রাসাদ বিভাগ বা বণ্টনের কোন সম্ভাবনা নেই, সারাক্ষণ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় জীবনতৃষ্ণা ভোগকামনা আরও তীব্র আরও বেদনাময় জ্বালাময় হয়ে উঠবে।

কিন্তু এঁরা আপত্তি করছেন; বলছেন, আমরা রাজী নই, লড়তে হবে মৃত্যুর সঙ্গে, আরও ছ'মাস যদি সময় পাই, মেয়ের বিবাহ ত হতে পারে, অবিভক্ত অংশের খরিদ্দার আমরা ঠিক ক'রে দেব, নূতন বাড়ী চার মাসে ক'রে দেবে এমন কন্ট্রাক্টার আমাদের জানা আছে; অন্ততঃ সাত ঋতুর পুষ্পদলের অসমাপ্ত ছবিটি আঁকা শেষ হোক, অন্তলোকে এ সব ফুল আছে কিনা কে জানে।

দলেতে এঁরা ভারি, এখন ডেমক্রেসীর যুগে সংখ্যাগরিষ্ঠের জয় হবে, অন্ততঃ তাঁদের যে জয় হয়েছে তা দেখাতে হবে।

কিন্তু আমি ত আপনাদের ইচ্ছা-পূরণের নিয়ামক নই। যিনি কালের নিয়ন্তা তাঁহারি কালস্রোতে ভাঙন গড়নের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

ডাক্তারী বাহির হয়েছেন ভেষজ নিয়ে, যদি তাঁর গাড়ী পথের গাড়ীর ভিড়ে বা চৌরাস্তার লাল আলোক-

নিমেষে বার বার থামাতে হয়, দেরী হয়ে যেতে পারে, সংজ্ঞাহীন চন্দ্রশেখরের জীবনকালের সঙ্গে তাঁর আবির্ভাবের কালের মিলন না হলেই মুশকিল।

পরম ধৈর্য্যে প্রতীক্ষা করুন।

রাধারমণ-গৃহিণী যখন গুরুজীর বাড়ী পৌঁছালেন তখন গুরুজী শ্বেতমর্ম্মরের নিভৃত গৃহে ধ্যানে বসেছেন, দ্বার রুদ্ধ, কাহারও ডাকবার বা খোলবার আদেশ নেই।

এক প্রহর কেটে গেল।

আশীর্ব্বাদভিক্ষার্থিনী ভক্তিমতী নতজানু হয়ে বদ্ধদ্বারের চতুষ্কাঠে বার বার প্রণাম করতে লাগলেন।

দুয়ার খুলে গেল, গন্ধধূপের ধোঁয়ার মধ্যে এক শ্বেতোজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশিত হ'ল।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভক্তিমতী গুরুজীর সজ্জার দিকে অবাক্ হয়ে চাইলেন। সোনালী সিল্কের আলখাল্লা নেই, সবুজ পাড় মোটা মিলের ধুতি, গলা-খোলা বোতাম-ছেঁড়া টুইলের সার্ট, মাথায় টেরী কাটা, যেন কলেজের নবীন ছাত্র।

বাবা আমরা এসেছি, আশীর্ব্বাদ করুন!

কন্যার মুখের দিকে চেয়ে গুরুজীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, একটু চমকে বললেন, তুমি! তুমি ত চন্দ্রশেখরের কন্যা, তোমার বাবা কোথায়? এখন কোথায়?

ভীতভাবে কন্যা উত্তর দিলে, জানি না ত, সকালে বাহির হয়েছেন, আমাকে খুঁজতেই বাহির হয়েছিলেন, অথচ আমি বাড়ীতেই ছিলুম—বোধ হয় বাড়ীতেই ফিরেছেন।

চক্ষু মুদিত ক'রে গুরুজী স্তব্ধ দাঁড়ালেন তারপর ব্যস্তভাবে ব'লে উঠলেন, হ্যাঁ, বাড়ীতে ফিরেছে, বাড়ীতে, চলো, চলো, শীগগির, গাড়ী আছে ত—আর আমার ঔষধের বাক্সটা নাও, ও হোমিওপ্যাথিক গোলাগুলি নয়, হিমালয়ের শিকড়পাতার ঝুলিটা,—গাড়ী আছে, চলো শীগগির, আমি ঔষধ দিতে পারি কিন্তু করালকালস্রোত রুদ্ধ করতে পারি না।

কে যেন দুই চোখের পাতা টেনে খুলে দিলে। শেখর চোখ মেলে চাইলে।

আলো! আলো! চারিদিকে কি তীব্র অগ্নিপ্রভ আলোকধারা! এ আলোকবন্যায় দুই চোখ কোন্ অতলে ডুবে যাবে।

এই কি জ্যোতির্লোক! সে জ্যোতির্ম্ময়ী মায়া কোথায়!

কানের কাছে কে মৃদুস্বরে বললে, স্থির হয়ে শুয়ে থাকো, ওঠবার চেষ্টা ক'রো না।

কেন? স্বর্গে কি সকলে সারাক্ষণ শুয়ে থাকে! সে যে চলতে চায়।

আলোকমণ্ডল হতে এক ভুলে-যাওয়া চেনা-চেনা মুখ ফুটে উঠল, কোন হারানো-যৌবনে দেখা!

কে হাসির সুরে ডাকলে—শেখরচাঁদ! শেখরচাঁদ!

উজ্জ্বল যৌবনের ওপার হতে সে আহ্বানধ্বনি ভেসে আসছে!

কে? নিতাই মনে হচ্ছে! নিতাই! তুমি কি আমার আগে এ লোকে এসেছ, যাক, অজানা দেশে পুরাণো বন্ধু পাওয়া গেল—অমন হাসছ কেন, কথা বলো, এদেশে কি শুধু হাসি—শোন নিতাই, কলেজে তোমার অনেক প্রক্সি দিয়েছি, অমন হেসো না, তুমি কয়েক মাসের জন্যে এখানে আমার প্রক্সি দিতে পারবে? কে হাসে! সেই পাগ্‌লাটা বুঝি আবার হেসে উঠল—আমি আর শুয়ে থাকতে পারব না।

শঙ্কিতকণ্ঠে কন্যা ব'লে উঠল, বাবা! বাবা! চুপ ক'রে শোও, কি যা তা বলছ, ইনি গুরুজী, আমাদের গুরুজী, তোমায় বাঁচালেন।

শেখর হাস্য ক'রে উঠল, আরে তুইও এখানে, এখানে এসেছিস, তাই খুঁজে পাচ্ছিলুম না।

—আসব না! এই ত আমাদের বাড়ী, আমাদের ঘর, আমি ত বাড়ীতেই ছিলুম, দেখ, সব আলো জ্বালিয়ে দিয়েছি।

ও ! এ কি ! আমি আমাদের সেই পুরোনো ঘরে শুয়ে আছি, আমি ভাবছিলুম—আরে নিতাই, না, না, নিত্যানন্দ গুরুজী, এ কোন্‌টা অলীক কোন্‌টা সত্য—হা ! হা ! সেই পাগলটা আবার হাসছে।

উচ্চহাস্যে শেখর ওঠবার চেষ্টা করল। একটি বিষপত্র গুরুজী শেখরের মুখে দিলেন। দোদুল্যমান ঝাড়লণ্ঠনগুলির বেলোয়ারী কাচের প্রখর প্রভা সে আর সহ্য করতে পারল না।

শান্ত হয়ে শেখর আবার চোখ বুজলে।

কোন্‌টা অলীক কোন্‌টা সত্য ? সে পাগলটা আবার হাসছে।

পরদিন প্রভাতে শেখরের স্বাস্থ্যসংবাদ নিতে বাহির হলুম।

সেই চতুষ্কোণ, কলিকাতা কর্পোরেশনের অযত্নরক্ষিত স্কোয়ার, ঘাস-ওঠা, রেলিং-ভাঙা, অর্দ্ধেক রেলিং চুরি গেছে।

শেখর আমার দিকেই এগিয়ে আসছে, পরণে বার্মাসিল্কের ঘনসবুজ লুঙি, গায়ে রাত্রিবেশের সাদা-কালো ডোরা-কাটা কোট, নয়নে সদ্যজাগরণের জড়তা, যেন স্বপ্নঘোরে চঞ্চলপদে এগিয়ে আসছে।

আমাকে দেখে আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠল, হ্যালো বোস্‌, জমি দেখেছ ? একটা জমি !

—জমি ! আজ কি জমি হারিয়েছে, জমির অন্বেষণে বাহির হয়েছ ?

—হ্যাঁ, একটি জমি চাই, নতুন বাড়ী তৈরি করতে হবে, এসো আমার সঙ্গে, পরামর্শ আছে।

তেতলায় শেখরের ঘরে প্রবেশ করলুম। প্রভাতের আলোয় চারিদিক ঝিলমিল করছে, ঝাড়ের কাচে, ছবিগুলির সোনালী ফ্রেমে, দীর্ঘ দর্পণশ্রেণীর শুভ্রতায়, খাটের বাজুতে, ষোড়শলুই চেয়ারে, বৈদ্যুতিক গোল ঘড়ির কাঁটায় আলোকধারা ঝিকমিক করছে, তাহারি আনন্দ আভা শেখরের দীপ্তচোখে, শুধু যুগলপরীধৃত অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী ঘড়িটি অতুচ্ছ পরিহাসের মত অচল।

সিগারেটের টিনের সঙ্গে পকেট হতে কয়েকটি কাগজ বাহির ক'রে শেখর আমার দিকে ছুঁড়ে দিলে,—আও, পড়, চার দালালের চিঠি, নিউ পার্কে, আলিপুরে, তালপুকুরে, ব্যারাকপুরে, সব জমি আছে।

—প্রপিতামহদের গোবিন্দপুরে বুঝি জমি পাওয়া যাবে না !

—না, আর গোবিন্দপুরে নয়।

রূপার কফিদান হতে কফি ঢালতে ঢালতে কন্যা ব'লে উঠল, বাবা, ডাক্তার ঘোষ টেলিফোন করেছেন, তোমাকে আজ বেহালা নিয়ে যেতে, মা কাল নাকি কয়েকটা কথা কয়েছেন। আমি কিন্তু যেতে পারব না, গুরুজীর কাছে যেতে হবে।

শেখর চঞ্চলভাবে ব'লে উঠল, আচ্ছা, বুঝেছি, যাও তুমি। শোন বোস্‌, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, আমাকে ? কিসের সন্ধানে ?

—হ্যাঁ, দালালদের সঙ্গে আমি দরাদরি করতে পারব না জানো, আর বেহালার নতুন সব তার কিনতে হবে। বোস বোস্‌, আজ শুধু কফি নয়।

স্ফটিকের যুগল পেয়ালায় চঞ্চল ঘর্ষণে রাইনজলধারাপুষ্ট দ্রাক্ষারস টলমল ক'রে ঝলকে উঠল।

শেখরের রং-চটা পৈতৃক মোটরগাড়ীতে তার পাশে বসলুম, আবেগের সঙ্গে সে চালনচক্র ধ'রে এক্সিলারেটরে পদপেষণ করলে, চৌমাথার লাল আলোর নিষেধ মানলে না। কালরেখাঙ্কিত আননে দুই নয়ন চিরতৃষ্ণাদীপ্ত। আবার এক নবদিবসব্যাপী অন্বেষণ শুরু হ'ল।

হায় ! এ এষণার শেষ কোথায় !

(এই উপন্যাসের সকল নরনারীচরিত্র ও ঘটনাবলী কাল্পনিক ও অমূলক।)

উপহার লিপিকা

শ্রীনিশিকান্ত

প্রাণাধিকাসু

প্রিয়তমা দিদিমণি শম্পা,
আমায় করিয়ো অনুকম্পা !
পত্র লাভের লাগি'
আমি তব অনুরাগী !
লিপিকা-লেখার মালা খুলো না,
প্রবাসী প্রমাতামহে তোমার কুশল দিতে ভুলো না।

এখানে এসেই ফিরে গিয়েছো ;
গিয়েই যে-ক'টি চিঠি দিয়েছো,
তার প্রতি অক্ষরে
মর্মের মধু ঝরে,
প্রাণের সুবাস আসে ছুটিয়া,
বাংলা দেশের কোন্ কিশোরী-কুসুম ওঠে ফুটিয়া !

বঙ্গে এখনো আছে গ্রীষ্ম,
তুমি চাও বর্ষার দৃশ্য ;
এখানে গ্রীষ্মাদপি
দীপনের দিন লভি
প্রখর আদর্শের সবিতায়,
তীব্র তপস্যার সূর্য্যমুখীরে আনি কবিতায়।

সজল জলদে আমি ভাসি না,
সিক্ত মালতী ভালোবাসি না !
তুমি যে বাদল-নিয়ে-
-রচনা চেয়েছো প্রিয়ে,
আমি সে-পত্র পাঠ করিয়া
পারিনি জবাব দিতে কোনো নবজলধরে ধরিয়া !

তাই কি হয়েছো তুমি রুষ্ট ?
কী ক'রে তোমায় সন্তুষ্ট
করা যায়, তাই ভেবে
বুঝি বা যাবোই ক্ষেপে,
মনে মোর জল-ঘোর ঘনাবো,
মুখর-শ্রবণে তব শ্রাবণের সঙ্গীত শোনাবো !—

কেমনে শোনাবো হায়-হায় গো,
হাসি পায়, কান্নাও পায় গো !
এই কবি অভাজন
ঋতু-অভিনন্দন
করেনি কখনো কোনো ছন্দে,
হয়নি আপন-ভোলা বর্ষায়-শরতে বসন্তে।

মেঘে রচে না তো মেঘপুঞ্জ ;
বুঝেছো আমার কথা, শুনছো ?
সূর্য্যে, মাটির মাঝে
যে চির অনল আছে,
তারি তাপে হয় মেঘ-সৃষ্টি ;
বৃষ্টিধারায় ঝরে জ্যোতিকণা-বিকিরণ-বৃষ্টি।

মেঘ শুধু ছায়া, শুধু বাষ্প,
তবে কেন তাকে ভালোবাসবো ?
'বাদল-বাদল' ক'রে
তুমি যে জ্বালাও মোরে,
আমি সেই জ্বালাতেই জ্বলিয়া
জ্বলার বাদল দেবো, সে-কথা আগেই রাখি বলিয়া।

তোমার জন্ম-ধন-ধাত্রী
নহে বারিবর্ষণ-দাত্রী ;
সে তোমায় এনেছে যে
গ্রীষ্ম-তপন-তেজে
জ্বেলে দিয়ে জ্যৈষ্ঠের বহ্নি ;
সে-দিনের শিশুশিখা তোমাতে হয়েছে আজ তন্বী।

এখন তুমি তো নও বালিকা ;
তবু কেন গাঁথো মেঘ-মালিকা
মোর মনে অবিরত
অবোধ-বালার মত ?
কেন সাধো বাদলের সঙ্গ ?
সখি, তবে তাই হোক ! দেবো নব বাদল-বিভঙ্গ।

২

তোমায় বাদল দিতে পারবো ?
না-পেয়ে তোমার আশা ছাড়বো ?
তোমায় স্মরণ ক'রে
বসেছি কলম ধ'রে,
করবো তোমার মানভঞ্জন ;
তোমার চলার পথে হবোই তোমার মনোরঞ্জন।

জানি এই নীল খাম খুলবে,
আমার ছন্দে তুমি দুলবে !
শতেক বর্ষ পরে
কোনো তরুণীর করে
নাই বা রইলো, এই কবিতা
আধুনিকা সুন্দরী সপ্তদশীতে হবে শোভিতা।

তুমি নও ভাবাকুল-লোচনা,
ভূর্জপাতায় গীতরচনা
করোনি তো কোনোদিনই ;
আমি তো তোমায় চিনি
চলন্ত ট্রামে-বাসে-বাইকে ;
এ-কবিতা পাঠ কোরো কলেজে কমনরুমে মাইকে।

বিরহে বিধুর কোনো লগনে
হেরিয়া সজল ঘন গগনে
অধরে মিনতি মাখি'
মেলিয়া করুণ আঁখি
তুমি কারো প্রতীক্ষা করোনি,
বকুলকুঞ্জ পানে নাই তব অভিসার-সরণী।

যেটুকু পেয়েছি তব পরিচয়,
তারি প্রেরণায় আমি করি জয়
কালের মন্থরতা !
বলেছো নিজের কথা :
ভারতীয় সেনাদলে মিশিতে
বালিকা-বয়েস থেকে যোগ দিয়ে আছো 'এন্-সি-সি'-তে।

বাদল বাউল আর নাচে না,
তার একতারা আর বাজে না
তোমার জীবন-মাঝে ;
শোনো ট্রাম্পেট্ বাজে,
শোনো রণ-শঙ্খের আহ্বান,
চলো সমরাঙ্গনে, শক্তিবন্দনায় গাও গান।

বিজনে তটিনীকূলে আসোনি,
অলস বিলাসে জলে ভাসোনি,
সকলের সম্মুখে
ভরা গঙ্গার বুকে
ঝাঁপ দিয়ে সাবলীল ভঙ্গে
তুমি যে পুরস্কার পেয়েছো সন্তরণ-সঙ্ঘে।

বাঁশিতে শুনিয়া সুর পুরবী,
কেতকী-পরাগে তনু সুরভি
কে করেছে অনুরাগে
কত যুগান্ত আগে,
নীপশাখে সোহাগের দোলনা
দোলা দিয়ে কে দুলেছে ? তোমাতে আছে কি সেই ললনা ?

অলকাপুরীর ভরা বরষায়
তুমি নেই, আমি সেই ভরসায়
তোমায় পত্র দেই
কলিকাতা নগরেই,
মিলিটারি ট্রেনিঙের প্রান্তর
যেখানে তোমায় রাখে, যেথা জাগে জীবনে যুগান্তর !

যদি কবি কালিদাস থাকতেন,
তিনি কি তোমার কথা রাখতেন ?
হে সমর-সঙ্গিনী,
তুমি নও বিরহিণী,
আমি নেই বিরহী সে-যক্ষে ;
অনুকূল নহে কাল মেঘদূত রচনার পক্ষে।—

তবু দেখো, হে বাদল-বচনা,
করি নবমেঘদূত রচনা :
নবযুগ-উদয়ের
আলো-ঝরা-বাদলের
ধারায় তোমার সাথে দুলেছি,
তোমায় মানবতায় নতুন হিন্দোলায় তুলেছি।

৩

স্পীডোমিটারের কাঁটা দুলছে,
সীমাবিন্দুতে তার ঝুলছে !
দুলে ওঠে কালো চুল,
কানের সবুজ দুল ;
সালোয়ার-পাঞ্জাবি-উড়্নি
সোনালী সিল্কে দোলে। তুমি কি পাহাড়ে-ঝোরা-ঘূর্ণী ?

ঘুরে ঘুরে ঘুলে ঘুলে উঠ্‌ছো,
মোটর-বাইকে-চ'ড়ে ছুট্‌ছো ;
স্টিয়ারিঙে হাত রেখে
চলেছো ঝড়ের বেগে !
তোমার গতি যে আর থামে না,
শুধুই উপরে ওঠে, পাহাড়তলীর পথে নামে না।

কেউ বলে, "খেয়ালিনী, ফিরে আয়,
সমতলে স্বজনের নীড়ে আয় !
ঐ দুর্গমতায়
দুর্জনে তোকে চায় ;
ঐ পথে কত দুর্বৃত্ত
পান্থের প্রাণ হানে, লুণ্ঠন করে তার বিত্ত।"

কেউ বলে, "ও-যে বীরদর্পে
হানিয়াছে গোক্ষুরসর্পে ;
বুভুক্ষু হায়নারে
হানে গিরিকান্তারে ;
নারীনিগ্রহীদের নিষ্ফল
লালসার সম্মুখে দোলে তার উদ্যত পিস্তল।"

কেউ বলে,—"নির্ঘাত মরবে,
নিজেকে নিজেই খুন করবে !
হঠাৎ যন্ত্রযান
ভেঙে হবে খান খান,
কোনো অসতর্ক মুহূর্তে
ঘটাবে দুর্ঘটনা ! ও-পাশে যখন যাবে ঘুরতে

পর্বত-অঙ্গের ঘর্ষণ
দেবে জীবনান্তিক ধর্ষণ !
এ পাশে গড়ালে হায়
খাদের গভীরতায়
নিমেষেই হবে নিশ্চিহ্ন !"
শোনোনি তাদের কথা ; আছ তুমি অচলে অভিন্ন।

মোড়ে মোড়ে লেখা আছে, ডেন্‌জার,
তবু তুমি চাও এ্যাড্‌ভেঞ্চার !
ঊর্ধ্বে অসীমাকাশ
দেয় না তো আশ্বাস,
মধ্যদিনের মার্তণ্ড
তোমার রৌদ্রানলে পরশিয়া হয় যে প্রচণ্ড।

আমি দেখি, তুমি নিঃশঙ্কায়
চলেছো করাল গিরিকন্দরায় !
বিশাল বৃত্তাকার
অজগর-পাঁয়ায়
কুণ্ডলী পাকে পাকে যুক্ত
বিপদের বাঁকে বাঁকে তুমি দুর্দম, তুমি মুক্ত।

কে বলে তোমায় দিক্‌-ভ্রান্ত !
উদয় শৈল শিখরান্ত
সাধিয়া তোমার মুখে
রঞ্জন লাগে সুখে
নবারুণ-বিকাশের বর্ণে,
শোণিতোচ্ছ্বাসে ঐ কপোলে-কপালে আর কর্ণে

রক্তগোলাপ কত ফুটলো !
প্রতিকুল সমীরণ উঠলো,
ঐ তারি হিল্লোলে
বিজয়-নিশান দোলে
অবদ্ধ কুন্তলরাশিতে ;
শুনি আনন্দ-ধ্বনি মোটরের হর্ণে ও হাসিতে।

এখনো যে সরণী-ভুজঙ্গী
দেখায় ভয়ঙ্কর ভঙ্গি !
এখনো যে অতিকায়
ক্ষুধিত পাষাণ চায়
গ্রাসিতে তোমার তনুলতিকা ;
এখনো সকলে বলে তোমায় উন্মাদিনী পথিকা।

আমি ভাবি, বিঘ্ন-বিচরণে
জন্মদিনে কি তুমি মরণে
হরণ করিতে চাও !
যাও তবে, উঠে যাও ;
দুস্তর বাধা করি' দীর্ণ
তুঙ্গ-শিখর-পারে আপনারে করো উত্তীর্ণ।

আমি বলি, সঙ্কটচারিণী,
তোমার সঙ্গ আমি ছাড়িনি ;
আমি তব বিশ্বাসে
স্পন্দিত নিঃশ্বাসে
নন্দিত হই প্রতি পলকে,
তোমার নয়নে জ্বলি চূড়ান্ত-সন্ধানী-ঝলকে।

৪

মনে কি ভেবেছে ঐ নীলাকাশ
জ্যোতিষ্কদলের লীলাভাস
দেখাবে সুদূর থেকে !
দূরবীক্ষণে দেখে
আমরা হবো না সন্তুপ্ত,
নীলিমা-বিমন্থনে আমাদের গতি হবে দৃপ্ত।

হয়তো এয়ারক্রাশে জ্বলবো !
জলন্ত উল্লাসে বলবো
অনির্বাণের বাণী !
পাবকবতীর পাণি
আমরা পেয়েছি এই মর্ত্তে,
তারি স্পর্শ দেবো বিশ্বের বিকাশ-বিবর্ত্তে।

পাখীর এরোপ্লেনে উড়বো,
সূর্য্যসংক্রমণে ঘুরবো !
মহীয়সী বসুধার
পাবন মৃত্তিকার
এক মুঠো মাটি নিয়ে পকেটে
যাবো শশাঙ্কদেশে শশকে সমুত্থিত রকেটে ;

আমাদের ললাটের পঙ্ক
পাবে চাঁদ, হবে অকলঙ্ক ;
রাহুদংশনে তার
অধর রবে না আর,
কেতুর কবল হবে চূর্ণ,
কৃষ্ণপক্ষ যাবে, পূর্ণিমা হবে সম্পূর্ণ।

যাবো ধরণীর দীপ জ্বালাতে
নিয়তির নীহারিকামালাতে ;
রোহিণীর আরোহণ
লভিবে উদ্দীপন ;
বৃহস্পতির জ্যোতিশ্চক্র
দেবে গতি শুক্রকে, শনি আর হবে না তো বক্র।

অরুন্ধতীর আঁখি-পলকে,
রজতশুভ্র তার অলকে
দুলাবো মুক্তামল
নবদূর্বার দল ;
সপ্তঋষির ধ্যানমগ্ন
নয়নে আমরা হবো নূতন লগনে সংলগ্ন।

আমাদের গতি অবরুদ্ধ
যদি করে, তবে হবে যুদ্ধ
ঐ কালপুরুষের
সঙ্গে ; সমূর্দ্ধের
কারো কাছে পরাজিত হবো না,
কোনো দেব-দানবের তারার প্রভাব-বশে রবো না।

আনন্দে অশ্বিনী আসিয়া
আমাদের সাথে উদ্ভাসিয়া
সব নক্ষত্রকে
দেখাবে, মর্ত্ত্যলোকে
গাঁথি' নব জ্যোতিষ্কমালিকা
অতলে আলোক ঢালে পূর্ব্বাচলের দিগ্বালিকা।

তুমিও, তোমার সখাসখীদের
ঝলকিয়া দিয়ো শুধু চকিতের
অতল-বিচ্ছুরণে !
তোমার জন্ম-খনে
যা' পেয়েছো বিদ্যুৎ-ফণীতে,
তারি সঞ্চার দাও রসাতল-নাগিনীর শোণিতে।

৫

স্থলে-জলে-অম্বরে-পাতালে
আপন প্রভার মদে মাতালে
কেন্দ্রাভিকর্ষিণী
অচলা সৌদামিনী,
তারি প্রশান্ত অবিচলতা
লভিয়াছি অভিযানে, তারি বিভা দিল নির্ম্মলতা।

জীবনের আগে-পরে কী আছে
জানি না তো ; কেহ কি জানিয়াছে ?
আমাদের প্রাণধারা
হয়নি আত্মহারা
পরলোকে সদ্গতি লভিবার
দুরাশায় ; বসুন্ধরার পথে আমাদের অভিসার

সার্থক হ'ল এই জীবনে
নিখিল-সম্মিলন-দীপনে !
যে-আলো, যে-গতি দানে
জগতের কল্যাণে
যোগ দিল বাস্তব বিজ্ঞান,
তারি সাথে মিশায়েছি আমাদের মর্ম্ম-অভিজ্ঞান।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অমানিশার অর্ঘ্য
শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

(প্রবাসী - ১৩৩৮, ভাদ্র হইতে পুনর্মুদ্রিত)

যে-গতি দুর্গতিতে দিতে চায়,
যে-আলোক নিরালোক দিতে চায়,
আমরা শত্রু তার,
তারে হানি অনিবার ;
আসুরিক বিজ্ঞান বীর্য্যে
হোক সে জগৎজয়ী, তবু তার উদ্ধত শির যে

ধুলায় বিলুণ্ঠিত করেছি,
তারি সম্পদরাশি ধরেছি
আমাদের সম্পদে ;
জয়-বৈভব-মদে
আমরা হই না তবু মত্ত,
আমরা সমরে সাধি শাশ্বত-অধিকার-স্বত্ব

দানব-জগদ্দল-হন্ত্রী,
বিশ্বের বার্য্য নিয়ন্ত্রী
পার্থিবতায় আছে ;
আছে আমাদের মাঝে
সেই মহাশক্তির সিন্ধু,
তারি তরঙ্গ তোলে আমাদের রুধিরের বিন্দু।

৬

এখন তোমার প্রতি অঙ্গ
লভিয়াছে অভয়ার সঙ্গ,
কত জন্মের পারে
এ-জন্মে তুমি তারে
পেয়েছো তোমার প্রাণ-শয্যায় ;
জীবন-রণাঙ্গনে বরণ করিয়া তাই রণদায়

কৃপাণ দুলায়ে কটিবন্ধে
দেখা দিলে মর্ত্যদিগন্তে ;
মস্তকে পরিধান
স্বর্ণ-শিরস্ত্রাণ,
লৌহবর্মে তনু সাজালে ;
ভুজ-ভুজঙ্গে তব যুগল পাণির ফণা নাচালে।

সমর-পূর্বদিন স্মরিয়া
ঝটিকার বেগ সংবরিয়া
রাখিয়াছ ! ললাটে কি
কালান্ত-শিখা দেখি,
অধরে ভয়াবহ ছন্দ !
প্রলয়-শর্বরীর ধ্রুবতারা নয়নে অতন্দ্র।

চলো তবে, চলো রণ-রঙ্গে,
আছে প্রলয়ঙ্করী সঙ্গে ;
হে সমর-সজ্জা,
বীর্যে অরিন্দমা,
অশুভ-সংহারিণী-সত্তা,
অত্যাচারীকে হানো, হত্যাকারীকে করো হত্যা ;—

সে যদি করিতে চায় সন্ধি,
তারে তুমি দিয়ো অভিনন্দি'
দিগ্বিজয়ের পথে
মুক্তগতির রথে ;
তারে তুমি করিয়ো না বন্দী,
শুধু খণ্ডিয়ো তার বিনষ্টি-বিকাশের গ্রন্থি।

৭

জাতকে জানাই অভিনন্দন ;
তার দেহরক্ষার ক্রন্দন
করি না, আমরা জানি
আবার সে-সন্ধানী
স্বরূপ অন্বেষণে আসবে,
স্বভাব সন্দীপনে বহ্নির বন্যায় ভাসবে।

বহ্নি বাদল এলো এইবার !
সজল বাদলবেলা নেই আর ;
বিচ্ছেদ-বেদনায়
অশ্রুবাদল চায়,—
যারা চায় বিগলিত অতীতে,
মেলে না তাদের ধারা আমাদের প্রোজ্জ্বল গতিতে।

বহ্নিজলদ হই তপনে,
বহ্নি বিলায়ে ছুটি পবনে !
যে-আদি-অনল হ'তে
ভেসেছি জীবন-স্রোতে,
প্রতি বস্তুতে তারে লভিলাম,
নিবিড় অন্ধকারে উদয়মন্ত্র তার জপিলাম।

তোমার জন্মদিন স্মরিয়া
প্রেরণায় ওঠে প্রাণ ভরিয়া !
বহ্নি বজ্রপাত
লভিয়া অকস্মাৎ
পাই চির বিদ্যুৎজ্যোতিকে !
তোমার স্বভাবে পাই জগদিন্দ্রজয়ের প্রতীককে।

অনেক ব্যাধির শর-শয্যায়
আমি আছি ; অস্থিতে মজ্জায়
তবু অনুভব করি
তড়িতের মঞ্জরী !
এসো তুমি, সে-কুসুম তুলে নাও,
তারি শিখাদলে ছুলি' স্বরূপ-মুকুলে দল খুলে দাও।

৮

তোলো তবে লিফ্‌টের দোলাতে
তোমার সপ্তদশ-তলাতে ;
নব-নির্মিত ঘরে
দ্বার খোলো মোর তরে ;
বলো তো কখন তুমি জালবে
আমার তড়িৎ-শিখা তোমার ইলেক্‌ট্রিক্‌ বাল্‌বে ?

কেউ আমেরিকা যায়, চীনে যায় ;
আমরা আজকে যাবো সিনেমায় ;
সিনেমায় চীন দেখে
ফিরবো রাশিয়া থেকে ;
রূপালি পর্দা হবে হিমালয় ;
অণুবিশ্লেষণের ছবিতেই পাবো যে অসীমালয়।

দেখা দিতে সুদূরের মিত্রে
এসো টেলিভিশনের চিত্রে ;
রেডিয়োতে গান গাও,
বেতারে বার্তা দাও ;
সাগর-গভীরে সংযুক্ত
ডুবারী জাহাজে যাও, তুলে নাও হীরে মণি-মুক্তো।

তাপের অঙ্ক ব্যারোমিটারে
আজ কত ? রৌদ্রে নয়, হিটারে
চাপাও চায়ের জল ;
আত্মীয়ের দল
এসেছে জানাতে শুভাকাঙ্ক্ষা,
বসাও ড্রইংরুমে, খুলে দাও বিজলীর পাখা।

ক্লিক্‌-ক্লিক্‌-শব্দ যে থেমে যায় !
কার ফটো নিলে তুমি ক্যামেরায় ?
মোর শুভ-কামনায়
ক্যামেরাতে কতবার
কার ফটো ওঠে জানো ? রেখে যাও ;
যেথায় তুহিনাতে প্রণয়তার দাগ রেখে যাও।

গ্রামোফোনে ঠুংরী কাহারবা
কে বাজায় ! কিনেছো মিনার্ভা
নতুন মোটরকার ?
তুমি হও ড্রাইভার,
বন্ধু-বান্ধবীরা চড়বো,
তোমার জন্মদিনে নগর প্রদক্ষিণ করবো।

৯

নগরী পরিক্রমা অন্তে
ঘরে ফিরে এসেছি আনন্দে !
ঐ টেবিলে তো নাই
তিল-ধারণের ঠাঁই,
জমে প্রীতি-উপহার-পুঞ্জ ;
হাত-ঘড়ি দেখে বুঝি জন্মদিনের খন গুনছো ?

তোমায় দেবার মত কিছু নেই !
আছি তাই সকলের পিছুতেই ;
সকলে চলিয়া গেলে,
তুমি মোর কাছে এলে ;
আমি বলি, আমি শুধু নিতে চাই,
তোমার জন্মদিনে আমার হৃদয় রঞ্জিতে চাই।

নিতে নিতে ভ'রে যায় চিত্ত,
অঝোরে ঝরে যে তব বিত্ত !
তোমার নির্ঝর-তলে
যাহা পাই, পলে পলে
রাখি মোর কথামালা রচনে ;
হে অনির্বচনীয়া, কতটুকু রাখা যায় বচনে ?

তব সঙ্কেত অনুসরণে
আমি চলি, বিদ্যুৎ-চরণে
আগে আগে তুমি চলো ;
আচম্বিতে কী হ'লো !
এই জ্যৈষ্ঠের বালিগঞ্জে
হঠাৎ আমায় নিয়ে দার্জিলিঙের গিরিমঞ্চে।

শীত-গ্রীষ্মকে হার মানালে !—
এয়ারকন্‌ডিশনে বানালে
প্রাইভেট চেম্বার,
আমায় বসালে তার
ভায়োলেট-কুসুমের দোলাতে ;
যেখানে বিভব-রাশি নিওন্-লাইট-জ্বালা প্রভা-তে

যত দেখি, হই আশ্চর্য।
জীবনের এই ঐশ্বর্য
এতকাল কোথা ছিল!
তোমাতে কি মূর্তিল
আধুনিক বিজ্ঞানধারিণী?
তুমি বিচিত্রা! তুমি নব-নব উদ্ভবকারিণী।

এলে তুমি অঘটন-ঘটনে,
প্রবল ইলেকট্রন-প্রোটনে
গাঁথিয়া গতির মালা
সাজায়ে জ্যোতির ডালা
জ্বেলেছো জরার দিবা যামিনী
পঞ্চাশোর্দ্ধে মোর! কে তুমি সপ্তদশী দামিনী?

১০

ঝড়ে দোলা জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যায়
করকা-কমল-ফোটা পন্থায়
প্রখর পয়লা জুনে
এলে তুমি যে-আগুনে,
বিংশ শতাব্দীর বোমানল
সে-অগ্নি সকাশে রূপান্তরিয়া হয় হোমানল।

আমি সেই হোমানলে হবি হই,
নবযুগ-যাত্রার কবি হই;
আমি সাধি আণবিক
আর পারমাণবিক
অপশক্তির পরিবর্তন,
সর্বনাশীরে দেই সর্বমঙ্গলার নর্তন।

মঙ্গল-নর্তনে নাচিয়া
তুমি নব সৈনিকা সাজিয়া
আমায় করিলে সাথী,
আমার দিবস-রাতি
সংগ্রাম-সাধনায় রাখিলে;
মানস-নয়নে মোর পারনীর অঞ্জন আঁকিলে।

সেই অঞ্জনে লিখে লিপিকা
চাই তব দৃষ্টির দীপিকা!
দেখো, প্রতি অক্ষরে
বহ্নিবাদলে ঝরে
তোমারি প্রদীপ্তির তুলনা;
নাও প্রীতি-উপহার; প্রবাসী প্রমাতামহে ভুলো না।

ইতি
তোমার চিরজন্মের সহযাত্রী
ছোট কর্তাদাদু
নিশিকান্ত।

সতেরো বছর আগে পয়লা জুনে ভরাজ্যৈষ্ঠের কাল-বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যায় বজ্রপাত-মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেছিল আমার দৌহিত্রী-কন্যা-সম্পর্কীয়া শ্রীমতী শম্পা মুখোপাধ্যায়। কিছুদিন পূর্বে সে চেয়েছিল আমার কাছে বর্ষা-বাদল সম্পর্কে একটি কবিতা; সেই সূত্রে তাকে তার সাম্প্রতিক জন্মদিনে এই কবিতায় রচিত লিপিকা উপহার দিলাম।—লেখক।

সিতাংশু

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ছবি দেখছি, মস্ত একটা মাঠ।
ছবি দেখছি, নদীর বুকটা কালো।
ছবি দেখছি, স্তব্ধ সুদূর দেহাতী পথঘাট।
আকাশে লাল আলো।

ছবি দেখছি, রক্তবর্ণ আলোর আভা ধীরে
মিলিয়ে যায়, মিলিয়ে যায়। কারা
অন্ধকারে মৌন বিশাল জঙ্গলটাকে ছিঁড়ে
আনায় অন্বেষণের চক্ষু। তারা।

ছবি দেখছি, আবছা একটা পথ।
ছবি দেখছি, মাঠের বুকটা কালো।

ঊর্ধ্বাকাশে লগ্ন মেঘের মায়াবী পর্বত।
শিয়রে তার কালপুরুষের আলো।

এবং শুনছি, কে যেন কের সিতাংশুকে ডাকে।

ও রাত্রি, তুই কাকে ডাকিস, কাকে?
সিতাংশুকে? আমার বন্ধু সিতাংশু, সেই যার
বাঁ-কপালে মস্ত একটা তিল ছিল, তুই তার
চিহ্ন খুঁজে ফিরিস নাকি? সিতাংশু তোর চেনা!

ও রাত্রি, তুই তারার আলো নিবিয়ে ফেল্ তবে,
বিদায় নিয়ে কে আর ফেরে কবে।
সিতাংশু ফিরবে না।

সন্ত অ্যালবার্ট্

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

"তবু সে-রোদ্দুরে টুপি প'রে
কাজ ক'রে যেতে হবে।
অগোয়ের
অলস্ত আয়না-জল মাঠের কিনারা তলে
নির্মম ঔজ্জ্বল্যে চেয়ে থাকে,—
গুল্ম গাছ আগাছার ভারি তটে তারি
বেড়া বেঁধে এসো ক্ষুদ্র চারা বুনি
সব্‌জি বাগানের,
যদি দ্বন্দ্বে জয়ী হয় ক্ষুধার উত্তর।
শত ক্ষত আফ্রিকায়
গহন প্রাচীন বনে দিনে ঝিঁঝিঁ খরতান,
কুষ্ঠ রোগী গলি বেয়ে শোয় হাসপাতালে,
সেবা-হাত যুক্ত হোক
অনিদ্র নৈপুণ্যে রত।
কুমীর-মশার দাহ-জয়ী
একটি সুব্রত ক্ষণ জাগে
বিষুবরেখার স্পর্শ মানুষ-ঘৃণার বিষে মেশা
হানে নি যেখানে চৈতন্যকে॥

"কেটে যায় অর্ধ শতাব্দীর এই দিন।
ছিল সঙ্গীতের স্তরে পশ্চিম মানস
চিন্তার শৈলান্ত-ঘেরা জন্মের নগর শীত দেশে,
রক্তে আজো কথা বাজে, জেলে শয্যা-দীপ
রাত্রির গদ্যের রেখা লিখি অবসরে ;
দেশে দেশে প্রাণের প্রার্থনা
ভক্তি-মন্ত্র সর্ব জীবনের,
শিখেছি দারুণ আফ্রিকায়—
এসেছিল ধ্বনি কর্মযোগে
অপরাহ্ণ নদীপথে অগোয়ের॥

টেবিলে রেখেছি হাত, শোলা টুপি খুলে,
নক্ষত্র চিত্রণ গোধূলিতে
আরো এক পর্ব শেষে এসেছি প্রত্যহ পথে ঘরে,
অরণ্যে লণ্ঠন-আলা যাত্রা শেষে—
ভাবি আরো কাজ কত বাকি॥"

(সোয়াইট্জার্ কেন্দ্র, ল্যাম্বারেণে, মধ্য আফ্রিকা।)

লুসিয়া, প্রকৃতি, আমরা

শ্রীবিষ্ণু দে

And, oh, the difference to me—Wordsworth

সেও ছিল কোয়েলের নির্ঝরের ভিড়ে
পায়ে চলা না-চলার অগণন পথে,
প্রকৃতির মেয়ে সেও, মিলেছিল নিঃসঙ্গে নিবিড়ে
প্রকৃতির সত্তার সম্মতে।

পৃথিবী তাকেও বেছে দিয়েছিল রহস্যের চাবি
আপন আবেগে আর বিধিনিষেধের,
আশ্বিনের মেঘ তার তনুদেহে এঁকেছিল দাবি,
রৌদ্রে তার চোখ দুটি পান করে নূতন মেঘের।

সদ্য সবিতায় লঘু নৃত্য তার টিলায় প্রান্তরে
স্বতঃস্ফূর্ত হরিণ উল্লাসে,
অঙ্গের মাধুরী তার বৈশাখীর রুদ্র রূপান্তরে,
সে সদ্য প্রসন্ন যেন আম্রকুঞ্জ ফাল্গুন বাতাসে।

নিশুতি রাতের তারা নির্ভীক স্বপ্নের তার মিতা,
আরণ্য স্তব্ধতা স্থির আভিজাত্যে সে আনম্র বলয়ে,
বালিতে উপলে স্বচ্ছ মর্মরিত নদী সচকিতা
লাবণ্যে ফলেছে তবু তার মুগ্ধ নবীন বিস্ময়ে।

সে আমার জানাশোনা, জীবনে সে আগামী প্রসাদ,
চৈতন্যে সে বেঁধেছিল ঘর।
তাই তো এমন তীব্র অসার্থক বেদনার খাদ,
বহুকাল পরে দেখা—সে এখন মেনেছে শহর।

অথচ শহর কিবা আমাদের ? অপ্রাকৃত, কৃত্রিম আদিম,
প্রকৃতিবিরোধী, শুধু বিকৃত বর্বর।
শুষ্ক মরণের তলে আমার লুসিয়া নয় হিম,
আমাদের এই শোক, প্রতিদিন সে গাঁথে কবর ॥

এখনও গরম নেই, ফাল্গুনের শেষ,
পল্লবে মুকুলে ফুলে চোখ ভরে, ঘ্রাণ ভরে,
আর পাখী শত পাখী গান করে।
অসহায় আর হিংস্র জন্তুজগতেও জাগে
প্রকৃতির দেশজ আবেশ।
চড়া বালি ছোট বড় শাদা কালো শিলা
চতুর্দিকে ইতস্তত জলে বাসন্তীর অনুরাগে,
তার মাঝে নয়নাভিরাম হিম স্বচ্ছ স্রোত।
গ্রাম্য গলি বাঁয়ে রেখে
ডাইনে বাঘোয়া টিলা ফেলে নেমে চলি
জলে জলে স্বচ্ছ স্নিগ্ধ জলে
স্পর্শের আরামে অবিরত নেমে নেমে চলি।

ছড়ায় নদীর বাহু সমস্ত শরীর
পাহাড়ে মাটির তীর ঘিরে থাকে স্বচ্ছন্দ বিস্তারে।
কানে আসে গভীর সঙ্গীত।
চার স্রোতে ভাঙে নদী শিলায় শিলায়,
বিবাদীর ধ্বনি মেলে আত্মদানে প্রেমের নিস্তারে,
প্রবল ঝোরায় ঝাঁপ দেয় প্রপাতে বেগে উৎক্রান্ত ধারায়।
নিচে বেশ দশবারো হাত নিচু স্তরে
তরল তন্ত্রীর ক্ষিপ্র চারটি পরদায় সাহসী ঝঙ্কারে
অপরূপ সঙ্গীতে হারায়,
স্বাতন্ত্র্য মিলায় যেন মৎসার্টের প্রেরণার বরদা প্রসাদে,
উত্তীর্ণ সংহতি পায় মধুর তরল নানা খাদে হরেক নিখাদে।
দুঃখের কড়িতে আনি আরেক আশার নিশ্চিত কোমল,
অনেক লুসিয়া সেই স্থিরলক্ষ্য সুরে বুঝি আজ ভুল মানে।

সুরেলা ঝোরায় ঢালি নিজেকেও
গানে স্নানে ফেনিল ঊর্মিল তোড়ে ছেড়ে দিই
যেন ইতিহাসে,
ধুয়ে দিই শরীর ডোবাই কাঞ্চনের শেষাশেষি
প্রাকৃত সংবিতে।

প্রকৃতির মেয়ে সে যে, সেও তোলে
প্রকৃতির কত ছেলে মেয়ে তোলে প্রকৃতির দাবি।
প্রকৃতি সে ভুল দেখে শীর্ণমুখ ফিরায় কি
দগ্ধ আষাঢ়ের শেষে আশ্বিনে বন্যায় তাই ভাবি।

পাহাড়ে নদীর সেই গ্রাম্য দুঃখে সুখে
দেখেছি সচ্ছল চলা সর্বাঙ্গ সঙ্গীতে
পাথরে বালিতে হীরা ছড়িয়ে দু'হাতে
হেমন্তে, বসন্তে, গ্রামে পাড়ে পাড়ে নিত্য স্রোতে
কুলুকুলু শুধাতে শুধাতে, বর্ষার থাকুক দেরি
নিশ্চিত সে আদিগন্ত ভেরী যখন বাজাবে মেঘ
তখন শহর গ্রাম সারা দেশ পাবে নাকি
কূলভাঙা কূলগড়া পাথর ভাসানো
পলি-তোলা লাল স্রোতে

নদীর আবেগ ?
নদী কি ভুলেছে সত্তা, নেমে এল, সে কি দীঘি ধমকাল
সাঁতারু সাহেব-মেমে অদ্ভুত শহরে ?

পিপুল কি মাটির বৈভবে বিস্তৃত শিকড় ভুলে
পাতাঝরা শীতে ভাবে উঠে যাবে ভাড়াকরা
প্রাসাদের টবে ?

চাষী কি কখনও ভাবে তেরোতলা ছাতে
বুনবে ধানের ক্ষেত, আল্ দেবে খুলে ?
পলাশ কি রাজন্যসভায় যাবে মহাবক্তা সভাসদ ?
অথবা গদীতে চেপে প্রত্যহই কী আপদ ক'রে যাবে বধ
অহংসর্বস্ব আর অবান্তর পঞ্চমুখে
আজ কারো শিশুপাল কাল কারো কৃষ্ণই স্বয়ং ?

তাহলে সে, প্রকৃতির মেয়ে কেন ভাবে আজ
তার ঠাঁই শিকড়ে না, উড়ন্ত পল্লবগ্রাহিতায় ?
তার ঠাঁই কাবারের নাচের টেবিলে
কিংবা রাজধানীর মেলায় হরেক খেলায়
তারে তারে দুলে দুলে, কিংবা ভাবে ডিগবাজি দিলে
তার মান বেশি ফোটে এই সোজা এই উল্টো
নির্বোধ কৌশলে ?
পাহাড় কি নীলাকাশ শীর্ষ ছেড়ে তরাই জঙ্গলে
অবিশ্রাম পেঁজে পেঁজে হিমালয় খুঁজে ফেরে ?
প্রকৃতির মেয়ে তার অপ্রাকৃত ঘোর
কবে যে কাটবে ভাবি।

তাই চলি অবশ্যসম্ভাবী দিন পৃথিবীতে
নামাই সবাই, নীলাকাশ মিত্র করে সেই দাবি।
অমর পাহাড় নদী পিপুল পলাশ চাষী
আমরা প্রকৃত পুণ্য চাই সত্য রূপ তার
প্রকৃতির রূপ মেয়ের, যাকে নবসভ্যতার স্বপ্নে ভালোবাসি।

—

কৃশবৎসা কৃশতী শ্বেত্যাগাদারেত্ত কৃষ্ণা সদনাচ্ছন্যাঃ।
সমানবন্ধু অমৃত্তে অনূচী স্থাবা বর্ণং চরত আমিনানে॥

আমাদের উষা নেই উষসীও নেই, শুধু আশা
কৃশবৎসা কৃশতীর মতো, জীবনে না হোক
আশা মনের দহনে।
আমরা হায়রে বটে, শূন্য হাওয়ায় হাওয়ায় ঘোরাফেরা
মরেও মরি না, কি যে ঠিক চাই তাও জানি না, অথবা
যাঁদের দায়িত্ব জানা, জানেন না কেউই তেনারা।
হয়তো আমরাই জানি মর্মে মর্মে, অসহায় মানুষেরা
দুর্গত সরল গ্রাম্য প্রকৃতিস্থ জানে।
রক্তে জানি শরীরের হৃদয়ের সত্যে জানি
আমরা সরল তাই সরল জীবন চাই সচ্ছল সভ্যতা চাই
ঘরে ঘরে ঘরে ও বাইরে চাই ঘনিষ্ঠের আত্মহারা
যোগাযোগ মানুষে মানুষে আর প্রকৃতি মানুষে
চাই অবিষ্টের আদিম মিলন চাই সেই পরিণত
বিবাহের সভা
যেখানে রাজন্য দক্ষ নত বস্ত্র ভিখারীর কাছে।

অথচ এ দক্ষযজ্ঞে সব পশু,
পার্বতী বেতালা নাচ ধরে আর শিব!
চড়কের সং সেজে লণ্ডভণ্ড মাথার দাঁড়ায়
হাসায় বিশ্বের লোক আর কেউ রোজগার করে
পোষা বাঁদরে কেউ দাঁও মারে দাঁতে ধার করে
কিছুরই নিয়ম নেই, কিবা আগে কিবা পরে
কোনো বিবেচনা
ক্ষমতাও নেই তার সততাও নেই
আর যদিবা নিয়ম কিছু মাথা ভেঙে দেখা দেয়
কোনো কিছু প্ল্যান্
সে আবার আরো বেশি হিতে বিপরীত
পদে পদে ভুলে ভুলে বাঁধ ভাঙে অথচ নদীও মরে।
বনবাদাড়ের বন্যা সোজা ছোটে
রাজপথে এঁকে-বেঁকে চলে সরীসৃপ সে যে
আরো সর্বনেশে।
ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থ্‌ সেকালেই কেঁদেছেন মানুষেই মানুষের
কি অমানুষিক ক্ষতি করে দেখে বাদশাহী তাঁরই দেশে
What man has made of man!
আজকে অন্যত্র দাসবংশীদের নৃশংসতা দেখে
নটরাজ শিঙা ধরে সে কবিসংবিতে নীলকণ্ঠ
অন্ধকারে সপ্তসবিতার।

সবিতা পশ্চাতাৎ সবিতা পুরস্তাৎ
সবিতোত্তরাত্তাৎ সবিতাধরাত্তাৎ।
সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিং
সবিতা নো রাসতাং দীর্ঘমায়ুঃ॥

—০—

বাঙালীর রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি

বঙ্গভূমিকে রাষ্ট্রিক হিসাবে তিন টুকরা করা হইয়া থাকিলেও, সমগ্র ভারতে যেখানে যত বাঙালী আছেন, তাঁহাদিগকে বাঙালীর রাষ্ট্রিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা অ-বাঙালী কাহারও ক্ষতি বা অনিষ্ট করিতে চাই না, কিন্তু সর্বত্র ভারতীয় নাগরিকের সমান অধিকার চাই। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রিক সংহতি পুনঃস্থাপন আমাদের সাধ্যাতীত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রিক সংহতি এই প্রকারে যতটুকু রক্ষিত হইতে পারে, তাহা রক্ষা করা চাই।

সাংস্কৃতিক সংহতি পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করিতে হইবে। বাঙালী মহিলা পুরুষ যিনি যেখানে আছেন তাঁহাকে বাংলা বলিতে হইবে, বাংলায় চিঠি লিখিতে হইবে, সাহিত্যিক শক্তি থাকিলে বাংলা গদ্য বা পদ্য উভয়ই রচনা করিতে হইবে, বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইবে, বঙ্গের সংগীত ও ললিতকলার অনুরাগী হইতে হইবে, এবং শক্তি থাকিলে অন্ততঃ গায়ক বাদক চিত্রকর বা ভাস্কর হইতে হইবে।

প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৌষ ১৩৩৩।

সেকাল আর একাল

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

"সেকাল আর একাল"—চিরকালের কলহ, জগতে সকল দেশে। আবার প্রত্যেক মানুষেরই আছে নিজের সেকাল আর একাল। নিজের বয়স ও অভিজ্ঞতা বা চেতনা অনুসারে সে কালধারায় নিজের অবস্থান ঠিক করে এবং পক্ষ গ্রহণ করে।

আমার মনে হয়, ফরাসী দেশে এ ব্যাপারটি যে রকম জোরালো আর ঘোরালো এবং চিত্ত-চমৎকারী এমন আর কোনো দেশে নয়। বিশেষতঃ তাদের সাহিত্যে ও শিল্পে—যেহেতু ফরাসীরা তাদের জীবন যাপন করে অনেকখানি তাদের মস্তিষ্কের মধ্যে—এই নূতন-পুরাতনে লড়াই ইতিহাসের একটা ক্রমিক, ধারাবাহিক ঘটনা। প্রত্যেক যুগে পুরুষানুক্রমে চ'লে এসেছে এই কবির লড়াই, আর তা চলে রীতিমত নিয়ম অনুসারে, আঁটঘাট বেঁধে, খেলার যাবতীয় আইন ধ'রে। তার আছে পক্ষ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত, বাদ-বাদী, প্রতিবাদী—protagonist—antagonist—propaganda (manifesto)—আর সে কি হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড! স্মরণ করা যেতে পারে ভিক্তর হিউগোর বিপ্লবকারী—ভাবে-ভঙ্গিমায়-ভাষায়—নাটক "হেরনানি"র প্রথম রজনী (La bataille d' Hernani)!

আমাদের দেশেও, রাজনারায়ণ বসুর "সেকাল আর একাল"এর বহু পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাস যখন মহাকবি হয়ে ওঠেন নি, উদীয়মান তারকার মত তাঁকেও এ রকম একটা অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল—আসরে নূতন সমাগত তিনি, তাই একালের পক্ষ ধ'রেই ঘোষণা করেছিলেন, পুরানো হলেই যে তা সাধু (অনবদ্য) হবে আর নূতন হলেই তা হবে দুষ্ট (অবদ্য) তা নয়।

যা হোক, আমিও এই গতানুগতিক প্রথা, এই সনাতন ধর্ম্ম অনুসরণ করব আজ এবং তদুচিত গুণ দোষ কীর্ত্তন করব কিছু। তবে আশা করি শুধু কলহ বা বাক্‌বিতণ্ডা নয়, দু একটি মূল সত্যের অবতারণা এবং কিঞ্চিৎ সমালোচনাও হবে। তা হলে গোড়াতেই ব'লে রাখি, আমাকে সেকালের পক্ষই অবলম্বন করতে হবে। কারণ ভিক্তর হিউগো বা কালিদাসের মত আমি তরুণ নই—এবং ময়ূরপুচ্ছ ধারণ ক'রে নবীন সাজতে রাজী নই। তবে রাজনারায়ণ বসু ত আছেন—তিনি মহাজন, আমি না হয় তাঁকেই অনুসরণ ক'রে হব সেকাল-পন্থী।

এই গেল প্রস্তাবনা, এখন তবে আসল বিষয়ে আসা যাক। আমার সেকাল অর্থ হবে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর কথা। আমার প্রথম যে প্রবন্ধ প্রবাসীতে বের হয় এবং সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হ'ল "কবিত্বের ত্রিধারা।" তৎপূর্ব্বে আমার দুএকটি প্রবন্ধ এখানে ওখানে অবশ্য ছাপা হয়েছিল। তখন "সাহিত্য" পত্রিকার স্বনামধন্য সুরেশ সমাজপতি সমালোচনার সম্মার্জ্জনী হস্তে বিরাজমান ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে প্রায়। তিনি শুধু সমাজপতি নন, ছিলেন সাহিত্য-পতিও। আমার প্রবন্ধ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তাঁর মত তিনি স্পষ্ট ব্যক্ত করেছিলেন—আমার (ভুয়া) পাণ্ডিত্য-কণ্টকাকীর্ণ বিষয় এবং অস্পষ্ট আড়ষ্ট ভাষা নিয়ে তিনি বেশ ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন। তবে "কবিত্বের ত্রিধারা" তাঁর মনকে একটু ভিজিয়েছিল, বলেছিলেন, আমার হাতে ধীরে রস-সঞ্চার হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুকের কাহিনী বলতে পারি। আমার সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় চিত্তরঞ্জন দাশের "নারায়ণ" পত্রিকায়। তার পূর্ব্বে (বলতে গেলে প্রায় বাল্যকালে) আমাদের নিজেদের (শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত) সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধর্ম্মে' হাত মক্স করেছি। প্রবন্ধটির নাম ছিল "আর্টের আধ্যাত্মিকতা।" লেখাটি চিত্তরঞ্জনকে এতখানি আকৃষ্ট করেছিল যে তিনি ধ'রে নিয়েছিলেন যে তা শ্রীঅরবিন্দের লেখনী ছাড়া আর কারো হতে পারে না—কারণ লেখাটি পণ্ডিচেরী থেকে পাঠান হয়েছিল, এবং এখানে আর কে এমন লিখতে পারে? তাই লেখকের নাম "শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ" ছাপিয়ে লেখাটিকে পত্রিকায় প্রথম স্থান দিয়েছিলেন। শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, "নলিনী গুপ্ত", হল শ্রীঅরবিন্দের ছদ্মনাম—নলিনী অর্থ ত অরবিন্দ (পদ্ম) আর তখন তাঁর গুপ্তবাস পণ্ডিচেরীতে, সুতরাং তিনি গুপ্ত ত বটেই! তাঁর ভুল ভাঙবার জন্যে শ্রীঅরবিন্দ নিজে তাঁকে চিঠি লেখেন যে নলিনীকান্ত গুপ্ত কাল্পনিক ব্যক্তি নয়, বা অন্য কেউ নয়—সে সশরীরে জল-জীবন্তভাবে তাঁর সঙ্গে বসবাস করছে।

যা হোক—সে যুগে "প্রবাসী"র প্রাণ—শুধু প্রাণ কেন, প্রাণ ও মন বলতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন অজিত চক্রবর্ত্তী ও চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের দুজনার সঙ্গেই আমার প্রীতি সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ হয়েছিল—আমার বিশেষ সৌভাগ্য। কোন সাময়িক পত্র বা পত্রিকাকে আশ্রয় ক'রে একটা গোষ্ঠী গ'ড়ে ওঠা স্বাভাবিক—তবে সে গোষ্ঠীর গড়ন কমবেশী স্পষ্ট স্ফুট গাঢ়বদ্ধ হয় ক্ষেত্র অনুসারে। তখনকার দিনে এ রকমের আয়ো ছিল "ভারতী"-গোষ্ঠী, "বিচিত্রা"-গোষ্ঠী এবং সকলের চেয়ে বিখ্যাত "সবুজপত্র"-গোষ্ঠী। এ ছাড়া "কল্লোল"-গোষ্ঠীও সর্বজন-বিদিত—কিন্তু এ গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ আমার ঘটে নি। এ সকলের মধ্যে সবুজপত্রের সঙ্গেই শেষটা আমার সম্বন্ধ সুনিবিড় হয়ে ওঠে,—যদিও প্রারম্ভে তার সূত্রপাত হয় একটা বিরোধ এবং দ্বন্দ্ব নিয়ে। আমি তখন বয়সে নবীন, বাস্তবতঃ সবুজই কিন্তু সাহিত্যিক রীতি বিষয়ে আমি "চলিত"পন্থী নয়, ছিলাম "সাধু"পন্থী। আমার "চলিতভাষা বনাম সাধুভাষা" প্রকাশিত হয় "নারায়ণে"। প্রমথ চৌধুরী তার উত্তর দেন সবুজপত্রে—বলেন, বিপক্ষের কথা এমন সুষ্ঠু ও যুক্তিযুক্ত ভাবে বিবৃত আর কোথাও তিনি দেখেন নি। কিন্তু আমার দিক্ থেকে এ হল প্রায় তামাসা (scoff) করতে এসে পূজায় (pray) ব'সে যাওয়ার ব্যাপার। কারণ আমি শেষে বুঝলাম যে প্রমথ চৌধুরীর "চলিত" ভাষা সম্বন্ধে আমার কতকগুলি ভুল ধারণা ছিল। যেমন আমি মনে করেছিলাম, চলতি-রীতি অর্থ সংস্কৃত-বর্জ্জিত খাস বাংলা বা গ্রাম্যভাষা—যেমন এক সময়ে ইংরেজী সাহিত্যে ধুয়া উঠেছিল, লাতিন-গ্রীক-ফরাসী সব শব্দ বনবাস দিয়ে ব্যবহার করতে হবে বিশুদ্ধ আংলো-সাক্সন। আমি যে কতদূর এ ক্ষেত্রে ধর্মান্তরিত (converted) হয়েছি তার প্রমাণ আমার এই বর্ত্তমান নিবন্ধের রীতি। দু-একটি ঘটনা সবুজ আসরের প্রসঙ্গে। একবার ওখানে আমি নিমন্ত্রিত হই। কথায় কথায় প্রমথবাবু আমাকে একটি প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন। প্রশ্নটি তিনি করলেন নিজেরই সমস্যা ব'লে, না আমার বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করবার জন্য রহস্যচ্ছলে, ঠিক বুঝে উঠলাম না। কথাটা এই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার একটি লেখা বের হয়েছিল—তাতে আমি গ্রীক চেতনার, তার কবিচিত্তের বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করেছিলাম প্রশান্তি, নির্ম্মলতা, স্বচ্ছতা, স্থিরসাম্য এই ধরণের গুণ। প্রমথবাবু আমাকে ব'লে বসলেন, কার্য্যতঃ এ সবের পরিচয় কি পাই? গ্রীক নাট্যে যে সব বীভৎস ঘটনা, যেরকম উৎকট-বৃত্তির উদ্দাম প্রকোপ দেখি তাতে ত মনে হয় সেক্সপীয়রও হার মানে। উত্তরে আমি বললাম, বস্তু বা ঘটনা ঐ রকম বটে কিন্তু যে চেতনা বা চিত্ত এসব ব্যবহার করেছে, যে ভঙ্গিতে (ভাষায় ও ছন্দে) তা প্রকাশ করেছে, যে আবহাওয়া ঘিরে রেখেছে তা তার ঊর্দ্ধে—সুনীল নির্ম্মল আকাশেরই মত (Ionian sky)। এখন হলে শ্রীঅরবিন্দের উপমা ধার ক'রে বলতাম—যোগীর মন যেমন প্রশান্ত থাকে, তার ভিতর দিয়ে সহস্র চিন্তার উদ্বেল তরঙ্গ চ'লে গেলেও—ঠিক যেমন আকাশের স্থৈর্য্যভঙ্গ হয় না, পাখীর ঝাঁক তার ভিতর দিয়ে তরঙ্গ তুলে চ'লে গেলেও। যা হোক প্রমথবাবু আমার কথা শুনে কোন মন্তব্য করলেন না, প্রসঙ্গান্তরে ঘুরে গেলেন।

আর একদিনের অর্থাৎ রজনীর কথা। আমরা জমায়েত হয়েছি চৌধুরী মশায়ের ওখানে এক বৃহৎ গোষ্ঠী—জন ৩০।৪০ হবে। উপলক্ষ্য এখন আর মনে নেই। কলকাতার জ্ঞানী-গুণী-জন বহু উপস্থিত—সত্য সত্যই অভিরূপ-ভূয়িষ্ঠ-পরিষৎ। আনন্দ দেবার জন্য, আনন্দ উপভোগ করবার জন্য একটি প্রস্তাব করা হল—পিয়ানোতে ব'সে ইন্দিরা দেবী (প্রমথবাবুর স্ত্রী) রবীন্দ্রনাথের এক-একটি গানের প্রথম কলি বাজিয়ে যাবেন—উপস্থিত শ্রোতা সকলকে একটা কাগজে লিখে দিতে হবে তা কোন্ কোন্ গান। আমিও কাগজ পেন্সিল পেলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান তেমন শুনেছি ক'টা—আমার নিজের সঙ্গীতজ্ঞান কি স্তরের !! বসবাস করি সেই দাক্ষিণাত্যে—সুদূর কন্যাকুমারীর কাছে, তাও আবার ভারতে ফরাসী সিকাদীকার এক কোণে। আমার দলে এক সুরেশ চক্রবর্ত্তী ছিল ওস্তাদ, তারও বিজ্ঞতা পরিমিত ছিল স্বদেশী গানের মধ্যে—যেমন "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়", "মোরা যোনেকে হিন্দুস্থান", বড় জোর "আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে"। সুতরাং ফল, পরীক্ষার সাদা খাতা দাখিল ক'রে ফিরে বসলাম। সুরেশ হয়ত দুএকটা গান চিনতে পেরেছিল। মনে আছে সেবার প্রথম হলেন অবনীন্দ্রনাথ—সব ক'টা গান তাঁর পরিচিত, বলা বাহুল্য। আর আমি সর্বশেষ—নম্বর শূন্য।

আসল বিষয়ে এখন ফিরে আসা যাক। আমি বলছিলাম, সবুজগোষ্ঠীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেশী হয়েছিল। সেকালের গোষ্ঠী কয়জনের স্বরূপটিই হ'ল আসলে আমার বক্তব্যের হেতু। সবুজগোষ্ঠীর মতামত যে আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল তা নয়, অনেক বিষয়ে বরং আমি বিভিন্ন ও বিপরীতই ছিলাম। সবুজ-পত্রের আবহাওয়া গ'ড়ে উঠেছিল Rationalist (যুক্তিবাদী) ও aestheteদের (সৌন্দর্য্যবাদী) নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে। এ দলের বাইরে, লোকাতীত

বস্তু বা আধ্যাত্মিক জগৎ সে আবহাওয়ায় ছিল ধোঁয়ার ছায়া। তবুও সেখানে আমার চেতনা স্থান পেয়েছে, কোথাও অনুভব করেছি একটা ঐক্য ও একপ্রাণতা। আত্মার ঐক্য ধ'রে একটা মিল হয়, গোষ্ঠিবন্ধন হয়—পুরাকালে তার নাম ছিল মঠ বা আশ্রম। কেবল দেহকে আশ্রয় ক'রে—পান-ভোজনের আনন্দ দিয়েও গোষ্ঠী সৃষ্ট হতে পারে—ইদানীন্তন কালের ক্লাব এই পর্য্যায়ে। আমার সঙ্গে সবুজের এ দুটির একটিও সম্মেলনের হেতু ছিল না। একটা আন্তর সংযোগ—মিল কোথাও নিশ্চয়ই ছিল।

অনেক বিভিন্নতা ও বৈপরীত্য সত্ত্বেও যে মিল, তাকে আমি সাধারণভাবে বলতে চাই মনের মিল। সেকালে এ জিনিষটা সহজ ও সাধারণ ছিল ব'লে আমার বিশ্বাস। একালের যে মিল, যাকে আশ্রয় ক'রে গোষ্ঠী গড়ে, তা হ'ল মনের নয়, মতের মিল। আধুনিক জগতে এই মতের মিলটাই বড় হয়ে উঠেছে। আমাদের চেষ্টা, সবাই একমত হোক। মন অর্থাৎ মনপ্রাণ বা অন্তর অবোধ্য, জটিল, বিচিত্র জিনিষ, তা নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় না, কাজকর্ম্ম হয় না—একান্ত অনিশ্চিত, অবাধ্য, নিরঙ্কুশ তা। এবং তা একান্ত ব্যক্তিগত জিনিষ। তাই বর্ত্তমানে একমতে সায় দিতে পারলেই আমরা দল গড়ি—creed, dogma, শীল-অনুশাসন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ভুলে যাই এবং পদে পদে দেখি যে মতের মিলে দল "গঠন" হয় না, হয় দল "পাকানো"। দল বাঁধি আমরা—কিন্তু মতের মিলে একটু গরমিল হলেই অর্দ্ধচন্দ্রেন নিঃসারিত হতে হয়—যার আধুনিক নাম sanction, purge, liquidation, ইত্যাদি।

আমি বলছিলাম, তাই মতের মিল নয়, মনের মিল—সৌমনস্য ছিল সেকালের একটা গুণ। একালে আরো অনেক পুরানো জিনিষের সঙ্গে এ বস্তুটিও আমরা বর্জ্জন করেছি। আজকাল অনেক দিক্‌ দিয়ে যে আমাদের অনৈক্য বেড়ে গিয়েছে তার কারণ ঠিক এইখানে—বুদ্ধি দিয়ে, বিধান গ'ড়ে, এক কাঠামোর ভিতরে আমরা সব মানুষকে ঠেসে পুরে দিতে চেষ্টা করেছি। তার ফল, চারদিকে সব ফেটে ফুটে বের হয়ে পড়ছে। জগতের ঐক্যের জন্তে আমরা চাই এক ভাষা, এক লিপি—এক পোষাক, এক পরিচ্ছদ—এক ধর্ম্ম, এক কর্ম্ম—কতকগুলি অব্যভিচারী বিধি আর কতকগুলি ততোধিক অকাট্য নিষেধ। কার্য্যতঃ তাই দেখছি—যত চেষ্টা করি ঐক্য, তত ঘটে অনৈক্য।

তা না ক'রে, এসব হ'ল বাহ্য, এই বিবেচনা ক'রে বলতে হবে "মন চল নিজ নিকেতনে।" মতের মিলকে নস্যাৎ করি না, কিন্তু তার আগে তার পিছনে অন্তরে দাঁড় করাতে হবে যাকে বলেছি মনের মিল। আবার মজার কথা, মনের মিল থাকলে, মতের অমিলে কিছু আসে যায় না। আজকাল co-existence-এর যে ধুয়া উঠেছে একটা, তা ঐরকম কিছুর দিকে যদি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ ক'রে থাকে তবেই মঙ্গলের কথা।

সেকালে মনের মিলটাই বড় ছিল, তাই একই দলের মধ্যে দেখেছি বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক। মতদ্বৈধ, মতবিরোধ সত্ত্বেও তখন দল গ'ড়ে উঠত এবং সজীবভাবে বর্ত্তমান থাকত—ওতে হয়ত আসর গরমই থাকত—কেউ অস্বস্তি বোধ করেনি—সকলে যেন complementaries (প্রতিপূরক) এই বোধ ছিল। মতভেদ হলেই "খ'সে পড়" বা "কোতল কর" এ হুকুম দেওয়া হ'ত না। জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, মতের ঐক্য শুধু কি মতেরই ঐক্য—তার পিছনে থাকে না একই রকম মনের বা প্রাণের ছন্দের মিল, কোনরকম একটা আন্তরভাবের ঐক্য? হতে পারে তা, কোন কোন ক্ষেত্রে—কিন্তু সাধারণতঃ, মতের উপর জোর দিই যখন ও যতখানি, তখন ও ততখানি মনের মিলটা হারিয়ে ফেলি।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে আজ যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে মিল হওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে, সম্মিলিত নেশন (united nations) যে মিশ খেয়ে যাচ্ছে না, এক অভিন্ন জগৎ (one world) হয়ে উঠছে না—তার গোড়ায় গলদ ঠিক এইখানে নয় কি? মনের উপর জোর দিই না আমরা, দিচ্ছি মতের উপর জোর।

ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে ফেলেছি অনেকখানি হয়ত। "প্রবাসী"র জয়ন্তী-উৎসবে স্মৃতিকথা লিখবার জন্ত আমন্ত্রিত হয়েছি—স্মৃতিকথা যে কোনদিন লিখব বা লিখতে পারব কল্পনায় আসে নি। কিন্তু তাও দেখছি ঘ'টে গেল—যদিও যৎকিঞ্চিৎ। তাহলে এইখানেই বলা যাক, অলম্ বিস্তরেণ ইতি শিবম্।

জগদীশ-স্মৃতি

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

ছেলেবেলায় শুনিতাম, জগদীশচন্দ্র বসু বিনাতারে টেলিগ্রাফের এক অদ্ভুত কল আবিষ্কার করিয়াছেন। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই বাঙালী বৈজ্ঞানিকের মাথার মধ্যে কি আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ইংরেজ সরকার নাকি তাঁহাকে অনেক টাকা দিয়া রাখিয়াছেন। সেই বয়সে বিশেষ কিছু না বুঝিলেও আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকের এই অপূর্ব কৃতিত্বের জন্য একটা অনির্বচনীয় গর্ববোধ করিতাম। যখন কিছু বুঝিবার বয়স হইয়াছে, তখন দেশের এই কৃতী সন্তানকে দূর হইতেও একবার দেখিবার আশায় বিজ্ঞান-মন্দিরের দরজার সামনে বৃথাই কয়েকবার ঘোরাঘুরি করিয়াছি। বিজ্ঞান-মন্দিরের এই বিরাট্ বাড়ীটাকে আশেপাশের লোকেরা বলিত 'পাথর-কুঠী' (পরে বিজ্ঞান-মন্দিরের শাখা গবেষণা-কেন্দ্র দার্জিলিং-এর মায়াপুরীকে 'শীসা-কুঠী' এবং ফল্তার শাখা গবেষণা-কেন্দ্রকে 'হাওয়া-কুঠী' বলিতে শুনিয়াছি)। পাথর-কুঠীর সামনের ফটক সর্বদাই বন্ধ থাকিত। ভিতরে কি হয়—কেহই কিছু বলিতে পারিত না। পাথর-কুঠীর সামনে, দোতলা সমান উঁচুতে ঘড়ির মত দাগ-কাটা বেশ বড় একটা কাচের ডায়েল ঝুলিতে দেখা যাইত। তার মধ্যস্থলে ছোট-বড় দুইটি কাঁটা ছাড়া আর কোন যন্ত্রপাতি ছিল না। কাঁটা দুইটি কিন্তু ঠিকমতই চলিত। এই ঘড়িটাকে কিছুকাল আবার সামনের নিমগাছটার উঁচু ডালে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। রাস্তার লোকদের বলাবলি করিতে শুনিয়াছি—জগদীশ বসু এমন একটা কায়দা করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে গাছটা তার নিজের শক্তিতেই ঘড়িটাকে চালাইয়া যাইতেছে।

জগদীশচন্দ্রের প্রসঙ্গে একদিন এক প্রবীণ ব্যক্তি বলিলেন—সার জে. সি. বোস আমাদের দেশের গৌরব সন্দেহ নাই, কিন্তু শুনিয়াছি তাঁহার চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ—সবই নাকি সাহেবী ধরণের; এমন কি, কথা-বার্তায়ও নাকি মাতৃভাষা ব্যবহার করেন না। অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না, যেহেতু তিনি ছিলেন উচ্চ-স্তরের মানুষ, তাছাড়া বিদেশেও অনেককাল কাটাইয়াছেন। কিন্তু কথাটা শুনিয়া কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিয়াছিলাম।

কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আহ্বান পাইয়া জগদীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। দুই-একটি কথার পরেই কিছুদিন পূর্বে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আলো-দেওয়া গাছপালা' সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া সেই বিষয়ে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা কি আছে, জানিতে চাহিলেন। সব শুনিয়া বলিলেন, বিষয়টা খুবই জটিল, এই জৈব-আলো সম্বন্ধে ঐ সব দেশেও তেমন কিছু কাজ হয় নাই। তুমি যদি আমার এখানে আসিতে চাও, তবে অনেক কিছুই শিখিতে পারিবে। এই সব হইল ১৯২১ সালের প্রথম দিকের কথা—তখন হইতেই বিজ্ঞান-মন্দিরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হইল।

যাহা হউক, জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে মনে মনে যে ছবি আঁকিয়াছিলাম, প্রথম দর্শনেই বুঝিলাম, আমার সেই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মধ্যমাকৃতির গৌরবর্ণ সুদর্শন পুরুষ—পরিধানে বাঙালীদের মতই ধুতি-পাঞ্জাবি। রাশভারী লোক, চোখেমুখে একটা সুস্পষ্ট দৃঢ়তার ভাব। পোশাক-পরিচ্ছদ ও কথাবার্তায় একটা আভিজাত্যের ভাব প্রকাশ পাইলেও সাহেবীয়ানার কোন লক্ষণই দেখিলাম না। তাছাড়া তিনি যে মাতৃভাষায়ই কথাবার্তা বলেন এবং বাংলা ভাষায় অন্ততঃ একখানা মাসিক পত্রিকা পাঠ করেন, তাহার পরিচয় ত হাতেহাতেই পাইলাম! তবে বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেন কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য কিছু সন্দেহ রহিয়া গেল।

সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই দিনের পর দিন বিজ্ঞান-মন্দিরের সঙ্গে কেমন যেন একটা ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিতেছিল। ইহা ঠিক অফিস-আদালতের মত দশটা-পাঁচটার সম্বন্ধ নয়। আসিবার একটা মোটামুটি নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু যাইবার তেমন কিছু স্থিরতা ছিল না।

বিজ্ঞান-মন্দির আধুনিক উপকরণে সজ্জিত হইলেও এখানে বিষয় একনিষ্ঠ শিষ্যবর্গ প্রাচীন আদর্শানুযায়ী আশ্রমিক পদ্ধতিতে আজীবন সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিবেন—ইহাই ছিল জগদীশচন্দ্রের ঐকান্তিক কামনা।

বিজ্ঞান-মন্দিরের সম্বন্ধে কর্মীবৃন্দের যাহাতে কেবল জীবিকার্জনের ক্ষেত্র হিসাবে নয়, জীবনের সার্থকতা লাভের সাধন-ক্ষেত্র হিসাবে মমত্ববোধ জাগ্রত হয়, তাহার জন্য জগদীশচন্দ্র চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এই পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে তিনি টিফিন ক্লাব, খেলাধূলা এবং নানারকম অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখনকার টিফিন ক্লাব ছিল বিজ্ঞান-মন্দিরের বিশেষ একটা আকর্ষণের বস্তু। গবেষণা-কর্মীরা প্রত্যেকেই পালাক্রমে বাড়ী হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নানাবিধ খাবার তৈয়ার করিয়া আনিতেন। কে কত ভাল খাওয়াইতে পারে, তার প্রতিযোগিতাও চলিত। বশীবাবুর (বশীশ্বর সেন—বর্তমানে আলমোড়ায় রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টর) পালায় লেডী বসু পনেরো দিন টিফিন তৈয়ার করাইয়া দিতেন।

প্রথম দিকে খেলাধূলার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তারপর এক সময়ে পুলিনবাবুর (পুলিনবিহারী দাস) পরিচালনায় লাঠিখেলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। লাঠিখেলার উৎসাহ কমিয়া গেলে অনেক কাল পরে ব্যাডমিন্টন, টেনিস খেলা প্রবর্তিত হয়। খেলাধূলা ব্যতীত ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানান উপলক্ষে অনেক সময়েই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইত। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞান-মন্দিরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল—ভিজিটরদের ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন। প্রায় সব সময়েই ভিজিটর সমাগম হইত; কিন্তু শীতকালটাই ছিল ভিজিটরের মরশুম। ইহার অন্যতম কারণ হইল—পাঁজি, ডাইরেক্টরী, গাইডবুকে কলিকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির তালিকায় বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের নামও রহিয়াছে। শীতকালে দলে দলে ভিজিটর আসিত। তার মধ্যে বিদেশীয়দের সংখ্যাই বেশী। জগদীশচন্দ্র নিজেই তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া সব কিছু দেখাইতেন।

বিজ্ঞান-মন্দিরে আসিবার পর কিছুদিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্রের দৈনন্দিন কর্মধারার একটা মোটামুটি পরিচয় পাইলাম। রোজ সকালে আসিয়া তিনি গাছপালা পশুপাখী বাড়ীঘর—সবকিছু ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেন। তারপর আবার দশটা-সাড়ে দশটার সময় আসিয়া একে একে সবাইকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। কাহাকে কি করিতে হইবে, বুঝাইয়া দিয়া বিভিন্ন পরীক্ষা-গৃহে কার কি কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা দেখিয়া যাইতেন। বারোটা বাজিলেই বেয়ারা আসিয়া খবর দিয়া যাইত—মেম সাহেব বসিয়া আছেন। পোশাক-পরিচ্ছদে যেরূপ আড়ম্বরশূন্য ছিলেন, তাঁহার খাওয়া-দাওয়াও ছিল সেরূপ বাহুল্যবর্জিত। শুনিয়াছি, ছেলেবেলায় যে সকল খাবার খাইতেন, শেষ বয়স পর্যন্ত সেই সকল খাদ্যই পছন্দ করিতেন। এমন কি, ছেলেবেলার অভ্যাস, রোজই বিকালে চায়ের সঙ্গে কাঁচালঙ্কা-মুড়ি না হইলে চলিত না।' খাওয়া-দাওয়ার পর প্রায় তিনটা অবধি বিশ্রাম করিতেন। তারপর আবার আসিয়া কাজকর্মের খোঁজখবর লইতেন।

লজ্জাবতী, বনচাঁড়াল এবং ঐ জাতীয় স্পর্শকাতর ও স্পন্দনক্ষম উদ্ভিদ্ এবং অন্যান্য কতকগুলি লতা-গুল্ম লইয়াই বেশীর ভাগ পরীক্ষা চলিত। ঐ সকল পরীক্ষায় লতা-পাতার উপর, নীচ বা পাশের দিক্ কোথায় কি ভাবে যন্ত্রের সহিত সংযোগ করিতে হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য নিজের বাঁ-হাতের তর্জনীটিকেই পাতা বা কাণ্ড হিসাবে নানা ভঙ্গীতে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখাইতেন। ইহাতে অনেক সময় বুঝিবার খুবই অসুবিধা হইত। কিন্তু না বুঝিলেই মুশকিল। কাহারও দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইত না। কেহ ইতস্ততঃ করিলেই দু-একটা রূঢ় মন্তব্য করিয়া অনেকটা যেন অনির্দিষ্ট ভাবেই নিকটবর্তী অন্য কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া—ওকে বুঝিয়ে দাও ত—বলিতে বলিতে স্থানত্যাগ করিতেন। লক্ষ্য করিয়াছি—এইরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন সময় পরে আবার আসিয়া তাঁহার অভিপ্রায় অন্যভাবে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অনেক সময়েই দেখিয়াছি—কোন কারণে একটু বিরক্ত হইলেই সহজ কথাও সহজ করিয়া বলিতে পারিতেন না—খুবই রূঢ় শুনাইত। শুধুমাত্র ধমক দিবার জন্য ধমকাইলেও অনেকে কিন্তু ভুল বুঝিয়া একটায় আরেকটা করিয়া বসিত। বিজ্ঞান-মন্দিরের সহকারী অধিকর্তা (প্রোফেসর নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ) এই কারণে যে কতবার পদত্যাগের হুমকি দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু প্রত্যেকবারই জগদীশচন্দ্র—'যাকে আমি বেশী ভালবাসি তাকেই ভর্ৎসনা করি' এই কথা বলিয়া ঠাণ্ডা করিয়াছেন। কিন্তু সর্বশেষ একবার অবস্থা চরমে উঠিল—পদত্যাগ-পত্র পেশ করিয়া প্রোফেসার নাগ ঘরে গিয়া শুইয়া রহিলেন। সারাদিন আর আসিলেন না। পরের দিন দেখা গেল—নাগ সাহেব নিত্যকার মতই লেবরেটরীতে কাজকর্ম করিতেছেন। ব্যাপারটা যাহা শোনা গেল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই:—গতরাত্রে বোস সাহেব নলিনীকে* স্বপ্নে দেখিয়া বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন, এই অবস্থায় নাগ সাহেব আর কি করেন!—পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

* নলিনী জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয়ী, আনন্দমোহন বসুর কন্যা, নাগ সাহেবের পত্নী।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

পুঁটিরাম একজন সুদক্ষ কারিগর। প্রবীণ-বয়স্ক অতি সরল প্রকৃতির লোক। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। সময়মত কোন একটি কাজ শেষ না হওয়ায় জগদীশচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—তোমার দ্বারা চলবে না—তোমার আর দরকার নেই। কোন একটি কথা না বলিয়া পুঁটিরাম সারাদিন নীরবে তাহার পাটের উপর বসিয়া কাটাইল। বিকালে যাইবার সময় জগদীশচন্দ্রের কাছে গিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল। কি চাই—জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিল—তাহলে কাল থেকে কি আমি আর আসব না? কথাটা শুনিয়া তিনি যেন অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—যত সব আহাম্মক! নাগ সাহেব তখন অনেকটা দূরে থাকিলেও তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—নগেন্দ্র! নগেন্দ্র! ওকে বুঝাইয়া দাও ত?—এই কথা বলিতে বলিতেই চলিয়া গেলেন। নাগ সাহেব অবশ্য ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

ছাত্র, শিষ্য বা কর্মীদের কাছে গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া চলিলেও হাস্য-পরিহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপে তিনি কম যাইতেন না। কোন হাসির কথা বলিয়া নিজে হাসিবার সময় আর সকলে হাসিয়া উঠিলে তন্মুহূর্তে হাসি বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়া যাইতেন। কর্মীদের সমক্ষে অকস্মাৎ কখনও হাসিয়া ফেলিতেন বটে, কিন্তু সেটা মুহূর্তের বিদ্যুৎঝলকের মত। কথায় কথায় একদিন সত্যেন গুহ পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ-ভঙ্গীতে 'ত্যাড় ঘণ্টা' বলিয়া ফেলিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বিদ্রূপের সুরে বলিয়া উঠিলেন—বাঙালের মত 'ত্যাড়' 'ত্যাড়' বলছ কেন—'দেড়' বলতে পার না? অথচ তিনিই এক সময়ে কোন কারণে লেডি বোসকে বলিয়াছিলেন—'এখন আবার হিটকার—লজ্জা করে না?'

কিছুদিন পরের ঘটনা। জগদীশচন্দ্র বাগানটার পুবদিকের রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছেন। পিছনে দাশুবাবু (নারায়ণদাস কর, নিজের নার্সারী ছিল, রোজই একবার করিয়া আসিতেন এবং বাগানের গাছপালার তদারক করিতেন) এবং আরও কয়েকজন ছিলেন। কি একটা কাজ বুঝাইবার জন্য দাশুবাবুকে বোঁটাসমেত একটা করবী ফুল ছিঁড়িয়া আনিতে বলিলেন। অদূরেই করবী ফুলের গাছ ছিল। ফুল সমেত একটা করবীর ডাল ভাঙিয়া আনিতেই ঝাঁঝালো-সুরে বলিলেন—এটা কি আনলে? করবীর ডাল নিয়ে এস। ভড়কাইয়া গিয়া দাশুবাবু বড় দেখিয়া আর একটা করবীর ডাল ভাঙিয়া আনিলেন। অবস্থা এবার চরমে উঠিল। ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া দাশুবাবুকে তিক্ত ভাষায় তিরস্কার করিতে করিতে করবী ফুলটা কি রকম দেখিতে, তাহা বুঝাইতে লাগিলেন। সকলেরই তখন চমক ভাঙিল—উনি যা চাইছেন, সেটা তবে করবী ফুল নয়—কল্কে ফুল হওয়াই সম্ভব। কল্কে ফুল আনা হইল। এবার জগদীশচন্দ্রের রাগ পড়িল। তিনি বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াই সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। তিনি ত সরিয়া গেলেন, কিন্তু মুশকিল হইল দাশুবাবুকে লইয়া। পদ্মানদীর ষ্টীমার-ঘাটে দেখিয়াছি, বড় বড় প্যাসেঞ্জার ষ্টীমার ঘাট ছাড়িয়া রাক-নদীতে যাইবার পর ঘাটে বাঁধা নৌকাগুলি বড় বড় ঢেউয়ের মাথায় চড়িয়া একবার উঁচুতে উঠিয়া যায়, পরক্ষণেই আবার আছড়াইয়া পড়িয়া একটা প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া তোলে, অথচ কাছে থাকিতে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না।—দাশুবাবুরও হইল সেই অবস্থা। জগদীশচন্দ্র যতক্ষণ কাছে ছিলেন, দাশুবাবু ততক্ষণ সম্পূর্ণ নির্বাক্ অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিলেন—তিনি চলিয়া যাইতেই তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিলেন। সেখানে উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—দেখলেন ত ওনার কাণ্ডখানা! কল্কে আর করবীতে নিজেই গোলমাল ক'রে ফেললেন, আর না-হক্ আমাকে

যা-তা ব'লে গেলেন ! কত বড় একটা দায়িত্বের ব্যাপার আমার উপর—আর আমার কিনা একটা মান-মর্যাদা নাই ! আমি কিসের তোয়াক্কা করি—আজই কাজে ইস্তফা দিয়ে চ'লে যাব।

কিন্তু যখন শুনিলেন—পূর্ববঙ্গের লোকেরা কল্কে ফুলকেই করবী ফুল বলে, তখন তাহাদের প্রতি একটা যেন সহানুভূতিপূর্ণ হতাশার ভাব দেখাইয়া চুপ করিয়া গেলেন।

জগদীশচন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনায়। কিন্তু যাঁহারা কখনও তাঁহার সংস্পর্শে আসেন নাই অথবা যাঁহারা কদাচিৎ কোন কার্যোপলক্ষে সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের উপরেও জগদীশচন্দ্রের নামের একটা অদ্ভুত প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছি। দৈনন্দিন অনেক ব্যাপারেই, কি ভিতরের, কি বাহিরের—অনেকেই, জগদীশচন্দ্র ডাকিয়াছেন শুনিলেই একটা অজানা আশঙ্কায় কেমন যেন একরকম হইয়া যাইতেন। ইহা কি ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, না কোন বিরাট্ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতাজনিত ভয়প্রসূত, তাহা বলা শক্ত। যাহা হউক, দুই-একটি তুচ্ছ ঘটনা হইতে বিষয়টা অনুধাবন করা যাইতে পারে।

পাঁচটার পর একদিন কেহ কেহ চলিয়া গিয়াছে। সহকারী অধিকর্তা নাগসাহেব সবেমাত্র তাঁর ঘরে গিয়া জামাটা খুলিয়া রাখিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছেন। ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্র কি একটা জরুরী কাজের জন্য ওয়ার্কশপে আসিয়া নাগসাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। খবর পাইবামাত্র নাগসাহেব কোনরকমে জামাটা গায়ে দিয়া একরকম ছুটিতে ছুটিতেই ওয়ার্কশপে হাজির হইলেন। জগদীশচন্দ্রের হাতে এক টুক্‌রা কাগজ। তিনি একটা টুলের উপর বসিয়া কাগজখানাকে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছেন। নাগসাহেব টুলের পাশে দাঁড়াইয়া একটু একটু হাঁপাইতেছিলেন। কাগজখানার উপর দৃষ্টি রাখিয়াই কিছু লিখিবার উদ্দেশ্যে পাশের দিকে হাত বাড়াইয়া নাগসাহেবের কাছে পেন্সিল চাহিলেন। পেন্সিল ছিল নাগসাহেবের পকেটে। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া একবার বুকপকেট আবার নীচের দুই ঝুল পকেট হাতড়াইতেছিলেন, কিন্তু একটা পকেটও খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। পেন্সিল পাইতে দেরী দেখিয়া তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিবামাত্রই আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। বোস সাহেব ডাকিয়াছেন, তাও আবার অসময়ে—কাজেই কোন কিছু ভাবিবার অবসর পান নাই; জামাটাকে উল্টাইয়া যেমন ভাবে খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, ঠিক তেমন উল্টাভাবেই পরিয়া আসিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র একদৃষ্টে তাঁহার দিকে—যাকে বলে 'করুণনয়নে চাওয়া', ঠিক সেইভাবে—কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার ভঙ্গীতে কেবল বলিলেন—হা ভগবান্ !

আর একদিনের কথা—বারোটার পর জগদীশচন্দ্র খাইতে চলিয়া গিয়াছেন। এই অবসরে অনেকেই একটু এদিক্-ওদিক্ গিয়া গল্পগুজব করিত। সেদিন ঐ সময়টায় কেমিক্যাল লেবরেটরীর সামনে ক্রোটন গাছগুলির আড়ালে বসিয়া পোকা-মাকড় অনুসন্ধান করিতেছিলাম। হঠাৎ নগেন্দ্র, নগেন্দ্র—ডাক শুনিলাম, ঠিক বোস সাহেবের গলা। কিন্তু এই সময়ে ত তিনি কোনদিনই এখানে আসেন না ! গাছের ফাঁক দিয়া দেখিলাম—বড় সাহেবই বটে। নদীয়া কেমিক্যাল্‌স্ হইতে সেদিনই পাইরেক্স গ্লাসের খুব বড় বড় দুইটি মেজারিং সিলিণ্ডার আসিয়াছিল। নাগসাহেব তখন কোন তরল পদার্থ-ভর্তি নূতন সিলিণ্ডার দুইটি দুই হাতে উঁচু করিয়া ধরিয়া দুই পা ফাঁক করিয়া নিবিষ্ট মনে তাহাদের পরিমাপ করিতেছিলেন। ডাকের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেমিক্যাল লেবরেটরীর দিক্ হইতে 'ঝুম' করিয়া বেশ ভারী একটা আওয়াজ কানে গেল। কিছুক্ষণ পরেই শুনিতে পাইলাম—হাল্কা গোছের একটা খালি শিশি সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া পড়িলে যে রকম শব্দ হয়, কতকটা যেন সেই রকমের একটা শব্দ। বুঝা গেল, নাগসাহেব নামিয়া আসিতেছেন। নাগসাহেবকে কি একটা কথা বলিয়া জগদীশচন্দ্র চলিয়া গেলেন। তখন আড়াল হইতে বাহিরে আসিলাম। এদিক্-ওদিক্ হইতে আরও দুই-এক জন আসিয়া জুটিল। নাগসাহেব জমাদারকে ডাকিতে পাঠাইয়াই উপরে ছুটিয়া গেলেন। ব্যাপার কি ? কেনই বা অসময়ে বোস সাহেব আসিলেন, কোন কথা না বলিয়া নাগসাহেবই বা কেন উপরে চলিয়া গেলেন ? উপরে গিয়া দেখিলাম, যেন একটা দক্ষযজ্ঞ হইয়া গিয়াছে। জলের মত একটা তরল পদার্থ মেঝের প্রায় অর্ধেকটা ছড়াইয়া রহিয়াছে, আর তার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাঙা কাচের টুক্‌রা। ব্যাপারটা যাহা বুঝা গেল, তাহা এই—নূতন আমদানী দাগ-কাটা মেজারিং সিলিণ্ডারে সলিউশন ভর্তি করিয়া কাজ করিবার সময় বোস সাহেবের ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি করিবার ফলে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে।

এই ত গেল ভিতরের লোকের কথা। বাহিরের লোকও তাঁহাকে কিরকম সমীহ করিত, সেই সম্বন্ধে সাধারণ একটা ঘটনার কথা বলি।—জগদীশচন্দ্রের বই বিলাতে ছাপা হইত। একখানা বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাঠাইবার

তোড়জোড় চলিতেছিল। বইয়ের ব্লকও এখানে প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইতে হইত। ব্লক প্রস্তুত করিত তখন 'কিং হাফটোন কোম্পানী'। ব্লকগুলি আগে পাঠাইবার কথা স্থির হইয়াছিল। পরের ডাকেই পাণ্ডুলিপি যাইবে। এইরূপ ব্যবস্থার কথা প্রেসকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ডাকের আগের দিন কিং হাফটোন হইতে কাঠে 'মাউণ্ট' করা তিনটি বড় বড় বাণ্ডিলে ব্লক আসিয়া পৌঁছিল। কাঠে মাউণ্ট-করা ব্লক দেখিয়াই তিনি রাগে জলিয়া উঠিলেন। অত বড় বড় বাণ্ডিল ডাকে পাঠান যাইবে না, কাঠ খুলিয়া ব্লক প্যাক করিতে হইবে। আমার উপর হুকুম হইল যাহাতে সেই দিনই ব্লকগুলির যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়। যাহা হউক, কিং হাফটোনে গিয়া গোপাল-বাবুকে অবস্থাটা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি ত চটিয়াই আগুন। বলিলেন—আপনারা ত পূর্বেই এরূপ নির্দেশ দিতে পারতেন! এখন এতগুলি ব্লকের কাঠ খোলা সম্ভব নয়। বলিলাম—আমি সে কথার জবাব দিতে পারব না—তবে এটুকু বলতে পারি—তাঁর ইচ্ছা, আজই যেন কাঠগুলি খুলে দেওয়া হয়। সেটা সম্ভব না হলে, আপনি গিয়ে বুঝিয়ে ব'লে আসুন। তিনি কিন্তু তাহাতেও রাজী হইলেন না; বলিলেন—আজ আমি খুবই ব্যস্ত। কাল যা হয় হবে।

মহা সমস্যায় পড়িলাম। এই সকল কথা তাঁহাকে গিয়া বলিলে প্রথম বর্ষণটা হইবে আমারই উপর। ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ পন্থাই অবলম্বন করিলাম।

'তাহলে বোস সাহেবকে গিয়ে আপনার কথা বলি, তিনি যা ভাল বুঝবেন—করবেন'—এই কথা বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া আসিলাম।

উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া তাঁহাকে কি বলা যায়—ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলাম। হয়ত একটু দেরী হইয়া থাকিবে। আসিয়া শুনিলাম, বোস সাহেব উপরেই আছেন। দোতলায় উঠিতে সিঁড়ির মোড় ঘুরিয়াই দেখি, গোপালবাবু দোতলার বারান্দায় দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। বোধ হয় সাহেবকে আগমন-বার্তা জানাইয়া ভিতরে আহ্বানের অপেক্ষায় আছেন। বিস্মিত হইলাম—আমার আগে আসিলেন কেমন করিয়া! যাহা হউক, আর উপরে উঠিলাম না, অবস্থা কি হয়, দেখিবার জন্য সেখানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। গোপালবাবু ভিতরে ঢুকিতেই উপরে উঠিয়া বারান্দা হইতেই শুনিলাম—পরিচিত কণ্ঠে ভর্ৎসনা-বর্ষণ সুরু হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক নিশ্চল কাঠের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন। ইতিমধ্যে আমাকে পাশে দেখিতে পাইয়া কি যেন একটা জবাব দিতে যাইতেছিলেন। বোস সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন—না, না—আমি ওসব শুনতে চাই না, এখনই তুমি ঐগুলি ঠিক ক'রে দিয়ে যাও—আমার আর সময় নেই।

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গোপালবাবু খালি হাতেই কাজে লাগিয়া গেলেন এবং অদ্ভুত কৌশলে ঠুকিয়া ঠুকিয়া সবগুলি ব্লকের কাঠ খুলিয়া সন্ধ্যার পর বিদায় নিলেন।

জগদীশচন্দ্রের প্রায় সব কাজেই দেখিয়াছি—শেষের দিকে তাড়াহুড়া পড়িয়া যাইত। কাজের শেষের দিকে খুবই অধৈর্য হইয়া উঠিতেন এবং জায়গা ছাড়িয়া নড়িতে চাহিতেন না। ইহার ফলে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হওয়া দূরে থাকুক, সময়ে সময়ে বরং অনর্থ ঘটিয়া যাইত।

বিলাতে একখানা বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাঠাইবেন। অনেকদিন হইতেই লেখা আর টাইপ করা চলিতেছে। ডাকযোগে বিদেশে পার্শেল যাইত সপ্তাহে মাত্র একদিন। জি. পি. ও-তে বিদেশী পার্শেল গ্রহণের শেষ সময় ছিল নির্ধারিত দিনের সাড়ে চারটা পর্যন্ত। ডাকের দিনেই কিছু নূতন সংশোধনের পর দুই-তিনখানা পৃষ্ঠা পুনরায় টাইপ করিতে দিয়াছেন এবং টাইপিস্ট্‌কে ঘন ঘন তাগিদ দিতেছেন। বারান্দায় ছোট টেবিলটার উপর সূচ-সূতা, মোমকাগজ, আঠার বোতল, সিল-মোহর, গালা, প্রভৃতি রাখিয়া নাগ সাহেব ও নিশিবাবু প্রস্তুত হইয়া আছেন। আমিও এক পাশে দাঁড়াইয়া আছি, যদি কোন দরকার হয়! দেয়াল-ঘড়ির কাঁটা তখন দুইটার ঘর অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। বোস সাহেব হল্ ঘরটার মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করিতেছেন। মাঝে মাঝে টাইপিস্টের কাছে যান, আবার বারান্দায় আসিয়া দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকান। প্রত্যেকের মুখেই একটা উদ্বেগের চিহ্ন। যাহা হউক, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই টাইপ শেষ হইল। নূতন টাইপ-করা পাতার পিছনে আবার ছবি আঁটিয়া দিতে হইবে। নাগ সাহেব ছবিতে আঠা মাখাইতেছেন, নিশিবাবু ছবি আঁটিতেছেন। বোস সাহেব পিছনে দাঁড়াইয়া নির্দেশ দিতেছেন। আমি তিনটা সূচে সূতা পরাইয়া রাখিতেছি। ছবি আঁটা দেখিয়া বোস সাহেব তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন। সবাই যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু তখনই ধরা পড়িল—

একটা ছবি উল্টা ভাবে লাগান হইয়াছে। তাড়াতাড়ি ছবিটা তুলিয়া ঠিক করিয়া দেওয়া হইতেছিল—ইতিমধ্যে তিনি পুনরায় আসিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—আর পনেরো বিশ মিনিট মাত্র সময় আছে, এখনও হইল না? বোস সাহেবের মুখ হইতে এই কথা কয়টি উচ্চারিত হইতে না হইতেই নিশিবাবু একটা অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া ফেলিলেন—যাহা দেখিয়া আমরা তিনজন ত বটেই, স্বয়ং জগদীশচন্দ্র পর্যন্ত—যাকে বলে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' —সেইরূপ একটা অবস্থায় নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নাগ সাহেব নিজের ফর্মুলায় আঠা তৈয়ার করিয়া মোটা-মুখ একটা পাউণ্ড বোতলে ভর্তি করিয়া আনিয়াছিলেন। ছবিতে আঠা মাখাইবার পর সেই বোতলটা মুখ-খোলা অবস্থায় টেবিলটার উপরেই বসানো ছিল। বোস সাহেবের পুনরাবির্ভাব এবং নৈরাশ্যপূর্ণ কণ্ঠস্বরেই বোধ হয় ঘাবড়াইয়া গিয়া হাত নাড়িতেই জামার আস্তিনে ঠেকিয়া আঠার বোতলটা কাৎ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। বোতলের প্রশস্ত মুখ দিয়া সেই তরল আঠা কাগজ-পত্র ভিজাইয়া, টেবিলটার একদিক্ ভাসাইয়া অজস্র ধারায় মেঝের উপর পড়িতে লাগিল। বোতলটাও গড়াইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু নাগ সাহেব খপ করিয়া সেটাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ধরিলে কি হইবে! বোতলটার সর্বশরীরে আঠায় মাখামাখি, নাগ সাহেবের হাতের মুঠি হইতে পিছলাইয়া গিয়া বোস সাহেবের পায়ের কাছে পড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া নাগ সাহেব দুই হাতে আঠা তুলিয়া ভাঙা-বোতলের তলার অংশটাতে রাখিতে আরম্ভ করিলেন। বোস সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর কোন কথা না বলিয়া তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন। এই ধরণের আরও দুই-একটি ঘটনা ঘটিবার পর শেষের দিকে কোন কাজের সময় জগদীশচন্দ্রকে বেশীক্ষণ নিকটে থাকিতে বড় একটা দেখা যাইত না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, জগদীশচন্দ্র ছাত্র, শিষ্য বা তাঁহার সহকর্মীদের সহিত হাসি এবং কথাবার্তায় কদাচিৎ নিয়ত্তম মাত্রা অতিক্রম করিতেন। অধিকাংশ সময়েই একটা গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। কাজেই রহস্য করিয়া কিছু বলিলেও মুখের ভাব হইতে প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ অনর্থ ঘটাইয়া ফেলিত। একটি সাধারণ ঘটনা হইতেই ইহার তাৎপর্য উপলব্ধি হইবে। একদিনের কথা। জগদীশচন্দ্র ফটকের পিছনে অপ্রশস্ত উদ্যানটিতে নূতন কিছু গাছপালা রোপণের স্থান নির্বাচন করিতেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন পার্শ্বচর। আঙিনার ঘাসের উপর দারোয়ান তাহার ভিজা কাপড়খানা টান করিয়া শুকাইতে দিয়াছিল। দেখিবামাত্রই উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন—কে এখানে কাপড় শুকাইতে দিয়াছে? এক্ষুণি এটা পোড়াইয়া দাও। বলিতে না বলিতেই পার্শ্বচরদের একজন অপর একজনের কাছ হইতে দেশলাইয়ের বাক্স চাহিয়া লইয়া একটা কাঠি জ্বালাইয়া কাপড় পোড়াইতে অগ্রসর হইলেন। জগদীশচন্দ্র দেখিলেন—মহাবিপদ্! সত্য সত্যই জ্বলন্ত কাঠিটা কাপড়ে লাগাইয়া দেয় আর কি! আগের হুকুম রদ করিবার জন্য বাধ্য হইয়াই আবার নূতন হুকুম জারী করিতে হইল। ধমক দিয়া বলিলেন, থাক্ থাক্—ঢের হয়েছে—আর 'মক্ হিরোইজ্‌ম্' দেখাতে হবে না।

দৈনন্দিন তুচ্ছ ঘটনা হইতে অনেক সময় মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণেই বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি মাত্র টুক্‌রা খবর প্রকাশ করিলাম। তবে এইগুলি সবই বহুজন-সমক্ষে প্রকাশিত ঘটনা। ইহা ছাড়া সাধারণের অগোচর কতকগুলি নেপথ্য ব্যাপার ছিল, যাহা না জানিলে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রকে বুঝিতে কষ্ট হইবে না বটে, কিন্তু মানুষ-হিসাবে জগদীশচন্দ্রের ঔদার্য এবং চরিত্র-মাধুর্য উপলব্ধি করিতে অসুবিধা ঘটিবে।

যাহা হউক, জগদীশচন্দ্রের বাংলা সাহিত্য-প্রীতি বা বাংলা সাহিত্য-চর্চা সম্বন্ধে একটা কৌতূহল ছিল—ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। অনেকদিন পর্যন্ত এই সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধানই করি নাই। দার্জিলিং হইতে একবার তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন—দার্জিলিং রওনা হইবার আগের দিন স্ফিগ্‌মোগ্রাফ যন্ত্রের যে ছবিটা আঁকিয়া আমাকে দেখিতে দিয়াছিলে, সেটা আমি ভুলে ফেলিয়া আসিয়াছি। বোধ হয় ফিজিওলজির বইয়ের মধ্যে আমার লাইব্রেরীর খোলা আলমারিতে রহিয়াছে। সেটা পাঠাইয়া দাও। না পাইলে আর একখানা ছবি আঁকিয়া পাঠাও।

ইহার আগে কখনও তাঁহার লাইব্রেরীর ঘরে প্রবেশ করি নাই, কোন দরকারও পড়ে নাই। লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন সংস্করণ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বিষয়ের অনেক বাংলা বই রহিয়াছে। বাংলা একখানা গীতা-ভাষ্যের এক স্থলে এক কালি কাগজের চিহ্নও দেখিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রও আছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের কোন চিহ্নই দেখিলাম না।

কিছুকাল পরে দার্জিলিং-এ তাঁহার পড়িবার ঘরে দেখিতে পাইলাম—সুদৃশ্য মলাটে বাঁধানো শরৎচন্দ্রের

সবগুলি বই টেবিলের পাশে র‍্যাকের মধ্যে সজ্জিত রহিয়াছে। সযত্ন-রক্ষিত তাঁহার একটি বাক্সে 'কায়ার ফ্লাই' নামে অতি সুদৃশ্য মলাটে বাঁধানো রবীন্দ্রনাথের একখানি ছোট্ট বই দেখিয়াছিলাম মাত্র। তার পর আরও কয়েকটি ব্যাপারে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগের প্রমাণ পাইয়াছি। সর্বোপরি তাঁহার 'অব্যক্ত' পুস্তকখানি অবশ্য তাঁহার বাংলা সাহিত্য-প্রীতি এবং সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাইয়াছিল।

তিনি ছিলেন আর্টের সমঝদার—সৌন্দর্যের উপাসক। তাঁহার পড়িবার ঘর, বসিবার ঘর, হল্‌ ঘর, এমন কি—খাবার ঘরেও দেশীয় প্রখ্যাত শিল্পীদের অঙ্কিত ছবি, বিশেষতঃ অজন্তা গুহা-চিত্র এবং দেশীয় শিল্পকলার যে সকল নমুনা সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাঁহার সৌন্দর্য-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া তাঁহার বাড়ীর দ্বিতলের হল্‌ ঘরের চতুর্দিকে বড় বড় এমন কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ছবি সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, যাহা সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। সেগুলি হইল ফেরাওদের আমলের প্রাচীন মিশরের শিল্প, ভাস্কর্য, সামাজিক অনুষ্ঠান, যুদ্ধবিগ্রহ এবং নানাবিধ বৈষয়িক ব্যাপার সম্পর্কিত চিত্রাদির নিখুঁত প্রতিলিপি। ছবিগুলির নাম ছিল—"The Book of the Dead"—অতি প্রাচীন মিশরের চিত্রাক্ষর 'হাইরোগ্লিফিক্‌স্‌' হইতে আরম্ভ করিয়া ইহাতে ফেরাওদের 'মমি' তৈয়ারীর বিচিত্র প্রক্রিয়ার সর্বসমেত প্রায় দেড়-শতাধিক ছবি ছিল। কিন্তু সবগুলি টাঙান সম্ভব হয় নাই। সু-প্রাচীন বিদেশীয় সভ্যতার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রভৃতি সম্বন্ধে কতখানি অনুসন্ধিৎসা এবং অনুরাগ থাকিলে সাধারণের অজ্ঞাত এইরূপ দুষ্প্রাপ্য বস্তুর সংগ্রহ সম্ভব হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিজ্ঞান-মন্দিরের সুবৃহৎ অট্টালিকা, হল্‌ ঘর, বক্তৃতা-গৃহ, গবেষণা-কক্ষ, প্রভৃতি সব কিছুই ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণে জগদীশচন্দ্র কর্তৃক পরিকল্পিত। এই পরিকল্পনা রূপায়িত করিয়াছেন, অবনীনাথ মিত্র। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইহা একটি বিরাট্‌ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বিজ্ঞান-মন্দিরের ভবিষ্যৎ কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের কামনার বিষয় পূর্বেই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি প্রথমতঃ নয়জন কর্মীকেই আহ্বান করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য কর্মীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কর্মী নির্বাচনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপকে তেমন প্রাধান্য দিতেন না, অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অনুরক্তি, ধৈর্য এবং আনুগত্য, প্রভৃতি সম্বন্ধেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন।

বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতীক-চিহ্ন বজ্র ও অর্ধামলক তাঁহার নিজের পরিকল্পনা। নির্যাতিত দেবতাদের দুর্দশা মোচনের জন্য মৃত্যু বরণ করিয়া দধীচি নিজের অস্থি দান করিয়াছিলেন—আর সসাগরা ধরণীর অধিপতি মহারাজ অশোক যথাসর্বস্ব দান করিয়া আধখানা মাত্র আমলকি নিজের জন্য রাখিয়াছিলেন, অপরের প্রয়োজনে সেই অবশিষ্ট আমলকি-খণ্ড দান করিয়া রিক্ত-হস্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এই আদর্শকেই তিনি প্রতীক-চিহ্নে রূপায়িত করিয়া বিজ্ঞান-মন্দিরের সর্বত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের কর্মধারা পরিসমাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার আদর্শকে যেভাবে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত এই প্রতীকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই জন্যই তিনি শেষ কথায় বলিয়াছিলেন—

রিক্ত হস্তে আসিয়াছি, রিক্ত হস্তেই ফিরিয়া যাইব।
ইতিমধ্যে যাহা অর্জিত হইয়াছে তাহাই আশীর্বাদ মনে করিব।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাদেশিকতা

শ্রীরত্নমণি চট্টোপাধ্যায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আশাবাদী ছিলেন। জাতির ভবিষ্যতে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল; আর বিশ্বাস ছিল, সাধনার দ্বারা বাঙালীকে সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি জাতির কল্যাণকল্পে আজীবন কঠিন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। পুরুষকার ছিল তাঁর আশালতার আশ্রয়। অখণ্ড পুরুষকার অবলম্বনে তিনি স্বীয় জীবনকে কল্যাণকর্ম্মে মহান্ করিয়া গিয়াছেন এবং বাঙালী তথা ভারতবাসীর জন্য মহান্ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্য তখন জীবনের শেষ প্রান্তে। বয়স ৮০ পার হইয়া গিয়াছে। শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে, বেশির ভাগ সময় শয্যাগ্রহণ করিয়া কাটাইতে হয়। একদিন কথাবার্ত্তার সময় প্রশ্ন করিলেন—রামমোহন রায়ের জন্ম কোন্ সনে? উত্তর হইল ১৭৭২ কি ৭৪। চিন্তামগ্ন ভাবে আচার্য্য বলিলেন, তবেই দেখ না কেন। এই কথা বলিয়া তিনি আমাদের ভারত ইতিহাসের একটি বিশেষ ঘটনা লক্ষ্য করিতে আহ্বান করিলেন। বলিলেন, পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল তো ১৭৫৭ সনে। তার ১৫।১৬ বৎসর পরে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়—এ যেন নদীর বাঁকপথ। তার পর শ্রোতার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উপর আপন হাসিভরা বুদ্ধিদীপ্ত মুখ রাখিয়া আচার্য্য কথাটা বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন, পলাশী যুদ্ধের কালে বাংলা দেশের অবস্থা যত সঙ্কটময় ততটাই অন্ধকারময় ছিল। ইতিহাসে যুগ-পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেশের প্রধানদের মধ্যে পরস্পর সন্দেহ, অবিশ্বাস, আত্মস্বার্থ সাধনের জন্য দেশের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিবার অতিশয় হীন লজ্জাকর আয়োজন, পরাধীনতার ফাঁদে পা দিবার নারকীয় উল্লাস, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, রাজপুরুষদের উচ্ছৃঙ্খলতা, চারিত্রিক অবনতি ও ভ্রষ্টতা এবং দায়িত্ববোধ-শূন্যতা। অপর দিকে দেশের অভ্যন্তরে শ্মশানের বিভীষিকা—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মহাকাল বাংলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোককে গ্রাস করিয়া লইয়াছে, বাংলার ঘরে ঘরে কান্নার রোল। জাতীয় জীবনের এই ঘন অন্ধকার ও মহা দুর্যোগের দিনে বাংলার

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

এক নিভৃত পল্লীতে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিলেন। বাংলার লুপ্তপ্রায় জীবনধারা যেন বাঁকপথে আসিয়া মোড় ফিরিল। দূরে নদীর বাঁকপথ দেখিয়া মনে হয়, নদীর ধারা বুঝি সেইখানেই লুপ্ত হইয়াছে, আবার বাঁকপথে পৌঁছিলে বুঝা যায়, ধারা লুপ্ত হয় নাই, নদী মোড় ঘুরিয়াছে। বাংলার তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া—একদিকে পলাশীর লজ্জা ও অপরদিকে মন্বন্তরের হাহাকার দেখিয়া মনে হয়, যেন বাঙালীর প্রাণধারা সেইখানেই লুপ্ত হইয়াছে।

তৎকালে বাংলার কোলে রামমোহন রায়ের জন্ম বাঙালীর জীবনধারার সেই বাঁকপথ। এইখানে মোড় ঘুরিবার পর সেই ধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগ ঘটিল, জীবনধারা নূতন আদর্শ ও নূতন ভাবের সংস্পর্শে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে লাগিল এবং যুগমানব রামমোহনের কর্ম্মসাধনায় নব্যভারত-গঠনের পথ নানাদিকে খুলিয়া গেল।

নব্যভারতে এই নূতন পথের অন্যতম পথিক হইলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। সমুদ্রমন্থনে অমৃতের মত রামমোহনের কাল হইতে সুরু করিয়া সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বাঙালীর হৃদয়সমুদ্রমন্থনে যে অমৃতের উদ্ভব হয়, তাহা হইল বাঙালীর স্বদেশী বা স্বাদেশিকতা। এই স্বদেশীর দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই বাঙালী সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের পথে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষকে সেই মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ এই স্বাদেশিকতা বা দেশাত্মবোধকে ভারতের যুগধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যাত করেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন বাংলার এই স্বাদেশিকগণের অন্যতম। তাঁর জীবনব্রত ছিল স্বদেশীর সাধনা। তাঁহার মত অস্থিমজ্জায়, চিন্তায় ও কর্ম্মে এমন ষোল-আনা স্বদেশী মানুষ বিরল।

আচার্য্য রায় যখন কলিকাতা হেয়ার স্কুলের ছাত্র তখন মহানগরীতে স্বাদেশিকতার হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে। এই স্বাদেশিকতার দীক্ষাগুরুদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম। এই সম্বন্ধে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'চরিত-কথা' পুস্তকে লিখিয়াছেন :

> "বাংলার এই আধুনিক স্বাধীনতা ও স্বাদেশিতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নানা দিকে নানা লোক নানা চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই নূতন সাধনার সর্ব্বপ্রথম যুগের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু তিনজন—রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ। * * সুরেন্দ্রনাথই প্রথমে এই স্বাদেশিকতার মধ্যে এক অভিনব ও উন্মাদিনী ঐতিহাসিকী উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। সুরেন্দ্রনাথের তড়িৎসঞ্চারিণী বাগ্মী প্রতিভাই সর্ব্বপ্রথমে * * এদেশের নব্য শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মানসচক্ষে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অভিনব মর্ম্ম ও উন্মাদিনী উদ্দীপনা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করে।"

সুরেন্দ্রনাথের উন্মাদিনী বক্তৃতায় তরুণ ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয়ে এক নব উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে এবং ছাত্রাবস্থা হইতেই প্রফুল্লচন্দ্র দেশের স্বাদেশিকতার যুগকে বরণ করিয়া লইয়া জীবনে তার অভিনব গুরুদায়িত্ব বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন।

উত্তরকালে যাঁহারা বড় হইয়া উঠেন এবং চিন্তায় ও কর্ম্মে আপন মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া দেশ ও সমাজের মুখ উজ্জ্বল করেন, তাঁহাদের প্রথম জীবনের ছোটখাট ঘটনা হয়ত তত লক্ষ্য করিবার মত মনে হয় না। কিন্তু লক্ষ্য করিলে অনেক সময় অর্থ পাওয়া যায়। প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রাবস্থার এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করি। বিদ্যালয়ে পাঠের কাল হইতেই ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তারপর ১৮৮২ সালে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পাইয়া তিনি বিলাতযাত্রা করেন এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এই সময় তিনি নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করেন যে বর্ত্তমান যুগে ভারতে বিজ্ঞানের প্রয়োজনই সমধিক; বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বলিয়াছেন, সেই জ্ঞান আহরণ ব্যতীত ভারতে উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে না। তাই এডিনবরায় স্বাদেশিক প্রফুল্লচন্দ্র মুহূর্ত্তে আপন পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন। সাহিত্য ও ইতিহাসকে বিদায় দিয়া তিনি সেখানে বিজ্ঞানের ছাত্র হইলেন। এই ঘটনাটির পশ্চাতে তাঁহার যে গভীর স্বদেশপ্রেম ছিল তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দেশসেবার স্বপ্ন লইয়া তিনি দেশে ফিরিলেন। তখন বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার হাওয়া উঠিয়াছে। ক্ষেত্রের কোনদিকই বাদ যায় নাই। ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সেবা, শিল্প, কলা, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য সকলেতেই স্বাদেশিকতার রং ধরিতেছে। হিন্দুমেলা, ভারতসভা, ন্যাশনাল কনফারেন্সে স্বাদেশিকতা ঘনীভূত হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন শিক্ষাক্ষেত্রে—চমকপ্রদ ও কোলাহলমুখর রাজনীতিক্ষেত্রে নহে। ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি নব জ্যোতিষ্কের মত উদিত হইলেন এবং জীবনান্ত পর্য্যন্ত সেইখানে স্থির জ্যোতিষ্করূপে বিরাজ করিয়া দেশকে সর্ব্বভাবে শ্রেয়ের পথ প্রদর্শন করিয়া গেলেন।

দেশে ফিরিয়া প্রফুল্লচন্দ্র পরাধীনতার দুঃখ, অপমান ও বিড়ম্বনা অনুভব করিলেন। তাঁহার মত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ২৫০৲ টাকা মাসিক মাহিনায় প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের একটি পদ দেওয়া হইল—ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস্ সারা জীবন ধরিয়া দূরে রহিয়া গেল। চাকরি পাইবার পর এই লইয়া প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের নিকট অভিযোগ করেন। ইংরেজপুরুষ স্বভাবসুলভ দাম্ভিকতার সঙ্গে উত্তর দিলেন—কে আপনাকে এই চাকরি লইতে ডাকিয়াছে—চাকরি ছাড়া অন্য অনেক কাজ ও জীবনে আছে। প্রফুল্লচন্দ্রকে এই অপমান বড় বাজিল। এই সূত্রে গান্ধীজীর প্রথম জীবনের অনুরূপ একটি ঘটনার কথা মনে

পড়িতেছে। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিবার পর তিনি তাঁহার ভাই-এর হইয়া একটি ব্যাপারে সুপারিশ করিবার জন্য কাথিওয়াড়ের পলিটিক্যাল এজেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁর কথা বলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্রিটিশপুঙ্গব তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হুকুম করেন। তিনি ইতস্ততঃ করিলে সাহেবের হুকুমে চাপরাশি আসিয়া গান্ধীজীর ঘাড় ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইংরেজের দাম্ভিকতার এই আঘাত ইংরেজের উভয়েরই মনে পরাধীনতার তীব্র দহন জ্বালিয়া দেয় এবং এই প্রতিকারহীন লজ্জা ও অপমান উভয়ের মনে দেশসেবার সঙ্কল্প পরিপুষ্ট করিয়া অটল করিয়া তুলে।

প্রেসিডেন্সী কলেজ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আঁটঘাট বাঁধা কেল্লা। এই পরের কেল্লায় প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষকজীবনের প্রথমার্দ্ধে স্বদেশীর সাধনা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই কলেজের পরীক্ষাগারে রসায়নশাস্ত্রের মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তিনি জগদ্বিখ্যাত হন। এই সময়েই তাঁহার বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তিনি হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস রচনা করেন। সর্ব্বোপরি বহু সাধনা ও অপেক্ষার পর এইখানেই রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার অপূর্ব্ব সজ্ঞশক্তি বিকাশলাভ করে এবং তিনি ভারতীয় নব্য রাসায়নিকের দল সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। তখনকার দিনে ইহা আচার্য্যের অসাধ্যসাধন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সজ্ঞসৃষ্টির মূলে স্বাদেশিক প্রফুল্লচন্দ্রের একদিকে ছাত্রগণের প্রতি গভীর স্নেহ এবং অপরদিকে স্বদেশকে বড় করিবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প ছিল একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের প্রধান কারবার ছিল ছাত্রদের লইয়া। কত ছাত্রকে কতভাবে যে জীবন-পথে অগ্রসর করাইয়া দিবার জন্য তিনি সহায়তা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আচার্য্য নিজ জীবনে আত্মসেবা বা স্বার্থসেবা কখন করেন নাই। ছাত্রেরা তাঁহার আচরণে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিত তাঁহার সেই পরম সত্যকে—তাঁহার অনুক্ষণ জাগ্রত দেশাত্মবোধকে। ছাত্রদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের মত—একদিকে অফুরন্ত স্নেহ,অন্যদিকে সুগভীর শ্রদ্ধা। এই পবিত্র মধুর সম্পর্ক তাঁহাদের সকল কার্য্যকে আনন্দরসে ভরিয়া রাখিত এবং দেশসেবার স্বপ্নে ঝলমল করিত। বাংলাদেশে বিগত এক শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন কলেজে বহু অধ্যাপক নানা বিষয়ে অধ্যাপনা করিয়া কৃতিত্ব ও যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্যের স্বাদেশিকতা তাঁহাকে এমন একটি বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করিয়াছিল যাহা একান্ত বিরল। এইজন্য তিনি যেমন ছাত্রদের কাছে টানিতে পারিতেন, এমন বোধ হয় অপর কেহ পারেন নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজ দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে একটা অভিমান ছিল। তাঁহার ধুতি-চাদর ও চটির মধ্যে সেই অভিমান উগ্র হইয়া দেখা দিত একথা সকলে জানেন। এই অভিমান আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রেও বিদ্যমান ছিল। আচার্য্য চিরকাল সরল বেশভূষায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। পরবর্ত্তীকালে খদ্দর গ্রহণ করিয়া দেশের দীনতমের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। এই অভিমান আত্মাভিমান নহে, ইহাতে সঙ্কীর্ণতা নাই—ইহা দেশাত্মবোধ ও আত্মমর্য্যাদার আশ্রয়। ছাত্রগণ বিদেশে গিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করুক ইহা তিনি একান্তভাবে চাহিতেন কিন্তু তাহাদের বিদেশের ডিগ্রী গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি বলিতেন, বিলাতী ডিগ্রী নিয়ে দেশবাসীর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু উহাতে জ্ঞানান্বেষণের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। তিনি বলিয়াছিলেন—"আমাদের দেশে মেঘনাদ সাহা ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীমান্দ্বয় বিলাতী ডিগ্রীর মোহে স্বাদেশিকতাকে খর্ব্ব করেন নি এ পরম গৌরবের কথা।" ("সাধনা ও সিদ্ধি" বক্তৃতা)। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আভিজাত্য—ধনমান পদমর্য্যাদার অপেক্ষা রাখে নাই। তাঁহার কখনও মোটর গাড়ী ছিল না। ছিল ছোট একটি ঘোড়ার গাড়ী। এই গাড়ী করিয়া তিনি গড়ের মাঠে প্রতিদিন হাওয়া খাইতে যাইতেন—নহিলে শরীর টিঁকিত না। আর এই জন্যই কখন কখন রহস্য করিয়া বলিতেন, এ গাড়ী আমার মেডিকেল বিল।

চিরকুমার আচার্য্য অতিশয় সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। আপার সার্কুলার রোডে সায়ান্স কলেজের দ্বিতলে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একখানি ঘরে তিনি থাকিতেন। একটি চারপয়ের উপর সামান্য শয্যা বিস্তৃত থাকিত। আর কয়েকটি আলমারিতে বই ভর্ত্তি ছিল। বিজ্ঞানসেবী হইলেও প্রফুল্লচন্দ্র নিয়মিতরূপে সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার ঘরের আলমারিতে সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ক বহু পুস্তক ছিল। কত বিষয়ে যে তাঁহার পাঠের আগ্রহ ছিল তাহা যথাযথ বুঝানো যায় না। একদিন তাঁহার কাছে গিয়া দেখি,খুব মনোযোগ সহকারে মাইকেল কলিন্সের জীবনী পাঠ করিতেছেন। অপর একদিন "আর্ট ও আহিতাগ্নি" (যামিনী সেন প্রণীত) বইখানির বিভিন্ন অধ্যায়ের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি আমাদের দেখাইতে লাগিলেন। লাইনের নীচে দাগ দিয়া

তিনি বই পড়িতেন এবং পৃষ্ঠার পার্শ্বে ফাঁকা জায়গায় মন্তব্য লিখিয়া রাখিতেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রভৃতি বিষয়ে ভাল লেখা তিনি নিজ হাতে কাটিং করিয়া রাখিতেন। সেক্সপীয়র তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল একথা অনেকে জানেন। আবার এমার্সন হইতে তিনি অনেক সময় কথা উদ্ধার করিতেন। তাঁহার একটি বক্তৃতায় আছে—

"এমার্সন বলেন—'গোলাপ বাগান কার? আমার; আমার দেখে সুখ, চোখের তৃপ্তি, হৃদয়ের আনন্দ! বাগানের মালিক বেড়া বাঁধান, মালি রাখেন, জল সেচন করেন; সে অনেক কাণ্ড! কিন্তু অমন শোভা ত কারও একার নয়।' * *

কথাটি পাঠাগার সম্বন্ধেও সত্য।"

("পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা"—বক্তৃতা।)

১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গ বন্যায় আর্ত্তসেবা-কার্য্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আচার্য্য সংগঠন-শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় দেন। সে সময় বিজ্ঞান-মন্দির সেবামন্দিরে পরিণত হয়। আচার্য্যকে পাইয়া সেদিন সারা বাংলায় সেবাকার্য্যে কি অপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল! বাংলার গ্রাম সহর কোথাও আর বাকি ছিল না। সকল স্থান হইতে অন্ন-বস্ত্র অর্থাদি স্রোতের মত আচার্য্যের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আচার্য্য নিজে নৌকাযোগে উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত নানা স্থানে ঘুরিয়াছিলেন। আর্ত্তজনের অন্তহীন দুঃখের গভীর স্পর্শ আচার্য্যের মহান্ হৃদয়ে করুণার তরঙ্গ তুলিয়া তাঁহার স্বাদেশিকতাকে অভিনব শ্রী দান করিয়াছিল।

খুলনা দুর্ভিক্ষ ও উত্তরবঙ্গ বন্যায় দুঃখের দাবদাহের মধ্যে আচার্য্য চরকার মর্ম্ম উপলব্ধি করেন,—বুঝিতে পারেন, ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের মূক জনগণকে ঘোর দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিবার সম্ভাবনা চরকার মধ্যেই নিহিত আছে। একদিন তিনি চরকার ঘোর সমালোচক ছিলেন। এখন নিজহাতে চরকা কাটিয়া অপরকে চরকা লইতে আহ্বান করিলেন। এখানে বৈজ্ঞানিকের প্রেষ্টিজ স্বাদেশিকের পথে বাধা সৃষ্টি করে নাই।

চরকা ও খাদির কার্য্যের জন্য আচার্য্য বহু সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন—এই অর্থের পরিমাণ ৫৬০০০ টাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্র চর্চ্চার জন্য তাঁহার দানের পরিমাণ বড় কম নয়।

১৯০৮ সালে আলিপুর জেলে কানাই দত্তর ফাঁসি হয়। স্বাধীনতার সাধনের জন্য বাংলায় প্রাণোৎসর্গের ব্যাপার সেই আরম্ভ হইয়াছে। আচার্য্য তখন কানাই দত্তের আত্মীয় মেডিকেল কলেজের এক তরুণ ছাত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন—তোদের তাঁতিরা আজ দেশকে বাঁচালে। বাংলার বিপ্লবী দলের এই মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বলিয়াছিলেন, যে দেশে এমন যুবকদল জন্মগ্রহণ করেন সে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আস্থা রাখি। এদিকে গান্ধীজীর ভারতব্যাপী গণ-আন্দোলনে আচার্য্য ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর উপর আচার্য্যের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর দুঃখদারিদ্র্যের কথা ভাবিয়া আচার্য্য অভিভূত হইতেন। নব্য-ভারত গঠনে বাঙালী মধ্যবিত্তের দান সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। মধ্যবিত্ত ভাঙ্গিয়া পড়িলে বাঙালী ভাঙ্গিয়া পড়িবে এই আশঙ্কা তাঁহার প্রবল ছিল। বাঙালীর অন্ন-সমস্যা ও শিক্ষা-সমস্যা লইয়া তিনি অতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন। তাই সভায় দাঁড়াইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

"আজ এই জীবনসন্ধ্যায় রসায়নের পরীক্ষাগার থেকে বাহিরে এসে উৎকট অন্ন-সমস্যা সম্বন্ধে যদি আলোচনা আরম্ভ ক'রে থাকি, তবে আপনারা জানবেন সে নিতান্তই প্রাণের দায়ে। বাঙালীর আজ পেটের দায়। আজ সমস্ত দেশের ছাত্রদের গলা ছেড়ে ডেকে বিমর্ষভাবে আমাকে বলতে হচ্ছে—সাবধান, বিপদ্ সন্নিকট। * * * মধ্যবিত্ত বাঙালীর সন্তান ডিগ্রী পেলেই জীবিকা-সংস্থান করতে পারবে আর তার অভাবে চারিদিক্ অন্ধকার দেখবে এটা কত বড় ভুল আজ নিঃসংশয়ে তা বুঝে নিতে হবে। * * * কলেজের দ্বারে এই যে শত শত ছাত্র আঘাত করছে, মাথা খুঁড়ছে, এরা কি প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থী অথবা ডিগ্রীপ্রার্থী মাত্র—উদ্দেশ্য গলাধঃকরণ, উদ্গীরণ ও ডিগ্রী গ্রহণ। * * * যে শিক্ষায় শুধু মেরুদণ্ডহীন গ্রাজুয়েট তৈরী হয়, মনুষ্যত্বের সঙ্গে পরিচয় হয় না, যে শিক্ষা আমাদের 'ক'রে খেতে' শেখায় না, দুর্ব্বল অসহায় শিশুর মত সংসার-পথে ছেড়ে দেয়, সে শিক্ষার প্রয়োজন কি? * *"

দেশের অন্ন-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, সমাজ-সমস্যা, প্রভৃতি লইয়া আচার্য্য দেশের নানা স্থানে নানা ভাবে নানা

বক্তৃতা দিয়া দেশবাসীর চিত্ত উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের দৃষ্টি-পরিধির বিস্তার সাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালীর মনকে নানা দিকে মুক্ত করিয়া তাহার মানসিক জড়ত্বের অপসারণ করা। তাঁহার বক্তৃতা শুনিলে মনে হইত, শ্রোতা যেন তাঁহার সহিত পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া সকল দেশের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর ও কর্মবীরগণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হইতেছে এবং তাঁহাদের আদর্শ, উদাহরণ, নানা-বিষয়িনী চিন্তা ও বিবিধ চেষ্টা হইতে কর্মের আহ্বান পাইতেছে—যেন শুনিতেছে উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। আচার্য্য সকল সময়েই বলিতেন, সাধনার দ্বারাই জীবনে সিদ্ধিলাভ হয়—ডিগ্রী ও চাকরীর পশ্চাদ্ধাবনে নহে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে ভারতের চিরন্তন গুরু-শিষ্য সম্পর্কের ধারা পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার সকল চেষ্টা ও কর্মে, সকল চিন্তা ও আচরণে, তাঁহার প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদিতে স্বাদেশিকতা ওতপ্রোত হইয়াছিল। বাংলা ও ভারতের কর্মক্ষেত্রে তাঁহার শুচি, শান্ত, মঙ্গলময়, রূপ জীবনপথে আমাদের প্রেরণার চির উৎস হইয়া বিরাজ করুক।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭

শ্রীপরিমল গোস্বামী

"বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো আমার মনে"—আষাঢ়ের বৃষ্টিধারার সঙ্গে এই গানটি শুনতে শুনতে হঠাৎ তেইশ বছর আগের একটি মৃদু বর্ষাদিনের স্মৃতি জেগে উঠল মনে। জাগে এমনি অনেক স্মৃতি—অকস্মাৎ। কেমন ক'রে, জানি না।

তেইশ বছর আগের সেটি বর্ষাকাল নয়। ফেব্রুয়ারি মাস—২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭। আগের দিন আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ ছিল। তারই রেশ চলছে পরের দিনও। ভাঙা মেঘ, কখনো মৃদু বৃষ্টি।

সেদিন একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিন্তু তবু সেদিন এর সৌন্দর্য ঠিকমতো উপভোগ করতে পারি নি। আজ মনে হচ্ছে, সেদিন আমি একটি পরম গৌরবমণ্ডিত তীর্থে উপস্থিত হয়েছিলাম। একটি দিন মাত্র। কিন্তু সেই একটি দিন আমার জীবনে একটি মহৎ দিন, এবং এখন হৃদয়ঙ্গম করি, তা আমার অখ্যাত জীবনের যাত্রাপথকে একটি রত্নখচিত মাইল-স্টোনে চিহ্নিত ক'রে রেখেছে।

ইতিহাস রচিত হয়েছে সেদিন চন্দননগরে। তার আগে সেখানে কখনো যাই নি, এবং সেদিন গিয়েও চন্দননগরকে কোথাও দেখি নি, দেখেছি শুধু বহু সহযাত্রী সতীর্থের পরিচিত মুখ। স্থানীয় ভূগোল বা ইতিহাস কোনটাতেই সেদিন রুচি ছিল না। চন্দননগরকে সেদিন দেখেছিলাম একটিমাত্র ব্যক্তির ভিতর দিয়ে। তাঁর নাম শ্রীহরিহর শেঠ। স্থানীয় দ্রষ্টব্য অন্য কিছুই সেদিন দেখার প্রয়োজন বোধ করি নি। শেঠ মহাশয়ের সহৃদয়তা এবং তাঁর বিনীত ব্যবহার—এবং তাঁর সন্দেশের আয়োজনে সেদিন এমন একটি প্রাচুর্য প্রকাশ পেয়েছিল যে, মনে হয়েছিল স্বপ্ন দেখছি না তো!

চন্দননগর! কত দর্শনীয় ভরা ফরাসীদের রাজত্ব। আমি শুধু জেনেছি, চন্দননগর একটি রেলস্টেশন মাত্র। আর কিছু দেখি নি সেখানকার। তারপর দেখলাম হুগলী নদীর ঘাট। যে ঘাটে রবীন্দ্রনাথের হাউস-বোট বাঁধা আছে। 'অধ্যাপক' গল্পের নায়ক চন্দননগরের যে ঘাটে তার শকুন্তলাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল এবং যে শকুন্তলার তপোবন কুটিরটি গঙ্গার ধারেই ছিল, সেটি ঠিক কণ্বের কুটিরের মতো ছিল না। গঙ্গা থেকে ঘাটের সিঁড়ি বৃহৎ বাড়ির বারান্দায় উঠে গেছে। বারান্দাটি ঢালু কাঠের ছাদে ছায়াময়।

সে তো অনেক দিনের কথা। সে-ঘাটও আমি দেখি নি, অনুসন্ধানও করি নি সেটি কোথায়। কোনো তপোবন দেখব ব'লেও আশা করি নি। কিন্তু যা দেখেছি তা আমারই আশৈশব মনে লালিত স্বপ্নের বাস্তব রূপ।

গঙ্গার তীর থেকে সামান্য একটু দূরের সেই হাউস-বোটখানা। তারই মধ্যে ব'সে আছেন রবীন্দ্রনাথ। তীর থেকে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।

এর আগে তাঁকে দেখেছি তাঁরই বাড়িতে। ১৯৩৬ সালে মে মাসে, সন্ধ্যায়। (২৩শে মে?) সেদিন তিনি তাঁর গদ্যছন্দে লেখা অনেক কবিতা প'ড়ে শুনিয়েছিলেন "বিচিত্রা" গৃহে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির ৬।৩ নম্বর বাড়ির দোতলায়। তারপর দেখেছি চন্দননগরে আসবার সাত দিন আগে নাট্যনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু তার আকর্ষণ আমার কাছে ছিল অমোঘ। যতবার কাছে এসেছি "Familiarity breeds contempt" নামক প্রবাদ বাক্যটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, উল্টোটা সত্য মনে হয়েছে।

নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলাম একখানা, সম্মিলনীর পক্ষ থেকে। দলেও ভারী ছিলাম। একত্র গিয়েছিলাম অনেকে, কে কে এখন মনে নেই। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি সবাই প্রায় পরিচিত। শুনলাম বলাইচাঁদ এসেছে ভাগলপুর থেকে। তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখা গেল, তার জন্যনির্দিষ্ট ঘরে বিছানা বিছিয়ে সে দিব্যি আরামে ব'সে ব'সে চা খাচ্ছে, এবং শুধু চা নয়।

ওখানে ব'সে আলাপ করছি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে হাউস-বোটখানা দুলছে, যেমন দুলতে দেখেছি কিছুক্ষণ আগে গঙ্গার উপরে। বাল্যকাল থেকে ঐ বোটের সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় হয়েছে ছিন্নপত্রের ভিতর দিয়ে। চোখে দেখছি এই প্রথম।

ছিলাম পল্লীগ্রামে—পাবনা জেলার এক অখ্যাত গ্রামে। পদ্মা নদীতে এই জাতীয় বোট দেখেছি অনেক। ভিতরটা কেমন তাও দেখেছি। আমার এক আত্মীয় জল-জমিদারের খাজনা আদায় করতেন, প্রথম তাঁর বোটই দেখেছি পদ্মাতে। তাতে উঠে কি আনন্দ যে হ'ত। যেন একটা আস্ত জমিদারের কাছারি ভেসে বেড়াচ্ছে জলের উপর।

ছিন্নপত্রে বোটের কথা প'ড়ে সেই রকম বোটেরই কল্পনা জাগত। তার মধ্যে যুবক কবিকে (তাঁর চব্বিশ বছর বয়সের ছবি দেখা ছিল) কল্পনা করতে কষ্ট হ'ত না। এই বোট পাবনার ইছামতী নদী দিয়ে চলেছে, সাজাদপুর এসেছে বর্ষায়, সবই যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ মনে হ'ত। কারণ স্কুল-জীবনের অনেকটাই কেটেছে সাজাদপুরের কাছে। কুষ্টিয়ার গড়াই নদীতে এই বোট ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছিল, ছিন্নপত্রে তার কি অদ্ভুত সুন্দর সংক্ষিপ্ত এবং সংযত বর্ণনা আছে। এই কুষ্টিয়ার সঙ্গেও আমার বাল্যকালের পরিচয়। ইছামতী নদীর উপর বাস করেছি অনেকদিন। সব মিলেমিশে একটা রোম্যান্টিক অনুভূতি।

অতএব এই বোট দেখামাত্র মন আনন্দে বিহ্বল হ'ল, এতে মনের কি দোষ? কখন্ কোন্ ফাঁকে ওখানে যাওয়া যায় সেটাই ছিল প্রধান চিন্তা।

চন্দননগর গিয়েছি কোন্ বিশেষ উপলক্ষে তা এতক্ষণ বলা হয় নি। উপলক্ষ বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন। অভ্যাগতদের বিরাট্ তালিকা। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীহরিহর শেঠ, সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সাহিত্য-শাখার সভাপতি প্রমথ চৌধুরী, সাংবাদিক-সাহিত্য-শাখার সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও যে কত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তা এখানে উল্লেখ বাহুল্য। সভা উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিন্তু এ হ'ল সম্মিলনের ইতিহাস। আমার বক্তব্য অন্য। উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ। অর্থাৎ আমার হাতে ছিল ক্যামেরা এবং এতদিন নিজের খুশি মতো রবীন্দ্রনাথের কোনো ফোটোগ্রাফ তুলতে পারি নি সেই দুঃখে ম্রিয়মাণ ছিলাম। চন্দননগরে আমার সহায় হলেন অমল হোম। আমার প্রধান উদ্দেশ্য, বোটের মধ্যে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি তোলা। হুকের সাহায্যে হোক বা ক্রুকের সাহায্যে হোক, এ সুযোগ ছাড়া হবে না, কেননা আর পাব না। ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে একখানি মাত্র ফ্ল্যাশলাইট ফোটো-তুলে তৃপ্তি পাই নি। সে কথা পরে বলছি।

অমল হোম অভয় দিলেন। ঠিক হ'ল সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার পর আর বেশিক্ষণ সভায় থাকা হবে না, সভা থেকে বেরিয়ে সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হবে। কিন্তু সভারম্ভের আগে বসে থাকি নি। একখানা গ্রুপ ফোটো তুললাম শ্রীহরিহর শেঠকে কেন্দ্র ক'রে। সে ফোটোগ্রাফখানা ও অন্যান্য ফোটোগ্রাফ, তখন ছোট্ট একটা বিবরণ লিখেছিলাম, তার সঙ্গে ভারতবর্ষে ছাপা হয়েছিল কয়েকদিন পরেই। ফোটোগ্রাফে আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, নীহাররঞ্জন রায়, সজনীকান্ত দাস, সুবোধ রায়, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ছবি

তুলনায় রবীন্দ্রনাথ যখন সভায় প্রবেশ করেন তখন। তাঁর হাতে চশমা, এবং তাঁকে ধ'রে আনছেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী এবং অনিলকুমার চন্দ। সুধাকান্ত সম্ভবত কোনো 'এক্সট্রা স্পেশাল' কুন্তলবর্ধক তেল ব্যবহার ক'রে নামের সার্থকতাটা মাথার উপর দিয়ে বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন। কারণ তাঁর মাথার চাঁদি প্রায় চাঁদের মতো, উপরন্তু এমন পালিশকরা যে, তাতে মুখ দেখা যায়। অথচ নামের দিক্ দিয়ে কিন্তু অনিলকুমারই চাঁদ, দ্বিতীয় ভাষায় চন্দ্। অথচ তাঁর মাথা ঘনচুলে ঢাকা (১৯৩৭)।

রবীন্দ্রনাথ মঞ্চের উপর এসে বসলেন। তারপর যে ভাষণ দিলেন তা অলিখিত। কিন্তু বললেন যেন আগাগোড়া মুখস্থ করা। কোথাও কোনো দ্বিধা নেই, প্রত্যেকটি বাক্য কণ্ঠ-ঝর্ণা থেকে যেন স্বতঃউৎসারিত। যেন একটি গান গাওয়া হল বক্তৃতার নামে, এমনি সম্পূর্ণ এবং ছন্দোময় তাঁর শব্দসংযোজন-কৌশল এবং ভাষণ-ভঙ্গী। একটি বক্তৃতা সকল দিক্ দিয়ে সমতা রক্ষা ক'রে এমন একটি অখণ্ড রসোত্তীর্ণ রূপ নিয়ে জন্মাতে পারে তা রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা না শুনলে ধারণা করা শক্ত। তিনি সেদিন যা বলেছিলেন তার ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র এখন মনের এক অবচেতন গোপন কোণে জমা হয়ে আছে। কিন্তু চন্দননগর থেকে সদ্য সংগৃহীত 'বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন' নামক সুবৃহৎ পুস্তিকা ওল্টাতে গিয়ে সব মনে প'ড়ে গেল।

আমার শোনা এই তাঁর শেষ বক্তৃতা, অবশ্য এর পর ১৯৩৮ সালে কালিম্পং থেকে আবৃত্তি করা জন্মদিনের কবিতা বেতার-মাধ্যমে শুনেছি।

আগেই বলেছি, আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল বোট। সাহিত্য অপেক্ষা করতে পারে, বোট পারে না। ঐ বোটখানা স্পর্শ করতে পারলেই জীবনের একটি বড় সার্থকতা লাভ হবে এমনি তখনকার মনোভাব। বলেছি, অমল হোমের সঙ্গে আগেই ষড়যন্ত্র করা ছিল। অতএব আমরা দু'জনে কাউকে কিছু না ব'লে বেলা প্রায় তিনটের সময় সেই বোটের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। বোটে উঠতে আরও একখানা খেয়া নৌকো দরকার হয়। ইশারা করতেই সেখানা এগিয়ে এলো। দু'জনের জায়গায় আমরা তিনজন গিয়ে উঠলাম। আমাদের সঙ্গী নীহাররঞ্জন রায়। প্রথম সুযোগ তিনিও হারান নি।

কবির সান্নিধ্য এমন ভাবে একখানি ভাসমান বাড়ির মধ্যে পাওয়া সত্যিই জীবনের একটি বড় সার্থকতা ব'লে মনে করেছিলাম সেদিন। আজ সেই মুহূর্তটিকে কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি। এটি আনন্দ কিনা জানি না, কিন্তু বুঝতে পারি, এটি এমন প্রবল একটি উপলব্ধি যা জীবনে খুব বেশি ঘটে নি। আশৈশব 'রবিবাবু' একটি ভাবরূপে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন, যাকে অতিক্রম ক'রে সম্পূর্ণ 'অবজেকটিভ' দৃষ্টিতে আমি তাঁকে কখনো দেখতে পারি নি। তাই ক্যামেরা নামক যন্ত্রে তাঁর বাস্তব রূপটি দেখব ব'লে এমন ব্যগ্রতা। মনের দিক্ থেকে বাস্তব রবীন্দ্রনাথকে বাস্তব মানুষ ব'লে কোনো সময়েই মন মানতে চায় নি। কাছে বা দূরে, তিনি সব সময়েই আমার কাছে একটি অস্পর্শ-যোগ্য অশরীরী সত্তা। মনের এ কি ব্যবহার আমি জানি না। তাই বোটের ভিতর গিয়ে প্রথমেই কোন্ অনুভূতিটি প্রবল হয়ে উঠেছিল তা বিশ্লেষণ করা শক্ত। তবে তাঁর পোষাকের রং দেখে পাঁচ বছর আগের একটি বেদনাময় অনুভূতি পুনরায় মুহূর্তের জন্য মনে জেগে উঠেছিল এই কথাটা শুধু মনে আছে। গেরুয়া রঙের ধুতি পাঞ্জাবি এবং চাদর। দৃষ্টিতে কিছু উদাস ভাব। পোষাকের এই রং দেখেই ১৯৩২ সালে নিউ এম্পায়ারে অভিনীত 'নবীন' ঋতুনাট্যের একটি গানের কথা হঠাৎ বিদ্যুতের মতো মনে একটা ধাক্কা মেরেছিল। পর পর তিনদিন দেখেছিলাম সেই অভিনয়। তার মধ্যে অনেকগুলো গানই ছিল কবির আসন্ন বিদায়-বেদনার রসে মণ্ডিত। তারও মধ্যে—ঝরাপাতার গানের কয়েকটি কথা আমার মনে দারুণ দাগ কেটে গিয়েছিল। সেই যে—

> "তোমার মতো আমায় উত্তরী
> আগুন রঙে দিও রঙীন করি,
> অস্তরবি লাগাক পরশমণি প্রাণের মম শেষের সম্বলে।"

এই ক'টি কথা আজও মনে পড়লে সেই প্রথম দিনে শোনার শিহরণ জেগে ওঠে মনে।

সেই আগুন-রঙা পোষাকেই ব'সে আছেন কবি অস্তরবির পরশমণির দিকে চেয়ে। তাঁর এই নিঃসঙ্গ মূর্তিটি দেখে হঠাৎ মনে হয়েছিল, এক কল্পজগতে প্রবেশ করেছি। এখানে কিছুই যেন সত্য নয়। কবি যেন পৃথিবীর সকল সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে বহু দূরে স'রে গেছেন। যেন অন্য জগতে প্রবেশ করেছেন।—কিন্তু এ অনুভূতিটি চকিত। কল্পনা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

কবি কিন্তু প্রকৃতই নিঃসঙ্গ ছিলেন না। পাশে অনিলকুমার চন্দ ছিলেন, যদিও সেই আগুনের কাছে তাঁর শাদা পোষাক নিষ্প্রভ। কবি নিঃসঙ্গ ছিলেন না অন্য অর্থেও। তাঁর নিজের গড়া এক অতি বিরাট্ এবং বিচিত্র জগতের মালিক তিনি। মহাকাশের সঙ্গেও তাঁর বিজ্ঞানীসুলভ পরিচয় ছিল। বাল্যকাল থেকে তিনি গায়ত্রী-মন্ত্রের সঙ্গে নিজেকে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে ক্ষণকালের জন্য নিজের আত্মার বিরাট্ স্বরূপকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন। সেই থেকে আমৃত্যু তিনি বিশ্বের সঙ্গে একাত্মকতা উপলব্ধি ক'রে আসছেন। এবং তা মনের কোনো কাব্যসুলভ মুডের ব্যাপার নয়, সমস্ত জীবনের সাধনাই ছিল তাঁর সেটি। একই সঙ্গে ছোটর সঙ্গে ছোট হয়ে মেশা এবং বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে ব্যাপ্ত ক'রে দেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর।

সেদিন আরও একটি জিনিষ লক্ষ্য করেছিলাম। দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে একটি রেডিও সেট্ তাঁর দরকার ছিল এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য ছিল একটি বিনোকুলার। বোটের মধ্যে যতটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায় তার চেষ্টার অভাব ছিল না।

আমার হাতে ক্যামেরা থাকাতে আমার উদ্দেশ্যের কথা আর ব'লে দিতে হ'ল না। বাইরে তখন ট্যালকাম পাউডারের মতো জলের পাউডার ঝরছে আকাশ থেকে। নৌকো একটু একটু দুলছে। তবু আমার কাজের কোনো অসুবিধা হ'ল না।

কয়েকটি ছবি নেওয়ার পর সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর প্রবেশ। হয় তো কবি তাঁর অপেক্ষা করছিলেন, হয় তো অপেক্ষিত সময় পার ক'রে তিনি এসেছেন, এবং কবি সেজন্য কিছু উদ্বিগ্ন হয়েছেন সম্ভবত, কিন্তু কবির ব্যবহারে তা কিছুই আমাদের বোঝবার উপায় নাই। হয় তো সুধাকান্ত বুঝে থাকবেন। কারণ কবি সুধাকান্তের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে মৃদু হেসে বললেন, "সিনেমা দেখা হ'ল?"

"এখানে সিনেমা!" অবাক্ হলেন সুধাকান্ত।

গম্ভীর সুরে কবি বললেন, "চন্দননগরে হয় তো হয়, ঠিক জানিনে।"

আমি ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়ে আছি, কৌতুক অনুভব করছি এ ধরনের অপ্রত্যাশিত কথাবার্তায়। বোটের বড় বড় জানালাপথে যেটুকু আলো আসছে, তা শেষ হয়ে যাবার আগে যতটা পারি তার সুবিধাটুকু আদায় ক'রে নিচ্ছি। বিমর্ষ প্রকৃতি। বাইরে নৌকারোহী ছেলেদের কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে বোটের ভিতরে।

আমি তিন-চার মিনিটে তিন-চারটি ছবি তুলে আসনে বসেছি। অমল হোম কিঞ্চিৎ উত্তেজিত। আমিও, কিন্তু সে সময়ে সংযত ছিলাম। উত্তেজনার কারণ অত্যন্ত লোভনীয় সন্দেশের প্রাচুর্য। কথাটা পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মতো অবশ্যই। প্রিয়জনকে তো বটেই।

অমলবাবু অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় বললেন, "এঁরা যা খাইয়েছেন তা ভুলতে পারব না। সব চমৎকার—বিশেষ ক'রে সন্দেশ, চমচম।" কণ্ঠস্বরের আবেগ প্রায় কাব্যের ধাপে উত্তীর্ণ। আদিম যুগ হলে অমল হোম গান গেয়ে উঠতেন। একটি মনোহর সংবাদ শুধু রসনার উল্লাসে যে এমন রসাত্মক হয়ে উঠতে পারে সে অভিজ্ঞতা হয় তো অনেকেরই আছে। কোনো বিস্ময়ের কথা যখন মনকে অতি চঞ্চল করে, এবং তা প্রিয়জনকে না ব'লে থাকা যায় না, তখনই বুঝতে হবে প্রকৃত সাহিত্যের সূত্রপাত হ'ল।

এই আবেগ কবির মনে সাড়া না জাগিয়ে পারে নি। যেন সামান্য স্ফুলিঙ্গ থেকে বারুদে আগুন লাগল। কবির দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেল অনিলকুমার চন্দের দিকে। তিনি তিরস্কারের সুরে বললেন, "অনিল, তুমি তো ওখানে ব'সে এসে আমি খাব না, শুনলে তো?"

অনিলকুমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়জাত বোধ থেকেই সম্ভবত বললেন, "ওঁরা খাবার পাঠিয়ে দেবেন।" আত্মরক্ষার চেষ্টা এটা, কিছু না জেনেই বলা হয় তো। কিন্তু কথাটা যে সত্য তা একটু পরেই প্রমাণ হয়ে গেল। প্রকাণ্ড সরাতে মূল্যবান্ সেই সব সাহিত্য- এবং সাহিত্যিক-উদ্দীপক এসে পৌঁছল। কবির দৃষ্টিতে এক ঝলক খুশির বিদ্যুৎ।

এই সময়ে যে সব আলোচনা হয়েছিল তার সামান্য একটুখানি অংশ এখানে বিবৃত করছি। (এই বোটের ভিতরকার আলোচনা এবং পরবর্তী আগন্তুকদের সংবাদ ভারতবর্ষে আমি খুব সংক্ষেপে লিখেছিলাম সে সময়, সেই লেখাটি পরে আমার 'ম্যাজিক লণ্ঠন' বইতে সংকলিত হয়। এ রচনা লেখার সময় বইখানা সামনে খুলে রেখেছি।)

আলোচনা কবির বক্তৃতা নিয়ে আরম্ভ হ'ল। নীহাররঞ্জন বললেন, "আপনার বক্তৃতা খুব পরিষ্কার শোনা গেছে।"

রবীন্দ্রনাথ

[ফোটো : শ্রীপরিমল গোস্বামী

চন্দননগর সাহিত্য সম্মেলনে প্রথম সারির বাঁদিকে—২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ৩ শ্রীঅমল হোম, ৪ শ্রীহরিহর শেঠ, ৫ শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, ৬ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৭ শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ রামকমল সিংহ। দ্বিতীয় সারির বাঁদিকে—১ শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ৩ শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৪ শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৫ বনফুল, ৬ শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, ৮ শ্রীনরেন্দ্র দেব, প্রভৃতি।
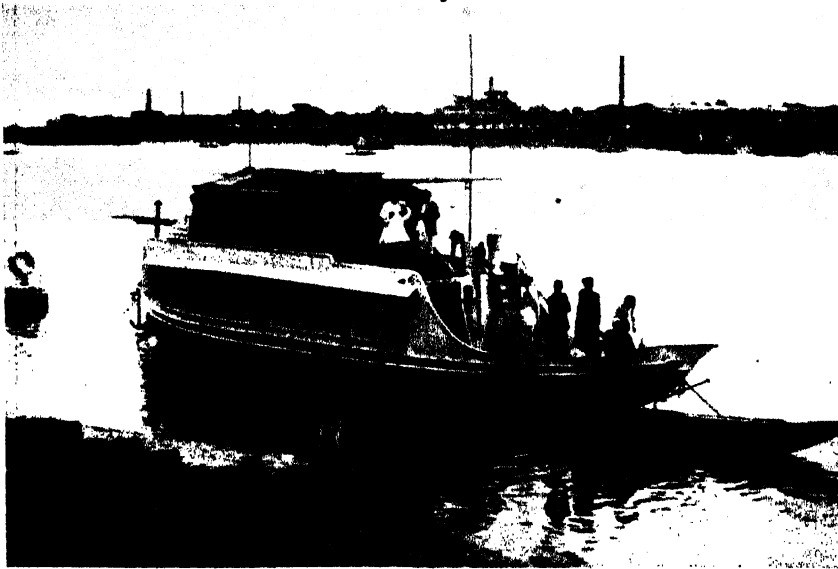
চন্দননগর গঙ্গার ঘাটে রবীন্দ্রনাথের বোট

[ফোটো-দুইটি শ্রীপরিমল গোস্বামী কর্তৃক গৃহীত

পরিষ্কার এই অর্থে যে মাইক্রোফোন এবং অ্যাম্‌প্লিফায়ারের ভাল ব্যবস্থা ছিল।

কবি বললেন, "বড় বড় বক্তৃতা কেউ শোনে না, আর সাহিত্য বিষয়ে কিছু বললে সেখানে লোকও বেশি আসে না।"

সত্যিই সভায় আশাতীত রকমের বড় ভিড় হয় নি।

কবি বলতে লাগলেন—খুব সহজ এবং গম্ভীরভাবে—অথচ কণ্ঠে মৃদু ব্যঙ্গের সুর ফুটিয়ে—"এর সঙ্গে সিনেমা দেখালেই তো পারে। ধর এর সঙ্গে যদি আলিবাবা দেখানো হ'ত!"

লক্ষ্য করলাম, কবি এই অল্প সময়ের মধ্যে সিনেমা প্রসঙ্গ দুবার তুললেন। 'পরে এ নিয়ে ভেবেছি। আজ (১৯৬০) থেকে তেইশ বছর আগে (এবং তাঁর মৃত্যুর প্রায় চার বছর আগে পর্যন্ত) দেশী সিনেমার প্রসার আজকের মতো হয় নি। তবে উত্তেজনা এবং উন্মত্ততার প্রথম লক্ষণ সে সময়ে যথেষ্ট প্রকট হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সিনেমায় বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ নড়াচড়া করছে, কথাও বলছে, এতেই জনতার উল্লাস। মনে হয়, কবি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলেন শুধু সাহিত্য আর ভবিষ্যতে লোককে টানবে না, সিনেমা দেখিয়ে সাহিত্যসভায় লোক টানতে হবে।

কবি সম্পর্কে আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তা হলে তাঁর সেদিনের সেই অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা ভবিষ্যৎ এতদিনে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এখন সিনেমাই তো আমাদের একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা। সাহিত্য ডুবেছে—এবং শিক্ষা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বন্যায় সব তলিয়ে গেছে, ভেসে আছে শুধু সিনেমা। আত্মক্ষমতায় বিশ্বাস হারালে যেমন মাদুলি ভরসা, সাহিত্যে বিশ্বাস হারালে তেমনি সিনেমা ভরসা। এখানে অন্তত সকল সমস্যা, সকল অভাব, আড়াই ঘণ্টায় মিটে যায়।

এর মাত্র পাঁচ দিন আগে (১৭. ২. ৩৭) কবি বিশ্ববিদ্যালয়ে কন্‌ভোকেশন বক্তৃতা দিয়েছেন। এ সময়ে আমার রেডিও স্টেশনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তাই আমি শুনেছিলাম যে তাঁর কন্‌ভোকেশনের বক্তৃতা রেডিও থেকে ছয়খানা রেকর্ডে ধ'রে রাখা হয়েছে। কবিকে বললাম সে কথা।

কবি জানতে চাইলেন, "সবটাই কি নিয়েছে?" আমি বললাম, "না, খানিকটা নিয়েছে।" কবি তখন বিলেতের কথা তুললেন। সেখানেও তিনি শুনেছেন তাঁর কণ্ঠস্বর ব্রডকাস্টিং-এর পক্ষে খুব সুন্দর।

এই সময় যশোদা পাল প্রতিষ্ঠিত নাট্যনিকেতনে গোরা নাটকের অভিনয় হচ্ছিল। উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র। ১০ই জানুয়ারি ১৯৩৭ রবিবার গোরা নাটক প্রথম দেখি সেখানে, যশোদা পালের নিমন্ত্রণে। এবং রেডিওতে তার সমালোচনা করি। ১৪ই ফেব্রুয়ারি (১৯৩৭) যেদিন রবীন্দ্রনাথ নাট্যনিকেতনে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন, সেদিন আমি তাঁরই অনুরোধে মঞ্চের উপর থেকে প্রথম সারিতে উপবিষ্ট কবির একখানা ফ্ল্যাশলাইট ফোটোগ্রাফ তুলি। (এই ফোটোর কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি।)

গোরা নাটকের অভিনয় কবি দেখেছেন, আমি তো আগেই দেখেছি, অতএব সেই প্রসঙ্গ তুললাম। কবি বললেন, "আমি উপন্যাসে যা লিখেছি সেই কন্‌সেপ্‌শন নিয়ে স্টেজে কোনো নাটক হওয়া শক্ত, তবে ওরা যেটুকু করেছে, তা ভালই হয়েছে।"

আমারও মোটের উপর ভাল লেগেছিল। সবচেয়ে অকৃত্রিম মনে হয়েছিল ছোট্ট একটি ভূমিকা—হরিমোহিনীর (দুর্গারাণী করেছিলেন)। সে কথা কবিকে বলাতে তিনি তা স্বীকার করলেন, এবং বললেন "কিন্তু আমি দেখলাম, পানুবাবুর (নরেশ মিত্র) অভিনয়টা সাধারণের পক্ষে সহজ হয়েছে, দর্শক হরিমোহিনীকে সে ভাবে নিতে পারে নি। তা ছাড়া পরেশবাবুর (অহীন্দ্র চৌধুরী) ভূমিকাও খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।"

অমল হোম বললেন, "হরিমোহিনী চরিত্রের সঙ্গে বাঙালী অতি পরিচিত, তাই ওর মধ্যে বোধ হয় কোনো সৌন্দর্যই দেখতে পায় নি।"

কবি বলেন, "তা হবে।"

আমি যোগ করলাম, "একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি। যার যা কিছু বিদ্যা, তা এখন হয় সিনেমায় না হয় থিয়েটারে বিক্রি হচ্ছে। যেমন গোরা নাটকে একটা গোটা ব্যায়াম-সমিতি এসে তাদের ব্যায়াম-কৌশল দেখাচ্ছে।"

কবি গম্ভীর ভাবে বললেন, "নাটকে হঠযোগের কথা থাকলে তাও দেখতে পেতে।"

এই ভাবে এক কথা থেকে আর এক কথা, এবং এক অভ্যাগত থেকে আর এক অভ্যাগত। অর্থাৎ এতক্ষণে

বোটের মধ্যে নতুন আক্রমণ শুরু হল। প্রথম বনফুল, তার পর নলিনীকান্ত সরকার, সজনীকান্ত দাস, ও পরে
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এসে পৌঁছলেন।

নতুন সভা বসল। বাইরে ছিল সাহিত্য-সভা, বোটের ভিতর বসল ভাষাতত্ত্বের সভা। এই সব বিবরণ
আমার পূর্ব প্রবন্ধে বিস্তারিত আছে। বানান প্রসঙ্গে জোর আলোচনা চলল। পরিশেষে কবি সুনীতিকুমারকে
বললেন, "বানান বিষয়ে একখানা অভিধান লেখ ; তাতে শব্দার্থ থাকবে না, শুধু বানান কেমন হওয়া উচিত
তাই থাকবে।"

সুনীতিকুমার সম্ভবত সে অভিধান আজও লেখেন নি। কবি তৎভব শব্দের যথাসম্ভব ধ্বনিগত বানানের
পক্ষপাতী ছিলেন।

বর্ত্তমানে বানানের অরাজকতা চরমে উঠেছে। সম্পাদক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—মাসে
চার পাঁচ শ লেখা এবং প্রচুর চিঠি পাই। লেখকদের শতকরা একজনও আগাগোড়া শুদ্ধ বানান লিখতে পারেন
না। সুনীতিকুমার অভিধান লিখে এ অরাজকতা রোধ করতে পারবেন ব'লে মনে হয় না। ব্যাকরণ লিখে
পারেন নি। তাই সেদিনের বোটের ভিতর বানান নিয়ে যে সব গুরুতর আলোচনা হয়েছিল তা বর্ত্তমানের
পরিপ্রেক্ষিতে কমিক ব'লে মনে হতে পারে। এখন আর এ আলোচনায় কেউ গুরুত্ব দেবেন না।

সেদিন আরও দু-একটি কথা হয়েছিল, তার সাক্ষী আছেন একমাত্র অমল হোম। সে কথা প্রকাশ করা
চলবে না আজও, হয় তো কোনো দিনই না। প্রকাশ করলে সাহিত্যজগতে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে।

কিন্তু সে কথা থাক। সেদিন রবীন্দ্রনাথকে বহুদিন পরে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে পেয়েছিলাম, সেই স্মৃতি
আজ আমার কাছে বড়।

আরও বড় এই কারণে যে সেদিন তাঁর বোটের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। বাল্যকালের সকল স্বপ্ন
সেদিন রূপ ধরেছিল। কবি নিজেও এই বোট ভালবাসতেন তার প্রমাণ পেলাম তাঁর একটি কথায়। তাঁর ছবি
তোলার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন "আমার বোটের একখানি ছবি নিও, এ আমার বহু দিনের বোট।"

সে আদেশ পালন ক'রে আমি ধন্য হয়েছি।

সহপাঠী সুভাষ

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবর সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হয়, প্রেসিডেন্সী কলেজের ত্রৈবার্ষিক শ্রেণীতে পড়তে এসে। সুভাষ কটক
হতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ ক'রে এই কলেজের প্রথম বৎসর হতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ আরম্ভ করেছিল।
আমার অন্যতম সুহৃদ দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে সেখানে তার আলাপের সূত্রপাত হয়। আমি আবাল্য মেট্রপলিটান
স্কুলে পড়েছিলাম। দিলীপকুমার এখানে পুরাতন তৃতীয় ও বর্ত্তমান অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়ে আমার সহপাঠী হন।
ম্যাট্রিক পাশ ক'রে আমি মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে) ভর্ত্তি হই ও সেখান হতে আই.
এসসি পরীক্ষা পাশ করে পদার্থ বিজ্ঞানে "অনার্স" পাঠের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে চ'লে যাই। ঐ সময় বিদ্যাসাগর
কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নে "অনার্স" পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না। প্রেসিডেন্সী কলেজ সম্পর্কে কোনও দিন
আমার কোনও মোহ না থাকায় এবং আমার প্রাচীন কলেজের অধ্যাপকদের স্নেহ ও যত্নের বন্ধন দৃঢ় থাকায়, আমি
নিতান্ত বাধ্য হয়েই সরকারী কলেজটিতে ভর্ত্তি হই। কিন্তু সেখানে যে-সকল বন্ধুলাভ ঘটেছিল, তাতে পরবর্ত্তী
জীবনে এজন্য মনে কোনও ক্ষোভ থাকে নাই। অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে অনেকের সঙ্গে স্নেহ-সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হবার
সৌভাগ্য এখানেও ঘটেছিল, একথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হয়, কলেজের পত্রিকা বিতরণ উপলক্ষে; সুভাষ ছিল তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র-প্রতিনিধি; ও সম্ভবতঃ সেই হিসাবেই পত্রিকাটি আমাকে দিতে এসেছিল। এ ধরণের আলাপে বন্ধুতা জমে না; কারণ, আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র, সুভাষচন্দ্র দর্শনের। কোনও ক্লাসে একসঙ্গে দেখা হবার কোনই কারণ ছিল না। বন্ধুতা গ'ড়ে ওঠে কলেজের একটি বিখ্যাত ধর্ম্মঘট কেন্দ্র ক'রে। অধ্যাপক ওটেন কিছু ছাত্রের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করার ফলে এই ধর্ম্মঘট শুরু হয়। অধ্যক্ষ জেম্‌সের অনুমোদন নিয়ে কয়েকজন ছেলে হেয়ার স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সভায় গিয়েছিল ও কিছু বিলম্বে ক্লাসে ফিরছিল। তারা যে ক্লাসটিতে যাচ্ছিল, সেই ঘরের ঠিক আগের ঘরটিতে অধ্যাপক ওটেন ক্লাস করছিলেন। ছেলেরা গল্প করতে করতে বারাণ্ডা দিয়ে তাঁর ক্লাস পার হয়ে যাচ্ছিল; তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসে বকাবকি করেন ও পরে ঘাড় ধ'রে কয়েকজনকে ধাক্কাও দিয়েছিলেন। একজন তরুণ অধ্যাপকও নাকি ছাত্রভ্রমে এভাবে নিগৃহীত হন, কিন্তু চাকুরির মায়ায় তিনি সেটা হজম ক'রে গিয়েছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি। যাই হোক, ফলে সেই ছেলেরা তাদের ক্লাসের প্রতিনিধিসহ অধ্যক্ষ মহাশয়কে জানায় যে, এই রকম ব্যবহারের জন্য অধ্যাপক ওটেনের দুঃখপ্রকাশ করা কর্ত্তব্য। অধ্যাপক তাতে রাজী হন নাই; এবং প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট শুরু হয়, তার পরদিন হতে। আমি ছাত্রদের প্রতিবাদের কথা শুনেছিলাম; কিন্তু ফলাফল জানার আগেই বাড়ী চ'লে আসি। কারণ, আমার মা ঐ সময়ে অসুস্থ ছিলেন। পরদিন সকালে কলেজে যেয়ে দেখি, কলেজের প্রাঙ্গণে গেটের সামনে সুভাষচন্দ্র ও আরও কিছু ছেলে দাঁড়িয়ে। সুভাষের কাছে ব্যাপার শুনে আমি বই ও খাতা বগলদাবা ক'রে অন্যদের সঙ্গে গেটে পাহারায় দাঁড়িয়ে গেলাম। খানিক পরে অধ্যাপক জেম্‌স্ এসে আমাদের ক্লাসে যেতে অনুরোধ করলেন। কিছু ভয়ও দেখালেন বৃত্তি বন্ধ ক'রে দেবার, ধর্ম্মঘট করার জন্য। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকায় তিনি পরিশেষে আমাদের কলেজের প্রাঙ্গণ ছেড়ে চ'লে যেতে বললেন। আমরা তখন ইডেন হিন্দু হোস্টেলে গেলাম। ওখানে ছাত্রপ্রতিনিধিরা একটা সভা আহ্বান ক'রে কর্ত্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করে। এই আলোচনার সময় কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ হতে যাতে কোনও বাধা না আসে, এজন্য সুভাষচন্দ্র ও অন্যেরা দ্বাররক্ষার ভার আমাকে দিয়েছিলেন। প্রকাণ্ড কাঠের গেটের হুড়কো (দুটো খাপে ঢোকানো যায় যে ধরণের) কি জন্য জানি না, দরজায় লাগানো ছিল না। আমার ডান হাত হুড়কোর বদলে ব্যবহার ক'রে আমি দরজায় পিঠের ঠেস দিয়ে সভার পর্য্যালোচনা শুনলাম। আমি ঐ সময় ভোরে উঠে কুস্তি লড়তাম ও সন্ধ্যাবেলা দাঁড় টানতাম কলেজ স্কোয়ারের দীঘিতে। কাজেই দারোয়ানী কাজটা আমার খুবই খাপ খেয়েছিল। সে যুগের প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রমণ্ডলীর মাত্র দুটি ছেলে ধর্ম্মঘটের সময় কলেজে গিয়েছিল। আমাদের ধর্ম্মঘট ছিল সম্পূর্ণ সত্যাগ্রহের ভঙ্গীতে—অহিংস আকারের। কাকেও কোনও বাধা না দিয়ে শুধু বুঝিয়ে এবং যারা যাবে তাদের কাজ অশোভন এই কথা প্রমাণ ক'রে, সকলকে নিরস্ত করা হয়েছিল। ধর্ম্মঘটের তৃতীয় দিনে অধ্যাপক ওটেন ছাত্রদের সঙ্গে মিটমাট ক'রে দুঃখ প্রকাশ করেন ও ধর্ম্মঘট শেষ হয়। কিন্তু শোনা যায়, তাঁদের শ্বেতাঙ্গ ক্লাবে এজন্য তাঁকে খোঁটা খেতে হয়। যে কারণেই হোক, অধ্যাপক মহাশয় মুখে দুঃখপ্রকাশ করলেও পরে মনের ঝাল ছেলেদের প্রতি কটূক্তি ক'রে মেটাবার চেষ্টা করেন। একদিন তিনি ক্লাসে সোজাসুজি "ভারতীয়রা জাতি হিসাবে নিকৃষ্ট এবং তারা নিয়ম মানতে জানে না" এই সব কথা বলেন।

এই সময়ে বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন চলেছিল। ইংরেজ সরকারও সেই প্রচেষ্টা নির্ম্মমভাবে দমন করছিল। বেশীরভাগ ইংরেজ কর্ম্মচারী ভারতীয়দের অসৌজন্য দেখানই স্বাভাবিক ব'লে মনে করতেন এবং ইংরেজের গায়ে আত্মরক্ষার্থ হাত তোলাও প্রায় রাজদ্রোহের সামিল ব'লে দণ্ডনীয় হ'ত। ঐ যুগেই এক প্রবীণ বাঙালী উকীল পূর্ব্ববঙ্গে রেলগাড়ীর একটি উচ্চশ্রেণীর কামরায় টিকিট কিনে উঠে নিগৃহীত হন। কামরাটিতে দু'জন শ্বেতাঙ্গ যুবক ছিল; তারা উকীলবাবুর গাড়ীতে ওঠায় বাধা দেয়, যদিও কামরাটি তাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল না। যুবকদ্বয় যখন তাঁকে গাড়ী হতে ফেলে দেবার চেষ্টা করে, তখন প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রাণরক্ষার্থে, নিজের কাছে একটি কুকরী ছিল, সেটা বাহির ক'রে আঘাত করতে উদ্যত হন। যে কোন সভ্যদেশে ন্যায়বিচারে যুবক-দুটিরই দণ্ড হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু কারাদণ্ড হয় উকীলমহাশয়ের, আত্মরক্ষার এই চেষ্টার পরিণামে। ঘটনাটির উল্লেখ এজন্য করলাম যে, অধ্যাপক ওটেনের প্রহারের পদ্ধতির কারণের সঙ্গে এই ধরণের ঘটনার যোগাযোগ আছে। উল্লিখিত ঘটনাটি ওটেন প্রহারের আগে কি পরে ঘটেছিল, আমার মনে নাই। কিন্তু একজন শ্বেতাঙ্গ ইংরেজকে আক্রমণ করলে যে প্রথমে থানা ও হাজতে অকথ্য অত্যাচার ভোগ করতে হবে ও পরে দীর্ঘদিন কারাদণ্ড

ঘটবে, এ বিষয়ে ছাত্রমহলে জ্ঞান অতিশয় টনটনে ছিল। অধ্যাপক ওটেন ভারতীয়দের জাতি হিসাবে অপমান-সূচক কথা বলায় কিছু ছাত্র স্থির করে, এক্ষেত্রে পুনরায় ধর্ম্মঘট অর্থহীন; একমাত্র "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" ব্যবস্থা অবলম্বন কর্ত্তব্য। ঐ সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কিছু বিপ্লবী ছাত্র ভর্ত্তি হয়েছিল। "আর্ট্‌স্" বিভাগের ছেলেরা ওটেনের সুপরিচিত ব'লে বিজ্ঞানের ছাত্ররাই এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়। আমি তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি; কলেজে নবাগত; এবং কোনও বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগ ছিল না। এজন্য এসব আমার তখন অজ্ঞাত ছিল। তাছাড়া উদ্যোক্তারা সাবধানতা অবলম্বন ক'রে নিজেদের কয়েকজনের মধ্যে মন্ত্রগুপ্তি করেন। ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণ প্রায় পনেরো বৎসর পরে প্রহর্ত্তাদের নেতাদের একজনের কাছে শুনি। সুভাষের সঙ্গে এদের কারও কারও পরিচয় ছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে নিয়ম ছিল, কোনও কোনও ক্লাসের সময় ছাত্ররা সেমিনারে ব'সে পড়াশোনা করতে পারত; একজন অধ্যাপক এজন্য সেখানে ঐ সময় উপস্থিত থাকতেন। মনে হয়, সুভাষ প্রহার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহিত ছিল, যদিও প্রত্যক্ষভাবে তাতে যোগ দেয় নাই। সুভাষ ঐদিন দুপুরে ঘটনার সময়ে সিঁড়ির পাশের, উপরতলায় দর্শনের সেমিনার ঘরে উপস্থিত ছিল; ক্লাসে যায় নাই। অধ্যাপক ওটেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে শেষ ধাপে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথার উপর একটি বড় থলি ফেলে ঢেকে দু'জন ছাত্র তাঁকে প্রহার করে। একথা শোনা যায় যে, সুভাষ সেমিনার ঘর হতে বেরিয়ে এসে উপরতলা হ'তে উৎসাহসূচক কিছু বাক্য উচ্চারণ করেছিল। ঐ ব্যাপারের তদন্ত কমিটিতে সাক্ষাৎ প্রমাণ না পেলেও, যেহেতু সুভাষ ক্লাসে না যেয়ে সেমিনার ঘরে ছিল ও সেখান হ'তে ঘটনাস্থলে যেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসা অসম্ভব ছিল না, এবং ধর্ম্মঘট প্রভৃতির সুভাষ অন্যতম উদ্যোক্তা, এই অপরাধে তাকে দণ্ডিত করা হয়। সুভাষচন্দ্র ও অপর কয়েকজন ছাত্র-প্রতিনিধির কলেজ হ'তে নাম কাটা হয় ও ভবিষ্যতে পড়া বন্ধ এই দণ্ডাদেশ হয়। যারা মারপিট করেছিল, তারা সন্দেহের আওতাতেও আসে নাই। সে সময়ে ইংরেজ কর্ম্মচারী ও বাঙালী তরুণদের মধ্যে কিরূপ বিদ্বেষভাব জেগে উঠেছিল, এবং বহুসংখ্যক ছাত্র বিপ্লবী-সন্দেহে কি ভাবে নির্য্যাতিত হয়েছিল, এ কথা মনে না রাখলে এ ঘটনা সম্বন্ধে ভুল বিচারই সম্ভব। এ সময় দেশের কোনও মঙ্গলকর কাজে লিপ্ত হওয়াই ছিল রাজরোষের কটাক্ষপাতের কারণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই সময়েই এই মনোভাবের উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন যে "পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ" এই প্রাচীন ন্যায়ের যুক্তিকে উল্টে নিয়ে, সরকারী তরফ হ'তে দেশপ্রেমের বহ্নি বর্ত্তমান থাকলেই বিপ্লবের ধূম সন্দেহ করা হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ জেম্‌স্ ব্যতিরেকে অন্য শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকদের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। আমার মনে পড়ে, তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী শেষ হওয়ার পরেও পদার্থবিজ্ঞানের অনার্স-প্রাকৃটিকাল ক্লাস একটিও করার ব্যবস্থা হয় নাই ব'লে আমার সহপাঠীদের প্রতিনিধি হিসাবে আমি ঐ বিভাগের কর্ত্তা অধ্যাপক পীক্‌-এর সঙ্গে দেখা করি। আমি খুব মোলায়েম ভাবেই আমাদের অসুবিধার কথা তাঁর কাছে উল্লেখ ক'রে বলি ও অনুরোধ করি, তিনি অনুগ্রহ ক'রে যেন সপ্তাহে একটা ক'রে অন্ততঃ অনার্স প্রাকৃটিকাল ক্লাসের ব্যবস্থা করেন। পীক্‌-সাহেব বললেন, আগস্ট মাসে এম এস-সি প্রাকৃটিকাল পরীক্ষা শেষ হ'লে তিনি এ বিষয়ে ভেবে দেখবেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম; আগস্ট মাস বহু দূরে এবং যারা এম এস-সি পরীক্ষার্থী তারা তখন আর কলেজে আসে না, আর সেপ্টেম্বরে মাত্র কয়েকদিন ক্লাস হবে। এইরূপ দেরী করলে, আমাদের প্রাকৃটিকাল কোর্স শেষ হবে না। আমি ঐ সব কথা বললাম, এবং এবার জোর ক'রেই বললাম, যে আমাদের এখনই ক্লাস করবার জায়গা ও যন্ত্র আছে। আমাদের উপযুক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করা তাঁর অবশ্যকর্ত্তব্য। অধ্যাপক মহাশয় খ্যাক্‌ ক'রে বললেন, "আচ্ছা, ভেবে দেখব।" আমি চ'লে এলাম ও রসায়নের একটা ক্লাস ছিল, সেখানে চ'লে গেলাম। পরদিন কলেজে আসতেই অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে ডেকে পাঠালেন। ব্যাপার কি? তাঁরা আমাকে বললেন, অধ্যাপক পীক আমার উপর ক্ষেপে গেছেন। বলেছেন, "কে ঐ ছোকরা যে বুক ফুলিয়ে এসে আমাকে বলে যে তাদের প্রাকৃটিকাল ক্লাসের ব্যবস্থা ক'রে দিতেই হবে? সে কি মনে করে যে সে লাটসাহেব?" আমি অধ্যাপকদের বললাম আমি কি কি বলেছিলাম। পৈতৃক লব্ধ দীর্ঘকায় দেহ ও প্রচুর নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে দৃঢ়-বদ্ধ আমার পেশী, চলনের ভঙ্গী এবং সোজা দাঁড়িয়ে মুখ তুলে কথা বলা অপরাধের মধ্যে গণ্য হ'য়েছিল মনে হ'ল। অধ্যাপক

মৈত্র জানতেন আমি শ্রমিকদের একটা নৈশ বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষকতা করি। তিনি বললেন, "ওহে, তুমি সাবধান থেক। কলেজ হ'তে উগ্র স্বাধীনচেতা ছাত্র ব'লে তোমার নামে সরকারী (অর্থাৎ পুলিস) দপ্তরে রিপোর্ট গেলে, হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হওয়া আশ্চর্য্য নয়।" যাই হোক, সে যাত্রা আমার প্রতি স্নেহসম্পন্ন অধ্যাপকত্রয় পীক সাহেবকে বুঝিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দেন ও প্রাকৃটিকাল ক্লাসেরও ব্যবস্থা হয়। শ্বেতাঙ্গ শিক্ষক ও ভারতীয় ছাত্রের সম্পর্ক যখন এই রকম, সে অবস্থায় কোন তীব্র সংঘর্ষ ঘটলে আগুন জ্ব'লে ওঠা মোটেই আশ্চর্য্য নয়। অধ্যাপক ওটেনের ব্যবহারে ঘটেও ছিল তাই।

ওটেন-মারপিট ও ছাত্রদের দণ্ড দেওয়ার পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। আগেই বলেছি, আমার মা সে সময় অসুস্থ ছিলেন। বাবারও শরীর ভাল ছিল না। চিকিৎসকের নির্দ্দেশে মা ও বাবাকে নিয়ে আমি পুরী আসি। চক্রতীর্থের কাছে সমুদ্রের ধারে একটি ছোট নূতন বাড়ী আমরা ভাড়া নিয়েছিলাম। সুভাষের বাবা জানকীবাবু ঐ সময়ে 'শশীনিকেতন' বলে পোস্টাফিসের কাছে একটি বড় বাড়ীতে এসে উঠেছিলেন। সুভাষও পুরীতে এসেছিল। আমাদের উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা এখানে নিত্য দেখাশোনার মধ্যদিয়ে গাঢ় হয়ে ওঠে। দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের দুজনেরই মনোভাব ছিল একই রকম—দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে হবে যথাসাধ্য। আমি আমার শৈশবের পরেই ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে যে প্রার্থনা করা শিক্ষা করেছিলাম আমাদের বাড়ীর আবহাওয়ার প্রভাবে, তার সঙ্গে একছত্র জুড়ে দিয়েছিলাম—"আমার দেশ যেন স্বাধীন হয়।" আমাদের বাড়ীতে ও আমার মাতুলালয়ে বিদেশী সাবান, প্রসাধন দ্রব্য ও মিহি সুতার কাপড় আগে ব্যবহার হ'ত। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে আমার মাতৃদেবী সমস্তই বর্জ্জন করেন। আমাকেও দেশী সুতার তৈরী মোটা কাপড় পরিয়েছিলেন। অতি সহজ ভাষায় বুঝিয়েছিলেন, কেন এসব করা দরকার। "দেশের জিনিষ কিনলে, দেশের টাকা দেশেই থাকে, যারা জিনিষ তৈরী করে, তারা খেতে পায়। বিদেশী জিনিষ কিনলে টাকা বিদেশে চ'লে যায়।" আমাদের বাড়ীতে তাঁত বসিয়ে কাপড় বোনা হয় ঐ সময়ে। পরে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে আমার মাতৃদেবী বিদ্যাসাগর-বাটীতে চরকাকেন্দ্রে মেয়েদের সুতাকাটা শিক্ষা দেন।

সুভাষচন্দ্রের পরিবারে স্বদেশী আন্দোলনের ছাপ কি ভাবে পড়েছিল, আমার ব্যক্তিগতভাবে জানা নাই। কিন্তু সুভাষের বাবা ছিলেন অতি সজ্জন, এবং ধর্ম্মভাবাপন্ন মানুষ। সুভাষ সম্ভবত: বাড়ীর এই আবহাওয়ার ফলে কৈশোরেই মানুষের সেবা জীবনের প্রধান ব্রত ব'লে মেনে নিয়েছিল। পুরীতে ওর বাল্যবন্ধুদের কাছে কৈশোরে সুভাষের কটকের উপান্তে গ্রাম অঞ্চলে সেবাকার্য্যের কথা শুনি। আর ঐ বয়সেই, যেটা করতে হবে মনে করত, সে বিষয়ে কোনও পিছুটান ওকে আটকাতে পারত না। ঐখানেই বন্ধুদের কাছে শুনলাম, বাড়ীতে ওর নাম সাধুবাবা। একবার ভগবানের সন্ধান পাবার জন্য গুরু খুঁজতে ও সুদূর কনখল চ'লে গিয়েছিল কিশোর বয়সে। ঐ যুগে আমাদের অনেকের মনের উপর স্বামী বিবেকানন্দের লেখার প্রভাব পড়েছিল। সুভাষের বাবা জানকীবাবুর এক সাধকগুরু ছিলেন। এই পরিবেশে সুভাষের ঈশ্বরানুসন্ধানে গুরুর সন্ধান স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ বয়সে এই উদ্দেশ্যে সুদূরের পথে যাত্রা তার সমগ্র জীবনের প্রধান ধারারই ইঙ্গিত দেয়। যা করতে হবে বাধাবিপত্তি অসাফল্যের কথা না ভেবে, সেই পথে এগিয়ে যেতে হবে। এই ছিল তার মূলমন্ত্র। কৈশোরেই তার পূর্ব্বাভাস প্রকাশ পেয়েছিল।

আমার মাতামহ নারায়ণচন্দ্র তাঁর যৌবনে ঘাটাল মহকুমায় কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে জমিদারের অন্যায় আদায় ও তারই পিছনে সরকারের যে প্রশ্রয় এই দুইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি সে-সব গল্প বাল্যে তাঁর কাছে শুনেছিলাম। আমার বাবা য়ুরোপ হ'তে ফিরে এলে সে দেশের মানুষের সার্ব্বজনীন শিক্ষার ও সাধারণ লোকের শিল্প প্রভৃতি জ্ঞান সম্বন্ধে শুনেছিলাম। সমুদ্রের ধারে সন্ধ্যার পর ব'সে দুই বন্ধুতে আলোচনা হ'ত, দেশ স্বাধীন করার জন্য কি কি আবশ্যক। এই কারণে আমি প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার কথা বলেছিলাম। গ্রামের সেবা মারফৎ গ্রামকে গ'ড়ে তোলা বিষয়ে সুভাষও ছিল এক-মত তার নিজের বাল্য-অভিজ্ঞতা হ'তে। কিন্তু সুভাষের প্রিয় আদর্শ ছিল মাৎসিনি ও গারিবল্ডির; সৈন্যদল সংগ্রহ ক'রে লড়াই করতে হ'বে। তবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। এ বিষয়ে সুভাষ তখনই স্বপ্ন দেখেছিল।

দিলীপের সঙ্গে সুভাষের প্রেসিডেন্সী কলেজে আগেই আলাপ হয়েছিল, একথা পূর্ব্বে লিখেছি। দিলীপ

নিজে ছিল চিরকালই ভক্তবাদী এবং প্রতীকপূজার ভক্ত। ট্রামে চ'ড়ে মেট্রপলিটান স্কুল হ'তে দক্ষিণমুখে যেতে হ'লে, অল্প দূরেই কালীতলার কালী-মন্দির পড়ে। ঐ স্কুলে পড়ার সময় দিলীপ ও আমি যখনই ট্রামে ক'রে ঐ জায়গা পার হয়েছি, দিলীপ ভক্তিভরে নমস্কার করেছে মন্দিরের দেবতার উদ্দেশে; আমি নির্বিকার ব'সে থেকেছি। দিলীপ বলত, তুমি নাস্তিক। তখন আমি হেসে ফেলতুম। দিলীপ কলেজে পড়ার সময় আমাকে সগর্বে বলেছিল, সুভাষ তোমার মত নাস্তিক নয়। তার পর একটু ভেবে বলে, "কিন্তু ও আবার খাওয়া ছোঁয়া মানে।" বন্ধুবর দিলীপ আমাকে নাস্তিক অভিহিত ক'রে যে ভুল করেছিলেন, সুভাষের খাওয়া ছোঁয়া সম্বন্ধে উক্তিও সেরূপ ভ্রান্ত। কিন্তু একথা আমি প্রথমে বুঝতে পারি নাই; কারণ এ বিষয়ে পরখের কোনও উপলক্ষ্য ঘটে নাই। পুরীতে এসে এ কথা যাচাই হয়ে গেল। সুভাষের পুরাতন বন্ধুরা কয়েকজন মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে এসে বসত। একবার ওদের সখ হ'ল, পুরীতে আমাদের ভাড়া করা বাড়ীতে যাবে। তৎক্ষণাৎ সকলে উঠে চলল; অল্প দূর যেয়ে সুভাষ বললে, "এস, এখন ভাটা পড়েছে; শক্ত বালিতে দৌড়ে যাওয়া যাক।" যথা বাক্য, তথা ক্রিয়া। আমরা দল বেঁধে দৌড়ে চললাম ক্ল্যাগস্টাফের কাছ হতে চক্র-তীর্থ অবধি। বাড়ী দেখেই ওরা ফের দৌড়ে ফিরে গেল। ওরা চ'লে যাবার আগে বললে, আর একদিন এসে জলযোগ করবে। আমি খুশীমনে রাজী হয়ে বললাম, "কিন্তু আমরা জাত মানি না; আমার বাড়ী খেলে তোমাদেরও জাত যাবে।" সুভাষ অবাক্ হয়ে বললে, "তার মানে?" আমি দিলীপের কাছে শোনা ওর খাওয়া ছোঁয়া মানার কথা উল্লেখ করলাম। সুভাষ হো হো ক'রে হেসে উঠল; বললে, "তুমি যতবার খুশী খাইও; আমার জাত যাবে না।" ওরা আসবে শুনে মা ওদের জন্য লুচি, ছেঁচকী, মিষ্টি ও আমের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুভাষ ও তার বন্ধুরা খেয়ে ফিরে যাবার সময় ওর বন্ধুরা ওর সাধুবাবা নাম আমাকে জানায় ও পরিহাস ক'রে বলে, "সাধুবাবার বাড়ীতে সাধুবাবা এত সহজে এ-সব ব্যবস্থা করতে পারে না। সাধুবাবারা ত এ সবের ধার ধারে না?"

বৎসর খানেক পরে সুভাষের স্থায়ী পড়াবন্ধের দণ্ড রহিত হয়; কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজের দরজা ওর জন্য বন্ধ থাকে। সুভাষ স্কটিশচার্চেস কলেজে ভর্ত্তি হয়। ফলে এর পর ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কালে কল্যাণে ঘটত। দেখা হ'ল আবার বিলাতে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্কটিশচার্চেস কলেজ হ'তে দর্শনে প্রথম শ্রেণীর সম্মানের সঙ্গে সুভাষ বি-এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার পর ওদের বাড়ী হতে ওঁকে বিলাত পাঠানো হয়। সুভাষের অন্য ভাইয়েরা কেহ আগেই বিলাত গেছলেন বা তখন যাচ্ছিলেন; সুভাষেরও ইচ্ছা হয়েছিল বিলাত যাওয়ার। ঐ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল সুভাষ তার প্রিয় "মেজদার" কাছে; তাঁর মারফৎ জানকীবাবু আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু শর্ত ছিল যে সুভাষ আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবে। ১৯১৯ সালের শেষ ভাগে সুভাষ ঐ বৎসরের কেম্ব্রিজের পাঠারম্ভ-কাল হতে ফিট্‌জউইলিয়াম হল্-এ দর্শনের ছাত্র হিসাবে ভর্ত্তি হয়। দিলীপও প্রায় ঐ সময়ে ঐখানে গণিতের ছাত্র হিসাবে যোগ দেয়। আমি এক টার্ম পরে পৌঁছাই ও ক্রীস্‌মাসের ছুটির মধ্যে কথা ব'লে জানুয়ারীতে গবেষণাকারী ছাত্র হিসাবে ভর্ত্তি হই। আমি সে সময় ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটারীতে সার জে. জে. টমসনের তত্ত্বাবধানে পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলাম। তিন বন্ধু তিন বিষয়ের পড়াশুনা ও গবেষণায় ব্যাপৃত থাকায় এক কলেজে ভর্ত্তি হওয়া সত্ত্বেও পাঠের ব্যাপারে দেখা হ'ত না। দেখা হত অন্যত্র। আমার থাকার ব্যবস্থা কলেজ হতে মদন রোডে একটি বাড়ীতে করা হয়। বাড়ওয়ালী বুড়ী বললে, সন্ধ্যাবেলা আবার রান্না ক'রে দিতে পারবে না। শুধু সকালে প্রাতরাশ দেবে। দুপুরে ত আমি কলেজে খাব, ল্যাবরেটারী বা লাইব্রেরী হ'তে যেয়ে। ইচ্ছা করলে সন্ধ্যাবেলাও কলেজে খেতে পারি। কিন্তু এ অবস্থায় অসুবিধা ছিল। সুভাষ তখন মদন রোডেই অপর একটি বাড়ীতে দোতলায় ছিল; ঐ বাড়ীতে সি. সি. দেশাই অন্য দুটি ঘরে থাকত। সকালে ও রাতে ওরা একসঙ্গে দেশাই-এর বসার ঘরে খেত। ওদের বাড়ীওয়ালী উভয়ের অনুরোধে আমার রাত্রের আহার ওখানে দিতে রাজী হয়। ফলে আমরা দু টার্ম প্রায় প্রত্যহ রাত্রে একসঙ্গে খেতাম। সুভাষের সঙ্গে পুরাতন বন্ধুতা আবার ভাল ক'রে জমে উঠল।

সরকারী চাকরী করবার ইচ্ছা সুভাষের মোটেই ছিল না। কিন্তু কথা দিয়ে এসেছে ব'লে পড়াশোনা করত, যেন আই. সি. এস. পাশ করা ওর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগত জীবনে সুভাষ খুব বাঁধা নিয়মে চলত। সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ব'সে ধ্যান ক'রে তার পরে পড়াশুনা আরম্ভ করত। পড়ার সময় ওর সমস্ত বই একটি শেল্‌ফে সাজানো থাকত—যে দু'একটি বই ও পড়ছে, সেগুলি ছাড়া। একটা বই শেষ ক'রে অন্য একটা

পড়তে শুরু করার আগে, প্রথম বইটা তাকে রেখে অন্য বইটা নিয়ে এসে পড়তে বসত। আমরা টেবিলে এ অবস্থায় অন্য বই ফেলে রাখতাম ও পাঠশেষে সব বই তুলে রেখে দিতাম। ওর এই বৈশিষ্ট্য দিলীপ ও আমার উভয়েরই নজরে পড়েছিল। দিলীপ মাঝে মাঝে পরিহাস করত ওর এই নিয়মে বাঁধা কাজ করার জন্য; সুভাষ কখনও প্রতিবাদ করত না; মৃদু হাসত। আই. সি. এস. পরীক্ষায় ফেল ক'রে, কোন্ পেশা অবলম্বন ক'রে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করবে ও দেশের কাজও করতে পারবে, এ বিষয়ে সুভাষ মাঝে মাঝে আলোচনা করত। হিসাব-পরীক্ষকের কাজটা এ হিসাবে মন্দ নয় ব'লে ও মত প্রকাশ করেছিল। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হলে দেখা গেল, সে বৎসর যে সামান্য কয়জন (পাঁচ জন) আই. সি. এস. চাকরীতে নেওয়া হবে, সুভাষ সেই প্রথম কয়টি স্থানের মধ্যে পাশ করেছে। আই. সি. এস. পাশ ক'রে সুভাষ মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ল। প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে প'ড়েও ফেল হবে ব'লেই তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; পাশ ক'রে হ'ল নূতন সমস্যা। সুভাষ অনেক চিন্তা ক'রে বাড়ীতে চিঠি লিখল, যে সে তার কথা রেখেছে। কিন্তু পাশ ক'রে সরকারী চাকরী করবে এরকম কোনও প্রতিশ্রুতি সে দেয় নাই। সেজন্য সে তার বাবার অনুমোদন চাইছে পদত্যাগ করার। উত্তর আসতে সময় লাগবে; তখন এরকম এয়ার মেল ছিল না। তাই পাশ করার পর যে শিক্ষানবিশী ক্লাস করা হয় ভারতীয় আইন, হিন্দুস্থানী শিক্ষা, ঘোড়ায় চড়া ও ঘোড়ার যত্ন, ইত্যাদি সম্বন্ধে, সেগুলিতে সুভাষ হাজিরা দিয়ে চলল। এখানে সুভাষের নজর পড়ল ঘোড়া রাখা সম্বন্ধে সরকারী উপদেশ-পত্রের উপর, যেটি ভারতীয়দের পক্ষে অবমাননাসূচক। ঘোড়ার কিরূপ যত্ন করা উচিত সে কথা এই পত্রটিতে লেখার পর উল্লেখ ছিল, "মনে রাখতে হবে তোমার ঘোড়াও যে খাবার খায়, ঘোড়ার ভারতীয় সইসও সেই খাদ্য ভক্ষণ করে; অতএব সাবধান।" ভাষাটা ভারতীয় সইসের প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক। সে সময় ও তার আগেও অনেক ভারতীয় ছাত্র আই. সি. এস. পাশ ক'রে ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা করেছে ও ঐ পত্রটি পড়েছে। কিন্তু এ অভদ্র মন্তব্যটি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার কেহ মনে করে নাই। প্রকৃতপক্ষে যারা এই চাকরীতে ঢুকত তারা মুখে তখন যাই বলুক বা এখন যাই ব'লে থাকে, আসলে ইংরেজ সরকারের কোনও নির্দ্দেশের কোনওরূপ সমালোচনা করবার সাহস তাদের ছিল না। সুভাষচন্দ্রের হাতে নির্দ্দেশ-পত্রটি যেদিন আসে, সেদিন আমি তার ঘরে গিয়েছিলাম। সুভাষ খুব উত্তেজিত হয়ে পত্রটি আমাকে দেখালে ও বললে, "এর প্রতিবাদ করতেই হবে।" লিখিত প্রতিবাদ সুভাষ পরদিনই পেশ করেছিল আই. সি. এস. শিক্ষানবীশদের পরামর্শদাতার কাছে। তিনি চিঠি প'ড়ে সুভাষকে ডেকে বল্লেন, "দেখ যুবক, এরকম মনোভাব নিয়ে এ চাকরীতে ঢুকলে তুমি তাতে বেশীদিন টিকতে পারবে না।" সুভাষ বলেছিল, "বেশীদিন থাকবার ইচ্ছা আমারও নেই।" পরামর্শদাতার বোধ হয় বাক্‌রোধ ঘটেছিল এর পর। যাই হোক, ফলে মুদ্রিত পত্রটি সংশোধন করা হয়।

পদত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পত্র পেয়ে বাড়ী হতে সুভাষের বাবা বিরোধিতা জানিয়ে পত্র লেখেন। সুভাষের যে দাদারা লণ্ডনে ছিলেন তাঁরাও ওর উপর চাপ দেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুভাষ পদত্যাগ-পত্র পেশ করে। আই. সি. এস. পাশ হওয়ার দরুণ এ সময় একটা ভাতা পাওয়া যায়; সে জন্য বাড়ী হতে টাকা আর বিশেষ পাঠানো হ'ত না ওকে। যাতে ঐ ভাতা না নিয়ে দর্শনের ট্রাইপস পরীক্ষা ১৯২১ সালের জুন মাসে দিতে পারে, সে জন্য আমার ও দিলীপের কাছে সুভাষ টাকা ধার ক'রে রাখে। এ টাকা পরে শরৎবাবু শোধ ক'রে দিয়েছিলেন। সুভাষ চাকরী ছাড়ার চিঠি সরকারী দপ্তরে পাঠালে, ঐ সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে ভারতীয় দপ্তর হতে সুভাষের দাদাদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে সুভাষকে এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করা হয়। ঐ সময় আবার জানকীবাবু খুব শক্ত রকমের একটা চিঠি লেখেন সুভাষকে, যে তার বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতার মনে সে কিরূপ কষ্ট দিচ্ছে। ফলে তাঁদের শরীর ভেঙে যাচ্ছে। সুভাষ বাহিরে স্থির থাকলেও মনে খুবই আঘাত পেয়েছিল। রাত্রে ভাল ঘুমোতে পারত না এ সময়। একদিন বললে, "দেখ, আমার মনে এমন একটা তীব্র দ্বন্দ্ব ঘটছে যে, মনে হয় আমার ব্যক্তিত্ব দুভাগ হয়ে যাচ্ছে" (split personality)। ঐ সময় শরৎবাবু সুভাষকে একটা চিঠি লেখেন; চিঠিটি সুভাষ আমায় দেখিয়েছিল। চিঠিতে আগাগোড়া দুঃখ প্রকাশ যে সুভাষ কি অন্যায় করছে; মা-বাবার মনে কষ্ট দিচ্ছে, নিজের ভবিষ্যৎ কিরূপ নষ্ট করছে, কিন্তু সব শেষের পংক্তিতে লেখা ছিল, "বাবা যেরূপ বলিলেন সেইরূপ লিখিলাম।" সুভাষ বলেছিল, এই উক্তিতে বোঝা যায় যে, তার মেজদার সমর্থন আছে তার পদত্যাগে। চাকরী ছেড়ে দেওয়ার পর সুভাষের বাবা ওকে খুব স্নেহপূর্ণ একটি চিঠি লেখেন; তিনি জানিয়েছিলেন যে, বাবা-মা চিরকালই সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন থাকে। তাই তার ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা ক'রে ঐরকম কড়া

চিঠি লিখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সে নিজের জন্য যে পথ বেছে নিয়েছে তাতে তিনি গৌরব বোধ করেন। এই পত্রে সুভাষের মনের ক্ষোভ মুছে যায়।

সুভাষ আই. সি. এস. পাশ ক'রে পদত্যাগ করায় কেম্‌ব্রিজের ভারতীয় ছাত্রমহলে হৈ হৈ প'ড়ে গেল। একদিনে সুভাষ তাদের পরম প্রিয় লোক হয়ে উঠল। যে কোনও ব্যাপারে ছাত্রদের প্রতিনিধি আবশ্যক, সুভাষকে সেই কাজের মুখপাত্র ক'রে দেওয়া হ'ল। বিশেষ ক'রে ভার দেওয়া হ'ল, ওখানে ভারতীয় ছাত্রদের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনানায়ক শিক্ষা দলে (C. U. O. T. C.) যোগদানের অধিকার আদায়ের। কেম্‌ব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের ঐ শিক্ষার অধিকার ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানীয় কর্তাদের প্রশ্ন করায় তাঁরা বলেন, "তোমরা একসঙ্গে পড়াশোনা কর, খেলাধুলা কর, আমাদের আপত্তি কি ক'রে থাকবে এ ব্যাপারে? তোমরা আমাদের সামরিক দপ্তরের অনুমোদন আন। তাদের মানা আছে।" সুভাষকে ভারতীয় ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডনে সামরিক দপ্তরে পাঠানো গেল। সেখানে তারা দরখাস্ত নিয়ে মুখে বললে, এটা ভারতীয় দপ্তরের ব্যাপার। সেখানে যেতে তারা জবাব দিল, এটা সামরিক দপ্তরের ব্যাপার। সুভাষ পুনরায় সামরিক দপ্তরে গেল। তারা পরিষ্কার ব'লে দিল, আমাদের কোনও বক্তব্য নাই এ ব্যাপারে ; ভারতীয় দপ্তরের সচিবের কাছে পাকা খবর পাবে। সে সময় লর্ড লিটন ভারতীয় দপ্তরের সহকারী সচিব ছিলেন। তিনি খোলাখুলি বললেন, "দেখ যুবক, তোমাদের কেহ কেহ তোমাদের দেশ হতে আমাদের বিতাড়িত করতে চাও। তোমরা কি আশা কর যে সেজন্য তোমাদের যে সামরিক শিক্ষার দরকার আমরা তার ব্যবস্থা ক'রে দেব?" এর পর আর আমাদের, কেম্‌ব্রিজে ছাত্রদের সামরিক বাহিনীতে, ভর্তি হওয়ার কথা স্বভাবতঃই ওঠে নাই।

কেম্‌ব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের যে সমিতি ছিল, সেটা মজলিশ নামে খ্যাত ছিল। এতদিন সুভাষ এই মজলিশে কোনও বক্তৃতায় যোগ দেয় নাই। সুভাষের পদত্যাগের পর একবার আমাদের এই সভায় কম্যাণ্ডার ওয়েজউড্‌ নিমন্ত্রিত হন, আলোচনায় যোগ দিতে। ওয়েজউড অনেকটা ফেবিয়ানদের মত ভারতবর্ষের ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসন লাভের কথা বলেন। এই আলোচনায় সুভাষ যোগ দিয়েছিল। প্রথমে অতিথি হিসাবে স্বাগত জানাচ্ছি ব'লে সুভাষ শ্রীযুক্ত ওয়েজউডকে সাবধান ক'রে বলে, আমি আপনার যুক্তিজালকে তীব্র আক্রমণ করব। তারপর আবেগ-ও যুক্তি-পূর্ণ বক্তৃতায় সুভাষ কমাণ্ডার মহাশয়ের যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন ক'রে দেয়। অতিথি মহাশয় পার্লামেণ্টে খ্যাতিসম্পন্ন লোক ; এ বক্তৃতার ছাপ তাঁর মনে লেগেছিল। তিনি তাঁর উত্তর সপ্রশংস ভাবেই দিয়েছিলেন।

আমার এ ছোট প্রবন্ধে আমাদের উভয়ের দীর্ঘদিনের একসঙ্গে রাজনীতি ক্ষেত্রে কাজের উল্লেখ সম্ভব নয়। তাই শুধু সহাধ্যায়ী হিসাবেই সুভাষের পরিচয় দিলাম। প্রবন্ধ শেষের আগে সুভাষের সামাজিক ব্যাপারে ঐ সময়ের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে কিছু বলব।

সুভাষের ব্যক্তিগত অভ্যাস—নিয়মে কাজ করার কথা আগেই বলেছি। এ ছাড়া, বিদেশে আমরা যে আমাদের দেশের প্রতিনিধি, কোনও অশোভন কাজ করলে দেশের মানুষের দুর্নাম হবে, এ বিষয়ে সুভাষ অত্যন্ত সজাগ ছিল। সে জন্য পোশাক-পরিচ্ছদে, ব্যবহারে সুভাষ খুব কেতাদুরস্তভাবে চলত এবং ওদেশের যেগুলো অলিখিত রীতি (convention), সেগুলি বিশেষ ক'রে মেনে চলত। বন্ধুবর দিলীপকুমার এ বিষয়ে কিছু ঢিলা দিতেন, অবশ্য অশোভন ক'রে নয় ; আমিও এ বিষয়ে ঐ পথের অনুবর্তী ছিলাম। কারণ ওদেশের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোশাক ও কেতা সম্বন্ধে কিছু স্বাধীনতা অবলম্বন করত ও অন্যের ক্ষেত্রেও তাতে বিস্মিত হ'ত না। এ জন্য আমাদের দুজনের এ বিষয়ে কিছু ব্যতিক্রম ওখানকার রীতিসম্মত ব'লেই গণ্য হ'ত। আমরা দুজনে মধ্যে মধ্যে সুভাষকে বাংলাভাষায় যাকে "ক্ষেপানো" বলে সেই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ওর সামনে ইচ্ছা ক'রে করতুম। আমাদের তিনজনের হৃদ্যতা কেম্‌ব্রিজে ভারতীয় মহলে সুবিজ্ঞাত ছিল ; অনেকে আমাদের "ত্রয়ী" নামে উল্লেখ করতেন। একসঙ্গে তিনজনে হয়ত গল্প ক'রে চলেছি ; দিলীপ ও আমি একবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে, দেশে যেমন কাঁধে হাত দিয়ে বন্ধুরা অনেক সময়ে হাঁটে, সেই রকম ক'রে যেতে শুরু করলাম। সুভাষ বললে, "এই, কি হচ্ছে?" আমরা অজ্ঞতার ভান ক'রে বলতাম "কি হয়েছে?" সুভাষ তখন বুঝত, এটা করা হয়েছে বিশেষ ক'রে তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। তারপর আবার ওদেশের রীতিতে চলা যেত। সুভাষ মনে করত, এ সব বিষয়ে একটু বেশী নজর রাখাই ভাল।

দেশে ফিরে ভবিষ্যতে দেশের কাজ করার সম্পর্কে একটা কথা স্বভাবতঃই আলোচনার মধ্যে এসেছিল—

বিবাহ সম্পর্কে। বাল্যের ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিশেষ আবহাওয়াতে বড় হওয়ায় ও সম্ভবতঃ আনন্দমঠ ও ঐ ধরনের গ্রন্থের প্রভাবে সুভাষের মনে এ সময় বিবাহ সম্পর্কে একটু অন্য রকমের ধারণা ছিল। দেশের কাজের বড় মানুষ সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করতে না পারে; বিবাহ-বন্ধন ও তার দায়িত্ব গ্রহণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেশ-কর্মীর পক্ষে সম্ভব না হতে পারে। তার একথা আমি স্বীকার করতাম। কিন্তু উপযুক্ত সহধর্মিণী পেলে, বা যাকে সখী ও সহকর্মিণী উভয় রূপে বানিয়ে নেওয়া যায়, সেরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ পূর্ণতর জীবনের সূচনা করে, আমি এই মত প্রকাশ করেছিলাম। কুমার ব্রহ্মচারী হয়েই শুধু যদি দেশের কাজ সম্ভব হয় তা হলে দেশের প্রধান অংশের লোকেরা কি দেশসেবার বাইরে প'ড়ে থাকবে? তারা কোন্ ধরণের মানুষের পথ অনুসরণ ক'রে চলবে? সুভাষের মনে এ সময়ে যে দ্বিধা ছিল, সেটা নারী ও পুরুষের বিবাহিত জীবনে দৈহিক মিলন সম্বন্ধে কিছু হীন ধারণা। আমি জানি না, কৈশোরে সুভাষ খৃষ্টীয় সাধুদের লেখা বই পড়েছিল কি না। কারণ সে-সব পুস্তকে লেখা উক্তির মতই সুভাষ মনে করত ও বলেছিল যে এ মিলন একটা অপরিচ্ছন্ন ব্যাপার। দুজন মানুষের অবাধে পরস্পরের কাছে চরম আত্মসমর্পণের মধ্যে যে কোনও কলুষ বা অপরিচ্ছন্নতা থাকতে পারে না, এ ধারণা ওর ছিল না। অবশ্য আমরা উভয়েই তখন এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাহীন; এজন্য এই তর্ক সেদিন শুধু যুক্তির প্রয়োগে অমীমাংসিত থেকে গিয়েছিল। বৎসর আষ্টেক পরে, আমার কলিকাতার বাড়ীতে সুভাষকে একদিন দুপুরে আহারের জন্য ধ'রে এনেছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন চার কি পাঁচ বৎসরের। গৃহিণী তার পূর্ব্বেই আমার সঙ্গে কংগ্রেসের নানা কাজে, অগ্রণী হয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সুভাষ তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। সুভাষেরও বিশেষ দরকারী কিছু কাজে তিনি সহায়তা করেছিলেন। আমরা বারান্দায় খেতে বসে ছিলাম; সেখানে বিজলী পাখা ছিল না। আমার ক্ষুদ্রকায় পুত্র তার "সুভাষ জ্যেঠামশায়"কে হাত-পাখা দিয়ে হাওয়া করছিল ও সেই চেষ্টায় নিজেও পাখার সঙ্গে দুলছিল। গৃহিণী পরিবেশন করছিলেন। সেদিন সুভাষকে প্রশ্ন করেছিলাম, বিবাহ সম্বন্ধে তার মত কি তখনও পূর্ব্বের মত? সুভাষ বলেছিল, না, উপযুক্ত সহকর্ম্মিণী পেলে বিবাহ করতে সে রাজী আছে। কিন্তু সেরকম মেয়ে খুঁজে বার করার ফুরসুৎ বা উৎসাহ কোনটাই তার নাই।

রামানন্দ দাসাশ্রম দাসী

শ্রীজীবনময় রায়

ভূমিকা

বিশ্ববিশ্রুত, মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসী সম্পাদক, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে আমরা প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞ ও দেশপ্রেমিক বলিয়া জানি। ৫০ বৎসর ধরিয়া তিনি রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, চরিত্রগঠন, প্রভৃতি সর্ববিষয়ে অসাধারণ সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন সৎগুরুর মত কল্যাণের পথে দেশকে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ভারতবর্ষে মানবপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রেরিত হৃদয়বত্তা ঘটিত জনসেবার ইতিহাসে তাঁহার দান যে কত বড় তাহার ধারণা আমাদের দেশে অতি অল্প লোকেরই আছে। "গত শতাব্দীর শেষের দিকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এদেশে জনসাধারণের মধ্যে মদ্যপানের বিরুদ্ধে কর্মী হিসাবে যে অপূর্ব কাজ করেছিলেন তার খবর পৌঁছেছিল বিলেত পর্যন্ত। বিলাতী পার্লামেন্টের তদানীন্তন সদস্য ডব্লিউ. এস. কেন্ সাহেবের 'আবকারী' পত্রিকায় মদ্যপান নিবারণে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জনসেবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হয়।" ×

এই জনসেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে সেই যুগে (যখন ভারতবাসীদিগের মধ্যে জনকল্যাণ-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া জনসেবায় প্রবৃত্ত হইবার কোনো চেষ্টা জাগ্রত হয় নাই), দুইটি সমধর্মী যুবকের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিল এবং দেখিতে দেখিতে এমন একটি সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল যাহার তুল্য সেবা-প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নাই এবং এখনও নাই। কপর্দকশূন্য তিনটি যুবক যে কেমন করিয়া এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন

তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। আসলে আর কিছু নয়, রামানন্দ ছিলেন আদৌ ভগবদ্ভক্ত মানুষ। তাঁহার স্বভাবজাত ভগবৎ-প্রেম হইতেই তাঁহার মানবপ্রীতি, দেশপ্রেম ও সত্যদৃষ্টির জন্ম। যে দুইটি যুবকের সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটিল, ঈশ্বরের করুণা ও মঙ্গলময়তার বিশ্বাস তাঁহাদের অদ্ভুত দৃঢ় এবং মানব-প্রীতি রসে তাঁহাদের চিত্ত পরিপূর্ণ ছিল। ইহার সহিত আসিয়া যুক্ত হইলেন শান্তসাধক, সেবাব্রত ইন্দুভূষণ রায়, তাঁহার অসাধারণ স্বাস্থ্য, অদম্য কর্মশক্তি এবং হৃদয়ভরা অজস্র করুণা লইয়া। যেন মণিকাঞ্চনের সহযোগ হইল। রামানন্দের ত্যাগ ও পরিচালনাশক্তি ও দাসদাসীগণের আত্মভোলা সেবা ও প্রেম অতি অল্পদিনেই এই প্রতিষ্ঠানকে একটি অদ্বিতীয় সেবা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিল। এই প্রতিষ্ঠানেরই নাম 'দাসাশ্রম।'

দাসাশ্রমের কথা

ইংরাজী ১৮৯১ সালের ২৭-এ জুন তারিখে বসিরহাট সবডিবিজনের অন্তর্বর্তী জালালপুর নামক গ্রামে দুইটি ব্রাহ্ম যুবক, (ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ও মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী) বিশেষ ভাবে উপাসনা করিয়া 'দাসাশ্রম' প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের বৃদ্ধ পিতা পুত্রের এই মঙ্গলকর্মে সহায় হইয়াছিলেন ও তাঁহার নিজবাটীতে ইহার প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছিলেন। যুবক দুইজন নিজের নিজের সঞ্চিত যথাসর্বস্ব দান করিয়া ইহার আরম্ভ করেন। "মানব-সেবা ও ঈশ্বর-প্রেম" রামমোহনের তথা ব্রাহ্মসমাজের এই উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত "দাসদল" স্থাপন করিয়া মানব-সেবা ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকল্পে দাসাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। তখনকার দিনে গাঙ্গের ভারতে, ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত সর্বত্র নারীর অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। সুতরাং যুবকদ্বয়, নারীর মর্যাদা রক্ষা ও নারীর অবস্থার মান উন্নয়নে 'দাস'গণের জীবন উৎসর্গীকৃত হইবে এইরূপ স্থির করিলেন। উঁহাদের মধ্যে একজন গ্রামে থাকিলেন ও আর একজন, মৃগাঙ্কধর কলিকাতায় গিয়া অর্থোপার্জন এবং দাসদলের কার্যক্ষেত্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন।

অন্বেষণের ফলে 'রিলিফ ফ্রেটার্নিটি' বা শান্তি-সম্প্রদায় নামক এক যুবপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ হয়। ঐ যুবকদল বাড়ী বাড়ী যাইয়া রোগীদিগের সেবা করিতেন ও চিকিৎসারও বন্দোবস্ত করিতেন। শান্তি-সম্প্রদায়ের সহিত কাজ করিতে করিতে মৃগাঙ্কধর দেখিলেন যে (১) দরিদ্র রোগীকে তাহার অস্বাস্থ্যকর গৃহ ও পরিবেশ হইতে স্থানান্তরিত না করিলে তাহার আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা থাকে না। প্রাণপণ সেবা ও কষ্টে সংগৃহীত অর্থসাহায্য দুইই পণ্ড হয়। (২) রাস্তায় ঘাটে এমন রোগী পড়িয়া থাকে যাহাদের কোনো আত্মীয়বন্ধু বা আশ্রয় নাই। এই দুই দল রোগীর জন্যই একটা আশ্রয় দরকার হয়। অথচ বাড়ী ভাড়া করিবার মত না আছে অর্থ, না আছে সহায় বা ভরসা দিবার মত মানুষ। বাঙালী সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে অতিথিসৎকার ও ভিখারী বৈষ্ণবকে ভিক্ষাদান যথেষ্ট বদান্যতার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। পথে প্রান্তরে পতিত নিরাশ্রয় দুঃস্থ মানুষের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার মনোভাব তখনো মানুষের মনে জাগে নাই। মৃগাঙ্কধর লিখিয়াছেন যে "ঠিক এই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই কার্যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন ও নানা ভাবে সাহায্য করেন"—অর্থাৎ কার্যকরীভাবে ইঁহাদের সহিত যোগ দেন।

পূর্বে ঈশ্বরে বিশ্বাস, মানবে প্রেম ও মানবসেবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা ছিল, এখন মস্তিষ্ক আসিয়া তাহার সহিত যুক্ত হইল। নিজেদের সাধ্যের মধ্যে কিভাবে কাজ করিলে প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সেবাকার্য সাধন হয় তাহার প্ল্যান করিতেন এবং দাসগণ প্রাণপণে খাটিতেন। এখন হইতে মৃগাঙ্কধরের বাসায় দু'একটি করিয়া রোগী আনা হইতে লাগিল। কিন্তু কপর্দকশূন্য মৃগাঙ্কধরের ক্ষুদ্র কক্ষে স্থানাভাব। মৃগাঙ্কধর নিজের বিছানা মশারী বরফুরার রোগীদের ছাড়িয়া দিয়া কক্ষের পার্শ্বস্থ বারান্দায় আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন এইভাবে চলিলে পর শান্তি-সম্প্রদায়ের যুবকগণের উৎসাহে ১০২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে ৩২৲ টাকা ভাড়ায় মৃগাঙ্কবাবু একটি বাড়ী লইলেন। এইবার গ্রামের কাজের অন্য ব্যবস্থা করিয়া ক্ষীরোদচন্দ্র আসিয়া মৃগাঙ্কবাবু ও রামানন্দবাবুর সহিত মিলিত হইলেন ও প্রকাশ্যভাবে দাসাশ্রমের কাজ আরম্ভ করিলেন।

পূর্বোক্ত বাটীতে চণ্ডীচরণ গুহ নামে একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি একটি পতিতা রমণীর কন্যাকে তাহার মায়ের নির্বন্ধাতিশয্যে পাপের পরিবেশ হইতে নিজবাটীতে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন। চণ্ডীবাবুর অনুরোধে দাসাশ্রম এই সকল বালিকার ভার লইয়া ইহাদের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্থির হইল যে, ঐ সকল বালিকাকে শিক্ষা দিয়া সেবাধর্মের উপযোগী করিয়া, দাসদাসীগণের সঙ্গে দাসাশ্রমে সেবায় নিযুক্ত করা হইবে।

এই দাসদাসীগণ সেবাকেই ধর্মরূপে বরণ করিয়াছিলেন। "ভগবানের পুত্রকন্তার সেবা করিলে প্রকৃত ভগবানের সেবা হয়" (দাসী ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) এই ছিল তাঁহাদের আদর্শ। সেইজন্ত তাঁহাদের নাম প্রকাশ ছিল না। 'দাস' ও 'দাসী' নামেই তাঁহাদের একমাত্র পরিচয় ছিল। দাসাশ্রমের ইতিহাস—দলবদ্ধভাবে সম্পূর্ণ নিষ্কামসেবার ইতিহাস আজিকার যুগে একান্ত দুর্লভ।×

ঐ সকল বালিকার এইরূপ ব্যবস্থার সংকল্প স্থির হইবামাত্র একজন দাসী (মৃগাঙ্কবাবুর পত্নী কমলবাসিনী) তাঁহার গলার হারটি দান করেন। সেই হার ৪৩৲ টাকায় বিক্রয় হয় এবং ঐ টাকায় চারিজন রোগীর শয্যা ও তৈজসাদি ক্রয় করা হয়। (মৃ)

"১২৯৮-এর ৯ই মাঘ তারিখে ওলাউঠায় আক্রান্ত ধ্রুব নামে একটি রোগীকে শান্তিসম্প্রদায়ের যুবকগণ দাসাশ্রমে লইয়া আসিলেন। মহা উৎসাহের সহিত সেবার কাজ চলিল—দিবারাত্র সকলে মিলিয়া সেবাযত্ন করিয়াও তাহাকে রক্ষা করা গেল না। ১১ই মাঘ 'ধ্রুব' ধ্রুবলোকে চলিয়া গেল। দাসদাসীগণ সকলে মিলিয়া তাহার জন্ম কণ্ঠ মিলাইয়া প্রার্থনা করিলেন ও অশ্রুজলের সহিত তাহাকে বিদায় দিলেন।" মৃগাঙ্কধর লিখিয়াছেন, "১২ই মাঘ সেই ধ্রুবের স্মৃতিচিহ্নপূর্ণ গৃহে অশ্রুজল-বিধৌত প্রাণে, বিশেষভাবে উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া সেবালয় স্থাপিত হইল। ঐ দিনই বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে সম্পাদক করিয়া একটি কমিটি নিযুক্ত হয়।"

পতিতা-গৃহের বালিকাদের উদ্ধারের সংকল্প পরে ত্যাগ করিতে হয়; "কারণ দেখা গেল যে আইনের নানা মারপ্যাচের জন্ম তাহা সম্ভব নয়। সুতরাং অল্পদিন পরেই কমিটি উঠিয়া যায় এবং বাটীভাড়ার অধিকাংশই সম্পাদক মহাশয়কে শোধ করিতে হয়।" (মৃ)

এই সময় আমার পিতা ইন্দুভূষণ রায় সপরিবারে আসিয়া এই দলে যোগ দিলেন। আমি তখন অল্পবয়স্ক বালক হইলেও বোঝা না বোঝার মধ্য দিয়া অনেক ঘটনাই আমার স্মৃতিপটে গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছিল। বহু ব্যাপারই আমি নিজে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কিছু কিছু ঘটনা অদ্যাবধি আমার স্মরণে সুস্পষ্টরূপে গ্রথিত আছে।

"এই সময় রামানন্দবাবুকে সম্পাদক করিয়া 'দাসী' পত্রিকা বাহির করা হয়।" (মৃ) এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কার্য পরিচালনার জন্ম "ইন্দুবাবুকে দাসাশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়।" মৃগাঙ্কধর লিখিয়াছেন যে, "এই সময় দাসাশ্রমের কার্য যেন উপন্যাসের মত চলিয়াছিল। সে সময়ের কথা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কে বা তখন টাকার কথা ভাবিত, কে বা তখন সংসারের কথা ভাবিত। এখন রোগিগণ কার্যকারকগণের পুত্রকন্যাগণের ন্যায় আদরের ও যত্নের বস্তু ছিল। এখন নিত্য উপাসনা হইত ও ভগবানের প্রেমের স্রোত দাসাশ্রম প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইত। তখন দাসদাসীগণ চাহিলেই পাইতেন (অর্থাৎ, ভগবানের নিকট—লেখক), না পাইলেও অবিশ্বাস আসিত না, পরন্তু নিজেদের দোষ আছে ভাবিয়া আরও হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিতেন, আর ভগবান্ অজস্রধারে আশীর্বাদ বর্ষণ করিতেন।" সহ-সম্পাদক মৃগাঙ্কবাবুর রিপোর্ট হইতে মাঝে মাঝে উদ্ধৃত করিয়া, কি প্রকার আবহাওয়ার মধ্যে দাসাশ্রমের কার্য পরিচালিত হইত তাহাই দেখানো আমার উদ্দেশ্য। এই সকল উপাসনা, উৎসব-আনন্দ কোনোটিতেই তাঁহাদের রোগী পুত্রকন্যাগণ বাদ পড়িতেন না। মনে আছে, মাঝে মাঝে কোনো বদান্য ব্যক্তির দানে উপাসনার পর রোগীদিগকে ফল, মিষ্টান্ন ও খিচুড়ী খাওয়ানো হইত। তাহাদের খাওয়া না হইলে বাড়ীর শিশুরাও খাইতে পাইত না। মৃগাঙ্কবাবু লিখিয়াছেন—"উপাসনায় দাসাশ্রমের জন্ম, উপাসনায় দাসাশ্রমের বৃদ্ধি। উপাসনা দাসাশ্রমের সকল অভাব দূর করিয়াছে এবং বিশ্বাস করি উপাসনাই দাসাশ্রমের সকল অভাব দূর করিবে।" আশ্চর্য এই যে রোগিগণ 'দাসদাসী'দের প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ ভগভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন। ছেলেবেলায় সেই যা দেখিয়াছিলাম তেমনটি আর জীবনে কখনো চোখে পড়িল না। এই সমস্তের মধ্যে রামানন্দ নির্বাক্, সস্মিত প্রসন্ন মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ও রোগীদের তৃপ্তিপূর্ণ মুখ দেখিয়া তাঁহার মনে যে আনন্দ জন্মিত, তাঁহার সেই পবিত্র সুন্দর উজ্জ্বল আননে তাহা প্রতিভাসিত হইত।

"এই সময়ে মাণিকদহের জমিদার বিপিনবিহারী রায় তাঁহার পরলোকগতা পত্নী সুরাজমোহিনীর ২৬০০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কারগুলি মৃগাঙ্কধরের হস্তে সমর্পণ করেন। ভগবানের করুণা ও দাসাশ্রমের দাসদাসীদের উপর মানুষের এই অসীম বিশ্বাস দেখিয়া 'কার্যকারকগণ অবাক, কাঁদিয়া আকুল'। সেইদিন প্রথম দাসাশ্রম কমিটির

গঠিত হয়। বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কার্যাধ্যক্ষ সম্পাদক হন। ঐ কমিটি তখন কেবল পরামর্শ দিতেন। যেমন ঘরোয়া পরামর্শ হয় তেমনি হইত।" (মৃ)

"এই সময় বাবু শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় দাসাশ্রমের জন্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনেক পরিশ্রম করেন। বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয় ডাক্তার ভাবে অনেক সাহায্য করেন। তজ্জন্ত উভয়কে কমিটির সভ্য করিয়া লওয়া হয়। মূল হইতে দাসাশ্রমের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কোনও যোগ ছিল না।" (মানে, ফর্ম্যাল যোগ কিছু ছিল না। অবশ্য সকল কর্মই ব্রাহ্মধর্মানুগতভাবে ব্রাহ্মসমাজের মানুষদের দ্বারাই সম্পাদিত হইত।—লেখক।) "দাসাশ্রমের কার্যকারকগণ কোনও ধর্মসমাজের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হইয়া অপর সমাজের লোকদিগের সহায়তা করিবার পথ রুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই।" (মৃ)

তাঁহারা জানিতেন কোন বর্ণহিন্দু তাঁহাদের মত জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের রোগীর মলমূত্র উচ্ছিষ্ট ঘাঁটিবেন না। তখনকার অবস্থায় বর্ণহিন্দুর পক্ষে তাহা অসম্ভব ছিল। কিন্তু শরৎবাবু ফ্যাকড়া তুলিলেন যে যদি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হয় তবে ব্রহ্মনাম হয় কেন। ব্রাহ্মরা হিন্দুদের ভাতজল দেন কেমন করিয়া, ইত্যাদি। কার্যকারকগণ কমিটির অধীন সুতরাং শরৎবাবুর এই সব ফ্যাকড়া তোলায় কাজের খুব অসুবিধা হইতে লাগিল।

কাজ আর ভাল ভাবে হয় না। লোকে একটু একটু করিয়া বিরক্ত হইতে লাগিল। কমিটিও নিজ মূর্তি ধারণ করিলেন। কার্যকারকগণের বুক ভাঙিয়া গেল। তাঁহারা বলিলেন, বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করিতে হইলে তাঁহারা চলিয়া যাইবেন।

৪র্থ বৎসরের বার্ষিকসভা হইল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সভাপতি হইলেন। বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনারেবল রাসবিহারী ঘোষ, মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ বক্তৃতা করিলেন।

কমিটি নিয়ম প্রণয়ন করিলেন, দাসাশ্রম যাহাতে অসাম্প্রদায়িক ভাবে চলিতে পারে: (১) ব্রাহ্মগণ রসুইঘরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। (২) রোগীদিগকে ভাতজল দিতে পারিবেন না। (৩) সেবালয়ে উপাসনা হইতে পারিবে না। (৪) অন্নদানের সময় প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

কার্যকারকগণ চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে দাসাশ্রম ত্যাগ করিলেন। তখন কমিটি বেতন দিয়া একজন কার্যাধ্যক্ষকে রাখিলেন ও তাঁহার অধীনে ব্রাহ্মণী, চাকর ও মেথর রাখিয়া দিলেন। কিন্তু রোগীদের সেই আপনার গৃহে আত্মীয়ের সেবাযত্ন আদর পাওয়ার সুখ আর থাকিল না। মায়ের মত সেবা করিবার জন্ত দাসগণের পত্নীরা নাই। "দাসাশ্রমের যদি কিছু বিশেষত্ব থাকে, তাহা এই যে ঈশ্বরের দাসদাসীগণ নিজ হস্তে রোগীদের সেবা করিয় আপনারা চরিতার্থ হন ও রোগীদের প্রাণে আরাম তৃপ্তি দান করেন। এখন সেই দাসাশ্রমের সেবার বিশেষত্ব চলিয়া গেল। অনেকেই বলিতে লাগিলেন, দাসাশ্রম হাসপাতালে পরিণত হইল।" (মৃ)

নানা বিশৃঙ্খলা শুরু হইল। এতদিন কার্যকারকগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। তাহা বন্ধ হওয়াতে দাসাশ্রমের কর্জ হইতে লাগিল। এইবার কমিটিতে প্রশ্ন হইল, "এখন এ দেনার জন্ত দায়ী কে হইবে? শরৎবাবু বলিলেন, কমিটিকেই দেনার জন্ত দায়ী হইতে হইবে।" ইহাতে কমিটির অন্তান্ত সভ্য কেহ রাজী হইলেন না। আসলে নামের লোভে মাতব্বরি করিতে, গোঁড়ামি করিতে অনেকেই পারে। কিন্তু সেবা করিতে, আত্মত্যাগ করিতে, কায়মনপ্রাণে ভগবানের উপর নির্ভর রাখিয়া দাসাশ্রমের মত বিত্তহীন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ও আপন সন্তানজ্ঞানে স্বহস্তে রোগীদিগের মলমূত্র পরিষ্কার করিতে, আপ্রাণ সেবা করিতে কেহ প্রস্তুত ছিলেন না। দায়ে পড়িয়া আবার কার্যকারকগণের হাতে অর্থাৎ "যে ব্রাহ্মযুবকদ্বয় (মৃগাঙ্কধর ও ক্ষীরোদচন্দ্র) দাসাশ্রম প্রথম স্থাপন করিয়াছিলেন" তাঁহাদের হাতে পুনরায় দাসাশ্রমকে সমর্পণ করিয়া কমিটি ভাঙিয়া দেওয়া হইল এবং দাসদাসীগণ পূর্ববৎ মাত্র ঈশ্বরকৃপার উপর নির্ভর করিয়া দাসাশ্রম চালাইতে লাগিলেন।

সংক্ষেপে এই হইল দাসাশ্রমের স্বরূপ। নীরব কর্মী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের এক মহান্ আদর্শ যাহার মধ্য দিয়া সার্থক হইয়াছিল এবং যাহার মুখপত্ররূপে তাঁহার জীবনের প্রথম মাসিক পত্রিকা "দাসীর" সম্পাদক রূপে তাঁহার ভবিষ্যৎ সাংবাদিক জীবনের ভিত্তি স্থাপনা হইয়াছিল।

দাসী

প্রবাসীর গৌরবের পূর্বসূচনা লইয়া দাসাশ্রম প্রতিষ্ঠান হইতে "দাসী" পত্রিকা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে সম্পাদক করিয়া বাহির হইল। রামানন্দের প্রত্যেকটি কাজেই অনন্যসাধারণতা প্রকাশ পাইত। "দাসী" পত্রিকা

বাহির হইবামাত্র তাহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যদিচ "দাসী" দাসাশ্রমের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যদিচ জনসেবার ভাবে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, দাসাশ্রমের মহৎ উদ্দেশ্য প্রচার ও তাহার মাসিক কার্য-বিবরণ ও আয়ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তথাপি গোড়া হইতেই "দাসী" সর্বপ্রকার জনকল্যাণসাধন ও জনশিক্ষা প্রচারে তৎকালীন অন্যান্য পত্রিকা হইতে একটি স্বতন্ত্র সত্তা লইয়া বাংলাদেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

এই "দাসী" পত্রিকা হইতে যাহা কিছু লভ্য হইত তাহা দাসাশ্রমের সেবাকার্যে ব্যয়িত হইত। রামানন্দ এক পয়সাও ইহার সম্পাদনার জন্য গ্রহণ করিতেন না।

রামানন্দ সম্বন্ধে শান্তা দেবী লিখিয়াছেন—"দেশে দুঃখের অভাব নাই। নিরক্ষরতা, দুর্ভিক্ষ, রোগশোক, অধর্ম, মাদকতা, পশুপীড়ন কত কি? রামানন্দের মন কৈশোর হইতেই দেশহিতব্রত ও নিষ্কাম মানবপ্রীতিতে অর্পিত ছিল। প্রথম জীবনে বহু কাজের মধ্যে তিনি ঝাঁপ দিয়াছিলেন, কিন্তু মানবপ্রীতির যে অন্তহীন উৎস তাঁর অন্তরে সতত উৎসারিত হইত, তা কোনো একটা মাত্র কাজে তৃপ্তি পাইত না। * * * কোনো কাজই তুচ্ছ মনে হইত না। অথচ যে কাজেই আকণ্ঠ ডুবিয়া যান মনে হয় অন্য অনেক কাজ হয় নাই। * * * আপাততঃ ব্রাহ্মসমাজের কাজ ও দাসাশ্রমের কাজেই তিনি মন দিলেন। লেখনী ধারণের অধিকার তাঁর ছিল। তার সাহায্যে দাসাশ্রমে যদি কিছু অর্থ আসে এই উদ্দেশ্যে তিনি লেখনীই তুলিয়া লইলেন। আগেই ডায়েরীতে দেখিয়াছি বিধাতা যেন তাঁকে বলিলেন, "Do with all your might whatever your hands find nearest to do" * * * যতটুকু শক্তি যতটুকু জ্ঞান তাঁর ছিল তিনি নির্বিচারে সর্ব-মানবের সেবায় তা ঢালিয়া দিলেন।"

মানব-কল্যাণের জন্য দাসীর মত ক্ষুদ্র কাগজে কি কি বিষয় তখনকার দিনেও আলোচনা চলিত তাহার একটু নমুনা দি। বিলাতের ধারায় সেবা যথা—Poor Law, অনাথ-আবাস, ইতর প্রাণীদের সেবা, ইত্যাদি। গো-মাতাকে রক্ষা করার চেষ্টা, ছায়া-বৃক্ষ রোপণ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, জলছত্র দান, প্রভৃতি দেশীয় রীতির জীব-সেবার কথা। এ ছাড়াও, আসামের কুলিদের কথা বিশেষ ভাবে একদল ব্রাহ্মসমাজের মানুষকে তাহাদের দুঃখমোচন চেষ্টায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। রামানন্দ ও কৃষ্ণকুমার মিত্র এই দলের হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই দলের মধ্যে কেহ কেহ নিজেরাই চা-বাগানের কুলি হইয়া গিয়া কুলিদিগের দুঃখকষ্ট নিজেরা ভোগ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়াও দাসীতে, উপন্যাস, কবিতা, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ, পুস্তক সমালোচনা, পুরাতত্ত্ব, প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগের এবং তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠতম লেখকগণের লেখা বাহির হইত। রামানন্দের আকর্ষণে কি দাসাশ্রমে, কি দাসীর লেখকগোষ্ঠীতে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণ আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।

শান্তা দেবী লিখিয়াছেন যে, "তখন দাসী ও দাসাশ্রম কলিকাতার সমাজে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিল। * * * জনসাধারণে যে দাসাশ্রমের কাজে সহানুভূতি ছিল তা প্রতি মাসে সাধারণের দানের হিসাব হইতেই বুঝা যায়।" সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে স্কুলের বালক-বালিকারাও উৎসাহী হইয়া এই প্রতিষ্ঠানে দান করিত নিজেদের টিফিনের পয়সা বাঁচাইয়া।

দাসাশ্রম, দাসী ও তৎসম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে ঠিক মতো লিখিতে হইলে একখানি বৃহৎ পুঁথি লেখার আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিষয়টির প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। তথাপি এই অনন্য-সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও ইহার দাসগণের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে আভাসমাত্র দিয়া ক্ষান্ত হইতে হইল। কেবল প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, আষাঢ়, ১২৯৯-এর দাসী হইতে, দাসীর প্রস্তাবনাটুকু উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রস্তাবনা

(দাসী, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়—১২৯৯)

"বঙ্গ-সাহিত্যে মাসিক পত্রিকার অভাব নাই। এতগুলি মাসিক পত্রিকা থাকিতে আমরা কেন আর একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশিত করিতেছি, এই প্রশ্ন সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব বা বিজ্ঞানের অনুশীলন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বঙ্গীয় পুরুষ ও রমণীগণের হৃদয়ে সেবাভাব জাগাইয়া দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের এতাদৃশ দুরূহ কার্যের অনুরূপ শক্তি নাই। আমরা বিশ্বসেবা-ব্রত

ধারণের উপযুক্ত নহি। যাহার যতটুকু শক্তি, তিনি ততটুকুই জীবের সেবায় নিয়োজিত করিবেন, ইহাই ভগবানের আদেশ। কেবল এই ভরসায় কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি যে, যদি ভগবানের কৃপা থাকে, আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা ফলবতী হইবেই হইবে।

"বর্ত্তমানে বঙ্গদেশকে দুঃখের জলধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশে দুর্ভিক্ষ ত লাগিয়াই আছে। * * * ইহার উপর আবার জ্বর, বসন্ত, বিসূচিকা, প্রভৃতির উপদ্রবে জনসাধারণ ব্যতিব্যস্ত। অনেক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে কোনো কোনো গ্রাম অধিবাসীশূন্য হইয়া পড়ে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। * * * দরিদ্রা বহু সন্তানবতী বিধবা জননীর ক্লেশ, অর্থহীন বিদ্যার্থীর মনোবেদনা, দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির নৈরাশ্য ও রোগ-যন্ত্রণা, মহানগরীতে অসহায় পীড়িত ব্যক্তিগণের দুর্দশা প্রভৃতি * * * তাহার পর, সহস্র সহস্র বঙ্গীয় যুবক এবং প্রৌঢ় ব্যক্তিগণের অধোগতির কারণ পান-দোষ এবং ব্যভিচারের নিয়ত প্রবহমাণ স্রোতে কত নরনারীর কত পরিবারের সুখ শান্তি ভাসিয়া যাইতেছে ইহা ভাবিলেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। কোনো সরলপ্রাণা রমণীর একবার পদস্খলন হইলে, কে তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে? সে ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়। * * *

* * * "'দাসী' কেবল সকলকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে সংসারে দুঃখীর অভাব নাই, দয়াবৃত্তি পরিচালনের যথেষ্ট প্রয়োজন ও সুযোগ আছে। * * * ভগবান্ "দাসী"র মস্তকে কৃপাবারি বর্ষণ করুন। 'দাসী' যেন এই মহানিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ হয়।"

লেখার ভাষা, ভাব, ঢং, প্রভৃতি বিচার করিয়া আমার যতদূর মনে হয়, লেখাটি স্বর্গীয় মৃগাঙ্কধর রায়-চৌধুরীর।

প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাসাশ্রমের অনন্যতা অস্বীকার করা যায় না এবং এই আশ্চর্য প্রতিষ্ঠানের দাসগোষ্ঠীর মানুষগুলিও যে অনন্যসাধারণ ছিলেন দাসীর রিপোর্ট হইতে, ও নিজের যতদূর মনে পড়ে, পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়াছি এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ রামানন্দকে পরিচালকরূপে বরণ করিয়া তাঁহারা যে কত দূর-দৃষ্টির ও নিজেদের সততা ও নিরহংকার চরিত্রের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা রামানন্দের দাসাশ্রম পরিচালনা, দাসীর সম্পাদনা এবং পরবর্তী জীবনের উৎকর্ষের দ্বারায় নিঃশেষে প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রবন্ধটি "দাসী"র রিপোর্ট, শান্তা দেবীর "রামানন্দ ও অর্দ্ধ-শতাব্দীর বাংলা" এবং বহু স্থানেই সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক যোগানন্দ দাস মহাশয়ের "দাসাশ্রম" ও "দাসী" সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহ হইতে সাহায্য লইয়াছি। মৃ = মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী। × = যোগানন্দ দাস।— লেখক।

—•—

পিতৃস্মৃতি

শ্রীসীতা দেবী

বাবার স্বভাবের একটা দিক্ বাইরের সকলের কাছে খুব একটা ধরা পড়ত না, আত্মীয়স্বজনরা অবশ্য জানতেন। সেটা তাঁর একান্ত বন্ধুবৎসলতা। জীবনে একবার যাঁকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব'লে তিনি গ্রহণ করতেন, তাঁকে কখনও ভুলতেন না। একনিষ্ঠতা তাঁর স্বভাবের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন তিনি, তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে মতামত বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে মতামতও এবেলা ওবেলা বদ্‌লাত না। সুবিধাবাদীও তিনি ছিলেন না। হিন্দু-ধর্মের প্রচলিত পন্থা ত্যাগ ক'রে, উপবীত ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার জন্য প্রথম যৌবনে তাঁকে কিছু উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল, সেটা তিনি গ্রাহ্যও করেন নি। পরিণত বয়সে, প্রায় শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি তাঁর রাষ্ট্রীয় মতামতের জন্য বিদেশী সরকারের উৎপাত সহ্য করেছিলেন, তাতে কোনোদিনও বিচলিত হন নি। সাংসারিক ক্ষয়-ক্ষতি কিছুই তাঁকে কোনোদিন পথভ্রষ্ট করে নি।

খুব ছোটবেলাকার বন্ধু যাঁরা, যাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছিলেন, তাঁদের কথা প্রায়ই বলতেন। একটি গল্প শুনে আমরা খুব হাসতাম। তিনি যখন খুব ছোট, পাঠশালে পড়েন, তখন তাঁর সঙ্গে একক্লাশে একটি তাম্বলী জাতীয় ছেলে পড়ত। সে একদিন ক্লাশের সময়ই বাবাকে বলে তার পিঠ চুলকে দিতে। বাবা পিঠ চুলকে দিলেন, গুরুমশায় সেটা দেখতে পেলেন এবং চ'টে বাবাকে একটা চড় মেরে বললেন, "তুই কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তাম্বলীর পিঠ চুলকে দিলি!" ছোট থেকেই জাতিভেদ জিনিষটাকে ঘৃণা করতেন এবং কোনোদিনই সেটা পালন করতে চাইতেন না। পরিণত বয়সে "জাত-পাত-তোড়ক" মণ্ডলীর সভাপতি হন। মুসলমান বন্ধুদেরও খুব ভালবাসতেন। বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে যোগ রাখা সব সময় সম্ভব হ'ত না। কখনও কোনো সময়ে তাঁদের সন্ধান পেলে চিঠিপত্র লিখে আবার আলাপ করার চেষ্টা করতেন। তাঁকেও সহপাঠীরা মনেই রেখেছিলেন চিরকাল বোধহয়। একবার জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেই সময় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এসে প্রবেশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ বাবার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় প্রমথবাবু বললেন, "আমরা এক সঙ্গে কলেজে পড়েছি মনে হচ্ছে।" বাবা তখন বললেন যে, সে কথা তাঁরও মনে আছে। সম্ভব প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁরা একসঙ্গে পড়েছিলেন।

বাল্যকালে বাঁকুড়ায় যাঁদের সঙ্গে পড়েছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে খুব খুশী হতেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন, তাঁকে আমরা পরেশকাকা বলতাম। ইনি এলাহাবাদে ও কলকাতায় অনেক সময়ই আমাদের বাড়ী আসতেন। বাবা তাঁকে দেখে খুশী হয়ে বাল্যকালের অনেক গল্প করতেন এবং পরেশকাকাকে কাজকর্ম জুটিয়ে দিয়ে সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন।

এলাহাবাদেই আমার বাল্যকাল কেটেছে। তখন দেখে অবাক্ হতাম যে, বাবা যদিও ব্রাহ্ম, তবু দারুণ সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁর কত বন্ধুত্ব। এঁদের একজন ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। বাবাকে তিনি বড় ভালবাসতেন। আমাদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা ছিল। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে বাবার নানাকারণে প্রায়ই বিরোধ ঘটত। বাবা অনেক সময় কাজ ছেড়ে দিতে চাইতেন। পণ্ডিত মালবীয় তখন মাঝে প'ড়ে বিবাদ মিটিয়ে দিতেন। বাবাকে এলাহাবাদে ধ'রে রাখার চেষ্টা তাঁর সর্ব্বদাই ছিল। হোলীর সময় ও-প্রদেশের সাধারণ মানুষরা বড় অসভ্যতা করত। পণ্ডিত মালবীয় তখন "নির্দ্দোষ হোলী"র জন্য আন্দোলন করেন, এতে বাবার খুব সহানুভূতি ছিল।

পণ্ডিত সুন্দরলাল, মহোমহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতি অতি সনাতনপন্থী মানুষ বাবার খুব বন্ধু ছিলেন। আমাদের বাড়ী যাওয়া-আসা ছিল অনেকেরই।

এলাহাবাদে বাসকালে যাঁকে আমরা বিশিষ্টরূপে পিতৃবন্ধুরূপে জানতাম, তিনি মেজর বামনদাস বসু। ইনি সৈন্যবিভাগের চিকিৎসক ছিলেন, কার্য্যগতিকে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে ঘুরে বেড়াতেন, মধ্যে মধ্যে এসে এলাহাবাদে থাকতেন। কোথায় তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম মনে পড়ে না, তবে তাঁর জরীবসানো কালো রং-এর সামরিক পোশাক দেখে খুব চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলাম। ইনি এবং এঁর বড় ভাই শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পাণ্ডিত্য ও সাধুতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরা আজন্ম প্রবাসী বাঙালী, কিন্তু বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। প্রবাসী বাঙালীরা যাতে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে একেবারে বিযুক্ত না হয়ে যান, সে জন্যে এই দুই ভাই ও বাবার সমবেত চেষ্টায় ওখানে একটি "প্রবাসী বাঙালী সম্মিলন" সৃষ্টি হয়। ওখানকার বাঙালীরা এতে খুব আনন্দের সঙ্গে যোগদান করেন, এবং সবদিক্ দিয়ে এটিকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তোলেন।

বামনদাসবাবু বিপত্নীক ছিলেন, একটিমাত্র পুত্র তাঁর ছিল, নাম ললিত। তাঁর দাদার বড় পরিবার ছিল, ছেলেমেয়ে অনেকগুলি, পৌত্রও অনেক। দুই ভাই একত্রেই বাস করতেন বাহাদুরগঞ্জের এক বিশাল বাড়ীতে। বাড়ীখানি তাঁদের নিজেরই, এবং আমরা যতদিন এলাহাবাদে ছিলাম, দেখতাম, তাতে হয় ঘর বাড়ানো হচ্ছে, নয় কিছু একটা বদলে অন্যরকম করা হচ্ছে। মিস্ত্রি সারাক্ষণই কাজ করছে, বাঁশের ভারা বাড়ীর কোনো না কোনো জায়গায় বাঁধাই রয়েছে। একতলায় অনেকগুলি ঘর, দোতলায় ঘরের সংখ্যা তত বেশী নয়। একতলার গোটা দুই বড় ঘর, মেঝে থেকে ছাদ পর্য্যন্ত বইয়ে ঠাসা, উপরের বই পাড়তে হলে মইয়ে চ'ড়ে পাড়তে হ'ত। গান্ধার শিল্পকলার নিদর্শন অনেকগুলি পাথরের মূর্ত্তিও সেখানে দেখতাম। এগুলি বামনদাস বসু মহাশয় সীমান্তে বাস

করা কালে সংগ্রহ করেছিলেন জনতায়। এই বসতবাড়ি বৈঠকখানা ও লাইব্রেরীরূপে ব্যবহার করা হত। বাড়ীর কর্তারা পড়াশুনো নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন। শ্রীশবাবু সংস্কৃত ব্যাকরণ নিয়ে বই লিখেছিলেন, তাইতেই তাঁর প্রথম প্রসিদ্ধি ঘটে। এ ছাড়া শিশু-সাহিত্যের দিকে মনোযোগী ছিলেন। তাঁর সংকলিত Folktales of Hindusthan এবং Adventures of Guru Noodle বই দুটি পরে আমরা দুই বোন বাংলাভাষায় রূপান্তরিত করি। বামনদাসবাবুও লিখতেন, ভারতে ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে ও হিতকরী ভেষজ সম্বন্ধে। Modern Review ও প্রবাসীতে এঁর অনেক লেখা বেরিয়েছিল।

মেজর বসু মহাশয় অতি দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। সুতরাং সরকারী কাজ করা তাঁর বেশী দিন সম্ভব হয় নি। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তিনি কাজ ছেড়ে দেন, এবং এলাহাবাদে এসে বাস করতে আরম্ভ করেন।

শ্রীশবাবুর কন্যারা ও ভ্রাতুষ্পুত্রী, ইন্দিরা, সুজাতা ও মৃণালিনী আমাদের বন্ধু ছিলেন। এলাহাবাদে যতদিন ছিলাম, ততদিন এঁরাই একমাত্র বন্ধু ছিলেন। অন্য কোনো বাড়ীতে আমাদের যাওয়ার অনেক বাধা ছিল, আমরা ব্রাহ্ম সমাজের, চালচলন সব স্বতন্ত্র, এ নিয়ে অনেক মন্তব্য হ'ত। এই বাড়ীতে সে সব কোনো উৎপাত ছিল না, চালচলন ধরণ-ধারণে এঁরা অনেকটা আমাদের মতই ছিলেন। বাড়ীর সকলেই শিক্ষিত, শ্রীশবাবুর এক ভগিনী ও ভগ্নীপতি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মই ছিলেন। কাজেই আমরা নিঃসঙ্কোচে এখানে যাওয়া-আসা করতাম। এমনি যাওয়া ত হতই, রামলীলার সময় মিছিল দেখার জন্যে অতি আগ্রহ ক'রে, প্রায় সকাল থেকেই ওখানে থেকে যেতাম। সে রকম মিছিল পরবর্ত্তী জীবনে আর দেখি নি এমন নয়, কিন্তু তখন চোখে যা রং লাগত, তা আর কখনও লাগে নি। যেন সত্যিই একেবারে ত্রেতাযুগে চ'লে যেতাম। কি আনন্দ যে পেতাম, তা এখন ব'লে বোঝাতে পারব না।

মেজর বসু বাবার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত। বাবাকে যতরকমে সাহায্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল, সব তিনি অকাতরে করতেন। তখনকার দারুণ রাষ্ট্রীয় সঙ্কটের দিনে তিনি নির্ভীক কনিষ্ঠ ভাইয়ের মত সব সময় বাবার পাশে দাঁড়াতেন, কোনো কিছুতে হঠতেন না। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও তাঁর ছিল অসাধারণ, উপস্থিত সঙ্কট এড়াবার কতরকম কৌশল যে চট ক'রে আবিষ্কার করতেন তার ঠিক নেই। অতি বিনয়ী ভদ্রলোক ছিলেন, কিন্তু ভিতরটি ছিল খাঁটি ইস্পাতে গড়া। আমাদের মত বালিকাদের ও তার চেয়ে ছোট ভাইদেরও তিনি "আপনি" ব'লে সম্বোধন করতেন এবং কখনও প্রণাম করতে দিতেন না। এলাহাবাদের বাস উঠিয়ে দেবার পরও বাবা এঁর মায়া কাটাতে পারেন নি, বার বার গিয়ে এঁর সঙ্গে থেকে এসেছেন। মেজর বসু বোধ হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

কলকাতায় আসার পর দেখলাম, তাঁর প্রথম জীবনের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র যাঁরা ছিলেন, বাবা তাঁদের আবার যেন ফিরে পেলেন। অনেকের মধ্যে প্রথম যে দু'জনের নাম মনে প'ড়ে, তাঁরা দু'জনেই বাবার গুরু ছিলেন। একজন আচার্য্য স্তর জগদীশচন্দ্র আর একজন অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। জগদীশচন্দ্র বাবাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, এবং বাবার কন্যা ব'লে আমরাও সে স্নেহের অংশভাগিনী হতাম। তাঁর দুরূহ বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক ইংরেজী বক্তৃতাগুলিতে বাবার সঙ্গে আমাদেরও ডাক আসত। এমন চমৎকার সহজ ক'রে বলতেন যে আমাদের মত অর্ব্বাচীনেও খানিক খানিক বুঝতে পারত। বাইরের লোকেরা অবশ্য বুঝতে পারত না যে এই বিজ্ঞানজ্ঞানহীন বালিকারা কি কারণে এই সব বক্তৃতায় উপস্থিত হতেন।

হেরম্ববাবুর প্রতিও বাবার শ্রদ্ধা ছিল অসীম। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কেও বাবা আদর্শচরিত্র গুরু বোধে ভক্তি করতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল বেশ, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কাজে বেশী ব্যস্ত থাকায় তিনি এদিকে মন দিতেন না। বাবা জোর ক'রে তাঁকে দিয়ে লেখাতেন, তাঁর বই ছাপাতেন। বাবার অনুরোধে প'ড়ে তিনি অনেকগুলি বই লিখেছিলেন, যা এমনি হয়ত তিনি লিখতেন না। শিবনাথ বাবাকে বড় ভালবাসতেন। এলাহাবাদে আমাদের বাড়ী গিয়ে তিনি অনেকবার অতিথি হয়েছিলেন। আমরা তাঁকে দাদামশায় ব'লে জানতাম। শাস্ত্রী মহাশয় ৩০শে সেপ্টেম্বর মারা যান ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বোধ হয়। ১৯৪৩-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর বাবা পরলোক গমন করেন।

বাবার বন্ধুদের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁর জীবনাকাশের সূর্য্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একজন পুরুষ আর-একজন পুরুষকে এমন গভীরভাবে, এমন ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে আজীবন ভালবাসতে পারেন এ আমার জীবনে আমি কখনও দেখি নি, বইয়েও পড়ি নি। অবশ্য De Profundis-এর ভাষায় বলা যায় 'Great passion requires great souls.' এ রকম ভালবাসা উদ্রেক করবার মত মানুষই বা জগতে ক'জন জন্মেছে এবং এ রকম ক'রে ভালবাসতেই বা ক'জন পেরেছে? ভালবাসা ব'লে সংসারে যা চলে, তার ক'টাই বা সত্য ভালবাসা? সত্য ভালবাসার ক্ষেত্রেও তারতম্য থাকে, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু বাবার মধ্যে প্রতিদানের কোনো আশা কখনও দেখি নি। দিয়েই তিনি তৃপ্ত ছিলেন, ফিরে পাচ্ছেন কি না সেটার হিসাব মিলাতে যেতেন না। কথাটা অবশ্য তাঁর এবং রবীন্দ্রনাথের ভালবাসার ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়। রবীন্দ্রনাথও বাবাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন। কিন্তু অন্য অনেক জায়গায় দেখেছি, অত্যন্ত ভালবাসা দিয়েও প্রতিদানে বাবাকে অবহেলা ছাড়া কিছু না পেতে। সেক্ষেত্রেও তাঁর ভালবাসা ফিরে যায় নি, প্রেমাস্পদের মঙ্গলচিন্তা আগেরই মত তাঁর হৃদয় জুড়ে ছিল। ভালবাসাকে তিনি শুধু একটা উচ্ছ্বাস করবার জিনিষ ব'লে মনে করতেন না, বরং এই উচ্ছ্বাসটাই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। যাঁকে ভালবাসতেন, তার জন্য প্রাণপণ ক'রে খেটে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁর ও তাঁর কাজের মঙ্গলসাধন না করতে পারলে বাবার হৃদয় তৃপ্ত হ'ত না। রবীন্দ্রনাথ অলোকসামান্য লোকোত্তর পুরুষ ছিলেন। তাঁর প্রতিভা, তাঁর মহিমা, কোনো কারণেই চাপা থাকত না। কিন্তু তাঁর সকল রচনার, সকল কাজের অকুণ্ঠ প্রচারে ও সর্ব্বাঙ্গীণ সহায়তায়, এই স্বল্পবাক্, অক্লান্তকর্ম্মী বন্ধুর কতখানি অংশ ছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজে তা বুঝতেন এবং নিজের অনবদ্য ভাষায় বহুস্থলে তা স্বীকার ক'রেও গেছেন। দেশবাসীর কাছে তিনি প্রথম জীবনে অবহেলা, উপেক্ষা ও বিদ্রূপ কম পান নি, সেজন্যে কবির হৃদয়ে একটা অভিমান শেষদিন পর্য্যন্ত ছিল। কথাবার্ত্তায় সেটা মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ত। বাবা উপস্থিত থাকলে দুঃখিত হতেন, এবং মাঝে মাঝে প্রতিবাদও জানাতেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই বলতেন, "জগদীশের বা আপনার কথা কি আর আমি বলছি?"

বাবার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কখন আলাপ হয় তা ঠিক আমি জানি না। দু'জনেই সাহিত্যব্রতী, দুইজনেই মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, এই সূত্রে তাঁদের পরিচয় হয়ে থাকবে। শিশুকালেও এলাহাবাদে তাঁকে আমাদের বাড়ী আসতে দেখেছি। কলকাতায় যখন আমরা বরাবরের মত চ'লে এলাম এলাহাবাদ ছেড়ে, তখনই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ ঘনিষ্ঠ হ'ল। বাবা তাঁকে আগেই চিনতেন, এখন আমরাও তাঁকে চিনবার সুযোগ পেলাম। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমরা শান্তিনিকেতনে যাওয়া-আসা আরম্ভ করি। ওখানের উৎসবাদিতে বড় আগ্রহ ক'রে আমরা যোগ দিতাম, যেতে না পেলে হতাশায় হৃদয় ভেঙে পড়ত। বাবা এসব ব্যাপারে সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন, কারণ রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাবার আগ্রহ তাঁরও কম ছিল না। কলকাতায় যখনই রবীন্দ্রনাথ আসতেন, বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতেন, আমাদের ডেকে খোঁজ-খবর নিতেন। নূতন কোনো লেখা প্রস্তুত হলেই কলকাতায় এসে তাঁর ভক্তবৃন্দকে শুনিয়ে যেতেন। লেখাগুলি প্রায়ই প্রবাসীর পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করত। একমাত্র "সবুজ পত্রে"র যুগে কিছুদিন এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। কিন্তু এই "ক্ষণিকের মেঘ" এই দুই বন্ধুর চিরদিনের ভালবাসার উপর কোনো ছায়াপাত করে নি। রবীন্দ্রনাথকে বাবা জানাতে চেষ্টা করতেন যে এ বিষয়ে তাঁর কোনো অভিযোগ নেই, রবীন্দ্রনাথ উল্টে জানাতেন যে আজকাল তাঁর ক্ষমতা কমে আসছে, যা লিখতে পারেন তাতে দুটি কাগজের ক্ষুধা মেটে না, অনিবার্য্য কারণে নূতনটির পাতেই বেশী পড়েছে। কিন্তু এই সময়েও প্রবাসীতে একেবারে তাঁর লেখা বেরোত না, এমন নয়। যেসব প্রবন্ধ 'সবুজ পত্রে' চলত না, তা সবই প্রায় প্রবাসীতে বেরোত।

ইংরেজী লেখায় রবীন্দ্রনাথকে প্রবৃত্ত করানো বাবার আর এক কাজ ছিল। কবি প্রথমে রাজী হতেন না, পরিহাস ক'রে বলতেন, ইংরেজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চুকে গেছে। "বিদায় করেছি যারে নয়নজলে, এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে?"

বাবা কিন্তু এতে নিরস্ত হতেন না। বাবার অনুরোধ এড়াতে না পেরে কবি ইংরেজী লিখতে আরম্ভ করেন। মধ্যে মধ্যে ভাষা-সংশোধনের জন্য বাবার কাছে পাঠিয়ে দিতেন, সংশোধন অবশ্য কিছু করতে হ'ত না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। 'কণিকার' দু'চারটি অনুবাদে সামান্য পরিবর্ত্তন হয়েছিল। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর কাজে সহায়তা করবার চেষ্টা বাবা বরাবর করতেন। অর্থসাহায্য মাঝে মাঝে করেছেন তাঁর সাধ্যমত। অবশ্য এভাবে "রাজ ভিখারীকে" যা তিনি দিতে পেরেছিলেন, তা দশগুণ "সোনা" হয়ে তাঁর নিজের ভাণ্ডারে ফিরে

এসেছিল। "গোরা"র জন্ম হয় এই ভাবে। বিদ্যালয়ের জন্য ভাল শিক্ষক জোগাড় ক'রে দেবার চেষ্টা বাবা সর্ব্বদা করতেন। নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়কে তিনিই সংগ্রহ ক'রে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেন। ইনি যতদিন কর্ম্মক্ষম অবস্থায় ছিলেন, ততদিন ওখানেই কাজ করেছিলেন। বাবা নিজেও বিশ্বভারতীতে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকের কাজ করেছেন। আমরা বছর দুই শান্তিনিকেতনে বাস করেছিলাম, আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাই প্রসাদকে ওখানের বিদ্যালয়ে পড়াবার জন্যে। তার শরীর অসুস্থ থাকায় সে বোর্ডিংএ থেকে পড়তে পারত না। এই সময় আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিবেশী ছিলাম। তাঁর যত রাজনৈতিক লেখা সব নিয়ে সমস্ত সময় বাবার সঙ্গে আলোচনা চলত। দুটি বাড়ীর মাঝে ছোট একটি মাঠ ছিল। রবীন্দ্রনাথ সারাক্ষণ যাওয়া-আসা করতেন। ওখানের ছোট সভায় যখন এই সব প্রবন্ধ পাঠ হত, বাবা অনেক সময় সভাপতির কাজ করতেন। কলকাতার বৃহৎ সভাগুলিতেও কর্ম্ম-কর্তারূপে সব রকম ব্যবস্থা করতে অনেকবারই বাবার ডাক পড়ত। শান্তিনিকেতন সে যুগে পুলিশের আনাগোনা থেকে বঞ্চিত ছিল না। আমাকে ডেকে রবীন্দ্রনাথ পরিহাস ক'রে বলতেন, "সীতা, ওরা তোমাদের সন্ধানেই এসেছে, ভাবছি তোমাদের ওখানেই পাঠিয়ে দেব। সবাই ত জানে আমি অতি ভাল মানুষ, আমার কাছে কেন আসবে?" তিনি কবি মানুষ, অনেক সময় উত্তেজনার মুখে এমন কিছু করতে যেতেন, যাতে তাঁর ক্ষতি হতে পারত। বাবা নিরন্তর সতর্ক থাকতেন এবং প্রাণপণ প্রয়াসে তাঁকে নিবৃত্ত করতেন। কোনোদিক্ থেকে কোনো দুর্যোগের আঁচ রবীন্দ্রনাথের গায়ে যাতে না লাগে এ বিষয়ে তাঁর অতন্দ্রিত চেষ্টা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ বাবার চেয়ে চার বৎসরের বড় ছিলেন। তিনি বাবার দুই বৎসর আগে দেহত্যাগ করেন। তাঁকে শেষ ব্রহ্মনাম শুনিয়ে আসার পর বাবার যা মূর্ত্তি দেখেছিলাম তা এখনও মনে পড়ে। শোকের যে কালো ছায়া তাঁর মুখে সেদিন পড়ল, তা আর তাঁর জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত অপসারিত হয় নি। শ্মশানযাত্রা দেখতে তিনি যান নি, তবে রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনেক স্থানে আচার্য্যের কাজ করেছিলেন। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের এখনও মনে আছে হয়ত।

মনে হত, তাঁর প্রিয়তম বন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাবার আত্মাও যেন সহমরণে চ'লে গিয়েছিল। আরো দুই বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন। তবে পীড়িত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থায়। এরও মধ্যে যারা তাঁর সেবা করত, তাদের কষ্ট হচ্ছে ভেবে সঙ্কুচিত হতেন। সামান্যতম কাজের জন্যে কত কৃতজ্ঞ হতেন। আমরা তাঁর অযোগ্য সন্তান, শেষ সময়ে যথাযোগ্য সেবা হয়ত হয় নি ভেবে এখনও অনুশোচনা হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ সেপ্টেম্বর বাবা পরলোকগমন করেন। আশা হয় মনে, তাঁর বন্ধুর সান্নিধ্য হয়ত আবার লাভ করেছেন।

বিদেশী কয়েকজন বন্ধু ছিলেন বাবার, তাঁদের কথা না লিখলে, এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ভগিনী নিবেদিতা, Charles Freer Andrews ও Dr. J. T. Sunderland, বাবার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে কোথায় ও কখন তাঁর আলাপ হয় ঠিক জানি না। তিনি Modern Review-এর নিয়মিত লেখিকা ছিলেন, চিত্রপরিচয়ও অনেক সময় লিখতেন। বাংলা বলতে বা পড়তে তিনি জানতেন না মনে হয়, কিন্তু বাংলা দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সব ব্যাপারের খবর রাখতেন ও যোগ দিতেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার আন্তরিক যোগ ছিল, এই সূত্রে বাবার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। তাঁকে আমি একবার মাত্র চোখে দেখেছিলাম। বাবার অসুখের সময় তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। দীর্ঘ, জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, পোশাক অনেকটা পাশ্চাত্য সন্ন্যাসিনীদের মত। রুদ্রাক্ষের মালা পরেছিলেন মনে হচ্ছে যেন। ঘরে ঢুকবার আগে জুতো খুলে রাখলেন। প্রয়োজন নেই বলায় বললেন, "আমি জানি জুতো খুলে রাখতে হয়।" বেশীক্ষণ ছিলেন না। চিঠিপত্র বাবার কাছে প্রায়ই আসত। তাঁর লেখার কোনো সম্পাদনা তিনি পছন্দ করতেন না, তবে বাবার সম্বন্ধে অন্য নিয়ম ছিল।

ভগিনী নিবেদিতা দার্জ্জিলিং-এ মারা যান। মরবার আগে বাবাকে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খবর যখন পৌঁছল, তখন যাত্রা করলে আর তাঁকে জীবিত দেখার সম্ভাবনা ছিল না। শেষ দেখা হয় নি।

Andrews সাহেব শান্তিনিকেতনের কাজে যখন এসে যোগ দেন, তার আগে থেকেই বাবার সঙ্গে তাঁর আলাপ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসা তাঁদের একটি যোগসূত্র ছিল। Andrews সাহেবের মত অহং জ্ঞানহীন মানুষ আমি কখনও দেখি নি। তিনি জাতিতে ইংরেজ, আমরা তখন ইংল্যাণ্ডের শাসনাধীন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের যাঁরা তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন, তাঁদের তিনি একান্ত ভাবে শ্রদ্ধা করতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়কে "বড় দাদা" ব'লে সম্বোধন করতেন, এবং অত্যন্ত ভক্তি করতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ অতি সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, যখন কথা বলবার ঝোঁক চাপত, তখন কার সামনে কি বলছেন, তাও ভুলে যেতেন। Andrews সাহেব তাঁর স্বজাতির অতি তীব্র সমালোচনা শুনেও হাস্যমুখে ফিরে এসে বলতেন, "We had a very interesting conversation with Baro-dada today."

বাবাকে Andrews অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, বাবাও তাঁকে নিজের ভাইয়ের মত দেখতেন। অনেক বক্তৃতায় ও লেখায় Andrews বলেছিলেন যে, বাবাকে তিনি নিজের বড় ভাই মনে করেন। দু'জনই পরোপকারী দেশ-হিতব্রতী ছিলেন, এও তাঁদের মিলনের একটা কারণ ছিল। দেশটা এখানে অবশ্য Andrews-এর নিজের দেশ ছিল না, ভারতবর্ষকেই তিনি নিজের দেশ ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন, আমরণ তারই জন্য পরিশ্রম করেছিলেন, এবং মৃত্যুর পর এ দেশের মাটিতেই চিরবিশ্রাম লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথকে Andrews যে ভাবে ভালবাসতেন, তাকে পূজা বলা চলে। তাঁর পরিহাস-রসিকতা অম্লান-বদনে সহ্য করতেন। একদিন আমাদের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ ও Andrews সাহেব একত্রে এসেছিলেন। যে ঘরে তাঁরা বসলেন, সেখানে একটি বইয়ের আলমারি ছিল। সাহেব দাঁড়িয়ে বইগুলি দেখছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব'লে উঠলেন,"Sita, I warn you never to lend any books to Mr. Andrews." কেন জানতে চাওয়ায় বললেন, সে বই আর কখনও ফিরে আসে না। দুই-তিনবার এ রকম warning দেওয়ায় সাহেব বললেন, "This is too bad, Gurudev," ব'লে গিয়ে চেয়ারে বসলেন।

Dr. Sunderland-এর সঙ্গে বাবার চেনা-পরিচয় হয় Modern-Review-এ লেখার সূত্রে। বাবা বলতেন, "এমন ভারত-হিতৈষী বিদেশী মানুষ আর নেই। চিঠি-পত্রের মারফতেই তাঁদের আলাপ চলত। Sunderland সাহেব একবারই বোধ হয় এসেছিলেন ভারতবর্ষে। তিনি সম্ভবতঃ ধর্মমতে Unitarian ছিলেন। সেই সূত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে এসেছিলেন। তখন বাবা তাঁকে চাক্ষুষ দেখেন, আমরাও দেখি। এঁর লেখা 'India in Bondage' বইখানি প্রকাশ করার জন্যে বাবা রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁর আর printer-এর ২০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হয়। এ নিয়ে দেশে তখন খুব সাড়া প'ড়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী, মোতীলাল নেহরু, প্রভৃতি বাবাকে অনেক চিঠিপত্র লেখেন।

বাবার বন্ধুর সংখ্যা ত ব'লে শেষ করা যায় না। যতগুলি মনে করতে পারছি এখন, তা লিখলাম। মৃত্যুর আগের বছর কলকাতা ছেড়ে কিছুদিন বাঁকুড়ায় ছিলেন। সেখানে গিয়েছিলাম তাঁকে নিয়ে আসবার জন্যে। তখন স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়কে দেখেছিলাম সেখানে। তিনি রোজ গল্প করতে আসতেন বাবার সঙ্গে। কাছেই তাঁর বাড়ী ছিল।

শেষের বৎসর বাবা শারীরিক বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। যিনি চিরকাল পরের দুঃখ দূর করার ব্রত নিয়েছিলেন, তাঁর অদৃষ্টে এত যন্ত্রণা কেন জুটল জানি না। এই বৎসর তাঁর বয়স হয় আটাত্তর। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি অভিনন্দন ও উপহার পেয়েছিলেন। উঠতে পারতেন না, শুয়ে শুয়েই সে সব গ্রহণ করেন, এবং মুখে মুখে সেগুলির যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেন।

এর পর খুব বেশীদিন আর তিনি জীবিত ছিলেন না। আশ্বিনের মাঝামাঝি দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর অতি প্রিয় অনেকগুলি মানুষ তাঁর আগেই ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। নিদারুণ পিতৃবিয়োগদুঃখের সময় এই মনে ক'রে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করতাম, যে হয়ত সেই বহুদিন হারানো প্রিয়দের সাহচর্য্য পেয়ে সব দুঃখ তিনি ভুলেছেন। পরলোকের বিষয় আমরা পরিষ্কার ক'রে কি-ই বা জানি? তবু ইহকালে যাঁদের নিত্য পুণ্যকর্মে ব্রতী দেখেছি, পরকালে তাঁরা উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছেন এই আশাই করি।

—•—
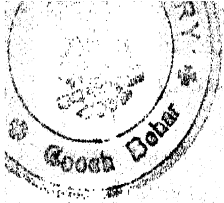
আমার রামানন্দ ঠাকুরদা

শ্রীপুষ্প দেবী

সে প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। বাঁকুড়ায় আমার বাবা স্বর্গত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন মহকুমা-শাসক। সকাল থেকে বাড়ীতে সাড়া প'ড়ে গেছে, খুড়োমশাই আসবেন। ঘটনাটা তেমন কিছু চাঞ্চল্যকর নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগল যখন দেখলাম, মা স্নান ক'রে নিজে রান্না চড়িয়েছেন। আমার মা খুব অসুস্থ ছিলেন, বাড়ীতে মাকে রান্না করতে যেতে কখনো দেখিনি। আজ দেখলাম, মায়ের মুখে একান্ত স্নেহভরা পরিতৃপ্তির হাসি। বাবা গেছেন স্টেশনে খুড়োমশাইকে আনতে। মায়ের কাছে শুনলাম যে ঠাকুরদা নিরামিষ খান; সেই জন্যে বোধ হয় তাঁর জন্যে আলাদা ক'রে রান্না হচ্ছিল। মনে মনে ধারণা হ'ল, বুঝি কেউ সাধু-সন্ন্যাসী গোছের আসছেন। ওমা, এ কি? মোটেই ত তা নয়? সাদা থান কাপড়-পরা, গলাবন্ধ কোট, পায়ে জুতো, হাতে লাঠি, একটি মানুষ বাবার সঙ্গে গাড়ী থেকে নামলেন। আমরা তাঁকে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালাম। কি সুন্দর সে প্রশান্ত মুখ, কি সৌম্য শান্ত মুখশ্রী, কি আনন্দের পূর্ণ মূর্ত্তি। তার পরের ঘটনা আজ আর মনে নেই।

বোধ হয় দিন-তিনেক তিনি আমাদের বাড়ী ছিলেন, এবং কত যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁকে ধৈর্য্য ধ'রে আমার কাছে শুনতে হয়েছিল সেই কথাই আজ মনে পড়ছে।

এর পর তাঁকে দেখলুম ঝামাপুকুরের বাড়ীতে আমার বিয়ের পর। গোড়াতেই বলেছি, সে অনেক দিন আগের কথা। বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে সবে শ্বশুরবাড়ী গেছি। আমার শ্বশুর শুনেছিলুম রামানন্দ ঠাকুরদার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। জানি না সেই বন্ধুত্ব-সূত্রে, কি নূতন সম্পর্কের সূত্রেই রামানন্দ ঠাকুরদা এলেন আমাদের ঝামাপুকুরের বাড়ীতে। বহুদিন বাদে পুরনো বন্ধু পেয়ে বালিকাবধূ মুখর হয়ে উঠল। সেদিনও সে বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের "নদী" কবিতা তাঁকে আবৃত্তি শুনতে হ'ল। পরে, গলার উচ্চতার জন্যে শাশুড়ী মায়ের কাছে তিরস্কারও শুনেছিলুম।

এরপর আবার দীর্ঘ যুগ কেটে গেল। আমার মেয়ের বিয়েতে এলেন রামানন্দ ঠাকুরদা। কিন্তু কিছু খেলেন না। এমন কি একটু ফল মিষ্টিও না। বললেন, "এরকম শিশু-বিবাহের আমি বিরোধী, আমায় খেতে ব'লো না।" একেই সকালে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে বাবাকে নিয়ে। এগারো বছরের মেয়ের বিয়ে শুনে বাবা বলেছেন তিনি আসবেন না। অনেক কষ্টে তাঁকে আনিয়ে আশীর্ব্বাদ করান হয়েছে। আবার ঠাকুরদার এই কথা।

এরপর আবার রামানন্দ ঠাকুরদার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল একটি কবিতার মাধ্যমে। হঠাৎ একটা ছাপান ফর্ম এসে হাজির হ'ল। মানভূম পল্লীসংস্কার সমিতির জন্যে একটি গান লিখে দিতে হবে। এক হাজার শব্দের মধ্যে যা কিছু প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি পালনের কথা দিয়ে। পুরস্কার নগদ পাঁচ টাকা। তাও লিখলুম। ঠিকানায় পাঠিয়ে আমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। যথাসময়ে উত্তর এল রামানন্দ ঠাকুরদার গোটা গোটা মুক্তোর মত অক্ষরে লেখা, "কবিতা পেয়েছি। ব্যাপারটা নাতনীর সঙ্গে ঠাকুরদার নিছক পরিহাস মাত্র। প্রতিযোগিতার দিন পেরিয়ে গেছে। আর ওটি গান হয়েছে কিনা তা আমি বলতে পারি না, কারণ আমি গাইয়ে নই।"

এর পরের বার দেখা আমার ভায়ের বিয়েতে—বারান্দায় চেয়ারে রামানন্দ ঠাকুরদা ব'সে আছেন, সামনে মা দাঁড়িয়ে, হাতে পাথরের থালায় ফল মিষ্টি। আমার আঁচল ধ'রে দাঁড়াল আমার শিশুকন্যা তপু। তপুর দুই চোখে বিস্ময়ের আভাস। রামানন্দ ঠাকুরদা তাকে ডাকলেন, "এস, তাহলে তোমার সঙ্গেই খাওয়া যাক।" তপু সে সাদর আমন্ত্রণে মনে মনে খুশী হলেও, মুখে বলল, "এই ত রবিঠাকুর এসেছেন, তবে যে সবাই বলে তিনি মারা গেছেন?" বিয়ে বাড়ীতে নানা ধরণের লোক, কেউ কেউ হেসে উঠল। তপু তবুও বলল, "বা রে, আমি বুঝি চিনি না, আমাদের বসবার ঘরে ছবি আছে না, যার সঙ্গে?" আমি জানি না কি নিবিড় যোগ এই দুটি বন্ধুর মধ্যে তার শিশুমন দেখতে পেয়েছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের তখন সবে দেহান্ত ঘটেছে। তিনি খুবই সুপুরুষ ও সুন্দর

ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু রামানন্দ ঠাকুরদার মত অমন শান্ত সংযত প্রতিভাদীপ্ত পবিত্র অম্লান মুখশ্রী যে দেবদুর্লভ তাও ঠিক। সেদিন ভাবতেও পারিনি এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা, আর তাঁকে দেখতে পাব না।

তাঁর শেষ চিঠি পেয়েছিলুম বাবা যখন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সরকারী কাজ ছেড়ে শ্রীনিকেতনে সচিব হয়ে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন, সেই সময়। তিনি লিখেছিলেন, "সুকুমার সরল বিশ্বাসে ওখানে গেছে, আমার আশঙ্কা হয় পাছে আঘাত পেয়ে ফিরে আসে।" আজীবন সত্যবাদী ঋষির একথা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল। এখানে ঋষি কথাটাও আমার অত্যুক্তি নয়। এর চেয়ে সহজ উপমা যেন তাঁর হয় না।

আমার ঠাকুরদা স্বর্গত রামসদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। রামানন্দ ঠাকুরদা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মনে হয় সেই কারণে দুটি পরিবারে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু আমার বাবা অত্যন্ত উদারপন্থী ও উন্নত হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তাঁর মনে রামানন্দ ঠাকুরদা ও তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ও নিবিড় যোগাযোগ ছিল।

রামানন্দ ঠাকুরদার শেষ কণ্ঠস্বর শুনি রেডিওতে, যেদিন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ মারা যান। কি গভীর সংযত সে ভাষণ, অমন উচ্ছ্বাসবিহীন শোকের প্রকাশ সত্যকারের সাধক ছাড়া কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। রামানন্দ ঠাকুরদার মহাপ্রয়াণের ক'দিন আগে বাবা তাঁকে দেখতে কলকাতায় আসেন। ফেরার পথে আমার শ্বশুরবাড়ীতে এসে আমায় বললেন, "তিনি তোমার ও শৈলর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।" অনিবার্য্য কারণে আমার পক্ষে তাঁর কাছে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তাঁর শেষ দর্শন যে আর পাই নি, একথা ভাবলে আজও আমি অশ্রু সম্বরণ করতে পারি না।

রামানন্দ-স্মৃতি

শ্রীঅবনীনাথ রায়

সেটা ইংরেজী ১৯৩৯ সালের কথা। এলাহাবাদে প্রয়াগ বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হবে। স্থির হল এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আনতে হবে।

রামানন্দবাবু তখন শারীরিক অসুস্থ—দৃষ্টিশক্তি নিয়েও কষ্ট পাচ্ছেন। সুতরাং চিঠি লিখে তাঁকে আহ্বান জানালে তাঁর অসম্মত হওয়ারই সম্ভাবনা। অথচ এলাহাবাদ তাঁর কর্মভূমি। "প্রবাসী"র জন্মভূমি এলাহাবাদেই। রামানন্দবাবু আর একবার তাঁর পূর্ব-পরিত্যক্ত এলাহাবাদে আসেন এটা এলাহাবাদের বাঙালী সম্প্রদায়ের সকলেরই ইচ্ছা। কি উপায়ে তাঁকে আর একবার এলাহাবাদে আনা যায় এই নিয়ে সকলে পরামর্শ করতে লাগলেন।

রামানন্দবাবু এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সময় তাঁর কাছে পড়েছেন পরমানন্দ চক্রবর্তী। ইনি আমাদের সম্মেলনের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে একজন ছিলেন। সকলে পরমানন্দ চক্রবর্তীকে অনুরোধ করলেন, 'আপনি কলকাতায় গিয়ে আপনার গুরুদেবকে ধ'রে পড়ুন। ছাত্রের অনুরোধ তিনি ঠেলতে পারবেন না।' পরমানন্দবাবু রাজী হলেন। তিনি তখন রুড়কী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর নিয়ে এলাহাবাদে ফিরে এসেছেন।

পরমানন্দবাবু একেবারে খাঁটি প্রবাসী বাঙালী—তখন তাঁর বয়স ৫৩ বৎসর, কিন্তু তখনো তিনি একবারও কলকাতায় যান নি। সেই যে গিয়েছিলেন সেটাই তাঁর প্রথম এবং শেষ কলকাতায় যাওয়া। সুতরাং তিনি আমাকে তাঁর সহযাত্রী হতে অনুরোধ করলেন। আমি সানন্দে রাজী হলাম।

রামানন্দবাবু তখন সাহেব পাড়ায় একটা বাড়ীতে থাকতেন—রাস্তার নাম এখন মনে পড়ছে না। আমরা দু'জনে বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তখন দুপুরবেলা। বেশ মনে আছে, ঘরে বিজলী বাতি জ্বলছিল এবং তিনি চেয়ারে ব'সে টেবিলের উপর ঝুঁকে কাজ করছিলেন।

পরমানন্দবাবু ছাত্র ব'লে পরিচয় দিতে রামানন্দবাবু খুব খুশী হয়ে উঠলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এলাহাবাদের তখনকার সকলের খবর নিলেন। বিশেষ ক'রে খবর নিলেন, সুরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয়ের। রামানন্দবাবু যখন অধ্যক্ষ, তখন দেব মহাশয় সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। রামানন্দবাবু এলাহাবাদ আসতে সম্মত হলেন। ঐ সম্মেলনে রামানন্দবাবু এবং দেব মহাশয় দু'জনে এক সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং আমরা গৌরববোধ করেছিলাম যে কত কাল পরে আবার অধ্যক্ষ এবং সহকারী অধ্যক্ষ এক জায়গায় ব'সে সভা উজ্জ্বল ক'রে তুললেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ এবং স্বনামধন্য কবি ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন আমাদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

রামানন্দবাবু এলাহাবাদের গৌরব মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের পুত্র ডাঃ ললিতকুমার বসু মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

সম্মেলনের পরদিন সকালে বাসায় ব'সে আছি। হঠাৎ রামানন্দবাবু আমার বাসায় পদধূলি দিলেন। আমি একেবারে অবাক্ হয়ে গেলাম। তিনি যে আমার মত সামান্য লোকের বাসায় অযাচিত ভাবে আসবেন এ আমি কল্পনাই করতে পারি নি। মনের আনন্দে বাড়ীর ভিতর দৌড়ে গেলাম। আমার স্ত্রীকে বললাম, যাঁর শুধু নামই শুনেছ, কিন্তু কখনো চোখে দেখবে কল্পনাও করতে পার নি, তিনি স্বয়ং আমাদের বাড়ী এসেছেন। আমার স্ত্রীও এসে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলা নিলেন।

এমনি ছিলেন রামানন্দবাবু। তাঁর সৌজন্যবোধ আজকালকার যুগের লোকদের ধারণার সঙ্গে মিলবে না। অত বলিষ্ঠ উদার মন এখন আর চোখে পড়ে না। তাঁর সততা, বিদ্যাবত্তা, স্বাধীনচিত্ততা, দেশের লোকের কল্যাণের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ আজ সর্বজনবিদিত। তিনি প্রবাসী ও Modern Review সম্পাদনা ক'রে দেখিয়ে গিয়েছেন, বাঙালী সাংবাদিকতার কত উচ্চ মান পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে।

আমি যখন সিংহলের কলম্বো শহরে চাকরি ব্যপদেশে গিয়েছিলুম, তখন সেখানে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পাই। তারপর কত রাত্রি যে তাঁর জন্যে চোখের জল ফেলেছি, তার লেখাজোখা নেই।

—০—

স্মৃতির ঝাঁপি

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

"ও অন্নদা, বঙ্গবাসী আইছে নাকি? কলকাতার খবর কি?" জিজ্ঞেস করছিলেন অশ্বিনীখুড়ো বরিশালের এক গ্রামের পোস্টমাস্টার অন্নদা ঠাকুরকে। বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী, সঞ্জীবনী, কলকাতার এই সব সাপ্তাহিক কাগজগুলিরই সঙ্গে পাড়াগাঁয়ের বুড়োদের পরিচয়, যদিও এইগুলির একটাই নাম তাঁদের কাছে, বঙ্গবাসী। বঙ্গদর্শন, নব্যভারত, বামা-বোধিনী পত্রিকা, ভারতী, সাহিত্য, কলকাতার এই সব মাসিক পত্রিকার আমল তখন! তাদের নাড়াচাড়া করতেন শহরে লোকেরাই। এই রকম যুগে একদিন অন্নদা ঠাকুর ডাকের থলে খুলে পেলেন একখানি মাসিক পত্রিকা। গ্রামের এক যুবকের নামে তা এসেছিল। পত্রিকাখানির নাম 'প্রদীপ'। সম্পাদকের নাম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। পাতলা কাঁচা দাড়ি মুখে। যুবক সম্পাদকের ছবিও ছিল তাতে। পত্রিকাখানি দেখে সকলেরই মনে হ'ল—নতুন একটা জিনিষ বটে।

কিছুদিন পরে প্রদীপের পিলসুজের উপর রোশনাই জ্বালল একখানি নতুন মাসিক পত্রিকা। নাম তার 'প্রবাসী'। সম্পাদক সেই একই ব্যক্তি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কয়েক বছর বাদে এই পত্রিকাখানি উঠে এল এলাহাবাদ থেকে কলকাতায়। আর সম্পাদকের বসবাসের সঙ্গে পত্রিকার দপ্তরও হ'ল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের 'সমাজপাড়া'র এক বাড়ীতে।

প্রবাসী ছাপা হয়ে বেরুল এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে; তার মালিক ছিলেন এক বাঙালী, নাম তাঁর চিন্তামণি ঘোষ। তাঁর তাঁবে কাজ করতেন সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন লেখক হিসাবে প্রবাসীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। সাহিত্যিক নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্তে তার পরে যে কয়েকজন সাহিত্যিক

গী দে মোপাসাঁর গল্পের সহিত বাংলাদেশের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন চারুবাবু ছিলেন তাঁদেরই একজন। মোপাসাঁর গল্পের সঙ্গে তাঁর লেখা রকমারী অন্য গল্প আর উপন্যাস প্রায়ই প্রবাসীতে বের হ'ত। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন নামজাদা লেখক।

প্রবাসীর দপ্তর কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তামণিবাবুর এক বইএর কারবারও খোলা হ'ল কলকাতায়। নাম হ'ল ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। কলকাতায় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন তার কর্তা আর কর্তাভজার সঙ্গে স্থান হ'ল সাহিত্যিক শিবরতন মিত্রের সহিত আমার। পাবলিশিং হাউসের অফিসের সহিত আমাদের তিনজনের আস্তানাও হ'ল একই সঙ্গে একই বাড়ীতে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রবাসী হয়ে উঠল বাংলার সেরা মাসিক পত্রিকা। তাতেই তা হ'ল একদল লোকের চক্ষুশূল। সেই দলের কেউ কেউ ব্যঙ্গ করতে লাগলেন ওরিএন্টাল আর্টকে, কেননা অবনীন্দ্রনাথের সেই ধাঁচের ছবিই ছাপা হ'ত প্রবাসীতে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে এক সময় কাব্যবিশারদ মিঠেকড়ার টিপ্পনি কেটে-ছিলেন, এতদিন পরে তারই জের টানলেন ডি. এল. রায় সাহিত্যে নীতির ধুয়া ধ'রে। তাতে রবীন্দ্রনাথের রচনায় নীতি ও রুচিকে লক্ষ্য করা হয়েছিল, কারণ রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রবাসীর প্রধান লেখক। প্রবাসীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ায় চারুবাবুর নামটি নিয়েও টিট্‌কারী দেওয়া হ'ল 'শ্রীহীন চারু' ব'লে, যেহেতু চারুবাবু নিজের নামের আগে শ্রী লিখতেন না। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সাফাই গাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তবু অবনীন্দ্রনাথ দুটি কথায় রুচি-বাগীশদের জবাব দিয়েছিলেন—সুরুচির খাতিরে সুনীতিকে ত্যাগ করলে ধ্রুবকেও হারাতে হয়।

প্রবাসীর সঙ্গে সমাজপাড়ায় ব্রাহ্মমেশিন প্রেসে ছাপা হ'ত আরো দুটি মাসিক পত্রিকা—মুকুল আর দেবালয়। নব্যভারত মাসিক পত্রিকার অফিসও ছিল ঐ পাড়ায়ই, প্রেস ছিল তার নিজেরই। সমাজপাড়ার অল্পদূরে বড় রাস্তার উপরই ছিল বঙ্গদর্শন আর ভারতীর দপ্তর। এই ভাবে ছয়টি দল মেলে ফুটে উঠেছিল সরস্বতীর পাদপীঠের শ্বেতপদ্ম। সেই পদ্মের উপর চরণ-কমল রেখে দেবী ভারতী বীণার যে ঝঙ্কার তুলেছিলেন তা শুনে ছুটে এসেছিলেন বাংলাদেশের গুণীজন দু-হাত ভ'রে অঞ্জলি দিতে। তাঁদের প্রায় সকলেই আজ আমাদের চোখের আড়ালে। কিন্তু চোখের আড়াল ব'লে কি মনের আড়ালও হয়েছেন তাঁরা? তাঁদের অনেকের সঙ্গেই এখনও চলে আমার মনে মনে কানাকানি। এঁদের দু চারজনের কথাই তাই বলছি।

কলকাতায় দৈনিক পত্রিকারও চলন হয়েছিল অনেক আগেই। তাদের মধ্যে নবশক্তি, সন্ধ্যা, আর নায়ক এই তিনখানি পত্রিকাই রণডঙ্কা বাজিয়ে মাতিয়ে তুলেছিল যুবকদের। নবশক্তির মালিক ছিলেন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। সন্ধ্যা আর নায়কের সম্পাদক ছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা। সেকালে কেউ মুখ ফুটে একবার বন্দেমাতরম্ বললেই তার পিঠে পড়ত দমাদ্দম পুলিশের লাঠি। বরিশাল কনফারেন্সের সময়ে চিত্তরঞ্জন মুখে তুলেছিলেন সেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, আর তাঁর মাথায় পড়েছিল লাঠির পর লাঠির ঘা। সেই লাঠির আঘাতে তাঁর সর্ব্বাঙ্গে রক্তগঙ্গা বয়ে গিয়েছিল, তবু তাঁর মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি থামেনি। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পুত্রকে নিয়ে যখন পিতা এসে দাঁড়ালেন মঞ্চের উপর তখন মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে ফেটে পড়েছিল কন্‌ফারেন্সের প্যাণ্ডাল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বেঁচে নেই, নেই তাঁর সন্ধ্যাও, কিন্তু সেদিনের বাঙ্গালী কি ভুলতে পেরেছে সন্ধ্যার সেই মর্ম্মান্তিক শ্লেষোক্তি—'ফিরিঙ্গি বড়ই দয়ালু। ফিরিঙ্গির কৃপায় দাড়ি গজায়, শীতকালে খাই শাঁখ আলু।'

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য ছিল স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। তিনিই আশুতোষের খেতাব দিয়েছিলেন, 'শুঁকো সরস্বতী'। পাঁচকড়িবাবু নায়কে স্যার আশুতোষকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রে কাগজখানা বগলদাবা ক'রে নিয়ে যেতেন তাঁর দরবারে। তারপরে তাঁর চোখের সামনে লেখাটা খুলে ধ'রে বলতেন, 'আপনাকে দেখাতে এসেছি এটা। এবারে দিন দেখি আমাকে দুটো টাকা, যাওয়া-আসার খরচা।' স্যার আশুতোষ গোঁফ ফুলিয়ে বলতেন—'আমাকে গালি দিয়ে কোন্‌মুখে চাওয়া হচ্ছে আমারই কাছে যাওয়া-আসার খরচা?' পাঁচকড়িবাবু হেসে জবাব দিতেন—'আপনাদের মত হোমরা-চোমরাদের গালি না দিলে আমাদের কাগজ চলবে কেন?'

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মনে করলেই মনে হয় সেই রকমই আর এক ব্রাহ্মণের নাম। সখারাম গণেশ দেউস্কর তিনি। মারাঠী হয়েও তিনি ছিলেন বাংলা ভাষার সিদ্ধ-সাধক। দেউস্কর মশায় যখন হিতবাদীর সম্পাদক তখন সুরাট কংগ্রেসে লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছিল। সে কাণ্ডের নায়ক একপক্ষে ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। অপর পক্ষের দলে

সুরাটে গিয়েছিলেন হিতবাদীর মালিক। তিনি তাঁর পত্রিকার সম্পাদককে টেলিগ্রাম করলেন, কাগজে যেন তিলকের বিরুদ্ধে লেখা হয়। মারাঠী ব্রাহ্মণ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'না, না, আমার কলমে তিলক মহারাজের নিন্দা বেরুবে না।' ফলে তাঁকে হিতবাদীর সংস্রব ত্যাগ করতে হ'ল।

বিবেকের দোহাই মেনে এই রকমেই উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে ছাড়তে হয়েছিল বাপ-দাদার সমাজ। বিদ্যারত্ন মশায় ছিলেন 'মন্দার-মালা' পত্রিকার সম্পাদক, পণ্ডিত মানুষ, জাতে বৈদ্য। এক সময়ে তিনি মৈমনসিংহে ছিলেন। একবার সেখান হতে দেশের বাড়ীতে আসছিলেন নৌকোয়। সঙ্গীও ছিলেন কয়েকজন ভদ্রলোক। নৌকোর মাঝি ছিল জাতে নমঃশূদ্র। সেই নৌকায়ই রান্নাবাড়া ক'রে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করলেন। দেশে এ খবর পৌঁছতেই হুলুস্থুল প'ড়ে গেল। দলসমেত উমেশচন্দ্রকে একঘরে করার কথাও হ'ল। বিদ্যারত্ন মশায়ের সঙ্গীরা সাফ জবাব দিলেন, নৌকোয় তাঁরা জলগ্রহণও করেন নি। উমেশচন্দ্র বললেন—'মিথ্যা বলব কেন? খেয়েছি নমঃশূদ্রের নৌকোয় ব'সেই আমি ভাত।' এর ফলে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজে।

পাবলিশিং হাউসের সম্পর্কে আমাদের আস্তানায় আনাগোনা হত অনেক সাহিত্যিকেরই। এমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দু'একবার এসেছিলেন ভাড়াগাড়ীতে চ'ড়ে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সেখানে এসেই প্রবাসীর লেখকদের দলে ভীড়ে পড়লেন। একদিন ক্ষিতিমোহন সেন এলেন।

কিছুদিন পরে ক্ষিতিমোহনবাবুকে আর আমাকে পাবলিশিং হাউসের সম্পর্ক ছেড়ে দিতে হ'লো। শিবরতনবাবু ছিলেন কলকাতার 'মানসী' মাসিকপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর একজন। সে সম্পর্কও চুকিয়ে দিয়ে তিনি দেশে ফিরে গেলেন। এরপর চারুবাবুকেও ছাড়তে হ'লো পাবলিশিং হাউসের ভার। সে ভার তখন নিলেন ভারতীর অন্যতম সম্পাদক আর কান্তিক প্রেসের মালিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মণিলালবাবু নিজেও ছিলেন সাহিত্যিক। তাঁর কান্তিক প্রেসেই জমে উঠল সাহিত্যিকদের আসর।

পাবলিশিং হাউসের আলাদা অফিস আর রইল না। দোকানই হ'ল প্রধান। সেখানেও গল্পগুজব করতে অনেকে জমায়েৎ হতেন। সেই দলের মধ্যে একজন ছিলেন বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয়পাত্র। স্যার গুরুদাস ডাকতেনও তাঁকে চণ্ডী ব'লে। চণ্ডীবাবু একবার তাঁর বড়ছেলে ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে স্যার গুরুদাসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ইন্দুপ্রকাশ তখন তরুণ যুবক। স্যার গুরুদাস তাঁকে সম্বোধন করলেন আপনি ব'লে। চণ্ডীবাবু বললেন—'ও যে আমার ছেলে। আমাকে ডাকেন আপনি নাম ধ'রে আর আমার ছেলেকে বলছেন আপনি!' স্যার গুরুদাস জবাব দিলেন—'চণ্ডী, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় তোমার ছেলেবেলা থেকে, কাজেই তোমাকে নাম ধ'রেই ডাকি। কিন্তু তোমার ছেলের সঙ্গে পরিচয় হ'ল তার গোঁফ গজাবার পর। গোঁফওলা মানুষকে কি নাম ধ'রে ডাকা চলে?'

তখন বড়দের কাছে ছোটদেরও মান-মর্য্যাদা ছিল যথেষ্ট, বিশেষতঃ সাহিত্য-ক্ষেত্রে। চণ্ডীবাবুর ছেলে ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সুরু করেছিলেন সাহিত্যসেবা। কিন্তু মহাযুদ্ধের সময়ে আমেরিকা হতে আসার পথে লুসিটেনিয়া জাহাজডুবি হয়ে তাঁর অকালমৃত্যু হয়। পিতারও হয়েছিল সেইরকম মৃত্যু ট্রামে উঠতে গিয়ে। বহু বৎসর পরে এইরকম দুর্ঘটনায়ই অকালমৃত্যু ঘটেছিল আর এক সাহিত্যিকের। নাম তাঁর প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে তিনি একসময়ে যুক্ত ছিলেন।

আমার বন্ধু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর একখানা বই পাঠ্য করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথেষ্ট প্রতিপত্তি। সতীশবাবু তাঁর বইখানার সম্বন্ধে তদ্বির করার জন্যে স্যার গুরুদাসের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি প্রথমেই স্যার গুরুদাসকে বললেন, 'স্যার, আমি একটা কাজের জন্যে এসেছি। আমি জানি সেই কাজের জন্যে ক্যানভাসিং করা অন্যায়, আর আমি যা বলব তা হয়ত ক্যানভাসিং ব'লেই ধরা হবে। তবু আপনার অনুগ্রহের জন্যেই আমাকে আসতে হয়েছে।' স্যার গুরুদাস জবাব দিলেন, 'বলুন না কি ব্যাপার, আপনি যা বলবেন তা যদি ক্যানভাসিংই হয়, তাতেই বা দোষ কি? দোষ হবে ন্যায়-অন্যায় বিচার না ক'রে সেই ক্যানভাসিং-এর ধাপ্পায় প'ড়ে ভুলে গেলে। নইলে ক্যানভাসিং কোথায় না আছে? বরঞ্চ অনেক সময় তা ভাল-মন্দ বিচারেরই সাহায্য করে। ধরুন না আদালতের মামলার কথা। দু'পক্ষের উকিলেরই কথা শুনে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটকে রায় দিতে হয়। সেটা কি উকিলদের ক্যানভাসিং নয়? শুনুন আমার এক অভিজ্ঞতার কথা। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যের জন্যে তিনজন ভদ্রলোকের লেখা তিনখানি নমদময়ন্তী পুস্তক

আগে। বই তিনখানি প'ড়ে আমি আমার বিচারমত শ্রেষ্ঠ বইটির গায়ে ১নং, মাঝারিখানির গায়ে ২নং এবং তার পরেরখানির গায়ে ৩নং দিয়ে রাখি। তিন-চারদিন পরে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন— তিনি তাঁর লেখা নলদময়ন্তী পাঠ্যের জন্যে দাখিল করেছেন, সেই বই পাঠ্য হতে পারে কি না, আমার নিকট তাই জানতে এসেছেন। আমি ভদ্রলোকের নামটি জেনে নিয়ে নলদময়ন্তী তিনখানা বার ক'রে দেখলুম, তাঁর বই-এর নম্বর ২। তাঁকে তখন স্পষ্টই ব'লে দিলুম, অমুকের লেখা আর একখানি নলদময়ন্তী আমরা পেয়েছি। আমার মতে সেই বইখানি পাঠ্য হওয়ার যোগ্য। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, সেই বইখানি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের নল-দময়ন্তীর আখ্যানের অবিকল নকল, যদিচ মলাটের উপর নাম লেখা অন্য লোকের। আমি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত বের ক'রে দেখি, ভদ্রলোকের কথাই ঠিক। তখন আমার ভুল ভেঙে গেল। ১নং-এর বদলে পাঠ্য হ'ল ২নং নলদময়ন্তী। এবার বলুন দেখি, যে ভদ্রলোক আমার ভুল ভেঙে দিয়েছিলেন তাঁর কথাকে কি ক্যান্‌ভাসিং বলব, না, তা ন্যায়বিচারে সহায় হয়েছিল বলব?'

নরেন্দ্রনাথ দত্তের ছেলেবেলায় খেলার সাথী ছিলেন জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। দু'জনে একসঙ্গে আড্ডাও দিতেন গিয়ে হেদুয়ার পাশে ভাড়াগাড়ীর আস্তাবলের কাছে। এর পর বয়স বাড়লে নরেন্দ্র হলেন স্বামী বিবেকানন্দ আর জীবনকৃষ্ণ হ'লেন এক অফিসের কেরাণী। আমেরিকা হতে স্বামীজী কলকাতায় ফিরে আসার পর একদিন অনেক বড়লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। জীবনকৃষ্ণও গেলেন, কিন্তু তিনি বসলেন গিয়ে সবার পিছনে। অন্য লোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে বলতে স্বামীজীর দৃষ্টি পড়ল জীবনকৃষ্ণের দিকে। তিনি ব'লে উঠলেন—'ও কি জীবন, তুমি পেছনে ব'সে কেন? এস, এস, সামনে এসে বোস।' জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'আজ্ঞে আমি এখানেই বেশ আছি। আপনার কাছে এই সব বড়লোক এসেছেন, এঁদের সঙ্গেই কথা বলুন।' বিবেকানন্দ বললেন—'ও জীবন, আজ্ঞে আপনি করছ কাকে, আমি যে নরেন!' জীবনকৃষ্ণ জিভ কেটে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, এখন কি আর আপনাকে নাম ধ'রে ডাকা চলে, আপনি এখন কত বড়! আর আমি কত ছোট।' বিবেকানন্দ হেসে জবাব দিলেন—'ওঃ, আমি বিবেকানন্দ হয়েছি ব'লে কি তোমার আমার মধ্যে তফাৎ হয়েছে নাকি? না তোমার কাছে আমি আজও নরেন, আর তুমি আজও আমার বন্ধু জীবন?'

দেবালয় পত্রিকা ছিল 'দেবালয়' প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র। প্রতিষ্ঠানটি গড়েছিলেন সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কাজ চালাবার জন্য দানও ক'রে গিয়েছিলেন সমাজ-পাড়ায় নিজেরই বাড়ী। কিছুকাল সেই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হতে হয়েছিল আমাকে, আর দেবালয় পত্রের সম্পাদনার ভারও পড়েছিল আমার উপর। সেই সূত্রে প্রতিষ্ঠাতার স্নেহের পাত্র ছিলুম আমি। কবি রজনীকান্ত সেনের সঙ্গেও আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি তখন গলার ক্ষতরোগে ভুগছিলেন আর চিকিৎসার জন্যে ছিলেন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের এক কুটীরে। শশীকান্তবাবুর ইচ্ছা হল কান্ত কবির সঙ্গে দেখা করার। সে জন্যে আমাকেই হতে হ'ল তাঁর সঙ্গী। রজনীকান্ত সেবাব্রত মহাশয়কে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। রোগের জন্যে কথা বলার শক্তি নেই। পেন্সিল দিয়ে একখানি কাগজে লিখে জানালেন—'মহাপুরুষকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ। কি ভাবে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করি! আমার শেষ-সময়ও তাঁকে নিয়ে এস একবার আর আমার কানে শুনিও হরিনাম।'

সংবাদপত্রের কাজে আমার হাতে খড়ি হয় দৈনিক নবশক্তির সম্পাদকীয় বিভাগে। তার আগে যখন কলেজের ছাত্র আমি, তখন মাসিকপত্রের সহিতই আমার যোগ ছিল বেশী। সেই মাসিকপত্রের মধ্যে কলকাতার নব্য-ভারত আর ঢাকার বান্ধবই ছিল প্রধান। নব্য-ভারতের সম্পাদক ছিলেন দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। আর বান্ধবের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। কবি গোবিন্দ দাসের 'মঘের মুল্লুক' পুস্তিকায় ঘোষ মহাশয়ের রুদ্র মূর্ত্তিরই পরিচয় পেয়েছিলুম। ঢাকার বান্ধব অফিসে গিয়ে দেখলুম তাঁর আর এক মূর্ত্তি। চারিদিকে স্তূপাকার বই, ধূপ-ধুনার গন্ধে সে স্থান ভরপুর; তারই মধ্যে সরস্বতীর ভক্ত পূজারী, তিনি সাহিত্যসাধনায় মগ্ন। বান্ধবে তাঁর লেখা ভৌতিক কাহিনী 'ছায়াদর্শন' নামে বেরুত। একদিন আমি ঘোষ মশায়কে জিজ্ঞাসা করলুম—আপনি যে পরলোকের কথা লিখছেন, নিজে কি বিশ্বাস করেন তা? তিনি উত্তর দিলেন—বিশ্বাস! আমি নিজের চোখে দেখে প্রমাণ পেয়েছি, যাকে ভূত বলা হয় সে রকম আত্মা সত্যিই আছে। তিনি জানালেন, সেই রকম একটি ভূতের দর্শনও পেয়েছিলেন বরিশাল শহরে বেণু সিংহের পুকুর পাড়ে। ঘোষ মশায়ের কথা শুনেও তখন আমার মনের সন্দেহ ঘুচেছিল না। কিন্তু কয়েক বছর পরে রংপুরে আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা হয়েছিল প্রেতলোকের চারটি আত্মার সহিত কথাবার্ত্তা বলার।

দেবালয় সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মিলন-ক্ষেত্র। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। একবার কিছু বলার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেবালয়ে আনা হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে কবি নিজেই গেয়ে শুনিয়েছিলেন তাঁর নতুন গান—

'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু, এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাই নি, যেন সেকথা রয় মনে।'

গানটি শেষ হতেই একজন শ্রোতা ব'লে উঠলেন—'আপনি কি জন্মান্তরবাদ মানেন নাকি? এ জীবনের কথা পরের জীবনেও মনে রাখতে চাইছেন যে!' রবীন্দ্রনাথ সে কথার জবাব আর কি দেবেন, একটুখানি হাসলেন মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের ডাকে একবার আমাকে যেতে হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনের তখন আদিম অবস্থা। পথে আমার সহযাত্রী ছিলেন 'মনীষা'র কবি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। অতিথিশালায় গিয়ে সারারাত কাটালামও দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে। কিন্তু একটিবারও তিনি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে মুখ খুললেন না। দু'জনে এক সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলুম। তিনি কিন্তু আদর-আপ্যায়ন করলেন তাঁকেও যেমন আমাকেও তেমন। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কি শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন তা-ও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল সেদিন।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও একবার অপ্রস্তুত বোধ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে। দীনেশবাবু তখন কুমিল্লায় হেডমাস্টারি করতেন। তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তখন বেরিয়েছে। তাঁর সাধ ছিল বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু সে বিষয়ে কথাই তুললেন না। দীনেশবাবু কুমিল্লায় থাকেন শুনে জিজ্ঞাসা করলেন—সেখানে ধান চালের দর কি?

মনবুড়ীর ঝাঁপি খুললে এ রকম কত বেসাতিই বেরিয়ে পড়ে। ঝাঁপির মালিককে তার জিনিষ ফিরিয়ে দিতে গিয়ে এই স্মৃতি-পূজা সাঙ্গ করি তাঁরই কথায়, এর বোধন হয়েছিল যাঁর উদ্দেশ্যে।

তিনি হলেন প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন শিষ্ট, ত্যাগী, নিরহঙ্কার, নীরব সাধক। তরুণ বয়স হতেই তিনি মাতৃভাষার সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রথমে 'দাসী' পত্রিকার, পরে 'প্রবাসী', তার সঙ্গে 'মডার্ণ রিভিয়ু' নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকার সেবায় তাঁর জীবন কেটেছে। তাঁর সাধনার পথে দেশের হিতই ছিল তাঁর প্রধান চিন্তা। আর্থিক লাভ-লোকসান কিংবা কারও অনুগ্রহ-নিগ্রহের হিসাব ক'রে তিনি চলেন নি। বরঞ্চ কলেজে প্রিন্সিপ্যালের কাজে ইস্তফা দিয়ে, দেনার দায় নিয়েই তিনি আরম্ভ করেছিলেন তাঁর ব্রত। তাঁর ত্যাগের দৃষ্টান্ত—বিলাস-ব্যসন দূরের কথা, তাঁর ব্রত পালনের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও কখনো তিনি দৃষ্টি দেন নি, এমন কি কলকাতায় এসে গাড়ীতে চড়াও ছেড়েছিলেন। একবার দীনেশবাবুর সঙ্গে আমি এস্প্ল্যানেডের মোড়ে গিয়ে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, রামানন্দবাবুকে দেখলুম সেই পথে হেঁটে আসতে। দীনেশবাবু তাঁকে ট্রামে নিয়ে আসার জন্যে টানাটানি করতে লাগলেন। তিনি বললেন—'আমি গাড়ীতে চড়ব না।' দেখলুম তিনি এস্প্ল্যানেড থেকে হেঁটেই বাড়ীর দিকে যাচ্ছেন।

তাঁর প্রকৃতির জন্য প্রবাসীর লেখার বিচার হ'ত লেখককে দেখে নয়, লেখার গুণ দেখে। একবার এক ভদ্রলোক প্রবাসীর অফিসে গিয়ে বললেন—'চিনুন দেখি মশাই, আমি কে?' রামানন্দবাবু অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন, কোন জবাব দিতে পারলেন না। ভদ্রলোক তখন নিজের পরিচয় দিলেন—তাঁর নাম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ছোট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই নাম ছিল প্রভাতবাবুর। 'বলবান্ জামাতা', 'আত্মতত্ত্ব', 'শরীলে আর পদথ নাই'—তাঁর রচনায় এই রকম বাক্যগুলি তখনকার দিনে রহস্যালাপে লোকের মুখে শোনা যেত। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বাংলা দেশের একজন প্রধান লেখক। তাঁর রচনার মধ্যে হাস্য-কৌতুকের প্রাধান্য ছিল। তাঁর গল্প, উপন্যাস উভয়ই প্রবাসীতে বেরুত। অথচ সম্পাদকের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি কখনও। রামানন্দবাবু প্রভাতবাবুর পরিচয় পেয়ে বললেন—'মনে মনে আমিও আন্দাজ করছিলুম আপনারই নাম।' প্রভাতবাবু হেসে জবাব দিলেন—'মনের আন্দাজী কথাটা মুখ ফুটে বলতে না পারাতেই ত আমার সঙ্গে বাজীতে হেরে গেলেন।'

কলকাতায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামে সড়ক হয়েছে, বাঁকুড়ায় হয়েছে কলেজ। কিন্তু এ সব স্মৃতি কোন্ ছার! পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের গৌরবের পরিচয় ছিল—প্রিন্স অব্ বেনারস—বাঙ্গালীর শিরোমণি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়েরও সেই রকমই গৌরবের খ্যাতি—প্রিন্স অব জার্নালিস্ট্স্—সাংবাদিকের রাজা। তাঁর এই গৌরবের মূলে আরো অনেক কিছু থাকলেও মাতৃভাষার ভক্ত বাঙ্গালীর চোখে প্রধান হ'ল—'প্রবাসী'।

আয়না

শ্রীলীলা মজুমদার

কথা বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ। কথায় থাকে ক্ষুরের ধার, আগুনের দীপ্তি, বিষের জ্বালা, চাবুকের তেজ, জলের প্রাণশক্তি, বিদ্যুতের আলো, অমৃতের মধু। কথার জোরেই মানুষরা পৃথিবীর প্রভু হয়েছে।

বলেছেন সুকুমার রায়,

"নিরীহ কলম নিরীহ কালি
নিরীহ কাগজে লিখিল গালি—
বাঁদর বেকুব আজব হাঁদা
বকাট ফাজিল অকাট গাধা।
আবার লিখিল কলম ধরি
বচন মিষ্ট যতন করি,
শান্ত মাণিক শিষ্ট সাধু
বাছা রে, ধন রে, লক্ষী যাদু।
মনের কথাটি ছিল যে মনে
রটিয়া উঠিল খাতার কোণে,

আঁচড়ে আঁকিতে আখর ক'টি
কেহ খুসি, কেহ উঠিল চটি।
রকম রকম কালির টানে
কারো হাসি কারো অশ্রু আনে।
মারে না ধরে না হাঁকে না বুলি,
লোকে হাসে কাঁদে কি দেখি ভুলি?
সাদায় কালোয় কি খেলা জানে,
ভাবিয়া ভাবিয়া না পাই মানে।"

ঐ এতটুকু এক শিশি কালি আর একটা খোঁচামুখ কাঠি দিয়ে অমর হয়ে যাওয়া যায়, এ ত কম আশ্চর্য কথা নয়। কালিও মুছে যায়, কলম ভেঙ্গে যায়, কাগজ হারিয়ে যায়, তবু মুখে মুখে কথা বেঁচে থেকে অমরত্বের রসদ জোগায়।

কথায় বেঁচে থাকেন সব দেশের রসের রাজারা। কথায় বেঁচে আছেন সুকুমার রায়। তবে না লোকে বলে কথার কোনো দাম নেই, বলে শুকনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না, শুধু খানিকটা বাতাস নাকি কথা? যাদের প্রাসাদ হয়ে যায় ধুলো, সাম্রাজ্য হয় কিংবদন্তী, চার হাজার বছর পরে মাটি থেকে খুঁড়ে পাওয়া ভাঙ্গা হাঁড়ির কানায় আঁকা-বাঁকা ক'টা আঁচড়ের মধ্যে দিয়ে আবার তারা কথা কইতে থাকে। এমনি সাংঘাতিক জিনিষ কথা, ম'রেও মরে না। কথাকে তাই সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। মুখ দিয়ে যদি বা বেরিয়ে পড়ে অসতর্ক কথা, কাগজে যা লেখা হবে তার কলমের আগা যেন সত্যের কালিতে ডুবিয়ে নেওয়া হয়।

সত্যিকথা ছাড়া কখনো কিছু লেখেন নি সুকুমার রায়। তাঁর সমস্ত বানানো গল্প আর অভাবনীয় কবিতা নিছক সত্যিকথা দিয়ে ঠাসা। শুধু ঘটনার যাথার্থ্য দিয়ে ত সত্যিকথা হয় না; ঘটনা নিমেষে শেষ হয়ে গিয়ে আবার নতুন ঘটনা শুরু হয়ে যায়, কিন্তু সত্যের অখণ্ড রূপের আর শেষ নেই। নব নব ঘটনার মধ্যে দিয়ে নিত্য নিত্য তার প্রকাশ। ঘটনা ত সত্যের বাহনমাত্র। মাটির পৃথিবীতে যদি উপযুক্ত বাহন না মেলে, বাহন গ'ড়ে নেন সাহিত্যিকরা। সাহিত্যের প্রাণই হ'ল সত্য, সত্য ছাড়া সাহিত্য হয় না। যা ঘটে নি তাকে মিথ্যা বলে না। যাতে সত্যের অসম্মান হয়, আসলে শুধু সেই মিথ্যা। এ কথা সাহিত্যিকরা সবাই বিশ্বাস ক'রে থাকেন। মুখের সামনে আয়না তুলে ধরলে যেমন নিজের আসল চেহারাটা প্রকট হয়ে ওঠে, অন্য লোকের বর্ণনা শুনে কখনো তেমন হয় না। সুকুমার রায়ের সমস্ত রচনাগুলো একসঙ্গে সংগ্রহ ক'রে যদি প্রকাশ করা যায়, তবে সে গ্রন্থের নাম দিতে হয় 'আয়না'। যাতে নিজেদের মুখ দেখে হেসে সবাই সারা হবে।

বেশী কিছু নয়, খানকতক কবিতা আর খানকতক গল্প। বইয়ের মলাটের পিঠটা শক্ত ক'রে কাপড় দিয়ে বাঁধিয়ে, বইটা আজীবন হাতের কাছে রেখে দিতে হয়। এমন আয়না আর কোথায় পাওয়া যাবে, যাতে নিজেদের প্রকৃত চেহারা দেখে কান্নার বদলে হাসি পাবে?

আয়নার উল্টো পিঠে কি থাকে? পারার মতো রং থাকে, তার ওপর পুরু লালচে জিনের মতো প্রলেপ থাকে, তার ওপরে কাঠ দিয়ে শক্ত বাঁধাই থাকে। ওগুলো না থাকলে আয়না যেমন আয়না হ'ত না, তেমনি হাসির উল্টো

পিঠে কঠিন বাস্তব থাকে, সে কান্না দিয়ে ভরা। তা নইলে হাসিও আর হাসি হ'ত না। কান্না আছে ব'লেই হাসি মিথ্যা হয়ে যায় না, বরং কান্না যদি উল্টোপিঠে এঁটে না থাকত, হাসির মধ্যে দিয়ে কোনো কিছুই ধরা পড়ত না। আয়না হয়ে যেত স্বচ্ছ কাচ, যার মধ্যে দিয়ে দেখলে বাস্তব জগৎকে দেখা যায়, কিন্তু নিজেকে দেখা যায় না। সে কাচে হয়ত কোনো রং লেগে থাকত, তাই বাস্তব জগৎকেও সঠিকরূপে দেখা যেত না, কাচের রং থেকে তাতে রং ধ'রে যেত। তাই কান্নাকে অস্বীকার ক'রে যে হাসি, সে হাসি কখনো সত্যের বাহন হয় না। সুকুমার রায়ের হাসি সে হাসি নয়। তিনি সমগ্র জগৎটাকেই দেখেছেন, একটা চোখ বুঁজে রাখেন নি।

এ রসের আরেকটা দিকও আছে। যদিও দুনিয়াতে কোনো দেশের কোনো রসরচনা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আসন পাবার যোগ্য ব'লে কখনো বিবেচিত হয়েছে কি না সন্দেহ, তবুও হাসির একটা চিরন্তন গুণ আছে। অন্যান্য গদ্য-সাহিত্য সেকেলে হয়ে যায়, কিন্তু দুঃখের দুনিয়াতে হাসির সামগ্রীর এতই অভাব যে একবার তাকে পেলে কেউ তাকে সহজে ছাড়তে চায় না। Alice in Wonderland-এর রচয়িতার আদর যেমন একটুও কমে যায় নি, হ-য-ব-র-ল-র রচয়িতার আদরও দিনে দিনে বাড়ছে বই কমছে না; অথচ চল্লিশ বছর যাঁরা গদ্য লিখে সম্মান পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, তাঁদের প্রায় সকলেই সেকেলের কোঠায় বরখাস্ত হয়ে গেছেন। এমন কি অতুলনীয় প্রমথ চৌধুরীর লেখাও আজকাল জনপ্রিয়তা হারিয়েছে।

সমর্সেট ম'ম বলেছিলেন কাব্য চিরন্তন, গদ্যের আদর বড় জোর দু পুরুষ। এ নিয়মকে যদি সত্য ব'লে মেনে নিতে হয়, তা হলে গদ্যের তালিকা থেকে রসরচনা ও ছোটদের সাহিত্যকে বাদ দিতে হয়। এদের মধ্যে কাব্যের অনেক গুণ থাকে। কাব্য যেমন মাথা ডিঙিয়ে হৃদয়ের দ্বারে গিয়ে আঘাত করে, এও তেমনি। যে রচনার রস উপলব্ধি করতে হলে মাথা ঘামাতে হয়, এ সে রস নয়। এ সূর্যের আলোর মতো বিশুদ্ধ ও আদিম। এ ধরণের রস আগে আমাদের ভাষাতে ছিল না বললেই হয়। মানুষের মাথাটা প্রগতির দোসর, হৃদয়টা চিরকেলে। ওরকম লেখা আগে ত ছিলই না, পরেও খুব বেশী হয় নি। অদ্ভুত কতকগুলো শব্দের অর্থহীন সমাবেশ দিয়ে 'আবোল-তাবোল' জাতীয় কবিতা হয় না। কতকগুলো অ্যাং ব্যাং শব্দ, শুনতে মজার কথা শুনে ছোট ছেলেরা হাসতে পারে, কিন্তু যা শুনে ছোট ছেলেরা হাসে অনেক সময়ই তাতে হাস্যরসের লেশমাত্র থাকে না। ছোট ছেলেরা কুঁজো মানুষ দেখে হাসে, গুরুজনদের সঙ্গে কেউ বেয়াদবি করলে হাসে, স্লেটের ওপর পেন্সিল দিয়ে ক্যাঁচ করলেও হাসে। কিন্তু ওসব ত হাস্যরসের উপাদান নয়। ছোটদের জন্যে লেখা রসরচনা প'ড়ে বুদ্ধিমান্ বড়দেরও যদি ভালো না লাগে, তা হলে সাহিত্যে সে লেখা অচল।

আসলে আজগুবি লেখা কখনো অর্থহীন হয় না। যদি হয়, তাহলে তাই দিয়ে সাহিত্য হয় না। সুকুমার রায় অজস্র আজগুবি কথা লিখেছেন, কিন্তু এক বর্ণও অর্থহীন কথা লেখেন নি। মুখের সামনে আয়না তুলে ধরলে নিজেকে চিনতে পারা চাই। যে আয়নায় ছায়াগুলো একেবারে আঁকা-বাঁকা অর্থহীন হয়ে গেছে, সে আয়না কারো কোনো কাজে লাগে না।

হাসি হ'ল দুনিয়া দেখার একটা ঢং মাত্র। কত সময় একই উপকরণ দিয়ে হাসি ও কান্না তৈরী হয়। এ আয়নাটা একেবারে দোকানের আয়না হলে চলবে না, তাতে ত শুধু-চোখে যেমন দেখা যায়, হুবহু তেমনি দেখা যাবে। আয়নার পেছনের রংটাকে একটা যাদুকরী ভুঙ্গি দিয়ে লাগাতে হবে, রসের মাজা দিয়ে রংটা গুলতে হবে। নইলে নিজের দোষ দুর্বলতা দেখে হাসি পাবে কেন? সহানুভূতি দিয়ে গোলা অনেকখানি নিছক সত্য থাকবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাই দিয়েই ত শ্রেষ্ঠ কান্নার সাহিত্যও তৈরী হয়। তফাৎটা তা হলে রইল কোথায়?

সত্যিই কি খুব বেশী তফাৎ থাকার দরকার আছে? চোখেতে হাসির অঞ্জন লাগালেই ত দুঃখগুলোর সঙ্গে বাস করা যায়। কান্নার দেয়ালে মাথা না খুঁড়ে, তার মজার দিকটা খুঁজে পেলেই ত হয়ে গেল। কিন্তু কে দেখতে পায় সে মজার দিকটা? নিজে দেখতে না পেলে আর পাঁচজনাকে দেখাবেই বা কি ক'রে? সেইজন্য দুঃখের কথা লেখার চাইতে হাসির কথা লেখা লক্ষগুণে শক্ত। সেইজন্য একশো জন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের মধ্যে একজনও হাস্যরসিক সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। সেইজন্য সুকুমার রায়ের উত্তরাধিকারী কে হবে তাই নিয়েই হ'ল সমস্যা।

যে অনুকরণ করে, সে শুধু খোলটা নিয়ে মশগুল হয়ে থাকে, প্রাণটা পর্যন্ত পৌঁছয় না। প্রকৃত যে অনুসারী সে খোলটা দেখে খুশী হবে, কিন্তু খুঁজে বেড়াবে প্রাণটাকে।

ফোর আর্ট্‌স্ ক্লাব

শ্রীসুনীতি দেবী

সমুদ্র-মন্থনে উঠেছিল অমৃত ও বিষ। স্মৃতি-সাগর মন্থন করলেও উঠে আসে আনন্দ ও বেদনা। তার মধ্য থেকে আনন্দ ও উৎসাহের গল্প শোনাবার সময় যদি ঈষৎ বিষাদের ছায়া কখনও এসে পড়ে ত পাঠক-পাঠিকা ক্ষমা করবেন। গোকুলচন্দ্র নাগের অকৃত্রিম বন্ধু—শ্রীসতীপ্রসাদ সেন (গোরা), বেশ কয়েক বছর আগে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন ফোর আর্ট্‌স্ ক্লাব (Four Arts Club) ও কল্লোল সম্বন্ধে কিছু লিখতে। কিন্তু তখন আমার শরীর-মন এত রুগ্ন ছিল যে পেরে উঠি নি। আজ আবার সেই অনুরোধ এসেছে শ্রীসুধীর চৌধুরীর কাছ থেকে। ইংরেজী ১৯২০-২১ সালে এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। তবে সন, তারিখ, বার, ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার মত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এটা লিখছি না,—শুধু মনের পটে যে ছবিগুলি ভেসে উঠছে তারই একটা অসংলগ্ন আখ্যান হয়ত শোনাতে পারব।

ক্লাবের নামটি কার দেওয়া ঠিক মনে নেই। কবে বা কোথায় সূচনা—তাও যেন ভাল ক'রে মনে পড়ে না। হয়ত দার্জিলিংএর এক রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে কিংবা সেখানকার অবিরল-বর্ষণ-স্নাত কোন এক মেদুর সন্ধ্যায়, নয়ত আলিপুরের চিড়িয়াখানায় অনুষ্ঠিত এক পূর্ণিমা-সম্মিলনের জ্যোৎস্না-ধৌত রজনীতে। ক'জনেরই মনে উদয় হয়েছিল—সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও হস্তশিল্প এই চারটির সমাবেশে একটি ক্লাব গ'ড়ে তোলা যাক।

আরম্ভে দীনেশরঞ্জন দাস তাঁর অশিক্ষিত-পটু তুলি দিয়ে কাগজের ওপর এমন সব ছবি ফুটিয়ে তুললেন যে আমরা অবাক্। গোকুলচন্দ্র নাগ তাঁর নিপুণ অঙ্কনের একখানি ছবি ক্লাবঘরকে উপহার দিলেন। কান্তিচন্দ্র ঘোষ তাঁর ওমরখৈয়ম আবৃত্তি ক'রে সবার মনকে সাহিত্যরসে অভিষিক্ত করলেন। গান গাইলেন কতজনে তার ইয়ত্তা নেই। আর এ সবের প্রেরণা জোগাতে আমাদের নিরু ও টুলটুলিদা* তাঁদের দরাজ মনের দরজা খুলে সবাইকে ডেকে আনলেন তাঁদের ঘরের মাঝখানে। তাঁদের হাজরা রোডের বাড়ীতেই আমাদের বৈঠক বসত। ঘরের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের "ছিল যে পরাণের অন্ধকারে" কবিতাটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙ্গান হ'ল। সত্যিই অনেক সভ্যের মনের সুপ্ত প্রতিভা এই ক্লাবের উৎসাহে বাইরের আলোয় জন্মলাভ ক'রে জেগে উঠেছিল।

সৃষ্টিধর্মী বিধাতার সৃষ্ট মানুষও নতুন কিছু সৃষ্টির জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ। তাই নতুন ক্লাব গড়ার কাজে লেগে গেলাম অনেকেই। নিয়মাবলী রচনা হ'ল, বৈঠকের দিনক্ষণ ঠিক হ'ল, উদ্বোধনের নিমন্ত্রণ গেল প্রত্যেক সভ্যের বন্ধুবান্ধবদের ঘরে ঘরে। সভ্য হবার নিয়ম ১৲ মাসিক চাঁদা। আর সভ্য নেওয়া হ'ল জাতিধর্ম, স্ত্রীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলকে। এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখি, আমার পিতৃদেব বিজয়চন্দ্র মজুমদার এখানে অতি সহজ ভাবেই বয়োকনিষ্ঠদের সঙ্গে সব রকম আলোচনা ক'রে যেতেন। ক্লাবঘরে অবাধে আসতেন বর্ষীয়সী গৃহকর্ত্রী ও সেই সঙ্গে তাঁর শিশু নাতি-নাতনীর দল। একেবারে শিশুরাও এটাকে তাদেরই বৈঠকখানা মনে করত ও তাদের নৃত্যগীত আবৃত্তি দিয়ে সভ্যদের মনোরঞ্জন করত।

বিখ্যাত শিল্পী অতুল বসু এলেন গোকুলবাবুর নিমন্ত্রণে। এসেই তাঁর প্রাণপ্রাচুর্য্যে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুললেন সবাইকে। আমাদের মত আনাড়িও তাঁর উৎসাহে কাগজে আঁচড় কাটতে সুরু ক'রে দিল। তিনি মাঝে মাঝে নিয়ে আসতেন শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় মহাশয়কে। যামিনীবাবু নীরবে সব দেখতেন শুনতেন, কাউকে বা একটু আধটু ছবি আঁকার পদ্ধতি দেখিয়ে দিতেন, সে ধন্য হয়ে যেত। একটি মেয়ে ত তাঁর কাছে আশ্বাস পেয়ে শান্তিনিকেতনে কলাভবনে গেল চিত্রবিদ্যা অনুশীলন করতে। তার ভিতরের শিল্পীকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ব'লে তার আঁকার কাজে সে এগিয়ে যেতে সাহস করেছিল। তাঁর শান্ত সমাহিত ভাবটুকু মনের ওপর গভীর ছাপ রেখে যেত। স্বনামধন্য দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীও আমাদের কাছে এক-আধবার আসতেন। এতগুলি গুণী শিল্পীর সমাবেশ আমাদের কতটা গর্ব্বিত করত তা না লিখলেও সকলে বুঝবেন।

---

* সুকুমার দাশগুপ্ত ও তাঁর পত্নী নিরুপমা।

চিত্রাঙ্কনে সবাই মাথা গলাতে পারত না, কিন্তু গানের ক্লাসে কাউকে বাদ দেবার জো কি! "যত ছিল নলবনে, সব হ'ল কীর্ত্তনে, কাস্তে ভেঙে গড়াল করতাল।" কে শিক্ষক, কে ছাত্র বোঝা দায় ছিল। যে যেটুকু জানত তা অন্যকে শেখাত।

হাতের কাজের ক্লাসে সেলাইতে সবাই মেতে উঠল। সেলাই ও কাটের শিক্ষক হলেন সুকুমার দাশগুপ্ত। একটা মজার কথা—সেলাইতে ঔৎসুক্য দেখা গেল মেয়েদের চেয়ে ছেলেদেরই বেশি। এমন কি একজন বেশ বয়স্ক ভদ্রলোকও অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে আরম্ভ ক'রে দিলেন সেলাই ও কাটছাঁট শিখতে। কয়েক বছর পরে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যান, তাই এখন ভাবি, অত কোট, পেন্ট, শার্টের কাট ও সেলাই তাঁর জীবনে কোন কাজেই লাগল না।

এবার সাহিত্য বিভাগে আসা যাক। উমা দেবীর নাম সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ছে, কারণ তিনি আমাদের সকলের আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। অত অল্প বয়সে তাঁর যে কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হয়েছিল, বেঁচে থাকলে তা আরও হয়ত বিকশিত হ'ত। শুধু লেখায় নয়, গানে, ছবি আঁকায়, অভিনয়ে—সবেতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যেত—যদিও তা প্রকাশ পেত, শুধু অন্তরঙ্গদের কাছে। নিজেকে জাহির করবার মধ্যে তাঁর বেশ একটু সলজ্জ কুণ্ঠা ছিল। অকস্মাৎ চ'লে গেলেন স্বামী, পরিজন ও আদরের শিশুকন্যাটিকে ফেলে। সমস্ত বন্ধুজনের শোকান্ধকারময় মনে রইল জ্ব'লে স্মৃতির একটি দীপশিখা। কবি নজরুলকেও আমরা মাঝে মাঝে পেতাম। কবিতা শোনাতেন, গানও গাইতেন। তখন কি একবারও কেউ ভেবেছিলাম যে এমন দীপ্ত প্রতিভা এমন মেঘে ঢেকে যাবে?

আমাদের সভ্যদের মধ্যে খ্যাত, অখ্যাত, উদীয়মান সব রকম সাহিত্যিকই ছিলেন। একটি মেয়ের কথা মনে আছে, বিদেশে স্বামীকে চিঠি লেখাতেই যার সাহিত্য-চর্চ্চা নিবদ্ধ ছিল,—সে হঠাৎ খুব গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখতে সুরু ক'রে দিল, এবং প্রতি সপ্তাহের সাহিত্য-বাসরে, বিরূপ সমালোচনার ভয় না রেখেই, সে সব প'ড়ে শোনাতে লাগল।

সাহিত্য-জগতে 'রমলা'র লেখক হিসাবে পরিচিত মণীন্দ্রলাল বসু আমাদের সভায় যোগ দিতেন। তবে এত চুপ ক'রে থাকতেন যে, তাঁর গলার স্বরই যেন শুনি নি! দীনেশবাবুর খেয়াল হ'ল, একটা বই প্রকাশ করা যাক। তিনি, গোকুলবাবু, মণীন্দ্রলাল ও আমি চারটি গল্প দিলাম, আর সে ক'টি 'ঝড়ের দোলা' নাম দিয়ে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হ'ল। 'ঝরণা' নামে পত্রিকা বের করতেন সোমনাথ সাহা। ইনিও কাজের তুলনায় কথা কমই বলতেন। 'প্রবাসী'র কবি সুধীর চৌধুরীও ক'টা কথা বলতেন তা আঙ্গুলে গোনা যেত। যদিও তাঁর অত সঙ্কোচের কারণ ছিল না, কেননা তখনই তাঁর কবিখ্যাতি যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়েছিল। চুপচাপের দলে গোকুল নাগও ছিলেন। এতগুলি 'নীরব কবি' নিয়েও আমাদের সাহিত্যবাসর কিন্তু বেশ সরব হয়ে উঠত। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও এখানে নিয়মিত আসতেন। ছোট প্রবন্ধের মধ্যে সকলের নাম দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু পাঠক বুঝতে পারছেন নিশ্চয় যে আমাদের উৎসাহী সভ্যদের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। আপনারা এটাও লক্ষ্য করেছেন বোধ হয়, যে বেশীর ভাগ সভ্যের কথা উল্লেখ করার সময় তাঁকে নীরব কিংবা স্বল্পবাক্ আখ্যা দিয়েছি। কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, সবাই যদি চুপ ক'রেই থাকেন ত বৈঠকের সার্থকতা কোথায়? কিন্তু আমি দেখেছি যে, কথার বাহুল্য না থাকলেও এঁদের মধ্যে পরস্পরের মন বুঝতে দেরী হ'ত না, আর সেজন্যই এত বিচিত্র মনোভাবসম্পন্ন মানুষদের মধ্যে একটা একতা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল—যার মধ্যে হিংসাদ্বেষের গ্লানি ছিল না। আর একটা বিশেষত্ব ছিল যে, এঁদের মধ্যে আত্মপ্রচারের চেষ্টা ছিল না বললেই হয়। এখন ভাবতে একটু আশ্চর্য্য লাগে যে, বিনা প্রচারেই এই ক্লাবের নাম এত ছড়িয়েছিল কি ক'রে। হয়ত এর অভিনবত্বের একটা আকর্ষণ ছিল। এখানে একত্র হয়ে গল্পগুজব করার যে আনন্দ তা ত ছিলই, তাছাড়া যার মধ্যে যেটুকু গুণ ছিল তা ফুটিয়ে তুলবার এমন একটা পরিবেশ ছিল যা সচরাচর এখনকার ক্লাব-জীবনে কমই দেখা যায়। সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও শিল্প—এই চারটিই মানুষের মনের অস্পষ্ট, অস্ফুট, ও অব্যক্ত কল্পনা ও চিন্তাধারাকে একটা সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দিতে পারে। এখানে সকলে সেই চেষ্টাই করেছিলেন।

আমাদের যে বড় বৈঠকগুলি হ'ত তাতে এত বন্ধুবান্ধব আসতেন যে, ছোট ঘরে স্থান সংকুলান হওয়া কষ্ট ছিল। তাই মাঝে মাঝে বাইরে গ্রামে কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তরেও আসরের আয়োজন করা হ'ত। এত বছরের ব্যবধানেও সেই দিনগুলির স্মৃতি মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

হাজরা রোডের ঘরটি যখন ছাড়তে হ'ল, তখন অন্য কোথাও ঘরও পাওয়া গেল না। ক্লাব বন্ধ করতে হ'ল সেই জন্যই,—সভ্যদের উৎসাহের অভাবে নয়। আজ মনে হয়, অল্পায়ু হলেও এই ক্লাব যথেষ্ট সার্থকতা ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। বহু হারানো ধারার মধ্যে হারিয়ে গিয়েও বিশ্বের দরবারে তার দাবী সে জানিয়ে গেছে।

এর পরে সব বন্ধুরা যখন ছড়িয়ে পড়লেন নানাদিকে, তখন হঠাৎ একদিন দীনেশবাবু ও গোকুলবাবু এসে জানালেন যে, তাঁরা একটা মাসিক পত্রিকা বের করা ঠিক করেছেন। নামটা বেশ ভাল লাগল, "কল্লোল"। এঁরা নতুন বন্ধু, নতুন লেখক নিয়ে কাজে মেতে উঠলেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমার হয় নি। মাঝে মাঝে লেখা দেওয়া ছাড়া এঁদের সঙ্গে আর বিশেষ কোন যোগ রাখতে পারি নি। তবে সময়ে সময়ে কাগজের পাণ্ডুলিপি থেকে কেউ প'ড়ে শুনিয়ে যেতেন।

গোকুলবাবু একদিন বললেন, "অন্য কাউকে খোসামোদ না ক'রে নিজেই একটা উপন্যাস লিখব ভাবছি—কাগজে উপন্যাস দিতেই হয়।" আমি একটু হেসে বলেছিলাম, "আপনি ত নিতান্ত ছোট্ট মতন কথিকা প্রভৃতি লেখেন—উপন্যাস আর লিখতে হয় না আপনাকে।" মনে হ'ল আহত হয়েছেন। পরদিন সকালেই 'পথিকে'র প্রথম পরিচ্ছেদ লিখে এনে শুনিয়ে গেলেন, আর বললেন, "দেখবেন, আমি পারি কি না উপন্যাস লিখতে।" 'পথিক' তখন সত্যিই খুব নাম করেছিল। জনপ্রিয়তার জন্য পরে এটাকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করতে হয়েছিল।

সম্পাদক দু'জন কি পরিশ্রম ক'রে লেখক জোগাড় করেছেন, ছাপা-খরচ চালিয়েছেন, এ সব তাঁরা কোনদিন আমাদের জানান নি। তবে পরে অনেকের কাছে এঁদের প্রচণ্ড সংগ্রামের খবর পেয়েছিলাম। অল্পাহারে, এমন কি দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়েও কাগজ চালিয়ে গেছেন। নিন্দার কণ্টকমুকুটও হাসিমুখে মাথায় পরেছেন। 'কল্লোল যুগে'র সব কাহিনী আমার জানা নেই। এ বিষয়ে যে বই বেরিয়েছে তা পড়বার সুযোগও ঘ'টে ওঠে নি। তবে যে দু'জন এ যুগের প্রবর্ত্তক ছিলেন তাঁদের কথা অল্প কিছু ব'লে যেতে চাই।

গোকুলচন্দ্রের স্বার্থলেশহীন হৃদয়ের কথা ভুলবার নয়। নীরবে সব দুঃখতাপ সয়ে গিয়েছেন, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ক'রে গিয়েছেন। শেষে একদিন প্রকৃতির প্রতিশোধ এল দুরারোগ্য যক্ষ্মারূপে। বন্ধুরা তখন বুঝলেন, এই মানুষটি সত্যি বুকের রক্ত ক্ষয় ক'রে বন্ধুসেবা ও সাহিত্যসেবা করেছেন। সব ক'টি বন্ধু পাশে এসে দাঁড়ালেন, বিশেষ ক'রে দীনেশবাবু। চিকিৎসা ও সেবার অভাব হ'ল না। এমন কি দার্জিলিং স্যানাটোরিয়ামে পাঠাবার ব্যবস্থাও হ'ল। শেষ দিনটি এগিয়ে এল তবু। বন্ধুবান্ধবের কাছে খবর গেল। ছুটে চললেন দীনেশবাবু এবং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। দীনেশবাবু নিজে তখন বিশেষ সুস্থ নন, তবু সেই ঘোর বর্ষাতে—যখন দার্জিলিং ট্রেনের পথ কয়েক মাইল বন্ধ,পাহাড় ধ'সে হাঁটাপথও দুর্গম—তিনি না থেমে হাঁটতে হাঁটতে দার্জিলিং পৌঁছলেন। মৃত্যু-পথযাত্রী বন্ধু তাঁর হাতখানি ধ'রে বুঝলেন পৃথিবীতে স্নেহ, প্রীতি মমতা এখনও আছে। ধীরে ধীরে শেষ বিদায় নিলেন। দার্জিলিং-এ পূজনীয়া হেমলতা সরকার ও তাঁর মেয়েরা ও অন্য বন্ধুরাও প্রাণ দিয়ে যা সেবা করেছিলেন, সে কথা গোকুলবাবুর অগ্রজ ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয় বার বার সকৃতজ্ঞ অন্তরে এখনও স্মরণ করেন। শেষকৃত্য সমাপন ক'রে এই আদর্শ বন্ধুরা কলকাতায় ফিরলেন। মুখে কিছু বলতে পারি নি, কিন্তু মনে মনে সেদিন এঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম। তার পর দীনেশবাবুও যেন ভেঙে পড়লেন। নানা সংগ্রামে তাঁর শিল্প-সাধনা ব্যাহত হ'ল। একদিন তিনিও চ'লে গেলেন।

ফোর আর্টস্ ক্লাবের কথা প্রসঙ্গে 'কল্লোলে'র এবং তার সম্পাদকদের কথা এটুকু না বললে, আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যেত—কারণ 'কল্লোল' এই ক্লাবের প্রাণধারা নিয়েই কল্লোলিত হয়ে উঠেছিল।

—•—

কবি কথা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।' কথাটা কত বড় নিষ্ঠুর সত্য এটা হয়ত একাধিক হতাশ কবি-ভক্তই মনে মনে স্বীকার করবেন। কয়েকজন পূজনীয় এবং কয়েকজন প্রীতিভাজন পরিচিত কবির কথা গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ শোনাচ্ছি।

এ ধরণের স্মৃতিচারণার সবচেয়ে বড় বিপদ্ হচ্ছে 'প্রথম পুরুষের একবচন' কেবলই পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ায়। এই ভয়েই বরাবরই এ কাজটা আমি এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু 'প্রবাসী'র এই ষষ্টিতম বর্ষ পূর্ত্তির উৎসবে কবিবন্ধু সুধীরকুমারের অনুরোধে আজ সে দৃঢ়তা রাখা সম্ভব হল না।

এই রচনার মধ্যে উল্লিখিত কবিদের কাব্যকর্ম সম্বন্ধে আমি কোনও আলোচনা করব না। কেবল তাঁদের একটু রেখাচিত্র মাত্র এই টুকরো স্মৃতিকথায় দিতে চেষ্টা করছি। এটাও হয়ত সম্ভব হত না যদি না সংশ্লিষ্ট কবিকুল আজ তাঁদের বাঞ্ছিত কাব্যলোকের অমরাবতীতে মহাপ্রস্থান করতেন।

প্রথমেই বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা বলি। সমবয়সী ও বয়োকনিষ্ঠদের কথা পরে হবে। যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আশীর কোঠার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। 'দিন-লিপি' রাখার অভ্যাস ছিল না। সময়ও ছিল না। কাজেই, স্মরণের চিত্রগুহা থেকে এই ছবিগুলি উদ্ধার করতে চেষ্টা করছি। ভুলচুক হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

আমাদের তরুণ বয়সে লেখক-লেখিকাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীই ছিলেন সকলের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা। তাঁর কথা দিয়েই শুরু করা যাক। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর-সাধিকা বলা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর কাব্য, গীতিনাট্য, গাথা ও সঙ্গীত রচনাও নিতান্ত কম নয়। আমরা তাঁকে কবি ব'লেই ভালবাসতুম। মহর্ষির মহীয়সী কন্যা জেনে শ্রদ্ধা করতুম। তাঁর অনেক গান ও কবিতা এক সময় আমাদের কণ্ঠস্থ ছিল। বিশেষ ক'রে প্রতিবৎসর সরস্বতী পূজার দিন স্বর্ণকুমারী দেবীর যে গানটি আমাদের স্কুলে গাওয়া হ'ত তার কয়েক পংক্তি আজও ভাঙা ভাঙা মনে আছে—

"ওগো, কমল-আসনা, রঙ্গিনী-বীণাপাণি !
আমি কাহারেও আর জানি না ভারতি
তোমারেই শুধু জানি।
ওগো মধুরছন্দা, হৃদয়ানন্দা,
জানি না প্রভাত, জানি না সন্ধ্যা,
তোমার পর্বে অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি !"

যৌবন সমাগমে আমাদের প্রেমসঙ্গীতে হাতে-খড়ি হয় রবীন্দ্রনাথের আগে স্বর্ণকুমারী দেবীর গান দিয়েই। মনে আছে সেই মনে মনে গাওয়া :

"এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী
সে শুধু গো যদি আসিত।
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা
সে যদি গো ভালবাসিত !"

স্বর্ণকুমারী দেবী তাই আমাদের কাছে ছিলেন প্রধানতঃ কবি। তাঁর দুর্লভ সান্নিধ্যলাভের সুযোগ যখন আমাদের হয়েছিল তখন আমাদের প্রভাত-যৌবন, আর স্বর্ণকুমারী দেবী যেন বিদায়োন্মুখ সূর্যের স্বর্ণরশ্মিতে সমুজ্জ্বল, গোধূলি বর্ণ-রঞ্জিতা কমল। তিনি যে একদা অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন তার ঘোষণা তখনও মিলিয়ে যায় নি একেবারে। শেষ বয়সেও তাঁর রূপের জ্যোতি যা ছিল তা সেদিনের অনেক তরুণীরও ঈর্ষা উৎপাদন করত।

স্বর্ণকুমারী অত্যন্ত সুরসিকা ছিলেন। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এ বিদ্যায় দিদিরই শিষ্য হয়ে উঠেছিলেন। ১৩৩৬ সালে সেবার 'বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন' কলকাতায় হয়েছিল। বিরাট্ আয়োজন। নির্বাচিত সভাপতি রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হতে পারবেন না জানায় মূল সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণকুমারী দেবী। একদিন সকালে তাঁর সানিপার্কের বাড়ীতে গেছি। শুনলুম তিনি স্নানের ঘরে। অপেক্ষায় রইলুম। আমাকে শুভ্র বেশে এলো চুলে তিনি এসে যখন হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, মনে হল যেন সাক্ষাৎ বীণাপাণি এসে আবির্ভূতা হলেন।

বললেন, তোমার কথাই ভাবছিলুম। তুমি দীর্ঘায়ু হবে। দেখ, শেষ বয়সে এই যে এক দুর্বহভার তোমরা চাপিয়ে দিলে আমার উপর, এ কিন্তু সামলাতে হবে তোমাদেরই। অভিভাষণটা আমার একটু বড় হয়ে গেছে, আমার গলা নেই, আর দমও নেই যে সবটা পড়তে পারব। আমি অবশ্য একটু শুরু ক'রে দেব, বাকিটা তোমাকেই সারতে হবে।

বলা বাহুল্য যে সেই চুয়াত্তর বছর বয়সে তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন এক মিষ্টি জাদু মাখানো ছিল। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত অনুরোধে মনে মনে বেশ একটু গর্ব বোধ করলেও কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়লুম। বললুম, আপনার অভিভাষণ পড়া আমার পক্ষে কি শোভন হবে? আমার চেয়েও অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ কুলশ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা রয়েছেন, তাঁদের কাউকে পড়তে দিলে হত না?

হেসে বললেন, সেটা কি আমি না ভেবেই বলছি? তোমার চেয়ে বয়সে বড় অনেকেই আছেন, কিন্তু বড় গলার কেউ নেই যে। নলিনী (৺নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত) বলছিল হেমকে (শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর) দিয়ে পড়াতে। তার যুক্তি হ'ল, মহিলা সভানেত্রীর ভাষণ একজন মহিলা পড়লেই ভাল হবে। আমি যদিও 'সখী-সমিতি' করেছি, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এই পুরুষ-মহিলার পৃথক্ ভাগ থাকা আমি অসম্মানজনক মনে করি। তাছাড়া এত বড় অভিভাষণ সবটা চেঁচিয়ে পড়া হেমের কর্ম নয়। সরলা (৺সরলা দেবী) হয়ত পারত কিন্তু তার মস্ত অসুবিধা হচ্ছে, অতক্ষণ ঠোঁট দিয়ে দাঁত চেপে রেখে পড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি এবার হেসে ফেললুম। বুঝতে পারলুম অসভ্যতা হ'ল। কিন্তু না হেসে পারি নি। ৺সরলা দেবীকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন তাঁর উপরপাটির সামনের কয়েকটি দাঁত একটু বড় ছিল। তিনি সর্বদা ওষ্ঠ-আচ্ছাদনে উপরের দাঁত ক'টি চাপা দিয়ে কথা বলতেন।

আমি বললাম, উনি ছাড়া কি আর কোনও বলিষ্ঠ-কণ্ঠ মহিলা নেই?

উনি বললেন, প্রচুর আছেন। কিন্তু, তাঁদের কণ্ঠ শুধুই কলহপটু, ভাষণ-কুশল নয়।

আবার হেসে ফেললুম। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললুম, আমাদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় রয়েছেন। তাঁর গলার কাছে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।

স্বর্ণকুমারী দেবী খুব গম্ভীর ভাবে বললেন, সেই ভয়েই ত তাঁকে বাদ দিতে চাই। তা তুমি এ ব্যাপারে এত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? নামে তুমি 'দেবকবি' হলে কি হবে, বিধাতা তোমাকে 'দানবকণ্ঠ' দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তুমি পড়লে তোমার যোয়ান গলায় আমার অভিভাষণটা সকলের কানে গিয়ে পৌঁছবে। আমার ইচ্ছা, অস্তাচলের এই ধ্বনিটুকু প্রতিধ্বনিত হোক নবীন দিনের উদয়গিরি-পথে।

বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সেই বিরাট্ সভামণ্ডপে সমবেত সহস্রাধিক প্রতিনিধি ও শ্রোতারা সত্যই সেদিন আমার দানবকণ্ঠ প্রত্যেকেই শুনতে পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তখনও কলকাতায় 'মাইকের' আমদানি হয় নি। দেশব্যাপী বাংলার স্বদেশী আন্দোলনটা একদা গলার জোরেই চলেছিল।

আর এক দিনের কথা বলি। এটা সাহিত্য সম্মেলনের পরের ঘটনা। ৩নং সানি পার্কে স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়ীতে সেদিন ছোট-খাটো চায়ের মজলিশ বসেছিল। তখনকার দিনের অনেক নামকরা প্রথম শ্রেণীর লেখক-লেখিকা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, সে আসরে এসেছিলেন কবি প্রসন্নময়ী দেবী ও তাঁর কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, কবি কামিনী রায়, কবি মৃণালিনী সেন, প্রমথ চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিরণশঙ্কর রায় এবং আরও কয়েকজন। তরুণদের মধ্যে আমাদের 'ভারতী' সম্প্রদায়েরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

সেদিনের সমাবেশে এক-একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে ঘিরে এক-একটি নক্ষত্রমণ্ডল গ'ড়ে উঠেছে দেখা গেল। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে ঘিরে এমনি একটি সাহিত্য-পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল সভার এক কোণে। বাংলা-সাহিত্যে মহিলাদের রচনা সম্পর্কে প্রমথবাবু আলোচনা করছিলেন। তাঁর মোদ্দা কথা ছিল, এদেশের মেয়েরা জীবনের আর কোনো ক্ষেত্রে না হোক অন্ততঃ সাহিত্য ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের কারুর রচনার মধ্যেই মহিলা লেখিকার কোনও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয়তার ছাপ ফুটে ওঠে নি। মেয়েদের যে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁদের নিজেদের উপলব্ধি ও চিন্তাধারা, তাঁদের আপন সুর ও স্বর, অর্থাৎ মেয়েলি ভঙ্গী খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা প্রায়ই দেখি কোনো না কোনো যশস্বী পুরুষ লেখকের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেন। তাঁদের নিজেদের অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুভূতি আবেগ এবং আনন্দ বেদনার প্রকাশ তাঁদের লেখার মধ্যে আজও দানা বেঁধে ওঠে নি। যে কোনও মহিলার রচনা থেকে তাঁর স্বাক্ষরিত নামটিকে চাপা দিয়ে যদি কোনও পাঠককে জিজ্ঞাসা করা হয়, এ রচনা কার বলুন ত? তাহলে সে রচনার শিল্পীকে সনাক্ত করতে নিশ্চয়ই পাঠকের ভুল হবে।

বোধ করি প্রমথবাবুর এ কথাগুলি স্বর্ণকুমারী দেবীর কানে গিয়ে তাঁর প্রাণে বেজেছিল। কারণ, তাঁর রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, প্রভৃতি কথাশিল্পীর অনুকরণের ছাপ একটু বেশী মাত্রায় দেখা যেত। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বললেন, প্রমথর কথাগুলো আমাদের কাছে আপত্তিজনক মনে হলেও একেবারে অসত্য নয়। পুরুষ লেখকেরা এদেশের মহিলা লেখিকাদের আদর্শ ত বটেই! শুধু আদর্শ কেন, আমাদের ঈর্ষার পাত্রও। তাঁরা উচ্চশিক্ষার ও স্বাধীন ভাবে বাইরে ঘোরার সুযোগ পেয়ে জীবনের নানা অভিজ্ঞতা আর নানা ভাষার সাহিত্য থেকে ঐশ্বর্য আহরণ ক'রে বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে চলেছেন। মেয়েদের ত তাঁরা বিদ্যার বৈতরণী পার হবার সুযোগ দেন না? মাত্র তেরো বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল। চোদ্দ বছর বয়সেই মা হয়েছি। শিশু মেয়েকে কোলে নিয়ে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে সুদূর বোম্বাইয়ে হাজির হই। তোমার শ্বশুর আর পিস্-শ্বশুরের চেষ্টায় সামান্য কিছু ইংরেজী বাংলা লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম। কাজেই সাহিত্য-সাধনায় মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ না ক'রে উপায় কি আমাদের? তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞাতসারেই ওটা হয়। মেয়েদের ওপর পুরুষের আধিপত্য ত এদেশে আজ নূতন নয়?

তরুণ লেখিকাদের অগ্রণী হয়ে শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী (তখনও দত্ত) বললেন, ওদেশের অনেক মেয়েদের লেখাও ত দেখি পুরুষালি ঢং-এ। আমার মনে হয়, প্রত্যেক শিল্পীর মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয় সত্তাই থাকে। গভীর অনুভূতিশীল মহৎ শিল্পী পুরুষ হলেও তাঁর রচনায় নারী-হৃদয় ও নারী-চরিত্র যেমন জীবন্ত হয়ে ওঠে, সুদক্ষা নারী শিল্পীর রচনাতেও তেমনি পুরুষ-চিত্র পুরুষ-চরিত্র বা পুরুষ-সুলভ উপলব্ধির সার্থক বিকাশ সম্ভবপর হবে না কেন?

প্রমথবাবু, এঁকেও অবশ্য আমরা কবির পংক্তিতে টেনে বসাতে পারি, 'এঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ' আর 'পদচারণ' দু'খানি দেখিয়ে বললেন, সে ত হতেই পারে। বায়োলজির মতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যেই পুরুষ ও নারী উভয় সত্তাই বর্তমান। তবু বলব, কতক ক্ষেত্রে নারী একান্তই নারী, আর পুরুষ একান্তই পুরুষ। তাদের সেই নিজস্ব বিশেষত্বকে আপনাপন শিল্পসৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারলে তবেই তার স্বকীয়তার দাম হয়। যেমন ধরো, রঙ্গমঞ্চে সৌখীন অভিনয়ে পুরুষ যতই নিখুঁত মেয়ে সেজে অভিনয় করুন না, তাঁর চেহারায়, কণ্ঠস্বরে, চাল-চলনে, হাবে-ভাবে কোথাও না কোথাও ধরা পড়তে হয় যে তিনি আসলে মেয়ে নন। মেয়েদের বেলাতেও এই একই সত্য খাটে। জীবনের এই বাস্তব সত্যকে শিল্পীরা তাঁদের কলমের ডগায় ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না কেন? মেয়েরা কেন এমন লেখা লিখবেন না যে-লেখায় লেখকের নাম দেওয়া না থাকলেও কারুর বুঝে নিতে ভুল হবে না যে এ লেখা পুরুষের নয় মেয়ের। পুরুষের পক্ষে কিন্তু সম্ভব নয় ঠিক এমনি ঢঙে কিছু লেখা।

প্রসন্নময়ী দেবী এবার এ আলোচনায় যোগ দিয়ে রহস্যচ্ছলে বললেন, তুমি পণ্ডিতের মতো যাই বল প্রমথ, তা ব'লে বিবির (শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী) লেখা সম্বন্ধে তোমার ও সমালোচনা খাটবে না। ওর 'নারীর উক্তি'গুলোকে কেউ পুরুষের ব'লে ভুল করবে না!

ঘরের যে কোণটিতে এই আলোচনা হচ্ছিল সেখানে সরু-মোটা-মিহি গলায় এক সঙ্গে বেশ একটা হাসির ঢেউ বয়ে গেল!

এমন সময় চা ও তার সঙ্গে কিছু দেশী-বিদেশী জলযোগের প্লেট এসে পড়ায় আলোচনা অন্যপথে মোড় নিলে। প্রসন্নময়ী দেবী বললেন, এই একটা ক্ষেত্র—যেখানে পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে পিছিয়ে আছে, আমাদের আঁষ-নিরিমিষ হেঁসেলে ঢুকতে পাও না তোমরা। আমাদের খাস তালুক আমাদের সনাতন রান্নামহল। সবিনয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম, সেদিন আর নেই কিন্তু। শহরের বারো আনা মহলে এখন দ্বারভাঙ্গা কিংবা কটকের ঠাকুর বহাল। প্রমথবাবু বললেন, মোগল আমলেও তাই ছিল। কন্টিনেন্টেরও সমস্ত বড় হোটেলেই এখনো রান্না করে পুরুষ 'chef', পরিবেশনও করে পুরুষ বা খিৎমৎগার খানসামার দল। মহাভারতের যুগেও দেখি বিরাট রাজার রন্ধনশালায় সুপকার হয়ে ঢুকেছিল ভীম, দ্রৌপদী নন।

প্রসন্নময়ী বললেন, কি জানি বাপু! অতশত বুঝি নি। আমরা ত বরাবর দেখে এসেছি পাবনার বাড়ীতে আমাদের মা-ঠাকুরমারাই রান্নামহলে রাজত্ব করতেন।

কবি প্রসন্নময়ী দেবী পাবনার জমিদার চৌধুরীবাড়ীর মেয়ে। স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইনি। প্রমথবাবুও এঁরই কনিষ্ঠ সহোদর। কবিতা লেখার ঝোঁক এঁর কিশোর বয়স থেকেই ছিল। এঁরই মুখে

শুনেছি, দশ বছর বয়সে এঁর বিবাহ হয়। বিবাহিত জীবনে ইনি সুখী হতে পারেন নি। একমাত্র কন্যা প্রিয়ম্বদার জন্মের পর স্বামী উন্মাদ হয়ে যাওয়ায় ইনি পিত্রালয়ে চ'লে আসেন। স্নেহময় পিতা তখন বহু যত্নে এঁকে ইংরেজী বাংলা লেখাপড়া শেখান। সেকেলে মেয়ে হলেও প্রসন্নময়ী ছিলেন চিন্তায় ও কর্মে প্রগতিবাদিনী। কন্যা প্রিয়ম্বদাকে ইনি কলেজে পড়িয়ে গ্র্যাজুয়েট করেন। সৎপাত্রে কন্যার বিবাহ দিয়ে আবার সুখের নীড় বাঁধতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিধাতা বিমুখ। কন্যা তাঁর স্বামী ও একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে দুর্ভাগিনী জননীর অশ্রুসিক্ত অঞ্চল-ছায়াতেই ফিরে এলেন।

মা ও মেয়ে পরস্পরকে অবলম্বন ক'রে ওল্ড বালিগঞ্জের একটি উদ্যানবেষ্টিত মনোরম কুঞ্জকুটীরে বাস করতেন। প্রিয়ম্বদা দেবী উত্তরাধিকারসূত্রে মায়ের কাছে কবিত্বশক্তি পেয়েছিলেন কিন্তু একপুরুষ পরে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় মায়ের চেয়ে মেয়ের লেখা বেশ একটু আধুনিক ছিল। আমরা প্রায়ই এই প্রিয়বাদিনী প্রিয়ম্বদা দেবীর বাড়ীতে যেতুম। তিনি আমাদের কবিতা শোনাতেন, চা খাওয়াতেন, খাবার খাওয়াতেন। কত সেকালের গল্প শোনাতেন। চলতি সাহিত্যের আলোচনাও হ'ত। প্রসন্নময়ী দেবীর সঙ্গে এঁর সূত্রেই আমাদের পরিচয় হয়েছিল। প্রসন্নময়ী স্বল্প-ভাষিণী ছিলেন। আমাদের সাহিত্য আলোচনাতে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন। তবে, সব সময়ে নয়। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের রচনাবলীর তিনি অত্যন্ত অনুরাগিণী ছিলেন। কুরুক্ষেত্র, রৈবতক, পলাশীর যুদ্ধের অনেক অংশ সেই প্রাচীন বয়সেও তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁর মুখেই শুনেছি—নবীনচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল। কবিবর নাকি ছিলেন তাঁর একজন গুণগ্রাহী সমঝদার।

কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবী রবীন্দ্র-ভক্ত ছিলেন। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের কবিতাও তাঁর খুবই ভাল লাগত। তাঁর মুখেই আমরা প্রথম জগদিন্দ্রনাথের এই কবিতাটির আবৃত্তি শুনেছিলুম।

"বেদনা যত পেয়েছি ওগো, রয়েছে বুকে গাঁথা—
নীরবে আমি সকলগুলি নিয়েছি পেতে মাথা।
বুকের যত শোণিত-ধারা নয়ন পথে ঝরে,—
কলস ভ'রে রেখেছি সব সাজায়ে তব তরে।

এর পর আমরাও জগদিন্দ্রনাথের রচনার অনুরাগী হয়ে পড়েছিলুম। 'মানসী ও মর্মবাণী'র আমলে আমরা মহারাজের অন্তরঙ্গ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা লাভে ধন্য হই। কবিবন্ধু যতীন্দ্রমোহন বাগচীর মধ্যস্থতায় তিনি আমাদের সাহিত্য-বন্ধুও হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ল্যান্সডাউন রোডের 'নাটোর প্রাসাদে' বহু সন্ধ্যা আমাদের পরমানন্দে কেটেছিল। সে সব কথা পরে বলব।

প্রিয়ম্বদা দেবীর সঙ্গে যখন আমাদের প্রথম পরিচয় হয় তখন তিনি প্রায় প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু সেদিনও তাঁর রূপের জ্যোতি এতটুকুও ম্লান হয় নি। তাঁর স্নেহময়ী জননী প্রসন্নময়ী দেবীও যে একদা তাঁর জীবনপ্রভাতে একজন অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন তার নিদর্শন সেই বৃদ্ধবয়সেও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। তিনি অতি মধুর মৃদুকণ্ঠী ছিলেন। মায়ের এই মৃদু মধুর কণ্ঠস্বরটি প্রিয়ম্বদা দেবীও পেয়েছিলেন। তাঁর কথাগুলি ছিল ভারি মিষ্টি। শিশুর মুখের আধ আধ বুলির মতো মৃদু ও মোলায়েম। আমাদের সঙ্গে ব'সে যখন গল্প করতেন, মনে হ'ত তিনি যেন তাঁর বয়সের কথা ভুলে গিয়ে কখন নিজের অগোচরে আমাদের সমবয়সী বন্ধু হয়ে উঠেছেন! অথচ ধীর, সংযত, সুপরিমিত তাঁর আলাপ। উচ্ছ্বাস আছে কিন্তু আতিশয্য নেই। সমকালীন সবকিছু সাহিত্য-সংবাদ জানবার কৌতূহলে ভরা ছিল তাঁর চিরতরুণ মনটি। মুখেও মাখানো ছিল বালিকার সারল্য।

প্রিয়ম্বদা দেবী ছিলেন সেকালের দুর্লভ একটি গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। কিন্তু বিদ্যার অহংকারের পরিবর্তে তাঁর মধ্যে দেখেছি অপরিসীম বিনম্র বিনয়। ব্যর্থ-জীবনভারে প্রপীড়িতা কন্যা। ততোধিক ব্যর্থ জীবনের নিষ্ঠুর পরিহাসে বিভ্রান্ত জননী! কিন্তু, তবুও এই দুটি মা ও মেয়ের সংসারে কাব্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টি ছিল। এঁদের ক্ষুদ্র সংসারে শূন্যতার মধ্যেও একটা শান্তি দেখেছি।

কবি কামিনী রায়ও (সেন) স্ত্রী-শিক্ষা-বিরল সেকালের একজন গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। তাঁকে বাইরে থেকে দেখে মনে হ'ত তিনি যেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু আলাপে বোঝা যেত, কত তিনি অমায়িক। সেদিনের মহিলা কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অর্ঘ্য এঁরই চরণে এসে পড়েছিল। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ তিনি। স্বভাবের মধ্যে কিছু মাত্র চটুলতার স্পর্শ খুঁজে পাই নি। আমাদের মতো ছেলে-ছোকরা লেখকদের বড় একটা আমোলই দিতেন না।

আমরাও কখনও সাহস ক'রে তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপনের স্পর্ধা করি নি। সাহিত্য সংক্রান্ত সভা-সমিতিতেও কচিৎ তাঁকে যোগ দিতে দেখা যেত। অবশ্য, তার কারণও ছিল। সুদীর্ঘ জীবনে পর পর কয়েকটি শোচনীয় দুর্ঘটনায় তাঁর দেহ-মন একেবারে ভেঙে পড়েছিল। দুটি পুত্র-কন্যাকে অকালে হারিয়ে এবং আচম্বিতে অপঘাতে স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি যেন ক্রমশঃ নিজেকে আপনার মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর ওখানেই একদিন।

আর নয়। আজ এই পর্যন্তই থাক। পরে মাসিক প্রবাসীতে আবার বলব।

—•—

শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসুর শিবলীলার চিত্র

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের মহামান্য যশস্বী সাহিত্য-রসিক মহাশয়রা, বাংলার অধুনিক ও সমকালীন রূপ-সৃষ্টির উপর দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই—এই কথাটা অপ্রিয় হইলেও—অকাট্য সত্য। বাংলাদেশের সাহিত্যের নিপুণ ও বিচক্ষণ সমালোচনায় আমাদের সমসাময়িক সাহিত্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু, রূপ-সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের সমালোচকগোষ্ঠী অনেকটা নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন। এইক্ষেত্রে চেষ্টার একমাত্র প্রমাণ,—দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার পৃষ্ঠে আমাদের চিত্রপ্রদর্শনীর তথাকথিত সমালোচনা। এই সব বাক্যবহুল অন্তঃসারশূন্য সমালোচনা আমাদের যশস্বী লেখক মহাশয়রা লেখেন না, সুতরাং শ্রেষ্ঠ লেখকদের সুচিন্তিত, প্রামাণিক ও নিপুণ রস-বিচার বলিয়া—এই শ্রেণীর সমালোচনা আমরা সসম্মানে গ্রহণ করিতে পারি না। অথচ, এই শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সহরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—ভারতের নূতন রীতির চিত্র-পদ্ধতি। এবং মাসের পর মাস, শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু—এই প্রবাসীর পৃষ্ঠায় নূতন-পদ্ধতির চিত্রকলার নির্ব্বাচিত নমুনা—রঙীন প্রতিলিপির মারফৎ দেশের সংস্কৃতিবান্ পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন—এই সব চিত্র-সৃষ্টির যথোচিত রস-বিচারের দাবী করিয়া। কিন্তু, তখনকার কালের শিক্ষিত-সমাজ এই দাবীর সম্মান রাখিতে পারেন নাই। অথচ এই দাবীর নির্ম্মম প্রত্যুত্তর আসিয়াছিল—সেকালের শ্রেষ্ঠ মাসিক "সাহিত্য"-পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বলিষ্ঠ লেখনীর মুখে। প্রবাসীর পাতায় ছাপা আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও ডাক্তার নন্দলাল বসুর চিত্রগুলি সমাজপতি মহাশয়ের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইত, মাসের পর মাস "সাহিত্য" পত্রিকায়। চিত্র-সমালোচনার ইতিহাসে সুপণ্ডিত সুরেশচন্দ্রের মাসিক গালি-বর্ষণ আজও স্মরণীয় হইয়া আছে। ব্যাপারটা বহু প্রাচীন হইলেও তাহার আলোচনা আজও অবান্তর নহে। কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কোনও নূতন রীতির প্রকাশ সহৃদয়চিত্তে গ্রহণ করিবার শক্তি অনেক সময় উচ্চশ্রেণীর সমালোচকদের মধ্যেও দেখা যায় না। গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির নবীন ধারা, তখনকার যশস্বী সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দ্বিধাহীনচিত্তে স্বাগত করিতে পারেন নাই। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যদের চিত্রের রসাস্বাদনের প্রশ্নটা কিছু স্বতন্ত্র। কারণ, সেযুগে কাব্য-সৃষ্টির রস-বিচারে দক্ষ অনেক সাহিত্যিক বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু, বাঙ্গালী শিক্ষিতসমাজের মধ্যে তখনও রূপ-রস বিচার করিবার যোগ্য রসিক একবারেই বিরল ছিল—ইহা অত্যুক্তি নহে। ৫০ বৎসর পরেও চিত্র-সমালোচনার ক্ষেত্রে পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ১৯১৪ সালে, যখন এই নূতন রীতির ভারতীয় চিত্র-পদ্ধতি—য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ কলাকেন্দ্র পারী নগরে পৃথিবীর কলা-রসিকদের চিত্ত জয় করিল এবং সাংবাদিক 'রয়টার' যখন অবনীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ের বার্ত্তা ("Triumph of Abanindranath!") দেশে দেশে তার করিয়া সারা ভারতকে স্তম্ভিত করিল, তাহার পরেও বাংলার, তথা ভারতের শিক্ষিতসমাজ, এই নূতন চিত্র-পদ্ধতির আদর্শ সমাদরে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পারী

নগরীর বিখ্যাত পত্রিকাগুলি যখন এই চিত্র-শৈলীকে "কলিকাতার বিশিষ্ট শৈলীর দান" (L' Ecole du Caloutta) বলিয়া সম্মানিত করিল—এই সহরের অধিবাসীরা বিশেষ উল্লাসের পরিচয় দেন নাই। বর্ত্তমানকালে, ভারতের কোনও সিনেমা-চিত্র য়ুরোপের কোনও আন্তর্জাতিক উৎসবে ক্ষীণতম প্রশংসা অর্জ্জন করিলে, ভারতের সংবাদ-পত্রগুলি তুমুল দুন্দুভি-নিনাদে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। কিন্তু জাতীয় চিত্ররচনার ক্ষেত্রে—অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের উৎকৃষ্ট 'মাস্টারপিস্'গুলিও এ পর্য্যন্ত যথোচিত সম্মান লাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের রচনার বিভিন্ন দিক্ অবলম্বন করিয়া শতাধিক প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি আমাদের বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের রচনা সম্বন্ধে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রামাণিক সমালোচনা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমি সাহস করিয়া সদর্পে দাবী, করিতে চাই যে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ উনবিংশ-বিংশ শতকের ভারতের, তথা পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ রূপস্রষ্টা। তাঁহার রচনার যথার্থ মূল্য বিচার করিবার শক্তি আমরা এখনও অর্জ্জন করিতে পারি নাই। আমি আরও দাবী করি যে ডাক্তার নন্দলাল বসু সমগ্র এসিয়ার মধ্যে জীবিত চিত্র-শিল্পীদের শীর্ষস্থানীয়। ভারতের শিল্পকে তিনি যে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, (রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি কথা বাদ দিলে) দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহার অনুরূপ সাফল্য সম্ভব হয় নাই। সুতরাং নন্দলাল বসুর চিত্র-সৃষ্টি কেবল ভারতীয় নূতন পদ্ধতির চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ স্তম্ভরূপেই নহে, সমগ্র এসিয়ার বিংশ শতকের চিত্র-সাধনার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। যখন জাপানের কলা-বিষয়ক পত্রিকা "কোক্কা"র পৃষ্ঠায় নন্দলালের দুইখানি চিত্র পর পর প্রকাশিত হয়, "কৈকেয়ী" ও "যম-সতী", তখন অনেকে মন্তব্য করিয়াছিলেন, যে, নন্দলালের রেখা-পদ্ধতিও বলিষ্ঠ রূপকল্পনা চীন-জাপানের শ্রেষ্ঠ রূপ-শিল্পীদের সমগোত্রীয়। ভারতের চিত্র-শিল্প যখন য়ুরোপীয় রূপ-পদ্ধতির কৃত্রিম প্রভাবে বিপর্য্যস্ত এবং শীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল,—তখন, সমগ্র এসিয়ার চিত্র-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া ভারতের নবীন চিত্র-শিল্পীরা—চীন ও জাপানের প্রদর্শিত পথে মুক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই যুগে চীন-জাপানের পদ্ধতির স্পর্শ ঠিক ভারতের উপর 'প্রভাব' বলিয়া ধরা সঙ্গত নহে। কারণ, বহু পূর্ব্বে, গুপ্তযুগে এবং তাহার পরে, ভারতের চিত্র-রচনার পদ্ধতি—চীন ও জাপানী শিল্পীরা বৌদ্ধধর্ম্মের আনুষঙ্গিক সংস্কৃতি হিসাবে তাঁহাদের দেশে বহন করিয়া লইয়া যাইয়া প্রাচ্যদেশে, বিশেষতঃ চীন ও জাপানে—সমগ্র এসিয়ার কলা-পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং, যে পদ্ধতি বৌদ্ধধর্ম্মকে বাহন করিয়া চীন ও জাপানে অভিযান করিয়াছিল, সে পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় পদ্ধতি। সুতরাং যে পদ্ধতি ও আদর্শ—চীন-জাপান ভারত হইতে ঋণ করিয়া লইয়াছিল, বিশ শতকে ভারতীয় চিত্র-শিল্পী সেই পদ্ধতি যদি পুনরুদ্ধার করিয়া আনে—তাহাকে চীন-জাপানের 'প্রভাব' বলিয়া ব্যাখ্যা করা যুক্তিসঙ্গত বিচার নহে। অজন্তার চিত্র-শৈলী সাত শতকে জাপানের হরি-উজির মন্দিরের ভিত্তি-চিত্রের প্রমাণে—ভারতের নিকট জাপানের ঋণ স্পষ্টরূপে দীপ্যমান রহিয়াছে। মধ্য এসিয়ার ও চীনের নানা গুহা-মন্দিরে (খোটান্ দান্দান্ ইউলিক মিরান, কুচা, ও তুয়ান্-হুয়াঙ্) অসংখ্য বৌদ্ধ ভিত্তি-চিত্র—অজন্তার চিত্রপদ্ধতির শাখারূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং, এইসব প্রমাণ অবলম্বন করিয়া বলা যায় যে মধ্য-এসিয়া, তিব্বত, চীন ও জাপান,—ভারতের চিত্র-সূত্রের উপর মালার ন্যায় গ্রথিত হইয়া আছে। নন্দলাল—এই একসূত্রে গাঁথা প্রাচীন এসিয়ার চিত্র-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া ভারতের চিত্রপদ্ধতিকে নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সুফলের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হইল—নন্দলালের "উমার শোক" চিত্র ("রূপম্" পত্রিকা, জানুয়ারী, ১৯২২)। এই শ্রেষ্ঠ চিত্রে ভারত, চীন ও জাপানের চিত্র-পদ্ধতি অপূর্ব্ব সমন্বয় লাভ করিয়াছে।

কিন্তু নন্দলালের বিশিষ্ট দান—কেবল এসিয়ার চিত্র-শিল্পের ঐক্য সাধনা নহে—ভারতের ক্লাসিক যুগের রূপ-পদ্ধতিকে নূতন পরিণতির পথে চালনা করা। অনেক সমালোচক নন্দলালের চিত্র-শৈলীকে অজন্তার চিত্র-শৈলীর "পুনরুক্তি" বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। নন্দলালের চিত্র-সৃষ্টিতে ভিত্তিগত ভারতীয় পদ্ধতির অনুসরণ নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু কোথাও ঐ প্রাচীন ঐতিহ্যের যান্ত্রিক অনুকরণ বা পুনরুক্তি নাই। তাঁহার চিত্রে ভারতের প্রাচীন রূপের ভাষা নূতন পথে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

শৈব-পুরাণের চিত্রায়নে নন্দলাল যে অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন—ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে তাহা চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। শিব-পার্ব্বতীর নূতন রূপ-কল্পনায় নন্দলাল—নিশ্চয়ই মধ্যযুগের শৈব ভাস্কর্য্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন,—কিন্তু এই উপাদানকে যে মৌলিক কল্পনার নূতন রূপ দান করিয়াছেন—তাহা ভারতের রূপ-শিল্পের ইতিহাসে এক নূতন ও মূল্যবান্ যোজনা—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলা

দেশে প্রাচীন পটে এবং যাত্রা-গানের অভিনয়-শিল্পে স্থূলোদর, শ্মশ্রুযুক্ত যে বৃদ্ধের আদর্শ শিবের প্রাচীন কল্পনাকে বিকৃত করিয়াছিল—নন্দলাল সেই দুষ্টপন্থা বর্জ্জন করিয়া—এক কমনীয়-কান্তি, শ্মশ্রু-হীন, চিরকুমার, অনন্ত-যৌবন অতিমানুষের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যাহা মধ্যযুগের শিব-মূর্ত্তির কল্পনাকে নূতন মর্য্যাদা ও পরিণতি দান করিয়াছে। কাংড়া-চিত্র-শৈলীতে শিবের পারিবারিক জীবনের যে শিশু-সুলভ সারল্যের ছবি আমরা দেখিতে পাই, তাহার তুলনায় নন্দলালের শিব-চরিত্র অনেক উচ্চ আদর্শে কল্পিত। সর্ব্বোপরি, শৈবতত্ত্বের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন ভারতের শৈব-সাধনায় নিহিত আছে—তাহার রহস্ত উদ্‌ঘাটন করিয়া, নন্দলাল শৈবধর্ম্মের অতি গুহ্য কথার উপর সুন্দর, প্রাঞ্জল টীকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাঁহার অপরূপ শিবপুরাণের চমৎকার চাক্ষুষ চিত্রমালায়। "শিবের ক্রোড়ে মৃত সতী", "শিবের বিষপান," "শিবের সংহার-নৃত্য", ইত্যাদি নন্দলালের ছয়খানা শৈব-চিত্র ভারতের নবীন পদ্ধতির চিত্রের কপালে ছয়টি উজ্জ্বল নীল-মণি। ভারতের চিত্র-সৃষ্টির গর্ব্বের বস্তু।

নন্দলালের শৈব-পুরাণের ক্ষেত্রে এই সকল বিচরণ অনেকে সহানুভূতির চক্ষে দেখেন নাই। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রধানতঃ প্রাচীন কাব্য ও পুরাণ হইতে চিত্রশিল্পের রস-বস্তু আহরণ করিয়াছেন, সম-সাময়িক বাস্তবিক পরিবেশকে উপেক্ষা করিয়া। আধুনিক শিল্পী আধুনিক কালের জীবন-যাত্রা হইতে তাঁহার উপকরণ লইবেন,—আধুনিক জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তুলিবেন তাঁহার চিত্রে, প্রাচীন মৃত-বস্তুকে বর্জ্জন করিয়া, নূতনের পথে চলিবেন—এইরূপ সমালোচনা কেহ কেহ করিয়াছেন। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে প্রাচীন উপকথার রূপায়ণে নিযুক্ত থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—তিনি বলিয়াছিলেন—"চিত্রে মহৎ বস্তুর অবতারণা অবশ্য কর্ত্তব্য,—কিন্তু আমরা বর্ত্তমান জীবনের আশে-পাশের মানুষের আদর্শে, ভঙ্গী, ভঙ্গিমা, ও আচরণে এমন কোনও মহত্তের সন্ধান পাই না—যাহা আমাদের রূপ-সাধনার আদর্শ রসবস্তু হইতে পারে। হীন, তুচ্ছ, নিম্নমুখী পরিবেশে উচ্চ-চিন্তার উপাদানের একান্ত অভাব। চিত্রকে প্রাণময় করিতে পারে, জীবন্ত করিতে পারে, এমন মহনীয় রসের একান্ত অভাব। প্রাচীন বিষয়-বস্তুতে, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনীতে উচ্চ-চিন্তার ও চিরন্তন সত্যের অজস্র উপাদান আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার স্রোত আজও শুষ্ক হয় নাই।"

রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে' তাঁহার এক বিখ্যাত প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন—"আমরা (অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসী) পৌরাণিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি।" পৌরাণিক উপকথায় সরল বিশ্বাসের অশিক্ষিত শিশুমন আমরা হারাইয়াছি। কথাটা আংশিকভাবে সত্য হইলেও সর্ব্বতোভাবে সঠিক নহে। কারণ, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে মুষ্টিমেয় মানুষ মাত্র পৌরাণিকতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, বাকি শতকরা অন্ততঃ ৮০ জন মানুষ পৌরাণিকতার ভাবে ও ভাবনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এখনও ভারতে হাজার হাজার মানুষ (তাহার মধ্যে অনেক ইংরেজী-শিক্ষিত অগ্রগামী মানুষ আছেন) শিব-চতুর্দ্দশীর ব্রত পালন করেন। শিবকে তাঁহারা এখনও হারান নাই। সুতরাং নন্দলাল শৈবপুরাণের চিত্রায়ণে ভারতের সংখ্যা-গরিষ্ঠ সমাজের মানুষের বিশ্বাস ও মনের কথার সুষ্ঠু প্রকাশ করিয়া—সহৃদয় সামাজিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার উপর আর একটি কথা বলিতে হয়,—প্রাচীন পুরাণের উপকথায় এমন সব দেশ-কালের অতীত চিরন্তন সত্য-বস্তু নিহিত রহিয়াছে—যাহা আধুনিককালের মানুষকেও তাহার নানা আধুনিক জটিল সমস্যার সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে। গ্রীক-পুরাণের উপকথার কথা-বস্তু,—গ্রীকসভ্যতার অবলুপ্তির পরেও বহু শতাব্দীর য়ুরোপের চিন্তার ক্ষেত্রে রস-বস্তুর ইন্ধন যোগাইয়াছে। গ্রীক-পুরাণের সহিত ইংলণ্ডের শিক্ষিত মানুষের কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই, তাঁহাদের পক্ষে উহা কল্পকথা বস্তু। তথাপি রয়েল্ একাডেমির বার্ষিক চিত্র-প্রদর্শনীতে একাধিক গ্রীক-পুরাণের কথা-বস্তু অবলম্বনে লিখিত চিত্র অদ্যাপি প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একাধিক কাব্যে ("কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ", "গান্ধারীর আবেদন", "চিত্রাঙ্গদা", "উর্ব্বশী", ইত্যাদি) পৌরাণিক প্রাচীন রসবস্তুকে নূতন রূপদানে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। ইহারই অনুরূপ পদ্ধতিতে শৈব-পুরাণের প্রাচীন আখ্যান-বস্তু নন্দলালের ঐন্দ্রজালিক তুলিকায় নূতন প্রাণ পাইয়া আমাদের আধুনিক জীবনে উজ্জ্বল দীপ রচনা করিয়া দিয়াছে। প্রাচীন উপকথার মধ্যে অনেক মূল্যবান্ তথ্য গুপ্ত রহিয়াছে। আজিকার ব্যবহারিক জীবনেও তাহা অবাস্তব মিথ্যা ভাবণ নহে। শিবের "নৃত্য" ধ্বংসের মধ্যে নূতন জীবনের প্রতীক রচনা করে, নূতন মঙ্গলের সূচনা করে। এখনও আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে মধ্যে মধ্যে এমন মানুষের সাক্ষাৎ মেলে—যিনি, শিবের 'বিষপানের' আদর্শে,—নিজে সামাজিক 'বিষ' পান করিয়া অন্তকে মৃত্যুর আঘাত হইতে রক্ষা করেন।

শিবের পৌরাণিক আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া নন্দলাল বসু অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ চিত্র রচনা করিয়াছেন,—এই শিবের চিত্রমালা-ভারতের চিত্রসাধনার কপালে অতি উজ্জ্বল টীকার অলঙ্কার আরোপ করিয়া আধুনিক ভারতীয়-চিত্রকে জয়যুক্ত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের একটি অনবদ্য কবিতার চিত্রায়ণে নন্দলাল মহাযোগী শিবদেবতার আদর্শ প্রতীক নিপুণ ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এই কবিতাটি হইল "কল্পনা"গুচ্ছের একটি অতি উজ্জ্বল রত্ন। এখানে তাহার কয়েক পদ উদ্ধৃত হইল।

"মোরে কর সভা-কবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্ব্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা!
তোমার আকাশ জুড়ি' যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।
তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্যোগ
ভ্রমিতেছে জগতে জগতে
আমারে তুলিয়া লও সেই তার ধ্বজচক্রহীন
নীরবঘর্ঘর মহারথে।"

উদ্ধৃত কবিতায় উল্লিখিত 'ধ্যানমৌন সভাকবির' কল্পনা নন্দলাল—ধ্যানমগ্ন শিবের চিত্রে চাক্ষুষ করিয়া তুলিয়াছেন সুষ্টু কৌশলে। চিত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছিল—কবির 'কল্পনা'-পুস্তক হইতে সংগৃহীত ইংরেজী অনুবাদে (Fruit Gathering, pages, 122-123, XX, Macmillan & Co., 1919.)

কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথমেই রঙীন প্রতিলিপিতে প্রথম প্রকাশিত হইল শিল্পাচার্য্যের আর একখানি শিবের অপূর্ব্ব আলেখ্য। এই চিত্রখানি আচার্য্য রচনা করেন, বাংলাদেশের পঞ্জিকার প্রবাদ অবলম্বন করিয়া। প্রবাদ আছে যে, পার্ব্বতী শিবকে বৎসরের ফলাফল প্রশ্ন করিলে শিব যে ফলাফল উচ্চারণ করেন, পঞ্জিকাকার সেই ফলাফল পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন। বাংলা দেশের পঞ্জিকায় একটি বাংলা কবিতায় এই শিবপার্ব্বতীর কথোপকথন উদ্ধৃত হইত। এই ব্যাপারে কয়েকটি অতি প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

কৈলাশ-শিখরাসীনং হরং প-প্রচ্ছ পার্ব্বতী।
অধুনা ব্রুহি মে নাথ নব-পঞ্জী-ফলাফলম্॥
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নব-পঞ্জী-ফলাফলম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ দিব্যজ্ঞানং লভেন্নরঃ॥"

শ্লোকে উল্লিখিত শিব-পার্ব্বতীর কথোপকথন—শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিকায় অলৌকিক দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছে।

শিল্পাচার্য্য নন্দলালের রূপসৃষ্টি

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

অনুলেখক—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

তরুণ বয়সে প্রথম যখন নন্দলালের সংস্পর্শে আসি তখন তিনি ওরিয়েন্ট্যাল আর্ট সোসাইটির অধ্যাপক। তেতরের তাগিদে তখন অবিশ্রান্ত ভাবে ছবি এঁকে চলেছি। গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছি অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-রীতি দ্বারা। নন্দলাল সেই সময়ে রূপকার হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। তাঁর আঁকা ছবি আমার বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে খুলে দিলে যেন এক অভিনব রূপলোকের সিংহদ্বার।

ছবি আঁকা সম্বন্ধে উপদেশ নেবার জন্তে নন্দলালের কাছে গিয়েছি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রায়—তাও বার দু'য়েকের বেশী নয়। তার অনতিপরেই নন্দলাল চ'লে গেলেন শান্তিনিকেতনে। ছবি আঁকা শিখবার জন্তে তাঁর কাছে যাবার সৌভাগ্য আর আমার হয়ে ওঠে নি। তা ছাড়া গত ত্রিশ বছরের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও আমার হয় নি। কিন্তু সেই অল্প বয়সে তাঁর রূপসৃষ্টি আমার মনে যে ছাপ রেখেছিল আজও তা অনপনেয় হয়ে আছে। তাঁর শিল্পকলার প্রতি আমার অনুরাগ অপরিসীম, তাঁকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। আমার মতে তিনি শুধু শীর্ষস্থানীয় শিল্পী নন, কোনো কোনো দিক্ দিয়ে অদ্বিতীয়।

নন্দলালের রূপসৃষ্টির সব চেয়ে বড় কথা এই যে, দেশের মাটির সঙ্গে তার একেবারে নাড়ীর সম্পর্ক। অবনীন্দ্র-অনুগামীদের মধ্যে ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি এঁকে আরো কেউ কেউ প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, কিন্তু একথা জোরগলায় বলা চলে যে, রূপসৃষ্টি মাধ্যমে ভারতের আত্মাকে প্রকাশ করতে আর কেউ এতটা সফলকাম হন নি। নন্দলালের শিল্পকলাকে তাই বলা চলে এদেশের একেবারে নিজস্ব খাঁটি সম্পদ্—দেশের প্রাণসত্তার সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গি-ভাবে বিজড়িত।

পুনরুজ্জীবিত ভারতীয় চিত্রকলার উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের কথা প্রায়শঃই আমরা ভুলে যাই। অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুগামীরা ভারতীয় বিষয়বস্তু অবলম্বনে ছবি এঁকেছেন সত্য, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য্য যে, তাঁদের ছবির কম্পোজিশনে এসে গেছে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। এ জিনিষটি আমাদের দেশে ছিল না, শিল্পশাস্ত্রেও এর উল্লেখ নেই। এ হ'ল পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দান। আমাদের শিল্পকলা স্বাঙ্গীকরণের দ্বারা এ জিনিষকে একেবারে নিজস্ব ক'রে নিয়েছে। এই পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিকে নন্দলাল যে কতটা আত্মসাৎ করেছেন তা সুপরিস্ফুট তাঁর অজস্র চিত্রকর্মে। পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে আঁকা তাঁর ছবিগুলি দেশীয় ঐতিহ্য অনুসারী হলেও এর উপস্থাপনায় (কম্পোজিশনে) যে বিদেশী প্রভাব রয়ে গেছে তা অনেকেরই চোখ এড়িয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় তাঁর বিখ্যাত শিব-পার্ব্বতী ছবিটির কথা, এর কম্পোজিশনে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব কলাবিদের চোখে ধরা না পড়েই পারে না। কিন্তু ছবিটির বহিরঙ্গ পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবিত হলেও এর আত্মা স্বদেশী এবং রূপকল্পনাও নন্দলালের নিজস্ব। দেশ-আত্মার চিরন্তন-স্বরূপ আর কারুর ছবিতে এমন পরিপূর্ণ মহিমায় অভিব্যক্ত হয় নি, এমন কি স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মেও নয়। 'জাত' ভারতীয় শিল্পী কথাটি বর্ত্তমান যুগের কোনো শিল্পীর সম্বন্ধে যদি প্রযোজ্য হয় তা হলে তিনি হচ্ছেন শিল্পাচার্য্য নন্দলাল।

শিল্পী তাঁর সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং ভাব-কল্পনাকে প্রকাশ করেন বর্ণপ্রয়োগে এবং রেখার ছন্দে। ছবিতে রঙের যথাযথ বিন্যাস বড় সহজ কথা নয়। কোন্ রং কোন্ স্থানে, কি মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে, বিভিন্ন বর্ণের blending বা সামঞ্জস্য-বিধান কি ভাবে করতে হবে সে সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বোধশক্তি না থাকলে যথোচিত effect সৃষ্টি হতে পারে না। আর এই বর্ণবিন্যাসজ্ঞান আসে শিল্পীর instinct থেকে। এ জিনিষ চেষ্টা ক'রে শেখা যায় না বা শেখানোও যায় না। যার হয় তার আপনা থেকেই হয়। সাধক-বাউলের কথায়—"যে পারে সে আপনি পারে ফুল ফোটাতে।" নন্দলালের এই instinct সহজাত, বর্ণবোধও তাঁর অনন্যসাধারণ। তাই ছবিতে অবলীলাক্রমে তিনি লাল, সাদা, সবুজ এবং কালো এই চারটে রঙের এমনিতরো সামঞ্জস্য-বিধান করতে পারেন। নন্দলালের ছবিতে বিভিন্ন বর্ণের এই হার্মনি রূপরসিকের চোখে যেন মায়া-অঞ্জন বুলিয়ে দেয়। তাঁর ছবিতে বর্ণবিন্যাসে মাধুর্য্যের সঙ্গে শক্তির যে সমন্বয় হয়েছে তা অন্যত্র দুর্লভ।

রঙের পরে আসে রেখার প্রসঙ্গ। রেখার ছন্দোময় বাঁধনে বন্দী হয়ে রূপ বিকশিত হয়ে ওঠে দৃষ্টিগ্রাহ্য অথচ অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে। নন্দলালের ছবিতে রেখার রূপময় প্রকাশ শুধু তাঁর ছন্দানুভূতি নয়, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তিরও পরিচায়ক। অসংখ্য ছবি এঁকেছেন নন্দলাল, কিন্তু রেখার dead accuracy বা একঘেয়েমি কোথাও দৃষ্টিকে পীড়া দেয় না। বিষয়বস্তুর ন্যায় রেখার ভ্যারাইটি বা বৈচিত্র্যও তাঁর রূপসৃষ্টিকে অনন্যতুল্য বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ক'রে রেখেছে। আর লক্ষণীয় তাঁর রেখার প্রাণশক্তি। সবল তুলির টানে আঁকা রেখাগুলি প্রাণপ্রাচুর্য্যে উচ্ছ্বসিত, দুর্ব্বলতার লেশমাত্রও নেই কোথাও।

সাহিত্য-বিচারের প্রসঙ্গে ম্যাথু আর্নল্ড এক জায়গায় বলেছেন, "without sincerity no vital work in literature is possible."—শিল্পকলার প্রসঙ্গেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। এই আন্তরিকতার অভাব থাকলে, আঙ্গিকের দিক্ দিয়ে নিখুঁত হলেও চিত্রকর্ম প্রাণকে স্পর্শ করে না, তা হয় প্রথাগত পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি মাত্র।

নন্দলালের স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতার অভিব্যক্তি তাঁর রূপসৃষ্টিতে। এই আন্তরিকতা তাঁর আঁকা ছবিগুলোকে এমনি প্রাণবন্ত ক'রে রেখেছে যে, তারা শুধু 'নয়ন-ভোলানো'ই নয়, তাদের আবেদন সরাসরি একেবারে অন্তরের অন্তস্তলে। এই আন্তরিকতার দিক্ দিয়ে নন্দলালের সমকক্ষ আমাদের দেশের শিল্পীদের মধ্যে কমই আছেন। টেম্পারা বা wash ইত্যাদিতে বহু ছবি তিনি এঁকেছেন। যে আঙ্গিকে বা যে পদ্ধতিতে ছবি তিনি আঁকুন না কেন, সকল ক্ষেত্রেই রসিকচিত্তকে অভিভূত করে তাঁর এই সুগভীর আন্তরিকতা এবং যে রস তিনি পরিবেশন করেন তা সহৃদয়-হৃদয়বেদ্য।

শিল্পী নন্দলালের মধ্যে এই আন্তরিকতার সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে আর একটি জিনিষ, সেটি হ'ল তাঁর সংযম এবং মাত্রাবোধ। নন্দলাল যে শুধু আঁকতেই জানেন তেমন নয়, কোথায় থামতে হবে সেই আর্টও তাঁর জানা আছে প্রকৃষ্টরূপে। কোনো রসাত্মক বাক্যের সমাপ্তির পূর্ব্বে আকস্মিকভাবে ছেদ টানলে বাক্যটিকে যেমন হত্যা করা হয় তেমনি রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রেও সমাপ্তির পূর্ব্বে বিরতি যে কি মর্মান্তিকভাবে শোচনীয়, বেশীর ভাগ শিল্পীই সে সম্বন্ধে সচেতন নন। আবার বক্তব্য ইঙ্গিতে এবং ব্যঞ্জনায় শেষ না ক'রে অনাবশ্যক বর্ণনায় অথবা বর্ণপ্রয়োগে ভারাক্রান্ত ক'রে তুললে সাহিত্য এবং রূপসৃষ্টি যে রসোত্তীর্ণ হয় না সে জ্ঞানও অনেকের নেই। আমাদের দেশের শিল্পীদের মধ্যে নন্দলাল এর লক্ষণীয় ব্যতিক্রম। আঁকার সঙ্গে যথাস্থানে থামা যে রীতিমত কঠিন একথা তাঁর অজানা নয়।

শিল্পী নন্দলালের আরো দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখযোগ্য,—তাঁর সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসচেতনতা। রূপকর্ম্ম যা কিছু নন্দলাল করেছেন, তা জেনে করেছেন, কোনো কিছুই accidentally বা দৈবাৎ ঘটে নি।

নন্দলালের ছবিতে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কেও দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। একথা সত্য যে তাঁর 'সতীর দেহত্যাগ', 'লক্ষ্মী', ইত্যাদি ছবি আধ্যাত্মিক এবং পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে আঁকা এবং অধ্যাত্ম অনুভূতির রূপময় প্রকাশ হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কিন্তু নৈতিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য আধ্যাত্মিকতার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তাঁর চিত্রের বাস্তবতা এবং অন্যান্য দিকের কথা ভুলে যাওয়া সমীচীন নয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আধ্যাত্মিকতা চিত্রকলার একটা দিক্ বটে, কিন্তু সেইটেই তার শেষ কথা নয়। আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য বিষয় নিয়ে ছবি আঁকলেই বা মূর্ত্তি গড়লে তা যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা অর্জ্জন করবে না এমন কোনো কথা নেই। কোনার্কের মন্দিরসমূহে নরনারীর মিথুনলীলা সম্পর্কিত যে সব মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে তাদের কোনো আধ্যাত্মিক আবেদন আছে কিনা তা ব্যক্তিবিশেষে প্রশ্নসাপেক্ষ হলেও, রূপসৃষ্টি হিসাবে সেগুলি যে অনবদ্য সে বিষয়ে শিল্পরসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই। আর্টের ক্ষেত্রে কি বলা হ'ল সেইটে আসল কথা নয়, বক্তব্য কতটা এবং কিভাবে প্রকাশ হয়েছে তাই হ'ল আসল জিনিষ। ধরা যাক, পাশাপাশি দুটি ছবি আঁকা হয়েছে। একটিতে চন্দনানুলিপ্ত, পুষ্পভারাক্রান্ত এবং সৌগন্ধামোদিত শিবের মাথায় জল ঢালা হচ্ছে এবং অপরটিতে বুভুক্ষু মানব পূতিগন্ধযুক্ত ডাস্টবিনের আবর্জ্জনার স্তূপ থেকে খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে। যদি রূপসৃষ্টি হিসাবে সার্থক হয়, তা হলে আর্টের বিচারে দুটিকেই তুল্যমূল্য দিতে হবে।

নন্দলাল যে পারিপার্শ্বিক এবং বাস্তব সম্বন্ধে উদাসীন নন, তাঁর প্রমাণ রয়েছে তাঁর আঁকা বহু ছবিতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জীবজন্তুর ছবিগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণ বিচারে যা নিতান্ত তুচ্ছ, শ্রেষ্ঠ রূপকারের হাতে তাই যে রসের উৎস হতে পারে এই সমস্ত ছবি তারই নিদর্শন। নন্দলালের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, কি আধ্যাত্মিক, কি ঐহিক সকল বিষয়বস্তুর রূপায়ণেই তাঁর সৃষ্টি চলে সমান তালে। নন্দলাল সম্বন্ধে বড় কথা এটা নয় যে, ছবির মাধ্যমে তিনি আধ্যাত্মিকতার উদ্গাতা, তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে, তিনি সকল রসের পরিবেশক রূপদক্ষ শিল্পী, সার্থক রূপ- ও রস-স্রষ্টা।

বক্তব্যশেষে তাঁর শিল্পসৃষ্টির সামনে অবনতমস্তকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

—•—

যামিনী রায়ের ছবি

বিষ্ণু দে

ছবির সার্থকতা মূলত তার দ্রষ্টব্যতায়, ছবির পরোক্ষ আলোচনা গৌণ ত বটেই, এমন কি শিল্পীর চিত্রাবলী বেশ কিছু দেখার পরেই তার যৎসামান্য কম-বেশী সার্থকতা। কারণ দৃশ্যবস্তুর তুলনায় কথা একদিকে জটিল আবার অন্যদিকে অনেক বেশী অনির্দিষ্ট, পিচ্ছিল। আমাদের চোখের অভিজ্ঞতা সচরাচর প্রত্যক্ষে স্পষ্ট হয়, কারো কারো অবশ্য তাও হয় না। শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের চিত্রকর্ম এতই চাক্ষুষ শুদ্ধিতে ও প্রত্যক্ষতায় স্পষ্ট এবং অধিকন্তু অক্লান্ত প্রেরণার পর্বে পর্বে এতই বহুধাবিচিত্র যে, কলমের কথায়, বিশেষ ক'রে কয়েক পৃষ্ঠায় তার পরিচয় দেওয়া যায় না। তবু যখন শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী এ বিষয়ে লিখতে বলেন, তখন সে অনুরোধ আমার শিরোধার্য। এবং বিষয়-মর্যাদার অনুরূপ লেখার যোগ্যতা না থাকলেও যামিনী রায়ের শিল্পসাধনার ঐশ্বর্য বিষয়ে লেখার সুযোগ সর্বদাই আনন্দকর।

যামিনী রায়ের চিত্রের চিত্রধর্মনির্দিষ্ট শুদ্ধতাই বোধ হয় তাঁর চিত্রসাধনার সবচেয়ে বড় কথা। আর তাঁর কাজের অবিশ্রাম বৈচিত্র্য বিস্তার। তাঁর প্রতিভার বিস্ময়কর স্ফূর্তি প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধ'রে দৈনিক একনিষ্ঠ কর্মব্রতে প্রকাশ পেয়েছে, ক্রমান্বয়ে এবং কখনো কম কখনো বেশী আততির যন্ত্রণাময় স্বপ্রতিষ্ঠ সৌন্দর্যসৃষ্টিতে।

যামিনীবাবুর জন্ম ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, বোধ হয় ১১ই এপ্রিলে, বাংলার পশ্চিমভাগে আমাদের লৌকিক ও সামন্ত সংস্কৃতির দিক্ থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বাঁকুড়া জেলায় বেলেতোড় গ্রামে। বেলেতোড়ের রায়েদের পূর্বপুরুষেরা যশোরের প্রতাপাদিত্যের আত্মীয়-পরিবার থেকে মল্লভূমিতে চ'লে আসেন এবং প্রথমে বিষ্ণুপুর রাজ-দরবারে আশ্রয়ানুকূল্য পান, তার পরে রাজকীয় ব্যাপারের অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা জঙ্গলের মধ্যে বেলেতোড়ে জাগীর বাছাই করেন।

যামিনীবাবুর পিতা নিশ্চয়ই তাঁর মানসলোকে একটি বড় প্রভাব। সেকালের শিক্ষিত বাবু-সমাজের মধ্যে থেকেও তাঁর জীবনদর্শন অসামান্য ছিল। আমাদের ইংরেজীযুগের আধাসভ্য বা বিকৃত শহরের জীবনযাত্রা এবং শিক্ষাদীক্ষার প্রণালী বিষয়ে তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তার কথা শুনলে আশ্চর্য লাগে। অবশ্য একালের বিজ্ঞানেই বা সমাজ-পরিকল্পনার কর্মকাণ্ডেই এই স্বয়ংসম্পূর্ণ সরল, কিন্তু সংহত, জীবনের তত্ত্ব বোঝা সহজ হয়ে উঠেছে,যেমন হয় তলস্তয়ের ধ্যানধারণা বা গান্ধীজীর এবং বৃহত্তর আধুনিক মননে রবীন্দ্রনাথের। শিক্ষার কথাই ধরা যাক, যামিনী রায়ের পিতা নিজে ইংরেজী ভালোই জানতেন, বাংলা সংস্কৃতির প্রাগ্রসর মানসলোক তাঁর চেনা ছিল, ব্রহ্ম-সঙ্গীত তিনি নিজে করতেন। তবু যে দেশে শতকরা পঁচানব্বইজন গ্রামীণ, সে দুঃস্থ দেশে পরদেশী শাসনের বিকলাঙ্গ শহরে তিনি নড়বড়ে আত্মহত্যার গলিপথ খোঁজেন নি, তিনি মুখে ও কাজেও বলতেন, আমাদের শিক্ষা সার্থকতা পাবে এক হাতে বই আরেক হাতে লাঙলের সমন্বয়ে।

যামিনী রায়ের জীবনদর্শনে তাঁর এই শৈশবের অভিজ্ঞতা ও তাঁর পিতার ভাববীজের অগোচর প্রভাব, তিনি নিজেই বলেন যে, আজ তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করেন; কারণ শৈশবে মানুষ খেলে বেড়ায়, মানুষের যৌবন যায় আশা আকাঙ্ক্ষায় আবেগের অস্থিরতায়, পরিণত বয়সে কর্মক্ষেত্রে ও সাংসারিক প্রতিষ্ঠায় সে ব্যস্ত থাকে, পল্লবিত বার্ধক্যে অর্জিত মানসিক স্বচ্ছতাতেই মানুষ বুঝতে পারে তার মূলের অভিজ্ঞতার প্রাজ্ঞ তাৎপর্য।

যামিনী রায়ের জীবনদর্শনের আলোচনা এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বিষয়টি মনে রাখা দরকার, তাঁর শিল্প-সাধনার প্রসঙ্গেই। যামিনী রায়ের মতো শিল্পীর মানস তাঁর চেতন ও অবচেতনের, নন্দনতত্ত্বের ও জীবনের অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে সামগ্রিক ব্যাপার। কারণ যামিনী রায়ের মতো শিল্পী মহত্ত্ব অর্জন করেছেন শুধুমাত্র হাজার হাজার উৎকৃষ্ট চিত্র রচনার কৃতিত্বেই নয়, যদিও নিছক শিল্প-বিচারে তাঁর মহত্ত্ব দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, তাঁর বিরাট্ চিত্র-সাধনার নিত্যনব এক চিরসদ্য রূপদর্শী মুক্ত চক্ষুর আনন্দকর বিস্ময় ত বড়.কথা বটেই, অধিকন্তু তাঁর প্রতিভার আধিদৈবিক শক্তির ও তাঁর বিকাশের পুরুষার্থ আরেক গভীরতা পেয়েছে তাঁর এই সমগ্র ব্যক্তিগত ঈসথেটিক বা

নন্দনতত্ত্বের অক্লান্ত সন্ধান ও আবিষ্কারে। এইখানেই একজন নিপুণ চিত্রকর এবং একজন স্বকীয় দৃষ্টির ও হাতের কর্তৃত্বে অনন্য মৌলিক আর্টিস্টের মধ্যে তফাৎ।

যামিনী রায়ের অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী চিত্রকর্মে দেখা যায় এক প্রতিভাদৃপ্ত শিল্পীর একক তীব্রতায় একটি ধীর, কিন্তু নিশ্চিত পরিণতির পর্বে পর্বে দীর্ঘ ইতিহাস, যে শিল্পী তাঁর টেকনীক বা কলাকৌশল এবং তাঁর স্বকীয় রূপদ্রষ্টা ব্যক্তিত্বকে কখনও বিছিন্ন করতে চান নি। তাঁর ঈসথেটিক অর্থাৎ নন্দনপ্রেরণা সর্বদাই দাবি করেছে সংহতি ও সংলগ্নতার ধীর একাত্মতা। যে সব দুর্লভ শিল্পীর স্বকীয়তা অনস্বীকার্য, তিনি নিশ্চয়ই সেই স্বল্পসংখ্যকের মধ্যে একজন। তার কারণ তিনি অনেক চিত্রকরের মতো তথাকথিত স্বকীয়তার পিছনে মরীচিকা-সন্ধান করেন নি, কারণ তিনি সমানে ছবি এঁকে গেছেন, প্রয়োগ পরীক্ষা ক'রে গেছেন প্রকৃত নন্দনশিল্পীর বা জাত-আর্টিস্টের ব্যক্তিস্বরূপের গভীর উৎস থেকে। এ রকম জাত-আর্টিস্টদের চৈতন্যে ভর ক'রে থাকে সরল, কিন্তু দুর্নিবার এমন কি নির্মম, এক সৌন্দর্যের দর্শন তার সমস্ত রকম আকার-প্রকার সমেত, যাতে আর এ রকম শিল্পীদের মনে কখনও স্থিতির শান্তি থাকে না। এবং এই সংগ্রাম-সাধনায় যামিনী রায়ের মনে তাঁর চিত্রধর্মের অন্বিষ্ট তাঁর জীবনদর্শনের ছন্দে সম্পূর্ণতা পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রবাসীর সাবেক পাঠকদের কাছে বোধ হয় নিম্নোক্ত উল্লেখ মনোজ্ঞ হবে।

সুধীরবাবুর কাছে এ প্রবন্ধের নির্দেশ পাবার পরে সম্প্রতি একদিন রায় মহাশয়ের বাড়ীতে ১৩১৬ সালের বাঁধানো জীর্ণাবস্থ একটি "প্রবাসী"তে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত "তপোবন" নামে প্রবন্ধটি। দাগদেওয়া অংশের তলায় ও পাশে দেখলুম যামিনীবাবুর মন্তব্য। রবীন্দ্রনাথ সে অংশে বলছেন:

"কেউ না মনে করেন ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা ব'লে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ ক'রে এই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটি মাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালে পালায় আপনাকে চারিদিকে বিস্তীর্ণ ক'রে দেয়।...

"মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা পিতলের মতো ছাঁচে ঢালবার জিনিষ নয়।

"বাজারে কোনো বিশেষকালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানব-সমাজকে একই কারখানায় ঢালাই ক'রে ফ্যাসানের বশবর্তী মূঢ় খরিদ্দারকে খুশী ক'রে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা।

"ছোট পা সৌন্দর্য বা আভিজাত্যের লক্ষণ, এই মনে ক'রে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সঙ্কুচিত ক'রে চীনের মেয়ে ছোট পা পায় নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

"একথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে জিনিষের অভাব নেই তোমারও যদি সেই ঠিক জিনিষটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদলবদল চলতে পারে না, তাহলে তোমাকে সমকক্ষ ভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিগিরি ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোন প্রয়োজনই থাকবে না। তাহলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মানবোধ চ'লে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।"

যামিনীবাবুর হাতে লেখা মন্তব্যটিতে তাঁর সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর আগে চিত্রসাধনার সেই পর্বে তীব্র সঙ্কটের নিশানা মেলে:

"আমার মনের কথা আজ লিখায় পড়লাম।...ঠিক আট মাস পূর্বে এই কথা উপলব্ধি হয়েছে—১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল—।"

তাই রবীন্দ্রনাথের শেষ প্যারাগ্রাফে তিনি আবার দাগ দিয়েছেন:

"এই জন্যেই ঝড় কেবল সঙ্কীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে—আর শান্ত বায়ু-প্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন ক'রে থাকে।"

হতে পারি দীন তবু নহি মোরা হীন—এই বৃহত্তর অনুভূতিই যামিনীবাবুকে তাঁর অসামান্য অঙ্কন-নৈপুণ্যের সাফল্যে সন্তুষ্ট রাখতে পারে নি, পণ্যযুগের ঐশ্বর্যময় ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক অঙ্কনরীতি অর্থাৎ রিয়ালিজমের

ভেদাত্মক যোগফলমার্কা রীতি তাই তাঁকে তৃপ্তি আর দিচ্ছিল না এবং তিনি জীবিকা বিপন্ন ক'রে প্রচণ্ড আকুতিতে এঁকে যাচ্ছিলেন ছবির পরে পরীক্ষার্থী ছবি, খুঁজছিলেন ভিন্ন ভিন্ন রূপাকৃতির গোটা চেহারা, খুঁজছিলেন সেই রঙের ও রেখার সরল শুদ্ধি ও স্বভাবের গভীরোৎসারিত সত্তা, যাতে তাঁর জীবনের বোধ ও শিল্পীর রূপদর্শন একতায় সহজ হয়ে উঠতে পারে। ঐ রকম সময়েই যখন তিনি ভারতের রৌদ্রে এবং ভারতের নববাবু-সমাজের প্রতিধ্বনিত চাহিদায় রিয়ালিজমের অন্তঃসারশূন্যতার বিষয়ে মর্মে মর্মে বিচলিত অথচ তাঁর স্বকীয় মার্গ বিষয়ে তাঁর হাত ও মনের অভ্যাস তখনও নিঃসংশয় নয়, এ রকম সময়েই তাঁর চার-পাঁচ বছরের বালকপুত্রের অপটু, কিন্তু প্রকৃত শিশু-চিত্রকরের সত্য দৃষ্টিতে আঁকা ছবিতে স্বকীয় সমাধানের আভাস পান।

যামিনী রায়ের শিল্পীজীবনে দেখা যায়, বার বার এই যন্ত্রণাময় সন্ধান ও বিশিষ্টরূপ অর্জনের মুখে বা সঙ্গে সঙ্গেই অথবা হয়ত অব্যবহিত পরেই তিনি সমর্থন পান দেশের বা বিদেশের লোকশিল্পী বা কারিগরের বা শিশুদের কাজে। এবং এটা প্রায়ই ঘটে আকস্মিক যোগাযোগের সুযোগে। আর তখন শিল্পী খুশীতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বাইজান্তীয় পর্বে এটা স্পষ্ট দেখেছি।

এখন আমাদের পক্ষে সম্ভব তাঁর পঞ্চাশ বছরের চিত্রসাধনার চাক্ষুষ ইতিহাসের একটা ধারণা করা। এই ধারণাটা করতে পারলে বোঝা যায় যে, সৌন্দর্যের কি নির্দেশে, যার কথা সক্রাটিস ডিওটিমা আলোচনা করেছিলেন, বাংলার এই চিত্রকরকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য সাংসারিক সাফল্যের নিরাপত্তার কূলত্যাগ করিয়ে নামিয়েছিল আপন শিল্পীসত্তার সম্পূরণের দুর্গম সাধনায়। সন্ধানের সেই যুগটি কৃচ্ছ্রসাধনের কষ্টে বস্তুত এক বীরত্বের ইতিহাস। বাধা যে কি কঠিন ছিল আজকের নবীন পাঠকের পক্ষে তা কল্পনাতেই জানা সম্ভব। কারণ যামিনী রায় আজ দেশে ও বিদেশে, সারা বিশ্বে আদৃত শিল্পী। কিন্তু তখন তাঁকে যাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে স্নেহ-ভালবাসা দিয়েছেন, তাঁরাও দ্বিধান্বিত হয়েছেন, তাঁর শিল্পসাধনার নতুন মার্গকে গ্রহণ করতে। যেমন ধরা যাক শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে ছাত্রাবস্থা থেকেই স্নেহের চক্ষে দেখতেন, কিন্তু সে তাঁর ইউরোপীয় মার্গে অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য, তাই অবনীন্দ্রনাথের কথায় ছাত্রাবস্থাতেই যামিনী রায় জোড়াসাঁকোয় গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট আঁকেন। যামিনী রায়ের প্রথম পরীক্ষার যুগের ছবি, অর্থাৎ যখন তিনি ছবিতে তেলরঙের কাজেও রেখার স্পষ্টতা ও রঙের স্বরসমতায় মন দিয়েছেন, সে যুগের ছবি দেখে গগনেন্দ্রনাথও খুশী হয়েছেন ও কিনেছেন। আচার্য যদুনাথ সরকার, যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়—এঁরাও নবীন শিল্পীকে দিয়ে পোর্ট্রেট করিয়েছেন। এবং অধ্যাপক ভাণ্ডারকর ত বহুকাল ধ'রে যামিনী রায়ের ছবির গুণগ্রহণ ক'রে যান। প্রবাসীর শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পারিবারিক ও ব্যক্তিগতভাবে যামিনী রায়কে চিনতেন ও স্নেহ করতেন। কিন্তু দেশের তদানীন্তন শিল্পতত্ত্বের আবহাওয়ায় তিনিও কখনও প্রবাসীতে বা প্রবাসী-প্রকাশিত এলবম্‌মালায় যামিনী রায়ের ছবি ছাপতে পারেন নি।

এই রকম কঠিন বাধার মধ্যে যামিনী রায়ের একাকী অভিযান চলল রঙের ও রেখার বা রূপের শুদ্ধির পথে। রিক্ত নিছক রূপের ধূসর ছবির পর্বে পৌঁছে যামিনী রায় বোধ হয় প্রথম তৃপ্তিলাভ করলেন। কিন্তু জীবন্ত স্বভাব শিল্পস্রষ্টা ত কখনও নিজের সিদ্ধিতে স্থাবর হতে পারেন না, তাই যামিনী রায়ও রূপের এই ব্রহ্মচর্যের সিদ্ধ পর্বে আবদ্ধ হতে পারেন নি। তাঁর অশান্ত অন্বেষা চলল আরেক রকম রঙের ইন্দ্রিয়ময়তার সামাজিকতায় গার্হস্থ্যে; এল রামায়ণের মানসিকতার, কৃষ্ণলীলার আনন্দবেদনার মাতৃরূপের রেখায় আধৃত সমস্বর বর্ণাঢ্যতা। যামিনী রায়ের মতো ক্রমান্বয়ে আত্তত শুদ্ধ অর্থাৎ আধুনিক শিল্পীর উত্তরণ বা ক্রান্তি গন্তব্যের স্থিতিতে নয়, গমনাগমনের আন্দোলনেই তাঁর শিল্পীস্বভাবের স্বরূপ প্রকাশিত। শান্তির প্রসাদ তাঁর ছবির লক্ষ্য, কিন্তু তাঁর নিজের শান্তি কোথায়? তিনি বলেন, সুখাদ্য সুপাচ্য জিনিষ তৈরি করে যে সে ত আগুনের কারবারী, আর যে খাবার খেয়ে আমরা তৃপ্তি পাই, ক্ষুধা শান্তি পায়, সে খাবার ত আগুনে পোড়া, বা ভাজা বা সিদ্ধ হয়ে তবে তৃপ্তিকর, শান্তিদায়ক। এই শিল্পীর জঙ্গমতার জন্যই বোধ হয় যামিনী রায়কে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে তাঁর কোন্ ছবি বা কোন্ পর্ব তাঁর নিজের প্রিয়, তখন তিনি বিড়ম্বিত বোধ করেন, তাঁর মনে হয়, গাছ কি তার কোনও বিশেষ ফলকে পক্ষপাত দেয়? গাছ ত শুধু মাটি কাদা জল রৌদ্রে হাওয়ায় কাজ ক'রে ক'রে ফল ফলায়; আর ফল বাছে, পাড়ে ত অন্যেরা যার যা রুচির প্রয়োজন সেই অনুসারে।

তাই এই খ্যাতির শীর্ষে তিয়াত্তর বছর বয়সেও যামিনী রায় তৃপ্তিহীন। তার মানে এ নয় যে, তিনি তাঁর নিজের কাজ দেখে কখনও খুশী বোধ করেন না বা দর্শকের চোখে মুখে প্রসন্ন বা উত্তেজিত নন্দিতভাব দেখে খুশী

প্রকরণকে পেরিয়ে গিয়ে। প্রকরণ ছাড়া ছবি, ছবি হয় না; স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিশক্তি 'স্কেচ' করে। সেই স্কেচকে ছবির মর্যাদা দিতে হলে শিল্পীকে শিল্প-প্রকরণটুকুর প্রয়োগ করতে হয়। সে প্রয়োগে হয়ত শিল্পী-শাস্ত্রীয় প্রকরণকে উত্তীর্ণ হয়ে যান; তবু সেই বাঁধা-পথেই তাঁর প্রারম্ভিক পদক্ষেপ। কোন কোন ক্ষেত্রে স্কেচ শিল্প-পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অবহিত। তিনি বললেন, কিন্তু যে স্কেচ করার মধ্যে আর্টিস্টের আনন্দ ধরা থাকে তার ধরণ স্বতন্ত্র। ছোট গল্পের মত ছোট ও সামান্য হলেও সেটা সম্পূর্ণ জিনিষ এবং সেটা লিখতে অনেকখানি আর্ট চাই। ছোট হলেই ছোট গল্প হয় না, একটুখানি টান দিয়ে অনেকখানি বলা বা বেশ ক'রে কিছু ফলিয়ে বলার কৌশল শক্ত ব্যাপার। আর্টিস্ট কেন সে শ্রম স্বীকার করতে চায় তার একমাত্র কারণ বলবার এই যে, নানা কারিগরি—তাতে আনন্দ আছে।······সঙ্গীতের চিত্রের কাব্যের সব শিল্পেরই প্রকরণের দিকটায় খাটুনী আছে—ভাব ও রসকে ফাঁদে ধরার ছাঁদে বাঁধার খাটুনী।[৪] তবে কলের মজদুর যেমন শুধু রুজি-রোজগারের জন্য নিরানন্দ খাটুনী খাটে, শিল্পীর খাটুনী তেমন নিরানন্দ নয়। যতনের খাটুনী, যে খাটুনী খাটেন সন্তানের জননী সেই খাটুনী হ'ল শিল্পীর। আর অযতনের খাটুনী, যেমনটি খাটে মাইনে-করা ধাত্রী, তার দ্বারা শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় না। শিল্পী কোন্ ধারা খাটুনী খাটল তার নিশানা রইল তার শিল্পকর্মে। যেখানে খাটুনীর পিছনে যত্ন রইল সেখানে সুন্দরের আসন পাতা হ'ল, আর যেখানে শ্রম শুধুমাত্র অযত্ন-আশ্রিত তা বিশ্রী, উদ্ভট রূপ নিয়ে রসিককে পীড়া দিল। প্রকরণ শুধুমাত্র সৃষ্টি-মাধ্যম; সেই মাধ্যমটিকে অবহেলা করলে সৃষ্টি সম্ভব হয় না। শিল্পীগুরু আপন মতের স্বপক্ষে মহাশিল্পী রোদাঁর মতের উল্লেখ করলেন :

"Craft is only a means but the artist who neglects it will never attain his end···Such an artist would be like a horseman, who forgets to give oats to his horse."

প্রকরণ ব্যতিরেকে কি শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়? রোদাঁ এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, সহজ ক'রে সুন্দর ক'রে লিখতে এবং আঁকতে হলে প্রকরণটুকু পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে হয়। এই আয়ত্তীকরণের প্রচেষ্টা বহু-শ্রম-সিদ্ধ। বহুদিনের অক্লান্ত সাধনায়, বহু বিনিদ্র রাতের তপস্যায় এই প্রকরণকে আয়ত্ত ক'রে একেবারে আপনার ক'রে নেওয়া যায়। এই আপনার ক'রে নেওয়াই হ'ল যথার্থ শিল্পীর কাজ। শিল্পী যখন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এই প্রকরণটিকে একেবারে আয়ত্ত করেন তখন তা শিল্পীর নিজস্ব সৃষ্টি-কৌশল হয়ে পড়ে। তা রসিকজনকে মুগ্ধ করে। প্রখ্যাত বেহালাবাদক মেহুহিনের সুরসৃষ্টির সহজ নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রশংসা করলে তিনি সবিনয়ে বলেছিলেন :

"God alone knows with what difficulty I acquired this ease."

এই যে শিল্পীর সহজ নৈপুণ্য এটি তখনই আসে যখন শিল্প-প্রকরণে শিল্পী পারঙ্গম হয়ে ওঠে। প্রকরণ পারঙ্গম হলে তবেই শিল্পীর সৃষ্টিতে স্বতঃস্ফূর্তির প্রসাদ গুণটি এসে যুক্ত হয়। শিল্পীগুরু বললেন,[৫] প্রকরণে পূর্ণ অধিকার না হলে লেখায়, বলায়, চলায়, কাজে, কর্মে স্বতঃস্ফূর্তি গুণটি আসে না, অথচ এই গুণটি সমস্ত বড় শিল্পের একটা বিশেষ লক্ষণ। এত সহজে কেমন ক'রে আর্টিস্ট যা বলবার যা দেখবার তা প্রকাশ ক'রে গেল এইটেই প্রথম লক্ষ্য করে আমাদের মন বড় শিল্পীর কাজে। শিল্পী কি কঠিন প্রক্রিয়ায় রচনা করেছে তার সন্ধান ত রচনায় রেখে দেয় না। মুছে দিয়ে চ'লে যায় তার হিসাব এবং এই কারণে ঠিক সেই কথাটি নকল করতে চাইলে আমরা ঠকে যাই, ঠেকে যাই, হদিস্ পাই নে কি কি উপায়ে কোন্ পথ ধ'রে গিয়ে শিল্পী তার পরশমণি আবিষ্কার ক'রে নিলে। তাই ত অবনীন্দ্রনাথের পূর্ব-সূরী হিসেবে আমরা তন্ত্রশাস্ত্র রচয়িতাদের মধ্যেও এই মতের পূর্বাভাস পাই। তন্ত্রশাস্ত্রে শিল্পকর্মকে পাখীর এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেমন ক'রে কোন্ পথে পাখী উড়ে গেল তার কোন নিশানাই রইল না মহাশূন্যে। এক এক পাখীর এক এক ধরণের গতি-শৈলী। দু'জনায় বড় একটা মিল পাওয়া যায় না।

৪। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৭৪।
৫। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৭৭।

এরা সবাই একক, অনন্ত। শাস্ত্রীয় প্রকরণে কেমন ক'রে কোন্ পথে আত্মস্থ ক'রে তাকে একেবারে আপনার ক'রে নিল সে তত্ত্বটি শিল্পকর্মে অনুল্লিখিত থেকে যায়। কেমন ক'রে কোন্ পথে প্রতিভার স্পর্শটুকু এসে লাগল শিল্পীর আপন শিল্পপ্রকরণের মাধ্যমে, সে কথাটা অব্যাখ্যাত রয়ে গেল পৃথিবীর সকল শিল্পশাস্ত্রে। সুতরাং বলতে হবে, বললেন৬ শিল্পীগুরু, একজনের technique অন্যের অধিকারে কিছুতেই আসতে পারে না, সে চেষ্টা করাই ভুল। কেননা তাতে ক'রে চেষ্টা কাজের ওপরে আপনার সুস্পষ্ট ছাপ দিয়ে যায় এবং আর্টিস্টের কাজে সেই ব্যর্থ চেষ্টার দুঃখটাই বর্তমান থেকে যায়। তা হ'লে দেখা গেল যে টেক্‌নিক বা প্রকরণ নিয়ে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিল্প-দার্শনিক ক্রোচের মতের একটা মৌল পার্থক্য। অবনীন্দ্রনাথ যখন প্রকরণকে শিল্পের অঙ্গীভূত বলছেন তখন ক্রোচে তাকে শিল্পলোকের অন্ত্যেবাসী বললেন। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, যে, প্রকরণ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে তবেই শিল্পী রসিককে তাঁর শিল্পমাধ্যমে আনন্দ দান করতে পারেন। আনন্দ দেওয়ার এই দুরূহ ভারটুকু শিল্পী বহন করে প্রকরণের সার্থক ব্যবহারে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে এই ভাবটুকু ব্যক্ত ক'রে বললেন, যে-প্রকরণ সম্পূর্ণ কায়দা না হ'লে কেউ আর্টিস্ট হ'তে পারে না সেটি হচ্ছে আকার গড়বার বা বলবার করবার সামান্য প্রকরণ নয়, সেটি হচ্ছে আনন্দের সঙ্গে কর্মসাধনের অসামান্য প্রকরণ। এই অসামান্য প্রকরণটি আয়ত্ত করার পন্থা হ'ল সামান্য প্রকরণের পরিপূর্ণ আয়ত্তীকরণ।

শিল্পীগুরু আমাদের বলেছেন যে শিল্পের আইন-কানুন শিল্প-শিক্ষার্থীর জন্য। শিল্পীর জন্য আইনের অঙ্কুশ-তাড়না নেই। প্রকরণের কৌলীন্য রক্ষার ভার শিক্ষানবীশদের ওপর। যদি আমরা আর্টিস্টদেরও শাস্ত্রীয় প্রকরণের কৌলীন্য রক্ষা করবার নির্দেশ দিই তা হলে শিল্পে যে একঘেয়েমি আসবে তার অবসাদ রসিক-মনকে পীড়া দেবে। শিল্প-সাঙ্কর্য্যের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার মৈত্রের প্রমুখ তৎকালীন মনস্বী ব্যক্তিরা যখন [illegible] তখন তাঁরা এই ভয়াবহ সম্ভাবনাটি সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত ছিলেন না। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রকথিত প্রকরণকে বিশুদ্ধ রাখবার চেষ্টায় এঁদের উদ্যম প্রশংসনীয়। তবু শিল্পীগুরু এঁদের মতকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। তিনি বললেন যে শিল্পীর পথ হ'ল খেয়ালের পথ। খেয়াল মতো যে পথে চলবার কিছু জো নেই সে পথ কখনও কোন শিল্পের পথ হতে পারে না।···সঙ্করত্বের ভয় ক'রে হিন্দুশাস্ত্র মত ভারতশিল্পের নিয়মে শিল্পীদের বদ্ধ করলে সঙ্করত্বের হাত থেকে বাঁচাতে পারি শিল্পকে কিন্তু বাঁধা প্রকরণের ভয়ঙ্করত্ব যখন শিল্পের সর্বাঙ্গে জরা আর মৃত্যুর লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তুলবে তখন শিবেরও অসাধ্য তাকে শুধরে রমণীয় ক'রে তোলা। আর্ট বিষয়ে খেয়ালীর কাছে যেতেই হবে নবযৌবন ভিক্ষা ক'রে। আর্টিস্ট চলে খেয়ালের পাখায়, খুশির হাওয়ায় ভর ক'রে। তাই ত প্রকরণসার সঙ্গীতবিদ্যায় আমার প্রাণের স্পন্দন ফোটে; তাই ত বিশ্বকর্মা শুধুই দেবদেবীর মূর্তি গড়েন নি। সৃষ্টির বিশুদ্ধতা রক্ষা করবার নামে দেবশিল্পী শুধু তুলসী আর চন্দন গাছই সৃষ্টি করলেন না। দেবদারু, নারকেল, পাইন, রডোডেন্‌ড্রন্, আরো কত গাছ সৃষ্টি হ'ল।

এ ও শিল্পীর খেয়ালখুশির তাগিদে হ'ল। শিল্পীর খেয়ালটাই শিল্পজগতে গ্রাহ্য ব'লে ভারতশিল্প হিন্দুশিল্প-প্রকরণের পবিত্রতা রক্ষা করতে উৎসুক হয় নি। তাই ত ভারতশিল্পের বিশুদ্ধতা গ্রীক, মোঘল, চৈনিক এবং নেপালী শিল্পরীতির দ্বারা ক্ষুণ্ণ হ'ল; ভারতশিল্প পুষ্ট হ'ল, প্রাণবান্ হ'ল, বেগবান্ হ'ল অপরের শিল্প প্রকরণকে আত্মস্থ ক'রে। হিন্দুর শিল্পশাস্ত্রেও এই প্রকরণ-সাঙ্কর্য্যের সমর্থন শিল্পীগুরু আবিষ্কার করেছেন: "শিল্পী দেবতাই গড়ুন আর আর বানরই গড়ুন বা দেবতাতে বানরে পাখীতে মানুষে মিলিয়ে খিচুড়িই প্রস্তুত করুন, সে যদি শিল্পী হয়, যদি তার প্রকরণের সঙ্গে তার মনের আনন্দ ভাবের বিশুদ্ধি এ সব জুড়ে দিয়ে থাকে সে, তবে সে বিশুদ্ধ জিনিষই রয়ে গেল।"৮ শিল্পী আপন মনের এই আনন্দটুকুর স্পর্শ যখন শিল্পকর্মে অনুস্যূত ক'রে দেন সার্থক ভাবে তখনই সেই শিল্পকর্ম যথার্থ শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। সমালোচক তাঁর প্রকরণের বিশুদ্ধতা দেখেন না, তাঁর শিল্পবিষয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধেও প্রশ্ন তোলেন না; আনন্দ যখন রসিকচিত্তকে স্পর্শ করে তখনই শিল্পকর্মের সার্থকতা সম্বন্ধে আর দ্বিমত থাকে না। কবি বা শিল্পী এই লোকোত্তর আহ্লাদের সন্ধানী ব'লেই কোন প্রকরণ বা শাস্ত্রীয় বিধানের বন্ধন তাঁদের জন্য নয়। নিষেধের উদ্যত শাসন শিল্পীর প্রকাশকে ব্যাহত করে, তার আনন্দ দেবার শক্তিটুকুকে খর্ব করে। আর্টিস্টের চলা হ'ল আনন্দে চলা—হাতুড়ি পিটে, কলম চালিয়ে, সোনা গালিয়ে, হীরে কেটে, সুর ভেঁজে, তাল ঠুকে শাস্ত্রের অঙ্কুশ খেতে খেতে ইন্দ্রের ঐরাবতের মত চলা নয়। আর্টের প্রকরণ নিরঙ্কুশ প্রকরণ, আর্টের পন্থা নিরঙ্কুশ পন্থা, এইজন্য বলা হয়েছে 'কবয়ো নিরঙ্কুশাঃ।'"৯

৬ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৭৭।
৭ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৮০।
৮ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৮৬-১৮৮।
৯ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৮৮।

বাংলার নারী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

'প্রবাসী'র বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। বাঙ্গালী এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে জীবনের কত দিকে কত বিচিত্র উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার একটি হিসাব-নিকাশ করা সময়োপযোগী সন্দেহ নাই। এই বিচিত্র উন্নতি সাধনে বাংলার নারীসমাজের কৃতিত্ব ও কর্ম্মকুশলতা অসামান্য। বাংলা তথা ভারতের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ইতিহাসে ইহা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

প্রাচীন ভারতে যাহাই থাকুক না কেন, ব্রিটিশ আমলের প্রথমদিকে মাৎস্যন্যায়ের যুগে সমাজে নারীর মর্য্যাদা বড়ই হীন হইয়া পড়ে। রাজা রামমোহন রায় 'সতীদাহ' নিরোধক পুস্তিকায় নারীর আত্মসম্বিৎ ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি উপায় বাৎলাইয়া দেন। ইহার মধ্যে প্রধান দুইটি—শিক্ষা এবং সম্পত্তিতে নারীর অধিকার স্বীকার। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন গত শতাব্দীর ষষ্ঠ সপ্তম দশকে ধর্ম্মে এবং সমাজ-ব্যবহারে নরনারীর সমান অধিকার ঘোষণা করেন। ক্রমে নারীজাতির মধ্যে বিবিধ উপায়ে শিক্ষা প্রসারলাভ করিতে থাকিলে মহিলাদের মধ্যেও এই বোধ জন্মে যে, তাঁহারা পুরুষের মত সমাজের ও দেশের হিতকর্ম্মে সবিশেষ তৎপর হইতে পারেন। সাহিত্যানুশীলনে, পত্রিকা সম্পাদনে এবং সমাজসেবায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থকেই নারীদের মধ্যে কেহ কেহ যত্নবতী হইয়াছিলেন। ঐ সময় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সেবাধর্ম্মের যে বীজ উপ্ত হয় তাহাই বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া উঠিতে দেখি। নারীর কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমে বিস্তৃততর হয়। সাহিত্য-সাধনা, পত্রিকা-সম্পাদনা, শিক্ষা, প্রচার ও সমাজসেবা, সঙ্গীত ও শিল্পানুশীলন, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান, শারীর চর্চ্চা, প্রভৃতি বিভিন্ন দিকেই নারীগণ নিপুণতা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন।

সাহিত্য-সেবা ১

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে নারীদের ভিতরে সাহিত্য-সাধনার সূচনা হয়। তখন নারীজাতির শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজের প্রাচুর্য্য ছিল না। বহু ক্ষেত্রে অন্তঃপুরে শিক্ষালাভ করিয়াই মহিলারা সাহিত্য-সাধনায় মনঃসংযোগ করিতেন। তবে স্কুল-কলেজে শিক্ষিতা নারীরাও ক্রমে সাহিত্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্তঃপুরে এবং স্কুলকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা সাহিত্যিকগণ অনেকে গত শতাব্দীর শেষদিকেই সাহিত্য-সাধনায় অগ্রসর হন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাহিত্যচর্চ্চা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথিতযশা কয়েকজন মহিলার কথা এখানে কালানুক্রমিকভাবে প্রথমে অতি সংক্ষেপে বলিব।

স্বর্ণকুমারী দেবী

প্রথমেই 'সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী' স্বর্ণকুমারী দেবীর (আনুমানিক ১৮৫৫-১৯৩২) নাম উল্লেখ করিতে হয়। রস-সাহিত্য ও মনন-সাহিত্য উভয়বিধ রচনায়ই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শুধু গল্প-উপন্যাস ও কবিতা-নাটকই নহে, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, প্রভৃতির চর্চ্চায়ও তিনি সে যুগে প্রবৃত্ত হন। 'ভারতী' সম্পাদনাকালে

তিনি মনন-সাহিত্য চর্চার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার কয়েকখানি প্রথম শ্রেণীর নাটক, প্রহসন ও উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

'অশ্রুকণা'র কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর (১৮৫৮-১৯২৪) নাম স্বর্ণকুমারী দেবীর পরেই আমাদের মনে উদিত হয়। কাব্য-চর্চাই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার বৈশিষ্ট্য। অর্ঘ্য (১৯০২), স্বদেশিনী (১৯০৬) এবং সিন্ধুগাথা (১৯০৭) তাঁহাকে বিশেষ জনপ্রিয় করিয়া তোলে। পত্রিকা-সম্পাদনায়ও তিনি নৈপুণ্য দেখান।

মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩):—পল্লীবাসিনী হইয়াও সাহিত্যানুশীলনে ঐকান্তভাবে মনোনিবেশ করেন এবং কবিরূপে গত শতাব্দীতেই শিক্ষিত-সমাজে সুপরিচিত হন। বর্ত্তমান শতকেও মানকুমারীর সাহিত্য-চর্চ্চা অব্যাহত ছিল। গল্প, উপন্যাস ও আখ্যায়িকা রচনায়ও তাঁহার নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়।

কামিনী রায় (পূর্ব্বে কামিনী সেন) (১৮৬৪-১৯৩৩):—'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯) লিখিয়া গত শতাব্দীতে কবিখ্যাতি লাভ করেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া উদীয়মানা কবিকে শিক্ষিত-সমাজে পরিচিত করান। মূলতঃ কবি হইলেও, গল্প, জীবনী এবং নিবন্ধাদি সম্পর্কিত পুস্তকাদিও তিনি রচনা করিয়াছিলেন, এই সকল পুস্তকের মধ্যে অধিকাংশই বর্ত্তমান শতকে প্রকাশিত হয়। তিনি আমৃত্যু সাহিত্য-চর্চ্চায় রত ছিলেন।

প্রিয়ম্বদা দেবী

হেমলতা সরকার (১৮৬৮-১৯৪৩):—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। তিনি ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী। 'মিবার-গৌরবকথা', 'নেপালে বঙ্গনারী', 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত', প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁহার 'তিব্বতে তিন বৎসর' ধারাবাহিক ভাবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

কামিনী রায়

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা (১৮৭০-১৯৪৬):—মূলতঃ কবি হইলেও গদ্যপদ্য উভয় রচনায়ই নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। প্রথমে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান শতকেও ইহা অব্যাহত থাকিয়া ক্রমে ভক্তিমূলক কাব্যগ্রন্থাদি রচনায় আত্মপ্রকাশ করে।

প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫):—সুকবি বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রথমে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রধানতঃ কবিতা লিখিয়া তিনি বিদগ্ধ-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বহু কাব্যগ্রন্থ-রচয়িত্রী, তবে গদ্যরচনায়ও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁহার বিস্তর গদ্য-রচনা প্রকাশিত হয়। আজীবন সাহিত্য-সাধনায় রত থাকেন বটে, কিন্তু সমাজ-কল্যাণেও তিনি বরাবর তৎপর ছিলেন।

সাহিত্য-সেবা ২

এখনও পর্য্যন্ত যে সব মহিলা সাহিত্য-সাধনায় লিপ্ত রহিয়াছেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দার সেতু স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন চারিজন প্রবীণা মহিলা: (১) হেমলতা ঠাকুর (১৮৭৩), (২) স্নেহলতা সেন (১৮৭৪), (৩) সরলাবালা সরকার (১৮৭৫) এবং (৪) মৃণালিনীসেন (রাণী মৃণালিনী ১৮৭৯)। হেমলতা ঠাকুর দীর্ঘকাল কাব্য-সাধনায় রত রহিয়াছেন। 'বঙ্গলক্ষ্মী'র সম্পাদিকা এবং সমাজসেবিকা-রূপেও তাঁহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। দ্বিতীয় ও চতুর্থ মহিলা প্রথম জীবনে যথাক্রমে গল্প ও কাব্য-রচনায় মন দেন। উভয়েই পরে ইংরেজী সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০):—ইংরেজী, ফরাসী ও মাতৃভাষা বাংলায় সমান ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মনন-সাহিত্য রচনায় তিনি বেশ নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে 'নারীর উক্তি' (১৯২০), 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ত্রিবেণী-সঙ্গম', 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' এবং সম্পাদিত গ্রন্থ 'বাংলার স্ত্রী-আচার' ও 'পুরাতনী' উল্লেখযোগ্য।

নিরুপমা দেবী (আনুমানিক ১৮৭৮-১৯৫১):—ঔপন্যাসিকারূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার 'দিদি' উপন্যাসখানি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ইহা ছাড়া তিনি 'শ্যামলী', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'বন্ধু', প্রভৃতি আরও বহু উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন।

অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮):—ঔপন্যাসিকারূপে সুনাম অর্জ্জন করেন। 'পোষ্যপুত্র', 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা', 'মা', প্রভৃতি বহু পুস্তকের তিনি রচয়িত্রী।*

নিরুপমা দেবী

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫৭ সনে প্রকাশিত "বঙ্গ সাহিত্যে নারী" পুস্তকে মৃত অধিকাংশ মহিলা-সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বঙ্গের মহিলা কবি' পুস্তকখানিও দ্রষ্টব্য।

সরলাবালা সরকার প্রথমে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে কবিতাদি পরিবেশন করিতে সুরু করেন। গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনায়ই তিনি ক্রমে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কবিতা, ছোটগল্প, জীবনী, স্মৃতিকথা, প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার বহু গ্রন্থ আছে। তাঁহার গদ্য রচনা সহজ, সরল ও প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট।

গল্প-উপন্যাস লেখিকারূপে শান্তা দেবী, (১৩০০ বঙ্গাব্দ) বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস গ্রন্থের মধ্যে উষসী, চিরন্তনী, জীবনদোলা, অলখ ঝোরা, সিঁথির সিঁদুর, বধূবরণ, পথের দেখা উল্লেখযোগ্য। পিতা 'প্রবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীগ্রন্থ (ভারত-মুক্তিসাধক রামানন্দ ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা) তাঁহার মননসাহিত্য রচনার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

অনুরূপা দেবী

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী (১৮৯৪):—জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেনের পৌত্রী। তিনি গৃহে বসিয়াই বিদ্যাভ্যাস করেন। তিনি প্রথমে সাময়িকপত্রে কবিতা লিখিতে সুরু করেন এবং পরে প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাস রচনায় হাত দেন। তাঁহার ছায়াপথ, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ, মনের অগোচরে, রাজযোটক এবং আরাবল্লীর আড়ালে—গ্রন্থনিচয় বিশেষ সমাদৃত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা সীতা দেবী (১৩০২ বঙ্গাব্দ):—গল্প ও উপন্যাস লেখিকারূপে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তদীয় অগ্রজা শান্তা দেবীর সহযোগে লিখিত 'হিন্দুস্থানী উপকথা' ও 'উদ্যানলতা' বাদে তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য: সোনার খাঁচা, রজনীগন্ধা, পরভৃতিকা, মাটির বাসা, ক্ষণিকের অতিথি, ছায়াবীথি, পুণ্যস্মৃতি (রবীন্দ্র স্মরণে), মাতৃঋণ ও জন্মস্বত্ব। তিনি ইংরেজী রচনায়ও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। Garden Creeper ও Knight Errant তাঁহার বিখ্যাত দুইখানি অনুবাদ-পুস্তক।

রাধারাণী দেবী (১৯০৪):—প্রথমে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার নাম ছিল রাধারাণী দত্ত। এই নামে তাঁহার লীলাকমল (১৩৩৬) কবিতা পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। মূল ও ছদ্মনামে তাঁহার বহু কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ও তিনি কবিখ্যাতি অর্জ্জন করেন।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫):—উপন্যাস লেখিকারূপে সর্ব্বত্র পরিচিত। বহু গ্রন্থের রচয়িত্রী। স্নেহের মূল্য, ব্রতচারিণী, সহধর্ম্মিণী, প্রভৃতি তাঁহার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ঘরোয়া কথা সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে তিনি সুনিপুণ।

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯):—প্রথমে বিভিন্ন পত্রিকায় কিশোর-সাহিত্য রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। পরে তিনি গল্প ও উপন্যাস রচনা সুরু করেন। ইঁহার রচনা সুধীসমাজে প্রশংসিত হইয়াছে। তাঁহার জনপ্রিয় উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থগুলির কয়েকখানি এই: বলয়গ্রাস, অগ্নিপরীক্ষা, যোগবিয়োগ, শশীবাবুর সংসার, আর একদিন, স্বনির্ব্বাচিত গল্প, প্রভৃতি।

মৈত্রেয়ী দেবী (১৯১৪):—কাব্যগ্রন্থ: উদিতা, চিত্তছায়া। তাঁহার 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' একখানি সুখপাঠ্য পুস্তক। রাশিয়া ভ্রমণের উপর লিখিত তাঁহার মহাসোভিয়েট গ্রন্থখানি বিশেষ তথ্যপূর্ণ।

প্রতিভা বসু (১৯১৫):—কথা-সাহিত্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকগুলির মধ্যে, মনোলীনা, সেতুবন্ধ, মনের ময়ূর, মাধবীর জন্য, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ডঃ উমা দেবী (রায়, ১৯১৯):—উচ্চশিক্ষিতা এবং ডি. ফিল উপাধি প্রাপ্তা। রসসাহিত্য এবং মননসাহিত্য উভয়বিধ রচনায়ই তিনি পারদর্শিনী। তিনি মূলতঃ কবি। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হয়।

তাঁহার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : সঞ্চারিণী। তাঁহার গল্প এবং সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদিও সাময়িক পত্রিকাসমূহে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাঁহার ডি. ফিল-এর বিষয়—'গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাণী রায় (১৯২০):—কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লেখিকারূপে ইতিমধ্যেই বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকগুলির ভিতর জুপিটর, পুনরাবৃত্তি (গল্প), প্রেম (উপন্যাস), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আশালতা সিংহ, শৈলবালা ঘোষজায়া, রাণী চন্দ এবং ডক্টর রমা চৌধুরীর সাহিত্যিক কৃতির কথাও বলা আবশ্যক। আশালতা সিংহ ঔপন্যাসিকারূপে যশস্বিনী হইয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি এই : সহরের মোহ, সমর্পণ, অন্তর্য্যামী। শৈলবালা ঘোষজায়া এক সময়ে গল্প ও উপন্যাস লেখিকারূপে শিক্ষিতসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার 'শেখ আন্দু' একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রাণী চন্দ আদতে শিল্পী, কিন্তু লেখনী পরিচালনায়ও তিনি নিপুণা। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থ দুইখানি রচনায় তাঁহার সহযোগিতা স্মরণীয়। 'পূর্ণকুম্ভ' শীর্ষক তীর্থভ্রমণ-কাহিনী রচনা করিয়া তিনি 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন। ডক্টর রমা চৌধুরী দর্শন-সাহিত্য রচনায় সুধীমহলের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন।

শিশু ও কিশোর সাহিত্যেও মহিলারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪১) কিশোর মাসিক পত্র 'বালক' (বৈশাখ-চৈত্র ১২৯২) সম্পাদনা করিয়া এ বিষয়ে মহিলাদের মধ্যে প্রথম পথ-প্রদর্শকের গৌরব অর্জ্জন করেন। তাঁহার 'টাক ডুমা ডুম্ ডুম্' (নাটক) এবং 'সাত ভাই চম্পা' (নাটিকা) ১৯১০-১১ সনে প্রকাশিত হয়। কিশোর সাহিত্যে তাঁহার পরই উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও (১৮৮৮)। তিনি প্রথম যুগের কিশোর সাহিত্য রচয়িতা বিখ্যাত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। তাঁহার 'বেহুলা' পুস্তকখানি (লেখিকার আঁকা বারখানি রঙিন চিত্র এবং রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বলিত) বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য সম্পদ্। কিশোর মনোরঞ্জক 'গল্প আর গল্প', 'সোনার ময়ূর', 'আলিভুলির দেশে' এবং নূতন ধরণের সচিত্র শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি যশস্বিনী হইয়াছেন। কিশোর সাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবী প্রথমে বেশ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার, আশা দেবী প্রমুখ আরও কয়েকজন মহিলা কিশোর সাহিত্যে বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

জীবিত এবং সদ্যমৃত মহিলা লেখিকাদের মধ্যে এমন আরও অনেকে আছেন যাঁহারা কি কথা-সাহিত্য, কি মনন-সাহিত্য উভয়বিধ রচনায়ই পুস্তক প্রকাশ করিয়া এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্রে রচনা প্রকাশ দ্বারা বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর রহিয়াছেন। সকলের নামোল্লেখ সম্ভব না হইলেও এখানে আমরা এই কয়েকজনের মাত্র নাম দিতেছি। অনিন্দিতা দেবী, অন্নপূর্ণা গোস্বামী (মৃত), অমিতাকুমারী বসু, আশালতা দেবী, ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী, গিরিবালা দেবী, জ্যোতির্মালা দেবী, তুষার দেবী, দুর্গাবতী ঘোষ, নিস্তারিণী দেবী, পারুল দেবী, পূর্ণশশী দেবী, পুষ্প বসু, প্রতিমা দেবী (ঠাকুর), বাণী গুপ্তা, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য, মিসেস আর. এস্. হোসেন, শান্তিসুধা ঘোষ, মহারাণী সুচারু দেবী, সুরুচিবালা সেনগুপ্তা, হাসিরাশি দেবী, হেমন্তবালা দেবী।*

মৃত ও জীবিত মহিলা লেখিকাগণের কাহারও কাহারও সাহিত্যিক গুণপনা দেশ-বিদেশে বিদগ্ধসমাজে যথেষ্ট স্বীকৃতি পাইয়াছে। মহিলাদের গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থাদি, ইংরেজী ও কোন কোন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া ইহা প্রমাণ করিতেছে। বঙ্গেতর বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়ও ইহার অনেকগুলি অনুবাদিত হইয়া শিক্ষিতজনকে আনন্দদান করিতেছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যকৃতির নিমিত্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে 'দেশিকোত্তমা' বা অনারারী ডি. লিট. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। মৃত ও জীবিত বহু মহিলা সাহিত্যিক উক্ত কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক, ভুবনমোহিনী পদক ও লীলা পুরস্কার লাভের অধিকারিণী হইয়াছেন। বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, শিক্ষাতত্ত্ব প্রভৃতি কোনটাই নারীদের সাহিত্যসাধনা হইতে বাদ যায় নাই।

পত্রিকা সম্পাদনা

গত ষাট বৎসরের মধ্যে সাহিত্যানুশীলনে যেমন, পত্রিকা সম্পাদনায় ও পরিচালনায়ও তেমনি নারীদের কৃতিত্ব

* শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত "সাহিত্য-সেবক-মঞ্জুষা"য় ('মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত) মৃত ও জীবিত লেখিকাগণের মধ্যে অনেকের সাহিত্য কৃতির উল্লেখ আছে। কয়েকজন লেখিকার নিকট হইতে তাঁহাদের জীবন ও সাহিত্য-কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি পাইয়াছি।—লেখক।

আমাদের স্মরণীয়। গত শতাব্দীর শেষপাদেই মহিলাগণ কেহ কেহ পত্রিকা-সম্পাদনে রত হইয়াছিলেন। এই সকল পত্রিকার মধ্যে 'ভারতী' শীর্ষস্থান অধিকার করে। 'ভারতী'র অষ্টম-নবম (১২৯১-৯২) বর্ষ হইতে ১৩৩৩ সালের মধ্যে প্রথমে স্বর্ণকুমারী দেবী, মধ্যে হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী, পুনরায় স্বর্ণকুমারী দেবী এবং শেষে সরলা দেবীচৌধুরাণী কয়েক বৎসর মাত্র বাদে দীর্ঘকাল ইহার সম্পাদনায় লিপ্ত ছিলেন। মহিলা সম্পাদিত হইলেও 'ভারতী' নারী পুরুষ উভয়েরই পঠনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের রচনায় পূর্ণ থাকিত। জাতির মধ্যে আত্মসম্বিৎ এবং স্বাবলম্বন বৃত্তির উন্মেষে সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' (১৩০৬-১৩১৪ সাল) যাহা করিয়াছে তাহা নবজাগরণের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। ভারতীর ন্যায় 'জাহ্নবী'ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র জাতির উন্নতির চিন্তায় রত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠার পর ৩য় বর্ষ (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) হইতে ইহার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। এই ধরণের তৃতীয় পত্রিকা কুমুদিনী মিত্র (পরে বসু) সম্পাদিত 'সুপ্রভাত'। ইহা ১৩১৪,শ্রাবণ মাসে আরব্ধ হইয়া একাদিক্রমে নয় বৎসর চলিয়াছিল। স্বদেশীর যুগের মরশুমে বাঙ্গালীচিত্তে নবজাতীয়তা দৃঢ় মূল করিবার জন্য ইহার আবির্ভাব। জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পত্রিকাদি পরিচালনেও নারীগণ লিপ্ত হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত 'বাঙ্গালার কথা' সম্পাদনে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বাসন্তী দেবী ১৯২১ সনের ২৩শে ডিসেম্বর হইতে কিছুকাল যাবৎ লিপ্ত ছিলেন। এখানি ছিল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। অসহযোগ প্রচেষ্টার প্রায় সমকালে শ্রমিক আন্দোলনও সুরু হয়। শ্রীযুক্তা সন্তোষকুমারী গুপ্তা এই আন্দোলনের মুখপত্রস্বরূপ 'শ্রমিক' নামে একখানি বাংলা ও হিন্দী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ১৩৩১ সালে বাহির করেন।

সরলা দেবী

বিংশ-শতাব্দীর অরুণোদয়ে পুরুষের মত নারীরাও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহার আভাস আমরা পাইলাম। নব্যশিক্ষা প্রাপ্তা নারীগণ নিজ সমাজের উন্নতি চিন্তায় প্রথমে একক ভাবে এবং পরে সভা-সমিতি-সঙ্ঘের মাধ্যমে পত্র-পত্রিকা পরিচালনে অগ্রসর হন।

এই জাতীয় পত্রিকাগুলির মধ্যে বনলতা দেবী সম্পাদিত 'অন্তঃপুর' পত্রিকার নাম আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে হয়। গত শতাব্দীর শেষে ইহা আবির্ভূত হইয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে মাঘ-সংখ্যা হইতে ১৩১২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা পর্য্যন্ত অন্য কয়েকজন মহিলার দ্বারা ইহা সম্পাদিত ও পরিচালিত হয়। এই শ্রেণীর আর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা যথাক্রমে এই: ভারত-মহিলা (১৩১২, ভাদ্র); গৃহলক্ষ্মী (১৩১৪, আশ্বিন); ভারতলক্ষ্মী (১৩১৭, চৈত্র); মাহিষ্য-মহিলা (১৩১৮, বৈশাখ); পরিচারিকা, নবপর্য্যায় (১৩২৩, অগ্রহায়ণ); আন্নেসা (১৩২৮, বৈশাখ); শ্রেয়সী (১৩২৯, বৈশাখ); মাতৃমন্দির (১৩৩০, আষাঢ়); বঙ্গনারী (১৩৩০, আশ্বিন)।

এখন নারীকল্যাণমূলক সভা-সমিতি বা সঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা সমূহের কথায় আসা যাক। এ সম্পর্কে প্রথমে উল্লেখযোগ্য পত্রিকা সরোজনলিনী নারীমঙ্গলসমিতির মুখপত্র "বঙ্গলক্ষ্মী"। ১৩৩২, অগ্রহায়ণ মাস হইতে প্রকাশিত হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ নারীজাতির কল্যাণ সাধনে এবং সংহতি প্রতিষ্ঠায় এই পত্রিকাখানি রত রহিয়াছে। প্রথম হইতে মহিলা সাহিত্যিকগণ ইহার সম্পাদনা করিয়া আসিতেছেন। প্রথম সম্পাদিকা কুমুদিনী বসু (১৩৩২-১৩৩৩), দ্বিতীয় সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লতিকা বসু (বর্ত্তমানে ঘোষ। ১৩৩৪, বৈশাখ-কার্ত্তিক)।

ইহার পর শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী (ঠাকুর) দীর্ঘকাল (১৩৩৪, অগ্রহায়ণ—১৩৫৫, কার্ত্তিক) একক ভাবে বঙ্গলক্ষ্মীর সম্পাদনা করেন। অতঃপর 'বঙ্গলক্ষ্মী'র সম্পাদিকারূপে হেমলতা দেবীর সঙ্গে শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী ও শ্রীযুক্তা আরতি দত্তের উল্লেখ পাই। ১৯৫৪ সনে পত্রিকাখানি ত্রৈমাসিকে পরিণত হয়। এই সন হইতে হেমলতা দেবী বঙ্গলক্ষ্মীর সম্পাদকমণ্ডলীর সভানেত্রী এবং সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা আরতি দত্ত ও শ্রীযুক্তা কণপ্রভা ভাদুড়ী।

'বঙ্গলক্ষ্মী'র পরেই উল্লেখযোগ্য মহিলা পত্রিকা 'জয়শ্রী'। শ্রীযুক্তা লীলাবতী নাগ (পরে লীলা রায়) নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, আত্মশক্তির উন্মেষ, শারীর চর্চা প্রবর্ত্তন এবং সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদির আলোচনা, প্রভৃতি উদ্দেশ্য লইয়া ১৯২৩ সনে দীপালি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩৮ সনের বৈশাখ হইতে দীপালি সঙ্ঘের মুখপত্ররূপে 'জয়শ্রী' মাসিক পত্রিকাখানি শ্রীমতী নাগের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদিকা নাগ মহোদয়া রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ হইলে অন্যান্য মহিলারা ইহার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। মাঝে পত্রিকাখানিকে সরকার কিছুকালের জন্য বন্ধ করিয়া দেন। পত্রিকাখানি এখন পর্য্যন্ত শ্রীমতী লীলা রায়ের সম্পাদনায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

'জয়শ্রী'র পরেই মহিলা সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'মন্দিরা'। এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় ১৩৪৫, বৈশাখ হইতে। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে মহিলাদের ভিতরে রাজনৈতিক চেতনা বিশেষ ভাবে জাগ্রত হয়। বিশিষ্ট রাজনৈতিক মহিলা কর্মীরা কারামুক্ত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই মন্দিরা পরিচালনা সুরু করেন। ইহার প্রথম সম্পাদিকা কমলা চট্টোপাধ্যায়। তৃতীয় বর্ষ হইতে শ্রীযুক্তা কমলা দাশগুপ্তা, স্নেহলতা সেন এবং পুনরায় কমলা দাশগুপ্তা—'মন্দিরা' সম্পাদনা করেন (১৩৫৪, চৈত্র পর্য্যন্ত)।

বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ নারীদের ভিতরেও ক্রমে অনুপ্রবিষ্ট হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় নারীর মানমর্য্যাদা-হানিকর যে-সব সমস্যা দেখা দেয় তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি ক্রমে সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। ইহার মুখপত্রস্বরূপ শ্রীযুক্তা মঞ্জুশ্রী দেবী ১৩৫৫, আশ্বিন হইতে 'ঘরে বাইরে' শীর্ষক পত্রিকা সম্পাদনা আরম্ভ করেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি ইহা তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। পরে ১৩৫৬, জ্যৈষ্ঠ হইতে তিনি 'জয়া' বাহির করেন। সরকার এখানিরও প্রচার রহিত করিয়া দেন।

মেয়েদের সমস্যা আলোচনার জন্য চতুর্থ-দশকে আরও কয়েকখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাহাদের মধ্যে 'মেয়েদের কথা' (১৩৪৮, বৈশাখ); মহিলা (১৩৫৪, আষাঢ়) এবং মহিলা-মহলের (১৩৫৪, আষাঢ়) নাম উল্লেখ করিবার মত।

ভারত-বিভাগের পর পূর্ব্ব-পাকিস্থানের ঢাকা হইতে মহিলাদের কথা আলোচনার নিমিত্ত প্রথম সচিত্র সাপ্তাহিক 'সুলতানা' (১৪ই জানুয়ারী, ১৯৪৯) প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদিকাদ্বয় বেগম সুফিয়া কামাল ও জাহানারা আরজু। এখান হইতে প্রকাশিত মহিলাদের সম্পাদিত মাসিকপত্র 'নওবাহার' (ভাদ্র, ১৩৫৬) মাহ্ফুজা খাতুনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এখানি অদলীয় নিছক সাহিত্য-পত্র।

বিশেষ বিশেষ আলোচনার জন্যও কোন কোন পত্রিকার উদ্ভব হয়। ইহাদের মধ্যে 'আনন্দ সঙ্গীত' পত্রিকা (শ্রাবণ, ১৩২০) এবং 'শিক্ষা'র (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭) নাম উল্লেখ করিতে হয়। প্রথম পত্রিকাখানি কয়েক বৎসর জীবিত থাকিয়া উঠিয়া যায়। 'শিক্ষা' শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা সেনের সম্পাদনায় এখনও শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনায় রত রহিয়াছে। শ্রীমতী মালবিকা দত্তের সম্পাদনায় 'তরুণের স্বপ্ন' ১৯৪৮, ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিনে প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া ফাল্গুন, ১৩৫৬ (১৯৫০) হইতে মাসিকে পরিণত হয়। মহিলা-সম্পাদিত হইলেও সাধারণ বিষয়াদির আলোচনায় এখানি ব্যাপৃত রহিয়াছে। সুবিখ্যাত কিশোর পত্রিকা 'মুকুল' সম্পাদনা করিয়া মহিলারা বিভিন্ন সময়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

বস্তুতঃ স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং সংবিধানে নরনারীর সমান অধিকার সাব্যস্ত হইবার পর শুধুমাত্র মহিলাদের সমস্যা লইয়া আলোচনার প্রয়োজন আর তেমন অনুভূত হইতেছে না। যে-সব পত্রিকা প্রথমে মহিলাদের সমস্যা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং এখনও যে-সমুদয় জীবিত আছে তাহার অধিকাংশই সাধারণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়াদির আলোচনায় ব্যাপৃত। এখন সাধারণ মাসিক পত্রিকা-গুলিতে শুধু গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতাই নয়, জটিল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধাদিও লেখিকাগণ পরিবেশন করিতেছেন। আমাদের আলোচনা-কালের মধ্যে বহু পত্রিকা আবির্ভূত হইয়া অল্পকালের

ভিতরেই উঠিয়া গিয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পায়ু কোন কোন পত্রিকার আমরা উল্লেখ করিয়াছি বটে, কিন্তু বহু পত্র-পত্রিকার উল্লেখ মাত্র করাও সম্ভব নয়।*

সঙ্গীত-সাধনা

বাংলা দেশে গত শতাব্দীর শেষ পাদেও ভদ্রগৃহস্থ ঘরে নারীদের সঙ্গীতচর্চ্চার প্রতি পুরুষের বিরূপ মনোভাব ছিল। কিন্তু পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে হিন্দু সঙ্গীত ও আধুনিক সঙ্গীতের অবিরাম চর্চ্চা এবং তাহাতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মহিলাদের সার্থক যোগদানের ফলে উক্ত বিরূপ মনোভাব ধীরে ধীরে দূরীভূত হয়। এদিক্‌ দিয়া বাংলার নব্য সংস্কৃতির ইতিহাসে কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের কৃতিত্ব সর্ব্বদা স্মরণীয়।

এ প্রসঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারভুক্ত তিনজন মহিলার নাম আমাদের মনে উদিত হয়। তাঁহারা যথাক্রমে, প্রতিভা ঠাকুর (পরে প্রতিভা চৌধুরী), সরলা ঘোষাল (পরে সরলা দেবী চৌধুরাণী) এবং ইন্দিরা ঠাকুর (পরে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী)। ইঁহারা প্রত্যেকেই গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জন্মগ্রহণ করেন এবং শেষ দুই দশকেই সঙ্গীতানুশীলনের জন্য বেশ যশস্বিনী হন। প্রতিভা ঠাকুর ইউরোপীয় সঙ্গীতে, সরলা ঘোষাল দেশীয় সঙ্গীতে এবং ইন্দিরা ঠাকুর ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় সঙ্গীতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। প্রথমোক্ত দুইজন মহিলার গান ও স্বরলিপি ঐ সময়েই কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে।

বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের প্রথম দুই কলির স্বরলিপি করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁহারই উপদেশে সরলা দেবী অবশিষ্ট অংশের স্বরলিপি সংযোজন করিয়া 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। সরলা দেবীর সঙ্গীতের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। তিনি রবীন্দ্রনাথকেও বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীত রচনায় নানা স্থল হইতে আহৃত তাঁহার সঙ্গীতগুলি উপহার দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি 'জীবনের ঝরাপাতা'য় (৩০-৩৪ পৃষ্ঠা) লিখিয়া গিয়াছেন। সরলা দেবীর "শত গান" (১৯০০), তাঁহার একনিষ্ঠ ও অনন্যমনা সঙ্গীতচর্চ্চার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। 'জীবনের ঝরাপাতা'য় দীর্ঘকালব্যাপী সঙ্গীত সাধনা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। মাতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দ্দেশে হাফেজের কয়েকটি লাইনে সুর বসাইয়া সরলা তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন এবং তিনি পরমতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে হাজার টাকা মূল্যের গহনা দিয়া পুরস্কৃত করেন। বিবাহিত জীবনেও সরলা দেবী সঙ্গীতচর্চ্চা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

প্রতিভা ঠাকুর (প্রতিভা চৌধুরী):—সরলা দেবীর বয়োজ্যেষ্ঠা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা। একটু আগে বলিয়াছি, তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীত চর্চ্চায় পারদর্শিনী হন। দেশীয় সঙ্গীতের মধ্যে হিন্দী সঙ্গীতেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল অনন্যতুল্য। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বাংলা সঙ্গীতের সুরকাররূপেও তিনি বিশেষ নৈপুণ্য দেখান। তদ্‌রচিত স্বরলিপি 'ভারতী ও বালক' এবং 'ভারতী'তে বিস্তর প্রকাশিত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হইবার পরও তিনি সঙ্গীতচর্চ্চা অব্যাহত রাখেন। তিনি বাংলার তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সঙ্গীতশিক্ষা প্রসারের জন্য "সঙ্গীত-সঙ্ঘ" স্থাপন করেন। এই সঙ্গীত-সঙ্ঘেরই মুখপত্র 'আনন্দ-সঙ্গীত' পত্রিকা। তিনি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সহযোগে ইহার সম্পাদনা করিতে থাকেন।

প্রতিভা দেবীর সাক্ষাৎ পরিচালনায় সঙ্গীত-সঙ্ঘ বহু বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় সমাজে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষাদানে তৎপর ছিল। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের যেসব হিন্দুস্থানী ও অন্য সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা এবং অন্যান্য সঙ্গীত ও স্বরলিপি সঙ্ঘের মুখপত্রখানিতে প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সঙ্গীত-সঙ্ঘ এক সময়ে বেথুন কলেজের সঙ্গীতশিক্ষার ভারও গ্রহণ করে। প্রতিভা দেবীর মৃত্যুর পরও (১৯২২) সঙ্ঘ ও পত্রিকাখানি কিছুকাল জীবিত ছিল।

আনন্দ-সঙ্গীত পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদিকারূপে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর নাম এইমাত্র আমরা পাইলাম। তিনি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। দীর্ঘজীবনে তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারক ও বাহকরূপে বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি শান্তিনিকেতন সঙ্গীত-ভবনের অন্যতম সংগঠিকা। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বভারতী স্বরলিপি-সমিতির সদস্যারূপে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তদীয় রবীন্দ্রস্মৃতি পুস্তক পাঠে আধুনিক যুগে

---

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সাময়িক পত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী" পুস্তকে মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

বাংলার সঙ্গীত চর্চ্চা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। ইন্দিরা দেবী জীবনের সায়াহ্ন পর্য্যন্ত বিবিধভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতের বহু অজ্ঞাত এবং স্বল্পজ্ঞাত সুর পরিবেশনেও তিনি বরাবর লিপ্ত ছিলেন। সরলা দেবীর মত তিনিও রবীন্দ্রনাথের বহু গানের রসদ জোগান। 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম' পুস্তকে ইঁহার কিছু কিছু পরিচয় মিলিবে। শান্তিনিকেতনে এবং কলিকাতায় বর্ত্তমানকালে রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং অন্যবিধ সঙ্গীতাদি চর্চ্চারও যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা এখনও এই ধরণের সঙ্গীতচর্চ্চায় নিজদিগকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন তাঁহাদের কথা ইন্দিরা দেবী 'রবীন্দ্রস্মৃতি' পুস্তকে (২৫ পৃষ্ঠায়) এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :

"ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি পরিবারের সঙ্গে রবিকাকার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। যেমন চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবার, স্যর্ কে. জি. গুপ্তের পরিবার, ডাক্তার নীলরতন সরকারের পরিবার, ইত্যাদি। এঁদের সকলেরই ঘরে সুগায়িকা ছিলেন, যাঁরা রবিকাকার কাছেই তাঁর গান শেখবার সুযোগ পেয়েছেন। যেমন ডাক্তার নীলরতনের বড় কন্যা নলিনী, তাঁর অপর এক কন্যা অরুন্ধতী, সুকুমার রায়ের স্ত্রী সুপ্রভা, কনক দাস, সাহানা বসু। ডাক্তার নীলরতন সরকারের মেয়েরা এখনো পর্য্যন্ত দেশী-বিলিতী সঙ্গীতের একসঙ্গে চর্চ্চা রেখেছেন।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কনিষ্ঠা ভগ্নী অমলা দাশ রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও অন্যান্য সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়া যশস্বিনী হন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন কলেজে সঙ্গীত শিক্ষাদানের যখন নূতন ব্যবস্থা হয় তখন ইঁহার নিমিত্ত অমলা দাশ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর এই পদে নিযুক্ত থাকিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার স্ব-রচিত সঙ্গীতও ছিল অনেক। তিনি একাধারে সঙ্গীত-রচয়িত্রী ও সুরকার। বাংলাদেশে সঙ্গীতচর্চ্চার নবতন আয়োজনের কথা আলোচনাকালে তাঁহার নামও আমাদের অবশ্যই স্মরণ করিতে হইবে। ইন্দিরা দেবী অমলা দাশের সঙ্গীত-কৃতি সম্বন্ধে এইরূপ সশ্রদ্ধ উক্তি করিয়াছেন :

"বাইরের মেয়েদের ভিতর গায়িকা হিসেবে অমলা দাশকে আগে মনে পড়ে। এখনও গ্রামোফোনে তাঁর সুন্দর চড়া গলায় 'এ কি আকুলতা ভুবনে' এবং 'চিরসখা হে' শুনে লোকে শিক্ষা ও আনন্দ দুইই পায়। তাঁর গাওয়া একটি হিন্দী গান 'সৈঁয়া জাঁউ জাঁউ' ভেঙে 'পিপাসা হায় নাই মিটিল'* গানটি রচিত। বঙ্কিমবাবুর মৃণালিনীর 'যমুনারি জলে মোরে' এবং 'মথুরাবাসিনা মধুর-হাসিনী' গান দুটি তিনি খুব গাইতেন। কলকাতার কোন এক কংগ্রেসে অমলা দশ হাজার লোকের সভায় একলা 'বন্দেমাতরম্' গানটি বিনা মাইকে শুনিয়েছিলেন। তাঁর গলা যেমন মিষ্টি তেমনি সতেজ ছিল।" (রবীন্দ্রস্মৃতি, ২৪-২৫ পৃঃ।)

সঙ্গীতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন শেফালিকা শেঠের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার স্বরলিপি-পুস্তক ইঁহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। শ্রীযুক্তা বিজন ঘোষ দস্তিদার সুরকাররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ; তদীয় ভজন বিষয়ক পুস্তক ও স্বরলিপি প্রভৃতি সঙ্গীতশিল্পে বিশিষ্ট দান।

বাংলার নিজস্ব পদাবলী পালা কীর্ত্তনে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন কোন মহিলার কীর্ত্তন আমরা কৈশোরে শুনিয়াছি। এই পদাবলী কীর্ত্তন পুনরুজ্জীবনে নব্যশিক্ষিতা সুরুচিসম্পন্না মহিলারাও আধুনিককালে সবিশেষ যত্নবতী হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কন্যা অপর্ণা দেবীর নাম। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্তা শোভনা চৌধুরী পালা গানে ও পদাবলী গানে (কীর্ত্তন গান ও লীলা গান) একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এ যুগে নারী-সমাজে সাধারণ ভাবে সঙ্গীতচর্চ্চার বিবিধ রকম আয়োজন হইয়াছে। স্বতন্ত্র সঙ্গীত বিদ্যালয়-সমূহে ছাত্র-ছাত্রী নির্ব্বিশেষে সকলেই শিক্ষালাভ করিতেছে। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে ছাত্রীদের সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতাস্থ সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য একাডেমীতে যে সঙ্গীতবিদ্যার উদ্যোগ চলিতেছে তাহাতেও নারীগণ অধিক সংখ্যায় যোগ দিতেছেন।

শিল্প-অনুশীলন

লোকসঙ্গীতের মত বাংলার লোকশিল্পের কথাও আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর জানা। লোকশিল্প বলিতে আগেকার রীতির গ্রামীণ শিল্পের কথাই আমরা বুঝি। শিল্পের কারু ও চারু এই দুই রূপই লোকশিল্পে বিধৃত। দৃষ্টান্ত দিয়া কথা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। আধুনিক যুগে যেমন সঙ্গীতচর্চ্চা নবরূপ লাভ করিয়াছে, শিল্প অনুশীলনেও তেমনি নূতন যুগের সম্ভাবনা লক্ষ্য করি।

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ এই নবযুগের প্রবর্ত্তক। নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ শিষ্য-পরম্পরায় চিত্রশিল্পের এই নবযুগের সাধনা, রূপে রসে মাধুর্য্যে, গভীরতায় ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে। নারীদের মধ্যেও কেহ কেহ তাঁহাদের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান শতকের প্রথম পাদেই শিল্পকলার চর্চ্চায় কতকটা মনঃসংযোগ করিয়াছেন। তবে মহিলা শিল্পীদের মধ্যে চিত্রশিল্পে যিনি দেশ-বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তিনি কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত এবং নন্দলাল-অসিতকুমার পরিপোষিত নব্যধারার আদৌ অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার কথাই এখানে একটু বিশেষ করিয়া বলি।

এই মহিলা শিল্পীর নাম সুনয়নী দেবী। তিনি শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা সহোদরা। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথের সহোদরা হইয়াও তিনি কেমন করিয়া চিত্রশিল্পে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সেকালের হিন্দু প্রথা অনুসারে দ্বাদশ বর্ষ বয়সেই তাঁহার বিবাহ হয় এবং তিনি শ্বশুরালয়ে চলিয়া যান। শ্বশুর-গৃহে নিভৃত-অন্দরে বসিয়া তিনি ছবির স্বপ্ন দেখিতেন। তাঁহার চিত্র-বিষয়ক ধ্যানধারণায়—যাহাকে এক কথায় 'অভিভাব' বলা যায়—শুধু মশগুল থাকিতেন না, তিনি নিজেকে চিত্রাদি অঙ্কনেও নিয়োজিত করিতেন। মাসিকপত্রের বহু ছবি তিনি নকল করিতে চেষ্টা করিতেন। সেকালের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী রবি বর্ম্মার চিত্র তাঁহাকে আনন্দ দান করিত। কিন্তু তিনি কখনও কোন শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই; এমন কি অগ্রজদের নিকট হইতেও চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে কোন উপদেশ গ্রহণের সুযোগও তাঁহার ছিল না। তবে তাঁহার ছবি আঁকার চেষ্টা ও ছবির স্বপ্নদেখা নিয়ত চলিয়াছিল। ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি একেবারে রং ও তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে সুরু করেন।

বাংলার লোকশিল্পের যে বিশিষ্ট রূপটি স্মরণাতীতকাল হইতে পটে বিধৃত রহিয়াছে তাহা হইতেই সুনয়নী দেবী বিশেষ অনুপ্রেরণা পাইয়াছেন। তাঁহার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি পট-শিল্পানুসারী। তাঁহার চিত্রের বিষয়বস্তু অধিকাংশই পটে বিধৃত—হিন্দু দেবদেবী, রাধা আর কৃষ্ণ, ভগবতী, অর্দ্ধনারীশ্বর প্রভৃতি। পট-অনুসারী হইয়াও এই সকল চিত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া বাংলার সাধারণ মানুষ, গৃহস্থ-বধূ, প্রভৃতির চিত্রও তাঁহার তুলিকায় সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্রশিল্প চর্চ্চার বিষয় জানিতেন, কিন্তু মুখে কখনও কিছু বলিতেন না। অন্যত্র বলিতেন—সুনয়নীর চিত্র নিজগুণেই সুধীসমাজে সমাদর লাভ করিবে। সুনয়নী দেবী অন্তঃপুরে বসিয়াই ছবি আঁকিতেন। তাঁহার চিত্র-সত্তার বাহিরের লোকে কেহ একটা জানিত না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডক্টর স্টেলা ক্রামরিশই সর্ব্বপ্রথম 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় (জুলাই, ১৯২২) তাঁহার চিত্রাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন।

সুনয়নী দেবীর চিত্রাবলীর কিছু কিছু দেশ-বিদেশের আর্ট গ্যালারিতে বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে। মাদ্রাজের আর্ট গ্যালারি, ত্রিবাঙ্কুর, লক্ষ্ণৌ এবং আরও বহুস্থলের শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁহার চিত্র নিয়ত দর্শকবৃন্দকে আনন্দদান করিতেছে।

সুনয়নী দেবীর সমকালে, বিশেষত বর্ত্তমান শতকের প্রথম দিকে, আরও কোন কোন মহিলা চিত্র-শিল্পের অনুশীলনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও-এর নাম। প্রথম জীবনে তিনি শিল্পদক্ষ পিতার নিকটে চিত্র-শিল্প অনুশীলনে ব্যাপৃত হন। নিজ 'বেহুলা' পুস্তকের চিত্রাবলী বাদে তিনি আরও অনেক চিত্র অঙ্কন করিয়া শিল্পরসিকদের নিকট হইতে প্রশংসালাভ করেন। বহু শিল্পপ্রদর্শনীতে

তাঁহার চিত্রাবলী প্রদর্শিত হয় এবং তিনি প্রশংসাপত্র ও পদকাদি লাভ করেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে তাঁহার একাধিক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

চিত্র-শিল্পী প্রতিমা দেবীর (রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ) নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। মাতুল অবনীন্দ্রনাথ এবং জাপানী শিল্পীদের নিকট তাঁহার চিত্রশিল্পে হাতেখড়ি হয়। প্রতিমা দেবীর কয়েকখানি চিত্র 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। তাঁহার ন্যায় আরও কোন কোন মহিলা গৃহে বসিয়াই শিল্পচর্চ্চায় মন দিয়াছিলেন। তাঁহাদেরও কোন কোন চিত্র সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা শান্তা দেবীর একাধিক চিত্রের প্রতিলিপি 'প্রবাসী'তে বাহির হইয়াছিল।

বিশ্বভারতী কলাভবন সর্ব্বপ্রথম মহিলাদের শিল্পানুশীলনের একটি প্রকৃষ্ট কেন্দ্র হইয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর কন্যা শ্রীমতী গৌরী দেবী, শ্রীযুক্তা রাণী চন্দ, প্রভৃতি কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। গৌরী দেবী চিত্রশিল্পে খ্যাতিলাভ করিলেও বর্ত্তমানে কারুশিল্প চর্চ্চায়ই নিজেকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন। সূচীশিল্প এবং আলপনা শিল্পে তাঁহার জুড়ি মেলা ভার। শ্রীযুক্তা রাণী চন্দ চিত্রশিক্ষা সমাপনান্তে কয়েক বৎসর যাবৎ নিষ্ঠার সহিত শিল্পানুশীলনে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট চিত্রগুলি লইয়া একখানি 'এল্‌বাম'ও মুদ্রিত হয়। বিশ্বভারতী কলাভবনে শিক্ষাপ্রাপ্তা আরও দুই-একজন মহিলার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্তা চিত্রনিভা চৌধুরীর চিত্রাবলী প্রশংসিত হইয়াছে। তাঁহার চিত্রসম্ভার লইয়া একটি প্রদর্শনীও গত বৎসর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী দেবী কলাভবনের প্রখ্যাতা ছাত্রী। তিনি গুজরাটী মহিলা, তবে বিবাহিত জীবনে তিনি বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছেন। বিশ্বভারতী কলাভবনের মত কলিকাতা কলা মহাবিদ্যালয়েও বর্ত্তমানে নারীগণ চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। এখনও বহু মহিলা অন্তঃপুরে বসিয়াই চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা করিতেছেন, সম-সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁহাদের চিত্রাদির প্রতিলিপি প্রকাশিত হওয়ায় ইহার প্রমাণ মিলিতেছে। বহু নারী চিত্রশিল্পীর শিল্পচর্চ্চার কাহিনীও কোন কোন দৈনিকে প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি। শ্রীযুক্তা সরমা ভৌমিক, শীলা অডেন, আমিনা আহমেদ, হৈমন্তী সেন, কমলা রায়চৌধুরী, শাহু মজুমদার, নমিতা সাহা প্রমুখ কয়েকজন মহিলা চিত্রশিল্পচর্চ্চায় রত থাকিয়া বর্ত্তমানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।*

শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ

শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণে নারীর কৃতিত্বের কথা বলিতে হইলে প্রথমেই ভগিনী নিবেদিতার কথা আমাদের মনে পড়ে। ১৯০২ সনে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিকে পুনর্গঠিত করেন। এখানে বালিকা, বিধবা এবং গৃহিণীরা শিক্ষালাভ করিতে আসিতেন। সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, প্রভৃতি বিষয় বাদে নিবেদিতা সকল ছাত্রীকেই চিত্রবিদ্যা, পুতুল, খেলনা, ছাঁচ তৈরী, সেলাইয়ের কাজ শিক্ষা দিতেন। উদ্দেশ্য ছিল,—শিক্ষাকে সমাজ-কল্যাণের উপযোগী করিয়া তোলা। তাঁহার এই আদর্শ নিম্নের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সত্বর রূপ পরিগ্রহ করে।

মহিলা বিধবা আশ্রম : স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ১৯০৬ সনে কলিকাতায় মহিলা বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব্বেকার সখিসমিতি এবং তদন্তর্বর্ত্তী মহিলা শিল্প-মেলা বা প্রদর্শনীর আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি এই আশ্রমটি খুলেন। অনাথা বাল-বিধবা এবং বয়স্কা বিধবাদেরও আশ্রয়স্থল হইল এই বিধবা আশ্রম। এখানে তাহাদের সাধারণ এবং কেজো শিক্ষার আয়োজন হইল। বাহির হইতেও বয়স্কা নারীরা দিনের বেলায় এখানে পড়িতে আসিতেন। সুতা-কাটা, তাঁতবোনা, মাটির পুতুল তৈরি করা, সেলাইয়ের কাজ, মোজা তৈরি, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, নার্সিং, প্রভৃতি কেজো শিক্ষা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিধবা আশ্রমের মূল উদ্দেশ্য—বিধবাদের ও বহিরাগত নারীদের সাধারণ এবং কেজো শিক্ষাদানান্তে উক্ত উভয়বিধ শিক্ষা দিবার উপযুক্ত করিয়া তোলা। বিধবা আশ্রমে আবাসিক এবং বহিরাগত ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। প্রথমাবধি বহু গুণী ও মানী মহিলা বিধবা আশ্রমের অধ্যক্ষ-সভার সদস্যা ছিলেন, যেমন মহারাণী সুনীতি দেবী, মহারাণী সুচারু দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, মিসেস এস. পি. সিংহ (পরে লেডী-সিংহ) প্রভৃতি। তবে হিরণ্ময়ী দেবী আশ্রমটির সম্পাদিকারূপে ইহার জন্য আমৃত্যু মনেপ্রাণে খাটিয়া গিয়াছেন। ১৯২৫ সনে তাঁহার পরলোকগমনের পর বিধবা আশ্রমের নামকরণ করা হয় 'হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রম'। স্বর্ণকুমারী দেবী সভানেত্রীরূপে আরও সাত বৎসর এই আশ্রমটিকে পালন-

* এই অধ্যায়ের তথ্য সংগ্রহে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

পোষণ করিয়াছিলেন। হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রম, হিরণ্ময়ী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ডক্টর কল্যাণী মল্লিকের সুষ্ঠু পরিচালনায় এখনও সমাজ-কল্যাণে রত রহিয়াছে।

অবলা বসু

ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল : স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণী (পূর্ব্বেই বিবাহিতা ও পঞ্জাব প্রবাসিনী) ১৯১০ সনে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনকালে একটি নিখিলভারত মহিলা-সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনেই 'ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলে'র প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। তখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নারীদের অল্প বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষায় অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। সরলা দেবীর প্রস্তাবে মহামণ্ডলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, বিভিন্ন প্রদেশে শাখা-মণ্ডল স্থাপন করিয়া বিবিধ উপায়ে অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষা ও জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করা। পঞ্জাবে ও বাংলায় শাখা-মণ্ডল অল্পকালের মধ্যে স্থাপিত হইয়া উক্ত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করে। বঙ্গীয় শাখার প্রথমাবধি সম্পাদিকা ছিলেন কৃষ্ণভাবিনী দাস। তিনি চৌদ্দ বৎসর স্বামী অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে বিলাতে অবস্থান করিয়া তথাকার নারীদের সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক বৎসরের মধ্যে স্বামী ও একমাত্র কন্যা হারাইয়া কৃষ্ণভাবিনী মহামণ্ডলের কার্য্যে মনপ্রাণ সঁপিয়া দেন। তিনি প্রথমে একাই কলিকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলে খালি পায়ে থান ধুতি মাত্র পরিয়া বাড়ী বাড়ী গমন করিতেন এবং অন্তঃপুরিকাদের সাধারণ ও কেজো শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ক্রমে তাঁহার কয়েকজন মহিলা সহকর্ম্মিণীও জুটেন। তাঁহারাও এইরূপ কার্য্যে নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সনে কৃষ্ণভাবিনীর মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলে সুকবি প্রিয়ম্বদা দেবী মহামণ্ডলের সম্পাদিকা পদ গ্রহণ করেন। তিনিও বহুবৎসর মহামণ্ডলের আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য পরিচালনা করেন। ১৯২৮ সনে সরলা দেবী চৌধুরাণী (তখন কলিকাতাবাসিনী) মহামণ্ডলের কার্য্যভার স্বহস্তে লইলেন। তখন কিন্তু তিনি ইহার প্রয়োজনীয়তা আর অনুভব করিলেন না। তিনি বয়স্কা নারীদের প্রবেশিকার মান পর্য্যন্ত শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় খুলিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল বাংলাদেশে দীর্ঘ আঠার বৎসর অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া উঠিয়া যায়।

নারীশিক্ষা সমিতি : আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণী লেডি অবলা বসু ১৯১৯ সনে কলিকাতায় নারীশিক্ষা সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য—বালবিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা অসহায়া নারীদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কেজো শিক্ষা দানের আয়োজন করা। নারীশিক্ষা সমিতি এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া দুইটি শাখা শিক্ষায়তন খুলেন—(১) বিদ্যাসাগর বাণীভবন, (২) মহিলা শিল্পভবন। প্রথম হইতেই সমিতি কলিকাতায় কয়েকটি প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনায় উদ্যোগী হয়। বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন আবাসিক বিদ্যালয়। এখানে প্রথমে প্রাথমিক এবং পরে ষষ্ঠ শ্রেণীর মান পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। বাণীভবনে কেজো শিক্ষাও ছাত্রী-দের দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সাধারণ শিক্ষার উপরই জোর দেওয়ার কথা থাকে। এখান হইতে শিক্ষাপ্রাপ্তা বহু ছাত্রী কখনও শিক্ষণ-বিদ্যা আয়ত্তের পর, কখনও বা সরাসরি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত হইতেন। বলা বাহুল্য এই সকল বিদ্যালয়ের অধিকাংশই হয় নারীশিক্ষা সমিতির সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে অথবা সমিতির উপদেশে স্থানীয় ব্যক্তিদের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইত। গত মহাযুদ্ধের সময় বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন ঝাড়গ্রাম-রাজের প্রদত্ত ঝাড়গ্রামস্থ জমিতে উঠিয়া যায়। এখানে থাকিয়া বাণীভবনের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষালয় বাদে একটি জুনিয়র হাইস্কুল এবং একটি নারী শিক্ষণকেন্দ্রও সমিতির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে।

দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান মহিলা শিল্পভবনও দীর্ঘকাল মহিলাদের ভিতরে কেজোশিল্প শিক্ষার আয়োজন করিয়া আসিতেছে। মহিলা শিল্পভবন নারীশিক্ষা সমিতির কলিকাতায় নিজস্ব ভবনে (১৯৩৯) স্থাপিত রহিয়া কুটিরশিল্প শিক্ষায় নারীদের যথেষ্ট সুযোগ করিয়া দিতেছে। এখানেও বর্ত্তমানে আবাসিক ছাত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। এই আবাসিক ছাত্রীগণ এবং বহিরাগত মহিলারা এখানে তাঁত, চরকা, সূচীশিল্প, প্রভৃতি বিবিধ কুটিরশিল্পে শিক্ষালাভ করিতেছেন। এই ভবনে বর্ত্তমানে চতুর্থ মান পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষাদানেরও আয়োজন করা হইয়াছে। বিদ্যাসাগর বাণীভবন হইতে যেমন, মহিলা শিল্পভবন হইতেও তেমনি বিস্তর ছাত্রী কুটিরশিল্পে শিক্ষার সার্টিফিকেট পাইয়া বহু শিল্পকেন্দ্রে বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মৃত্যুকালে বয়স্কা নারীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ও কেজোশিক্ষার আয়োজনের নিমিত্ত নারীশিক্ষা সমিতির হস্তে এক লক্ষ টাকা দিয়া যান। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী 'সিস্টার নিবেদিতা উইমেন্‌স্ এডুকেশন ফাণ্ড' এই নামকরণ করা হয় অর্থভাণ্ডারটির। ইহার অর্থানুকূল্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থলে বয়স্কা নারী-শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়।

ভারত বিভাগের পর পূর্ব্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সঙ্গে স্বভাবতই সমিতির যোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। লেডি অবলা বসু ছিলেন এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদিকা। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় এবং সংগঠন-নৈপুণ্যে সমিতি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবৎ সমাজকল্যাণে নিয়োজিত রহিয়াছে।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি: নারীশিক্ষা সমিতির পরই উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি। মহিলা সমাজের উন্নতিসাধনে অনন্যকর্ম্মা সরোজনলিনী দত্তের মৃত্যুর পর স্বামী গুরুসদয় দত্ত তাঁহার সার্থক স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই সমিতি ১৯২৫, ফেব্রুয়ারী মাসে স্থাপন করেন। পুরুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার পরিচালনা ভার প্রথম হইতেই প্রধানত মহিলাদের উপরই অর্পিত হয়। তাঁহারা অতি নিষ্ঠার সঙ্গে বরাবর সমিতির বিভিন্ন বিভাগীয় কর্ম্ম পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। এই সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গলক্ষ্মী'র সম্পাদনা ভারও আরম্ভাবধি মহিলা সাহিত্যিকদের উপরই ন্যস্ত।

সমিতির প্রধান কাজ দুইটি—এক: বিভিন্ন অঞ্চলে মহিলাদের লইয়া সভা-সমিতি গঠন। এই সকল সভা-সমিতির মাধ্যমে স্থানীয় নারীগণ সমাজসেবায় এবং বিবিধ সংগঠনমূলক কার্য্যে নিজেদের ব্যাপৃত রাখিতে উদ্বুদ্ধ হন। এই সব সভা-সমিতির কার্য্যের কথা 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইত। দুই: কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতায় সমিতির দ্বারা বরাবর একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল বা শিল্পবিদ্যালয় পরিচালিত হইতে থাকে। বহু মহিলা দ্বিপ্রহরে এখানে আসিয়া বিভিন্ন রকমের কেজো-শিল্প শিক্ষার সুযোগ লন। শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলাদের অনেকে স্বাবলম্বী হইয়া উঠেন। বিবিধ শিল্পদ্রব্য তৈরী করিয়া তাঁহারা বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতে সমর্থ হন। আবার কুটিরশিল্প শিখাইবার জন্য তাঁহারা কেহ কেহ বিভিন্ন নারী-শিক্ষাকেন্দ্রে কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

সমিতির নিজস্ব ভবন নির্ম্মিত হয় ১৯৪০ সনে। ভারত বিভাগের পর ইহার কার্য্যকলাপ সঙ্কুচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবং আসাম ও বিহারে কোন কোন স্থলে শাখা মহিলা-সমিতির মাধ্যমে ইহার উদ্দেশ্য কর্ম্মে রূপায়িত হইতেছে। ১৯৫৯ সনে সমিতির শাখাকেন্দ্র ছিল পঁয়ত্রিশটি। এই সব শাখা-কেন্দ্রে বিবিধ উপায়ে নারী ও শিশুদের মধ্যে সেবাকার্য্য চলিয়া আসিতেছে। শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা নারীগণের আত্মমর্য্যাদা-বোধই শুধু বাড়িতেছে না, নিজ নিজ পরিবার তথা সমাজের আর্থনীতিক কাঠামো দৃঢ়ীকরণেও তাঁহারা তৎপর রহিয়াছেন। মূল সমিতি এই সকল শাখাকেন্দ্রে অর্থসাহায্য দিয়া ও শিক্ষয়িত্রী প্রেরণ করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে।

সমিতির মূল কেন্দ্র কলিকাতায় শিল্পশিক্ষালয় পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। ইহা ছাড়া এখানে সিনিয়র টীচার্স ট্রেণিং বিভাগ, প্রবেশিকা পরীক্ষার মান-উপযোগী কন্‌ডেন্‌স্‌ড্ কোর্স, লেডী ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমা ক্লাশ, প্রভৃতিতে যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে। এখানকার ওয়ার্ক সেণ্টার বিভাগে শিল্পে শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলারা অর্ডার সরবরাহ দ্বারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। সমিতির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে প্রসূতি এবং শিশুদের চিকিৎসা চলে। পুরীর বিধবা-আশ্রম পরিচালনাও এই সমিতির অপর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য।

নিখিল-ভারত মহিলা-সম্মেলন: এই সম্মেলন "All India Women's Conference" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। ইহা ১৯২৭ সনে মিসেস মারগারেট কাজিন্‌স্-এর উদ্যোগে স্থাপিত হয় এবং ইহার প্রথম অধিবেশন

হয় পুণা শহরে। এই অধিবেশনে বাংলাদেশ হইতে সরলা দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে এক মহিলা প্রতিনিধি দল যোগদান করেন। প্রাথমিক শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্গীয় প্রতিনিধিদলের প্রস্তাব সম্মেলন সাদরে গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ সমাজসেবী মিসেস পি. কে. রায় (সরলা রায়) সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রথম হইতেই বহু বিদুষী বঙ্গমহিলা সোৎসাহে সম্মেলনের কার্য্যে যোগ দেন। শিক্ষা, সমাজসংস্কার এবং অন্যান্য সেবামূলক উদ্যোগে সম্মেলন অগ্রণী হয়। ১৯৩৫ সনের ভারত সংস্কার আইনে ভারতীয় নারীদের যে ভোটাধিকার প্রদত্ত হয় তাহার মূলে এই, সম্মেলনের বহুবৎসরব্যাপী প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি। কেন্দ্রীয় আইন সভায় সমাজে নারীদের বিবিধ অধিকার সম্পর্কিত যে সকল প্রস্তাব পর পর গৃহীত হয় তাহাতে সম্মেলন-কর্ত্তৃপক্ষ :সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। তাঁহাদের পক্ষে শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় ১৯৪৪ সন হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এ কারণে সদস্য প্রেরিত হন।

বাংলা দেশে এই সম্মেলনের যে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা প্রথমাবধি সম্মেলনের উদ্দেশ্য সার্থক করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। তবে মহাযুদ্ধকালে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় হইতেই ইহা সমাজের দুর্গতদের সেবায় বিশেষভাবে লিপ্ত হয়। ১৯৪৬ সনে কলিকাতা ও নোয়াখালির সাংঘাতিক দাঙ্গার পরে স্থানীয় শাখা কর্ত্তৃপক্ষ সমাজের উচ্ছিন্ন, দুর্গত, নারী ও শিশুদের আশ্রয়স্থল ও শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র গঠনে তৎপর হন। উত্তর কলিকাতায় এইরূপ একটি শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইল। দুইটি আশ্রয়স্থলে প্রায় তিনশত মহিলা থাকিবার সুযোগ পান। একটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রও খোলা হয়—সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই সকল দুর্গত শিশুদের শিক্ষাদানের নিমিত্ত। ভারতবিভাগের পর পূর্ব্ববঙ্গের ছিন্নমূল অধিবাসীরা এখানে আসিলে উক্ত শিক্ষাকেন্দ্র ও আশ্রয়স্থলসমূহে দুর্গত নারীগণ শিল্পশিক্ষালাভের সুযোগ পান এবং তাহাদিগকে বিবিধ উপায়ে নূতন জীবনযাত্রা সুরু করাইতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ উদ্যোগী হন। এই প্রসঙ্গে সম্মেলনের তৎকালীন প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্তা করুণাকণা গুপ্তা, ডক্টর ফুলরেণু গুহ, অশোকা গুপ্তা, প্রভৃতির একনিষ্ঠ সেবাকার্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গীয় শাখা প্রথম হইতেই কলিকাতার বস্তী অঞ্চলসমূহে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাদানকল্পে নানারূপ ব্যবস্থা করেন। কর্ত্তৃপক্ষের এই প্রযত্ন বর্ত্তমান বেলিয়াঘাটায় বুনিয়াদি বিদ্যাপীঠে একটি পরিণত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বিদ্যাপীঠে প্রাক্ বুনিয়াদী শিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা, সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা, প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শাখা কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতায় বিভিন্ন কেন্দ্রে, বিশেষ করিয়া সহরতলীসমূহে, বহু শিল্পশিক্ষালয়ও পরিচালনা করিতেছেন। বর্ত্তমানে এই শাখা আরও কয়েকটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। বয়স্কা নারীদের শিক্ষা, বালিকাদের স্বল্প সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সুযোগ করিয়া দিবার ব্যবস্থা, উদ্বাস্তু নারীদের শিল্প শিক্ষা, বিভিন্ন শিক্ষায়তনে করা হইতেছে।

জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় ইন্‌ফ্যাণ্ট্ এণ্ড্ নার্সারী স্কুল: এই প্রাক্-প্রাথমিক শিশু বিদ্যায়তনটি শ্রীযুক্তা মৃন্ময়ী রায়ের একক চেষ্টায় অতি সামান্য ভাবে ১৯৩৬, ২রা এপ্রিল স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্তা মৃন্ময়ী ইতিপূর্ব্বে বিলাতে গিয়া তথাকার নার্সারী স্কুল পরিচালনা এবং শিশুদের লালন-পালন ও কিণ্ডারগার্টেন উপায়ে শিশুদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসেন। এই ধরণের প্রাক্-প্রাথমিক শিশু ও নার্সারী বিদ্যালয় বাংলা দেশে এইটিই মনে হয় প্রথম। ইহার সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র ভবনে শিশু হাসপাতাল ১৯৫৪ সনে স্থাপিত হইয়াছে। এখানে শিশুদের সর্ব্বরকম ব্যাধির চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে। এই সেবাভবন প্রতিষ্ঠার মূলেও শ্রীযুক্তা মৃন্ময়ী রায়।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বাংলা দেশে প্রধানত মহিলাদের উদ্যোগে শিক্ষা-সংস্কৃতি-সমাজকল্যাণমূলক আরও বহু প্রতিষ্ঠান বিবিধ উপায়ে জনসাধারণের হিতসাধনে লিপ্ত ছিল। তন্মধ্যে বেঙ্গল এডুকেশন লীগ স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন স্তরের উন্নতিসাধনে প্রয়াসী হয়। নিখিল বঙ্গ নারী ইউনিয়ন বা সমিতি বিপথগামী নারীদের উদ্ধারকল্পে সচেষ্ট হইয়া কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কলিকাতার সন্নিকট দমদমে গোবিন্দকুমারী হোম এই সমিতির উদ্যোগে স্থাপিত হয়। উদ্ধারপ্রাপ্তা নারীগণকে এখানে আশ্রয় দিয়া উক্ত সমিতি তাহাদের নানারূপ শিল্প-শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করে। বাংলা সরকার পতিতালয় উচ্ছেদকল্পে যে আইন প্রণয়ন করেন তাহার নিমিত্তও এই সমিতি পূর্ব্বাহ্ণে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। মহিলা আত্মরক্ষা-সমিতি দ্বিতীয় মহাসমর কালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় এই সমিতি দুর্গত বুভুক্ষু নারী ও শিশুদের সাহায্যার্থ আত্মনিয়োগ করে। এই সমিতি ক্রমে সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় এবং "ঘরে বাইরে" নামক একখানি মুখপত্র প্রকাশ করে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মহিলাসমাজের মধ্যে সেবাধর্ম্মের নবপ্রেরণা অনুভূত হয় এবং পূর্ব্বেকার সমিতি এবং

প্রতিষ্ঠানগুলি বাদে এই প্রকার আরও নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইতে থাকে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে সরকার হইতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা সমিতি কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পাইত বটে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর এই সকল জাতিগঠনমূলক উদ্যোগের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিশেষভাবে পতিত হয়। বলা বাহুল্য, সরকারী সাহায্যও বেশী পরিমাণে ইহারা পাইতে থাকে। কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের কার্য-নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালন এবং ইহাদের মধ্যে সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটি উপদেষ্টা পর্ষদ স্থাপন করিয়া তাহাদের মাধ্যমেই অর্থ সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শারীরচর্চ্চা

মহিলাদের শারীর তথা ব্যায়াম চর্চ্চা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। এই বিষয়ে যতদূর জানা যায়, প্রথম অগ্রণী হয় ঢাকার দীপালি সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্তা লীলা রায় (লীলা নাগ) ১৯২৩ সনে নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শারীর চর্চ্চারও আয়োজন করিয়াছিলেন। লাঠি-ছোরা-অসি খেলায় এই সঙ্ঘ নারীদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে শারীর চর্চ্চার সাধারণ রীতি-পদ্ধতিও অনুসৃত হয়। এই দশকে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান কলিকাতার ছাত্রীসঙ্ঘ (১৯২৮)। এই সঙ্ঘও ছাত্রীদের তথা নারীদের মধ্যে শারীর চর্চ্চার উদ্যোগ করেন। দীনেশ মজুমদার তাহাদের লাঠি ও অসি খেলা শিক্ষা দিতেন। এই দীনেশ মজুমদারেরই পরে ফাঁসী হয়। বিখ্যাত বিপ্লবী এবং লাঠি-ছোরা-অসি খেলায় সিদ্ধহস্ত পুলিনবিহারী দাস তাঁহার বাদুড়বাগান ব্যায়ামাগারে পুরুষের ন্যায় মেয়েদেরও ঐ সব খেলা শিখাইতে আরম্ভ করেন। এই দশকে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বেথুন কলেজে ছাত্রীদের ব্যায়ামচর্চ্চা ও খেলাধূলার প্রবর্ত্তন। ইহার পর হইতে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে শারীর চর্চ্চার ক্রমশঃ আয়োজন হয়।

ব্যক্তিগতভাবেও নারীরা ক্রমে ব্যায়াম অনুশীলনে লিপ্ত হইতে থাকেন। এ বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় শিবকালী দেবীর নাম। তিনি ১৯২৯ সন হইতে শারীর চর্চ্চা সুরু করেন এবং অল্পকালের মধ্যে এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে সক্ষম হন। তাঁহার দ্বারা ১৯৩৮ সন পর্য্যন্ত কয়েকটি মহিলা ব্যায়াম কেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল। এখানে আর একটি বিষয়ও স্মরণীয়। ১৯৩০ সন হইতে ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তির প্রচেষ্টায় পুরুষের মত নারীরাও যোগদান করেন। এই সময়ে শক্তি-চর্চ্চায়ও নারীগণ খুবই অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন।

শিবকালী দেবীর পরেই উল্লেখ করিতে হয় শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের (এখন লীলা দে) নাম। তিনি প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের বাংলা সরকার কর্তৃক পরিচালিত মহিলা শারীর চর্চ্চা শিক্ষায়তনে (Govt. Training College of Physical Education for Women) এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া Diploma of Physical Education লাভ করেন। শ্রীযুক্তা লীলা উচ্চতর শারীর চর্চ্চা শিক্ষার জন্য আমেরিকায় যান। এবং প্রথমে Utah বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে কানাডার Toronto বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর চর্চ্চা সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। Utah বিশ্ববিদ্যালয় হইতে M. S. উপাধি (Master of Science : Physical Education & Health & Recreation) প্রাপ্ত হন। তিনি তথা হইতে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক নারী শারীর শিক্ষা মহাসম্মিলনে ভারতের একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি রূপে যোগ দেন। ভারতবর্ষে ফিরিয়া তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মহিলা শারীর শিক্ষাবিভাগের Chief Inspector পদে নিযুক্ত হন। তিনি ভারত সরকারের শারীর শিক্ষার কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদে সাত বৎসর কাল (১৯৫০-৫৭) মহিলা সদস্য পদে বৃত ছিলেন। ১৯৫০ সনে গোয়ালিয়রে স্থাপিত নারীদের শারীর শিক্ষার কলেজে তিনি (১৯৫৭-৬০) এই তিন বৎসর যাবৎ অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কলেজের নাম বর্ত্তমানে "Laxmibai College of Physical Education"। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টার কথাও কিছু বলিতে হয়। ১৯৫৭ সনে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র বাণীপুরে শারীরিক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় তাঁহারা স্থাপন করেন। এখানে কুড়িটি মহিলার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রীদের শারীর শিক্ষা দানের দুইরকম ব্যবস্থা আছে। স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য ডিপ্লোমা এবং মধ্যশিক্ষা উত্তীর্ণদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

গত দুই দশকের মধ্যে আরও বহু মহিলা লাঠি-ছোরা-অসি খেলা, সন্তরণ, বিবিধ ব্যায়াম তথা যুযুৎসু, দৌড়ন, যোগব্যায়াম, ভার উত্তোলন, ভারবহন, মোটর গাড়ীর গতিরোধ, প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের ভিতরে অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায় (মুখোপাধ্যায়) মোটর গাড়ীর গতিরোধে, বাণী ঘোষ সন্তরণে, বীণা ঘোষ লাঠি ও ছোরা খেলায়, পূর্ণা ঘোষ দৌড় প্রতিযোগিতায়, আরতি সেন তরবারি খেলায়, লাবণ্য পালিত যোগ-

ব্যায়ামে, শোভা বন্দ্যোপাধ্যায় (গঙ্গোপাধ্যায়) লাঠি ও যুযুৎসুতে, রেবা রক্ষিত বুকের উপর দুই টন রোলার ও হাতী গ্রহণে ও নানাপ্রকার সারিবন্দী ব্যায়ামে, কমলা দাস ব্যাডমিন্টনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা একদিকে যেমন জনসাধারণকে চমৎকৃত করিতেছেন তেমনি অন্যদিকে নারীর শারীর শক্তি স্ফুরণের বিবিধ পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে। এই সব মহিলাদের কেহ কেহ শারীর চর্চ্চার নূতন নূতন ধারা ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছেন। ইঁহাদের অনেকে মেয়েদের শারীর চর্চ্চার নিমিত্ত বিভিন্ন স্থানে মহিলা ব্যায়াম সমিতি গঠন করিয়াছেন। মহিলা ব্যায়াম সমিতি, বালিকা শক্তি সঙ্ঘ, মহিলা শারীর শিক্ষা সমিতি, প্রভৃতি বিভিন্ন সমিতির মাধ্যমে নারীগণ শারীর চর্চ্চায় শিক্ষালাভ করিয়াছেন। শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাদের অনেকে মেয়েদের স্কুল-কলেজে শারীর শিক্ষাদানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে বালিকাদের ব্যায়াম চর্চ্চায় উৎকর্ষ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রামমোহন জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবে সেণ্ট্ পল্স্ কলেজের শতবর্ষপূর্ত্তি উৎসব অনুষ্ঠানে এবং আরও বহু অনুষ্ঠানে মেয়েদের ব্যায়াম প্রদর্শন এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যায়াম চর্চ্চা এখন আর কোন বিশেষ সমিতি বা সঙ্ঘের মধ্যেই নিবদ্ধ রহে নাই। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন স্কুল-কলেজের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে তেমনি শারীর চর্চ্চায় পারঙ্গম মহিলাদের শিক্ষায়, বিভিন্ন রকমের খেলাধুলায় বালিকা তথা মহিলারাও উৎকর্ষ দেখাইতেছেন। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে শারীর চর্চ্চার যে একান্ত আবশ্যক, নারীসমাজের মধ্যেও এ বিষয়ে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। বাংলাদেশে পূর্ব্বাবধি এমন আরও কয়েকটি সমিতি রহিয়াছে, যাহাদের দ্বারা নারীর শারীর চর্চ্চার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী সমিতির নাম আমাদের প্রথমেই মনে আসে।

বর্ত্তমানে বাংলার মহিলারা সন্তরণেও বিশেষ দক্ষতা দেখাইতেছেন। অবশ্য নদীমাতৃক বাংলার পল্লী-নারী সন্তরণ বিষয়ে স্মরণাতীত যুগ হইতে যে অত্যন্ত পটু ছিলেন তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। কলিকাতা শহরে সন্তরণ শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকায় বহু মহিলা সন্তরণ শিক্ষা লাভে সমর্থ হইতেছেন। আধুনিক কালে এই বিষয়ে তাঁহাদের কেহ কেহ স্বদেশে ও বিদেশে সন্তরণ-নৈপুণ্য হেতু গৌরবের অধিকারিণী হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্বতঃই আমাদের মনে আসে শ্রীমতি আরতি সাহার (গুপ্ত) নাম। তিনি ১৯৫৯ সনের অক্টোবর মাসে ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছেন। স্বদেশেও ইতিপূর্ব্বে তিনি বিভিন্ন সময়ে সন্তরণ-নৈপুণ্যের জন্য প্রশস্তি লাভ করিয়াছিলেন। আরও কয়েকজন মহিলা ইতিমধ্যেই সন্তরণে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কল্যাণী বসু ও সন্ধ্যা চন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সন্তরণ ব্যতীত রাইফেল স্যুটিং এবং অনুরূপ আরও কয়েকটি বিষয়ে মহিলাগণ যশস্বিনী হইয়াছেন।*

রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনা

বর্ত্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে ভারতবর্ষের সর্ব্বাত্মক স্বাধীনতা প্রচেষ্টার যে আয়োজন চলে তাহার সূচনা দেখি এই শতকেরই উষাকালে। আর ইহাতে যাঁহারা অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন মহিলার কথা আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হয়। তিনি হইলেন সরলা দেবী চৌধুরাণী (তখন সরলা ঘোষাল নামে পরিচিত)। তিনি পূর্ব্ব হইতেই 'ভারতী'র সম্পাদিকারূপে ইহারই মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির মানসিক ও শারীরিক জড়তা বিদূরণপূর্ব্বক আত্মশক্তির উন্মেষকল্পে লেখনী পরিচালনা করিতেছিলেন। এই শতকের সূচনায়ই তিনি এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি কার্য্যকর উপায়ও অবলম্বন করেন, যথা: কুস্তীগির নিযুক্ত করিয়া যুবকগণকে নিয়মিত শারীর চর্চ্চার সুযোগ দান, বিভিন্ন কুস্তীর আখড়ার যুবকগণকে সম্মিলিত করিয়া প্রতাপাদিত্য উৎসব ও উদয়াদিত্য উৎসব পালন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপনপূর্ব্বক জনসাধারণকে বিলাতীর বদলে স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা, প্রভৃতি। তিনি ১৯০৪ সনে 'বীরাষ্টমী' ব্রতের সূত্রপাত করেন। মহাষ্টমীর দিনে রামচন্দ্র হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত ভারতীয় বীরগণের বীর্য্যপ্রকাশক কার্য্যাবলী একটি স্তোত্রে সন্নিবদ্ধ করিয়া যুবকগণ পুষ্পপত্রশোভিত তরবারি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ইহা উচ্চারণ করিতেন এবং আত্মশক্তি উন্মেষের পন্থাগুলি জীবন দিয়া পালনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বাত্মক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাকল্পে বিপ্লবধর্ম্মী ও অহিংস স্বাবলম্বন ভিত্তিক প্রচেষ্টাগুলির মূল সরলা দেবীর

* শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ জানার 'স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম' পুস্তক হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় ও শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র দে আমাকে কোন কোন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

এতাদৃশ উদ্যোগসমূহের মধ্যে লক্ষ্য করি। বিদেশিনী হইয়াও বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে তখনই এইসব উপায়ের নির্দ্দেশ দিতেছিলেন বিবিধরূপে।

স্বদেশী যুগ : বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বাঙালী মহিলারা যে সবিশেষ যত্নবতী হইয়াছিলেন, নানা সূত্র হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। জাতীয় সঙ্গীত রচনায়, এই সকল সঙ্গীত পরিবেষণে, গদ্য পদ্য আরও বহু লেখায় স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, হিরণ্ময়ী দেবী, কুমুদিনী মিত্র (পরে বসু) প্রমুখ মহিলাগণ স্বদেশীয় ভাবনাকে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিতে থাকেন। ঐ সময় বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলন যে এত সফল হইয়াছিল তাহার মূলে ছিল বঙ্গীয় নারীসমাজের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। পুরুষের উপর, বিশেষতঃ যুবক ও বালক ছাত্রদের উপর শাসকবর্গের অত্যাচার-নিপীড়নে নারীসমাজ যে খুবই বিচলিত হইয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। বিবেকানন্দ-ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'যুগান্তরে'র সম্পাদকরূপে কারারুদ্ধ হইলে তাঁহার বৃদ্ধা জননীকে কলিকাতার মহিলাসমাজের পক্ষ হইতে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। ইহাতে মাতৃ-জাতির পক্ষে স্বদেশীব্রত এবং আত্মশক্তির উপর নির্ভর করার সঙ্কল্প গ্রহণে তাঁহাদের দৃঢ়তা সূচিত হয়। ঘরে ঘরে চরকার প্রবর্ত্তন, তাঁত প্রচলন, স্বদেশজাত দ্রব্যের সরবরাহ, প্রভৃতি ব্যাপারে নারীগণ অন্তরালে থাকিয়াই পুরুষের সহায়তা করিতেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও এই সময়ে লেখনীর মাধ্যমে এবং সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলন বিশেষতঃ জাতীয় শিক্ষাকল্পে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করিতেছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে যে বিপ্লবী দল উত্থিত হয় তাহার কোন কোন কার্য্যে তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের (শ্রীঅরবিন্দ) সঙ্গে তাঁহার সমপ্রাণতা ও ঐকান্তিক সহযোগিতা দৃষ্টে হয়ত অনেকে এইরূপ মনে করিয়া থাকিবেন।

উত্তর স্বদেশী যুগ : স্বদেশী আন্দোলনের পরে এবং অসহযোগ প্রচেষ্টার পূর্ব্বে দশ বৎসর কাল ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এবং বহির্জ্জগতে বহু যুগান্তরকারী ঘটনা ঘটে। দ্বিখণ্ডিত বাংলা পুনরায় যুক্ত হইল বটে,[১] কিন্তু বাঙ্গালার যুবসমাজের স্বদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প অব্যাহতই রহিয়া গেল। বিপ্লবাত্মক পন্থাকেই তাহারা এই উদ্দেশ্য-সাধনে বিশেষভাবে আঁকড়াইয়া ধরে। প্রথম মহাসমরের সূচনায় তাহারা জাতির মুক্তি আসন্ন বিবেচনা করিয়া এমন সকল কার্য্যে লিপ্ত হন যাহাতে ব্রিটিশ সরকার পর্য্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। বিপ্লবী যুবসমাজ বিস্তর আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেন এবং বহু ক্ষেত্রে ইহা রক্ষার ভার পড়ে মহিলাদের উপর। এই সময় আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষা করা সন্দেহে ননীবালা দেবী নামে এক মহিলা সরকারের হস্তে বিশেষভাবে নির্য্যাতিত হন। পরিশেষে ১৮১৮ সনের তিন আইন অনুসারে তাহারা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। ১৯১৯ সনে তিনি কারামুক্ত হন। এই সময় বাঁকুড়া জেলার পল্লীবাসিনী সিন্ধুবালাও উক্তরূপ সন্দেহে দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। উত্তর স্বদেশী যুগে প্রকাশ্য রাজনীতিতে মহিলারা আসিয়া যোগ দিলেন।

১৯১৫ সন হইতে সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের কার্য্যে ক্রমশঃ একান্তভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন। এনি বেসাণ্ট প্রবর্ত্তিত "হোম রুল" আন্দোলনেও মহিলাদের সমর্থন উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সনে কলিকাতায় লালা লজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয় তাহাতে মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের অধিনায়কত্ব করেন বিখ্যাত কংগ্রেসসেবিকা জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়।

অহিংস অসহযোগ প্রচেষ্টা :—১৯২১ সনে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ প্রচেষ্টায় বাংলার মহিলাগণ মনেপ্রাণে যোগদান করেন। এই প্রচেষ্টাকে সর্ব্বপ্রথম সমর্থন করিয়া অভিনন্দন জানান বঙ্গনারী সরলা দবী চৌধুরাণী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন বাংলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। মহিলাগণ চরকায় সূতা কাটা, খদ্দর তৈরি ও ফেরি করা প্রভৃতি কাজের ভার লন। দেশবন্ধুর ভগিনী উর্ম্মিলা দেবী মহিলাদের দ্বারা এই ধরণের রচনাত্মক কার্য্য সম্পাদন উদ্দেশ্যে 'নারীকর্ম্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। খদ্দর ফেরি করিতে গিয়া দেশবন্ধুর সহধর্ম্মিণী বাসন্তী দেবী, ভগিনী উর্ম্মিলা দেবী, এবং সুনীতি দেবী প্রকাশ্য রাজবর্ত্মে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হন। কয়েক ঘণ্টা আটক রাখিবার পর তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ইহা লইয়া যে আলোড়ন উপস্থিত হয় তাহাতে নারীসমাজের মধ্যে বিশেষ জাগরণ দেখা দিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বেআইনী ঘোষিত হইলে নারীকর্ম্মমন্দির রচনাত্মক কার্য্য বাদে রাজনৈতিক সভাসমিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে থাকে। এই সময় কুমিল্লার শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার নারীকর্ম্মমন্দিরের পক্ষ হইতে যে সাহস ও বীর্য্যবত্তার পরিচয় দেন তাহা কখনও ভুলিবার নয়।

নারীকর্ম্মমন্দির উঠিয়া গেলে তাহার স্থলে হেমপ্রভা অগ্রণী হইয়া নারী কর্ম্মীসংসদ গঠন করেন। কংগ্রেসের রচনাত্মক কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কাদের সাধারণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও সংসদ করিয়াছিল। অসহযোগ প্রচেষ্টার মরশুমে মোহিনী দেবী, শ্রীযুক্তা সন্তোষকুমারী গুপ্তা ও আরও কোন কোন মহিলা শুধু কলিকাতায় নয়, বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, গঞ্জ ও গণ্ডগ্রামে গিয়া অসহযোগের বার্ত্তা প্রচার করিতে থাকেন। পুরুষ নেতৃবর্গ একে একে কারাবরণ করিলে মহিলারা আসিয়া তাঁহাদের কার্য্যভার লন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কারাবরণের পর শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৯২২ সনে চট্টগ্রামে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হইল তাহারও সভাপতিত্ব করেন বাসন্তী দেবী। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে ক্রমে ক্রমে মহিলারা যোগদান করিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের মোড় ফিরে স্বরাজ্যদল প্রতিষ্ঠা হইবার পর। এই সময় হইতে দুই তিন বৎসরকাল কংগ্রেস যে রচনাত্মক কার্য্যে জোর দিতেছিল তাহাতে মহিলারা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সনে সুভাষচন্দ্র বসু (পরে নেতাজী) বন্দীদশার অবসান ঘটাইয়া বাংলা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলন পুনরায় প্রবলভাবে সুরু হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব জেলা বা মহকুমা সম্মেলন এবং যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহার সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকটি স্থলেই মহিলা-সম্মেলন হইতে থাকে। কলিকাতায় ও মফঃস্বলে এই যে নারীসমাজের মধ্যেও রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্রেক হয় তাহা স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থলে মহিলাদের সমিতি এবং সঙ্ঘ স্থাপিত হইতেছিল। এইরূপ একটি সমিতি ছিল 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সমিতি'। ইহার সভানেত্রী ছিলেন সুভাষ-জননী প্রভাবতী বসু এবং সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ। কলিকাতায় শ্রীযুক্তা কল্যাণী দাস, কমলা দাশগুপ্তা প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের ছাত্রীদের উদ্যোগে ছাত্রীদের ভিতরে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারের জন্য 'ছাত্রীসঙ্ঘ' স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' নামক দল দুইটি বিপ্লবাত্মক প্রচারে ও কর্ম্মসম্পাদনে অগ্রসর হয়।

১৯২৮ সনের কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সামরিক ধারায় কার্য্য করিতে থাকে তাহাতে ছাত্রীরাও আসিয়া দলে দলে যোগ দেন। প্রধানতঃ ইহাদের লইয়া গঠিত মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ। কংগ্রেসের পর ছাত্রীসমাজের অনেকে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিপ্লবাত্মক কর্ম্মে সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন: মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সনে ১২ই মার্চ্চ লবণ আইন ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে 'দণ্ডী' যাত্রা সুরু করিলে পুরুষের ন্যায় মহিলারাও স্বদেশের রাষ্ট্রীয় মুক্তির নিমিত্ত বিপুল সাড়া দেন। কলিকাতায় ও মফঃস্বলে মহিলাগণ সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাদের এই আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্র প্রচার করিতে থাকেন। কলিকাতার সদ্য প্রতিষ্ঠিত নারী সত্যাগ্রহ সমিতি, পূর্ব্বেকার মহিলা রাষ্ট্রীয় সমিতি এবং ছাত্রীসঙ্ঘ প্রভৃতি বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনকল্পে বড়বাজার, চাঁদনী ও অন্যান্য কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী পাঠাইয়া এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুলিসের উৎপীড়ন বিনাবাক্যে সহ্য করেন এবং দলে দলে কারাবরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক হইতে ব্যর্থকাম হইয়া স্বদেশে ফিরিবার পরই কারারুদ্ধ হন। তখন পুনরায় দ্বিতীয়বার সত্যাগ্রহ বা আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। এ সময়েও নারীগণ দলে দলে কারাবরণ করিলেন।

পূর্ব্বে বিপ্লবাত্মক কর্ম্মের প্রতি নারীদের, বিশেষ করিয়া ছাত্রীসমাজের যে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ পায়, আইন-অমান্য আন্দোলনকালে তাহা কার্য্যে সুপ্রকট হইয়া পড়িল। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০, ১৮ই এপ্রিল) এবং তৎসংশ্লিষ্ট কার্য্যাবলীর সঙ্গে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শ্রীযুক্তা কল্পনা দত্ত (পরে যোশী) ও অন্যান্য বহু মহিলার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। কুমিল্লায় শ্রীযুক্তা শান্তি ঘোষ (এখন দাস) এবং সাবিত্রী চৌধুরী কর্ত্তৃক এজলাসে ষ্টিভেন্স হত্যা (১৯৩১, ১৪ই ডিসেম্বর) এবং শ্রীযুক্তা বীণা দাস (এখন ভৌমিক) কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবকালে (১৯৩২, ৬ই মার্চ্চ) গবর্ণরের উদ্দেশ্যে রিভলবারের গুলী নিক্ষেপ মহিলাদের বিপ্লবাত্মক কর্ম্মের সঙ্গে যোগাযোগের দুইটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার পর আরও কোন কোন স্থলে বিপ্লব-কর্ম্মের চেষ্টা হয়। বিপ্লবকর্ম্মে লিপ্ত থাকার সন্দেহে এই সময় হইতে বহু ছাত্রী ও বয়স্কা মহিলা দলে দলে ধৃত হইয়া কখনও বিচারে এবং অধিকাংশই বিনা বিচারে কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। এই সময়কার বিভিন্ন বিপ্লবকর্ম্মের

কাহিনী আমরা শ্রীযুক্তা কল্পনা দত্তের "The Chittagong Armoury Raid", শ্রীযুক্তা বীণা দাসের "শৃঙ্খল-ঝংকার", শান্তি দাসের "অরুণ-বহ্নি", কমলা দাশগুপ্তার "রক্তের অক্ষরে" পুস্তকে এবং "মাষ্টার-দা" সূর্য্যকুমার সেনকে লিখিত, ও পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদারের পত্রাবলী হইতে জানা যায়।

১৯৩৫ সনের ভারত সংস্কার আইনের পরে: ভারতবর্ষে যখন সহস্র সহস্র নারীপুরুষ স্বদেশের রাষ্ট্রীয়-মুক্তি-সাধন কল্পে অশেষ নির্য্যাতন ও দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন তাহার মধ্যে কয়েক বৎসর ব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর ১৯৩৫ সনে ভারত সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনবলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কখনও সম্ভব ছিল না বটে, কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে ভারতশাসনে ভারতবাসীর আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটে। এই আইনবলে ভারতীয় নারীগণও সর্ব্বপ্রথম পুরুষের ন্যায় ভোটাধিকার লাভ করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতেও আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব হইল। ১৯৩৭ সনে নূতন আইনবলে সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। ইহাতে নারীগণ যোগদান করেন এবং ব্যবস্থা পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাইতেও সক্ষম হন। বাংলাদেশেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। নূতন পরিবেশে ১৯৩৮ সনে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। এই সময় তাঁহারই নির্দ্দেশে ভারতবর্ষের সর্ব্বাত্মক উন্নতিকল্পে একটি planning বা পরিকল্পনা কমিশনও কংগ্রেস গঠন করেন। এই প্ল্যানিং কমিশনের মহিলা-বিভাগে কোন কোন বাঙ্গালী মহিলা দায়িত্বপূর্ণ পদে গৃহীত হন।

কংগ্রেসের উচ্চতন কর্তৃপক্ষের সহিত মতবিভেদ হেতু দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াও সুভাষচন্দ্র এই পদ ত্যাগ করিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। তখন তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার, লীলা রায় প্রমুখ নেতৃস্থানীয়া মহিলারাও আসিয়া যোগ দেন। সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে এবং পরে স্বদেশের রাষ্ট্রীয় মুক্তি ত্বরান্বিত করিবার জন্য তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া মহিলারা অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করেন। ১৯৩৮ সনে প্রধানত মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় বাংলার বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষ রাজবন্দী একে একে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিপ্রাপ্ত নারীগণ অনেকেই আসিয়া কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদান করিলেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হইতে আলাদা হইয়া গেলে মহিলা কর্ম্মীদের কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে যোগ দেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই মূল কংগ্রেসের কার্য্যে মনঃসংযোগ করেন। কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনার জন্য যে সাময়িক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয় তাহার কোন কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থাকিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত মহিলারা কার্য্য করিতে থাকেন।

আগস্ট বিপ্লব ও পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ: দ্বিতীয় মহাসমরকালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তি প্রচেষ্টা সুরু হয় নিবিড়ভাবে। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মতামতের প্রতি ব্রিটিশ জাতির তথা ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্নরূপে উপেক্ষা প্রদর্শনে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যে বিক্ষোভ দেখা দেয় তাহারই বহিঃপ্রকাশ এক কথায় ১৯৪২ সনের এই আগস্ট বিপ্লব। এই সময় ভারতবর্ষে অগণিত নরনারীর মধ্যে যে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকট হইয়া পড়ে পূর্ব্বে এমনটি কখনও দেখা যায় নাই। বাংলার সর্ব্বত্র নারীসমাজ পুরুষের সঙ্গে সমানতালে চলিয়া আইন অমান্যমূলক বিবিধ কার্য্যে মনেপ্রাণে যোগ দিলেন। তখন মহাযুদ্ধের মরশুম। এই জনবিপ্লব দমনে বিভিন্ন ঘাঁটিতে অবস্থিত সামরিক বাহিনীরও সাহায্য গ্রহণ করা হয়। তমলুকে শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতে গিয়া জাতীয় পতাকা হস্তে মাতঙ্গিনী হাজরা নিহত হন সেনার গুলীতে। এইরূপ চরম আত্মাহুতি কম লোকের ভাগ্যে ঘটিলেও বহুস্থলে, যেমন পুলিস তেমনি সামরিক বাহিনীর হস্তে নারীগণ নির্যাতিত হইয়াছিলেন। পুরুষের ন্যায় বহু নারী এবারেও কারারুদ্ধ হন। কোন কোন মহিলা আত্মগোপন করিয়া আন্দোলন পরিচালনায় রত হন। পঞ্চাশের মন্বন্তর কালে আর্ত্তসেবায়ও তাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় মহাসমরের অবসানে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তি আসন্ন বলিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সময়েও ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু (তখন "নেতাজী" বলিয়া আখ্যাত) পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্তর্গত বহু সহস্র সৈন্যকে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া আনা হয় বিচারের জন্য। তখন জানা যায় বহু প্রবাসী বাঙ্গালী মহিলা নানাভাবে ফৌজভুক্ত হইয়া ব্রিটিশের অগ্রগতিতে বাধা দিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকালে এবং আরও কয়েকটি কারণে অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশেও বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। এই সময় বিভিন্নস্থলে যে সব ধর্ম্মঘট, সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, প্রভৃতির আয়োজন হয় তাহাতেও মহিলারা আসিয়া পুরুষের পাশে দাঁড়ান। ১৯৪৭ সনে

১৫ই আগস্ট ভারত বিভাগের ভিত্তিতে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। ইহার নিমিত্ত যতবিধ সক্রিয় প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহাতে ক্রমে ক্রমে মহিলারাও আসিয়া একান্তভাবে যোগ দেন।*

বাংলার নারী বিদ্যায় বুদ্ধিতে কর্ম্মনৈপুণ্যে বর্ত্তমানে যে কোন দেশের নারীসমাজের সমতুল বলিয়া গণ্য হইবেন। আন্তর্জ্জাতিক সমিতি ও সম্মেলনে, ভারতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে, মন্ত্রীসভায়, পৌরসভায়, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহারা কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। এ কারণ অনেকে দেশ-বিদেশে সম্মানলাভ করিয়াছেন। মহিলা নেত্রীবৃন্দ বিদ্যা, বুদ্ধি এবং সেবাপরায়ণতার দ্বারা বিপুল জনসমষ্টিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছেন। নারীগণ নিজেরাই সমাজের অজ্ঞ, নিরক্ষর, দুর্গত শ্রেণীর, বিশেষত নারীসমাজের উন্নতিসাধনে নিয়ত তৎপর। বিভিন্ন বিভাগে তাঁহারা ইতিমধ্যেই যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতে সমগ্র জাতিকে শক্তিমান্‌, সংহত এবং ঐক্যবদ্ধ করিয়া ইহার নবরূপায়ণ আশু সম্ভব করিয়া তুলিবে নিঃসন্দেহ।

* বর্ত্তমান লেখকের "জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী" পুস্তকে রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনায় নারীর কৃতিত্বের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্রৌপদী

শ্রীসুরুচি সেনগুপ্ত

ভোরে ঘুম থেকে উঠে কাপড়-চোপড় কেচে বুড়ী ঠাকুমা জপ-আহ্নিকে বসেছিলেন। হঠাৎ একটা গোলমাল তাঁর কানে আসে। গোলমালটা খুব উচ্চস্তরের না হলেও খুব নিম্নস্তরেরও নয়। জপ প্রায় হয়েই এসেছিল, এখন মালাটা কপালে ছুঁইয়ে দেয়ালের একটা হুকে ঝুলিয়ে রেখে, টেবিলের উপর থেকে চশমাটা তুলে নিয়ে আঁচলে তার কাচ মুছতে মুছতে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, রঙ্গমঞ্চে ভৃত্য বিশাই চোরের মত দাঁড়িয়ে আছে আর সপ্তদশ-বর্ষীয়া নাতনী চিনু এক ঝুড়ি কাঁচা তরকারির সম্মুখে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ প্রয়োগ করছে। আসামী যে বিশাই আর উপলক্ষ্য যে ঐ আনাজপত্র শাকসব্জিগুলো সে কথা বুঝতে ঠাকুমার দেরী হয় না। নাকের উপরে যুৎ ক'রে চশমাটা বসিয়ে শুচিপরায়ণা ঠাকুমা স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে যথাসম্ভব নাতনীর ঘনিষ্ঠ হয়ে আসেন, কি লো বিদুষী নাতনী, সকাল বেলাতেই এমন মারমূর্তি কেন? হ'ল কি?

কি আবার হবে?—চিনু ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে ওঠে। এই উজবুক চাকরটাকে রাখতে তখনই আমি বাবাকে বারণ করেছিলাম। এই সব ইডিয়ট্‌ লোক দিয়ে কখনো কাজ চলে?

বিশাইকে যখন কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়, তখন চিনুর আপত্তি ছিল, এ ইতিহাস ঠাকুমার জানা নেই, বরং চাকর না থাকাতে অসুবিধে হচ্ছে ব'লে চিনুই ওকে রাখতে বেশী আগ্রহান্বিত হয়েছিল। এখন তার মুখে একথা শুনে তিনি মনে মনে হাসেন।

উজবুক গালটা বিশাইয়ের একেবারেই পছন্দ নয়। কিছুদিন আগে সে এক ফিরিঙ্গি সাহেবের বাড়ী কাজ করেছিল, তাই ইংরিজি গালাগালগুলো ওর খানিকটা গা-সহা হয়ে গেছে, কিন্তু বাংলার গালাগালগুলো শুনলেই ও অগ্নিশর্ম্মা হয়ে ওঠে—একেবারে বাপের কুপুত্তুর আর কি! নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য ঠোঁট খুলে পান-দোক্তায় কালো দন্ত দু'পাটি অর্দ্ধ-বিকশিত করবার আগেই আবার চিনু ধমক দিয়ে বলে, শাট্‌ আপ্‌।—ফিরিঙ্গি বাড়ীতে থাকবার সময় বিশাই ষ্ট্যাণ্ড্‌ আপ্‌, টেক্‌ আপ্‌, ঐ দুটো আপের মানে শিখেছিল, কিন্তু এই শাট্‌ আপের মানেটা কি তা ত সে জানে না? করুণ নেত্রে সে ঠাকুমার মুখের দিকে তাকায়। একটু চাপা মিষ্টি হেসে ঠাকুমা বলেন, কি হয়েছে রে চিনু?

চিনু বলে, দেখ না কি কাণ্ড! আমার দু'চারজন বন্ধুকে—

বাধা দিয়ে ঠাকুমা বলেন, বন্ধু নয়, বান্ধবী বল্, নয় ত নানা হাম্লায় পড়বি—

আ-হা, বন্ধু হলেই বা ক্ষতি কি?

ক্ষতিকে ভয় নেই, ভয় লাভকে—ব'লেই ঠাকুমা হেসে ওঠেন।

তোমাদের যত্ত সব—চিনুর চোখে বিদ্যুৎ চমকায়, ঠোঁট লাজুক হয়ে ওঠে, কণ্ঠস্বর একটু গদগদ শোনায়। সে ঠাকুমাকে ধমক দিয়ে বলে, বাজে কথা রেখে এখন কাজের কথা শোন—

শুনতে আমি প্রস্তুত, বল—

তোমাকে ত কালই ব'লে রেখেছি যে, চারজন বন্ধুকে খেতে বলেছি, তারা রিচ্ ফুড খাবে না, চীপ ফুড খেতে চায়। তাই তুমি বেশ ভাল ক'রে কয়েকটা নিরামিষ তরকারি রাঁধবে ব'লে ভাল ভাল সব রকম তরকারি আনতে ওকে ব'লে দিয়েছিলাম। তা কি এনেছে দেখ—টালমারা তরকারিগুলোর দিকে সে ঠাকুমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। দেখেছ? গুচ্ছের করলা, একগাদা ডাঁটা, ডজন দু'য়েক কাঁচকলা, ডালনার জন্য ছানা আনতে বলেছিলাম, ছানা না এনেছে না-ই এনেছে, রাম-গরুড়ের ছানা এনে যে হাজির করে নি, এই আমার ভাগ্যি। কচি শশা লোকে মুড়ীর সঙ্গে খায় জানি, কিন্তু ঐ পেকে যাওয়া বুড়ো শশাটা কি কাজে লাগবে শুনি? ঐ হাতীর মাথার মত মানকচুটা এনেছে ও কি বুদ্ধিতে?

সে হাত আর ঠোঁট উল্টায়।

এই ফাঁকে বিশাই একটু কথা বলবার অবসর পায়, বলে, কাল সারারাত জলঝড় হয়েছে, বাজারে মাছ, তরকারি কিচ্ছু ওঠে নি। এই তরকারি, চিংড়ি মাছ, আর বেলে মাছ ছাড়া আর কিছু পেলাম না, বেলা হলে যদি আসে। যা পেয়েছি তাই এনেছি—

বেশ করেছ, আমার মাথা কিনে নিয়েছ—চিনুকে বেশ চিন্তিতা দেখায়। ঠাকুমা বলেন, যে মাছ তরকারি এসেছে, তাতেই হয়ে যাবে চিনু, তুই কিছু ভাবিস্ নে। আমি স-ব ঠিক ক'রে নেব।

যা খুশি কর গে যাও—আঁচল ঘুরিয়ে চ'লে যায় চিনু। তরকারির ঝুড়ি নিয়ে ঠাকুমাও গিয়ে নিরামিষ রান্নাঘরে ঢোকেন।

যথাসময়ে সেন্টের গন্ধে চারদিক্ সুরভিত ক'রে, জুতার খুট্‌খুটানিতে সিঁড়ির বুক স্পন্দিত ক'রে কলকণ্ঠে বাড়ীর কোণাকাঞ্চি পর্য্যন্ত সচকিত ক'রে মিনু, বিনু, টুনু, হিনু, চিনুর এই বান্ধবী চতুষ্টয়ের আবির্ভাব হ'ল।

চিনু সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের বসবার ঘরে নিয়ে বসায়। একটু পরেই খাবার জন্য ওদের ডাক পড়ে, সেই রঙ্গিণী, ভঙ্গিনী, সঙ্গিনীরা তখন খাবার টেবিলে গিয়ে বসে। রান্নাবান্না শেষ ক'রে পরিবেশনের জন্য ঠাকুমা তৈরী হয়েই ছিলেন, হাসিমুখে তিনি ওদের পরিবেশন করতে আসেন। বিশাই এসে থালায় থালায় নুন লেবু দিয়ে গেল, ভাত দিয়ে গেল বামুন ঠাকুর। ঠাকুমা প্রথম যে তরকারিটা ওদের পাতে দিলেন, সেদিকে চেয়ে বিনু বলে, এ তরকারিতে দুধ দিয়েছেন কতটা ঠাকুমা?

বিনুর দোষ নেই, তরকারিটা সত্যি দুধের মত ধব্‌ধব্ করছিল। ঠাকুমা বলেন, না, দুধ দিই নি, পোস্ত-বাটা দিয়েছি। এটা শুক্ত, এটাই আগে খাও।

এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে টুনু বলে, শুক্ত বুঝি? বা, খেতে বেশ হয়েছে ত? ঠাকুমা, আমাকে আরেকটু দিতে হবে।

টুনুকে আরও শুক্ত দিতে দেখে অন্য চারজন মেয়েও গোলযোগ করে, এ রকম পার্শিয়ালিটি চলবে না, আমাদেরও দিতে হবে।

হিনু বলে, শুক্তটা কেমন ক'রে বেঁধেছেন আমাদের একটু শিখিয়ে দিন না ঠাকুমা?

ঠাকুমা বলেন, এ শুক্তকে তিতা-ঝোলও বলে। পাঁচজনের খাওয়ার মত শুক্ত রাঁধতে হলে আধপোয়াটাক্ মটর ডাল ভিজিয়ে বেটে রাখা চাই। আর বাটতে হবে আধপোয়া পোস্ত আর আদা এক সঙ্গে ক'রে। দুটো করলা আধ আঙুলের মত লম্বা ক'রে কেটে ধুয়ে নিতে হবে। একেকটা করলায় বার টুকুরো হবে। আর গোটা চার-পাঁচ ঝিঙে খোসা ছাড়িয়ে অমনি লম্বা ক'রে কেটে দুটোতেই একটু নুন মাখিয়ে রাখ। কড়াতে তেল দিয়ে

বাটা-ডালগুলো বেশ ক'রে ফেনিয়ে বড় বড় ক'রে বড়া ভাজতে হবে, তাকে ঠিক বড়া না ব'লে বলা হয় চাপড়ি। তার পর কড়ার তেল গরম হলে তাতে রাঁধুনি-ফোড়ন দিয়ে করলাগুলো বাদামী ক'রে ভেজে তাতে ঝিঙেগুলো দিয়ে অল্প একটু নেড়ে জল দিতে হবে। করলাটা একটু ভাজা ভাজা না হলে ভালো সেদ্ধ হয় না। জলটা দু'চার বার ফুটলে তাতে বড়াগুলো আর আন্দাজ মত নুন দিয়ে দাও। তরকারি সেদ্ধ হয়ে যাবে আর অল্প জল থাকবে, তখন নামিয়ে ঐ আদা পোস্ত-বাটা দিয়ে নাড়ো। ঝোল থাকবে না, শুকিয়েও যাবে না। উনুনের উপরে পোস্ত দিলে একটু ছাড়া ছাড়া মতন হয়, আর পেতলের সরাতে না রেঁধে লোহার কড়াতে রাঁধলে এমন দুধের মত রং হবে না। আমাদের সময়ে এতে আমরা একটু ঘি দিয়েছি।

আমাদের সময়েই বা দেব না কেন?—চিনু ফোঁস ক'রে ওঠে।

ঠাকুমা বলেন, ঘি দেব? তোদের সময় ঘি পাব কোথায় যে দেব? দিলে ঐ ডালডা দিতে হবে ত? আরে রাম, রাম, তার চেয়ে ঘি না দেওয়াই ভালো।

শুক্ত দিয়ে চেটে-পুটে খেয়ে মিনু বলে, ওয়াণ্ডারফুল! আচ্ছা ঠাকুমা, ঠাকুরদাদাকে আপনি এমনি শুক্ত রেঁধে খাওয়াতেন ত? তাই তিনি আপনার অত বশ হয়েছিলেন। তাই না?

ঠাকুমা বলেন, সেকথা তোরা বুঝিস্ কোথায়? রান্নার ভার ছেড়ে দিয়েছিস্ ঝি-চাকরের হাতে—

তার পর ওদের পাতে পড়ে কচুর লতির বাটি-চর্চ্চড়ি।

এটা কি? কচুর লতি? ও বাবা, গলা ধরবে না ত?—মেয়েরা কণ্টকিত হয়ে ওঠে। চিনুকে আবার উষ্মা দেখায়, ঐ বুদ্ধু চাকরটা বাজারে গিয়ে এইসব কচু-ঘেঁচু নিয়ে এসেছে, আহাম্মক!

বিশাই ঘরেই ছিল, বলে, যা বলবে দিদিমণি এক রকম বল, একবার ইষ্টুপিট্ একবার আহাম্মক, এ ত ভালো শোনায় না—

ওরা হাসে। লতির তরকারি দিয়ে ভাত মেখে মুখে দিয়ে হিনু বলে, মিথ্যে ওকে বকিস্ নে চিনু, তরকারিটা ত চমৎকার হয়েছে!

সকলেই এতক্ষণে লতির চর্চ্চড়ি খেয়েছে, কেউ দুল দুলিয়ে, কেউ বিনুনী নাচিয়ে, কেউ হাত নেড়ে এই কচুর-লতির গুণ বর্ণনা করে। ঘি নেই গরম মসলা নেই, সামান্য পয়সার জিনিষ, অথচ খেতে কি ভালই না লাগছে। ও ঠাকুমা, এর প্রস্তুত-প্রণালীটা বলুন না। এগুলো জন্মায় কোথায়?

ঠাকুমা বলেন, কেন, তোরা কি নাৎজামাইদের রেঁধে খাওয়াবি নাকি।

দূ্যৎতোর, নিকুচি করেছে নাৎজামাইয়ের! নিজেই খেয়ে বাঁচব। সস্তায় এমন ভাল তরকারি! তরকারির বাজারেই আপনার এ লতি পাওয়া যাবে ত? যাবে? আচ্ছা এখন কি ক'রে রাঁধব ব'লে দিন?

ঠাকুমা বলেন, যেখানে কচুর ক্ষেত থাকে তার গোড়ায় গোড়ায় লতার মত লতিয়ে লতিয়ে যায় কচুর লতি। সেইগুলো তুলে এনে বাজারে বিক্রি করে মুঠো ক'রে বেঁধে। ধুয়ে নিয়ে ওর গায়ের ছাল ছাড়িয়ে আধ আঙুলের মত টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে অল্প জলে সেদ্ধ ক'রে জল নিংড়িয়ে রাখতে হবে। বাটতে হবে আন্দাজ মত লঙ্কা আর সরষে। বেশী হলে একটা নয়ত আধখানা নারকেল কুরিয়ে মিহি ক'রে বেটে ঐ লতিতে দিতে হবে, আর দিতে হবে নুন, একটু বেশী ক'রে সর্ষের তেল, ঐ সর্ষে লঙ্কা বাটা আর চেরা কাঁচা লঙ্কা। লতির সঙ্গে এগুলো বেশ ক'রে মেখে কচি কলাপাতায় পাত্ পাত্ ক'রে রেখে আরেকখানা পাতা দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ফেলতে হয়। নরম পাতা না হলে পাতাগুলো ছিঁড়ে যাবে। উনুনের উপরে সাঁড়াশী রেখে, নয়ত রুটি ভাজার চাটু বসিয়ে তার উপরে সেই কলাপাতার পুঁটুলিটা বসাতে হয়। একদিকের পাতা পুড়ে কালো হয়ে উঠলে সাবধানে উল্টিয়ে দিতে হবে। দু'দিকের পাতাই পুড়ে কালো হয়ে গেলে নামিয়ে পাতা ছিঁড়ে খেতে হবে।

এ ত বেশ মুখরোচক খাদ্য—একটি মেয়ে মন্তব্য করে।

ঠাকুমা বলেন, ওলো, আমরা সেকেলে মানুষ, তখনকার দিনে কথায় কথায় ভিয়েন বামুন এসে এখনকার মত চপ কাটলেট ভাজতে বসত না। সব বাড়ীর যজ্ঞি রান্নায় আমরা মেয়েরাই গিয়ে রেঁধেছি, মাছ-মাংসও থাকত, কিন্তু এই সব তুচ্ছ জিনিষকেও আমরা তুচ্ছ ভাবি নি।

মেয়েরা হার মানে, সত্যি বলেছেন, আপনার এ তুচ্ছ লতির চর্চ্চড়িকে শীগগির ভুলতে পারব না।

তাদের পাতে আরেকটা তরকারি দিয়ে ঠাকুমা বলেন, এর নাম ধ'রে ডাঁটার ক্যাচকা।

খ'রে ? সে আবার কি ? খরখরে হলেও একটা মানে হয়। ডাটার ত চর্চ্চড়ি হয়; ফ্যাচকা ? ব্যাপারটা কি ? কোলাহল ক'রে ওরা খেতে সুরু করে। এক-একখানা ডাঁটা মুখে দিয়ে ওরা প্রেমানন্দে চিবুতে থাকে, ও ঠাকুমা, এ-ও ত মন্দ নয়, ও ডাঁটা ডাঁটা রে, তোমার মহিমা অপার, ঝোলে থাকো, ঝালে থাকো, চর্চ্চড়িতে থাকো গো, এবার উদয় হলে ধ'রে ফ্যাচকার আকার—

আহা—হা—কবিতার ঢেঁকি রে, থামো এবার দেখি রে,—সকলে মিলে মিহুর সঙ্গীতে বাধা দেয়। বলে, আচ্ছা, এবার এই ফ্যাচকার জন্মবৃত্তান্তটি জানা যাক—ঠাকুমা বলুন, এক যে ছিল ডাঁটা—

ঠাকুমা বলেন, তোদের পেটের মধ্যে কলেজী বিদ্যে থৈ থৈ করছে, তার মধ্যে এই সব সেকেলে রান্নার বিদ্যের ঠাঁই হবে কি ? লড়াই লাগবে যে রৈ রৈ ক'রে।

লাগুক লড়াই, দুনিয়ার সর্ব্বত্র লড়াই চলছে, লড়াইকে আমাদের ভয় নেই। বলুন।

ঠাকুমা বলেন, কচি ডাঁটা দিয়ে ফ্যাচকা হয় না। ক্ষেতে থেকেই ডাঁটাগুলো যখন পেকে লাল হয়ে যায়, অর্থাৎ উপরটা শক্ত হয়ে যায়, ভেতরটা থাকে নরম মোমের মত, এই তোরা যাকে অন্তঃসলিলা বলিস্ সেই রকম আর কি, সেই ডাঁটাকেই খ'রে ডাঁটা বলে। সেই ডাঁটা এক আঙুলের মত ক'রে কুটে ধুয়ে রাখতে হবে। বাটতে হবে কিছুটা মটর ডাল ভিজিয়ে। উনুনে কড়ায় তেল গরম হলে চেরা কাঁচালঙ্কা আর কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে ডাঁটাগুলো ছেড়ে দিতে হবে। একটু নুন মিষ্টি দিয়ে নেড়ে-চেড়ে সেদ্ধ হবে এই পরিমাণে জল দিয়ে ঢাকা দিলে শীগ্‌গির ডাঁটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। ডাঁটা টিপে যখন দেখবে যে সেদ্ধ হয়েছে আর অল্প জল আছে, তখন বাটা ডালটা একটু জল দিয়ে গুলে তাতে ঢেলে দিয়ে নাড়বি। যারা বেশী ঝাল খায় তারা আরো দু'চারটি কাঁচালঙ্কা চিরে দিতে পারে। নাড়তে নাড়তে ডাঁটাগুলো ভাঙ্গো ভাঙ্গো হয়ে থকথকে মত হলে নামাবে। ঠাণ্ডা হলে আরেকটু শুকিয়ে যাবে।

মেয়েদের ডাঁটা চিবুনো শেষ হয়েছে, ওরা অন্য তরকারির প্রতীক্ষা করছে। ওদের পাতে তরকারি দিয়ে ঠাকুমা বলেন, এর নাম ডাল ছড়ানো আনাজ। কোনো কোনো ডালে কোনো কোনো তরকারি দেওয়া হয়, যেমন—লাউ, সিম, নয়ত ডাঁটা, নয়ত মূলো এই সব। তাতে একরকম কি দু'রকম তরকারি দেয়, তার তাতে ডালই থাকে মুখ্য, তরকারি গৌণ। কিন্তু এই ডাল ছড়ানো আনাজে তরকারিই মুখ্য, ডাল গৌণ, এতে শুধু ডালটা ছড়ানো থাকবে মাত্র। এই আনাজ রাঁধতে হলে মটর অথবা ভাজা মুগের ডাল চাই। এতে তরকারি চাই অনেকরকম, না হলে এর অঙ্গহানি ঘটে।

বিহু বলে, তাই ত দেখছি, বিশ্বের তরকারি ঠাঁই পেয়েছে এর মধ্যে।

হ্যাঁ—ঠাকুমা ব'লে যান, আলু, বেগুন, মিট্টিকুমড়ো, লাল আলু, কাঁচকলা, থোড়, ঝিঙ্গে, পটোল, কচুর মুখী, বরবটি বা বীন, সিম-মূলোর দিনে সিম-মূলো, কপির দিনে ফুলকপি, বাঁধা কপির পাতা খুলে খুলে, ডাটা, কাঁঠালের বীচি কোনোটা বাদ নেই। এ ছাড়াও এই আনাজের জন্য প্রয়োজন হয় লাউ বা কুমড়োর ডগা পাতা। তরকারিগুলো কাটতে হবে মোটা মোটা বড় বড় ক'রে। কাঁচালঙ্কা ছাড়া এতে অন্য কোনো মসলা লাগে না। পাঁচ-ছ'জনের তরকারির জন্য আধপোয়া ডালই যথেষ্ট। জল দিয়ে প্রথমে ডাল চড়াতে হবে। ডাল প্রায় সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে তরকারিগুলো ঢেলে দিয়ে নুন আর চেরা কাঁচালঙ্কা দিতে হয়। মুগের ডাল হলে একটু মিষ্টি দিতে হয়, মটর ডালে নয়। জল এমনভাবে দিতে হবে যে সেদ্ধ হবে, অথচ ডাল বা তরকারি কিছুই যেন গ'লে না যায়। সেদ্ধ হলেও ডালগুলো তরকারির গায়ে গায়ে আস্ত আস্ত থাকবে। ডাল অথবা তরকারি গ'লে গদ্‌গদে হয়ে গেলে এর স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। তরকারিগুলো আধা সেদ্ধ হলে লাউ বা কুম্‌ড়োর ডগা-পাতাগুলো ওতে দিয়ে দিতে হবে। ডাল তরকারি সব সেদ্ধ হয়ে গেলে নামাবে। তারপর কড়া চাপিয়ে তাতে তেল দেবে, মুগের ডালের আনাজ হ'লে একটু ঘি দিলেই ভালো। তেল অথবা ঘি যা-ই হোক সেটা পাকলে তাতে কয়েকটা শুকনো লঙ্কা ছিঁড়ে দেবে, সেটা কালো হলে চারুটি কালোজিরে দিয়ে তরকারিটা সাঁতলাতে হবে। ঝোল থাকবে না, মাখো মাখো হবে।

একজন বলে, আপনি ত দেখছি মটর ডাল ছড়িয়ে রেঁধেছেন, ডাল সেদ্ধ হয়েছে, অথচ আনাজের গায়ে গায়ে কেমন ছড়িয়ে আছে। দেখতে বেশ লাগছে। সামান্য হলেও এ রান্নার বাহাদুরী আছে, বুড়ী কন্দির দ্রৌপদী !

দুঃখের কথা এই যে, পঞ্চ দূরের কথা বুড়ীর একটিও স্বামী নেই ! হ্যাঁ ঠাকুমা, এমন সব রান্না খাইয়েও ঠাকুরদাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না ?

ঠাকুমা হেসে বলেন, নেমকহারাম, নইলে এমন হয়, খেয়েদেয়ে দিব্যি পাড়ি জমালো—

এটা আবার কি দিচ্ছেন? প্রশ্ন করে একজন।

কাঁচা মানকচু বাটা—মুখ টিপে হাসেন ঠাকুমা।

একে কচু, তাতে কাঁচা, ওরে প্রাণ বাঁচা বাঁচা—স্খলিত অঞ্চলে পঞ্চ বান্ধবী প্রায় লাফিয়ে ওঠে।

ঠাকুমা বলেন, আমার কাছে প্রাণ বাঁচাবার মন্ত্র আছে, তোরা নির্ভয়ে খা।

নির্ভয়ে নয়, ওরা ভয়ে ভয়েই মুখে দেয়—খেতে ত ওয়াণ্ডারফুল, কিন্তু এখন শেষ রক্ষে হ'লে হয়।

কিন্তু শেষরক্ষা হয়, গলা ধরে না, ফুরিয়ে গেলে ওরা আবার চেয়ে নেয়। ব্যাপার কি ঠাকুমা, কাঁচা মানকচুকে এমন বশ করলে কেমন ক'রে?

কৌশলে কি না হয়? গলা ধরে ব'লে মানকচুর তোরা আর কোনোদিন নিন্দে করবি? ওঝার হাতে পড়লে ভূতও ভাগে, তাই মানকচুও অহিংস বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

তার হিংসে দূর করলেন কেমন ক'রে?

তবে শোন্—ঠাকুমা সুরু করলেন, কচুর আগার দিকটা নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে শিল-নোড়াতে বাটতে হবে। খুব মিহি না করলেও মিহি হবে। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মিহি ক'রে সরষে বেটে রাখতে হবে, আর নারকেল কুরিয়েও মিহি ক'রে বাটতে হবে। সেই বাটা কচুকে বাটা সরষে নারকেল, অল্প তেল নুন দিয়ে মেখেই এই অপূর্ব্ব খাদ্য তৈরী হয়েছে।

সত্যি অপূর্ব্ব! এটা আবার কি?

শশার ঘণ্ট।

শশার ঘণ্ট? শশা ত ফলের সঙ্গে কেটে ঠাকুরকে ভোগ দেয়, নয়ত মুড়ির সঙ্গে খায়। শীতকালে মুড়ীর সঙ্গে খাইলে কচি শশা—আ—আ—

আঃ! জ্বালালে! থাম ত? সেই লাল বুড়ো শশাটা দিয়ে তুমি এমন সুন্দর ঘণ্ট করেছ—চিনু এতক্ষণে বিশাই-এর উপরে মনে মনে প্রসন্ন হয়েছে ব'লে মনে হয়, কেমন ক'রে রাঁধলে ঠাকুমা?

ঠাকুমা বলেন, তোরা মনে করিস, তোদের কচিদেরই বুঝি আদর, আর আমাদের মত পাকা বুড়ীর বুঝি আদর নেই! দেখছিস ত বুড়ো শশাকেও তোরা কত আদর করছিস—

ওরা পাঁচজনেই কল্লোলিত হয়ে ওঠে, সে কি ঠাকুমা, আপনারাই ত নাটের গুরু, কে বললে বুড়ীর আদর নেই? বুড়ী না থাকলে আমাদের মত ছুঁড়ীরা দাঁড়াবে কার কাছে? এখন বলুন শশা-ঘণ্ট উপাখ্যান—

ঠাকুমা বলেন, এই ঘণ্টের জন্য চাই ভিজে ছোলা। ছোলা তখন তখন ভেজালে চলবে না, ভেজাতে হবে কয়েকঘণ্টা আগে। চাই কয়েকটা ডালের বড়ি, একটু হলুদ বাটা, একটু জিরে-আদা বাটা, একটু দই, আর একটু ভালো ঘি। শশার খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে লাউঘণ্টের মত সরু সরু ক'রে কাটতে হয়। প্রথমে তেল চড়িয়ে ডালের বড়িগুলো বাদামী ক'রে ভেজে নামাবে। ফোড়ন দিতে হবে দুটি কাঁচা লঙ্কা, তেজপাতা আর জিরে। শশায় বেশী ঝাল মানায় না, তাই লঙ্কা বেশী না দেওয়াই ভাল। সেই তেলে হলুদ-বাটা দিয়ে একটু নেড়ে দিতে হবে আদা জিরে বাটা, আরো একটু নেড়ে দিতে হবে দই আর মিষ্টি। এ তরকারি একটু মিষ্টি হলে ভাল, তাই একটু বেশী মিষ্টি দিতে হবে। মসলাটা ভাজা হলে কোটা শশাটা তাতে ঢেলে দেবে। ভেজানো ছোলাগুলোও এই সময় ঢেলে দিয়ে মুখ ঢাকা দিয়ে দিতে হবে,। শশা থেকে জল উঠবে আর জল দেবার দরকার নেই। ঢাকনা খুলে মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে হবে। শশা সেদ্ধ হয়ে জল যখন ম'রে আসবে, তখন ভাজা ডালের বড়িগুলো গুঁড়িয়ে ওতে ফেলে দিয়ে জল শুকিয়ে গেলে, একটু আটা অথবা ময়দা গুলে নেড়ে নামাতে হবে। একটু ভালো ঘি দিতে পারলে ভালো, অভাবে একটু নারকেল কুরিয়ে বেটে দিলেও চলবে। মধুর বদলে গুড় আর কি?

ও বিশাই, বামুন ঠাকুরকে বল্ ওদের মাছ দিয়ে যেতে।

ঠোঁট উলটায় চিনু, যে না মাছ—বিশাই-এর প্রতি ওর মনটা আবার অপ্রসন্ন হয়। কি মাছ রে? প্রশ্ন করে বিনু।

বেলে মাছ—! বিড়বিড়িয়ে বলে চিনু।

মাছের মধ্যে বেলে, সাপের মধ্যে হেলে—বলে একজন : গেল, গেল, গেল ঐ বেলে মাছটা পালিয়ে, বাবুদের কপালে নেই কালিয়ে, তা' বেলে মাছের কালিয়া মন্দ কি ?

ঠাকুমা বলেন, কালিয়ে নয়, হয়েছে বেলে মাছ পোড়া—

—কচু পোড়া নয়, খেতে হবে মাছ পোড়া ! বলে হিন্থ ব'লে মেয়েটি।

শ্রীবৎস রাজার হাত থেকেই না পোড়া মাছ পালিয়ে গেছিল—বিহু বলে।

এ পোড়া মাছ পালাবে না ভয় নেই—খেয়ে দেখ, তোদের ঐ শিককাবাব টাবাবের চেয়ে কম যাবে না।

—পোড়া মাছ মুখে দিয়ে মেয়েরা খুশী হয়, তাই তো দেখছি, তা' দগ্ধ হয়ে বেলে মৎস্য এমন সুস্বাদু হ'ল কেমন ক'রে ?

ঠাকুমা বলেন, বেলে মাছ কুটে ধুয়ে নিতে হবে, মাথা থাকবে না। তাতে নুন হলুদ মাখিয়ে একটা শিকে বিঁধিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নিতে হবে। গনগনে আগুনে ফেলে দিলেও হয়, কিন্তু তাতে ছাইটাই লাগতে পারে। পুড়ে উপরটা কালো হবে আর মাছটা নরম হলে নামিয়ে রেখে ঠাণ্ডা হলে কালো কালো পোড়া ছালটা ফেলে কাঁটা বেছে ফেলতে হবে। তাতে তেল নুন কাঁচা লঙ্কা আর মিহি ক'রে বাটা সামান্য একটু সর্ষে দিয়ে বেগুন পোড়ার মত ক'রেই মাখতে হবে। তারপরে খেয়ে ত দেখেছিস।

চমৎকার ! খুব ভালো ! বেশ !—একজনকে ছাড়িয়ে আরেক জনের গলা চ'ড়ে ওঠে।

চিনু বলে, আমাদের আধুনিকাদের মন ভোলাবার জন্য তুমি সবই কি পৌরাণিক রান্না রেঁধেছ নাকি ঠাকুমা ? —চিনু ঠাকুমার মুখের দিকে চায়।

ঠাকুমা হেসে বলেন, সেকেলে হলেও আমি একালে এ'সে পৌঁছেছি। সেকালের সঙ্গে একালের সামঞ্জস্য না রাখতে পারলে টিকতে পারব কেন রে ? ঠাকুরকে দিয়ে র'াধিয়েছি চিংড়ি মাছের মালাই কারি।

ঠাকুর মালাইকারির কাঁসী ধ'রে নিয়ে আসে। মেয়েরা হর্ষধ্বনি ক'রে ওঠে। আগে দর্শনধারী, পিছে গুণ বিচারি—ঠাকুমা, আপনার মালাইকারির রূপ দেখেই আমরা মোহিত হয়ে গেছি, খাবার আর দরকার নেই। এটা কি ক'রে র'াধা হয় ?

ঠাকুমা বলেন, শুধু জিওমেট্রি আর অ্যালজেব্রাই জানিস, আর কি জানিস তোরা ?

আপনারা যা শেখাচ্ছেন, তাই শিখছি। নাঃ, এবার দেখি রান্না শিখতেই হবে। মোটামুটি ডাল ভাত মাছের ঝোল র'াধতে জানলে কি হয়, এসব রান্নাও শিখতে হবে ত ? বলুন—

ঠাকুমা বলেন, বাগদা অথবা মোচা চিংড়ি কুটে ধুয়ে হলুদ নুন মাখিয়ে রাখবে। দুটো নারকেল কুরিয়ে বেটে গরমজলে ফেলে চটকিয়ে ছিবড়ে ফেলে পাৎলা ন্যাকড়ায় ছেঁকে দুধটা রাখবে। হলুদ লঙ্কা আর জিরে আদা বেটে নেবে পরিমাণ মত। কড়াতে তেল দিয়ে জিরে তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে মাছগুলো ছেড়ে দিয়ে নাড়বে। বেশী ভাজবে না। কয়েক টুকরো আলু কুটে ধুয়ে নুন হলুদ মেখে আগেই ভেজে নামিয়ে রাখবে। এখন মাছে ঐ বাটা মসলাটা দিয়ে একটু দই একটু মিষ্টি দিয়ে একটু ভেজে নারকেলের দুধটা দেবে, আলুগুলোও দেবে, আর জল লাগবে না। গরম মসলা থেঁতো ক'রে আর দু'চারখানা তেজপাতা ফেলে দিয়ে ঢেকে দেবে। আলু সেদ্ধ হয়ে পরিমাণ মত ঝোল থাকলে নামাতে হবে। ভালো ঘি থাকলে দিতে পার।

টক আর দই মিষ্টি খেয়ে মেয়েরা হৈ হৈ ক'রে উঠে পড়ে। খাবার টেবিলে ব'সে আমরা রান্নায় পারদর্শিনী হয়ে গেলাম, কলঘর থেকে এসে ওরা পান খায়।

—•—

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন, বিদেশী-কবল-মুক্ত। কত ফাঁসী, কত দ্বীপান্তর, কত তিলে তিলে নির্যাতন সহ্য করা, কত বেত আর ব্যাটনের প্রহার, ঘোড়ার পদতলে কত পিষ্ট দলিত হওয়া, পুলিস ও মিলিটারীর গুলীর সামনে গিয়ে নিজের বুক পেতে দেওয়া—এ সবই রয়েছে স্বাধীন ভারতবর্ষের ভিত্তির নীচে গাঁথা। সেই ভিত্তি গ'ড়ে তুলেছিলেন বহু অজ্ঞাত অখ্যাত সৈনিক। আজ আমি শুধু তাঁদেরই কয়েকজন নারীর কথা এখানে লিপিবদ্ধ করব যাঁরা আমাদের জানা অথবা পরিচিত।

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপী আমাদের শোচনীয় সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটেছিল, সেই মানসিক ও সামাজিক বিপ্লবের সুযোগ পেয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে নেমে এলেন প্রতিভাশালিনী নারী সরলা দেবী চৌধুরাণী। সমগ্র জাতিরই তিনি একজন অগ্নিবাহিকা নেত্রী। যে সময় আমাদের সমাজের মেয়েরা বাড়ীতে পর্দার আড়ালে শুধুই ঘরকন্না করেছেন, সমাজের সেই অন্ধকারের মধ্যে সরলা দেবী ১৮৯০ সালে ১৭ বছর বয়সে ইংরেজীতে অনার্স-সহ বি-এ পাস করেন।

সরলা দেবী বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাঙালী জাতির মধ্যে শরীরচর্চার উৎসাহ দেবার জন্য, শৌর্যে-বীর্যে মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড় করাবার জন্য ব্যায়ামচর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন কুস্তীগির ও পালোয়ানদের কাছে। দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার জন্য তিনি ১৯০৩ সালে কলকাতায় "প্রতাপাদিত্য উৎসব", ১৯০৪ সালে "বীরাষ্টমী ব্রত" এবং পরে "উদয়াদিত্য উৎসব" অনুষ্ঠিত করেন।

তাঁর "উদয়াদিত্য উৎসবে" স্টেজের উপরে একখানি তরবারি রাখা হ'ত। সভাসীনেরা বীর উদয়াদিত্যকে স্মরণ ক'রে তাতে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। যুবমনে উৎসাহের একটা প্রবল জোয়ার এসে ধাক্কা দিত। "প্রতাপাদিত্য উৎসবে" কেবলমাত্র একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হ'ত—প্রতাপাদিত্যের জীবনী। এই উৎসবে বাঙালী কুস্তীগির, তলোয়ারধারী, বক্সিং খেলোয়াড় ও লাঠিবীরদের খেলার প্রদর্শনী হ'ত।

১৯০৫ সালে বেনারস কংগ্রেস অধিবেশন মণ্ডপে সভাপতি গোখলে সরলা দেবীকে "বন্দেমাতরম্" গানটি গাইতে অনুরোধ করেন। সরলা দেবী "সপ্তকোটি"কে চট্ ক'রে "ত্রিংশকোটি" ক'রে দিয়ে তাঁর কণ্ঠের সকল মধু ঢেলে যে-গান গেয়েছিলেন তাতে দূর দূর প্রান্ত থেকে সমাগত স্বদেশভক্তগণ মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। "বন্দেমাতরম্" গানের প্রথম সুর তাঁরই দেওয়া রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দু' লাইনের সুর নিজে বসিয়েছিলেন।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সমগ্র ভারতব্যাপী বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আয়োজন হয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), ও রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে। উত্তর-ভারতের সৈনিক-বিদ্রোহ ও বিপ্লবের নেতৃত্ব ছিল রাসবিহারী বসুর উপর। বাংলা দেশ ও পূর্ব-ভারতের নেতৃত্ব ন্যস্ত ছিল যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর। কৃপাল সিং নামক একজন কর্মীর বিশ্বাসঘাতকতায় উত্তর-ভারতের বিপ্লব সফল হ'তে পারে নাই।

জার্মানীর নিকট থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে ভারতীয় বিপ্লবীরা ইংরেজকে বাংলাদেশে আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। জার্মানীর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 'মাভেরিক' নামে একটি জাহাজের ভারতবর্ষে আসবার কথা ছিল। এই বৈদেশিক বিভাগের ভার ছিল যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপর।

চেকোস্লোভাকদের বিশ্বাসঘাতকতায় 'মাভেরিক' আর অস্ত্র নিয়ে ভারতে পৌঁছাতে পারল না। ভারতীয় বিপ্লবীদের সমস্ত খবর ইংরেজ জেনে ফেলে। ভারতে বিপ্লবীদের ঘাঁটিগুলির উপর ইংরেজ নির্মমভাবে আঘাত হানতে থাকে। বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরের খণ্ডযুদ্ধে নিহত হন ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর। দেশময় ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অত্যাচার শুরু হয়। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও ইংরেজের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য ক'রে পূর্ব-ভারতের

পথ ধ'রে চীন শ্যাম ও আসামের ভিতর দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র আনিয়ে ভারতে বিপ্লব ঘটাবার জন্য বিপ্লবীরা আর একটা বিপুল প্রচেষ্টা করেছিলেন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে।

চারিদিকে চলেছে তখন ব্রিটিশ শক্তির নির্মম অত্যাচার। চলেছিল ফাঁসী, দ্বীপান্তর, পুলিসের নির্যাতনে পাগল হয়ে যাওয়া এবং দালান্দা হাউসে নিয়ে গিয়ে চার্লস টেগার্টের তদারকে মলদ্বারে রুলার ঢোকানো, কমোড থেকে মলমূত্র এনে মাথায় ঢেলে দেওয়া, কয়েকদিন উপবাস করিয়ে পিছনে হাতকড়া অবস্থায় বন্দীকে দাঁড় করিয়ে রেখে লাথি ও রুলের প্রহার।

এই রকম বিপদসঙ্কুল দিনে ননীবালা দেবী আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন অমর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পলাতক বিপ্লবীদের রিষড়া ও চন্দননগরে। ১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে রামচন্দ্র মজুমদার স্টেট প্রিজনার হবার সময় একটা Mauser পিস্তল কোথায় রেখে গেছেন জানিয়ে যেতে পারেন নি। বিধবা ননীবালা দেবী রামচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী সেজে প্রেসিডেন্সী জেলে রামবাবুর সঙ্গে ইণ্টারভিউ নিয়ে জেনে আসেন পিস্তলের গুপ্ত খবর। ১৯১৫ সালে যে যুগ ছিল তখন বাঙালী বিধবার পক্ষে পরের স্ত্রী সেজে পুলিসের ক্রূরদৃষ্টিকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে জেলের ভিতর থেকে খবর নিয়ে আসার কথা কোনো সাধারণ মেয়ে বা পুলিস কল্পনাও করতে পারত না। সেদিনকার নারী তৈরি ক'রে দিয়ে গেছেন আমাদের যুগের বিপ্লবী নারীকে।

পুলিস ক্রমে জানতে পারল, ননীবালা দেবী রামবাবুর স্ত্রী নন। ওদিকে চন্দননগরের বিভিন্ন স্থানে তল্লাসী ও বিপ্লবীদের নিমেষে পলায়নের পর পুলিস ননীবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করতে তৎপর হয়ে উঠল। ননীবালা দেবী পলাতক হলেন। তাঁর এক বাল্যবন্ধুর দাদা কর্মোপলক্ষ্যে পেশোয়ার যাচ্ছিলেন। ননীবালা দেবী পলাতক অবস্থায় তাঁর সঙ্গে পেশোয়ার চ'লে গেলেন।

পুলিস খুঁজে খুঁজে সেখান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে আসে কাশীর জেলে। স্বীকারোক্তি আদায় করবার জন্য তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। জমাদারণীকে দিয়ে তাঁকে উলঙ্গ করিয়ে তাঁর শরীরের অভ্যন্তরে লঙ্কা দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর জেল গেটে এনে আবার পুলিসের জেরা—কি জান বল, নইলে আরো শাস্তি পেতে হবে। ননীবালা দেবীর চোখে আগুন ছুটছে তখন।

—যা খুশি করতে পারেন, আমি কিছু বলব না।

কাশীর জেলে প্রাচীরের বাইরে মাটির নীচে একটা "পানিশ্‌মেণ্ট্‌ সেল" ছিল। তাতে দরজা ছিল একটা কিন্তু আলো বাতাস প্রবেশ করবার জন্য অন্য কোনো জানালা ছিল না। সেই সেলের মধ্যে দুই দিন প্রায় আধঘণ্টা ও তৃতীয় দিনে প্রায় ৪৫ মিনিট সময় ননীবালা দেবীকে তালাবদ্ধ ক'রে আটকে রাখে। কবরের মতো সেলে প্রথম দুই দিনে আধঘণ্টা পরে দেখা যেত তাঁর প্রায় অর্দ্ধমৃত অবস্থা। তৃতীয় দিনে দেখা যায়, ননীবালা দেবী প'ড়ে আছেন মাটিতে জ্ঞানশূন্য। তবু তাঁকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করাতে পারে নি।

পুলিস তাঁকে কাশী থেকে নিয়ে এল কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে। সেখানে তিনি অনশন করলেন। প্রতিদিন তাঁকে গোয়েন্দা অফিস ইলিসিয়াম রোতে নিয়ে যেত। সেখানে আই. বি. পুলিসের স্পেশাল সুপারিন্‌-টেণ্ডেণ্ট্‌ গোল্ডি (Goldie) তাঁকে জেরা করত।

—আপনাকে এখানেই থাকতে হবে, কি করলে খাবেন ?

—আমাকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্ত্রীর কাছে রেখে দিন, তাহলে খাব।

—দরখাস্ত লিখে দিন।

ননীবালা দেবী তখুনি দরখাস্ত লিখলেন। গোল্ডি সেটা ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে টুকরিতে ফেলে দিল। অমনি যেন বারুদে আগুন পড়ল। বাঘিনী লাফিয়ে উঠে গোল্ডির মুখে এক চড় বসিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় থাপ্পড় মারবার আগেই তাঁর উদ্যত হাতকে অন্যান্য গোয়েন্দা কর্মচারীরা ধ'রে ফেলল।

—ছিঁড়ে ফেলবে ত আমায় দরখাস্ত লিখতে বলেছিলে কেন ? আমাদের দেশের মানুষের মান-সম্মান থাকতে নেই ?

ননীবালা দেবীকে করা হ'ল ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে স্টেট্‌ প্রিজনার ১৯১৭ সালে। তিনিই বাংলা-দেশে একমাত্র মহিলা স্টেট প্রিজনার।

প্রেসিডেন্সী জেলের মধ্যে সিউড়ির দুকড়িবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'ল। ননীবালা দেবী জানতে

পেলেন যে, সিউড়িতে দুকড়িবালা দেবীর বাড়ীতে রডা কোম্পানী থেকে চুরি ক'রে আনা সাতটা Mauser পিস্তল তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন ব'লে তাঁর দুবছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁকে করা হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী। ডাল ভাঙছেন তিনি প্রতিদিন আধমণ।

ননীবালা দেবী তখন কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, ব্রাহ্মণ-কন্যা তাঁর জন্য রান্না ক'রে দিলে তিনি খাবেন। তাই হ'ল। ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন দুকড়িবালা দেবী। দুই রাজনৈতিক ব্রাহ্মণকন্যা জেলখানাতে সংসার পেতে বসলেন। ননীবালা দেবী মুক্তি পেয়েছিলেন ১৯১৯ সালে, দুকড়িবালা দেবী ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে।

ওদিকে ময়মনসিংহের ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরী ১৯১৬-১৭ সালে পলাতক বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি ৮।১০ জনকে আশ্রয় দিতে দিতে উল্কার মতো ছুটে বেড়িয়েছেন বাংলাদেশ ও আসামের অসংখ্য স্থানে প্রায় এক বছর। পুলিস ধরি ধরি ক'রেও কোনোদিন হদিস করতে পারে নাই।

কলিকাতার তিলজলা রেলওয়ে ক্যাবিনের দেবেন ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী সিন্ধুবালা দেবী ১৯১৭ সালে তাঁদের রেলওয়ে কোয়ার্টার্সে আশ্রয় দিয়েছিলেন ভূপেন্দ্র দত্ত, অমর চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল চক্রবর্তী, প্রভৃতি পলাতক বিপ্লবীদের। পুলিস প্রায় আসন্নপ্রসবা সিন্ধুবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের বাঁকুড়ার ইন্দাস গ্রাম থেকে। তাঁকে স্টেশন পর্যন্ত অনেকখানি রাস্তা হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই বছরে হুগলীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি অখিলচন্দ্র দত্ত এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন। বাংলার তৎকালীন গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডশে বিধান-পরিষদে এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ফলে সিন্ধুবালা দেবী মাসখানেক বাঁকুড়া জেলে আটক থাকার পর মুক্তি পান।

বিপ্লবীদের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের পর ১৯২১ সালে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জন্মগ্রহণ করে। ১৮৯০ সালের কলকাতা অধিবেশনে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী কংগ্রেস সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে বক্তৃতা দেন। স্বর্ণকুমারী দেবীও কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেন। তিনি মহিলাদের মধ্যে স্বদেশী প্রচারের চেষ্টা করেন।

অনেক ভাঙা-গড়ার পর মহাত্মা গান্ধী এসে কংগ্রেসে যোগদান করেন ১৯১৯ সালে। ১৯২১ সালে তাঁর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। অধিকাংশ বিপ্লবী দলই ১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন।

এই আন্দোলন ভারতীয় নারী-জাগৃতির সর্বাপেক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধি। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও ভগ্নী উর্মিলা দেবী প্রথম অগ্রণী হয়ে জনসাধারণের মধ্যে নেমে এসে কারাবরণ করেন। নারীজাতি সাড়া দিয়ে উঠলেন। কাতারে কাতারে তরুণ ছেলের দল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জেলখানা মাতিয়ে তুললেন। অনেক মহিলাই কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে পরবর্তী আন্দোলনের জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। লতিকা ঘোষ এবং অরু সেন, প্রভৃতি মেয়েদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার কাজ করতে থাকেন। কলকাতায় কল্যাণী দাস ছাত্রীসংঘ গঠন ক'রে ছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ'ড়ে তুলতে প্রয়াস পান। ঢাকায় লীলা নাগ তার আগে থেকেই দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে, মেয়েদের সচেতন ক'রে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। অন্যান্য জেলাতেও তখন এরূপ নারী-সংগঠনের কাজ আরম্ভ হয়েছিল।

লতিকা ঘোষ ছিলেন কলকাতা কংগ্রেসের নারী-স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত। একটা অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দেয় মেয়েদের মধ্যে। সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে সমগ্র স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী সেদিন কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুকে নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে হাওড়া স্টেশন থেকে কংগ্রেস মণ্ডপ পর্যন্ত মার্চ ক'রে চলেছিল।

১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালে গান্ধীজী কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন। ১৯৩০ সালে গান্ধীজী স্বয়ং ডাণ্ডি অভিযান করেন এবং লবণ আইন অমান্য করেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষ সমুদ্রের তরঙ্গের মতই আন্দোলিত হ'তে থাকে। মেয়েরা বাঁধভাঙা জলরাশির মতো ছুটে এগিয়ে আসতে লাগলেন। হেমপ্রভা মজুমদার, মোহিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, লাবণ্যপ্রভা দত্ত,

উর্মিলা দেবী, শান্তি দাস (কবীর), বিমলপ্রতিভা দেবী, নেলী সেনগুপ্তা, প্রভৃতি নারী-আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁরা গ্রামে ও শহরে বক্তৃতা দিয়ে নারীসাধারণকে জাগ্রত করতে থাকেন এবং সদলবলে গ্রেপ্তার হতে থাকেন।

জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ১৯২০ সালে কলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে প্রথম নারী স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী সংগঠন ক'রে সকলকে বিস্মিত ক'রে দেন।

লাবণ্যপ্রভা দত্ত শুধু যে ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে দলে দলে মেয়েদের সংগঠন ক'রে দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জেলে পাঠিয়েছেন এবং নিজে বার বার কারাবরণ করেছেন তাই নয়, ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভানেত্রীও ছিলেন। "ভারত ছাড়" আন্দোলনের সময় অত্যন্ত দুর্যোগের মধ্য দিয়ে তিনি কংগ্রেসের কাজ পরিচালনা করেছিলেন।

১৯৩০ সালে নেলী সেনগুপ্তা নিষিদ্ধ জনসভায় বক্তৃতাদান কালে গ্রেপ্তার হন এবং কারাবরণ করেন। তিনি ১৯৩৩ সালে কলকাতার বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন। অধিবেশনের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন।

১৯৩০ সালে গান্ধীজী নারীকে অহিংস আন্দোলনে পুরুষের অপেক্ষা অধিক যোগ্য ব'লে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁদের তিনি বিদেশী জিনিসের দোকানে পিকেটিং করতে এবং আইন অমান্য করতে আহ্বান করেছিলেন। ভারতের নারী যেন শত বছরের জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠলেন।

১৯৩০ সালের ১৩ই মার্চ বাংলাদেশের কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী ও নেত্রী কলকাতায় "নারী সত্যাগ্রহ সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি কংগ্রেসের বাহিরে ছিল। সভানেত্রী উর্মিলা দেবী, যুগ্ম-সম্পাদিকা শান্তি দাস (কবীর) এবং বিমলপ্রতিভা দেবী।

বাঙালী-অবাঙালী নির্বিশেষে সকল প্রদেশের মহিলাগণ এই সমিতিতে যোগদান ক'রে কাতারে কাতারে কারাবরণ করেন। তাঁরা কলকাতার বড়বাজার, বৌবাজার, নিউমার্কেট, প্রভৃতি ব্যবসাকেন্দ্রে গিয়ে দোকানের সামনে পিকেটিং করতেন। ফলে পুঁজিপতিদের বিদেশী মাল গুদাম ও গদীতেই বস্তাবন্দী রইল। বড়বাজারের বিলিতি বাজার মিলিটারী ছাউনীতে পরিণত হ'ল। পুলিস দলে দলে মহিলাদের গ্রেপ্তার ক'রে ভ্যানে তুলে নিয়ে চ'লে যেত।

শোভাযাত্রার দু'একটি কাহিনী উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীতে সমস্ত কলকাতা শহরে ১৪৪ ধারা জারী ছিল। "নারী সত্যাগ্রহ সমিতি" সেদিন ঐ আইন ভঙ্গ ক'রে শোভাযাত্রা পরিচালিত করেন কলেজ ষ্ট্রীট থেকে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত। শোভাযাত্রা এসে পৌঁছাল দেশবন্ধু পার্কে। অগণিত নরনারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে পার্কের ভিতর প্রবেশ করলেন জলস্রোতের মতো। সার্জেণ্ট, ঘোড়সোয়ার ও পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁদের উপর। বেথুন কলেজের ছাত্রী ইলা সেন ইওরোপীয়ান অশ্বারোহী অফিসারকে বাধা দেবার জন্য দৃঢ়মুষ্টিতে তার ঘোড়ার লাগাম ধ'রে ফেললেন। ঘোড়াটা লাফিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ইলা সেনও লাগাম-ধরা অবস্থায় শূন্যে ঝুলতে থাকেন। ঘোড়ার সঙ্গে তাঁর ওঠানামা চলতে থাকে। ক্ষীণাঙ্গী নারীর অদ্ভুত সাহস সেদিন পুলিসকে স্তম্ভিত করেছিল। ওরই মধ্যে বিশাল জনতার সামনে সভানেত্রীর ক্ষুদ্র ভাষণের পর সম্পাদিকাদ্বয়ের "বন্দেমাতরম্‌" ধ্বনির মধ্য দিয়ে সভা ভঙ্গ হয়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার শুরু হয়ে যায়।

১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে যে ঘটনা ঘটেছিল তাও অবিস্মরণীয়। সেদিন কলকাতার সমস্ত বড় বড় পার্ক এবং অক্টারলোনী মনুমেণ্ট অজস্র পুলিস ও ঘোড়সোয়ার ঘিরে রাখে, যাতে সেখানে গিয়ে কেউ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে না পারে। কিন্তু দলে দলে মহিলা এই ব্যূহ ভেদ ক'রে মনুমেণ্টের তলায় পৌঁছবার জন্য অগ্রসর হন। লাঠি চার্জের আঘাতে এবং ঘোড়ার পদতলে বহু নারী আহত ও পিষ্ট হয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু তারই ভিতর থেকে দুচার জন নারী মাটিতে প'ড়ে আহত হয়েও আবার উঠে দৌড়ে গিয়ে মনুমেণ্টের তলায় পৌঁছেই উড়িয়ে দিয়েছেন জাতীয় পতাকা—ঘোষণা করেছেন স্বাধীন ভারতের জয়ধ্বনি। তারপর আরম্ভ হয় দলে দলে গ্রেপ্তার।

ওদিকে ঢাকায় আশালতা সেনের নেতৃত্বে "সত্যাগ্রহী সেবিকা-দল" সমস্ত ঢাকা ও বিক্রমপুরের মহিলাগণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন। সেবিকা-দলের কর্মীগণের অনেককে পুলিস গ্রেপ্তার না ক'রে এমন ভাবে ধাওয়া করত যেন

তারা কোথাও আশ্রয় না পান। সুরবালা সেনের পরিচালনায় শোভাযাত্রাকারী এমনই একদল মহিলাকে পুলিস দুই দিন দুই রাত্রি ধ'রে অবিরাম মাঠঘাটের ভিতর দিয়ে ঘোরাতে থাকে। অবশেষে একটা নৌকায় তাঁদের উঠিয়ে নিয়ে মাঘ মাসের শীতের মধ্যে রাত্রির গভীর অন্ধকারে এক নির্জন নদীর ধারে নামিয়ে রেখে নৌকা নিয়ে চ'লে যায়। বিপন্ন মহিলাগণ তখন দুর্গম মাঠের পথ পার হয়ে এসে অনাহারে অনিদ্রায় একটা গ্রামে পৌঁছে গ্রামবাসীদের সাহায্য পান।

ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার গালিমপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠক থেকে সুনীতি বসু ও উষা গুহকে পুলিস গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গিয়ে হাঁটাতে থাকে বিকাল ৪টা থেকে। অনেক মাইল হাঁটিয়ে একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাঁদের ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে রেখে চ'লে যায়। বেতঝোপটা এত ঘন ছিল যে, আকাশও দেখা যাচ্ছিল না। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসাও অসম্ভব। গালিমপুরের জঙ্গলে বাঘ থাকত। ভোর হলে পুলিস দেখে, ঐ নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দুটি গান্ধী-অনুগতা স্বদেশভক্ত নারী তখনো বেঁচে আছেন, বাঘে খায় নি। তারপর নিয়ে যায় তাঁদের থানায়।

শুধু ঢাকা ও কলকাতায় নয়। কুমিল্লার লাবণ্যলতা চন্দ তাঁর প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ ত্যাগ ক'রে অভয় আশ্রমে যোগদান করেন এবং আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। মেদিনীপুরের চারুশীলা দেবী সেখানকার দলবদ্ধ মেয়েদের নিয়ে লবণ আইন অমান্য করতে থাকেন। উত্তরবঙ্গের শশীবালা দেবীর প্রচারকার্য অভিনব ছিল। সফরকালে ট্রেনে যেতে যেতে যখন ট্রেন কোনো স্টেশনে একটু বেশীক্ষণ থামত, তিনি সেখানেই নেমে প'ড়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে সাড়া জাগিয়ে তুলতেন। সরলাবালা দেব "শ্রীহট্ট মহিলা-সংঘ" গঠন ক'রে সমগ্র শ্রীহট্টকে আন্দোলনে তোলপাড় ক'রে তোলেন। বালুরঘাটে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন প্রভা চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি। ফরিদপুর রাজবাড়ীর নেত্রী ছিলেন চারুপ্রভা সেনগুপ্ত। বরিশাল ভোলার সরযুবালা সেন, বানরিপাড়ার ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা সেদিকের আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। সুরেন্দ্রবালা রায় মালদহের এবং সুশীলা মিত্র নোয়াখালির আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। এইভাবে খুলনা, বাঁকুড়া, কাটোয়া, গাইবান্ধার আন্দোলন পরিচালনা ক'রে কারাবরণ করেছিলেন স্নেহশীলা চৌধুরী, শতদল সরকার, সুরমা দেবা, দৌলতন্নেসা খাতুন, প্রভৃতি। সর্বত্রই পুলিসের নির্মম অত্যাচার ও লাঞ্ছনা পূর্ণোদ্যমে বজায় ছিল। নারী অকুতোভয়ে বন্যার বেগে গিয়ে কাতারে কাতারে জেলখানা ভ'রে ফেলেছিলেন।

এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি ১৯৩০ সন থেকে বিপ্লবী আন্দোলনেও মেয়েরা সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

১৯৩০ সনে ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়। সুহাসিনী গাঙ্গুলী অন্যের স্ত্রী সেজে চন্দননগরে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পলাতক বিপ্লবী অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, প্রভৃতিকে আশ্রয় দেবার জন্য গ্রেপ্তার হন ও পরে মুক্তি পান।

১৯৩০ সনে ২৫শে আগস্ট কলকাতায় ডালহাউসি স্কোয়ারে চার্লস্ টেগার্টের উপর বোমা পড়ে। কমলা দাশগুপ্ত, শোভারাণী দত্ত এবং সত্যরাণী দত্ত এ সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। সে সময়ে বিপ্লবী কাজের জন্য যে শতাধিক টি. এন. টি. বোমা তৈরী হয়েছিল সেগুলি সব কমলা দাশগুপ্তের কাছে নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছিল। তিনি সেগুলি রক্ষা করতেন এবং চিহ্নিত লোকের কাছে পৌঁছে দিতেন। শোভারাণী দত্ত ঐ মামলার পলাতক বিপ্লবা মনোরঞ্জন রায়কে আশ্রয় দান করেন। সত্যরাণী দত্তের স্বামী সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময় ঢাকার রেণু সেনকেও কলকাতায় গ্রেপ্তার করে। এই চারজন মহিলা কিছুদিন হাজতবাসের পর প্রমাণ অভাবে মুক্তি পান।

অসীম স্পর্দ্ধা নিয়ে মেয়েরা একে একে প্রত্যক্ষ-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৩১ সনের ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লায় কিশোরী দুটি মেয়ে শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী ম্যাজিস্ট্রেট ষ্টিভেন্সকে গুলী ক'রে নিহত করেন। ছোট্ট দুটি মেয়ে যেন ধূমকেতুর মত সমগ্র দেশকে তোলপাড় ক'রে দিয়ে গোটা সমাজের হয়ে শাস্তি বহন করতে কারান্তরালে চ'লে গেলেন, দেশবাসীকে চাঞ্চল্যে ও বিস্ময়ে হতবাক্ ক'রে দিয়ে।

কলকাতায় বীণা দাস গভর্ণর স্ট্যানলী জ্যাকসন্‌কে গুলী করেন কন্‌ভোকেশান হলে ডিগ্রী আনবার সময়। কেঁপে উঠেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি।

চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলীর ইংরেজদের ক্লাব আক্রান্ত হয়। প্রীতিলতা আত্ম-বলিদান ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ী হন। চট্টগ্রামের কল্পনা দত্ত অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে পলাতক জীবন যাপন করেন। গাহিরা নামক স্থানে মিলিটারীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করতে করতে তিনি গ্রেপ্তার হন।

দার্জিলিং লেবং-এর মাঠে গভর্ণর এ্যাণ্ডারসনকে গুলী করবার জন্য ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি বন্দ্যোপাধ্যায়কে দার্জিলিং-এ লুকিয়ে রিভলভার পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন উজ্জ্বলা মজুমদার। পারুল মুখোপাধ্যায় টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন। জ্যোতিকণা দত্ত ডায়োসেসান কলেজের বোর্ডিং-এ রিভলভার রাখার জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন। বনলতা দাশগুপ্ত তাঁকে রিভলভার রাখতে দেন এবং তিনি হিজলীতে রাজবন্দীরূপে আটক থাকেন। সাবিত্রী দেবী এবং ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস চট্টগ্রামে পলাতক বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনকে আশ্রয় দেবার অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত হন।

কানপুরের সুনীতি দেবী ও তাঁর কন্যা মায়া দেবী ছিলেন উত্তর-প্রদেশের বিখ্যাত বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের বিপ্লবী দলের কর্মী। মায়া দেবী ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় কলকাতায় গ্রেপ্তার হন এবং পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সুনীতি দেবী রাজবন্দী হন।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বিপ্লবী নারীর ক্রিয়া-কলাপে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তারা সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য দলে দলে মেয়েদের বিনাবিচারে বন্দী বা রাজবন্দী (ডেটিনিউ) করতে আরম্ভ করে। কুমিল্লায় শান্তি সুনীতির ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার পরদিনই কুমিল্লা থেকে প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম এবং চট্টগ্রামের ইন্দুমতী সিংহকে গ্রেপ্তার ক'রে রাজবন্দী করে। ঢাকা থেকে লীলা রায়কে রাজবন্দী করে। লীলা রায় ঢাকার দীপালি সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী এবং শ্রীসংঘ নামক বিপ্লবী দলের নেত্রী ছিলেন। তাঁর সহকর্মীরূপে রাজবন্দী হন রেণু সেন, হেলেনা দত্ত, প্রমীলা গুপ্ত এবং সুশীলা দাশগুপ্ত। কলকাতা থেকে রাজবন্দী হলেন, যুগান্তর দলের কর্মী সুহাসিনী গাঙ্গুলী, কমলা চট্টোপাধ্যায় (ময়মনসিংহ), কমলা দাশগুপ্ত, ইন্দুসুধা ঘোষ, কল্যাণী দাস, শোভারাণী দত্ত। রাজবন্দী হয়েছিলেন অনুশীলন দলের প্রতিভা ভদ্র, সরোজআভা চৌধুরী, উষা মুখোপাধ্যায়, অমিতা সেন, চারু চক্রবর্তী।

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের আগস্ট আন্দোলনের সময় জাতির চিত্তে ছিল স্বাধীনতা অর্জনের দুর্জয় সংকল্প। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নির্মম অত্যাচারের নিষ্পেষণ-যন্ত্র চালিয়ে দিল। দেশ তাতে দ'মে যায় নি। চলেছিল তাদের ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম।

মেদিনীপুরের মেয়েদের আত্মত্যাগের কাহিনী লেখা আছে স্বর্ণাক্ষরে। ৭২ বৎসর বয়স্কা মাতঙ্গিনী হাজরা হাজার হাজার কর্মীর সঙ্গে চলেছিলেন তমলুক শহরের দিকে থানা দখল করতে। মহিলাগণকে দলের পিছনে রাখা হয়েছিল। বিদ্রোহী দল তমলুক দেওয়ানী আদালতের নিকটবর্তী হবার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষীর দল গুলীর ফোয়ারা ছাড়তে থাকে। বিদ্রোহী দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখে মাতঙ্গিনী হাজরা মুহূর্তে তাঁর কর্তব্য স্থির ক'রে নিলেন। তিনি জাতীয় পতাকা হাতে সামনে এগিয়ে এসে বিদ্রোহীদের আহ্বান করলেন, "করব অথবা মরব, তোমরা বাড়ী ফিরে গিয়ে কি বলবে?" তাঁর আহ্বানে বিদ্রোহীরা ফিরে দাঁড়ালেন। মাতঙ্গিনী দেবীর নেতৃত্বে তাঁরা অগ্রসর হলেন। রক্ষীদল বেপরোয়া গুলীবৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। মাতঙ্গিনী দেবী জাতীয় পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে ধ'রে অগ্রসর হন। তাঁর দু'খানা হাতই গুলীবিদ্ধ হয়। হাত স্খলিত হ'ল, কিন্তু জাতীয় পতাকা বীরাঙ্গনার গুলীবিদ্ধ হাতে সগর্বে মাথা উঁচু ক'রে উড়তে থাকল। মাতঙ্গিনী দেবী অকম্পিত পদে এগিয়ে চললেন। বলতে লাগলেন, "ভাইয়ের বুকে গুলী চালিও না, তোমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান কর।" উত্তরে আর একটি গুলী এসে তাঁর কপাল ভেদ ক'রে চলে গেল। ভূ-লুণ্ঠিত রক্তাপ্লুত হাতে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় তখনও উঁচু হয়ে উড়ছে জাতীয় পতাকা। সরকারী সৈন্য ছুটে এসে জাতীয় পতাকা ধুলায় লুটিয়ে দিল।

ওদিকে মেদিনীপুর সদর মহকুমার কেশপুর থানার তোরিয়া গ্রামের শশীবালা দাসী কেশপুর থানা দখল করতে ছুটে গিয়েছিলেন অসংখ্য কর্মীর সঙ্গে। শত্রুর গুলী এসে তাঁর অন্তিম শয্যা রচনা করেছিল।

শহীদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে চলেছিল সেদিন থানা দখলের সংগ্রাম।

বীরভূম রামপুরহাটের আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ক'রে সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর উদ্যত বন্দুকের সামনে গ্রেপ্তার হন মায়া ঘোষ, সন্ধ্যারাণী সিংহ, সাবিত্রী গান্ধী, প্রভৃতি। বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে আন্দোলন পরিচালনা ক'রে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন রাণী চন্দ, নন্দিতা কৃপালানী, প্রভৃতি। অন্যান্য স্থান থেকেও মহিলাগণ কারাদণ্ড বরণ করতে থাকেন।
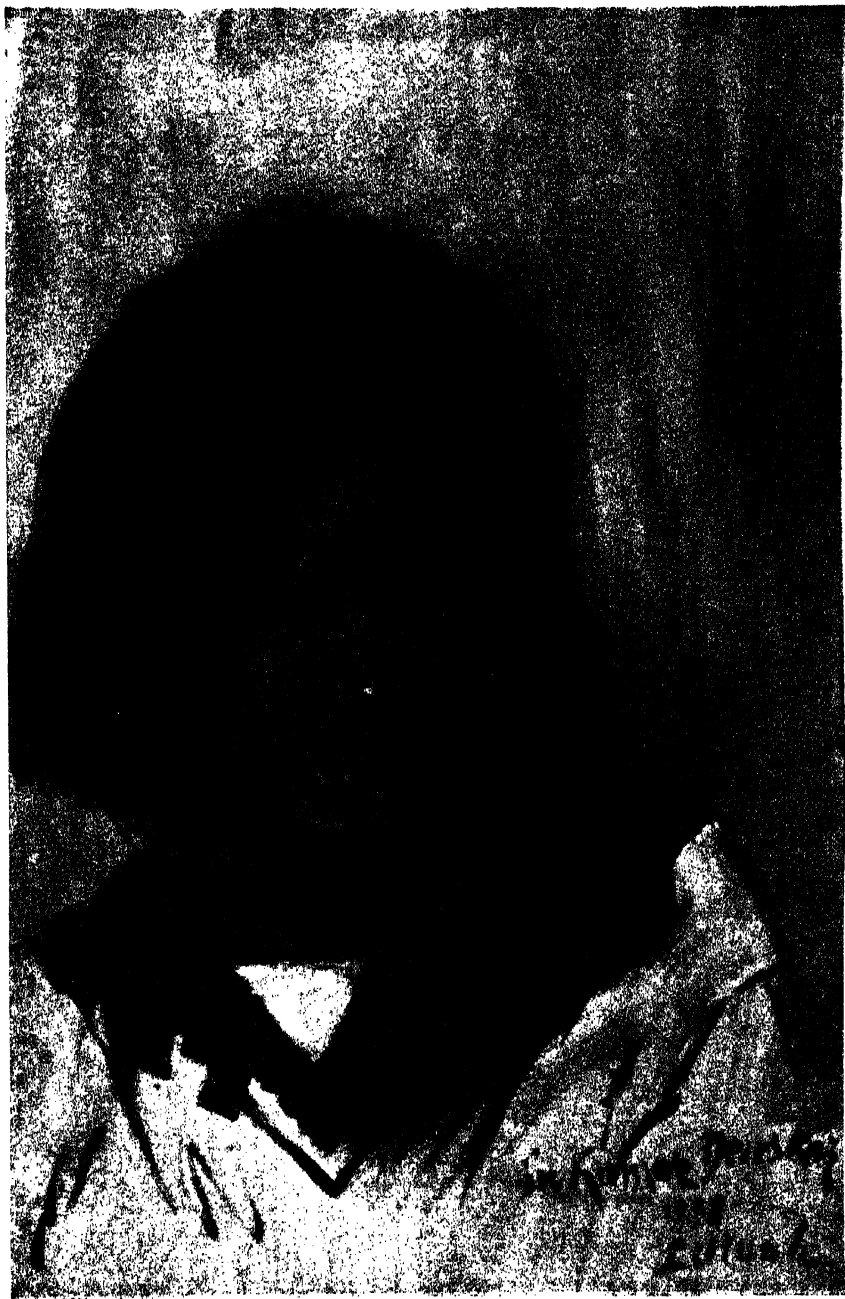
"ভারত ছাড়" আন্দোলনে যোগদান করাতে ভূতপূর্ব রাজবন্দী ও দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীগণ অনেকেই আবার রাজবন্দী হন। নতুন কর্মীও রাজবন্দী হয়ে আসেন অনেকে।

১৯৪৪ সালে ভারতের পূর্ব-সীমান্তে এসে কোহিমা ও ডিমাপুরে নেতাজী উড়িয়েছিলেন বিজয়-পতাকা। গড়েছিলেন তিনি "ঝান্সীর রাণী বাহিনী।" লক্ষ্মী স্বামীনাথন্ তার নেত্রী। সমগ্র ভারতে এই নারী-বাহিনীর প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

১৯৪৫ সালে ইংরেজের আদালতে আজাদ্-হিন্দ-বাহিনীর যে বিচার শুরু হয়েছিল তাতে সমস্ত ভারতবর্ষে নর-নারী নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই জেগেছিল প্রচণ্ড বিক্ষোভ। বোম্বাই ও করাচীতে নৌ-বিদ্রোহ এবং এরোপ্লেন-বাহিনীর ধর্মঘট দেখা দেয়।

ইংরেজের প্রবল পরাক্রম সমগ্র দেশে সেদিন পর্যুদস্ত। ওদিকে ছিল সংকটজনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। ইংরেজ জয়ের আশা পরিত্যাগ করল। উড়ল ভারতবর্ষে স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা ১৯৪৭ সনে। গৌরবে মহীয়ান্ হয়ে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যদের সঙ্গে বাংলার নারীর অবদান।*

* প্রবন্ধে উল্লিখিত নারীদের নামের পূর্বে শ্রী, শ্রীযুক্তা প্রভৃতি শ্রদ্ধাবাচক শব্দগুলি বাদ দিয়েছি তাঁদের প্রতি মনে মনে পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই।

—০—

জীবিকার ক্ষেত্রে এই শতাব্দীর মেয়েরা

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়

এও কি সম্ভব? বাঙ্গালী ঘরের যে মেয়েদের 'বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না' সেই সব অন্তঃপুরবাসিনী অবগুণ্ঠনবতী মা-বোনদেরই কি নাম আছে ঐ হাজার হাজার বেকার চাকরী-প্রার্থিনীদের নামের তালিকায়? ভাগ্যিস্ এখনো আমাদের সেকেলে ঠাকুমা-দিদিমারা বেশীর ভাগই নিরক্ষর, নইলে ঘরের বৌ-ঝিদের নাম এই বেকার-বাহিনীদের মধ্যে দেখতে পেলে দুঃখে তাঁদের বুক ফেটে যেত।

এই বেকার চাকরী-প্রার্থিনী মেয়েদের হিসেবটা বেরিয়েছে সম্প্রতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক ও আর্থনীতিক সমীক্ষার রিপোর্টে। তাঁরা বলেছেন যে বেকারীর তীব্রতা এখানে পুরুষদের চেয়েও মেয়েদের মধ্যে বেশী। তার প্রধান কারণ, কাজের চাহিদা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই প্রবল অথচ কাজের সুযোগ ও ক্ষেত্র মেয়েদের জন্য যতটুকু আছে তা অনেক বেশী সীমাবদ্ধ।

পশ্চিম বাংলার অবস্থাটাই দেখা যাক। পশ্চিম বাংলা এমপ্লয়মেণ্ট্ এক্স্চেঞ্জের তালিকাভুক্ত চাকরী-প্রার্থিনী মেয়ের সংখ্যা চুয়াত্তর হাজার (৭৪,০০০)। আর এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, সকলের পক্ষেই আর এমপ্লয়মেণ্ট্ একস্চেঞ্জে গিয়ে নাম লিখিয়ে আসবার সুযোগ-সুবিধে হয় না। সুতরাং চাকরী-প্রার্থিনী নারীর সংখ্যা যে প্রকৃতপক্ষে চুয়াত্তর হাজারের অনেক বেশী তা বোঝাই যাচ্ছে।

কিছুদিন আগেই দৈনিক মাত্র ছয় আনা পারিশ্রমিকে একটা চাকরীর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। তাতে কলকাতার রাজপথে শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত হাজার হাজার মেয়ের ভিড় যে পুলিসের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়েছিল সেই মর্মান্তিক দৃশ্যের ছবি অনেকেই সংবাদপত্রে দেখেছিলেন। সকালে ঘুম ভাঙ্গলেই কত যে চোখ কর্মখালির পৃষ্ঠায় ঘুরে বেড়ায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সরকারী স্টাটিস্টিক্যাল ব্যুরোর এক হিসাবে দেখা যায় যে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কর্মক্ষম নারীর শতকরা ৮০·৬ ভাগ দিনে পাঁচ ঘণ্টার বেশী সময় ব্যস্ত থাকেন গৃহস্থালির কাজে। সুতরাং দেখা যায় যে আংশিক সময়ের কাজ চান এমন নারী কর্মপ্রার্থিনীর সংখ্যা পূর্ণ সময়ের কর্মপ্রার্থিনীদের চেয়ে আড়াই গুণ বেশী। এই সমীক্ষার রিপোর্টে আরও দেখা গেছে যে শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরীর জন্য যেসব মেয়েরা আবেদন

করেছেন তার মধ্যে শতকরা ৮২ জনই ক্ষুদ্রশিল্পে কাজ করতে চান। এর থেকেই দেখা যায় যে ঘর-সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও নেহাৎ অনুপায় হয়েই গৃহস্থঘরের গৃহিণীরা পর্যন্ত কোনো না কোনো আংশিক কাজ ক'রে যতটা সম্ভব সংসারের সুরাহা করতে চেষ্টা করেন।

আবার আজকাল কাজ করছেন বা বিবিধক্ষেত্রে কাজ ক'রে উপার্জন করছেন এমন মেয়েদের সংখ্যাও অনেক। স্কুলে, কলেজে, হাসপাতালে, বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে, সরকারী ও বেসরকারী অফিসে—বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আজ মেয়েরা ছড়িয়ে পড়েছেন। সরকারী হিসাব মতে পশ্চিম বাংলায় মোট ১,১৪,৬৪,৪৬৭ জন মেয়ের মধ্যে (১৯৫২ সনের আদমসুমারী অনুযায়ী) শতকরা অন্তত ৫২'২ জন কর্মক্ষম অর্থাৎ ১৫-৫৫ বছরের মধ্যে। এর মধ্যে অন্তত ১১ লক্ষ মেয়ে কোনো না কোনো উপার্জনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষকতা, ডাক্তারি, নার্সিং, সমাজসেবা, কলকারখানা, অফিস, প্রভৃতিতে চিরাচরিত পেশা ছাড়াও অনেক নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে আজকাল মেয়েরা প্রবেশ করছেন। অনেক মেয়ে বিজ্ঞানের সাধনায় ও আইনের ব্যবসায়েও যেতে আরম্ভ করেছেন। সাহিত্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এ যুগের মেয়েদের অগ্রণী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ আইনসভাগুলির সদস্যা হয়েছেন, মন্ত্রিত্বের কাজও করছেন। এইরকম বহুবিধ কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের এগিয়ে আসাটা শুধু যে তাঁদের আর্থনীতিক স্বাবলম্বনের দিক্ থেকেই উল্লেখযোগ্য তাই নয়, সমাজপ্রগতির দিক্ থেকেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু তবুও একথা বলতে হবে যে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের চেয়ে যাঁরা করছেন না, অথচ তাঁদেরও কাজ করা দরকার, এরকম মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশী। তাই নারীসমাজের মধ্যে আজ জীবিকার সমস্যা এত তীব্র।

কেন এমন হ'ল? ইতিহাসের চাকা কি দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে! এক শতাব্দী পার হয় নি—যখন রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ-সংস্কারকদের স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্য, স্ত্রী-স্বাধীনতার চেতনা জাগাবার জন্য সমাজের হাতে কত লাঞ্ছনাই না সহ্য করতে হয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষার বৈধতা প্রমাণ করবার জন্য সেদিন মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে গ্রন্থ রচনা করতে হয়েছিল। মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, মতিলাল শীল, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ মনীষীদের আলোচনা, তর্ক, প্রবন্ধ পুস্তক রচনার কাজ ক'রে দেশের জনসাধারণকে বোঝাতে হয়েছিল স্ত্রীশিক্ষার ন্যায্যতার কথা। আর কেশবচন্দ্র সেনকে উদ্যোগ নিতে হয়েছিল অন্তঃপুরেই মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার। তখন স্কুল-কলেজে মেয়েরা ভর্তি হলে কর্তৃপক্ষ কৃতার্থ বোধ করতেন। চাকরী করতে গেলে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ত! জাতীয় আন্দোলনে মেয়েদের অংশ গ্রহণ করাবার জন্যও দেশ-নেতাদের কতই না চেষ্টা করতে হয়েছিল।

এ হেন দেশের মেয়েরা দেখতে দেখতে কতদূর এগিয়ে এসেছে! স্কুল-কলেজের ভর্তির দরজায়, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের দরজায় দেখবেন দলে দলে মেয়েদের ভিড়। শুধু নেই আজ বিদ্যাসাগর, রামমোহন,—তাঁরা জানলেন না যে তাঁদেরই দেওয়া আলোয় আজ অসূর্য্যম্পশ্যার অন্তঃপুরের সূর্য কত প্রখর হয়ে জ্বলছে।

সম্প্রতি পাটনায় ওয়ার্কিং উইমেন্স্ এ্যাসোসিয়েশনের একটা সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনের সভানেত্রী কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীলক্ষ্মী মেনন ঠিকই বলেছেন: 'আপনারা যাহাকে এখনও অভিজাত পরিবারের নারীদের বন্ধনমুক্তির সমস্যারূপে দেখিতেছেন, নিম্নতর মধ্যবিত্ত পরিবারের সেই সৌখীন সমস্যা বহুকাল পূর্বেই উড়িয়া গিয়াছে। মেয়েরা হাজারে হাজারে চাকরীর সন্ধানে নামিয়াছে এবং সেটা নিজের স্বাধীনতা ও নারীমুক্তির দাবী আদায়ের জন্য নয়—নিতান্তই এক টুকরা রুটির সন্ধানে। উৎসাহেও নয়, আদর্শবাদের তাগিদেও নয়—এক হাতের রোজগারে যখন পরিবারের পাঁচ মুখের ক্ষুধা মিটে নাই—অনেক অনিচ্ছুক মেয়েও চাকরীর সন্ধানে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে" (যুগান্তর—২১।৭।৫৯)। তিনি আরও বলেন যে, শিক্ষিত মেয়েদের উপযুক্ত সামাজিক গঠনমূলক কাজে না লাগালে জাতীয় শক্তিরই অপচয় করা হবে: ("The Services of women with University Education should be utilised for the benefit of the society—otherwise it would be a National wastage"—Hindustan Standard 21. 7. 59).

উক্ত সম্মেলনে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, যেসব মেয়েরা সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকায় সারাক্ষণ চাকরী করতে পারেন না, তাঁদের জন্য শিক্ষকতা, নার্সিং, টেলিফোন বিভাগ, প্রভৃতিতেও আংশিক সময়ের কাজের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেকার নারীদের সমস্যা সম্বন্ধে কলকাতা ও সন্নিহিত পৌরসভা

এলাকাগুলিতে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁরা অনুসন্ধান ক'রে দেখেছিলেন, মহিলাদের চাকরীর সন্ধান (১) কতটাই বা উন্নততর জীবনের জন্য (higher standard of living), অর্থাৎ গৃহসজ্জা, আমোদপ্রমোদ, ইত্যাদির জন্য আর (২) কতটাই বা প্রকৃত দারিদ্র্যের জন্য। এই অনুসন্ধানের রিপোর্টে দেখা গেছে যে মেয়েদের মধ্যে চাকরীর চাহিদা সবচেয়ে বেশী—প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ—যে সব পরিবারের মোট আয় ১১০-৩৫০৲ টাকা, এবং পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচ জনের কম নয়। উচ্চমধ্যবিত্তদের মধ্যে বরং চাকরীর তাগিদ কম। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের প্রতি পাঁচজন মহিলার মধ্যে একজন পুরো সময়ের চাকরী প্রার্থিনী। এঁদের মধ্যে চল্লিশ বছরের বেশী বয়স্কা মহিলারাও আছেন। কর্মপ্রার্থিনীদের মধ্যে আবার অবিবাহিত মেয়েদের সংখ্যাই বেশী।

ন্যাশনাল এমপ্লয়মেণ্ট সার্ভিসের রিপোর্টে দেখা যায় যে গত পাঁচ বছরে মধ্যে চাকরী প্রার্থিনী মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ২০০ গুণ বেড়ে গেছে। ("A recent survey conducted by the National Employment service revealed regarding employment of women :—as with men the number of women job seekers has increased by about 200 % during the last five years."—Statesman, 15, 9, 59.)

মেয়েদের মধ্যে জীবিকা অর্জনের সমস্যাটা দেখতে দেখতে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। অথচ এই শতাব্দীরই তৃতীয় দশক পর্যন্ত মেয়েদের উপার্জন করবার পথে কত সামাজিক ও মানসিক বাধা ছিল। লেখাপড়া শিখলেও, উপার্জন করার যোগ্যতা থাকলেও মেয়েদের চাকরী করা উচিত কিনা এই নিয়ে কত দ্বন্দ্ব ছিল,—তাদের শিক্ষাদীক্ষা, ঘরসংসারের পরিবেশ মার্জ্জিত করার কাজে, নিজেদের চরিত্র গঠনের কাজে বা সন্তান-সন্ততির চরিত্র গঠনের কাজে লাগলেই সে শিক্ষাদীক্ষার চরম সার্থকতা লাভ হবে—এই ধরণের কত আলোচনা তর্ক চলত ঘরে ঘরে। এখনো যে এ আলোচনা তর্ক না হয়ে থাকে তা নয়, তবে অধিকাংশের মধ্যে বাস্তব অবস্থার চাপ সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তর্কের সোজাসুজি জবাব দিয়ে দিয়েছে। আর যে স্বল্পসংখ্যকের সংসারে মেয়েদের উপার্জন ছাড়াই) সচ্ছলতা বজায় রাখা সম্ভব তাদের মধ্যেই মাঝে মাঝে আদর্শবাদের কথা বেশী ক'রে ওঠে। আর সমাজের বিপুল অংশের সামনে প্রশ্ন হ'ল এখন, কি ভাবে মেয়েদের উপার্জনের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করা যায়, কি ভাবে মেয়েদের সব উপার্জনের যোগ্য ক'রে শিক্ষিত ক'রে তোলা যায় আর কি ভাবেই বা ঘরের মায়েরা বোনেরা চাকরীতে গেলে ঘর-সংসারের কাজ আর শিশুপালনের সমস্যার সমাধান করা যায়। নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ক'রে এই সব সমাজচিন্তা করার দরকার হয়ে পড়েছে। দিন অনেক বদলে গেছে, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, এখন যদি নতুন অবস্থার সঙ্গে মনকে খাপ খাইয়ে না নিতে পারা যায় তবে পরিবারে ও সমাজে দ্বন্দ্ব বাড়বে বই কমবে না।

এই শতাব্দীর চতুর্থদশক বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যে মেয়েদের চাকরীর সমস্যাটা এত তীব্র হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা সমাজটাই একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে তোলপাড় হয়ে যায়। সমাজের আর্থনীতিক জীবনের সর্ব্বগ্রাসী ভাঙ্গনের মুখে অনেক সংস্কার দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভেঙ্গেচুরে একসা হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষ মহামারীর সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েদের চাকরী করার ন্যায্যতা নিয়ে নীতিগত তর্কাতর্কি বৃথা হয়ে যায়। তখন থেকেই চাকরীর চেষ্টায় ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক মেয়েকে আসতে দেখা যায়। আবার দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলা দেশ ভাগ হয়ে যাবার ফলে পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির ব্যাপক সমস্যা দেখা দেয়। উদ্বাস্তুরা পুরুষ নারী-নির্ব্বিশেষে চাকরীর সন্ধানে ছুটেছেন, এবং এখনো ছুটছেন। ঘরবাড়ী, সাতপুরুষের ভিটে সবই যখন গেল তখন আর মেয়েদের পর্দ্দার আড়ালে থাকবার অবকাশ কোথায়? স্ত্রী-পুরুষ মিলে কঠিন পরিশ্রমে আপ্রাণ চেষ্টায় যখন ভাঙ্গাঘর জোড়া দেবার প্রশ্ন সামনে, তখন ঢিমে তেতালা, অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য সামন্তযুগীয় জীবনধারার সংস্কার রক্ষার স্থান কোথায়?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বের গণমানবের নব অভ্যুত্থান দেখা দেয়। আমাদের দেশেও তার প্রভাব পড়ে। দেশে দেশে পৃথিবীর নারীসমাজ নূতন চেতনায়, নূতন কর্ম্মপ্রেরণায়, নূতন সামাজিক দায়িত্ববোধে, বিশ্বশান্তি রক্ষা ও সমাজজীবন গ'ড়ে তুলবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে; রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রেও অগ্রণী মেয়েদের অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসের হাতে ভাঙ্গা ও গড়ার কাজ একই সঙ্গে চলে। আমাদের সমাজেও যখনই পুরাতন আর্থনীতিক ব্যবস্থা, সমাজ সংস্কারের ভাঙ্গার কাজ সুরু হ'ল তখনই আবার নূতন ধরণের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন গড়ার কাজও সুরু হ'ল।

গত এক দশকের মধ্যে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষা ও উপার্জনের ক্ষেত্রে পূর্ব্বেকার যে কোনো সময় অপেক্ষা অনেক বেশী ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু এখানেই আবার অতি দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, মেয়েরা নিজে থেকেই পারিবারিক জীবনের অর্থসমস্যা সমাধানের জন্য যতটা এগিয়ে এসেছেন, সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থা মিলেও তার সমাধান ক'রে উঠতে পারে নাই। অর্থাৎ বহু চাকরী-প্রার্থিনী মেয়ের জন্যই চাকরীর ব্যবস্থা নাই। মেয়েদের বহুসংখ্যককে যাতে উপার্জনের কাজে নিয়োগ করা যায় এরকম প্রতিষ্ঠানও খুবই কম আছে। তাছাড়া অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মেয়েদেরও যাতে অর্থকরী শিক্ষা দিয়ে মোটামুটি উপার্জনের পথ খুলে দেওয়া যায় তারও উপযুক্ত যথেষ্ট ব্যবস্থা নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক হিসেব অনুযায়ী এখানে মেয়েরা শিক্ষকতা, নার্সিং, টাইপিস্ট, দোকানে বিক্রয়ের কাজ, নৃত্য ও শিল্পকলা, পটারী, ধোপা, দর্জ্জির কাজ, প্রভৃতি মোট ৩৫ রকমের কাজ ক'রে থাকেন। আর পুরুষরা করেন মোট ৭০ রকমের কাজ। বলা বাহুল্য, পুরুষের চাকরীর সঙ্গে মেয়েদের চাকরীর কোনো বিরোধ নাই (যদিও অনেকে ভুল ক'রে মনে ক'রে থাকেন যে, বিরোধ আছে) মেয়ে ও পুরুষ চাকরী প্রার্থী একই সমাজ, এবং বহুক্ষেত্রে একই পরিবার থেকেই আসেন। তাঁদের উভয়ের উপার্জন সংসারের পরিপূরক ছাড়া প্রতিকূল শক্তি হতেই পারে না। আর পুরুষদের মধ্যেও বেকার সমস্যা খুবই বেশী, তবে এখানে সে বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে না, এখানে কেবল জীবিকার ক্ষেত্রে মেয়েদের কথাই বলা হচ্ছে।

সরকারী হিসেবমতে গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের সংখ্যা কমেছে বৈ বাড়ে নি। ১৯১১ সনে সারা ভারতে যেখানে চা, খনি, প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৪,৩০,০০,০০০ (চার কোটি ত্রিশ লক্ষ) সেখানে ১৯৫১ সনে ঐ সংখ্যা ক'মে দাঁড়িয়েছে ৪,০০,০০,০০০ (চার কোটি)। অথচ এই চল্লিশ বছরে সারা ভারতে নারীর সংখ্যা বেড়েছে আড়াই কোটি (১৯৫১ সনের পর আর কোনো সরকারী হিসাব নেওয়া হয় নাই)। অবশ্য এখানে বলা দরকার যে এ শুধু চা বাগান, কয়লাখনি, চটকল, প্রভৃতি শিল্পে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের তালিকা। গত কয়েক বৎসরে অফিসদপ্তরে, জনস্বাস্থ্য- ও শিক্ষা-সংস্থায় নারী কর্মীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে।

এই হিসাব অনুযায়ী ১৯১১ সন থেকে পশ্চিম বাংলায় নারীর পরনির্ভরশীলতা ও পরাধীনতা ক্রমশই বেড়েছে। ১৯১১ সনে কৃষিজীবী জনসংখ্যার প্রতি দশ হাজারে আত্মনির্ভরশীল নারীর সংখ্যা ছিল ৫৭৯ জন আর ১৯৫১ সনে এই সংখ্যা ক'মে দাঁড়িয়েছে প্রতি দশ হাজারে ৩৭৬ জন। ১৯১১ সনে অকৃষিজীবী জনসংখ্যার প্রতি দশ হাজারে আত্মনির্ভরশীল মেয়ের সংখ্যা ছিল ১,০১৮ জন আর ১৯৫১ সনে এই সংখ্যা ক'মে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫৩১ জন (আদমসুমারী রিপোর্ট), আর কলকাতা এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জের তালিকায় নারী কর্মপ্রার্থিনীর সংখ্যা ৭৪ হাজার। আরও উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৫৪ সন থেকে ১৯৫৬ সনের মধ্যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে যে কর্মখালির হিসাব বেরিয়েছে তার মধ্যে শতকরা মাত্র ৩·৬ ভাগ ছিল মেয়েদের জন্য। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় মেয়েদের কর্মক্ষেত্র কত যে সংকুচিত তার ঠিক নেই!

যাই হোক, মেয়েদের বেকারীর হিসেবটাই বড় কথা নয়, বড় কথা হ'ল কি ক'রে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্মক্ষম মানুষদের জীবিকা উপার্জনের কাজে শিক্ষিত ক'রে তোলা যায়, আর কি ক'রেই বা তাদের সকলের চাকরীর সংস্থান হয়। সেজন্য প্রয়োজন উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ব্যাপক পরিকল্পনা ও প্রসার, নারী কর্মপ্রার্থিনীদের নানা ধরণের কাজে শিক্ষিত ক'রে তোলা, স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কুটিরশিল্পেরও ব্যাপক প্রসার—যাতে সর্বস্তরের চাকরী-প্রার্থিনীদের নিয়োগ করা সম্ভব হয়। গঠনমূলক কাজের এই ব্যাপক প্রসারই আমাদের এই মুহূর্ত্তের অপরিহার্য জাতীয় প্রয়োজন।

মেয়েদের উপার্জনের এই নেহাৎ আর্থিক দিকটা ছাড়াও আরও বৃহত্তর দিক্ আছে, সেটাও ভাববার সময় এসেছে। আর্থনীতিক মুক্তি না হলে মেয়েদের পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না পুরুষের সঙ্গে সমাজ ও পারিবারিক জীবন গঠনে উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করা। আর সমান দায়িত্ব গ্রহণ না করতে পারলে কি আর সমান অধিকার কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়? এই ত দেখা যায় যে, যতদিন না মেয়েরা উপার্জন করতে সুরু করে ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষের সমান অধিকার, সমান মর্যাদা—এসব জিনিষগুলো যেন কেমন ভাসাভাসা আলোচনা আর তত্ত্বগত বিশ্লেষণের পর্যায়ে থেকে যায়। আর যেই মেয়েরা আর্থনীতিক স্বাধীনতা পেয়ে যায়, অমনি আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলোর সমাধানের পথ পরিষ্কার

হতে থাকে। অর্থাৎ আর্থিক ভিত্তিটা কায়েম হলেই তারপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, তত্ত্বগত ও মানসিক সমস্যাগুলো বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাধানের পথ খোলা পায়।

এই আর্থনীতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তির পথে বিংশ শতাব্দীর মেয়েরা অনেকখানি এগিয়েছেন। অনেক বাধা, অনেক প্রতিকূলতা উত্তীর্ণ হয়ে আজ তাঁরা দেশ ও জাতি গঠনের কাজে, সমাজ ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনের কাজে দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের দাবি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। আজ যদি তাঁদের জন্য সমাজ ও সরকার পরিপূর্ণ সুযোগ না খুলে দেন তবে সারা দেশের পক্ষেই বিরাট ক্ষতি আর শক্তির অপচয় হবে। আর, কর্মক্ষম স্ত্রী-পুরুষের শক্তির অপচয় ক'রে কি আর দেশ ও জাতি গঠনের কাজ এগোতে পারে?

তাই বলছিলাম যে, আজকের দিনে একদিক্ থেকে নতুন যুগের নতুন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ, বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে সচেতন নারীসমাজের জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, আর অন্যদিক্ থেকে কর্মপ্রার্থিনী মেয়েদের ক্রমবর্ধমান বেকারীর সমস্যা আমাদের এক কঠিন দ্বন্দ্বের সামনে উপস্থিত করেছে। নারীর কর্মক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসারের মধ্যদিয়ে এর সমাধান না হলে শুধু দেশের আর্থনীতিক জীবনই নয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনও সুষ্ঠুভাবে গ'ড়ে তোলা যাবে না।*

---

* এই প্রবন্ধের সংখ্যাতত্ত্বের জন্য যে বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে: (১) ১৯৫২ সনের আদমসুমারী রিপোর্ট, (২) **Economic and Social Status of Women in India (Govt. of India)**, (৩) **Unemployment among Women in West Bengal (Govt. of West Bengal)**, (৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থনীতিক ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের সামাজিক আর্থনীতিক তদন্তের রিপোর্ট, (৫) পশ্চিমবঙ্গ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের হিসাব।

—০—

আলপনা চিত্র

শ্রীসুলেখা দাশগুপ্ত

বাংলা দেশের মেয়েরা এক রক্তের ঋণে আবদ্ধ আছে তাদের পূর্বগামিনীদের কাছে। মা-ঠাকুমাদের হাতের পিটালি গোলার বাটি শুকোতে দেখে নি যে দেশের মেয়েরা, আলপনার কথা বলতে কুণ্ঠিত সংকুচিত হলে তাঁদের কাছে ক্ষমা পাবে না তারা। দূর-দূরান্তরের রাজ্য থেকে ভর্ৎসনা ক'রে উঠবেন তাঁরা। ক্ষুব্ধ অভিমানে বলবেন, কোন কাজের কোন চিরন্তন চিহ্নই ত আমরা রেখে আসতে পারি নি। না ছিল উপকরণ, না ছিল আয়োজন, না ছিল কোন সঞ্চয় শিক্ষা সুযোগ। কিন্তু তবু যে আমরা কেবল, 'রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা' এই নিয়েই দিন কাটাতাম না, জৈব প্রয়োজনে জীবনের সব প্রয়োজন মিটিয়ে দিতাম না, ভাষা আবিষ্কারের আগে মানুষ যে শিল্পের অধিকার অর্জন করেছিল, সেই অধিকারের উত্তরাধিকারে যে আমরা বঞ্চিত ছিলাম না, দরিদ্র ছিলাম না,—শিল্পের পূজা যে আমরা ক'রে গেছি, জীবনকে সুন্দরতর ক'রে তুলবার সাধনা যে আমরা ক'রে গেছি—সে কথাটা অন্ততঃ তোমরা বল।

বাংলার গ্রাম আর আলপনা—যেন কথা নয়, ছিল প্রকৃতির পটে ফুটে থাকা ছবি। দূর বনান্তরালে মিলে আছে প্রকৃতির কোলাশ্রয়ী ছায়াঢাকা স্নিগ্ধ শান্ত সবুজে সুন্দরে মেলা বাংলার গ্রাম। মাঠ ক্ষেতের উপর দিয়ে, অশথ বট গাছের তলা দিয়ে, বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে তার আঁটালো মাটির পথ বয়ে চলেছে। গ্রামের উদ্দেশে। কিন্তু গ্রামের ভেতরে ঢুকে আর সে তার এই দু পা ফেলে চলার মতো পথটুকুও বজায় রাখছে না। বাড়ী যাবার আগে এর খবর, তার সংবাদ নিয়ে যেতে হবে যে। গ্রাম তার পথ সেই জন্যই যেন তার পর থেকে সবার বাড়ীর উপর দিয়ে ক'রে নিয়েছে। ওর বাড়ীর উঠোন, তার বাড়ীর আঙিনা, আর একজনার বাড়ীর ধানের গোলা আর

পুকুর-পাড়ের ধার দিয়ে স্মিতমুখে কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করতে করতে চলে সে, 'কি গো, তোমরা সব ভালো ত?' এ পথের আলপনা নেই কোথায়? কার আঙ্গিনা সাদা? কার অন্দরের উঠোন থাকে আলপনাবিহীন? কার বাড়ীর দাওয়ায় নেই জোড়ামাছ শুয়ে? কার গোলার ধারে আঁকা নেই ধানের বিড়া, আখের শিষ, কাশের গুচ্ছ? আমাদের দেশে আজকাল বিশিষ্ট অতিথি আগমনের দিনে পথসজ্জা হয়। গ্রামের পথ আলপনা-আলপনায় সেজে থাকত সবার জন্য, সব দিনে। তার শুভ আহ্বান শুদ্ধ থাকত না কোন বিশেষ লোকের জন্য, বিশেষ দিনের জন্য। আলপনা শুধু শিল্প নয়, চিত্র নয়—আলপনা ছিল তাদের কাছে মঙ্গলের প্রতীক।

কি থেকে মেয়েদের মনে প্রথম আলপনা চিত্রের উদয় হয়েছিল জানি না। কিন্তু এই আলপনা আবিষ্কারের গৌরব একমাত্র নারীর। এই শিল্পের সর্বস্বত্বিত্ব নারীর। এর অনুভূতি, এর ভাব, এর চিত্রের ভাষা নারীর। এ শুধু মেয়েদের হাতে চিত্রিত নারী-চিহ্নিত চিত্রবিদ্যা। এমন একান্ত নারীমনের সৃষ্টি ব'লেই বোধ হয় আলপনার শুভকামনার প্রতীকধর্মিতার সঙ্গে, তার শুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টির অনন্যসাধারণতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগুতে পারার শক্তি রাখে এমন কোন বস্তু বা চিত্র আর নেই। তার আঁকা জোড়াপদ্মে, শস্য-শীষে, ধানের ছড়ায়, মঙ্গল-ঘটে যে কথা বলে তা শুধু শিল্পানুভূতির কথা নয়। শুধু সুন্দরের কথা নয়। শুধু সজ্জার কথা নয়। বলে তার সংসারের প্রতি, তার পরিবার-পরিজনের প্রতি তার কল্যাণ-কামনার কথা।

পিতার জন্য, ভ্রাতার জন্য, স্বামীর জন্য, সন্তানের জন্য নারীর যে প্রতি মুহূর্তের মঙ্গলকামনা, সেই কামনার কথাকে ছড়ায় বেঁধে, আলপনার প্রতীক এঁকে নারী প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় যে জীবনের পূজায় বসত তারই নাম ব্রত। ব্রত আর আলপনা তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সূর্যের আলপনা এঁকে প্রার্থনা করত সে পিতা-পুত্র-স্বামীর তেজবীর্য আয়ু। জয় প্রার্থনা করত ধ্বজা এঁকে। চাঁদের আলপনা এঁকে প্রার্থনা করত সে তার মায়ের ঘরে চাঁদের মত ভাইবোন। বহু সন্তানের কামনা জড়িয়ে থাকত তার তারার আলপনায়। ভরা বর্ষায় জল নদী নৌকোর চিত্র এঁকে প্রার্থনা করত সে, যাঁরা বিদেশে আছেন তাঁদের নির্বিঘ্ন প্রত্যাগমন। সর্প আলপনার কাছে হাঁটু গেড়ে স্তব করত তাকে তুষ্ট করতে। জোড়ামাছ, ধানের শীষ আর লক্ষ্মীর পায়ের কাছে ব'সে করত সে ধনজন সমৃদ্ধির পূজা। এই আচার অনুষ্ঠানের পেছনে কোন ধর্মের আদেশ ছিল না, শাস্ত্রের অনুশাসন ছিল না। এ ছিল নারীর প্রাণের পূজা। ব্রত আর আলপনা হ'ল যেন ভাষায় আর চিত্রে মেয়েদের মনের নিভৃত ছবি।

আলপনায় প্রতিকৃতিকে তাঁরা ধরতে পারেন নি। সে চেষ্টাও তাঁরা করেন নি। প্রকৃতিকে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন,—প্রকৃতিও ফুল লতা পাতা পাখী প্রজাপতি জল মাছ নিয়ে সানন্দে ধরা দিয়েছিলেন তাঁদের হাতে। অপরাপর শিল্পের মতো মডেল বা সরঞ্জাম-পত্রের কোন ব্যবহার নেই এতে। এক মুঠো চালের গুঁড়ো, একটুকরো নেকড়া, একটি ছোট বাটি আর চালের গুঁড়োটা গুলে নেবার জন্য একটু জল—এই ছিল তার উপকরণ। রং-এর কোন ব্যবহার তাঁরা করতেন না। যদি তেমন ইচ্ছে হ'ত, গাছপাতার রস নিংড়ে বের ক'রে নিতেন সবুজ রং। ফুলের রস নিংড়ে নিতেন লাল নীল হলুদ। কিন্তু সেই জলো রং ব্যবহার ক'রে আনন্দ পেতেন না ব'লেই হয়ত জলো রং-এর আলপনা তারা আঁকতেন না। চাল, নানা বর্ণের ডাল—সোনা বর্ণের ছোলা, হলুদ বর্ণের মটর, লাল বর্ণের মশুর, সবুজ বর্ণের মুগ আর কলাই দিয়ে কাশ্মীরী কাজের মতো আলপনার ফুল লতা পাতায় ঘর ভ'রে ভ'রে এক রকমের রঙ্গিন আলপনা তারা আঁকতেন। আঁকতেন চকমাটির গুঁড়ো, কাঠকয়লার গুঁড়ো আর লঙ্কা হলুদ চুনের রঙ্গিন আলপনাও। কিন্তু তা নিতান্তই কখনো-সখনো। আলপনার জন্ম-উপকরণ শুধু এক মুঠো আতপ চাল। জন্ম-রং তার দুধবরণ সাদা। নেকড়ার টুকরোটি পিটালি গোলায় ভিজিয়ে নিয়ে চার আঙ্গুলের মৃদু চাপে গোলার সাদা রংটি ঝরাতে ঝরাতে অনামিকার মোটা রেখায় এঁকে চলতেন তাঁরা আলপনা। কখনো একজন, কখনো কয়েকজনাতে মিলে এক সঙ্গে।

যে সময় বিদ্যা-অর্জনের জন্য পর্যন্ত কোন বিদ্যালয় ছিল না, সেই সময় চিত্রশিক্ষার জন্য যে কোন চিত্রালয় থাকবে না এ ত বলাই বাহুল্য। মা-ঠাকুমাদের কাছেই তাঁরা শিক্ষা করতেন আলপনা-বিদ্যা। তাঁদের কন্যা শিক্ষা করত তাঁদের কাছে। শুধু শিখে আর এঁকেই সন্তুষ্ট থাকতেন না তাঁরা। চর্চা করতেন। অনুশীলন করতেন। যে প্রতিযোগিতা না থাকলে, গুণের যে স্বীকৃতি না মিললে কোন শিল্পের, কোন গুণের বিকাশ ঘটতে চায় না, উৎকর্ষ সাধিত হতে চায় না—আলপনা চিত্র নিয়ে তাঁদের মধ্যে ছিল সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তাপ। ছিল গুণীজন-সমাদর—ছিল দক্ষ হাতের ডাক ঘরে ঘরে। কুলো চিত্রিত করার জন্য, পিঁড়ি চিত্রিত করার জন্য, বৌ-বরণের

আলপনা আঁকার জন্য পড়শী এসে দরজায় দাঁড়াত ডাক নিয়ে। প্রশংসা মিলত, অভিনন্দন মিলত। সম্মান বলুন, উপহার বলুন—(পারিশ্রমিক নয়) আসত তাও। উৎসব-বাড়ীর মেয়ে ঝি বৌদের দেখা যেত দৈ মাছ মিষ্টি পানসুপারি হাতে।

সেই অঙ্গন নেই, প্রাঙ্গণ নেই, পিঁড়া নেই, পৈঠা নেই, দাওয়া নেই । আজ মাটির আলপনা তার জোড়া মাছ, আখের শীষ, ধানের ছড়া, লক্ষীর পার নকশাটাই শুধু নয়, আলপনার সাদা রংটি পর্যন্ত সঙ্গে ক'রে উঠে এসেছে বিছানা ঢাকনায়, টেবিল ঢাকনায়, পর্দায় রুমালে ব্লাউজে। কিন্তু তাতে ঐ ছাপই থাকছে, নকশাই থাকছে—প্রাণ থাকছে না। ইংরেজী S অক্ষরটির মতো একটি প্যাঁচানো রেখার ইঙ্গিতের উপর পাঁচটি ফোঁটা বসল লক্ষীর পা। সিঁড়ি বেয়ে এঁকে বেঁকে সেই পা উপরে উঠছে, বারান্দা দিয়ে হাঁটছে, এঘরে প্রবেশ করছে। আলপনার এই পাদুটির অধিকারিণী লক্ষী ঠাকরুনকে হাতে হাত-পদ্ম, পায়ে পা-পদ্ম, সিঁথিতে স্বর্ণ-সিঁথি—মায় তাঁর হাতের ঝাঁপিটি সমেত আমরা দেখতে পেতাম সিঁড়ি উঠতে, বারান্দা দিয়ে চলতে, ঘরে ঢুকতে, এমন কি হাতের ঝাঁপিটি পর্যন্ত দেখতে পেতাম স্পষ্ট নামিয়ে রাখতে। কিন্তু যন্ত্রের ছাপের ভেতর কি তা আমরা দেখতে পাই? যন্ত্রের চাপে প্রাণ ম'রে যায়।

অবশ্য আজ আলনা শিল্পটিকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য নানা চেষ্টা হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে আলপনা শিল্পকে উজ্জীবিত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উৎসবে মেলায় অভ্যর্থনায় আলপনা চিত্রিত হ'ত, এখনও হয়। কিন্তু বাংলার যে বারো মাসের তের পার্বণের মধ্যে ছিল আলপনার প্রাণ-উৎস—সেই ব্রত-উৎসব, পূজা-পার্বণ যদি মানুষের জীবন থেকে দিনে দিনে খ'সে যেতে থাকে, ম'রে যেতে থাকে, তবে আলপনা বেঁচে থাকবে কাকে আশ্রয় ক'রে? অবলম্বনের অবলুপ্তি ঘটলে শিল্পকে কি উজ্জীবিত ক'রে তোলা সম্ভব? নতুন ধানের নবান্নর অন্নই যদি ঘরে না থাকে, তবে কাঁসার ঝকঝকে বাটিটি পিটালি গোলায় ভ'রে, ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে নবান্নের মঙ্গল-আলপনা নারী আঁকতে বসবে কাকে উদ্দেশ ক'রে?

—০—

স্ত্রীশিক্ষা

শ্রীবেলা দে

মানবের কল্যাণের জন্য, লোকহিতের জন্য, নানা অনুষ্ঠান আয়োজন সকল যুগেই হয়ে আসছে। কিসে মানবের সত্যিকার কল্যাণসাধন করা যায় এ সমস্যার সমাধান সহজ নয়। দেশকে, প্রতি মানবকে শিক্ষা-দীক্ষায় বড় ক'রে তুলতে পারলেই বহু সমস্যার সমাধান আপনিই হয়ে যায়।

দীর্ঘকাল দেশে নারীরাই শিক্ষাসম্পদ্ থেকে বিশেষ ক'রে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। তাই গত ত্রিশ-বত্রিশ বছর ধ'রে নারীশিক্ষা সমিতি বাংলার মেয়েদের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও পরনির্ভরতা দূর করবার চেষ্টা করছেন। এই কাজে সবচেয়ে আগে মনে পড়ে বাংলার বধূ শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস-কে। মাত্র দশ বছর বয়সে বহুবাজার নিবাসী শ্রীনাথ দাসের পুত্র ব্যারিস্টার দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ইনি স্বামীর সঙ্গে বিলাত পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। বিলাত থেকে ফেরবার পর তাঁর লেখা 'ইংরাজদের পর্ব' ও 'বিলেতের গল্প' ১৮৯২ সনে 'সখা'য় প্রকাশিত হয়। এই বিদুষী মহিলার বহু লেখা 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', প্রভৃতির পুরনো পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কৃষ্ণভাবিনী নারীকল্যাণ কাজে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি 'ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলে'র প্রাণস্বরূপিণী ছিলেন। দেশের সেই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে তিনি মেয়েদের যাতে শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতি হয় তার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

বাংলাদেশে নারীশিক্ষা সমিতির কাজে সবচেয়ে বড় দান করে গেছেন আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর

সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অবলা বসু। ১৯১৪ সনে শ্রীমতী বসু তাঁর স্বামীর সঙ্গে জাপান পরিভ্রমণে যান এবং সেখানে গিয়ে সে দেশের শিক্ষাবিস্তার দেখে নিজের দেশের অজ্ঞতা স্মরণ ক'রে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তখনই তাঁর মনে নারীশিক্ষা সমিতি স্থাপন করবার কল্পনা উদয় হয়। দেশে ফিরে এসেই তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এই বিষয় আলোচনা ক'রে তাঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় তিনি ১৯১৯ সনে নারীশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। বন্ধুদের পূজোর দালানে, কারুর বাগানবাড়ীতে মেয়েদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। মেয়েদের মধ্যে এইরূপ প্রতিষ্ঠান সেই প্রথম। এই বিত্তালয়টি ও বেলতলা বালিকা বিত্তালয় এখন স্থানীয় প্রচেষ্টায় কলেজে পরিণত হয়েছে। সেদিনের ক্ষুদ্র বীজ বিরাট্‌ মহীরুহে রূপান্তরিত। কিন্তু লেডী অবলা বসু ও নারীশিক্ষা সমিতির সঙ্গে এঁদের সম্পর্কের কথা হয়ত সকলে জানেন না। তারপর কলকাতার পৌরসভা যখন প্রাথমিক শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করলেন, তখন সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হ'ল। বাংলার অবজ্ঞাত অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লীগুলিতে শিক্ষার আলো তখনো পৌঁছায় নি, মেয়েদের শিক্ষা যেখানে তখনো অভাবনীয় ছিল, সেই সব গ্রামে গ্রামে বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হতে লাগল। গ্রামে কাজ করবার সময় শিক্ষয়িত্রীর অভাব দেখে সমিতির মনে হয় আমাদের দেশের দুঃস্থা বিধবা মেয়েরা, যাঁরা অপরের গলগ্রহ হয়ে বাস করেন, তাঁদের লেখাপড়া শিখিয়ে গ্রামে গ্রামে কাজ করতে পাঠানো উচিত। এই কল্পনা থেকেই বিদ্যাসাগর বাণীভবনের উৎপত্তি। এই কাজে শ্রীমতী হরিমতী দত্ত নামে একটি বিধবা মহিলা ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন। এই ভবন থেকে বহু দুঃস্থা বিধবা, শিক্ষাসমাপ্ত ক'রে স্বাবলম্বী হলেন। এখানে বিনা খরচে শিক্ষার্থিনীদের মধ্যে ইংরাজি মান পর্য্যন্ত লেখাপড়া, তাঁত, সেলাই, কাটছাঁট, রেশম শিল্প ও আরো অনেক বিষয়ে শিক্ষাদান করা হ'ত। যাতে ক'রে দুঃস্থা মেয়েরা আর্থিক জীবনেও কিছু করতে পারে এই উদ্দেশ্য নিয়েই সেদিন তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন। এই আদর্শেই মহিলা শিল্পভবন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সনে। এখন অবশ্য এই ধরণের বহু প্রতিষ্ঠান হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক বোধহয় নারীশিক্ষা সমিতি ও সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি। নারীশিক্ষা সমিতির আর একটি বিশেষ কাজ ছিল গ্রামে গ্রামে বয়স্কা-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এক লক্ষ টাকা এই কাজে দান করেন। সেই টাকা দিয়ে ভগিনী নিবেদিতার নামে একটি ফাণ্ড খোলা হয়। গ্রামে কাজ করতে গিয়ে সমিতির কর্মীরা অনুভব করেন যে বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষিতা করতে না পারলে শিক্ষার স্থায়ী ফল হয় না, তাই এই শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশ্যই ছিল পল্লীর বয়স্কা মেয়েদের লিখন-পঠন শিক্ষাদান।

শ্রীমতী বসু দীর্ঘকাল ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর বাণীভবন, নারীশিক্ষা সমিতি, ঝাড়গ্রাম নারী শিল্পাশ্রম, কামারহাটী নারী শিল্পাশ্রম ও নারী-কল্যাণকর বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত সকল শ্রেণীর জনগণের সেবায়, বিশেষ ক'রে বাংলার নারী-সমাজের কল্যাণের জন্য লেডী অবলা বসু জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। যে সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন ক'রে গেছেন, তার ভিতর দিয়ে শ্রীমতী বসুর স্মৃতি বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

শ্রীমতী বসুর দিদি শ্রীমতী সরলা রায়ও একজন সমাজসেবিকা ছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নবজাগরণ-সময়ে যে সব মহিলা জাতীয়তা-বোধের আলোক প্রজ্বলিত ক'রে স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে বাঙ্গালীকে অগ্রসর ক'রে গেছেন শ্রীমতী সরলা রায় তাঁদের অন্যতম। ইংরাজ অধিকারের শতাধিক বছর পর্য্যন্তও স্ত্রীশিক্ষার ভার গ্রহণ ব্যাপারে ইংরাজ সরকার অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রে আসছিলেন। ১৮৫৭ সনে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর কুড়ি বছর পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের পরীক্ষা দেবার অধিকার ছিল না,—১৮৭৮ সনে ২৭শে এপ্রিল তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের পরীক্ষা দেবার অধিকার প্রথম দেওয়া হয়। সরলা রায় ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ১৮৭৮ সনে ডিসেম্বর মাসে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার অনুমতি লাভ করেন। এই দু'জন মহিলাই ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রথম ছাত্রী। যদিও সরলা দাসের (রায়) এই সময় সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়ে যাওয়ায় তিনি আর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারেন নি। কিন্তু এই সময় থেকেই তিনি নারীশিক্ষা ও নারীসংগঠন কাজে মনোনিবেশ করেন। বিবাহের পর স্বামীসহ ঢাকায় গিয়ে সেখানে বালিকাদের উচ্চশিক্ষার জন্য একটি বিত্তালয় স্থাপন ক'রে নিজেই শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাঁর স্বামী কলকাতায় বদলি হয়ে এলে তিনি তখন বহু নারীকল্যাণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সুযোগ পান। ব্রাহ্মবালিকা বিত্তালয় যখন উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে উঠে যাবার মত হয়েছিল, তখন তিনি এর কার্য্যভার নিজেই গ্রহণ করেন। তিনিই

এর প্রথম মহিলা সম্পাদিকা হন। তিনিই প্রথম স্ত্রীশিক্ষায়তনে পুরুষ-শিক্ষক-নিরপেক্ষ ভাবে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়টি পরিচালনা করেন। এর দ্বারা তিনি প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন নারী সুযোগ পেলেই সংগঠনী শক্তিতে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত 'সখি-সমিতি' বাংলার প্রথম মহিলা সমিতি। সরলা রায় স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে 'সখি-সমিতি'র শ্রীবৃদ্ধি করেন। শ্রীমতী রায় তাঁর অদম্য উৎসাহ, অসীম শক্তি এবং সমস্ত জীবন স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিয়োগ ক'রে গেছেন। তাঁর অন্যতম অমরকীর্ত্তি গোখলে মেমোরিয়াল বিদ্যালয়।' কে বলে বাংলা দেশের মেয়েদের তেজ নেই, বল নেই, গঠনশক্তি নেই। বীরের মত তিনি সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে বাংলার মেয়েদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ ক'রে গেছেন।

আজকের দিনে মেয়েরা জীবনকে নানা ভাবে ফুটিয়ে তোলবার সুযোগ পেয়েছেন, স্কুল কলেজে যাচ্ছেন, দেশবিদেশে বেড়াতে যাচ্ছেন, সাঁতার কাটছেন, খেলাধুলা প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় স্থানলাভ করছেন। কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন মেয়েদের এমনি ক'রে এগিয়ে যাওয়া কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। তাই সেই অন্ধকার যুগকে ভেদ ক'রে আলোর সন্ধানে বেরিয়ে এলেন কলকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বধূ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। কত নিন্দা, কত বাধা, কত কুৎসিত মন্তব্য সবকিছুকে পিছনে রেখে, তিনি এলেন জ্ঞানের জন্য, শিক্ষার জন্য তাঁর অভিযান সুরু করতে। নিজেকে স্বামীর কর্ম্মে সত্যিকার সঙ্গিনী ক'রে তোলার জন্য জ্ঞানদানন্দিনী ইংরাজি শিখিতে সুরু করেন। নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য, শিক্ষা আন্দোলনকে শক্তিশালী ক'রে তোলার জন্য এইটাই হচ্ছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। যেখানে মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না, যা মেয়েদের শেখা নিষেধ ছিল, সেই নিষেধের বাধা অমান্য ক'রে জ্ঞানের রাজ্যে পদার্পণ করার প্রথম উদ্যোগ ইংরাজি শিক্ষা। মেয়েদের লেখাপড়া শেখা দরকার এ কথা তিনি বার বার প্রচার করেছিলেন। প্রাচীনপন্থী ঠাকুর পরিবারে সেদিন আন্দোলনও কম হয় নি। স্বামীর সঙ্গে তিনি বিলেতও গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি মেয়েদের জীবনের সহজ সত্যটিকে উপলব্ধি করেছিলেন। পর্দাপ্রথা ছেড়ে দিয়ে বোম্বাই ফ্যাশানে শাড়ী প'রে বাইরে বেরুনো ইত্যাদি তিনিই প্রথম এ দেশে সুরু করেন। রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান, সভাসমিতির কার্য্যভার গ্রহণ, স্বদেশী প্রচার, মেয়েদের মধ্যে জাতীয়তার ও শিল্পকলা বিস্তারের জন্য সমিতি গ'ড়ে তোলা, ইত্যাদি বহু কাজে শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনীর নাম স্মরণযোগ্য। সেই যুগে তিনি আলো দিয়ে যে আলো জেলেছিলেন তারই শিখা ধ'রে আজ আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি।

নারী সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ। অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হলে মানুষ যেমন চলতে পারে না, সমাজ-জীবনও তেমনি অচল হয় যদি নারী ও পুরুষ, ধনী ও দরিদ্র সমভাবে উন্নত না হয়। তাই আজকের দিনে আমাদের সবচেয়ে বড় আনন্দ ও গর্ব্ব যে, সেদিনের সেই অন্ধকারাচ্ছন্নতাকে ভেদ ক'রে কয়েকজন মহীয়সী মহিলা দুঃখভারাক্রান্ত, মূঢ় ম্লান মুখগুলিকে আশার আলোতে দীপ্ত ক'রে তুলেছেন, তারই সূত্র ধরে আজ আমাদের এত উৎসাহ এত প্রচেষ্টা। বিস্তারিত ভাবে আরো অনেকের কথা বলা হল না তবুও এঁদের মধ্যে অগ্রনায়িকা হিসাবে স্মরণ করি,—স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরোজনলিনী দত্ত, অঘোরকামিনী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরাণী, কুমুদিনী বসু প্রসন্নময়ী দেবী, সরলাবালা দাসী, বাসন্তী দাশগুপ্ত, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, লাবণ্যপ্রভা বসু, জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রতিমা ঠাকুর, সুখলতা রাও, পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী, শান্তা দেবী, সীতা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রভৃতি মনস্বিনী মহিলাদের।

সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকারে ব্রাহ্ম সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মহিলারাও নানা কাজে কম সহায়তা করেন নি। জায়গায় জায়গায় স্কুল খুলে, পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে সমিতি স্থাপন ক'রে তাঁরা সাধারণ মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ও সুস্থতা প্রবেশ করাবার চেষ্টা করতেন। এঁদের আন্তরিক চেষ্টা ও শুভেচ্ছার ঋণ বাংলার নারীসমাজ কোনদিনই ভুলবে না।

—•—

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘর বাঁধতে ঘৃণার আগুন
দেখি জ্বলে আমার বিদেশ ;
নিজের শরীর বেচে তুমি
রক্তে নেয় সন্তানের দ্বেষ।

চার দিকে তস্করেরা ঘোরে
কুয়াসায় দেখা যায় না মুখ ;
ছেলে মেয়ে ধুলায় লুটায়
জননীর কঠিন অসুখ।

খিল বন্ধ ঘরের কূজন
শুনি আর যন্ত্রণায় জ্বলি ;
মা ব'লে ডেকেছি তোরে, দেশ !—
সেই লজ্জা কার কাছে ব'লি।

—০

প্রেম ও প্রতিমা

শঙ্খ ঘোষ

কথায়, মুদ্রায়, ভাবে মনে হয় পিতামহী-সমা,
একটি শ্যামল রেখা পড়ে নি সে দু'খানি ভুরুতে।
শৈশব-সুলভ ভঙ্গি পায় না কি অবিরাম ক্ষমা
তার কাছে। তাই যদি, সে এবং ধার্মিক পুরুতে
কী প্রভেদ ? কিংবা যদি ধরো কোনো বিজ্ঞের নকলে
ডেকে আনি দুই ঠোঁট দিগন্তের মতো ঠোঁটে তার—
তার দুটি চোখ যদি নিদ্রার আভাসে পর্ণ খোলে,
তবে তাকে প্রিয়া বলে মিছিমিছি ডাকা কেন আর !

বিকেলে নীরব বেলা, ঘাটে ঘাটে নেমে আসে আলো,
গরীব দিনের শেষে কুমারী মেয়েরা গান গায়—
তুমি তার চোখে চেয়ে ভাবো তারে ভালোবাসো কিনা।
ধীরে ধীরে রাত বাড়ে। ঘর নেমে বাহিরে মিলালো,
প্রবল ফেণায় ঢেউ ওঠানো ধূসর গঙ্গায়—
একদিন উদাসীন, এখন সে হয়েছে প্রতিমা॥

—০—

অঙ্গীকার

নিখিলকুমার নন্দী

এমন কী বেশি আশা
দূর থেকে কাছে আসা
ফের ছেড়ে যাওয়া শূন্য তীর
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে প্রবীণ নদীর
নাচতে থাকা ভেসে যাওয়া ভাসা
যদি বলি এই ভালোবাসা !

ফিরব বলে ভেসে যাওয়া
ভাসব বলে ফিরে চাওয়া
শ্রাবণের গান শুনতে বৈশাখীরে
ডাকা আর ফাল্গুনী আবীরে
শীতকে আড়াল করতে পাওয়া
শীর্ণ ডালে বন্যতার হাওয়া।

এই তো জীবন, প্রিয়, খেয়া
আনমনে বার বার দেওয়া।
কিছুতে ভরবে না জানি ডালি
অঞ্জলির শূন্যতা পুরতে বালি
জল চেয়ে ; কণ্টকিত কেয়া
দংশনের স্নিগ্ধ স্নেহ নেওয়া।

তবু সব ভাঙে না মনে হয়
ক্ষীণ ভাগ্য দুর্ভাগ্য তো নয় :
এই যে মুহূর্ত-জোড়া চোখে-চোখ
হাতে-হাত সুখ দুঃখ শোক
বিরল বন্ধুতা গন্ধময়
জনতার উপহাস্য অথচ অক্ষয়।

এর কথা ভেবে যদি যাওয়া-আসা
অবিবেকী কাঁদা-হাসা
অসামান্য হয়েও বিফল—
পরিণামী মনে করে বিবেচক ছল
সত্যে হানা—এই ভালোবাসা
এমন কী বেশি আর আশা !

—০—

বৃক্ষ-বন্দনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যে বৃক্ষের সব পুষ্প স্বচ্ছ, চিরলোহিত, উজ্জ্বল ,
যে বৃক্ষের পত্ররাজি ঈশ্বরের ইশারায় কাঁপে,
আমার সমস্ত ধ্যান জুড়ে আছে সেই বৃক্ষতল
আমার আত্মার রক্ত ঝ'রে পড়ে সুস্বাস্থ্য উত্তাপে

সহজ, সহসা-দৃষ্ট সেই মায়া তরুর শিকড়ে ;
উত্তর আকাশ থেকে মধ্যযামে তীব্র এক দ্যুতি
কত মুখচ্ছবি, প্রেম, নির্জনতা উদ্ভাসিত করে ;—
একদা রূপের তৃষ্ণা, বাসনার করেছি যে স্তুতি

পাপের উল্লাস, দৃপ্ত, কলঙ্কিত জীবনের লোভ
সব কিছু শেষাবধি স্বপ্নের গৌরব সাক্ষ্য রাখে,
আমার মৃত্যুর পর আমার এ বুকের বিক্ষোভ
যেন এই কল্পবৃক্ষে চিরকাল বিদ্যমান থাকে ।

—০—

আসঙ্গনীল

সুধীর চক্রবর্তী

আর কিছু নেই শুধু জানলায় রিক্ত আকাশ :
বাউল দুপুর। আকাঙ্ক্ষা আছে অনাসক্তির মর্মমূলে ;
নীল আকাশের এ-প্রান্তশায়ী চিলেকোঠা ছাদে
সেই সনাতন যুগ্ম প্রতীক কপোতকপোতী ঠোঁট ঠুকরোয় ।

ছাদ ভরা ছায়া অনেক আকাশ রোদের প্রহর
মাঝে মাঝে ভাসে রোদের গভীরে চিলের ছায়ার পদসঞ্চার,
এমন পঙ্গু দুঃস্থ দুপুরে নির্বাক্ সেই বর্ণবাহার
আহা মনে পড়ে, মনে প'ড়ে যায় তোমার নামের ধ্বনিতরঙ্গ।

মমতা-ঝর্ণা, দুটো নামই বেশ। ছোটখাট সুখ
মৃদু কম্পিত তোমার নামের ধ্বনি তরঙ্গে :
মমতার মত স্পর্শ-প্রয়াসী, ঝর্ণার মত রহস্যময়
ঘন গাঢ় দুটি বুকের বৃন্ত এই দুপুরের মতন ধূসর ।

শৃঙ্গার শেষ। কপোতকপোতা উড়ে চ'লে গেল ।
নীল আকাশের স্নেহকরপুটে আমার হৃদয় দুই পাখী হয়ে
উড়ে যেতে চায়, আসঙ্গনীল তোমার সে-মনে ;
যে-মন এখন আমার নামের স্মৃতিমন্থর ॥

কুয়াশা

উমা দেবী

দু-এক মুহূর্ত শুধু—
তার পর সে চোখের দৃষ্টির কুয়াশা
মুছে ফেলে চেনা আলো ।
অচেনার রহস্য তখন
হৃদয় আক্রান্ত করে—
সাহসী সৈন্যের মত ।
কিছুকাল ডুবে থাকি বিস্মৃতির শীতল অতলে ।
আবার একদা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে সহাস্য আশায়—
নয়নে নয়ন রেখে খুঁজি এক শীতল নিরালা ।

নিশীথের হিমপাত্রে তারাগুলি ঝ'রে যায় শিশিরের মত
দুর্বোধ দক্ষিণ বায়ু নিদ্রাহীনতার বীজ ছড়ায় চৌদিকে
অন্ধকার ঘিরে আসে সর্পিল রেখায় ।
—আর এক শরীরীর শরীর তখন
জীর্ণ হয় প্রবল তৃষ্ণায়
প্রাণের রহস্যগ্রন্থি মোচন তৃষ্ণায় ।

কেন তার দৃষ্টির কুয়াশা
আমার পৃথিবী করে নিরুত্তাপ বিস্বাদ বিকল ?
সে কুয়াশা ছিন্ন ক'রে রঙিল নিরালা কোনো দিন
নামাবে না মনের গহনে ?
যে গহনে রাত্রি আর কোনোদিন ঝরাবে না তারার শিশির
ঘুমাবে পিপাসা পৃথিবীর ।

—০—

সুখ দুঃখের ঢেউ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সহিব বিকীর্ণ দুঃখ যদি জানা থাকে
তৃষা প্রেম অস্থিরতা বিচিত্র মনীষা
নিয়ে যাবে অন্য স্বচ্ছ হৃদয়ের বাঁকে
যেখানে গুমোট মেঘ ভেঙে ভেঙে তৃষা

অন্তর্লীন রৌদ্রে গন্ধে গানে। রমণীয়
হবে আকাঙ্ক্ষারা। কোনো মেধাবী স্মৃতিতে
বিহ্বল সংঘাত শেষে হবে গ্রহণীয়
রক্তক্ষরা ভাবনারা গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে।

নিমজ্জিত কেউ কেউ স্রোতের অতলে
আকাঙ্ক্ষার বাঁকা ঠোঁট, নীড়ের মায়ায়
অভিভূত হয়ে। জীবিকার পদতলে
কেউ কেউ নিষ্পেষিত। কেউ বা ছায়ায়

নীড় বাঁধে রৌদ্র হতে এসে। আরো কেউ
জ্বলে' জ্বলে' নিভে যায় হিংস্র ফুৎকারে
যখন দু'কূলপ্লাবী তীব্র-ক্ষিপ্র ঢেউ
কঠিন বিস্তৃত হাতে পৃথিবীকে নাড়ে!

গান বাঁধি, ছবি আঁকি। অদৃশ্য শিকড়ে
রসধারা। জীবনের ঘনিষ্ঠ প্রত্যয়ে
আশাবাদী। কারুণ্যকে ঢালে অবক্ষয়ে
নিয়ত দু'হাতে, প্রাণ বাঁচে ঘরে-ঘরে॥

অন্তিম ভাষণ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এই যে বাড়িটা দেখছো অরুণা, আগে
এখানে একটা উধাও মাঠের খুশি
বিস্তৃত ছিল। আর জানো, গাছে গাছে
উৎসী-আকাশ'অবাধ রৌদ্ররাগে
ছড়াতো গভীর কাকলীর ভালবাসা।
হাল্কা হাওয়ায় আমি এসে কতদিন
হেঁটেছি বন্ধু প্রিয় ছায়া-পথ দিয়ে।

বুঝলে অরুণা, তার পর একে একে
দেখলাম এলো বহু লোকজন, আর
ইট-কাঠ-চুণে মানুষের স্বাধিকার
আকাশে বাড়ালো স্পর্ধিত অভিলাষ।
গাছের চেয়েও উঁচু এ-বাড়িটা আজ
হয়ত' আগেই কেড়ে নেয় নীলাকাশ!

তবুও যখন হাওয়ার নালিশ দোলে
সুখী শয্যায়, প্যারাটবে আঁকা ফুলে;
যখন দুপুর চিলের ডানার মত
বাড়িটাকে ঘেরে; গাছ বা গাছের যত
পাখীসংসার পাথরে কি পথ ভোলে!

এই যে বাড়িটা দেখছো, আমাকে রোজ
নিয়মিত তাই দেখে যেতে হয়। ভাবো
সব স্মৃতি নয়···শুনছো অরুণা? শোন,
একদিন আমি তোমাকেও ছেড়ে যাবো!

সশস্ত্র বিপ্লবে বাঙ্গলার বলি

কালীচরণ ঘোষ

বাঙ্গলায় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইতে সশস্ত্র বিপ্লব রূপ গ্রহণ করিতে প্রায় সত্তর বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্তরে আত্মসম্মান জ্ঞান ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা ক্রমেই প্রবলতর গতিবেগ লাভ করিয়াছে। বিদেশীর উপর বিরূপভাব ইহার এক প্রধান লক্ষণ। এ কার্য্যে বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল, গুপ্তকবি, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, শিবনাথ, আনন্দমোহন, প্রভৃতির নাম পুরোগামীদের মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দেশীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সমাজ-সেবা, প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া স্বাধীনতার দাবী আসিয়া দেখা দিল। কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটক, তাহাতে ইন্ধন জোগাইয়াছে। "স্বদেশী" আন্দোলন সুরু হইবার পূর্ব্বেই সন্ত্রাসবাদ বাঙ্গলায় আসন খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল এবং কাহারও কাহারও নিকট আশ্রয় পাইয়া,- সমাদর পাইয়া বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। নানা ক্ষেত্রের নানা লোকের নিকট ইহা উপস্থিত হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী) অরবিন্দ, বারীন্দ্র এক দিক্ হইতে; পি. মিত্র, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ব্রহ্মবান্ধব, ভূপেন্দ্র দত্ত, সুবোধ মল্লিক, আর এক দিক্ হইতে সন্ত্রাসবাদের কথা ভাবিয়াছেন। অপর দিকে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন-চন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রমুখ মহারথীগণ। আর শক্তি বৃদ্ধি করিলেন তরুণের দল উপেন্দ্রনাথ, উল্লাসকর, পুলিন-চন্দ্র দাস, হেমচন্দ্র দাস, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতি।

দারুণ গ্রীষ্মের পর বর্ষার ধারা মাটিতে ঝরিয়া পড়িলে যেখানে যত বীজ জীবন্মৃত অবস্থায় ঐ শুভ সূচনার জন্য দিন গণিতেছিল, তাহারা হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসে। অঙ্কুরিত হইয়া পৃথিবীর রস আলো তেজ গ্রহণ করিবার জন্য লোলুপ হইয়া উঠে। রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণের সঙ্কল্প যখন স্থির হয়, কাল তখন পূর্ণ হইয়াছে। কবিতা গানে সেই চিন্তাধারা পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দেশের মধ্যে আসন্ন প্রলয়ের আগমনীর সুর বিজয়চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কাব্যবিশারদ, কামিনী ভট্টাচার্য্য, দেবব্রত (বসু), প্রভৃতি কবিগণ বাজাইয়া তুলিলেন। সে ডাক বাঙ্গালী যুবকের মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিয়াছে এবং রক্ত দান ও শত্রুর রক্তপাত করিবার জন্য দুর্ব্বার গতিতে তাহারা ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহারা আত্মাহুতি দান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা জাতির নমস্য। আজ স্বাধীন ভারত তাঁহাদের কাছে বহু রূপে ঋণী। সকলের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব নহে; স্থানাভাব বশতঃ তাঁহাদের কাজের সামান্য পরিচয় দিবারও সুযোগের অভাব। "বিপ্লবী বাঙ্গালী" পত্রিকা অগ্নিযুগের শহীদদিগের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। নানা দিক্ হইতে চেষ্টা না হইলে বহু স্মরণীয় নাম বাদ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। যতদূর সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহারই একটা তালিকা মাত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পরে যাঁহারা এ গহন পথে আসিয়া পড়িবেন তাঁহাদের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইলেও হইতে পারে।

সশস্ত্র বিপ্লবে বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শহীদ, প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী। ইনি প্রফুল্ল চাকীর অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু ছিলেন; একই পথের যাত্রী। ইদানীং প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যু-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইহার নাম সাধারণের গোচরীভূত হইতেছে। ১৯০৬ সালে দেওঘরে রোহিণী পাহাড়ে উল্লাসকরের প্রস্তুত বোমার শক্তি পরীক্ষা করিতে গিয়া বিস্ফোরণে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিশ্চিত মরণের পথে বাঙ্গালীর ছেলে দলে দলে নির্ভয়ে চলিয়াছে ও আত্মবলিদান করিয়াছে।

১৯০৮ সালের ২রা জুন মাণিকগঞ্জের বাহ্রা ডাকাতি হয়। বিপ্লবীরা যখন নৌকাযোগে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, তখন গ্রামবাসী ও পুলিশ তীরে তীরে পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে। পালের সাহায্যে নৌকা খুব জোরে চলিতেছে, বাতাসের বেগে জল চল্‌কাইয়া নৌকায় উঠিতেছে। তাহার উপর পুলিশের গুলীতে ছিদ্র হওয়ায় নৌকায় শীঘ্র জল ভরিয়া উঠিতেছে। সঙ্গীরা প্রাণপণে দাঁড় টানিয়া চলিতেছেন, আর গোপাল সেন পাত্রের

সাহায্যে জল ছেঁচিয়া বাহিরে ফেলিতেছেন। এমন সময় পুলিশের এক গুলী আসিয়া কপাল বিদ্ধ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু আসিয়া আপনার শীতল ক্রোড়ে গোপালকে গ্রহণ করিল। নিশ্চিত মরণ জানিয়াও তিনি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া দেশ-প্রেমের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

লোকে সম্পূর্ণ ভুলিয়াছে; নিতান্ত পুরাতন সঙ্গীদেরও স্মরণ করাইয়া না দিলে মনেই পড়ে না। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, উল্লাসকর, প্রভৃতির সহিত অশোক নন্দী আলিপুর বোমার মামলায় সাত বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯০৮ সালের ২রা মে, তাঁহাকে ১৩৪ হ্যারিসন রোড হইতে ধরা হয়। যখন মামলার আপীল হাইকোর্টে চলিতেছে তখন জেলের মধ্যেই অশোকের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯০৯ সালে।

আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে প্রথম বাঙ্গালী শহীদ, আলিপুর বোমার মামলার আসামী ইন্দুভূষণ রায়। ১৯১২ সালে জেল কুঠরীর মধ্যে তিনি আত্মহত্যা করেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সেলুলার জেলে। ইন্দুভূষণের মৃত্যু সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন, "ইন্দুভূষণ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। তাহার বলিষ্ঠ শরীর কঠোর পরিশ্রমেও কখনও কাতর হয় নাই; কিন্তু জেলখানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপমানে যেন দিন দিনই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত; মাঝে মাঝে বলিত, 'জীবনের দশটা বছর আমার পক্ষে এই নরকে থাকা অসম্ভব'। একদিন রাত্রে সে নিজের জামা ছিঁড়িয়া, দড়ি পাকাইয়া পিছনের ঘুলঘুলিতে ফাঁসি খাইল।" (নির্ব্বাসিতের আত্মকথা, পৃঃ ১০১)। ইহাতে কোনও ফল হয় নাই। সেলুলার জেলের অত্যাচারের তুলনা পৃথিবীতে বিরল। ইহাকে যে "Indian Bastille" বলা হয়, তাহা সর্ব্বাংশে সত্য।

মৌলভীবাজারে (আসাম, শ্রীহট্ট) ক্যাপ্টেন গর্ডনের আবাসের সামনে বিকট শব্দে একটি বোমা ফাটে ২৭ মার্চ্চ, ১৯১৩ সালে, রাত্রে। গর্ডন সাহেব জগৎসী অরুণাচল আশ্রম খানাতল্লাসী উপলক্ষ্যে (১৯১২ সালের প্রায় শেষ) দারুণ অত্যাচার করে; ফলে একজন আশ্রমবাসী (ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র দে) নিহত হন। তাহারই প্রতিশোধ লওয়ার জন্য এই প্রচেষ্টা। তখন কেহ নামও জানিল না, দেখা গেল কতগুলি মাংসখণ্ড চারিদিকে ছড়াইয়া আছে এবং তাহারই এক খণ্ডে পৈতা লাগিয়া থাকায় বোঝা গেল, মৃত যুবক ব্রাহ্মণ-সন্তান। অন্য কোনও রূপে সনাক্ত করার উপায় ছিল না। ১৯১৫ সালের বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার এক সাক্ষীর মুখে প্রকাশ পাইল, সেই যুবকের নাম যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। নিজেকে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলা বিপ্লবীদের এক বড় লক্ষণ।

রংপুরের বিপ্লবীদলের এক অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার যুবাপুত্রের সন্ত্রাসবাদ কার্য্যে "হাতেখড়ি" প্রয়োজন। তিনি বিশ্বস্ত দুঃসাহসী সহকর্মী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর উপর ভার দিলেন। সঙ্গে অপর একজন অভিজ্ঞ সঙ্গী। জঙ্গলের ভিতর দিয়া গন্তব্যস্থানে যাইবার সময় বাঘ আসিয়া প্রথমেই যুবককে আক্রমণ করে। নরেন্দ্র বাঘের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে! যুবককে ছাড়িয়া বাঘ সমস্ত শক্তি নরেন্দ্রের উপর প্রয়োগ করে। সেইখানেই নরেনের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। এ ঘটনার সাক্ষ্য দিবার জন্য সেই বয়স্ক (বৃদ্ধ) ব্যক্তি আজও বাঘের আঁচড় চিহ্ন বহন করিয়া জীবিত আছেন।

কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় মজঃফরপুরে মিসেস ও মিস কেনেডি ১৯০৮, ৩০ এপ্রিল নিহত হন। গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করেন প্রফুল্ল চাকী ও সঙ্গী ক্ষুদিরাম বসু। ধরা পড়িবার আগেই মোকামা রেল-স্টেশনে ১লা মে, ১৯০৮, প্রফুল্ল আপনার গুলীতে আত্মহত্যা করেন।

ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন ওয়াইনি স্টেশনে ১লা মে। ঘটা করিয়া বিচার হয় এবং ফাঁসিতে তাঁহার মৃত্যুর আদেশ হয়। ফাঁসির তারিখ ১১ই আগস্ট, ১৯০৮। ইহাই বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক কারণে প্রথম ফাঁসি। তিনি জীবন দিয়া প্রমাণ করিলেন—

"আমি ধন্য হব মায়ের জন্য লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের বেত্রাঘাতে, কারাগারে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে।
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।"

আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, উল্লাসকর, প্রভৃতি আসামী। মোকদ্দমা "পাকা" করিবার জন্য পুলিশ কৌশলে নরেন গোঁসাইকে রাজসাক্ষী সৃষ্টি করিল। আসামীদের সমূহ বিপদ্ উপস্থিত। সত্যেন বসু অসুস্থ যক্ষ্মার রোগী। তাঁহার মনে হইল রোগে ভুগিয়া আর না হয় ফাঁসিতে মরিয়া লাভ নাই। "মড়ার মতন না লভি মরণ, সাধকের মত" মরিতে হইবে। কানাইলাল দত্ত এ সংবাদ পান এবং রোগের অছিলায় হাসপাতালে যান। পরামর্শ পাকা হইলে স্বীকারোক্তি করিবার উদ্দেশ্যে নরেন গোঁসাইকে হাসপাতালে ডাকিয়া পাঠান। মহা

আনন্দে পুলিশ এই আলাপের সুযোগ করিয়া দেয়। ৩১ আগস্ট, ১৯০৮, বিশ্বাসঘাতকের প্রাণনাশ করিয়া কানাই দত্ত ১০ নবেম্বর আর সত্যেন বসু ২১শে নবেম্বর, ১৯০৮, হাসিমুখে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

সামসুল আলম পুলিশের ডেপুটি 'সুপার' হিসাবে রাজনৈতিক মামলা গুছাইয়া তুলিতে সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিলেন ; বিশেষতঃ সাক্ষী "গড়িয়া" খাড়া করায় একেবারে অদ্বিতীয়। তখনকার ছোকরা বিপ্লবীরা গানের সুরে বলিত—

"ওগো সরকারের শ্যাম, তুমি আমাদের শূল,
তোমার ভিটেয় কবে চরবে ঘুঘু, তুমি দেখবে চোখে সরষে ফুল।"

তাঁহাকে পৃথিবী হইতে অপসারণের ভার পড়ে বীরেন দত্তগুপ্তর উপর। ১৯১০, জানুয়ারী ২৪, বীরেন তাহাকে হাইকোর্টে গুলী করিয়া হত্যা করেন। বিচারমতে বীরেন ১৯১০, ফেব্রুয়ারী ২১, ফাঁসিকাষ্ঠে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

সরকারী উকিল আশু বিশ্বাস রাজনৈতিক মামলা পরিচালনায় "আইনসঙ্গত" প্রমাণ সংগ্রহ ব্যাপারে পুলিশের প্রধান পরামর্শদাতা। মামলায় যাঁহার মুক্তি পাইবার কথা, তিনি মামলার ভার লইলে সেই আসামীর ফাঁসি হইবার উপক্রম। তাঁহার এ কার্য্যে যবনিকাপাত করিবার জন্য বিকলাঙ্গ চারু বসু আলিপুর কোর্টে ১৯০৯, ফেব্রুয়ারী ১০, তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করেন। বিচারে কয়েক মাস বাদেই তাঁহার ফাঁসি হয়। তিনি পলাইবার চেষ্টা করেন নাই, মামলায় অংশ গ্রহণ করা তাঁহার অনভিপ্রেত ছিল। জন্মাবধি চারুর বাঁহাতে তালু অঙ্গুলি ছিল না, বাংলায় চলিত কথা "নুলো"। সেই হাতে পিস্তল বাঁধা ছিল। দক্ষিণ হস্তে "ঘোড়া" (trigger) টিপিয়া রিভলবার চালান। তিনি মনে করিয়াছিলেন, "মাতৃকণ্ঠে যার বাজিছে শৃঙ্খল, সবল দুর্ব্বল, সে কি ভাবিবে।"

বড়লাট বাহাদুর হার্ডিঞ্জ ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১২, দরবার উপলক্ষে দিল্লীতে মহাসমারোহে হস্তীপৃষ্ঠে যাত্রা করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার উপর এক বোমা নিক্ষিপ্ত হয় ; তখন কেহ ধরা পড়ে নাই। পরে পাঞ্জাবে লরেন্স গার্ডেন বোমা বিস্ফোরণ উপলক্ষে ধরপাকড় চলে এবং অপর কয়েকজনের সহিত বসন্ত বিশ্বাস ধরা পড়েন। বিচারে ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫, বিশ্বাসের ফাঁসির হুকুম হয় ; সেসন আদালতের বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় ; পরে সরকারী আপীলে তাহা বৃদ্ধি করিয়া মৃত্যুদণ্ডে পরিণত করা হয়। বয়সে বালক বলিলে চলে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি রাসবিহারী বসুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন।

ধরণীধর দে কুমিল্লা, ফরিদপুর প্রভৃতি নানা স্থানে বিপ্লবাত্মক কাজে লিপ্ত ছিল। তাহাকে কোনও রকমে ধরিতে না পারিয়া পুলিশ ফেরারী আসামী বলিয়া প্রচার করিয়া দেয়। তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। অবশেষে তাহাকে কলিকাতা নেবুতলায় একটি ঘরের মধ্যে পুলিস সন্ধান করিতে আসিয়া ধরিয়া ফেলে। তাহার দেহ খানাতল্লাসী করিবার পূর্ব্বে সে একটি বড়ি মুখে ফেলিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বেই তাহার জীবনান্ত ঘটে ; তারিখটি ১৪ই এপ্রিল, ১৯১৬ সাল।

নদীয়া জেলার প্রাগপুর গ্রামে পুলিশের সহিত প্রকাশ্য সংঘর্ষে ৩০শে এপ্রিল, ১৯১৫, সুশীল সেন জীবনোৎসর্গ করেন। এই সুশীল সেনকে কিংস্‌ফোর্ড ম্যাজিষ্ট্রেট বেত্রাঘাতের আদেশ দেন।

শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বিপ্লবীদলের একজন অক্লান্ত কর্ম্মী। ১৯১৬ সালে নানা জেলে রাখিবার পর গুপ্ত সংবাদ পাইবার সুযোগ হইতে পারে বলিয়া তাহাকে রংপুরে পিতার নিকট অন্তরীণ রাখা হয়। প্রতিনিয়ত পুলিশ আসিয়া এত উপদ্রব অত্যাচার করিত যে অবশেষে তাহাকে আত্মহত্যার সাহায্যে সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয়।

পুলিশের সহিত গুলী বিনিময়ে ময়মনসিংহে ১৯১৫ সালে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন মণীন্দ্র বসু। অনুরূপ কারণেই ১৯১৬ সালে উত্তরবঙ্গে সুশীল দত্ত নিহত হন।

১৯১৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর, সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। পাথুরিয়াঘাটায় ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫, পুলিশ বলিয়া সন্দেহক্রমে এক ব্যক্তি নিহত হইলে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া উড়িষ্যার জঙ্গলে কপ্তিপদা নামক জঙ্গলময় স্থানে শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আশ্রয়লাভ করেন। পুলিশ সন্ধান পাইয়া সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় রায় (চৌধুরী), নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও যতীশচন্দ্র পাল সে স্থান পরিত্যাগ করেন। পরে বালেশ্বরে চষাখন্দ নামক স্থানে বুড়াবালং

নদীতীরে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সহিত প্রকাশ্য সংঘর্ষে ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫, চিত্তপ্রিয় ঘটনাস্থলেই মারা যান। যতীন্দ্রনাথ হাসপাতালে পরদিন (১০ই) চিত্তপ্রিয়কে অনুসরণ করেন।

বিচারে নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসির হুকুম হয় এবং ১৯১৫, নভেম্বর বালেশ্বরে ফাঁসি হয়। যতীশের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। দণ্ডের কালপূর্ণ হইয়া বহরমপুর জেল হইতে মুক্তিলাভের পূর্ব্ব সপ্তাহে সন্দেহজনক ভাবে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রঙ্গলালের বাণী :

"সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার"

যতীন্দ্রনাথ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

ভারত-জার্ম্মান ষড়যন্ত্র ব্যাপারে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ধরা পড়েন। তাঁহার নিকট স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্ম্মম অত্যাচার চলিতে থাকে। যন্ত্রণায় পাছে মুখ দিয়া কিছু প্রকাশ হইয়া পড়ে, সে কারণে তিনি (গোয়া মতান্তরে, নাসিক) জেলে ১৯১৬ সাল, ২৭ জানুয়ারী, আত্মহত্যার সাহায্যে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

শ্রীশ মিত্র (হাবু) রডাপিস্তল চুরি ব্যাপারে জড়িত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগের উদ্দেশ্যে "লঙ্ঘি বনানী পর্ব্বতরাজি" চীনে যাইবার জন্য রওনা হন। ভারতসীমা লঙ্ঘন করিয়া চীন রাজ্যে পড়িলে (১৯১৬) চীনা সান্ত্রীর গুলীতে প্রাণ হারান।

মাতৃকণ্ঠের শৃঙ্খলধ্বনি যাহার কানে বাজিতেছে, তাহার বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই, বিপদ্‌-আপদের জ্ঞান নাই। প্রবোধ ভট্টাচার্য্য অন্তরীণ অবস্থা হইতে একদিন উধাও হইয়া যান, তাঁহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। পরে (১৯১৬) ললিতেশ্বরে এক লুণ্ঠনকার্য্যে যাইবার সময় সর্পদংশনে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সঙ্গীরা তাঁহার মৃত্যুর কথা "গায়েব" করিয়া ফেলে।

সহকর্ম্মী অন্তরঙ্গ বন্ধু বিপ্লবের নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া বিপথগামী হয়। তাহাকে হত্যা করার অভিযোগে ১৯১৭ সালে লক্ষ্ণৌ জেলে সুশীল লাহিড়ীর ফাঁসি হয়।

আত্মসম্মানের জ্ঞান মানুষকে কত বে-পরোয়া করিতে পারে তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় রাধাচরণ প্রামাণিকের জীবনের ঘটনা হইতে। গার্ডেন রীচ অর্থ-লুণ্ঠনের মামলায় রাধাচরণের দীর্ঘ মেয়াদী কারাবাসের আদেশ হয়; তখন ১৯১৭ সাল। জেলে থাকাকালীন তাঁর চক্ষুর পীড়া দেখা দেয় এবং তিনি তদানীন্তন জেল সুপারের কাছে ঔষধ চান। সুপার মহাপ্রভু বলেন যে, যাহারা সমাজবিরোধী কাজ করে তাহারা অন্ধ হইয়া গেলে দেশের কল্যাণ। ঘৃণায় রাধাচরণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, জেলে থাকাকালে কৃপার ঔষধ তিনি আর ব্যবহার করিবেন না। পরে দারুণ রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়াও জেলের চিকিৎসায় তিনি অসম্মত হন এবং সেই রোগেই তাঁহার ভবলীলা শেষ হয়।

দার্জ্জিলিং হইতে ১৯৩২ সালের ৬ই জুন এক অতি সংক্ষিপ্ত সংবাদ দেওয়া হয় যে দেউলী বন্দীনিবাসে মৃণালকান্তি চৌধুরী আত্মহত্যা করিয়াছে; বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

১৯১৮ সালের ১৫ই জুন ঢাকা কালতাবাজারে পুলিশের সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে ঘটনাস্থলে প্রাণ দেন তারিণী মজুমদার, পরের দিন (১৬ই) হাসপাতালে নলিনী বাগচির দেহান্ত ঘটিয়াছিল।

অন্তরীণ অবস্থায় অস্বাস্থ্যকর হিংস্রপশুসঙ্কুল স্থান, বিপদে আপদে কাহারও সাহায্য পাইবার উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় কত বিপ্লবী "বেঘোরে" প্রাণ দিয়াছে তাহার সব সংবাদ প্রকাশ পায় নাই। ১৯১৮ সালে সত্যেন সরকার এইরূপ অন্তরীণ অবস্থায় পাগলা শিয়ালের কামড়ে মৃত্যু আলিঙ্গন করেন।

টেগার্ট-ভ্রমে অপর একজনকে ১২ জানুয়ারী, ১৯২৪, হত্যা করায় গোপীনাথ সাহার ফাঁসির হুকুম হয় এবং ১লা মার্চ্চই ফাঁসি হয়।

গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশ্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভূপেন চ্যাটার্জ্জিকে আলীপুর জেলের মধ্যে (দক্ষিণেশ্বর

সহপাঠী সুভাষ

নিরালম্ব স্বামী (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

জীবন ঘোষাল

দীনেশ গুপ্ত

এস. আর. চৌধুরী

নির্ম্মলজীবন ঘোষ
(বার্জ্জ-হত্যার ষড়যন্ত্র মামলায় মেদিনীপুর জেলে
১৯৩৪, ১৬ই অক্টোবর ফাঁসী হয়।)

যতীন মুখোপাধ্যায়

হরিগোপাল বল. মতিলাল কানুনগো

যতীন্দ্র দাসগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, পুলিন ঘোষ

নরেশচন্দ্র রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধূভূষণ ভট্টাচার্য্য

দেবপ্রসাদ গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন, রজত সেন, স্বদেশ ঘোষ

বোমার মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী) অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরী ২৮ জানুয়ারী, ১৯২৬, লোহার ডাণ্ডার আঘাতে হত্যা করেন। বিচারে মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয় এবং আগস্ট (১৯২৬) উভয়ের ফাঁসি হয়।

৯ই আগস্ট, ১৯২৫, কাকোরি ট্রেন লুঠ হয় এবং একজন গুর্খা যাত্রী নিহত হয়। মামলা চলে এবং ৬ই এপ্রিল, ১৯২৭ সালে রায় প্রকাশিত হয়। অপর তিনজনের সহিত রাজেন লাহিড়ীর ফাঁসির হুকুম হয় এবং গণ্ডা জেলে ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৭, তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে যতীন দাস প্রভৃতির বিচার চলিতেছিল। রাজনৈতিক বিচারার্থীর যোগ্য ব্যবহার দাবী জানাইয়া যতীন অনশন ব্রত গ্রহণ করেন এবং ৬৩ দিন অনশনের পর ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯, (বেলা ১-৫) মৃত্যুঞ্জয়ী হন। মনে কত শক্তি থাকিলে লোকে তিলে তিলে আপনাকে ক্ষয় করিতে পারে তাহা কল্পনার বিষয়। তাঁহাকে ভারতের টেরেন্স ম্যাক্সুইনী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

যতীন্দ্রনাথ জীবনে গাহিয়াছিলেন :

"যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর—
দুঃখিনী জনমভূমি, মা আমার ! মা আমার !"

মরণে তাহাই প্রমাণ করিয়া গেলেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের উপযোগী প্রচণ্ড বোমা তৈয়ারী করিবার কালে (১৯১৩) বিপ্লবী ধীরেন্দ্রনাথ দে বিস্ফোরণের ফলে আহত হইয়া মৃত্যুবরণ করে।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের নেতা "মাস্টার দা" ছোট ভাইদের ডাক দিলেন :

"হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নিমন্ত্রে কি না ?

* * * *

পোড়াতে অরিকে, পুড়িয়া মরিতে
পারিবি কি না ?

* * * *

ধেয়ে আয় যারা মরিতে পারিস্
শ্মশানের ধূমে মিশাইতে বিষ,
মরণ আদেশ দিতেছে স্বদেশ,
পালিবি কি না ?"

এ আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই : অজাতশ্মশ্রুগুম্ফ বালকেরও একদল আসিয়া বিপ্লবের "মুক্ত সমুন্নত পতাকা তলে" ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

অতঃপর ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ চট্টগ্রাম সামরিক ও পুলিশ অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। অস্ত্রাগারের মধ্যে দগ্ধ হইয়া ২৮শে হিমাংশু সেন জীবন দান করেন। ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে সম্মুখসমরে নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য্য, হরিগোপাল বল, মতি কানুনগো, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, পুলিনবিকাশ ঘোষ, যতীন দাশগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, নির্ম্মল লালা আত্মাহুতি দান করেন। অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নীত হয় এবং ২৪ এপ্রিল তাহার দেহান্ত ঘটে। অমরেন্দ্র নন্দীকে পুলিশ তাড়া করিয়া সদরঘাটে লইয়া যায় ; সেখানে সে রিভলভারের সাহায্যে ২৪ এপ্রিল আত্মহত্যা করে, তখন তাহার নিকট দুইটি রিভলভার ছিল।

কালারপোলে ৬ই মে তারিখে (১৯৩০) দেবপ্রসাদ গুপ্ত, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন ও স্বদেশ ঘোষ (রায়) পুলিশের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

ডালহাউসি স্কোয়ারের নিকট টেগার্টের গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করিবার কালে বিস্ফোরণে অনুজা সেন ঘটনাস্থলেই ২৫ আগস্ট, ১৯৩০, মারা যান।

জীবন ঘোষাল, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ফেরারী আসামী, চন্দননগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩০, পুলিশের সহিত সঙ্ঘর্ষে তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কর্ম্মরত আই. জি. পুলিশ সিম্প্‌সন্‌কে তিন বন্ধু বিনয় বসু, সুধীর গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত ৮ই ডিসেম্বর (১৯৩০) হত্যা করেন। সুধীর বা বাদল ঘটনাস্থলেই পটাসিয়াম্‌ সায়েনাইড খাইয়া আত্মহত্যা করে। বিনয় ও দীনেশ আত্মহত্যার জন্য নিজ দেহে গুলী চালনা করেন। জীবিত অবস্থায় তাঁহাদের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। বিনয়ের মৃত্যু ঘটে ১৩ই ডিসেম্বর, দীনেশ আরোগ্য লাভ করে। বিচারে তাহার ফাঁসির হুকুম হয় এবং ৭ই জুলাই (১৯৩১) তাহার ফাঁসি হয়।

জলপাইগুড়িতে টেলিগ্রাফের তার কাটার উদ্দেশ্যে রেল লাইন ধরিয়া নৃপেন দত্ত ও বীরেন রায় চলিতেছিলেন। অতর্কিতে ট্রেন আসিয়া পড়ায় দুই বন্ধুই রেলে কাটা পড়িয়া (১৯৩০) প্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

পুলিশের আই. জি. ক্রেগকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে গিয়া তারিণী মুখার্জ্জি দারোগাকে চাঁদপুর স্টেশনে হত্যা করেন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, ১ ডিসেম্বর (১৯৩০)। বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয় ১৯৩১ জুলাই মাসে।

আলিপুরের সেসন জজ গার্লিককে কাছারির এজলাসে হত্যা করিয়া কানাই ভট্টাচার্য্য বিষপানে ২৭ জুলাই (১৯৩১) আত্মহত্যা করেন।

হিজলী বন্দীনিবাসে ১৬ সেপ্টেম্বর (১৯৩১) পুলিশের গুলীতে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনের জীবনান্ত ঘটে।

ফরিদপুর আন্ধারিয়া লুণ্ঠন ব্যাপারে জ্যোতির্ম্ময় মিত্র স্থানীয় অধিবাসী কর্ত্তৃক বর্শাবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন ১৯৩৩ সালে।

৫ই জুন, ১৯৩২, স্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদক ওয়াট্‌সন্‌কে হত্যার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া অতুল সেন ৫ই জুন, ১৯৩২, আত্মহত্যা করেন।

চট্টগ্রাম ধলঘাটে পুলিশের সহিত সংঘর্ষে ১৩ জুন নির্ম্মল সেন ও অপূর্ব্ব সেন নিহত হন।

চরমুগুরিয়া লুণ্ঠন ব্যাপারে লিপ্ত বলিয়া ১৯৩২, আগস্ট মাসে বরিশাল জেলে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের ফাঁসি হয়।

বিপ্লবীদের মধ্যে বাঙ্গালার নারীর স্থান নিতান্ত তুচ্ছ নহে। তাঁহাদের সহযোগিতা না পাইলে অনেক বিপ্লবীকে অকালে ধরা পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইত; অনেক কাজ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদী ঘটনায় তাঁহারা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ইহার সামান্য ব্যতিক্রম। ২৪শে অক্টোবর (১৯৩২) প্রীতিলতা চট্টগ্রাম ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করেন, এবং ঘটনাস্থলেই বিষপানে আত্মহত্যা করেন। বাঙ্গালীর, বাঙ্গলার নারীর পক্ষে ইহা এক মহা গৌরবের দিন। ইঁহাদেরই জন্য কবি গাহিয়াছিলেন:

"আজি মা গো খুলে রাখ মণিময় হার,
গলে পর নরমুণ্ডমালা,
ভয়ঙ্করা নীল ঘোরা শ্যামাঙ্গিনী কালী,
সাজ তুমি কপালকুণ্ডলা।
করে লহ ক্ষিপ্ত অসি ফেলে হেম বাঁশী,
দৈত্য বধি রক্তপান কর মা গো আসি।"

আবার বলিয়াছিলেন:

"এলাইয়ে দাও কুটিল কুন্তল,
জ্বাল মা! হৃদয়ে প্রতিহিংসানল,
নয়নের কোণে লুকায়ে গরল,
মরণে বরণ করিয়া লও গো।

ঐ শোন বাজে বিধাতার ভেরী,
বাঁধি কটিতটে সুশাণিত ছুরি
দানবদলনী সাজ গো জননী,
কাঙ্গালিনী বেশ ছাড় গো।"

এ সকল মন্ত্রের সাধন করিয়া গিয়াছেন আমাদেরই ভগ্নী প্রীতিলতা।

ননী লাহিড়ী ও (অনিল ভাদুড়ী) গোপাল চৌধুরী ওয়াট্‌সনের উপর হামলা করিয়া মাঝেরহাট মৃত্যাশিবতলায় আশ্রয় লন ; সেখানে ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ পুলিশের সহিত গুলী-বিনিময়ে নিহত হন। একই কারণে ১৯৩২, ডিসেম্বর মাসে ধলঘাটে শ্যামকুমার নন্দীর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

ঢাকায় পুলিশগারদে (১৯৩২) অত্যাচারের ফলে অনিল দাস ও মেদিনীপুরে সন্তোষ বেরার জীবনপুষ্প অকালে ঝরিয়া যায়।

ম্যাজিষ্ট্রেট কামাখ্যা সেন ২৭ জুন (১৯৩২) নিহত হন। কালীপদ মুখার্জ্জির আততায়ী সন্দেহে বিচার হয় এবং ২২ জানুয়ারী (১৯৩৩) তাঁহার ফাঁসি হয়।

বিপ্লবীর নিকট আত্মীয় অপেক্ষা দেশ বড়। মামা ছিলেন পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং কাকোরী মামলা সাজাইয়া তুলিবার ভার ছিল তাঁহার উপর। মণীন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) ২৮ জানুয়ারী (১৯২৮) তাঁহার উপর হামলা করেন, মাতুল রক্ষা পান। মণীন্দ্রের ১০ বৎসর সশ্রম কারাবাসের দণ্ড হয়। ১৯৩৪ সালে ২০ জুন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি জেলেই প্রাণত্যাগ করেন।

চট্টগ্রাম পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবের উপর হামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে পুলিশ শৈলেশ্বর চক্রবর্ত্তীর তল্লাস করিয়া বেড়ায়। অবশেষে ১৯৩৩ সালে আত্মহত্যা করিয়া তিনি সকল উপদ্রব হইতে মুক্তিলাভ করেন।

আন্দামান সেলুলার জেলে দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদে মোহিত মৈত্র, মনকুমার নমদাস (ও মহাবীর সিং) অনশনব্রত গ্রহণ করেন এবং যথাক্রমে ২৮ মে, ২৬ মে ও ১৭ মে, ১৯৩৩, স্বাধীনতা যজ্ঞে শেষ আহুতি দান করেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অধিনায়ক সূর্য্য সেন, (মাস্টারদা) পুলিশের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ১৯৩০ এপ্রিল হইতে ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আত্মগোপন করিয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের গৈরালা গ্রামে তিনি ধৃত হন ; বিচারে অবধারিত ফল ফলিল। ১২ জানুয়ারী, ১৯৩৪, তাঁহার ফাঁসি হয়। মরণের সহযাত্রী হন ঐ একই দিনে জীবনের সহচর তারকেশ্বর দস্তিদার। তিনি গেরা গ্রামে ১৯ মে, ১৯৩৩, ধরা পড়িয়াছিলেন।

দীনেশ মজুমদার টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেন। মেদিনীপুর জেল হইতে পলায়ন করিয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২২ মে, ১৯৩৩ সালে পুলিশের সহিত যুদ্ধে দীনেশ ধরা পড়েন, ৯ই জুন, ১৯৩৪ সালে তাঁহার ফাঁসি হয়।

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডাগলাসকে হত্যার অপরাধে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্যের ফাঁসি হয় ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৩।

২৭ জুন ১৯৩২ কামাখ্যা সেনকে হত্যার অভিযোগে ২২ জানুয়ারী, ১৯৩৩, কালীপদ মুখার্জ্জির ফাঁসি হয়।

পুলিশের নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার ফলস্বরূপ ১৯৩৩ সালে ময়মনসিংহে ধীরেন দের প্রাণান্ত ঘটে।

চট্টগ্রাম গোহিরা থানায় পুলিশের সহিত সঙ্ঘর্ষে মনোরঞ্জন দাস ও পূর্ণ তালুকদার এবং মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ্জ হত্যার প্রচেষ্টায় ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৩৩) মৃগেন দত্ত ও অনাথ পাঁজার জীবনান্ত ঘটে।

৭ই জুলাই (১৯৩৩) চট্টগ্রাম ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড খেলার মাঠে গুলী চালনা সম্পর্কে ঘটনাস্থলে নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য ও হিমাংশু চক্রবর্ত্তী (ভট্টাচার্য্য) নিহত হন এবং হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরী ধরা পড়েন। ১৯৩৪ জুন মাসে উভয়ে ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন উৎসর্গ করেন।

ময়মনসিংহ জামালপুরের ১৯৩৩ সালের ২৩ আগস্ট তারিখের ঘটনা। আই. বি. পুলিশের লোক আসিয়া ধীরেন দেকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ধীরেন বাড়ী আসে না ; পিতা-মাতা আত্মীয়রা ব্যাকুল লইয়া চারিদিকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতে সরকারী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ধীরেনের প্রাণহীন দেহ পাওয়া গেল। দেহে যে প্রচুর গুলী বর্ষণ হইয়াছে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে ; আরও আছে দেহের নানাস্থানে বিশেষতঃ তলপেট অঞ্চলে নিদারুণ আঘাতের চিহ্ন। তাহার মুখ হইতে কোনও গুপ্ত সংবাদ আদায়ের জন্য পুলিশ এই নির্ম্মম অত্যাচার করিয়া হত্যা করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ।

ময়মনসিংহে হত্যা, ডাকাতির চেষ্টা, বেআইনী অস্ত্র রাখা, প্রভৃতির অভিযোগে এক স্কুলের ছাত্রের প্রতি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় ৫ই জুলাই, ১৯৩৩। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাহার ফাঁসি হয় নাই, অন্ততঃ সঠিক খবর আমার জানা নাই। কিন্তু তাহার সহিত অপর একটি আসামীর জেলের মধ্যেই প্রাণান্ত ঘটে। স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টায় যে অত্যাচার করা হয়, ইহা তাহারই সাক্ষাৎ ফল বলিয়া অনুমান করা হয়। আজ পর্য্যন্ত তাহার নাম জানিতে পারা যায় নাই।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত আসামী নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ওরফে "গিরিজাবাবু" আগ্রা জেলে দণ্ডভোগ কালের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন।

দেওলী জেলের আবহাওয়া অনেক বাঙ্গালী বন্দীর সহ্য হয় নাই। রাজসাহীর হরিপদ বাগচী বন্দীনিবাস হইতে রুগ্ন অবস্থায় স্থানীয় ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইবার পর ২৩শে আগস্ট, ১৯৩৩, প্রাণত্যাগ করেন।

শৈলেশ চট্টোপাধ্যায় হিজলী বন্দীনিবাসে নানাপ্রকার ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন; চিকিৎসায় কোনও ফলই দেখা যায় নাই। উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিয়াই ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২, তাঁহাকে দেউলী পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৯শে অক্টোবর, ১৯৩৩, জেল হাসপাতালে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

শ্রীহট্ট ইটাখোলা ডাকাতির মামলায় (১৯৩৪) অসিত ভট্টাচার্য্যের ফাঁসি হয়।

বার্জ্জ হত্যায় নির্ম্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তীর বিচার হয় এবং ২৫ অক্টোবর (১৯৩৪) তাঁহাদের তিন জনের ফাঁসি হয়।

পরজকান্তি চৌধুরী চট্টগ্রামে পুলিশের সহিত সংঘর্ষে (১৯৩৪) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঢাকা দেওভোগে গুলী চালনার ব্যাপারে ১৫ ডিসেম্বর (১৯৩৪) মতি মল্লিকের ফাঁসি হয়।

বাঙ্গলার লাট হত্যার চেষ্টায় রাজসাহীতে ৩ মার্চ্চ (১৯৩৫) ভবানী ভট্টাচার্য্যের ফাঁসি হয়।

পলাতক আসামীকে আশ্রয়দানের অভিযোগে রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর দীর্ঘ সশ্রম কারাবাস ঘটে। তাঁহাকে মেদিনীপুর জেলে বন্দী রাখা হয়। কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করেন (১৯ ৬) এবং তাহারই ফলে তাঁর জীবনান্ত ঘটে।

পথ হইতে অতর্কিতে ধরিয়া লইয়া গিয়া মেদিনীপুরে থানার মধ্যে পুলিশ ননীজীবন ঘোষকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করে (১৯৩৬)। ফলে তাহার মৃত্যু ঘটিলে রাস্তার উপর ফেলিয়া দেয়।

ফরিদপুরে অন্তরীণ আবদ্ধ অবস্থায় অপমান ও অত্যাচারের প্রতিবাদে রোহিণী বড়ুয়া দারোগাকে হত্যা করেন। বিচারে তাঁহার (১৯৩৭) ফাঁসি হয়।

অন্তরীণ অবস্থায় ও কারাগারে সশস্ত্র বিপ্লবের বহু সৈনিক প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নাম জানা সম্ভব হইবে না। তবে তাঁদের প্রতীক হিসাবে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা যায়। দৃঢ়চেতা, ক্ষুরধার বুদ্ধি, সঙ্কল্পে অটল, নির্ভীক, অনলস কর্ম্মী ও পরে নেতা হিসাবে সাতকড়ির জোড়া মেলা কঠিন। ১৯৩৭, ফেব্রুয়ারী ৬, দেউলী বন্দীনিবাসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জেল কর্ত্তৃপক্ষের অকথ্য আচরণের প্রতিবাদে ঢাকা জেলে ১৯৩৮ জানুয়ারীতে হরেন মুন্সী অনশনে দেহত্যাগ করেন।

মাদ্রাজ উপকূলে সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়াইবার চেষ্টায় ১৯৪৩, সেপ্টেম্বর ৯, মনকুমার বসু ঠাকুর, দুর্গাদাস রায় চৌধুরী, নন্দকুমার দে, নিরঞ্জন বড়ুয়া, চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, কালীপদ আইচ ও নীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ফাঁসি হইয়াছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সহিত দেশের যোগাযোগ স্থাপন উদ্দেশ্যে আজাদ ফৌজের যে কয়জন সেনা পুরীতে অবতরণ করে তাহাদের একজন মাহিন্দ্র সিং জেলের মধ্যে আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করেন।

সাধ্যাতিরিক্ত চেষ্টাতেও যে বহু নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিখিলবঙ্গ শহীদ ও দেশসেবক স্মৃতিসমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত তালিকায় অনেক নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অতি সামান্য পরিচয়ই পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং কাজ অনেক বাকী, এ সম্বন্ধে নিষ্ঠার সহিত লাগিয়া থাকিতে না পারিলে বহু রোমাঞ্চকর স্মরণীয় ঘটনা বিস্মৃতিগর্ভে তলাইয়া যাইবে।

পরিশেষে একটি বিষয়ের অবতারণা করার প্রয়োজন মনে করি। যাঁহারা দেশের জন্য জীবন দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া স্বাধীন ভারতের নরনারী অনেকেই নিজেদের ধন্য মনে করিতেছেন। যাঁহারা ইংরেজের কৃপায় পুষ্ট হইয়া এই সকল শহীদদের নাম কলঙ্কলিপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহাদেরও অনেকে উঁহাদের নাম গ্রহণে গদগদ হইয়া পড়েন। যাঁহাদের কথা সকলেই ভুলিতে বসিয়াছে, তাঁহাদের নাম মনে আনিতে কোনও চেষ্টাই নাই। তাঁহাদের বাড়ীর উপর, অধিবাসীদের উপর লঘুগুরু বহু অত্যাচার স্বাধীনতার বাহিনী কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে। কাহারও যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে, কেহ এক রাত্রে পথের ভিখারী

হইয়া গিয়াছেন। এই লুণ্ঠনকার্য্যে লিপ্ত কর্মীদের সহিত স্বাধীনতা-সংগ্রামের কি সম্পর্ক আছে তাহা সঠিক না জানিয়া কেবল ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে প্রতি গৃহীর কর্ত্তব্যপালন করিতে তাঁহারা বাধা দিতে গিয়াছেন। নারীনির্য্যাতনের গুরু অভিযোগ নাই। ধনহানি, অঙ্গহানি, প্রাণহানি পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইয়াছে। ধনের অপবাদই তাঁহাদের একমাত্র অপরাধ। ইহার উপর সরকারের মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়া বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই নিকট বহু লাঞ্ছনা, অত্যাচার, মনস্তাপ সহ্য করিতে হইয়াছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লুঠের কালে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, "ঋণ" হিসাবে অর্থ গৃহীত হইতেছে; দেশ স্বাধীন হইলে তাহা সুদসমেত পরিশোধ করা হইবে। এই লুণ্ঠিত পরিবারের কেহ কেহ কেহ প্রাণে মরিয়াছে, বিশেষতঃ পরিবারের সাহসী ও শক্তিমান্ যুবকের দল যাহারা বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই আক্রমণকারীদের মধ্যে আজ অনেকেই অসমসাহসিক দেশের কাজের অজুহাতে শাসনের গদিতে সমাসীন; কেহ কেহ বা সরকারী সম্মান, কৃতজ্ঞ দেশবাসীর নিকট মর্য্যাদা, অর্থসাহায্য, প্রভৃতি পাইয়া পরমানন্দে আছেন। যাঁহারা লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, সর্ব্বস্বহীন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের "ঋণ পরিশোধের" কথা ভাবিয়া দেখার দিন আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে বসিয়াছে। যাহারা অর্থসংগ্রহের জন্য সেইদিন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ ছিলেন, তাঁহারা অনেকে আজও বাঁচিয়া আছেন। তাঁহাদের কাছ হইতে এই বিষয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া যতদূর সম্ভব ঋণ পরিশোধ করার কার্য্যে সরকারের অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্ববঙ্গ গিয়াছে, সুতরাং বহু পরিবারের আর সন্ধানই পাওয়া যাইবে না। তবে তাঁহাদের সন্তানসন্ততি আত্মীয়স্বজনের সন্ধান করিলে কতকটা ফল পাওয়ার সম্ভাবনা এখনও আছে।

যাহাই হউক, শহীদদের সহিত বিপ্লবাত্মক কাজে যাঁহারা ক্লেশভোগ করিয়াছেন তাঁহাদেরও আজ স্মরণ করি।

বাঙালী ও অবাঙালী এই শ্রেণীভেদটাও অপ্রীতিকর। ভারতবর্ষের ভাষা যদি এক হইত এবং সব প্রদেশের সব রকম লোকদের মধ্যে একত্রে ভোজন ও বৈবাহিক আদানপ্রদান প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে এই দেশের সব লোক ভারতীয় বলিয়াই পরিচিত হইত। কিন্তু এখন নানাভাগে ও শ্রেণীতে আমরা বিভক্ত। ভাষা, ধর্ম্ম, জাতি, আর্থিক অবস্থা, প্রভৃতি এইসব ভেদের কারণ। এইসকল পার্থক্যকে কেবলমাত্র অমঙ্গলের উৎপাদক মনে করিলে ভুল হইবে। পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন দ্বারা যে ঐক্য লব্ধ হয়, তাহার সমৃদ্ধি ও শক্তি খুব বেশী হয়, কিন্তু যদি সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয়, সকল ভাগ ও শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনে ইহা সর্ব্বদা কাজ না করে, তাহা হইলে মহাজাতির একতা জন্মিবে না।

এই হেতু বাঙালী ও অবাঙালী কথা দুটির মধ্য হইতে যে প্রতিযোগিতা ঈর্ষা ও অসদ্ভাব মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়, তাহা আশঙ্কার বিষয় মনে করি। প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও সদ্ভাব স্থাপন ও রক্ষা কঠিন হইলেও তাহা করিতে হইবে।

প্রত্যেক দেশ ও প্রদেশের সব রকম কাজ যথাসম্ভব তথাকার লোকের দ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়া উচিত। তাহা হইলেও বাঙালীরা "বাংলাদেশ বাঙালীদেরই জন্য" এই নিয়ম চালাইবার নিমিত্ত বাংলা গভর্ণমেণ্টকে কখনও অনুরোধ জানায় নাই—যদিও এরূপ নীতি বিহার প্রভৃতি প্রদেশে অনেক বৎসর ধরিয়া চলিতেছে এবং তাহাও তত্তৎপ্রদেশের লোকদের সহযোগিতা, চেষ্টা ও অনুমোদনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সমুদয় ভারতবাসী যে একজাতি, এই কথা সর্ব্বপ্রথম বাংলাদেশেই বলা হইয়াছিল। এই বাণী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের নানাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৬।

রবীন্দ্র-প্রতিভা

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

আমরা যখন বলি যে, পৃথিবীর ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য বহুমুখী প্রতিভাশালী মহাপুরুষ অন্য কাহাকেও আমরা দেখিতে পাই না; সে কথা আমাদের মহাকবির প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার আতিশয্যপ্রসূত অতিশয়োক্তি নহে। নিরপেক্ষভাবে পৃথিবীর সকল দেশের কাব্য, সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, নাট্য, নৃত্য, অভিনয় ও অপরাপর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অভিব্যক্তির চর্চা করিলে দেখা যায় যে, একাধারে বহু সহস্র কবিতা ও গান রচনা, গানে নিজ পরিকল্পনার সুর সংযোগ, শত শত প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গীতিনাট্য রচনা ও নৃত্যগীতে অপরূপ সমন্বয় সৃজন, কোনও একজন রূপরসের উপাসকের দ্বারা কখনও কোথাও সম্পন্ন হয় নাই। ইহার উপরে আছে তাঁহার আধ্যাত্মিকতা, দর্শন ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা; তাঁহার দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা অর্জ্জন-প্রচেষ্টা। শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার ক্ষেত্রে তাঁহার অভিনব রীতিনীতি প্রবর্ত্তন ও গঠন-কার্য্য এবং তাঁহার মানবতাবাদ ও বিশ্ব-মৈত্রী। তাঁহার শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও সুরুল; এবং আধুনিক শিক্ষার সকল প্রয়োজন সুরক্ষিত রাখিয়া প্রাচীন শিক্ষার আশ্রমিক আবহাওয়া ফিরাইয়া আনা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সকল দেশ হইতে ভারতীয় ও নিজ দেশীয় বিদ্যার প্রসিদ্ধ অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশ্বভারতীতে আনয়ন এবং সুরুলে গ্রাম-সংস্কার কার্য্যের নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিশ্বমানবসংগঠন ক্ষেত্রে এক বহু উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নিজে বহু দেশে ভ্রমণ করিয়া ও বহু মনীষীকে নিজ দেশে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তিনি যে পরস্পরের সভ্যতা, জ্ঞান ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধার ভাব বিশ্বমানবের মনে সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই জন্যই আজ তাঁহার শতবার্ষিক জন্মদিন উপলক্ষে দেশে দেশে দূর-দূরান্তরে তাঁহার স্তুতিবাদ ও জয়গান শুনা যাইতেছে। প্রকৃত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাহাই, যাহার অনুপ্রাণনায় মানুষ বহু বর্ষ বিগত হইলেও কোন মহামানবের আদর্শ ও নীতিকে নিজের কার্য্যে ও বিশ্বাসে জীবন্ত ও সতেজভাবে জাগ্রত রাখিয়া চলিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সেইরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আজও লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে প্রাণবান্ হইয়া আছে ও তাহা এই হিংসাবিক্ষুব্ধ জগতের একটি অতি বড় আশার ও নির্ভরের কথা। তিনি কথায়, কাব্যে, গানে ও নিজের শান্ত, সৌম্য, ঋষিতুল্য মূর্ত্তির সম্মোহে বিশ্বজয় করিয়া গিয়াছেন।

এই কথা, কাব্য ও সুরের সম্রাট্ বিশ্বজগৎকে ইন্দ্রিয়ের পথে কেমন করিয়া উপলব্ধি করিতেন এবং কল্পনা রূপ ও রসের রঙে রাঙাইয়া অথবা সকল ভাব ও বস্তুকে আকারে প্রকারে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া কেমন করিয়া নব নব রূপে সাজাইয়া লইতেন তাহার কাহিনী তাঁহার রচনাবলীর পাতায় পাতায় লিখিত আছে। যেখানে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি, কল্পনা, রূপ ও রসের পূর্ণ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট হইত না ও অন্তরিন্দ্রিয় কোন অতীন্দ্রিয় পথে ভাবসংগ্রহে বাহির হইত সেখানেও এই ঋষিকবি উপমা, তুলনা, সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ও সুনির্ব্বাচিত সংশ্লেষণে জগতের সকল কবিকে বহু দূরে ফেলিয়া রূপ ও রস-কল্পনার সীমাহীন অনন্তে অবাধে বিচরণ করিতেন। তাঁহার কল্পনা ও বাস্তব-অবাস্তবের ভাঙাগড়ার খেলা আমাদের মনে সেই মায়া ও ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে, যাহাতে আমাদের মনে হয়, শিশু শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখবিবরে মা যশোদাকে ব্রহ্মাণ্ড দেখানর কথা। সরল, সহজ, শিশুসুলভ গতি ও কর্ম্মভঙ্গী; কিন্তু অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্মভাবে পূর্ণাঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহার ভক্ত বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহাকে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থে জগৎ গুণী-জনের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এই গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছিল The Golden Book of Tagore এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, রম্যাঁ রলাঁ, এলবার্ট আইনস্টাইন, জগদীশচন্দ্র বসু, লরেন্স বিনিয়ন, ইয়োহান বোইয়ের, বেনেদেত্তো ক্রোচে, জন গলস্‌ওয়ার্দি, অরবিন্দ ঘোষ, কুট হামসুন, সুভেন হেডেন্, জুলিয়ান হাক্সলি,

সেল্‌মা লাগেরলফ, হারল্ড ল্যাস্কী, সিলভ্যাঁ লেভি, টমাস মান্‌, মরীস মেটেরলিঙ্ক, স্যর গিলবার্ট মারে, কামিনী রায়, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, আপ্‌টন সিনক্লেয়ার, নীলরতন সরকার, জাবেজ টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড, সিবিল থর্ণডাইক, এম উইণ্টার-নিট্‌স্‌, ডব্লিউ. বি. ইয়েট্‌স্‌। এই গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু সারাংশ এই স্থলে দেওয়া হইতেছে :

"অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনার ইন্দ্রজাল তাঁহাকে বিশ্বের অন্তরে বাহিরে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে সক্ষম করে এবং তিনি তাঁহার পাঠকদিগকেও নিজের সহযাত্রী করিয়া লইতে পারেন। বাংলা সাহিত্যকে তিনি বিশ্বসাহিত্যের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া জগতের আধ্যাত্মিক ও আধুনিক চিন্তার ধারা বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে।···

"দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি কোন নিয়ন্ত্রিত চিন্তাপদ্ধতির সৃষ্টি করেন নাই। ধর্ম্ম ও দর্শন তাঁহার রচনার মধ্যে একাধারে পাওয়া যায়। কাব্যে ও প্রবন্ধে তিনি তাঁহার ধর্ম্ম ও দার্শনিক চিন্তা ব্যক্ত করিয়াছেন।···

"মনের ভিতরে তিনি দুইটি জগতে বাস করেন। একটি তাহার বর্ণ ও আকারে গঠিত ও অপরটি সুরের। সে সুরের জগতেও আবার সুরের আকার ও সুরের বর্ণ দেখা যায়। সুরের মধ্যে তিনি পুরাতনকে নূতন রূপ দান করিয়াছেন এবং এমন অভিনব সুর-সামঞ্জস্যে গান বাঁধিয়াছেন, যাহা ধ্বনিজগতের নূতন সৃষ্টি।···

"ছয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন জার্ম্মানী ও চেকো-স্লোভাকিয়াতে গিয়াছিলেন, আমার তাঁহার সঙ্গে থাকিবার সৌভাগ্য হয়। তাঁহার উচ্চারিত বাংলা কবিতা শুনিয়া তদ্দেশীয় লোকেরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বারম্বার কবিতাগুলি আবৃত্তি করিতে বলেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠোচ্চারিত বাণীর শব্দতরঙ্গ দ্রুত ও সুমিষ্ট এবং বাংলা দেশের সংবাদপত্রের লেখকরাও তাঁহার কথা শুনিয়া লিখিয়া লইতে পারেন না।···

"তিনি নাট্যাভিনয়ে অপরূপ শক্তিশালী এবং অভিনয়কে তিনি পুনর্ব্বার উচ্চ আসনে বসাইয়াছেন।···

"সঙ্গীতে ভারতবর্ষে ভদ্রমহিলাদিগের স্থান ছিল না বহুকাল। ঠাকুর পরিবার ও ব্রাহ্মসমাজ সেই অধিকার ভারতের নারীদিগকে পুনরায় আনিয়া দিয়াছেন।···

"তাঁহার দেশভক্তিজ্ঞাপক গানগুলি অপরূপ। তাহাতে কৃষ্টি আছে, সংযম আছে। নাই আস্ফালন, বীরত্বের অভিনয়, মিথ্যার গর্জ্জন ও অহঙ্কারের তর্জ্জন। তাঁহার স্বদেশী যুগের গান ও 'কথা ও কাহিনী'র কবিতা-গুলি তাঁহাকে বাঙালীর প্রাণে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে। এই সকল গান ও কবিতা বাঙালীর চরিত্র গঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে ও করিয়া চলিয়াছে। তিনি বাংলার গ্রামে যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় বয়নশিল্প শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠে ও অন্যান্য গ্রাম্যশিল্পও সতেজ হয় তাহার জন্য বহু চেষ্টা করিতেছেন।···

"গঠন মূলক অসহযোগ বিষয়ে তিনি অনেক লিখিয়াছেন। "পরিত্রাণে" ধনঞ্জয় বৈরাগী দেহে শৃঙ্খল ধারণ করিয়া ট্যাক্স না দেওয়াকে দেশভক্ত ও নেতামহলে ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।···

"তাঁহার দেশভক্তির মধ্যে সঙ্কীর্ণতা, কলহবিবাদ, হিংসা ও অপরের অনিষ্ট চেষ্টা নাই। তিনি ভারতের বিশেষত্বে বিশ্বাস করেন। পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা আছে। প্রাচ্য অনেক কিছু পাশ্চাত্ত্যের নিকট শিখিতে পারে।···

"ব্রিটিশের ভারতের প্রতি অবিচার তিনি সহস্র বার অধর্ম্ম ও অন্যায় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু ব্রিটিশ জনসাধারণের প্রতি তাঁহার কোন বিদ্বেষ নাই।···

"রবীন্দ্রনাথ ১৯১১ সনে আমার অনুরোধে আমাকে তাঁহার দুইটি কবিতার ইংরেজী তর্জ্জমা দিয়াছিলেন, এইগুলি শ্রীলোকেন্দ্রনাথ পালিতের অনুবাদ। মে ও সেপ্টেম্বর ১৯১১ সনে এই দুইটি কবিতা মডার্ণ রিভিয়ু-এ মুদ্রিত হয়। ইহার পরে তাঁহাকে বারম্বার অনুরোধ করায় তিনি নিজেই এই ভাষান্তরণ কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। আমার বিশ্বাস ইংরেজীতে তাঁহার লেখা এইগুলিই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে।······

"আমি তাঁহার অতি সুন্দর হস্তাক্ষরের কথা বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে চিত্রাঙ্কন সুরু করিলেন তখন মনে হইল যে, সুন্দর অক্ষর লেখন ও চিত্রাঙ্কন একই প্রেরণার বিবিধ অভিব্যক্তি।··· তাঁহার চিত্রগুলিকে যাহাকে ভারতীয় চিত্রকলা বলে তাহা বলা যায় না। অপর কোন প্রাচীন বা আধুনিক চিত্রকলার অনুকরণও তাহা নহে। তাঁহার চিত্রের মধ্যে সেই রূপ, রস ও কল্পনা ব্যক্ত হয় যাহা স্বয়ং মহাকবি

রবীন্দ্রনাথও নিজের অতুলনীয় ভাষা ও ছন্দে ব্যক্ত করিতে চাহেন নাই—হয়ত সে অভিব্যক্তির উপযুক্ত ভাষা ও নাই বলিয়া।...তাঁহার শিল্পকল্পনা সম্পূর্ণ নিজস্ব।...

"তিনি অতি উচ্চস্তরের সাধক। কিন্তু তিনি ত্যাগকে জীবনের আদর্শ বলিয়া মানিয়া লয়েন নাই। 'বৈর সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' তিনি নিজেই বলিয়াছেন।"

ই. বি. হ্যাভেল ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির চর্চ্চায় বিখ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে Gold Book of Tagore-এ লেখেন যে "বয়স তাঁহার মনের নবীনতাকে দমন করিতে পারে নাই। গত বৎসর তি যে সকল নিজ অঙ্কিত রেখাচিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার রূপকল্পনা ও অঙ্কন-পদ্ধতির অ মৌলিকত্ব দেখা যায়। কাব্য, নাট্য ও সঙ্গীতের সেবা এবং তাঁহার বিরাট্ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সকল ব্য করিয়াও যে তিনি নূতন পথে রূপরসের অনুসন্ধান করিবার সময় পান ইহা আশা করি তাঁহার দীর্ঘ জীবে প্রতিশ্রুতি।"

জোসেফ সাউথল উপরোক্ত অভিনন্দন গ্রন্থে বলেন, "রবীন্দ্রনাথের রেখাঙ্কনে ইহাই প্রমাণ করে যে, যদি তিনি কথা ও ভাষার অধিপতি, তাহা হইলেও তিনি এমন রূপকল্পনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হন যাহা ভাষায় ব্যক্ত ক যায় না অথবা যাহা শুধু রেখা, আলোছায়া ও বর্ণেই পূর্ণ প্রকাশ লাভ করে।...তাঁহার চিত্রগুলিতে তাঁহ শক্তিশালী কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু প্রাচ্যের শিল্পীদের মধ্যেই রেখা ও বর্ণের ছন্দ ও সামঞ্জস্য এইর সুনির্ব্বাচিতভাবে সংরক্ষিত দেখা যায়। তাঁহার বর্ণবিন্যাস অপূর্ব্ব।"

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ছন্দ, ভাব, ভাষা ও অলঙ্কারের নিখুঁত উৎকর্ষ্য অতুলনীয়। তাঁহার রচি গানে ও তাহার সুর সংযোজনে যে নিপুণতা ও কলা-কৌশল দেখা যায় তাহা অপরাপর সঙ্গীতকারদিগে মধ্যে কদাপি লক্ষিত হয় নাই। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গীতিনাট্য, রূপক, ব্যঙ্গ ও প্রহসন, তত্ত্বকথা, প্রভৃ সকল রচনাতেই তিনি অপূর্ব্ব ভাবকুশলতা ও রূপদক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার পরিচয় তাঁহার লেখনী প্রসূত কথাতেই বিশেষ করিয়া পাওয়া যায়। কাব্যে, বিভিন্ন রূপকল্পনাতে অথবা বাস্তবের বর্ণনায় তিনি কথার নির্ব্বাচন, ভাষার গঠন ও তাহার সহিত ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষার ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা অ কোন লেখকের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নহে। সেই রূপকল্পনা, ছন্দ, তাল, ভাব, সামঞ্জস্যরক্ষা তিনি শব্দ ও স্বরে ক্ষেত্রে সুর রচনাতে দেখাইয়াছেন এবং তৎপরে রেখায়, বর্ণে ও আকৃতিতে নিজ চিত্রকলায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

১২৯৯ সালে যখন কবির বয়স কিঞ্চিদধিক ত্রিশ বৎসর তখন তাঁহার কাব্যপ্রতিভা ভাষা ও ছন্দের আশ্রে মানবাত্মার অন্তরের ও বাহিরের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, অনায়াসে প্রবেশ ও ভ্রমণ করিয়া, হৃদয়ের অন্তস্ত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম নীহারিকা অবধি পাঠকের অনুভূতির ক্ষেত্রে আনিয়া দেখাইতে পারিত। "মানস সুন্দরী কবিতায় তিনি বলিয়াছিলেন,

> "শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
> কাঁপিব সঙ্গীত ভরে ; নক্ষত্রের প্রায়
> শিহরি জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায় ;
> শুধু তরঙ্গের মতো ভাঙিয়া পড়িব
> তোমার তরঙ্গ-পানে ; বাঁচিব মরিব
> শুধু, আর কিছু করিব না।..."

কোনো রসানুভূতি কিংবা কল্পনার আনন্দে বিভোর হইয়া মনেপ্রাণে তাহার মধ্যে ডুবিয়া যাওয়ার ইহা অপেক্ষ পূর্ণতর অভিব্যক্তি আর কি হইতে পারে ? কবির কল্পনা তাঁহাকে ক্ষণিকের মধ্যে দূর-দূরান্তরে ঘুরাইয়া আনিত পারে। যাহা অপরে দেখে না তাহা দেখাইতে পারে। যাহা কেহ শুনিতে পায় না তাহা শুনাইতে পারে। যা কাহারও অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না তাহা অনায়াসে পূর্ণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে আনিয়া বসাইয়া দেয়। তাঁহা কাব্যের ছত্রে ছত্রে তাঁহার দেখিবার, শুনিবার ও বুঝিবার কথা জীবন্তভাবে লিখিত রহিয়াছে। দেখিবার যা আছে তাহার মধ্য হইতে রূপরসের সারবস্তু যাহা দৃষ্টি তাহাই চয়ন করিয়া লইতেছে। পৃথিবীর দিকে চাহি আকাশ ও নদীর রূপে কবি দেখিতেছেন,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নীলাম্বরে ডুবে।"

অথবা বিভিন্ন দেশের বিচিত্র রূপের বর্ণনায় তিনি বলিতেছেন,

"শস্যশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহা পিপাসার রঙ্গভূমি ;"

"চারিদিকে শৈলমালা
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিক-নির্মল স্বচ্ছ ;......"

"যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্র-পরা,
নিঃসঙ্গ নিস্পৃহ, সর্ব-আভরণহীন,
যেথা দীর্ঘ রাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সংগীতবিহীন......"

"একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল..."

দৃষ্টির অনুভূতির সহিত শ্রবণের অনুভূতিও কবির অন্তরের রসরহস্য চিরজাগ্রত করিয়া রাখে। যেখানে আমরা শুধু শুনি গোলযোগ ও সুরহীন শব্দঝঞ্ঝা, সেইখানে কবি শুনিতে পান "শতেক-সহস্ররূপে গুঞ্জরিছে গান শত লক্ষ সুরে......" এবং তিনি সেই সকল সুরের উপাসনায় মন্ত্রোচ্চারণের ভাষায় বলিতেছেন

"যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোম-শিখাসম উঠিছে কাঁপিয়া
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া
বিশ্বতন্ত্রী হতে।"

তিনি যখন এই ধরায় থাকিবেন না, তখনও তাঁহার গান নদীর স্রোতে ধ্বনিত হইতে থাকিবে, এই ছিল তাঁহার বিশ্বাস এবং তিনি প্রশ্ন করিয়া গিয়াছেন,..."নদীজলে মোর গান, পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান নদীকূল হতে..."

কথা, ভাষা ও অলঙ্কার ; ছন্দ ভাব ও ভাষার সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সৃজন—এই সকল উপকরণ দিয়াই কাব্য রচনা হয়। শব্দ, স্বর, সুর, তান, তাল ও ভাব-অভিব্যক্তি হইল গানের অবয়ব ও প্রাণ। ভাষা যেমন তাঁহার রূপ-রস-কল্পনাকে ব্যক্ত করিয়া কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে ; ছন্দ তাল সুর ও ভাব তেমনি তাঁহার অন্তরে ধ্বনিত স্বর-সমন্বয় কল্পনার প্রকাশ। দেখিবার সময় তিনি যেমন বলিয়াছেন, "নীল আকাশের আলোর ধারা পান করেছে নতুন যারা সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া নিয়েছি আজ দু'চোখ পুরে।" সুরের ক্ষেত্রেও তিনি বলিয়াছেন, "আমার বীণায় সুর বেঁধেছি ওদের কচি গলার সুরে।" এবং নিজে যখন বিশ্বস্রষ্টার অঙ্গুলিতে ঝঙ্কৃত বীণার ধ্বনি হইয়া বাজিতে থাকেন তখন তাঁহার নিজের সুর সেই সুরই "যে সুর ভরিলে ভাষা-ভোলা গীতে, শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে, জননীর মুখ তাকান হাসিতে..." শিশুর সরল সহজ দৃষ্টিভঙ্গি, শিশুর সরল সতেজ প্রাণবান্ আবেগ, যাহা রূপ-রসের আগ্রহে সকল কল্পনাকে বাস্তব করিয়া তোলে ও সকল বাস্তবকে কল্পনার রঙে রাঙাইয়া নূতন করিয়া লয়, সেই শিশুর দেখিবার ও শুনিবার শক্তি জীবন্ত ভাবে মহাকবির প্রাণে সঞ্জীবিত হইয়াছিল। তিনি মুহূর্তে দূরের

বস্তুকে কল্পনার মায়াস্পর্শে নূতন রূপ দান করিয়া নিজের প্রাণের অন্তরঙ্গ করিয়া গড়িয়া লইতে পারিতেন। জাঁ ক্রিস্তোফে রম্যাঁ রলাঁ নিজের শিশুকালের কথায় বলিয়াছেন, কেমন করিয়া মুহূর্তে তাঁহার শিশুকল্পনার যাদুতে পাপোশগুলি নৌকা হইয়া ঘরের মেঝের তরঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া দূরে চলিয়া যাইত; কবি রবীন্দ্র-নাথের সকল বয়সের কল্পনাই সেইরূপ শক্তিশালী ছিল। তিনি দেখিবার, শুনিবার ও অনুভব করিবার ক্ষেত্রে অবাধ শক্তিতে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নিজ রূপ-রস-কল্পনার ছাঁচে ঢালিয়া সারা বিশ্বের শব্দ, সুর, রেখা ও বর্ণকে নিজের উপভোগ্য করিয়া গড়িয়া লইতেন। তাঁহার সেই কল্পনার আঘাতে সুর, ছন্দ, গন্ধ, বর্ণ, শব্দ ও ভাব পরস্পরের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার প্রাণে এমনই ইন্দ্রজালের খেলা খেলাইত যে তিনি সর্ব্বত্র "সুরের আগুন" ছড়ান দেখিতেন; "অগ্নিবীণা"র ঝঙ্কারে 'আকাশ' "তারার আলোর গানের ঘোরে" কম্পমান হইত এবং তিনি সত্য অনুভূতির ভাষায় লিখিতেন—

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।"

কবির দৃষ্টি, কবির শুনিবার রীতি, কবির অভিব্যক্তির পদ্ধতি, কবির রূপ-রস-কল্পনার অভিনব ধারা, ভাব-সমন্বয়ের বৈচিত্র্য, বিশ্লেষণের গভীরতা ও গঠনের ভঙ্গি—সবই অতুলনীয়, চিন্তার অতীত ও অপূর্ব্ব। আমাদের ভাষায় তাঁহার প্রতিভা ব্যক্ত করা অসম্ভব। তাঁহার নিজের ভাষায়, তাঁহার রূপ-রস-কল্পনার অভিব্যক্তির ভিতর দিয়াই শুধু তাঁহার পরিচয় লাভ সম্ভব। এবং সে পরিচয় বহু ধারায়, বহু রূপে, বহু পরিবেশে ও বিভিন্ন সঙ্গে লাভ করিতে হইবে। শৈশব, যৌবন, কিম্বা বার্দ্ধক্য; দুঃখ, আনন্দ, ভালবাসা, ক্রোধ কিংবা বৈরাগ্য; যাহা কিছু সুন্দর ও যাহা ঘৃণ্য ও পরিত্যজ্য; কবির সৃজনশক্তির প্রবেশ ও গতি সবের মধ্যেই। ছোট মেয়ে অন্ধকারে প্রদীপ হাতে চলিয়াছে। "সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে, প্রদীপটা তার নিবে গেছে বাতাসেতে। শুধাই তারে 'কী হয়েছে বামী।' সে কেঁদে কয় নীচে থেকে 'হারিয়ে গেছি আমি'।" বৃদ্ধ তাঁহার [illegible]কে বলিতেছেন,

"আমার ছুটি সেজে বেড়ায় তোমার ছুটির সাজে,
তোমার কণ্ঠে আমার ছুটির মধুর বাঁশি বাজে।
আমার ছুটি তোমারই ওই চপল চোখের নাচে,
তোমার ছুটির মাঝখানেতেই আমার ছুটি আছে।"

বালক বলিতেছে,

"মাকে আমার পড়ে না মনে।
... ...
একটা কি সুর গুনগুনিয়ে কানে আমার বাজে,
... ...
মা গিয়েছে, যেতে যেতে গানটি গেছে ফেলে॥
... ...
জানলা থেকে তাকাই দূরে নীল আকাশের দিকে—
মনে হয় মা আমার পানে চাইছে অনিমিখে।
কোলের পরে ধরে কবে দেখত আমায় চেয়ে—
সেই চাউনি রেখে গেছে সারা আকাশ ছেয়ে॥"

অপরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের মনের গোপন কথা ও গভীরতম অনুভূতিগুলি চয়ন করিয়া আনিয়া নিজের অপরূপ ভাষার অলঙ্কারে সাজাইয়া জগতের রসিকসমাজে উপস্থিত করিয়া দেওয়া সহজ কার্য্য নহে। চেতনার যাহা উপলব্ধি তাহা তিনি সকলের হইয়া সকলকে বুঝাইয়া, শুনাইয়া দিয়াছেন। অর্দ্ধচেতনার ক্ষেত্রে যাহা নিবিষ্ট তাহাও তিনি খুঁজিয়া বাহির করিয়া জাগ্রত অনুভূতির ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মনের গতি ছিল অন্তরে বাহিরে বাধাহীন অনন্ত এবং তিনি অনুভূতির ক্ষেত্রে শব্দ, বর্ণ গন্ধ, স্পর্শ, মায়া, মমতা, প্রেম, আসক্তি, "সুদূরের পিয়াসা" অথবা "অন্তরতর" ও চির কল্যাণের আকর সেই পরম পুরুষের ধ্যানে মগ্ন থাকা—সকল কিছুই একাধারে পাইয়াছিলেন। কোন মহাঋষি যদি মানব জীবনের প্রত্যেক ভাব, রূপ, রস ও কল্পনাকে সত্য ও সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়া যাইতেন, যদি তিনি সকল কথাই বিভিন্ন সুরে বাঁধিয়া স্বরপুষ্পে গাঁথা মালার মত গাঁথিয়া জীবন-দেবতার কণ্ঠে দুলাইয়া দিতে পারিতেন, যদি তিনি, আরও ছন্দ, তাল ও তজ্জাত রূপরসের অনুসন্ধানে বিশ্বের সকল লীলাভঙ্গিকে নৃত্যের ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেন, যদি তিনি তদুপরি দেশভক্তি, বিশ্বমানবপ্রীতি, শিশুর শিক্ষা, বয়স্কের জীবনাদর্শ ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টার পথ-প্রদর্শক হইতেন এবং পরিশেষে রেখা ও বর্ণে নিজ রস-উপলব্ধিকে চিত্রে আঁকিয়া রাখিয়া যাইতেন; তাহা হইলে সেই মহাঋষিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনা করিতে পারিতাম। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সকল অনুভূতিকে কিরূপে অন্তরে গ্রহণ করিতেন তাহা তিনি কাব্যে বলিয়া গিয়াছেন।

"—হিল্লোলিয়া মর্মরিয়া
কম্পিয়া স্খলিয়া বিকিরিয়া বিচ্ছুরিয়া
শিহরিয়া—সচকিয়া, আলোকে ভুলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে উত্তরে দক্ষিণে
পূরবে পশ্চিমে ;···"

সারা বসুন্ধরাকে ব্যাপক ও গভীর ভাবে দেখিয়া তিনি সকলের নিকট নিজের দেখা শোনা ও অনুভূতির কাহিনী ভাষায় সুরে ও বর্ণে চিরকালের জন্য বলিয়া গিয়াছেন। সেই কথা, সুর ও বর্ণের কাহিনী জগৎকৃষ্টির ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। সেই কাহিনীতে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ ও শ্রমভার-জর্জ্জরিত জীবনযাত্রার কথা বিশেষ সহানুভূতির সহিত সর্ব্বত্র কথিত হইয়াছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের দর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান ও মানবতাবাদের কথা ভুলিয়া তাঁহার জাতীয়তা ও জনগণের কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষার রূপ "আধুনিক" ছিল কি না এই কথার অবতারণা করেন, তাঁহাদের রবীন্দ্রসাহিত্যের সহিত পরিচয় অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কাব্যের দুই-চারিটি পুনরাবৃত্তি হইতেই বুঝা যায় যে তিনি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে জগতের সাধারণ মানবকে দেখিতেন। তাঁহার মানবতার মানব অবাস্তব কষ্টকল্পনা-সৃষ্ট কোন কিছু নহে। সে মানব সংখ্যায় অনেক কিন্তু তাহার সুখদুঃখপূর্ণ জীবনধারা প্রাণবান্ ও রূপরসের আধার।

"ভাঙা অতিথশালা।
ফাটা ভিতে অশথবট মেলেছে ডালপালা।
··· ··· ···
বহুদিনের শিখার কালি আঁকা ভিতের 'পরে
শুকজলা দিঘির পাড়ে জোনাক ফিরে ঝোপেঝাড়ে
ভাঙা পথে বাঁশের শাখা ফেলে ভয়ের ছায়া।"

যিনি গরীবের সহিত এক পথে চলিয়া তাহার প্রাণের সহিত পরিচিত হইয়াছেন তিনিই শুধু এই বর্ণনা করিতে পারেন।—

"লোহার গরাদে দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই
লোনাধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা পড়া দাগ।

বাষ্পেবোনা চেলাঞ্চল উড়ে পড়ে দেয় ছড়াইয়া
স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণরশ্মিচ্ছটা। চরম ঐশ্বর্য্য নিয়ে
অস্তলগনের শূন্য পূর্ণ করি এল চিত্রভানু—
দিল মোরে করস্পর্শ ; প্রসারিল দীপ্ত শিল্পকলা
অন্তরের দেহলিতে ; গভীর অদৃশ্যলোক হতে
ইশারা ফুটিয়া পড়ে তুলির রেখায়।…"

পারস্য ভ্রমণ করিয়া সাম্প্রদায়িকতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে কবি বলিলেন,

"যুগে যুগে জ্ঞানের পরিধি বিস্তার, তার অভিজ্ঞতার সংশোধন, তার অবস্থার পরিবর্ত্তন চলছেই, মানুষের মন সেই সঙ্গে যদি অচল আচারে বিজড়িত ধর্ম্মকে শোধন করে না নেয় তা হলে ধর্ম্মের নামে হয় কপটতা নয় মূঢ়তা নয় আত্মপ্রবঞ্চনা জমে উঠতে থাকবেই। এই জন্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবুদ্ধি মানুষের যত অনিষ্ট করেছে এমন বিষয়বুদ্ধি করে নি। বিষয়াসক্তির মোহে মানুষ যত অন্যায়ী যত নিষ্ঠুর হয় ধর্ম্মমতের আসক্তি থেকে মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশী ন্যায়ভ্রষ্ট, অন্ধ ও হিংস্র হয়ে ওঠে, ইতিহাসে তার ধারাবাহিক প্রমাণ আছে, আর তার সর্ব্বনেশে প্রমাণ ভারতবর্ষে আমাদের ঘরের কাছে প্রতিদিন যত পেয়ে থাকি এমন আর কোথাও নয়।" এ সকল কথা তিনি ভারতের সাম্প্রদায়িক কলহকেই উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্বদাই দাঁড়িপাল্লা ও ফিতা হাতে সকল বস্তুর পূর্ণরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করেন, সেই সকল বস্তুর পরিমাপের পণ্ডিতদিগকে কবির ভাষায় শুনান যায় যে, শুধু তথ্য বিচার করিয়া রূপ ও রসের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। "ঊর্দ্ধ-আকাশের বায়ুস্তরে ভাসমান বাষ্পপুঞ্জ একটা সামান্য তথ্য, কিন্তু উদয়াস্তকালের সূর্য্য-রশ্মির স্পর্শে তার মধ্যে যে, অপরূপ বর্ণলীলার বিকাশ হয় সে অসামান্য, সে 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ' মাত্র নয়, সে যেন একটা অকারণ অত্যুক্তি, একটা পরিমিত বস্তুগত সংবাদ-বিশেষকে সে যেন একটা অপরিমিত অনির্ব্বচনীয়তায় পরিণত করে দেয়। ভাষার মধ্যেও যখন প্রবল অনুভূতির সংঘাত লাগে তখন তা শব্দার্থের আভিধানিক সীমা লঙ্ঘন করে।……আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে তা সয় না। তাকে যতই ঠিকঠাক করে বলা যাক না, শব্দের নির্ব্বাচনে, ভাষার ভঙ্গিতে, ছন্দের ইশারায় এমন-কিছু থাকে যেটা সেই ঠিকঠাককে ছাড়িয়ে যায়, যেটা অতিশয়।"

'ট্রাজেডি' কেন উপভোগ্য, শিল্প-সাহিত্য কেন খাদ্যের মতই অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা আমাদের তিনি সুন্দরই বুঝাইয়াছেন। "দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটুস্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর।……

"বদ্ধজল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্ম-পরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।……

"আমাদের পেট ভরাবার জন্যে, জীবনযাত্রার অভাব মোচন করবার জন্যে আছে নানা বিদ্যা, নানা চেষ্টা, মানুষের শূন্য ভরাবার জন্যে, তার মনের মানুষকে নানা ভাবে নানা রসে জাগিয়ে রাখবার জন্যে, আছে তার সাহিত্য, তার শিল্প।……সভ্যতার কোনো প্রথার ভূমিকম্পে যদি এর বিলোপ সম্ভব হয় তবে মানুষের ইতিহাসে কি প্রচণ্ড শূন্যতা কালো মরুভূমির মতো ব্যাপ্ত হয়ে যাবে।"

মানবত্ববাদ কি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম? তাঁহার নিজের "মানুষের ধর্ম্ম" আলোচনায় দেখা যায় তিনি বলিতেছেন,

"বৈজ্ঞানিক এই কথা শুনে ধিক্কার দেন, বলেন, দেবতাকে প্রিয় বললে দেবতায় প্রতি মানবিকতা আরোপ করা হয়। আমি বলি, মানবত্ব আরোপ করা নয়, মানবত্ব উপলব্ধি করা। মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌঁছেচে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না।……পরম মানবিক সত্তাকে পেরিয়ে গিয়েও পরম জাগতিক সত্তা আছে। সূর্য্য-লোককে ছাড়িয়ে যেমন আছে নক্ষত্রলোক। কিন্তু, যার অংশ এই পৃথিবী, যার উত্তাপে পৃথিবীর প্রাণ, যার যোগে পৃথিবীর চলাফেরা, পৃথিবীর দিনরাত্রি, সে একান্তভাবে এই সূর্য্যলোক। জানে আমরা নক্ষত্রলোককে জানি কিন্তু জ্ঞানেকর্ম্মে আনন্দে দেহেমনে সর্ব্বতোভাবে জানি এই সূর্য্যলোককে। তেমনি জাগতিক ভূমা আমাদের

জ্ঞানের বিষয়, মানবিক ভূমা আমাদের সমগ্র দেহমন ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়। আমাদের ধর্মশ্চ কর্ম্ম চ, আমাদের ঋতং সত্যং, আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ সেই সত্তারই অপর্যাপ্তিতে।

"মানবিক সত্তাকে ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা, তাঁকে প্রিয় বলা বা কোনো-কিছুই বলার কোনো অর্থ নেই। তিনি ভাল-মন্দ সুন্দর-অসুন্দরের ভেদ-বর্জ্জিত। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে পাপ-পুণ্যের কথা উঠতে পারে না। অস্তীতিব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। তিনি আছেন, এ ছাড়া তাঁকে কিছুই বলা চলে না।"

তাহা হইলে দেখা যায় যে, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ছিল মানবত্বে, কিন্তু তাঁহার সাধনা ও ধ্যান ছিল সেই "পরম পুরুষের" যিনি মানবতার স্রষ্টা, কিন্তু যাঁহার "মন" হইতে উদ্ভূত সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ; বাস্তবে, চিন্তায়, কল্পনায়, রূপে, রসে ও অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিতে ও মনের গভীর অনুভূতিতে।

কবিপ্রতিভার বিবৃতি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, যদি না তাঁহার সকল চিন্তার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে কিছু কিছু চয়ন করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরা হয়। তাঁহার রচনার বিষয় অনন্তবিস্তৃত এবং সংখ্যায় অসংখ্য। দুই-চারিটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলে শুধু অঙ্গের পরিচয় হইবে কবির মনের বিস্তৃতির সহিত। রাশিয়ার চিত্রভাণ্ডারগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি চিত্রগুণ বিচার আরম্ভ করেন। "চিত্রবস্তুর সংস্থান (Composition), তার বর্ণকল্পনা (Colour Scheme), তার অঙ্কন, তার অবকাশ (Space), তার উজ্জ্বলতা (Illumination), যাতে করে তার বিশেষ সম্প্রদায় ধরা পড়ে সেই তার বিশেষ আঙ্গিক (Technique) এ সকল বিষয়ে আজও অল্প লোকেরই জানা আছে।" মানব মনের বন্ধনগুলির মধ্যে ধর্ম্মের বন্ধন সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্যত্বের হানিকর হইতে পারে। "কেননা, যে ধর্ম্ম মূঢ়তাকে বাহন করে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড় শত্রু হতে পারে না—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই শিকলবদ্ধ করুক না।......সে ধর্ম্ম বিষকন্যার মত ; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্ম্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।"

—:•:—

বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্চ্চা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, যে জাতির ইতিহাস নাই সে জাতির উন্নতির আশা নাই। বাঙ্গালীর কলঙ্ক—তাহার ইতিহাস নাই। তিনি নিজে কয়েকটি প্রবন্ধে বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্চ্চা কি ধারায় চলিতে পারে তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও গত শতাব্দীর শেষ দশকেই লিখিয়াছিলেন যে, ইতিহাসের নামে পরের মুখে ঝাল খাইয়া আমাদের কোনই লাভ হইবে না। স্বদেশের স্ব-জাতীয়দের পুরাবৃত্ত আমাদিগকেই তন্নতন্নাস করিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহার উপরে যে ইতিহাস রচিত হইবে তাহাই হইবে আমাদের সত্যিকারের ইতিহাস। গত ষাট বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্চ্চায় যুগান্তর ঘটিয়াছে। আমরা এখন আর পরের মুখে ঝাল খাই না। নিত্য নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইতিহাসের কাঠামো রচনায় প্রবৃত্ত। যতই দিন যাইতেছে ততই জাতীয় ইতিহাস রচনার পথ সুগম হইয়া উঠিতেছে।

বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভাবধি আমাদের ইতিহাস চর্চ্চা প্রধানতঃ চারিটি খাতে চলিয়াছে : (১) ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস ; (২) বাঙ্গলার ইতিহাস ; (৩) বৃহত্তর ভারতের কথা এবং (৪) আধুনিককালে বিশেষতঃ ব্রিটিশযুগে ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের ইতিহাস। আবার ক্রমশঃ ইতিহাস চর্চ্চার রীতিপদ্ধতিও বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আর রাজা-রাজড়ার কাহিনী ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়, সাধারণ মানুষ এবং তাহার সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় লইয়াই ইতিহাস রচনা হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষের জীবন, শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি সমুদয়ই আজ ইতিহাসের ভিতরকার আলোচ্য বিষয়। তবে প্রচলিত অর্থেও আলোচনা গবেষণার মাধ্যমে যে ইতিহাস

এখনও রচিত হইতেছে না তাহা বলা যায় না। আজিকার দিনে এই সব ইতিহাসের মধ্যেও কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা অবিরাম ঢুকিয়া যাইতেছে। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে সব রকম ইতিহাসেরই মূলধারা নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইব। ইতিহাস রচনা করিতে গেলে মালমশলা উপকরণাদি হাতের কাছে পাওয়া আবশ্যক। এ যুগে কিন্তু ইতিহাস রচয়িতাকেই এই সমুদয় তত্ত্বতল্লাস করিয়া আলোচনা গবেষণায়ও লিপ্ত হইতে হইয়াছে। এ জন্ত কল অধিক কিছু লব্ধ হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু যতটুকু আমরা পাইয়াছি তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই ইতিহাস রচনা করিতে আমরা অনেকটা সক্ষম হইতেছি।

ভারতবর্ষ

প্রথমতঃ ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইতিহাস রচনা সম্পর্কে কিছু বলা যাক। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের অন্তর্গত বিবিধ বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিল। সোসাইটির অনুশাসন, শিলালেখ, তাম্রলিপি, মুদ্রা, মূর্ত্তি, স্থাপত্য-ভাস্কর্য্যের এবং শিল্পকলার নিদর্শনসমূহের সংগ্রহকে ভিত্তি করিয়াই বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম গঠিত হয়। এই সকল পুরাতত্ত্ব আলোচনার দ্বারা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের কাঠামো রচনায় পণ্ডিতগণ সে যুগে লিপ্ত হইয়া পড়েন। এই বিষয়ক আলোচনা গবেষণায় ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্বদেশীয়দের মধ্যে পথপ্রদর্শক। রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থাদির ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির একখানি প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করিতে সক্ষম হন। মধ্যযুগের বিশেষত মুসলমান আমলের ইতিহাস রচনায় পূর্ব্বোক্ত উপকরণগুলি ব্যতীত আরও বিস্তর আকরের সন্ধান আবশ্যক হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মুসলমান রাজা-রাজড়াদের আখ্‌বার ও চরিতনামাগুলির উপরই বেশী করিয়া নির্ভর করা হইত। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এগুলি ছাড়া অন্যান্য আকরেরও যে অনুসন্ধান না করেন তাহা নয়। তবে এ বিষয়ে সম্যক্ সার্থকতা লাভ করেন, তৎকালীন অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম বৎসরেই ১৯০১ সনে আচার্য্য যদুনাথের ঔরঙ্গজীব সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক বাহির হয়। তাহাতেই বুঝা গেল মধ্যযুগের বিশেষত মুসলমান আমলের ইতিহাস চর্চ্চায় নূতন ধারা অবলম্বিত হইয়াছে। এ সময়কার ইতিহাস রচনা করিতে গেলে মূল ফারসী ও উর্দ্দু ভাষার সঙ্গে একান্ত ভাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। ফারসী ছাপা বই বেশী নয়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ফারসী পুঁথি ও অন্যান্য লেখার পাণ্ডুলিপির মধ্য হইতেই মুসলমান যুগের ইতিহাসের উপকরণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অনুবাদ দিয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইলে ইতিহাস লেখা হয় না। আচার্য্য যদুনাথ ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃতের সঙ্গে পূর্ব্বেই বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি ফারসী ভাষার চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিলেন। মুসলমান আমলের সমসাময়িক প্রাদেশিক ভাষাসমূহ যথা: উর্দ্দু, হিন্দী, মরাঠি, গুজরাটী এবং ঐ সময় আগত বিদেশীয়দের ভাষা যেমন ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, প্রভৃতিও যথাযথ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। তাঁহার ইতিহাস রচনায় এই ধারায় সমসাময়িক বিদগ্ধ ব্যক্তিরা চমৎকৃত না হইয়া পারেন নাই। প্রথমে 'মডার্ণ রিভিয়ু'র প্রকাশারম্ভ হইতেই (জানুয়ারী ১৯০৭) তিনি ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী—ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে থাকেন। ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস সম্বলিত বিরাট পুস্তক ক্রমান্বয়ে পাঁচ খণ্ডে (১৯১২—১৯২৪) প্রকাশিত হয় এবং শুধু স্বদেশীয় নয়, ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতেও ইহা বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। মূল আকর—বই-পুঁথির সন্ধান ত তিনি করেনই, উপরন্তু ইতিহাসের ঘটনাবলী ভারতবর্ষে যে সব স্থলে সংঘটিত হয় সে সব স্থলে নিজে গিয়া অনুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়কার পর্ত্তুগীজ ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় লিখিত ভারতবর্ষের মানচিত্রাদিও তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন। শিবাজীর এবং মরাঠা জাতির ইতিহাস রচনাকালেও তিনি ঐ সমুদয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধানের নিমিত্ত এবং ঘটনাস্থল স্বচক্ষে দেখিবার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে অন্যূন চল্লিশবার তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার "Shivaji and His Times" গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল ১৯১৯, দ্বিতীয় পুস্তক "House of Shivaji" প্রকাশিত হয় ইহার বহু বৎসর পরে ১৯৪০ সনে। মোগল যুগ সম্বন্ধে আলোচনা গবেষণার নিদর্শন তাঁহার আরও বহু পুস্তকে আমরা পাই। কিন্তু তাহার এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি অন্যান্য বিষয়ের মত ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বেশী করিয়া পড়ে। তাঁহারা বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের শিক্ষার বিষয়রূপে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকেও গ্রহণ করেন এবং তরুণ অধ্যাপক ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও হারাণচন্দ্র চাকলাদার। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য-মূলক ইতিহাস রচনায় লিপ্ত হন। তদবধি এ

যদুনাথ সরকার

বিষয়ক আলোচনা গবেষণায় যে সুরু হইল তাহার আর বিরাম ঘটে নাই। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের অন্যতম প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় করিয়া লন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এই বিভাগের প্রবর্তন দ্বারা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির আলোচনা-গবেষণা সুগম করিয়া দেওয়া। এই বিভাগের বহু অধ্যাপক উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন-স্তরের গবেষণায় লিপ্ত হইলেন। কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ালের Hindu Polity (১৯২৪) প্রাচীন ভারতের গণতন্ত্র-ভিত্তিক বহু রাজ্যের বর্ণনায় ভরপুর। ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং আরও অনেকে হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থাদি লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ডক্টর রায়চৌধুরীর Political History of India (১৯২৭) গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসুর পুরাণ প্রবেশ (১৯৩৪) পূর্ব্বকালের ভারতীয় ইতিহাসের বহু জট খুলিয়া দিয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চায় সুধীগণ এই শতাব্দীর প্রথম হইতেই আত্মনিয়োগ করেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'হিন্দু কেমিষ্ট্রী' (১ম খণ্ড ১৯০২, ২য় খণ্ড ১৯০৯) এই শতাব্দীর গোড়ায়ই প্রকাশিত হয়। ইহার একটি সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দেন আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস রচনায় আরও অনেকে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আচার্য্য যদুনাথের যোগ্যতম শিষ্য ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো পাঠান ও মোঘল যুগের সন্ধিক্ষণ লইয়া বিস্তর আলোচনা গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার শেরশাহ্ (১৯২১) পুস্তকখানি সর্ব্বত্র সমাদৃত। তিনি 'দারা' সম্পর্কে একপ্রস্থ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে পরিবেশন করেন। তিনিও ইতিহাস রচনায় মূল আকর ও উপকরণসমূহকে একান্তভাবে কাজে লাগাইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন অধ্যাপক শিখজাতি ও মরাঠা জাতির উপরে প্রামাণিক পুস্তকাদি লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কি প্রাচীন ইতিহাস, কি মধ্যযুগীয় ইতিহাস উভয়ের চর্চায়ই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক ও গবেষক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় ভারতবর্ষের সরকারী পুরাতত্ত্ব-বিভাগ বিভিন্ন স্থানে ভগ্নস্তূপ খনন দ্বারা যুগান্তর আনিয়াছে। সিন্ধু-পঞ্জাব সীমান্তে হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদরো স্তূপ খনন সুরু হয় ১৯২২ সন নাগাদ। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদরো খননকার্য্যে লিপ্ত হইয়া মূর্ত্তি এবং বিবিধ শিল্পের যে সকল নিদর্শন পান তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম জানা যায় যে, সিন্ধু তথা ভারতীয় সভ্যতা খ্রীষ্টাব্দ প্রারম্ভের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেই পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই সভ্যতা একটি পরিপূর্ণরূপ লাভ করিতে অন্যূন দুই হাজার বৎসর কাটিয়া যায়। বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত সমসাময়িক প্রমাণাদি দৃষ্টেও ইহার সত্যতা নির্ণীত হইয়া গিয়াছে। মহেঞ্জোদরো আবিষ্কারের মূলে ছিলেন যেমন রাখালদাস তেমনি এ সম্বন্ধে তিনিই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ রচনাদি প্রকাশ করিয়া সর্ব্বপ্রথম সভ্যজগতের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। ১৯২৪ সনে উত্তরবঙ্গে পাহাড়পুর ভগ্নস্তূপের খননকার্য্যেও রাখালদাস লিপ্ত হন। এখানে পুরাতত্ত্বের যে সমুদয় নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা হইতে শুধু বাংলা কি ভারতবর্ষ নয়, বঙ্গদেশের সঙ্গে যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ, সুমাত্রা, শ্যাম, প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের দেশগুলিরও যে একদা বাণিজ্যব্যপদেশে শিক্ষা-সাহিত্য-সভ্যতা-সংস্কৃতিমূলক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্য্যন্ত যেসব নূতন নূতন ঐতিহাসিক উপকরণ আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় History of Orissa শীর্ষক গ্রন্থখানি দুইখণ্ডে লিখিয়া যান। তাঁহার

বৃহত্তর অব্যবহিত পরে (১৯৩০) প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দুইখণ্ডই পর পর প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভগ্নস্তূপ খননকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি উদ্ধারে রত রহিয়াছে।

বঙ্গদেশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতেই বঙ্গদেশের ইতিহাস রচনায় বঙ্গসন্তানেরা তৎপর হন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র দত্তের "বাঙ্গালার ইতিহাস" সম্বলিত পাঠ্য বইগুলির কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু ইতিহাস রচনার মূল আকরের অনুসন্ধান ও খোঁজখবর তন্নতন্নাস শুরু হয় প্রধানত এই শতাব্দীর প্রথম দিকে এবং এ সকলের উপর ভিত্তি করিয়াই ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয়। বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রথমেই নাম উল্লেখ করিতে হয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের। তাঁহার সিরাজদ্দৌল্লা (১৮৯৭) এবং মীরকাশিম (১৯০৫) শুধু ইতিহাস নয়, বাংলা সাহিত্যে 'ক্লাসিক্‌স্‌'-এর মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য। ইতিহাস আলোচনায় পুরাতত্ত্ব তথা মূল আকর সমূহের উপর যে নির্ভর করা একান্ত প্রয়োজন অক্ষয়কুমার 'ঐতিহাসিক চিত্রে' (১৮৯৯) তাহা প্রথম হইতেই বিঘোষিত করেন। রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান্ উপদেশ-বাণী লইয়া এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠাবধি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের আলোচনাও আরম্ভ করে। এই আলোচনার মাধ্যম হয় পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। পুঁথি সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পুরাবৃত্তের নিদর্শনসমূহের সংগ্রহেও পরিষদ প্রবৃত্ত হইল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত মূর্ত্তি, লেখ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, মুদ্রা, চিত্র, প্রভৃতি পরিষদ-কর্তৃপক্ষ চিত্রশালায় সংগ্রহ করিতে থাকেন। এই সকল মূল আকর হইতেও বাংলার ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা গবেষণার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে।

বাংলার ইতিহাস সংকলনে বিশেষ সুযোগ করিয়া দিল ১৯১০ সনে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সারথ্যে দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, প্রভৃতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি। এই সমিতির কর্তৃপক্ষ উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত ইতিহাসের উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া ইহার সংগ্রহশালায় জড় করেন। বিভিন্ন সময়ে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক সাময়িক পুস্তক প্রকাশিত হইতে থাকে। এখানে সংগৃহীত এবং অন্যত্র প্রাপ্ত আকরগুলির উপর ভিত্তি করিয়া এই সাময়িক পুস্তকে নিবদ্ধ প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ রচনা করিয়াছেন। সমিতির আনুকূল্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত গৌড়লেখমালা (১৯১২) এবং রমাপ্রসাদ চন্দ সম্পাদিত গৌড়রাজমালা (১৯১২) প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের কামরূপ শাসনাবলীর (১৯৩১) কথাও উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ, বাংলার ইতিহাস রচনায় বঙ্গসন্তানদের শুধু সহায়তা নয়, বিশেষভাবে উদ্‌বুদ্ধও করে। আবার কোন কোন আকর-গ্রন্থও সম্পাদিত হইয়া এই সময় প্রকাশিত হইল। তাহাতেও তাহারা কম সহায়তা পান নাই। সন্ধ্যাকরনন্দীকৃত 'রামচরিতম্' প্রাক্‌মুসলমানযুগের বাংলার রীতিনীতি শাসন-পদ্ধতির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। এখানি প্রথম ১৯১০ সনে প্রকাশিত হয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায়। ক্রমে এখানির গুরুত্ব এতই উপলব্ধি হইতে থাকে যে, সুযোগ্য ঐতিহাসিকগণের সম্পাদনায় পরে ইহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও যথাক্রমে ১৯৩৯ ও ১৯৫৩ সনে মুদ্রিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মৌলিক উপকরণসমূহের উপর নির্ভর করিয়া বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় প্রথমে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার Palas of Bengal (১৯১৪) খণ্ড-রচনা হইলেও বাংলার ইতিহাসের একটি অমূল্য অধ্যায়। তিনি দুই খণ্ডে পর পর যথাক্রমে ১৯১৫ ও ১৯১৭ সনে "বাংলার ইতিহাস" পুরাকাল হইতে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন। বাংলার ইতিহাসের আকরসমূহ লইয়াও রাখালদাসের পরে আরও কেহ কেহ পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন। তন্মধ্যে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal (১৯২২), ননীগোপাল মজুমদারের Inscriptions of Bengal (১৯২৯) এবং ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেনের Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal (১৯৪২), প্রভৃতির এখানে নাম করা দরকার।

বাংলার ইতিহাস সংকলনের উপযোগী নূতন নূতন উপাদান ও আলমশলা নানাভাবে ক্রমশঃ সংগৃহীত হইতেছিল। এই সকলের নিরীখে রচিত Early History of Bengal (১ম খণ্ড ১৯৩৯ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪০) পুস্তক বিদগ্ধজনের দৃষ্টি স্বতঃই আকর্ষণ করে। বই দুইখণ্ড প্রমোদলাল পালের রচিত। পুরাকাল হইতে

মুসলমান আবির্ভাব পর্য্যন্ত এই খণ্ডের বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় খণ্ডের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই দীর্ঘ সময়ের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস যতদূর জানা যায় তাহা ইহাতে প্রথম সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইহার পরেই উল্লেখযোগ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক দুই খণ্ডে প্রকাশিত "History of Bengal" গ্রন্থ। ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সনে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায়। প্রাক্-মুসলমান যুগ লইয়া বিবিধ বিষয়ক আলোচনা এখানিতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সনে। ইহা সম্পাদনা করেন আচার্য্য যদুনাথ সরকার। মুসলমান আমল হইতে ব্রিটিশ আবির্ভাব পর্য্যন্ত বাংলার ইতিহাস ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। Cambridge History of India-র আদর্শের দুই খণ্ডের বিষয়বস্তুই বিবিধ প্রবন্ধাকারে লিখিত। পুস্তক দুইখানি বৃহদাকার। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সম্পাদকদ্বয় প্রধান লেখক হইলেও বিবিধ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বহু অধ্যায় লেখান হইয়াছে। এ যাবৎ বাংলার হিন্দু ও মুসলমান যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা ও বিষয়াদির উপর যত নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাকে ভিত্তি করিয়াই অধ্যায় বা প্রবন্ধগুলি রচিত।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রথম খণ্ডের ভিত্তিতে প্রাক্-মুসলমান যুগের একখানি বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৬) সংকলন করেন। বাংলার ইতিহাসের উক্ত অভিনব ইংরেজী গ্রন্থ দুই খণ্ড প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি লইয়া একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব করিয়া দেয়।

মুসলমান আমলের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যায় গোলাম হুসেন সলীম প্রণীত 'রিয়াজ-উস-সলাতীন' নামক ফারসি পুস্তকে। রামপ্রাণ গুপ্ত এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করেন ১৯০৫ সনে। এই যুগের শেষ দিক্কার বাংলা দেশের তথ্যমূলক বিবরণ অনেকটা পাওয়া যায় নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' (১৩০৪ বঙ্গাব্দ) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "Begums of Bengal" (১৯৪২), তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পলাশীর যুদ্ধ (১৩৬০ বঙ্গাব্দ), প্রভৃতি পুস্তকে।

এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয়, নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব্ব" শীর্ষক সুবৃহৎ পুস্তকখানির (১৯৫০)। প্রাচীনকাল হইতে তুর্কিপূর্ব্ব যুগ পর্য্যন্ত সামগ্রিক ইতিহাস ইহাতে বিবৃত ও আলোচিত হইয়াছে। বাংলা দেশের রাজা-রাজড়ার কাহিনীই শুধু নয়, বাঙ্গালী জাতির আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল বিষয়ের উপরই তথ্য-নির্ভর আলোচনা ইহাতে পাওয়া যাইবে। বইখানি এদিক্ দিয়া বাংলার ইতিহাসে একক বলা যাইতে পারে।*

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলার কয়েকখানি প্রামাণিক ইতিহাসও রচিত হইয়াছে। মুদ্রা মূর্ত্তি শিলালিপি পুঁথি-পত্র এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্য্যের বিভিন্ন নিদর্শন এই সকল গ্রন্থ রচনায় বিশেষ কাজে লাগিয়াছে। জেলাগুলির ইতিহাস পর্য্যালোচনার দ্বারা মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বঙ্গের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব হইবে নিঃসন্দেহে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির "জর্ণাল", সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, "Indian Historical Quaterly" (ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা সম্পাদিত), প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পত্রিকা এবং "প্রবাসী", "মডার্ণ রিভিয়ু", "Calcutta

* "বাংলার ইতিহাস সাধনা" পুস্তকে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন বাংলা সংক্রান্ত ইতিহাস-পুস্তকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন।

Review", প্রভৃতি সাধারণ ইংরেজী বাংলা পত্রিকায় বঙ্গদেশ সংক্রান্ত বহু ঐতিহাসিক তথ্য ও এই সকল তথ্যভিত্তিক রচনা বিস্তর প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

বৃহত্তর ভারত

ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশসমূহের যোগাযোগ যে এক সময় নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা পূর্ব্বে বেশীর ভাগই অনুমান করিয়া লওয়া হইত। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে যে সব স্তূপ খনন দ্বারা প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন-সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে এই ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় যোগাযোগের কথা জানা গিয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'বাঙ্গালী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮) ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দেই এইরূপ যোগাযোগের বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে "সাহিত্য" পত্রিকায় (১৩১৪) সাগরিকা শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে পরে তিনি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। পশ্চিম-ভারতের হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদরো স্তূপ এবং উত্তরবঙ্গে পাহাড়পুর স্তূপ খননের ফলে এক দিকে যেমন ভারতীয় সভ্যতার সুপ্রাচীনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে অন্যদিকে ভারতবর্ষের বাহিরে প্রতিবেশী দেশসমূহকে ভারতীয় সভ্যতা যে বিভিন্ন সময়ে প্রভাবিত করিয়াছিল নবাবিষ্কৃত তথ্য প্রমাণ হইতে তাহাও জানা গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ দূর- ও নিকট-প্রাচ্যে কয়েকবার পরিক্রমা করেন বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের সহযোগে। তাঁহারা ভারতবর্ষের ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের প্রভাবের সুস্পষ্ট ছাপ, এই সকল দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন।

বহির্ভারত তথা বৃহত্তর ভারত সম্পর্কে আলোচনা-গবেষণার নিমিত্ত কলিকাতায় পণ্ডিতগণ রবীন্দ্রনাথকে "পুরোধা" করিয়া Greater India Society বা বৃহত্তর ভারত সমিতি ১৯২৬ সনে প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিষয়ে অগ্রণী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ডক্টর কালিদাস নাগ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, প্রভৃতি। ইরাণ, আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, তিব্বত, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ-সুমাত্রা, শ্যাম এবং চীন-জাপান সম্বন্ধীয় যে সব নূতন নূতন ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছিল তাহার বিবরণ প্রথমে সোসাইটির পক্ষে বিভিন্ন বুলেটিন বা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৩৪ সন হইতে সোসাইটির মুখপত্রস্বরূপ একখানি ষান্মাসিক জর্নাল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন সোসাইটির কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ। ইহার সম্পাদকতা করেন ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (১৯৩৪-৪৫), ডক্টর কালিদাস নাগ (১৯৪৬) এবং ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত (১৯৪৭-)। সোসাইটির পণ্ডিত সদস্যগণ গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বৃহত্তর ভারতের বিষয় সম্পর্কে তথ্যনির্ভর পুস্তকাদিও রচনা করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সকল পুস্তকের কয়েকখানি মাত্র এখানে উল্লিখিত হইল। পাঠক ইহাতে দেখিতে পাইবেন প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিক্ষা, প্রভৃতি নানা বিষয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা কিরূপ সার্থকভাবে এই সকল পুস্তকে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পুস্তকগুলির কয়েকখানি এই: ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের "Ancient Indian Colonies in the Far East"; শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "Indian Literature in China and the Far East"; শ্রীযুক্ত হিমাংশুভূষণ সরকার কৃত Indo-Javanese History; অধ্যাপক পি. এন. বসুর Indian Colony of Siam। পুস্তিকা বা বুলেটিনসমূহের মধ্যে ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর "India and China", ডক্টর কালিদাস নাগের Greater India", ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের "Ancient Indian Culture in Afghanistan", ডক্টর এন. পি. চক্রবর্ত্তীর "India and Central Asia", প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডক্টর কালিদাস নাগ বৃহত্তর ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা গবেষণায় এখনও রত রহিয়াছেন। তাঁহার এই বিষয়ক পুস্তকগুলির মধ্যে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ভারত ও বহির্ভারতের যোগাযোগ সম্পর্কে বিস্তর তথ্য পাইবেন। তাঁহার এ বিষয়ক পুস্তকগুলির কয়েকখানি এই: "India and the Pacific World", "Discovery of Asia" এবং "Greater India."

আধুনিককালের বাংলা ও ভারতবর্ষ

পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর হইতেই ব্রিটিশ আমলের সূচনা। তবে ব্যবসাসূত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইংরেজরা ভারতবর্ষে বিভিন্নস্থলে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতে ব্রিটিশ যুগের ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে বিস্তৃত

আড়াইশত বৎসরেরই ইতিহাস। এই যুগকেই আমরা সাধারণতঃ আধুনিককাল বলিয়া আখ্যাত করি। এই সময়ের মধ্যবর্ত্তী ঘটনাসমূহের বিবরণ আমরা নানাসূত্র হইতে পাই। কিন্তু এতাবৎকাল সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্ববর্ত্তী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী তথা ব্রিটিশ সরকারের দলিল দস্তাবেজ (মুদ্রিত-অমুদ্রিত) দেখিবার ও পরীক্ষা করিবার সুযোগ মাত্র আমাদের ছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ব্রিটিশ আমলের সবকিছুই যাচাই করিবার সুযোগ সুবিধা বর্ত্তমানে আমরা পাইয়াছি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশের বাণিজ্য প্রসার ও আধিপত্য বিস্তারকালে আরও কয়েকটি ইউরোপীয় জাতি, যেমন পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, প্রভৃতি এখানে ব্যবসাসূত্রে এবং কখনও কখনও অধিকার স্থাপন ব্যপদেশে আগমন করে ও পরস্পরের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত হয়। তাহাদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইউরোপে নিজ নিজ দেশে কার্য্যকলাপের ফিরিস্তি নিয়মিতভাবে পাঠাইতেন। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত এই সকল দলিলও মুদ্রিত হইয়া এখন সাধারণের আয়ত্তে আসিয়াছে। বিভিন্ন জাতির দলিল দস্তাবেজ আলোচনা করিয়া ব্রিটিশ প্রভুত্বস্থাপনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রামাণিক ইতিহাস রচনা বর্ত্তমানে সম্ভবপর। তবে এই সকল আকরের দিকে বিদগ্ধ জনের দৃষ্টি সবেমাত্র পতিত হওয়ায় এ যুগের ইতিহাস রচনা কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হইবে নিঃসন্দেহ।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুদ্রিত ও অমুদ্রিত দলিল দস্তাবেজের ভিত্তিতে খণ্ডশঃ হইলেও ইতিহাস রচনার কাজ পূর্ব্বেই সুরু হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতী ছাত্র এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়া তথ্যনির্ভর পুস্তকাদিও কিছু কিছু রচনা করিতেছেন। ভারতবর্ষের সরকারী দপ্তরখানা এবং ইণ্ডিয়া আফিস দপ্তরখানা ও ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে বহু তথ্য আহরণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান ভারতের যুগস্রষ্টা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে বিস্তর অজ্ঞাত ও স্বল্পজ্ঞাত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তৎকৃত "Dawn of New India" (১৯২৭) পুস্তকখানিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কোম্পানীর আমলে আরব্ধ নূতন ভূমিব্যবস্থা, হায়দার আলি, টিপুসুলতান, ভারতের ও বঙ্গের শিল্পবাণিজ্যাদির দুরবস্থা এবং ব্রিটিশ শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, প্রভৃতির উপরও সরকারী দলিল দস্তাবেজের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থাদি রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সভ্যতার সংঘাতে একটি অভিনব যুগ সূচিত হয়। বাঙালী সমাজের আর্থনীতিক কাঠামোয় তখন ভীষণ আঘাত লাগে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সব বিষয়েই একটা আলোড়ন দেখা দেয়। এই সব বিষয় সরকারী দলিল দস্তাবেজে বিবৃত রহিয়াছে। এখানে একশ্রেণীর দলিলের কথ বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। প্রতি কুড়ি বৎসর অন্তর বিলাতের ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসনকার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত পার্লামেণ্টের নিকট হইতে চার্টার নামক এক সনদপত্র লইতে হইত। এই বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার প্রাক্কালে এই কুড়ি বৎসরের মধ্যেকার কোম্পানীর যাবতীয় কার্য্যের রিপোর্ট পেশ করা হইত ব্রিটিশ সরকারকে। সরকার কোম্পানীর অনুকূলে ও প্রতিকূলে লিখিত এবং মৌখিক সাক্ষ্য প্রমাণাদিও বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে গ্রহণ করিতেন। এই সকল নথিপত্রকে এক কথায় পার্লামেণ্টারী পেপার্স বলে। কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিষয়ক বিধিব্যবস্থার ঐতিহাসিক উপকরণ

এই সকল কাগজপত্রের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত। ব্রিটিশযুগের প্রাক্-সিপাহীযুদ্ধকালীন বিবিধ বিষয়ের রীতি-প্রকৃতি অনুধাবনে ইহা খুবই কার্যকরী।

লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড মিন্টো, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, প্রমুখ কোম্পানীর আমলের বড়লাটদের স্মৃতিকথাও জীবনীগ্রন্থ হইতে সমকালীন ভারতশাসন সংক্রান্ত অনেক তথ্য পাওয়া যায়। আমি রাজা রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বহু প্রধান ব্যক্তি এবং পণ্ডিতগণের নিকট তাঁহার লেখা চিঠিপত্রের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি। এ সকলের মধ্যে সমসাময়িক শাসনব্যবস্থা এবং শিক্ষাসংস্কৃতি সাহিত্য বিষয়ক নানাকথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এসব সমসাময়িক মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বিবরণ হইতে ইতিহাসের মালমশলা প্রচুর পাওয়া যায়।

ব্রিটিশযুগের বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ এবং সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস চর্চায় আর একটা প্রধান অবলম্বন সমসাময়িক ইংরেজী বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র। ইতিপূর্ব্বে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা হইতে কিছু কিছু সংকলন পুস্তক বাহির হইয়াছে, যেমন, ডবলিউ. এস. সিটনকারের Selections from Calcutta Gazettes, ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' হইতে এবং মন্মথনাথ ঘোষের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' হইতে সংকলন পুস্তক বাহির হইয়াছে। কিন্তু প্রথম পুস্তকখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদের ইংরেজী গেজেট বা সংবাদপত্রসমূহ হইতে ইউরোপীয়দের কার্য্যকলাপ সম্বলিত সংবাদগুলিই মুখ্যত স্থান পাইয়াছে। শেষোক্ত দুইখানি পুস্তকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত প্রবন্ধাবলী সন্নিবেশিত। কিন্তু তথ্যাংশে ইহাদের কোনটিই তেমন সমৃদ্ধ নয় বলিয়া সমকালীন ইতিহাস রচনায় আশানুরূপ কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। অন্যপক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রধানতঃ 'সমাচার দর্পণ' এবং অংশত 'সংবাদ প্রভাকর', 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ও 'সম্বাদ ভাস্কর' হইতে সংকলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" (প্রথমে তিন খণ্ডে এবং পরে দুই খণ্ডে প্রকাশিত) তথ্যের দিক্ দিয়া অতীব সমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক ইংরেজী পত্রপত্রিকা হইতে ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার কর্তৃক সংকলিত Raja Rammohan Roy and Progressive Movements in India (১৯৪১) গ্রন্থখানিরও নাম করা দরকার। আর এই ধরনের গ্রন্থ প্রকাশে গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক, শিক্ষা-ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সমসাময়িক ইতিহাস চর্চায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইতিহাস এখন আর শুধু কোন দেশের বা ভূখণ্ডের রাজা-রাজড়ার কাহিনী নয়। ইহা তথাকার মনুষ্যসমাজের সামগ্রিক জীবনেরই কাহিনী। আধুনিকযুগের ভারতবর্ষ তথা বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে একথা পুরাপুরিই প্রযোজ্য। পশ্চিমের সঙ্গে সংস্রবের ফলে প্রথমে বাংলার এবং পরে সেখান হইতে সমগ্র ভারতে নবজাগরণের সূচনা হইয়াছে। আজ একথা বলিলে এতটুকুও অত্যুক্তি হইবে না যে, নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীরাই ভগীরথের মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়নের মত ভারতবর্ষের দিকে দিকে নবজাগরণের স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন। এই নবজাগরণের সৃষ্টিতে যেমন, তেমনি ইহার তথ্যভিত্তিক ইতিহাস চর্চা বা রচনায়ও বঙ্গসন্তানগণই অগ্রণী। ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষায় তাঁহারা পুস্তকাদি লিখিয়াছেন। এই সম্পর্কে প্রথমেই স্মরণীয় রমেশচন্দ্র দত্তের প্রাক্-ভিক্টোরীয় এবং ভিক্টোরীয় যুগের ভারতবর্ষ তথা বাংলার আর্থনীতিক ইতিহাস পুস্তক দুইখানি। ইহার পর নাম করিতে হয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ ১৯০৩)। একটি জীবনকে কেন্দ্র করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতির আনুপূর্ব্বিক বিবরণ পারিবারিক কাগজপত্র এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রন্থকার ইহাতে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। সরকারী দলিল দস্তাবেজ এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রাদির উপর নির্ভর না করায় ইহাতে তথ্যপ্রমাদ কিছু রহিয়াছে বটে, কিন্তু এখানি বাঙ্গালী জাতির এই সময়কার প্রথম পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাসের মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার কৃত History of Political Thought from Rammohan to Dayananda (১৯৩৪) উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় চিন্তার ক্রমবিকাশের একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। ইংরেজী বাংলা পত্র-পত্রিকা হইতে সাক্ষাৎভাবে তথ্য সংগ্রহ দ্বারা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন বিষয়ের উপর নূতন আলোকপাত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম কিছুকাল ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না যদি এ সময়কার ভারতবাসীদের পরিচালিত রাজনৈতিক পাশাপাশি জাতীয় তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিবৃত্তও সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ না হয়। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় প্রথম সন্মান

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক "মুক্তির সন্ধানে ভারত" (প্রথম প্রকাশ ১৯৪০) এবং অনুরূপ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়া রাজা রামমোহন রায় হইতে মূলপুস্তকের প্রকাশকাল পর্য্যন্ত মুখ্যতঃ বাঙ্গালীর এবং গৌণতঃ ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয়-চেতনা, রাজনৈতিক আন্দোলন, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রযত্নসমূহ, এক কথায় নবজাগরণ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার History of Indian Association (১৮৭৬-১৯৫০) গ্রন্থখানি (১৯৫৩) একটি সভার ইতিহাস প্রসঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রীয় চেতনার বিভিন্ন পর্য্যায়ের তথ্যমূলক ইতিবৃত্ত-পুস্তকের মর্য্যাদা পাইতে পারে। এখানে প্রসঙ্গত আর দুইখানি পুস্তকের উল্লেখ করা প্রয়োজন। জীবনী হইলেও এই দুইখানিই বাংলার তথা ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে। এ দুইখানি জীবনীগ্রন্থ যথাক্রমে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র জীবনী" (চারি খণ্ড ১৯৩৩-১৯৫৬) এবং শ্রীযুক্তা শান্তা দেবীর "ভারতমুক্তিসাধক রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা" (১৯৪৬)। ১৮৬২ হইতে ১৯৪৩ সন পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ আশী বৎসরাধিক কালের ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি, রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, প্রভৃতি বিষয়ক বিবিধ এবং বিচিত্র প্রযত্নের কথা এই দুইটি মহান্ জীবনকে কেন্দ্র করিয়া বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সিপাহী বিদ্রোহ ও অন্যান্য খণ্ড-বিদ্রোহের উপর সরকারী ও বেসরকারী আকর-সমূহের নিরিখে তথ্যনির্ভর ইতিহাস রচনায় বাঙ্গালী মনীষীগণ লিপ্ত রহিয়াছেন। রাজনীতি-বহির্ভূত বিবিধ বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস আলোচনায়ও বহুজন বর্ত্তমানে লিপ্ত। আশা করা যায়, আধুনিক তথা ব্রিটিশযুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনাও এই সব প্রয়াসের ফলে আশু সম্ভবপর হইবে।

প্রধানত ব্রিটিশ যুগের বাংলার ইতিহাস চর্চ্চার নিমিত্ত কলিকাতায় ১৯০৭ সনে Calcutta Historical Society প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী দলিলপত্রের উপর নির্ভর করিয়া এ যুগের ইউরোপীয় ও ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ বাংলা তথা কলিকাতার বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্যমূলক বিবরণ প্রকাশে তৎপর রহিয়াছেন। সোসাইটির মুখপত্র 'Bengal Past and Present' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় এই-সব রচনা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ (১৯৫০) ও ইহার মুখপত্র 'ইতিহাসে'র মাধ্যমে ঐতিহাসিকগণ বিবিধ বিষয়ক রচনা পরিবেশন করিতেছেন।

বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর উপরে বাঙ্গালী মনীষা ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ; ব্রিটিশ, যুগের বাংলা, বৃহত্তর ভারত, প্রভৃতির ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন বিভাগে যেসব আলোচনা গবেষণায় তৎপর রহিয়াছে তাহার সামান্যমাত্র পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব হইল। সাধারণ মানুষের জীবনযাপন প্রণালী, আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাষা-সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, প্রভৃতির ভিত্তিতেই জাতীয় ইতিহাসের কাঠামো নির্ম্মাণে পণ্ডিতগণ নিজেদের ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। তবে এখানে শুধু ইতিহাসের মূল কথাই বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত করা হইয়াছে। কোন বিশেষ ভাষা-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি বা শিল্পচর্চ্চার ইতিহাস প্রদান স্বল্পপরিসরে সম্ভব নহে। বর্ত্তমান আলোচনায় নমুনাস্বরূপই কোন কোন বিষয়ের পুস্তকের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে নবাবিষ্কৃত আকর ও উপকরণাদির ভিত্তিতে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক্ লইয়া পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভবপর হইবে।

রবীন্দ্রনাথের একটি গান ও তার অ-পূর্ব্বপ্রকাশিত স্বরলিপি

মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন তব চরণতলে,

শুভ লগন গেল চলে,

প্রেমের অভিষেক কেন হ'ল না তব নয়নজলে ॥

রসের ধারা নামিল না, বিরহে তাপের দিনে ফুল গেল শুকায়ে—

মালা পরানো হ'ল না তব গলে ॥

মনে হয়েছিল দেখেছিনু করুণা তব আঁখি-নিমেষে,

গেল সে ভেসে।

যদি দিতে বেদনার দান আপনি পেতে তারে ফিরে

অমৃতফলে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

[গা -া গপা]
র্সা র্সনা II সা -া সপা পমা | মা -গা -ঋগরা গা I গা -মা -া -া | -া -া মা মপা I
ম ম০ দু ঃ খে০ র০ সা ০ ০০ ধ ন ০ ০ ০ ০ ০ য বে০

I গা গপা পা পঋা | পা -ঋা -পনা ধা I ঋধপা -ঋপা মা গা | গা গা গরা গা I
ক রি০ নু নি০ বে ০ ০০ দ ন০০ ০০ ত ব চ র ণ০ ত

I গা -মা -া -া | -া -া মা মপা I পগা গপা পা পঋা | পা -ঋা পা -ঋা I
লে ০ ০ ০ ০ ০ শু ভ০ ল গ০ ন গে০ ল ০ চ ০

I পা ঋা -া -ধধপা | -ঋা -পা -া -া I পা পনা না নধা | ধা -নর্সা ধনা -ধপা I
লে ০ ০ ০০০ ০ ০ ০ ০ প্রে মে০ র অ০ ভি ০০ বে ০কু

I পনা ধনঃধঃ ধপা পঋা | পধপা -ঋপা মা গা I গা গপা পমা মগা | রগাঃ রঃ সা সন্‌া II
কে০ ন০০ হ০ ল০ না০০ ০০ ত ব ন য়০ ন০ জ০ লে ০ "য য০"

-া -া II { পঋা ধা পা পা | না -া পা ঋা I পা -না না -া | র্সা না র্সর্সা -া I
০ ০ য০ সে র ধা রা ০ না মি র্শ ০ না ০ বি র হে ০

I না না ধনর্সা র্সনা | ধপা -া (-া -া) } I পা-ঋা পাপনা ধনা পধা | ঋপা -মা মা গ I
তা পে র০ দি নে০ ০ ০ ০ ফু ল্‌ গেল০ ভ০ কা০ য়ে ০ মা লা

I গা গা গা গা | গা গা গমা রা I গা -ঋা ঋা -পা | -ঋা -পা মা গা I [ ] I
প রা নো হ ল না ত০ ব গ ০ লে ০ ০ ০ "য য"

-া -া II মপা পা পা পঋা | পা ঋা পা ধা I ধনা পা ধা পা | ঋপা -মা মা গা I
০ ০ ম০ নে হ য়ে০ ছি ল দে খে ছি দু ক রু পা০ ০ ত ব

I সগা গা গরা গরগা | গা -মা -া -পা I পগা গপা পমা মগা | রসা -া (-া -া) I পা পা I
আঁ০ খি নি০ মে০০ যে ০ ০ ০ পে ল০ সে ভে সে০ ০ ০ ০ য দি

I ধা পা পা -না | না -া র্সা না I র্সা -া -া -া | র্সা র্সগা র্গা র্গরা I
দি তে বে ০ দ ০ না র ধা ০ ০ ন্‌ আ প০ নি পে০

I র্রা -র্সা র্সা না | ধা -নর্সা ধনা ধপা I পা পনা ধনা পধা | ঋপাঃ -মঃ মা গা II [ ] I
তে ০ তা রে কি ০০ রে ০০ অ মৃ০ ত০ ক০ লে০ ০ "য য"

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

ফিরবে না

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

রাত্রিকে আর যতোই সাজাও আলোর মালায়
ফিরবে না আজ ফিরবে না সেই ব্যর্থ নাবিক
এ-বন্দরে।
বিপর্যয়ের ঘূর্ণি হাওয়ায়
উঠলো তুফান। নিভলো আলো। প্রেমের অধিক
আলোর ব্যাকুল তৃষ্ণা নিয়ে পুড়লো হৃদয়
কী যন্ত্রণায়!
হঠাৎ কখন দেশান্তরের বন্ধু হাওয়া
পথ দেখালো একটি দ্বীপের। আলোয় বাজে করুণ-মধুর।
ডুবলো বুঝি এ-বন্দরের সকল ছবি, সকল চাওয়া
স্নিগ্ধ নিবিড় সুখের মতো সবুজ দ্বীপের মুগ্ধ মায়ায়।

রাত্রিকে আর মিথ্যে সাজাও অভিজ্ঞানের আলোর মালায়!

—০—

আমার ভালোবাসা

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

গোধূলি রঙে রঙে অপার ভালোবাসা
এই যে ঢেলে দিলো বনের সিঁথিমূলে
রাতের আশ্লেষে এ-রঙ মুছে যায়—
কী তাতে হয় বলো! শান্ত বুকে তুলে
নিভৃত ভালোবাসা গোধূলি ডুব দেয়
নদীর কালো জলে।
আমার ভালোবাসা,
তাই তো বলি শোন, স্বীকার করে নাও
কচিৎ ছলনাকে। হয়ো না দুর্বাসা—

তোমার পৃথিবীর মুগ্ধ বাহুডোর
মুক্ত করো করো, অলকনন্দায়
যে যায় যেতে দাও। ক্ষমায় সুন্দর
হও গো হও তুমি। অসীম সন্ধ্যায়
ওই যে মঙ্গল শঙ্খ বেজে ওঠে—
গোধূলি হও তুমি আমার ভালোবাসা।

রেখো না মনে কোন বঞ্চিত প্রত্যাশা!

—০—

পদ্মাপুরাণ

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

বিষহরির মঠের পাশে মাঠে
প্রতি বছর একটি দুটি লোককে সাপে কাটে।
যেমনটি হয় প্রতি বছর, কাল সে মঠের পাশে
পদ্মাপুরাণ গান হ'ল। ফি বছর যেমন আসে
দল বেঁধে সব শুনতে সে গান, মেয়েই আসে বেশী,
এবারেও তাই এল। ও পাড়ার মুক্তকেশী,
স্বামীটি যার উনিশ সালে মরল সাপের বিষে,
সেও এসে কাল বসেছিল বুড়ীর দলে মিশে
মা-বুড়ীকে সঙ্গে ক'রে। পদ্মাপুরাণ শোনা,
চোখদুটোকে শুকনো রেখে, সহজ কথা ত না?
সবাই কেঁদে আকুল হ'ল। মুক্তকেশীর চোখে
এক ফোঁটা জল নেই যে কেবল দেখে সকল লোকে।

আর কাঁদে নি চাঁদ সদাগর। তার যে রেষারেষি
দেবতাদেরই সঙ্গে ছিল। কিন্তু মুক্তকেশী,—
কোন্ দেবতা চেনেন তারে? কাঁদে কিংবা হাসে,
তিন ভুবনে কার তাতে যায় আসে?

গানের শেষে সবাই যখন চোখ মুছে নাক ঝেড়ে
ফিরল বাড়ী, ফিরল সেও; কেবল সে ডাক ছেড়ে
উঠল কেঁদে তখন। বললে, 'ওমা, আমার মা গো!
এত ক'রে বলেছিলাম, আমায় দিলে না গো
তোমরা সেদিন ভেসে যেতে
ওর দেহটি বুকে ক'রে কলার মান্দাসেতে।
পাঁচজনাতে মিলে আমায় ধ'রে
রাখলে বেঁধে ঘরে।
দিলাম যেতে একা,—
সঙ্গে গেলে কোন্ দেবতার কোথায় পেতাম দেখা,
হয়ত ফিরে পেতাম আমার পতি,—
শুধাই মা গো, বিপুলা কি আমার চেয়ে সতী?'

—০—

ভগবানের মনে সুখ নেই।

মুখে তার সেই এক কথা—"সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাব। আপনি দেখে নেবেন।"

চলে যাব বলে, কিন্তু যায় না।

রোজ যেমন আসে, সেদিনও তেমনি এল। হাতে দুধের বালতি, গায়ে হাত-কাটা ফতুয়া, পরণে খাটো কাপড়। জিজ্ঞাসা করলাম, "এ নামটি তোমার কে রেখেছিল ভগবান্?"

জবাব দিলে না, আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসেই চলে গেল।

খানিক বাদেই দেখি আবার সে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির!

—"কি ব্যাপার?"

—"আপনি একবার আসুন বাবু!"

—"কোথায়?"

—"বিশুবাবুর বাড়ী।"

—"কেন?"

—"একটা বাচ্চাকে একটু দাওয়াই দেবেন বাবু!"

এই সেরেছে!

—"আমি তো ডাক্তার নই ভগবান্!"

—"তা হোক, আপনি আসুন।"

ভগবান্ দেখেছে, আমার বাড়ীর সবাই হোমিওপ্যাথি ওষুধ খায়। হোমিওপ্যাথির যত রকমের বই আছে আমি কিনি আর পড়ি। ওটা আমার পেশা নয়—নেশা।

যেতে হ'ল ভগবানের সঙ্গে।

গিয়ে দেখি, বিশুবাবুর বড় মেয়ে বসে আছে একটা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে।

—"কি হয়েছে?"

বিশুবাবুর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। বললেন, "মেয়েটা দুধ খাচ্ছে আর বমি করে দিচ্ছে। ভগবান্ দুধে আজকাল কি যে মেশাচ্ছে কে জানে।"

ভগবান্ সে কথায় কান দিলে না। আমার পাশে উবু হয়ে বসে চুপিচুপি বললে, "আপনি একবার পারুলকে দেখুন বাবু।"

—"কেন, পারুলকে কেন দেখবেন? বলছি পারুলের দুধ বাচ্চাটা খায় না, তবু ভগবান্ বিশ্বাস করে না!"

ভগবান্ বললে, "দুধ থাকলেই তো খাবে! আপনি ওকেও একটা ওষুধ দিন বাবু।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "এইটিই কি পারুলের প্রথম ছেলে?"

বিশুবাবুর স্ত্রী বললেন, "না। এইটি কোলের। আরও দুটি আছে।"

মেয়েটার বয়স উনিশ-কুড়ির বেশি নয়। বছর চারেক আগে বিয়ে হয়েছে।

আমার ডাক্তারীর প্রয়োজনে দু'একটা কথা পারুলকে জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু একটা কথারও জবাব পেলাম না তার নিজের মুখ থেকে। তার মা তাকে কিছু বলতেই দিলেন না। বললেন, "আপনিও যেমন! পারুর কিছু হয় নি। ভগবানের কথা শুনবেন না আপনি।"

ভগবান্‌কে বললাম, "চল, ওষুধ নেবে চল।"

বিশুবাবুর বাড়ী এসেছি, অথচ বিশুবাবুর সঙ্গে দেখা না করে চলে যাওয়া খারাপ দেখায়। তাই চলে আসবার আগে বললাম, "বিশুবাবুকে দেখছি না তো!"

পাশের ঘর থেকে বিশুবাবুর গলার আওয়াজ শোনা গেল।—"এই যে, এখানে রয়েছি। ওষুধটা লিখে দিন। জামাই নিয়ে আসুক দোকান থেকে।"

বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন বিশুবাবু। পেছনে বেরিয়ে এলো জামাই।

জামাইকে দেখে পারুল তার মাথার কাপড়টা টেনে দিলে।

জামাই বললে, "লিখতে হবে না, বলুন না কি আনতে হবে! পালসেটিলা?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "জানেন নাকি?"

জামাই বললে, "পারিবারিক চিকিৎসা বই একখানা কিনে অনেক চেষ্টা করেছি মশাই, ও কিছু হয় না। একেবারে বাজে ভাঁওতা।"

খুব খারাপ লাগল কথাটা। বললাম, "তাহলে আমাকে ডাকলেন কেন?"

"আমরা তো ডাকি নি। ওই ভগা ডেকেছে।"

"হ্যাঁ, আমিই ডেকেছি।" বলে ভগবান্‌ই আমাকে সেখান থেকে তুলে আনলে।

এখানে আসা আমার উচিত হয় নি। বললাম, "ভগবান্, ওষুধ আমি দেব না। ওদের অন্য ডাক্তার দেখাতে বল।"

ভগবান্ বললে, "ডাক্তার ওরা দেখাবে না বাবু।"

"নাই যদি দেখায়, তোমার কি?"

ভগবান্ কোনও কথা বললে না। আমার পিছু পিছু আসতে লাগল।

বাড়ীতে ঢুকে বললাম, "যাও।"

ভগবান্ গেল না। বললে, "মেয়েটা আর বাঁচবে না বাবু।"

"কে বললে বাঁচবে না?"

"আমি বলছি বাবু।"—ভগবান্ বসে পড়ল চৌকাঠের কাছে। বললে, "বছরে একটা করে যার বাচ্চা হয় সে কখনও বাঁচে? ওর কী চেহারা ছিল, আর এখন কিরকম হয়ে গেছে!"

বললাম, "তুমি এর কোনও প্রতিকারই করতে পারবে না ভগবান্, তুমি কেন ভাবছ? ওর মা রয়েছে, বাপ রয়েছে, স্বামী রয়েছে..."

কথাটা আমাকে শেষ করতে দিলে না ভগবান্। বললে, "কেউ নেই বাবু, কেউ নেই। দিন আপনি, ওষুধ দিন।"

"ওষুধ দিলেও ওরা খাওয়াবে না।"

ভগবান্ বললে, "আমি নিজে খাইয়ে দিয়ে আসব বাবু। বাচ্চাটা মরে মরুক, পারুলকে বাঁচিয়ে দিতেই হবে।"

বাঁচিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। যদি কারও থাকে তো আছে একমাত্র হোমিওপ্যাথির। সেই বিশ্বাসের জোরেই ওষুধ দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। আমার অপমান হয় হোক, হোমিওপ্যাথির অপমান যেন না হয়! দিলাম ওষুধ। বাচ্চাকেও দিলাম, তার মাকেও দিলাম।

সেই দিনই সন্ধ্যায় ভগবান্ এল দুধ দেবার জন্যে। হাতে দুধের বালতি, মুখে হাসি। দুধের ব্যবসা ছেড়ে দেবার কথা কিছু বললে না। শুধু বললে, "ভাল আছে।"

"কে ভাল আছে?"

"বাচ্চাটার বমি বন্ধ হয়ে গেছে বাবু। দুধ খাচ্ছে।"

এই বলেই ভগবান্ পিছন ফিরে কাকে যেন ডাকলে।

পঁচিশ-তিরিশ বছরের একজন যুবক এসে দাঁড়ালো দোরের কাছে। পরণে ফুল প্যান্ট, গায়ে হাফশার্ট, মাথার চুলগুলো বড় বড়। হাত দুটি জোড় করে একটি নমস্কার করলে।

আমি কিছু বলবার আগেই ভগবান্ বললে, "এর খাঁসি হয়েছে বাবু। সারারাত ঘুম করতে পারে না।"

"ওষুধ দিতে হবে।"

"হ্যাঁ বাবু।"

বললাম, "তুমি আমাকে ডাক্তার না করে ছাড়বে না দেখছি।"

ছেলেটিকে কাছে ডাকলাম।—"বল তোমার কি হয়েছে।"

কথা বলার ভঙ্গীতে বুঝলাম ছেলেটি বাঙ্গালী নয়। দিনের বেলা ভালই থাকে, কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুয়েছে কি বাস্, কাশির ধমকে উঠে বসতে হয়। দু'দিন হ'ল, সারারাত ঘুমোতে পারে নি।

ওষুধ নিয়ে ছেলেটি চলে গেল।

দেখলাম ভগবান্ তার আগেই কোন্ সময় উঠে চলে গেছে। জিজ্ঞাসা করা হ'ল না—ছেলেটি কে।

চারদিন পরে ভগবানের সঙ্গে দেখা।

কখন দুধ দিয়ে যায় বুঝতেও পারি না।

সেদিন এল সে নিতান্ত অসময়ে। দুপুরবেলা—সবে আমি তখন খেয়ে উঠেছি, ভগবান্ এসে দাঁড়াল, হাতে বালতি নেই, মুখে কথা নেই, হাতকাটা ছেঁড়া একটা জামা পরেছে, মনে হ'ল যেন কোথাও গিয়েছিল।

বললাম, "সেই ছেলেটি তো কই আর ওষুধ নিতে এল-না?"

"কাল খবর নিয়েছি বাবু, খাঁসি ভাল হয়ে গেছে।"

বলেই ভগবান্ দেয়ালের কাছ ঘেঁষে মেঝের ওপর বসে পড়ল। মুখ দেখে মনে হ'ল খুব চিন্তান্বিত।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথাও গিয়েছিলে?"

"হাঁ বাবু, বাগবাজার থেকে আসছি।"

এই বলে সে নিজেই গড় গড় করে বলে গেল তার 'বাগবাজার' যাবার হেতু, এবং সঙ্গে-সঙ্গে এও জানালে যে পরের জন্ত রোজ-রোজ এই 'ঝুট-ঝামেলা' তার আর ভাল লাগছে না। দুধের কারবার তুলে দিয়ে তাকে যদি এ-পাড়া ছেড়ে কোথাও চলে যেতে হয় তো শুধু এইজন্যেই যেতে হবে।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলে, এই পাড়ার কোন্ এক গলির ভেতর 'বীণা দত্তো' নামে কোন্ এক 'ভদ্দর আদমি' বাস করেন—তাঁকে আমি চিনি কি না!

বললাম, "চিনি না। কিন্তু 'বীণা' তো কোনও 'আদমি'র নাম হয় না ভগবান্, 'বীণা' মেয়েছেলের নাম।"

ভগবান্ কিছুতেই স্বীকার করবে না সে কথা। শেষ পর্য্যন্ত বুঝলাম, আমারই শোনবার ভুল। নাম বিনয় দত্ত। ভগবানের বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্ত শোনাচ্ছিল 'বীণায় দত্তো'।

সেই বিনয় দত্ত পরমানন্দে বাস করছিলেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। স্ত্রী খুব সুন্দরী। বয়স কম। ছেলেপুলে

হয় নি। একদিন কি একটা ব্যাপার নিয়ে তাদের ঝগড়া হয়। স্বামী একটা চড় মেরেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। পরের দিন আপিস থেকে ফিরে বিনয় দত্ত দেখেন বাড়ীতে তালা বন্ধ। স্ত্রী চলে গেছে তার বাপের বাড়ী—বাগবাজার। বিনয় দত্ত নিজে গেলেন স্ত্রীকে আনতে। স্ত্রী এল না। শাশুড়ী বললে, 'মেয়ে আমার যাবে না।' বড় মেয়ে-জামাই থাকে বাড়ীতে। বড় জামাই বললে, 'স্ত্রীর গায়ে যে হাত তোলে সে জানোয়ার। তুমি বেরিয়ে যাও এ-বাড়ী থেকে।' বিনয় সেই যে চলে এসেছিল আর যায় নি। দিন-পাঁচেক আগে বিনয়ের নামে আদালত থেকে এক শমন এসে হাজির। স্ত্রী নালিশ করেছে স্বামীর নামে। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা। আপিসে ছুটি নিয়ে বিনয় দত্ত বাড়ীতে বসে বসে ক্রমাগত চোখের জল ফেলছে। আর এইটে নিষ্পত্তি করবার জন্য গত তিন-চার দিন ভগবান্‌কে ক্রমাগত টালা আর বাগবাজার, বাগবাজার আর টালা করতে হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "নিষ্পত্তি হ'ল?"

"হাঁ বাবু হ'ল।" ভগবান্ বললে, "সবাইকার পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে নিয়ে এলাম বৌমাকে। কথা হ'ল, বীণাবাবু ওর ওই বাড়াটি কাল বৌমার নামে দানপত্র রেজেষ্ট্রী করে দেবেন। বৌমা তাহলে মামলাটি তুলে নেবে।"

মনে-মনেই হাসলাম। এই স্বামী-স্ত্রী!

ভগবান্ বললে, "এইরকম আইন আজকাল হয়েছে, না বাবুজি?"

"হ্যাঁ হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।"

ভগবান্ এগিয়ে এল আমার কাছে। চুপি চুপি বললে, "পারুলকে দিয়ে একটা করিয়ে দিলে হয় না?"

"কী করিয়ে দেবে?"

"ছাড়াছাড়ির মামলা।"

"পারুল রাজী হবে কেন?"

"খুব রাজী হবে। স্বামীটাকে পারুল দু'চক্ষে দেখতে পারে না। শুধু ওর বাবার ভয়ে চুপ করে থাকে। লোকটা বিশুবাবুর বন্ধু কিনা, তাই।"

কথাটা শুনে একটুখানি অবাক্ হয়ে গেলাম।

শ্বশুর-জামাই দুই বন্ধু!

ভগবান্ বললে, "জানেন না বুঝি? তবে শুনুন।"

বিশুবাবু লোকটা ভাল নয়। মাইনে পায় শ' পাঁচেক টাকা, কিন্তু ঘোড়দৌড়ের মাঠে টাকাগুলো উড়িয়ে দিয়ে আসে বলে সংসারের অভাব তার কিছুতেই ঘোচে না। পারুলের স্বামী হরিহর তার সেই রেসের বন্ধু। হরিহর একদিন 'ট্রেব্‌ল্ টোট্' জিতে দেড় হাজার টাকা পেয়ে যায়। বিশুবাবুর পকেটে তখন ট্রামভাড়ার পয়সা পর্য্যন্ত নেই। হরিহর একটা ট্যাক্সি ডেকে বলে, চল তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিই। এই বাড়ী পৌঁছোতে এসেই হ'ল বিপদ্। পকেটে যার দেড় হাজার টাকা, বিশুবাবু তাকে ছাড়তে চাইলে না। বললে, আজ রাত্রে তোমাকে এখানে খেয়ে যেতে হবে। খেতে বসে বিশুবাবু বললে, এবার তুমি একটি বিয়ে কর হরিহর। হরিহর বললে, ভাল মেয়ে কোথায় পাব? পরিবেশন করছিল পারুল। বিশুবাবু বললে, একে বিয়ে করবে? হরিহর প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি। বিশুবাবু বললে, আমার কিন্তু একটি পয়সাও নেই। দুটো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। পারুলের ছোট আর একটা আছে, বুবুল। হরিহর তার রেসে-জেতা টাকাগুলো বিশুবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বললে, এই দিয়ে আপাততঃ বিয়ের খরচ চালাও। বাস, পারুলের বিয়ে হয়ে গেল হরিহরের সঙ্গে। বিয়ের পর জানা গেল, হরিহরের না-আছে চাল, না-আছে চুলো, থাকে কলকাতার একটা মেসে, চাকরি করে একটা প্রেসে। মাইনে পায় মাত্র দেড়শ' টাকা। শনিবার রেসের মাঠে দেখা হয় শ্বশুর-জামাই-এর। সেখান থেকে একসঙ্গে বাড়ী ফেরে, শনিবার থাকে, রবিবার থাকে, সোমবার হরিহর তার মেসে চলে যায়। এমনি চলছে আজ চারটি বৎসর। চার বছরে হয়েছে তার তিনটে মেয়ে। একটা মেয়েও মায়ের মত হয়নি। গায়ের রং কালো আর প্যাঁকাটির মত রোগা।

ভগবান্ বললে, "এরকম স্বামীকে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।"

বললাম, "ছেড়ে দেব বললেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। ছাড়বার কারণ দেখাতে হয়, আর তা প্রমাণ করতে হয়।"

ভগবানের মুখখানি শুকিয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "পারুলকে তুমি খুব ভালবাস, না?"

"হাঁ বাবুজি।"

"তোমার নিজের ছেলেমেয়ে নেই?"

ভগবান্ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় আমার স্ত্রী ঘরে ঢুকল। বললে, "চার পয়সার পান এনে দেবে ভগবান্?"

পয়সা নিয়ে ভগবান্ পান আনতে চলে গেল।

আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে, "কী এমন কথা হচ্ছিল ভগবানের সঙ্গে?"

"জিজ্ঞাসা করছিলাম, ওর ছেলেমেয়ে আছে কি না।"

"শুনেছি তো আছে। একটা মেয়ে আছে ঠিক পারুলের মত। মেয়েটা পারুলের সঙ্গে খেলা করত, খুব ভাব ছিল পারুলের সঙ্গে।"

"কোথায় সে মেয়ে?"

"বিয়ে হয়ে গেছে। সেদিন ভগবান্‌কে বলছিলাম, মেয়েটাকে মাঝে মাঝে নিজের কাছে এনে রাখলেই তো পার! ভগবান্ বললে, পাঠায় না। দুধ বিক্রি করে বলে ওর ধারণা—সবাই ওকে ঘেন্না করে।"

পারুলের বোন বুবুলের বিয়ে।

ভেবেছিলাম, আবার হয়ত কোন্ রেসের বন্ধুকে ধরে আনবেন বিশুবাবু।

কিন্তু না, দেখলাম মেয়েটার কপাল ভাল। সুন্দর একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে বুবুলের। বুবুল মেয়েটিও বেশ সুন্দরী। বর-কনে মানিয়েছে চমৎকার।

ভগবান্ বললে, "বিশুবাবুকে কিছুই করতে হয় নি। মেয়েটা নিজেই জুটিয়েছে। তার এক বন্ধুর দাদা।"

ভগবান্ খুব খাটছে। মনে হচ্ছে যেন তার নিজের মেয়ের বিয়ে।

মেয়ে-জামাইকে কিছু দিতে হয় নি বিশুবাবুকে।

ছেলেটির অবস্থা ভাল। বি-এস্‌সি পাশ করে ডাক্তারী পড়ছে। সে নাকি বলেছে—"একটি হরিতকী দিয়ে কন্যা দান করবেন। নিরাভরণা বুবুলকে আমি নিয়ে যাব। তার পর তার মনের মত অলঙ্কার দিয়ে তাকে আমি সাজাব। আমি তাকে ভালবাসি।"

সৌভাগ্যবতী বুবুল! সাজাবার দরকার হয় নি তাকে। একে তো বিধাতা তাকে সাজিয়েছেন স্বাস্থ্যসুন্দর দেহ আর নবোদ্ভিন্ন যৌবনের অপরূপ সুষমা দিয়ে, তার ওপর দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত পুষ্পের মত, নারীজীবনের সর্ব্বস্বধন অন্তরের স্বতঃউৎসারিত ভালবাসার অদৃশ্য সৌরভে গৌরবময়ী কুমারী বুবুল যখন আবেগকম্পিত থর-থর দেহে বিবাহমণ্ডপে এসে দাঁড়াল, মণ্ডপের একপাশে সবার অলক্ষ্যে দুধওলা ভগবান্ তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে!

ভালবাসার বিয়ে!

ভাবতে গিয়ে ভগবানের চোখ দুটো জলে ভরে এল—আহা, পারুলের যদি এমনিটি হ'ত!

চোখের জল আর মানা মানলে না। দর দর করে গড়িয়ে এল তার টোল-পড়া গালের ওপর দিয়ে।

দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েছিল হরিহর-জামাই। কাছে এসে বললে, "তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরা-কান্না কাঁদছিস কেন? ভাগ্!"

দপ্ করে জ্বলে উঠল ভগবান্। বললে, "জানোয়ার!"

"কি বললি?

ফিরে দাঁড়াল হরিহর।

ভগবান্ তার ছেঁড়া জামাটা তুলে চোখ দুটো মুছতে মুছতে বললে, "কিছু বলি নি। যাও।"

হরিহরের রাগ কিন্তু থামল না। আভাসে ইঙ্গিতে এই লোকটা তাকে অনেকদিন ধরে অনেক কথা বলেছে, কিন্তু এমন স্পষ্ট মুখের ওপর 'জানোয়ার' কোনোদিন বলে নি।

হরিহর তাকে ডাকলে, "শোন্।"

ভগবান্ উল্টে পড়ে গেল।

"কি শুনব ?" যাবার ইচ্ছা ছিল না ভগবানের, তবু তাকে যেতে হ'ল হরিহরের পিছুপিছু।

বাড়ীর বাইরে নির্জ্জন গলিটার মুখে নিয়ে গিয়ে হরিহর বললে, "কি বললি বল্ আর একবার !"

ভগবান্ নিঃসঙ্কোচে বলে বসল, "ও তো আমি হরদম বলি। তুমি একটি জানোয়ার। রেস্তুড়ে জানো—"

কথাটা শেষ হ'ল না। হরিহর ধাঁই ক'রে একটি প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলে তার গালে। এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না ভগবান্। উলটে পড়ে গেল।

মাটিতে হাত দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল সে, হরিহরের অনেক দিনের আক্রোশ কিন্তু তখনও শান্ত হয় নি। আবার তার পেটের ওপর এক লাথি মেরে বসল।

—"খুব বাড় বেড়েছে তুমি। পাজি, ছোটলোক, নোংরা, গোয়ালা কোথাকার ! খবরদার বলছি, পারুলের সঙ্গে তুমি আর কথা বলবে না। আমার সন্দেহ হয়—"

কথাটা শেষ করলে না হরিহর। পেছন ফিরে একবার তাকিয়েও দেখলে না। তাড়াতাড়ি বাড়ীতে গিয়ে ঢুকল।

বিয়ে-বাড়ীতে মেয়েরা তখন উলু দিচ্ছে। শাঁখ বাজছে।

ভগবান্ উঠে দাঁড়াল। শরীরে মারের যন্ত্রণা তখন সে ভুলে গেছে। হরিহর যে-কথাটা বলতে গিয়েও বললে না সেই কথার যন্ত্রণায় তার বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল।

পেছনে পড়ে রইল উৎসব-মুখরিত বিবাহ-মণ্ডপ। ভগবান্ ধীরে ধীরে চলে গেল তার সেই নোংরা খাটালের দিকে।

বিয়ে-বাড়ীর আলো গলির মুখ পর্য্যন্ত পৌঁছোয় নি। আবছা অন্ধকারে যা ঘটল তা অন্ধকারেই থাক্।

কেউ জানলে না, কেউ শুনলে না। বিয়ে-বাড়ীতে এত লোক যে খেয়ে গেল, ভগবান্ খেলে কি না খেলে কেউ একবার খোঁজও নিলে না। পারুলের চোখ দুটো এদিক্-ওদিক্ খুঁজলে কিছুক্ষণ। আরও হয়ত খুঁজত, কিন্তু বড় মেয়েটা বিয়ে দেখতে গিয়ে আছাড় খেয়েছে, মেজটা চেঁচাচ্ছে খাবার জন্যে, ছোটটাকে ঘুম না পাড়ালে তার নিস্তার নেই।

কাজের ঝোঁকে সারাদিন কিছু খাওয়াই হয় নি ভগবানের। শুকনো কাঠ-কুঁচো জোগাড় করে ছোট উনোনটা ধরাতে বসল সে। উনোন ধরানো এক ঝক্মারি কাণ্ড। যতই ফুঁ দেয়, ততই যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে।

না, সুবিধে হচ্ছে না কিছুতেই।

হাঁটু গেড়ে বসল ভগবান্। দু'হাত দিয়ে বুকটাকে চেপে ধরে ক্রমাগত ফুঁ দিতে লাগল।

কাঠটা বোধ হয় ভাল নয়। আগুনের চেয়ে ধোঁয়াই বেশি। চোখদুটো জ্বালা করছে আর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

ছি, ছি, লোকে দেখলে ভাববে বুঝি সে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

উনোনে জল ঢেলে দিয়ে ভগবান্ তার খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

এককালে মস্ত বড় খাটাল ছিল। তিরিশটে গাই থাকত। চারটে ডেয়ারী-কোম্পানীর দুধ জোগাত ভগবান্। আজকাল টিনের বেড়া দিয়ে ছোট করে নেওয়া হয়েছে। ওপারে গরুর বদলে থাকে মানুষ। ছোট ছোট বারোটি ঘর। ঘর-পিছু দশ টাকা করে ভাড়া। এপারে থাকে ভগবান্ নিজে আর তিনটি গাই।

তিনটি গাই আর দুটি বাছুর। একটি বাছুর মরে গেছে। সেই মরা বাছুরের চামড়া আর খড় দিয়ে একটা বাছুরের মত করে রাখা হয়েছে। দুইবার সময় সেইটে ধরে দেওয়া হয় তার মায়ের মুখের কাছে। মরা বাছুরের চামড়াটা জিব দিয়ে চাটে, আর মায়ের দুধ এসে জমে স্তনের বোঁটায়।

এই গাইটার দুধ কি জানি কেন, ভগবান্ নিজে দুইতে পারে না। রোজ সকালে একজন গোয়ালা এসে দুয়ে দিয়ে যায়।

সেদিন সে এসে দেখলে, ভগবান্ তখনও শুয়ে।

—"তোমার কি শরীর ভাল নেই?"

উঠে বসল ভগবান্। বললে, "না বাবা, উঠেছি অনেকক্ষণ। আজ আর গাই দুইতে ইচ্ছে করছে না। লক্ষ্মী এসেছিল?"

—"এসেছিল বোধ হয়। গোয়াল পরিষ্কার ক'রে জাবনা দিয়ে চলে গেছে।"

ভগবান্ বললে, "তাহ'লে তুই বাবা একটি কাজ কর্। আমাকে দু' আনার মুড়ি বাতাসা এনে দে আগে।"

মুড়ি বাতাসা খেয়ে রোজ যেমন বালতি হাতে নিয়ে বাড়ী বাড়ী দুধ দিয়ে যায়, ভগবান্ সেদিনও তেমনি দুধ দিয়ে গেল। কারও সঙ্গে একটি কথাও বললে না।

বিশুবাবুর বাড়ীতে দুধ দিয়ে চলে আসছিল, পেছনে ডাক শুনে হঠাৎ থম্‌কে থামল।

—"কাকা!"

বারান্দায় পারুল দাঁড়িয়ে।

—"কাল তুমি কখন খেলে দেখতে পেলুম না। খেয়েছিলে তো?" মাথা নেড়ে হাঁ না কি-যে বললে বুঝতে পারা গেল না। মুখটা তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল ভগবান্।

দিন চার-পাঁচ পরেই হবে।

বিয়ে-বাড়ীতে যে-সব হালুইকর রাঁধুনী মিষ্টি তৈরি করেছে, রান্না করেছে তারা তখনও টাকা পায় নি। বিশুবাবু ক্রমাগত তাদের ফিরিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আজ নয় কাল, এবেলা নয় ওবেলা।

সেদিন তারা তিনজন লোক একজোট হয়ে এসেছে টাকাটা আদায় করবার জন্যে। টাকা তারা নেবে তবে উঠবে।

পাবে তারা পঞ্চাশটি টাকা, অথচ বিশুবাবুর হাতে কিছু নেই।

বিয়ের পরে হরিহর-জামাইও চলে গেছে তার দেশে।

আগামী শনিবারে রেসের মাঠে যাবেন, সেখান থেকে টাকা জিতে এনে রবিবার সকালেই তাদের টাকা দিয়ে দেবেন বিশুবাবু।

বললেন, "রবিবার সকালে এসে পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে যেও।"

তারা শুনলে না সেকথা। বললে, "আজ্ঞে না, আমরা গরীব মানুষ। টাকা আমাদের আজই চাই।"

বিশুবাবু সোজা চলে গেলেন পারুলের কাছে। বললেন, "তোর একটা যা হোক কিছু গয়না-টয়না দে তো পারু। রাঁধুনীগুলো ভারি জ্বালাতন করছে পঞ্চাশটা টাকার জন্যে। গয়নাটা আবার রবিবার দিন ফেরত পাবি।"

পারুল বললে, "গয়না আমার কোথায় বাবা?"

"সে কি কথা? কি হ'ল তোর এত-এত গয়না?"

পারুল তার শুকনো মুখে ম্লান একটু হাসলে। বললে, "তোমার জামাইকে জিজ্ঞাসা ক'রো।"

বিত্তবাবু এবার শেষ চেষ্টা করতে গেলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে। জানেন পাবেন না, তবু গেলেন। আর ঠিক সেই সময় এল ভগবান্ দুধ দেবার জন্যে।

পারুলের কাছে দুধ দিয়েই সে চলে যাচ্ছিল। পারুল বললে, "শোন। আমাকে পঞ্চাশটা টাকা ধার দেবে কাকা?"

"ধার?"—ভগবান্ বললে, "না।"

বলেই সে হন্ হন্ করে চলে গেল সেখান থেকে।

তখনও দুটো বাড়ীতে দুধ দেওয়া বাকি। সেই দিকেই যাচ্ছিল ভগবান্। যেতে যেতে থমকে থামল। কি ভেবে যেন আবার ফিরল তার খাটালের দিকে। বালতিটি নামিয়ে ঘর খুললে। খাটের নীচে ছিল তার কাঠের সিন্দুক। কোমর থেকে চাবি বের করে সেই সিন্দুক খুলে গুনে গুনে দশ টাকার পাঁচখানি নোট বের ক'রে নিয়ে যেই সে সিন্দুকটি আবার বন্ধ করতে যাবে, মনে হ'ল কে যেন দোরের কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু আশ্চর্য্য, পেছন ফিরে দেখলে, কেউ নেই। তবে কি, যে এসেছিল সে সরে গেল? ভয় হ'ল ভগবানের। এইখান থেকে বাক্স ভেঙে একবার তার তিনশ' টাকা চুরি হয়েছিল। তার পরেই সে এই কাঠের সিন্দুকটা কিনেছে।

ভগবান্ আবার সিন্দুকটা খুললে। কাপড়ের একটি থলের ভেতর তার সঞ্চিত যা কিছু ছিল বের ক'রে কোমরে জড়িয়ে বাঁধলে, তার পর নিশ্চিন্ত-মনে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পারুলের পায়ের কাছে থলিটা ফেলে দিয়ে ভগবান্ বললে, "এই নে। ভেবে-চিন্তে খরচ করিস।"

পঞ্চাশটি টাকা মাত্র সে চেয়েছিল, কিন্তু থলির ভেতর পারুল দেখলে সাতশ' টাকা রয়েছে।

—এত টাকা কি হবে? বলতে গিয়ে মুখ তুলতেই দেখে, ভগবান্ চলে গেছে।

বাপকে দেবার জন্যে থলি থেকে পঞ্চাশটি টাকা বের ক'রে থলিটি সে যত্ন ক'রে লুকিয়ে রাখলে ভগবান্‌কে ফেরত দেবে বলে।

•

কিন্তু ভগবানের আর দেখা নেই।

পরের দিন সকালে আমার স্ত্রী বললে, "চা খাবে কেমন করে? ভগবান্ এখনও দুধ দিয়ে গেল না তো!"

এত বেলা সে কোনোদিনই করে না।

ভগবানের আস্তানা বেশী দূরে নয়। নিজেই গেলাম দুধের সন্ধানে।

গিয়ে দেখি, ভগবান্ তার খাটের ওপর বসে বসে নিশ্চিন্ত মনে সুর ক'রে তুলসীদাসের একটি রামায়ণ পড়ছে আর চোখ দিয়ে দর্ দর্ ক'রে জল গড়াচ্ছে।

আমাকে দেখেই পড়া বন্ধ ক'রে চোখ মুছে বললে, "আসুন বাবু। বসুন।"

বলেই খাটের তলা থেকে বোধ করি মোড়াটা টেনে বের করবার জন্যে উঠতে গেল, কিন্তু উঠতে পারলে না। যন্ত্রণায় 'উঃ' বলে হাত দিয়ে নিজের একটা পা চেপে ধরলে। দেখলাম, হাঁটুর কাছটা বেশ ফুলেছে, কপালের জায়গায় জায়গায় রক্তের দাগ।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হ'ল তোমার? দুধ দিতে যাও নি যে?"

—"দুধের কারবার তুলে দিলাম বাবু।"—আঙুল বাড়িয়ে ভগবান্ তার ফাঁকা গোয়ালটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, "গাই তিনটে গোরাবাগানে পাঠিয়ে দিলাম বিক্রি করবার জন্যে।"

একটুখানি অবাক্ হয়ে গেলাম।

—"পায়ে মাথায় চোট্ লাগল কেমন করে? আমার কাছে গেলেই তো পারতে। ওষুধ দিয়ে দিতাম।"

—"হাঁটতে পারছি না যে। খুব জোর মার মেরেছে।"

—"তোমাকে মেরেছে? কে মেরেছে? কেন মেরেছে?"

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ক'রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভগবান্ বললে, "সে আর শুনে কাজ নেই। বসুন। একটু রামায়ণ শুনুন।"

মনে হ'ল যেন কথাটা সে বলতে চায় না। বললাম, "না, বসব না। তুমি বল।"

ভগবান্ বড় করুণ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার পর বললে, "আচ্ছা বাবুজি, দুনিয়ায় কি টাকাটাই সব? টাকার জন্মে মানুষ মানুষকে এমনি ক'রে মারতে পারে?"

—"টাকার জন্মে মেরেছে?"

—"হাঁ বাবুজি। আমার টাকা আমি আর কাউকে দিতে পারব না, তাকেই সব দিতে হবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কে সে?"

ভগবানের ঠোঁট দুটি থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল। চোখ দিয়ে দর্ দর্ ক'রে জল গড়িয়ে এল। অতি কষ্টে বললে, "আমার ছেলে।"

—"তোমার ছেলে?"

ভগবানের খাটের এক পাশে বসে পড়তে হ'ল।—"তোমার ছেলে আছে, কই, কোনোদিন তো জানাও নি?"

ভগবান্ বললে, "আমার কাছে থাকে না সে। আমাকে বাপ বলে পরিচয় দিতে তার লজ্জা করে।"

"কোথায় থাকে সে?"

"এই তো এইখানে একটা মেস-বাড়ী আছে, সেইখানে। একটা রঙের কারখানায় চাকরি করে, তবু আমার কাছ থেকে যখন-তখন টাকা নিয়ে যায়।"

"তুমি দাও কেন?"

"কেন দিই?"—ভগবান্ তার চোখ দুটো মুছে নিয়ে আবার চাইলে আমার মুখের দিকে। বললে, "ছেলে আছে আপনার?"

বললাম, "না। নেই।"

আবার ভগবানের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। আবার তার চোখ দুটো জলে ভরে এল। বললে, "থাকলে বুঝতেন—কেন দিই।"

চোখ মুছে ভগবান্ খানিকটা সামলে নিলে। সামলে নিয়ে বললে, "আপনি আমার ছেলেকে দেখেছেন বাবুজি।"

"দেখেছি? কখন?"

ভগবান্ বললে, "সেই যে আপনার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনি খাঁসির ওষুধ দিয়েছিলেন। ওই আমার ছেলে।"

মনে পড়ল সেই শার্ট প্যাণ্ট পরা প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে। বললাম, "দেখলে তো মনে হয় না—"

"না বাবুজি, মানুষকে বাইরে থেকে দেখে চেনা যায় না। ওই ছেলেকে আমি এই দুধ-বেচা টাকা দিয়ে মানুষ করেছি, সভ্য করেছি, লিখাপড়া শিখিয়েছি, বি-এ পাশ করিয়েছি…"

এই পর্য্যন্ত বলেই হঠাৎ সে তার ছেলের প্রসঙ্গ বন্ধ করে বললে, "থাক্ ও-সব কথা বাবু, যত বলব ততই দুঃখু বাড়বে। তার চেয়ে এই আর একটা ছেলের কথা শুনুন বাবু।"

রামায়ণটি তার চোখের সুমুখে খোলাই ছিল। ভগবান্ তার সেই খোলা পাতার দিকে তাকিয়ে বললে, "রাজা দশরথের ছেলে শ্রীরামচন্দ্র বনে যাচ্ছেন। তুলসীদাস বলছেন—

জিয়ে মীন বরু বারি বিহীনা। মনি বিনু ফনিকু জিয়ে দুখ দীনা॥
কহউ সুভাউ ন ছলু মন মাহীঁ। জীবনু মোর রাম বিনু নাহী॥"

সুর ক'রে প'ড়ে যাচ্ছিল ভগবান্। আমি বললাম, "পড় তুমি। আমি তোমার ওষুধ নিয়ে আসি।"

—•—

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

স্মৃতির ফলকে রেখেছিনু লিখে,
পুরাণো দিনের যে ক'টি গান,
শতবার্ষিকী-উৎসবে আজি
স্বদেশবাসীরে করিনু দান।

হে মোর বাংলা দেশ,
জন্মের স্মৃতি, কর্মের স্মৃতি,
শত স্মৃতি পরিবেশ
জাগে যে তোমার কোলে,
মনোরম সাজে মর্মের মাঝে
স্মৃতি-মালা হয়ে দোলে।

মালা-ঝরা দু'টি ফুল,
শুকায়ে ঝরিল, সুবাস রহিল,
হলো না ছিন্নমূল।
চির আশা-ভরা মন,
স্বপনে স্বপনে দুলি, ক্ষণে ক্ষণে
আনে চির জাগরণ।
মেলি' অনন্তে দৃষ্টি
চলিতেছে কাল ছিঁড়ি' মায়াজাল,
রচি' অনন্ত সৃষ্টি।

অকৃতজ্ঞ

অনুবাদক—শ্রীদিলীপকুমার রায়

ওগো জনমে মরণে চিরসাথী সখা, প্রিয়তম শ্যামরায়!
কালো মন যে আমার,
তাই বার বার ভুলে সে তোমায় যায়।
দাও কত দান—জানি তা কি আমি?
করুণা তোমার চিনি না যে স্বামী!
ফিরেও চাই না তোমা পানে সুখে,
উঠি উদাসিয়া এতটুকু দুখে,
ব্যথাহারী হয়ে আসো হে তারিতে বেদনাকালো নিশায়।

সবারে সাদরে দিই কোল—শুধু
তোমা হ'তে থাকি দূরে দূরে বঁধু!
ফিরে যাও দেখে রুদ্ধ দুয়ার
শত অপরাধ ক্ষমিয়া আমার,
সাঁঝ-ছায় যবে একা মন ফিরে ডাকে গো কেঁদে তোমায়।

মীরা গায়: হ'ল গভীর রজনী,
শেষ যামে দেখা দাও নীলমণি!
আমারে কাঙাল ক'রে তুমি নাথ,
চরণের দাসী রাখো সাথে সাথ,
শত বন্ধন কাটিয়া শরণ দাও হে চরণছায়।

ইন্দিরা দেবীর সমাধি-লব্ধ মীরাভজন।

স্মরণে

শ্রীসুশীলকুমার দে

আর কিছু ছিল না ত,—সম্মুখে দিশাহারা দুঃখের ছিল অমারাত্রি,
নির্ভীক দ্বিধাহীন যারা তবু একদিন দুর্গম পথে হ'ল যাত্রী,
প্রণমি তাদের আজ,—ধূলায় আঁকিল যারা আপন রুধিরে পদচিহ্ন,
আপন অস্থি দিয়ে বজ্র গড়িল, তারি আলোকে আঁধার হ'ল ছিন্ন।

প্রলয়ের দুর্দ্দিন একদা ছড়ায়ে পড়ে, বিদ্যুৎ-বাণ বাজে বক্ষে,
ভাঙে সত্যের ক্রূর আঘাতে স্বপ্নসুখ, তন্দ্রাজড়িমা নাহি চক্ষে;
আসিল পরম ক্ষণ, চরমের একায়ন, তরুণের জীবনের তন্ত্রে;
লক্ষ্যহারার হ'ল লক্ষ্য শঙ্কাহীন অমরণ মরণের মন্ত্রে।

বিশ্ববিজয়ী ছিল শাসন দুঃশাসন, ছিল রথচক্র নৃশংস,
তার তলে পড়ি' কেহ নিপিষ্ট নিরুপায় পথের ধূলায় হ'ল ধ্বংস;
হাসিমুখে কারাগার ফাঁসির মঞ্চ কেহ বরিল, ঝরিল দেহে রক্ত;
শক্তের উদ্যত হস্তে চূর্ণ হ'ল উন্মদ দুরাশা অশক্ত।

তমসার তীরে তবু আদিত্যবর্ণের দেখে তারা সত্যের সদ্ম,
রক্ত-সায়রে তাই অবশেষে একদিন ফোটে মুক্তির শ্বেতপদ্ম;
তারা জেনেছিল—নহে সীমাহীন পারাবার; বিদ্বেষ—তারো আছে অন্ত;
শঙ্কারও আছে শেষ, দুঃখেরও অবসান—নিষ্ফল নহে বিষ-মন্থ।

শান্ত হয়েছে আজ সেদিনের বিভীষিকা, ক্লান্ত হয়েছে রণ-তূর্য্য;
পূর্ব্ব ভুবনে তবু উদয়ের অনুরাগে জাগে কি আঁধারে নব সূর্য্য?
ধর্ম্মচক্রতলে অধর্ম্মে লাঞ্ছিত হয় শ্লথ জীবনের গ্রন্থি,—
স্মরি তাই আঁখিজলে বিগত বীরের দলে, আজ যারা দূর-নভ-পন্থী।

বেদনা-সমিধ্ আর প্রাণের হব্য দিয়ে অগ্নি আহবনীয় ইদ্ধ
সেদিন করিল যারা, কোথা তারা? হবে না কি
তাদের সাধনা আজো সিদ্ধ?

মুমূর্ষু তরে তারা আনে জীবনের বাণী, হবে কি তা মরণের বন্ধ্য
মুক্তির মরীচিকা মাঝে?—আহিতাগ্নিক কোথা তারা পুরোধা নমস্য!

কাজরী

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

আছে সব সাজানো সে কবিতার ফুল,
গন্ধে-বরণে তারা চির-মনোলোভা,
মালা গেঁথে নিতে মন তেমনি আকুল,
দ্বিধা লাগে, ছুঁলে যদি ম্লান হয় শোভা!
বর্ষা এসেছে নিয়ে শ্যাম-সমারোহ,
বিজুলিতে খেলে যায় বাঁকা বিদ্রোহ,
কুহু-কেকা নাচে-গানে জাগায় যে-মোহ
'কড়-কড়'-রবে তারে তেড়ে আসে বাজ!
কড়ি ও কোমলে ছু'য়ে
মিলে যে আকাশে ভুঁয়ে
বিচিত্র উৎসবে ভ'রে তোলে সাঁঝ।
সজীব কবিতাখানি ফিরে গৃহকাজে,
মোটামুটি মন্দ কী,—যে-ই যা বলুক,—
কেশে-বেশে-চাহনিতে সরোষে সলাজে
ছন্দের ছোঁয়া দিয়ে গাঁথে সুখদুখ।
এখানেও কণ্ঠে তো বাজে যেন বীণ,
বেজে ওঠে রুদ্ররাগ ক্ষণে যে কঠিন!
কখনো আলাপে মিঠা কেটে যায় দিন,
মেজাজের লয় বোঝা সহজে কি ঘটে!
কাব্যের সুর-সাধা
পদে-পদে পায় বাধা
মুখ দেখে ভাবা ভুলি এলে সে নিকটে।
—মুখ দেখে হাবে-ভাবে জানান বনিতা—
দরকারী কাজ সেরে
শেষে ব'সে একটেরে
আপত্তি নেই কারো যা করি ভণিতা!
নদীর পাড়ির মতো থেকে নির্বাক্
বুকে ধরি' তরঙ্গের অন্তরঙ্গ বাণী,—
দিকে দিকে ছন্দে ছন্দে ওঠে এত ডাক,
কী ভাবে কী সাড়া দেব, কী বাঁধুনি জানি!
ভাবি ব'সে, তাই তো কী করা যায় তবে,—
এমন ভাবের মুখে ভরাডুবি হবে?
সকল কবিতা ছেয়ে ওই তো নীরবে—
দিগন্তে অনন্ত আছে বাঙ্ময়!
তার সুরে সেধে সুর
দেখি চলে কতদূর,
কিছু না-ব'লেও বলা হয় কি না হয়।
আধুনিকী পুরাতনী কবিতার এই ডামাডোলে
কী নিয়ে কী বেঁধে যাবে,—দিন যা ঘোরালো!

কাজ কী এগিয়ে মিছে, প'ড়ে যাব গোলে,
চলে যদি,—কথা বেশি না-বলাই ভালো।
বোবাদের শত্রু নেই—শাস্ত্রের কথা—
মিত্র বাড়ে না-বাড়ে,—চাই হেথাহোথা—
— দোর-গোড়ে কী যে হাতে কে যেন আগতা।
দেবীর প্রসাদ সে কি? হই উন্মুখ।
হাতটি বাড়ায়ে চুপে
ভাব চেপে কোনোরূপে
কাপ্‌ নিয়ে বাদ্‌লায় চায়ে দি চুমুক।
আলোটি জ্বালায়ে যায়, কাজ সে না ভোলে;
আঁধারই যে আলো হত, কারে বা সে বলি!
কে শোনে তা বাতাসের আবোল-তাবোলে,
কাছে যদি এসে বসে,—ভাবি তা কেবলি!
ও ঘরে এবারে গিয়ে ধরে গুন্‌গুন্‌,
জল হয়ে গলে যেন গুমোট আগুন;
কোন্‌ গুণে তারে আজ করা যায় গুন—
হুন্‌হু বায়ু এলোমেলো দোরে মাথা কোটে।
কী বাহির কী ভিতর
ক্রমে হয়ে একস্তর
সব মিলে একখানি সুর হয়ে ওঠে!
সুরে ভরে মন; শুনে লয় অনুভবে—
সুর যেন এইবার
পার হবে সীমা তার,
মিশে যাবে নৈঃশব্দ্যের মহা-উৎসবে।
ফেরাতে করিনে পিছে মিছে ডাকাডাকি,
কী করি! সাধে যা থাক্‌, আছে সাধ্যে বা কী!
—নীরবতা দিয়ে শুধু আলপনা আঁকি,
রবের নিগম-পথ-রেখা পায়ে পায়ে।
বিনা মৌন সে-ভূমিকা
গোলে সব হবে ফিকা,
যতি যে আড়ালে করে ব্যক্ত কবিতারে।
"বরষে বাদরোয়া"-র যাদু ভরা কলি—
ভাষা যত করে শেষ,
আশা এসে ধরে রেশ,
ব'লেও না-বলা থেকে যায় কি সকলি!
জলে করে একাকার বাহিরে শাওন—
গানে আর প্রাণে চলে ঘরে রসায়ন।

* * *

কাজরীতে লেগে আসে সুরটি থামার,—
খুঁজে ফিরি মনোমতো কী যেই আমার।

পদ্মমধু

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই জীবনের পণ্যশালায় কাটল বেলা পদ্মমধু খুঁজে,
যশের হাটে—রূপার হাটে—রূপের হাটে নারীর মৃণাল ভুজে।
প্রাণ যে আমার কি চেয়েছে—মন সেকথা ঘুণাক্ষরেও জানত না।
সন্ধ্যা হ'ল, বন্ধু আমার, নিজেরে আজ কি ব'লে দিই সান্ত্বনা ?

কেউ বলেছে দেবতা তোমায়,—কেউ বলেছে মাতা,—কেউ বা পিতা।
জীবনপদ্মবনের মধু তুমিই, বঁধু, বুঝেও বুঝিনি তা!
অন্দরে দ্বার বন্ধ রেখে সন্ধানে তাই ফিরনু পথে প্রান্তরে।
মানব-জনম সফল-করা সোনার ফসল তুমিই—কে তা জানত রে ?

আলোয় তুমি দি'ছলে দেখা রাজার সাজে হাজার সৈন্য সাথে
বাজিয়ে ডঙ্কা,—আমার শঙ্কা—আমার দৈন্য ঘুচল না তো তাতে!
ভিড় জমাল প্রসাদলোভী,—পথের ধূলা ঢাকল ফুলে চন্দনে।
বিরহিণীর বরণমালা মিলল না তার গোপন বুকের স্পন্দনে!

আতসবাজির কারসাজিতে জয়ধ্বনি যতই কর জড়ো
আমি তাতে ভুলছি না আর, আমার দাবী অনেক বেশী বড়ো।
ভিক্ষুকেদের বিলোও সোনা; প্রেমিক খোঁজে মানসমকরন্দ সে;
আর কতদিন ঠেলবে তারে ? প্রাণ দিলে প্রাণ মিলবে না তার
কোন্ দোষে ?

আঁধারে ঐ কিসের শব্দ ? মহিষকণ্ঠে ঘণ্টাধ্বনি ওঠে ?
কিংবা তোমার নূপুর বাজে ? এমন রাতে কোথায় কমল ফোটে ?
বাতাস মধুগন্ধনিবিড়,—কোন্ সে নিশীথ পদ্মসোহাগ সিক্ত তা!
অন্ধকারের বন্ধু এলে এতক্ষণে ভ'রতে প্রাণের রিক্ততা ?

———

সমুদ্র

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

সমুদ্র আমায় ডাকে : দুর্বার তরঙ্গ কলরোলে
নিরন্তর মোরে ডাকে অন্তহীন নীলাম্বু-হৃদয় ;
উদ্দাম অশান্ত ঢেউ জীবনের রক্তে রক্তে দোলে ;
অথচ মৃত্তিকাতরা কি বেদনা ক্লান্তিতে সভয় !
নিবিড় নিঃসঙ্গ তৃষ্ণা, যন্ত্রণার বিজন আঁধার,
দুর্গম ক্লেদাক্ত পথ, দিশাহীন অস্পষ্ট আকাশ,
কুয়াশাধূসর চোখে পৃথিবী হারায় বার বার :
আমায় ডেকেছে তবু অন্তহীন সমুদ্র-আশ্বাস।

সেই ডাকা দুর্নিবার। জীবনের ক্ষুদ্র আয়োজনে
মুহূর্তের মুগ্ধনীড়ে আকাঙ্ক্ষার জেগেছে উচ্ছ্বাস ;
প্রত্যাশার ভগ্নস্তূপে তারপর স্মৃতিজীর্ণ মনে
কুয়াশাজর্জর নীল আকাশের আঁকি প্রতিভাস।
বিশীর্ণ জীবনপ্রান্তে দেখি এক দিগন্তের আলো,
আমার সংকীর্ণ মনে কি আশ্বাস সমুদ্র ছড়ালো ?

—•—

প্রবাসী : নতুন ধ্যান

দিলীপ দাশগুপ্ত

কী এক নতুন ধ্যানে জীবনের বিচ্ছুরিত ছবি
অসীম পটের 'পরে সমাহিত ক'রে বিশ্বকবি
তৃষ্ণারে সরায়ে দূরে, ফেলেছ নিঃশ্বাস
মধুময় পৃথিবীতে, মধুগন্ধী তাই কি বাস ?

প্রগাঢ় প্রেমের দানে প্রাণ থেকে কোটি মহাপ্রাণ
ফিরেছে ত্রিলোকে শুধু গেয়ে গেয়ে এক সামগান,
পাষাণে গলায়ে সুধা দিয়েছে কৌতুকে,
প্রীতির বন্ধনে সে যে আছে বুকে মুখে !
তবু বারেবার
প্রেম ভুলে, হিংসা দিয়ে মুছে ফেলে সত্য অঙ্গীকার—
অপমানে, অনাদরে ডেকে আনি ঘোর সর্ব্বনাশ
ভেঙে দিয়ে আত্মার বিশ্বাস।
বিচিত্র এ পৃথিবীতে কেহ নয় স্বদেশে প্রবাসী,
ক্ষণিকের আত্মসুখে মুহূর্তের আমরা উদাসী !

—•—

প্রথম প্রশ্ন

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

এ উন্মত্ত ব্যাকুলতা কোথা থেকে আসে ?
চারিদিকে রুক্ষ মরু, পর্বত নির্বাক্,
সংশয়ের ধূলিজাল, তবুও উল্লাসে
হৃদয়-সমুদ্রে জাগে জোয়ারের ডাক !

কত আশা, ভালবাসা, তরঙ্গ, তুফান
তুচ্ছ করি' নিয়তির নিষ্ঠুর তর্জনী
অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত পুঞ্জ পুঞ্জ গান
বেদনার গাঢ় নীলে ঝলকিত মণি !

কে কবে দিয়েছে ডুব ভাসিয়েছে ভেলা
ইতিহাসে লেখা নেই কোন পরিচয়,
ঢেউ দিয়ে ঢেউ গ'ড়ে ঢেউ ভাঙা খেলা,
শূন্যতার রৌদ্র-আঁখি তাই স্বপ্নময়।

তার নিত্য কল্লোলের মত্ত কলরোলে
দিগন্ত-দুয়ার মৃত্যে নক্ষত্রেরা খোলে।

—•—

কত কী পেলাম না যে

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কত কী পেলাম না-যে। যা পেলাম—এই দুই হাতে
কুড়িয়ে নিলাম। যার হয়ত-বা কোনো দাম নেই।
তবু যা পেলাম -এই উপলব্ধি মানসে-প্রজ্ঞায়
বস্তুত অনেক দামী : জ্যোৎস্নায়ও আকাশ ভরে যায়।
না হ'ল পর্যাপ্ত, স্ফীত আয়োজন—দুঃখ নেই তাতে।
সমৃদ্ধি-প্লাবায় কিন্তু জর্জরিত নই—এই লাভে
তৃপ্তি পাই, অহর্নিশ ঠিক পন্থা পরিক্রমণেই
ব্যস্ত থাকি। এ-প্রত্যয় জানি শেষে ঋদ্ধিই বাড়াবে।

যা পেলাম—অপর্যাপ্ত। অধিক দুরাশা নেই মনে,
উত্তুঙ্গ-পর্বতচূড়া কামনা করি না, নিচে থেকে
একটু স্নেহার্দ্রধারা প্রাপ্তিতেই খুশি, তা-ই চেখে
যে আকণ্ঠতৃষ্ণা তৃপ্তী।—কী হবে তুষারস্রোত ঠেলে ?
যা পেলাম—অভিনব। চাই না পরম সেই ধনে,
সমুদ্রের সাধ নেই গঙ্গোত্রী-যমুনা কাছে পেলে।

—•—

বিক্রমপুর-তালতলীর পুল

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

চিত্রাধিকারী—শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ হইতে পুনর্মুদ্রিত

অবন্ধন

মায়া বসু

—হঠাৎ কখন,
রাত্রিশেষে নিশিগন্ধ ফুলের মতন
ডানা মেলে সে বিহঙ্গ বহু দূরে
উড়ে গেছে ফের,
আরেক অজানা দেশে।

সে এখন অন্য আকাশের।
দুয়ার খোলাই ছিল। মুক্তিস্পর্শ এনেছে বাতাস,
বার বার তাকে ডাক দিয়ে গেছে স্তব্ধ নীলাকাশ।
সীমাহীন অবন্ধনে
মেলে দিয়ে লঘুপক্ষ ডানা,
অন্য এক পৃথিবীর সে বিহঙ্গ পেয়েছে ঠিকানা।
তাকে কি দেখতে চাও?

ঢেউ তোলা সাগরের পারে
ফুল হয়ে ফুটে আছে—
ছায়া ঘেরা ঘুমের পাহাড়ে।
কঠিন তুষার শিলা নেচে নেচে এখানে ওখানে,
কী কথা যে লিখে গেছে—
সেই পাখী বোঝে তার মানে।
বহুরূপী সেই পাখী! ক্ষণে ক্ষণে রং বদ্‌লায়,
মেঘে ও মাটির বুকে, কখনো বা মৌসুমী হাওয়ায়!
একটি ডানায় তার কালো রাত
কুয়াসা-মলিন।
আরেক পাখার তলে ঝলকায়
সূর্যদীপ্ত দিন।
সাদা পাখী কালো হয়।
কালো পাখী হঠাৎ কখন,
আলো হয়ে ফুটে ওঠে—
আকাশের তারার মতন।

সমুদ্র, অরণ্য, আকাশ, তুমি

হেনা হালদার

অরণ্যের আকর্ষণ, অতলান্ত সমুদ্র-বিলাস
আঁখির গভীরে মগ্ন। পরিব্যাপ্ত তীব্র অভিলাষ,
আকাশ পিপাসা হয়ে জেগে থাকে আদিগন্ত লীন
প্রান্তরের মরুতীর্থ-পর্যটনে আদিঅন্ত হীন।

তুমি কি রেখেছ ধ'রে সমুদ্র ও অরণ্য-আকাশ
প্রমূর্ত সত্তায়? তাই ক্ষণে ক্ষণে তারি প্রতিভাস।
তোমায় আকাশে মন উড়ে চলে যেন বিহঙ্গম
মুক্তপক্ষ।
দেহ চায় দুর্নিবার সাগর-সঙ্গম।
আদিম অরণ্য-ভয় পদে পদে একান্ত নিকটে
তোমাকেই টেনে আনে অজানিত রহস্যের তটে।

জীবন-জিজ্ঞাসা

শ্রীকরুণাময় বসু

আমার আকাশ হ'তে জ্যোতির্ময় অনন্ত আলোক
কখন পড়েছে মুখে, তাই মোর মুগ্ধ দুটি চোখ;
এই চোখে ভালো লাগে প্রভাতের ফুলের পশরা,
মাঠ ঘাট, গ্রামান্তের শীর্ণা নদী কলকণ্ঠস্বরা,
রৌদ্রস্নাত তালীবন; চামেলির শুভ্রবৃন্তগুলি
সুন্দরের প্রত্যাশায় ধ্যান করে, কখন গোধূলি
সাজাবে ফুলের দেহ; চঞ্চলিত জীবন-বেদনা
ক্ষণে ক্ষণে খেলা করে, শূন্য ঘরে করে অভ্যর্থনা
নূতন সৃষ্টির লাগি'। আমি শিল্পী, নব অভ্যুদয়
প্রত্যক্ষ করেছি যেন যেইখানে দিগন্ত-বলয়
রঙের নিঃশ্বাস ফেলে, মুহূর্তের সৌন্দর্য-চিত্রণে
মহত্তর শিল্পরেখা রেখে গেল মানুষের মনে।

এ মুহূর্ত নদী যেন, শুধু স্রোত, ঢেউ ঢেউ খেলা,
আমার জীবনতরী দাঁড় টেনে চলেছে দুবেলা
জন্মহীন মৃত্যুহীন নক্ষত্রের কোন দূর দেশে
অব্যক্ত চেতনাতীত রূপহীন সত্তার উদ্দেশে
অসংখ্য মৃত্যুর পারে চৈতন্যের স্ফুলিঙ্গ-দীপ্তিতে
নির্জন নিঃসঙ্গ লোকে। বড়ো ক্ষুদ্র এই পৃথিবীতে
আমারে ধরে না যেন, আমার আত্মার তীব্র ক্ষুধা
মিটাতে পারে না এই ক্ষুদ্রপাত্রে মাটির বসুধা
চরম ঐশ্বর্য দিয়ে; আমি চাই আরো, আরো, আরো
অর্থহীন, খ্যাতিহীন, তৃপ্তিহীন প্রাণ মহত্তর,—
স্নেহ মায়া, ভালোবাসা, ফুল লতাপাতা দিয়ে আঁকা
আশ্চর্য জীবনস্বপ্ন; সুন্দরের হাতে হাত রাখা
শূন্যতার পুষ্পবনে, তার পর ফেলে যাওয়া পথে
সঞ্চয়ের যত কিছু ক্লান্ত ফুল, খরতর স্রোতে
ভাসালো অসীম প্রাণ। এই চির পথযাত্রী আমি,
বিকীর্ণ জন্মের ফুলে মালা গেঁথে দিলাম প্রণামী
কি জানি কাহার পায়ে? রিক্ততার শূন্যতম পারে
জীবন-জিজ্ঞাসা মোর অর্থ খোঁজে নিঃশব্দ আঁধারে।

"মধুর, তোমার শেষ যে না পাই"

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

"কে সে? জানি না কো। চিনি নাই তারে···
শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে "অজানা" বলেছেন, উপনিষদ্‌ও তাঁকে "অবিজ্ঞাত" বলেছেন। অথচ সেই "অজানা"কেই মানুষ প্রেমের ডোরে বাঁধতে চেয়েছে। কেউ তাঁকে বলেছে পিতা, কেউ মাতা, কেউ ভ্রাতা, বন্ধু, সখা। কেউ-বা বলেছে, পতি, প্রিয়তম।

শৈব ও ব্রহ্মোপাসকগণ, পিতা, প্রভু, বিধাতৃরূপে; শাক্তগণ মাতৃরূপে; বৈষ্ণবগণ, বাউলগণ, বন্ধু, সখা, পতি, প্রিয়তমরূপে তাঁর উপাসনা করেন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, ঐ সর্বপ্রকার উপাসনাই প্রচলিত রয়েছে।

উপরোক্ত সম্বন্ধসমূহেরও অধিক, দেবতার সঙ্গে আর একটি বিচিত্র সম্বন্ধ কল্পিত হয়েছে। দেবতা পুত্র, ভক্ত মাতা। দেবতার প্রতি ভক্তের বাৎসল্যভাব। দেবতাকে বালগোপালরূপে উপাসনা। এটিও বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই বিশেষত্ব।

স্নেহকে বলা হয় অধোগামী। দেবতাকে পিতৃরূপে, মাতৃরূপে ভালবেসেও মানুষের তৃপ্তি হ'ল না। তাঁকে সন্তানরূপে স্নেহ করবার, সেবা করবার আকাঙ্ক্ষা হ'ল। তাই বালগোপালের কল্পনা। বৈষ্ণব সাধক-সাধিকাগণ সন্তান কল্পনা ক'রে আরাধ্য দেবতার উপর স্নেহের নির্ঝরিণী বহিয়ে দিলেন।

ভারতবর্ষীয় সাধকের অপূর্ব এই কল্পনা!

আমাদের বাংলাদেশে বৈষ্ণব ও শাক্ত, এই দুটি সাধনার স্রোত পাশাপাশি ব'য়ে চলেছে। দুটিই প্রবল স্রোত। এরা বাঙ্গালীর জীবনকে সরস, মধুময় করেছে। বৈষ্ণবগণ যেমন আরাধ্য দেবতার বালগোপালরূপ সৃষ্টি করলেন, শাক্তগণও তেমনি ইষ্টদেবতাকে কন্যারূপে কল্পনা করলেন।

সুজলা, সুফলা বাংলার মাটিতে, বাঙ্গালীর স্নেহময় গৃহে, আদরিণী কন্যা উমারূপে, জগজ্জননী দশভুজা নবজন্ম গ্রহণ করলেন। এই উমাকে নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় কত না করুণ আগমনী সংগীতের সৃষ্টি হ'ল। বাংলার হিন্দুমুসলমান উভয়েই তাতে অংশগ্রহণ করলেন।

দেবতাকে কন্যারূপে দর্শন, বাঙ্গালীর মানসলোকেই সম্ভব হ'ল। বাঙ্গালীর মাতৃভাষাতেই এই অপূর্ব দেবতার অভিনব স্তোত্র রচিত হ'ল।

আদিম মানব, দেবতার ভয়ংকর রূপই দেখেছিল। দেবতার সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল, শাসক-শাসিতের, রক্ষক-ভক্ষকের। পুজো দিয়ে, ডালি দিয়ে, উপহার দিয়ে, উৎকোচ দিয়ে দেবতাকে পরিতুষ্ট রাখবার জন্য সে সর্বদা সচেষ্ট থাকত। হতভাগ্য শুধু "ভয়ানাং ভয়ম্" রূপই দেখেছিল। "আনন্দরূপম্ অমৃতম্"-এর দর্শনলাভের সৌভাগ্য তার হয় নাই। সর্বশক্তিমান্ বিশ্ববিধাতার মধুররূপ দর্শন, তাঁর সঙ্গে মধুর সম্বন্ধ স্থাপন, তার কল্পনারও অতীত ছিল।

আদিম অসভ্য মানুষ যখন সভ্য হ'ল, তখন তার উগ্র বর্বররূপ তিরোহিত হ'ল। সে ভদ্র, নম্র, মধুর হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তার দেবতাও অনুরূপ রূপ ধারণ করলেন।

কবে কতকাল পূর্বে এই পৃথিবীতে দেবতার মধুররূপ কল্পিত হয়েছিল? কতকাল পূর্বে মানুষ তাঁকে পিতৃরূপে কল্পনা করেছিল? মাতৃরূপেই বা মানুষ কবে তাঁকে দেখতে শুরু করল?

কবেই বা তাঁকে ভ্রাতা, বন্ধু, সখারূপে, পতি প্রিয়তমরূপে মানুষ দেখল?

প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মানুষ দেবতাকে পিতৃরূপে, মাতৃরূপে, ভ্রাতা, বন্ধু, সখারূপে দর্শন করেছিল।

আবার সেই সময়েই সে তাঁকে পতি, প্রিয়তম রূপে আরাধনা করেছিল। এমন কি তাঁকে সন্তানরূপেও কল্পনা করেছিল।

বেদে, এমন কি ঋগ্বেদেই আমরা দেখছি, তিনি পিতা এবং মাতা :

ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ।
অধা তে সুম্নমীমহে ॥ ঋগ্বেদ, ৮।৯৮।১১ ; সামবেদ, ২।৫২০ ; অথর্ববেদ, ২০।১০৮।২।

"হে বসু, হে শতক্রতু, তুমি আমাদের পিতা, তুমি মাতা, তাই আমরা তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করি।"

পিতা মাতা সদম্ ইন্ মানুষাণাম্। ঋগ্বেদ, ৬।১।৫।

"(তুমি) সমস্ত মানুষের চিরন্তন পিতা এবং মাতা।"

তিনি কি কেবল পিতামাতা? না। তিনি পিতা, মাতা. ভ্রাতা, বন্ধু সখা :

অগ্নিং মন্যে পিতরম্ অগ্নিম্ আপিম্ অগ্নিং ভ্রাতরং সদম্ ইৎ সখায়ম্। ঐ, ১০।৭।৩।

"অগ্নিকে মনে করি আমরা পিতা, আপ্তজন, ভ্রাতা, এবং চিরন্তন সখা।"

উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা। সামবেদ, ২।১১৯১ ; ঋগ্বেদ, ১০।১৮৬।২।

"হে পবন, তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের ভ্রাতা, তুমি আমাদের সখা।"

স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা। যজুর্বেদ, বাজসনেয়ি-সংহিতা, ৩২।১০ ; অথর্ব, ২।১।৩।

"তিনি আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের জনক, তিনি আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিধানকর্তা।"

প্রাণঃ প্রজা অনু বস্তে পিতা পুত্রমিব প্রিয়ম্। অথর্ব, ১১।৪।১০ ; ঋগ্, ১০।২২।৩।

"সেই প্রাণের প্রাণ, পরমদেবতা, প্রিয়পুত্রের নিকট পিতার ন্যায়, সমস্ত প্রাণীর অতি সন্নিকটে বাস করেন।"

ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, কি পৃথক্, পৃথক্ দেবতা, কিংবা স্ব-স্ব-প্রধান দেবতা; অথবা এক ঈশ্বরেরই নানা নাম, সে-তর্ক এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ইষ্টদেবতাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধবার প্রয়াস, তাঁর সঙ্গে ভক্তের নানাবিধ মধুর সম্বন্ধ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাই এখানে লক্ষণীয়।

ঈশ্বর এক কি বহু, বৈদিকসংহিতার ঋষিদের সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ছিল। সংহিতান্তর্গত বহু মন্ত্রই তার সাক্ষ্য বহন করছে :

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ[১] ॥ ঋগ্বেদ, ১। ৬৪।৪৬ ; অথর্ব, ৯।১০।২৮।

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ ॥ বাজসনেয়ি-সংহিতা, ৩২।১।
স ধাতা স বিধর্তা স বায়ুর্নভ উচ্ছ্রিতম্ ॥
সোঽর্যমা স বরুণঃ স রুদ্রঃ স মহাদেবঃ ॥
সো অগ্নিঃ স উ সূর্যঃ স উ এব মহাযমঃ ॥ অথর্ব, ১৩।৪।৩-৫।
ন দ্বিতীয়ো ন তৃতীয়শ্চতুর্থো নাপ্যুচ্যতে ॥
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে ॥
নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে ॥···
স এষ এক একবৃদ্ এক এব ॥ অথর্ব, ১৩।৪।১৬-২০।

"এক সৎস্বরূপকে বিপ্রগণ অগ্নি, যম, বায়ু, প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করেন।"

"তিনিই অগ্নি, তিনি আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনি চন্দ্র, তিনিই শুক্র, তিনি ব্রহ্ম, তিনি আপ, তিনি প্রজাপতি।"

"তিনি ধাতা, তিনি বিধর্তা (ধারণকর্তা), তিনি বায়ু, তিনি আকাশ, তিনি অর্যমা, তিনি বরুণ, তিনি রুদ্র, তিনি মহাদেব। তিনি অগ্নি, তিনি সূর্য। তিনি মহাযম।"

"তিনি দ্বিতীয় নন, তৃতীয় নন, চতুর্থ নন, পঞ্চম নন, ষষ্ঠ নন, সপ্তম, অষ্টম, নবম দশম নন, তিনি এক, এক, এক।"

যাই হোক, ঈশ্বর বা দেবতার একত্ব বা বহুত্ব বিষয়ক তর্ক এখানে অবান্তর।

১। "অগ্নি এক, কিন্তু বহুরূপে প্রদীপ্ত, সূর্য এক, কিন্তু সর্বরূপে প্রকাশমান, ঊষা এক, তবু সর্বত্র তার বিভা, তিনিও এক, তবু বিশ্বরূপে বিরাজমান ॥" ঋগ্বেদ, ৮।৫৮।২।

মানুষ তার ইষ্টদেবতার সঙ্গে কতরূপ মধুর সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেছে, তাই আমাদের বক্তব্য। সে ইষ্টদেবতা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, যাই হোন না কেন।

ঋগ্বেদেই দেখতে পাই, আরাধ্য দেবতাকে, প্রিয়তম পতিরূপে, কল্পনা করা হয়েছে :

সনায়ুবো নমসা নব্যো অর্কৈর্বসূয়বো মতয়ো দস্ম দদ্রুঃ।
পতিং ন পত্নীরুশতীরুশন্তং স্পৃশন্তি ত্বা শবসাবন্ মনীষাঃ॥২ ঋগ্বেদ, ১।৬২।১১।

"হে সুন্দর। তুমি নবস্তু, তুমি প্রশস্ত। নতিসহ, স্তুতিসহ, মনীষীগণ তোমার অভিমুখে ধাবমান ; তাঁদের কেউ বা অমৃতাকাঙ্ক্ষী, কেউ বা ধনাকাঙ্ক্ষী। হে শক্তিমান্, প্রেমাতুরা পত্নী যেমন প্রেমাতুর পতিকে স্পর্শ করে, মনীষী-স্তোতৃগণের স্তবরাজি (বা প্রার্থনাসমূহ) তেমনি তোমাকে স্পর্শ করছে।"

ঋগ্বেদের ঋষি তাঁর ইষ্টদেবতাকে সন্তানরূপে কল্পনা করেছেন :

মতরঃ সোমপামুরুং রিহন্তি শবসস্পতিং।
ইন্দ্রং বৎসং ন মাতরঃ॥ ঋগ্বেদ, ৩।৪১।৫, অথর্ববেদ, ২০।২৩।৫।

"মাতৃগণ যেমন বৎসকে, মনীষীগণ তেমনি মহান্, শক্তিমান্ সোমপ ইন্দ্রকে বারংবার চুম্বন করেন।"

তিনি মাতা, তিনি পিতা, তিনি, ভ্রাতা বন্ধু সখা। তিনি পতি, প্রিয়তম। তিনি সন্তান। আরাধ্য দেবতার সহিত এতরূপ মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করেও ভক্তের তৃপ্তি হ'ল না। দেবতাকে এত আপন করে, এত ঘনিষ্ঠভাবে লাভ করেও মনে হ'ল—এখনো যেন সম্পূর্ণভাবে পাওয়া গেল না। এখনও যেন তাঁর সঙ্গে ব্যবধান রয়ে গেল।

তাঁকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে, অন্তরতমরূপে লাভ করতে চাইলেন ঋষি :

যদ্ অগ্নে স্যাম্ অহং ত্বং ত্বং বা ঘা স্যা অহম্।
স্যুষ্টে সত্যা ইহাশিষঃ॥ ঋগ্বেদ, ৮।৪৪।২৩।

"হে স্বপ্রকাশ, যখন আমি 'তুমি' হই, কিংবা (বা ঘা) তুমি 'আমি' হও, তখন ইহলোকে তোমার সমস্ত আশীষ সত্য হয়।"

দেবতার সহিত ভক্তের একাত্মতা, এবং ভক্তের সঙ্গে দেবতার অভেদ, সাধনার এই সর্বশেষ পরিণতি।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে, ভারতীয় ঋষি এই পরিণতি প্রার্থনা করেছিলেন। তপস্বীর সেই আকুল আকুতি নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়েছিল।

হে সুন্দর! এই বিশ্ব তোমার সৌন্দর্যে, তোমার আশীষে পরিপূর্ণ। বিচিত্ররূপে মধুররূপে, নয়নবিমোহন মনোহররূপে, নানা মাধুর্যময় স্নেহ, প্রীতি, প্রেমের বন্ধনে তুমি ধরা দিয়েছ :

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥
উতৈষাং পিতোত বা পুত্র এষামুতৈষাং জ্যেষ্ঠ উত বা কনিষ্ঠঃ।
একো হ দেবো মনসি প্রবিষ্টঃ প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ॥

অথর্ববেদ, ১০।৮।২৭-২৮।

"স্ত্রীরূপে, পুরুষরূপে, কুমাররূপে, কুমারীরূপে, তুমি এই সংসারে বিরাজ করছ। দণ্ডধারী জীর্ণ বৃদ্ধরূপে, তুমি কম্পিতচরণে ভ্রমণ করছ। সমস্ত বিশ্বের দিকে দিকে তুমিই জন্ম নিয়েছ।

"পিতারূপে, পুত্ররূপে, জ্যেষ্ঠরূপে, কনিষ্ঠরূপে, সেই একই দেবতা বিরাজ করছেন। অন্তরে অন্তর্যামীরূপে তিনি প্রবিষ্ট হয়েছেন। বিশ্বে প্রথম যিনি জন্ম নিয়েছেন, তিনি সেই দেবতাই। আজ এখনও ভূমিষ্ঠ হন নাই, গর্ভের মধ্যে রয়েছেন যিনি, তিনিও সেই দেবতাই।"

২। হে দস্ম (হে দর্শনীয়, হে সুন্দর), অর্কৈঃ (মন্ত্রের দ্বারা, স্তোত্রের দ্বারা), নমসা (নমস্কারের দ্বারা), নব্যঃ—স্তুত্যঃ ভবসি (তুমি স্তুতির যোগ্য, প্রশংসনীয়)। সনা-যুবঃ, সনা ইতি একম্ অব্যয়ং নিত্যম্ আচষ্টে (সনা, এই অব্যয় শব্দ নিত্যত্ববাচী), নিত্যম্—অমৃতত্বম্ আত্মনঃ ইচ্ছন্তঃ (যাঁরা নিজেদের নিত্যত্ব বা অমৃতত্ব আকাঙ্ক্ষা করেন), বসূয়বঃ—বসু, ধনম্ আত্মনঃ ইচ্ছন্তঃ—ধনকামাঃ, বা মতয়ঃ—মেধাবিনঃ স্তোতারঃ বা (অথবা, যাঁরা নিজেদের ধন আকাঙ্ক্ষা করেন—ধনাকাঙ্ক্ষী মনীষীগণ বা স্তোতৃগণ), দদ্রুঃ—মহতা প্রয়াসেন ত্বাং জগ্মুঃ (বহু কষ্টে তোমার নিকটগত)। হে শবসাবন্—বলবন্ (হে বলবান্), উশতীঃ প্রযুক্তাঃ মনীষাঃ—স্তুতয়ঃ (তাঁদের প্রযুক্ত স্তুতিসমূহ), ত্বা—ত্বাং স্পৃশন্তি—প্রাপ্নুবন্তি (তোমাকে স্পর্শ করছে—লাভ করছে)। তত্র দৃষ্টান্তঃ (সে বিষয়ে এই দৃষ্টান্ত), উশতীঃ পত্নীঃ—উশত্যঃ পত্ন্যঃ—কাময়মানাঃ পত্ন্যঃ (পতির প্রতি আসক্তা পত্নীগণ, পতিকামকামা পত্নীগণ) উশন্তং পতিং ন—কাময়মানং পতিম্ ইব (যেমন পত্নীর প্রতি আসক্ত পতিকে, যেমন পত্নীসক্তেচ্ছু পতিকে), "স্পৃশন্তি" "প্রাপ্নুবন্তি" ("স্পর্শ করে"—"লাভ করে")।

এক

এক সময়ে এক রাজা ছিলেন, তাঁর যে ছিল এক ছেলে, তাঁর ছিল উজীর তাঁরও ছিল এক ছেলে। দু'জনেরই এক বয়স, দুজনের মধ্যে খুবই ভালবাসা। কেউ কাকেও ছেড়ে থাকতে পারেন না। একদিন দুই বন্ধুতে পণ করলেন তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে দেশ-ভ্রমণে বের হবেন। এত বড় সুন্দর পৃথিবী, কত দেশ মহাদেশ, কত সাগর, কত নদী, কত বৃহৎ মন্দির ঘর-বাড়ী, কিই বা দেখেছেন তাঁরা? একদিন দুই বন্ধু মিলে বের হয়ে পড়লেন অজানার সন্ধানে। জানলেন না রাজা, জানলেন না উজীর। রাজপুত্রের নাম অলক, উজীরের ছেলের নাম সঞ্জয়।

দিনের পর দিন চলেছেন দু'জনে, নির্জ্জন পথ, ঊষর মরুভূমি, ঘন বনজঙ্গল, যেতে যেতে একদিন রাজপুত্র বললেন তাঁর বন্ধুকে, ভাই সঞ্জয়, এস এই বকুল গাছের তলায় একটু বিশ্রাম করে নিই, বড় পিপাসা লেগেছে, আর আমার চলবার শক্তি নেই বন্ধু!

সঞ্জয় বললেন, বন্ধু অলক, তুমি ওই ঘন পাতায় ঢাকা ওই গাছের তলায় বিশ্রাম কর, আমি জলের খোঁজে যাচ্ছি। আমি না আসা পর্য্যন্ত তুমি কোথাও যেয়ো না, বুঝলে?

রাজপুত্র বললেন, কোথা যাব? আমার যে সে শক্তিই নেই—উঃ! বলেই শুয়ে পড়লেন সেই গাছের নীচে।

সঞ্জয় বহু কষ্টে এক সরোবর হতে পানীয় জল সংগ্রহ করে এনে দিলেন রাজপুত্রকে। অলক সে জল পান করে বললেন,—কি চমৎকার! কি মিষ্টি জল। আমি দেখব সেই সরোবর, চল আমাকে নিয়ে সে জায়গায়, সেই সরোবরের কাছে।

সঞ্জয় নানা আপত্তি করলেন, বললেন জায়গাটা ভাল নয়, পথও নোংরা, কাঁটায় ভরা, নেহাৎ কাছেও নয়।

কিন্তু রাজপুত্র অলক একেবারে নাছোড়বান্দা। কাজেই সঞ্জয়কে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হল। ওদিকে হয়েছিল কি, সরোবরের দক্ষিণ দিকে জলের উপর সঞ্জয় দেখেছিল এক অপূর্ব্ব সুন্দরী নারীর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে। রাজপুত্র এই প্রতিবিম্ব দেখে যদি আবার কিছু বলে ফেলেন তবেই যে হবে মুস্কিল। কিন্তু পারলেন না—রাজপুত্র অলককে মানা করতে। রাজকুমার দেখলেন সেই সুন্দরীর প্রতিবিম্ব সরসীর স্বচ্ছ সলিলে।

তখন রাজকুমার অলক বললেন, ভাই সঞ্জয়, আমি এই নারীকে না দেখে যাব না। তুমি যেমন করে পারো, তাকে দেখাও। রাজকুমারের এই মিনতিতে সঞ্জয়ের চিত্ত বিগলিত হল, সে বললে, তবে তুমি আমার

কথা শোন। তুমি এই বড় গাছটির উপর উঠে রেতে নিদ্রা যেও, যে পর্য্যন্ত না আমি ফিরে আসি—ততক্ষণ এখান থেকে কোথাও যাবে না।

অলক বলল, তাই হবে বন্ধু। কোথাও—কোথাও যাব না ভাই, তোমার কথা শুনব।

ক্রমে রাত্রি হ'ল। রাজপুত্র সেই গাছের ডালে নিভৃত স্থানে উঠে বসে রইলেন! সে গাছের পাশেই সেই স্বচ্ছ সলিলের সরোবর। ক্রমে চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার নেমে এল, অরণ্য সরোবর সব ঢেকে ফেলল ঘোর তমসায়। রাত্রি যখন গভীর হ'ল তখন রাজপুত্র দেখলেন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এক বিরাট সাপ বনের ভিতর হতে বেরিয়ে এল হিস্ হিস্ শব্দ করতে করতে, মুখে তার ধক্ ধক্ ক'রে জলছে এক প্রকাণ্ড মণি, সে মণির দ্যুতিতে বন জঙ্গল হয়ে উঠল দীপ্তিমান্। দীর্ঘ সুন্দর তার দেহ, মস্ত বড় ফণা, আর মাথায় তার মণি। সরোবরের পারে গিয়ে সে যেই তার মুখের ভিতর হতে মণিটি বার করে জল স্পর্শ করল, অমনি নিমেষমধ্যে সরোবরের জল গেল শুকিয়ে, আর সরোবরের ভিতরে দেখা গেল—লোহার এক বিরাট্ তোরণ! সেই বৃহৎ অজগর সাপ, সেখানে রাতের শিশির-জল পান করতে লাগল!—আবার যখন ভোর হয়ে এল, তখন সেই অজগর সাপ যেমন সরোবরের শুক্‌নো বুকে মণিটি ছোঁয়ালো, তখন আবার সরোবরের বুক জলে ভরে গেল। টলমল করতে লাগল সেই জল।

দুই

ভোরের বেলায় রাজপুত্র নেমে এলেন গাছের নীচে, তৈরি করলেন একটা লোহার ফাঁদ, তার সঙ্গে বাঁধলেন একটা দড়ি। তারপর যেমন সন্ধ্যা হয়ে এলো, উঠলেন আবার গাছের উপর। দুপুর রাতে আবার এলো সেই দীর্ঘ সুন্দর বিরাট অজগর সাপ, রেখে দিল তার মণি, সরোবরের জল মণি ছুঁইয়ে শুকিয়ে শিশির পান করতে, যাবার সময় মণিটি রেখে গেল গাছতলায়—সেই গাছের নীচে যার উপরে রাজকুমার অলক বসে ছিলেন। সাপটি যখন একটু দূরে গেছে, তখন রাজপুত্র তাঁর লোহার ফাঁদ ফেলে মণিটিকে তুলে নিলেন তাঁর কাছে। মণি গাছের উপর তুলে নেবার পর অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক্। সাপ ছুটে এল গর্জ্জন করতে করতে গাছের দিকে। কোথায় মণি, কোথায় গেল তার মণি,—সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গাছের নীচে মাথা ঘষতে লাগল; ছোবল মারতে লাগল, তারপর-হিস্ হিস্ শব্দ করতে করতে ধীরে ধীরে সে মরে গেল।

আস্তে আস্তে এইবার রাজপুত্র নেমে এলেন মণিটিকে যত্ন করে সঙ্গে নিয়ে। সরোবরে তখন জল নাই, শুষ্ক তার বুক। অতি সন্তর্পণে রাজপুত্র এগিয়ে এলেন সেই লোহার তোরণের কাছে, নির্ভীকভাবে প্রফুল্ল মনে প্রবেশ করলেন তোরণ দিয়ে। আশ্চর্য্য হলেন যখন ভিতরে এসে দেখতে পেলেন মণিমরকতে ঝলমল করছে এক রাজপুরী। প্রথমে যে কক্ষটিতে প্রবেশ করলেন, সেখানে দেখতে পেলেন—রূপার খাটে রূপার ঝালর, রূপার মত সাদা চাদরের নীচে শুয়ে রয়েছেন এক তরুণী। তাঁর রূপে ঝলমল করছে চারিদিক্। তাঁর মাথার কাছে রয়েছে একগাছি রূপার মালা, পায়ের তলায়ও তেমনি রূপার মালা। রাজপুত্র অলক পায়ের তলার রূপার মালা বদলে দিলেন মাথার দিকে আর মাথারটা সরিয়ে দিলেন পায়ের তলায়। জেগে উঠলেন রূপার পরী। জেগে উঠে রাজপুত্রকে দেখে বললেন—'ওগো, তুমি কে? কেন আমার প্রভু নাগরাজকে তুমি মেরে ফেললে, কেন সাহস করে এলে আমাদের পাতালপুরীতে? বল, কেন এমন কাজ করলে?

রাজপুত্র অলক বললেন—তোমার কথা ঠিক, তোমার প্রভু নাগরাজকে আমি মেরে ফেলেছি। যদি তুমি তাকে মারতে, তা হলে আমি তোমাকে দিতাম মুক্তি। উদ্ধার পেতে এই বন্দীদশা থেকে।

—অলক চলে এলেন দ্বিতীয় কক্ষে, দেখলেন সে ঘরে সবই সোনার। সোনার এক সুন্দর খাটে শুয়ে আছে, সোনার পরী। রূপকুমারীর চেয়েও স্বর্ণ পরী আরো বেশী রূপসী। তার কণ্ঠে ছিল স্বর্ণমালিকা, সেই মালাখানি রাজপুত্র যেমনি রেখে দিলেন তার পায়ের তলায়, অমনি জেগে উঠল সেই সোনার পরী,—প্রশ্ন করল রূপকুমারীরই মত, আহা! কেন তুমি নাগরাজকে বধ করলে?

উত্তর দিলেন রাজকুমার আগেরই মত।

তার পরের ঘরে এলেন অলক। এখানে দেখতে পেলেন লাল পরীকে। ঘুমিয়ে রয়েছেন সেই প্রবাল শয্যায়। আলো লাল সব। রূপসী সে আরো বেশী—রূপকুমারী আর সোনার পরীর চেয়েও অনেক অনেক বেশী! তার মালা বদল করা মাত্র সেও চোখ মেলে চাইল এবং বলল সেই একই কথা।

অতি সুন্দর হীরামাণিক্যে মোড়া একপাটি জুতো।

এবার রাজকুমার এলেন চতুর্থ কক্ষে। দেখতে পেলেন মণিমাণিক্যে ঝলমল সেই কক্ষে ঘুমে অচেতন জহর পরী। সে সকলের রাণী। তারই সুন্দর মূর্তি প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছিল সরোবরের বুকে। অলক সেই রূপবতী জহরপরীকে দেখে মনে করলেন, ধরাতলে এমন রূপসী আর নেই। মুগ্ধ রাজপুত্র দংশন করলেন তার কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি, অমনি জেগে উঠল জহরপরী। তার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন বিস্মিত রাজপুত্র অলক। তাঁর চোখে পলক নেই!

জিজ্ঞাসা করল জহরপরী রাজকুমার অলককে—তুমি ত মানুষ! কেমন করে এলে এই পাতাল-পুরীতে? যেখানে নাগরাজার তপ্ত শ্বাসে মানুষ যায় মরে! বল, বল, কেমন করে এ অঘটন ঘটল।—কেমন করে আমায় পেলে তুমি? মধুর কণ্ঠে বলল জহর রাণী অলককে এ কথা।

তখন রাজকুমার একে একে সব কাহিনী বললেন সেই শ্রেষ্ঠা সুন্দরী রাণীকে। আমি পণ করেছিলাম, যদি না বিবাহ করতে পারি ধরণীর শ্রেষ্ঠ সেই রূপসী নারীকে, সরোবরের জলে প্রতিফলিত যার মূর্তি দেখে আমি মোহিত হয়েছিলাম, তবে আমি যাব না এ স্থান ছেড়ে!

সব শুনে জহরপরী বলল, শোন রাজকুমার, আমরা সকলে ঐ নাগরাজার কাছে দাসীর মত বাস করছিলাম, তিনি ছিলেন এই মাণিকের অধিকারী! তুমি আমাদের মুক্ত করেছ। ধন্য তুমি, বীর তুমি, আমি তোমারই কণ্ঠে পরিয়ে দিচ্ছি আমার বরণমালা! হে বন্ধু, তুমিই আমার স্বামী।

তারপর দুজনে বাস করতে লাগলেন সেই নাগরাজার সুন্দর সুসজ্জিত পাতালপুরে—পরম সুখে।

* * * *

এই ভাবে দিন যায় সুখে, আনন্দে ,গানে, নৃত্যে, উৎসবে!

একদিন বসন্তের প্রভাতে যখন গাছে গাছে ফুটেছে ফুল, তরু-পল্লবে পল্লবে, কচি কিশলয়ে বিকশিত হয়েছে শ্যাম শোভা, কত শ্যামা দোয়েল পপিয়া গান গেয়ে গেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, কোকিল মুহু মুহু কুহুকুহু করে গেয়ে গেয়ে উঠছে বকুলবীথিকায়—এমনি বসন্ত দিনের এক সুন্দর অপরাহ্নে—

রূপপরী, স্বর্ণপরী, লালপরী আর জহরপরীদের সঙ্গে মনের আনন্দে অলক বেড়াচ্ছেন সরোবরের তীরে—ঠিক সেই সময়ে শোনা গেল অশ্বের হ্রেষারব, শোনা গেল সৈন্যদের রণকোলাহল, শোনা গেল রণদামামার ঘন ঘন প্রচণ্ড রব। দেখতে পাওয়া গেল, দূরে ধুলো উড়িয়ে বিশাল প্রান্তরের মধ্য দিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে একদল সৈন্য এগিয়ে আসছে। অমনি পড়ে গেল একটা সাড়া,—ঐ আসে, ঐ যে এসে পড়ল বিরাট্ সৈন্যবাহিনী ভীমবিক্রমে! শঙ্কিতা পরীর দল সরোবরের তট হতে ছুটতে লাগল সরোবরের বুকের ভিতরের পাতাল-পুরীর দিকে। দৌড়ে পালাবার সময় জহরপরীর সোনা-রূপার-হীরা-জহরতে মোড়া পায়ের জুতোর এক পাটি পড়ে রইল মাটির উপরে।

তিন

ঘটনাটা হয়েছে কি, অন্য দেশের এক রাজার ছিল এক ছেলে। তিনি ছিলেন কাণা, মানে একটি চোখ তাঁর ছিল না। রাজপুত্র গিয়েছিলেন শিকারে সঙ্গীসাথী নিয়ে, যখন ফিরছিলেন সে সময় তড়াগের পাড়ে এসে দেখতে পেলেন, অতি সুন্দর হীরা-মাণিক্যে মোড়া একপাটি জুতো। সেই কাণা রাজপুত্র ফিরে এলেন রাজধানীতে।

তুমিই যোগ্য মানুষ। ধ'রে আন সেই রূপসীকে।

এসে শুয়ে পড়লেন সোনার খাটে হাতে সেই মণি-মাণিক্যে-মোড়া জুতোর পাটি। রাজপুত্র খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলেন। কোথায়, কে এমন রূপসী নারী আছে যার পায়েরশোভা বাড়িয়েছিল এই জুতোর পাটি!

রাজা দাসদাসীদের কাছে রাজপুত্রের পীড়ার কথা শুনলেন। তাঁর চোখে নেই নিদ্রা, মুখে নেই আহার, কেন এমন হ'ল? কোন খাবার জিনিষ স্পর্শ করেন না। শঙ্কিত রাজা-রাণী। এলেন রাজা পুত্রের কাছে। শুধালেন তাকে। কি হয়েছে তোমার, বল, বল, কোন লাজ ভয় সঙ্কোচ ক'রো না। অনেক সাধ্য-সাধনার পর রাজপুত্র বললেন সব কথা, দেখালেন তাঁর বুক থেকে তুলে সেই জুতোর পাটি। আমি খাব না, জলস্পর্শও করব না, যদি এই পাদুকার অধিকারিণীকে না পাই। তাকে আমি বিয়ে করব। নইলে আমি অনাহারে থেকে করব মৃত্যুবরণ।

রাজা শেষবার ছেলেকে বললেন—তুমি আহার কর, সুস্থ হও, এই পাদুকার অধিকারিণী রূপসীর সঙ্গেই দেব তোমার বিয়ে।

রাজা ডেকে পাঠালেন রাজ্যের যত চতুরা বুদ্ধিমতী কুহকিনী বর্ষীয়সী মহিলাদের। এলো সকলে। রাজা একে একে প্রশ্ন করলেন তাদের, কার কেমন আছে প্রভাব।

প্রথমা রমণীকে রাজা বললেন—দেখ এই বহুমূল্য জুতোর পাটি। এনে দিতে পারবে তাকে, যার পায়ে ছিল এই জুতোর পাটি?

প্রথমা নারী বললে, মহারাজ, আমি আকাশে গভীর গর্ত করতে পারি। রাজা মুখ বাঁকিয়ে বললেন, নানা তোমাকে দিয়ে হবে না। যাও তুমি। সে গেল চলে। এলো দ্বিতীয়া, সে বললে, আমি আকাশ ঢেকে দিতে পারি। না, না, যাও তুমি, আমি চাই না তোমাকে। তুমি কোন কাজের নও। তৃতীয়া নারী এসে বললে, আমি আকাশ ছেঁদা করতে পারব না, আকাশ ঢেকে দিতেও পারব না, কিন্তু ছলে বলে কৌশলে যে ভাবেই পারি সেই রূপসী কন্যাকে নিয়ে আসব।

রাজা বললেন, বেশ কথা, তুমিই যোগ্য মানুষ, তুমি ধরে আন সেই রূপসী পরীকে। তোমাকে আমি দেব মনের মত পুরস্কার। রাজা হলেন খুশী, কাণা রাজকুমারের মুখে ফুটল হাসি।

চার

সেই কুহকিনী নারী এক উড়ন্ত বিছানায় বসে চলে এল সেই শুভ্র সরোবরের উপর বুকে। সেখানে সে বাস করতে লাগল। এভাবে দিন যায়। একদিন সন্ধ্যায় সে দেখতে পেল, সব সুন্দরী পরীরা চলে এসেছে দলে দলে তড়াগের তটে। কুহকিনী নারী তাদের দেখে কাঁদতে আরম্ভ করল। কেন কাঁদে জানবার কৌতূহল হ'ল পরীদের।

জহরপরী তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, কেন কাঁদ মা তুমি? তখন সে বলল, জান না কেন কাঁদি? আমাকে চেন না, এ অতি অদ্ভুত ঠেকছে। আমি ছিলাম তোমাদের পরিবারের মালিনী। কাছে এস ত মা। জহরপরী এলেন কাছে, তখন তার চিবুক ধরে চুমো খেয়ে আদর করতে করতে বলল কুহকিনী, আহা, মা, তুমি দেখতে হয়েছ ঠিক তোমার মায়ের মত! আহা! সে ত আর বেঁচে নেই, তারপর তোমরা ত আর আমার কথা ভাব না। আমি যে না খেয়ে মরি, তাই ত কাঁদি!

জহরপরীর মনে বড় দুঃখ হ'ল। সে বললে—এস দিদিমা, আমার সাথে আমাদের কাছে থাকবে তুমি, তোমার খাওয়া-পরার কোন কিছুর জন্য ভাবতে হবে না।

জহরপরী কুহকিনীর কথা সত্য বলে মেনে নিয়ে তাকে পাতাল-পুরীতে এনে সেবা-যত্ন করতে লাগল।

এই ভাবে দিন যায়। একদিন রাজকুমার অলক খাটে শুয়ে ঘুম যাচ্ছেন। কুহকিনী জিজ্ঞাসা করল এক পরীকে, বল দেখি ভাই, রাজকুমারের প্রাণ কোথায় রয়েছে?

আগে ছিল তারই হৃদয়ে, এখন আছে তা মণির মাঝে, যে মণি ছিল একদিন নাগরাজার!

টুপ করে ফেলে দিল সেই মণি।

এ কথার পর সে গেল জহরপরীর কক্ষে, সেখানে যে ঘরে সে হীরামন পাখাটিকে খাওয়াচ্ছিল। হেসে বলল কুহকিনী, চল না ভাই তোমার হীরামন পাখাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি মাঠ থেকে। ওদিকে করেছে কি? যেমন জহরপরী একটু অন্যমনস্ক হয়েছে সেই মুহূর্তে সে সেই ঘরের লুকোনো জায়গা থেকে বের করে নিল সেই মহার্ঘ মণি।

হীরামন পাখী সঙ্গে করে জহরপরী আর ডাইনী পাতালপুরী থেকে বের হয়ে এলো সরোবরের বুকে। সেখানে ছিল উড়ন্ত শয্যা। কুহকিনী বলল, এস না ভাই এই বিছানায় একটু বসি। জহরপরী প্রথম বললে, না, না, কোন দরকার নেই, চল আমরা বাড়ী ফিরে যাই। কিন্তু শেষটায় ডাইনীর পীড়াপীড়িতে সে যেমন বসল সেই উড়ন্ত বিছানার উপর, অমনি উড়ে চলল জহরকুমারীকে নিয়ে সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে উড়ন্ত বিছানা। সমুদ্রের বুকের উপর উড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই চতুরা ডাইনী বুড়ি টুপ করে ফেলে দিল সেই মণি। এই মণির ভিতরেই রয়েছে রাজপুত্রের জীবন। জহরপরীর সাধের হীরামন পাখী লক্ষ্য করল সেই জায়গাটি।

তারা পৌঁছে গেল কাণা রাজপুত্রের রাজধানীতে। রাজা আনন্দে অধীর, রাজপুত্রের মুখে হাসি! আনন্দ উৎসবে পূর্ণ হ'ল রাজধানী।

রাজপুত্র বললেন বাবা, এইবার আমার সঙ্গে বিয়ে দাও সুন্দরী জহরপরীর। দেরী ক'রো না।

রাজা বললেন, সে ব্যবস্থাই করছি।

বাজল রাজ্যে বিয়ের বাজনা। বাজল সানাই ঢাক-ঢোল! কত কি! শুনলেন সব জহরপরী।

ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি বললেন কাণা রাজকুমারকে—শোন তুমি, সাবধান! এই ডাইনী বুড়ী আমাকে এনেছে ছলনা করে—চুরি করে, এই রাজ্যে আমার স্বামী বেঁচে আছেন। তোমার অপেক্ষা করতে হবে ছয় মাস, যদি তিনি এর মধ্যে এসে পড়েন, তবে আমি তাঁর সঙ্গে চলে যাব। এ কয়মাসের মধ্যে যদি তুমি আমাকে বিয়ে করবার আয়োজন কর তবে আমি অগ্নিতে করব আত্মবিসর্জ্জন। অমনি রাজ্যে থেমে গেল বাদ্য-বাজনা। রাজা চুপ—রাজপুত্রও নীরব নিস্তব্ধ। অপেক্ষা করতে লাগলেন সে শুভদিনের। দিন মাস সময় ত থাকে না, ছয় মাস আর ক'টা দিনই বা।

এদিকে জহরপরী করলেন কি? তিনি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় গরীব-দুঃখীদের বিতরণ করতে লাগলেন ভিক্ষা। টাকাকড়ি, চাল, সব।

পাঁচ

সেই যে উজীরের পুত্র সঞ্জয়,—সরোবরের জলে প্রতিফলিত ধরাতলের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারীর সন্ধানে বেরিয়েছেন তিনি। বন্ধু রাজপুত্র অলকের জন্য তাঁকে খুঁজে বের করা চাই।—বনপথে, প্রান্তরে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল এক দুর্দ্দান্ত মহাবলশালী দানবের, দানবের সঙ্গে তাঁর হ'ল গভীর বন্ধুত্ব। তিনি বললেন দানবকে, কেন তিনি বেরিয়েছেন, চান যে সে রূপসী কন্যাকে বন্ধুর জন্য। দৈত্য বললে, বন্ধু ভয় নেই, আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করে দেব। সে বনে ছিল এক হনুমান, সেও হ'ল সঞ্জয়ের বন্ধু।

এদিকে ছয় মাস কেটে যাচ্ছে, জহরপরী ভিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন, কিন্তু কেউ ত এলো না তাঁকে

দু'জনে হেসে মেতে উঠল, বড় মজা হবে ত !

উদ্ধার করবার জন্য। শেষদিন, রাজপুরীতে বেজে উঠেছে উৎসবের বাঁশী, সেদিনটিই সেই সময়ে এল এক ভিখারী ভিক্ষা নিতে,—সে হ'ল উজীরের পুত্র সঞ্জয়, সঙ্গে ছিল তার আঙ্গরাখার ভিতরে জহরপরীর একখানি সুন্দর ছবি। পরী সে ছবি দেখে বিস্মিত হলেন! এ কে! এ কে! সেই অপরিচিত ভিখারীকে কাছে ডেকে নিয়ে সুধালেন—সব কথা, শুনলেন নীরবে রাজকুমার অলকের কথা,—তার পর কেমন করে এক ডাইনী বুড়ী তাঁকে যাদু করে এখানে নিয়ে এসেছে, বললেন সে কাহিনী করুণকণ্ঠে জহরপরী তাঁর কাছে।

উজীরপুত্র সঞ্জয় বললেন ভয় ক'রো না তুমি, আজ রাত্রিতেই তোমাকে এ পুরী হতে নিয়ে যাব উদ্ধার করে, পুড়িয়ে দেব রাজধানী, রাজার লোকজন, তুমি শুধু তোমার ঘরের ঐ উড়ন্ত শয্যা নিয়ে আসবে, যে বিছানায় করে তোমায় নিয়ে এসেছিল ডাইনী বুড়ী।

দানবের সঙ্গে দেখা করে বললেন সঞ্জয়, দেখ বন্ধু, তুমি রাজ-বাড়ীর তোরণের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে দেবে পাহারা, আর যখন লোকজন সে পথে বের হবে তখন তাদের ধরে ধরে মেরে ফেলবে আর ভীষণ চীৎকার করবে।

দৈত্য বন্ধু বললেন হুঙ্কার করে, হাঁ, হাঁ, সব ঠিক হবে!

হনুমান বন্ধুকে বললেন—হনুমান ভাই।

কিচির মিচির করে সে জবাব দিল—কেঁ কেঁ চিঁ চেঁ ; বল, বল।

সঞ্জয় বলল—শোন বন্ধু, ঠিক রাত দুপুরে, তুমি মুড়ো জেলে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে রাজপুরীতে, প্রাণের ভয়ে লোকেরা যখন হুড়মুড় করে পালাবার জন্য তোরণের কাছে ছুটে আসবে তখন আমার দৈত্যভায়া মানুষগুলিকে ধরে ধরে গিলবে! কি বল?

দু'জনে হেসে মেতে উঠল—বড় মজা হবে ত! সঞ্জয় চুপি চুপি রাতের অন্ধকারে উঠে গেল দ্বিতলে।

তারপর সেই বুড়ী ডাইনী আর জহরপরীকে নিয়ে সঞ্জয় উড়ে চললেন সেই পাতালপুরীর দিকে। সেই যে হীরামন পাখী, দেখেছিল সমুদ্রের যে স্থানে ডাইনী ফেলে দিয়েছিল সেই সঞ্জীবনী মণি! অমনি সে সেখান হতে উড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে, উদ্ধার করে নিয়ে এল হীরামন সেই মণি। তারপর বুড়ী ডাইনীকে সঞ্জয় ফেলে দিল সাগরজলে!

তারা সরোবরের কাছে এসে 'উড়ন্ত শয্যা' রেখে দিল সরোবরের তীরে। তারপর মহা আনন্দে জহরপরীকে নিয়ে এলো সেই তোরণপথে দুইজনে পাতালপুরীতে, সঙ্গে ছিল সেই হীরামন পাখী।

—রাজপুত্র তখনও ঘুমোচ্ছিলেন, যেমন মণিটি তাঁর শিয়রের কাছে রেখে দিলেন তাঁরা অমনি জেগে উঠলেন রাজকুমার, মহা আনন্দে বললেন—আমার চমৎকার সুনিদ্রা হয়েছে কাল রাত্রে ভাই। তারপর যখন বন্ধু সঞ্জয় ও পরীর দিকে পড়ল তাঁর নজর এবং শুনলেন সব কথা জহরপরীর মুখে, তখন তিনি আনন্দে বুকে টেনে নিলেন বন্ধুকে। আনন্দের ঢেউ খেলে গেল রাজপুরীতে।

—এইভাবে কয়েক দিন আনন্দে কেটে গেল। এইবার রাজপুত্র অলক প্রস্তাব করলেন, রাজধানীতে বাবা-মা রাজা-রাণীর কাছে ফিরে যেতে। যাবার আয়োজন চলছে, সঞ্জয় এলেন সরোবর-তটে, সেখানে তিনি দেখতে পেলেন, এক থুড়থুড়ে কাণা বুড়ী কাঁদছে।

সুধালেন সঞ্জয়—ওগো বুড়ী মা, তুমি কাঁদছ কেন?

সে বললে, শোন বাছা আমার কথা, রাজকুমার যে পথ দিয়ে চলবে, সেই পথের পাশের গাছটা ভেঙ্গে পড়বে ডালপালা নিয়ে তার মাথার উপর, অমনি হবে তার মরণ! সাবধান, সে পথ দিয়ে তাকে যেতে দিও না বলে দিচ্ছি! সে গাছের নীচ দিয়ে যেন যায় না সে, যেতে দিও না!

বল কি গো, বল কি!

সত্যি বলছি গো, সত্যি বলছি। উত্তর দেয় বুড়ী।

বুড়ী বলে, আরো শোন, আরো শোন,—রাজকুমার যখন ঘোড়ায় চড়ে এক গভীর বনপথ দিয়ে যাবেন তখন সেই নিবিড় বনের ভিতর হতে একটা বিরাট্ বাঘ বেরিয়ে এসে আক্রমণ করবে তাঁর ঘোড়াটাকে, তারপর রাজপুত্রকে মেরে ফেলবে। ওগো সাবধান! সে পথে শুধু ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেবে। ঘোড়াই শুধু প্রাণ হারাবে। তোমাদের প্রাণ পাবে রক্ষা!

এ কি সত্য?

হাঁ গো, সত্য, বলে বুড়ী।

আরো শোন, রাজকুমার অলক যখন রাজপুরীতে পৌঁছবেন, তখন যেমন রাজবাড়ীর সিংহদরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন, অমনি তাঁর মাথার উপর ভেঙ্গে পড়বে সিংহদরজা। তুমি এক কাজ করবে, তুমি আগে আগে গিয়ে সিংহদরজা ভেঙ্গে ফেলে তৈরি করবে এক ফুলের তোরণ, ফুলে ফুলে সাজিয়ে দেবে সেই প্রবেশ পথ, গড়ে তুলবে মঞ্জু কুঞ্জের মত। এ সবই করতে হবে রাজকুমারের পৌঁছবার আগে।

বিস্মিত, ভীত ও চকিত—সঞ্জয় বললে, আরো কিছু কি বলবার আছে দিদিমা?

—বুড়ী বললে—আছে গো, আছে। মন দিয়ে শোন।

রাজপুত্র তাঁর রাণীকে নিয়ে রাজবাড়ীতে পৌঁছলে—আদর-অভ্যর্থনার পর, রাজা আর সকলে বসবেন খেতে। রাজার পাশে বসে খাবেন রাজপুত্র, প্রথমে যে ফলটি দেবেন খেতে, যেমন রাজপুত্র ফলটি নেবেন হাতে মুখে দেওয়ার জন্য, অমনি সেটি ছিনিয়ে নিয়ো তাঁর হাত থেকে। কেননা সে ফলের ভিতরে আছে মস্ত বড় একটা কাঁটা। সে কাঁটা গলায় ঠেকলে মরে যাবেন রাজকুমার!

অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকেন উজীরের ছেলে।

বুড়ী বলে—শোন ভাই, সে রাত্রিতে ছাতের উপর হতে বের হবে একটা কালসাপ, দংশন করবে রাজকুমার ও তাঁর রাণীকে, সে সময় যদি কেউ সে ঘরে থেকে সাপটাকে কুচি কুচি ক'রে কেটে ফেলে তরোয়াল দিয়ে, তবে রক্ষা পাবে দু'জনারই প্রাণ, এবং দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে দু'জনা। তোমাকে একটা কথা বলি, আমি যা বললাম, তুমি যদি তা প্রকাশ কর কারুর কাছে তবে তুমি হবে পাষাণে পরিণত! তবে যখন রাজকুমার ও তাঁর রাণীর হবে এক ছেলে, সে ছেলেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তোমার গায়ে, তুমি একটি কথাও বলবে না। রাজবাড়ীর পেছন দিকে একটা বড় অশথগাছ আছে, সে গাছের উপর একটা পাখী বাসা বেঁধেছে, যদি তুমি তার পুরীষ এনে ছেলের গায় লেপে দেও তবে ছেলে বেঁচে উঠবে!···

বুড়ী হলো অদৃশ্য।

ছয়

এ সব শুনে উজীরপুত্র সঞ্জয় এলেন রাজপুরীতে, যাত্রার হ'ল আয়োজন, সকলে এক সঙ্গে মিলে মহা আনন্দে করলেন জয়যাত্রা। যাত্রাপথে সেই বুড়ী যেমন যেমন বলেছিল, একে একে ঘটল সব ঘটনা,—গাছ পড়ল ভেঙে, বাঘ নিল ঘোড়াটিকে মুখে ক'রে, নিবিড় বনে, রাজপুরীর তোরণ পড়ল ধসে।

—রাজধানীতে এলে পর রাজা তাঁর প্রিয়পুত্র যুবরাজ অলককে দেখে হলেন মহা খুশী। অলক পিতার পাশে খেতে বসেছেন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সঞ্জয়, কুমার যেমন ফলটি মুখে দেবার জন্ম হাতে তুলে রয়েছেন, অমনি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিলেন ফলটি সঞ্জয়—উজীরের ছেলে।

রেগে উঠলেন রাজপুত্র, বললেন, প্রহরীকে, ধরে নিয়ে এস উজীরের ছেলেকে, এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার হাত থেকে কিনা কেড়ে নেয় ফল।

উজীরের পুত্র বললেন, কেটে দেখ ত ফলটা, দেখ না কি আছে এর ভিতর?

কেটে দেখা গেল, তার মধ্যে রয়েছে এক বিরাট্ কাঁটা। গলায় ঠেকলে আর রক্ষা ছিল না। ক্ষমা চাইলেন যুবরাজ, বললেন, 'বন্ধু, আমায় ক্ষমা কর।'

রাত্রিতে রাজপুত্র রাজকুমারী শুয়ে আছেন। গভীর নিশীথে উজীরের ছেলে এলেন চুপি চুপি সেই ঘরে। অমনি দেখতে পেলেন, এক কালো গোখরো সাপ ছাত থেকে ঝুপ ক'রে পড়ে গেল তাঁদের বিছানার উপর। অমনি সঞ্জয় তীক্ষ্ণ-ধার তরোয়াল দিয়ে সাপটা কেটে ফেললেন, সে সময়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়েছিল জহরপরীর বুকের উপর। জেগে গেলেন জহরপরী, জেগে গেলেন রাজকুমার, রাজকুমার অলক রেগে আগুন হয়ে উঠলেন, তরোয়াল তুলে নিলেন হাতে—এমন সময় বললেন সঞ্জয়, একবার চেয়ে দেখ বন্ধু, তোমার বিছানার নীচে!

অলক দেখলেন ভয়ে বিহ্বল হয়ে—সেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নিহত গোখরো সাপ।

আনন্দে বন্ধুকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, তুমি বাঁচিয়েছ বন্ধু আমার জীবন। ধন্য তুমি।

সঞ্জয় বললেন—বন্ধু, এইবার তুমি সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত হয়েছ, কিন্তু কেমন ক'রে এই যে-সব ঘটনা ঘটবে আমি জানতে পেরেছিলাম, সে বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না।

—অলক বললেন—বন্ধু আমাকে সে কথা না বললে, কোনমতেই তোমাকে যেতে দেব না।

কি আর করবেন—তাঁর নিজের ভাবী বিপদের কথা জেনেও যেমন একে একে সব কাহিনী [illegible]তে আরম্ভ করেছেন সঞ্জয়—সে সময়ে ধীরে ধীরে তাঁর দেহ পরিণত হতে আরম্ভ হয়েছিল পাষাণে, তাঁর বুকের আধা-আধি পর্য্যন্ত পাষাণ হয়ে এসেছে যখন, তখন রাজকুমার বললেন—আর শুনতে চাই না সঞ্জয়। ক্ষান্ত হও বন্ধু!

না, না, সে হয় না, সে ত সম্ভব নয়। তবে যদি তুমি একটা কাজ কর···

উৎকণ্ঠিত হয়ে অলক বললেন—তোমার মত বন্ধুর জন্য এমন কোন কাজ নেই যা আমি না করতে পারি। বল, বল!

—যদি তোমার ওই নবজাত শিশুকে আমার বুকে ছুঁড়ে মেরে ফেলতে পার, তবে—তবে আবার আমি আগেকার মত মানুষ হব।

কথা শুনবামাত্র রাজকুমার শিশুটিকে ছুঁড়ে মারলেন তার বুকের উপর। অমনি মানুষ হয়ে গেলেন উজীর-পুত্র সঞ্জয়—আর স্বাভাবিক হওয়া মাত্র ছুটে গেলেন রাজপুরীর পেছনে, দেখলেন এক অদ্ভুত বিরাট্ বিহঙ্গম বসে আছে গাছের উপর। নিমেষ মধ্যে সঞ্জয় তার পুরীষ সংগ্রহ ক'রে এনে শিশুর গায়ে লেপে দিলেন সেই পুরীষ! বেঁচে উঠল শিশু। দু' হাত বাড়িয়ে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল মধুর হাসি হেসে!

এমন সময় রাজপুরীতে বেজে উঠল উৎসবের বাঁশী, সকলে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন:

'আমার কথা ফুরলো,
নটে গাছটি মুড়োলো।'*

---

* The Indian Antiquary, Vol. XXI, Part CCLXI, June 1892, p. 185

বনের মাঝখানটায় খুব পুরাণো উঁচু একটা বটগাছ। মাটি অবধি ঝুরি নেমেছে তার। সেই গাছের মাথায় থাকে একদল কাক। গাছের মাঝামাঝি, কতগুলো কোকরে থাকে অনেক কাঠবিড়ালি। নীচের ডালে বাসা বেঁধেছে চড়াই পাখীরা। গাছের গোড়ায়, শিকড়ের কাছে, মাটি খুঁড়ে ইঁদুর আর খরগোসরা ঘর বেঁধেছে।

কাকেরা সারাদিন গোলমাল করে। কাঠবিড়ালিরা ঘাসের বীচি, গাছের ফল খুঁটে খায়; বটগাছের ঝুরি বেয়ে ওঠানামা খেলা করে। সকলের ভিতর বেশ ভাবসাব আছে। কেবল, কাকগুলো লোভ সামলাতে পারে না; মাঝে মাঝে ইঁদুরছানাকে একলা পেলে ধরে নিয়ে যায়। তাই ইঁদুররা কাকদের উপর মনে মনে চটা। খরগোসরা ও তাদের ছানারা বড় হলে, তবে গর্ত্তের বাইরে আসে।

এক রাতে খুব ঝড় হ'ল। পুরাণো বটগাছের সবচেয়ে বড় ডালটা হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেল ভেঙে। বড় ডালটা যেখানে ছিল, সেখানে গাছের গায়ে দেখা দিল একটা কোটর।

পরদিন সকালে উঠে, ইঁদুর পাখী খরগোস সকলে বাইরে এসে অবাক্ হয়,—এ কি? ঝড়ে বন বাদাড় ওলট পালট। বড় ডালটাকে মাটিতে প'ড়ে থাকতে দেখে, তার উপর খানিক নেচে নেচে বেড়াল সবাই। শেষটায় দেখতে গেল নতুন কোটরটা। কাক আগে গিয়ে তার ভিতর মাথা গলালো। গলিয়েই সে 'ক'—বলে একটা

একটা ইঁদুরছানা নিয়ে পালাল।

ডাক দিয়ে, উল্‌টে এসে চিৎ হয়ে পড়ল বাইরে। আর কথা নেই মুখে। চড়াই কাঠবিড়ালি এরা ছুটে এল দেখতে কি হয়েছে। একটু সামলে নিয়ে কাক বল্‌ল, "ওর ভিতরে ভূত আছে। কট্‌মটে গোল গোল চোখ, ইয়া বড় চাপদাড়ি!"

আসলে হয়েছে কি, ঝড়ের সময়ে একটা পেঁচা খাবার খুঁজতে বেরিয়ে ছিল। বাতাসের ঠেলায় সে উড়ে এসে পড়ে সেই কোটরের সামনে। মাথা গুঁজবার জায়গা পেয়ে পেঁচা তাতে ঢুকে পড়ে ; কাকের কথা শুনে সকলের মুখ শুকিয়ে চুন হয়ে গেল। —ভারি মুশকিল তো। কি করা যায়? বাসা ছেড়ে পালাবে কি? শেষটায় ঠিক হ'ল আর দুদিন দেখ যাক। জানা পড়বে ভূত না আর কিছু।

প্রথম রাতে 'হুত্‌ হুতুম, হুত্‌ হুতুম' ক'রে অদ্ভুত গম্ভীর আওয়াজ এল কোটরের ভিতর থেকে। বটগাছের বাসিন্দারা এমন আওয়াজ আগে শোনেনি ; তারা ঘাবড়ে গেল। দ্বিতীয় রাতে,পেঁচা একটা ইঁদুরছানা নিয়ে পালালো। 'কে নিল, কে নিল?' ক'রে ইঁদুররা কত খোঁজ করল পরদিন। কোথাও পেল না। কিছু বুঝতে পারল না তারা।

আবার পরের রাতে, পেঁচা গেল কাকের বাসায় ডাকাতি করতে। এ তো ইঁদুরছানা নয় যে চিঁ চিঁ করবে খালি। পেঁচা তাকে ধরতেই কাকের ছানা এমনি চেঁচিয়ে উঠল যে, মা-কাক বাবা-কাক ধড়ফড় ক'রে জেগে গেল। তার পর ডানা ঝট্‌পট্‌ ক'রে তেড়ে এসে, তারা ঠুকরে ঠুকরে পেঁচার চুল দাড়ি গোছা গোছা উপড়ে নিল। পেঁচা মশাই পালিয়ে বাঁচলেন।

সকাল হতে না হতে, কাকেরা গিয়ে জড়ো হয়েছে কোটরের সামনে, বলছে, "বেরিয়ে এস। বেরিয়ে এস, দেখি তোমার কত সাহস। কাকের ছানা নেওয়া বার করছি।" পেঁচা ভয়ে গুটিসুটি হয়ে যতটা পারে কোটরের ভিতরে ঢুকে রয়েছে। তখন বটগাছ ধমকি দিয়ে বলল, "এত গোলমাল কিসের?"

সব শুনে সে বলল পেঁচাকে, "দেখ বাপু, এখানে থাকতে হলে, ভাল মানুষের মত থাকতে হবে। ঝগড়াঝাঁটি হিংসাহিংসী চলবে না। যদি তা না থাকতে পার, তবে আর কোথাও ঘর দেখ। আমার বাড়ীতে এত গোলমাল আমি সইতে পারব না।"

কাকদের ভয়ে পেঁচা বেরোতে পারছে না। বটগাছ এবার কাকদের বলল, "ওকে পথ ছেড়ে দাও, চ'লে যাক। আর যাতে না আসে, সে আমি দেখব।" কাকরা স'রে দাঁড়ালে, পেঁচা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। তবু কাকদের রাগ পড়ল না। এখনও তারা পেঁচা দেখলেই পিছনে লাগে।

স্বর্গ-বিভ্রাট

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

১

মহারাজা ত্রিশঙ্কুকে নিয়ে স্বর্গে-মর্ত্ত্যে হুলস্থুল প'ড়ে গেল। বিশ্বামিত্র মুনি তাঁকে সশরীরে স্বর্গে তুলবেন, দেবতারা কিন্তু তুলতে দেবেন না। ত্রিশঙ্কু একবার উপরের দিকে ওঠেন, আবার নীচে নেমে পড়েন—এই না ক'রে শেষে আকাশের মাঝপথেই থেকে গেলেন।

বিশ্বামিত্র মুনি আকাশের সেই মাঝপথেই এক নতুন স্বর্গ তৈরি করলেন। সেই স্বর্গে ত্রিশঙ্কুর স্থান হ'ল।

নতুন স্বর্গে নতুন দেবতাও'তো চাই। বিশ্বামিত্র নতুন ক'রে ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, পবন, যম—এই সব দেবতাদেরও সৃষ্টি করলেন। তারপর সেই নতুন দেবতাদের উপর নতুন স্বর্গের ভার রেখে নিজে হিমালয়ে তপস্যা করতে চ'লে গেলেন।

২

নতুন স্বর্গে নতুন দেবতারা থাকেন, ত্রিশঙ্কুও আছেন। কিন্তু আর কোনো জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই।

নতুন ইন্দ্র দেবসভায় যান। গিয়ে দেখেন, সেখানে না আছে মুনিঋষিরা, না আছে গন্ধর্ব্বদের গান, না আছে অপ্সরাদের নাচ। সিংহাসনে একলা একলা খানিকক্ষণ ব'সে থেকে নতুন দেবরাজ ইন্দ্রপুরীতে ফিরে যান।

চন্দ্র জ্যোৎস্না ছড়াবেন কোথায়? তাঁকে তাই বারো মাসই অমাবস্যার অন্ধকারে থাকতে হয়।

যাগযজ্ঞির ঘি না পেয়ে অগ্নি দিন দিন মুষড়ে পড়তে লাগলেন।

পবন হুহু ক'রে ছুটে আসেন। কিন্তু কোথাও গাছপালা দেখতে না পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে যান।

যমরাজ চিত্রগুপ্তের দপ্তরখানায় গিয়ে রোজই জিজ্ঞেস করেন—'মুন্সীজী, আজ কারু স্বর্গে আসার পালা আছে নাকি?' চিত্রগুপ্ত খাতাপত্তর ঘেঁটে জবাব দেন—'আজ্ঞে, না।' শুনে যমরাজের মুখখানি কাঁচুমাচু হয়ে যায়।

৩

এই ভাবে দিন কাটে। দেবতারা নতুন স্বর্গে ব'সে থেকে থেকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন—জনপ্রাণী না এলে এ-স্বর্গ চলবে কি ক'রে! ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, পবন, যম সবাই মিলে তখন দেবগুরু নতুন বৃহস্পতির নিকটে উপদেশ নিতে গেলেন।

বৃহস্পতি বললেন—'মুশকিলেরই কথা বটে! লোকজন ছাড়া এ-স্বর্গ দিয়ে হবেই বা কি!'

ভেবেচিন্তে শেষে তিনি বললেন—'আচ্ছা, চলুন দেখি পৃথিবীতে। সেখানে গিয়ে দেখা যাক পটিয়ে-পাটিয়ে কাউকে কাউকে সশরীরে স্বর্গে আনা যায় কিনা।'

বৃহস্পতি খুশী হয়ে বললেন বেশ বেশ, এই ত মরদকা বাত।

বৃহস্পতি বললেন—'তা হলে তো কাজই হয়। কিন্তু তা করবে কে?' তিনি একে একে ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, পবনকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—কে পারে এ কাজ করতে?

ইন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন—'আমার সাধ্যি নয়।'

চন্দ্রও জবাব দিলেন—'আমারও নয়।'

অগ্নি আর পবনের কাছ থেকেও উত্তর পাওয়া গেল—'বাব্বাঃ! অসম্ভব তা।'

তাঁদের কথা শুনে বৃহস্পতি বললেন—'তা হলে আমাদের স্বর্গকে উপরে ঠেলে তোলার কথা ছেড়েই দিতে হয়। এখন আর-একটা উপায় আছে—পুরানো স্বর্গকেই নীচে টেনে আমাদের স্বর্গের পাশে আনা। কিন্তু'—

'কিন্তু' ব'লে থেমে গিয়ে বৃহস্পতি কি ভাবতে লাগলেন। ভেবেচিন্তে বললেন—'সে কাজই বা হয় কি ক'রে?'

দেবতারা সবাই মিলে যুক্তি করতে লাগলেন—কি ক'রে তা হতে পারে।

তাঁরা এটা-সেটা ব'লে নানান রকম যুক্তি-পরামর্শ করছেন, এমন সময়—যে-গাছতলায় তাঁরা ব'সে ছিলেন,—সেই গাছের মাথায় ঝুপ্ ঝাপ্ হুপ্ হুপ্ শব্দ শোনা গেল। তাই শুনে বৃহস্পতি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন—গাছের ডালে ইয়া-ইয়া প্রকাণ্ড ল্যাজওয়ালা একদল হনুমান। সেই হনুমানদের দেখেই বৃহস্পতির মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি উরুতে দুই থাপ্পড় মেরে ব'লে উঠলেন—'বাস্, ঠিক হয়েছে। আমরা যা ভাবছি সেই কাজই হবে ঐ বাঁদরদের দিয়ে। ডাকা যাক্ দেখি ওদের এখানে।'

বৃহস্পতি ইশারা ক'রে হনুমানদের নীচে নেমে আসতে বললেন। হনুমানের দলও অমনি ঝুপ্ ঝাপ্ ক'রে লাফিয়ে গাছের তলায় নেমে এলো।

বৃহস্পতি হনুমানদের বললেন—'বাপুরা, তোমরা তো বীরের জাত। একবার সাগর ডিঙ্গিয়ে, পাহাড় মাথায় ক'রে তোমাদের জাতভাই অনেক বীরত্বই দেখিয়েছে। এখন পারবে তোমরা সেইরকম বীরত্ব দেখিয়ে দেবতাদের একটা কাজ ক'রে দিতে?'

হুপ হুপ ক'রে হনুমানরা যে জবাব দিল তার মানে—'কেন পারব না?'

বৃহস্পতি খুশী হয়ে বললেন—'বেশ বেশ, এই তো মরদকা বাত। তোমাদের কি করতে হবে তা-ও তবে ব'লে দিচ্ছি।—এই একটু লাফানো-ঝাঁপানোর ব্যাপার আর কি! আছে তো সে-অভ্যাস তোমাদের? তোমাদের বাপদাদারা একবার কেলাফের কসরত দেখিয়েছিল, পারবে কি তোমরাও সেই রকম লাফ দিয়ে আকাশ ডিঙোতে?'

হুপ্ হুপ্ শব্দে বানরদের জবাব মিলল—'আলবৎ।'

হনুমানদের কথায় ভরসা পেয়ে বৃহস্পতি দেবতাদের বললেন—'এদের দিয়েই কাজ হবে। এখন যাওয়া যাক এদের নিয়েই স্বর্গে।'

বৃহস্পতির কথামত তখন এক-একজন দেবতা তিন-চারটি হনুমানকে কাঁধে নিয়ে চললেন।

নতুন স্বর্গে গিয়ে বৃহস্পতি হনুমানদের পালের গোদাকে বললেন—'দাও তো, বাপু, এবার তোমার গুণের পরীক্ষা। তোমার ভীমের বংশে জন্ম। আগেই তোমার ল্যাজটাকে বাড়িয়ে নাও দেখি একশো গুণ। তারপর,

যেমন ক'রে এক লাফে তোমার বাপ-দাদারা সাগর ডিঙিয়েছিল, তুমিও সেই ভাবে একটি লাফ মারো দেখি, আর সেই লাফে আকাশ ডিঙিয়ে যাও মাথার উপরে ঐ যে দেখা যায় ধু ধু করা স্বর্গটা, তার উপরে। সেখানে গিয়ে দেখবে আদ্যিকালের প্রকাণ্ড একটা বটগাছ, আর সেই বটগাছের তলায় ঘর্ ঘর্ ক'রে চরকা কাটছে চাঁদের বুড়ী। সেই বটগাছের গুঁড়িতে তোমার ল্যাজটা ক'ষে বেঁধে আবার এক লাফে তোমাকে ফিরে আসতে হবে।'—এই-ন ব'লে বৃহস্পতি গোদা হনুমানকে পুরানো স্বর্গ আর আদ্যি-কালের সেই প্রকাণ্ড বটগাছটা দেখিয়ে দিলেন।

গোদা হনুমান একলাফে পুরানো স্বর্গে গিয়ে পৌঁছল। তারপর আদ্যিকালের সেই প্রকাণ্ড বটগাছটার গুঁড়িতে নিজের ল্যাজটা বেঁধে আর-এক লাফে নতুন স্বর্গে ফিরে এলো।

পুরানো স্বর্গকে টেনে নীচে নামাতে হবে, গোদা হনুমানের ল্যাজটা সেজন্যেই আদ্যিকালের প্রকাণ্ড বটগাছটার গুঁড়িতে বাঁধা ছিল। সে ফিরে আসতেই নতুন স্বর্গের দেবতারা বানরদের সঙ্গে মিলে তার চার ঠ্যাং ধ'রে 'হেঁইয়ো হেঁইয়ো' ব'লে টানাটানি সুরু করলেন।

হেঁইয়া হেঁইয়া ব'লে টানাটানি সুরু করলেন।

একদিন যায়, দুদিন যায়, দেবতারা বানরদের সঙ্গে মিলে গোদা হনুমানের চার ঠ্যাং ধ'রে টানছেন তো টানছেনই, কিন্তু তাতে পুরানো স্বর্গকে নাড়ায় কার সাধ্যি? তিন দিনের দিন 'হেঁইয়ো হেঁইয়ো' ব'লে যাই-না তাঁরা হনুমানের ঠ্যাং ধ'রে টান দিয়েছেন, অমনি আদ্যিকালের সেই বটগাছটা উপড়ে গিয়ে হুড়মুড় ক'রে পড়ল এসে একেবারে নতুন স্বর্গের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকাণ্ড গাছের চাপে নতুন স্বর্গটা মেটে-হাঁড়িটির মত ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তখন দেবতারা আর হনুমানেরা হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন একদল আর একদলের গায়ের উপর। তারপর কে কোথায় ছিটকে পড়লেন, কে তার খোঁজ রাখে?

হুড়মুড় শব্দ শুনে পুরানো স্বর্গের দেবতারা উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন—ব্যাপার কি। তাঁরা দেখে অবাক্ হলেন। আকাশের মাঝপথে যে-স্বর্গটা ঝুলছিল, ভাঙা খোলার মত তা এদিক্-সেদিক্ ছড়িয়ে পড়েছে, আর সেই ভাঙা খোলা ধ'রে কি-সব জানোয়ার বাদুড়ের মত ঝুলে রয়েছে। তাদের মুখের শব্দও শোনা যাচ্ছিল, কিচির-মিচির।

আকাশ-প্রদীপ

(পল্লী-চিত্র)

—শ্রীগিরিবালা দেবী—

শরতের উৎসবে মণ্ডিত সোনার রৌদ্রমাখা দিনগুলিকে বিনু যেন দুই হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে চায়। মিলনের মধুর বাঁশরী-ঝঙ্কার ও ফুল ফোটার সমারোহের ভিতরে এক অবোধ বালিকার অস্ফুট হৃদয় অহরহ প্রতীক্ষা করে হেমন্ত লক্ষ্মীর মৃদুমন্দ পদধ্বনির।

ঠাকুমার গলা জড়াইয়া বিনু প্রশ্ন করে, "আর ক'দিন পরে আকাশ-প্রদীপ জ্বলবে ঠাকুমা?"

ঠাকুমা সস্নেহে উত্তর দেন, "আশ্বিন মাস তো চ'লেই গেল, দুইদিন পরেই আকাশ-প্রদীপ। আকাশ-প্রদীপ দেখতে তুই এত ভালবাসিস বিনু?"

বিনু ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথা দোলায়। "হ্যাঁ, আমার খুব ভাল লাগে ঠাকুমা, কত উঁচুতে মিটু মিটু ক'রে প্রদীপ জ্বলে। আকাশের পথ আলো হয়ে যায়। সেই আলোর পথ চিনে আসে তারা, যারা স্বর্গে চ'লে যায়।"

ঠাকুমার চোখ জলে ভরিয়া যায়। বেশী দিনের কাহিনী নয়, মাত্র দুই বছর। গত বছর আকাশ-প্রদীপের পরে এ বছর আকাশ-প্রদীপ আসিলেই দুই বছর পূর্ণ হইবে। বিনুর বছর দুই-এর বড় ছিল মিনু, এক বৃন্তে আধফোটা দুটি ফুলের মতন। কিন্তু পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইবার অবকাশ হইল না। কালের প্রবল ঝটিকায় মিনু অকালে ঝরিয়া গেল।

সাথীহারা অবোধ বালিকা সরল বিশ্বাসে কেবলই খুঁজিয়া বেড়ায় তার হারানো দিদিকে। সে অন্বেষণ ইহলোকে নয়, পরলোকে সুনীল গগনপটে, উজ্জ্বল নক্ষত্রের মধ্যে।

শোকাচ্ছন্না বালিকাকে শোকবিধুরা জননী একদা সান্ত্বনাচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, মানুষ মরিলে অন্য কোথাও যায় না, আকাশে তারা হইয়া সারারাত্রি স্বজনদের দিকে চাহিয়া থাকে।

সরলা বিনু মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "একদিনও কি তারা পৃথিবীতে নামে না?"

"নামে বৈকি, রূপালী জ্যোৎস্না রাতে অনেক অনেক ফোটা ফুলের সুগন্ধে পুণ্য তিথিতে তারা আসে, আবার যায়। শুধু একটি মাস নিত্যি আসা-যাওয়া করে। সে আকাশ-প্রদীপের সময়। সন্ধ্যায় আকাশ-প্রদীপ জ্বালানো মাত্র তারা নেমে এসে ফুল তোলে, মালা গাঁথে, খেলা করে। নীলাকাশে ভোরের আলো দেখা দিতে না দিতে ফের পালিয়ে যায়, তারা হয়ে আকাশে।" মার মুখে শোনা এতবড় সত্যভাষণে বিনু অবিশ্বাস করে না, তাই অপার আগ্রহ লইয়া অসীম আশায় স্নিগ্ধ শীতল হেমন্তের প্রতীক্ষায় থাকে।

ম্লান গোধূলি বেলায় ঠাকুমার কোল ঘেঁষিয়া বিনু শিখিয়া লইয়াছে তারকার নাম, কে আগে উদয় হইয়া অপরকে ডাকিয়া আনে, সভা সৌষ্ঠব করিয়া হাসে। সাঁঝ তারার পরেই কৃত্তিকা, রোহিণী, মঘা। একটির পরে একটি আকাশের রঙ্গমঞ্চে ফুলঝুরি ফুটায়।

তাদের বাড়ীর সামনেই গ্রামের ছোট নদীটি, কুলুকুলু গানে তটভূমি মুখর করিয়া বহিয়া যায়। দিদি তারা হইয়া মুখ দেখে নদীর স্বচ্ছ জলে। স্রোতে এত ফুল ভাসাইয়া দেয় কে? এ কীর্ত্তি তারই। সে যে বড় দুরন্ত, দুষ্টু মেয়ে। ভাঙা-চোরা ছেঁড়া—যত অকাজ করিয়া বেড়াইত।

সে অভ্যাস এখনও যায় নাই, তাই নদীর জলে গাছের ডাল ভাঙিয়া, ফুল ছিঁড়িয়া ভাসাইয়া দেয়। কতদিন প্রভাত-সূচনায় বিনু আধো ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে ঘনতরুপল্লবে লুক্কায়িত পাখীর প্রভাতী কূজনে দিদির মিষ্টি মধুর হাসির শব্দ শুনিয়াছে। হ্যাঁ, উনি বড় চালাক, লুকাইয়া ডালে ডালে বেড়ান! এবার হইতে বিনুও বিচরণ করিবে পাতায় পাতায়। মিনুর বোন বিনু নিরেট বোকা নয়।

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির প্রভাত হইতেই আকাশ-প্রদীপের আয়োজন সুরু হইল। ঢালু নদীর পাড়ে বিনুর ঠাকুর্দ্দা একটি পঞ্চবটী বন রচনা করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চবটী এখন বিশাল তরুশ্রেণীতে পরিণত হইয়া চারিদিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। পঞ্চবটীর অনতিদূরে চণ্ডীমণ্ডপ, তুলসীকুঞ্জ, পুষ্পোদ্যান। স্থানটি যেমন শান্তিপূর্ণ তেমনি মনোরম। কতকাল হইতে দুই শালগাছের খুঁটি পোঁতা অবস্থায় রহিয়াছে। খুঁটির মাঝখানে প্রতিবছরেই একটি আকাশস্পর্শী বৃহৎ নূতন বাঁশের মাথায় কপিকল লাগাইয়া আকাশ-প্রদীপ ঝোলানো হয়। কার্ত্তিক সংক্রান্তির পরদিন বাঁশ খুলিয়া আকাশ-প্রদীপের কাঁচ বসানো নূতন লণ্ঠন ও নূতন টিনের কুপী পুরোহিতকে দান করিবার নিয়ম। ঈশ্বর বা পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে যাহা উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা গৃহে রাখিতে নাই।

শালের খুঁটি দুটি আকাশ-প্রদীপের পরে তেমনি দণ্ডায়মান হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। কাক, চিল উড়িয়া আসিয়া তাহার মাথায় আশ্রয় লয়। আর নদীর জলে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শিকারী মাছরাঙা পাখীরা ধ্যানে বসিয়া থাকে। কখনো কখনো বনলতা বেষ্টন করিয়া ধরে কঠিন শালের খুঁটিকে। শ্যামল চিক্কণ পত্রে আচ্ছাদন করিয়া থোকা থোকা পুষ্পসম্ভারে সুসজ্জিত করিয়া দেয়। পাশের শেফালী গাছের একটি ডাল খুঁটির গায়ে হেলিয়া পড়িয়াছে। শরৎ সমাগমে পুষ্পবর্ষণ আরম্ভ হয়। গোটা কার্ত্তিক মাস সে বরিষণের বিরাম হয় না।

গৃহে আজ আকাশ-প্রদীপের অনুষ্ঠান হইতেছে, পুরোহিত আসিয়াছেন। ঠাকুমার প্রীতিপ্রসন্ন মুখখানি আষাঢ়ের পুঞ্জীভূত মেঘের মত থম থম করিতেছে। মা'র স্নেহভরা আঁখিদুটি অশ্রুভারে ছলছল।

বিনুর ওই দিকে তেমন মনোযোগ নাই। সে মহাব্যস্ত। আকাশ-প্রদীপ জ্বালিবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-গাঙের জ্যোৎস্না-তরী বাহিয়া দিদি ভূমিতে অবতীর্ণ হইবে। এই দিনেই সে ধরণীর বক্ষ হইতে চিরবিদায় লইয়া-ছিল। তাহাকে স্মরণ করিয়াই বুঝি বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে।

ওরা এত করিতেছে আর সে কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? বিনু ধীর পায়ে পাড়ায় বাহির হইল। পল্লীগ্রামে চালে চালে বসতি। বিনুর সখীর সংখ্যা কম নাই, কম না থাকিলেও তার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সখী টুনু। টুনু যে দিদিরও খেলার সাথী, সেই জন্য বিনু তাকে এত ভালবাসে, মনের যত গোপন বার্ত্তা উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেয়। টুনুদের অঙ্গনে উপনীত হইয়া বিনু ডাকিল, "টুনু, ও টুনু!" টুনু বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এক্ষুণি চান করতে যাবি নাকি? নীলা, তুনি, বাতাসীকে ডেকে এনেছিস?" পাড়ার বালিকারা প্রত্যহ দল বাঁধিয়া নদীর ঘাটে স্নান করিতে যায়। টুনু ভাবিয়াছিল স্নানে যাইবার এ আহ্বান।

বিনু চকিতে চারিদিকে তাকাইয়া চুপে চুপে বলিল, "না, চানের বেলা তো হয় নি টুনু, আমি এসেছি তোকে নিয়ে পদ্মদীঘিতে যাব ব'লে।"

"পদ্মদীঘিতে কেন রে? পদ্মফুল দিয়ে কি করবি?"

"কি করব তা কি জানিস নে, টুনু? আজ না আকাশ-প্রদীপের দিন? দিদি যে পদ্ম বড় ভালবাসত মনে নেই?" বিনুর গলার স্বর বুজিয়া আসিল। আয়ত আঁখিপল্লব বাহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল গণ্ডে ঝরিয়া পড়িল।

টুনুরও মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সেও একবার সভয়ে চারিদিকে তাকাইয়া অনুচ্চস্বরে উত্তর দিল,

পদ্ম নিতে এসে মেয়েরা ফিরে যায়, বটকৃষ্ণ ফেরে না।

"আমরা কি দীঘির মাঝখান থেকে ফুল আনতে পারব, বিনু? কিনারার যত ফুল দুর্গাপূজোর সময় সবাই তুলে নিয়েছে। একটা চাকরকে সাথে আনলেই পারতিস। সেই সাঁতার-জল থেকে তুলে দিত।"

"তা হলেই যে মা ঠাকুমা জেনে ফেলতেন টুনু। দিদিকে দেব জানলে ওঁরা কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন। ওঁদের কান্নার ভয়ে আমি কখনো দিদির নাম করি না পর্য্যন্ত। ওঁরা যেমন চাল কলা কি যেন সব তাকে নিবেদন ক'রে দিচ্ছেন; আমরাও চুপে চুপে দেব তার ভালবাসার ফল ফুল।"

টুনু ক্ষণকাল ভাবিয়া সায় দিয়া গেল, "হাঁ, আমাদেরও দিতে হবে বৈকি? তা একটা কাজ করি না কেন? বুটুদা ওই যে পেয়ারা গাছের ডালে ব'সে পেয়ারা চিবুচ্ছে, ওকেই ডেকে নিয়ে যাই চল্।"

আশার আশ্বাসে দুই সখী পেয়ারা গাছের তলায় চলিল। টুনুর বীরপ্রবর বুটুদা, বা বটকৃষ্ণ, মাত্র তের বছর বয়সেই ডানপিটে নামে গ্রামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বীরোচিত কর্ম্মসাধনে কেহ কোনদিন তাকে বিরত হইতে দেখে নাই। বিনু ছিল বুটুরই সমবয়সী অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার উদ্দেশে কয়েকটা পদ্মফুল সংগ্রহের প্রস্তাবে বুটুর উৎসাহের সীমা রহিল না।

পদ্মবিল গ্রামের শেষপ্রান্তে। টুনুদের বাড়ী হইতে আধ মাইলের কম রাস্তা নহে। মাঝখানে সঙ্কীর্ণ গলি পথ। দুই দিকে ঘন বাঁশের ঝাড় ও আগাছার জঙ্গল। অরণ্যের প্রান্তে হরিৎ শস্যক্ষেত্র. স্বর্ণকান্তি পাকা ধান কাটিবার সময় হইয়াছে। হেমন্তের সুশীতল বাতাসে ধান গাছ নাচিতেছে হেলিয়া দুলিয়া। পাকা ধানের ঝম্ ঝম্ নূপুরধ্বনিতে বনপ্রান্তর মুখরিত হইতেছে, ক্ষেতের আল-পথ ঢাকিয়া সতেজ কলমীলতা ফুলে ফুলে ফুলময় করিয়া রাখিয়াছে। ঘুঘুর কণ্ঠ বিরাম-বিহীন, কোকিলের পঞ্চম স্বর দিকে দিকে সুধা বিকিরণ করিতেছে।

টুনুর অনুমান মিথ্যা নয়। সত্যই কাজলা দীঘির তীরের কাছে একটা পদ্মফুলের চিহ্নও নাই। পদ্মপাতা পদ্মকলি সমস্তই লোকে নির্দ্দয়ভাবে লইয়া গিয়াছে, দুর্গাপূজার জন্য। জলজ ঘাস ও শেওলায় তটভূমির সমাচ্ছন্ন। দীঘির মাঝখানে কতকগুলি শ্বেতপদ্ম পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাথা তুলিয়া হাসিতেছে, গুন গুন রবে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি একবার ছুটিয়া যাইতেছে আবার ফিরিয়া আসিতেছে। পাড়ের প্রাচীন তেঁতুলগাছের কাণ্ডে তারা চাক বাঁধিয়াছে।"

বিনু ও টুনু দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল, গাব গাছের ছায়ায় তাহারা বসিয়া পড়িল।

পাড়ার গাছি ছিদাম আসিয়াছিল খর্বাকৃতি খেজুর গাছ পরিষ্কার করিয়া কাটির হাঁড়ি ঝুলাইতে। জীয়েন কাটা খেজুর-রস ও পাটালি গুড়ের সময় আগতপ্রায়।.

ছিদাম গাছি কয়েক পা অগ্রসর হইয়া সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "দা ঠাকুর, দিঠাকুরুনরা কিসের লেগে আইছো তরা দুপুরে? পদ্মফুল নেবা? ফুল কি রাখি দিচে কোন ব্যাটা? মুড়িয়ে চুড়িয়ে শ্যাব করে দিচে।"

বুটু বিজ্ঞের মত গম্ভীর হইয়া বলিল, "কিনারায় ফুল না থাকলেও বিলের মাঝখানে ঢের আছে।

"তা আছেক বটে, কিন্তক আনতি যাবে কে? একে অথই জল, তাতে গোক্ষুর সাপের আস্তানা।" বলিতে বলিতে ছিদাম ব্যাগার খাটার ভয়ে চট করিয়া সরিয়া গেল। বিনু সকরুণ স্বরে বলিল, "বুটুদা, চল ফিরে যাই, পদ্মের দরকার নেই। আলের ওপর থেকে এক কোঁচড় কলমী ফুল তুলে নিইগে। মালা গাঁথার জন্তে আমি একডালা শিউলি কুড়িয়ে রেখেছি। কলমী মালা আর শিউলি মালাতেই দিদি খুশী হবে।"

টুনু ঘাড় নাড়িল, "আমাদের গাছে কত গন্ধরাজ ফুটে রয়েছে। পদ্মের চেয়ে গন্ধরাজ মন্দ নয়, আমি গন্ধরাজের মালা গেঁথে দেব। কি হবে আর পদ্ম দিয়ে? বিলের মধ্যেখানে যাওয়া তো মুখের কথা নয়?" বুটু সহসা উত্তেজিত হইয়া ভেংচি কাটিল, "মুখের কথা নয়, ভীরু কোথাকার! পদ্ম নিতে এসে মেয়েরা ফিরে যায়, বটকৃষ্ণ ফেরে না। একজনা দেবেন কলমী মালা, আর একজনা গন্ধরাজের। মিনুকে আমি যেন ভালবাসি না, সে যেন আমাদের বন্ধু ছিল না।" বলিয়া বুটু পরিধানের ধুতিখানা আঁটিয়া পরিল। গায়ে-জড়ানো লাল গামছা থলির আকারে কোমরে জড়াইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

তরুতলায় বসিয়া দুই সখী সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল বুটুর সলিল-ক্রীড়ার দিকে।

ঘণ্টাখানেক পরে বুটু তীরে আসিলে দেখা গেল তার গামছার থলি ভরিয়া গিয়াছে পদ্মচাকা, পাতা ও ফুলে। বিনু পুলকিত স্বরে বলিল, "এত পদ্মচাকা এনেছ বুটুদা, এগুলি রেখে দিলে অনেকদিন চলবে।" বুটু গামছার থলি ঘাসের উপর নামাইয়া পা ছড়াইয়া বসিল। কয়েকটা পদ্মের চাকা বাহির করিয়া বলিল, "নে তোরা, দুটো দুটো ক'রে ভাগ ক'রে নে, আমাকেও দে, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। গিন্নীপনা ক'রে তোদের আর বাসি পদ্ম রাখতে হবে না। মাত্তর একটা মাস তো আমি নিত্যি মিনুকে তাজা পদ্ম দিতে পারব। আর ব'সে থাকে না, দানা খেতে খেতে চল্। বাড়ীতে বকুনির কথা ভুলে গেছিস নাকি?"

বিনু কাজের মেয়ে। পথ চলিতে চলিতে আনমনা হইয়া বলিতে লাগিল, "দিদি পদ্মের দানা খেতে যেমন ভালবাসত তেমনি কাশের"—

তার কথা শেষ না হইতেই টুনু বলিয়া উঠিল, "আর ডাঁশা পেয়ারা। সকালবেলা বুটুদা গাছে চ'ড়ে ডাঁশা পেয়ারাগুলো সাবাড় ক'রে দিয়েছে, গাছে আর যদি না থাকে?"

পদ্মের দানা চিবাইতে চিবাইতে বুটু ফের ভগিনীকে ভেংচি কাটিল, "আর যদি না থাকে? এক গাছে না থাকলে অন্য গাছে থাকবে। আমি কি গাঁয়ের সব গাছ উজাড় ক'রে পেয়ারা খেয়েছি? নে, এখন পা চালিয়ে চল্, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। নদীর ধারে গিয়ে আগে কাশের আখ খেয়ে চান ক'রে বাড়ী যাব। তাহলে কেউ টের পাবে না আমরা কোথায় গিয়েছিলাম।" "আমাদের সাথে যে গামছা নেই বুটুদা, তেল না মেখে চান করব কি?" বুটু মুরুব্বি চালে প্রচণ্ড ধমক দিল, "গামছা নেই তাতে কি হয়েছে? আঁচল রয়েছে তো? তোরা ভারী নবাব, একদিন তেল না মাখলে হয় কি?" ইহার পর আর কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

আকাশ-প্রদীপের তোড়জোড় করিতেই হেমন্তের স্বল্পায়ু বেলার অবসান হইল। স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে অস্তগামী সূর্য্যের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত হইয়া ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল।

প্রকাণ্ড এক টিনের কুপীতে সরিষার তেল ভরিয়া নূতন কাপড়ের পলতে পাকাইয়া রাখা হইয়াছিল। আকাশ-প্রদীপের গোড়ায় খুঁটির চারিপাশ গোবর-জলে নিকানো হইয়া তক্ তক্ করিতেছিল। সন্ধ্যা সমাগমে শঙ্খ বাজিল, উলুধ্বনি হইল। পুরোহিত ফুল ছিটাইয়া মন্ত্র পাঠ করিলেন "দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলায়াসহ। প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি ন মোহনন্তায় বেধসে।"

কপিকলের সাহায্যে প্রদীপ ঊর্দ্ধলোকে, আকাশলোকে আলো বিতরণ করিতে ধাবিত হইল।

আলোর পর্ব্ব চুকিয়া গেলে সকলে যে যার কাজে ফিরিয়া আসিলেন। শুধু ফিরিল না তিনটি প্রাণী। বুটু,

শিশিরসিক্ত মৃত্তিকায় সুস্পষ্ট দুইটি সুকোমল পদচিহ্ন।

টুনু ও বিনু। ঝোপের ধারে বসিয়া আকাশ-প্রদীপের প্রতি স্থির দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া রাখিল। মিনু প্রদীপের নিশানায় আকাশ-নদীর জ্যোৎস্নাতরী বাহিয়া কখন নামিয়া আসিবে?

বড়রা সরিয়া গেলে তারা তাদের কাজ সম্পূর্ণ করিয়া রাখিতে ভুলিয়া যায় নাই। নিকানো জায়গায় একটি পদ্মপাতা বিছাইয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। রসে পরিপক্ক এক আঁটি কাশফুলের ডাঁটা, দুটি অর্দ্ধপক্ক পেয়ারা, পদ্মচাকা, কয়েকটা সাদাপদ্ম, দুইগাছা ফুলের মালা, একটা গন্ধরাজের আর একটা শেফালীর।

ক্রমে সন্ধ্যার ঘোর কাটিয়া ম্লান জ্যোৎস্নায় চরাচর ভরিয়া গেল। ঝোপে-ঝাড়ে ঝিল্লী তান ধরিল। হাটুরিয়া নৌকাগুলি নদীর বক্ষ আন্দোলিত করিয়া বৈঠার খটর খটর শব্দে ফিরিয়া চলিল স্বস্থানে।

জেলেপাড়া হইতে অকস্মাৎ বাজিয়া উঠিল গোপীযন্ত্রের সহিত ঝম ঝম করিয়া করতাল। সেখানে মনসা মঙ্গলের আসর বসিয়াছে। ভাঙ্গা বেসুরো গলায় মনসা দেবীর প্রশস্তি চলিতে লাগিল, "সোনার খাটে গা মা'র রূপোর খাটে পা, তাতে শ্বেত চামরের বা"।

সংসারের জ্ঞানশূন্য তিনটি অবোধ বালক-বালিকা আকাশ-প্রদীপের পানে অনিমেষে তেমনি চাহিয়া রহিল—শুভ্রবেশা শুভ্রমাল্যধারিণী জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তিতে কেহ তো নামিয়া আসে না? তবে কি বৃথাই তাদের পুষ্প চয়ন, মাল্য রচনা, প্রিয়বস্তু সংগ্রহ?

মা আলো হাতে কি কাজে যেন মণ্ডপ-ঘরে আসিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় আবছা অন্ধকারে তিনমূর্ত্তিকে আকাশ-প্রদীপের নীচে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চমকিত হইলেন। ওখানে বসিয়া ওরা কি করিতেছে? পদ্মপাতায় কি উপকরণ সাজাইয়া রাখিয়াছে? মা হাতের আলো পঞ্চবটী বনের দিকে তুলিয়া মমতায় বিগলিত হইয়া বলিলেন, "বুটু, টুনু, বিনু, তোরা চ'লে আয়। রাত ক'রে জঙ্গলে ব'সে থাকিস নে। তোদের জন্য পুজোর প্রসাদ রেখেছি, খাবি চল্।"

ওরা কথা বলিল না, নীরবে মায়ের অনুসরণ করিল। পরদিন দিবসারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে তিনটি বালক-বালিকা সমবেত হইল পঞ্চবটী বনে। আকাশ-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। চৌকা সাদা কাচের গায়ে প্রভাতের আলো হীরকদ্যুতি বিচ্ছুরিত করিতেছে।

পদ্মপাতা শূন্য, মালা হইতে খসিয়া পড়া কয়েকটা পাপড়ি পড়িয়া আছে মাত্র। পদ্মপাতার কাছে শিশিরসিক্ত মৃত্তিকায় সুস্পষ্ট দুইটি সুকোমল পদচিহ্ন। আনন্দে পরিতৃপ্তিতে তিনটি সরল হৃদয় উদ্বেলিত হইল। মিনু তাদের ভুলিয়া যায় নাই। আকাশ-প্রদীপের আলোয় পথ চিনিয়া সে আসিয়াছিল। মালা গলায় পরিয়া স্নেহোপহার লইয়া গিয়াছে।—

বুটু, টুনু, বিনু জানে না,—তাদের জাগরণের অনেক পূর্ব্বে রজনীর শেষ যামে শোকবিহ্বলা করুণাময়ী জননী তাহাদিগকে শান্তি দিতে, সান্ত্বনা দিতে উপহারগুলি গোপনে নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন।

বসন্ত

শিল্পী চিত্রনিভা চৌধুরী

কুমড়ো ভাতে

শ্রীজীবনময় রায়

১

একদা গদাই বসি পালঙ্কে
খাতাখানা তার অঙ্কে অঙ্কে,
আঙ্গুলের ডগা কালীর পঙ্কে
ভরিয়া উঠিল ক্ষেপে।
কিছুতেই আর মেলে না হিসাব
দুনিয়ার যত ভাঙ্গা আসবাব
কিনে,—নীলামেতে বেচলে যা লাভ,
সেটা কত, তাই মেপে।
ভুনোদের সেই ফাটা আলমারী
কিনেছে সে কাল পাকা চাল মারি'
চড়া দামে তার, ইয়া গাল ভারি,
ডাকাডাকি হবে শুরু;
তা ছাড়া টেবিল চেয়ার আরশি,
ভাঙ্গা খাট, দোর, জানলা সারশি,
পোড়া কার্পেট আদত পারশী
পাঁচটি ইঞ্চি পুরু।
ফাটা চটা চীনেমাটির বাসন,
ছেঁড়া কালিঢালা রঙ্গিন আসন,
ফুটো হাঁড়ি ঘড়া তাম্রশাসন,
ছেঁদা পিতলের নাদা।
যত ধরে দাম, মনে নাহি ধরে,
এক গুণো দাম দশ গুণো করে,
পাতা ভ'রে ওঠে ক্ষুদে অক্ষরে
লিখে লিখে গাদা গাদা।

২

হেনকালে তার পড়শী নিতাই,
একা ব'সে গদা করিছে কি তাই
এলো সে দেখিতে। কহিল নিতাই,
"এ কী ব্যবহার তোর?
আমরা ওদিকে পেড়ে নিয়ে তাস,
তিনটিতে ব'সে করি হা-হুতাশ,
বলি, মোলো নাকি গদাধর দাস।
বেলা হয়ে গেল ভোর।"
গদা বলে, "চুপ—সময় যে নাই;
জানিস, কি প্যাঁচ জিনিষ চেনাই,
তা না হলে হবে পণ্ড কেনাই
এসব সরেশ মাল।"

চ'ড়ে ব'সে তার ভুঁড়ির উপরে
বেধড়ক পেটে দিবস ছু'পরে।

এত বলি' গদা কলম ঠুকিয়া,
খাতার উপরে আবার ঝুঁকিয়া,
লিখিতে লাগিল বিষম রুখিয়া,
হিজিবিজি জঞ্জাল।
বলে, হুঁ হুঁ বাবা, পেয়েছ চালাকি ?
হিসেবের কড়ি বাঘে খাবে নাকি ?
মাণিক তুলব, সমুদ্র ছাঁকি',
এ কি সোজা কারবার ?
"ও রে এই গদা। ওঠ্ শীগ্‌গির।"
কে শোনে। গদাই করে বিড়বিড়,
"এই ঘরে কাল নীলেমের ভিড়—
ক'ষে দাঁও মারবার।
পাকা খদ্দের নিতে পারি চিনে,
টেড়িকাটা বাবু, ধুতি ফিন্‌ফিনে,
হীরের আংটি—রুখে নেবে কিনে
বিশগুণো দিয়ে দাম।"

"ও রে গদা!"—"বোস্, বছরখানেক
হবে কত লাখ টাকা, তা জানে কে।
রাজা-বাদশারে তখন মানে কে,
যত টাকা তত নাম।
যত হুঁকোমুখো হাড়হাবাতের
ঘোচাব দুঃখু পান্তাভাতের,
চেটেপুটে খাবে সকড়ি পাতের,
হিংস্কুকে খাবে কলা।
তা বলে নিতাই পুরণো ইয়ার
তাকে তাড়াব কি ? করিয়া পিয়ার
ছোটখাটো কাজ দেব না কি আর—
গা-টেপা, হাত পা ডলা ?
সভাসদ দলে মো-সাহেব হবে,
আমি হাঁ-করিতে কথা কেড়ে ক'বে,
কাঁদিলে কাঁদিবে ভেউ ভেউ রবে,
হাসিলে হাসবে হাহা।

লাঠিটা ছাতাটা দেবে হাতে হাতে,
খাবে চেটেপুটে মোর এঁটো পাতে,
সুখে যাবে দিন—আমারি সেবাতে,
ভাবিবে বাহবা বাহা!
"কী রে গদা।" "থাম্, জুতো-বর্দার
মালী চাকরের হবে সর্দার,
তারি হেপাজতে মোর ঘরদ্বার
সব দেশ ছেড়েছুড়ে।"
"তবে রে গদাই, কুমড়োপটাশ,
মনে ভয় নেই? আমারে চটাস্?
ঢাকাই জালাটা ফাটাব ফটাস্,
ব্যাটা হাঁদারাম কুঁড়ে।"
গদা বলে, "মুখ সাম্‌লে চলিস্
মনিবকে তুই যা খুশি বলিস্?
নিজের কানটা যদি না মলিস্
ছিঁড়ে দেব নিজে হাতে।"
বাঙাল নিতাই রাগে প্রচণ্ড—
তেড়ে উঠে বলে, "তবে রে ষণ্ড।
করিব রে তোরে লণ্ডভণ্ড,
মাখিব কুমড়ো-ভাতে।"

৩

এত বলি' সেই তেলের কুপোরে
চ'ড়ে ব'সে তার ভুঁড়ির উপরে—
বে-ধড়ক পেটে দিবস দু'পরে
লাথি, কীল, চড়, থাবা।
গদা হাঁকে—"ড্যাম, ডেভিল, ফুলিশ,
মনিবের গায়ে হাত যে তুলিস্?
ডাকাত, গুণ্ডা! এই ও,—পুলিস,
গেছি রে বাবা রে বাবা।"
দুরদাম্ রবে পাড়া তোলপাড়,
আলমারী খাট ভাঙে দুবাড়,
জানলা কপাট ভেঙে চুরমার,
পড়ে বা আকাশ কেটে
খোট্টা যেমন ঠেঙার বাড়িতে
ছারপোকা-অলা খাটিয়া ঝাড়িতে
হরদম গাল পাড়িতে পাড়িতে
তেমনি নিতাই পেটে।
মার খেয়ে গদা, হাঁদার মতন,
চেঁচায় হাঁ ক'রে গাধার মতন,
গড়ায় ঢাকাই নাদার মতন।
ঘাড়ে ধ'রে দিয়ে ঝাঁকি,
কহিল নিতাই, "হুজুর, মা-বাপ
এবারের মত করবেন মাপ,
গা টেপার এই নমুনা। আদাপ।
হাত-পা ডলাটা বাকী।"

৪

মাস দুই পরে সেরে উঠে গদা
লিখে দিল সেঁটে, দেয়ালে একদা
মোটা অক্ষরে—"মনে রেখে সদা",
দাগ দিয়ে বারে বারে—
"এই কথা ক'টি জেনো মনে সার,
সেধে করিবে না কারো উপকার,
আর ঘেঁটিও না, কাঙাল, বাঙাল,
গোঁয়ার বা জানোয়ারে।"

—০—

আজকে পুতুমই আগে ঘুম থেকে উঠেছিল। একেবারে সক্কালবেলা, মাত্র দুটো কি তিনটে কাক ডেকেছে তখন, আর আকাশটা ঠিক সিঁদুরে আমের মত দেখতে হয়েছে। উঠেই দরজার পিঠের শেষ দাগটা মুছে ফেলবার জন্যে হাত নিসপিস করছিল তার, অনেক কষ্টে লোভ সামলে আছে বেচারা। না সামলে উপায় কি, আজকের দাগটা যে দাদার ভাগের। দাদা উঠে যদি দেখে পুতুম তার ভাগের দাগটা মুছে ব'সে আছে, তা হলে পুতুমের নামটাই পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে চাইবে কি না ঘুটুম কে জানে!

অতএব লোভ সামলানো ছাড়া আর কি করা?

অবিশ্যি লোভ সামলে আছে ব'লেই কি আর চুপ ক'রে ব'সে আছে পুতুম? উঁহু, তা মোটেই নয়। উঠে পর্য্যন্তই দাদাকে ওঠাবার জন্যে উঠে প'ড়ে চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘুটুম বরাবরই একটু ঘুম-কাতুরে, পুতুমের খোঁচানিতে কেবলই 'উ আঁ' ক'রে পাশ ফিরছিল।

অবশেষে পুতুম ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করল, 'আর যদি দেরী করিস দাদা, ভাল হবে না কিন্তু, দাগ মুছে দেব।'

এতক্ষণে ঘুটুম উঠে বসল। একেবারে রেগে কাঁই হয়েই বসল, 'দাগ মুছে দিবি? আবদার পেয়েছিস? আজ কার দিন?'

পুতুমেরও রাগ হয়েছে, সে-ও ঝেঁকে উঠে বলে, 'তা তুই উঠছিস-না কেন?'

'এই তো উঠলাম, এই তো মুছলাম,' ব'লে ঘুটুম এক সেকেণ্ডের মধ্যে, তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে ঘরের দরজার একটা কবাট বন্ধ ক'রে ঘস ঘস ক'রে কবাটের পিছনের সেই শেষ দাগটা মুছে দিল। যেটার জন্যে এতক্ষণ হাত নিসপিস করছিল পুতুমের।

দাগগুলো হচ্ছে মামার বাড়ী যাওয়ার দাগ! যেদিনকে প্রথম মামার বাড়ী যাওয়ার কথা উঠেছে, সেদিনকে দরজার পিঠে খড়ি দিয়ে দাগ কেটে রেখেছে ঘুটুম পুতুম। মা বলেছিল যাবার আর সাতদিন আছে, তাই গুনে গুনে সাতটা দাগ দিয়েছিল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে আইনও তৈরি ক'রে ফেলেছিল।

পালা ক'রে দাগ মুছবে দু'জনে, আজ ঘুটুম তো—কাল পুতুম।

দাগ মুছে ফের ব'সে প'ড়ে হাই তুলল ঘুটুম, অগত্যা পুতুমও হাই তুলল। তাই নিয়ম কি না? তা' পর দুঃখু দুঃখু গলায় বলল, 'তোর বেশ মজা দাদা, ফার্স্ট দাগটাও তোর, লাস্ট দাগটাও তোর।'

ঘুটুম একটু আত্মগর্বের হাসি হাসল, 'হুঁ কেমন চালাকিটি খেলেছি!'

'তুই সব সময় জিতে যাস!' দুঃখু মুখে বলল পুতুম।

'জিতবই তো, আমি বড় না?' বলল ঘুটুম।

পুতুম আর তর্কের দিকে গেল না, তক্ষুণি হাসি হাসি চোখে বলল, 'তোর কী মনে হচ্ছে রে দাদা?'

'কী আবার মনে হবে ?'

'আহা যাওয়ার কথা বলছি। মনে হচ্ছে না যে এক্ষুণি বিকেল হয়ে যাক ?'

'তা তো হচ্ছে-ই। কিন্তু দেখিস তুই ঘড়িটা আজ কী রকম শত্তুরতা সাধবে। ঠিক দু'তিন ঘণ্টা পর পর একবার বাজবে।'

'ই-স্, কী দুষ্টু রে! কেন অমন করে বল্ তো দাদা ?'

'কেন আর!' ঘুটুম দার্শনিক দার্শনিক গলায় বলে, 'যা দেখছে তাই শিখবে তো? দেখছে বাড়ী সুদ্ধু সক্কলের তাল শুধু আমাদের জ্বালাতন করা, তাই-ই শিখছে।'

'মামাবাড়ীতে কিন্তু এ রকম না, না রে দাদা ?'

'বাঃ, মামার বাড়ীতে এ রকম হবে কি ক'রে ?' ঘুটুম বোনকে—নস্যাৎ ক'রে দেয়, 'ঢেঁকীর মতন কথা বলিস কেন ? অভিধানে কি সব লেখা আছে ?'

অভিধানে কি লেখা আছে, অথবা কি লেখা থাকে, তা পুতুমের অজানিত, তবে চট্ ক'রে হার মানাও তো চলে না, তাই বলে, 'হ্যাঁ, সেই সব তো কত কি-ই লেখা আছে!'

'খুব বিদ্যে প্রকাশ করেছিস···থাক্। লেখা আছে না, মামার বাড়ীর আদর, মামার বাড়ীর আবদার!'

'সে তো আছেই, জানি না নাকি ?'

'ছাই জানিস। সব আমার কাছে শিখে নিয়ে নিয়ে বলিস।'

'তা তুই ছোটকার কাছে অঙ্ক শিখে নিস না?' পুতুম ঝুমরো চুলগুলো এক ঝটকায় মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বলে, 'বড়দের কাছেই সব শিখতে হয়।'

ঘুটুম নিশ্বাস ফেলে বলে, 'অথচ দেখ্, বড়রা কী বিচ্ছিরি!'

'ইস দাদা, কী বললি? মা-ও তো বড়, মা বিচ্ছিরি ?'

ঘুটুম অপ্রতিভ ভাবটা ঢাকতে চোখদুটো সাংঘাতিক রকমের গোল করে, 'মার কথা বলেছি আমি? মা তো আমাদের দলে। জ্যেঠীমা? পিসীমা? পিসীমাই সবচেয়ে—কাল আবার বলছিল কি জানিস, এবার তো দীর্ঘকালের মতন মামার বাড়ী চললে, যাও থাকগে, সুখ করগে। শুনছি না কি মামার অনেক পয়সা হয়েছে, সব ভোল পাল্টে গেছে। শুনলে এত রাগ ধরে!'

পুতুম বোকামী ধরা পড়বার ভয় তুচ্ছ ক'রেও ব'লে ফেলে,'দীর্ঘকাল না কি যেন বললি রে দাদা, ওর মানে কি ?

'ওর মানে? দীর্ঘকাল মানে?' হঠাৎ হো হো ক'রে বেদম হাসতে থাকে ঘুটুম, হেসে হেসে পুতুমকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে বলে, 'দীর্ঘকাল মানেও জানিস না? কী বোকা রে! মানে হচ্ছে, অনেক কাল। বেশী দিন থাকব কি না এবার ?'

'অ-নেক বেশীদিন? কতদিন রে দাদা ?'

পুতুমের মুখটা জ্বল জ্বল ক'রে ওঠে।

'অনেক দিন, মানে আর কি বেশী দিন। নাঃ, তুই বড্ড বোকা।'

'আর ওই, ভোল পাল্টা না কি বললি, তার মানে ?'

'তার মানে?' ঘুটুম নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, 'সব কথার মানে জেনে কি মহারাণী হবে তুমি? আর বড়দের কথার মানে থাকেই নাকি? যত সব বাজে কথা বলার ওস্তাদ। এই যে ঠাকুমা রাতদিন বলে, খেটে খেটে হাড় কালি হ'ল আমার,—এ কথার মানে আছে কিছু? ছালের তলায় মাংস, মাংসর তলায় হাড়, সে হাড় কালি হবে কি ক'রে রে? তাহলেই বোঝ্ বড়দের কথার মাথামুণ্ডু থাকে কি না। যাক্‌গে বাবা, আসল কাজের কথা কিচ্ছু হচ্ছে না, খালি পচা কথা। তুইও তেমনি—'

পুতুম অবাক্ দৃষ্টিতে বলে, 'আসল কাজের কথা কিসের রে দাদা ?'

ঘুটুম চোখেমুখে একটি ঘোরালো রহস্য-রোমাঞ্চের আভাস এনে বলে, 'তোকে বললেই তো সব্বাইকে ব'লে বেড়াবি!'

'কখখনো না, এই বইয়ে হাত দিয়ে বলছি রে দাদা, কাউকে বলব না—।'

'এই, ফের দিব্যি করছিস ?'

'আচ্ছা, আচ্ছা বাবা, করব না। বল না কি কাজের কথা?'

'মামাবাড়ী নিয়ে যাবার জন্তে আমি এ্যাইসা একটা জিনিস জোগাড় করেছি—'

'নিয়ে যাবার জন্তে! ওমা! মা তো বলছিল সেন মশাইয়ের সন্দেশ নিয়ে যাবে।'

'মাদের তো শুধু ওই খালি খাওয়াবার চিন্তা। আমি যা নিয়ে যাব, হুঁঃ বাবা!'

'তুই খালি খালি সব কথা অমন দেরী ক'রে ক'রে কষ্ট দিয়ে বলিস কেন দাদা? তাড়াতাড়ি বল্ না।'

'তাড়াতাড়ি! হুঁঃ। তাড়াতাড়ি বললে তুই মানে বুঝতে পারবি?' বলেই হঠাৎ খুব দ্রুতগতিতে বলে, 'মামাবাড়ীর বাগানে গাছ পুঁততে বীচি জোগাড় করেছি। পারলি বুঝতে?'

পুতুম হতাশ হয়ে বলে, 'অত তাড়াতাড়ি?'

'হুঁ বাবা! এও পারব না, সেও পারব না। শোন্ তা'হলে, পঞ্চা আমাকে একরকম গাছের বীচি দিয়েছে, পুঁতলে তিনদিনে গাছ, সাতদিনে ফুল। মামার বাড়ী গিয়েই বাগানে পুঁতে দেব—'

পুতুম ঈষৎ ভয়ে ভয়ে বলে 'বাগান কোন্‌টা রে?'

'বাগান কোন্‌টা? বাঃ চমৎকার! রান্নাঘরের পেছনটা ভুলেই গেলি?'

'ওঃ।' পুতুম ঢোঁক গিলে বলে, 'তা' ওখানে যে ভুষণ্ডী বুড়ী গাদা গাদা উহুনের ছাই ফেলে!'

সেই জন্যেই তো—' ঘুটুম যুদ্ধবিজয়ীর গর্ব্ব নিয়ে বলে, 'ওখানটাই পছন্দ করেছি। পঞ্চা বলেছে, ছাই-গাদায় পুঁতলে ছু'দিনেও গাছ বেরোতে পারে। আর ফুল যা হবে ইয়া—বড়—বড়—'

'কী ফুল রে দাদা?'

'ইস্, অমনি জেনে নেওয়া হচ্ছে! বলব কেন?'

'বল্ না রে দাদা, তোর ছুটি পায়ে পড়ি।'

'কাউকে বলবি না বল্?'

'বলছি তো বলব না, আর কতবার খাটাবি?'

ঘুটুম মুখটাকে পুতুমের ঘাড়ের কাছে এনে প্রায় কান কামড়ানোর ভঙ্গীতে সেই গোপন কথাটি উচ্চারণ করে।

পুতুম চমকে উঠে বলে 'য্যাঃ।'

'ব্যস্, অমনি অবিশ্বাস! সাধে কি আর বলি না?'

'না রে দাদা অবিশ্বাস করছি না, শুধু আশ্চর্য্য হচ্ছি। উঃ, কী মজা হবে রে দাদা তা'হলে? দিদি তো দেখে আশ্চর্য্যর আশ্চর্য্য! না রে?'

'কে নয়? মেজমামী, সেজমামী, মামারা—'

'আর বড় মামী দিল্লী থেকে এসে—'

'মা-ও!'

পুতুম জোরে জোরে হাততালি দিয়ে ওঠে, 'ঠিক তো, মাও তো। দাদা রে, আমার ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুণি বিকেল হয়ে যাক।'

'আমাদের কথা যদি ভগবান্ শুনত রে পুতুম!'

'সেই তো হুঃখু!'

ভগবানের অবিবেচনায় ছু'জনেরই নিশ্বাস পড়ে, বেশ বড়সড় দীর্ঘনিশ্বাস!

একটুক্ষণ নীরবতা।

আবার পুতুমই নীরবতা ভঙ্গ করে। 'মামার বাড়ীটা কী সুন্দর পুরনো পুরনো দাদা?'

'ওই জন্যেই তো', ঘুটুম বলে, 'অত চমৎকার!'

'দেয়ালগুলো কেমন একটু একটু ইঁট,—একটু একটু সাদা?'

'সেই তো! ঠিক সি-এল-টি'র বাড়ীটার মতন। আবার ইঁটগুলোর ফাঁক থেকে কেমন লাল লাল গুঁড়ো পড়ে।'

'ওমা, তুইও দেখেছিস দাদা? একদিন মায়ের চুলের কাঁটা নিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে বার ক'রে আমি না—হি-হি-হি—একটুখানি খেয়ে না—'

'খেয়েছিলি তুই? ঈস্‌স্!'

'না রে দাদা, সত্যি বলছি বেশ মজার—নোন্‌তা নোন্‌তা খেতে।'

ঘুটুম উৎসাহ গোপন রেখে উদাস উদাস গলায় বলে, 'আচ্ছা বেশ, এবার না-হয় খেয়ে দেখা যাবে। কিন্তু ও সব ছাইপাঁশ খেয়ে পেট ভরালে পেয়ারা গাছের পেয়ারাগুলো কে খাবে শুনি?'

'আহা, আমি কি পেট ভরাতে বলছি? পেয়ারার সঙ্গে নুনের বদলে তো খাওয়া যায়?'

'তা' অবশ্য।'

'কিন্তু দাদা!' পুতুম মুখখানাকে ঠাকুমার প্যাটার্ণে ঝুলিয়ে গম্ভীর ক'রে বলে, 'পেয়ারা পাড়বি কি ক'রে? ছাতের আলশে ভেঙে গেছে ব'লে ছোট মাসী যে খালি খালি ছাতে যেতে বারণ করে। আর ঠিক ভাঙা দিকেই তো গাছটা।'

'পেয়ারা পেড়ে পেড়েই তো—ভেঙেছে ছোট মামারা।'

ঘুটুম হেসে হেসে ফিস্‌ফিস ক'রে বলে, 'ছোট মাসী বারণ করে ব'লে আমরা যেন যাই না! বারণ করে ব'লেই তো আরও মজা!'

দুধ-টুধ খেতে হবে না?

'ইস্ রে দাদা, ঠিক বলেছিস। এই জন্যেই তো তোকে এত ভালবাসি। আমারও তাই। সেই যখন দুকুরবেলা দিদা ঘুমিয়ে পড়েন, মেজমামী সেজমামী গল্পর বই নিয়ে ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে শোয়, আর মা আর ছোটমাসী রাজ্যির গল্প করে, তখন? তখন চুপি চুপি ছাতে উঠতে কী রকম ভয় ভয় করা ভাল লাগে?'

'মামার বাড়ীর সিঁড়িটা কী মজার সরু আর কী চমৎকার অন্ধকার!'

'আর ঠিক সুড়ঙ্গর মতন, দুদিকে কেমন উঁচু উঁচু কালো কালো দেওয়াল!'

'আর কী অদ্ভুত মিষ্টিমতন চামচিকে চামচিকে গন্ধ!'

'আর ধাপগুলোর মাঝখানটা কেমন নৌকোর মতন নীচু নীচু!'

'মামার বাড়ীর সিঁড়িটাই সবচেয়ে ভাল।'

দু'জনে একসঙ্গে রায় দেয়।

কিন্তু কোন্‌টাই বা ভাল নয়? মেজেগুলো খাবলে খাবলে উঠে গিয়ে আপনি আপনি যে গাব্বুগুলো তৈরি হয়েছে? জানলার শিক ভেঙে যাওয়ার জন্যে যেখানে তার জড়িয়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছে? কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা বলবে?

মামাবাড়ী সম্পর্কে আলোচনাটা আরও কতক্ষণ চলত বলা শক্ত, কিন্তু ব্যাঘাত হানলেন এসে পিসীমা। 'কী, এখনো দুটোতে ব'সে ব'সে হাই তুলছিস? দুধটুধ খেতে হবে না?'

'হাইতোলা আবার কি!' পুতুম ব'লে উঠল, 'আমরা তো সেই কখন থেকে উঠে মামার বাড়ীর গল্প করছি।'

কথাটা বলবার সময় দাদা যে তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল, সেটা আর বেচারা বুঝতে পারল না। পুতুম বেচারা দাদার থেকে মাত্র আড়াই বৎসরের ছোট হয়েও অনেক কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু ঘুটুম পারে। যেন এইমাত্র পারল, পুতুমের ওই বোকার মত কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই পিসীমা নাক বাঁকাবেন। হ'লও তাই। পিসীমা ব'লে উঠলেন 'নমস্কার বাবা তোমাদের পায়ে, আজই যাচ্ছ মামাবাড়ী, তবু তার গল্প চলছে। এসে না জানি আরও কত হবে। এবারে তো আরোই হবে। কি ক'রে আদর-যত্ন করে মামীরা তা তো জানি না। বাড়ীতে এত ঐশ্বর্য্য এত আদর, তবু মন ওঠে না গো!'

এই বাঁদররা কি বলেছিস্ পিসীমাকে ?

'বাড়ীতে আদর ?' ঘুটুম আর থাকতে পারে না, ফেটে পড়ে, 'বাড়ীতে তো খালি বকুনি! যাও, আজ দুধ খাব না।'

'বেশ, খাস নি! বয়ে গেল। মামাদের কালো গরুর দুধ খেগে যা পাঁচসের ক'রে।'

'পাঁচসের ক'রে!' হি হি ক'রে হেসে ফেলে পুতুম,'তোমার মতন "মুনকে রঘু" নাকি আমরা ?'

'কী! কী বললি! আমি মুনকে রঘু? তা বলবি বই কি?' ব'লে পিসীমা দুমদাম ক'রে চ'লে যান।

ওরা এবার মুখ ধোবার জন্যে প্রস্তুত হয়, তবু কি গল্পের বিরাম আছে? 'মামার বাড়ীতে কেমন মন্দিরের ওপর তুলসী গাছ আছে রে! আর মামার বাড়ীর গোয়ালের পিছনের পাতকুয়োটা কী সুন্দর?'

কিন্তু বেশীক্ষণ দেরী হয় না, কাকা এসে দু'জনের দুটি কান ধরেছেন, 'এই বাঁদররা, কী বলেছিস পিসীমাকে?'

কি বলেছে, কিম্বা কিছুই বলেছে কি না, অথবা আদৌ আজ ওরা পিসীমাকে চোখেই দেখেছে কি না, একেবারে মনে পড়ে না, তাই মুখ লাল ক'রে কান ছাড়াবার চেষ্টা করে।

কিন্তু কাকা নাছোড়।

'বল্, কি বলেছিস! বল্ শীগ্‌গির!'

শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুমা তাদের ছাড়িয়ে নেন কাকার হাত থেকে। 'আহা, আজ ওরা বাড়ী থেকে যাত্রা করবে, কেন মারধোর করছিস?'

'ওঃ, মামাবাড়ী যাবেন তো রাজ্যপদ পেয়েছেন!' ব'লে কাকা রাগ ক'রে চ'লে যান।

এরপর মা এসেও খানিকটা বকাবকি করেন, 'কী অসভ্য ছেলেমেয়ে হচ্ছ তোমরা! পিসীমা গুরুজন, ওসব কি কথা বলেছ! যাচ্ছি তো নিয়ে, কি যে তোমরা করবে গিয়ে!'

আহা!

যেন মামাবাড়ী গিয়েও ওরা গুরুজনকে কিছু বলবে।

যেন এর আগে কখনও সেখানে যায় নি ওরা!

যেন সেখানের সব্বাই বলে না 'কী সভ্য লক্ষ্মী ছেলেমেয়ে!'

সারাদিন আস্তে আস্তে দু' ভাই বোনে ওই কথা!

বিকেলের দিকে আরও উদ্দাম হয়ে ওঠে আলোচনা। পঞ্চার দেওয়া সেই ফুলগাছের বীচি দাদাকে তুতিয়ে পাতিয়ে দেখে নিয়েছে পুতুম। যদিও দেখে কিছু বোঝা যায় না যে ওর মধ্যে সেই অতি আশ্চর্য্য 'আকাশ কুসুমের' গাছ লুকোনো আছে। দেখতে ঠিক আঁব ফলের বীচির মত গোল গোল কাল কাল লাগছে, কিন্তু পঞ্চা তো জানে ওটা 'আকাশ কুসুমে'র বীজ। পঞ্চার যে নিজের প্রত্যক্ষ দেখা! আর তিনটি দিন পরে ঘুটুমরাও নিজের চোক্ষে প্রত্যক্ষ দেখবে। তারপর, সাতদিনের মধ্যে?

ফুল আর ফুল!

আর মামার বাড়ীর পুরনো-ঝি ওই ভুষুণ্ডী বুড়ীটাকে ওরা দেখতে পারে না বটে, কিন্তু আজ তাকে ভক্তি করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভাগ্যিস ওই রান্নাঘরের পিছনের মাটি মাটি জায়গাটায় রোজ ছাই ফেলে!

তাই না এইটি সম্ভব হচ্ছে?

আবার এক সময় ধমক!

বাবার কাছে।

'সারাদিন দু' ভাইবোনে কিসের এত ষড়যন্ত্র হচ্ছে? পড়ার বইটই কিছু সঙ্গে নিচ্ছ? নাকি সে সব ভুল?'

বাঃ, ভুল কেন হবে! একটা ট্রাঙ্ক ভর্ত্তি করে শুধু বইখাতাই তো নিয়েছে। তিনদিন আগে থেকেই তে পড়াটড়া বন্ধ ক'রে তুলে ফেলেছে। যাতে না ভুল হয়ে যায়। দেখাতে হবে না সবাইকে? কিন্তু এত কথা কি বাবাকে বলা যায়?

তাই তখনকার মতন চুপ।

আবার গাড়ীতে।

দেখতে ঠিক আঁষফলের বীচির মত।

ফিসফিস শব্দে গাড়ী মুখর।

'মামার বাড়ীর নামটাও কি সুন্দর রে দাদা, আলমবাজার! এক মিনিটে বলা হয়ে যায়, আর আমাদের? রাজা বসন্ত রায় রোড! বাবাঃ! বলতে মুখ ব্যথা হয়ে যায়।'

এবার ধমক দেন মা।

'থাম তো তোরা! দু' দণ্ড ট্যাক্সীতে চড়েছে তাও চুপ নেই, খালি বক বক!'

মেজমামা, যিনি নিতে এসেছিলেন তিনি হেসে বলেন, 'আহা করুক না, তাতে আমাদের বক্‌বকানির কিছু ব্যাঘাত হয়েছে?'

মা হেসে ওঠেন।

এতক্ষণে ঘুটুম পুতুমের হুঁস হয়, ওঁরাও তবে বকবক্ করছিলেন। কি আশ্চয্যি, কিছু শুনতে পায় নি তো। এবার পায় অবশ্য।

মা বলছেন, 'ঘুটুম পুতুম একেবারে হাঁ হয়ে যাবে, কি বল মেজদা?'

মেজমামা হেসে বলছেন, 'সেই জন্যেই তো আগে থেকে কিছু বলি নি।'

'কিন্তু যাই বল মেজদা, ওই কয়লার ব্যবসাই তোমার লক্ষ্মী।'

হেসে ওঠে পুতুম খুক খুক ক'রে, মার যেমন কথা! কয়লা আবার লক্ষ্মী! তার পর সেই কয়লা কয়লা নিয়ে কি যে সব বাজে বাজে কথা ওরা বলে, কিছু যদি বোঝা যায়। দাদা ঠিকই বলে, বড়দের সব কথার মানে থাকে না।

তার চাইতে অনেক ভাল রাস্তা দেখা!

এই তো কখন ছেড়ে গেছে মৌলালি,···এই তো এসে গেল শ্যামবাজার···তার পর ওই তো সেই বড় গম্বুজওলা বাড়ীটা, ওই তো লম্বা মতন বিচ্ছিরি একটা বাড়ী!...আরে আরে এই তো এই তো এসে গেল তো! এইবার সেই শিউলীগাছটা, ব্যস্ তার পরেই—কিন্তু এ কী, এ কী, এখানে কী! শিউলীগাছটা না আসতেই গাড়ীটা ঘটাং ক'রে থেমে গেল কেন? আর মেজমামা ট্যাক্সীর মিটার দেখতে দেখতে হাসি হাসি মুখে বললেন কেন, 'এই এসে গেলে তোমরা মামার বাড়ী। নেমে পড় এবার! কি, পছন্দ তো?'

মেজমামা কি নিজের বাড়ীই গুলিয়ে ফেললেন? কাদের বাড়ীতে এনে বসলেন?

কিন্তু মা? মা এই ভুল বাড়ীটাতেই এসে আহ্লাদে একেবারে আটখানা হচ্ছেন কেন? সেই দরজার শিউলীগাছ দেওয়া, বালির মতন ঝুরি ঝুরি কাঠের গুঁড়ো-ঝরা কালো চকচকে দরজা লাগানো ইট ইট বাড়ীটার বদলে ভুল ক'রে যে অন্য একটা বিচ্ছিরি চকচকে ঝকঝকে নতুন বাড়ীর সামনে এনে ফেলেছে ট্যাক্সী ড্রাইভার,

কিচ্ছু না।

আর মেজমামা খুলো মন হয়ে বলছেন, এসে পড়েছি, এটা কি মাও খেয়াল করছেন না? পুতুমের মতন উছলে উছলে হেসে খালি খালি বলছেনই বা কেন, 'মেজদা! মেজদা!'

মানে কি এর?

মানে বুঝতে পারছে না এরা। ঘুটুম আর পুতুম। কিছু বুঝতে পারছে না।

লাল টুকটুকে পালিশ মতন মেজেওয়ালা এই বাড়ীটার মধ্যেই তো মেজমামী, সেজমামী, সেজমামা, বুবুদিদি, কানুদাদা সব্বাই। ওদের দেখে এলও তো হৈ হৈ ক'রে। 'কি রে, ঘুটুম তুই যে এই ক'মাসে বেড়ে লম্বা হয়ে গেছিস! পুতুম তুই লম্বা হসনি যে?'

ঘুটুম পুতুম দু' ভাইবোন কি সিনেমার ছবির মানুষ হয়ে গেছে? হাঁটছে নড়ছে, অথচ নিজেরা কিছু বুঝতে পারছে না!

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তো বুঝতেই হ'ল!

ঠিক তাদের রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়ীর মতন রেলিং দেওয়া বিচ্ছিরি আলো আলো সিঁড়ি দিয়ে দিদিমা নেমে এলেন থপ থপ ক'রে, আর এসেই ফোকলা মুখে একগাল হেসে ব'লে উঠলেন, 'কি দাদামণি, মামার বাড়ী পছন্দ হয়েছে? দেখ, মামারা সেই আদ্যিকালের পাকাবাড়ী ভেঙে কেমন নয়া এমারত বানিয়েছে! ভোল একেবারে পাল্টে ফেলেছে।'

ভোল!

ভোল পাল্টানো!

এতক্ষণে কথাটার রহস্য জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যায় পুতুম ঘুটুমের কাছে। একটা সুন্দর জিনিবকে বিচ্ছিরি করার নামই তবে ভোল পাল্টানো?

চোখ দিয়ে কেমন যেন গরম-গরম জল উপচে উঠছে, মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে কোনরকমে লজ্জানিবারণ

দিদিমা ততক্ষণে মেয়ের সঙ্গে কথা জুড়েছেন, 'সব ঘুরে ফিরে দেখবি চল্ না উষা, কোথাও আর সেই ভাঙাপচার চিহ্ন অবশিষ্ট নেই।'

'ঘর তুলেছ কোথায়? মেজদা বলছিল দু'খানা নাকি—'

'ঘর? ওই রান্নাঘরের পেছনের পড়ো জমিটুকুতে। পাঁশগাদা হয়ে পড়েছিল, ওপর নীচেয় দিব্যি দু'খানা ঘর হয়েছে। তোরা ছেলেপুলে নিয়ে আসিস, শোবার কষ্ট হয়, ওপরের ঘরটা শোবার জন্তে, নীচেরটা—ওমা ও কি রে উষা, তোর ছেলে পকেট থেকে কি একমুঠো বার ক'রে আকাশে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে?'

মা চোখ পাকিয়ে বলেন, 'কি অসভ্যতা হচ্ছে ঘুটুম, কি ও? কি ফেলছিস?'

ঘুটুম আরও চোখ পাকিয়ে বলে, 'কিচ্ছু না।'

—•—

গোরা যখন তার কৈশোরের গোড়ায়, এগারো কি বারো তার বয়স, তখনই তার একাধিক ভাষায় দখল হয়েছিল।

শুধু যে মানুষের ভাষাই সে বুঝতে পারত তাই নয়, পেয়ারা লিচু পাঁপড়ভাজার কথাও বুঝতে পারত সে। পশুপাখীর ভাষা অনেকে বুঝতে পারে ব'লে শোনা গেছে, সে তো গোরার কাছে কিছুই নয়, যাদের আমরা নিতান্তই অবোলা জীব ব'লে ভাবি, এই যেমন সন্দেশ কি রসগোল্লা, চকোলেট কি স্যাণ্ডউইচ—দেখবামাত্র তাদের মনের কথাও টের পেত সে।

আলুকাবলি কি চীনেবাদামের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে স্পষ্ট শুনেছে তারা পিছন থেকে ডাকছে—কা দাদা! দেখতে পাচ্ছ না নাকি? অমনি তাকে ঘুরে দাঁড়াতে হয়েছে। পাকা কলা কি ডাঁশা কুল, দেখেছে সে, আকুল হয়ে তাকে সাধছে। খাবার জন্যই সাধছে তাকে।

সবাই ভালোবেসে তার উদরে স্থান পেতে চায়। সেও তার জন্য কিছুমাত্র কাতর নয়। সেও বেশ উদার। সবাই তার PET, তার পেটে সবার জন্যই সমান জায়গা।

এই গল্পটা গোরাই আমাকে বলেছিল। আরো বলেছিল যে, এটা মোটেই গল্প নয়, সত্য ঘটনা। যেমনটি তার মুখে শুনেছিলাম তেমনটিই আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ করছি।

সেদিন হয়েছিল কি, গোরার মেজমামা গোরাকে নিয়ে বড়বাজারে কী একটা কিনতে বেরিয়েছিলেন। ফলপটির কাছটায় গাড়ী থামিয়ে গোরাকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে তিনি জিনিষটা কিনতে গেলেন। গোরা গাড়ীর জানালার ধারে ব'সে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল সব।

সারি সারি ফলের দোকান। ঝুড়ি ঝুড়ি কমলা লেবু। থরে থরে সাজানো কিসমিস বাদাম পেস্তা। আর আপেল আখরোট। কাজু আর নাশপাতি।

দেখল সে, দোকানদারের হাত ফসকে একটা ডাঁশা পেয়ারা রাস্তার দিকে গড়িয়ে এল। ফুটপাথের একধারে একটা কলার খোসা প'ড়ে ছিল তার কাছে গড়াতে গড়াতে এল পেয়ারাটা।

এসে বললে, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

গোরাকে নয়, কলার খোসাটাকেই বললে। গোরার নিজের কানে শোনা।

পেয়ারাটা খোসাটাকে বলল, ঐ যে ফলের দোকান দেখছ, ঐখানে একটা ঝুড়িতে আমি ছিলাম···

কলার খোসাটা আড়চোখে দোকানটা একবার দেখে নিল—তারপর বলল—ও!

পেয়ারাটা বলল—তোমার সঙ্গে আলাপ করতেও এলাম বটে, তা ছাড়াও আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে। কোনো একটা ছেলের সঙ্গেও আমি ভাব জমাতে চাই। কোনো ছোটখাট ছেলে নয়—লিকলিকে চেহারার এইটুকুন

আমি বাপু ডাঁশা পেয়ারা, সহজ পাত্র নই।

রোগা ছেলে আমি পছন্দ করিনে। আমার ভাবের ধাক্কা সে সামলাতে পারবে না। আমি ভাব করতে চাই বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছেলের সঙ্গে। বছর বারো-তের বয়স হবে, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা হবে, এমন একটা ছেলে হলে তবেই আমার পোষায়।

কলার খোসা বলল—তেমন ছেলে নিয়ে কি করবে তুমি?

পেয়ারা জবাব দিল—দেখতে পেলেই সে আমায় কুড়িয়ে নেবে আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই আমি তার পেটের ভেতর চ'লে গেছি। সত্যি বলতে, তোমার-আমার জীবনধারণ কিসের জন্যে? কারো না কারো পেটে যাবার জন্যই ত? তা না হলে এ জীবন ত একেবারেই নিষ্ফল।

কলার খোসা বলল—হ্যাঁ, তা বটে।

পেয়ারা—দেখছ ত আমায় এতটুকু, কিন্তু তুমি দেখে নিয়ো আজ রাত্রেই আমি তাকে ডবোল ক'রে দেব—পেটের কামড়ে কেঁদে ককিয়ে চেঁচিয়ে মেচিয়ে অস্থির হয়ে উঠবে সে, অস্থির ক'রে তুলবে সবাইকে। পাড়ার কেউ আজ ঘুমোতে পারবে না তার চেঁচানির ঠেলায়। বাড়ীর কাউকে চোখ বুজতে দেবে না। হ্যাঁ, আমি দেখতে ছোট হতে পারি কিন্তু ফল হিসেবে নেহাৎ ফ্যালনা নই! দশ বিঘে জমিতে বা দশটা গাছে যত ছেলে ফলতে পারে তাদের সবাইকে আমি জব্দ করার ক্ষমতা রাখি, জেনে রেখো।

কলার খোসা একটু অবাক্ হয়ে ওর দিকে তাকাল—তাই নাকি?

পেয়ারা—তা না ত কি? কলাকে নিয়ে ছেলেরা যা খুশি করে, কিন্তু আমি বাপু ডাঁশা পেয়ারা! সহজ পাত্র নই! কলা খেয়ে হজম করা সোজা কিন্তু ডাঁশা পেয়ারা—হুম্!

কলার খোসা হাই তুলে বলল—ওঃ, সামান্য একটা ছেলের জন্যই অপেক্ষা করছ তুমি! বুঝেছি। তা ছাড়া আর কিই বা করবে! তোমার ঐ ক্ষুদ্র দেহের পক্ষে ক্ষুদে একটা ছেলেই খুব। তবে আমার কথা যদি বলো, আমার সমকক্ষ লম্বা-চওড়া ইয়া জোয়ানকেই আমি পছন্দ করি। ঐ দেখ, ঐ একটা লোক আসছে, আমার ধার ঘেঁষেই যাবে সে। এই ধরণের লোকের সঙ্গেই আমার কারবার। দেখছ ত কী বিরাট বপু, কত বড় লাঠি, কেমন পাগড়ি···।

'ওকে তুমি কাবু করতে পারবে?' পেয়ারাটা বলে।

'এ আর বেশি কি?' প্রকাশ করল কলার খোসা। 'ঐ যে, ঐ কোণে আরেকটা খোসা প'ড়ে আছে, দেখছ

কি! আমারই সহোদর ভাই। সহোদর কিম্বা পিঠোপিঠি যাই বলো। একই মায়ের পিঠ থেকে জন্ম আমাদের। একই কলার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এখানে ওখানে ফেলা আমরা...'

'হ্যাঁ, দেখছি। ঐখেনে প'ড়ে রয়েছে।'

'হ্যাঁ, ওই আমার ভাই। একটু আগেই ত দেখলাম··· নিজের এই চোখেই দেখলাম ত! অনায়াসে সাড়ে তিন হাতের এক জোয়ানকে আকাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল ও এক লহমায়···ঐ আমার ভাই···

'বলো কি?'

'ওর মতই ঐ রকমই কিছু একটা আমি করতে চাই।'

ডিগবাজি খেয়ে সশব্দে এসে পড়ল।

বলতে না বলতে এক বিশালকায় কাবুলি, ওজনে যে পাক্কা আড়াই মণ, ভোজনের পর আরো সের দশেক বাড়বে, উপস্থিত হ'ল সেখানে। কলার খোসাও তৈরী হয়ে ছিল, আসামাত্রই পা আঁকড়ে ধরেছে তার, ধ'রেই তাকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে অবলীলায়। কাবুলিটা এক পাক ঘুরে, শূন্যেই একটা ডিগবাজি খেয়ে, সশব্দে এসে পড়ল একটা কমলালেবুর ঝুড়ির ওপর। তার পায়ের ধাক্কা লেগে আপেলের বাক্স ভেঙে চুরমার। আর দেহের চাপে আড়াই শো কমলা লেবু চ্যাপটা হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে একসঙ্গে—তাদের সমবেত অশ্রুপাত পিচকিরির মত বেগে বেরিয়ে এসে সমস্ত পথচারীর জামাকাপড় দিয়েছে ভিজিয়ে। সে এক হুলুস্থুল ব্যাপার।

এই দৃশ্য না দেখে গোরা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। হাঁ করেছিল ব'লেই রক্ষে! নইলে ওর জামা কাপড় সব খারাপ হয়ে যেত, গোরা বলল আমায়। বাঁচাও, বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও, বলতে বলতে এক পিচ্‌কিরি কমলালেবুর রস তীরবেগে তার দিকে ছুটে এসেছিল, গালে লেগে, গায়ে ছড়িয়ে তার হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট নষ্ট হয়ে যাবার কথা। কিন্তু অবাক্ হয়ে হাঁ করেছিল ব'লেই সেই বিচ্ছুরিত রস তার গালের মধ্যে ঢুকে গেল। বেঁচে গেল জামাটামা।

হাফশার্ট আর গোরা একসঙ্গে হাঁফ ছাড়ল।

চারদিকে ভিড় গেল জমে। দোকানের ওপর হাজার হাজার কিসমিস পেস্তা অবাক্ হয়ে ফিস ফিস করতে লাগল। আপেলগুলো চোখ বড়ো বড়ো ক'রে কমলালেবু কাবুলির কন্দিশন দেখছিল। কাবুলিটা কিছুক্ষণ তার বুদ্ধি হারিয়ে থাকার পর অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল। উঠে সে কলার খোসাটার বাপান্ত করতে করতে পৃথিবীর নানাস্থান থেকে তার জিনিষপত্র সংগ্রহ করতে সুরু করল। ডাস্টবিন থেকে লাঠিটা আনল, পাগড়িটা উদ্ধার করল দোকানের মাথা থেকে, লাঠির সাহায্যে পাড়তে হল তাকে। এক পাটি নাগরা আর এক দোকানে গিয়ে উঠেছিল, অপর পাটি নর্দমায় গড়াগড়ি যাচ্ছিল, তাদের আবার পদস্থ করতে কিছু সময় গেল তার।

অবশেষে কাবুলিটা যখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে একেবারে অন্য ফুটপাথ ধরল, কলার খোসা তখন পেয়ারার দিক ভ্রূক্ষেপ করল—কি হে, কেমন দেখলে?

পেয়ারাটা তখন লজ্জায় আরো সবুজ হয়ে গেছে, কলার খোসার চোখের আড়াল হতে পারলে বাঁচে তখন। মনে মনে তার আপসোস হচ্ছে—আহা এমন কাজ কি আমার দ্বারা হবে কখনো? ছি ছি! কী বৃথা গর্বই না করেছি! কী অপদার্থ আমি! আমার দ্বারা কিছুই হল না জীবনে! জীবন আমার বৃথায় গেল। ওর মতন অতুল কীর্তি রেখে যেতে কই পারলাম।

কলার খোসা তার মনের ভাব বুঝতে পেরে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তাতে কি হয়েছে! তুমি কোন দুঃখ ক'রো না। তোমার নিজের লাইনে যতটুকু করবার তুমি ক'রে যাও। যতটুকু তোমার শক্তি, যতটা সাধ্য, তাই তোমার কর্ত্তব্য। তাতেই তোমার সার্থকতা, তোমার জীবনের সাফল্য। অবশ্য, একথা ঠিক, একশো সের ওজনের এক অতিকায়কে আকাশে তুলে তার দ্বারা কমলালেবুর বাক্স ভাঙা তোমার সাধ্য না, তবে তোমারও কাজ আছে বইকি পৃথিবীতে। তুমিও কিছু নিষ্ফল যাবে না।...'

'না দাদা!' বলল পেয়ারাটা। তার আত্মবিশ্বাস তখন অনেকটা ট'লে গেছে। 'না দাদা! সবার জীবন সমান নয়। সবাই কিছু সফল হয় না। অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেকে তুচ্ছ হয়ে যায়। একটা বাতাবি লেবু এ কথা আমায় বলেছিল। ভদ্রলোকদের পাতে পড়বার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু শেষটায় অভদ্র যত পাড়ার ছেলেদের পায়ে প'ড়ে জীবনটা তার বরবাদ গেল। ছেলেরা তাকে ফুটবল খেলেই উড়িয়ে দিলে।'

'তাই ভেবে তুমি মন খারাপ ক'রো না। কাবুলি না হোক, একটা গাঁট্টাগোট্টা ছেলেকে কাবু করতে পারা—তাই কি কিছু কম কথা? এবং তাই যদি তুমি নিখুঁত ভাবে করতে পারো তাহলে একটা পাড়া অন্ততঃ একটা রাত তোমার ক্ষমতা হাড়ে হাড়ে টের পাবে আর ডাক্তাররা দু হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবে তোমায়।'

এতক্ষণে ডাঁশা পেয়ারটা একটু হাসল, তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আবার। কলার খোসার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—'দাদা, তোমার কীর্তিতে যা মুষড়ে দিয়েছিলে! তোমার কথায় আবার উৎসাহ পেলাম। তুমিই ধন্য দাদা!'

এই সময়ে অদূরে একটা হাফপ্যান্টের উদয় হতেই কলার খোসাটা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—'বলছিলাম না, তোমার জীবনও সফল হবে? তোমার জীবনেও ছেলে আসবে? ঐ দ্যাখো! আসছে ঐ!'

ডাঁশা পেয়ারাটা চোখ তুলে তাকাল—আসছে বটে একজন। ঠিক যে ধরণের বালকের তার প্রত্যাশা ছিল সেই রকমই বটে। ছেলের মতই ছেলে।

সে উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

এবং গোরাও।

ছেলেটা এল এবং তাকে কুড়িয়ে নিল। উদরস্থ হবার জন্য পেয়ারাটা তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে, প্রাণ দিয়েও নিজের জীবন সার্থক করতে সে পেছ-পা নয়। সফল তাকে হতেই হবে। কিন্তু ছেলেটা তাকে তুলে ধরে শুট করল উপরের দিকে। দারুণ এক শুট।

রাস্তার লোকজন এবং সেই ছেলেটা এবং গোরাও মোটরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যতদূর সম্ভব লক্ষ্য করবার চেষ্টা করল—কলার খোসাটাও। কিন্তু না, পেয়ারাটাকে আর দেখা গেল না।

গোরা বলল আমায়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না পেয়ারাটার? উচ্চ হতে হতে আরো উচ্চ হয়ে শেষ পর্যন্ত শূন্য হয়ে গেল সে! যাক্, জীবনে সার্থক না হোক, স্বর্গ তো পেল শেষটায়?'

—০—

অল্প বয়সে ভূত সম্বন্ধে কৌতুহল-মেশানো ভীতি সবারই থাকে, আমারও ছিল। ভূতের গল্প শুনতে ভাল লাগত বটে, কিন্তু বেশী ভয়ের গল্প হলে বেশ দু'চারদিন গা ছম্ ছম্ করত। মনে মনে তখন বলতুম, 'ভূত আমার পুত, শাঁকচুন্নি আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি!' ঠাকুমা ভূতের ভয় থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে এই মন্তরটা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রমশঃ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার একটা কৌতূহলও জেগেছিল মনে। তখন সত্য ঘটনা ব'লে কেউ ভূতের গল্প বললে, আমি তাকে চেপে ধ'রে প্রশ্ন করতুম, আপনি স্বচক্ষে ভূত দেখেছেন কি? অনেকেই তখন আমতা-আমতা ক'রে বলতেন, আমি নিজে দেখি নি, কিন্তু নিজে দেখেছে এমন লোকের মুখ থেকে শুনেছি।

আমার এক বড় ভগ্নীপতি ছিলেন, তিনি খুব ভাল গল্প বলতে পারতেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা ভূতের গল্প শুনতুম। নানা ভাবে অনেকবার নাকি তাঁর সঙ্গে ভূতের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল। তিনি সেই কাহিনীগুলি এমন ভাবে গুছিয়ে আমাদের কাছে বলতেন যে, আমরা ভয় পেলেও বার বার সেগুলি শুনতে চাইতুম। একবার তিনি তাঁর পিসতুতো ভাই-এর এমন একটি ঘটনা আমাদের কাছে বলেছিলেন, যা আজও ভুলতে পারি নি। ভুলতে পারি নি আরও এই জন্যে যে, সেই পিসতুতো ভাইকে ছোটবেলায় আমরাও দেখেছিলুম এবং এ-কাহিনী যে সত্য তা তিনি নিজেও আমাদের কাছে স্বীকার করেছিলেন।

ভগ্নীপতির এই পিসতুতো ভাই ছিলেন তাঁর বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। তাঁদের অবস্থাও বেশ ভাল ছিল। গ্রামের মধ্যে দোতলা কোঠা বাড়ী ছিল একমাত্র তাঁদেরই। জমি-জায়গার আয় থেকে সংসারই শুধু চ'লে যেত না, বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব পূজাআর্চাও হ'ত। ঐ পিসতুতো ভাই-এর বউটি ছিল ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। লক্ষ্মী-প্রতিমার মত বউটি শ্বশুরের ঘর আলো ক'রে ঘুরে বেড়াত। শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাযত্নে, ঘর-সংসারের কাজকর্মে সকলের মুখেই বউ-এর সুখ্যাতি আর ধরত না। কিন্তু বিয়ের পর সাত-আট বছর কেটে যাবার পরও বউ-এর যখন কোনো ছেলেপুলে হ'ল না, তখন পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন থেকে শ্বশুর-শাশুড়ী সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একমাত্র ছেলের কোনো ছেলেপুলে না হলে ছেলের বাপ-মায়ের ভাবনা হয় বৈ কি! তাঁরা বউ-এর ছেলেপুলে হবার জন্যে নানা ঠাকুর-দেবতার শরণাপন্ন হতে লাগলেন। এখানে-ওখানে বউ-এর নামে পূজাআর্চা দেন, মানত করেন। যে

ছিঃ মা, এ তুমি কি করতে যাচ্ছ?

যা বলে তাই ক'রে, বউ-এর হাতে গণ্ডা-কতক মাদুলী ঝুলিয়ে দিলেন। এমনি ক'রে আরও প্রায় বছর দুই কেটে গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। শেষে বউ-এর উপর কেমন যেন একটা বিরূপ ভাব দেখা দিতে লাগল শ্বশুর-শাশুড়ীর। বিশেষ ক'রে শাশুড়ীই সেটা প্রকাশ ক'রে ফেলতে লাগলেন নানা ভাবে। পাড়ার মেয়েরাও এসে যোগ দিতে লাগল তাঁর সঙ্গে। এমন টুকটুকে মিষ্টি বউ-এর মুখে ক্রমশঃ ভয়ে-ভাবনায় কে যেন এক রাশ কালি ঢেলে দিলে। সুঠাম, সুশ্রী চেহারা দিন দিন রোগা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে লাগল। অনেকে এমন কথাও বললে যে, বউ-এর উপর নিশ্চয়ই কোন অশরীরীর দৃষ্টি পড়েছে—তাই ছেলেপুলেও হচ্ছে না, আর শরীরটাকেও চুষে খাচ্ছে।

এই সব শুনতে শুনতে বউ-এর মনেও একদিন ধিক্কার এসে গেল। সে স্থির করলে, এ জীবন সে আর রাখবে না।

একদিন রাত-দুপুরে বাড়ীর পাশেই এক জল-থইথই দীঘিতে ডুবে আত্মহত্যা করবে ব'লে সে বেরিয়ে পড়ল চুপি চুপি। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বাড়ীর দরজা খুলে দীঘির পাড়ে এসে সে দাঁড়াল। চারিদিক আবছা চাঁদের আলোয় থম্ থম্ করছে। মৃত্যুভয় না থাকলেও, বউটি হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সামনেই বেল-গাছের তলায় এক ইয়া লম্বা-চওড়া পুরুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। আলো-আঁধারের মধ্যেও তাঁকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন বউটির কাছে। এসেই ধমকের সুরে বললেন, ছিঃ মা, এ তুমি কি করতে যাচ্ছ! যাও, ঘরে ফিরে যাও—শীগ্‌গিরই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তবে এ কথা আর কারুকে ব'লো না তুমি।

গলায় পৈতে, খালি গা, দীর্ঘাকার এই পুরুষকে প্রণাম ক'রে বউটি ভয়ে ভয়ে আবার পা-টিপে-টিপে বাড়ী ফিরে এলো। সকলে তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বাড়ীর কেউই এ কথা জানতে পারলে না।

পরদিন সকাল থেকে বউ হয়ে গেল একেবারে অন্য মানুষ। এতদিন মন-মরা হয়ে যে নিজের মৃত্যু কামনা
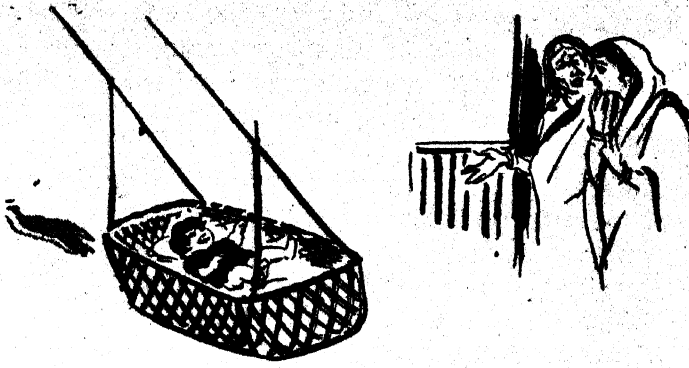
বাচ্চার ঠাকুমা বাড়ীর সবাইকে ব্যাপারটা ডেকে এনে দেখালেন।

করেছে,আজ তার মুখ হাসিখুশী, মনে আনন্দের জোয়ার! কয়েক মাস যেতে না যেতেই ক্রমশঃ বউ-এর কোলে বাচ্চা আসার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল সকলের কাছে। শ্বশুর-শাশুড়ী থেকে আরম্ভ ক'রে পাড়া-পড়শীদেরও আনন্দ আর ধরে না। বউ-এর তখন সে কি আদর-যত্ন! শাশুড়ী বলে, তুমি মা বেশী খাটাখুটি ক'রো না; শ্বশুর বলে, বউমাকে মাছের মুড়োটা দাও। আর তার স্বামীর তো কথাই নেই! সে যেখান থেকে যা পারে ভাল ভাল খাবার জিনিষ এনে দেয় বউকে।

এমনি ক'রে দিন যায়। ব্রহ্মদত্যি ব্রাহ্মণের কথাটা কিন্তু বউ-এর পেটের মধ্যে ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকে। স্বামীকে বলি-বলি ক'রেও ভয়ে বলতে পারে না। শেষে একদিন থাকতে না পেরে ব'লেই ফেললে। স্বামী তো শুনে একেবারে হতভম্ব! কিন্তু এই হতভম্ব ভাব সহজেই কেটে গেল, যখন একটি মিষ্টি হাত-পা-নাড়া জ্যান্ত ডলি পুতুলের মুখ ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল সে। মাথায় একরাশ কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, টানা-টানা চোখ, আর তুলতুলে দেহটা যেন ময়দার সঙ্গে আলতা গুলে তৈরি করেছে কে!

ছেলের মা-বাবা তো বটেই, এমন কি ঠাকুমা-ঠাকুর্দা থেকে আত্মীয়স্বজন সকলেই আঁতুড়-ঘরে গিয়ে বিভোর হয়ে যেত, এই সাত রাজার ধন মাণিককে দেখে—তার দিক্ থেকে কেউই চোখ ফেরাতে পারত না!

কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে, আঁতুড়-ঘরেই বিষাদের ছায়া নেমে এলো। বউটি হঠাৎ মারা গেল আটকড়ায়ের আগের দিন সেপ্‌টিক জ্বরে। মারা যাবার একটু আগেও বউটির বাচ্চার দিকে চেয়ে চেয়ে সে কি দেখা! বাচ্চার গায়ে একটা হাত রেখেই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

এমন ঘটনা ঘটবে তা কেউ ভাবতেও পারে নি! সবাই দুঃখে শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। কিন্তু এই শোককেও চাপা দিয়ে আর এক ঘটনা বাড়ীর সবাইকে ভয়ে-ভাবনায় একেবারে কাবু ক'রে ফেললে! ব্যাপারটা ঘটল ঐ নবজাত শিশুকে নিয়ে। মা-মরা বাচ্চাকে কি ক'রে বাঁচান যাবে, এই নিয়ে যখন সকলেই জল্পনা-কল্পনায় ব্যস্ত, তখন কোন্ এক অদৃশ্য হাত এসে যেন তার সব ভার নিজের হাত তুলে নিলে।

দুধের বাচ্চাকে মানুষ করার হাঙ্গামা অনেক। তাছাড়া মায়ের মত বুকের রক্ত আর স্নেহ-যত্ন দিয়ে কেউই পারে না সাত-আট দিনের বাচ্চাকে বাঁচাতে! কিন্তু এ হাঙ্গামা কারুকেই পোয়াতে হ'ল না, বরং বাচ্চার আনন্দ-উজ্জ্বল মুখ ও হালুচালু ভাব দেখে সবাই অবাক্ হয়ে গেল। ছেলের পেট যেন সারাক্ষণই ভ'রে আছে, খাওয়াতে গেলে খেতে চায় না, কান্নাকাটিও বেশী নেই। একটু কেঁদেই কাকে এদিক্-ওদিক্ দেখে আবার যেন চুপ ক'রে যায়, মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। গায়ের কাঁথা বা ঢাকা ভিজিয়ে ফেললে, কেউ বদলে দেবার আগেই, সেগুলি সবার অলক্ষ্যে কে যেন পাশে টেনে ফেলে আবার নতুন পাটকরা কাঁথা-কাপড় বদলে দেয়।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বাড়ীর কেউই তেমন ক'রে বুঝতে পারে নি, কিন্তু সেদিন বুঝল, যেদিন দেখল বাচ্চার দোলা বারান্দায় আপনা থেকেই দুলছে। বাচ্চার ঠাকুমা দোতলার বারান্দায় বাচ্চার জন্যে একটা বেতের দোলা টাঙিয়েছিলেন। মা-মরা এই ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে, দোলায় শুইয়ে দিয়ে, তিনি একটু নিশ্চিন্ত হতেন—সংসারের কাজকর্ম দেখতে পারতেন। কিন্তু এমন কাণ্ড যে ঘটতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। মানুষজন কেউ কোথাও নেই, অথচ দোলা আপনা থেকেই দুলছে! দুলতে দুলতে যেই দোলাটা থেমে আসছে, আবার যেন কেউ ঠেলে দিচ্ছে সেটাকে। বাচ্চার ঠাকুমা বাড়ীর সবাইকে ব্যাপারটা ডেকে এনে দেখালেন। দেখে সবাই তো থ হয়ে গেল!

কথাটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাড়া-পড়শীরা ভেঙে পড়ল বাড়ীতে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল আশেপাশের চারিদিকে। দূর দূর গ্রাম থেকেও লোক আসতে লাগল এই ভুতুড়ে দোলা দেখার জন্যে।

পাড়ার মাতব্বররা ছেলের বাপ ও ঠাকুর্দার কাছে, গিন্নীবান্নীরা ঠাকুমার কাছে গিয়ে বলতে লাগল রোজা ডাকিয়ে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করার জন্যে। গয়ায় গিয়ে মায়ের পিণ্ডি দিতেও বলল কেউ কেউ। কিন্তু এক বছরের আগে গয়ায় মৃতের পিণ্ডি দেবার রীতি নেই। তাছাড়া ছেলের বাপ এ সবে আপত্তি করলে। এ ব্যাপারে সে ভয় পেয়ে গেল আরও এই জন্যে যে, এতে হয়ত ঐ শিশুর জীবন নিয়েও টানাটানি হতে পারে!

শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করা হ'ল না। দিনের পর দিন এই ভুতুড়ে কাণ্ড চলতে লাগল বাড়ীতে। এক মাস, দু'মাস ক'রে ছেলে বড় হতে লাগল, হামা দিতে শিখল। ক্রমশঃ তার মুখে ভাত দেবার সময় এগিয়ে এলো। ছেলের মৃত মা-ই তখন অলক্ষ্যে থেকে তাকে তদারক করে, তার সঙ্গে খেলা করে। ছেলে উপরের ঘরে থেকে হাসে-খেলে। তাকে দেখার জন্যে ঠাকুমাকে আর উদ্‌গ্রীব হতে হয় না। শুধু একটি বুড়ী ঝিকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, বেশী টাকা দিয়ে, তার জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছে।

ব্যাপারটা বাড়ীর সকলের গা-সওয়া হয়ে গেলেও সবারই মনে একটা চাপা অস্বস্তি লেগে ছিল। তাছাড়া এক বছর হয়ে গেল অথচ ছেলের অন্নপ্রাশন হ'ল না! কতদিনই বা অস্বস্তিকর ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা টেনে যাওয়া যায়? এদিকে ছেলেও বড় হচ্ছে আর আত্মীয়স্বজনরাও যা-তা রটাচ্ছে! এমনি সময় ছেলের বাপ একদিন গয়ায় যাওয়াই স্থির করলে। যাওয়ার আগে তার বাপ-মার সঙ্গে যুক্তি ক'রে গেল যে, গয়া থেকে ফিরে এসেই ঘটা ক'রে তারা ছেলের মুখে ভাত দেবে।

কিন্তু তার আর সুযোগ হয় নি। গয়া থেকে ফিরে এসে ছেলের বাপ ছেলেকে আর দেখতে পায় নি! যেদিন সে গয়ায় তার কাজ শেষ করে, সেই দিনই গ্রামে ঐ শিশু ডিপথিরীয়ায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়।

আশেপাশের যারা এই ভুতুড়ে ঘটনার কথা জানত, তারা সকলেই একবাক্যে এই মৃত্যুসংবাদ শুনে বলেছিল, মা-ই নিয়ে গেল বাচ্চাটাকে তার কাছে!

—০—

নায়েব কাকার কাণ্ড

শ্রীআভা পাকড়াশী

খুব বর্ষা নেমেছে কলকাতায়। বালিগঞ্জ পার্কের ক্লাব-ঘর জমজমাট। "ইস্, শনিবারের বিকেলটা মাঠেই মারা গেল দেখছি," এই কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকল রমেন। ভিজে ছাতাটা এক পাশে মুড়ে রেখে চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখল, সভ্যেরা সকলেই প্রায় হাজির। এমনি বর্ষায় কারুর ঘরে ব'সেও মন টি'কছিল না আবার পার্কে নেমে যে ফুটবল খেলবে তারও উপায় নেই।

ওকে দেখেই সকলে মিলে হৈ চৈ ক'রে উঠল। "আরে থামো তোমরা সব, রমেন এসে গেছে, এবার গল্প জমানো যাক।" কেউ বলল ভুতের গল্প হোক; কেউ ডিটেকৃটিভ, আবার অনেকে চাইল হাসির গল্প শুনতে। কারণ রমেনের গল্প শুনে প্রাণ খুলে হেসে মনের ভার বেশ লাঘব করা যায়। দিনকালের সব ব্যাপারে এই বয়সেই শহুরে ছেলেরা যেন সব "রামগরুড়ের ছানা" হয়ে পড়ছে। রমেন বেশ রসিয়ে গল্প বলতে পারে। তাছাড়া ওর অভিজ্ঞতার ঝুলিটিও ভরা।

কেননা ও আসছে পাকিস্তান থেকে। আর ভুতই বলো, অ্যাডভেঞ্চারই বলো, পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামের ছেলেদের ওসব একচেটে।

সকলের পীড়াপীড়িতে রমেন বলে, "গল্প মনে পড়ছে না ভাই, তবে কয়েকটা মজার ঘটনা বলছি, হাসি পায় তো হেসো।" "আরে তাই সুরু ক'রে দাও" সকলে ব'লে ওঠে সমস্বরে।

রমেন সুরু করল।

আমাদের একজন কাকা ছিলেন গ্রাম-সম্পর্কে। তিনি আবার বাবাকে জমিদারী কাজে সাহায্য করতেন, তাই আমরা তাঁকে নায়েব কাকা বলতাম। ভারি আমুদে, সরল আর মজার মানুষ ছিলেন ইনি। আমরাও খুব দৌরাত্ম্য করতাম তাঁর ওপর। উনি খেতেও পারতেন খুব। মাঝারি গোছের একটা কাঁঠাল একাই খেতে পারতেন। অমনি ক'রে খেয়ে একবার মাকে খুব জব্দ করেছিলেন। জমিদারী কাজে আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই

।সে থাকতে হ'ত তাঁকে। যে ঘরে ওঁকে শুতে দেওয়া হয়েছিল সেই ঘরের তক্তপোশের নীচে ছ'টা কাঁঠাল পেড়ে রাখা হয়েছিল সত্যনারায়ণের পূজোর জন্তে। উনি তার থেকে দুটি আলাদা ক'রে সরিয়ে রেখে আর চার দিনে চারটে কাঁঠাল শেষ ক'রে লম্বা দিলেন। পূজোর দিন মা কাঁঠাল বার করতে গিয়ে দেখেন চারটে কাঁঠালের ভেতর ইট পাটকেল ঠাসা। এর আগে মা যতবার বলেছেন, "ঠাকুরপো, আপনি হেঁটে গেলে যেন কাঁঠালের গন্ধ পাচ্ছি?" উত্তর পেয়েছেন, "কি যে কন মেজ বৌঠান? চৌকির নীচে কাঁঠাল রাখছেন। তাই গন্ধ বারাইছে কাপড়ে।"

এই তড়বড়ে বেঁটে খাট মানুষ নায়েব কাকাটি থাকতেন খুবই সাধারণ ভাবে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে মজা করবার জন্ত বলতেন, "তোমরা আর কিসের জমিদার? জমিদারী তো আমি করি। হাতীতে ছাড়া চড়ি না গাঁয়ে, শহুরে এলে ইটালিয়ান 'ভেলিকো' গাড়ী। মহালে যখন থাকি রাজার হালে খাইদাই। আমিই তো হলাম বড়লোক।" কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। আমরা তো থাকতাম শহরে। বাবা ছিলেন একটু লাজুক মুখচোরা মানুষ। বেশী যেতেন না মহালে। প্রজারা ওঁকেই কাছে পেত। শাসনও করতেন উনি, আবার তাদের দায়েদৈবে দেখতেনও উনি। ডাক এল কার অসুখ করেছে, শীত নেই গ্রীষ্ম নেই অর্দ্ধেক রাতেও হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্সটি নিয়ে গরুর গাড়ীতে রওনা দিলেন কাকা। রাত জেগে তার চিকিৎসা ক'রে, দরকার হলে নিজের পয়সায় তাকে পথ্যি দিয়ে, সুস্থ ক'রে তবে ওঁর ছুটি। কার চালে খড় নেই, কার ঘরে খাবার ধান নেই সম্বৎসরের, সব খবর ওঁর নেওয়া চাই। নিঃসন্তান কাকা কাকীমা ঐ গরীব চাষা-প্রজাদের জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সন্তান-জ্ঞানে স্নেহ করতেন। তারাও ওঁকে দেবতার মত ভক্তি করত। এই নিঃস্বার্থ মানুষটিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত তারা। এঁর মুখের গালাগালকে তারা আশীর্ব্বাদ মনে করত। কেউ কোন অন্যায় করলে তার বিচার করতেন কাকা। ওঁর বিচার খুশী মনেই দুপক্ষ মেনে নিত। কারুর কোন অন্যায় দেখলেই কিন্তু বেদম বকুনি লাগাতেন তাকে। "হালারে মাইরা ফেলুম" ছিল তাঁর মুখের বুল্‌কি।

ওরা ব'লে ওঠে, "নে, তুই যে দেখছি কাকার সুখ্যাতিতেই পঞ্চমুখ হয়ে উঠলি, দু'একটা মজার কথা বল্? এ আবার কোন্ দেশী হাসির গল্প?"

অপ্রস্তুত হয়ে রমেন বলে, "দাঁড়া না বলছি, ওঁর স্বভাবটা কেমন না বললে গল্প জমবে কি ক'রে?" আসলে রমেন সেই আগেকার দিনগুলিতে চ'লে গিয়েছিল মনে মনে।

হ্যাঁ, সেদিন হঠাৎ রাত্রিবেলা কাকা এসে বললেন, "আজ আমারে রাইতের গাড়ীতেই একবার বামনডাঙ্গা যাইতেই হইব। রহমৎএর মাইয়ার বিয়া, আমারে অনেক কইরা যাইতে কইছিল, একদম ভুইলা গেছি।" বাবা ওঁর ঘুমের বহর জানতেন তাই বারণ করলেন। বললেন, "আজ বাদ দাও যাওয়াটা, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়। কাল দিনে দিনে যেও।" কিন্তু উনি নাছোড়বান্দা। আসলে রহমৎ-এর মেয়ের সাদিতে দই-চিঁড়ের ফলারের চিঁড়ে জোগাবেন উনি। কথা দিয়েছেন। চিঁড়েও মজুত। যেতেই হবে। কারণ কালই বিয়ে। তবু "অল্প দুটি খাইয়া লই" ব'লে ব'সে গেছেন আমাদের সঙ্গে। কলকাতার বাজার তো নয়? বাড়ীতে কাটা পাঁঠার মাংস আর ঘন দুধ ও ভাত। অম্লানবদনে প্রায় আধসেরটাক মাংস সহযোগে একথালা গরম গরম ভাত উদরস্থ করলেন। তার পর বিরাট এক ঢেঁকুর তুলে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললেন, "সারছে। আজ আবার মাংস রাঁধছিলা ক্যান্ ঠাকুর? খাওয়াটা যেন বড় জব্বর হইয়া গ্যাল।" এইবার গলাবন্ধ কোটটি গায়ে দিয়ে, কড়ে আঙুল বের করা বিবর্ণ ক্যানভাসের জুতা জোড়া পায় গলিয়ে two bull power-এর 'ভেলিকো' গাড়ীতে রওনা দিলেন স্টেশনে। গাড়ীর নীচের ঝুলন্ত back lightটা আস্তে আস্তে পুকুরের পাড় ঘুরে দুলতে দুলতে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাত বেশ হয়েছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে সমস্বরে। আমরা গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা একটা চেঁচামেচিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। উস্কোখুস্কো চুল, লাল করমচার মত চোখ নিয়ে নায়েব কাকা হাতমুখ নেড়ে বাবাকে বলছেন শুনলাম, "ঐ যে কাল যাওনের আগেই আপনে টুকছিলেন, এয়ার লাইগাই তো যাবার পারলাম না। সারারাত কি হয়রানিটা যে গেল। রংপুর থিকা টিকিট কইরা সবে একটু জুতজাত কইরা বসছি গাড়ীতে, বোধ করি একটু তন্দ্রা আইছিল। চোখ খুইলা দেখি বামনডাঙ্গা ছাড়াইয়া গেছি। উয়ার পরের স্টেশনে আইছি। নামডাঙ্গায় লাইমা পড়লাম তাড়াতাড়ি। তারপর গার্ডেরে অনেক কইলা কইয়া আবার পরের গাড়ীতে চাইপা বসলাম। ঠিক করলাম, এইবার চক্ষু-দুইডা খুইলা বইসা থাকুম।" মাথাটা

একটু চুলকে বলেন, "বুঝি, কাল ঐ পেট ঠাইসা খাওনের লাইগাই মরণটি হইল। এবার মাথা তুইলাই দেখি, বামনডাঙ্গা আবার পার কইরা আইছি। চৌধুরাণী স্টেশন। উয়ার আগেরটা বামনডাঙ্গা আছিল। আর নামি নাই। ধুত্তোর বইলা চইলা আইলাম। চিড়ার থইলাডা আজম আলিরে দিয়া আইলাম। সকালের ফেরত গাড়ীতে চইলা গেল। আমি আর যামু না।"

হাসির রোল প'ড়ে গেল ক্লাব ঘরে। কারণ ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ভদ্রলোক সারারাত ধ'রে বামনডাঙ্গা স্টেশনেরই এদিক্ আর ওদিক্ করেছেন। স্থানে পৌঁছতে আর পারেন নি।

আর একবার হাতীতে চ'ড়ে এসেছেন রংপুরে। আমাদের এই হাতীটি ছিল ওঁর বড় প্রিয়। মেয়ের মত স্নেহ করতেন। নাম রেখেছিলেন 'মণিমালা'। আদরিণী হাতীকে বেশী কষ্ট দিতেন না। মণিমালাও ঐ আদর বেশ বুঝত। তাই তিন ঘণ্টার পথ ছ' ঘণ্টায় চলত। ধীরে, ধীরে; তুলকি চালে। বামনডাঙ্গা থেকে এসেছে হাতী। প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ মাইল রাস্তা হেঁটেছে। পুরো একদিন বিশ্রাম দিতে হবে ওকে। বাড়ীতে লক্ষ্মী এসেছে। মা নিজে হাতে ওর মাথায় তেল-সিঁদুর দিয়ে, ধামায় ক'রে চাল এনে খেতে দিলেন মণিমালাকে। মালীকে ব'লে কাকা কচি কচি কলাগাছ আনালেন ওর জন্যে। আমরা ওর কাছাকাছি ঘুরছি।

পরদিন আমরাও বামনডাঙ্গা যাব ঠিক হ'ল। আমাদের নতুন কেনা শেভ্রলেয় চ'ড়ে বড়দা আর ড্রাইভার পালা ক'রে চালাবে ঠিক হ'ল। বাবা কলকাতায় গেছেন। বড়দার তাই খুব উৎসাহ। এই মওকায় ড্রাইভিংটা আরও একটু ভাল ক'রে রপ্ত ক'রে নেবে।

কিন্তু নায়েবকাকার সব বড়লোকী ব্যবস্থা। অপ্রসন্নমুখে বললেন—"দেখ, তুমরা আইজকাইলকার পোলা-পানেরা কিছু বুঝবার চাও না। বিনা এত্তেলায় জমিদার বাবুরা যাইলে মান-সম্মান থাকে নাকি? আমার মাথাডা হেঁট কইরা ছাড়বা দেখি। আগে আমারে রওনা কইরা দেও। আমি যাইয়া সব জানান দেই, তবে সেনা তুমরা যাইবা? তা না—যত্তসব।"

তাই ঠিক হ'ল। কাকা ভোর ভোর হাতীতে চ'ড়ে আগে রওনা হয়ে যাবেন। আর তার পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পর ধীরেসুস্থে আমরা রওনা হব।

সকালে যাবার আগে পই পই ক'রে বড়দাকে মানা ক'রে গেলেন, তাড়াতাড়ি রওনা হতে বা রাস্তায় হর্ণ দিতে। কেন না হাতীটা গাঁয় থাকে। মোটর কখনো দেখে নি। তার শব্দে বা হর্ণে তো মোটেই অভ্যস্ত নয়। পেছনে আচমকা ওগুলোর বিকট শব্দ শুনলে ঘাবড়ে গিয়ে কি ক'রে বসে তার ঠিক নেই।

খুব আশ্বাস দিয়ে ওঁকে রওনা করিয়ে দিল বড়দা। তারপর অধৈর্য্য হয়ে সমানে ঘড়ি দেখছে। যাই হোক, তোড়জোড় ক'রে আমাদের নিয়ে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর রওনা হ'ল। বড়দাই চালাচ্ছে। পাশে ড্রাইভার বীরেনবাবু ব'সে। বেগতিক দেখলেই সামলে নেবে। পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পার ক'রেই বেরুনো হয়েছে কাকার নির্দ্দেশ মত।

প্রথম ষ্টিয়ারিং হাতে পাওয়ার আনন্দে বড়দা বেশ জোরেই চালাচ্ছে। স্পীডের মাথায় এক্সিলারেটরে চাপ মারায় গাড়ীতে শব্দ উঠছে গোঁ—ও গোঁওও। বেশ খানিকটা উজিয়ে আসার পর হঠাৎ হাতীর গলার ঘণ্টার শব্দ পাওয়া গেল ঢং ঢং। সর্ব্বনাশ। এ কি? কাকা এখনো রাস্তায়? ছি, ছি, হাতীটা যে গাড়ীর শব্দে রাস্তা ছেড়ে বন-বাদাড় ভেঙে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে জঙ্গলের দিকে? কি হবে এখন? কাকার বিপদের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি আমরা। এবার বীরেনবাবুর হাতে গাড়ী ছেড়ে দিয়ে বড়দা বলে, "তাড়াতাড়ি চলুন। ওখানে গিয়ে লোক জোগাড় ক'রে পাঠাতে হবে এক্ষুণি। ছি, ছি, কি কাণ্ড হয়ে গেল! কাকা আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খেয়েছেন হাতীটার। চলতেই চায় না।"

কাছারিবাড়ীর বারান্দায় অস্থির হয়ে পায়চারি করছে বড়দা। আমরাও অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করছি। বেশ কিছুক্ষণ পর দূরের মাঠে কয়েকজনকে আসতে দেখা গেল। একটু কাছে আসতে দেখা গেল, মাহুত কৈলাসের কাঁধে ভর দিয়ে অতি কষ্টে আসছেন কাকা। গরুর গাড়ী পাঠান হয়েছিল, সেটা গেল কোন্‌দিকে?

এবারে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনরকমে পৌঁছেই দাওয়ার ওপর ধপাস ক'রে ব'সে প'ড়ে কাঁদ কাঁদ গলায় ব'লে ওঠেন কাকা, "দেখ দেখি, আমার কি দশাডা করছ তোমরা? হাজার বার কইয়া আইছিলাম না ঘণ্টা পাঁচ-ছয় পরে
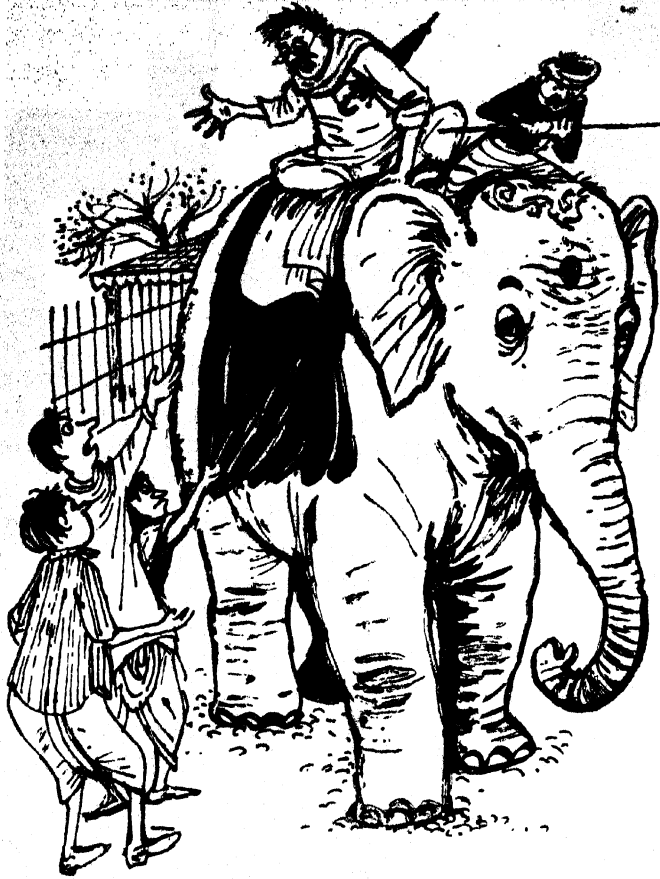
কাকাকে পিঠে নিয়ে ঠায় গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বারাইবার লাইগা ? তা না, পিছনে আইসা ঐরকম বিকট শব্দ করলা আর শালার হাতীডা আমারে লইয়া দৌড় পারিয়া বোল্লার* চাকে ঠাইসা ধরল। ভয়ে চক্ষু বন্ধ কইরা খাড়ায়া রইলো, যাওনের রাস্তা নাই। আর বোল্লায় আমারে কাইটা একেবারে কোল-বালিস বানাইয়া ছাড়ছে। আমি আজই জমিদারীর কাজে ইস্তফা দিমু।"

বড়দা করুণ সুরে কাকুতি-মিনতি করে। অন্ততঃ বাবার কানে যেন কথাটা না যায়। যদিও জানে কাকা কিছুই বলবেন না, তবু খোসামোদ করে। কিন্তু কাকা যখন রেগেছেন, গালাগাল দেবেনই। কোন কথা না শুনে পকেট থেকে ফাউন্টেন পেন বার করেন—কাকা, পরক্ষণেই চেঁচিয়ে ককিয়ে ওঠেন, "হায় হায়, আমার কত সাধের ফাউন্টেনের শরীরডাই নাই, মাথাটুক দিয়া কি করুম ? এই, তোমারেই একটা নতুন কলম কিইনা দিতে হইব। না হইলে বেবাক কইয়া দিমু কর্ত্তারে।"

"দেব কাকা, নিশ্চয়ই দেব" ব'লে বড়দা চাকরদের বলে, "হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? তামাকের জল এনে ঢেলে দে কাকার গায়।"

শুধু ক্যাপটা আটকেছিল জামার পকেটে, পেনটা প'ড়ে গিয়েছিল জঙ্গলে। আমরা গোপনে ঘরের মধ্যে

* বোল্‌তা।

গড়াগড়ি দিয়ে হাসছি তখন। একে বেঁটে খাট মানুষটি, তায় বোল্‌তার কামড়ে একেবারে ফুলে ঢোল।

পরদিন সকালে দেখি কুয়োর-পাড়ে ছাই দিয়ে দাঁত মাজছেন নায়েব কাকা। পরনে একটি গামছা। আমি তাই দেখে বলে উঠলাম, "আপনি বড়লোক মানুষ! এই ঘুঁটের ছাই দিয়ে দন্তধাবন করাটা কি আপনার পক্ষে ঠিক শোভা পাচ্ছে?" তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠে, এক মুঠো ছাই হাতে নিয়ে কৃত্রিম রাগে চীৎকার ক'রে বলেন, "কি? কি কইলা? এই বুদ্ধি নিয়া ইস্কুলে পড়? আরে বোকা, এইটা হইল 'ডায়মণ্ড ডাষ্ট', খাঁটি হীরক-চূর্ণ। ইহা, কয় কিনা ঘুঁটের ছাই?" তাঁর ঐ ছেঁড়া কেড্‌স্ পায় কেন? একথা জিজ্ঞেস করলেই চুপি চুপি ব'লে উঠতেন, ছি, ছি, আর কারেও কইয়ো না যেন, লোকে হাসব। গাঁয় থাক, শহরের হাল-চাল জানবা কেমনে? ইয়ার নাম 'অ্যালবার্ট শু', মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী ইয়ার প্রবর্ত্তন করছিলেন।" আর ঐ তেলচিটে কোট, ওটা নাকি কলকাতার সেই সময়ের সব চেয়ে বড় দর্জ্জির দোকান 'র‍্যাঙ্কিন' থেকে তৈরী হয়ে এসেছে। আর আমাদের ... horse power-এর শেভ্ থেকে ওঁর গরুর গাড়ী কম কিসে? সেটা হ'ল গিয়ে Two bull power-এর ইটালিয়ান 'ভেলিকো' গাড়ী। সেই জন্য নিজেকে বলতেন, 'বড়লোক'। অন্তরের ঐশ্বর্য্যে সত্যিই তিনি বড়লোক ছিলেন। সরল নিরহঙ্কার মানুষ। পোশাকের প্রতি ভ্রূক্ষেপও ছিল না। তাঁর ঐ পেটেণ্ট জিনিষ ক'টি ছাড়া অন্য জিনিষ দিলেও নিতেন না। আর নিলেও তা দান ক'রে দিতেন।

এবার আর একটা মজার ঘটনা ব'লে আমার এই কাহিনী শেষ করি।

সেদিন আবার তাড়াতাড়ি বামনডাঙ্গার স্টেশনে পৌঁছতে হবে নায়েব কাকাকে। আমার দিদির বিয়ের পাকা দেখা। রংপুর সেদিন পৌঁছতেই হবে ওঁকে। না হলে পাকাফলার মারা যায়। তাছাড়া কাজেকর্মে উনি কাছে না থাকলে মা-বাবা দু'জনেরই চক্ষু অন্ধকার। কুটুম্বদের বসানর ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ ক'রে ভিয়েনের বামুনের ফর্দ্দের বায়না মেটান পর্য্যন্ত, সবতাতেই কাকা সমান ওস্তাদ।

একে বেরুতে দেরী হয়ে গেছে রোগী দেখতে গিয়ে। তায় মণিমালা দুল্‌কি চালে চলেছে। সেদিনের ব্যাপারে কাকা একটু চ'টেই ছিলেন ওর ওপর। "চালাও", হুকুম দিলেন মাহুতকে। "ভাগাও হাতীডারে, দৌড়াও। আর সময় নাই যে। শালার হাতী, খাইয়া খাইয়া খোদার খাসি বনছে, একেবারে চলতে পারে না তেজে।" এমনি ক'রে হাতীটাকে দৌড় করিয়ে যখন স্টেশনে এসে পৌঁছলেন তখন ট্রেন লাস্ট হুইস্‌ল্ দিয়েছে। ছাতটা হাতে নিয়ে উত্তেজনায় প্রায় দাঁড়িয়ে উঠে মাহুতকে বলেন, "বসা, বসা, ওরে জলদি:বসা হাতীডারে। গাড়ী যে ছাইড়া যায়।" আর বসা—দৌড় করানর দরুন আদরিণী হাতীর তখন রাগ হয়েছে। কিছুতেই বসল না। কাকাকে পিঠে নিয়ে ঠায় গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর ওর পিঠে ব'সে ছট্‌ফট্ করতে করতে কাকা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনটা হুস্ হুস্ ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেল। আর ঠিক তক্ষুনি বসল মণিমালা। হাতীর খুব বুদ্ধি হয় তো, তাই বুঝিয়ে দিল, যে জন্যে আমাকে দৌড় করিয়েছ, তা হতে দেব না কিছুতেই। যেতেই দেব না তোমাকে।

গল্প শুনে সকলের হাসতে হাসতে পেটে খিল ধ'রে গিয়েছিল। বাইরে বৃষ্টিও ধ'রে এসেছে দেখে এবার যে যার বাড়ী রওনা দিল।

—০—

ঘুঁটেরাম সংবাদ

রবিদাস সাহা রায়

ঘুঁটেরাম চামারিয়া থাকে বড়বাজারে,
দিনরাত গোনে টাকা লাখে আর হাজারে।
নিজের দেশেতে তার ছিল নাকো সম্বল,
বাংলা মুলুকে এলো নিয়ে লোটা কম্বল।
খুললো এখানে এসে আড়তের কারবার,
রাতারাতি বরাত সে উল্টায় বারবার।
তারপর জোচ্চুরি কিছু টাকা কামিয়ে
নূতন ব্যবসা এক খোলে মাথা ঘামিয়ে।
কিনলো আটার ভুষি দাম পেয়ে সস্তা,
পাথরের কুচি কেনে শ'তিনেক বস্তা।
দশ সের ভুষি দেয় এক মণ আটাতে,
কাঁকর মিশায় চালে যত পারে খাটাতে।
মাটি দিয়ে কালো জিরে করে রং মিশিয়ে,
তেঁতুলের বীচি দেয় ময়দাতে পিষিয়ে।
সোডাতে মিশায় নুন, ঘিয়ে দেয় দালদা,
রেলেতে চালান করে বাঁকুড়া ও মালদা।
দিনে দিনে ফেঁপে ওঠে ভেজালের কারবার,
কলকাতা শহরেই হ'ল কতো বাড়ী তার।
মোটর হাঁকিয়ে চলে চামারিয়া ঘুঁটেরাম,
দিনে দিনে বাড়ে ভুঁড়ি, সাথে সাথে বাড়ে নাম।

একদিন পুলিসের হুঁস বুঝি জাগল,
চুপি চুপি তার পিছে কেউ সব লাগল।
গুদাম ঘেরাও করি' পেয়ে যায় বিস্তর,
ভুষি, তেঁতুলের বীচি, মাটি আর প্রস্তর।
ঘুঁটেরাম চামারিয়া এ খবর শুনল,
ভুঁড়ি কাঁপে দুরু দুরু—বিপদ্ সে গুনল।
ভাবে মনে, হায় হায়, গেল সব ধনমান,
তার চেয়ে ভালো হয় যায় যদি এই প্রাণ!
এখনি পুলিস তাকে আসবে যে ধরতে,
তার আগে নিশ্চয় হবে তাকে মরতে।
সায়ানাইড বিষ আছে অতিশয় তীব্র,
বিনা কষ্টেতে লোক মরে খুব শীঘ্র।
ঘুঁটেরাম সেই বিষ আনি' দুই পুরিয়া,
তাড়াতাড়ি জল দিয়ে মুখে দিল পুরিয়া।
চোখের পলকে সে তো এখনই মরবে,
পুলিসকে আজ খুব জব্দটি করবে।

টিক্ টিক্ ঘড়ি চলে—কেটে যায় ঘণ্টা,
ঘুঁটেরাম মরে না তো, ঘাবড়ায় মনটা।
ঐ যে পুলিস আসে—কপাল কি মন্দ,
বিষেতে ভেজাল ছিল নাই কোন সন্দ!
নিমকহারামি বিষ তার সাথে করল,
তিনটে পুলিস এসে জাপটিয়ে ধরল।

ঠকিয়েছে লোক কত ভেজালের কায়দায়,
ভেজাল ঠকাল তাকে শেষকালে হায় হায়!

—•—

কানাই সামন্ত

লাল পুতুলের বিয়ে
পান্তুয়ারাজ-পুত্র-সঙ্গে
ভোট-মুলুকে কালিম্পঙে
(তুলনা নেই রাঢ়ে বঙ্গে)
খুঞ্চেপোশের উড়্‌নি মাথায় দিয়ে।

বাজায় বাঁশি, বাজায় কাঁশি,
বাজছে জগঝম্প—
লম্ফ ভায় গো হনুমানে,
ছাতারে আর টিয়ের গানে
তালা লাগিয়ে দিচ্ছে কানে,
জাম্বুবানের গায়ে জ্বরের কম্প।

পাদুম্-লামা হাদুম্-লামার
বড়োই লম্বা টিকি—
হেঁকে বলেন, থামা! থামা!
সুর সেধে নে 'গা ধা মা মা',
মল্লারে খুব বিষ্টি নামা—
ক'নের মামা রেগে আগুন, কী!—কী!

গানের তোরা গ জানিস নে
তিব্বতী ভূতগুলি।
গণ্ডগোলে কৃতবিদ্য
আমরা অসুর বেতাল-সিদ্ধ,
করলে তোদের মর্ম বিদ্ধ
বাধবে বিষম কাণ্ড চুলোচুলি।

লামা হঠাৎ থামা দিতেই
হকচকিয়ে গিয়ে,
হ্যাচ্চো হ্যাচ্চো কেবল হাঁচ্‌চে,
দিল্লী লাহোর আওয়াজ যাচ্চে,
কেবা তখন দেখতে পাচ্চে—
তুতুল, না, না, পুতুল খাম্‌চি দিয়ে।

পান্তুয়ারই একটুখানি
চেখে দেখেন—বা রে!
মিষ্টি মিষ্টি খেতে তো বেশ!
খেতে খেতেই পান্তুয়া শেষ।
মন্ত্র পড়বার সময় বিশেষ
বর খুঁজে কেউ পায় না চারি ধারে।

'বর কোথা গো, বর গেল কৈ
পান্তুয়া-রাজ-পুত?
লাল পুতুলের বিয়েই কেমন
অদ্‌ভুত! অদ্ভুত!'
তুতুল তখন— মানে পুতুল—
দে— ছুট, দে— ছুট—
কাকার কোলে চ'ড়ে বলে,
দাও লিলি-বিস্কুট,
পান্তুয়া কী ভীষণ মিষ্টি!
'ওমা, এমন অনাছিষ্টি!
কাণ্ড তোমার কী এ!
ঢ্যাম্ কুড়্ কুড়্ বাদ্যি বাজে,
খুঞ্চেপোশের উড়নি মাথায় দিয়ে
এই বুঝি, লাল পুতুল, তোমার বিয়ে!'

ক'নের বয়স ৪, ক'নের কাকাটি কবি। কালিম্পঙ্গে বিয়ের দিনক্ষণ একদা আশ্বিনে, যখন আকাশ-জোড়া জোড়া রামধনুর নীচে বৃষ্টিতে রোদেতে লুকোচুরি আর ছুটোছুটি—আর, মা-ঠাকুমাদের মতে শ্রীযুক্ত শিব-ঠাকুরেরও বিবাহ।

পুতুলেরা নাচে

শৈল চক্রবর্তী

বাজারে একরকম সস্তার খেলনা পাওয়া যায়, যার নাম দেওয়া যায় 'হাত-পা নাড়া সৈনিক বা সঙ'। এটি আর কিছু না—একটি কাঠির ওপরে শক্ত বোর্ডের কাটা একটি মানুষ। তার হাত আছে, পা আছে, মাথা আছে। মজা হচ্ছে, কাঠিটি আঙুলে চেপে ঘোরালে হাত পাগুলি নড়তে থাকে। সেগুলি উঁচুতে ওঠে এবং নেমে যায়। তাড়াতাড়ি সোজা উল্টো ঘোরাতে থাকলে আরো মজা। মনে হবে সঙের মত মানুষটি শূন্যে হাত পা ছুঁড়ছে।

আর একরকম দু'চার পয়সার একটি খেলনা তোমরা দেখেছ যাতে দুটি কাঠ টিপে ধরলে ওপরে দড়িতে ঝোলা একটি সার্কাসের খেলোয়াড় ডিগবাজি খেতে থাকে। যেন সে দু'হাতে বার ধ'রে ভল্ট খাচ্ছে। এটিও শক্ত কাগজ বা কার্ড বোর্ডে তৈরী মানুষ। এর ঝাঁপ খাওয়া, দোল-খাওয়া, ভল্ট খাওয়া দেখতে বেশ কৌতুককর।

এই সাধারণ খেলনার কথা তোমাদের বলছি কেন, নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারনি। আমি যে কথাটি বলতে যাচ্ছি, সেটি হচ্ছে পুতুল ও তার নড়ন-চড়নের গল্প। পুতুল নিয়ে ছোটবেলায় খেলে না কে? সব দেশের সব ছেলে-মেয়েরাই খেলে। তাই

রাজা ও হাতী
উপর থেকে সুতো দিয়ে নাচাবার পুতুল
রাজপুতানার এই রকম পুতুল দেখা যায়।

নয় কি ? কিন্তু পুতুলকে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে নাচিয়ে গাইয়ে যে খেলা এতে সবার আগ্রহ। এতে মেতে ওঠে ছোটরা শুধু নয়, বড়রাও। ছেলে মেয়ে ছোট বড় এমন কেউ নেই যে, পুতুলের অভিনয় দেখে মুগ্ধ না হয়।

এখনকার দিনে তোমরা সিনেমা দেখ। কখনো বা থিয়েটার দেখ। আগেকার দিনের ছেলেমেয়েরা এসব দেখতে পেত না। তারা এগুলোর বদলে অনেক অন্য রকম খেলা দেখত, তার মধ্যে ছিল পুতুল নাচ।

সারা এশিয়া জুড়ে তখন ছিল পুতুলদের আসর। জাভাতে বলিদ্বীপে চীনে জাপানে ইন্দোনেশিয়ায় ভারতবর্ষে কত রকম রকম পুতুল নাচের আসর বসত।

আজও জয়পুর থেকে ছোট ছোট দল পুতুলের পুঁটলি মাথায় নিয়ে কলকাতায় আসে। মাঝে মাঝে তারা এসে হাজির হয়। কয়েকটা টাকা দিলেই তারা এক অদ্ভুত বাজনার সঙ্গে পুতুলনাচ দেখায়। বাংলাদেশেও ছিল অনেক দল। মাঝে মাঝে গ্রামের হাটে বাজারে মেলায় তাদের ডাক পড়ে। কিন্তু সারা বছর তারা প্রায় ব'সে থাকে ঘরে। কেউ বা ব'সে ব'সে কাঠ চেঁচে-ছুলে পুতুলের মুণ্ডু বানায়। কেউ বা সেলাই করে পুতুলের পোশাক।

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পুতুলনাচ দেখে থাকবে। কারুর বা এবিষয়ে দেখার এবং [illegible]র আগ্রহ থাকতে পারে। আমার ত নিজের এ জিনিষটা যে কি ভাল লাগে তা আর কি বলব! তাই অবসর [illegible]য়ে ঘরে ব'সে ব'সে তৈরি করি নানা পুতুলের চরি[illegible]। ছোট বাচ্চাদের স্টেজ ক'রে দিই, তারাও মেতে ও[illegible] পুতুল নাচাতে।

এ এক নতুন জগৎ। এতে আছে ছবি [illegible]র কাজ, মূর্তি গড়ার কাজ, রং দেওয়ার কাজ, [illegible]মা-পোশাক তৈরির কাজ, পুঁতি বা চুমকি বা জরি [illegible]য়ে সাজানোর কাজ। আরো আছে হাজার রকমের [illegible]— মায় শেষ অবধি স্টেজ তৈরি, সীন তৈরি। তারপর আছে নাটক বেছে নিয়ে পুতুলদের দিয়ে অভিনয় করানো।

কাঠি দিয়ে নাচাবার পুতুল-রাণী।

এত রকম কাজের কথা শুনে তোমরা লাফিয়ে উঠছ, কেমন ? কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই। সব কাজগুলিই বেশ মজার। করতে খুব আনন্দ আছে। আনন্দ এই জন্যে যে, তুমি গড়ছ, তোমার রুচি দিয়ে তুমি সৃষ্টি করছ। আর শুধু তাই নয়, প্রতি পদে পদে নানান অসুবিধাকে তুমি বুদ্ধি দিয়ে, কৌশল দিয়ে জয় করছ।

আচ্ছা, এইবার একটু কাজের কথা বলি। আজকালকার দিনে পৃথিবীতে নানা রকমের পুতুলনাচ হচ্ছে। সুতো বেঁধে নাচানো খুব একটা প্রাচীন পদ্ধতি। তাছাড়া বড় বড় কাঠের পুতুলকে রড বা খুঁটি ধ'রে নাড়ানো তাও আছে। এ ছাড়া হাতের আঙুলে মুণ্ডু পরিয়ে অন্য দুটি আঙুলকে পুতুলের দুই হাত বানিয়ে নেওয়া যায়। এটিকে বলে গ্লাভ পাপেট (Glove Puppet)। সবগুলিকেই বেশ কিছুদিন ধ'রে অভ্যাস ক'রে ক'রে রপ্ত করতে হয়।

এখন তোমাদের একটি মজার পদ্ধতির কথা বলছি। এ খানিকটা ঐ হাত-পা নাড়া সেপাই-এর মত, যার কথা প্রথমেই বলেছি। কয়েকটি কাঠির সাহায্যে এই পুতুলদের নড়ন-চড়ন অভিনয় করাতে হবে। তোমরা

সহজেই যে এগুলি তৈরি ক'রে নিতে পারবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

শ্যামদেশের পুতুল নাচের কাঠের-তৈরি অপদেবতা।

প্রাচীন চীনে পথে পথে দেখানো পুতুল নাচের স্টেজ।

প্রথমে পাতলা অথচ শক্ত বোর্ড বা টিন খানিকটা চাই। তার ওপরে মানুষের চেহারার ড্রইং ক'রে নিতে হবে। চেহারার ওপরে যে সাজসজ্জা পরিচ্ছদ থাকবে তারও নক্সা থাকবে কিন্তু। আর একটি কথা, মানুষকে পাশ থেকে দেখলে যেমন দেখা যায় সেই ভাবে, অর্থাৎ profile ক'রে আঁকতে হবে।

কালো কালি দিয়ে ড্রইংটি হয় গেলে, আউট-লাইন ধ'রে ধ'রে ছবিটি কেটে নিতে হবে। হাত দুটিও কাঁধ থেকে কেটে নাও এবং বুকের এপাশে একটি এবং ওপাশে অন্যটি বসিয়ে সুতো বা পিন দিয়ে আটকে নাও। এমন ভাবে আটকাতে হবে যেন হাত দুটি ওপরে নীচে স্বচ্ছন্দে ওঠা-নামা করতে পারে।

এইবার কাঁধের ওপর থেকে গলাটিকে কেটে নিয়ে কাঁধের নীচে ঐ ভাবে আটকে নিতে হবে, যাতে মাথাটি ওপরে নীচে উঠতে নামতে পারে। কয়েকটি কাঠি এবার দরকার। সরু অথচ শক্ত হওয়া চাই। দু'হাতের কব্জির সঙ্গে দুটি কাঠি এঁটে নাও। মুণ্ডুর সঙ্গেও একটি

[illegible] নিতে হবে। কাঠিগুলি এমন লম্বা চাই যাতে পুতুলের দেহটা ছাড়িয়ে বেশ কিছু নীচে অবধি নামে।

একটু আগে যা বলেছি, তিনটি কাঠি লাগবে, তা ছাড়াও আর একটি কাঠি এঁটে নিতে হবে আসল দেহটির সঙ্গে। সেটি নীচের দিকে ধ'রে থাকলে পুতুলের দেহটি সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঐ কাঠিটি এক হাতে ধ'রে অন্য হাতে অন্য কাঠিগুলি নাড়ালে পুতুলের হাত ও মাথা নড়তে থাকবে।

এতক্ষণে পুতুলের কাজ মোটামুটি ভাবে শেষ হ'ল। এখন দুটি পর্দা চাই। একটি সাদা পাতলা কাপড়ের পর্দা টান টান ক'রে খাটানো থাকবে। ঐটির গায়ে পুতুলগুলি নড়বে-চড়বে অভিনয় করবে। আর একটি মোটা কাপড়ের পর্দা চাই পুতুল-নাচিয়েদের আড়াল করবার জন্যে। পুতুল-নাচিয়েরা নীচে থেকে কাঠি দিয়ে পুতুল নাচাবে অথচ সামনের দর্শক তাদের দেখতে পাবে না।

বাড়ীতে ছোট-খাটো ষ্টেজ তৈরি ক'রে এরকম পুতুলনাচ দেখানো যায়। জাভা বলিদ্বীপে আবার এইরকম পুতুল হয় শক্ত চামড়া থেকে। সেই চামড়ার ওপর কেটে কেটে নানা অলঙ্করণ করে তারা। আলো পড়লে সেগুলি বড় চমৎকার দেখায়। চীনদেশেও এরকম ছিল আগে। তারা আবার ঐ ফাঁকগুলিতে রঙিন স্বচ্ছ কাপড় বা কাগজ দিয়ে অপূর্ব রঙ-বাহার দৃশ্যের সৃষ্টি করত।

রুচি আর কল্পনার রঙ দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হবে। এখনকার দিনে আলোর অভাব নেই। বিশেষ শহরে। নানা রঙের আলো আছে, নানা রকম জোরের আলো লাগানোও সহজ। তাছাড়া, মঞ্চ সাজানোর নানান সরঞ্জাম, হরেকরকমের কাপড়-চোপড় জোগাড় করাও শক্ত নয়। কুঁচি ক'রে হলদে বা হাল্কা ব্লু-রঙের পাতলা সিল্ক বা সাটিন ঝুলিয়ে দিলে খুব সুন্দর দেখায়। স্টেজের মধ্যে আলোগুলি এমনভাবে রাখতে হবে যাতে বাইরে আলো না যায়। সাদা পর্দার সামনে আলো পড়বে আবার পর্দার পেছনেও আলো দেওয়া যেতে পারে, তাতে পুতুলগুলি কালো সিলুয়েট দেখাবে। তোমাদের যেভাবে খুশি আলোর ব্যবস্থা ক'রে নিতে পার।

কিন্তু আসল কথাটাই এখনো বলা হয় নি। কথাটা হচ্ছে নাটক। কি অভিনয় হবে? যে নাটক অভিনয় হবে তারই চরিত্রগুলির পুতুল চাই। সুতরাং আগে নাটক ঠিক ক'রে তবেই না পুতুল তৈরি করতে হবে? পুতুল-নাচের উপযুক্ত নাটক পাওয়া শক্ত—নাটক তৈরি ক'রে নিতে হবে। নাটকের মালমশলা চারদিকে ছড়ানো আছে, শুধু খুঁজে নেওয়া। ইতিহাসের ছোট ছোট ঘটনা আছে, রামায়ণ মহাভারতের হাজার হাজার গল্প রয়েছে। আবার হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্রের গল্প থেকেও নাটক করা যায়। কত রূপকথার গল্পকে সুন্দর ভাবে দেখানো যায়। আর কত মজাদার হাসির গল্প বানিয়ে অভিনয় করা যেতে পারে।

পুতুলনাচের পক্ষে কোন্ নাটক ভাল? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, যে-কোন নাটকই ভাল, তবে সবচেয়ে মজা হয়, [illegible]য়ে জ'মে ওঠে হাসির গল্প। একটু অদ্ভুতত্ব দেখালেই হ'ল, সবাই হেসে উঠবে। যেমন ধরো, টিংটিঙে এক [illegible]তার সেপাই যদি নিজের বীরত্বের বড়াই করে আর বিরাট এক তলোয়ার নিয়ে আস্ফালন করে কিন্তু সামান্য আওয়াজেই আবার ভয়ে কুঁকড়ে যায়, তা'হলে কী মজাই না হয়। ছোট বড় সব দর্শকই হাসিতে ফেটে

[illegible]আর সেইটাই হবে তোমাদের সাফল্য।

—•—

সম্পাদকীয়

নানা কারণে প্রবাসী ষষ্টিবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থটি সঙ্কল্পিত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভবপর হ'ল না, বিলম্ব হ'ল। অবশ্য, গ্রন্থটি প্রবাসীর ষষ্টিবর্ষ বয়ঃপূর্ত্তির স্মারক, এবং এই ষষ্টিপূর্ত্তি ঘটেছে বিগত চৈত্র-সংক্রান্তিতে; সেদিক্ দিয়ে বিচার করলে বলা যেতে পারে, গ্রন্থটি যথোপযুক্ত সময়েই প্রকাশিত হচ্ছে, তবুও যাঁরা বহুদিন হ'ল অগ্রিম মূল্য দিয়ে গ্রন্থটির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদের কাছে আমরা লজ্জিত।

এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্কল্প যখন আমরা গ্রহণ করি, তখন এই বিশ্বাস নিয়েই করেছিলাম যে বাংলা দেশে কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা তাঁদের আজকের দিনের প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রবাসীর কাছে কিছু পরিমাণেও অন্ততঃ ঋণী আছেন, এবং যাঁরা ঠিক সেই ভাবে প্রবাসীর কাছে ঋণী নন, অথচ প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা করেন ও প্রবাসীর বহুবর্ষব্যাপী বিভিন্নমুখী কল্যাণ-প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করেন না, তাঁরাও আমাদের এই উদ্যমকে স্নেহের চক্ষে দেখবেন। তা যে তাঁরা দেখেছেন এই গ্রন্থটিতে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বস্তুতঃ, নানা দিক্ দিয়ে নানা জনের কাছ থেকে এতখানি সহৃদয় আনুকূল্য যে আমরা পাব—তা নিজেরাও আমরা আশা করি নি। প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে কি অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং তাঁর প্রবাসীর জন্যে যে কি গভীর মমতা এ দেশের বহু নরনারীর মনে এখনো রয়েছে, এই গ্রন্থ প্রকাশের সূত্রে তার অজস্র পরিচয় আমরা পেয়েছি। এ এক মর্ম্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা।

কয়েকজন খ্যাতনামা লেখক-লেখিকার প্রতিশ্রুত লেখা শেষ অবধি আমরা পাই নি। তাঁদের মধ্যে চারজন, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, রাজশেখর বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অতুল গুপ্ত গ্রন্থটির গ্রন্থনকালের মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছেন। এ আমাদের ও দেশের সকলের অতি বড় দুর্ভাগ্য। অন্য কয়েকজন হয় অস্বাস্থ্য নয়ত অন্য কোনো গুরুতর কারণে প্রতিশ্রুত রচনা আমাদের দিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁরা এজন্যে আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আমরাও পাঠকদের কাছে এ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কি করতে পারি?

কিন্তু আমাদের এর চেয়েও বেশী দুঃখ, যে, কয়েকজন শক্তিমান্ লেখকের উৎকৃষ্ট রচনা ছাপব ব'লে চেয়ে এনেও আমরা ছাপতে সক্ষম হলাম না, গ্রন্থে স্থানাভাব ঘটল ব'লে। এঁদের কাছে আমরা অপরাধী এবং বুঝতে পারছি না কি করলে এ অপরাধের স্খালন হয়। ৬০০ পৃষ্ঠার বই হবে ব'লে সুরু করা হয়েছিল, সেই ধারণা থেকে বইটির মূল্য নির্দ্ধারণও করা হয়েছিল, অনুমিত পৃষ্ঠাসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে কার্য্যকালে হয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫০। স্থানাভাব কথাটা কেন ব্যবহার করেছি, আশা করি এর থেকে সেটা বোঝা যাবে, এবং বুঝে এঁরা আমাদের ক্ষমা করতে চেষ্টা করবেন।

এই গ্রন্থ সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছেন শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, শ্রীমতী শান্তা দেবী ও শ্রীমতী বাণী রায় যিনি গ্রন্থের মহিলা বিভাগটির সম্পাদনার ভার সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল নানা ভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থের সমস্ত প্রতিকৃতিগুলি (কালিকলমের পোর্ট্রেট) এঁকেছেন শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ইত্যাদি চিত্রিত করেছেন তিনি এবং শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী। এঁরা দুজন যে কত উৎসাহ ক'রে এবং কি স্নেহশীল মন নিয়ে এই কাজ করেছেন তার একমাত্র সাক্ষী আমরাই। এঁদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটিতে বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালীদের বিষয়েই বেশী ক'রে বলা হয়েছে। বিবিধ প্রসঙ্গ থেকে উদ্ধৃতিগুলিতেও এইটেই আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, বাংলা ও বাঙালী সম্বন্ধে সব অবস্থায় এবং সব সময় কি আশ্চর্য্য সচেতনতা 'ভারত-মুক্তি-সাধক' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মনে ছিল। বাঙালীরা নিজেদের নিয়েই থাকুক, নিজেদের বাইরে কিছু না দেখুক, এ তিনি কদাপি চাইতেন না, আমরাও তা চাই না। কিন্তু তিনি যেমন বিশ্বাস করতেন, আমরাও তেমনি বিশ্বাস করি, যে, ভারতীয়তার সঙ্গে বাঙালীত্বের কেবল যে কোনো বিরোধ নেই তা নয়, বাঙালীর পক্ষে উত্তম বাঙালী না হয়ে উত্তম ভারতীয় নাগরিক হবার চেষ্টা হাস্তকর।

এক শতাব্দীর অধিক কাল ধ'রে ভগবান্ বাংলা দেশে একের পর এক বহু মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীকে পাঠিয়েছেন, আর এঁদের অধিকাংশ স্বল্প বা দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন বিগত ষাট বৎসরের মধ্যে। একসঙ্গে এত মহামানবের সমাবেশ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও কখনও দেখা গিয়েছে ব'লে আমাদের জানা নেই। হয়ত এ রকম ঘটেছিল, প্রয়োজনটা আমাদেরই সবচেয়ে বেশী ব'লে। হয়ত ভগবান্ চেষ্টা ক'রে দেখছিলেন, এত ক'রেও এই জাতির মানুষগুলিকে আরও একটু মানুষের মত ক'রে তোলা যায় কি না। তাঁর সেই চেষ্টার ফল কি হয়েছে, নিজের চার পাশে তাকিয়ে তা অনুধাবন করতে একজন চিন্তাশীল বাঙালীকেও যদি এই গ্রন্থটি উদ্বুদ্ধ করে, তা হলেই আমরা আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হ'ল ব'লে মনে করব।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী
শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সাহিত্য-বিষয়ক বাংলা সাপ্তাহিক।

বার্ষিক ৩, টাকা; ষাণ্মাসিক ১.৫০ টাকা।

উইক্‌লি ওয়েস্ট বেঙ্গল

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত ইংরেজি সাপ্তাহিক।

বার্ষিক ৬, টাকা; ষাণ্মাসিক ৩, টাকা।

বসুন্ধরা

গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি-বিষয়ক বাংলা মাসিক পত্র।

বার্ষিক ২, টাকা।

শ্রমিক-বার্তা

শ্রমিক-কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা-হিন্দি পাক্ষিক পত্র।

বার্ষিক ১.৫০ টাকা।

পশ্চিম বংগাল

নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক ৩, টাকা; ষাণ্মাসিক ১.৫০ টাকা।

মগরেবী বংগাল

উর্দু ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক ৩, টাকা; ষাণ্মাসিক ১.৫০ টাকা।

গ্রাহক হবার জন্য এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:

প্রচার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্‌ডিংস্‌, কলিকাতা।

সবার চাইতে ভালো
আই সি আই-এর
স্যাভলন্
'হিবিটেন' ও 'সেটাভ্‌লন্'
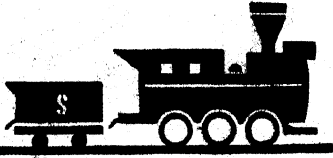
EGS
এক্সপ্রেস
গুডস্
সার্ভিস্
ছোট-ছোট মাল এখন আমরা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছি
হাওড়া থেকে
ধানবাদ ২য় দিনে
পাটনা জংশন ৩য় দিনে
গয়া ৩য় দিনে
ভাগলপুর ৩য় দিনে
রামপুরহাট ৩য় দিনে
ই, জি, এস এর সুযোগ নিন
গুডস্ সুপারভাইজর, হাওড়া এর কাছে বিশদ বিবরণ পাবেন
পূর্ব রেলওয়ে
adarts/61